২৭শ বর্ষ] ১৩৫৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

গল্প :—

বিদেশী গল্প :—

সংকলন :—

কবিতা :—

যুগবাণী :—

সূচিপত্র

প্রবন্ধ :—

উপন্যাস :—

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ :—

কবিতা

প্রবন্ধ

গল্প

শ্রীরমণীমোহন মল্লিকের সৌজন্যে]

গণদেবতা

জোড়াসাঁকো

—পূর্ণেন্দু পাল

(শান্তিনিকেতন)

তিনি এলেন

ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথ দেখাতে

বিশ্ববিধানের ধারায় দেখি যখনই কোন রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় দেশের বুকে ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন কোন এক যুগাবতার। তাঁর সারাজীবনের সাধনার দ্বারা তিনি দেশকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন ঠিক সেই ধরণের এক মহাপুরুষ। ভারতের অন্তর যখন আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'তে বসেছে সেই সময়ে তিনি ভারতের বুকে আবির্ভূত হ'লেন তাঁর যুগান্তব্যাপী উদাত্ত বাণী নিয়ে। তাঁর এই বাণীই সেদিনের সেই আত্মবিস্মৃত ভারতকে ফিরিয়ে দিয়েছে আত্ম-চেতনা, আত্মানুভূতি।

আজ 'বসুমতীর' জয়ন্তী উৎসবে রামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ না উঠে পারে না, কারণ ঠাকুরের সেই বাণীকে সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে বসুমতীই প্রকাশ করেছে ও জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং জনসাধারণের আত্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা নিয়েই বসুমতীর পথ-চলা সুরু। তার সেই সাতাশ বছরের পথ-চলাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যেই বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের এই জয়ন্তীর আয়োজন।
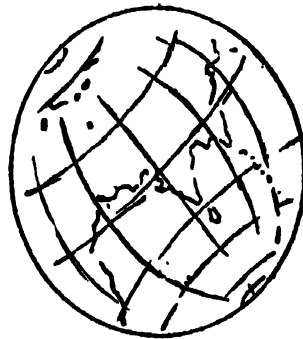
মাসিক বসুমতী • রজত জয়ন্তী সংখ্যা
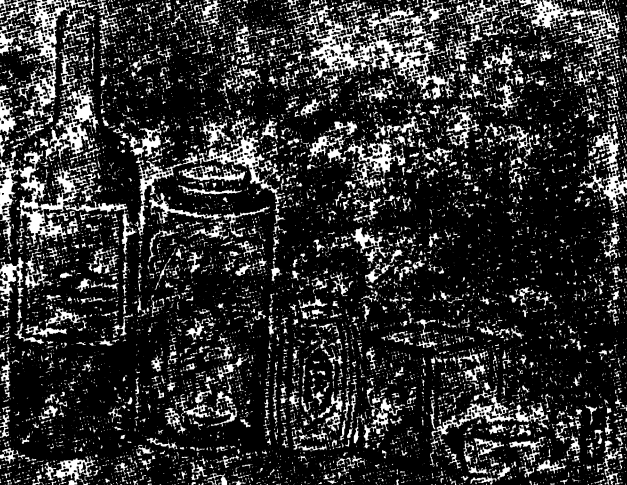
সৌন্দর্যের স্বপ্নজাল বোনে
হিমানী
স্নো, সাবান, সেন্ট, কেশ তৈল
লিপষ্টীক, বডি পাউডার
নখের পালিশ প্রভৃতি

Blessed are the pure in spirit, for they shall see God.

—JESUS CHRIST

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছিলে আর এক রকম, তখন স্পষ্ট স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, 'আলু লও' 'পয়সা দাও।'

"বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁহাকে দর্শনের পর শাস্ত্র, science সব খড়কুটো বোধ হয়।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ, এ সব আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন?

"কিন্তু যো-সো ক'রে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হউক আর বেড়া ডিঙিয়েই হউক, তখন ইচ্ছা হয় ত তিনিই ব'লে দিবেন, তাঁর ক'খানা বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর দ্বারবান্ সব সেলাম ক'রবে। (সকলের হাস্য)।

এক জন ভক্ত। এখন বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম্ম চাই। সাধন চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে ব'সে থাকলে হবে না। তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো—'দেখা দাও' ব'লে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনীকাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোক বলুক যে, ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিনকতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো। শুধু 'তিনি আছেন' ব'লে ব'সে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে, পুকুরের পাড়ে শুধু ব'সে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার কর, চার ফেল। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয় ত মাছের খানিকটা একবার দেখা গেল, মাছটা ধপাঙ্ ক'রে উঠলো। যখন দেখা গেল, আরও আনন্দ।

—কথামৃত

একতার বুলি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল কংগ্রেসের ভিতর থেকে যখন ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল অতি দ্রুতবেগে খসে পড়ছে, তখন কংগ্রেসের নেতারা উচ্চকণ্ঠে দাবী করছেন যে, দেশের মঙ্গল সাধন করতে হ'লে সব চেয়ে বেশী দরকার—একতার। কোটিপতি থেকে আরম্ভ করে দীন-দরিদ্র শ্রমিকের মধ্যে চাই আদর্শগত ও কর্ম্মপন্থাগত একতা; আর তা না থাকলে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সুষ্ঠু ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনায়, এমন কি দেশরক্ষার কাজ পর্য্যন্ত ব্যাহত হবে।

এই একতার মাহাত্ম্য ছেলে-বেলা থেকে শুনে আসছি। বাল্যকালে রঙ্গলালের কবিতায় পড়েছিলুম—

"একতায় হিন্দু রাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন
সে ভাব থাকিত যদি পার হয়ে সিন্ধু নদী
আসিতে কি পারিত যবন?"

সেই সময় থেকেই আমার মনে এই প্রশ্ন উঠতো যে, কোন হিন্দু রাজারই কি সৈন্য-সংখ্যা পাঠান বা মোগলদের চেয়ে বেশী ছিল না? ১০০৮ খৃষ্টাব্দে যখন সুলতান মামুদের সঙ্গে জয়পালের ছেলে অনঙ্গপালের যুদ্ধ হয়, তখন তো উত্তর-ভারতের সব রাজাই অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অনঙ্গপালের সাহায্য করেছিলেন। একতার কোন অভাব হয়নি। হিন্দুদের সৈন্য-সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশী ছিল। তবুও হিন্দুরা হেরে গেল কেন? রাজপুতেরা তখন একজোট হয়ে প্রাণপণে লড়েছিল। তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কেউ প্রাণের ভয়ে পালায়নি। কিন্তু একতা সত্ত্বেও তারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি।

তার পর ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। ইউরোপ তখন ঠিক ভারতবর্ষের মতই ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সুবিধা পেলেই তারা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করতো। ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী একতা তাদের ছিল না। কিন্তু এক দিকে স্পেন, আর অপর দিকে ভিয়েনা পর্য্যন্ত গিয়েই তুর্ক-সৈন্যকে থেমে যেতে হয়েছিল। কেন? একতার অভাব তো ইউরোপে যথেষ্টই ছিল। তবু ইউরোপ পরাধীন হল না কেন?

এই 'কেন'র উত্তর যে কি, তা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাববার অনেক অবসর এ-জীবনে পেয়েছি। আমার মনে হয় যে, আমাদের জাতটার প্রাণশক্তির অভাব হয়েছে; অন্তরের আনন্দ আমাদের শুকিয়ে গেছে; রকম-বেরকমের বিধি-নিষেধের চাপে এই শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ ছিঁড়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। মোগল, পাঠান বা ইংরেজের কাছে গোটা কতক লড়ায়ে হেরে গিয়েছি বলেই যে আমরা পরাধীন তা নয়। আমাদের অন্তরের দুর্ব্বলতাই মোগল, পাঠান, ইংরেজকে ডেকে এনে আমাদের ঘাড়ের উপর বসিয়ে দিয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ বাংলার মসনদে উঠে বসেনি। আমাদের মনগুলো নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল বলেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি সেকালের রাজনৈতিক পাণ্ডারা "একতাবদ্ধ" হয়ে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

শুধু কুচ-কাওয়াজ বা ড্রিলের জোরে এ পরাধীনতা সারবে না। রোগের মূল যেখানে, সেইখানে আমাদের ওষুধ লাগাতে হবে। যাঁরা কর্ম্মী, তাঁরা বাইরের কাজের মধ্যে একতা আনবার জন্যে স্বভাবতই ব্যস্ত। কিন্তু সে একতাকে স্থায়ী করতে গেলে এ জাতের মনের গোড়ায় কাজের গোড়াপত্তন করতে হবে। এ জাত সত্যই যেখানে এক, সেইখানে কাজের বনিয়াদ গাঁথতে হবে।

আমাদের পুঁথিতে বলে যে, শক্তির তিন রূপ—ইচ্ছা, জ্ঞান আর ক্রিয়া। কোন কাজ করতে হলে একটা অভাব বোধ, আর সেই অভাব ঘোচাবার তীব্র ইচ্ছা থাকা চাই। তার পর যে কাজটা করতে হবে, তার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। এই ইচ্ছা আর জ্ঞানের মধ্যে যদি কোন রকম গোঁজামিল থাকে, তা হলে বাইরের কাজে তা' ফুটে বার হতেই হবে। একটা যা'-তা' কাজ অবলম্বন করে একতা গড়া চলে না।

১৯০৭ সালে যখন সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যায় তখন এ দেশের মডারেটরা 'একতা চাই,—একতা চাই' করে চীৎকার আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তখন যদি দেশের লোক একতার খাতিরে মডারেটদের কথায় সায় দিয়ে যেত, তা হলে দেশের কি বিশেষ কিছু লাভ হতো? মডারেটদের স্বাধীনতা পাবার ইচ্ছাও ছিল না; আর কি ক'রে যে স্বাধীনতা পেতে হয়, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও ছিল না। সুতরাং একতার খাতিরে দেশ যে তাদের কাজে সায় দিতে পারেনি, তাতে দেশের লোকের লাভ বই লোকসান হয়নি।

আজ কংগ্রেসী নেতারাও দেশের কাছে একতার দাবী করছেন। তাঁরা না কি অহিংস সংগ্রামের ফলে দেশকে স্বাধীন করে ফেলেছেন—যদিও রাজা ষষ্ঠ জর্জ আর লর্ড মাউণ্টব্যাটন এখনও আমাদের ঘাড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। অন্যায় জেনেও ইংরেজের হুকুম মেনে নিয়ে তাঁরা দেশকে বিভক্ত করেছেন; এবং তার পর থেকে পাকিস্তানী সমস্যার সমাধান করতে না পেরে আবল-তাবল বকছেন। কাশ্মীর আর হায়দারাবাদ নিয়ে নেতারা চক্ষে অন্ধকার দেখছেন; তবুও সস্তায় কিস্তি মারবার লোভে তাঁরা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। আজ এই কংগ্রেসী নেতারাই পুরাতন মডারেটদের স্থান অধিকার করেছেন। তাঁরা কি চান, সে সম্বন্ধে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা নেই। কি করলে যে দেশ সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁদের নিজেদের হাতে খানিকটা রাজনৈতিক ক্ষমতা এসেছে; আর এই ক্ষমতাটাকে স্থায়ী ভাবে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের অপরিসীম। তাই গলা ফাটিয়ে তাঁরা সকলকে জানাচ্ছেন যে, তাঁদের পতাকা-তলে সমবেত হওয়া ছাড়া দেশের সদ্‌গতির আর অন্য উপায় নেই।

এ সত্যটা তাঁদের চোখে পড়ছে না যে, ইংরেজের সঙ্গে রফা-নিষ্পত্তি করে তারা দেশের লোকের উপর খানিকটা প্রভুত্ব পেয়েছেন বটে; কিন্তু তাতে দেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা বিন্দুমাত্র কমেনি। অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, রোগ, শোক, মহামারী দেশকে সমান ভাবেই ঘিরে আছে। কতকটা স্বাধীনতার আস্বাদ ইংরেজের কৃপায় তাঁদের মিলে গেছে বলেই যে বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাঁদের হুকুম তামিল করলেই দেশের জনসাধারণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে, তা' মনে করবার কোনই কারণ নেই। যেখানে মিলনের মূলে সত্য নেই, সেখানে উৎসাহ ফিকে হয়ে যাবে, কাজে শ্রদ্ধা থাকবে না, লোক-দেখানো সাফল্যের জন্য মন লোলুপ হয়ে উঠবে। আর তার অভাবে সব কাজ ভেঙ্গে পড়বে, যেমন অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু বার হয়েছিল। এসো, আমরা ভিতর থেকে গড়ি এমন জিনিষ যা নিজের বেগে নিজের পথ সৃষ্টি করে নেবে—যা ভিতরের, গোড়ার একতাকে বাইরে টেনে মূর্ত্ত করে তুলবে।

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা!
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে
পরাণ ঢালি!

—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—গোপাল ঘোষ

(অপ্রকাশিত)

জবা ফুল

জবা বুঝি গিয়েছিলি মোষ-বলি দেখ্‌তে
কাপড় জামা ডুবিয়ে এলি টকটকে রক্তে;
ফ্যাল খুলে ফ্যাল পাঞ্জাবীটা, নাওগে বল্‌ছি যাও,
কবচ-বাঁধা সুতো গলার—রক্তে ভিজে তাও!

হাতীশুঁড়ো

হাতীশুঁড়োর শুঁড়ের তিলক ক্ষুদে মেয়েটি,
দেখে বলে ঢোল্‌কলমী 'কে গো? কে এটি?'
তাই শুনে অলক্ষ্মী দেবীর গলায় ছেঁড়া মালার,
কালকাসুন্দে বলে 'ওমা, ও আমাদের পাড়ার।'

স্থলপদ্ম

গুল্‌-গুলাবি কাপড় কি বা ঘুরিয়ে পরেছে
গিলে করা ওড়নাখানি হাওয়ায় ধরেছে,
যেমন বা রং তেমন গড়ন, কে? হ্যাঁ গা! ও কে?
স্থলের পদ্ম টোক্কা দিলে জলের পদ্মকে!

-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

"আমার এ মাসের বসুমতীটি ভাল ক'রে রেখে দিও মা, খোকা যেন হাত না দেয়।"

মাসিক বসুমতীর পঁচিশ বৎসর অতিক্রম হল। এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে মাসিক বসুমতী ভারতের ঘরে-ঘরে কত আনন্দ-রস পরিবেশন করেছে, আপনার নব নব রচনা-সম্ভারে কত নর-নারীর হৃদয়ে অমৃতধারা সিঞ্চন করছে। কত পারিবারিক স্মৃতি, জীবনের কত ছোট-খাটো ঘটনা জড়িয়ে আছে আমাদের প্রিয় বসুমতীর পাতায় পাতায়। আজ বসুমতীর অতিক্রান্ত পঁচিশ বৎসরে রজত জয়ন্তীর দিনে গত দিনের কত স্মৃতি মনের দুয়ারে ভীড় করে দাঁড়ায়, আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, স্মৃতিতে দু'চোখ ভরে আসে অশ্রুতে। কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বসুমতী আজ দাঁড়িয়েছে পঁচিশ বৎসরে, অশোক-চক্রাঙ্কিত ত্রিবর্ণ পতাকার তলে, স্বাধীন ভারতে আপনার আশ্চর্য-সুন্দর মহিমায়। আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগে। পারিবারিক কত স্মৃতি চোখের সামনে ভাসছে। বসুমতী আসতো আমাদের বাড়ী মাসে মাসে তার অপরূপ দেহ-সম্ভার নিয়ে। ছেলেমানুষ ছিলাম; দেখতাম তখন এই বইখানি আসা মাত্র কে আগে পড়বে, এই নিয়ে গোলমাল হট্টগোল বেধে যেত। আমরা যেমন ঝগড়া করতাম শিশুসাথী আর মৌচাক এলে। তার পর মনে পড়ে, আমাদের চায়ের আসরের সুন্দর মধুময় অবসরটুকু শরতের সোনার মেঘের মত হাল্কা হয়ে উড়ে যেত। আমাদের দাদাদের অন্যান্য পত্রিকা আসতো, মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক, আর আমার দিদির আসতো মাসিক বসুমতী। বসুমতী আসার প্রথম কয়েক দিন সাহিত্যের সরস আলোচনায় আমাদের পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীটি সব সময় সরগরম হয়ে থাকতো। বুঝতে পারতাম না, ঐটুকু বইয়ের মধ্যে এত কথা কি করে থাকতে পারে? কোন দিন নির্জন দুপুরের অখণ্ড অবসরে ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে উঠে যেতাম তেতলার লাইব্রেরী-ঘরে। দাদা দিদি প্রভাতদা অমলদা সকলে স্কুলে গেছেন, বাবা নীচের ঘরে বিশ্রাম করছেন হয়তো বা চ'লে গেছেন, মা আছেন নিদ্রিত, সে জন্ত লাইব্রেরী-ঘরে যেতে বিন্দুমাত্র বাধা ছিল না। চাকর কৈলাসের কর্তব্য ছিল, ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেলে লাইব্রেরী-ঘর ঝেড়ে-মুছে, জানালা-দরজা বন্ধ করে রাখা। সে নিত্য কাজ শেষ করে তেতলার ছাতের কার্ণিশের ছায়ায় কিংবা সিঁড়ির নীচে ঘুমিয়ে থাকতো। ও-ঘরে আমাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল বলেই ও-ঘরের প্রতি আমাদের এত কৌতূহল ছিল। বসুমতীতে আমাদের হাত দেওয়ার অধিকার ছিল না বলেই বসুমতীকে পাওয়ার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল। কোন রকমে লাইব্রেরীর দরজা খুলে টেবিলে রাখা সেই মাসের বসুমতীর ওপরের মলাটে মা বসুমতীর ছবিটির ওপর সোনার রংয়ের ধান-শীর্ষের ওপর হাত বুলাতাম। আর দিদি যদি বইখানি বইয়ের আলমারীতে তুলে রেখে যেতেন তাহলে আর আমাদের দুঃখ রাখবার স্থান হত না। বসুমতীর সংগে আমাদের পরিবারের এক বেদনাময় স্মৃতি জড়ান আছে, আজ তাই মনে পড়ছে। দিদিকে আমি চোখ বুজে আজও স্পষ্ট মনে করতে পারি। তাঁর বুদ্ধি আর প্রতিভা-মাখা চোখ দু'টি, সুন্দর মুখ, আর কাল চুলের অরণ্যে আমার কল্পনা হারিয়ে যায়। দিদির বিয়ে হয়েছিল বাগবাজারে। তিনি যখন বাগবাজারে থাকতেন, মাঝে মাঝে পার্ক ষ্ট্রীটে চিঠি লিখতেন। তাঁর চিঠিতে থাকতো—"আমার এ-মাসের বসুমতীটা ভাল করে রেখে দিও মা, খোকা যেন হাত না দেয়" ইত্যাদি কথায় তাঁর চিঠি ভরা থাকতো! বসুমতী ছিল দিদির প্রিয় বস্তু, তাঁর অবর্তমানে প্রিয় বস্তুটির যদি অনাদর হয়, এ আশঙ্কা তাঁর চিঠিকে দীর্ঘ করে তুলতো। মা তাঁকে কত বার বলতেন বসুমতীটা বাগবাজারে নিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তিনি আপত্তি করতেন, দিদি ছিলেন কবি, সাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণ। বসুমতীতে তাঁর লেখা প্রকাশ হত মাঝে মাঝে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যপ্রিয়তা বাগবাজারে সুপরিস্ফুট হতে পারতো না। অজস্র প্রাণ-কল্লোলে উচ্ছ্বসিত হত না সেখানকার চায়ের টেবিল। তাই বোধ হয়, তিনি তাঁর প্রিয় বসুমতীকে সেখানে স্থানান্তরিত করতেন না। চা খেতে খেতে দিদি সামান্য চায়ের কথাই তুলতেন, বলতেন, "টু লিভস্ এণ্ড এ বাড্" এবং এই সামান্য কথাতেই উঠতো কথার ঝড়, দু'টো পাতা এবং একটা কুঁড়িতেই তুফান উঠতো চায়ের পেয়ালায়। সে আনন্দময়ী মূর্তি ভোলবার নয়! এর পর কিছু-কাল গেল; দিদি গেলেন শিমলা পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে, আর ফিরে এলেন না। শিমলা শৈলের ছায়াচ্ছন্ন অসীম নীরবতার মধ্যে তাঁর শেষ নিশ্বাস মিলিয়ে গেল। সে খবর পেয়ে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম, চোখের জলের সামনে ভেসে উঠেছিল দাদাকে লেখা তাঁর কয়েক দিন আগেকার চিঠি। কত কথার পর দাদাকে সে লিখেছে, "এবার বসুমতীর গল্পগুলো এবং আমার কবিতাটি কেমন হয়েছে?" তার পর কতবার দেখেছি, দিদির গ্রামোফোন, অর্গান, আর বাঁধানো বসুমতীর ওপর হাত রেখে সবার চোখের আড়ালে নিঃশব্দে মা কাঁদতেন। দিদি মারা যাবার পর বসুমতী এলে আমারও চোখ দু'টি জলে ভরে উঠতো। বুক ঠেলে উঠতো তপ্ত নিশ্বাস। তার পর সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর পরিক্রমণ কত বার শেষ হল। মা'ও চলে গেলেন। আজ বসুমতীর রজত জয়ন্তীর দিনে দেখি হৃদয়ের কোণে কোণে স্মৃতির ধুলো জমেছে। তাই বলছিলাম, বসুমতী আমাদের জীবনের বহু স্মৃতির সংগে জড়ান। প্রার্থনা করি, চিরদিন যেন সে নবতর আনন্দ-সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ভারতের ঘরে ঘরে আনন্দ-দীপ জালিয়ে দিয়ে যায়। ইতি

শ্রীমতী শেফালী মুখোপাধ্যায়
কামতোল। দ্বারভঙ্গ। বিহার

মাসিক বসুমতীর রজত জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন বাণী আসছে নানান্ দেশ বিদেশ থেকে। আপাতত একটি পত্র দেওয়া হল। অন্যান্য ক্রমশ প্রকাশ্য।

সতীশচন্দ্র

যুগাবতার রামকৃষ্ণ আনলেন জাতির জীবনে ধর্ম্মের ও সেবার মন্ত্র। মৃতপ্রায় তরুকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে পুনর্জীবিত করবার জন্য। সেই মন্ত্র তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ ছড়িয়ে দিলেন দেশের ও দশের মধ্যে। নর-নারায়ণের সেবায় করলেন আত্মোৎসর্গ। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, আর্ত্তকে শুশ্রূষা। আর তাঁর আর এক ভক্ত উপেন্দ্রনাথ জাতির মনের ক্ষুধা, জ্ঞানের পিপাসা দূর করা জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করলেন। দেশকে, জাতিকে, কৃষ্টিকে, ধর্ম্মকে জানতে হলে জনসাধারণের সেই সংক্রান্তীয় পুস্তকের সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। ধর্ম্মগ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য, সৎসাহিত্য দুর্ম্মূল্য, জাতি দরিদ্র। এই অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্য, দরিদ্র দেশবাসীর হাতে জ্ঞানের অমৃত ভাণ্ডার তুলে দেবার জন্য তিনি যেন একটা দানসত্র খুললেন। সুলভে অমূল্য গ্রন্থরাজি। রামকৃষ্ণ-চরণ ভরসা করে 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্রে দীক্ষিত ভক্তবর অসম্ভবকে করে তুললেন সম্ভব। দেশে ধর্ম্মের বন্যা বয়ে গেল। জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠল।

সতীশচন্দ্র তাঁর পিতা ভক্তিসাধক উপেন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত। পিতার যে সদিচ্ছা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল তিনি তা করলেন সম্পূর্ণ। তাঁর কর্ম্মজীবন একটা সাধনা। ভারতের জাতীয় জীবন তখন উন্মেষোন্মুখ, সেই সদ্য ঘুমভাঙ্গা জাতির এক হাতে তুলে দিলেন দর্শন, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের রত্নমঞ্জুষা। আর এক হাতে দিলেন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অমূল্য রচনা-সম্ভার। সুলভ সাহিত্য-প্রচার সাহিত্য-জগতে সতীশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের প্রয়োজনীয়তা যেমন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি রোটারী মেশিন প্রবর্ত্তন ও রয়টারের গ্রাহক হয়ে বাঙ্গালা সংবাদপত্র-জগতে তিনি হয়েছিলেন অগ্রগামী। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির তাঁর চির অম্লান কীর্ত্তি। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বসুমতী এবং গ্রন্থাবলী তাঁহারই কীর্ত্তিগাথায় দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করছে। আর তাঁর নিজের হাতে রোপিত মাসিক বসুমতী আজ বিশাল মহীরুহতে পরিণত হয়ে, ঊর্দ্ধে জয়গান করছে। তাঁরই আশীর্ব্বাদে আজ মাসিক বসুমতী সুধী-সমাজে বাঙ্গালী জাতির মুখপত্র হিসাবে গণ্য।

মধ্যমা কন্যার বিয়োগের পর থেকেই সতীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। তার ওপর বংশের অলঙ্কার-স্বরূপ প্রাণপ্রিয় একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের অকাল বিয়োগে তিনি একেবারে যেন নিঃস্ব হয়ে পড়লেন। সে আঘাত তাঁর পার্থিব দেহ সহ্য করতে পারলে না। মৃত্যুর মধ্যে তিনি পেলেন সেই বুকভাঙ্গা বেদনার সান্ত্বনা।

আজ চার বছর হল তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। অজস্র কর্ম্মকোলাহলের মধ্যেও প্রতিটি দিন তাঁর বিয়োগ-ব্যথা অন্তরে অন্তরে আমরা অনুভব করছি। তিনি যে আমাদের মধ্যে নাই সে কথা যেন আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। অমর কীর্ত্তির মাঝেই মানুষ অমরত্ব লাভ করে। তাই তিনি অমর। বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের কর্ম্মিবৃন্দের সহিত মিলিত হয়ে আমরা অক্লান্ত কর্ম্মবীর, নিরলস সাধক সতীশচন্দ্রের চির অম্লান পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
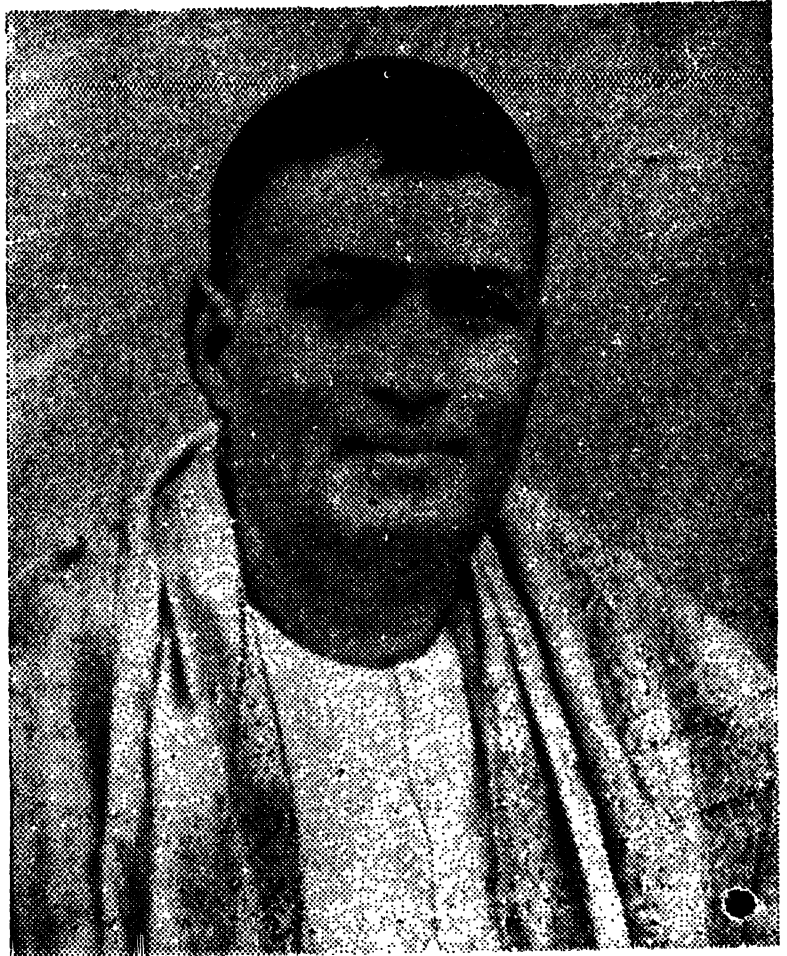
স্বামিজী, নেতাজী ও মহাত্মাজী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বর্ত্তমান যুগে যে সকল মহাপুরুষ ভারত-হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বামিজী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং মহাত্মাজী গান্ধীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মহাপুরুষত্রয় বর্ত্তমান ভারতকে তিনটি বিশিষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত পন্থাত্রয়ের মধ্যে সাম্য বা বৈষম্য কোথায় তাহা শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তাঁহার 'জয়তু নেতাজী' পুস্তকে সুস্পষ্ট ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন এবং 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, ভাব তেমন গভীর এবং বিশ্লেষণও তেমন তীক্ষ্ণ। মোহিতলালের সুচিন্তিত তুলনার বিদ্যুতালোকে আমরা এই প্রবন্ধে দেখিব, স্বামিজী, নেতাজী ও মহাত্মাজীর মধ্যে ঐক্য বা পার্থক্য কি ?

দেশ-বিদেশের বহু লোকে স্বামিজীর বাণী ব্যাখ্যা করেছেন। সেইগুলির মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লেগেছে ভগ্নী নিবেদিতা, মতিলাল রায় এবং মোহিতলাল মজুমদারের রচনা। আমার মনে হয়, মোহিতলালের মত কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকই স্বামিজীকে এত গভীর ভাবে বোঝেন নাই। বাংলার নবযুগ এবং বাঙ্গালীর বিশেষত্ব বুঝিতে যাইয়া তিনি স্বামিজীর বিশিষ্ট স্বরূপটি ধরিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন, "স্বামিজীর মত সন্ন্যাসী অথচ দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ পূর্বে আর ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই।"···"বাঙ্গালীর প্রতিভাই ভারতীয় সাধনার বিচিত্র ও বহুমুখী প্রয়াসকে আত্মসাৎ করিয়া এবার যে নূতন বাণী ঘোষণা করিল তাহাতে জীব ও ব্রহ্ম, ইহ ও পর, নিজের মোক্ষ ও পরের মুক্তি, আর্থিক ও পরমার্থিকের ভেদ রহিল না। এই মন্ত্রই স্বামী বিবেকানন্দের অপার্থিব মুক্তি-পিপাসাকে পার্থিব মুক্তি-পিপাসার সহিত অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। আত্মার বন্ধন ও দেহের বন্ধন যে দুই-ই সমান এবং দেহের বন্ধন-দশাই অগ্রে মোচন করিতে হইবে, এই মহাবাণী তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বজ্রকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন।" (৮২ পৃষ্ঠা)। স্বামিজীর স্বদেশপ্রেমের অলৌকিকত্ব তাঁহার জীবনী-লেখক বিদেশী রোমাঁ রোলাঁ এবং ভগ্নী নিবেদিতাও বুঝিয়াছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ বলেন, "মাতৃভূমি ভারতের সেই সর্বাঙ্গ-নগ্ন মূর্ত্তি ও সর্বপ্রকার শোচনীয়তা তাঁহার চিত্তগোচর ছিল। অতিশয় হীন শয্যায় শায়িত সর্বাভরণরিক্ত সেই রাজেন্দ্রাণীর দেহ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন।" ভগ্নী নিবেদিতা বলেন, 'স্বামিজী ছিলেন আজন্ম প্রেমিক। প্রেম ছিল তাঁহার জন্মগত সংস্কার। মাতৃভূমি ছিল তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা। স্বদেশের কোন দোষই তিনি ক্ষমা করিতে পারিতেন না, তাহার সংসার-বৈরাগ্যকেও তিনি গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতেন। কারণ, স্বজাতির সকল দোষকে তিনি স্বীয় দোষরূপে দেখিতেন।"

মোহিতলাল আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ স্বজাতির ব্যাধিযন্ত্রণাকে যেমন, হৃত-স্বাস্থ্যকেও তেমন নিজ দেহে ও আত্মায় যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এ যুগে তৎপূর্বে আর কেহ করেন নাই—এই সত্য সর্বাগ্রে ও সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।"···"ব্যক্তিগত মুক্তি-সাধনাকে তুচ্ছ করিয়া এই যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিপ্রেম, ভারতবর্ষে ইহা নূতন। আবার সেই স্বদেশপ্রেম যে অধ্যাত্ম-পিপাসার একটি রূপ ইহা ভারতবর্ষেই সম্ভব।" (২২-২৩ পৃষ্ঠা)। দেশের দুর্বিষহ দারিদ্র্য ভাবিতে ভাবিতে তিনি নির্বাক্, নিস্পন্দ হইতেন, অশ্রু-বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইত। কিন্তু তাঁহার হৃদয়-বেদনার উচ্ছ্বাস রোদন-রবে প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিশপ্ত, শয্যাশায়ী, মৃতকল্প জাতির শিয়রে বসিয়া তাহার বক্ষে ও বাহুতে বলাধান করিবার জন্য তিনি কর্ণে ক্রমাগত মৃতসঞ্জীবনী তত্ত্বমসি মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। জাতির হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বাভাবিক হইলেই সকল দুর্বলতা ও উপসর্গ আপনা হইতেই দূর হইবে ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। এই জন্য তিনি বেদান্তবাণী ও সেবাধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

মহারাষ্ট্রের স্বামী রামদাস এবং পাঞ্জাবের গুরু গোবিন্দসিংহ যাহার সূত্রপাত করিলেন, স্বামিজীর দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে স্বপ্নে দেখিলেন, স্বামিজী তাকে ধ্যানে পাইলেন। মোহিতলাল সত্যই বলিয়াছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তা-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন সেই জাতীয়তা-ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-দৃষ্টিতে আরও বিশুদ্ধ ও গভীর হইয়া উঠে. জাতির হৃদয়ে তিনিই প্রকৃত 'মহাভারতে'র বীজ বপন করেন।' স্বামিজী ছিলেন যুগাচার্য্য, জাতির জাগরণ-মন্ত্রের ঋষি। তিনি যাহা চিত্তগোচর করিলেন, তাহা দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য বহু বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইবে, ইহার ভবিষ্যৎ বাণী তিনি মহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে অকুণ্ঠস্বরে করিয়াছেন। মোহিতলাল বলেন, 'বিবেকানন্দ যাহাকে তত্ত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আসন্ন ভবিষ্যতের প্রয়োজনে চতুর্দিকের মাটিতে বপন করিয়াছিলেন তাহারই একটি বীজ অনতিবিলম্বে অঙ্কুরিত হইয়া নেতাজী নামক বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।" (৮৩ পৃষ্ঠা)। মোহিতলাল আরও বলেন, "জাতির আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পাশ্চাত্যের নিকট হইতে বঙ্কিমচন্দ্র যজ্ঞের যে সমিধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় ভাবে শোধক করিয়া তাহাতে যে অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন সেই অগ্নিতেই স্বামী বিবেকানন্দ নব পুরুষ যজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেন। ভারতের সেই প্রাচীন মুক্তি-সাধনাকেই তিনি ঋষির অরণ্য, যোগীর গুহা এবং ভক্তের আশ্রম হইতে উদ্ধার করিয়া জাতি ও সমাজের জীবন-সমস্যার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। আহুতি শেষে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে যে পুরুষের আবির্ভাব হইল, সেই বাণী যে মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার লৌকিক নাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র।" (৭৬ পৃষ্ঠা) মনীষী মোহিতলাল বলেন, এই অর্থে নেতাজী স্বামিজীর উত্তরসাধক, মন্ত্রশিষ্য বা মানসপুত্র। "স্বামিজীর দেশপ্রেম মন্ত্রই নেতাজীর সাধনায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।" "যে ভারতকে স্বামিজী ধ্যানে লাভ করিয়াছিলেন নেতাজী তাহাকেই মূর্ত্তিতে গড়িয়া

স্বামিজীর প্রভাব নেতাজীর জীবনে বাল্যকাল হইতেই পড়িয়াছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ছিল তাঁহার কাছে অনুপ্রেরণার দিব্য উৎস। সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার জন্য তিনি চিরকুমার রহিলেন। বেলুড় মঠে যোগদান করিবার জন্য তিনি একবার গিয়াছিলেন। বিদেশ হইতে 'উদ্বোধন' সম্পাদককে লিখিত একটী পত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দ স্বামিজীকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মোহিতলালের সিদ্ধান্ত সত্যই। হিন্দুধর্মের যে সনাতন স্বরূপ মহাভারতে পাওয়া যায় তাহাই স্বামীজি বর্ত্তমান যুগে পুনরুদ্ধার পূর্বক বৃহত্তর মহাভারতের আগমনী গাহিলেন। গুরু-কৃপায় তিনি আমাদের ধর্মকে মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া যুগোপযোগী করিলেন। মোহিত-লালের মতে ভারতের স্বাজাত্য-সাধনায় ধর্মকে প্রয়োগ করিয়া বাঙ্গালী আধুনিক ভারতে এক নব ধর্মের গুরু হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই এই ধর্মের আদি দ্রষ্টা। পরে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে ইহার স্ফুটতর ও পূর্ণতর অভিব্যক্তি হইয়াছে। স্বামিজী ও নেতাজীর মধ্যে বৈচিত্র্যটিও মোহিতলালের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি বলেন, "স্বামিজী ছিলেন আদৌ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, পরে দেশপ্রেমিক ; আর নেতাজী আদৌ দেশ-প্রেমিক, পরে দেশসেবার জন্য সন্ন্যাসী।" "যে দেশপ্রেমকে স্বামিজী জ্ঞানে পাইয়া কর্মে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, নেতাজী ইহাকে জ্ঞানেও নয় ধ্যানেও নয়, তাঁহার নিশ্বাস-বায়ুরূপে পাইয়াছিলেন।" "শাক্ত বাঙ্গালী নেতাজীর আত্মবলির জন্য একটি দেবীর প্রয়োজন ছিল ; ধ্যান-কল্পনা বা কবিত্বের দেবী নয়, একেবারে সাক্ষাৎ মৃন্ময়ী মূর্তি। দেশমাতৃকার ভূলুণ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তাঁহাকে পাগল করিয়া-ছিল। তাঁহারই প্রেমে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন, জীবন ও যৌবন তাঁহাকেই সমর্পণ করিলেন! এমন সর্বত্যাগ আর কেহ করে নাই।" (১৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)। দশের, দেশের দুঃখ তাঁহাকে কত ব্যথিত—অভিভূত করিত, তাহা ভাবিলে পাষাণ হৃদয়েও প্রীতির সঞ্চার হয়। রাস্তা হইতে রোগ-কাতর দরিদ্র বালককে কুড়াইয়া বুকে করিয়া বাড়ীতে আনিয়া তিনি সেবা করিতেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের আহত পক্ষী সেবার মতই এই সমবেদনা অদ্ভুত! ভগ্নস্বাস্থ্য নেতাজী যখন মান্দ্রাজ জেলে পাকস্থালীর কঠিন ব্যাধিতে মরণাপন্ন ও আহারত্যাগী, তখনও প্রত্যহ স্বহস্তে তিনি কিছু-না-কিছু খাদ্য পাক করিয়া জেলের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদিগণকে আহ্বান করিয়া খাওয়াইতেন এবং সেই সুযোগে তাহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে সদুপদেশ দিতেন। স্বদেশের নরনারী তাঁহার কাছে সহোদর-সহোদরা তুল্য। প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগিলে মানুষের মনে এমনি সমবেদনাই জাগে, মানুষ অপরের দুঃখকে এমনি ভাবে নিজের দুঃখ বলিয়াই মনে করে।

স্বামিজীর মতই নেতাজী দেশের দাসত্ব ও দুর্গতিকে কিরূপ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। সিঙ্গাপুরের বিশাল প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ও সমবেত জনসমুদ্রের সম্মুখে মঞ্চোপরি যোদ্ধৃবেশ-পরিহিত নেতাজী দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মত দণ্ডায়মান। মাতৃভূমির দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি সর্বস্ব পণের শপথপত্র পাঠ করিতেছেন। দেশের চল্লিশ কোটি নরনারীর দুর্বিবহ দারিদ্র্য ও দুর্গতির বেদনা তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইল। পুঞ্জীভূত বেদনার বিদ্যুৎস্ফুরণে তাঁহার দেহ নিস্পন্দ ও প্রস্তরবৎ সংজ্ঞাশূন্য এবং চক্ষু পলকহীন হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট, সমাধিস্থ হইলেন। প্রায় বিশ মিনিট বা অর্ধ ঘণ্টা কাল তিনি এইরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় রহিলেন। এমন দেশাত্মবোধ সত্যই দুর্লভ। এইরূপ গভীর স্বদেশপ্রেম ভারতেই সম্ভব, অন্যত্র নহে। মোহিতলাল বলেন, "নেতাজীর সেই বিরাট বিশাল হৃদয়-মুকুরে ভারতবর্ষ আজ তাহার আত্মার প্রতিবিম্ব দেখিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার নব জন্ম হইয়াছে।" পঞ্চাশ বৎসর বাঙ্গালী যে স্বাধীনতার সাধনা করিয়াছে তাহারই ফলে নেতাজীর আবির্ভাব বাংলা দেশেই সম্ভব হইয়াছে! তিনি বর্তমান ভারতের, বর্তমান যুগের মুখ্য প্রতিনিধি। ইহা নির্দেশ পূর্বক মোহিতলাল নেতাজীর জীবন-ব্রতটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি নেতাজীকে বিবেকানন্দ-জীবনের জীবন্ত ভাষ্যরূপে দেখিয়াছেন তাঁহার মতে স্বামিজীকে না বুঝিলে নেতাজীকে বুঝা যাইবে না। এবং নেতাজীকে না দেখিলে স্বামিজীর দর্শন লাভ হইবে না। (২০ পৃষ্ঠা)। মোহিতলাল মনে করেন, নেতাজীর আবির্ভাবে স্বামিজীর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে। নেতাজী না আসিলে স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে কে বুঝিত, কে তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিত? মোহিতলালের ভাষায় "সেই ভবিষ্যৎ বাণী যে এত শীঘ্র ফলিবে তাহা কে জানিত? আবার সেই সন্ন্যাসী! সেই ত্যাগ, সেই প্রেম! সেই কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া আবার তেমনি দেশের জন্য দেশত্যাগ! সেবার জগৎ-ধর্ম মহামণ্ডলীতে জয় জয় রব, এবার জগৎ-মহাকুরুক্ষেত্রে 'জয় হিন্দ' রব। সেবার সশরীরে প্রত্যাগমন, এবার প্রত্যাগমন অশরীরে।" (পৃষ্ঠা ৩৪)।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, স্বামিজী ও নেতাজীর মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্য কি? এখন মহাত্মাজী ও নেতাজীর মধ্যে মতভেদ বা আদর্শগত বৈষম্য কি, তাহাই আলোচ্য। নেতাজীর জীবনের মূলমন্ত্র 'আগে স্বাধীনতা, পরে আর সব।' যে পরাধীনতার বেদনা বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সাধনায় মানসী মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়া-ছিল তাহাই নেতাজীতে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মোহিত-লালের ভাষায় "সুভাষচন্দ্র কেবল যুদ্ধনায়ক নেতা নহেন : ইংরেজের সহিত যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে জয়লাভই তাঁহার সাধনার শেষ ফল নহে। তিনি কেবল শত্রুঞ্জয় নহেন, তিনি আরও অনেক বড়। তিনি নিজে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া এই জাতির মৃত্যুভয়হারী। যে বীর্য্যবলে বিনতানন্দন গরুড়ের মত স্বর্গ হইতে স্বাধীনতার অমৃত-সোম হরণ করা যায় তিনি সেই বীর্য্যের অবতার। সেই বীর্য্য ও সেই অমৃতপিপাসা তিনি আপনার বক্ষ হইতে সমগ্র জাতির বক্ষে সঞ্চারিত করিয়াছেন। তিনি বিবেকানন্দের উত্তর সাধক।" মোহিতলাল বলেন, আধুনিক ভারতে নেতাজী ভিন্ন আর কাহারো ইংরেজ-মোহভঙ্গ হয় নাই ; এবং তিনিই স্বদেশের প্রকৃত মুক্তিকে অপরোক্ষ করিয়াছেন। সেই এক মুক্ত জীবের অপূর্ব উৎসাহ ও উল্লাস শত শত জীবকে বন্ধন-মুক্ত করিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র শলাকা যেমন কক্ষব্যাপী বহু শতাব্দী স্থায়ী অন্ধকার নিমেষে নাশ করে, তেমনি নেতাজীর মুক্তিলাভে সারা দেশের মোহ ভঙ্গ হয়েছিল। যে মুক্তিকে তিনি নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বাহিরেও সেই মুক্তিকে চাক্ষুষ করাই ছিল তাঁহার জীবনব্রত। সেই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি তিলে তিলে প্রাণপাত

[১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অভিন্নহৃদয়েষু,

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

বিজ্ঞাপনদাতাদের যদি প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতে হয় তা হলে শুধু পুষ্ট হয়েই পরিতুষ্ট থাকতে চায় না মাসিক বসুমতী। শাসক ও শাসিতদের মধ্যে অন্তরের যোগ না থাকলেও পোষক ও পরিপুষ্টদের মধ্যে আছে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। ওদের সম্বন্ধ যেন সাপে-নেউলে, কিন্তু আমাদের পরস্পরের আন্তরিক সম্বন্ধের কথা আজ আর জানতে কারও বাকী নেই। তাই আমাদের পাঠক, পাঠিকা, পৃষ্ঠপোষক, শুভ ও অশুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই আজকাল হামেসাই বলে থাকেন যে মাসিক বসুমতী শুধু যেন বিজ্ঞাপনেই পরিপূর্ণ!

কথাটি সর্ব্বৈব সত্য না হলেও আপাতদৃষ্টিতে যেন তাই মনে হয়। কিন্তু কেন, বাঙলায় অসংখ্য সাময়িক পত্রিকা থাকতেও মাসিক বসুমতীতে বিজ্ঞাপনদাতাদের এ হেন বহিঃপ্রকাশের কারণ কি? একটু তলিয়ে দেখলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই দেখতে পাবেন, মাসিক বসুমতীতে কেবল মাত্র দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রসাধন, অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ বা ব্যাঙ্ক, বীমা, যন্ত্রপাতি কিংবা ঔষধ, পানীয়, খাদ্যদ্রব্য ও বইয়ের বিজ্ঞাপনই থাকে না। এদের বাদ দিয়ে যা থাকে তার সবটুকুই সুপাঠ্য ও সুদৃশ্য লেখা, রেখা ও আলোকচিত্র। সুচিন্তিত রচনা, সত্যপূর্ণ তথ্য, জীবন-তত্ত্ব প্রভৃতির সমন্বয়ে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এই অভিনব সমাবেশ মাসিক বসুমতীর অন্তান্তরণ। এই সকল আকর্ষণেই বাণিজ্য-চুম্বকরা স্বয়ং উপস্থিত। তাঁরা নিশ্চিত জানেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় করতে ও জাতে তুলতে হলে মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় ঢাক পিটতে হবে নতুবা সুধীজনের পঙ্‌ক্তি-ভোজনে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। আজকের সভ্য জগতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজ একমাত্র মাসিক বসুমতীর, তাকে বাদ দিলে আর কোন মাধ্যম খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিন আজ সমুপস্থিত।

পঁচিশ বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে মাসিক বসুমতী অভিবাদন জানাচ্ছে তার সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের,—আমাদের সাদর-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আমার জীবনযাত্রায় আপনাদের অকৃপণ সাহায্যের কাহিনী আমার বক্ষপটে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। নমস্কারান্তে ইতি—

আপনাদের অনুগত

মাসিক বসুমতী

পুঃ প্রসঙ্গতঃ একটি গোপনীয় কথা আপনাদের কানে কানে জানিয়ে দিই। আমার রজত-জয়ন্তী সংখ্যাটির জন্য বসুমতীর কর্তৃপক্ষ যে আয়োজন করছেন তা বোধ হয় অভূতপূর্ব্ব। লেখা, রেখা ও পরিকল্পনায় সংখ্যাটি যে রূপ ধারণ করবে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার জুড়ি মেলা ভার। তাই উক্ত সংখ্যাটিতে যদি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত করেন, অবশ্যই লাভবান হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতি

মা. ব.

-বিশেষ দ্রষ্টব্য-

★ সংখ্যাটি একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ সংখ্যারূপে আগামী ভাদ্রে প্রকাশিত হবে।

★ মূল্য হবে পাঁচ টাকা। ডাক মাশুল দিতে হবে না।

★ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হবে, সুতরাং স্থানীয় ও মফস্বলের গ্রাহক-গ্রাহিকা ও এজেন্টদের সতর্ক হতে অনুরোধ করি।

★ মণি-অর্ডার ব্যতীত ভি, পিতে কোন অর্ডার নেওয়া হবে না। মূল্য অগ্রিম দেয়।

করিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহার এত অধৈর্য্য, এত উৎসাহ, এত উন্মাদনা। নেতাজী মরেন নাই, তিনি অমর। তাঁহার মৃত্যুতে কোটি জীবন জাগিয়াছে। তিনি যে মহাত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে দিব্য দীপশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। দেশের অধীনতা মোচন যে মহাজীবনের একমাত্র সাধনা তাহা কি কখনও ব্যর্থ হয়? দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তিনি হইলেন নেতাজী অর্থাৎ অগ্রণী। সরদার ত শিরদারই হয়।

মোহিতলাল বলেন, 'নেতাজীর পন্থা কি নিষ্ফল হইয়াছে? মহাত্মাজীর পন্থা কি সফল হইয়াছে? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর যাঁহারা ধীর ভাবে চিন্তা করিবেন তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, নেতাজীর নিষ্ফলতাও সারা ভারতে যে কল্যাণ সাধন করিয়াছে, মহাত্মাজীর অধুনা বিঘোষিত তথাকথিত সফলতা সেই কল্যাণকেও বিপন্ন করিতে চলিয়াছে।' বাহিরের সফলতা বা নিষ্ফলতা মহত্ত্বের মাপকাঠি হইতে পারে না। মোহিতলালের মতে ইতিহাস বা কালের কতকগুলি লগ্ন আছে। সেই লগ্ন যদি এইরূপ জীবনের বৃক্ষ হয় মহাত্মাজীর মত পুরুষের অভ্যুত্থান ঘটে। লগ্ন যদি অনুকূল না হয় তাহা অপেক্ষাও মহত্তর ব্যক্তি ইতিহাসের অগোচর থাকিয়া যায়।

নেতাজীর দেহত্যাগ নানা স্থানে নানা ভাবে প্রচার করা সত্ত্বেও লোকে এখনও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করে কেন? তিনি যে মরিয়াছেন, ইহা লোকে বিশ্বাস করিতে চাহে না কেন? ইহার উত্তরে মোহিতলাল বলেন, 'এক্ষণে ভারতবাসীর মনের অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের সেই কুন্দনন্দিনীর মত। যে পিতা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই, সেই পিতার মৃত্যু-শিয়রে সে বসিয়া আছে। গভীর রাত্রে জনহীন কক্ষে পিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তখনও সেই ক্ষীণ দীপালোকে সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। পিতার মৃত্যু হইয়াছে এ বিশ্বাস সে কিছুতেই করিবে না। কারণ, তাহার যে আর কেহ নাই—এমন সর্বনাশ কি হইতে পারে? তাই কুন্দনন্দিনী তার মৃত পিতাকে যতক্ষণ পারে জীবিত মনে করিয়া সেই মহাভয় দূর করিতে চায়। নেতাজী জীবিত কি মৃত—সে বিশ্বাস ভারতবাসীর পক্ষেও তেমনি। তাহার যে আর কেহ নাই; তুমি হুঙ্কার করিলে কি হইবে?" (১২৬ পৃষ্ঠা)।

নেতাজীর সহিত মহাত্মাজীর যে বিরোধ তাহা বুঝিলেই উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। নেতাজীর নীতি গান্ধীবাদের প্রতিবাদরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। গান্ধীবাদ অন্ধ ধর্মমতের ন্যায় জনসাধারণের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। উহা মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিকতারই নবীন রূপ। ইহা অন্ধ-বিশ্বাসের ধর্ম। ইহাতে যুক্তি-বিচারের স্থান নাই। যে মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা ও ভাবপ্রবণতা হইতে বিবেকানন্দ প্রমুখ আধুনিক ধর্মাচার্য্যগণ আমাদের ধর্মকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন মহাত্মাজী তাহাই প্রচার ও প্রপুষ্ট করিলেন। ফলে, কংগ্রেসও তাঁহার নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রাম ভুলিয়া অধ্যাত্মবাদে অন্ধবিশ্বাসী হইল, লক্ষ্য হারাইয়া উপলক্ষকে মুখ্য করিল, দেশভক্তির উপরে গান্ধীভক্তিকে স্থান দিল। যে বাংলায় 'অতীতের দুয়ার সবলে ভাঙিয়া অত্যুগ্র বর্ত্তমান' প্রবেশ করিল, যে বাংলা দেশের স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্ন দেখিল ও স্বাধীনতাকে ধ্যানে পাইল, যে বাংলায় স্বাধীনতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ব্যতীত অন্য কোন দেশনায়ক প্রীতির চক্ষে দেখিলেন না, এমন কি মহাত্মাজীও নহেন। সেই জন্য মহাত্মাজীর সহিত যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতভেদ ঘটিয়াছিল তেমনি নেতাজীরও বিরোধ হইল। অবশেষে অবস্থাচক্রে পড়িয়া বাধ্য হইয়া কংগ্রেস দেশবন্ধু বা নেতাজীর মতই প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের দ্বারা ইহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। নেতাজী যখন দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তখন মহাত্মাজী ভগ্ন হৃদয়ের গভীর আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছিলেন, 'সুভাষচন্দ্রের জয়ে আমারই পরাজয় হইয়াছে।' ইহার দ্বারা মহাত্মাজী প্রমুখ কংগ্রেস-নায়কদের কী মনোভাব প্রকটিত হইয়াছে তাহা আর পাঠক-পাঠিকাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

খিলাফৎ আন্দোলনের সহযোগী হইয়া মহাত্মাজী যে "রাজনৈতিক বুদ্ধিহীনতার' পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা পূর্বতন নেতাগণ বুঝিয়া ভবিষ্যৎ বিষয়ে হতাশ হন। মোহিতলাল বলেন, "গান্ধীজী প্রথম হইতেই ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে সেই গুরুত্ব দিয়াছিলেন যাহা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষেই অতিশয় সুবিধাজনক। গান্ধী-কংগ্রেস সেই সমস্যাকে ভয় করিয়াই তাহার শক্তি ও দুর্দ্ধর্ষতাকে এমনই বৃদ্ধি করিল যে, অবশেষে তাহাই টর্পেডো রূপ ধারণ করিয়া কংগ্রেসের সুবৃহৎ রণতরীকে জলমগ্ন করিয়াছে।" গান্ধী-নীতির প্রতিবাদস্বরূপ নেতাজী যে ব্যবহার করিলেন, তাহাকে মোহিতলাল কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের সংগ্রামের তুলনা করিয়াছেন। কংগ্রেস ইংরাজকে বিশ্বাস করে, মুসলিম লীগকে ভয় করে, কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও নেতাজীকে শত্রু মনে করে। ইংরাজ-প্রীতি এখনও কংগ্রেসপন্থী দেশ-নায়কগণের অন্তরে বিদ্যমান। ইংরাজ-মোহ ভাঙ্গে নাই বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ সত্ত্বেও পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ কোন দেশ-নায়কই ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথা সাহস করিয়া এখনও বলিতে পারিতেছেন না। অথচ নেতাজী বহু পূর্বে কত বার না এই কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। এই ইংরাজ-প্রীতির অন্যতম ফল সুভাষ-ভীতি। শেষ পর্য্যন্ত নেতাজীকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মহাত্মাজী নিশ্চিন্ত হইলেন। ত্রিপুরীর কলঙ্ক-কাহিনীই অভ্রান্ত প্রমাণ যে, গান্ধীপন্থীগণ সুভাষ-বধের জন্য কত দৃঢ় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। নেতাজী গান্ধী-চরিত্রকে অশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু, তিনি গান্ধী-নীতিকে স্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করিতেন। তাঁহার হৃদ্‌গত বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধযাত্রা কালে সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সকল ব্যবধান বিলুপ্ত হয়, তেমনি যাহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য আকুল, তাহাদিগকে সংগ্রামে নিযুক্ত করিলেই তাহাদের মধ্যে জাতিধর্মাদির ভেদ অচিরে তিরোহিত হইবে। স্বাধীনতা লাভের আগ্রহই যখন জাতীয়তা ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিবে তখন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মিলাইয়া যাইবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া তিনি তাঁহার বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিলেন। তাঁহার নীতি যে কত অভ্রান্ত ইহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

কিন্তু মহাত্মাজী অহিংস-নীতি ও আপোষ-নীতি ছাড়িলেন না। মোহিতলাল গান্ধীবাদের এইরূপ গভীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মহাত্মাজীর এই মনোভাবের মূলে আছে তাঁহার জাতিগত, বংশগত

এই সকল সংস্কার তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। মোহিতলাল বলেন, 'একে ভারতীয় সংস্কারের অধ্যাত্ম-প্রীতি, তাহার উপর জৈন ধর্মের প্রভাব। এবং তাহারও উপরে তাঁহার রক্তগত বৈশ্যবুদ্ধি। ইহার কোনটাই জাগতিক ব্যাপারে কোন পার্থিব আদর্শ-নিষ্ঠার অনুকূল নহে।...জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় সগোত্র। তাহাতে সর্বপ্রকার হিংসাই পাপ, অহিংসাই ধর্ম। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তির প্রয়োগ অপেক্ষা আত্মদমনই বা নিষ্ক্রিয়তার প্রতিরোধই কল্যাণকর।... ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ তত্ত্বই ভারতীয় মনীষার বা সাধনার একমাত্র তত্ত্ব নয়। উহা একটা আংশিক তত্ত্ব মাত্র, বরং প্রধান চিন্তাধারার বিরোধী।...তাঁহার বণিক-মনোবৃত্তির বশে তিনি আদান-প্রদান, লেন-দেন ও আপোষকেই সর্ববিধ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ নীতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ তাঁহার চিন্তায় চিরদিন গৌণ। লোকহিত সাধনের স্বাধীনতাই তাঁহার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা।" (৬৪-৭০ পৃষ্ঠা)। ইহাই গান্ধীবাদের সার কথা। মহাত্মাজী উনবিংশ শতাব্দীর মনোভাব লইয়া বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহার নীতি বিংশ শতাব্দীর নবীন ভারতের উপযোগী হইবে কিরূপে? বাল্যে জৈন-প্রভাব এবং যৌবনে টলষ্টয়ের প্রভাবে তিনি লালিত-পালিত। যে কাথিয়াবাড়ে তিনি বাল্য অতিবাহিত ও এন্ট্রান্স অবধি শিক্ষালাভ করেন তথায় জৈন-প্রভাব এখনও প্রবল। কাথিয়াবাড়ী হিন্দু বালকগণের ন্যায় তিনিও জৈন-প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যে জৈন ধর্ম পিপীলিকাকে শর্করা দান এবং ছারপোকাকে মানুষের রক্ত খাওয়ান ধর্ম-সাধনা বলিয়া মনে করে তাহার কাছে হিংস্র শত্রুদমনও পাপ! বর্ত্তমান লেখক কাথিয়াবাড় প্রবাস কালে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, জৈন বালকগণের ন্যায় হিন্দু বালকগণও তথায় পিপীলিকা, ছারপোকা ও সর্পাদি দংশন করিতে আসিলে উহাদিগকে নিহত বা আহত করিতে পশ্চাৎপদ হয়। ছারপোকার প্রতি অহিংসার মধ্যে যে মানব হিংসা নিহিত তাহা তাহারা বোঝে না। মহাত্মাজী তেমনি মুসলমানের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের জন্য নেতাজী প্রমুখ কত হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিলেন তাহা তিনি বুঝিয়াও বোঝেন নাই! জৈন ধর্ম ভারত ধর্মের আংশিক বিকাশ মাত্র, এবং অবৈদিক। বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ইহাও বেদ-বিরোধী। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়া উভয়ের প্রভাব ধ্বংস করিলেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিলেন ক্লৈব্য ত্যাগের জন্য। এই জন্যই শ্রীরামচন্দ্র রাবণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। গান্ধীবাদ জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মের অভিনব সংস্করণ মাত্র, ইহা খাঁটি হিন্দু বা বৈদিক ধর্ম নহে। মোহিতলালের এই তুলনামূলক আলোচনা মৌলিক। তিনি আরও বলেন, "গান্ধীজীর প্রেরণা সম্পূর্ণ moral, নেতাজীর প্রেরণা একান্ত ভাবে spiritual, একটিতে আছে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের উপরে ধর্মাধর্ম বোধের কঠিন শাসন, আর একটিতে আছে 'বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ'। সেই আত্মার সর্ববন্ধন মুক্তি, অকুণ্ঠিত প্রসার, অসীম স্ফূর্তি। গান্ধীজী ধমক দেন, ভর্ৎসনা করেন, নেতাজী বুকে জড়াইয়া ধরেন। গান্ধীজী বলেন, তোমরা দুর্বল পাপচিত্ত, আমি করিব কি? নেতাজী বলেন, কোন ভয় নাই, তোমাদের ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে; নয়। গান্ধীজী নিয়মিত ভজনের দ্বারা আত্মশুদ্ধি বা পাপমোচনের উপদেশ দেন। নেতাজী ভগবানের নাম করেন না, মানুষের নামই করেন। তাঁহার ধর্ম ভগবানকে ভক্তি নয়, মানুষকে প্রেম। সেই প্রেমে পাপের চিন্তা মাত্র নাই।" (পৃষ্ঠা ১৩)। বিবেকানন্দের বাণী 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' নেতাজীর জীবনে প্রমূর্ত হইয়াছিল। বিদেশ গমন কালে জাহাজে ভারতের নিন্দায় উন্মত্ত কোন পাদ্রীকে যে জন্য স্বামিজী কণ্ঠদেশে ধরিয়া স্বীয় সন্ন্যাসধর্ম ভুলিয়া মাতৃভূমির সম্মানরক্ষার্থ প্রহারোদ্যত হইয়াছিলেন, সেই জন্য নেতাজীও স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য অস্ত্র ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, ও বিবেকানন্দের মধ্যে যে ভারতীয় আদর্শ সাকার হইয়াছিল, তাহাই নেতাজীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল দেশকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য। নেতাজীর যুদ্ধ-ঘোষণাকে যাঁহারা হিংস-নীতি বলেন, তাঁহারা ভারতের সাধনার সহিত আদৌ পরিচিত নহেন।

গান্ধীবাদে জীবন-ধর্মের স্থান নাই। তাই মহাত্মাজী বাঁচাইতে জানেন না, মরিবার উপদেশ দেন। গান্ধীবাদের মূলমন্ত্র আত্ম-সংবরণ, আত্ম-সংকোচ বা আত্ম-সম্মোহন। নেতাজীর ধর্ম আত্মবিকাশ, আত্ম-প্রসারণ। মোহিতলাল বলেন, 'মহাত্মাজী ও নেতাজীর লক্ষ্যও এক নয়। এক জন চান, যত দূর সম্ভব দেশের জনগণের দুর্গতি লাঘব। আর এক জন চান, দেশের বন্ধন-মুক্তি।' নেতাজী অন্তরের অন্তরে ব্রহ্মবাক্যের মত বিশ্বাস করিতেন, মুক্তি ব্যতীত দেশের দুর্গতি নাশের উপায়ান্তর নাই। মোহিতলাল আরও বলেন, 'গান্ধীজী মহাত্মা হইলেও মহাপুরুষ নহেন। তিনিও কত ভুল করেন, আরও কত করিবেন, মহাত্মার মত তাহা স্বীকার করেন। মহাপুরুষের মত তাহা বোধ করিতে পারেন না। সুভাষচন্দ্র নিজে মুক্ত, নিত্যমুক্ত, তাঁহার সেই মুক্ত স্বভাবের যে প্রয়াস তাহা স্বতঃস্ফূর্ত ও দ্বিধাহীন, তাহা experiment নয়। কোনরূপ ফলাফলের উপর তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। তাঁহার মনে কোন সংশয় নাই, তাঁহার দৃষ্টি অভ্রান্ত, তাঁহার পথও পৌঁছিবার পথ, আবিষ্কারের পথ নয়। নিজে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া তিনি জানেন, কোন্ পথে সকলকে পৌঁছতে হইবে।' (৮৫ পৃষ্ঠা)। গান্ধী-নীতি ভ্রান্ত এবং তাহা অনুসরণ করিলে কংগ্রেস বিপন্ন হইবে—এই ভবিষ্যৎ-বাণী নেতাজী বহু পূর্বে বার বার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে তাহা আজ দেশের বালক-বালিকারাও বুঝিয়াছে। 'সাপের ছুঁচো গেলা'র মত কংগ্রেস আজ স্বাধীনতা পাইয়া দেশের দুর্গতি-মোচনে অসমর্থ। মহাত্মাজী ধর্মগুরু হইতে পারেন, কিন্তু দেশনায়ক নহেন। মহাত্মাজীর আপোষ-নীতির ফলে হইয়াছে পাঞ্জাবে, সিন্ধু ও নোয়াখালিতে হিন্দুর ধ্বংসলীলা, এবং পাকিস্তান সৃষ্টি। মোহিতলাল সত্যই বলিয়াছেন, 'নেতাজীর মত চিন্তাশীল, তীক্ষ্ণধী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জননায়ক আধুনিক ভারতে আর দেখা যায় নাই। তাহার অসংখ্য প্রমাণ তাঁহার চরিত্রে, চিন্তায় ও কার্য্যাবলীতে পাওয়া যাইবে। কংগ্রেস তাঁহাকে নেতৃপদ হইতে বিচ্যুত না করিলে দেশের এই দুর্দশা কখনও হইত না।

অহিংসা কোন ব্যক্তির জীবন-নীতি হইতে পারে, কিন্তু উহা একটা বিশাল জাতির জীবন-নীতি বা principle কিরূপে হইবে?

কোথায় ?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

দীর্ঘ পথ শ্রান্ত আমি, ক্লান্ত ও মন্থর পদে
খুঁজি বিশ্রামের ঠাঁই। দক্ষিণ-সমুদ্র তীরে!
কিম্বা হিমগিরি ক্রোড়ে? নৃত্যপরা মন্দাকিনী
যেথা কলস্বরে ছুটে যায়, সেই ঋষিকেশে?

কিম্বা অতিক্রমি যোধপুর মরুর প্রান্তরে?
তৃণগুল্মহীন রুক্ষ ও আতপ্ত ধরণীর
বিশুষ্ক বিস্তারে, নিস্তরঙ্গ বালুকা-সমুদ্রে?
গৈরিক বালুকা-তটে নীল সিন্ধু যেথা মৌন,
সহসা তরঙ্গবেগে উঠিবে উচ্ছ্বসি, সেথায় কি
অন্তিম শয়ন? খুঁজে ফিরি বিশ্রামের ঠাঁই!

যেথা যাই; দিগন্ত-বিস্তৃত সেই নীলাকাশ,
সন্ধ্যা কালে শয়ন-শিয়রে অজস্র তারকা
নিষ্পলকে চাহে মুখপানে,—মরুতে পর্ব্বতে
সমুদ্রসৈকতে, বনে, তোমার বিশ্রাম হোক
আমাদের মাঝে। এরি লাগি রয়েছি জগয়া

ত্রিশ কোটি নর-নারীকে উহা অভ্যাস করিতে বলা বাতুলতা মাত্র। অহিংসাকে পলিসিরূপে কংগ্রেস গ্রহণ করিলেও আপত্তি নাই। জনসাধারণ তমোগুণাচ্ছন্ন। তাহারা এক লাফে সত্ত্বগুণে কিরূপে উঠিবে? তাহাদিগকে প্রথমে রজোগুণী করিতে হইবে। সেই জন্য স্বামিজী বলিলেন, 'যখন শত শত সবল শত্রুকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইবে তখনই ক্ষমা করিতে পার। তখনই অহিংসা অভ্যাস সম্ভব। দুর্বলের ক্ষমা অশোভনীয়, অকল্যাণকর।' যদি অহিংসার এত মাহাত্ম্য মহাত্মাজী বুঝিয়াছেন, তিনি সুরাবর্দীকে এত চেষ্টা করিয়াও ভাল করিতে পারিলেন না কেন? সমগ্র জাতিকে অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি দেশের যে সর্বনাশ করিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আর চাহিয়াছিলেন। তাই তাঁর কম্বুকণ্ঠে সদা রণভেরী নিনাদিত হইত কংগ্রেস যখন তাঁহাকে দ্বার রুদ্ধ করিল, তখন তিনি আর কোন কাজ না পাইয়া হলওয়েল মনুমেণ্ট সংক্রান্ত একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সেই আন্দোলনে কারারুদ্ধ হইয়া তিনি অশেষ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় জীবন ধারণ আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এ জগতে সবই নশ্বর। কেবল উচ্চ আদর্শ, উৎকৃষ্ট তত্ত্ব ও মহতী কামনার বিনাশ নাই। এইরূপ একটি আদর্শের জন্য যদি কেহ আত্মোৎসর্গ করে, তবে তাঁহার মৃত্যুতে সহস্র জীবন উজ্জীবিত হইবে।" নেতাজী স্বীয় ভবিষ্যৎই ইঙ্গিত করিলেন। শেষে তিনি দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইলেন। ইহার

আমার শিকারোক্তি

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

..."তখন আমি করলাম কি, কোটের হাতায় মুড়ে আমার বাঁ হাতখানা তার গলার ভেতর পুরে দিলাম। কাজটা মোটেই সোজা নয়—মজার তো নয়ই। ধারালো দাঁতের কথা ভাবো একবার!...এদিকে সে যখন আমার বাঁ হাতখানা চিবুতে থাকলো, অকাতরেই—বলতে কি, আমি ডান হাত দিয়ে তার পাঁজরায় আমার ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করে দিয়েছি। ভালুকটা একবার একটা হেঁচ্‌কি তুললো, বেশ ডাকসাইটে হেঁচ্‌কি। তুলেই ব্যস্—আমার পায়ের তলায় ঢলে পড়লো—যাকে বলে, পতন আর মৃত্যু!...সেই ভালুকটার চামড়া এখনো আমরা বাড়ীতে টাঙিয়ে রেখেছি।" এত বলে বক্তা থামলেন।

পুরীর সমুদ্র-তটে এক হোটেলের একটা কামরায় বসে আমাদের গুলতানি চলছিল। সামনের বড়ো জানালাটা খোলা, তার ভিতর দিয়ে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি উঁকি মারছে। তার ওপারে হৈমন্তিক সমুদ্রের রোমন্থন। আর এদিকে, সমুদ্র-পুরীতে তটস্থ হয়ে আমরা শুনছিলাম।

সন্ধ্যে হব হব। আবহাওয়াটা এমনিই যে সহজেই মজলিস্ জমে ওঠে, সৌহার্দ গাঢ় হয়। তার ওপরে আরেক যোগাযোগ—একটু আশ্চর্যই বলতে হবে, আসরের সকলেই এক একটি শিকারী। তাঁদের বিবৃতি থেকেই ক্রমে ক্রমে সেটা বিস্তৃত হতে লাগলো।

ভালুক-শিকারীর একটু আগে আরেক জন সুরু করেছিলেন। শুকনো আমশির মতো চেহারা। মনে হয় যেন বহুৎ দিন ধরে রোদে টাঙিয়ে রেখে তাঁকে শুকোনো হয়েছে। রৌদ্রপক্ক সেই ভদ্রলোক বুনো-গণ্ডার শিকারের একটা গল্প আমাদের শোনালেন। মারি তো গণ্ডার, কথায় বলে। গণ্ডারটার আবার ভাণ্ডার লুঠ করার দিকে ঝোঁক ছিল। এক গেরস্তর গোয়ালে ঢুকে তার সযত্ন-পালিত গোরুদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ব্যাটা—

"কতগুলি গোরু?" আমি জিজ্ঞেস করেছি।

"তা এক গণ্ডার কম না।"

"গণ্ডারে গণ্ডারে স্থূল পরিমাণ।" আমি বললাম। শুভঙ্করী কষে।

"...জোচ্চোরটা গোরুদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের দিকে কেটে পড়ছে, এমন সময়ে..."

এমন সময়ে সেই অবশ্য-শিকার্য কাণ্ডটা ঘটলো। তিনিই ঘটালেন। তাঁর ঘনঘটা শেষ হতে না হতেই আরেক জন সুরু করলেন। ইনিও বায়ুপরিবর্ত্তকদের এক জন! দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট দেহ। পুরীর জল-হাওয়া এঁর শ্রীঅঙ্গের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি করতে পারবে বলে' বোধ হয় না। একবার নদীতে চান করতে গিয়ে তার তলদেশ থেকে আধ মণের বেশি ঘুমন্ত এক কাছিমকে কি করে তিনি টেনে তুলে এনেছিলেন তার কাহিনী।

এম্‌নি চলছিলো—এক জনের পর আরেক জনের আরম্ভ—বর্ণনা আর আড়ম্বর! আর অবশেষে আড়ং ধোলাই! একটার পর একটা ধারাবাহিক শিকারের পালা। প্রত্যেক ঘটনাটাই নির্জলা সত্যি—প্রত্যেকেই দিব্যি গেলে জানাচ্ছিলেন, এমন কি, যিনি জলের তলা থেকে কচ্ছপ আমদানি করেছিলেন তিনিও। কিন্তু সবাইকে টেক্কা মারলো আমাদের ভালুক-শিকারীর কেচ্ছা। ভূয়োদর্শী এক ভালুককে এক হাতে একলা কাবু করা চাট্টিখানি নয়।

আমরা হাঁ করে শুনছিলাম।

"অবাক্ কাণ্ড তো!" অজ্ঞাতেই কখন মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে।

"আপনার বুঝি বিশ্বেস হচ্ছে না?" ভালুকওয়ালা ফোঁস্ করে উঠলেন।

"না না, বিশ্বাস হবে না কেন? বিশ্বাস খুবই হচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ঈর্ষাও হচ্ছে, বল্‌তে কি!" আমি বল্লাম।

"চাই সাহস—!" আমশিপানা চেহারা জানালেন: "সাহস আসে নিয়মিত ব্যায়াম করলে। নিয়মিত ব্যায়ামে যদি ব্যায়াম না আসে তাহলে সাহস আসতে বাধ্য। সাহস আর মাস্‌ল্—দুই এক সঙ্গে আসবে। আর বাড়তে থাকবে—সাথে সাথেই।"

এই বলে' তিনি শীর্ণ বক্ষস্থলে নিজের জীর্ণ হাতটা রাখলেন।—"আর ব্যায়ামের সেরা হচ্ছে বারবেল্ ভাঁজা। সেও কিছু কম শিকার নয়।"

"আমি অস্বীকার করি না।" সবিনয়ে জানালাম।

"শিকার করাও একটা মস্ত ব্যায়াম।" সেই কূর্ম-কীর্তিধ্বজ বল্লেন: "আপনি কখনো শিকার-টিকার করেছেন?"

"শিকার—না—ব্যায়াম? কোনোটাই নিয়মিত করবার সুযোগ পাইনি। তবে একবার—"

"বনবিড়াল-টিড়াল বোধ হয়?" ভালুক-শিকারী চোখ মট্কালেন।

"না না, বনবেড়ালের সঙ্গে আমি পেরে উঠবো—কী বলেন? বেড়াল, আর্সোলা, নেংটি ইঁদুর—এরা ভারী মারাত্মক। ওদের ত্রিসীমানায় আমি নেই—"

"তাহলে কী? মাছি-টাছি?"

"মাছি নয়, মাছও না। মাত্র একটা বাঘ।"

পালে যেন বাঘ পড়লো। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো, বুঝি বা, একটু বক্র দৃষ্টিতেই।

'বা—ঘ!' ভালুকধারীর বিস্ময় বাগ মানে না।

"কি করে বাগালেন?" বল্লেন কূর্মবীর।—"আপনার নিশানা খুব ভালো বলতে হয়।"

"আমার নিশানা?" আমি একটু আমতা আমতা করি: "কিন্তু আমি তো বাঘটাকে গুলী করিনি। বন্দুকই ছিলো না আমার কাছে।" আমার নিশান অবনত করতে হোলো।

"তাহলে বাঘটাকে মারলেন কিসে?" আমূলী ভদ্রলোককে বেশ রাগতই দেখা গেল।

"বাঘটাকে মেরেছি আমি বল্লাম কখন? মোটেই মারিনি। বাঘ মারবো—আমি! আপনারা পাগল হয়েছেন! সে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মারতে গেলে শুনেছি ওরা ভারী ক্ষেপে যায়, এমন কি উল্টে মেরে বসে—মারবার আগেই। না, মশাই, না। ওসব হঠকারিতার আমি নেই। বাঘটাকে আমি জ্যান্ত পাকড়েছিলাম।"

"ও! একটা ব্যাঘ্র-শিশু! তাই বলুন!" কূর্ম অবতার স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন।

"না মশাই, শিশু নয়, আস্ত বাঘ। আসামের জঙ্গলে পাকড়েছিলাম। আমি তখন কলকাতার এক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করতাম—সেই সূত্রেই।"

"কী সূত্র বল্লেন?"

"খুব মজবুত সূত্র। কাগজটা ছিলো এক দেশমান্য নেতার। তিনি সভায়-টভায় বক্তৃতা করতেন, আর আমি তার বৃত্তান্ত ফলাও করে আমার কাগজে ছাপতাম—"

"দেশনেতা রাখুন, আপনার বাঘের কথা শুনি—"

"অতো ব্যগ্র হচ্ছেন কেন? ক্রমেই সে কথা আসছে—"

"ক্রমে নয়, আগে। কি করে' পাকড়ালেন বাঘটাকে—সে-রহস্য দয়া করে' একটু ফাঁস্ করবেন কি?" আসল কথায় আসবার ওঁদের ব্যগ্রতা!

"কেন করব না? আপত্তি কিসের? এমন কিছু বাহাদুরির কাজ নয়। গল্প লেখার চেয়ে সোজা—এমন কি, সম্পাদকতা করার চেয়েও। আরে মশাই, যদি সম্ভব হোতো তাহলে আমি এই লেখকগিরির পেশা ছেড়ে দিয়ে বাঘ ধরার ব্যবসাই নিতাম [illegible]

সোজা তেমনি মজার। কিন্তু দুঃখু এই, কলকাতার আশে-পাশে বাঘ মেলে না—"

ঢোঁক গিলে আমি বলতে শুরু করি: "কিন্তু সে যাই হোক, আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারব আমার বাঘ শিকার এমন কিছু কাণ্ড নয়। তেমন রোমাঞ্চকর ব্যাপার না। আপনারা হয় তো ভাবছেন, আমার একখানা হাত বা পা অযাচিত তার মুখের সামনে ধরে দিয়েছিলাম—মোটেই তা নয়।"

"দিলেও বাঘ তা মুখে তুলতে চাইতো কি না সন্দেহ। ওই তো রোগা রোগা হাত-পা।" ভালুকমারের তরফ থেকে বাধা এলো। —"আর যাই হোক, বাঘেদের রুচি বলে' একটা আছে।"

"ঠিক। ওঁর মতো অতো চর্বি নেই আমার। বাঘ এগুলি চর্বিত চর্বণ করতে, রাজি হোতো বলে আমিও মনে করি না। তাছাড়া, এই মুষ্টিমেয় হাত-পা বেহাত হতে দিতে আমার নিজের দিকেও আপত্তি আছে। কাজেই ওসব হাতাহাতির কাণ্ডে না গিয়ে—যখন আপনারা শুনতেই চাচ্ছেন নেহাৎ তখন খোলসা করেই বলি···

"ঘটনাটা এই। আসামে গিয়ে আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম। লোকে প্রেমে পড়ে আসামী হয়—আদালতে দাঁড়ায়—আর আমি আসামী হয়ে প্রেমে পড়লাম···তা, ঐ একই কথা! আসামের মেয়ে, নয়, বাঙালী মেয়ে—কিন্তু আসামী চেহারা। এ রকম কম্বিনেশন্ যদি কোথাও দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন তাদের প্রেমে না পড়া বহুদূর কষ্টকর ব্যাপার। অবশ্যি, পড়াটাও কিছু কষ্টের নয়। মানে, তাদের ছোঁয়াচটাই হচ্ছে মারাত্মক। তাহলেও··· যাক্, যে কথা বলছিলাম। নারীদের ব্যাপারে তখনো আমি খুব আনাড়ি। ঠিক এখনকার মতই। কিন্তু হলে কি হবে মশাই, মেয়েটি ছিলো অদ্ভুত—যেমন দেখতে তেমনি শুনতে। সারা শিলঙে অমন মেয়ে আর একটাও ছিলো না। আর সারা সহরটা যেন তার ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

"বিশেষ করে একটি ছোকরার ঝোঁক যেন একটু বেশি রকমেরই দেখা গেল। ছোকরা আবার শিকারী! বাঘ-টাগের পিছু পিছু দৌড়োনোই ছিলো তার বাতিক। তা দৌড়োক্, আমার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু দেখা গেল, সেও আমার মত সেই একমাত্র মেয়েটির পিছনে রয়েছে···"

"তার শিকারের ধরণটা কি রকম? আপনার মতই না কি?" শ্রোতাদের এক জন জিজ্ঞেস করলো।

"না। সেই সেকেলে ধরণের। সেই সনাতন কাল থেকে বাঘ শিকারের যে সমবায় পদ্ধতি আছে তাই। সবাই মিলে তোড়জোড় করে বাঘ মারা। এক দল লোক আগে গিয়ে জঙ্গলে মাচা বেঁধে আসে, গর্ত খুঁড়ে রাখে,—তার ওপরে জাল পেতে রাখা হয়। তার পর তারা চার ধার থেকে হট্টগোল করে বাঘটাকে তাড়া করে—তাড়িয়ে তাকে সেই অধঃপতনের মুখে ঠেলে নিয়ে আসে। সেই সময়ে মাচায় বসা শিকারী বাঘটাকে গুলী করে। কিম্বা বাঘটা নিজেই গর্তে পড়ে হাত-পা ভেঙে মারা পড়ে। সেই আধমরা অবস্থাতেও তাকে বন্দুক দিয়ে মারা যায়,—মানে, ঠিক বন্দুক দিয়ে নয়, গুলী দিয়েই।

"তবে বাঘ এক এক সময়ে ভুল করে বসে। ভুলক্রমে গর্তের [illegible]

মারতে হয়। বন্দুক, গুলী—কিল্ ঘুষি—যা হাতের কাছে পাওয়া যায়। অবশ্যি কাছিয়ে এলে, বাঘ এ সবের মারামারি গ্রাহ্যই করে না। উল্টে বিরক্ত হয়ে বন্দুকধারীকেই মেরে বসে। তবে কি না, পারৎপক্ষে বাঘকে সে রকমের সুযোগ দেয়া হয় না—দূরে থাকতেই তার মতলব গুলিয়ে দেয়া হয়।

"চল্তি কায়দা হচ্ছে এই। পদ্ধতিটা যেমন সাবেক তেমনি অমানুষিক। আমার মতে মোটেই ভদ্রজনোচিত নয়। এক দল লোক মিলে চার ধার থেকে চড়াও হয়ে একটা অসহায় বাঘকে ফাঁদে ফেলা বা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে টেনে এনে মায়াজালে জড়িত করা—তাকে শিকার না বলে শিকারের জালিয়াতি বল্লেই ভালো হয়।

"অবশ্যি, জালে আগাপাশতলা জড়িয়ে পড়লে আখেরে বাঘটার ভালোই হয়। তাকে আর না মেরে—বেঁধে-ছেঁদে প্যাক্ করে পত্রপাঠ চিড়িয়াখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এবং ভেবে দেখলে আসামের জঙ্গলের চেয়ে আমাদের আলিপুর জায়গা মন্দ নয়। ড্যাম্পো নয়, মশা নেই, কালাজ্বর হবার ভয় কম, তাছাড়া নিখরচায় খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত। কিন্তু জানোয়ারের মাথায় কি এ সব তত্ত্ব সহজে ঢোকে? হাড়-জংলী। বুঝতেই পারছেন!

"হ্যাঁ, যা বল্ছিলাম।···শিলং শুদ্ধ সবাই আমরা মেয়েটার পিছু-পিছু ঘুরতে লাগলাম। না, না—দল বেঁধে নয়। ফাঁক মতো। যে যার নিজের ফাঁক তালে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে সকলেই খসে পড়লো। রয়ে গেল মোট দু'জন। সেই বাঘশিকারী আর আমি।

"সেই বাঘমারির চালচলনে, বলতে কি, আমি বেশ ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম। বাঘ-টাগের দিকেই ছোকরার বেশ ঝোঁক বলে শুনে-ছিলাম। কিন্তু তাদের পিছনে না লেগে মেয়েটির আশে-পাশেই তাকে ঘুর-ঘুর করতে দেখা যেত।

ছোকরা না কি দেখতে সুশ্রী ছিল। কাউকে কাউকে একথাও বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তো তার চেহারার ভেতর শ্রী-ছাঁদ কিছুই পাইনি। নানান দৃষ্টি-ভঙ্গীতে তাকি-য়েছি—কিন্তু অহো তাক্ করেও আকৃষ্ট হবার মতো কিছুই আমার নজরে পড়েনি। কাঁধের কাছটা ভয়ঙ্কর রকম চওড়া, চোয়াড়েদের যেমন হয়ে থাকে। ফর্সা রঙ, এতো ফর্সা যে পানসে বলে মনে হবে। তার ওপর গাল দু'টো গোলাপী—হুবহু মেয়েলি টাইপের—যার-পর-নাই খারাপ। আর বড়ো বড়ো কালো কালো বিচ্ছিরি

করে! অর্থাৎ সমস্ত মিলিয়ে যদ্দূর নোংরা হতে হয়। কিন্তু আর সবার মতে সেই গুলিই ছিলো না কি তার বড়ো রকমের গুণ। এছাড়াও সে গুন্-গুন্ করে গান গাইতে পারতো।

"আর আমার গুণের মধ্যে ছিল আমার সাংবাদিকসুলভ সর্বজ্ঞতা। সেই কাল্চার যার চারা নেই—যার আজ চাড় সব চেয়ে বেশি। আমার কৃষ্টি আর আমার দৃষ্টিভঙ্গী। এছাড়াও, আমার গল্প লেখবার এবং তার চেয়েও আরো, গল্প করবার ক্ষমতা। ঠিকমতো জায়গায় যুতসই কথাটা বসাতে আমি মজবুত ছিলাম। কথার প্যাঁচে মারা আর মার প্যাঁচের কথায় আমার বাহাদুরি ছিলো অবিসংবাদিত। তাছাড়া, সংবাদিত বিষয়েও আমার জোড়া মিলত না। নিউটনের আপেল পড়ার ব্যাপারে আমি আলোচনা চালাতে পারতাম। জ্ঞান-সমুদ্রের উপকূলে উপল কুড়োতে গিয়ে কি ভাবে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন এবং কেবল নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়েই ঝুড়ি করেছেন তা আমার অজানা ছিল না। আইন্‌ষ্টাইন্ যে আইনজীবি নন্ তাও আমার জানা ছিল। কি করে সমুদ্রের মোহনায় পলি পড়ে ব-দ্বীপ গজায় তার রহস্য ব্যক্ত করে' শ্রোতাদের থ' করে দেয়া আমার পক্ষে শক্ত ছিল না। একস্বরে, অমিট্রে রে এবং প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধেও বেশ দু' কথা আমি সবাইকে শুনিয়ে দিতে পারতাম।

"এবং এই ভাবেই আমাদের দু'জনের রেষারেষি চল্ছিল। নিজের নিজের ধারায়। তার গালের আপেলের বিরুদ্ধে আমার নিউটনী আপেল, তার মোহময় চোখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার মোহনাময় ব-দ্বীপ। সে গুন্ গুন্ করে গান শুনিয়ে যাবার পরেই আমি

দেশনেতার গরম বক্তৃতার গন্‌গনে একখানা ছেড়ে দিতাম। তার গুঞ্জনের পরেই আমার গর্জনা। এই ভাবেই চলছিল। মোটের উপর, দু'জনের কেউই কাউকে আমরা টেক্কা দিতে পারছিলাম না। আর মেয়েটিও, আমাদের কার ওপরে যে তার টান, হাব-ভাবে তার বিন্দু-বিসর্গও জানান্ দিত না।

"চলছিল এম্‌নি। এমন সময়ে আরেক ব্যক্তি এসে হানা দিলো। তার উপস্থিতিতে চিরন্তন ত্রয়ীর আমাদের চলতি ত্রিভুজ চ্যাপ্‌টা হয়ে চার কোণা হয়ে দাঁড়ালো! এই অভিব্যক্তিটি এক বাঘ।

"প্রকাণ্ড এক বাঘ। কোথ্‌ থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের সহরতলীতে এসে হাজির হোলো কেউ বলতে পারে না, কিন্তু তার জ্বালায় মশাই, গোরু-বাছুর নিয়ে কারু ঘর করা দায় হোলো। মাঝে মাঝে সে সহরের এলাকাতেও টহল দিতে আসত। হাওয়া খেতেই বোধ হয়, কিন্তু হাওয়া ছাড়া অন্যান্য খাবারেও তার অরুচি ছিল না। একবার এক মনোহারী দোকানের সব কিছু সাফ্‌ করে নিয়ে গেল। আরেক বার এক গ্রামোফোনের দোকান ফাঁক করলো। একবার এক সন্দেশওলাকে সাবাড় করলো—তার সন্দেশ-সমেত। সন্দেশের দোকানীকে পরে অবশ্যি পাওয়া গেছ্‌ল—একটু বেহুঁস অবস্থায়—বেপাড়ার মদের দোকানে। এক জনের লাউড-স্পীকার নিয়ে উধাও হোলো এক দিন। কিন্তু লাউড-স্পীকারে বাঘের কী দরকার—হ্যাঁ, মশাই? ও-জিনিষ বাঘা বাঘা নেতার বক্তৃতায় লাগলেও বাঘের ওতে কী প্রয়োজন? ওদের পার্টস্‌ অব্‌ স্পীচ তো এমনিই খুব জোরালো বলে' শোনা যায়।

"বাঘের দুর্ব্যবহার দিনকের দিন বাড়তেই লাগলো। এক দিন সকালে সহরের একটি স্মার্ট মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেল না—সেই সঙ্গে কলেজী এক ছোকরাকেও—নিঃসন্দেহ সেই বাঘের কাণ্ড। ক্রমে সেখানকার যত কিছু ক্রাইম্‌ আর কেলেঙ্কারি—যার কিনারা হোতো না—সবই অবশেষে সেই বাঘে গিয়ে বর্তাতে লাগলো। সেই অঞ্চলের চোর, ডাকাত, দালাল আর ঘটক—এদের সকলের কর্তব্যের গুরু ভার—সেই বাঘ একলা নিজের ঘাড়ে একাধারে বহন করছিলো। কি রকম ভয়ঙ্কর বাঘ ভাবুন একবার!

"বাঘ-শিকারী আমার সন্নিকটও তার খর্পর থেকে রেহাই পায়নি, তার গোড়ালির খানিকটা সেই বাঘের খাবার মধ্যে চলে গেছ্‌ল, সেই সঙ্গে, তার নতুন গগল্‌সের চশমাটাও। যৎসামান্য ওই দু'টি জিনিস হাতিয়েই সে অমন কীর্তিমান্ একটা লোককে কেন ছেড়ে দিল তা বুঝতে আমি অক্ষম। তাহলেও এই নিয়ে তাকে ঠাট্টা করবার সুযোগ আমি ছাড়লাম না। তাকে বেশ এক হাত নিলাম। মেয়েটির সামনেই তাকে বদ্ধুর পারি খেলো করে দিলাম।

"ফলে আমাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে গেল। রাগের মাথায় আমি বলে বসলাম, আমি হলে কখনই বাঘকে আমার গোড়ালি গছিয়ে পালিয়ে আসতাম না। গোড়াতেই তাকে পাক্‌ড়ে আনতাম। এমন কি দরকার হলে, যদিও আমি অহিংস-নীতির ভক্ত, বাঘটাকে মেরে ফেলাও আমার কাছে কিছু শক্ত ছিল না।

"বাস্তবিক, ভেবে দেখলে, অনেক বুদ্ধিজীবি বাঙালী সাংবাদিকের পক্ষে এ কাজ এমন কি কঠিন? প্রত্যহ কতো রাজা উজীরকেই তো আমরা মারছি—বলে, ব্রিটিশ-সিংহকেই যায়েল করে দিলাম! একটা বাঘ মারব, তার এমন কি! নেহাৎ ছেলেখেলা বই তো না!

"আমার এই কথার পরে যা হবার তাই হোলো। মেয়েটি বলে বস্‌লো, আমাদের দু'জনের যে বাঘটাকে মেরে শিলঙের সবাইকে বাঁচাতে পারবে, বুঝতে হবে সেই তাকে সত্যিকারের ভালো-বাসে। আর সে তার গলাতেই মালা দেবে।

"তার এই কথায় আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম। চাঁদ এবং বাঘ। ঠিক করলাম সেই রাত্রেই বাঘটাকে পাক্‌ড়াতে হবে। দেরি করলে পাছে আর কেউ শিকার করে ফ্যালে বা বাঘটা নিজেই আত্মহত্যা করে বসে—এমন দাঁওটা ফস্‌কে যায়—সেই ভয়ে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা আমি সমীচীন বোধ করলাম না। তক্ষুনি চলে গেলাম—আহা! আপনাকে ঠাকুর ডাকছে যে! রান্না-ঘরে আপনার জলখাবার দেয়া হয়েছে, শুন্‌ছেন না?"

"চুলোয় যাক্ খাবার।" জবাব দিলেন ভালুক-শিকারী: "পরে খাব'খন। বাঘের কী হলো শুনি?"

"হ্যাঁ। আমার পাল্লাদার তো লোক-লস্কর জোটাতে বেরিয়ে পড়লো! তক্ষুন তক্ষুন। সেই গর্ত খোঁড়া, ফাঁদ পাতা, জালাঙ্গাল,—সেই সব সেকেলে কায়দা-কানুন! তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে। আর আমি সোজা চলে গেলাম মাংসের দোকানে—সদ্যনিহত আস্ত একটা পাঁঠার যোগাড় করতে। তার পরে গেলাম এক দাবাইখানায়। সেখানকার ডাক্তারের সঙ্গে কন্‌সাল্‌ট করে' ঘুমের ওষুধ যোগাড় করলাম। এক পাউণ্ড লুমিনল, এক পাউণ্ড ভার্নল, আর এক পাউণ্ড ব্রোমুরাল কিনে সমস্ত সেই পাঁঠার কুক্ষিগত করে' জঙ্গল আর সহরতলীর সঙ্গমস্থলে গেলাম। নদীর ধারে বাঘটার জলখাবার জায়গায় রেখে দিয়ে এলাম পাঁঠাটাকে। তার পর বাসায় ফিরে আমার সাংবাদিকতা নিয়ে পড়লাম। নেতৃবরের সেদিনকার বক্তৃতার রিপোর্ট লেখা তখনো বাকী ছিল।"

"নেতা রাখুন, বাঘের কী হোলো বলুন আগে?" হাঁ হাঁ করে উঠলো সবাই।

"বলছি তো। ভোর না হতেই একটা ঠেলা-গাড়ী নিয়ে সেই সঙ্গমস্থলে আমি গেলাম। বাঘের জলযোগের জায়গায় গিয়ে দেখি, অপূর্ব দৃশ্য! ছাগলটার শুধু হাড় ক'খানাই পড়ে আছে, আর তার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন আমাদের ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল! গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। রাত্রে যারা চৌকি দেয় তেমন কোনো পাহারাওলাও এমন ঘুম বুঝি কখনো ঘুমোয়নি। দেখে আমার যা আনন্দ হোলো তা বুঝতেই পারছেন। তক্ষুনি আমি জানোয়ারটার হাত-পা-মুখ—আপাপাশতলা বেঁধে ফেললাম।..."

"বেঁধে ফেললেন?" সবাই হাঁ।

"হ্যাঁ, বেঁধেই তো ফেলব।" আমিও অবাক্ না হয়ে পারি নাঃ "কেন, বাঁধবো না কেন?"

"বাঁধবার সময় বাঘটা হঠাৎ জেগে উঠ্‌লো না?"

"সত্যি বলতে, এক-আধটু যে নড়ে চড়েনি, তা নয়। হাই তুলবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু তক্ষুনি আমার পকেটে যে মোটা খাতা ছিলো—যাতে নেতাদের বক্তৃতার নোট নিতাম—তাই দিয়ে তার মাথায় বেশ এক ঘা বসিয়ে দিয়েছি। আর যেমন চোট্ খাওয়া অমনি ঠাণ্ডা।"

"নোট-বইয়ের ঘা খেয়ে?"

"হবে না? বই ভর্তি ছিলো কী? তার পাতায় পাতায় উদ্দীপনাময়ী গরমাগরম যতো বাণী। একবার কারো মাথায় ঢুকলে আর রক্ষে আছে? তা সে বাঘই হোক আর বাঙালীই হোক্। মানুষই হোক্ আর মেষই হোক্। আর যেই না সেই দেশাত্মবোধের ধাক্কা লাগা, অমনি সে আবার অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে।..."

"যাক্ গে। তার পর?"

"তার পর আর কি? তাকে বেশ করে বেঁধে-ছেঁদে আমার ঠেলায় টেনে তুললাম। তুলে রওনা দিলাম—সহরের দিকে।"

"আপনার ভয় করলো না?" গণ্ডারবাজ জিজ্ঞেস করলেন।

"কেন, ভয় কিসের?"

"বাঃ, জলজ্যান্ত একটা বাঘ পশ্চাতে রেখে ঠেলাগাড়ী টেনে নিয়ে যেতে ঘাবড়ালেন না একটুও? হাজার হোক, নিশ্চয়ই সে আপনার সেই অহিংস নেতাটির মতো নয়।"

"কিন্তু সে যে তখন ঘুমিয়ে একেবারে কাতা।"

"সারা রাস্তা?"

"বিল্‌কুল। মাঝে মাঝে অবশ্যি সে জেগে উঠতে চেয়েছে, একটুখানি চেতনার মতো দেখা দিয়েছে হয়তো বা, তক্ষুনি তার মাথায় আমার নোট-বইয়ের এক ঘা। আর তার পরেই আবার তার নাক-ডাকানি সুরু। ঘুমুতে ওস্তাদ ছিলো বটে—সেই বাঘটা। প্রায় আমার পাল্লাদার। যাই হোক্, এই ভাবে তো টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে সহরে ফিরলাম। ফিরলাম আমার প্রিয়া-নিবাসে। তার সামনে তাকে ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম।"

"ল্যাজ্ ধরে? বলেন কি মশাই?" ভল্লুক-শিকারী অবিশ্বাসের হাসি হাসলো।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাজটা শিষ্টজনোচিত নয়, তা মানি, কিন্তু ল্যাজ্ ছাড়া তার ধরবার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা যে।"

"যাক্ গে। তার পর কী হোলো?"

"আমার প্রতিদ্বন্দ্বীটির যেন মাথা কাটা গেল। বিনা বাক্য-ব্যয়ে সে সরে পড়লো সেখান থেকে। আর—আর—"

তার পরের কথা প্রকাশ করতে স্বভাবতই আমার সংকোচ হতে থাকে।

"তার পর?"

তার পর আর কি।..."

"সেই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল আপনার?"

"উঁহু।"

"বিয়ে হোলো না—তার মানে?"

"তার মানে, তার কোনো মানে হয় না। মেয়েটি বিয়ে করতে চাইতেই আমার বুক কাঁপতে লাগলো। সঙ্গিনীরূপে মেয়েরা অপূর্ব কিন্তু আর সব রূপে একেবারে সঙ্গীন্। তাছাড়া অতো সুন্দর মেয়েকে একেবারে নিজের করে পাওয়া—একান্ত কাছাকাছি পাওয়া—দিন-রাত সব সময়ের জন্ত পাওয়া...ভাবতেই আমি কেমন ঘাবড়ে গেলাম। সেই দিনই দেশ-নেতার কাছে আমার সম্পাদকির কাজে আমি ইস্তফা দিলাম, আমার আত্মশক্তিতে আর কুলোলো না। সেই

ধারাবাহিক নূতন উপন্যাস

নগরবাসী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২ পৃষ্ঠায় সুরু হল

ভদ্রলোকটি কায়েদে আজম না অন্য কেউ?

গণদেবতা

—মনুজ দাস

গর্কী-স্মৃতি

নিকোলাই তেলেশেফ্
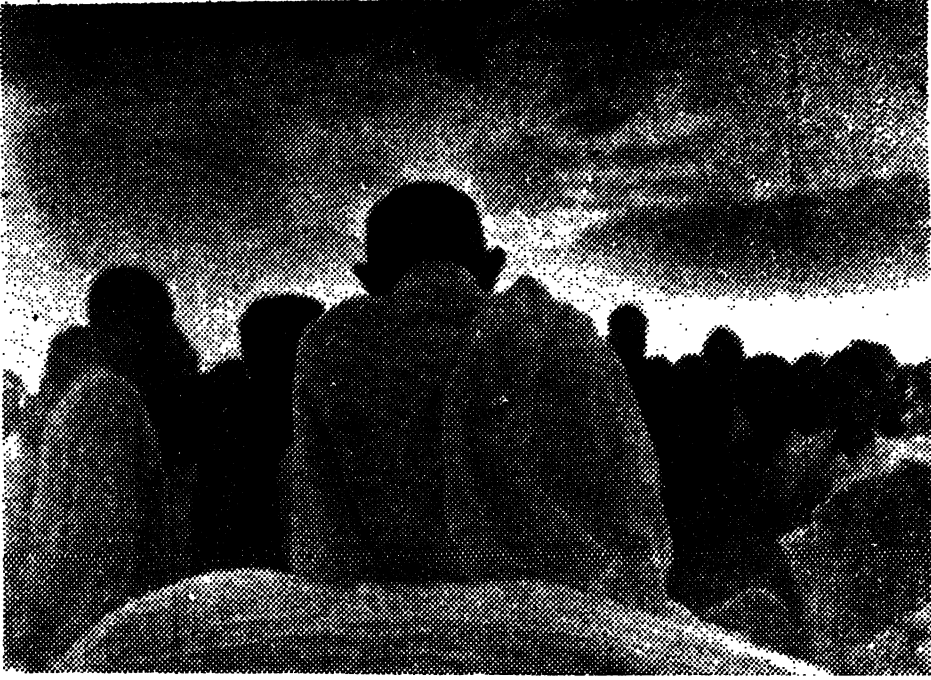
জনপদ। আগে নাম ছিল নিঝ্নি নভগরদ—আজ নাম হয়েছে গর্কী। এখানেই আজ প্রায় ৫০ বছর আগেকার কথা; দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে এই সহরেই ম্যাক্সিম গর্কীর। গর্কী তখন যুবক। তাঁরই নামে আজ সহরের নামকরণ হয়েছে। এই সহরেরই একটি কাগজে এক দিন তাঁর লেখা পড়লাম:—"চারি দিকে প্রাণের স্রোত উঠছে ফেনিয়ে; নতুন চেতনা উঠছে জেগে; নতুন কর্ত্তব্যের আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। নতুন মানুষের হচ্ছে উদ্ভব। সেই নতুন মানুষ প্রশ্ন করবে—কোথায় সত্য? কোথায় বিচার? শত্রু কে মিত্র কে?..."

তখন ছিল স্বেচ্ছাচারের যুগ। রুশ জনগণ তখন সবে সেই স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা সুরু করেছে। ছাত্র, শ্রমিক, লেখক, কর্ম্মচারী সকলেই তখন এই অত্যাচারের প্রতিবাদে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখছে। গর্কীর মত লেখকের আবির্ভাবের পক্ষে সময়টা ছিল অত্যন্ত উপযুক্ত। তাঁর গল্পগুলো ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ—দুর্নিবার ছিল তাদের আকর্ষণ, জীবন্ত ও সাবলীল তাদের রূপ আর গতি। ইচ্ছাশক্তি আর আত্মবিশ্বাসের উন্মাদনায় তারা কথা কয়ে উঠত—"মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।"

ঠিক সেই সময়েই দেখা হোল আমাদের দু'জনের। গর্কী ছিলেন লম্বা, রোগা, সামান্য একটু কুঁজো। চুল পিছন দিকে উল্টে আঁচড়ান। পাতলা এক জোড়া গোঁফ ছিল। চোখ দু'টি ছিল বসা। হাসি তাঁর ছিল দুর্লভ, কিন্তু হাসতেন যখন, সে হাসি ছিল অতি মিষ্টি। ভলগা অঞ্চলের বাসিন্দাদের মত তাঁর কথায় 'ও'টা একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করতেন।

অনেকে আমাকে জিগেস করেন, "সাহিত্যিক বুধবারটা" কি ব্যাপার? গর্কীকে আলাপ হবার পরই আমি এই বিশিষ্ট বুধবারের কথা বলেছিলাম। বুধবারে বুধবারে উদীয়মান তরুণ লেখকসম্প্রদায়ের একটা জমায়েৎ হোত; সেখানে সকলে লেখাগুলো ছাপবার আগে পড়া হোত, সমালোচনা হোত। গর্কীকে বলতেই তিনি বললেন যে, "খুব ভাল কথা, মস্কোতে গেলেই আমি জমায়েতে হাজির হব। আপনারা বেশ ব্যবস্থা করেছেন তো, লেখকদের তো এই ভাবেই মিলে-মিশে কাজ করা উচিত। লেখকদের ক্ষতি করার ভুল পথে নিয়ে যাবার লোকের তো অভাব নেই।" সেদিন থেকে গর্কী যখনই মস্কো গিয়েছেন, বুধবারের সাহিত্য-আসরে যোগ দিয়েছেন। ভেরেসায়েভ, বুনিন, আন্দ্রিয়েভ, কুপ্রিণ, স্কিতালেৎসের মত নবীন লেখক থেকে আরম্ভ করে চেখভ, করলেংকো, মামিন-সাইবীরিয়াকএর মত প্রবীণ লেখকেরাও আসরে উপস্থিত হতেন। এই আসর থেকেই গর্কী তাঁর "জ্ঞানসংগ্রহ" (Collected knowledge) প্রকাশ করেন। আসরে নবীন লেখকদের কাছ থেকে তিনি লেখা সংগ্রহ করতে করতে বললেন—"আজকের দিনটিকে আসুন অমর করে রাখা যাক।—চলুন ফটো তুলে আসি সকলে মিলে।" তোলা হোল ফটো। ফটোতে রইলাম আমরা সাত জন—আমি, গর্কী, স্কিতালেৎস্, আন্দ্রিয়েভ, চালিয়াপিন, বুনিন আর চিরিকভ্। প্রতিবিপ্লবী "ব্ল্যাকহানড্রেড"দের কাগজগুলো ছাড়া অন্য সব কাগজে ছবিখানি ছাপা হোল এবং বহু কপি দেশ-বিদেশেও গেল। গর্কীর নাম তখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছে।

১৯০০ সালের বসন্ত কাল। ইয়াল্‌তায় আবার আমাদের দেখা হোল। উঁচু একটি জায়গায় একটি বাসা নিয়ে আছেন গর্কী। সেখান থেকে সমুদ্রের ও প্রাকৃতিক শোভা বড় সুন্দর লাগল চোখে। সবই যেন প্রস্ফুটিত-যৌবনা। গর্কীর ঘরখানি আমার বেশ মনে পড়ে। সারা দিনই লোকের আনাগোনা। সারা দিনের মধ্যে [illegible]

ম্যাক্সিম গর্কী ও এইচ জি ওয়েলেস
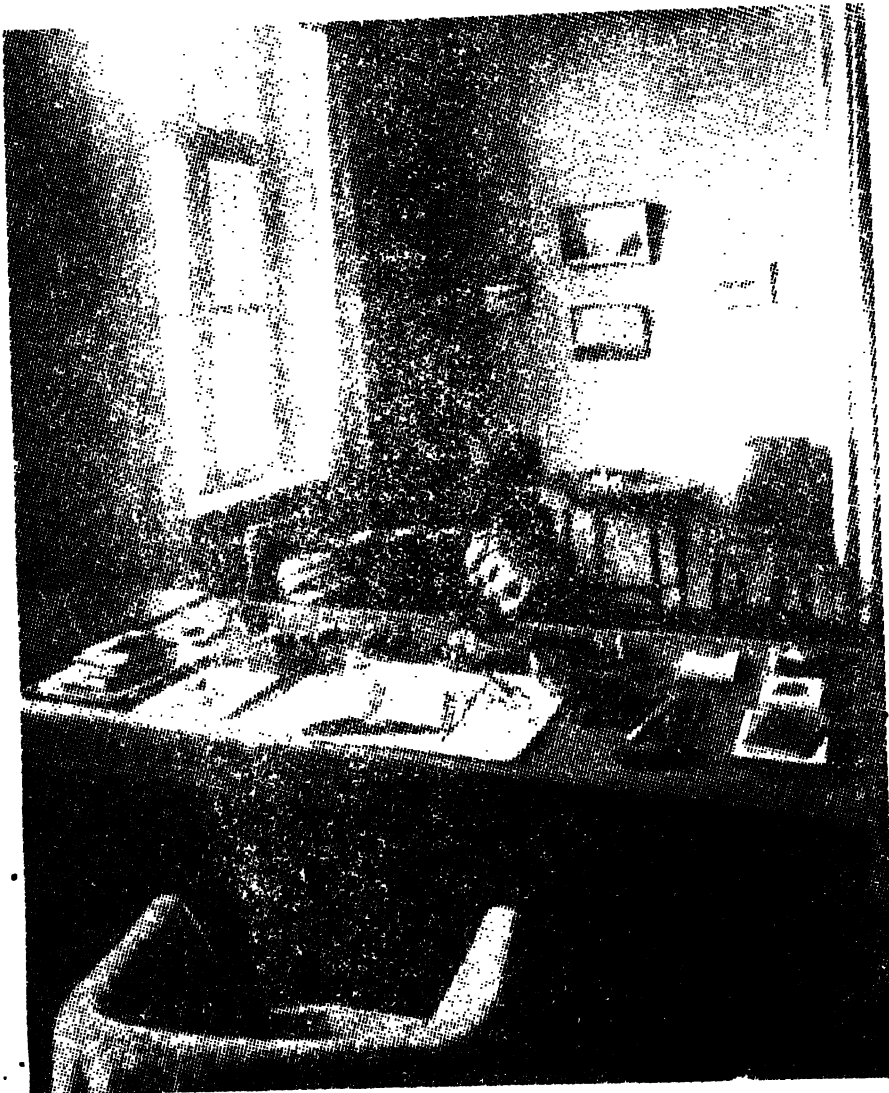
আমাদের দেখা হত প্রতিদিন। কোন দিন আমি আর বুনিন তাঁর কাছে যেতাম, কোন দিন তিনি আসতেন আমাদের হোটেলে। এখানেই গর্কীর সঙ্গে আমার পরিচয় হোল আরও ঘনিষ্ঠ, পরিচয় হোল তাঁর অগাধ পড়াশোনার, তাঁর প্রতিভার তাঁর মনের উদারতার সঙ্গে। যে বিষয়েই তিনি কথা বলুন না কেন, অতি সরল সোজা ভাষায় তা বলতেন। সেই বলার মধ্যে কোনখানে এতটুকু আড়ম্বর ছিল না অথচ আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধারণ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আর আশা এই দিয়েই গড়া তাঁর প্রকৃতি। মাঝে মাঝে আমরা সবাই মিলে চেখফের বাড়ী যেতাম।

গর্কীর গানের গলা ছিল খুব মিষ্টি। গান ছিল তাঁর সাধের জিনিস। আমি, গর্কী, চালিয়াপিন্ আর স্কিতালেৎস চার জনে মিলে

গর্কীর সৃষ্টিক্ষেত্র

গর্কীর শব যাত্রা

মাঝে মাঝে জেলে-ডিঙ্গি বেয়ে যেতাম কৃষ্ণসাগরে। আমাদের চারি দিকে জল থৈ-থৈ করত; আর কোন জন-মানব বা জাহাজের অস্তিত্ব থাকত না। নীল সাগরের ঢেউগুলোর উপর সোণালী আলো মাখান থাকত। চালিয়াপিন্ গান ধরতেন,—"ডাউন্ সন্ মাদার ভল্গা।" তার পর গর্কী আর স্কিতালেৎস্ সমস্বরে! নীরব শ্রোতা মাত্র আমি একা। চালিয়াপিনের গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে যেত দূর-দূরান্তরে, ঢেউএর পর ঢেউ ডিঙ্গিয়ে।......

রুশ-বিপ্লবের উপর গর্কীর প্রভাব হোল অদ্বিতীয়। ঠিক সেই জন্যই সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রী সর্বহারা শ্রেণী সাহিত্যের স্রষ্টা হচ্ছেন ম্যাক্সিম গর্কী!

১৯৪১ সালের ভয়াবহ কালো নভেম্বর মাসের ৬ই তারিখ—নাৎসী বাহিনী মস্কোর সিংহদ্বারে উপস্থিত। ঠিক সেই দিন মস্কো সোবিয়েতের অধিবেশনে স্তালিন এক ভাষণে বলেন যে, গর্কী হলেন রুশ জাতির সেই স্তরের মানুষ যে স্তরে হলেন, লেনিন, পুশকিন আর বেলিনস্কি!

মলোটভ স্টালিন

গর্কীর শবদেহ
বহন করে নিয়ে চলেছেন
ষ্টালিন ও মলোটভ প্রভৃতি।

নতুন ব্যালজাক

ষ্টিফেন জুইগের লেখা ব্যালজাকের জীবন-কাহিনীর পাঠক-সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কিন্তু উইলিয়াম হোবার্ট রয়েসের চেয়েও গভীর আবেগ নিয়ে কেউ সে বই পড়েনি। ভদ্রলোকের বয়স ৬৮ বছর। প্রায়ই তিনি এমন হাবভাব দেখান যেন তিনিই স্বয়ং ব্যালজাক। তিনি দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ব্যবসা করেন। নিজের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ঔপন্যাসিকের মন, দেহ এবং আত্মা লাভের জন্য জীবনের অধিকাংশই তাঁর ব্যয় হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এমন অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছেন যে, তিনি ফ্রান্সে কখনও পদার্পণ না করলেও এবং ফরাসী ভাষায় কষ্ট করে কথা বললেও ব্যালজাক-ভক্তরা প্রথম দর্শনেই তাঁকে বলে ওঠেন, "রক্ত-মাংসের শরীরে ব্যালজাককে দেখলাম।"

ব্যালজাকের মত রয়েসও গোলগাল এবং ঢলঢলে। চুল-দাড়ির ছাঁটকাটও একই রকমের। ব্যালজাকের মতই তিনি ভোজনবিলাসী। মস্তিষ্ক-কোষ সক্রিয় রাখবার জন্য ব্যালজাকের মত গ্যালন গ্যালন কড়া কালো কফি খান, নস্য নেন এবং ব্যালজাকের প্রিয় তামাক 'লটাকিয়া' সেবন করেন। ব্যালজাকের মতই তিনি প্রথম রাতটা ঘুমিয়ে মধ্য-রাত্রে উঠে লেখা-পড়ার কাজ করেন। এই সময়টিতে তিনি ব্যালজাকের মত সন্ন্যাসীর আলখাল্লা পরেন। ভদ্রলোকের ধৈর্যশীলা স্ত্রী স্বামীর এই খেয়াল চরিতার্থ করবার কাজে সাহায্য করতে কখনও বিরক্ত বোধ করেন না।

ব্যালজাক সাহিত্যে রয়েসের পাণ্ডিত্য সুগভীর। তিনি ব্যালজাকের ৩ শত ৫০ খানি গ্রন্থের গ্রন্থ-বিবরণী লিখেছেন এবং চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস দুই খণ্ডে সেই গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। আরও ছয় খানি গ্রন্থ-রচনার মাল-মসলা তাঁহার হাতে আছে।

ষ্টিফেন জুইগ রয়েস সম্বন্ধে লিখেছেন, "রয়েস যশ অথবা লাভের পেছনে ঘুরছেন না। এযুগের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার সেবা করে তিনি পবিত্র আনন্দ লাভ করেন। তাই তাঁকে এই দ্বন্দ্বময় জীবন যাপন করতে হচ্ছে।"

রয়েসের এই ব্যালজাক-প্রীতির জন্য ফরাসী প্রাদেশিক সহর ইসোডন তাঁকে নাগরিকের সম্মানে ভূষিত করেছেন।

যৌবনে ব্যালজাকের "লা পেরে গোরিয়ট" পড়ে রয়েস তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং সেই থেকে প্রতিদিন তিনি একখানা করে ব্যালজাকের উপন্যাস শেষ করেন।

রয়েস বাস করেন ব্রুকলীনে (নিউইয়র্ক)। ব্যালজাকের বাড়ীর মত তাঁর বাড়ীর নামও "লা জার্ডিস" এবং বাড়ীটি ব্যালজাকের বাড়ীর মতই পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

১৯৩৪ সালে রয়েস আমেরিকায় ব্যালজাক সোসাইটী গঠন করেন। তিনি এই ক্লাবের সভাপতি এবং বুলেটিনের সম্পাদক। ক্লাবের সদস্য-সংখ্যা ৫০০। সদস্যদের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তিরা আছেন।

ব্যালজাক সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন করে রয়েস এমন এক বুদ্ধি-বৃত্তির স্তরে উঠে গেছেন যে, যে কোন বিষয়ে তিনি তাঁর গুরুর মত মতামত ব্যক্ত করেন এবং দৃষ্টিভঙ্গিটিও ঠিক গুরুরই মতন। যেমন ধরুন প্রেম সম্বন্ধে, "যত দিন তুমি ভালবাসবে, তত দিনই তোমার জীবন, যত বেশী ভালবাসবে তত বেশী বাঁচবে" মেয়েদের সম্বন্ধে, "বিশ্বের সুন্দরতম বস্তু হচ্ছে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক।" গণতন্ত্র সম্বন্ধে, ব্যালজাক গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন।

রয়েসকে ঠিক 'নকল ব্যালজাক' বলা চলে না। তিনি ব্যালজাকের একনিষ্ঠ ভক্ত, তাই ব্যালজাকের আচার-ব্যবহার নকল করতে ভালবাসেন। কিন্তু কখনও নিজের লেখা গল্প বা উপন্যাস নিয়ে "ব্যালজাকের মত লিখেছি" বলে পত্রিকা-অফিসে গিয়ে হানা দেন না।

ব্রুকলীনের বাড়ীতে রয়েস। ব্যালজাকের মত পোষাক পরে (উপরে ব্যালজাকের ছবি দেখুন) পাঠাগারে বসে আছেন।

পিকাসো-পায়রা সাক্ষাৎকার

মঁসিয়ে পিকাসো? খোলা জানলা ডিঙিয়ে অভদ্র ভাবে আপনার ঘরে প্রবেশ করছি বলে ক্ষমা করবেন। আমি মাসিক বসুমতীর প্রতিনিধি। আপনার কাছ থেকে কিছু জেনে নিয়ে মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেবার বাসনা নিয়ে এসেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কেমন করে সুরু করব তাই আমি জানি না। "আমার তর্জনী আর মধ্যমায় আরাম করে বসে আরম্ভ করুন"—মধুর কণ্ঠে বললেন শিল্পী। আপনার অসীম অনুগ্রহ। কিন্তু আপনি আমায় স্নানাগারে নিয়ে চলেছেন কেন? "কারণ স্নানাগারের পথে আপনি তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারবেন। শুনছেন না, আমার দৌবারিক কি রকম দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে? সে আবার আমার চিলে ঘরে অচেনা পায়রার উপস্থিত পছন্দ করে না। ছোট বন্ধু, জানলা দিয়ে উড়ে গিয়ে দেখুন কোন জলপাই শাখায় বসতে পারেন কি না। যদি পারেন, তাহলে আমি আপনার প্রতিমূর্ত্তি রেখাঙ্কিত করব। দেখবেন সেটা চমৎকার হবে। আর যদি কোন জলপাই গাছ খুঁজে না পান তা হলেও ক্যানভাসে বেঁধে রাখব আপনাকে। কিন্তু সে ছবিটি হবে বড় ভয়ঙ্কর।"

স্নানাগারে। বিশ্বের নম্রতম বিহঙ্গমা বিশ্বের ভীষণতম শিল্পীর সম্মুখীন।

"আপনার সৃষ্টি, মঁসিয়ে……সেই দু'মুখো মহিলারা। আপনি আমাদের ডানা ধরে বেদনাদায়ক ভাবে টানাটানি করছেন না কি? কোথায় খুঁজে বেড়ান আপনি আপনার অনুপ্রেরণা? আপনি কিছুই বোঝেন না, সব লাভ করেন? এবং এই মুহূর্তে আপনি প্যারিসের সব চেয়েও সুন্দরী পায়রাটিকে লাভ করেছেন—তাই না? আমি বাজী রেখে বলতে পারি, সব পায়রাকেই আপনি ঐ একই কথা বলেন।"

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ঘরে-বাইরে

নিমাইচরণ সরকার

হড়প্পা
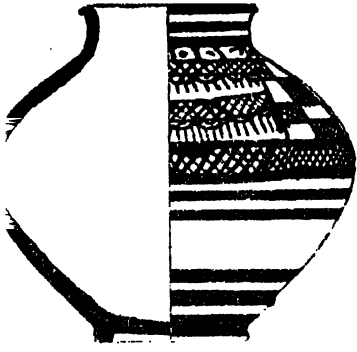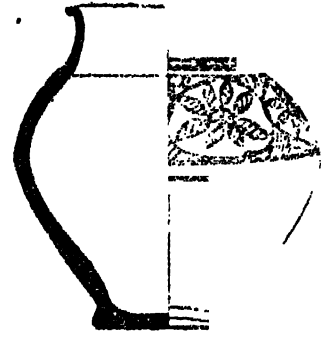
বিশ্বরূপ গুপ্ত

ঋগ্বেদকেই আমরা ভারতবাসীরা সাধারণতঃ আমাদের সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস ব'লে বিশ্বাস করি। কিন্তু আজ আর সে বিশ্বাস করা চলে না। আজ যদি কেউ তা বিশ্বাস করেন তাহলে সেটা জন্মগত কুসংস্কার বলতে হবে। খুব বেশী হলেও ঋগ্বেদ খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বছরের পুরানো। তা'ছাড়া আর্য্য-ঋষিদের যে সব স্তোত্র-মন্ত্র তার মধ্যে আছে তা থেকে বোঝা যায় যে, আর্য্যদের বৈদিক-সভ্যতা অনেক পরবর্ত্তী যুগের সভ্যতা, ভারতবর্ষের আদি সভ্যতা নয়।

ঋগ্বেদের 'ঋক্' বা মন্ত্রগুলি পড়লে দেখা যায় যে, একটা বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তির উপরেই বৈদিক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। এই বৈদিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোর মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় ঋক্‌গুলি থেকে। সেখানে দেখতে পাই, বৈদিক যুগে আর্য্যদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল 'গরু'। গরু আর ঘোড়া যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়াই ছিল যজ্ঞকারীর শ্রেষ্ঠ কামনা ও বাসনা। অর্থ বলতে তখন প্রধানত গরু ও ঘোড়াই বোঝাত'। দেবতার কাছে যত প্রার্থনা আছে তার মধ্যে প্রথমেই গরু আর ঘোড়ার উল্লেখ দেখা যায়, তার পরে মানুষের। গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, কুকুর গৃহপালিত পশুদের মধ্যে অন্যতম ছিল। যে সব ষাঁড় প্রজননের কাজে ব্যবহার করা হত না তাদের দিয়ে লাঙল আর গাড়ী টানানো হত। দেবতাদের কাছে ষাঁড় ও মহিষ বলিদানও দেওয়া হত। গরু-পালনের পর ভেড়া-পালন করাই ছিল প্রধান কাজ। পশুর লোম দিয়ে কাপড় কম্বল ইত্যাদি বোনা হত। গরু ছাড়া ঘোড়াও বৈদিক যুগে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য জন্তু ছিল দেখা যায়। ঘোড়া যুদ্ধের সময় রথ টানত', ঘোড়দৌড়ের বাজী জিতত'। গাধাও বোঝা বইত', কিন্তু ঘোড়ার তুলনায় গাধার আদর অনেক কম ছিল। ঘোড়ার কদর গরুর সমানই ছিল বলা চলে। তার পর কুকুর। কুকুর পশুপালকদের কাছে গরুর সন্ধান এনে দিত, মৃগয়াতে নিত্যসঙ্গী থাকত', চোর-ডাকাত তাড়াবার কাজ করত' এবং উৎসব উপলক্ষে বা যাগযজ্ঞে মাংসের হাড়গোড় খেতে পেত। প্রধানত, এই সব পশুই ছিল বৈদিক আর্য্যদের আর্থিক সম্পদের উপকরণ। সুতরাং পশু-পালন এবং পশু-উৎপাদনই ছিল, তাদের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রধান সংগ্রাম। তার পর হ'ল, কৃষিকাজ অথবা খাদ্যশস্য উৎপাদন। যে জমিতে মানুষ স্থায়ি ভাবে বাসস্থান তৈরী করত তাকে বলা হত "ক্ষেত্র," আর কৃষিকাজে ব্যবহারের উপযুক্ত জমিকে বলা হত "উর্ব্বর"। আবাদের জমি সম্বন্ধে বিশেষ আইন-কানুন, বিলি-বন্দোবস্ত এবং

ভূগর্ভস্থ সমাধি হইতে প্রাপ্ত মাটির পাত্র

পোড়ামাটির মূর্তি :—জীবজন্তু, দেবদেবী, নরনারী
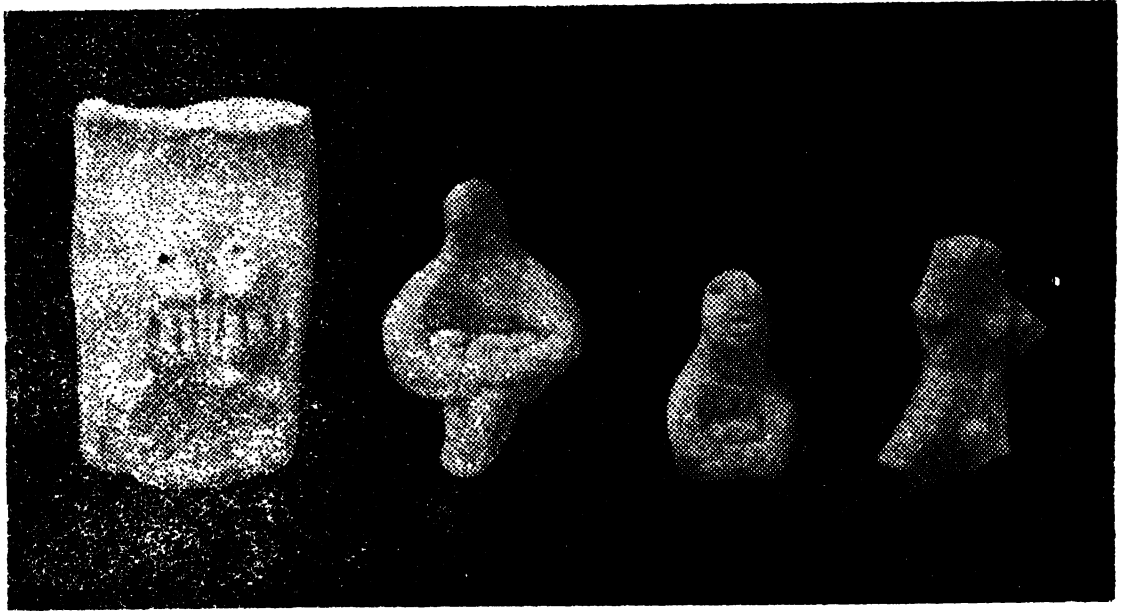
ব্যক্তিগত অধিকারের (ভোগের জন্য) ব্যবস্থাও ছিল দেখা যায়। চাষের জন্য "লাঙ্গল" ব্যবহার করা হত। সাধারণতঃ, গম ও যবেরই চাষ হত বেশী। ধান-চালের উল্লেখ বেদে কোথাও পাওয়া যায় না। কৃষিকাজ ছাড়া নানা রকমের হাতের কাজ ছিল দেখা যায়। যেমন কাঠের কাজ, রথ তৈরীর কাজ, ধাতুর কাজ, চামড়ার কাজ, কাপড়-বোনার কাজ

হড়প্পার শবসমাধি
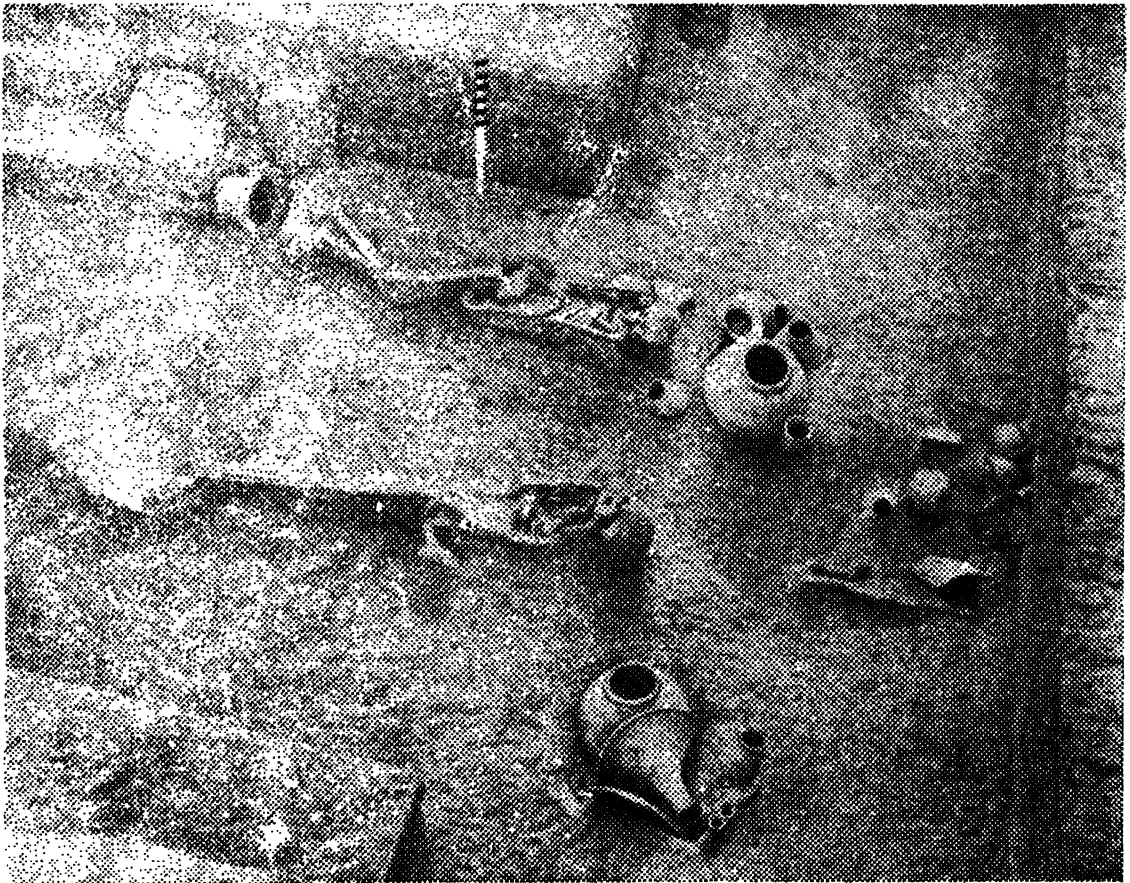
ইত্যাদি। বৈদিক যুগের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যও যে না করত তা নয়। বেদে নৌকায় ক'রে সমুদ্র-গমনের কথার অনেক উল্লেখ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য অবশ্য পণ্য-বিনিময় পদ্ধতিতে চলত, এবং টাকার বদলে গরুরই ব্যবহার করা হত। গরুর দামেই সব জিনিসের দাম ঠিক হত, এমন কি অন্যান্য পশুর পর্য্যন্ত। বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক কাঠামো মোটামুটি এই রকম ছিল। রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা এরই অনুরূপ ছিল। রাজা ও পুরোহিত প্রধান একটা সমাজ-ব্যবস্থা বৈদিক যুগের শেষের দিকে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখা যায়।

বৈদিক যুগের এই যে সভ্যতা একে নিশ্চয়ই মানুষের আদি সভ্যতা বলা যায় না। তা যদি না বলা যায় তাহ'লে ভারতবর্ষেরও আদি যুগের সভ্যতা নিশ্চয়ই বৈদিক-সভ্যতা নয়। তার আগে সভ্যতার অনেকগুলি স্তর মানুষকে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং ভারতবর্ষের মানুষও রাতারাতি হঠাৎ বৈদিক-যুগে অবতীর্ণ হয়নি। তার আগে গেছে সুদীর্ঘ আদি-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগ, তাম্র-প্রস্তর ও ব্রোঞ্জযুগ। তার পর দেখা যায় ইতিহাসে বৈদিক-যুগের আবির্ভাব। সুতরাং, আজ আর কোন মতেই বৈদিক-যুগকে ভারতীয় সভ্যতার আদি-যুগ বলা যায় না। তা যদি বলা হয় তা'হলে ভারতীয় সভ্যতাকে প্রাচীনতম সভ্যতা বলারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না।

আদি-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগের সভ্যতার ইতিহাস বাদ দিলে আজ দেখা যায় প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছে সিন্ধু নদের উপত্যকায়। প্রস্তর-যুগের ভারতীয় সভ্যতার কোন নিজস্ব বিশিষ্টতা নেই। অন্যান্য দেশের মতন ভারতবর্ষেও এই সভ্যতার সুদীর্ঘ বিকাশ হয়েছিল এই পর্য্যন্ত আজ নৃবিদ্‌রা প্রমাণ করেছেন। প্রাচীনতম স্থায়ী ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন হ'ল সিন্ধু-সভ্যতা। সিন্ধু-সভ্যতা না বলে আজ আমরা এই সভ্যতাকে "হড়প্পা-সভ্যতা" নিঃসন্দেহে বলতে পারি। প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই সভ্যতাকে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টা তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে। সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো ও চানহুদড়োতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা যে সব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মাটি খুঁড়ে বার করেছেন, তা থেকে একটা বিরাট সভ্যতার ধারাবাহিক বিকাশ সিন্ধু থেকে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আন্দাজ করা যায় মাত্র। কিন্তু এই সভ্যতার ধারাবাহিকতাকে আজ পর্য্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। সাধারণতঃ যে সব নিদর্শন যে ভাবে পাওয়া গেছে, তাতে এইটাই মনে হয় যেন একটা বিরাট সভ্যতার বিকাশ হঠাৎ এক দিন ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে হয়েছিল, তার পর যে কোন কারণেই হোক তার ক্ষয় ও ধ্বংস হয়েছে। এই সভ্যতার একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত লেখার চেষ্টা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা এত দিন ধরে করছিলেন। শুধু তাই নয়, সুমের ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও তাঁরা করছিলেন। তা না করলে, হড়প্পা সভ্যতার ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে যেমন পরিপূর্ণ ধারণা হয় না, সভ্যতার ইতিহাসের দিক্ দিয়েও তেমনি তার ঠিকুজী তৈরী করা যায় না। প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করা খুবই কঠিন, কিন্তু তার চাইতে আরও অনেক বেশী কঠিন, সেই ভগ্নাবশেষ ও বিক্ষিপ্ত সব নিদর্শন জোড়-তালি দিয়ে ইতিহাসের একটা যুগের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি তৈরী করা। মানুষের কঙ্কালের কয়েকটা টুকরো হাড়-গোড় আর মাথার খুলি থেকে পরিপূর্ণ মানুষটিকে এবং তার জাতটিকে পর্য্যন্ত যেমন নৃবিজ্ঞানীকে অনেক
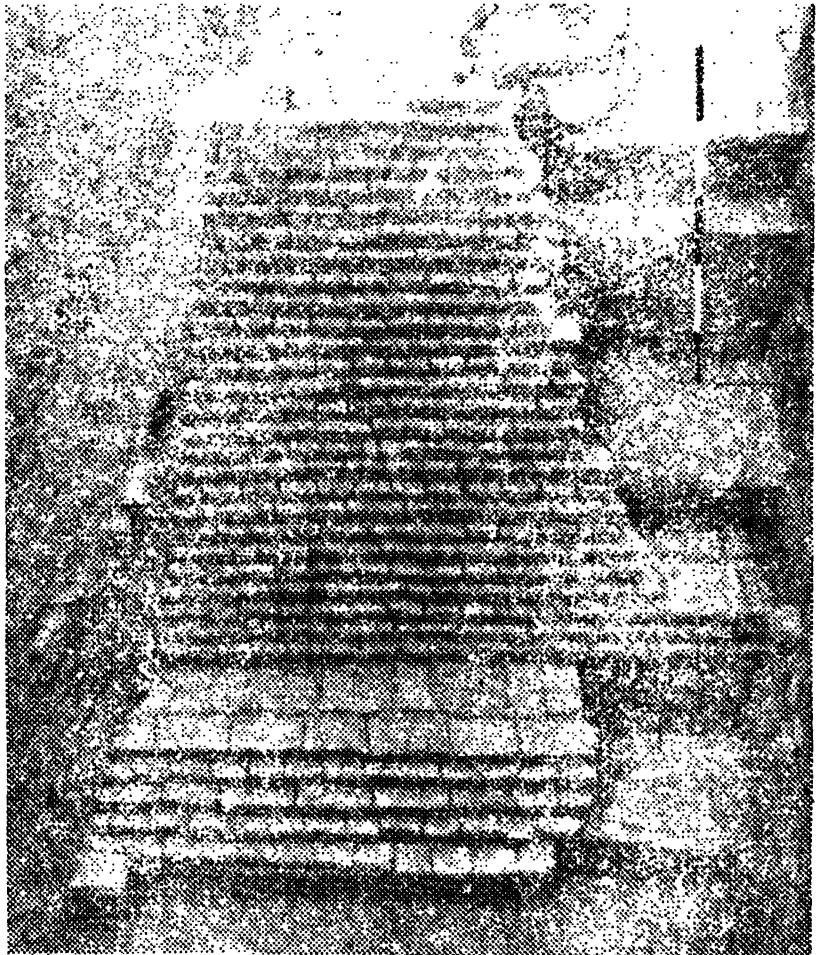
হড়প্পার নগর-রক্ষা ব্যবস্থা

কল্পনা ও গবেষণা ক'রে রূপ দিতে হয়, তেমনি প্রাচীন সভ্যতার ভূগর্ভস্থ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষ থেকে সেই সভ্যতার পরিপূর্ণ পরিচয়টি তৈরী করতে হয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের। শুধু একটা বংশ-পরিচয় তৈরী করলেই মুক্তি নেই, ইতিহাসের সঙ্গে তার একটা সংযোগ স্থাপন করাই আসল কাজ। এই সংযোগ স্থাপনের কাজ এত দিন সুসম্পন্ন হয়নি। এত দিন পর্য্যন্ত তাঁরা ইঙ্গিত ও কল্পনাই করছিলেন। তার বেশী তাঁদের করার সাধ্য ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে ভারত গবর্ণমেন্টের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ থেকে এই অঞ্চলে আরও জোর অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এই অনুসন্ধান চালানোর ফলে আরও যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে এই প্রাচীন যুগের প্রাগান্ধকার ইতিহাস অনেকটা আলোকিত হয়েছে বলা যায়। মৃৎশিল্পের অনেক নতুন নিদর্শন পাওয়া গেছে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত মজবুত দুর্গ ও প্রাকারও খুঁড়ে বার করা হয়েছে। আগে কল্পনার সাহায্যে যে ইতিহাসের কাঠামো অনেকটা তৈরী করা হয়েছিল বলা যায়, আজ তার যথেষ্ট বাস্তব উপাদান পাওয়া গেছে। সুমের ও মিশরের সভ্যতার সঙ্গে আজ হড়প্পার সভ্যতার একটা যোগাযোগ স্থাপনের উপায়ও আবিষ্কৃত হয়েছে। আরব সাগর থেকে সিমলা পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রায় হাজার মাইল জুড়ে ৩৭টা অঞ্চলে এই "হড়প্পা-সভ্যতার" ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত দু'টিকেই রীতিমত বিরাট কেন্দ্র বলা চলে—একটি হড়প্পা, আর হড়প্পার চাইতে কিছু বড় মহেঞ্জোদড়ো। দু'টি শহরই যেন নিজস্ব একটা উদাসীন গাম্ভীর্য্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হবে যেন তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই বা ছিল না কোন দিন। বাকী অন্যান্য অঞ্চলের ভগ্নাবশেষগুলি ছোট ছোট স্তূপ মাত্র, গ্রামের নিদর্শন, শহরের নয়। কিন্তু হড়প্পা ও মহেঞ্জোদড়োর মধ্যে যদিও প্রায় ৪০০ মাইলের ব্যবধান, তাহলেও এই দু'টি শহরের যে রাজকীয় মহিমা ও ঐশ্বর্য্য দেখা যায়, তাতে তাদের বিরাটত্ব এবং স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। দু'টি শহরই রীতিমত সুরক্ষিত এবং সেই নগর-রক্ষা ব্যবস্থার ভগ্নাবশেষ যা আজও মাথা তুলে রয়েছে, তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সেকালের এক নির্মম স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রেরই প্রতিমূর্তি এই শহর দু'টি। এই সব নিদর্শন ছাড়া অন্যান্য উপায়েও অবশ্য এই হড়প্পা সভ্যতা সম্বন্ধে জানবার আরও অনেক কিছু আছে। হড়প্পার বর্ণমালা যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা যত দিন না পড়তে পারা যাচ্ছে, তত দিন এর বেশী জানার আর উপায় নেই। তত দিন কেবল মাটি খুঁড়েই সব জানতে হবে। এই মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে হড়প্পার গোরস্থান সম্বন্ধেও অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। যা পাওয়া গেছে তাতে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সুমের সভ্যতার মত হড়প্পা সভ্যতারও শব-সৎকারের ব্যবস্থা ছিল। সুমের সভ্যতার সঙ্গে হড়প্পার সমকালীনত্ব এই দিক্ দিয়েও প্রমাণিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, আজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের অবিশ্রান্ত খনন-কার্য্যের ফলে আমরা ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন হড়প্পা সভ্যতার কুলগত পরিচয় প্রায় সঠিক ভাবেই জানতে পেরেছি এবং ঐতিহাসিক কুল-নির্ণয়ের বাস্তব উপাদানও আমাদের হাতে এসেছে।

হড়প্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের অনুসন্ধানের ফলে আজ দেখা যায়, খৃষ্টপূর্ব প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর থেকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত নানা রকমের গোষ্ঠী ও গ্রাম্য সমাজ গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য অনুযায়ী তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও তারতম্য ছিল। এই সময় মানুষ যে শুধু চাষ করতে এবং পশুপালন করতে শিখেছে তা নয়, মানুষ তাপ-নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে, মাটির পাত্র তৈরী করতে শিখেছে, ধাতুর সন্ধান পেয়েছে এবং প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা থেকে ধাতু গলাতে, ঢালাই করতে, পেটাতে শিখেছে। এই সব নতুন বিদ্যা ও কৌশল আয়ত্তে আনার ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আগের চাইতে অনেক বেড়েছে। তার ফলে আগেকার গ্রামীণ সভ্যতা ও সমাজের কূপমণ্ডূক বৃত্তি ভেঙে গেছে। সমাজের সঙ্গে সমাজের, মানুষের সঙ্গে মানুষের, দেশের সঙ্গে দেশের যোগাযোগ ও লেন-দেন বেড়েছে। নদী উপত্যকার পাললিক ভূমির উর্ব্বরতা অতুলনীয়। সেখানে প্রচুর ফসল ফলে। ফসলের প্রাচুর্য্য লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি করে, উদ্বৃত্ত যা থাকে তাই ভোগ করে এক শ্রেণীর লোক প্রত্যক্ষ উৎপাদনের মেহনত থেকে মুক্তি পেতে পারে। সমাজে কারিগর শ্রেণী, পুরোহিত শ্রেণী ও শাসক শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয়। তাই নদী উপত্যকায় গ্রামীণ সভ্যতার বদলে নগর সভ্যতার গোড়া-পত্তন হয়েছে।

আগেকার আত্মনির্ভরশীল গ্রাম্য সমাজ ধ্বংসোন্মুখ। কৃষক ও পশুপালকদের পরিবর্ত্তে প্রত্নতাত্ত্বিকরা দেখতে পেলেন যে, মানুষ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। সমাজের মোটামুটি সমতল ভূমিতে ফাটল ধরেছে। এই সব শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হ'ল পুরোহিত শ্রেণী, রাজা-রাজড়া শ্রেণী, কেরাণী-কর্ম্মচারী-বণিক্-কারিগর শ্রেণী, সৈনিক শ্রেণী ইত্যাদি। এবারে প্রত্নতত্ত্ববিদ্রা ভূগর্ভ অনুসন্ধান ক'রে খুঁড়ে যত না উৎপাদনের হাতিয়ার পেলেন, তার চাইতে অনেক বেশী পেলেন কুটীর-শিল্পজাত নানা রকমের সামগ্রী, মন্দিরের আসবাব-পত্তর, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, কুম্ভকার-পটুয়ার মাটির তৈরী রঙ-বেরঙের পাত্র, বিরাট বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ, পিরামিড, প্রাসাদ, অট্টালিকা, কারখানা, মজুর-বস্তি, দুর্গ, সুরক্ষিত প্রাচীর ইত্যাদি। এই সব নিদর্শন সুমের, মিশর, হড়প্পা ও মহেঞ্জোদড়োর সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এগুলি এক নতুন সভ্যতার নিদর্শন, যাকে আমরা শ্রেণি-সভ্যতা এবং রাষ্ট্রীয় নগর-সভ্যতা বলতে পারি।

সুমের ও মিশরের মতন হড়প্পা-মহেঞ্জোদড়োতেও একই রকমের নিদর্শন অনেক পাওয়া গেছে বলে অনেকে এই সভ্যতাগুলিকে সমকালীন বলেছেন। কিন্তু হড়প্পা-মহেঞ্জোদড়োতে কতকগুলি নিদর্শন পাওয়া যায়নি এত দিন যা সুমের ও মিশরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। পোড়া ইট, চুণ ও মাটি দিয়ে গাঁথা হর্ম্ম্য, শান-বাঁধানো পুষ্করিণী, পাকা পয়ঃপ্রণালী, অভিজাত ধনীর প্রাসাদ, গৃহস্থের ঘর, সাধারণ ভজনালয়, ভোজন গৃহ, স্নানাগার, অতিথিশালা, শ্রমজীবী ও কারিগরদের সারবন্দী বাস-গৃহ, নানা রকমের নক্সা করা মাটির পাত্র, গহনাগাটি—এ সব হড়প্পায় পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু মিশর ও সুমেরের মত গর্ব্বোদ্ধত বিরাট বিরাট পিরামিড, স্মৃতিস্তম্ভ, দুর্গ ও সুদৃ

নগর-রক্ষা ব্যবস্থার কোন চিহ্ন এত দিন পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া, হড়প্পায় শব-সমাধির যে সামান্য চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, তাতে শব-সমাধির চাইতে এখানে শব-দাহ প্রথার চলন ছিল বলে অনেকে মনে করতেন। মার্শাল সাহেব সিন্ধু-সভ্যতার সংকার-প্রথা সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তই করেছিলেন যে অগ্নিদাহ প্রথাই এখানে প্রচলিত ছিল। শব-সমাধির সামান্য নিদর্শন তিনি বিদেশীদের সমাধি বলে মনে করতেন। ম্যাকে সাহেবও পরে আরও অনুসন্ধান করে এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। এই সব কারণে মিশর ও সুমেরের সঙ্গে হড়প্পা সভ্যতার অনেক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা বৈসাদৃশ্য আছে ব'লে অনেকে মনে করতেন। তাঁরা কল্পনা করতেন, মিশর ও সুমেরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা-রাজড়া, ফ্যারাওদের মতন কোন রাজার আবির্ভাব হড়প্পায় হয়নি। একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত সুনিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থাও হড়প্পায় গ'ড়ে ওঠেনি। শাসন-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা যে যথেষ্ট ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে মিশর ও সুমেরের মতন ঐশীশক্তিসম্পন্ন রাজা-রাজড়ার অধীন একটা মজবুত শ্রেণি-রাষ্ট্র হড়প্পায় গ'ড়ে ওঠেনি, এই অনেকের ধারণা ছিল। নগর-রক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না বা তার চিহ্ন তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায়নি বলে এই বিশ্বাস অনেকের বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। আমরা আজকাল যাকে "উদার ধনিক সমাজ" বলি, কতকটা সেই ধরণের একটা সমাজ ও সভ্যতা হড়প্পাতে গ'ড়ে উঠেছিল ব'লে অনেকে অনুমান করতেন। এই দিক দিয়ে সুমের ও মিশর সভ্যতার চাইতে হড়প্পা সভ্যতা অনেকটা প্রগতিশীল ছিল বলে তাঁদের ধারণা ছিল।

হড়প্পার সামাজিক রূপ

সম্প্রতি হড়প্পাতে আরও অনুসন্ধান ক'রে যে সব মূল্যবান ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে আগেকার এই ধারণা বদলে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। এই সব নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে, হড়প্পা সভ্যতার বাসপ্রীতির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না, নেইও। ১৯৪৬ সালে হড়প্পার "এ, বি, স্তূপ" (Mound A B) ভাল ক'রে খুঁজে দেখা গেছে যে, এক সময় এটা রীতিমত সুরক্ষিত ছিল। নগর-রক্ষার একটা বিরাট সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থারও সন্ধান পাওয়া গেছে এখান থেকে। মজবুত বড় বড় দুর্গ, প্রাচীর কিছুরই অভাব নেই। দুর্গ ও প্রাচীর প্রায় তিন বার নতুন ক'রে ভেঙে গড়া হয়েছে দেখা যায়। দ্বিতীয় বার যখন তৈরী করা হয়েছে তখন দেয়ালগুলোকে আরও মজবুত ও চওড়া করা হয়েছে এবং কেবল পাকা ইট দিয়েই গাঁথা হয়েছে। এই সময় হড়প্পা সভ্যতা সমৃদ্ধির সৌধশিখরে উঠেছিল। তার পরের বারে দেখা যায় যে, একটা দিক খুব মজবুত করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দিকের কয়েকটি দুর্গদ্বার একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই সময় হড়প্পা সভ্যতার সঙ্কট এবং এগুলি তার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

এই রক্ষা-ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়ার পর সুমের সভ্যতার সঙ্গে হড়প্পা সভ্যতার সাদৃশ্য ও সমকালীনত্ব প্রমাণ করার সুবিধা হয়েছে। হড়প্পার সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আগেকার ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। সুমেরের নগর-রাষ্ট্রের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ও শক্তির মালিক ছিল পুরোহিত শ্রেণী এবং রাজা। বাইরে সেই সম্পদ ও শক্তির প্রতিমূর্ত্তি ছিল বিরাট মন্দির। ঐশ্বরিক বিধান অনুযায়ী একটা সুসংহত কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থার নিদর্শন ছিল এই দেবতার মন্দির। এই মন্দিরের চারি দিকে থাকত শস্যাগার, কারখানা এবং সেখানে দাস-অনুদাসের মতন কাজ করত অসংখ্য শ্রমজীবীরা। লাগাশের বাউ মন্দিরের পাশে ২১ জন রুটিওয়ালা থাকত ২৭ জন নারী-দাসী নিয়ে, ২৫ জন মদ্য-ব্যবসায়ী থাকত ৬ জন দাস নিয়ে, আর তাদের সঙ্গে থাকত তাঁতি, কুমোর, কামার ইত্যাদি। উরের চন্দ্রদেবী নান্নারের মন্দিরের এলাকার মধ্যে একটা কাপড়ের কারখানা ছিল, তাতে ৯৮ জন স্ত্রীলোক এবং ৬৩ জন শিশু কাজ করত। এই সব নগর অত্যন্ত সুরক্ষিত, দৈবশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তির অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগের প্রতীক-চিহ্ন। সুমেরের এই সমাজ-ব্যবস্থা একটা অত্যন্ত মজবুত শ্রেণী-বিভক্ত-সমাজ ব্যবস্থা, যন্ত্রের মতন সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত। প্রচুর উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদ ভোগ করা ও বণ্টন করার সুবন্দোবস্তও এই সমাজে ছিল। আজকাল আমরা রাজনৈতিক ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে যা বুঝি, তার কোন চিহ্নও ছিল না।

এই যে সমাজের ছবি, এর সঙ্গে হড়প্পা ও মহেঞ্জোদড়োর সমাজের ছবি প্রায় মিলে যায়। যে "এ, বি, স্তূপের" কথা আগে বলেছি, তা সর্ব্বোচ্চ স্থানে অত্যন্ত সুরক্ষিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই স্তূপের তলায় সারি সারি ব্যারাক-ঘর, কুলিদের বাসস্থান, বৃত্তাকার প্ল্যাটফর্মের লাইন এবং শস্যাগার-সমষ্টি। ঘর-বাড়ীর সমস্ত পরিকল্পনাটি ঠিক একটি মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টের মতন, রাজকীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আধিপত্যের চিহ্ন তার মধ্যে যথেষ্ট আছে। কুলিদের ব্যারাকগুলির নকশা এক রকমের, প্রবেশ দ্বার অত্যন্ত নীচু ও ছোট, যেন বাইরে থেকে না দেখা যায় এই ধরণের। শস্যাগারগুলি খুব উঁচু ক'রে গাঁথা, খোলা-মেলা। বৃত্তাকার প্ল্যাটফর্মগুলিতে শস্য পেষার যাঁতা থাকত। এই সব থেকেই বোঝা যায়, হড়প্পার অধীশ্বর, যাঁরা রাজ্যশাসন করতেন তাঁরা সুমের ও আক্কাদের রাজাদের মতন সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতার প্রতিভূ ছিলেন। অর্থাৎ হড়প্পার সভ্যতা যে নীল এবং টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের নদী-উপত্যকার সভ্যতার সমকালীন ছিল, তা আজ প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায়। তাই অবশ্য এত দিন সকলে প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ করা যায়নি। এখন অবশ্য তা প্রমাণ করা যায়। সংকার-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও বলা যায় যে, শবদাহ প্রথার চাইতে শব-সমাধি প্রথারই চলন ছিল হড়প্পার সমাজে। মাটির পাত্রের নকশা এবং শীলমোহরের প্রতীক-চিহ্ন থেকে তো আগেই সুমের ও হড়প্পার সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়েছে।

আজ তা'হলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মিশর ও মেসোপোতামিয়ার সমসাময়িক আর একটি বিরাট সভ্যতার বিকাশ আমাদের এই ভারতবর্ষে সিন্ধু নদের তীরে হয়েছিল। পশ্চিমে তার ওয়াজিরিস্থান ও বেলুচিস্থান পর্ব্বতমালা, উত্তরে হিমালয় এবং পূবে থর মরুভূমি, সুমেরের প্রায় চার গুণ বড়ো একটা ত্রিভুজাকার অঞ্চলে উত্তর-ভারতের মহেঞ্জোদড়ো ও হড়প্পায় এই সভ্যতার বিকাশ ও বিনাশ হয়। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ এবং দেবতা-রাজার একচ্ছত্র আধিপত্যই এই সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। পুরোহিত শ্রেণীই ছিল তার প্রকৃত শাসকশ্রেণী। এই সভ্যতা কি ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তাও আজ অনেকটা জানতে পারা গেছে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ, শ্রেণী-শাসন, স্বৈরাচারী রাজশক্তির চাপে এই সভ্যতা ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে এই ভাবে ধ্বংসস্তূপে

ভুল

শ্রীশান্তি পাল

এমন ভুল কি করে মানুষ
যে-ভুল তুমি ক'রেছ,
হৃদয় দিয়ে হৃদয় পেতে
গুমরে কেঁদে মরেছ।
নূতন প্রণয় বরতে গিয়ে
সকল কিছু বিলিয়ে দিয়ে,
সিক্ত চোখে বেদন নিয়ে
রিক্ত হাতে ফিরেছ ;
এমন ভুল কি করে মানুষ
যে-ভুল প্রিয়ে ক'রেছ !

পড়ছে মনে সে সব কথা
কইতে নিতি সাঁঝেতে ;—
পুকুর-ঘাটে নাইতে এসে
বকুল-বন মাঝেতে !
ঘটটি তোমার ভাসিয়ে জলে,
চাইতে মুখে কৌতূহলে ;—
ভুলিয়ে মোরে কথার ছলে
পালিয়ে যেতে লাজেতে ;
পড়ছে মনে সে-সব কথা
কইতে নিতি সাঁঝেতে।

এলিয়ে খোঁপা কলসী কাঁখে
নুইয়ে তনু, নেউটি,
ঘাটের পথে ফিরতে ঘরে
সহজ যেন সেউটি !
তোমার চলার পথের 'পরে
ফুল ছড়িয়ে যেতাম ধরে,
কইতে তুমি লীলার ভরে
ফুল ছড়াল কে—উটি ?—
অঙ্গ মেজে কলসী কাঁখে
নুইয়ে তনু, নেউটি।

এমনি ক'রে খেলতে গিয়ে
বছর ষোল কেটেছে,
পড়সী-মেয়ে সকাল-সাঁঝে
এই নে' কত নেটেছে।

তাদের কথা শুনতে পেয়ে
কাঁটা-বনের ভেতর যেয়ে,
অবাক্ হ'য়ে রইতে চেয়ে,—
সরমে বুক ফেটেছে ;
এমনি ক'রে খেলার ছলে
বছর ষোল কেটেছে।

হঠাৎ যে-দিন বাজল বাঁশী
তোমার গৃহ-কোণেতে,
ফুলের সাজে ফুলের বাসে
ঢুকলে ফুল-বনেতে।
বসলে চুপে রুদ্ধশ্বাসে
কাজল-লতায় ল'য়ে পাশে,
আকাশে চাঁদ মুচ্‌কে হাসে,—
হাসলে তুমি মনেতে ;
হঠাৎ যে দিন বাজল বাঁশী
তোমার গৃহ-কোণেতে।

অতিথ এল,—শতেক সখী
শঙ্খনাদে বরিল ;
নৃত্য-গীতে-রঙ্গ-রসে
বাসর-রাতি ভরিল।
সে-সুর বাজে দীপক রাগে,
বেহাগ হ'য়ে করুণ মাগে,
তকুল ছেপে জোয়ার জাগে
মল্লারে সে ঝরিল।
অতিথ এল,—শঙ্খনাদে
শতেক সখী বরিল।

প'ড়ছে মনে সে-সব কথা
সইয়ের কাঁধে হেলিয়া,
যাবার বেলা কইলে চুপে,—
'যে-ধন গেনু ফেলিয়া,
যত্ন ক'রে রাখিস তুলে,
কেউ যেন তা' নেয় না ভুলে' ;
বারেক শুধু ঘোমটা খুলে
চাইলে আঁখি মেলিয়া ;

পড়ছে মনে কইলে কথা
সইয়ের কাঁধে হেলিয়া।

সে-দিন ছিল চাঁদনী রাতি
রূপোর আলো ছড়ান,
উঠলে গিয়ে দোলার 'পরে,
গাঁট-ছড়াটি জড়ান ;
পালকী গেল মাঠের পারে,—
পাথর হ'য়ে দেখনু তারে ;
পাথার হ'য়ে অশ্রুভারে—
ধূলায় সে কি গড়ান !
সে-দিন ছিল চাঁদনী রাতি
রূপোর আলো ছড়ান।

কেমন ক'রে কাটল সে-রাত
পারবে না তা' বুঝিতে
পারতে যদি পাগল হ'য়ে
মনের বনে খুঁজিতে।
হয় ত পেতে বুকের কাছে
কোলটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ;
ফুলের ডালি সাজিয়ে যাচে
চরণ দু'টি পূজিতে ;
কেমন ক'রে কাটল সে রাত
পারবে না তা' বুঝিতে

এমন ভুল কি করে মানুষ
যে-ভুল তুমি ক'রেছ ;
হৃদয় দিয়ে হৃদয় পেতে
হাওয়ায় মুঠি ধ'রেছ।
নূতন প্রণয় বরতে গিয়ে
সকল কিছু বিলিয়ে দিয়ে
সিক্ত চোখে বেদন নিয়ে
রিক্ত হ'য়ে ফিরেছ ;
একটি ভুলে কাছে থেকেও
অনেক দূরে সরেছ !

পর্য্যদস্ত করল কারা ? আজ নিঃসন্দেহেই বলা যায়, বৈদিক যুগের আর্য্যরা। বেদে যে দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আছে, কারা সেই দস্যু ? তারাই আদি ভারতবাসী, হড়প্পার সভ্যতা যারা গড়েছিল। তাদেরই দস্যু, অনার্য্য, অসভ্য বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের সভ্যতা যে কতটা সমৃদ্ধিশালী ছিল, হড়প্পা তার প্রমাণ। আর্য্যরা ছিল ঘোড়সওয়ার, দুর্দ্ধর্ষ, উন্নত ধাতু ও হাতিয়ারের ব্যবহার তারা ভালই জানত, বর্শা বল্লম চালাতেও তারা সুদক্ষ ছিল, যুদ্ধবিদ্যা বেশ আয়ত্তে এনেছিল। তাই হড়প্পার মতন সমৃদ্ধিশালী সভ্যতা যখন শ্রেণী-জর্জ্জরিত হয়ে অন্তঃসারশূন্য হয়ে এসেছিল তখন তাকে তাসের ঘরের মতন ভেঙে ফেলতে আর্য্যদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তবে লড়াই যে তাদের বেশ ভাল করেই করতে হয়েছিল তার প্রমাণ বেদে স্পষ্ট আছে।

—শৈল চক্রবর্তী

হরিজনদের মধ্যে মহাত্মাজী

শীতে উপেক্ষিতা

'রঞ্জন'

এক

মুমূর্ষু সরীসৃপটা যেন পুনরুজ্জীবিত হোলো। স্টেশনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্ল্যাটফরমের বিশাল পরিধিতে পরিব্যাপ্ত যে অগণিত জনতার কোলাহল এতক্ষণ শোকার্তের আর্তনাদের মতো সকলের কর্ণপীড়ার কারণ হয়েছিল, ক্রমে তা-ও প্রায় নিমজ্জিত হয়ে গেল এঞ্জিনের বেসুরো আসুরিক আওয়াজে। দীর্ঘ, স্থাণু লৌহকক্ষ-সমষ্টির পঞ্জরে এলো দুরন্ত প্রাণের স্পন্দন, শোনা গেল আসন্ন গতির বৃহৎ গর্জন। কর্কশ ঘণ্টাধ্বনিতে খণ্ডিত হোলো বহু জনের বিদায় সম্ভাষণ, ব্যাহত হোলো বহু জনের ব্যবসায়িক বার্তা-বিনিময়। অনেকের হয়তো অনেক কিছু থেকে গেল অকথিত, কিন্তু নিষ্প্রাণ স্টেশনের বৈদ্যুতিক ঘড়ি তার খবর নেয় না; সে চলে আপন নিয়মে আর তারই নির্দেশে চলে রেলগাড়ি। নীল সার্জের সুনিষ্কর্ম-পরিহিত গার্ডের বাঁশী ও আলোর সংকেতে সরীসৃপ অপসৃত হোলো ধীর গতিতে, অপেক্ষমান ব্যক্তি সমূহের অসমাপ্ত কাহিনীর প্রতি নির্দয় ঔদাসীন্যে।
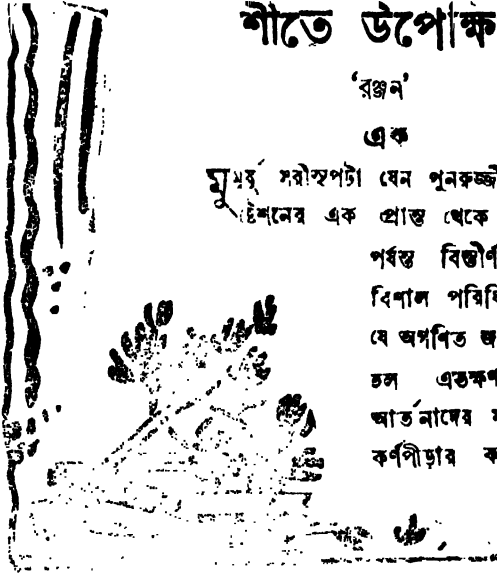
এই বিদায়ের ক্ষণটি আমার মনে বড়ো বেদনাবিধুর হয়ে বাজে। যে জনসমাগমকে আমার পশ্চাতে রেখে এলেম তার এক জনের সঙ্গেও আমার মুহূর্তমাত্রেরও পরিচয় ছিল না, দ্বিতীয় সাক্ষাতে তাদের এক জনকেও অপর জন থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারব না, কিন্তু তবু কী যেন একটা অকারণ বিষাদ বোধ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে প্রতি যাত্রার প্রাক্কালে। রাজনীতিতে আমি সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিবিশ্বাসী, জনতা সম্বন্ধে আমার ভীতি মজ্জাগত, সাম্যবাদীদের গণদেবতার স্তবগানে আমি জীবনে কখনো কণ্ঠযোগ করিনি, বহুকে আমি কখনোই বিশেষের ঊর্ধ্বে স্থান দিইনি, সমষ্টিকে সর্বদাই ব্যষ্টির ব্যর্থতা বলে জ্ঞান করেছি। তবু কেন জানিনে, এই ডকে, স্টেশনে বা ঘাটে ফেলে যাওয়া জনতার জন্যে আমার মনে আছে একটা আন্তরিক মমত্ববোধ। এই ভীড়ের নৈকট্য আমার মনে আনে শংকিত সংকোচ। আমার মন বাস করে এই জনতার বহু দূরে স্থিত স্বকল্পিত এক শ্বেতদুর্গে, এদের শারীর সান্নিধ্য আমাকে দেয় একটা অতিশয় অস্বস্তিকর অনুভূতি, এই জনতার সঙ্গে আমার চরিত্র ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান অপরিসীম, এর বুদ্ধি সম্বন্ধে আমার মন অশ্রদ্ধার পরিপূর্ণ, কিন্তু তবু একে রেখে যাওয়ার সময় আমার সমগ্র সত্তা যেন জানে যে কোন একটা অদৃশ্য বন্ধন ছিন্ন হোলো এই মুহূর্তে। বুদ্ধি দিয়ে এ-বোধের নাগাল পাইনে, কিন্তু তা বলে এর অস্তিত্বকে তো অস্বীকার করতে পারিনে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলুম এই সহসা জড়ীভূত জনতার দিকে। তার আকৃতি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে হতে ক্রমে সম্পূর্ণ ভাবে আমার দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হোলো। রেলগাড়ির গতিবৃদ্ধির সঙ্গে তার ধ্বনিতে সংযোজিত হোলো সেই অতি পরিচিত একঘেয়ে অতিবাধ্য সুরটা। সে-রাগিণীর জন্যে বাক্যরচনা ছিল আমার শৈশবের প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা। গাড়ির চাকা আর লাইনের সংঘর্ষে যে সংগীতের সৃষ্টি হয় তাকে দিয়ে কখনো বলিয়েছি 'তুমি যাও, আমি যাই,' কখনো বা মনে-মনে শুনেছি রেল-লাইনের আপন মর্মবেদনা, 'আমি থাকি, তুমি যাও'। আজ যেন সেই ছেলেমানুষী কথার খেলায় শুনতে পেলেম স্টেশনের পরিচয়হীন জনতার ক্রন্দনধ্বনি। 'হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।'

মৃত্যুতে আকস্মিকতার বিস্ময় আছে। দীর্ঘ, আরোগ্যাতীত অসুস্থতার ক্ষেত্রেও একেবারে চরম বিদায়ের মুহূর্তটা থাকে অজ্ঞাত। মৃত্যুজনিত বেদনার গভীরতা যতটা তার প্রতিকারহীনতার জন্য, প্রায় ততটাই বোধ হয় তার পূর্বজ্ঞানহীনতার জন্য। কিন্তু গাড়ি-ছাড়া? তার বিদায় আর আগমনী তো পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্ব-ঘোষিত। বর্তমানের অস্থির-ব্যবস্থায় রেলগাড়ির আগমন যদি বা প্রায়শই বিলম্বিত হয়, গমনে ব্যতিক্রম ঘটে কদাচিৎ। তবে কেন বেদনাবোধ? স্টেশনের বৃহদাকার ঘড়িটা প্রতি পলে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছে, বলেছে, আর বাকি আছে পাঁচ মিনিট, চার মিনিট, তিন, দুই, এক! তবু কেন শেষ মুহূর্তের সেই বিয়োগ-ব্যথা? আবেগ-বিশ্বের অধিকাংশ কেন-র মতোই এ-প্রশ্নেরও সঙ্গত, যুক্তিসম্মত কোনো সদুত্তর নেই। প্রস্তুতিরও বিশেষ সার্থকতা নেই। যুদ্ধকালীন নিয়োগের অস্থায়িত্বের কথা তো জানা ছিল সকল কর্মচারীর, তবু কেন যুদ্ধাবসানে তাই নিয়ে ধর্মঘট? মানব-জীবনের নশ্বরতার কথা শৈশবের পাঠ্যপুস্তকে মুখস্থ করেছে সবাই, তবু কেন প্রিয়জনের তিরোধান আনে সেই অসহনীয় শূন্যতা?

বাহিরের চলমান ও ঘনায়মান অন্ধকারের ভয়াবহ গর্ভ থেকে চোখ সরিয়ে গাড়ির অভ্যন্তরে আনতেই সহযাত্রীদের সম্মিলিত কলস্বর কানে এলো। সে তো স্বর নয়, শোর। কথা নয়, কলহ। যে-কোনো বিদেশী সেখানে উপস্থিত থাকলে কালবিলম্ব না করে অ্যালার্ম চেন টানতে উদ্যত হোতো, গার্ড এসে বলতো: 'কী ব্যাপার বুঝতে পারিনি, কিন্তু কী যেন একটা বিষম বিরোধ বেধেছে এদের মধ্যে।' সামান্য অনুসন্ধানে অচিরেই আবিষ্কৃত হোতো যে বিরোধের বাষ্পমাত্র নেই, সহযাত্রীদের মধ্যে সৌজন্য-বিনিময় হচ্ছে মাত্র! অন্তরঙ্গতার তরঙ্গোৎক্ষেপকে যে-বিদেশী দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত বলে ভ্রম করতে পারতো, তাকে আর যেই দোষী সাব্যস্ত করুক আমি তার ফাঁসির হুকুম দিতে পারব না।

অথচ আমি শম্বুকস্বভাব ইংরেজ নই। ট্রামে-ট্রেনে আমি আমার চতুর্দিকে সংবাদপত্র বিস্তার করে এক সাময়িক দুর্গ রচনা করিনে রোজ সকালে। আমারও মনের তয়খানায় আছে একটা সঙ্গকামী, প্রীত্যর্থী বুভুক্ষু। বন্ধুত্বের উষ্ণতা আমারও হৃদয়কে স্পর্শ করে, সৌহার্দের স্নিগ্ধতা আমারও মর্মে মধুরতা বর্ষণ করে, প্রীতির মাধুরী আমারও অন্তরকে জাগ্রত করে। দ্বীপমনা ইংরেজের মতো অপরিচিতকেই আমি অরি জ্ঞান করিনে, প্রতি আগন্তুককেও কিছু সন্দেহভাজন মনে করিনে। অজানাকে জানবার অভিলাষ আমারও আছে, কিন্তু দূরকে অতি নিকট করবার বেলায় আমি একটু সাবধানতার পক্ষপাতী। সম্ভাব্য কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষতির আশংকা নেই সে দ্বিধার মূলে, আছে শুধু স্বভাবগত একটা উচ্ছ্বাসের অনাতিশয্য, চরিত্রগত একটা মাত্রাবোধ। পরিচিতির বাইরের-ঘরে থাক বহু

;, অন্তরঙ্গতার অন্দরমহলে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র দিই অতি সংখ্যক, সমমানস বিশেষ কয়েক জনকে। আন্তরিক সেই প্রীতির সম্পর্কটা উভয় পক্ষের অর্জনসাপেক্ষ, পারস্পরিক সেই ঝা-পড়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ। সহযাত্রিত্বের মতো কস্মিক একটা ঘটনার পরিবেশে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে রা জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রথম সাক্ষাৎ মিললো সেইখানে— পন্যাসে আর চলচ্চিত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে বহু—কিন্তু সেটা নিয়ম য়, ব্যতিক্রম। সহযাত্রীকে আমি তাই সহযাত্রী বলেই মনে করি, র বেশী নয়। আকস্মিক সান্নিধ্যের সুযোগ নিয়ে নিজকে প্রক্ষিপ্ত রিনে অপরের উপর।

কিন্তু, হায়, ইতিহাসে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে শান্তিকামী জাতির পর প্রতিবেশী, আগ্রাসী রাষ্ট্রের আক্রমণের। ভারতবর্ষ তার দ্রতাবোধ দিয়ে হিন্দ-পাকিস্তান সীমান্তের সম্মান রক্ষা করলেও পর পক্ষ আন্তর্জাতিক ভব্যতাকে উপেক্ষা করে উর্দিবিরহিত বাহিনী প্রেরণ করতে পারে কাশ্মীরে আর জয়সালমীরে, আমার সহযাত্রীরা রে আমার নৈঃশব্দের নির্দেশ না মেনে আমার ব্যক্তিগতের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করতে। রাজধানীর 'অকাল গ্রীষ্ম' সম্বন্ধে যে একটা রীতিমতো গরম আলোচনা যখন অনেক দূর অগ্রসর য়েছে তখন এক জনের প্রয়োজন হোলো আমার সমর্থনের। আমার পিতৃব্যের বয়সী সেই ভদ্রলোক তাঁর গরম কোটটা খুলতে লতে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কী বলেন দাদা ?"

মাসিয়ে ট্রিগভে লী-র উদ্দেশ্যে মনে মনে বললেম, দেখে রাখো কোন পক্ষ থেকে প্রথম গুলীনিক্ষেপ হোলো।

এক মাত্র নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কারো মুখে এই 'দাদা' সম্বোধনটার বিরুদ্ধে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় বিদ্রোহ করে। এ আহ্বানে আন্তরিকতা নেই; বহু-ব্যবহারের মালিন্যযুক্ত এই ডাকটায় আমি একটা অশোভনতার আভাস পাই। কেবলি ভয় হতে থাকে যে এর পরেই সুরু হবে অনাহূত আত্মীয়তা; প্রশ্নধারা বর্ষিত হতে থাকবে নানা ব্যক্তিগত ব্যাপারে যার উত্তর দিতে অন্তরাত্মা আপত্তি করে, উত্তর না দিতে সৌজন্য। ফুটবল খেলায় যেমন অফসাইড আছে, একটা সময়ে প্রতিপক্ষ একটা সীমানার এপারে আসতে পারবে না, তেমনি সামাজিক জীবনে একটা আইনের প্রয়োজন আছে যা বাইরের লোককে বলবে; এই পর্যন্ত, এর পরে আর নয়। খেলার রেফারীর প্রহরিতা নিয়ম-ভঙ্গের প্রতিকার করে কিন্তু রেলের কামরায় আমার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় নিজেকেই। হুইলারের ষ্টল থেকে ক্রীত বিদেশী সাময়িক পত্রগুলিকে বিস্তৃত করে দিলেম আমার মুখের সামনে।

চীনের দেয়াল চীনকে বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি, মাজিনো লাইন পারেনি ফ্রান্সকে রক্ষা করতে। আমার পত্রব্যূহ ব্যবস্থাও তেমনি শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হোলো। পূর্ব-জিজ্ঞাসা উচ্চতর কণ্ঠে পুনর্ঘোষিত হোলো: "আপনি কোথায় যাচ্ছেন সার?" এবারে আর উত্তর না দিয়ে উপায় রইল না। বললেম, "দার্জিলিং"।

"দার্জিলিং!" !!!

বিস্ময়বিস্ফারিত কণ্ঠে আমার গন্তব্যস্থলের নামটার এমন সম্মিলিত পুনরুচ্চারণ যে কোনো নাট্য-পরিচালকের শিক্ষার বস্তু হতে পারতো। আমার নিজের কৌতুকবোধ ব্যাহত হোলো সমগ্র সহযাত্রীকুলের এই সমবেত কৌতূহলপ্রদর্শনে। এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। এই জন্যেই সকল প্রশ্ন এড়াতে চেষ্টা করেছিলেম প্রাণপণে। কিন্তু একবার যখন এদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি তখন জানি যে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি থেকে পরিত্রাণ নেই। এখন, ভাগ করে নিতে হবে সকলের সাথে আলাপন।

আমি আলাপবিলাসী। বিলাসী বলেই সকল আলাপেই আনন্দ পাইনে, কথা যে বলে তাকেই কথক বলে মনে করিনে। সঙ্গীত সম্বন্ধে দেখেছি, সাধারণত মানুষের একটা সংকোচ আছে। সে বিদ্যায় যার পারদর্শিতা নেই, তার জন্যে সুরময় কণ্ঠ বিধাতা যাকে দেননি, সে স্নানের ঘরে বা কলকাতা বেতারের ষ্টুডিয়োর বাইরে বড়ো একটা গায় না। লোকেও তাকে গাইতে বলে না। কিন্তু কথার বেলায় সে-সংকোচের বালাই নেই, কথা বলতে পারাটায় যেন সকলের জন্মগত অধিকার! অনাবশ্যক প্রগল্ভতাকে বমাল করতে যেন প্রয়োজন নেই সাধ্যের বা সাধনার। অন্তত আমার সহযাত্রীরা যে সকলেই সেই সহজ মতে বিশ্বাসী, শীঘ্রই তাতে আর সন্দেহ রইল না।

কে বলে বিস্ময়ে লোকে অবাক্ বা হতবাক্ হয়? আমার দার্জিলিং যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে মুহূর্তকাল পূর্বে যে বিস্ময়ের সূচনা করেছিলেম তা নিয়ে তৎক্ষণাৎ যে বাগ্‌বিস্তার সুরু হোলো তার কলরব নায়েগ্রার মতো অন্তত তিনটি জলপ্রপাতের কলোচ্ছ্বাস ব্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। কোরাস ক্রমে সোলো-য় রূপান্তরিত হলে শোনা গেল;

"বলেন কী মশায়! এই জানুয়ারীর শীতে দার্জিলিং? এখন তো বেলা বারোটায় বরফ পড়বে সেখানে। দার্জিলিং-এর সীজন হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। ১৯৩১ সালে আমি যখন…"

জানতেম যে এর পরেই সুরু হবে বক্তার দার্জিলিং-বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণী। সে-কাহিনীতে উল্লেখ থাকবে প্রতিটি অপ্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটির, তা সরকারী কর্মচারীর টুর ডায়েরির মতো বিশদ হবে এবং ঠিক তেমনি বিরক্তিদায়ক হবে। গল্প-বলার আর্টের প্রথম কথাটাই হচ্ছে কতটা বাদ দিতে হবে। ওরা যোগ জানে, বিয়োগ জানে না। তাই সে-বিবরণ নিবারণের উদ্দেশ্যে সময় থাকতে যোগ করলেম:

"দার্জিলিং-এর সীজন আমার সীজন না হতে পারে।"

অপর এক ভদ্রলোক ঠিক এমনি কোনো সুযোগের জন্যে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছিলেন। কেন না, শীঘ্রই জানা গেল, তিনি নিজেও দার্জিলিং অভিমুখেই যাত্রা করেছেন। ভদ্রলোক সোৎসাহে আমার সমর্থনে ব্রতী হলেন।

"তা যা বলেছেন মশাই, কাজের কি আর সীজন আছে? ব্যবসার ডাক কি আসে কারো সুযোগ সুবিধে বিচার করে? এই দেখুন না, তিরিশ ওয়াগন্ টিম্বার আমার লোকেরা এত হ্যাঙ্গাম করে নামিয়ে এনে শিলিগুড়িতে জড়ো করেছে, কিন্তু সেই পর্যন্তই। তার পরে আর এগুতে পারছে না, এদিকে আমার ডেলিভারি ডেট এগিয়ে আসছে ভীষণ কাছে। হেঁ হেঁ," আপন পরিহাস-পটুতায় তুষ্ট হয়ে বলে চললেন, "হেঁ হেঁ, এখন আমার নিজের না গিয়ে উপায় আছে? বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন কিন্তু যার বাণিজ্যই দার্জিলিং-এর পাহাড়ে

তার উপায় কী না গিয়ে, তা মাসটা জানুয়ারীই হোক আর সেপ্টেম্বরই হোক।" একটু থেমে, "তা আপনারও তেমনি জরুরী কোনো কাজ আছে বুঝি ?"

ভদ্রলোকের সমর্থনে কৃতজ্ঞের চাইতে বিব্রত হলেম বেশী। তিনি নিজেও বোধ করি বিব্রত হলেন যখন বললেম, "আজ্ঞে না, আপনি যাকে লক্ষ্মী বললেন আমার তিনি কলকাতায়ই। তারই হাত থেকে পলায়ন করতেই দার্জিলিং যাচ্ছি।"

এবারে তৃতীয় যাত্রীর সুযোগ সমুপস্থিত। তিনি টীকাকার মাত্র, বললেন, "অর্থাৎ ছুটিতে যাচ্ছেন ?" আমি শিরশ্চালনে সম্মতি জানাতেই পূর্বোল্লিখিত লক্ষ্মীর উপাসক আলোচনার সূত্র তুলে নিলেন নিজ হাতে।

"তাহোলে আমায় মাপ করতে হোলো মশাই। এই শীতে কেউ বেড়াতে যায় দার্জিলিং-এর মতো বরফ-জমানো পাহাড়ে ? আমার মটো-ই জীবনে এই যে কাজের জন্যে সব রকমের কষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছি, কিন্তু তাই বলে অমনি নয়। রোজগারের জন্যে, হ্যাঁ, পেটে খেলে পিঠে সয়, হেঁ হেঁ, আমার ব্যবসার শুরু হয়েছিল খুব ছোটো ভাবেই। শুধু এই দু'টো হাতের পরিশ্রমের জোরেই তো আজ যা দু'টো পয়সা নাড়াচাড়া করতে পারি। দার্জিলিং তো দার্জিলিং, দরকার হলে, লাভের আশা থাকলে, তিব্বত-সিকিম যেতে রাজী আছি।..."

সেই উদ্যোগী পুরুষসিংহ অনতিবিলম্বেই নিজেকে সমগ্র পুরুষ জাতির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ করলেন যে সে-জাতির একমাত্র ধর্ম হচ্ছে অর্থকরী কর্মে পরিপূর্ণ আত্ম-নিয়োগ। সমগ্র মানব জাতির জীবন-দর্শন সম্বন্ধে তাঁর আপোষ-বিহীন, সুস্পষ্ট মতামতের সবিস্তার বিশ্লেষণ অপর সকল যাত্রীর সাগ্রহ সমর্থন লাভ করল। গর্বিত নায়ক এবার পরম করুণাভরে পরাজিত শত্রুকে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের সর্বশেষ সুযোগ দান করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনাকে যদি জিগেস করি যে মানুষের মধ্যে কোন্ গুণটিকে আপনি সব চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করেন, তা হোলে আপনি কী বলবেন ?"

"স্বল্পভাষিতা।"

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তর যে উপস্থিত যাত্রিমণ্ডলীর তীব্র ক্ষিপ্ততার কারণ হবে, সে-আশংকা স্মরণ করে আর বাক্যব্যয় না করে আপাদ-মস্তক কম্বলে আচ্ছাদিত হয়ে ক্লান্ত শরীর প্রসারিত করে দিলুম আমার নির্ধারিত বার্থের উপর। আমার উদ্ধত উক্তিটা ছিল বিলম্বিত-বিস্ফারী বোমার মতো, তার পূর্ণ মর্মোদ্ধার করে প্রতিপক্ষ যখন প্রতিক্রিয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন তখন আমার নিদ্রার ভাণ বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। শুনতে পেলেম :

"লোকটা ভদ্রতা জানে না।"

"উহুঁ, এই শীতে যখন বেড়াতে দার্জিলিং যাচ্ছে তখন আমার কী মনে হয় জানেন," গলার স্বরটা আরো একটু ক্ষীণ হোলো, "আমার মনে হয়, মাথার একটু দোষ আছে।"

আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা যে বেশ গুরুতর ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এর পূর্বেই সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শীতলতম শৈলাবাসে বিশ্রাম মানসে যাওয়ার অনুকূল ঋতু যে শীত নয় সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল সবাই। ছুটিদাতা মনিব বলেছিল, "এখন ভীষণ শীত যে দার্জিলিং-এ।" মদ্র সহকর্মী বলেছিল, "have you gone bats or what ?" অভিজ্ঞ বান্ধব বলেছিল, "এ জার্নি 'বোনা ফাইডি' হতেই পারে না। কিছু একটা আছে তোমার আস্তিনের তলায়।" স্নেহশীলা ভগিনীর নিষেধ অমান্য করায় শুনতে হয়েছিল, "শেষে নিউমোনিয়া নিয়ে এসে মাকে ভোগাবে আর কি !"

সমর্থন করেনি শুধু এক জন, যার মৃদুতম অনুমোদনের দামাস্ততম ইঙ্গিতের ক্ষীণতম আভাসের জন্যে রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করেছিলেম গাড়ি ছাড়বার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত।

[ক্রমশঃ

কে এল কামারপুকুরে ?

আজ ধরার ভার করতে লঘু
কে এল কামারপুকুরে ?
যার প্রেমের ধারে সিক্ত জগৎ
সে যে বিশ্বপ্রেমিক রে !
এবার লুকিয়ে সে বনমালী
কাঁধে লয়ে জীব-প্রেমের ঝুলি
বিশ্ব-প্রেমের প্রেমিকরূপে
মুক্তি বিতরে ॥
ওরে, কে এল কামারপুকুরে ?

শ্রীঅজিতকুমার কুণ্ডু

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি

ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়

মূল উদ্দেশ্য

এক কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য—"জ্ঞান লাভ।" জ্ঞান লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য—পরা শান্তি লাভ।"

"জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি"

—গীতা।

জ্ঞান দ্বিবিধ—পরা ও অপরা।

পরা জ্ঞান—পরা বিদ্যা—ভূমা—আত্মবোধ।

যে জ্ঞানের উন্মেষণ হইলে সীমাবদ্ধ খণ্ডিত জীবন অতিক্রম করিয়া জীব অখণ্ড, অনন্ত আনন্দ-ঘন পরম তত্ত্বের বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে, ইহাই সত্যদর্শী পূজ্যপাদ ঋষিগণ কর্তৃক পরা-জ্ঞান বা পরা বিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞান লাভই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। ইহা লাভ হইলে মরণশীল মানব অমৃতত্ব লাভ করে। তখন সে জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানব-জীবন সার্থক হয়।

অপরা জ্ঞান—অপরা বিদ্যা অনাত্মবোধ।

আত্মজ্ঞান বা পরা বিদ্যা ব্যতীত যাবতীয় জ্ঞান, যথা—আয়ুর্বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অর্থকরী ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই অপরা নামে অভিহিত হয়। পরা জ্ঞান লাভে মানব মোক্ষ লাভ করে; এবং অপরা জ্ঞান লাভে মানব সর্ববিধ ভোগ ও তজ্জনিত বন্ধন প্রাপ্ত হয়।

মানব-জীবনের সার্থকতা ভোগে নয় ত্যাগে, প্রবৃত্তি-মার্গে নয় নিবৃত্তি-মার্গে। এই শিক্ষাই মানব জাতির প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান। মাত্র ভোগ-তৃপ্তিই মানব-জীবনের একমাত্র কাম্য নয়। আহার নিদ্রা মৈথুন মানব-জীবনের কেবল মাত্র কাম্য নয়। পশু-পক্ষীরাও এই তিনটির আচরণ করে। মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া যাহারা কেবল মাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতেই রত তাহারা পশুরই সমান।

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ।
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ।
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

—মনুসংহিতা।

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কর্মধারা নিরূপণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়াছেন। আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, আজ সর্বত্রই দেশে হাহাকার। ঘরে ঘরে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, অর্থাভাব, জ্ঞানাভাব, শিক্ষার অভাব, অভাব—অভাব—অভাব। অভাবের অগ্নিশিখা আজ প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দিকে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; এ অভাবের অভাব কবে আসিবে কে জানে?

"মৃত্যোর্মামৃতং গময়"

হীনবীর্য্যতা, পরশ্রীকাতরতা, উচ্ছৃঙ্খলতায় আজ দেশ সমাচ্ছন্ন, মানব-কুল আজ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত।

এ দুর্দশার মূল কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাব। পরাধীনতার বন্ধন হইতে আজ আমরা মুক্ত হইলেও আমাদের মধ্যে এত আবিলতা, এত গলদ, বর্তমানে তাহার আমূল সংস্কার না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হইবে না—হইতে পারে না।

বহিঃআবিলতা দূর করা সহজ, কিন্তু অন্তরের আবিলতা বিদূরিত করা সহজ নয়; অন্তরের আবিলতা তখনই বিদূরিত হইবে, যখন দেশের প্রত্যেক শিক্ষক, প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রত্যেক জননী ও প্রত্যেক সন্তান প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নব জীবন লাভ করত ভারতের আকাশ-বাতাস গরিমায় পূর্ণ করিবে। এখন ভারতমাতা তাঁহার প্রদীপ্ত প্রভায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিয়া জগতে পুনরায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন, ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শিক্ষার ভিত্তি

দেশে "প্রকৃত মানব" গঠিত না হইলে "খাঁটি মানুষ" তৈয়ারী না হইলে, দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না।

আমাদের দেশ ভগবানের দেশ। এ দেশের উন্নতিকল্পে যিনি যে দিক্ দিয়াই প্রচেষ্টা করুন, যত রকমেরই দেশহিত কল্পনা করুন—এ দেশের মজ্জাগত যে ভাব, যে কৃষ্টি তাহা ভগবানমূলক। আমরা এ শিক্ষা সমুজ্জ্বল করিয়া ধরিবার দিকে যদি দৃষ্টি না রাখি—ভগবৎ-অভিমুখী সমাজ-বিজ্ঞানের দিককে যদি অবহেলা করি, সমাজ পরিচালনে ভগবৎ-বংশজাত বলিয়া যদি নিজেদের আত্মিক লক্ষ্য স্থাপন না করি এবং সেই জন্য মানব-বংশধারায় যদি "ঋষি" বা "অতিমানব" প্রসবের যোগ্যা "মা" দেখিতে না পাই, তবে দেশের কিছু মাত্র কল্যাণ সাধিত হইল, ইহা আমরা দেখিতে পাইব না।

যেমন বিশ্বজননীর লক্ষ্য সন্তানকে ভুক্তি-মুক্তি দান, মানবী মায়ের লক্ষ্যও ঠিক সেই দিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইবে—যদি প্রকৃত এ দেশের কৃষ্টি ও জগতের চির কল্যাণদাতা মানব-বংশধারা রক্ষা করিতে হয়।

এইরূপ প্রসূতি তৈয়ারী করা যায়, যদি এই মায়েদের চিত্তে এ আশা সুদৃঢ় বিজ্ঞানের যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া যায়—সে যে তাঁহাদের ঋতুকালীন আচরণ হইতে গর্ভাবস্থা ও প্রসবের পর সন্তান পালন এই তিনটি অবস্থায় তাঁহারা সতর্ক লক্ষ্যে সন্তানের দিকে চাহিয়া থাকিতে শিক্ষা করেন।

ঋতুকালই প্রকৃত সন্তান সৃষ্টি, সন্তান প্রসব ও তাহাকে পালন করিয়া প্রকৃত মানবরূপে পরিণত করিবার উদ্যোগ-পর্ব।

নারীকে এই শিক্ষায় যদি দীক্ষিত করা যায়, তবে নারী সহজেই চিরস্মরণীয় সন্তান-রত্নের "মা" হওয়ার আশা করিতে পারবেন। এবং এইরূপে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যাইতে পারে।

দেশ কল্যাণকর এবং সংগঠন-কার্য্যে (constructive programme) এর মধ্যে এটি যে অন্যতম এবং প্রধান ব্যবস্থা সে কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত।

তাই বলিতেছি যে, দেশকল্যাণকর প্রকৃত মানব গঠনের প্রথম ও প্রধান সোপান মূল ভিত্তি হইবে নারীর শিক্ষা—শিক্ষার ভিত্তি যতই সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তদুপরি নির্মিত শিক্ষাসৌধও ততই দীর্ঘস্থায়ী ও সুরম্য হইবে। ইহার অন্যথায় দেশোদ্ধার হইবে না।

নারীর শিক্ষা

যত দিন দেশের নারীগণ আদর্শ রমণীরূপে গঠিত না হন, তত দিন সুসন্তান জন্মিবে না। সুসন্তান না জন্মিলে, সুসন্তানে দেশ পরিপূর্ণ না হইলে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না, বহু রক্তদান ও কারাবরণ দ্বারা অর্জ্জিত এই নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা হইবে না। তাই নারীশিক্ষার এত প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে স্কুল-কলেজে আমাদের বালিকাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ। নারী-জীবনে যে সকল বিশেষত্ব ভগবানের সৃষ্টি, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাপ্তবয়স্কা বালিকাগণকে সাধারণ জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে পালনীয় নিয়মগুলির যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সকল নিয়ম না জানায় ও পালন না করায় বহু প্রকার "স্ত্রীরোগের" সৃষ্টি হয়।

চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল স্ত্রীরোগ-চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, এ দেশের মেয়েরা "ঋতুকালীন" "গর্ভাবস্থা" ও "সন্তান প্রসবান্তে" পালনীয় নিয়মগুলি না জানায় এবং অনেক ক্ষেত্রে জানিয়াও পালন না করায় তাঁহারা অনেকে দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হন। তাঁহাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত সুসন্তান লাভে তাঁহারা বঞ্চিত হন।

ঋতুকালীন নারীদের যে সকল নিয়ম পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহা না করায়, বহু নারী রোগগ্রস্ত হইয়া যাবজ্জীবন জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন করেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

> "আর্ত্তবস্রাব দিবসাদহিংসা ব্রহ্মচারিণী।
> শয়িত দর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিং ন চ॥
> করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাহরেৎ।
> অশ্রুপাতং নখচ্ছেদমভ্যঙ্গমনুলেপনম্।
> নেত্রয়োঃ রঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনং।
> অত্যুচ্চশব্দশ্রবণং হসনং বহুভাষণং
> আয়াসং ভূমিখননং প্রবাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ রজঃস্বলা স্ত্রী রজঃনিঃসরণ দিবস হইতে তিন দিন হিংসা করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে, পতিকে দর্শনও করিবে না, হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, অভ্যঙ্গ, অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, অত্যুচ্চ শব্দশ্রবণ, ভূমিখনন ও প্রবল বাত সেবন এগুলি বর্জ্জন করিবে।

প্রসবের পর সন্তান পালন কি ভাবে করিতে হয়, তাহা আমাদের দেশের কয় জন জননী জানেন? গর্ভধারিণী হওয়া সহজ কিন্তু 'মা' হওয়া অত সহজ নয়।

শিশুপালন

শিশুর প্রয়োজনীয়তা

শিশুই জাতীয় জীবনে ভবিষ্যৎ বল ও ভরসা। শিশু ভিন্ন কেহই কালে বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না—তাই শিশুর এত প্রয়োজন। কিন্তু সেই শিশু যদি সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার দ্বারা বংশরক্ষা, জাতি-রক্ষা বা দেশরক্ষা কোন কাজই হয় না। যদি শিশু চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল ও চরিত্রহীন হওয়া যে কি নিদারুণ—কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা—সে দুঃখ যে কি দুঃখ—পিতামাতার সে যে কি জীবন্ত দহন তাহা যাঁহাদের ঘটিয়াছে মাত্র তাঁহারাই জানেন। ইহা অন্যের ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

শিশু এরূপ হয় কেন? শিক্ষার দোষে।

শিশুর শিক্ষা যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতে আহার-বিহার ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে সৎশিক্ষা না পায়, সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না। সন্তানকে মাত্র আহার ও পরিধান প্রদান করিলেই তাহাকে পালন করা পূর্ণ হয় না। সন্তানকে যথারীতি পালন করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্য গঠনের—চরিত্র গঠনের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতা-মাতা নিজে সৎ হইয়া সৎদৃষ্টান্ত না দেখাইলে সন্তান সৎ হয় না—হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, 'মা' হওয়া সহজ নয়। বাল্যে মাতৃক্রোড়ে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাই তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে, কিন্তু যদি সে জীবনে প্রথম হইতেই সর্ব্ব বিষয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করিতে শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন্ত ছবি আজ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান।

তাই আজ আমার সকাতর নিবেদন যদি আমরা সুস্থ—বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাই—যদি আমাদের সন্তানকে বংশের গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরবরূপে দেখিতে চাই, তবে তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই আহার-নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই সতর্ক হইতে হইবে। এই নির্দ্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করিলেই জন্মভূমির প্রতি-গৃহ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পরিপূর্ণ হইবে।

"আঁতুড়ে" জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। বাল্যের শিক্ষা যত সহজে অভ্যাস হয়, পরবর্ত্তী কালের শিক্ষা তত সহজে অভ্যাস হয় না, হইতে পারে না।

বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া যায়। সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্কুল-কলেজে সাধারণ জ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যা লাভ হইতে পারে, কিন্তু অধুনা তথায় মনুষ্যত্ব লাভের শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়।

বাল্যকাল হইতে শিশুকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে এবং লোভ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অসৎ বৃত্তিগুলি তাহার কোমল হৃদয়ে যাহাতে উদিত না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শিশুর শিক্ষা লাভের প্রকৃষ্ট কাল ও স্থান,—প্রকৃত শিক্ষা—বাল্যের শিক্ষক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "আঁতুড়ে" জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে এবং পরিজন-বেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। শিশু যখন পাঠশালা যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার চরিত্র গঠনের দায়িত্ব "গুরু" মহাশয়ের উপরও কতকাংশে ন্যস্ত হয়।

ণ, তিনিও এক জন বাল্যের অন্যতম শিক্ষক। পাঠশালাতে র 'গুরুকরণ' আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত গুণ লাভ করিবার পূর্ব্বেই যেমন অনেকে 'মা' হইয়া পড়েন, র বিষয়, উপযুক্ত গুরুগুণ বিহীন হইয়াও অনেকে সেইরূপ াচ্য হইয়া দাঁড়ান।

"মা"ই হউন আর গুরু মহাশয়ই হউন, যাঁহার নিজের চরিত্র ত হয় নাই তিনি অপরের বিশেষতঃ ভাল-মন্দ জ্ঞানবিহীন শিশুর গঠনের ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিজের কাম- াদি রিপু দমনে অক্ষম তিনি অপরকে রিপু দমনে শিক্ষা দিবেন পে? কেবল মাত্র মৌখিক উপদেশ দানে অপরের চরিত্র গঠন যায় না। অপরের চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় নিজের চরিত্র ত করিয়া অপরের সম্মুখে স্থাপন করা। পিতামাতা ও শিক্ষক- র সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের শিক্ষাই দর্পণে প্রতি- বৎ শিশুতে প্রতিফলিত হয়।

শিশুর নৈতিক শিক্ষা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আহার, নিদ্রা, মৈথুন মানব-জীবনে কেবল মাত্র য নয়, পশু-পক্ষীরাও এই তিনটির আচরণ করে। মনুষ্যত্বের পরিচয় ভোগে নয়, নিবৃত্তিমার্গে। মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া যাহারা কেবল মাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতে রত তাহারা পশুর সমান।

সন্তানকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করিতে হইলে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিম্নলিখিত বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হইবে।

সৎসঙ্গ, সদাচার, সহবৎ, সত্যবাদিতা, সরলতা, অহিংসা, পরপীড়া বর্জ্জন, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সংযম, দানশীলতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, শৃঙ্খলতা বা নিয়মানুবর্ত্তিতা।

উপসংহার

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার অবসান তখনই সম্ভব, যখন সুশিক্ষিত সুসংযত সচ্চরিত্র শিক্ষা-নিপুণ সহৃদয় শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইবে, যখন স্বাস্থ্যবতী সন্তান-পালনে সুশিক্ষিতা সুনিপুণা স্নেহময়ী মাতৃমণ্ডলীর দ্বারা প্রতি গৃহ সুশোভিত হইবে তখনই সম্ভব, যখন দেশের যুবকবৃন্দ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রাণ ও সুসংযত জীবনে হইয়া সুগঠিত হইবে।

ভারতমাতার লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

"বন্দে মাতরম্"

সুপ্রভাত

[Richard Middletonএর 'Carol of the Poor Children'এর অনুসরণে

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

গরীবের ছেলে, গরীবের ছেলে কাঁথা ছেড়ে তোরা ওঠ্ জেগে—
দ্যাখ্ চেয়ে তোরা দ্যাখ্ চেয়ে তপ্ত তপন তোদেরই দৃষ্টি মেগে:
সর্ব্ব-দিনের একটি দিন আর সর্ব্ব-রাতের একটি রাত—
আজকে তোদের মুখটি চেয়ে বল্‌লে বুঝি—সুপ্রভাত।

জীবন-জমি মরুচে-ধরা, মুখে না হয় কেবল কালী—
তাই বলে হায় শুন্‌বি কেবল জগৎ-জোড়া ঘৃণার গালি?
পেটে না হয় রইলি উপোস্, কণ্ঠে না হয় না-ই বা গান:
তাই বলে কি রূপোর পায়ে বিকিয়ে দিবি জোয়ান্ প্রাণ?

বাজ্‌বে যখন দিক্-হারাদের বাঁশী উঠ্‌বি তখন নাচি?
নীলিম্ কোণে আছেন যে-জন তাঁরই আশীষ যত্নে যাচি—
পেটের জ্বালায় মর্‌লো যারা—সইলো ব্যথার খোঁচ্:
তাদের লাগি দু'চোখ বেয়ে বৃথাই তোদের অনুশোচ্!

নাই রে আজ দুঃখ নাই—সোনার রবি উঠলো পূবে:
তার শিরেতে পড়বে বাজ, তোদের যে-জন মারবে ডুবে—
সর্ব্ব-দিনের একটি দিন আর সর্ব্ব-রাতের একটি রাত:
আজ্‌কে তোদের মুখটি চেয়ে বল্‌ছে বুঝি: সুপ্রভাত!

বাবু বুলাকিরাম

মুল্‌ক্‌রাজ্‌ আনন্দ্‌

[মুল্‌ক্‌রাজ্‌ আনন্দ্‌ : প্রগতিশীল সাহিত্যিক হিসেবে ইতিমধ্যেই তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। জন্ম (১৯০৭ সালে) তাঁর পেশোয়ারে ; শিক্ষা—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় আর পরে লণ্ডন ও ক্যামব্রিজে। ওখানকারই Ph. D. লেখেন তিনি সাধারণত মূল ইংরাজীতে। পর-পদানত, নিপীড়িত ভারতের মর্মকথাই তিনি তুলে ধরেন জগতের সমক্ষে। তাঁর 'কুলি', 'আনটাচেবল্‌', 'টু লিভস্‌ এ্যাণ্ড এ বাড', 'ভিলেজ' প্রভৃতি উপন্যাস সকলেরই নিকট সমাদৃত। গল্প ও শিল্প-সমালোচক হিসেবেও খ্যাতি তাঁর প্রচুর। সাহিত্য-ধর্মে তিনি হলেন খাঁটি বাস্তবপন্থী। নীচের গল্পটি New Writingsএ প্রথম প্রকাশিত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট অসহায় মধ্যবিত্ত এক কেরাণী-জীবনের বাস্তব চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে।]

'কর্ণেল সাহেব আ' গিয়া আপিস্‌ মে ?'

বাইসাইকেলের ব্রেক্‌ কষতে কষতে প্রশ্ন করলে বাবু বুলাকিরাম মহা ব্যস্ত হয়ে। সাইকেল থেকে সে নেমে পড়ল নিতান্ত আনাড়ি ভাবে।

'নেহি বাবুজী, অভি আয়া নেই।' পাকা দাড়ি নেড়ে জবাব দিলে সেপাই আর্দালী বচিত্তার সিং।

জবাব শুনে তবু আশ্বস্ত হোল না বাবু বুলাকিরাম। তাড়াহুড়ো করতে লাগল সে। ধূলি-ধূসরিত পথটা এসে শেষ হয়েছে ডাক-বাংলোয়। ডাক-বাংলোর বেশীর ভাগটাই হোল (রিক্রুটিং অফিসার) কর্ণেল পটিঙ্গার সাহেবের বাসা-বাড়ী। বাকি অংশে লাহোর ডিভিশনের বিভিন্ন ব্রিগ্যাডের রিক্রুটিং অপিস। ডাক-বাংলোয় আসার রাস্তাটির দু'পাশে গোটা কয়েক চারা গাছ পোঁত

হয়েছিল সম্প্রতি। লোহার তার দিয়ে গাছগুলোকে রাখা হয়েছিল ঘিরে। বুলাকিরাম সাইকেলখানাকে রাখতে গেল একটা ঘেরার গায়ে কাত করে। কিন্তু সাইকেলের হাণ্ডলটাকে বাগানো গেল না কিছুতেই। ভারসাম্য বুঝি হারিয়ে ফেলল ওটা মাধ্যাকর্ষণের ফলে। সকাল বেলা থেকেই এমনি ধারা বিপর্যয় তার ঘটে আসছে। ঘুম থেকে উঠে সে বুঝি আজ বিড়ালের মুখ দেখেছে সর্বপ্রথম! সকাল থেকেই স্ত্রী আছে তার মুখ গোমড়া করে। স্নানের ঘরের অস্পষ্ট অন্ধকারে তাড়াতাড়ি কামাতে গিয়ে চিবুকটাই কেটে ফেলল সে অনেকখানি। আপিসের টাইম মত যদি মিলত ভাতটা! গলির বাঁথায় এসে সে তো আর একটু হলে গড়িয়েই পড়ছিল খাণ্ডড়দের কাদা-তোলা নর্দমাটার মধ্যে। তার পর সোণা মসজিদের পেছন দিকটায় দু'টো টাঙ্গাওয়ালাকে বাজারের ঘিঞ্জি রাস্তাটা ছেড়ে দিতে গিয়ে সাইকেলের গতিটা নিতে হয়েছিল তাকে কমিয়ে। হুমড়ি খেয়ে সে তো তখন পড়েই যাচ্ছিল আর একটু হলে। গত দিন কয়েক থেকে খালি এমনি ধারা ব্যাপারই তার ঘটে চলেছে।···

রেলিংএর গায়ে ঠেস দিয়ে রাখবার সময় সাইকেলখানা আছড়ে পড়ল তার পায়ের উপর সশব্দে।

'ঘোড়া'টা দেখছি সকাল থেকেই বেজায় খাপ্পা, বাবুজী!' আর্দালী বচিত্তার সিং ছুটে এল সাহায্য করতে।

খানিকটা ছ'ড়ে গিয়েছিল হাঁটুটার। বুলাকিরাম ঝুঁকে পড়ল ক্ষত চিহ্নটার উপর। হাত বুলিয়ে একটু বুঝি আদর করল তাকে। তার পর আর্দালীর দিকে মুখ তুলে একটু হাসলে সে। খাকির প্যান্টটার উপর লম্বা কালো একটা দাগ পড়েছে। চোটটা সামলে নেয়ার পর-মুহূর্তেই সেটা তার চোখে পড়ল হঠাৎ। মুখখানা তার শুকিয়ে গেল এতটুকু হয়ে। কর্ণেল সাহেবের নজরে পড়লে তাহোলে আর রক্ষে নেই। নিশ্চয় তাকে তখন বকুনি খেতে হবে নোংরা, ময়লা পোষাক পরে আসা হয়েছে বলে আপিসে। কড়া রোদ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্ম গগলস্ পরেছিল বুলাকিরাম। গগলস্টা এবার সে খুলে নিলে। না, দাগটা খুব বড়ো নয়। একটু ধুয়ে নিলেই চলবে। স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল সে। কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল টস্-টস্ করে। হাত বাড়িয়ে সে ঘামের ফোঁটাগুলি নিলে মুছে।

বারান্দা দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলেছিল সে তার আপিস-ঘরে। এমন সময় পথ আগলে দাঁড়াল এ্যাসিস্টেন্ট ক্লার্ক উধাম সিং। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন উধাম সিংএর। ছাগীর মত একটু-খানি দাড়ি তার চিবুকে। এক-গাল হেসে অভ্যর্থনা জানাল সে বুলাকিরামকে।

'কাটা ঘায়ে আর নুণ ছিটোবেন না বলছি!' খেঁকিয়ে উঠল বুলাকিরাম।—'বাজল ক'টা জানেন? কর্ণেল সাহেব এসে গেছেন না কি? বাকোর্ ঘড়িটা আবার গেছে আমার বিগড়ে! সারাতে দিয়ে আসতে হোল শালাকে।'

অধীনস্থ কর্মচারীর অমন ধারা গাল ভরা আপ্যায়নে বুলাকিরাম চটে গিয়েছিল হাড়ে হাড়ে। অন্ত সময় হলে সে অবশ্য এ সব গায়েই মাখত না।

'বাজল তো মাত্র সাড়ে আটটা!' চপচপে ঘামে-ভেজা শার্টটার নীচে শস্তা নিজের হাত ঘড়িটার উপর একবার চোখ দু'টি বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিলে উধাম সিং। গ্রাম্য রসিকতায় তার পর ফেটে পড়ে বললে: 'কর্ণেল সাহেব গো এখন নিশ্চয় 'হাজরী' খাচ্ছেন টিয়ে পাখীর মত টুকটুকে তাঁর মেমসাহেবকে নিয়ে।' তার পর বললে: 'অমন কাঁপটে বলেই তো বিপদে পড়তে হয় আপনাকে, বুলাকিরাম বাবু! সস্তা একটা জাপানী ঘড়ি আর জাপানী একটা শস্তা বাইক কিনলে অমন দশাটা তো হবেই!'

'আমরা কোন দিন একটু দেরী করে আসি না, অমনি সাহেব খেঁকিয়ে উঠবেন ডালকুত্তার মত!' সহকর্মীর উপহাসে কোন কান না দিয়ে বলে চলল বুলাকিরাম আপন মনে: 'আমি ভাবলাম, আমার বুঝি আজ দেরী হয়ে গেল ভয়ানক। সূর্য উঠেছে অনেকক্ষণ।'

'উহুঁ, আপনি হলেন কি না হেড্ ক্লার্ক—' গেঁয়ো চাষাড়ে ভাষায় জবাব দিলে উধাম সিং।—'থোড়া ওই সূর্যটাকে মানতে যাওয়া তো আপনার কথা নয়। আপনি—'

'হেড্ কোয়ার্টারে পাঠানোর জন্ম সেই যে চিঠিগুলো দিয়েছিলাম আপনাকে, ড্রাফ্‌টগুলো করেছেন কিছু?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলে বুলাকিরাম। 'না, খালি টোঁ-টোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক্-ওদিক্?'

'ওঃ, তাই তো! তা এক্ষুনি গিয়ে করে ফেলছি স্যার!' এক নিশ্বাসে জবাব দিলে উধাম সিং। তার পর হাত দু'টো কচলাতে কচলাতে বললে বিনীত ভাবে: 'আপনি তো সবই জানেন, ইংরেজীটা আমি কিছুতেই লিখতে পারি না ভালো রফ্‌ত করে। এ যাত্রাটা আমায় একবার দিন না বাঁচিয়ে। ড্রাফ্‌টা একটু দেখে দিন। লোরেঞ্জএ গিয়ে আপনাকে বরং খাইয়ে আনব আচ্ছা করে এক পেগ!'

'আপনি যদি নাই বা লেখেন কিছু আমি আবার শুদ্ধ করতে যাব কি?' জবাব দিলে বুলাকিরাম।—'এমন ধারাটি যে হবে আমি আগেই জানতাম। শেষকালে আমাকেই সব লিখে দিতে হবে।'

'দোস্তের মত দোস্ত একেই বলে, বাবু বুলাকিরাম!' বিপুল আগ্রহে উধাম সিং জড়িয়ে ধরল হেড ক্লার্ককে।—'সত্যি সত্যি আপনি হলেন কত পণ্ডিত মানুষ। আপনার মত বিদ্বান আর একটিকে বার করে দিক তো দেখি কেউ গোটা ভারতীয় ফৌজের ভেতর থেকে?'

'আঃ, ছাড়ুন—ছাড়ুন,' প্রতিবাদ করে উঠল বুলাকিরাম!—'মুখ থেকে যে আপনার বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে রশুনের। গায়েও বাপু, ঘামের দুর্গন্ধ!'

উধাম সিংএর বাহুবেষ্টন থেকে বুলাকিরাম নিজেকে মুক্ত করে নিলে কোন রকমে। তার পর গিয়ে ঢুকল নিজের আপিসে। প্রকাণ্ড আপিস-ঘরটা চুণকাম করা হয়েছে সম্প্রতি। একখানা টেবিল পাতা রয়েছে এক পাশে। স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে তার উপর রাশি রাশি ফাইল, লাল ফিতে, ক্লীপ, কালির বোতল ইত্যাদি। মাঝখানটায় রয়েছে একটা সিন্দুক। অর্ড্যানস্ সার্ভের একখানা ম্যাপ ঝুলছে এক পাশে; আর অপর পাশে একখানা চার্ট—সারি সারি তাতে অনেকগুলো বিন্দু।

ইলেকৃটিকের পাখাটা বুলাকিরাম দিল ছেড়ে। নিজের চেয়ার-খানায় সে এসে বসল ডুবে। স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল বুঝি তার পর। মাথার পাগড়ীটা সে খুলে রাখল পাশের এক ট্রের

উপর। তার পর ঘাড় আর কপালের ঘামটা এমন জোরে জোরে সে মুছতে লাগল যে মাথার বেণীটা তার দুলে উঠল এদিক্-ওদিক্।

'কী যে জীবন!' বুলাকিরাম বিড়-বিড় করে উঠল অসহ্য হয়ে। সকাল বেলাকার ভাবটা এখনো খোলা হয়নি। তবু জিরিয়ে নিতে লাগল সে পাখার হাওয়ায়। স্বস্তির একটা দীর্ঘ বুক থেকে তার ঝরে পড়ল। কি তাড়া-হুড়োটাই না করতে হয়েছে তাকে আপিসে আসবার জন্ত। নাকে-মুখে গুঁজে আসতে হয়েছে ভাত ক'টা। কর্ণেল সাহেবের কিন্তু কোন পাত্তাই নেই এখনো।...উধাম সিংটা একেবারে আস্ত একটা গাড়ল—গবেট একটা! কোন কাজেই আসে না। নিজের সব কাজটা তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চায়! এতটুকু যোগ্যতাও যদি তার থাকত! শুধু ওকে আমল না দিয়ে সে পারে না। কেন না, উধাম সিংএর এক কাকা ছিলেন এখানকার বড়বাবু। বুলাকিরামের প্রমোশনের সুপারিশ করে গেয়েছিলেন তিনি যাবার সময়। উধাম সিংএর ভুল-চুকগুলি সব শুধরে দেবে বলে অবশ্য গোপন প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল বুলাকিরামকে। সব ঝক্কিই তাই এখন হজম করতে হচ্ছে তাকে। উধাম সিং-এর ভুল-ভ্রান্তির জন্ত মুখ ঝামটা আর ধমকি খেতে হচ্ছে কর্ণেল সাহেবের নিকট। সত্যি, এ ভারী অন্যায়—!

ডাকে-আসা চিঠিপত্রগুলির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই হাতখানা সে টেনে আনলে। চেয়ারের মধ্যে আবার বসে পড়ল ডুবে।

স্থূল, বিপুল আয়তন কর্ণেল পাটিংস্তার সাহেবকে দেখলে যে-কোন লোকেরই গায়ে রীতিমত জ্বর আসে কম্প দিয়ে। আপিসে ঢুকেই তিনি ভূত ছাড়িয়ে দেন গালমন্দের চোটে।...আচ্ছা, আজকাল তাঁর মেজাজটা অমন তিরিক্ষি হয়ে থাকে কেনো? বিশেষ করে বিলেত থেকে ফেরার পর থেকে? কই, আগে তো তিনি অমন কোন দিন ছিলেন না? বিলেত যাবার আগে তিনি তার মাইনে দিয়েছিলেন বাড়িয়ে। জমাদারের পদে সে যাতে প্রমোশন পেতে পারে তার আশ্বাসও পর্য্যন্ত দিয়ে গিয়েছিলেন। বিলেত থেকে ফেরার পর এমন কি অঘটন ঘটল, যাতে গোটা মহাভারত পর্য্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে গেল? প্রথম প্রথম কয় দিন তিনি তো বেশ খাসাই ছিলেন। বিলেত থেকে আসবার সময় একটা ফাউন্টেন পেন পর্য্যন্ত এনেছিলেন তার জন্ত। হঠাৎ এমন কি ঘটল?...কে জানে, কেউ হয়ত চুকলি কেটেছে তার নামে। কিংবা, সারা দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন তো বেড়ে চলেছে ক্রমশ। জাতীয় কংগ্রেস সাফল্য অর্জ্জন করছেন উত্তরোত্তর। তাই দেখে হয়ত মেজাজটা তাঁর গিয়ে থাকবে বিগড়ে। বেসামরিক এলাকায় কিসবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিপ্লবীর দল। মিলিটারী কর্ম্মচারীরা বেসামরিক এলাকায় বাস করুক, তিনি তা পছন্দ করেন না। এ কথাটা তিনি অনেক বার মুখেও বলেছেন।...ক্লাবে এ বিষয় নিয়ে তাঁরা না কি রীতিমত সলা-পরামর্শও করেছেন। নয়া শাসনতন্ত্র চালু হতে চলেছে দেখে ঘাবড়ে গেছেন ওঁরা রীতিমত। ভারতীয় দেখলেই নাক সিঁটকে ওঠেন ঘৃণায়। কেন না, একটানা একটা আন্দোলন তো কংগ্রেস করে চলেছে সদা-সর্ব্বদা। কংগ্রেসের এ সভ্যরাই হোল সব ভারতীয়। বিপ্লবী হোক বা নাই বা হোক, ভারতীয় মাত্রই হোল রাজদ্রোহী; সন্দেহভাজন। তাদের উপর কড়া নজর না রাখলে নয়। কথাবার্ত্তা বলতে হয় রূঢ় ভাষায়; অপমান করতে হয় কথায় কথায়। জায়গা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়ল কি না দেখতে হবে।...কিন্তু সে-ও বা কি পারে করতে? শত শত বেকার আশে-পাশে তার ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্যা-ফ্যা করে। সাহেব-সুবারা সে খবর রাখেন ভালো করেই। সেদিনের কথাটা মনে পড়ল বুলাকিরামের। কর্ণেল সাহেব খেঁকিয়ে উঠেছিলেন উধাম সিংকে। বলেছিলেন: ইচ্ছে করলেই বিশ টাকাতে এমন এক ঝুড়ি এম-এ আর দু' ঝুড়ি বি-এ পাশ তিনি পেতে পারেন। কাজ-কর্ম্ম যদি সে ভালো ক'রে না করে তাহোলে তাকে তিনি তাড়িয়ে দেবেন দূর করে।

এ ভয়টা তারও নেহাৎ কম নয়। যে কোন দিন হয়ত সাহেব তাকে ডেকে নিয়ে মুখের উপর শুনিয়ে দেবেন কথাটা। অভিজ্ঞতা তার থাকলই বা প্রচুর। আজকালকার যে কোন এম-এ পাশের চাইতে কাজ-কর্ম্মে সে ঢের ভালো। কিন্তু এমনতর একটা বিসদৃশ ঘটনা ঘটবার পূর্বে চাকরীতে সে তো নিজেও দিতে পারে ইস্তফা! কিছু দিন পূর্বে এমনতর একটা ব্যাপার ঘটেছিল বলে সে তখন গিয়েছিল ইস্তফা দিতে চাকরিতে। রেজিস্‌নেশন পত্রটি পর্য্যন্ত রেখেছিল সে তৈয়েরী করে। সাহেবের হাতে দেবে বলে ওটাকে রেখে দেয় ড্রয়ারের মধ্যে।

হাত বাড়ালে সে ড্রয়ারটা টেনে খুলবার জন্ত। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই হাতখানা আবার টেনে আনলে। অমন চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে মুদির দোকান খুলবে না কি সে?—বুলাকিরাম শুধালে নিজেকে।—লোকেই বা তাকে ভাববে কি তখন?

'হে ঈশ্বর!' কথাটা মুখ থেকে তার খসে পড়ল কখন অলক্ষ্যে। ডাকের চিঠিপত্রগুলির দিকে এবার সে মুখ ফিরালে। বাছাই করতে লাগলো চিঠিপত্রগুলি: সরকারী, বে-সরকারী, কর্ণেল সাহেব, মেডিকেল অফিসার প্রভৃতির ব্যক্তিগত পত্রের খোকায়।

তার নামেও ব্যক্তিগত চিঠি এসেছে একখানা। বাবা লিখেছেন। কাঠের মোটা হাতলওয়ালা কাগজ-কাটা ছোরাখানা খুলতে লাগল সে। বুকটা তার কেঁপে উঠল দুড়-দুড় করে। স্ত্রীর কান্নাকাটিতে সে যে শাশুড়ী-মাকে আরও পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়েছিল, বাবা বোধ হয় জানতে পেরেছেন তা। তিরস্কার করে তাকে হয়ত তাই লিখেছেন কড়া এই চিঠিখানা। কিন্তু চিঠিখানা খুলবার পূর্ব্বেই এসে হাজির হোল উধাম সিং। মুখখানা কাঁচু-মাচু করে নিতান্ত বিনীত ভাবে বলল: 'বাবু বুলাকিরাম, বাবু বুলাকিরাম, আপনাকে এলাম একটু বিরক্ত করতে।'

'ও ভগবান।' গাল পেড়ে মুখ কুঁচকে উঠল বুলাকিরাম। বললে: 'কি আপদ! জীবনটা দেখছি আপনি অতিষ্ঠ করে তুলবেন। কি চান?'

'শুধু একবারটি—শুধু একবারটি ক্ষমা করেন বাবু বুলাকিরাম!' হাত দু'টি কচলাতে শুরু করলে উধাম সিং।—'আপনাকে বড় বিরক্ত করছি বলে ক্ষমা করবেন। সেদিন আপনি বললেন না, লিখবার সময় লিখবে পণ্ডিতের মত করে আর কথা কইবার সময় কথা কইবে সাধারণ আর পাঁচ জনের মত করে—'

'আর আপনি করেন ঠিক উল্টো—' খানিকটা রেগে গিয়ে, খানিকটা ব্যঙ্গ করে বাধা দিয়ে উঠলে বুলাকিরাম মাঝখানটায়।—

'পণ্ডিতের মতই আপনি খালি কথা কন আর লিখবার বেলায় কেবল হনুমান···কবে যে নিষ্কৃতি পাবো হাত থেকে কে জানে? বাপ্‌রে, যেন একটা জোঁক! গায়ে সেঁটে থেকে শুষে খাচ্ছে রক্ত!'

'এখন হয়েছে কি, পণ্ডিতের মত করে এখন লিখতে গেলে—' খানিকটা বোকার মত হাসলে উধাম সিং। হেসেই বুঝি গড়িয়ে দিল বড়বাবুর গায়ের ঝালটা।—'মনের মত করে লিখতে গেলে আপনার সরকার বাহাদুরের চকচকে ছাপ-মারা বড় সাইজের সেই ফুলস্কেপ কাগজ চাই বাবুসা'ব।···অতএব আমার একান্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, আপনার একান্ত অনুগত, চির বশংবদ, দাসানুদাস এবং সতীর্থ,—আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক কয়েক সীট শাদা কাগজ এবং—'

'কাল যে কাগজটা দিয়েছিলাম, কি করলেন সেগুলি? বাজে নষ্ট করেছেন বুঝি?' প্রশ্ন করলে বুলাকিরাম।—'দেখুন বাবু উধাম সিং, এমন ধারা কিন্তু রোজ রোজ চলতে পারে না। সরকারী কাগজ-পত্র এ ভাবে নষ্ট করবার আপনার কোন অধিকার নেই। কর্ণেল সাহেবের কাছে আমাকেই এর কৈফিয়ৎ দিতে হয়, আপনাকে নয়।'···

ওঃ, শুধু এবারটি'—নির্লজ্জের মত বলে চলল উধাম সিং:—'শুধু এবারটি ক্ষমা করেন বাবু বুলাকিরাম। এমন আর কখনও করবো না। আপনি হলেন আমার সাক্ষাৎ বড় ভাই-এর মত। আসুন—আসুন, চিঠির ড্রাফ্‌টখানা সংশোধন করে নেবার সময় আপনাকে আবার যা আর একটু বিরক্ত করব। নইলে ত্রিসীমাও আর আপনার মাড়াব না কোন দিন।'

বিনয়ে বুঝি গলে পড়ল উধাম সিং।

'সবটারই কিন্তু একটা সীমা থাকা উচিত!' রাগে একেবারে ফেটে পড়ল বুলাকিরাম।—'ড্রাফ্‌ট করতে গিয়ে একবার নষ্ট করেছেন অমন ভালো সরকারী কাগজখানা। এখন সংশোধন করতে গিয়ে ফের নষ্ট করবেন আর একখানা। বাজে কাগজে এ সব করতে পারেন না?'

'বাজে কাগজ কই? দিন না কিছু দয়া করে?'

'হে ভগবান!' বুলাকিরাম খেঁকিয়ে উঠল।—'তাও কি আমায় যোগাড় করে দিতে হবে? আচ্ছা, এই নিন। সিগ্‌ন্যালের ওই প্যাডটা নিয়ে যান।'

'সঙ্গে খান কয় ফুলস্কেপ কাগজও দিন নয়, সংশোধন করে—' যোড়ন দিলে উধাম সিং। 'আপনার পায়ে পড়ছি।'

'বেশ এই নিন—এই নিন। মুণ্ডুটা আর খাবেন না জ্বালিয়ে। বুলাকিরাম তার প্যান্টের পকেটে হাত গলিয়ে দিলে। পকেটটা হাতড়াতে লাগল সে চাবির গোছাটার সন্ধানে।

নতুন একটা কোহিনুর পেন্‌সিলও দিন না, বাবু বুলাকিরাম।'—ছেলেমানুষের মত আব্দারের সুরে বললে উধাম সিং।—'কিছুটা কালিও—'।

'যান, কিছুই পাবেন না আপনি', এ্যাসিষ্টেন্টের ক্রমবর্দ্ধমান দাবীর বহর দেখে বলে উঠল বুলাকিরাম খানিকটা রগড় করে।

'আরে, আসুন—আসুন'। এগিয়ে এসে উধাম সিং বুলাকিরামের হাত-পা ধরে একরূপ টানা-হিঁচড়া দিলে শুরু করে নিতান্ত হ্যাংলার মত।

'আঃ, কি করছেন?' বুলাকিরাম হাসবে কি কাঁদবে ঠাউরে উঠতে পারলে না।—'পাগল হলেন না কি আপনি?'

কাগজ-কলম প্রভৃতি অপিসের ষ্টেশনারী জিনিষ-পত্র সব আবদ্ধ থাকে উল্‌টো দিকের দেয়াল-আলমারীটাতে। আলমারীর চাবিটার জন্য বুলাকিরাম নিজের ড্রয়ারটা খুলতে গেল টেনে।

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলে বুড়ো আর্দালী বচিত্তার সিং। জানালে: 'বাবুজী, কন্‌ট্রাক্টর শেখ মহম্মদ দীন আয়া।' ডাক-বাংলো মেরামত কো লিয়ে কর্ণেল সা'ব'কা সাথ মোলাকাত করনেকো মাংতা।'

'দাঁড়াও একটু! আগে বিদায় করে নিই একে।' জবাব দিলে বুলাকিরাম। অতগুলো কাজ একটা লোককে একসঙ্গে করতে হচ্ছে বলে মনে মনে বুঝি একটু চটলও। মুখে বলল: 'শেখ মহম্মদের সঙ্গে একটু পরেই দেখা করছি। ঈশ্বর! চিঠি ক'টাও যে দেখা হোল না এখনো!'

'শেখ সাহেব তাঁর টাঙ্গায় অপেক্ষা করছেন, বাবুজী।' বচিত্তার সিং বুঝি নিজ কর্ত্তব্যবোধে সজাগ হয়ে উঠল।—'কি বলব বাবুজী গিয়ে?'

'ওঃ', বুলাকি কি যেন ভাবলে এক মুহূর্ত্ত। তার পর সরকারী টাইমপিস্‌টার দিকে তাকিয়ে একবার বললে: 'কর্ণেল সাহেব এসেছেন কি না অপিসে দেখে এসো একবার। যদি এসে থাকেন, শেখ সাহেবকে বলো গিয়ে নিজে দেখা করতে। এর আগেও তিনি দেখা করেছেন সাহেবের সঙ্গে।'

উধাম সিং-এর ফাই-ফরমাসের দিকে এবার নজর দিলে বুলাকিরাম।

পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল বচিত্তার সিং কর্ণেল সাহেবের অপিস-ঘরের দিকে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলে বুঝি একবার উঁকি মেরে। ফিস্‌-ফিস্‌ করে তার পর বললে ফিরে এসে: 'হ্যাঁ, বাবুজী, সাহেব কাজে আছেন টেবিলে।'

'তাই না কি?' গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে জিগেস করলে বুলাকিরাম।—'চিঠিপত্র আজ কই, চেয়ে পাঠালেন না?···আচ্ছা তুমি যাও, শেখ সাহেবকে পথ দেখিয়ে এসো।'

দু'পায়ের আঙুলের উপর ভর করে দাঁড়ালে বুলাকিরাম। লাল মেঝের উপর পাছে যদি কোন শব্দ হয় জুতোর, বিরক্ত হবেন তা'হোলে সাহেব। সব সময় তাই সে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। ওটা বুঝি এখন দাঁড়িয়ে গেছে তার অভ্যাসে।

'ওঃ হ্যাঁ, এবার মনে পড়ল', উঠে বুলাকিরাম আলমারীর দিকে পা বাড়াতেই বলে উঠল উধাম সিং।—'খান কয় কার্বন পেপারও যে দরকার আমার।'

'তার সঙ্গে আমার কলিজেটাও চেয়ে নিলেই তো পারেন?' বিড়্‌বিড় করে উঠল বুলাকিরাম।

'সালাম, বাবু সাহেব,' শেখ মহম্মদ দীন বুলাকিরামের অপিসে এসে ঢুকলেন। শুভ্র পোষাকে তাঁর সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন। গাল-ভরা ঘন দাড়িটা মেহেদি রঙ করা। কোন পাঞ্জাবী দেশবাসী অপর কোন পাঞ্জাবীকে যেমন করে সাদর সরব সম্ভাষণ জানান, শেখ মহম্মদ দীনও তাই জানালেন বুলাকিরামকে।

—'সু-সু—।' ডান হাতের তর্জ্জনীটি ঠোঁটের উপর রাখলে

বুলাকি-রাম। চোখ দিয়ে কর্ণেল সাহেবের আপিস-ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে ফিস্‌-ফিস করে বললে চাপা গলায়: 'ডাক বাংলোটার মেরামতের সেই ব্যাপারে এসেছেন নিশ্চয় শেখ সাহেব? তা যান না, সাহেব এখন আছেন তাঁর দপ্তরখানায়।

'আচ্ছা, হুজুর,…' তোষামদে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন কন্‌ট্রাক্‌টার সাহেব। বানু ব্যাবসায়ী লোক তিনি। অন্য সময় হলে বুলাকি-রামকে 'ডেঙো' হিন্দু বলেই হয়ত গাল পাড়তেন। কিন্তু আজ বললেন, 'দু'টো-তিন'টে বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করার ছিলো।'

'বেশ করবেন বই কি, সে আপনার অশেষ দয়া,' জবাব দিলে বুলাকিরাম।—'যাবার আগে একবারটি দেখা করে গেলে খুবই ভালো হয়। আমারও কিছুটা দরকার ছিল।' চাপা একটু হেসে মিষ্টি শিষ্টাচারের ফাঁকে বুলাকিরাম তার কমিশনের অস্পষ্ট ইঙ্গিতটা সমঝিয়ে রাখল একবার।

দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন কর্ণেল সাহেবের ঘরে কন্‌ট্রাক্‌টার। উধাম সিং-এর ফরমাসী জিনিষ-পত্র সব গুছিয়ে দিতে লাগল বুলাকিরাম।

'এ সব মুসলমানদের কিন্তু বিশ্বেস করতে নেই একদম,' উধাম সিং বলে উঠল আপনা থেকে।—'কাজে হাত দেবার আগেই টাকাটা কিন্তু আমি আদায় করে নেবো ওঁর কাছ থেকে। আমি জানি, বাংলোটা সারাবার কথা ভাবছেন কর্ণেল সাহেব। সর্দার বুতা সিং তো আমাদেরই শিখ জাত-ভাই। ওকে দিয়ে কন্‌ট্রাক্টটা করিয়ে নেবো ভেবেছিলাম। বেশ মোটা কমিশনটাই ও দিত আমাদের।'

'হ্যাঁ, সব কিছুই পারে শাদা বাঁকোদেরা।' জবাব দিলে বুলাকিরাম। 'জোট বেঁধেই থাকে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে একে অপরের সাহায্যে। সরকারও এদিকে নেহাৎ কম যান না। একচোখা পক্ষপাতিত্ব করে মাথা নিয়েছে সব ওদের কিনে। তার পর 'ডিভাইড্‌ আণ্ড রুল'এর নীতি রেখেছে চালু করে।'

'সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করতে আপনি পাঠালেন কেন ও ব্যাটা গরুখোরকে? তার পূর্বে কি-টা আপনার সাব্যস্ত করে নেয়াই উচিত ছিল।'

'না, কিছু-এসে যাবে না ওতে।' বললে বুলাকিরাম।—'আমি তেমন লোভী নই। এক ঝুড়ি ফল ঘুষ দিয়ে সাহেবকে আমার জায়গায় নিজের ছেলে কি ভাইপো কাউকে বসিয়ে না দিলেই হোল। আমি আর কিছু চাই, না।'

'না—না; তা না। আমি তা বলছি নে, বাবু বুলাকিরাম।'…

'আপনার নিবও কয়েকটি চাই, না?' মহা উদার হয়ে উঠল বুঝি সহসা বুলাকিরাম।

'আকাশখানা দু'খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লেও আমরা কি আর পারবো না ধরে ছাড়ি!' হৃদ্যতায় গলে গেল উধাম সিং। আরও বললে, 'তা আপনি যখন দিতে চাচ্ছেন বেশ, দিন খান 'কয়। ছোট ভাইটা তো আমার আজকাল গাঁয়ের পাঠশালায়—'

'স্‌-স্‌!' বুলাকিরাম থামিয়ে দিল ওকে সহসা। কাণ দুটি খাড়া করে রইল কিছু শুনবার প্রতীক্ষায়।

হুড়-মুড় করে কিছু যেন একটা ভেঙ্গে পড়ল।

আঁত্‌কে উঠল বুলাকিরাম। কান পেতে রইল সে আরও গভীর উৎকণ্ঠায়।

গোঁঙিয়ে উঠল কেউ যেন। আর্ত অসহায় কেউ যেন কাতরাতে লাগল গভীর যন্ত্রণায়। ধস্তাধস্তির একটা শব্দও ভেসে এল এক সময়। পর মুহূর্তেই মহম্মদ দীনের বিপুল আয়তন দেহখানা হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল বুলাকিরামের আপিসে ছিট্‌কে।

ভয়ে কাঠ হয়ে উঠল বুলাকিরাম। নড়তে পারল না সে এক পা-ও। থর-থর করে কাঁপতে লাগল তার পা দু'টো। মুখখানা হয়ে উঠল আতংকে বীভৎস।

কন্‌ট্রাক্‌টারের নিকট ছুটে গেল উধাম সিং।…

চমক ভাঙতেই বুলাকিরামের সহসা যেন মনে হোল, কর্ণেল সাহেব যেন তাকিয়ে আছেন তার দিকে কট্‌মট্‌ করে। চোখ দু'টি তাঁর জ্বলছে ক্রোধে। তিনি বুঝি এক সময় গর্জে উঠলেন: 'ও লোকটাকে পাঠিয়ে দিল কে আমার ঘরে?' দরজা থেকে মুখখানা বুঝি তাঁর সরে গেল তার পর। গর-গর করতে লাগলেন তিনি আক্রোশে ফেটে পড়ে। বন্‌-বন্‌ করে যেন ঘুরতে লাগল আশ-পাশের সব কিছু বুলাকিরামের। সব কিছু যেন তার গুলিয়ে গেল। হারিয়ে ফেলল যেন নিজের ব্যক্তিসত্তা কর্ণেল সাহেবের তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টির মুখে। নিস্তেজ, নিস্পন্দ হয়ে গেল সে ধীরে ধীরে।…

'আসুন বাবু, চলুন, শেখ সাহেবকে তুলে বসাই গে।' সহজ গলায় বললে উধাম সিং।

ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল বুলাকিরামের কপাল থেকে। আস্তিন দিয়ে ঘামটা সে মুছে নিলে মুখ থেকে। স্থাণুর মত হয়ে তখনও সে দাঁড়িয়ে রইল। ঢেঁকির পাড় পড়তে শুরু হোল যেন বুকের মধ্যে। উষ্ণ নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন-ঘন।

কি হয়েছে সে বুঝি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মুখ তুলে। কিন্তু গলাটা যেন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন স্বরই বেরুল না। ব্যাপারখানা কি তলিয়ে দেখবার জন্য সে বুঝি পা বাড়াতে গেল। কিন্তু পায়ের খিলানগুলি সব তার ঢিলে, নড়বড়ে হয়ে গেল যেন। হুড়-মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে বুঝি এখনই একটু নড়তে গেলে!…

ঝুঁকে দাঁড়াল সে সিন্দুকটা ধরে। দেহের সবটুকু শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে সে নিঃশেষে। কর্ণেল সাহেবের সেই তীব্র দৃষ্টিটা যেন ভেসে উঠল তার চোখের উপর। সে আরও মুসড়ে পড়ল। হৃত-শক্তি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়ে উঠল সে এবার। মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। প্রতিবাদ জানাতে ইচ্ছে হোল সাহেবের কাছে গিয়ে। কৈফিয়ৎ তলব করতে স্বপক্ষ অবলম্বন করে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বিড়-বিড় করে উঠল সে এক নিশ্বাসে: 'ইস্তফা দেব চাকরির!'

সে তাকাল মহম্মদ দীনের মুখের দিকে। উধাম সিং-এর সাহায্যে তিনি তখন উঠে বসেছেন কোন রকমে।

কন্‌ট্রাক্‌টারের পাগড়ীটা ছিট্‌কে পড়েছিল দূরে। উধাম সিং পাগড়ীটা কুড়িয়ে আনলে। কাপড়-চোপড়ের ধুলো ঝেড়ে দিয়ে তার পর প্রশ্ন করলে: 'কি হয়েছিল শেখ সাহেব?'

'ওঃ, না, কিছু না সর্দারজী!'

ক্ষিপ্র হস্তে মহম্মদ দীন পাগড়ীটা বাঁধতে লাগলেন মাথায়।

'তবু বলুন না, কি হয়েছিল ?,' আবার প্রশ্ন করলে উধাম সিং।

'না ভাই, কোন কথা-বার্ত্তাই হয়নি।' জবাব দিলেন কনট্রাক্টর সাহেব। 'আচ্ছা সালাম, সালাম বাবুজী !'...

পাশ কেটে বচিতার সিং-এর দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ কি ভেবে যেন থমকে দাঁড়ালেন মুহূর্ত্ত কাল। একটুখানি ফিকে হেসে বললেন : 'এ্যাবট্ রোডে আর একটা কাজ আছে বাবুজী। চিঠি মারফৎ সব কথা লিখে জানাব আপনাদের।'

হন-হন করে তিনি তার পর বেরিয়ে গেলেন।

'কি হয়েছে বলুন তো বাবু বুলাকিরাম ?' উধাম সিং শুধালে আবার।

কোন জবাবই কিন্তু দিলে না বুলাকিরাম। দু'হাতের তালুর মধ্যে মাথা রেখে ডুবে রইলেন চেয়ারে।

'এই বচিতার সিং,' চাপা-গলায় একটু পরে জিজ্ঞেস করলে বুলাকিরাম। 'সাহেব আভি হ্যায় আপিস্‌মে ?'

'ঠিক মালুম নেই বাবুজী, জবাব দিলে বচিতার সিং।—'এই সময়ে তো প্রায় থাকেন সাহেব। আছেন বোধ হয়—'

'আছেন বোধ হয়—'গর্দ্দভ কাঁহাকা' ভ্যাংচিয়ে উঠল উধাম সিং। আমি বলছি উনি নেই। ভুল করে কনট্রাকটার সাহেব ঢুকে পড়েছিলেন একেবারে মেম-সাহেবের ঘরে। তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ছিটকে পড়লেন একেবারে হুমড়ি খেয়ে এখানে এসে।'...

বচিতার সিং যেন আকাশ থেকে পড়ল। সব অপরাধের হাত থেকে নিজেকে যেন বাঁচাবার জন্ম বিস্ফারিত করে চোখ দু'টি জবাব দিলে :, কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম বাবুজী, সাহেব তাঁর টেবিলে—'

'আচ্ছা, কনট্রাক্টার কি সাহেবের সঙ্গে কোন কথা-বার্ত্তা না করেই চলে গেলেন ? আপনি কি বলেন বাবু বুলাকিরাম ?' প্রশ্ন করলে উধাম সিং।

ভয়ে-ভয়ে চোখ দু'টি তুলে একবার তাকাল দরজার দিকে বুলাকিরাম। সাহেব আছেন কি আপিসে ? বুজরুকির মত কি যেন হয়ে গেল ! হয়েছিল কি ব্যাপারখানা ? বুলাকিরাম শুধালে নিজেকে। আচ্ছা, কী না অমন হতে পারে ? ড্রয়ার থেকে চাকরীর সেই রেজিক্‌নেশন লেটারখানা বার করে নিল সে এক টানে। চিঠিখানার দিকে কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে রইল শূন্য চোখে। হঠাৎ মনটা তার মোচড় দিয়ে উঠল। টন-টন্ করে উঠল আঙুল ক'টি।

'আমি হেড কোয়াটারের ওই অর্ডার ফাইলটা নিয়ে আসুন তো ?'

মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে পড়ল কখন কথাগুলি অলক্ষ্যে।

অনুবাদ—নিখিল সেন

বোকা গাছ

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বড় দম্ভে ঘুরে বেড়ায় শীতের শীর্ণ গাছ
আমি শূন্য বুক হলাম :
বাধা নেই আর ফাগুনের
মক্ষিকা-মন-চরণের কোটি পলাশ-আগুনের—
হায় এই হু-হু হাওয়া ভাই,
কী মজায় পাতা ঝরাই !

আর আমি এক শুকনো গাছ, বড় বোকা গাছ
আপাতত পুতুল-নাচ নাচি ;
আপাতত রক্তপথে ক্রমব্যর্থমনোরথে
হঠাৎ কেঁদে উঠি কেন আমি আছি ?
কেন আমি বুঝি না
এ উত্তুরে হাওয়ায় যদি সব ঝরে যায়,
তবেই তো শাপে বর,
তবেই বসন্ত-প্রাণ তবেই তো কুহুতান তবেই পঞ্চশর
হায়, আমি বুঝব না কেন আমি বাঁচি—
কারণ আমি বোকা গাছ আমি এক শুকনো গাছ
আপাতত পুতুল-নাচ নাচি।

জানি আমি শুকনো গাছ আমি এক বোকা গাছ,
এমন কি আসে-যায় তাতেই ?—
ফাগুন তো আসবেই।

নগরবাসী

দারুণ গুমোট-করা বর্ষার দুপুর। আকাশ যেন গাঢ় ভাপ্‌সা ভাপ হয়ে নগরের বুকে চেপে এসেছে, মরা বাতাস নড়ে না। শ্মশানপুরীর মত চারি দিক্ স্তব্ধ নিঝুম, জনহীন রাজপথ। কদাচিৎ দু'-একটি গাড়ি সচল শঙ্কিত দ্রুত পদে হেঁটে চলেছে দু'-এক জন পথিক। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসে। সেই অস্পষ্টতার মধ্যেও টের পাওয়া যায় তীক্ষ্ণ হিংসার ধার। দোকানগুলি বন্ধ, রুদ্ধদ্বার বাড়ীগুলির একটি ঘরের জানালাও

জানালার খড়খড়ি তুলে ক্ষণিকের জন্য ভীতি-ক্লিষ্ট মুখ উঁকি দেয়। মহানগরীর কোলাহল-মুখর উদ্দাম উজ্জ্বল জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকা-পাতের পরবর্ত্তী জেরটুকু শুধু চলছে।

গলির মোড়ের কাছে বড় রাস্তার মাঝখানে থেমে ট্যাক্সিটা দু'জনকে নামিয়ে দেয়। রাস্তার এদিকের এলাকায় গলির মধ্যে কারফিউ। ট্যাক্সিতে ড্রাইভার ছাড়া আরও তিন জন শিখ—এদের সাথে না নিয়ে দেড় টাকার পথ পনের টাকায় আসতেও ট্যাক্সিটা রাজি হয়নি। দোষ দেবে কে? মৃত্যুর আতঙ্কে থমথম করছে চারি দিক, প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে তা অনুভব করা যায়, জীবনের মূল্য নিয়ে কে দর-দস্তুর করবে? গুমোটে ঘেমে ঘেমে প্রমথর শরীর ভিজে গিয়েছে, এতক্ষণে কেঁপে শিউরে উঠল জলে-ভেজা কুকুরের গা-ঝাড়া দেবার মত।

সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে প্রমথ ভাড়া মিটিয়ে দেয়। বারংবার সে তাকাচ্ছে প্রণবের দিকে। প্রণবের দীর্ঘ বেঢপ দেহ, মোটা কাপড়ের বিনা নীলে সাবান-কাচা পাঞ্জাবী, চশমা আর সিগারেট তার আশা, ভরসা ও সাহস।

ডাষ্টবিনের ময়লা ছাপিয়ে উঠে রাস্তা ছড়িয়েছে, পচে গেঁজে উঠেছে পরশুর বৃষ্টিতে। ভাড়া পেয়েই ট্যাক্সিটা দিশেহারার মত সেই ছড়ানো ময়লা তছনচ করে বেরিয়ে গেল। চার পা শূন্যে তুলে পড়ে আছে মরা কুকুরটা, বেলুনের মত ফুলে উঠেছে। সন্তর্পণে কয়েকটি খড়খড়ি উঠল কয়েক বাড়ীর কৌতূহলী জানালায়, বন্ধ পানের দোকানের পাটাতন ফাঁক করে উঁকি মারল দু'টি পশ্চিমা মুখ। গলির মুখের রকের ছায়ায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত পাগলীর উলঙ্গ দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে ঝিমোচ্ছিল, ধীরে ধীরে উঠে এসে গরম পিচের তপ্ত ভাপে ক্ষণেক মোহাচ্ছন্ন হয়ে থেকে বাঁকা আঙ্গুলগুলি আধ সোজা করে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ঝেঁঝেঁ বলল, পয়সা দে। মৃতপুরীর প্রেতিনীর মত তার সর্বাঙ্গ আলস্যে শিথিল, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ—জীবন্ত প্রখর সূর্য্যালোকে মানুষ যখন ইটের কোটরে কোটরে আত্মগোপন করে থর-থর কাঁপছে, একা সে রাণীর মত ভয়ার্ত মুহ্যমান জগতকে জয় করে পথে দাঁড়িয়ে তীব্র অবজ্ঞার সঙ্গে পথিক-প্রজার কাছে খাজনার মত দাবী করছে ভিক্ষা।

ভাগেন মশাইরা, ভাগেন। কোথাকার বোকা হাঁদা? পালান, পালান।

যে চেঁচায় তাকে দেখা যায় না, কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকের গাঢ় স্তব্ধতায় এমন ভাবে হারিয়ে মিশিয়ে যায় গলার আওয়াজ বনে-জঙ্গলে গভীর রাত্রে নিশাচর পাখীর আচমকা চীৎকারের মত যে, পরক্ষণে খটকা লাগে সত্যই কেউ চেঁচিয়েছে কি না। তার পর এক দিক্ থেকে মিলিটারী ট্রাকের ঘর্ঘর ধ্বনি দ্রুতগতিতে চড়তে চড়তে ভেসে এসে সব শব্দের রেশ আর নিঃশব্দতা ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। হাত ধরে প্রমথকে প্রণব গলির মোড় থেকে অপর দিকের ফুটপাতে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। কারফিউ এলাকার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো নিরাপদ কি না জানা নেই। কার আইন, কেই বা জানে, মানেই বা কে।

গা ছমছম করছে, প্রণব।

এত দূর এসে দু'পা যেতে? এই গলি তো?

দ্বিধার সঙ্গে প্রমথ সায় দেয়। এই সংশয়ের জন্যই এত ইতস্তত করা, হঠাৎ গলির মধ্যে ঢুকে পড়তে মন সরছে না। এমন ভাবে বদলে গিয়েছে পথটার চেহারা, এমন ভাবে গা-ঢাকা দিয়েছে চিনিয়ে দেবার চিহ্নগুলি যা স্মৃতিকে সাহায্য করতে পারত। দর্জ্জির একটা দোকান ছিল মনে আছে, ওই আধপোড়া কালচে-মারা ঘরটা কি সেই দর্জ্জির দোকান? সারি সারি রঙীণ কাপড় ব্লাউজ ফ্রক শুকোত একটা দোতালা বারান্দায়, তারই উপরে তেতালার বারান্দায় ফেলা থাকত চিক, এই যে খাঁ-খাঁ করছে শূন্য বাড়ীটা, মানুষ নেই, জামা, কাপড় নেই, চিক নেই, জানালা দরজা এলো-মেলো ভাবে হাঁ করে বন্ধ হয়ে আছে, এটা কি সেই বাড়ী? গলিতে স্রোতের মত একটানা আনাগোণা ছিল মানুষের।

এ ঠিকানায় ওরা না-ও থাকতে পারে।

প্রমথ একটু ইতস্তত করে বলে, না, এখানেই আছে। চিঠি পেয়েছি।

মণি চিঠি লিখেছে? আশ্চর্য্য তো! ক'দিন আগে?

চার-পাঁচ দিন হবে।

চার-পাঁচ দিন! দশ-বিশ বছরের লোক-জনে ভরপুর বাড়ী এক বেলায় বিনা নোটিশে খালি হয়ে যাচ্ছে, প্রমথ হিসাব ধরেছে চার-পাঁচ দিন আগে পাওয়া চিঠির। মুখে সে কিছু বলে না। প্রাণের মায়া প্রমথর কম নয়, বিপদের পরিমাণটাও তার অজানা নেই। তাকে আরও বেশী ভড়কে দিয়ে কোন লাভ হবে না। এটা সত্যই আশ্চর্য্য যে, নিজেও সব দেখে-শুনে ভাল করে অবস্থা বুঝেও আর না এগোবার কথা প্রমথ একবারও বলেনি। এখানে এসেও ফিরে যাবার কথা সে ভাবছে না, তাহলে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিত না। প্রাণের মায়া যত থাক, যতই ভীরু তার প্রকৃতি হোক, ভয়ে বিবর্ণ আধমরা হয়েও সে বাকী পথটুকু এগিয়ে যাবে। হয় তো একেই মনের জোর বলে। প্রণব জানে না, তার এত ভয়ও নেই, এত বেশী মনের জোরের দরকারও হয় না।

গলির ভেতরে একটু এগোলেই মণিমালাদের বাড়ী, বেশী দূর নয়। হয় তো কোন বিপদ ঘটবে না। কারফিউ ভঙ্গের জন্য তো নয়ই। দাঁড়িয়ে লাভ নেই, যেতে যদি হয় চলুন।

গলির মধ্যে উষ্ণ ভাপসা ছায়া। ভয় তারা করছিল গলির ভিতরটাকে, দু'পা এগোতে না এগোতে আক্রমণ কিন্তু এল বড় রাস্তার দিক্ থেকেই। গলির মোড়ে অতর্কিত

ইতস্তত করাটাই তাদের বোকামি হয়েছে, ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা হন-হন করে গলিতে ঢুকে পড়লে এরা মনস্থির করতে করতে নাগালের বাইরে চলে যেতে পারত। ছোরা আর লোহার ডাণ্ডা হাতে দু'জন মানুষ দ্রুতপদে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপরে, নিঃশব্দে, উল্লাস বা ধিক্কারের আওয়াজ না তুলে, হত্যা করতে। কলের মত যেন নকল করছে বুনো শিকারী পশুর। এরা দু'জন আর ওরা দু'জন পরস্পরকে জীবনে কখনো ছাখেনি, শুধু জামা-কাপড়ের পার্থক্য থেকে পরস্পরকে শত্রু বলে চিনেছে। অতর্কিতে আঘাত হানতে এরা নিঃশব্দে আক্রমণ করেছে কিন্তু এদিক্-ওদিকে তৎক্ষণ সোর উঠেছে ছড়ানো বহু কণ্ঠের উন্মত্ত চীৎকারে, তারই প্রতিধ্বনি উঠেছে তেমনি চীৎকার শাঁখের শব্দে। সহরের জীবনে এ নিত্যকারের ঘটনা, সকাল-সন্ধ্যা দিবা-রাত্রির কাহিনী—দু'জন আর দু'জনের সংঘাত বিরাট সমগ্র ঘটনার সামান্য একটা তুচ্ছ অংশ মাত্র। প্রমথ প্রায় প্রতিরোধের সময়ও পায় না, সে হকচকিয়ে গিয়েছিল, তার শুধু হাত দিয়ে আঘাত ঠেকাবার অন্ধ দিশেহারা চেষ্টার পাশ কাটিয়ে একটা ছোরা কাঁধের নীচে ঢুকে যায়। প্রণবের কোমরে গোঁজা ছিল কৃপাণ, সতর্ক উৎকর্ণ থাকা, আর দিশেহারা না হওয়াটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অভ্যাসে।

তবে সে-ও নিজেকে বাঁচাতে পারত কি না সন্দেহ, এদের দেখেই চেনা যায় এরা সহরের এ ব্যবসায়ে পুরানো ঘাগী লোক, ছোরা ডাণ্ডা চালাবার কায়দা জানে, বিদ্বেষে উন্মাদনায় হঠাৎ যাদের মাথায় খুন চেপেছে, এরা তারা নয়। তারা এ ভাবে ক'জনে মিলে আক্রমণ করে না। দল বেঁধে দলীয় উন্মত্ততায় দিশেহারা উত্তেজনায় এলোমেলো বিশৃঙ্খল হানা দেয়। দু'পক্ষেরই এই নিয়ম। এক বাড়ীর ছাত থেকে ইট পড়ছিল, এপাশের বাড়ীর রোয়াকের নীচে একটা ফটকা বোমা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল, লক্ষ্যটা খুব বে-ঠিক হয়েছে, হয় তো তাদের বাঁচিয়ে ছুঁড়তে হওয়ার জন্য। তার পর একটা বন্দুকের আওয়াজ হল।

চোখের পলকে দু'জন মিলিয়ে গেল গলির মোড়ের দিকে।

প্রণবের মাথার বাঁ দিক্ খানিকটা কেটেছে, ডাণ্ডা পিছলে যাওয়ায় মাথা ফাটেনি। কাঁধে ঘা লেগে বাঁ হাতটা একটু অবশ বোধ হচ্ছে। প্রমথর ক্ষতের মুখে হাতের তালু দিয়ে চেপে তাকে জাপটে ধরে সে এগোয়। প্রমথ টলতে টলতে চলে। কয়েকখানা বাড়ী পেরিয়ে দোতলা বাড়ীখানার দিকে সে কষ্টে চোখ মেলে তাকিয়ে ক্ষণকাল চিনতে চেষ্টা করে।

বলে, এই বাড়ী।

মুখে রক্ত তুলে বলে।

মধ্য-ভারতের এক বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র সহর থেকে মণিমালার চিঠি পেয়ে এত দূরে এসে বাড়ীর দুয়ারে এ ভাবে প্রমথ মারা যাবে কে ভাবতে পেরেছিল। সাত বছরে কত বদলে গিয়েছে জগৎ, মণিমালার জন্য সে টান কি আর ছিল প্রমথর, মণিমালারই কি আছে? তবু মামার জন্য তাঁর অসহ্য আশ্চর্য্য শোক দেখে কে বলবে সাত বছর আদর-মমতার আদান-প্রদান চিঠিপত্রেও এক রকম বন্ধ ছিল। সাত বছর আগে কি উপলক্ষে এসে কয়েকটা দিন সে থেকে গিয়েছিল তা-ও মণিমালার ভাল মনে নেই, হয় তো কোন উপলক্ষ ছিল না। আসলে মণিমালাকে দেখতেই সে এসেছিল, সেই আসল কারণটাই তার মনে আছে। তবে বিশেষ ভাবে দুঃখ পাবার, বিচলিত হবার কারণ মণিমালার আছে। কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় টেঁকা যায় না বলে কিছু দিন গিয়ে মামার কাছে থেকে আসবার ইচ্ছা জানিয়ে সেই তো এত কাল পরে চিঠি লিখেছিল প্রমথকে। চিঠি পেয়ে প্রমথ নিজেই এ ভাবে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসবে অত দূর দেশ থেকে, এটা অবশ্য সে আশা করেনি। পুরানো দিনের মত প্রমথর ভালবাসার এই অভাবনীয় প্রমাণ পাওয়ায় হয় তো তার কষ্টটা বেশী হয়েছে।

ও মামা, তুমি এমন দাগা দিলে তোমার মণির মনে?

মরা মানুষটাকেও প্রাণে ব্যথা দেবার অনুযোগ দিয়ে কাঁদা পুরানো মণিকে যেন আবার নতুন করে চিনিয়ে দেয় প্রণবের কাছে। বহুদিনের অসাক্ষাতে পরিচয়টা তার মনে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। মৃদু কোমল ভাবেই মণি কাঁদে, চেঁচামেচি তার কোন দিনই আসে না। তার একগুঁয়ে মৃদুতার জোরটা প্রণবের মনে পড়ে যায়। সহরের জীবনের একটানা আতঙ্কের চাপে মনটা চড়া সুরে বাঁধা বলেই বোধ হয় মৃদুস্বরে হলেও কথা বলে সে কাঁদছে, নইলে হয় তো নিয়ম মত ঘুম খেয়ে শুয়ে পড়ে নিজের মনে নিঃশব্দেই কাঁদত।

সুশীল বলে, তোমাকে আজ থাকতে হয় প্রণব। কারফিউর মধ্যে যাওয়াও উচিত নয়, তা'ছাড়া নানা রকম হাঙ্গামা আছে—ঠাকুরপো না থাকলে হবে কেন?—কান্নার মধ্যেই মণি বলে।

থাকতে তাকে হবে প্রণব জানত, এদের মুখ থেকে স্পষ্ট আবেদন শুনে নিশ্চিন্ত হল। তাকে এক দিন বাড়ী থেকে তাড়াতে চেয়েছিল সুশীল, মণিরও তাতে সায় ছিল,—অন্য বাড়ী থেকে। এদের মতি-গতিতে তার ছেলেবেলা থেকে বিশ্বাস কম, কখন কিসের জের টানবে এরাই ভাল জানে। নিজে থেকে থাকার কথাটা যে তুলতে হল না তাই ভাল। সে-ই এক রকম হাঙ্গামা সাথে করে বয়ে এনে ঘরে তুলেছে, তার দায়িত্বের ঘোষণাটা এদের মুখেই মানানসই হয়েছে।

থাকব বৈ কি। ব্যবস্থা যা করার করতে হবে।

কাল সকালে ছত্রিশ ঘণ্টার কারফিউ শেষ হবে, তার আগে কোন বিষয়ে কিছু করার উপায় নেই। তার আশ্বাসে সুশীল-মণিরা স্বস্তি পেয়েছে আন্দাজ করা গেল সহজেই।

মনটা ঢিল দেয় প্রণব, তা ছাড়া উপায় কি। সপরিবারে মণিকে সে দেখল অনেক দিন পরে। সহরের অন্য প্রান্তের

বাড়ীটা থেকে তাকে উপলক্ষ করে মণিরা ভিন্ন হয়ে চলে আসার পর বছর চারেক আগে একবার দেখা হয়েছিল সুরেন কাকার বাড়ীতে। সুরেন কাকার মেয়ের বিয়ের সমারোহ ছিল, দেখা হলেও কথাবার্ত্তা প্রায় কিছুই হয়নি। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনটি ছেলে, দু'টি মেয়ে আর সুশীলকে সঙ্গে নিয়ে সুরেন কাকার বাড়ীর দরজায় মণিকে সে যে গাড়ী থেকে নামতে দেখেছিল, সেই ছবিটাই সব চেয়ে স্পষ্ট ভাবে মনে আছে। একটি কিশোরী মেয়ে যেন বড় বড় ছেলে-মেয়ে ও প্রৌঢ় স্বামীর মস্ত সংসারের গিন্নী সেজে আত্মীয়ের বাড়ী বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে। সেটাই যেন সব, স্বামী আর ছেলেমেয়েগুলি যেন তা: ওই গিন্নী সাজারই অঙ্গ। মণির আর ছেলেমেয়ে হয়নি, এটা খুবই আশ্চর্য্য তবে হয়তো অসম্ভব নয়। এক সাথে থাকার সে বাড়ীতে কি ভাবে সে যেন মানিয়ে যেত সংসারের বৌ-গিন্নী হিসাবে, তার কচি কিশোরীর চেহারা চোখেও পড়ত না, শুধু মনে হত সে বড় রোগা। বাইরে বায়স্কোপে গেলে পর্য্যন্ত ভাবা যেত না সে এতগুলি ছেলের মা, চারটি জাওর, দু'টি ননদ, কয়েকটি ভাগ্নে-ভাগ্নী, বিধবা পিস্‌শাশুড়ী আর একটি রায় বাহাদুর পেনসনভোগী শ্বশুরের বিরাট সংসার সে চালায়। বাড়ীতে তাকে পাকা গিন্নীই মনে হত। আজও তাই মনে হল। ক'বছরে ছেলে-মেয়েরা বেড়েছে, লম্বা-চওড়া হয়েছে। বড় ছেলে সুধীন পড়ছে বি, এস-সি, বড় মেয়ে আশা ষোলয় পা দিল। আশা পেয়েছে এ বংশের ধাঁচ, বর্ষার কলা গাছের মত তার বাড়, তার চেয়ে আজ অনেক ছোট খাট মণিমালা, গড়ন তার মেয়ের তুলনায় অনেক বেশী কিশোরী মেয়ের মত। তবে মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে, সে লাবণ্য আর নেই, ফর্শা হাতে নীল শিরা দেখা যায়।

তোমার শরীর কেমন আছে মণি-বৌদি ?

আমার আবার শরীর, তার আবার কেমন থাকা।

রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময় এই প্রশ্নোত্তরে সবাই যেন খানিকটা মাটির মানুষের আলাপ-আলোচনার ধাতে ফিরে এল। মামার জন্য কেঁদে কেঁদে ক্লান্তিও এসেছিল মণিমালার।

তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ ঠাকুরপো। সে চেহারার চিহ্ন নেই তোমার।

সুশীল বলে, সেদিন কাগজে তোমার নাম দেখছিলাম। এক কোণে ছোট করে লিখেছে, হঠাৎ চোখে পড়ল। গবর্ণমেণ্টকে গাল দিয়ে না কি বক্তৃতা করেছ। চিরকাল তো, গবর্ণমেণ্টকে গাল দিয়ে এলে, কিছু হল কি ?

যাক গে না।—মণি অস্ফুট স্বরে বলল কি বলল না।

অ্যাঁ ? না, তা বলিনি।—সুশীল মাথা নেড়ে নেড়ে কাকে সায় দিল সেই জানে, চশমা খুলে কোঁচড়ের খুঁটে সাফ করে বলল, সভায় বক্তৃতা দাও, যা কর, সেটা আমি তত বুঝি না। মাঝে, ইতিমধ্যে ছিতি-টিতি করে নিয়ে বসা তো উচিত ছিল তোমার। একটা ভাল পোষ্ট—চাকরী না কর, সাপ্লাই-টাপ্লাইএর একটা ভাল মত কণ্ট্রাক্ট—

যাক গে না। মণি আবার বলে।

অ্যাঁ ? তা যাক গে, তুমি যা ভাল বুঝেছ—

তোমাদের ওদিকে তো ভয় নেই, না ঠাকুরপো, সব হিন্দু-পাড়া ?

হ্যাঁ, হিন্দুদের ভয় নেই।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছাড়া-ছাড়া ভাসা-ভাসা আলাপ চলে, যার মোট কথাটা এই যে, সব দিক্ দিয়েই জীবনটা হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই, মাঝে-মাঝে দূরাগত আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হওয়া, তার পর আবার কথা বলা. শুয়ে পড়ে লাভ নেই, ঘুম আসবে না। সুধীন মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে নজর বুলিয়ে আসে চারি দিকে, ছোট ছেলেটা খেলার ছলে ছটফট করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। আশার চুল উসকো-খুসকো, মাথা ধরার যন্ত্রণায় সে থেকে থেকে মাথায় ঝাঁকি দেয়, তার কথার মৃদু স্বরে কাঁসার মত একটা ক্ষীণ খ্যান-খ্যান আওয়াজ বাজে। আজ বড় গরম, আকাশে মেঘ জমেছে। দু'-এক ফোঁটা বৃষ্টি বুঝি এক সময় পড়েছিল, তার পর আর বৃষ্টিপাতের লক্ষণ নেই।

মামার জন্য মণির মনঃকষ্ট, তা সে যেমন কষ্টই হোক্, শেষ হয়েছে বলা যায় না। কষ্টটার অভিনবত্ব ইতিমধ্যে সে আয়ত্ত করেছে। দোতলার ঘরে বসে কথা বললেও নীচের তলায় চাদর-ঢাকা প্রমথকে কেউ ভুলে যায়নি, ইতিমধ্যে সহ্য হয়ে গিয়েছে। কত কয়েকটা বছর কোন্ সুরে ঠেলে দিয়েছে এ বাড়ীর শান্ত-কোমল অল্পে-কাতর চেতনাকে। আগে অবাঞ্ছিত আশ্রিত কেউ এ বাড়ীতে স্বাভাবিক ভাবে মরলেও তার ধাক্কা অন্তত কয়েকটা দিন সকলকে নিষ্ক্রিয় মুহ্যমান করে দিত। আজই শেষ দুপুরে পথ থেকে শোচনীয় ভয়ঙ্কর মৃত্যুর রূপ নিয়ে শ্রদ্ধেয় পরমাত্মীয় আচমকা এ বাড়ীতে ঢুকে, তার দেহটা পর্য্যন্ত এখনো শ্মশানে চালান যায়নি। তবু সম্ভব হয়েছে সুখ-দুঃখের ঘরোয়া আলাপ। সে ঘরোয়া সুখ-দুঃখ অবশ্য আর অবশিষ্ট নেই, বাইরের বিরাট দুঃখ-যাতনার বন্যা বেনো জলের মত জবরদস্তি ঘরে ঢুকে ঘোলাটে আবর্ত্ত করে ছেড়ে দিয়েছে ঘরের জীবন। তা থেকেই এ সহনশীলতা, ব্যাকুলতার এই আত্মনাশের আপোষ। সেই জাপানী বোমার দিন থেকে পথে-ঘাটে ছড়ানো সস্তা অপমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, পুলিশের গুলী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা অন্দরে অন্দরে ঢুকে রক্ষিত মনগুলি ঘুঁটে দিয়েছে। চরম করেছে এই দাঙ্গা। দিনের পর দিন এক মুহূর্ত্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরে যে যায়, সে ফিরবে কি না জানে না বাড়ীর লোক। ফিরে এসে বাড়ীর লোককে দেখবে কি না জানে না বাইরে যে যায়। বাড়ীতে সকলে একত্রে উদ্বেগ-আতঙ্কের পল গুণে সময়ক্ষেপ, উন্মত্ত কোলাহলের কখন

আবির্ভাব ঘটে দলবদ্ধ ধ্বংসের। কখন কারফিউ নামে, কখন বন্ধ হয় রেশন, হাট-বাজার, হাঁড়ি চড়া বাতিল হয়ে যায় সংসারে।

তবু তারা আলাপ করে, অবস্থা তাদেরও নিজের তালে গড়ে-পিটে সাথে সাথে টেনে নিয়ে চলেছে বলে।

প্রমথের টেলিগ্রাম পেয়ে প্রণব ষ্টেশনে গিয়েছিল। তখন জানত না তার সঙ্গে এ বাড়ীতে আসতে হবে, জানলেও যেত। হয় তো বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে ফিরে যেত, হয় তো ভেতরে ঢুকে বসে যেত কিছুক্ষণ। অত চুলচেরা জটিল হিসাব সে করেনি, তার আসে না। কবে সুশীলেরা পণ করেছিল তার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকবে না, হয় সে যাবে নয় তারা যাবে বাড়ী ছেড়ে, সেই পণ বজায় রাখার অজুহাতে দশ জনের হৈ-চৈ হট্টগোল ভরা সংসারের অসুবিধা এড়িয়ে নিভৃতে নিজেদের মনে স্বাধীন ভাবে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে এ বাড়ীতে উঠে এসেছিল, মনে তার আছে সব কথাই। কিন্তু সেই অকারণ মিথ্যা কলহ আর অশান্তির কোন গুরুত্ব সে দেয় না, তার দরকার নেই। তার ক্ষোভও নেই, অভিমানও নেই।

পুলিশ এক দিন তার ঘরটা সার্চ্চ করেছিল। তাতে সরকারী কলেজের অধ্যাপক পরিবারের কাছে এমন বিপজ্জনক বিপ্লবী যদি হয়ে উঠেই থাকে যে, তার সঙ্গে একত্র বসবাস আর উচিত মনে করা যায়নি, সেটা খাপছাড়া কিছু হয়নি। ভাই বলেই বরং বিপদের ভয় ছিল বেশী। স্বদেশী ছেলে স্বদেশী ভাইএর শুধু বাপ হওয়ার জন্য কেন, আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব হওয়ার জন্যও এ দেশে অনেকের ভাগ্যে কম লাঞ্ছনা জোটেনি। তবে তাকে বাড়ী থেকে তাড়াবার জন্য এরা অমন উঠে-পড়ে লেগেছিল কেন প্রণব ভাল বুঝতে পারেনি! শুধু তার সঙ্গ বর্জ্জন করাটাই মণির বাড়ী ছাড়ার একমাত্র কারণ ছিল না। অন্য সবার সাথে থাকার দায়িত্ব ঝক্কি আর বিড়ম্বনা এড়িয়ে নিজেদের রোজগার শুধু নিজেদের জন্য খরচ করে নিজেদের মনের মত স্বাধীন সুখী নীড় গড়ার প্রবল সাধটাও ছিল। তাকে তাড়ালে তো এ সাধ মিটত না, বরং দায়িত্ব আরও বেড়ে যেত।

পরে মনে হয়েছে, ভিন্ন হবার সঙ্কোচ কাটাতে অত বেশী বাড়াবাড়ি করেছিল তাকে নিয়ে, সকলকে ফেলে সরে যাওয়া যে স্বার্থপরতা নিজেদেরই এ বোধ থাকায় অজুহাতটা ফেনিয়ে বড় করেছিল।

মণিরও কিছুই ভুলে যাবার কথা নয়। গোড়া থেকে মনে বোধ হয় তার বিঁধছিল। প্রণব বেশী রাত্রে শুতে যাবার পর সে আন্তরিতার সঙ্গে বলে, তুমি এই প্রথম এলে। তোমাকে দোষ দিই না ঠাকুরপো। সত্যি দিই না। কেন আসবে তুমি? তোমাদের ভাইদের মধ্যে কি হয়েছে না হয়েছে আমি অত তার ধার ধারি না, কদ্দিন ভেবেছি তোমায় একটা চিঠি লিখি, আমাদের তো আর ঝগড়া হয়নি! কিন্তু লিখতে পারিনি। তোমার কাছে তো আমি তোমার দাদার বৌ। কে জানে তুমি কি ভাববে।

দাদার বউ নও না কি?

মণি এই প্রথম একটু হাসে। তার হাসিও প্রায় তেমনি আছে, পাতলা দু'টি ঠোঁটের হাসি নয়, সমস্ত মুখ দিয়ে যেমন হাসত। কেবল আগের মত তেমন তাজা নয় তার হাসিটা। ভিন্ন হয়ে স্বাধীন ভাবে নিজের ঘরকন্না গড়ে তুলতে মুখের হাসি তবে ম্লান হয়ে গেছে মণির? আকাশ-কুসুমের সাধ বুঝি তার মেটেনি।

যার-ই বৌ হই, তোমায় আমায় কি রকম ভাব ছিল বল তো?

সে কথা মিথ্যা নয়, তাই পরবর্ত্তী পরিণতিটা আজও ধাঁধার মত লাগে! মণির উৎসুক ব্যাকুল প্রশ্নে সমস্ত অতীতটা নতুন করে আনন্দময় ছেলেমানুষীর এক নিষ্ফল অধ্যায়ের মত মনে ভেসে আসে। ছোট্ট অপটু শরীর আর মিষ্টি কচি মনটুকু দিয়ে জীবনের আশে-পাশের পরিসরটুকু মণি জয় করতে চেয়েছিল। দু'-চার জনকে ছাড়া মাঝারি আকারের পরিবারটিকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করতে পারেনি বলেই কি মণির হাঁপ ধরেছিল, আরও ক্ষুদ্র পরিসর চেয়েছিল অবাধ মোহ বিস্তারের, সবাই যেখানে তারই মায়ায় পোষ মানবে, বশ হবে? টান কম ছিল না প্রণবের, মণি বাপের বাড়ী গেলে ব্যাকুল হয়ে সে তাকে দেখতে যেত, তাগিদ দিয়ে ফিরিয়ে আনত, হাসি কথা সমবেদনায় তাদের বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়, সাধারণ পারিবারিক সম্বন্ধ কি তাদের প্রাণের সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি? কিন্তু হলে কি হবে। মন-প্রাণ তো প্রণব সঁপে দিতে পারেনি, বাইরে তার ছড়ানো জীবন গুটিয়ে এনে চিন্তা-জগৎ আলতো করে রেখে মণির মনের মত হতে পারেনি। মণির মনের সাথে সে চলবে ফিরবে ভাববে বাঁচবে, মণি তার বিয়ে দিয়ে বৌ আনাবে, সুখে আনন্দে তার জীবন সার্থক করবে মণি। তাই যদি না হয় তবে কিসের ভাব, কিসের মায়া।

মোটেই যে আপন হল না—সে নয় চুলোয় গেল, ব্যাকুল আগ্রহে যে স্নেহ মেনে নিল, তাতে জীবনটাও যদি আত্মসাৎ না করা যায় মিছে বেঁচে আর তবে সুখ কি? তাই হয় তো এত জ্বালা হয়েছিল মণির।

তাই বোধ হয় সে পুরানো দিনের কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে যায়, কি ভাবে সে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল সবার জন্য, কেউ তার মর্য্যাদা দেয়নি, রাখেনি, এতটুকু প্রতিদান তাকে দেয়নি!—চুপি চুপি কত কেঁদেছি, কেউ তোমরা টের পেয়েছ কোন দিন? কেউ কোন দিন তাকিয়ে দেখেছে আমার দিকে? পরের ঘর থেকে এলাম, মানিয়ে নিতে আমার কত কষ্ট। কি রকম চাল-চলন সংসারের, কার মনটা কি, কত ঘা খেয়ে খেয়ে তবে তা আমায় জানতে হয়েছে। বুক দুর-দুর করেছে দিন-রাত, কাউকে বলিনি। সবাই দেখেছে হাসিখুসী, সবাই জেনেছে

যার যা চাই আমার কাছে পাবে, এক দিনের তরে কোন বিষয়ে কেউ আমার নালিশ শুনেছে? আমি যে একটা মানুষ—

মণির কান্নাও মৃদু, হাসির মত সমস্ত মুখখানা দিয়েই সে কাঁদে। কথায় বাধা পড়ে না, আঁচলে নাক মুছে বড় জোর দু'বার ঢোক গিলতে হয়, চোখে যেটুকু জল আসে তা চোখেই শুকিয়ে যায়। যা সে বলে তার সাধারণ মানে খুব সহজ: মানুষের সেই চিরন্তন নালিশ, কেউ তার দাম দিল না। কিন্তু এইটুকুই তো সব কথা নয় আসলে, আসল কথাও নয়। যার চাপে প্রাণে ক্ষোভ আর বেদনা, সেটা জানা না থাকায় সবার মত মণিরও প্রকাশ করার ব্যাকুলতাই সার হয়, বেরিয়ে আসে সাদা-মাটা সস্তা নালিশ। কি সে দিল মানুষকে আর কিসের দাম কেউ তাকে দিল না, জিনিষের দাম টাকায় হয়, তার পাওনার দামটা কিসে হত, এ সব তো আর মণি ভাবেনি।

আমার মনটা যদি তোমরা বুঝতে ঠাকুরপো, বুঝতে কেন ভিন্ন হয়েছি। আমার নিন্দেটাই শুধু রটত না চাদ্দিকে, আমারি সব দোষ হত না।

তোমার দোষ? তোমায় কে দোষ দিয়েছে? প্রণব শান্ত সুরে বলে, তোমার নিন্দেও রটেনি চাদ্দিকে! এতে নিন্দের কথা কি আছে, সব সংসারেই এ রকম ভিন্ন হয়, তোমরা প্রথম নও।

আসল কথা আড়ালেই থেকে যায়। ভিন্ন হওয়াটা সংসারে চালু হয়ে গেছে সত্য, তাতে নিন্দা-প্রশংসার প্রশ্ন নেই, মণিরাও সোজাসুজি তফাৎ হয়ে এলে এত দিন পরেও এই অপরাধ বোধ টিঁকে থাকত না। ভিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটা হয়েছিল কুৎসিত, সেটাই আজও এদের পীড়ন করছে, মণির অস্বস্তিও সেই জন্যই। এসব পুরানো কথা ঘাঁটাঘাঁটি করার ইচ্ছা প্রণবের নেই। বাজে তুচ্ছ হয়ে গেছে এ সব তার কাছে। সে চেষ্টা করে তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বিষয় আলোচনা আরম্ভ করে। সুরু হতে না হতে আলোচনা এসে ঠেকে বর্ত্তমান অবস্থায়, পড়াশোনাও মাথায় উঠেছে সকলের, কি যে হবে। একমাত্র অতীতের আলোচনায় কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়, অন্য সমস্ত কথায় দাঙ্গা এসে ঢুকবেই, এমন তার ব্যাপ্তি। ঘুম পেতেই প্রণব তাই মণিকে ক্ষুণ্ণ করেও কথার ছেদ ফেলে শুতে যায়। দিনের পর দিন মারামারি চলবে বলে দিনের পর দিন রাত জেগে জটলাও চালাতে হবে, তার কোন মানে নেই।

কিন্তু আত্মহত্যায় রত সহর কেন মানুষকে ঘুমোতে দেবে? ঘুম ঘনিয়ে আসতে আসতে সে শোনে—আগুন লেগেছে, আগুন।

কোথায় লেগেছে আগুন? ছাতে উঠে দেখা যায়। বড় রাস্তার ওপারে অল্প দূরে বস্তিতে আগুন ধরেছে, রাস্তার পাকা বাড়ীর আড়ালে [illegible]

উঠেছে শিখা, হলকা আর স্ফুলিঙ্গ। আকাশে আভা পড়েছে।

কেন এরা এমন করছে ঠাকুরপো?

প্রণব শুনতে পায় না। সে তখন পাশের বাড়ীর ছাতের মোটা ভদ্রলোকটির কথা শুনছে। গলার আওয়াজে ভদ্রলোককে বেশ খুসী আর পরিতৃপ্ত মনে হল, সুশীলকে ডেকে সে বলছিল, দুপুরে গলির ভেতর এসে তিন জনকে সাবাড় করে দিয়েছিল না, এই তার জবাব দেওয়া হল। হাঃ, বেটারা মনে করেছিল, চুপ-চাপ মার হজম করে যাব, এবার বুঝুক। এমনি ভাবে ঠাণ্ডা করতে হয়, ব্যাটারা কারফিউ পর্য্যন্ত মানবে না মশায়।

মিশ্র কোলাহল শোনা যাচ্ছিল, হিংস্র গর্জ্জনকে ছাপিয়ে উঠেছে বহু কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ। সহরের এ এলাকা প্রণবের ভাল চেনা নেই, তবু সে অনুমান করে, ওটা মজুর-বস্তি নয়। মজুররা এ দাঙ্গায় নামেনি, তাদের বস্তিতে সহজে আগুনও লাগতে পায় না, পালা করে দল বেঁধে পাহারা দেয়। তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সুযোগে এটা কর্ত্তাদের অন্য প্রতিশোধ হলে আলাদা কথা।

সুধী, নীচের দরজাটা দিবি আয় তো।

কোথায় যাচ্ছ?

ঘটনা-স্থলে গিয়ে প্রণব একটু ব্যাপারটা দেখে আসতে চায় শুনে সুশীল আর মণি সন্ত্রাসে কলরব করে ওঠে। সুধীন আর আশা প্রায় একসঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে, সত্যি যাবে কাকা?

তুমি কি পাগল হলে ঠাকুরপো? কি বলছ তুমি? ওখানে এখন মানুষ যায়? এ কোন্ দেশী বাহাদুরী?

মণির কাছে যেন এক মুহূর্ত্তে মুছে গেছে মাঝখানের এতগুলি বছরের ব্যবধান এমনি তার ব্যাকুলতা, তীব্র তিরস্কার!— প্রণব পর্য্যন্ত কিছুটা অভিভূত হয়ে যায়।

না মণি বৌদি, পাগল হইনি। বাহাদুরী করার মোটে সাধ নেই, ও-সব বীরত্বের মোটে ধার ধারি না। মিছামিছি কেউ যেচে প্রাণ দিতে যায়?

তুমি জ্যান্ত ফিরবে ভেবেছ?

তাই তো আশা করি। নেহাৎ যদি তা না হয়, উপায় কি? কথাটা কি জান, লোক জন হয় তো এলোমেলো ছুটোছুটি করছে দিশেহারা হয়ে। আমি বলে নয়, যে কেউ এক জন গিয়ে যদি হাঁক দেয় খানিকটা শৃঙ্খলা আসবে, আগুন নেবানো, মানুষ বাঁচানোর চেষ্টা হবে। অনেকে যারা ভয়ে আসছে না তারাও এসে জুটবে। অনেক কিছু হতে পারে, গিয়ে না দেখলে বুঝব কি করে?

ছাতের আবছা আলোয় মণির চোখ দেখা যায় না। প্রণবের পিছু পিছু সমস্ত পরিবারটি নিঃশব্দে নীচে নেমে আসে। প্রণব বাইরের দরজা খুলছে, সুধীন হঠাৎ বলে,

আবদার করে নয়, জোরের সঙ্গে বলে। সুশীল ধমকে ওঠে, বাজে বকিস নে।

কিন্তু যুদ্ধ-বিপ্লবের ঢেউ লাগা পাক দেওয়া এ যুগের তরুণ মন প্রণবের হাঁক শুনেছে, ধমকে সে অত সহজে কাবু হয় না।

কিছু হবে না, আমি যাই কাকার সঙ্গে।

মণি মৃদুস্বরে বলে, যেতে চাও, যাও।

শুনে প্রণবও আশ্চর্য্য হয়ে তাকায়। এখানে প্যাসেজের আলোতে মণির মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছে। সুশীল প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে, যাও মানে? যাবে কি রকম? মাথা খারাপ না কি তোমার?

ইচ্ছে হয়েছে, যাক। ঠাকুরপোর কিছু না হলে সুধীরও কিছু হবে না।

এবার আর প্রণব দ্বিধা করে না। সে-ই ধমক দেয় সুধীনকে।

পাগলামি কোরো না সুধী। তুমি ঝোঁকের মাথায় বাহাদুরী করতে যাবে, আমি তোমাকে সামলে বেড়াব? এ সবের মধ্যে যেতে হলে তৈরী হতে হয়।

প্রণব ইচ্ছা না করুক, এ কথায় সত্যই ব্যঙ্গ ছিল—অপমান ছিল। নীচের ঠোঁট কামড়ে মণি মাথা হেঁট করে।

পরদিন প্রমথের দেহ সংক্রান্ত হাঙ্গামা মিটিয়ে এসে প্রণব বিদায় নেবে, মণি প্রায় মরিয়া হয়ে বলে, তোমাকে বলার মুখ রাখিনি আমরা, তবু তোমাকেই বলি ঠাকুরপো।

ভিন্ন হওয়ার স্মৃতি মণি কিছুতেই ভুলতে পারে না। অথচ নিজে সে সত্যই কারো সঙ্গে এক দিনের জন্য ঝগড়া করেনি, অশান্তির বিষয়ে একটি কথাও বলেনি। শেষ দিন পর্য্যন্ত এ ভাবটাই দেখিয়ে এসেছে যে, ও-সব গোলমালের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, সে ভাব রাখতে চায় সবার সঙ্গে, সবার কাছে কেঁদেই সে বিদায় নিয়েছিল। তার যেন অবাঞ্ছিত ঘটনা, নিরুপায় সে অনিচ্ছায় দুঃখ বরণ করল। বোধ হয় সেই জন্যই আজ এই প্রতিক্রিয়া, নিজে ঝগড়া করে এলে হয় তো এ দুর্ব্বলতা আসত না।

তুমি তো অনেক খবর রাখো, ভাল পাড়ায় একটা বাড়ী দেখে দেবে? এখানে যে ভাবে দিন কাটাচ্ছি ঠাকুরপো, আমি পাগল হয়ে যাব বাইরে কোথাও যেতে পার না?

কোথায় কার কাছে যাব? মামার কাছে যেতে পারতাম, মামার প্রাণটা গেল আমার জন্যে। ভাইদের কাছে গেলে তারা খরচ-পত্র নেবে না, বিরক্ত হবে। কদ্দিন থাকতে হয় তাই বা ঠিক কি? ও-ভাবে গিয়ে থাকতে পারব না, তার চেয়ে মরাও ভাল। কি যে বিপদে পড়েছি ঠাকুরপো!

সুশীল বাড়ী ছিল না। কাল কারফিউর জন্য কামাই হয়েছে, শ্মশান থেকে সে আপিস গেছে। প্রণব চিন্তিত ভাবে বলে, বাড়ী পাওয়া মুস্কিল। রোয়াকটুকু বারান্দাটুকু নিয়ে গ্যারেজে গুদামঘরে লোকে গাদাগাদি করে আছে। এমনি যাদের ঘরে কুলোয় না, দশ গুণ আত্মীয়-স্বজন আশ্রয় নিতে এসেছে। প্রণব খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।—তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, ও-বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পার। রাঙ্গাদা' রাজী হবে কি না জানি না।

মণি একবার চোখ তুলে চেয়ে পায়ের গোড়ালি খুঁটতে থাকে। গোড়ালিটা তার অযত্নে ফেটে চৌচির হয়ে আছে, ফাটার দাগে কালো ময়লা জমেছে। তার মসৃণ সুশ্রী টুকটুকে পায়ের অবস্থা নজর করে প্রণবের দুঃখ হয়। ওর মনটাও চৌচির হয়ে ফেটেছে, এ তার আরেকটা লক্ষণ।

তাতে কিছু দোষ নেই। ভিন্ন হলেই কি শত্রুতা হতে হবে?

কাল মাঝ-রাত্রে মণি যেমন আচমকা প্রণবের সঙ্গে ছেলেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে যাবার অনুমতি দিয়েছিল, এখন তেমনি ভাবে হঠাৎ মন স্থির করে ফেলে সে বলে, তাই যাব। তুমি ব্যবস্থা কর।

প্রণব খুঁজে পেতে একটা লরী যোগাড় করে আনে। সেই দিনই শেষ বেলায় তারা এ-বাড়ী ছেড়ে যায়। মধ্য-ভারতের সহরে মামার কাছে যাবার কথা ভেবে ঘটনা-চক্রে মণি ফিরে যায় সেই বাড়ীতে—সাত-আট বছর যে বাড়ীতে ফেরার কথা সে ভাবতেও পারেনি। তখনো গত রাত্রের আগুন লাগানো বস্তি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সমস্ত এলাকায় নতুন কারফিউ সুরু হতে আর আধ ঘণ্টা খানেক দেরী ছিল।

গান্ধী মহারাজ

পুরোনো আমলের একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি

সুভো ঠাকুর

আমার মনটা কী একটা মিউজিয়ম !...

কত বিখ্যাত ব্যক্তির চেহারাই না টাঙানো তার দেয়ালে, কত অদ্ভুত ঘটনাই না সাজানো তার আনাচে-কানাচে। সেখানকার প্রত্যেকটি জিনিষের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন আছে কত দিনের কত ইতিহাস, কত দেশের কত কিম্বদন্তী—কত কীর্তি !

সত্যিই তো এসেছে গেছে কত লোক সে বাড়ীতে ! রাজা, উজীর, দেশ-বিদেশের কত সাহিত্যিক, শিল্পী, সাধু, মহন্ত, মুসাফির-ফকির।

বাঙলা দেশের বুকে আমার পূর্বপুরুষের রচিত সামর্থ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভের মত দাঁড়ানো সেই 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী' প্রায় দশ বছর হতে চল্লো দম্ভভরে পরিত্যাগ করে এসেছি। পূর্বপুরুষের অর্জিত সুখ্যাতির সার্টিফিকেট আমার কি জানি কেন কখনই সহ্য হয়নি সহজ ভাবে। তাই এই এতো বছরের স্বোপার্জিত কুখ্যাতি নিয়ে আমি আগের চেয়ে অনেক শান্তিতে সন্তুষ্ট। তবু, যখনই জোড়া-সাঁকোয় অবস্থিত আমার আগের সেই পিতৃপুরুষের আবাসভূমির কথা উদয় হয়েছে মনে, তখনই ছবির মত আবছা চোখের ওপর ভেসে ওঠে:—সেই চিৎ-হয়ে-থাকা চিৎপুর রোডের বুকে, বিরাট কোলাহলকারী জনতার বিচিত্র চলমান জগৎ ! আর সেই ঊর্মি-মুখর শব্দ-সমুদ্রের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে নির্জন নিস্তব্ধতার দ্বীপের মত, কি অদ্ভুত একাকিত্বে দাঁড়িয়ে থাকা অচলায়তনের ভঙ্গিতে তখনকার দিনের আমাদের সেই বাড়িটা।—সে-বাড়ীর ফল্গুর মত প্রবাহিত অহঙ্কারের অন্তঃসলিলা ঔদ্ধত্য অনেক সময় অবাক্ কোরেছে আমাকেই।

জমির বাব্‌রা ঘিরে সেখানে চুম্‌কির বিভিন্ন কারুকার্য্যের মত গায় গায় ওঠানো অগুন্তি নানা কিস্‌মের কাম্‌রাগুলো গুম খেয়ে থাকা—বাসিন্দেরা জন-সংখ্যায় তাতে নিতান্তই নাম মাত্র।

একদা সেই কাম্‌রার অভ্যন্তর অধিকারীরা এক এক দিকে ছিল দিক্‌পাল, তা সে কি অর্থে, সামর্থে, শিল্প, সাহিত্য অথবা সঙ্গীতে। বাঙলা দেশ তথা ভারতভূমির বক্ষপঞ্জরে ব্যক্তিত্বের বিরাট পদ বিস্তার করে ছিল তারা এক এক জন।

আজ সে বাড়ীতে আমি আর থাকিনে।

ঢাকা সহরে না কি শোনা যায় মস্‌লিন্ মিলত এক সময়—সেই মোহের মৌতাতে আজও বেঁচে থাকায় বিশ্বাসী আদৌ আমি নই। আমার কাছে অতি মূল্যবান মস্‌লিন্-ও যদি বহু ব্যবহারে মলিন হয়—তবে তা পরিত্যাজ্য। আর তাই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত 'ঠাকুর-বাড়ীর' সে মস্‌নদ পরিত্যাগ করে বহু দূর এগিয়ে আসার আস্পর্দ্ধা অর্জন করেছি আমি। খদ্দরের শুভ্র উত্তরীয়ে আবৃত আজ দেহ।

এই এগিয়ে-আসা পথের প্রান্ত থেকে পিছু পানে চোখ ফেরালে, হঠাৎ যেন আজ আস্তে আস্তে সেই অতীত দিনের পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনা মনের প্রাকারে ছায়াছবির মত ফুটে উঠতে চায় একটা অবাস্তবতার আবেশময় অবয়ব নিয়ে।

মনে পড়ে: সকাল সাতটা, পেটা-ঘন্টার মারফৎ ঘোষিত হলে, কুল-পুরোহিত শিরোমণি মশায়ের উপনিষদের সুরে মুখরিত হোতো উপাসনার দালান। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দিবা-নিদ্রার আয়োজনের ফাঁকে তখন উঁকি মেরে কত দিন আলসেছে নজর করেছি: অসংখ্য আলশের ছাওয়ায় আশ্রিত অজস্র ভবন-কপোতের অবিরাম কূজন-মুখরিত উদাস দু-পহর—তার পর কখন অগোচরে অপরাহ্নের পড়ন্ত রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে মালির দল টবে-লাগান ফুলের গাছের তদারকিতে হয়ে উঠত তৎপর। অপরাহ্ণ বিকেলের বুকে গড়িয়ে গেলে আসত সন্ধ্যা ! যে সন্ধ্যা, পাঁচতলার ছাতে উঠলে দেখা যেত—সমাধিস্থ হতে চলেছে তারায় ভরা রজনীর রোমাঞ্চে।

সে-বাড়ীর দিনগুলো এমনিতরই আসতো যেতো। আপনাকে নিয়ে আপনি ভরপুর—নিজের মধ্যে নিজেই থাকত যেন অবগাহন করে। দেখা যেত সব সময়ই সে তন্ময়, তার সেই নিজের তৈরী 'নিবিড় গভীর একাকিত্বে।'

নিজেকে নিয়ে ডুবে থাকা সে-বাড়ীর ওমনিতর আত্মরতির রীতি, আমার সহ্য হোতো না কেমন যেন তখন। অথচ আজ সেই পুরোনো দিনের তাঁবু, এই দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে মন্দ দেখায় না দেখি। বহু বছরের বিস্মৃতির কুয়াশা নেমে আব্‌ছা হলেও মনে পড়ে: অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ মাষ্টারের তত্বিরে সেই সার সার বাড়ীর বালকরা পাঠ-রত। তখন পায়জামার উপর কাথিওয়াড়ের চিপের মত আয়না বসানো 'ঝব্‌লা' গায় ভূ-প্রদক্ষিণের সমারোহে উপর থেকে নীচে অর্থাৎ দেউড়িতে দাসীর কোল ছেড়ে চাকরের তত্ত্বাবধানে সবে মাত্র নামতে শিখেছি আমি। তাক্ লাগানো পৃথিবীকে হাঁ হয়ে সেখানে তাকিয়ে দেখেছি অবাক্ আশ্চর্য্যে—তখনই ত' দেখেছি, কত রাজাদের অভ্যর্থনা আমাদের বাড়ীতে। তাদের সঙ্গে আসত মাথায় পাগড়ি-বাঁধা কত সেপাই-শান্ত্রীর সারি। কারও বা কোমরে বেঁকানো তলোয়াল বাঁধা, কেউ বা রূপোর সোঁটা হাতে, কেউ বা থাকত রাজছত্র ধরে রাজার মাথায়। ওঃ, কি চমৎকার ছিল সেই জরীর কারুকার্য্য-করা ছাতিটা ! আজও যেন চোখের পাতায় মিলিয়ে যেতে যেতেও এক একবার ঝিলিক্ মেরে যায়। দেখেছি কত, সেই আগের আমলের 'বড়লাট' 'ছোটলাটের' আগমন-উৎসব। লাট-প্রাসাদের পোষাক-পরা ঘোড়সোয়ারের সারিতে মনে হোত, আমাদের সামনের দেউড়ির বুকটা যেন সত্যি সত্যিই দুড়-দুড় করছে। এমনি কত ছবি আজও মনে পড়ে। আবার কত ছবি কালের কালিতে জুব্‌ড়ে গিয়ে হয়েছে দুর্ব্বোধ্য, তার মধ্যেকার কত চেহারায় ঝুল লেগে ধুলোয় ধোঁয়ায় হয়েছে প্রায় অদৃশ্য।

কিন্তু অবাক্ হই একটি ঘটনায়। কালের শত অত্যাচার আশ্চর্য্য রকম এড়িয়ে আমার মনের মিউজিয়মে টাঙানো এই একটি ছবি কি করে রয়ে গেল—প্রথম দিনটির পরিবেশে উজ্জ্বল, একই জায়গায় একই রকম ভাবে, সেই কথাই আমি ভাবছি।...

আমার বয়স তখন শৈশবের শেষ সীমায়। [illegible]

সোভি হতে শুরু হয়েছে সবে মাত্র। এমনি এক দিনে তখন দুপুরের ঘুমে দারুণ ভাবে দ্রবীভূত দেহ, মনে পড়ে, হঠাৎ চাকরের চীৎকারে ঘুম ভেঙে চমকে উঠে শুনলুম—বলছে "খোকা বাবু! ওঠো, উঠে পড় তাড়াতাড়ি। বাড়ীতে গান্ধী মহারাজ এসেছেন—দর্শন করবে চল।"

'জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে' আমাদের তরফের আবাস নির্দিষ্ট ছিল উপাসনার দালানের উত্তর-পূর্ব কোণের এক ধারে। সামনের ফটক পেরিয়ে যেতে হোত ভিতরে, তার পর প্রকাণ্ড উঠোনটাকে মাড়িয়ে পৌঁছতে হোত আমাদের দিকে। তাই, বলতে গেলে নিস্তব্ধতার উপর নিরবচ্ছিন্ন একাধিপত্য করত বাড়ীর মধ্যে আমাদের অংশটাই সব চেয়ে বেশি। গান্ধীজীর আগমনে জোড়াসাঁকো বাড়ীর, এমন কি আমাদের অংশের সেই নিস্তব্ধতার অন্তর্লোকও বেপথু—বিপুল জয়ধ্বনির উল্লাস-মুখর ঝঙ্কারে!

হ্যাচকা টানে সেই ভৃত্যটি তেতলার নিদ্রালস নিভৃত আসর থেকে আমাকে তখন নামিয়ে এনেছে নীচে। বেশ মনে পড়ে, অপরাহ্ণ তার অজস্র সূর্য্যালোক দু'হাতে ওড়াচ্ছে আকাশে—তার থেকে কয়েক মুঠো উত্তপ্ত আলোর গুঁড়ো ছড়িয়ে রয়েছে মাটিতে। উঠোনের একটা ধার তপ্ত তাওয়ার মত হয়ে উঠেছে আতপ্ত। উঠোন পেরোতেই দেখি—দেউড়ির সামনে কাতারে-কাতারে মানুষ, ক্ষণে ক্ষণে 'গান্ধী মহারাজ কি জয়' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ব্যাপৃত করেছে।

পশ্চিম-মুখো আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়ীতে ঢুকতেই দেখা যেত, সারা দোতলার প্রান্ত বেয়ে চলে গেছে সাড়ির পাড়ের মত একটি বারান্দা। এই বারান্দার পরই ছিল কবির বসবার ঘর। বাড়ীর সকলেই এই বারান্দাটিকে 'পশ্চিম বারান্দা' বলে উল্লেখ করত। এবং সেই থেকে আরও অনেকের কাছেও 'পশ্চিম বারান্দা' এই আখ্যা ঐ-বারান্দা পেয়ে আসছে অনেক দিন ধরেই। চাকরটি তখন ধরে পড়ে পাকা-খুলিয়ার মত ভীড়ের ঢেউ ডিঙিয়ে মনে নেই কেমন করে, কি কায়দায়, আমাকে উপরে এই 'পশ্চিম বারান্দার বুকে' কোন ক্রমে এনে হাজির করেছিল।

জ্যাঠা মহাশয়, কাকারা এবং বড় জ্যাঠতুত খুড়তুত ভাইরা অঙ্গে জোব্বা আলখাল্লা চড়িয়ে উন্নাসিক আভিজাত্যে মহা মুরুব্বিয়ানা সহকারে এদিক্-ওদিক্ ঘোরা-ফেরা করছেন। লম্বা চেহারাগুলো তাঁদের ঈষৎ বেঁকানো ধনুকের মত, এবং দু'টো হাত পিছন পানে গিয়ে একটি মুঠোয় এক হয়েছে। কিন্তু ও-লোক দু'টো কে? ওই যে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে? কাকার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলছে। উঃ, কি বিরাট দেখতে ওদের! মাথায় আবার পশমী টুপী, মুখে দাড়ি (১)। টুপীর উপর অর্দ্ধচন্দ্রের চিহ্ন। নীচে তখন সামনের ফাঁকা জায়গাটায় কাতারে কাতারে মানুষ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি পেরিয়ে চিৎপুর রোড অবধি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ, 'গান্ধী মহারাজ কি জয়' ধ্বনিতে ধুলোর মত উড়িয়েছে ধ্বনির স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু মহারাজা কোথায়? কোথায় তাঁর শান্ত্রী, সামন্ত? সঙ্গীণধারী পাহারা কোথায়? এ তো রাস্তার লোকগুলো খালি চেঁচাচ্ছে পাগলের মত! কোথায় গেল সেই জরীর ছাতি? চাকরের কাণে-কাণে ভয়ে ভয়ে জিগেস করলুম, "মহারাজা কোথায়?"

ও আস্তে আস্তে বসবার ঘরটার সামনে এসে হাওয়ায়-ওড়া পর্দার ফাঁক থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "ওই ত' গান্ধী মহারাজ, নমস্কার কর।" এই বলে নিজেও সেই দূর থেকে অগোচরে হাতটা কপালে ঠেকাল।

আমি বললুম, "দূর, ও ত' রবিদাদা (১)। তার পাশে ত' এণ্ড্রুজ সাহেব। আমাদের গাল টিপে মাঝে-মাঝে আদর করে যে। আর ও-পাশে ঐ লোকটা কে? রোগা লিকলিকে চেহারা। মাথায় আবার কি রকম একটা টুপী। ধুতিটা হাঁটুর ওপর অদভুত মত। ঐ লোকটাই কি তবে মহারাজা? কিন্তু ও কি রকম মহারাজার ছিরি? মাথায় বেনারসী কাপড়ের জরীর বুটিদার পাগড়ী কোথায়, কোথায় তাতে মুক্তর কল্কা? গলায় হীরের নেকলেস নেই, পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আঙটি···কিছুই ত' ওর নেই? মার রাজাদের যে ইয়া বড় মোচ থাকে তাও ত' নেই ওর। দেঃ, এ কখনই মহারাজা নয়। কিন্তু মহারাজা না হলেও, মায়ার ভরা ও-মুখ আমার সেই তখনকার অবোধ শিশু-মনে যে আঁক কেটেছিল, তা আজও মুছল কৈ?

আজ বহু বছর চলে গেছে। অনেক স্মৃতি, অনেক বিস্মৃতি জীবনের এই ভারবাহী পিঠে চাপিয়েছে তার পোঁটলা। কত বার মহাত্মাজীর দর্শনের দারুণ সুযোগ পেয়েছি—কিন্তু আর না···এ মাটির পৃথিবীতে মানুষের মন-জগৎএর যে তিনটি মহারাজের মূর্তি একত্রে দর্শন লাভ ঘটেছিল সেই শৈশব কালে, তার উপর আরও সৌভাগ্যের পুঁজি বাড়াবার মত পুঁজিবাদী আমি নই। এ-ছবি আমার মনের মিউজিয়ামে প্রথম বেদীটির উপর টাঙানো। সময়ের জলের ঝাপটায় ধুয়ে-ধুয়ে চিরন্তনতার চরণ-চিহ্ন পড়েছে এর উপর।

ওরিয়েণ্টাল আর্টের আঙ্গিক অনুযায়ী রং পাকা করার জন্যে বারে বারে জলে ধুয়ে ধুয়ে আঁকতে হয় ছবিকে, তাতে ছবি ঈষৎ অস্পষ্টতায় আবছা হলেও আমেজ বহন করে অদ্ভুত।

আমার এই ছবিটিও কালের জলে ধুয়ে ধুয়ে নিজে নিজেই অজে এনেছে যেন ঐ রেনেসাঁ পর্বের ভারতীয় ছবির রোমাঞ্চময় অপূর্ব্ব ছায়াবাদ! এ-ছবির অধিকারী হয়ে আমি ধন্য।

১। এঁরারা ছিলেন 'আলি-ভ্রাতা।'

১। রবীন্দ্রনাথকে সম্পর্কে ঠাকুর দাদা হওয়ায় নাতি সম্পর্কে বাড়ীর ছেলেরা সবাই 'রবি দাদা' বলে থাকে।

যাবার বেলায় পিছু ডাকে

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

ফ্রাঙ্কোর নীল কোর্তা-পরা ফ্যাসিষ্ট সৈন্য-দল চার-দিক্ প্রায় ঘিরে ফেলেছে। আমার পলায়নের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে এল অথচ আর কিছু দূর লুকিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেই হয়ত ফরাসী সীমান্তে পৌঁছে যেতে পারব।

কিন্তু পারব কি না জানি না। যে কোন সময়ে এই পাহাড়ে অঞ্চলের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসবে মূর্ত্তিমান্ যমের মত ফাক্রি-সৈন্য বা ছুটে আসবে ওদের বন্দুকের গুলী। ভয়ে ভয়ে পাহাড়ের তলায় তলায়, গাছের পর গাছের আড়াল আশ্রয় করে এগিয়ে চলেছি আমি, বাঙ্গালী মেয়ে অনিতা আর নন্দ অর্থাৎ কার্ণান্দো।

বিপদ এত ঘনিয়ে এসেছে যে এই অতীতের একটা মাসের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে সময় পাচ্ছি না। অথচ বুঝতে পারছি যে জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ, সব চেয়ে বড় সঞ্চয় পিছনে ফেলে চলে আসছি—নিরাপত্তার সন্ধানে। নিরাপদ হয়ত হতে পারব কিন্তু নিঃসম্পদ হয়ে। স্বাধীনতা হয়ত বজায় থাকবে, কিন্তু শত স্মৃতিজালে শৃঙ্খলিত থাকবে সে স্বাধীনতা।

আমি বাঙ্গালীর মেয়ে অনিতা পাল বিলেতে বাপ-মায়ের পয়সায় পড়তে এসেছিলাম। বেশ ত,' পড়াশুনা শেষ করে শিক্ষাবৃত্তির ডিপ্লোমা নিয়ে ঘরের মেয়ে নির্ব্বঞ্ঝাটে ঘরে ফিরে গেলেই পারতাম। আর বাবা ও মা ত তাই চেয়েছিলেন। বিলেতের মুক্ত নীলাকাশে বন্ধনহীন পাখীর মত স্বেচ্ছায় বিচরণ করে বেড়িয়েছি, কিন্তু তার পিছনে ছিল খড়-কুটার ব্যবস্থার কথা—আহার্য্যের জন্য ত নিশ্চয়ই চাই কি, নীড় বাঁধবার সঙ্গী জুটে গেলেও কেহ অসুখী হত না যদি দেশ ও সমাজ বাঁচিয়ে সেটা সম্ভব হত। তা ত হলই না—উল্টে কি যে হতে যাচ্ছে তা নিজেই বুঝতে পারছি না। তার সময়ও নেই।

ঘরের মেয়ে ঘরেই ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ জিব্রাল্টার পর্য্যন্ত পৌঁছে স্পেনের সন্ধানে নেমে পড়বার সখ হল। অদৃষ্ট, অব্যক্ত, অজ্ঞাত অদৃষ্ট জিব্রাল্টারের গিরি-গাত্রের মহিমার পটভূমিকায় স্পেনকে পরম রমণীয়রূপে দেখিয়ে দিল। লোভ হল, প্রতীচ্যের প্রাচ্যভূমি, ইউরোপের ভারতবর্ষ স্পেনকে একবার দেখে যাব। বাবাকে টেলিগ্রাম করে দিলাম বোর্দোতে টাকা পাঠাতে; সালামাঙ্কার সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দেখে, সান সিবাষ্টিয়ানের পাহাড়ে-ঘেরা নীল সমুদ্রে স্নান করে, ইরুণ গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে ফ্রান্সে গিয়ে আবার জাহাজ ধরব। টমাস কুককে বলে দিলাম, মাল-পত্র মার্সেলসে পরে যে জাহাজে যাব, তার জন্য জমা করে রাখতে।

টেলিগ্রাম পেয়ে অধীর হৃদয়ে প্রতীক্ষমানা মা নিশ্চয়ই দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলেছিলেন। সে কথা এখন সোমোসিয়েরা গিরিবর্ত্মের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে চলতে চলতে প্রায়ই মনে হচ্ছে। এ পথ দিয়ে সওয়া শ' বছর আগে নেপোলিয়নের পোলিশ বাহিনী চলেছিল স্পেন অধিকার করতে; বাঙ্গালিনী প্রায় একাকিনী অনিতার পলায়নের জন্য এ পথ তৈরী হয়নি।

ভুল, ভুল করেছি। এই বাইশ-তেইশ বছর বয়সটাই ভুল করবার বয়স। না হলে কাগজ পড়ে এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে, স্পেনে এ সময় না আসাই ভাল। কিন্তু আমি বিদেশিনী; যদি বা এক-আধটা দাঙ্গা হয় আমার দেশ ও বেশই বড় ছাড়পত্র; তা ছাড়া জীবনে ত আর এ সুযোগ পাব না, এ ভেবেই নেমে পড়েছিলাম জাহাজ থেকে। কিন্তু এ ভুল আমার এক হাতে দিল অবর্ণনীয় ভয় ও বিপদ, অন্য হাতে দিল অনন্ত আনন্দ ও সম্পদ। এ ভুল আমার মাথার মণি হয়ে থাকুক।

মাদ্রিদে একটা সুন্দর কিন্তু ছোট হোটেলে উঠেছি। আমার ঘরের ঝুল বারান্দা থেকে 'কালিয়ে আলকালা' রাজপথে হল্লা ও হুল্লোড় দেখতে বেশ ভাল লাগে। মনে হয়, প্রায় দেশে এসে পড়েছি। অথচ বিদেশের বাধাহীনতা ও স্বাধীনতার মধ্যেই আছি। পথে পথে বার্লিনের সুকঠিন সুষ্ঠু শৃঙ্খলা বা লণ্ডনের গতির স্রোতে ভেসে যাওয়া নেই। হিস্পানীর দল পথের মধ্যে 'কাফের' সামনে দাঁড়িয়ে খাস দখল প্রমাণ করে গল্প করছে। বিদেশিনী আমি বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করলাম। যাব কি নীচে রাস্তায় নেমে? ওরা যেমন উন্মুক্ত অন্তর লোক, নিশ্চয়ই আমার সঙ্গ দেবে, দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়ে দেবে। তাহলে এই মামুলী বাঁধি গৎ আওড়ান গাইডগুলির হাত থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

কিন্তু বেশী ভাবতে হল না। আমার দরজায় মৃদু টোকা পড়ল ও প্রশ্ন হল—সিনরিটা, আসতে পারি কি?

আমার মৃদু সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় আবার নাড়া পড়ল এবং ঘরে ঢুকে পড়ল স্পেনের স্বচ্ছ উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের একটি বালক—নাম তার কার্ণান্দো। আমারি পাশের ঘরের বাসিন্দা। তার সঙ্গে আলাপের জন্ত উঠে এলাম হোটেলে মূরীয় কারুকার্য্যময় বৈঠকখানায়। আমাদের সামনের টিপয়ের আবরণটি ছিল নীল বর্ণের। অপরাহ্ণের দীপ্ত দ্যুতি কার্ণান্দোর আনন্দময় মুখে খেলা করছিল, কিন্তু প্লেন গাছের ছায়াচ্ছন্ন 'রাম্ব্লা' অর্থাৎ সান্ধ্য-বিহার পথের স্নিগ্ধ শান্তি ছিল তার চোখে। আর বৈঠকখানার পাশের ঘরের বাসিন্দা পেরু দেশের মেয়েটি তখন সবে গীতারে এক-আধটা মধুর গুঞ্জন তুলতে আরম্ভ করেছে।

আলাপ-পরিচয়ের পর কার্ণান্দো বলল যে, আমি নিশ্চয়ই অচেনা স্থানে অসুবিধায় পড়েছি; কাল থেকে—যদি সিনরিটা কোন আপত্তি বা অসুবিধা বোধ না করেন—সে আমায় সহর দেখিয়ে বেড়াবে। আজ সন্ধ্যায় তার সময় নেই, তবে সে আমায় এমন একটা নাচ-ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে যেতে পারে যেখানে আমি খাঁটি হিস্পানী নানা রকম নাচ দেখে আসতে পারব। আশা করছে সে যে, আমি নিশ্চয়ই ফিরবার পথে ট্রামের নম্বর দেখে বা ট্যাক্সিতে ঠিক মতই চলে আসতে পারব।

আমি ত হাতে স্বর্গ পেলাম। আহা, সিনর কার্ণান্দো চিরানন্দে যেন থাকেন সেই শুভ কামনা করলাম। সে চেয়ার থেকে উঠে প্রায় আজানু নত হয়ে সামনে ডান হাত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ছড়িয়ে দিয়ে সম্মান দেখিয়ে বলল—সিনরিটা ম্যানিটা পোলা তাকে যে সম্মান দেখালেন, তার বিনিময়ে সে স্পেনের শ্রেষ্ঠ মাতাদোর (বুল-ফাইটের অর্থাৎ ষাঁড়ের লড়াইয়ের সর্দার-যোদ্ধা) হতেও চায় না। যাক্, ষাঁড়ের লড়াইয়ের যে তার ভক্তি থাকলেও আসক্তি নেই, এ শুনে আশ্বস্ত হলাম মনে মনে।

.. সে সন্ধ্যাটার কথা ভুলব না। হিস্পানী ট্যাঙ্গো নাচের তুলনা নেই পৃথিবীতে। যে নাচে এবং যার সঙ্গে নাচে দু'জনেই অর্কেষ্ট্রার বসন্ত-মত্ত মূর্চ্ছনার বিলম্বিত তালে তালে আনন্দ-দোলায় ভাসতে থাকে। আমার বহু পূর্ব্বপুরুষ সঞ্চিত রক্ষণশীল ধমনীতে দ্রুত রক্তস্রোত সঞ্চালিত হতে লাগল। এত মাধুরী, এত মাদকতা, এত মাধবী-পূর্ণিমার আবেশ যদি আসে এক জনের বাহুলগ্ন হয়ে নাচলে, তাহলে লাভ কি ওই শত শতাব্দীর প্রাচীন পতনোন্মুখ সামাজিক সংস্কার আঁকড়িয়ে থেকে, যার ফলে এই দু'টো বছরেও বিলেতে নাচ শিখতে কোন দিন ইচ্ছা পর্য্যন্ত হয়নি। নিজেরই অজ্ঞাতে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ অর্কেষ্ট্রার বাজনা থেমে গেল। মৃদু স্তিমিতভাব নীল বাতি বৈদ্যুতিক প্রখরতায় জ্বলে উঠল। চার দিক্ তখনো সঙ্গীত ও নৃত্যের রেশে গম-গম করছে। কিন্তু আতঙ্কের আসন্ন পূর্ব্বাভাসকে সত্য করে বেদীর উপর থেকে নাচ-ঘরের কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করল যে, ফ্রাঙ্কোর বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আজ; হিস্পানী সরকার ঘোষণা করেছেন যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহকে ক্ষমাহীন যুদ্ধে নিঃশেষে নির্মূল করতে হবে। অতএব স্পেনবাসী যেন প্রস্তুত হয়।

ভীরু কোলাহল ও কল-কাকলীর মধ্যে নাচ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নাচ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমিও বের হলাম অসহায়ের মত। আরো বেশী অসহায় বোধ করলাম পথে ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে ও সব ট্যাক্সি চলে গেছে দেখে। কি করব ভাবছি আর চারি দিকে পলায়মান জনস্রোত দেখে আরো বিপন্ন বোধ করছি, এমন সময় দেখলাম, সামনে দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে কার্ণান্দো।

বিদ্রোহ ঘোষণার খবর পেয়েই সে বুঝতে পেরেছিল যে আমার ফিরতে মুস্কিল হবে। তাই সে জন্ত কাজ ফেলে ছুটে এসেছে এখানে যদি আমার কোন অসুবিধা হয় তাহলে হোটেলে পৌঁছে দেবে বলে। তাকে পেয়ে আমি অকূলে কূল পেলাম এবং দেখলাম যে, আমার প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে এসে পৌঁছাতে পেরেছে বলে তারও মুখে একটা সার্থকতার আনন্দ ফুটে উঠেছে। আরো অনুভব করলাম যে, তার মনকৃষ্ণ আঁখিতে আপদের মধ্যে—আঁধারের মধ্যে আনন্দ সন্ধানে উৎসুক, বিপদকে পদদলনেচ্ছু, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে একসঙ্গে য্যাডভেঞ্চার করবার একটা আমন্ত্রণ ফুটে উঠেছে। সে আঁখির আমন্ত্রণকে অস্বীকার করা যায় না। আমিই বললাম—আজ রাত্রে চলুন কোন রেস্তোঁরায় যেখানে 'সাপার' পাওয়া যায়; এখনি হোটেলে নাই ফিরলাম?

দীপ্ত মুখে সে বলল—কোন বড় জায়গা নিশ্চয়ই এই অবস্থায় খোলা থাকবে না, কিন্তু আমার মত ডানপিটে লোকদের জন্ত সরাইখানা খোলা থাকে সর্ব্বদাই। সেখানে যা খেতে পাওয়া যায় তাতে রুচি বজায় থাকে না, কিন্তু সেখানে রোম্যান্স রাজার মত বিরাজ করে।

মনকে আমার তখনো ট্যাঙ্গোর রেশ কুরঙ্গের মত উদ্ভ্রান্ত করে রেখেছে। উৎসাহ দেখিয়ে বললাম—চলুন, সেখানেই যাওয়া যাক। সেখানেই পাব প্রকৃত স্পেনের পরিচয়। আপনি হবেন আমার ভ্রমণ-তরণীর কাণ্ডারী।

রাতের আঁধারে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম একটা সরাইখানায়। সেখানে সোণালী রঙের 'ম্যানজানিলা' পরিবেশন করল প্রথমেই। তার বদলে আমি নিলাম নারাঙ্গি; কিন্তু মন-কুরঙ্গ তখন—আজ মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে লুকাব কেন?—ম্যানজানিলার দিকেই ঝুঁকেছে। যে রঙ মনে অনুভব করছি তা ওই সোণালী সুরারই অনুরাগের রঙ, নারাঙ্গির নয়। খুপরীর মত একটা কাঠের কুঠুরীতে বসলাম দু'জনে, আধখানা ঝলসানো হ্যাম এনে দিল আর কালো সরস জলপাই এক পাত্র। বেতের কারুকার্য্য করা চুপড়ীতে ভরা আঙ্গুর আর কমলা। আরো কিছু খাবার আনতে বলাতে একটা ছোকরা ঘরের দরজা খুলে চিক তুলে সামনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কি? না, রাস্তার ওপারের দোকান থেকে মাছ-ভাজা ও আলু-ভাজা নিয়ে আসবে।

লণ্ডনের সুসজ্জিত হোটেলে খাওয়া ও আজ রাত্রির নাচ-ঘরের বিলাস সজ্জা তখন বাইরের অন্ধকারে মুছে গেছে। আমি সাহসিনী বাঙালিনী অনিতা পাল ম্যানিটা পোলা হয়ে মৃদু স্বরে কার্ণান্দোকে ডাকলাম—নন্দ, আপনি 'ফানি' নন্দ।

হেসে অথচ রাগের ভাণ করে সে বলল—কি? আজ আমাদের দেশে বিদ্রোহ হয়েছে বলে কি আপনি বিদ্রূপ করতে সুরু করলেন? আমি 'ফানি' নই, আপনাকে একটু 'ফান' দিব বলেই এখানে

এসেছি। জানেন, 'এই সরাইখানার ছোকরারা ছোরা ছুঁড়তে পারে বন্দুকের গুলীর মতই দ্রুত ও অব্যর্থ ভাবে?

আতঙ্ক অঙ্কিত হয়ে গেল আমার কপালে। এটা কি তবে মাদ্রিদের মেছোবাজার না কি? কিন্তু সে হেসে বলল—সিনরিটা পোলা, ভয় পাবেন না। আমরা অতিথিপরায়ণ। আমরা যেমন কাঁদাতে জানি তেমন ভালবাসতেও জানি।

ট্যাঙ্গোর নেশ আমার রক্তধারার গতিকে দ্রুততর করে তুলেছে। আমি বললাম—তাহলে ত নিজেরাই কেঁদে যাবেন।

এই প্রথম তার সুন্দর আঙুলগুলি লক্ষ্য করলাম। তার হাত দু'টি শিল্পীর জন্য, চিত্রকরের জন্য, পিয়ানো বা গীতার বাজানর জন্য বিধাতা সৃষ্টি করেছিলেন। হাতের আঙুল মটকাতে মটকাতে সে বলল—তা ঠিকই, সিনরিটা পোলা, আমরা শুধু ভালবাসি না, ভালবাসাতেও জানি। আমাদের দেশে প্রেম হয় প্রথম দর্শনেই। বর্ত্তমান সঙ্গকে বাদ দিয়েই অবশ্য আমি বলছি। আর প্রেম হয় প্রভাত থেকেই। ইংলাটেরাতে (ইংলণ্ডে) লোকের উপর প্রেমের প্রভাব প্রবল হয় না, যতক্ষণ না সন্ধ্যার ককটেল তাকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু আমাদের ধমনীতে যা বয় তা রক্তধারা নয়, রক্তিম সুরা।

এ কথা বলে সে এমন ভাবে কাজল-কালো দু'টি চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল যে মনে হতে লাগল, তার আঁখিভঙ্গির মধ্যেও বুঝি সুরা-স্রোত বইছে। তার নেশা এমন সংক্রামক যে আমি, সংরক্ষণশীল দেশের সংরক্ষণশীল পরিবারের বাঙ্গালী মেয়ে, আমিও তার বাক্য-প্রবাহকে অসংযত বলে মনে করতে পারলাম না। বরং মনে হল, তার চটকদার কথাগুলির উপযুক্ত প্রত্যুত্তর না দিতে পারলে সমগ্র নারী জাতির প্রতিনিধিত্বের যে কর্ত্তব্য আমার স্কন্ধে এসে চেপেছে তার দায়িত্বরক্ষা করা যাবে না। শুনেছিলাম, এ দেশে যে নারী রগাল রসিকতার রূঢ় উত্তর দিতে পারে, সমাজে তারই প্রশংসা হয় বেশী।

মৃদু হেসে বললাম—সে কথা যে সত্য তা ত বুঝতেই পারছি। না হলে মাত্র এক দিনের আলাপ, এখনি আপনাকে আপনি বলব, না তোমাকে তুমি বলব সে নিয়ে ভাবছি। অবশ্য কার্ণান্দো নামটা 'ইনফারনাল' (নারকীয়) ভাবে লম্বা বলেই নন্দ বলে ডাকছি। কিন্তু জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি যে, আপনাদের দেশে যদি এত প্রেমের প্রবাহ বইছে আপনাদের জানলাগুলিতে এত গরাদ কেন?

ক্ষতি কি তাতে? আয়ত দু'টি চোখ ও মুখের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে বসল। ক্ষতি কি তাতে? গরাদগুলি লোহার বটে কিন্তু কেমন কারুকার্য্য তাতে আছে তা লক্ষ্য করেছেন কি? আমাদের শিল্পী ও প্রেমিকরা লোহাকে লক্ষ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে দিয়েছে।

তা ঠিক বটে। এক একটা করে সরস মধুর আঙুর মুখে দিতে দিতে ভাবলাম—সত্যই বটে; না হলে এমন সস্তা ও সাধারণ একটা সরাইও এমন সেরা রেস্তোরাঁ বলে মনে হচ্ছে কেন? যে উৎকণ্ঠার মধ্যে আমার দিনগুলি যেতে লাগল সেগুলিকে রাত্রি-ভোজনের সময় লঘু করে দিত কার্ণান্দো। স্পেনে কোন্‌টা ভাল খাবার তা বিদেশীর কাছে অজানা থেকে যায়। সে যে কেমন করে আমার রুচি বুঝতে পারত তা সেই জানে। বিশেষ করে আমার জন্যই সে বিকেলে পার্কে বেড়াতে যাবার সময় আনাত রাইয়ের রুটি; এমন তার রঙ ও সৌরভ; মুচ্‌মুচে অংশটা মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। তার সঙ্গে আনত ছাগল-দুধের পনীর ও জলপাই। যেন রাজার হালে নিশ্চিন্তাবনায় আছি।

রাত্রিতে খাবার আগে প্রথমে আনাত 'ক্রে কোয়ার্তো ডি ওরা' অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে তৈরী করা মাংস, চাল ও সব্‌জীর সুরুয়া। তার পরেই আনাত 'আরোজ আ লা ভ্যালেন্সিয়ানা।' তাতেও সেই চাল, জাফরাণ আর লঙ্কা, গলদা চিংড়ীর টুকরো, মুর্গির নরম মাংসের টুকরো, গুগলি আরো কত কি যে থাকত তার মধ্যে। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কত প্রাচীন গল্প, কত কাব্য-কাহিনীর কথা সে বলত। ভুলে যেতাম যে বিদেশে এসে আটকিয়ে গিয়েছি। এক ভাতই বিদেশে ভেতো বাঙ্গালীকে ভুলিয়ে রাখতে পারে, তার উপর তার আগ্রহ আনন্দ সহানুভূতিতে ভরা উপস্থিতি।

এমনি করে দিনের পর দিন উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে আনন্দ ও অনির্বচনীয়তা মিশে যেতে লাগল হোটেল আগিলারে। সেখানে মুরীয় কারুকার্য্যময় অলিন্দে রোজ আলোচনা করতাম কোন্ পথে ফিরে যেতে পারি। যে পথে ফিরবার কথা ছিল তার কাছে অনেক জায়গা ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা দখল করে ফেলেছে। দক্ষিণে অনেক জায়গা এখনো খোলা আছে কিন্তু নিরাপদ নয়, আমার হাতে আর টাকাও নেই। এক মাত্র চেনা লোক এই কার্ণান্দো, কিন্তু সে ত মাত্র ছাত্র, আর তার সেভিলের বাড়ী ফ্রাঙ্কোর দখলে চলে গেছে। পথ অন্ধকার।

তার সঙ্গে এক দিন ব্রিটিশ রাজদূতাবাসে গেলাম। কোন কর্ত্তা-ব্যক্তির দেখা ত পেলামই না, বরং যে সব কলোনিয়াল ইংরেজ ভিড় করে ছিল তাদের কাছে বুঝলাম যে আগে তাদের ব্যবস্থা হয়ে তবে আমার মত কালতু লোকের কথা ভাবা হবে। দু'-এক দিন হাঁটাহাঁটি করে সে পথ ছেড়ে দিলাম।

এক মাত্র আশা কার্ণান্দো। স্পেন থেকে বের হয়ে ফ্রান্সে হাঁটা-পথে পৌঁছাবার পথ সে জানে। সীমান্ত অঞ্চলে অনেক অজ্ঞাত বিপদ-সঙ্কুল জনমানবহীন পার্ব্বত্য পথ আছে; সেখান দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু পারব কি আমি কষ্ট করে পাহাড় চড়াই করতে? আধপেটা খেয়ে বিপথে বিপদে এগিয়ে যেতে? যে-কোন গুণ্ডা বা বিদ্রোহীর গুলী খাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও? যদি পারি তা হলে কার্ণান্দো আমার সঙ্গে ট্রেণে যত দূর এখনো যাওয়া যায় গিয়ে গুপ্ত পথে ফ্রান্সে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে এসে সৈন্যদলে যোগ দিবে।

গত্যন্তর নেই দেখে সেই অজ্ঞাত পথের সন্ধানেই বেরিয়ে পড়লাম। তার পরের দিনগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কেটে গেল।

এই গত কালই কি ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেল।

সীমান্ত প্রান্তে প্রায় এসে পড়েছি। ফ্রাঙ্কোর দলের একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে না গেলে উপায় নেই। তার চার পাশে পীরেনিজ শৈলমালার কয়েকটা দুর্লঙ্ঘ্য শৃঙ্গ রয়েছে। পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। নন্দ একলা গ্রামের চার পাশে ঘুরে এসে বলল—চল, সব প্ল্যান ঠিক করে এসেছি, কিন্তু দেখো, ভয় পেয়ো না মোটেই। আমি তত দিনে ভয় ও কষ্টের জন্য আর গ্রাহ্য করি না।

গ্রামে সরাইখানায় গিয়ে যা আশা করেছিলাম তাই দেখলাম। মাথায় ত্রিভুজ ধাঁচের টুপী-পরা 'কারাবিনেরো'র দল রাইফেল ও কফি হাতে বসে আছে। কাউণ্টারের ও-পাশে দু'জন হিস্পানী মেয়ে—অত্যন্ত রকমের হিস্পানী—তাদের কালো চুল আমাদের চুলকে প্রায় হার মানায় আর আঁখি-তারকার বিদ্যুৎ ওই রাইফেলের গুলীর চেয়ে বেশী সচকিত করে তুলবে। তারাই অবশ্য এমন সচকিত হয়ে উঠল আমায় দেখে।

ফার্ণান্দো তাদের বলল যে, আমি ইণ্ডিয়া ইংলেসার মেয়ে হলেও লাল ফৌজের অত্যাচারে স্পেন জর্জরিত হচ্ছে বলে তাদের সহানুভূতি দেখাতে এসেছি এবং আমি ফ্রাঙ্কোর জাতীয় বাহিনী কি রকম স্পেনের মুক্তি এনে দিবার জন্ম যুদ্ধ করছে, তার বর্ণনা আমার দেশের কাগজে পাঠাচ্ছি।

এই না, বলেই ফার্ণান্দো একটা বিশেষ নটবর-ভঙ্গিতে সামরিক সেলাম করে মেজরকে বলল,—কিন্তু মেজর, একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে। আমি আর সিনরিটা পোলা এক জন লাল ফৌজের অফিসারকে এই একটু আগে জঙ্গলে ঢুকতে দেখলাম; হয়ত গুপ্তচরই বা হবে। কি জানি, রাত্রিতে সাঙ্কেতিক আলো দেখিয়ে আমাদের এই জাতীয় আস্তানাতে লাল বিমানের হানা-ই না ঘটিয়ে দেয়।

"কডিল্লো"র জয় হোক্ বলে হেঁকেই সে আবার একটা সামরিক সেলাম ঠুকে দিল।

আমার পেটের ভিতরটা ততক্ষণে ঘুলিয়ে উঠেছে। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা হল যে, হয়ত কোন নির্দোষ লোকের জীবনের বিনিময়ে এই গ্রামের ভিতর দিয়ে যাত্রার বন্দোবস্ত করছে ফার্ণান্দো। কিন্তু ভাবতেও সময় দিল না সে।

হঠাৎ তার কোমরের "নাভাজো"টা খুলে বিদ্যুতের মত ঝলকিত করে মাথার উপর ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল—এই জিনিষটাই হচ্ছে সেই গুপ্তচরের একমাত্র ওষুধ। বলেই সে ছুটল নিকটবর্ত্তী পাহাড়ী জঙ্গলের দিকে। তার হাতে "নাভাজো"র বাঁকানো কম্-সে-কম তিন ইঞ্চি চওড়া আর আট ইঞ্চি লম্বা ফলা সূর্য্যের আলোতে যেন নাচতে নাচতে ছুটল। পিছনে পিছনে ছুটল জাতীয় জল্লাদের দল আর সহজেই তাদের ছাড়িয়ে চলে গেল। হিস্পানী হুল্লোর কাকে বলে তা আমি দেখেছি। হৈ-হৈ করতে করতে সবাই কাফের পিছনে ছুটল; কাণ্টা কোথায় আছে বা কে কাকে তাড়া করতে বলেছে তার হিসাব রাখবার জন্ম কারো মাথা-ব্যথা নেই। ফার্ণান্দো ততক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে তার অভিনয় সাঙ্গ করে আমায় সঙ্গে নিয়ে আবার সুরু করল পলায়ন-যাত্রা।

কিন্তু এমন করে আর যে পারি না! শুনেছি যে, ফ্রাঙ্কোর দক্ষিণ বাহু জেনারেল মোলা তার অক্টোপাস বাহু ক্রমেই এ এলাকাতে ভাল করে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। আর বেশী দিন গেলে আমার পালাবার কোন পথই আর বাকী থাকবে না। তা' ছাড়া, নন্দর জন্তই আমার ভয় বেশী। আমি হয়ত কোন বড় অফিসারের সামনে হাজির হয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এ দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার একটা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু নন্দ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তার চিহ্ন লাল রুমালটা সে সযত্নে ওভারকোটের নীচে লুকিয়ে রেখেছে; সে ধরা পড়লে সেটাও ধরা পড়বে। বন্দ হবে চোখ-বাঁধা অবস্থায় দেওয়ালের পটভূমিকায় সারি সারি ভরা বন্দুকের গুলী। উঃ মা গো? ভাবতে পারি না।

কড়া রোদ চার দিকে। যদিও একটা বড় পাথরের আড়ালে গাছের তলায় লুকিয়ে আছি, মাথা ধরে আসছে ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ হল নন্দ গিয়েছে কিছু খাবার ও গুপ্ত পথের সন্ধান করতে কিন্তু এখনো ফিরল না। একটা অজ্ঞাত বিষাদ, ঠিক ভয় নয়, মনটাতে সন্ধ্যার অন্ধকারের মত ছেয়ে এসেছে।

এমন সময় আশার আলোয় উজ্জ্বল মুখে ফিরে এল ফার্ণান্দো। হাতে তার কতকগুলি গাছের ডালের মত মোটা আর কিম্ভূতকিমাকার 'সসেজ'; কিন্তু দেখেই মনে হল যে, অনেকক্ষণ থেকে খেতে না পেয়ে যে খিদেটা মরে গিয়েছিল, সেটা আবার জেগে উঠেছে। তারও ত একই দশা। আমাকে আমার ভাগ আগে দিয়ে তবে নিজে খেতে আরম্ভ করল। ওঃ, কোথায় লাগে এর কাছে আইসক্রীম বা ইটালিয়ান কেক। প্যারিসেও কোন দিন এমন সুস্বাদু ও ক্ষুধা-উত্তেজক কিছু খেয়েছি বলে মনে পড়ছে না।

খেতে খেতে বললাম—নন্দ, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি যে, যে আনন্দ তোমার মুখে ঝিকিমিকি করে খেলে বেড়াচ্ছে তা শুধু এই গেছো সসেজের ফলে নয়। আরো কিছু আছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি না।

আনন্দ ঢেকে রাখবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে সে বলল—ধরেছ ঠিক, তোমার মুক্তি প্রায় আসন্ন; আশ্চর্য্য, ক'দিন ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহাড় চড়াই-উৎরাই করে কখন যে 'বাজতান' উপত্যকা ছাড়িয়ে এসেছি তা টেরই পাইনি। আর গ্রামের লোকজের ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করা যায় না; হয়ত অমনি শত্রুর আস্তানায় হাজির করবে।

উদ্ধারের আশায় ততক্ষণে আমি অধীর হয়ে উঠেছি। কে শুনতে চায় তখন ভূগোল বা গ্রামের লোকের কথা! হাতের একটা ভঙ্গিতে ও-কথাকে বন্ধ করে দিয়ে বলে উঠলাম—কিন্তু, কবে, কখন্ ফ্রান্সে পৌঁছাব? কোন্ পথে? কখন?

অত উতলা হয়ো না, য়্যানি। সে ধীরে ধীরে বলল। অত উতলা হয়ো না।

সম্পদের দিনের সিনরিটা পোলা বিপদের মধ্যে কখন যে য়্যানিটায় পরিণত হয়েছিলাম তা খেয়াল করিনি। আপত্তি করতাম না যদি বা খেয়াল করতাম। কিন্তু আজ কি মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে না দেখতেই স্বার্থপর ও বিপদের দিনের বন্ধুর প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছি যে এতটুকু স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতাও নজরে পড়ল? কত দিন যে হাত-ধরাধরি করে পাহাড়ে-জঙ্গলে চলেছি, তার কাঁধের উপর ভর করে পাহাড়ী ঝরণা পার হয়েছি নুড়ির পর নুড়ির উপর পা দিয়ে। কই, তখন ত য়্যান, য়্যানি, য়্যানিটা এ-সব ডাকে আপত্তি ত দূরের কথা, খেয়ালও করিনি যে বিপদের মুখোমুখী হয়ে কত নিকটে এসে পড়েছি আমরা? শুধু কি তাই? তার ত কোন বিপদই ছিল না। স্বেচ্ছায় সে আমার বিপদে এসে মাথা গলিয়েছে আমায় নিরাপদ দেশে পৌঁছে দেবে বলে। নিজের সংরক্ষণশীল মনের ক্ষুদ্রতার জন্ম নিজেকে ধিক্কার দিলাম।

তবু বললাম—তাড়াতাড়ি বল, নন্দ, কখন্ ফ্রান্সে পৌঁছাব?

সে আবার ধীরে ধীরে বলল—আজ শেষ রাত্রে। এই

পাহাড়টার উপর চড়লেই ও-পারে পাব একটা ছোট ফরাসী গ্রাম। সেখান থেকে সুরু হবে তোমার মুক্তি। বোর্দোতে তোমার যে ব্যাঙ্কে টাকা আছে তা সেখানেই আনিয়ে নিতে পারবে। কোন গোলমাল হলে হয়ত ব্রিটিশ কনসাল তোমার সাহায্য করবে। কিন্তু আজ সন্ধ্যা বেলা তুমি ঘুমিয়ে নাও। শেষ রাত থেকে সুরু হবে শেষ যাত্রা।

অনেকক্ষণ খিদে চেপে রাখার পর অনেক খাওয়ায় দেহ ক্লান্ত ও মন আচ্ছন্ন হয়েছিল। একটা গাছের দু'পাশে আমরা দু'জন শুয়ে আছি চুপ-চাপ করে। কিন্তু ওই কথাটা থেকে থেকে আমার মনকে এমন নাড়া দিয়ে যাচ্ছে যে, সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন সে ধাক্কায় নড়ে উঠছে।—"শেষ রাত থেকে সুরু হবে শেষ যাত্রা।"

অলক্ষিতে একবার কার্ণান্দোর দিকে তাকালাম। তারও মনে একটা অস্বস্তির উত্তেজনা খেলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। সামান্য একটা গাছের ব্যবধানে আর এটুকু বুঝতে পারব না? আজ ও যদি মাদ্রিদে থাকত আর আমি থাকতাম মার্সেল্সে, তবু ত বুঝতে পারতাম।

এতক্ষণ ধরে অতীতের ক'টা দিন কেমন করে গেছে তার স্মৃতি যেমন ভাবে মনকে পেয়ে বসেছিল, ঠিক তেমনি-ভাবে আগামী দিনগুলি কেমন ভাবে যাবে তার ভাবনা মনকে পেয়ে বসল। একা যেতে হবে—কেবল একা। কিন্তু শুধু আমি ত একা নই; সে-ও ফিরে যাবে একা।

ওর কথা ভাবতেই মন একটা করুণ বিষাদে ভরে গেল। অনন্ত সময়-সমুদ্রে আমরা দু'টি ভাসমান দ্বীপ এক জায়গায় এসে থেমেছিলাম। তার পর আমার দুঃখের ঢেউয়ে একা পাড়ি জমাতে দেখে নিজে থেকে সে আমার সঙ্গে ভাসতে সুরু করেছে অকূল দরিয়ায়। আজ পারের কাছে এসে হবে ছাড়াছাড়ি; তবু তার কথা কইছি না।

খুব মৃদু স্বরে ডাকলাম—যেন ও ঘুমিয়ে পড়ে থাকলে ঘুম না ভাঙে—নন্দ!

ও জেগেই ছিল—খুব অস্পষ্ট স্বরে সাড়া দিল—পোলা!

খুসী হলাম না। আজই শেষ দিন, শেষ সন্ধ্যা, শেষ রাত্রি। আজ ত আমি পোলা নই, আমি ন্যানিটা, ন্যানি, ন্যান—যা খুসী আমায় ডাকো, শুধু পোলা বলো না।

বললাম—নন্দ, তুমি আজ কত দূরে চলে গেলে।

একটু চুপ করে থেকে সে বলল—না, আমি দূরে যাইনি, দূরই তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে।

খুব কুণ্ঠা সহকারে বললাম—তুমি ত ইচ্ছা করলেই এই দূরত্বকে অতিক্রম করতে পার। এস না আমার সঙ্গে। আমার দেশে এস। আমার টিকিট বেচে থার্ড ক্লাশের দু'টো টিকিট কিনব। তুমি আমাদের দেশে সহজেই চাকরী পেয়ে যাবে।

উঠে বসল কার্ণান্দো। দেখলাম, আনন্দের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই তার মুখে। তার মুখের বাদামী রঙ এই ক'দিনের রোদে ঘোর লাল হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু ইটের মত সে রঙ বালির মত বিবর্ণ দেখাচ্ছে। সে বলল—তুমি কি মনে কর, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া উচিত হবে?

আমি। কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে।

নন্দ। না, আমার দেশ আমায় ডাকছে। এ দুর্দিনে আমি গণতন্ত্র ছেড়ে, যুদ্ধ ছেড়ে বিদেশে যেতে পারি না। আর যদি সে সব না-ও হত তবু বিদেশে আমি যেতাম না।

একটু পরিহাস করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম—বেশ ভাল ত! কলম্বস যে দেশ থেকে ভারত আবিষ্কার করতে বের হয়েছিল, সে দেশের লোকের উপযুক্ত কথা।

মাথা নেড়ে সে বলল—না, আমি সে দেশেরই লোক। সে জন্যই তুমি—বিদেশিনী তুমি আমার চোখে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলে। কলম্বস পোলষ্টারের দিকে এমন নির্নিমেষ ভাবে চেয়ে অনির্দিষ্ট সাগরে পাড়ি দেয়নি যেমন ভাবে আমি পোলার দিকে তাকিয়ে পথে চলেছি।

বললাম—তোমার কথা শুনে বড় কৌতূহল হচ্ছে। ইচ্ছা হচ্ছে, আজকের শেষ দিনে জানতে—সেই প্রথম দিনে কি ভেবে তুমি আমার দরজায় টোকা দিয়েছিলে? তোমার মনে যেন ছাপ পড়েছে একটা অনাদি আদিম অ্যাডভেঞ্চারের।

সায়াহ্নের অস্তরাগের মত ম্লান একটা হাসি সে মুখে টেনে আনল; তার পর বলল—জান, আমরা স্প্যানিয়ার্ডরা একটু আদিম জাতই বটে—বিশেষ করে নারী যেখানে জড়িত, সেখানে। ভালবাসি আমরা সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টাই। আমরা আকাশের চাঁদ এনে প্রেয়সীর পায়ে লুটিয়ে দিই, সূর্য্যকে তার জলন্ত চুল ধরে টেনে আনি; এই বিশ্ব-নিখিলের সব কিছুর সঙ্গে উপমা দিয়েও আমাদের আশা মেটে না। তবু, জানো, আমাদের প্রেমের চরম লক্ষ্য হচ্ছে দেহ। আমাদের রোমান্স হচ্ছে প্রেমের রোমন্থন, রমণীয়তা নয়।

একটু বিব্রত হয়ে বললাম—হোটেল আগিলারে নেপথ্যচারিণী পেরুর মেয়েটির গীতারের মৃদু মূর্চ্ছনার মধ্যে যে আমার সঙ্গে পরিচয় করেছিল, সে-ও নিশ্চয়ই সে রকম হিস্পানী ছিল না।

তার উত্তর শুনে আমি, ভারতবাসিনী, সীতা-সাবিত্রীর দেশের আমি আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি আজ সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। সে বলল—নিশ্চয়ই ছিল। তুমি যখন স্পেনে এসেছ, আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্ভান্টেসের কলহময় পারিবারিক জীবন-কাহিনী নিশ্চয়ই পড়েছ। অথবা কালদেরণের উপন্যাস নিশ্চয়ই পড়েছ। নর-নারীর আদিম আকাঙ্ক্ষায় কোন দোষই নেই আমাদের চোখে যদি গীর্জা ভবিষ্যতে কোন দিন তাদের সম্পর্কে নিগড় পরে দেয়।

বললাম—কিন্তু আমাদের বেলা ত সে রকম কোন সম্ভাবনা ছিল না।

—না থাকুক। তবু এগিয়ে যেতে দোষ নেই। আমরা হচ্ছি বিশ্ব-বিচরণের জাত। এগিয়ে চলাই ছিল আমাদের ধর্ম। নারীর দিকেও আমরা অমনি করে এগিয়ে যেতে শিখেছি। হেসে-খেলে দু'দিন বেঁচে থাকাই হচ্ছে যথেষ্ট। আমরা যখন খেতে পাই না, তখনো মুখে হাসি লেগে থাকে। মেয়েরা যখন সাথিহীন হয়ে প্রাদো মিউজিয়মের পথে ঘুরে বেড়ায়, অচেনা লোকের সঙ্গে দু'-একটা উড়ো রসিকতা করতে ছাড়ে না। মোট কথা, হেসে-খেলে নাও; দু'দিন বই ত নয়।

একটু রসিকতা করবার লোভ এখনো আমি ছাড়তে পারলাম না। বললাম—কিন্তু আমাদের ত' আজ তৃতীয় দিন।

বিষণ্ণ ভাবে সে বলল—আমার তৃতীয় দিন বহু দিন থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম কলম্বসের কৌতূহল ও হিস্পানীর প্যাসন নিয়ে। অগ্নিশিখা মনে হয়েছিল তোমাকে—পতঙ্গের মত ছুটে এলাম, কিন্তু দেখলাম, তুমি অগ্নির শিখা নও, শোভা; তুমি উজ্জ্বল কিন্তু জ্বল না। তুমি হিস্পানী নও, বিদেশিনী।

ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললাম—সে ত আমি প্রথম থেকেই ছিলাম।

মৃদু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সে বলল—তা ছিলে; তবু আমাদের কাছে নারী চিরকালই নারী, আর পরনারীই হচ্ছে পরমা নারী। যে আয়ত্তের বাহিরে, আয়াস করি তাকেই পেতে। নাগাল পাই না বলেই নিগড় গড়তে চাই। কিন্তু আমি রমণীর মধ্যে রোম্যান্সময়ী আবিষ্কার করলাম যে দিন সে দিন, থেকেই তোমার সঙ্গে হল প্রকৃত পরিচয়। সে দিন থেকেই তুমি বিদেশিনী। আমার কামনা দিয়ে তোমায় কমনীয় করে তুলতে চাইনি সে দিন থেকে; আমার বেদনা দিয়ে তোমায় বরণীয় করে নিয়েছি।

তার পর চুপ করে রইল সে। ধীরে ধীরে কখন একটা তারা পীরেনীজের একটা শৃঙ্গ থেকে আর একটার পিছনে আশ্রয় নিয়েছে জানি না। শুধু জানি যে, নক্ষত্র নীরবতা নির্জন নিশীথিনীকে একটা গূঢ় অর্থ দিয়ে একটা আন্তরিক আস্তরণে ঢেকে দিয়েছে। আমিও চুপ করে রইলাম।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে সে আবার বলল—তোমার সঙ্গে দুঃখের ভিতর দিয়ে—বিপদের মধ্য দিয়ে চলে আসব এত দূর, শুধু সেইটুকুই ছিল আমার অভিলাষ। আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আমাদের অভিযানকে কখনো জড়িয়ে তুলতে চাইনি; এক দিন আমাদের দেশ চেয়েছিল তোমাদের দেশকে খুঁজতে স্বর্ণখনি লাভের আশায়; আমি বিদেশিনীর মধ্যে খুঁজে পেলাম স্পর্শমণি। লোহা আমার সোনা হয়ে গেল। ওগো অজানা, ওগো বিদেশিনী!

আর সহ্য করতে পারলাম না। উদ্বেলিত অশ্রু সংবরণ করতে করতে তার ওই শিল্পীর মত সুন্দর আঙ্গুলগুলি তুলে ধরে বললাম—আর বলো না, বিদায়ের রাতে আর এমন করে বলো না। আমি জানি তোমাকে প্রথম দিন থেকেই। সে দিন রাত্রে ওই ট্যাঙ্গো নাচ আর ওই সরাইখানার রহস্য-রোমাঞ্চ আমায় বর্ষার বন্যা-স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেত শুধু তুমি যদি একটুখানি আকর্ষণ করতে। হয়ত সে দিন আমি তারই প্রত্যাশায় নিজেরই অজ্ঞাতে উন্মুখ হয়েছিলাম। তবু আশ্চর্য্য হলাম তোমার শেষ নিস্পৃহতা দেখে। তুমি সে দিন আমায় অবন্ধন দিয়ে যা আবদ্ধ করেছ তার ইতিহাস কেহ জানবে না।

বেদনাতুর কণ্ঠে সে বলল—না, না, তোমার মুক্তি চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাক। সে মুক্তি মুক্তার মত আমার হৃদয়ে শোভা পাবে। তুমি থাকবে আমার স্বর্গের স্বপ্ন, মর্ত্ত্যের সোপানে নামিয়ে এনে তোমায় কখনো দেখব না।

ক্ষতি কি হত তাতে? আমার অবস্থা ত সেই একই। আমি ত আজ আর যে হৃদয় নিয়ে এদেশে এসেছিলাম, সে হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতে পারব না। আজ শেষ রাতে পদে পদে পিছনে ফিরে তাকাব; কাল প্রাতে নিরাপদ সীমান্ত-পারে আমায় ছেড়ে তুমি পীরেনিজের নিঃসীম নীলিমায় লীন হয়ে যাবে। আমি কি তখন হাস্যময় ফ্রান্সের উদ্যানকুঞ্জগুলির দিকে তাকিয়ে থাকব, না, এই জলভরা গিরিনদীগুলির শ্যামল তীরে তীরে অরণ্যের অন্ধ অন্তরালে তোমার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চলার কথা মনে করে আনমনে পিছনের দিকে পা ফেলতে চাইব? ওগো, বিদায়-রাতে আমায় উতলা করলে তুমি এ কথা তুলে। তুমি বড় অকরুণ!

বিষণ্ণ দু'টি কালো চোখ তার আমার মুখের উপর এসে স্থির হয়ে রইল। আমার প্রতি নয়, নিজের প্রতি করুণতায় ভরা তার চোখ দু'টি। কলম্বস বোধ হয় এমনি ভাবে তাকিয়ে থাকত আমেরিকা আবিষ্কারের অভিযানে সমুদ্রের নীল নিদ্রা-নিবিড়তার দিকে চেয়ে চেয়ে।

তার নীরবতা যেন সহস্র অগ্নিশিখা বিস্তার করে দাবানলের মত আমায় ঘিরে আসছে। বাস্তবিক কি মানুষ এই দেশের লোক? এবং মানবতাই হচ্ছে এদের দেশের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য? সেটাই বার বার ফুটে উঠেছে এদের কবিতায়, চিত্রকলায় ও স্থাপত্য-শিল্পে। ওরা ওদের স্বর্ণ যুগেও চিন্তা করে মরেনি; বেঁচে থাকার আনন্দের মধ্যে অনুভব করেছে, কাজে মেতেছে, প্রেমে মজেছে। যৌবনের অমৃত-নিষেকে ওরা জীবনে ফুল ফুটিয়েছে, অজ্ঞাতের আকাঙ্ক্ষায়, সুদূরের সুদুর্লভের সন্ধানে বিশ্বকে ওরা বিদেশিনী বানিয়েছে। ওর চোখে আমি আজ বিশ্বের বন্দিতা বিশ্বনন্দিতা, বিদেশিনী। ওর প্রেমের মহিমায় আমি নিজেকে নূতন আলোকে সার্থকস্বরূপা দেখছি।

তার ওই শিল্পীর হাত দু'টির উত্তাপ আবার স্পর্শ করে অনুভব করতে লোভ হল। আমার হাত দু'টি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তার হাত প্রতিবাদের আভাস দেখিয়ে একবার উপরে উঠে আবার নেমে গেল। ধীরে ধীরে সে বলল—জান, যাকে ধরা যায় না, পাওয়া যায় না, সে চিরকালই অকরুণ, চিরকালই নিষ্ঠুরের মত সে পিছু টানে। তবু ত সামনেই আমরা চলি, সামনেই তাকিয়ে থাকি। সর্ব্বদাই। শুধু যখন ভোর বেলা তাঁবু তুলে নিয়ে যাত্রা সুরু করি তখনি কে যেন পিছু ডাকে। কার ক্যাষ্টিনেটের মাতাল ঝঙ্কার যেন পায়ে পায়ে শৃঙ্খলের মত বেজে ওঠে। কিন্তু তার জন্য ত বসে থাকতে দেবে না কেউ। একটুক্ষণ বসে থেকে যে নিশ্বাস নেব, তারও উপায় নেই।

হঠাৎ একটা মৃদু অথচ স্পষ্ট শীষের আওয়াজে চমকে উঠলাম।

সে বলল—ওই শোন, আমাদের আজকের পথ দেখাবার রাখাল ছোকরা সাঙ্কেতিক শীষ দিচ্ছে। এখনি আমাদের যেতে হবে; শেষ রাত পর্য্যন্ত দেরী করলে চলবে না বুঝতে পারছি।

আমার বুকের তলায় লুকানো পিস্তলটা একবার স্পর্শ করে দেখে নিলাম ঠিক আছে কি না। নন্দ তার 'নাভাজো'টা কোমরে এঁটে বেঁধে নিল। হাত-ধরাধরি করে দু'জনে তাড়াতাড়ি রাত্রির মধ্যে এগিয়ে চললাম শীষের আওয়াজ লক্ষ্য করে। ভাববার সময় নেই; পিছু ফিরে তাকাবার অবসর নেই। শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ শীঘ্রই অস্ত যাবে।

হলিউডের আত্মকথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

৬

আর্থার কানিংহামের ঘরে না গিয়ে সেলে ফিরে এসে শুয়ে থাকল। কানিংহাম ভাবছিল, প্লেট্ এবং মগ্ নেবার জন্য আর্থার তার কাছে যাবে। আর্থারের জন্য মিনিট পনর অপেক্ষা করে মগ্ এবং প্লেট্ নিয়ে কানিংহাম নিজেই আর্থারের সেলে আসল এবং আর্থারকে শুতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "কি হে, খাবে না?"

আর্থার বলল, "খেতে ইচ্ছা আছে কিন্তু নাকে এবং গালে ভয়ানক ব্যথা। একটা ওয়ার্ডন আমাকে বেশ ঘুসি মেরেছিল, সে কথা তুমি নিশ্চয়ই জান। যাক্‌গে, আজ না খেলেও চলবে—শরীরটা একটু হাল্‌কা হবে। মগ্ আর প্লেট্‌টা যথাস্থানে রেখে যেয়ো।" আর্থারের মুখ হতে কথাগুলি এমনি ভাবে উচ্চারিত হচ্ছিল যেন এক জন মজুর আর এক জন মজুরকে আদেশ করে না, অনুরোধ করে।

এবার কানিংহাম বুঝল, আর্থার নিশ্চয়ই মজুর। এর দ্বারা বাইরে বেশ কাজ হবে। সে বললে, "এরূপ ওয়ার্ডনকে বাইরে পেলে কি করবে?"

আর্থার সরল মনেই বললে, "কি আর করব, সে হল রাজক[illegible]চারী আর আমি হলাম মামুলী মজুর, সেলাম করে পথ ছেড়ে দিব, এর বেশী আর কি?"

কানিংহাম এবার বুঝল, সত্যিকারের চাষাই বটে। "আচ্ছা তোমার জন্যে মগ্ এবং প্লেট্ রেখে যাচ্ছি। অন্য কিছুর দরকার হলে জানিও।"

আর্থার কিছুই বললে না। চোখ দু'টা আপনা হতেই বুজে গেল। তার নাসিকা-ধ্বনি অন্যের নিদ্রার বাধা দিচ্ছিল বলে এক জন কয়েদী তাকে একবার ডেকেছিল। তন্দ্রার মধ্যেও সে কায়দা মাফিক বলছিল, "ক্ষমা করবেন, বড়ই পরিশ্রান্ত।"

সকাল পাঁচটায় সময় বিছানা ত্যাগের আদেশ হল। আর্থারও ঘুম থেকে উঠল এবং দেখতে পেল, অনেকেই নেংটা হয়ে এদিক্-সেদিক্ হাঁটছে। অবস্থা দেখে বুঝল, এখানে দোষীদের শাসন করা হয় না, যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এ সবের কি প্রতিকার নেই? প্রতিকার আছে, কিন্তু কে সে প্রতিকারের পথ দেখাবে? জেলের জীবন যাতে উন্নত হয় সে সম্বন্ধে কিছু করা চাই, কিন্তু এখানে বসে থাকলে চলবে না। বাইরে গিয়ে কাজ করা সমূহ দরকার।

.সকালের খাবার খেতে গিয়ে দেখলে, সেখানে শৃঙ্খলা আছে কিন্তু সভ্যতা নেই। সকলেই মহানন্দে কুবাক্য বলে আরাম পাচ্ছে। নাগরিক জীবনে যে আরাম পাওয়া যায় না এখানে তাই পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, খেতে বসেই আর্থার দেখতে পেলে, এখানে নম্বর আছে কিন্তু "রো" অর্থাৎ একই শ্রেণীর কয়েদী একত্রে আহার করার কোন সুবন্দোবস্ত নেই। যার যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসেই খাচ্ছে। খাবার সময় ওরা দল পাকায়। আর্থার কোন দলের লোক নয় সে কথা সে জানত, কিন্তু খেতে বসে জানল, সে কৃষক শ্রেণীতে খেতে বসেছে। চাষারা বড়ই ভাল মানুষ। মামুলি খাদ্য খেয়ে বেশী পরিশ্রম করে। জেলের খাদ্য তাদের কাছে সুখাদ্য বলে গণ্য। আগের দিন-রাত আর্থার খায়নি বলে সকাল বেলা বেশ পেট ভরে খেল। পাশে বসা কৃষক জিজ্ঞাসা করলে, "কার ঘোড়া চুরি করেছিলে?"

আর্থার বুদ্ধিমান ছেলে, নাকটা ফুলিয়ে বললে, "ঘোড়া চুরির ফুরসৎ হয়নি হে, শহরে আসবার পথে একটা লোক আমাকে কিছু কাগজ বিক্রি করতে দিয়েছিল। কাগজ বিক্রি করতে গোপনীয় মদের দোকানে যাই, সেখানে যাবার পরই বিপদে পড়ি। আর কখনও শহরে যাব না। বেটারা ভয়ানক বদ্‌লোক। এখানে কি কাজ করতে দেবে, বল ত?"

"কাজ এখানে কিছুই নেই। কাজের ভয় আমাদের করতেও নেই। কিন্তু আসল কথা হল এখানে অনেক দল আছে। এরা নূতন লোককে দলে ভিড়িয়ে ফেসাদে ফেলে। হুঁশিয়ার হয়ে চলবে। এখানে এমন লোকও আছে, যারা গোপনে নানা রকমের বই বাইরে হ'তে এনে পড়তে দেয়। তাতে নানা কথা থাকে, এ সব বই যদি তোমার হাতে জেলার দেখতে পায় তবেই বিপদ। কমিউনিষ্ট, আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাব, নাৎসী, গুণ্ডা এবং আরও নানা রকমের দল আছে। কাজ করব, খাব। এ সবের কি দরকার বল ত?"

"এ সব দলে মিশলে টাকা পাওয়া যায়?"

"জানি না ভাই, এ সব বিষয়ের ধারও ধারি না। ঘরে গিন্নীকে রেখে এসেছি, বেচারী ত কেঁদেই খুন। পাপের মধ্যে পাপ করেছিলাম —একটা ক্যাফ্ (পুলিশ) ধরে ঠেংগিয়েছিলাম, তাতেই দু'মাস জেল। এখানে আসার পর বেটারা বলে কি না এ, বি, সি পড়তে। তা কি হয়? আমার বাবাও টিপ্-সহি দিয়ে মাইনে নিতেন, আমিও তাই করছি। ভবিষ্যতেও তাই করব। দেখব, বেটারা কি করে তাদের তিড়িং-বিড়িং শিখায়।"

"আমারও একই অবস্থা ভাই। যদি বই পড়তে জানতাম তবে কি এ সব বই বিক্রি করতে যেতাম? নিশ্চয়ই না। শুনছি, রুস্‌ভেল্ট প্রেসিডেণ্ট হলে অনেক কয়েদী খালাস পাবে। এদের মধ্যে যদি আমিও খালাস পাই তবে একেবারে আলাবামা ষ্টেটের দিকে চলে যাব। শুনেছি, সেখানে লেখা-পড়ার চর্চ্চা খুবই কম, সত্যি না কি কথাটা?

অপর লোকটি বললে, নির্জলা খাঁটি নয়, তবে এখানের মত নয়। এখানে কথায় কথায় বেটারা বিজ্ঞাপন ছড়ায়, এ সব সেখানে দেখতে পাবে না। এখন খেয়ে ফেল, সময় হয়ে এল, তার পর বই পড়তে হবে, এই যা মুস্কিল।"

ঘণ্টি বাজবার পর কৃষকদের প্রাইমারী স্কুলের দিকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল। শিক্ষক মহাশয় স্কুলে প্রবেশ করেই নম্বর ধরে রোল কল করলেন। আর্থার তার নম্বর স্কুলের তালিকায় দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হল। তার পর সর্বপ্রথমেই নূতন কয়েদী আর্থারকে ডেকে শিক্ষক মহাশয় বললেন, "তুমি যদি ভাল করে লেখা-পড়া শিখ তবে তোমায় ভাল চাকুরি করে দেব। ইংলিশ অক্ষর জান?"

"না।"

"তবেই ত মুস্কিল। একেবারে আনাড়ী। আচ্ছা, তোমাকে একখানা বই দিচ্ছি। [illegible]

দেবে।" শিক্ষক মহাশয় আর্থারের হাতে একখানা বই দিয়ে পাশের লোকটিকে বললেন, "একে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দাও।"

আর্থার দাঁড়িয়ে বললে, "ইংলিশ শিখব না স্যার, আমি আমেরিকান, ইংলিশ শিখে কি হবে, আমেরিকান্ শিখব।

শিক্ষক মশাই চিৎকার করে বললেন, "হাঁ, তুমি আমেরিকান্ই শিখবে।"

আর্থার চুপ করল। পাশের লোকগুলি অনেকেই বাইবেল নিয়ে পড়ছিল। শিক্ষকও একখানা বই নিয়ে পড়ছিলেন। রুমটিতে নীরবতা বিরাজ করছিল। এমনি সময় দু'টা কয়দী ঝগড়া আরম্ভ করল। কথা-কাটাকাটির পর হাতাহাতি শুরু হল। অন্য কয় জন লোক তাতে যোগ দিল। দাংগা আরম্ভ হল। পাগলা ঘণ্টি বাজল না। দাংগার শেষে দেখা গেল, একটা লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। হসপিটালে পাঠাবার পূর্বেই তার প্রাণবায়ু বের হয়েছিল। লাসটা হসপিটালে গেল কিন্তু পরে কি হল তা আর আর্থার জানল না। যার কাছে বসে আর্থার অক্ষর শিখছিল তাকে জিজ্ঞাসা করে জানল, এই ধরণের নরহত্যা প্রায়ই হয় এবং সে জন্য কারো বিশেষ শাস্তি হয় না। সংবাদটি শুনে আর্থার অবাক্ হল এবং আরও জানবার জন্যে উৎসাহ না দেখিয়ে নিজের কাজে মন দিল। স্কুল পয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য বসেছিল। তার পরই অন্য কাজ। সেদিন অন্য কাজ আরম্ভ হবার পূর্বে কয়েক জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এসে দাংগার কারণ প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলেন। কে কি বলল আর্থার তা জানতে পারল না। আর্থারকেও দাংগার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, এরূপ দাংগা সে কখনও দেখেনি এবং কেন যে এরূপ দাংগা বাধল তার কারণও অনুভব করতে সক্ষম হয়নি। সে যখন কথা বলছিল, তখন এক জন অফিসার বললেন "লোকটা গতকল্য এসেছে, এখনও নূতন।" আর্থারকে ছেড়ে দেওয়া হল। ঘণ্টা দুই পরে তাদের কাজে নিয়ে গিয়ে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হল। কাজ কঠিন ছিল না। সবজি-বাগানের কাজ। সবজি-বাগানের কাজ সে জানত। যে কাজ তাকে দেওয়া হয়েছিল আধ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করে অন্যান্য কয়দীর কাজ দেখছিল। বাগানখানা যেন তার নিজের। কোথায় কি করতে হবে পলকে পলকে তার অন্তরে বেজে উঠছিল। সুপারভাইজার আর্থারকে এদিক্ সেদিক্ হাঁটতে দেখে কাছে এসে বললে, "কি হে, কি দেখছ, তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন তা পনর মিনিটে শেষ করেছি। সবজির কাজই করতাম, সে জন্য কোথায় কি করতে হবে তাই ভাবছি।"

"হাঁ, তাই ত. তুমি ভাববে আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি এখানে এরই মাঝে সুপারভাইজার হয়ে গেলে দেখছি। কয় বৎসরের জন্য এসেছ?"

"আজ্ঞে, তিন মাসের জন্য।"

সে জন্যই তুমি এত বদমাস। একটু সবুর কর, তোমাকে শেখাচ্ছি, বলেই সর্দার কয়েদি হুইসেল বাজিয়ে দিল। নিকট থেকে কয়েকটা লোক এসে আর্থারকে ঘিরে ফেলল। সর্দার কয়দি ইংগিত করা মাত্র তারা আর্থারকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিল। আর্থার অজ্ঞান হল, তার পর যখন চোখ মেলল, তখন দেখল সে হসপিটালের বিছানায় শুয়ে আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসতে মাস দুই সময় লাগল। তার পর সপ্তাহ দুই নীরবে জেল বাস করে মিষ্টারের ঘরে যেদিন ফিরে আসল, সেদিন তার শরীর এতই দুর্বল ছিল যে কথাই বলতে পারছিল না।

সপ্তাহ চলে গেল। তার পর এক দিন রবিবারে সে তার বন্ধুদের মিষ্টারের মারফৎ ডাকিয়ে আনল এবং তাদের কাছে জেল-কাহিনী বর্ণনা করল। মিষ্টার চুপ করে আর্থারের সকল কথা শুনার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন, "লং ওয়ে টু টিপুরারী", অন্যান্য সকলেই নীরব থাকল।

আরও মাস দুই আর্থার কোন কাজই করল না। শরীরও তার ভাল হচ্ছিল না। মিষ্টার বললেন, "চল, এবার আমরা শহরে যাই, সেখানে গিয়ে মাস দুই থেকে আবার গ্রামে ফিরে আসব। আমেরিকার গ্রাম এবং শহরে কোনও প্রভেদ নেই। গ্রামেও ফ্রেস্ এয়ার পাওয়া যায়, শহরেও তার অভাব নাই। শহরে লোকের সংখ্যা বেশী গ্রামে কম, এই যা পার্থক্য।"

হলিউড্, লস এঞ্জেলস্ নগরের একটি অংশ। সেখানে যাওয়াই ঠিক হল। ব্রন্‌সন্ এভেনিউতে একটি ছোট ঘর ভাড়া করা হল। ঘরটি একতলা এবং তাতে পাঁচটি রুম। মাসিক ভাড়া মাত্র বার ডলার। বিছানা এবং ফারনিচার ভাড়া আরও তিন ডলার। গরম এবং ঠাণ্ডা জলের কল ছিল। আর্থার দেখলে, এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে এসেছে, এখানেও লোক-জন নাই বললেও চলে, তবে স্থানটা একটু পাহাড়ে এবং সমুদ্রের হাওয়া পাওয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই এক জন গৃহরক্ষিণীকেও রাখা হল। গৃহরক্ষিণীর নাম মিসেস ব্রাউনসন্। বেশ লম্বা এবং বলিষ্ঠ স্ত্রীলোক। ঘণ্টায় পাঁচ মাইল হাঁটতে পারেন। বেশী কথা বলা তার অভ্যাস ছিল না। সারা দিনই বই নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। দিনের মাঝে দু'-এক জন লোক তার সংগে দেখা করতে আসে, তারা পাক-ঘরে বসেই কথা বলে চলে যায়। আর্থার পাক-ঘরে যেত না। ডাক্তার তাকে পাক-ঘরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। আমেরিকানরা ডাক্তারের আদেশ সর্বদা এবং সর্বতোভাবে মানে না। ডাক্তারের আদেশ অবজ্ঞা করে এক দিন আর্থার পাক-ঘরে গিয়ে দেখতে পেলে মিসেস্ ব্রাউনসন্ একটা লোকের সংগে চুপি-চুপি কি বলছেন। আর্থার রীতিমত ক্ষমা চেয়ে পাক-ঘর হতে ফিরে এসে মিষ্টারকে বলল "মিসেস ব্রাউনসনের ঘরে প্রায়ই কেন লোক আসে?" মিষ্টার বললেন, "এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে নেই। এখন ভাল হও, তার পর আমরা অন্য চিন্তা করব।"

মিসেস ব্রাউনসন কৃষক-পত্নী এবং একটি প্রসিদ্ধ ব্যাংকের এজেন্ট ছিলেন। কৃষক মারা গেছেন এবং ব্যাংকটি দরজা বন্ধ করে দেওয়ায় তারও চাকরি গেছে। দুদিনে চাকুরী যাওয়ায় মিসেস ব্রাউনসনের পাচিকা বৃত্তি ছাড়া আর কোন কাজ পাবার সুযোগ ছিল না। পাচিকা-বৃত্তি কাজ করাটা অসম্মানের কাজ ত নয়ই বরং সম্মানের কাজ, কিন্তু মিসেস যে ভাবে থাকতেন তাতে সাধারণ লোকেরও তার প্রতি সন্দেহ হত। তাঁর ব্যাংক দরজা বন্ধ করার জন্য মিসেস ব্রাউনসন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মুখ দেখাতে পারতেন না, সকলেই তাকে ঘৃণা করত এবং মুখের উপরেই বলত, যারা ব্যাংক দেউলিয়া করেছে মিসেস ব্রাউনসন তার অন্যতম। এতেই ব্রাউনসন

জানতেন না। মিসেস ব্রাউনসন জানতেন, যারা তাদের ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রেখেছিল তাদের মধ্যে কেউ তাকে হত্যাও করতে পারে। যাতে তার প্রাণ বাঁচে সে জন্যই পাচিকা-বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। অন্যান্য যারা তার সংগে দেখা করতে আসত তারাও ব্যাংকেরই কর্মচারী।

এক দিন বৃদ্ধ এবং আর্থার সকাল বেলা যখন খেতে বসেছিল, তখন আর্থার লক্ষ্য করল, মিসেস ব্রাউনসন অন্যমনস্ক এবং তার মুখখানা সাদা। আর্থার এবং বৃদ্ধ উভয়েরই দৃষ্টি মিসেস ব্রাউনসনের দিকে আকৃষ্ট হল। বৃদ্ধ পাচিকার মুখের অবস্থা দেখে দুঃখিত হল। পাচিকাকে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল, তার মুখ কেন সাদাটে দেখাচ্ছে? বৃদ্ধ আরও বললে, এখানে ভূতের ভয় নাই, যদিও বা থাকে তবে বৃদ্ধকে বললেই হত। বৃদ্ধ ভূত-তাড়ানোর ঔষধ জানে। পাচিকা বৃদ্ধকে বললে, সে ভূতের ভয়ে ভীত নয়, কিন্তু যে ভয় তাকে পেয়ে বসেছে সেই ভয় হতে বৃদ্ধ এবং আর্থার কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

বৃদ্ধ একটু চিন্তিত মনে বললে, "আমাদের যদি তোমাকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতাই না থাকে তবে আমাদের এখানে তোমার থাকা ভাল হবে না। আমাদের এক-জন রোগী আর আমি বৃদ্ধ, কারো ভালো-মন্দে আমরা থাকতে চাই না।"

বৃদ্ধের কথা শুনে মিসেস ব্রাউনসন কিছুই বললেন না, সকালের খানা পরিবেশন করে নিজে কিছু খেয়ে ঘর হতে বের হয়ে গেলেন। যাবার সময় তার ডান হাতে বাজার করার কাগজের ব্যাগটি আছে তা আর্থার লক্ষ্য করেছিল। বেলা এগারটার পূর্বেই মিসেস ব্রাউনসন প্রত্যহই ফিরে আসতেন, সেদিন এগারটার পরও যখন মিসেস ফিরে আসলেন না, তখন বৃদ্ধ নিজেই পাক বসাল। বৃদ্ধ অনেক বৎসর পাক করেনি বলে প্রথমত একটু ঠেকছিল কিন্তু মিনিট দুই-এর মধ্যেই পাকের নিয়মাবলী তার মাথায় এসে গেল এবং চটপট করে কাজ করতে আরম্ভ করল। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পাক হবার পর আর্থার এবং বৃদ্ধ খেতে বসল। খেতে বসে তারা তাদের পাচিকার কথা একবারও ভাবেনি। কিন্তু তাদের পাচিকা তাদের ভুলতে পারেনি। শহর হতে ফেরার পথে মিসেস ব্রাউনসন্ সাব-ওয়ে ধরে আসলেন। এতে তার আধ ঘণ্টা সময় বেঁচেছিল। তা বলে কি হয়, আড়াইটার সময় মিসেস ব্রাউনসন্ ঘরে ফিরে দেখলেন, বৃদ্ধ এবং আর্থার পাক করে খেয়েছে। মিসেস্ ব্রাউনসন্ তার দেরীর জন্য বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলেন। বৃদ্ধ তাকে ক্ষমা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন কি করেছ যে জন্য তোমাকে এত ভীত হতে হচ্ছে?"

মিসেস ব্রাউনসন্ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "অনেক অন্যায় করেছি মিষ্টার, সে অন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অথবা হাউমাউ করে চিৎকার করে কাঁদলেও সান্ত্বনা পাওয়া যাবে না। হুভারের রাজত্বের প্রথম ভাগে আমরা একটি ব্যাংক খুলি। প্রথমত ব্যাংকটি একটি বড় ব্যাংকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। বড় ব্যাংকের ম্যানেজার আমাদের সংগে নানারূপ অন্যায় আচরণ করতে থাকে। তার হাত হতে রেহাই পাবার জন্য আমরা কয়েক জন নিজেদের হাতেই ব্যাংকের পরিচালনার ভার গ্রহণ করি। বড় ব্যাংকের ডাইরেকটরগণ যখন সংবাদ পেলেন আমরা নিজেরাই ব্যাংক পরিচালনা করছি, তখন তারা আমাদের কাছে একখানা পত্র লিখে শুভ কামনা করলেন। আমরাও ভাবলাম, সত্যিই বুঝি তারা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমাদের উদ্বৃত্ত অর্থ যেমন ভাবে আমরা তাদের ব্যাংকে জমা রাখতাম তেমনি ভাবে হিসাব রেখে চললাম। অনেক দীন-দরিদ্র আমাদের ব্যাংকে টাকা রাখত শুধু আমাদেরই প্রভাবে। কিন্তু এক দিন শুভ প্রভাতে দেখতে পেলাম, আমাদের বড় ব্যাংক দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। যাদের সংগে আমাদের নিকট-সম্বন্ধ, তাদেরই যখন দরজা বন্ধ হয়ে গেল তখন আমাদের কে বিশ্বাস করবে? আমাদের ব্যাংকে রান্ হতে থাকল। আমরা মাথা ঠিক রেখে যাদের অল্প টাকা তাদেরই হিসাব মিটিয়ে দিলাম। তার পর যারা বেশী টাকা গচ্ছিত রেখেছিল তাদেরও কিছু কিছু দেবার পর যখন দেখা গেল, কোন মতেই কোথাও হতে টাকার সংস্থান হচ্ছে না, তখন আমাদের যথাসর্বস্ব বিক্রি করে যতটুকু পারলাম ততটুকু হিসাব পরিষ্কার করলাম। আমাদের এক বন্ধুর পল্লীগ্রামে একখানা বাড়ী ছিল, তা-ও বিক্রি করে আমরা লোকের হিসাব পরিষ্কার করার পর মাত্র দু' হাজার ডলারের অভাবে ব্যাংক বন্ধ করে দিয়ে তোমার চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের অফিস-ঘরও কি নীলাম করে দিয়েছ?"

"হাঁ, অফিস-ঘরও নীলামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছি। যতটুকু সৎভাবে কাজ করা সম্ভব হয় ততটুকু করতে কোনরূপ কসুর করিনি।"

"তোমাদের ব্যাংক সম্বন্ধে যা ঘটেছে তার আনুপূর্বিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছ?"

"না।"

"আমার মনে হয়, তুমি যদি তোমাদের ব্যাংক সম্বন্ধে একটি ভাল প্রবন্ধ লিখে আমার কাছে দাও তবে 'গারজিয়ান্' পত্রিকায় ছাপাবার বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হব। আমরা লেখাপড়ার ধারও ধারি না তা আমাদের থাকার পদ্ধতি দেখেই বুঝতে পেরেছ। কোনও এক সময়ে আমি এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে কাজ করতাম, তিনি বর্তমানে 'গারজিয়ান্' পত্রিকার এক জন ডিরেকটর্। তাঁর সংগে হালেও দেখা হয়েছে। দেখা হলেই তিনি আমার ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন, যদি কোনও কষ্টের করুণ কাহিনী শুনতে পাও তবে আমার কাছে এসে বলবে, সংবাদপত্রে সেই করুণ কাহিনী প্রকাশ হলে তার অনেকটা প্রতিবিধান হতে পারে। তুমি যদি তোমাদের ব্যাংক সম্বন্ধে যা ঘটেছে তাই লিখে দাও তবে আমি ছাপাবার জন্য আমার পূর্বের মনিবের কাছে দিয়ে আসতে পারি। আমার মনিব বেশ ভাল লোক, ঘটনা সত্যি হলে এবং ঘটনাটা বেশ ভাল করে লেখা হলে বেশ টাকা দেন। আমার মনে হয়, তোমাদের ঘটনা প্রকাশ হলে অন্তত পক্ষে দুই শত ডলার পাওয়া যাবে। যা পাওয়া যাবে তার কিছুটা যদি আমাকে দাও তবে আমি তোমার কাজ হাসিল করতে কালই স্যানফ্রান্সিসকোতে যেতে পারি।"

মিসেস ব্রাউনসন্ আলো দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তার সহকারীদের ফোনে ডাকলেন এবং বৃদ্ধের উপদেশ মত একটি প্রবন্ধ লিখে বৃদ্ধের হাতে দিলেন। বৃদ্ধ সেই প্রবন্ধ নিয়ে বেরিয়ে যাবার পূর্বে মিসেস ব্রাউনসনকে বললে, আমার ছেলেটি রোগাক্রান্ত, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না, যদি প্রতিজ্ঞা [illegible]

থেকে বের হব। তোমার বন্ধুরা আমার বাড়ীতে আসতে পারবে, সে অধিকারটুকুও দিতে রাজী আছি। মিসেস ব্রাউনসন্ তাতে রাজী হলেন। বৃদ্ধ আর্থারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা তাদের হেড-কোয়ার্টারে গিয়ে উপস্থিত হল। উইলী, ড্যান্ সেখানে উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধকে দেখামাত্র সকলে উঠে কেউ বৃদ্ধকে চুমু দিল, কেউ বৃদ্ধের লম্বা চুল এবং দাড়িতে হাত বুলিয়ে দিল, এক জন এক মগ কাফি এনে বৃদ্ধের মুখের কাছে ধরল। এরূপ করে আদর-আপ্যায়ন শেষ হলে বৃদ্ধ বললে, আর্থারের শরীর ভালর দিকেই চলেছে। আর্থার জানতে চেয়েছে, জেলের ভেতর লোক পাঠানো হয়েছে কি না, সেই সর্দার কয়দী কি এখনও জীবিত আছে?

উইলী বললে, "খুড়ো, সেই সর্দার কয়দী ভবলীলা সাংগ করেছে। জেলে পুরাদমে সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। সুখের বিষয়, আমাদের উপর বদনামটা না এসে কমিউনিষ্টদের ঘাড়েই পড়েছে। বেশ ভ'লই হয়েছে। ব্যাটারা ধনীদের সংগে হাত মিলাতে চাইছে।"

"সে আবার কেমন হে, এ যে নূতন সংবাদ বলে মনে হচ্ছে!"

উইলী বললে, "তোমার কাছে সবই নূতন সংবাদ, সংবাদপত্রও পড়বে না, সে জন্ত কি আমরা দায়ী?"

বৃদ্ধ মুখ গম্ভীর করল। বৃদ্ধের মুখ যখন গম্ভীর হয় তখন সকলেই ভয় পেত, বুঝত, বাক্যবাণ ছাড়বার জন্ত বৃদ্ধ প্রস্তুত হচ্ছে। উইলীর দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললে, "বল, কি হয়েছে?"

উইলী একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল, তার পর বলতে আরম্ভ করল, "সিংগার মেশিন কোম্পানীর লোক সর্বত্র ধর্মঘট আরম্ভ করে ধর্মঘটে কৃতকার্য্য হয়েছে। তাদের মাইনে বেড়েছে। তাদের মাইনে বাড়ার পর সিংগার মেশিনের দাম আমেরিকাতে ডলার-প্রতি দুই পেণি বেড়েছে। আমেরিকার বাইরে যা চালান যাবে সে জন্ত এক পেণিও দাম বাড়েনি। হিসাব করে দেখা গেছে, সিংগার মেশিন কোম্পানী তাদের মজুরের মাইনে যা বাড়িয়েছে সেই টাকাটা এবং তার দ্বিগুণ জনসাধারণ হতে টেনে নিচ্ছে। এখানে মজুর এবং ধনী মিলে কি সাধারণ লোকের সর্বনাশ করল না?"

"সে কথা ত নূতন নয় হে, আমি ভাবছিলাম অন্ত কিছু, একটি ঘটনা দেখেই একটি পার্টিকে দোষী সাব্যস্ত করা চলতে পারে না। জিহ্বা সংযত করে কথা বলবে। অসংযত কথার নানা দোষ, সে সম্বন্ধে অনেক গল্প তোমাকে শুনিয়েছি, তবুও কেন যে পুনরাবৃত্তি করছ তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে।"

উইলী মাথা নত করল এবং অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকল।

প্যাট কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে সাংবাদিক, 'গারজিয়ান' পত্রিকার ডাইরেকটর। কংগ্রেসের মেম্বর, ওয়াশিংটনে যখন সে লেকচার দেয় তখন সকলে তার লেকচার কাণ পেতে শুনে। সেনেট-মেম্বররা তাকে ঘৃণ করে। ডিমোক্রেটিক মেম্বররা তাকে অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন লোক বলে স্বীকার করে। মাউণ্ট ওয়াশিংটনের পর্বতমালার শৃংগে অবস্থিত বাড়ীতে প্রায় সেনেটারই অতিথি হতে পারলে ধন্ত হন। তার প্রকাণ্ড জমিদারীতে হাজার দুই লোক কাজ করে। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও প্যাট বৃদ্ধের কাছে "ক্যাফ্" মানে রাস্তার পুলিশ বলেই পরিচিত। প্যাটও বৃদ্ধকে জান্ বুল বলতে কসুর করে না। তবুও বৃদ্ধের কাছে প্যাট শিশুর মত আদর পেত এবং যখনই পথভ্রষ্ট হত তখনই তর্জনীর তাড়নায় অস্থির হত। প্যাটের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বলল, একটু দাঁড়াও হে, তোমার জন্ত একটি কাজ এনেছি। বৃদ্ধ তার জন্ত কি কাজ এনেছে জানবার জন্ত উৎসুক হল। পকেট হতে মিসেস ব্রাউনসনের প্রবন্ধটা বের করে প্যাটের হাতে দিয়ে বৃদ্ধ বললে, "এই প্রবন্ধটা হয় তোমাদের পত্রিকায়, নয় অন্ত কারো সংবাদপত্রে ছাপবে এবং দোষীদের ধরে টাকা আদায় করার ব্যবস্থা করবে। এই কাজের জন্যই এসেছিলাম। বল, আর কোন সংবাদ আছে কি?"

প্যাট প্রবন্ধটা হাতে নিয়ে বললে, বিশেষ কোন সংবাদ নেই।

এখন বিদায়ের আদেশ পেলেই ফিরে যেতে পারি বলে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল।

"না হে বৃদ্ধ, বিদায় হলে চলবে না, তোমাকেও কিছু কাজ করতে হবে।"

বৃদ্ধ সামনের দু'টা দাঁত বের করে বললে, "হ্যাঁ, বস্, তোমাদের গোলামী করতেই জন্মেছি, আদেশ কর?"

তুমি বোধ হয় জান হলিউডের অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের প্রতি দারুণ অত্যাচার চলেছে?"

"তা আমি বেশ ভাল করেই জানি। আসল কথা হল, এই শ্রেণীর লোককে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। দেখলে ত, চ্যারলী ব্যাটা কি করে বসল? তার ক'টা যে বিয়ে হয়েছে সে সংবাদ আমেরিকার নিকট বিশিষ্ট গোয়েন্দারাও জানতে পারে না। ওদের ভাল-মন্দ আমি চিন্তা করব না। এ বিষয়টা কমিউনিষ্টদের হাতে ছেড়ে দাও।"

"হাঁ, তবেই ত হল, সমানে সমান।" কথাটা বলেই প্যাট টেবিলের নীচে মাথাটা ঢুকিয়ে দিলে, কারণ প্যাট জানত, বৃদ্ধ কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধাচরণ করতে চায় না। দলের লোক রটনা করেছিল, বৃদ্ধ না কি বিয়ে করতে চায়, সে জন্য সে কমিউনিষ্টদের সুনজরে দেখে।

বৃদ্ধ একটু হেসে বললে, "কংগ্রেসে গিয়েই এই বিষয়টা নিয়ে একটু লেকচার দিও, আমার কাছে নয়। জান ত শরীরটা যেমন পুরাতন মনটা তেমনি খিটখিটে হয়েছে। প্রেমের কথা ওয়াশিংটনে গিয়েই বলবার স্থান। এখন তবে বিদায় হই, বস্।"

উইলী বললে, "যাবে ত যাবেই, কেউনী পুর্তরীকোতে গিয়ে কতকগুলি ফল এনেছে। ফলগুলি খেতে বেশ ভাল। তাকে "মেংগো" বলা হয় শুনতে পেয়েছি। অভিধান দেখে জানতে পেরেছি, এই ফল ইণ্ডিয়াতেও প্রচুর হয়। ইণ্ডিয়া ত তোমার বাপ-ঠাকুরদার কলনি, সেখানকার একটা ফল খেয়ে যাও।"

বৃদ্ধ উইলীর কথা এড়াবার জন্য একটি বাজে কথা বলে হেড কোয়ার্টার হতে বের হয়ে পড়ল এবং যেমনটি এসেছিল তেমনটি করে রেলগাড়ীর টিকিট কিনে হলিউডের দিকে রওয়ানা হল।

ঘরে ফেরবার পর আর্থার বৃদ্ধকে বললে, "বৃদ্ধ তোমার মনিবকে পেয়েছিলে?"

"হাঁ, তাকে পেয়েছিলাম। তিনি আমাদের পাচিকার রিপোর্ট সংবাদপত্রে ছাপাবার বন্দোবস্ত করে দেবেন বলেছেন। তোমার সংগে প্যাট বলে একটা ছোকরার দেখা হয়েছিল, মনে আছে?"

"নিশ্চয় মিষ্টার, লোকটা গেল কোথায়? অনেক কাল হল তার সংগে দেখা হয়নি। তার সংগে কি তোমার দেখা হয়েছিল?"

"হাঁ, সে কথাই ত বলছি। তোমাকে যে সর্দার-কয়েদী মেরেছিল

তাকে না কি জন্য কতকগুলি কয়েদী যমালয়ে পাঠিয়েছে। প্যাটের এক ভাই হালে জেল থেকে ফিরে এসেছে, সে-ই সংবাদটা প্যাটকে দিয়েছে। প্যাট আবার একটি ভাল মানুষ। সে এ সব হত্যা মোটেই পছন্দ করে না। তার ভাই সশরীরে ফিরে এসেছে, এতেই সে সন্তুষ্ট, দুনিয়ার ধার ধারে না সে। মিসেস্ ব্রাউনসন্ কোথায়?"

"তিনি তার ঘরেই আছেন। তোমার চলে যাবার পর মিসেস ব্রাউনসন্ এক মিনিটের জন্যও বাইরে যাননি। তুমি একটু অপেক্ষা কর, তোমার ফিরে আসার সংবাদ দিয়ে আসি।" আর্থার মিসেস ব্রাউনসনের ঘরে গিয়ে দেখলে, তিনি মন দিয়ে 'মজুর' পত্রিকা পড়ছেন। যে দিন বৃদ্ধ আর্থারকে বলেছিল, "মজুর মজুরের কথা ভাববে" সেদিন থেকে মজুরদের কোন পত্রিকা সে পড়ত না। পাচিকার হাতে 'মজুর' পত্রিকা দেখে আর্থার বললে, "কি গো, মাইনে বাড়াবার তালে আছ না কি? এখানে কিন্তু তা হবে না। আমরা পাক করে খেতে জানি।"

মিসেস ব্রাউনসন্ আর্থারের দিকে কটাক্ষপাত করে বললেন, "আমি কি পড়ি তা দেখার এবং আলোচনা করার অধিকার তোমার নেই। বৃদ্ধ এসেছেন কি?"

"হাঁ মেম্, বৃদ্ধ এসেছেন এবং আপনাকে স্মরণ করেছেন।"

মিসেস ব্রাউনসন্ ঘরে প্রবেশ করা মাত্র বৃদ্ধ তাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিল। মিসেস ব্রাউনসন্ বসার পর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলল, "তোমার লেখাটা আমার মনিবের কাছে দিয়ে এসেছি। তিনি বলেছেন লেখাটা ভালই হয়েছে, এখন দেখা যাক্, সম্পাদক ব্যাটারা কত টাকা মঞ্জুর করে। তবে আমার ধারণা, দু'শ ডলার তুমি পাবেই। বল ত যদি দু'শ ডলার পাও তবে আমাকে কত দেবে?"

মিসেস ব্রাউনসন্ একটু চিন্তা না করেই বলে ফেললেন, "অর্দ্ধেকটা তুমি পাবে।"

"ভাল কথা মেম্, বাকি টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?"

মিসেস ব্রাউনসন্ বললেন, করার মত অনেক কিছুই আছে, তবে আসল কথা হল, আমি নিউইয়র্ক হতে প্রকাশিত একখানা দৈনিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম, তার ছয় মাসের চাঁদা এখনও দেওয়া হয়নি। তার চাঁদা পরিশোধ করতে পারলেই অনেক ঝন্ঝাট কমে যায়। এর পরেও কি খরচ নেই? খরচ আছেই। টাকা কি করে খরচ হয় সে প্রশ্ন করে লাভ নেই। বস্, আমার জন্মই হল টাকার মধ্যে এবং মৃত্যুটা যখন হসপিটালে হবে তখন যারা আমাকে কবর দেবে তাদেরও কিছুটা টাকা খরচ করতে হবে। টাকার কথাই লোকে ভাববে।

আর্থার বললে, "উনি 'মজুর' পত্রিকা পড়েন, মজুরদের কথা নিশ্চয়ই ভাবেন, আমাদের কথা ভাবেন না কেন? আমরাও ত মজুর, আমাদের প্রতি ওঁর দয়া করা উচিত।"

বৃদ্ধ ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "কিরূপ দয়া তুমি চাও?"

"কেন, বিনা মাইনেতে পাক করে দেওয়া।"

"এ সব কথা রেখে দাও আর্থার, তুমি এখনও কিছুই শিখতে পারনি বলে অপরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। নিজের চরকায় তেল দিতে শেখ, তার পর অন্যের বিষয় নিয়ে চর্চা কোরো।"

বৃদ্ধ এবার মিসেস ব্রাউনসনের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার পুরাতন মনিব বড়ই ভাল মানুষ। তিনি দরিদ্রের দুঃখে দুঃখী হন। তোমার কথা আমি তাঁর কাছে বলেছিলাম। তোমাদের দুঃখের কাহিনী শুনে তিনি বড়ই দুঃখিত হন এবং তার পর যখন তোমার লেখাটা পড়লেন তখন তার মুখ দেখেই বুঝতে পারি তিনি রেগে গেছেন এবং যারা তোমাদের ঠকিয়েছে, তাদের শাস্তি দেবার জন্য কোনও বড় গুণ্ডার দলের সাহায্য নেবেন।"

ব্রাউনসন্ বললে, "আমার ইচ্ছা ছিল, আণ্ডার-প্রেজুয়েট ক্লাবের সাহায্য নিই, কিন্তু এদের খুঁজে বের করা বড়ই কঠিন।"

"এ সব ক্লাবের কথা কিছুই জানি না। ক্লাব বলতে ত বুঝি খেলার ক্লাব, পড়বার ক্লাব, বেডমিন্টন্ ক্লাব। গুণ্ডাদের ক্লাব হয় এই প্রথম তোমার কাছে শুনলাম। ছোটবেলায় যখন এ দেশে আসি তখন শুনতে পেয়েছিলাম, এ দেশে দাবা-খেলার একটা ক্লাব আছে, সেই ক্লাবটা দেখবার জন্য চিকাগো গিয়েছিলাম। মস্ত বড় হল, তাতে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক টেবিল দখল করে বসে থাকে। লোকগুলিকে দেখলেই মনে হয়, তারা পৃথিবীটাকে ভুলবার জন্য সেখানে যায়। অনেকে মদ খেয়ে পৃথিবীটাকে ভুলবার জন্য সেখানে যায়। অনেকে মদ খেয়ে পৃথিবীর দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করে, এ কথা শুনেছি। দাবাও খেলিনি, মদও খাইনি, সে জন্য পৃথিবীর সুখ-দুঃখ কিছুই ভুলতে পারিনি। তুমি যে ক্লাবের কথা বলছিলে, সেই ক্লাবটা হয় ত মাতালদের ক্লাব হবে। ব্যাটারা পরীক্ষায় ফেল করে মদ খেয়ে শুয়ে থাকে এবং পারলে চুরি-ডাকাতি করে। এদের সন্ধান নিও না, আজ হয়ত এরা তোমার উপকার করবে কিন্তু এরাই কয়েক দিন পর অন্যের টাকা খেয়ে তোমার যে অনিষ্ট করবে না তার প্রমাণ কি? আমার পুরাতন মনিব যে সকল লোকের সাহায্য নিবেন তারা হল ভদ্রলোক। কারো অনিষ্ট করার মতলব তাদের নেই। তারা প্রত্যেকেই ধনী এবং বিদ্বান্। আইনের সাহায্য নিয়েও যখন তারা পেরে উঠে না তখন তারা গুণ্ডামী করে, অর্থাৎ তখন তারা আইন নিজের হাতে নেয়। আইনবিরুদ্ধ কাজ করলেই আমরা গুণ্ডামী বলি। বুঝলে মেম, বয়স হয়েছে এখন আইনটাকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে চাই নতুবা বাঁচব কি করে? এখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে পাক করগে, তোমার দুঃখ থাকবে না এ কথা আমার মনেই বারংবার বলছে।

[ক্রমশঃ।

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

পরিপূর্ণ বিকশিত অন্তর লইয়া ঝরণা যাত্রা করিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে গাছ-পালা, তাহার কোলে-কোলে বিস্তৃত, অল্প-বিস্তৃত, দীর্ঘ-বিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তরের দূরপ্রান্তে বিলীয়মান গ্রাম-রেখা—সবই যেন তাহার আঁখিপটে ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে। যে দিকেই সে চায়, সেই দিক্ হইতেই চোখ যেন তাহার আর নামিতে চাহে না। অবশেষে মোটর আসিয়া মলিনদের গ্রামে ঢুকিল।

ট্রেণে যাইতেই ঝরণা এত দিন আবছায়ার মতই পল্লীগ্রামের চেহারা দেখিয়াছে, আজ তাহার চোখে পড়িল পল্লীর অন্তর্চিত্র—পুকুর-বাগান, গাছ-পালা, কাক-কোকিল! গ্রামখানির প্রত্যেক বস্তুই যেন তাহার চোখে—অপরূপ! গ্রামের প্রান্তভাগে একটি পুকুর, সেই পুকুরের একান্তে একটি অতি প্রাচীন অশথ গাছ, তাহার চারি-পাশ বেড়িয়া খাটো-খাটো ঝোঁপ, তাহার ডালে-ডালে ফল পাকিয়া—লাল টুক্‌টুকে! প্রকৃতির এই সহজ সৃষ্টি ঝরণার চোখে আর কোনও দিন পড়ে নাই। এই দৃশ্যে তাহার কৌতূহলী মন যেন নাচিয়া উঠিল। সাগ্রহে তাহার সঙ্গীটিকে প্রশ্ন করিল, "ওগুলো কি ফল?"

মলিনের মুখখানা কালো হইয়া গেল। এই পুকুরের পাড়ে এই ফল তুলিতে কত দিন না সে আসিয়াছে—তাহার সাথী ছিল আর এক জন! তাহার আঁচল ভরিয়া দিয়াছে এই ফলে! এই বন, এই ঝোঁপ—ইহার নিভৃত কক্ষে তাহাদের এলোমেলো কত কথাই না গচ্ছিত আছে! অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "বৈঁচি—"

মলিনের এই ভাবটা ঝরণার নিকট গোপন রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ স্বামীর একটি হাত টানিয়া লইয়া নিজের মুঠোর ভিতর চাপিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "লজ্জা-লজ্জা করছে নয়—ভয়-ভয়?"

মলিন বিব্রত ভাবে জবাব দিল, "না—তা' নয়!"

"অনেক দিন অজ্ঞাত-বাস?"

মলিন একটু হাসিল মাত্র।

ঝরণা স্বামীর মাথার চুলগুলি গুছাইয়া দিয়া পুনশ্চ কহিল, "তার পর—সঙ্গে আমি!"

মলিন চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ি এইবার লোকালয়ে প্রবেশ করিয়াছে। আওয়াজ শুনিয়া, পাড়ার ছেলে-মেয়েরা রাস্তার ধারে জড় হইল, বউ-ঝিরা পর্য্যন্ত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই বিস্ময়-বিহ্বল নেত্র ওই দিক্‌টায় পড়িতে লাগিল—কে ওই বড়লোক? একটা মোড়ের বাঁকে গাড়ি ঘুরিতে গিয়া গাড়ির গতি মন্দ হইল। সেইখানে কতগুলি লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের ভিতর এক জন বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আমাদের মলিন, না?"

পাশেই আর-এক জন গলা চাপিয়া কহিল, "দূর, সঙ্গে যে মেয়েছেলে!"

মোটর আর-একটু অগ্রসর হইয়া গ্রামের লাইব্রেরী-ঘরের মুখে গিয়া পড়িল। তথায় এক দল মলিনের সমবয়স্ক ছেলে জটলা করিতে-ছিল। মোটর দেখিয়া, তাহারা সকলেই সেই দিকে তাকাইল এবং সঙ্গে-সঙ্গে একটি ছেলে যেন আকস্মিক আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মলিনদা' যে—" বলিয়াই জিব্ কাটিয়া ফেলিল। লজ্জায় পড়িয়া সে আর একটি ছেলের দিকে চাহিয়া কহিল, "আরে! কাকে কি বললাম—সঙ্গে যে 'লেডি'!"

মলিন তাড়াতাড়ি নীচু হইয়া মুখ লুকাইবার চেষ্টা করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝরণারও চক্ষুর্দ্বয় যেন এক আলোকচ্ছটায় দপ্-দপ্ করিয়া উঠিল। সে অত্যধিক আদরে স্বামীর মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া সতেজ কণ্ঠে কহিল, "দায়িত্বটা আমারই একার! নিষ্ঠুর জেরার মুখে যদি দাঁড়াতে হয়, আমিই দাঁড়াবো। মুখ হেঁট্ তোমাকে করতে হবে না।"

মোটর আর-খানিক অগ্রসর হইতেই মলিন ড্রাইভারকে কহিল, "এইখানে দাঁড়াও—"

ঝরণা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—"বাড়ী এলাম?"

"হ্যাঁ।"—কথাটা অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়াই মলিন তাহাদের বাড়ীর দিক্‌টায় তাকাইয়া বিস্ময়ে ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

ঝরণা তাড়া দিল—'নামো।'

"নামি!" অস্ফুট কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করিয়াই মলিন আপন-মনে বলিয়া উঠিল, "এই তো আমাদের বাড়ী! কিন্তু—মন্দির এখানে কোথা থেকে এলো? তার পর—ফুলের বাগান!" ড্রাইভারকে কহিল, "একবার হর্ণ দিলে হতো!"

'মায়ের' সেই পত্র, তার প্রত্যেকটি অক্ষর ঝরণার মনে পড়িয়া গেল।—ভদ্রাসনখানিও হস্তান্তর হইয়াছে। ড্রাইভারকে কহিল, "তাই দাও তো!"

হর্ণের আওয়াজ হইতেই একটি তরুণী বাহির হইয়া আসিল। তাহার মাথায় রাশীকৃত কালো চুল উঁচু করিয়া গোজ বাঁধা, নাকে সরু তিলক-ছাপ, পরনে তসরের থান-কাপড়। মোটরের কাছাকাছি হইয়াই মেয়েটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "মলিনদা'?" বলিয়াই যেন বিব্রত-বিহ্বল দৃষ্টিতে ঝরণার দিকে তাকাইয়া মলিনকে প্রশ্ন করিল—"ইনি?"

মলিন ও ঝরণা তখন উভয়েই মোটর হইতে নামিয়াছে। ঝরণা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি? আমি তোমাদেরই এক জন!" বলিয়াই মেয়েটির হাত ধরিল।

মেয়েটি এতক্ষণ ঝরণাকে ভালো করিয়া দেখে নাই, এইবার যেন একটু চমকিয়া তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিল, দেখিল—মাথায় সিঁদুর! হঠাৎ তাহার মুখখানা ম্লান হইয়া গেল, কিন্তু সে এক পল মাত্র, মুহূর্ত্তেই সে-ভাবটা সামলাইয়া লইয়া জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল, "মলিনদা'র বউ?"

মেয়েটির ওই ভাব-পরিবর্ত্তন ঝরণার লক্ষ্য এড়াইল না। কিন্তু সে-দিকে যেন তাহার দৃষ্টিই পড়ে নাই, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, "না—তোমার বউদি! তুমি—" মলিনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তুমি ওঁর বোন বুঝি?"

"আমি? না—না! উনিও তো জানেন!"—মেয়েটি একবার মলিনের দিকে মুখ তুলিয়াই দ্রুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি এই পাড়ার মেয়ে—ওঁর কেউ নই!" বলিয়াই গলায় জোর দিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঝরণা সেই হাসিতে হাসি মিলাইয়া প্রশ্ন করিল, "তোমার নামটি?" বলিয়াই মলিনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "তুমিও তো জানো—"

মলিন মুখ নামাইল। অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "জানি—সন্ধ্যা।"

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার চোখে যেন এক সহস্র বাতি একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, যেন এক দেবদাসী তাহার চোখের আলোকেই আরতি করিয়া এক পাষাণ-মূর্ত্তিকে চঞ্চল করিয়াছে! থাম্‌কা যেন রাগিয়া উঠিয়া ঝরণাকে বলিয়া উঠিল, "বউদি, তোমরা যেন কী! বাড়ী এসো।"—বলিয়াই অত্যুগ্র অভ্যর্থনায় ঝরণাকে টানিয়া লইয়া গেল।

মলিনের মা আহারান্তে প্রতিদিনকার মত ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া সবে মাত্র একটু অঙ্গ ঢালিয়াছেন। সন্ধ্যা নাচ-দুয়ারে পা দিয়াই, ডাকিয়া উঠিল, "বড়মা—"

বড়মা চমকিয়া উৎকর্ণ হইলেন।

অতঃপর ভিতর-বাড়ীর উঠানে আগাইয়া গিয়া সন্ধ্যা পুনশ্চ ডাক দিল—"বড়মা, শীগ্‌গির—"

বড়মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

"মলিনদা'—"

"এ্যাঁ—"

"মলিন এসেছে—"

বড়মার মুখ দিয়া আর শব্দ নিঃসৃত হইল না। তাঁহাকে দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, তাঁহার অন্তস্তলে এক অপ্রত্যাশিত আনন্দের ঝড় উঠিয়া তাঁহাকে ঘন-ঘন কাঁপাইয়া দিতেছে! যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার হস্তদ্বয় ছড়াইয়া গেল—তাঁহার নন্দ-দুলাল আসিয়াছে, বুকে চাপিয়া ধরিবেন! অতঃপর তেমনিই প্রসারিত হস্তে উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় তাঁহার স্থবির-অপটু দেহটাকে যেন যেন তিনি ধাক্কা মারিতে-মারিতে বাহির করিয়া আনিলেন—

চখের পলক পড়িল না, ঝরণা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

বড়মা চক্ষুর্দ্বয় আকর্ণ-বিস্তৃত করিয়া অপরিসীম বিস্ময় ও সংশয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মা তুমি—তুমি কে?"

"আপনার—"

সন্ধ্যাও কাছে গিয়া ঝরণার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি ঝরণার মুখে হাত-চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, "মলিনদা'র বউ, বড়মা—রাঙা টুকটুকে!"

ধরিত্রীর দিবালোক আর যেন পৃথিবীর অঙ্গে নাই! দেশ-মহাদেশ, অরণ্য-প্রান্তর, লোক-লোকালয় আঁধার করিয়া উহার সবটাই যেন বড়মার জ্যোতিঃহীন নেত্রদ্বয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চোখে পলকও পড়িল না, মুখে কথাও সরিল না—নিঃশব্দে ওই মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে বিহ্বল হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। কতক্ষণ এই ভাবে রহিলেন তাহা তাঁহার হুঁস ছিল না, এক সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঐ মেয়েটিকে তিনি বুকে চাপিয়া ধরিয়া আছেন! তার পর—

তার পর এক হাতে ঝরণার মুখটি তুলিয়া অধীর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার বউ?"

ঝরণা একটি বার মুখ তুলিয়া 'মায়ের' দিকে চাহিল, তার পর তাঁর বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া সাড়া দিল, "মা—"

এক অসহ্য আনন্দ, সেই আনন্দে 'মায়ের' গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে ঝরণার মুখখানা বুক হইতে উঠাইয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সন্ধ্যাকে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, ওরে,—ও সন্ধ্যা! কে এ জানিস্—আমার বউ, আমার বউ—আমার বউমা!"

সন্ধ্যার চোখের উপর একটি আমগাছ, সেই আম গাছে একটি একটি পাখী বসিয়াছিল, এইমাত্র পাখা মেলিয়া উড়িয়া গিয়াছে—সন্ধ্যা সেই দিকেই নির্নিমেষ নেত্রে তাকাইয়া। বড়মা'র কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মাকে ডেকে আনি, বড়মা—"

বড়মা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "আর অমনি নিবারণকে বলিস্—মাছ! আমি রান্না চড়াতে যাচ্ছি—"

সন্ধ্যা আর দাঁড়াইল না। মলিনের মা—তাঁহারও আর তিল-মাত্রও সময় নাই—ছেলে-বউ আসিয়াছে, রান্না চড়াইতে হইবে। ঝরণাকে ঘরে তুলিয়া যেমন তিনি বাহির হইয়া যাইবেন, ঝরণা তাঁহাকে বাধা দিল, দিয়াই কহিল, "না, মা! আজ থেকে হাঁড়ি-হেঁসেল তো আমার!"

মলিনের মা কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, সপ্রশ্ন নেত্রে ঝরণার দিকে তাকাতেই, ঝরণা তৎক্ষণাৎ কহিল, "রান্না-ঘরে আমিই যাবো, মা!"

"তুমি?"

"আপনাদের হাঁড়ি—আমাকে ছুঁতে দেবেন না, বুঝি?"

"ষাট্, ষাট্! তুমি যে আমার মলিনের বউ!"—মলিনের মা চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া ফেলিলেন। তার পর এক পরম তৃপ্তির আলোকে চোখ দু'টি আলোকিত করিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "আজই কি তোমাকে হাঁড়ি ধরতে দিতে পারি মা?"

ঝরণা এক-মুখ হাসিয়া কহিল, "ও! আমি মনে করেছিলাম—আমি কোন্ জাতের মেয়ে কি না—তাই!"

এক মহা-মহিমময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া 'মা' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "মেয়েমানুষের নিজের জাত, বিয়ের পরে আর তার থাকে না মা—স্বামীর জাতেই তার জাত!"

এইরূপ অভিনব বাণী ঝরণা আর কোনোও দিন আর কাহারো কাছে শুনে নাই। অপরিমিত পুলকে সে আত্মহারা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া রাখিয়া পুনশ্চ আর একটি কথা পাড়িল। কহিল, "কিন্তু বিয়ের সময় বাপ মায়ের অনুমতির দরকার, নইলে সে-বিয়ে বাপ-মা না কি স্বীকার করেন না। কিন্তু, আপনার অনুমতি উনি তো নেন্‌নি—"

এক স্নিগ্ধ হাস্যে 'মায়ের' সারা মুখ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কহিলেন, "অনুমতি, তার কাঙাল—মা-বাপ, কখন্ হয়, জানো মা? যখন তাঁদের সন্তান সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে। প্রতিমা নিয়ে যখন ঘরে ঢোকে—তখন নয়।" আর দাঁড়াইলেন না।

* * * *

পরদিন সকাল হইতেই সন্ধ্যা ছোট্ট একটি পুটুলি হাতে করিয়া বড়মা'র কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, কপালে চন্দনের টিপ্। হাসিয়া কহিল, "এইবার আমি ছুটি নিলাম, বড়মা!"

বড়মা তখন ছেলে-বউকে স্বহস্তে চা তৈরী করিয়া দিতে বসিয়াছেন। মলিন চায়ের কাপে সবে চুমুক দিয়াছে, আর ঝরণা কাপ লইয়া আড়ালে সরিয়া যাইতেছে। বড়মা বিস্মিত নেত্রে সন্ধ্যার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "কোথায় চল্‌লি?"

"কাশী—"

বৈশাখী

আশরাফ সিদ্দিকী

এসো এসো রত্নাবতি ! লক্ষ্মীমরি ! বসো পীঁড়ি পেতে।
শ্যামল আঁচল ভরে কি এনেছো ? বিন্নী-শালী ধান…?
হে ধান বরণ কন্যা ! ঘরে এসো। বসো পীঁড়ি পেতে।
আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাও : স্থায়ী হোক বিন্নী-শালী ধান।

যে বধূটি সন্ধ্যা হ'লে দীপ হাতে পাঠায় প্রণাম
যে লোকটি ধান বোনে : বর্ষা-রোদে পায়ে ফেলে ঘাম

মায়ে-ঝিয়ে পিতা-পুত্রে তাহাদেরে করো আশীর্ব্বাদ :
দু:খ মাছে বেঁচে থাক। এসো কন্যা ! বিলাও প্রসাদ।

আরো এক নর আছে। আরো এক নারী আছে হেথা।
তারা সব কু-সন্তান। স্বদেশের জারজ সন্তান !
হে কন্যা ! পাষাণ হও। শালী-ধানে বিষ দিও সেথা !
যে হস্ত কাড়ে ও মারে হোক তার চির অবসান।

ধান হোক আশীর্ব্বাদ। মন-পাখী। হিয়া-নিধুবন।
রাধা হোক হাসি আর বাঁশী হোক শ্যাম-অগ্রহায়ণ।

"কাশী ?"—ঝরণা চমকিয়া উঠিল। এই বাড়ীতে পা দিয়া অবধি তার চোখে সন্ধ্যার মূর্ত্তিটি যেন খাপ-ছাড়া, অস্পষ্ট ঠেকিতেছিল—যে-মাটিতে মেয়েমানুষের জন্ম-মৃত্যু হয়, সে মাটির সঙ্গে যেন তাহার সম্পর্কই নাই। তাহার মূর্ত্তি-লিপিকায় কি যে গোপন অর্থ ছিল তাহা ঝরণা পুন: পুন: চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে পারে নাই। কিন্তু, রাত্রে সন্ধ্যাকে পরিষ্কার করিয়া ধরিয়া দিয়াছিলেন মলিনের-মা। ফলে, সন্ধ্যা এই বাড়ীর যে কতখানি তাহা আর তার বুঝিতে বাকী ছিল না। তাড়াতাড়ি কাপটা নামাইয়া রাখিয়া সন্ধ্যার কাছে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "হঠাৎ ?"

"হঠাৎ নয়, বউদি ! এত দিন তোমারই অপেক্ষায় পড়েছিলাম !"—বলিয়াই সন্ধ্যা কাপড়ের খুঁট খুলিয়া খান-তিনেক টেলিগ্রাম দেখাইল। সেগুলি তাহার গুরুদেবের। কাশীতে মহামারী স্বরু হইয়াছে—প্লেগ ! আর্ত্তের সেবায় গুরুদেবের আশ্রম ব্রতী হইয়াছে—সেবিকার প্রয়োজন, তাই তিনি পুন: পুন: সন্ধ্যাকে ডাক দিয়াছেন।

ঝরণা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "সেখানে প্লেগের ভেতর তোমাকে ছেড়ে দেব আমরা ?"

সন্ধ্যা শুধুই একটু হাসিল, যেন তাহার সমগ্র চেতনা এইক্ষণে আর এক দিকে উন্মুখ—মহামারী, প্লেগ, মৃত্যু !—তাহাদেরই সঙ্গে আজ তার মিতালির দিন ! হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না, বউদি ! গাড়ি দাঁড়িয়ে—"

"মা—" ঝরণা 'মায়ের' দিকে ফিরিয়া কি-এক মস্ত-বড় নালিশ জানাইতে গেল, কিন্তু পারিল না।

মা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "তা' হয় না, বউমা ! আমি ওকে কথা দিয়ে রেখেছি।" অতঃপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি সন্ধ্যার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ঝরণার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কাশীর বিশ্বনাথ, তিনি যদি সত্যি হন্, তা' হলে আমারও এই কথা সত্যি হবে—ও সেখানে বজ্র হয়ে থাকবে।" একটু থামিয়াই পুনশ্চ স্বরু করিলেন, "মানুষের মৃত্যু যার হাতে ভস্ম হয়, তার কি অমঙ্গল হয়, বউমা ? যিনি সৃষ্টির মালিক, তিনি যে তাকে রক্ষে করেন ! সংসারে যে-বস্তু প্রচার করবার জন্যে ভগবান্ মেয়েমানুষকে রচনা করেছেন, সেই বস্তুর শক্তিশেলে সন্ধ্যা তার সর্ব্বহারা জীবনটিকে অক্ষয় কোরে রেখেছে—তার ওপর নিয়তির নিষ্ঠুর হাত কোনো দিনই পড়তে পারে না, মা !"

ঝরণার নেত্রদ্বয় ছল-ছল করিয়া উঠিল। কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আর দু'টো দিন, তাও কি ও থাকতে পারে না, মা ?"

এইবার মা সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন। কহিলেন, "না, মা ! হয়তো এক দিন কথা ছিল—এই ঘরেই ও ঘুরে ফিরে বেড়াবে ! দু'টো দিন নয়—এই ঘরেই ও ঘর করবে চিরটা দিন ! কিন্তু—" হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া উভয়েরই প্রতি এক-একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তার পর সেই দৃষ্টি ঝরণার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া একান্ত সহজ—স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, যা' হবার নয়, তা' কি হয়—হয় না ! এই ঘর, এই ঘরে লক্ষ্মীর বাতি নিয়ে আলো করবে যে মা, তুমি !" বলিয়াই অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ঝরণা এইবার মলিনের দিকে একবার আড়চোখে তাকাইল, দেখিল—সে স্থাণুর ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া। বুঝি বা তাহার মনে এইক্ষণে কত কথাই না উঠিয়াছে। এই ধরিত্রী, এর জন্ম—মানুষের সৃষ্টি—তার প্রথম দিনে, প্রথম লগ্নে তাহারাই ছিল মাত্র দুইটি মানুষ—সে আর সন্ধ্যা ! সেই দিনের সেই প্রতিমাটি, তার আদর, তার শাসন, তার মান-অভিমান, প্রীতি-কলহ, সবই বুঝি আজ তার মনে পড়িয়াছে। সেই একদিন, যেদিন পৃথিবীতে মানুষই ছিল, কিন্তু, মানুষকে দু'মানুষ করিবার আত্মজ্ঞান ছিল না, বিবেক-বুদ্ধি ছিল না, শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না—সেই দিনের সেই দুর্দ্দান্ত স্মৃতি এক-এক করিয়া হয় ত বা আজ এই একান্ত অ-দিনে তার সুস্থির অন্তরে দীপমালার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে ! ঝরণা সন্ধ্যার দিকে আর-একটু সরিয়া আসিল এবং আস্তে-আস্তে তাহার হাত দু'টি চাপিয়া ধরিয়া ধরা-গলায় কহিল, "সত্যিকার তুমি কে, তার পরিচয় আমি পেয়েছি ! তুমি কী, তাও আমার কাছে গোপন নেই ! তুমি নিজেকে অন্ধকার কোরে রাখ্তে চাইলেও, তোমার ভেতরকার জ্যোৎস্না তোমাকে আজ ঠকিয়ে দিলো, বোন !" বলিয়াই সন্ধ্যার আনত মুখটি তুলিয়া ধরিল, ধরিয়াই পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "যেখানেই যাবে, যাও ! কিন্তু, একটা কথা শুনে যেয়ো, ভাই ! হয় তো তুমি এক জনকে এক দিন পেয়েছিলে ! যাঁকে পেয়েছিলে—তিনিই তাঁর প্রকৃত মানুষ ! আর, আমি যাঁকে পেলাম, তিনি সে মানুষ নন—তিনি নিরক্ষর !"

সন্ধ্যা চমকিয়া উঠিয়া ঝরণার দিকে তাকাইল, তার পর মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সমাপ্ত

ভাব-রস ও ভাষাবন্ধে ভারতের প্রিয় কাব্য

শ্রীমহাদেব রায়

করুণায় বিগলিত-হৃদয় বাল্মীকি দৈবী-প্রেরণায় যে ছন্দোবদ্ধ বাণী উচ্চারণ করেন, ব্রহ্মা উহার নাম দেন "শ্লোক"। এই ছন্দোবদ্ধ শ্লোকই হইল রামায়ণের মূল সূত্র। শ্লোকের জন্মদান করিয়া বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় আদি-কবিরূপে পরিচিত হইলেন। ব্রহ্মা কবিকে মহামূল্য আশ্বাস-বাণী দিয়া রামায়ণ রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই বলিয়া তিনি উৎসাহ দান করিলেন যে, যত দিন মহীমণ্ডলে গিরি-নদী প্রবাহিত হইবে, তত দিন সমস্ত লোকে রামায়ণ-কথা প্রচারিত হইবে।

দুঃখের কথা—যে দেশে এই অপূর্ব গ্রন্থের সৃষ্টি হইল, সেই দেশেই আজ ইহার সেরূপ প্রচার নাই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত; কিন্তু কালের ব্যবধানে সেই অতি আত্মীয় সংস্কৃত ভাষা ধীরে ধীরে আমাদের অনাত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, উহা আজ প্রাণহীনের ন্যায় পরিত্যক্ত। তাই সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্য বহু মূল্যবান্ গ্রন্থের মত বাল্মীকি-রামায়ণেরও প্রচার—প্রসার বন্ধ হইয়াছে।

বঙ্গদেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ঘরে ঘরে আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। সামান্য কুটীরবাসী পর্যন্ত ক্ষীণ দীপশিখালোকে নিত্য সন্ধ্যায় এই রামায়ণ পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর হইত। দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘরে ঘরে এই রামায়ণ পাঠ বংশপরম্পরাক্রমে বাঙ্গালীর ঐতিহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সে ঐতিহ্য আজ আর রক্ষা হইতেছে না। সে "ট্র্যাডিশন" আর 'সমানে' চলিতেছে না।

তবে ভারতবর্ষে এখনও একটি রামায়ণের বিপুল প্রচার আছে—উহা ভক্তকবি তুলসীদাসের রামায়ণ। কবি 'মানস' সরোবরের সহিত রাম-চরিতের তুলনা করিয়া রামায়ণখানির নাম রাখেন 'রামচরিত-মানস'। "এই রামায়ণের মত আর একখানা বইও নাই যাহা ভারতবর্ষের এত লোকে পড়ে।" অবশ্য, বঙ্গবাসী আমরা, ইহার মাধুর্য হইতে অনেকেই বঞ্চিত; তাহার প্রধান কারণ, ইহার ভাষার সহিত আমাদের অপরিচয়। কিন্তু বাংলা-হরফে-লেখা হিন্দী ভাষার এই রামায়ণ অনেক বাঙ্গালী পাঠক পড়িয়া পড়িয়া যেন আশা মিটাইতে পারে না, এমনি ইহার মনোহারিত্ব। প্রথম কথা, সহজ ভাষায় ইহার যে "সোরঠা", "দোহা", "চৌপাই", "ছন্দ" প্রভৃতি সুরচিত, উহার মধ্যে যেন একটা মনোহর সুরের মোহ আছে। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনার প্রাক্কালে নিজের ভাষার সুরশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তাহা এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে—

"মানবের ভাষা অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারি ধারে,
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন।"

বলা বাহুল্য, বাল্মীকির প্রথম শ্লোকেই সেই অভূতপূর্ব সুর-শক্তির কথা প্রমাণিত।

'রামচরিত-মানসে'র ভাষায় সঙ্গীতের যে মোহকারী শক্তি, উহা উহার মনোহারিত্বের অন্যতম হেতু। কাব্যের রস বিচারে এ কথা যতই অপ্রধান হোক, কাব্যের কলাকৃতি বিচারে ইহা কখনই উপেক্ষণীয় নহে। তাহা ছাড়া, এই কাব্যের অন্তরের সৌন্দর্য এত বেশী যে, ইহা হিন্দুস্থানের সকল হিন্দীভাষী বা হিন্দী জানা লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। "এমন হিন্দবাদী চাষা নাই যে ইহার দু'-দশটা "চৌপাই" বা "দোহা" না জানে ও প্রয়োজন মত উল্লেখ না করিয়া থাকে। ইহার সম্পর্কে আর একটি বিশেষ কথা এই যে, ইহা যেমন সুপণ্ডিতের সুখপাঠ্য, স্বল্প শিক্ষায়—শিক্ষিতের কাছেও তেমনই। এক শ্রেণীর লেখক আছেন, যাঁহারা লেখেন, বিশেষ শ্রেণীর (classএর) জন্য। আর এক শ্রেণীর লেখক লেখেন, সর্বসাধারণের (massএর) জন্য। কিন্তু একাধারে বিশেষ এবং সাধারণ (class এবং mass) উভয় শ্রেণীর জন্য রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'রামচরিত-মানসে'র জুড়ি নাই।

ভাবাবন্ধ এবং ভাবরসের কি গুণে ইহা এত মধুর,—ভারতের এত প্রিয়, তাহাই এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তুলসীদাস লিখিয়াছেন—

"সরল কবিত কীরতি বিমল সোই আদর হিঁ সুজন।
সহজ বৈর বিসরাই রিপু জো সুনি করহিঁ বখান।"

—বালকাণ্ড

—'যদি বিমল কীর্তিকথা সরল কবিত্বে লিখিত হয়, তবে জ্ঞানবান্ উহার আদর করিবেনই। এমন কি, উহার মাধুর্যে শত্রুও বৈর ভুলিয়া গিয়া উহার প্রশংসা করে।'—তুলসীদাস বিমল কীর্তিকথা সরল কবিত্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাই উহা এত মনোহর।

ইহার সরল কবিত্ব ও বিমল কীর্তিকথার আলোচনায় আমরা ইহার রস-মাধুর্য উপলব্ধি করিব।

কবি সাধারণের ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করিয়া এই রামায়ণকে মনোহর করিয়া তুলেন। যে ভাষার সহিত প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রাণের পরিচয়, যাহার মধ্য দিয়া অন্তরের ভাব সহজে অভিব্যক্ত হয়, সেই ভাষায় তুলসীদাস চতুর্বিধ সম-লয় ছন্দে সমগ্র রামায়ণখানি রচনা করেন।

"ভাষাবন্ধ করব মৈঁ সোঈ
মোরে মন প্রবোধ জেহি হোঈ।"—বালকাণ্ড

—'আমি সাধারণের ভাষায় লিখিব, যাহাতে আমার মনের প্রবোধ হয়।' কত বড় তৃপ্তির আস্বাদন-কামী হইয়া কবি এই ভরসা করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি পূর্বতন প্রাকৃত কবিদের উপরও নির্ভর করিয়াছেন। রামায়ণের আদি-কবি বাল্মীকির বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রাকৃত কবিদের বন্দনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"জে প্রাকৃত কবি পরম সয়ানে।
ভাষা জিন্হ হরি চরিত বখানে।
ভয়ে জে অহহিঁ জে হোইহহিঁ আগে।
প্রণবউঁ সবহিঁ কপট সব ত্যাগে।"

—'যে সব চতুর প্রাম্য কবি গ্রাম্য ভাষায় হরি-চরিত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা পূর্বে ছিলেন, বা পরে হইবেন, তাঁহাদের সকলকে আমি অকপটে প্রণতি নিবেদন করি।'

তার পর, ভাষাবন্ধে-নিবদ্ধ এই কাব্যের সৌন্দর্য বস্তু কি কি, নিম্নের কয়েকটি ছত্রে তাহার আভাস পাই। 'মানস' সরোবরের সহিত রামচরিতের "সাঙ্গ উপমা" প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"ছন্দ সোরঠা সুন্দর দোহা।
সোই বহুরঙ্গ কমল কুল সোহা।
অরথ অনুপ সুভাব সুভাষা।
সোই পরাগ মকরন্দ সুবাসা।"—বালকাণ্ড

—'রামচরিত যথার্থই মানস সরোবরের তুল্য। এই রামচরিত মানসের ছন্দ, সোরঠা ও দোহাগুলি যেন নানা রং-এর পদ্ম। আর, উহার অনুপম অর্থ, সুন্দর ভাব এবং ভাষা যেন সেই পদ্মের পরাগ, মধু এবং সুগন্ধ।'—তুলসীদাসের এই কাব্যের সম্পর্কে এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য—ছত্রে ছত্রে সার্থক।

আলঙ্কারিকেরা কাব্যের যে ধ্বনিকে কাব্যের সৌন্দর্য-মাধুর্যের মাপকাঠি করিয়াছেন, যে বক্রোক্তি কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেই 'ধ্বনি' ও 'বক্রোক্তি' যেন এই মানস সরোবরের মনোহর মীন।

"ধুনি অবরের কবিত গুণ-জাতী।
মীন মনোহর তে বহু ভাঁতী।"—বালকাণ্ড

নানা প্রকারের 'ধ্বনি ও বক্রোক্তি' ইহার নানা প্রকারের মৎস্য-স্বরূপ। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা যখন তুলসীদাসের শুধু উপমালঙ্কারেরই আলোচনা করিব, তখনই দেখিব ইহার কবিত্ব-শক্তি কি অসাধারণ। কাব্যের গতানুগতিক উপমার বস্তু ছাড়াও, গ্রাম্য ঘটনা হইতে তিনি কি ভাবে অতি সুন্দর উপমা আহরণ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অন্তর পুলকিত হইয়া উঠে।

কিন্তু তুলসীদাসের কাব্যের শুধু এইটুকু স্তুতিবাদ বহিরঙ্গ মাত্র! ইহার রসকে যথার্থরূপে গ্রহণ করিতে হইলে, আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।

আমরা জানি, প্রকৃত নায়কের অভাবে কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে মহাকবির ঘোরতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। দশরথের গৃহে অবতীর্ণ ভগবান্ রামচন্দ্রের চরিত-কথায় সে সংশয় দূর হয়। মূল রামায়ণে দেখিতে পাই—বাল্মীকি যে অপগত-সংশয় হইয়া দৃঢ় প্রতীতি সহকারে রামায়ণ রচনা করেন, তাহার মূলে রামচরিত্রের অলৌকিকত্বে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সুগভীর বিশ্বাস। পূর্ণব্রহ্ম যে দৈব কার্য্যের জন্য দশরথের গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গ সকলেই দেব-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাল্মীকি-রামায়ণের এ কথা বিস্মৃত হইলে আমরা প্রথমেই ভুল করিব।

বস্তুতঃ, এই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল না করিয়া, বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্রকে এক জন আদর্শ মানুষ মাত্র প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের অগ্রণী ব্যক্তিরাই গোড়ায় গলদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাল্মীকি রামচন্দ্রের লৌকিক লীলার মধ্যে আদর্শ পুরুষত্বকেই প্রকট করিয়া দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু আদ্যন্ত তাঁহার ভগবত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। অহল্যা-উদ্ধার হইতে সমুদ্র-বন্ধন পর্যন্ত বহু অলৌকিক কর্মেই তাঁহার সেই ঐশ্বরিক পূর্ণতা।

রামচরিতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সম্পর্কে তুলসীদাসের কথা বাল্মীকি হইতেও স্বতন্ত্র। কালিদাস যেমন "পার্বতী-পরমেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণাম জানাইয়া 'রঘুবংশ' রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তুলসীদাসও সেইরূপ ভবানী-শঙ্করকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

"ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্।

—'যে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস ব্যতিরেকে নিজের অন্তরস্থিত অন্তর্যামীকে সিদ্ধেরাও দেখিতে পান না, ভবানী এবং শঙ্কর হইলেন সেই শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস; আমি তাঁহাদের বন্দনা করি।'

রামচরিত-মানসে ভক্তিরসই মুখ্য কথা। রবীন্দ্রনাথ তুলসীদাসের এই ভক্তিরসকে গ্রহণ করিয়াই লিখিয়াছিলেন, "ভগবানের প্রতি প্রেমের রস, অহৈতুকী ভক্তির রস রামচরিত-মানসের মুখ্য উপাদান। অহৈতুকী আনন্দের ভগবান্ রাম। তাঁকে নিয়ে তাই ভক্তকবির অহৈতুকী আনন্দের গান।......আমাদের মানস অহরহঃ প্রতি মুহূর্ত্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সেই খণ্ড খণ্ড প্রয়োজনকে একের ঐক্যের মধ্যে—একের পূর্ণতার অনুভূতির মধ্যে বিলীন করে' দিলে যে আনন্দ-রস, সেই আনন্দ-রসের সন্ধান পাই রাম-চরিত্রে। বিশ্বের বহুর মধ্যে বিচ্ছিন্ন মন বিশ্বের অন্তরতম একের মধ্যে যে তৃপ্তির আস্বাদন লাভ করে, তাতেই তার পরাতৃপ্তি। তখন বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে বিচ্ছিন্ন চৈতন্য একের আনন্দে মগ্ন হয়ে বিশ্বের সঙ্গে এক সুরে বেজে উঠে।"

"অস প্রভু হৃদয় অছত অধিকারী।
সকল জীব জগ দীন দুখারী।"—বালকাণ্ড

এইরূপ বিকাররহিত প্রভু (রামচন্দ্র) হৃদয়ে রহিয়াছেন; অথচ জীব-জগৎ দীন দুঃখী! একবার পার্বতী পরম সন্দেহে শঙ্করকে প্রশ্ন করেন যে, দশরথের পুত্র রাম যদি পূর্ণব্রহ্মই হইয়া থাকেন, তবে তিনি সীতা বিরহে ঐরূপ আকুল হইলেন কিরূপে? শঙ্করের কথায় বিশ্বাস না করিয়া রামচন্দ্রের পরীক্ষাও করেন। ঐ পরীক্ষাতেই কিন্তু তাঁহার সংশয় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। পরম ভক্তিভরে কবি তুলসীদাস এই কথা-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার কৃষ্ণচরিত্রে "পরিত্রাণায় সাধূনাম্"...ইত্যাদির মত 'রামচরিত-মানসে' রাম-চরিত্রের অবতারত্ব পাঠকের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের উদ্রেক করে।

রাম ভগতহিত নরতনুধারী।
সহি সঙ্কট কিয় সাধু সুখারী।"

ভক্তের হিতের জন্য রাম নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ক্লেশ সহ্য করিয়া সাধুদিগকে সুখী করিয়াছিলেন। রঘুপতির এই চরিত্র অপার বলিয়াই তুলসীদাস মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই, প্রকৃত কবিত্বের অধিকারী হইয়াও নিজ শক্তিতে সন্দেহ করিয়া কালিদাসের মত তিনিও বলিয়াছেন—

"কহঁ রঘুপতিকে চরিত অপারা।
কহঁ মতি মোর নিরত সংসারা।"

রঘুপতির অপার চরিত্র কোথায়, আর আমার সংসারে লিপ্ত মন কোথায়? আবার বলিতেছেন—

"করন চহউঁ রঘুপতি গুণ গাহা।
লঘুমতি মোরি চরিত অবগাহা।"

আমি রঘুপতির চরিত্র-গাথা বর্ণনা করিতে চাহিতেছি—কিন্তু আমার বুদ্ধি ক্ষুদ্র, অথচ রঘুপতির চরিত্র অপার। এ যেন ঠিক কালিদাসের "রঘুবংশ" রচনার প্রারম্ভের মত—"ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্প-বিষয়া মতিঃ"…ইত্যাদি।

তথাপি একমাত্র পূর্ণশক্তি রামচন্দ্রের প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তির বলেই তুলসীদাস বলিতেছেন—

"জদপি কবিত রস একউ নাহীঁ।
রামপ্রতাপ প্রগট এহি মাহীঁ॥
সোই ভরোস মোরে মন আবা।
কেহি ন সুসঙ্গ বড়প্পন পাবা॥"
—বালকাণ্ড

রামচন্দ্রের উপর ভক্তির নির্ভরশীলতাতেই তুলসীদাসের অসীম সাহসে 'রামচরিত মানস' রচনা। তাই এই দোহায় বলিতেছেন—কবিত্ব-রস এতটুকুও না থাক, ইহাতে যে রামচন্দ্রের প্রতাপ প্রকটিত হইয়াছে, উহাই আমার মনে কাব্য-রচনায় বড় সাহস দিয়াছে। সুসঙ্গ পাইলে কে না বড় হয়?

সার্থক উপমার প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন—

"ধূমউ তজই সহজ করুআই।
অগরু প্রসঙ্গ সুগন্ধ বসাই॥
ভনিতি ভদেস বস্তু ভলি বরণী
রাম-কথা জগ মঙ্গল-করণী॥"—বালকাণ্ড

ধূমও তাহার সহজ কালো রূপ ত্যাগ করে, যখন অগুরুর সঙ্গ পায়। অগুরুর ধোঁয়ায় সুগন্ধ; উহাতে কালি হয় না। তেমনই আমার ভাষা যত মন্দই হোক, ইহাতে জগতের হিতকর রামকথা বর্ণিত হইতেছে। ইহা ভাল না হইয়া পারে না। সুসঙ্গে বড় হওয়ার এমন সার্থক উপমা যথার্থই দুর্লভ। ইহা হইতেই আমরা "রামচরিত-মানসে"র বিমল কীর্ত্তিকথায় কথঞ্চিৎ সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি। কাব্যের বিস্তৃত আলোচনায় আমরা ইহার যথাযথ সার্থকতা বিস্তৃতি মূলে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস স্বীকার করিব। আপাততঃ "রাম-চরিত-মানসে"র ভক্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মূলে আমরা তুলসীদাসের সরল কবিত্বের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

ভক্তিতত্ত্বের কথা সম্পর্কে লক্ষ্মণ একবার রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন:—

"কহহু সো ভগতি করহু জেহি দায়া॥"—অরণ্যকাণ্ড

যাহা দ্বারা আপনি দয়া করিয়া থাকেন, সেই ভক্তির কথা বলুন।

রামচন্দ্রের অতি-সরল, অতি-স্পষ্ট উত্তর সংক্ষেপতঃ এই যে, ধর্ম হইতে বৈরাগ্য হয়, বৈরাগ্য হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে মোক্ষ হয়; কিন্তু আমার প্রতি ভক্তি করিলে আমি উহাতে বিগলিত হইয়া পড়ি; উহাতে ভক্তের সুখ হয়। ভক্তি কাহারও অধীন নহে; উহা স্বতন্ত্র, অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞান ভক্তিরই অধীন।

"সো সুতন্ত্র অবলম্ব ন আনা।
তেহি আধীন জ্ঞান বিজ্ঞানা॥" —অরণ্যকাণ্ড

আমাদের দেশে সর্বপ্রধান ভক্তি-শাস্ত্র 'শ্রীমদ্ ভাগবতে' নবধা ভক্তির উল্লেখ আছে।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য আর আত্মনিবেদন—এই হইল নবধা ভক্তি।

ভক্তকবি তুলসীদাসও রামচন্দ্রের মুখ দিয়া বলাইলেন—

"শ্রবনাদিক নব ভগতি দৃঢ়াহীঁ।
মমলীলা রতি অতি মন মাহীঁ॥" —অরণ্যকাণ্ড

শ্রবণাদি নবধা ভক্তি দৃঢ় হইলে আমার লীলার প্রতি মনে বিশেষ প্রেম জন্মে।

আরও বিস্তার করিয়া বলিলেন—

"সন্তচরণ পঙ্কজ অতি প্রেমা।
মন ক্রম বচন ভজন দৃঢ়নেমা॥
গুরু পিতু মাতু বন্ধু পতি দেবা।
সব মোহিঁ কহঁ জানই দৃঢ় সেবা॥
মম গুণ গাবত পুলক সরীরা।
গদগদ গিরা নয়ন বহনীরা॥
কাম আদি মদ দম্ভ ন জাকে।
তাত নিরন্তর বস মেঁ তা কে॥
বচন করম মন মোরি গতি ভজন করহি নিষ্কাম।
তিন হ কে হৃদয় কমল মহঁ করউ সদা বিশ্রাম॥"—অরণ্যকাণ্ড

এই ভাবে পদসেবন, কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্তি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন, যে সর্ববিধ প্রকারে নিষ্কাম ভজনা করিয়া কায়মনোবাক্যে আমার শরণ লইয়া থাকে, আমি সর্বদা তাহার হৃদয়-কমলে বিশ্রাম করি।

উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত জ্ঞান-ভক্তি বিচারের কথাই 'রামচরিত-মানসে'র শ্রেষ্ঠ অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সে বিচার অতি বিস্তৃত এবং দার্শনিক তথ্যে পূর্ণ। সেখানে ভক্তির প্রাধান্য সংক্ষেপতঃ এইরূপে স্বীকৃত হইয়াছে—

"সুলভ সুখদ মারগ যহ ভাঈ।
ভগতি মোরি পুরাণ শ্রুতি গাঈ॥
জ্ঞান অগম প্রত্যূহ অনেকা।
সাধন কঠিন ন মন কহঁ টেকা॥
করত কষ্ট বহু পাবই কোউ।
ভগতিহীন মোহি প্রিয় ন সোউ॥ —উত্তরকাণ্ড

আমার প্রতি ভক্তি ইহকাল ও পরকালে সুখ দান করে—বেদ-পুরাণে এই কথাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানের পথ দুর্গম, উহাতে অনেক বিঘ্ন আছে। উহার উপায়গুলি কঠিন, ও উহাতে মনকে স্থির অবলম্বন দিতে পারে না। বহু কষ্ট করিয়া কেহ কেহ ঐ পথে সিদ্ধি লাভ করে। অথচ, ভক্তিমান্ না হইলে আমার প্রিয় হইতে পারে না।

এই ভক্তিতে যাহার অধিকার, 'রামচরিত-মানসে' শুধু তাহাকেই ভাগ্যবান্ বলা হইয়াছে। তুলসীদাস রামচরণে পূর্ণ অনুরাগের অধিকারী চরিত্রকেই ভাগ্যবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বালকাণ্ডে অহল্যা যখন উদ্ধার লাভ করে, তখন তাহার ভাগ্যবর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

"অতি প্রেম অধীরা পুলক সরীরা মুখ নহিঁ আবই বচন কহী।
অতিসয় বড় ভাগী চরণন্‌হি লাগী জুগল নয়ন জলধার বহী।"
—বালকাণ্ড

অহল্যা ভক্তিতে অধীর হইয়াছে, শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছে, মুখে কথা সরিতেছে না। বড় ভাগ্যবতী অহল্যা—সে রামের চরণে পড়িয়া গেল—দুই চক্ষুতে তাহার অজস্র জলধারা বহিতে লাগিল।

বিভীষণ রামের চরণে আশ্রয়ের আশায় বলিতেছে—

"জে পদ জনক-সুতা উর লায়ে।
কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধর ধায়ে।
হর উর সর সরোজ পদ জেঈ।
অহো ভাগ্য মৈঁ দেখিহউঁ তেঈ।"—সুন্দরকাণ্ড

যে চরণ সীতার হৃদয়ে রহিয়াছে, যে চরণ কপট হরিণের সঙ্গ লইয়াছিল, যে পদ শঙ্করের হৃদয়ে পদ্ম ফুলের মত, আমি আজ সেই পদ দর্শন করিব। কী ভাগ্য আমার!

আবার বলিতেছেন—

"বড় ভাগী অঙ্গদ হনুমানা।
চরণকমল চাপত বিধি নানা।"—লঙ্কাকাণ্ড

অঙ্গদ ও হনুমানের বড় ভাগ্য, তাহারা নানা প্রকারে প্রভুর পদসেবা করিতেছিল।

"ভাগ্য" "ভাগ্যবান্‌" প্রভৃতি শব্দ এই ভাবে সপ্তকাণ্ডেই ভক্তির অধিকারীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আবার, এই ভক্তির অধিকারে ভক্তকবি সজ্জনের সঙ্গই সমধিক ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বরানুভূতিই তুলসীদাসের মত কবির সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা। সৎসঙ্গের প্রভাব যে এই ঈশ্বরানুভূতিতে পরম সহায়, 'রামচরিত-মানসে' তাহার ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়।

"বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হোঈ।
রাম-কৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ।"—বালকাণ্ড

সৎসঙ্গ ভিন্ন বিবেক জন্মে না, আবার সৎসঙ্গ করিতে হইলেই রামের কৃপারও একান্ত প্রয়োজন। কবির এই ভগবৎ-প্রীতি ভগবানে এই নির্ভরশীলতা যতখানি, তাহার পরিচয় কাব্যের যত্র-তত্র। ভগবদ্‌-ভক্তির সাধনে সাধু-চিত্ত যে কতখানি সহায়, আমাদের দেশের বৈষ্ণবশাস্ত্রেও তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্‌ভাগবত ও সংকলন-সার চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ করা চলে। ভক্তকবি ব্যাস মহতের লক্ষণ সম্পর্কে শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিয়াছেন—"মহান্তস্তে সমচিত্তা প্রশান্তা···যাবদর্থাশ্চ লোকে"—৫।৫।২ (ভাগবত)। অন্য বৈষ্ণব কবিও একই কথা বলিয়াছেন।

ভক্ত-কবি তুলসীদাস ঐ কথাই অনুপম উপমা দিয়া বলিতেছেন:—

"বন্দউ সন্ত সমানচিত হিত অনহিত নহিঁ কোউ।
অঞ্জলি-গত সুভ সুমন জিমি সমন্ত সগন্ধ কর দোউ।"
বালকাণ্ড—

সমচিত্ত সাধুগণের বন্দনা করি। অঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইলে উহা যেমন দক্ষিণ ও বাম দুই হস্তকেই সমান সুগন্ধ দান করে, সাধুজনও তেমনই শত্রু-মিত্র উভয়েরই সমান হিতসাধনা করেন।

প্রকৃত পক্ষে, এ জাতীয় উপমা অন্য কাব্যে বিরল। অতি সাধারণ ঘটনা হইতে আহৃত তুলসীদাসের অনুপম উপমার বিশ্লেষণ সবিস্তারে আলোচনা-সাপেক্ষ। আমরা এ ক্ষেত্রে শুধু দিগ্‌দর্শন করিতেছি মাত্র।

এখন সাধু ও অসাধুর ভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে তুলসীদাসের কবিত্ব-শক্তির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। ভরত রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে রঘুরাজ, সাধুদের মহিমা বেদে-পুরাণে নানা ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, আপনি সাধু ও অসাধুর ভেদ বুঝাইয়া বলুন।

রামচন্দ্র-বর্ণিত বহু বিস্তৃত প্রকরণের সার কথা এইরূপ

"নিন্দা অস্তুতি উভয় সম মমতা মম পদকঞ্জ।
তে সজ্জন মম প্রাণ-প্রিয় গুণমন্দির সুখ-পুঞ্জ।"

যাহাদের নিন্দা ও স্তুতি দুই-ই সমান আমার চরণ-কমলে যাহাদের মমতা, সেই সজ্জনেরাই আমার প্রিয়—তাহারা গুণ ও সুখের আকর।

পূর্বকথিত ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যানে এবং এখানে সজ্জনের লক্ষণ বর্ণনায় 'রাম-চরিত-মানসে গীতা-ধর্মের সার কথার ঐকান্তিক সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। উহা ভাষাবন্ধে, রচিত হইয়া সর্বজনের হৃদয়গ্রাহ্য এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাস উৎপাদনে পরম অনুকূল হইয়াছে। তুলনামূলে অসজ্জনের বর্ণনায় অতুলনীয় উপমাছলে তুলসীদাস বলিতেছেন—

"খলন্হ হৃদয় অতি তাপ বিসেষী।
জরহিঁ সদা পর সম্পতি দেখী।
জহঁ কহুঁ নিন্দা সুনহিঁ পরাঈ।
হরষহিঁ মনহুঁ পরী নিধি পাঈ।"—উত্তরকাণ্ড

অসজ্জনের হৃদয়ে সর্বদাই ভয়ঙ্কর জ্বালা—পরের শ্রী-সম্পদ্‌ দেখিলেই তাহারা জ্বলিয়া মরে। আর, পরের নিন্দা শুনিলে তাহাদের বড় আনন্দ—যেন কত পড়িয়া-পাওয়া ধন পাইয়া গিয়াছে। উপমায় রস-বস্তু লৌকিক হইতে অলৌকিক রসতত্ত্বে পৌঁছিয়া কাব্যেরও যেমন উৎকর্ষ খ্যাপনা করিতেছে, খলদের স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রতি পাঠকের তেমনই বিরাগও জন্মাইতেছে।

কবি আবার বলিয়াছেন—

"কাহু কৈ জেইঁ সুনহিঁ বড়াঈ।
স্বাস লেহিঁ জনু জুড়ী আঈ।"—উত্তরকাণ্ড

কাহারও সুখ্যাতির কথা শুনিলে এমন দীর্ঘশ্বাস লয় যেন কম্পজ্বর আসিয়াছে।

কাব্যারম্ভে সজ্জনের বন্দনার সঙ্গে অসজ্জনের বন্দনা করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"বহুরি বন্দি খলগণ সতি ভায়ে।
জে বিনু কাজ দাহিনেহু বায়ে।
পরহিত—হানি লাভ জিন কেরে।
উজরে হরষ বিষাদ বসেরে।"—বালকাণ্ড

—আমি সত্য ভাবে খলেরও বন্দনা করি। তাহারা বিনা কাজে আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরের ভালোতে বাধা দিতে

পারিলেই তাহাদের আনন্দ। কেহ উজাড় হইয়া গেলে বড় হর্ষ, আর কেহ যদি বসতি স্থাপনা করে, তবে বড় দুঃখ।

"পর অকাজ লগি তনু পরিহরহীঁ।
জিমি হিম উপল কৃষী দল গরহীঁ"।—বালকাণ্ড

—দুষ্টেরা পরের অনিষ্টের জন্ত প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। তুলনা দিয়া বলিতেছেন—ঠিক যেন তুষার-প্রস্তর (শিলা)। তুষার শিলা পড়িয়া গলিয়া যায়—নিজের দেহ পাত করিয়া দেয়, তবু শস্য নাশ করিয়া আনন্দ পায়।

ফলতঃ, আত্মভাবাবন্ধে, ভাবমাধুর্যে, রস-বিস্তারে তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' অতুলনীয়। এই কাব্য যে ভারতের এত প্রিয়, তাহার মূল কারণ সেই মহাসত্য, যাহাকে ভারত চিরদিন মনে-প্রাণে আচরণীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয়েরা অধ্যাত্ম তত্ত্বকেই চিরদিন বড় করিয়া দেখিয়াছে, পার্থিব ঐশ্বর্যকে বড় করিয়া দেখে নাই। ত্যাগে যে সুখ তাহারা পাইয়াছে, ভোগে তাহাদের সে কামনা চরিতার্থ হয় নাই। আহারে-বিহারে তাহারা অন্তরের দেবতার নির্দেশ চাহিয়াছে, অন্তর্যামীর পূজারূপেই লৌকিক কার্য পর্যন্ত সম্পাদন করিয়াছে। তাই লৌকিকতার মধ্যেও ভারতের অলৌকিকতা দেশ-দেশান্তরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাল্মীকি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবির সাহিত্যে তাই দেখি, অন্তর্মুখী ধর্মের—ঈশ্বরমুখী প্রবৃত্তির সরস অনুশীলন। তুলসী-কৃত রামায়ণ বিশেষ করিয়া ভক্তিতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে, সরল কবিত্বে-কীর্তিতে বিমল কীর্তি-কথায় ভারতের এত প্রিয় হইয়াছে।

এই যে বিশিষ্ট গুণে ইহা ভারতীয়ের নিকট পরম সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ বহু কবির উক্তির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। অন্ত কথা কি, রহিম, রস খান্, ইয়ারি শাহ, খুসরু, দরিয়া শাহ, তাজ, শেখ, নজির, কারে খাঁ, করিম বক্স, ইনশা, ওয়াজিদ, বুল্লে শাহ, আদিল, মকসুদ, মৌজদিন, ওয়াহিদ, দরবেশ, আদম, খালিশ, ওয়াজন, লতিফ হোসেন, এক রঙ্গ, আলম শাহ, নকিশ খলিলি, সৈয়দ কাশিম আলি প্রভৃতি অসংখ্য মুসলমান কবি একমুখে এই কাব্যের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কবি রহিমের একটি কথার উল্লেখ করিতে পারি—

"মানস তুলসীদাস কৃত সন্তন জীবন-প্রাণ।
হিন্দুয়ান কো বেদ সম মুসলিম প্রগট কুরান।"

তুলসীদাস রচিত 'মানস' সাধুগণের জীবনের জীবন। ইহা হিন্দুদের নিকট বেদের সমান, মুসলমানগণের নিকট প্রকাশিত কোরান-স্বরূপ।

—শান্তা মজুমদার

অনুপ গুপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

(সেই দৃশ্য। প্রতিমা একটা এমব্রয়ডারির কাজ করতে করতে গান গাইছেন)

গান

ভাঙা সভায় আমায় কি গো গাইতে হবে গান।
নিতে হবে হাট-কুড়ানো অবহেলার দান॥
কেউ বা পেল বিজয়-মালা,
কেউ লভিল বরণ-ডালা,
আমার তরে রইল পড়ে কেবল অপমান॥
শ্রোতারা সব একে একে গেল নিজের কাজে।
একা আমি রইনু বসে স্তব্ধ নীরব সাঁঝে॥
কান্না আমার সুরের রূপে,
বাহির হলো চুপে চুপে,
সফল হবে পেলে তোমার চরণ-তলে স্থান॥

(গানের মধ্যে নিঃশব্দে রজনীমোহনের প্রবেশ, হাতে একটা মোড়ক)

রজনী। চমৎকার, কিন্তু এমন দুঃখের গান কেন?

প্রতিমা। দুঃখের বুঝি, কই লক্ষ্য করিনি ত'। একলা বসেছিলুম হঠাৎ গানটা মনে পড়ল, গাইলুম।

রজনী। আমারও ভাগ্য ভাল, ঠিক সেই সময়ই এসে পড়লুম, তাই শুনতে পেলুম।

প্রতিমা। আপনার হাতে ওটা কি?

রজনী। বিশেষ কিছু না, তোমার জন্য কয়েকটা জিনিস কিনে এনেছি।

(মোড়ক খুলে শাড়ী, ব্লাউস, জুতো বার করলেন)

প্রতিমা। এ সব কি হবে?

রজনী। তুমি পরবে।

প্রতিমা। অনর্থক পয়সা নষ্ট করার কোন প্রয়োজন ছিল না, আমি ত ও-সব পরি না।

রজনী। কেন পরবে না! প্রতিমা, তুমি দেখতে সুন্দরী কিন্তু নিজেকে এমন প্লেন লুকিং দেখাবার চেষ্টা করো কেন?

প্রতিমা। সুন্দরী!

রজনী। হ্যাঁ, তুমি কি তা জান না?

প্রতিমা। সুন্দরী হয় ত এক দিন ছিলুম, কিন্তু আজ আর নেই।

রজনী। আমার চোখে তুমি চির-সুন্দর।

প্রতিমা। দেহের সৌন্দর্য্য কোনও দিন জগতের কোনও কাজে লাগেনি। শুধু সর্ব্বনাশ আর অশান্তির কারণ ঘটেছে। (তাচ্ছিল্যভরে কাপড়-জামার দিকে দেখিয়ে) এগুলো কখন্ পরতে হবে?

রজনী। যখন বাইরে-টাইরে যাবে।

প্রতিমা। কেন লোককে রূপ দেখাবার জন্য?

রজনী। (অপ্রস্তুত হয়ে) না, না, তা নয়। সকলেই ত বাইরে বার হবার সময় একটু সেজে-গুজে বার হয়।

প্রতিমা। কিন্তু এই শাড়ী, ব্লাউস, জুতো—

রজনী। সব মেয়েরাই এই রকম পরে থাকে।

প্রতিমা। তার কারণ, তারা কেবল অঙ্গকে আচ্ছাদিত করতে চায় না, আকর্ষণ করতে চায়। যৌন অভিব্যক্তির এও একটা অঙ্গ, আমরা যে জীবন যাপন করব মনস্থ করেছি, তাতে এ অংশটাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করতে হবে।

রজনী। কি কথা থেকে তুমি কি কথা এনে হাজির করলে, আমি যদি রুক্ষ-মাথায় একমুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে, ছেঁড়া কাপড়-জামা পরে তোমার সামনে এসে হাজির হই, তোমার খুব ভাল লাগে?

প্রতিমা। আজ তিন মাস পরে হঠাৎ এ কথা কেন? আমি গোড়ার দিন থেকে যে রকম ছিলুম তেমনিই আছি। তবে এখন যদি আপনার কাছে দৃষ্টিকটু হয়ে থাকি—

রজনী। দৃষ্টিকটু! কি বলছ প্রতিমা, অমন করে আমার মনে কষ্ট দিও না। আমি শুধু বলছিলুম, একটু ভাল ভাবে বেশ-ভূষা করলে—

প্রতিমা। আমার বেশ-ভূষা কি আপনার কাছে অভদ্রজনোচিত মনে হয়?

রজনী। না, না, আমি ত' তা বলিনি, আমার ইচ্ছে হয় যে তোমাকে সাজাতে। তবে তোমার যদি আপত্তি থাকে—

প্রতিমা। আপত্তি একটু আছে। কারণ আপনাকে আগেই বলেছি, তবে যদি জোর করেন—

রজনী। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজে তোমায় জোর করব, আমাকে এতটা হীন ভেব না। মানুষের সব ইচ্ছাই ত সব সময় পূর্ণ হয় না। (একটু থেমে) আমার কালকের লেখাটা কপি করেছ?

প্রতিমা। কাল রাত্রেই করেছি, দিচ্ছি। (দেরাজ থেকে লেখা বার করে দিলেন)

রজনী। (লেখা দেখে) সুন্দর তোমার হাতের লেখা। আমার এ প্রবন্ধটা তোমার কি রকম লাগল?

প্রতিমা। ভাল। সুস্থ, সবল চিন্তাশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

রজনী। আমি এটাকে পোষ্ট করে দিয়ে আসি, তা না হলে আজ আর যাবে না। তুমি এখন বেরুবে না কি?

প্রতিমা। না, সেই বিকেলে একেবারে বেরুব।

রজনী। সকালে অকল্যাণ্ড রোডে বেড়াতে বেড়াতে এক জনের সঙ্গে আমার এই প্রবন্ধটার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলুম। তিনি কয়েকটা কথার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

প্রতিমা। কে? স্যর হরপ্রসাদ?

রজনী। হ্যাঁ, মানে রাস্তায় দেখা হল—

প্রতিমা। তাঁর প্রতি আপনার বিরক্ত ভাব যেন একটু কমে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

রজনী। তিনি আমার মেসো হ'ন।

প্রতিমা। (আড়ষ্ট ভাবে) জানি।

রজনী। মানে তিনি মজলিসি লোক, বেশ গল্প করতে পারেন— যদিও আমার তাঁকে খুব ভাল লাগে না। আচ্ছা আমি চলি,

নইলে আবার আজকের ডাক মিস্ করতে হবে। এগুলো তোমার ঘরে রেখে দিচ্ছি।

(একটু ইতস্ততঃ করে কাপড়ের মোড়ক নিয়ে রজনীর প্রস্থান। প্রতিমা সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অপর দিকের দরজায় খট-খট ধ্বনি)

প্রতিমা। (চমক ভেঙ্গে) কে?

তপতী। (নেপথ্যে) আমি তপতী।

(তপতীর প্রবেশ)

প্রতিমা। তপতি! তুমি!

তপতী। হ্যাঁ। খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছ, না?

প্রতিমা। তা একটু হয়েছি বই কি। রাস্তায় পাছে আমার সঙ্গে চোখাচোখী হয়ে পড়ে, তাই তুমি বলতে গেলে চৌরাস্তায় বেড়ানই ছেড়ে দিয়েছ—

তপতী। না, না, তা নয়। শরীর খারাপ বলে ক'দিন বাড়ী থেকে বেরোইনি।

প্রতিমা। আমার বাড়ীতে এসেছ তা কি তোমার দাদা জানেন?

তপতী। না। লুকিয়ে এসেছি। তিনি জানেন আমি শিব-মন্দিরে গেছি।

প্রতিমা। এটা কিন্তু ঠিক হয়নি তপতি!

তপতী। তা জানি। কিন্তু আজ আর আমি না এসে থাকতে পারলুম না। আমরা কাল দেশে ফিরে যাচ্ছি।

প্রতিমা। যাবার আগে যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, সে জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

তপতী। এ ক'দিন আমার যে কি কষ্টে কেটেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারিনি।

প্রতিমা। আমার জন্য তোমায় যে মানসিক অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে সেজন্য আমি দুঃখিত।

তপতী। (নিজের মনে বলে চলেছেন) তোমার জীবন-কাহিনীর অতীত এবং বর্ত্তমান আমায় স্তম্ভিত করে দিয়েছে। তোমার প্রতি আমার মধ্যে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি—

প্রতিমা। তোমার বোধ হয় আবার রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। ডাক্তার সরকারের সেই ঘুমের ওষুধটা আবার কিছু দিন খাও।

তপতী। আমার দাদার একটা কার্ড এনেছি। (কার্ড বার করে) এতে আমাদের ঠিকানা আছে। মধ্যে মধ্যে চিঠি-পত্তর দিতে তো কোন দোষ নেই?

প্রতিমা। (কার্ড না নিয়ে) আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের চিঠি লেখালেখি না করাই ভাল।

তপতী। (বিষণ্ণ ভাবে) বেশ।

প্রতিমা। (কাতর স্বরে) তুমি কি বুঝতে পার না তপতী, এর ফল কোন পক্ষেই শুভ হবে না। তুমি অল্পতেই ভেঙ্গে পড়। করুণায়, সহানুভূতিতে চোখে জল এসে পড়ে। আমার মত স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখলে তোমায় অনেক উৎপীড়ন, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। সে শক্তি তোমার নেই। তার চেয়ে তুমি আমায় ভুলে যাও। এ অভাগিনীর কথা যদি কখনও মনে হয়, গোপনে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল।

তপতী। আমি তোমায় কোন দিন ভুলতে পারব না প্রতিমা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

(তপতী উঠে দাঁড়ালেন)

প্রতিমা। তপতি! (উঠে গিয়ে তপতীর হাত ধরে) তুমি কি মায়া জান? আমার মত পাষাণীর বুকে বাজে তোমার জন্য বিরহ শোক, চোখে ভরে আসে জল। আমি বড় একা তপতী— এ সংসারে একেবারে নিঃস্ব, একেবারে একা! কার সঙ্গে কথা কইব? কে আমার অন্তরের বেদনা বুঝবে? তুমি চলে গেলে আমার মনের কথা—হৃদয়ের ব্যথা কারো কাছে বলে লাঘব করব, এমন লোক আর নেই। একটা কথা তোমায় বলব মনে করছি।

তপতী। বল, কি বলবে?

প্রতিমা। এই দার্জ্জিলিং-এ এমন একটি লোক আছে, যে আমায় ভয়ানক যন্ত্রণা দিচ্ছে, যার ভয়ে আমি কাঁটা।

তপতী। তোমায় যন্ত্রণা দিচ্ছে? কেন?

প্রতিমা। সে চেষ্টা করছে আমাদের পৃথক্ করে দিতে।

তপতী। তোমাকে আর রজনী বাবুকে?

প্রতিমা। হ্যাঁ।

তপতী। তোমার কি মনে হয়, সে পারবে?

প্রতিমা। অসম্ভব।

তপতী। তবে ভয় পাচ্ছ কেন?

প্রতিমা। ভয় ঠিক পাচ্ছি না, তবু যেন মনে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।

তপতী। তোমার সঙ্গে সে লোকটির দেখা হয়েছে?

প্রতিমা। না, তবে শীগ গিরই দেখা করব মনে করেছি।

তপতী। সে লোকটি কে?

প্রতিমা। স্যার হরপ্রসাদ গুপ্ত—ওঁর মেসো।

তপতী। তাঁর ন্যায্য অধিকার আছে।

প্রতিমা। তা হয়ত আছে। অবশ্য যদি ধরা যায় যে কেবল সম্পর্ক থাকলেই অধিকার জন্মায়।

তপতী। ধর, যদি তিনি রজনী বাবুকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন?

প্রতিমা। (ভীত ভাবে) তুমি কি বলছ তপতি?

তপতী। তাও ত সম্ভব।

প্রতিমা। না না, তা কখনও হতে পারে না।

তপতী। কেন হতে পারে না?

প্রতিমা। হতে হয়ত পারে। তপতী, তোমায় বিশ্বাস করে মনের একটা গোপন কথা বলতে পারি কি?

তপতী। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার না?

প্রতিমা। পারি। দেখ তপতী, এই লোকটি আসার পর থেকে আমার মনে এক-এক সময় ভয় হয় যে হয়ত এমন এক দিন আসবে যেদিন আমাকে আর রজনী বাবুর প্রয়োজন হবে না।

তপতী। তুমি ত সে জন্য প্রস্তুত আছ, তুমিই আমায় বলেছিলে তোমাদের মধ্যে বন্ধন সমাজের নয়, মনের। সেখানে বাধ্যতা-মূলক কিছু নেই, যেদিন তোমাদের মনে হবে যে, সে বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে, প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে, সেই দিনই তোমরা উভয় উভয়কে মুক্তি দেবে।

প্রতিমা। হ্যাঁ, সেই কথাই ছিল বটে। তবু মনের মধ্যে একটা হীন ভীতির সঞ্চার হচ্ছে।

তপতী। কিসের ভয়?

প্রতিমা। ভয় হচ্ছে, বুঝি বা আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। বুঝি বা শেষ অবধি রজনী বাবুর জন্ত আমার এই ভালবাসা সাধারণ নারীর মত অসহায় আত্ম-নিবেদনে পরিণত হবে।

তপতী। ও!

প্রতিমা। ভয় হচ্ছে, যখন সত্যিকারের মুক্তি দেবার মুহূর্ত্ত উপস্থিত হবে, তখন হয়ত তাকে ছেড়ে চলে যেতে মন চাইবে না। উঃ, কি ভীষণ অবনতি! (দুই হাতে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলেন)

তপতী। এমন যে হবে তা আমি আগেই আশঙ্কা করেছিলুম। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হলে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

প্রতিমা। তুমি আশীর্ব্বাদ করো বোন, যেন সে শক্তি আমার থাকে।

তপতী। শ্রীভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন তোমার নিজেকে জয় করবার শক্তি তিনি তোমায় দেন। আমি আজ তবে চলি।

[প্রস্থানোদ্যত।

প্রতিমা। (উঠে দাঁড়িয়ে) তপতী একটু দাঁড়াও।

(প্রতিমা তপতীর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন, তপতী তাঁকে তুলে বুকে টেনে নিলেন)

তপতী। এ কি প্রতিমা?

প্রতিমা। আমি শুধু কথার জাল বুনে নিজেকে ঠকিয়েছি, সকলকে ঠকাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার মুখের কথার যে জোর ছিল, মনের ত' তা নেই। আমি যখন চোরা-বালিতে পা দিয়ে ডুবে যাচ্ছি, সেই সময়ে তুমি এসে আমার হাত ধরে টেনে তুললে। তুমি আমায় ঘৃণা করলে না আশীর্ব্বাদ করলে।

তপতী। আমার ঠিকানাটা তোমার কাছে রেখে দাও, যদি কখনও দরকার মনে করো আমাকে জানাতে কুণ্ঠিতা হয়ো না। সমস্ত জগৎ তোমার প্রতি বিমুখ হলেও আমার হৃদয়-দ্বার তোমার জন্ত চিরকাল উন্মুক্ত থাকবে। ঠিকানাটা দেব?

প্রতিমা। তোমার ঠিকানা ত আমি লিখে নিয়েছি।

তপতী। কোথায়?

প্রতিমা। আমার হৃদয়ে।

(সুরেনের প্রবেশ)

সুরেন। স্যার হরপ্রসাদ গুপ্ত এসেছেন।

তপতী। আমি তাহলে যাই।

প্রতিমা। মনে রেখ, তুমিই শেষ আশ্রয়-স্থল।

তপতী। সে কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

[তপতীর প্রস্থান।

প্রতিমা। সুরেন, স্যার হরপ্রসাদকে এইখানে পাঠিয়ে দাও।

(সুরেনের প্রস্থান। প্রতিমা একটা এমব্রয়ডারির কাজ হাতে নিয়ে বসলেন। একটু পরে স্যার হরপ্রসাদ গুপ্ত ঘরে ঢুকলেন)

হরপ্রসাদ। নমস্কার মিসেস দাস।

প্রতিমা। (উঠে দাঁড়িয়ে) নমস্কার। বসুন।

হরপ্রসাদ। (বসে) ধন্তবাদ। আমার পায়ে একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছিল—

প্রতিমা। আপনার খুঁড়িয়ে হাঁটা আমি লক্ষ্য করেছি।

হরপ্রসাদ। সেই জন্ত বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। আপনিও বসুন।

প্রতিমা। (বসে) আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন সেন্টিমেন্ট না থাকলেই ভাল হয়।

হরপ্রসাদ। আমার অতি-বড় শত্রুও আমাকে সেন্টিমেন্টাল অপবাদ দিতে পারে না। আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন জানতে পারলে—

প্রতিমা। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত বার বার চিঠি পাঠিয়েছিলেন—

হরপ্রসাদ। যদি সহজে গণ্ডগোলটা মিটিয়ে ফেলা যায় এই উদ্দেশ্যে—

প্রতিমা। জীবন সম্বন্ধে আপনাদের ভীউ খুবই সঙ্কীর্ণ।

হরপ্রসাদ। আমার ভীউ?

প্রতিমা। গাড়ি, বাড়ী, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, পার্টিতে যাওয়া-আসার সংখ্যা নিয়ে আপনারা মানুষের মূল্য নির্ণয় করেন—

হরপ্রসাদ। সে জন্ত কখন পস্তাতে হয়নি। আমার কোন প্রবলেমের মীমাংসার উপায়—

প্রতিমা। ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শ্লেষ করা।

হরপ্রসাদ। মিসেস্ দাস, পৃথিবীতে এমন ক'জন মানুষ আছে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিরুদ্ধে টিঁকে থাকতে পারে, যদি সেই ঠাট্টায় বিলক্ষণ বিষ থাকে।

প্রতিমা। আপনি যে সমাজে বসবাস করেন হয়ত সে সমাজে নেই। কিন্তু আমি সে সমাজের জীব নয়। আমার এবং রজনী বাবুর মধ্যে যে বন্ধুত্ব—

হরপ্রসাদ। বন্ধুত্ব!

প্রতিমা। সীরিয়াস স্থির-প্রকৃতি নর-নারীর মধ্যে—

হরপ্রসাদ। হাঃ হাঃ, সীরিয়াস নারী—আমাকে হাসালেন দেখছি।

প্রতিমা। আপনার ও ব্রহ্মাস্ত্র আমাকে বিঁধতে পারবে না। মনে রাখবেন এরিষ্টোক্র্যাট মহিলাদের মত আমি ননীতে গড়া নয়। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমাকে আপনার মত অনেক লোকের বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। তাতে যখন ভেঙ্গে পড়িনি—

হরপ্রসাদ। আপনার চমৎকার কথা বলার ভঙ্গী। আপনি প্রথম থেকেই ধরে নিচ্ছেন কেন যে আমি আপনার বিপক্ষে। "ফেয়ার সেক্স"এর সঙ্গে আমি কখনও বিবাদ করি না।

প্রতিমা। তা জানি, তাদের প্রতি আপনার মনোভাব একটু বেশী পায়ে-পড়া।

হরপ্রসাদ। আমার মনস্তত্ত্বও দেখছি আপনার চাটি করা আছে। আমার ময়্যালস্ সম্বন্ধে আপনার ধারণা বিশেষ উচ্চ নয় বলে মনে হচ্ছে।

প্রতিমা। সহজ কথায় তাই দাঁড়ায় বটে।

হরপ্রসাদ। আপনি ত এক সময় দেশের এক জন কর্ম্মী ছিলেন। জনগণ, লাল পতাকা, ধনীদের বিরুদ্ধে অভিযান এই সব নিয়ে

ছিল আপনাদের কারবার। আমার জীবন সম্বন্ধে আপনাদের কিরূপ ধারণা, একটু জানালে সুখী হব।

প্রতিমা। (একটু সরে গিয়ে) ক্ষমা করবেন। আপনি আমার অতিথি।

হরপ্রসাদ। (উঠে দাঁড়িয়ে) প্লীজ, কেয়ার ক্রীটিসিজম বই ত নয়, ভবিষ্যৎ জীবনে আমার অনেক কাজে লাগতে পারে। বলুন না শুনি।

প্রতিমা। আমি বলতে পারব না।

হরপ্রসাদ। ঐ দেখুন, আমাদের ডিসকাসানের মধ্যে সেন্টিমেণ্ট এনে ফেলছেন। মেয়েদের ও একটা স্বভাব।

প্রতিমা। অপ্রিয় সত্য শোনবার জন্ম যখন আপনি এত উৎসুক, তখন আমার আপত্তি করার কোনও প্রয়োজন দেখি না। স্কুলে আপনার ভাল ছেলে বলে খ্যাতি ছিল। কিন্তু সেই বয়সেই হেড মাষ্টারের বাড়ীতে পড়তে যাওয়ার ছুতা করে ঘন ঘন যাওয়া-আসা—অধিক বলবার প্রয়োজন দেখি না। আপনি বড়লোকের ছেলে, দোষ আপনার হলো না, গরীব হেড-মাষ্টারকে চাকরী ছাড়তে হলো। তার পর কলেজে পড়বার সময় মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়, মেয়েমানুষ—মোট কথা এমন কোনও ব্যসন ছিল না, যাতে আপনি গা ঢেলে দেননি। ফলে আপনাকে অতি শীঘ্রই কলেজের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়েছিল।

হরপ্রসাদ। বা, কি পরিষ্কার আপনার বর্ণনা করার ক্ষমতা। বই লিখুন, হু-হু করে কাটতি হবে।

প্রতিমা। আর কিছু শুনতে চান?

হরপ্রসাদ। বলুন না, বেশ লাগছে।

প্রতিমা। আপনার বাবা মারা গেলেন, তখন আপনার বাজারে বিস্তর দেনা। ঘর সামলাবার জন্তে আপনি রজনী বাবুর এক মাসীকে বিয়ে করলেন। বাপের এক মেয়ে, অগাধ টাকা। তার পর ক্রমাগত সাহেব-সুবোদের পার্টি দিয়ে, মদ ও মেয়েমানুষ জোগাড় করে দিয়ে আপনি ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসলেন। স্যার হলেন, দেশের এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালেন। যারা আপনাকে চেনে না, তাদের কাছে আপনি এক জন বিরাট পুরুষ বলে গণ্য হলেও আমাদের কাছে আপনি এক জন অসৎচরিত্র লম্পট ছাড়া কিছু নন।

হরপ্রসাদ। (তালি বাজিয়ে) হিয়ার, হিয়ার, আপনার ফিনিশটা খুব ড্রামাটিক হয়েছে। কিন্তু ভুলে যাবেন না, আপনি যে রকম কষ্ট করে আমার অতীত জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন আমিও আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে সেই রকমই, হয়ত তার বেশী ঘটনাবলী সংগ্রহ করেছি। আমার চেয়ে সেগুলো আরও বেশী মুখরোচক। আর মনে রাখবেন, আমি পুরুষ আর আপনি নারী।

প্রতিমা। অদৃষ্টচক্রে আমায় এমন অনেক দুর্নাম কিনতে হয়েছে, যার জন্ম আমি দায়ী নয়।

হরপ্রসাদ। দায়ী হন আর নাই হন, দুর্নাম ত স্বীকার করছেন।

প্রতিমা। আমরা দু'জনে ভিন্ন পথে গিয়েও হাজির হয়েছি একই অবস্থায়।

হরপ্রসাদ। সেই জন্তই বলছি, যে কাচের ঘরে থাকে তার পক্ষে অপরের দিকে ঢিল ছোঁড়া ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(দরজায় খট-খট ধ্বনি)

প্রতিমা। ভেতরে এস।

(চায়ের ট্রে হাতে সুরেনের প্রবেশ, প্রতিমার সামনে টেবিলের উপর ট্রে রেখে প্রস্থান)

প্রতিমা। (হরপ্রসাদের প্রতি) আপনি চা খাবেন ত?

হরপ্রসাদ। আপত্তি নেই, তবে চিনি দেবেন না, আমার ডায়াবিটিস আছে।

প্রতিমা। (চা ঢালতে ঢালতে) আচ্ছা বলুন ত, আপনার উপদেশ মত আপনিও ত ঢিল ছোঁড়বার যোগ্য ব্যক্তি নন: তবে এ সীরিয়াস কাজে আপনাকে পাঠানো হলো কেন?

হরপ্রসাদ। হা হা হা, বেশ বলেছেন। আমার মনে হয়, বোধ হয় তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

প্রতিমা। (চা'র বাটি এগিয়ে দিয়ে) তার মানে?

হরপ্রসাদ। মানে অতি সহজ। (চা খেতে খেতে) এই ধরুন, যে রকম পুলিশেরা চোর ধরতে হলে চোরের সাহায্য নেয়।

প্রতিমা। এই ইনসিনিউএশন কার বিরুদ্ধে? রজনী বাবুর?

হরপ্রসাদ। ইনসিনিউএশন?

প্রতিমা। তা'ছাড়া আর কি বলুন।

হরপ্রসাদ। এই দেখুন, আপনি চটে উঠলেন। আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড় এবং আপনার কথা মতই অনেক রকমের চরিত্রের সঙ্গে মিশেছি। আপনি একটা ভুল করছেন।

প্রতিমা। কি ভুল?

হরপ্রসাদ। রজনীর মূল্য সম্বন্ধে।

প্রতিমা। আমার কাছে তাঁর কি মূল্য আপনি জানেন?

হরপ্রসাদ। সবটা না জানলেও কিছু কিছু আন্দাজ করেছি। আপনি মনে করেন, সে এক জন অসাধারণ প্রতিভাবান্ লোক। সাংসারিক অশান্তির জন্ম তার বিরাট ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে বসেছে।

প্রতিমা। তা আমি অস্বীকার করছি না।

হরপ্রসাদ। দেখলেন, ঠিক ধরেছি। কিন্তু ওর আসল সত্যিকারের পরিচয় জানেন কি?

প্রতিমা। বলুন, শোনা যাক্।

হরপ্রসাদ। শুনবেন, বেশ। (চায়ের বাটি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে) আসল রজনী কি রকম জানেন? যার উচ্চাশা আছে কিন্তু ধৈর্য্য নেই, আত্মাভিমান আছে আত্মবিশ্বাস নেই, আকাঙ্ক্ষা আছে ক্ষমতা নেই।

প্রতিমা। ও!

হরপ্রসাদ। নিজের ভুল যার চোখে পড়ে না, ভুল দেখিয়ে দিলে সে ক্ষেপে যায়, যে আত্মগরিমার নেশায় সংসারকে তুচ্ছ দেখে, যার তাড়ির নেশা নেই কিন্তু শাড়ীর নেশা আছে,—কিছু বললেন?

প্রতিমা। না, আপনি বলুন, থামলেন কেন?

হরপ্রসাদ। সেই নেশা ভাঙাবার জন্ম আমরা তার বিবাহ দিয়াছিলাম। কিন্তু নেশা জিনিসটা এমনই প্রবল যে এক বার ধরলে আর ছাড়া যায় না। ফলে সে স্ত্রীকে নিয়ে তৃপ্ত হতে পারল না। তাই আজ সে এখানে, আপনার কাছে।

প্রতিমা। আর কিছু বলবেন?

হরপ্রসাদ। সাদা কথায় তার বুদ্ধি ভ্রান্ত, তার মন হিস্টিরিক, তার ময়্যালস—সে কথা আর নাই বললুম।

প্রতিমা। থামুন, আর বলতে হবে না।

হরপ্রসাদ। আমি বলতে চাইনি, আপনিই শুনতে চেয়েছিলেন।

প্রতিমা। মিথ্যা, সর্ব্বৈব মিথ্যা।

(রজনীর প্রবেশ)

রজনী। (হরপ্রসাদকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে) আপনি, এখানে?

প্রতিমা। উনি কয়েক বার চিঠি লিখে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়াতে আমি ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম।

[প্রতিমার প্রস্থান।

রজনী। আপনি এখানে কেন এসেছেন?

হরপ্রসাদ। শুনলে ত, উনি ডেকে পাঠিয়েছেন বলে আমি এসেছি।

রজনী। না আসলেও পারতেন। যাই হোক, দেখা হয়ে গেল ভালই হল। আপনার সঙ্গে আমার একটা কথাও ছিল।

হরপ্রসাদ। (সিগারেট ধরিয়ে) তাই না কি? হাউ ফরচুনেট!

রজনী। আপনি এ ভাবে আমাকে যন্ত্রণা দেওয়া বন্ধ করুন।

হরপ্রসাদ। যন্ত্রণা! কি বলছ তুমি?

রজনী। বেশ, যন্ত্রণা কথাতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তবে প্ররোচনা বলি। আপনি বৃথা অশান্তির সৃষ্টি করছেন।

হরপ্রসাদ। বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে বলা যে প্ররোচনা তা আমি জানতুম না। আর এর মধ্যে অশান্তিরই বা কি আছে বুঝতে পারলুম না।

রজনী। দেখুন আপনি আমার গুরুজন। আপনার সঙ্গে তর্ক অথবা কথা-কাটাকাটি করা ভাল দেখায় না। আপনার বক্তব্য এই ক'দিনে আমি বহু বার শুনেছি, আর শুনতে চাই না। আপনি কি বলতে পারেন, এই দুটি রমণীর মধ্যে—আমার স্ত্রী আর এর মধ্যে কার কাছে আমি বেশী কৃতজ্ঞ? ক্রমাগত অশান্তিতে যখন আমার দেহ-মন সব ভেঙ্গে দিয়ে স্ত্রী বাপের বাড়ী চলে গেলেন—তখন মৃত্যুমুখ থেকে কে আমাকে রক্ষা করেছে? এই রমণী। দিন-রাত এক করে যত্ন শুশ্রূষা করে কে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে? যখন আমার বাঁচবার সকল আশা, সকল ইচ্ছা শেষ হয়ে গিছল তখন কে সেবা দিয়ে, সাহস দিয়ে পুনর্জ্জীবিত করেছে? আমার শেষ উত্তর আপনাকে দিচ্ছি—সমাজ যতই আমাকে ঘৃণা করুক—লোক-লজ্জা, ভাল-মন্দ সব ত্যাগ করতে আমি কুণ্ঠিত নই। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিসর্জ্জন দিয়ে লোক-দেখান নৈতিক পবিত্রতাকে বজায় রাখা কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নয়।

হরপ্রসাদ। কৃতজ্ঞতাটা স্বাভাবিক। তবে তুমি যতটা বাড়াবাড়ি করছ অতটার কোন প্রয়োজন দেখি না। মানুষের দেহ সুস্থ না থাকলে মনটা দুর্ব্বল হয়। সেই সময় কোন সুন্দরী যুবতী যদি তার সেবা দিয়ে আরোগ্য করে তোলে, তবে সাধারণতঃ লোকে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই জন্যই পেশেন্টরা প্রায়ই নার্সদের বিয়ে করে বসে। তবে সে আকর্ষণের সমস্তটাই কৃতজ্ঞতা নয়।

রজনী। আপনি কি বলতে চান, এ অসুস্থ মস্তিষ্কের একটা মোহ মাত্র?

হরপ্রসাদ। এই তো বেশ বুঝতে পারছ।

রজনী। যত ইচ্ছা আপনি বিদ্রূপ করুন, কিন্তু আমার সঙ্কল্প এতে টলবে না। আমাদের মধ্যে যে বন্ধন, তার ভিত্তি অত কাঁচা নয়। এক জন বন্ধুহীন ছন্নছাড়া পুরুষের জন্য এক জন করুণাময়ী নারীর—

হরপ্রসাদ। এই করুণাময়ী নারীরাই তোমায় ডুবোবে দেখছি।

রজনী। ভুল করছেন! আমাকে ডুবিয়েছিল এক জন করুণাহীনা হৃদয়হীনা নারী। মানুষকে, সংসারকে ধ্বংস করে এই সব নারীরা। তারা চায় শুধু নিজের সুখ-সুবিধা, পুরুষের বুভুক্ষু হৃদয়ের দিকে চাইবার প্রয়োজন কখনও মনে করে না। তাদের সে সময়ও থাকে না, ইচ্ছাও থাকে না। এই রকম একটি নারী আমার মনকে, জীবনকে বিনষ্ট করেছিল। আমি ডুবছিলুম, ইনি আমায় টেনে তুলেছেন।

হরপ্রসাদ। যাক্। এ অপ্রিয় আলোচনা এখন বন্ধ থাক। আচ্ছা, ওঁর চুল অমন উস্কো-খুস্কো, কাপড়-জামা আধ-ময়লা, এ সব কি তোমাদের জীবনযাত্রার কোন নব প্রণালী?

রজনী। আমার সেবা-যত্ন নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে এ সব দিকে বড় মন দিতে পারে না।

হরপ্রসাদ। তোমার লজিকটা ঠিক হ'ল না রজনী। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। আমার মনে হয়, উনি যে সমাজের মানুষ তাতে এর চেয়ে ভদ্র ভাবে থাকার শিক্ষা ওঁর হয়নি, কারণ, কখনও দরকার হয়নি।

রজনী। যাকে যে দেখতে পারে না, পদে পদে সে তার ত্রুটি বার করে। সাদাসিধে জীবন যাপন করা কারও আদর্শ, আবার কারও চক্ষুশূল। পৃথিবীতে সকলেই ধনী নয়। বেশীর ভাগ লোকই গরীব। তাদের পক্ষে ধনীদের মত অনর্থক আড়ম্বর সম্ভব নয়।

হরপ্রসাদ। তুমি এই ধরণের কথাবার্ত্তা বোধ হয় তাঁরই কাছে শিখেছ। তুমি আসবার একটু আগেই আমাদের জীবন-প্রণালী ময়্যালস ইত্যাদি নিয়ে তিনি একটি সারগর্ভ বক্তৃতা আমায় শুনিয়েছেন। সে কি চোখা-চোখা বাণ! হা হা—

রজনী। আপনার কথাবার্ত্তা শুনলে সাধারণ লোকেরই টেম্পার রাখা সব সময় শক্ত হয়ে পড়ে। ব্যঙ্গ-শ্লেষ ছাড়া সহজ ভাবে আপনাকে কথা কইতে কখন শুনিনি। সে অনেক আঘাত-নির্য্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। তার পক্ষে চটে ওঠা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং একটু যত্ন-আত্তি পেলে তার ক্ষতগুলি আরোগ্য হতে পারে। তখন আর কথার মধ্যে একটা উগ্রতা থাকবে না।

হরপ্রসাদ। এ উগ্রতা কোন দিনই যাবে না, রজনী। ও-সব অস্থি-মজ্জাগত।

রজনী। যা বলে, সব ওর বাবার কাছ থেকে শেখা।

হরপ্রসাদ। তিনি তো জেলে মারা গিছলেন।

রজনী। হ্যাঁ।

হরপ্রসাদ। বহু দিন আগে একবার এঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম, আজকে আবার শুনলুম। আগেকার মত এখনও ভাষায় আগুন আছে,

জামা আছে, কিন্তু চেহারাটা আগে যেমন দেখলেই ডাইনীর মত মনে হ'ত, কোটরগত চোখ, আলুথালু কেশ, গালের হাড় উঁচু, কাঠির মত সরু সরু হাত-পা, এখন সে রকম আর দেখায় না।

রজনী। অনাহারে। বেচারী অর্দ্ধেক দিন খেতে পেত' না।

হরপ্রসাদ। গলাটি কিন্তু বেশ মিষ্টি। চেহারাটাও এবার দেখছি মন্দ মনে হচ্ছে না। ওকে যদি তুমি একটু ভদ্র ভাবে কাপড়-জামা পরিয়ে রাখ—শী উইল লুক ফাইন!

রজনী। আমি এই কথাই আজ ওকে বলছিলুম।

হরপ্রসাদ। তাই না কি! ভারী আশ্চর্য্য তো! হা হা—

রজনী। শেষে প্রতিমার বেশ-ভূষা—হোয়াট এ টপিক!

হরপ্রসাদ। পরিচ্ছদ থেকে মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সে কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করো। তা'ছাড়', বেশ-ভূষা সম্বন্ধে তোমার একটি আর্টিষ্টিক টেষ্ট আছে। তোমার স্ত্রীর কথাই ধর না কেন—

রজনী। সে কথা থাক, এখন বুঝেছি, কেবল বাহ্য আড়ম্বরই অন্তরের পরিচয় নয়।

হরপ্রসাদ। কিন্তু তাই বলে সঙ সেজে থাকলে অপরের চোখে দৃষ্টিকটু লাগে বই কি?

রজনী। অপর মানে?

হরপ্রসাদ। পাবলিক্।

রজনী। পাবলিক্‌কে আমি কেয়ার করি না।

হরপ্রসাদ। সংসারে বাস করতে হলে কেয়ার না করে উপায় নেই। তুমি রাস্তা দিয়ে তোমার অর্দ্ধক্ষিপ্তা সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। তাতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবেই ত'।

রজনী। আপনি তার সম্বন্ধে এমন অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করবেন না।

হরপ্রসাদ। (যেন শুনতেই পাননি এই ভাবে) ফ্রী ইউনিয়নকে তোমরা দেখছি বাংলা ভাষায় অবাধ মেলা-মেশা করে তুলেছ, ভুলে যেও না, অবাধ আর অবৈধর মধ্যে বেশী পার্থক্য নেই।

রজনী। আপনার এ কথা অবশ্য আমি অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু সকল প্রগতিশীল সমাজেই এ প্রযোজ্য।

হরপ্রসাদ। কিন্তু তোমাদের প্রতি আরও বেশী রকম প্রযোজ্য। একসঙ্গে থেকে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের ভাণ তারা করে না।

রজনী। আপনি বিশ্বাস করুন—

হরপ্রসাদ। বিশ্বাস আমি করছি রজনী, কিন্তু সকলে হয়ত করবে না। তোমাদের জীবন অস্বাভাবিক। অসম্ভব তোমাদের আদর্শ।

রজনী। তা জানি।

হরপ্রসাদ। যদি জান, তবে আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না কেন ছাই।

রজনী। তার কারণ আমি অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসহীন, কাপুরুষ নই। বড়লোকদের সে অপরাধটা বিলক্ষণ আছে।

হরপ্রসাদ। কোন জিনিষেরই বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বিশেষ করে পৌরুষের। সেটা যেমন নাটকীয়, তেমনি হাস্যকর। তোমরা কি করতে চাও শুনি?

রজনী। এখন যে অসম্ভব আদর্শ সে আঁকড়ে ধরে আছে, সময়ের সঙ্গে সেই বাঁধন যখন শিথিল হয়ে যাবে, যখন সে তার আদর্শের অসম্ভবতা বুঝতে পারবে, তখন আমরা অনেক দূরে লোকচক্ষুর বাহিরে নূতন নীড় বাঁধব।

হরপ্রসাদ। তুমি মূর্খ এবং কাপুরুষ দুই। সে অন্ততঃ যে কথাটা বলে সে সময়ের মত সে সেটাকে বিশ্বাস করে। তুমি তাও কর না। তুমি যে ভুল পথে চলেছ তা হয় বোঝ না, না হয় স্বীকার কর না। তুমি তার আদর্শকে বিশ্বাস কর না তাই তাতে কোন লোভও নেই। তুমি চাও তাকে, তার দেহকে। ছেঁদো কথায় নিজেকে এবং সকলকে ঠকাচ্ছ।

রজনী। আপনি আমার উপর অবিচার করছেন।

প্রতিমা। (নেপথ্যে) ভেতরে আসতে পারি কি?

(রজনীর দেওয়া অতি আধুনিক সাজে সজ্জিতা প্রতিমার প্রবেশ। লো-কাট ব্লাউস, হাতা শুধু ষ্ট্র্যাপ, ব্রোকেডের শাড়ী, হাই হীল জুতো, হাতে ভ্যানিটী ব্যাগ। রজনী ও হরপ্রসাদ দু'জনেই তার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন)

প্রতিমা। আপনি এখনও কাপড়-জামা পরেননি।

রজনী। কেন, ক'টা বেজেছে।

(রজনী দরজার কাছে গেলেন)

হরপ্রসাদ। আমাদের গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছেন? বেড়াতে?

প্রতিমা। হ্যাঁ। চলুন না আমাদের সঙ্গে। (রজনীর প্রতি) ওঁকেও সঙ্গে যেতে বলুন না।

(রজনী থমকে ফিরে দাঁড়াল)

হরপ্রসাদ। ধন্যবাদ। বড়ই দুঃখিত যে আমাকে এখুনি একবার হোটেলে যেতে হবে, নইলে নিশ্চয়ই যেতুম।

[রজনীর প্রস্থান।

প্রতিমা। তাই না কি! আমি ভেবেছিলুম, আমার মত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বেড়াতে বার হতে লজ্জা করছে, পাছে কেউ দেখে ফেলে—

হরপ্রসাদ। না, না, তা নয়—

প্রতিমা। বটেই তো! আমারই ভুল হয়েছিল। লজ্জা অথবা ভয় পাবার পাত্র তো আপনি নন। তবে কি ঘৃণা—

হরপ্রসাদ। আপনি আমার উপর অবিচার করছেন মিসেস্ দাস।

প্রতিমা। আপনি বোধ হয় এখন মনে মনে স্বীকার করছেন যে, আমাকে যতটা মূর্খ ভেবেছিলেন আমি ঠিক ততটা মূর্খ নই।

হরপ্রসাদ। আমার ধারণা একটু ভুল হয়েছিল। আপনি অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং চতুরা।

(সজ্জিত হয়ে রজনীর প্রবেশ)

রজনী। আমি তৈরী।

হরপ্রসাদ। আমি তবে আজ চলি। আর এক দিন আসব। চমৎকার সময়টা কাটল।

(দরজার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ালেন কেউ কিছু বলে কি না দেখবার জন্য। যখন দেখলেন, কেউ কথা কইল না তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন)

রজনী। (প্রতিমার হাত ধরে) প্রতিমা!

প্রতিমা। (হাত ছাড়িয়ে আড়ষ্ট ভাবে) এখন সন্তুষ্ট হয়েছেন?

রজনী। (কাছে গিয়ে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে) খুব! তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। ভেরী স্মার্ট।

নববর্ষ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পঞ্জিকার প্রথম পাতায় রাজা-মন্ত্রী সমাচার
নতুন বছর এলো ঘুরে, জল-ঘটে পল্লবে, সিঁদুরে।

রাস্তায় গলির মোড়ে দোকানে দোকানে হাল খাতা
নতুন পাতায় টানা জের বিগত সালের
ধোয়া-মোছা পুরোন ফরাস, বাঁধানো রূপার হুঁকো
চকচকে মাজার ঘসায় অভ্যর্থনা আপ্যায়ন
ওঠায় বসায় বকেয়া উশুল কিছু
মিষ্টি কিছু হাতে, হৃদয়ের বিনিময়
ক্রেতা আর বিক্রেতার সাথে, তোবড়ানো গালে, কালো ঠোঁটে,
অবশিষ্ট দু'-চারিটি দাঁতে ক্ষীণতর হাসির আভাসে

নতুন বছর তবু আসে বস্তীর মাটির ঘরে
কুমারীর কণ্ঠে বাজে শাঁখ, এসো এসো নতুন বৈশাখ।
রাজা-মন্ত্রী অদল-বদল তাই জানি রাষ্ট্রগত রাশিগত ফল
কি' বছরে কিছু শুভ, কিছু বা অশুভ, স্নেহ প্রেম প্রীতি তাই
ঈর্ষা, দ্রোহে, অসূয়ায় ঘেরা, জলে শস্যে নতুন গ্রহেরা
অধিপতি এ-পাশে ও-পাশে বৃদ্ধিতে উল্লাস কারো
কারো বা বিনাশে। রাজ-মন্ত্রী অদল বদল
বর্ষচক্রে শতদল ফোটে আর ঝরে, কত দল ভাঙে আর গড়ে

তাই নিয়ে গান বাঁধি তাই নিয়ে ছড়া
তিলে তিলে মিলে মিলে বছরের নতুন পসরা।

প্রতিমা। (সরে গিয়ে সোফায় বসে) ও! ধন্যবাদ!

রজনী। তুমি নিত্য নতুন শাড়ী ব্লাউস জুতো পরে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। রমণীরা তোমার সজ্জা দেখে আর পুরুষেরা তোমার ভাগ্য দেখে হিংসায় ফেটে পড়বে। কালই তোমার জন্য দশ-বারোখানা শাড়ী কিনে আনব—পরবে তো?

প্রতিমা। পরব।

রজনী। তুমি সত্যি হঠাৎ এমন বদলে গেছ—আমি ভারী আশ্চর্য হয়ে গেছি।

প্রতিমা। বটে!

রজনী। আমি কিন্তু তোমার এ পরিবর্ত্তনের কারণ জানি।

প্রতিমা। জান?

রজনী। হ্যাঁ। কারণ তুমি আমায় ভালবাস।

প্রতিমা। তাকদা থেকেই আমার মনে হয়েছিল আমাদের ভুল হচ্ছে। কিন্তু তবু নিজেকে ঠকিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, এখন শরীর খারাপ তাই মনের জোর নেই। সুস্থ হলে আপনি আমাকে বন্ধু হিসেবে দেখতে পারবেন,—আমি যে নারী সে কথাটা বড় করে দেখবেন না। এখন দেখছি, যে আদর্শের কথা আমি ভেবেছিলুম, আপনি তার যোগ্য নন। আপনার মেসো আপনার সম্বন্ধে একটু আগে যা বলে গেলেন—

রজনী। তুমি তাই বিশ্বাস করলে?

প্রতিমা। মুখে বললুম সব মিথ্যে, কিন্তু—

রজনী। কিন্তু কি?

প্রতিমা। তিনি মিথ্যে বলেননি। আমিও এখন বুঝতে পারছি, আপনি বন্ধুত্ব চাননি, এক জন নারীকে চেয়েছিলেন। খুব চুল-চেরা বিচার করলে বলা যেতে পারে নারীর বন্ধুত্ব, সাহচর্য্য—কিন্তু শেষ অবধি যা দাঁড়াবে—

রজনী। তুমি কি তবে—

প্রতিমা। না। সেইখানেই তো হয়েছে মুস্কিল। যখন প্রথমে জেনেছিলুম, যে আদর্শ বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে হওয়া অসম্ভব তখনই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পেরেছি কি? এখনই কি পারছি?

(টেবিলে মুখ ঢেকে ক্রন্দন)

রজনী। তুমি তবে আমায় সত্যই ভালবাস। (প্রতিমার পাশে সোফায় বসে তাঁর হাত ধরে) এ যে আমার কত বড় সুখের মুহূর্ত্ত তা তুমি বুঝবে না। তোমার নিশ্চয়ই এ ইচ্ছা ছিল না যে মেসোর হাত ধরে লক্ষ্মী ছেলের মত গুটী-গুটী বাড়ী ফিরে যাই। (প্রতিমা ঘাড় নাড়লেন) তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি যাব না। আমার জীবন আজ হয়েছে সার্থক, সম্পূর্ণ।

প্রতিমা। আমি ভবিষ্যতে আপনার মনের মত পোষাক-পরিচ্ছদ পরব যাতে আমার জন্য ভদ্রসমাজে আপনাকে অভদ্র না বলে, যাতে আমার প্রতি আপনার ঘৃণা না আসে, দূরে সরে যেতে ইচ্ছা না হয়—

রজনী। ঘৃণা! দূরে সরে যাবার ইচ্ছা! তুমি কি বলছ প্রতিমা? আমি চেয়েছিলুম, তোমার আসল রূপ লোককে দেখাতে—সুন্দরী, রূপসী—

প্রতিমা। আমি কি শুধু তাই? আর কিছু নয়? বাহিরের রূপই কি মানুষের স্বরূপ?

রজনী। (নিজের মনে) তুমি সুন্দর—অতি সুন্দর প্রতিমা—

(প্রতিমাকে জড়িয়ে ধরলেন)

প্রতিমা। না, না, আমাকে ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন—(বলতে বলতে প্রতিমা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। রজনী তাঁকে ঠিক করে শুইয়ে ব্যস্ত ভাবে চেঁচাতে লাগলেন)

রজনী। কি ভয়ানক! এ কি হল! (দরজার কাছে গিয়ে) সুরেন, সুরেন—শীগ্‌গির এস—

[ক্রমশঃ।

ভিজা কলোডিয়ন পদ্ধতি

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ

কলোডিয়ন

প্লেন কলোডিয়ন্ কি ? ও তার প্রয়োজন—পাইরক্সিলিন নামক এক বস্তু এ্যালকোহল ও ঈথারের সঙ্গে মেশানো হয়, এবং সেই মিশ্রিত বস্তুটিকে কলোডিয়ন বলে। তুলো যখন ২০ ভাগ পটাসিয়াম নাইট্রেট্ ও ৩০ ভাগ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত সলিউসনে গরম অবস্থায় (১৪০ ডিগ্রী ফারেন্ হিট্) ডুবিয়ে রেখে (১০ মিনিট আন্দাজ) পরে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়, তখন তার নাম হয় পাইরক্সিলিন। এবং এই পাইরক্সিলিন যখন এ্যালকোহল ও ঈথারের সংমিশ্রণে গলে যায় তখন তাকে বলা হয় কলোডিয়ন।

পাইরক্সিলিন বস্তুটি বিশেষ দাহক পদার্থ, একটু আগুনের স্পর্শ পেলেই ভীষণ ভাবে জ্বলে ওঠে এবং সবটা নিঃশেষে জ্বলে যায়, একটু ছাই পর্য্যন্তও থাকে না। যেহেতু কলোডিয়ন এইরূপ দাহ্য বস্তু দিয়ে প্রস্তুত সেই হেতু কলোডিয়ন যেখানে রাখা হবে সেখানে কোন রকম আগুন এমন কি একটি দেশলাই কাঠির শিখা পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে না পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা ও ব্যবস্থা করা দরকার। কলোডিয়ন প্রস্তুত ক'রতে হ'লে এ্যাবসোলিউট্ এ্যালকোহল অর্থাৎ ৯৯ পারসেণ্ট খাঁটী—যাতে মাত্র এক পারসেণ্ট জল আছে—ব্যবহার করতে হবে। এ্যালকোহল যে পাত্রে (বোতলে বা ড্রামে) রাখা থাকবে, তার মুখ যেন খুব ভাল ভাবে বন্ধ থাকে, কোন রকম বাতাস যেন প্রবেশ করতে না পারে, কারণ তাহলে স্পিরিটের অংশ উবে যাবে ও বাতাসের সঙ্গে যে জল আছে তা ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাকে দুর্ব্বল করে ফেলবে। এবং যেহেতু জলের ভাগ বেশী হ'য়ে যাবে, সেই হেতু তার কার্য্যকরী ক্ষমতাও অনেক পরিমাণে কমে যাবে এবং ঈথার যা কলোডিয়ন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন, তার স্পেসেফিক্ গ্র্যাভিটি যেন ·৭২০ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কলোডিয়ন ও আইওডাইজার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই দু'টি জিনিষ দু'টি বিভিন্ন বোতলে থাকে, ব্যবহারের পূর্ব্বে (অন্ততঃ পক্ষে ২৪ ঘণ্টা) মিশিয়ে রাখতে হয়। ভাল কলোডিয়ন প্রস্তুতকারক হিসাবে মসন্, জনসন, হার্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যদি কোন প্রতিষ্ঠান নিজেরাই কলোডিয়ন ও আইওডাইজার তৈরী ক'রে কাজ করতে ইচ্ছা করেন, তাহ'লে নিম্নোক্ত ফরমূলা বিশেষ কাজে লাগবে।

প্লেন কলোডিয়ন

জনসন পাইরক্সিলিন	২।০ আউন্স
এ্যালকোহল এ্যাবসোলিউট্	৭০ "
ঈথার ·৭২০	১০৫ "

আয়োডাইজার

এ্যালকোহল	২০ আউন্স
ক্যাডমিয়াম আয়োডাইড	১৮০ "
এ্যামোনিয়াম আয়োডাইড	৮০ "
ক্যাডমিয়াম ব্রোমাইড	১৮ গ্রেনস
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	১৮ "
আয়োডিন ফ্লেক্স	২০ "

প্রস্তুত প্রণালী

কলোডিয়ন তৈরী করার পূর্ব্বে পাইরক্সিলিন (জনসন) (তুলোর মত দেখতে) খুব ভাল ক'রে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে, তার পর পিঁজে নিয়ে ছোট ছোট টুকরো ক'রে বোতলের মধ্যে ফেলে এ্যালকোহল মিশিয়ে খুব ভাল ক'রে নাড়তে হবে এবং পরে ঈথার মেশানোর সঙ্গে সঙ্গে পাইরক্সিলিন গলে যাবে। যখন সম্পূর্ণ ভাবে মিলে যাবে তখন কাচের ফানেলের মুখে তুলো দিয়ে অন্য বোতলে ছেঁকে নিতে হবে। ছাঁকবার সময় ফানেলের উপর একটা কাচ দিয়ে চাপা রাখা ভাল, যাতে করে যত দূর সম্ভব হাওয়া না লাগে। আয়োডাইজার তৈরী করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একটি কেমিকেল যতক্ষণ না সম্পূর্ণ গলে যায় অপরটি যেন না দেওয়া হয়। একটি গলে যাওয়ার পর অপরটি দিতে হবে এবং এই ভাবে একে একে সব কেমিকেলগুলি মিশিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। এই ফরমূলা অনুযায়ী প্লেন্ কলোডিয়নে আয়োডাইজার মেশাতে হলে ৯ ভাগ প্লেন কলোডিয়ান ও ১ ভাগ আয়োডাইজার মিশিয়ে খুব কম পক্ষে ৪৮ ঘণ্টা রেখে দেওয়ার পর আবার ফানেলে তুলো দিয়ে ছেঁকে নিলেই কাজের উপযোগী হবে। কলোডিয়নে আয়োডাইজার মিশিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করা চলে, কিন্তু তার কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকে খুব ধীর। শুধু তাই নয়, অনেক সময় নেগেটিভ হয় ফগ অর্থাৎ ঘোলাটে, উজ্জ্বলতা থাকে না, স্বচ্ছতার হয় অভাব। এ দোষ অনেকটা অতিক্রম করা চলে, যদি অনন্য উপায় হয়ে সদ্য-মিশ্রিত আয়োডাইজড কলোডিয়ন ব্যবহার করতে হয় তবে ।০ পারসেণ্ট আইডিন সলিউসন্ (এ্যাল্কোহলে মিশ্রিত) প্রতি ১০ আউন্স আয়োডাইজড কলোডিয়নে পাঁচ ফোঁটা আন্দাজ মিশিয়ে কাজ করা। তবে আমার মতে কলোডিনে আয়োডাইজার মেশাবার পর অন্ততঃ পক্ষে ২ দিন রেখে তার পর ব্যবহার করাই সুফল পাওয়ার প্রকৃষ্ট উপায়।

প্লেন কলোডিয়ন আয়োডাইজার দেওয়া হয় কেন, তার মোটামুটি একটা ধারণা থাকা ভাল। তাই আমি সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করবো। কলোডিয়ন আর কিছুই নয়, শুধু কতকগুলি দ্রব্য যাহা আলোকপ্রভায় প্রভাবান্বিত হয় সেইগুলিকে বহন করে মাত্র। এখন কলোডিয়নের সংস্পর্শে এসে আলোক-প্রভায় প্রভাবান্বিত হয় যে দ্রব্যগুলি, তার মধ্যে প্রধান দু'টি হচ্ছে আয়োডাইড ও ব্রোমাইড। কলোডিয়ন ফিল্মের আলোক ধারণ ক্ষমতা দ্রুত ও মন্থর নির্ভর করে আয়োডাইড ও ব্রোমাডের উপর। আয়োডাইড মিশ্রিত কলোডিয়ন ব্রোমাইড মিশ্রিত কলোডিয়ন অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাপন্ন ; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে এই দু'টির সংমিশ্রণে যে কলোডিয়ন প্রস্তুত হয় ভিজা প্লেট্ ফটোগ্রাফীতে তা বিশেষ সুফলপ্রদ। কেবল মাত্র আয়োডাইজড কলোডিয়ন নেগেটিভের চরিত্রকে করে শক্ত, রুক্ষ, অর্থাৎ ছবির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখাগুলিকে বজায় রাখতে পারে না। অতএব যে হেতু প্লেন কলোডিয়নে কিছু মেটালিক সল্ট থাকা অপরিহার্য্য, সেই হেতু কলোডিয়নএ আয়োডাইড ও ব্রোমাইড মেশানো হয় এবং যখন এই আয়োডাইজড প্রলেপযুক্ত কলোডিয়ন প্লেট্ সিলভার বাথের সংস্পর্শ আসে, তখন সেটা সিলভার হ্যালাইডে পরিণত হয়, ও তখনই ইহার উপর আলোর ক্রিয়া ঘটে।

কাচের উপরে কলোডিয়নের প্রলেপ দেওয়া কার্য্যটি খুব সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে, এবং কাচের উপরে ফিল্মের ঘনত্ব যেন সমান হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। নিম্নোক্ত

নিয়মানুসারে কলোডিয়নের প্রলেপ দেওয়া কিছু দিন অভ্যাস ক'রলে কাজটা সহজ বলে মনে হবে। একখানা এ্যালবিউমেনের প্রলেপ দেওয়া শুকনো কাচকে (যদি হয় :১২ ইঞ্চি) বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল, তর্জ্জনী ও মধ্যম আঙুলের সাহায্যে ধ'রে
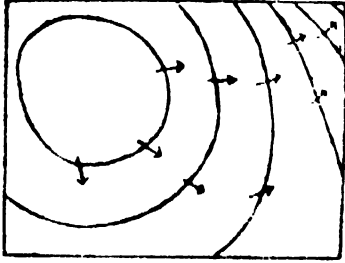
কলোডিয়নের গতি-পথ

কাচের মাথার দিকে ডান দিকের কোণে আস্তে আস্তে কলোডিয়ন ঢালতে হবে ততটা আন্দাজ ক'রে, যতটায় কাচখানিকে সহজেই প্রলেপ দেওয়া সম্ভব (অবশ্য এ আন্দাজ প্রথমটা ঠিক ঠিক হবে না, তবে কিছু দিন অভ্যাসের পরে কাচের আকার অনুযায়ী অনুমান করা সহজ হ'য়ে উঠবে)। এখন উপরের ডান দিকের কোণ সম্পূর্ণ ঢেকে যাওয়ার পর উপরের বাঁ-দিকে কলোডিয়নের গতিপথ ঘোরাতে হবে। (কলোডিয়নএর গতিপথ প্লেটের উপর ঘোরানো'র উপায় হ'চ্ছে আর কিছুই নয় শুধু আঙুলের চাপের সাহায্যে ইচ্ছাধীন দিকে হেলিয়ে দেওয়া) পরে উপরের বাঁ-দিক থেকে নীচের বাঁ-দিকে ধারাটিকে নিয়ে আসতে হবে ও পরে ডান দিকের কোণ নিয়ে এসে হাতখানি উঁচু ক'রে সেই কোণ দিয়ে উদ্বৃত্ত কলোডিয়ন অন্য একটি বোতলে ঢেলে ফেলতে হবে। এই ঢালার সময় প্লেটটিকে যেন স্থির না রাখা হয়, তা হ'লে কোণাকুণি ঢেউয়ের মত দাগ হ'য়ে যাবে। অতএব উদ্বৃত্ত কলোডিয়ন ঢালার সময় প্লেটটি যাতে বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে নড়ে, তেমনি ভাবে হাতটি নাড়াতে হবে। এর একটি সুন্দর উপায় হ'চ্ছে উদ্বৃত্ত কলোডিয়ন বোতলে ঢা-লার পর প্লেটটির দু'টি কোণ (উপরের ডান দিকের ও নীচের বাঁ-দিকের) দু'হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে খাড়াখাড়ি ভাবে নাড়ানো ততক্ষণ, যতক্ষণ ফিল্মখানি সেট্ করে।

এবার প্লেটখানি সিল্‌ভার বাথে ফেলতে হবে। বাঁ-হাত দিয়ে ডিস্‌টা তুলে ধ'রতে হবে এমন ভাবে, যাতে সমস্ত সলিউসন ডিসের ডান দিকে চলে যায়। তার পর প্লেটটির বাঁ-দিক্ ডিসের ভিতরের বাঁ-দিকে রেখে প্লেটটি ডিসের মধ্যে নীচু করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-হাতে উঁচু ক'রে ধরা ডিসের দিকটা নামিয়ে নীচু ক'রে দিতে হবে, যাতে সলিউসন একসঙ্গে সমান ধারায় এসে প্লেট্‌খানির সবটা ঢেকে ফেলতে পারে। যদি কোন রকমে সলিউসনের ধারা আটকে যায় তাহলে প্লেটে দাগ আসবে, যাকে বাথ-মার্ক বলা হয়। প্লেট যদি বাথ-মার্ক আসে তাহ'লে তা ডেভালপ করার পর বেশ বোঝা যায়, কারণ বাথ মার্ক প্লেটেরও পর স্বচ্ছ রেখার মত দেখায়। সিলভার বাথে প্লেট রাখার সময় নিরূপিত হয় ডার্ক-রুমের টেম্পারেচারের উপর। সাধারণতঃ এক থেকে দু'মিনিটের মধ্যে প্লেট্ তৈরী হয়ে যায়।

যে ডিসে প্লেট সেন্‌সিটাইজ করা হবে, তাতে সিল্‌ভার সলিউসনের পরিমাণ এমন থাকা চাই যা প্লেটের ওপর অন্ততঃ এক ইঞ্চি উঁচু থাকে এবং যতক্ষণ না প্লেটের উপরকার ফিল্ম ঠিক প্রস্তুত হবে ততক্ষণ ডিস্‌খানি দোলাতে হবে। ফিল্ম এক্সপোজারের জন্যে তৈরী হয়েছে বোঝা যাবে তখন, যখন প্লেটখানি বাথ থেকে তুলে ধরে দেখলে কোন রকম তেল কাটার দাগ থাকবে না। সিলভার বাথ থেকে প্লেট তোলবার জন্যে রূপার হুক্, ইবোনাইট বা এ্যালুমিনিয়াম্ হুক ব্যবহার করা হয় যেন। অন্য কোন ধাতু-নির্ম্মিত বস্তু যেন সিল্‌ভার সলিউসনের সংস্পর্শে না আসে। প্লেট বাথ থেকে তোলার সময় যত দূর সম্ভব ডিসে সিল্‌ভার ঝরিয়ে নিতে হবে, অথবা ড্রেসিং র‍্যাকের ওপরে রেখে ব্লটিং পেপারের প্যাড্ করে পেছনটা ভাল করে মুছে নিয়ে ডার্ক-স্লাইডে ভরে নিতে হবে। স্লাইডের কাঠের বারে সরু করে ব্লটিং পেপার দিয়ে তার ওপর প্লেট রাখা চলে। এতে কাঠের বার ও ক্লিপ দুই-ই ভাল থাকে। কিন্তু যেখানে আকারএর খুব সূক্ষ্ম বিচার প্রয়োজন, যেমন মানচিত্র ইত্যাদিতে—সেখানে ত দেওয়া চলে না, তাতে আকার বা ডায়মেন্‌সন্ তফাৎ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অতএব সে ক্ষেত্রে সপ্তাহে এক দিন করে যদি ২০ পারসেণ্ট সেল্যাক্ ভারনিসবারে লাগানো হয় তাহ'লে সিলভার সলিউসন্ দ্বারা কাঠের বিশেষ ক্ষতি হয় না।

কয়লা-কুলির বৌ
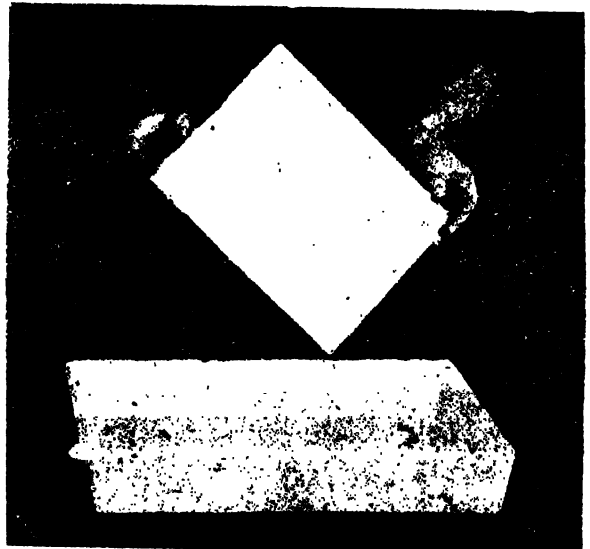
জ্যাক কম্‌রয়

বাবার সংকারের পর আমাদের বাড়ীটা আস্তে আস্তে নীরব হয়ে গেল।

কয় দিন সহানুভূতিশীল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের ক্রমাগত আলাপ-আলোচনার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তাম, কিন্তু কয়েক রাত্রি যেতে না যেতেই ঘরের নৈঃশব্দ্যে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল। বাড়ীর চারি দিক্‌টা এত নিস্তব্ধ যে, ইঁদুরের লুটোপুটি খুব বেশী না হলে সিঁড়ির নীচের দেয়াল-ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ পর্যন্তও শোনা যেত। আগে কখনও ইঁদুরের কথা মনেও হয়নি, অথচ স্মরণাতীত কাল থেকেই তারা ছিল এবং আছে, কিন্তু এখন তাদের ভয়ে আমি দিনরাত্রি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে থাকি। সে দিন স্বপ্ন দেখলাম, আমার বিছানাটা একটা দ্বীপ, সমুদ্রের নীল হিম-শীতল ঢেউ এসে চাবুকের মত আছড়ে পড়ছে। বাতাস যখন জোরে বহে তখন ঘরটা মাতালের মত টলমল করতে থাকে. আর ঘরের কাঠের জানলা-দরজা, কড়ি-বরগা-গুলো এমনি ভাবে আর্তনাদ করতে থাকে যে, কোন মানুষ যেন যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছে। অন্ধকারে নানা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের উদ্ভব হয়—কুলি-কামিনরা কয়লা খাদে আর্তনাদ করে, যারা তখনও মরেনি তাদের আর আশায় কবর-খোলাটা যেন হাই তুলছে, পিশাচের দল অতৃপ্ত তৃষ্ণার জ্বালায় ছটফট করে চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আঁধারে ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই, মা আমাকে অভয় দিয়ে দরজাটা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের কালো পর্দাটা খুলে গেল। কিন্তু আমার মন তবু সায় পেল না। কেরোসিনের ল্যাম্পটা মিট্‌-মিট করে জ্বলছে। মা তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে হুড়কা লাগিয়ে দিল। বড় রাস্তার ওপারের জমিতে বেতের চাষ হয়। বেতের ডলাগুলো বাতাসের অনুপস্থিতিতেও অনবরত খস্‌খস্ শব্দ করে। খনির মজুরেরা যখন সারা দিনের কাজ শেষ করে ঘরে ফেরে তখন তারা এমন শ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, কোন রকমে চোখ-কান বুঁজে খাওয়া শেষ করবা মাত্রই মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ে। লোকে কথায় বলে, শেষ বিচারের দিন গাব্রিয়েল ঢাক পিটিয়েও এদের ঘুম ভাঙাতে পারবে না, তাকে ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হবে। মা কিন্তু কখনও সে রকম কিছু প্রকাশ করেনি। সে বরং বলত, পাদরি-পল্লীর বাড়ীগুলো আমাদের এত কাছে যে, কেউ এসে আমাদের উত্যক্ত করতে পারবে না।

এক দিন রাত্তে আমাদের দরজায় কে যেন সসঙ্কোচে শব্দ করল। মা গিয়ে দরজা খুলতেই দেখতে পেল, এক বিরাটকায় নিগ্রো কাঁপতে-কাঁপতে একটা চেয়ারের উপর হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল। তাকে দেখেই বেশ বোঝা গেল যে, খুব মার খেয়েছে। একটা চোখ বুঁজে আছে, আর একটা সাদা চোখ চক্‌চক করছে। ঠোঁট দু'টো ক্ষত-বিক্ষত। মা পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু আমি দেখলাম, সে-ও কাঁপছে।

'মাফ করবেন, মাফ করবেন গিন্নি-মা, আমার বেয়াদবি মাফ করবেন!' সে বলে চলল। 'সাদা লোকেরা আমাকে মেরে

ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু কি মনে করে কয়লা-বোঝাই একটা গাড়ীর উপর চাপিয়ে দিল। গাড়ীটা এখানকার ক্রশিং-এর কাছাকাছি আসতেই আমি গড়িয়ে নীচে পড়ে গেলাম। তেষ্টায় আমার তখন ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, এখানকার চাষীদের কাছে একটু জল চাইলাম, কিন্তু তারা জলের বদলে কুকুর লেলিয়ে দিল। যেমন খিদে, তেমনি তেষ্টা আমাকে পেয়ে বসেছে। দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি নে। আমাকে দেখে ভয় পাবেন না গিন্নি-মা, আপনাদের কারুর কোন ক্ষতি আমি করব না। আমি বদ্‌লোক নই, নেহাৎ গরিব, আমার বাড়ী এখান থেকে অনেক দূরে, আলাবামায়, সেখান থেকেই আসছি।'

'তারা কেন তোমাকে মেরেছে?' শান্ত কণ্ঠে মা জানতে চাইল।

'কেন যে তারা আমাকে মারল, আমি তা জানি নে। আমাকে মারতে মারতে শুধু এই বলেছিল, ব্যাটা ছোটলোক কোথাকার, আমাদের রুটিতে ভাগ বসাতে আর কখনও আসবি ত খুন করে ফেলব!'

'ও, তাই বল, তুমি রুটিতে ভাগ বসাতে চাও?' মায়ের কণ্ঠে অভিযোগের সুর। 'তুমি তা হলে অন্য লোকের রুটি মেরে দিয়েছিলে? তা হলে ত তোমার মত লোককে মারাই উচিত।'

আমার কিন্তু ভয় হল, পাছে লোকটা রেগে গিয়ে অনর্থ বাধিয়ে বসে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হল যে, সে বিস্মিত হয়েছে। একটা চোখে তখনও সে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

'আমার যদি দোষ হয়ে থাকে ত বাজপাখীকে লোকে যেমন করে গুলী করে মারে তেমনি করে মেরে ফেলুন,' সে গম্ভীর ভাবে বলে উঠল। তার সুরে আন্তরিকতা। 'সাদা মজির লোক এসে শুধালো, মিসৌরি গিয়ে কাজ করতে রাজী আছি কি না? এর আগে অবশ্য সে অঞ্চলে কখনও যাইনি, তবুও বললাম—রাজী আছি। তারা আমাকে জাহাজে তুলে দিল। সেবিয়ার নামে ছোট একটি শহরে এসে জাহাজ থেকে নামলাম। জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখবার জন্যে রাতে একটু বেরোলাম। পথে সাদা লোকেরা আমাকে দেখেই মারতে শুরু করে দিল। তার পর তারা একটা কয়লা-বোঝাই গাড়ীর ছাদে চাপিয়ে দিল, তাই আমি এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু আমি কখনও কারুর অনিষ্ট কল্পনাও করিনি।

নিগ্রোটা কৃতজ্ঞ চিত্তেই পান-ভোজন শেষ করল। যাওয়ার সময় আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল, এ রকম অবস্থায় সে আর কখনও পড়বে না। সে দিনটা ছিল বেশ গরম, কিন্তু তবু মা সাবধানতার সঙ্গে দরজা-জানলা সব বন্ধ করল, ফলে অত গরমে আমাদের দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। ঘরখানা যেন হাপর। বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমরা এক ঘরেই ঘুমোই, আমার বোন ও মা এক বিছানায়, আর আমি আলাদা বিছানায়। দোতলার ঘরগুলি খালি পড়ে ছিল, তাই আমার ভয় পাচ্ছিল। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখি, ঘামে একেবারে ভিজে গেছি। মা বোনকে তালপাতার পাখায় বাতাস করছে, পাখা চালনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই সে আমার দিকে ফিরে আমাকে বাতাস করতে সুরু করল। পাখার হাওয়ায় বেশ একটু আরামই বোধ করছিলাম। প্রাতে ঘুম থেকে উঠে অবশ্য মায়ের দিকে তাকাতেই দেখলাম, রাত জাগার জন্যে তার মুখখানি শুকিয়ে গেছে, চোখের কোণে কালি।

আমরা অবশ্য কখনও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করিনি, কিন্তু এখন দেখতে পেলাম, আগের চেয়ে ঢের কম খরচে আমাদের চলছে। বাবার মৃত্যুর পর প্রথম প্রথম দিন কয়েক খনির মজুর ও তাদের গৃহিণীরা আমাদের জন্যে সামান্য উপহার নিয়ে আসত, কিন্তু সপ্তাহ কয়েক বাদেই সে সব বন্ধ হয়ে গেল।

এক দিন গীর্জা থেকে এক দল লোক এল আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে। সামনের ঘরে তারা বেশ জেঁকে বসল। তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি প্রতিটি ছিদ্রে কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল।

ওঁদেরই গোছের একটি মহিলা মাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'আমরা এসেছি পিতৃহারা ছেলেমেয়ে দু'টির একটা হিল্লে আর তোমার জীবিকার একটা পাকা ব্যবস্থা করবার জন্যে। জানি তুমি খুব আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়েছ। এখন তোমাকে না দেখলে খৃষ্টান হিসেবে আমাদের কর্তব্যহীনতার পরিচয় দেওয়া হবে। শুনেছি, ছেলেমেয়ে দু'টি পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না, পরনে আবশ্যক জামা-কাপড় নেই। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। (শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধকে দেখিয়ে) ওঁর নাম মিষ্টার রাইয়েরসন; ইনি ছেলেটিকে নেবেন আর আমি নেবো মেয়েটিকে। মেয়েটি নেহাৎ ছেলেমানুষ, নিজের উদরান্ন-সংস্থানের যোগ্যতা অর্জন করতে ঢের দেরী, কিন্তু ছেলেটি বেশ বড় হয়েছে, এখনই চাষবাসের কাজে লেগে যেতে পারবে। আর তোমার জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে জেথ্‌রো হেইনেস সাহেবের ওখানে। তাঁর স্ত্রী বছর কয়েক যাবৎ শয্যাগত আছেন। তোমার কাজ হবে সংসারের কাজকর্ম দেখা, বিশেষ করে, তাঁর পরিচর্যা।'

মায়ের মুখখানি দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল। ভীত হয়েও পড়ল। মুখখানি কাচু-মাচু করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল: 'আপনারা বৃহৎ লোক, দয়ার সীমা নেই, কিন্তু আমি আমার 'ঘর' ভাঙতে চাই নে, প্রাণপণ চেষ্টা করে ছেলেমেয়ে দু'টোকে 'মানুষ' করে তুলতেই চাই, যদি একান্তই না পারি, তখন অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে।'

গীর্জার প্রতিনিধি দল দরিদ্র বিধবার সোজা সরল উক্তির মধ্যে অকৃতজ্ঞতার আমেজ পেয়ে বিশেষ ভাবে অপমানিত বোধ করল। তারা একযোগে আড়ষ্ট ভাবে উঠে দাঁড়াল। বোঝা গেল, এর পর আমাদের সম্বন্ধে তারা আর কিছুই করবে না, কেন না, যাওয়ার সময় তারা শুধু এই বলে গেল যে, সাহায্য প্রত্যাখ্যান করায় তারা বিশেষ দুঃখিত।

তাদের চলে যাওয়ার পর দু'হাতে আমার মুখখানি তুলে ধরে মা এমন সাগ্রহে তাকাল যে, আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

মা বলল: 'এখন থেকে তোমাকে মানুষ হয়ে উঠতে হবে,' মায়ের স্বরে গাম্ভীর্য। 'তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এরা আর কখনও সাহায্য করতে চাইবে না।'

মানুষ হয়ে ওঠা মানে যে কি, সে সম্বন্ধে সেদিন আমার কোন স্পষ্ট ধারণাই ছিল না, তবু সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলাম। বাইরে পাহাড়তলীতে তখন গীর্জা-পল্লীর ছেলেমেয়েরা গান জুড়ে দিয়েছে, সুতরাং তাদের দলে ভিড়বার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল। ছেলেরা তখন গাইছে:

এক পালি গম,
এক পালি যব,
সব এখনো পাকেনি
আমি করব কি ?

বুঝতে পারলাম, কানা-মাছি খেলা পুরো দমে জমেছে, তাই এক দৌড়ে গিয়ে মাঠে পৌঁছলাম। আমার পৌঁছবার আগেই যে বুড়ি হয়েছে, সে একটা গাছের গুঁড়িতে চোখ ঢেকে লুকিয়ে সেখান থেকে খানাতল্লাসের ইঙ্গিত দিয়ে গেয়ে উঠল :

এক পালি মই
এক পালি ত্রিপত্র ;
কিছু লুকোনো নেই,
লুকিয়েও থাকতে পারবে না।

পরদিন মা বলল, ঝরণায় কাপড় কাচতে যেতে হবে। পাদরি-পল্লীর সামনেই অর্ধ-বৃত্তাকারে ঝরণাটা অবস্থিত। অনাবৃষ্টিতে যখন মাঠের জমি শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়, তখনও পাহাড়ের ফাটল বেয়ে ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল নালা দিয়ে ঝির-ঝির করে বয়ে আসে, আর তার চার পাশে ঘাস ও নানা রকম আগাছা জন্মায়। কয়লা-খাদের কুলি-কামিনদের কাপড়-চোপড় এখানে কাচা হয়। কেন না, এখানে কাচলে জল বাড়ী বয়ে নিয়ে যেতে হয় না। তা ছাড়া, এখান দিয়ে লোক-জন হামেশা যাতায়াত করে, ফলে যারা কাপড় কাচে তাদের নিঃসঙ্গ বোধ হয় না। কুলিকামিনদের কাপড়-জামা তারা নিজেরাই কাচে, কিন্তু যাদের বৌ বা ঘরে মেয়েছেলে নেই, জামা-কাপড় কাচবার জন্যে পয়সা দিয়ে লোক রাখতে হয়।

আমাদের কাজ শুরু হল। শুধু কুলিকামিনদের কাপড়ই কাচতাম না, কসাই কোক-এর কাপড়ও কাচতে লাগলাম।

আমি আর আমার বোন অবশ্য ঝরণায় যাওয়াটাকে একটা খেলা হিসেবেই নিলাম। মা সারা দিন কাপড় সিদ্ধ করে, আর আমরা দু'ভাই-বোনে শুকনো কাঠ-খড় কুড়িয়ে আনি। সময় সময় জলও বয়ে আনতে হয়। যতটুকু পারি, মাকে সাহায্য করি। নালায় সাবানের ময়লা গরম ফেনা জমে ওঠে। জল জমে জমে এক-একটা জায়গায় বেশ কাদা জমে আছে, সেখানে চিংড়ি মাছেরা বাসা বেঁধেছে। রাজমিস্ত্রী বোলতার দল এসে সেখান থেকে কাদা-মাটি আহরণ করে তাদের হাজার কামরার ঘর সাজায়। ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতার সমাবেশে আমাদের মনে হত যে, মাইল কয়েকের মধ্যে কাদা-মাটির এ রকম সমারোহ সম্ভবত আর একটিও নেই। নালার ধারে নেমে এসে বোলতার দল সাগ্রহে এমন গুঞ্জন শুরু করে যে, মনে হয়, তারা যেন পরস্পরে কোন গভীর সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত।

মায়ের হাত দু'খানি ক্রমাগত জলে ভিজে ভিজে সব সময়েই কুঁকড়ে থাকে, আর কাপড় কাচবার পর রং হয় তার পাঁশুটে, কিন্তু রাত্রিতে যখন হাত দু'খানি শুকিয়ে যায় তখন রং হয় লাল, উজ্জ্বল। কপালের বলি-রেখাগুলো কিন্তু কখনও মিলিয়ে যেতে দেখি নে। তার স্বাভাবিক ফেকাসে মুখখানিও এমন আরক্তিম থাকে যে, দেখলেই মনে হয় যেন স্থায়ী জ্বরে ভুগছে। সারা দিন গরম জলের তাপে তার মাথাটা ছেয়ে থাকে। কাপড় কাচা পাটার সঙ্গে তার কোমরের ক্রমাগত সংঘর্ষ চলে, আর জামার সামনেটা সব সময় সাবানের ফেনায় ভিজে থাকে। কলের মত অবিশ্রাম সে দুলতে থাকে, কাচা কাপড় শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়ার ফাঁকে বা উনুনের আঁচ ঠিক করে দেওয়ার সময়টুকু মাত্র তার অবসর।

তিনটি পাথরের উপর লোহার ভাঁটি বসানো, আমরা দু' ভাই-বোনে কাঠ কুড়িয়ে এনে ভাঁটির নীচে জোগান দিয়ে আগুন ঠিক রাখি। শুক গাছের টুনকো ডাল বাতাসে ভেঙে পড়ে চার দিকে ছড়িয়ে থাকে, সেগুলো সংগ্রহ করাই আমাদের প্রধান কাজ। সব সময়েই মা আমাদের সাবধান করে—খবরদার, যেন জ্বালানির সঙ্গে কোন পোকা-মাকড় পুড়িয়ে না মারি—প্রাণী মাত্রেরই না কি সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। কোন ডাল আগুনে দেওয়ার পর যদি দেখা যেত যে পিঁপড়ে বা কোন কীট আছে, সঙ্গে সঙ্গেই ডালটা উনুন থেকে টেনে ফেলে নিবিয়ে দিই।

শ্রীমতী কোক্‌-এর জামা-কাপড় সম্পর্কে মায়ের সাবধানতার সীমা ছিল না। তার জামা-কাপড়ের মত দামী কাপড় আমরা কখনও দেখিনি। মিষ্টার কোকের কামিজের কফ, কলার ও বুক খুব শক্ত করতে হত। জামা-কাপড়ের ইস্তিরি যদি সমান না হত বা কাপড় যথেষ্ট ফরসা না হত, তা হলে শ্রীমতীর মুখে অভিযোগের খই ফুটত।

জামা-কাপড় রাত্রিতে ইস্তিরি করা হত। আমাদের শুয়ে পড়ার অনেক পর পর্যন্তও ইস্তিরি চলছে বুঝতে পারতাম। সময় সময় নিরুপায় হয়ে মা আমাদের ঘরের দরজা খুলে রাখত, কিন্তু নিশাচর পাখীর কিচিমিচি, অথবা দমকা বাতাসে বেতবনের খসখসানিতে ভয় পেয়ে মা তাড়াতাড়ি সব দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ করে দিত। সময় সময় আমি চুপি-চুপি গিয়ে মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি, মায়ের বজ্রমুষ্টি তখনও সমানে ইস্তিরি চালিয়ে চলেছে। কাজ করতে করতে মাথার চুল চোখে-মুখে এসে পড়েছে, সাবানের ফেনা-মাখা হাতে কাঁচা-পাকা চুলগুলি ঠেলে সরিয়ে দেয়। ইস্তিরি করতে করতে সময় সময় দেখা যায়, মায়ের চোখ দু'টো বুজে আছে। নাকের ডগা আর গাল বেয়ে তার ঘাম ঝরে পড়ছে।

কয়েক বছর পর আমি রেল-পথ মেরামতের কাজে বাড়তি মজুর হিসেবে কাজ শুরু করি। সময়টা গ্রীষ্মকাল, এমন গরম যে, সারা দিনে এক হাতের বেশী রেল বসানো সম্ভব হত না। পাথরের নুড়ি-গুলি মনে হত যেন জ্বলন্ত কয়লা; আগের দিকের বসানো রেল অত্যধিক গরমে বেঁকে দুমড়ে যেত। এক দিন আমাদের দলের একটা ছেলে চিমটায় বড় পেরেক ধরে সেটা আঁটতে যাচ্ছে, আর এক জন হাতের লম্বা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সেটা চাপতে গিয়ে মাথা ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, ফলে এমনি জোরে গিয়ে ডাণ্ডাটা লোকটার মাথায় পড়ল যে, ডিমের খোলার মত তার মাথাটা চৌচির হয়ে গেল। করুণ নীরবতার মধ্যে আমরা ঠেলা-গাড়ী নিয়ে আড্ডায় গিয়ে পৌঁছলাম।

পাচক খাবার দিয়ে গেল। আমরা খেতে বসলাম, কিন্তু প্রত্যেকের মনই বিষাদক্লিষ্ট। গরম খাবারে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়াটা উড়িয়ে দিতে গিয়ে ভক্‌ করে এমন একটা দুর্গন্ধ নাকে এল যে, আমাদের সকলেরই পেটের ভিতর পাক দিয়ে উঠল—যেন একটা কিছু পচে গলে আছে। এক জন দেখতে গেল, তার থালায় দু'টো মরা মাছি রয়েছে। লোকটা নেকড়ে বাঘের মত গর্জন করে

উঠে খাবার-শুদ্ধ থালাটা পাচকের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ক্ষেপে গেলাম। লোকটা এক লাফে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছুটতে লাগল, আমরাও সকলে তাকে তাড়া করে পিছন পিছন ছুটলাম। ঢিল মেরে তাকে শহরের বাইরে খেদিয়ে দিলাম।

আমরা যখন লোকটার পিছনে দৌড়াচ্ছিলাম, তখন সবুজ কার্পেটের মত তৃণ-ভূমিতে ঘেরা প্রাচীর-বেষ্টিত একটি বাড়ী থেকে একটি প্রিয়দর্শন মহিলা বেরিয়ে আসছিলেন। তৃণ-ভূমিতে জল সেচন করবার জন্যে যে সব ঘূর্ণ্যমান জলের কল আছে, তারই একটিতে সাঁতারের পোশাক-পরা একটি ছোট ছেলে হেলান দিয়ে বসেছিল। মহিলাটি ছুটে এসে ভিজা ছেলেটিকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরে বসলেন, 'ওই বদলোকগুলো তোমাকে মারতে পারে!'

আমাদের রুক্ষ চেহারা দেখে ওঁর মনে হয়েছিল যে, আমরা হয়ত হিংস্র জানোয়ার। কিন্তু আমরা মাকে বললাম, আপনার ছেলের কোন অনিষ্টই আমরা করব না। রৌদ্রে আমরা কিছুটা কাবু হয়ে পড়েছি মাত্র।

তাঁর উদ্ধত আচরণ আমাদের হতবাক্ করে দিল। আমরা আর একটি কথাও বললাম না। হুইস্কির নেশা যেমন অল্পক্ষণ পরেই কেটে যায়, তেমনি আমাদের রাগও একটু বাদেই পড়ে গেল। তখন লজ্জায় গ্লানিতে আমরা অস্বস্থ বোধ করছিলাম। পাচকটা কোন্ কোণাঘুচি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর আমরা তখন আবার খুঁজতে খুঁজতে আড্ডায় ফিরে এলাম কাপড়-চোপড় নেওয়ার জন্যে।

মাতৃ-বন্দনার দিন তারা যখন টেবিলে খাবার ধরে দিল তখন সেগুলো গলাধঃকরণ করতে আমার একটুও আটকালো না। সেদিনকার সেই ছোট ছেলেটির মায়ের মত উপাদানেই হয়ত সব মায়েরা তৈরি। কিন্তু যে মা কয়লা খনির শহরে গভীর রাত্রিতে পরের জামা-কাপড় ইস্তিরি করে কাটায়, তার সম্পর্কেও কি সেই কথাই বলা চলে? সারা পশ্চিমাঞ্চলে কখনও এমন একটি উপহার খুঁজে পাইনি যা আমার মায়ের যোগ্য—এমন কোন জিনিস কোন দিন দেখিনি যা আমার মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে দেওয়া যায়, যে মা রাতের পর রাত ঘর্মাক্ত কলেবরে ইস্তিরি চালিয়েছে, দিনের পর দিন ধূমায়িত ভাঁটির উপর ঝুঁকে পড়ে কাপড় ধোলাই করেছে।

প্রেমের কবিতা

অরবিন্দ গুহ

আধো-ভেজা ফাগুনের শিশিরে ধূসর নীল রাতে
তোমার দু'চোখে রাত ঘুম যদি না চায় ছড়াতে,
ঘুম যদি নাই আসে,—না-ই হ'লো, না-ই হ'লো ঘুম;
জেগে থেকো সেই রাতে—যেই রাত শিশিরে নিঝুম।
নিজের মনের কাছে তুমি বুঝি কেবলি শুধাও:
খালের এ-পারে এসে এই রাতে বাঁধে কারা নাও?
পার হয়ে এলো সে যে কত নীল সাগরের সুর,—
আরো কত মেঘময় ছায়া-ভরা নিরালা দুপুর!
তোমার হৃদয় বুঝি ঠেলে এই জোয়ারের রাত,
ভেসে চলে আর ভাবে কত দূরে চাঁদের প্রপাত!
কত পথ পার হ'লে হৃদয়ের মুছে যায় ভয়
জনহীন কোনখানে নোঙরের নিরালা সময়!
ঘুমহারা ভীরু চোখে হারায়েছো হরিণীর দিশা?
ভয় কি,—আমি তো আছি, আকাশে তো আছে শতভিষা!

ভয়ঙ্কর দেখালো।

বাসে, ট্রামে গরুর গাড়ীর জটাজালে পথ অদৃশ্য। হাওড়া ব্রীজ থেকে নামতে নামতে পাঁচ-মাথার মোড়ে এসে আটকে গেল বাসটা। গ্রাম্য মেয়েটার চোখ শংকায় কুটিল।

শুভ্র হাতের মণিবন্ধে বাঁধা ছোট রিষ্ট ওয়াচটার দিকে একবার তাকাল মণিকা। হাওড়াগামী ট্রামটা নিশ্চল এই পনর মিনিট। ওর শাখের মত মসৃণ কপালে কয়েকটি কুঞ্চন-রেখা দেখা দিল।

ন্যুইসেন্স!

সর্ব অঙ্গে একটা বিরক্তির অনুভূতি শিরশিরিয়ে উঠছে মণিকার।

ন'টার সময় খেয়ে উঠেছি—ট্রামে আসছিলাম, ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে এসে স্যার আটকে গেল ট্রামটা। আগে জানলে স্যার হেঁটেই আসতুম। পঁচার বাবা কৈফিয়ৎটা রপ্ত করে।

এই গাড্ডী হটো—এ ঘোড়া গাড়ী।

আপ চল্‌তা হ্যায় ইঞ্জিন পর। ম্যয় তো জান পর। ঘোড়া শুনিয়ে সর্দ্দারজী। কচ্যা···কচ্যা···সত্যিই এগোবার চেষ্টা করে ঘোড়ার গাড়ী। কিন্তু সত্যিই পথ নেই।

ইস্, কি মনে করবে হীরক। একটা কিছু করতে ইচ্ছে করছে মণিকার।

বাকী টিকিট? টিকিট আপকা?

আরে বাপু দাঁড়াও, ভীড়ে চিপসে গেলুম, দাঁড়াবার জায়গা নেই —কেবল টিকিট!

আরে মশাই, নেবান না সিগারেটটা। ভীড়ে লোকে দাঁড়াবার জায়গা পায় না—তবু সিগারেট না ধরালেই নয়?

তাই বলে ছাতাটা দিয়ে আমায় খোঁচা দেবেন? ধূমপান-বিরোধী ভদ্রলোকটি লজ্জিত ভাবে চুপ করে গেলেন।

ও-পাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে রাস্তা দেখছিল যে মারোয়াড়ি মেয়েটি, তাকে দেখে গুন্‌-গুনিয়ে কয়েকটি লাইন মনে এল কবি ছেলেটির:

সোনালী ফসল, প্রাণ ফসল
সোনা-ঝরানো ক্ষেত—
এসেছ তুমি, এসেছি আমি
মিলেছি দোঁহে।

লাইনগুলো বার-কর মনে মনে আবৃত্তি করলো সুবিকাশ। কিন্তু ট্রামের বাঁ-পাশে একটা মোটর কেবলি [illegible]র্ণ দিচ্ছে। মোটর জিনিসটা পৃথিবী থেকে লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি নেই।

কন্‌ট্রোল-রুমে ট্রাফিক পুলিশটি [illegible]বিকার।

হঠাৎ হর্ণ, ঘণ্টা সব একসঙ্গে বেজে উঠলো—আর কবিতার লাইন

প্রদ্যোত গুহ

ক'টি হারিয়ে গেল সুবিকাশের। এতক্ষণ বাদে বোধ হয় সকলের খেয়াল হল যে, রাস্তা অনেকক্ষণ জ্যাম হয়ে আছে। একটু গা-নাড়া দিল সকলে।

এক কদম এগিয়ে আবার থেমে গেল ট্রামটা। রসিকতা!

আয়নার সামনে দাঁড়ালে কুৎসিত দেখাবে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সত্ত্বেও কপালে-মুখে কয়েকটি সর্পিল রেখা ফুটে উঠলো মণিকার।

আধ ঘণ্টা হয়ে গেল। ইস্, কি মনে করবে হীরক। এতক্ষণে হয়ত গাড়ী ইন্ করেছে ষ্টেশনে। হেল···

চার বৎসর আগে হীরক যেদিন দেখা করতে এসেছিল মণিকার সাথে, সেদিনকার কথা অবশ্য আজ মনে পড়ছে না। সেদিন হীরককে পুরো আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল ড্রয়িং-রুমে। আর তার জন্ত একটুও তাগিদ অনুভব করেনি মণিকা।

অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তোমাকে, কষ্ট করে একটু হাসি ভাব ফুটিয়ে তুলেছিল মণিকা।

চলে যাচ্ছি মণি, কোন দিন যদি পয়সা রোজগার করতে পারি তবেই ফিরবো···

তাই না কি···বিস্ময়ের ভাব দেখিয়েছিল মণিকা।

দু'টো বছর আমার জন্ত অপেক্ষা ক'রো মণি···মিনতি করেছিল হীরক।

পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট গেজিয়ে বিদেয় হয়েছিল হীরক। বান্ধবী

শিপ্রার কাছে বসিয়ে ঘটনাটির বর্ণনা করে প্রাণ খুলে হেসেছিল মণিকা।

সে এক solemn ব্যাপার—তুই যদি দেখতিস, শিপ্রা! যত sentimental foolsএর পাল্লায় পড়তে হয় আমাকে—avoide করতে পারি না। কত কষ্টে যে হাসি চাপতে হয়েছিল—সে তোকে কি বলবো!

কিন্তু সেদিনকার কথা স্বতন্ত্র। আজ হীরকের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স রূপকথা!

...জোর খবর! জোর খবর! পাকিস্তান উলট্ গিয়া... আনন্দবাজার, বোসুমতি, ইস্‌টেইস্‌ম্যান!...

শংকিত গ্রাম্য বৌটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। কী কুক্ষণেই কলকাতা দেখবার আবদার জানিয়েছিল মেয়েটা। শংকিত বিস্মিত ভীরু চোখে চারি দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন হিম্‌হিমিয়ে আসে।

বড্ড ভয় কইরছে গো!

মোলো যা, ভয় কিসের? 'ল্যা যাও—ল্যা যাও' করে যে মাথা খেয়ে ফেলেছিলি?

কাজ নাই শহর দেখে।

মোলো যা!

বোকামী বৃন্দাবনেরই—মেয়েমানুষের কথায় কান দিতে আছে। মা ত বারণই করেছিল। কিন্তু এমন ভাবে ঠোঁট ফুলিয়ে আবদার জানিয়েছিল আহ্লাদী—বৃন্দাবন সে আবদার ঠেলতে পারেনি। কি ঝকমারীটাই না হয়েছে! হেড বেয়ারাকে কত ভজিয়ে তবেই না ছুটিটা আদায় করা গেছে। এমন মেয়েমানুষ নিয়ে বেরোতে আছে!

কিন্তু আহ্লাদীরই বা কি দোষ! কলকাতার এত কাছে থেকে, স্বামী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা দেখার সখ কি অন্যায়?

...এই গাড্ডী বিচমে। এই রাস্তা হঠ যাও। বাসের শিখ ড্রাইভার রীতিমত রেগে উঠছে। লেট অবধারিত। শালা, উল্লু!...

ব্যালকনির মারোয়াড়ি মেয়েটি কেন জানি হাসছে! হারানো লাইন ক'টি ফের মনে পড়লো সুবিকাশের:

এসেছ তুমি, এসেছি আমি
মিলেছি দোঁহে।

লেকিন তুমি দেখে লিও রমেশ বাবু...বাজার আরও খারাব হ'বে!

না, আর মেলান যায় না কবিতা। বিরক্ত হয়ে ওঠে ছেলেটি। কিন্তু মেয়েটি বেশ। মারোয়াড়ি নয়, বোধ হয় গুজরাটি। কিন্তু দ' দশটার ক্লাশটা গেল।

ক'টা বেজেছে দাদা? পাশের ভদ্রলোককে আর একবার প্রশ্ন করেন পঁচার বাবা।

দশটা কুড়ি...এবার রীতিমত বিরক্ত হয়েছে ভদ্রলোক।

দশটা কুড়ি! এতক্ষণের রঙ-করা কৈফিয়তে কোন কাজ হবে বলে ভরসা করতে পারেন না পঁচার বাবা।

বেরোবার সময় ঐ অলক্ষুণে মেয়েটার মুখ দেখার পরই বুঝতে পেরেছিলেন পঁচার বাবা—দিনটা আজ ভাল যাবে না। দুম করে একটা কীল বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে মুখপুড়ীর পিঠে। অলক্ষুণে আলপ্পেয়ে মেয়েটার রোজই অফিসে যাওয়ার সময় এসে সামনে দাঁড়ান চাই। বিয়ে দিতে হবে বলে ফ্রক ছাড়াননি—তবু ধিঙ্গি হয়ে উঠছে লক্ষ্মীছাড়ী!

এই বাস, হঠো, পিছে যাও!

এতক্ষণে একটি লাল-মুখের আবির্ভাব হয়েছে।

গাড়ীটা যেন একটু লেট হয় আজ! ইস্, কি কেলেঙ্কারীটাই না হোল। মা পই-পই করে বলেছিলেন, মোটর নিয়ে বেরোতে। কেলেঙ্কারী, কি ভাববে হীরক! ওঃ হেল...

আর কোথায় উঠছেন মশাই? গাড়ীটা ছাড়বেও না...

শুধু একটা পা রাখবো মশাই।

জায়গা কোথায় আর?

শুধু একটা পা মশাই, লেট হয়ে যাব মশাই।

ব্যালকনির মেয়েটির মুক্তোর মত দাঁতগুলো সূর্য্যের আলোয় ঝকমক করছে। বেশ লাগছিল। এমন সময় বেরসিকের মত রাস্তাটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে যাবার কি দরকার ছিল—বুঝতে পারে না কবি ছেলেটি।

যাক, দু' মিনিট সময় আছে এখনও। হীরক নিশ্চয়ই একটু অপেক্ষা করবে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমালটি বার করে কপালের ওপর জমে-ওঠা স্বেদবিন্দু ক'টি মুছে নিল মণিকা। কপালের মুখের কুৎসিত সর্পিল রেখা ক'টি মিলিয়ে এসেছে।

বাকী টিকিট? টিকিট আপকা?

আরে বাপু, হয়ে গেছে।

আপকা?

মাড়োয়াড়ি না গুজরাটি মেয়েটির হাসির রেশটা মনে থাকলেও চেহারার আদলটা আর কিছুতেই মনে করা যাচ্ছে না।

রোখো, রোখো—এই রোখো।

বারে বারে ঘন্টা বাজাতে থাকেন পঁচার বাবা। পঁচিশ মিনিট লেট হয়ে গেছে।

রোখো! রোখো!

কিন্তু যতই ঘন্টা বাজান না কেন, ডালহৌসির আগে আর থামবে না বাস। ডালহৌসি থেকে ষ্ট্রাণ্ড রোড অবধি ফিরে এসে তবে আফিস করতে হবে পঁচার বাবাকে।

রোখো! রোখো! তবু আর একবার ঘন্টা বাজালেন পঁচার বাবা।

ভ্রম সংশোধন

"নিরক্ষর" উপন্যাসের চব্বিশ পরিচ্ছেদের পর ভ্রমবশতঃ 'সাতাশ' ছাপা হইয়াছে, কিন্তু ঘটনা-সমাবেশ ঠিকই আছে। পাঠকগণ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মাঃ বঃ সঃ

কিষাণ-মজদুর-প্রজারাজ

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের কোটি-কোটি কৃষক-শ্রমিকের চরম দুর্দ্দশাই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্ব্বপ্রধান উৎস। যারা দুধে-ভাতে আছে,—তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি জাতীয় আত্মাভিমান; তার গণ্ডী সমাজের উপর-তলায় সীমাবদ্ধ। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি এবং অর্দ্ধাহার, কিম্বা কর্ম্মহীনতা এবং উপবাসের রাজ্যে শুধু মাত্র তারই আঘাতের তীব্রতা মানুষকে নড়াতে পারে না। সমাজের নীচের স্তরের এই কোটি-কোটি স্বশ্রমজীবি মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, গোলামী-নির্য্যাতন যখন তাদের উন্মত্ত করে তোলে, এবং তারা তাদের প্রত্যক্ষ স্বদেশী শোষক পরশ্রমজীবি ধনিক-বণিক্-মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তখন সমাজের ওপরের স্তরের ঐ স্বদেশী বাবুরা বিদেশী শাসক-শোষকের দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রে তাদের উত্তপ্ত দণ্ড সেই দিকে পরিচালিত ক'রে নিজেদের জাতীয় আত্মাভিমানের চরিতার্থতার সুযোগ করে নেয়। এমনি করে এই গণশক্তির রুদ্র রোষকে তারা নিজেদের শ্রেণীর স্বাধীনতার সংগ্রামে যতটা ব্যবহার করতে পেরেছে, ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতার সংগ্রামের তীব্রতা ও ব্যাপকতার পরিমাণ ঠিক ততখানিই। জাগ্রত গণশক্তিকে এমনি করে বিভ্রান্ত ক'রে শ্রেণি-সংগ্রামের শক্তি খর্ব্ব করার বুর্জ্জোয়া জাতীয়তাবাদী কৌশলের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত, '৪৫ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে—কমার্শিয়্যাল মিউজিয়মে আচার্য্য কৃপালনীর প্রদত্ত বক্তৃতা ('হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড'—৬।১২।৪৫)—তিনি বলছেন:

"শ্রেণি-সংগ্রামে শ্রমিকদের কোন লাভ নেই! তাতে শুধু মনিব বদল হবে। শ্রমিকদের দুর্দ্দশার জন্যে দায়ী বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা। তার মূল হচ্ছে বিদেশী শাসন। যদি শ্রমিকরা এই শাসনের অবসান ঘটাতে পারে, তাহলেই ধনবাদ ধ্বংস হবে। তখন সার্ব্বজনীন প্রেমের দ্বারাই শ্রেণি-বিরোধেরও অবসান হবে।"

এমন মনোহারী হ য ব র ল, ব্যাখ্যা বা মন্তব্যের অতীত। শুধু বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে নীরবে তারিফ করার জিনিস।

*   *   *   *

"'৪৫ সালে আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের গড়পড়তা মাসিক মজুরী, পুরুষ—১।৵৩ পাই,—নারী—৭৵/১ পাই, এবং শিশু—৫৵৹/১০ ছিল। তার আগের বছরে ছিল যথাক্রমে ৮।৵৪, ৬৵৹/৪, এবং ৫।২ পাই।

"এই মজুরীর সঙ্গে কিছু খাদ্য এবং বস্ত্র মজুরদের সস্তায় দেওয়া হয়। সে খাতে তাদের রোজগার মজুরীর দুই-তৃতীয়াংশের সমান,—প্রতি টাকায় ।৵১ পাইয়ের মতন।'—('ষ্টেটসম্যান'—১১।১২।৪৫)

অর্থাৎ চাকুরিয়া সর্ব্বসাকল্যে যা রোজগার করে, তার পরিমাণ—পুরুষ—প্রায় ১৬ টাকা, মেয়েরা—প্রায় ১৩ টাকা, এবং শিশুরা—প্রায় ১ টাকা। এরা উদয়াস্ত খাটে,—যথেষ্ট রোগে ভোগে এবং উপোস করে,—এবং বেঁচে থাকে নেহাৎ মরণ অভাবেই। তাই, ৫।১২।৪৫এর 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে' সর্দ্দার প্যাটেলের এক বাণীতে বলা হয়েছে,—"সত্য এবং অহিংসা দিয়ে সঙ্ঘকে শক্তিশালী কর। যে কৃষ্টিবান্ শ্রমিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে পবিত্র এবং সরল জীবন যাপন করে,—সেই হ'চ্ছে যে-কোন মিল-এজেন্ট বা ধনী ব্যক্তির চেয়ে বহুগুণে সুখী ব্যক্তি।"

এ সব হচ্ছে মজুর শ্রেণীকে বিভিন্ন কায়দায় অহিংস আক্রমণের বিচিত্র দৃষ্টান্ত।

*   *   *   *

ঐ কাগজেই মহাত্মাজী আহমদাবাদ কাপড়ের কলের মজুরদের এক বাণী দিতে গিয়ে বলছেন,—"এক জন মজুর আর মজুর-সঙ্ঘকে কি বাণী দিতে পারে? নিজেকে নিজে বাণী দেওয়া কে কবে কোথায় শুনেছে?"

*   *   *   *

সর্দ্দার প্যাটেলের সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে প্রোঃ রঙ্গ বলছেন ('হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড'—২১।১০।৪৫)—"আপনি ১৯২৮ সালে বাপুজীর প্রেরণায় বারদোলীর কৃষকদের মধ্যে যে সত্যাগ্রহের যুগ এনেছিলেন, তারই ফলে আজ ভারতের ৩০ কোটি কৃষক ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবের মধ্যে বর্ত্তমান সম্মানজনক স্থান অধিকার করতে পেরেছে।"

*   *   *   *

বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে ২৮।৪।৪৩ এর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ:—"রোগীর সংখ্যা দশ লক্ষ;—হাসপাতালে যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার জন্তে শয্যা-সংখ্যা মোট ৩১০;—তার মধ্যে বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের খরচে চলে মোট ৮০টা শয্যা। স্যর ফ্রেডরিক এবং লেডী বারোজের (বাঙ্গলার লাট ও লাটপত্নী) যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল পরিদর্শন উপলক্ষে এই সব তথ্য-তালিকা প্রকাশ হয়েছে।"

৮।১।৪৮এর 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' সম্পাদকীয় প্যারায় যক্ষ্মারোগ সংক্রান্ত কর্ম্মী সম্মেলন উপলক্ষে বলা হয়েছে,—"ভারত ও পাকিস্তানে (অর্থাৎ বৃটিশ ভারতে—নাঃ বঃ) বছরে ৫ লক্ষ লোক যক্ষ্মারোগে মারা যায়, এবং অকর্ম্মণ্য হয়ে যায় তার ৫ গুণ (অর্থাৎ ২৫ লক্ষ লোক)।

"যক্ষ্মারোগের এই ভীষণ প্রকোপের জবাব হ'চ্ছে,—অনাহার-অর্দ্ধাহার-অপুষ্টি নিবারণ,—অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অজ্ঞতা, সামাজিক চেতনার অভাব প্রভৃতির অবসান।…"

*   *   *   *

এ জবাব কে দেবে? মোট এক মণ চালের দাম মজুরী নিয়ে যে মজুরকে এক মাস সারা দিন খাটতে হয়,—সেই মজুরকে যারা বলে,—"যেমন খাচ্চো তেমনি খাও, এবং আরো বেশী খাটো"—সেই মোটা মাইনের ধনিক-দালাল কিষাণ-মজদুর-প্রজারাজ-রামরাজ্যের ধাপ্পাবাজেরা?

*   *   *   *

ভারতের কংগ্রেসী সরকারের শ্রমনীতির বাস্তব রূপের একটু পরিচয় ১৬।৬।৪৭এর 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' বেরিয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকদের কাজের অবস্থা-ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্তে ভারত সরকার কারখানা সম্বন্ধীয় চীফ এডভাইসারের অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। সেই প্রতিষ্ঠান কারখানার কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারকে, দেশীয় রাজ্যগুলোকে এবং মালিকদের পরামর্শ দেবে;—কারখানা সংক্রান্ত আইন-কানুনগুলো প্রচার করবে, এবং কারখানা পরিদর্শক তৈরী করবে। তাদের পরামর্শ মানতে অবশ্য কেউ বাধ্য থাকবে না।

*   *   *   *

ঐ কাগজেই আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-দপ্তরের (লীগ অফ নেশনসের শ্রমিক-শাখা) সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে; তাতে বলা হয়েছে, দেশে দেশে কল-কারখানার শ্রমিকদের কাজের অবস্থা-ব্যবস্থা পরিদর্শনের

জন্যে একটা আন্তর্জাতিক পরিদর্শক কমিটি তৈরী হবে। ভারত সরকার সে সিদ্ধান্ত সমর্থন করবেন। কিন্তু ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী জগজীবনরাম বলছেন,—"আন্তর্জাতিক পরিদর্শক কমিটি ক'রে কী-ই বা হবে? সেটা করাও যাবে না, আর করা গেলেও কার্য্যকরী হবে না (neither practicable nor feasible)।"

শ্রমিকদের জন্যে সত্যিকারের মাথা-ব্যথা থাকলে মুনাফায় হাত পড়ে, অথচ মাথা-ব্যথা একটু না দেখালেও নয়, এমন অবস্থায় পর্ব্বত মূষিকই প্রসব করে থাকে!

বম্বেতে ভারতীয় বণিক-সভায় ভারতের অর্থসচিব সন্মুখম চেট্টী বলেছেন,—"ধনিকরা নিরুৎসাহ হন, এমন ভাবে ট্যাক্স বসানোর মধ্যে আমি নেই। অবশ্য তাঁদের খানিকটা সরকারী নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হবে, কিন্তু এ বিষয় তাঁরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এমন ভাবে করা হবে, যাতে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।" (বর্ত্তমান শিল্পনীতিতে ঠিক ঐ রকম ব্যবস্থাই হয়েছে)

এই কথার উল্লেখ করে 'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র আর্থিক সংবাদদাতা মন্তব্য করেছেন,—"চেট্টী নিজে এক জন দামী ব্যবসায়ী।"

—'ষ্টেটসম্যান' ৬।১০।৪৭

*　　*　　*　　*

ঐ কাগজেই পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ শ্রমিকদের অধিকার এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলছেন,—"স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ঘাড়ে কতখানি দায়িত্ব পড়েছে, তা তাদের বোঝা দরকার। এখন তারা রাষ্ট্রের অংশ, সুতরাং রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়, এমন কিছু যেন তারা না করে। সর্ব্বাধিক সংখ্যকের সর্ব্বাধিক কল্যাণের দিকেই তাদের নজর দেওয়া দরকার। গভর্ণমেণ্ট কৃষক-মজুর-প্রজা-রাজ করতে চায়; তাই বলে' অন্য শ্রেণীগুলো উপে যাবে না। শুধু নিজেদের কথাই ভাবলে চলবে না।"

কিন্তু শয়তানগুলোর স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক খোরাক খেয়ে পেট ভরে না;—ভৌতিক পেটের ভৌতিক খোরাক চায় স্বাধীন স্বদেশী সরকারের কাছে। ধিক্!

এই যে শ্রমিকের পেট কেটে ধনিকের বাণিজ্য ও মুনাফা বৃদ্ধির ষড়যন্ত্র, এই ষড়যন্ত্রেরই আর একটা দিক্ পরিস্ফুট হয়েছে বৃটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে ভারতের, অর্থাৎ ভারতীয় ধনিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থায়। এত কাল বৃটেন "ভারত এবং বৃটেন, উভয়ের কল্যাণের জন্যে" ভারত-বৃটেন বাণিজ্যের যে ব্যবস্থা করে' ভারতের কাঁচা মাল এবং সস্তায় মজুর শোষণ করে' এসেছে, আজ কংগ্রেসী লাটসাহেবদের আমলেও তাই করার ব্যবস্থা হ'চ্ছে। কিছু দিন আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে বৃটেনের যে বাণিজ্য চুক্তির কথা চলছিল, সেটার সম্বন্ধে '৪৭ সালের ২রা নভেম্বরের 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' তাদের লণ্ডন অফিস থেকে লিখিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে,—"এই বাণিজ্য-চুক্তির কথাবার্তা শুধু এই কারণেই ভেঙ্গে যেতে পারে যে, বৃটেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া, উভয় দেশকেই বিদেশ থেকে কাঁচা মাল আমদানী করতে হয়,—এবং শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী করে জমা-খরচ মেলাতে হয়।"

এ থেকে বোঝা যায়,—বৃটেনের সঙ্গে কারবার সেই সব দেশেরই জমে ভাল, যারা কাঁচা মাল রপ্তানী করে, এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানী করে;—অর্থাৎ শিল্পে অনুন্নত দেশ,—যার শিল্পোন্নতির পথ সুগম নয়। স্বভাবতঃই বৃটেনের স্বার্থ, সে দেশে শিল্পোন্নতির পথে কাঁটা দেওয়া।

এইবার এই যুক্তিটাকে ভারতের ওপর প্রয়োগ করলেই সাম্প্রতিক ভারত-বৃটেন বাণিজ্য-চুক্তির হুড়োহুড়ির প্রকৃতি বোঝা যাবে। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য-চুক্তি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

*　　*　　*　　*

১৫।১০।৪৭এর 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কমনওয়েলথ প্ল্যানিং সম্পর্কে বলা হয়েছে—"যেহেতু সমগ্র কমনওয়েলথের আর্থিক দুর্দ্দশাই সমান,—বিশেষতঃ যেহেতু বৃটেনের সঙ্গে কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতের মিল আছে বেশী,—দুই দেশকেই বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী করতে হয়,—অতএব অটোয়া সম্মেলনের সময় যেমন বিশেষজ্ঞরা সমস্ত ব্যাপারগুলো পরীক্ষা করেছিলেন, এখন আবার তেমনি করা উচিত।

"স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়াটা যদি বাঞ্ছনীয় হয়ও,—তা'হলেও আমদানী কমানোর চেষ্টা, এবং রপ্তানীর যোগ্য মালের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাই অপেক্ষাকৃত কার্য্যকরী হবে।

"আগে ভারত ও পাকিস্তানের কথা বুঝে নিতে হবে;—তার পর কমনওয়েলথ এবং সাম্রাজ্যের সম্পদ এবং সম্ভাবনা পরীক্ষা করতে হবে;—শেষে সমগ্র ষ্টার্লিং এলাকার আদান-প্রদান সম্বন্ধেও পরীক্ষা করতে হবে।"

*　　*　　*　　*

এশিয়া আঞ্চলিক সম্মেলনে (দিল্লীতে) পণ্ডিত নেহেরু তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন,—"ভারতের সব চেয়ে বড় সমস্যা আর্থিক। বিশাল জনসংখ্যার দারিদ্র্য, বেকারী অর্দ্ধ-উপবাস,—জীবনযাত্রার অতি নিম্ন মানদণ্ড,—এই সে সমস্যার রূপ।

"শিল্প শ্রমিকদের কথাও উপেক্ষণীয় নয়:—কিন্তু ভারত, এবং এশিয়ার প্রায় দেশগুলোই কৃষিপ্রধান,—এবং এখনও অনেক দিন তাই থাকবে। কাজেই কৃষির দিকে নজর দিতে হবে আগে।"—

—'ষ্টেটস্‌ম্যান', ২৮।১০।৪৭)

ইংরেজের গরজে ইংরেজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে স্বাধীন হলে এমনি হয়!

*　　*　　*　　*

৫।৮।৪৭এর 'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গভর্ণর নিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে,—"সংশোধিত '৩৫ সালের শাসন-বিধিই এখন চলছে, এবং তাতে গভর্ণরদের যে বিশেষ ক্ষমতা ছিল, তাও এখন রয়েছে;—বোধ হয়, নতুন যে শাসন-বিধি তৈরী হ'চ্ছে, তাতেও সেটা থাকবে। (বর্ত্তমান খসড়া শাসন-বিধিতে সেটা দেখা যাচ্ছে)

"ভারতে বিলেত থেকে যে দু'জন নতুন গভর্ণর আনানো হয়েছে, তাঁরা গভর্ণরদের পূর্ণ কার্য্যকাল পর্য্যন্ত গভর্ণর থাকবেন। এই সুন্দর ব্যবস্থার ফলে বৃটিশ-ভারত সম্পর্কটা মধুরতর হয়ে উঠবে।" (অর্থাৎ তাঁরা এখনও অনেক দিন থাকবেন)

অংশীদারিত্বের চুক্তি! মায়া-কাটানো সোজা নয়। মহাত্মা গান্ধীও বলেছেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সখটা সহজ, কিন্তু কাজটা সহজ নয়।"

ইংরেজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে পার্লামেণ্টের আইনের মঞ্জুরীতে সাম্রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও এমনিই হয়। ১৪।১০।৪৭এর

'ষ্টেটস্‌ম্যানে' রয়টারের খবরে প্রকাশ যে, ব্রহ্মদেশের ন্যাশনাল প্ল্যানিং সংক্রান্ত মন্ত্রী ইউ মিয়া বলেছেন,—"বিদেশী মূলধন এবং যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়া হবে ; কিন্তু কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা, এবং আমদানী-রপ্তানীর জমা-খরচ মেলানোর জন্যে রপ্তানী বৃদ্ধি করা,—এই দু'টো কাজের ব্যবস্থাই বর্ত্তমানে করা হবে। 'ক্ষমতা হস্তান্তরের' জন্যে প্রয়োজনীয় বর্ম্মা-বৃটেন চুক্তি আগামী শুক্রবারে লণ্ডনে স্বাক্ষরিত হবে।"

* * * * *

১১।১০।৪৫এর 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কমিটীর চেয়ারম্যান লেষ্টার বি পিয়ার্সন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলেছেন,—"ভারতে ভবিষ্যৎ-দুর্ভিক্ষ নিরোধ করার সমস্যাটা ভারি কঠিন ; কারণ, ভারতের অর্দ্ধেক লোকই প্রয়োজন মত খেতে পায় না, আর, বোধ হয় ৮ কোটি লোক জীবনে কখনও যথেষ্ট খেতে পায় না।"

কিন্তু আমাদের গিরিজাশঙ্কর বাজপাই,—যিনি আমেরিকায় ভারতের বৃটিশ সরকারের মহিমা কীর্ত্তন করার জন্যে মোটা মাইনে পেতেন, এবং এখনও স্বদেশী স্বাধীন কংগ্রেসী সরকারও তাঁকে মোটা মাইনে দিয়ে পুষ্‌ছেন,—তিনি ২১।১০।৪৫ তারিখে ঐ কাগজেই বলছেন,—"ভারতের ৪০ কোটি লোকের শতকরা ৩০ জনই পেটপূরে খেতে পায় না।...এটা ভারতের নিজস্ব সমস্যা।...ভারতকে লোকে যতটা অনুন্নত মনে করে, ভারত ঠিক তা নয়। ভারতে চমৎকার কৃষি ও বন সংক্রান্ত গবেষণাগার আছে।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগে থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের খাদ্য ও কাঠ ব্যবহার করার জন্যে বিলেতের গরজে ভারতের খরচে ইংরেজ এ সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। বেশী দিন ভাণ্ডারজাত করে রাখা যায় এমন গম ও তার রক্ষার ব্যবস্থা,—"বিদেশে" চালান দেওয়ার মত বিশেষ রকমের চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি করছিল ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচার্যাল ইনষ্টিটিউট ; আর দেরাদুন ফরেষ্ট ইনষ্টিটিউট করছিল, কোন্ কাঠকে কেমন করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল রাখা যায়—এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সেগুলোকে লোহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়। লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে ৮০ ফুট প্যানের কাঠের পুল পরীক্ষা করা হয়েছিল, এবং রেলের লাইনের বাঁধনের কাজে কাঠের পরীক্ষা করতে গিয়ে বিহিটা ট্রেণ দুর্ঘটনা হয়েছিল।

চাষের উন্নতির জন্যে বড় বড় জমি বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে চাষ করা দরকার। চাষাদের জমির অধিকার বা স্বত্ব-ব্যবস্থাও তার প্রতিকূল, আর তাদের টাকাও নেই। খরচ করতে হবে গভর্ণমেণ্টকে। তারও টাকা নেই, সুতরাং ধার করতে হবে। আমেরিকা ট্র্যাক্টর প্রভৃতি ধারে বেচতে পারে, সুতরাং তাদের সঙ্গে ধারের বন্দোবস্ত হবে। বাকি যে টাকা খরচ করতে হবে, সেটা আসবে কোথা থেকে ? জমিদারদেরও টাকা নেই। তাদের খেসারৎ দিয়ে সেই টাকা কর্জ্জ রেখে চাষের ব্যবসাটাকে তাদের হাতে তুলে দাও। খেসারতের টাকাও আমেরিকা কর্জ্জ দেবে।

আমেরিকার কাছে কর্জ্জ করলে ডলার-ক্রেডিট চাই। কাঁচা মাল কিছু ডলার এলাকার দেশগুলোতে যাবেই। তার সঙ্গে বিড়লা-টাটার কারখানার মাল দেশের লোককে বঞ্চিত রেখে এশিয়ার দেশগুলোতে রপ্তানী কর। দেশের লোকের জিনিষের অভাব মেটাবার ভার বিলেতের। তাদের এ দেশ থেকে কাঁচা মাল নিতে হয়, —শিল্প-পণ্য দিয়ে তারা শোধ দেয়। সকল দেশের ধনিক-বণিকের সকল বাণিজ্যই এমনি করে মাখিয়ে-মিলিয়ে একটা অখণ্ড সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বণিক-রাজ তৈরী কর। চলো চলো,—জেনেভা-ক্যানবেরা-হাভানায় চলো।

* * *

লর্ড-সভায় ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বিলের আলোচনা কালে লর্ড লিষ্টওয়েল বলেছিলেন ('অমৃতবাজার পত্রিকা', ১৮।৭।৪৭)—"ভারত ও পাকিস্তান বৃটিশ কমনওয়েলথের সভ্য হওয়ায় তাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে,—পররাষ্ট্র-নীতি, অর্থ-ব্যবস্থা, উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। আমাদের সঙ্গে স্বার্থ-সংঘাত এড়িয়ে, যে ভাবে আদান-প্রদান চললে আমাদের এবং তাদের উভয়েরই কাজ চলে, সেই রকম ব্যবস্থাই ঠিক হবে।"

ভারত সরকারের বর্ত্তমান নীতি এবং কার্য্যকর্ম্ম ঠিক সেই ভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। আমরা বিলেতকে শুধু কাঁচা মালই বেচবো, আর তার বদলে বিলেতের শিল্প-পণ্য এবং যান্ত্রিক আয়োজন কল-কব্জা কিনবো, এবং আমাদের ষ্টার্লিং পাওনা মজুদ রপ্তানীর চেয়ে বেশী কিনবো না, পাছে ষ্টার্লিং পাওনার ওপর বেশী চোট পড়ে ; আমেরিকা থেকে আমাদের খাদ্য আমদানী করতে হয়, সুতরাং আমাদের ডলার-ক্রেডিটের জন্যে আমরা ডলার এলাকায় রপ্তানী বাড়াবো আমদানীর চেয়ে বেশী, দেশের লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষের যত অভাবই থাক, তার জন্যে বিলিতী মাল আছে ;—এই রকম ভাবে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও উৎপাদন-নীতি সকল ক্ষেত্রেই বিলেতের স্বার্থ এবং ভারতীয় ধনিকদের মুনাফা, এই দুয়ের ওপর ঘুরছে।

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষ বাবুর সভাপতির অভিভাষণে বলা হয়েছিল,—"ভারতে ভারতীয়দের সঙ্গে সমান সর্ত্তে প্রতিযোগিতা করবার অধিকার বিদেশীদের থাকাটা একটা আজগুবী কাণ্ড। ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় সম্বন্ধে পৃথক্ ব্যবস্থা করার অধিকার যদি ভারতের না থাকে, তা'হলে সে অবস্থাকে স্বরাজ বলা চলে না।

"মহাত্মাজী '৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরই 'ইয়ং ইণ্ডিয়াতে' "দৈত্য ও বামন" নামক যে বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন, তাতেও তিনি বলেছিলেন,—"ভারতীয় ও অ-ভারতীয়দের স্বার্থকে ভিন্ন ভাবে দেখা অন্যায়, এ কথা বলার অর্থ ভারতের দাসত্বকে চিরন্তন করা মাত্র। একটা দৈত্যের সঙ্গে একটা বামনের সমান অধিকারের অর্থ কি ?"

তার পর ১৯৩৫ সালের শাসন-বিধিতে ইংরেজদের ভারতীয় ব্যবসাকে ভারতের জাতীয় ব্যবসা বলে গণ্য করার আইন বিধিবদ্ধ হয়। সুভাষ বাবুর উপরে উদ্ধৃত বক্তৃতায় সেই কথাটাকেই আজগুবী বলা হয়েছে।

কিন্তু আজ '৪৮ সালেও সেই শাসন-বিধি এবং ভারতের ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যগুলোকে ভারতেরই জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বলে গণ্য করার ব্যবস্থা বজায় রয়েছে। ইংরেজদের ব্যবসার ওপর এক পয়সা বিশেষ-ট্যাক্স বসাবার ক্ষমতা আজও রাজাজী-পণ্ডিতজী-সর্দারজীদের নেই।

কিন্তু তাহলে কি হয়। "১৫ই আগষ্ট ('৪৭) ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে"—এবং "ভারত স্বাধীন হইয়াছে।" কিং জর্জ্জ লিখবে "স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন।" কিষাণ মজদুর-প্রজার রামরাজ্য আর কত দূরে ?

৩

কতক্ষণ এ ভাবে কমলকামিনীর কাটত বলা যায় না। বাঁশ-বাগানে ছেলের দলের একটা অসম্বদ্ধ কলরব শোনা যায়। তাঁর বুকটা ছ্যাক্ করে ওঠে। ওদিকে আবার হলো কি! তিনি দ্রুতপদে চলে যান। বিপ্রপদ হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসেন। কেবল মার্, মার্, ধর ধর্, শব্দ··· !

এই এদিকে—এদিকে···ঐ পালাল পালাল···ধর্, ধর্···লেজটা টেনে ধর্···দেখি লাঠিটা আনত···ঐ যে ঐ তো পালায়···ছেলেরা উচ্চস্বরে হৈ-হৈ করে চলেছে। হাততালি দিচ্ছে অবিশ্রান্ত। কেউ কেউ আবার দিচ্ছে শীষ।

একটা ভাম তার তিন-তিনটা বাচ্চা নিয়ে এদিক্-ওদিক্ ছুটোছুটি করছে। ছেলেরা হাতের কাছে যে যা পায় তাই ছুঁড়ে মারে। ইট-কাঠ, শুকনা গাছের ডাল, ভাঙা বাঁশের মুড়ো। কেউ কেউ লাঠি-মুগুর নিয়ে সশস্ত্র সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি যে করবে বুঝেই উঠতে পারে না। অতি-নাবালকের দল ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মত চেয়ে আছে। কেউ বা খুঁজছে সুযোগ কখন এক ঘা বসিয়ে দিতে পারে। কেউ বা দিচ্ছে খোঁচা।

বুনো বিড়ালটা প্রথম ছানাগুলোকে নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে পলাতে চেষ্টা করেছে। শেষটায় পরিশ্রান্ত হয়ে যে যার আত্মরক্ষার চেষ্টাও বুঝি করেছে। অনেক কৌশল করেও দেখল আজ আর রক্ষা নেই। একটা যখন বাঁশের ঝাড়ে লুকায়, অপরটা যায় গর্তে। এমনি অবিরাম হুটোপুটি ছুটোছুটির আর অন্ত নেই। বাচ্চাগুলির কি আর্তনাদ! অবশেষে তারা বালক-বাহিনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করল। ধাড়ীটাই পড়ল অমরেশের হাতে ধরা। আর দু'টো গেল ছুটে অন্য এক দিকে পালিয়ে। সে তাকে ধরেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

এমন সময় কমলকামিনী ও বিপ্রপদ এসে পড়ায় সৈনিকের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। নাবালকটির টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

'যত অমানুষিক কাণ্ড তোমার ছেলের। দলের সর্দারই ঐটে,—ঐ হারামজাদা।'

'ছেলে কি আমার একার না তোমারও? পুরুষ মানুষের ঐ এক রা—সভায় পাই না ঠাঁই, ঘরে এসে মাগ কিলোই। আমি কি শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে তুই প্রাণি-হত্যা কর, জীব-হত্যা কর? আমাকে মেজাজ দেখালে হবে কি?'

'আমি বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ স্থাপিত করে জীবহিংসা বন্ধ করে দিয়েছি। আর আমার ছেলে কি না একটা নিরীহ জীবকে—'

'বড্ড তো নিরীহ!'

'নাই দিয়ে দিয়ে তুমি ছেলেটার মাথা খেলে।'

'তা তো ঠিক! দেখ না, অমরেশের পোষা হাঁস-জোড়ার কি দশা করেছে?' কমলকামিনী এক জোড়া মৃতকল্প হাঁস বনের মধ্যে থেকে টেনে এনে বিপ্রপদর সুমুখে ছুঁড়ে দেন।

রক্তমুখো ছেঁড়া-খোঁড়া হাঁস দু'টোকে দেখে বিপ্রপদ নিঃশব্দে পিছিয়ে যান।

ছেলেরা আবার একে একে গিয়ে খাল-পাড়ের গাব গাছটার তলে জমা হয়। ভামটার কান ধরে কেউ টানে, কেউ বা ঠ্যাং ধ'রে। কেউ কেউ আবার গায়ে হাত বুলায়। কি নরম, কি তুলতুলে! ওটা বিরক্ত হয়ে চোখ বুঁজে থাকে। কেউ একান্ত ব্যথা দিলে চোখ মেলে দাঁত খিঁচোয়।

'দেখ রে শালার গোঁপ জোড়া।' হরেন বলে, 'বুড়ো, তোমার বয়স কত?'

'কি গো বাঘের মাসী, এখন কেমন? খাবে আমার হাঁস? বড্ড নরম মাংস, না? এখন তবে হাঁস-ফাঁস ক'রছ কেন?' অমরেশ বলতে বলতে একটা চড় মারে।

জন্তুটা খেঁকিয়ে ওঠে।

এখন পর্যান্ত যারা ভামটা দেখেনি, তারা ছুটে আসে। একটুখানি মাণিকটা ভিড় ঠেলে দেখতে না পেয়ে কেঁদেই ফেলে। ক্রমশঃ দেখা যায়, প্রবীণরাও এসে ভিড় করেছে—প্রশ্নও করছে দু'-চারটা। মন্তব্য করতেও কসুর করছে না। তখন ছেলের দল অন্য দিকে সরে পড়ে।

তাদের সমস্যা, এখন এটাকে নিয়ে কি করা যাবে?

একটা শটির বন ভেঙে পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ছেলেরা সব গিয়ে বসে। এ স্থানটা বেশ আবডাল।

নবীন মোদকের ছেলে যাচ্ছিল সেই বনের পাশ দিয়ে। টিকি-ওয়ালা শান্তিরাম। পরনে তার যদু তাঁতির একখানা খাটো গামছা সাদা রঙের। খাটো—এমন খাটো সে হাঁটুও ঢাকেনি। সে দেখতে অনেকটা ঝুনো নারকেলের মত। রোগা-পটকা-ছন্ন-ছত্তি, বেশ বুদ্ধি-মানও বটে।

'শান্তিদা, বলো তো এটাকে নিয়ে এখন কি করি?'

সব শুনে অমরেশের প্রশ্নের জবাবে শান্তি বলে, 'তোর উচিত হয়নি ওটাকে ধরা। জীবহিংসা মহাপাপ, তা বুঝি তুই পড়িসনি বইতে?'

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ধীরে আমার হাঁস যে খেলে ধরে?"

'ওরা তো বনের পশু, ওদের কি বুদ্ধি আছে?'

গোঁসাই ছেলেটা সেদিন চুল ছেঁটেছে। এমন করেই ছেঁটে দিয়েছে নাপিতে যে, মনে হচ্ছে যেন ক্ষুর দিয়ে কামিয়ে দিয়েছে। সে কদমফুলী মাথাটা নেড়ে বলে, 'বুদ্ধি না থাকলে তাকে ঠেঙিয়ে শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে। ওরা যার-তার গোষ্ঠী-গোত্তরে মিলে হাঁস-পায়রা ধরে ধরে খাবে, আর ওকে তুমি দিতে বলছ প্রশ্রয়? তুমি আমাদের মধ্যে বড়, তুমি দিচ্ছ এই বুদ্ধি? ওরা সাবাড় করে দেবে আমাদের পোষা সখের হাঁস-পায়রাগুলো।'

অমরেশ ও অন্যান্য অনেকে দুষ্কৃতকারী জানোয়ারটাকে মেরে ফেলতে চায়। মেরে না ফেলুক, অন্ততঃ গুরুতর শিক্ষা দিয়ে দিতে মনস্থ করে।

কিন্তু শান্তিরাম বলে, 'এক্টা নিরীহ বুনো বিড়াল, তাকে তোরা মানুষ হয়ে মারতে চাস, কি আশ্চর্য্য? ওরা ছানা-মা'য় তিনটা না থাক, আমি ধরি দশটা আছে। সে অনুপাতে তোদেরও তো কমসে কম ত্রিশটা হাঁস-পায়রা আছে। ক'টা আর ওরা ধরে খাবে? আহা-হা, নিরীহ জীবটাকে মারতে চাচ্ছিস সবাই মিলে? ওর দিকে চাইলে তোদের মায়া হয় না?'

গোঁসাইর এ সব ন্যাকামী বলে মনে হয়। সে বোঝে যে দলের ছেলেরা সব শান্তিরামের কথায় গলে গেছে, তাই সে চুপ করে থাকে।

অমরেশের প্রাণটা নরম, সে বলে, 'তা ঠিক শান্তিদা, ওকে দেখলে দুঃখ হয়। দেখছ, কেমন চোখ বুঁজে চুপ করে আছে অবুঝ জীব!'

আরও দু'-চারটা কথাবার্ত্তার পর শান্তি স্থির করে দেয়: 'ওকে শাস্তি না দিয়ে সংযম ও অহিংসা শিক্ষা দিয়ে গৃহপালিত নিরীহ বিড়ালে পরিণত করতে হবে। তার পর ছেড়ে দিতে হবে বনে। এবং ও গিয়ে স্বজাতির মধ্যে অহিংসা প্রচার করবে, অর্থাৎ আর কোনও ভামে এ গাঁয়ের ছেলেদের হাঁস-পায়রা ধরে খাবে না।'

জন্তুটার শিক্ষা-দীক্ষার ভার পড়ে সদ্য অনুশোচনা-ক্লিষ্ট পরম বৈষ্ণব অমরেশের ওপর।

গোসাই যাওয়ার সময় বলে, 'ঐ অবুঝ জীবে এক দিন তোমাদের সবাইকে বুঝিয়ে ছাড়বে।'

সন্ধ্যার পরের কথা।—

বোসের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সব খেতে বসেছে। রান্না ঘরখানা শিশু-কণ্ঠের এলোমেলো চীৎকার-মিনতি-কান্নায় সরগরম। বৌ'রা যথারীতি শাসন করছে, আশ্বাস দিচ্ছে, কেউ কেউ রাঙাচ্ছে চোখ। যখন খাওয়া প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী হয়ে গেছে, তখন কমলকামিনী দুধ-মিষ্টি নিয়ে প্রবেশ করেন। এক হাতে তাঁর দুধের বালতি, অন্য হাতে সদ্য জাল দেওয়া খেজুর গুড়ের একটা বড় বাটি। মিষ্টির লোভে ছেলেমেয়েরা কল-বল করে ওঠে। শুধু অমরেশ দুধ পাওয়া মাত্র চট করে সকলের অলক্ষ্যেই উঠে যায়। সাথে যায় শ্রীমান বিনু—তার খুড়তোত ভাই। হাতে তার কেরোসিনের ডিবাটা।

একটা মাটির খোপ থেকে ভামটাকে টেনে বের করে তার মুখের কাছে দুধের বাটিটা ধরে। পূর্ণপাত্র দুধের দিকে একবার মাত্র চেয়ে ভামটা চোখ বোঁজে। উজ্জ্বল আলোটা বোধ হয় সহ্য হয় না। অনেক চেষ্টার পর দুধ না খাওয়াতে পেরে অমরেশের রাগ হয়। সে ভামটার মুখ দুধের মধ্যে থুবড়ে ধরে। তবু সে অভিমানে মুখ বেজার করে থাকে। তখন উপায়ান্তর না দেখে বাটি শুদ্ধ দুধ হেঁচকে ফেলে দিয়ে ওটাকে সাবধানে খোপে রেখে চলে যায়।

বিমলা গোপনে থেকে সব দেখছিল—সে ছুটে গিয়ে সংবাদটা বেশ ফলাও করে কর্ত্রীমহলে প্রচার করে। ফলে নেপথ্যে তর্জ্জন-গর্জ্জন শোনা যায়। অমরেশ ও বিনু পুকুর-ঘাটে বাটিটা ও ডিবাটা রেখে পালিয়ে আসে। এবং বাড়ীর অনেকগুলো বিছানার মধ্যে কোথায় গিয়ে যে অন্ধকারে চুপ করে শুয়ে থাকে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। অনেক রাত্রে যখন অপরাধীদ্বয় ধরা পড়ে তখন তারা সকল শাসনের বাইরে—গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

খুঁজতে খুঁজতে কমলকামিনী অমরেশকে পান শিবপদর বিছানায়। 'কি করি বলো তো ঠাকুরপো, ছেলেটা তো একেবারে ডানপিটে হয়ে গেল। একটা মাত্র ছেলে, তাও যদি মানুষ না হয়, তবে কি যে সে দুঃখ! গত জন্মে কত যে পাপ করেছি তাই এ জন্মে পেটে ধরলাম একটা ব্যাধ! কেবল শীকার—শীকার! হয় পাখী, না হয় পশু, না হয় মাছ। আচ্ছা ঠাকুরপো, যে ক'দিন বাড়ী আছি একটু ভাল লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা যায় না? এর পর গিয়ে ওঁকে ধরে মফঃস্বলের বাসায় যা হোক একটা ব্যবস্থা করাব।'

'কি করব বৌঠান্? আজ না হক কাল, কি দু'দিন বাদে আমারও ঐ এক সমস্যা। পণ্ডিতের কাছে আর ক'দিন পড়বে বিনু?'

'তা ঠিক। বাড়ীর সব ছেলেদের জন্যই এখন থেকেই তোমাদের ভাবা উচিত। তোমাদের মান-সম্মান সব মিথ্যা যদি সন্তান মূর্খ হয়। রাগ করো না ঠাকুরপো, তোমাদের এদিকে একটু লক্ষ্য কম।'

'রাগ ক'রে করব কি? আমরা তো সব মূর্খের দল! আমাদের মধ্যে দাদাই যা শিখেছেন।'

'তোমার দাদাকেই বা কি বলব? যেখানে থাকেন সে-টা একটা অজ গণ্ডগ্রাম। না আছে ইস্কুল, না আছে কোন পড়াবার সুবিধা। শুধু নদীর পাড়ে একটা কাছারী বাড়ী, পাইক-পেয়াদা গোমূখ্যুর দল।'

'সে খবর তো আমি জানি। তবু দাদাকে বলা ছাড়া উপায় কি?'

অমরেশ নড়ে উঠতেই কমলকামিনী উঠে দাঁড়ান। তিনি নিজের শয্যার দিকে চলতে চলতে ভাবেন: ওই তো একটি মাত্র ছেলে! ওকে মানুষ করতেই হবে। নইলে সবই আঁধার। মিথ্যা হবে এই চোখ-ঝলসান বৈভব। একটা নতুন ধারার ওই হচ্ছে প্রথম পুরুষ। ওর পায়ে-চলার পথ ধরে' চলবে পিছে আসছে যারা। তাই তো ওকে চালাতে হবে ঠিক পথে—জ্ঞানের পথে। তাঁর বহু আরাধনার সোনার চাঁদ, বুকের রক্ত, দেহের নির্য্যাস। এই যে দুলে রয়েছে তাঁর বুকে যদি একটু পাগল হয়, দুরন্ত হয়—তবে কি ক'রতে পারেন তিনি? বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হিতোপদেশ দিয়ে ওকে পথে আনতে হবে। খাটতে হবে ওর পিছে। বিপ্রপদর কাছে ব'লে হবে কি? বহির্মুখী যার মন, তাকে এখন বলে কোনই লাভ নেই, সময় মত উস্কিয়ে দিলে চলবে। তিনি ঘুমন্ত ছেলের মুখে ক'টা ঘন ঘন চুম্বন করেন, একটু চেপে ধরেন বুকে।

রাত্রে আর ভাল ঘুম হয় না। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখেন: পৈত্রিক

বসন প'রে শ্রীমান যেন যাচ্ছে কোন এক তপোবনে পড়তে। চূড়া ক'রে তার চুল বাঁধা, বগলে তাল-পাতা, হাতে ঝুলছে মসীপাত্র। ব্রহ্মচারী বালক হাসতে-হাসতে দুলে-দুলে চলে—সংগে চলে তার সহচর ছায়াটি।

ঋষির সুমুখে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ করেন—'জয়স্তু বৎস! তুমি কি চাও এখানে?'

'আমি তোমার কাছে লেখাপড়া শিখব. এই দেখ, নতুন তাল-পাতা কেটে মা কেমন আমাকে গুছিয়ে দিয়েছেন।'

'তোমার নাম?'

সে যেন নিজের নামটাই ভুলে গেছে। স্মরণ করতে দেরী হয়।

তপোবনের ছেলেরা ওর ভাব দেখে খিল-খিল করে হেসে ওঠে। অমরেশ কেঁদে ফেলে।

ছেলেরা আবার হেসে ওঠে।

লজ্জায় দুঃখে অমরেশ মা-মা বলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে। কমলকামিনী ত্রস্তে যাকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন. সে তাঁর কাল্পনিক অমরেশ নয়।

আর ঘুম আসে না কমলকামিনীর। তিনি শুয়ে-শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন। এই যে ছেলে কোথায় ছিল, কেমন করে এলো তাঁর কোলে? এদের আবার সংসার হবে, বৌ আসবে, নাতি-নাতনীতে ভরে যাবে ঘর। কত নতুন নতুন মুখ—একটা যেন পাঠশালা বোঝাই ছেলেমেয়ে! কত হবে বিবি, তাদের জন্য খুঁজতে হবে কত সাহেব-সুবা! তারাও বড় হবে, চলে যাবে এক-এক করে। আসবে আর এক দল!...তিনি আর ভাবতে পারেন না। এতগুলো ছোট-বড় নানা-রকম মুখ মনে রাখতেও যেন কষ্ট হয়। তিনি আবার পাশ ফিরে অমরেশের গায় হাত দেন।

'মা, রাত কতক্ষণ? এখনও তুমি ঘুমোওনি?'

'অমরেশ, একটা কথা শুনবি বাবা?'

'কি কথা মা, গল্প বলবে?'

'না। আমার একটা কথা শুনবি?'

গল্প ছাড়া এমন কি কথা হতে পারে! অমরেশ কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে, 'শুনব, বলো।'

'আচ্ছা, তোমার মাকে যদি কেউ মারে?'

'বাঃ রে, কেন মারতে যাবে আমার মাকে?'

'তুই তবে কেন মারতে গেলি বুনো ভামটাকে? ওরও তো দু'টো বাচ্চা আছে?'

'ও আমার সখের হাঁস খেলে কেন?'

'যার খাদ্য সে খাবে তাই ব'লে কি তুই তাকে মারবি?'

বালক এবার আর উত্তর দিতে পারে না।

'আমাকে যদি মেরে কেউ বেঁধে নিয়ে যায়, তোর কেমন লাগে বল তো?'

অমরেশ চুপ করে মা'র বুকের মধ্যে এগিয়ে আসে। কমলকামিনী বুঝতে পারেন, অষুধে ক্রিয়া হ'য়েছে। তিনি আর ওকে বিরক্ত করেন না।

সকাল বেলা ফলস্বরূপ দেখা যায়, অমরেশ ভামটাকে বাঁশ-বাগানে নিয়ে গিয়ে মুক্তি দিয়েছে।

কিন্তু ভামটার সে-কথা মনে থাকে না। সপ্তাহ কয়েক যেতে না যেতেই অমরেশের হাঁস-পায়রা প্রায় সাবাড় করে আনে। সে কি সংঘবদ্ধ আক্রমণ।

অমরেশের মা'র ওপর রাগ হয় না, রাগ হয় শান্তিরামের ওপর। সেই টিকিওয়ালা ঝুনো নারকেলটার বুদ্ধিতেই আজ এই দশা। সে যদি হাতের কাছে পেতো টিকিটা ধরে তার টেনে দিত! কিন্তু তাও বুঝি সে পারত না। মোড়ল ছেলের টিকি ধরলে সব বন্ধুরা তাকে একঘরে করবে।

অতএব তার চোখে জল আসে।

৪

অবস্থার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে স্বামি-স্ত্রীরও যেন কাজ বেড়ে চলেছে। শুধু কাজ আর কাজ! দু'জনার ঘরে-বাইরে একটুও জিরেন নেই। জিরেন চানও না। এক মুহূর্ত্ত বসে থাকলে মনে হয় যেন কত কি ক্ষতি হয়ে যাবে। এদিকে কাজ ওদিকে কাজ—যেন কাজের স্রোতে বান ডেকেছে। ওঁরা বসে থাকবেন কি করে? সেই জন্যই এ বাড়ীর কেউ বসে থাকে না। বৌ-ঝি-কামলা-মজুর কেউ ফাঁকি দেয় না সংসারকে। এ বাড়ীতে অহোরাত্র যেন সমারোহ চলেছে।

বিপ্রপদ ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছেন—এ ছুটি তাঁর আলস্যে গা-ঢেলে দেওয়ার জন্য না। তিনি একমনে আরো কাজ করে থাকেন। দু'টো মেয়ে বড় হ'য়েছে, তাদের বিয়ে দেবেন। পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করবেন। কতক ভাল খানি জমি এখনও খরিদ করতে পারেননি, তা করা একান্ত দরকার—আরো কত কি যে বাকী!

'বিপ্রপদ, একটু উঠে শুনে যাও, বিশেষ একটা জরুরী কথা আছে।'

আজ হাট বার কি না। অন্য কেউ না জানলেও বিপ্রপদ জানেন জরুরী কথাটা কি। তিনি একটু হেসে জবাব দেন, 'এই এখানে এসেই বলুন না দীনুদা, এখন তো কেউ নেই এখানে।'

জরুরী কথাটা দীনু বলতেই পারে না। ইতিমধ্যে এক দল দেশী মুসলমান এসে উপস্থিত হয়। বিপ্রপদকে আদাব জানাতেই তিনি ব্যস্ত হ'য়ে তাদের ব'সতে আপ্যায়ন করেন। আনতে বলেন পান-তামাক।

এই পান-তামাক দেওয়ার প্রথাটা যে এদেশে কত কাল ধ'রে প্রচলিত তা এরা কেউ জানে না। শিশুকাল থেকে দেখে দেখে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। খরচ অতি সামান্য, কিন্তু এইটাই গ্রাম্য ভদ্রতার মানদণ্ড। সেই পান-তামাক তখনই আসে।

তামাক টানতে টানতে ইস্মাইল মিঞা বলে, 'এখন কও না!'

দলের ভিতর থেকে আর এক জন জবাব দেয়, 'তুমি হইছ দলের সরদার, তুমিই মেয়া ছাহেব, তুমিই কও না!'

দীনু এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল—সে প্রলুব্ধের মত ওদের এক পাশে একটা বেঞ্চে এসে বসে এবং তার নিজের জরুরী কথাটা আপাততঃ ভুলে যায়। ধোপা-বৌ'র পেট-ব্যথা থেকে মহেশ্বর মুচীর মহাপ্রয়াণ পর্য্যন্ত—গ্রামের এমন কথা নেই, যাতে না এই রোগা কালো বামুনটির স্বার্থ আছে! বড় বড় বাড়ীর বিষয় হ'লে তো সবিশেষ ভাবে জানাই দরকার। কখন কোন্‌টা কি কাজে লাগে বলা যায় না তো!

বৃদ্ধ ইছমাইল মিঞা তার মুখের স্থূল রেখাগুলো কুঞ্চিত করে ব'লতে আরম্ভ করে, 'ঠান মশাই না কি তার এদেশী তালুকটা বিক্রি করবে। পাইকপাড়ার ঘোষালরা তিন হাজার টাকা বহায় দিতে চায়, ও-পাড়ার এস্তেজলীও না কি ওৎ পাতিয়াই আছে কিনবে বলইয়া। ঘোষালেরা এহন পড়তা পড়ছে। ভাই ভাইও ঘোর বিবাদ চলছে—একেবারে বিষম বিবাদ। ওরা তালুক কেনবে এইডা।' বলে ইছামাইল মিঞা সভাস্থ সকলকে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। 'ওরা গ্রামের ভিতর মিথ্যা গুজন রাখছে। তবে এস্তেজালী কিনতে পারে। ওডা টাকার কুমইর। ওর—'

ইমাম উত্তেজিত হয়ে বাধা দেয়। 'ঐ এস্তারে দিমু তালুক কেনতে? আমার জান থাকতে না। তয় বাবুর কাছে আইলাম কেন?'

ইসমাইল মিঞা বলে 'তোর সাথে না হয় বিবাদ আছে ঐ এস্তেজালির, তাতে স্যানেগো কি? তারা যেহানে টাকা বেশী পাইবে সেইহানেই নিকা হইবে। ইমামের জন্ম স্যানগো বড় মাথা ব্যথা।'

ইমাম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। 'কি, এত দিন যে ওনাদের খাজনা দিলাম, সেলাম দিলাম হ্যা কি হইবে মিথ্যা? আচ্ছা, দেইখ্যা নিমু, মা-ঠাকইণ তো বাঁচাইয়া আছেন এহনও।'

'তুই চুপ কর—না হইলে আমরা উঠি। কথাডাই কইতে দিলি না!'

'না, না, কও মেয়া ছাহেব। পরাণডা আমার কাইট্যা যায় তুমি গোসা হইও না, তুমিই কও।'

এখানে সামান্য একটু ইতিহাস বলা দরকার।

এস্তেজালী ইমামের বৈবাহিক। ইমাম তার বড় মেয়ে নুরবানুকে বিয়ে দিয়েছিল এস্তেজালির ছেলের সাথে। সখ করে তার স্নেহের নুরবানুকে অল্প বয়সে তুলে দিল বড়লোকের ঘরে। মেয়েটার ছিল স্বাস্থ্য ভাল। একটা ছেলে হলো চোদ্দ বছরে। তার পর তাকে ধরল সুতিকা জ্বরে। মেয়েকে ওঝা-বৈদ্য দেখাবার জন্য অনেকবার যায় ও নৌকা নিয়ে। কিন্তু বার বার ও ফিরে আসে। কত কান্না-কাটি সাধা-সাধি তবু টলে না, একটুও গলে না এস্তেজালির পাষাণ প্রাণ। তখন তার ঘরে ধান উঠেছে। বৌ না থাকলে সামলায় কে? বধুর অসুখ না আর কিছু! সকলই তার ভাণ, কাজ না করার অছিলা।···কিছু দিন পরে শোনা যায়, বৌ নিতান্ত অবাধ্য। কেবল বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্যান-প্যান করে। কোলের ছেলেটা যায় হঠাৎ মারা। প্যানপ্যানান আরো বাড়ে।···তার পর এক দিন-ইমামের স্নেহের নুরবানুর মৃত্যু-সংবাদ। গ্রামের লোকে বলে: ওরা বাপ আসে-বেটায় মিলে না কি বৌটাকে কাঁথা চাপা দিয়ে বাপের বাড়ীর কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তা না হলে স্বাভাবিক মরার অমন চেহারা হতে পারে না। কেউ ভয়ে পুলিশে খবর দেয়নি, কারণ, ওদের না কি যথেষ্ট টাকা। ঘটনাচক্রে ইমামও সে দিন বাড়ী ছিল না—থাকলে সে একবার দেখে নিত! সেই অবধি ইমামের কলিজাটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ ইছমাইল মিঞার বক্তব্য: তারা বিপ্রপদের এক গ্রামের বাসিন্দা। পুরুষানুক্রমে তারা মেলামেশা করে এসেছে যোসেফের সাথে। তাই একটা স্নেহ মায়া মমতা জড়িয়ে গেছে সকলে। সম্পত্তিটা বেশী, হিন্দুমুসলমানে আদায় দেবে—তাকলে কেউ না এসে পারবে না—এমন যে ঘোষালেরা, তারাও তো করবে না মাথা হেঁট! 'এক তালুক না বাবু, এ্যাট্টা ডঙ্কো, একেবারে রাজতক্তা।'

বিপ্রপদর চোখ জোড়া লোভে জ্বল-জ্বল করে ওঠে। তবু তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কেউ রাখ না কেন—তোমাদের স্বজাতির মধ্যে তো এস্তেজালী ছাড়াও পয়সাওয়ালা লোক আছে।'

খালের এ-পাড়ে তেমন লোক নেই এক ইছমাইল মিঞা ছাড়া। কিন্তু সে বৃদ্ধ, তার ছেলেমেয়ে নেই। কে রক্ষা ক'রবে এবং খাবেই বা কে? বড় খালের ও-পাড়ের কেউ এ সম্পত্তি খরিদ করে এটা তাদের বাঞ্ছনীয় না। এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের বাসিন্দাকে আদাব দিতে যাওয়া নিতান্ত লজ্জাজনক। যদি বিপ্রপদ টাকা চালাতে না পারেন—সর্বদা তো নগদ টাকা হাতে থাকে না, এরা ধার দিতেও প্রস্তুত এবং সে টাকা যেদিন ইচ্ছা তিনি পরিশোধ করেন যেন, তবু সম্পত্তিটা খরিদ করে সকলের মান রক্ষা করুন, এই তাদের ইচ্ছা।

'কত টাকার দরকার?'

'হাজার পাঁচেক!'

'পাঁচ হাজার!'

ভয়ের কিছু নেই। জীবনে এক দিন মাত্র একটা কাজ করে রাখবেন—ছেলেমেয়ে তা বসে-বসে ভোগ করবে। নিরাপদ রইল তাদের ভবিষ্যৎ—এ গ্রামের হিন্দু-মুসলমানেরও মুখ উজ্জ্বল হ'ল। 'বাবু, তুমি ভয় পাইও না, এই বুড়ার কথাডা লও, রাখো যাইয়া তালুকটা।'

এতক্ষণ পরে দীনু একটা গুজন করে কথা ছাড়ে: 'বিপ্রপদ, টাকায় সুযোগ আনতে পারে না, সুযোগ আনে ভাগ্যে। তবে বিবেচ্য, তুমি থাক বিদেশে, মহাল রক্ষা ক'রবে কে?'

প্রাচীন ক্রুদ্ধ হ'য়ে উচ্চকণ্ঠে দীনুকে এমন একটা তাড়া দেয় যে, সে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'রাহেন আপনার মাইগ্যা কথা। আমরা বাধা থাকলে একটা মাগীতেও রাখতে পারে এ তালুক। চেনেন ইছমাইল মিঞারে—শোনেন নাই হের নাম?'

দীনু এবার একেবারে বিপ্রপদর কাছ ঘেঁষে এসে বসে: 'তবু না ভেবে-চিন্তে কিছু করা যায় না, উচিতও না। আমরা হিতকাঙ্ক্ষী, ওর টাকায় এবং আমাদের টাকায় প্রভেদ কি?' তার হিসাব না কিসে যেন বুকটা টন-টন করতে থাকে। 'আজ বিপ্রপদ নিঃস্ব হলে আমারও নিঃস্ব। দু'-চার টাকা যে হাওলাত-বিলেত পাবো, সে আশাও আর থাকবে না। আমরা কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষী।' দীনু নিতান্ত অচল। একটি একটি করে প্রায় পঞ্চাশটি টাকা এ যাত্রা ও এই সংসার থেকে ধার বলে নিয়েছে, কিন্তু আর ফিরিয়ে দেয়নি। ওর রীতিমত ভয় হয় যে, বিপ্রপদর এতগুলো টাকা হাতছাড়া হলে ওর উপায় হবে কি?···সে ছাড়া, যদি এই তালুকটা বিপ্রপদ কিনতে পারেন, তবে আর একটা বিপদে পড়বে এই দীনু। বাকী-বকেয়া পাওনাগুলো কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে তাকে। সেনেরা ওকে 'না-জিল' বাদশা খেতাবী দিয়েছে। সে খেতাবী টিকবে না বিপ্রপদর কাছে। টাকার জোরে আর্জি দিয়ে সব পাওনা উশুল করে নেবেন। দীনু উপায় চিন্তা করে, কি ক'রে উদ্যমটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যায়। 'শুনলাম না কি তালুকটার ওয়ারিশ সব নাবালক। কেমন করে হবে বলিন?'

'কাগজ-পত্র দেইখ্যা উকিলের পরামর্শ লইয়া তবে তো বাবু টাকা দেবেন—সে জন্ম আপনার মাথা ব্যথা ক্যান ?'

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'মুনাফা কত ?'

'তিনশো টাকা।'

'সদর খাজনা ?'

'তিনশো।'

'খাজনা মুনাফা সমান। লাভ সম্মানটাই।'

কিন্তু কতগুলো টাকা! এক সময় গুণে দিতে হবে—থাকে থাকে। সঞ্চয় করতে কত দিন কেটে গেছে। কত অনাহার কত অনিদ্রা গেছে দেহের ওপর দিয়ে। এ সব সম্পত্তি কষ্টার্জিত টাকায় কেনা চলে না। বিপ্রপদর মুখের চেহারা শুষ্ক হয়ে আসে, জিভ ভিতরে টেনে যায়।

দীনু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মুসলমানরা নিবে খেতে চায়।

বিপ্রপদ বলেন, 'আজ না হয় ওঠ! যাক, আর এক দিন এসো। এতো টাকা-পয়সার ব্যাপার, চিন্তা না ক'রে বলি কি!'

'আচ্ছা, বিষয়ডা একটু ভাইব্যা দেখবেন—আদাব আদাব।'

'আদাব, আবার এসো, বুঝলে ?'

'বিপ্রপদ এবার—'

'কি ?'

'আজ হাট বার, দু'টো টাকা ধার দাও। জানই ত আমার—'

বিপ্রপদ অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি করবেন ?'

'আসছে হপ্তায় শোধ করে দেবো।'

অন্ত দিন হলে তিনি একটু হাসতেন। দু'-একটা রসিকতার কথাও হয়ত বলতেন। কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি দু'টো টাকা বের করে দিয়ে ওকে বিদায় করে দেন।

স্বদেশে স্বগ্রামে তালুক। অহংকারী ঘোষালেরা প্রজা। গুরু-পুরুত পাড়া-প্রতিবেশী তটস্থ। দেশের উত্তম অধম জনসাধারণ জোড়-হাতে দণ্ডায়মান। প্রলোভন—ভীষণ প্রলোভন। এ সুখের তুলনায়, এ সম্মানের কাছে, আর্থিক ক্ষতি অতি সামান্য। যে দেশে তিনি দীন-দরিদ্র ব'লে পরিচিত ছিলেন এই সেদিন পর্য্যন্ত—সেই দেশের রাজা হবেন! যেন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর! কল্পনায়ও কি সুখ! আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের উজ্জ্বল হবে মুখ। ভরত-লক্ষ্মণের মত ভাইদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে দেশে। এর চেয়ে আর কাম্য মানুষের কি থাকে? তিনি নিশ্চয় তালুক খরিদ করবেন—যত টাকাই লাগুক, ফিরবেন না।

'তুমি যে ওদের ফিরিয়ে দিলে—কিছু ঠিক-ঠাক্ করে বলে দিলে না? এমন সুযোগ কি তোমার ভাগ্যে আর জুটবে ?'

'তোমার কাছে না জিজ্ঞাসা করে—প্রতিবেশী গুরুঠাকুরের পরামর্শ না নিয়ে কি একটা জবাব দিয়ে দেবো বলো তো ?'

'তা হ'লেই তুমি তালুক কিনেছ! সাত-কাণ পাঁচ-কাণ যত ক'রবে ততই হবে বিঘ্ন।'

'তাহ'লে কি তোমাদেরও অনুমতি নেব না ?'

'না। এ সব কাজ যত গোপনে হয় ততই ভাল।'

'আচ্ছা, তবে তাই হবে।'

'এখন আর দাঁড়িয়ে থেকো না—আজই তো আর আমার কথায় বায়না দিচ্ছ না—বেলা হয়েছে, নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা কর গে'। এসো আমার সংগে।' কমলকামিনী আগে আগে চলেন।

৫

ফাল্গুনের উষা···

সবে পাখীরা ডেকে উঠেছে। গাছগুলোর পাতার আড়ালে-আবডালে তরল অন্ধকার। এখনও প্রকৃতির দিনের রূপ-সমারোহ স্পষ্ট হয়নি। যে ফুল শীতের হাওয়ায় ফুটতে পারেনি, তা এই ফাল্গুন মাসে দু'-একটি ক'রে পাঁপড়ি মেলছে। বোসেদের শীতলা-তলার বাগানে একটা মিহি মিঠে গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মরা ডোবাটার বুকে একগুচ্ছ ঢোল কল্মীর ফুল ঝুলে প'ড়ে দুলছে ঐ।

তরল অন্ধকার আরো তরল হয়ে ক্রমে এসে মিলিয়ে যায়।

অমরেশ রোজ যেমন ফুল তুলতে আসে—আজও তেমনি এসেছে।

ও কে? রঙিন একখানা গায়ের কাপড় জড়িয়ে ও মেয়েটি কে দাঁড়িয়ে? যেন তুলি দিয়ে আঁকা! অমরেশ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে। চেয়ে দেখে ওর ফুল তোলার ভংগি। ওর ভ্রূ, চোখের পালক, এলো-চুল অপরূপ বলে মনে হয়। রূপকথার কোন বনদেবী না কি? ফুল তুলতে এলো ওদের বাগানে? অমরেশের গা-টা ঝম-ঝম করে ওঠে।

'কি রে, কেমন আছিস অমরেশ ?'

'তু—তুমি সোণালীদি। কবে এলে ?'

'কাল রাত্রে।'

'কোথায় গিয়েছিলে ?'

একটু ফিক্ করে হাসে মেয়েটি। শুভ্র দাঁতের ওপর এক ঝলকা আলো ঝিক্-মিলিয়ে যায়।

সীঁথির সিঁদুরের প্রতি দৃষ্টি প'ড়তেই অমরেশ কি যেন ভাবে। সে হেসে ব'লে ওঠে, 'ও বুঝেছি, বুঝেছি। গত বছর এমনি দিনে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে···'

'চুপ কর, চুপ কর ডেঁপো ছেলে।' বলে, সোণালী ওর গালে ঠাস ক'রে একটা চড় কশিয়ে দেয়।

আঘাত পেয়ে অমরেশ প্রতিঘাত ক'রতে চেষ্টা করে। 'বলব, একশো বার ব'লব। বিয়ে হয়েছে—শাঁখ বাজিয়ে নিয়ে গেছে।'

'নিয়ে গেছে তো তোর কি? ব'লবি বল, এই আমি চ'ললাম।'

মেয়েটি চ'লে যায়। অমরেশ সুর করে তার সাধ্যমত ঐ সব কথা বলে। 'বিয়ে হয়েছে, ওমা কি ঘেন্নার কথা, বিয়ে হ'য়েছে রে।'

সেদিন অমরেশের ফুল তোলায় আর সুবিধা লাগে না। দু'-চারটা ঝুমি-জবা তুলে সে বাড়ী ফেরে। মনে মনে বলে, 'আবার যদি ওকে এখানে দেখি, দেবো ওর গালে খামচি বসিয়ে।'

মেয়েটি পাড়ার এক বামুন বাড়ীর। ওর মা আছে, বাপ নেই। অমরেশের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। দেখলে মনে হয়, ওর ভিতর এমন কিছু জন্মেছে যা বালকের অভিজ্ঞতার বাইরে। মেয়েটি গরীবের—কোথায় যেন কোন দূর দেশে ওর মা ওকে অন্ন খরচে এক অপদার্থের হাতে তুলে দিয়ে রেহাই পেয়েছে।

দু'দিন বাদে ফের দেখা। এবার সুপারী বাগানের নির্জন পথে।

বেলা আর নেই। পড়ন্ত রোদ ক্রমে ম্লান হ'য়ে আসে শিমূল গাছের শাখায়—চূড়ায়। লাল ফুলগুলো আরও রক্তাভ হ'য়ে ওঠে। ওরা লজ্জায় যেন অন্ধকারে লুকিয়ে যাবে। ম্লান আলো বাঁশ-বাবলার ফাঁকে ফাঁকে কাঁপতে থাকে। গরুগুলো গ্রাম্য পথ ধরে বাড়ী ফিরছে। দু'-একটা লতা-গুল্মও খাচ্ছে পথের পাশের।

'এত রাগ যে, আমাদের বাড়ী একটি বারও যেতে পারলিনে। আচ্ছা, দেখা যাবে অমরেশ। এক মাঘে শীত কাটে না।'

'তুমিও তো আসোনি ফুল তুলতে এ দু'দিন। আমি রাগ ক'রেছি না হাতী! আমার অত রাগ নেই।'

'বেশ, তা হ'লে কাল যাস আমাদের বাড়ী।'

'নিশ্চয় যাবো। কিন্তু ফুল তুলতে আসতে হবে তার আগে—কাল সকালেই।'

'না ভাই। মা বারণ করে। বলে, বড় মেয়ের অত ফুল তোলায় যাই কেন?' 'বড়' কথাটা উচ্চারণ ক'রে সোণালী নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে।

অমরেশ ওর অপাংগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কত বড় হয়েছে তা পরিমাপ করতে চেষ্টা করে।

'বড় হলে ফুল তুলতে বারণ—এমন কি বড় হয়েছ তুমি?' সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। 'এই তো এইটুকু—ও আবার বড়!'

সোণালী একটু সরে যায়।

'তুমি কাল এসো, বারণ না ছাই!'

অগত্যা সোণালী জবাব দেয়, 'আচ্ছা, আসব খুব ভোরে আবার ফিরেও যাবো সকাল সকাল, মা ঘুম থেকে ওঠার আগে।'

'তাই বেশ, তাই খুব ভাল, টের পাবে না কেউ। একেবারে খুব ভোর বেলা উঠে এসো।'

কথায় কথায় সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসে।

'তুই আমায় একটু এগিয়ে দিবি, অমরেশ?'

'দেবো।'

'তোর ভয় করবে না?'

'ভয় কিসের, এটা তো আমাদের বাগান।'

কতটুকু এগিয়ে গিয়েই একটা ছোট খাল। খালটা ছোট কিন্তু বেশ গভীর। পূর্ব-বাঙলায় এমনি খাল বাড়ী-ঘরের আনাচে-কানাচে, যখন জোয়ার আসে তখন জল থৈ-থৈ করে, আবার ভাঁটার টানে শুকিয়ে যায়। খালটা পারাপারের জন্ত একটা সাঁকোর বদলে এক খণ্ড সুপারী গাছ দেওয়া ছিল। একে বলে 'চার'। সেই 'চারটা' জোয়ারের জোরে ভেসে গেছে। হয়ত পূবটানে, নয়ত পশ্চিমে।

'এখন উপায়, পার হই কি করে?'

'এই এমনি ক'রে।' অমরেশ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্থানটা এক লাফে পার হয়।

'আমি ত পারব না অমরেশ।'

'খুব পারবে—একটু হাতখানা এগিয়ে দাও, আমি ধরি, তুমি এবার লাফ দাও।'

কথিত প্রণালীটা মন্দ না। সোণালী একেবারে হুড়মুড় করে গিয়ে অমরেশের গায়ের ওপর পড়ে। খানিকটা শাড়ী ভিজে যায়। তার পর সে কি হাসাহাসির পালা! একটা নরম স্পর্শে অমরেশের দেহটা কেমন ক'রে ওঠে যেন। সোণালীতে ওকে অনেকক্ষণ এমনিই জড়িয়ে ধ'রে থাকে! শেষে অমরেশ একটু বিরক্ত হ'য়েই ছিন্ন করে ওর নাগপাশ।

ফেরার সময় অমরেশ ভাবে, কাল কি কি ফুল তুলবে!

[ক্রমশঃ
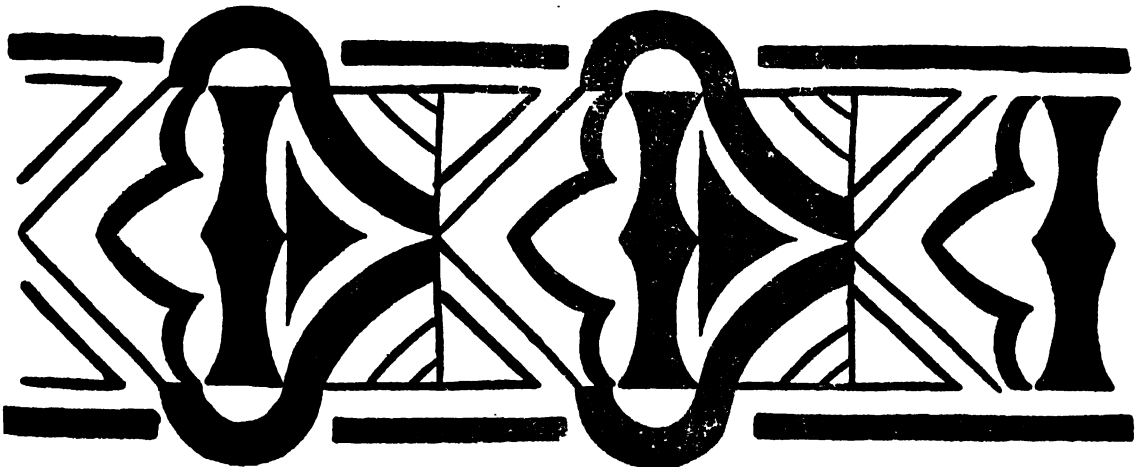
—[illegible] মজুমদার

তিমিরবরণ
তিমির বরণ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

ডাক্তার আগেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে

প্রসবের সময় দুষ্ট-জীবাণুর আক্রমণ হতে পারে

ডাক্তার বললেন —

প্রসবের সময় 'ডেটলের' উপর নির্ভর করতে আমি সব প্রসূতিকেই পরামর্শ দিই, অন্যান্য ঘরেও সর্ব্বদা 'ডেটল' রাখতে বলি।

ANTISEPTIC DETTOL NON-POISONOUS GERMICIDE

'DETTOL'

এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ, ২০-১, চেতলা রোড, কলিকাতা

ছোটদের আসর

বারো

পুরাতন ইতিবৃত্ত

সুব্রত যখন সুজিতদের বাড়ীতে ফিরে এল, রাত্রি তখন প্রায় নয়টা হবে। সুবিমলের চা-পানের নিমন্ত্রণ আর তার রক্ষা করা হয়নি। এলোমেলো নানা প্রকারের চিন্তায় মনটা তার তখন অত্যন্ত চঞ্চল।

সুব্রতর চিন্তা-রেখাংকিত মুখের দিকে তাকিয়ে সুজিত প্রশ্ন করলে, 'ভারতী-ভবনে গেছিলি বুঝি ?'

'না ভাই, যাওয়া হয়নি।'

সুজিতের মা ভগবতী দেবী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, 'টেবিলে ভাত দিয়েছে সুজিত, খাবি চল।'

আদিনাথ চাকুরি-জীবনে অনেক প্রকার সাহেবীয়ানাই ক- ছিলেন, এবং চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর একটি মাত্র অভ্যাস ছাড়া আর সব কিছুই অবলীলাক্রমে ত্যাগ করেছিলেন। সেই অভ্যাসটি হচ্ছে, সকলে মিলে একত্রে টেবিলে বসে খাওয়া।

বাড়ীতে একটি মাত্র লোকই কেবল টেবিলের 'পরে খেতেন না, স্বয়ং ভগবতী দেবী। স্বামীর সকল প্রকার সাহেবীয়ানাতেই তিনি বরাবর হাত মিলিয়ে চলেছেন, কেবল স্বামীর হাজার অনুরোধ সত্বেও কোন দিন টেবিলে বসে খেতে রাজী হননি।

আদিনাথ টেবিলের সামনে বসে ওদের জন্ম অপেক্ষা করছিলেন।

টেবিলের 'পরে সব কাচের প্লেট সাজান।

ওরা দু'জনে এসে দু'খানি চেয়ার অধিকার করে বসল।

ভগবতী দেবীও একখানা চেয়ার অধিকার করে বসলেন, ওদের আহারের তদারক করতে, এটি ওঁর চিরদিনের অভ্যাস।

সকলে মিলে নানা ধরণের গল্প চলেছে, আর খাওয়া চলেছে, হঠাৎ পাশের ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো, ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং।

আদিনাথ তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন, কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন, 'ভারতী-ভবন থেকে অমুতোষ বাবু ফোন করছিলেন সুব্রত ; তোমার যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে এখুনি একটিবার সেখানে যেতে বলেছেন।'

'কেন, এত রাত্রে আবার সুব্রতকে তার কিসের দরকার ?···' ভগবতী দেবী রুক্ষ স্বরে বললেন।

'কি না কি জরুরী কথা আছে সুব্রতর সংগে তার।···'

'না না, এত রাত্রে আর যাওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই, কাল সকালে যাস সুব্রত।'

'না মাসিমা, হয়ত' কোন বিশেষ ব্যাপার হবে, আপনি ত' জানেনই, শংকর ঘোষের খুনের ব্যাপারটা আমি বেসরকারী ভাবে তদন্ত করছি।'

* * * *

খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত করে সুব্রত গাড়ী নিয়ে বের হয়ে পড়ল। আকাশের এক প্রান্তে কাস্তের মত সরু এক-ফালি চাঁদ। কালো আকাশের বুকে নক্ষত্রগুলো যেন হীরার কুচির মতই জলজল করছে। পাড়াগাঁ, এর মধ্যেই চারি দিকে যেন একটা ভৌতিক স্তব্ধতা নেমে এসেছে। মাঝে মাঝে গ্রাম-প্রান্ত হতে দু'-একটা কুকুরের চিৎকার। লোক-জনের চলাচল বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

সুব্রত যখন ভারতী-ভবনের সামনে এসে গাড়ী থামাল, রাত্রি তখন বোধ করি দশটা।···

প্রকাণ্ড জমিদার-ভবনটা রাত্রির আবছা চাঁদের আলোয় যেন বিরাট একটা ভৌতিক ছায়ার মতই মনে হয়। দূর আকাশের প্রান্ত হতে ফালি-চাঁদের বুক হতে ও অসংখ্য নক্ষত্রের কোষ হতে যেন অতি সূক্ষ্ম আলোর একটা স্নিগ্ধ ধারা প্রকাণ্ড বাড়ীটার সর্বাংগে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে।

বাড়ীর সামনের বাগানের গাছগুলো যেন মাটির পৃথিবীর অসংখ্য ইসারা। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দূর আকাশের স্তিমিত চন্দ্রালোকে।

বাড়ীর কোন জানালাতেই কোন আলোর চিহ্ন নেই। প্রায় সব জানালা-দরজাগুলিই বন্ধ। যা হোক, লোহার গেট দিয়ে ঢুকে, বাগান পার হয়ে গিয়ে সদর দরজায় ধাক্কা দিতেই সুখদাস এসে দরজা খুলে দিল।

ঘরটি বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত। এ-বাড়ী হতে ফোনে ডাক আসায় সুব্রত একটু যেন কেমন অবাকই হয়ে গেছিল।

গত উৎসবের রাত্রিতে যখন সে এ-বাড়ীতে আসে তখন বৈদ্যুতিক আলোর কোন চিহ্নই দেখেনি, আগাগোড়া সব ঘরে ঝাড়-লণ্ঠনের সমারোহ, এমন কি সিঁড়িতেও দেওয়াল-বাতি। যা হোক, মনের বিস্ময় সে তখনকার মত মনের মধ্যেই চেপে রাখে।

'এই যে সুখদাস, তোমার বাবু কোথায় ?'

নাগপাশ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

'আসুন, এই পাশের বসবার ঘরেই তিনি আপনার জন্ত অপেক্ষা করছেন।'

সুখদাসের পিছু-পিছু সুব্রত বারান্দা দিয়ে, পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। বারান্দাতেও আজ বৈদ্যুতিক বাতি, এবং যে ঘরের মধ্যে গিয়ে সুব্রত প্রবেশ করল, সে ঘরেও সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা টেবিল-বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে।

সামনেই একটা সোফার 'পরে অমুতোষ বাবু বসে আছেন, বৈদ্যুতিক টেবিল-বাতির নরম সবুজ আলো তার মুখে ও বুকের প'রে এসে ছড়িয়ে পড়ছে। একমনে তিনি একখানা বই পড়ছেন। সুব্রতর পদশব্দে অমুতোষ বাবু বই হতে মুখ তুললেন, 'এই যে সুব্রত বাবু আসুন, এই রাত্রে অসময়ে আপনাকে এ ভাবে টেনে আনার জন্ত সত্যিই বড় লজ্জিত।'

সুব্রত লক্ষ্য করলে, অমুতোষ বাবুর গায়ে একটা দামী শাল জড়ান।

'সুখদাস, কফি তৈরী করে নিয়ে এসো।'

'আপনিও খাবেন ত' বাবু!'

'হ্যাঁ।'

সুব্রত আর একটা ধাক্কা খেলে বিস্ময়ের। যা হোক, সুখদাস ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতেই সুব্রত আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলে না। এতক্ষণ যে প্রশ্নটা তার গলার কাছে এসে ঠেলাঠেলি করছিল, সেটা সে উগরিয়ে ফেলল, 'আমার এ কৌতূহলের জন্ত আগেই মাপ চেয়ে রাখছি, একটা জিনিষ যেন আজ 'ফোন কল' পাওয়ার পর হতেই কেমন কেমন ঠেকছে।

'কি বলুন ত?' ধীর সংযত অমুতোষের গলার স্বর।

'যে রাত্রে আপনার বাড়ীতে উৎসবে যোগ দিতে আসি, তখন ত' আপনার বাড়ীর কোথায়ও কোন বিদ্যুৎ-বাতি দেখিনি। সব ঝাড়-লণ্ঠন, দেওয়াল-বাতি।...'

অমুতোষ মৃদু হেসে বললেন, 'এ-বাড়ীতে প্রথম যখন আমি বাস করতে আসি, এর কোথায়ও কোন বিদ্যুৎ-বাতি ছিল না, একমাত্র একটি ফোন ও দাদা মশায়ের শয়ন কক্ষে একটি সিলিং ফ্যান ছাড়া। বাড়ীতে বিদ্যুতের কানেকশন থাকা সত্ত্বেও কোন বিদ্যুৎ-বাতির ব্যবহার ছিল না। দাদামহাশয়ের সেই সেকেলে আভিজাত্য! ঝাড়-লণ্ঠন, দেওয়াল-বাতি, কেবল অফিসের কাজ-কর্মের জন্ত একটা ফোন মাত্র ছিল। আমি এখানে আসবার পর সব ঘরে বিদ্যুৎ-বাতি লাগাই, এবং একমাত্র কোন বিশেষ উৎসবের রাত্রি ছাড়া এ-বাড়ীতে বিদ্যুৎ-বাতিই জ্বলে। কেবল কোন বিশেষ উৎসবের রাত্রে দাদামশায়ের যুগের পুরাতন আভিজাত্যটাকে সম্মান দেওয়ার জন্ত বিদ্যুৎ-বাতি না জ্বালিয়ে, ঘরে-ঘরে সর্বত্র ঝাড়-লণ্ঠন ও দেওয়াল-বাতি জ্বালান হয়। এই কারণেই সে উৎসবের রাত্রে আপনি বিদ্যুৎ-বাতি দেখেননি।'

এমন সময় একটা ট্রেতে করে সুখদাস গরম কফি নিয়ে এল।

'আপনি এখানে আসবার একটু আগে সুখদাসের সংগে আমার সেই কথাই হচ্ছিল, যা বলবার জন্ত আমি আপনাকে এই শীতের রাত্রে এ ভাবে কষ্ট দিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুখদাস আমাকে তেমন কোন সাহায্যই করতে পারলে না। আমি আশা করেছিলাম, ও অন্ততঃ এ বিষয়ে আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু শংকর ঘোষ সম্পর্কে সুখদাস আমাকে তেমন বিশেষ কিছুই বলতে পারলে না। মানে, আমি একটু আগে সুখদাসের সংগে শংকর ঘোষের কথা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। কিন্তু সুখদাস বলছিল, শংকর ঘোষ লোকটা না কি অত্যন্ত চাপা-প্রকৃতির ছিল, বিশেষ কারো সংগেই তেমন মেশামিশি বা তেমন কথাবার্ত্তাও কইত না।

সুখদাস বলছিল, কখনো না কি শংকর তার নিজের বিষয় নিয়ে কারো সংগে কোন রকম আলোচনাই করতো না।''

সুখদাস কফির পেয়ালায় কফি ঢেলে দুধ-চিনি মিশাচ্ছিল আপন মনে। সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুখদাসের মুখের দিকে তাকাল, মুখের রেখাগুলোর মধ্যে যেন কোন প্রাণের স্পন্দন পর্য্যন্ত নেই। মড়ার মুখের মতই রূঢ় ও কঠিন, যেন জমাট বেঁধে গেছে বরফের মত। হঠাৎ সুখদাসের দিকে নজর রেখেই, অমুতোষের দিকে তাকিয়ে সুব্রত প্রশ্ন করে: 'লোকটার কোন গোপনীয় কিছু ছিল না ত'? যার জন্ত হয়ত সে নিজেকে সকলের জিজ্ঞাসার আড়ালে রাখতো?'

জবাব দিল সুখদাস, ভাব-লেশহীন নির্বিকার কণ্ঠে: 'আজ্ঞে না। তেমন কোন কিছু ছিল বলে মনে হয় না। আমরা দু'জনে এ-বাড়ীতে আজ পঁচিশ বছরেরও উপরে আছি। তেমন কোন কিছু থাকলে নিশ্চয়ই জানতে পারা যেত। তা'ছাড়া আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় তেমন কিছুই, ত ছিল না। এ বাড়ীর মাহিনা-করা লোক হলেও তার ও আমার মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। যদিচ কর্ত্তা বাবু তার মাহিনা-করা লোকদের মধ্যে কখনো কোন পার্থক্যই করতেন না, ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায়।'

'আচ্ছা সুখদাস, তুমি বলছো শংকর ঘোষের সংগে তোমার তেমন বন্ধুত্ব বা মেলামেশা ছিল না। অথচ তোমরা দু'জনে এ-বাড়ীতে পঁচিশ বছরেরও উপরে ছিলে, এর মানে কি? তোমাদের দু'জনের মধ্যে কি কোন কারণে কোন দিন ঝগড়া-ঝাটি হয়েছিল?' সুব্রত প্রশ্ন করলে।

'আজ্ঞে না। হাজার হলেও এ-বাড়ীর সে ছিল নায়েবের মত, আর আমি এক জন সামান্ত ভৃত্য মাত্র। আমাদের দু'জনের মধ্যে তেমন মেলামেশা কেমন করে সম্ভব হয় বলুন!'

কফির পেয়ালা দু'টো সুখদাস দু'জনের দিকে এগিয়ে দিল: 'আর কিছু চাই কি ছোট বাবু?

'না, তুমি এখন যেতে পার সুখদাস।'

নিঃশব্দে দীর্ঘ একটা ছায়ার মতই যেন সুখদাস ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সুব্রত কফির পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে বললে, 'তার পর হঠাৎ আমাকে ডেকেছেন কেন অমুতোষ বাবু?'

মৃদু স্বরে অমুতোষ বাবু বললেন, 'শংকর ঘোষ সম্পর্কেই দু'-একটা কথা বলবার জন্ত আপনাকে আমি এ সময় ডেকেছি সুব্রত বাবু। আজ কয় দিন থেকে শংকর ঘোষের মৃত্যুর ব্যাপারটা যেন ছায়ার মতই জাগরণে নিদ্রায় সর্বদা আমাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে।' টেবিল-বাতির মৃদু নীলাভ আলো অমুতোষ বাবুর মুখের 'পরে পড়েছে। চারি দিক নিশুতি, নিস্তব্ধ। ঘরের পিছন দিকের জানালা দু'টো খোলা। শীত-রাত্রির উত্তরে হাওয়া ঝিরঝির করে এসে ঘরে প্রবেশ করছে। অমুতোষ বাবু বলতে লাগলেন, 'সে আজ আড়াই বছরের আগেকার কথা, মামার মৃত্যুর পর প্রথম যখন আমি এ-বাড়ীতে

এসে উঠি। আপনাকে সেদিনই বলেছিলাম, মামার এক প্রকার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল শংকর ঘোষ। মামার এক ছেলে ছিল সন্তোষ। সে আমার চাইতে বছর ছয়েকের বড় হবে বয়সে। তার বয়স যখন বছর বাইশ-তেইশ হবে, হঠাৎ এক দিন সে কোন কারণে মামার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যায়। প্রথমে মামা তার কোন খোঁজ-খবরই নেননি বছর চার-পাঁচ, তার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিলেন, কিন্তু তার আর কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যায় না। মামার মৃত্যুর মাস দুই আগে হঠাৎ রাওলপিণ্ডি পুলিশের কাছ থেকে একটা সংবাদ পাওয়া যায়, সন্তোষ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি রাওলপিণ্ডির এক হোটেলে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছে। সংবাদ পেয়ে মামা ও শংকর ঘোষ দু'জনেই সেই রাত্রে রাওলপিণ্ডিতে রওনা হয়ে যায়। মামাই মৃতদেহ সনাক্ত করে বলেন, মৃত ব্যক্তি তাঁরই নিরুদিষ্ট পুত্র সন্তোষ। আমি তখন পাকশী স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার। ঐ ঘটনায় মামা অত্যন্ত আঘাত পান। ফিরবার পথে সোজা তিনি আমার ওখানে গিয়ে ওঠেন, আমি একটা কাজে তখন কলকাতায় ছিলাম। আমার সংগে তাঁর দেখা হয় না। তিনি আমার নামে একটা চিঠি লিখে কোন্নগরে ফিরে আসেন। পাকশীতে ফিরে, মামার চিঠি পড়ে আমারও মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়; এবং আমি সেই দিনই পাকশী হতে রওনা হয়ে পড়ি। এখানে এসে দেখলাম, ডাক্তারেরা বলেছেন, মামার নার্ভাস 'ব্রেক ডাউন' হয়েছে। অনেক প্রকার চিকিৎসাই করা হলো, আমি কিছু দিন এখানে থেকে আবার পাকশী চলে যাই। ক্রমে মামা একটু একটু করে তখন আবার সুস্থ হয়ে উঠছেন। উক্ত ঘটনার প্রায় মাস দুই বাদে হঠাৎ এক দিন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মামা মারা গেলেন। মামার মৃত্যুর মাস খানেক বাদে আমি এখানে চলে এলাম চাকরী ছেড়ে দিয়ে। এখানে এসে দেখলাম, এ-বাড়ীতে শংকর ঘোষের স্থান ঠিক যে কোথায়, তা বলা কষ্ট। সে চাকরও বটে, আবার নায়েবও বটে। সে এ-বাড়ীর কেউ না হয়েও, এ-বাড়ীর যেন সর্বেসর্বা। সে তার নিজের ইচ্ছামত চলে ফিরে। যখন খুসী বাড়ীর গাড়ী বের করে নিয়ে যায়। অথচ তাকে এ বিষয়ে কিছুই বলবারও উপায় নেই; কেন না, মামার উইল অনুসারে শংকর ঘোষ যত দিন বেঁচে থাকবে, এ-বাড়ীতে থাকবে এবং নিয়মিত ১১০৲ করে মাইনা পাবে, তা সে কাজ করুক আর নাই করুক। অখণ্ড স্বাধীনতা! যেন মামার পোষ্যপুত্র!'

শুনেছি, লোকটার আত্মীয়-স্বজন এ পৃথিবীতে কেউ ছিল না, তবে তার এক দূর-সম্পর্কীয় ভাই শ্রীরামপুরে থাকে শুনেছি, তার কাছে প্রায়ই ও যেত, এবং যাবার সময় গাড়ী নিয়েই যেত। প্রায়ই শংকর তার ভাইয়ের সংগে দেখা করতে যেত, এবং শনিবার রাত্রিটা সেখানে থেকে আবার রবিবার সকালে চলে আসত। আমিও তাকে কোন দিন অবিশ্বাস করিনি। এবং হয়ত' করতামও না।

সুব্রত বিস্মিত ভাবে অমুতোষ বাবুর মুখের দিকে তাকাল।

অমুতোষ আবার বলতে লাগল, 'সেদিনটাও শনিবার, আমি কলকাতায় গেছিলাম একটা কাজে, রাত্রি তখন আটটা হবে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকেছি কিছু খাবো বলে, হঠাৎ রেস্তোরাঁর এক কোণে নজর পড়ল, দেখি, শংকর ঘোষ আর এক জন মোটা গুণ্ডা ধরণের লোক বসে ফিস্-ফিস্ করে কি সব কথাবার্তা বলছে। আমাকে ওরা দেখতে পায়নি। কোন দিনও সে আমাকে যাবার সময় বলে যেতো না। অথচ সেদিন দুপুরে যাবার সময় সে বলে গেছিল আমাকে, তার আত্মীয়টির অত্যন্ত অসুখ, সে এবারে রবিবার না এসে সোমবার সন্ধ্যায় আসবে। মনে কেমন একটা খটকা লাগলো, কিছুক্ষণ পরে আমি ওদের অজ্ঞাতেই রেস্তোরাঁ হতে বের হয়ে এলাম।'

'সে বারে শংকর ঘোষ বোধ হয় সোমবারই ফিরেছিল?'

'হাঁ, সোমবার সন্ধ্যায়।'

'আপনি তাকে ও-সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

'হাঁ, কিন্তু সে অস্বীকার করে বলে আমারই দেখার ভুল, কেন না, সে না কি দু'টো দিন ও রাত তার আত্মীয়ের শয্যার পাশ ছেড়ে একেবারেই ওঠেনি। অথচ আমি জানি, আমি তাকে সত্যিই দেখেছিলাম। নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।'

'শংকর ঘোষের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়টি শ্রীরামপুরে কোথায় থাকে, জানেন কি অমুতোষ বাবু?'

'না।'

'আচ্ছা আপনিও ত' শুনেছেন, মৃত্যুর কয়েক মাস আগে হতে সে তার সেভিংস্ ব্যাংকে অনেক টাকা জমা দিচ্ছিল, কোথা হতে ও এত টাকা ইদানিং পাচ্ছিল বলে আপনার কোন ধারণা হয়?'

'না।'

এমন সময় হঠাৎ ওরা শুনতে পেলে, কে যেন বাইরের বন্ধ দরজার কড়াটা নাড়ছে।

'হঠাৎ এত রাত্রে আবার কে এল?' অমুতোষ বাবু উঠে দাঁড়ান।

'বাইরের বারান্দায় কার দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল, বোঝা গেল, কেউ দরজা খুলে দিতে যাচ্ছে।

অমুতোষ বাবু আবার বসে পড়ল।

দু'জনেই চুপ-চাপ, হঠাৎ উঁচু পর্দায় কারা কথা-কাটাকাটি করছে শোনা গেল?

ওরা দু'জনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে।

অকস্মাৎ এমন সময় রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে কার আর্ত আকুল স্বর চারি ভিতে ছড়িয়ে পড়ে—'বাঁচাও! কে আছো, বাঁচাও!...'

তের

ঘটনার স্রোতে

'সর্বনাশ! ও ত' সুখদাসের গলা'! মুহূর্তে চেয়ার হতে উঠে পড়ে অমুতোষ বাবু তড়িৎ বেগে দরজা খুলে বাইরে চলে গেলেন।

সুব্রতও আর কালবিলম্ব না করে অমুতোষ বাবুকে অনুসরণ করে।

বাইরের সদর দরজাটা খোলাই ছিল, দরজার মাথার 'পরে ইলেকট্রিক আলোটা জেলে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই অমুতোষ বাবু এবং তার ঠিক পশ্চাতেই সুব্রত খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজার ঠিক নীচেই সুখদাস ও সুসীম, সুসীমের হাতে একটা পিস্তল এবং সুখদাস দু'হাতে প্রাণপণে সুসীমকে জড়িয়ে ধরে চেষ্টা করছে সুসীমের হাত হতে পিস্তলটা কেড়ে নিতে।

সুব্রত অমুতোষকে এক প্রকার ঠেলে সরিয়ে নীচে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

সুখদাস তীব্র দৃষ্টিতে সুব্রতর দিকে তাকাল, তার চোখে যেন একটা রক্তলোলুপ হায়নার জিঘাংসা। সমগ্র মুখখানা একটা কুৎসিত প্রতিহিংসায় হিংস্র ও ভয়াল হয়ে উঠেছে।

মড়ার মুখে যেন একটা ঘৃণ্য ক্রুর হাসি।

ততক্ষণ এক ঝাপটা দিয়ে সুসীম সুখদাসের আলিঙ্গন হতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে, এবং রুক্ষ স্বরে বললে, 'শয়তান! ভাল্লুক! তুই মনে করেছিস আমার হাত হতে তুই নিস্তার পাবি, দেখি তোকে কে রক্ষা করে। মর।'

সংগে সংগে সুসীমের হস্তধৃত আগ্নেয়-অস্ত্র অগ্নি উদ্‌গিরণ করলে, একটা ভয়ংকর শব্দ রাত্রির স্তব্ধ-আঁধার বুকখানাকে যেন চিরে ফালি-ফালি করে দেয়, দুড়ুম!...

ঘটনাটা অত্যন্ত আকস্মিক!...

কিন্তু উত্তেজনার মুখে সুসীম তার লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারেনি, গুলীটা গিয়ে বাড়ীর পাকা দেওয়াল ভেদ করল।

সেই মুহূর্তেই সুব্রত বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে পড়ে জাপানী যুযুৎসুর প্যাঁচ দিয়ে সুসীমের হাত হতে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিল।

সুসীম তখনও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।...

অমুতোষও এগিয়ে এসে সুসীমকে ধরল। শুধু একা সুখদাস নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইলো। তার ভাব-লেশহীন মড়ার মত কঠিন মুখখানা—যা একটু আগে ভয়ংকর একটা কুৎসিত হিংসায় প্রেতায়িত হয়ে উঠেছিল, এখন যেন তার কোন রেখায় এতটুকুও কোন চিহ্ন নেই। এই মাত্র যেন ও কবরের ভিতর হতে ঘুম ভেংগে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

এমন সময় গোলমালে ও গুলীর শব্দে সুবিমল ও মালতী এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে।

দু'জনের মুখেই একটা বিস্ময় ও আতংক।

'ব্যাপার কি দাদা? এত গোলমাল কিসের এই রাত্রে?' সুবিমল বলে।

'গুলীর আওয়াজ পেলাম', মালতী প্রশ্ন করে।

'ঠিক আছে, কোন ক্ষতি হয়নি', সুব্রত বলে।

অমুতোষ রুক্ষ স্বরে সুসীমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'কে তুমি?'

সুসীম তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অমুতোষের দিকে তাকায়, চোখের দৃষ্টি হতে যেন একটা ঘৃণা ঝরে পড়ছে। সে নিজেকে অমুতোষের দৃষ্টি হতে ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করে তীক্ষ্ণ বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে বলে: 'ছেড়ে দাও, যেতে দাও আমাকে!...কিছুই আমি তোমাকে বলতে রাজী নই!—ছেড়ে দাও!'...

অমুতোষ আরো শক্ত করে সুসীমের ধৃত হাতখানা চেপে ধরে, 'সুবিমল, এখুনি থানায় আমার নাম করে সন্তোষ বাবুকে একটা ফোন করে দে। বলবি, জলদি এক জন কনেষ্টবল পাঠিয়ে দিতে।'

তীব্র ঘৃণা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে অমুতোষের দিকে তাকিয়ে সুসীম বলে, 'এত তাড়া-হুড়ো করে থানায় খবর না দিলেই বোধ হয় ভাল করবেন অমুতোষ বাবু, শেষ কালে হয়ত আপনার এ হঠকারিতার জন্ম আপশোষেরও সীমা থাকবে না। আমার ব্যাপারে কেউ-ই মাথা ঘামাবে না।'

'নেশা করেছে লোকটা!'...

'হাঁ, তবে মদ-গাঁজা-গুলি নয়, সিদ্ধি!' তীব্র ঝাঁঝাল স্বরে সুসীম জবাব দেয়।

এতক্ষণে সুখদাস কথা বলে, 'একে বোধ হয় চিনতে পারছেন না ছোট বাবু? বোসপাড়ার এক টেরে যে ছোট একতলা বাড়ীটা এত দিন খালি পড়েছিল, সেই বাড়ীতেই এ আর এর বড় ভাই এসে ভাড়া নিয়ে আছে। এর দাদা আপনাদের মিলে চাকরী করে।'

সবিস্ময়ে সুব্রত সুখদাসের মুখের দিকে তাকাল।

সেই নির্বিকার ভাব-লেশহীন সুখদাস। সমগ্র মুখের মধ্যে কোথায়ও এতটুকু জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। মড়ার মুখের মতই ফ্যাকাশে, কঠিন।

'কি বললে?' অমুতোষ সুখদাসের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকায়।

'বোধ হয়, বাবু সুখদাসের বন্ধু!'...সকলেই একসংগে যুগপৎ বিস্ময়ে ফিরে তাকায় বক্তার দিকে। বক্তা আর কেউ নয়, ঐ বাড়ীর নতুন ভৃত্য কৈলাসচরণ! সে-ও ইতিমধ্যে কখন এক সময় ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

'তাই না কি সুখদাস?'

'আজ্ঞে, দু'-এক বার দেখেছি, তাই চিনি', সুখদাস শান্ত নির্বিকার ভাবে জবাব দেয়।

সুবিমল কিন্তু ফোন করতে যায়নি, কারণ, সুব্রত চোখ-ইসারায় সুবিমলকে ফোন করতে নিষেধ করেছিল।

সুব্রত অমুতোষের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার মনে হচ্ছে সত্যিই লোকটা খুব বেশী সিদ্ধি খেয়েছে।'

অমুতোষ তখন তীব্র দৃষ্টিতে সুসীমের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি হে ছোকরা? এখানে এত রাত্রে আবার বাড়ীর চাকরকে খুন করতে এসেছিলে কেন? জান, এখন তোমাকে আমি পুলিশের হাতে ইচ্ছা করলেই ধরিয়ে দিতে পারি?'

'বেশ ত', দিন না পুলিশের হাতে ধরিয়ে, আপনার পায়ে ধরে ত' আমি নিষেধ করছি না! কিন্তু এখনও বলছি, আমাকে যেতে দিন, না হলে আপনাকেই হয়ত আপশোষ করতে হবে।'

অমুতোষ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে, না একে পুলিশের হাতেই দেওয়া উচিত! কিন্তু নেশার ঘোরে ও বুঝতে পারছে না, কি ও করছে।

'কিন্তু আশ্চর্য্য! হঠাৎ সিদ্ধি খেয়ে ও-ই বা কেন পৃথিবীতে এত লোক থাকতে সুখদাসকে খুন করতে এত রাত্রে ছুটে এলো?'

'আগাগোড়াই কি ব্যাপারটা স্রেফ নেশা?' কথাটা বললে সুবিমল?

'আমি ওকে খুন করতে চাইনি,' তীব্র ঝাঁঝাল স্বরে সুসীম সুবিমলের প্রশ্নের জবাব দেয়।

সুব্রত এতক্ষণে আবার কথা বললে, 'তুমি অমুতোষ বাবুর কাছে ক্ষমা চাও। নিজেকে আস্ত একটি গর্দভ প্রতিপন্ন করেছো।'

অমুতোষ তীব্র দৃষ্টিতে সুব্রতর দিকে তাকায়: 'একে কি আপনি চেনেন সুব্রত বাবু?'

'সামান্যই চিনি, শুনেছি, এই ভাবে সিদ্ধি খেয়ে গোলমাল করাটা ওর একটা অভ্যাস। আরো দু'-চার বার ক্লাবে রেস্তোরাঁয় এ রকম ও করেছে।'

'সর্বনাশ, এই বয়েসে অমন সিদ্ধি খেতে শিখেছে! কিন্তু এখন একে নিয়ে কি করা আমার কর্তব্য? ওকে ছেড়ে দেবো, না পুলিশের হাতে তুলে দেবো? I mean, এ সব লোক dangerous, গুণ্ডা, any momentএ কি করে ফেলবে!'

সুব্রত অমুতোষের কথায় মৃদু হেসে বললে: 'আমি হলে কিন্তু ওকে ছেড়েই দিতাম, তবে আপনার বাড়ীর ব্যাপার। যা আপনি ভাল বোঝেন তাই করবেন।'

'কি জানি। ব্যাপারটা বড্ড বিশ্রী। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত সুখদাসকে খুনই করে বসত।'

'ওকে ছেড়েই দিন ছোট বাবু! নেশা ছুটে গেলে হয়ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে ওর নিজেরই আপশোষ হবে। তা'ছাড়া, আমার নিজেরও ইচ্ছা নয় ওকে পুলিশের হাতে দেওয়া হোক।'

এবারে কথা বললে সুসীম: 'আমি সুখদাসের ক্ষতি করতে চাইনি, আমার···মানে দোষই হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন।···আমি যা হয়ে গেছে, তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত!'···

'বেশ। আজ তোমাকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এ ধরণের কাজ আর ভবিষ্যতে কোন দিন করো না। যাও'···অমুতোষ সুসীমের ধৃত হাতখানা ছেড়ে দিল।

আর একটি মাত্র কথা না বলে সুসীম অন্ধকারে দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুসীমের প্রস্থানের সংগে সংগে সকলেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ব্যাপারটা যেন একটু কুশ্রী দুঃস্বপ্নের মত সকলের মনের 'পরে ভারী হয়ে চেপে বসেছিল।

অমুতোষই প্রথমে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল; তার পিছু পিছু আর সকলেও এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর'ল।

ঘরের মধ্যে এক মাত্র সুখদাস ছাড়া সকলেই এসে প্রবেশ কর'ল।

কারও মুখেই কোন কথা নেই; সকলেই যেন নিজ নিজ চিন্তায় বিমনা। হঠাৎ এক সময় সুবিমল বলে উঠে; 'আমি ত' কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, এত লোক থাকতে হঠাৎ লোকটা আমাদের সুখদাসকেই বা খুন করতে এল কেন? আমার কিন্তু মনে হয়, দাদা, তোমার ঐ পুরাতন ভৃত্য সুখদাসই আমাদের শংকর ঘোষকে গুলী করে মেরেছে?'

জবাব দিল অমুতোষ: 'সুখদাস শংকর ঘোষকে গুলী করে মেরেছে! তার মানে? কি তুই পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছিস? আর দুনিয়ায় লোক নেই, হঠাৎ সুখদাসই বা কেন শংকর ঘোষকে গুলী করে মারতে যাবে? কি তার স্বার্থ আছে এতে?' কণ্ঠস্বরে একটা সুস্পষ্ট বিস্ময়ের সুর!

'তাই যদি না হবে, তা'হলে ও লোকটা সুখদাসকেই বা গুলী করতে যাবে কেন?'

'কি তুমি বলছো বিমলদা? পাগলের মত যা-তা? এই সব হাই-পাঁশ ভাবতে ভাবতে দেখছি তুমি যা-তা বলতে সুরু করেছো।' কথাটা বললে মালতী দেবী। তার পর সহসা সুব্রতর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে: 'আচ্ছা সুব্রত বাবু, আপনি কি তা-ই মনে করেন? সুখদাসই শংকর ঘোষকে খুন করেছে?'

'না, অসম্ভব!'···ধীর গম্ভীর স্বরে সুব্রত জবাব দেয়।

'বেশ। তাই যদি না হবে, তবে কেন লোকটা এই রাত্রে এখানে এসেছিল হঠাৎ? আপনারা হয়ত বলবেন, সিদ্ধির ঝোঁকে হঠাৎ সে এখানে এসেছিল। এবং তার পর সিদ্ধির ঝোঁকেই এক জনকে গুলী করে মারতে চেষ্টা করেছিল। আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটাকেই হয়ত আপনারা সকলে সিদ্ধির নেশা বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন! এ-ও কি কখনো সম্ভব বলে মনে হয়? কথা নেই বার্ত্তা নেই,' হঠাৎ খানিকটা সিদ্ধি খেয়ে হঠাৎ সিদ্ধির নেশায় এক জনের বাড়ীতে এত রাত্রে চড়াও হয়ে এক জনকে গুলী করতে যাওয়া? ব্যাপারটা কি হাস্যকর নয়? তা'ছাড়া, সিদ্ধির নেশা কি এতই জোরাল যে মানুষ আবোল-তাবোল কাজ করবে?'

'কিন্তু একটা জিনিষ আপনি আগাগোড়াই ভুলে যাচ্ছেন সুবিমল বাবু! লোকটা যে শুধু নেশাই করেছে, তা নয়। লোকটা স্বভাবতই অস্থির ও অসহিষ্ণু প্রকৃতির। কিন্তু এ আলোচনা আজকের মত থাক। রাত্রি অনেক হলো। অমুতোষ বাবু, একটা কথা আপনাকে আমি বলে যাচ্ছি, আমার যত দূর মনে হয়, লোকটার ধনিক শ্রেণীর লোকদের 'পরে একটা সহজাত বিজাতীয় ঘৃণা আছে। এবং সত্যিই হয়ত সেই জন্যই ও হঠাৎ আজ রাত্রে এ বাড়ীতে এসে চড়াও হয়েছিল। বহু দিনকার পুঞ্জীভূত ঘৃণা সহসা কোন কারণে হয়ত হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাতের মত ওর বুকখানা বিচলিত করে তুলেছিল। এবং আজকার নেশাটা হয়ত সেই অগ্ন্যুৎপাতের মূলে অনুকূল হাওয়া দিয়েছে মাত্র। আসলে ও-ধরণের অসহিষ্ণু চঞ্চল প্রকৃতির লোকেদের ভয় করবার মত কিছুই নেই। সত্যিকারের ক্ষতি এরা কারও কোন দিন করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। আসলে যে কার 'পরে ওর লক্ষ্য ছিল, তা হয়ত ও নিজেই ভাল করে জানে না। আচ্ছা, আজ তবে আসি! গুড্ নাইট্।'

সুব্রত ঘর হতে নিস্ক্রান্ত হয়ে গেল।

* * * *

মাথার মধ্যে যেন অনেকগুলো চিন্তা একটার সংগে আর একটা এলামেলো ভাবে জট পাকিয়ে তুলছে।

সুব্রত অত্যন্ত ধীর গতিতে গাড়ী চালাচ্ছিল।

শীতের গভীর নিশুতি রাত্রি। চারি দিকে যেন একটা শ্বাসরোধকারী ভৌতিক নিস্তব্ধতা!

শীত-রাত্রির শীতল বাতাস চলমান গাড়ীর উইণ্ডস্ক্রীনের পাশ দিয়ে এসে জাগরণ-ক্লান্ত চোখে-মুখে যেন একটা তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে দেয়।

সুতীব্র গাড়ীর হেড-লাইটে চারি দিক্ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে সুব্রত গাড়ি চালাচ্ছিল। সহসা ওর নজরে পড়ল, ধীর শ্লথ গতিতে সুসীম এগিয়ে চলেছে।

সুসীমের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে গাড়ীর ব্রেক কসে, সুব্রত গাড়ীর দরজাটা খুলে সুসীমকে মিষ্ট আহ্বান জানান: 'সুসীম বাবু?'

'কে?' চকিতে সুসীম প্রশ্নকারীর দিকে ফিরে তাকায়।

'আসুন, গাড়ীতে উঠুন। আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিই।'

'না, না, ধন্যবাদ, সুব্রত বাবু, আমি হেঁটেই যেতে পারবো।

সুব্রত মৃদু হেসে জবাব দেয়, 'তা আমিও জানি যে আপনি হেঁটেই বাড়ী পৌঁছাতে পারবেন, তবু আমি ত' ওই দিকেই যাবো, আসুন, উঠে পড়ুন।'

সুসীম আরো দু'-একবার মৃদু আপত্তি জানাল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত

সুব্রতর অনুরোধ এড়াতে পারলে না, গাড়ীতে উঠে, ঝুপ্‌ করে ফ্রণ্ট সিটেই সুব্রতর পাশে বসে পড়ল।

সুব্রত আবার গাড়ী চালাল।

নিঃশব্দে সুব্রত গাড়ী চালাচ্ছে, কারো মুখেই কোন কথা নেই। দু'জনেই পরস্পর পরস্পরের চিন্তায় যেন হয় বিভোর।

সুসীমদের বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামিয়ে, দু'জনে বাকী পথটা অতিক্রম করবার জন্য এগোচ্ছে হঠাৎ সুসীমের বাড়ীর সদর দরজাটা খুলে গেল, এবং লণ্ঠন হাতে অসীমকে দেখা গেল।

ওরা দু'জন আর একটু এগুতেই অসীমের উৎকণ্ঠিত গলার স্বর: 'কে, সুসীম না? এত রাত করে কোথায় গেছিলে?···কে ও তোমার সংগে?'

সুব্রত এগিয়ে এল: ভয় পাবেন না অসীম বাবু! আমি সুব্রত!'···

অসীম বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল: হুঁ, আমি তখনই অনুমান করেছিলাম। এত বড় বন্ধু ত' এ জায়গায় আর কেউ নেই আমাদের! কিন্তু ব্যাপার কি বলুন ত'?···

সুসীম তার ভাইকে এক প্রকার ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে ক্লান্ত স্বরে বললে, 'যা কিছু জানবার সব তুমি সুব্রত বাবুর কাছে জানতে পারবে দাদা। আমি শুতে চললাম, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার।' বলতে বলতে দ্রুত পদবিক্ষেপে সুসীম শয়ন-কক্ষের দিকে চলে গেল।

[ক্রমশঃ।

গ্রীষ্মের ছড়া

প্রভাকর মাঝি

কাঠ-ফাটা রোদ্দুর—জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্ম
নিঝ্‌ঝুম চার দিক্‌, নিশ্চুপ বিশ্ব।
মাঝে মাঝে থেকে থেকে শন্‌-শন্‌ ঘূর্ণি,
ঘুরপাক খায় যেন পাতাগুলি চূর্ণি।
রাঙা ধুলা উড়ে যায়—আঁখি লাগে চক্ষে,
যেথা যাই আইঢাই—কোথা নাই রক্ষে!
পার্শ্বের ঝাউ-শাখে আচমকা আজ যে
ছন্দের ঝুমঝুমি একটানা বাজছে!
একটা বেয়াড়া কাক বিচ্ছিরি ডাকছে—
থোলো থোলো কাঁচা-মিঠা আম যেথা পাকছে!
ঐ শোন সেখানে কি টৈ-টৈ শব্দ,
আম-মাছি কামড়ায়—আচ্ছা সে জব্দ!
'সোনামণি' বিছানায় ছটফট করছে,
কুসুলি চুলকায়—চোখে জল ঝরছে!
গ্রীষ্মের ছড়া কই? ক্রমাগত ঘামছি—
ক' লাইন লিখতে গে' বারে বারে থামছি!

চেয়ে দেখো

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কতো জিনিষই তো আমরা নিত্য দেখি!

তার কিছুটা মনে রাখি, মনে রাখবার চেষ্টা করি আর কিছুটা বা শীঘ্র ভুলে যাই!

কিন্তু কি ভাবে দেখলে, সেই দেখাটা সত্যিকারের দেখা হয়—প্রকৃত পক্ষে কাজের দেখা হয়, সেইটেই হ'ল বড় কথা।

দেখা জিনিষটা হোল চোখের কাজ ও অভ্যাস। তার পিছনে কিন্তু আছে মনের কাজ অর্থাৎ সজাগ দৃষ্টি। সেটা অভিনিবেশের ফলে জন্মায়। এই দৃষ্টিটুকু শিক্ষা ও সংযমের সাহায্যে আরো ভালো ভাবে তীক্ষ্ণ করে ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়।

মহাভারতে কৌরব-রাজকুমারদের অস্ত্র-শিক্ষার পরীক্ষার গল্পটা মনে আছে তো? গাছের ডালের ওপর বসানো নীল পাখীটিকে দেখতে গিয়ে কুরুবংশের রাজপুত্রেরা আশে-পাশের অনেক জিনিষ দেখতে পেলেন। কিন্তু অর্জ্জুন দেখেছিলেন একমাত্র পাখীর মাথাটিকে। দ্রোণাচার্য্যের শিক্ষা ও নির্দ্দেশ তাই সফল হয়েছিল প্রিয় শিষ্যের একাগ্র তন্ময়তায়! এই যে তীক্ষ্ণ, অভ্রান্ত আর অনন্যচিত্ত দৃষ্টি—এটা বহু দিনের সাধনার বস্তু।

জীবনে—বিশেষ করে অধ্যয়নব্রত ছাত্র-জীবনে এই একাগ্রতার মূল্য আর প্রয়োজন কতোখানি, তা আর বলে দিতে হবে না। দরবেশ আর উটের গল্প যদি পড়ে থাকো, তা হলে তোমাদের মনে পড়বে দরবেশের আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা! পথের ধুলায় পদ-চিহ্ন আর রাস্তার এক ধারে ছড়ানো শস্য-কণাগুলি লক্ষ্য করে দরবেশ অনুসন্ধানী বণিকদের বলে দিয়েছিল যে, দলভ্রষ্ট উটটি ছিল কানা ও খোঁড়া।

স্যর কনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি শার্লক হোম্‌সের অনুসন্ধান-পদ্ধতির সঙ্গে যদি তোমাদের পরিচয় হয়ে থাকে, তা হলে বুঝবে যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে তাঁর তদন্ত-কাহিনীগুলি ভোজবাজির গল্পের মতই। সাধারণ লোকে যা দেখছে, যে চোখ দিয়ে দেখছে, তিনিও তাই করছেন। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু শার্লক হোমসের দৃষ্টিভঙ্গী এতই মৌলিক যে একটি টুপি, ঘাড় অথবা লাঠি দেখে তিনি তার মালিকের চেহারা, চরিত্র অভ্যাস প্রভৃতি খুঁটি-নাটি খবরগুলো আশ্চর্য্য সঠিক ভাবে বলে দিতে পারেন। লোকের তাক্‌ লেগে যায়। কিন্তু যখন লোকে বুঝতে পারে, তাঁর বিচার-পদ্ধতির কৌশলটা আসলে কি, তখন তারা ভাবে—এটা কত সহজ! সবই আছে,—অথচ এই ভাবে জিনিষটা তো দেখিনি! সত্যিই সহজ জিনিষ, কেন না দেখার চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক কাজ কি আর থাকতে পারে! তবু ঐ বিশেষ ভাবে, মন দিয়ে চেয়ে দেখাটাই হ'ল কঠিন কাজ।

এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যার যত ধারালো ও তীক্ষ্ণ, বিচার ও বুদ্ধিবৃত্তি তার ততই মার্জ্জিত এবং উন্নত, অনুমান এবং সিদ্ধান্তগুলো তার ততই নির্ভুল এবং সত্য।

বিজ্ঞানে এই পর্য্যবেক্ষণের সবিশেষ মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কোনো একটি বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছুবার আগে তথ্য-সংগ্রহ এবং তথ্য-নিরূপণ দরকার। এবং তা করতে

হলে প্রথমে নিরীক্ষণ অর্থাৎ ভালো করে দেখা আবশ্যক হয়। তার পর তথ্য-সংগ্রহের পালা শেষ হলে গ্রহণ-বর্জ্জনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন তথ্য একত্র সমাবেশ করে, যেগুলির প্রয়োজন সেগুলিকে নির্বাচন করে কাজে লাগাতে হয়। এর পর নানা পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি নিরূপিত সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম সোপান হ'ল তাই পর্য্যবেক্ষণ। খুব সাধারণ একটা দৃষ্টান্ত দিতে গেলে, নানা ধরণের রোগের বীজাণু নিয়ে যে সব পরীক্ষা হয়েছে তার কথা উল্লেখ করতে হয়। এই সব গবেষণার গোড়াতে তথ্য-নিরীক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ অনুসন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকরা বহু প্রকারের রোগ-তথ্য লক্ষ্য করে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছেন—কোন্ কোন্ রোগের বীজাণু কি ভাবে মানুষের দেহকে সংক্রামিত করে এবং তাদের প্রতিকারই বা কি।

বৈজ্ঞানিকের চোখে যে দৃষ্টি, অর্থাৎ যে দৃষ্টি নিয়ে নৃতত্ত্ব-প্রাণিতত্ত্ব-পদার্থতত্ত্ব সমাজতত্ত্ববিদ, গণিতজ্ঞ, রাসায়নিক প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর গবেষণায় অগ্রসর হন, সেটা হ'ল সজাগ বিশ্লেষণের দৃষ্টি। প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের দেহের মধ্যে, সমাজের মধ্যে খণ্ড খণ্ড তথ্যগুলিকে সেই দৃষ্টির সাহায্যে নিরীক্ষণ করা, বিচার করা, যাচাই করাই হ'ল তাঁদের প্রধান কাজ। এ ছাড়া আবার আর এক রকম দৃষ্টি আছে, যেটি বিশ্লেষণমূলক নয়। সেটি হল সমগ্র দৃষ্টি, যার সাহায্যে দেখা জিনিষগুলোকে একত্র করা যায়। এই সব দৃষ্ট তথ্য বা সত্যের সমীকরণকে এক কথায় বলা যায় সংশ্লেষণ-দৃষ্টি। সৃষ্টির বিভিন্ন অংশে যে সব নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রকাশ্য পদার্থ রয়েছে, তাদের মধ্যে থেকে একটা বড় অখণ্ড সত্যের আভাস পেয়েছেন বহু কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক। তাঁদের দৃষ্টিও কম তীক্ষ্ণ নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে তাঁদের দেখার তফাৎ এইখানে যে, তাঁদের দৃষ্টি-আয়তন খণ্ডিত কিংবা কয়েকটি পরীক্ষাধীন তথ্যের ওপর সীমাবদ্ধ নয়,—আরো বিস্তৃত এবং প্রসারিত। তাই বহুর মধ্যে তাঁরা একের সন্ধান পান, নিখিল জগতে তাঁরা একই বিরাট সত্য বা চরম প্রতিপাদ্য উপলব্ধি করেন। কবি-শিল্পীর ধ্যানলব্ধ অন্তর্লোক শুধু কল্পনার বিলাস নয়; একটি বিশেষ ধরণের মানস-দৃষ্টি বা গভীর অনুভূতি।

সৌন্দর্য্য বা শিল্প-ধারণার মূখে আছে এই নিরীক্ষা, অন্তর দিয়ে দেখবার ভঙ্গী। নানা ভাবে, নানা সময়ে, সেই সৌন্দর্য্যকে দেখে ধীরে ধীরে রস গ্রহণ করলে তবেই জন্মায় সৌন্দর্য্য-বোধ। কেউ বা শেলীর মতন একবার মাত্র দেখেই আনন্দ-উত্তেজনায় অধীর। কেউ বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতন শান্ত সমাহিত আবেশে দেখে নিয়ে নীরবে আত্মস্থ হয়ে সংযত প্রকাশে যত্নবান্ হন। কিন্তু সকল সৌন্দর্য্য-প্রিয় ব্যক্তিই আনন্দময় রসঘন দৃষ্টিতে দেখেন এই জগতের বিচিত্র রূপকে, মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র ভাবনা ও অনুভূতিকে। কবি ডী লা মেয়র তাই বলেছেন—'Look thy last on all things lovely', অর্থাৎ চোখ ভরে দেখে নাও জীবন ও জগতের নিত্য সৌন্দর্য্য-স্রোত। হয়তো এই শেষ দেখা, আর এমন সুযোগ না-ও মিলতে পারে।

এই দেখাটাই সকল আনন্দ, শিক্ষা ও সৃষ্টির প্রেরণা। বহু দিন ধরে গান না শুনলে যেমন ভালো গাইয়ে হওয়া যায় না, শ্রুতি ঠিক হয় না,—তেমনি অনেক ছবি না দেখলে, প্রকৃতিকে ঠিক মত ভালোবেসে না দেখলে ও বুঝলে ভালো শিল্পী বা কবি হওয়া যায় না। বহু মানুষকে তেমনি আবার না চিনলে সত্য অভিজ্ঞতা জন্মায় না, মানব সাহিত্য রচনাও সম্ভব হয় না। কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিক আমাদেরই মতন চোখ দিয়ে দেখেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী তফাৎ বলেই তাঁরা যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন আমরা তা পারি না।

সমাজে, মানুষের নিত্য সংস্পর্শে থেকে যে লোক চোখ খুলে রাখে, সে-ই জেতে। কেন না, পৃথিবীর জটিল পথে চোখ বুজে চলার মতন নির্বোধ কাজ আর কিছু নেই। যার দৃষ্টি সজাগ অর্থাৎ যে চোখ খুলে চেয়ে দেখে এবং তলিয়ে বোঝে, সব অবস্থাতেই সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে নিতে পারে। সাংসারিক ব্যক্তিই বলো, আর কবি অথবা শিল্পী কিংবা রাষ্ট্রনেতাই বলো,—যাঁর চোখ খোলা আছে এবং যে চোখে দূর-দৃষ্টি আছে,—তিনি চট করে বিপদে পড়েন না। সজাগ দৃষ্টি-ব্যবহারের ফলে তাঁদের ধারণা-শক্তি হয় তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। এঁদের মধ্যে আবার যে ব্যক্তি নীরবে দেখার কাজ সারেন, সহসা মতামত ব্যক্ত করেন না, তিনিই হলেন শিল্পী ও বিচক্ষণ। এই দেখা এবং বোঝাটাই আসল; বেশী কথা বলা কিছু কাজের নয়।

এই যে দেখার কথা বললুম,—এটা শিক্ষা ও সাধনার ব্যাপার। একাগ্রতা এবং অভ্যাস দিয়ে একে অর্জন করতে হয়। কি ভাবে দেখতে হয়—এটা যদি তোমরা শেখো, তা'হলে তোমরা নিশ্চয়ই লাভবান্ হবে। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতই ঠিক সময়টিতে নির্ভুল কৌশলে ব্যাট চালিয়ে নিজেদের জীবনে উইকেট্ বাঁচাতে পারবে।

ফাঁকি

জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার ঘরের জানালাটা আজ বন্ধ রেখেছ কেন?
খুলে দাও, ওটা খুলে দাও:
মুঠো মুঠো করে মিঠেল বাতাসে
ছোট ঘরখানা ভরে নাও।

কে বলে তোমার মাথার ওপরে আকাশের কান্না নেই?
জানালাটা খোলো একবার—
হাতছানি দিয়ে ডাকবে আকাশ
বাড়িয়ে ব্যাকুল হাত তার!

আকাশ পেয়েছ, বাতাস পেয়েছ: সবুজ মাটি কি পেয়েছ?
সবুজ মাটি তো পাবে না:
জানালার ফাঁকে দৃষ্টি দিলেও
সবুজের কাছে যাবে না।

: কারা ফাঁকি দিয়ে এখানে সবুজ কেড়ে নিলে?
পায়ের নীচেতে সবুজের ঢেউ ভেঙ্গে দিলে?

ডাকাতের সর্দার

আমিনুর রহমান

হরিপদ আর নিশাকর দুই বন্ধুতে অনেক দিন পরে দেখা। সেই ছেলেবেলায় এক সঙ্গে খেলা করত, তার পর অবস্থা-বিপাকে কে কোথায় ছিটকে পড়েছিল তার ঠিক নেই। এখন তারা এক পাড়াতে পাশাপাশি বাড়ীতেই থাকে। সকাল-সন্ধ্যে দুজনাতে বসে গল্প গুজব করে, দুপুরে যে যার কাজে বেরিয়ে যায়।

এক সন্ধ্যাবেলা হরিপদ নিজের বাড়ীর রোয়াকে বসে নিশাকরকে নিজের অতীত এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শোনাচ্ছে: বগুড়া থেকে যাচ্ছিলুম রংপুর। বিনা টিকিটে বেশী দূর এগুতে পারলুম না, গাইবাঁধায় ট্রেণ থেকে নামতে বাধ্য হলুম। ষ্টেশনে খবর নিয়ে টের পেলুম, সেদিন আর কোন ট্রেণ নেই। অগত্যা মাঠ ভেঙ্গে হেঁটেই পাড়ি দিলুম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—কত মাইল হাঁটা হ'ল তার হিসেব রাখিনি। সামনে একটা পুরনো বাংলোতে টিম্-টিম্ করে আলো জ্বলছে দেখে এগিয়ে গেলুম সেদিকে। দেখে মনে হল, সরকারি বাংলো। নির্জ্জন মাঠের মাঝখানে এ রকম একটা বাংলো দেখে আশ্চর্য্য হলুম। মাঝের ঘরের সামনে গিয়ে দেখি, এক জন বিশাল বপুধারী কালো লোক, সাহেবী পোষাক প'রে ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা বই পড়ছে। আমি দোর-গোড়া থেকেই বললুম, 'ভিতরে আসতে পারি কি?' ভদ্রলোক হঠাৎ চমকে লাফিয়ে উঠে প্যান্টের পকেট থেকে সটান একটা পিস্তল বার ক'রে আমার দিকে তাক ক'রলেন। আমি এতটার জন্য মোটেই তৈরি ছিলুম না, ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি কিছু বলতে না পেরে, থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলুম। ভদ্রলোক অত্যন্ত কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কি চাই এখানে?' আমি তখনও থর-থর করে কাঁপছি, গলা দিয়ে স্বরই বের হচ্ছে না—কে যেন গলা টিপে ধরেছে। অনেক কষ্টে আমতা-আমতা করে বললুম, 'আজ্ঞে, আমি কিছু চাইনি, মানে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যে হয়ে গেল, তাই এখানে আলো জ্বলছে বলে এসেছিলুম। আমার কোন কু-মতলব নেই। আমি না হয় এখুনি চলে যাচ্ছি।' ভদ্রলোক পিস্তল পকেটে রেখে প্রশ্ন করলেন, 'কি কর তুমি?' পিস্তলের তাক থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে একটু ধড়ে প্রাণ পেলুম; গুছিয়ে বললুম, 'কিছুই করি না। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রেলের পয়সা নেই বলে হেঁটে রংপুর যাচ্ছিলুম। ভদ্রলোক পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি রাত্রে এখানে থাকতে চাও?' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'আজ্ঞে, সেই জন্যই এখানে আসা, অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।'

'চাকরি করবে?'

'আজ্ঞে, পেলে কেন করব না।'

'বেশ, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে। আমার চাকরটা কাল না বলে পালিয়েছে, নিয়ে যেতে পারিনি কিছু। তুমি ঠিক মত কাজ কর, তা'হলে খাওয়া-পরা পনর টাকা মাইনে পাবে,—যদি বেয়াড়াপনা কর তাহলে এক গুলীতেই খতম করে দেব।'

'আমি আপনার কাছেই থাকব হুজুর। আর চলে যাবার দরকার হলে, বলে-কয়ে যাব।'

'খাওয়া হয়েছে?'

'আজ্ঞা না, দু'দিন উপোস আছি।'

'তবে যাও, খেয়ে নাওগে। বাংলোর পেছনে একটা কুঁড়ে আছে সেখানে চৌকিদার থাকে, তাকে আমার নাম করে বললেই সে খাবার ব্যবস্থা করে দেবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'যে আজ্ঞা' বলে সেখান থেকে বাংলোর পেছন দিকে চলে গেলুম। কুঁড়ে ঘরে গিয়ে ডাকাডাকি করতে এক রোগা বুড়ো বেরিয়ে এল। তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, কুঠির সাহেব আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার খাবার থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করল 'দাম দেবে কে?'

'ঐ সাহেবই সব দাম দেবেন।'

'বেশ বাপু ভেতরে এসে বস, বিনা নুটিশে এ রকম হুট করে খাবার অর্ডার দিলে কি করেই বা সামলাই। দু'কোশের মধ্যে বাজার-হাট নেই।' ইত্যাদি গজর গজর করতে করতে কুঁড়ের ভেতর ঢুকল। আমিও তার পেছন পেছন ঢুকলুম। বুড়োর সঙ্গে ভাব করে

আমার নতুন মুনিবটি কে, তা জানা দরকার হয়ে পড়েছিল। সরকারি অফিসার হলে আপিসের আর্দ্দালি সঙ্গে থাকবার কথা, ব্যবসায়ী হলে সহর ছেড়ে মাঠের মাঝখানে ডেরা ফেলবে কেন? এ-কথা সে-কথার পর বুড়োকে সাবধানে জিজ্ঞেস করলুম, 'এখানে তুমি কত দিন আছ মোড়ল?'

'তা দু'কুড়ি বছর হয়ে গেল।'

'তোমার চলে কি করে?'

'তা তোমার বাপ-ঠাকুর্দ্দার আশীর্ব্বাদে ভালই চলে। মাইনে পাই চোদ্দ টাকা। আর এই কত্তারা এলে খোরাকি, আলো, ঝাড়ুদার আর বখ্‌শিশ্‌ বাবদ যা পাই তাতেই ঢের হয়।'

'সাহেবটা কে বলতে পার? মানে, আমি আজ থেকে ওঁর কাছে বহাল হয়েছি কি না, তাই সাহেবের পরিচয় জানতে চাই।'

'কি জানি ভাই, কে। পরিচয়ে আমার দরকার কি। খাবে-দাবে, পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবে—আর যাবার সময়ে খাতায় নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যাবে।'

এমন সময় বাইরে কার গলা শোনা গেল, 'হারু খুড়ো আছ না কি?'

'এই যে, এস বাবাজী'। বলল চৌকিদার।

আধা-বয়সী এক গ্রাম্য লোক কুঁড়ের ভেতর ঢুকে সেই মিটমিটে টেমির আলোতে আমাকে আপাদমস্তক দেখতে লাগল। চৌকিদার বলল, 'চার-পাইটার ওপর বস বাবাজী, তার পর সহরের খবর কি?'

'খবর জোর আছে খুড়ো, খুব সাবধানে থেক।'

'কেন বল দিকি?'

'কাল রাত্তে ট্রেণে যে ডাকাতি হল না—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—'

'সেই ডাকাতদের সর্দ্দার না কি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'এ্যাঁ, তাই না কি?'

'হ্যাঁ গো, কাছে-পিঠেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে, ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচশ' টাকা পুরস্কার!'

'তাই তো, ভাবিয়ে তুললে!'

'ভাবনার এখন হয়েছে কি, কাল খোদ পুলিশের বড়কত্তা নিজে এদিকে আসছেন, এ কথা থানার জমাদারের শালার নিজের মুখ থেকে শুনে এসেছি আমি।'

'তা, পুলিশের বড়কত্তা এখানে মরতে আসবে কেন? ডাকাতের সর্দ্দার সরকারি ডাক-বাংলোয় উঠবে না কি? তা'হলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতেও একবার খোঁজ নিতে বল না।'

'বলা ত যায় না, সাধু সেজে বাংলোতে এসে উঠতেও ত' পারে...কেন, কেউ এসেছে না কি?'

বুড়ো একবার আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে বললে, 'উঠেছে ত' এক বাঙ্গালী সাহেব, মরুক্‌ গে—আমার আর কি নেবে? তবে বলছিলুম, পুলিশের বড়কত্তা যদি সত্যিই আসে, তাহলে বাংলোর এই হাল দেখে চাকরিটা না খসায়। যা নোংরা হয়ে আছে। তার ওপর মেরামতের নাম করে যে টাকা নিয়েছিলুম তাও ত' দেশে আকাল পড়ল বলে পাঠিয়ে দিলুম। যাক গে, যা হয় হবে।' তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলল, 'নাও বাপু, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড় গে যাও; সব শুনলে ত'?'

সব শুনে আমার মনের অবস্থা যা হয়েছিল বুঝতেই পারছ। যা হোক, নাকে-মুখে গুঁজে মুনিবের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। মুনিব ততক্ষণে গেলাস-বোতল বার ক'রে নেশার আমেজে ডুবতে বসেছেন। এ সময় বিরক্ত করলে আবার যদি পকেট থেকে ফস করে রিভলবার বার ক'রে তাগ করে, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে পড়ব তাতে সন্দেহ ছিল না। তাই নিজের শরীরটা দরজার আড়াল ক'রে ভয়ে ভয়ে বললুম, 'হুজুর, খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছি, এখন শুতে যাব?' হুজুর যেন আমারই অপেক্ষা করছিলেন, বললেন, 'আরে এসো এসো, ভিতরে এসে বস।' বুঝলুম, হুজুর এখন দুনিয়া ভুলেছেন। সাহস করে ভেতরে গেলুম। একটা ভাঙ্গা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে হুজুর হুকুম করলেন, 'বস, তার পর তোমার নামটা কি শোনা হ'ল না ত'?' আমি নাম ভাঁড়িয়ে বললুম, 'শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মাইতি।'

'বেশ, তার পর চলবে না কি এক গেলাস?' আমি একটু কিন্তু কিন্তু করতে লাগলুম। মুনিব বললেন, 'আরে নাও নাও, লজ্জা করতে হবে না, চাকরি নিয়েছ বলে কি চাকর-মুনিবের সম্বন্ধ সব সময় চলে, কাজের সময় কাজটা ঠিক পেলেই আমি খুশি।' ব'লে একটা গেলাস ভর্ত্তি করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি আর আপত্তি করতে পারলুম না। জানই ত', ছেলেবেলায় একটু-আধটু অভ্যাস ছিলই, তাই সামনে পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারলুম না।

মুনিবকে সত্যিই আমার খুব ভাল লেগে গেল। আরে না না, সে লোক ডাকাতের সর্দ্দার হতেই পারে না। আর হলেই বা কি। আমার অসময়ে যে সাহায্য করে, সে ভাল হোক মন্দ হোক, আমার শ্রদ্ধার পাত্র। মুনিবকে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা বলে বললুম, 'শ'-পাঁচেক টাকা পেলে একটা ব্যবসা করতুম।' মুনিব উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'তার জন্ত ভাবনা কি? আমি দেব টাকা। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'—বলে, বুক পকেট থেকে মোটা মণিব্যাগটা বার করে একশ' টাকার পাঁচখানা নোট বার ক'রে তখুনি আমার হাতে দিয়ে দিলেন। কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম সেদিন, তাই অমন মুনিবের দেখা পেলুম। একবার মনে হয়েছিল কেটে পড়ি, আবার ভাবলুম, না, সেটা ঠিক হবে না। ভাল লোককে ঠকান উচিত নয়। ঠিক করলুম, পরের দিন জ্ঞান হলে টাকা ফিরিয়ে দেব—তার পর খুশি হয়ে যা দেন তাই হাত পেতে নেব। দু'-চার কথার পর বললুম, 'এখানকার খবর শুনেছেন কিছু?'

'কি খবর হে, তুমি যে দেখছি একটা গেজেট! আসতে না আসতেই এখানকার খবর জেনে বসে আছ?'

'খবরটা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে বলেই শুনতে পেলুম। মানে, কাল না কি এখানে কোথায় ট্রেণে ভীষণ ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, আর ডাকাতদের সর্দ্দার না কি কাছাকাছি কোথাও পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

খবর শুনেই মনিবের নেশা ছুটে গেল, সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কি বললে, ডাকাতের সর্দ্দার? তুমি কি মনে করেছ, আমিই সেই ডাকাতের সর্দ্দার?'

মনে পিস্তলের ভয় জাগল, চটান ঠিক হবে না ভেবে বললুম, 'মোটেই না হুজুর! আপনার যদি কোন ক্ষতি হয় এই ভেবে সাব-ধান করে দিচ্ছিলুম—জায়গাটা ভাল নয়। তা না হলে পুলিশ

তাকে ধরবার জন্ত চারি দিকে লোক পাঠিয়েছে ; পাঁচশ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

মনিব ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমিও যেমন। কোথাকার বাজে খবর নিয়ে আমার নেশাটা ফিকে করে দিলে ত'। ঢাল আর এক গেলাস।'

তার পর একটু থেমে বললেন, 'আচ্ছা ছোক্‌রা, আমিই যদি সেই ডাকাতের সর্দ্দার হই, তা'হলে তুমি কি কর?'

'এখন যা করছি তখনও তাই করতুম, বরং আপনাকে নিরাপদ স্থানে যেতে সাহায্য করতুম। বেইমানি আমার কাছে পাবেন না হুজুর।'

মুনিব খুশি হয়ে আমাকে আর এক গেলাস মদ দিলেন। আমার কাছে রহস্ত যেন ঘনিয়ে আসছিল, তাই আর মদ খেলুম না। সকালেই পুলিশের লোক আসবে। গোয়েন্দারা পাঁচ শ' টাকার পুরস্কারের লোভে ইতিমধ্যে বাংলোর আশে-পাশে কান পেতে আছে কি না কে জানে।

মুনিব ত' এদিকে বেহুঁস হয়ে ইজিচেয়ারেই ঢলে পড়েছেন। আমি খানিকক্ষণ বসে থেকে পাশের কুঠুরিতে গিয়ে একটা ভাঙ্গা খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়লুম। হঠাৎ কি মনে হল, উঠে চলে গেলুম সহরের দিকে। অনেক ঘুরে বড় দারোগার বাড়ী খুঁজে পেলুম। মাঝ রাত্রে বড় দারোগার দেখা পাওয়াও সোজা ব্যাপার নয়। ভয়ানক জরুরি, গোপন খবর আছে বলে পাঠাতে তবে তিনি এলেন। আমি চুপি-চুপি বললুম, 'হুজুর, আপনারা যার খোঁজ করছেন, তার সন্ধান পেয়েছি।'

দারোগা বললেন, 'ওঃ, এই তোমার খবর? আমরাও সন্ধান পেয়েছি। তোমার সন্ধানটা শুনি।'

আমি বেজায় দমে গেলুম—পুরস্কারটা বোধ হয় ফস্কেই গেল, তা'ছাড়া, ভুল খবর প্রমাণ হলে ফাটকে যাবার সম্ভাবনা আছে। বললুম, 'হুজুর আমার সন্ধান, তিনি ডাক-বাংলোতে আত্মগোপন করে আছেন।'

'আমার ইনফরমারও তাই বলেছে—কাল সন্ধ্যে বেলা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সে ডাক-বাংলোয় উঠেছে।'

'তাহলে ত হুজুর আমার পুরস্কারটা ফস্কায়।'

দারোগা ভাবলেন, সেই সঙ্গে না শীকার ফস্কায় তাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না, পুরস্কার তোমাকেও কিছু দেওয়া হবে; কিন্তু তার আগে বল ত,' তুমি কে?'

'আমি হুজুর কাল রাতে তাঁর কাছে চাকরি নিয়েছি, তার পর তিনি নেশা করতে করতে অনেক কথা বেফাঁস বলে ফেলেছেন।'

'তুমি তাকে সনাক্ত করতে পারবে?'

'হুজুর তা পারব, তবে তার পকেটে রিভলভার থাকে, কথায় কথায় রিভলভার বার করেন তাই ভয় হয় হুজুর, সনাক্ত করতে গিয়ে রক্তাক্ত হতে না হয়।'

'কিছু ভয় নেই, আমরা রাত ৪টার সময় হানা দেব, তুমি বাংলোর বাইরে অপেক্ষা করবে।'

'যে আজ্ঞা' বলে বিদায় নিলুম। বাংলোতে ফিরে এসে আর একবার মুনিবের ঘরে উঁকি মেরে দেখলুম। মুনিব তখনও একই ভাবে ঘুমুচ্ছেন।

মুনিবের হাত-ঘড়িতে ৪টা বাজতে দেখে নিয়ে বাংলোর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে দেখতে পেলুম, দূরে কতকগুলি লোক বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখলুম, বড় দারোগার সঙ্গে দশ-বার জন বন্দুক রিভলভার হাতে পুলিশ। আমি বড় দারোগাকে ফিস্‌-ফিস্ করে বললুম, 'ডাকাতের সর্দ্দার এখনও ঘুমে অচেতন, চুপি-চুপি গিয়ে ঐ অবস্থাতেই বেঁধে ফেলতে হবে।'

আমার পরামর্শ মত যেমনি মুনিবকে বাঁধা, অমনি সে কি ধস্তা-ধস্তি! আমি সেই অবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে গেলুম। পকেটে মুনিবের দেওয়া পাঁচশ' টাকা ছিল। একেবারে কাথিওয়ার চলে গেলুম। সেখান থেকে ঘুরে-ফিরে কোলকাতায় এ ।।'

হরিপদর গল্প শুনে নিশাকর শুধু বলল, 'তুই ভাই এত নীচ হতে পারলে? তোমার উপকার করল আর তুমি তাকে ধরিয়ে দিলে?'

হরিপদ বলল, 'ধরিয়ে আর দিলুম কোথায়। থানায় গিয়েই বড় দারোগা নিজের ভুল বুঝতে পারল। যাকে ধরেছে, সে ডাকাতের সর্দ্দার মোটেই নয়।'

'তবে ডাকাতের সর্দ্দার কে?'

'কেন, আমি। আমি নিজের বিপদ বুঝতে পেরে বাঁচবার জন্ত ভদ্রলোককে একটু কষ্ট দিয়েছিলুম।'

মহাভারতের শেষ-মহাবীর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দশম

দিগ্বিজয়

হর্ষ যদিও রাজ-উপাধি গ্রহণ ক'রে রাজপুত্র শিলাদিত্য নামে পরিচিত হলেন, তবু তাঁর রাজ্যকাল গণনা করা হয় রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর থেকেই (৬০৬ খৃঃ)।

রাজ্যশ্রী দেবীর উপরে প্রতিনিধি-নৃপের কর্ত্তব্য-ভার অর্পণ ক'রে হর্ষ হ'লেন অনেকটা নিশ্চিন্ত। রাজ্যশ্রী ললিতকলায় ও শাস্ত্রালোচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মেও বিশেষরূপে শিক্ষিতা। তাঁর এই বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগ হর্ষকেও বড় কম প্রভাবান্বিত করেনি। তিনি নিজে শৈব ও সূর্য্যোপাসক ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত না হয়েও তিনি হিন্দুর চেয়ে বেশী ভালবাসতেন বৌদ্ধদেরই।

দিদির হাতে রাজদণ্ড দিয়ে হর্ষ দৃঢ়হস্তে ধারণ করলেন শাণিত তরবারি। কেবল শশাঙ্ককে পরাজিত ও বিতাড়িত ক'রেই তিনি তুষ্ট হ'তে পারলেন না, মুক্তকণ্ঠে চারি দিকে প্রচারিত ক'রে দিলেন, "সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে আমি আনব বিপুল একচ্ছত্রের ছায়ায়। আমার আদর্শ হবেন মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও যশোবর্দ্ধদেব। বহু খণ্ডে খণ্ডিত উত্তরাপথ ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে চরম অধঃপতনের দিকে, শিয়রে তার সর্ব্বদা জাগ্রত হয়ে রয়েছে যবন ও হূণ দস্যুদের শনির দৃষ্টি। ছোট ছোট রাজারা পরস্পরের সঙ্গে আত্মঘাতী গৃহ-যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে আর্য্যদের ক্ষাত্রবীর্য্যকে ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছেন ধ্বংসের মুখে। আর্য্যাবর্ত্তকে আবার অখণ্ড ক'রে তুলতে হ'লে তথাকথিত

রাজাদের নির্ম্মম ভাবে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে তুচ্ছ আগাছার মত। যত দিন না এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারি, তত দিন আমার তরবারিকে করব না কোষবদ্ধ। স্বদেশের জন্যে যাঁর একটুকু প্রাণের টান আছে, তাঁকেই আমি সাদরে আমন্ত্রণ করছি আমার পতাকার তলায়।"

হর্ষবর্দ্ধনের এই দৃপ্ত আহ্বান-বাণী শ্রবণ ক'রে আর্য্য বীরদের বুকের ভিতর আবার নতুন ক'রে জেগে উঠল দেশাত্মবোধের উদ্দীপ্ত মত্ততা। দেশ-দেশান্তর থেকে একে একে নয়—দলে দলে যোদ্ধারা এসে যোগ দিতে লাগল তাঁর বাহিনীতে। যশোধর্ম্মদেবের বহু কাল পরে আবার এক তরুণ আর্য্যবীর দিগ্বিজয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, তাই তাঁর সঙ্গীর অভাব হ'ল না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কি-রকম সৈন্য নিয়ে হর্ষবর্দ্ধন যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র আর একবার দিয়েছি, এখানে তারই পুনরুক্তি না ক'রে উপায় নেই।

৩২৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে গ্রীক আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন, তখন থেকে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতীয় রাজাদের ফৌজ গঠনের পদ্ধতি ছিল প্রায় অপরিবর্ত্তিত।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বাহিনীকে ছয় ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। পরিচালনার জন্যে তিনি প্রধান কর্ম্মচারী রেখেছিলেন ত্রিশ জন—অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগে পাঁচ জন ক'রে। বিভাগগুলি এই:

১। নৌ-বিভাগ। ২। রসদ-বিভাগ (মাল চালান দেবার, দামামা-বাদক, সহিস, কারিগর ও ঘেষেড়া প্রভৃতিরও খোরাকের জন্যে ভালো বন্দোবস্ত ছিল)। ৩। পদাতিক-বিভাগ। ৪। অশ্বারোহী-বিভাগ। ৬। গজারোহী-বিভাগ।

ভারতীয় ফৌজ চিরকালই পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী—এই চার অঙ্গ নিয়ে গঠিত হ'ত। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভা এই সঙ্গে অতিরিক্ত আরো দু'টি অঙ্গ জুড়ে দিয়েছিল—নৌ ও রসদ বিভাগ। হয়তো গ্রীক ফৌজ পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এই দু'টি অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি বলেন, ভারতীয় ফৌজের প্রত্যেক রথে থাকত সারথি ও দু'জন ক'রে যোদ্ধা এবং প্রত্যেক হাতীর উপরে থাকত মাহুত ও তিন জন ক'রে ধনুকধারী।

চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের মত ছিল, ফৌজের পক্ষে সব চেয়ে দরকারি হচ্ছে, রণহস্তীরা। কারণ, শত্রু-সৈন্য ধ্বংস হয় তাদের দ্বারাই। (মধ্যযুগের দিগ্বিজয়ী তৈমুর লং যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন, ভারতীয় রাজা-বাদশাহরা তখনও রণহস্তী ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি এক নূতন কৌশল অবলম্বন করে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন হাতীদের সার্থকতা। তার ফলে ভারতীয় ফৌজের রণহস্তীরা হয়ে উঠত ভারতীয়দের পক্ষেই অধিকতর বিপদজনক।)

চন্দ্রগুপ্তের প্রত্যেক অশ্বারোহীর কাছে থাকত একখানা ক'রে ঢাল ও দু'টি করে বল্লম। পদাতিকদের প্রধান অস্ত্র ছিল চওড়া ফলকওয়ালা তরবারি এবং অতিরিক্ত অস্ত্ররূপে তারা সঙ্গে নিত শূল বা ধনুক-বাণ। আমরা এখন যে ভাবে বাণ ছুঁড়ি, তারা সে ভাবে ছুঁড়ত না। গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়্যান বলেন, ভারতীয় সৈনিকরা ধনুকের এক প্রান্ত মাটির উপরে রেখে, বাম পায়ের চাপ দিয়ে এমন ভয়ানক জোরে বাণ ত্যাগ করত যে, শত্রুদের ঢাল ও লৌহবর্ম্ম পর্য্যন্ত কোন কাজে লাগত না। বোঝা যাচ্ছে, সেকালের ভারতীয় ধনুক হ'ত আকারে রীতিমত বৃহৎ।

হর্ষবর্দ্ধনের যুগেও ভারতীয় বাহিনী যে প্রায় ঐ ভাবেই গঠন করা হ'ত, এটুকু অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি ভারতীয় বাহিনীর চতুরঙ্গ থেকে বাদ দিয়েছিলেন প্রধান একটি অঙ্গ। যে কারণেই হোক, তিনি রথারোহী সৈন্য পছন্দ করতেন না, তাঁর সঙ্গে রথ থাকত না। তিনি যখন প্রথম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল পাঁচ হাজার রণহস্তী, বিশ হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক।

আরম্ভ হ'ল রাজপুত্র শিলাদিত্যের দিগ্বিজয়-যাত্রা। পরিপূর্ণ হয়ে গেল আকাশ-বাতাস বিজয়ী বীরবৃন্দের জয়নাদ ও শত শত দামামার গম্ভীর মেঘ-গর্জ্জনে, হাজার হাজার গজ ও অশ্বের পদভারে থর-থর কাঁপতে লাগল পৃথিবীর বুক। চীনা পরিব্রাজক হিউএন সাংয়ের বর্ণনায় দেখি, সসৈন্যে হর্ষবর্দ্ধন ছুটে চলেছেন কখনো পশ্চিম দিকে এবং কখনো পূর্ব্বাঞ্চলে, অবাধ্যদের দমন করতে করতে দিনের পর দিন যায়, হাতীদের পিঠ থেকে নামানো হয় না হাওদা, সৈনিকরা খোলবার অবকাশ পায় না শিরস্ত্রাণ।

একাদশ

যুদ্ধের দুঃখ

এই ভাবে কেটে গেল সাড়ে পাঁচ বৎসর।

ওদিকে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং এদিকে বঙ্গদেশের কতক অংশ হ'ল হর্ষবর্দ্ধনের করতলগত। তিনি রীতিমত এক সাম্রাজ্যের অধিকারী।

তাঁর সামরিক শক্তিও হয়ে উঠেছে এখন অতুলনীয়। তিনি ইচ্ছা করলেই যে কোন সময়ে ষাট হাজার রণহস্তী, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও তারও চেয়ে বেশী পদাতিক নিয়ে অবতীর্ণ হ'তে পারেন রণক্ষেত্রে।

কিন্তু মগধ ও গৌড় থেকে আসছে দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ। শৈব নরপতি শশাঙ্কের অত্যাচারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত আর্ত্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন।

মধ্য-ভারতে পরাজিত হয়েও শশাঙ্ক স্বরাজ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। তিনি কেবল বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র ও কুশীনগরের বৌদ্ধ বিদ্রোহীদের দমন ক'রেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু পবিত্র বোধিদ্রুম উৎপাটিত এবং বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ও বহু বৌদ্ধ-কীর্ত্তিও নষ্ট ক'রে ফেলেছেন। বৌদ্ধরা পালিয়ে গিয়ে নেপালের পর্ব্বতমালার মধ্যে আশ্রয় নিয়েও শশাঙ্কের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছেন না।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকলেও বুদ্ধিমান হর্ষের এটা বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, অতঃপর তাঁর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে স্বরাজ্যে ফিরে গিয়ে প্রকাশ্যে রাজা-উপাধি গ্রহণ ও রাজমুকুট ধারণ করা। এত দিন তাঁকে নাবালক ভেবে যারা বিরুদ্ধতা করে আসছিল, এইবারে তারা বিশেষ ভাবে অনুভব করতে পেরেছে তাঁর সবল বীরবাহুর শক্তি। তাঁর অঙ্গুলি-তাড়নায় বৃহত্তর আর্য্যাবর্ত্ত আজ মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে, বিনা বাধায় সিংহাসন অধিকার

করবার এমন সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। শশাঙ্ক? সে তো হচ্ছে পলাতক সর্প, নিজের বিবর ত্যাগ ক'রে বাইরে আসবার সাহস আর তার হবে না। আগে নিজের সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করি, তার পর তাকে শাসন করতে বেশী দিন লাগবে না।

প্রায় ছয় বৎসর পরে বিজয়ী বীর হর্ষবর্দ্ধন আবার ফিরে এলেন স্থানেশ্বরে। প্রজারা তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করলে মহা সমারোহে। রাজপথে বিপুল জনতা, প্রত্যেক ভবন পত্র-পুষ্প-পতাকায় অলঙ্কৃত, পুরনারীরা অলিন্দে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তরুণ রাজপুত্রের মাথার উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন লাজাঞ্জলি। সকলের চক্ষে উৎসাহ, মুখে হাসি ও কণ্ঠে জয়ধ্বনি। স্থানেশ্বর আজ শিলাদিত্যের অপূর্ব্ব বীরত্বের জন্যে গর্ব্বিত, শত্রুরাও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে নিশ্চেষ্ট মৌনব্রত।

কবিবন্ধু বাণভট্ট এসে হাস্যমুখে বললেন, "রাজপুত্র শিলাদিত্য, আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।"

হর্ষবর্দ্ধন বললেন, "কবি, তোমার অভিনন্দন লাভ ক'রে মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন যুদ্ধজয়ের চেয়ে বেশী গৌরব অনুভব করছেন।"

বাণভট্ট দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন?"

—"হ্যাঁ বন্ধু, রাজপুত্র শিলাদিত্য এর পর থেকে ঐ নামেই পৃথিবীতে পরিচিত হবেন।"

বাণভট্ট উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "জয় মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের জয়!"

হর্ষবর্দ্ধন অগ্রসর হয়ে বাণভট্টের স্কন্ধে একখানি হাত রেখে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, "কিন্তু কবি, রাজ্যের চেয়ে কাব্য—আর রাজার চেয়ে কবি বড়। মহারাজা বিক্রমাদিত্য যত দিন বেঁচে ছিলেন, নিজের রাজ্যে নিজের প্রজাদের পূজা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সভাকবি কালিদাস সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের পূজা থেকে বঞ্চিত হবেন না। এ রাজ্যের বাইরের লোকদের কাছে আমি মহারাজাধিরাজ বটে, কিন্তু তুমি যে আমার মনের মানুষ, তোমার কাছে আমি শ্রীহর্ষ ছাড়া আর কেউ নই।"

—"খালি শ্রীহর্ষ নয়, তুমি হচ্ছ মহাকবি শ্রীহর্ষ। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, পৃথিবীর দেশে দেশে তুমি ঐ নামেই অমর হয়ে থাকবে।"

—"দুঃখের কথা বন্ধু, বেঁচে থেকে কেউ নিজের অমরত্বের সঠিক প্রমাণ পায় না। তাকে অমর করে ভবিষ্যতের মানুষ।"

—"কিন্তু মহারাজ, তোমার অমরত্বের প্রমাণ পেয়েছি আমি বর্ত্তমানেই। আমি কি তোমার রচনা পাঠ করিনি? তার ছত্রে-ছত্রে আছে যে অমরত্বের নিশ্চিত নিদর্শন!"

হর্ষবর্দ্ধন হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার মুখে এ কথা শুনলে লোকে বলবে চাটুবাদ!"

—"লোকের কথায় আমি কাণ দি না। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কোরো মহারাজ, এ হচ্ছে আমার আন্তরিক কথা।"

—"উত্তম তা'হলে তোমাকে পুরস্কৃত করবার জন্যে তোমার উদর-গহ্বর পরিপূর্ণ ক'রে দেব আমি মিষ্টান্নের স্তূপে। যাই বন্ধু, গুরুতর রাজকার্য্য আছে।"

হর্ষবর্দ্ধনের প্রস্থান। সেনাপতি সিংহনাদের প্রবেশ। এসেই বললেন, "মহারাজা মিষ্টান্নের কথা কি বলছিলেন না?"

—"হ্যাঁ। তিনি বলছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি সিংহনাদকে মিষ্টান্ন জোগাতে জোগাতে তাঁর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়েছে।"

ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে সিংহনাদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "না, মহারাজা এ কথা বলতে পারেন না, এ হচ্ছে তোমারই বানানো কথা। কলম নেড়ে কালি মেখে দিন কাটাও, তুমি কি বুঝবে হে যুদ্ধক্ষেত্রের কথা? সেখানকার অদ্বিতীয় নীতি হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো। সেখানে থাকে কেবল রক্ত আর মড়া, মিষ্ট বা তিক্ত কোন রকম অন্নই সেখানে পাওয়া যায় না—বুঝলে?"

—"না, বুঝলুম না।"

—"এমন সোজা কথাটাও বুঝলে না?"

—"উঁহু।"

—"মানে?"

—"বললে, যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ন পাওয়া যায় না। তাহ'লে তোমরা ভক্ষণ করতে কি? বায়ু?"

—"যা ভক্ষণ করতুম তা বায়ু না হ'লেও মোটেই আহার্য্য ব'লে স্বীকার করা যায় না। তোমাদের ঘাসের রুটি খাওয়ার অভ্যাস আছে?"

—"থু, থু, রামচন্দ্র! তাও আবার মানুষে খায় না কি?"

—"সময়ে সময়ে তাও আমাদের অমৃত ব'লে গ্রহণ করতে হয়েছে।"

—"তাহ'লে যুদ্ধক্ষেত্রটা তো দেখছি ভারি খারাপ জায়গা!"

—"খারাপ ব'লে খারাপ, একেবারে জঘন্য!"

—"আহা, তোমার জন্যে আমি দুঃখিত!"

—"ভায়া, সাড়ে পাঁচ বছর আগে আমার উদর-দেশটি ছিল এমন প্রশস্ত যে গৃহস্থেরা আমাকে নিমন্ত্রণ করতেও ভয় পেত। কিন্তু আজ তার অবস্থা দেখছ?"

—"কই, আমি তো ইতর-বিশেষ কিছুই নিরীক্ষণ করতে পারছি না!"

—"তুমি ভাসা-ভাসা চোখে খালি উদরের উপরটাই লক্ষ্য করছ। কিন্তু কুখাদ্য আর অখাদ্য খেয়ে খেয়ে এর ভিতরটা হয়ে গেছে শুকিয়ে এতটুকু!"

—"তাই তো, তুমি আমাকে ভাবালে!"

—"কেন?"

—"মহারাজা এই মাত্র ব'লে গেলেন, আমার জন্যে প্রচুর মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দেবেন। ভেবেছিলুম তোমাকে নিমন্ত্রণ করব। কিন্তু তোমার শুকনো নাড়ীতে সুখাদ্য সহ্য হবে কি?"

—"কেন হবে না, আমি প্রাণপণে সহ্য করবার চেষ্টা করব। নিমন্ত্রণ থেকে আমাকে বাদ দিও না দাদা!"

—"বেশ, তবে নিমন্ত্রণ রইল।"

—"ধন্যবাদ!"

[ক্রমশঃ

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীর ভয় নিবারণ সম্পর্কে শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলিতেছেন: "ভয় তো আছেই। ভয়ের কারণও আছে কিন্তু ভয়ের কারণ যতটা আছে, ভয় তাহার তুলনায় মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারিলে কখন কখন করিয়া থাকে, সব সময় করে না। করে না বলিয়া সামাজিক জীবন সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া সবলতার মাপ কেবল কায়িক-শক্তি, বা সংখ্যা-শক্তির উপরই নির্ভর করে না। শারীরিক দুর্ব্বল হইয়া মানসিক সবল হইতে পারে। মানসিক সবলতাকে চরিত্র-বল বলা যাইতে পারে। এই চরিত্র-বল সংখ্যার উপর, সুবিধার উপর বা কায়িক-বল ও ধনবলের অপেক্ষা রাখে না। পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীরা সেই বল হইতে বঞ্চিত নহেন। ইঁহারাই দেশের জন্য নানা কষ্ট সহ্য করিয়াছেন. ইংরাজের সবল শাসন-শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, পরাজয় স্বীকার করেন নাই। বারে বারে জেল ভুগিয়াছেন, লাঞ্ছনা লইয়াছেন, অত্যাচার সহিয়াছেন। আজ তাঁহাদেরই স্বজন কি ভয়ভীত হইয়া দেশ ত্যাগ করিবেন? কাহার ভয়? মুসলমানের? পূর্ব্ব-বঙ্গের কয় জন মুসলমান হিন্দুকে অত্যাচারিত করিতে চাহেন? খুবই সামান্য সংখ্যক হইবে। তাঁহাদের প্রাধান্যই কেন স্বীকার করিব? অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তবে না অন্যায়ের নিরসন হয়, পলাইলে অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।" শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবুর উক্তিতে তর্কের কোন স্থান নাই, সন্দেহ করিবারও কোন অবকাশ নাই। কারন, তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গে বৎসরাধিক কাল বাস করিতেছেন, ভয়ে কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নাই। ফলে নোয়াখালী অঞ্চলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মনোভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

• • • •

তাহার পর সতীশ বাবু বলিতেছেন: "আতঙ্কের যে স্রোত বহিতেছে ইহা ঠেকাইবার পথ পশ্চিম-বঙ্গে বসবাসের ব্যবস্থা করা নহে। ইহার প্রতিকারের পথ হইতেছে, আতঙ্কিতের ভিতর সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করা। কাজ করার জন্য যে সংগঠন আবশ্যক তাহা এসেম্বলীর সদস্যরা গঠন করিয়া লইতে পারেন। উহা জেলাওয়ারী ও পরিশেষে থানাওয়ারী হইবে।" এ প্রস্তাবও যুক্তিযুক্ত এবং যথাযথ করিতে পারিলে ফলপ্রদ হইতে বাধ্য।

• • • •

কিন্তু সতীশ বাবু যখন বলেন যে: "সংবাদপত্রে সংবাদদাতা অতিরঞ্জিত ঘটনা প্রকাশ করিতে দিয়া কোন লাভ তো হয়ই না, বরঞ্চ কুফল হয়। সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা এড়ান কঠিন হয়। তাহাতে শাসকগণের উপর সতেজ ক্রিয়া হয় না। তাঁহারা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন। আবার অপর দিকে আতঙ্ক বাড়িতে থাকে। কুফল হয়, হইতেছেও তাহাই।" তখন আমরা তাঁহার কথা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিতে পারি না। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের প্রতি এক শ্রেণীর মুসলমানের, বিবিধ প্রকার অত্যাচারের কথা যদি সংবাদপত্রে যথা সময়ে প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে কলিকাতায় কোন 'সন্ধি-সম্মেলন' বসিত কি না সন্দেহ! সংবাদ যদি মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত হয়, তাহা হইলে সরকারী ভাবে তাহার প্রতিবাদে বাধা কোথায়? কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের অ-মুসলমান পত্রিকায় প্রকাশিত কয়টি সংবাদের প্রতিবাদ পূর্ব্ববঙ্গ সরকার করিয়াছেন? সংবাদপত্রে সংবাদ-প্রকাশের বাধা-নিষেধ কি হওয়া উচিত, সে-বিষয় আমরা সতীশ বাবুর সহিত একমত নহি।

• • • •

সতীশ বাবু আরো বলিতেছেন যে: "খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব হিন্দুদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে চাহেন। তবুও যদি অন্যায় হয় তবে বুঝিব, তাঁহার অনভিপ্রেত যাহা তাহাই হইতেছে। সে স্থলে প্রয়োজন, বর্ত্তমান ব্যবহারসম্মত উপায়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে থাকা, প্রধান মন্ত্রীর গোচরে আনিতে থাকা।" কিন্তু ইহা অতি উচ্চ মার্গের কথা। সাধারণ লোকের নিকট হইতে এ প্রকার মনোভাব আশা করা অসম্ভব। মানুষের ধৈর্য্য বলিয়া একটা জিনিষ আছে—তাহার সীমাও একটা আছে। সাধারণ মানুষের সকলকে মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সত্যাগ্রহী বলিয়া মনে করা ভুল হইবে।

• • • •

পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের দেশত্যাগ সম্বন্ধে 'জনশক্তি'র মন্তব্য চিন্তার বিষয়। 'জনশক্তি' বলিতেছেন: "আজ আমাদের অর্থাৎ পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীর সম্মুখে একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই সমস্যা এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থানান্তর-সমস্যা। আজ এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, যে কোন কারণেই হোক, পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে সর্ব্ব-শ্রেণীর হিন্দু অধিবাসিগণ কিছুটা অধিক সংখ্যায়ই পশ্চিম-বঙ্গ ও আসামে চলিয়া যাইতেছে, যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই সত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং ইহার ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করিতে হইবে। যাঁহারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব এতো কাল করিয়া আসিয়াছেন, সভা-সমিতিতে, বৈঠকে লোককে পথ-নির্দ্দেশ করিবার দাবী করিয়াছেন, তাঁহারাও আজ নিরুপায় অসহায় দর্শক অথবা ইচ্ছাকৃত নীরবতায় মজ্জমান। অন্য দিকে সংখ্যাধিক্যের বলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আজ যাঁহাদের উপর বর্ত্তিয়াছে, তাঁহারাও নীরব থাকিয়া ইহাই প্রমাণ করিতেছেন, 'যাবে তো যাও, থাকিবে তো থাক' আমাদের কি যায় আসে। কিন্তু ইহা খুব স্বাভাবিক নয়, নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের দায়িত্বপালনও নয়।" পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা দায়িত্বপালন না হইতে পারে, কি 'স্বাভাবিক' বলিয়া আমরা মনে করি। পাকিস্তান সরকার ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত কার্য্য দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতেছেন—দুঃখের সঙ্গেই এ কথা বলিতে হইতেছে।

• • • •

তাহার পর 'জনশক্তি' বলিতেছেন :—"আজ ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানেই কি ভাবে জীবন ধারণ করা যাইবে, তাহাই লোকে খুঁজিয়া পাইতেছে না, তদুপরি ভবিষ্যতের ভাবনা আরও সমস্যাসঙ্কুল। দেশের আইন ও শৃঙ্খলা ক্ষেত্রে একটা অব্যবস্থিত ভাব বিদ্যমান—কোন কোন অঞ্চলে চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। ইহা যে কেবল সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ তাহাও নয়, তথাপি ইহা অস্বাভাবিক এবং ভীতিজনক অবস্থা। সমাজ-বিরোধী অপরাধ-প্রবণেরা কোন কোন স্থানে বেশ নিরঙ্কুশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এখানে সুনামগঞ্জের উল্লেখ করিতে পারি—সেখানে মুসলিম লীগ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই অবস্থার বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আজ যদি মানুষের মনে আশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হয়, তাহা হইলে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। আত্মশ্লাঘা অনেকেই বোধ করা গিয়াছে, উঁহারাও বলিয়াছেন আমরাও বলিয়াছি, পূর্ব্ববঙ্গ পাঞ্জাব কিম্বা উত্তর-পশ্চিম ভারত নহে—এখানে মনুষ্যত্ব তেমন কবিয়া বিড়ম্বিত হয় নাই, হইতে পারে না। শুধু তাহাই নয়, এ কথাও আমরা বলিব. বহু মুসলিম লীগ নেতা ও রাষ্ট্রনায়কগণ অকপট চিত্তে দেশের শান্তি বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টাও করিয়াছেন, তথাপি সর্ব্বত্র সেই সুমনোভাব কার্য্যকরী না হওয়ায়ই মনে হয় গলদ কোথাও রহিয়া গিয়াছে। সেই গলদ দূর করিতে না পারিলে লোকের মনে স্বস্তি ও আশ্বাস আনয়ন করা যাইতে পারে না।" পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুসলিম জননেতাদের চিন্তার খোরাক ইহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। পাকিস্তানে থাকিয়াও 'জনশক্তি'র সত্য কথা সহজ ভাবে সংসাহস আছে।

* * * *

সাপ্তাহিক 'নীহারে'র মন্তব্য : দুর্নীতিতে দেশ একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। ছোট-বড় কেহই এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত নয়। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এই দুর্নীতি দমন জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও সমাজ-জীবন হইতে এই পাপ দূর করিতে সক্ষম হইতেছেন না। সম্প্রতি দুর্নীতির বিভাগের সুপারিশ ক্রমে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার সকল বিভাগের ছোট-বড় বহু সরকারী কর্ম্মচারীকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের এক জন ডেপুটী সেক্রেটারী, রেশনিং বিভাগের এক জন স্পেশ্যাল অফিসার, এক জন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এক জন টেক্সটাইল ইন্সপেক্টার, লোহা-ইস্পাতের ডিরেক্টারদের এক জন ইন্সপেক্টার এবং এক জন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার। বিভিন্ন সাপ্লাই বিভাগের বহু কেরাণী, দুই জন হেড কনষ্টেবল, চারি জন হাসপাতাল কর্ম্মচারীও রহিয়াছেন। এ ছাড়া মিথ্যা ভাতা পেশের অভিযোগে এক জন মহকুমা অফিসারকেও শাস্তি দেওয়ার কথা প্রকাশ পাইয়াছে।" কিন্তু চারা মাছ বেশী ধরা পড়িলেও রুই-কাতলা বিশেষ জালে পড়ে নাই। কলিকাতা পুলিশের নানা দুর্নীতি সাময়িক ভাবে ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিত্ব কালে বন্ধ হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে আবার পুলিশের বহু কর্ম্মচারী এবং কনষ্টেবল ক্রমে তাহাদের পূর্ব্ব অভ্যাসে ফিরিয়া যাইতেছে। সুখের কথা, বাঙ্গালী যে সকল যুবক পুলিশের নিম্নতর পদে বহাল হইয়াছে, তাহারা বাবু কনষ্টেবলদের বহু পাপ হইতে এখনও মুক্ত রহিয়াছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে বলিয়া মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে, পশ্চিম-বাঙ্গালা সরকারের ইংরেজ অন্তপ্রীতি এবং কতকগুলি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর এখনও রহিয়াছেন—যাঁহাদের কার্য্যকলাপের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। ইঁহারাও প্রথম প্রভু-পরিবর্ত্তনের মুখে প্রায় মেষ-শাবকে পরিণত হয়েন; কিন্তু ক্রমে পূর্ব্বতন নেকড়ের রূপ ধারণ করিতেছেন।

* * * *

'নির্ণয়' দুঃখের সহিত মন্তব্য করিতেছেন : "পূর্ব্বে আমরাও এ-বিষয় দৈনিকে বহু কিছু বলিয়াছি। "রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের আবেদনক্রমে এই বৎসরের দোল উৎসবে সকল কংগ্রেসকর্মী ও কংগ্রেসানুরাগী ব্যক্তিগণ যোগদান না করিলেও এক দিকের বিচারে আড়ম্বরের কিছুমাত্র অভাব ঘটে নাই। বরং বলা যাইতে পারে আতিশয্যই ঘটিয়াছে। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ঐ দিনের সংবাদে প্রকাশ যে, অত্যুৎসাহী কিছু সংখ্যক যুবক ভিন্ন সম্প্রদায় ও নারী, বিশেষ করিয়া এই উৎসবে যোগ দিতে যাঁহারা অনিচ্ছুক তাঁহাদের উপর জোর করিয়া রং দিয়াছে। দোলের বিভ্রাটের ফলে কলিকাতার রাজপথে বাস-ট্রাম চলাচলেও মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটে। মফঃস্বল হইতেও অনুরূপ মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার কয়েক স্থানে এই উচ্ছৃঙ্খলতা থামাইবার জন্য গুলী পর্য্যন্ত চালাইতে হয়। ভাবিতেছি, ইহা কি জাগরণ? না, অতি নিকৃষ্ট পর্য্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা! আনন্দের উৎসব আজ দিন দিন ভয়াবহই হইয়া দাঁড়াইতেছে।" কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণেই নহে। কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয় এবং সিনেমা-গৃহেও এক দল লোকের—বিশেষ করিয়া এক শ্রেণীর ছাত্র এবং যুবকের ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিকর। কথাবার্ত্তায় এবং আচরণে ইহারা সামান্য ভদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। অথচ যাহারা এই প্রকার ব্যবহার করে তাহারা সকলেই ভদ্র-সন্তান। সমাজ এবং রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তার কথা!

* * * *

'আর্থিক বাংলা' পূর্ব্ব-বঙ্গের বাস্তুত্যাগী চিকিৎসকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন : পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী যে সকল চিকিৎসক পশ্চিম-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সেদিন উইলিয়মস্ লেনস্থ ডাঃ অমল রায় চৌধুরীর বাড়ীতে এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে উপস্থিত বাস্তুত্যাগী বহু চিকিৎসকের পক্ষ হইতে ডাঃ রায় চৌধুরী বলেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণের ব্যবসায় চালান পূর্ব্ব-বঙ্গে অসম্ভব হইয়াছে। এ যাবৎ প্রায় আড়াই শত চিকিৎসক পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থার যদি উন্নতি না হয় তবে শীঘ্রই এই সংখ্যা এক হাজারে দাঁড়াইবে। এই শোচনীয় অবস্থার জন্য চিকিৎসকগণ প্রস্তুত ছিলেন না। ডাঃ রায় চৌধুরী মনে করেন, ইহার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের। সুতরাং সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা আশু কর্ত্তব্য বলিয়া ডাঃ রায় চৌধুরী মনে করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, এ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিকট প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।" দায়িত্ব কি কেবল পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের? বাস্তুত্যাগী চিকিৎসকগণ কেন পশ্চিম-বাঙ্গলার গ্রামের দিকে যাইতেছেন না? দেশে এখন বহু গ্রাম আছে, যাহার দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে কোন ডাক্তার নাই, অথচ রোগের কোন কমতিও এ-সব স্থানে নাই। সরকারের উপর

ভরসা না করিয়া ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ারগণও যদি কিছু করিতে না পারেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকের অবস্থা কি হইবে? ডাক্তার স্বাবলম্বী হইবে এ কথা মনে করা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বা অন্যায় নহে।

* * * *

'নীহার' পাঠে জানিতে পারি যে: "সম্প্রতি সবঙ্গ থানার আদাশিমলা ঠাকুর-মন্দির-প্রাঙ্গণে এক বিরাট সার্ব্বজনীন ভোজ হয়, তাহাতে প্রায় ষোল শত সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দু একত্রে ভোজন করেন। ইহার পরদিন ঐ স্থানেই সার্ব্বজনীন মহিলা-ভোজে প্রায় ৫৫০ শত সর্ব্ব শ্রেণীর মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই ভোজের অনুষ্ঠান হয়।" সার্ব্বজনীন বিরাট ভোজে উৎসাহ বিশেষ দেখা যাইতেছে। কিন্তু অন্য প্রকার দেশহিতকর কাজে সার্ব্বজনীন বিরাট উৎসাহ তেমন দেখা যায় না কেন? কষ্টকর বলিয়া কি?

* * * *

'আর্থিক বাংলা'তে প্রকাশ: "ঘরের কোণে ঝুল, ছেঁড়া পাপোষ, আফিংএর রং সদৃশ বিছানা বালিসের অবস্থা, জানালা-দরজার পর্দাগুলির মালিশ হয়নি অনেক দিন, ছেলেমেয়ের "কুথাপ" বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার, পানের বাসনের ঘ্রাণ এলে "অন্নপ্রাশনের ভাত" ধাপার মাঠের দিকে "অগ্রগতি" নেয়, গিন্নীর কিন্তু "অগ্রগতির" পথে মোটেই বাধা নাই। গৃহস্থ তুমি "বিবাগী" হও নচেৎ তোমার গৃহের পরিত্রাণ নাই অপরের "সাধুকণ্ঠে" বাধা দিতে নাই। "অগ্রগতি" রোধ করিতে নাই। উহা পাপাচরণেরই নামান্তর।" বিবিধ মহিলা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভুক্তভোগী মাত্রেই উপরিউক্ত মন্তব্যের নিষ্ঠুর সত্যতা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিবেন। ভয়ে অধিক কিছু আর বলিতে পারিলাম না।

* * * *

'বর্দ্ধমানের কথা' বলিতেছেন: "ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত যে সমস্ত আইন আছে তাহা ক্ষেত্রবিশেষে এমনই হইয়াছে যে পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড সর্ব্বোচ্চ চুরাশী টাকা ট্যাক্স ধার্য করিতে পারে, এক দিন হয়ত' এই সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সঙ্গতই হইয়াছিল আজ কি ইহা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় নাই? ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় বড় বড় ব্যবসা-ক্ষেত্র, গঞ্জ, কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, বড় বড় জমিদার-ধনিকেরা সেখানে বাস করিতেছেন, আয় তাঁহাদের যাই হোক, চুরাশী টাকার বেশী ট্যাক্স তাহাদের হইবে না। আয় না বাড়িলে ব্যয় করা যায় না ইহা সাধারণ কথা। ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয় না বাড়াইতে পারিলে তাহারা জনকল্যাণের কাজ করিবে কোথা হইতে? গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন সংশোধন করিয়া আয়ের অনুপাতে ট্যাক্স ধার্য করিবার ক্ষমতা ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে প্রদান করিলে তাহারা ব্যবসাদার, কল-কারখানার মালিক, বিত্তশালী জমিদারদের উপর আয়ের অনুপাতে ট্যাক্স ধার্য করিয়া রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার, জল-সরবরাহ, চিকিৎসা প্রভৃতি জনকল্যাণের কাজে উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করিতে পারে।" প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত। পশ্চিম-বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি এদিকে দেওয়া কর্ত্তব্য।

* * *

"দেশের জনসাধারণের হাতে আজ ক্ষমতা আসিয়াছে—নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডগুলির কাজ চালাইবেন, সেই জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত সভ্য তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারদের এই সব প্রতিষ্ঠানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা আজও বজায় আছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি মনে করিলে ইচ্ছানুযায়ী জন-কল্যাণের কাজে অর্থ ব্যয় করিতে পারে না, নিজেদের খেয়াঘাট বিলি করিতে পারে না, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী কর্মচারীদের এতখানি কর্ত্তৃত্ব কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। অবশ্য ইহা দ্বারা আমরা ইহা বলিতে চাহিতেছি না যে, প্রাদেশিক সরকারের কোন কর্ত্তৃত্বই এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির উপর থাকিবে না। আমরা বলিতে চাহিতেছি, সরকারী কর্মচারিগণ যাহাতে তাহাদের খেয়াল ও মর্জি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চালাইতে না পারে। সাধারণ ভাবে যে সব আইন সংশোধন ও প্রণয়ন প্রয়োজন তাহাই আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এই দিকে পড়িলে সুখী হইব।' মন্তব্য অনাবশ্যক। আশা করি, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার 'বর্দ্ধমানের কথা'র সারবত্তা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কথাগুলি সমগ্র পশ্চিম-বাঙ্গলার উপরেই প্রযোজ্য।

* * * *

'জনশক্তি' বলিতেছেন: "সরকারী কর্ম্মচারীদের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন জনসাধারণের প্রতি সাধু ব্যবহার। অতীতে তাহা আমরা লক্ষ্য করি নাই। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছেন যে, জনসাধারণের সেবক হিসাবে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে চলিতে হইবে। কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। এখন যাহাতে তাহা কার্য্যকরী হয়, তজ্জন্য আমরা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। যদি জেলার কর্ত্তারা জনসাধারণের প্রতি সাধু ব্যবহার করেন—তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিয়া তাহা দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হন, তবে অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও এরূপ হইতে বাধ্য হইবেন। নূতন যুগের যে ডাক আসিয়াছে, সরকারী কর্ম্মচারীরা কি তাহাতে সাড়া দিবেন না?" একেবারে যে সাড়া দিতেছেন না, তাহা নহে। সরকারী কর্ম্মচারীদের বিশেষ করিয়া হাকিম এবং পুলিশের পূর্ব্বতন হাকিমী মেজাজের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহা স্বীকার করিব। এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের বর্ত্তমানের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এমন বহু জন আছেন, যাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারীদের তাঁহাদের খাস মহালের ভৃত্য বলিয়া মনে করেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত কাজেও ইঁহারা বাধা দিতে কসুর করেন না। আমাদের এ মনোভাবও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

* * * *

বহু কাল পরে 'পল্লীবাসী' পত্রিকায় একটি সংবাদ পাঠ করিতে পারিয়া খুসী হইলাম: "প্রতি বৎসর দামোদরের বন্যা দেশের যে অনিষ্ট করে, তাহা দূর করিবার জন্য দামোদর ও বরাকর নদীতে ৭টি বাঁধ দেওয়া হইবে। ইহাতে যে শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা নয়, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার প্রায় ১০,০০,০০০ বর্গ-একর জমিতে ধান চাষের জল দেওয়া হইবে; প্রায় ৪,০০,০০০

টন অর্থাৎ ১,০৮,০০,০০০ মণ শস্য উৎপন্ন হইবে; রবিশস্য হইবে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের। এই সাতটি বাঁধে "জল-বিদ্যুৎ" (Hydro-Electricity) হইবে প্রায় ৩০০০,০০০ কিলোওয়াট। আলাদিনের প্রদীপের সংস্পর্শে যেমন রাজপুরী জাগিয়া উঠিয়াছিল তেমনি ছোটনাগপুর ও পশ্চিম-বাংলা ধন-ধান্যে ভরিয়া উঠিবে। এই পরিকল্পনা সার্থক হইলে এই বাঁধগুলিতে দামোদরের যত বালি আটক পড়িবে, হুগলী মোহনায় আর পৌঁছিতে পারিবে না। মোহনার অশেষ উন্নতি হইবে, কলিকাতা বন্দর বাঁচিয়া যাইবে। বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুর হইতে হুগলী জেলার রঘুনাথপুর পর্য্যন্ত একটি নৌকা-চলাচলের খাল কাটা হইবে এবং হুগলী নদীর সঙ্গে সংযোগ হইবে। তাহাতে অণ্ডালের নিকট হইতে কয়লা, ধান্য ও অন্যান্য পণ্য অতি অল্প খরচায় কলিকাতায় আসিতে পারিবে। ইহাতে রেলে এই সব মাল বহনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কমিবে। এতদ্ভিন্ন উপরোক্ত জেলাসমূহের জল-নিষ্কাশনের অধিক উন্নতি সাধন হইবে। এই খালের জলে হুগলী নদীর উন্নতি হইবে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে।"

* * * *

'নবসঙ্ঘ' বলিতেছেন: পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে সকল হিন্দু ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের জন্য পশ্চিম-বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট কিছুটা উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। যাঁহারা চলিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আস্থা দান পূর্ব্ব-পাকিস্তানের গবর্ণমেণ্ট করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। এই অবস্থায় নিরুপায় হিন্দু জাতি পশ্চিম-বঙ্গে একেবারেই নিরাশ্রয় হইবে—ইহা পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দু জাতি সহ্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের তরুণেরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণবলি দিয়াছে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রোধ করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন নাই। বর্ত্তমান বঙ্গবিভাগের ব্যাপারেও পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের আন্দোলন কার্য্যকরী হইয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি পশ্চিম-বঙ্গবাসিগণের সমবেদনা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ দায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বহন করা সম্ভব নহে। অতঃপর, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এই দায়ভার গ্রহণ করায় আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টও বাংলায় পুনর্ব্বসতি সমস্যার সমাধানে উদ্যত হইয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গের পরিধি-বিস্তার দ্রুত সম্ভব না হইলেও উপস্থিত যে সকল বিস্তৃত স্থান পশ্চিম-বঙ্গে আছে তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের বাসস্থান করিয়া দিতে হইবে।" যুক্তিযুক্ত কথা এবং প্রস্তাব।

* * * *

'নবসঙ্ঘ' আরো বলেন যে: "পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুপ্রধান স্থানগুলি হইতে হিন্দু জাতিকে আমরা পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের নিকট কোনরূপ নিরাপত্তার আশা না পাইলেও স্থানত্যাগে নিষেধ করি। পরিবর্ত্তনযুগে রাজ্য শাসনের শ্রথতা চিরদিন স্থায়ী হয় না। পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে শাসন ব্যবস্থা সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিবেন—এ আশা আমরা নিরর্থক মনে করি না। চট্টলের রাজপথে কোন এক ভদ্রমহিলা প্রহৃতা হওয়ায় চাঞ্চল্যের হেতু নাই, এইরূপ ঘটনা পূর্ব্বেও হইয়াছে। তবে এইরূপ আচরণ অমার্জ্জনীয়। চট্টলের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবিধান করিবেন। পাকিস্তানে যে সকল হিন্দু সমষ্টিবদ্ধ ভাবে বাস করিতেন তাঁহারা উৎখাত হইলে, গান্ধার যেমন আফগানে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গও তদ্রূপ ইসলামস্থানে পরিণত হইবে। অনেক দুর্ভাগ্য সহিয়াও হিন্দু জাতিকে পূর্ব্ববঙ্গে জনমতের পুষ্টিবিধান করিয়া টিকিয়া থাকিতে হইবে। বাঙ্গালী মুসলমানগণ এই নীতির অন্তরায় নহেন। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই কোন এক বিশেষ ঘটনায় উদ্বেলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু জাতি যাহাতে নিশ্চিহ্ন না হয়, সে দিকে আমরা লক্ষ্য রাখিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন।" পূর্ব্ববঙ্গবাসী ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা আমাদের, পশ্চিম-বঙ্গবাসীদের উপর খাপ্পা হইয়া আছেন, কারণ, আমরা না কি একান্ত স্বার্থপর! পূর্ব্ববঙ্গবাসীর মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া আমরা সেই কাঁটালের ভাগ তাঁহাদের দিতে রাজী নহি! কাজেই আমরা কোন কথা বলিলে লাভ হইবে না।

* * * *

'দামোদরে' প্রকাশ: "বর্দ্ধমানের মহামান্য মহারাজের মহলে খাজনার দরুণ সাজা ধান্য আদায়ের সময় হাত-বাঁড়িতে ধান্য মাপা হয়, সেই সময় প্রতি পশুরীর (৫ সের) সহিত একটি করিয়া আধ সের চাপাইয়া দেওয়া হয়, ফলে এক মণে /৪ সের বেশী করিয়া ধান্য আদায় করা হয়। এই অন্যায় বে-আইনী আদায়ের প্রতিকার এখনও হয় নাই। এ বৎসরই জোর করিয়া আদায় চলিতেছে। ইহার উপর সুদের জুলুম তো আছেই।" প্রতিকার 'প্রজারাই' করিতে পারেন। তবে একজোটে কাজ করিতে হইবে। বর্দ্ধমানের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ আশা করি এ-বিষয়ে নজর দিবেন।

* * * *

'বর্দ্ধমানের কথা' স্থানীয় কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী সম্বন্ধে বলেন: "অসংখ্য ষ্টল শূন্য পড়িয়া আছে। যে কয়টি ষ্টল ভর্ত্তি হোয়েছে তার মধ্যে ছ' আনা রকম ষ্টলেও যদি পল্লীবাসীর শিক্ষামূলক বিশেষ কিছু বিষয়বস্তু থাকিত, তবে দুঃখের কারণ ছিল না। কিন্তু অধিকাংশ ষ্টলগুলিতেই বিলাস দ্রব্যে ও চা মিষ্টিতে ভর্ত্তি করা হোয়েছে। দু'-একটি স্বাস্থ্য, শিল্প ও জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের চিত্র ষ্টল যাহা রহিয়াছে, সাধারণের মনকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করবার কোন ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই। মহাত্মাজীর ও নেতাজীর আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি দু'টিকে যথারীতি সজ্জিত করবার কোনরূপ ব্যবস্থা না হওয়ায়, আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণের সুরুচির পরিচয় পেলাম না। প্রদর্শনীটি দেখিয়া সাধারণের বিজয়চাঁদ রোডের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক।" দুঃখ করিবার কারণ কি? বড় বড় প্রদর্শনীরও প্রায় একই অবস্থা এবং অব্যবস্থা। খুচরা মনিহারী দোকান এবং সিনেমা থিয়েটারের আয়োজন দ্বারাই উদ্যোক্তারা কিস্তিমাৎ করেন!

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

আলপনা

শেফালি দাস
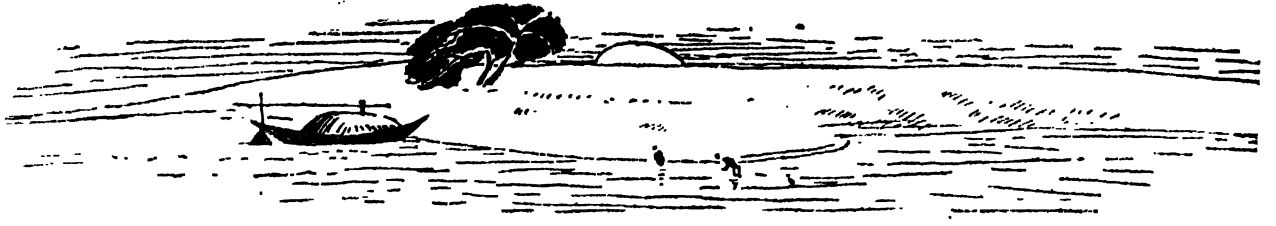
হঠাৎ আলপনা সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলাম কেন?…এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হয়তো বিশেষ কিছুই বড় ক'রে বলতে পারবো না;—তবুও জানি, এই বিশেষ ভারতীয় আর্ট বা শিল্পের ওপর আমার যেমন স্বভাবজাত একটা অনুরাগ আছে, তেমনি শুধু আমিই নয়,—আমার মত অনুরাগীর বাইরেও এই শিল্পের প্রকৃত দরদী আরও অনেকেই আছেন।

এটি একটি প্রাচীন ভারতীয় শিল্প। তবে ঠিক কবে থেকে এবং কোথায় যে এই শিল্পের গোড়াপত্তন হয়, তা হিসেব ক'রে বলা কঠিন।…কিন্তু আমরা জানি, অনেক আগেকার দিন থেকেই পূজা-পার্বণে এবং নানা রকম শুভ কাজের মধ্যে এই ধরণের 'আলপনা' দেওয়ার রীতি আমাদের দেশে ছিল।

আমরা অনেকেই জন্ম থেকে দেখে আসছি—আমাদেরই মা, মাসি, ঠাকুমা-দিদিমারা বেশ চমৎকার 'আলপনা' দিতে পারেন। ছোট বেলা থেকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি, কি সুন্দর ভাবে ওঁরা আলপনা দেন।…আজকাল আমরা কলেজ-স্কুলে প'ড়ে দিনের পর দিন পরিশ্রম ক'রে লিখতে, আঁকতে আর পড়তে শিখি।…অঙ্কন শিল্প শিখতে গেলে আর্ট স্কুলে যেতে হয়…তার পর কত খাতায় দাগ টানতে টানতে আঁকতে শিখি।…কিন্তু আমাদের ঐ সমস্ত মা-মাসির কথা ভাবলে অবাক হ'য়ে যাই।…কি অদ্ভুত শক্তি ওঁদের।…পড়াশুনো না ক'রে খুব সাধারণ জ্ঞান নিয়েই ওঁরা কি সুন্দর আলপনা আঁকতে পারেন।…'উইনসর নিউটনের' রংও নয়, আর 'সেবেল্ হেয়ার ব্রাসও' নয়; চালের গুঁড়োর 'পিটুলীতে' আর হাতের আঙুল দিয়েই তাঁরা আঁকতে থাকেন।

যখন দেখতাম তখন বেশ কিছুটা অবাক্ হ'য়ে যেতাম।…মাঝে মাঝে ভাবতাম, এ কি ক'রে সম্ভব! মনের মধ্যে হিংসেও যে হ'তো না এমন না,—ভাবতাম, ওঁরা পারে আর আমি পারি না!

ভরসা ক'রে এক দিন মাকে জিজ্ঞেস ক'রে ফেললাম…আমি দেবো মা?…বেস্পতিবারের লক্ষ্মীপূজোর জন্তে মা তখন বাড়ীর চৌকাঠে আর সিঁড়িতে সিঁড়িতে আলপনা কেটে চলেছেন। আমার কথা শুনে গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিলেন—"তুই পারবি না।"

কথাটা শুনে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।…নিজের মনেই বার বার প্রশ্ন করতে লাগলাম, পারবো না,—কেন পারবো না?

এর পর এক দিন বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে লুকিয়ে আলপনা দিলাম। অনভ্যস্ত হাতের প্রচেষ্টা হ'লেও সবার আগেই বাবা প্রশংসা ক'রে ব'ললেন।…যার মুখে শুনেছিলাম—পাকা দালানের থেকে 'নিকানো' মসৃণ মাটির ওপরেই আলপনা ভালো হয়। আর দেখায়ও ভালো। দেখলাম, সত্যিই তাই। মামার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে আর এক দিন ভরসা ক'রে দাওয়ার ওপর একটা আলপনা দিয়ে বসলাম।…বুড়ী দিদিমা সেকালের লোক,—আমার মত আজকালকার দিনের মেয়েকে আলপনা দিতে দেখে আদর ক'রে বললেন—কার কাছে শিখেছিস্?… আমি পুরানো দিনের কথাগুলো স্মরণ করে অভিমানের সুরেই বললাম—কে আবার শেখাবে?—আমি নিজে নিজেই শিখেছি।

আজ বড় হ'য়ে বুঝছি—সত্যিই তাই, এ শিল্পটা কাউকে হাতে ধ'রে শেখানো যায় না। প্রচেষ্টা থাকলে আপনার থেকেই শিখে ওঠা যায়।…আমারই এক ভাই আর্ট স্কুল থেকে পাশ ক'রেছে। বেশ ভালো ছাত্র; কিন্তু হাতে-কলমে আলপনা দিতে গিয়ে যার কাছেই নাকাল হ'য়ে প'ড়েছিল। এরও ঐ একই কারণ।… আলপনা আঁকতে গিয়ে দেখা যায়, তার মধ্যে কোন মাপ-জোপ নাই, ড্রয়িং ইন্সট্রুমেণ্টও নাই। কেবল চোখে দেখে আন্দাজ মত আঙুল চালিয়ে যাওয়া। অভ্যাস না থাকলে চলবে কেন?

বাংলা দেশে আজও আলপনা দেওয়া হয়। তবে আলপনা দেওয়ার রেওয়াজটা পশ্চিম-বঙ্গের থেকে পূর্ব-বঙ্গের মধ্যেই বেশী। পূর্ব-বঙ্গের সেকালে লোকেরা সুন্দর আলপনা দিতে পারেন। পশ্চিম-বঙ্গে অনেকগুলো বিশেষ কারণেই এ শিল্পটা লোপ পেয়ে যাচ্ছে।… শান্তি-নিকেতনের মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন শিল্প হিসাবে এর এখনও কিন্তু কদর আছে।…ওখানে অনেক ছেলে-মেয়েকেই আমি বিশেষ ক'রে আলপনার চর্চা করতে দেখেছি।…আস্তিক কি নাস্তিক, সে বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে—অনেককে আর্ট হিসেবে এর কদর এবং আদর ক'রতে দেখেছি।

শুধু বাংলা দেশেই নয়,—আলপনার কদর ভারতের আরও অনেক জায়গাতেই আছে। বিহার, ইউ-পিতে আলপনা দেখেছি,—তবে তাঁদের আঁকাগুলো একটু ভিন্ন ধরণের, কোথাও কোথাও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-বস্তু নিয়ে। দিল্লীতে আলপনার প্রতিযোগিতা দেখেছি। তবে ভারী চমৎকার! না দেখলে বোঝানো যায় না।…সারি-সারি প্রতিযোগী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজের নিজের জায়গায় আলপনা দিচ্ছে—অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি!

মাটির দেওয়ালে রাঙা মাটির লাল আলপনাও দেখেছি।—দেখতে সুন্দর।…সব শেষে বলি, এই প্রাচীন শিল্পটি বেঁচে থাক। আজ-কাল মেয়েরাও আর্ট স্কুলে প'ড়ে তাদেরকে সেখানে আলপনা দিতে শেখালে ভালই হয়।…বৃদ্ধারা বলবেন হয়তো হিঁদুর হিঁদুয়ানি বাঁচবে, আমি বলবো না,—শিল্পটাই বাঁচবে। হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্নটা পরে।

পথের ব্যথা

শ্রীমতী নমিতা গাঙ্গুলী

পথ দিয়ে চ'লেছি। অমাবস্যার রাত্রি। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। এই বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের সাথে আমার হৃদয়ের যেন অনেকটা মিল আছে, সেখানেও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

আমার মনের আকাশে এক দিন চাঁদ উঠেছিল! তন্ময় হয়ে তার সুধা পান করেছিলাম, কোথা হতে রাহু এসে আমার চাঁদকে গ্রাস করে নিল, হৃদয় গভীর আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। জানি না, কবে আমার চাঁদ রাহুমুক্ত হবে, কবে তার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে আমার হৃদয়াকাশ আবার আলোকিত হবে!

অনেক কষ্টে আঁধারের পাহাড় ঠেলে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় কে আমায় ডাকলে। ভাবলাম, ও কিছু নয়। এই নিবিড় নিশীথ রাত্রে আমার মত অভাগা কে আছে যে সুখ-শান্তিময় গৃহ-কোণ ছেড়ে পথে বাহির হবে? বন্ধনের আশায় ঘর বেঁধেছিলাম, কিন্তু ঘর আমায় বাঁধতে পারেনি, তাই পথই আমার সম্বল।

আর একটু অগ্রসর হয়েছি, আবার কে ডাকলে—সে ডাক বড় করুণ, বড় মর্ম্মান্তিক। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যায় না; কেবল শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। পায়ে কি একটা কোমল পদার্থ ঠেকল। অনুভবে বুঝলাম, একটা ফুল—মল্লিকা, গোলাপ, রজনীগন্ধা একটা কিছু হবে। কে যেন তার সবটুকু সৌন্দর্য্য, কোমলতা, মধুরতা নিঃশেষ করে নিয়ে পথের এক পাশে নিতান্ত অনাদরে, অবহেলায় ফেলিয়া গিয়াছে। তাই, মৃত্যুর পারে দাঁড়িয়ে সে আমায় ডাকলে তার দুঃখের কাহিনী শুনাবে বলে। হায়! বিধাতার কি নির্ম্মম পরিহাস! অতীত যার কাছে ব্যর্থ হায় গেছে, বর্ত্তমান যাকে ব্যঙ্গ করে, দুঃখের অকূল পাথারে যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই তার কাছে কেবল মরীচিকা মাত্র, তার কাছে এই আবেদন! ভাবলাম, দুঃখীর কথা দুঃখী না শুনলে কে শুনবে?

এই পৃথিবীর বুকে প্রতিদিন কত ফুল অকালে ঝরে যায়, কত ফুল বৃন্তেই শুকিয়ে যায়, কত ফুল দলিত পিষ্ট হয়ে পরিত্যক্ত হয়, তাদের ব্যথার কাহিনী ত কেউ শুনে না? না হয় আমিই আজ একটু শুনলাম। কিছু করতে না পারি, অন্ততঃ একবার 'আহা'ও ত বলতে পারব! অথবা, যে দুঃখকে নিজে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলে মনে করি, যে ব্যথা অহরহ আমার হৃদয়কে আঘাত করে, এ সংসারে হয়ত তার চাইতে বড় দুঃখ, বড় ব্যথা আছে। যা' জানি না, তা' হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারব না, এমন ত' হ'তে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু খবরই বা রাখি!

* * * *

সে বলিল—

"আমি বনমল্লিকা। কিন্তু বনে আমার জন্ম নয়, আমার জন্ম রাজবাড়ীতে। টুকুমপুরের রাজবাড়ী দেখেছ, তারই বাগানে আমি ছিলাম। সে বাগানে ফুলের অভাব ছিল না,—মল্লিকা টগর, চাঁপা, গোলাপ আরও কত কি? কিন্তু আমারই আদর ছিল বেশী। মালী আমার দেখাশুনা করত না, আমার পরিচর্য্যা করতেন রাজকুমারী নিজে। কি আদর, কি যত্ন! এখন কেবল কল্পনা বলে মনে হয়।

সবে মাত্র আমি রূপে, গন্ধে, কোমলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলাম। পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে আমার নিটোল যৌবন উছ্‌লে পড়ছিল। আশায় আনন্দে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যা-সমীরণ আমায় আবেশময় করে তুলেছিল, তার মধুর স্পর্শে আমি আবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হচ্ছিলাম, আর আড় চোখে এক একবার আগ্রহবশে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ ছিল না, তবুও ভাবছিলাম, একটি বার যদি দেখা পাই!

রাজবাড়ীতে উৎসব। টুকুমপুরের রাজকুমারীর বিবাহ। সমস্ত রাজবাড়ী অপরূপ শোভামণ্ডিত। প্রতিটি কক্ষ শত শত দীপমালায় সুশোভিত। দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গলঘট স্থাপিত। মিলনের মধুর সুরে টুকুমপুরের আকাশ-বাতাস মুখর। সখীগণ-পরিবৃতা রাজকুমারী আজ অপরূপ সাজে সজ্জিতা। সে রূপের বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। আমার রূপে গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে রাজকুমারী স্বহস্তে আমায় তাঁর কবরীতে পরেছেন। আমার কি আনন্দ! রাজকুমারীর প্রতি অনুরাগে আমার সারা মন-প্রাণ অধীর। হায়! তখন জানতাম না, ক্ষুদ্রের এই আত্মবলির মূল্য ধনীর নিকট কিছুই নয়। সামান্য খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য আমার মত শত শত প্রাণ অকালে ঝরে যায়।

উৎসবের রাত্রির প্রভাত হলো। সারা রাত্রির পেষণে আমার দেহ কঙ্কালসার। কাল যে আমি পরিপূর্ণ-যৌবনা ছিলাম, আশায় আনন্দে আমার অন্তর পূর্ণ ছিল, প্রভাতের সাথে দেখে আমি আর সে আমি নহি। যেন যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত গ্লানি আমায় আচ্ছন্ন করে দিল। পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে কদর্য্যতা প্রকাশিত হ'ল! দেখলে আমায় চেনাই যায় না।

রাজকুমারীর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। অনাদরে অবহেলায় তিনি আমায় দূরে ফেলে দিলেন। কাল যাকে সুন্দর বলে আদর করে কাছে নিয়েছিলেন, আজ আবার হতশ্রী বলে তাকে দূর করে দিলেন।

আমার আর সময় নাই। চির বিদায়ের ক্ষণে আমি তোমায় আমার কাহিনী শুনিয়ে গেলাম, জানি না, এর স্মৃতিটুকু তোমায় ব্যথা দেবে কি না। বিস্মৃতির গর্ভে যখন সবই হারিয়ে যাবে, তখন এই বনমল্লিকার ব্যথার ইতিহাসটুকু কি তোমার হৃদয়ে চিরন্তন হয়ে থাকবে?"

* * * *

চাহিয়া দেখি, পূবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। আধ-আলোয় আধ-আঁধারে 'ফুলটিকে কুড়িয়ে নিলাম। এক ফোঁটা চোখের জল তার উপর পড়ে গেল। ভাবলাম, কাল যে ছিল আজ সে নাই। কাল যে পরিপূর্ণতার দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, না জানি, কত ব্যথায় সে নিমেষে ঝরে পড়ল।

আবার আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। সংসার-পথের যাত্রী আমি, আমার চলা ছাড়া আর উপায় কি? জানি না, কবে এই চলার শেষ হবে?

বোকার ভুল

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী

৬

সমুদ্র! সমুদ্র! সমুদ্র!

উন্মুক্ত প্রশান্ত নীল বিরাট আকাশের তলায় এই চির-চঞ্চল শিশুর কি অদ্ভুত উন্মাদনা! সমুদ্র হচ্ছে প্রকৃতি দেবীর একটি বিদ্রোহী সন্তান! ঢেউয়ের পর ঢেউ, তার পর ঢেউ, অসংখ্য অগুন্তি ঢেউ সঙ্গে ক'রে সে তেড়ে আসচে তীরের দিকে পৃথিবীর বালুকাময় প্রাণহীনতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। হাজার হাজার ঢেউ-সৈন্য হুহুঙ্কারে লাফিয়ে পড়ছে আত্মরক্ষায় অক্ষম কোটি কোটি বালুকা-কণার ওপর—জয় সমুদ্রেরই হয়। দুর্বল বালির কণার ওপর সমুদ্র জয়ের আনন্দের ফেনা ছড়িয়ে আবার ফিরে যেতে থাকে; কিন্তু প্রথম ঢেউয়ের দল ফিরে যেতে না যেতেই আর এক দল ঢেউ এসে হাজির হয়। তারাও আক্রমণ করে, তারাও ফিরে যায়—আবার আসে এক দল···আর এক দল···আর এক দল···বিরাম নেই, বিরতি নেই, সমুদ্রের এই আক্রমণের। তার দেহের গতিশীলতার সঙ্গে রং পরিবর্ত্তনও কি বৈচিত্র্যময়! সে বহুরূপী! প্রাতঃসূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখি সে-ও সোনালী হয়ে উঠেছে, মধ্যাহ্নে সে অসম্ভব প্রখর-দীপ্তিতে ভ'রে ওঠে, সন্ধ্যায় সে রক্তবর্ণ, রাত্রে মুখের ওপর টেনে দেয় কালো অবগুণ্ঠন! সমুদ্র এতো ভয়ঙ্কর, সমুদ্রের এতো রূপ-বৈচিত্র্য! অনন্ত কাল ধরে সে এই বিভীষণতা আর রং নিয়ে খেলা করবে! তার কূলে বালির ওপর দাঁড়িয়ে এই সব কথাই ভাবছিলুম।

দিদি বললে, সুমিতা বাড়ী চল্—এখনও তো দু'মাস এখানে রইলি, যতো ইচ্ছে সমুদ্র পরে দেখিস্, এখন চল্। আমি আমার মুগ্ধ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, তোমার খোকা কই দিদি? তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখ সুমি, ঐ স্যুটপরা লোকটি কি রকম ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। চ' ভাই তাড়াতাড়ি, আমার বড় ভয় করছে। আমি ফিরে দেখে বললাম, দেখ দিদি, ভদ্রলোকটিকে চেনা-চেনা লাগছে, কোথায় যেন ওঁকে দেখেছি। ওরে ও যে আবার এদিকেই আসছে, আয় ভাই তাড়াতাড়ি,—বলে দিদি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন। ভদ্রলোকটি ততক্ষণ কাছে এসে পড়েছেন, হাত জোড় করে নমস্কার করে বললেন, এই যে মিস রায়, চিনতে পারছেন না বুঝি? আমি মেজর বিমান দত্ত। ওহো, মনে পড়েছে বটে, অণির জন্মদিনে দেখেছিলাম। নমস্কার করে বললাম, মাপ করবেন, চিনতে পারিনি মিঃ দত্ত! তার পর পুরীতে কী বেড়াতে এসেছেন না কি? মিঃ দত্ত হেসে বললেন, আজ্ঞে, ভাগ্যের খাতায় সে রকম কিছু লেখা আছে বলে তো মনে হয় না দেবি! তবে এই মুহূর্ত্তে সশরীরে সমুদ্রের তীরে বালির ওপর আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে যে কথা বলবার সুযোগ মিললো, সে শুধু আমার কর্ম্মফলের দৌলতে! অর্থাৎ কি না, সোজা কথায় এখানে বড্ডো কলেরা হয়েছে—সরকার থেকে পাঠিয়েছে মাস খানেকের জন্যে। রোদে দিদির ফর্সা মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে দেখে মিঃ দত্তর কাছে বিদায় নিলাম। মিঃ দত্ত দিদিকে দেখিয়ে জিগেস করলেন, ইনি কি আপনার—? আমি বললাম, হ্যাঁ দিদি—সুনন্দা দেবী; দিদি, ইনি মেজর বিমান দত্ত। ওঁরা দু'জনে দু'জনকে নমস্কার করলেন। যেতে যেতে মিঃ দত্ত একটু হেসে বললেন, বিকেলে আপনাদের বাড়ী গিয়ে খুব খানিকটা বিরক্ত করে আসব'খন, মিস্ রায়! হেসে বললাম, না না, বিরক্ত হবো না মোটেই, বরং মা-বাবা কতো খুশী হবেন দেখবেন। আচ্ছা চলি, নমস্কার!

৭

অণির কথা

মা গো মা, পোড়ামুখী সুমিতা অসিতদা'কে এতোও ভালোবেসেছে—তবুও আমায় বলেনি। আচ্ছা, 'এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা'। আমার দিনও আসবে। অর্থাৎ আমিও যেদিন ভালোবাসবো বাংলা দেশের একটি মাত্র তরুণকে প্রাণের সমস্ত তারে বিচিত্র রাগিণীর ঝংকার তুলে, যে তরুণের মূর্ত্তি হবে আমার চক্ষের মণি, যার বাহু দু'টি হবে আমার কণ্ঠের মালা, যার আগমনের পদশব্দে আমার হৃদয়-সমুদ্রে অনিশ্চিত অচিন্ত্যনীয় আনন্দের আন্তিশয্যে কামনার ঢেউগুলো তোলপাড় করতে থাকবে, যার···দ্যুৎ! এ সব কি ভাবছি আমি। যাই হোক, মোট কথা আমি যাকে ভালোবাসবো তার কথা একটুও বলবো না ওকে! জানালার ধারে বসে এই সব ভাবছিলাম, পিছন থেকে কে বলে উঠলো, একা একা বসে কি ভাবা হচ্ছে অনুরাণীর? ফিরে দেখি অসিতদা; বললাম, ও মা অসিতদা তুমি কি ভাই মনের কথা বুঝতে পারো? জানালার ওপর চেপে ব'সে প'ড়ে অসিতদা বললেন, তবেই বোঝ দিদি, আমি এক মাইল দূরে থেকেও লোকের মনের কথা বুঝতে পারি।

আমি বললাম, আচ্ছা বল তো, সুমিতা এখন কী করছে? দেখলাম, দাদার মুখ এই কথায় লাল হয়ে উঠলো। থতমত খেয়ে দাদা বলে উঠলেন, বাঃ, তাঁর খবর আমি কি ক'রে বলবো?

বা রে, যে সব বুঝতে পারে সে আর সামান্য এই কথাটা বলতে পারে না? না ভাই দাদা, তোমার বলতে হবে না। কিন্তু তোমার মুখ যে একেবারে এতোটুকু হয়ে গেছে ভাই! বসো, মা'র কাছ থেকে তোমার খাবার চেয়ে আনি। দাদা বললেন, না অনু, আমার ক্ষিদে নেই। তার চেয়ে তুমি সেদিনের শেখা সেই নতুন গানটা একবার গেয়ে শুনিয়ে দাও, আমায় এখুনি উঠতে হবে।

*   *   *   *

সুমিতার চিঠি পেয়েছি। বিমান মামা না কি ওদের বাড়ী খুব যাওয়া-আসা করছেন।

অসিতদা'র কথা লিখেছে—তিনি আসেন কি? কেমন আছেন? অসিতদা' বিকেলে আসতে সুমিতার চিঠিটা তাঁকে দিলাম। চিঠি প'ড়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো; তার পরে চিঠিটা দিব্যি পকেটে ভ'রে ফেললেন—আমাকে ফিরিয়ে দেবার কথা মনেও হলো না।

একটু হেসে আমি বললাম, আচ্ছা দাদা, আমায় একটা কথা বলবে ভাই? বলবার মতো হ'লে নিশ্চয় বলবো, অনু।

সাদা কথা বলে যাচ্ছি—সাদা উত্তর দিতে হবে। অত সাদা-কালো বুঝি নে বোন, বলবার মতো হ'লে ঠিক বলবো।

সুমিতাকে তুমি—না ভাই, তুমি রাগ করবে? অসিতদা' একটু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, তবে ব'লো না। বুঝছো যদি রাগ কোরবো, তাহ'লে ব'লে লাভ কি?

আমি আর কিছু না ব'লে উঠে এলাম।

৮

অসিতের কথা

ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে, কিন্তু বিছানার মায়া ত্যাগ করে তখনোও উঠিনি। সকালের মিষ্টি রোদে ঘরখানা ভ'রে গেছে। বোন মীনা স্নান ক'রে ঘরে ঢুকে বললে, ছোড়দা, এখনও শুয়ে আছো? উনুন যে ধরে গেছে, বাজার করবে কখন আর চা-ই বা খাবে কখন শুনি? হেসে বললাম, তোর মুখের এই মিষ্টি ধমকটুকুর লোভে আমি শুয়ে থাকি যে মিনু। হাসচিস্? সত্যি বলছি মিনি, এই ধমকটুকু না খেলে আমার দিন ভালো যায় না।

মীনা হেসে বললে, নাও, ওঠো ছোড়দা। ভাই, নীচের ঘরে তোমার চা রেখে দিয়েছি খাওগে। বিছানা ছেড়ে নীচে নামতে মা বললেন, অসি, এতো বেলা হলো কেন রে তোর?

মুখ ধুয়ে মুছতে মুছতে বললাম, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মা!

মা বললেন, অনুকে আসতে বলে এসেছিস তো? মেয়েটাকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দেবে। বললাম, অনু চারটের মধ্যে আসবে বলেছে, মা।

মা বললেন, তুই চা খেয়ে বাজারটা চট্ করে ঘুরে আয়— কিছু খাবার নিয়ে আসবি। সুতোলা-ভালি চার হাত এক হ'য়ে গেলে বাঁচি। তার পরে অনুর মা ধরেছে অনুকে আমায় নিতে হবে। ঘাড় নাড়ছিস্ কি রে? হুঁ, তুমি না বললেই আমি শুনবো কি না, কেন অনু কি মন্দ মেয়ে শুনি?

আমি বললাম, ভালো-মন্দের কথা বলিনি, মা কিন্তু অনু যে আমায় দাদা বলে, সেটা কি ভুলে গেলে মা? মীনা অনু দু'জনেই আমার বোন।

মা হার মেনে বললেন, আচ্ছা বাছা, খুব তার্কিক হয়েছ, অনু ছাড়া ঢের মেয়ে পৃথিবীতে আছে, আমি শ্রাবণের মধ্যে বউ বরণ ক'রে তুলবই, সে তুমি যাই বলো।

মীনা নীচে এসে বললে, ছোড়দা, চা খেয়েছ? খাওনি? ওর আর পদার্থ নেই কিছু।

আমি হেসে বললাম, বাজার করে এসে চা খাব'খন, ওটা বরং তুই খেয়ে ফেল্।

আচ্ছা, সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না—বলে বাজারের থলেটা আমার হাতে দিল।

* * * *

বিকালে শুয়ে আছি—ঝোড়ো হাওয়ার মতো অনিতা দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

বইটা মুড়ে বললাম, এ কি অনু, এতো দৌড়ে এলে কেন? বাঘে তাড়া করেছে বুঝি?

দাঁড়াও দাদা, বলছি—ও মা, আবার এখানেও আসে যে গো! দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি, বন্ধুবর অজিতকুমার।

বললাম, কি হে, পথ ভুলে না কি? অজিত দেখি অনুর মুখপানে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে—আমার কথা হয়তো ওর কানেই গেল না।

জোরে হেসে উঠে বললাম, ওহে বন্ধুবর, অধমের এই নিবেদন, সপ্তম স্বর্গের রূপ-সৌন্দর্য্যের আবহাওয়া থেকে চক্ষু-কর্ণকে নামিয়ে এনে মর্ত্তবাসীর ব্যর্থপ্রলাপকে শ্রবণ করবার চেষ্টা করবেন কি?

অপ্রতিভ হয়ে অজিত একটু হেসে বললে, কেমন আছো অসিত? অনেক দিন তুমি ক্লাবে যাওনি। সতীশরা তাই তোমার খোঁজে পাঠালেন। হেসে বললাম, সত্যি, আমার খোঁজে এসেছিলে না কি রে? কিন্তু আমার তো অন্য রকম মনে হচ্ছে। তাড়া দিয়ে অজিত বললে, আচ্ছা, ঢের ফাজ্‌লামী হয়েছে, এখন থাম তো।

অনুকে বললাম, অনু, মীনাকে দু'কাপ চা করে দিতে বলে যাও তো। অনিতা চলে যাবার পর বললাম, আচ্ছা অজু, লেখা-পড়া শিখেছো, কিন্তু অমন অসভ্যের মতো অনুর পানে তাকিয়ে ছিলে কেন বল তো? অজিত গম্ভীর হবার মিথ্যে চেষ্টা করে বললে, বাঃ লোকের বাগানে যদি একটি সুন্দর গোলাপ ফোটে, তুমি কি চোখ মেলে সেটা দেখ না? তেমনি আমিও দেখছিলাম, এতে আর গোলাপের কি ক্ষতি হলো?

হেসে বললাম, বা রে অজুচন্দর—তুমি দেখছি কবি হয়ে উঠলে! নাঃ, প্রথম দর্শনেই এতো! অনি শুনলে বেজায় খুশী হয়ে যাবে! ঘটকালী করব না কি হে?' অজিত হাসিমুখে বললে, বেশ তো, কর না। মা তো ধরেছেন এই মাসের মধ্যে তাঁকে বৌ এনে দিতে হবে! বললাম, তা'হলে গোলাপটির মা'র মতামত নিয়ে তোকে দু'-চার দিন বাদে জানাব, কি বলিস্? মীনা চা আর অন্য খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। অজিত তাড়াতাড়ি উঠে অনুর হাত থেকে খাবারের ট্রেটা নামিয়ে নিলে। মীনা মুখ টিপে একটু হেসে বললে, বাব্বাঃ, অজুদা' কি এক-চোখো তুমি—আগে আমি ঢুকলাম তা না আমায় ফেলে সব প্রথমেই অনুদির কষ্ট লাঘব করতে দৌড়লে—বেশ! অজিত হেসে বললে, আরে, তোর ভার লাঘব করবার লোকও তো শীগ্‌গির আসছে, মাসীমার মুখে শুনলাম। মীনা মুখ লাল করে বললে, ভারী অসভ্য হয়েছ তুমি অজুদা! এসো ভাই অনুদি, আমরা যাই।

[ক্রমশঃ।

উত্তর

স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ইটালীর সাধারণ নির্ব্বাচন—

গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৪৮) ইটালীতে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল, সমগ্র পৃথিবীর সাগ্রহ দৃষ্টি উহার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল; ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই অবশ্য ছিল না। এই নির্ব্বাচনে ইটালীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইটালীর নিজস্ব প্রশ্ন লইয়া নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় নাই। একটা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্ত ইটালীর ভোটদাতাদিগকে ভোট দিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু এই নির্ব্বাচনের ফলাফল আদৌ বিস্ময়জনক কিছু হয় নাই,—এই নির্ব্বাচনের ফলে ইটালীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা ছিল, নির্ব্বাচনের ফল তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনে যতগুলি ভোট দেওয়া হইয়াছে তাহার শতকরা ৪৯টি ভোটই ডি গ্যাস্‌পারির খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক দলই পাইয়াছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এই নির্ব্বাচন হইতে যে এই দলই বৃহত্তম দল হইয়া বাহির হইয়াছে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং পোপের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এই দলের শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে অসমর্থ হইয়াছে। ইটালীর এই সাধারণ নির্ব্বাচনের পরিণাম বুঝিবার জন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কি পরিমাণ ভোট পাইয়াছে, সিনেট এবং চেম্বার অব ডেপুটিজে কোন্ দলের সদস্য-সংখ্যা কত হইয়াছে, ১৯৪৬ সালের জুন মাসের নির্ব্বাচনে কোন্ দল কি পরিমাণ ভোট পাইয়াছিল এবং উভয় পরিষদে কত সংখ্যক আসন দখল করিয়াছিল, প্রথমে সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইটালীর রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কম পক্ষে ১১টির কম নয়। এই সকল দলের মধ্যে নিম্নলিখিত দলগুলিই শুধু উল্লেখযোগ্য: (১) খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক দল, (২) কম্যুনিষ্ট দল, (৩) বামপন্থী সমাজতন্ত্রী দল বা নেনীর সমাজতন্ত্রী দল, (৪) দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী দল বা সারাগাত ও লম্বার্‌ডোর সমাজতন্ত্রী দল, (৫) ন্যাশন্যাল ব্লক, (৬) রিপাবলিকান দল, (৭) জাতীয় রাজতন্ত্রী দল এবং (৮) ইটালীয় সোশ্যাল মুভ্‌মেণ্ট। এই আটটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আবার প্রথমোক্ত চারিটি দলই প্রধান, ইটালীর রাজনৈতিক জীবনে উহাদেরই গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে তীব্র প্রতিযোগিতা হইয়াছে উহাদের মধ্যেই। এই চারিটি দলের মধ্যে আবার কম্যুনিষ্ট দল ও বামপন্থী সমাজতন্ত্রী দল মিলিত হইয়া গঠিত হইয়াছে পপুলার ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট। সারাগাত এবং লম্বার্‌ডোর নেতৃত্বে পরিচালিত যে-দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী দল, তাহাই সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টি নামে অভিহিত। ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৬ সালের জুন মাসের নির্ব্বাচনের পর যে কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল তাহাতে কম্যুনিষ্ট ও বামপন্থী সমাজতন্ত্রী সদস্যও ছিলেন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে প্রধান মন্ত্রী ডি গ্যাসপারি এক রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া মন্ত্রিসভা হইতে কম্যুনিষ্ট ও বামপন্থী সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীদিগকে বিতাড়িত করেন। খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক দল দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের সহিত একটা কোয়ালিশন গঠন করিয়াছিলেন। ইটালীর সোশ্যাল মুভমেণ্ট দলটি নয়া-ফ্যাসিষ্ট দল। ইটালীতে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ২ কোটি ৭০ লক্ষ। তন্মধ্যে ২ কোটি ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার ১৮৩ জন ভোটদাতা ভোট দিয়াছেন। নিম্ন পরিষদ বা চেম্বার অব ডেপুটিজের নির্ব্বাচনে প্রধান দলগুলির কোন্ দল কত ভোট পাইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল:—(১) খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাট: ১,২৭,৫১,৮৪১ (শতকরা ৪৮.৭); (২) পপুলার ফ্রণ্ট: ৮০,২৫,১১০ (শতকরা ৩০.৭); (৩) সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি: ১৮,৬০,৫২৮ (শতকরা ৭); (৪) ন্যাশন্যাল ব্লক: ১০,০১,১৫৬ (শতকরা ৩.৮); (৫) জাতীয় রাজতন্ত্রী: ৭,২৯,১৮৭ (শতকরা ২.৮); (৬) রিপাবলিকান্: ৬,৫০,৪১৩ (শতকরা ২.৫), (৭) ইটালীয় সোশ্যাল মুভমেণ্ট: ৫,২৫,৪০৮ (শতকরা ২)।

১৯৪৬ সালের জুন মাসের সাধারণ নির্ব্বাচনে খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৫টি ভোট পাইয়াছিল। আলোচ্য নির্ব্বাচনে পাইয়াছে শতকরা ৪৮.৭ ভোট। সুতরাং এই দলের যে শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক দলের এই শক্তি বৃদ্ধি আদৌ কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তিহ্রাস সূচনা করে না। এই নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তি একটুকুও হ্রাস হয় নাই। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সোশ্যালিষ্ট পার্টি মিলিয়া মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৯টি ভোট পাইয়াছিল; তন্মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি পাইয়াছিল শতকরা ৩১টি ভোট এবং সোশ্যালিষ্ট পার্টি পাইয়াছিল শতকরা ৮ ভোট। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকেই সোশ্যালিষ্ট দল দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্রী দল নেনীর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হইয়া গঠিত হয় পপুলার ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট। আলোচ্য নির্ব্বাচনে পপুলার ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩০.৭ ভোট এবং সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টি শতকরা ৭ ভোট পাইয়াছে। সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টির শতকরা এক ভোট কম হইলেও কম্যুনিষ্ট পার্টির ভোট কমে নাই। সুতরাং খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে অন্যান্ত দক্ষিণপন্থী দলের ভোট ভাঙ্গাইয়া, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এখন

দেখা দরকার, সিনেট এবং চেম্বার অব ডেপুটিজে কোন্ দল কত সংখ্যক আসন দখল করিয়াছে। নিম্ন পরিষদ বা চেম্বার অব ডেপুটিজ মোট আসন-সংখ্যা ৫৭৪টি। তন্মধ্যে খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি দখল করিয়াছে ৩০৩টি আসন এবং পপুলার ডেমোক্রাটিক ১৭৮টি আসন দখল করিয়াছে। সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টি ২১টি, ন্যাশন্যাল ব্লক ১৫টি, জাতীয় রাজতন্ত্রী দল ১২টি, রিপাবলিকান দল ৬টি, ইটালীয় সোশ্যাল মুভমেণ্ট দল (ফ্যাসিষ্ট) ৪টি এবং ছোট-খাটো দল ৫টি আসন দখল করিতে পারিয়াছে। উচ্চ পরিষদে অর্থাৎ সিনেটে ভোটের ফল অনুসারে খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি ১৩০টি আসন দখল করিয়াছে এবং পপুলার ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট দখল করিয়াছে ৭৪টি আসন। ইহার সহিত অধুনালুপ্ত গণ-পরিষদ ফ্যাসী-বিরোধী কার্য্যকলাপের বিষয় বিবেচনা করিয়া সিনেটের যে আসন সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও যোগ দিতে হইবে। এই সকল সিনেটরদের মধ্যে খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক দল ১৮ জন এবং পপুলার ফ্রণ্ট ৪৫ জন সদস্য পাইয়াছেন। সুতরাং সিনেট বা উচ্চ পরিষদ খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য-সংখ্যা ১৪৮ জন এবং পপুলার ফ্রণ্টের ১১১ জন সদস্য হইয়াছে। এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, নিম্ন পরিষদে খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক দল নিঃসন্দেহরূপে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু উচ্চ পরিষদ সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, যদিও পপুলার ফ্রণ্টের সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক দলের সংখ্যা অনেক বেশী। তবে অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলগুলি যে খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক দলের সহিতই সহযোগিতা করিবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৬ সালের জুন মাসের নির্ব্বাচনে নিম্ন পরিষদে কম্যুনিষ্ট পার্টি ১০৪টি এবং সোশ্যালিষ্ট পার্টি ১১৫টি এবং উভয় দল মিলিয়া ২১৯টি আসন দখল করিয়াছিল এবং খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি দখল করিয়াছিল ২০৭টি আসন। ঐ সময় সোশ্যালিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয় নাই, এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আলোচ্য নির্ব্বাচনে পপুলার ফ্রণ্ট ১৭৮টি আসন অধিকার করিয়াছে। তন্মধ্যে কম্যুনিষ্টরা পাইয়াছে ১৩১টি আসন এবং নেনীর দল পাইয়াছে ৩৯টি। কিন্তু সোশ্যালিষ্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ায় দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট পার্টি বা সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টি ২১টি আসনের বেশী দখল করিতে পারে নাই। এই কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সোশ্যালিষ্টরা 'তৃতীয় শক্তি' (Third force) বলিয়া দাবী করিলেও দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীর মধ্যে 'স্যাণ্ডউইচ' হইয়া ইহারা দক্ষিণপন্থীদের শক্তিই বৃদ্ধি করিবে।

রাশিয়ার হস্তক্ষেপের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু ইটালীর আলোচ্য নির্ব্বাচনে আমেরিকা যে প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা কাহারও পক্ষেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গত পাঁচ বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইটালীকে ২০০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য করিয়াছে। ইটালীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহে যে সকল কাঁচা মাল প্রয়োজন তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করিয়াছে। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে রাশিয়ার মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়াই ইটালীকে ত্রিয়েস্তে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র খোলাখুলি ভাবেই ইটালীর ভোটদাতাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছে যে, কম্যুনিষ্টদিগকে ভোট দিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য হইতে ইটালী বঞ্চিত হইবে। খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি নির্ব্বাচনের প্রচারকার্য্যে যে সকল প্রাচীরপত্র ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে ইটালীর ভোটদাতাদিগকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যদি কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা পায়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইটালীকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবে। স্বয়ং পোপ সাধারণ মানুষের ধর্ম্মান্ধতার সুযোগে খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষে প্রচার করিয়াছেন। এত করিয়াও খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাক দলের যে জয় হইয়াছে তাহা নেতিবোধক (negative) জয় ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। অর্থাৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া কম্যুনিষ্টদিগকে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারিয়াছেন মাত্র। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তি একটুকুও হ্রাস হয় নাই। রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা প্রচার করিতে চান, তাঁহারা ইটালীর শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা, বেকার সমস্যা, কৃষকদের এবং শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা সমস্তই লৌহ-যবনিকা দ্বারা বিশ্ববাসীর দৃষ্টির বহির্ভূত রাখিতে চান। খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি নির্ব্বাচনে জয়লাভ করায় এবং ইটালী পশ্চিমী গণতন্ত্রের দলভুক্ত হওয়ায় এই সকল সমস্যায় আদৌ কোন সমাধান হয় নাই। সমাধান হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় কি?

খৃষ্টিয়ান ডেমোক্রাটিক দলের জয় আসলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জয় ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। এই জয় সত্ত্বেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্টরা নিয়মতন্ত্র-বিরোধী কার্য্যকলাপ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি করিবে। কিন্তু শুধু কম্যুনিষ্টদিগকে দোষ দিয়া ইটালীর জনগণকে ক্ষুধার জ্বালা ভুলাইয়া রাখা সম্ভব কি? ইটালীতে বর্ত্তমান বেকার লোকের সংখ্যা ২০ লক্ষ। ইটালীর শিল্পপতিরা যাহাতে তাঁহাদের পুরাতন বিদেশী বাজারগুলি দখল করিতে পারেন তাহার জন্য উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। এই ব্যয় হ্রাস করা হইবে তথাকথিত বাড়তি শ্রমিকদিগকে বরখাস্ত করিয়া। সুতরাং বেকারের সংখ্যা আরও বাড়িবার আশঙ্কাই দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ ইটালীতে বহু সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক রহিয়াছে। তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করা দরকার। ডি গ্যাসপারি তাহা করিতে সমর্থ হইবেন কি? ইটালীতে মুদ্রাস্ফীতি এত বেশী হইয়াছে যে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামান্য আয়ে তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি তাহাদের সমস্ত আয় গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ইটালীর বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায়, রপ্তানীর মূল্য অপেক্ষা আমদানীর মূল্য ৮০ কোটি ডলার বেশী। মার্শাল-পরিকল্পনায় ইটালী প্রথম বৎসরে ৭০ কোটি ডলার বেশী পাইবে। তাহাতেও ঘাটতি পড়িবে ১০ কোটি ডলার। এই ১০ কোটি ডলার পূরণ করা হইবে কোন্ উপায়ে? কম্যুনিষ্টদের জয়লাভ প্রতিরোধ করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মান্ধতা এবং রুশ-বিরোধী মনোভাব প্রচার করিয়া ইটালীর অধিবাসীদের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইবে না। কি ইটালীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, কি ইউরোপীয় ব্যাপারে ধনি-দরিদ্রের যে লড়াই সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধান হওয়া অসম্ভব।

মিঃ বেভিনের হুমকী—

গত ৪ঠা ও ৫ই মে (১৯৪৮) বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্স সভায় বৃটেনের পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে যে বিতর্ক হইয়া গেল তাহা

না কি তেমন জমিয়া উঠে নাই। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিলের অনুপস্থিতিকেই উহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-নীতি এবং টোরী গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-নীতির মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নাই। কাজেই বিতর্ক নীরস হইয়া থাকিলে, উহাকে আমরা বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে করি না। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন তাঁহার বক্তৃতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এই পর্য্যালোচনায় তিনি যদি নূতন কোন ভাবধারার পরিচয় দিতে অসমর্থ থাকেন, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু তিনি একেবারেই নূতন কিছু বলেন নাই, এ কথাও স্বীকার করা অসম্ভব। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, এবার অতি সংক্ষেপেই তিনি তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। বার্লিন সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা মার্কিণ জেনারেল এবং জার্ম্মাণীর মার্কিণ-অধিকৃত অঞ্চলের প্রধান কর্ত্তা জেনারেল লুসিয়াস ক্লের উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। জেনারেল ক্লে গত ২২শে মার্চ্চ বলিয়াছিলেন, "We came into Berlin by right and we have every intention of staying." মিঃ বেভিনও বলিয়াছেন: "We are in Berlin as of right. It is our intention to stay there." অর্থাৎ অধিকারের বলে বার্লিনে আমরা আছি এবং থাকিয়া যাইবারই আমাদের ইচ্ছা।' কিন্তু রাশিয়া সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মিঃ বেভিন বলিয়াছেন: "আমার সর্ব্বদাই ইহা মনে হইয়াছে যে, যদি কম্যুনিষ্ট আদর্শবাদের সহিত মীমাংসার চেষ্টা না করিয়া রাশিয়ার সহিত করিতে হইত, তাহা হইলে মীমাংসা সম্ভব হইত। মুস্কিল এই যে, যে-মীমাংসাই আমরা করি না কেন, উহা কম্যুনিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপোষক হওয়া চাই, ইহাই ঐক্যমত হওয়ার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।" তাঁহার বক্তৃতায় মিঃ বেভিন এ কথা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন যে, ক্রেমলিন যে পর্য্যন্ত আদর্শগত মনোভাব বর্জ্জন না করিতেছে সে পর্য্যন্ত বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে স্থায়ী মীমাংসার সম্ভাবনা নাই। মিঃ বেভিনের এই উক্তি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, রাশিয়া ও ক্রেমলিনের মধ্যে তফাৎ কি? সেই সঙ্গে আরও দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। হোয়াইট হল ও বৃটেনের মধ্যে পার্থক্য কি? হোয়াইট হাউস ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই বা কি পার্থক্য?

হোয়াইট হল যেমন বৃটেনের রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক, হোয়াইট যেমন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক, ক্রেমলিন প্রাসাদও তেমনি প্রতীক রাশিয়ার রাষ্ট্রশক্তির। মিঃ বেভিন মনে করেন যে, রাশিয়ার রাষ্ট্র নায়ক কম্যুনিষ্ট আদর্শবাদ গ্রহণ করিলেও রুশ জনগণ তাহা গ্রহণ করে নাই। এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় কি? রাশিয়ার জনসাধারণ ধনতান্ত্রিক দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা খুব দুঃখে দিন কাটাইতেছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা জনগণের পক্ষে শুধু উপবাস করার স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার আকাশ-কুসুমের লোভ দেখাইয়া জনগণকে প্রতারিত করা খুব সহজ নয়। গ্রীসের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য কয়েক হাজার কম্যুনিষ্ট নর-নারীকেই দায়ী করা হইয়া থাকে। তাহাদের জন্যই না কি গ্রীসের অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীক রাষ্ট্রনায়কদের মতে বর্ত্তমানে ২৬ হাজার গরিলা সংগ্রাম চালাইতেছে। তাহাদের এক-চতুর্থ অংশই না কি খাঁটি কম্যুনিষ্ট নয়। অবশিষ্টদের মধ্যে কতক না কি ফৌজদারী দণ্ড আইন অনুসারে অপরাধী। ন্যায় বিচার এড়াইবার জন্য উহারা পলায়ন করিয়া গরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা অভিযোগই আজ আর নিন্দনীয় নহে। গত বৎসর গ্রীক গবর্ণমেণ্টের সৈন্য-বাহিনী গরিলাদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যে গ্রীক গবর্ণমেণ্টের সৈন্য-বাহিনী অধিকতর শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সৈন্য-সংখ্যাও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট গরিলাদিগকে গ্রীক সরকারী সৈন্য-বাহিনী আর কত দিনে দমন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিতেছে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও অনেকের মনে এই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, গ্রীসকে যে বিপুল অর্থ সাহায্য দেওয়া হইতেছে তাহা কোথায় যাইতেছে? কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করা সম্ভব হইতেছে না কেন? আলবানিয়া, বুলগেরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়া গ্রীক কম্যুনিষ্টদিগকে সাহায্য করিতেছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাই। এই ক্ষুদ্র তিনটি দেশ কতই সাহায্য করিতে পারে? তাহারা গ্রীক কম্যুনিষ্টদিগকে যে সাহায্য করিতেছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহা অপেক্ষা বিশ গুণ সাহায্য করিতেছে গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে। তবু কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের নৈতিক বল গ্রীক গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদের নৈতিক বল অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় কেন? তাহার এক কারণ, গ্রীসের সরকারী সৈন্যরা যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছে তাহার সার্থকতা তাহারা নিজেরাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীক গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ ও মার্কিণ পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও গ্রীক জনগণকে তাঁহাদের মহান্ উদ্দেশ্যের পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারেন নাই। বিলাতের 'ডেইলী মেইল' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং কম্যুনিজম ও কম্যুনিষ্টদিগকে শুধু দোষ দিলে চলিবে কেন?

রাশিয়া যদি কম্যুনিজমের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইত, তাহা হইলেই রাশিয়ার সহিত বৃটেনের ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনের মিল হইত এ কথাও স্বীকার করা অসম্ভব। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পৃথিবীতে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে চায়। রাশিয়া ব্যতীত তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও নাই। রাশিয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইলেও উভয়ের মধ্যে মিত্রতা সম্ভব হইত না। তবে রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ ধনতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া উহা রাশিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের অন্যতম প্রবল কারণে পরিণত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের যে বিরোধ তাহা কম্যুনিজমের সহিত ধনতন্ত্রের বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেক দেশের বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের সহিত কম্যুনিজমের সংঘাত উহারই খণ্ডিত রূপ মাত্র।

গ্রীসে পাইকারী হত্যাকাণ্ড—

গ্রীসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে খুব কম সংবাদই প্রকাশিত হয়। যাহাও প্রকাশিত হয় তাহাও এত বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত যে, প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া অনেক সময়ই কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ পাইকারী ভাবে প্রাণদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রীক গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, তাহাতে রাজনৈতিক বিরোধী দলের প্রতি

প্রতিহিংসার অপরিমেয় হিংস্রতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিরোধী দলের লোককে শত শত সংখ্যায় হত্যা করা পৃথিবীর ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম। উগ্র প্রতিহিংসাপরায়ণ নাৎসীরাও বিরোধী দলের লোকদিগকে পাইকারী ভাবে হত্যা করিয়াছে! তাহারাও এইরূপ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছে গোপনে। প্রকাশ্যে এইরূপ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে নাৎসীরা কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ পৃষ্ঠপোষিত গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহী গ্রীক গবর্ণমেণ্টের কুণ্ঠা বোধ করিবার কিছুই নাই, তাহাদের ফ্যাসিষ্ট শাসনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হইতেছে, এ কথা বলিবারও কেহ নাই। গত ১লা মে (১৯৪৮) গ্রীসের বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ক্রিষ্টস ল্যাডাস আততায়ী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হইয়াছেন বলিয়াই গ্রীক গবর্ণমেণ্ট ধৈর্য্যের সীমা হারাইয়া ফেলিয়াছেন. এইরূপ যুক্তির মত হাস্যকর যুক্তি আর কিছুই হইতে পারে না।

মঃ ল্যাডাসের আততায়ী এফ্‌ষ্ট্রাটিয়স মোয়াট্‌কয়ানিস (Efstratios Moatcoyarnnis) বাইস বৎসরের যুবক। সে এথেন্সের রাজপথে ঝাড়ুদারের কাজ করিত। পুলিশ বিভাগের চারি ঘণ্টা-ব্যাপী প্রশ্নের উত্তরে সে না কি বলিয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্দ্দেশে সে এই কাজ করিয়াছে। আততায়ীও ধৃত হইবার পূর্ব্বে উক্ত বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর পুলিশ গার্ডের গুলীতে আহত হয়। গত ৪ঠা মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, মঃ ল্যাডাসের স্থলবর্ত্তী অস্থায়ী বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মঃ রেন্‌ডিস্ প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত এক হাজার কম্যুনিষ্ট বন্দীর দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চাপ দিতেছেন। ১৯৪৪ সালের বিদ্রোহের পর ইহাদের উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৮৩০ জন কম্যুনিষ্টের ব্যাপার ফয়সালা করিবার জন্য মঃ রেন্‌ডিস্ বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। মঃ ল্যাডাসের হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে ১০০ জন কম্যুনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহারা না কি ভয়ানক বিপজ্জনক কম্যুনিষ্ট।

বিচার বিভাগের অস্থায়ী মন্ত্রী মঃ রেন্‌ডিস্ গত ১ই মে (১৯৪৮) তারিখে বলিয়াছেন যে ১৯৪৪ সালে এবং তাহার পরে বিদ্রোহের মামলায় ২৬১১ জন অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। বিচার বিভাগের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মঃ ল্যাডাসের কার্য্যকালে ১২৭ জনকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। ৪ঠা মে ১৫৪ জনকে গুলী করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। পাইকারী হত্যাকাণ্ড সুদীর্ঘ লহরীতে একসঙ্গে এত অধিক হত্যা আর করা হয় নাই। ৫ই মে ২১ জনকে এবং ৬ই মে ৪৫ জনকে হত্যা করা হইয়াছে। মঃ ল্যাডাসের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ-স্বরূপ এই হত্যাকাণ্ড করা হয় নাই, এ কথা কাহারও পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব কি? এইরূপ হত্যাকাণ্ডের ফলে আইনের মর্য্যাদার চরম লাঞ্ছনা হইয়াছে। বিশ্ববাসী কোন যুক্তিতেই এই নৃশংসতা সমর্থন করিতে পারিবে না। গ্রীসের তৎকালীন জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট ই-এ-এম ছিল জনগণের প্রতিষ্ঠান। জনগণের সমর্থনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি-ভূমি। ১৯৪৪ সালের গৃহ-যুদ্ধ সঙ্গত কি অসঙ্গত হইয়াছিল, বর্ত্তমান গ্রীক গবর্ণমেণ্টের তাহা স্থির করিবার অধিকার নাই। বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে জনমতকে দাবাইয়া রাখিয়া এই গৃহ-যুদ্ধে গ্রীসের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জয়লাভ করিয়াছে। 'ভারকিজা' চুক্তিতে বন্দীদিগকে ব্যাপক ভাবে মুক্তি দিবার সর্ত্ত ছিল। সেই সর্ত্ত প্রতিপালিত হয় নাই। কিন্তু চারি বৎসর পরে ই-এ-এমের নেতাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করার মত নৃশংসতা আর কিছু হইতে পারে কি? গ্রীক গবর্ণমেণ্টের অভিভাবক বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মঃ পেটকভের ফাঁসী হওয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উহার মধ্যে তাঁহারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিনাশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন। গ্রীসের এই পাইকারী হত্যাকাণ্ডে তাঁহারা কি করেন, বিশ্ববাসী সাগ্রহে তাহা লক্ষ্য করিবে।

হেগ সম্মেলন—

গত ৭ই মে (১৯৪৮) হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগের 'হল অব নাইটসে' ইউরোপীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন-বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল মার্শাল-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ষোলটি রাষ্ট্রের একটি ইউনিয়ন গঠনের জন্য আহ্বান জানাইয়া এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ইউনিয়ন শীঘ্রই সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়নে পরিণত হইবে এবং অতঃপর সমগ্র পৃথিবী তিনটি বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বশেষে গঠিত হইবে বিশ্বরাষ্ট্র। অবশ্য হেগ-সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য মার্শাল-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ষোলটি রাষ্ট্র লইয়া একটি ইউনিয়ন গঠন। ইতিপূর্ব্বেই বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবার্গ এই পাঁচটি দেশ লইয়া অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল চাহেন যে, অবশিষ্ট এগারটি রাষ্ট্রও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করুক। এই ষোলটি রাষ্ট্র লইয়া একটি সুদৃঢ় ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পর রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপই উহার অন্তর্ভুক্ত হউক ইহাও তাঁহার কাম্য। সমগ্র পৃথিবী কিরূপ তিনটি অংশে বিভক্ত হইবে, সে-সম্বন্ধেও মিঃ চার্চ্চিলের একটা ধারণা আছে। তিনি মনে করেন, সমগ্র পৃথিবী নিম্নলিখিত তিনটি অংশে বিভক্ত হইবে: (১) বৃটেন এবং বৃটিশ কমনওয়েলথ সহ ইউরোপীয় পরিষদ; (২) পশ্চিম গোলার্দ্ধ; (৩) সোভিয়েট ইউনিয়ন। এই তিনটি অংশকে তিনি 'শান্তির তিনটি বাহিনী' (Three 'Armies of Peace') নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বেনেলুক্স চুক্তি, পঞ্চশক্তির নিরাপত্তা চুক্তি এবং ষোড়শ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট মিঃ চার্চ্চিলের প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেন না। বৃটিশ শ্রমিকদল হেগের এই সম্মেলনে শ্রমিকদলের সদস্যদিগকে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিলের প্রচেষ্টা যদি সার্থক হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহাও অবশ্য বিবেচনার বিষয়। মার্শাল-পরিকল্পনা পশ্চিম-ইউরোপের নেতৃত্বকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করিয়া মিঃ চার্চ্চিল কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ নেতৃত্বের অধীনে বৃটেনের জন্য ক্ষুদে নেতৃত্ব গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন? পূর্ব্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হইলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি বৃটেনের তাঁবেদার রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছু হইবে কি?

পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করিবার পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য, রাশিয়া ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীকে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন এবং অধীনস্থ ও প্রভাবাধীন দেশগুলিতে আধিপত্য রক্ষা করিয়া মার্কিণ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের মধ্যে মিঃ চার্চ্চিল বৃটেনের লুপ্ত নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

রুশ-মার্কিণ দ্বৈত আলোচনা—

১২ই মে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সচিব মিঃ মার্শাল রুশ-মার্কিণ আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, মীমাংসার একটি মাত্র পথ আছে। নিরাপত্তা পরিষদ এবং বার্লিনের মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদই মীমাংসার এই পথ। রাশিয়াস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ স্মিথ এইরূপ আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এ কথাও তিনি অস্বীকার করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সত্যকে গোপন করা বা বিকৃত করা চিরন্তন প্রথা। কাজেই রাশিয়াই এইরূপ দ্বৈত আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নয়। মিঃ স্মিথ যে মঃ মলটভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্য মিঃ মার্শাল স্বীকার করিয়াছেন এবং মিঃ স্মিথ যে একবার গোপনেও মঃ মলটভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে কথাও তিনি অস্বীকার করেন নাই। এই অবস্থায় মিঃ স্মিথ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা মঃ মলটভ এবং মিঃ স্মিথ ছাড়া আর কেহ-ই জানে না। যদি স্বীকার করা যায় যে, আলোচনার প্রস্তাব রাশিয়ার দিক্ হইতেই প্রথম আসিয়াছে, তাহা হইলে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য রাশিয়ার আগ্রহই সূচিত হইতেছে। আর যদি আলোচনার কথা প্রথম আমেরিকার দিক্ হইতেই উঠিয়া থাকে এবং রাশিয়াই তদনুযায়ী উহাকে আলোচনা প্রস্তাবের বাস্তব রূপ দিয়া থাকে, তাহা হইলে আমেরিকার এই প্রত্যাখ্যানের কি অর্থ তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না।

নিরাপত্তা পরিষদে এবং কন্ট্রোল কাউন্সিলে মীমাংসার চেষ্টা এবং রুশ-মার্কিণ দ্বৈত আলোচনা একই কথা। কারণ, ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানে আমেরিকাই একা বহু হইয়া বসিয়া আছে। সুতরাং দ্বৈত আলোচনার মত ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানে মীমাংসার চেষ্টাও ব্যর্থ হইবারই সম্ভাবনা। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াই আসিয়াছে।

প্যালেষ্টাইন—

প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট অবসান হওয়ার পূর্ব্বদিন আমরা এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসানে প্যালেষ্টাইনের অবস্থা যে কিরূপ ভয়াবহ দুর্য্যোগপূর্ণ হইবে ইতিমধ্যেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আরব না ইহুদী, কাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি রহিয়াছে, আজ এই প্রশ্ন অবান্তর। আরব-ইহুদী সংঘর্ষ এড়াইবার জন্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্যালেষ্টাইন বিভাগ প্রস্তাব বর্জ্জন করিয়া ট্রাষ্টিশিপের প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘও এই প্রস্তাবে 'ভিটো' দিয়াছে। কিন্তু সমগ্র প্যালেষ্টাইনে শান্তিরক্ষার প্রস্তাব প্রথমে জেরুজালেম রক্ষার প্রস্তাবে পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু তাহাও সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না। জেরুজালেমের প্রাচীন সহর অর্থাৎ পবিত্র স্থানগুলি রক্ষা করা সম্বন্ধে আরব ও ইহুদীরা একমত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন সহর বাদে অবশিষ্ট জেরুজালেম সহ সমগ্র প্যালেষ্টাইনই যে আরব-ইহুদী সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পরিণত হইবে, এই সম্ভাবনা ম্যাণ্ডেট অবসানের পূর্ব্ব হইতেই ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৭ই এপ্রিল ট্রান্সজর্ডানের রাজা আবদুল্লা ঘোষণা করেন যে, আরব-জগতের দুষমণ ইহুদীদের হাত হইতে পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্যালেষ্টাইনের আরবদের সাহায্যার্থে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিবেন। ইহার পর ট্রান্সজর্ডানের রাজধানী আম্মানে গত ২৬শে এপ্রিল সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান এবং ইরাকের রাষ্ট্র-প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে প্যালেষ্টাইন আক্রমণের জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ঐদিনই ট্রান্সজর্ডান ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্যালেষ্টাইনকে ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার এক পরিকল্পনার কথাও আমরা শুনিয়াছি। গত ১১ই মে মিশরের রাজা ফারুক ঘোষণা করিয়াছেন যে, মধ্য-প্রাচ্যে মিশর সীমান্তের নিকটে তিনি ইহুদী-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সহ্য করিবেন না। মিশর সামরিক, আর্থিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দ্বারা প্যালেষ্টাইনের আরবদিগকে সহায়তা করিবে। কিন্তু ইহুদীরাও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই।

বৃটিশ ম্যাণ্ডেট অবসান হইলেই ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-রাষ্ট্র ঘোষণা করিবে। হাইফা ও তেল আবিব ইহুদীদের তাঁবে। জাফা লইয়া সংগ্রাম চলিতেছিল। জাফা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্যালেষ্টাইনের অপর একটি বন্দর। এই বন্দরটি আরবপ্রধান। গত ১২ই মে এই বন্দরটি ইহুদীদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তেল আবিব হইতে জেরুজালেম পর্য্যন্ত সড়কটিও ইহুদীরা প্রায় দখল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এই সংঘর্ষের পরিণাম অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। ইহুদীদের ভাগ্যে আবার কি ঘটিবে তাহা কে জানে? প্রাচীন বাইবেলের ইস্রাইলের রাজা ডেভিড বা দাউদ জেরুজালেমে রাজধানী স্থাপন করেন। সুলেমান (খৃঃ পূঃ ৯৭০-৯২০ অব্দ) জেরুজালেমে সর্ব্বপ্রথম মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রাচীর বলিয়া যাহাকে অভিহিত করা হইয়া থাকে তাহারই নাম 'ওয়েইলিং ওয়াল'। ক্রন্দন-প্রাচীর। ধর্ম্মপ্রাণ ইহুদীরা এই প্রাচীরের নিকট যাইয়া তাঁহাদের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকেন। ইহারই পাশেই 'ডোম অব রক' (The Dome of Rock)। সুলেমানের মন্দির না কি এইখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইখানেই না কি এব্রাহাম তাঁহার পুত্র আইজাককে ঈশ্বরের উদ্দেশে জবেহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই না কি স্বর্গদূত জেব্রাইল হজরত মহম্মদকে সপ্ত স্বর্গ প্রদর্শনের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। এই স্থানের মসজিদটি ইসলামের পবিত্রতম মসজিদ সমূহের তৃতীয়। খৃষ্টানদের পবিত্র স্থান 'হোলি সেপালকার গীর্জ্জা।' এইখানেই না কি যিশুখৃষ্টকে সমাহিত করা হইয়াছিল। যে স্থান দিয়া যিশু তাঁহার ক্রশ বহন করিয়া ক্যালভেরিতে লইয়া গিয়াছিলেন তাহার নাম 'ভায়া ডলরোসা'। ইহাও খৃষ্টানদের একটি পবিত্র স্থান। উল্লিখিত পবিত্র স্থানগুলি কাছাকাছি অবস্থিত এবং উহাদের চারি দিক্ একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রবেশ-দ্বার পাঁচটি। ইহাই প্রাচীন জেরুজালেম। একাধিক বার জেরুজালেম ধ্বংস হইয়াছে। শেষ বার ধ্বংস হয় রোম-সম্রাট্ টিটাস্ কর্ত্তৃক। তার পর অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নগরীর কোন অস্তিত্বই না কি ছিল না। প্রথম খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট্ কনষ্ট্যানটাইন এখানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ক্রুসেডারগণ পবিত্র স্থানগুলির চারি দিক্ প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়াছিলেন।

সুলেমানের মৃত্যুর পর বর্তমানে যে অঞ্চল প্যালেষ্টাইন নামে খ্যাত, তাহারই উত্তর অংশে ইজরাইলদের বারটি বংশ মিলিয়া এজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং দক্ষিণ অংশে জুডা ও বেঞ্জামিন বংশীয়দের রাষ্ট্র ছিল। খৃঃপূঃ ৭২১ অব্দে এসেরিয়গণ উত্তর অঞ্চলের রাজ্য আক্রমণ করিয়া সমস্ত অধিবাসীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল তাহা চির রহস্যময় হইয়াই রহিয়াছে। ইহার দুই শত বৎসর পরে বেবিলনের রাজা নেবুচানাদার দক্ষিণ অঞ্চল জয় করিয়া উহার অধিবাসীদিগকেও বন্দী করিয়া লইয়া যান। পারশ্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাইরাস ফুরাৎ বা ইউফ্রেটিস নদী হইতে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জয় করেন। তিনিই ইজরাইলদের বংশধরদিগকে পুনরায় প্যালেষ্টাইনে প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃঃপূঃ ৩৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইন ছিল পারশ্যের অধীন। তার পর পর্য্যায়ক্রমে প্যালেষ্টাইন মিশর, তুরস্ক ও রোমানদের অধীনে আসে। রোম সাম্রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইলে প্যালেষ্টাইন প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যের বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরবরা প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর ক্রুসেড পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইন পর্য্যায়ক্রমে বোগদাদ, দামাস্কাস ও মিশরের খলিফাদের দ্বারা শাসিত হয়। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক প্যালেষ্টাইন জয় করে এবং চারি শত বৎসর তুরস্কের অধীনে থাকার পর ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ জেরুজালেমে প্রবেশ করে। ত্রিশ বৎসর পর বৃটিশ প্যালেষ্টাইন ছাড়িয়া যাইতেছে। অতঃপর উহার ভাগ্যে কি আছে কে বলিবে?

ব্রহ্মে গৃহযুদ্ধ ?—

ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই উহার আরম্ভ। কিন্তু উহা যে কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সংবাদ প্রথম পাওয়া যায় মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে যখন ব্রহ্ম কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দমন করিবার জন্ম ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট কঠোর হস্তে দমন-নীতি গ্রহণ করেন। গত এক মাসে কম্যুনিষ্টদের এই অভ্যুত্থান অধিকতর ব্যাপক ও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। রেঙ্গুনের ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত পেগু জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিকে ৫ শত মাইল দূরবর্ত্তী মান্দালয় সহরের বিপরীত দিকে ইরাবতী নদীর পশ্চিম তীরে সাগাইং জেলা পর্য্যন্ত এবং টেনাসেরিম্ এবং আরাকানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চল ব্যাপিয়া এই অভ্যুত্থান বিস্তৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট এই অভ্যুত্থানকে যে দমন করিতে পারিতেছেন না, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইহার জন্ম ব্রহ্ম সৈন্যবাহিনীর বৃটিশ অফিসাররাই দায়ী, না সৈন্যরাই এই দমন-নীতির প্রতি সহানুভূতিশূন্য, তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন। ব্রহ্মদেশের আধা-সরকারী পত্রিকা 'নিউ টাইমস্' এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে মন্তব্য করিয়াছিল যে, কম্যুনিষ্ট-প্রভাবের বাহিরে যে সকল দেশ আছে, সেই সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট-জগতে যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চলিতেছে ব্রহ্মের ঘটনাবলী তাহারই অংশ মাত্র। এই পত্রিকায় ভারতে ও ব্রহ্মদেশে একই সময়ে কম্যুনিষ্টদের বিক্ষোভ সৃষ্টির প্রয়াসের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশের কম্যুনিষ্টদের এই অভ্যুত্থান যে চীন ও গ্রীসের মতই গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা এখন পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এ-এফ-পি-এফ-এল ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে একটা আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। এই আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর হইতেই এই অভ্যুত্থান দ্রুত বিপুল ও ব্যাপক হইয়া উঠে। ব্রহ্মদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি আছে দুইটি: (১) লাল ঝাণ্ডা পার্টি ও (২) সাদা ঝাণ্ডা পার্টি। লাল ঝাণ্ডা পার্টিকে দুই বার বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। শেষ বারের মত উহাকে বে-আইনী করা হয় ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে। সাদা ঝাণ্ডা পার্টি বেআইনী নয়। ব্রহ্ম আইন সভায় এই দলের সাত জন সদস্য আছেন। সম্প্রতি এই পার্টির কার্য্যালয়ে হানা দেওয়া হয় এবং পার্টির পলাতক নেতা থাকিন থান টুনকে গ্রেফ্তারের জন্ম পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে। ব্রহ্ম সরকার মনে করেন, নীতি লইয়া এই দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে যে বিবাদ ছিল তাহা মিটাইয়া ফেলিয়া দুই দল একজোট হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে কম্যুনিষ্ট ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা কত তাহা সঠিক জানা যায় না। অনেকে মনে করেন, ইহাদের সংখ্যা ২০ লক্ষের বেশী ছাড়া কম হইবে না। কম্যুনিষ্টরা পুনর্গঠন কার্য্য ব্যাহত করিতেছে, এই অভিযোগ করার কোন অর্থ হয় না। জনগণের অবস্থা ভাল করিবার জন্ম ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের কোন পরিকল্পনা নাই। এই অভ্যুত্থান যদি গৃহযুদ্ধই হয়, তাহা হইলে কোন সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাকেও যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যায় না।

উ স'র ফাঁসী—

ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী উ স'র বৈচিত্র্যময় জীবনের অত্যন্ত শোচনীয় অবসান হইয়াছে, ৮ই মে (১৯৪৮) শনিবার প্রত্যূষে আউঙ সানের হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে ইন্সিন্ জেলে তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার জন্ম তিনি যে দরখাস্ত করেন তাহা পর্য্যন্ত মঞ্জুর করা হয় নাই। তাঁহার ফাঁসীর তারিখ ধার্য্য ছিল ৯ই এপ্রিল। আপীলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করায় তাঁহার জীবনকাল আরও এক মাস বৃদ্ধি পায়। উ স'র সহিত আরও আট জনের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই আট জনের মধ্যে পাঁচ জনের গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৭) ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ৮ই মে তারিখে অপর তিন জনের ফাঁসী হইয়াছে।

উ স যে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতাকামী দেশপ্রাণ জাতীয় নেতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নূতন ব্রহ্ম সরকার তাঁহার দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করিয়া ন্যায়দণ্ডের কঠোরতাকে করুণা-নম্র করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাণদণ্ডের পর ব্রাউনিংএর উক্তিই আমাদের মনে পড়িতেছে: "Thus I entered, and thus I go."

প্রচ্ছদপট

প্রচ্ছদপটে এবার নতুন দিল্লীর একটি ফোয়ারার আলোকচিত্র মুদ্রিত হল। স্বাধীনতার আনন্দোৎসবে আলোকিত করা হয় ফোয়ারাটি। আলোক-চিত্র-শিল্পী শৈলেন্দ্রকুমার নাথ। নতুন দিল্লীর অধিবাসী।

নববর্ষ

পুরাতন বর্ষ বিদায় লইল। ১৩৫৪ সাল অতিক্রম করিয়া ১৩৫৫ সালের দ্বারদেশে আজ আমরা উপনীত। অতীত ও ভবিষ্যৎ, কি দিয়াছে ও কি দিবে তাহা বিচার করিতে মন স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বিগত বৎসরে জাতির জীবনে লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করিলে জমার অঙ্কে এক বিরাট শূন্য ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ১৩৫৪ সাল কাটিয়াছে তিমিরে, দুর্য্যোগপূর্ণ রাত্রির মধ্য দিয়া। নববর্ষ ও সূর্য্যরশ্মি দেখা যাইতেছে না। যে দিকে ফিরাই আঁখি, সবই অন্ধকার দেখি। কোন আশার আলোক নজরে পড়ে না।

ভারতের ইতিহাসের বহু অবিস্মরণীয় ঘটনা বিগত বর্ষকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করিয়া ভারতবর্ষ কৃত্রিম ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। দেশের যাঁহারা নেতৃস্থানীয়, তাঁহারা সেই খণ্ডিত ভারতকে স্বীকার করিয়া বিভক্ত ভারত ডোমিনিয়নের রাজনৈতিক কর্ণধার হইয়াছেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত গত বর্ষে যে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও হানাহানিতে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার জের আজও আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই। পরন্তু, সেই হিংসার বহ্নিশিখায় অহিংসার পূজারী, বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীকে আমরা হারাইয়াছি।

জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন, যেন একটা আসন্ন ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ চতুর্দ্দিকে। বহু অমীমাংসিত সমস্যাকে নূতন বর্ষে সমাধান করিতে হইবে। সমস্যাগুলি সবই জটিল। বৃটিশ, মুসলিম লীগ এবং আমাদের আপোষকামী নেতাদের কল্যাণে পাকিস্তান সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। ইহারই এক অঙ্গ হিসাবে ভূস্বর্গ কাশ্মীর আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অবসানের পূর্ব্বেই হায়দ্রাবাদ হইতে আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত। সেই সঙ্গে বিগত বৎসর ভারতবর্ষের অঙ্গহানি-জনিত লক্ষ লক্ষ আশ্রয়-প্রার্থীর উপস্থিতি।

দীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী বৃটিশ শাসনের কবলে থাকিয়া ভারতের সর্ব্বত্র যে অভাব-অনটন-দারিদ্র্য-শোষণ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দূর করিয়া এক নূতন জীবন ও সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্যই দেশবাসী স্বাধীনতা চাহিয়াছিল। আমরা আংশিক স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু অভাব-অনটন দূর হইবার বিন্দু মাত্র লক্ষণও কোন দিকে চোখে পড়িতেছে না। পুরাতন আমলের শাসন ও শোষণ যেন নূতন রূপে আমাদের অধিকতর বিভ্রান্ত করিতেছে। শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে নয়, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই আর একটি নূতন যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। নববর্ষ আশা আনে নাই, আতঙ্ক আনিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মাসিক বসুমতী এই বৈশাখে ২৬ বর্ষ সম্পূর্ণ করিয়া ২৭ বর্ষে পদার্পণ করিল। যাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্যে মাসিক বসুমতী জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে, নববর্ষে আমরা তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি। আর মাসিক বসুমতীর জন্মদাতা ও প্রথম সম্পাদক, বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যাঁহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মাসিক বসুমতী নির্ভীক ভাবে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, সেই পুণ্যশ্লোক পথ-প্রদর্শককে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আন্তঃ ডোমিনিয়ন সম্মেলন

সরকারী বিবৃতি হইতে এই সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে কিছু বোঝা শক্ত। যে সকল বিষয়ে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিমণ্ডলী একমত হইয়াছেন সেগুলি এতই অস্পষ্ট যে, সমগ্র চুক্তিপত্র আমাদের কাছে শুধু একান্ত ভাবে নৈরাশ্যজনক বলিয়াই মনে হইতেছে না, উহার মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর দূরদৃষ্টি ও কূটনৈতিক বুদ্ধিরও অভাব সূচিত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তু-ত্যাগ নিরোধ এবং বাস্তু-ত্যাগী হিন্দুদের স্বগৃহে ফিরাইয়া লওয়ার সমস্যাই ছিল এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। পাকিস্তানের প্রতিনিধিমণ্ডলী এমন কৌশলে আলোচনায় মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন যে, মূল প্রশ্নটাই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। চুক্তিপত্রের ১ ধারায় ৬ উপধারায়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই প্রাদেশিক সংখ্যালঘু বোর্ড এবং উহার অধীনে জেলা সংখ্যালঘু বোর্ড গঠন করার কথা আছে। পূর্ব্ববঙ্গে এই বোর্ডের কার্য্যকরী শক্তি সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে তো ঐরূপ বোর্ড গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তাই দেখা যায় না। তথাপি এইরূপ একটি অপ্রয়োজনীয় এবং ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিকারী সর্ত্ত ভারতীয় প্রতিনিধিগণ স্বীকার করিয়া মানসিক দুর্ব্বলতা ও তোষামোদের পরিচয়ই দিয়াছেন। পাকিস্তান এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াছেন মাত্র।

ডোমিনিয়ন-অধিবাসী সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্পত্তি, নাগরিক অধিকার রক্ষা করা এবং তাহারা যাহাতে ন্যায়বিচার পায়, তাহার ব্যবস্থা করা ঐ ডোমিনিয়নের গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব; সম্মেলনে উভয় পক্ষই এ-বিষয়ে একমত হইয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তান ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্ট যে এই সর্ত্ত প্রতিপালন করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তাই নাই। অতীতের ঘটনাবলী দেখিয়া আশা পোষণ করিতে সাহসও হয় না।

চুক্তিপত্রের ১ম ধারায় ২য় উপধারায় বলা হইয়াছে, পাকিস্তানে এবং ভারতে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা এবং সমান দায়িত্ব থাকিবে। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত অধিকার সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা হইবে। ভারতে অনুরূপ শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে, কিন্তু পাকিস্তানে কবে হইবে, আদৌ হইবে

কি না তাহা আমরা জানি না। বরং কায়েদে আজম জিন্না বহু বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তান শরিয়ৎ অনুযায়ী শাসিত হইবে। সে-ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের কোনরূপ নাগরিক অধিকারই ভোগ করা সম্ভব হইবে না। তাহাদিগকে গোলামের জাতি হইয়া পাকিস্তানে বাস করিতে হইবে। সুতরাং পাকিস্তানে এই চুক্তির কোন মূল্য থাকিবে কি? পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের স্বভাব এই যে, পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর যতই অত্যাচার হোক না কেন, অম্লান-বদনে সে কথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে ভারতের উপর মিথ্যা করিয়া পাল্টা চাপান দিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হ'ন না। ১ম ধারার ৬ষ্ঠ উপধারায় সেই মনোভাবেরই পরিচয় রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের আশঙ্কা হয়, চুক্তিপত্র স্রেফ এক খণ্ড কাগজেই পর্য্যবসিত হইবে।

চুক্তিপত্রে উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সংবাদপত্রের সহযোগিতাও দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে যে কয়েকটি সর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রকারান্তরে সংবাদপত্রের উপরেও অভিযোগ আনা হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। সর্ত্তের সহযোগিতার অর্থ কণ্ঠরোধ; পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কোন সংবাদ যাহাতে ভারতের পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত না হয়, তাহার জন্যই এই সর্ত্ত রচিত হইয়াছে। সব মিলাইয়া দেখা যাইতেছে, ভারত-হায়দ্রাবাদ চুক্তির মতই ইহা শেষ পর্য্যন্ত একটি আত্মঘাতী চুক্তিতে পরিণত হইবে। সর্দ্দার প্যাটেলের মত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এক এক সময় আমাদের সন্দেহ হয়, জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই বোধ হয় এই আশার বাণী। বাগ্মিতা দ্বারা দুর্ব্বলতা ঢাকিবার অভ্যাস আমাদের নেতৃবৃন্দের চিরকালের অভ্যাস।

ভারতীয় হিন্দুরা ভারত বিভাগ চায় নাই। কিন্তু চুক্তিপত্র অনুসারে অখণ্ড ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখাও অপরাধ। আন্দোলন মহাপাপ। এইরূপ অদ্ভুত সর্ত্তে ভারতীয় প্রতিনিধিরাই বা রাজী হইলেন কিরূপে? উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি সংক্রান্ত সর্ত্তের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উভয় পাঞ্জাবে এই চুক্তির ব্যর্থতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বস্তুতঃ, এই চুক্তি দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের ধন-প্রাণ, মান-মর্য্যাদা, জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়,—কোনটাই রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিশেষ কোন অসদ্ভাব নাই। শাসনকর্ত্তারা যদি সুবিচার করেন ও তাঁহাদের শাসন অব্যাহত রাখিবার জন্য বাহির হইতে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত লোককে পূর্ব্ববঙ্গে আমদানী করিয়াছেন, তাহাদের বিদায় দেন, তাহা হইলেই হিন্দুরা আশ্বস্ত হইতে পারে।" কিন্তু তাহা করিলে শরিয়ৎ শাসন চলিবে কি প্রকারে? তাহাদের দাপটে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান সবাই অতিষ্ঠ। হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের জন্য ইহারাই প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু সম্মেলনে এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয় নাই। ইহাদিগকে বিদায় করিবার কোন চেষ্টাই আজ পর্য্যন্ত খাজা সাহেব করেন নাই। করিবেন সে আশা করাও বৃথা।

খসড়া শাসন-তন্ত্র

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুনের পর আধা-স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া পুরা স্বাধীন হইবে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের পক্ষপুট হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে এই আশাই অধিকাংশ ভারতবাসী পোষণ করেন। পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় "সার্ব্বভৌম স্বাধীন সাধারণতন্ত্র" কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর "সাধারণতন্ত্র" পরিবর্ত্তন করিয়া "রাষ্ট্র" কথাটি বসাইতে চাহেন। এই পরিবর্ত্তনের কারণ হিসাবে ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছেন, "আমার সংশোধন প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, শাসনতন্ত্রে যেন এরূপ কিছু না থাকে, যাহার দ্বারা ভারতবর্ষ ও বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে স্বতঃ ও আত্মবিচ্ছেদ সঙ্কটিত হয়। "সাধারণতন্ত্র" ব্যবহারে বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হইতে পারে, ইহা এড়াইবার জন্য আমি "রাষ্ট্র" কথাটি ব্যবহার করিতেছি।" শুধু আম্বেদকর নহেন, গণ-পরিষদে, বিশেষতঃ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটিতে অনেকেই আছেন, যাঁহারা ভারতের সহিত বৃটেনের বন্ধন পাকা করিয়া রাখিতে চাহেন। সুতরাং স্বাধীনতার জন্য এত সংগ্রাম, এত ত্যাগ, এত আত্মবলির পর শেষ অবধি আমাদের স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে ডোমিনিয়ন নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

খাদ্য-সচিব সম্মেলন

নয়া দিল্লীতে প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী এবং খাদ্য-সচিব সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, "দেশ একটা চরম খাদ্য-সঙ্কট এড়াইতে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা এখনও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের প্রচেষ্টাকে শ্লথ করা চলে না।" বিভিন্ন প্রদেশের সচিবগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রদেশে খাদ্য-সঙ্কট এখনও দূর হয় নাই। কিন্তু কেহই খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ ভাবে কিছু বলেন নাই। এই অস্পষ্টতার মধ্যে একমাত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য-সচিব মূল্যবান তথ্যাদি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত তথ্য-তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে ১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। এই সালের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৪ কোটি ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টন। কিন্তু ভারতে প্রতি বৎসর বাহির হইতে আমদানী করিতে হয় ২০ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ টন। কাজেই ১ লক্ষ টনে সে অভাব দূর হইবে না। অখণ্ড ভারত গম সম্পর্কে স্বাবলম্বী ছিল, চাউলও আমদানী করিতে হইত মাত্র ১৫ লক্ষ টন। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে দুই প্রধান খাদ্যশস্য-উৎপাদক অঞ্চল পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাব ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় খাদ্যশস্যের ঘাটতি আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ভারত সরকার খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবার দায়িত্ব হইতে এখনও মুক্ত হইতে পারেন নাই। এই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য ভারতের বাহির হইতে আমদানিকৃত এবং উদ্বৃত্ত প্রদেশ-সমূহ হইতে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহ দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার একটি খাদ্যশস্য-তহবিল গঠন করিয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে জোড়া তালি দিয়া কত দিন চলিবে? স্বাবলম্বী না হইলে

দেশের অভাব কোন দিনই মিটিবে না। আর্থিক অবনতিও ঘটিতে থাকিবে। কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে ইহা লজ্জার বিষয়।

পশ্চিম-বঙ্গ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটিই প্রধান ঘাটতি প্রদেশ। তন্মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের দুর্ভাগ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রেশন ব্যবস্থার ১০ আউন্সের বেশী খাদ্যশস্য দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। আধপেটা খাওয়ার পক্ষেও পর্য্যাপ্ত নয়। বঙ্গ-বিভাগের ফলে বাঙ্গালার উর্ব্বর অঞ্চল সকল পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে। ইহার উপর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। ফলে ঘাটতি আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরও অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্যের দাবী করিয়াছেন। সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা ন্যায্য দাবী। আশা করা যায়, পশ্চিম-বাঙ্গালার এই শোচনীয় খাদ্য-পরিস্থিতি উন্নত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তহবিল হইতে অধিকতর খাদ্যশস্য প্রদান করিবেন।

বস্ত্র-সঙ্কট

নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাইবার পর কাপড়ের দাম ছাপা দামের উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে—মাদ্রাজে শতকরা ৭৫ ভাগ, বোম্বাইয়ে ৭০ ভাগ, পশ্চিম-বঙ্গে ১০০ ভাগ, যুক্তপ্রদেশে ১৮৫ ভাগ, আসাম ও উড়িষ্যায় ২০০ ভাগ, পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে ১০০ ভাগ, বেরার ও মধ্যপ্রদেশে ৮৫ ভাগ। দাম এখন সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার ঊর্দ্ধে। কিন্তু তাহার প্রতিকারের জন্য সরকারের কোন চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় না। বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধি নিরোধের জন্য ভারতীয় টেক্সটাইল কমিশনার সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণকে দোষী করেন এবং বলেন যে, জনসাধারণ যেন কাপড় কিনিবার জন্য কাড়াকাড়ি না করেন। অর্দ্ধোলঙ্গ দেশবাসীর প্রতি উপযুক্ত উপদেশই বটে। তাহার পর সরকারী বিজ্ঞাপন—যাহারা কাপড়ের মূল্য বেশী লইতেছে, জনসাধারণ যেন তাহাদের বিবরণ পুলিশে জানাইয়া দেয়। সরকারী টাকা খরচ করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল। কিন্তু দুষ্ট ব্যবসায়ীরা মোটেই গ্রাহ্য করিল না। অতঃপর পশ্চিম-বঙ্গের সরকার সচিব ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার জানাইয়া দিলেন যে, কাপড়ের অতি-লাভ দমনের কোন অস্ত্র তাঁহাদের হাতে নাই। চোরা-বাজার দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশে বস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করিলেন। সেই অঞ্চল সমূহের কতকগুলি জেলায়ও কাপড়ের পারমিট দেওয়া স্থগিত করিলেন। মুর্শিদাবাদের কয়েকটি থানায় সান্ধ্য আইন জারী হইল। কিন্তু ইহাতে চোরা-বাজার তো বন্ধ হইলই না, পরন্তু খোলা-বাজারের কাপড় গায়েব হইয়া গেল এবং দাম অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিল। সম্প্রতি আবার সমবেদনার আবরণে নূতন সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সূতা সহ কাপড়ের উপর হইতে সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা রহিত করিয়াছেন। জনসাধারণকে বুঝাইয়াছেন যে, কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধিতে সরকার বাহাদুর অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহারা উহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ ব্যস্ত; এখন
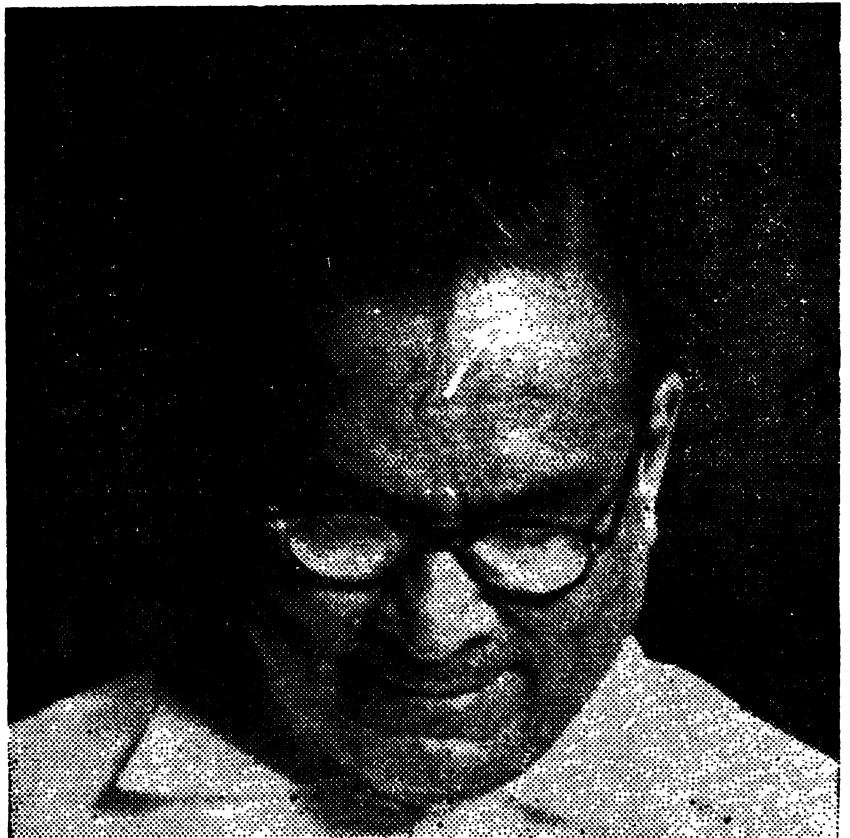
বাঙলার ভাগ্যবিধাতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। সম্প্রতি বিরুদ্ধ চক্রান্তের দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিজয়ী হইয়া কংগ্রেস এসেমব্লি পার্টির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কি অতি-লাভ চালাইয়া যাহারা অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে, তাহাদের টাকাগুলি যাহাতে সরকারের কাজে আসে তাহার জন্ম না কি সরকারের চিন্তার অবধি নাই! কিন্তু সরকার কি জনসাধারণকে এতই বুদ্ধিহীন মনে করেন যে, তাঁহাদের এই কুম্ভীরাশ্রুতে তাহারা বিগলিত হইবে? সকল ঘটনা দেখিয়া-শুনিয়া তাহারা যদি মনে করে যে, কাপড়ের অতি-লাভ বন্ধ করিবার জন্ম সরকারের মোটেই কোন মাথা-ব্যথা নাই এবং সরকারের সকল কার্য্য ও কথা অন্তঃসারশূন্য, তাহা হইলে কাহাকেও কোন দোষ দেওয়া চলে কি? ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আজ কি ইহাই মনে হইতেছে না যে, তাঁহারা জনসাধারণকে শোষণ করিবার জন্ম শিল্পপতি ও তাঁহাদের এজেন্টদের অবাধ ক্ষমতা দিয়াছেন এবং যে জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহারা নিজেদের দাবী করেন, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা শিল্পপতি ও তাঁহাদের এজেন্টদের স্বার্থের নিকট বলি দিয়াছেন?

কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ

কাশ্মীর সম্পর্কে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে। হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "হায়দ্রাবাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ খোলা রহিয়াছে—হয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান, না হয় যুদ্ধ।" প্রত্যেক ভারতবাসীর মতেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার উক্তিতে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ভারত গবর্ণমেণ্ট কি করিবে তাহাই এক গুরুতর আশঙ্কার বিষয়। বৃটেন ও মার্কিণের চাপেই যে ভারত গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীর সমস্যা লইয়া নিরাপত্তা পরিষদে গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে এবং জাতিপুঞ্জ কমিশনের সহিত সহযোগিতা না করিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট সাহসী হইবেন কি?

কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণে আপত্তি নাই। কিন্তু গণভোট গ্রহণের অছিলায় বৃটিশ এবং মার্কিণ চাপে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত করিবেন না, সে সম্বন্ধে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের ভরসা করিবার কিছুই নাই। আমাদের আশঙ্কা হয় যে, 'নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব মানিব না' জোর গলায় এই কথার প্রচার দ্বারা দেশবাসীকে ভুলাইয়া রাখিয়া তলে তলে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অক্ষরে অক্ষরেই তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ভারত বিভাগ সহ্য করিব না বলিয়া ভারত বিভাগ করার কথা আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। ইহার পরিণামে সমগ্র কাশ্মীরই হয়ত পাকিস্তানে চলিয়া যাইবে। নেহাৎ ভাগ্য ভাল হইলে জম্মু প্রদেশ ভারতের ভাগ্যে পড়িতেও পারে। নিরাপত্তা পরিষদে না যাইয়া সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করিলে কাশ্মীর এত দিন হানাদারশূন্য হইত এবং কাশ্মীর সমস্যা বলিয়া কোন সমস্যাই থাকিত না।

হায়দ্রাবাদের সমস্যা কাশ্মীর অপেক্ষাও গুরুতর।

হায়দ্রাবাদে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। হায়দ্রাবাদের অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু, তাহারা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষপাতী। তবু হায়দ্রাবাদ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক। তথাপি কেন আলাপ-আলোচনা দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দ্রাবাদ-সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছেন? ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের পথে চলিতে ভীত নহেন, তর্কের খাতিরে তাহা না হয় স্বীকারই করিলাম। কিন্তু যতই দিন যাইবে হায়দ্রাবাদ ততই সামরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। হায়দ্রাবাদে যে সামরিক আয়োজন চলিতেছে সে-সম্বন্ধে বহু সংবাদ ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদে বহুসংখ্যক আরব সৈন্ম আছে এবং বহু আরব ধীরে ধীরে হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করিতেছে। এই সকল আরবকে অস্ত্র-শস্ত্র দেওয়া হইতেছে। সেদিন 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা যে-সংবাদ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ইত্তেহাদুল মুসলমিনের নেতা ভারতের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালাইবার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। একই সঙ্গে বেরার আক্রমণ, এক শত মাইল দীর্ঘ করিডরের ভিতর দিয়া পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত গোয়ায় প্রবেশ এবং উত্তর সরকারে রাজাকর বাহিনীর হানা, এই ত্রিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনা গঠিত হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ইত্তেহাদ-নেতা না কি আশা করেন যে, ঠিক ত্রিমুখী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্মও দিল্লী আক্রমণ করিবে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিবার জন্ম সময় আবশ্যক। আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়া পণ্ডিতজী আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছেন। আসলে সার ওয়াল্টার মঙ্কটন আলাপ-আলোচনার ছলে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্ম সময় অতিবাহিত করিতেছেন মাত্র।

পণ্ডিতজী যুদ্ধের পথে চলিতে ভীত না হইতে পারেন, কিন্তু সম্ভাবিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছেন কি? হায়দ্রাবাদ ও পাকিস্তান হইতে যদিই আক্রমণ হয়, তাহা হইলে ভারতের ভিতরে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়াছেন কি? ঐরূপ আক্রমণের সময় আমাদের সাড়ে চারি কোটি মুসলিম ভ্রাতা কি করিবেন, সে প্রশ্ন উপেক্ষার বিষয় কি? পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অনেক মুসলিম আশ্রয়প্রার্থী ভারতে চলিয়া আসিতেছে কেন? আক্রমণ আরম্ভ হইলে ইহারা কি করিবে? আঠার হাজার মুসলিম রেল-কর্ম্মী আবার ভারতে চাকুরী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে কেন? যুদ্ধের সময় চলাচল ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। আক্রমণ আরম্ভ হইলে রেল-চলাচলের ব্যাপারে ইহাদের উপর নির্ভর করা যাইবে তো? পণ্ডিতজী এ সকল সমস্যার কথা ভাবেন কি না জানি না। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই হায়দ্রাবাদের সমস্যা ভারতের পক্ষে প্রাণান্তকর সমস্যা হইয়া উঠিতেছে।

পণ্ডিতজীর পণ্ডিতী বোঝা দায়

ভারত বিভাগের পূর্ব্বে পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন, 'ভারত বিভাগ কিছুতেই সহ্য করিব না।' মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের দাবীকে তিনি উন্মাদের পরিকল্পনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন সেই উন্মাদের পরিকল্পনা বাস্তব রূপ গ্রহণ করিল তখনও তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের আবার মিলন হইবে, খণ্ডিত ভারত আবার পরিণত হইবে অখণ্ড ভারতে। গত ২৭শে এপ্রেল বোম্বাইএর এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের পুনর্ম্মিলনের কোন প্রস্তাব

ভারত গবর্ণমেণ্ট সহ্য করিবেন না।' সত্যই পণ্ডিতজীর পণ্ডিতী বোঝা দায়।

উঁহাদের পরিকল্পনা ও স্বভাব-বিরোধী হইয়াও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইল কিরূপে? ভারত বিভাগে রাজী হইবার সময় পণ্ডিতজী কি একবারও দেশবাসীর মতামত জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন? মহাত্মাজী ভারত বিভাগকে গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ অনুগামী কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব ভারত বিভাগের সম্মতি দিয়া সেই গুরুতর পাপকার্য্য করিলেন কিরূপে? নেতাদের পাপের ফল, ভুলের পরিণাম ভোগ করে জনসাধারণ। সত্বর কিস্তীমাৎ করিবার আশায় দেশবাসীর মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহারা ভারত বিভাগে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া অধিবাসী বিনিময়ে রাজী হইলেন না। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে অধিবাসী বিনিময় জোর করিয়া তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইল। সহস্র সহস্র নরনারী নিহত, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট, বহু সহস্র হিন্দু ও শিখ নারী অপহৃতা এবং অর্দ্ধ কোটির অধিক লোক উদ্বাস্তু ও নিঃস্ব হইয়া এই অধিবাসী বিনিময় সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই। সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হিন্দু ও শিখরা ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অধিবাসী বিনিময় হয় নাই অর্থাৎ ভারতের মুসলমানেরা যায় নাই। কাজেই ভারতে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের দুর্দ্দশার কারণও ভারত বিভাগ। শুধু ইহাই নহে। সুখ-সুবিধা পাইবার আশায় যে সমস্ত মুসলমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিরাশ হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছেন। প্রায় ১৮ হাজার মুসলমান রেল-কর্ম্মচারী চাকুরীর আশায় পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ১২ হাজার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং চাকুরীতে ভর্ত্তি হইয়াছেন। ইঁহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থাও একটি গুরুতর সমস্যা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহাদের ভারতবর্ষে ফিরিবার ব্যবস্থা পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট করিতেছেন, কিন্তু ছয় লক্ষ হিন্দু ও শিখ ভারতবর্ষে চলিয়া আসার আশায় অপেক্ষা করিতেছেন, পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের সে দিকে কোন চেষ্টাই নাই। মনে সন্দেহ হয়, প্রত্যাগত মুসলমানদের অন্য কোন অভিসন্ধি নাই তো?

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

১১ই বৈশাখ বোম্বাই-এ গান্ধী নগরীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় দেশের সাধারণ অবস্থার বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান যে, তাঁহারা যেন পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লন এবং সরকারের সহিত সহযোগিতা করেন।

তাহার পর প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকাই ভারতের নীতি। কাশ্মীর সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতের পক্ষে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করা অসম্ভব। হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে বলেন যে, হায়দ্রাবাদের পক্ষে দুইটি পথ খোলা আছে। হয় তাকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে হইবে নতুবা যুদ্ধ করিতে হইবে। ভারত হায়দ্রাবাদ সম্বন্ধে কাশ্মীরের ন্যায় নীতি অবলম্বন করিবে।

কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য যুগলকিশোর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কংগ্রেস গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গত দুই হইতে আড়াই বৎসর কার্য্য চালাইয়া খসড়াটি প্রণয়ন করিয়াছেন। স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় এবং সেই প্রতিষ্ঠানটিকে জনসাধারণের যথাসম্ভব সমধিক সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই কংগ্রেসের অভিপ্রায় বলিয়া গঠনতন্ত্রের বিষয়টি চাপা পড়ে। ইহার চারি আনার সদস্য প্রথার বিলোপ করা হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের প্রথম ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র মানিয়া লইলে প্রাপ্তবয়স্ক (২১ বৎসরের বেশী বয়সের) যে কোন ব্যক্তি কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারিবেন।

নূতন গঠনতন্ত্রের প্রথম ধারাটি এই :—"ভারতবাসীর কল্যাণ ও উন্নতি সাধন এবং বিশ্বশান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সমান সুযোগ ও সুবিধা দানের এবং সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ভিত্তিতে ভারতে একটি কো-অপারেটিভ কমনওয়েল্থ বা সমবায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই হইল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।" দ্বিতীয় ধারাটি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ সম্পর্কে এবং তৃতীয় ধারাটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এলাকা সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ বা পশ্চিম-পাঞ্জাবে কংগ্রেসের শাখা বজায় রাখা সম্ভব নহে। ইচ্ছামত সেখানে পৃথক্ কংগ্রেস গঠন করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাহা নিখিল ভারত কংগ্রেসের অংশ হইবে কি না?

পরদিন ১২ই বৈশাখ বাকী ধারাগুলির আলোচনা হয় এবং খসড়া অনুযায়ী প্রায় সব ধারাই গৃহীত হয়। রাষ্ট্রীয় সমিতির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ডিষ্ট্রিবিউটেড ভোট ব্যবস্থায় এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন বলিয়া খসড়া-তন্ত্রে বর্ণিত প্রস্তাব সমিতি কর্ত্তৃক বাতিল হয়। রাষ্ট্রীয় সমিতির সমস্ত সদস্যই সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোটদান পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত হইবেন বলিয়া সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় যে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী নিজ নিজ বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে চলিয়া আসিতেছেন, তাহাদের পুনর্বসতির কার্য্যে সদস্যগণকে আত্মনিয়োগ করিতে বলেন।

স্মারকলিপি

পাকিস্তানস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের নিকট ঢাকা সংখ্যালঘু সমিতি যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের সতেরটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি কারণ আছে, যাহার যে-কোন একটিই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ভারতবর্ষ দুইটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে ভয়ানক নৈরাশ্য সৃষ্টি হইয়াছে সে কথা ঠিকই। এই নৈরাশ্য সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেই তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, তাঁহাদের মনে এই ভরসাও ছিল যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাদের অধিকার রক্ষায় সহায় হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তা যেন সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায় ও পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তির পরিণাম। পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কগণ তথা লীগ নেতৃবৃন্দ পরোক্ষ ভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের উস্কানি দিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু হিন্দুদের রক্ষার জন্য ভারত সরকার কোন ব্যবস্থাই করিলেন না।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হওয়ার কারণকে যেমন সরকারী ও বে-সরকারী দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তেমনি অত্যাচার-গুলিও সরকারী ও বেসরকারী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত সরকারী নিপীড়নের দিক্‌ হইতে হিন্দুদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ, তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করিবার আয়োজন প্রভৃতির কথাও স্মারক-লিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঘর-বাড়ী রিকুইজিশনের ব্যাপারে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইয়াছে, হিন্দুদের উপর বৈষম্যমূলক ও নিষেধাত্মক কর ধার্য্য করা হইতেছে। ব্যাপক ভাবে হিন্দুদের বন্দুক দখল ও গৃহতল্লাসী করা হইয়াছে এবং হইতেছে। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র, শরিয়তের অনুশাসন অনুযায়ী এই রাষ্ট্র শাসিত হইবে,—এই মর্ম্মে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কগণ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থাও হইবে ইসলামী আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং হিন্দুকে হয় এই শিক্ষা অর্জ্জন করিতে হইবে, না হয় নিজের সংস্কৃতি বিসর্জ্জন দিয়া ইসলামী শিক্ষাই গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী কোন বিভাগেই হিন্দু কর্ম্মচারী গৃহীত হইতেছে না। কাজেই হিন্দুদের জীবিকার একটি পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শিল্প ও ব্যবসায় দ্বারা যে তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে, তাহারও উপায় নাই। বৈষম্যমূলক নীতির ফলে শিল্প ও ব্যবসায় দ্বারা হিন্দুদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার উপর আছে বে-সরকারী উৎপীড়ন। হিন্দুদের বাড়ী, জমি জোর করিয়া দখল করিয়া লওয়া আছে, আছে হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পজীবীকে বয়কট করা। সর্ব্বোপরি বড় উৎপীড়ন হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের ধন-প্রাণ তো নিরাপদ নয়-ই, তাহাদের নারীর মর্য্যাদাও বিপন্ন। শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া বাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নিজে নিরাপদ স্থানে বাস করিয়া 'পরোপদেশে পাণ্ডিত্য' প্রকাশ করা খুবই সহজ। ভারতের রাষ্ট্রনায়করা যদি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের অধিকার রক্ষা সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে ভয় পান, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট স্মারকলিপি দাখিল করিয়াই বা লাভ কি?

পশ্চিম-বঙ্গে নূতন মন্ত্রিসভা

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনিবার কথা হইয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত তাহা আর উত্থাপিত হয় নাই। মনোমালিন্য আপোষে মিটিয়া গিয়াছে। তবে মন্ত্রিসভার কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ২৩শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ডাঃ রায় পশ্চিম-বঙ্গ মন্ত্রিসভা নূতন করিয়া গঠন করিয়াছেন। প্রাক্তন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে পর এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, শ্রীভূপতি মজুমদার ও শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণকে নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয় নাই। তিনটি আসন শূন্য ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে একটিতে শ্রীভূপতি মজুমদারকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গভর্ণর নিম্নলিখিত মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিয়াছেন—

১। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, প্রধান মন্ত্রী, (স্বরাষ্ট্র বিভাগ, সাধারণ শাসন, যানবাহন ও উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ)।
২। শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, (অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য)।
৩। শ্রীকিরণশঙ্কর রায় (স্বরাষ্ট্র, পুলিশ ও জেল বিভাগ)।
৪। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (শিক্ষা)।
৫। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (অসামরিক সরবরাহ)।
৬। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (কৃষি, পশু-চিকিৎসা, মৎস্য ও বন বিভাগ)।
৭। শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ (পূর্ত্ত ও ভূমি-রাজস্ব)।
৮। শ্রীনিকুঞ্জবিহারি মাইতি (সমবায়, সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি)।
৯। শ্রীনীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার (বিচার বিভাগ)।
১০। শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি (শ্রম বিভাগ)।
১১। শ্রীভূপতি মজুমদার (সেচ ও ওয়াটার ওয়ার্কস্)।

পরলোকে ফ্লাইট-লেফ্টেন্যাণ্ট গুপ্ত

ফ্লাঃ-লেঃ গুপ্ত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১০ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। গুপ্ত হাওড়া জিলা-স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সি ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করেন।

বঙ্গীয় সরকার বাঙ্গালী যুবকদের বিমান চালনায় উৎসাহিত করিবার জন্য বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন, লেঃ গুপ্ত সর্ব্বপ্রথম এই বৃত্তি লাভ করেন। দমদমে পুরাপুরি ভাবে ফ্লাইং শিক্ষার সুযোগ আসিল। আরো তিনি বি মা ন-চা ল না শি ক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে I.A.F.V.R.এ Cadet officer-রূপে যোগ দেন।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে Fighter‍র Leader ট্রেনিং-এর জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিলাত পাঠান এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর রণক্ষেত্রের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ, যখন তিনি তাঁহার বিমান-বহরের পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন নিহত হন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

বাসে যাতায়াত করতে মায়ের হাতের খড়্গ দু'বার দেখলুম ? ?
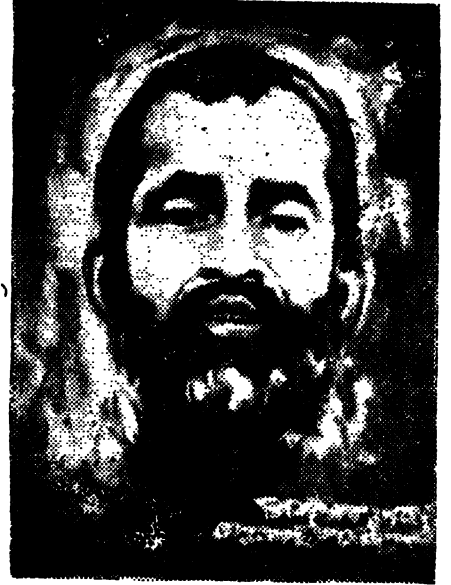
একবার কাটলেন অর্থের বন্ধন···আর একবার কাটলেন মায়ার বন্ধন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবকে ডাকতেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন সব—জলের মত পরিষ্কার! যখন ফিরি তখন দেখলুম শুধু মায়ের মুখখানি—টানাটানা চোখ, সদাহাস্যময়ী। জলের মত পরিষ্কার। 'করাপশনের' যুগেও ঠাকুর সদা বর্ত্তমান সেটাও বুঝলুম জলের মত। যাক, ডাকা বিফল হয়নি তা'হলে।

তাঁকে পেলেই সব পাওয়া যায়—মানুষকে বেশী কষ্ট সহ করতে হয় না—শুধু তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা আর শুধু প্রার্থনা করা; জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও। বিবেক বৈরাগ্য এসে যাবে।

আমার জীবনে ত' তাই এলো! "দুত্তোর ছাই" বলে মোটা মাইনের সুখের চাকুরীটি ছেড়ে দিয়েছিলুম গত এপ্রিলে, হিমালয়ে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ফেলে রেখে কলকাতায় লেগে গেলুম কাজে—বিজ্ঞাপন তৈরী করা, তার আর শেষ নেই, আর কেশতৈলই বা কত আছে, বাংলাদেশের লোক খেতে পাক বা না পাক কেশতৈলের ছড়াছড়ি। রাত বারোটায় তুলি ছাড়ি আর বলি···"ঠাকুর, এই বাজে কাজ থেকে মুক্তি দাও"। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন-শিল্পীর জন্য কি কিছুই কাজ নেই?

ঠাকুরের মন্দির থেকেই ছবিখানা প্রচারের ইঙ্গিত পেলুম। বসুমতীতে প্রাণতোষ বাবুর ঘরে ঢুকেই প্রথমে নজরে পড়লো ঠাকুরের সমাধি অবস্থার অপূর্ব্ব ছবি। বাড়ী এসে সমরদাকে বলুম—সমরদা আঁকুন অয়েলে, ছেপে বিতরণ করি। 'কমার্শিয়াল আর্ট' করেছি জীবন-ভোর—তাই নিজে পারলুম না, আপনিই আঁকুন, শুধু 'মেডেল'ই ত' পেয়ে এলেন, পেটভরে ভাত খাবার ভারও কেউ নিলে না, তাঁর ছবি আঁকুন তিনিই খাওয়া-পরার ভার নিয়েছেন!

কেশতৈল বিক্রয়ে বিজ্ঞাপন তৈরী ক'রে সহায়তা করেছি, আর বাঙালীর ঘরের শ্রীশ্রীভগবানকে, ভারতের মুক্তি সাধনার অগ্রদূতকে, আর আমার নতুন Boss শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে আত্মবিস্মৃত বাঙালীর হৃদয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো না?

আপনারাই বলুন!

প্রকাশিকার এই ছবি পরিবেশন করছেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

শ্রীঅন্নদা মুনশী

স্বপ্নজাল বোনে
হিমানী
স্নো, সাবান, সেন্ট কেশতৈল
লিপষ্টীক, বডি পাউডার
নখের পালিশ প্রভৃতি

২৭শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ ঃ ১৩৫৫ সাল
১ম খণ্ড ঃ ২য় সংখ্যা

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। যে অসুখ তোমার হ'য়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আস্‌বো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অসুখটা ভাল ক'রে দাও ; দেখ, তাঁর নাম-গুণ ক'র্ত্তে পাই না।

ডাক্তার। ধ্যান ক'ল্লেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে, অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখন তাঁর নাম ক'রে নাচি।

* * * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায় ; আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া এই দু'টি দরকার। মানুষ তো অজ্ঞান, ভুল হ'তেই পারে। এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি ত অন্তর্য্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। ব্যাকুল হ'য়ে সাকারবাদীব পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে।

মিছরীর রুটি সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও ; মিষ্ট লাগ্‌বে। তোমার ছেলে অমৃতটি বেশ।

ডাক্তার। সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)। আমার কোন শালা চেলা নাই। আমিই সকলের চেলা, সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস,— আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস। চাঁদা মামা সকলেরই মামা। (সভাস্থ সকলের আনন্দ ও হাস্য)।

দেশবন্ধুর শেষ উইল

শ্রীতারানাথ রায়

সে কথা ত স্পষ্ট বলে দিয়েছিল বিপ্লবীরা—"পথ—বিপ্লবের পথ, রক্তপাতের পথ, রাজসংক্ষেত্রে রণচণ্ডীর নৃশংস তাণ্ডব নৃত্য ঘটাইবার পথ—আধ্যাত্মিকতা, ভাবুকতা, কল্পনা বা অভিনয়ের পথ নয়। সে পথ অহিংস অসহযোগী মহাত্মা গান্ধীর পথ নয়, সে পথ ডি ভ্যালেরার পথ—বিরোধ, রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতার পথ।"

তবু জয়ধ্বনির হুজুগ। সেই মাগুর মাছের ঝোল, বোল হরি বোল—সেই সহজ পন্থা, কৌপীন, কম্বল, টিকি আর ফোঁটা—মুখে গৌর-নিতাই এর জয়ধ্বনি।

'৪৬এও যেমন আগষ্ট বিপ্লবী আর আই-এন এ বিপ্লবীদের সমর্থন করেছিল দেশ, '১৯২৫এ তাই করেছিল। বিপ্লবী প্রচেষ্টা ও প্রভাবের সুযোগ এবারও যেমন আপোষপন্থীরা নিয়েছে, সেবারও নিয়েছিল। নয় কো আন্দোলনের মূলেও বিপ্লবীরা—হিন্দুস্থানী পাকিস্থানী কিস্তিমাতের মূলেও বিপ্লবীরা।

চিত্তরঞ্জনের যোগাযোগ এদের সঙ্গে সুরু থেকেই। আলিপুর বোমার মামলার আদালতে তাঁকে দেখেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "আমার রক্ষার জন্য স্বয়ং নারায়ণ এসেছেন।' বাহির থেকে শোনা যেত বিপিনের বিষাণ, অরবিন্দ ও উপাধ্যায়ের কাটা কাটা বোল, কিন্তু টাকা টাকা করে প্রাণ যেত সুবোধের, রজতের আর চিত্তরঞ্জনের। বরাবর বিপ্লবীদের টাকার অভাব হলেই ও চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে পাওয়া যেত।

কিন্তু বিপ্লব প্রবর্ত্তনের প্রথম পর্ব্বের পর,—বিশেষ ক'রে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের ভারতব্যাপী আয়োজন যখন ব্যর্থ হ'ল, তখন বারোয়ারী দরবারে পবিত্র রিজোলিউসান ছাড়া—দেশের মুক্তির জন্য আপোষের আবেদন ছাড়া আর কোন চেষ্টা কেউ করেনি।

দশ বছর পর বিপ্লবীরা ফিরে এসে দেখল, দেশে কৌপীন তকলীর মাতামাতি। এই কৌপীন ও তকলীর আধ্যাত্মিক প্রভাব চিত্তরঞ্জনকেও পেয়ে বসেছিল। তাঁর সর্ব্বস্ব ত্যাগে সাধরণ মানুষ দলে দলে জেল ভর্ত্তি করেছিল। ভীড়ের মানুষকে আন্দোলন আর জয়ধ্বনিই করতে দেখেছেন চিত্তরঞ্জন। কিন্তু গণ-উত্তেজনার সুযোগ বিপ্লবীদের নিতে দেখে গান্ধীজীও যেমন ভীত—চিত্তরঞ্জনও তেমনি শঙ্কিত হয়েছেন। বিপ্লবীরা গণ-উত্তেজনার সুযোগ নেবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প। তারা দখল করতে লাগল বাংলার মাত্র নয়, সব প্রদেশের কংগ্রেস। সুতো কাটার দল সরে পড়তে বাধ্য হল। বিপ্লবীদের কাজে লাগাবার জন্যে চিত্তরঞ্জন চেষ্টা করেছিলেন বাইরে নির্ব্বাসিত বিপ্লবীদের দিয়ে এসিয়াটিক ফেডারেশন গড়ে, আর ভেতরে স্বরাজ্য দলের একটা ভাঙ্গনের কাজ সুরু ক'রে।

বিপ্লবীরা নতুন এক আন্তর্জ্জাতিক সুযোগ নেবার জন্য সুস্পষ্ট ভাবে তৈরী হচ্ছিল। তারা কংগ্রেসী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রতীক্ষাও করছিল। দেশবন্ধু গান্ধী-মোহমুগ্ধ কংগ্রেসের মনোভাবে হতাশ হয়ে সেদিন বলেছিলেন—"মনে কর কাল যুদ্ধ বাধল। আমার মতে সে ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর তখনই সরকারের সহযোগিতা থেকে ক্ষান্ত হয়ে আইন অমান্ত করা উচিত। কারণ, ভুরস্কের যুদ্ধ এশিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধ। কংগ্রেস এ প্রস্তাবের আলোচনা পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য যখন করেছেন, তখন আমি আর কংগ্রেসে থাকতে পারিনে।"

বিপ্লবীরা দেশবন্ধুকে সাহায্য করল। স্বরাজ্যদলের পত্তন হ'ল। আইন অমান্ত সঙ্কল্প পরিহারের ফলে দেশে যে অবসাদ এসেছিল, বিপ্লবীরা নিয়মতান্ত্রিক ও হিংস্র প্রচেষ্টা প্রয়োগে সে অবসাদকে দূর করবার চেষ্টা করল।

ইংরেজরা সেদিন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। কংগ্রেসী দলের দুই এক জন তাইও বিপ্লবী প্রচেষ্টার আভাষ পেয়ে বলেছিলেন—"ভবিষ্যতে হয়ত এমন কিছু ঘটতে পারে যার জন্ত আমার (স্বরাজ্য) দল ত্যাগ করা আবশ্যক হবে!" এ সময় বলশেভিক দলের চিঠিও আসছিল দেশবন্ধুর কাছে।

দেশবন্ধু অন্তরে এদের সমর্থন করতে পারছিলেন না, তবু আপনার কাজে এদের প্রয়োগ করছিলেন। দেশবন্ধুকে সেদিন বিপ্লবী গোপীনাথের প্রশংসা করতে হয়েছিল। গান্ধীজী তাতে মহা ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করেছিলেন—"এই বিপজ্জনক আন্দোলন বন্ধ করে দেব আর বিপ্লবীদের দেখাব যে, স্বরাজ্য লাভের জন্ত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করলে পবিত্র ভাবে স্বার্থত্যাগ করবার অনেক পথ আছে।'

দেশবন্ধুও এ বিপজ্জনক পথের প্রতিষেধক আপোষের জন্ত তৈরী হতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন—"Compromise করতে যে শিখল না, বোধ হয় এ জীবনে সে কিছুই শিখল না। Tory Govt is the cruelest Govt in the world." এরা না পারে পৃথিবীতে এমন অত্যাচার নাই। আবার মিটমাট ক'রে নেবার পক্ষেও বোধ করি এমন বন্ধু নাই। কিন্তু ভয় হয়, আমি তখন আর থাকব না।"

বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন—"এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে ভয়ানক মারাত্মক। এই activityতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ ২৫ বছর পিছিয়ে যাবে। তা'ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিষ যাবে না। তখন আরও স্পর্দ্ধিত হয়ে উঠবে। সামান্ত মতভেদে একেবারে Civil war বেধে যাবে।"

তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে কিন্তু বুঝা-পড়া চলছিল। তাই ফরিদপুর সম্মিলনে দেশবন্ধু খোলাখুলিই বলেছিলেন, "আমরা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এখন একটা সর্ত্তে আবদ্ধ হব যে, কি কথায়, কি কাজে, কি হাব-ভাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিব না এবং আমরা সর্ব্বতোভাবে এরূপ আত্মঘাতী আন্দোলন দেশ থেকে দূর করবার চেষ্টা করব।"

বিপ্লবী কর্ম্মীরা তখন প্রায় সবাই ইংরেজের কারাগারে। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ দেশবন্ধু নিয়েছিলেন। তবু যারা বাইরে ছিল তারা দেশবন্ধুকে সেদিন সমর্থন করতে পারেনি। গান্ধীজী মহা খুশী হয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেটরাও উল্লসিত হয়েছিলেন। রক্তবিপ্লবীদের অবর্ত্তমানে ভারতের আপোষপন্থীদের একটা United front গঠন করতে চেষ্টা করছিলেন দেশবন্ধু। মৃত্যুর পূর্ব্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কাছে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাই হল দেশের

কাছে তাঁর শেষ উইল। এ পরে ছিল—"ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য, সেই অভীষ্টের সাধনাতেই আমাদের সকল কর্ম্মশক্তি প্রযুক্ত করতে হবে। সর্ব্ব প্রকার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বর্জ্জন করতে হবে।"

১৯২৫এর ১৬ই জুন দেশবন্ধু আমাদের ছেড়ে গেছলেন। ১১ই জুন তিনি আপন অনুচরদের পরামর্শ দিয়ে যে পত্র দিয়েছিলেন তা প্রকাশ করলে আজ বোধ হয় অন্যায় হবে না। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

স্টেপ এসাইড, দার্জ্জিলিং

প্রিয়.........

আমাদের কাজ সম্বন্ধে কতকগুলো পরামর্শ দেব বলে ভাবছিলাম তোমায় ডেকে পাঠাব, এ কথা বোধ হয় প্রতাপের কাছে শুনেছ। এখন আসবার দরকার নেই। সংবাদপত্রে দেখলাম, সাতকড়ি ফরিদপুর প্রস্তাবগুলোর বিবেচনার জন্য বি-পি-সি-সির সভা ডেকেছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বি-পি-সি-সিতে যাতে ফরিদপুর প্রস্তাব পাশ হয় তার জন্য সর্ব্বশক্তি তোমায় নিয়োজিত করতে হবে। যাতে খুব বেশীর ভাগ সদস্যের ভোটে আমরা জিতি তার জন্য সাতকড়ি, কিরণ এবং প্রত্যেককে চেষ্টা করতে বলছি। আগে থেকে চেষ্টা করলে এ অতি সহজ ব্যাপার। যা খরচা লাগবে করতে হবে। আমার পরামর্শ এই—

(১) ময়মনসিং থেকে, বা যেখানে থাকুক, সেখান থেকে সতীশ চক্রবর্ত্তীকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে দিয়ে ময়মনসিং দলের মধ্যে কাজ কর। সে কৌশলী, সম্ভবতঃ সে অন্য সবাইকে ভজাতে পারবে।

(২) নির্ম্মলের মারফত হাওড়ার শরৎ চাটুজ্জেকে দিয়ে চেষ্টা করতে পারলে হাওড়ার সদস্যদের আমাদের দলে আনতে পারবে।

(৩) প্রয়োজন হ'লে ঢাকার মনোরঞ্জনকে ধর। মহিম ও ঢাকার অন্যের সঙ্গে কথাও বলতে হবে। কিরণ যদি একটু তৎপর হয় তবে এ কাজ সে বেশ করতে পারে। ঢাকার আর যে সব সদস্য আছে শ্রীশ তাদের আনতে পারবে। চেষ্টা যদি কর, শ্রীশ তোমার সাহায্য করবে।

(৪) দিনাজপুর ও রাজসাহীতে সমর্থন পাবার কোন উপায় বের কর। আমার ধারণা, ওরা আমাদের বিরোধী। কিন্তু এখনই চেষ্টা ক'রে তুমি ওদেরও দলে আনতে পারবে।

চিঠিখানি সাতকড়ি, কিরণ ও প্রতাপকে দেখিও, আর কাউকে নয়। তোমরা একত্রে বসে পরামর্শ ক'রে সব কাজের ব্যবস্থা কর।

বোধ হয় তোমরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারছ না। আমায় বিশ্বাস কর। গান্ধীকে আমাদের সাথে রাখবার সর্ব্ব প্রকারের চেষ্টা করতে হবে। মহাত্মার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ দুই দলেরই কার্য্য-পদ্ধতির পক্ষে মারাত্মক হবে।

লণ্ডন 'টাইম্‌সে' আমার ফরিদপুরের বক্তৃতার উপর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়লাম। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোতে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেরিয়েছে, তাতে কিছু বুঝা যায় না। 'টাইম্‌সে'র প্রবন্ধে বেশ আশাপ্রদ অবস্থা বলে আমার মনে হচ্ছে। সমস্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমার ধারণা এই—

(১) তারা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে সম্মত।

(২) ১৯২৯এর পূর্ব্বে শাসন-সংস্কার আইন বদলাবে বলে অবশ্য তারা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না, তবে এ আইনের মধ্যে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তারই বলে শাসন-সংস্কারের প্রসার তারা করতে সম্মত। কি করে খেলতে হয় আমরা যদি জানি তা'হলে আইন না বদলিয়েও প্রকৃতপক্ষে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য আমরা পেতে পারব।

(৩) রেডিং আমাদের কাউকে ডেকে পাঠাবেন। যদি কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত হয় তা'হলে সমস্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে আমাদের কাউকে না কাউকে ইংল্যাণ্ডে পাঠান যেতে পারবে।

(৪) যদি উপরের কর্ম্মপদ্ধতি ওরা অবলম্বন না করে তাহলে তারা শাসন-পরিষদগুলো ভেঙ্গে দেবার আদেশ দিয়ে পরীক্ষা করবে দেশ স্বরাজ্যদলকে সমর্থন করছে কি না। যদি দেখে ফল দলের অনুকূল, তখন তারা উপরের পন্থা অবলম্বন করবে।

পরিস্থিতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শেষ কথা আমরা বলেছি। এখন দায়িত্ব সরকারের। আর কোন বিবৃতি বা ব্যাখ্যা আমি করব না। তোমরা সংবাদপত্রগুলো কি বলে লক্ষ্য করে যাও, আর ওরা গুরুতর ভুল করে, সংশোধন করে যাও। বি-পি-সি সিতে আমরা যদি হেরে যাই, তা'হলে সব মাটি হবে।...

১১।৬।২৫ তোমাদের সি আর দাস

অহিংস সহিংস কোন অসহযোগেই দেশবন্ধুর বিশ্বাস ছিল না। গান্ধী দলকে আপন কাজে প্রয়োগ করে আশু রাজনৈতিক কোন রকমের একটা অধিকার অধিগত করাই তাঁরও যেমন উদ্দেশ্য ছিল, গান্ধীজীরও তাই-ই ছিল, মডারেটদেরও তাই ছিল।

কণ্টক মাত্র দুর্জ্জয় বিপ্লবীরা। 'ক্রমশঃ', 'আপোষ' এ সব কথা শুনাবার জন্য তারা কোন দিনই প্রস্তুত নয়।

শরৎ বাবু তখন 'পথের দাবী' লিখেছেন, অনেকের ধারণা, বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম খুব। বিপ্লবীদের কাছে এক আবেদনের খসড়া লিখতে দেশবন্ধু তাঁকে বললে শরৎ বাবু লিখেছিলেন—

"যদি তোমরা কোথাও কেউ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করতেও না পারো ত অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কার্য্য-পদ্ধতি স্থগিত রেখে আমাদের প্রকাশ্যে মুক্ত চিত্তে কাজ করতে দাও।" দেশবন্ধু—'যদি'তে আপত্তি করে বলেছিলেন—যদি—যদি—যদিতে কাজ নেই। ২১ বছর ধরে assuming but not admitting ক'রে এসেছি কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি তারা আছে।"

তারা ছিল—তারা আছে—তারা থাকবে। দেশবন্ধু এর কয় দিন পর আমাদের ছেড়ে গেছলেন, তখন বিদেশে বিভুঁইয়ে বিপ্লবীরা ইংরেজের শেকল গুনছে।

এর পর দেশবন্ধুর পন্থা অবলম্বন ক'রে গান্ধীজী বিপ্লবী বর্জ্জিত ভারতে অহিংসার বীজ বুনতে চেষ্টা করলেন। যাদের মুখ চেয়ে আপোষের চেষ্টা গান্ধীজীর তথা দেশবন্ধুর—তাদেরই মুখপাত্র Lord Birkenhead কিন্তু স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন—"It is true to say today that if we left India, to-morrow, it will be submerged by the same anarchical murderous disturbances as in the days of Clive"

দেশবন্ধু তখন ছিলেন না। বিপ্লবীরা ফিরেছিল। তাদের কর্ম্মপন্থা পরিবর্ত্তনের কোন হেতু জন্মেনি, আন্তর্জ্জাতিক যে নব-পরিস্থিতির জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছিল তা এসেছিল ১৫ বছর পর। তাদের শব-সাধনার ফলেই দেশবন্ধুর আপোষ পন্থায় খণ্ডিত দেশ ঔপনিবেশিক অধিকার ভিক্ষা পেলেও স্বাধীনতা লাভ করেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জ্ঞানজাগরণ

জ্ঞানান্বেষক

তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল।— ১৫ই ফেব্রুয়ারি বুধবার এগ্রিকলটিউর সোসাইটি অর্থাৎ কৃষি বিদ্যা-বিষয়ক সমাজের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেভিড স্কাট সাহেব কর্তৃক প্রেরিত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত তণ্ডুল-নিষ্পাদক এক প্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন। ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুই জন লোকে ১০ দশ মোণ তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে। তাহার এক জন কল লাড়ে, ইহাতে পরস্পর শ্রান্তিযুক্ত হইলে ঐ কর্ম্মের পরিবর্ত্তন করে এতদ্দেশে ঢেঁকি যন্ত্রে তিন জন বিনা অর্দ্ধ মোণের অধিক তণ্ডুল হওয়া দুষ্কর আর তাহারা পরিশ্রান্ত হইলেই ঢেঁকি বন্দ হয়। (সমাচার-দর্পণ—১১ই মার্চ্চ ১৮২৬) কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।— যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঙ্গাতীরের রাস্তার উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সূজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কলের দ্বারা গম পেষা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্যে ত্রিশ অশ্বের বলধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনাদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোণ গম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন। (সমাচার দর্পণ—৮ই আগষ্ট ১৮২৯)............এইক্ষণে ইংলণ্ড হইতে সূতা ও নানাবিধ কাপড় যেমত যন্ত্রদ্বারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকে তদ্রূপ এক নূতন যন্ত্র যাহা এইস্থানে স্থাপিত হইল ইহার দ্বারা সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষাও এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়া কল দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম, যেহেতুক এমত কল কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরন্তু কলিকাতায় আসিয়া সেই কথা সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে ঢাকা শহরেতেও ঐরূপ এক কল প্রস্তুত হইতেছে...
......পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং ইংরেজী উত্তম জানেন ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস আছে তিনি অবশ্যই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বারা দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভঞ্জনকরণে বাধিত করিবেন।— কস্যচিৎ চন্দ্রিকা পাঠকস্য। (বং দূং (বঙ্গদূত)—সমাচার দর্পণ, ৮ মে ১৮৩০)

ক্লাইব ষ্ট্রিট নামক রাস্তার পড়ে ২৫ ফুট নীচে অথবা টাকশালের মেজের ২৬।০ ফুট নীচে গঙ্গা হইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুত কাপ্তান ফর্বস সাহেবকর্ত্তৃক ১৮২৪ সালের মার্চ মাসের শেষে ঐ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় অতএব উপরিলিখিত ইমারত অপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বৎসরে ইহার ∴বং কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্ব তুল্য বল এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে, ৩,০০,০০০ খানা রূপা মুদ্রিত হইতে পারে। গত বৎসরের ৩০ আপ্রিল লাগাইদ নূতন টাকশালের সমুদয় খরচ ২৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে তন্মধ্যে কলেতে ১১ লক্ষ এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে ১৩ লক্ষ। সম্পূর্ণরূপে কল চলিলে প্রতি-মাসে ১৮,০০০ টাকা খরচ হয়। গত জানুয়ারি মাসের আসিয়াটিক (সোসাইটির) জর্নল হইতে গৃহীত। (সমাচার দর্পণ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪)

নূতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্টেম্বর তারিখ-অবধি জারী হইবে। ঐ তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আক্ট অর্থাৎ আইনে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা চলন হইবে। (সমাচার দর্পণ, ২৯ আগষ্ট ১৮৩৫)। আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংলণ্ডদেশ হইতে বাষ্পের জাহাজ গতকল্য কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয় যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্ম্ম প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়। (সমাচার দর্পণ, ১০ ডিসেম্বর ১৮২৫)

সংপ্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই তাহার কারণ এই যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত গমনপথে যত নদী আছে সে সকলের উপর রজ্জুময় সেতু হইয়াছে অতএব গমনের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং অনায়াসে ডাক গমনাগমন করিতেছে। (সমাচার দর্পণ, ২৩ জুলাই ১৮২৫)

মোকাম কলিকাতাতে ছকরা গাড়ীর উৎপাতে রাস্তায় চলা ভার......। (সমাচার দর্পণ, ২৭ এপ্রিল ১৮২২)

গত এক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতুক এত পুস্তক ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র লোকেরদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তদ্দারা ক্রমে লোকেরদের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইবেক। যে লোকেরা পুস্তকপাঠের রসাস্বাদন করিবেন তাহারা বুঝি বিস্মরণ হইতে পারিবেন না ইহাতে ক্রমে ২ ছাপা কর্ম্মের বাহুল্য ও লোকেরদের জ্ঞানোদয় হইবেক। (সমাচার দর্পণ, ২২ জানুয়ারি ১৮২৫)

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড প্রণীত 'A Grammar of the

Bengali Language' ছাপা হয় এবং ইংরাজিতে লেখা এই ব্যাকরণ খানিতে দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে অংশবিশেষ ছেনি-কাটা বাঙলা হরফে প্রথম মুদ্রিত হয়।১ ১৮৫৩ সালে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী এদেশে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে রেলপথ প্রবর্তনের কথা বলেন এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০ মাইল রেলপথ এদেশে তৈরী হয়।২

প্রাচীন বাঙলা সংবাদপত্র থেকে সংকলিত কয়েকটি সংবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সংবাদগুলি সাধারণ সংবাদ নয়, জাতীয় জীবনের সংবাদ। প্রত্যেকটি সংবাদ জাতীয় জীবনের যুগ-সন্ধিক্ষণের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষ। ঘটনাগুলি এই: এদেশের ঢেঁকি, যাঁতা, তাঁত ইত্যাদির বদলে বিদেশ থেকে ধানভাঙ্গা কল, আটাপেষা কল, কাপড়ের কল আমদানি হচ্ছে। কলগুলি বাষ্পীয় শক্তিচালিত। কোন কলে প্রতিদিনে দশ মণ চাল হয়, কোন কলে দিনে দু'হাজার মণ গম পিষতে পারা যায়। এদেশে এসব কলের কাণ্ডকারখানা আগে কেউ দেখেননি; তাই দলে দলে সকলে গঙ্গার তীরে তীর্থযাত্রীর মত কল দেখতে যাচ্ছেন এবং দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, অনেকের মনে প্রশ্ন উঠছে; সন্দেহ জাগছে। কলে কি দেশের মঙ্গল হবে, না অমঙ্গল হবে? সংবাদ-পত্রে তাঁরা পত্রক্ষেপ ক'রে জানতে চাইছেন, ইংরাজদের ও ইংলণ্ডের এই সব যন্ত্রপাতির ব্যাপার সম্বন্ধে যাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁরা যেন এই সন্দেহ তাঁদের মন থেকে দূর করেন। কল আসছে, নতুন টাকশালও তৈরি হচ্ছে। টাকশালে টাকা-পয়সা তৈরির যন্ত্রপাতি আমদানী হচ্ছে। সাত ঘণ্টায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা তৈরি করা হবে। কোম্পানির তৈরি এই টাকা ভিন্ন হরেক রকমের টাকা-পয়সাও যে আর দেশের মধ্যে চলবে না, সে সংবাদও আমরা পাচ্ছি। বিচিত্র বহুরূপী সব পয়সা-কড়ি আর চালু থাকবে না। পয়সার কি আর অন্ত আছে না কি? পুরানো সিক্কা পাই পয়সা, নতুন 'বিট' পাই পয়সা, মাত্রাহীন বাঙলা, ফারসী ও দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা। মহাদেবের বড় ত্রিশূলচিহ্ন আঁকা পয়সা, ছোট ত্রিশূল-আঁকা 'গুটলি' পয়সা, পাটনাই পয়সা। তাছাড়া "কামারিয়া ত্রিশূলি পয়সা, অর্থাৎ দেশের কামারেরা এক ছিলিম তামাক খাওয়ার মতন অত্যন্ত সহজেই যে সব কৃত্রিম পয়সা তৈরি করত।" এত রকমের পয়সা-কড়ি, সোনা-রূপোর টাকা আধুলি আর চলবে না। কোম্পানির টাকা-পয়সা সকলকে বিতাড়িত ক'রে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। সংবাদগুলির মধ্যে এদেশের যানবাহন-ব্যবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায়। পাটনা কাশী গয়া বৃন্দাবন প্রয়াগ দিল্লী সর্বত্রই পায়ে-হাটা পথেই যাতায়াত করতে হ'ত। পথের মধ্যে নদীর উপর কাঠের আর দড়ির সেতু ছিল। কোম্পানির আমলেও এই ব্যবস্থা বহু দিন চালু ছিল, নতুন পথ আর সেতু তৈরি হয়েছিল, ডাকবাংলা গ'ড়ে উঠেছিল পথের মধ্যে মধ্যে, ডাকবাহকদের ও ইংরেজ কর্মচারী-দের বিশ্রাম নেবার সুবিধার জন্য। জলপথে ছিল নৌকা। কিন্তু ১৮২৫ সালে ইংলণ্ড থেকে বাষ্পীয় জাহাজ প্রথম এসে পৌঁছল এদেশে। অবশ্য তিন মাস বাইশ দিনে এল, কিন্তু তাতে কি? দেশের মধ্যে জলপথে বাষ্পীয় নৌকা চলাচল শুরু হ'ল। তার পর ইংরেজদের স্বার্থেই যে এদেশে রেলপথ তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন তা লর্ড ডালহৌসী বুঝলেন। রেলপথও তৈরি হ'ল। দেশের পণ্ডিতদের যা কিছু পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান তা এত দিন হাতে-লেখা পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই জ্ঞান বিতরণ ক'রে নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি করা এবং সাধারণ লোককে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেবার কোন প্রবৃত্তি তাঁদের ছিল না, কারণ উপায়ও ছিল না। ইংরেজদের আমলে এদেশে ছাপাখানা এল, এদেশের কামারই তখন ছেনি-কাটা বাঙলা হরফ এবং অন্যান্য হরফ তৈরি করল। চালের বাতায় গোঁজা পুঁথির গোপন বিদ্যা গ্রন্থাকারে ছাপা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল চারি দিকে।

এই যে সব ঘটনা ঘটল, এগুলো আগেকার রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার এবং রাজবংশের উত্থান-পতনের গুরুগম্ভীর ঘটনার চেয়ে হাজার গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধানকল, গমভাঙ্গা কল, পাটকল, কাপড়ের কল, টাকা তৈরির কল, বই ছাপার কল, বাষ্পীয় জাহাজ, রেলপথের বাষ্পীয় ইঞ্জিন—এসব যখন এদেশে এল, তখন সশব্দে তাদের আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হয়নি। আর্য্য, শক, হূণ, পাঠান, মোগলের ঘোড়ার মতন শব্দ ক'রে তারা আসেনি, তলোয়ারের ঝনৎকারও তাদের শোনা যায়নি। তারা নিঃশব্দে এসেছে, হয়ত একটু ধোঁয়া জমেছে এখানকার নির্মল আকাশে, অথবা একটু শব্দও হয়েছে নাট-বল্টু-শ্যাফট-হুইলের। কিন্তু আগেকার সমস্ত অভিযানের নৃশংসতা এদেশের বোবা মাটি বুক পেতে সহ্য করেছে। হাজার নৃশংসতা, হাজার অত্যাচারেও এদেশের ধ্যানমগ্ন সমাজের ধ্যান ভঙ্গ হয়নি। ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে কলের ধোঁয়ায়, যন্ত্রপাতির শব্দে। আরবী ঘোড়া আর তলোয়ার যা পারেনি, সামান্য ধানকল, পাটকল, টাকা ছাপান কল, বাষ্পীয় ইঞ্জিন তাই পেরেছে। তারা শুধু উপরতলা ধ্বংস করেনি সমাজের ভিৎ পর্য্যন্ত উপড়ে ফেলেছে। তাই তারা শুধু ধ্বংসের আর্তনাদে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত ক'রে আসেনি, নব জীবনের, নব জাগরণের প্রভাতী সুরের রেশ তুলেও এসেছে।

তাই এ-যুগকে আমাদের দেশের "রিনেসাঁসের যুগ" অর্থাৎ নব জীবন ও নব জাগৃতির যুগ, আধুনিক যুগের শৈশবকাল বলা হয়। ইয়োরোপের অনুকরণে বলা হয়, কিন্তু ইতিহাসের প্রতি অবিচার ক'রে বলা হয় না। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক দিন ইয়োরোপের নব যুগ ঠিক এই ভাবেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল উত্তর ইটালীতে, বিশেষ ক'রে ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে। এদেশে এ সব যন্ত্রদূত এসে বহু শতাব্দীর গাঢ় নিদ্রা থেকে আমাদের জাগিয়ে তুলেছিল, ইয়োরোপে তাদের জন্ম ও বিকাশ হচ্ছিল কয়েক শতাব্দী ধ'রে। সামন্ত-তন্ত্রের জঠরেই তাদের জন্ম এবং সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস ক'রেই তাদের বিকাশ হয়েছে। সেকথা পরে বলছি। ইয়োরোপেই বহু শতাব্দী ধ'রে যে সব যন্ত্রদূতের জন্ম ও বৃদ্ধি, ইয়োরোপকে ও যারা মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আধুনিক যুগের আলো-বাতাসের মধ্যে নিয়ে এসেছে, তারাই এদেশের ঘুম ভাঙিয়েছে। তারা শরীরী "যন্ত্র" রীতিমত স্থূল। তারা সূক্ষ্ম অশরীরী "আদর্শ" নয়। তারা "টেকনিক্স", "ইডিওলজি" নয়। মূল "টেকনোলজি" ফল-ফুল শাখা-প্রশাখা "ইডিওলজি"। ইয়োরোপে নব জাগৃতির ভাব-বিপ্লব ঘটেছিল টেকনোলজিকেল বিপ্লবের জন্য! ইয়োরোপ থেকে 'টেকনোলজি' ও 'ইডিওলজি' দুই-ই এদেশে আমদানী হয়েছিল। কিন্তু

কেবল যদি 'আদর্শ' থাকত এবং তার সঙ্গে কল যন্ত্রপাতি ষ্টীম ইঞ্জিন বাষ্পীয় জাহাজ না আসত, যদি ছাপাখানা ও রেলপথ তৈরি না হ'ত, তাহ'লে আদর্শের হাজার সোনার কাঠির স্পর্শেও এদেশের ঘুমন্ত সমাজের ঘুম ভাঙত না, ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যেতে হ'ত আদর্শকে। আদর্শকে এদেশে বসবাস করতে হচ্ছে, সেই বাসের বনিয়াদ তৈরি করেছে উন্নত উৎপাদনের হাতিয়ার, নতুন যন্ত্রপাতি, টেকনিক। কত সাধকের কত আদর্শ ব্যর্থ হয়েছে এদেশে, অন্ধতার অতল অন্ধকারে, কত মহান্ আদর্শ ডুবে গেছে তার হিসাব নেই।

ছোট ছোট যে সব যন্ত্রপাতির কথা আগে বলেছি তারা কেউ তাই ছোট নয়। ধানকল, পাটকল, কাপড়ের কল, চেংগিস-তৈমুরের চাইতেও শক্তিশালী। প্রেস আর টাইপ শঙ্কর-রামানুজ-কবীর-দাদূ-নানক-চৈতন্যের ব্যর্থ বাণী ও আদর্শকে রূপান্তরিত ক'রে সার্থক করেছে। রেলপথ ও বাষ্পীয় জাহাজ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম ভারতের ব্যবধান ঘুচিয়েছে, গ্রাম্য আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙেছে। নতুন যুগের চৈতন্যের ভাবধারা ট্রেনে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটে যেতে পারে। চৈতন্য যা পারেননি, বাষ্প ও বিজ্ঞান সহজেই সেই জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য সমাজের বুক থেকে বিলুপ্ত করতে পারবে। আর বুদ্ধ-যিশু মহম্মদ কেউ যা পারেননি, 'টাকা' তাই পারবে। নব যুগের সুদর্শন চক্র 'টাকা' প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে খেতে সমাজের মধ্যযুগীয় শ্রেণীভেদ বংশগৌরব কৌলীন্যবোধ বর্ণবিভেদ সব ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে। সুতরাং 'সমাচার দর্পণে'র সংবাদ সামান্য সংবাদ নয়, প্রত্যেকটি সংবাদ এক একটি অসামান্য যুগান্তকারী সংবাদ ও ঘটনা।

টাকা ধর্ম, টাকা স্বর্গ

যন্ত্রযুগের শৈশব কালের মৌলিক আবিষ্কারগুলির মধ্যে ঘড়ি শাশ্বত মহাকালের কল্পনা চূর্ণ ক'রে জটিলতম যন্ত্রের প্রতিমূর্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। মানচিত্রকরেরা অসীম অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চারি দিকের সীমানার মধ্যে বেঁধে ফেলে দিল। অদৃশ্য রহস্যালোক ভেদ ক'রে কাচ ব্যাকটেরিয়া ও গ্রহ-উপগ্রহের রাজ্যে প্রবেশ করল। ভেনিসিয়ান আরশিতে মুখ দেখে মানুষ নিজেকে দেবদেবীর চাইতে বেশী সুন্দর, বেশী শক্তিশালী মনে করল। মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যের আত্মাভিমান ও সংকীর্ণতা চূর্ণ ক'রে সর্বজনীন শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের বাণী নিয়ে এল প্রিন্টিং প্রেস। তার পর বাষ্পীয় শক্তি হাজার হাজার ঘোড়ার শক্তি কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে প্রমাণ ক'রে দিল ভগবান সর্বশক্তিমান নয়, মানুষ। দূরত্ব জয় করার ব্যবধান চূর্ণ করার অদম্য ইচ্ছা প্রকাশ পেল শিল্পী ও ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে! লেওনার্দো। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুধু যে যন্ত্র-বিদ্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে গিয়েছিলেন তা নয়, আকাশ-পথে উড়ে যাওয়ার জন্যে এরোপ্লেনেরও নক্শা করেছিলেন। লেওনার্দো কেন, যুগ যুগ ধরে মানুষ এই দূরত্ব জয় করতে চেয়েছে, স্থান-কালের ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছে পাখির মতন ডানা মেলে উড়তে চেয়েছে আকাশে, ক্ষিপ্রগতি হরিণের মতন, ঘোড়ার মতন ছুটতে চেয়েছে মাটিতে। তার ব্যর্থ কল্পনা রূপকথা রচনা ক'রেছে। জিন পরী দৈত্য দানব রাজকুমাররা ডানা মেলে আকাশে উড়েছে; লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটেছে, এক এক পদক্ষেপে সাত সাত ক্রোশ পথ। রেলপথে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, রাজপথে মোটর, আকাশপথে বিমান মানুষের সেই দূরত্ব জয়ের বাসনাকে আজ বাস্তবে রূপায়িত করেছে। রেলপথ ও বাষ্পীয় জাহাজ মধ্যযুগের অলি-গলির সংকীর্ণতা, মধ্যযুগের আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙে দিয়েছে। 'মনোমারুতগামিনী,' 'সর্বগতি সহা যন্ত্রযুক্ত নৌকা,' পুষ্পকযান' আজ বাস্তব সত্য, মধ্য-যুগের ব্যর্থ-কামনার প্রতীক নয়। বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশ-দেশান্তরে বাষ্পীয় ট্রেণ যে ব্যবধান ঘুচিয়েছে, শহরে-নগরে মোটর আরও দ্রুতগতিতে তাকে সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু এ হ'ল পরের কথা। নতুন যন্ত্রযুগের সব আবিষ্কারকে ম্লান ক'রে দিয়েছে মুদ্রা। মুদ্রা প্রধান অর্থনীতিই নব যুগের সমাজের বনিয়াদ। যা-কিছু হচ্ছে, যত উদ্যম, যত প্রেরণা গবেষণা আবিষ্কার সবই এই মুদ্রার মোহে। এ-মুদ্রা মধ্যযুগের মুদ্রা নয়, রঙ-বেরঙের বাহারে মুদ্রা নয়, ফিউডাল লর্ড, রাজা-মহারাজার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জাহির করাই তার উদ্দেশ্য নয়। মধ্যযুগের মুদ্রার নড়া-চড়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, লর্ডদের মতন মুদ্রাও ছিল আরামপ্রিয়, অলস ও বিলাসী। মুদ্রার চাইতে জিনিষ-পত্তরই নড়ে-চড়ে বেড়াত বেশী। প্রয়োজনীয় জিনিষের বদলে জিনিষ পেলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলত, মুদ্রার প্রয়োজন হ'ত সামান্য। কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগে মুদ্রার মৌলিক রূপান্তর ঘটল। ছোট 'চাকতি' হ'লে কি হবে? সেই চাকতির ঘুরপাক খাওয়ার (circulation) যে প্রচণ্ড শক্তি তা আর কোন মুদ্রার কোন কালেই ছিল না। সেকালের মুদ্রার আলস্যে দিন কাটানো চলত, ধামা, কলসি, হাঁড়ি, সিন্দুকের মধ্যে ডানা গুটিয়ে কুম্ভকর্ণের মতন ঘুম দিলেও তার ক্ষতি ছিল না। কিন্তু একালের মুদ্রার আলস্যে দিন কাটানো চলে না। অলস হয়ে থাকলেই মুদ্রার আর কোন মূল্য থাকে না। এ যুগের ব্যাংকে গিয়ে মুদ্রা যখন জমা হয়, তখন সে ব্যাংকের সিন্দুকে নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে থাকে না। লোহার সিন্দুক ভেদ করে মুদ্রা বাইরের জগতে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায়, তবেই সে আরও মুদ্রা প্রসব করে তা ব্যাংকাররা সুদ দেয়। ধনতান্ত্রিক মুদ্রা তাই সচল সজীব গতিশীল। প্রয়োজন মতন তার গতি কমানো-বাড়ানো যায় ঠিক যন্ত্রের মতন। তার জন্য অর্থনীতিবিদ্দের কত ফরমূলা আছে, যন্ত্রবিদ্দের যেমন যন্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল আছে। নতুন যন্ত্রযুগের সচলতা, সক্রিয়তা ও প্রচণ্ড গতিশীলতার আদর্শ প্রতিমূর্তি হ'ল মুদ্রা, টাকা. (সিমেল)।১৪

টাকা ধনতান্ত্রিক যুগের ধর্ম, টাকাই স্বর্গ। সবার উপরে টাকাই সত্য। টাকা শুধু গতিশীল নয়, সৃষ্টিশীল (creative)। টাকার গতিশীলতার উপর টাকার সৃষ্টিশীলতা নির্ভর করে। সেকালের 'সঞ্চিত ধন' একালের মূলধনের মতন সৃষ্টিশীল ছিল না। ধনতান্ত্রিক যুগে 'ক্যাপিটেল' হ'ল 'ক্রিয়েটিভ'। বিশাল প্রাসাদ অট্টালিকা প্রমোদ-উদ্যান আর স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে এ যুগে সঞ্চিত ধনের কবর দেওয়া হয় না। প্রাসাদ অট্টালিকা যে এ যুগে নেই তা নয়, ধনিক পুঁজিপতিরা যে তা তৈরী করেননি তাও নয়। কিন্তু টাকার প্রধান উদ্দেশ্য তা নয়। টাকার প্রধান ও মহান্ উদ্দেশ্য হ'ল, কারখানা থেকে কারখানায়, শ্রমশিল্প থেকে শ্রমশিল্পে, বাণিজ্য, ব্যাংক থেকে শত শত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে ঘুরপাক দিয়ে বেড়ানো এবং অনবরত বংশবৃদ্ধি করা। টাকার অভিযানের অন্ত নেই। যত বেশী, চলবে,

যত বেশী ঘুরবে, তত বেশী টাকার সৃষ্টিশক্তি বাড়বে। নর্তকী বাইজীর নাচের জন্ত সেকালের রাজা-মহারাজারা অনর্গল টাকা খরচ করতেন। একালের পুঁজিপতিদের সেই বেহিসাবী ব্যয়ের প্রয়োজনই নেই। সবই এ যুগে বেচা-কেনার পণ্যে পরিণত হয়েছে। টাকা নিজে রূপান্তরিত হয়ে সকলকেই রূপান্তরিত করেছে। মানুষও হয়েছে বেচা-কেনার পণ্য, মুনাফার শিকার। মধ্যযুগের নর্তকী প্রমোদ কানন ছেড়ে এ যুগের বাণিজ্য-কেন্দ্র শহরে বাস করছে, এখন তার দেহ-মন সবই পণ্য, সবই 'সৃষ্টিশীল মূলধন'। ধনতান্ত্রিক যুগের টাকার প্রজনন-শক্তি এত প্রচণ্ড, তার সৃষ্টিশক্তি এতই প্রবল যে নারীর প্রজনন-শক্তিকে ধ্বংস ক'রে তার বিরাট অংশকে সে বেচা-কেনার পণ্যে পরিণত করেছে।

কার্ল মার্কাস তাই বলেছেন, এ যুগের মুদ্রার ঘূর্ণাবর্তে যা পড়বে তাই সোনা হবে। সেকালের কোন মুনি-ঋষির হাতে এ রকম ভেল্কি খেলত না। মুদ্রাকে মার্কস 'Radical leveller' বলেছেন। এক দিক থেকে বিচার করলে মৃত্যুর চাইতেও শক্তিশালী 'লেভেলার' টাকাকে নিশ্চয়ই বলা যায়। কিন্তু কোন দিক থেকে? টাকা চূর্ণ করেছে মধ্যযুগের রক্তের দম্ভ, কুল-কৌলীন্তের ব্যবধান। যন্ত্রযুগে বংশগৌরব কুলমর্যাদা কিছু নেই। বংশানুক্রমিক পেশাগত শ্রেণীভেদও টাকা ভেঙে দিয়েছে। তার বদলে টাকা নিজের কৌলীন্ত সগৌরবে জাহির করেছে। টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম তো নিশ্চয়ই, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, স্তোত্রমন্ত্র সবই 'টাকা টাকা টাকা'। তাছাড়া টাকাই বংশ, টাকাই গোত্র, টাকাই শ্রেণী। নতুন যে শ্রেণীবিন্যাস এল সমাজে সে হ'ল টাকার বিন্যাস। সবার চাইতে বড় কুলীন টাকা, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ টাকা। রক্তের প্রবাহের (circulation) মতন যখন টাকারও বৈশিষ্ট্য হ'ল তার প্রবাহ, তখন 'রক্ত' হ'ল 'টাকা', সমাজের শিরা-উপশিরায় টাকারই প্রবাহ ছুটে চলল। 'টিক্-টিক্-টক্-টক্' ক'রে ঘড়ি বলল: "শাশ্বত মহাকালকে টুকরো টুকরো ক'রে কাটছি। প্রত্যেকটা সেকেণ্ড, প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা টিক্‌টিকানির মূল্য আছে।" প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে খেতে টাকা বলল: "টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম, টাকা বংশ, টাকা গোত্র, টাকাই জপতপ ধ্যান। ঘড়ির টিকটিকানির সঙ্গে টাকা-টাকা ক'রে জপ করো। হিসাব ক'রে প্রতি সেকেণ্ডে টাকা পয়দা করো, টাকার গতি বাড়িয়ে দাও। সময়ের যে মূল্য, যে হিসাব, সে হ'ল টাকার মূল্য, টাকার হিসাব।" মধ্যযুগ ছাড়িয়ে যন্ত্রযুগ ও ধনিক-যুগের প্রবেশ-দ্বারের সামনে যেন বড় বড় হরফে লেখা আছে:

TIME IS MONEY

প্রাচীন ও মধ্যযুগের দেব-দেবী, স্বর্গ-নরক, জিন পরী দৈত্য দানব ভূত প্রেত পিশাচদের নিয়ে অনন্ত অসীম রহস্যময় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যে শাশ্বত সনাতন মহাকাল, তা যন্ত্রযুগে, ধনতান্ত্রিক যুগে তালগোল পাকিয়ে কুঁচকে এই ছোট্ট 'টাইম ইজ মনি' কথাটির মধ্যে নব রূপান্তর লাভ করেছে। এখন আর মিনার, গম্বুজ বা অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বললে হবে না, 'হে ঈশ্বর!' এখন বলতে হবে, 'হে হিসাবের খাতা! হে লেজার!' এখন আর ভক্তি নয়, আবেগের চাপে কাঁপতে কাঁপতে মূর্চ্ছা যাওয়া নয়, ভাবালুতা নয়। এখন জমা-খরচের লাভ-লোকসানের কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব, বিত্তবুদ্ধির তীক্ষ্ণ বাণবিদ্ধ নির্মম নিষ্ঠুর যুক্তি। আবেগ ভক্তির স্যাঁতসেঁতে রহস্যলোক পার হয়ে ধনতান্ত্রিক যুগ বুদ্ধি ও যুক্তির বিশাল শুকনো খটখটে প্রান্তরে পা দিয়েছে। 'সময় আর টাকা'র মতন 'টাকা আর বুদ্ধি', 'টাকা আর যুক্তি' এক হয়ে মিশে গেছে। এই বুদ্ধি ও যুক্তির অভিযান টাকার অভিযানের মতই যুগান্তকারী।

নব জাগৃতির ধারা

'সমাচার দর্পণে'র সংবাদগুলি কেন সাধারণ সংবাদ নয়, জাতীয় সংবাদ, ঐতিহাসিক ঘটনা তা নিশ্চয়ই এই আলোচনার পরে পরিষ্কার বোঝা যাবে। ধানকল পাটকল, এক রকমের টাকা-পয়সা, ছাপাখানা, বাষ্পীয় জাহাজ, রেলপথ—এগুলি হ'ল এদেশের নব জাগৃতির প্রথম দূত। আগে যে ঘড়ি ও ভেনিসিয়ান কাচের কথা বলেছি, যে দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা বলেছি, তাও নিশ্চয়ই এদেশে আগে ছিল না। আর্যরা বা মুসলমানরা এই অর্থনৈতিক এজেন্টদের এদেশে নিয়ে আসতে পারেননি। এদেশের মাটিতে এদের উৎপত্তিও হয়নি। ইংরেজরা আসার পরে এই অর্থনৈতিক এজেন্টরা এদেশে এসেছে। এই অর্থনৈতিক এজেন্টরাই নব জাগৃতির বিপ্লবী অগ্রদূত। এদেশের স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা এই সব কলকারখানা, কোম্পানির টাকা-পয়সা, বাষ্পীয় জাহাজ, রেলপথ সর্বপ্রথম আঘাত করে চূর্ণ করেছে। শাশ্বত সনাতন মহাকালের গগনচুম্বী গম্বুজ এই বিপ্লবী অর্থনৈতিক দূতরাই ধূলিসাৎ করেছে। এদেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সর্বজনীনতা আত্মবিশ্বাস বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যুক্তির এরাই আদি গুরু। শাস্ত্র কুসংস্কার দেশাচার ও জনশ্রুতির বিরুদ্ধে এরাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। রামমোহন, দ্বারকানাথ, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র নেতৃবৃন্দ, বিদ্যাসাগর সকলের সংগ্রামের পথ এই বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক এজেন্টরাই পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। কলকারখানা, বাষ্পীয় শক্তি, সচল মুদ্রা এবং প্রিন্টিং প্রেস যদি না থাকত, তাহলে, রামমোহন-'ইয়ং বেঙ্গল'-বিদ্যাসাগর সমস্ত সকলের আন্দোলন ও আদর্শবাদ কবীর-দাদূ-চৈতন্যের মতন শূন্যে মিলিয়ে যেত। বলিষ্ঠতা উদারতা প্রগতিশীলতা জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ কোন কিছুরই বিকাশ হ'ত না এঁদের চরিত্রে। তাই ব'লে কল-কারখানা, বাষ্পীয়শক্তি, মুদ্রা ও প্রিন্টিং প্রেসের যান্ত্রিক সৃষ্টি এঁরা নন। যন্ত্র এঁদের চলার পথের আগাছা কেটে সাফ করেছে। নতুন অর্থনৈতিক শক্তি সমাজের জড়তা ও আত্মকেন্দ্রিকতার মূলে আঘাত করেছে। তাই এঁদের চলার বেগ প্রচণ্ড হয়েছে এবং সেই চলার পথে এঁরাও আবার সেই অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশের পথ আরও প্রশস্ত করেছেন। এই হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নব জাগৃতির ধারা। বাঙলার সংস্কৃতি সমন্বয়ের ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার জন্য এই প্রবাহের বিশেষ জোয়ার-ভাঁটা এই বাঙলা দেশেই সম্ভব হয়েছে এবং সেই জোয়ার-ভাঁটা উত্থান-পতনের তরঙ্গ-বিক্ষোভের প্রধান কেন্দ্র হয়েছে কলিকাতা মহানগরী। কারণ, নতুন যুগ নগরকেন্দ্রিক, গ্রামকেন্দ্রিক নয়।

* * * *

বাঙলার নব জাগৃতির প্রথম যুগে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। এখানেও নব জাগৃতির ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখা যায়। প্রতিভা'র বিকাশ

যদিও এ যুগেই সম্ভব হয়েছে, তাহ'লেও ঐতিহাসিক নিয়মেই নব যুগের গোড়াতে সেই বুদ্ধির ও সৃষ্টির প্রতিভা এবং কর্মীর প্রতিভা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল। বুদ্ধির সঙ্গে কাজের, শিল্পীর সঙ্গে উদ্‌যোগী শিল্পপতির ও কর্মীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ভন্‌ মার্টিনের ভাষায় বলা যায়, বাঙলার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের 'entrepeneur'রা একই ব্যক্তি ছিলেন। ইয়োরোপীয় নব যুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বাঙলা দেশেও অক্ষুণ্ণ ছিল। আপাতদৃষ্টিতে 'অদ্ভুত সাদৃশ্য' ব'লে মনে হলেও এ কেবল সাদৃশ্য নয়, অদ্ভুতও নয়, একই ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার প্রকাশ মাত্র। বাঙলার নব যুগের সমন্বয় সাধক রামমোহন কেবল সাধক ছিলেন না, ভাবরাজ্যেই তাঁর সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান কম দুঃসাহসিক নয়। তাঁর সরকারী চাকরী, কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা ও তেজারতি কারবার থেকে ধনসঞ্চয়ের স্পৃহা শাস্ত্রপন্থী না হলেও, যুগপন্থী। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রধান সহকর্মী দ্বারকানাথের স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যম সম্বন্ধে প্রশংসায় বৃটিশ ব্যবসায়ীরাও পঞ্চমুখ ছিলেন। সে কথা আগে বলেছি। ডিরোজিওর শিষ্য "ইয়ং বেঙ্গলের" নেতাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ অসাধারণ বাগ্মিতা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের জন্য অগ্রণী ছিলেন। রামগোপাল ইহুদী ব্যবসায়ী জোসেফের অফিসে কাজ করতেন প্রথমে, পরে কেলসল্‌ সাহেবের অংশীদার হয়ে 'Kelsall Ghosh and Co' প্রতিষ্ঠা করেন। শেষে 'R. G. Ghosh and Co' নামে এক কোম্পানি ক'রে রামগোপাল স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অর্থনৈতিক আদর্শ ছিল 'অবাধ বাণিজ্য'র আদর্শ, টিপিকাল 'free enterprise'এর আদর্শ। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অবদান যুগান্তকারী। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথমে (১৮৩১ সালে) "কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোম্পানীতে আমদানি রপ্তানির কাজ করেন। পরে ১৮৫৫ সালে দুই ছেলেকে নিয়ে "প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স" কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। "গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল কোং লিঃ" ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন প্যারীচাঁদ। তিনি "বেঙ্গল টী কোং," "ডারাং টি কোং লিঃ"এরও ডিরেক্টর ছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্যারীচাঁদের অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৮ সালে যখন "দি সোসাইটি ফর দি এক্যুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী তার যুগ্ম-সম্পাদক হন। "দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির (১৮৪৩) সভাপতি ছিলেন জর্জ টমসন, অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ। তিনি গোড়া থেকেই "দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" (১৮৫১), "বীটন সোসাইটি" (১৮৫১), "দি ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েল্টি টু এনিম্যালস" (১৮৬১) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বেভারলি সাহেব ও প্যারীচাঁদ "দি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের" (১৮৬৭) যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৮২০ সালে কেরী সাহেব এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য যে "এগ্রিকাল্‌চারাল এণ্ড হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া"র প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৪৪ সালে প্যারীচাঁদ তার সদস্য হন, কৃষি-বিষয়ে সোসাইটির জার্নালে অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং অনেক ইংরেজী প্রবন্ধের বাঙলায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন। এই হ'ল বাঙলার প্রথম সামাজিক উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলালের" লেখক প্যারীচাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এছাড়া শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক উন্নতির জন্য উনবিংশ শতাব্দীর ধনিক ব্যবসায়ী শেঠ-শীল-মল্লিকদের দানও কম উল্লেখযোগ্য নয়। কর্মীর উদ্যম, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর প্রতিভার অপূর্ব সংমিশ্রণ এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগৃতির প্রথম যুগে সম্ভব হয়েছিল। এই সংমিশ্রণ এই সমন্বয় ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক।

বাঙলার নব জাগৃতির ধারা বাধা-বন্ধনহীন সমতল ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়নি। কোন আন্দোলনই তা হয় না। তার উত্থান-পতন আছে, জোয়ার-ভাঁটা আছে, দ্বন্দ্ব ও তরঙ্গ আছে। রামমোহনের যুগ প্রধানত ভাবকেন্দ্রিক সমন্বয়ের যুগ। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ ও সামাজিক আন্দোলন গৌণ, আদর্শ-লোকের সংগ্রামে সামান্য বাস্তব রূপ ও পরীক্ষা মাত্র। তাঁর বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ, তাঁর নতুন জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধের সমন্বয়ের মধ্যেই তাঁর সংগ্রামের সার্থকতা। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি ক'রে তাকে সমীকৃত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা 'ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এ-আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। শ্রেষ্ঠ জীব বলে দেবতাদের অস্তিত্ব রামমোহন স্বীকার করেছেন, ব্রহ্মের অবতার না স্বীকার করলেও রাম কৃষ্ণ বুদ্ধকে অবতার ব'লে মেনেছেন। পুরাণ-তন্ত্রাদি, জাতিভেদ, দেশাচার ইত্যাদি তিনি একেবারে বর্জন করতে পারেননি। বেকনের চার শ্রেণীর 'idols'এর বিরুদ্ধে রামমোহন অভিযান করেছিলেন সত্য, কিন্তু কুসংস্কারের সমস্ত মানসপ্রতিমা ও প্রেতাত্মাগুলিকে তিনি ধ্বংস করতে পারেননি। এই ধ্বংসের কাজ প্রধানত 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের নেতাদেরই করতে হয়েছে; ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিষ্টদের মতন তারা সমস্ত ধর্মবিশ্বাস, দেশাচার, জনশ্রুতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। যে নতুন শক্তি রামমোহনের যুগে 'সঞ্চিত' হয়েছিল, তাকে আরও গভীর ক'রে 'ইয়ং বেঙ্গলের' নেতৃবৃন্দ ব্যাপক ভাবে সমাজের বুকে 'সঞ্চারিত' করেছিলেন। তাঁরা ইয়োরোপের "বাঙালী সংস্করণ" ছিলেন না। তাঁরা বাঙলা দেশেরই মানুষ ছিলেন এবং দেশের মঙ্গলের কথাও ভুলে যায়নি। ব্রাহ্ম-সমাজের পরিণতি অথবা 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের একদেশদর্শিতা ও উগ্রতা পরের কথা, আর এক দিকের কথা। রামমোহনের যুগ থেকে 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুগের গভীরতা ও ব্যাপকতাই এখানে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাপক শক্তি-সঞ্চার ও আলোড়নের ফলেই নব জাগৃতির প্রবাহ উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে এবং পরে সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচণ্ড গতিশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রে আত্মস্থ হয়েছে। এই ধারাতেই সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এই ধারাই বিংশ শতাব্দীর বিস্তৃত ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারের সঙ্গে মিশে গেছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও এই ধারা রামমোহন—দেবেন্দ্রনাথ—অক্ষয়কুমার—রাজেন্দ্রলাল—বিদ্যাসাগর—প্যারীচাঁদ—মধুসূদন—বঙ্কিমচন্দ্র—হেমচন্দ্র—নবীনচন্দ্র—বিহারীলাল—রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে প্রবাহিত হয়েছে। প্রথম যুগে

ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাঙলা ছাপার হরফ তৈরি হয়েছে এবং বাঙলা গদ্য জন্মগ্রহণ ক'রে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ক'রে এগিয়ে গেছে। আগের যুগের সামাজিক জড়তা, স্থিতিশীলতা ও আদিম সরলতার মধ্যে বাঙলা গদ্যের বিকাশ সম্ভব হয়নি, হতে পারে না, পৃথিবীর কোন দেশেই হয়নি, কারণ ভাষা ও জীবন, ভাষা ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। তাই সমাজ যখন সচল, সক্রিয় ও জটিল হয়ে উঠল, মানুষের জীবনের সামনে বিবিধ সমস্যা দেখা দিল, তখন ভাষাকেও আর অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত কাব্যের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে রাখা সম্ভব হ'ল না। সমস্ত জটিলতাকে আত্মসাৎ ক'রে বাঙলা গদ্যের ধীরে ধীরে বিকাশ হ'ল, সামাজিক নক্সা ও উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে উপন্যাসেরও জন্ম হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা গদ্য ও উপন্যাসের পূর্ণ বিকাশ হ'ল।

নব জাগরণের এই ধারার পাশাপাশি আর একটি ধারাও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারাকে আমরা রাধাকান্ত—ভূদেব—রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের ধারা বলতে পারি। এই দুই ধারা ঠিক প্রগতি (Progress) ও প্রতিক্রিয়ার (Reaction) দু'টি পরস্পর-বিরোধী নির্দিষ্ট ধারা নয়। নব জাগৃতির প্রথম প্রচণ্ড গতিশীলতার যুগে বিরোধ তীব্র উগ্রমূর্তি ধারণ করেনি। প্রগতির সাধারণ ধারাই নতুন পুরাতনকে সমীকৃত ক'রে নিজস্ব গতিবেগে সমন্বয়ের প্রশস্ত পথে প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই দ্বিতীয় ধারাটি প্রতিক্রিয়াশীলতার বাঁধা-ধরা খাতে বইতে পারেনি। তাকে শুধু বিরোধিতার (Opposition) ধারা বলা যায়। এই ধারার 'দুর্বলতা' তার 'উদারতার' মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। রাধাকান্ত-ভূদেবের ভিতর দিয়ে এই ধারার চরম প্রকাশ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে হয়েছে। রাধাকান্ত-ভূদেবের ধর্মগোড়ামি ও সামাজিক উদারতা শেষে রামকৃষ্ণের প্রাকৃতিক মানবতাবোধ এবং বিবেকানন্দের ধর্ম ও মানুষ, আশ্রম ও সমাজ, শাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে আরও ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার নূতনত্ব, তার বিচার-বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করাই এ ধারার বৈশিষ্ট্য। যা কিছু নতুন মহান্ উদার তা সব এদেশেই আছে। ধর্ম আশ্রম মঠ সবই থাকল কিন্তু তাও যে কত মহান্, কত মানবিক, কত উদার, কত গতিশীল, এমন কি কত দূর সমাজতান্ত্রিক পর্য্যন্ত হ'তে পারে, বিবেকানন্দ তা শুধু এদেশের লোককেই বললেন না, বিদেশেও প্রচার করতে গেলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ ব্যর্থ হ'লেন। নতুন ভাবধারাকে সমীকৃত ক'রে সমৃদ্ধ হওয়াই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং তাকে আরও গভীর ভাবে আবেগভরে আপনার করে নেওয়া বাঙলার বিশিষ্টতা। আবেগ নিষ্ঠা বলিষ্ঠতা উদারতা ও গভীর মানবতা-বোধের মধ্যে বিবেকানন্দের চরিত্রে বাঙলার বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। বিবেকানন্দ নব যুগের বাঙলার শ্রীচৈতন্য। কিন্তু বাঙলার নব জাগৃতির যুগ রামমোহন—দেবেন্দ্রনাথ—অক্ষয়কুমার—কেশবচন্দ্রের যুগ, ডিরোজিও—টমসন—কৃষ্ণমোহন—রামগোপাল—দক্ষিণারঞ্জনের যুগ, বিদ্যাসাগর—রাজেন্দ্রলালের যুগ, মধুসূদন—প্যারীচাঁদ—বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথের যুগ। শ্রীচৈতন্যের যুগ শেষ হয়েছে। বিবেকানন্দের যুগও শেষ হয়ে গেল। রাধাকান্ত—ভূদেব—বিবেকানন্দের ধারাই পরবর্তী যুগে পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীলতার খাতে প্রবাহিত হয়েছে। জাগৃতির ধারা, প্রগতির ধারা যত দ্রুত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, বৃহত্তর সমন্বয়ের পথে এগিয়ে গেছে, রাধাকান্ত—ভূদেব—বিবেকানন্দের ধারাও তত দ্রুত সংকুচিত হয়েছে, তার উদারতা ও মানবতাবোধ বর্জন করে সংহত প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক রূপও বদলে যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াশ্রেণী শৈশবকাল উত্তীর্ণ হ'য়ে যৌবনে পা দিচ্ছে, নিজের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর উদারতা, মানবতা ও আন্তর্জাতিকতা-বোধই আজ সাবালক বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে ভীতিপ্রদ 'সোশ্যালিজমের' রূপ ধারণ করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলতা তাই 'আর্য্য সংস্কৃতি,' 'নব্য হিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতি', এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে শক্তিশালী ও সংহত হচ্ছে। বিরোধ তীব্রতর হচ্ছে, স্পষ্টতর হচ্ছে। বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া শ্রেণীর শৈশব কালের উদারতা, মানবতা, স্বাধীনতার বাণী আজ তাই সংকীর্ণতা, বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার গর্জনে পরিণত হচ্ছে। সংকটের সময় সোশ্যালিজম বিরোধী ধর্মযুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলতার আবর্জনা-স্তূপ ঘেঁটে ধর্ম শাস্ত্র হিংসা সাম্প্রদায়িকতা অধ্যাত্মবাদ আত্মা-পরমাত্মা প্রভৃতি ভূত-প্রেতদের জড়ো করতেও আজ তাই বুর্জোয়া শ্রেণী পশ্চাদ্‌পদ নয়।

কিন্তু জাগৃতি ও প্রগতির ধারা ঐতিহাসিক নিয়মেই বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রবাহিত হবে। প্রবাহের পথে সংঘাত ও বিরোধ তীব্রতর হবে। হওয়া স্বাভাবিক। রামমোহন 'সোশ্যালিজম' সম্বন্ধে রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে বিলাতে তর্ক করেছিলেন। 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের' মূল সূত্রগুলি তিনি জানতেন। বেকন-লক, ফরাসী এনসাইক্লোপিডিষ্টরা, ফরাসী-বিপ্লব, রামমোহনকে বিশেষ করে নব্য বাঙলার নেতাদের উৎসাহিত করেছিল, নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। সেই পথে তাঁরা নির্ভয়ে অভিযান করেছিলেন। তাঁদের অভিযান ব্যর্থ হয়নি। বিংশ শতাব্দীর রুশ-বিপ্লব আর এক যুগান্তরের প্রেরণা দিয়েছে। রবার্ট ওয়েন থেকে মার্কস-এঙ্গেলসের পথে লেনিনের যুগ পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে পৃথিবী সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি। বিদেশের কোন বিপ্লব, কোন স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাতে রামমোহনও কুণ্ঠিত হননি। নেপলসবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যর্থতায় রামমোহন যে শুধু বেদনা বোধ করেছিলেন বা ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়তে দেখে তিনি যে শুধু "ধন্য, ধন্য, ফ্রান্স" ব'লে অভিনন্দন জানিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়। রামমোহন বলেছিলেন: "স্বাধীনতার শত্রু আর স্বেচ্ছাচারিতার মিত্র যারা, তাদের জয় ইতিহাসে হয়নি কোন দিন, হবেও না ভবিষ্যতে।" এ যুগে নির্ভয়ে তাই রুশ-বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নকে বাঙালী তথা ভারতবাসী অভিনন্দন জানাবে। বাঙলার নব জাগৃতির এ যুগের উত্তরাধিকারীরা তাই নির্ভীক চিত্তে লেনিন—গোর্কি—রোঁলা-রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে সমীকৃত করবে। বাঙলার জাগৃতি-ধারা, বাঙলার সমাজ সংস্কৃতি দৃঢ়পদে বলিষ্ঠ চিত্তে 'সোশ্যালিজমের' প্রশস্ত পথে বৃহত্তর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে।

মুসাফির

আজকাল ক'লকাতার Busএ যাওয়া মানে খণ্ডযুদ্ধবিশেষ। স্মরণ হয়, একদা এক বিদেশী বন্ধু ব'লেছিলেন "যে দেশে মানুষ এই রোদের তাপে মাইলের পর মাইল অমন ভাবে ঝুলতে ঝুলতে যেতে পারে, সে দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈনিকের অভাব হয় কেন?"

একটা ঘাঁটিতে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গর্জাচ্ছে—সেটা ছাপিয়ে শোনা গেল "দেশী চিরুণী নেবেন?" এ জিনিসটি দুর্লভ হয়েছে ফলে বাড়ীর উদগ্র দেশসেবিকাদের চুল বাঁধা দুষ্কর হয়েছে। ফুটপাতে রঙ-বেরঙের আমেরিকান ও বিলিতি চিরুণীর ছড়াছড়ি, কিন্তু দেশী ছাপওয়ালা দেখি না। চট্ করে একটি কিনে নিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতি ছুটে মনের অন্দর-মহলে কাঁটালতা-ঘেরা লুপ্তচিহ্ন দুয়ার খুলে গেল। প্রথম কুঠুরীতে একটি মেয়ের দেখা পেলুম—১৯৩০ সালের আন্দোলনে ব্রতী—খাদি কাপড় ফিরি ক'রছে। আরও ভেতরে গিয়ে চোখ প'ড়ে গেল এক বলিষ্ঠ যুবকের ওপর।

১৯২১ সাল; এমনই অনিশ্চিতের জগৎ—উত্তেজনাময়ী নগরী—কি এক জরুরী কাজের জন্য ট্রামের ষ্টপে দাঁড়িয়ে আছি; হঠাৎ ভরাট মৃদু-মধুর কণ্ঠে শুনলুম "স্বদেশী দেশলাই নেবেন?" চমকে উঠলুম—কে যেন অতি সন্তর্পণে গোপন কথা বললো কাণে কাণে; চেয়ে দেখি এক সুন্দর যুবক—গান্ধীজীর চেলা। সম্ভ্রান্ত-ঘরের ছাপ তার সর্বাঙ্গ ঘিরে আছে—স্বদেশী প্রচারের ঝোঁকে ফেরীওয়ালা সাজার সঙ্কোচে যেন আচ্ছন্ন। খুব ব্যক্তিত্বসূচক চেহারা। শিল্পী-সুলভ ব্যঞ্জনামাখা মুখ, দৃপ্ত দৃষ্টি, দৃঢ়তাসূচক নাক ও ঠোঁটের গড়ন, পেশীবহুল বলিষ্ঠ ঋজু দেহ, মৃদু গৌরবর্ণ, ঘন অযত্নবিন্যস্ত চুল। অদ্ভুত তার হাসি ও কণ্ঠস্বর। এ গানের গলা নয়—কথা বলার গলা—আত্মীয়তার রণণ লেগেই আছে। কিন্তু কিসের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার দ্বন্দ্বে যেন চঞ্চলচিত্ত। নগ্নপদ, পরণে মোটা খাটো খদ্দর, গায়ে উত্তরীয়।

মনটা ভ'রে গেল—এই তো চাই—এমন পৌরুষমাখা দেহ ও সবল চরিত্র। অহিংসার বীর্য্যের পথে কি শীর্ণশুষ্ক প্রাণহীন ভীরু যাত্রী মানায়? এমন পুরুষসিংহই তো চাই যে ইচ্ছা ক'রলে দু'-চার জন অত্যাচারীকে ধরাশায়ী ক'রতে পারে, কিন্তু সহজ সংযম ও শান্তি-প্রিয়তার বিশ্বাসে অধর্ম ক'রবে না—যে শক্তিসত্ত্বেও শক্তির সংযম [illegible] ব'লবে—অপরাধের [illegible] !

নিমেষের মধ্যে তার ঝুলিভরা দেশলাই নিঃশেষ হোল—বলা বাহুল্য, দেশ-প্রীতির তাগিদে নয়, তার সুদর্শন যৌবনের মোহে।

আমার কাজের তাগিদ পড়ে রইল। মানুষটির সঙ্গে আলাপ করার জন্য এগিয়ে গিয়ে বললুম "দু',-একটা প্রশ্ন ক'রতে পারি কি?"

সেই বিশেষ ভঙ্গীতে হেসে ব'ললে, "নিশ্চয়, বলুন।"

"আপনি কি এই অঞ্চলে থাকেন?"

"আজ্ঞে না," ব'লে যে ঠিকানা দিল সে প্রায় এই বীডন ষ্ট্রীট হ'তে মাইল তিনেক দূরে।

"তবে এখানে এত দূরে ওগুলো বয়ে নিয়ে এসে কষ্ট করে ফিরি ক'রছেন কেন?"

একটু আমতা-আমতা করে কুণ্ঠিত স্বরে ব'ললে, "এদিকে—মানে—ঐ চলতে চলতে আসা আর কি—এদিকে নতুন পাড়ার মানুষ—অন্য বন্ধুরা তো আমাদের এলাকায় আছেই।"

ঈষদারক্ত মুখ দেখে অনুমান ক'রলুম, এ কাজে ওকে আদর্শবাদ ঠেলে পাঠিয়েছে, কিন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য বাধা সৃষ্টি ক'রছে—পরিচিত জনের মাঝে বিক্রি ক'রতে আড়ষ্টবোধ করে। পোষাকটাও ঐ মতের সমর্থন জানাচ্ছিল। বললুম, "বেলা তো প্রায় বারোটা—খাওয়া হ'য়েছে?"

"আজ্ঞে না, এই তো যাব—বেশী আর কি বেলা হ'য়েছে।"

ওর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ওর সঙ্গে চ'লতে সুরু ক'রলুম। প্রচণ্ড গরম—রাস্তার পীচ গ'লে তলতল ক'রছে—অসহ্য তাপ লাগছে তবু খালি পায়ে হেঁটেই চ'লেছে। বুঝলুম, এও নবলব্ধ আদর্শের কিছু অঙ্গ—বোধ হয় অযথা ব্যয়বাহুল্য করা হবে না এই দরিদ্র শোষণক্লিষ্ট দেশে। লক্ষ্য ক'রলুম, মাঝে মাঝে পথের পাশে পা ধুয়ে নিচ্ছে; ভাবলুম—তাপের জন্য এমন ক'রছে—কিন্তু এ যে হিতে বিপরীত হবে—ফোসকা প'ড়বে। মুখটাও কেমন বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠছে।

"বড় কষ্ট হ'চ্ছে গরমে—না?"

"আজ্ঞে না, পথে এমন থুতু—ময়লা—মনে হচ্ছে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।"

যেমন হাসি পেল—তেমনই মায়া হোল—সর্বহারার এক জন হবার এ কি কৃত্রিম প্রয়াস! সস্নেহে একবার চেয়ে দেখলুম। করুণা ক'রতে দ্বিধা হয়, 'আহা' তো বলাই চলে না।—অতি ভদ্র এবং সতেজ ব্যবহার—সকল কথায় আগে 'আজ্ঞে' জুড়েই আছে।

"আপনি কি আমার বাড়ীর কাছেই যাবেন বুঝি?"

"বাড়ীর কাছে নয়—তোমার বাড়ীতেই যাব। আপত্তি আছে কি—আমি গোয়েন্দা নই কিন্তু"—তুমি অজ্ঞাতে বেরিয়ে গেল।

দৃপ্ত উত্তর হোল, "গোয়েন্দা হলেও আপত্তি ছিল না—আমি গান্ধীশিষ্য— গোপন ষড়যন্ত্র কিছু নেই।"

কেন যাচ্ছি এ বিষয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। একটা মানানসই গাম্ভীর্য্য ও দূরত্ব যেন ওর স্বভাবসিদ্ধ। আমার প্রবল কৌতূহল—তাই চললুম সাথে সাথে।

যা আশা ক'রেছিলুম—তা পেলুম না। অভিজাত-ঘরের বিরাট ফটকওয়ালা বাড়ী নয়, চাকর-দারোয়ান ছুটে এল না। একটি ভাড়াটে বাড়ীর এক অংশে বাস—তালা খুলে ঢুকলো। ঘরটা নিতান্ত নিরাড়ম্বর—শয্যা ও রাশীকৃত বই। পাশে ছোট ঘেরা বারান্দায় [illegible] আমাকে ব'সতে ব'লে—[illegible]—সেই

পাকশালায় ঢুকলো। কয়েকখানা বিজ্ঞানের ভারী ভারী বইয়ে নজর প'ড়লো—কিছু পরে ধোঁয়ায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। চেয়ে দেখি একটা ইকমিক বসান—একটা আঙ্টির ওপর—সেটা কাগজে কয়লায় ঠাসা—নীচে প্রচুর ফুঁ এবং দেশলাই কাঠির অপব্যবহার হচ্ছে, তবু অগ্নিদেবের আবির্ভাব হয় না। অনাবৃত পিঠ ও মুখ স্বেদস্নাত—চক্ষু রক্তবর্ণ অশ্রুসজল। এ কাজে নেহাৎ অপটু—বোধ হয় প্রথম এক্স্‌পেরিমেণ্ট চ'লছে। আমিও আনাড়ী—কি ক'রবো ভাবছি, হঠাৎ পাশের দরজা খুলে এক বিধবা বেরিয়ে এলেন—হাতে ঢাকা খাবারের থালা। সেটা মাটিতে রেখে বললেন, "বিজু, তুমি কি আমাকে বাড়ীছাড়া করে স্বস্তি পাবে? তোমার অত্যাচারের একটা সীমা থাকা উচিত বাবা, আর যে সয় না। কাছে মা নেই ব'লে আমাকে এমন ক'রে বিঁধলে বিশ্বনাথের কাছে অপরাধ হয়। আমিও যে সন্তানের জননী।"

খুব অপ্রস্তুত-মুখ ক'রে শিশুসুলভ প্রসন্নতামাখা হাসি হেসে ব'ললে, "আজ কেন যেন উনুনটা ধরছে না, কি একটা গোল বেধেছে—আপনি একটু দেখুন না।"

"না, আমার অত নষ্ট করার মতো সময় নেই।—এই একপ্রস্থ বেঁধে-বেড়ে আবার তোমার ঐ ছ'পয়সা মাপের অখাদ্য রাঁধতে পারি না। আজ কেন—ভজুয়াই তো রোজ ও-পিণ্ডি পাকায়—তুমি কখনও জীবনে উনুনে আঁচ দিয়েছ—দিয়েছ কেন—কখনও দিতে দেখেছ? আমি ক'দিন এ-সব অরাজকতা লক্ষ্য করছি—অরুণের কাছ থেকে তোমার মায়ের ঠিকানা জেনে নিয়ে খবর পাঠিয়েছি। তিনি এসে তোমার যা-হোক ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত আমার ওখানে খাবে। যদি এ কথা অমান্য কর তো আমি ভিটে ছেড়ে চলে যাব। তখন কে ভেবেছে এমন পাগলা ছেলে আসবে—এমন আনন্দে ভাড়ার টিকিটখানা ছিঁড়ে রেখে খালি বাড়ী ফেলে রাখতুম। কাগজগুলো বের ক'রে ধোঁয়া থামাও—আর খেয়ে নাও। পরে থাল নিতে লোক পাঠাব, আবার ধুতে যেও না যেন।" একটু নিম্নস্বরে প্রায় আপন-মনে ব'লতে ব'লতে চ'লে গেলেন "কোন বড় ঘরের একমাত্র ছেলে এমন ছন্নছাড়ার মতো জীবনটা মাটি ক'রছে—এ কি দেশ উদ্ধারের গেরোয় ধরেছে বাবা! দেশকে ভালবাসলে—তার মঙ্গল করতে গেলে কি নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে হয়—যত অনাছিষ্টি কাণ্ড।"

ছেলেটির মুখখানা কোমলতার ছোঁওয়ায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। নীরবে খেয়ে নিয়ে থালাটা ঠেলে রাখলো। বুঝলুম, এখানে ওর পরাজয়-স্বীকারে আপত্তি নেই।

"তোমার নাম কি?"

"বিজয় রায়"

"বাঃ, সার্থক নাম রেখেছেন তো বাপ-মা। সত্যিই তুমি বিজয়—তোমার প্রতিটি ভঙ্গী জয়সূচক। এ আত্মনিগ্রহ কত দিন চলছে?"

"আত্মনিগ্রহ ব'লছেন কেন? আত্মোপলব্ধি বলুন। বেশী দিন নয়। দেখুন কি বিপদ—ইংরেজ সরকারের সঙ্গে লড়া যায়, কিন্তু এঁদের স্নেহের কাছে হার-স্বীকার করতেই হবে।"

অসহযোগ আন্দোলন, ভারতের ভাবী কর্ম্মপন্থা, গান্ধীজীর নূতন যুগান্তকারী বাণী—এসব বিষয়ে দু'-চার কথার পর উঠলুম।

কেমন যেন মায়া প'ড়ে গিছলো ছেলেটির 'পরে। দিন কয়েক পরে ঐ সময়েই গেলুম—উদ্দেশ্য, খাওয়ার সময় নিশ্চয় বাড়ীতে পাওয়া যাবে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল চাকর—এই ভজুয়া হবে। জানালো—বাবুরা এখনই আসবে—একটু অপেক্ষা ক'রলে দেখা হবে। বসলুম। আজও রান্না হচ্ছে ভজুয়ার তত্ত্বাবধানে।

জিগেস ক'রলুম, "কি রাঁধছো?"

"কে জানে বাবু—এদের কি সব মর্জ্জি—সব চীজ একসাথ দিয়ে পাকাতে বলেছে। এ কি সোমরস ব'নবে—এতে তো পঞ্চরস ভী আছে—ও খাটটা-মীঠা-কড়ুয়া-নমক সব আছে—আনাজও আছে। ও তো আবার ছ'পয়সা মাপের আছে—জ্যাদা হবে না কিছুতে।"

"সোমরস, সে আবার কি?"

আজও পূর্ব্ববৎ দরজা খুললো—সেই স্নেহময়ী অন্নপূর্ণামূর্ত্তি দেখা দিলেন।

"কি রে, আজ আবার রান্না কেন?"

"বাবুর হুকুম আছে মাইজী।"

"কি রাঁধছিস দেখি—ও মা—এ হরতুকী পর্য্যন্ত দিয়ে কি পাঁচন হচ্ছে রে?"

"কেয়া সোমরস—দেওতারা খাইতেন।"

"সোমরস না যমরস। এই যে বিজু,—আজ কি ব্যাপার বল তো?"

সদ্য আগত যুবকদ্বয়ের মধ্যে বিজয় ব'ললে, "আজ্ঞে, আজ অরুণ খাবে কি না তাই একটু রান্না হচ্ছে—মানে—নতুন প্রক্রিয়া আর কি—ঐ পঞ্চরস মিশিয়ে—

"অমৃত—না? অখাদ্যব্রত, ছ'পয়সার খোরাক এ-সব ছাপিয়ে আবার কিছু মাথায় গজিয়েছে বুঝি? তা হরতুকী কেন তরী-তরকারীর মধ্যে?"

"ওটা কষায়—কষায় আর কিছু খুঁজে পেলুম না তাই"

'বরটা কষায় ক'রে বিবাগী হয়ে গেলে হাড় জুড়োয় বাপু। নেমন্তন্ন ক'রে ঐ পরমান্ন খাওয়ান হবে বুঝি অরুণকে?"

সঙ্গের বন্ধুটি ব'লে উঠলো, "না, এটা আমার মাথায় প্রথম আসে, তা বাড়ীতে তো করার সুযোগ নেই, তাই বিজুর এখানে ব্যবস্থা হয়েছে—নেমন্তন্ন কেন?"

"বেশ হয়েছে। তোমরা এ-বাড়ী ছেড়ে কবে যাবে ব'লতে পার? জেলে গিয়ে লপসি-যপসি খেলেও এর চেয়ে ভাল। তা'ছাড়া চোখের ওপর এ দুঃখু-দুর্দ্দশা দেখতে হয় না। হ্যাঁ রে, তোদের বুঝি শরীরকে নানা দিক থেকে বেঁধে না মারলে দেশসেবার তপস্যা হয় না?"

আজ আর বিজয়ের মুখের কাঠিন্য দ্রব হোল না। বললে "দেখুন, আজ কিন্তু আপনার খাবার চ'লবে না। আজ এটা খাব মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, তা'ছাড়া রোজ রোজ ঐ বেশী দামী খাবার খেয়ে সঙ্কল্পচ্যুত হওয়া ঠিক না।"

আশ্চর্য্য এই ভদ্রমহিলা। তাপহীন স্নেহ-সজল কণ্ঠে ব'ললেন, "বেশ তো বাবা, তোমার ব্রতে আমি বাধা দেব না। তবে আমার এ থালার জিনিসও এখানে থাক না—ক্ষতি কিছু হবে না—না হয় ভজুয়াই খাবে'খন।"

ভজুয়া এ সংবাদে পরম আশ্বস্ত বোধ ক'রলো। বিজয় এইবার আমাকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে উঠলো, "আপনি কখন এলেন? আপনার খাওয়া হয়েছে?"

হেসে উত্তর ক'রলুম, "বিলক্ষণ। দেখতে এলুম এখানেই আছো না নিজ-বাড়ীতে গেছো।"

দু'জনে খেতে ব'সলো—মাঝে সেই সোমরসের পাত্র। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে "মন্দ হয়নি তো" ইত্যাদি ব'লেও বিশেষ অপ্রসন্ন হ'তে পারলো না। যতক্ষণ এরা খাচ্ছিল—অন্তরাল থেকে কারো স্নেহদৃষ্টি লক্ষ্য ক'রছিল বোধ হয়। আহারান্তে তিনি এসে ব'ললেন, "প্রতিজ্ঞা তো পালন করা হোল বাবা, এখন তো এ-বেলার খাওয়া শেষ হয়েছে—এবার আমার খাবার একটু মুখে দিলে কিছু দোষ হবে না" ব'লে মতামত প্রকাশের অবকাশ না দিয়ে দু'জনের পাতে নানা মুখরোচক অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন ক'রলেন। তারাও যেভাবে সে বস্তুগুলোর সদ্ব্যবহার ক'রলো তাতে মনে হোল, ঐ পঙ্করসে আর পিত্তরসে ক্ষুধার উদ্রেক মাত্র ঘ'টেছিল—এখন তা নিবৃত্ত হচ্ছে।

তৃপ্ত-মুখে মহিলাটি ব'ললেন, "অরুণের আজ নেমন্তন্ন ছিল তাই তোমার বাঁধা খরচের অঙ্ক বেড়ে গেল—সে জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ো না বা নিজের প্রতি কঠোরতর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিও না—অতিথি ফকির এলে নিয়মের ব্যতিক্রম করার হুকুম শাস্তরে আছে।'

এটা সর্বার্তিহারী মায়ের অন্তরশাস্ত্রের নির্দেশ। বিজয়কে জয় ক'রেছে যে হৃদয় তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। এঁদের স্পর্শে সকল ক্ষতিই পূরণ হয়—সব দুঃখ সুখ হয়।

"বীডন্ ষ্ট্রীট, উতার যাইয়ে" শব্দে চমক ভাঙলো, তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পথচারী এক ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা লেগে গেল। লজ্জিত হ'য়ে মাপ চাইবার আগেই তিনি মধুর হেসে বললেন, "ও কিছু নয়—এত ভীড়ে অমন হ'য়েই থাকে।"

এ রুক্ষ অধৈর্য্যের দিনে এমন দুর্লভ ভদ্রতা বড় ভাল লাগলো। মনে হোল, গলাটা বড় দরদী—আর ঐ হাসি যেন আমার নিতান্ত পরিচিত। এঁর পরণেও খাদি আর এই তো সেই বীডন্ ষ্ট্রীট। সহসা জিগেস ক'রে ফেললুম "আপনার নামটা দয়া ক'রে বলবেন?"

"বিজয় রায়।"

পুস্তক সমালোচনা

"মাসিক বসুমতী"র গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠকবর্গ ও লেখকগোষ্ঠী অনেক দিন হইতে চিঠিপত্র লিখিয়া "পুস্তক সমালোচনা" বিভাগ খুলিবার জন্য আমাদের অনুরোধ করিতেছেন। এই অনুরোধ পূর্ব্বেই আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম, কিন্তু গতানুগতিকভাবে পুস্তক সমালোচনা করিয়া কোন লাভ নাই বলিয়া, আমরা এই 'বিভাগ' এত দিন ইচ্ছা থাকিলেও খুলিতে ভরসা পাই নাই। শেষ পর্য্যন্ত, পাঠক ও লেখকদের অনুরোধে এবং প্রয়োজনেও বটে, আগামী **আষাঢ় সংখ্যা** হইতে আমরা "মাসিক বসুমতীতে" পুস্তক সমালোচনা নিয়মিতভাবে আরম্ভ করিব ঠিক করিয়াছি। সমালোচনা যাহাতে নিরপেক্ষ সাহিত্যালোচনা হয়, তাহাই আমাদের লক্ষ্য হইবে। উচ্চশ্রেণীর বিদেশী পুস্তক এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত পুস্তকের সমালোচনাও আমরা প্রকাশ করিব।

সমালোচনার জন্য লেখক ও প্রকাশকরা দুইখানি করিয়া বই পাঠাইবেন এবং "মাসিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্য" এই কথা লিখিয়া দিবেন। আমাদের বিচারে যে বই সমালোচনার যোগ্য নয়, তাহা আমরা সমালোচনা করিব না, প্রাপ্তি স্বীকার করিব মাত্র।

মাসিক বসুমতী

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন উপন্যাস

প্রণব এক দিন বলেছিল : জানো, জীবনে যার বিশ্বাস নেই, সে মরেও সুখ পায় না।

দর্শনের সূত্রের মত এমন ছাঁকা কথাটা সে কি প্রসঙ্গে বলেছিল মণির মনে আছে। প্রণবের সঙ্গেই সেকেণ্ড ইয়ারে বিজ্ঞান পড়ত একটি ছেলে, নাম তার আশীষ,—সে সায়ানাইড খেয়ে মরেছিল। চশমা-পরা সুশ্রী লাজুক ছেলেটিকে মণি কত দিন চা খাইয়েছে কিন্তু কোন দিন তার লজ্জা ভাঙতে পারিনি। ঘটনাচক্রেও সে একটি বার মণির চোখে চোখে তাকিয়েছে কি না সন্দেহ। প্রণবের তীব্র ব্যঙ্গ মণি ভোলেনি।—একটু ভদ্রতা রেখেছে, সায়ানাইড খেয়েছে, গলায় দড়ি দেয়নি। ছেলেরা যখন ফাঁসিতে ঝুলছে তখন গলায় দড়ি দিলে—?

প্রণব তখন ভাবপ্রবণ ছিল, গলায় গলায় ভাব ছিল মণির সঙ্গে। তার মনও গভীর ভাবে নাড়া খেয়েছিল, এক সুরে বাঁধা দু'টি মন হলে একের ঝঙ্কারে অপরটি যেমন সাড়া দেয়। জীবনে বিশ্বাস, মরণে সুখ! কোন্ জীবন? কি বিশ্বাস? এ প্রশ্নের জবাব মণি কখনো জানেনি। জীবিতের সুখ-দুঃখকে মরণের সঙ্গে জড়ানো তার অদ্ভুত মনে হয়েছে। বিশ্বাসের জন্য মরেও সুখ আছে, এটা চলতি কথা, সবাই জানে। কিন্তু সে হল বিশ্বাসের জন্যই জীবন আর বিশ্বাসের জন্যই মরণের কথা, তেমন আর ক'টা লোকের হয়? সংসারে সাধারণ মানুষের যে জীবন, সুখ-দুঃখের যে ঘটা, তাতে বাঁচার মধ্যেই সব, ওটাই সীমা। এ জীবনের কিসে কোন্ বিশ্বাসটা থাকলে মরাও সুখকর হয়, সায়ানাইড খাবার মারাত্মক অবস্থাটা ছাড়া? তখন তো মরণেই বিশ্বাস, জীবনে নয়! নিজের মনের এই মেয়েলি তর্কাতর্কিতে অবশ্য মণির খটকা রয়েছে অনেক, কারণ জীবনে সে একটা জিনিষে বরাবর হোঁচট খায়,—নতুনত্বে। কোন নতুনত্বের জন্যই নিজেকে সে কল্পনার সাহায্যে ভেবে-চিন্তে এটুকু প্রস্তুত ক'রে রাখতে পারে না, যাতে শুধু অবাক হয়ে অভিভূত হয়ে পরিবর্ত্তনটাকে গ্রহণ করতে পারে, নিজেও মানিয়ে যায়, অভিনব যা এল তাকেও মানিয়ে নেয়! সে সোজাসুজি হোঁচট খায়। প্রতিবার টের পায়, তার ভাবার চেয়ে অনেক বেশী বা অনেক কম অভিনব হয়েছে বলে তার মুস্কিল নয়, ব্যাপারটাই একেবারে অন্য রকম। মোটে সে ধরতে পারেনি, তার ধারণায় আসেনি। যেটুকু তার পরিধি ছিল জীবনের নতুনত্ব আসবার আগে, যত অভিজ্ঞতা ছিল, যা এল তা যেন সে জগতের নয়। অন্য এক জগৎ থেকে অজানা বিস্ময়, অভাবনীয় অভিজ্ঞতা এসেছে। অথচ কি আর এমন সৃষ্টিছাড়া পরিবর্ত্তন তার জীবনে ঘটেছে আজ পর্য্যন্ত এক জগতের আরেক জগতের যোগ ঘটার মত? সাধারণ বাপের বাড়ী সাধারণ ভাবে মানুষ হ'য়ে সাধারণ শ্বশুর-বাড়ী

আসা, কিছু দিন বৌ সেজে ঘরকন্না করে স্বামীর সঙ্গে ভিন্ন হওয়া, ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে সংসার করা। এই সাধারণ জীবনের প্রতিটি সাধারণ বড় ঘটনা তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে-চুরে অপ্রস্তুতে ফেলেছে। পনের বছরে বিয়ে হয় অনেক মেয়ের, যেমন তারা ভাবে শ্বশুর-বাড়ী তেমন তাদের হয় না, তার মত কার মনে হয়েছে কুমারী-জীবনের মানুষদের সংসার থেকে একেবারে অন্য রকম জীবদের মধ্যে এসে পড়েছে? স্বাধীন সুখী জীবনের কল্পনায় মসগুল আত্মহারা হয়ে ভিন্ন বাড়ীতে এসে দেখতে পেয়েছে সেটা আরও ছোট খাঁচা, আরও বৈচিত্র্যহীন পরাধীন জীবন? ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে খেয়াল করে, নিজের বয়স বেড়েছে জেনে, এত ছোট পরিবারের এত সঙ্কীর্ণ জীবনটুকু কাণায় কাণায় ভরে তুলতে না পারার কষ্টভোগে, বার বার তাকে অপ্রস্তুতে ফেলেছে জীবন। এত দিন পরে এ বাড়ীতে ফিরে এসে তারই আরেক পালা সুরু হল।

এ বাড়ীর মানুষের ভিড়টা নয়, তাদের একাকার জীবন-যাত্রার বহর মণিকে আবার ওলোট-পালোট খাওয়ায়। তার মনের হাল পানি পায় না। সবই তাকে প্রণব খুলে বলেছিল। ছোট দোতলা বাড়ীতে এমনিতেও লোক বরাবর বেশী, দাঙ্গার জন্য আরও অনেক আত্মীয়-বন্ধু এসে ভিড় বাড়িয়েছে। ধরা-বাঁধা পারিবারিক নিয়মের বাঁধুনি এ বাড়ীতে চিরদিনই শিথিল, এখন আরও বিপর্য্যয় এসেছে তাতে।

কোণের সেই ছোট ঘরটা তোমাদের ছেড়ে দিতে পারব। খুব কষ্ট হবে মণি বৌদি।

ছ্যাঁৎ করে হিংসা ঝলক মারে প্রথমে। ছোট ঘরটা ছেড়ে দিতে পারব! দয়া, অনুগ্রহ! স্বেচ্ছায় তারা ছেড়ে চলে এসেছে বলে যেন ও-বাড়ীতে মণির স্বামীর অংশও বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু না, কথাটা তা নয়। তাদের খাতির করেই ছোট হলেও আস্ত একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হবে। ও-বাড়ীতে এখন একটি সম্পূর্ণ ঘর কারো দখলেই নেই। মণিদের ছোট ঘরটা ছেড়ে দিলে অন্য সকলের থাকা খাওয়া শোয়া বসার ঘোরালো স্থান-সমস্যা আরও ঘোরালো হবে। তা হোক। ওদের গা-সওয়া আছে, মণিদের মোটে অভ্যাস নেই ও-ভাবে থাকা।

হিংসা ছ্যাঁৎ ক'রে বুক ছুঁয়েছিল, সব শুনে প্রতিক্রিয়া হল বিপরীত।

তুমি আমায় কি ভাবো? সবার কষ্ট হবে, আমি সুখে থাকতে চাইব? আমায় তুমি চিরদিন ভুল বুঝলে ঠাকুরপো!

সুখে থাকবে না মণি বৌদি।

চাই না সুখ। মিলে-মিশে কষ্ট-অসুবিধা সওয়ার চেয়ে সুখ আছে?

কি ভেবে সে এ কথা বলেছিল, কি দেখল এখানে এসে। কষ্ট? অসুবিধা? মনে তো হয় না এতটুকু বাড়ীতে জন-কুড়ি স্ত্রী-পুরুষ আর গণ্ডা আড়াই কাচ্চা-বাচ্চার ছ্যাঁচরা-পোড়া ডাল-ভাত খেয়ে ঘরে-বাইরে রোয়াকে বারান্দায় শুয়ে-বসে জীবন কাটাতে কোন কষ্ট, কোন অসুবিধা আছে। এ যেন খেয়াল-খুসীর হাটে এসে পড়েছে মণি, স্বামী পুত্র নিয়ে সেই শুধু এসেছে বাধ্য হয়ে, আর সকলের সাধ করে বেড়াতে আসা! কি খাবে, কোথায় শোবে, কি করে একটু আড়াল পাবে কারো তা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই, যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা এবং অকাতরে মেনে নেওয়া যে তাই সই, তাই সই। সুখে-স্বচ্ছন্দেই বেশ আছি বলে ভাঁড়ামি করা নয় নিজের সঙ্গে। আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়ে মুখ আলো করে কেউ বসে নেই, দুর্ভোগ হচ্ছে প্রত্যেকের। বর্ষায়, গরমে, ভাল খাওয়ার অভাবে, সবার চেহারাতেই ক্লিষ্টতার ছাপ, টিঁকে থাকার এত বাস্তব ক্লেশ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছেলে-মেয়ের অসুখ-বিসুখ, তারা রোগা হয়ে গেছে, তারা কাঁদে। শুধু এ সব নিয়ে কারো নালিশ নেই, কেউ হা-হুতাশ করে না।

না, শুধু তাই নয়। শুধু মন-মেজাজ বিগড়ে গিয়ে হতাশা ঠেকানো নয়। বাড়ীতে সে-বার একসঙ্গে তিন জনের গুরুতর অসুখের সময়, আর এবার এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে সে যেমন মাঝে মাঝে অলক্ষণের জন্য শরীর-মন শিথিল করে দিত যে যা হবার হোক তার কিছু এসে যায় না,—এ বাড়ীতে সবাই যেন পরামর্শ করে একসঙ্গে তেমনি আলগা করে দিয়েছে ভাবনা-চিন্তা-কষ্টবোধ।

বোধ হয় তাও শুধু নয়। কেমন একটা সামঞ্জস্যও করে নিয়েছে দাঙ্গা-পীড়িত সহরের বেঁচে থাকার সব রকম দুর্দ্দশার সঙ্গে, সেটা নিষ্ক্রিয় গা-এলিয়ে দেওয়া সামঞ্জস্য নয়। তাই এত গল্প-গুজব তর্ক-বিতর্ক হাসি-তামাসা, তাই এত গা-ঘেঁষা অন্তরঙ্গতা যাতে হোটেল-খানার মত মায়ালো রসালো ভাবালুতা একেবারে বাদ, এত এলোমেলো হৈ-চৈ।

সদর দরজায় মোটা-সোটা সন্তানবতী একটি বৌ মণিকে প্রথম অভ্যর্থনা জানায়। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেনি, কয়লার টুকরির দর করছিল। রোগা ঢ্যাঙ্গা, একফালি ময়লা ন্যাতা পরণে এগার-বার বছরের একটা মেয়ে, তার মাথায় চারটি ছোট ছোট কয়লার টুকরি। চোরা কয়লার ছুটকো ফিরিউলী। দশ আনায় একটা টুকরী, সের আড়াই কয়লা। দশ টাকা মণ।

দরদস্তুর স্থগিত রেখে মোটা-সোটা বৌটি বলেছিল, এসো ভাই। বলে বস্তির অকালে-পাকা ন্যাংটো-প্রায় মেয়েটাকে বলেছিল, দিয়ে যা। কি আর বলব তোকে। তোকে গাল দিয়ে কি হবে। তোর কয়লাওয়ালা বাবুটার যেন পোলাও খেয়ে কলেরা হয়, কয়লা বমি করে কয়লা হেগে নরকে যায়!

দোতলার দক্ষিণ কোণে ছোট যে ঘরটি মণিকে দেওয়া হয়েছে, সে ঘরে এই সরস্বতীও থাকত। আরও তিনটি বৌয়ের সঙ্গে থাকত, যাদের মোট সাতটি কচি-কাচা। সরস্বতী এ রকম দেখতে-শুনতে চোরা কয়লার দরদস্তুরেই গিন্নী-বান্নী, বয়স তার মোটে তেইশের কোটায়। চিদানন্দ নামে প্রণবের

চেয়ে বয়সে ছোট যে বন্ধুটিকে এক দিন মণি জানত, তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। দেড় বছরের একটি মেয়ে, মাস চার-পাঁচ পরে আরেকটি ছেলে বা মেয়ে হবে। সরস্বতীকে এ জন্য একটু বেশী মোটা দেখায়। অন্য তিনটি বৌ মণির একেবারে অজানা। প্রণব তাদের কি বলল সেই জানে, হুকুম না অনুরোধ, চার জনে হাত লাগিয়ে দেখতে দেখতে জিনিস-পত্র সরিয়ে ঘরটা খালি করে দিল।

লজ্জা-সঙ্কোচে মণি হয়তো মরে যেত। কিন্তু এ বাড়ীতে ও-রকম বাজে মরা সম্ভব ছিল না। অনেক কাল একা থেকে প্রবল হৃদয়াবেগ সামলে চলার অভ্যাস মণি হারিয়েছিল। রোগা ঢ্যাঙা ফর্সা বৌটি কুলুঙ্গি থেকে তার বেতের ঝাঁপিটি নামিয়ে নিচ্ছে, আচমকা তার হাত চেপে ধরে মণি নাটুকে খাপছাড়া ভাবে যে কথাগুলি গলগল করে বলে গিয়েছিল, সে সব সামান্য কারণে সময়ে মরে যাবার অবস্থারই সস্তা কথা।

বৌটির নাম নীলিমা, ত্রিশ-ঘেঁষা বয়েস, মুখে একটা আশ্চর্য্য শ্রান্তির ভাব, স্থিরতার মত ম্লানিমা। তার স্বামী গিরীন এক ইংরাজী দৈনিকের সহকারী সম্পাদক, তার মুখেও অবিকল এই রকম ক্লান্ত-স্থৈর্য্যের ছাপটাই মণির প্রথম চোখে পড়েছে, দু'জনের এই মিল তাকে আশ্চর্য্য করে দিয়েছে। নীলিমা নীরবে মন দিয়ে তার কথা শুনে বলেছিল, কেন ভাবছ ভাই ? আমরা কি নালায় ভেসে যাচ্ছি তোমার খাতিরে ? আমাদের ব্যবস্থাও হচ্ছে।

ব্যবস্থাই বটে। খোলা ছাতে খান-কয়েক মর্চ্চে-ধরা টিন পড়েছিল, আর ছিল চুণ-সিমেণ্ট মাখানো কতগুলি বাঁশ। যুদ্ধের ঠিক আগে দোতলা সম্পূর্ণ করার জন্য কেনা, পুরাণো সস্তা মাল। দু'জন মিস্ত্রী পাড়াতেই ছিল, কাল্লু ও রহমত। তাদের মধ্যে কাল্লুকে ডাকা মাত্র পাওয়া গেল, রহমতের জ্বর। এক জন ছোকরাকে সাথে নিয়ে কাল্লু খোলা ছাতে অস্থায়ী একটা চালা খাড়া করার কাজে লেগে গেল।

একা কাল্লু আর তার অল্পবয়সী সাথীটিকে বাড়ীর মধ্যে দেখেই মণির গা একটু শিউরে উঠেছিল। অন্তঃপুরচারিণী মনে এমনি বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস জমেছে। নইলে কি নতুন ঘুমপাড়ানি ছড়া শোনা যেত, দুরন্ত ছেলেকে মায়েরা ভয় দেখাত, মুসলমান ধরে নেবে। পাল্টা ছড়া, পাল্টা ভয় দেখান চালু হত অন্য এলাকায়।

ওদের কেউ কিছু বলে না ঠাকুরপো ?

এখনো বলেনি।

এ পাড়ায় কাল্লু-রহমতদের বসবাস আশ্চর্য্য মনে হলেও রহস্যময় অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়।

খাটুনে গরীব কিন্তু একচেটিয়া পেশা, ওদের বাদ দিয়ে দালান ওঠে না। এই ইঁটের অরণ্যে যুদ্ধোত্তর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেও চুণ-সুরকি-সিমেণ্ট-ইঁটের শিল্পসৃষ্টি যথেষ্ট চলছে এবং সেটা অত্যন্ত লাভজনক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। কনট্রাক্টর তার তেতলা বাড়ীর জমকালো উপরের অংশটা দেখা যায়, যদিও নীচের দু'টো মোটরের গ্যারেজ আড়াল থাকে। মাল-মসলা দুষ্প্রাপ্য, অথচ মাধবকে কনট্রাক্ট দিলে সে তিন মাসে তেতলা দালান তুলে দেবে। কিন্তু সে জন্য কাল্লু-রহমতদের দরকার। পথটা ভেতরের দিকে গিয়ে যেখানে একটা মাঝারি ও একটা সরু গলিতে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানকার বস্তিটার একাংশে এরা কয়েক ঘর বাস করে। গোড়ার দিকের উন্মত্ততায় আক্রমণের একটা চেষ্টা হয়েছিল। প্রণব এবং পাড়ার দশ-বারটি ছেলে ছুটে গিয়ে বুক পেতে রুখে দাঁড়িয়ে সেটা ঠেকাবার ব্যর্থ-চেষ্টা করছে, দামী গাড়ীর নিঃশব্দ উদারতায় মাধব এসে হাজির।

হুঙ্কার দিয়ে সে বলেছিল, তোমরা কি চাও ? আমি হিন্দু, আমি ব্রাহ্মণ। আমি সহ্য করব না। হিন্দু কখনো নিরীহ শান্ত মানুষকে মেরেছে, বিধর্ম্মী বলে ? এরা আমার লোক।

এ পাড়ার রতন সান্ন্যাল সব চেয়ে উগ্র, ব্যক্তিগত ভাবেও দাঙ্গায় সে সত্যই নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রতিহিংসায় তার পাগল হওয়া আশ্চর্য্য নয়। রতন ক্ষোভে চীৎকার করে বলেছিল, ওদের পাড়ায় ওরা মারছে না, নিরীহ শান্ত মানুষকে ?

মারছে ? ওদের পাড়ায় যাও। সেখানে গিয়ে ধ্বংস করে ফেল ওদের। আছে সে বুকের পাটা ?

এটা প্রকাশ্য নাটক, বাজে অভিনয়। তা দিয়ে ঠেকানো যায়নি। তা হলে খাঁটি আন্তরিক চেষ্টা দিয়ে প্রণবেরাই ঠেকাতে পারত। আসল কথা, মাধব এ ভাবে রুখে দাঁড়ালে এ পাড়ায় কারো সাধ্য নেই প্রাণের সাধ মিটিয়ে হিংসার জ্বালা ঝালে।

বাড়ীর আনাড়ি সহকারীদের সাহায্যে আটটার মধ্যে কাল্লু ছাদে চালা খাড়া করেছিল। কয়েক জন পুরুষ এ চালায় এল। ছোট ঘরের বাসিন্দা বৌ ক'জন বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গেল তাদের ছেড়ে-দেওয়া ঘরে। এই ব্যবস্থা হল।

মণি কোথায় অবাক হবে, তার হল জ্বালা।

তুমি এ জন্য আমায় এনেছিলে ঠাকুরপো ? এ ভাবে অপমান করতে ?

মণিকে সে যেন জোর করে টেনে এনেছে, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। মাঝ-রাত্রি যখন পার হয়ে গেছে, শ্রান্তিতে যখন আকাশের চাঁদ আর অবুঝ জগৎ সহজ স্পষ্ট বাস্তব ঘুম চেয়ে ধৈর্য্য হারাতে বসেছে জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য, তখন এ রকম ন্যাকামিতে মহাপুরুষেরও রাগ হয়।

অপমান হয়েছে ? বেশ, কাল ফিরে যেও।

সে অপমান নয়।

কোন্ অপমান তবে ?

তুমিও আমায় বুঝলে না ঠাকুরপো ?

কথা হচ্ছিল সিঁড়িতে। প্রণব ছাদে উঠছে। নতুন চালাটার নীচে হোক, খোলা আকাশটার নীচে হোক, কোন এক যায়গায় গা এলিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে। মণি

কুড়িয়ে মর্মাহত হয়ে,—ছোট হোক বড় হোক একটা ঘর তাকে দেবার জন্য এক বেলায় এ রকম চালা তোলা, সকলের বসবাস উল্টে-পাল্টে দেওয়া! এরা তাকে ভেবেছে কি?

মণি জানত না আবেগেরও সীমা আছে। সে সীমা দেহের—সহ্যশক্তির, হৃদয়ের নয়। প্রণবও বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল যে অতীত মরেও মরে না মণিদের জীবনে। এত দিন পরে এত বয়সে পুরানো ছেলেমানুষির পুনরাভিনয় তাকে প্রথমটা প্রায় থতমত খাইয়ে দেয়। মণির কিন্তু বাঁধ ভেঙেছে। সে অনায়াসে প্রণবের বুকে মুখ রেখে তার নিঃশব্দ ভঙ্গিতে কাঁদে।

কেন গিছে এমন করছ মণি বৌদি? শান্ত হও।

শান্ত হচ্ছি ঠাকুরপো।

সঙ্গে সঙ্গে সত্যই সে শান্ত হয়। করুণ ভাবে একটু হাসে।

এই বোধ হয় প্রথম, না ঠাকুরপো? যেচে তোমার মায়া চাইলাম? মনের জোর এমন কমে গেছে আমার!

সেই আত্মনাশা অহঙ্কার। অবিকল সেই সরলা ক্ষীণা আনাড়ি তরুণীর বিজয়িনী হতে চাওয়া, জগতকে জয় করার ইচ্ছা ছেঁটে-ছেঁটে শ্বশুরবাড়ীটা পর্য্যন্ত আয়ত্ত না করতে পেরে আরো গুটিয়ে শুধু স্বামি-পুত্রের নীড়টুকু সম্বল করা, যেখানে অন্তত সে সর্ব্বতোময়ী। প্রণব একটু আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এ ভাবে নিজেকে সামলাবার জোর তবে সেই মণি পায় কোথায়?

তুমি তেমনি আছো।

আছি? তেমনি আছি ঠাকুরপো? তবে কেন তুমি ভাল করে কথা কইছ না আমার সঙ্গে? কেন পর-পর হ'য়ে তুমি ভাল থাকছ? শুধু আমি বলে ঠাকুরপো, অন্য মেয়ে হলে, এ রকম ভাব হলে, তোমার সঙ্গে অন্যরকম সম্পর্ক হয়ে যেত। যেত না? তুমিই বলো। সবাই কাণাকাণি করেছে, উনি পর্য্যন্ত যা তা সন্দেহ করেছেন, কিন্তু আমাদের মনে এতটুকু ময়লা আসেনি। আমরা গ্রাহ্যও করিনি লোকে কি ভাববে, লোকে কি বলবে। নয় কি?

এত কথার জবাবে প্রণব মৃদু স্বরে বলে, ঘুমোবে না?

অপমানে মণি চোখ বোজে। কিন্তু সে ছোট হয়েছে, জীবনের পরিধি ছোট করে এনেছে, কখনো হার মানেনি। আজও সে হার না মেনে গাঢ় স্নেহের মৃদু হাসি হেসে বলে, তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে?

শেষ রাত্রে আচমকা ঝড় ওঠে, মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ছাদের চালা-ঘরটা উড়ে ছত্রখান হয়ে পড়ে ঝড়ের প্রথম ধাক্কাতেই। প্রণব সিঁড়ির নীচে একতলায় দু'জন ঘুমন্ত মানুষের মাঝখানে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে জাগে না। ছাদের মানুষগুলি মাদুর-বিছানা বগলে নীচে নামে, সিঁড়ির নীচে আর পাশের ঘরে শোয়া-বসার আয়োজন করে, গণ্ডগোলে প্রণবের ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু সে জাগে না। বস্তুতে গড়া দেহ মানুষের, বিশ্রাম ছাড়া চলবে কেন। তার অনেক কাজ।

একটি-দু'টি দিন চলে যায়, প্রণবের কাজের চাপটা মণির ঠাহরে আসে। ভাব দেখে মনে হয়, কোন বিষয়ে প্রণবের এতটুকু তাড়াহুড়া নেই কিন্তু কি স্পিডে কত কাজ সে করে সেটা শুধু আন্দাজ করা যায় তার দিকে না চেয়ে তার কাজের হিসাব করলে। হিসাব করাটা মণির পক্ষে খুব সহজ হয়। শুধু তাকে আর তার ক'টা ছেলে-মেয়ে নিয়ে যে ছোট-খাট সংসার, সেটা চালিয়ে আসছে সুশীল। এই দায়িত্ব নিয়েই সে কত ব্যস্ত, কত ব্যতিব্যস্ত, রোজ একেবারে হিমসিম খেয়ে যায়! সে সব ছিল ফেণানো কাজ, একটা কাজের সঙ্গে অসংখ্য অকাজ। তুচ্ছ কাজের তুচ্ছ খুঁটি-নাটিকেও অযথা গুরুত্ব দিয়ে নিখুঁত করার চেষ্টা। এই নিয়েই কি সে ছিল? এ বাড়ীর মোটা কাজ আর মোটা ব্যবস্থা, খুঁটি-নাটি নিয়ে মাথা ঘামানো বর্জ্জন, মণিকে তার সংসারের কথা মনে পড়িয়ে উতলা করে তোলে। ছেলেপিলে সম্পর্কে পর্য্যন্ত এদের গা ছাড়া ভাবকে মনে মনে যথেষ্ট নিন্দা করেও সে সুখ পায় না। ভালই আছে ছেলেপিলেরা এখানে, যথেষ্ট ভাল আছে, চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে না থেকেও!

বার বার ছোট ঘরটিতে গিয়ে মণি বসে, আকাশ-পাতাল ভাবে। বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না, দম আটকে আসে তার। একটা আস্ত বাড়ীতে তার যে সংসার ছিল, এতটুকু এই ঘরটি ভরাট করার মতও যেন তা নয়, আরও ছোট আরও সঙ্কীর্ণ। কারণ, একা সেই কেবল একটি ঘর পেয়েছে এ বাড়ীতে।

সেদিন সকালে গিরীন বাড়ী ফিরল না। রাত্রে সে আজকাল বাড়ী ফেরে না, কাগজের আপিসেই শুয়ে থাকে। রাত জাগলে বাড়ী ফিরতে তার বেলা হয়, অন্য দিন সকাল সকাল এক প্রস্থ বাজার বা রেশন নিয়ে পৌঁছে যায়। পথে বিপজ্জনক এলাকা পড়ে কিন্তু একটা সুবিধা আছে গিরীনের, আপিসের ভ্যান তাকে নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছে দেয়। তবে যে অবস্থা সহরের, কিছুই আজকাল বলা যায় না। লাট-প্রাসাদের এলাকা ছাড়া কেউ কোথাও নিরাপদ নয়। গিরীন না এলেও তার সহ-সম্পাদনার খবরের কাগজখানা এসে পৌঁচেছে। হকারদের কাগজ বিলি করা পর্য্যন্ত কিছু ঘটেনি আশা করা যায়, ঘটলে কাগজের সঙ্গে সে খবরটাও সে দিত। আপিস থেকে বেরিয়ে কোন কাজে কোথাও কি গিয়েছে গিরীন? কোথাও আটকে গেছে? বিপদ ঘটেছে?

পাড়ার রসময়দের বাড়ী থেকে নীলিমার ভাই গোকুল ইণ্ডিয়ান একস্প্রেস আপিসে টেলিফোন করে আসে এগারটার সময়, প্রণব বাড়ী ছিল না। মণি প্রথম জানতে পারে এ বাড়ীতে নীলিমার একটি ভাইও থাকে এবং গোকুল নামে নীলিমার মত রোগা ঢ্যাঙা ও তুলনায় বেশ একটু কালো ছেলেটিই তার সেই ভাই। নীলিমা যে ভাইকেও আগে চিনিয়ে দেননি তাও বোধ হয় এদের রীতি। গোকুল দেখে

[২৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যখের ধন
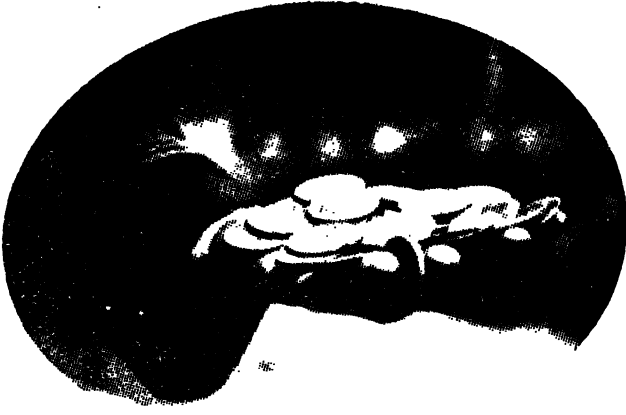
মাটি খুঁড়ে পাওয়া এক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা। এই মুদ্রাগুলি ১৭১০ সালের

সঞ্চয় করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যেদিন থেকে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম হয়েছে, সেদিন থেকে মানুষ সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ দুর্দিনের কথা স্মরণ করে, নিজের বংশধরদের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে মানুষ সঞ্চয় করে। এ যুগে সঞ্চিত ধন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ক'রে রাখা হয়, কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা চালু হবার আগে মানুষ তার সঞ্চিত ধন গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখত। ভারতবর্ষে সঞ্চিত ধন মাটির তলায় পুঁতে রাখবার রেওয়াজ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, পূর্ব-পুরুষের গুপ্ত ধন যে কোথায় আছে, ভবিষ্যৎ বংশধররা তা জানতে পারে না। ফলে চিরকাল তা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। বহু বছর বাদে বাড়ী বানাতে, পুকুর কাটাতে অথবা অন্য কোন কাজে মাটি খুঁড়তে গিয়ে এই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে গুপ্ত ধনের সঙ্গে যখ নামক অশরীরী আত্মার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। সরল-বিশ্বাসী সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়কারী তার ধন-সম্পত্তি ভোগ না করতে পারলে মৃত্যুর পর তার অতৃপ্ত আত্মা যখে রূপান্তরিত হয় এবং যখ হয়ে সে তার গুপ্ত ধন আগলায়। কাজেই যেখানে যত গুপ্ত ধন আছে সবই কিন্তু যখের ধন। তার উপর লোভ ক'রে কেউ যেন নিজের বিপদ বাড়'তে যাবেন না। আর যারা কৃপণতা ক'রে নিজেকে বঞ্চিত রেখে ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করছেন, তাঁরাও সাবধান। মৃত্যুর পর যখ হয়ে পৃথিবীতে বসে নিজের সঞ্চিত ধন পাহারা দেওয়ার কাজটা মোটেই লোভনীয় নয় বলেই মনে হয়। এই পৃষ্ঠায় মাটি খুঁড়ে পাওয়া ধাতু-মুদ্রা ও সোনার বাটের কয়েকটি ছবি দেওয়া হল। আমাদের দেশে বহু লোকের কাছেই এমনি প্রাচীন মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়।
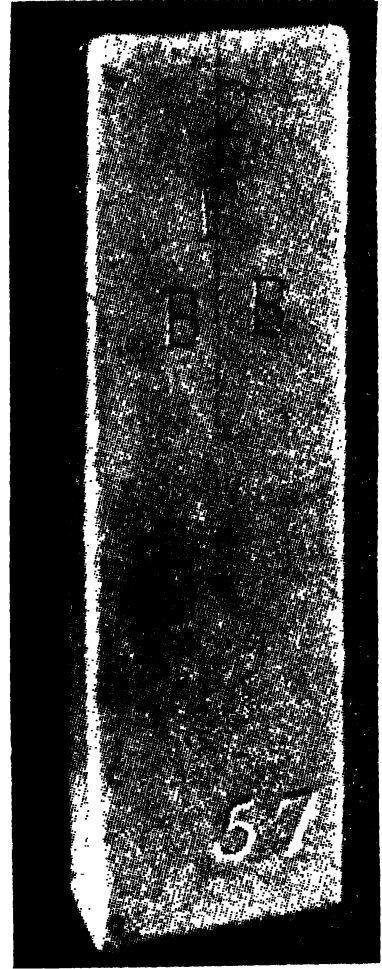
মাটি খুঁড়ে পাওয়া সোনার বাট। এর মূল্য ৮৫০ পাউণ্ড (প্রায় সাড়ে ১১ হাজার টাকা)।

৭০০ বছর আগেকার জাল মুদ্রা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৃতীয় হেনরীর রাজত্বের সময়কার এই মুদ্রাগুলি এসেক্সের এক গীর্জা খুঁড়ে পাওয়া গেছে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে মুদ্রাগুলি জাল। তখনকার দিনেও যে মুদ্রা জাল হ'ত তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অথ কুক্কুট-সমাচার
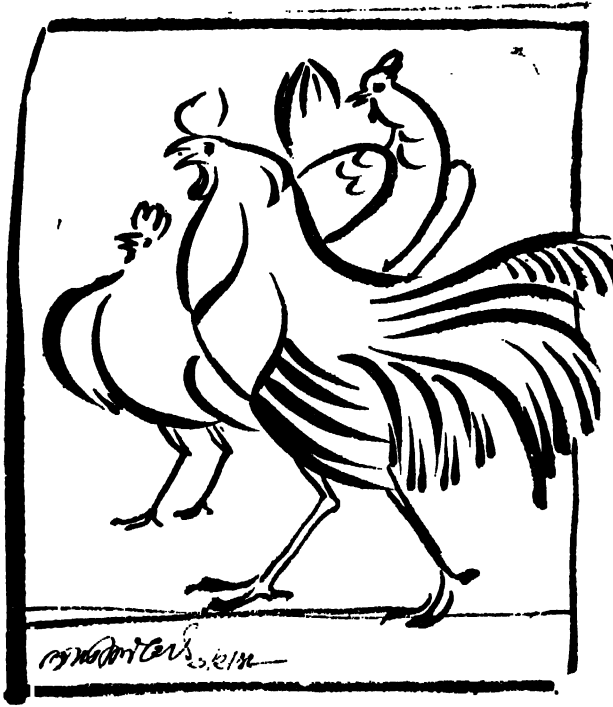
১৮৫৮ সালের আগে পর্যন্ত আড়াই শ' বছর জাপান নিরঙ্কুশ শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে কাটিয়েছে। এই সময় বাইরের জগতের সঙ্গে জাপানীদের একেবারে যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার জন্য এই সময়ে জাপানীরা তাদের জাতীয় শিল্পকলা ও কারিগরী উন্নয়নের চমৎকার সুযোগ পায়। অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাপানীরা কাঠ এবং ধাতুর উপর যে সূক্ষ্ম কারুকার্য করেছে তা আজও অতুলনীয় হয়ে আছে। এই সমৃদ্ধিসূচক দীর্ঘস্থায়ী একতার জন্য জাপানী শিল্পকলাই শুধু উন্নতি লাভ করেনি, বাগ-বাগিচা এবং জীব-জন্তু প্রজনন শিল্পেও তারা অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বাগ-বাগিচা শিল্পে তারা যা করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকার ফুলের বাহারে। এক চন্দ্রমল্লিকা ফুলেরই কত নতুন জাত তৈরী করে নতুন নতুন বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। গৃহ-পালিত জীব-জন্তুর উপর কৃত্রিম প্রজননের পরীক্ষা চালিয়ে তারা অসংখ্য নতুন নতুন জীবের সৃষ্টি করেছে। মহিলাদের অতি প্রিয় চ্যাপ্টা নাকওয়ালা খুদে জাপানী কুকুর, বিচিত্র ল্যাজওয়ালা অদ্ভুত আকারের জাপানী মোরগ—এ সমস্তই জাপানীদের কৃত্রিম প্রজনন-সৃষ্ট জীব।

এই পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবিগুলো দেখলে স্বভাবতই মনে হয় যে, এগুলো রূপকথার দেশের কল্পলোকের পাখী, কিন্তু পাখীগুলো সবই মোরগ জাতীয়। মোরগের কথা শুনেই বাবুর্চির কথা চিন্তা করবেন না। হোটেলের রান্না-ঘরে চালান করবার জন্য জাপানীরা বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওদের সৃষ্টি করেনি। ওদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের সৌন্দর্য-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য।

চন্দ্রমল্লিকা

ল্যাজহীন শ্বেতাঙ্গিনী

গাছের ডালে বসা ছোট্ট মোরগের ল্যাজ লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। ল্যাজের দৈর্ঘ্য ১৯ ফিট। ল্যাজটাকে কৃত্রিম বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যি ওটা কৃত্রিম নয়। কৃত্রিম প্রজননের সাহায্যে নতুন জীবটির আবির্ভাব হয়েছে। ওর ঠিক উল্টো। একেবারে ল্যাজহীন মোরগের যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, সেটিও কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা সৃষ্ট জীব। সত্যিই ওর একেবারেই ল্যাজ নেই। ক্রিসেনথিমাম ফুলের পাপড়ির মত পালকওয়ালা মুরগীটি তার সৌন্দর্য্য দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করে, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য জাপানীদের কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। জাপানের সর্বত্র কৃত্রিম প্রজনন-সৃষ্ট এই রকম পাখী দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য, কিন্তু এদের সম্বন্ধে সব চেয়েও দুঃখের কথা হল এই যে, পাখীগুলো অত্যন্ত ক্ষীণ-জীবী। সামান্য কয়েকটি ছোট ছোট ডিম তারা পাড়ে বটে তার সে ডিম থেকে যে ছানা বেরোয়, তা আরও ক্ষীণজীবী। তাই এদের বংশের কোন বাড়-বাড়ন্ত নেই। তা যদি থাকত তা'হলে জাপানী খেলনার সঙ্গে জাপানী আজব পাখীরাও নিশ্চয়ই ভারতের বাজারে বাজারে আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হত না।

ল্যাজের গরব

পুষ্পময়ী

এরিক গিল

গোপাল ঘোষ

যাঁরা সত্য সত্যই গরীব,—তাঁদের জীবন-সংগ্রামের নানান ধাপ পার হ'য়ে দেখা যায় সত্যই তাঁরা গর্বের বস্তু। সকাল রোজই আসে, সন্ধ্যা রোজই হয়, সবই সত্য একটা বিশেষ সকাল, সন্ধ্যায় ডালা ভরে নিয়ে আসে সম্মান ও শ্রদ্ধার অর্ঘ নিয়ে। তবুও গরীব গর্ব করেন না, কারণ তাতে তাঁদের সৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয়, পদে পদে নিজের প্রতিবিম্বই প্রাণ-প্রচেষ্টা অপবিত্র করে দেয়। তাই দেখা যায়, যাঁরা গুলে খেয়েছেন আর্ট তাঁদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাটাও যা-তা নয়; যতই হোক না তিনি যা-তা!

যাঁর কথা দু'-চার আঁচড়ে কইতে ইচ্ছে হয়েছে, তাঁর নাম Eric Gill; ইনি খুব গরীব না হলেও সাদা ভাবে বলা চলে, তেমন সচ্ছল অবস্থা এঁরও ছিল না, গরীবের স্তরেই ইনি পড়েন। কিন্তু তাতে যত অসুবিধা অভাব থাকুক, এঁরা তার ভেতর থেকেই আবার একাগ্রচিত্তে থাকবার ও সৃষ্টি করবার আর্ট আয়ত্ত করেন। ঈশ্বরের এইটুকুই তাঁদের প্রতি মস্ত দান। এই ছোট্ট বিশ্বাসটুকু যাঁদের উদয় হয়নি তাঁরা ঈশ্বরের নামে নাক বাঁকাবেন; কিন্তু এক এক জন মহা শক্তিমান আছেন জ্ঞান না এলে গিল-ও ভাল লাগবে না, গরুও ভাল লাগে না। যাক, সাদা কথায় গিল্ ছিলেন গরীব।

গিলের নিজে আঁকা নিজের ছবি

Eric Gill একদিকে মস্ত মানুষও। ইনি স্থপতি বিদ্যায় বিশারদ তো ছিলেনই, কিন্তু খোদাই শিল্পে ও ভাস্কর্য্যেই উদয় হয়েছিলেন আসলে Eric Gill.

বিলেতের মানুষ ইনি। বিলেতের মাটিতে বিচরণ ক'রে আকাশের দিকে তোলা ছিল এঁর আসল মন। এঁর একাগ্রতা ছিল অসাধারণ, তার কারণ ইনি ঈশ্বরের সংগে মুখোমুখি কথা কইবার সাহস রাখতেন। তাই ইনি গর্বের বস্তু হলেও গর্ব করতে শেখেননি, মানুষ Eric Gill অত্যন্ত নম্র, ধীর, আগাগোড়া অন্য ধাতুতেই গড়া ছিলেন। কিন্তু আজকের মানুষ ধীর স্থির হওয়াটাকে পছন্দ করেন কি না জানি না, আসল কথা, আধুনিক নামের মানুষ পোকা আজকের দিনে সিনেমা দেখে সুস্থতার শ্বাস নিংড়ে বার করে দিয়েছেন; শ্রী, ছবি ছিরি তাতে নাই তবুও এই আবহাওয়ায় ভূমণ্ডল শ্রীমণ্ডিত করতে ভগবানের তরফ থেকে কার্পণ্য হয় না। তিনি অবিরাম অজ্ঞানের মাঝে আসল মানুষ পাঠিয়েই চলেছেন।

Eric Gill তাঁর আত্ম-জীবনীতে এক জায়গায় লিখেছেন—Poverty is thus a bond of peace—তাই সেই povertyর দৌলতে কাজে একাগ্রতা ও ঐক্য আনে। তাই এ সম্পদ বাজারে কিনতে যাওয়া যায় না, এটি জীবনের মাঝে মাঝে অর্জন করে নিতে হয়। এরিক্ গিল এ দুর্লভ অনুভূতি অর্জন করেছিলেন অত্যন্ত সাবধানে।

আত্ম-জীবনীর কথাই যখন উঠলো, তখন আগে এটা এই ভাবে সেরে নেওয়া যাক।

আর পারি না! আর পারি না, দেশে যখন প্রকাশক আছে অর্থাৎ আমাদের দেশে; ওঁদের দেশে কিন্তু প্রকাশকরাই দেশের যথার্থ প্রাণ ফুটিয়ে রেখেছেন।—আমাদের দেশের প্রকাশকরা যেমন হাঁক্ পাঁক্ করছেন কী করে পয়সা পেটা যায়! অর্থাৎ অখাদ্য কুখাদ্য জনসাধারণকে গোগ্রাসে গিলিয়ে দিতে পারলেই হোলো। ও-দেশ কিন্তু বজ্জাত বয়াটে ডিপ্লোমেটিক কেটিক হয়েও দেশের ডেকোরেশনের দিকে দশের মানসিক উন্নতির মইতে উই না ধরে তার দিকে আছে বিশেষ কড়া নজর।

এখন কথা হোলো, Eric Gill-এর আত্ম-জীবনীখানা প্রকাশকের দৌলতে আমরা পেয়ে গেলাম। তাঁর প্রকাশক তাঁকে অনুরোধ করায়, তিনি এ কাজটিতে হাত দেন।

এখানে কথা উঠতে পারে তাঁর কথায়—প্রকাশক কেন? কারণ তিনি উচ্চাঙ্গের লেখকও যে ছিলেন; তাঁর কয়েকখানি বইয়ের নাম উল্লেখ করলে আশা করি মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। যথা:—

Clothes;
Clothing without cloth;
Trousers and the most precious ornament
Art nonsense
Beauty looks after herself
Money and morals
Work and leisure
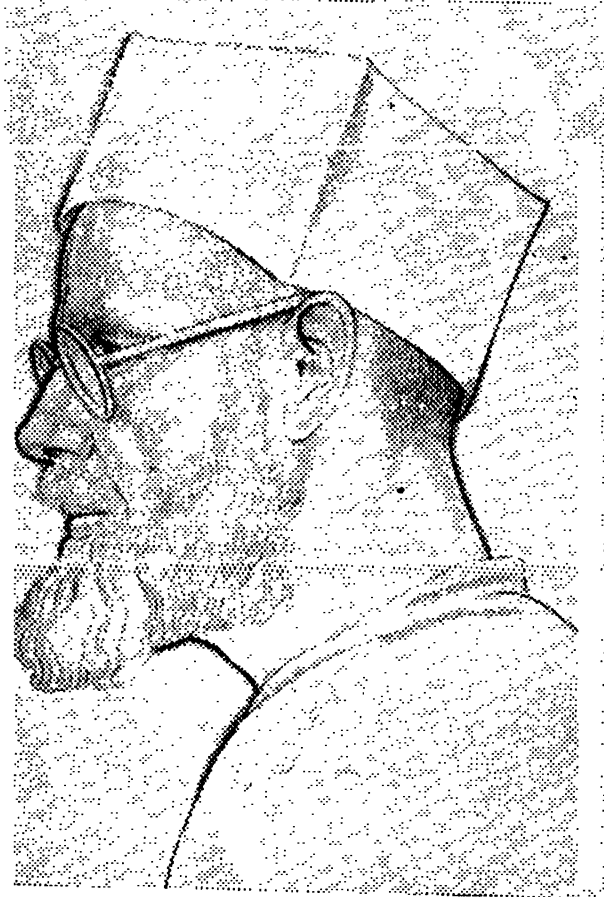
The necessity of belief
Sacred and secular
Christianity and the machine age.

ও সব তো গেল আত্মজীবনী ছাড়া আনন্দের অন্যান্য রচনা। আত্মজীবনীখানা লিখতে গিয়ে তিনি Preface-এ এই ভাবে লিখে আসছেন—I have given way to the reiteried requests of any publisher that I should write an autobiography. But I cannot write a record of doings and happenings, for nothing particular has happend to me—except inside my head,

দেখা যাচ্ছে, ঐ "হেড"-ই আজও Auto-biography থেকে Atom bomb ইত্যাদির আড়ৎ।

তা, তিনি "হেড"-খানীর থাকে থাকে তুলে রাখা কিছু ঘটনা, খানিক অলঙ্কার এই সব মিশিয়ে একখানা অপূর্ব আত্ম-জীবনী লিখে গেছেন। সেখানি ছাপার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মনে রাখতে হবে ও তখন জার্মাণের ঘাড়ে বৃটেন এসে পড়েনি। নাগাড় বই ছাপিয়ে গেছেন।

নভেম্বর ১৯৪০ সনে তিনি মারা যান আর ডিসেম্বর ১৯৪০-এ এই বইখানি প্রথম প্রকাশ হয়ে ১৯৪১ সনের ডিসেম্বরের মধ্যে ছ'বার ছাপা হয়ে গেছে। (আর আজ তো ১৯৪৮): এখনো সংস্করণের শেষ নেই।

তা, সংস্করণের শেষ নাই বা হোলো, আমার বক্তব্য অসমাপ্ত হোলেও, এইখানেই বন্ধ করতে বাধ্য হলাম এই ভরসায় Eric Gill-এর মাথার কাজই যেন পাঠককে বাকিটা বাৎলে দেয়।

পংখেতার এরিক গিল

গিলের আঁকা অক্ষর

-আগামী সংখ্যায়-

রবীন্দ্রনাথের চিত্র

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যে দিন সকল মুকুল গেল ঝ'রে — নীরোদ রায়
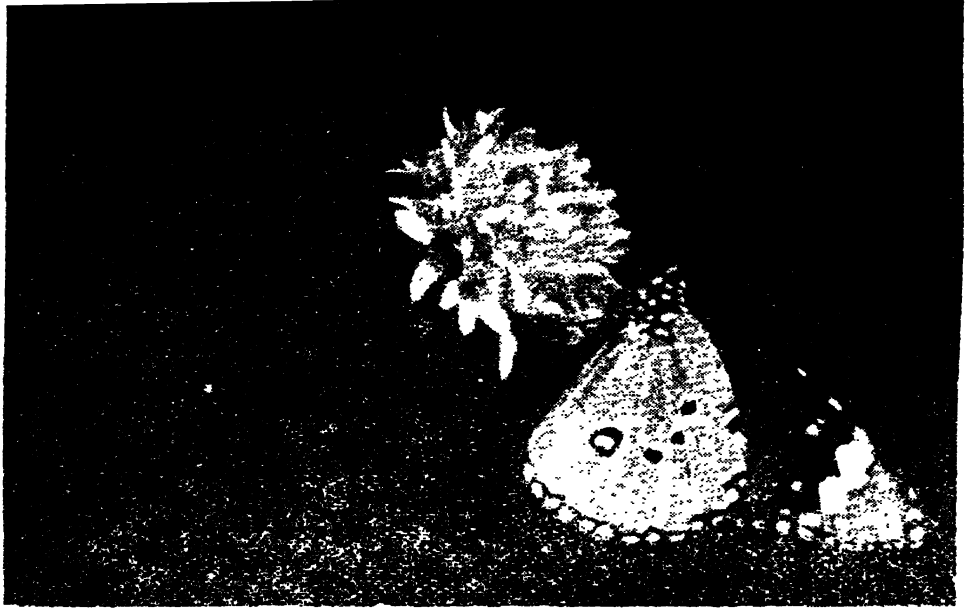
হৃদয় আমার আকুল করে সুগন্ধধন লুঠবে —পরিমল গোস্বামী

অমন দীন-নয়নে তুমি চেও না

(প্রথম পুরস্কার)

—অরুণকুমার সরকার

—শ্রীগোবিন্দলাল দাস

পল্লীশ্রী (দ্বিতীয় পুরস্কার)

প্রচেষ্টা —শি, সু, বসু
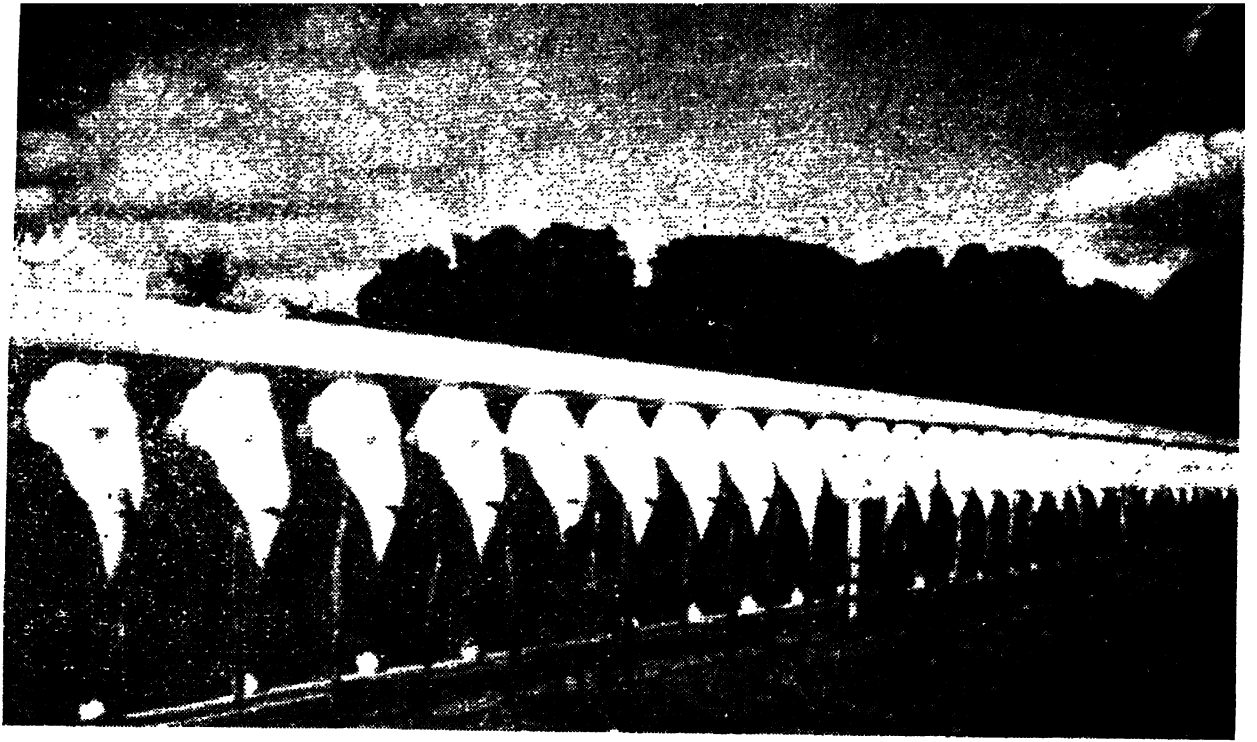
স্থপতি —বিভাস মিত্র

এঁচোড়ে পাকা

(তৃতীয় পুরস্কার) সমর পাঙ্গ

—গোবিন্দচন্দ্র সাউ

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে পাঠক-পাঠিকাদের যে পত্র দেওয়া হয় তারই কয়েকটি উত্তর এবার দেওয়া হল।
অন্যান্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আপনাদের চিঠি পড়ে সমস্ত মন অতীত স্মৃতির সুখ-সায়রে ডুব দিয়েছিল, সেই কোন্ ছোট বেলায় এ-বাড়ীতে বধূ হ'য়ে এসেছি। মাসিক বসুমতীর জন্ম থেকেই আমার শ্বশুর মহাশয় স্বর্গীয় রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়-চৌধুরী এর গ্রাহক ছিলেন। সংসারের দুর্গম পথে তাঁর আশীর্ব্বাদ আমাদের চির সহায় হয়েছে। সেই সূত্রে জ্ঞান-বিকাশের প্রতি মুহূর্ত্তে মাসিক বসুমতী আমাদের জ্ঞানগুরুর গুরু দায়িত্ব বিচক্ষণতার সঙ্গে পালন করেছে। আজ তিনি নেই। কিন্তু প্রতি মাসে যখন মাসিক বসুমতী এসে আমার হাতে পৌঁছয়, তখন তাঁরা যে নেই এ কথা কিছুতেই মনে করতে পারিনে। চরম ক্ষতিকে যারা পরম লাভের পর্য্যায়ে উত্তোলিত করে তুলেছেন সেই মাসিক বসুমতীর পরিচালক-গোষ্ঠীকে কৃতজ্ঞতা জানাবার মতো ভাষা আমার দুর্ব্বল লেখনীতে নেই।

বাংলার অন্তঃপুরে মেয়ে হয়ে জন্মেছিলেম। ধর্ম্মের নামে নানা জঞ্জাল জড়ো করে বহু দিন থেকেই আমাদের দেশে—বিশেষ করে মেয়েদের চাপা দিয়ে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। কিন্তু জীবনের সেই প্রায় গোড়ার দিক থেকেই মাসিক বসুমতী সত্যধর্ম্মের নির্ম্মল আলোকে আমাদের সংসারের জীবন থেকে ধর্ম্মের মিথ্যা মুখোসটিকে দূরে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে যে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করি তার পেছনেও মাসিক বসুমতীর চিন্তা-নায়কদের কল্যাণ কর্ম্ম কাজ করছে।

আজ রাজনৈতিক দুর্ব্বিপাকে বঙ্গমাতা খণ্ডিতা হয়েছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের আবাসভূমির প্রায় বেশির ভাগই নবগঠিত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। সেখানে হিন্দুর ধর্ম্ম, বাঙলার কৃষ্টি আজ বিপন্ন। মাসিক বসুমতী থেকেই শিক্ষা পেয়েছি, পৃথিবীর সকল ঘটনাই বিধাতাপুরুষের অভিপ্রায়ে ঘটে থাকে। তিনি মঙ্গলময়। আজকের এই দুর্ব্বিপাকের মধ্যে কোন্ মঙ্গল নিহিত রয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারিনে। মাসিক বসুমতী তার পাতায় পাতায় মূল্যবান্ গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন আমাদের এ কথা বুঝিয়ে দেবে, এই ভরসাই আমাদের সম্বল। ইতি—

নমস্কারান্তে নিবেদিকা

বধূরাণী নীহারিকা রায়-চৌধুরী

(হরিপুর)

'যদি গাহন করিতে চাও
এসো নেমে এসো হেথা
গহন তলে।'
—মিসেস্ সুফিয়া হক

মাসিক বসুমতীতে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুধীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও জ্ঞানিগণের সুচিন্তিত সন্দর্ভ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বোপরি আগা-গোড়া পত্রিকাখানিতে একটা সাম্যের ভাব প্রকাশ পায়, এই সব কারণে আমি ইহার সমাদর করি।

আমি পত্রিকাখানির দীর্ঘ জীবন, বহুল প্রচার ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

ইতি—আপনার বিশ্বস্ত
এ, হান্নান চৌধুরী
ধরমপাশা, শ্রীহট্ট।

নবাব বাহাদুর
—রেখা মুখোপাধ্যায়

"যশোহর সাহিত্য-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে এইটুকু অনুরোধ জানাইতেছি যে, এই সংখ্যায় মহাকবি মাইকেলের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রকাশ করিবেন।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের প্রচেষ্টায় মহাকবির রচনা জনসাধারণে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে, এটা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকি।"

শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার
সম্পাদক,
যশোহর সাহিত্য-সঙ্ঘ

নবাব বাহাদুর নয়, স্যর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন। বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসে সম্প্রতি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের অভ্যর্থনা-সভায় এই ছবিটি গৃহীত হয়।

পত্রগুচ্ছে প্রতিবার কয়েকটি দেশী ও বিদেশী চিঠি ও চিঠির অনুলিপি প্রকাশিত হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত মানুষের জীবনের বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁদের চিঠিতে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে চিঠিতেই একমাত্র অন্তরের কথা প্রস্ফুটিত হয়। মুখে যা বলা যায় না চিঠিতে সে কথা অতি সহজেই বলা যেতে পারে। এক কথায় বলতে হয়, মানুষের মুখের মত চিঠিও তার অন্তরের প্রতিচ্ছবি। বিভাগটি পাঠক-পাঠিকার অন্তর স্পর্শ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। পাঠক-পাঠিকা ও সাধারণের নিকট থেকে প্রকাশ-যোগ্য মূল্যবান পত্রের সন্ধান পেলে আমরা সাদরে গ্রহণ করব। স্বামী বিবেকানন্দের পত্র দু'টির জন্য উদ্বোধন পত্রিকার সৌজন্য স্বীকার করছি। পত্র দু'টি এত দিন অপ্রকাশিত ছিল।

—মাসিক বসুমতী

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

(১)

Darjeeling
C/o. M .N. Banerjee
20th April,'97

প্রিয় শশী,

তোমরা অবশ্যই এতদিনে মান্দ্রাজ পঁহুছিয়াছ। বিলগিরি অবশ্যই অতি যত্ন করিতেছে ও সদানন্দ* তোমার সেবা করিতেছে। পূজা-অর্চা পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে মান্দ্রাজে করিতে হইবে। রজোগুণের লেশমাত্র যেন না থাকে। আলাসিঙ্গা বোধ হয় এতদিনে মান্দ্রাজ পঁহুছিয়াছে। কাহারও সহিত বাদ-বিবাদ করিবে না—সদা শান্তিভাব আশ্রয় করিবে। আপাততঃ বিলগিরির বাটীতেই ঠাকুর স্থাপনা করিয়া পূজাদি হউক, তবে পূজার ঘটা একটু কমাইয়া সে সময়টা পাঠাদি ও লেক্‌চার প্রভৃতি কিছু কিছু যেন হয়। কান ফুঁকতে যত পার ততই মঙ্গল জানিবে। কাগজ দুটার তত্ত্বাবধান করিবে ও যাহা পার সহায়তা করিবে। বিলগিরির দুটি বিধবা কন্যা আছেন। তাঁদের শিক্ষা দিবে ও তাঁদের দ্বারা ঐ প্রকার আরও বিধবারা যাহাতে সংস্কৃত ও ইংরাজী স্বধর্ম্মে থাকিয়া শিক্ষা পায়, এ বিষয়ে যত্ন সবিশেষ করিবে। কিন্তু এ সব কার্য্য তফাৎ হতে। যুবতীর সাক্ষাতে অতি সাবধান। একবার পড়িলে আর গতি নাই এবং ও অপরাধের ক্ষমা নাই।

গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; কিন্তু শুনিতেছি ঐ কুকুর হন্যা নহে—তাহা হইলে ভয়ের কারণ নাই। যাহা হউক গঙ্গাধরের প্রেরিত ঔষধ সেবন করান যেন হয়।

---

* স্বামী সদানন্দ

প্রাতঃকালে পূজাদি অল্পে সারা করিয়া সপরিবারে বিলগিরিকে ডাকাইয়া কিঞ্চিৎ গীতাদি পাঠ করিবে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম শিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। শুদ্ধ সীতারাম ও হরপার্ব্বতীতে ভক্তি শিখাইবে। এ বিষয়ে কোনও ভুল না হয়। যুবক-যুবতীদের রাধাকৃষ্ণলীলা একেবারেই বিষের ন্যায় জানিবে। বিশেষ বিলগিরি প্রভৃতি রামানুজীরা রামোপাসক, তাদের শুদ্ধ ভাব যেন কদাচ বিনষ্ট না হয়।

বৈকালে ঐ প্রকার সাধারণ লোকের জন্য কিছু শিক্ষাদি দিবে। এই প্রকার ধীরে ধীরে 'পর্ব্বতমপি লঙ্ঘয়েৎ'।

পরমশুদ্ধ ভাব যেন সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। ঘুণাক্ষরেও যেন বামাচার না আসে। বাকি প্রভু সকল বুদ্ধি দিবেন, ভয় নাই। বিলগিরিকে আমার বিশেষ দণ্ডবৎ ও আলিঙ্গনাদি দিবে। ঐ প্রকার সকল ভক্তদের আমার প্রণামাদি দিও। আমার রোগ অনেকটা এক্ষণে শান্ত হইয়াছে---একেবারে সারিয়া গেলেও যাইতে গেলেও যাইতে পারে প্রভুর ইচ্ছাতে। আমার ভালবাসা নমস্কার আশীর্ব্বাদাদি জানিবে। কিমধিকমিতি---

বিবেকানন্দ

পুনঃ---ডাক্তার নন্জুণ্ড রাওকে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ দিবে ও তাহাকে যতদূর পার সহায়তা করিও। তামিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা হয় তাহা করিবে। ইতি---

বি---

ভাই শশী,---তুমি আমার ভালবাসা জানিবে এবং গুপ্তকে জানাইবে। তুমি সেখানে কেমন থাক সর্ব্বদা লিখিবে। স্বামিজী এখানে অনেক ভাল আছেন, প্রস্রাবের দোষ অনেক কমিয়াছে এই উপকার স্থায়ী হইলে আরোগ্য হইয়া যাইবেন। গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ভাবিত আছি---সে কেমন আছে লিখিবে। তাহাকে সর্ব্বদা আমোদে রাখিবে এবং সকল আবদার সহ্য করিবে। যেমত আমাদের উপর তোমার ভালবাসা সেইরূপ তাহাকে জানিবে। ইতি--- †　　　　----দাস রাখাল

(২)

Almora
The 29th July, 1897

প্রিয় শশী,

তোমার কাজকর্ম্ম বেশ চলছে খবর পাইলাম। তিনটী ভাষ্য বেশ করে পড়ে রাখবে আর ইউরোপী দর্শনাদিও বেশ করে পড়বে, ইহাতে অন্যথা না হয়। পরকে মারতে গেলে ঢাল তলওয়ার চাই, একথা যেন ভুল একদম না হয়। সুকুল এক্ষণে পৌঁছিয়াছে, তোমার সেবাদিও বেশ চলছে বোধ হয়। সদানন্দ যদি সেখানে থাকিতে না চায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবে; এবং প্রতি সপ্তাহে একটা রিপোর্ট, আর ব্যয় প্রভৃতি সব সমেত মঠে পাঠাইতে ভুল যেন না হয়। আলাসিঙ্গার বোনাই এখানে বদ্রীদাসের নিকট হইতে চারিশত টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে—পৌঁছিবামাত্র পাঠাইবার কথা, এখনও কেন পাঠাইল না। আলাসিঙ্গাকে জিজ্ঞাসিবে এবং সত্বর পাঠাইতে কহিবে, কারণ আমি পরশুদিন এখান হতে যাচ্ছি---মশুরি পাহাড় বা অন্য কোথাও যাই পরে ঠিক করব। কাল এখানে ইংরেজ মহলে এক লেকচার হয়েছিল, তাতে সকলেই বড়ই খুসী। কিন্তু তার আগের দিন হিন্দিতে এক বক্তৃতা করি, তাতে আমি বড়ই খুসী—হিন্দীতে যে oratory করতে পারবো তা ত আগে জানতাম না। মঠে ছেলেপুলে যোগাড় হচ্ছে কি? যদি হয় ত কলিকাতায় যেভাবে কার্য্য হচ্ছে ঠিক সেইভাবে করে যাও। নিজের বুদ্ধি এখন কিছুদিন বেশী খরচ করবে না, পাছে ফরিয়ে যায়—কিছুদিন পরে করো।

তোমার শরীরের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে---তবে বিশেষ আতুপুতুতে শরীর উল্টা আরও খারাপ হয়ে যায়। বিদ্যের জোর না থাকলে কেউ ঘণ্টা মানবে না, একথাটা নিশ্চিত এবং এইটা মনে স্থির রেখে কাজ করবে।

আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে ও Goodwin প্রভৃতিকে জানাইবে। ইতি—

বিবেকানন্দ

† স্বামীজীর পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দের (রাখাল মহারাজের) লিখিত অংশ। উঃ সঃ

(৩)

আম্বালা

১৯, আগষ্ট, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

মান্দ্রাজের কাজ অর্থাভাবে উত্তমরূপে চলিতেছে না শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আলাসিঙ্গা ও তাহার ভগিনীপতির টাকা আলমোড়ায় পৌঁছিয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। Goodwin লিখিতেছে যে, যে টাকা বাকি আছে lectureএর দরুণ—তাহা হইতে কিছু লইবার জন্য Reception Committeeকে চিঠি লিখিতে বলিতেছে।

* * *

আমি এক্ষণে ধর্ম্মশালার পাহাড়ে যাইতেছি। নিরঞ্জন, দীনু, কৃষ্ণলাল, লাটু ও অচ্যুত অমৃতসরে থাকিবে। সদানন্দকে এতদিন মঠে কেন পাঠাও নাই? যদি সে সেখানে এখনও থাকে, পরে অমৃতসর হইতে নিরঞ্জন পত্র লিখিলেই তাহাকে পাঞ্জাবে পাঠাইবে। আমি কিছুদিন আরও পাঞ্জাবী পাহাড়ে বিশ্রাম করিয়া পাঞ্জাবে কার্য্য আরম্ভ করিব। পাঞ্জাব ও রাজপুতানাই কার্য্যের ক্ষেত্র। কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তোমাদের পত্র লিখিব।

* * *

আমার শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। এক্ষণে ধীরে ধীরে শুধরাইতেছে। পাহাড়ে দিন কতক থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। আলাসিঙ্গা G G, R A Goodwin, গুপ্ত, সুকুল প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা দিও ও তুমিও জানিও। ইতি—

—বিবেকানন্দ

(১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় রিলিফ বিল পাশ দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নাগরিক অক্ষমতা দূর করার চেষ্টা হয়। মহাত্মা গান্ধীর মতে আপোষ নিষ্পত্তি সর্বাংগসুন্দর হতে হ'লে আরো কয়েকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানও একান্ত প্রয়োজন। তিনি অবশ্যকরণীয় কতকগুলি সংস্কারের একটি তালিকা পত্রাকারে জেনারেল স্মাট্সের নিকট পেশ করেছিলেন। স্মাট্স পত্রান্তরে মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নাবলীর বিশদ আলোচনা করেছিলেন। নীচের চিঠিখানি স্মাট্সের উত্তর পাওয়ার পরে লেখা।)

জুন ৩০, ১৯২৪

অন্য বহু জরুরী কাজ হাতে থাকা সত্ত্বেও গত শনিবার আপনি যে সাক্ষাৎকার দান করিয়াছিলেন আমায়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী সম্বলিত আপনার পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী যে ভাবে অপরিসীম ধৈর্য ও শিষ্টতার সঙ্গে আমার বক্তব্য শুনিয়াছিলেন সেজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-সংগ্রাম সুরু হইয়াছিল যাহার ফলে এক দিকে ভারতীয়দের সমূহ শারীরিক নির্যাতন ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে এবং যাহা সরকারপক্ষেরও বহু উৎকণ্ঠা ও বিচার-বিবেচনার কারণ ঘটাইয়াছিল, ভারতীয় রিলিফ বিল পাশ হওয়ার দরুণ এবং আমাদের পত্রালাপে সেই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমার স্বদেশবাসীরা এ ব্যাপারে আমাকে আরো অধিক দূর অগ্রসর দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের ট্রেড লাইসেন্স, ট্রান্সভালের স্বর্ণ আইন, ট্রান্সভাল নাগরিক আইন, ১৮৮৫ সালে ট্রান্সভালের তিন আইন প্রভৃতির এমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই যে তত্রস্থ প্রদেশের ভারতীয়রা জমির মালিকানা স্বত্ব, ব্যবসা ও বসবাসের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিতে পারে। এই কারণে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। প্রদেশান্তরে গমনাগমনের অধিকারও স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া কেউ কেউ ক্ষুব্ধ। আবার রিলিফ বিল দ্বারা বিবাহঘটিত প্রশ্নের কোন সুরাহা হয়নি। তাহারা আমাকে উপরি উল্লেখিত বিষয়গুলি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সংগ্রামের অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবী জানাইয়াছিল। কিন্তু আমি তাহাদের দাবী মানিয়া লইতে পারি নাই। যাহাই হউক, এগুলি যদিও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সংগ্রামের তালিকাভুক্ত করা হয় নাই, অদূর ভবিষ্যতে যে সরকার পক্ষকে একদিন না একদিন ঐ বিষয়গুলি আরো সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে সেকথা অনস্বীকার্য। যত দিন না প্রবাসী ভারতীয়রা সম্পূর্ণ নাগরিক সুবিধা পাইতেছে তত দিন সম্পূর্ণ সন্তোষ আশা করাও যায় না।

আমি আমার স্বদেশবাসিগণকে ধৈর্য অবলম্বন করিবার অনুরোধ জানাইয়াছি—সম্মানজনক উপায়ে তাহাদের এমন ভাবে জনমত

গঠন করিতে হইবে যাহাতে সরকার পক্ষ আরো অধিক দূর অগ্রসর হইতে বাধ্য হন। আশা করি, দক্ষিণ আফ্রিকার য়ুরোপীয়গণও ইহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিবেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আমদানী নিষিদ্ধ থাকায় এবং গত বৎসরের দেশান্তর গমন নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ করায় কার্যত ভারতীয়দের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ রুদ্ধ হইয়াছে। আমার স্বদেশবাসিগণের যখন সেখানে কোন রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক উচ্চাকাংক্ষা নাই, তখন তাহাদের প্রতি ন্যায়বিচার করাই উচিত এবং যে সমস্ত অধিকারের কথা আমি এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছি তাহারা যাহাতে সেই সব অধিকার পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে পারে য়ুরোপীয়গণেরই সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

ইতিমধ্যে গত কয়েক মাস যাবৎ সরকার পক্ষ থেকে যেরূপ উদারতার সহিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, চালু আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও পত্রোল্লেখিত উদারতার প্রতিশ্রুতি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, আমার নিশ্চিত ধারণা, সমগ্র ইউনিয়নের ভারতীয়রা কিছুটা শান্তি ভোগ করিতে পারিবে এবং সরকার পক্ষেরও কোন দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিবে না। ইতি— এম. কে. গান্ধী।

(ক্যাথারিন অফ আরগনের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ভায়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে অ্যান বোলীন অভিযুক্ত হন। টাওয়ারে বন্দী অবস্থাকালে এই চিঠিখানি অষ্টম হেনরীকে লেখা। ১৫৩৬ সালের মে মাসে অ্যান বোলীনকে হত্যা করা হয়।)

(টাওয়ারের বিষাদমলিন কারাকক্ষ থেকে,)

মহামান্য সম্রাটের অপ্রিয়ভাগিনী হওয়া এবং কারাবাস —দুই-ই আমার কাছে এমন আশ্চর্য্য ঘটনা যে কি লিখব আর কি লিখব না ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না। আপনি এমন লোককে আমার কাছে পাঠিয়েছেন (উদ্দেশ্য, সত্য স্বীকার করিয়ে আপনার অনুগ্রহলাভ) যে আমার বহুদিনের প্রকাশ্য শত্রু। তার কাছে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার উদ্দেশ্য আমি ঠিকমত ধরতে পেরেছিলাম। আপনার কথামত, সত্য স্বীকারেই যখন আমার বাঁচার একমাত্র পথ, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সে-আদেশ শিরোধার্য করলাম।

কিন্তু সম্রাট ভুলেও যেন না মনে করেন যে আপনার হতভাগিনী স্ত্রী এমন একটি অপরাধ কবুল করতে বাধ্য হবে যার চিন্তাও তার মনে কখনো স্থান পায়নি। সত্যি কথা বলতে কি, অ্যান বোলীনের মত এমন কর্তব্যপরায়ণা, প্রেমনিষ্ঠ স্ত্রী সম্রাটের আর একজনও নেই। ঈশ্বর এবং সম্রাটের এই যদি অভিপ্রায় হ'ত আমি তাই নিয়েই সুখী থাকতাম। আমার রাণী সৌভাগ্যের দিনেও আজকের মত এমন আত্মবিস্মৃতি ঘটেনি। আমার অদৃষ্টে যে এ ঘটবে সে-ভয় আমার সব সময়ই ছিল। আমি জানি, [illegible] অনুরাগ প্রমত্ততার ঠুনকো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—[illegible] পরিবেশান্তরেই বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হয়। সামান্য পদ-[illegible] থেকে আপনি আমাকে রাণী ও সহচরীর মর্যাদা দিয়েছেন—সে আমার যোগ্যতা ও কল্পনার অতীত বস্তু। যদি আমাকে সেই সম্মানের পাত্রীই মনে ক'রে থাকেন, নিছক খামখেয়ালীপণায়, অথবা আমার শত্রুদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আমাকে সেই পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না। এ কলংক —সম্রাটের প্রতি দ্বিচারিণী হওয়ার কলংক, আপনার কর্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রী ও শিশু রাজপুত্রীর গায়ে যেন না দুরপনেয় কালিমা লেপন করতে পারে। আমার বিচার হোক, কিন্তু ন্যায়সংগত বিচার আমি চাই। আমার প্রকাশ্য শত্রুরা যেন অভিযোগকারী না হয়—তারা যেন বিচারের আসনে না বসে। আমার নিরপেক্ষ বিচার হোক, কেন না আমার সত্য লাঞ্ছনার ভয় করে না। আর তখনই হয় আমার নির্দোষিতা প্রমাণিত হবে, সন্দেহ নিরসিত হয়ে আপনার বিবেক রাহুমুক্ত হবে এবং পৃথিবীব্যাপী এই অখ্যাতি অপযশের স্রোত চিরকালের জন্য রুদ্ধ হবে, আর নয়ত' আমার অপরাধ প্রকাশ্যে ঘোষিত হবে।

সে যাক্, ঈশ্বর বা সম্রাটের বিধান যাই হোক, কোন নিন্দা যেন সম্রাটকে না স্পর্শায়। আমার অপরাধ বিচারে প্রমাণিত হলে সম্রাট তাঁর দ্বিচারিণী স্ত্রীকে সমুচিত দণ্ড দিতে পারেন—আর ভগবান বা লোকের কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। এমন কি, আপনার অনুগ্রহ-পুষ্ট দলটির প্রতিও তখন আরো অনুগ্রহ বর্ষণ করতে পারবেন। যে দলটির জন্যই আজ আমার এ অবস্থা —কিছুক্ষণ আগেও যাদেরকে আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম। এদের সম্বন্ধে আমার সন্দেহ সম্রাটের একটুও অজানা নয়।

কিন্তু আপনি যদি আমার সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য স্থির করেই ফেলে থাকেন, কেবল মৃত্যু নয় আমার সম্বন্ধে প্রচারিত জঘন্য অপবাদ শ্রবণেই যদি আপনার আনন্দ, তাহ'লে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করেন। ভগবানের কাছে আমার আবো প্রার্থনা, শীঘ্রই আমরা যখন সেই পরম বিচারকের সম্মুখীন হব তখন তিনি যেন আপনাকে আমার প্রতি অবিবেচিত ও নির্মম আচরণের জন্য কোন প্রকার কঠোর শাস্তি না দেন। পৃথিবীর লোক আমার সম্বন্ধে যাই বলুক না কেন, তাঁর ন্যায়বিচারে আমার নির্দোষিতা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হবেই।

আমার শেষ এবং একটি মাত্র মিনতি—আমাকেই শুধু যেন আপনার ক্রোধের সকল দাপট সইতে হয়। যে সমস্ত নিরীহ ভদ্রলোক আমার জন্য (আমি যতদূর জেনেছি) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন আপনার শাসনদণ্ড যেন তাদের না স্পর্শ করে। যদি আপনার চোখে কোন দিন ভালবাসার আলো দেখে থাকি, যদি অ্যান বোলীনের নাম কোন দিন আপনার কাণে মধুবর্ষণ ক'রে থাকে, আমার এই শেষ মিনতি নিশ্চয়ই রাক্ষত হবে। আর অধিক আমি সম্রাটকে বিরক্ত করতে চাই না। ভগবানের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা, তিনি যেন আপনার মঙ্গল করেন—সকল কাজে শুভ নির্দেশ দেন।

৬ই মে, ১৫৩৬। আপনার বিশ্বস্ত ও চিরানুগত

অ্যান বোলীন

(লেডি ক্যারোলিন ল্যাম্ব লেডি বেসবারার কন্যা ও ডিভনশায়ারের ডাচেসের বোনঝি। তিনি ভাই-কাউণ্ট ও লেডি মেলবোর্ণের দ্বিতীয় পুত্র উইলিয়ম ল্যাম্বকে বিয়ে করেন। লেডি ক্যারোলিন ছিলেন মনোরমা মহিলা। তার মেজাজও ছিল খেয়ালী। এই খামখেয়ালীপণা অনেক সময় যাকে বলে পাগলামিতে এসে দাঁড়াত। লণ্ডন সহর সব সময় না একটা নষ্টামিপূর্ণ কৌতুকে সরগরম হয়ে থাকত। লর্ড বায়রণের সঙ্গে তার প্রেমাভিসার সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল পলায়ন-কাহিনী। নীচের এই চিঠিখানি যখন লেখা হয় তখন কেলেংকারী এত দূর ঘনিয়ে উঠেছিল যে; লেডি ক্যারোলিন বাড়ীর চাপে প'ড়ে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হন। তাঁর এই দুর্বিপাকে লর্ড বায়রণ তাঁকে মমতাভরা এই বিষণ্ণ চিঠিখানি লিখেছিলেন।)

প্রিয়তম ক্যারোলিন,

অগাষ্ট, ১৮১২

যে অনভ্যস্ত চোখের জল তুমি সেদিন আমার চোখে দেখেছিলে, তোমার কাছ থেকে বিদায়ের মুহূর্ত্তে যে অধীরতা ফুটে উঠেছিল আমার সর্বাংগে ও মনে, যে অধীরতা এই দীর্ঘ ঘটনার প্রতিক্ষণে তুমি প্রত্যক্ষ করেছ, আমার মুখের যত কথা আর যত কাজ, তোমায় সুখী করার জন্য আমি যা করতে চেয়েছি অথবা যা করেছি—সেই সব মিলিয়েও যদি তোমার প্রতি আমার মনের অনুভূতি সত্যিকারে প্রমাণিত করে থাকে, তবে আর কোন প্রমাণের উপায় আমার হাতে নেই। ভগবান সাক্ষী, তুমি সুখী হও। আজ আমি যখন তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি, বরং তুমিই মা ও স্বামীর প্রতি কর্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমায় ত্যাগ করছ, তখন এ সত্য আমি আবার শপথ করে জানাচ্ছি যে, যত দিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে তত দিন তুমিই রইবে আমার একমাত্র প্রেমময়ী। এ আমার কাছে চির-পবিত্র এবং চির পবিত্রই থাকবে। সেই পরম ক্ষণটি ছাড়া আমার সব চাইতে প্রিয়তম সখার পাগলামি আমি বুঝতে পারিনি। কথার এ সময় নয়। কিন্তু এই বেদনার মধ্যেও আমি একপ্রকার বিষণ্ণ মধুরতা অনুভব করছি যার বিন্দুবিসর্গও তুমি বুঝতে পারবে না, কেন না আজও তুমি আমায় ঠিক চিনতে পারনি। ভারাক্রান্ত হৃদয়েই আমি চলে যেতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু সারা দিনের ঘটনায় যে অসম্ভব কাহিনী পল্লবিত হয়ে উঠত বিকেলে আমার উপস্থিতি তারই মূলে কুঠারাঘাত করবে। তোমার কি এখন মনে হচ্চে প্রিয়তমা, আমি অতি নিরুত্তাপ, কঠোর—ছলনাময় পুরুষ? অন্যেরাও কি তাই ভাবছে? তোমার মা'ও কি তাই ভাববেন? যে মায়ের জন্য অবশ্যই আমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে—আমাকেই সব চাইতে বেশী যা তিনি জানতে বা কল্পনা করতেও পারবেন না কোন দিন? তোমায় ভালবাসব না প্রতিজ্ঞা করতে হবে। কিন্তু হায় ক্যারোলিন, প্রতিজ্ঞার সময় পার হয়ে গেছে। যাক্, কোন ক্ষোভ রাখব না মনে। তুমি ত' সব কিছু দেখেছ, আমার নিজের হৃদয় ছাড়া আর যার সাক্ষী কেউ নেই। ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন, সুখে রাখুন—ক্ষমা করুন।

তোমার—চিরদিনের তোমারই,—
প্রেমানুরক্ত বায়রণ।

(শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'যমুনা' সম্পাদক ৺ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি পত্র দেওয়া হল। এই ক্ষুদ্র চিঠিটিতে শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে)।

রেঙ্গুণ

[এপ্রিল, ১৯১৩]

প্রিয় ফণীবাবু,—আমার হইয়া একটা কাজ আপনাকে করিতে হইবে। আমি প্রচলিত মাসিক কাগজগুলোর সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই জানিতে পারি না বলিয়া সমালোচনা লিখিতে পারি না। আমি নেহাৎ মন্দ সমালোচক নই—সুতরাং এই দিকটায় একটু চেষ্টা করিব,—অবশ্য যমুনার জন্যই। সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি, আমার হইয়া দুই তিনটি ভাল মাসিক কাগজ V. P. P. ডাকে যাহাতে এখানে আসে করিয়া দিবেন। আমি দাম দিয়া delivery লইব। 'প্রবাসী,' 'সাহিত্য,' 'মানসী,' 'ভারতী'। লেখা দিয়া কাগজগুলি বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না—অত লেখাই বা পাই কোথায়? অবশ্য দুই একটা এখন খাতিরে পাইতেছি, কিন্তু ও খাতিরে আমার আবশ্যক নাই। বরং লজ্জা পাইতেছি যে তাঁহারা কাগজ পাঠাইতেছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছুই দিতে পারিতেছি না। মুখ ফুটিয়া এ কথা জানাইতেও লজ্জা করিতেছে। এই সব মনে করিয়াই এই অনুরোধ আপনাকে করি—ঠিকানা 14, Lower Pozoung Street. বৈশাখ থেকে যদি আসে বড় ভাল হয়। আমাদের ক্লাবে কাগজ আসে বটে, কিন্তু সে বড় অসুবিধা। আপনাকে অনেক রকম অনুরোধ করিয়া মাঝে মাঝে ব্যস্ত করিবই। আমার স্বভাবটাই এইরূপ। কিছু মনে করিবেন না—আপনি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি বলিয়াই এইরূপ ব্যাপার খাটিতে বলি। অত মেলে চিঠি ও লেখা প্রভৃতি পাঠাইব। ইতি—শরৎ
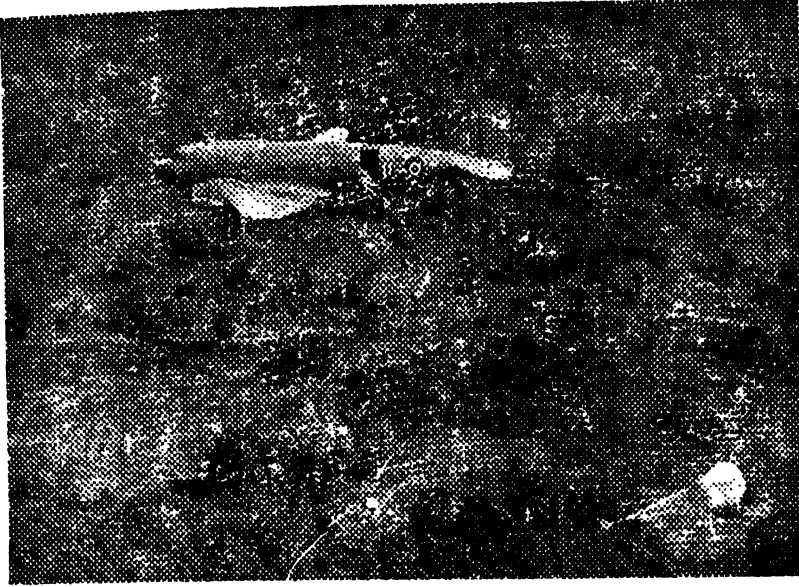
ভ্রষ্ট সাধনার বীরবৃন্দ

উইনষ্টন চার্চিল

বিফল সাধনার কাহিনীতে মানুষের চিরন্তন কৌতূহল। এ মনস্তত্ত্বের কারণ কি? অতীতে যে সাধনা ভ্রষ্ট হয়েছিল ভবিষ্যতে সে সবল প্রাণশক্তিতে বেঁচে থাকে কি করে? আসলে মানব সমাজ যত বস্তুমুখী ও সার্থক, তার চেয়েও বেশী কল্পনাপ্রবণ। অধিকাংশ লোকই নিজেকে বিফল সাধনার নায়ক হিসেবেই কল্পনা ক'রে গর্বানুভব করে, কোন গর্বিত বা আত্মতৃপ্ত বীরের কালজীর্ণ জয়-গাথায় মধ্যে আত্ম-পরিচয় সন্ধান করতে চায় না। তা ভিন্ন পৃথিবীর ইতিবৃত্তের অন্তহীন জয়-কাহিনী দুনিয়াকে দুঃখ ও জটিলতা থেকে মুক্তি দিতে পারেনি কোন কালেই। চলতি কালের ইতিহাসে বহু বার বহু দিকে মানব সমাজ অগ্রগামী হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড়ো বড়ো বিজয় সেই সব অগ্রগমনকে পুষ্টি দেয়নি। দিয়েছে অন্য বহুবিধ কারণ। অদৃশ্য অশরীরী সর্বশক্তি ও প্রভাব মানব সমাজকে যত জোরালো ভাবে বিবর্তিত ক'রেছে মানুষের স্বেচ্ছা-প্রতিষ্ঠিত কোন শক্তির দ্বারাই তা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে ব্যর্থ সাধনার সেই সব কাহিনী লোক-লোচনের অন্তরালে কালগর্ভে সমাধিস্থ হ'য়েছে—সাম্প্রতিক মানব সমাজের সব ভর্ৎসনাকে অতি সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত প্রভাবকে ভবিষ্যতের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হয়েছে। ইতিহাসে এই ধরণের সাম্প্রতিক সফলতার ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার ভূরি ভূরি উদাহরণ ছড়ান। সেদিনের জয়লাভের চলমান চটকের অন্তরালে আবার মূলীভূত হ'য়েছে এমন সব বিবিধ বিচিত্র শক্তি যা অনতিদূর ভবিষ্যতে আবার সেই প্রতিষ্ঠিত প্রভাবকে ব্যর্থতার পঙ্কে নিমজ্জিত ক'রেছে।

'ঈশ্বর সকল জয়ীর সঙ্গে আর কেটো চিরকালই পরাজিতের সাথী।' লুকেনাসের এই বাণী বহু গর্বিত হৃতগৌরব হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তের তিরস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে সেই সব ভ্রষ্ট সাধনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিদেহী থেকে। যেখানে বস্তুহীন ভুবনে কালের কোলে লালিত হয় এমন এক উজ্জ্বল সুস্থ ভবিষ্যৎ যা বর্তমানের ভ্রান্তিভরা দুঃখদায়ী সমাজ-ব্যবস্থার চেয়ে অনেক-গুণে কাম্য।

বিফল সাধনার সেই সব বীর নায়ক যাঁরা আপন আদর্শের জন্য একনিষ্ঠ ভাবে সংগ্রাম করে গেছেন, বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের বনিয়াদের সঙ্গে নিজেদের বড়ত্ব নিয়ে তলিয়ে গেছেন, তাদের দৃপ্ত চেহারায় মানুষ কল্পনার খোরাক পায়! শুধু কল্পনাই নয়, মানব জাতি যে বলিষ্ঠ গৌরব ও মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের সেই সব মৌল-বৃত্তিকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে যায় এই সব নায়কদের কীর্তি-গাথা। আনন্দ হয় এই কথা ভেবে যে, এমন এক জন মানুষ ছিলেন যিনি সর্বস্ব খোয়াবার আগে হার মানেননি। অনেক ক্ষেত্রে যিনি জয়ী হ'য়েছিলেন তাঁর আদর্শই হয়ত ছিল ভাল, কিন্তু তবু বিজয়ীর নামকীর্তন করতে করতে এ কথা আমাদের মনে হয় যে, পরাজিত নায়কের কাছেও আমাদের কিছু কৃতজ্ঞতা বাকি আছে। সেই সব ব্যর্থ বীরবৃন্দ—তাঁদের জীবন, তাঁদের কীর্তি, তাঁদের দুঃখ-বেদনা কোটি কোটি মানুষকে যুগে যুগে প্রেরণা দেয়। জনসাধারণ এই নিয়েই তুষ্ট থাকে যে তাদের নায়কেরা মরতলে প্রতিষ্ঠা পাননি।

অতিক্রান্ত কালের ইতিহাসে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করি। ব্যর্থ বীরবৃন্দের জীবন আলোচনা করি।

কেন্ ও এ্যাবেলের কলহের ঘটনা-পরম্পরা আমাদের এত দূর জানা নয় যে, নিরপেক্ষ ভাবে তার আলোচনা করা সম্ভব। এ কথা সত্য যে, কেন্ হত্যা করেছিল এ্যাবেলকে। সমস্ত ইতিহাস যদি আমাদের জানা থাকত হয়ত দেখা যেত, এ্যাবেল ছিল ঘোর উত্তেজক। হয়ত এ্যাবেলের দাবী ছিল এত প্রবল যে রক্তমাংসের মানুষ কেনের পক্ষে তা সহ্যের অতীত হয়ে উঠেছিল। হয়ত বহু বর্ষ ধরে সে কেন্‌কে নিঙড়ে নিঙড়ে রক্তহীন করে তুলেছিল। এ্যাবেলের শেষ দাবী পূরণ করতে হয়ত কেন্‌কে তার প্রিয় পরিজনদের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখতে হোত, নয়ত এ্যাবেলের চাওয়াকে চিরকালের মত রুদ্ধ করতে হোতই। এ ক্ষেত্রে বিফল প্রচেষ্টা বলব কাকে? এ্যাবেল মরল—কেন্ বেঁচে জিতে রইল। কিন্তু বেঁচে রইল দারুণ অভিশাপের বোঝা নিয়ে।

আমাদের আলোচনার জন্য এমন মানুষের প্রয়োজন, যাদের সম্বন্ধে সম্যক্ তথ্য আমাদের জানার সীমানার মধ্যে। অবশ্য তেমন কাহিনী অপ্রচুর নয়। হেক্টর, ডেমস্থেনিস, হ্যানিব্যাল, মিথার ডেটস, জুগুর্থা, সুলা, সিসেরো, ভারসিন গেটোরিক্স, সম্রাট জুলিয়াস, রিনিকো, কিড, হ্যারল্ড, সাহসী চার্লস, টমাস মুর, মেরী টুডোর, প্রথম চার্লস, কনষ্টানটাইন, পোপ লোগাস, তৃতীয় জর্জ,

ম্যারী এন্টয়নেট, মেত্তারনিক, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, লী, লুডেনডর্ফ। এ তালিকা পুষ্ট করা যে কোন পাঠকের পক্ষে সহজ।

ডেমস্থেনিস প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহ্য থেকে এক আদর্শ সৃষ্টি করে আপন বাগ্মিতায় তা তিনি রক্ষা করে যাচ্ছিলেন, অথচ আসলে যে আদর্শ মোটেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। গ্রীক সাম্রাজ্যের রাণী এথেন্সের প্রতিষ্ঠিত স্বর্গরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখার সাধনা ছিল তাঁর। গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি দেশ গ্রীসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে শাসনদণ্ডের আতঙ্কে নয়—গ্রীসের মহিমা সংস্কৃতির অদৃশ্য সুদৃঢ় বন্ধনে। গ্রীক গ্রীকের শাসক নয়। এক সময়ে শ্রীমন্ত হয়ে উঠবে সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশ। যবনদের বিরুদ্ধে সংহত শক্তিতে প্রতিরোধ দান করবে। কিন্তু এমন দিনে ম্যাসিডনের ফিলিপ এই স্বপ্ন পরিবেশকে পীড়িত করতে সুরু করল। সব গ্রীক সমান—সব গ্রীক সমান মহিমাময়, কিন্তু ম্যাসিডন তার মধ্যে সামরিক শক্তিতে অনেক শ্রেষ্ঠ আর কূটনীতির বীর কৌশলেও সুদক্ষ। তার পর এক দিন ম্যাসিডন আক্রমণ করল গ্রীসকে বিরাট সৈন্যবাহিনী ও শঠতা নিয়ে। সেদিন ডেমস্থেনিসের ধারণা হোল যে যত ভালই হোক না কেন অত্যাচারী মাত্রই অগ্রীক। এক দিকে ফিলিপের দয়াহীন দস্যুতা আর এক দিকে গ্রীক সিনেটের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র—এ দু'য়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডেমস্থেনিস তাঁর সেই অপূর্ব বাগ্মিতা ছোটালেন। ফিলিপ কিন্তু তেমনি থমকে থমকে অগ্রসর হ'তে লাগল।

খ্যাতনামা আইনজীবিদের মধ্যে ডেমস্থেনিসই প্রথম রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করে কর্মের ঘূর্ণিতে আটকা পড়েছিলেন। কোন এক বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে শ্রেয়ঃ মনে করে কোন জাতি অথবা কোন দল যদি কোন কাজ করে, তাকে বলা হয় হুইগারি। ডেমস্থেনিস নিজে ছিলেন সেই হুইগ। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেকটি সাধু চিন্তাকেই অন্য কোন ভিন্নধর্মী চিন্তা, অথবা তীক্ষ্ণ কর্মধারা নিকট কালেই দ্বন্দ্বে আহ্বান করে। অবশ্য চিন্তার চেয়ে কর্ম-প্রখরতায় কাজ হয় বেশী। ফিলিপও তার কর্মপ্রখরতায় ধীরে ধীরে সমস্ত গ্রীক জাতিকেই রাহুগ্রস্ত করেছিল। ফিলিপের চক্রান্ত ও অস্ত্রের তীক্ষ্ণতাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন ডেমস্থেনিস তাঁর বাগ্মিতায়। কিন্তু তরবারির ধারে বাগ্মিতা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। ডেমস্থেনিসের বক্তৃতায় থিবিস ও এথেন্স ঐক্যবদ্ধ হতে পারত, কিন্তু ফিলিপের তরবারি chaeronea-তে সে ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। সুরু থেকেই নিজের পক্ষের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ডেমস্থেনিস। তিনিই বলেছিলেন যে, ফিলিপের সঙ্গে রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আর পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধাদের বিপক্ষে সৌখিন যোদ্ধাদের উপস্থাপিত করা একই কথা। সৌখীন যোদ্ধাদের হার মানতেও বেশী দেরী হোল না। তবু এ কথা বলা শোভন নয়, উচিত শিক্ষা হয়েছে ওদের। হয়ত শোভনই। তবু গ্রীক আদর্শের স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক মৈত্রীর বিনাশের সঙ্গে পৃথিবী কত হতশ্রীই না হয়েছে।

ডেমস্থেনিসের যুক্তি এবং এথেন্সের প্রতিরোধ-শক্তির উপরই আলেকজাণ্ডারের বিক্রম দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। তত দিনে এক সাম্রাজ্যের মধ্যে পারিবারিক আনুগত্যের ধারণা ধূলি-লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। সমগ্র পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ তার সদম্ভ পদক্ষেপ সুরু করেছে। ডেমস্থেনিস কারারুদ্ধ হলেন—পরে নির্বাসিত হলেন। কিন্তু সেখানেও তার নিষ্কৃতি ছিল না। যতক্ষণ না তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করলেন। তথাপি তাঁর গরিমা বিজয়ী সেকেন্দারের চেয়েও কোন অংশে কম নয়। ডেমস্থেনিসের বাগ্মিতার কাহিনী আজও মানুষের মনে প্রেরণা দেয়—সেকেন্দারের দিগ্বিজয়ের কাহিনীর পরোয়া করে কে?

অন্য শ্রেণীর ব্যর্থ সংগ্রামের নায়ক হলেন হ্যানিব্যাল। তিনি ছিলেন কর্মী। তাঁর মানসের বিন্দুমাত্রও আমরা জানি না। শুধু তাঁর বিরাট কর্মজীবনের দিকে আমরা মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকি। তাঁর ইতিবৃত্তের সবটুকু নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছে তাঁর শত্রুরা। বিরাট এক বিয়োগান্ত নাটকের মহারথী হিসেবে তাঁকে আমরা পেয়েছি সমগ্র য়ুরোপের উপর। রোমান প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতিরোধ ছিল হ্যানিবলের সংকল্প। তবুও সে কারণ ছিল আরো ব্যাপক—ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে যত বড় পৃথিবী, সেখানে প্রভুত্ব করবে কোন্ জাতি—আর্য না ইহুদী? কার্থেজ রণাঙ্গনে বিজয়ীদের উচ্ছৃঙ্খল জয়োল্লাসের মধ্যে থেকে হ্যানিব্যালের ছিন্ন শির দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। পরাজিত শত্রুর বিরুদ্ধে যত বিষোদ্গার, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যত কালিমা তার মধ্যে থেকেই হ্যানিবালকে চিনে নিতে হয়। তা ভিন্ন আর আর সব ঐতিহাসিক তথ্যই বিনষ্ট। তবু রোমের প্রতি ঐকান্তিক ঘৃণা নিয়ে যে মানুষটি পিতার সাহচর্যে বেড়ে উঠেছিলেন তাঁর ইতালী আক্রমণের কাহিনী, পনের বৎসর ধরে তাঁর সংগ্রাম-সাধনা, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর চূড়ান্ত লাঞ্ছনা যাঁর প্রতিজ্ঞা এবং সর্বশেষ আফ্রিকায় মাতৃভূমি রক্ষার্থে তাঁর শেষ জেহাদ, সব কিছু মিলিয়ে এমন এক সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর চরিত্রে উজ্জ্বল যার তুলনা নেই মানব-ইতিহাসে। তবু তাঁর চরিত্রের সামঞ্জস্যও আমরা জানি না। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারির শাণিত আঘাতে তিনি যে ভাবে শত্রুকে নিষ্পেষিত করতেন, তাই থেকেই তাঁর চরিত্রের নিষ্ঠুর দুর্দ্ধর্ষতার কিছু মাত্র অনুমান আমরা পাই।

ক্যানেতে প্রভাত কাল। সৈন্যব্যূহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হ্যানিব্যাল। গিসকো নামে তাঁর এক জন পার্শ্বচর অফিসার চেয়ে দেখছিল সম্মুখ চোখে দূর-প্রান্তরে বিরাট রোমান-চমূর দিকে। নিজের মনের ভাব কখন বুঝি প্রকাশও করে ফেলেছিল সে। 'হ্যাঁ, গিসকো'—বললেন হ্যানিব্যাল, তার দু'টি চোখে তাচ্ছিল্যের হাসি, সমস্ত চেহারায় দৃপ্ত পৌরুষ। বললেন তিনি—'হ্যাঁ গিসকো। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য জিনিস কি জান? ওদের মধ্যে একটিও গিসকো নেই।' নায়কের কথায় সেদিন কার্থেজের রণক্ষেত্রে সমবেত সৈন্যদের যে অট্টহাসি উঠেছিল শতাব্দী ডিঙিয়ে তা যেন কাণে এসে পৌঁছোয়।

সমস্ত দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে একা সংগ্রামশীল সেই মানুষটির কি ধাতু ছিল, নব জাগ্রত রোম সামরিক শক্তির আঘাতে আঘাতে জর্জ্জর এবং আপন সৈন্যদের দুর্বলতা ও রসদের অপ্রাচুর্যের মধ্যেও সেই মানুষটির অটলতা তাঁর স্নায়ুর কাঠিন্য সম্বন্ধে আমাদের আরো সচেতন করে তোলে। ইতিহাস থেকে সংগৃহীত আমাদের ধারণা থেকেও যা অতিরিক্ত।

তাঁকেও বিষ পান করতে হয়েছিল। কার্থেজকে পরাজিত করেছিল রোম—সে ভালই হয়েছিল। রোমান-বিবরণীও তাই চলতে চায়। তবু সেদিনের রোম-বীরেরা যত উন্মত্ত অভিনন্দনই পান না কেন, হ্যানিব্যালই আমাদের মনকে জুড়ে দাঁড়ান। তাঁকেই একবার দেখতে চায় দু'টি চোখ, ফেবিয়াস বা স্কিপিওকে নয়।

অলিম্পাসের গিরিবক্ষে তুষার ঝড় ও শৈল-স্খলিত তুষার-স্তূপের মধ্যে বিচরণশীল হস্তিযূথের গম্ভীর চাল-চলন আমার নিজের ভারী সুন্দর লাগে। কত যুদ্ধে তারা একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে লড়েছে। কিন্তু জামা রণক্ষেত্রে তারা পশ্চাদপসরণ করেছিল—যেন স্বসৈন্য ব্যূহের দিকে ছুটেছে আধুনিক যুদ্ধের ট্যাংক-বাহিনী। অগণ্য বিপক্ষ সৈন্য আর মাত্র কয়েকটি হস্তী। সৈন্যদের চীৎকারে ও ধাতুনির্মিত বাদ্যের শব্দে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাতে তাদের কোমল শুণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। বর্শার খোঁচায় তাদের উদর ও সর্বাংগ হয়েছিল শতবিদ্ধ। তবু হস্তী-বাহিনী সহজে নিষ্ঠা ত্যাগ করেনি। কিন্তু সহ্যের অতীত হোল যখন, তখন পলায়ন ছাড়া গতি রইল না। তারাও বিফল সাধনার সাধক। মানুষেরই জয় হোল সেদিন।

এই সব সংগ্রামের সত্যকার ইতিবৃত্ত লেখা উচিত। এই সব সংগ্রামের কাহিনী আধুনিক মহাযুদ্ধের কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী চমকপ্রদ। আজকের যুদ্ধের বোমা-বারুদের অগ্নিবাণে বহু বৎসর ধরে বসুন্ধরার পংক-মৃত্তিকা উৎক্ষিপ্ত হয় শুধু আকাশে আর কুঁকড়ে থাকা মানুষের দল মরে অসহায় ভাবে।

স্বধর্মত্যাগী সম্রাট্ জুলিয়ান অন্য এক ব্যর্থ সংগ্রামের নায়ক ছিলেন। ক্রীশ্চান পরিবেশে মানুষ হয়েও তিনি চেয়েছিলেন—লোক-কাহিনীর কাব্য, স্বপ্ন ও পুরাণ-রহস্যমণ্ডিত পৌত্তলিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু নতুন ধর্মমতকে তিনি নৃশংস ভাবে আক্রমণ করেননি কখনো। প্রতিদিনের জীবনে ব্যঙ্গ-পরিহাস দিয়ে তাদের বিদ্ধ করে তিনি তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাট—নতুন ধর্মমতের একান্ত বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্যে মানুষ ছিল দাস—সাম্রাজ্য ছিল শ্রীহীন। নিজেদের দুর্ভোগের বোঝা নিয়ে তার প্রজারা সেদিন নতুন সান্ত্বনার সন্ধান করছিল—কেন না, অলিম্পাস শিখরের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করে তারা কোন স্বস্তিই পায়নি। তাদের বেদনার্ত হৃদয়ের কাতর আর্তনাদ শুধু পর্বতগাত্র থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসত। তারা তখন চাইছিল কোন বাস্তব চিন্তাধারা যা তাদের মুক্তি দিতে পারবে। আর সেদিন এক নব বিধান তারা পেয়েও ছিল।

সেই বিপরীত ধর্ম-পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেদিন দার্শনিকরা শুধু কল্পনার বীভৎস বয়ন করেছিলেন। মানব-ইতিহাসে বারে বারে ধর্মমত প্রতিষ্ঠা নিয়ে নানা অনুমান হয়েছে। কিন্তু শুধু অনুমান নয়, সেদিন মানুষ সত্য সত্যই নব বিধানের জন্য পিপাসিত হয়ে উঠেছিল।

পার্থিয়ানদের সঙ্গে সংগ্রামে জুলিয়ান যখন দেহত্যাগ করলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ। ক্রীশ্চান ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাঁর বহু চিন্তাপ্রসূত সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈরিতার সেদিন পূর্ণ বিচার হ'তে পারেনি। জুলিয়ানের অনুসৃত নীতির ফলে ক্রীশ্চান ধর্মমতের যত ক্ষতি হয়েছিল, পরবর্তী কালে আরো নৃশংস অত্যাচারেও তা হয়নি। কিন্তু যে বৃদ্ধ বিধাতাদের উপর তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, তাঁদেরও স্নেহ ছিল তার উপর। সেই বিড়ম্বিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তাঁরা জুলিয়ানকে নিষ্কৃতি দিলেন। পরিবর্তনশীল যুগস্রোতে তিনি ছিলেন অনিশ্চয়তার প্রতীক। তাঁর চরিত্রে গ্রীক মহিমতা ও রোমান বীরত্ব সমন্বয় সাধন করেছিল। সেই বিরাট শাসক ও যোদ্ধা, সৌন্দর্যকামী দার্শনিকের দিন ফুরিয়ে গেল। তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে, রোমান-জগতে ক্রীশ্চান ধর্মমতের তিনিই ছিলেন একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

এইখানে ক্যানিউটের কথা স্মরণে আসে। তিনিও চেয়েছিলেন আসন্ন জলস্রোতকে ঠেকিয়ে রাখতে। তাঁর মনস্তত্ত্ববাহী মানুষের ধারা আজো শুষ্ক হয়নি। পরবর্তী কালে মিসেস্ পার্টিংটন ও তার স্বামী আতলান্টিক মহাসমুদ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যদিও ক্যানিউট তার নির্বোধ পার্শ্বচরদের শিক্ষা দেবার জন্য সে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু আধুনিক পার্টিংটনরা অনেক বেশী ব্যগ্র।

রোমের সাধনা ভিন্ন কোন সাধনাই জয়যুক্ত হতে পারে না। সেদিন এই ছিল নিয়ম। কেন্দ্রীয় শক্তি শুধু বাড়তেই জানে। তাই সেদিনের অন্য সব শক্তিই হয় সংঘর্ষে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, নয়ত বিরাট রোম-সাম্রাজ্যের আয়তন আরো বৃদ্ধি করেছে। সেই যুগের রোম-রাহুগ্রস্ত ভূভাগেও কয়েকটি বিরাট আবছায়া মূর্তি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের রোমবিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে যা কিছু জানবার তার উৎস হোল রোমান ইতিবৃত্ত। জুগুর্তা রোম শাসন-শৃংখল থেকে মুক্ত করেছিলেন নুমিদিয়াকে—তার স্বাধীনতাও অটুট রেখেছিলেন কিছু দিন। বিজয়ীর পক্ষ থেকে হয়ত কিছুটা বিকৃত ভাবেই সেদাষ্ট সেদিনকার কাহিনী অমর করে গেছেন। রোমান সৈন্য-বাহিনীর বিপুলতার সম্মুখীন হয়ে সেদিন যে ঘৃণাব্যঞ্জক কথা উচ্চারণ করেছিলেন তিনি তা আজো মরেনি। 'নীলামের সহর' নাম দিয়েছিলেন তিনি রোমকে। কিন্তু রোমের বিরাট শক্তি ও দুর্নীতি তাঁর শেষ চিহ্নটুকু অবধি মুছে দিয়েছিল। শুধু সেই ব্যঙ্গবাণীটুকু মোছেনি।

Vercingetorix আরো বড়ো খ্যাতি পেয়েছিলেন। আজকের জগতেও কেল্‌টিক আদর্শ বেঁচে আছে। কেল্‌টিক আদর্শ, যা পরাজিত হয় কিন্তু হার মানে না—বিফল কিন্তু দুর্দমনীয়, যা অনুচ্চ কিন্তু অব্যয়—সেই কেলটিক জাতি আজো পৃথিবীর সর্বত্র ক্রিয়াশীল। নীল-নয়ন রক্ত-কেশ গল বীরদের সংহত করে একজাতিত্বের সচেতনতায় সমবেত করার দাবী কেলটিক জাতির মধ্যে একমাত্র **Vercingetorix**েরই।

সেকালের কাহিনীতে পড়া যায় যে, কেলটিকরা সর্ব রণাঙ্গনেই অগ্রগামী কিন্তু পরাজিত। সিজারের প্রত্যেকটি রণ-সংবাদে কেলটিক সৈন্য-বাহিনীর পরাজয়ের বিবৃতি। রোমানদের সদর্প জয়োল্লাসের ছবির পাশে সেদিনের সেই যাযাবর সৈন্য-বাহিনী, তাদের পালিত পশু ও বড়ো বড়ো মহিষ-টানা শকটের ব্যূহের মধ্যে নরনারী ও শিশুদের বিপরীত ভাগ্যের সংগ্রামের ছবি যখন আমাদের মনের পটে ভেসে ওঠে, স্বতঃই মনে জাগে—'তাদেরও কি সত্য-সাধনা ছিল কোনো?'

রোমানদের কাছে অবশ্য সে সাধনার মূল্য ছিল না। গল মাত্রই তাদের কাছে অসভ্য। সুসংহত সামরিক শক্তির সহজ শিকার। পদদলিত করার, ক্রীতদাস করার—হত্যা করার তুচ্ছ প্রাণী মাত্র।

গত দু'টি যুগে আফ্রিকার য়ুরোপীয়ানরা যা করেছে, এক সময় গলদের উপর রোমানরা তাই করেছিল। রোমের বিরাট সম্পদ ও রোমের সভ্য সশস্ত্রতার বিরুদ্ধে এক উপজাতির সাহসী প্রতিরোধের কতটুকুই বা দাম? উপজাতির পর উপজাতি,

গ্রামের পর গ্রাম দমন করেছিলেন সীজার। এমন সময় তাদের মধ্যেই এক জন বিরাট ত্রাণকর্তার উদ্ভব হোল। Vercingetorix তাঁর বিক্রমে, তাঁর বাগ্মিতায় সমগ্র গল-গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। একজাতিত্বের শক্তিমত্তায় দীর্ঘ আট বছর ধরে তারা সংগ্রাম চালাল। সে লড়াইয়ের ধরণও বেপরোয়া। সে লড়াইয়ের শেষ অধ্যায় Vercingetorixর দুর্গ-সহর এলেসিয়ায় দীর্ঘ অবরোধ। অবশেষে দুর্গ-সহরের অধিকাংশ বাসিন্দা মরল হয় অনশনে—নয় সীজারের সৈন্ত-বাহিনীর তরবারির আঘাতে। মমসেন লিখেছিলেন—ফিনিসিয় ইতিহাস জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন হ্যানিব্যাল, যেমন আছেন Vercingetorix কেলটিক ইতিহাস জুড়ে। তাঁরা শুধু যে স্বজাতিকে বিদেশী শাসনের শৃংখল থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, তাদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন জাতি হিসেবে নারকীয় অধঃপতন থেকে।

কেলটদের দৃষ্টিভংগী কেমন ছিল তা জানাবার জন্ত কোন সাহিত্যই বেঁচে নেই। তারা শুধু কামনা করেছিল, পৃথিবীর যে মৃত্তিকা-অংশে তারা লালিত-পালিত হয়েছে, তাদের সেই মাতৃভূমিতে সুখে সগৌরবে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকবে। সে আদর্শের জন্ত, তারা মৃত্যু অবধি লড়েছে। কিন্তু তাদের আদর্শ সার্থক হওয়ার একমাত্র অর্থ হোত যে, সারা য়ুরোপে বিচ্ছিন্ন শ্রেণি-সাম্রাজ্য গড়ে উঠত। প্রত্যেকটি উপজাতি আপন আপন পৌরুষ ও আদিম সংস্কৃতির ধারাকে মহিমময় করে তুলত। বার্ড ও ড্রুইডে এক আদিম সংস্কৃতি বেঁচেছিল—সাহিত্যে তার বিবরণীও সার্থক হয়নি—না হওয়াই ভাল হয়েছে। এদিকে রোমান বিজয় অভিযানের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনার ধারারক্ষী Vercingetorix ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ দিলেন। অবশ্য তাঁর কাছ থেকে আর কিছু আশাও করা যেত না, এমন কি তাঁর দুর্ভাগ্যের কোন বিবরণও নয়। কিন্তু তাঁর আত্মা ও গল জাতির আত্মা আজো অপরাজেয় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। রোম-শাসনাধীনে গল ফ্রান্সে রূপান্তরিত হয়েছিল—যে ফ্রান্স আজকের দিনে য়ুরোপের অগ্রগামী দেশ। সেকালের ভ্রষ্ট সাধনার পুনর্জন্ম ঘটেছে একালে। আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, দু'টি লাটিন জাতির মধ্যে কে অধিক শক্তিশালী।

ফরাসী জাতির পক্ষে Vercingetorix যা, ইংরেজের কাছে বোডেশিয়াও তাই। বিগবেনের বিপরীতে তার রথচক্রবাহী মূর্তি আজো বিদ্যমান। স্বর্গতঃ Labouchere এই মর্মর মূর্তিটি সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করেছিলেন। বোডেশিয়ার হাতে ঘোড়ার লাগাম নেই—তাই তিনি বলেছিলেন যে, সেই মহীয়সী মহিলার কর্মজীবনে সবই যদি অমনি শ্লথ ছিল তবে তাঁর সৈন্তবাহিনী যে পরাজয় বরণ করেছিল, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কর্মশৈলীর প্রভাব অবশ্য অনস্বীকার্য। পরাজিত হবার আক্রোশে কবিরা তাদের প্রতিশোধ নিয়ে নেন। আর বিজেতারা সেই কাব্য পড়েন—আমোদও পান এবং নিজেদের কাঠামোর সঙ্গে সেগুলি সাজিয়ে নিয়ে বিশ্বাস করতে সুরু করেন যে সেগুলি তাঁদেরই রচনা।

রাজা হ্যারল্ডের সঙ্গে আমার চিরকালের সম্প্রীতি। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন দেশের সমস্তাগুলি ছিল অতি জটিল। কিন্তু প্রাণ ও পরাক্রমের জন্ত তিনি সাহসের সঙ্গে কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সেই দ্বীপখণ্ডে ছিল যার কিছু রক্ষিদল ও রাজকীয় বাহিনী। আর ছিল চতুর্দিকে উন্মুক্ত সমুদ্র এবং দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত চলাচলের একান্ত অসুবিধা, কিন্তু এই সব সমস্যা নিয়েও হ্যারল্ড অপেক্ষা করেছিলেন হাজার ছেষট্টি সালে দুই দিক থেকে দুটি বিভিন্ন আক্রমণের জন্ত। উত্তরে নর্সরা জল-বাহিনী সজ্জিত করে তুলছিল। দক্ষিণে ডিউক উইলিয়ম ও নর্মান সামরিক প্রতাপ ওঁৎ পেতে বসেছিল। তাঁর সামরিক কৌশল, ধৈর্য ও বীরত্ব সব কিছু সংহত করে হ্যারল্ড তার সামরিক শক্তির প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন যেন। যে সব প্রদেশাংশ প্রথম বিপন্ন হতে পারে তাদের রক্ষীদলকে প্রতিরোধের জন্ত প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। স্বয়ং তিনি কেন্দ্রে তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত রইলেন। তাঁর ঐ অশ্বারোহী বাহিনীই ইংলণ্ডের প্রথম অশ্বারূঢ় পদাতিক বাহিনী। ঘোড়া ছুটিয়ে এগোত তারা কিন্তু লড়ত পদাতিকের মতই। সেই হাজার ছয়-সাত সৈন্ত এক অদ্ভুত সংগ্রাম-নৈপুণ্য দেখিয়েছিল। এদিকে নরওয়েজিয়ান আক্রমণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই হ্যারল্ড নিজে গিয়ে উপস্থিত হলেন ইয়র্কশায়ারে।

ষ্ট্যামফোর্ড ব্রীজে পঁচিশে সেপ্টেম্বর তারিখে হ্যারল্ডের সেই প্রথম ও শেষ জয়াভিযান। সে জয়ে উল্লাস করার সময় ছিল না। ততক্ষণে নর্মানরা দক্ষিণে নেমে পড়েছে। সেখান থেকে দু'শো সত্তর মাইল অগম্য পথ অতিক্রম করতে হ্যারল্ডের তিন সপ্তাহও সময় লাগেনি। হেষ্টিংসে চোদ্দই অক্টোবর হ্যারল্ড শত্রুর সম্মুখীন হলেন।

হেষ্টিংসের যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরেজের মন নিরপেক্ষ। কিন্তু সে যুদ্ধে হ্যারল্ডের পক্ষেই তাদের সায় থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। সে যুদ্ধ এবং যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও আমি নিজে হ্যারল্ডের পক্ষে। তবু এ কথা আমি বলব না যে, হ্যারল্ডের জয়ী হওয়া উচিত ছিল। সেদিন হেষ্টিংসের রণক্ষেত্রে মহাকাল যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন যার অবশ্যম্ভাবী ফলে আজকের দিনে যুক্ত-সাম্রাজ্যে মানুষ সুখে বসবাস করছে, আমার যুক্তি সেই ইতিহাসের বিপক্ষেই যাবে। হ্যারল্ডের সাধনার অবশ্য কোন চমক ছিল না। সেদিন ফরাসী শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগ না পেলে আজো অবধি ইংলণ্ড হয়ত মূঢ় জড় দেশ থেকেই যেত। সে দেশে না থাকত সুন্দরের সাধনা, না হোত ধার্মিক নাট্যের অবতারণা, না আসত দুঃসাহসের জোয়ার। অর্থাৎ ফরাসী উৎকর্ষতার কিছুমাত্র পেত না ইংল্যাণ্ড। হেষ্টিংসের যুদ্ধে অগ্রগামী সংস্কৃতিরই জয় হয়েছিল।

পরবর্তী কালে আর একবার হেষ্টিংসের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে, তার শুধু ঢাল সম্বল ছিল না তাদেরও বেড়া-ঘেরা গড় ছিল। এক জন দিক্‌পাল ঐতিহাসিক ঐ ধরণের গড় আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু ছোট ছোট অভ্রান্ত সমালোচকরা সে আবিষ্কারকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছিলেন সত্যি কথা, হ্যারল্ডের সামরিক শক্তির মধ্যে ছিল রণ-কুঠার আর পদাতিক বাহিনী। কিন্তু নর্মানদের ছিল তীরন্দাজ, অশ্বারূঢ় সৈন্তদল আর ছিল সামরিক শৃংখলা। সেদিনের সেই সব আদিম অস্ত্রধারী রক্ষিবাহিনী যারা দিনরাত্রি ধরে আক্রমণকারীদের নিক্ষেপিত শস্ত্রকে প্রতিরোধ করেছিল—ইতিহাসে তাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন। তবু তারা যে পরাজিত হয়েছিল, সেই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সে দিনের বিফল সাধনার পুনর্জন্ম ঘটেছিল পর যুগে। পূর্ব-এ্যানাগ্লিয়ার জলা-ভূমিতে

যতই বীরত্ব প্রদর্শন করুক হিয়ারওয়ার্ড, পরাজিত জাতির সঙ্গে কখন অলক্ষ্যে বিবাহ-সূত্রে তারা আটকা পড়েছিল তা তারা জানতেও পারেনি। সেবারও রণদেবতার উপর টেকা দিয়েছিল রতি। যে জটিল মুহূর্তে হেষ্টিংসের রণক্ষেত্রে হ্যারল্ডের চোখে তীর বিদ্ধ হয়েছিল, সেই মুহূর্তে এই ভবিষ্যৎ দর্শন করা অসম্ভব ছিল হ্যারল্ডের। সে ক্রান্তদর্শিতা বা ঔদাসীন্য তাঁর ছিল না। সে সব প্রহর ছিল যেমন ভয়াবহ তেমনি নৈরাশ্যময়।

জেকভদের সম্বন্ধে এবং ষ্টুয়ার্ট বংশের পতনের সম্বন্ধে কিছু লিখতে ইচ্ছা করছে। ইংরেজ পরিবেশের মধ্যে তারা ছিল অচল। প্রথম জেম্‌স ছিলেন চতুর, অপ্রিয়। বিচারকদের প্রতি প্রথম চার্লসের চোখে ছিল ঘৃণা। দ্বিতীয় চার্লস তাঁর বংশকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জন-সাধারণের প্রীতিতে তিনি আবার সময় পেয়েছিলেন, কিন্তু সে-সময় তিনি অপব্যয় করেছিলেন মেয়েমানুষ আর কোলের কুকুরদের নিয়ে। দ্বিতীয় জেমস ছিলেন অনেক বেশী স্বার্থত্যাগী, প্রটেসটাণ্ট ইংলণ্ডকে রোমের সঙ্গে আবার বিচ্ছিন্ন করার বাধ্যকতাকে তিনি শাস্তি দিতেন।

সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ অবশ্য সে সব শাসন যুগের জটিলতাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রা সংক্রান্ত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত করেন। তখনকার দিনে মূল্যবান ধাতুর প্রাচুর্য হয়েছিল খুব। সুতরাং এক দিকে মুদ্রার মূল্য গিয়েছিল কমে অথচ দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল জিনিষের। তৎকালীন দরিদ্র রাজাদের কিন্তু বাঁধা আয়ের মধ্যেই শাসন-ব্যবস্থা ও সামরিক খরচাদি কুলিয়ে নিতে হোত। আজকের যুগে মধ্যবিত্তরা যে ভাবে বিপদগ্রস্ত, সেদিন রাজাদের অবস্থাও হয়েছিল তাই—অবশ্য বিপরীত কারণে। কিন্তু পার্লামেন্ট অনুধাবন করতে পারত না যে, কি ভাবে মুদ্রা-মূল্য দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তিত করে। আজও তারা যত মূঢ় সেদিনও এত মূঢ়ই ছিল। তা ভিন্ন তখন সংখ্যা-শাস্ত্রের সুযোগ ছিল না। রাজার প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করার সময় বাজারে বর্দ্ধিত মূল্যের কোন হিসেবই নেয়নি পার্লামেণ্ট। সম্রাটকে তারা নিজের ব্যয় নিজেই বহন করতে অনুরোধ করেছিল। উৎকট-বুদ্ধি হ্যাম্পডেন ইতিহাসে এই বলে খ্যাতি পেয়েছেন যে, তার মাথায় সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধি এসেছিল যে নৌ-বাহিনীর জন্য দেশাভ্যন্তরের প্রদেশগুলির কাছে কর আদায় করা উচিত নয়। সুতরাং ষ্টুয়ার্ট বংশের পরিত্যক্ত রাজ-গদীতে হানোভার বংশ আসীন হোল। তার পর এল আমাদের যুগ, আর সেই সঙ্গে এল উন্নতি—বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হোল, বাজার কাটকা সুরু হোল। জেকোভাইটরা আর তাদের হোয়াইট রোজ লীগ এক ব্যর্থ কারণ হয়ে রইল চিরকালের জন্য।

ব্যর্থ সাধনার নায়কদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলেন জেনারেল লী। লীর সামরিক প্রতিভা এবং উন্নত দৃপ্ত চরিত্রের জন্য তাঁর সাধনার প্রতিও অবাক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চেয়ে আছে চলতি কালের ইতিহাস। আমরা জানি যে, সে দিন যে যুক্ত সৈন্যবাহিনী দক্ষিণাংশের জন্য বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল, তারা নিজেদের রাষ্ট্রের সার্বভৌম স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। দু'বছর সংগ্রামের পর তবেই না উত্তরাংশে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধন তারা দাবী করেছিল। অন্ততঃ উত্তর-আমেরিকা থেকে ক্রীতদাস-প্রথা চিরকালের মত বিলোপ করেছিল সেই পবিত্র জেহাদ। সেদিনের জনসাধারণ যে ব্রতকে মূঢ় জঘন্য বলে ভাবত, সেই ব্রতের ধ্বজাধারী এক জন মানুষ বহু দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েও সেই পবিত্র সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। যত দিন কেটেছে মানুষের মনে লী ও তাঁর পার্শ্বচরদের ছবি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেদিনকার বিজয়ীর ছবি কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তাঁদের সাধনা ব্যর্থ হয়েছিল বটে, তাঁদের দেশ বিরাট শক্তিশালী আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেই বীর নায়কদের নাম মানুষের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয় সম্পদের মত তাঁরাও আছেন।

শ্রীলঙ্কা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত
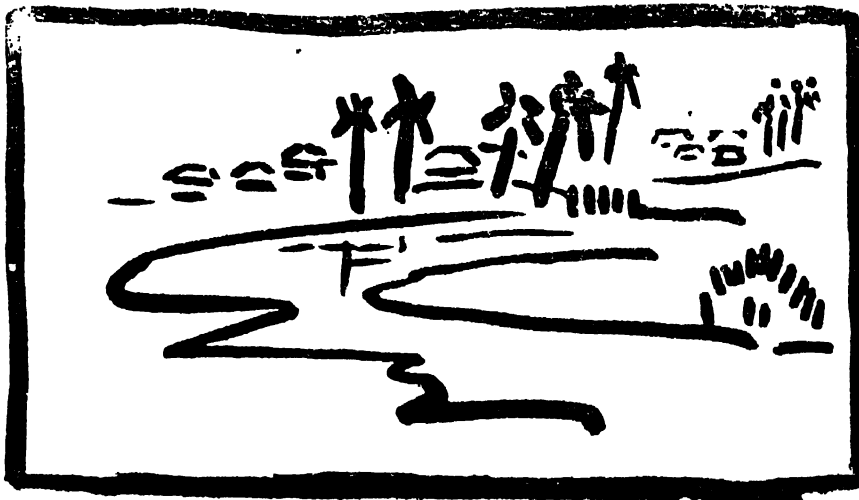
স্বাধীন সিংহলের জাতীয়-সঙ্গীতের প্রারম্ভে আছে—নমো শ্রীলঙ্কামাতা। এই লঙ্কামাতা শব্দ সূচনা করে বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে লঙ্কার কৃষ্টিগত সম্বন্ধ। বঙ্গমাতা, ভারতমাতা আমাদের দৈনন্দিন আদরের প্রাধান দেশমাতৃকার। আমি বাংলা এবং ভারতবর্ষের নাম এ সম্পর্কে উল্লেখ করছি, কারণ, সিংহলের অধিবাসী আজিও সগর্বে বলে—আমরা ভারতের বঙ্গদেশের ঔপনিবেশিক। অবশ্য উত্তর-সিংহলের অধিবাসী তামিল-ভাষাভাষী: তারা নিজেদের তামিল-সিংহলী বলে। সিংহলে জাতীয়তা সংগঠনে উভয় বিভাগে যে সবিশেষ একপ্রাণতা নাই, দুই পক্ষের সংবাদপত্র পাঠ করলে কিম্বা উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদের সঙ্গে বাক্যালাপ করলেই বোঝা যায়। কাণ্ডটা পরিতাপের বিষয়। সকল গৃহবিবাদের মূল কারণ এক—ক্ষমতা হস্তগত করবার প্রচেষ্টা এবং নিজের সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী কর্মে সুবিধা লাভের আয়োজন। কিন্তু সিংহলের মত ক্ষুদ্র দ্বীপে এমন সাম্প্রদায়িকতা মারাত্মক। লঙ্কার হিতকামী মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য একজোটে এক আদর্শে স্বদেশের উন্নতির পরিকল্পনা। লঙ্কা সত্যই স্বর্ণ-লঙ্কা হতে পারে যদি সিংহলী মাত্রেই কৃত-সংকল্প হয়—শ্রীলঙ্কার শ্রীবৃদ্ধির আয়াস ও প্রয়াসে।

স্বর্ণলঙ্কা শব্দ স্মৃতিপটে আনে শ্রীরামচন্দ্র, মা জানকী, দশানন ও বিভীষণ—অবশ্য হনুমান। কিন্তু আধুনিক লঙ্কায় রামায়ণের ঐতিহ্য যোটে নাই। দু'-এক জন পণ্ডিতের সঙ্গে গবেষণায় কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণ সিংহলীর মাতৃভূমি-প্রেমের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের স্থান নাই। একটি মাত্র মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ এক চিত্রে শ্রীরাম কর্তৃক বিভীষণের রাজ্যাভিষেকের চিত্র আছে। কিন্তু সে উৎকীর্ণ প্রস্তর-ফলক আধুনিক। এই মন্দিরের এক দিকে বিভীষণের প্রাসাদের নির্দেশ আছে, নামও আছে। কিন্তু তার জনপ্রিয়তা নাই।

সিংহলের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধ। তাই বৌদ্ধ ইতিহাস, বুদ্ধদেবের জীবন-কথা এবং যাঁরা বৌদ্ধ নীতি-সুধা এনেছিলেন তাঁদের গৌরব-স্মৃতিতেই সিংহল গৌরবান্বিত। শিক্ষিতরা নিজেদের বঙ্গ-ভারতীয় বলেন, সুতরাং বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়-বার্তাও এঁদের নিকট মনোরম। বহু লোকের উপাধি সিংহ—আমাদের দেশের মত মাত্র সিংহ নয়—মুনেসিংহ, সমরসিংহ, বিক্রমসিংহ প্রভৃতি। সিংহ জাতীয় নিশানের প্রতীক। এবং প্রাচীন ও আধুনিক সকল অট্টালিকায় সিংহ-চিত্রের প্রাচুর্য্য, কিন্তু লঙ্কার সিংহ চিত্র বাস্তব সিংহের প্রতিকৃতি নয়। যে হেতু, ছবির সিংহের পশুরাজের মত কোমর বা দেহ নাই। বিরাট কেশর এবং অনতিদীর্ঘ এক জানোয়ার কেশরীর রূপ-কল্পনার মধ্যে দেখা যায়।

আমার মনে হয়, ভারতমাতার প্রকৃত রূপ এবং আকৃতি উপলব্ধি করতে গেলে লঙ্কামাতার দর্শন অবশ্য কর্তব্য। বৃহত্তর ভারত বললে দক্ষিণ-সাগরপারের যে সব দ্বীপ বা উপদ্বীপ বোঝায়, সিংহলের তাদের সঙ্গে পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। ত্রিবাঙ্কুর বা কোচিনে পরিভ্রমণ করবার সময় যেমন আর্য্য-দ্রাবিড় লোকের এবং পরিচ্ছদের আভাস পাওয়া যায়, সিংহলের প্রধান সহর কেন, পল্লীতেও তেমনি পোষাক-পরা ঐ রকম চেহারার লোকের বাহুল্য। ভাষা মলয়ালমও যেমন দুর্বোধ্য অবশ্য সিংহলীও তেমনি। কিন্তু এ উভয় ভাষা পরস্পরের মধ্যে বা তামিল, তেলেগু এবং কানাড়ীর সঙ্গেও এদের কারও সম্পর্ক নাই। অথচ সাহিত্যের ভাষা ধীরে ধীরে প্রণিধান করলে বোঝা যায় যে, এই পঞ্চ ভাষার মধ্যে বহু সংস্কৃত শব্দ স্বরূপে এবং বিকৃত কলেবরে বিদ্যমান। আর বিশেষ বিস্ময়ের কথা—কতকগুলি বাংলার নিজস্ব কথা, যেমন ভাত বা গাছ, বাত বা গাচ রূপে, সিংহলীতে বিদ্যমান। এই ভাষাতত্ত্ব প্রকৃতই অনুশীলনের বিষয় এবং সেই গবেষণার ফলে প্রাচীন বাঙলা ও সিংহলের সম্পর্ক ফুটে ওঠবার সম্ভাবনা। অতি ক্ষণিক দৃষ্টিতে আধা-হাত কামিজ ও পেণ্টলান-পরিহিত সিংহলীকে দেখলে বাঙালী বলেই ভ্রম হয়। আর যে মহিলারা বাঙালীর মত শাড়ী পরিহিতা তাঁদের বাঙালিনী মনে হয়। মাদ্রাজের পথে চলতে সে ভ্রম হয় না।

স্থানীয় হিন্দু-মন্দির

কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর বা সিংহলের আধুনিক মেয়েরা আমাদের আধুনিকাদের মতই দেখতে। তবে বাঙলায় যেমন ধবধবে সুন্দরী দেখা যায়, তেমন বর্ণ লঙ্কায় বিরল। শ্যামবর্ণ ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই ভদ্র সংসারের ছেলে মেয়ের রঙ। পল্লীগ্রামে বা পার্বত্য প্রদেশে দু'চার জন চেরীর সন্ধান পাওয়া যায়। তারা বেদ্দা প্রভৃতি আদিম অধিবাসী। প্রবাদ, আদিবাসী যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি কুলে জাত।

আমি মাত্র সেদিন সিংহলে গিয়েছিলাম। পূর্বে সিংহল যাত্রার বাহন ছিল রেল বা জাহাজ। অর্ণব পোত মাদ্রাজ হ'য়ে কলম্বো পৌঁছতে সাত দিন লাগে। রেলপথে মাদ্রাজ পৌঁছান যায় তৃতীয় দিনে। তার পর বিভিন্ন মিটার গেজ রেলে মাদ্রাজ হ'তে ধনুষ্কোটী যেতে লাগে দু'দিন। সাগর পার হয়ে আবার রেলে কলম্বো পৌঁছতে লাগে প্রায় বারো ঘণ্টা। অবশ্য পথের কষ্ট আছে। যাবার পথে পথে চিদম্বরম, কুম্ভকোনম, তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বর। এ সব তীর্থ দর্শন করবার লোভ সম্বরণ ক'রে রেলপথে যেতেও অনেক সময় লাগে। এগুলি পরিভ্রমণ করলে এক মাসে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল পরিদর্শন সম্ভবপর।

ভক্তপ্রধান হনুমান, জয় রাম বোলে এক লাফে লঙ্কায় পৌঁছেছিলেন। জানকী উদ্ধারের পর "পুষ্প বিমানেন বিগাহমানঃ" শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেই এরোপ্লেন হ'তে তিনি জানকীকে দেখিয়েছিলেন রত্নাকর-তীরের শোভা—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার প্লেন কলিকাতা হ'তে বাঙ্গালোর যায়। সিলোন-যাত্রী এই প্লেনে মাদ্রাজ অবধি উড়ে যায়। তার পর এয়ার ইণ্ডিয়ার জাহাজে কলম্বো পৌঁছে। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠান বাঙালীর, শেষোক্ত টাটার। আমি ইতিপূর্বে কখনো দূর পাল্লা দিই নাই হাওয়াই জাহাজে। নানা কথা শুনতাম—রক্তের চাপ বাড়ে, বমি হয়, মাথা ঘোরে ইত্যাদি। জাহাজে আমার কখনও সামুদ্রিক পীড়া হয় না। উড়ো জাহাজেও হাওয়াই পীড়ার কোনো ইঙ্গিত পেলাম না বা কোনো সহযাত্রীর তেমন লক্ষণ দেখলাম না। ভোর সাতটায় সময় দমদম হতে যাত্রা করলাম। প্লেন ছিল ডাকোটা শ্রেণীর—নাম লেখা মেঘবাহন। চালক, পরিচালক, বেতার-কর্মী, এমন কি হোস্টেস সবাই বাঙালী। অতি মসৃণ, সরল অথচ ক্ষিপ্রগতিতে জাহাজ চললো। গবাক্ষ দিয়ে দেখি গ্রামের পর গ্রাম, নদীর পর নদী, কত জলা, কত প্রান্তর ছায়াচিত্রের মত অপসরণ করছে। রেলে নড়লে গা নড়ে, নিজের আসনে বসে লেখা যায় না। আমি পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, এরোপ্লেনের আসনে উপবিষ্ট হয়ে অনায়াসে লেখা যায়। শব্দও রেলের শব্দ হতে বিকট নয়। অনেকে কাণে তুলার ছিপি ব্যবহার করে। যে সারা দিন পুলিশ কোর্টে থাকে এবং রাত্রে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে বাস করে সে কোলাহল-জয়ী। সুতরাং এরোপ্লেনের শব্দ আমাকে কাতর করলে না। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় উড়ো জাহাজ যে বীভৎস ধ্বনি করে, প্লেনের ক্রোড়ে তত অধিক শব্দ শোনা যায় না। মোট কথা, রেল গাড়ীতে ভ্রমণ করবার সময় যে শব্দ কানে বাজে আকাশ-পথে ওড়বার সময় ততোধিক শব্দ কানকে উৎপীড়ন করে না। শুনেছি, হঠাৎ নামবার সময় কানে তালা লাগে। তখন না কি নাক টিপে জৃম্ভন করলে তালা ছাড়ে।

জাহাজ ভোর সাতটা থেকে এক টানে উড়ে বেলা সাড়ে দশটায় ওয়ালটেয়ারে পৌঁছে। জাহাজ নামবার ওঠবার সময় অনেক পাক খেয়ে ধীরে ধীরে ওঠে-নামে—সুতরাং অস্বোয়াস্তি হয় না। সত্যই আমি গর্বিত হলাম এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়ার বাঙালী চালক, কর্ণধার প্রভৃতির কৃতিত্বে। এরা নবীন, কৃতবিদ্য ও বিনয়ী। আমাদের যুবকদের পক্ষে এ বৃত্তি গৌরবের। গত মহাযুদ্ধে বহু বাঙালী পাইলটরূপে যশ অর্জন করেছেন এবং প্রাণ হারিয়েছেন। আমার পরমাত্মীয় বিগত উইং-কমাণ্ডার করুণ মজুমদারের স্মৃতিতে ব্যথিত হলাম। অথচ তার কৃতিত্বের গৌরবে গর্ব অনুভব করি সর্বদা।

মাদ্রাজে কলম্বোর যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে কলিকাতার প্লেন যায় বাঙ্গালোর। ভিজাগাপত্তন হতে মাদ্রাজ অবধি জাহাজ সমুদ্রের উপর দিয়ে যায় ভারতবর্ষের কূলে কূলে। এক দিকে দিগন্তবিস্তৃত নীল সাগর, অন্য দিকে সাগর-ফেনা-চুম্বী বেলাভূমি, পূর্বঘাট শৈলরাজির পরিখা। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে বালুচরে, শৈল-পদপ্রান্তে। আট-নয় হাজার ফুট উপর হতে মাত্র একটা শ্বেত রেখা দেখা যায় ভূমিস্পর্শী। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গের কোনো সাড়া বা ইসারা পাওয়া যায় না উপর হতে—মাত্র তরল নীলের বিস্তীর্ণ টলটলে ছবি, রবির কিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে মাঝে মাঝে প্রশান্ত হরিৎ বিস্তৃতি। পথে পড়ে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও পেন্নার নদীর সাগরসঙ্গম।

জেলে

মাদ্রাজে কলম্বোর যাত্রীদের আবার ব্যস্ত হতে হয়। পুলিশ দেখতে চায় পাশপোর্ট এবং খতির টাকা। ২৫০ টাকার অধিক মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। ভারতীয়ের ছাড়পত্র লাগে না। সরকারের হুকুম মত অর্থ ব্যাঙ্কের মারফত আজকাল বিদেশে পাঠানো যায়। কাষ্টমস্ বাক্স খুলে পরীক্ষা করে, শুল্ক ধার্য্য যার ওপর আছে এমন কোনো পদার্থ সঙ্গে আছে কি না। পরীক্ষান্তে বাক্সর উপর খড়ির স্বাক্ষর করে দেয়। তার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা। প্রত্যেক যাত্রীকে চিকিৎসকের পত্র দেখাতে হবে যে, সে এক মাসের মধ্যে বসন্ত, কলেরা এবং টাইফয়েডের টীকা নিয়েছে কি না। যদি তেমন সার্টিফিকেট থাকে এবং নাড়িতে জ্বর না থাকে, তবে যাত্রী যেতে পারে লঙ্কায়।

তখন ছিল ঔপনিবেশিক শাসন-তন্ত্র। তারা স্বাস্থ্য পরীক্ষার অজুহাতে রাজনৈতিক হুকুমের ভয়ে ভারতীয়কে বাধা দিত লঙ্কায় প্রবেশ করতে। আরও ভয় ছিল, তাদের শ্রমিক-শিবিরে বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রসারে মুনাফা হ্রাসের। কিন্তু স্বাধীন সিংহল তাকে কেন বাধা দেয়—যে বাঙালী চিকিৎসকের পত্র দেখায় এবং কুলি-পল্লীতে না বাস ক'রে ইংরাজ-পরিচালিত, এবং অন্ততঃ চার শত সম্ভ্রান্তের সাথে গল্ ফেস্ হোটেলে বাস করবে। নিগ্রহের শেষ মাদ্রাজে নয়। কলম্বো পৌঁছেই ডাক্তারের জোর উৎপীড়ন। তার পর একখানা মোচলেখায় সহি দিতে হবে যে, পনেরো দিন যাবৎ এক দিন দু'দিন অন্তর ডাক্তারের কাছে হাজির দিতে হবে। শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধদেবের শ্রীমন্দির দর্শন করতে তিন দিনের জন্য গেলে প্রথমে চিকিৎসক দর্শন করতে হবে তিন বার। সিংহলের অতিথি সেবা মনোরম ও অপূর্ব। সিংহলবাসীর সৌজন্য উপাদেয় ও উপভোগ্য। কিন্তু এদের গবর্ণমেন্টের রোগাতঙ্ক ও তজ্জনিত যাত্রী-উৎপীড়ন বিচারসহ নয়। সাবধানের বিনাশ নাই সত্য। কিন্তু অতি ভক্তির মত অতি সাবধানতা ভালো লক্ষণ নয়।

কোনো মানচিত্র দেখলে সিংহলকে দেখায় একটি কাঁচা আমের মত; ভারতবর্ষের নিচে যেন ঝুলছে। উপর হতে সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ অবশ্য দেখা যায় না। কিন্তু ভারত ছেড়ে সিংহলের উপবিভাগে পৌঁছবার উত্তেজনা মনোরম। প্লেন দক্ষিণ দিকে ছুটছিল। এতাবৎ ডান দিকে ছিল জমি, বামে সমুদ্র। তার পর হল বামে জমি, দক্ষিণে সমুদ্র। নতুন প্লেনের হোষ্টেস্ মিস্ জেকব হাতে বুলেটিন দিল। দশ হাজার ফুট উঁচে উড়ছি। ১৮০ মাইল ঘণ্টায় গতি—নিম্নে জাফনা। সিলোনের পশ্চিম উপকূলে বিস্তৃত জলাভূমি। পূর্বে চিল্কার উপর দিয়ে এসেছিলাম। তাতে মাত্র একটা বড় প্রবেশ-পথ আছে সাগরের। জাফনা উপকূলের হ্রদ এক দিক সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই কূলে মাছ ধরার ধুম আর সাগরের এই প্রান্তেই মুক্তা ওঠে সমুদ্র হ'তে।

বেলা পাঁচটায় কলম্বোর উপর এলাম; প্লেন হ'তে সহর দেখা যাচ্ছে। মসজিদের চুড়া, গির্জার শিখর, মন্দিরের গোপুরম, বড় বড় বাড়ী। কিন্তু সমস্ত ছবিটার পটভূমি হরিৎ—নারিকেল গাছ, তাল গাছ, বড় বড় মহীরুহ। সহর ছেড়ে দক্ষিণে চলে গেলাম—প্রায় দশ মাইল। তার পর নামলাম। রত্নামালম।

আবার পুলিশ, পরীক্ষা, কাষ্টম, যা'র চেয়ে দরদী চিকিৎসক! ইনি কতোয়া দিলেন এক দিন অন্তর সহরের কোয়ারানটিন ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

"কোথা সে পীঠস্থান?"

"খুঁজে নেবেন। বোরেল্লা।"

মহাবোধী সোসাইটির সচিব ভিক্ষু জিনরত্ন একটা প্রোপাগাণ্ডা করেছিলেন। তার ফলে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ষ্টেশনে এসেছিলেন—ডাঃ কান্নাগারা—যিনি শিক্ষা-সচিব, থাকার কালে সিংহলে বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছেন প্রত্যেক কলেজে। আর এসেছিলেন শ্রীমতী রাজা হেওয়াবিতারণ—মহাপ্রাণ ধর্মপালের ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ, ডাঃ গুনরত্নক—প্রত্নতত্ত্বের সহকারী ডিরেক্টর, সম্প্রতি ডেনমার্ক হ'তে ফিরেছেন। মুদালিয়র মলনগোড়া, তাঁর কন্যা শ্রীমতী সুবিনিতা ও জামাতা ডগলাস ডি অলবিস প্রভৃতি। আমার কলিকাতার পরিচিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমলশেখর ছিলেন এঁদের সঙ্গে। আমি অভিভূত হ'লাম। বাঙলাকে এরা শ্রদ্ধা করে। আমরা এদের জন্য কি করি? হেসে বললাম—ধন্য হলাম। কিন্তু এক দল ব্যাণ্ড-বাজনা আনলে আপনাদের অভ্যর্থনা সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ত।

ডাঃ কান্নাগারা বললেন—ভুলছেন কেন আপনারা—মহাবোধী হলে আমাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সেদিন সিংহল স্বাধীনতার উৎসব সমারোহে সম্পন্ন করেছিলেন বাঙালী ভায়েরা এবং সভাপতি ছিলেন আপনাদের গবর্ণর।

-চম্পার কুমারী

অবশ্য তাতে গান ছিল, বাজনা ছিল। কিন্তু হাতী নিজের দেহ দেখতে পায় না। তাঁর কল্যাণে আজ সারা সিংহলের কলেজের ছেলে-মেয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা পায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ গুনরত্নকের গাড়ীতে তাঁর বিমলশেখরের সঙ্গে সমুদ্রকূলে গল্ ফেস্ হোটেলে এসে পৌঁছিলাম। সাগরের হাওয়া পথের সকল কষ্ট নষ্ট ক'রে সঞ্জীবিত করলে আমাকে। কোনো রাষ্ট্রের রাজধানী এতো হরিৎ ও পুষ্প-শোভিত হতে পারে, কলিকাতার অধিবাসী সে কথা কল্পনা করতে পারে না।

ব্রাহ্ম সমাজ
ও
শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বর্তমান ভারতের জনকস্বরূপ রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৩৩ সালে রাজা পরলোকে প্রয়াণ করেন; আর ১৮৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়। রামমোহনের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হ'ন।

কালী-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও স্বীয় ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিন বলিলেন, 'শুনিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বর-চিন্তা করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।' হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন মথুরানাথের সহপাঠী। সুতরাং পূর্ব হইতে কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়াও ঠাকুরকে দেবেন্দ্রনাথের নিকট লইয়া যাইতে মথুরানাথের কোন দ্বিধাই হইল না। মথুরানাথের সঙ্গে ঠাকুর এক দিন দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ সাদরে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা পূর্বক তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ করিলেন। ঠাকুর এই ব্রাহ্মনেতার দেহের অধ্যাত্ম লক্ষণসমূহ দেখিবার জন্য তাঁহার শরীরের উর্ধভাগ অনাবৃত করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত করিলে ঠাকুর তাঁহার বিশাল বক্ষে গোলাপী আভা দেখিতে পাইলেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, "যখন তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাকে স্বভাবতঃই ঈষৎ অহঙ্কৃত বলিয়া মনে হইয়াছিল। এত ধন, সম্পদ, সম্মান, পাণ্ডিত্য; অহঙ্কৃত হইবারই কথা। উহা মনে করিয়া মথুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অহংকারের মূল কারণ কি? ইহা জ্ঞানের জন্য হয়, না অজ্ঞানের জন্য হয়? ব্রহ্মকে যে জানিয়াছে সে কি কখনও আপনার বিদ্যা বুদ্ধি, ধন ও সম্পদের জন্য গর্ব অনুভব করিতে পারে?" দেবেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমার মন সহসা এক উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইল। সেই ভূমি হইতে আমি সকলের চরিত্র অবগত হইতে পারি। বিবেক-বৈরাগ্য অন্তরে পরিপূর্ণ না থাকিলে, তখন মহাপণ্ডিতগণকে তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ হয়। আমার হাসি আসিল। দেখিলাম, দেবেন্দ্রের যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে। তাহার অনেকগুলি ছোট ছোট সন্তান আছে। তাই মহাজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও সে সংসারে লিপ্ত। তাহাকে বলিলাম, 'তুমি কলির জনক। সংসারে থাকিয়াও জনক ঋষি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তুমি সংসারে থাকিয়াও ভগবানে মতি স্থির রাখিয়াছ। তাই তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমাকে ভগবানের কথা কিছু শুনাও।' *

আমার অনুরোধে দেবেন্দ্র বেদ হইতে কয়েকটি শ্লোক আমাকে শুনাইল। সে বলিল, 'এই বিশ্ব একটি ঝাড় আলোর মত, প্রত্যেক প্রাণী এই ঝাড় আলোর এক একটি বাতি।' পঞ্চবটীতে ধ্যান করিবার কালে আমারও এই দর্শন হইয়াছিল। আমার অনুভূতির সহিত মিলিয়া যাওয়ায় ভাবিলাম, দেবেন্দ্র নিশ্চয়ই এক জন মহাপুরুষ হইবেন। আমি তাহাকে এই বাক্যটি ব্যাখ্যা করিতে বলিলাম। দেবেন্দ্র বলিল, 'এ জগৎকে কে জানিতে পারে? ভগবান মানুষকে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। ঝাড় আলো যদি নিবিয়া যায়, সব কিছুই তখন অন্ধকারে আবৃত হয়। তখন ঝাড় আলোকটিকেও দেখা যাইবে না।' অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা কথাবার্তা বলিলাম। সন্তুষ্ট হইয়া দেবেন্দ্র আমাকে তাহাদের ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করিল। আমি বলিলাম, 'তাহা ভগবানের ইচ্ছার উপরে

কেশব সেন

* কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত Life of Ramakrishna (২২২—২২৩ পৃষ্ঠা) চতুর্থ সংস্করণ, দেখুন।

নির্ভর করে। আমার অবস্থা তো দেখিতেছ। তিনি যে কখন আমাকে কোন্ অবস্থায় রাখেন তাহার কিছু ঠিক নাই।' দেবেন্দ্র বলিল, 'না, তোমাকে আসিতেই হইবে। তবে তুমি ধুতি-চাদর পরিয়া আসিও। যা তা অবস্থায় তুমি আসিলে তোমাকে দেখিয়া লোকে মন্দ বলিবে, তাহাতে আমার বড় কষ্ট হইবে।' আমি বলিলাম, 'তা অসম্ভব। আমি বাবু সাজিতে পারিব না।' এই কথায় দেবেন্দ্র, মথুর ও অন্য সকলে হাসিতে লাগিল। পরদিন মথুরের কাছে দেবেন্দ্রের নিকট হইতে পত্র আসিল, আমি যেন উৎসবে না যাই। নগ্ন গাত্রে উৎসবে যাওয়া শোভনীয় হইবে না। ইহা হইতে প্রতীত হয়, দেবেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ মিলন হয় নাই।

আরো অনেক বাঙ্গালী যুবকের ন্যায় অন্তরে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বশতঃ নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং যথারীতি উহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইলে তিনি এক দিন দেবেন্দ্রনাথের নিকট গমন করিয়া প্রশ্ন করেন, "মহাশয়, আপনি কি ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন?" মহর্ষি বলিলেন, "তোমাতে যোগীর লক্ষণসমূহ প্রকটিত দেখিতেছি। ভগবানের ধ্যান কর, তাঁহার দর্শন পাইবে।" এই পরোক্ষ উত্তরে নরেন্দ্রনাথের মন তৃপ্ত হইল না। অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না সেইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি কখনও জ্ঞান-পিপাসুর হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে পারে না। ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন না পাওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ অথবা অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাগণের কেহই নরেন্দ্রনাথের ধর্ম-পিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। যাঁহারা আন্তরিক ধর্মজিজ্ঞাসু, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন ব্যতীত তাঁহাদের অন্য উপায়ান্তর রহিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তাঁহাদের জীবনে নহে, ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের জীবনেও সুগভীর পরিবর্তন আনয়ন করিলেন। কেমন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের নেতাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইলেন অতঃপর আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মনেতাগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বাপেক্ষা নিবিড় সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। মহর্ষির অনুপ্রেরণায় মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। সকল কার্যে তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত। ক্রমে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের অবিসম্বাদী নেতা হইলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম মিলনের পর হইতে দক্ষিণেশ্বরের এই দেব-মানব নিয়ত তাঁহার অন্তরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেশব ক্রমেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক গভীর ভাবে প্রভাবিত হইলেন। বহু পূর্বে আদি ব্রাহ্ম সমাজে ধ্যানমগ্ন কেশবচন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, সকল ধ্যানরত ব্যক্তিদের মধ্যে কেশবের ধ্যানই গভীর। পরে এক দিন ভাবাবস্থায় তিনি কেশবকে দেখিয়াছিলেন একটি ময়ূররূপে। ময়ূরটির মস্তক মণিশোভিত এবং উহা পেখম বিস্তার করিয়া আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করিলেন, 'মুক্ত পেখমটি কেশবের অনুসরণকারিগণের প্রতীক, এবং মণিখণ্ডটি তাঁহার রাজসিক মনোভাবের পরিচায়ক।'

কেশবের ধর্মসাধনার কথা শ্রবণ করিয়া ঠাকুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। কেশব তখন দক্ষিণেশ্বরের কয়েক মাইল দূরে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগান-বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এক দিন অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেন বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার গাড়ীতে কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। যথাস্থানে পৌঁছিবার পর হৃদয় যাইয়া কেশবচন্দ্রকে তাহার ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ত মাতুলের আগমন-সংবাদ দিলেন। কেশবও তাঁহার অনুচরগণ এক জন ঈশ্বরপ্রেমিকের শুভাগমনে আনন্দিত হইলেন। অতি সাধারণ পরিচ্ছদে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, 'শুনিয়াছি, তুমি ভগবচ্চিন্তা কর; তাই আমি সেই সম্বন্ধে তোমার নিকট কিছু শুনিতে আসিয়াছি।' অতঃপর উভয়ের ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঠাকুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবেশে একটি শ্যামাসঙ্গীত গাহিলেন। গাহিতে গাহিতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কর্ণে ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হৃদয় তাঁহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিলেন। কেশব ও তাঁহার সহচরবর্গ ইতিপূর্বে এরূপ অলৌকিক অবস্থা কখনও দেখেন নাই। গভীর শ্রদ্ধায় তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনোযোগের সহিত তাঁহারা ঠাকুরের 'কথামৃত পান করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগের সহিত ভগবদ্দর্শন

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন, এবং ছোট ছোট গল্পের মধ্য দিয়া সেই সকল গভীর তত্ত্ব প্রাঞ্জল করিয়া তুলিলেন। ঠাকুর প্রেরণাময়ী বাণী কেশবের অন্তরে দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইল যে, এই মহাপুরুষ নিশ্চয় ভগবদ্দর্শন করিয়াছেন। কেশব এই লোকোত্তর মহাপুরুষের অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। কথাবার্তার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বলিলেন, 'তোমার ল্যাজ খসিয়াছে।' কেশব এই গ্রাম্য বাক্যটির গূঢ়ার্থ বুঝিতে অক্ষম হইলে ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'পুষ্করিণীতে ব্যাঙাচি নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। যত দিন তাহাদের ল্যাজ থাকে তত দিন তাহারা জলেই বাস করে। কিন্তু যখন উহাদের ল্যাজ খসিয়া যায়, তখন তাহারা জলে ও স্থলে সর্বত্র বিচরণ করিতে পারে। এইরূপে, যত দিন মানবের অজ্ঞানরূপ ল্যাজ থাকে, তত দিন সে এই জগতের মলিন পুষ্করিণীতে অবস্থান করে। কিন্তু, যেই তাহার অজ্ঞানরূপ ল্যাজ খসিয়া পড়ে তখনই সে ইচ্ছানুযায়ী ভগবৎধ্যানে মগ্ন, অথবা সংসারে থাকিতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন সেই অবস্থায় উপনীত। তুমি ইচ্ছা করিলে ভগবৎ সত্তায় আত্মহারা হইতে পার, আ...র সংসারেও থাকিতে পার।' সেদিন কয়েক ঘণ্টা ভগবৎপ্রসঙ্গে কাটাইয়া ঠাকুর কেশবের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে প্রস্থান করিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী

শ্রীরামকৃষ্ণের পূত-সঙ্গ কেশবের মনে গভীর রেখাপাত করিল। শুধু তাহাই নহে। এই দিব্য-সঙ্গের ফলে তাঁহার জীবনধারা পরিবর্তিত হইল। ঠাকুরের সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ করিয়া কেশব বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার পবিত্র সঙ্গ লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি স্থাপিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে কেশবের গৃহে যাইতেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবাদিতে যোগদান করিতেন। অনেক সময় একটি ষ্টীমারে ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কেশব আগমন করিতেন। এমনি এক দিনে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (পরবর্তী কালে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক) উপস্থিত ছিলেন। যুবক নগেন্দ্রনাথ ছিলেন কেশবের অনুরক্ত ভক্ত। তখন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস। কেশব তাঁহার জামাতা কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের ষ্টীমারে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত তীরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব যুক্তকরে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন। ডেকের উপরে মুখোমুখি হইয়া উভয়ে বসিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের পাশে বসিয়া উভয়ের আলোচনা শ্রবণ করিলেন। তিনি বলেন, "আলোচনা বলিয়া কিছুই হয় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, প্রায় আট ঘণ্টা ধরিয়া, মাত্র একটি ধ্বনিই শোনা যাইতেছিল। সে ধ্বনি, সে স্বর শ্রীরামকৃষ্ণের। মাঝে মাঝে তাঁহার সামান্য একটু তোতলামি আসিতেছিল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কথা-স্রোতের কোন ব্যাঘাত হইল না।...ভগবৎ ভাবের এবং তত্ত্বজ্ঞানের এক অফুরন্ত উৎস হইতে প্রবাহিত এই কথামৃতের ধারা কে কোথায় শ্রবণ করিয়াছে।...রামকৃষ্ণ সর্বোচ্চ ভাবভূমিতে অধিরূঢ় ছিলেন। সমস্ত ষ্টীমারে প্রগাঢ় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। প্রত্যেকে ঠাকুরের কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ ছিলেন। গভীর ভাবাবেগে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত ছিল। উপমা আর উপকথার প্রাচুর্য্য, চিন্তার গাম্ভীর্য্য, এবং প্রত্যক্ষ ভগবদ্দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গের অনাবিল অবিচ্ছিন্ন স্রোত বহিতেছিল, এবং আধ্যাত্মিক ভাবের যে মহিমা ক্ষণে ক্ষণে বক্তার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা আমাদিগকে ধর্মভাবে, এবং পরমার্থ চিন্তায় আপ্লুত করিল।
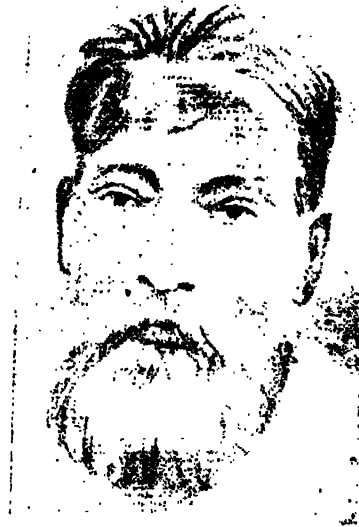
কথা বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন। এক সময় কেশবের ক্রোড়ে তাঁহার পদযুগল পতিত হইল। কেশব তাহাতে একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না বা সরিয়া বসিলেন না—সম্পূর্ণ নিশ্চল হইয়া আসীন রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পরনের ধুতি কোমর হইতে খুলিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কেশব এক মুহূর্তের জন্যও অন্য দিকে চোখ ফিরাইলেন না। সহসা সচেতন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মসম্বরণ করিলেন, এবং একটু পিছাইয়া বসিয়া পরিধেয় কাপড়টি ঠিক করিলেন। কেশব প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না?' শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধনিমীলিত আঁখিযুগল মুহূর্তের জন্য বিস্ফারিত হইল। এক নূতন আলোকে সেইগুলি সমুজ্জল হইয়া উঠিল। পরমহংসদেব বলিলেন, 'তুমি নিরাকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ? এ সম্বন্ধে কিছু বলা বড় কঠিন। নিরাকার, নিরাকার।' আর কোন কথা না বলিয়া তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। মৃদু মধুর হাস্যে তাঁহার ওষ্ঠাধর উদ্ভাসিত হইল। সমাধির সৌন্দর্য্যময় প্রভায় তাঁহার মুখমণ্ডল ভাস্বর হইয়া উঠিল। ক্যামেরায় সে ছবি তো কোন দিন ফুটিয়া উঠিবে না। এই নির্বিকল্প সমাধিতেই নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়! পঞ্চাশ বৎসর আগে শ্রবণ করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য মূর্তি ও কথা আজও আমার স্মৃতিতে সমুজ্জল। যদি চেষ্টা করিতাম—তবুও সেই দিব্য স্মৃতি ভুলিতে পারিতাম না।" *

অপূর্ব অনুভূতি এবং সরল উপদেশ সাধারণের মধ্যে প্রচারোদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে এবং অন্যান্য বক্তৃতামঞ্চে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার 'সুলভ সমাচার,' 'সানডে মিরর,' 'থিইষ্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ প্রদান কালে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ উপদেশ বন্ধ করিয়া কেশবচন্দ্র বেদী হইতে

* করাচি হইতে প্রকাশিত তাঁহার 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশ' নামক ইংরাজি পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অবতরণ করিতেন; ও পরমানন্দে ঠাকুরকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন। যখনই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন, ঠাকুরের জন্ত ফুল, ফল, মিষ্টি প্রভৃতি লইয়া যাইতেন এবং ঠাকুরের চরণে তৎসমুদায় নিবেদন করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে শিষ্যের ন্তায় সশ্রদ্ধ ভাবে উপবেশন করিয়া ঠাকুরের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিতেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা বেশী বলিতে কেশবকে ঠাকুর নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "পিতার কাছে কি কোন সন্তান তাঁহার ধন, রত্ন ও ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করে? বরং পিতা তাহাকে কত ভালবাসেন এই ভাবিয়া সে আনন্দিত হয়! তাঁহার অসীম শক্তি ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিলে তাঁহাকে তুমি আপনার জন বলিয়া ভাবিতে পারিবে না; আমাদের প্রতি তাঁহার অনন্ত প্রেমও উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এরূপ করিলে তাঁহার দুর্জ্ঞেয় স্বরূপ ও অসীম মহত্ব আমাদিগকে নিরুৎসাহ করিয়া ফেলিবে। যদি তাঁহাকে জানিতে চাও, তবে আপনার মতো ভাবিয়া তাঁহাকে ভালবাস।" কেশবের ধর্ম্মমত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় অনেকাংশে পরিবর্তিত ও উদার হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কেশব ভগবানের সাকার রূপে বিশ্বাসী হইলেন, ও মূর্তিপূজা মানিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কাঠের আপেল যেমন আমাদিগকে আসল আপেলের কথা মনে করাইয়া দেয়, মূর্তিও তেমনি নিরাকার ভগবানের চিন্তা করিতে মানুষকে সাহায্য করে। যেমন প্রচণ্ড শীতে জল জমিয়া বরফ হয় তেমনি ভক্তির গভীরতায় নিরাকার ভগবান সাকার মূর্তি পরিগ্রহ করেন।" কেশব ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষানুযায়ী নিরাকার ও সাকার ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ একই জানিয়া স্বীয় সমাজে দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেশবের এই সকল অনুষ্ঠান ও আচরণ মূর্তিপূজার সমর্থক বলিয়া প্রতীত হইল। ব্রাহ্ম সমাজে মূর্তিপূজাকে ঘৃণার চোখে দেখা হইত। কেশবচন্দ্র 'সান্‌ডে মিরর' পত্রিকায় লিখিলেন, "হিন্দুর মূর্তিপূজা একেবারে বর্জনীয় বা উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, ভগবানের শত সহস্র ভাবপ্রতীক ইহাতে বিদ্যমান। হিন্দুর মূর্তিপূজা বাস্তবে রূপায়িত ভগবানের পূজা।" এখানে কেশবের উক্তি এক জন হিন্দুর ন্তায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁহার মন এত দূর হিন্দু ভাবে ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মজীবনে হোম, দীক্ষা, গৈরিক বস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তাও কেশব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং নিজে তাহাদের কিছু কিছু গ্রহণও করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সমাজের আচার্য্যগণ বৈরাগ্যের চিহ্নস্বরূপ গৈরিক উত্তরীয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেশব এক দিন ঠাকুরকে স্বীয় গৃহে লইয়া যাইয়া আপনার ধ্যানঘর, পাঠকক্ষ, আহারকক্ষ, শয়নাগার প্রভৃতি দেখাইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে ঐ সকল স্থান আশীর্ব্বাদপূত করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, যেন ঐ সকল স্থান তাঁহাকে ঠাকুরের দিব্য-সঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বামী সারদানন্দজীকে বলিয়াছিলেন যে, কেশব ঠাকুরকে তাঁহার ধ্যান-কক্ষে সচন্দন ফুল দিয়া পূজা করিয়াছিলেন।

দুই বৎসর ধরিয়া কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের উদার উপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আপনার 'নববিধান' ঘোষণা করিলেন। ঠাকুর আচার্য্যরূপে কখনও নিজের মত কাহাকেও সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করাইতে চাহেন নাই। শুধু তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনে দিব্যালোক সম্পাত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে স্বীয় ভাবানুযায়ী গড়িয়া উঠিতে দিতেন। স্বীয় সমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্ত কেশব ঠাকুরের বাণী পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তাই তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজ সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণ করিয়া নিজ ধর্ম্মমত গঠন করিল। সমালোচনার আলোকে দেখিলে মনে হয়, কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর সামান্ত অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। নববিধান প্রতিষ্ঠার চারি বৎসর পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অকালমৃত্যু না হইলে কে বলিতে পারে কেশব ঠাকুরের দ্বারা আরও প্রভাবিত হইতেন কি না? কেশব অবশ্য ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরের নিকট তাঁহার আধ্যাত্মিক ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যতই একদেশদর্শী হউক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ উহাকে ভগবৎ সন্নিধানে পৌঁছিবার একটি পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। সঙ্কীর্ত্তনান্তে সকল ধর্ম্ম ও আচার্য্যগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবার কালে ব্রাহ্ম সমাজকে প্রণাম করিতে তিনি ভুলিতেন না। ইহা ব্রাহ্ম সমাজ, সমাজের নেতৃবৃন্দের ও ভক্তবৃন্দের প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রীতির পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাঁহাকে কিরূপ অধ্যাত্ম শক্তির আধার বলিয়া মনে করিতেন—তাহা কেশবের অসুস্থতার কথা শুনিয়া মা কালীর নিকট কেশবের রোগমুক্তির জন্ত তাঁহার আকুল প্রার্থনা হইতেই বুঝা যায়। কেশবের শেষ অসুখের সময় তিনি কেশবের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। কেশবের রোগজীর্ণ শীর্ণ দেহ দেখিয়া তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। বলিয়াছিলেন, "আরো বড় গোলাপ ফুটিবে বলিয়া বাগানের মালী ফুলগাছের গোড়া খুঁড়িয়া রৌদ্রালোকে ও শিশিরে শিকড়গুলিকে উন্মুক্ত করিয়া রাখে। তেমনি ঈশ্বর তোমার ধর্ম্মজীবনের দ্রুত বিকাশের জন্তই তোমার শরীরের এ অবস্থা করিয়াছেন।" আবার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কেশবের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বাক্ হইয়া তিন দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। পরে বলিয়াছিলেন, "কেশবের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মনে হইল, যেন আমার শরীরের অঙ্গহানি হইয়াছে।

উৎসবাদি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মণিমোহন মল্লিক, জয়গোপাল সেন, বেণীমাধব পাল, কাশীশ্বর মিত্র এবং আরো কয়েক জন ব্রাহ্ম ভক্তের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর সোমবার তিনি মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাহ্ম উৎসবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত সঙ্কীর্ত্তনানন্দে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। উক্ত ঘটনাস্থলে নগেন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ এবং শরৎ, হরিপ্রসন্ন প্রভৃতি ভবিষ্যতের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্বামী সারদানন্দের সুবিখ্যাত গ্রন্থ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" এই দৃশ্যের মনোরম বর্ণনা আছে। মণিমোহনের পরিবারস্থ একটি মহিলার ধ্যানকালে এক শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখচ্ছবি বার বার মনে আসায় কিছুতেই ঈশ্বরে মনস্থির করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের নিকট তিনি উপদেশ প্রার্থনা করিলে ঠাকুর কর্ত্তৃক ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রকেই বালগোপালরূপে চিন্তা করিয়া ধ্যান করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই অপূর্ব নির্দ্দেশের আশ্চর্য্য ফল ফলিল ভাগ্যবতী নারীর ধর্ম্মজীবনে। তিনি ঠাকুরের আদেশ যথাসাধ্য কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনে যথেষ্ট উন্নতি সাধন

করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর বুধবার প্রভাতে ঠাকুর কেশবকে তাঁহার অন্তিম শয্যায় শায়িত দেখেন। সেই দিন অপরাহ্ণে জয়গোপাল সেনের বাটীতে ব্রাহ্ম-উৎসবে তিনি যোগদান করেন। সেখানে তিনি রামপ্রসাদের কয়েকটি গান গাহিলেন। পরে অমৃতলাল, ত্রৈলোক্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। ঠাকুর জয়গোপাল সেনের গৃহে যে কক্ষে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, উহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জয়গোপাল এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক ঐ কক্ষটি বহু বৎসর পর্য্যন্ত উপাসনায় এবং ধ্যানের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র সেন, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কেহই ঠাকুরের অপ্রতিরোধনীয় প্রভাব হইতে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ এবং বাংলার ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন্ চার্লস এইচ্ টনি * পর্য্যন্ত ইহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, "ব্রাহ্ম সমাজের দুই শ্রেষ্ঠ নেতা কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকেও তিনি (রামকৃষ্ণ) গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন।" কেশবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ও উত্তরাধিকারী প্রতাপ মজুমদার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল 'সান্‌ডে মিরর'এ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে 'থিইষ্টিক্ কোয়ার্টার্লি রিভিউ' পত্রিকায় ইহা পুনঃ প্রকাশিত হয়। ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি সত্ত্বেও আরো অনেকেরই ন্যায় তিনি কেমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই নিবন্ধে তিনি তাহার সর্বপ্রথম বর্ণনা এই ভাবে দিয়াছেন :—

"এই মহাপুরুষ যেখানেই যাইতেন, সেখানেই আপনার চতুর্দিকে একটি জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতেন। আজও আমার চিত্ত সেই জ্যোতির্মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে। যখনই আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত তখনই এক অপূর্ব ভাবাতীত ও ভাবাতীত করুণা তিনি আমার প্রাণে ঢালিয়া দিতেন, আমি আজিও সেই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারি নাই। আমি এক জন ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, অর্দ্ধ-নাস্তিক, এবং তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী। আর তিনি এক জন দরিদ্র, অশিক্ষিত, মূর্তিপূজক হিন্দু! কেন আমি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার পদতলে বসিয়া থাকিতাম ?... শুধু আমিই নহি, আমার ন্যায় আরো বহু ব্যক্তি এইরূপ করিতেন। আমাদের মধ্যে কয়েকটি চতুর বুদ্ধিমান গণ্ডমূর্খ অবশ্য তাঁহার মধ্যে কিছুই দেখিতে পায় নাই......দৈহিক শীর্ণতা সত্ত্বেও তাঁহার মুখমণ্ডলে যে পূর্ণতা, শিশুসুলভ কোমলতা, সুগভীর দৃশ্যমান নম্রতা এবং অবর্ণনীয় মাধুর্য্য হাসি ও শ্রী প্রকটিত হইত তাহা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। তিনি খ্যাতি-প্রতিপত্তির অত্যন্ত বিরোধী এবং খোলাখুলি ভাবেই কৌতূহলী ব্যক্তিদিগের দর্শন ও প্রশংসার তীব্র সমালোচনা করিতেন।" ঠাকুরের যে সার্বজনীন ধর্মভাব প্রতাপচন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, "তাঁহার ধর্মই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। তাঁহার ধর্ম কি? ইহা গোঁড়া হিন্দুধর্ম নহে। ইহা এক অভিনব হিন্দুধর্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক ছিলেন না। তিনি শুধু শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব নহেন, বৈদান্তিকও নহেন। তবু তিনি এই সবই। তিনি শিবোপাসনা করেন, কালীপূজা করেন, রামের আরাধনা করেন এবং কৃষ্ণের বন্দনা করেন; আবার তিনি বেদান্ত ধর্মের এক জন একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক। তিনি প্রত্যেকটি ধর্ম, উহার আনুষঙ্গিক আচার-ব্যবহার ও প্রথা সমেত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রত্যেকটি ধর্ম অভ্রান্ত। তিনি এক জন সাকার উপাসক, আবার নিরাকার ভগবানের একান্ত অনুরক্ত সাধক। সাধারণ হিন্দু সন্ন্যাসীদের ধর্ম হইতে তাঁহার ধর্ম পৃথক্। তাঁহার ধর্মে অত্যধিক গোঁড়ামী, বিতর্কমূলক পাণ্ডিত্য, অথবা বাহ্য পূজাদির স্থান নাই। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্মই সমাধি, তাঁহার পূজা সহজই প্রত্যক্ষানুভূতিপ্রদ ধ্যানে পর্য্যবসিত, দিবারাত্রি তাঁহার সমগ্র সত্তা অনন্ত বিশ্বাস ও জীবন্ত অনুভূতির উত্তাপে অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান। তাঁহার কথাবার্তা এই অন্তরাগ্নির অবিরত আত্মপ্রকাশ মাত্র। এই দিব্য প্রকাশ বহু ঘণ্টা ব্যাপিয়া স্থায়ী হয়। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার বাক্‌যন্ত্র পরিশ্রান্ত হইয়া আসিলে বাহিরে দুর্বল বলিয়া প্রতীত হইলেও অন্তরে তিনি চির সতেজ থাকেন। দিবাভাগে প্রায়ই কথা বলিতে বলিতে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন এবং আনন্দময় সমাধিতে মগ্ন হইয়া যান। কথোপকথন কালে যদি ভগবত আনন্দের কোন সূত্র খুঁজিয়া পান অমনি তিনি সমাধিমগ্ন হইয়া যান।" ঠাকুরের অসাধারণ আত্মসংযম প্রতাপচন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহার বর্ণনা দিয়াছেন :—

"তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণরূপে কামজয়ী হওয়া। দেহবুদ্ধির অতীত হইতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রত্যেক নারীকে জগদম্বার অংশসম্ভূতা বলিয়া দেখিতে মা কালী তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন। এখন তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃরূপে দেখিয়া থাকেন। নারী ও বালিকার সম্মুখে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। সন্তান যেমন শুদ্ধমাত্র আপনার মাতাকেই পূজা করিয়া থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ নারীজাতির নির্দিষ্ট কয়েক জনকেই পূজা করিতে চাহেন না। নারী জাতির সহিত তাঁহার সম্পর্ক ও তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অতুলনীয় এবং আদর্শস্থানীয়। কাঞ্চনের দৃশ্য তাঁহাকে এক অদ্ভুত ভয়ে অভিভূত করিয়া ফেলে; কামকাঞ্চন ত্যাগই তাঁহার দেব চরিত্রের মূল রহস্য। যীশুর নাম শুনিলে তিনি মস্তক অবনত করেন। যীশুর সন্তান ধর্মকে তিনি শ্রদ্ধা করেন এবং দুই-এক বার খৃষ্টীয় উপাসনালয়েও গমন করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম্ ধর্মের সর্বশক্তিমান আল্লাকে দর্শন করিবার জন্য তিনি উক্ত ধর্মের প্রথানুযায়ী সাধনাদি করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ হিন্দুর প্রাচীন ধর্মকে কত উদার, উন্মুক্ত করিয়াছেন এই সকল ঘটনাই তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ।" ইহার পর কেমন করিয়া তাঁহাদের বিদ্যাভিমান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ধূলিসাৎ হইল প্রতাপচন্দ্র তাহারই বর্ণনা দিতেছেন : "তিনি কখনও কিছু লেখেন না, তর্ক করেন খুব কম; কখনও অপরকে শিক্ষা দিতে যান না;

* ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে Imperial Quarterly Review and Oriental and Colonial Record এ প্রকাশিত 'একটি আধুনিক হিন্দু সাধু' (A Modern Hindu Saint) শীর্ষক তাঁহার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সর্বদা ভগবৎ-প্রসঙ্গে স্বীয় অন্তরাত্মাকে সমাহিত রাখেন। অতি মধুর কণ্ঠে তিনি গান গাহিয়া থাকেন।"

"পুরাণ সমূহের জটিল অংশগুলির উপর অজ্ঞাতসারেই তিনি অপূর্ব আলোকপাত করিয়া থাকেন এবং প্রচলিত হিন্দু-বিশ্বাসের মৌলিক সত্যসমূহ দার্শনিক তত্ত্বের সহিত সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার সমস্ত কথাগুলি যদি লিপিবদ্ধ করা হইত তবে তাহা এক অদ্ভুত সারগর্ভ পুস্তক প্রস্তুত হইত। নারী জাতির সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তারাশি লিখিত হইলে লোকে মনে করিত যে, প্রাচীন ঋষিদের যুগ বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এই মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের উদারতা ও গভীরতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। রসনাকে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে সংযত করিয়াছিলেন, এমন কি প্রায় বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ভগবান ব্যতীত তাঁহার জীবনে অন্য কোন চিন্তা বা লক্ষ্য ছিল না। ভগবান ভিন্ন আর কাহারও সহিত তাঁহার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব ছিল না, ভগবান ব্যতীত তাঁহার অন্য কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার পূর্ণ পবিত্রতা, বর্ণনাতীত গভীর ঈশ্বরানুভূতি, তথাকথিত শিক্ষা ব্যতীতই অনন্ত জ্ঞানরাশি, শিশুসুলভ সারল্য, সকলের প্রতি সমান প্রীতি এবং অলৌকিক ভগবৎপ্রেম এ জীবনে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আমাদের ধর্মজীবনের আদর্শ বিভিন্ন। কিন্তু যত দিন তিনি আমাদের সহিত অবস্থান করিবেন, তত দিন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া আমরা অলৌকিক পবিত্রতা, অপার্থিব মানবতা, অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ততা শিক্ষা করিয়া ধন্য হইব।"

কেশব সেনের জীবন-চরিতে (৩৫৭—৩৫৯ পৃষ্ঠা) প্রতাপচন্দ্র কেশবের জীবনের ও ধর্মবিশ্বাসের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর প্রভাব স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন: "এই মহাপুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের) পরিচয় শীঘ্রই ঘনিষ্ঠ মিত্রতায় পরিণত হইল। এই মিত্রতা কেশবের জীবনে গভীর পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল। পরমহংসদেবের চরিত্রের সর্বপ্রথম লক্ষ্যণীয় বস্তু ছিল ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ। ভগবানের মাতৃভাবের প্রতি পরমহংসদেবের এই অনুরাগ কেশবের অন্তরে এক প্রবল প্রভাব বিস্তার করিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অধিকাংশে উক্ত প্রভাবের পরিণতি বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইল। কেশব যে নববিধানের প্রবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরের মাতৃভাব তাহাতে একটি সম্পূর্ণ নূতন রূপ সৃষ্টি করিল। ইউরোপীয় ভাব এই পরিণতিকে যতই অশ্রদ্ধা করুক, কেশবের ধর্ম হিন্দু সমাজে এই পরিবর্তনের ফলে সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছিল।"

কেশব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তিকায় তিনি কেশব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের সুগভীর প্রভাবের কথা সরল ভাবে এইরূপে স্বীকার করিয়াছেন— "পরমহংসদেবের জীবনের দৃষ্টান্ত হইতেই ব্রাহ্ম সমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাবে উপাসনা উদ্ভূত হয়। বিশেষরূপে তাঁহারই নিকট হইতে আমাদের আচার্য্য কেশবচন্দ্র ঈশ্বরকে সরল শিশুর ন্যায় সুমধুর মাতৃভাবে সম্বোধন করিবার এবং প্রতি কার্য্যে শিশুর মত তাঁহাকে ডাকিবার শিক্ষা লাভ করেন। পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজ শুষ্ক জ্ঞান ও শুষ্ক বিতর্কের ধর্মে আস্থাবান ছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনালোকে উঁহার শুষ্ক ভাবগুলি অন্তর্হিত হওয়ায় ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম আরও সরস এবং সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হইল।"

বাংলায় লিখিত কেশবচন্দ্রের জীবনীতে (১৩২—১৩৩ পৃষ্ঠা) ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উপরের মন্তব্যগুলি সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন: "এই মহাত্মাদ্বয়ের ভাবের আদান-প্রদানের ফলে ব্রাহ্ম সমাজ ভক্তিপথে অনেক দূর অগ্রসর হইল। পরমহংসদেবের শিশুসুলভ সরল ও মধুর স্বভাব কেশবের যোগ, বৈরাগ্য, নৈতিকতা, ভক্তি ও ধর্মভাবকে সুবর্ণে রঞ্জিত করিল। ব্রাহ্ম সমাজে যে মনোরম ভক্তিভাব এবং ঈশ্বরের মাতৃভাবে উপাসনা লক্ষিত হয় তাহা প্রধানতঃ পরমহংসের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অনেকেই অবগত আছেন যে, কেশব পরবর্তী কালে যে ভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেন, এবং তাঁহার উপাসনা যে ভক্তিভাব ও সহজ ভাষায় পরিপূর্ণ হইত, তাহা মহাত্মা পরমহংস দেবের দান।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পুস্তকে ত্রৈলোক্যনাথ লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ সংসারীর জীবনেও ভগবদ্দর্শন সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উহা ঠাকুরের কর্ণগোচর করা হইলে বলরাম বাবুর বাটীতে ত্রৈলোক্যের সহিত দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোচনায় ঠাকুর তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিলেন। আলোচনা স্থলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ বিখ্যাত ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ অতি মধুর কণ্ঠে গান গাহিতে পারিতেন। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান সংগীত-রচয়িতা। তাঁহার রচিত সংগীতের সুরস্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক দিন সমাধিলোকে চলিয়া যাইতেন। ত্রৈলোক্যনাথও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দর্শনে দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়া বহু সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের বিপুল প্রভাব ছিল। সে প্রভাবের কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি বা সাক্ষ্যের যে সকল প্রমাণ উপরে দেওয়া হইল, তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কেশব ও তাঁহার অনুচরগণের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশিত এবং তাঁহাদের উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেরও সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুরের সার্বজনীন প্রেম ও অসাধারণ উদারতা ব্রাহ্ম সমাজের সকল শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট তাঁহাকে এত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল যে, কুচবিহারের বিবাহ লইয়া বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার পরেও নববিধান এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মগণ তাঁহার নিকট যাতায়াত করিয়া শান্তিলাভ করিতেন। শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে কয়েক জন অনুরাগী ব্রাহ্ম শ্মশানে শববাহিগণের অনুগমন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন! জনৈক প্রবীণ ব্রাহ্মভক্ত আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি শ্মশান হইতে কিছু চিতা-ভস্ম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বীয় উপাসনা-কক্ষে রক্ষা করিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যত দিন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ছিলেন, তত দিন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁহার কয়েক জন সহকর্মীর বিদায় গ্রহণের পর আর সেই প্রভাব স্থায়ী হয় নাই। বিজয়ের পরবর্তী আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট অনেক বার গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন। কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে বিজয় ও অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাগণের পরিবর্তন ও ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ দেখিয়া শিবনাথের ভয় হইল, পাছে তাঁহার নিজেরও ঐ

অবস্থা হয়। তাই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্বে নরেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। শিবনাথ তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই নিকট প্রায়ই যাইতেন। এক দিন তিনি শিবনাথকে দক্ষিণেশ্বরে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শিবনাথ সরল ভাবে উত্তর দিলেন, 'যদি ঘন ঘন সেইখানে যাই, তবে আমার সঙ্গীরাও সেইরূপ করিবে। ফলে, আমার সমাজ ভাঙিয়া যাইতে পারে।' নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে শিবনাথ এই বলিয়া ঠাকুরের নিকট যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, 'তাঁহার সমাধি স্নায়বিক দুর্বলতা বশতঃ এক প্রকার মৃগী রোগ মাত্র; তিনি যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান তাহা মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই লক্ষণ।' শিবনাথের এই সকল অভদ্র মন্তব্য শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। এক দিন শিবনাথ যখন ঠাকুরের সম্মুখে দণ্ডায়মান, তখন ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা শিবনাথ, শুনিয়াছি আমার ভাবাবস্থাকে তুমি স্নায়বিক রোগ বলিয়া থাক। দিবারাত্রি ইট, কাঠ, মাটী, পাথর এবং স্ত্রী-পুত্র, টাকা-পয়সার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তুমি নিজেকে সুস্থ এবং স্বস্থ রাখিতে পার, আর আমি সমগ্র জীবন ঈশ্বরের চিন্তা করিয়া পাগল হইয়াছি? যাঁহার চেতনায় সমগ্র জগৎ চৈতন্যময়, তাঁহার চিন্তা করিলে কি কেউ পাগল হয়? এ তোমার কেমন বুদ্ধি?' ইহা শ্রবণে শিবনাথ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাঁহার সমাজের লোকেরা যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে যান শিবনাথ ইহাও পছন্দ করিতেন না, পাছে তাঁহারাও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া পড়েন। এক দিন ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা কালে নরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হন। সমাজের উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিলেন। যাহাতে সকলে দেখিতে না পায় এই উদ্দেশ্যে সমস্ত আলোক নিবাইয়া দেওয়া হইল। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অপমান লক্ষ্য করিয়া বাহিরে আসিয়া এই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জীবনের প্রান্তে আসিয়া ১৯১১ সালে শিবনাথ পরমহংসদেব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্মৃতি 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। উহা তাঁহার লিখিত "Men I have seen" পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন: "কোন বন্ধুর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত জীবন ও বাণীর কথা শ্রবণ করিয়া তিনি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট গমন করেন। ঠাকুর তাঁহার সহিত পরম প্রীতিভরে আলাপ করেন। প্রথম সাক্ষাতের দিন বার বার ঠাকুর তাঁহার সেই সরল শিশুসুলভ ভাবে বলিয়াছিলেন, 'তোমাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। তুমি কি মাঝে মাঝে আমার সহিত দেখা করিতে আসিবে?' বারংবার যাতায়াতের ফলে যখন তাঁহাদের বন্ধুত্ব গভীর হইল, ঠাকুর তখন তাঁহার অধ্যাত্ম উপলব্ধি সকল তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। শিবনাথ যে ঠাকুরকে এত শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়, 'অনন্যসাধারণ বৈরাগ্য, কঠোরতা ও নিষ্ঠার দ্বারা তিনি এমন এক পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, যাহা খুব অল্পই দেখা যায়। অবশেষে কামিনীর প্রতি তাঁহার অনাসক্তি এতই বর্দ্ধিত হয় যে, আপনার কয়েক পদের মধ্যে কোন রমণীকে তিনি আসিতে দিতেন না। কোন নারী তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে আসিলে বলিতেন, 'মা! মা! ঐখানেই থাক। নিকটে আসিও না।' কোন নারীকে তাঁহার অতি নিকটে আসিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ শিবনাথকে ধর্মসাধনার প্রথমাবস্থায় কামিনী পরিহার করিয়া চলিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু শিবনাথ ইহাতে আপত্তি করায় বিদায় কালে শ্রীরামকৃষ্ণ মাথা নাড়িয়া উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'তোমার যাইবার সময় হইল, আর দেরী করিও না। অন্যথায় তোমার পত্নী তোমাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবে না।' শিবনাথ লিখিয়াছেন: "ঠাকুরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ কিছু তাঁহার সম্মুখে বলিলে ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন।" শিবনাথ রামকৃষ্ণ-চরিত্রের এই ভাবটি পছন্দ করিতেন। ঠাকুরের ভাব ও সমাধি প্রভৃতি অবশ্য শিবনাথ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যজনিত অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। যাহা হউক, চৈতন্য, মহম্মদ, খৃষ্টপ্রমুখ মহাপুরুষদিগের যে এইরূপ সমাধি মাঝে মাঝে হইত শিবনাথের নিকট এই কথা শুনিয়া তবু আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি! ঠাকুরের অসাক্ষাতে কোনও ধনী ব্যক্তির সম্মুখে হৃদয় এক দিন ঠাকুরের প্রশংসা করিয়াছিলেন। জানিতে পারিয়া ঠাকুর হৃদয়কে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের এই অংশটিকে যদিচ শিবনাথ মানসিক বিকার-প্রসূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তথাপি এই ঘটনাটি তাঁহার মনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে উচ্চ ভাব পোষণের পরিপোষক হইয়াছিল। শিবনাথ লিখিয়াছেন: "তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে আমার মনে যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা এই যে, ঈশ্বর দর্শনের জন্য এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এত তপস্যা ও কঠোরতা আমি আর কাহারও দেখি নাই। তিনি যে এক জন সিদ্ধপুরুষ, এবং পরমার্থ সত্যদ্রষ্টা, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হইয়াছিলাম।" শিবনাথ এক দিন এক খৃষ্টীয় প্রচারককে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে লইয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুর উক্ত প্রচারকের সহিত যীশুর অবতারত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনার মধ্যে ঠাকুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গ্রাম্য ভাষায় এমন কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছিলেন যে, সেইগুলি প্রচারকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারিত ও সাধিত ঈশ্বরের মাতৃভাব কেশবের ন্যায় শিবনাথের মনেও সাড়া দিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবের ধারণা মূর্তি বা প্রতীককে অতিক্রম করিয়া অনন্তের পথে বহু দূর অগ্রসর। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মাতৃ-সংগীত গাহিতেন, তখন চতুর্ভুজা কালিকা মূর্তির অতীত ভাবই সেই গানে প্রকাশিত হইত। তাঁহার নিকট কালী ও কৃষ্ণ উভয়ই এক ভগবৎ শক্তির প্রকাশ।' অবসর পাইলেই শিবনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। অনেক বার তাঁহাদের দেখা-শুনা ও কথাবার্তা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের যে সকল উপদেশ তাঁহার মনে ছিল, সে সকল তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঠাকুর এক দিন শিবনাথকে নানা কর্ম ও কর্ত্তব্য জড়িত না হইয়া প্রধানতঃ অধ্যাত্মসাধনার প্রতিই মনোযোগ দিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "সর্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপদের মধ্যেও যে বিশ্বাস অটল না থাকিতে পারে, তাহা বিশ্বাসই নহে।"

ঠাকুর যে শিবনাথকে সমধিক স্নেহ করিতেন, সে সম্বন্ধে দুই-একটি ঘটনা শিবনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। একবার আসিয়া তাঁহার

সহিত দেখা করিবার জন্য ঠাকুর শিবনাথকে বার বার সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু শিবনাথ সমাজের নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ঠাকুরের নিকট যাইতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে ঠাকুর স্বয়ং এক দিন তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আর এক দিন দমদমের এক বাগান-বাড়ীতে ব্রাহ্ম-উৎসব উপলক্ষে ঠাকুর আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শিবনাথ কিছু বিলম্বে সেখানে যাইয়া দেখিলেন, এক বিরাট জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন। শিবনাথকে দেখিয়াই ঠাকুর তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আঃ! আমার বুক জুড়াইয়া গেল!" এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ীতে চিড়িয়াখানায় যাইতেছিলেন, শিবনাথ দক্ষিণেশ্বর হইতে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতার কিছু দূর অবধি সেই গাড়ীতে গমন করিলেন। গাড়ীর ভিতরে শিবনাথকে তিনি আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া নিজের মাথার উপর নারীদিগের ন্যায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন। অতঃপর দক্ষিণ হস্তে শিবনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'দেখিতেছ না, ক্ষণিকের জন্য আমি নারী হইয়াছি এবং আমার প্রিয়তমের সহিত বিহার করিতেছি।' শিবনাথ লিখিয়াছেন: "তৎপরে আমি যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা এ জীবনে ভুলিব না। তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল অপূর্ব দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।" ঐ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় কয়েক মুহূর্তের জন্য শিবনাথের গাত্রলগ্ন হইয়াছিলেন।

শিবনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে, দুইটি কারণে শেষের দিকে তিনি ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে থাকিতেন। প্রথমতঃ, থিয়েটারের অভিনেতাদের ন্যায় হীনচরিত্র লোকের সহিত ঠাকুরের সংস্পর্শ। দ্বিতীয়তঃ, শিষ্যগণ কর্তৃক ঠাকুরকে অবতাররূপে ঘোষণা। অন্তিম অসুখের সময় ঠাকুর যখন চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনীত হন, তখন শিবনাথ তাঁহার শেষ দর্শন লাভ করেন। শিবনাথ সর্বশেষ মন্তব্য করিয়াছেন, ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি আজিও শত শত নর-নারীর পরমার্থ তৃষ্ণা তৃপ্ত করিতেছে। শিবনাথ স্বীকার করিয়াছেন, 'তাঁহার সুগভীর স্নেহের ঋণে আমি আজিও আবদ্ধ রহিয়াছি। এ জীবনে আমি যাঁহাদের সংসর্গ লাভে ধন্য হইয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য।' শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের বহু কাল পরেও শিবনাথ বাঁচিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের বাণী ধর্মজগতে যে বিপ্লব আনিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সমাজের অনুরোধে তিনি অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র বিজয়কৃষ্ণের ধর্মমতই এই দেবোপম মহাপুরুষের সংগলাভে আমূল পরিবর্তিত হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি বৈষ্ণব চিহ্ন সকল স্বীয় অংগে ধারণ করিতেন। তিনি ছিলেন যথার্থ সত্যান্বেষী ও সত্যপ্রেমিক। ব্রাহ্ম সমাজে যোগদানের পর সত্যের অনুরোধে তিনি বৈষ্ণব চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কুচবিহার বিবাহের পরে সত্যের অনুরোধেই গুরুর ন্যায় যাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন সেই কেশবচন্দ্রকে তিনি ত্যাগ করিলেন। ইহার পরে সত্যের সম্মানরক্ষার্থ বিজয় ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করিলেন। এই জন্য কেশবের সংগে তাঁহার বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়কেই ভালবাসিতেন বলিয়া এই মনোমালিন্য পছন্দ করিতেন না। এক দিন উভয়েই তাঁহাদের দল-বল লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত। এক দল অন্য দলের আগমন-সংবাদ অবগত ছিলেন না বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে কেশব এবং বিজয় সংকোচগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এই অপ্রীতিকর মনোমালিন্যের অবসান করিবার জন্য ঠাকুর দুই জনকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, ভগবান শিব আর রামচন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে একবার বিরোধ উপস্থিত হয়। সকলেই জানেন, রামের গুরু শিব আর শিবের গুরু রাম। তাই এই দ্বন্দ্বের কিছু কাল পরেই উভয়ের মিলন ঘটিল। কিন্তু শিবের অনুচর ভূত আর রামের অনুচর বানরের দলে কোন দিন মিলন হইল না। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা বিস্মৃত হও। তোমাদের নিজেদের মধ্যে আর কোন বিরোধ থাকা উচিত নহে। উহা তোমাদের দল-বলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকুক।" ইহার পর হইতে কেশব ও বিজয়ের মধ্যে আবার পূর্বের ন্যায় কথাবার্তা হইত এবং উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের মেঘ অপসৃত হইয়া গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া বিজয় সনাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি আর সাকারে ঈশ্বরে জন্মগত বিশ্বাস লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি তখন হিন্দু সাধুদিগের ন্যায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিতেন। ইহাতে ব্রাহ্ম সমাজের নির্দিষ্ট বৃত্তি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহাকে ভীষণ অর্থকষ্টে পড়িতে হয়। ঠাকুরের নিকট তিনি যে অধ্যাত্ম আলোক লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সকলের সমক্ষেই স্বীকার করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কলিকাতায় শ্যামপুকুরে গল-রোগে আক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন তখন বিজয় একবার তাঁহাকে রক্তমাংসের শরীরে ঢাকায় দর্শন করেন। পাছে ঐ দর্শন চক্ষুর ভ্রমজনিত হইয়াছে তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের হস্ত-পদ টিপিয়া স্বীয় দর্শনের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। এইরূপ অলৌকিক অনুভূতি বিজয়ের মনকে একটি মহাসত্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া দিয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমার্থজ্ঞান ও দিব্যালোকের দেবদূত। ঠাকুর সম্বন্ধে তিনি কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার এই সরল উক্তি হইতেই বুঝা যায়: "বহু তীর্থক্ষেত্রে, পর্বতপ্রদেশে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় কাহাকেও দেখিলাম না। তাঁহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ ভাবে বিকশিত হইয়াছে, তাহার এক সামান্যাংশ মাত্র অন্যত্র দেখা যায়। কলিকাতার নিকটে থাকায় তাঁহার নিকট গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল। সেই জন্যই আমরা তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যদি তিনি পর্বত-গুহায় অথবা ঐরূপ কোন দুর্গম স্থানে অবস্থান করিতেন, তবে আমরা তাঁহার মহত্ত্ব কথঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিতাম।" একবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া ভাবাবেগে বলিয়াছিলেন যে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কে অতিশয় ভালবাসিতেন। বিজয়ের উচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন: "বিজয় এখন সমাধি-মন্দিরের দ্বারে করাঘাত করিতেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য সংস্পর্শে আসিয়া বিজয় ক্রমেই অধ্যাত্ম-জগতে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং দুর্লভ সত্য লাভে জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবোন্মাদ নৃত্য এবং সংকীর্তন কালে ঘন ঘন সমাধি দর্শনে লোকে চমৎকৃত

হইত। জীবনের শেষ দিবসগুলি তিনি পুরীতে অতিবাহিত করেন। তখন তিনি বিখ্যাত হিন্দু মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের জীবনে যদি ভগবান লাভের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা থাকিত, তবে তাঁহারাও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া ইহজীবনের চরম ও পরম সার্থকতা লাভ করিতেন। বিজয়ের জীবন ইহার অতুলনীয় উদাহরণ। কিন্তু সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অনুরোধে ব্রাহ্ম নেতাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মের সমগ্র স্বরূপের পরিচয়ও তাঁহারা পান নাই। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, ব্রাহ্ম সমাজই সর্বপ্রথম ঠাকুরের অধ্যাত্ম আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে অনুসরণ করিয়া কলিকাতার ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগকে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করেন। নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, শশী, তারক, হরিপ্রসন্ন প্রভৃতি ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যগণ তাঁহার সহিত ব্রাহ্ম সমাজে অথবা ব্রাহ্ম সমাজের মধ্য দিয়াই মিলিত হ'ন। ব্রাহ্ম সমাজ ছিল ঠাকুরের সহিত তরুণ ভক্তগণের মিলনক্ষেত্র। তাঁহারা এবং ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ এই ব্রাহ্ম সমাজেরই মধ্য দিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে উপনীত হইলেন। স্বামী সারদানন্দ কৃতজ্ঞতার সহিত ব্রাহ্ম সমাজের নিকট তাঁহাদের গভীর ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, এই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান বাংলার ধর্ম্মপিপাসু তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট হিন্দু ধর্ম্মের একটি সহজসাধ্য আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল এবং এতদ্দারা তাঁহাদের সকলের ধর্ম্মজীবন গঠনের সহায়ক হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ প্রকৃত ঈশ্বর দর্শনার্থীর অভাব মোচন করিতে পারে নাই। সেই জন্য বহু ধর্ম্মপিপাসু তরুণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিবার পর ঠাকুরের চরণ-প্রান্তে উপনীত হন। ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু ধর্ম্মের কেবল মাত্র একটি ভাব প্রচার ও সাধন করিলেন। নিরাকার ভাবই ব্রাহ্মগণ গ্রহণ করিলেন। ভগবানের অনন্ত ভাবের একটি মাত্র প্রচার করায় হিন্দু সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশ তাঁহাদের পদানুগ হইল। কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রচার করিলেন হিন্দু ধর্ম্মের সমগ্র স্বরূপ। ইহাই ব্রাহ্ম সমাজ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য। এই জন্যই সমগ্র হিন্দু জাতি শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব জীবনী এবং যুগোপযোগী বাণী গ্রহণে প্রমত্ত হইল।
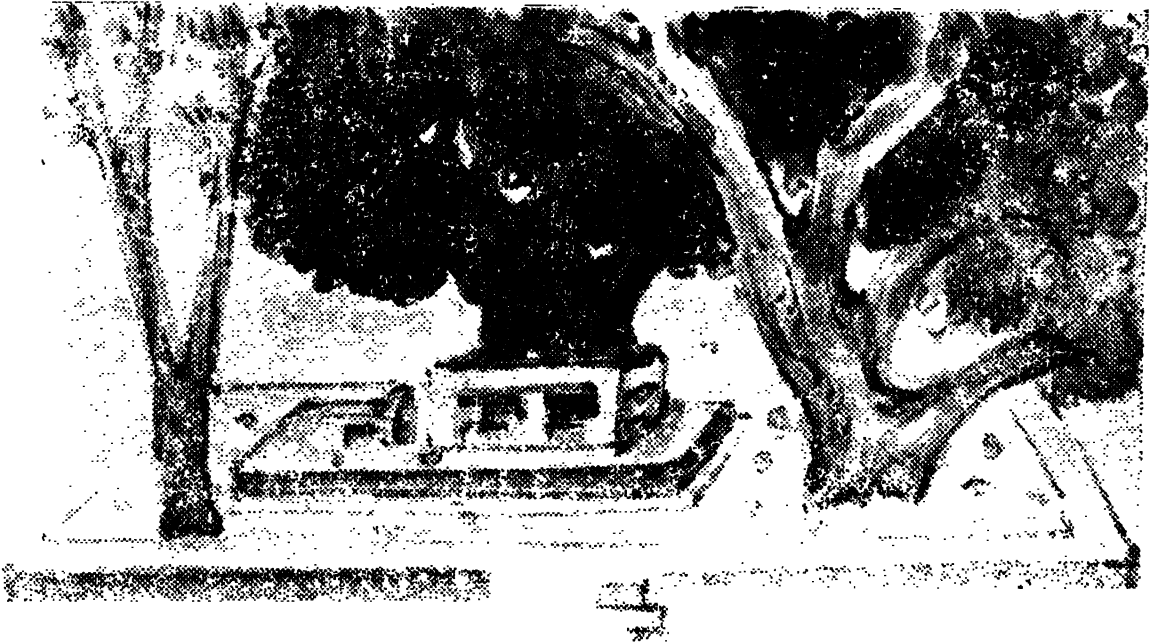
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই　　—পূর্ণেন্দু পাল (শান্তিনিকেতন)

হলিউডের আত্মকথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

৭

আমেরিকার আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাব অতি প্রসিদ্ধ ও অতি গোপনীয়। কোনও আমেরিকানের মুখে এই ক্লাবটির নাম শুনতে পাওয়া যায় না। কোন সংবাদপত্র এই ক্লাবটির নাম উচ্চারণ করে না। তবে মাঝে মাঝে যখন এই ক্লাব লটারী খেলে, তখন প্রত্যেক সংবাদপত্রই কয়েকটি কথায় সংবাদটি প্রকাশ করে কাজের শেষ করে। যেমন—নম্বর এত, এত হাজার পেয়েছে তার পরই থাকে U. C. আজ আমরা জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগনের সম্বন্ধে আমেরিকানদের দ্বারা প্রচারিত নানা সংবাদ পাচ্ছি, কিন্তু আমেরিকার আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাবের নাম-ধাম এবং কার্য্যকলাপ কিছুই শুনতে পাই না—পাবও না! না পাবার অনেক কারণ আছে।

আমেরিকার লোক যখনই মহা বিপদে পড়ে, তখনই তারা ন্যায়-বিচারের জন্য আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাবের শরণাপন্ন হয়। মিসেস ব্রাউনসনও মহা বিপদে পড়েছিল, সে জন্য আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্লাবের শরণাপন্ন হতে যাচ্ছিল। আমাদের পূর্ব-বর্ণিত মিষ্টার আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাবের এক জন কর্মকর্ত্তা, তা আর্থারও বুঝতে পারছিল না। এই ক্লাবের লোক এরূপ করেই আত্মগোপন করে থাকে।

মিষ্টার, মিসেস্ ব্রাউনসনকে আশার বাণী শুনিয়ে চুপ করে সময় কাটাচ্ছিল। ব্রাউনসন মিষ্টারের এরূপ চুপ করে থাকাটা ভাল মনে করছিল না। সময় সময় মিষ্টারকে মিসেস ব্রাউনসন জিজ্ঞাসাবাদ করত। মিষ্টার কিন্তু হাঁ, না, কিছুই বলত না।

এক দিন মিষ্টার চুপ করে বসেছিল এমনি সময় উইলী এসে বলল, "ব্যাংকএর পলাতকদের ধরে ফেলা হয়েছে এবং তারা যে অর্থ নিয়ে পালিয়েছিল তার তিন-চতুর্থাংশ দিয়ে দিয়েছে। টাকা কি করতে হবে তার আদেশ পাবার জন্য এসেছি।"

মিষ্টার বললে, "যাদের টাকা তাদের দিয়ে দাও, তবেই আপদ চুকে গেল। মিসেস্ ব্রাউনসনকে একখানা অফিসিয়েল চিঠি পাঠাও, সেই ঠিক-ঠিক ভাবে কাজ করতে পারবে, কি পদ্ধতিতে কাজ করতে হয় তা তোমরা জান—এখন যেতে পার।"

কয়েক দিন পর মিসেস ব্রাউনসনের কাছে তাদের ব্যাংক-ম্যানেজারের কাছ থেকে পত্র এল। তিনি পুনরায় ব্যাংকের কাজে যোগদান করার পূর্বে মিষ্টারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। মিষ্টার বললে, "ধন্যবাদ আমি কেন পাব? ধন্যবাদ পাবেন আমার মনিব যিনি দয়া করে এতটুকু করেছেন।"

বৃদ্ধের হলিউডে আসার অন্য কারণ ছিল। সেই কাজে তখনও বৃদ্ধ হাত দিতে পারেনি, কারণ, তখনও আর্থারের শরীর সুস্থ হয়নি। আরও তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হবার পর আর্থারের শরীর ভাল হ'ল এবং কাজ করার উপযুক্ত হল। আর্থার বসে থাকা মোটেই পছন্দ করে না, কাজ করতে চায়। এদিকে কি করে কাজ আরম্ভ করতে হবে তার কোন সুনির্দ্ধারিত উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হলিউডের সিনেমা-ডাইরেকটর এবং মালিকগণ সহজ লোক নয়। তারা কোটি কোটি টাকার মালিক। তাদের অধীনে অনেক লোক কাজ করে। এদের এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট থাকে এক যায়গায় আর সেক্রেটারী থাকে অন্য জায়গায়। টেলিফোনের সাহায্যেই তারা কাজ-কারবার সেরে নেয়। এমতবস্থায় এদের সংগে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া মহা কষ্টকর কাজ। এদিকে চারলী চাপলিন, গেটা গার্বো, পাওয়েল মুনী শ্রেণীর অভিনেতারা স্বাধীন ভাবেই কাজ করেন। তাদের চরিত্রে দূষিত কোনই দোষ নেই, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কতগুলি দোষ রয়ে গেছে, যদি তারা এ সব পরিত্যাগ না করেন তবে সমাজের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

বৃদ্ধ এক দিন দরজার সামনে বসেছিল, আর্থার বাইরে পায়চারি করছিল। আর্থারকে ডেকে এনে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল "বল ত আর্থার, তোমার সেই জীবনটা, মানে",…এর বেশী বৃদ্ধ বলতে পারল না।

আর্থার সামনে এসে বলল "বুঝতে পেরেছি, আমার সেই জীবন আর পশুর জীবন একই ধরণের ছিল।"

বৃদ্ধ একটু চিন্তিত হয়ে বললে, 'কালিফরনিয়ার সর্বত্র তোমার সেই জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শিশু সাহিত্যের প্রসারের নাম করে তোমাদের মত ছেলেমেয়েদের একত্রিত করে কতগুলি অভদ্র এবং সমাজের শত্রু এখানে কারবার পেতে বসেছে সেদিকে তোমার দৃষ্টি পড়েছে?

"না মিষ্টার, তা ত' কিছুই দেখতে পাইনি।'

মিষ্টার বললে, "গার্ডিয়ান,পত্রিকাটা নিয়ে এস তাতে দেখতে পাবে ছোটদের আসর বলে সুন্দর একখানা পাতা রয়েছে! পরিচালনা করছে জংলী পাখী। এই জংলী পাখী আর কেউ নয়, নিউকাইণ্ড-এর হর্তা-কর্তা বিধাতা। তারই দুর্বুদ্ধিতে অনেক মেয়ে উধাও হচ্ছে, অনেক ছেলে মা-বাপের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং এরাই দূর-দেশান্তরে গিয়ে কোনও সিনেমা-মালিকের ঘরে থাকছে অথবা ডিরেক্টরদের খেলার পুতুল হচ্ছে। এ সবের কি কোন প্রতিকার নেই?"

"থাকবে না কেন মিষ্টার, একমাত্র প্রতিকার হ'ল পাকা হাতের একটি ছোট্ট বুলেট।"

"এতে যে অনেক হত্যা হবে আর্থার, সে কথা ভাব কি?"

আর্থার বললে, "হক না লাখে লাখে হত্যা, তাতে ক্ষতি কি? এ সব লোকের কিন্তু সাহস নেই, এদের দু'-একটা যমালয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ কাজে যদি আমাকে লাগাতে চাও আমি সে কাজ সাদরে গ্রহণ করব, কিন্তু আমার সংগে আর একটা ছেলে দিতে হবে।"

"কোথায় কি ভাবে কাজ করতে হবে তার এখনও ঠিক হয়নি, তোমার সংগে আর একটি ছেলে দেবার প্রশ্ন এখানে মোটেই উঠে না। দিন কতক সবুর কর, ভেবে-চিন্তে দেখা যাক্, তোমাকে কোথায় নিযুক্ত করলে ভাল হবে। এদিকে পুলিশের সংগেও একটু ঠিক হয়ে যাক্, নতুবা কাজে নেমে অকেজো হয়ে বসে থাকলে চলবে কেন। আমার মনে হয়, একই দিনে কয়েক জন ফিলম্-প্রডিউসারকে হত্যা করতে পারলে ভাল হবে, তার পর ক'টা ডাইরেক্টরের ছিন্ন মুণ্ড

হলিউডের যেন বোক্লাবের কাছে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, কেমন;—তোমার মত কি আর্থার?"

"আমার মতামতের জন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না, যা বল তাই করতে রাজী আছি, কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, কি করে এরূপ পাপ কার্য্যের শেষ হবে?"

বৃদ্ধ বললে, "সোভিয়েট রুশিয়াতে এরূপ পাপ কার্য্য হতে রেহাই পাবার জন্ত একটি পথ আবিষ্কার করেছে। সেই পথটি হল বেকার সমস্যা। যে দেশে বেকার নেই সে জন্ত কোনরূপ পাপকার্য্যও নেই। তোমার মত ছেলে এবং তোমার বয়সী মেয়েরা যদি আর্থিক সাহায্য পায় তবে কি কখনও এরূপ অন্যায় কাজে মন দিতে পারে? নিশ্চয়ই পারে না, তা আমি জানি, কিন্তু মজুর-সমস্যা আমাদের দেশের বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান করার জন্ত কি পথ অবলম্বন করা যেতে পারে তা নিয়ে অন্ত লোক মাথা ঘামাবে, আর আমি-তুমি এ বিষয়ে চুপ করে থাকব, তা হতেই পারে না। সোভিয়েট রুশিয়ায় যেরূপ ভাবে বেকার সমস্যার সমাধান হয়েছে আমাদের দেশে সেরূপ ভাবে সমস্যা সমাধানের কোনরূপ প্রচেষ্টাই দেখছি না। আমরা কিন্তু আপাততঃ আমাদের মতানুযায়ীই কাজ করে যাব। আগামী কল্য আমি স্যান ফ্রান্সিসকোতে যাব, তুমি যদি যেতে চাও তবে আমার আপত্তি নেই।"

আর্থার বললে, "নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু আমার স্যুটটা বড়ই কদর্য্য হয়েছে, চল, আর একটা স্যুটও নিয়ে আসা যাবে এবং রুশিয়ার কয়েকখানা ছবি এসেছে তাও দেখা যাবে। যদি ভাল না লাগে তবে হপ্তা খানেক ডাউন টাউনে থেকে আসা যাবে। স্যানফ্রান্সিসকোতে তুমি ক'দিন থাকবে?"

"থাকব আর ক'দিন, ঘণ্টা দুইএর বেশী নয়। চল, এখন একবার বাড়ীওয়ালীর সংগে দেখা করে ভাড়া চুকিয়ে যাই। অগ্রিম এক মাসের ভাড়া দিয়ে যাব এবং বাড়ীতে যাতে চোর ঢুকতে না পারে তার কথাও বলে যাব।"

আর্থার বললে, "তাই হউক বৃদ্ধ, এখন বের হয়ে পড়। তোমার ঘর থেকে বের হ'তে দু'ঘণ্টা লাগে।"

বৃদ্ধের চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু এক স্থান হ'তে অন্ত স্থানে যাবার ক্ষমতা ছিল না, সে জন্তই ঘর থেকে বের হতে দেরী হল। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট দলের নির্দেশ মতে মোটর গাড়ী, রেল পথ পরিত্যাগ করে চলাই নিয়ম ছিল, সে জন্ত বৃদ্ধ চলাফেরা করতে বড়ই বেগ পেত। বৃদ্ধের বয়স ছয়বট্টি পেরিয়ে ছিল। আমেরিকাতে বৃদ্ধাবস্থায় পেন্সন্ আছে। বৃদ্ধের কোন কর্ম-পদ্ধতি না থাকায় নামমাত্র পেনসন্ পেয়েছিল। বৃদ্ধের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করলে নিজের দলের লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করতে পারত। কিন্তু তা কি কখনও সম্ভব হয়? যে পার্টি অথবা যে দলে অর্থলোভী কর্ণধার হ সেই পার্টি অথবা সেই দল বেশী দিন টিকতে পারে না। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট দল নিজেকে বাঁচিয়ে আসছে শুধু তাদের মধ্যে অর্থগৃধ্নু নাই বলেই।

বৃদ্ধ ঘর হতে বের হয়ে সোজা রেল-ষ্টেশন গিয়ে স্যানফ্রান্সিসকোর দু'খানা টিকিট কিনল এবং যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে পার্টির সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাল। সেক্রেটারী বৃদ্ধের কাছে এসেই বললে, "আমরা জেনারেল সভা সবরই ডাকছি, বৃদ্ধ, এ সম্বন্ধে তোমার উপদেশ নিতে যাইনি বলে বড়ই দুঃখিত।"

বৃদ্ধ বললে, "সাধারণ সভা ডাকবার কারণ কি?"

সেক্রেটারী বললে, "আমেরিকার আটচল্লিশ প্রদেশ, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা, পুর্তরীকো, পানামা, ইউরোপ, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার সেক্রেটারিগণ জানিয়েছেন, টেরারিজমের যুগ চলে গেছে, এখন কর্ম-পদ্ধতি বদলাতে হবে। আগামী জানুয়ারী মাসে আটান্ন জন সেক্রেটারীর সভা হবে, সেই সভায় তোমার বক্তব্য তুমি বলবে। তোমাকে যা-তা বলতে দেওয়া হবে না। কালিফরনিয়া প্রদেশের লোকের কথাই তোমাকে বলতে হবে। এটা গণতন্ত্রের যুগ, জান্‌লে—তোমাদের মত বৃদ্ধদের যুগ চলে গেছে। এখন বল, তোমার আদেশ কি?"

বৃদ্ধ একটু চিন্তিত হয়েই বললে, "বলার মত অনেক কথাই ছিল, এই ধরে নাও, ফিল্ম্ কোম্পানীতে যেরূপ ভাবে ব্যভিচার চলেছে, সেই ব্যভিচার দমন করতে হবে। এটা দমন করতে হলে কি উপায় অবলম্বন করতে হবে তারই কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম। এটা হল মুখ্য কাজ, দ্বিতীয় কাজ হল, আর্থারকে একটা স্যুট কিনে দেওয়া—সে সিনেমা দেখতে চায়। সিনেমাতে তোমরা কেউ তাকে নিয়ে যাও। আমি হোটেলে যাচ্ছি। তোমাদের এখানে যদি পাক হয় তবে তোমাদের ঘরেই খাব ঠিক করেছি। তোমাদের ঘরে আজ কি রান্না হবে?"

সেক্রেটারী বললে, "সে কথা তুমি আমার স্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তোমার কথা কি আমার স্ত্রী কোন দিন অমান্য করেছে? দাঁড়াও, ফোন করছি, এখান থেকেই আমার স্ত্রী এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। আর্থারের সিনেমা দেখার ইচ্ছে হয়েছে। হওয়ার কথাই, যত রাজ্যের বদ্ ছেলে তুমি একত্র কর, এটাকে তাড়িয়ে দাও না।"

বৃদ্ধ আর সহ্য করতে পারলে না, রেগে তেড়েমেড়ে বললে, "চুপ, কর,, শুয়রের বাচ্চা!"

সেক্রেটারী আর একটি কথাও বললে না, শুধু তার স্ত্রীকে ফোনে জানিয়ে দিলে, "বৃদ্ধ এসেছে, এক্ষুনি এসে তাকে নিয়ে যাও। যদি সম্ভব হয় তবে তার জন্ত কাছের হোটেলে শোবার বন্দোবস্ত করে দিও এবং তোমার বোনকে দিয়ে আর্থার নামে ছেলেটাকে সিনেমায় পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব।"

ফোন পাওয়া মাত্র সেক্রেটারীর স্ত্রী চলে এলেন এবং বৃদ্ধকে সম্বোধন করে বললে, "কেমন আছো বাবা, চল, ঘরে যাই।"

বৃদ্ধ দ্বিরুক্তি না করে বাইরের ঘরে এসে আর্থারকে ডাকলে এবং সেক্রেটারীর স্ত্রীর সঙ্গে তাদের ভাড়াটে ঘরে উঠল। সেক্রেটারীর ঘর সহরে। ডাউন টাউনের কলরব সেখানে পৌঁছয় না। সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করছিল। বাড়ীটাতে অনেকগুলি ফ্ল্যাট্। তারই বৃহত্তম ফ্ল্যাটটি সেক্রেটারী ভাড়া নিয়েছে। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল, "এদিকে কোথাও কি হোটেল আছে?"

"নিশ্চয়ই তিন তলায় সবটাই হোটেল। বাইরের লোককে স্থান দেওয়া হয় না। তোমাদের জন্ত দু'টা রুম ঠিক করে রেখেছি। মিসেস রবার্টসন্ আমার বিশিষ্ট বন্ধু, তবে তিনি কমিউনিষ্টদের সাহায্য করেন বলে তার সংগে কম সংস্রবই রাখি। তার ঘর দু'বার

তল্লাসী হয়েছে। পাড়ার লোক তার ঘর-তল্লাসীর নমুনা দেখে প্রতিজ্ঞা করেছে, রিপাব্লিকানদের ভোট দেবে না।"

বৃদ্ধ বললে, "কেন, কি করেছিল?"

মিসেস্ রবিনসন বললে, "তুমি বুঝি সে সংবাদ রাখ না? পুরুষ হয়ে স্ত্রীলোকের তাল্লাসী নেওয়া কি কোন সভ্য দেশে প্রচলিত আছে? হুভারের দল পাগল হয়েছে, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই কামড়াচ্ছে। এই যে ফ্ল্যাটগুলি খালি পড়ে আছে তার মূলেও হুভার। দৈনিক নব্বই সেন্ট মাইনে পেয়ে কয় জন ত্রিশ ডলার বাড়ীভাড়া দিতে পারে? যারা এই ফ্ল্যাটগুলিতে থাকত, তারাই এখন হোটেলে রাত কাটায়। তোমরা ত কমিউনিষ্ট নাম শুনলেই চমকে উঠ। মিসেস রবার্টসন্ যদি এই ঘরগুলি ভাড়া নিয়ে হোটেল না খুলতেন তবে এই বাড়ীটার অনেকেই রাস্তায় শুতে বাধ্য হ'তো। বেচারী আমার প্রিয় বন্ধু, মাত্র পাঁচ সেন্ট করে মাথা-পিছু নিয়ে রাত্রে শুতে দেয়। সমস্ত তিন তলাটার ভাড়া মাসে এক শত কুড়ি ডলার। সেখানে প্রত্যহ প্রায় দুই শত লোক ঘুমায়। এতে লাভ যা হয় তা বিছানা পরিষ্কার রাখতেই চলে যায়। এখন ভেবে দেখ, এরূপ দয়ালু রমণী এই সহরে কয় জন আছে? তোমরাও গরীবের-সাহায্য কর কিন্তু তা অন্য রকমে। সেই সাহায্য অতি অল্প লোকের কাছেই পৌঁছয় কিন্তু মিসেস রবার্টসনের দয়া সর্বসাধারণ পাচ্ছে এবং তাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করছে। বৃদ্ধ, তোমাদের পথ এবং মত বদলাও, নতুবা শেষে আপশোস করতে হবে।"

হাঁ, ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে, এ সব কথা এখন চিন্তা করব না। অনেক বৎসর হল সিনেমা দেখিনি, সিনেমা দেখবার বড়ই সাধ হয়েছে, তুমি যাবে?"

"না বৃদ্ধ, আমি যাব না। বল, তোমার জন্য কি রান্না করতে হবে?"

"সব্‌জির সুপ তুমি বেশ ভাল করেই রান্না কর, তাই করবে। এখন আমরা যাই, কেমন?"

"আচ্ছা যাও, সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে এসো।"

বৃদ্ধ এবং আর্থার মিলিয়ন্ ডলার প্রেক্ষা-গৃহে গিয়ে টিকিট কিনল, নির্বাক চিত্র অথচ দাম দিতে হল পচিশ সেন্ট। লোকে লোকারণ্য। রাশিয়ান ফিলম্ দেখান হচ্ছে। আর্থার প্রেক্ষা-গৃহে প্রবেশ করেই বললে, "এখানে বসা যাবে না মিষ্টার, বড়ই দুর্গন্ধ। যা দেখানো হচ্ছে তাও বুঝতে পারব না বলেই মনে হয়।" কিন্তু হঠাৎ দর্শকবৃন্দ চিৎকার করে উঠল, "বিদ্রোহ বেঁচে থাক।" আর্থার ভেবে পেল না, কিসের বিদ্রোহ এবং কেনই বা বিদ্রোহ বেঁচে থাকবে! বিদ্রোহ হয় তার পর বিদ্রোহের উদ্দেশ্য মিটে গেলে বিদ্রোহও লোপ পায়—এ যে ক্রমাগত বিদ্রোহ। দ্বিরুক্তি না করে বৃদ্ধ এবং আর্থার দু'টি সিট দখল করল। সিনেমা চলছিল। মধ্যস্থল হতে দেখতে আরম্ভ করলে। কিছুই বুঝতে পারা যায় না, পরে কিছুটা হৃদয়ঙ্গম হল। বৃদ্ধ কিছুটা বুঝল, আর্থার কিছুই বুঝল না। পুনরায় যখন সিনেমা আরম্ভ হল, তখন বৃদ্ধ এবং আর্থার সিট ছাড়ল না, তারা বসেই রইল। নূতন করে সিনেমা আরম্ভ হল। এবার বৃদ্ধ এবং আর্থার বিষয়টা কি এবং বিদ্রোহই বা কেন চিরদিন বেঁচে থাকবে, অনেকটা বুঝতে সক্ষম হল।

সিনেমা দেখার পর বৃদ্ধ এবং আর্থার যখন প্রেক্ষা-গৃহ হতে বের হ'ল, তখন কতকগুলি লোক তাদের লক্ষ্য করে হাসলে। বৃদ্ধ এবং আর্থার সেই হাসির অর্থ মর্মে-মর্মে অনুভব করে উভয়ই মাথা নত করে ট্রাম ধরে শহরে চলে আসল। রবিনসনের ঘরে এসে বৃদ্ধ কাঁদতে আরম্ভ করল। আর্থার তাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিল, কিন্তু বৃদ্ধের মনে স্বাভাবিক ভাব ফিরে এল না। রবিনসন, ঘরে এসে বৃদ্ধকে বিমর্ষ দেখে রবিনসন জিজ্ঞাসা করল, "মিষ্টার, তোমার কি হয়েছে?"

বৃদ্ধ আর ভদ্রতা বজায় রাখতে পারলে না, রবিনসনকে লক্ষ্য করে বললে, "আমরা সিনেমা দেখে যখন প্রেক্ষা-গৃহ হতে বের হলাম, তখন কতকগুলি লোক আমাকে এবং আর্থারকে একত্রে দেখে বেশ হাসল, এর মানে তুমি বুঝতে পেরেছ আমিও? তা ভাল করেই জানি। ধনীর দেশ, সভ্যের দেশ, পৃথিবীর সেরা দেশ আমেরিকাতে পিতা-পুত্রে একত্রে পথে হাঁটলে লোকে সন্দেহ করে। স্বামি-স্ত্রী যদি পথে বের হয় তবে লোকে ভাবে, একটি বারবনিতাকে নিয়ে একটি যুবক যাচ্ছে। হলিউডের প্রত্যেকটি ফিল্‌ম্ কোম্পানীতে শুধু কাম রিপুর চর্চাই হয়, যে যাকে ঘৃণা করে, সে-ও বাধ্য হয়ে সেই লোকটার কাছেই শরীর বিক্রি করে। এ সব হতে রক্ষা পেতে হলে কি উপায় নির্ধারণ করা যেতে পারে তারই খোঁজ কর। নরহত্যা অনেক করেছি, কিন্তু নরহত্যায় এর প্রতিকার হচ্ছে না। আজ আমি এখানে এসেছিলাম "আর, এ, ও" সিনেমা কোম্পানীর প্রডিউসারের হত্যার আদেশ দেব এই মনে করে, কিন্তু সেই পদই অন্য যে নূতন লোকটি অধিকার করবে, সে-ও ত' আবার সেই পুরান পাপের পথই অবলম্বন করবে। কাল সকালেই আমি এখান থেকে চলে যাব ঠিক করেছি, লস এঞ্জেলস্ যদিও পাপীদেরই স্থান তবুও সেখানে পিতা-পুত্রে একত্রে পথে চলা যায়। আমার ইচ্ছা ছিল, আর্থারকে দিয়েই "আর, এ, ও" সিনেমা কোম্পানীর প্রডিউসারকে হত্যা করাই। কিন্তু একটা ছোট লোককে হত্যা করার পর আর একটা ছোট লোক সেই স্থান অধিকার করবে। আর্থার ক'টাকে হত্যা করবে? অতএব হত্যা-পর্ব এখানেই শেষ করা ভাল। কেমন, তুমি কি মনে কর?"

রবিনসন্ একটু পায়চারী করে বললে, "হত্যা চালিয়ে যেতে হবেই, এবং আর্থারকে এই হত্যা কাজে নিযুক্ত করা হবেই। তবে কথা হ'ল, আমরা কবে হত্যা হতে বিরত হব তার স্থিরতা এখনও হয়নি। এই সবে মাত্র আমাদের দেশে প্রগতিশীল দলের সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে হত্যা করা বন্ধ করতে পারা যাবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, ওহিও প্রদেশের সেনেটর এবারও হুভারকে প্রেসিডেন্ট করতে ইচ্ছুক, সে জন্য সে তার খামারে যত মজুর আছে তাদের প্রত্যেককে এক মাসের মাইনে বোনাস হিসেবে দেবে বলে স্বীকার করেছে। যদি ওহিওতে হুভার শতকরা নব্বইটি ভোট পেয়ে যান, তবে কনভেন্টের প্রেসিডেন্ট হবার আশা নেই। সে জন্যই ওহিও ষ্টেটের আমাদের লোক হুভারপন্থী লংম্যানকে হত্যার ব্যবস্থা করেছে। বোধ হয় দু'-এক দিনের মধ্যেই তার হত্যার সংবাদ পেয়ে যাবে। আচ্ছা বল ত, তোমরা অর্থাৎ বৃদ্ধেরা হত্যার বিরুদ্ধে এমনি ভাবে উঠে-পড়ে লেগেছ কেন? পাপীদের যদি সায়েস্তা করা না যায় তবে আমেরিকাতে এক টুকরা রুটিও যে কেউ পাবে না। এই সেদিন হ্যাপি ভেলির মালিককে যদি হত্যা করা না হ'ত তবে সেখানকার

অবস্থা কি হত বল? লোকটা পনর সেণ্ট মজুরী হতে পাঁচ সেণ্ট ঘণ্টায় দেবার বন্দোবস্ত করেছিল। ফিলিপাইন, জাপানী এবং চীনা মজুর তাতেই কাজ করতে রাজী হয়েছিল। আমেরিকান্ মজুর মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। ভেবে দেখ, কত শিশু না খেতে পেয়ে মরত কত বৃদ্ধ আত্মহত্যা করত। একটা লোককে হত্যা করে আমরা কতগুলি মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছি।"

বৃদ্ধ চেয়ার হতে লাফ দিয়ে উঠল এবং বলল, "শাসন-কাঠামো বদলাতে হবে, তবেই হত্যার আর দরকার হবে না।"

রবিনসন বললে, "বস বৃদ্ধ, এত রাগ করো না, রাগ করলেই [illegible] হয় না। আমার মনে হয়, রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট হলেই শাসন-ব্যবস্থারও পরিবর্তন হবে। এ সব কথা এখন রেখে দাও, চল, খেতে বসি।"

"চল, আর ভেবে কি লাভ হবে, বৃদ্ধ হয়েছি বলে অবহেলা করো না—অবহেলা মোটেই সহ্য হয় না। চল্ আর্থার, খেতে যাই, ভাল করে খেয়ে নিস্, এবার তোকে বড় কাজে নিযুক্ত করব। তোর ত অনেক টাকা আছে, তাই দিয়ে কি করবি?"

আর্থার চিন্তা না করেই বললে, "তোমরা টাকা নিয়ে নিও মিষ্টার, মাকে বড়ই ভালবাসতাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ লক্ষ মা অনশনে মারা যাচ্ছেন। আর মা'র কথা ভেবে লাভ নেই, যেদিন মা-গোষ্ঠীর অন্নাভাব দূর হবে সেদিন আমার মায়েরও দুর্দশা ঘুচবে।"

টেবিলে পৌঁছবার পূর্বেই আর্থার তার কথাগুলো শেষ করে নিল। খাবার টেবিলে দেখল, আরও কয় জন ভদ্রলোক বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছেন। উইলী তার মধ্যে অন্যতম। ভ্যানডার চুপ করে রয়েছিল। উইলীকে দেখা মাত্র বৃদ্ধ একটু রেগে গেল এবং বলল, "আমার ওখানে যাওনি কেন রে?"

"কি করে যাব বল? ইলেক্শন নিয়েই যে রাত-দিন খাটছি। এই ত' গত পরশু "হার্টস্ চেলেঞ্জ" এক জন সম্পাদককে সাবাড় করে এলাম। আমরা ত' খুন করা পেশার মধ্যেই ডুবে আছি, কিন্তু খুন করে হজম করা যে কত কষ্টকর তা কি তুমি জান না? তোমার প্রিয়পাত্রটিকে কবে কাজে পাঠাচ্ছ?"

"সে কথা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না উইলী, আমার পুত্র আর্থার প্রত্যহ একটা করে খুন করে হজম করতে পারবে সে ভরসা আমি রাখি। কিন্তু এখন বিবেচ্য বিষয় হল, কিরূপে এই অসহনীয় কাজ আমরা আরও চালিয়ে যেতে বাধ্য হব? একটা উপায় ঠিক কর, যাতে আর এই হীন কাজে অগ্রসর হতে না হয়।"

উইলী বলল, "সে কথা তোমরা ঠিক করে নিয়ে আমাদের আদেশ দিও। তোমাদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে। তবে মনে হয় কি জান, যদি মার্কসইজম গ্রহণ করা হয় তবে হয়ত আমাদের আর খুন খারাপী না করলেও চলবে।"

বৃদ্ধ রেগে বললে, "রেখে দাও তোমার ইহুদী-ইজম্। এ-সব আমি মোটেই বুঝি না, তবে অধিকাংশ মেম্বর যদি মত করে বসেন মার্কসইজমই গ্রহণ করতে হবে, তবে আমি তা গ্রহণ করব বটে, কিন্তু কাজ কিছুই করব না।"

"এর মানে হল, তুমি আমাদের দল ছেড়ে দেবে, কেমন তাই নয় কি বৃদ্ধ?"

বৃদ্ধ বললে, "এর মানে কিছুই নয়, ভালটাকে গ্রহণ করতেও মন চায় না কেন জান? ১৯১৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মার্কসইজমের বিরুদ্ধে একটানা কথা শুনে এসেছি, এর মোহজাল হতে রেহাই পাওয়া অতীব কষ্টকর। তবুও বলছি, তা'ও গ্রহণ করতে রাজী আছি যদি কর্ম হতে রেহাই পাওয়া যায়। হত্যা হতে নিষ্কৃতি পেয়ে যদি আমরা প্রকাশ্য ভাবে কাজ করতে পারি এবং বদমায়েসদের সায়েস্তা করতে পারি তবেই হব নিশ্চিন্ত। আমি মনে করব আমার কাজের শেষ হয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে উত্তর কানাডায় অথবা আলাস্কাতে গিয়ে এসকিমোদের সংগে বসবাস করতে সক্ষম হব।"

উইলী বললে, "এখন এ সব কথা রেখে দাও। খেয়ে শুয়ে থাকাই হবে তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল কাজ।"

"শুয়ে থাকা? এখন রাত চার ঘণ্টার বেশী ঘুমাই না হে, বই পড়েই সময় কাটাই।"

"তবে তাই করো, ইতিমধ্যে আমার কাছে সংবাদ এসেছে—নন্-আমেরিকান্, সাদা রুশ মেজর জেনারেল বেরজিন্ এদেশে রবিন্ হুড্ নামে পরিচিত এবং ফিল্ম্ প্রডিউসারদের মধ্যে অগ্রগণ্য, তাকে কি করে খুন করতে হবে তার উপায় নির্দ্ধারণ করতে। লোকটা ভয়ানক কামুক। তাকে খুন করার জন্য আর্থার ত' যাবেই, আরও কয়েক জনকে নিযুক্ত করতে হবে, সে জন্য আগামী কল্য সকাল বেলাই আর্থারকে নিউইয়র্ক পাঠাতে চাই। সেখানে সে আমাদের আড্ডায় থেকে হপ্তা খানেক শিক্ষালাভ করে কাজে নিযুক্ত হবে, কেমন বৃদ্ধ?"

"তাই হবে।"

পরের দিন বিকেল বেলা বৃদ্ধ হলিউডে চলে গেল এবং আর্থার অন্য দু'টি যুবকের সংগে নিউইয়র্কের দিকে রওয়ানা হল। বৃদ্ধ হলিউডে পৌঁছে বাস্তবিকই আর্থারের অভাব অনুভব করল, এবং আর্থারও বৃদ্ধকে ছেড়ে বেশ একটু কষ্ট পেল। কিন্তু নিউইয়র্ক পৌঁছনর পর আর্থার বৃদ্ধকে একেবারে ভুলে গেল। লোকের অভাব দেখে সে এতই দুঃখিত হল যে, সে ধনী সম্প্রদায়ের প্রতি চটে গেল। এক দিন ওয়াল্ ষ্ট্রীটে বেড়িয়ে আসল। এতে তার মনে নূতন করে আর একটা ধাক্কা লাগল। নিউইয়র্ক দেখার পর সে গেল ওয়াশিংটন। সেখানকার নীরবতা তার মোটেই ভাল লাগল না, কিন্তু তার থাকার স্থান অর্থাৎ শিকার ধরার স্থান সেখানেই। বেরজিন সেখানেই থাকে।

বেরজিনের সংগে হুভারের সরাসরি সম্বন্ধ। প্রায় চার হাজার সাদা রুশের সে চালক। অনেকগুলি বড় বড় কোম্পানীর সে অংশ কিনেছে, এমতাবস্থায়ও সে রাত্রে ক্লাবে বেহালা বাজিয়ে সামান্য অর্থ উপার্জন করে। তার কারণ আর্থার বুঝতে পারেনি। আর্থার মামুলী লোক। বিদেশের সংবাদ তথাকথিত ন্যাশনালিষ্ট সংবাদপত্র হতেই সে সংগ্রহ করত। যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করত, তাও বুঝতে পারত না। সে ভৌগোলিক তথ্য কিছুই জানত না। তার সাথীরা উভয়েই শিক্ষিত। উভয়েই আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট। পরীক্ষা ফেল করে বাঙালীর ছেলে পটাসিয়াম সাইনেট্ খায়—আমেরিকান ছেলে তা না করে সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দেয়। এদের সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দেবার একটা কারণ ছিল। সেই কারণটি হ'ল, পরে ব্যবসায়ী এদের উভয়কেই সাহায্য করতেন। বৎসর

কম্পিত শিখার স্তব

প্রভাকর সেন

হিমাশ্রয়ী স্তব্ধতাকে জীবনের শেষ বলে যারা জেনে গেছে, তারা গেছে
নিথর নদীর বুকে আঁধার হাওয়ার মতো হেসে,
তার পর এক দিন তারাও এসেছে
স্তব্ধের অর্গল ভেঙে স্বর্ণচ্ছটা স্মিত মহাদেশে
চলে যাবে বলে যারা অশ্রুভার মতো এক স্থয়মান জীবন চেয়েছে :
তাদেরও হয়েছে মনে স্বপ্নের তুষার-কণা
উদাস প্রান্তর পরিধিতে—
সমস্যাকাশের কুহেলিতে।

আমি আসিনি তো
আঁধার তরঙ্গ হয়ে ফিরে যেতে চাই বলে আঁধার সমুদ্র-নাভি হতে,
পৃথ্বীকে গণিকা-প্রেমে ভালোবাসিনি তো
তমিস্রার সেতুপথে জ্যোতিঃপ্রাণ ক্ষণচ্ছায়া ফেলে
পার হয়ে যাবো ভেবে এক আলো হতে অন্য স্বচ্ছল আলোতে :
কোনো আত্মরণনের আলো জ্বেলে
উজ্জ্বল হবার মতো, কিংবা সব আলো নিবে গেলে
জ্বলে উঠবার মতো পরম ক্ষমতা
সে আমার কোথা ?

আমি শুধু পারি
কম্পিত শিখার মতো জ্বলে যেতে, সমুদ্র-সঞ্চারী
যখন বিহ্বল হাওয়া পৃথিবীর মাঠে মাঠে স্বাদ মেখে যায়,
সবুজ স্নেহের ছায়ে সন্ধ্যার কুলায়
যখন বাসনা হয়ে, মোহ হয়ে, ভালোবাসা হয়ে জেগে ওঠে,
যখন অধীর-হওয়া ঠোঁটে—
সোনালি সমুদ্র-স্বাদ প্রবাসের আত্মা ঝলসায়।

এই প্রজ্বলন্ত বিশ্বে সেই ঘষা কতো তীব্র জ্বলা,
কপিশ সময়মার্গে সেই চলা কত দূর চলা,
শূন্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সময়ের কতখানি অলস ভ্রমণ,
জেগে গেছে মন :

সে জেগেছে, জেগেছে সে, নীমার ক্রন্দন
উদ্বেলিত মানুষীর বুকে মিথ্যা নয়,
আকাশের ঈশ্বরের মতো কোনো পরম আশ্রয়
আমাদেরও আছে,
সময়ের কাছে
আমরাও নই শুধু রৌদ্র-জ্বলা বালুতটে সমুদ্র-স্বাক্ষর,
আমাদেরও ঘর
নক্ষত্রের দ্বীপে দ্বীপে, চিত্রভানু আকাশে আকাশে
মরকত মেঘতুঙ্গ, নর্মোচ্ছল বাতাসে বাতাসে
পূর্ব্বাশার সিংহদ্বারে, গোধূলির স্তিমিত ময়ূখে,
অন্তহীন রাত্রির সমুখে।

আমাদের মন তবু পড়ে থাকে, আছে,
রূপ জ্বলে-যেতে-থাকা ক্ষণিকের পৃথিবীর পারে,
নিত্য নৈমিত্তিকের দুয়ারে
তবু চির আনাগোনা আমাদের, একই ছাঁচে
প্রাণ পায়, গড়ে ওঠে, ভেঙে যায় মন
স্বপ্নের ভিতরে দেখা অন্য এক স্বপ্নের মতন।

তবু জানি কোনো দিন আমাদের কথা ফুরাবে না,
অন্য এক তমসার বাহুডোরে সময়ের অজানা অচেনা
আশ্চর্য্য সকাল হলে,
রঙে দিক্ ভেসে গেলে অন্য গ্রহবলয়ের স্বর্ণাঞ্চলে
আমরা তখনো র'বো, আমাদের গান থামবে না :
হয়তো বা হতে পারে সেই দেশে আমাদের কথা, কথকতা;
নদনদী বনানী কি হিমানীর আশ্চর্য্য বারতা।

দুই পরে তিনি মারা যাওয়ায় এদের এলাউন্স বন্ধ হয়। যে ভদ্রলোক সম্পত্তির মালিক হন তিনি এদের উভয়কে জানিয়ে দেন, গরীবের ছেলে যদি তুখড় ছেলেও হয়, তবুও তারা গরীব। গরীবকে সাহায্য করলে ঈশ্বরের রাজ্যে ছোট-বড় থাকবে না। সে জন্ম ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ তিনি কোন মতেই করতে পারবেন না। এরা যেন নিজের ভাগ্য অনুযায়ী চলে।

ধনিপ্রবর থেকে ইত্যাকার পত্র পেয়ে ছেলে দু'টি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে বই পড়াতে মন দিল—কেন মানুষ দরিদ্র হয় তা জানবার জন্য। মানুষ দরিদ্র হবার কারণ জানবার পর তাদের কর্ত্তব্য ছিল প্রগতিশীল দলে যোগ দেওয়া, কিন্তু তারা তা না করে প্রতিশোধ নেবার জন্য অন্য দলে যোগ দেয়। আমেরিকান্ যুবকদের প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি একবার জেগে উঠলে পৃথিবীকেও ভুলে যায়—প্রতিশোধ নেবে তবে ছাড়বে। লোকে বলে, আরব অথবা পাঠানরা প্রতিশোধ নিতে একের নম্বর ওস্তাদ। কিন্তু আমেরিকানদের কাছে এরা শিশু অথবা নগণ্য। আরব এবং পাঠানরা বর্বরতার দিক্ দিয়ে চরমত্ব প্রকাশ করে—আমেরিকানরা তা করে না।

[ক্রমশঃ।

অনুপ গুপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

[শোবার ঘর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘরে আলো জ্বলছে। আগেকার দৃশ্যের কাপড়-জামা-পরিহিতা প্রতিমা খাটে অর্দ্ধ-শায়িতা। একটা সুদৃশ্য শালে তাঁর পা থেকে বুক অবধি ঢাকা। মাথায় কয়েকটা কুশন দেওয়া। খাটের পাশে তপতী দাঁড়িয়ে। টেবিলের কাছে বসে ডাক্তার সরকার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখছেন। প্রতিমা তপতীর সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা কইছেন)

ইন্দ্রনাথ। হুঁ। আচ্ছা প্রতিমা দেবী, এর পূর্ব্বে কখনও আপনার এ রকম হয়েছিল?

প্রতিমা। আজ্ঞে না। পূর্ব্বে কখনও হয়নি এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও কখন হবে না।

ইন্দ্রনাথ। (লিখতে লিখতে) আমার মনে হয়, এ আপনার নার্ভাস ব্রেনের জন্ম হয়েছে। নিউরেস্থিনিয়া। সাতটা বাজে। আমি এবার উঠি। আধ ঘণ্টাটাক পরে আমার ডিস্পেন্সারীতে লোক পাঠিয়ে দেবেন। ওষুধ তৈরী থাকবে।

প্রতিমা। কি ওষুধ?

ইন্দ্রনাথ। রুগীদের ওষুধ বলা ঠিক নয়, তবে যখন জিজ্ঞেস করছেন বলতে আপত্তি নেই। আজ রাত্রের জন্ম একটু পীকস্ ব্রোমাইড দেব আর একটা টনিক নিউরো ফসফেট, ফসফো লেসিথিন অথবা ঐ জাতীয় কিছু। দু'বার ক'রে রোজ খেতে হবে। তপতী দেবী, আপনি কি কিছুক্ষণ আছেন?

তপতী। আর ঘণ্টা খানেক। তবে বাড়ীতে একটা খবর দিতে হবে।

ইন্দ্রনাথ। কেন, আপনার দাদা জানেন না আপনি এখানে এসেছেন?

তপতী। না। আমি মন্দির থেকে ফিরছিলুম, এমন সময় দেখি হন্তদন্ত হয়ে রজনী বাবু ছুটে চলেছেন। আমাকে দেখে বললেন যে, উনি একবার আপনার কাছে যাচ্ছেন। যদি সম্ভব হয় তো একবার যেন ওঁর বাড়ী যাই, প্রতিমা অজ্ঞান হয়ে গেছে। সেই শুনে পথ থেকেই আমি চলে এসেছি। বাড়ী গিয়ে খবর দিতে পারিনি।

ইন্দ্রনাথ। সে ভার আমি নিলুম। আপনি একটু ওঁর জন্ম মিছরি দিয়ে গরম দুধের ব্যবস্থা করুন। আর মিষ্টার সেন আসা অবধি যদি থাকেন—

তপতী। বেশ, থাকব। তিনি কোথা গেছেন?

ইন্দ্রনাথ। প্রতিমা দেবীর জন্ম টনিক কিনতে। পেটেণ্ট ওষুধ কি না। দোকান বন্ধ হয়ে গেলে আজ আর পাবেন না। কাল আবার রবিবার। আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি, নমস্কার।

তপতী। নমস্কার।

(প্রতিমাও হাত তুলে নমস্কার করলেন)

[ইন্দ্রনাথের প্রস্থান।

প্রতিমা। তোমায় রজনী বাবু অনর্থক কষ্ট দিলেন।

তপতী। কষ্ট আর কি!

প্রতিমা। তোমার দাদা জানতে পারবেন—

তপতী। উপায় নেই। খবর তো দিতে হবেই। নইলে বড় ভাববেন।

প্রতিমা। তুমি চলে গেলেই পারতে। তিনি ভয়ানক রাগ করবেন।

তপতী। সহ্য করব। কিন্তু মানুষের একটা কর্ত্তব্য-জ্ঞান তো আছে। রাগের ভয়ে তা অবহেলা করা যায় না। তা ছাড়া, আমি তো কোন দোষ করছি না। তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাক, আমি তোমার গরম দুধের বন্দোবস্ত করি গে।

[তপতীর প্রস্থান।

(প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে পরে গুন্-গুন্ করে গাইতে লাগলেন। ক্রমে গলা স্পষ্ট হয়ে উঠল। গানের মধ্যে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন)

প্রতিমা। গান

কেন গো আসিলে আজি প্রাতে।
আমার জীবন ফুরায়েছে প্রিয়,
কালি অমানিশা-রাতে।
মন-কাননেতে ফোটে নাক' ফুল,
গাহে না সেথায় অলি-পিককুল,
বসন্ত সেথা আসে নাক' আর,
ডুবেছে সকলি নিরাশাতে।
জীবনে কেবলি লভেছি বেদনা,
অনাদর-অপমান।
মরণের তীরে কেন তুমি দিলে,
অমৃতের সন্ধান।
ফুটিবার আগে ঝরেছে যে ফুল,
ফোটাবে তাহারে, এ কি তব ভুল!
জিনিয়া শমনে বাঁচাবে কেমনে,
শুধু প্রেম-কামনাতে।

(গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ হাতে রজনীর প্রবেশ)

রজনী। এখন কেমন আছ প্রতিমা?

প্রতিমা। ভাল। (উঠে বসলেন)

রজনী। না না, উঠো না।

প্রতিমা। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, এই দেখুন।

রজনী। আর কোনও উইকনেস নেই?

প্রতিমা। না।

রজনী। দেখি (প্রতিমার হাত ধরলেন) এই ত' হাত কাঁপছে।

প্রতিমা। আপনি হাত ধরলে—(হাত ছাড়িয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে লাগলেন)

রজনী। প্রতিমা, কি হলো?

প্রতিমা। কিছু না, কিছু না।

রজনী। (কাছে গিয়ে) তুমি কাঁদছ?

প্রতিমা। শত দুঃখেও আমি আগে কখনও কাঁদিনি। কিন্তু আজ জানি না, কেন আমার চোখে খালি জল ভরে উঠছে। সাধারণ মেয়েদের মত কাঁদছি, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি, এ ত শুধু দেহের উইক্‌নেস নয়, আমার মনও শক্তি হারাচ্ছে।

রজনী। তুমি কি অসুখী প্রতিমা ?

প্রতিমা। না। কিন্তু তবু কেন—

রজনী। আমি যে আজ কত সুখী হয়েছি, তা তোমাকে কি বলব প্রতিমা। তুমি আমায় ভালবাস।—

প্রতিমা। আগে বুঝতে পারিনি—

রজনী। যাক্, এখন ত' বুঝতে পেরেছ। এবার আমরা মুক্ত।

প্রতিমা। মুক্ত।

রজনী। তোমার অসম্ভব আ'দর্শের নাগপাশ থেকে, তোমার পাগলামি সমর্থনের প্রবঞ্চনা থেকে। কিছু মনে করো না। নারী ও পুরুষ একত্র থাকবে আকর্ষণ জয় করে, এ আমার কাছে পাগলামি, অসম্ভব বলেই মনে হয়।

প্রতিমা। আজ আমারও তাই মনে হচ্ছে।

রজনী। লোকের সামনে একটা অসম্ভব আদর্শের প্রচার করব, দৃষ্টান্ত দেব—তারা বিশ্বাস করবে না, মুখ টিপে অবজ্ঞার হাসি হাসবে, আড়ালে পাগল অথবা প্রতারক বলে বিদ্রূপ করবে—সে হতো এক অসহ্য জীবন। অস্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে মানুষের শক্তির অপচয় হয়।

প্রতিমা। তবে কি আমাদের একসঙ্গে লেখা, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা সব ভেসে যাবে—

রজনী। ভেসে যাবে কেন ? ভবিষ্যতে আমরা সাধারণ পুরুষ ও নারী। আমি কাজ করব একা, তুমি নেবে বিশ্রাম। আমরা দূরে—বহু দূরে চলে যাব। যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না, কেউ সন্ধান নেবে না। ভূঃস্বর্গ কাশ্মীরে গিয়ে আমরা নতুন করে স্বর্গ গড়ব। (নেপথ্যে গান) বাহিরে কি চমৎকার গান গাইছে। জানলাটা খুলে দি। (জানলা খুলে) ঐ দেখ আকাশে চাঁদ উঠেছে। (দু'জনে চুপ করে বসে রইলেন। নেপথ্যের সঙ্গীত ভেসে আসতে লাগল)।

গান

মনের দুয়ার গেল খুলে,
বাহিরে খুঁজেছি ভিতরে দেখিনি
বল প্রিয় কোন্ ভুলে।
আকাশের চাঁদ কহিল আমারে
পথে পথে মিছে খুঁজিস্ কাহারে
হৃদয়ের নিধি পড়িয়া ভূতলে—
সযতনে নে রে তুলে।

(ধীরে ধীরে সঙ্গীতধ্বনি মিলিয়ে গেল)

রজনী। কি মধুর ! যেন আমাদের মনের কথাই বলছে।

প্রতিমা। হ্যাঁ।

(রজনী একদৃষ্টে প্রতিমাকে দেখতে লাগলেন)

কি দেখছেন ?

রজনী। তোমাকে। প্রতিমা, কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে।

প্রতিমা। রজনী বাবু, এটা কি আমাদের পাগলামী হচ্ছে না ?

রজনী। না প্রতিমা, এইটা স্বাভাবিক। নারী যদি নিজেকে নারী বলে স্বীকার করতে না চায় সেইটাই পাগলামী।

(কিছুক্ষণ আবার উভয়ে চুপ-চাপ)

প্রতিমা। আপনার খাবার সময় হয়ে গেছে।

রজনী। তাড়াতাড়ি কিসের। (একটু পরে) প্রতিমা—

প্রতিমা। কি ?

রজনী। আমি যদি তোমাকে বিবাহ করতে চাই—

প্রতিমা। বিবাহ !

রজনী। হ্যাঁ। এখন হতে আমরা স্বাভাবিক নর-নারীর মত জীবন কাটাতে চাই। আশা করি, তুমি আপত্তি করবে না।

প্রতিমা। (নিম্নস্বরে) না।

রজনী। (প্রতিমার হাত ধরে) তুমি যে আমায় কত সুখী করলে তা তুমি ধারণা করতে পারবে না।

প্রতিমা। এ সব কথা এখন থাক। আপনি আগে খেয়ে আসুন। আমি দেখি, খাবারের কত দূর—

রজনী। এই যে যাচ্ছি। একটা সিগারেট খেয়ে নিই।

(সিগারেট ধরালেন)

[প্রতিমার প্রস্থান।

(রজনী উঠে যাচ্ছেন এমন সময় সুরেনের প্রবেশ)

সুরেন। স্যার হরপ্রসাদ গুপ্ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

রজনী। (বিরক্ত ভাবে) আচ্ছা, তাঁকে এইখানেই পাঠিয়ে দাও।

[সুরেনের প্রস্থান।

(রজনী অস্থির ভাবে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। স্যার হরপ্রসাদের প্রবেশ।)

হরপ্রসাদ। একা রয়েছ ?

রজনী। তা আছি বৈ কি।

হরপ্রসাদ। আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারিনি বলে কিছু মনে করো না। কয়েক জন লোকের আসবার কথা ছিল—

রজনী। আমরা কিছুই মনে করিনি।

হরপ্রসাদ। আমার একে শরীর খারাপ। তার উপর লোক-জনের আসা-যাওয়া বিরক্ত করে মারলে। পায়ের ব্যথাটা আবার আজকে একটু বেড়েছে। কলকাতা থেকে ওঁরা সব এলেন—

রজনী। কারা ?

হরপ্রসাদ। পায়ে বোধ হয় বাতই ধরল, যা ব্যথা। হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী এসেছেন।

রজনী। মালবী ? বুলবুল ?

হরপ্রসাদ। তোমার ভায়ের যত সব কাণ্ড। নিশিকান্তটা চিরকালই গাধা। বলা নেই কওয়া নেই মালবীকে নিয়ে এখানে এসে হাজির। এদিকে আমার যে পায়ে ব্যথা।

রজনী। আপনিই নিশ্চয় তাদের আনিয়েছেন।

হরপ্রসাদ। হ্যাঁ, এ সময়ে এ দৌরাত্ম্য।

প্রতিমা। (নেপথ্যে) আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।

(বলতে বলতে ঘরে ঢুকে হরপ্রসাদকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন)

হরপ্রসাদ। উঃ, কি ব্যথা, আমি বসলুম আর দাঁড়াতে পারছি না। (প্রতিমার প্রতি) আপনি আমায় কিন্তু খুব ঠকালেন। (চেয়ার টেনে বসলেন)

প্রতিমা। ঠকালুম ?

হরপ্রসাদ। আমি একে বুড়ো মানুষ, তার পায়ে ব্যথা, কাজকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি চৌরাস্তার দিকে গেলুম, আপনাদের সঙ্গে

একটু বেড়াব বলে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। কারুর দেখা পেলুম না।

রজনী। চৌরাস্তায় গেলেন কেন? আমরা ত সেখানে যাব আপনাকে বলিনি।

হরপ্রসাদ। তা বলনি, তবে সাধারণত ঐখানেই সবাই বেড়াতে যায় তাই—তোমরা বুঝি আজ বেড়াতে বার হওনি?

প্রতিমা। আপনাদের সমাজের মেয়েরা কখনও অজ্ঞান হয়ে যান কি?

হরপ্রসাদ। তার মানে? উঃ, পা'টা গেল।

প্রতিমা। মানে, আপনাদের উচ্চ সমাজে—

হরপ্রসাদ। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া? হাঁ, সুবিধামত, প্রয়োজন হলে স্বেচ্ছায় একটু-আধটু হন বই কি।

প্রতিমা। কিন্তু আমি তো আপনাদের মত উঁচু সমাজের নই, তাই অসুবিধায় এবং নিষ্প্রয়োজনে অনিচ্ছায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম।

হরপ্রসাদ। আই সী! শুনে বড়ই দুঃখিত হলুম। আশা করি, এখন একটু সুস্থ হয়েছেন?

প্রতিমা। হ্যাঁ। ধন্যবাদ।

(এক কাপ দুধ হাতে তপতীর প্রবেশ)

হরপ্রসাদ। (প্রতিমার প্রতি নিম্নস্বরে) কে? নার্স?

প্রতিমা। (বিরক্ত ভাবে) না, আমার বন্ধু।

হরপ্রসাদ। ওঃ, ভেরী সরী! মেয়েটি কিন্তু দেখতে বেশ।

(প্রতিমা সেখান থেকে সরে গেলেন

তপতী। প্রতিমা, দুধটা গরম গরম খেয়ে ফেল।

প্রতিমা। এখানে না। বাইরে চল।

(তপতী ও প্রতিমার প্রস্থান।

হরপ্রসাদ। রজনী, মেয়েটি কে হে?

রজনী। তপতী দেবী, তাকদায় এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

হরপ্রসাদ। স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

রজনী। উনি বিধবা।

হরপ্রসাদ। হাউ স্যাড! আলাপ করিয়ে দিও তো।

(তপতী ও প্রতিমার প্রবেশ)

রজনী। তপতী দেবী, শ্রীযুত হরপ্রসাদ আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চান।

তপতী। তাই না কি! ধন্যবাদ!

হরপ্রসাদ। আমি রজনীর মেশো হই। আপনি যে এদের জন্য কষ্ট করছেন—

তপতী। সে জন্য আপনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। কেমন?

হরপ্রসাদ। মানে, ওর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ল—

তপতী। তা জানি। এবং বোধ হয় আপনার পূর্ব্বেই, কারণ, আপনি আসবার আগে আমি এসেছি।

হরপ্রসাদ। সো কাইণ্ড অফ ইউ। আপনি বুঝি যাঁর সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে এসেছেন?

তপতী। না, দাদার সঙ্গে।

হরপ্রসাদ। আপনার দাদার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। তিনি কি করেন?

তপতী। কলকাতায় প্রফেসারী করেন।

হরপ্রসাদ। হোটেলে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? এখানকার যা সব হোটেল—

তপতী। আমরা হোটেলে থাকি না।

হরপ্রসাদ। ওঃ, ঘর ভাড়া নিয়েছেন বুঝি?

তপতী। হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়া ফল্‌সের কাছে একটা ফ্ল্যাট—

হরপ্রসাদ। বেশ, বেশ। দার্জ্জিলিঙের ফ্ল্যাটগুলো কেমন আমার দেখবার ভয়ানক ইচ্ছে। ধরুন, যদি কাল বিকেলে একবার আপনাদের ওখানে যাই—

তপতী। বেশ তো। যাবেন।

হরপ্রসাদ। (পকেট থেকে নোট-বই বার করে) আপনার দাদার নাম, ঠিকানাটা—

তপতী। প্রফেসার ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। দী ফল্‌স্।

হরপ্রসাদ। (নোট-বইতে টুকে) ধন্যবাদ। তাহলে কাল বিকেলে—এই ধরুন, চারটের সময়—

তপতী। বেশ। বাড়ীওয়ালাকে বলব ঘর-দোর পরিষ্কার করে রাখতে।

হরপ্রসাদ। (বিস্মিত ভাবে) তার মানে?

তপতী। আমরা কাল দেড়টার সময় দার্জ্জিলিঙ ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি কি না।

হরপ্রসাদ। (স্তম্ভিত হয়ে) ওঃ, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, রজনী, তুমি আমায় কি বলবে বলছিলে—

রজনী। আমি বলছিলুম না [illegible] বলছিলেন। আমার ঘরে চলুন।

(হরপ্রসাদ ও রজনীর প্রস্থান)

প্রতিমা। সুপ্লেনডিড তপতীদি'। খুব শিক্ষা দিয়েছ।

তপতী। ও রকম বদলোকের শিক্ষার প্রয়োজন।

প্রতিমা। উনি আশা করেননি—

তপতী। তার কারণ, ওঁদের সমাজে পয়সা থাকলেই মানুষ মেশবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। এবার ও তোমাদের সম্মুখ সমর আরম্ভ হলো।

তপতী। তোমাদের বাড়ী আসা-যাওয়া, তোমার প্রতি ওঁর সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব আমায় একটু আশ্চর্য্য করে দিয়েছে!

প্রতিমা। ওঁর প্রকৃতিটাই একটু আশ্চর্য্য রকমের। কিন্তু আমি জানি, মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে উনি আমার কাছ থেকে রজনী বাবুকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না।

তপতী। (ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে) ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না! কোথায় গেল তোমার আদর্শ, তোমার বিদ্রোহ? এত দূর অধঃপতন! তোমার বেশভূষা আজ এমন কেন? সাধারণ নারীর মত রূপের জলুসে বেঁধে রাখতে চাও এক জন পুরুষকে। প্রলোভনের মধ্যে থেকে প্রলোভনকে জয় করা বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রে বিধবাদের সংযম, ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিয়েছে। আমি জানি, তুমি সমাজ—শাস্ত্র কিছুই মান না, কিন্তু তাই বলে এই প্রবঞ্চনা। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যা আকর্ষণ তাই যদি তোমার কাম্য, তবে এত দিন একটা অসম্ভব আদর্শের দোহাই দিয়ে অসাধারণ হবার চেষ্টা করলে কেন? প্রতিমা, একবার বাঁধ

ভাঙলে স্রোতকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এখনও সময় আছে, তুমি সব ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে চলে এস।

প্রতিমা। চলে যাব?

তপতী। হ্যাঁ। এ প্রেম নয়। একটা নেশা। কিছু দিন দূরে থাকলেই কেটে যাবে। তোমায় নিয়ে আমি দেশে চলে যাব। প্রকৃতির ক্রোড়ে, শান্ত শ্যামল সুষমায়, আড়ম্বরহীন সরল জীবন—

(নেপথ্যে আবার গান শোনা গেল)

জীবনে প্রথম এল বসন্ত
মধুর আভায় ভরি দিগন্ত
রেখো গো আমারে জীবন-দেবতা
রাতুল চরণমূলে।

(সঙ্গীতধ্বনি মিলিয়ে গেল)

প্রতিমা। শুনলে তপতী?

তপতী। গান?

প্রতিমা। হ্যাঁ। চমৎকার নয়। প্রেমের গান—

তপতী। গান হিসেবে চমৎকার হয়ত, কিন্তু প্রেমের গান বলেই যে চমৎকার তা বলা ঠিক হবে না। ঐ ওঁরা আসছেন। আমি তোমার রাত্রের খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বাড়ী যাই।

[তপতীর প্রস্থান।

(অন্য দরজা দিয়ে হরপ্রসাদ ও রজনীর প্রবেশ)

হরপ্রসাদ। সব কথা ওঁকে খুলে বল।

প্রতিমা। কিসের কথা?

রজনী। আমার স্ত্রী দার্জ্জিলিঙে এসেছেন। তাঁর কৃতকর্ম্মের জন্য তিনি দুঃখিতা।

প্রতিমা। আপনার স্ত্রী! এখানে?

রজনী। হ্যাঁ, অনুতাপ জানাতে এসেছেন। এ সমস্ত চক্রান্ত। (হরপ্রসাদের প্রতি) নিশিকান্তর আর আপনার—

হরপ্রসাদ। ছিঃ ছিঃ রজনী, বুড়োকে আর এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন?

রজনী। জড়াবার অপেক্ষা আপনি রাখেননি। এ রকম ড্রামাটিক পরিস্থিতি তার মাথায় আসে না। আপনি নিজেই বলেছেন সে একটা গাধা।

প্রতিমা। আপনি যে বন্ধুর কথা বলছিলেন এঁরাই বুঝি তাঁরা।

হরপ্রসাদ। হ্যাঁ।

রজনী। আপনি তাঁদের জানিয়ে দেবেন, আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া অথবা তাঁকে নিয়ে ঘর করা আর সম্ভব হবে না। আমি সোমবারে রেজিষ্ট্রী করে প্রতিমাকে বিবাহ করব।

হরপ্রসাদ। অতি উত্তম প্রস্তাব। তা বাবা, এ সংবাদটা ত' আমি নিজে দিতে পারব না। তুমি যদি গিয়ে একবার বলে এস—

রজনী। তা হয় না। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করব না।

হরপ্রসাদ। তাহ'লে এক কাজ কর, একটা চিঠি লিখে দাও।

রজনী। তাই দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

হরপ্রসাদ। অদ্ভুত তোমার ক্ষমতা! অপূর্ব্ব তোমার চাতুরী!

প্রতিমা। (রেগে) মানে?

হরপ্রসাদ। মানে তুমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছ। এমন সুন্দর কৌশলে তুমি যুদ্ধ করলে যে আমরা সব কুপোকাৎ।

প্রতিমা। এইটেই বুঝি আপনাদের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল।

হরপ্রসাদ। তা ছিল। ভেবেছিলুম, মালবীর অনুতাপ, চোখের জল, কাতর প্রার্থনা বুঝি রজনীকে আবার ঘরের দিকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু তোমার সম্মোহন অস্ত্রে সব ফেঁসে গেল। ছোকরা একবার দেখা পর্য্যন্ত করতে রাজী হলো না।

প্রতিমা। তার জন্যে কি আপনি আমাকে দায়ী করেন?

হরপ্রসাদ। না, দায়ী করি মালবীর অদৃষ্টকে। আমি জানতুম, যে ভাবে তোমরা চলছিলে তাতে শীঘ্রই উভয়ে উভয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে ত্যাগ করে চলে যাবে।

প্রতিমা। কি করে জানলেন?

হরপ্রসাদ। যে সমাজে রজনী জন্মেছে, মানুষ হয়েছে, তার সঙ্গে তোমার খাপ খায় না। মলিন বসন, আলুথালু বেশ, আদর্শের প্রলাপ, বক্তৃতার তোড়, সে বেশী দিন সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু ঠিক যখন তোমাদের বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে, সেই সময় তুমি এক ভেল্কী খেললে। তোমার পূর্ব্বেকার মূর্ত্তি ত্যাগ করে বসনে-ভূষণে, কথায়-বার্ত্তায় অতি আধুনিকাকেও হার মানিয়ে তার চোখের সামনে দাঁড়ালে। নেশার ঘোর কাটবার আগেই সে আবার মাতাল হয়ে পড়ল। আচ্ছা, হঠাৎ তোমার এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

প্রতিমা। আমার বেশ-ভূষা সম্বন্ধে আপনার ইঙ্গিত।

হরপ্রসাদ। ইঙ্গিতে ইচ্ছা হতে পারে, কিন্তু কাপড়-জামা ত' তৈরী হয় না।

প্রতিমা। কাপড়-জামা রজনী বাবুই আমার জন্য এনেছিলেন। আমি হয়ত' পরতুম না, কিন্তু আপনার কথায়—

হরপ্রসাদ। তাহ'লে আমিই আমার পরাজয় ডেকে আনলুম বলো? একবার হাস। (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য) কই, হাসছ না ত'?

প্রতিমা। বিদ্রূপের কোনও প্রয়োজন আছে কি?

হরপ্রসাদ। এখন ত' বিদ্রূপ আমার করার কথা নয়, এখন ত' বিদ্রূপ তুমি করবে, আমরা শুনব। কিন্তু প্রতিমা, বিশ্বাস করো, আমি তোমার জন্য দুঃখিত। মনে রেখ, রজনী এরিষ্টোক্র্যাটিক সমাজের বড়লোকের ছেলে। তোমার মত মেয়ে তার জীবনে এই প্রথম নয়।

প্রতিমা। আপনি কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন।

হরপ্রসাদ। তোমার ভালর জন্যই আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই যে, তোমরা ভুল করছ। যদি বিবাহ করে তোমরা চিরসুখী হতে পারতে তবে আমিই তোমাদের প্রথম আশীর্ব্বাদ করতুম। প্রতিমা, আমি তোমাদের চেয়ে বয়সে বড়। আমার অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী। আমার ভয় হচ্ছে, এ আকর্ষণ তোমাদের চিরদিন থাকবে না। যে দিন ভুল ভাঙবে সে দিন তোমরা হয়ে পড়বে উভয়েই শ্রান্ত, রিক্ত। নিজের চোখেই নিজে নীচু হয়ে পড়বে, সান্ত্বনা দেবার কিছুই থাকবে না। রজনী পুরুষ, সে আবার সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই ফিরে পাবে। কিন্তু তুমি নারী, তাই বলছি প্রতিমা, সাবধান, এখনও সময় আছে।

প্রতিমা। আপনার সৎপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। নারীর জীবন ফুলের মতন একবার ক্ষণিকের জন্য বিকশিত হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। একটা ঢেউয়ের মত সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠে তখনই ভেঙ্গে পড়ে। ঐ একটি ক্ষণ, একটি শুভ মুহূর্ত্তই নারীর প্রাণ। তার জন্য সে কুল, মান, লোক-লজ্জা সব ত্যাগ করতে পারে।

হরপ্রসাদ। যাকে ভালবাসে তার সর্ব্বনাশ করতে পারে?

প্রতিমা। সর্ব্বনাশ! কি বলছেন আপনি?

হরপ্রসাদ। তার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল—

প্রতিমা। তিনি তা ত্যাগ করে চলে এসেছেন আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে।

হরপ্রসাদ। কিন্তু তা শেষ হয়ে যায়নি। ছিন্ন সূত্র এখনও জোড়া লাগতে পারে। তার বন্ধু-বান্ধবেরা এখনও জানে যে, তার শরীর খারাপের জন্য জাহাজে করে সমুদ্রে বেড়াতে গেছে। এখনও সমাজে তার মাথা উঁচু আছে।

প্রতিমা। আপনি কি বলতে চান, স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের কথা কেউ জানে না?

হরপ্রসাদ। বড়-ঘরের অমন অনেক কথা থাকে। একটু-আধটু মুখরোচক নিন্দা-কুৎসাও হয়ত' কেউ কেউ করে। কিন্তু কিছু দিন আবার একসঙ্গে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। জনসাধারণের স্মরণশক্তি খুব তীব্র নয়।

প্রতিমা। রজনী বাবু মিটমাট করে ঘর করতে রাজী হয়েছেন?

হরপ্রসাদ। একই বাড়ীতে রজনী ও তার স্ত্রী থাকবে—ভিন্ন ভিন্ন অংশে। কেউ কারও মুখ দেখবে না। কিন্তু এ-ও তোমাদের আদর্শের মত একটা পাগলামী। এ রকম করে কত দিন থাকবে? শেষ অবধি মিল হয়ে যাবেই। লোক কথায় বলে, "দম্পত্যোঃ কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।"

প্রতিমা। এ কথা রজনী বাবু বলেছেন?

হরপ্রসাদ। তোমার কথাও আমরা ভেবেছি।

প্রতিমা। ধন্যবাদ! কিন্তু আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না তো?

হরপ্রসাদ। তুমি তো চিরকাল বিবাহ-বিরোধী। হওয়াও উচিত। বিবাহের ফল প্রায়ই বিষময় হয় জান তো?

প্রতিমা। আপনি যা বলতে চাইছেন বলে ফেলুন।

হরপ্রসাদ। তোমাদের বিবাহতে আমি আপত্তি করি। রজনী চিরকালই খামখেয়ালী। তাই ওর বাবা ওর জন্য একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে বাকী সমস্ত বিষয় মালবীকে দিয়ে গেছেন। আর মালবীর বাবা—সুনীলচন্দ্র সেনগুপ্ত আই, সি, এদের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। তিনি মৃত্যুকালে তাঁর অর্দ্ধেক সম্পত্তি মালবীকে দিয়ে গেছেন। রজনী যদি আবার বিবাহ করে তো তার আর্থিক অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক হবে না। তা'তে তার ভবিষ্যৎ পলিটিক্যাল কেরীয়ারে ক্ষতি হতে পারে।

প্রতিমা। এ পর্য্যন্ত বুঝলুম। তার পর—

হরপ্রসাদ। তোমার সঙ্গে একটা কমপ্রোমাইজ করে নিলে মন্দ হয় না। তুমি ওদের বাগান-বাড়ীতে রইলে—

প্রতিমা। ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন হরপ্রসাদ বাবু! এ হীন প্রস্তাব মুখে আনতে আপনার লজ্জা করল না? আপনারা নিজেদের সভ্য—কলচার্ড বলে গর্ব্ব করেন? ছিঃ ছিঃ! যদি আর কিছু বলবার না থাকে তো এইবার যেতে পারেন। আপনার কথা শোনবার আগ্রহ বা ধৈর্য্য আমার নেই।

হরপ্রসাদ। (উঠে দাঁড়িয়ে) রজনী আমায় ঠিকই বলেছিল—

প্রতিমা। কি বলেছিলেন?

হরপ্রসাদ। যে তুমি ওর জন্য কোন রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত নও।

প্রতিমা। (হরপ্রসাদের সামনে গিয়ে) তিনি এই হীন প্রস্তাব করেছেন? মিথ্যা কথা।

হরপ্রসাদ। তাই সে তোমাকে এ কথা বলতে বারণ করেছিল।

প্রতিমা। বারণ করেছিলেন, কারণ, আপনার চেয়ে তাঁর ভদ্রতা-জ্ঞান বেশী।

হরপ্রসাদ। আহা, চট কেন?

প্রতিমা। আপনার কথা হয়ত' সত্য। হয়ত' এ প্রেম চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু আজ আমার প্রতি তাঁর যা মনোভাব তাতে এ হীন প্রস্তাব করতে তিনি পারেন না।

(চিঠি হাতে রজনীর প্রবেশ)

রজনী। এই নিন চিঠি।

হরপ্রসাদ। (চিঠি পকেটে পূরে) তাহলে তুমি সত্যিই ওদের সঙ্গে দেখা করবে না।

রজনী। না।

হরপ্রসাদ। বেশ, তাহলে আমি চলি। (প্রস্থানোদ্যত)

প্রতিমা। একটু দাঁড়ান। (রজনীর প্রতি) রজনী বাবু!

রজনী। কি?

প্রতিমা। স্যার হরপ্রসাদ আমার সম্বন্ধে যে বন্দোবস্তের কথা বলেছেন—

রজনী। শুনেছি। আমার জ্যেঠতুত ভাইয়ের প্ল্যান—

প্রতিমা। আপনার স্ত্রীও নিশ্চয় অনুমোদন করেছেন?

রজনী। তাইত' মনে হচ্ছে।

প্রতিমা। আচ্ছা, আপনি যদি এখন ফিরে যান তাহ'লে পূর্ব্বেকার কেরীয়ার আবার চালাতে পারেন ত'?

রজনী। তা হয় ত' পারি। সকলে জানে, শরীর অসুস্থতার জন্য আমি বাইরে আছি।

প্রতিমা। আপনি ফিরে গেলে পারেন?

রজনী। তা পারি, কিন্তু ফিরব না।

প্রতিমা। ফেরবার কিন্তু এই সুযোগ। পরে অনুতাপ যখন আসবে তখন সময় হয়ত' থাকবে না।

রজনী। সে বিষ আমি নিতে প্রস্তুত।

প্রতিমা। খেয়ালের বশে কোনও কাজ করবেন না রজনী বাবু! আপনি না হয় একবার সকলের সঙ্গে দেখা করে আসুন, দূর থেকে মানুষ যে প্রতিজ্ঞা করে, কাছে গেলে অনেক সময় তা ভেসে যায়।

রজনী। তুমি আমায় কি করতে বলো?

প্রতিমা। ভাল ভাবে সব কথা শুনে মন স্থির করতে বলি।

[illegible]

রজনী। ৯টায়।

প্রতিমা। এখন ক'টা?

রজনী। সাড়ে আটটা।

প্রতিমা। এখনও সময় আছে, যান।

রজনী। গিয়ে কি কোনও লাভ আছে? আমি তোমাকে বিবাহ করব মনস্থ করেছি।

প্রতিমা। বিবাহ করতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না, কিন্তু পশ্চাত্তাপ করতে হয় সারা জীবন ধরে। আমরা উভয়েই ভুক্তভোগী, প্রণয়হীন পরিণয় নরকের চেয়েও ভীষণ। মনুষ্য-জীবনে সব চেয়ে বড় অভিশাপ। তাই আপনাকে মিনতি করছি, ভাল ভাবে অগ্র-পশ্চাৎ বিচার না করে এতে নামবেন না।

রজনী। বিচার আমি করেছি। তবে তুমি এখন বলছ আমি যাচ্ছি।

প্রতিমা। আর হরপ্রসাদ, আপনি রজনী বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। আপনাদের তূণের সব অস্ত্র প্রয়োগ করে দেখবেন, ওঁর বর্ম ভেদ করা যায় কি না।

(হরপ্রসাদ ও রজনী বেরিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় ব্যস্ত ভাবে অধ্যাপক ধীরেন মজুমদারের প্রবেশ)

ধীরেন। তপতী এখানে আছে?

রজনী। আছেন। আপনি বসুন, আমরা একটু বেরুচ্ছি।

[হরপ্রসাদ ও রজনীর প্রস্থান।

ধীরেন। আমার বসবার সময় নেই, আপনি শীঘ্র ওঁকে ডেকে দিন।

প্রতিমা। ডাকছি।

[প্রতিমার প্রস্থান।

(ধীরেন অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পরে প্রতিমা ও তপতীর প্রবেশ)

ধীরেন। ডাঃ সরকারের মুখে খবর পেলুম, তুমি এইখানে এসেছ।

তপতী। কারণটাও তিনি নিশ্চয় বলেছেন!

ধীরেন। হাঁ। প্রতিমা দেবী, এখন আপনি কেমন আছেন?

প্রতিমা। ভাল আছি। ধন্যবাদ।

ধীরেন। তাহ'লে তপতী, তুমি এবার বাড়ী চল।

তপতী। যাচ্ছি, প্রতিমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

প্রতিমা। আমাকে?

তপতী। হাঁ। কারণ, নারী হয়ে নারীর অধঃপতন আমি দেখতে পারব না।

প্রতিমা। অধঃপতন! তুমি কি বলছ তপতী?

তপতী। আমি ঠিকই বলছি। এ ভাবে তোমার থাকা আর উচিত হবে না।

প্রতিমা। আমাকে রজনী বাবু বিবাহ করতে চেয়েছেন।

তপতী। কারণ, তোমাকে পাবার ঐটেই সব চেয়ে সহজ উপায়। কাছে থেকেও তুমি তাঁর নাগালের বাইরে ছিলে। দুষ্প্রাপ্য বলেই তাঁর কাছে তোমার দাম। যেদিন সহজলভ্য হয়ে পড়বে, সেদিন কোন মূল্যই তোমার থাকবে না।

প্রতিমা। সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হবার কোনও কারণ দেখি না। আমরা এখন উভয় উভয়কেই চাই। আমার জীবনে এইটাই সব চেয়ে বড় শুভ মুহূর্ত।

তপতী। কামনা চরিতার্থের সুবিধাই এর উদ্দেশ্য। বিবাহ শুধু লোক-দেখানো একটা ভড়ং মাত্র। তুমি পাগল, তাই এই কথায় ভুলেছ। পাঁকের মধ্যে পা দিও না, ডুবে যাবে।

প্রতিমা। যাই, যাব। জীবনে এই প্রথম সুখের সন্ধান পেয়েছি, তুমি তাতে বাধা দিও না।

তপতী। অমৃত ভেবে যা পান করতে যাচ্ছ, তা হলাহল। "বিষকুম্ভ পয়োমুখম্।" উপরের দুগ্ধ দেখে তুমি ভুলেছ, ভেতরের বিষের সন্ধান তুমি রাখো না।

প্রতিমা। ঐ দুধের সন্ধানও ত' আগে আমায় কেউ দেয়নি। তাই আকণ্ঠ পান করতে গিয়ে যদি আমার জীবন তীব্র হলাহলের বিষে দগ্ধ হয়, কালিমায় ভরে উঠে, তাতেও আমি পেছ-পা হব না! তুমি যাও। আমায় বাঁচতে দাও, মরতে দাও।

ধীরেন। ওঁর জবাব ত শুনলে তপতী, এখন চল।

তপতী। ও উন্মাদ, নিজের ভাল-মন্দ নিজেই বুঝতে পারছে না। আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমি প্রকৃতিস্থ থেকেও ওকে বাধা দেব না, এ কি করে সম্ভব হতে পারে?

ধীরেন। যে নিদ্রিত তাকে জাগান যায়, কিন্তু যে জেগে নিদ্রার ভাণ করে, তাকে জাগান অসম্ভব। ওর জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?

তপতী। তার কারণ আমাদের উভয়ের জীবন একই রকম।

ধীরেন। কি বলছ তপতী?

তপতী। আমি ঠিকই বলছি। আমার জীবনের কথা কেউ জানে না। তোমাকে পর্য্যন্ত বলিনি পাছে তুমি কষ্ট পাও। আমার বিবাহের কয়েক সপ্তাহ মাত্র পরে আমি জানতে পারলুম যে আমার স্বামী মদ্যপ—লম্পট। হিন্দু-নারীর স্বামি-নিন্দা করতে নেই জানি, তবুও আজ আর সব কথা না বলে থাকতে পারছি না। মদ খেয়ে বারনারীদের নিয়ে আমার চোখের সামনে, আমারই শয়ন-কক্ষে সে যে কী নারকীয় অভিনয় করেছিলেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আপত্তি করাতে প্রহার পর্য্যন্ত করতে পেছ-পাও হননি। লিভার পচে গিয়ে তিনি মারা যান। তাঁর শরীরে কুৎসিত রোগ ঢুকেছিল। যখন জানতে পারলুম, তখন আমি অন্তঃসত্ত্বা, তাই আমার ছেলেও বাঁচল না। জন্মাবার পূর্ব্বেই রোগের বিষে তার দেহ জর্জ্জরিত হয়েছিল। প্রতিমার মত আমিও এক জনকে ভালবেসে ছিলুম, কিন্তু তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার শক্তি ভগবান আমায় দিয়েছিলেন। তিনিও আজ মৃত। আমার গোপন এ প্রেমের কথা জগতে কেউ জানে না—এক ইষ্টদেবতা ছাড়া। তাঁরই চরণে দেহ-মন অর্পণ করে আমি মনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন, প্রতিমাকেও রক্ষা করবেন।

প্রতিমা। ভগবান! আমি তাঁকে বিশ্বাস করি না। নইলে তাঁরই জগতে পুরুষ এবং নারীর নীতি-বিচারের মধ্যে এত পার্থক্য কেন?

তপতী। সে পার্থক্য ভগবানের সৃষ্টি নয়, মানুষের সৃষ্টি।

প্রতিমা। মানুষের নয়, পুরুষের সৃষ্টি। তাঁরা নিজেদের সুবিধা, সখটুকু বজায় রেখে সমাজের নিয়ম তৈরী করেছেন।

তপতী। নিয়ম যে সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য তা আমি বলছি না, কিন্তু এক জন পুরুষ খারাপ হলে যত ক্ষতি হয়, এক জন ভ্রষ্টা নারী তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করতে পারে। তারা মা, মায়ের আদর্শ বজায় না রাখলে সন্তান-সন্ততি কি করে সুস্থ, সবল, আদর্শবান্ হবে।

প্রতিমা। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বিবাহ করলে—

তপতী। বিধবার বিবাহ হয় না।

প্রতিমা। ও তোমাদের একটা পুরনো সংস্কার মাত্র। দেহের, মনের ক্ষুধা চেপে রাখাই কি নারীর একমাত্র লক্ষ্য?

তপতী। সকল ইচ্ছা পূর্ণ করা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র।

ধীরেন। বৃথা বাদানুবাদের কোনও প্রয়োজন দেখি না তপতী, উঁর যদি আসতে ইচ্ছা না হয়, তুমি জোর করে ওঁকে নিয়ে যাবে কেন?

তপতী। জোর আমি করব না, কারণ, সে অধিকার আমার নেই। প্রতিমা, তুমি আমার সঙ্গে চল। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য। রজনী বাবু ফিরে এলে ওঁর মনের অবস্থা কিরূপ থাকবে তা তোমার পরীক্ষা করে দেখা কর্ত্তব্য। এখানে থাকলে বিচার নির্ভুল হবে না। আশা করি, তোমার অমত নেই। যাবে?

প্রতিমা। চল।

[ধীরেন ও তৎপশ্চাতে প্রতিমার হাত ধরে তপতীর প্রস্থান।

[ক্রমশঃ

সিংভূম, ধলভূম ও মানভূম

—দেড়শ' বছর আগে

এরা ছিল প্রাচীন বাঙলার ঘাটবাল অঞ্চল
বাঙালীরা এদের শাসন পরিচালন করত
অধিবাসীদের মাতৃভাষা ছিল বাঙলা।

—পলাশীর পরাজয়ের পঁচাত্তর
বছরের মধ্যে

বাঙলার এই ঘাটবাল অঞ্চলে জেগেছিল বিদ্রোহ গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে। বঙ্গরক্ষীদের এই স্বাধীনতার সংগ্রাম দমন করেছিল ইংরেজ—বিহারী পল্টনের সাহায্যে। আর বাঙালীর এই বিদ্রোহের নাম দিয়েছিল চুয়াড় বিদ্রোহ।

তার পর বিপ্লবী ও বিদ্রোহী বাঙলা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য। তার পশ্চিম ও দক্ষিণের এই রক্ষী অঞ্চলগুলো বাঙলা ফিরে পেতে চায়।

ঘোষালদের বৈঠকখানা। দীনু অপেক্ষা করছে।…

একটা ভাঙা টিনের ঘর, পুরোন সুঁদরী কাঠের ঘুনে-ধরা খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে যেন শেষ নিশ্বাস ফেলছে। কতক্ষণে যে এ ধুঁকুনি শেষ হবে তার জন্তই যেন অপেক্ষা। আলমারীটায় ওপর শতাধিক বছরের পুরোন অপ্রয়োজনীয় কাগজ পত্র-দলীল-দাখিলা। তার ভিতর আরসোলা ও ইঁদুরের বাস। ইঁদুরগুলো যখন-তখন ছুটোছুটি হুটোহুটি করে। তখন আগন্তুক মানুষটিকে তারা হিসেবেই আনছে না।

একখানা ত্রিপদ চেয়ারের ওপর ভারসাম্য করে কোন প্রকারে বসে আছে দীনু। বসে বসে সে কেবলই বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরখানা আঁধার হয়ে এলো। সে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। ঘোষালেরা তিন ভাই গেল কোথায়? এমন সময় ছাড়া দিনের বেলা কোনও জটিল পরামর্শ করার অনেক বিঘ্ন। কেউ শুনতে পেলে তার কি যে ক্ষতি হবে একমাত্র সেই বোঝে।… ঘোষালদের দিয়ে আর যাই হোক, কোনও দিন কারুর আপদে-বিপদে উপকার হয়নি, বা হবে না। এমন মিথ্যা অপবাদ কেউ কখন দিতে পারে না তাদের নামে। বরঞ্চ এই সুখ্যাতিই তাদের আছে, যে জলে পড়ে, তাকে তারা আর একটু ঠেলে ধ'রে জল খাইয়ে ছাড়ে, আগুনে পড়লে আর একটু ভিতরের দিকে ঠেলে দেয়। পুরুষানুক্রমিক ধারা তারা শত গৃহ-বিবাদেও বজায় রেখেছে। এ সব কাজে তাদের একতার তুলনা কোন স্বাধীন দেশেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এটুকু দীনু জানত এবং ভাল করেই জানত বলে এ বিপদে তাদের শরণাপন্ন হ'য়েছে।

যখন তিনটি ভাই তিনটি হুঁকো এবং তিনটি লণ্ঠন নিয়ে এই এজমালী বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করল, তখন দীনু তার ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনটি শনিগ্রহকে অভিনন্দন জানায়। 'এসো এসো বাবাজীরা, ভাল তো সব।'

'এত দিন বাদে যে খুড়োর আবির্ভাব?' তার পর পৃথক পৃথক তিনখানা আসন গ্রহণ করে। প্রথম গ্রহটি জিজ্ঞাসা করে, অবশ্য খুব নীচু গলায়, 'ব্যাপার কি?'

'বহু দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, জানতে এলাম কেমন আছ। আর একটু—'

'কাজ আছে।' অপূর্ণ বাক্যটি পূর্ণ করে অপেক্ষাকৃত বয়োকনিষ্ঠ গ্রহটি। বাকী দু'টি হেসে ওঠে।

প্রথমটি মন্তব্য করে, 'খুড়ো না ঠেকলে কি এদিক্ মাড়ায়?'

'ঠেকা তেমন কিছু নয়, তবে কি জানো, বাবা তোমাদের বড্ড ভালবাসতেন। আমি সেই চোখেই তোমাদের দেখি; কিন্তু অবস্থা সঙ্গীন হ'লে কোন মায়াই দেখান যায় না, তাই সর্বদা খোঁজ-খবর নিতে পারিনে। তা বলে তোমরা বুদ্ধিমান, রাগ করবে কেন? এই দেখ-না, প্রয়োজনের সময় খুড়ো ঠিক হাজির।'

'এখন আসল কথাটা কি তাই বলুন।' দ্বিতীয়টি প্রশ্ন করে।

'আপদে-বিপদে চিরকাল তোমরা আমাকে পেয়েছ, আমিও তোমাদের ভরসা করি, তোমাদের সে ধর্মজ্ঞান এখনও লোপ পায়নি।' এবার দীনুর কণ্ঠস্বর রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়। 'ঐ যে সেনেরা না কি তালুক বেচছে, তা তোমরা নিশ্চয় জানো। তোমরা বনেদী ঘর, তোমরা যদি চেষ্টা-চরিত্তির করে না রাখো তবে কোন্ রাহুর গ্রাসে পড়তে হয় কে জানে! আমাদের শক্তিগড়ের সবাই একবাক্যে প্রার্থনা করছে যে, ঠাকুর যেন ঘোষাল বাবুদের সুমতি দেন—তাঁরাই যেন এ সম্পত্তিটা রাখে। মায় মুদী-জোলা-তাঁতি পর্য্যন্ত। সেই সংবাদটা জানাতেই আমার আসা।'

'কেন, তোমাদের ঘোষেরা তো রয়েছে পয়সাওয়ালা উঁচতি ঘর?'

'আরে দূর, দূর! তাদের কি এতে অধিকার আছে? ব্রাহ্মণের অধিকার শাস্ত্রে, বৈশ্যের অধিকার চাষে—ওরা এখনও নিতান্ত চাষা। এত যে পয়সা—এখনও বাড়ীতে একটা চাকর নেই। বাবু নিজ হাতে জাল বোনেন! গিন্নী নিজ হাতে গরু বাঁধেন! তোমরা তা কস্মিন্ কালে পারোনি বা পারবে না? সত্যি কি না?'

'ওদের মধ্যে কেউ একটা মামলা-মকর্দ্দমা বোঝে? জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করে আজ না হয় বড়টার একটু পদোন্নতি হয়েছে—তা বলে কি প্রজাপুঞ্জ শাসন করার ক্ষমতা আছে ওদের মধ্যে কারুর? এই দেখ না, বাবা গত হবার পরই নিতাই সরদার যেমন একটু অবাধ্য হয়ে এক সন খাজনা বন্ধ করেছে, অমনি তার বিষ-দাঁত কেমন করে সাঁড়াশি দিয়ে টেনে ধরেছি!' বলে সে প্রথম গ্রহটি তার আঙুলগুলো বেঁকিয়ে ভঙ্গিখানা দেখিয়ে দেয়।

'হাঃ হাঃ হাঃ!' ছোট দু'টি হেসে ওঠে।

'আমরা হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়েই চাই—তালুকটা তোমরা রাখো।'

তৃতীয় গ্রহটি চোখ দু'টো তার মিটমিট করছিল, বলে, 'দাদা, একখানা পোষ্ট-কার্ড ছেড়ে দাও না সেনেদের ঠিকানায়? কথাবার্ত্তাটা একটু পাকা-পোক্ত করে চালাও, তার পর দেখা যাবে। আজ রাত্রেই লেখা হ'ক চিঠি। পোষ্ট-কার্ড আছে দাদার কাছে?'

'না।'

'মেজদার তহবিলে?'

'উঁহু।'

'আমার কাছেও তো নেই।'

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

অর্থাৎ থাকলেও কেউ অনির্দিষ্ট একটা এজমালী কাজের জন্য দিতে রাজী নয়।

অবস্থার গুরুত্ব দীনু বুঝতে পারে। একটা হুঁকো এক জনের হাত থেকে টেনে নিয়ে বলে, 'কাল প্রত্যুষে আমিই নিয়ে আসব।'

তা হ'লে আর চিন্তা কি। তিন ভাই আশ্বস্ত হয়।

অনেকক্ষণ বাদে তামাকে টান দিয়ে দীনুর দম সামলাতে বেশ একটু সময় লাগে। 'তামাকটা তো বেশ!...নিতাই না কি সহরে গেছে—অর্থ সাহায্য করছে বিপ্রপদ।'

প্রথম গ্রহটি প্রমাদ গণে, অপর দু'টি এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

প্রথমটি তবু আস্ফালন করে, 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। আচ্ছা, দেখা যাবে।'

দ্বিতীয়টি মন্তব্য করে, 'কাঁচা পয়সার ঝন্-ঝনি ক'দিন? ও-রকম কত দেখেছি। কত চন্দ্র-সূর্য দেখলাম—ও তো কেরোসিনের ডিবা, এক ফুঁতেই ব্যস!'

তৃতীয়টি একটা অসভ্য মুখভঙ্গী করে।

'বিপ্রপদর স্ত্রীকে নিতাই মা ডেকেছে। এখন টাকার জন্য ও আর পিছু হটবে না।'

'এত টাকার দেমাক। টাকা না হয় চলল, বুদ্ধি দেবে কে? বুদ্ধি...ও-পাড়ে ঐ শক্তিগড়ে কোন দিন জন্মায়নি, বুদ্ধির ব্যাপারী আমরা, কি বলো দাদা?'

বড়টি হাসে না মুখ ভেঙ্‌চায়, বোঝা যায় না।

'আস্ফালনে লাভ কি বাবাজীরা—ফলেন পরিচয়। আচ্ছা, তা হ'লে উঠি, রাত অনেক হলো। কিন্তু যাবো কি করে? যে অন্ধকার! কোনও আলোর একটু—'

কথাটা কানে যেতেই তিন ভাই তিনটি লণ্ঠন স্তিমিত করে বাড়ীর ভিতর চলে যায়। কিন্তু যাওয়ার সময় দীনুকে প্রণাম করার সৌজন্যটা তারা ভোলে না।

দীনু অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে।

পথ চলতে চলতে ভাবে: বুদ্ধির ব্যাপারী কোথায়? পাইক-পাড়ায় না শক্তিগড়ে?...এরা নিতান্ত স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর। এদের অর্থের সম্বলও অতি অপ্রচুর। এদের ব্যবহার অতি ঘৃণিত। কিন্তু এদের শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে আপাততঃ তাকেই যুদ্ধ করতে হবে। অন্তরাল থেকে নিক্ষেপ করতে হবে বাণ। আবার বিপ্রপদকেও হাতে রাখতে হবে। তাকেও লেলিয়ে দিতে হবে, আশা দিতে হবে—দিতে হবে উৎসাহ। বর্দ্ধিষ্ণুর যদি প্রতিপক্ষ না থাকে তবে গ্রাম্য সাধারণ বাঁচবে কি করে? বিশেষতঃ দীনুর মত যারা। তাদের আসন উঁচুতে রাখতে হলে এই একমাত্র পথ। দীনু পরিশ্রম করতে পারে না, টাকা-পয়সা ক্ষেত-খামারও তার নেই। তাকেও তো বাঁচতে হবে? তারও তো সমাদর চাই? মানুষ হয়ে জন্মেছে সে, গরীব বলে কি তার উচ্চাকাংখা, উচ্চাভিলাষ থাকবে না? যত দিন তার বাবা বেঁচে ছিল, সেও এই ভাবেই চলে গেছে—কত ভেদনীতি চালিয়ে গেছে ঘরে-ঘরে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে। দীনু বেশী কিছু আশা করে না—শুধু যোগ্য পুত্রের মত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যেতে চায়। শ্রীভগবান যেন তার দিকে মুখ তুলে চান। সে মনে মনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে।...তাকে বহুরূপী হতে হবে। জীবন-সংগ্রামে সকলের নীতি এক হলে চলবে কি করে? মানুষে চাষ করে বলদ দিয়ে, সে চাষ করবে মানুষ দিয়ে। তার ক্ষেত্র তাকেই তৈরী করে ফসল বুনতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে।

পরদিন সময় মতই দীনু পোষ্ট-কার্ড নিয়ে উপস্থিত হয়।

বহু গবেষণার পর একটা মুসাবিদা স্থির হয়। মহা উৎসাহে তা মেজো ঘোষাল সাজিয়ে ফেলে পোষ্ট-কার্ডের অংগ ভরে—সারে সারে। পোষ্ট-কার্ডখানা লেখা হলে সে নানা সুরে নানা ছন্দে বাকী ক'টি পরশ্রীকাতর জীবকে পড়ে শোনায়। তারা এমন করে কান পেতে শোনে, যেন মনে হয় কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের গুহ্য ব্যাখ্যা শুনছে।...

একটা তরকারীর ডালা মাথায় নিয়ে সেই সময় যাচ্ছিল নিতাই সদরের হাটে। বৈঠকখানার পাশ দিয়েই পথ।

'কি হে, তুমি না কি মামলায় জবাব দিয়েছ?'

'সময় মত সবই জানতে পারবেন, আমি তো আর অন্যায় করিনি বড় বাবু—আইন-আদালতের আশ্রয় নিয়েছি।'

'তবে অন্যায় বুঝি আমাদের? বেশ কথা তো শিখেছ তুমি?'

'আপনারাই তো গুরুমশাই, আমরা আপনাদের ছাত্তর।'

কনিষ্ঠ ঘোষাল বলে, 'গুরুমশাই দেখেছ, কিন্তু তার বেত দেখনি।'

'এত কড়া কথা বলবেন না কর্তা, তা হলে হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে দেবো।'

এখানেও একটু টীকার প্রয়োজন।—

ছোট ঘোষালের একটি রক্ষিতা আছে। ছোট ঘোষাল তাকে না কি গোপনেই রক্ষণাবেক্ষণ করে। বেহায়া নিতাই এতগুলো গুরুজনের সুমুখে সেই কথারই ইংগিত দিল! এমন আস্পর্দ্ধা একটা সামান্য প্রজার! ছোট গ্রহটা রাগে গর্ গর্ করতে থাকে। কিন্তু সে আর নিতাইকে ঘাঁটায় না। বলা তো যায় না, বেহায়া কিসে কি বলে বসে!

ভাইএর পরাজয়,—বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভাইএর! বড় ঘোষালের ক্ষণিকের জন্য মতিভ্রম ঘটে। সে মুক্তকচ্ছ হয়ে পায়ের খড়ম হাতে নিয়ে ছুটে যায়। 'তবে রে শালা—'

দীনুর মনে মনে আনন্দ হয়, কিন্তু মুখে বলে, 'আহা হা, করো কি, করো কি? একেবারে জ্ঞান হারিয়েছ।' সে হস্তক্ষেপ করে থামায় না।

'দাঁড়া, তোকে আজই শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি—কাকের ওপর আবার কামান দাগার কি!' এবার ছুটে যায় প্রবীণ উকিল মেজ ঘোষাল। বিদ্বান্ মানুষ—বিক্রমের টাল সামলাতে না পেরে গিয়ে পড়ে নিতাইএর ওপর হুড়মুড় করে।

দীনু অস্থির হয়ে বলে, 'তোমরা আজ ক্ষেপে গেলে সব?'

'কি, এত দূর! নিজের দোরগোড়ায় পেয়ে—' আর কিছু নিতাই বলে না। সে বলিষ্ঠ বাজের মত দু'টো গ্রহকে দু'হাতে ধরে কক্ষচ্যুত ক'রে ধুলায় অবলুণ্ঠিত করে দেয়। অতিরিক্ত কিছু করে না—কারণ, প্রভুদের স্বাস্থ্য ভংগ হতে পারে। কিন্তু ওতেই কাজ হয়।...

ডালা মাথায় নিয়ে নিতাই চলে যায়। প্রভুদের জন্য যেটুকু পরিশ্রম সে করল, তাতে তার এতটুকুও নিশ্বাস দোলে না।

'শালার নামে একটা ফৌজদারী করতেই হবে।' বড় ঘোষাল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'শালাকে শিক্ষা দিতেই হবে।'

'কিন্তু মিথ্যে মামলা প্রমাণ হ'লে কি হবে দাদা? বড্ড ভুল করেছ নিজের বাড়ীর দরজায় বসে ওকে অপমান করে। মিথ্যা মামলার ফল ২১১—ভাল প্রমাণ হলে জেল। সে বার নবীন মণ্ডল—'

মেজো ঘোষাল মন্তব্য করে, 'তুই আর আইন শেখাস নে বড়দাকে।'

বড়টি জিজ্ঞাসা করে, 'তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে ছোট?'

'আমি আলমারীটার পিছনে ছিলাম। সবাই এক সাথে মার খেয়ে আসামী হলে তদ্বির করে কে? আর তা ছাড়া আমার তো শরীরটাও বিশেষ ভাল না। সেই লিভারের ব্যথাটা—'

'মূর্খ।'

দীনু পথে পথে অবৈজ্ঞানিক প্রচার সচিবের কাজ করে।

দেশময় টি টি পড়ে যায়: কি চাও, নিতাই সরদার ঘোষালদের মেরেছে! খুন-জখমও হয়েছে না কি কে জানে! আরো অনেক কিছু।

বিপ্রপদর নেপথ্যে যা ঘটে ঘটুক, তিনি নিজের সংসারের প্রতি দৃষ্টি দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করেন না।

স্ত্রী কমলকামিনী তাঁর ন'টি সন্তানের শুধু জননী নন, সহধর্ম্মিণীও বটে। তাঁরও স্বাস্থ্য অটুট। কেউ তাঁকে দেখলে ব'লতে পারে না যে, তাঁর গর্ভে এতগুলো সন্তান জন্মেছে, এতগুলো শিশুর দৌরাত্ম্য গেছে তাঁর বুকের ওপর দিয়ে। দেহের মাংসপেশী এতটুকুও শিথিল হয়নি, অসংলগ্ন হয়নি স্তনভার। বরঞ্চ মানিয়েছে বেশ সুন্দর। মাতৃত্বের রস-ধারায় তাঁর মুখখানা স্নিগ্ধ গম্ভীর। এ রূপ সাধারণের কাছে কামনার অতীত। কিন্তু সময় সময় বিপ্রপদকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। কখন কখন মন্থরগামিনী গৃহস্বামিনীর গতিবেগ তাঁকে বিভোর করে দেয়।···পুরোনকে নতুন ক'রে পাওয়ার আকাংখা জন্মে। তিনি এগিয়ে যান। গিয়ে, অকারণে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাল আছ তো?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন;' হেসে উত্তর দিয়ে একটু কটাক্ষ নিক্ষেপ করে কমলকামিনী চলে যান—আবার হয়ত ঐ পথেই ফেরেন।

'চলো, আজ একটু ক্ষেতের কাজ করি। বর্ষা এখন হবেই, ডেঁড়ো ক্ষেতটা কুপিয়ে রাখ্‌লে দানা ফেলতে সুবিধা হ'তো।'

'তাই চলো, যাবো—এই কলসীটা একটু রেখে আসি।'

কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা দু'টিতে একত্র হতে চান, একান্ত একান্তে। ফাল্গুনের তপ্ত শ্বাসে বিপ্রপদর হৃদয় যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিঃশেষপ্রায় রক্তিন শিমুল ফুলগুলোর দিকে আজ তাঁর নজর পড়ে। ওগুলো দেখতে বেশ লাগে—যেন তাঁর কমলেরই মত।

কমলকামিনী দু'খানা কোদাল নিয়ে আসেন। একখানা বিপ্রপদকে দেন।

'ওখানাও দেও, ক্ষেতে গিয়ে নিও।'

'কেন?'

'তোমার কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হবে কোদাল নিতে, আর কোপাতে?'

'তোমার কুপিয়ে কাজ নেই, আজ বসে বসে শুধু ঢিল ভেঙো।'

বিপ্রপদর কণ্ঠস্বরে কি যেন কমল টের পান। নীরবে কোদালখানা তাঁর হাতে দেন। অপেক্ষাকৃত একটা হাল্কা যন্ত্র তুলে নেন। প্রথম যৌবনের কয়েকটি কথা তাঁর স্মৃতিপথে ফুটে ওঠে। কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত বিপ্রপদ বিশ্রাম করতে সময় সময় পুকুর-ঘাটে গিয়ে বসতেন। তিনিও এ-টা ও-টা ছুতো করে কেবলই পুকুর-ঘাটে আসতেন-যেতেন। অল্প বয়সের কথা! জল ছড়িয়ে কাজ করতেন! দু'এক দিন এত দেরী হয়ে যেত যে সত্যি সত্যি রান্নাঘর থেকে ডাক পড়ত। কি যেন সব কথা, এখন ছাই মনে হয় না, অর্দ্ধপথে অসমাপ্তই থেকে যেত।··· সেদিনের চাহনি আজ যেন বিপ্রপদর চোখে জ্বলে উঠেছে। বলছে: তুমি আর আমি, আমি আর তুমি।

ক্ষেতটা বেশী দূর না। 'জুতের' ঘরের পাশেই ঢেঁকি-ঘর—তার সুমুখে উত্তর-দক্ষিণ দীঘলি। ক্ষেতের এক পাশে গোয়াল। অপর দিকে ছায়া স্যাঁত-সেঁতে স্থানটায় পানের 'বর'। বাঁশের কাঠিগুলো দিয়ে সুন্দর একটা ঘর তৈরী করে সারি-সারি রোয়া হয়েছে পানের লতা। ওপরে পাতলা পাতলা ছাউনি—মৃদু আলো, মৃদু উত্তাপে ওরা ডগা মেলেছে। ঘরের মধ্যে একটাও বাজে ঘাস-লতা-পাতা নেই। অন্য কোনও কৃষিও নেই। শুধু কাঠি বেয়ে অজস্র পানের লতা উঠেছে ওপরের দিকে। ঘরের বাইরে চার দিক্ ঘিরে ওরা ইচ্ছা মত বেগুন কিম্বা লঙ্কা গাছ লাগায়। কমল-কামিনীও নানা রকম লঙ্কা গাছ পুঁতেছেন। ওগুলো বছর ভরে বাঁচে, বছর ভরে ফসল দেয়। বেগুন গাছও বেছে বেছে রোয়া হয়েছে—সবুজ বেগুনী সাদা তাদের ফল।

বিপ্রপদ কুপিয়ে চলেছেন—আর ঢিলগুলো ভাঙছেন কমল-কামিনী। ঈষৎ সরস মাটির চাপড়াগুলো এক আঘাতেই ফাগের মত গুঁড়ো হয়ে যায়। শক্তগুলো একেবারে লোহার মত কঠিন। তা মুগুরের ঘায় গুঁড়ো হয় না। সেগুলো ঠেলে রাখেন তিনি জল দিয়ে ভিজিয়ে, তার পর গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে। এ দেশের মাটি একেবারে দোয়াঁশ নয়—এঁটেলীর ভাগটাই একটু বেশী। তাই সরসটা যত নরম, নিরসটা তত কঠিন। তবু উর্ব্বর! একটু-খানি জলের স্পর্শে এর ভিতর জাগে নব চেতনা। মাখনের মত কমনীয়তা আসে এর অংগে। ক্ষুদ্রতম বীজটি পর্য্যন্ত নব জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে হেসে ওঠে। নদী-মাতৃক বাংলার এ মাটি। এ মাটির জন্য কত কাব্য, কত পল্লী-গীতি, কত ইতিহাস যে রচিত হয়েছে তা বিপ্রপদ ও কমলকামিনী জানেন না। তবু ভালবাসেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েরাও ভালবাসে—ভালবাসবে অনাগত বংশধরেরাও। হয়ত তারা এ মাটির জন্য রক্ত দিতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না। সর্বকালের সর্বদেশের ইতিবৃত্তের সাথে জড়িয়ে আছে এ মৃত্তিকার রহস্য!

'মা, তোমরা আজ আমাদের ফেলে এসেছ? আমরা যে খুঁজে খুঁজে হয়রান—মা আর বাবা গেল কোথায়?' চপলা কাঁদো লেগে যায়।

'বিমলা, এদিকে আয় মা। আমি আর তুই দু'জনে মিলে এই চাকাগুলো গুঁড়ো করি।'

'বাবা এতখানি কুপিয়েছে আর তুমি এতটুকু গুঁড়িয়েছ?'

'এখন তো আমার বয়স হয়েছে।'

কথাটা বিপ্রপদর ভাল লাগে না।

'আমি কি তোমার চেয়েও ছোট—এই দেখ না, কতখানি কুপিয়েছি?'

'তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার কথা কি।'

'মা, তোমার আর কাজ করতে হবে না, তুমি একটু বসো—বড্ড শ্রান্ত মনে হচ্ছে তোমাকে।' শ্যামলাও এসেছিল—মা'র হাত থেকে মুগুরটা কেড়ে নেয়।

'তোমাল কথা কি?' বলতে বলতে টলতে টলতে চার বছরের মেয়ে সেবাও এসে হাজির। ওর চলন দেখে সকলে হেসে অস্থির। বিপ্রপদও।

'বড় নলম মাতি।'

আবার সকলে সস্নেহে হাসে।

সেবা উৎফুল্ল হয়ে মাটির উপর গড়াগড়ি দেয় আর হাসে।

কমলকামিনী তাকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কি মাটি সেবা?'

'নলম মাতি—ভাল মাতি।'

'এখানে কি হবে মা?'

'ছাক্ হবে বুঁইচ হবে।' অর্থাৎ মরিচ।

বিপ্রপদ মন্তব্য করেন, 'রোজ রোজ ক্ষেতে এসে সেবাও কৃষি-তত্ত্ব শিখেছে। তোকে বেটি চাষার ঘরে বিয়ে দেবো—শুয়ে চাঁদ, বসে চাঁদ দেখবি।'

'চাষার ঘরের মেয়ে আমার চাষার হবে বৌ। টুকটুকে রাঙা।' সুর করে বলে কমলকামিনী, বিপ্রপদর দিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে-টিপে হাসেন।

বিপ্রপদও ইংগিতটা বুঝতে পেরে সোজা হয়ে একটু দাঁড়িয়ে হাসেন।

'এই, অত মাটি মাখে না সেবা, অসুখ করবে।'

'কলবে না অসুখ।'

মা ধরতে যায়, মেয়ে ছুটে পালায়।

'এই দাঁড়া, মারব কিন্তু।'

'মাললে ছোনা পাবে কই?'

মা ধরতে গেলেই আবার মেয়ে ছুটে পালায়। 'শোন তোমার মেয়ের কথা, শোন একবার।' বলতে বলতে তিনি সেবাকে একটু এগিয়ে ধরে ফেলেন। ধরে গালে গাল লাগিয়ে বিপ্রপদর দিকে চেয়ে থাকেন। দু'জনের মুখেই বিন্দু বিন্দু ঘাম—শ্রমে আরক্ত।

বিপ্রপদ কোদাল চালান বন্ধ করে মা ও মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। চার দিকে কাজ চলেছে—অবিরাম কাজ। কেউ জল আনে, কেউ ঢালে, কেউ বা গুঁড়িয়ে ফেলছে মাটি। যে যার অংশ পূর্ণ করতে ব্যস্ত। একটি লোককে কেন্দ্র করেই নিত্য-নিয়ত এই কাজের চাকা ঘুরে চলেছে। তাকে ঘিরেই যত বিস্ময়ের সৃষ্টি! সে-ই এ সংসারের গৃহিণী, ঘরণী, জননী!

একটা পায়রার মত কোথা থেকে যেন অমরেশ ছুটে এসে ডিগবাজী খেতে খেতে শ্যামলার কোদালের কাছে গিয়ে পড়ে। 'আরে থাম থাম, কেটে-ফুটে যাবে।'

অমরেশ বারণ মানে না।

'থাম, থাম, দস্যি ছেলে, যদি হাত-পায় চোট লাগে? কাজ করতে দে।' মা'র শাসনও বৃথা হয়।

বিপ্রপদ একটু চোখ রাঙান—এবার অমরেশ স্থির হয়।

'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! এবার বড্ড থামলি যে?'

'কি, আমাকে কুকুর বললি?' অমরেশ চপলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'জনে একটা খণ্ড যুদ্ধ বেধে যায়। অমরেশ চপলার শাড়ী ধরে টানে—হাত-পা কামড়ে দেবে।

মা, মা, দেখ অমরেশের কাণ্ডখানা। ও ওর কাপড়-চোপড় খুলে ফেলবে—সেমিজ-সায়া ছিঁড়ে ফেলবে।' বিমলা বলে।

চপলাও কম না। সে আত্মরক্ষা করে চলে, নালিশও করে—ফাঁকে ফাঁকে দু'-একটা কিল-চড়ও মারে।

'বড্ড বাড় বেড়েছে তোমার। আর দিদিদের সাথে লাগবে?' বিপ্রপদ কানে ধরে অমরেশকে টেনে আনেন।

সেবা বলে, 'আর কলবি দাদা? বাবু মাব্বে।'

জবাবে অমরেশ একটা মুখভংগি করে।

'দেখ মা, দাদা মালে।'

'তোকে মারলাম কখন? মিথ্যাবাদী মেয়ে!' অমরেশ সেবাকে কোলে নিতে যায়, সেবা ছুটে মা'র আশ্রয় নেয়। অমরেশ একটা চুমো খাবে, সেবা তাতে রাজী না।

সন্ধ্যার আবছায়া গাঢ় হয়ে আসে, পাখীদের কলরব থেমে যায়। চার দিকের গাছ-পালাও যেন সারা দিনের ব্যস্ততার পর বিশ্রাম নেবে। সুপারি বাগানের পূর্ব দিকের তুচ্ছলের ঘন লতাগুলোর ওপর দিয়ে ফাল্গুনের চাঁদ উঁকি মারে। জ্যোৎস্না উছলে পড়ে, এখনই ভাসিয়ে দেবে সব। ধরণী আজ রূপোর আঁচল গায় দিয়েছে। ক্ষেতের এক কোণে একটা হাসনাহানা তার উগ্র গন্ধ বাতাসে মিশিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে!

বিপ্রপদ ফলে-ভরা টমেটো গাছগুলোর শাখা-প্রশাখা আলের ওপর তুলে গুছিয়ে রাখেন। ফলের ভারে ওরা আজ পরিপূর্ণ—ঠিক তাঁর কমলের মত। নরম, নধর পাতাগুলোর ছোঁয়া বড় সুখপ্রদ! বড় সুকোমল! বিপ্রপদ থামেন না।

ছেলে-মেয়েরা যে যার কাজ শেষ ক'রে পুকুর-ঘাটে হাত-পা ধুতে চলে যায়। সেবাও তাদের সাথী হয়।

গোয়ালের দুয়ারে ধবলী ও কালী তাদের বাছুর নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কমলকামিনী তাদের গলায় দড়ি পরিয়ে দেন। বাছুর দু'টোকে একটু দুধ খাইয়ে খোপে রাখতে হবে। রাত্রের খাবার দিতে হবে গরু দু'টোকে তিনি রান্নাঘর থেকে ফ্যানের বালতি। মাচার ওপর থেকে খোল-ভুষি এনে গরু দু'টোর কাছে রাখেন। ওরা এক নিশ্বাসে খেয়ে অবশিষ্টটুকু লেহন করতে থাকে। কমল-কামিনীর হাতেও দু'-একটা চাটা মারে। তিনি ওদের দেহে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলেন, 'আজ আর ডেকো না—এখন ঘুমোও।' ধবলীর পেটের ওপর হাত পড়তেই তিনি বিপ্রপদকে ডেকে এদিকে আসতে বলেন। 'একটা মজা দেখে যাও। রাত হয়েছে, এখন গাছ-গাছালী নাড়া বন্ধ রাখো। কাল সকালে আবার যা হয় ক'রো।'

'তাই তো, রাত অনেক হয়েছে। তুমি এখনও পা ধুতে যাওনি?'

'বেশ, এক যাত্রায় দুই ফল? এক সাথেই যাব'খন। একটি বার এদিকে এসো না!'

বিপ্রপদ উঠে আসেন।

'এই দেখ, ধবলীর পেটে কেমন বাছুরটা নড়ছে—আর দু'-চার দিনের মধ্যেই বেরোবে। এবার বাচ্চাটা বকনা হলেই বাঁচি। দেখ হাত দিয়ে, কেমন নড়ছে!'

কি মসৃণ লোমগুলো! বিপ্রপদ হাত দিয়ে অনাগত গো-শিশুর নর্তন-অনুভব করেন। বড্ড তুষ্ট হবে, তোমার প্রতি মা-ষষ্ঠীর যেমন কৃপা আমার গোয়ালের প্রতিও তেমনি। তিনি একটু হাসেন।

উত্তরে কমলকামিনী একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করেন।

'এবার গা ধুতে চলো। তোমার আর কত দেরী?'

'না, বেশী দেরী নেই। তোমার কালীরও তো দুধ কমে গেছে, বাছুরটাকে দুধ দিতে চায় না। এবার একটা ভাল ষাঁড় দেখাতে হবে। আগে থেকে ব্যবস্থা করো। গতবার যে অসুবিধা হয়েছিল! ও-কাজ কি মেয়েমানুষের সাজে? তখন ঠাকুরপোরাও কেউ বাড়ী নেই—একে ডাকো ওকে ডাকো, কেউ স্বীকার করে না! বাপ রে, কি ঝামেলা!'

'হুঁ।'

গোয়ালের ঝাঁপ টেনে দিয়ে কমলকামিনী বলেন, 'এবার চলো। তুমি পুকুর-ঘাটের দিকে এগোও, আমি কাপড়-গামছা নিয়ে আসি।'

আর দু'-তিন বছরের মধ্যেই বিপ্রপদর গোয়ালখানা ভরে যাবে। হয়ত ওটা বড়ও করতে হবে। সাদা-কালো-খয়রা-মেটে কত রঙের গো-শাবক! এটা ছুটছে এদিকে, ওটা ছুটছে ওদিকে! কোনোটার দৃষ্টি চঞ্চল, কোনোটার চাহনি স্নিগ্ধ। এদের দৌরাত্ম্য একার পক্ষে সহ্য করা নিতান্ত অসম্ভব! একটা ছোট ছেলে খুঁজে-পেতে আনতেই হবে এক দিক্ থেকে। রাখাল না হলে গরুর পাল কি সামলান যায়? এখন মেয়েরা সাহায্য করে তাই কমলকামিনীর তেমন কষ্ট হয় না—ক্রমে ক্রমে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবে।

ঘরে-বাইরে সমান বাড়-বাড়ন্ত! যেন বিপ্রপদর দিকে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চেয়ে রয়েছে। তিনি আসমুদ্র মন্থন করে আহরণ করে আনছেন এদের জন্ম আহার্য। মনে মনে তাঁর গর্ব বোধ হয়।···কিন্তু কমলকামিনী যে এখনও আসছেন না!

'ঘাটে বসে ভাবছ কি?'

'ভাবছি তোমার কথা। এত দেরী যে?'

'কি দিয়ে ঠাকুরের বৈকালী দিতে হবে বলে এলাম।'

'আর আমারটা?'

দেবালয়ে শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি থেমে যায়। ধীরে-ধীরে ওঁরা জলে নামেন। প্রাণ ভরে স্নান করেন। দমকা হাওয়া আসে—একটা উগ্র গন্ধ মিশিয়ে নিয়ে। ছড়িয়ে দিয়ে যায় ঘাট-পাড়ে।

'কি, জবাব দিলে না যে?'

টুকরা হাসির মত জ্যোৎস্না কাঁপছে জলে। কমলকামিনী অসংবৃত বসন শাসন করে গুছিয়ে নিতে নিতে মিষ্টি মাখিয়ে চাপা-গলায় জবাব দেন, 'লংকা যত পাকে তত বুঝি ঝাল বাড়ে?'

আজ এই সিক্ত-বস্ত্রা রমণীকে চাঁদের আলোতে বিপ্রপদর পূর্ণ যুবতী বলে ভ্রম হয়। তাঁর চঞ্চল মরু-তৃষা ওঁকে আকণ্ঠ পান করতে চায়? পুরোন ছন্দ যেন নতুন ঝংকারে বেজে ওঠে। ওর রহস্যময়ী নারী! যুগে যুগে এমনি করেই বুঝি উন্মাদ করেছে তাঁকে!

'মা, মা, তোমার কি এখনও গা ধোয়া হলো না, সেবা যে থাকতে চায় না। ও দুধ খাবে, ঘুমোবে।' বিমলার কণ্ঠ শোনা যায়।

'আসি মা, এই তো আমার হয়ে গেছে। শুনছ, এখন আর দেরী করো না—বেশীক্ষণ জলে থেকো না। উঠে বাড়ীর ভিতর এসো, রান্নাও বোধ হয় হয়ে এলো।'

বিপ্রপদ হুঁ-না কিছুই বলেন না।

কমলকামিনীর সে উদ্দামতা কোথায় গেল? যৌবনের প্রথম চঞ্চলতা যা-ও ছিল, তা-ও আজ আর এতটুকু বুঝি অবশিষ্ট নেই। সে সকলি মন্থর হয়ে মিলিয়ে গেছে। বুঝি বা বিপ্রপদর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। আজ তিনি সেবার জন্ম যতখানি ব্যস্ত, তার ক্রন্দনে যতটুকু সাড়া দেন, তার ভগ্নাংশের একাংশও তো দেন না বিপ্রপদর জন্য! সেবা একটু উসখুস্ করে উঠলেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, অমনি পাশ ফিরে দুধ দেন, কিন্তু কত দিন বিপ্রপদ ডেকে দেখেছেন, কমলকামিনী ঘুমে অচেতন থাকেন।···মনে মনে তাঁর একটা গ্লানি বোধ হয়। প্রচ্ছন্ন হিংসাও যেন উঁকি মারে।··· অবশেষে বিষাদে মনটা পূর্ণ হয়ে যায়। কি যেন হারিয়ে গেছে তাঁর—কি অমূল্য রত্ন যেন তিনি আর খুঁজে পাবেন না এ-জীবনে।

এক খণ্ড লঘু মেঘ ক্ষণিকের জন্ম চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। ক্ষণিকের জন্য পুকুরের জল কালো হয়ে আসে।···তার পর আবার জ্যোৎস্না!

তিনি একটা এতটুকু মেয়ের সাথে হিংসা করছেন! আবার সে তাঁরই মেয়ে, ছিঃ ছিঃ! একটা অবোধ বালিকার সাথে প্রতিযোগিতা! কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওকে ডেকে ডেকে তিনি কতই না আবোল-তাবোল আদর-আলাপ করেন। এ সকলিই কি অর্থহীন—শুধু মাত্র ভাবাবেগ?

ঘরে গিয়ে বিপ্রপদ দেখেন যেন একটা সরাইখানার হট্টগোল চলেছে।

ছেলে-মেয়েগুলো সবে মাত্র খেয়ে উঠেছে। বৌরা হাত পর্যন্ত ধুতে পারেনি, এর মধ্যে ক্রন্দন, আবদার, অর্থহীন ক্রোধ আরম্ভ হয়ে গেছে।

'গামছা, গামছা? কোথায় আমার গামছা? কে নিল?' অমরেশ উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামলা ডেকে বলে, 'এই নে তোর গামছা—উড়ো চোখে খুঁজবি. পাবি কি করে? শুধু হৈ হৈ।'

'তুই মুখ মুছলি কেন? আমার লাগবে না লাগবে না রাক্ষুসী।'

'দেখ ছেলের কথাবার্তা। আচ্ছা, মা আসুক আগে দেখাচ্ছি তোকে মজা! দিন-দিন তোর বড্ড বাড় বাড়ছে—এত বড় খোকা, ঘুমে ঢুলে পড়ছেন এখনি!'

এর মধ্যে কমলকামিনী এসে পড়েন, তার কাছে বিমলা সখেদে আর্জি পেশ করে। কিন্তু কিছু ছাই কি শোনবার জো আছে! বিনু মরা-কান্না জুড়ে দেয়।

'ও মেজবৌ, ওটাকে এসে ধর—ওটা মরল যে।'

'মরুক, আর আমি পারি নে—ওদিকে ভাসুর-ঠাকুর বসে আছেন।'

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, ওটাকে তুই একটু থামা।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি এসো দিদি—বিড়ালগুলোও ঘুরছে, আবার কিসে মুখ দেয়।'

রান্নাঘরে যাওয়ার পথে কমলকামিনীর আবার আঁচলে টান পড়ে। ছোট ননদের মেয়েটা বলে, 'আমি মা'র কাছে যাবো।'

'চল। তুই বুঝি খাসনি, ঘুমিয়েছিলি?'

'হুঁ।'

'চল—আর কাঁদে না। তোর ভাগেরটা কেউ খায়নি অভাগী। বড় মাছের ছোট মুড়োটা তোকে দেব'খন। কাঁদে না আর।'

মেয়েটা ঠাণ্ডা হয়ে কমলকামিনীর কোলে চড়ে।

তিন ভাই পাশাপাশি খেতে বসেছে। পরিবেশন করছেন কমলকামিনী। বড় বড় কাঁটাল-কাঠের পিঁড়ি। বড় বড় কাঁসার থালা। ক্ষেতের ধানের সরু চাল, ভুর-ভুর করে গন্ধ বের হচ্ছে ভাতের। পুকুর থেকে বড় একটা মাছ আজ ধরা হয়েছিল। তার ঝোল, মুড়িঘণ্ট আরো কত কি! ঘরেই ঘি তৈরী হয়—একেবারে টাটকা সুগন্ধি। সর্বশেষে গাঢ় খাঁটি। আজ আবার শুধু দুধই নয়, মিষ্টান্নও আছে। যে যার মর্জি-মত খাবে—বাড়ীর কামলা-মজুর পর্য্যন্ত।

'বৌ'ঠান, আজ কতখানি খেজুর রস নেমেছে?' শিবপদ জিজ্ঞাসা করে।

'দশ-বার কলসী।'

'তাই বুঝি মিষ্টান্ন রেঁধেছ। রোজ আমি নজর দিতে সময় পাই নে—তা হলে আরো বেশী পাওয়া যায়।'

দেবপদ বলে, 'দাদা, কাল না কি নিতাই সরদার ঘোষালদের আচ্ছা করে ঠেঙিয়েছে!'

'কেন মেরেছে? এ তো ভারী অন্যায়!'

'কে বললে অন্যায়? অন্যায় ওদেরই, ওরাই আগে নিতাইকে মারে।' বলতে বলতে দীনু একেবারে রান্না-ঘরে এসে প্রবেশ করে। কমলকামিনী একটু মাথার কাপড় টেনে একখানা পিঁড়ি পেতে দীনুকে বসতে ইসারা করেন। 'বড় ঘোষাল এবং মেজো ঘোষাল দু'জনে মিলে প্রথম নিতাইকে অপমান করে। নিতাই অসহ্য হয়ে শুধু আত্মরক্ষা করেছে। তার দোষ কি? সে গরীব—তোমাদের সাহায্য নিয়েছে, এই যদি অপরাধ হয়, তবে তো আর এ দেশে গরীব-গুরবো থাকতে পারবে না।'

'না না, তা আমি বলছি নে—তবে কি না, মারামারি করাটা কি ভাল?'

'এ তো মারামারি নয়—স্রেফ আত্মরক্ষা।'

'আপনি আইনের কথা ছাড়ুন। হাজার হলেও ঘোষালদের একটা মান আছে।'

'আর নিতাইর বুঝি নেই?'

'তাও তো বটে।'

সে মার খেয়েও অত ক্ষেপত না—ক্ষেপেছে তোমাদের নিন্দা শুনে। সেখানে তখন আমি একটু আফিং চাইতে গিয়েছিলাম। না হলে এ সব কে-ই বা শুনত, জানতই বা কে? ওদের আক্রোশ ঠিক এখন আর নিতাইর ওপর নাই। দীনু একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

বিপ্রপদ বলেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি সব।'

দীনু এবার একটু এগিয়ে এসে খুব তীক্ষ্ণ একটা বাণ ছাড়ে। 'তোমরা না কি কেরোসিনের ডিব—এক ফুঁতেই ব্যাস! হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝলে ভায়া ওদের ধারণাটা?'

বিপ্রপদ মন্তব্য করেন, 'তাই না কি?'

দীনু এবার আর কথা না বলে শুধু চোখ দু'টো পাকিয়ে বা বুঝিয়ে দেয় তা কথার চৌদ্দ গুণ অর্থে ভরা।

জ্বলে ওঠে শিবপদ। 'দাদা, এখন আর চুপ করে থাকা যায় না। আমি এক্ষুনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসি, তোমরা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাও না কি? তোমাদের—'

'চুপ কর শিবে। তালুকটা আগে খরিদ করেনি—তার পর দেখা যাবে। কি বলেন দীনুদা?'

অনভিপ্রেত হলেও দীনুর এবার বলতে হয়, 'আলবৎ, এই ত বাপের আড়ি!' কিন্তু মনে মনে সে ক্ষুণ্ণ হয়—শেষ অধ্যায়টা তার বাঞ্ছনীয় নয়।'

আহারান্তে শিবপদ ও দেবপদর সাথেই দীনু চলে যায়।

'বাইরে যে দু'জন অতিথি আছে, তাদের জন্য কি ব্যবস্থা ক'রেছ বড়বৌ?'

'তারা অনেক আগেই খেয়ে গেছে।'

'কি করব, তালুকটা কি কিনব?'

'এর মধ্যে আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কি আছে আমি তো বুঝি নে।'

'কিন্তু এতগুলো টাকা…মেয়েদের বিয়ে…এত চাপ কি এক সময় কুলোতে পারব?'

'ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে পারতেই হবে।'

'তা ঠিক। ইচ্ছা থাকলে পথ হয়। বাবাও তাই বলতেন—আমি এখনও সে কথাটা ভুলিনি।'

'তা হ'লে সুবোধ ছেলের আর চিন্তা কি!'

'তুমি রহস্য করছ বড়বৌ? করতে পারো, করো। কিন্তু দু'-এক জনার দু'-একটা কথা এমন মনে থাকে যে, জীবনে কখনও ভোলা যায় না। সেই মহা বাক্যই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।'

রাত্রে শুতে গিয়ে বিপ্রপদ দেখেন যে, বিছানাখানা একটু নতুন করে পাতা হয়েছে! অমরেশ আজ আর এ বিছানায় স্থান পায়নি। সখ করে শ্যামলা সেবাকে নিয়ে গেছে, না কমলকামিনী ইচ্ছা করেই তার ছোট বালিশ-লেপ-তোষক ওদের বিছানায় দিয়ে এসেছেন, তা ঠিক বোঝা যায় না। একান্ত দু'জনের জন্যই আজ রাতের শয্যা রচিত হয়েছে। সুন্দর ধবধবে বিছানা। এখনও গ্রাম-গাঁয়ে একটু একটু শীত পড়ে—উত্তপ্ত শয্যা লোভনীয় বটে। তবে কি তাঁর কমল সবই বোঝে? তাঁর বোবা ব্যথায় তাঁকেও উন্মনা করেছে? তাই এত কাজের মধ্যেও এমন সুন্দর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন! ফাল্গুনী শুক্লা তিথি আজ বুঝি ব্যর্থ হবে না। তিনি যা কামনা করেন তাই বুঝি পাবেন। এ গৃহের জননী, রমণীরূপে তাঁকে ধরা দেবেন—নত নেত্রে লজ্জাপদ সঞ্চালনে। ওঁর কামিনী ওঁর চির সংগিনী আজ নিবেদন ক'রে দেবে তাঁর সর্বস্ব।

'একটা পান খাবে?'

'দাও, খাবো।'

'এখনও ঘুমোওনি?'

'না, আজ আর ঘুম আসছে না।'

'কেন ?'

'জানি না।'

আর কেউ কোনও কথা বলে না।

কমলকামিনীর কুঞ্চিত চুলগুলো এখনও শুকায়নি। ওঁর ললাটের ওই যে সিন্দুরবিন্দু—ও কার দেওয়া ? একান্ত বিপ্রপদর এঁকে দেওয়া পৌরুষের জয়চিহ্ন। আমরণ ওঁকে শয়নে জাগরণে বহন ক'রতে হবে। ওঁর বিজয়ের জয়লিখা আজ বড়ো উজ্জ্বল, বড় সুন্দর মনে হচ্ছে।

ধীরে ধীরে চার পাশের মশারি নেমে আসে। ধীরে ধীরে ফুঁ দিতে দিতে প্রদীপটা নিবে যায়।

শুধু অনির্বাণ থাকে বিপ্রপদর উদগ্র আকাংখা।

মৃদু হাস্তে দুরু-দুরু বক্ষে তাই কমলকামিনী আত্মসমর্পণ করেন সে আগুনে।

প্রদীপ শিয়রে জ্বলছে—

অতি প্রত্যুষে বিপ্রপদর ঘুম ভাঙে। তিনি দেখেন, সেবা ঠিক তার পুরোন জায়গাটা দখল করে জননীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঘুমোচ্ছে। কমলকামিনীও নিদ্রামগ্ন। যেন একটি বৃন্তে দু'টি ফুল। একটি প্রস্ফুটিত, অন্যটি কোরক। কিছুক্ষণ বিপ্রপদ চোখ ফেরাতে পারেন না। তিনি শিয়রের প্রদীপটা একটু বাড়িয়ে দেন। তার পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্নান-আহ্নিক করতে যান।

তাঁর হৃদয় আজ পূর্ণ।

[ক্রমশ:

কে জানিল তাহা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

যা বলেছি সে কী মোর সব ?
কামনা-কম্পিত বক্ষে, বন্ধু, লক্ষ কথা রহিল নীরব !
ভুলের ভুবনে কে জানিল তাহা ?
বাক্য যাহা
ভাষা দিয়া করিল প্রকাশ—
সে তো শুধু বুঝাবার বিফল প্রয়াস !
জীবনে জোয়ার জাগে :
সোনালী সূর্য্য ক্ষণে ক্ষণে অমরার প্রেম মাগে—
মনে হয়
ধরণীর যত কিছু অপচয়
যত শঙ্কা, যত ভয়
মুহূর্ত্তেকে পেয়ে গেছে লয় !

যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাসে
দিগন্তের রেখা টানি অন্তহীন নীলাকাশে
অকলিত করিবার আশা বুঝি আসে !
তুমি কি গো খুঁজে পাও বাণী
আকাশের তারা লোক করে যবে কানাকানি—
নিখিলের প্রাঙ্গণ-প্রান্তে : হিয়া যবে ওঠে পূর্ণ হয়ে—
আপনাতে আপনি হারা মধু-ক্ষরা ব্যাকুল বিস্ময়ে :
আবেগ-কম্পিত বক্ষে কোটি কথা এই মুখে
চাহে বাহিরিতে—তবু হায় রয়ে যায় বুকে
কত বাণী বাক্য-হারা : অশ্রু শুধু নামে চোখে—
ভুখা এই ধরণীর নিষ্করুণ স্তিমিত আলোকে !

যুগে যুগে মানবের কত কথা হয় নাকো বলা :
শুধু দ্বার হ'তে দ্বারে চলা !
কত নারী আসে চারি পাশে—
কেহ তুচ্ছ করে—কেহ অহেতুকী ভালোবাসে:
সবে এরা নহে সোনা,
কারো চোখে অগ্নি-রেখা ; কারো অশ্রু নোনা !
তবু হায়-সাধ যায় শরৎ সম্পাতে শেফালির সাথে
আসি যেন বারে বারে—
বুকে লয়ে বাক্যহীন বহু কথা ধাত্রী এই
ধরণীরই দ্বারে দ্বারে !

"চায়ের পটটা কত বড়!..."

নিশ্চয়ই অনেকে একসঙ্গে চা খাবেন, তাই এত বড় একটা পট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে চা দেওয়া হয়েছে মাত্র দু' চিমটি। এতে চা পাতলা এবং বিস্বাদ হ'তে বাধ্য। ভালো চা তৈরি করতে হ'লে মাথাপিছু চায়ের চামচের পুরো এক চামচ এবং ঐ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা সব সময়েই নিতে হয়।"

আয়েশ-আরামের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক যখন তখন চা খেয়ে থাকেন। কিন্তু ভালো চায়ের স্বাদ যে কী তা অনেকেই জানেন না। এটা কম দুঃখের কথা নয়। অথচ ভালো চা তৈরি করা কঠিন নয় এবং খরচও তাতে মোটেই বেশি পড়ে না। শুধু পাঁচটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই চমৎকার চা তৈরি করা যায়। স্বাদে গন্ধে সবদিক দিয়ে চা-টা ভালো করতে হলে এই নিয়ম ক'টি মনে রাখবেন এবং আপনার বাড়িতে চা করবার সময় সবাই যাতে এগুলো মেনে চলেন সে দিকে নজর রাখবেন।

চা তৈরির পাঁচটি সহজ নিয়ম

১। টাটকা জল একবার মাত্র ফুটিয়ে ব্যবহার করবেন ২। চা ভেজাবার আগে পটটা গরম করে নেবেন ৩। মাথা-পিছু এক চামচ আর ঐ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা নেবেন ৪। চা-টা তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ভিজতে দেবেন ৫। কাপে চা ঢালার পর দুধ চিনি মেশাবেন।

ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও তামিল ভাষায় "চা তৈরির খুঁটিনাটি" নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট একস্প্যান্‌শন্ বোর্ড, ১০১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ভাষার উল্লেখ করে চিঠি লিখলেই পুস্তিকাখানা বিনামূল্যে আপনার নামে পাঠানো হবে।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্প্যান্‌শন্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 297

প্যাগোডা

শ্রমশিল্পী ও ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে নিখিল ভারত প্রদর্শনী

[নিখিল ভারত প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধা নেই উক্ত উদ্যোগে বাঙলার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয়েছে। বাণিজ্য বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মালিকরা প্রায় সকলেই বহু অর্থ ব্যয় ক'রে প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছেন এবং অবশেষে সে অর্থ হয়তো লাভের অঙ্কে জমা পড়েনি। অন্যান্য কথা বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু বলা যায়, প্রদর্শনী আমাদের পত্রিকাগুলির যথেষ্ট ক্ষতি ক'রেছে। কারণ বিজ্ঞাপনদাতারা প্রদর্শনীতে যে অর্থ ব্যয় ক'রেছেন তাতে তাঁদের বার্ষিক ধার্য্য 'বাজেট'এর অধিকাংশই ব্যয় করতে হয়েছে। যদিও এখন বহু বিজ্ঞাপনদাতা ও প্রচার-শিল্পীদের আঙুল কামড়াতে দেখা যাচ্ছে এই অপব্যয়ের আপশোষে।]

সূর্য্যাস্তের পর আউটরাম ঘাট ও ইডেন উদ্যানাঞ্চলে বেড়াইতে চির দিনই আমার ভাল লাগিত। উদ্যানের ছোট ছোট জলাশয়, তাহার উপর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতু, আশে পাশে ঝোপ-ঝাপ, একটু-আধটু বাগান, দূরে দেবদারুর সারি—এ সব নিয়ে ইডেন উদ্যানকে কবি, প্রেমিক প্রভৃতির কাছে কল্পিত স্বর্গরাজ্যের সামিল করিয়া তুলিত। আমি কবি বা প্রেমিক নহি। বাস্তব পৃথিবীতে বাস করিয়া বস্তুতন্ত্র ছাড়া কল্পনার কলা-জালে জড়াই না। তবুও আজ যখন ইডেন উদ্যানে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াই তখন ভাবিয়া চমকিত হই, কেমন করিয়া কিছু দিন মাত্র পূর্ব্বে এইখানের এই শূন্য মাঠগুলির উপর কি বিরাট বৈভবরই না সৃষ্টি হইয়াছিল! আজও সেই ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা জলের ধারে দাঁড়াইয়া আছে,
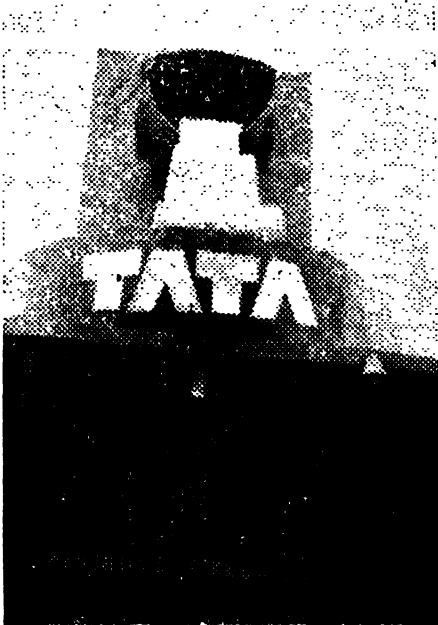
টাটা কোম্পানী

মূক, বধির ও অন্ধকার। প্রদর্শনীর সময়কার পীড়াদায়ক সেই "হারিয়ে যাওয়া" মানুষের কাতর চোখগুলিকে আজ আর সে সুশীতল করে না। "অমুক বাবু যেখানেই থাকুন না কেন প্যাগোডায় চলিয়া আসুন; অমুক দেবী আপনার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন"—ধ্বনি যারা কপালকুণ্ডলারূপে সে যূথভ্রষ্ট নবকুমারকে "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ" বলিয়া সতর্ক করে না।

১

এখন আর প্রতিদিন অপরাহ্নে হয় না এখানে জন-সমাবেশ; আজ হারায় না তাই কেউ। শূন্য উদ্যান তার বাগ-বাগিচা, গাছের সারি আর মাঝে মাঝে পাখীর কলরব লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, পাহাড়ের ন্যায় নিস্পন্দ, নিঝুম।

বৈভবই বটে। সন্ধ্যার পর বিজলী বাতিগুলি যখন একযোগে জ্বলিয়া উঠিত তখন সমগ্র বাগানটি আলোয় ঝলমল করিত। মনে হইত, যেন সুন্দর একটি সহর, যেখানে নাই অভাব-অভিযোগের কোন লেশ, দেখা যাইত না সেখানে দারিদ্র্যের কঙ্কাল ছায়া, ছিল না সেখানে বস্তী, মৃত্যু, রোগ, শোক, যন্ত্রণা। ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত প্রদর্শনী প্রদর্শন করাইত যেন আগামী কালের সুখোজ্জ্বল দিনগুলির ছায়া।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতে ভারতবাসী তাহার জাতীয় জীবন গঠনকল্পে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, বর্ত্তমান বছরে কলিকাতার ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রদর্শনী তাহার অন্যতম। মেলা, খণ্ড-বিখণ্ড প্রদর্শনী আমাদের দেশে আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কলিকাতার রাস্তার বুকের উপর রাস, রথ বা মহরমের মেলা আমরা দেখিয়াছি। নানা ধরণের পুতুল, খেলনা গৃহস্থালীর জিনিষ-পত্র বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীরা ফুটপাতে, কখনও কখনও বাঁশের ঝাঁকায় জিনিষ-পত্র লইয়া বসিত। গ্রামাঞ্চলেও ইহার প্রচলন ছিল। পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতি উৎসবের দিনগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিতে, ব্যবসায়ীরা সমাবিষ্ট হইত তাদের বেসাতি বিক্রয় করিতে। ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট দিনগুলির অপেক্ষায় গ্রামবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত সারা বছর ধরিয়া। বুড়ী

পিসিমা, ঠাকুরমা'রা সময়ে অসময়ে ঝাঁপিতে যেটুকু টাকা-কড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন তাহা এই সকল দিনগুলিতে নাতী-নাতনিকে দান করিয়া তাদের আনন্দোজ্জ্বল চোখ-মুখের চাহনীতে নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। মনে পড়ে আমাদের দেশের বেদেনীর কথা। রূপের পসরা মাথায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এরা দ্বারে দ্বারে। এ সব তো বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন প্রদর্শনীর প্রতীক। কখনও কখনও এদের ভিতর কারু-কলা, শিল্পের নূতনত্বের দেখা পাওয়া যাইত বটে; কিন্তু ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকতর অর্থাগম ভিন্ন দেশের অন্য কোন প্রকার উন্নতি সাধিত হইত না।

সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর সূত্রপাত হয় ও-দেশে; বৃটেন ও ফরাসী দেশে প্রথম প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়া উহার রীতি সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে।

গোড়ার দিকে এই প্রকারের প্রদর্শনীগুলি বেসরকারী উদ্যমে জমায়েত হইত।

এই ধরণের প্রদর্শনীর দ্বারা ব্যবসায়ী মহলে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত। যাহাতে অসংলগ্ন প্রচেষ্টাকে সংলগ্ন ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের উৎপাদন-শক্তিকে দৃঢ়তর করা যায় তাহার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। তখনও উদ্যোক্তাগণের ধারণা ছিল, প্রদর্শনীর একমাত্র সার্থকতা ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ও সওদার প্রচার। ক্রমে ক্রমে সওদাগরেরা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, বিজ্ঞাপন ও অর্থাগম ছাড়া প্রদর্শনীর একাধিক তাৎপর্য্য আছে। দেশের জনসাধারণকে শিল্প-বিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল করিয়া তোলার কার্য্যেও প্রদর্শনীর করণীয় আছে। প্রদর্শনীতে পণ্যদ্রব্যগুলির সমাবেশে যে অর্থ খরচ হয়, ব্যবসায়ীর পক্ষে ঐ স্থলে বিক্রয়লব্ধ মুদ্রা হইতে তাহা তুলিয়া লইতে সবিশেষ বেগ পাইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে লাভের পরিবর্তে লোকসানই হইয়া থাকে বেশী; তথাপিও প্রদর্শনীতে দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করিতে ব্যবসায়ীরা উৎসুক। এ উৎসাহের অন্য কারণ আছে। প্রদর্শনী-মণ্ডপে বিক্রয়াবলি লাভজনক না হইলেও উহা দ্বারা পণ্য-দ্রব্যের চাহিদার বাজারের পরিধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সে বর্দ্ধিত চাহিদার ফলাফল উপস্থিত ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত না হইলেও পরিণামে শুভই হইয়া থাকে। শিল্প-বাণিজ্য যেমন দেশীয় গণ্ডীর বেড়া-জাল ছিন্ন করিয়া আন্তর্জ্জাতিক হইয়া উঠিল, শিল্প-প্রদর্শনীও তেমন আর এক ধাপ আগাইয়া গেল।

দেশীয় প্রদর্শনীর স্থলে তাই দেখা দিল আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী এবং এই প্রকারের আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী সর্ব্বপ্রথম খোলা হইল ইংলণ্ডে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তী কালে অনুরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় প্যারিস, সিকাগো, সেন্ট লুইস্ প্রভৃতি সহরে। সর্ব্বনিকটবর্ত্তী কালে প্রথম শ্রেণীর যে আন্তর্জ্জাতিক (ঠিক আন্তর্জ্জাতিক নয়, কারণ উহা কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল) প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, তাহা সংস্থাপিত হয় ১৯২৪-২৫ সালে লণ্ডনের সন্নিকটস্থ ওয়েমব্লি উদ্যানে।

প্রদর্শনীর স্বপক্ষে এক তরফা গুণ-গান করিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। ইহাতে সময় সময় কুফলও দেখা দেয়। অনুন্নত বা অল্পোন্নত জাতির কোন বিশিষ্ট শিল্পের নমুনা মাত্রের আভাষ পাইয়া অধিকতর উন্নত জাতিগুলি বিরাট বিরাট শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়।
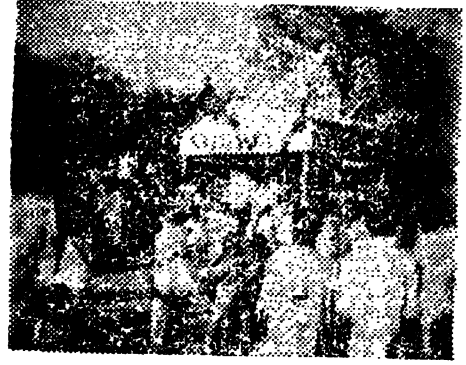
নরওয়ে দেশের কুটীর

প্রতিযোগিতার চাপে অনুন্নত দেশীয় শিল্প ধীরে ধীরে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে হটিয়া পরিশেষে লোপ পাইয়া যায়। নিজের দেশীয় শিল্পের প্রসারের জন্য কখনও কখনও ঐ সকল দেশের শিল্পপতিরা বিদেশীয় নূতন নূতন পেটেন্ট অপেক্ষাকৃত নামমাত্র বা অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া লন—ফলে ঐ সকল উদ্ভাবনী প্রতিভা পৃথিবীর আলো দেখিতে চিরতরে বঞ্চিত হয়। তবে তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারা দেখা যায়, আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর ফলে লোকসান হইতে লাভের সম্ভাবনাই বেশী—তাইতো দিনে দিনেই বাড়িয়া চলিয়াছে ইহার প্রসারতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে আবার আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর পালা শুরু হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংলণ্ডে এই ধরণের সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শনী খোলা হয়। পৃথিবীকে দেখাইবার জন্য "বৃটেন কি তৈয়ার করিতে পারে?" তখনও যুদ্ধের সংঘাত হইতে বৃটিশ শিল্পকলা গা-ঝাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। যুদ্ধে বিনষ্ট

হাওয়া-কল
(কে, এল, এম, বিমান কোম্পানী)
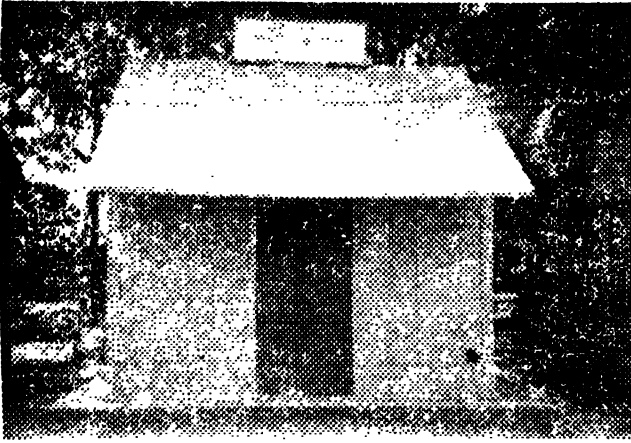
স্বল্পব্যয়ের আধুনিক কুটীর

ঘর-বাড়ী নূতন করিয়া তখনও গড়িয়া উঠে নাই। তার পর কয়লা, ও বিজলী সরবরাহের অভাব। যে যার প্রাণ সামলাইতে ব্যস্ত। অনেকেই উপরোক্ত কারণে প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার প্রদর্শনী খুলিবার জন্ম বদ্ধ-পরিকর হন। প্রদর্শনীর জন্ম ঘর-বাড়ী তৈয়ার করিতে যে সব মাল-মশলার ব্যবহার করা হয় তাহা অভিনব, সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। সুতরাং ইহাতে প্রচলিত কাঠ, সিমেণ্ট, লোহা প্রভৃতি ঘর-বাড়ী তৈয়ারীর মাল-মশলাতে কোনও প্রকার হাত পড়ে না। এই প্রদর্শনী এমন আকর্ষণের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, বর্ত্তমান বছরে ইংলণ্ডে যে "বৃটিশ শ্রমশিল্প প্রদর্শনী" হইবে তাহাতে প্রদর্শনকারীদের আবেদন-পত্র প্রদর্শনী মণ্ডপের জন্ম স্থিরীকৃত স্থানের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ বেশী হইবে। ফলে অনেক দেশই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিতে পারিবেন না। বৃটেনের বিখ্যাত বিখ্যাত সুপ্রতিষ্ঠিত ৮৭টি শিল্পের নমুনা ইহাতে প্রদর্শিত হইবে। যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হইবে ন্যূনকল্পে তিন হাজারের উপর। ইহাতে কি পরিমাণ অর্থ বায়িত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

পর্ব্ব-ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ধরণের শিল্পকলার প্রদর্শনী বিভিন্ন সহরে একাধিক বার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা সহরেও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনের অঙ্গ হিসাবে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। ১৯২৮ হইতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই বিশ বৎসরে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী আমরা এখানে দেখিতে পাই নাই। বর্ত্তমানের প্রদর্শনী এই সহরে অনুষ্ঠিত সকল প্রদর্শনীকে যে ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সরকারী ও বে-সরকারী সাহচর্য্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া কাহারও কাহারও মতে ইহা আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত সকল প্রদর্শনীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বস্তুতঃ, ইহাতে যত প্রকার বিষয়-বস্তুর সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহার যথাযথ আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। শ্রম-শিল্পী ও ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে এই প্রদর্শনী যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, আমি শুধু তাহারই আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকিব।
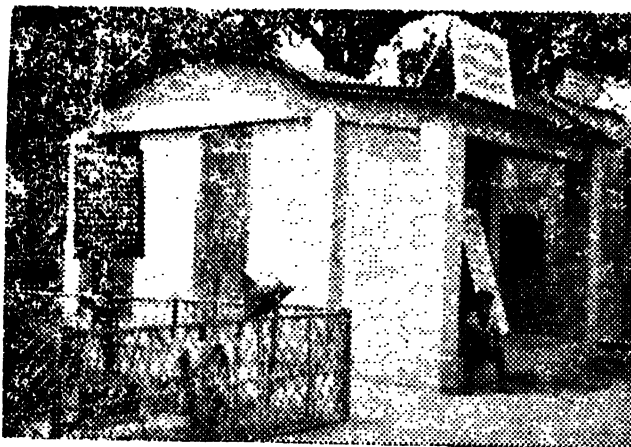
প্রদর্শনী-মণ্ডপে আনন্দ ও উল্লাসের যে সুযোগ-সুবিধা আছে, তাহার উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিলেও, উহাতে যে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষণীয় বস্তু ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ডাক, তার ও বেতার বিভাগের কার্য্যাবলী যে ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা সহজ সরল ভাবে বোঝান হইয়াছে। জন-সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত যে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতে সরকারকে সানন্দ অভিনন্দন জানাইতে হয়। জলসেচ বিভাগের প্রচেষ্টাকে সর্ব্বাধিক প্রশংসা করিতে হয়। দামোদর, ময়ূর ও মাটলা পিয়ালী জল-সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যে নমুনা উঁহারা প্রদর্শনী-মণ্ডপে দেখাইয়াছেন, তাহা অভূতপূর্ব্ব। মনে হয়, এমন কোনও দর্শক প্রদর্শনী-মণ্ডপে প্রবেশ করেন নাই, যিনি জল ও সেচ বিভাগের এই প্রচেষ্টাকে সুখ্যাতি না করিয়াছেন। এত অল্প জায়গায় বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলির বিভিন্ন অংশকে কার্য্যকরী ভাবে দেখান নিতান্ত সহজ ছিল না। সে চেষ্টা আরও বেশী সার্থক বলিয়া মনে হইয়াছে যখন দর্শকের মুখে শুনিয়াছি, বাংলা দেশের পুনঃপৌনিক দুর্ভিক্ষ হয়ত এক দিন নিবারিত হইবে। অল্প খরচে বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহে আমাদের মৃতপ্রায় কুটীর-শিল্পগুলিতে হয়ত আবার নতুন জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইবে, বাংলা ধন-ধান্যে আবার হয়ত তাহার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে। চারু-কলা বিভাগের মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ অঙ্কন ও চিত্র-শিল্প—যাহা ভারতীয় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের ধারাবাহিক ইতিহাস চিত্রিত হইয়াছে জাতীয় সংগ্রাম-মণ্ডপে। সংবাদপত্রের অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায় আর একটি মণ্ডপে। "ভেতোপায়ী" বাঙ্গালী সন্তানেরা যুদ্ধ-সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশে খানিকটা চমকাইল। আস্ফালনও যে না করিল তেমনও নয়; কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিল কি না, তাহার ছাপ দেখা গেল না তাহাদের চোখে-মুখে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমানের প্রদর্শনী সরকারী ও বে-সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক (পশ্চিম-বাংলা সরকারের) কৃষি, বাণিজ্য, জনস্বাস্থ্য, জলসেচ, তার ও বেতার, রেলওয়ে, দেশরক্ষা বিভাগ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও যুক্তপ্রদেশ ও আসাম সরকার তাঁহাদের দেশীয় শিল্পের কিছু কিছু নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। বে-সরকারী শিল্পপতিরা যাঁহারা এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ

স্বল্পব্যয়ের আধুনিক বাংলো

করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকাভুক্ত। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের দু'-একটি শিল্পের নমুনা প্রদর্শিত হইলেও ইহা দুঃখের সহিত বলিতে হয়, বোম্বাই প্রদেশের শিল্পপতিরা এই প্রদর্শনীতে তেমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যে যে প্রদেশ আজ শীর্ষস্থানীয়, তাহাদের কি দু'-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিল্কের সাড়ী ও টিনের কৌটার নমুনা ভিন্ন অন্য কিছুই প্রদর্শন করিবার ছিল না? প্রতিষ্ঠান দুইটির নাম—১। ভিটলদাস চুণীলাল, গড়িওয়ালা—বম্বে; ২। মেটাল প্রেস ওয়ার্কস লি:—বম্বে। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর অকস্মাৎ তিরোধানে প্রদর্শনীর অনেক কিছুই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তথাপি কোনও প্রতিষ্ঠান যদি সচেষ্ট হইতেন তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠান মহাত্মার মৃত্যুর বহুপূর্বেই প্রদর্শনীতে তাঁহার দ্রব্যসামগ্রী আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন।

প্রদর্শনী সম্বন্ধে দর্শকেরা দুই মত। উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কেহ কেহ ইহাকে ইংলণ্ডের ওয়েম্বলী প্রদর্শনী হইতে ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন; আবার কেহ কেহ ইহাকে "ভুষণ্ডীর মাঠ" বলিয়া অখ্যাতি করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ভাবপ্রবণতার বশে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। দুই চোখে যাহা দেখিয়াছি, তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। কল্পনাতে আত্মগোপন করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াসী হইব না। ওয়েম্বলী পার্কের প্রদর্শনী হইতে নিখিল ভারত প্রদর্শনী বড়, অন্য কিছুতে না হইলেও আয়তনে তো বটেই। প্রথমোক্ত প্রদর্শনীর স্থান ছিল ২২০ একর, আর ইডেন উদ্যানের প্রদর্শনীর আয়তন ছিল ১৬০ একর। কিন্তু কেবল আয়তনের উপরেই প্রদর্শনীর উৎকর্ষ নির্ভর করে না। প্রদর্শনীর সহায়তায় আমরা দেশের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের শিল্প ও বাণিজ্যের রূপ দেখিতে পারি। দেশীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার ভবিষ্যৎ গতিবিধিরও আভাষ পাওয়া যায় এখানে। নতুন ধরণের কল-কব্জার উদ্ভাবনা দ্বারা পুরাতন শিল্পকে আরও কি ভাবে বলশালী করিয়া তোলা যায়, তাহার ইঙ্গিত আমরা প্রদর্শনীতে পাইয়া থাকি। একেবারে আনকোরা নতুন শিল্প গড়িয়া তোলা যায় কি না সে প্রশ্নের সমাধানও কোন কোন প্রদর্শনীতে মিলে।

বর্ত্তমান প্রদর্শনীর সাফল্য বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, এই প্রদর্শনীর ফলে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইল তাহার দ্বারা ভাবী কালে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে কি না? উদ্বোধন-বক্তৃতায় সত্যই চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজা-গোপালাচারী বলিয়াছেন, যুদ্ধের দৌলতে আমরা যাহা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই ভাঙ্গিয়া আমরা বর্ত্তমানে খাইতেছি। নতুন কিছু আহরণ না করিয়া যদি পুঁজি-পাটার উপরেই কেবল মাত্র নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে অচিরেই আমাদিগকে দেউলিয়া সাজিতে হইবে। পরন্তু এই অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি আমরা শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নত হইতে পারি, তবেই মনে করা যাইবে, প্রদর্শনী সার্থকতা লাভ করিয়াছে; অন্যথায় ইহাকে পণ্ডশ্রমই গণ্য করিতে হইবে।

যে সমস্ত সামগ্রী এখানে দেখান হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই নিম্ন পর্য্যায়ভুক্ত :—

১। রাসায়নিক দ্রব্য।
২। কাগজপত্র ও নানাবিধ লিখিবার সরঞ্জাম।

ছোট পাকা বাড়ী

৩। বিলাসের উপকরণ।
৪। তৈল ও বনস্পতি।
৫। কাচ, চীনামাটি ও এনামেলের বাসনপত্র।
৬। কঠোর যন্ত্র-পাতি।
৭। তামাক জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী।
৮। বিজলী-চালিত দ্রব্য।
৯। কার্পাস ও পশমজাত দ্রব্য।
১০। কলকব্জা।

একাধিক দেশীয় রাজ্য এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ইন্দোর, জয়পুর, মেবার, মহীশূর, বরোদা, গোয়ালিয়র, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর ও হায়দরাবাদের নাম উল্লেখযোগ্য। নিজ নিজ দেশীয় শিল্পকলা, বনজ ও খনিজ দ্রব্য-সামগ্রী ইঁহারা আপন আপন মণ্ডপে দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল মহীশূর রাজ্য। ভারতের বিখ্যাত কোলার স্বর্ণ-খনিতে কিভাবে স্বর্ণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহার একটি সুনিপুণ নমুনা ইহাতে দেখান হইয়াছিল। অগণিত দর্শক ইহারই জন্য এই মহীশূর-মণ্ডপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে প্রদর্শনী চালু হইবার অল্প কিছু দিন পরেই ঝড়-বৃষ্টিতে আরও দু'-একটি মণ্ডপের সহিত মহীশূর-মণ্ডপের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে দর্শকেরা এই উৎকৃষ্ট নমুনাটি প্রদর্শনীর শেষ সময় পর্য্যন্ত দেখিতে বঞ্চিত হন। কয়লা আর সোনা—সম-মহিমাগে এই দুইটি জিনিষের বাজার-দরের ভিতর পর্ব্বত প্রমাণ প্রভেদ, কিন্তু কয়লা খনির শ্রমিক ও সোনার খনির শ্রমিকের মধ্যে হয়ত তেমন কিছুই প্রভেদ নাই।

ময়ূরভঞ্জের খনিজ সম্পদ ভাবী কালের শিল্প-পতিদের নানা-দিকে পথ দেখাইবে ইহা নিঃসন্দেহ। টাটা কোম্পানীর লৌহখনি যে ভাবে এক দিন এই রাজ্যের সংলগ্ন ভূভাগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ভবিষ্যতে এই রাজ্যের জমিতে তেমন ধরণের আরও নূতন নূতন আবিষ্কারের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইন্দোরের হাতের তৈরী ঘড়ি (যাহা ইন্দোরের প্রসিদ্ধ ঘড়িওয়ালা কর্ত্তৃক গত বৎসর জুন মাসে মহাত্মাকে উপহার দেওয়া হয়) ইন্দোর-মণ্ডপে তাহা

দেখান হইয়াছে। মেবার-মণ্ডপে রাণা প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার বর্ম্ম, তরবারী, এমন কি প্রসিদ্ধ চৈতকের "জিন" পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে। তাই বলিয়া বর্ত্তমান আণবিক যুগে যুদ্ধ-ঘোড়া ও তরবারী দেখাইবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। উহাকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান শিল্প-প্রদর্শনী না হইয়া যাদুঘর হইলেই ভাল হইত।

তবে, বর্ত্তমানের প্রদর্শনী তো কেবল মাত্র শিল্প-প্রদর্শনী নয়। গোয়ালিয়রের মৃৎ-শিল্প ও জয়পুরের হাতীর দাঁতের সামগ্রী চারু-কলার দিক হইতে যতই উন্নত ধরণের হউক না কেন, বিনিময় মূল্যের হার হ্রাস না পাইলে উহা প্রদর্শনীতেই শোভা পাইতে থাকিবে, সাধারণ মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

হিট্‌লী এণ্ড ফ্রেসীয়, কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানী, মার্শাল সন্‌স, জাস আলেকজাণ্ডার, মার্টিন, বার্ণ, ইণ্ডিয়া মেসিনারি, টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী তাহাদের মণ্ডপে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কল-কব্‌জার সমাবেশ করিয়াছিলেন। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমার তেমন সুনিপুণ জ্ঞান নাই। তবু সাধারণ দর্শক হিসাবে আমার একাধিক বার মনে হইয়াছে, প্রদর্শনীতে এই প্রকারের খণ্ড-খণ্ড কল-কব্‌জা দেখাইবার সার্থকতা কোথায়?

ইউরোপ বা আমেরিকার প্রদর্শনীগুলিতে প্রাচ্যের শিল্পপতিরা কল-কব্‌জা ক্রয় মানসে যোগদান করিয়া থাকেন। সেখানে কল-কব্‌জার নমুনা দেখাইবার যথেষ্ট কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে। আমাদের দেশে সে শিক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে জনসাধারণ শিখিতে পারে কি করিয়া কল-কব্জা চলিয়া থাকে। নেতাজী সুভাষ রোডের দুই পাশে কল-কব্জার যে দোকানগুলি আছে তাহা একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলে যে অভিজ্ঞতা হয়, তাহা হইতে অধিকতর ও উন্নততর শিক্ষা প্রদর্শনীতে গিয়া লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। মার্শাল কোম্পানীর যন্ত্রচালিত লাঙ্গল কবে যে আমাদের দেশে কাজে লাগান যাইবে তাহা আজও আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে "ফিলিপস্" প্রতিষ্ঠানটির মণ্ডপে। একটি অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে একযোগে একাধিক লোকের দেহের প্রতিচ্ছবি রঞ্জনরশ্মি দ্বারা কি করিয়া তোলা যায় তাহা এখানে দেখান হইয়াছে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতালে এই যন্ত্রটির বহুল প্রচলন সাহায্যকারী হইবে বলিয়াই মনে হয়। এতকাল আমরা জানিয়া আসিয়াছি যে, ফিলিপস্ প্রতিষ্ঠানটি কেবল মাত্র বেতার-যন্ত্র ও বিজলী বাতিই প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রদর্শনীর মারফত যে নতুন নতুন জ্ঞাতব্য জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায় ফিলিপস্ মণ্ডপটি তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর একটি মণ্ডপে দেখিলাম, আমাদের দেশেরই জি, সি, লাহা এণ্ড কোম্পানী দ্বারা ১৩২ রকমের পেনসিল ও ৭০ রকমের নিব তৈয়ার হইয়া থাকে। বিদেশী শাসনে আমরা আজীবন কেবল "ভিনাস" বা "কোহিনুর" পেনসিল এবং "রেড ইংক" বা "রিলিফ্" নিবকেই শিক্ষার বাহনরূপে দেখিয়াছি। পরাধীনতার চাপে তাই ঘরের জিনিষকেই যেন দেখিয়াও দেখি নাই, গ্রহণ করিয়াও গ্রহণ করি নাই। টাটা-মণ্ডপের পরিকল্পনাটি অভিনবত্বে পূর্ণ। নদী যেমন তাহার জল-সিঞ্চনে দেশকে শস্য-শ্যামল করিয়া তোলে, তুণ্ড লৌহের তরল ধারা লৌহদ্রব্য ও ইস্পাতে পরিণত হইয়া তেমন আমাদের দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবে।

বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রদর্শনীতে তেমন ভাবে যোগদান করেন নাই। বিদেশাগত যে মণ্ডপটি সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইতেছে নরওয়ে দেশের কুটীরটি। বিনাড়ম্বরে ছবির সাহায্যে নরওয়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে এখানে পরিষ্কার ভাবে দেখান হইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা কোন কোন সামগ্রীতে ভারতবর্ষের সহিত ইহার যোগাযোগ রহিয়াছে তাহাও নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে; নরওয়ে সরকারের এই পরিকল্পনাটি প্রশংসনীয়।

প্রদর্শনীতে দুই-এক ক্ষেত্রে অন্য দ্রব্য যে ভাবে দেখান হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞাপনের সার্থকতা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও প্রদর্শকের সুরুচির অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করা যায়, লক্ষ্মীবিলাস তৈল ও জীবনলাল কোম্পানীর মণ্ডপ দুইটি। লক্ষ্মীবিলাস মণ্ডপটিকে যখনই সন্ধ্যার দিকে দেখিয়াছি তখনই উহাকে "ওয়েষ্টিং হাউস" কোম্পানীর বিজলী বাতির বিজ্ঞাপন বলিয়া ভুল করিয়াছি। এলুমিনিয়াম-কারবারী জীবনলাল কোম্পানীর এলুমিনিয়াম পাতের কোন অভাব নাই। তাই রাতারাতি তাহারা একখানা এলুমিনিয়ামের সৌধ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। লোকের বাহবাও ইঁহারা পাইয়াছেন অঢেল। কিন্তু ইহা দ্বারা ভারতের তৈল বা এলুমিনিয়াম শিল্প কি ভাবে প্রভাবান্বিত হইবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। জীবনলাল কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা কি আমাদিগকে আজ হইতে ইট, কাঠ, সিমেন্ট ও লৌহ দ্বারা গঠিত ইমারতের পরিবর্ত্তে এলুমিনিয়ামের সৌধের স্বপ্ন দেখিতে বলেন? এই প্রকারের বিজ্ঞাপনের বদলে তাঁহারা যদি কোলার স্বর্ণখনি নমুনার মত বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম বাসনপত্র কি ভাবে প্রস্তুত হয় তাহা দেখাইতেন, তাহা হইলে জনসাধারণের শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধি পাইত এবং এলুমিনিয়াম তৈজসপত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে আজও আমাদের মধ্যে যতটুকু অন্ধ ধারণা বিদ্যমান আছে তাহা অনেকাংশে দূরীভূত হইত। লক্ষ্মীবিলাস বা জীবনলাল কোম্পানীর দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার আগ্রহ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা। আর বিজ্ঞাপন-বৈশিষ্ট্যই যদি একমাত্র লক্ষণীয় বস্তু হইত, তবে বস্তুবাদ ছাড়িয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ভাল হইত। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, কে, এল্, এম্ বিমান কোম্পানীর অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপন-নৈপুণ্য। কোন মাত্র বিমানপোত প্রদর্শন না করিয়া হলাণ্ড দেশের একটি "হাওয়া কলের" প্রতিমূর্ত্তির সাহায্যে বিমানযানের সাবলীল অফুরন্ত গতিকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে। কে, এল, এম কোম্পানীর এই বিচিত্র পরিকল্পনাটির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

সমস্যামূলক দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৃহ-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা। প্রদর্শনীতে গৃহের চার প্রকারের নমুনা দেখান হইয়াছে। কংক্রিট এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক এক কাঠা মাত্র জমির উপর যে গৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার আকর্ষণ ছিল সর্ব্বাধিক (১নং চিত্র দেখুন)। ইট, কাঠ, কড়ি-বড়গা বিনা "রোল লেজিং" নামক বাঁশ বা লোহার শলায় সিমেন্ট জমাট বাঁধিয়া যে গৃহটি নির্ম্মাণ করা

হইয়াছিল তাহাও দর্শকের নজরে পড়িয়াছে (২নং চিত্র দেখুন)। ইহা ছাড়া ভেনেস্তা কাঠের তৈয়ারী এবং বাঁশের তৈয়ারী বাড়ীর দর্শনও আমরা এই প্রদর্শনীতে পাইয়াছি (৩নং ও ৪নং চিত্র দেখুন)। প্রচেষ্টা সাধু, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা কত দূর ব্যবহারোপযোগী হইবে তাহাই চিন্তার বিষয়। তিন নম্বর ও চার নম্বর বাড়ীর প্রস্তুত খরচের কোন আভাষ প্রদর্শনীতে দেওয়া হয় নাই। তবে ব্যবহারের পক্ষে বাঁশের বা কাঠের তৈয়ারী বাড়ী তেমন উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। বাঁশের বা কাঠের বাড়ীতে আগুন লাগার ভয় বেশী, তার পর বাংলা দেশের মত জলীয় আবহাওয়ায় উহা তেমন দীর্ঘস্থায়ী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। বাঁশ ও সিমেন্ট দ্বারা গঠিত বাড়ী কিছু বেশী দিন টিঁকিতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুই বা তিনতলা বাড়ী তৈয়ার করা যাইবে না। তার পর বাঁশে জলীয় অংশ থাকার জন্ত এই প্রকারের ঢালাইয়ে পরে ফাটল দেখা দিতে পারে, তখন উহা সারাই করা কষ্টসাধ্য হইবে। আর লোহার শলা যদি ব্যবহার করা যায় তবে ইহাতে আর অভিনবত্ব রহিল কি? উপরোক্ত কারণে জন-সাধারণ "বোল লেদিং" প্রথায় গঠিত বাড়ীর দিকে তেমন আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। কংক্রিট এসোসিয়েশনের বাড়ীখানা মধ্যবিত্তরা পছন্দ করিতে পারেন; কিন্তু ইহার অন্তরায় প্রয়োজনীয় অর্থ। জমির মূল্য বাদে এই প্রকারের একখানা বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে বিজ্ঞাপিত মূল্য পড়িবে কম-বেশী প্রায় ৪৮৪৮ টাকা। জমি সমেত উহার মূল্য দাঁড়াইবে প্রায় ৮০০০ হইতে ১০,০০০ টাকা। সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে এই দুর্মূল্যের বাজারে স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করিয়া এত বেশী অর্থ সঞ্চয় করা একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং, মধ্যবিত্ত যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। গৃহ-সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত তেমন কোন আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে আজিকার এই প্রচেষ্টাই ভবিষ্যতে উন্নততর উদ্ভাবনার জননীরূপে দেখা দিতে পারে, এই আশা। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তারা এই চারি ধরণের বাড়ীগুলি পাশাপাশি নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিলে দর্শকমণ্ডলী অনায়াসে উহার তুলনা-মূলক দোষ-ত্রুটি, উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিতে পারিতেন।

প্রদর্শনকারীদের বিভিন্ন মণ্ডপের পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা এইখানেই শেষ করা যাক্। শ্রমশিল্পী ও ব্যবসায়ী হিসাবে এই প্রদর্শনীতে আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন প্রভাতে নূতন উষার আলোক দেখিতে উৎসাহী হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, হগ সাহেবের বাজার অথবা বড়বাজারের সারি-বাঁধা দোকানগুলির বদলে এখানে দর্শন মিলিবে কি ভাবে আমাদের দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের রথচক্র চলিতেছে। চলার পথে উহা কোথায় পাইতেছে বাধা, কাহারা বহিতেছে বলদের মত বোঝা, আর কাহারা শোষণ করিতেছে তার মুনাফা। আশা ছিল, বর্ত্তমান কালের অন্যতম প্রধান সমস্যা শ্রমিক আন্দোলন ও তাহার মীমাংসার একটা আলো ইহাতে মিলিবে। ভারতবর্ষে পাট-কল ও কাপড়ের কলের অভাব নাই। জমিতে বীজ বোনা হইতে আরম্ভ করিয়া মিল-জাত দ্রব্য কি ভাবে দেশে ও বিদেশে বিক্রীত হইতেছে তাহার একটা নমুনা কি এই প্রদর্শনীতে দেখান যাইত না? ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য চা। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় চায়ের পেয়ালা না হইলে আমাদের চলে না; কিন্তু কি ভাবে চা উৎপন্ন হইতেছে তাহার খবর ক'জনাই বা রাখে? সরকার ইচ্ছা করিলে চা-শিল্পের নমুনা জন-শিক্ষার নিমিত্ত দেখাইতে পারিতেন। এমনি ভাবে প্রধান প্রধান ভারতীয় প্রত্যেকটি শিল্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমুনা প্রদর্শনীতে দেখাইতে পারা যাইত। প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তাদের কল্পনাও হয়তো তাহাই ছিল। "প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য" শীর্ষক যে পুস্তিকা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, এই প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, খনিজ সম্পদ প্রভৃতির একটি যথাযথ আলেখ্য লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরা—যাহাতে প্রদর্শিত দ্রব্য-সামগ্রী হইতে উন্নততর ভারত-গঠন-কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করা যায়। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা কত দূর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা দর্শক মাত্রই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। উপরোক্ত আলোচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর দোষত্রুটি দেখান হইয়াছে বটে; ইহাও সত্য যে, এত বড় বিরাট জিনিষের একত্রীকরণ সহজ-সাধ্য নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু উহাতে দেখাইতে গিয়া আমি প্রদর্শনীকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হই নাই। আমি চাহিয়াছি, ভবিষ্যতে যেন আমরা আমাদের অতীত ভুল-ভ্রান্তির জের না টানি।

আগামী নভেম্বর মাসে (১৯৪৮) দিল্লী নগরীতে যে আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর প্রস্তাবনা করা হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, ভারতীয় কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার, এবং দেশীয় সামন্ত রাজ্যগুলি যোগদান করিবে। বিদেশী প্রদর্শনকারীদের নিকটেও আমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে যাহাতে আমরা ভারতীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের একটি সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর আলেখ্য পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি, তাহার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

শীতে উপেক্ষিতা

'রঞ্জন'

দুই

চিত্রের পরিপূর্ণ প্রস্ফুটনের জন্যে চাই বিস্তীর্ণ পট-ভূমিকা, প্রতিমাকে মূর্ত করে তোলে তার পশ্চাতের বিশাল চাল। মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে তেমনি প্রয়োজন আছে একটা মহৎ পরিবেশের। এই পরিবেশের প্রকৃতির প্রকারভেদ যে মানব-চরিত্রকে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এ-কথাটা বোধ হয় সাধারণত আমরা উপলব্ধি করিনে যে, পরিবেশের আকৃতিটাও প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংকীর্ণ পরিবেশে ব্যক্তিত্ব থাকে সংকুচিত হয়ে। যেখানে সবাই পরিচিত, সব কিছু জানা, জিজ্ঞাসা সেখানে সুপ্ত। জড়-পদার্থের জন্যে আঁট, মাপসই কোনো আধারই যথেষ্ট, তলোয়ারের খাপ যেমন তলোয়ারের মাপ মেনে চলে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের উপমা, সাড়ে তিন হাত মানুষ যদি সাড়ে তিন হাত উঁচু ঘরে বাস করে তবে তার বুদ্ধি খর্ব হয়, বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়।

মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশাপ নিয়ে যত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক অশ্রুবিসর্জন হয়েছে তার অধিকাংশই তার বিত্তের মধ্যতাকে কেন্দ্র করে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে সে-জীবনের নিষ্ঠুরতম অভিশাপ হচ্ছে পরিবেশের সংকীর্ণতা, সঙ্গতির সামান্যতা নয়। নানা তুচ্ছ প্রয়োজনের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সেই মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র বিশ্বে বৃহৎ কিছুর স্থান নেই, প্রস্থে তা পর্যাপ্তপ্রায়, উচ্চতায় সাড়ে তিন হাত। সেখানে নেই আকাশের নিঃসীম উদারতা। প্রাসাদের কৃত্রিম বিশালতাও নেই মধ্যবিত্তের সেই ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়ীতে।

একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে, পট ভূমির আকৃতির বিরাটত্বের যে-কথা আমি বলছি তা কেবল মাত্র অর্থলভ্য নয়। চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল, সে আছে মাটির কাছাকাছি। তার পরিবেশের পরিধি দিগন্ত-বিস্তৃত। সে বাস করে তার জীর্ণ কুটীরে, সে-কুটীর এতই জীর্ণ যে অধিকাংশ সময়েই তার মাথার উপরকার ছাদ তার ঘরের চাল নয়, আকাশ। রৌদ্রের আশীর্বাদ তাকে আবৃত ক'রে রাখে সারা দিনমান, রাত্রি অবতীর্ণ হলে তার পারিপার্শ্বিকের গভীর অন্ধকার লাঞ্ছিত হয় না মানবোদ্ভাবিত নানা কৃত্রিম আলোর নির্লজ্জতায়। প্রকৃতির সন্তান সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এই অস্তিত্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে সে প্রকৃতির হস্তে স্বেচ্ছা-ক্রীড়নক। প্রকৃতির করুণা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না, তাই নিয়ে মৃত্তিকার সন্তানের অভিমান আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। তার প্রশান্তি প্রশ্নহীন আত্ম-সমর্পণে। বৃহতী প্রকৃতির প্রশস্ত কোলে সে তার আপন ক্ষুদ্রতা নিয়ে তুষ্ট, শিশু যেমন মায়ের কোলে।

অপর দিকে ধনশালী শিল্পপতি তাঁর আনন্দ আহরণ করেন প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে নয়, তাকে জয় ক'রে। গভীর অরণ্য তাঁর কাছে রহস্যময় একটা অজ্ঞেয় বিস্ময় নয়, প্রভূত অর্থাগমের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ধ্বংসাপেক্ষী একটা ক্ষেত্র মাত্র। পর্বত-গাত্র-প্রবাহিনী নির্ঝরিণীর নিরাপদ দূরত্বে দণ্ডায়মান শিল্পপতির কর্ণে আর যে চিরন্তনী বাণীই বর্ষিত হোক না কেন, এ-কথা নিশ্চয়ই তাঁর নিমেষের জন্যেও মনে আসে না যে তা "ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে।" যদিও এমন সম্ভাবনা আদৌ কল্পনাতীত নয় যে তিনি "পদে পদে তব আলোর ঝলকে" স্মরণ করে অথবা কালহরণ না করে অনতিবিলম্বেই একটি হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটির যৌথ ব্যবসায়ের উদ্যোগ করবেন! অর্ধ-সভ্য আদিবাসীরা তাতে বর্বরতার ঘনান্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে যন্ত্র-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাকে কিছুতেই অবিমিশ্র আশীর্বাদ বলে মনে করতে পারিনে। কেবলি সন্দেহ জাগে, মানব-দেহের সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে মানব-মনকে বড়ো কঠোর মূল্য দিতে হয়নি কি?

আকাশের আকর্ষণ তার অসীমতায়, ইন্দ্রধনুর বিহ্বলতা তার অনির্দেশ্যতায়, নক্ষত্রমণ্ডলের সৌন্দর্য তার অসংখ্যতায়। তেমনি স্পর্শাতীত, সংজ্ঞাতীত, এমন কি বোধাতীত কিছু একটার প্রয়োজন আছে মানবের জীবনে। সমুদ্রের অতলতা ও অনতিক্রমণীয়তায় নিরাপত্তা নেই। বরং মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে প্রতি তরঙ্গের ভয়াবহ ব্যাদানে, হাঙর-কুমীরের চিরক্ষুধিত উদরে আছে মরণের আমন্ত্রণ। কিন্তু তবু, সেই সমুদ্রের সঙ্গীতেই আছে দুর্জয় জীবনের সুস্পষ্ট জয়গান। কূপে শুধু আছে মণ্ডূকের স্তিমিত অস্তিত্বের ঘূর্ণিত ধ্বনি। সমুদ্রে আছে নাবিকের নির্ভয়তা, আছে কূপবাসীর পরিপূর্ণ ভাগ্য-নির্ভরতা। ভিন্নমুখী হলেও, উভয়ই কল্পনাকে জাগ্রত করে। কিন্তু কূপ নিয়ে কোনো মহাকাব্য রচিত হবে, এমন সম্ভাবনাও কল্পনা করতে পারিনে

আজন্ম কূপবাসী হচ্ছে মধ্যবিত্ত। তাকে নিয়ে মহাকাব্য হয়নি, হবে না। তার আত্ম-জীবনীর নাম 'আত্ম-জীবিকা' হলেই সমীচীন হয়, কেন না, সাধারণত তার জীবিকা গ্রাস করে থাকে তার জীবনকে। সে নিশ্বাস নেয় তার আপিসের সীলিং ফ্যানের কৃত্রিম হাওয়ায়, সে-হাওয়া বয়ে আনে না কোনো অজানা দেশের অশ্রুত বাণী। তাই শুধু প্রাণধারণের, শুধু দিন-যাপনের সেই গ্লানিতে জীবন যখন শুকায়ে যায়, সকল মাধুরী লুকায়ে যায়; কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার, তখন অ্যানুয়েল লীভ্‌ আমার জন্যে বয়ে আনে, অবসাদ নয়, শুধু মাত্র অবসরও নয়, বয়ে আনে অনির্বচনীয় এক আশীর্বাদ। তখন আমার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্য পর্বত। টেবিলের পায়ায় বাঁধা পা-দু'টো তখন পাগল হয় দূরের আহ্বানে।

পাকুড়ী বা জশিডিতে যাঁরা ছুটি কাটান, তাঁদের সাবধানী প্রকৃতির প্রশংসা করব দূর থেকে কিন্তু তাঁদের ঈর্ষা করিনে। আমি অমন ছুটিকে ছুটি বলেই মানিনে। এ যেন বাড়ির বারান্দায় প্রাতর্ভ্রমণ, বা চৌবাচ্চায় সন্তরণ। শিমুলতলা আর কার্মাটাঁড়

তেমনি বাড়িরই একটু প্রসরণ মাত্র ; তাতে অজানার সঙ্গে পরিচয়ের সম্ভাবনা তো নেই-ই, এমন কি, অতি-পরিচিতের হাত থেকেও পরিত্রাণ নেই। আমার সঙ্গে তাঁদের প্রভেদটাই অবশ্য মূলগত, কেন না, আমি বাইরে যাই স্বাস্থ্যের অন্বেষণে নয়, বাইরের অন্বেষণে ; ক্লান্ত শরীরটাকে মেরামত করতে নয়, জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করতে ; হাওয়া বদলাতে নয়, মন বদলাতে। স্থানান্তরে আমি জন্মান্তর খুঁজি।

সে জন্যে দূরত্বটা একান্তই আবশ্যক। ওরা বলে, সান্নিধ্য ঘৃণা আনে। এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যুক্তি হতে পারে। কিন্তু যা দূরের, যা অজানা, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যা কেবলি চাইতে হয় কিন্তু কখনোই পাওয়া যায় না, তার সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা আকর্ষণ আছে। সেই অজ্ঞেয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন বিজ্ঞান-বিশ্বাসী আধুনিক, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন স্থূলানুভব বিষয়ী। প্রথমের ঔদ্ধত্য আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়, দ্বিতীয়ের স্থূলতা আলোচনার সম্মানেরই যোগ্য নয়।

পৃথিবী নামক এই যে গ্রহটায় আমি নামক এই যে সপ্রাণ বস্তুটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছি, এই সমন্বয়টার পরিপূর্ণ একটা ব্যাখ্যার সন্ধান করে ফেরে আমার মন। বিজ্ঞানীর বস্তু-সর্বস্ব ব্যাখ্যাটাকে কিছুতেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারিনে। সে ব্যাখ্যার কোথায় যেন ফাঁক আছে, আছে ফাঁকি। কিছুতেই মেনে নিতে পারিনে যে জীবন হচ্ছে অসম্বদ্ধ কতগুলি আকস্মিকতার সমষ্টি মাত্র। হৃদয় কিছুতেই এই নৈরাশ্যপূর্ণ ধারণাটা গ্রহণ করতে চায় না। যে জীবন হচ্ছে কোনো রোমান্টিকের ভাষায়—one damned thing after another until, at last, there's a final damned thing, after which there isn't anything. সমস্ত অন্তরাত্মা এই অবিশ্বাসটাকে প্রত্যাখ্যান করে যে জীবনটা কোনো মূঢ়কথিত প্রলাপ মাত্র।

অথচ প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা প্রতিবাদ করে সেই নির্বিচার বিশ্বাসটার বিরুদ্ধেও, যা বিশ্বের সব-কিছুকে ঈশ্বরের নিখুঁত একটি কাব্যসৃষ্টিরূপে জ্ঞান করে। জীবনের প্রতি পদে সেই কাব্যের ছন্দঃপতন প্রত্যক্ষ না করে উপায় নেই। 'রাইম্' তো দূরের কথা, অসংখ্য ক্ষেত্রে ঘটনার 'রীজন' আবিষ্কার করতে গিয়েও হাল ছেড়ে দিতে হয়। ঈশ্বরের পরম করুণাময়তার সঙ্গে কিছুতেই সামঞ্জস্যবিধান করতে পারিনে অসহায় বিধবার এক মাত্র পুত্রের মোটর-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর, প্রমাণিত দুর্বৃত্তের উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধির, এবং এমনি আরো সহস্র নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনার। রচনার সামঞ্জস্য পদে পদে রয়েছে খণ্ডিত। তা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী অর্কেস্ট্রার যে ঐকতান বিশ্বকবি শুনেছেন, তা শোনবার কান বিধাতা আমায় দেননি। আমার শ্রবণে সেই হার্মনি খণ্ডিতলয়। আমি তাই যে নদী মরুপথে হারালো ধারা আর যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, তাদের উপর পূর্ণের পদপরশ আবিষ্কার করতে না পেরে অস্থির হই। প্রশ্ন করি, উত্তর পাইনে।

আমার পিতামহ এই ব্যাধি থেকে একেবারেই মুক্ত ছিলেন। তিনি যেমন নিযুক্ত হয়েছেন, তেমন করেছেন। তাঁর হৃদয়ে হৃষীকেশের আসন ছিল দৃঢ়। তিনি ঈশ্বর নামক কুম্ভকারের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন মৃত্তিকারূপে। তাঁর চরম পরিণতি প্রদীপ হবে না ফুলদানি হবে, তা নির্ধারিত হবে কুম্ভকারেরই নির্দেশে। আগে থেকে তা জানতে চাইবার তাঁর না ছিল অধিকার, না ছিল দরকার। তিনি তো নিমিত্ত মাত্র। তাঁর বেলায় 'সুধা দিয়ে মাতান যখন' তখন যেমন ধন্য হরি, ধন্য হরি ; তেমনি 'ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন' তখনও ধন্য হরি, ধন্য হরি।

প্রথম তারুণ্যে এই আপাত-বিরোধিতায় হেসে আকুল হতেম। সমামুভাবী বন্ধু-জনের সপ্রশংস উপরোধে প্যারডি করে বলতেম, গয়লা দুধ দিলেও দাম দেব, দুধ না দিলেও দাম দেব। আজ লজ্জিত হই সে হাসির কথা স্মরণ করে। আজ জানি, মাঝে-মাঝে অন্তরের অন্তস্তলে উপলব্ধি করি, যে আমার পিতামহের সেই প্রশ্নহীন বিশ্বাসের মধ্যে এমন কোনো অন্তহীন প্রশান্তি নিহিত ছিল যার সন্ধান পেলে আমার আজকের অশান্ত জীবনকে হয়তো সহনীয় করে তুলতে পারতেম! তখন ভাবতেম, আমার বিশ্বাসী, বৃদ্ধ, বিগততেজ পিতামহ বুঝি প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। আজ আর সেই অর্বাচীনতার নিশ্চয়তা নেই! আজ জানি যে, হয়তো তিনি সত্যিই তাঁর প্রশ্নের চরম উত্তর পেয়েছিলেন, যে-উত্তরের সত্যতা বুদ্ধি তার আপন ঔদ্ধত্যে প্রত্যাখ্যান করলেও হৃদয় জানে সত্য বলে। তখন ভাবতেম, ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে বৃদ্ধ বুঝি কল্পিত পরলোকের তয়াল কর্তার সঙ্গে সন্ধি করে নিতে চাইছেন। আজ যখন পদে-পদে আপন বিবেকের সঙ্গে সন্ধি করে ইহলোকের অস্তিত্ব বজায় রাখতে আপনাকে প্রায় বিকিয়ে দিয়েছি, তখন সেই অশীতিপর বৃদ্ধকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে পারিনে, যিনি পরলোকের সঙ্গে সন্ধিভিক্ষা করেছিলেন কি না জানিনে—আপন বিবেকের সঙ্গে কখনোই করেননি। করেননি আপন বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা।

আজকের পরিতপ্ত আমি পিতামহের সেই স্থির বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি কই? বিশ্বাস জিনিসটাই এমনি, সে যায় অতি সহজে কিন্তু একবার গেলে আর ফিরে আসতে চায় না কিছুতেই! তখন বিশ্বাসের বস্তুকে স্বহস্তে নিষ্পেষিত না করে থামবার উপায় নেই, ওথেলো যেমন থামতে পারেনি ডেসডিমোনাকে বালিশের তলায় না পিষে। আজকের আমাদের প্রত্যেকের দুর্বুদ্ধি-বালিশের তলায় সমাহিত আছেন এক-এক জন অবিশ্বাসিত ভগবান! আধুনিক কাব্যে তাই মনুষ্য বর্ণিত হয়েছে শূন্য মানুষ, ফাঁকা মানুষ, ফাঁপা মানুষ বলে।

আমার পাশ্চাত্য সতীর্থের বেলায় তবু সেই শূন্যতার অন্তত সাময়িক পূরণ হয়েছে। সে মন্ত্রদেবকে নিধন করে যন্ত্রদেবকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করছে ভক্তিভরে, শক্তিভরে। আত্মগরিমায় গাঁথা সেই পশ্চিমী ইমারতে যে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে তার কিঞ্চিদধিক আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার অধুনাতন সাহিত্যে, সমাজের ভাঙনে, জীবন-যাত্রার পলায়নী উদ্দামতায়। কিন্তু তা এখনো একেবারে ধ্বসে যায়নি।

এদিকে আমার অবস্থাটা একেবারেই মর্মান্তিক। আমি ভগবদ্-বিশ্বাসের তরী থেকে ঝাঁপ দিয়েছি, কিন্তু অবিশ্বাসের তীরে যাবার সাধ্যও নেই, সাধও নেই। তাই শূন্য মন্দির মোর। আমি বারাণসী পরিভ্রমণ করে এসে সেই তীর্থের অস্বাস্থ্যকরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ রচনা করি ; আমি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির পরিদর্শন করতে গিয়ে তার স্থাপত্য পর্যবেক্ষণ করি, আলোচনা]

করি দেব-মন্দিরের দর্শনাভিলাষীদের পাদুকা-রক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেও এক মুহূর্তের জন্যেও অন্তরে সেই অনির্বচনীয় অনুভূতির পরশ পাইনে যা অঙ্গে আমার, চিত্তে আমার মুক্তি দিতো জানি। আমি শুধু আমার আপিসের টেবিলের সঙ্গেই বাঁধা নই, বাঁধা আমার সর্বনাশা অবিশ্বাসের সঙ্গে!

উত্তম পুরুষের অতি-উল্লেখ করলেম এই জন্যে যে উপরের এলোমেলো চিন্তাগুলো আমারই নিদ্রাহীনতার সন্তান। আপন গৃহের কোমল শয্যায়ই নিদ্রা আমার অত্যন্ত অল্প, তার উপর দ্রুত ধাবমান গাড়ির গর্জনের সঙ্গে সহযাত্রীর নাসিকা-গর্জন সম্মিলিত হয়ে আক্রমণ করলে নিদ্রা আমার একেবারেই নির্বাসিত হয়। সহযাত্রীদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলেম তাঁরা সবাই ঘুমে অচেতন। আরেক বার নির্মম ভাবে নিজেকে বড়ো একা মনে হোলো।

কিন্তু, যদিও অগৌরবে এক বচন ব্যবহার করেছি এতক্ষণ পর্যন্ত, আমার অবিশ্বাসের, আমার অনিশ্চয়তার, আমার জীবনের অধ্রুবতার সমস্যা বোধ হয় এক মাত্র আমার নয়। বর্তমান শতকের বহু সহস্র ভারতীয় নিশ্চয়ই, জ্ঞাত ভাবে বা অজ্ঞাতসারে, ঠিক এই সমস্যারই সম্মুখীন। জীবন আমাদের সামনে সংগ্রামের নির্দয়তা ও ভয়াবহতা নিয়ে দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে যুদ্ধে লড়াই করব কোন উদ্দেশ্যের নির্দেশে? কোন আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবো? প্রাণ দেবো কোন পতাকার মান রাখতে? বাঁচা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জন্য যে মরবার মতো কোনো মহৎ কারণ নেই আমাদের চোখের সামনে। বাঁচা আমাদের না-বাঁচার 'অলটারনেটিভ' মাত্র, মরা শুধু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। এ দু'টো চরমের মাঝখানে না আছে বৃহৎ কোনো জয়, না আছে মহৎ কোনো পরাজয়! শুধু প্রাণধারণের, শুধু দিনযাপনের গ্লানি!

সামাজিক সোপান-ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের অবস্থিতিটা অবিমিশ্র অগৌরবের। নীচের তলায় কৃষক-শ্রমিক মার্ক্স-মদ্য পান করে তাদের অসামান্য গঠন-শক্তির অপরিমেয় সম্ভাবনার দম্ভে স্ফীত! উপরের তলায় ধনিকের কাছে সে তো একেবারেই হরিজন। না, মানুষের সমাজে মধ্যবিত্ত আরো কিছু দিন হয়তো বাঁচতে পারে, কিন্তু মানুষ হয়ে নয়! গরিবের অরিজন হয়ে, নয়তো ধনিকের হরিজন হয়ে।

কিন্তু আমার এই অন্যথা ব্যর্থজীবনের অস্পষ্ট যেন একটা অর্থ খুঁজে পাই প্রকৃতির পায়ে এসে। আমার আত্মার কী যেন আত্মীয়তা আছে অনাদি কাল থেকে ওই অরণ্যের সঙ্গে, অলঙ্ঘ্য ওই পর্বতের ওপারে বুঝি আছে আমারই অতীতের কোন একটা বিস্মৃত অংশ, অপার সমুদ্রের অদৃশ্য অপর তীরটায় উৎকণ্ঠিত মোর লাগি কেহ যেন প্রতীক্ষিয়া আছে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে আবার যেন ফিরে পাই নিজেকে, আবার যেন পরশ পাই স্পর্শাতীতের, আবার যেন বোধ করি যে সূর্যের তলায় আমারও একটা স্থান আছে, আবার যেন অনুভব করি সেই অদৃশ্য শক্তিকে যার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারিনে কিন্তু অস্বীকারও করতে পারিনে।

পূর্বে যে পট-ভূমির, যে বৃহৎ পরিবেশের কথা বলেছি,—যা না থাকলে জীবন হয় ডাঙায় তোলা নৌকার মতো বিকল বা জলে-পড়া মোটর গাড়ীর মতো অচল—সেই পরিবেশ, সেই পট-ভূমি দিতে পারে গভীর বিশ্বাস, 'ফেইথ'। আর সেই গভীর বিশ্বাসের একমাত্র 'সব্‌ষ্টিট্যুট' হতে পারে 'নেচার', প্রকৃতি। প্রকৃতিতে প্রতিকৃতি আছে সেই "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে"-র, সেই অন্তর জগতের, সেই লোকাতীত লোকের যার নিঃসন্দেহ অস্তিত্বের আভাস মেলে সঙ্গীতের অদেহী মূর্ছনায়, কাব্যের অস্পষ্টতায়। সেই অন্তর জগতের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেয়ে যাঁরা ক্ষান্ত হবেন না তাঁদের উপহাস আজ উপেক্ষা করতে পারি। 'সমস্ত কে জেনেছে কখন?' অনুভূতি প্রমাণ করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। সঙ্গীতের আবেদন শ্রবণের কাছে; যে সেই আবেদনে সন্তুষ্ট না হয়ে বলবে, 'কই কিছু দেখতে পেলেম না তো!' তার কাছে সঙ্গীতের অস্তিত্ব প্রমাণ করব কী করে? ফুলের সৌরভ আছে কি নেই তার প্রমাণ ঘ্রাণেই; কিন্তু যে রসনার পরীক্ষা ছাড় কোনো কিছুকেই পাশ মার্কা দেবে না, তার কাছে ফুল তো অখাদ্য শাক হবেই। অমন প্রমাণে আমার প্রয়োজন নেই। যাকে বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় তাকে বুদ্ধি দিয়েই জানা ভালো। আর, যাকে জানতে হয় হৃদয় দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, তাকে তাই দিয়েই জানতে হয়। তা নইলে জানাই হয় না।

শীতের শিলিগুড়ির জনবিরল ষ্টেশনে নেমেই দূরে তাকিয়ে দেখলেম, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা উজ্জ্বল হয়ে আছে নবোদিত সূর্যের স্বর্ণাভ কিরণ-মহিমায়। একবারও মনে হোলো না যে চিরপরিচিত কলকাতাকে ফেলে এসেছি পশ্চাতে, মনে হোলো যেন বহু দিনের বিদেশ-বাসের পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছি, যদিও এই আমার প্রথম হিমালয় দর্শন। দেশের ঘাটে এসে পৌঁছেছি, বাড়ি পৌঁছতে আর কতক্ষণ! শিলিগুড়ির হাওয়ায় দার্জিলিঙের আমেজ আছে, হিমালয় নামক মহাগ্রন্থের সে ভূমিকা। তারই মধ্যে আমি চিনলেম আমার দার্জিলিংকে। এখানে এসেই শুনলেম সেই অপর-লোকের বাঁশী। কাজ নেই আমার বাঁশরিয়ার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণে। চাইনে আমি তার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ আর গাত্রবর্ণের বিশদ বিবরণী। বাঁশী যে শুনেছি, সেটা তো মিথ্যা হতে পারে না। 'সে কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে'—আর কেউ না শুনলেও।

[ক্রমশঃ।

-প্রচ্ছদপট-

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দিল্লীর লাল কেল্লার দেওয়ানীখাসের আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল।

শিল্পী—সুনীলকুমার গুপ্ত

জিওনলালের কুঠী

[অনুবাদ নয়]

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

দু'দিকে আখ ক্ষেত। তার মধ্যে দিয়ে সারা দিন ট্রেন ছুটেছে। জানলার কাছে সারা দিনটা ঠায় বসে আছে লীলা।

'কি অত দেখছ বৌমা, কপালে যে রোদ্দুরে কাঠ ফাটছে।'

শাশুড়ী ছেলেকে বললেন—'জানলাটা বন্ধ ক'রে দে না পরেশ—বৌমার কপালে রোদ্দুর লাগছে—পড়ন্ত রোদ্দুরটা।'

'না—না, থাক' প্রতিবাদে চনমন উঠল লীলা। আমি সবে বসছি মা। দেখুন—দেখুন, কি সুন্দর!'

'কি সুন্দর, বৌমা?

'গরুগুলো দেখুন। এদিককার গরু-বাছুর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।'

'ঐ গরুর দুধ খেয়ে শরীর সারিয়ে তুলতে হবে কিন্তু।' পরেশ বললে।

লীলার মুখ শুকিয়ে গেল। দু'টি ব্যথা-ভরা চোখ তুলে সে [illegible] স্বামীর দিকে। আর মনে মনে ভাবলে পরেশ—কেন [illegible] দিলুম।

[illegible]-ভারতের প্রান্তরে সন্ধ্যা নামছে। এদিকে মাটির চেহারা [illegible] রকম—মাটির বাড়ীগুলির বড় চেনা নয় লীলার। আর মানুষের [illegible] চেয়ে তার আর বিস্ময়ের শেষ রইল না।

[illegible] কামরায় উঠেছিল নূতন বিয়ে হওয়ার বর-কনে।

[illegible] স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে লীলার যেন আর আশা [illegible] না। তারও কি কোন দিন ছিল অমনি টলটলে মুখের [illegible]! তার হাতের কাঁকন নিটোল সখীত্বে বাজত কি কনকণ [illegible] চুড়ী-বালার সঙ্গে। এক সময় অজান্তেই লীলা হাতখানি [illegible] বাইরে বাড়িয়ে দিয়েছে। শেষ বেলার পড়ন্ত রোদ পড়েছে [illegible] তালুতে, মণিবন্ধে, কনুয়ে। [illegible] চেয়ে দেখছে লীলা। মোটা [illegible] শিরাগুলি হিলহিল করছে। [illegible] কাছে গহ্বর দেখা যাচ্ছে। [illegible] কাছে একটা হাড় ঠেলে [illegible]: হাতের তালুর বড় ফ্যাকাশে। [illegible] মন গভীর হতাশায় ভরে [illegible]।

[illegible] এক দিন ছিল যখন স্বামী [illegible]—'তোমার ও-হাতে লীলা-[illegible] ছাড়া আর কিছু মানায় না।'

সেই থেকে চুপ হয়ে আছে লীলা। [illegible] সারা দিন সে এদের বিরক্ত [illegible] কখন পৌঁছবে বলে। হাজার বার প্রশ্ন করেছে অকারণে।

মা ছেলে দু'জনেই লীলার এই [illegible]-পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। [illegible] আর কথা কননি।

এখানকার রাত্রি বড়ো গভীর। অথচ ঘড়ির কাঁটায় এখনো ন'টা বাজেনি।

টাঙার ঘোড়া ছুটেছে পক্ষীরাজের মত। ঠুং-ঠুং করে বাজছে তার গলার ঘণ্টা। খপ্-খপ্ করে আওয়াজ উঠছে ঘোড়ার খুরের। পাকা চার মাইল ঘোড়া ছুটবে তবে পৌঁছবে তারা জিওনলালের কুঠি।

উপরে বিপুল আকাশের পরিধি। রাত্রির তারা-ভরা মায়া-ভরা আকাশ কত দূর। তাকিয়ে থাকলে চোখে নেশা ধরে যায়।

মস্ত বাগান পেরিয়ে ওরা মোট-ঘাট নিয়ে নামল জিওনলালের কুঠিতে। চাঁদের মৃদু আলোয় সাদা বাড়ীখানির ব্যঞ্জনাটি শুধু চোখে পড়ল। আর কিছু নয়।

পেট্রোমাক্সের আলোয় ঘর চিনে নিল তারা।

লীলাকে নিয়ে সামলাতে পারেন না ব্রজরাণী। অত ভোরে উঠে বাগানে ঘুরে বেড়ানো অবশ্য লীলার স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয়, কিন্তু তাই বলে এই দূর বিদেশে একেবারে প্রথম দিনেই ভোরের কুয়াসা মাথায় করে ঘুরে বেড়ানোর কোন যুক্তি নেই। কিন্তু লীলা সে কথায় কান দেবার মেয়ে নয়। ব্রজরাণীর গলার আওয়াজ কানে যেতেই লীলা গাছের আড়ালে সরে দাঁড়িয়েছে।

সেখান থেকে দেখছে লীলা বাড়ীখানির দিকে।

এক তলার দাওয়াটা অর্ধ-বৃত্তাকারে ঘুরে গিয়েছে। তার কোলে পাশাপাশি তিনখানি ঘর। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরখানি মস্ত। তার ছাদও মস্ত উঁচু। বাড়ীর পিছন দিকে রান্না-ঘর, তা ইতিমধ্যেই দেখে নিয়েছে সে। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে দোতলায়। বাড়ীটির তুলনায় সিঁড়ি সত্যই নগণ্য। দু'পাক খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসেছে। সেখানে উত্তরমুখো ছাদ। তার কোলে আবার ছোট ছোট দু'খানি ঘর। এইখানেই শেষ ভেবেছিল লীলা।

কিন্তু এখন বাগান থেকে চেয়ে দেখল লীলা। দোতলার উপরে তিনতলার ছাদ আছে। কিন্তু তার কোনও সিঁড়ি ত তার চোখে পড়েনি।

সুতরাং ওর রহস্য আবিষ্কার করতে হবে; ছুটল লীলা। লীলাময়ী লীলা।

সারা দিন এমনি করেই কাটল। বিকালে স্বামী বললেন—'চল লীলা' বাজারের দিকে ঘুরে আসি।'

ব্রজরাণী বললেন—'সন্ধ্যার আগেই ফিরিস পরেশ। আর দেখিস, বৌমাকে যেন বেশী হাঁটাহাঁটি করতে না হয়।'

পরেশও টাঙা চাইছিল, কিন্তু লীলা তা হতে দেবে না। বললে—'অমন সাইকেল-রিকশা থাকতে এ টাঙা-এক্কা চড়ো কি করে?' তার পর একটু গায়ে-পড়া ভঙ্গীতে বললে—'রিকশায় কিন্তু বেশ ঠেসাঠেসি করে যাওয়া যায়—না?'

পরেশের দু'টি চোখ আবছা হয়ে এল হঠাৎ জলে। মনে মনে সে সহস্র বার বললে ভগবানের কাছে—'এই মেয়েটির ছোট ছোট আনন্দ তুমি হঠাৎ নিবিয়ে দিও না।'

পথে পড়ল এক ফটোগ্রাফারের দোকান। দেখেই লীলার আবদার হোল—'চলো না গো, ফোটো তুলি। তোমাতে আমাতে কেমন মানায় দেখি।'

'সে ত কতবার দেখেছ, আর নয়।'

তেমনি ঠোঁট ফুলিয়ে লীলা বললে—'তাই বলে বুঝি আর দেখতে নেই?'

নতুন বাঙালী পেয়ে ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক আহ্লাদে গলে গেল। বললে—'রঘুপতি ভালুকদারের নাম সবাই চেনে। ষ্টেশনে নেমে শুধু মুখের কথা খসালেই, মশায়, আমার বাড়ীর দোরগোড়ায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে দেবে। তা আপনারা ছবি তুলবেন? জোড়া না সিঙ্গল?'

মানুষটিকে দেখে পরেশের মোটামুটি ভালই লাগল। তারই মত বয়স। ভালো লাগল যে দেশের মাটি কামড়ে পড়ে না থেকে লোকটি এত দূর-দেশে স্বাধীন জীবিকার খোঁজে এসেছে।

পরেশ বললে রঘুপতিকে—'আমার নয়। একটু চলুন না ওদিকে বলছি।' তার পর লীলার দিকে ফিরে বললে—'তুমি এ্যালবামগুলো দেখো না লক্ষ্মীটি—আমি আসছি।'

একটু আড়ালে গিয়ে বললে পরেশ—'কেমন দেখলেন বলুন তো।'

রঘুপতি একটুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরেশ ভাবলে বুঝি উত্তর দিতে কিন্তু করছেন ভদ্রলোক।

'আপনার কোন লজ্জা নেই। সত্যি যা দেখলেন তাই বলুন না।'

রঘুপতি বললে—'বলার আগে তাই একবার ওঁর দিকে চেয়ে দেখলাম। খুব ভালই। অন্ততঃ চারটে শট ওঁর নেওয়া যায়। প্রত্যেকটাই নতুন এ্যাঙ্গেলে।'

পরেশ বললে—'না—না, তা নয়। ছবির কথা নয়—বলছি চেহারার কথা।'

তখন রঘুপতি বুঝলে যে তারই ভুল হয়েছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে—'অসুখ বুঝি?'

'হ্যাঁ, ওর জন্তেই আসা এত দূর-দেশে। এখানকার জল-হাওয়ায় দেখা যাক, কিছু উপকার হয় কি না।'

পরের দিন রঘুপতি চা খেতে এল এদের সঙ্গে। ছবিও তোলা হোল দোতলার উত্তরমুখো ছাদে।

তার পর থেকে রঘুপতি রোজই আসে। এটা-ওটা গল্প হয়।

এক দিন কথায় কথায় রঘুপতি বললে—'হিমালয় দেখেছেন এক দিনও?'

হিমালয়? তিন জনেই কৌতূহলী হ'য়ে উঠল।

'হ্যাঁ—হিমালয় দেখতে পাওয়া যায় এখান থেকে। ভারতের উত্তর এটা তা জানেন তো? তা ছাড়া আসার সময় ট্রেণ থেকে জঙ্গল দেখতে পাননি? সেই জঙ্গল এখানে তত ঘন নয় কিন্তু সেই জঙ্গল ক্রমশঃ পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছে হিমালয় অবধি। তাকেই ত টেরাই বলে। এখান থেকে ট্রেণে যেতে-যেতে সে জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়।'

লীলা বললে—'আমি জঙ্গল দেখতে যাবো, মা।'

ব্রজরাণী বললেন—'তা দেখবে বৈ কি মা। আচ্ছা, কাল পরেশ তোমায় জঙ্গল দেখিয়ে নিয়ে আসবে। কিছু খাবার করে দেবো, নিয়ে যেও। জঙ্গলে তো খাবার মিলবে না।'

অভিমানে লীলার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সে জানে, এ সব আবদার করা তার আর শোভা পায় না। না চাইতেই সে যা পায় তা বড়ো কম নয়। কিন্তু অসুখ হওয়া অবধি সে কতো অবুঝ হয়ে উঠেছে। নিজে বুঝলেও আবদার না করে সে থাকতে পারে না।

রঘুপতি বললে—'কিন্তু আপনাদের বাড়ীখানি চমৎকার মা। ঐ তিন তলার ছাদে উঠলে হিমালয় দেখা যাবে।'

'তিন তলার ছাতে ওঠবার সিঁড়ি যে নেই।'

তখন লীলার মনে পড়ল, সত্যিই ত সিঁড়ির কথাটা সে একবারে ভুলেই বসেছিল। সিঁড়ি নেই, ত ছাত করেছে কেন?

রঘুপতি উঠে পড়ল। বললে—'আসুন পরেশ বাবু, ছাদে ওঠা যাক্। আপনাকে দেখিয়ে দি, কোন্ জায়গায় হিমালয় দেখতে পাবেন।'

লীলার বুক দুর-দুর করে উঠল। সে ত প্রায় বলে ফেলেছিল, আমিও উঠব। কিন্তু হিমালয় দেখতে হ'লে ঐ ছাতে উঠতে হবে ভেবে সে নিরাশ হয়ে গেল। নিজের বুকের মত ধক-ধক করছে—হিমালয় ডাকছে তাকে। ডাকছে হিমালয়ের টেরাই—বহু ক্রোশ বিস্তৃত ঘন নিবিড় অরণ্য—ডাকছে সে অরণ্যের বাঘ।

পরেশ বললে—'যেতে দিন রঘু বাবু। হিমালয় দেখা কি চাট্টিখানি ব্যাপার!'

রঘুপতি ততক্ষণে কোট খুলে ফেলেছে। হাতের আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে গিয়েছে পাঁচিলের দিকে।

দোতলার দু'খানি ঘরের মাথার উপর তিনতলার ছাদ। এক দিকে টিনের ছাউনি আছে দু'খানি ঘরের শিয়রে। সে দিক

দিয়ে ওঠা সহজ নয়। বিশেষ করে রঘু বাবুর শরীরের ভার টিনের পক্ষে বিপজ্জনক।

সুতরাং চেষ্টা করতে হবে বিপরীত দিক থেকে। একতলার রান্না-ঘরের উপরে একটি ছোট কাঠ রাখার জায়গা। তার উপরে খোলার ঢালু ছাদ। সেই ছাদের কোল ঘেঁসে আধ হাত চওড়া ঢালু ইটের ছাদ।

রঘুপতি সেই কোল ঘেঁসে পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল। বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সে ধরে ফেলল ছাদের কার্ণিস বেয়ে নামা জলের নল। তার পর নলের গাঁটে পা দিয়ে উঁচু হয়ে সে ধরে ফেলল আলসের ফুটো। তার পর এক ঝাঁকুনি দিয়ে এক পা তুলে দিল, ধরে ফেললে আলসের কার্নিসে। সেখান থেকে এক ঝোঁকে ছাদের কার্ণিস—তার পর ছাদে ডিঙিয়ে গিয়ে নামল রঘুপতি। ছাদে দাঁড়িয়ে দু'হাত নেড়ে সে পরেশকে ডাকলে।

'আসুন না পরেশ বাবু। ভিউটা নিয়ে যান।'

'না মশাই, ও আমার দ্বারা হবে না। দেখতে পাচ্ছেন কিছু?'

রঘুপতি তখন চেয়ে আছে উত্তরে। চেয়ে আছে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে উত্তরের দিকে। সন্ধ্যার মৃদু হাওয়া উঠেছে। রঘুপতির এলোমেলো চুলগুলো উড়ছে।

'কি দেখছেন রঘু বাবু—বলুন না।'

লীলার গলা পেয়ে রঘুপতি নীচে তাকাল। বললে—না, পরিষ্কার দেখতে পেলাম না। কেমন যেন আবছা-আবছা।

তার পর ঠিক তেমনি করেই রঘুপতি নেমে এল।

সে দিন রাত্রে লীলা বিছানায় ছটফট করতে লাগল।

কত বার পরেশ বললে—'তোমার কি হচ্ছে বল লীলা।'

লীলা শুধু একবার বললে—'শরীরটা কেমন যেন আনচান করছে।'

পরেশ রাগ করে বললে—'ডাক্তার বলেছিলেন কোনো উত্তেজনা হওয়া চলবে না। অথচ ডাক্তার যেগুলো নিষেধ ক'রেছেন—তুমি ঠিক সেইগুলো করছ।'

লীলা সাড়া দিল না এ কথায়।

এক সময় পরেশ আদর করে বললে—'তুমি জানো না লীলা, তোমার কি দাম আমার কাছে। তুমি আমায় দুঃখ দিও না লীলা। দোহাই তোমার।'

লীলা স্বামীর কাছে সরে এল। বললে—'ডাক্তার ত তোমার কাছে শুতে বারণ করেছেন—সেইটাই কি মানতে পারছি গো। তাতে না কি তোমারও সমূহ বিপদ।'

কত দিন পরে আদর করে পরেশ তাকে বুকের কাছে টেনে নিল। লীলার সারা গায়ে ঘাম দেখা দিয়েছে।

পরেশ জানে, কত নিশ্চিত ধাপে-ধাপে লীলা তার থেকে সরে যাচ্ছে। কিন্তু কি উপায় করবে সে।

অনেকক্ষণ পরে লীলা ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে লীলা, দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে সে, আর পরেশ তিনতলার ছাদ থেকে তাকে ডাকছে হাত-ছানি দিয়ে। বলছে, ভয় কি লীলা, চলে এস। বেশ ত ভোরের আলো উঠেছে। পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসো—তার পর জলের নলটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড় কার্ণিসের ধারে। তার পর আলসের ফুটোতে হাত দিয়ে একবার যদি আলসের ধারে হাত দিতে পারো, আমি ত আছি। পালকের মত হালকা তোমায় তুলে নেবো একেবারে বুকের কাছে। চলে এস লীলা। ওখানে হিমালয় দেখা যাচ্ছে। দিগন্ত জুড়ে পাঁচিলের মত হিমালয়। তোমার বুকের মত ঠাণ্ডা তার গা।

ঘুম ভাঙতেই সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল লীলার। ব্লাউজ গা থেকে খুলে ফেলে সে উঠে বসল বিছানায়। বুকের মধ্যে ধক-ধক করছে যেন হাপরের মতো।

সকালে ব্রজরাণী অবাক্ হলেন। 'এক রাত্তিরে এ কি চেহারা হয়েছে, তোমার, বৌমা? কাল রাত্তে কি শরীর খুব খারাপ হয়েছিল?'

'না মা।' বলেই লীলা আড়ালে সরে গেল। মনে মনে সে হাসলে। কাল সারা রাত তার শরীরের যত কষ্টই হয়ে থাক না কেন, কাল রাত্তে যে আনন্দ সে পেয়েছে, অনেক দিন তা পায়নি। গভীর ঘুমে অচেতন স্বামীর দরাজ বুকের কাছে পাখীর মত শুয়েছিল সে। তার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে নির্ভয় আশ্রয় দিয়েছিল স্বামীর দু'খানি বাহু। কী অপূর্ব শান্তি পেয়েছিল সে।

বাগানে নেমে খানিক পায়চারি করে বেড়াল লীলা। তার পর সূর্যের আলো উজ্জ্বল হোল চারি দিকে।

এখানে নীচু-নীচু গাছগুলির গায়ে পথের ধুলো বড়ো বেশী লাগে। কেমন যেন ধুলোর রঙ ধরে পাতায় শাখায়।

কিন্তু যে গাছগুলি মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠে ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে—ডিঙি মেরে দেখতে চায় দিগন্তের ওধারে আর এক রহস্যময় জগতের দিকে, তারা এক অবাক্-বিস্ময় লীলার কাছে।

বাগানের সান-বাঁধানো বেদীতে শুয়ে পড়ে ঝক্‌ঝকে রোদ্দুরের দিকে চেয়ে থাকে লীলা।

পরেশ আসছে তাকে খুঁজতে, দেখে উঠে পড়ল লীলা। বললে—'আজ চলো না গো, ওদিকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

পরেশ বললে, 'আজ থাক। তোমার শরীর কেমন বোধ হচ্ছে লীলা?'

লীলা একবার ভাবলে. স্বপ্নের কথাটা স্বামীর কাছে তোলে। কিন্তু ভেবে বললে না সে। কাল যদি স্বামী উঠতেন তেতলার ছাদে রঘু বাবুর সঙ্গে—অন্ততঃ স্বামী ত বলতে পারতেন কেমন দেখতে হিমালয়।

হিমালয় কখনো দেখেনি সে। ভারতের উত্তরে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়। হিমালয়—দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়। বিরাট হিমালয়। মহৎ হিমালয়। স্বপ্নে শোনা তার বুকের মত ঠাণ্ডা হিমালয়।

তার পর থেকে দিন-রাত্তির তার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রইল হিমালয়।

স্বামীর সঙ্গে এক দিন উত্তরে বহু দূর অবধি বেড়িয়ে এসেছিল সে, কিন্তু হিমালয় এক দিনও সে দেখতে পায়নি। দিগন্ত-ঘেঁসা বনস্পতিদের সারি আড়াল করে রেখেছে হিমালয়কে। সামান্তদের স্বার্থপরতায় মহৎ আড়াল পড়ে গেছে।

এ আচ্ছন্নতা বাড়ে বিশেষ করে যখন রাত গভীর হয়ে আসে।

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে চারি দিক্ কেমন ঝম্ ঝম্ করতে থাকে। তখন নিজের বুকের মধ্যে লীলা অনুভব করে হিমালয়কে। বুকে হাত দিয়ে সে স্পর্শ নেয় হিমালয়ের। আর স্বামীর ওপর তার মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, কেন তিনি এক দিন উঠলেন না তিন তলার ছাদে—যেমন এক দিন স্বপ্নে দেখেছিল লীলা। তাহলে সে ত জানতে পারত, স্বামীর চোখে দেখতে পেত হিমালয়ের বিরাট মহিমা।

তবু এখানকার হাওয়ায় জলে আহার্যে কি যেন যাদু ছিল, যা লীলার ক্ষয়িষ্ণু শরীরকে রস যোগান দিল। আর সে রস প্রাণদাত্রী। স্বামী তার দিকে চেয়ে থাকেন দেখেছে লীলা। দেখেছে সেই চোখের স্নেহ-ভরা আনন্দ-ভরা চাওনি। কত দিন পরে স্বামীর চোখে আবার প্রেম প্রত্যক্ষ করে সে। আর নিজের শরীরের মধ্য থেকেই লীলা খুঁজে পায় আপন আনন্দকে—বাঁচার আনন্দকে।

ব্রজরাণী এক দিন বললেন—'জান বৌমা, তোমার শরীর আর একটু ভালো হলেই আমরা দেশে ফিরে যাব। এ বিদেশ-বিভুঁয়ে বাবু, আর মন টিকছে না।'

সে কথায় লীলাও নীরবে সায় দেয়। লীলা আবার ফিরে যেতে চায় তার নিজের ঘরে। জিওলগাছের কুঠি চমৎকার সন্দেহ নেই, কিন্তু চেনা-জগতে যেখানে এক দিন একটি অপরিচিত মেয়ে জন্মান্তরের একটি সাথীর হাত ধরেছিল, সেইখানেই ফিরে যেতে চায় সে। স্বামীকে—সংসারকে ফিরে নিতে চায় চেনা পরিবেশের মধ্যে।

এমনি করে বিদায়ের দিন আসে।

যাবার আগের দিন বনপতি বিদায় জানাতে আসে।

নানা কথার পর আবার সে বলে—'চলে যাচ্ছেন পরেশ বাবু, কিন্তু হিমালয়টা দেখে গেলেন না। পরে দেখবেন, এ নিয়ে আপনাকে আফশোষ করতে হবে।'

পরেশ হাসলে। বললে—'হিমালয় ত শুধু ঐ শিখরেই নেই বনু বাবু—হিমালয় এ সমতলেও ত আছে। তা ছাড়া, হিমালয় ত আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। দেখা যাবে এক সময়।

পরের দিন ব্রজরাণী খুব ভোরে উঠলেন। অনেক কিছু বাঁধা-ছাঁদা করতে হবে। বহু দিন রয়েছেন, রীতিমত একটি গৃহস্থালী গড়ে উঠেছে তিনটি প্রাণীকে কেন্দ্র করে।

ভোরের আলোয় বাগানে নেমে দু'টি হাত জোড় করে কপালে তুললেন ব্রজরাণী। মনে মনে বললেন—'বৌমাকে যে সুস্থ করে নিয়ে যেতে পারছি, সে তোমারই দয়া ভগবান। একটি ছেলে আমার, তার শোক দেখবার আগে আমার চোখ তুমি বুজিয়ে দিও।'

দোতলার ছাদে উঠে এলেন ব্রজরাণী। উপরের দু'টি ঘরের একটিতে থাকে পরেশ আর লীলা। আর একটিকে তিনি করেছেন ঠাকুর-ঘর।

আর এমনি ভোরবেলায় ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এই ঠাকুর-ঘরের সামনে দাঁড়ালে মন কি যে আনন্দ পায় যেন আর তুলনা নেই।

একবার চারি পাশে তাকিয়ে দেখলেন ব্রজরাণী। তার পর হঠাৎ তার নজর গিয়ে পড়ল তিন তলার ছাদের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠলেন ব্রজরাণী।

তিন তলার ছাদের আলসেতে একটি হাত—কার্ণিসের ধারে একটি পা, আর জলের নলের গাঁটে আর একটি পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লীলা। অপূর্ব দেখাচ্ছে তাকে। যেন আলসের ধারে গলাটি বাড়িয়ে সে দেখছে কাকে। ভোরের হাল্কা হাওয়ায় চুলগুলি উড়ছে। গায়ের এলোমেলো কাপড় উড়ছে আলতো ভাবে। দেখে মনে হোল ব্রজরাণীর যেন লীলা চাপা হাসি হাসছে।

'কি দজ্জাল মেয়ে তুমি বৌমা? নেমে, এস।' হাঁক দিলেন ব্রজরাণী।

কিন্তু লীলা মুখ ফেরাল না। শুধু মনে হোল ব্রজরাণীর যেন হাসির ঠমকে লীলার সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে উঠল।

ব্রজরাণী দরজাটা খুলে ফেললে। ছেলের গায়ে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুললেন তাকে। বললে—'দেখে যা বৌমার কাণ্ড।'

ঘুমন্ত চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এসে দাঁড়াল পরেশ।

দেখলে সে। ধ্যানমগ্নের মত লীলা দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ ভঙ্গীতে। তার চোখ দূর উত্তরের দিকে। যে দিকে হিমালয়।

মা ছেলে একসঙ্গে ডাকলে। 'বৌমা! লীলা! নেমে এসো। অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না। পড়ে যাবে। নেমে এস শীগ্‌গির।'

কিন্তু লীলা সাড়াও দিল না। মুখও ফেরাল না।

তখন পরেশ সেই দুঃসাহসের কাজ করলে।

সেই ঢালু ছাদ পা টিপে-টিপে উঠে গিয়ে, জলের নলটা ধরে ফেললে সে। তার পর একটু উঁকি মেরে লীলার সাড়ীর প্রান্ত ধরে টানলে।

ব্রজরাণী বললেন—'বৌমা, মুখ ফেরাও মা। কেন অমন করে দাঁড়িয়ে আছ? পরেশ যে তোমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।'

পরেশ বললে—'তুমি আস্তে আস্তে নেমে পড় লীলা। তোমায় ধরে নিচ্ছি আমি। তোমার কি ভয় করছে লীলা? কোন ভয় নেই।'

নিষ্ঠুরা লীলা সাড়া দিল না।

সুতরাং আরো দুঃসাহস করলে পরেশ। জলের নলের গাঁটে পা দিয়ে সে-ও আলসের ফুটো ধরল। তার পর এক ঝাঁকুনি দিয়ে কার্ণিসে পা তুলে দিল, আর সেই সঙ্গে আলসের ধার চেপে ধরে সে লীলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখলে পরেশ।

আলসের ধারে থুতনিটি লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লীলা। চোখ দু'টি আধ-মুদিত। যেন হিমালয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছে সে।

আর দেখলে পরেশ।

সমুখেই দিগন্ত-জোড়া হিমালয়। বিরাট মহৎ দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়।

আর লীলার বুকে হাত দিয়ে দেখলে পরেশ। সে বুক হিমালয়ের পাথরের মতই ঠাণ্ডা।

—চিত্ত দাস

মানুষের কবি নজরুল

আবুল কালাম শামসুদ্দীন
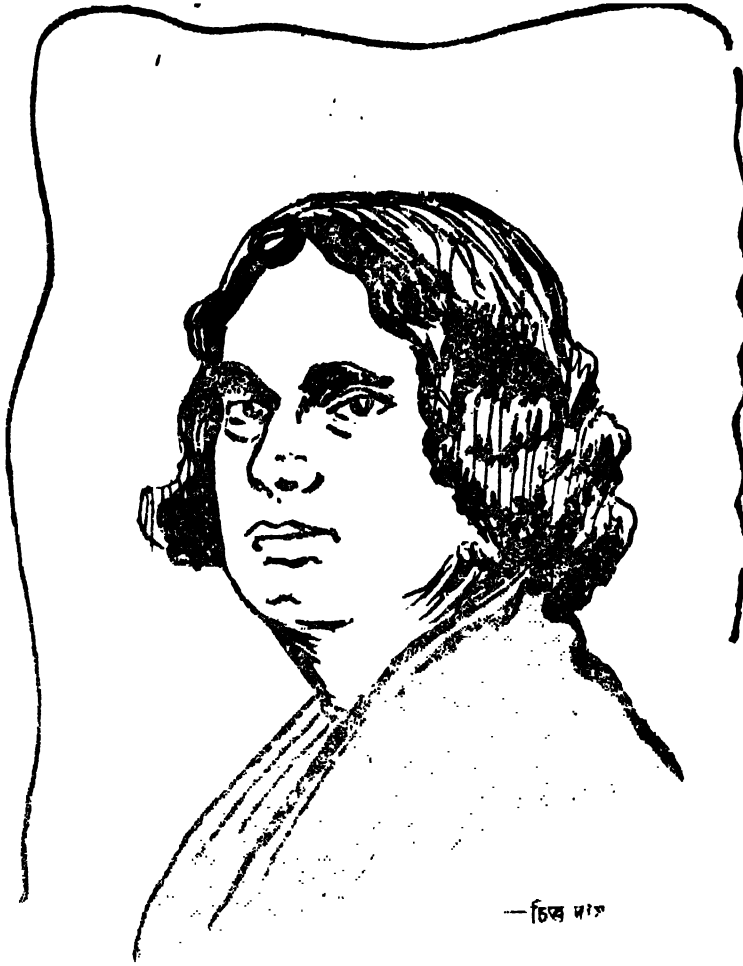
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যদিও বর্তমান বাংলা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা বহুল আলোচিত কবি, তবু একথা সত্য যে তাঁর কাব্য-বিচারের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি। সমগ্র ভাবে তাঁর রচিত কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির পশ্চাতে যে কবি-মানস বিরাজমান কিংবা তার আবেগ-অনুভূতির পশ্চাতে যে বোধ-চেতনা সক্রিয় তারো কোনো গুণ-বিচার অথবা বিশ্লেষণও এখনো পর্যন্ত অনুপস্থিত। অথচ আজ হিন্দু, মুসলমান নামধারী দুই সম্প্রদায়ের হানাহানি ঝগড়া-ঝাঁটিতে যখন সমস্ত জীবনে অসুন্দরের তাণ্ডব শুরু হয়েছে, সেই কালে নজরুল যে জীবন-সুন্দরের আরাধনায় ধ্যান, মন উৎসর্গ করেছিলেন, তার রূপ-বিশ্লেষণ ও আলোচনার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিলো।

অবশ্য সমালোচনার নামে অথবা হয়তো নজরুলকে সম্মানিত করার অকপট অভিপ্রায়েই এক শ্রেণীর লোক তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলে অভিহিত করার চেষ্টা করছেন। যেন নজরুল একান্ত ভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের কিংবা মুসলমানদেরই কবি, অন্য কোনো দেশ বা সম্প্রদায়ের তিনি কেউ নন। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় উক্তি অত্যন্ত আবেগময় হলেও খুবই সংকীর্ণতার পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথকে যদি হিন্দুদের কবি অথবা বাংলা দেশের কবি বলি, তাহলে যেমন হাস্যকর শোনাবে, তেমনি যে কোনো বড়ো শিল্পী বা সাহিত্যিক সম্বন্ধেও। সাহিত্যিক বা শিল্পীমন এমন এক রসোপলব্ধিক্ষম মন, যার হিন্দু-মুসলমান জাত নেই। সত্যিকারের যে কবি বা সাহিত্যিক, তাঁর মনে যে কেবল হিন্দু অথবা মুসলমানের দুঃখটাই বাজবে অন্যের দুঃখ-ব্যথা-বেদনা সম্পর্কে তিনি উদাসীন থাকবেন তা কোন কালেই হতে পারে না। বিপুল বিশ্বের যে বিচিত্র জীবন তাঁর সম্মুখে প্রসারিত, তাঁর মন ও মানস তার কোন অংশকে গ্রহণ এবং কোনো অংশকে বাদ দিতে পারে না। সমগ্র ভাবে জীবনকে নিজের বুদ্ধি ও অনুভূতির সঙ্গে জারিত করে নিতে না পারলে তাঁর সাহিত্যিক-মনই অসম্পূর্ণ। ফুল বা চাঁদ দেখে ভাবোদয় হওয়া মানেই কবিত্ব জাগা নয়। কবিত্ব মন ও মানসের এমন এক পর্যায়—যেখানে মনুষ্য আবহমানকালের চির আরাধ্য সুন্দরের রূপ প্রতিভাসে সমগ্র চিত্তলোক উদ্‌ভাসিত। এই জীবন সুন্দরের দর্শনলাভ বহু সাধনা-সাপেক্ষ। জীবনকে ভালো করে না জানলে, না দেখলে, তার প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্য-কারণকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে তার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃথা।

এ আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে থাকে। কিন্তু বুদ্ধি ও অনুভূতির মান অনুসারে আকুলতার রকম বিভিন্ন। আমাদের এ ধ্যান-কামনা থাকলেও, বুদ্ধি ও অনুভূতিবোধ অতো তীব্র নয় বলেই আমরা সাধারণ জীবনের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে রাখতে পারছি। কিন্তু যিনি এর ব্যতিক্রম, এ জীবনের ক্লেদাক্ত পরিবেশ, তার অন্যায় বিধি-বিধানকে, জীবনের নানাবিধ লীলা-বৈচিত্র্য প্রভৃতিকে যিনি সাহসের সঙ্গে স্বীকার বা অস্বীকার করেন, তিনিই সত্যিকারের কবি।

বলা বাহুল্য, নজরুলও এঁদেরি সমগোত্রীয়। এ গোত্র সকল হিন্দু বা মুসলমানের নেই। এ গোত্র মানুষের, যা বর্তমানে একান্ত দুর্লভ।

২

সত্যিকারের কবি-মন ছিলো বলেই শ্যামা-সঙ্গীতের সাথে সাথে ইসলামী গানও নজরুল লিখেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি চরিত্র অতি দরদী মন দিয়ে তিনি এঁকেছেন।

যে বিপুল প্রাণবন্যা তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে প্রবহমান, তা একান্ত দুর্লভ। বাংলা দেশের মাটিতে আকাশে-বাতাসে এমন সৃষ্টি কিছুটা অস্বাভাবিক। এ দেশ চিরদিনই গীতি-কবিতা বা ধর্মানুসারী কাব্য মারফৎ ভগবৎ-চরণে আত্মনিবেদনই করে এসেছে, 'ভগবান-বুকে ভৃগুচিহ্ন' এঁকে দেবার মতো অকুণ্ঠ সাহস তাঁর ছিলো না। অন্যায়কে, অত্যাচারকে চিরদিনই এ দেশ সয়ে এসেছে, বিদ্রোহ করেছে এমন নজীর দুর্লভ। নজরুলের কাব্যে প্রথম সে সুর বেজেছে। তাঁর মতো দৃপ্ত বীর্যভরা গান আর কেউ গাইতে পারেননি। এতো প্রাণ, এতো উদ্দীপনা, শোনা যায়নি আর কারো কণ্ঠে। আমাদের বর্তমান সমাজ জীবনে তাই তাঁর মূল্য

নাগশিশু নজরুল ইসলাম

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিদ্রোহী তব গান
যুগ-সূর্য্যের মুক্তি এনেছে শোষণের অবসান।
"অগ্নি-বীণা"র নিদ্রিত তারে
অঙ্গুলি তুলি সুর-ঝংকারে
ভৈরব তুমি রুদ্র দীপকে করেছিলে আহ্বান।

নির্জীব ওই মৌন লেখনী করি তারে তরবার
চুর্ণিলে তুমি নির্মম হয়ে মহীরুহ দীনতার।
উন্মাদ হয়ে আক্রোশ ভরে
ধ্বংস জাগালে সুপ্তের ঘরে
কলংক মুছি রক্ত-তিলকে লিখে দিলে বরাভয়
বীর্য্যহীনার বন্ধ্যা জঠরে বীরের অভ্যুদয়।

ঋত্বিক ভৃগু বণিক্-বক্ষে পদাঘাত শেষে হানি
করে সার্থক স্বপ্ন তোমার কাঙ্ক্ষিত তব বাণী।
জীর্ণ মেখলা ঝংকার বুকে
লুণ্ঠিত হয় কুণ্ঠিত মুখে
অস্ত আলোর রশ্মি আবার ভাসায় পূর্বাচল
তবু বিদ্রোহী মুক্ত প্রভাতে ঝরিছে অশ্রুজল।

"ক্ষমা কর হজরথ
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ তোমার যেথান পথ
যবে হিংসায় মগ্ন চেতনা
লুপ্ত করিল সর্ব সাধনা
আত্মঘাতী সে সংগ্রামে দেখি খোদারে প্রশ্ন করি
করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অন্তরে ব্যথা ভরি।

বিদ্রোহী কবি সৈনিক বীর স্বাধীনতা এল যবে
লক্ষ শ্মশানে রাক্ষসী চিতা পূর্ণ হয়েছে শবে।
পুণ্য কোরাণ পবিত্র বেদে
বক-ধার্মিক বীভৎস ক্লেদে
চির কলংক করে অংকিত অতীতের দিন সম
তুমি উন্মাদ বন্দী গৃহেতে দেখি চির অক্ষম।

তবুও মুক্তি বিজয় গর্বে খণ্ডিত এই দেশে
ঊর্দ্ধে উড়াল রক্ত নিশান দুর্য্যোগ নিশা শেষে।
প্রশ্ন শুনেছে মৌন দেবতা
মঙ্গল গীত উচ্চারি হেথা
সৃষ্টির বীজ করিতে উপ্ত ভারতের চারি ভিতে
কাণ্ডারী তব পুণ্য প্রেমের সুমহান্ সংগীতে।

তবুও অশ্রুজল
ব্যর্থ করিছে জন্মদিনের উৎসব-কোলাহল।
দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি
তীব্র ব্যথায় অন্তর ভরি
অকালে মুছি আঁখির অশ্রু ফিরে আসি ম্লান মুখে
তুমি উন্মাদ বন্দী গৃহেতে বেদনা বহিছ বুকে।

অপরিসীম। সেদিক থেকে মনে হয়, নজরুল যেন বিশেষ ভাবে এই যুগেরই কবি। লাঞ্ছিত সমাজেরই তিনি মুখপাত্র। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ-ভঙ্গির অসংযম, কিংবা তারল্য সত্ত্বেও নজরুল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত দেশের মন, বিশেষ করে যুব-মনকে নিজের দিকে এতো তীব্র ভাবে আকর্ষিত করে নিতে পেরেছেন। বাংলা দেশ তার গান গেয়ে গেয়েই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, হাসিমুখে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কারাবরণ করেছে, দিয়েছে স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মাহুতি।

তিনি তাদের কবি যারা এ জীবনে মনুষ্যত্বের সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী। যারা আগামী দিনের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সুন্দরের দেশ গঠনে অভিলাষী। মানুষের কবি সেই কাজী নজরুলকে আমরা প্রণাম জানাচ্ছি।

আমার শেষ যাত্রা

লুইগী পিরানদেলো

মাঝ রাত্রে ঘুম থেকে চমকে উঠে দেখলাম, আমার কামরা থেকে ছোট একটা রেল-ষ্টেশনের কাছাকাছি লাইনের পাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছি।

আমি একাই আছি এবং সঙ্গে কোনও মালপত্র নেই।

আশ্চর্য্য না হয়ে পারা যায় না, কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, আমার গায়ে একটু আঁচড় পর্য্যন্ত লাগল না বা কিসে এই সব ঘটল তার কিছু হদিসও পেলাম না।

দেখলাম, ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা ষ্টেশনের কাছে মাটির ওপর একলা পড়ে আছি, সেখানে এমন এক জন লোকও নেই যার কাছ থেকে কোনও নির্দ্দেশ বা সাহায্য পেতে পারি।

আরও দুঃখের বিষয় এই যে, আমি নিজে এখনও পর্য্যন্ত বুঝতে পারলাম না কেন এই যাত্রা করেছিলাম : এখানে পড়বার সময় কোন্ শহর থেকে যে আমি আসছি অথবা কোন্ শহরের দিকে চলেছি তার বিন্দুমাত্র ধারণাও হয়নি। এমন কি, এই যাত্রার উদ্দেশ্য কিম্বা আমার সঙ্গে কোন তল্পিতল্পা ছিল কি না তারও কিছু জানি না। সঙ্গে যখন কোন জিনিষ নেই তখন মনে হয় আগেও কিছু ছিল না।

রাতটা এত অন্ধকার যে ষ্টেশনের নামটাও পড়তে পারলাম না। তবে আগে যে এখানে কখনও আসিনি সে বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত।

ষ্টেশনের বাইরে বিস্তৃত চত্বরটা পরিত্যক্ত ও জনশূন্য। কেবল এক কোণে একটি মাত্র আলো তখনও জ্বলছে। সত্যিই বেঁচে আছি কি না পরীক্ষা করে দেখবার জন্তে আলোর দিকে এগিয়ে চললাম। হাত দু'টো তাড়াতাড়ি গায়ের ওপর চলতে থাকল এবং এই নিশুতি রাতে একমাত্র আমিই যে সেই অজানা পরিত্যক্ত শহরের মধ্যে হেঁটে চলেছি তার কোনও সন্দেহই রইল না।

এখানে ভোর হ'তে আর দেরী নেই। কিছুক্ষণ সময় এমনিই কেটে গেল। সূর্য্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আস্তে আস্তে শহরের দিকে হেঁটে চললাম এবং এমন সব জিনিষ দেখতে পেলাম, যা আমাকে আশ্চর্য্য করে দিত যদি না এই দেখে আরও বেশী আশ্চর্য্য হতাম যে আমার মত অন্য লোকও তখন সম্পূর্ণ অনায়াসে ও অবাধে শহরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন তারা সবাই নিজেদের কার্য্য সম্বন্ধে সচেতন এবং তারা জীবনের স্বাভাবিক পথ-রেখায় অগ্রসর হচ্ছে।

ভিড়ের ঠেলায় আমি এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম : তবু কি যেন একটা পিছন থেকে আমাকে টেনে ধরল যাতে বেশ বিরক্ত ও অস্বস্তি বোধ করলাম। নিজের সম্বন্ধে বা আমি কে এবং কোথায় চলেছি তার কিছুই জানি না। ওরা কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ও নিজেদের গতিবিধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত। অবশ্য এ সব আমারই দোষ, ওদের কিছু নয়, কিন্তু যতই আমি ওদের মত কিছু করতে চেষ্টা করি না কেন, বার বার কি যেন একটা জিনিষ পিছন থেকে টেনে ধরে আমাকে অসহায় ও দুর্ব্বল করে দেয়। এ-ও কি সম্ভব যে, কোন কিছু কাজ না করেই আমি বুড়ো হয়ে গেলাম? যদিও নিশ্চয় জানি যে এক দিন আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি—অমানুষিক পরিশ্রম। তবে কি এ-সব কেবল স্বপ্নেই হয়েছে? তা না হলে আর সব লোকেরা কেন আমার কাজ জানে এই ভাব দেখায় এবং আমি যখন তাদের পাশ দিয়ে চলে যাই, তখন আমার দিকে ফিরে চায় বা মাথার টুপি খুলে আমায় অভিবাদন জানায়? ওরা কি আমায় অন্য লোক ভেবে ভুল করে? কিন্তু কই, আমার সামনে বা পিছনে কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তবে কেন ওরা আমায় চিনতে পেরেছে এই ভাব দেখায় এবং এই শহরে, যেখানে আমি আগে কখনও এসেছি বলে মনেই হয় না, আমাকে সাদরে অভিনন্দন জানায়? আমি অন্য কারও পোষাক পরেছি না কি? সেই বা কেমন ক'রে সম্ভব, কাছে তো আমার কোন তল্পি-তল্পাই নেই?

আবার আমার হাত দু'টো তাড়াতাড়ি শরীরের চারি দিকে অনুসন্ধান করতে করতে লক্ষ্য করল যে, ভেতরকার পকেট থেকে

কি একটা শক্ত জিনিষ বাইরের দিকে ফুলে উঠেছে। এ একটা পুরান ব্যাগ, বেশী ব্যবহার করার দরুণ এর রংটা হয়ে গেছে একেবারে বিবর্ণ এবং দেখলে মনে হয়, যেন বহু দিন জলের ভেতর পড়ে ছিল। এ জিনিষ আমার হ'তেই পারে না : এ রকম ব্যাগ কখনও আমার ছিল ব'লে মনেই হয় না। খুব সন্তর্পণে আমি তার জলে জুড়ে যাওয়া ধার দু'টো খুললাম। জলের স্রোতে মুছে যাওয়া এবং প্রায় পাঠ-সাধ্যাতীত কয়েক খানা চিঠির মধ্যে এমন একটা ছোট পবিত্র মূর্ত্তি দেখতে পেলাম, যা ছেলেবেলায় প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় উপহার পেতাম। এর উল্টো পিঠে সমান মাপেরই একটা ছবি আটকান আছে। স্নানের পোষাক-পরিহিতা একটি সুন্দরী তরুণীর ছবি, যে বাতাসের দিক্ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মিতালীর সাদর সম্ভাষণে আমার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি যখন সেই সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকালাম, তখন নিশ্চিত না হলেও আমার মনে হল যে, সেই সখ্যতাপূর্ণ হাসি এবং সাদরে প্রসারিত সেই দুই হাত প্রকৃত পক্ষে আমাকেই নির্দ্দেশ করছে। তবু যতই প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করি না কেন, আমি যে তাকে কখনও দেখেছি এ কথা আদৌ স্মরণ হল না। এ-ও কি কখনও সম্ভব যে এই রকম সুন্দরী প্রাণী ঝড়ে খসে-পড়া পাতার মত আমার মন থেকে মুছে যাবে? এই মেয়েটিকেই তো আমি জীবনসঙ্গিনী-রূপে গ্রহণ করব ব'লে মনস্থ করেছিলাম, নইলে তার ছবিটা কেন এই পবিত্র মূর্ত্তির পিছনে রাখতে যাব?

আরও কিছু অনুসন্ধান করবার পর সেই ব্যাগের গোপন কোণ থেকে পরিষ্কার ভাবে ভাঁজ-করা ও জলে সামান্য মাত্র নষ্ট হওয়া একটা পুরান ব্যাঙ্ক-নোট বার করলাম। এর বিবর্ণ চেহারাটা দেখলে মনে হবে, যেন অনেক বছর ধ'রে এটা জলের ভেতর সুপ্ত ছিল। এই নোটটা মোটা অঙ্কের টাকার নোট, কিন্তু সম্প্রতি এর বাজারে চলন বন্ধ হয়ে গেছে। এটা বাস্তবিকই আমার কি না সন্দেহ হয়; তাছাড়া আমার কাছে যখন এক পয়সাও নেই, তখন এটা খরচ করা উচিত হবে কি না ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। নিকটেই একটা রেস্তরাঁ দেখতে পেয়ে কিছু খাবার ইচ্ছা হ'ল। আশ্চর্য্য এই যে, দোকানের ম্যানেজার আমাকে দেখেই চিনতে পারল এবং বড় বড় ক্রেতাদের মত খাতির আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু আমি তাতে বসতে রাজী হলাম না। সবার আগে আমি সেই নোটটার কথা জানতে চাইলাম। তার অচলতার কথা ম্যানেজার উল্লেখ করল, কিন্তু সে এ-ও জানাল যে আমার মত খ্যাতনামা ও সুপরিচিত লোককে ব্যাঙ্ক তার প্রচলিত রীতি বাদ দিয়েও নোটটা ভাঙ্গিয়ে দেবে। পরে সে আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে গেল এবং সেখানে আমার নোটটার বদলে এত বড় একটা তাড়া পাইয়ে দিল যা আমার ছোট ব্যাগটায় রাখা অসম্ভব। আমি হেঁটে রেস্তরাঁয় ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে আমি যে কপর্দ্দকহীন নয় এ-কথা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কেন না, বাইরে এসে দেখলাম যে চালকশুদ্ধ একটা বড় মোটর গাড়ী আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, চালকের হাতে টুপি রয়েছে এবং সে আমার ওঠবার জন্যে গাড়ীর দরজাটা খুলে রেখেছে।

কোথায় যে সে নিয়ে যাবে তা আমি জানি না, কিন্তু মনে হল যে, গাড়ীটা যখন পাওয়া গেছে তখন একটা বাড়ীও নিশ্চয়ই মিলবে। হাঁ, আমার একটা বাড়ী আছে বটে—একটা পুরান ধরণের জায়গা, যেখানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা এক দিন বাস ক'রেছে এবং বোধ হয় আমার উত্তরাধিকারীরাও পরে বাস ক'রবে। কিন্তু এই সব ভারী আসবাবগুলো কি আমার? জায়গাটাও আমার ঠিক স্মরণে আসছে না। সেখানে আমি এক জন আগন্তুক, প্রায় অনাহূতেরই সমান। এমন কেউ নেই যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি। সবই ফাঁকা আর নগ্ন দেখাচ্ছে, ঠিক যেমন কাল রাত্রে যখন ষ্টেশনের বাইরে প'ড়েছিলাম, তখন সমস্ত শহরটা নিস্তব্ধ ও শূন্য মনে হচ্ছিল। আমি নিজেকে আরামে রাখতে চেষ্টা করি, কিন্তু দুঃখময় বিষাদে মন ভ'রে ওঠে। আমি নিজেকে আর এই রকম ভেঙ্গে পড়তে দেব না, এই ভেবে ঘরের ভেতর ঢুকে যখন পায়চারি করছি, তখন হঠাৎ একটা দরজা খুলে গিয়ে এক আলো-ভরা শোবার ঘর দেখা গেল। সেখানে বিছানার ওপর ফটোর সেই সুন্দরী মেয়েটি শুয়ে আছে এবং তার নগ্ন হাত দু'টো সাদরে আমার দিকে বাড়ান রয়েছে। আমার কোন সন্দেহ রইল না। মেয়েটি নিশ্চয়ই বেঁচে আছে।

কিন্তু কোথায় সে অন্তর্হিতা হয়েছিল?

এ সব কি তবে স্বপ্ন মাত্র?

সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলাম, সে পালিয়েছে। এই বিছানাটা রাত্রে বেশ গরম ছিল, এখন তা কবরের মত বরফে পরিণত হয়েছে। কোথায় সে গেল? আবার আমি একা। আমার চারি দিকেই সেই—জায়গার পচা দুর্গন্ধ ছাড়ছে, জীবন যেখানে নির্ব্বাপিত;—পুরান ও বিস্মৃত আসবাবের গন্ধ।

এ আমার বাড়ী হতেই পারে না। আমি একটা দুঃস্বপ্নের বলি হয়েছি। আমি যে একটা উন্মাদ স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে চলেছি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কোন রকমে নিজেকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বিপরীত দিকের ঝুলান আরসিতে চেহারাটা একবার দেখে নিলাম। এ কি সত্যি হতে পারে? ঐ বর্ষীয়ান্ মুখটা কি আমারই মুখ? ঐ কি আমার আসল রূপ? কবে আমি এত বুড়ো হলাম? হঠাৎ কেনই বা এ রকম হল? এ কি কখনও সম্ভব? না, এ আর একটা স্বপ্ন?

দরজায় একটা ঘা পড়ল। এক জন এসে জানাল যে আমার ছেলে-মেয়েরা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমার ছেলে-মেয়ে?

আমার যে কোনও ছেলে-মেয়ে আছে এ কথা ভাবতেই ভয় পায়। কবে আমি বিয়ে করলাম? কবেই বা তারা জন্মাল? তবে কি গত কাল যখন আমি বয়সে নবীন ছিলাম? যদি তাই হয়, তাহলে আমি এখনই সানন্দে তাদের সঙ্গে দেখা করব। তারা ঘরের ভেতর এসে ঢুকল, কোলে তাদের নিজেদেরই ছেলে-মেয়ে। সবাই আমার-কাছে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে আমাকে ধ'রে একটা আরাম কেদারায় বসিয়ে দিল এবং তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াতে বকাবকি করতে লাগল। তারা বলল, এই বয়সে এবং এত রকম অসুখ নিয়ে আপনার আরও সাবধানে থাকা উচিত। কেমন ক'রে তারা জানতে পারল? আমার বয়স কত তা কি তারা জানে? কেমন ক'রে জানল যে আমি আর নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি না?

আরাম-কেদারায় বসে বসে আমি তাদের দিকে তাকাই এবং

পুনর্মূষিক

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

[আসামের জঙ্গলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের 'ডাইনোসর' জাতীয় এক অতিকায় প্রাণীকে দেখা গেছে—এই মর্মে সংবাদপত্রে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল কিছুদিন পূর্ব্বে,—তাহারই উপর কবিতাটির ভিত্তি।]

সত্যি এসেছ তুমি ?
আসামের ঘন গহন বনের নিবিড় অন্ধকারে
লুকিয়ে যেথায় শিহরায় গাছগুলো,—
অতীত দিনের স্মৃতি-বেদনায়
গুমোরিছে যারা আজো,—
শাখা-প্রশাখায় হাতড়ে বেড়ায়
কোথাও যদি বা
পুরোনো কিছু বা ঠেকে,—
আর মাঝে মাঝে শুকনো পাতায়
ফেলছে দীর্ঘশ্বাস,—
তাদের কোরেতে সত্যি এলে কি তুমি ?

ওরা যে গো তাই বলে !
ওরা যে লিখেছে, দেখেছে তোমায়
নিবিড় অন্ধকারে
লেহন করছো দীর্ঘ গাছের দেহ,—
হারাণো-শাবকে-ফিরে-পাওয়া এক
গভীর মমতা নিয়ে !
ওরা দেখেছে তো ঠিক ?

সত্যি আবার ফিরে এলে তুমি তবে ?
ফিরে এস, ফিরে এস।
পৃথিবীর জলে আবার আসুক
'হেস্‌পারোনিস্' যতো,
পৃথিবীর স্থলে 'ডিনোসর' আর
'ব্রন্টোসরে'র দল,
'টেরোডক্‌টিল্' উড়ুক আবার
পৃথিবীর আকাশেতে।

তোমরা যাবার পর,—
আজকে এখানে ছিনিমিনি চলে
প্রাণীদের প্রাণ নিয়ে !
গরীব লোকের চক্ষের জলে
ভাত ফোটে যতো ধনীদের ডেকচিতে !
শাসনকারীরা শোষণের কল ফাঁদে !
হরিনাম-ঝুলি পাঁঠার মাংসে ফোলে !

তুমি কি এসেছ একা ?
যদি এসে থাকো,
ফিরে গিয়ে ফের এস দলবল নিয়ে।
নিয়ে এস যতো প্রাক্-ইতিহাসের
অতিকায় সঙ্গীকে।
তারপরে ঠেলেঠুলে
গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে পৃথিবীটাকে গো
ঠেলে দাও বহু দূরে ;—
লক্ষ বছর, কিংবা তাহারো বেশি।
গড়িয়ে দাও গো একেবারে সেই
'প্রোটোজোয়া'দের যুগে।
তার চেয়ে ভাল পারো যদি একে
ঠেলে দিতে আরো জোরে,
কক্ষপথের বাঁধা পথ থেকে
যদি পারো একে করতে বিপথগামী !

তার পরে ? তার পরে ?
মাতালের মতো পৃথিবীটা গিয়ে
ধাক্কা লাগাক্ অন্য গ্রহের গায়ে,
বিরাট বিশ্ব ফাটুক বিস্ফোরণে,
তার পরে হোক্ ধোঁয়া,
নতুন 'নেবুলা' বুরুক আবার
পুরাতন মহাব্যোমে !

আমি যেন একটা প্রচণ্ড কৌতুকের বলি, এই রকম ভাব দেখিয়ে তাদের সাবধান-বাণী শুনি।

কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারি যে এটা নিছক কৌতুক নয়। তবে কি আমার জীবন ফুরিয়ে এসেছে ? এই কি আমার শেষ যাত্রা ? মহাপ্রস্থানের আগে চির বিদায় ?

এই ভেবে যখন তাদের দিকে তাকাই—তাদের মাথাগুলো যেন প্রার্থনার ভারে আমার দিকে নুয়ে পড়ছে—তখনই হঠাৎ নজরে পড়ে যে তাদের মাথায় এক রাশ পাকা চুল গজিয়ে উঠেছে। এ সবই আমার চোখের সামনে ঘটে এবং বিশ্বাস না করেও পারা যায় না। তারা যেন বলে—"না, এ ঠাট্টার কথা নয়, আমরা নিজেরাই বুড়ো হ'তে চলেছি যে।"

এমন কি তাদের মধ্যে যারা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল এবং যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নিজেদের পায়ের ভর রাখতে না পেরে টলতে টলতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারাও আমার কাছে এগিয়ে এসেছে আর চেয়ারের কাছে আসবার সময় বুড়ো হয়ে গেছে তাদের মধ্যে একটা ছোট মেয়ে, এখন এক জন বয়স্কা তরুণী। দু' হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরছে, তার মাথাটা আমার বুকের ওপর নুয়ে পড়ছে।

এ-আর আমি সহ্য করতে পারি না। আমার দাঁড়িয়ে উঠে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তখনই বুঝতে পারি যে, খুসী মত বা ইচ্ছা করার ক্ষমতাও আমার নেই।

যে তরুণ চোখের দৃষ্টি আজ বার্দ্ধক্যে নিষ্প্রভ সেই দৃষ্টি দিয়েই আমি আমার নত-জানু পক্ককেশ সন্তানদের দিকে অচল ও মূক হ'য়ে তাকিয়ে থাকি।

অনুবাদ—সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

ছানি

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক

ক'দিন ধরেই তারণ ভট্চাযের মহা আনন্দ—ধনী যজমানের পিতৃশ্রাদ্ধ, চাল কাপড় গামছা প্রয়োজনের চতুর্গুণ ফর্দ্দ দিয়েছে, সৌভাগ্য বলতে হবে তার। সময় যা চলেছে একখানা গামছার ফর্দ্দ দিলেই তো যজমানরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। সে স্থলে ফর্দ্দের বিরুদ্ধে আপত্তি নেই কিছুই।

তারণের আয় এখন কমে গেছে অনেক, তবুও সাধারণ কেরাণীর আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। প্রতিপাল্যও যথেষ্ট নয়, স্ত্রী, একমাত্র কন্যা সুরুচি, আর নিজে, সুরুচি ম্যাট্রিক পাশ কোরে আই, এ পড়ছে।

এ দুর্দ্দিনেও তার সংসার সচ্ছল বৈ কি।

শ্রাদ্ধের দিন সকালে স্নান সেরে তারণ যখন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করছিলেন, ও-ঘর থেকে সুরুচি এসে বললে: চায়ের জল চাপিয়েছি বাবা, চা খেয়ে তবে বেরিও।

কন্যার মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে তারণ বললেন: আচ্ছা মা।

সুরুচি চলে গেল। দেখা দিলেন তারণ-গৃহিণী তারিণী দেবী, স্থূল শরীর, বাতে পা দু'টো ফোলা, চলতে তাঁর কষ্ট হয়। থপ্-থপ্ করে এসে বসে পড়লেন পা ছড়িয়ে। পায়ে হাত বুলুতে বুলুতে স্বামীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ছাদ্দোটা বেরোচ্ছুস্ শু না?

পুঁথির স্তূপ দেখতে দেখতে হাসিমুখে তারণ বললেন: হ্যাঁ, বিরাটখানা কোথা বল দেখি?

ঝাঁঝালো সুরে তারিণী বললেন: জিজ্ঞাসা করো তোমার সোহাগী মেয়েকে।

কথা শেষ না হোতেই সুরুচি সেখানে দেখা দিল। এক হাতে মামলেট, রুটি-মাখন, দু'টো ডিম সিদ্ধ আর কলার প্লেট, অন্য হাতে চা নিয়ে। তারণের সামনে সেগুলো রেখে বললে: খেয়ে নাও বাবা, তোমার বিরাট আমি রেখেছি, এনে দিচ্ছি।

চোখ দু'টো কপালে তুলে রুষ্ট কণ্ঠে তারিণী বললেন: তুমি ছাদ্দ করাতে যাচ্ছ তো?

লজ্জায় তারণের মাথাটা যেন হেঁট হয়ে গেল।

পিতার এই ভাব সুরুচির দৃষ্টি এড়ালো না। মায়ের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে বলে উঠলো: যাচ্ছেনই তো, ফিরতে বেলা গড়িয়ে যাবে। কিছু না খেয়ে গেলে চলে?

তারিণী দেবী বলে উঠলেন: আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে

বার, টে'কুর উঠবে না ?···ডিমের গন্ধ বার হবে না তা'তে ? আর দশ জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কি বলবেন বল তো ?

—কিছু বলবে না, জানতেই পারবে না তা বলবে কি ? দু'-তিনটে ডিম খেয়ে হজম করবার মতো ক্ষমতা বাবার আছে—রুচি বললে—এ বরং ভালোই হোলো। Light refreshment, কেউ বুঝতেও পারবে না অথচ শরীরটাও টিকবে।

তারণের ভুঁড়ির খাঁজে খাঁজে ঘাম ঝরছে, কণ্ঠস্বর যেন ক্লান্তিতে পরিপূর্ণ, কুণ্ঠিত ভাবেই বললেন : না মা, থাক, তোর মা যা' বলছেন ঠিকই।

আব্দারের সঙ্গে সুরুচি বললে : না বাবা, আদৌ ঠিক নয়, বিলকুল ঝুঠা। আগেকার লোক ভাত-তরকারি-মাংস পেট ভরে খেয়ে যজমানের কাজ করতে যেতো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি কন্যার মুখের ওপর ফেলে তারণ বললেন : তুই কি করে জানলি এ-সব মা ?

সুরুচি বললে : কেন বাবা, উপনিষদেই রয়েছে তো, পড়ে দেখো না।

তাই না কি ? তারণ বলে উঠলেন—তুই বেটি তো খুব পণ্ডিত হয়েছিস, এবার একটু একটু পড়তে হবে সব।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে তারণ ভাবতে লাগলেন, রুচি তখন ছেলেমানুষ, এক দিন স্লেট-পেন্সিল আর পাটিগণিত এনে একটা অঙ্ক বুঝতে এসেছিল, পারেননি বোঝাতে, বলেছিলেন, এ সব অঙ্ক আমাদের সময়ে ছিল না তো, শুনে রুচি বলেছিল, তুমি বুঝি লেখা-পড়া জান না বাবা ? সেই রুচি আজ উপনিষদের কথা বলে।

দুই

তারণ ভট্চায যজমান-বাড়ী চলে গেলেন, রকে বসে বসে ভাবতে লাগলেন তারিণী দেবী, আজকের পাওনাটা কি রকম হবে, কাপড়গুলো যদি মিহি হয় তবে ভালো হয়—মোটা কাপড় তিনি পরতে পারেন না, দেবেও হয়তো তাই, নিজেই তিনি বলেছিলেন সে কথা যজমানকে, শুনে হেসেছিল। তবে যাত্রা যা হলো আজ। এমন অযাত্রা করেও বেরোয় মানুষ !

তারিণী দেবী আর কিছু চিন্তা করবার অবসর পেলেন না, দেখা দিল সামনের বাড়ীর ভবনাথ চক্কোত্তির ছেলে স্বদেশ। এদের দু'বাড়ীর সম্পর্ক যেন অহি-নকুল। তবুও স্বদেশকে ভালোবাসেন তারিণী দেবী নিজের সন্তানেরই মত। তা'রি মিষ্টি ব্যবহার স্বদেশের, সুরুচির চেয়ে দু'টো বেশী পাশ, তবুও তার মতো 'বিজ্ঞাত্তা' নয়। কর্ত্তাকে আজ ডিম খাইয়ে পাঠালো প্রাদ্ধ করাতে !

স্বদেশকে দেখেই তারিণী দেবী বলে উঠলেন : আয় বাবা আয়, বোস।

স্বদেশ উপবেশন করতেই কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে ছুটে এলো তাকে কামড়াতে,···সঙ্গে সঙ্গে রুচিও এলো তার ঘর থেকে বেরিয়ে।

স্বদেশ বলে উঠলো : কি কুকুরই তৈরী করেছো রুচি।

সুরুচি ততক্ষণে কুকুরটাকে তার কাছে ডেকে নিয়েছে, বলে : একটু বোসো স্বদেশ দা, এটাকে বেঁধে রেখে আসি।

তারিণী দেবী বলতে লাগলেন : যত সব ইয়ে,তে কাণ্ড বাড়ীতে, বামুন-ভট্চায্যির ঘর—কুকুর, পাখী, ডিম-খাওয়া, ধর্ম্ম কি আর আছে ?

কৌতুকের হাসি হেসে সুরুচি বললে : ধর্ম্ম ঠিকই আছে মা, অন্ততঃ যতক্ষণ তুমি আছ আর তোমার মুখ আছে।

সুরুচির মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলে তারিণী দেবী বসেই রইলেন, আর একটা কথাও বললেন না। কন্যাকে তিনি প্রগল্ভা বলেই জানেন, ওর কথাগুলো যেন বিষ-মাখানো তীরের ফলার মতো।

স্বদেশ বললে : ছি রুচি, মা'কে কি অমন করে বলে ?

কেন বলব না স্বদেশদা', মা মনে করেন, উনি সেই সত্যিযুগে বসবাস করছেন, কিন্তু দেশটায় যে কতখানি পরিবর্ত্তন হচ্ছে, সেটা যদি দেখতেন।

তারিণী দেবী আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন : দেশ দেখবার দরকার নেই রুচি, নিজের বাড়ীখানাই যে কতখানি এগিয়েছে সেটা দেখেই বুঝতে পারি।

মাকে আর কোনও কথা না বলে সুরুচি স্বদেশকে বললে : এক বার ভেতরে আসবে স্বদেশদা ? লজিকটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

খাঁচার ময়না পাখীটা বলে উঠলো : ও পোড়ারমুখী, ও কালামুখী !

পাখীটার বুলি শুনে স্বদেশ জিজ্ঞাসা করলো, কাকে এ সুমিষ্ট সম্ভাষণ ?

মৃদু হাস্যে সুরুচি বললে : কাকে আবার ? মায়ের ঐ আদরের ডাক তো রাত-দিন···যেমন শুনচে তেমনি শিখচে।

তারিণী দেবী বলে উঠলেন : বলবে না তো কি ? অতো বড়ো বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, ভাতের হাঁড়িটা নামাতে পারে না ?

খিল্-খিল করে হেসে সুরুচি বললে : যার যা কাজ। তুমি কি (a+b) কি হয় বলতে পারো ? যাক্, তোমার সঙ্গে কথা বলে তো লাভ নেই কিছু। এসো স্বদেশদা !

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে টেবিলে সামনা-সামনি দু'খানা চেয়ারে দু'জনে বসে দেখলো,—তারিণী দেবীও সেই ঘরে প্রবেশ করে জানালার ধারে দাঁড়ালেন।

অন্তরে দারুণ বিরক্তি নিয়ে এক টুকরো কাগজ স্বদেশের হাতে সুরুচি দিয়ে বললে : এইটা বুঝতে পারছি না স্বদেশদা।' তাতে লেখা 'বিজলি—সাড়ে ছটায়।'

কাগজটুকু দেখতে দেখতে একবার তারিণী দেবীকে দেখে নিজের পাশের বুড়ো আঙুল দিয়ে সুরুচির পা টিপে ধরে স্বদেশ বলতে লাগলো : এটা আর বুঝতে পারলে না রুচি ? শোন, আকাশের কোলে মেঘের ফাঁক দিয়ে যেমন এক একবার সূর্য্য দেখা দেয়, তেমনি অন্তর-আকাশে নিরাশা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আশার সূর্য্য সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমি কিন্তু অন্য রকম মনে করেছিলুম স্বদেশদা', আমি ভেবেছিলাম নিরাশার মেঘ যখন নিবিড় ভাবে সূর্য্যকে ঘিরে ধরে তখন তার আর বার হবার পথ থাকে না।

স্বদেশ বললে : 'সূর্য্য চির-ভাস্বর, তা'কে আচ্ছন্ন করতে পারে এমন অন্ধকার আজও জন্মায়নি।

তার পর ওদের লজিকের কত কথা হয়, আর তারিণী দেবী

মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখেন, স্বদেশ চলে গেলে ঘরের বাইরে আসেন।

তিন

স্বদেশ যখন বাড়ী ফিরলো, তখন বেলা অনেকখানি। মনের মধ্যে উৎসাহের পুলক, টানা চোখ দু'টিতে বিশ্ববিজয়ের প্রোজ্জ্বল দীপ্তি, মুখখানা আনন্দে উদ্দীপ্ত।

পিতা ভবনাথ তখন বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় লাইজু মেখে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, মাথার আর গোঁফের চুল অর্দ্ধেক সাদা হয়ে গেছে। তবুও অন্ততঃ পনের মিনিট চুল না আঁচড়ালে টেরিটা ঠিক মনের মত হয় না। চেহারাখানা এক কথায় তাল-পাতার সেপাই। হাত আর পা প্যাঁকাটির মত সরু, কপালের শিরা উঠেছে ফুলে। মাথাটা কিন্তু প্রকাণ্ড। ওঁর মাথার ভার দেহটা যে কি করে বহন করে সেইটাই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যের পরে আর একটা আশ্চর্য্য। পরনে চুনুট-করা দেশী তাঁতের কালা পাড় কাঁচি ধুতি। গায়ে ঢিলে-হাতা গিলে কুঁচানো আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে হাই পালিসের চটি জুতো।

ভবনাথকে দেখলেই মনে হবে, সে যেন জীবনে সর্ব্বপ্রথম শ্বশুরবাড়ী যাবে বা পুত্রের বিবাহের জন্য কোথাও পাত্রী দেখতে বেরুচ্ছেন। কিন্তু তা নয়, তাঁর সাধারণ পোষাকই ঐ। দামী সেন্ট রুমালে, কাণে আতর, পুরাদস্তুর বাবু, নিজের উপার্জ্জনে এই বাবুগিরি নয়, স্বর্গীয় পিতার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকা আর বাড়ী-ভাড়ার আয়েই তাঁর চলে যায়। সৌভাগ্য তাঁর যে, ঐ একটি মাত্র পুত্র স্বদেশ। আর পাঁচটা সাধারণ ঘরের বাপ-মা'র মতো যদি আট-দশটা ছেলে-মেয়ে বাড়ীতে কিল্‌বিল্ করতো তবে তাঁর অস্তিত্ব যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো সেটা এক ভগবানই জানেন।

যাক্ এ সব ইতিহাস, স্বদেশকে দেখেই ভবনাথ বলে উঠলেন: কোথা ছিলি এতক্ষণ? বাইরে বাইরে ঘোরা ভালো নয় বাবা!

মা একখানা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় সদ্য প্রকাশিত কি একখানা উপন্যাস পড়ছিলেন। তিনি উপন্যাসের পোকা। এই সব উপন্যাস পড়তে পড়তে তিনি না কি বুঝতে পেরেছিলেন, আজ-কাল শহরে না কি ছেলে-মেয়ের বিবাহ হয় না। যত সব আইবুড়ো ছেলে-মেয়ে কলেজে পড়তে পড়তে বা এমনি কোনও রকমে পরস্পরকে ভালোবেসে বাপ-মাকে কলা দেখিয়ে স্থানান্তরে বাসা বাঁধে: যদিও দু'-একটা বিয়ে দেখতে পাওয়া যায় তারও মূলে হয়ত ঐ একই নিয়ম কাজ করে। তিনি বললেন: সকালে ও বাড়ী গিয়েছিলি কেন? এতো করে নিষেধ করি তবু তুই কথা শুনবি না?

গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে স্বদেশ বললে: তোমার কথা কি শুনি না মা?

স্বদেশের কথা শুনে মায়ের মনটা যেন একটু নরম হলো, নরম সুরেই বললেন: ও-বাড়ীতে একেবারেই যাবি না, ভট্‌চায-গিন্নি বাস্তু ঘুঘু। কোন দিন আমার কী সর্ব্বনাশ কোরে বসবে। যাসনি বাবা ওদের বাড়ী, লক্ষ্মী বাবা আমার।

মায়ের কথায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো স্বদেশ, তিক্ত কণ্ঠে বললে: কী সব বা'তা ভাবছ মা', আমি কি এতই বোকা, এতই মূর্খ?

মা বললেন: ঐখানেই তো আমার ভয় রে বাবা, বিশেষ করে শিক্ষিত ছেলে আর শিক্ষিতা মেয়ে। এই ত্যাখ্, এই বই খানাতেও ঐ শিক্ষিত—

ভবনাথ এতক্ষণ নীরবেই ছিলেন, স্ত্রীর কথাগুলো অত্যুক্তি মনে করে বলে উঠলেন: নভেল পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে গিন্নি, নভেল—নভেল। ওর সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক নেই। ভয় পেয়ো না। ছেলে আমার ভট্‌চাযের বেটীকে করবে বিয়ে? ছোঃ! রায় বাহাদুর ৺ক্ষেত্তর চক্কোত্তির পৌত্তুর শ্রীমান স্বদেশ ঘরে আনবে অর্দ্ধেক রাজত্বের সঙ্গে এক রাজকন্যা। মেয়ে আমি ঠিক করেই রেখেছি। একজামিনটা হয়ে গেলেই দেখো না—কি হয়।

বলতে বলতেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, রুমালখানায় মুখটা মুছে নিয়ে, শিস্ দিতে দিতে ভবনাথ ঘরের ভেতর বেড়াতে লাগলেন।

পুত্রের সামনে ভবনাথ আর তাঁর স্ত্রী যে ভাবে কথা বলতে লাগল, তাতে তাঁদের এতটুকু সঙ্কোচ না হলেও শিক্ষিত পুত্রের মাথা যেন আপনা হতেই হেঁট হয়ে এলো, চলে গেল সে স্থান পরিত্যাগ করে।

স্ত্রীকে বলতে লাগল ভবনাথ: উপযুক্ত জ্ঞানবান ছেলে, তার ওপর শিক্ষিত। ওর সামনে অমন কোরে কথা বলে? কি মনে করবে বলো দেখি? দেখো যেন ঐ রকম বলতে বলতে সত্য সত্যই না এক দিন পালে বাঘ পড়ে যায়। তখন কি অবস্থা হবে জান?

নারীসুলভ অনুচ্চ কণ্ঠে ভবনাথ গান ধরলেন:

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী···

ভবনাথ গৃহিণী বলে উঠলেন: আহা, উপদেশের বালাই নিয়ে মরি। কি সভ্য-ভব্য কথা গো, সোমত্ত ছেলের সামনে তুমি কী করে অমন সব কথা বললে?

ভবনাথ বললেন: ও-রকম কথায় আদৌ দোষ নেই, শাস্ত্রে আছে,—

'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ'

ছেলে যখন ষোলয় পড়বে তখন থেকেই তার সঙ্গে মিত্রের মত ব্যবহার করবে। মিত্র শব্দের অর্থ কি জান?···বন্ধু।

ভবনাথ-গৃহিণী আর কোনও কথা বললেন না, স্বামীর মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শুনে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ভবনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

চার

সেদিন অপরাহ্ণে নরি-বোঝাই শ্রাদ্ধের পাওয়া দ্রব্যসম্ভার নিয়ে তারণ যখন বাড়ীর দুয়ারে এসে দাঁড়ালো, ভবনাথ তখন ছিল রকে বসে, স্নেহের হাসি হেসে বললে: আজ খুব ট্যাঁক মেরেছো হে ভট্‌চায! এই বেসনের দিনে—

তারণ আজ আনন্দে ভরপুর, ভবনাথের শ্লেষ আমলে না এনে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে বললে: কেবল এই দেখলে চক্কোত্তি? এই দেখো, গিনি দিয়ে সোনা উচ্ছুগ্‌গু করেছে হে। ভিক্টোরিয়া গিনি, খাঁটি—

খাওয়াবে না কি হে?···হাসতে হাসতে বললে চক্কোত্তি।

উৎসাহের সঙ্গে তারণ বলে ওঠে: নিশ্চয় নিশ্চয়—এস না ভাই, কলা দু'রকমই দিয়েছে, কাঁচা এবং পাকা, কচুও কতকগুলো আছে হে চক্কোত্তি।

ভবনাথের স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন, সামনের ঘরের জানালার ধারেই। হাড়ি-চাঁচার মতো গলার সুর বার করে বলে উঠলো: ওগুলো তুমিই পুড়িয়ে খেয়ো ঠাকুর।

ওর মুখের দিকে চেয়ে তারণ বলে উঠলো: ও, আপনিও আছেন দেখছি। তা' কচু কতকগুলো পুড়িয়েই খাবো বৌঠান, বড়ই উপাদেয়, কাঁচা কলাগুলো ভাতে দিতেই বলবো, বড় উপকারী।···এই দুর্দ্দিনের বাজারে বাজার-খরচটা তো পাঁচ-ছ' দিনের মতো বেঁচে গেলো। হিসেব করেই খেতে হবে বৌঠান, বাপ তো আর ব্যাঙ্কে কিছু রেখে যাননি যে, শিস্ দিতে দিতে উড়িয়ে দেব।···তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন বাবা, জিনিষগুলো সব ভেতরে নিয়ে চল্।

ভবনাথ আর তার স্ত্রী অন্য ঘরের ভেতর থেকে ঝগড়াটাকে তুমুল করবার জন্যে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। অন্য সময় হলে কি হতো বলা যায় না, আজ কিন্তু তারণ ভট্চায ভেতরের রকে বসে তোয়াজ করে পাখার বাতাস খেতে লাগলেন।

দ্রব্যসম্ভার দেখে তারিণী দেবী আনন্দিত হলেও তাঁর স্পষ্ট বলার স্বভাবের জন্যে বলে উঠলেন: এ কী ছাদ্দোর ঘটা! আহা বেচারা! বেঁচে থেকে ছেলের কাছে এক মুঠো ভাত পেলে না, রোগে এক ফোঁটা ওষুধ পেলে না, আর ঘটা দেখো না ছাদ্দোর।

এক গ্লাস জল দে মা রুচি—তারণ বলতে লাগলেন: বাইরের লোক তো ভেতরের খবর জানে না গিন্নি, চোরা-বাজারে টাকা করেছে অঢেল, বড়ো বড়ো ধনী-মানী লোক তার বন্ধু, তাদের কাছে তো নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে হবে? কেষ্ট-বিষ্টু গোছের এক জন বলে জাহির করতে হবে তো নিজেকে? তাই এই ঘটা, বুঝলে না? বাপের নিয়তি! মুখ্খু বাপের শিক্ষিত বিত্তবান ছেলে, বাপকে দেখবেই বা কেনো বলো? আমাদের এ সব আলোচনা করতেই নেই, যজমান আমাদের বেগুন ক্ষেত, তা'দের বাড়-বাড়ন্ত হোক। আমাদের উচিত তাদের আশীর্ব্বাদ করা, তাদের সমালোচনা নয়।···রুচি, কই রে মা?

এই যে বাবা—

তারণকে এক গ্লাস জল দিয়ে সুরুচি বললে: তোমার চায়ের জল চাপিয়েছি বাবা!

জলটা পান করে তারণ বলে উঠলো: আঃ, যা পিপাসা পেয়েছিল!

—পাবে না এই দারুণ গ্রীষ্মে।···আজ কিন্তু আমি সিনেমায় যাবো বাবা।

তারণ বললে: বেশ, যেয়ো মা, একাই যাবে তো? দেখো দেখি কী পরিবর্ত্তন! আগেকার চেয়ে মেয়েরা কতখানি সাহসী হোয়ে উঠেছে! এ সবই শিক্ষার গুণ বুঝলি মা, শিক্ষা না পেলে কি সাহস আসে।

পাঁচ

শ্রাবণের ধরিত্রী সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যেন অমানিশার অন্ধকারে ভরে উঠলো। আকাশের কোলে মেঘ জমেছে নিবিড় হয়ে, ঘন ঘন বিদ্যুতের বিকাশ, চোখ যেন ধাঁধিয়ে আসে, বিশ্ব-বিধ্বংসী বজ্রের সরোষ গর্জ্জন স্থাবর-জঙ্গম কাঁপিয়ে তুলছে যেন। দাবায় বোসে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলেন তারণ ভট্চায, তাঁর ধারণা, মা কালী রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর বেয়াদপীর বিরুদ্ধে যদি না দাঁড়ান, তা' হলে হয়তো সৃষ্টিই ধ্বংস হোয়ে যাবে আজ।

তারিণী দেবীও আশঙ্কায় যেন প্রস্তর-মূর্ত্তির মতো বসেছিলেন স্বামীর পাশেই; আপন মনেই তিনি বলে উঠলেন: এতো পাপ কি ভগবানের সহ্য হয়? ঘরের লক্ষ্মী—দেশের লক্ষ্মী মেয়েমানুষ দু' পাতা ইংরিজী পড়ে গুরুজনের নিষেধ শুনবে না, ছেলে দেবে না মা-বাপকে খেতে।

আকাশের কোলে খেলে গেল চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের প্রচণ্ড শব্দ, পৃথিবী বুঝি বধির হয়ে গেল। তারিণী বলতে লাগলেন: এত পাপ সহ্য হবে কেন দেবতার? এ যে ধর্ম্মের দেশ, এ দেশ যে দেবতার! এখানে শয়তানের রাজত্ব—পাপের রাজত্ব চলে কি?—না, ভগবানের সহ্য হয়? ঘরের ভেতর বসিগে চলো।

তাই চলো,—তারণ বললেন: রুচি কোথা? এ সময় একটু চা পেলে···রুচি, কোথা রে মা?

তারিণী বললেন: এই দুর্য্যোগে সে কি আর শুনতে পাচ্ছে? বরং চল ওরই ঘরে গিয়ে বসি, দু'জনের যায়গায় তিন জন হব তবু।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ওঁরা দেখেন রুচি নেই। ব্যগ্র-চঞ্চল কণ্ঠে তারিণী বলে উঠলেন: রুচি কোথা? রুচি!

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে অন্তরের মধ্যে দুর্ভাবনার ঝড় নিয়ে সমস্ত ঘরগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন তারণ, রুচি নেই, গেল কোথা?

তারিণী দেবী বলে উঠলেন: আর গেল কোথা? তখন টিক্-টিক্ করতুম, মেয়েছেলেকে এতটা বাড়তে দেওয়া ভালো নয়, আমার কথা কি শুনতে? ফল ভোগ এখন। কি করে মুখ দেখাবে লোকের কাছে?

তারিণী দেবীর চোখের দুই কোল জলে ভরে উঠলো।

চঞ্চল কণ্ঠে তারণ বললেন: এই দুর্য্যোগে কোথা খুঁজি বল?

কোথাও না,' তারিণী বললেন: খুঁজতে গেলে মুখে চুণকালি পড়বে। তখনকার লোক গৌরীদান, কন্যাদান করতো কি সাধ করে?···এই সব পাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। ভট্চায্যি বামুন হয়ে কিসের মোহে তুমি মেয়েকে কলেজে দিলে?

তারণ বলে উঠলেন: আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে গিন্নি তোমার কথায়। কিন্তু তুমি যা ভাবছো, হয়তো তা নয় গিন্নি, হয়তো সিনেমায় গিয়েছে, বড্ড ঝোঁক তো!

তাই যেন হয়। পথে বিজলি বাতি উঠলো জ্বলে, ওঁরা দুই স্বামি-স্ত্রী উন্মুখ হয়ে বসে রইলেন, পনর মিনিট প্রায় কেটে গেল, সমান ভাবেই চলছে বাইরের দুর্য্যোগ। ওঁদের কাণে এলো কড়া নাড়ার শব্দ।

দ্বার উন্মুক্ত করে তারণ দেখলেন, দুর্য্যোগকে ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী সেবানন্দ, জিজ্ঞাসা কোরলেন: এই দুর্য্যোগে স্বামীজি।···ভেতরে আসুন।

ভিতরে প্রবেশ করে স্বামীজি বললেন: যেতে হবে আপনাকে এখুনি।

কোথা স্বামীজি?

মঠে—সেবানন্দ বললেন: স্বদেশের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ, সম্প্রদান করছেন স্বরূপানন্দ, পৌরোহিত্য করছেন স্মৃতিকণ্ঠ, ভবনাথ এ বিবাহ অস্বীকার করেছে, আপনার করা চলবে না।

বিমূঢ়ের মতো তারণ বললেন: কিন্তু—

কিন্তুর কিছু নেই ভট্চায্যি মশায়, এ ছাড়া বাঁচবার উপায় ছিল না আপনাদের। এ বরং ভালই হোলো।

কেশবতী

[ব্যদলেয়রের গদ্য কবিতা হইতে]

তমসা গুপ্ত
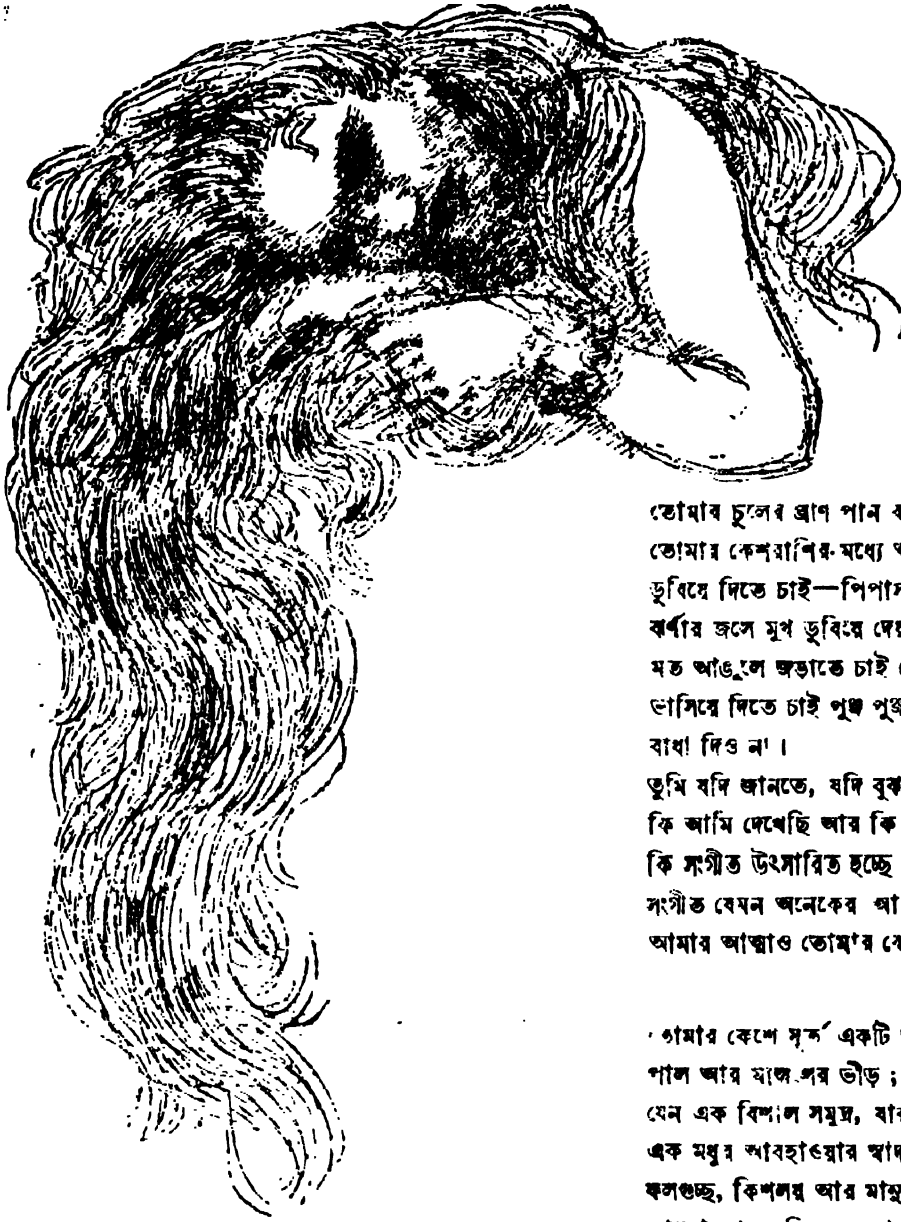
তোমার চুলের ঘ্রাণ পান করতে চাই আকণ্ঠ ভ'রে
তোমার কেশরাশির মধ্যে আমার সমস্ত মুখখানি
ডুবিয়ে দিতে চাই—পিপাসার্ত মানুষ যেমন করে
ঝর্ণার জলে মুখ ডুবিয়ে দেয়। সুগন্ধ রুমালের
মত আঙুলে জড়াতে চাই তোমার চুল, বাতাসে
ভাসিয়ে দিতে চাই পুঞ্জ পুঞ্জ স্মৃতির রেণু—তুমি
বাধা দিও না।
তুমি যদি জানতে, যদি বুঝতে পারতে
কি আমি দেখেছি আর কি অনুভব করেছি—
কি সংগীত উৎসারিত হচ্ছে তোমার কেশের বেলাভূমিতে
সংগীত যেমন অনেকের আত্মাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—
আমার আত্মাও তোমার কেশের সৌরভে ভাসমান।

তোমার কেশে মূর্ত একটি স্বপ্ন-কাব্য,
পাল আর মাস্তুলের ভীড়; তোমার কেশরাশি
যেন এক বিশাল সমুদ্র, যার নবম মৌসুমীতে
এক মধুর আবহাওয়ার স্বাদ—যা অনেক গভীর আর নীল।
ফলগুচ্ছ, কিশলয় আর মানুষের চামড়ার গন্ধে যে
আবহাওয়া সুরভিত। তোমার কেশের সমুদ্রে আমি দেখেছি
নানা জাতির বলিষ্ঠ মানুষের বিষণ্ণ গানে মুখরিত
বন্দরের সংক্ষিপ্ত দৃশ্য। যেখানে অসীম আকাশের দিক্‌চক্রে
উদ্‌ঘাটিত বহু জাহাজের সুন্দর আর জটিল স্থাপত্য।
তোমার চুলের স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শে আমার মনে পড়ে
জাহাজের ক্যাবিনের দোলনার স্বপ্ন-সম্মোহ। বন্দরে উপকূলে
আছড়ে পড়া ঢেউয়ের দোলায় আমি যেন দুলছি—ফুলদানী
আর স্নিগ্ধ জলের জগের মাঝখানে।

তোমার চুলের আগ্নেয় উজ্জ্বলতায় আফিং আর চিনির
স্বাদ মেশান তামাকের সুগন্ধ। তোমার চুলে যখন রাত্রি
ঘনিয়ে আসে; আমি অনুভব করি ট্রপিকের নীলাভ উজ্জ্বলতা।
তোমার চুলে আলকাৎরা, কস্তুরী আর নারকেল তেলের সুরভি
তোমার একরাশ কালো চুলের গুচ্ছ দাঁত দিয়ে কুট-কুট করে
কাটতে ইচ্ছে করে। তোমার উদ্ধত স্প্রিংয়ের মত চুলগুলি
চিবুতে চিবুতে মনে হয় যেন স্মৃতির রোমন্থন করছি।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

জীবনের প্রহসন

ইলা মিত্র

জীবন চলে যায় একটানা স্রোতের মত অতি বিচিত্র ভঙ্গীতে, বৈচিত্র্যের অবসান ঘটে মৃত্যুর করাল ছায়ায়, মৃত্যুর পদক্ষেপে নিঃশেষে মুছে যায় তার হাসি-গান, আনন্দ অশ্রু। আলো আর আঁধারের মত সুখ-দুঃখ তার জীবনে আনে পরম সার্থকতা, বিধাতার দেওয়া প্রাণ-সম্পদটুকু নিয়ে সে এগিয়ে চলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মৃত্যুর নিষ্ঠুর নিয়তিকে সে কল্পনা কোরতেও পারে না। বাস্তব তার কাছে কঠিন, কল্পনা তার সাথী, জিজ্ঞাসার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে তার সারাটা জীবন বন্ধনময়; কিন্তু এই বন্ধনেরও অতীত, কল্পনারও বাইরে যে চির সত্য, বিশ্ব-বিধানের যে অলঙ্ঘ্য নিয়ম, তার কল্পনা মানুষের দৈনন্দিন চিন্তাধারায় স্থান পায় না, চিরতরে চলে যাওয়ার চিন্তাকে যে সে ঠাঁই দিতে চায় না, সকলের কাছে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাওয়ার ব্যথাকে সে উপলব্ধি করতে পারে না, এই অবাঞ্ছিত চির সত্যই হচ্ছে মানব-জীবনের চরম প্রহসন! সৃষ্টির আদি-যুগ থেকে মানুষ চেয়েছে সুখকে প্রতিদিনের সামগ্রী করে নিতে, দুঃখকে উপলব্ধি করে সুখের অনুভূতিকে করেছে গাঢ়, মেঘ আর দুর্জ্জয়ের মত দারিদ্র্য আর অবিচারকে করেছে উপেক্ষা, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সে হয়েছে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, কিন্তু উপেক্ষা কোরতে পারেনি মহাকালকে! যে চির সত্য আমারই সামনে অতি পরিচিতের ওপরে প্রতিফলিত হল, যার অন্তর্ধানে বুঝলাম এই চলে যাওয়াকে, তাকে বিশ্লেষণ করবার সাধনা, একাগ্রতা মানুষের থাকে না, এই সাধনার অভাব জীবনের প্রহসন নয়, জীবনের ট্রাজেডি এবং প্রহসন সেইখানেই, যেখানে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। সেইখানেই তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় উত্তরোত্তর। কিশোর তার আশার বীজ বপন করে, যৌবনে তাকে উপলব্ধি করে, বার্দ্ধক্যে ঘটায় তার পূর্ণ বিকাশ, আর শেষ সীমায় জীবনের সায়াহ্নে এসে সে সঞ্চয় করে। এই আশা তার বৃদ্ধি পায় যখন, তখন সে এগিয়ে চলেছে জীবন-সীমার শেষ প্রান্তে। এর ব্যর্থতাই জীবনের ট্রাজেডি, এই মিথ্যে আশাই জীবনের প্রহসন।

রাষ্ট্রের, সমাজের শাসন ও রীতিকে মেনে নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি জীবন-পথে, সেই পথের শেষের সন্ধান আমি কখনো করি না। সমস্ত শুভকে আমি চাইছি, সমস্ত মন্দকে আমি দূরে রেখেছি, কীর্ত্তির বিজয়-নিশান তুলে বার-বার বলেছি, "আমাকে দেখ।" আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্ম-সুখলোভে কত সৃষ্টি, কত বিনাশ আমিই করেছি, কিন্তু ভাবতে পারিনি আমার সমস্ত শুভ-অশুভ নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে যাবে মৃত্যুর গাঢ় আলিঙ্গনে, যেমন করে প্রভাতের সোণালী আলো মুছে যায় কালবৈশাখীর কালো মেঘের নেপথ্যে! অথচ, প্রতিনিয়তই এই সত্য আমারই সামনে অপরের জীবনে ঘটে যাচ্ছে। কই, তারা ত তাদের কবরের ঢাকা খুলে বেরিয়ে আসে না, শ্মশানের থেকে বেরিয়ে আসে না? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মৃত্যু চির নবীন, তিনি বলেছেন, "মৃত্যু চির নবীন, অহরহই মৃত্যু জীবনকে নূতন করিতেছে।" মৃত্যুর এত বড় মূল্য যদি হয়, তবে সে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটুক ক্ষতি নেই আমার এই সীমাবদ্ধ জীবন-পথে, আমার এই হৃৎপিণ্ড দিয়ে তাকে ত প্রকাশ করতে পারব না। সে যদি বৈষ্ণব কাব্যের 'শ্যাম' হয়, সে যদি আমাদের মতে দুর্জ্জয়ও হয়, তবু তাকে আমার এই অন্তর দিয়ে, আমার এই ভাষা দিয়ে আমার পরিচিতের কাছে সে অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে পারব না। এই অপ্রকাশ্য অথচ অবশ্যম্ভাবী নিঃশেষ হওয়া মানব-জ্ঞানের বিশ্লেষণের অতীত বলেই যে সে এ চিন্তাকে তার কাজের মাঝে স্থান দেয় না তাই নয়, যদি সে এ চিন্তা এই নিঃশেষ হওয়ার ব্যথাকে অহরহ উপলব্ধি কোরতে থাকে তবে তার জীবনে থাকবে না কোন আনন্দ, কোন প্রেরণা, চার পাশে কেবল মহাশূন্যতাই বিরাজ করবে। সমস্ত উদ্দীপনা মিলিয়ে যাবে, কর্ম্ম-সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস হবে মূল্যহীন, সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, প্রতিভার অবদানের মধ্যে দিয়ে যারা 'আমিত্ব'কে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যুগের পর যুগ, তারা যদি এই অবধারিত সত্যকে সর্ব্বদা মনে রাখত তবে কোথায় পেতাম আমরা সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস? মানব-ইতিহাসে আমরা দেখেছি বীরত্ব, গরিমা, ঐশ্বর্য্য, সাধারণ মানব সমাজে দেখেছি অতি হীনতম, তুচ্ছতম জীবন দু'টোই মিলিয়ে গেছে, দু'টোই শেষ হয়ে গেছে। রাজার কথা কলমের মূক আঁচড়ে এখনো হয়ত আছে, ভিক্ষুকের কথা তার হীনতার কথা একেবারেই মুছে গেছে। যদি বিশ্লেষণ করে দেখি উভয়ের জীবনধারা, রাজার জীবনে দেখতে পাব তার সভা তার কৃত কীর্ত্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই পরিচিত জগতে নিজেকে আরো পরিচিত কোরবে। হীনতম, তুচ্ছতম জীবনধারী সেই ভিক্ষুক হয়ত বলত, "সুখ ও দুঃখ দুই-ই অপূর্ব্ব জীবন, খুব বড় একটা রোমান্স, বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স, অতি তুচ্ছতম হীনতম জীবনও রোমান্স।"

এই রোমান্স আর একটা রোমান্টিকের সঙ্গে মিশে যেতে চায় হয়ত, কিন্তু রোমান্সের খবর যেমন করে বলে গেলাম, কই রোমান্টিকের কথা ত প্রকাশ করতে পারলাম না। মানুষ যে ঘর বাঁধে সেখানে সে স্থিতি চায় না, কি সে চায় কি যে তার পথ তা নিজেও সে জানে না, তাই ত' জানি। মানুষ যেদিন প্রথম আবিষ্কার করল পায়ের তলায় আছে লোহা, সে দিন সেই লোহাকে সে আবিষ্কার করেই খুশী হল না। তাকে তুলে, তাকে যাতাই করে গড়ে তুলল বিরাট কারখানা, তার পর সমস্ত দুর্গমতাকে তুচ্ছ করে সে সুরু করল ব্যবসা-বাণিজ্য এতেও সে খুশী নয়। দেখেছি। মানুষকে ছুটে যেতে উত্তর মেরুতে, দক্ষিণ মেরুতে, বরফে ঢাকা তুষারাবৃত সেই প্রকৃতির হাটে নিজে উপস্থিত হয়ে দেখতে চেয়েছে কি আছে? ছোট শিশির-ভেজা বনফুলটিকে ছিঁড়ে এনে তাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছে, সেটাতে চেয়েছে তার কৌতুহল! কবিকে দেখেছি পাতার পর পাতা, ছত্রের পর ছত্র ভরিয়ে তুলেছে অমর ছন্দে, ভাষার চাতুর্য্যে! শিল্পী তুলির আঁচড়ে এঁকেছে কত বিচিত্র প্রতিচ্ছবি! ভাস্কর অপূর্ব্ব শিল্পি-মনের পরিচয় গড়ে রেখেছে কত স্থাপত্য! সকল অবদানের মূলেই ছিল আত্ম-প্রতিষ্ঠার, আত্ম-প্রকাশের অদম্য বাসনা তারাও জানত। যে, রহস্য মৃত্যুর আড়ালে আছে তা থেকে তাদের নিস্তার নেই। কিন্তু যখন তারা লিখেছিল—এঁকেছিল, যখন তারা গড়েছিল—তখন তাদের এ চিন্তা ছিল অনেক দূরে, এই চিন্তা যদি মানুষকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দিত, তবে তার সৃষ্টি পেত বাধা, কর্ম্ম হোত বিলীন।

এইখানেই জীবনের প্রহসন আছে লুকিয়ে। মানুষ তার জীবনকে করেছে সঞ্চয়ের, বণ্টনের, লুণ্ঠনের সংগ্রাম। সঞ্চয় তার ব্যর্থ হয়, লুণ্ঠন তার মিছে হয়, বণ্টন তার হারিয়ে যায় এই একটি মাত্র সত্যের আড়ালে। যা চির সত্য, যা চির অবধারিত, তার চিন্তা যদি কেউ মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে ব্যথা পায়, জনসাধারণের কাছে সে হয় উন্মাদ নয় নিরাশাবাদী, সভ্য-সমাজে সে অলস, সে স্বার্থপর। জীবনের ফার্স অর্থাৎ প্রহসন যেটা, সেটা মৃত্যুর মধ্যে নেই আছে এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার মধ্যে, মানব-জীবনের উদ্দীপনার মধ্যে। আজ যদি এই বিরাট ব্যস্ত পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একে প্রহসন বলি, তবে আমার তোমার অস্তিত্বকে এরা স্বীকার কোরবে না, আমাদের সুস্থতার কথা এরা বিশ্বাস কোরবে না, কিন্তু সত্যিকারের প্রহসন মানব-জীবনের এইখানেই। সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এ চিন্তা একেবারে করে না তা নয় সভ্যতার কর্ণধারেরা অসংখ্য মতবাদ দিয়ে মৃত্যুকে বর্ণনা করেছেন, বিজ্ঞান বলে, "Death is nothing but an accident, which is the ultimate fate of everybody." কাব্য বলেছে "মৃত্যু শ্যাম, মৃত্যু সুন্দর।" দর্শন বলেছে "মৃত্যু, নেই—মৃত্যু জীর্ণ বসন ছাড়িয়ে পরিয়ে দেয় নতুন বেশ, সে চির নবীন।" এত জেনেও আমরা কিছুই জানি না—এত উপলব্ধি করেও এ কথা আমাদের কল্পনা বলেই মনে হয়, এই প্রহসনই তার ধ্রুবতারা, জীবনকে করেছে সরস, প্রাণকে করেছে রসঘন আনন্দ—অশ্রুকাতর মুখচ্ছবি মিলিয়ে যাবে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে। এই যে কল্পনাতীত সত্য, এইটাই মানব-জীবনের পথ চলার পাথেয়। প্রহসন তাই লুকিয়ে আছে তার প্রকাশের উদ্দীপনায়, তার আশার অঙ্কুরে, পথ-চলার রাগে আর ব্যর্থতার মজ্জায় মজ্জায়। প্রতিনিয়ত এই 'সত্য' চিন্তার নেপথ্যে আছে বলেই আমি, আমরা সকলে খুশী, সকলে বেঁচে থাকতে চাই আলোর মাঝখানে।

অভ্যর্থনা

প্রতিমা মুখার্জ্জি

যাক যাক দূরে যাক পুরাতন
সবে আজি ডাকে তোমা এস হে নূতন।
এস আজি লয়ে তুমি নব ঋতু হয়
সব আগে লয়ে এস ভীষণ প্রলয়।
বহাও ভীষণ ঝড় কাল-বৈশাখী
এস হে নূতন আজি মোরা সবে ডাকি
পুরাতন হইবে গো গ্রীষ্ম যখন
পাঠাবে কি বর্ষারে করিয়া নূতন?
শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত আসিবে
চারি দিকে ফুলে-ফলে আনন্দে ভরিবে,
পুরাতন যাবে চলে লয়ে দুখভার
মুছে যাবে ধরা হতে বিষণ্ণতা তার।
মধুর গানেতে পাখী বন্দিবে তোমায়
(কাল) করিবে আরতি ভোর রাতের তারায়।
জয় হিন্দ, জয় হিন্দ মুখে সবে বলে
এস হে নূতন মোরা ডাকি যে সকলে।

স্বাধীন ভারতের স্ত্রীশিক্ষার রূপ

গীতা ঘোষ

মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার মধ্য দিয়া। পুরুষ ও নারী উভয়েই সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, সংসারের প্রতি উভয়েরই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে। কর্ম্মক্ষেত্র দুই জনের সমান নয়, সেই জন্য নারীর শিক্ষা স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়া যদি নূতন সমাজ গড়িতে হয় তবে পুরুষ ও নারীকে মিলিত ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

আজকাল অনেকেরই মুখে শুনা যায়, পুরুষ ও নারীর দাবী, অধিকার ও কর্ম্মক্ষেত্র এক ও সমান, কিন্তু এইরূপ ধারণা ভুল। পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র এক নয় বা হওয়া সম্ভব নয়, সেই জন্য স্ত্রীশিক্ষা একটু স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। নারী পুরুষের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে এবং প্রয়োজন মত পরিবারের অর্থ-সঙ্কট মিটাইতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছাড়াও পারিবারিক জীবনে নারীকে যে বিচিত্র ধরণের কাজ করিতে হয়, সে সম্পর্কেও নারী সমাজের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নারী যতই বাহিরের জগতে মেলামেশা করুক বা কাজ করুক, তবুও তাহাকে গৃহ দেখিতে হয়—গৃহকে বাদ দিয়া নারীর পক্ষে চলা অসম্ভব। নারী যদি গৃহ ছাড়িয়া শুধু বাহিরের জগৎ লইয়া থাকিতে চায়, তবে সংসার সুন্দর হইবে কি করিয়া? নারী সংসারের কর্ণধার। সংসারকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলাও নারী-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার একান্ত অভাব, যে শিক্ষা আমাদের দেশের মেয়েরা পাইয়া থাকে তাহা চরিত্র-গঠনের শিক্ষা নয়, সেই জন্য শান্তিপূর্ণ সুখের সংসার খুব কমই দেখা যায়। প্রত্যেক নারীর শুশ্রূষা-বিদ্যা, শিশু-মনস্তত্ত্ব, শিশুশিক্ষা, সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব, সন্তান পালন, সূচী-শিল্প, সঙ্গীত অবশ্য শিক্ষণীয়। নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা দান একান্ত প্রয়োজন।

স্ত্রীশিক্ষাকে এখনও পর্য্যন্ত আমরা জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের দিক্ হইতে গ্রহণ করিতে পারি নাই—স্ত্রী-শিক্ষা অনেকটা ফ্যাসান হিসাবে আমাদের দেশে চলিতেছে। ইহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী হইয়াছে। ভারতবর্ষ পরাধীন থাকায় ফলে নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলন করা সম্ভব হয় নাই। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। বিদ্যালয়ে এবং কলেজে মেয়েদিগকে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

স্বাধীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। শিক্ষার অভাবে আজ দেশ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। যদি ঐ ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে গৃহের সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য অতি সহজেই ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্বাধীন ভারতে শক্তিশালী জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মাতৃজাতির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতির মেরুদণ্ড মেয়েদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইলে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমরা এদিকে জাতির চিন্তানায়ক ও নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, অচিরেই একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের সর্ব্বত্র নূতন পদ্ধতিতে মেয়েদের শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

বোঝার ভুল

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী

৯

সুস্মিতার কথা

বিমান বাবু যেন আমায় পেয়ে বসেছেন। এমন বেহায়া পুরুষ আমি কখনো দেখিনি। আমি যতো ওঁকে ছাড়াতে চাই, উনি ততো যেন আঁকড়ে ধরেন। মা তো বিমান বলতে অজ্ঞান, তাঁর ইচ্ছা, বিমান বাবু ওঁর জামাই হন। মা গো! আমি কখনো তাতে রাজী হবো না। কেন, বাংলা দেশে জন্মেছি ব'লে আমার কি একটা মতামত নেই? এ ভারী অন্যায়।

আজ বেড়াতে যাবি নে সুমি—বলতে বলতে দিদি ঘরে ঢুকলো।

বললাম, শরীরটা ভালো লাগছে না। কেন রে? জ্বর হলো না কি? দিদি কপালে হাত দিয়ে দেখলে। কার আবার জ্বর হলো রে সুনন্দা? মা ঘরে ঢুকলেন।

আমি বললাম, কারুর নয়। তুমি রান্না-ঘর ছেড়ে বড়ো যে এলে মা? মা—আলমারী খুলে রুপোর টী-সেট বার করতে করতে বললেন, তোমাদের আক্কেল দেখে বাছা আসতে হলো। ভদ্রলোকের ছেলেকে খেতে বলেছি, তা গিয়ে যে মাকে একটু সাহায্য করবে, কি ফল ক'টা কেটে-কুটে রাখবে—তা নয়, দিনরাত নভেলে মুখে এক হয়ে রয়েছে! ধন্যি মেয়ে বটে! এখন দয়া ক'রে গা তোলো।

মুখটা ভার ক'রে বললাম, কাকে আবার খেতে বলেছো তুমি? সে যাকেই বলি বাছা, এখন মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়টা বদলে আমার সংগে নীচে এসো। জিজ্ঞেস করলাম, কে তোমার এত মাননীয় অতিথি আসবে, মা যার জন্তে আমায় ঘটা ক'রে সাজতে হবে? বেশী কথা কাটাকাটি করতে হবে না। তুই ওঠ তো। নন্দা, তুই আয় তো মা—বলে মা নীচে নেমে গেলেন।

দিদি যাবার সময় মৃদু কণ্ঠে বলে গেল, মেজর আজ এখানে চা খাবেন।

মনটা কঠিন হয়ে উঠলো। মেজর আসবেন তাতে আমায় সাজতে হবে কেন? এটা আমি বুঝতে পারি নে।

আলমারী খুলে লম্বা-হাতা একটা ব্লাউজ বার করলাম আর খুব খুঁজে খুঁজে কালো পাড় শাড়ী একটা বার ক'রে তাই প'রে নীচের নামতেই একেবারে মা'র সামনে পড়ে গেলাম। মা তীক্ষ্ণ নেত্রে কিছুক্ষণ আমায় নিরীক্ষণ করে বললেন, কই, কাপড় ছাড়লিনি? বললাম, আহা, এই তো ছেড়ে এলাম মা। মা বললেন, সাদা কাপড় পরলি কেন, এমনিতে তো রঙিন ছাড়া পরো না—আজ সাদা পরতে কে বললে? যাও, সেই সাগরের মতো ঘন নীল শাড়ীটা পর গে।

রোজ রোজ এক শাড়ী পরতে ভালো লাগে না মা। মা কথা বলবার আগেই চাকরটা এসে খবর দিলে, দত্ত সাহেব এসেছেন। সংগে সংগে মা ব'লে মেজর ভেতরে এসে দাঁড়ালেন।

মা তখন আমার রেহাই দিয়ে মেজরকে বললেন, এতো দেরী করলে কেন বাবা? আমি ভেবে মরি অসুখ হল না কি হল। সহাস্যে মেজর বললেন, চা'টের সময় আপনি বলেছিলেন—আমি না হয় সাড়ে পাঁচটায় এসেছি। কি করি বলুন পথের চাকর—বেরুচ্ছি, একটা কল এলো, সেটা সেরে আসতে একটু দেরী হ'য়ে গেল। এখন চলুন, আহার-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত সৈনিক আমি!

এসো বাবা, এসো! ব'লে মা খাবার-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমি আবার ওপরে উঠতে যাচ্ছি, মা বললেন, সুমি, দেখ তো, উনি বাইরে আছেন কি না?

সকালে স্নান শেষ করে বাথ্-রুম্ থেকে বেরোতে দিদি দু'খানা চিঠি এনে আমার হাতে দিয়ে বললে, খুব মোটা মোটা চিঠি তুই পাচ্ছিস, কার চিঠি রে এগুলো?

বললাম, একটা তো অণুর দেখছি, আর এটা কার বুঝতে পারছি নে। ওপরে এসে জানলার ধারে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পুরু নীলাভ খামটাই আগে খুললাম। নীল রঙের কাগজে লাইন চারেকের চিঠি। ভারি যত্ন ক'রে চিঠি লিখেছে—নাম দেখলাম অসিত। সত্যি বলতে কী, বুকটা আমার আনন্দে নেচে উঠলো। অযাচিত ভাবে যে আমাকে এই প্রথম পত্র দিয়েছে। সে যে আমার অন্তরের প্রিয়তম প্রিয়! আনন্দের আতিশয্যে আমার চোখ দু'টো অশ্রু-বাষ্পে পূর্ণ হয়ে উঠলো! এতো আনন্দ, এতো তৃপ্তি লুকানো ছিলো ঐ চার লাইনের অক্ষরগুলোর মধ্যে!

আমি কি এত দিন এরই আশা করছিলাম—একান্তে নিজের মনেরও অগোচরে?

অসিত বাবু লিখেছেন:

"দেবি! আপনাকে চিঠি লিখছি—আমার এ স্পর্দ্ধা দেখে হাসবেন না যেন। অণুর কাছে আপনার ঠিকানা চেয়ে নিলাম। সে খুব হাসলো। আপনার কলেজ তো খুলে গেছে। কবে ফিরবেন? আমার অন্তরের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আজ এই পর্যন্ত। অসিত।"

এতো মন দিয়ে কার চিঠি পড়া হচ্ছে? পেছু ফিরে দেখি, একেবারে পিঠের কাছে মেজর দাঁড়িয়ে। হাওয়ায় আমার খোলা চুল তার গায়ে লাগছে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রূটা একটু কুঁচকে বললাম, বন্ধুর চিঠি। চেয়ারটায় বসে মেজর তাঁর পাইপটা শক্ত করে দাঁতে চেপে ধরে অস্পষ্ট স্বরে বললেন, তোমার কলেজ খুলতে কত দেরী? বললাম, আমার কলেজ খুলে গেছে। বাবাকে আজ ফেরবার কথা বলব মনে করছি। মেজর জানুতে সজোরে চপেটাঘাত করে বললেন, আমার সংগেই চল না কেন—আমি তো কালই ফিরছি। মা বলছিলেন, তাঁর এখন ফেরবার ইচ্ছে নেই। দেখি বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ও লোকটা কেন যে আমায় জালাতন করে?—নিজের ঘরে বসেও শান্তি নেই। বয়ে গেছে ওর সংগে কলকাতায় যাবার জন্তে।

১০

অনিতার কথা

মীনাদের বাড়ীতে সেদিন একটা কথা শুনলাম। দাদার সংগে না কি আমার বিয়ে—বললে অবশ্য মীনা। তার চুল বেঁধে দিচ্ছিলাম, সে কথায় কথায় বললে, জানো অনিদি—তোমার বিয়ে। হেসে বলে উঠলাম, কার সংগে রে,—তোর সংগে না কি?

মীনা তার বড় বড় চোখ দু'টি আমার দিকে তুলে বললে, হাসছো? সত্যি তোমার বিয়ে দাদার সংগে। আমার ভারী মজা লাগছে অনুদি, তুমি আমার বৌদি হবে মনে করে।

গম্ভীর হ'য়ে বললাম, ছিঃ মীনু, ও-সব কথা মনে আনিস নে—অসিতদা যে আমার দাদা হন—মনে করতো তুই অসিতদার বৌ !

মুখে হাত চাপা দিয়ে মীনা বলে উঠলো, ছিঃ ছিঃ অনুদি, চুপ করো, দাদা শুনলে কী মনে করবেন ! মা গো, কী মেয়ে তুমি ? তোমায় বিশ্বাস নেই।

বললাম, তবে আমায় বলছিলি কেন রাক্ষসী ? আমার দাদা নেই, অসিতদাই আমার দাদা। মীনা আমার হাত ধরে বললে, আমায় মাপ করো অনুদি, আর কখনো বলবো না।

ওর কপালে সিঁদুর টিপ পরাতে পরাতে বললাম, না, আর কখনো বলিস নে। ক্ষাণিকক্ষণ চুপ করে মীনা বললে, আমি চলে গেলে মার ভারী কষ্ট হ'বে। আচ্ছা অনুদি, তোমায় জানা-শোনা বেশ ভালো মেয়ে একটি আছে ? আমি বললাম, জানা-শোনা মেয়ে একটি কেন অনেক আছে—কিন্তু তাদের কাউকেই তোর দাদার মনে ধরবে না।

মীনা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কেন ভাই, কেন ? হেসে বললাম, তোর দাদার মন এক জনের রাঙা চরণে বাঁধা রয়েছে যে

সে কে অনুদি ? তাকে চেনো তুমি ? কেমন দেখতে তাকে ?

বললাম, ধীরে সখী ধীরে, সব বলছি একে একে। সে আমার বন্ধু—নাম সুমিত্রা, আর তাকে দেখতে কেমন ?—ঐ আকাশের চাঁদের চেয়েও সে সুন্দরী ! মীনা হাসি মুখে বললে, আমায় এক দিন দেখাবে অনুদি ?

কি দেখবি রে মীনু ? বলতে বলতে অসিতদা ঘরে ঢুকলেন।

আমি বললাম, তোমার প্রেয়সীকে মীনু দেখতে চায় অসিতদা।

একটি চেয়ার টেনে বসে অসিতদা বললেন, তোমরা ভারী বাজিল হয়েছো দেখছি অনু। কেন আর মীনাটির মাথা খাচ্চো ? মীনা যা তো রে, মাকে বলে আয়, অনুর মা আজ আমায় খেতে বলেছেন—রাতে বাড়ীতে খাব না।

আমি মুখ ভার ক'রে উঠে পড়লাম। অসিতদা বললেন, অনু, রাগ করলে না কি ? আহা শোনো, শোনো, অজিতের বাড়ী যাচ্ছি।

আমি কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললাম, যার বাড়ীতেই যাও না—তাতে আমার কি প্রয়োজন ?

মুখ টিপে হাসতে হাসতে অসিতদা বললেন, না, তোমার আবার কি প্রয়োজন ? আমি এমনি বলছি। বা রে ! এতে তুমি প্রাণি-বিশেষের মতো মুখ করোছো কেন ভাই ?

আমার ভারী বয়ে গেছে—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

[ক্রমশঃ

২৫শে বৈশাখ স্মরণে

কুমারী কনকলেখা ঘোষ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ২৫শে বৈশাখের এক মধুময় ক্ষণে আমাদের প্রিয়তম মরমী বা মিষ্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম উদ্বোধনির বাঁশি বেজে উঠেছিল এই বাংলার বুকে। জগতের একটি লোকও সেদিন হয়ত কল্পনা করতেও পারেনি যে, ভাবী কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী, শ্রেষ্ঠ কবি ঐ ক্ষুদ্র অসহায় শিশুটির মাঝে লুকিয়ে আছে। তাঁর কচি কচি হাত দু'টি, কচি কচি চোখ দু'টি আর ছোট হৃদয়খানি যে এক দিন বাংলার ঘরে ঘরে কল্যাণের পরশ-কাঠি বুলিয়ে যাবে, এ কথা কে ধারণা করতে পেরেছিল ? কে জেনেছিল, ভাষাহীন ঐ অপরিণত কণ্ঠ যে এক দিন দীন স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে দরদ-ভরা কণ্ঠে বলবে—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

আজ মনে হয় কেউ না জানুক, নিদাঘের তপন, চির-দূরদর্শী ঐতিহাসিক সুদূর আকাশ, আর সন্তানবৎসলা পৃথিবী জেনেছিল, এই শিশু শুধু শিশু নয়, শিশুরূপে আবির্ভূত মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। তাই আকাশের রবি, এই শিশুরূপী মানব-রবির মুখে যে আলোর কুসুম ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা কুসুমের মতই নিষ্কলুষ, আর শুভাকাঙ্ক্ষার চন্দনে ভরা। আকাশ যে মধু হাসি হেসেছিল সে হাসি গর্ব ও আনন্দে ভরা,—পৃথিবী যে স্পর্শ দিয়ে ধারণ করেছিল এই ক্ষুদ্র শিশুকে সে স্পর্শ মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আবেগে মুখর।

বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বীর-প্রসবিনী উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবকে পরিপূর্ণ করেছিল এই ঋষি-প্রতিম আদর্শ মানুষটি। তিনি ত শুধু কবি নন ; তিনি সাধক, তিনি ত শুধু দেশপ্রেমিক নন ; বিশ্বপ্রেমিক। ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে সমগ্র স্বার্থের দিকেই ছিল তাঁর দৃষ্টি, একের জন্য নয় সমগ্র মানবের জন্য, শুধু দেশপ্রেমে নয়, সমগ্র জগতের প্রেমে তাঁকে ধ্যানমৌনী দেখতে পাই।

তাই কখনো শুনি তাঁর হৃদয় দেশপ্রেমে আত্মহারা হয়ে বলছে—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালোবেসে।"

আবার শুনতে পাই, কখনো তাঁর প্রশান্ত কণ্ঠ সমগ্র বিশ্বের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর আদর্শময়ী ভারতমাতার বুকে সমস্ত জাতিকে মিলবার অনুরোধ জানাচ্ছে। শত্রু-মিত্র কোন জাতিই তাঁর হৃদয় হ'তে দূরে নয়। তাই তাঁর দেশের বুকে সকলকে মিলবার, এক কথায় আবেগ-মুখর কামনায় তিনি সকলকে আহ্বান করছেন।...

"রণধারা বাহি, জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে,
ভেদি মরুপথ, গিরি-পর্বত, যারা এসেছিল সবে,
তাঁরা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নয় দূর—দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।

* * * *

এস হে আর্য্য এস অনার্য্য, হিন্দু-মুসলমান—
এস এস আজ তুমি ইংরাজ এস এস খৃষ্টান।"

বাস্তবিক সকলের স্পর্শ না হলে, সকলের ঐক্য না হলে কোন মহৎ জিনিষও যে সত্যিকার মহান্ হ'তে পারে না, যা সীমাবদ্ধ, যা ক্ষুদ্র গণ্ডী দিয়ে ঘেরা, তা যতই উচ্চ স্তরের হোক না কেন, তা যে স্বল্পায়ু, তা'কে অমরত্বের অধিকারী করতে গেলে চাই অসীমের প্রণয়-বন্ধন. এ কথা তিনি যেমন করে বলেছেন আর কেউ তেমনটি বলতে পারেননি। মানব জাতির ঐক্য-সম্ভাবের মূলমন্ত্র বিশ্বপ্রেমের বার্তা এ কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই, সংকীর্ণমনা কুটিল দেশপ্রেম থেকে নিজেকে দূরে রেখে প্রচার করেছিলেন আন্তর্জাতিক সৌখ্যের বাণী।

নারীর প্রতি তাঁর কল্যাণ-দৃষ্টি চির অবারিত। নারীকে তিনি কেবল ভোগের দৃষ্টিতে দেখেননি, তিনি নারীকে দেখেছেন কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মীরূপে। তাই নারীর প্রেয়সী মূর্তির চেয়ে নারীর দেবীমূর্তি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বেশী।

"তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে
তোমার প্রীতি ছিন্নজীবন গেঁথে গেঁথে আনে।"

• • • •

"রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছো প্রাণেশ্বরী
প্রাতে কখন দেবীর বেশে,
তুমি সমুখে দাঁড়ালে হেসে,
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মল বায়, শান্ত উষার নির্জন নদীতীরে।"

রাতে লাজনতা প্রেয়সীর মূর্তি কবিকে যতখানি না আনন্দ দিয়েছে, প্রাতে নারীর স্নিগ্ধ-শান্ত দেবীমূর্তি কবিকে সম্ভ্রম-শ্রদ্ধায় আরো অধিক আনন্দাবিষ্ট করে তুলেছে।

দরদী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নারীর অন্তস্তলের মধ্যে সতত বিরাজমান ছিল, তাই নারীর সুখ-দুঃখ, ব্যথা-অনুরাগ সব কিছুই তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ত। গুপ্তপ্রেম, ব্যক্তপ্রেম, বালিকা বধূ, মুক্তি, নারীর উক্তি, বধূ ইত্যাদি বহু কবিতায় নারীর সুখ-দুঃখের কথা নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মুক্তি আর বধূ কবিতাটি যেন সব চেয়ে মর্মস্পর্শী। ছোট্ট বেলা থেকে শ্বশুরবাড়ীতে বন্দী 'মুক্তির' নায়িকা তার রোগশয্যায় শুয়ে ২২ বছরের সঞ্চিত সুখ-দুঃখের ভাণ্ডার এক মুহূর্তে প্রকাশ করেছিল। ২২ বছর ধরে জগতে কত সুরের, কত সুখ-দুঃখের খেলা চলেছে, কত নতুন-পুরাতনের আনাগোনা হয়েছে, কিন্তু তার জীবনে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়নি—সংসারের গৃহকর্ম, আর রান্নাঘরের কাজটুকুই ছিল তার জীবনের একমাত্র কাজ। তাই দুঃখ করে বলেছে—

"জানি নাই ত আমি যে কি,
জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কি অর্থে যে ভরা
আমি কেবল জানি রাঁধার পরে খাওয়া
আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।"

তাঁর বধূ কবিতায় দেখতে পাই, পাড়াগাঁয়ের অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত বালিকা বধূটি যখন নগরের প্রাসাদ-কারার মধ্যে এসে বন্দী হ'ল, তখন তা'র বালিকা-হৃদয় এই অপরিচিত আড়ম্বর দেখে নিত্য পরিচিত গ্রাম্য-ছবি মনে করে গোপন মনে কেঁদে উঠল। একে একে গ্রাম্য জীবনের অতি-পরিচিত ছবিগুলি মানস-নয়নে ভেসে উঠল। দূর হতেও পরিচিত সুরে বেলা পড়ে যাবার কথা শুনিয়ে কে যেন তাকে জল তুলতে যাবার জন্য আহ্বান করছে। এই কঠিন আড়ম্বর থেকে সেই গ্রাম্য-জীবনে ফিরে যাবার জন্য তার হৃদয় কেঁদে উঠছে, কারণ, এখানকার প্রাণহীন স্নেহহীন আড়ম্বর তা'র কাছে দুঃখপ্রদ। তাই বালিকা ব্যথিত হৃদয়ে বললে :—

"হায় রে রাজধানী পাষাণ কায়া
বিরাট মুঠি তলে চাপিছে দৃঢ় বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহি কো মায়া।
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ-ঘাট
পাখীর গান কই বনের ছায়া।

• • • •

কেহ বা দেখে মুখ, কেহ বা দেহ
কেহ বা বলে ভালো, বলে না কেহ—
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে করে না স্নেহ।

বাস্তবিক বাংলার ঘরে ঘরে কত বালিকা বধূ তার স্বাভাবিক সরল জীবনকে পরিত্যাগ করে, শ্বশুরবাড়ীর নিয়মে বাঁধা জীবন গ্রহণ করে, শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। তাদের আবেদন ত কেউ শুনবে না, তাদের হৃদয়ের ত কেউ দাম দেবে না, তাই তারা হৃদয়ের তাপ জুড়াতে শেষ পর্য্যন্ত সর্বতাপহারী মৃত্যুকে কামনা করে। আমরা এই বধূ কবিতাতেও শেষ পর্য্যন্ত দেখতে পাই, ব্যথা-ক্লান্ত অভিমানিনী বালিকা বধূ মৃত্যু কামনা করে অশ্রুজলে বলছে—

"কবে পড়িবে বেলা ফুরাবে সব খেলা
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্।"

এই রকম নানা বিচিত্র রূপে ও নানা ভাবের প্রাচুর্য্যে ভরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য। শিশুদের সরল হৃদয়টিও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে ছিল না, তাই শিশুদের জন্য লেখা কবিতা নাটক শিশুদের মনকে গভীররূপে দোলা দেয়। মৃত্যু সম্বন্ধে লেখা তাঁর কবিতাগুলি এক নতুন ভাবে মানুষের হৃদয়গুলিতে অমৃতের ঝরণা-ধারা বর্ষণ করে। "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান"—কি অপূর্ব্ব রস নিয়েই না মৃত্যুকে মানুষের চোখে সরল ও সুন্দর করে তুললে।

এক কথায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা, মহাদেবের জটা থেকে উদ্ভূত নদীর ন্যায় নানা ভাবধারায় বয়ে চলেছে। আজ বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের সামনে যে শক্তির সহায়তায় সাহিত্য বলে সগর্বে দাঁড়াতে পারে, সে শক্তি সম্পূর্ণরূপে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

আজ ২৫শে বৈশাখ—কবির জন্মদিনের স্মৃতি নিয়ে সারা পৃথিবী আজ আনন্দ-চঞ্চল। আজকের এই মধু দিনে সেই ঋষি-প্রতিম দরদী মরমী শ্রেষ্ঠ কবির চরণে শ্রদ্ধানতি জানিয়ে বলি—"ওগো কাব্যের সম্রাট্, মানবতার পূর্ণ প্রতীক, ভারতের গৌরব, আজকের দিনে গ্রহণ কর তোমার চল্লিশ কোটি দেশবাসীর সশ্রদ্ধ নমস্কার আর হৃদয়ের প্রেমপদ্ম—আশীর্বাদ কর, তোমার প্রীতি যেন আমাদের সমস্ত আবিলতাকে ধুয়ে-মুছে সত্য ও আদর্শের পথে, এবং মনুষ্যত্বের পথে প্রেরণ করতে পারে।"

ছোটদের আসর

চৌদ্দ

সেই রাত্রে

'ব্যাপার কি সুব্রত বাবু? আমি রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, তার পর 'কালীতারা' রেষ্টুরেণ্টে ও ক্লাবে গিয়ে খোঁজ করে জানলাম, রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত ও কালীতারা রেষ্টুরেণ্টে ছিল, তার পর কোথায় গেছে কেউ জানে না। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভিতরে আসুন না?'

অসীমের আহ্বানে সুব্রত ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

'বসুন।'

সুব্রত একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। অসীমও অন্য একটা চেয়ারে মুখোমুখি বসল। হ্যারিকেনের ঝাপ-সা আলোর খানিকটা রশ্মি তির্য্যগ, ভাবে এসে অসীমের মুখের 'পরে পড়েছে। সমগ্র মুখখানি জুড়ে একটা নিরতিশয় উৎকণ্ঠার ভাব।

'বুঝতে পারছি, আপনিই সুসীমকে বাড়ী নিয়ে এসেছেন, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না দিলে অন্যায়ই হবে। বিশেষ করে কিছু দিন থেকে দেখতেই যখন পারছি, আমাদের কোন না কোন ভাবে উপকার করাটাই যেন আপনার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুসীম এত রাত্রে কোথায় গেছিল, কোথায়ই বা ওর সংগে আপনার দেখা হলো? কি করছিল ও সেখানে?'

'বিশেষ কিছুই না, চেষ্টা করছিল যাতে করে ওর হাজত বাস করতে সুবিধা হয়।' বলতে বলতে পকেট হতে সুসীমের হাত হতে ছিনিয়ে নেওয়া পিস্তলটা বের করে অসীমের দিকে এগিয়ে ধরল: 'দেখুন, সেদিনও একবার আপনাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, আজও আবার সাবধান ক'রে দিচ্ছি, এ জিনিষটা বড় সাংঘাতিক। এ নিয়ে ছেলেখেলা করাও যা, আগুন নিয়ে খেলা করাও ঠিক তাই। ভবিষ্যতে এটা এমন জায়গায় রাখবেন যেখানে সহজে মানুষের দৃষ্টি না পড়ে।'

লণ্ঠনের ম্রিয়মাণ আলোয় সুব্রত স্পষ্ট দেখলে, মুহূর্তে যেন অসীমের সমগ্র মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল, এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, 'সন্ধ্যা থেকেই পিস্তলটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। জানতাম না যে এটার সন্ধান সুসীম জানে। কোথায় গেছিল ও?'

সুব্রত তীব্র অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে অসীমের মুখের দিকে তাকায়, আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনি কি বলতে চান, ও কোথায় এতক্ষণ ছিল আপনি তা জানেন না?

অসীম চোখ তুলে সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়।

'ভারতী-ভবনে গেছিল আপনার ভাই।'

'সিদ্ধি খেলে ওর জ্ঞান থাকে না। তাছাড়া, ও অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও চঞ্চল প্রকৃতির। কিছু করেছে নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে?

'না, বিশেষ তেমন কিছুই নয়, অমুতোষ বাবুদের পুরান চাকর সুখদাসকে গুলী করতে চেষ্টা করেছিল।'

'সর্বনাশ! সে কি?' উত্তেজনায় অসীম যেন উঠে বসে।

'হাঁ! ব্যাপারটা বড় বিশ্রী হয়ে গেছে। বিশেষ করে আপনিই যখন সব দিক বাঁচিয়ে কাজ করছেন!'

'তারা কি করলে?'

'বিশেষ আর এমনি কি এ ব্যাপারে লোকে করতে পারে। শ্রীমানকে পুলিশের জিম্মায় তুলে দিতে চেয়েছিল। তার পর অমুতোষ বাবুকে আমি ওর হয়ে বলায়, ছেড়ে দিয়েছেন।'

'সুখদাসের নিশ্চয়ই কোথায়ও আঘাত লাগেনি।'

'না। কারও কোন ক্ষতি হয়নি।'

'আশ্চর্য্য হচ্ছি, এ ব্যাপারের পরও সুসীমকে তারা ছেড়ে দিলে?'

'হাঁ। ব্যাপারটা যখন সব মিটেই গেল।...'

'আপনার কথার মানে আমি ঠিক ধরতে পারলাম না সুব্রত বাবু।'

হঠাৎ সুব্রতর কণ্ঠে যেন একটা দরদের সুর নেমে আসে, 'কেন? কেন আপনি এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না অসীম বাবু? এখনও আমাকে বিশ্বাস করে সব খুলে বলুন।'

'এমন কোন কারণই আমি ভেবে পাচ্ছি না, যাতে করে আপনাকে আমি বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলতে পারি, সুব্রত বাবু!

না গ পা শ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তাছাড়া, আপনার সম্বন্ধেও আমি কিছুই জানি না। এক কথায় বলতে গেলে আপনি আমার একান্ত অপরিচিত। কেবল এইটুকু বুঝতে পারছি, আপনি পুলিশের দলের সংগে মিশে কাজ করছেন। এবং যেহেতু পুলিশের দ্বারা আমার কোন সাহায্যই হতে পারে না, সে ক্ষেত্রে…'

'আমি সবই জানি, এবং মানিও বটে আপনার যুক্তি, তবু আমিই আপনাকে সত্যিকারের সাহায্য করতে পারি।…'

'যেতে দিন ও সব কথা সুব্রত বাবু। ও বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করতেও আমার ইচ্ছা নেই আপনার সংগে। তাছাড়া, আমি বুঝতেই পারছি না আপনি কি বলতে চান।'

'দেখুন, আমি যে কি বলছি বা বলতে চাই, সেটা যে একেবারেই আপনি বুঝতে পারছেন না; আর যেই করুক আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু সে যা-ই হোক, এখনও যখন আমাকে বিশ্বাস ক'রে আমার কাছে মন খুলে সব কথা বলতে পারছেন না, তখন এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনি নিজে নিজেই সব কিছু করতে চান।'

'যদি বলি তাই!'

'তাহ'লে বলবো, আপনি অত্যন্ত ভুল পথে চলেছেন। এখনও আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আপনার এই অনর্থক লুকোচুরির জন্ম ক্রমেই ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে উঠ্‌ছে।'

'আশা করি, আমাকে আপনি ভয় দেখাচ্ছেন না।'

'না, ভয় দেখাচ্ছি না বটে, তবে সাবধান করে দিচ্ছি। আচ্ছা নমস্কার, আসি।' সুব্রত চেয়ার ছ'ড়ে উঠে প'ড়ে, দ্রুত পদে ঘর হতে নিক্রান্ত হয়ে গেল।

* * * *

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে, গাড়ী ব্যাক্ করে সুব্রত থানার দিকে গাড়ী চালাল। থানায় এসে যখন ও পৌঁছাল রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা।

থানার অফিস-ঘরে, একটা মলিন ডোমে ইলেক্‌ট্রিক বাতী জ্বলছে। কতকগুলি রাত-পোকা, বাতীর ডোমটার চারি পাশে ঘুর-পাক খেয়ে উড়ছে।

এক জন কনেষ্টবল একটা বেঞ্চের 'পরে বসেছিল, সুব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল, 'কোন হ্যায় তুম্?'

'দারোগা সাব্‌ কো বোলাও, বোলো, সুব্রত বাবু আয়া হ্যায়।'

সুব্রত একটা চেয়ারে বসে একটা সিগ্রেটে অগ্নি-সংযোগ করল।

পরিধানে একটা লুঙ্গী, গায়ে একটা আলোয়ান জড়াতে জড়াতে নিদ্রা-কাতর চোখে পিট্-পিট্ ক'রে তাকাতে তাকাতে সুশান্ত এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে: 'কি ব্যাপার মিঃ রায়? এত রাত্রে?'

'বসুন মিঃ সেন, আপনাকে আচম্‌কা মধ্য-রাত্রে এ ভাবে ঘুম ভেংগে উঠিয়ে আনবার জন্ম একান্ত দুঃখিত; কিন্তু ব্যাপারটা একটু জরুরী।'

সুশান্ত সবিস্ময়ে সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়।

সুব্রত ধীরে ধীরে ঐ রাত্রের ভারতী-ভবনের ব্যাপারটা সংক্ষেপে সুশান্তকে বলে গেল।

'হুঁ! এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে, মিছরীর দানার মত ব্যাপারটা এবারে আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠ্‌ছে।'

'কিন্তু আসলে যে জন্ম এসেছি, সেটা হচ্ছে কোন একটি চালাক-চতুর ছোকরাকে নিযুক্ত করতে হবে সুসীমের 'পরে সর্বদা নজর রাখবার জন্ম। সে ছায়ার মত সর্বদা সুসীমকে চোখে চোখে রাখবে।'

'কিন্তু…'

'যা বলছি তাই করুন সুশান্ত বাবু। সময়ে সব জানতে পারবেন।'

'কিন্তু লোকটার বিরুদ্ধে ত' কোন কিছুই নেই, কি ক'রে লোকটার পিছনে স্পাই লাগাই?'

'এবারে সত্যিই হাসালেন সুশান্ত বাবু। মহামান্য বিটিশ বাহাদুরের স্পেশাল ইনভেষ্টিগেশন দপ্তরে যে সব লোকের পিছনে স্পাইং চলেছে, তাদের মধ্যে সত্যিকারের কয় জনা দোষী বলতে পারেন? ক্যরত সত্যিকারের কয় জনকে আপনারা স্পাইং করতে পারেন? আজ যে শত শত ছেলে-মেয়ে সরকার বাহাদুরের কারা-প্রাচীরের অন্তরালে বন্দী হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে দোষী কয় জন? মনগড়া মিথ্যা সন্দেহের কালো রং তাদের মুখে মাখিয়ে আজ যে আপনারা তাদের 'পরে নিষ্ঠুর নির্য্যাতন করছেন, তার যুক্তিটা আপনাদের কোথায়? কিন্তু যাক্ সে কথা, সুসীমের 'পরে নজর রাখবেন।'

'যদি মনে কিছু না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। শংকর ঘোষের খুনের ব্যাপারে কি আপনি সুসীমকে সন্দেহ করেন?'

'না, সুসীমের পক্ষে কাউকে খুন করা ঐ ভাবে, একেবারেই অসম্ভব।'

'আপনি বলবেন না, সুসীমের 'পর কেন নজর রাখতে চান?'

'বলবো, কিন্তু এখন নয়। এখন বললে এই কেসের সব চাইতে বড় সূত্রটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। আরো একটা কথা, যে রাস্তার 'পরে, গাড়ীর মধ্যে শংকর ঘোষের মৃতদেহ পাওয়া গেছিল, তার আশে-পাশে খুঁজে দেখবেন ত' কোন সাইকেল পাওয়া যায় কি না? আশে-পাশে অনেক ঝোপ-ঝাড় আছে দেখছিলাম।'

'সাইকেল?'

'হাঁ, দু' চাকার গাড়ী—যাকে আমরা পা-গাড়ী অনেক সময় ব'লে থাকি। আচ্ছা, আজ তবে চলি সুশান্ত বাবু, আবার সময়ে দেখা হবে। নমস্কার।…'

সুব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে।

[ক্রমশঃ।

মেঘ-পরী

শ্রীরবিদাস সাহা-রায়

টুপ্, টাপ্,—ঝুপ ঝাপ্,—ঐ মেঘ বর্ষে,
মেঘ-পরী আসে বুঝি আজ মহা হর্ষে,
রুমুঝুনু…ঝম্, ঝম্…মঞ্জীর বাজে রে,
খাল, বিল, নদী আজ অপরূপ সাজে রে।
জাগে বন-তরুলতা ফলে ফুলে রঙ্গে,
কি নবীন শ্যাম শোভা তৃণ ধরে অঙ্গে।
যুঁই, বেলা, ভুঁই চাঁপা আনন্দে ফুটলো,
গুন্ গুন্ মৌমাছি কেয়া-বনে জুটলো।

কারখানা দু' রকমের। কাণ্ড-কারখানা আর কল-কারখানা। কল-কারখানাও আবার দু' রকমের হতে পারে কিন্তু সেটা বঙ্কিমের পাল্লায় পড়ার আগে আমার ইয়াদ হয়নি।

ইস্কুলের সেক্রেটারি বিনা নোটিশে খতম্ হয়ে ছুটিটা রেনিডে-র মতো হঠাৎ এসে গেল। বঙ্কিম বললে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কী হবে, চ তোদের বাড়ী যাই। তোকে একটা নতুন ধরণের খেলা দেখাব।

নতুন ধরণের খেলাই বটে! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না দেখলে বোঝাই যায় না—খেলোয়াড়টিকে অন্ততঃ। সত্যি, বঙ্কিম এত খেলাও জানে!

আমি বললাম—তাই চল্। বাবা আপিস গেছেন, তাঁর বসবার ঘরটা ফাঁকা। মা ঘুমুচ্ছেন তেতলায়, কেউ কোথ্‌থাও নেই। বেশ পিস্‌ফুল্ অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার।

আমাদের বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে বঙ্কিম বললে—তোদের বাড়ী টেলিফোন আছে তো রে?

"না। টেলিফোন করতে হলে আমরা পিসে মশায়ের বাড়ী যাই। এখান থেকে আধ মাইল। অন্ত জায়গায় করলে পয়সা লাগে কি না।"

"সেখানকার অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার কেমন? এই রকম পিস্‌ফুল?" বঙ্কিম জিজ্ঞেস করে।

"পিসে অবশ্যি এখন আপিসে। কিন্তু—তা বলে' মোটেই পিস্‌ফুল নয়।" আমি বলি: "বরং পিসিফুল বলতে পারিস। আমার পিসী রাত দিন সারা বাড়ী চষছেন। তাছাড়া বাড়ীটা দুর্দান্ত রকমের পিসতুত-ভাই-ফুল্। কেউ তারা দুপুরে ঘুমোয় না—আর যাকে বলে, আট্‌মোসট্ ফিয়ার। এক একটি জাঁহাবাজ আবহাওয়া।"

"তাহলে সেখানে গিয়ে কাজ নেই। আমাদের বাড়ীই চ'। আমাদের টেলিফোন আছে। তোকে চকোলেট খাওয়াব।" বঙ্কিম বল্‌ল।

টেলিফোনের জন্তে না, চকোলেটের খাতিরেই বঙ্কিমের বাড়ী গেলাম।

গিয়েই বঙ্কিম টেলিফোন নিয়ে বসলো—অবশ্যি, চকোলেটের বাক্স সামনে রেখে।

"খেলাটা হচ্ছে এই—," বঙ্কিম আমাকে বোঝাতে থাকে, "এই হচ্ছে টেলিফোন্। (টেলিফোন্‌টাকে ও পাকড়ায়) আর এর নাম বুঝলি রিসিভার—এম্নি করে' ধরতে হয়। (রিসিভারটাকে ও হাতায়) ধরে এইবার আমি একটু চোখ বুজবো, একটা নম্বর আন্দাজ করব। যা মনে আসে—যে কোনো নম্বর। এই যেমন ধর......"

চোখ বুজে রিসিভারটাকে কানে ধরে বঙ্কিম উদাহরণস্বরূপ হয়ে ওঠে।···"হ্যালো, বড়োবাজার ১০১০ হ্যালো, আপনারা বড়বাজার সত্তর সত্তর?···আপনি কে? দৌবারিক দাশ···মিষ্টান্ন বিক্রেতা?··· ভালো কথা, আপনাদের দোকানে আজ কোনো পচা সন্দেশ আছে? নেই? সব পাচার করে দিয়েছেন? পাড়াতেই করেছেন তো?··· বেশ বেশ!···ও, আমি? আমি আপনাদের পাড়ায় থাকি, পাড়ার ডাক্তার। ভালো করে কেন এখনো এখানে কলেরা লাগছে না সেই জন্তে ভারী ভাবিত আছি। খুব কসে পচা সন্দেশ চালান মশাই, বুঝলেন? কদাপি টাট্‌কা থাকতে বেচবেন না, আগে পচ্‌তে দিন্—রীতিমতো পচুক—তার পর পচিয়ে ছাড়ুন। বুঝেছেন···"

বঙ্কিম দৌবারিককে ত্যাগ করলো।

"এই একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। তেমন খুব ভালো দৃষ্টান্ত নয় যদিও। দোকানদারদের আমি পছন্দ করি না—পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। ওদের দিয়ে বিশেষ সুবিধে হয় না। ডোমেষ্টিক লোক পেলেই খেলাটা ভালো জমে। তবে কয়েকটা আজে-বাজে এই ভাবে যাবার পর এক একটা এমন মজার লোক কলে পড়ে তখন এ সব—সমস্ত লোকসান পুষিয়ে যায়···কেমন, খেলাটা তোর কেমন লাগছে?'

ওর কলের সময়ে আমার কেরামতি দেখাচ্ছিলাম। চকোলেটদের মুখে পুরছিলাম। ধ্বংসাবশেষটিকে গিলে ফেলে বল্‌লাম—"মন্দ না। হাতে কোনো কাজ না থাকলে এক-আধ ঘণ্টা এই ভাবে কাটাবার পক্ষে খারাপ কি? অবশ্যি, যদি বাবারা টের না পায়। দে, এবার আমি করি···

হাতে-কলমে যেমনটি শিক্ষা পেয়েছি—কাজে লাগাই। রিসিভার কানে দিয়ে চোখ বুজতে হয়···আন্দাজ মার্কা একটা নম্বরও বলে দিই···

"হ্যালো, এটা ইস্কুল? দয়া করে—একটু অঙ্কের মাষ্টারকে ডেকে দেবেন···তিনি ক্লাসে গেছেন? লাইব্রেরীতে কে আছেন এখন? ইতিহাসের মাষ্টার? আচ্ছা, তাঁকেই ধরতে বলুন।"

ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হোক্, আপত্তি কি?

"হ্যালো, মাষ্টার মশাই, আমার ছেলেকে আপনি যা পড়াচ্ছেন

Call-কারখানা

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

তা আর বলে' কাজ নেই। এ রকম প্রাইভেট টিউশনি ক'দিন থেকে করছেন মশাই? আমার ছেলেকে পড়াবার নামে যা ফাঁকি দিচ্ছিলেন—ছিঃ! সে-কথা আর বলে' কাজ নেই···"

"আজ্ঞে···আজ্ঞে···আপনি কী বলছেন?"

গলাটা গুরু-গম্ভীর করে আমি বজ্রের মতো গর্জন করি: "আর আজ্ঞে আজ্ঞেতে কাজ নেই। এই আমার স্পষ্ট কথা, শুনে রাখুন। আপনাকে আজ থেকে আর আমাদের বাড়ী পড়াতে আসতে হবে না। পড়ানো তো ছাই, যা আমার ছেলের কাছে শুনছি, আপনি না কি তার ঘাড় ভেঙে আলুকাবলি খান, সিনেমা ভাখেন, তার পর তার জন্মদিনের উপহার পাওয়া ফাউন্টেন পেনটাও এক দিনের জন্যে নিয়ে একেবারে মেরে দিয়েছেন—এ সব কী!"

অপর প্রান্ত থেকে এবার সশঙ্ক কণ্ঠ শোনা যায়—"দেখুন, আপনার রং নম্বর হয়নি তো? আমি তো আপনাকে বা আপনার ছেলেকে ঠিক ধরতে পারছি না।"

"আর পারবেনও না। আজকের সন্ধ্যের গাড়ীতেই আমরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছি। মধুপুর সটকে পড়ছি সটাং। আপনার মতো মাষ্টারের খর্পর থেকে বাঁচতে হলে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। নমস্কার।"

টেলিফোন ছেড়ে বঙ্কিমের দিকে তাকালাম—"কী! কি রকম হোলো? প্রথম চেষ্টা হিসেবে নেহাৎ মন্দ হয়নি, কি বলো?"

বঙ্কিম ঘাড় নাড়লো—একটু যেন বাঁকা ভাবেই।

তার পর ওর পালা। 'ওর বরাতে একটা হোলো নো রিপ্লাই, আরেকটা কিরিঙ্গি মেম, যার কথার মাথা-মুণ্ডু বোঝে কার সাধ্যি—অবশ্যি, আমাদের বঙ্কিমও ইংরিজি বোলচালে কিছু কম যায় না—কিন্তু হলে কী হবে, ওর বিলিতি সাধু ভাষা মেমটার কানে ঢুকলেও মগজে ঢুকলো কি না কে জানে। বঙ্কিম বিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলে। শেষ পর্য্যন্ত তার টেলিফোনে জুটলো এক মাড়োয়ারি—মাড়োয়ারি কিম্বা চাপরাসী—সে তো স্পষ্টই ওর মুখের ওপর বলে বসলো—"কেয়া বুরবকৃকা মাফিক্ বাৎ করতা হ্যায়?"

এই ধরণের বাতচিতের পর বঙ্কিম ভারী দমে গেল। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে গুম্ হয়ে বসে থাকলো।

তখন আমি পাকড়ালাম। প্রথমেই পাকড়ালাম এক নাম-করা সাহিত্যিককে। উপন্যাস লিখে তিনি নামজাদা। তাঁর লেখার ধরণ নিয়ে একটু আলোচনা করা গেল। তাঁর উপন্যাসের কাঠামোর কোথায় কোথায় গলদ তাঁকে আমি অকাতরে জানালাম। আশ্চর্য এই, সমস্তই তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন। কি ভাবে গল্প ফাঁদলে আরো ভালো হয় তারও কিছু কিছু আইডিয়া তাঁকে আমি দিলাম—পরবর্তী রচনায় তিনি সেগুলো কাজে লাগাবেন বললেন।

বঙ্কিম তো গুম্ হয়ে ছিলোই, এখন আরো গম্ভীর হয়ে গেল। ওর মুখ কালো হয়ে উঠতে দেখলাম—আমার হিংসেয়, বলাই বাহুল্য।

কালো মুখে ও রিসিভারটাকে হাতে নিলো এবার। নিয়ে চোখ বুজলো। আমি সেই ফাঁকে ওর আরেকটা চকোলেটের বাক্স থেকে আরো কতকগুলো সরালাম। একেবারে আমার মুখের মধ্যে সরিয়ে ফেল্লাম। ও চোখ বুজে থাকতে থাকতেই।

বঙ্কিমের ভাগ্যে এবার পার্ক ষ্ট্রীটের থানা এসে পড়লো। থানা শুনে আর সে এগুতে সাহস করলো না। "ওরে বাবা!" বলে রিসিভার রেখে দিলো। তৎক্ষণাৎ।

বললো: "থানা ধরা ঠিক নয়। উল্টে থানাতেই ধরে নিয়ে যায়।"

আমি ধরলাম। আমার টেলিফোন-জালে এবার এক জন লেডি ডাক্তার ধরা পড়লেন। ভালোই হোলো আরো। অনেক সদালাপের পর তাঁর কাছ থেকে মা'র অম্বলের ব্যারামের একটা পেটেন্ট দাবাই বাগলে নিলুম—ফি-টি না দিয়েই—বেবাক্ বিনে পয়সায়। আমার সাফল্যের উপর সাফল্য এবং নিজের ব্যর্থতার পর ব্যর্থতায় বঙ্কিম ক্রমেই চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠছিলো। এবার সে চটে-মটে চকোলেটের বাক্সগুলো তুলে নিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে বন্ধ করল।

বঙ্কিমটা ঐ রকম। বড্ডো হিংসুটে। অবশ্যি, আমি একটু বেশি বেশি চাখছিলাম তা ঠিক, তবু চকোলেটের এই বাজে খরচ—তাও হয়তো ওর প্রাণে সইতো। কিন্তু ওর খেলায় ওকেই হারিয়ে দেয়া—এটা বুঝি কিছুতেই ও বরদাস্ত করতে পারছিল না।

ক্রমেই ওর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে এলো। ওর মুখে একটা ক্রুর হাসি খেলা করতে লাগলো। ওর ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল। "এই বার শেষ—আমার পালা হয়েই খতম্।" এই বলে সে রিসিভারকে নিজের কানে লাগালো।

"ও—আপনি! ক'দিন থেকেই আপনাকে ফোন করব করব ভাবছিলাম—ভাগ্যিস্ আপনাকে আজ পাওয়া গেল টেলিফোনে···"

বঙ্কিমের মুখে হাসি ধরে না। অনেক ধরাধরির পর কাউকে ধরতে পারলে কার না আনন্দ হয় বলো!

"···আপনার ছেলের স্বভাব-চরিত্রের কথা আপনাকে না বলে পারছি না। আপনাকে সমস্ত খুলে বলাই আমার উচিত। এই বয়সেই ওর স্বভাবের ভেতর ঢ্যাতো গলদ ঢুকেছে যে—আপনাকে বলব বলব মনে করছি কিছু দিন থেকেই, কিন্তু—"
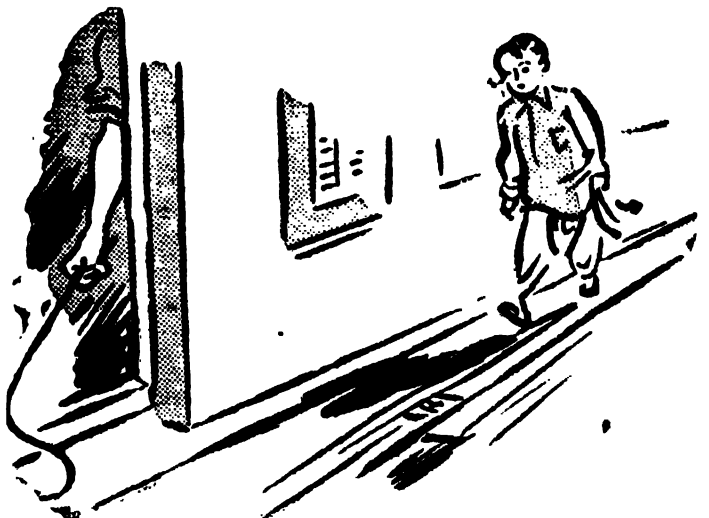
বঙ্কিম বলেই চলে। বল্‌তে বল্‌তে আমার দিকে বারেক বঙ্কিম কটাক্ষে তাকায়। আমিও ওকে ইঙ্গিতে উৎসাহ দিই—চালাও—চালিয়ে যাও! বেশ হচ্ছে। বাস্তবিক, এমন কলাও করে চমৎকার করে শুরু করেছে বঙ্কিমটা।

"···সিগ্‌রেট্? হ্যাঁ, সিগ্‌রেট্ তো টানেই, বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি ফুঁকে পার করে দিচ্ছে মশাই, সিগ্‌রেটের কথা কি বল্‌ছেন? সম্প্রতি আবার গাঁজা টানতেও শুরু করেছে। ···আজ্ঞে হ্যাঁ··· আমাদের খোট্টা দারোয়ানের সঙ্গে মিশে। প্রথমে লোটা লোটা ভাঙ ওড়াচ্ছিল, তখন আমি তেমন কিছু মনে করিনি, ভেবেছিলাম এ-বন্ধুত্ব বেশি দিন স্থায়ী হবে না, ভাঙের বন্ধুত্ব খুব শীঘ্রই এক দিন ভাঙবে। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল। এখন তা গাঁজায় গিয়ে গড়িয়েছে! তাই আপনাকে খোলাখুলি সমস্ত জানাতে বাধ্য হলুম।···"

"···ইস্কুল? কোথায় ইস্কুল! ইস্কুলে দু'-একটা ক্লাস করেই সে আমাদের দারোয়ানের আস্তানায় চলে আসে। এসে প্রাণ ভরে গাঁজা টানে। এই তো—এখনোও টান্‌ছে। সমানে টেনে চলেছে। আমার দোতলার পড়ার ঘরে বসে তার বিটকেল্ গন্ধ আমার নাকে পাচ্ছি। এমন মাথা ঘুরছে কী বলবো! আপনি এক্ষুনি একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে চলে আসুন না—হাতে-নাতে ধরতে পারবেন!···"

"বাহাদুর! বাহাদুর!!" আমি মুক্তকণ্ঠে ওর প্রশংসা না করে পারি না।

"হ্যাঁ, কী বল্‌ছেন? কাজ ফেলে এখন আসতে পারা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়? তাছাড়া, অমন ছেলের আপনি আর মুখ দেখতে চান না? আজ বাড়ী ফিরলেই আপনি ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবেন? তাড়িয়ে দেবেন বাড়ী থেকে? একেবারে—জন্মের মতই? তা আপনার ছেলে, আপনার যেমন অভিরুচি—আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন, আমি বলেই খালাস।···"

বঙ্কিম হাসিমুখে রিসিভার রেখে দিলো।

"ফাস্ কেলাস্!" আমি বলে উঠি, "একটা ছেলের দফা একেবারে রফা—জন্মের মতো সেরে দিয়েছিস্। আজ ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে বেচারার জান্ যাবে···"

বঙ্কিম শুধু বলে—হুম্।

"বাপ্‌স্? অন্য কারো বাবা না হয়ে যদি আমার বাবা হোতো তাহলে যে কী দাঁড়াতো ভাবতেই আমি শিউরে উঠছি। আমি তো তাই আস্ত থাকতুম না। আমার একটি কথা বলবার আগেই বাবা আমার হাড় এক জায়গায়, আর মাংস এক জায়গায় করে রাখতেন। মাংসের কিমা দেখেছিস্? সেই কিমার মতই অনেকটা···"

"তাহলে জেনে রাখো," বঙ্কিম বাধা দিয়ে জানায়, "তোমার বাবাই! তোমার বাবার অাপিসেই আমি এতক্ষণ ফোন করছিলাম—আর কখনো আমার সাধের খেলা মাটি করতে আসবে?"

হানাদার

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

হানাদার—হানাদার—
মানুষের মত দেহ ভয়ানক জানোয়ার।
অতি বুনো বর্বর
দুরন্ত ঘোরতর
হিংসায় খরতর—
করে সব ছারখার—
হানাদার।

জানে শুধু লুঠ-পাট, অসহায়ে মার-কাট্,
পোড়াইতে সম্পদ শস্যের ক্ষেত-মাঠ।
কসাইয়ের মত জানে
মানুষে মারিতে প্রাণে
লোকালয়ে টেনে আনে
মহামারী—হাহাকার—
হানাদার।

শার্দ্দুল, সিংহ বা চিতা-বাঘ, গণ্ডার,
নেকড়ে বা ভাল্লুক, বিষধর সাপ আর
যত আছে পশুকুল
নহে কেহ সমতুল!
রাক্ষসও ভয় করে
হিংস্র এ জানোয়ার—
হানাদার।

মা'র সম্মুখে মারে তাঁর শিশু-সন্তান;
রাখে না কো নারীদের প্রতি কোনো সম্মান
জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে
পশুরা যা নাহি পারে
মানুষেরে ল'য়ে করে
বেচা-কেনা কারবার—
হানাদার।

কাশ্মীরে দেয় হানা উৎকট জানোয়ার—
হত্যায় লুণ্ঠনে করে সব ছারখার।
পোড়াইয়া সুন্দর
যত কিছু মনোহর
নরকের প্রায় করে
ভূস্বর্গ নাম যার—
হানাদার।

সভ্য সমাজ আজ নরপশুসঙ্কুল!
কোথা ওরে বীর দল, কর সবে নির্ম্মূল।
দৈত্য দানব কভু
স্বর্গে হয়নি প্রভু!
নরকের পশুদের
নিঃশেষে মার মার—
হানাদার।

মহাভারতের শেষ মহাবীর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দ্বাদশ

ভিখারী হর্ষবর্দ্ধন

আর্য্যাবর্ত্তে আবার ফিরে এল রাম-রাজত্ব।

হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমায় ছিল আরব সাগর। জলন্ধর ও নেপাল ছিল উত্তর সীমায় এবং তার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হ'ত নর্ম্মদা-নদী। এমন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য পাঁচ-সাত বৎসরে হর্ষবর্দ্ধনের হস্তগত হয়নি। আর্য্যাবর্ত্তকে একই ছত্রের ছায়ায় আনতে তাঁর কেটে গিয়েছিল সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর কাল।

কিন্তু কেবল অসি নয়, মসীকেও করেননি তিনি অবহেলা। যখনই অবকাশ পেতেন বাণভট্টের সঙ্গে করতেন কাব্য আলোচনা এবং একান্ত সাহিত্য-সাধনারও ভিতর দিয়ে তাঁর কেটে যেত দিনের পর দিন। তাঁর বিচিত্র সাহিত্য-সাধনার অমর নিদর্শন আছে তিনখানি সুবিখ্যাত নাটকের মধ্যে—"নাগানন্দ," "রত্নাবলী" ও "প্রিয়দর্শিকা"। তিনি কবি হ'লেও তাঁর ব্যাকরণ-সম্পর্কীয় রচনাও আছে এবং সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্যেও তাঁর নাম খুব বিখ্যাত। তাঁর হস্তাক্ষরের নমুনা আজও বিদ্যমান আছে।

উপরন্তু তিনি কেবল নাট্যকার নন, অভিনেতাও ছিলেন। স্বরচিত নাটকে ভূমিকা গ্রহণ ক'রে অবতীর্ণ হ'তেন রঙ্গমঞ্চে। বোঝা যাচ্ছে, তাঁর প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী।

পরামর্শ দেবার জন্যে মন্ত্রীরা ছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যচালনা করতেন তিনি স্বয়ং। প্রজাদের ভালো-মন্দ দেখতেন স্বচক্ষে এবং তাদের অভিযোগ শ্রবণ করতেন স্বকর্ণে।

স্থানেশ্বর থেকে তিনি রাজধানী তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন কান্যকুব্জে—যেখানকার মহারাণী ছিলেন তাঁর সহোদরা রাজ্যশ্রী দেবী। কিন্তু রাজকার্য্যের জন্যে রাজধানীতে তিনি স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারতেন না। দেশে দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে করতেন যোদ্ধার কর্ত্তব্য পালন এবং অসি যখন কোষবদ্ধ হ'ত তখন তিনি করতেন রাজধর্ম্ম পালন। বর্ষাকাল ছাড়া বৎসরের আর সব সময়েই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে তিনি ভ্রমণ করতেন যাযাবরের মত। অসাধুকে দিতেন শাস্তি, সাধুকে দিতেন পুরস্কার।

দেশ থেকে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা ছিল এই রকম। হর্ষবর্দ্ধন ভ্রমণের জন্যে লতা-পাতা-শাখা দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতেন একটি চলন্ত প্রাসাদ। যখন যেখানে গিয়ে থামতেন, তখন সেইখানেই ঐ প্রাসাদ স্থাপন করা হ'ত এবং তিনি তা ত্যাগ করলে সেটিকে পুড়িয়ে ফেলা হ'ত।

তাঁর সঙ্গী হ'ত হাজার হাজার লোক-জন। এবং কয়েক শত দামামা-বাদক। তারা রাজার প্রত্যেক পদক্ষেপের তালে তালে বাজিয়ে চলত শত শত সোনার দামামা। অর্থাৎ রাজা যদি একশো বার পা ফেলতেন, তাদের দামামা বাজাতে হ'ত একশো বার। আর্য্যাবর্ত্তের আর কোন সামন্ত-রাজার এই অধিকার ছিল না।

হর্ষবর্দ্ধনের যুগে অপরাধীদের শাস্তি দেবার পদ্ধতি ছিল যথেষ্ট নিষ্ঠুর। গুরুতর অপরাধের জন্য যারা ধরা পড়ত তাদের অবস্থা হ'ত রীতিমত শোচনীয়। তাদের মানুষ ব'লে গণ্য করা হ'ত না। কেউ তাদের সাহায্য করতে পারত না। মানুষের বসতির বাইরে নিয়ে গিয়ে তাদের ফেলে দিয়ে আসা হ'ত, তারা কেমন ক'রে বাঁচবে বা মরবে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানো দরকার মনে করত না।

কোন কোন অপরাধের জন্যে নাক, কাণ, হাত বা পা কেটে নেওয়া হ'ত। ছেলে পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করলেও এই রকম শাস্তিলাভ করত কিংবা কখনো কখনো লাভ করত নির্ব্বাসন দণ্ড। লঘু পাপের জন্যে দিতে হ'ত জরিমানা।

জল বা অগ্নি পরীক্ষারও চলন ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গভীর জলে বা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হ'ত। ডুবে গেলে বা পুড়ে মরলে ধ'রে নেওয়া হ'ত সত্য সত্যই তারা অপরাধী। কে জানে এই ভাবে মারা পড়ত কত নিরপরাধ!

আগেই বলা হয়েছে, হর্ষবর্দ্ধন শিবকেও পূজা করতেন, সূর্য্যকেও মানতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্মেরও প্রতি ছিল তাঁর অচলা ভক্তি। তিনি তাই নিয়মিত ভাবে মঠ ও মন্দিরের জন্যে করতেন অর্থব্যয়।

আধুনিক বিহার প্রদেশে নালন্দা নামে এক বিখ্যাত মঠ ছিল, সেখানে কেবল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করতেন না। তার মধ্যে ছিল প্রকাণ্ড এক বিশ্ববিদ্যালয়। হর্ষবর্দ্ধনের যুগে সেখানে থেকে লেখাপড়া করত দশ হাজার ছাত্র। প্রতিদিন সেখানে এক শত বেদী প্রতিষ্ঠিত হ'ত এবং তার উপরে উপবিষ্ট হয়ে এক শত অধ্যাপক করতেন নানা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা। জ্ঞানার্জ্জনের জন্যে ছাত্রদের আগ্রহ ছিল এমন গভীর যে, অধ্যাপনার সময়ে তাদের কেউ এক মিনিটের জন্যেও অনুপস্থিত থাকত না।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে রাজা দান করেছিলেন এক শতখানি গ্রাম। তারই আয় থেকে ছাত্রদের সমস্ত ব্যয় সংকুলান হ'ত, ফলে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত পরম নিশ্চিন্ত ভাবে।

প্রতি চার বৎসর অন্তর হর্ষবর্দ্ধন আর একটি এমন কর্ত্তব্য পালন করতেন, পৃথিবীর আর কোন রাজা আজ পর্য্যন্ত যা করতে পারেন নি। আধুনিক এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলে এখন যেখানে কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হয়, হর্ষবর্দ্ধন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'তেন সদলবলে। তার পরে গত চার বৎসর ধ'রে রাজভাণ্ডারে যত ঐশ্বর্য্য সংগৃহীত হ'ত, তা নিঃশেষে দান করতেন সমাগত প্রার্থিগণকে।

হর্ষবর্দ্ধন যখন নিজের সাম্রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে (৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাংএর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। প্রয়াগের (বা এলাহাবাদের) সেই বিচিত্র দানোৎসবে হুয়েন সাং নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে সমস্ত দেখে যা বলেছেন তার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই:

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলে এসে সমবেত হয়েছেন হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে অসংখ্য রাজকর্ম্মচারী, অনুচর, সৈন্য ও সামন্ত-রাজার দল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল বিরাট এক জনতা—তার মধ্যে ছিল বহু নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী সাধু-সন্ন্যাসী এবং অনাহূত ও রবাহূত অনাথ ও ভিখারীর দল—সংখ্যায় তারা পাঁচ লক্ষের কম হবে না।

হুয়েন্ সাংকে সম্বোধন ক'রে হর্ষবর্দ্ধন বললেন, "পরিব্রাজক, আমাদের বংশে পুরুষানুক্রমে একটি রীতি পালন করা হয়। সেই

রীতি অনুসারে প্রতি পঞ্চম বৎসরে আমি প্রয়াগের এই পুণ্যতীর্থে এসে, আমার সঞ্চিত সমস্ত ঐহিক সম্পত্তি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দান ক'রে যাই। আজ ত্রিশ বৎসর ধ'রে আমি এই কর্ত্তব্য পালন ক'রে আসছি। এবারে আমার ষষ্ঠ দানযজ্ঞ।"

দুই মাস পনেরো দিন ধ'রে চলল সেই অসাধারণ দানোৎসব।

উৎসবের প্রারম্ভে দেখা গেল, সানুচর সামন্ত-রাজগণের সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা। সে এক বর্ণবহুল ও ঐশ্বর্য্যময় অতুলনীয় দৃশ্য, কারণ, আপন আপন রাজকীয় মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে কোন রাজাই প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

পাঁচ লক্ষ দর্শকের মাঝখানে উচ্চাসনের উপরে ব'সে আছেন মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন। তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্টা রাজ্যশ্রী দেবী। তার পর যথাযোগ্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করেছেন অমাত্য ও পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ, সভাকবি বাণভট্ট ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ।

প্রথম দিনে বুদ্ধদেবকে স্মরণ ক'রে দান-কার্য্য আরম্ভ হ'ল। নদীর তটে একটি পর্ণকুটীরের মধ্যে স্থাপন করা হ'ল বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। তার পর দুই হাতে বিলি করা হ'ল মূল্যবান সাজ-পোষাক ও অন্যান্য উপহার।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন হচ্ছে যথাক্রমে সূর্য্য ও শিবের দিন। কিন্তু বুদ্ধদেবের দিনে যত জিনিষ দান করা হয়েছিল, এই দুই দিনের দানের পরিমাণ তার আধা-আধির বেশী হ'ল না।

চতুর্থ দিবসে দান গ্রহণ করতে এলেন দশ হাজার নির্ব্বাচিত বৌদ্ধ ধার্ম্মিক। তাঁরা প্রত্যেকে লাভ করলেন এক শত স্বর্ণমুদ্রা, একটি মুক্তা, একটি তুলার পোষাক এবং বাছা বাছা খাদ্যসামগ্রী, পানীয়, ফুল ও গন্ধদ্রব্য।

তার পর বিশ দিন ধ'রে কাতারে কাতারে ব্রাহ্মণদের দল এল দান গ্রহণ করতে। ব্রাহ্মণদের পর জৈন এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের পালা। তাঁদের তুষ্ট করতে লাগল পুরো দশটি দিন। বহু দূরদেশ থেকে যে-সব শ্রমণ এখানে এসে জুটেছিলেন মধুলোভী ভ্রমরের মত, তাঁরাও আরো দশ দিনের আগে খুসি হলেন না। তার পর গোটা এক মাস ধ'রে দান নিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, অনাথ, পঙ্গু ও ভিক্ষুকের দল।

এই ভাবে অকাতরে দান করতে করতে রাজভাণ্ডারে পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত অর্থ একেবারে ফুরিয়ে গেল। হস্তী, অশ্ব ও সামরিক সাজসজ্জা ছাড়া রাজার নিজস্ব সম্পত্তি আর কিছুই রইল না। কিন্তু ও-গুলিকে দানসামগ্রী ব'লে গণ্য করা চলে না, কারণ রাজ্যচালনা অসম্ভব হয়ে উঠবে তাদের অভাবে।

হর্ষবর্দ্ধন তখন সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসে নিজের গা থেকে মণিমাণিক্যখচিত মুকুট, জড়োয়ার কণ্ঠহার, মৌক্তিমালা, কর্ণের কুণ্ডল ও বাহুর বলয় প্রভৃতি—এমন কি রাজপরিচ্ছদ পর্য্যন্ত খুলে বিলিয়ে দিলেন হাসিমুখে।

তার পর রাজ্যশ্রী দেবীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "দিদি, আজ আমি সর্ব্বহারা। আমার লজ্জারক্ষা হয়, তোমার কাছে এমন বস্ত্র ভিক্ষা করি।"

রাজ্যশ্রী তখন সেই আশ্চর্য্য রাজভিখারীর দিকে এগিয়ে দিলেন একটি আটপৌরে পুরাতন পোষাক।

সেই পোষাক প'রে হর্ষবর্দ্ধন প্রশান্ত মুখে প্রথমে দশ দিকের বুদ্ধদেবের উদ্দেশে বন্দনা ও প্রণাম করলেন। তার পর পবিত্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে জোড়হস্তে বললেন, "এই বিপুল ঐশ্বর্য্য সুরক্ষিত স্থানে পুঞ্জীভূত ক'রেও আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতুম না, কিন্তু আজ আমি পরম নিশ্চিন্ত! ধর্ম্মের নামে যা দান করলুম, তা রক্ষিত হ'ল যথাযোগ্য স্থানেই। আহা, ভবিষ্যতে আমি যেন জন্মে জন্মে এই ভাবে দান ক'রে বুদ্ধদেবের কৃপালাভ ক'রে ধন্য হ'তে পারি।"

ঐতিহাসিক হর্ষবর্দ্ধনের এই কল্পনাতীত দানশীলতার দৃষ্টান্ত দেখে বেশ বোঝা যায়, পৌরাণিক দাতাকর্ণের কাহিনী অবিশ্বাস্য নয়। সম্রাট অশোকও যাপন ক'রে গিয়েছেন সর্ব্বহারা ভিক্ষুর জীবন। তাঁর পিতামহ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও নিজের পূর্ণ গৌরবের সময়ে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন প্রায়োপবেশনে। অদ্ভুত দেশ এই ভারতবর্ষ! এখানকার মাটিতে যা জন্মায়, অন্য কোন দেশ তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

কিন্তু রাজর্ষি হর্ষবর্দ্ধন বারে বারে এই ভাবে সর্ব্বহারা হয়েও সকলকে খুসি করতে পারেননি। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ দেখে বৌদ্ধরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলত, "জয়, রাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের জয়! রাজর্ষি অশোকই আবার হর্ষবর্দ্ধনের মূর্ত্তি ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হয়েছেন ধরাধামে!"

কিন্তু ব্রাহ্মণরা হাসিমুখে তাঁর দান গ্রহণ ক'রেও তাঁকে দুই চক্ষে দেখতে পারত না। হিন্দু রাজার এই বৌদ্ধ-প্রীতি তাদের কাছে অস্বাভাবিক ও অন্যায় ব'লেই মনে হ'ত। হর্ষবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে তারা চক্রান্ত করতে লাগল। এবং আর্য্যাবর্ত্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বালবার জন্যে গোপনে ইন্ধন যোগাতে লাগল হর্ষেরই এক মন্ত্রী, অর্জ্জুনাশ্ব।

ইতিমধ্যে ঘটেছে কয়েকটি প্রধান ঘটনা।

মগধ-গৌড়ের মহারাজা শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছে (সম্ভবত ৬১১ খৃষ্টাব্দের পরে)। তাঁর রাজ্য এসেছে হর্ষবর্দ্ধনের অধিকারে।

শশাঙ্কের বন্ধু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে আক্রমণ করতে গিয়ে হর্ষবর্দ্ধন নিজেই পরাজিত হয়েছেন (৬২০ খৃষ্টাব্দে)। তার পর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি।

৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন গঞ্জামে গিয়ে শেষ যুদ্ধ ক'রে তরবারি ত্যাগ করেছেন। তিনি হয়েছেন অহিংসার উপাসক।

গঞ্জামে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাং।

[ক্রমশঃ।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা দেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় গত কয় মাস কলেরা, প্লেগ, বসন্ত এবং অন্যান্য নানা প্রকার রোগ-শোকের চাপে পড়িয়া, বাঙ্গালায় যক্ষ্মার লীলা কি প্রকার চলিতেছে, সে-বিষয় চিন্তা করিবারই সময় পাইতেছি না। এ-বিষয় কোন এক সহযোগীর সম্পাদক বলিতেছেন: "যে হারে যক্ষ্মারোগ দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দিনের পর দিন যে ভাবে এই মহাব্যাধির বিপাকে বিলয় পাইতে বসিয়াছে, তাহাতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনে একটি প্রথম শ্রেণীর যক্ষ্মা-হাসপাতাল ও সেবাগার স্থাপিত হওয়া এখনই প্রয়োজন। কিন্তু এ-দেশী হাসপাতাল সেবাগার ইত্যাদির খবর সকলেই রাখেন—প্রকৃত দরিদ্রের সেখানে কোন স্থান নাই। যাহারা পাহু-দুয়ার দিয়া দক্ষিণার কড়ি জোগাইতে পারে তাহারাই সেখানে সামনের দুয়ার দিয়া প্রবেশাধিকার পায়—আদর-যত্ন ও ঔষধ-পত্র যা কিছু সে-ও প্রাপ্য হয় শুধু তাহাদেরই। অন্যেরা কাঁদিয়া কাটিয়া প্রবেশ করিলেও মাতৃহীন শিশুর মত অনিশ্চিত করুণার মুখাপেক্ষী হইয়াই পড়িয়া থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত মুরদা-ঘরের সম্পদ বৃদ্ধি করে। যক্ষ্মা গুরুতর ব্যাধি এবং অদ্যাবধি ইহার ষোল আনা সার্থক চিকিৎসাও কিছুই বাহির হয় নাই। তবে প্রথমাবস্থায় এমন কি মধ্যপূর্ব্বেও ইহার গতিরোধ করার মত অনেক নির্ভরযোগ্য ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইঞ্জেক্সন, অস্ত্র-চিকিৎসা ইত্যাদিরও অনেক ব্যবস্থা অগ্রগামী দেশসমূহ করিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশে যে সমস্ত যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় আছে, তাহার কোন কোনটিতে এ-সবের কিছু কিছু আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার ব্যাপক বা বহুল প্রচার এখনও হয় নাই। তদ্ভিন্ন শুধু ঔষধেই তো রোগ সারে না, এই রোগে যে হারে দেহ ভিতর হইতে ক্ষয় হইয়া আসে, উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের সাহায্যে তাহার পরিপূরণও করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে আজ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম সাধারণ মানুষেরই পেট ভরিয়া খাইবার মত খাবার মিলে না—এত বড় রোগীর শরীরপুষ্টির যোগ্য খাবার কোথায়? দুধ-ঘি দুষ্প্রাপ্য, তদুপরি অবিশুদ্ধ অবস্থায় অলভ্য। মাছ ইদানীং অদৃশ্য হইয়াছে, মাংস ডিম ইত্যাদিও মূল্য-বৃদ্ধির ফলে অস্পৃশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সুতরাং শুধু হাওয়া খাইয়া যে কোন রোগীই রাতারাতি চাঙ্গা হইয়া উঠিবে না, ইহা মনে রাখিতে হইবে। খাদ্যের—এবং পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, সাধারণের ক্রয়-সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে সুলভও করিতে হইবে। যক্ষ্মালয়ের স্থাপন পরিকল্পনার সঙ্গে তাই খাদ্যসম্পদ বৃদ্ধির উপযোগী পরিকল্পনাও করিতে হইবে।" বাঙ্গালা দেশে বেসরকারী যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় বলিতে মাত্র একটি। যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল। এবং ইহার শাসনাধীন কার্সিয়ং এস বি দে স্যানাটোরিয়াম। অর্থাভাবে এই যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় এবং যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়াম ইচ্ছা স্বত্বেও—শত শত রোগীকে স্থান দান করিতে পারিতেছে না। কেবল মাত্র সরকারী সাহায্যে এই হাসপাতালের খরচা চলে না, কাজেই দেশবাসী যদি মুক্তহস্তে দান করিয়া যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতালে অবিলম্বে স্থান বৃদ্ধি না করেন, তাহা হইলে শত শত অকাল মৃত্যুপথযাত্রীদের যাত্রা রোধ করা যাইবে না। রোগীর সংখ্যা যে শহরে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার সেখানে যাদবপুর হাসপাতালে মাত্র ৩০০ বেডে কি হইবে?

*   *   *   *

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয়তাবাদী (?) অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক 'জিন্দেগী' বলিতেছেন:—"বিহার কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আবদুল বারীকে গুলী করিয়া যাহারা হত্যা করিয়াছিল, তাহারা আই-এন-এ এবং কংগ্রেস সরকারের বে-আইনী আমদানী রক্তানী বিরোধী স্কোয়ার্ডের কর্ম্মী দিল বাহাদুর, তপর্ণা ও হিনাওবাহেরা।—এই তিন জন অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি রাম ও বিচারপতি নারায়ণ জুরী ও অতিরিক্ত সেশন জজের রায় অনুসারে দিল বাহাদুরকে সাত বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং অপর দুই জনকে বেকসুর খালাসের হুকুম জারী করিয়াছেন। অধ্যাপক বারী কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন, কংগ্রেসেরই কাজে কর্ত্তব্যরত অবস্থায় গত বৎসরের ২৮শে মার্চ্চ ধানবাদ হইতে পাটনা আসিবার পথে খসরুপুরে আততায়ীদের হস্তে অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিত হন এবং পরিশেষে গুলীর আঘাতে নৃশংস ভাবে নিহত হন। আজ স্বাধীন কংগ্রেসী হিন্দুস্থানে এত দিন পরে, এত কাণ্ডের পরে তাঁহার আততায়ীদের বিচারের নামে যাহা করা হইল তাহাতে হিন্দুস্থানের মুখ রক্ষা হইয়াছে কি-না, তাহা হিন্দুস্থান আইন-সচিব ভাবিয়া দেখিতে পারেন।" 'জিন্দেগী' এত কথা বলিবার পূর্ব্বে নোয়াখালীর পাকিস্তানী বীর গোলাম সারোয়ারের বিচার-প্রহসনের কথাটা মনে করিলে ভাল করিতেন। চালুনীর ছুঁচকে গালি দেওয়া কি সাজে? কেবল গোলাম সারোয়ার কেন—আরো বহু শত পাকিস্তানী কাজীর বিচারের কথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু লাভ নাই ভাবিয়া তাহা করিলাম না।

*   *   *   *   *

মুন্সীগঞ্জে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুরাবার্দ্দী সাহেব বলিয়াছেন:—তিনি বলেন যে, "মুসলমানগণ যদি প্রতিহিংসার মনোভাব বর্জ্জন না করে তবে ভারতের মুসলমানদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। তিনি আরও বলেন যে হিন্দুরা অখণ্ড ভারতই চাহিয়াছিলেন। কাজেই দেশ বিভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন পরিস্থিতির সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া বিত্তশালীরা দেশত্যাগী হইলেন। ইহাতে যাহারা রহিয়া গেল তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইল। পশ্চিম-বাঙ্গালায় ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দুর স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব, ৫০ লক্ষ মুসলমান পশ্চিম-বঙ্গ ত্যাগ করিলেও তাহা সম্ভব হইবে না। আসাম, উড়িষ্যা ও বিহার বাঙ্গালীদের প্রতি বিরূপ। কলিকাতা ও তাহার আশে-পাশে জনসংখ্যা ভীষণ বাড়িয়া গিয়াছে, ইহার ফলে তথায় প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের উদ্বাস্তুরা পশ্চিম-বঙ্গে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মুসলমানদের শতকরা ১৫ জনই শান্তি চায়। বাকী ৫ জন মাত্র উপদ্রব সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছে। পাকিস্তানের সুনাম

বজায় রাখিতে তিনি মুসলমানদের নিকট আবেদন জানান। সেবা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই পাকিস্তানকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রাণের বিনিময়েও গুণ্ডাদের প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ডোমিনিয়নকেই সংখ্যালঘুদের বিশ্বাস করিতে হইবে। তবেই সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু বলিয়া কোন সমস্যা রহিবে না।"

পরিশেষে তিনি মুসলমানদের হিন্দুদের নিকট যাইয়া ভ্রাতৃভাব জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করেন এবং সর্ব্বত্র শান্তি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। কথা ভাল। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৫ জন অবাঙ্গালী মুসলমান এই কথা মত কাজ করিতে কি রাজী হইবে? অন্যকেও করিতে দিবে কি?

কোন এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস মহাপাল ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন:—"পূর্ব্ব-বঙ্গ সম্পর্কে আমরা তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। ভারতের বাহিরে কোনও ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না। কংগ্রেস ভারতের বাহিরে যাইতে পারে না। পূর্ব্ব-বঙ্গের লোকের অসুবিধা আমি জানি, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে উহা কি ভাবে দূর করা যায়।" দূর অতি সহজেই করা যায়—যদি পণ্ডিতপ্রবর চোরাই মাল মানভূম, ধলভূম, প্রভৃতি অঞ্চলগুলি দয়া করিয়া আমাদের ফিরাইয়া দেন। বাঙ্গালার সমস্যা রাজেন পণ্ডিত যেমন সহজে সমাধান করিলেন, পাঞ্জাব সম্বন্ধে তাহা পারিবেন কি? সেখানে ওঁ'তার বহর বেশী—কাজেই।

* * * *

'পল্লীবাসী' পর্য্যন্ত ছিঃ ছিঃ করিয়া মন্তব্য করিতেছেন: "ছিঃ! ছিঃ! এ-সব হইতে চলিল কি? দেশের চারি প্রান্ত যে চোরা-কারবারে ভরিয়া উঠিল! স্বাধীনতা পাওয়ার পর স্বার্থপর ব্যবসায়ীর দল যে দেশের এত দূর সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইবে, ইহা তো স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় নাই। ইংরেজের শাসনের নামে শোষণের জ্বালায় দেশ জ্বলিয়া মরিয়াছে। অতি কষ্টে দুই শত বৎসরের পাপ নামিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠায় জ্বালা নানা দিক্ দিয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে জ্বালা জুড়াইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবসর না দিয়া চোরা-কারবারীর দল দেশকে যে চতুর্গুণ জ্বালাইয়া তুলিল! ইহার আশু প্রতিকার চাই। স্বাধীনতার সুখস্পর্শ আদৌ অনুভব করিতেই যদি লোকে না পায়, তবে জাতীয় সরকার বলিয়া জনসাধারণ কত কাল তাঁহাদের তারিফ করিবে? আর স্বদেশবাসী বলিয়া কয় দিনই বা চোরা-কারবারীদের ক্ষমা করিবে? দরিদ্র জনসাধারণকে ঐ সব দুর্নীতি-পরায়ণের দল যে ভাবে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে সরকার প্রতীকার করিতে না পারিলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হইবারই আশঙ্কা। আজ এ-দেশ হইতে রাশি রাশি চাউল ও বস্ত্র যে পাকিস্তানে চোরাই চালানে চলিয়া যাইতেছে, ইহার মূল কোথায়? দেশবাসীর মধ্যে একটা জঘন্য দল দেশকে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য কত ভাবে যে চোরাই কারবার চালাইতেছে, তাহার সীমা নাই! মেলভ্যানের মধ্য দিয়াও কাপড় চালান হইয়াছে। প্রবৃত্তি কত দূর নীচ হইলে যে এই সকল দেশদ্রোহিতা করিতে পারা যায়, তাহা চিন্তা করিতেও লজ্জা হয়। কিন্তু পাকিস্তানের বাহাদুরী আছে। এক ছটাক জিনিষ সেখান হইতে আনিবার উপায় নাই। অথচ এ-দেশ হইতে কোটি কোটি টাকার দ্রব্য চলিয়া যাইতেছে, ফলে এ দেশবাসী কালাবাজারে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এ সময় কংগ্রেস কর্ম্মিগণের দায়িত্ব লওয়া উচিত ছিল। তাঁহাদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করা বৃথা। শুধু খদ্দর পড়িয়া লোকের মন বিভ্রান্ত করিবার দিন ফুরাইয়াছে। যদি এই সকল ব্যাপারে প্রতীকার-পরায়ণ না হইয়া সমান দুর্নীতি চলিতে দেওয়া হয়, তবে দেশবাসীকেই দুর্নীতির মুখোস্ খসাইয়া দিতে হইবে।" চোরা-কারবার কাহারা কি ভাবে চালাইতেছে, তাহা সরকার বাহাদুরের জানা আছে। কাপড়ের মূল্য লইয়া মিলওয়ালারা কি বিষম কাণ্ড করিতেছে, তাহাও নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু জানি না, কোন্ অদৃশ্য রজ্জু দ্বারা সরকারের হাত-পা বাঁধা আছে। দেড় সের চাউলের গরীব স্ত্রীলোক চোরা-কারবারী পুলিশের চোখ এড়াইতে পারে না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার চোরা-কারবারীরা রাজপথে মোটর হাঁকাইয়া বেড়ায় কোন্ সাহসে? কাহার ভরসায়?

* * * *

চোরা-কারবার এবং চোরা-কারবারী সম্বন্ধে 'নবসঙ্ঘ' মন্তব্য করিতেছেন: "চোরা-কারবারে দেশ তো ছড়াইয়া যায়; কিন্তু দেশের সব লোকই কি চোরের দল বাড়াইল? বাঙ্গালী কত দিকে মরিবে? যুদ্ধের সময় সময় বিভাগে কর্ম্মচারী নিয়োগ হইয়াছিল। যুদ্ধান্তে তাহাদের তো হাফপ্যান্ট শার্ট ছাড়িয়া কাচা কোঁচায় পুনর্মূষিক হইতে হইবে ইহা তো জানা কথা—তবুও চাকুরী ছাঁটাই এ দেশব্যাপী সত্যাগ্রহের আন্দোলন সৃষ্টি হয়। কেহ যদি চুরি করে—নরহত্যা করে—আর সে যদি কোন সমিতির সভ্য হয়, তবে তাহাকে দণ্ড দিলে সমিতির সকল কর্ম্মী কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বসিয়া পড়েন। সে দিন বাসের চালক ও কণ্ডাক্টার মিলিয়া এক জন বঙ্গ মহিলার উপর অত্যাচার করিল—আরোহীরা যেমনই প্রতিবাদ করিলেন অমনি কলিকাতায় বাস বন্ধ। ভৃত্য যদি অপরাধ করে, কড়া কথা বলার উপায় নাই। সেবকের দল হাত গুটাইয়া বসিবে। এ হইল কি? দেশের শাসন-শক্তি যেমন নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, মানুষেরাও তদ্রূপ শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। পথে-ঘাটে জখম খুন তো লাগিয়াই আছে। পথে-ঘাটে টাকাকড়ি লইয়া যাওয়ার উপায় নাই—বুকে পদে পদে ছুরী বসিবার আশঙ্কা আছে। দেশ কি আর প্রকৃতিস্থ হইবে না? শাসন-শক্তি কি চিরদিনই অদৃঢ় থাকিবে? দেশশুদ্ধ লোক চোর হইলে, চোরেদের ভোটের উপরই শাসন অধিকার লাভ সম্ভব হওয়ায় শাসন-শক্তি শ্লথ হইতে বাধ্য হয়। ধন্য গণতন্ত্রের মহিমা। আর বাঙ্গালীর কি কেরাণীগিরি করা ছাড়া উপায়ের অন্য পথ নাই? বাঙ্গালী হিন্দু শ্রমিকের ক্ষেত্রে আদৌ নাই. বাঙ্গালী মুসলমানেরা চাষ করে, নৌকা চালায়, ষ্টীমারের খালাসী হয়। পাঞ্জাবী শিখেরা মোটর চালায়—বিহারীরা গাড়ী হাঁকায়—শ্রমিক হিন্দু বাঙ্গালী কোথায়? তিলে তিলে মরণের পথে দীর্ঘ দিন চলিলে আয়ুঃ শেষ হইতে বিলম্ব হইবে না। চাকুরীর মোহ হিন্দু বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া তাহাকে মাটি চষিতে হইবে। গো-পালনে, ঘৃতোৎপাদনের কর্ম্মে অসংখ্য প্রকার শ্রম-সাধ্য ক্ষেত্রে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু শ্রমিকের স্থানে আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াক। আজ হিন্দু বাঙ্গালী শূদ্র জাতিতে পরিণত হোক্। সেবাই হোক তার জীবনের ধর্ম্ম। জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হইবে। শিথিল

স্নায়ুপেশী শক্ত হইয়া উঠিবে। এই কঠিন মন্তব্যের উপর আমাদের আর নূতন কোন মন্তব্য করার অবকাশ নাই। ভাবিতেছি, কবে, আর কত দিন পরে বাঙ্গালীর আত্ম-চেতনা হইবে। খাস বাঙ্গালাতেই বাঙ্গালীর যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর নির্য্যাতন লাভ এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে!

*　　*　　*　　*

দেশে নানা ভাবে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা হইতেছে। এই সময় 'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি দেশের উপকারে লাগিতে পারে। 'খাদ্য-উৎপাদন' বলিতেছেন: "অনেক প্রকারের পেঁপে আমাদের দেশে দেখা যায়: ইহা খুব সুস্বাদু ও বলকারক ফল; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগের পক্ষে কাঁচা ও পাকা পেঁপে খুবই উপকারী; পেঁপের আঠা হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা অর্শ রোগের পক্ষেও উপকারী। পেঁপে হইতে পেপেন নামক ঔষধ পাওয়া যায়। ইহা অজীর্ণ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে কোন মাটিতেই পেঁপে জন্মে; তবে বেলে দোআঁশ মাটিই ইহার পক্ষে উপযুক্ত; পেঁপের জমিতে জল আবদ্ধ হইয়া থাকিলে গাছ মরিয়া যায়; সুতরাং জমি হইতে জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত থাকা দরকার। প্রথমে বীজতলা বা হাপরে চারা প্রস্তুত করিয়া উহা নাড়িয়া আসল জমিতে রোপণ করিতে হয়; বীজতলার মাটি খুবই গুঁড়া করিয়া প্রস্তুত করা দরকার এবং উহাতে পচা গোবর সার দেওয়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন; আসল জমির মাটিও গভীর ভাবে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে। পচা গোবর, ঘাস জঙ্গল ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত সার, ছাই, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি পেঁপের জমির উপযুক্ত সার। উপযুক্ত যত্ন লইলে বৎসরের যে কোন সময়ে পেঁপের বীজ বপন করা যায়। গ্রীষ্মকালে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করা সহজ; হাপরে বীজ ছিটাইয়া উহাতে অল্প ঝুরা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়; দশ বার দিনের মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয়; চারাগুলিতে যখন তিন-চারিটি করিয়া পাতা গজায়, তখন উহা পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার, যেন আট-নয় ইঞ্চি অন্তর এক একটি চারা থাকে; যে চারাগুলি তুলিয়া ফেলা হইবে তাহা নষ্ট না করিয়া অন্য একটি হাপরে রোপণ করা যাইতে পারে; চারাগুলি যখন তিন চার ফুট লম্বা হইবে তখন উহাদিগকে নাড়িয়া আসল জমিতে পুঁতিতে হইবে। জমিতে গর্ত্ত করিয়া ও গর্ত্তে সার দিয়া চারাগুলি গর্ত্তে পুঁতিতে হয়—ছয় হইতে আট ফুট অন্তর চারা লাগানো উচিত। কৃষ্ণনগর সরকারী বাগানে পাঁচ ফুট অন্তর চারা লাগানো হয়। জমিতে রস না থাকিলে জল সেচন দরকার। সোয়া তোলা বীজ হইতে প্রায় এক বিঘার উপযুক্ত চারা পাওয়া যায়। তিন রকমের পেঁপে গাছ হয়; প্রথম রকমে কেবল পুরুষ-ফুল থাকে; দ্বিতীয় রকমে কেবল স্ত্রী-ফুল থাকে এবং তৃতীয় রকমের একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী-ফুল থাকে। পুরুষ-ফুলবিশিষ্ট গাছে কেবল ফুলই হয়, ফল হয় না; স্ত্রী-ফুলবিশিষ্ট গাছে ফুল ও ফল দুই-ই হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রী-ফুলবিশিষ্ট গাছে ফল হয় বটে, কিন্তু ফলন কম হয়। গাছে ফুল না ধরা পর্য্যন্ত বোঝা যায় না কোন্‌টি কোন্ রকমের গাছ। জমিতে যদি পুরুষ-ফুলবিশিষ্ট একটি গাছও না থাকে তাহা হইলে স্ত্রী-ফুলবিশিষ্ট গাছগুলিতে ফল ধরে, কিন্তু উহাতে বীজ হয় না। জমিতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি স্ত্রী-ফুলবিশিষ্ট গাছের জন্য অন্ততঃ একটি পুরুষ-ফুলবিশিষ্ট গাছ থাকা দরকার। চারা লাগাইবার আট দশ মাসের মধ্যেই গাছের ফল পাকে এবং তখন হইতে প্রায় বরাবরই ফল পাওয়া যায়; বৎসরের সব সময় ফল পাওয়া যায় না; বড় আকারের ফল পাইতে হইলে ফলগুলি পাতলা করিয়া দিতে হয়; একবার রোপণ করিলে তিন বৎসর ঐ সকল গাছ হইতে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়, তাহার পর ফলের আকার ছোট হইয়া যায়; সুতরাং তিন বৎসর অন্তর পেঁপের বাগান বদলানো উচিত।" কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে বহু জনের বহু জমি বেকার পড়িয়া আছে, কাজে লাগাইলে দোষ কি?

*　　*　　*　　*

'বীরভূম-বাণী'তে প্রকাশ:—"এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৪ পরগণা জেলাবোর্ড নাকচ করিয়াছেন। বীরভূম জেলাবোর্ডেও যেরূপ অবস্থা তাহাতে সরকারের অনুরূপ পথ অবলম্বন করা উচিত কি না, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি। একে তো টেষ্ট রিলিফের অর্থ তছ্‌রূপাতের মামলা একটি চলিতেছে এবং আরও অনেকগুলি তদন্তাধীন। তদুপরি হালে যে সরকারী সাহায্য এক লক্ষ দশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল তাহার সদ্ব্যয় যে কিরূপ হইয়াছে তাহাও দেখা দরকার। ১৯৪৬ সালের সরকার বোর্ডের আর্থিক সংস্থান সামলাইবার জন্য যে দুই লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন তাহা দিয়া বোর্ডের দেনা তো সম্পূর্ণ মেটেই নাই—বরং আজ এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে বোর্ড পুনরায় ঋণগ্রস্ত। যে প্রতিশ্রুতিতে বোর্ড ঋণ লইয়াছিলেন সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। বোর্ডের কার্য্য বা কার্য্যে অবহেলা সম্বন্ধে স্থানীয় প্রায় সকল পত্রিকা-স্তম্ভেই বহু আলোচনা হইয়াছে। বোর্ডের সভ্যগণের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে বোর্ডের কার্য্য নিতান্ত খারাপ ভাবেই চলিতেছে। কাজেই সব দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া জনস্বার্থ রক্ষার্থে এই বীরভূম জেলাবোর্ড সম্বন্ধেও ২৪ পরগণা জেলাবোর্ডের অনুরূপ একটি অর্ডিনান্স জারী হওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধে সরকারকে এবং জেলার সরকার-প্রতিনিধি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।" পশ্চিম-বাঙ্গালা সরকারের শুভদৃষ্টি এ-দিকে পড়া প্রয়োজন।

*　　*　　*　　*　　*

'দামোদর' পত্রিকা বলিতেছেন:—"স্বাধীন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ এমন কি পরোক্ষে সাহায্য দান করার অপরাধে বিদায়ী বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাদের সম্পত্তি, বন্দুক প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া পাইকারী জরিমানা বসাইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল, তাহা ফেরৎ দিয়া দেশভক্তদের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বহু বার অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষিত হয় নাই। স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সরকার পাইকারী জরিমানাগুলি ফেরৎ দিয়া ঐ টাকাগুলি স্থানীয় কোন জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত করিবার ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই। গত বাজেটে পাইকারী জরিমানা ফেরৎ দিবার কোন পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করেন নাই। এই ব্যবস্থায় এক দিকে যেমন জরিমানার টাকা ফেরৎ দিয়া সরকার অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের ন্যায় জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারিতেন, অন্য দিকে তেমনি ঐ টাকাটি জাতিগঠন কার্য্যে ব্যয়িত

হইলে সরকারেরই সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইত। জনসাধারণ ঐ টাকা ফেরৎ না লইয়া স্বাধীন সরকারের হাতে জাতি গঠনের জন্ত গৌরবের সহিত দান করিত।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

* * * *

'জনশক্তি' বলিতেছেন :—"বীমা কোম্পানীগুলি পাকিস্তান এলাকা হইতে তাঁহাদের ব্যবসা গুটাইয়া ফেলিতেছেন, অনেকে গুটাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহাও একটি গুরুতর সমস্তা। লোকের অর্থ নৈতিক ভবিষ্যৎ ইহাতেও কিছুটা বিপন্ন হইতেছে। বীমাকারিগণ ভবিষ্যতে কি ভাবে প্রিমিয়াম পাঠাইবে, বীমা চালু রাখিবে, ইত্যাদি চিন্তায় বিপর্য্যয় বোধ করিতেছে। রাষ্ট্র-কর্ত্তৃপক্ষের প্রথম কর্ত্তব্য ছিল, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে এইখানেও তাহাদের কর্ম্মকেন্দ্র বজায় রাখে তাহার ব্যবস্থা করা। তার পর এই সম্পর্কে বিবৃতি দিয়া জনসাধারণকে অবস্থাটা বুঝাইয়া দেওয়াও প্রয়োজন।"

* * * *

'দামোদর' বলিতেছেন :—"প্রবেশিকা পরীক্ষার চোরা-কারবারীতে দেখিতেছি, কাটোয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ পরীক্ষাকেন্দ্রে না কি 'জোর যার মুলুক তার' নীতি এখনো চলিয়া আসিতেছে। দুর্নীতির জন্ত প্রায় ৫০জন ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ গিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইল—এখনো কি নিজেকে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি যাইবে না? ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের কার্য্য বাদ দিয়া ছাত্রদের মধ্যে কি কাজ স্থানীয় ছাত্র-প্রতিষ্ঠানগুলি করিতেছেন, তাহা দেশবাসী জানিতে চাহে।"

* * * *

'দামোদর' পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত মন্তব্যের প্রতি বাঙ্গালার ডাক্তার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :—"আজ-কাল কি চিকিৎসকগণ কলেরা রোগী দেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন? আমাদের মেমারীর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, মেমারীতে লাইসেন্স প্রাপ্ত যে সমস্ত ডাক্তার আছেন তাঁহারা কলেরা রোগী দেখিতে যান না। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া রাজী করাইলে এক শত টাকা ফী চাহেন। কাজে কাজেই গরীবরা মারা যায়। রায়না থানার জামাইপোতা গ্রাম হইতেও একই প্রকার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। দেশ স্বাধীন হইবার পর যেখানে উদারতা বেশী পরিমাণে আশা করা যায়, সেখানে যদি ডাক্তার-শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছ হইতে এই আদর্শ দেখা যায় তবে আর কাহাকে সংস্কার করিতে যাইব? শত্রু, মিত্র, ছোট-বড় জ্ঞান ডাক্তারী ধর্ম্মে এত দিন ছিল না বলিয়াই তো আমরা জানি। কয়েক মাস পূর্ব্বে এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন, দেশের শিক্ষিত ডাক্তার-শ্রেণীর শোষণের কোন সীমা নাই। সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা চাপ দিয়া দরিদ্রদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করেন। অর্থের জন্ত তাঁহারা মানুষের জীবন লইয়া খেলা করেন। এ কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা একান্ত লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। বর্দ্ধমানের সর্ব্বত্র চিকিৎসক-সমাজও কি সম্প্রতি এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন?" ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কলিকাতা-শাখা এ-বিষয় কি বলেন? রোগীর চিকিৎসা ব্যাপারে ইহা কি এক প্রকার ম্যালপ্র্যাকটিস্ নহে? ইহাকেও কি প্রকারান্তরে চোরা-কারবার বলা যায় না?

'আর্য্য' পত্রিকায় অভিযোগ :—"বর্দ্ধমানে কয়লা এবং কেরোসিনের নিদারুণ অভাব দেখা দিয়াছে। ঝুড়ির কয়লা ১৫০-১৮৵ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। চিনির মত এই দুইটি বিলাস সামগ্রী নহে। অতএব বর্দ্ধমান সহরের জনসাধারণ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু দুইটি পাইতে পারেন, তৎপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করি। আমাদের কাছে অনেকেই এই দুইটি দ্রব্যের জন্ত লিখিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের কথা লিখিতে পারিয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইলাম! কিন্তু যিনি চৌর্ষট্টি লক্ষ টাকা ভূমি-রাজস্ব গ্রহণ করিয়া রাজাধিরাজের শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন, জনসাধারণের সুখ-দুঃখের অংশ লওয়া কি সেই মহারাজ বর্দ্ধমানের কর্ত্তব্য নহে? আর এক জনের নাম উল্লেখযোগ্য :—তিনি শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। তাঁহার জয়ন্তী করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু জনগণের সুখ-দুঃখের ভাগ তিনি লইতেছেন কি না তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না! সবাই কি কীল মারিবার গোঁসাই হইলেন না কি?" শ্রীযুক্ত পাঁজা 'আর্য্য' পত্রিকার প্রশ্নের জবাব দিবেন। আমরা কেবলমাত্র ইহা তাঁহার গোচরে আনিলাম।

* * * *

'আসানসোল হিতৈষী'র মন্তব্য :—"রবীন্দ্র জন্মোৎসব হয়ে গেল। রবীন্দ্র জন্মোৎসব না পাড়ায় পাড়ায় সরস্বতী পূজা? ঠিক বুঝতে পারলাম না। সেই নাচ-গান আর গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নেকামি ঢঙে কবিতা আবৃত্তি। সর্ব্বত্রই সমান। একটা দেখলে আর দ্বিতীয়টা দেখতে ইচ্ছা করে না। ইহাকেই কি বলে শ্রদ্ধা-নিবেদন; না একটা উপলক্ষ খাড়া ক'রে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা? হায় রবীন্দ্রনাথ! এই শ্রদ্ধা-নিবেদন দেখে অমরলোকে তুমি হয়ত শিউরে উঠছো আর ভাবছ "আমি কি বাংলা দেশকে আর কিছুই দিয়ে যাইনি? আমার বাঁশীতে কি আর কোন সুরই বাজেনি?" আমরাও প্রায় একমত। পশ্চিম-বাঙ্গলা সরকারও বোধ হয় তাই, এবং সেই কারণেই খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিকে 'পাবলিক হলিডে' ঘোষণা না করিয়া কেবল সরকারী হলিডে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

* * * *

'বীরভূম-বার্ত্তা'র প্রকাশ : "সরকারী ধান্ত ও চাউল সংগ্রহ বিভাগের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে যে সংবাদ ইতিপূর্ব্বে 'বীরভূম-বার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতি বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। অথচ প্রকাশিত সংবাদে ধান্ত ও চাউল সংগ্রহ ব্যাপারে যে দুর্নীতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে আমরা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাহার একটা প্রতিবাদ আসিবে আশা করিতেছিলাম। কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়াও যখন আমরা ব্যর্থ হইয়াছি তখন প্রকাশিত সংবাদটির সত্যতা সম্পর্কে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সংবাদে স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে—"মহম্মদ বাজার থানার চুরামুলী গ্রামের ব্রজেন্দ্র মণ্ডল ও রামপুর গ্রামের হারাধন মণ্ডল কর্ত্তৃক তাহাদের নিকট পঞ্চাশ টাকা উৎকোচ চাওয়া হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। আমরা এই দিকে

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও দুর্নীতি নিবারণের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সদর এস-ডি ও মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" আমরাও করিতেছি।

* * * *

'বীরভূম-বার্ত্তা' পাঠে জানিতে পারিলাম: "মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম কর্ত্তব্য সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান ও প্রথম সোপান জল, বায়ু, ময়লা ও জলনিঃসারণ। সিউড়ী সহরের বাড়ী-ঘর যে রকম ঘন, তাহাতে এখানে টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হওয়ারই কথা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত রোগের বৃদ্ধি হইতেছে। দুঃখের বিষয়, মিউনিসিপ্যালিটি ঐ রোগ বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। কলিকাতার মত সহরেও প্রত্যেক বাড়ীর মধ্যে কিছু খোলা জায়গা রাখার ও রাস্তা হইতে কিছু দূরে বাড়ী করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সিউড়ী সহরে এক বাড়ীর গায়ে অন্ত বাড়ী, রাস্তার উপরে বাড়ী, নর্দ্দমার উপরে বাড়ী, পায়খানার উপরে বাড়ী। শোনা যায়, বাড়ীর প্ল্যান মিউনিসিপ্যালিটী মঞ্জুর করিয়া থাকেন। তাঁহারা কি বাড়ীর জল ও ময়লা নিঃসারণের খোলা জায়গার দিকে নজর দিয়া থাকেন? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যে নূতন বাড়ীটি গঙ্গাকান্ত বাবুর হাতায় উঠিতেছে তাহার কথাই ধরা যাউক। ঐ বাড়ীর পশ্চিম দিক্ দিয়া ঐ জায়গার জল নিঃসারণ হয়। বাড়ীটি হওয়ায় জল নিকাশ বন্ধ হইল। ইহার গায়ে আবার অন্ত বাড়ী উঠিয়া কালে জায়গাটি মহামারীর আশ্রয়-স্থান হইবে। সহরের কোথাও কোন বাড়ীর প্ল্যান নাই। এই বর্দ্ধিষ্ণু সহরকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম এই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এ বিষয়ে পৌরসভার কর্ত্তৃপক্ষ ও জেলা কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীন থাকিলে চলিবে না।" কিন্তু এ-বিষয় সিউড়ীবাসীদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই ত' মিউনিসিপ্যালিটিকে ঢালিয়া সাজিতে পারেন। এ-বিষয় কলিকাতার সহিত সিউড়ীর যথেষ্ট মিল দেখিতে পাই। পুরানো বাস্তু-ঘুঘুদের, বিশেষ করিয়া বাড়ীওয়ালা ঘুঘুদের সরানো একান্ত প্রয়োজন। ভোটদানের সময় ভোটদাতা যদি স্তোকবাক্যে না ভোলেন তবেই মঙ্গল।

* * * *

'শিল্প ও সম্পদ' পত্রিকায় প্রকাশ: "কলিকাতার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি পি মুখার্জ্জি বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে বি বাগ্‌চী ওরফে বিমলেন্দু বাগ্‌চী নামক স্থানীয় একটি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরকে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রকাশ, আসামী ৩ হাজার টাকা জমা রাখিয়া একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হইতে একটি পুরাতন মোটরগাড়ী ভাড়া লয় এবং পরে চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ১, ২১২৲ টাকায় বিনিময়ে গাড়ীটি বিক্রয় করিয়া দেয়।...... যাহা বিমলেন্দু বাগ্‌চীর সম্বন্ধে হইয়াছে তাহা বহু ব্যাঙ্কের অনেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সেক্রেটারী, একাউন্ট্যান্ট ও ডিরেক্টরদের বেলায়ও হইত যদি আমানতকারী ও অংশীদারগণ কিঞ্চিৎ সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাহা না হওয়ায় শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশের ন্যায় স্বপ্রচারিত কর্ম্মবীর আদালত ও জনসাধারণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ভারত সরকারের অনুগ্রহ পর্য্যন্ত লাভ করিতেছেন। ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের শ্রীনিবারণ দত্তই কি বেনামীতে বালিগঞ্জে 'হিন্দুস্থান মার্ট' নামে একটি সম্পত্তি চালু করেন নাই? দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক, কুবের ব্যাঙ্ক, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা, ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক, ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যাঁহারা 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' ও 'শাখার তালিকা' প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে প্রতারণা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও বিরুদ্ধেই তো কোন ব্যবস্থা হইল না? প্রত্যেকেই সাধ্যমত গুছাইয়া লইয়া আত্মগোপন করিয়াছেন এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে নানা মূর্ত্তিতে রকমারী ব্যবসা ফাঁদিয়াছেন। কোন একটি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সাতটি শাখার 'ওভারড্রাফ্‌ট' লইয়া ব্যাঙ্কটি যখন কাজ-কারবার স্থগিত রাখিল তখন পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং এক্ষণে এক জন খ্যাতিসম্পন্ন ঠিকাদার হিসাবে গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞাপনে পশ্চিম-বঙ্গের মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্যের প্রশংসা-পত্রও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি কি কোন শাস্তি পাইতে পারেন না? ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি আটক করা যায় না? না, যৌথ কোম্পানীতে যৌথ দায়িত্ব ছিল বলিয়া যথেচ্ছা আচরণ করা চলে ও সমস্ত শাস্তি এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হয়? আদালত হইতে ইহার কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যাইবে কি?" পাওয়া উচিত। তবে সংবাদ মিথ্যা হইলে তাহার প্রতিবাদও প্রয়োজন। কেহ প্রতিবাদ করিবেন কি?

* * * *

'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রিকায় নিম্ন-লিখিত সংবাদ পাঠ করিলাম। আশা করি আমাদের পাঠকবর্গের ইহা মন্দ লাগিবে না: সংবাদ-পত্রে পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের ডাল, চিনি, গুড় খাওয়ার নির্দ্দেশ পাঠ করিয়া এক জন মহিলার এইরূপ উক্তি আমরা শুনিয়াছি: "প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নাই, তাঁর যদি সন্তান-সন্ততি থাকিত এবং তিনি যদি আমাদের মত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক হইতেন, আমি তাঁর বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়া আসিতাম তাঁর স্ত্রী সন্তান-সন্ততিগণকে বেশী পরিমাণ গুড়, ডাল, চিনি খাওয়াইতেন, না 'কালো বাজার' হইতে চাল, আটা ক্রয় করিয়া ছেলে-মেয়েদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেন।" কিছু মন্তব্য করার অবকাশ ছিল, কিন্তু ভয়ে তাহা করিলাম না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

প্যালেষ্টাইন ও ইহুদী রাষ্ট্র—

১৪ই মে (১৯৪৮) মধ্য-রাত্রে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেটের অবসান হইয়াছে। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিজয়ীবেশে বৃটিশ প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করে। ১৯২০ সালে মিত্রশক্তিবর্গের সর্ব্বাধিনায়ক পরিষদ (The Supreme Council of Allied Powers) বৃটেনের হস্তে প্যালেষ্টাইনের ম্যাণ্ডেট বা কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। ১৯২২ সালে লীগ অব নেশানস্ কর্ত্তৃক ম্যাণ্ডেট অনুমোদিত হয় এবং উহা আমলে আসে ১৯২৩ সাল হইতে। বৃটিশের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশের ৩০ বৎসর পরে এবং প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট আমলে আসিবার ২৫ বৎসর পরে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ কর্ত্তৃত্বের অবসান হইল। বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব শেষ হওয়ার ৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহুদী জাতীয় পরিষদ প্যালেষ্টাইনে নূতন ইজরাইল রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করেন। রক্তপাত ও কামান-গর্জ্জনের মধ্যে নূতন ইজরাইল রাষ্ট্র যখন ভূমিষ্ঠ হইল, তখন এক শত মাইলেরও কম দূরে এই নূতন শিশু রাষ্ট্র আক্রমণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল মিশরীয় এবং অন্যান্য আরব বাহিনী। নূতন ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাইবেলের সুপ্রাচীন ভবিষ্যৎ-বাণীকেই সার্থক করিতেছে কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। বাইবেলে আছে: "There thus saith the Lord; I am returned to Jerusalem with mercies; my house shall be built in it, saith the Lord of Host and a line shall be stretched forth upon Jerusalem.

"Cry yet, saying, 'Thus saith the Lord of Host, My cities through prosperity shall yet be abroad and the Lord shall yet comfort Zion and shall yet choose Jerusalem."

ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছিলেন: করুণা লইয়া আমি জেরুজালেমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, এখানে আমার মন্দির নির্ম্মিত হইবে, হোষ্টের প্রভু বলিয়াছেন এবং জেরুজালেমের উপর একটি রেখা প্রসারিত হইবে। এ কথা বলিয়া ক্রন্দন কর, 'হোষ্টের প্রভু বলিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যের জন্য আমার নগর সমূহের খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে, জিয়নকে ঈশ্বর সান্ত্বনা দিবেন এবং জেরুজালেমকেই তিনি মনোনীত করিবেন।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই সার্থক হইবে কি? বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বেই জেরুজালেম বহির্বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিন দিক হইতে এই নূতন রাষ্ট্র আক্রান্ত হইয়াছে এবং যুদ্ধ শুরু হইয়াছে তিন ফ্রণ্টে। ১৪ই মে মধ্য-রাত্রের এক মিনিট পরেই মিশরীয় সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ দিক হইতে প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করে। পূর্ব্ব দিকে ট্রান্সজর্ড্ডানের রাজা আবদুল্লার বাহিনী মরু-সাগরের উত্তর তীর দিয়া জর্ড্ডান নদী অতিক্রম করে এবং উত্তর দিকে গ্যালিলী হ্রদের দক্ষিণ দিকে সিরিয়া, লেবানন এবং ইরাকের সৈন্যবাহিনী প্যালেষ্টাইন সীমান্ত অতিক্রম করে। ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজা আবদুল্লার আরব লীজিয়ন পূর্ব্ব হইতেই প্যালেষ্টাইনের ভিতরে অবস্থান করিতেছিল। দশ হাজার সৈন্যসমন্বিত এই আরব লিজিয়নই ইহুদীদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক। এই বাহিনীর অফিসারগণ সকলেই বৃটিশ। ইহুদী-আরব সংগ্রামের বিবরণ এখানে দিবার স্থান নাই। নূতন ইজরাইল রাষ্ট্রের অস্থায়ী রাজধানী তেল-অবিবের উপর যেমন বোমা বর্ষিত হইয়াছে, তেমনি ইহুদীরাও ট্রান্সজর্ডানের রাজধানী আম্মানের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। দক্ষিণ দিক হইতে মিশরীয় বাহিনী অগ্রসর হইবার পথে বাধা পায় নাই। কিন্তু সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠে প্রাচীন জেরুজালেম সহরে এবং ইহুদীরা অবশেষে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। মিশর, ট্রান্সজর্ডান, সিরিয়া, লেবানন এবং ইরাক কর্ত্তৃক নূতন ইহুদী রাষ্ট্র আক্রান্ত হওয়ার মধ্যে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীই যেন প্রতিফলিত দেখা যায়। বাইবেলে আছে,—"For I shall gather all nations against Jerusalem to battle and the city shall be taken and the houses rifled and the women ravished; and half of the city shall go forth in captivity and the residue shall be cut off from the city." অর্থাৎ 'সমস্ত জাতিকে জেরুজালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমি সমবেত করিব, সহর অধিকৃত হইবে, গৃহ সকল লুণ্ঠিত এবং নারীরা ধর্ষিতা হইবে, সহরের অর্দ্ধাংশের অধিবাসী বন্দী হইবে এবং অবশিষ্ট অধিবাসীরা সহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে।' বস্তুতঃ প্রাচীন জেরুজালেম সহরের অবস্থা এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু নূতন জেরুজালেম সহর এখনও আরবরা দখল করিতে পারে নাই। নূতন ইজরাইল রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কি, প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ কি, এই প্রশ্নের উত্তর অনুমান করা অসম্ভব।

নূতন ইজরাইল রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অতঃপর রাশিয়া এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা কর্ত্তৃকও নূতন ইহুদী রাষ্ট্র স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু শুধু স্বীকৃতি দ্বারা একটা নূতন শিশু-রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখা যায় না।

ইহুদীদের সুগঠিত সৈন্যবাহিনী বলিতে কিছুই নাই। তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিবারও কেহ নাই। চারিটি রাষ্ট্র কর্তৃক তিন দিক হইতে ইহুদী রাষ্ট্র আক্রান্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্রই হউক আর আধুনিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত নাই হউক, এই সকল রাষ্ট্রের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী আছে, বৃটিশের নিকট হইতে তাহারা অস্ত্রশস্ত্রের যোগান পাইতেছে। মার্কিণ কংগ্রেসের সদস্য ইমানুয়েল সেলার স্পষ্টই অভিযোগ করিয়াছেন যে, আরব লিজিয়ন কর্তৃক ইহুদীরা আক্রান্ত হওয়ার দায়িত্ব বৃটেনের। বৃটেনকে যে ডলার সাহায্য দেওয়া হইতেছে তাহা প্রত্যাহার করার জন্যও তিনি দাবী করিয়াছেন। রিপাবলিকান দলভুক্ত সিনেটের আওয়েন ব্রিউষ্টার অভিযোগ করিয়াছেন যে, আমেরিকার করদাতাদের পকেট হইতে বৃটেন ট্রান্স-জর্ডানের সীমান্ত বাহিনীকে প্রতি বৎসর ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং এবং বৃটিশ অফিসার সরবরাহ করিতেছে। নিরাপত্তা পরিষদে উক্তরূপ অভিযোগ করিয়াছে যে, এক দিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে বৃটেন বলে শান্তির কথা আর এক দিকে বৃটেন তাহার সাধ্য অনুযায়ী আরবদিগকে সাহায্য করিতেছে। ইস্রাইল রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডেভিড বেনগুরিয়ন বলিয়াছেন, "হাইফাস্থিত বৃটিশ কন্‌সাল হাইফার ইহুদী মেয়রকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, আরবদের সদর কার্য্যালয় আম্মানের উপর যদি আবার বোমাবর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে বৃটিশ রয়েল এয়ার ফোর্স কামান দাগিয়া বিমান ভূপাতিত করিবে।" আরবরা বৃটিশ বিমানে চড়িয়া বৃটিশ কামান হইতে দিন-রাত জেরুজালেমের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে বলিয়াও তিনি অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহুদী রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে কেহ নাই। রোম নগরী যখন পুড়িতেছিল, নিরো তখন বেহালা বাজাইতেছিলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও যেন নিরোর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই আরব ইহুদী সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। নিরাপত্তা পরিষদ এই সংঘর্ষ নিরোধের জন্য কি করিয়াছেন? গত মার্চ্চ মাসে (১৯৪৮) নিরাপত্তা পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহাতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভাগ-প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এই অনুরোধে কোনই ফল হয় নাই। ১লা এপ্রিল (১৯৪৮) নিরাপত্তা পরিষদ দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। একটি প্রস্তাবে অবিলম্বে সন্ধি করিবার জন্য আরব ও ইহুদীদিগকে অনুরোধ করা হয়। এই অনুরোধের বন্ধ্যাত্ব নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আরও বিবেচনা করিবার জন্য সাধারণ পরিষদকে অনুরোধ করা হয়। অবিলম্বে সন্ধি করার প্রস্তাব যখন ব্যর্থ হইল, তখন ১৭ই এপ্রিল তারিখে সংঘর্ষ বন্ধ করিবার জন্য আরব ও ইহুদী দিগকে অনুরোধ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ২৩শে এপ্রিল নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক বেলজিয়ম, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে লইয়া একটি শান্তি কমিশন (Truce Commission) গঠিত হয়। অতঃপর ১৩ই মে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে জেরুজালেমের জন্য এক জন মিউনিসিপাল কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। সাধারণ পরিষদ এক জন সালিশ (mediator) নিযুক্ত করিবারও সুপারিশ করেন। বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন দিক হইতে যখন ইহুদী রাষ্ট্র আক্রান্ত হইল, নিরাপত্তা পরিষদ তখন কি করিতেছিলেন? প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ বন্ধ করিবার আলোচনা নিরাপত্তা পরিষদে তখনও চলিতেছিল। অনেক তীব্র বাদানুবাদের পর গত ২৯শে মে চারি সপ্তাহের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়া নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল ১লা জুন ভোর সাড়ে চারিটা। এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পূর্ব্বে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত সালিশ সুইডেনের অধিবাসী কাউন্ট ফক বার্ণাডোট প্যালেষ্টাইন যাত্রা করেন। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ে তো দূরের কথা যুদ্ধ বন্ধ করিতে সালিশ মহাশয় হিমসিম খাইয়া গিয়াছেন। অবশেষে নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ-বিরতির সময় নির্দ্ধারণের ভার সালিশের উপরেই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

যুদ্ধ-বিরতি কার্য্যকরী হইলে রোডস দ্বীপে আরব ও ইহুদীদের শান্তি-বৈঠক আরম্ভ হইবে। যুদ্ধ-বিরতি হইয়াছে কিন্তু উহা সত্য-সত্যই কার্যকরী হইবে, না শুধু কাগজে-কলমেই থাকিবে, এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ আছে, তেমনি আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সত্যই কোন মীমাংসা সম্ভব কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। আরবরা প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্রের বিরোধী। তাহারা ইহুদীরাষ্ট্রকে স্বীকার করিবে কি? যদি না করে তবে মীমাংসা হইবে কিরূপে? ইহুদীরা ইস্রাইল রাষ্ট্রের দাবী ত্যাগ করিবে ইহা আশা করা অসম্ভব। ইহুদীরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া বাস করিতেছে। কিন্তু বংশানুক্রমে তাহারা স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে ইস্রাইল রাষ্ট্রের। তাহাদের এই স্বপ্ন সর্ব্বপ্রথম আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। জার্ম্মাণ ইহুদী মোসেজ হেস তাঁহার 'রোম ও জেরুজালেম' নামক গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম ইহুদী জাতীয়তাবাদের কথা উল্লেখ করেন। হেসের পর ভিয়েনার জনৈক ইহুদী পোরেজ স্মোলেন্‌স্কিন ইহুদী জাতীয়তাবাদের আন্দোলন চালাইতে থাকেন। তাঁহার আন্দোলন ছিল তিন অংশে বিভক্ত: (১) প্যালেষ্টাইন, (২) ইহুদী আইন এবং (৩) হিব্রু ভাষা। ইউরোপ হইতে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের প্রথম আগমন আরম্ভ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে। রাশিয়ার ইহুদীদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলিতেছিল, তাহাই প্রথম তাহাদের প্যালেষ্টাইনে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। তাহারা প্যালেষ্টাইনে আসিয়া কৃষি-কলোনী স্থাপন করে। অনেক বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া তাহাদের কৃষি-কলোনী সাফল্য মণ্ডিত হইলে ক্রমশঃ আরও ইহুদী প্যালেষ্টাইনে আসিতে থাকে। তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য 'জিয়নপ্রেমিক' নামক একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং বিখ্যাত ব্যাঙ্কার রথচাইল্ডও তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইন তখন তুরস্কের অধীন। তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে আসিতে উৎসাহ যেমন দেন নাই, তেমনি বাধাও দেন নাই। প্যালেষ্টাইনে প্রথম আগমনকারী ইহুদীদের চেষ্টাতেই 'জিয়নিজম' আন্দোলনের বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলন নূতন প্রেরণা লাভ করে বেলফুরের ঘোষণা হইতে। উহার পরবর্ত্তী ইতিহাস বর্ত্তমান কালের ঘটনা।

আরবরা যদি বৃটিশের সাহায্য না পায়, তাহা হইলে প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা রাজী হইতে পারে। ইহুদীরা যদি কাহারও সাহায্য না পায় আর আরবরা বৃটেনের সাহায্য পায়, তাহা হইলে ইহুদী রাষ্ট্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। আরব এবং ইহুদী উভয় পক্ষ সমান শক্তিশালী হইয়া যুদ্ধ করিলে, বিভাগ-প্রস্তাব অনুযায়ী ইহুদীরা তাহাদের প্রাপ্য অংশ রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু জেরুজালেমের প্রাক্তন প্রাপ্ত মুক্তির কোন আশা ভরসা এখন আর দেখা যায় না। আরব প্যালেষ্টাইন বলিয়া কিছু না থাকিলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইহুদীদের সম্পর্কে নিরাশার কোন কথাই নাই। ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই সফল হয় কি না তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু বাইবেলে আছে: "Then shalt the Lord go forth and fight against those nations, as when he fought in the day of battle. And this shall be plague where with the Lord shall smite all the people that have fought against Jerusalem; Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes and their tongue shall consume away in their mouth." তৎপর ঈশ্বর পূর্ব্বে যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ ঐ সকল জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। জেরুজালেমের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল মহামারী দ্বারা তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিবেন। দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহাদের শরীরের মাংস ধ্বংস হইবে, চক্ষু-কোটরের মধ্যেই তাহাদের চক্ষু বিনষ্ট হইবে এবং মুখ-বিবরের মধ্যে বিনষ্ট হইবে তাহাদের জিহ্বা।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্ব্বাচন—

গত ২৮শে মে দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্ব্বাচনের যে ফল ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে বেশ একটু আশঙ্কার সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। স্বয়ং ফিল্ড-মার্শাল স্মাটস্ নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে পরাজিত হইবেন এবং ডক্টর মলানের নেশন্যালিষ্ট দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিবে, নির্ব্বাচন চলিতে থাকার সময়েও এইরূপ আশঙ্কা কেহ করে নাই। গত ২৪ বৎসর ধরিয়া ফিল্ড-মার্শাল স্মাটস্ ষ্ট্যাণ্ডারটনের প্রতিনিধিত্ব করিয়া আসিতেছেন। দুই বার তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। এবারে সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি নেশন্যালিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট ২২৪ ভোটে পরাজিত হইলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মিঃ উ, সি ডু প্লেসিস। ডক্টর মলান প্রায় ৫ হাজার ভোট বেশী পাইয়া তাঁহার আসন রক্ষা করিয়াছেন। স্মাটসের ইউনাইটেড পার্টি ৬৫টি, ডাঃ মলানের নেশন্যালিষ্ট দল ৭০টি, আফ্রিকানার দল ৯টি এবং শ্রমিক দল ৬টি আসন দখল করিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধিদের আসন আছে ৩টি। এই আসন তিনটির জন্য এক মাস পূর্ব্বে নির্ব্বাচন হইয়াছে। আফ্রিকানার দল নেশন্যালিষ্ট দলের সহিত সহযোগিতা করিবে এবং শ্রমিক দলের ৬ জন সদস্য এবং স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্রয় সহযোগিতা করিবেন ইউনাইটেড পার্টির সহিত। দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ ব্যবস্থা পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যা ১৫০ জন। আফ্রিকানার দলের ৯ জন সদস্য লইয়া নেশন্যালিষ্ট দলের সম্মিলিত সদস্য-সংখ্যা হইল ৭৯ জন এবং শ্রমিক দল ও স্থানীয় অধিবাসীদের তিন জন প্রতিনিধি লইয়া ইউনাইটেড পার্টির সম্মিলিত সদস্য-সংখ্যা ৭৪ জন হইয়াছে। সম্মিলিত নেশন্যালিষ্ট দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হইল মাত্র ৫ জনের। মোট ১০ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৪১ জন ভোটার ভোট দিয়াছেন। তন্মধ্যে ইউনাইটেড পার্টির অনুকূলে ৫,২৪,২৩০ ভোট, নেশন্যালিষ্ট দলের অনুকূলে ৪,০১,৮৩৪ ভোট, আফ্রিকানার দলের অনুকূলে ৪১,৮৮৫ ভোট শ্রমিক দলের অনুকূলে ২৭,৩৬০ ভোট হইয়াছে। বর্ত্তমান সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্ববর্ত্তী পার্লামেণ্টে স্মাটসের দলের সদস্য-সংখ্যা ছিল ৮২ জন এবং ডাঃ মলানের দলের সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন।

১৯১৯ সালে জেনারেল লুই বোথার মৃত্যু হইলে স্মাটস্ দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হন। ১৯২০ সালের মার্চ্চ মাসের সাধারণ নির্ব্বাচনেও তাঁহার ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। ১৯২৪ সালের নির্ব্বাচনে নেশন্যালিষ্ট দল ও শ্রমিক দলের সম্মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। ১৯৩২ সালে তিনি তৎকালীন নেশন্যালিষ্ট নেতা জেনারেল জেমস্ হার্টজগের সহিত কোয়ালিশন গঠন করেন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর বৃটেন জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পর এই কোয়ালিশনের অবসান হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইলে জেনারেল হার্টজগ দক্ষিণ আফ্রিকাকে আয়ারের মত নিরপেক্ষ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। জেনারেল হার্টজগের দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিরপেক্ষ রাখিবার প্রস্তাব ডাঃ মলানের সমর্থন লাভ করিয়াছিল, কিন্তু জ্যান ক্রিশ্চিয়ান স্মাটস্ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। হার্টজগ পরাজিত হইয়া পদত্যাগ করেন এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) স্মাটস্ নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্ব্বাচন হয় ১৯৪৪ সালে। তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের চাপে আর সমস্ত প্রশ্নই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধ-সংক্রান্ত নীতিই ১৯৪৪ সালের নির্ব্বাচনে ফিল্ড মার্শাল স্মাটসের জয়লাভের এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার কারণ। আবার ডাঃ মলানের যুদ্ধ-সংক্রান্ত নীতিই তাঁহাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। ডক্টর মলান যে দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিরপেক্ষ রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এক জন বুয়র হিসাবে তিনি বৃটিশ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ঘৃণা করেন। তিনি চান দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বাধীন বুয়র প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিতে। তিনি জার্ম্মাণীর জয়ই কাম্য বলিয়া মনে করেন, যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা পার্লামেণ্টে এইরূপ ইঙ্গিত পর্য্যন্ত তিনি দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত-কায়দের কাছে তাঁহার এই নীতি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুদ্ধসংক্রান্ত নীতির বালাই আর নাই। কাজেই নির্ব্বাচনের পাল্লা এবার ডাঃ মলানের দিকেই ঝুঁকিয়াছে।

ডাঃ মলানের বিজয়কে কেহ কেহ দুর্দ্দৈব বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। বৃটেনের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ, এইবার বুঝি দক্ষিণ-আফ্রিকা বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে চলিয়া যায়। কিন্তু নির্ব্বাচন-প্রতিশ্রুতিতে ডাঃ মলান বলিয়াছেন যে, তিনি ক্ষমতা পাইলে

অবিলম্বেই বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবেন না। নির্ব্বাচনের পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীরূপে ডাঃ মলান গত ৪ঠা জুন এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, যদি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহা হইলে বৃটেন এবং কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা আগ্রহের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ রক্ষা করিবে। কিন্তু মাত্র পাঁচ জনের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লইয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করা ডাঃ মলানের পক্ষে সম্ভব হইবে কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু স্মাটসের পরাজয়ে ভারতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে স্মাটস এবং ডাঃ মলানের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নাই। তবে ভারতীয়দের সম্পর্কে নির্ব্বাচন-প্রতিশ্রুতিতে ডাঃ মলান ছয়-দফা-যুক্ত যে কর্ম্মসূচী প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য। এই কর্ম্মসূচীতে ভারতীয়দিগকে পৃথক করিয়া রাখার নীতিকে কঠোর ভাবে প্রয়োগ করিবার কথা তো আছেই তা ছাড়া ভারতীয়দিগকে যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব অন্যত্র প্রেরণ করিবার কথাও আছে। ইহাতে ভীত হইবার সত্যই কোন কারণ আছে কি? আপাততঃ সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়া ডাঃ মলানের সহিত আলোচনা করিবার কথাও উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কথা এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে সংগ্রাম করা প্রয়োজন। দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্ব্বাচনের কয়েক দিন পূর্ব্বেই ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের সাত লক্ষ আফ্রিকান, ভারতীয় এবং অন্যান্য অশ্বেতকায়দের এক সম্মেলন জোহেনসবার্গে হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত জনগণের জন্য ভোটের দাবী করিয়া এবং দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সমগ্র আফ্রিকা একটি অবদমিত বিপ্লবের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ডাঃ মলানের দমন-নীতি এই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিবে মাত্র।

বৃটিশ শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলন

১৭ই মে হইতে ২১শে মে পর্য্যন্ত স্কারবরোতে বৃটিশ শ্রমিক দলের যে ৪৭তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে, শ্রমিক দলের ক্ষমতা লাভের পর উহাই তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন। দুই বৎসর পর ১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে আবার সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। কাজেই বৃটিশ শ্রমিকদলের এই বার্ষিক সম্মেলন নানা দিক দিয়াই যে গুরুত্বপূর্ণ তাহা অস্বীকার করা চলে না। সম্মেলনে বিভিন্ন বৃটিশ শ্রমিক নেতাদের বক্তৃতা এবং গৃহীত প্রস্তাবাদি আলোচনা করিলেই এই গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। অনুমোদিত বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ৪০ লক্ষ সদস্য এবং ব্যক্তিগত ৬ লক্ষ সদস্যের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই সম্মেলনের উদ্বোধন হয়, সংবাদে প্রকাশ, তাহা না কি ছিল টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম' কবিতায় বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থার অনুরূপ। সভা-গৃহের বাহিরে না কি বহুসংখ্যক বায়স সমবেত হইয়া তুমুল কলরব করিতেছিল। কিন্তু প্রতিনিধিবৃন্দ এই অশুভ লক্ষণকে মোটেই আমল দেন নাই।

এই সম্মেলনে যে সকল বিষয় আলোচনা হইয়াছে তন্মধ্যে বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-নীতির কথাই আমরা প্রথমে উল্লেখ করিব। মিঃ বেভিনের নীতি এবং মার্শাল-পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বিপুল ভোটাধিক্যেই গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ৪০,১৭,০০০ ভোট এবং বিপক্ষে ২,২৪,০০০ ভোট হইয়াছিল। আট লক্ষ ভোট কোন পক্ষেই প্রদত্ত হয় নাই। শ্রমিক দলের পররাষ্ট্র-নীতি যে এই সম্মেলনে বিপুল ভোটাধিক্যেই সমর্থিত হইবে সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন মিঃ জিলিয়াকাস। তিনি বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-নীতি সমালোচনা করিয়া যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার পক্ষে ২,২৪,০০০ ভোট এবং বিপক্ষে ৪০,১৭,০০০ ভোট হইয়াছিল। মিঃ বেভিন যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে বৃটিশ পররাষ্ট্র-নীতির চারিটি দিক বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথমতঃ, পশ্চিম ইউরোপে কম্যুনিষ্টরা আধিপত্য বিস্তার করিবে, আর বৃটেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম ইউনিয়নের রক্ষা-ব্যবস্থার প্রচেষ্টা কাহারও বিরুদ্ধে নয়, কেবল আক্রান্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট সমূহকে জনগণকে রক্ষার জন্য সাহায্য প্রদানই উহার উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ, মিঃ বেভিন দাবী করিয়াছেন যে, যে ১৫।১৬টি দেশ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল অবিলম্বে তাহাদের একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের রাজী হওয়া উচিত। গ্রীস সম্বন্ধে মিঃ বেভিন বলিয়াছেন, 'গ্রীসে পাঁচ হাজার লোক গৃহহীন এ কথা আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। শিশুদিগকে চুরি করিয়া অন্য দেশে লইয়া যাওয়া হইতেছে, ইহা আমার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।·········আপনারা জানেন, একটি স্থান হইতে একটি অঙ্গুলী উত্তোলিত হইলে আজ রাত্রেই উহা নিবারিত হইবে।' গ্রীস সম্বন্ধে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতিই যে পাঁচ হাজার লোক গৃহহীন হইবার কারণ, গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী না জানিলে তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। যাঁহারা জানিয়াও অজ্ঞতার ভাণ করেন, মিঃ বেভিনের মন্তব্যে তাঁহারা যে খুসী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রীস হইতে প্রতিদিন ছেলেমেয়েদিগকে চুরি করিয়া অন্য দেশে লইয়া যাওয়া হইতেছে কি না, সে-সম্বন্ধে সত্য সংবাদ কিছুই জানিবার উপায় নাই। কিন্তু 'একটি স্থান হইতে একটি অঙ্গুলী উত্তোলিত হইলেই উহা নিবারিত হইবে, মিঃ বেভিনের এই উক্তি তাৎপর্য্যপূর্ণ। যদিও ঐ স্থানটির নাম তিনি করেন নাই, তাহা হইলেও উহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। আজ যে গ্রীসের যুদ্ধ চলিতেছে তাহা নিরোধ করিবার দায়িত্ব রাশিয়ার উপর চাপাইতে তিনি কসুর করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে কোন কথা নাই, ইহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়।

বৃটিশ সমর-সচিব মিঃ ম্যানি শিনওয়েলকে অনেকে পার্লামেণ্টের বামপন্থী দলের ভাবী নেতা বলিয়া মনে করেন। মিঃ শিনওয়েল যদিও যথেষ্ট নরম ভাষাতেই বক্তৃতা দিয়াছেন, তথাপি সোশ্যালাইজড, বৃটিশ কয়লা-খনি সম্পর্কে কম কঠোর সমালোচনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "Nationalization without

democracy is not socialism," অর্থাৎ গণতন্ত্র ব্যতীত জাতীয়করণকে সমাজতন্ত্র বলে না।' তিনি নূতন ধরণের জীবনযাত্রার প্রণালী সৃষ্টি করিতে বলিয়াছেন, জরাজীর্ণ অর্থনৈতিক মতবাদ বর্জন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং অস্বাস্থ্যকর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে অস্বীকার করিতেও ক্রটি করেন নাই। বৃটিশ সমাজতন্ত্রের দুর্বলতার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"......and you cannot claim that an industry or service is socialized unless and until the principles of socialism and economic democracy are implict in day-today conduct." 'যে পর্য্যন্ত না দৈনন্দিন ব্যবহারে সমাজতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতেছে, সে পর্য্যন্ত কোন শিল্প অথবা সার্ভিসকে সোশ্যালাইজড্ করা হইয়াছে বলিয়া আপনারা দাবী করিতে পারেন না।' বৃটেনে কয়লা খনিগুলিকে জাতীয়করণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকদের পরিবর্ত্তে কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছে আমলা-তন্ত্র। সামাজিক মালিকত্বের শ্রমিকরাও অংশীদার সে-কথা শ্রমিকরা বুঝিতে পারিতেছে না। সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে বলা হইয়াছে যে, উৎপাদন বৃদ্ধিই সমাজতন্ত্রের পথ। কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক-নেতারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ধনতন্ত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বড় কম নয়। সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব শ্রমিকদিগকে অধিক উৎপাদনের প্রেরণা প্রদান করা। কিন্তু তথাকথিত বৃটিশ সমাজতন্ত্র তাহা পারে নাই। বৃটিশ সমাজতন্ত্র শিল্পের শেয়ার সমূহের মালিকানা-স্বত্বকে সরকারী ঋণপত্রের মালিকানা-স্বত্বে পরিণত করিয়াছে মাত্র। বৃটিশ সমাজতন্ত্রের এই দুর্ব্বলতা আগামী নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

আগামী নির্ব্বাচন সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রস্তাব মুলতুবী রাখা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ হার্বার্ট মরিশন বৃটিশ শ্রমিক দলের আগামী নির্ব্বাচন-কার্য্যসূচীর যে আভাষ দিয়াছেন, তাহাতে জাতীয়করণের গতিধারাকে মন্থর করিবার কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'আগামী নির্ব্বাচন আমাদের প্রাণ-রক্ষার সংগ্রাম হইবে। আমাদের জয়লাভ করা একান্তই প্রয়োজন, নতুবা টোরী সংখ্যা-গরিষ্ঠতা জাতির রক্ষা-কার্য্যের সমস্তই পাল্টাইয়া ফেলিবে।' এই আশঙ্কা কি সত্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? কেন এই আশঙ্কা? মিঃ মরিশন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, জাতীয়করণের পথে শ্রমিক দল যদি দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং অভাস্ত খুচরা (floating) ভোট পাওয়া সম্ভব হইবে না। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রবাদের কঠোর বাস্তব সমস্যা এইখানেই। দ্রুততর গতিতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেও ভোটে হারিবার আশঙ্কা, আবার গতি মন্থর করিলে সেটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তাহাতেও বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। ধনতন্ত্রবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যপন্থা যে অত্যন্ত দুর্ব্বল স্কারবরো সম্মেলনে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ লসন মিঃ মরিশনের বক্তৃতার উত্তরে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ শিল্পের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র জাতীয়করণ করা হইবে, এবং এই হারে জাতীয়করণ কার্য্য চলিতে থাকিলে বৃটেনে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিবে ২৫ বৎসর। এত কাল একসঙ্গে শ্রমিক দল রাজত্ব করিবে, অতিমাত্র আশাবাদীর পক্ষেও তাহা স্বীকার করা অসম্ভব।

বৃটিশ শ্রমিক দলের সমাজতন্ত্রের মত তাঁহাদের গণতন্ত্রও যে সোণার পাথরের বাটি, তাহারও পরিচয় স্কারবরো সম্মেলনে পাওয়া গিয়াছে। ইটালীর সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে শ্রমিক দলভুক্ত ৩৭ জন পার্লামেণ্টের সদস্য সিগনর নেনীর নিকট শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া এক টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৫ জন সদস্য বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের অজ্ঞাতে তাঁহাদের নাম টেলিগ্রামে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ২২ জনের মধ্যে শুধু মিঃ প্ল্যাটস-মিলসকে শ্রমিক দলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি দল হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেন। বাকী কয়েক জন ক্রটি স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পান। স্কারবরো সম্মেলনে মিঃ প্ল্যাটসমিলসের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ সমর্থনের জন্ম প্রস্তাব উঠিলে তাঁহাকে তাঁহার বক্তব্য বলিবার পর্য্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয় নাই, যদিও তিনি তাঁহার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট তাঁহার প্রতি আস্থাজ্ঞাপক ভোট পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। ইহারই নাম কি গণতন্ত্র? বিরুদ্ধবাদী যত দিন দুর্ব্বল থাকেন, বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র তত দিন তাঁহাকে সহ্য করে। বিরুদ্ধবাদীকে শক্তিমান হইতে দেখিলেই গণতন্ত্র ফাসিজমের রূপ ধরিয়া তাঁহাকে ধ্বংস করে। শ্রমিক দলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলভুক্ত ২৩ জন সদস্য হেগ-সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াই শ্রমিক দলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। মিঃ প্ল্যাটস্‌মিলসের সম্পর্কে গৃহীত নীতির সহিত উল্লিখিত ২৩ জন সদস্য সম্বন্ধে গৃহীত নীতির পার্থক্যই গণতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। সিগনর নেনীর নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু তিনি ইটালীর কম্যুনিষ্ট দলের সহিত একযোগে কাজ করেন। এই জন্যই তাঁহার নিকট শুভেচ্ছার টেলিগ্রাম প্রেরণ অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আর হেগ-সম্মেলনটা ছিল ইউরোপের যোলটি রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্মেলন। সেই জন্ম প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া হেগ-সম্মেলনে যোগদান করিলেও তাহা দোষের বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

জার্ম্মাণী বিভাগের সিদ্ধান্ত—

ছয় সপ্তাহব্যাপী গোপন অধিবেশনের পর গত ১লা জুন (১৯৪৮) লণ্ডনে ষড়রাষ্ট্র সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে এবং প্রতিনিধি-বৃন্দ সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশগুলিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা এই সকল সুপারিশ অনুমোদনের জন্ম স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিবেন। পশ্চিম জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্ম বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম, নেদার-ল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবার্গ এই ছয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উল্লিখিত সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনে প্রতিনিধিবৃন্দ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তন্মধ্যে বৃটিশ, মার্কিণ এবং ফরাসী-অধিকৃত পশ্চিম জার্ম্মাণীর তিনটি অঞ্চলের জন্ম একটি গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং পশ্চিম জার্ম্মাণীর অধিকৃত থাকা অবস্থার অবসান হওয়ার পরেও রূঢ় অঞ্চলে এবং রাইনল্যাণ্ডের কতক অংশে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য রাখিবার সিদ্ধান্ত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ষড়রাষ্ট্র সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ফলে জার্ম্মাণী দ্বিধা-বিভক্ত হওয়া স্থিরনিশ্চয় হইয়া গেল। জার্ম্মাণীর জনসাধারণ এবং রাশিয়া উভয় দিক হইতে দ্বিধা-বিভক্ত জার্ম্মাণীর প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। জার্ম্মাণীর জনসাধারণের উপর দ্বিধা-বিভক্ত জার্ম্মাণীর প্রতিক্রিয়া ভার্সাই সন্ধি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইবে। মার্শাল-পরিকল্পনার সাহায্য পাইলেও তথাকথিত গণতন্ত্রের অধীনে পশ্চিম জার্ম্মাণীর জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পূর্ব্ব জার্ম্মাণীতে কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং জনগণের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থায় পূর্ব্ব জার্ম্মাণী যে পশ্চিম জার্ম্মাণীর জনগণের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে উভয় জার্ম্মাণীর মধ্যে এক 'টাগ অব ওয়ার' চলিতে থাকিবে। ইহার পরিণাম কি হইবে তাহা বলা কঠিন। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধের যে আয়োজন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র করিয়াছে, পশ্চিম জার্ম্মাণী গঠন তাহারই একটা অংশ মাত্র। ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইয়াছে। উহা কোরিয়া বিভাগের নামান্তর মাত্র। অতঃপর জার্ম্মাণী বিভাগের এই ব্যবস্থা। পশ্চিম জার্ম্মাণীর রাজধানী হইবে ফ্রাঙ্কফোর্ট। সুতরাং বার্লিন সম্পর্কে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের কোন দাবীই আর থাকিতে পারে না। সুতরাং ইহা লইয়া রাশিয়ার সহিত ঠাণ্ডা যুদ্ধের নূতন আর এক ফ্রণ্ট সৃষ্টি হইবে।

মিঃ ডাল্টনের পুনঃ প্রবেশ—

সম্প্রতি বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিসভায় যে রদবদল হইয়াছে তাহার মধ্যে মিঃ ডাল্টনের মন্ত্রিসভায় পুনঃ প্রবেশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ইতিপূর্ব্বে মিঃ ডাল্টন ছিলেন রাজস্ব-সচিব। বাজেট প্রস্তাব পূর্ব্বেই ফাঁস হইয়া যাওয়া উপলক্ষে মিঃ ডাল্টন যখন পদত্যাগ করেন, তখনই এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে, আবার সুযোগ-মত তাঁহাকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইবে। বর্ত্তমানে তিনি চ্যান্সেলার অব দি ডাচি অব লঙ কাষ্টার রূপে মন্ত্রিসভায় পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন। এই দপ্তরের বর্ত্তমানে জার্ম্মাণী সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নাই, এ কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। পররাষ্ট্র-দপ্তরের প্রতি তাঁহার একটা লোভ আছে তাহা সকলেরই জানা কথা। কিন্তু মিঃ বেভিন অসুস্থ হওয়ার অছিলা করিয়া মন্ত্রিসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন, এইরূপ আশা করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু মন্ত্রিসভার বাহিরে মিঃ ডাল্টন পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের বামপন্থীদের নেতৃত্ব অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছিলেন। কাজেই তাঁহাকে মন্ত্রিসভার বাহিরে রাখা অপেক্ষা ভিতরে রাখাই নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।

অসামরিক বিমান বিভাগের মন্ত্রীর পদে লর্ড পাকেনহামের নিয়োগ মন্ত্রিসভায় অপর আর একটি পরিবর্ত্তন। তাঁহার যোগ্যতা সম্পর্কে 'মাঞ্চেষ্টার গাডিয়ানে'র রাজনৈতিক সংবাদদাতা কঠোর সমালোচনা করিলেও তাঁহার যোগ্যতা ও বিবেচনা-শক্তি সম্বন্ধে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের কোন সন্দেহ নাই।

রাশিয়া বনাম আমেরিকা—

জেনারেল বেডেল স্মিথ এবং মঃ মলটভের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হওয়া এবং রাশিয়া আমেরিকার সহিত আপোষ আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় অনেকের মধ্যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু মিঃ মার্শালের বিবৃতির পর সেই আশা নির্ম্মম ভাবেই শুধু ব্যর্থ হয় নাই, অতঃপর রাশিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে এগার দফা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। এ কথা অবশ্য সত্য যে, এই অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ হইতে বিরোধের কারণগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অভিযোগের কারণগুলি জানা থাকিলেই যে মীমাংসা সহজ হইয়া উঠে তাহাও নয়। অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস, পরমাণু-শক্তি, জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণ, জাপানের সহিত সন্ধি সর্ত্ত নির্দ্ধারণ, চীন হইতে সৈন্য অপসারণ, কোরিয়া, অপর রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্বের মর্য্যাদা রক্ষা এবং উহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সামরিক ঘাঁটি, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিকে সাহায্য দান এবং মানুষের অধিকার, এই এগারটি বিষয়ে আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে এবং প্রত্যুত্তরে রাশিয়া এই সকল অভিযোগের সমস্ত দায়িত্বই চাপাইয়াছে রাশিয়ার উপর। এখানে এই সকল অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ লইয়া আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। রাশিয়া ধনতান্ত্রিক দেশ হইলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঐ সকল অভিযোগ উপস্থিত করা সম্ভব হইত। কিন্তু রাশিয়া কম্যুনিষ্ট-মতাবলম্বী হওয়ায় কম্যুনিজমই এই সকল অভিযোগের প্রকৃত মূল কারণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাশিয়ার সম্প্রসারণ আর কম্যুনিজমের সম্প্রসারণ এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আমেরিকা আর দেখিতে পায় না। বরং রাষ্ট্রশক্তি রাশিয়া অপেক্ষা কম্যুনিজমকে ভয় করিবার কারণ বেশী। সব দেশেই জনগণের মধ্যে কম্যুনিজম মতবাদ প্রসারিত হইতেছে; এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। তাই আমেরিকার ঘরে-বাহিরে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সামগ্রিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চলিতেছে।

বৃটিশ সিভিল সার্ভিসে যাহাতে কম্যুনিজম প্রবেশ করিতে না পারে, বৃটেনে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদে গত ২০শে মে কম্যুনিষ্ট কনট্রোল বিল পাশ হইয়াছে। এই বিলের পক্ষে হইয়াছে ৩১৯ ভোট এবং বিপক্ষে হইয়াছিল ৫৮ ভোট। অতঃপর মার্কিণ সিনেটে এই বিলের আলোচনা হইবে। এই বিলের বিধান অনুযায়ী যদি কেহ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে টোটেলিটেরিয়ান একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে বা আন্দোলনে কোনরূপ সাহায্য করে বা ঐরূপ ষড়যন্ত্র বা আন্দোলন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে এবং তাহার নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লইতে পারা যাইবে। কোন কম্যুনিষ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী চাকুরীও পাইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিজম নিরোধের এই ব্যবস্থার সঙ্গে সামরিক শক্তিবৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত ২রা জুন (১৯৪৮) সৈন্য বিভাগ এবং বিমান বিভাগের জন্য ৬৫০,৯৯,৩৯,০০০ ডলার বরাদ্দ করিয়া প্রতিনিধি-পরিষদে এক বিল পাশ হইয়াছে। অতঃপর এই বিল লইয়া সিনেটে আলোচনা চলিবে। নৌবিভাগের জন্য ৩৬৮,৬৭,৩৩,২৫০ ডলার বরাদ্দ করিয়াও এক বিল উত্থাপিত আছে। সুতরাং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের

জন্ত মোট ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০১১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭২ হাজার ২৫০ ডলার। শান্তির সময়ে সামরিক বিভাগের জন্ত এত অধিক ব্যয়-বরাদ্দ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আর কখনও করা হয় নাই।

রাশিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। আমেরিকার নিরাপত্তার পক্ষে রাশিয়া ভীতিজনক ভাবে বিপজ্জনক (alarming menace) হইতে পারে, এই সরকারী সতর্ক-বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই হাউস এপ্রোপ্রিয়েসান কমিটি এইরূপ বরাদ্দ করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বিভাগের প্রধান কর্ত্তা এই কমিটিকে জানাইয়াছেন যে, রাশিয়ায় সশস্ত্র সৈন্তের সংখ্যা ৪০,০০,০০০ এবং ১৪,০০০টি বিমান আছে। এই সামরিক শক্তি লইয়া রাশিয়া ইউরোপের অধিকাংশ, নিকট ও মধ্য-প্রাচ্য, কোরিয়া, এমন কি চীন পর্য্যন্ত দখল করিতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে বরাদ্দ করিয়াছে তাহাতে, স্থলসৈন্তের সংখ্যা ৭,১০,০০০, নৌ-সৈন্ত ৫,৫২,০০০ এবং বিমান-সৈন্ত ৪,৪৪,৫০০ জন হইবে। রাশিয়া ও কম্যুনিজম নিরোধের জন্ত নিজের দেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই ভাবে ব্যাপক আয়োজন করিতেছে।

ডাক্তার বেনেসের পদত্যাগ—

প্রাগ হইতে প্রেরিত ৭ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, চেকোস্লো-ভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডক্টর বেনেস মন্ত্রিসভার নিকট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা মন্ত্রিসভার উপর অর্পিত হইয়াছে। তাঁহার দুর্ব্বল স্বাস্থ্য এবং সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমস্যা সমূহই পদত্যাগের কারণ বলিয়া তাঁহার পদত্যাগ-পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। পদত্যাগ-পত্রে তিনি তাঁহার দেশবাসীর প্রতি এক বাণীতে বলিয়াছেন, "অপরকে স্বাধীনতা দিয়া এবং নিজেরা স্বাধীনতা ভোগ করিয়া সকলকেই সহিষ্ণুতা, প্রীতি এবং ক্ষমার-ভিত্তিতে বাঁচিতে ও কাজ করিতে দেওয়া হউক।" তাঁহার পদত্যাগের প্রকৃত কারণ কবে প্রকাশিত হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। কোন কোন সংবাদে তাঁহাকে কার্য্যতঃ বন্দী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

টমাস মাসারিকের সহযোগিতায় ডাঃ বেনেস ১৯১৮ সালে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মধ্য হইতে চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তির পর তিনি পদত্যাগ করেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যান। নির্ব্বাসিত চেক গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্টরূপে ১৯৪০ সালে তিনি লণ্ডনে গমন করেন। যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায়ই চেক্-প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি মস্কো গিয়াছিলেন। চেকোস্লোভাকিয়া নাৎসী কবল-মুক্ত হওয়ার পর তাঁহার প্রেসিডেণ্ট-পদ বহাল রাখা হয় এবং ১৯৪৫ সালের ১০ই মে তিনি প্রাগে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ডাঃ বেনেস না কি পদত্যাগের পূর্ব্বে নূতন শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। গত ৯ই মে জাতীয় পারিষদে এই শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়।

ট্রটস্কীপন্থীদের সম্মেলন—

গত মে মাসের মধ্যভাগে প্যারী নগরীতে ট্রটস্কীপন্থীদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন গোপনে আসিয়াছিলেন, তেমনি সম্মেলনের পর গোপনেই দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন গোপনভাবে গভীর অন্তরালে তাঁহাদের সংগ্রাম পরিচালনের জন্ত। আমেরিকা ও রাশিয়ার আওতায় যে সকল দেশ আছে, সেই সকল দেশ হইতেও প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। যুদ্ধ এবং নির্য্যাতনের ফলে ট্রটস্কীপন্থীদের সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। কি জাতীয়তাবাদী, কি কম্যুনিষ্ট, সকলেরই নিপীড়ন-হস্ত ইহাদের উপর উত্তোলিত হইয়াছে। যে সকল প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সিংহল পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ কলভিন ডি সিলভা এবং গ্রেট বৃটেনের বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী মিঃ জক হাষ্টন অন্যতম।

ট্রটস্কীপন্থীদের এই সম্মেলনে বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করা হইয়াছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বলা হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদীরা সরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আরব-ইহুদীদের মধ্যে মিলনের আশা নাই। ভারত সম্বন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে, স্বাধীনতার কথা না বলাই ভাল। ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদের সহযোগিতায় বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসন হইতে পরোক্ষ শাসন-প্রতিষ্ঠার জন্ত 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইহা এক বিরাট চাল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে শীঘ্র সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। আমেরিকা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে রাশিয়াকে আক্রমণের জন্ত পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে আমেরিকা সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছে। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে, ফ্রান্স ও ইটালীতে শক্তিশালী ষ্ট্যালিনপন্থী দল থাকিতে ইউরোপে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ করা সহজ হইবে না। রাশিয়া সম্বন্ধে ট্রটস্কীপন্থীরা বলিয়াছেন যে, হঠাৎ গজান আমলাতন্ত্র এবং ষ্ট্যালিনপন্থী ডিকটেটরশিপ নিষ্ঠুরতায় নাৎসীদের মত হইলেও রাশিয়া শ্রমিক-রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ হইতে উহাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। ওয়ালেসের আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, শ্রমিক-অভ্যুদয়ে ভীত মার্কিণ বুর্জ্জোয়াদের উহা একটা চাল মাত্র। ট্রটস্কীপন্থীরা তাঁহাদের নীতিগুলিকে না কি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবেন। ঐ পুস্তকের নাম রাখা হইবে, 'Manifesto Addressed to the Exploited Workers of the World' অর্থাৎ বিশ্বের শোষিত শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে ফাস্তোয়া।'

ভিয়েটনামে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট—

ভিয়েটনামের জন্ত অস্থায়ী জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে সমর্থ হওয়ায় ইন্দোচীনে ফরাসী ভেদনীতি সাফল্য লাভ করিয়াছে। গত ৫ই জুন (১৯৪৮) ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এই অস্থায়ী জাতীয়তাবাদী ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্টের সহিত এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। ফ্রান্সের পক্ষ হইতে ইন্দোচীনের ফরাসী হাই-কমিশনার মঃ এমিল বোলার্ট এবং ভিয়েটনামের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আনামের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট বাওদাই এবং অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল সুয়ান এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই চুক্তিতে ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে ভিয়েটনামের স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে।

ফ্রান্স সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা হো-চি-মিনের নেতৃত্বে পরিচালিত ভিয়েটনাম রিপাবলিককে ধ্বংস করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

দশ হাজার নাৎসী জার্ম্মাণ সৈন্য ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াও আনামে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। কয়েকটি বড় বড় সহর ছাড়া সমগ্র আনামে ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্রের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠ রহিয়াছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের জুলাই হইতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অস্থায়ী ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আনামের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট বাওদাইয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাও দাইকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই হয়ত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, কিন্তু সম্মুখে এক্ষণে বহু প্রবল বাধা রহিয়াছে। হো-চি-মিনের ভিয়েটনাম রিপাবলিক দুর্ব্বল নয়। শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের সহযোগিতাও তাহারা পাইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্রকে এখন এক দিকে ফ্রান্স আর এক দিকে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভিয়েটনামে গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ।

ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ—

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থানকে আজও দমন করিতে পারেন নাই। গৃহযুদ্ধ নিরোধ করিবার জন্ত ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু মে মাসের (১৯৪৮) শেষ ভাগে এক বামপন্থী ঐক্যের পরিকল্পনা উত্থাপন করেন। এই পরিকল্পনাটি বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত 'পিপ্‌লস্‌ ভলান্টিয়ার অর্গেনিজেশনে'র এক বিশেষ সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। কিন্তু ২৭শে মে তারিখে এই সম্মেলন একমত হইয়া এই বামপন্থী ঐক্য-পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৭) এই প্রতিষ্ঠানটি মার্কসিষ্ট লীগ গঠনের পরিকল্পনাও অগ্রাহ্য করিয়াছিল। মার্কসিষ্ট লীগ গঠনের পরিকল্পনা এবং বামপন্থী ঐক্যের পরিকল্পনার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত পরিকল্পনায় গৃহবিবাদ-বিরোধী কম্যুনিষ্টদিগকেও এই বামপন্থী ঐক্য গঠনে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। বামপন্থী ঐক্যের পরিবর্ত্তে পি-ভি-ও যে পাল্টা প্রস্তাব করিয়াছে তাহাতে, অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি এবং গবর্ণমেণ্ট ও বিদ্রোহী নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার দাবী করা হইয়াছে। থাকিন নু যে-সকল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বামপন্থী ঐক্যের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা এখানে মোটামুটী উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহার প্রস্তাবিত সম্মিলিত দলের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখযোগ্য : (১) রাশিয়া এবং পূর্ব্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন, (২) শিল্প সমূহকে জাতীয়করণ, (৩) আমদানী রপ্তানীর ব্যবসাকে সোশ্যালাইজড্‌ করা, (৪) আর্থিক ও দেশরক্ষা ব্যাপারে বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান, (৫) সৈন্যবাহিনীকে জনগণের গণতন্ত্রী বাহিনীতে পরিণত করা, (৬) সীমান্ত অঞ্চলে জনপ্রিয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলা অসম্ভব। আগামী ২০শে জুলাই থাকিন নু প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিবেন। হয়ত তিনিই আবার প্রধান মন্ত্রী হইতে পারেন। কিন্তু চীন, কোরিয়া এবং গ্রীসে যে জনযুদ্ধ চলিতেছে, ব্রহ্মদেশের সংঘর্ষ তাহা হইতে ভিন্ন নয়।

ইন্দোনেশিয়া—

ইন্দোনেশিয়ায় প্রেরিত জাতিপুঞ্জের শুভেচ্ছা কমিটি তাঁহাদের দ্বিতীয় রিপোর্টে (নিউ ইয়র্ক হইতে ২১শে মে তারিখের সংবাদ) বলিয়াছেন যে, ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র এবং ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়গুলির মীমাংসার কাজ ভাল ভাবেই চলিতেছে। কিন্তু উহার পর যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অবস্থা অন্যরূপ বলিয়াই মনে হয়। গত ২রা জুন জোগজাকার্ত্তায় যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে সঙ্কট পূর্ণ আলোচনা (crisis talks) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আমাদের এই মন্তব্য লিখিবার সময় পর্য্যন্ত এই আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের সর্ত্ত দুইটি—(১) মন্ত্রিসভায় প্রজাতন্ত্রের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে, (২) সার্ব্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত আইন প্রণয়নে এই যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু পূর্ব্ব-ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ-তাঁবেদার রাষ্ট্রের বাণ্ডোয়েং-এ ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্ত যে সম্মেলন আহ্বান করেন, তাহাতে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে ইচ্ছা করিয়াই বাদ দেওয়া হয়। রেনভাইল চুক্তিতে গণভোটের যে সর্ত্ত আছে ডাচ কর্তৃপক্ষ তাহা বানচাল করিতে চেষ্টা করিতেছেন। রাশিয়ার সহিত ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, ডাচ কর্তৃপক্ষ তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। ডাচ কর্তৃপক্ষ দাবী করিয়াছেন যে, গত জানুয়ারী মাসের চুক্তিতে পররাষ্ট্র-নীতি ডাচ কর্তৃপক্ষের হাতে ছাড়িয়া দিতে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র রাজী হইয়াছেন। কিন্তু প্রজাতন্ত্র এই দাবী অস্বীকার করিয়াছেন।

হাওড়া ষ্টেশনে মহাসভা-নেতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ীর সম্বর্দ্ধনা। দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, আশুতোষ লাহিড়ী, ভবানীতোষ ঘটক, মাখনলাল বিশ্বাস প্রভৃতিকে ছবিতে দেখা যাইতেছে।

[২৪৪ পৃষ্ঠার পর]

আসে, গিরীন ভোরেই আপিস থেকে যথারীতি বেরিয়েছে। বিশেষ কাজে তার কোথাও যাওয়ার খবর কেউ জানে না।

সরস্বতী বলে, তবে তো ভাবনার কথা হল!

উষা বলে, আপনার উনি তো এ রকম খবর না দিয়ে কোথাও যান না দিদি?

উষা প্রণবের পিসতুতো বোন। মুসলিম সদর কেল্লা পার্ক সার্কাস থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে। সর্ব্বস্ব ফেলে সবাই মিলে শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে, উষার তাই যেমন রাগ যত বিদ্বেষ, তেমনি ভয়। যখন তখন সে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে গলা ছেড়ে অভিশাপ দিতে সুরু করে, কোন একটা বা দশটা বিশেষ মানুষকে নয়, একটা সম্প্রদায়ের নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্বকে। অভিশাপ দিতে দিতে সে কাঁদে, কাঁদতে কাঁদতে অভিশাপ দেয়। প্রণব এক দিন তাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে তাদের মত অনেকে এ অঞ্চল থেকেও তার ছেড়ে আসা এলাকায় পালিয়েছে, শুধু সম্পত্তি নয় আপন-জনের প্রাণও রেখে গেছে। উষা বোঝেনি। বুঝবার কথাও নয় তার। প্রণবও আর চেষ্টা করেনি; শুধু বলেছে, কয়েক কোটি লোককে শাপ দিয়ে কি করবি? কারো গায়ে লাগবে না। তার চেয়ে নাম ধরে গাল দে, মনে শান্তি পাবি। প্রণব কয়েকটা নাম-করা নাম তাকে শুনিয়ে দেন। সাম্প্রদায়িক নাম, সাম্রাজ্যের কর্ণধারের নাম।

উষা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, সায়েবদের শাপ দেব কেন? ওরা আমার কি করেছে!

মণি এ আলাপ শোনেনি, তখনো সে এ বাড়ীতে আসেনি। শুনলে হয় তো উষার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে খুসী হত। ইতিহাস বা রাজনীতি কোনটা নিয়ে কোন দিন মাথা না ঘামালেও এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে ইংরাজের দায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণ চলতি জ্ঞানটুকু তার ছিল।

ভূপেন ভোরে স্নান করে কাজে বেরিয়ে যায়, দুপুরে খেতে আসে। খেয়ে উঠে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করে আবার বেরোয়, ফেরে সন্ধ্যা নাগাদ। অনাত্মীয় প্রৌঢ় বয়সী সাদাসিদে নিরীহ মানুষ, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, অল্প কথার মিষ্টি মানুষ। খাই-খরচা দিয়ে বছরখানেক এ বাড়ীতে আছে, বৈঠকখানায় একটি তক্তপোষে শোয়। ভিড় হওয়ার পরেও এ বাড়ীতে শুধু তার শোয়ার ব্যবস্থা অবিকল রয়ে গেছে, কারণ, তক্তপোষটি তার মাত্র হাত দুই চওড়া, প্রায় একটি বেঞ্চের মত, এক জনের বেশী দু'জনের শোবার উপায় নেই।

বৈঠকখানায় প্রণবের বাবা অনুকূল ও বাড়ীর আরও তিন জন পুরুষ গিরীনের সম্পর্কে জল্পনা করে উদ্বেগ প্রকাশ করছিল, জামা খুলতে খুলতে ব্যাপার জেনে ভূপেন আবার বোতাম এঁটে বেরিয়ে যায়। পনের মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে জানায় যে গিরীনের খবর পাওয়া গেছে। মারাত্মক আহত এক বন্ধুর সঙ্গে সে হাসপাতালে গেছে। নিজে সুস্থ এবং অক্ষত আছে গিরীন।

লালবাজার ও হাসপাতালে ফোন করার কথা খেয়াল হয়নি বলে গোকুল লজ্জা বোধ করে।

খবর শুনে নীলিমা এসে শুধায়, কোন্ বন্ধু, নাম শুনছেন?

মনসুর।

কবি মনসুর? ইস্!

মণি একটু অবাক হয়ে তাকায় নীলিমার দিকে। তার মামার মৃত্যু-সংবাদ নীলিমা নীরবে শুনেছিল। তবে তার মামা নীলিমার অচেনা, কবিটি তার চেনা লোক।

উষা কাছে ছিল। সে বলে, মোসলা? ঠিক হয়েছে।

তার পর হঠাৎ সে আশ্চর্য্য হয়ে বলে, আপনার উনির মোসলা বন্ধু দিদি? এটা কি রকম কথা হল?

সে আমারও বন্ধু ভাই।

শুনে উষার মুখ একটু হাঁ হয়ে যায়।

তিনটে নাগাদ গিরীন ফেরে, তার কাছে ব্যাপারটা জানা যায়। সহরের ব্যাপক ও স্থায়ী দুর্ঘটনারই আনুষঙ্গিক ব্যাপার, মানুষটা অন্তরঙ্গ এবং গিরীনের চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটেছে এই শুধু বিশেষত্ব। একটু অবিবেচনার পরিচয়ও হয় তো গিরীন দিয়েছে। তা ছাড়া মনসুরের মত মানুষ, মত পথ বা আদর্শ হিসাবে যার ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতায় উপরে ওঠার মহৎ প্রচেষ্টা ছিল না, আপনা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই ও-সব বিশ্বাস ও সংস্কার তার মোটামুটি খসে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে নানা স্থানে নানা জাত ধর্ম্মের মানুষের ঘনিষ্ঠতায় বড় হয়ে তার হৃদয়-মন বিশেষ একটা গড়ন পেয়েছে। নিজেই সে জানে না সে নাস্তিক কি না, তার কথাবার্ত্তা চাল-চলন খাপছাড়া কি না, তার মানবতা-বোধ আছে কি না,—ও নিয়ে কখনো মাথাও ঘামায়নি। কবি হিসাবে নজরুলের আধুনিক সংস্করণ হবার চেষ্টাটা তার আন্তরিক, বোধ হয় সেই জন্যই তার কবিতায় সরলতা এবং জটিলতার চরম সমাবেশ ঘটে, একটা লাইন হয় গ্রাম্য ছড়া এবং পরের লাইন শব্দার্থক ধাঁধাকে ছাড়িয়ে যায়, কবিতা ভাল হয় না। তাতেও মনসুরের যেন দুঃখ নেই। গিরীন সব চেয়ে বেশী তার কবিতার নিন্দা করে, নিন্দার সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সে অফুরন্ত হাসি হেসে যায়, যেন উপভোগ করছে অসংযত ঘরোয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা।

নীলিমা হেন নারী, তারও মায়া হয়েছে। বাধা দিয়ে বলেছে, থামো তুমি। ছাই কবিতা লিখছে সবাই, মাথা নেই মুণ্ডু নেই। ওর কবিতার তবু দু'-চার লাইন বোঝা যায়।

সকালের আপিসের ভ্যান থেকে এসপ্লেনেডে নেমে তার সঙ্গে গিরীনের দেখা হয়। আজকাল ভোরে গিরীন একটু ক্লান্তি বোধ করে, মনটা ভাল থাকে না। চারি দিক থেকে যে সব উত্তেজনাকর খবর এসে জমা হতে থাকে পরদিন পরিবেশনের জন্য তার একটা দুর্বিসহ বিষণ্ণতার দিক আছে, রাত্রে সেটা টের পাওয়া যায় না। সকালে একটা শারীরিক গ্লানির মত, মাথা ধরে থাকার মত, নিরানন্দ কষ্টকর

ভাবটা অনুভব করা যায়। সারা রাত্রি যেন ভয়ানক ভয়ানক দুঃস্বপ্নের চাপে ঘুম হয়নি। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সংবাদগুলি কেটে-ছেঁটে চেলে নিতে নিতে প্রতিদিন যে সমগ্র তাৎপর্য্য পায় তা শুধু অশুভ ইঙ্গিতের, মারাত্মক সম্ভাবনার। সহজে সর্ব্বনাশা দাঙ্গার আগুন নিভবে, সহজে দেশজোড়া বিক্ষোভের মীমাংসা হবে, কল্পনা করাও অসাধ্য হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। দেখা-সাক্ষাতে কিছু দিন ছেদ পড়েছিল, দু'জনেই খুশী হয়। মনসুর তাকে চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে গিয়ে চা ও খাওয়ায়, একটা কবিতাও শুনিয়ে দেয়।

নতুন কবিতা? নীলিমা জিজ্ঞাসা করে।

কাল লিখেছে।

কবিতার আরম্ভটা মনে আছে গিরীনের: শত সংঘাতে টুটিবে না ভালবাসা, ভাষা যে রে একাকার! কবিতা পড়ে চিরদিনের মত সাগ্রহে মনসুর জিজ্ঞাসা করেছে, কেমন লাগল? এবং চিরদিনের মতই হাসিমুখে নিন্দা শুনেছে। ফকিরচাঁদ লেনে 'কালের কথা' মাসিক পত্রের আপিস, সম্পাদক কেদারনাথের বাড়ীরই বৈঠকখানায়—কবিতাটি সেখানে পৌঁছে দিতে বার হয়েছে মনসুর।

ডাকে পাঠিয়ে দিও। নিজে নাই বা গেলে?

কি হবে? আমি কাকে ডরাই! আমার কেউ শত্রু নেই।

এগুলি কবির কথা। আসলে অনেক দিন যাওয়া হয়নি, কেদারের ওখানে গিয়ে আড্ডা দেবার জন্য মনসুরের প্রাণ আনচান করছিল। গিরীনের প্রাণটাও হঠাৎ কেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেদারের ওখানে কেন, বহু দিন সেও দশ মিনিটের জন্য বাড়ীর বাইরে কোথাও আড্ডা দেয়নি। আকাশে মেঘ নেই, এই সকালেই চনচনে রোদ উঠেছে, এতক্ষণে চৌরঙ্গীর এদিকটা যান-মানুষের সরগরমে জীবন্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করার কথা। মাঝ-রাত্রি পর্য্যন্ত যেখানটা গাড়ী-মানুষে গমগম করত, সন্ধ্যা হতে না হতে আজকাল যে সেখানটা জনবিরল হয়ে আসে, সকালেও যেন তার জের চলছে, ভয়ে সঙ্কোচে অনিচ্ছায় আস্তে আস্তে আংশিক প্রাণ পাচ্ছে। ট্রাম-বাস অর্দ্ধেক খালি। তার জীবনেও এই ছোঁয়াচ লেগেছে। আপিসে যায়, সেখানেই ঘুমায়, সকালে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে, সারা দিন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে গতিবিধি মেলামেশা।

চল কবি, আমিও যাব।

কাছাকাছি আশেপাশে হাঙ্গামা হয়েছে গিরীন জানত, ফকিরচাঁদ লেন থেকে কোন গোলমালের খবর পাওয়া যায়নি। গুরুতর কিছু ঘটে থাকলে গিরীন জানতে পারত। আর যদি ঘটেই থাকে তাতেই বা কি? মানুষ কি শুধু আশঙ্কের হিসাব কষেই দিন কাটাবে। বিশ্রী হতাশা আর ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় গিরীনেরও অদ্ভুত একটা বেপরোয়া ভাব এসেছিল।

এদিকে ফকিরচাঁদ লেনেই রাত তিনটেয় ঘটে গিয়েছিল বীভৎস বিপর্য্যয়, খবর হয়ে খবরের কাগজের আপিসেও পৌঁছতে পারেনি সকাল পর্য্যন্ত। সে ঘটনার সঠিক বর্ণনা হয় না, ভাষায় তার রূপায়ণ নেই। পাশের এক পাড়া থেকে এসেছিল সংগঠিত আক্রমণ, অন্ধকারের সেই গোপন অভিযানের সেনাপতি ছিল এই এলাকার ছত্রপতি কলকাতার এক বিখ্যাত গুণ্ডারাজ। সশস্ত্র দল বল দিয়ে উন্মাদ জনতাকে হত্যা ও লুঠপাটে পরিচালনা করার এমন সুযোগ তার জীবনে কেন, তার পূর্ব্ববর্ত্তী নাম-করা ফারুক সর্দ্দারের একষট্টি বছর বয়স পর্য্যন্ত একচেটিয়া স্বরাট্ গুণ্ডামির জীবনেও কখনো আসেনি। ফকিরচাঁদ লেনের দুরন্ত প্রতিহিংসায় পুড়ে যাচ্ছিল। কতগুলি বাড়ী থেকে বারংবার টেলিফোন করে পুলিস বা ফৌজ আনান যায়নি। কথা বলতে বলতে ফকিরচাঁদ লেনে খানিক এগিয়ে গিরীন হঠাৎ অস্বাভাবিকতার আঁচ করেছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, চল, ফিরে যাই। অবস্থা সুবিধে নয়।

মনসুর রাত জেগে কবিতা লিখেছে, সে তখন সব কিছুর ঊর্দ্ধে।

—তুমি তো বড় ভীরু?

তার পর ফকিরচাঁদ লেনের বিক্ষোভ ডজনখানেক যুবকের মারফতে কবির উপর আছড়ে পড়েছিল। মনসুরের পরনে ছিল পায়জামা!

পায়জামা? মনসুর সত্যি পাগল!

পাগল ছাড়া কি। ধুতি-পায়জামা-প্যান্টালুন ইতি-মধ্যেই সহরের দাঙ্গা সম্পর্কে মর্মান্তিক রসিকতার মর্য্যাদা পেয়েছে। মানুষের গায়ে তো আর লেখা থাকে না তার ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়। কালা দেশের কালো মানুষদের চেহারা প্রদেশে প্রদেশে একই রকম। পোষাক ছাড়া চেনাই দায় হিন্দু কি মুসলমান—যদি না বিশেষ ভাবে চেনাবার জন্যই দাড়ি-গোঁপ ছাঁটাই করা হয়ে থাকে। কোট-প্যান্ট-টাই-হ্যাটের নিরাপত্তা দাঙ্গার এক মাসের মধ্যে জানা হয়ে গেছে। ট্রাউজার পরে সাহেব সেজে না কি যে কোন সময়, সহরের যে কোন এলাকায় গিয়ে নিরাপদে পাক দিয়ে বেড়ানো যায়, উদ্যত ছোরার পাশ কাটিয়ে!

পায়জামা পরার জন্যই প্রাণটা যেত মনসুরের। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা গিরীন যদি না হঠাৎ দিশেহারার মত গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে সুরু করত, এঁকে মারবেন না, ইনি কবি—ইনি কবি!

আপনি কে মশাই?

আমার নাম গিরীন রায়। আমি বই লিখি, ইনিও বই লেখেন। এঁর নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়।

এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রব ওঠে: ছেড়ে দাও। পাঁচ-সাতটি ছেলের গলা, তারা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, কিছুই করার ছিল না তাদের। প্রাণটা রয়ে গেল কবির, চেঁচামেচি বিশৃঙ্খলার মধ্যে ওই ছেলে ক'জন একটা গাড়ী যোগাড় করে এনে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করল।

বাঁচবে তো ?

হয়তো বাঁচবে। ঠিক নেই।

এতক্ষণ পরে নীলিমা প্রথম জিজ্ঞাসা করে, তোমার কিছু হয়নি তো ?

এক ঘা ডাণ্ডা খেয়েছি।

বাঁ হাতটা প্রায় অবশ, টনটনে ব্যথা। মণি এতক্ষণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। গিরীনের মুখে যাতনার ছাপটা সবখানি কবি মনসুরের জন্য তার বেদনাবোধের প্রমাণ বলে ধরে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। এ রকম বন্ধুত্ব কল্পনা করতে গেলে তার অনেক বিষয়েই মুস্কিলের সীমা থাকে না।

সন্ধ্যার সময় এক খাপছাড়া ব্যাপার ঘটে। চাল-আটা কম পড়েছে এবেলা, মেয়েরা আলোচনা করছিল কি ব্যবস্থা করা যায়। কিছু চোরাবাজারী চাল এনে রেশনের ঘাঁটতি পূরণের কথা ছিল গিরীনের, চাল সে আজ আনতে পারেনি। আচমকা একটি মেয়ে আসে এ বাড়ীতে, তার চোখ দু'টি আশ্চর্য্য সুন্দর। তাদের মত তাদেরি ধরণে শাড়ী-ব্লাউজ পরা, আলগা খোঁপা এবং মাথায় পিছনে আঁচল ঠেকানো ঘোমটা। শুধু সিঁথিটা সাদা। নীলিমা তাকে বিস্ময় দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়, রশৌনা! তুমি এখানে ?

তার নাম শুনে মণিরা থ' বনে থাকে। রশৌনার চোখ-মুখের কাঠিন্য সুস্পষ্ট, নরম গাল পাতলা ঠোঁটের আড়ালে সে যেন দাঁতে দাঁতে কামড়ে আছে।

তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এলাম।—রশৌনা বলে।

হাসপাতালে গিয়েছিলে ভাই ? সরস্বতী তার মোলায়েম গলায় শুধায়।

সেখান থেকেই আসছি।

নীলিমার মুখে উদ্বেগের ছাপ পড়ে।—কি হয়েছে ? ব্যাপার কি ? কবি ভাল আছে তো ?

সরম লাগল না জিগ্যেস করতে ? গলায় আটকালো না ?—আবেগে ফেটে পড়ে রশৌনা, তীব্রতায় তীক্ষ্ণতায় চমকপ্রদ মনে হয় তার জ্বালা আর ক্ষোভ—ফন্দি করে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মারলে,—কি হয়েছে, ব্যাপার কি, ভাল আছে তো! মা যে বলতো তোমাদের জাতটাকেই বিশ্বাস নেই, এমনি ক'রে তার প্রমাণ দিলে ? বন্ধুকে খুন করিয়ে ?

খুন করিয়ে ? নীলিমার চমক লাগে, কি বলছিস তুই ? তিনটের সময় ও দেখে এল—

তুই তুই করিস নে তুই আমাকে। তুই আমার বন্ধু নোস। তোরা খুনে, তোরা জাহান্নামে যাবি।

উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপে, এলোমেলো নিশ্বাস নেয় কিন্তু তার ঘৃণা-বিদ্বেষের তীব্রতা ভুল করার উপায় নেই, শুধু বেদনায় অভিমানে সে আত্মহারা হয়নি। নীলিমা তাকে ঘাঁটাতে না চেয়ে শুকনো সুরে সোজা প্রশ্ন করে, মনসুর মারা গেছে ?

মারতেই তো চেয়েছিলে, পারলে না বলেই তো জ্বলে-পুড়ে মরছ।

যাক, কবি তাহলে বেঁচেই আছে, শোকের ধাক্কায় মাথা খারাপ হয়ে রশৌনার এ পাগলামি নয়। ছেলেবেলা থেকে স্কুলে তারা একসাথে পড়েছে, ভাব তাদের আজকের নয়, তাদের সখিত্বের ভিত্তিতেই গিরীন আর মনসুরের পরিচয়, বন্ধুত্ব। আচমকা এ ভাবে এসে রশৌনা এ রকম আবোল-তাবোল কথা বলতে সুরু করায় মনে মনে নীলিমা চরম দুর্ঘটনাটাই ঘটেছে বলে ধরে নিয়েছিল। সেটা সত্য নয় জেনে নীলিমা যে কি ভরসা পেল !

রশৌনা সহজেই আবেগ সামলে নেয়। সে সত্যই মনগড়া অভিমানে কাতর হয়ে নালিশ জানাতে আসেনি, রাগের জ্বালা সইতে না পেরে অসময়ে এত দূরে ঝগড়া করতে এসেছে। তার পরের কথা ব্যবহারে সেটা আরও স্পষ্ট হয়। নীলিমা তাকে বসতে বলে, জানতে চায় তাদের দোষটা কি — যে জন্য এত জ্বালা হয়েছে রশৌনার। রশৌনা বলে সে বসতে আসেনি, কেন তারা এমন কুৎসিত এমন জঘন্য কাজ করেছে তার কৈফিয়ৎ চাইতেও আসেনি। সে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এসেছে, জানিয়ে দিতে এসেছে আজ থেকে সেও তাদের শত্রু, তাদের সর্ব্বনাশ করা আজ থেকে তার পণ।

তোমরা কাফের, তোমরা পারো মুখোস পরে বন্ধুকে ভুলিয়ে প্রাণে মারতে, আমরা পারি না। আমরা জানিয়ে শত্রুতা করি। তাই বলতে এসেছি, পরে যেন দোষ দিও না বন্ধু সেজে ক্ষতি করেছি।

এ সব কথা মাথা বিগড়ে যাবার লক্ষণ, কিন্তু এ হল্কা যে সত্য সত্যই মনে লাগানো আগুন থেকে আসছে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা আছে রশৌনার পাগলামির পিছনে। নীলিমা কি বলবে ভেবে পায় না। এক দিনে এক কথায় তাদের এত দিনের বন্ধুত্ব বাতিল হয়েছে মেনে নেবার অভিনয় করাটাও তার কাছে হাস্যকর মনে হয়।

বন্ধুর মতই সে তাই বলে, কার কাছে আবোল-তাবোল কি শুনেছিস, ব্যাপার তুই কিছুই জানিস না রশৌনা।

যার জান নিয়ে ব্যাপার, তার কাছেই শুনেছি।

কবি বলেছে ? কবি বলেছে ওকে ভুলিয়ে—?

বলবে না ? তোমরা সয়তান, তোমরা ধাপ্পা দিয়ে জানে মারবার চেষ্টা করবে—

শুকনো চোখ রশৌনা দু'বার রগড়ে দেয়। তার সুন্দর চোখ দু'টি একটু লাল ও কর্কশ হয়ে আরও অপরূপ হয়েছে।

দাঁড়া, ওকে ডাকি। নীলিমা বলে।

ডাকো না, ডাকো। রশৌনা বেপরোয়া ভাবে বলে।

হাতের ব্যথায় গিরীন একটু কাতরাচ্ছিল, ব্যাপার শুনে সে কাতরানি ভুলে যায়। চিন্তিত হয়ে বলে, যা বলে বলুক মেনে নিও, তর্ক কোরো না, ঘাঁটিও না। সঙ্গে কেউ আসেনি ? কি মুস্কিল !

গিরীনকে দেখে গ্রীবা তুলে যে ঘৃণা ও হিংসার দৃষ্টিতে

যে ভঙ্গিতে রশৌনা তাকায় তাতে আপাতত তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করার কথা গিরীন ভাবতেও পারে না।

আপনার কিছু বলার আছে?

কিছু না। ডাণ্ডা খেয়ে আমার অবস্থাও একটু কাহিল।

এ কথাটা গিরীন না বললেই পারত।

ও-সব চালাকি জানি।

গিরীন একটু নীরব থেকে বলে, কবির জ্বর বেড়েছে?

আপনার জেনে দরকার?

গিরীন শান্ত সুরেই বলে, চলুন না কাল একসঙ্গে দেখতে যাই? নীলিমাও যাবে।

রশৌনার চোখে ছুরির ধার ঝলকে ওঠে, ওঁর ধারে কাছে আপনারা কেউ গেছেন যদি শুনি, পরের বার ছোরা নিয়ে আসব।

গিরীন ও নীলিমা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে। সরস্বতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সে বলে, রাত হলে ফিরতে অসুবিধা হবে ভাই।

ঝেঁঝে উঠে কি একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে রশৌনা চেপে যায়। মুখে কথার বদলে তার দু'চোখে জল নামে। দেখে আবার আরেকটা স্বস্তি বোধ করে নীলিমা।

সরস্বতী বলে, এক জন এগিয়ে দিয়ে আসুক। তোমায় খাতির করে বলছি না। তুমি যেচে এসেছ, আমরা ডাকিনি। এক জনকে সঙ্গে যেতে দেওয়া তোমারি কর্ত্তব্য। মনে যাই থাক, অন্যায় কোরো না ভাই, হাত জোড় করে বলছি।

প্রণব বাবু আছেন?

এত দিনের বন্ধুরা শত্রু হয়ে গেছে কিন্তু শত্রুপুরীর প্রণবকে সঙ্গে যেতে দিতে তার আপত্তি নেই। প্রণবকে মণি আজ আমার নতুন করে চেনে।

প্রণব ফেরেনি। আমি যাই? সরস্বতী বলে।

না।

স্পষ্ট নিষেধ জানিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি ভাবে রশৌনা চলে যায়, তফাৎ থাকে এই যে এবার তাকে চোখের জল মুছে নিতে হয়। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, সহরের বর্ত্তমান অবস্থায় একা তাকে এ ভাবে যেতে দেওয়া অসম্ভব। এখানে অথবা মনসুরের ছোট ফ্ল্যাটটি যে এলাকায় সেখানে হাঙ্গামা নেই, কিন্তু দাঙ্গার সুযোগে গুণ্ডা-বদমায়েসরা সহরের নরক গুলজার করে রেখেছে। গোকুলকে তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে পাঠানো হয়। বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে রশৌনার ঠিক সঙ্গে সে যাবে না, একটু তফাতে থাকবে।

মণি সংশয় ভরে বলে, পাগল তো মনে হল না?

মনে খুব ঘা লেগেছে। কবির কিছু হলে ও সইতে পারে না।

ভাবতে ভাবতে নীলিমা গিরীনকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি যখন এলে কবির জ্ঞান হয়নি?

ভাল জ্ঞান হয়নি। এলোমেলো ভাবে চেতনা হচ্ছিল, আবার ঝিমিয়ে যাচ্ছিল।

কি এমন বলল যে রশৌনা ক্ষেপে গেল?

ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাল-আটার সমস্যাটা মুলতুবী ছিল। তাকে তুলে রেখে এক বেলার জন্য ভুলে থাকার মতও নয় সমস্যাটা, এতগুলি লোক আজ রাত্রে খাবে কি?

মণি হঠাৎ বলে, আমার কাছে কিছু চাল আছে, দিচ্ছি।

তুমি চাল পেলে কোথা? তুমি যা সঙ্গে এনেছিলে সে তো খরচ হয়ে গেছে?

ভাল চাল তোলা আছে।

ছেঁড়া জামা-কাপড়ের ট্রাঙ্কে সের সাতেক সুগন্ধি আতপ তোলা ছিল, পায়েস-পোলাউ খাওয়ার দামী চাল, সচরাচর মেলা কঠিন। হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকে নীলিমা মাথা নাড়ে, না বাবা, প্রাণ ধরে এ চালের ভাত রেঁধে খেতে পারব না শাক-পাতা দিয়ে—তোমরা পারবে? ভাতের চাল আনা হোক, এ চাল দিয়ে কাল বরং ভোজ হবে।

ভূপেন পাড়ার যাদুগোপালের মুদী দোকান থেকে চোরা-বাজারের দরে দশ সের কাঁকরময় সাধারণ মোটা চাল নিয়ে আসে। মুদী দোকানের সঙ্গেই রেশনের দোকান, একই মালিক। পাড়ার ভিতরের দিকে বস্তির অনেকগুলি কার্ডের রেশন এ দোকান থেকে নেওয়া হয়, সব কার্ডের পুরো রেশন নেবার পয়সা কিছু মেয়ে-পুরুষের সব সপ্তাহে থাকে না, সহায়হীনা বুড়ীদের সংখ্যাই বেশী এর মধ্যে। তারা যে আটা-চাল ছেড়ে দেয় বাধ্য হয়ে, ওজনের কায়দায় এবং অন্য রকমে যা বাড়তি হয়, যাদুগোপাল সেটা চোরা দরে ছেড়ে দেয়।

প্রণব একটু বেশী রাত্রে বাড়ী ফেরে। মণির কাছে সে রশৌনার খবর শোনে, প্রতিদানে তার খবরটা সে কিন্তু বিশেষ করে মণিকে শোনায় না, খোলা ছাদে রাত্রের আড্ডায় সকলকে শোনায়। বিকালের দিকে একটা মিলিটারী লরী একটি ছেলেকে চাপা দেওয়ায় রাস্তার লোকে লরীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাচক্রে প্রণব সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, লরীটা তখন পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটু দাঁড়িয়ে দেখছিল, এই অপরাধে তাকে ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরেছে।

যেখানে যে হাঙ্গামা হোক, তোমার কি সেখানেই যাওয়া চাই ঠাকুরপো?

মণি একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে। তার জ্বালা হয়েছিল যে প্রণব এতক্ষণ তাকে এ কাহিনী শোনায়নি।

[ক্রমশঃ

জাতীয় সরকারের স্বরূপ

জনগণের দোহাই দিয়া জনপ্রিয় রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছেন কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব। কিন্তু জনগণকে দাবাইয়া রাখিয়া অথবা জেলে পুরিয়া গণরাষ্ট্র চলিতে পারে না, চলে সাম্রাজ্যবাদী রাজ্য। বিরোধিতা পার্টি ছাড়া কোন ডেমোক্র্যাটিক রাজ্য চলে না। নিজের দল ছাড়া অপর সকলকে দমন অথবা নিগৃহীত করা একদলীয় ফ্যাসিজমেরই নামান্তর। কোন জনপ্রিয় সরকার তাহা করেন না যতক্ষণ তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস ও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে। ভারতবর্ষে আজ যাহা চলিতেছে তাহাতে মনে হয়, হয় কর্ত্তারা নিজেদের শক্তি এবং জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ভীত হইয়াছেন অথবা বিদেশী কোন শক্তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে দেশবাসীকে যে সকল প্রতিশ্রুতি তাঁহারা দিয়াছিলেন তাহা প্রায় সবই ভঙ্গ করিয়াছেন। মার্কিণ এবং বৃটিশ চাপের জন্য কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের সমস্যার আজও সমাধান হইল না। ভারতের নিজস্ব স্বাধীন পলিসি সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়া আজ বিদেশী শক্তির আওতায় সম্পূর্ণরূপে গিয়া পড়িয়াছেন। জনগণের সহিত সংযোগ-সূত্র ছিন্ন করিয়াছেন, তাহাদের দমন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন অথচ বচনে জনগণের হাতে স্বর্গ তুলিয়া দিয়াছেন। দুই নৌকায় পা দিয়া চলা বিপজ্জনক। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া দেশবাসীকে ডেমোক্র্যাটিক বক্তৃতায় মুগ্ধ করা প্রবঞ্চনা মাত্র। ফলে ক্রমেই তাঁহারা দেশবাসীর বিশ্বাস ও আস্থা হারাইতেছেন। ইহাতে দেশের সর্ব্ব দিক দিয়া ক্ষতি হইতেছে। সরকারের বচনে ও কার্য্যে গরমিল থাকার জন্য দেশবাসী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। সরকার আজ বলিতেছেন এক কথা, কাল বলিতেছেন ঠিক তাহার বিপরীত আর এক কথা। বিভিন্ন সচিবের বিবৃতির মধ্যেও বিলক্ষণ গরমিল দেখা যাইতেছে। ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। আজিকার আশাপ্রদ কথায় বিশ্বাস করিয়া কেহ রিস্ক লইতে রাজী নয়, কারণ কালই হয় তো নিরাশার বাণী শুনিতে হইবে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ তাই ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত সরকার মতি স্থির করিয়া কোন পলিসি ডিক্লেয়ার না করিলে এবং দৃঢ়তার সহিত সেই পলিসির মত কার্য্য না করিলে দেশের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন। তাঁহারাও যাইবেন এবং সমগ্র দেশও ধ্বংস হইবে। শাসনের ভিত্তি দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে নিজের দেশে এবং বিদেশে সেই শাসক-গোষ্ঠী সম্মান ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে না। দেশপ্রেমিক হইলেও যে সুশাসনে পোক্ত হইবে এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা নাই।

খাদ্যশস্য পরিস্থিতি

খাদ্যশস্য-নীতি কমিটি শেষ রিপোর্টে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বার্ষিক এক কোটি টন বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন পাঁচ বৎসরের অধিক যেন না থাকে। কি করিয়া বৃদ্ধি করা হইবে তাহারও সুপারিশ আছে। বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করা, গভীর চাষ এবং আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির আবাদ।

বর্ত্তমানে যে সকল বহুমুখী পরিকল্পনা গঠিত হইয়াছে তাহাদের মোট সংখ্যা ২৫টি। সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করিতে লাগিবে দশ হইতে পনর বৎসর। আর খরচের কথা না বলাই ভাল। উহাদের দ্বারা ১ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইবে। ফলে ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বেশী উৎপন্ন হইবে। কিন্তু আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা যে সম্ভব নয় তাহা কমিটি স্বীকার করিয়াছেন। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে গভীর চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন আগামী পাঁচ বৎসরে ৩০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে। পতিত জমি আবাদ করিয়া ৩০ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাবে এক কোটি টন খাদ্যশস্যের হিসাব মিল দেওয়া হইয়াছে। কাগজে-কলমে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কতটা কি হইবে তাহা বলা শক্ত। বাণী ও সুপারিশ কণ্টকিত দেশে কার্য্যের বড়ই অভাব। তাহা ব্যতীত খরচের অর্থের কথা তো রহিয়াই গেল। আসিবে কোথা হইতে? গরীব দেশবাসীর পকেট হইতে নিশ্চয়ই? তাহার চোদ্দ আনা আত্ম ও আত্মীয় পোষণ এবং সরকারী ব্যয়ে চলিয়া যাইবে। লোক দেখাইবার জন্য দুই আনা কাজে লাগিবে। এক টাকা ব্যয় করিয়া দুই আনার কাজের জন্য দেশের লোকের লালায়িত হইবার কোন কারণ নাই।

কমিটির কথা মত পাঁচ বৎসরের পর তো আমরা হাতে স্বর্গ পাইব, কিন্তু এই পাঁচ বৎসর স্বর্গসাত ঠেকাইয়া রাখিব কি প্রকারে? এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের এক মজুত তহবিল গঠন করার এবং আমদানীর জন্য একটি স্বয়ং-চালিত কর্ত্তৃত্ব শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। খাদ্যশস্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্য্যন্ত বাহির হইতে আমদানী করিতেই হইবে। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটিবে কি?

বস্ত্র-সমস্যা

বস্ত্র-মূল্য সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত ট্যারিফ বোর্ড ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট তাঁহাদের যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহা না কি 'টপ সিক্রেট'। জনসাধারণের সমস্যা 'টপ সিক্রেট' হয় কি করিয়া তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঢোকে না। এক যদি জন সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া মিল-মালিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবার ইচ্ছা থাকে তবেই তাহা সম্ভব হয়। কাণা-ঘুষায় শুনা যাইতেছে যে, রিপোর্টে বস্ত্র-মূল্য বৃদ্ধির জন্য মিল-মালিকদেরই দায়ী করা হইয়াছে। তাঁহারাই কাপড়ের এক্স-মিল দর অত্যধিক ধার্য্য করিয়াছেন। এই সত্য জনসাধারণকে না জানিতে দেওয়াই বোধ হয় লুকোচুরির উদ্দেশ্য।

বস্ত্র-মূল্য বৃদ্ধির কারণ বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও বস্ত্রোৎপাদকদের মিলিত ষড়যন্ত্র। ভারত সরকার যে তাহাতে বিশেষ বাধা দিয়াছেন তাহা তো মনে হয় না। কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-প্রথা প্রত্যাহারের জন্ত কাপড়ের কলের মালিক ও কাপড়-ব্যবসায়ীদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত তাহারা বুঝাইয়াছিল যে, নিয়ন্ত্রণ-প্রথা তুলিলেই ন্যায্য মূল্যে জনসাধারণকে পর্য্যাপ্ত কাপড় বিক্রয় করা চলিবে। মহাত্মাজী তাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন—হাজার হোক, তাহারা তো এই দেশেরই উৎপাদক ও ব্যবসায়ী; বেশী লোভ কি দেখাইতে পারে? ফলে যাহা ঘটিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

কাপড়ের অতিলাভের ও অতিলোভের জন্ত জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। ভারত সরকার এলেন মালিক ও ব্যবসায়ীদের রক্ষা করিবার জন্ত। বলিলেন যে, এই মূল্যবৃদ্ধির জন্ত জনসাধারণই দায়ী। হ্যাংলামী করিয়া তাহারাই দাম বাড়াইয়াছে। যাহাই হোক, তাঁহারা ব্যাপারটা তদন্ত করিয়া একটা ন্যায্য মূল্য ধার্য্য করিবেন। ভার পড়িল ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ডের উপর। তদন্ত কালেই প্রকাশ পাইল যে, কাপড়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-প্রথা প্রত্যাহৃত হইবার পর এক শত দিনের মধ্যেই একমাত্র কাপড়ের মালিকরাই ৩০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে।

জনসাধারণ স্তম্ভিত হইল। সরকার তাড়াতাড়ি বলিলেন,—মা ভৈঃ; ওদের আমরা সায়েস্তা করিব। লাভ করিলে কি হয়, সে টাকা ওদের ভোগে আসিবে না। এমন ব্যবস্থা করিব যে সব লাভের টাকা আসিয়া পড়িবে সরকারী তোষাখানায়। তার পর তাহা ব্যয় হইবে জনহিতকর কার্য্যে। লোকরা আশ্বস্ত হইল। যাক্, পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে লেংটি পরিয়াও থাকা যায়। সরকার কার্য্যেও অগ্রসর হইলেন। কুখ্যাত টেক্সটাইল কন্‌ট্রোল বোর্ড ভাঙ্গিয়া দিবার সিদ্ধান্ত হইল। এই বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও বস্ত্রোৎপাদকদের প্রতিনিধি। বর্ত্তমানে বস্ত্র-মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত টেক্সটাইল এডভাইসরী কমিটি গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৪ জন সভ্যের মধ্যে ১১ জনই বিরাট শিল্পপতি। কাজেই এই কমিটি দ্বারা মূল্য যে কতটা কমিবে তাহা বলাই বাহুল্য। জনসাধারণের সুবিধার জন্ত এই কমিটি গঠিত হয় নাই, হইয়াছে তাহাদের কথায় প্যাঁচে ভুলাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিবার জন্ত।

পাছে ফাঁকি ধরা পড়ে, এই জন্ত কমিটি গঠনের সংবাদের সহিত এই সঙ্গে এক সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে যে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা যায় কি না ভারত সরকার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। কথাটা যে স্রেফ ধাপ্পাবাজী তাহা ভারতের শিল্পনীতি ঘোষণাতেই প্রকাশ—'আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত শিল্প রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার ইচ্ছা সরকারের নাই।'

সরকারের পক্ষপুটের আড়ালে মিল-মালিক ও বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারত হইতে এই বছরে মাত্র ৩২ কোটি গজ কাপড় রপ্তানী হইবে বলিয়া স্থির হইলেও ইতিমধ্যে অর্থাৎ মাত্র দুই মাসেই প্রত্যক্ষ ভাবে ২১ কোটি গজ ও পরোক্ষ ভাবে ৮ কোটি গজ কাপড় রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। এখনও সমস্ত বৎসরটাই বাকী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সারা বছরের চালান-যোগ্য কাপড় রপ্তানী করিলে আকস্মিক ভাবে বাজারে বস্ত্রাভাব দেখা দিতে বাধ্য। মহাত্মাজী আমদানী ও রপ্তানী দু'য়েরই বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষরের চেলা-চামুণ্ডারা গদীতে বসিবার পর হইতে তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া আসিতেছেন। সুবিধা মত দু'-একটা উপদেশ মান্য করিয়া তারস্বরে মহাত্মাজীর জয়গান করিতেছেন, এবং প্রয়োজন মত তাঁহার ভাষার বিকৃত অর্থ করিতেও দ্বিধা করিতেছেন না। নিয়ন্ত্রণ-প্রথা প্রত্যাহার, জাপানী কাপড়ের আমদানী বন্ধ মহাত্মাজীর আদেশে বলিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করিলেও আসল কারণ বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও বস্ত্রোৎপাদকদের যথেচ্ছা লাভ করিবার সুযোগ দেওয়া। রপ্তানী করিলে এই পুঁজিপতিদের সুবিধা হয়, অতএব ভারতের কাপড় বাহিরে পাঠাইয়া বস্ত্রাভাব সৃষ্টির বেলায় তাঁহার উপদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে কাহারও বাধে নাই।

— —

বাস্তহারা

বাস্তহারাদের সকল দুঃখের মূল পাকিস্তান সৃষ্টি এবং কংগ্রেসের কর্ত্তারা এই পাকিস্তান সৃষ্টিতে সম্মতি দিয়াছিলেন বলিয়া বাস্তহারাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্ত তাঁহারা যে অন্ততঃ আংশিক ভাবে দায়ী, সে কথা কংগ্রেসের কর্ত্তারা অস্বীকার করিলেও তাঁহাদের সে দায়িত্ব এড়াইবার উপায় নাই। এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—ভালই হোক আর মন্দই হোক, ভারত যখন একবার বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, তখন উহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত। যুক্তিটার ভিতর ফাঁকী এই যে, যে গণ-পরিষদ ভারত বিভক্তিতে সম্মতি দিয়াছিলেন, তাহা শুধু শতকরা তেরো জন দেশবাসীর প্রতিনিধি মাত্র। কেবল মাত্র উঁহাদের মত দেশবাসীর মত নহে। বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেস কর্ত্তারা দেশবাসীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অবিভক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ত অহিংস সংগ্রাম চালাইবেন। কিন্তু কার্য্য-কালে দেখা গেল যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চাপে তাঁহাদের মুসলিম লীগ-তোষণ নীতি অকস্মাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। পণ্ডিত নেহরু প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারত বিভক্তের প্রশ্ন যদি উঠে, তাহা হইলে তিনি জনসাধারণের মত না লইয়া তাহাতে সম্মতি দিবেন না। কার্য্যকালে তাঁহারও স্মৃতিবিভ্রম ঘটিল। বিভক্তিতে সম্মতি দিবার সময় জনসাধারণের সুখ-দুঃখের কথা তাঁহার মনে পড়িল না। সস্তায়, বিনা সংগ্রামে, গদীতে উঠিয়া বসিলেন।

হাতে হাতে ইহার ফলও ফলিতে আরম্ভ হইল। রক্তস্রোতে পাঞ্জাব ও পূর্ব্ববঙ্গ প্লাবিত হইল। লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানবাসী হিন্দু অকস্মাৎ আবিষ্কার করিলেন যে, ভারতবর্ষকে তাঁহাদের আপনার দেশ বলিবার অধিকার আর নাই। তাঁহাদের বড় সাধের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এক কলমের খোঁচায় তাঁহাদিগকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি, মান-সম্ভ্রম কিছুই আর নিরাপদ নহে। সর্ব্বহারা হইয়া পাকিস্তান-বাসী ভারত ইউনিয়নে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিলেন। অনেক গবেষণার পর কংগ্রেস কর্ত্তারা ঘোষণা করিলেন যে, পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সহিত উচ্চাঙ্গের আলাপ-আলোচনা চালাইয়া শীঘ্রই একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। ইণ্ডো-পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। হায়দ্রাবাদের স্থিতাবস্থা চুক্তির মতই তাহা কার্য্যকরী।

কংগ্রেসের কর্তারা পাকিস্তানবাসী হিন্দুগণকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—তোমরা পাকিস্তানী রাষ্ট্রের প্রতি সরল ভাবে আনুগত্য স্বীকার কর। নিজ নিজ বাস্তুভিটায় ফিরিয়া যাও। সেইখানে গিয়া নাগরিক অধিকার লাভের চেষ্টা কর। অনর্থক এখানে আসিয়া আমাদের বিব্রত করিও না। অর্থাৎ তোমরা চুলোয় যাও। গদীতে বসিয়া বহু দিন পরে যে নবাবী করিতেছি তাহাতে ব্যাঘাত ঘটাইও না।

পণ্ডিতজী তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—ভারতবর্ষের সহিত পাকিস্তানের সংযুক্ত হওয়া অসম্ভব। এমন কি পাকিস্তান কর্তারা জোড় হাতে মিনতি করিলেও নয়। এই পণ্ডিতজীই এক দিন বলিয়াছিলেন, দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে ভারত বিভক্ত হইতে দিব না। পাকিস্তান উন্মাদের পরিকল্পনা। তিনিই আবার ভারত বিভাগে মত দিয়া বলিয়াছিলেন, এ বিভাগ টিকিতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে ভারত আবার অখণ্ড হইবে। আজ তাঁহার মুখে নবতম বাণী শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়, ইনিই কি সেই দেশপূজ্য জওহরলাল?

—

বাঙ্গালা ও কংগ্রেস

কংগ্রেস বাঙ্গালাকে কোন দিনই প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ তো বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে রীতিমত ঘৃণা করেন। আর তাঁহার নিজস্ব প্রদেশ বিহারে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ বহু দিনের। এই বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করে ১৯৩৭ সালের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পর। তৎকালীন একটা আপোষ মীমাংসা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই, বরং বিদ্বেষ বাড়িয়াছে—স্বাধীনতা লাভের পর হইতে তাহা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কি ভাবে বিহারীরা অভিযান চালাইতেছে তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত। বিহারের শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের চাপে অধিকাংশ স্কুলেই বাঙ্গালা শিক্ষা প্রায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দী ভাষা প্রবর্ত্তনের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা গ্রামে গ্রামে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য-সঙ্ঘে যোগদান করার অপরাধে সরকারী কর্ম্মচারীরা বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকেও হেনস্তা করিতে ছাড়েন নাই। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন আন্দোলনের অপরাধে বহু বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীর নাম সরকারী 'কালো খাতায়' উঠিয়াছে। স্বয়ং মহাত্মাজী এই পদ্ধতিতে প্রদেশ গঠনের উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় শিষ্যরা ঠিক বিপরীত কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে!

পূর্ণিয়া জেলার কতকাংশ, মানভূম জেলা, ধলভূম পরগণা এবং সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ বাঙ্গালা-ভাষাভাষী অঞ্চল। বৃটিশ শাসনের আমলে বাঙ্গালাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্যই এইগুলিকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এবং মহাত্মাজীর ইচ্ছামত আমাদের আশা ছিল, ঐ অঞ্চলগুলি বাঙ্গালাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক, ঐ অঞ্চলগুলিতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বাঙ্গালীদিগকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে বিহারী বানাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

আমাদের অপর প্রতিবেশী আসাম গ্রহণ করিয়াছে প্রত্যক্ষ আক্রমণের পন্থা। সেখানে বাঙ্গালীদের প্রহার করিয়া বিদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। আসামের এই 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনও নূতন নয়। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। লীগ গবর্ণমেণ্টের আমলে মুসলমানরা আসামে যাইয়া বাঙ্গালীকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের আমলে মুসলমান বন্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু অসমীয়ারা হিন্দু বাঙ্গালীদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই প্রথম বিস্ফোরণ হয় গত ৮ই মে। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করে। ২৫শে মে সংবাদ পাওয়া যায় যে যাঁহারা অসমীয়া নহেন, এইরূপ লোকদের সামরিক পাহারার সাহায্যে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে নিরাপদ এলাকায় আনা হইয়াছে। অবস্থার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। আশঙ্কা হয় যে, এইরূপ ব্যাপার চলিতে থাকিলে একান্ত নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থায় আসাম হইতে বাঙ্গালী পশ্চিম-বঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে আসিতে আরম্ভ করিবে।

বাঙ্গালীর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিকার কংগ্রেসের নিকট হইতে মিলিবে না, নিজেদেরই করিতে হইবে। র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে বাঙ্গালার প্রতি যে ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে তাহা কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব যে বুঝেন না তাহা নহে, কিন্তু প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না, কারণ বাঙ্গালাকে পঙ্গু করিয়া রাখাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পশ্চিম-বঙ্গের দুইটি অংশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং যাইতে হইলে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ভারত ইউনিয়নের ভিতর দিয়া রেলপথ খুলিতে গেলে বিহারের ভিতর দিয়া রেলপথ লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু বাঙ্গালার প্রতি বিহারের যা হৃদয়তা, তাহাতে বিহারের ভিতর দিয়া যাতায়াত খুব নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বাঙ্গালাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে বিহারের বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলগুলি পশ্চিম-বঙ্গের অবশ্যই চাই। কিন্তু আমরা সে জন্য কি করিয়াছি? বাঙ্গালা প্রাদেশিক কংগ্রেস একবার মাত্র মুখ খুলিয়াই বোবা হইয়াছেন। গণ-পরিষদে বাঙ্গালার প্রতিনিধিরা মৌনী বাবা সাজিয়া বসিয়া আছেন। বহু দিন নীরব থাকিয়া পশ্চিম বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট অবশ্য শেষ অবধি কিছুটা সক্রিয় হইয়াছেন। কিন্তু অন্য প্রদেশবাসীদের দাবী লইয়া এই ভাবে ছিনিমিনি খেলা হইলে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে যে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করা হইত, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার তাহার শতাংশের একাংশও করেন নাই। উপরন্তু, অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে যে ভাবে তাঁহারা পশ্চিম-বঙ্গের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে লাভ হইবে কি বেশী ক্ষতি হইবে তাহা চিন্তার বিষয়।

পশ্চিম-বঙ্গের তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দাবী করার নাম প্রাদেশিকতা, কিন্তু বিহারের এই প্রাপ্য দানে বিরোধিতা অথবা আসামের বল্লম ও সোডার বোতলের সাহায্যে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদ। ইহাই যদি অবস্থা দাঁড়ায় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসসেবীদের হাতেই কংগ্রেসের মৃত্যু অনিবার্য্য। নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদের নামে প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষা ইহার ফল ভারতের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর হইবে। আজ সকলে

মিলিয়া প্রাদেশিকতার যূপকাষ্ঠে বাঙ্গালাকে বলি দিতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সৃষ্ট এই অদ্ভুত ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মত সৃষ্টি-কারীকেই আক্রমণ করিবে। সমগ্র ভারতে প্রদেশে প্রদেশে বিরোধিতা আরম্ভ হইবে। শাসন-যন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বিদেশী শোন-দল ঝাঁপাইয়া পড়িবে এই দলাদলির ভাগাড়ে। বাঙ্গালীরা যে স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতেও তাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের ধ্বংস করিলে দেশের সমূহ বিপদ অনিবার্য্য। তাই বলি, হে কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বগোষ্ঠী, সাবধান! এখনও সময় আছে।

এশিয়া ও সুদূর-প্রাচ্য অর্থনৈতিক সম্মেলন

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠনের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্ত্তৃক ১৯৪৭ সালের মে মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় সাংহাই নগরে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় গত নভেম্বর মাসে ফিলিপাইন রিপাবলিকের বাগুইয়ো সহরে। ভারতের উটকামণ্ড সহরে হইতেছে তৃতীয় অধিবেশন। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত বহু-বিস্তৃত ভূভাগের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করা এবং সম্মিলিত ভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রুশিয়াও এই সম্মেলনের সদস্য। পৃথিবীর জনগণের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে এই দুই রাষ্ট্রের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই উহাদিগকে সভ্য করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সোভিয়েট রুশিয়া এশিয়া মহাদেশেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র।

উটকামণ্ডের এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ইহা অবশ্যই আমাদের গর্ব্বের বিষয়। পণ্ডিতজী বিশ্ব-সমস্যার সুবৃহৎ পরিপেক্ষিতে এশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্ব-সমস্যার দুইটি দিক প্রধান। প্রথম, এশিয়া ও আফ্রিকার অধীন দেশগুলির উপর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আধিপত্য, দ্বিতীয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের জালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিকে আবদ্ধ করিবার আয়োজন। উদ্বোধন বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, "রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে না। এখনও এশিয়ার বৃহত্তর অংশ বিদেশীর প্রভাবাধীন।" ইন্দোনেশিয়া অন্যতম সম্পদশালী দেশ হইলেও এই সম্মেলনে তাহার কোন প্রতিনিধির স্থান হয় নাই, কারণ ইন্দোনেশিয়া এখনও হল্যাণ্ডের অধীন। পণ্ডিতজী মনে করেন যে, এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির রাজনৈতিক সংগ্রাম তাহার স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য পরিণতি লাভ করিতে চলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে অর্থনৈতিক সংগ্রাম। প্রশ্ন হইল এই যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারে কি না? পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক দিক যাহাই হোক না কেন, অর্থনৈতিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি উহার গুরুত্ব রাজনৈতিক দিক অপেক্ষাও বেশী।" মার্কিণের নিকট ভিক্ষার ঝুলি প্রসারণ—এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিণ ডলার যদি তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহা হইলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহার প্রভাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারী। পণ্ডিতজী অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রত্যাশা করিলেও এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, সাহায্য দানের অছিলায় অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সহ্য করা হইবে না। পণ্ডিতজী কি মনে করেন যে, মার্শাল-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দানসত্র খোলা? না, এই উক্তির দ্বারা দেশবাসীকে ভুলাইয়া দেশকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিতে চান? আমাদের নেতারা মুখে যাহা বলেন, কার্য্যকালে করেন তাহার বিপরীত। সেই জন্যই আমাদের এই আশঙ্কা।

হায়দ্রাবাদ

রাজাকারদের অত্যাচার দিন দিন বর্ণনার এবং সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। নিজামের মনোভাব এবং কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয়, পিছনে কোন বৈদেশিক শক্তির প্রভাব আছে। নতুবা নিজামের পক্ষে এতখানি দৃঢ়তা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। নিজামের সহিত সুমীমাংসার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যেরূপ নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়াছেন তাহাতে এই সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হইতেছে। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের চাপেই ভারতের রাষ্ট্রনায়করা হায়দ্রাবাদ সম্বন্ধে কোন পন্থাই গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই হোক আর নিজামের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের আলাপ-আলোচনাই হোক, বর্ত্তমানে উহার একমাত্র সার্থকতা—নিজামকে ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় দেওয়া। স্থিতাবস্থা চুক্তিও নিজামকে এই সুযোগই প্রদান করিয়াছে। যেখানে এক পক্ষ চুক্তির কোন মর্য্যাদাই দিতেছে না, সেখানে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

ভারতের সহিত বিভিন্ন সমস্যার আলোচনার জন্য দিল্লী আসিতে নিজাম ঔদ্ধত্যভরে অস্বীকার করিলেন, তবু আবার তাঁহার প্রতিনিধির সহিত নূতন করিয়া আলোচনা শুরু করা হইল। কিন্তু কি আশায় কি উদ্দেশ্যে এই দর-কষাকষির প্রহসন। ভারত ইউনিয়নের দুইটি দাবী আছে—নিজামের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া হায়দ্রাবাদে দায়িত্বশীল সরকার গঠন ও হায়দ্রাবাদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান। প্রথমটিতে নিজাম যে রাজী নহেন তাহা পূর্ব্বের ন্যায় নিজামের প্রধান মন্ত্রী লায়েক আলি এবারও ভারতীয় ইউনিয়নের কর্ত্তাদের জানাইয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। নিজাম বাহাদুর বড় জোর দয়াপরবশ হইয়া শতকরা ১৩ জন মুসলমান ও ৮৭ জন হিন্দুর মধ্যে সংখ্যা-সাম্যের ভিত্তিতে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন। আর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনা করাও অসম্ভব, খুব জোর দেশরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কে একটা দীর্ঘস্থায়ী মীমাংসায় সম্মত হইতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হাত দিতে দিবেন না। দেশরক্ষা, যানবাহন ও পররাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতে যেরূপ আইন-কানুন আছে, হায়দ্রাবাদে তদনুরূপ আইন কানুন না হইলে, ভারত সরকার এই সকল

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। অধিকন্তু, যে সকল আইন হায়দ্রাবাদের পক্ষে ক্ষতিকর মনে হইবে, নিজামের ব্যবস্থা পরিষদের তাহা বাতিল করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে আলোচনা চালাইবার প্রয়োজন কি ?

—

কাশ্মীর কমিশন

৩রা জুন তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক কাশ্মীর সমস্যা বিচারের জন্য বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনাকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিশনের কার্য্যক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি করিয়া জুনাগড়, ভারতে ব্যাপক মুসলমান নিধন এবং ভারত কর্ত্তৃক চুক্তিভঙ্গ উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইহার 'তীব্র প্রতিবাদ' করিয়াছেন। তবুও কমিশন গঠিত হইয়াছে ও কার্য্যক্ষেত্রের পরিধি বর্দ্ধিত হইয়াছে। যদি মনে করা যায় যে, কাশ্মীর কমিশনের প্রস্তাব অনুমোদন না করার হুমকী দিলেও কমিশনকে কাশ্মীরে আসিতে ও ফিরিয়া যাইতে এবং তাঁহাদের ইচ্ছামত পরিদর্শন এবং তদন্ত করিতে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিবার প্রতিশ্রুতি ভারত গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন, তাহা কি নেহাৎ ভুল হইবে ? ভারত গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতাই কি ইহার জন্য দায়ী নয় ?

পণ্ডিতজীর আপত্তি সত্ত্বেও কমিশন জেনেভা হইতে রওনা হইয়াছেন। অবশ্য কবে ভারতে আসিবেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ যে তাঁহার আপত্তির কোন মূল্য দেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট। ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেই খাল কাটিয়া কুমীর আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন তাহাকে খেদাইয়া দিতে পারিবেন কি ? রুশিয়া কোরিয়া কমিশনকে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করিতে দেয় নাই। কিন্তু ভারত রুশিয়া নয়।

এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তা ও চাতুর্য্য লক্ষ্যণীয়। কাশ্মীর কমিশনের সহিত সহযোগিতা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়া পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ বলিয়াছেন, "আমরা যতটুকু সম্মত হইয়াছি ততটুকু পর্য্যন্ত কমিশনকে সাহায্য করিব।" কাশ্মীর হইতে উপজাতীয়দের অপসারিত করা সম্পর্কে পাকিস্তান রাজী হয় নাই। উপরন্তু পাকিস্তান বাহিনীর তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্য চাকোটি-উরি অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছে। পাকিস্তানের এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে হয়ত নিরাপত্তা কমিশন আমলই দিবেন না, অথবা উহাকেই কমিশনের সহিত পাকিস্তানের সহযোগিতা বলিয়া ধরিয়া লইবেন। ফলে হয় কাশ্মীর দ্বিখণ্ডিত হইবে, না হয় ষোল আনাই পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইবে। জুনাগড় সম্পর্কেও ইহার চেয়ে ভাল কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক ভাবে হিন্দু ও শিখ হত্যা হইয়াছে, সহস্র সহস্র হিন্দু ও শিখ নারী অপহৃতা হইয়াছে, অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কমিশন সে সম্পর্কে তদন্ত করিবেন না, করিবেন ভারতে ব্যাপক মুসলমান হত্যা সম্বন্ধে। চুক্তি লঙ্ঘনের কথা বলিতে গেলে, পাকিস্তানই ক্রমাগত চুক্তিভঙ্গ করিয়াছে। অথচ তদন্ত হইবে ভারত কর্ত্তৃক চুক্তিভঙ্গের। নিরাপত্তা পরিষদ যে বিচারালয় নহে, বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের কূটনৈতিক রঙ্গভূমি, তাহা কি ভারত গবর্ণমেণ্ট জানিতেন না ? এ অজ্ঞতা অমার্জ্জনীয়। যদি জানিতেন, তবে কাশ্মীর সমস্যা লইয়া নিরাপত্তা পরিষদে গেলেন কেন ? গতিক সুবিধার নয় দেখিয়া চলিয়া আসিলেন না কেন ? যদি ইঙ্গ-মার্কিণ চাপই ইহার কারণ হয়, তবে কেবল মৌখিক 'তীব্র প্রতিবাদ' জানাইয়া তাঁহারা কি করিতে পারিবেন ? জনগণকে ঠকানো ছাড়া পণ্ডিতজীর হুমকীতে আর কি কার্য্য সাধিত হইবে ? স্বাধীন ভারতের ভরাডুবী করিতে আমাদের রাষ্ট্রনায়করা কিছু বাকী রাখিবেন না বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। কিন্তু গদীওয়ালা কি ইহাও বুঝেন না যে, সেই সঙ্গে নিজেরাও ডুবিবেন।

—

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিছু কাল হইতে তিনি গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। প্রবীণ আইনজ্ঞ হিসাবে হাইকোর্টে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি আছে। যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, এই নূতন পদেও তিনি খ্যাতিলাভ করিবেন।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার হিসাবে তিনি খ্যাত। যোগ্যতার দিক দিয়া এই নির্ব্বাচন ঠিকই হইয়াছে। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

—

পরলোকে কবিরাজ সতীশচন্দ্র সেন

প্রাচীন ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসক কবিরাজ সতীশচন্দ্র সেন মহাশয় গত ২১শে মে তাঁহার কলিকাতা ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ও অগাধ পাণ্ডিত্য সর্ব্বজন-বিদিত। বিগত ১৩৩৪ সালে বারাণসীর "ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল" তাঁহার চরকের ব্যাখ্যায় ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে "ভিষকভূষণ" উপাধিতে অলঙ্কৃত করেন। তিনি চতুর্থ বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহা সম্মিলনীর ও দক্ষিণ কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি অমায়িক, পরোপকারী ও পরম নিষ্ঠাবান ছিলেন। বহু অনাথ ও আতুরকে তিনি নীরবে সাহায্য করিতেন ও বহু অপারগ রোগীকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্যাদি দান করিতেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাখীস্থান
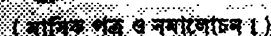
—রেবতীভূষণ ঘোষ

চিড়িয়াখানা

১, ২, ৩। প্রদ্যোৎকুমার পাল।
৪। বিধুভূষণ মিত্র

সৌন্দর্য্যের স্বপ্নজাল বোনে
হিমানী
স্নো, সাবান, সেন্ট, কেশতৈল
লিপষ্টীক, বডি পাউডার
নখের পালিশ প্রভৃতি

হিমানী * কলিকাতা

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—আষাঢ় ঃ ১৩৫৫ সাল

১ম খণ্ড ঃ ৩য় সংখ্যা

[পরমহংসদেবের তিরোধানের পর স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীম'র নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা।]

মাষ্টার। প্রথম দেখা'র দিনটি তোমার বেশ স্মরণ পড়ে?

নরেন্দ্র। সে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে। তাঁহারই ঘরে। সেই দিনে এই দু'টি গান গেয়েছিলাম।

মন চল নিজ নিকেতনে।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।

মাষ্টার। গান শুনে কি বললেন?

নরেন্দ্র। তাঁর ভাব হয়ে গিচলো। রামবাবুদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ছেলেটি কে? আহা কি গান!' আমায় আবার আসতে বললেন।

মাষ্টার। তার পর কোথায় দেখা হলো?

নরেন্দ্র। তার পর রাজমোহনের বাড়ী। তার পর আবার দক্ষিণেশ্বরে। সে বার আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব করে বলতে লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছ!'

কিন্তু এ কথাগুলি কাহাকেও বলিবেন না।

মাষ্টার। আর কি বললেন?

নরেন্দ্র। 'তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছ! মাকে বলেছিলাম, মা আমি কি যেতে পারি। গেলে কার সঙ্গে কথা কব! মা, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকবো।' বললেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি, আমি এসেছি।' আমি কিন্তু কিছু জানি না; কলকাতার বাড়ীতে তোফা ঘুম মারছি।

মাষ্টার। অর্থাৎ তুমি এক সময়ে Present'ও বটে, Absent'ও বটে; যেমন ঈশ্বর সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন।

নরেন্দ্র। কিন্তু এ কথা কারুকে বলবেন না।

কাশীপুরে তিনি শক্তিসঞ্চার করে দিলেন।

মাষ্টার। যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনী জেলে বসতে; না?

নরেন্দ্র। হাঁ। কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখি। কালী বললে, 'কি একটা Shock তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল।'

"এ কথা (আমাদের মধ্যে) কারুকেও বলবেন না—Promise করুন।"

মাষ্টার। তোমার উপর শক্তি সঞ্চার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে: তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। এক দিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে।'

—কথামৃত।

ভাঙা অমিত্রাক্ষরের স্রষ্টা কে?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তথাকথিত 'গৈরিশ' বা 'গৈরিশী' ছন্দের নাম যে অনেকেই অবহেলা-ভরে উল্লেখ করেন, এটা প্রায়ই লক্ষ্য করেছি। আধুনিক সাহিত্যিকদের অনেকেই তাকে আমলে আনতেই রাজী নন। তাঁদের বিশ্বাস, সাহিত্যক্ষেত্রে ও-রকম ছন্দ পতিত: ওকে একটা বাজে থিয়েটারি ছন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

পৌরাণিক ও ধর্ম্মমূলক নাটকের পক্ষে ঐ ছন্দটির উপযোগিতা যে অত্যন্ত অধিক, গিরিশচন্দ্র সেটুকু উপলব্ধি করেছিলেন বিশেষ ভাবেই। ঐতিহাসিক নাটকেও স্থানে স্থানে বিশেষ উচ্ছ্বাস প্রকাশের সময়ে তিনি ঐ ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন বটে, কিন্তু তা ততটা সফল হয়নি। কারণ বাস্তব ইতিহাসের ক্ষেত্রে, আধুনিকদের কাণে বাজে গদ্যের পাশে ঐ ছন্দটি। তবে এই পরীক্ষা তিনিই প্রথম করেননি, তাঁরও আগে করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

'গৈরিশী' ছন্দ নিয়ে আলোচনা করবার আগে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মাইকেলের অভিমত নিয়ে দু'-চার কথা বলা দরকার।

"তিলোত্তমাসম্ভবে" (কবির প্রথম কাব্য) অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার ক'রে মাইকেল লিখেছিলেন: "আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।"

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সত্যদ্রষ্টা কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয়নি। তাঁর যুগেই একাধিক বাঙালী কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিখ্যাত কাব্য রচনা করেছেন। তার পর যত দিন গিয়েছে ততই বেড়ে উঠেছে অমিত্রাক্ষরের প্রভাব। প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা। এবং বর্ত্তমান যুগেও দেখছি, অতি-আধুনিক কবিরা যেন অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই বেশী পক্ষপাতী। কিন্তু আপাতত যাক্ ও-কথা।

মধুসূদন কেবল মহাকবি নন, বাংলা রঙ্গালয়ের যখন জন্ম হয়, তখন নাট্যকাররূপেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। যুগধর্ম্মের গতি বুঝে প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শ ছেড়ে পাশ্চাত্য আদর্শে তিনিই প্রথম বাংলা নাটক রচনা করেন। এবং আধুনিক নাট্যকাররাও তাঁর অবলম্বিত আদর্শ ত্যাগ ক'রে এক পদও অগ্রসর হ'তে পারেননি। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগেও মধুসূদন হয়েছিলেন বেঙ্গল থিয়েটারের নিজস্ব প্রধান নাট্যকার। অভিনয়ের অস্বাভাবিকতা দূর করবার জন্যে তিনিই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মধুসূদন নাট্যকলায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন: "যত দিন না নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হবে, তত দিন তার কোন উন্নতিই আশা করা যায় না।" আর পরে হয়তো এই সত্যই বুঝে নাট্যকলারসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথও "বিসর্জ্জন" এবং "রাজা ও রাণী" রচনার সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাহায্য না নিয়ে পারেননি।

"তিলোত্তমাসম্ভব" মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য হ'লেও ঐ ছন্দটিকে গদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রথম ব্যবহার করেন "পদ্মাবতী" নাটকে।

কিন্তু নাটক বা দৃশ্যকাব্য প্রধানত পাঠ করবার জন্যে নয়, অভিনয় করবার জন্যে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় পয়ারের মত প্রতি পংক্তিতে চৌদ্দটি ক'রে অক্ষর আছে। এ-রকম কবিতা পাঠ বা সাধারণ আবৃত্তির পক্ষে যতটা উপযোগী, অভিনয়ের পক্ষে ততটা নয়। এইটুকু উপলব্ধি ক'রে মধুসূদন "পদ্মাবতী" নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে প্রথম পরীক্ষার সময়ে মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছিলেন ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই। যথা

(প্রথম)

"এ বিদর্ভপুরে
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল; তার প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী।"

(দ্বিতীয়)

"এ কি? ওই না সে পদ্মাবতী?
আয় লো কামিনী—
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা"

(তৃতীয়)

"কিঞ্চিৎ কালের জন্য অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত।"

(চতুর্থ)

"হেন দুরাচার আর আছে
কি জগতে? ভাল, কলিদেব—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?" প্রভৃতি।

বোধ হয় প্রমাণিত করতে পেরেছি যে, গিরিশচন্দ্রের অনেক আগেই সর্বপ্রথমে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার ক'রে গিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এত দিন এই সত্যটির দিকে কারুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি কেন, জানি না। তার পর কালীপ্রসন্ন সিংহের পালা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ কেবল মহাভারতের অনুবাদক ও "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"র লেখকই ছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন নট, নাট্যকার ও নাট্য-সমালোচকও। তিনি চারখানি নাটক রচনা করেছিলেন—"বাবু", "বিক্রমোর্ব্বশী", "সাবিত্রী-সত্যবান" ও "মালতীমাধব"। তাঁর নাটকের ভাষা কি-রকম ছিল বলতে পারি না, কারণ নাটকগুলি পাঠ করবার—এমন কি দেখবারও—সৌভাগ্য চক্ষে আমার হয়নি।

কালীপ্রসন্ন সিংহের কবি ব'লে খ্যাতি নেই। কিন্তু কোন্ খেয়ালে জানি না, "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"য় তিনি কয়েক পংক্তির একটি কবিতা-কণিকা রচনা ক'রেছিলেন। পংক্তিগুলি এই:

"হে সজ্জন!
স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী-বরে;
কৃপা-চক্ষে হের একবার;
শেষে বিবেচনামতে,

তিরস্কার কিংবা পুরস্কার যাহা হয়,
দিও তাহা মোরে,
বহু মানে লব শির পাতি।"

এই ছোট্ট কবিতায়ও ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দই ব্যবহার করা হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র যখন পৌরাণিক নাটক রচনায় হাত দিলেন তখন প্রথমেই অনুভব করলেন নাটকের উপযোগী ভাষার অভাব। ঠিক সেই সময়েই দৈবগতিকে তাঁর চোখে পড়ল কালীপ্রসন্নের রচিত ঐ কয়েকটি পংক্তি। হাত বাড়িয়ে তিনি পেলেন স্বর্গ! পৌরাণিক নাটকের পক্ষে এই তো আদর্শ ভাষা! সেই ভাষায় প্রথমেই রচিত হ'ল তাঁর "রাবণবধ"। তার পর রঙ্গমঞ্চের উপরে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের অসামান্য সফলতা দেখে তিনি তাঁর প্রত্যেক পৌরাণিক ও অধিকাংশ ধর্মমূলক নাটকে ঐ এক ছন্দই ব্যবহার ক'রে গিয়েছেন। আমার মনে হয়, "পদ্মাবতী" নাটক রচনাকালে মাইকেল মধুসূদনও কালীপ্রসন্নের মতই অমিত্রাক্ষর ছন্দের চৌদ্দ অক্ষর-সংবলিত পংক্তি মাঝে মাঝে ভেঙে দিয়েছিলেন, এটা গিরিশচন্দ্রের লক্ষ্যে পড়েনি।

গত বৈশাখের "শনিবারের চিঠি"তে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "বাংলা নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রথমে এই ছন্দে 'হরধনুর্ভঙ্গ' নামে পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন; তিনিই বাংলা নাটকে—কাব্যেও বটে—ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' একই বৎসরে, ১২৮৮ সালে, প্রকাশিত হইলেও, অভিনয় ও পুস্তক-প্রকাশ—উভয় ক্ষেত্রেই রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বগামী।"

বাংলা নাটকে রাজকৃষ্ণ রায়ই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক কি না, সে কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব। কিন্তু আপাতত এই প্রশ্নই মনে জাগে, গিরিশচন্দ্র 'রাবণবধে' ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করবার আগে রাজকৃষ্ণের রচনার কথা জানতেন কি না? আমাদের মতে, না জানাই স্বাভাবিক। কারণ, গিরিশচন্দ্র যখন 'রাবণবধে'র রচনা-কার্য্য সম্পূর্ণ করেন, রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' তখনও অভিনীত বা প্রকাশিত হয়নি। ঐ দু'খানি নাটকই প্রায় একই সময়ে অভিনীত হয়—'হরধনুর্ভঙ্গ' ও 'রাবণবধে'র অভিনয়ের মধ্যে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধান। সুতরাং এইটেই বুঝতে হবে যে, দুই নাট্যকারই স্বাধীন ভাবে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ গ্রহণ করেছিলেন পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই।

গিরিশচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, কালীপ্রসন্ন সিংহই তাঁর পথপ্রদর্শক। কিন্তু রাজকৃষ্ণের সামনে কোন্ আদর্শ ছিল, আজ আর তা জানবার উপায় নেই। তবে তিনি যে বাংলা নাটকে "ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক" নন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

আসলে বহুনিন্দিত "গৈরিশী ছন্দ" মোটেই গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট নয়, তাঁর আগেই বাংলার তিন জন প্রতিভাধর অমর সাহিত্যিক ঐ ছন্দ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে গিয়েছেন। তবে এ-কথা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে, গিরিশচন্দ্রের হাতে না পড়লে ঐ ছন্দটি আজ এত-বেশী জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে পারত না। কিন্তু ছন্দটি জনপ্রিয় হয়ে সুফল প্রসব করেনি। কারণ, পরে অনধিকারী নাট্যকারদের হাতে প'ড়ে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের এমন শোচনীয় দুরবস্থা হয়েছে যে তা বর্ণনা করতে গেলে প্রকাণ্ড একটি প্রবন্ধ রচনা করতে হয়।

গিরিশচন্দ্রের ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখে দার্শনিক কবিবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পাদিত "ভারতী" পত্রিকায় লিখেছিলেন: "আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী! ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশ বাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।"

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত: "এত দিনে নাটকের ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে।"

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনও করেছিলেন সুখ্যাতিপূর্ণ এক দীর্ঘ সমালোচনা।

অনেকের হয়তো বিশ্বাস আছে যে, প্রত্যেক পংক্তিতে চৌদ্দ অক্ষর বজায় রেখে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনা সুকঠিন বলেই গিরিশচন্দ্র ভাঙা অমিত্রাক্ষরের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে আমি গিরিশচন্দ্রের এমন কয়েকখানি নাটকের নাম করতে পারি যেগুলির সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়েছে চতুর্দ্দশাক্ষর অমিত্রাক্ষর ছন্দই। এটা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত, গিরিশচন্দ্র কবি এবং নির্দ্দোষ মিত্রাক্ষর ছন্দে বহু কবিতাও রচনা করেছেন। তিনি ভাঙা অমিত্রাক্ষরের আশ্রয় নিয়েছিলেন নিজের সুবিধার জন্যে নয়, অভিনয়ের সুবিধার জন্যেই। প্রথম চেষ্টাতেই ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর রচনা কতটা মধুর এবং অভিনয়ের উপযোগী হয়েছিল তা বোঝাবার জন্যে "রাবণবধ" নাটকের এক টুকরো নমুনা এখানে তুলে দেওয়া হ'ল।

সীতা বলছেন শ্রীরামচন্দ্রকে:

"কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে?
কহ, অধীনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি?
সতী নারী আমি,
কহি চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী করি—
সাক্ষী মম দিবস-শর্ব্বরী,
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণ কায়।
সাক্ষী আপাদমস্তক বেত্রাঘাত,—
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন।
সাক্ষী নয়নের নীর
ঝরিতেছে অবিরল,
সাক্ষী পবননন্দন হনু,
সাক্ষী বিভীষণ,—
সাক্ষী, নাথ, তোমার অন্তর!"

মনে রাখবেন, এ রচনার ভাষা হচ্ছে আজ থেকে পঁয়ষট্টি বৎসর আগেকার ভাষা! তখন বঙ্কিম-যুগ চলছে এবং মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু হয়েছে মাত্র আট-নয় বৎসর আগে।

ওয়াচ মেকার

ডেভিড হেয়ার

ডেভিডের স্বাক্ষর

সত্যদর্শী

"এদেশীয় বন্ধুগণ ও ছাত্রদের দ্বারা ডেভিড হেয়ারের এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। স্কটল্যাণ্ডবাসী ডেভিড হেয়ার ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরে আসেন এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন মাত্র ৬৭ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা তিনি ঘড়ি-ব্যবসায়ে যথেষ্ট দক্ষতা ও সুনাম অর্জ্জন করেন। বিদেশ হইলেও তাঁহার কর্ম্মভূমিকেই তিনি মাতৃভূমির মতো আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং ব্যবসায় ছাড়িয়া বাকী জীবন তিনি তাঁহার সমস্ত কর্ম্মশক্তি, অর্থ ও উদ্যম কেবল একটি মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই মহৎ উদ্দেশ্য হইতেছে, এদেশীয় বাঙালীদের সুশিক্ষা দেওয়া এবং নৈতিক চরিত্রগঠন করা। তাঁহার জীবদ্দশায় এদেশের হাজার হাজার লোক তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। তাঁহার মৃত্যুতে তাহারা পিতৃবিয়োগের বেদনা বোধ করিয়াছে।"

কলিকাতা শহরে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিস্তম্ভের উপর ইংরেজীতে যে-কথা খোদাই করা আছে, এই হ'ল তার মর্ম্ম।—এ দেশবাসীর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি ডেভিড হেয়ারের প্রাপ্য।'

১লা জুন, ১৮৪২ সাল। সারা দিন বৃষ্টি ঝরছে। কলিকাতার পথ-ঘাটে জল জমেছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গ্রে সাহেবের বাড়ীতে, হেয়ার সাহেব যেখানে থাকতেন, সেখানে বিশিষ্ট বাঙালীদের ভিড়। রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত এবং আরও অনেকে এসেছেন। হেয়ারের সহকর্ম্মী ও স্বনামধন্য ছাত্ররা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। হাজার হাজার লোকের ভীড় জমেছে হেয়ার সাহেবের বাড়ীর সামনে—এখনকার হেয়ার ষ্ট্রীটে। স্কুল-কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, অফিসের কেরাণী, কর্ম্মচারী, সরকার, দোকানদার, কুলি মজুর থেকে সুরু ক'রে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই এসেছেন। কলেজ স্কোয়ারে জনসমুদ্রে যেন জোয়ার নেমেছে। ভীড় ঠেলে তরুণ ছাত্ররা কেউ কেউ কোন রকমে সংস্কৃত কলেজের প্রাচীরের উপর উঠেছে। আশপাশের গাছগুলো পর্য্যন্ত লোকের ভারে ঝুলে পড়েছে। রাস্তার গ্যাসপোষ্ট থেকে আরম্ভ ক'রে বাড়ীর বারান্দা পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। মেঘলা দিন, বাদ্‌লা নেমেছে বাঙলার আকাশে। সারা বাঙলার মনের আকাশেও যেন "ঘন ঘোর স্তূপে স্তবকে স্তবকে" মেঘ জমেছে। কলিকাতা শহরের কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে যারা ভীড় করেছে তারা কৌতূহলী উন্মত্ত

হেয়ারের মর্ম্মর মূর্তি

মতো তাদের মনের আকাশেও বাদল নেমেছে। দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে। কি একটা মর্ম্মান্তিক অঘটন ঘটে গেছে যেন বাঙলার ইতিহাসে।

স্কচ্‌ ওয়াচমেকার ডেভিড হেয়ার সাহেব মারা গেছেন। কাঁদছে সুদূর বাঙলার বাঙালীরা, বাঙলার শ্রেষ্ঠ দেশকর্ম্মী সমাজ-সেবক শিক্ষাব্রতী ও কর্ম্মবীররা, বাঙলার তরুণ যুবক ও ছাত্ররা, শত শত গৃহস্থ বাঙালী পরিবার, হাজার হাজার দীন-দুঃখী বাঙলার জনসাধারণ। ইতিহাসের একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? নিশ্চয়ই তাই। ইতিহাসে এ রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার দু'-একটা ঘটে। বাঙলা দেশেও যা দু'-একটা ঘটেছিল তার মধ্যে এ হ'ল একটা অন্যতম ঘটনা। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে ১৮৪২ সালের ১লা জুন বাঙলা দেশ ও বাঙালী তার পরমাত্মীয় অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ডেভিড হেয়ার সাহেবকে হারিয়েছিল। তাই বাঙলার রাজধানী কলিকাতার ঘরে-বাইরে বাদলা নেমেছে।

ভীড় ঠেলে বৃদ্ধ পাদ্‌রী সাহেব, রেভারেণ্ড ডাঃ চার্লস উপস্থিত হলেন। হেয়ার সাহেবের কফিন রাস্তার উপরে আনা হ'ল। জনসমুদ্র তখন উদ্বেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা গেল অনেকের। কারা এরা? খৃষ্টান নয়, পাদ্‌রীও নয়, সাহেবও নয়। হিন্দুই বেশী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের সংখ্যাও অল্প নয়। বাঙলার দিক্‌পালরা, যাঁরা হেয়ার সাহেবের শবানুগমন করছেন, তাঁদের চোখেও আজ জল ছল্‌-ছল্‌ করছে।

এই ভাবে সুদূর বাঙলা দেশে এক জন বিদেশী স্কটল্যাণ্ডবাসী সাহেবের জীবনের শেষ হ'ল। যবনিকাপাত হ'ল তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্ম্মজীবনের উপর। জন্ম তাঁর স্কটল্যাণ্ডে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে। জীবনের সুরু তাঁর এক জন নগণ্য ওয়াচমেকাররূপে। নব-যৌবনের প্রারম্ভে পঁচিশ বছর বয়সে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁকে আমরা দেখতে পাই কলিকাতা শহরে ওয়াচমেকাররূপে। তার পর ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তাঁর একটি বিজ্ঞপ্তি "গবর্ণমেণ্ট গেজেটের" অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার বাঙলা মর্ম্ম হ'ল :

"ডেভিড হেয়ার—ওয়াচমেকার, তাঁহার বন্ধুগণ ও সর্ব্বসাধারণকে এতদ্দারা জানাইতেছেন যে, তিনি আজ হইতে তাঁহার ব্যবসায় অবসর গ্রহণ করিলেন। গত আঠারো বৎসর যাবৎ তাঁহারা যেরূপ উদার ভাবে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, সে জন্য তিনি আজ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই সুযোগে তিনি তাঁর অনুগামী ব্যবসায়ী মিঃ গ্রে'র প্রতি পূর্ব্বের মতো সহৃদয়তা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন। মিঃ গ্রে বিলাত হইতে এখানে আসিয়া গত পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহকারিরূপে ঘড়ির কাজ শিখিয়াছেন। গ্রে সাহেবের চরিত্র ও কর্ম্মকুশলতা তিনি যেটুকু ব্যক্তিগত সান্নিধ্য হইতে জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।—১লা জানুয়ারী, ১৮২০।"

ঘড়ির ব্যবসা থেকে শুরু ক'রে তিনি বাঙালীর ঘরের কোণের পরমাত্মীয় পর্য্যন্ত হলেন কি ক'রে? এই কথাই সর্ব্বপ্রথম ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে মনে হয়। শ্রেষ্ঠ সমাজহিতৈষী ও শিক্ষাব্রতিরূপে যাঁর জীবনের শেষ হ'ল দেখা যায়, তাঁর জীবনের সুরু হ'ল ঘড়ির ব্যবসায়ে কেন? যে কারণেই হোক্‌, হেয়ার সাহেব যে ওয়াচমেকার ছিলেন সেটাও একটা অত্যাশ্চর্য্য ঐতিহাসিক ঘটনা। নবযুগের অগ্রদূত হ'ল ঘড়ি। সেকাল থেকে একালে, মধ্য-যুগ থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নবযুগে পদার্পণের সন্ধিক্ষণে যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক আবিষ্কার মানব-জীবনে ও মানব-সমাজে যুগান্তর এনেছিল, তার মধ্যে ঘড়ি অন্যতম। ঘড়ি নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুগের প্রতীক।

ডেভিড হেয়ার —গোপাল ঘোষ অঙ্কিত

মহাকাল শাশ্বত সনাতনের মধ্যযুগীয় কল্পনাকে ধূলিসাৎ ক'রে, শিথিল মন্থর অলস বিলাসী বাদশাহী জীবনযাত্রায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে ঘড়ির আবির্ভাব হ'ল। ছোট্ট ঘড়ির মডেলে তাই গ'ড়ে উঠলো যন্ত্রযুগের সমাজ ও জীবনযাত্রা, ঘড়ির কল-কব্জার আদর্শে তৈরী হ'ল কত রকমের জটিল যন্ত্র আর কল-কারখানা, ঘড়ির নির্দ্দেশে সুরু হ'ল আত্মবিশ্বাসী নবযুগের মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে দুঃসাহসিক অভিযান, সমাজ ভাঙাগড়া। সেই নবযুগ-প্রবর্ত্তক ঘড়ির কারিগরিতে ও ব্যবসায়ে যে বাঙলার নবযুগের অন্যতম প্রধান প্রবর্ত্তক ডেভিড হেয়ার এক জন ওস্তাদ্ ছিলেন, এটাও ইতিহাসের এক অভিনব যোগাযোগ বলতে হবে। এদেশে তাঁর আগে ঘড়ির ব্যবসা আর কেউ করেছেন কি না জানি না, ঘড়ির প্রচলন তিনি ছাড়া আর কেউ করেছেন কি না তাও জানি না। করলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু ডেভিড হেয়ারের ঘড়ির ব্যবসা এদেশে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। রাজা-মহারাজা, আমির-ওমরাহের এই দেশে যেখানে শতাব্দী আর সপ্তাহে কোন পার্থক্য ছিল না, যুগ যুগ ধ'রে সমাজ-জীবনের সর্ব্বগ্রাসী জড়তায় যে-দেশ-...তর মতো অসাড় অচৈতন্য হয়েছিল, সে-দেশের মানুষের সময়ের মূল্যবোধ জাগানো, শতাব্দী নয়, যুগ নয়, বৎসর নয়, প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা ঘণ্টা সম্বন্ধে তাদের সজাগ ক'রে তোলা, মহাকালের কূল-কিনারাহীন ভবসমুদ্রের তীর থেকে সীমাবদ্ধ দেশ কাল সমাজ ও জীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পরিবর্ত্তন, এই সমাজ-চেতনা ও সময়ের মূল্যবোধ মৃতপ্রায় জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এ-যুগের ঘড়ির এ-কাজ করার যোগ্যতা সব চেয়ে বেশী। তাই কি ডেভিড হেয়ার সাহেব এ-দেশে এসে প্রথম আঠারো বছর ঘড়ির ব্যবসা করেছিলেন? মনে হয়, ইতিহাসের দূত হয়েই তিনি এসেছিলেন, তাই তিনি ছিলেন ঘড়ি-ব্যবসায়ী। তাঁরই কাছ থেকে ঘড়ির ব্যবহার, ঘড়ির প্রচলন, সময়ের সদ্ব্যবহার ও মূল্যবোধ এ-দেশের নবযুগ-প্রবর্ত্তকেরা শিখেছিলেন কি না সেটাও কি গবেষণার বিষয় নয়? অনেকেই যে শিখেছিলেন তা কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। কারণ, ঐ ঘড়ির দোকান থেকেই তাঁর পরিচয় হ'ল বাঙলার তদানীন্তন সমাজের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠতা হ'ল সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে। ঘড়ির দোকান থেকেই তাঁর বৃহত্তর কর্ম্মজীবনের সুরু হ'ল। তাই তাঁর সহকারী গ্রে সাহেবকে তাঁর ব্যবসা হস্তান্তরিত ক'রে হেয়ার সাহেব যথাসময়ে ঘড়ির দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে বাঙলার সমাজ-জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে।

ওয়াচমেকার হলেন শিক্ষাব্রতী

জীবনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের জন্য আর একটি জিনিসের প্রয়োজন। সে হ'ল শিক্ষা। ওয়াচমেকার ডেভিড হেয়ার শিক্ষাব্রতিরূপে বাঙলার সমাজে অবতীর্ণ হলেন। এ-দেশে শিক্ষার অবস্থা তখন কি ছিল?

পণ্ডিত আর মৌলবীদের টোল পাঠশালা মক্তব মাদ্রাসায় যে শিক্ষা এ-দেশে দেওয়া হত তা হাতেখড়ি বর্ণপরিচয়, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের হিসাব নিকাশ, বড় জোর একটু শাস্ত্রানুশীলনের ক্ষমতা অর্জ্জন ক'রেই শেষ হয়ে যেত। জীবনের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে সে শিক্ষার কোন যোগ ছিল না। অবশ্য যেমন সমাজ তেমনি তার শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। যেমন কূপমণ্ডূক সমাজ, তেমনি সঙ্কীর্ণ তার শিক্ষা-ব্যবস্থা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত "কলিকাতা স্কুল সোসাইটির" প্রথম রিপোর্টে (১৮১৮-১৯) এ দেশের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়:

> বর্ণপরিচয় অক্ষরপরিচয় এবং পাটিগণিতের সামান্য জ্ঞানের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ। পাঠাভ্যাস কারও নেই বললেই হয়। দু'-একটি পাঠশালায় দু'-এক জন ভাল ছাত্রকে হাতের লেখা মুসাবিদা করতে দেখা গেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের হস্তাক্ষর এমনই কাঁচা যে তাদের পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করতে রীতিমত গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হয়। শুদ্ধ বানানের কোন বালাই নেই, অক্ষরের মূর্ত্তি তো চেনাই যায় না। আর বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানের কথা উত্থাপন না করাই উচিত। কারণ, এ-সব পাঠ্য-বিষয়ের অন্তর্ভুক্তই নয়।

এই হ'ল তখনকার শিক্ষার অবস্থা। "কলিকাতা স্কুল সোসাইটি" এই রিপোর্টে এই প্রস্তাব করেন যে "কলিকাতা শহরে এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অবিলম্বে সাধারণের শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা এবং বুদ্ধিমান বালকদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এদেশীয় প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করাও অত্যন্ত প্রয়োজন।" ডেভিড হেয়ার এই স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা কালেই এর কমিটির এক জন অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন সে-রকম অনুভূত হয়নি। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত-চর্চাতেই ইংরেজ শাসকরা গোড়াতে উৎসাহ দিতেন, পণ্ডিত আর মৌলবীদের দিয়ে আইন-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়ে নিলেই তাঁদের কাজ চলে যেত। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে নদীয়া ছাড়াও কলিকাতায় সংগীত-চর্চার একটি বড় কেন্দ্র ছিল দেখা যায়। কলিকাতায় ন্যায় ও স্মৃতি চতুষ্পাঠীর সংখ্যা দেখলেই তা অনুমান করা যায়।

কলিকাতার চতুষ্পাঠী

পণ্ডিতের নাম	অবস্থান-কেন্দ্র	ছাত্রসংখ্যা
অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ	হাতিবাগান	১৫
রামকুমার তর্কালঙ্কার	ঐ	৮
রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার	ঐ	৮
রামদুলাল চূড়ামণি	ঐ	৫
গৌরমণি ন্যায়ালঙ্কার	ঐ	৪
কাশীনাথ তর্কবাগীশ	ঘোষালবাগান	৬
রামসেবক বিদ্যাবাগীশ	শিকদারবাগান	৪
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বাগবাজার	১৫
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	ঐ	৬
রামকুমার শিরোমণি	ঐ	৪
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	টালা	৫
শম্ভু বাচস্পতি	ঐ	৬
শিবরাম ন্যায়বাগীশ	লালবাগান	১০
গৌরমোহন বিদ্যাভূষণ	ঐ	৪

পণ্ডিতের নাম	অবস্থান-কেন্দ্র	ছাত্রসংখ্যা
হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন	হাতিবাগান	৪
রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন	সিমলা	৫
রামহরি বিদ্যাভূষণ	হরিতকী বাগান	৬
কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার	আড়কুলি	৬
গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন	ঐ	৫
পীতাম্বর ন্যায়ভূষণ	ঐ	৫
পার্ব্বতী তর্কভূষণ	ঠনঠনিয়া	৪
কাশীনাথ তর্কালঙ্কার	ঐ	৩
রামনাথ বাচস্পতি	সিমলা	৯
রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত	মলাঙ্গা	৬
রামতনু বিদ্যাবাগীশ	শোভাবাজার	৫
রামকুমার তর্কপঞ্চানন	বীরপাড়া	৫
কালীদাস বিদ্যাবাগীশ	ইটালী	৫
রামধন তর্কবাগীশ	সিমলা	৫

এ ছাড়া বাঁশবেড়ে, ত্রিবেণী, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, গোন্দলপাড়া, ভদ্রেশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, বালি, আন্দুল প্রভৃতি স্থানেও ন্যায় ও স্মৃতি চতুষ্পাঠী ছিল। এই সব পণ্ডিত ও টোল চতুষ্পাঠীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের হঠাৎ-ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা, ইংরেজদের দেওয়ান, মুন্সী, কেরাণী, বেনিয়ান ও দালালরা এবং তাঁদের বংশধরেরা। পণ্ডিত পালন করা, টোল-চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা ক'রে শাস্ত্রানুশীলনে উৎসাহ দেওয়া তখনকার দিনের হঠাৎ-সম্ভ্রান্তদের সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের একটা প্রধান নিদর্শন ছিল। সখের যাত্রা, বুলবুলি ও হাফ-আখড়াইয়ের দলের মতো ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে এ-দেশে এই সব সখের টোল-চতুষ্পাঠীও অনেক গজিয়ে উঠেছিল, কবিওয়ালাদের মতো পণ্ডিতেরাও হঠাৎ-বড়লোকদের তথাকথিত আভিজাত্যের খোরাক যোগাচ্ছিলেন। সকলেই যে শুধু তাই করছিলেন তা নয়, তবে অধিকাংশই যে তাই করছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা না হ'লে স্কুল সোসাইটির প্রথম রিপোর্টে শিক্ষার এ-রকম শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করা হত না। ইংরেজ শাসকরাও তাঁদের শাসনের প্রয়োজনে তখন আরবী, ফারসী, সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন, নতুন শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেননি। কলিকাতা মাদ্রাসা, কাশীর সংস্কৃত কলেজ ইত্যাদি এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়, এ-দেশের প্রচলিত ধারানুসারে পণ্ডিত ও মৌলবী তৈরী করার জন্য। ক্রমে নতুন শিক্ষার প্রচলন, ইংরেজী শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং পুরাতন প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা ইংরেজরা এবং এদেশীয় ব্যক্তিরা অনুভব করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রেভারণ্ড মে নামে এক পাদরী সাহেব চুঁচুড়ায় একটি মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ-দেশের ইংরেজী স্কুলের মধ্যে এইটিই সর্ব্বপ্রথম। তার পর ফিরিঙ্গী সাহেব শেয়বোর্ণ কলিকাতায় একটি ইংরেজী স্কুল খোলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙলার অনেক কৃতী পুরুষের বাল্যশিক্ষা এই স্কুলে হয়। ক্রমে আরাটুন পিটার্স, রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত প্রভৃতির ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু এতেও ইংরেজী শিক্ষার দুরবস্থা দূর হয় না। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার নিজে উদ্যোগী হয়ে ইংরেজী শিক্ষার জন্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। উদ্দেশ্য শুধু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া নয়, নতুন যুগের নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার আলোক এ-দেশের লোককে বিতরণ করা।

হিন্দু কলেজ—নবযুগের শিক্ষাকেন্দ্র

ঘড়ির ব্যবসা হেয়ার সাহেব হঠাৎ ছাড়েননি। ব্যবসা কালে এ-দেশের সমাজনেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল দেখা যায়। এই পরিচিতদের মধ্যে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামমোহনকে কেন্দ্র ক'রে তখন কলিকাতা শহরে সামাজিক প্রগতির এক যুগান্তকারী আন্দোলন সুরু হয়েছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, কালীনাথ মুনসী, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তখন রামমোহনপন্থী। ডেভিড হেয়ারও রামমোহনের এই প্রগতি আন্দোলনের ধারা গভীর উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। রামমোহন রায়ের একটি সভায় একবার হেয়ার সাহেব বিনা নিমন্ত্রণেই উপস্থিত হন। পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা ইত্যাদি দূর করার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি স্থাপনের কথা এই সভায় যখন আলোচনা হয়, তখন হেয়ার সাহেব সর্ব্বাগ্রে একটি ভাল ইংরেজী স্কুল স্থাপনের কথা বলেন। তাঁর যুক্তি হল, নতুন শিক্ষা পেলেই এ-সব কুসংস্কার কেটে যাবে। হেয়ার সাহেবের এই প্রস্তাব তখনই অবশ্য কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে আসেন। হেয়ার সাহেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। হাইড ঈষ্ট তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এই সময় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঈষ্ট সাহেবের রোজ ভোর বেলা প্রাতর্ভ্রমণের সময় দেখা হ'ত। কথা-প্রসঙ্গে তিনিও এই প্রস্তাব তোলেন! এই সব আলাপ-আলোচনার ফলে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে (না, ১৮১৬ খৃঃ)* ঈষ্ট সাহেব তাঁর কলিকাতার ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটস্থ বাসায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেন। হিন্দু কলেজের সঙ্গে রামমোহন রায়ের নাম জড়িত থাকার প্রস্তাবে রক্ষণশীলের দল আপত্তি জানান। রামমোহন রায় তাঁর নামের জন্য এত বড় একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'তে দেবার মতো ব্যক্তি নন। প্রথমে হিন্দু কলেজের নামকরণ "মহাবিদ্যালয়" হয়, এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী আপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে যোড়াসাঁকোতে ফিরিঙ্গি কমল বসুর গৃহে স্থানান্তরিত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার গোলদীঘির উত্তরাংশে অবস্থিত সংস্কৃত কলেজ ভবনে (১৮২৪, ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত) হিন্দু কলেজ স্থানান্তরিত হয়। এই জমির মালিক ছিলেন হেয়ার সাহেব। সামান্য মূল্যে তিনি এই জমির স্বত্ব গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে দেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী হিন্দু কলেজ এবং ১৮১৮, ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা কালেই হেয়ার সাহেব কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। হিন্দু কলেজের ভিত্তি স্থাপন প্রসঙ্গে হেয়ার সাহেবের নাম ছাপার

---

* রাজনারায়ণ বসুর "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধে ১৮১৪ সাল আছে, প্যারীচাঁদ মিত্রের "A Biographica Sketch of David Hare" গ্রন্থে ১৮১৬ খৃঃ আছে।

হয়েছে দেখা যায় না। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন কলেজ-কর্তৃপক্ষ হেয়ার সাহেবকে "ভিজিটর" হবার জন্য অনুরোধ করে পত্র লেখেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর মনোনীত হন। তাহলেও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার এক জন যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ডেভিড হেয়ার তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এই গৌরবের অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে হ'লে ইতিহাস বিকৃত ক'রে করাই সম্ভবপর।

হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি পরিচালিত স্কুল ছাড়াও হেয়ার সাহেব আগে থেকেই নিজের অর্থে, সামর্থ্যে ও তত্ত্বাবধানে কয়েকটি পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। তার মধ্যে সিমলা পাঠশালা, আরপুলি পাঠশালা ও পটলডাঙ্গা স্কুল উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে পটলডাঙ্গা স্কুল প্রথমে স্কুল সোসাইটি ও হেয়ার সাহেব উভয়ের অর্থে পরিচালিত হয়ে পরে সোসাইটির পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আসে। এই ভাবে দেখা যায়, এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় হেয়ার সাহেব শুধু যে উদ্যোগী ছিলেন তা নয়, তিনি নিজের হাতে, নিজের অপরিসীম অধ্যবসায়, যত্ন ও স্বার্থত্যাগের ফলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কৃতী ছাত্র দুই-ই গ'ড়ে তুলেছিলেন। স্কুল সোসাইটির একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, নিম্ন ব্যয়ে দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের হিন্দু কলেজে পড়ানো। ক্যাপ্টেন আরভিনের পরে হেয়ার সাহেব এই ছাত্রদের সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত হন। একবার সোসাইটির কয়েক জন ছাত্র বহু দিন কলেজ কামাই করে এবং কর্তৃপক্ষ তাদের নাম কেটে দিয়ে হেয়ার সাহেবকে জানান। হেয়ার সাহেব তার উত্তরে সোসাইটিকে লেখেন :

"হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ আমাদের কয়েক জন ছাত্র সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মিঃ আরভিনের কলিকাতা ত্যাগের সময় হইতে যখন আপনারা আমাকে সোসাইটির কলেজী ছাত্রদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন তখন এই বিষয়ে আমার মতামত জানাইবার প্রয়োজন মনে করি।...এই পদ গ্রহণের পর হইতে আমি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে একবার ও প্রায়ই দুইবার কলেজ পরিদর্শন করিয়াছি, সযত্নে হাজিরা-রেজিষ্টার পরীক্ষা করিয়াছি এবং অধ্যক্ষের নিকট ছেলেদের আচরণ সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইয়াছি।...সোসাইটির তরফ হইতে হিন্দু কলেজে ছাত্রদের পাঠাইবার উদ্দেশ্য হইল—এমন এক দল সুশিক্ষিত যুবক সৃষ্টি করা, যাহারা পরে তাহাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিবে। যে-সব ছেলে বেশ কিছু দিন কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে মাত্র কয়েক দিনের অনুপস্থিতির জন্য তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া এই উদ্দেশ্যের আদৌ অনুকূল নহে।"

এই চিঠিখানা থেকে হেয়ার সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর একটা চমৎকার আভাস পাওয়া যায়। ছাত্রদের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হননি। শিক্ষাই ছিল তাঁর প্রাণ, শিক্ষাই তাঁর ধর্ম্ম। তাই ছাত্ররাই ছিল তাঁর সর্বস্ব, তাঁর নিজের সন্তানের মতো। কাজের বিরাম ছিল না তাঁর। অবশ্য তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠতেন বেলা ৮টার সময়। তাতে কি? তাঁর গৃহে সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সব সময় ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীদের ভিড় জ'মে থাকত। ছেলেদের তিনি শুধু কি খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করতেন? নানা রকমের খেলনা দিতেন, রঙ-বেরঙের সব ছবির বই দিতেন। তাঁর চেয়ার ঘিরে ছেলেদের হল্লা হৈ-চৈ লেগেই থাকত, প্রশ্নবাণে তারা তাঁকে জর্জ্জরিত করতেও ছাড়ত না। বেলা ১০টার মধ্যে তাঁর সাদাসিদা প্রাতরাশ খেয়ে তিনি তৈরী হয়ে নিতেন। এদিকে পাল্কী প্রস্তুত। বইয়ের বোঝা, ওষুধ-পত্তরের বাণ্ডিল সব পাল্কীতে বোঝাই হ'ল, হেয়ার সাহেব উঠলেন। যত দিন আরপুলি পাঠশালা ছিল, তত দিন প্রথমে সেখানে যেতেন। পথে ছেলেরা তাঁর পাল্কীর পিছু-পিছু ছুটত। পাঠশালায় গিয়ে তক্তাপোষের উপর ব'সে তিনি ছাত্রদের পড়া-শুনার তদারক করতেন। সেখান থেকে হিন্দু কলেজ, মেডিকাল কলেজ, পটলডাঙ্গা স্কুলে যেতেন। তার পর অনুপস্থিত ছাত্রদের নাম-ঠিকানা রেজিষ্টার থেকে নিয়ে তাদের বাড়ী-বাড়ী যাওয়া, অসুস্থ ছাত্রদের শুশ্রূষা করা, ওষুধ বিলি করা, কাউকে বই কিনে দিয়ে আসা ইত্যাদি নানা কাজ তাঁর ছিল। রাজনারায়ণ বসু তাই লিখেছেন :

"আমি এক জন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন।" (সে কাল আর এ কাল)

হেয়ার সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে এই ধরণের মতামত আরও অনেক উদ্ধৃত করা যায়, কিন্তু তাতে লাভ নেই। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে শুধু নয়, আদর্শ মানুষ হিসাবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় এর মধ্যে। শুধু স্কুল-পাঠশালা নয়, হিন্দু কলেজ নয়, কলিকাতার মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠা কালেও যে, হেয়ার সাহেব কতটা উদ্যোগী ছিলেন তা ব্রামলি সাহেবের রিপোর্ট থেকেই বোঝা যায়। ব্রামলি সাহেব পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করেছেন যে হেয়ার সাহেব না থাকলে মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠা, এমন কি কলেজের কাজ চালানোও সম্ভব হ'ত না! হেয়ারের ছাত্ররাই কুসংস্কার ও গোঁড়ামি বর্জ্জন ক'রে প্রথম আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য এগিয়ে যান, সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বাধা-বিপত্তি দূরে ঠেলে ফেলে শব-ব্যবচ্ছেদাদিতে শিক্ষানবীশী করেন। তেমনি হেয়ার সাহেবের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে মানুষ স্কুল-পাঠশালার ছাত্ররা, হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই বাঙলা-দেশে নবযুগের শিক্ষার ও জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেছেন, তাঁদের আলোকেই বাঙলার অগ্রগতির নতুন পথ আলোকিত হয়ে উঠেছে। এই হিন্দু কলেজই পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়েছে (সিনিয়র বিভাগ) এবং জুনিয়ার বিভাগ হয়েছে হিন্দু স্কুল। এ হ'ল ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের কথা।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরেই এ-দেশে নবযুগের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে বলা চলে। এই মহাবিদ্যালয়ই বাঙলার নবযুগের জ্ঞান-জাগরণের মহাকেন্দ্র। এই হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, নবযুগের নব্য বাঙলার প্রবর্ত্তক। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জ্জি, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, রাধানাথ শিকদার, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র,

শবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই হিন্দু কলেজ তথা প্রেসিডেন্সী লেজের ছাত্র। এই হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই তাদের শিক্ষক রোজিওর শিক্ষার প্রেরণায় অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজ ক্লাবের মতো একাডেমিক এসোসিয়েশন" (Academic Association) তিষ্ঠা করেন (ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউশনে)। ইতিহাস, ভূগোল, ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই এসোসিয়েশনে লোচনা ও বিতর্ক হ'ত এবং ডেভিড হেয়ার প্রায়ই এই সভায় পস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিতেন, ছাত্রদের উৎসাহও দিতেন। রোজিও কলেজ ছাড়ার পর ডেভিড হেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি র্বাচিত হন। ১৮৩৮ খৃষ্টব্দের ১২ই মার্চ্চ রামগোপাল ঘোষ, রীচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি কয়েক জন মিলে সংস্কৃত লেজে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি সভা আহ্বান করেন এই সভায় "সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল লেজ" (Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেক াসে এই সভার একবার ক'রে বৈঠক বসবে, সেখানে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত বিধ বিষয় নিয়ে মৌখিক ও লৈখিক আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ করা হবে, কোন ধর্ম্মবিষয়ে কিছু আলোচনা হবে না। ডেভিড হেয়ার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে এই সোসাইটির 'অনারারী ভিজিটার" নির্ব্বাচিত করা হয়। একাডেমিক এসোসিয়েশনের মতো এই সোসাইটির প্রত্যেক সভায় হেয়ার সাহেব উপস্থিত থেকে বক্তৃতা ও বিতর্কে যোগদান করতেন।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, রামমোহন থেকে "ইয়ং বেঙ্গলের" যুগ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের নব জাগরণের প্রত্যেকটি আন্দোলনের সঙ্গে হেয়ার সাহেব ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। আধুনিক সমাজ-সংস্কারে ও শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর দান শুধু অসামান্যই নয়, তিনি এক জন প্রধান উদ্‌যোগী। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যেমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, রামমোহনের সভা-সমিতিতে তিনি যেমন যোগ দিতেন, তেমনি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে তাঁরই ছাত্ররা যখন বিভিন্ন ক্লাব, এসোসিয়েশন ও সোসাইটা প্রতিষ্ঠা ক'রে নব্য বঙ্গের আন্দোলন সুরু করলেন তখন তিনি তার থেকে দূরে স'রে থাকেননি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্‌যোগী তিনি ছিলেন, ইংরেজী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান প্রবর্ত্তকরূপে তাঁর নাম সর্ব্বাগ্রে করতেই হবে। তাছাড়াও নব্য বঙ্গের প্রাণস্বরূপ সে "একাডেমিক এসোসিয়েশন" ও "সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ" তারও এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হেয়ার সাহেব ছিলেন। সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা উদারহৃদয় ডেভিড হেয়ারের সমকক্ষ মানুষের মতো মানুষ আমাদের এ-দেশের মাটিতেও বেশী জন্মাননি বললে মিথ্যা বলা হয় না।

এই হ'ল হেয়ার সাহেবের পরিচয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে জনস্রোত অকারণে নামেনি। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাব্রতীদের স্মৃতিরক্ষার কথা হ'ল তখন দেখা গেল, এ-হেন ডেভিড হেয়ারের নাম বাদ পড়ে গেল। স্যার হাইড ঈষ্ট ও ডাঃ উইলসনের স্মৃতিরক্ষায় সকলে অগ্রণী হলেন। বাঙলার দুর্ভাগ্য বলতে হবে! আজও যেমন নেই, সে-যুগেও তেমনি আত্মবিস্মৃত বাঙালীর অভাব ছিল না। কিন্তু সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান নির্ভীক কৃতী বাঙালী সন্তানও তখন এ-দেশে অল্প ছিল না। এই অন্যায় অবিচার দেখে হিন্দু কলেজ ও স্কুল সোসাইটির প্রবীণ ছাত্ররা স্থির থাকলেন না। তাঁরা সভা-সমিতি ক'রে হেয়ার সাহেবকে অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা করলেন। স্থির হ'ল, তাঁর একটি চিত্র আঁকানো হবে এবং একখানি মানপত্র দেওয়া হবে। যাঁরা এই ব্যাপারে অগ্রণী হলেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জ্জী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শীকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এই রকম ৫৩৫ জন ছাত্রের স্বাক্ষর সহ হেয়ার সাহেবকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। হিন্দু কলেজের যুবক ছাত্রদের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত ক'রে তাঁদের গুরুস্থানীয় শিক্ষক ডিরোজিও এই সময় একটি সনেট রচনা করেন। সনেটটির নাম" To those who originated and carried into effect the proposal for procuring a portrait of David Hare, Esq" তার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

Your hand is on the helm—guide on, young men
The bark that's freighted with your country's doom,
Your glories are but budding ; they shall bloom
Like fabled Amarnaths Elysian, when
The share is won, even now within your ken
And when your torch shall dissipate the gloom
That long has made your country but a tomb,
Or worse than tomb, the priests, the tyrant's den.
Guide on, young men ; your course is well begun ;..."

হেয়ার সাহেবের যোগ্য সম্মান যারা দেবার তারা দিয়েছে। তরুণ বাঙলা, যুবক বাঙলা, নবযুগের নতুন শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত নব্য বাঙলা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছে, তাঁর ঋণ স্বীকার করেছে। রক্ষণশীল তমসাচ্ছন্ন বাঙলার কটাক্ষ ও ঔদাসীনতা তারা অগ্রাহ্য করেছে। নবযুগের বাঙলার উত্তরাধিকারী আজকের তরুণ বাঙলা, যুবক বাঙলাও হেয়ার সাহেবকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে, নব্য বাঙলার আলোক-বর্ত্তিকা তারা আরও দুর্গম, আরও অন্ধকার পথে বহন ক'রে এগিয়ে যাবে। কারও কটাক্ষ, কারও ভ্রূকুটি তাদের চলার পথ রোধ করতে পারবে না। ডিরোজিওর বাণী তাদের কানেও প্রতিধ্বনিত হবে, হেয়ার সাহেবের স্মৃতির সঙ্গে—

Your hand is on the helm—guide on, young men

* * * *

Guide on, young men ; your course is well begun ;...

[এই প্রবন্ধটি এই বইগুলি অবলম্বনে রচিত : প্যারীচাঁদ মিত্রের "A Biographical Sketch of David Hare", রাজনারায়ণ বসুর "সে কাল আর এ কাল" এবং "বিবিধ প্রবন্ধ" ("হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" নামক প্রবন্ধ), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"]

স্মৃতিকথা

শ্রীইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী

বৌঠাকুরাণীর অনুমতিক্রমে
বৌঠাকুরাণীর হাট হইতে পুনর্মুদ্রিত

[এই লেখাটি আমার অনেক কালের পুরোনো দৈনিক লিপি থেকে নেওয়া। তবে উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে একটু সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি—দেশবন্ধুর মৃত্যু সম্পর্কেই সব কথা সংশ্লিষ্ট।—লেখিকা]

১৭-৬-২৫—কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।—এই তো সেদিন, এখনো এক হপ্তা পেরোয়নি, তাঁকে দার্জিলিঙে দেখে এলুম। অসুস্থ হলেও এমন কিছু শয্যাগত রোগী নন—হাসছেন, গল্প করছেন, হেঁটে বেড়াচ্ছেন—আর এরি মধ্যে কল্ বন্ধ হয়ে গেল—সে মানুষটা পর্য্যন্ত নেই?—এই 'আছে' আর 'নেই'-এর মধ্যে যে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড তফাৎ, তা ঘটতে এত অল্প সময় লাগে বলেই প্রথমে শুনে বিশ্বাস করা এত শক্ত মনে হয়, যেন সব ভেল্কিবাজী।···ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে গেলে এ বিষয়ে কিছু বলবার নেই, উচ্চ-নীচ সকলেই এই এক জায়গায় সমভাবে বাক্যহত, মাথা নত। তবে দেশের দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি যে পূর্ণ গৌরব ও যশের উচ্চশিখরে থাকতে থাকতে চলে গেলেন, সে এক প্রকার ভালোই। কারণ, রাজনীতির বিচিত্র উত্থানের পর পতন বিচিত্র নয় আর এরি মধ্যে চক্র-পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়েছিল। স্বরাজ দল গেল, কারণ ঐ এক জনই তার অবলম্বন ছিল, যেমন এদেশে সর্ব্বত্রই হয়ে থাকে। বংশের উত্তরাধিকারীর জন্য আমরা মহা ব্যস্ত, কিন্তু সুযোগ্য মানসপুত্রের দ্বারা ভাবের বংশরক্ষা আমাদের বড়লোকদের কপালে প্রায় ঘটে না। দেখা যাক, দেশবন্ধুর মত দেশনায়ক আবার কবে কে ওঠে। তবে স্বরাজের 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী' ও 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' রাজত্বের বিনাশ কোন কালে হবে না।

১১-৬-২৫—কাল বেলা ১০টা-১২টার মধ্যে আমরা গাড়ী করে এক চক্র ঘুরে চিত্তরঞ্জনের শেষ যাত্রা দেখে এলুম—এ এক প্রকার বরযাত্রা বললেই হয়,—তফাতের মধ্যে কন্যাপক্ষের 'মরণ' আলিঙ্গন, বিপুল জনতা, বিশাল ভীড়। আর তারি মধ্যে ফুলাচ্ছাদিত মৃতদেহ গান-বাজনা, নিশেন, পুষ্পবৃষ্টি, ফুলের তোরণ, লাজবর্ষণ ও জলসিঞ্চনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। রাজোচিত সমারোহ বটে, এইটুকুই বাসন্তীর সান্ত্বনা। লোক তো ঘরে ঘরে পলে পলে মরে,—আত্মীয়-বন্ধু ছাড়া কে তার খোঁজ রাখে, কে তার জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে? কিন্তু তার স্বামীর অভাবে আজ দেশশুদ্ধ শোকাচ্ছন্ন—মহানগরী লোকে লোকারণ্য। অধিকাংশ গেছে শুধু চোখের দেখা দেখতে, কৌতূহল চরিতার্থ করতে; কেবল অল্পসংখ্যকই গেছে সত্যকার সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে। তবু গেছে তো,—আর বড় সুখে যায়নি। এই রোদ্দুরে বেশীর ভাগ খালি পায়ে ঐ ঠাসের মধ্যে অতটা পথ প্রাণ হাতে করে চলা বড় সোজা কথা নয়, এবং অনেকটা আন্তরিকতার পরিচায়ক কেউ কেউ Crowd psychology অস্বীকার করেন। কিন্তু বহু লোকের একত্র সমাবেশে যে ঐক্য ভাব বা মিলিত কাজ হয়, তা তাদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তির চেয়ে কোন বড় সত্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত বলেই বোধ হয়। শুনলুম, সকলে 'জল জল' করে অস্থির হচ্ছিল। মুখের ভেতরের চেয়ে মাথার ওপরে পাবার দিকেই বেশী ঝোঁক। অবশেষে Corporatio[n] না কি রীতিমত দমকল ছেড়ে দিয়েছিল। বড় বড় লরী-ভরা 'শীত[ল] পবিত্র জল' আগে-পাছে যাচ্ছিল, আর রাস্তা তো আগে আগে জ[লে] চুবিয়ে রাখছিল। আমি ভাবছিলুম যে দেশী প্রাণের মধ্যে এ[ত] দরদ স্বদেশী নগরপাল দ্বারাই সম্ভব। এক দিনের মধ্যে এত বন্দোবস্ত করতে পারাটাই আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হয়। তবে ত্রুটি ধরতে গেলে বলা যায়—যাত্রাটা সবশুদ্ধ আর এক শোভাযাত্রা করা যেতে পারত যদি (এক জন বল্লেন) কলকাতায় ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীকে নিজ নিজ বেশভূষায় দলবদ্ধ ভাবে এবং ভিন্ন পাড়ার লোককে নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রায় যোগ দেওয়ানো যেত। স্বদেশী নিশান ও সেই তিন রঙের ফুল-পাতায় নিশানের ও বড় বড় ফুল-পাতায় সজ্জিত তোরণের ওপর 'বন্দে মাতরম্', 'জননী জন্মভূমিশ্চ' ইত্যাদি, 'একতাই বল' প্রভৃতি দেশবোধক মন্ত্র লেখা ছিল। এক দল কীর্ত্তনে 'হরিবোল' করতে করতে ও এক দল শিখ কালো নিশান নিয়ে চলেছিল। শুনলাম ডাক্তার প্রফুল্ল রায়, মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত কাঁধ দিয়েছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা বুঝি ষ্টেশন থেকে সোজা বাড়ী গিয়েছিলেন। বাসন্তীর পক্ষে আর পারা শক্ত। উত্তেজনা মনের পক্ষে বলকর হলেও শরীরের পক্ষে যথেষ্ট ক্লান্তিকর। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় তার যে মরণযাত্রা করতে হয়েছিল, তার ভীষণ অবসাদের কথা কাল ক'জন মনে করেছিল? বড়লোকের উপযুক্ত স্ত্রী হওয়া শক্ত কাজ ছেলেও প্রায় বংশরক্ষা করে মাত্র, স্মৃতিরক্ষা করে না। আশু মুখুজ্যে এবং চিত্তরঞ্জন দু'জনেরই বিদেশে হঠাৎ মৃত্যুর কথায় আমাদের চলিত 'মাটি কেনা'র কথা মনে হয়,—যার সেখানে মাটি কেনা থাকে, সেখানেই মৃত্যু হয়। কেউ বলে Step Aside অলক্ষুণে বাড়ী, ইত্যাদি। কত কথাই এখন উঠবে, চিত্তকেও কত রকম অলৌকিক ক্ষমতায় ভূষিত করবে। কিন্তু দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত স্থান ও কাজের মূল্য নির্দ্ধারিত হতে ধীর শান্ত জহুরীর দরকার, সময় দরকার। আর তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করতে যে লোক দরকার, তার শুভাগমন কবে হবে কে জানে?

২০-৬-২৫—কাল সন্ধ্যায় একবার বাসন্তীকে দেখতে গিয়েছিলুম তাদের ১৪৮ নং রসা রোডের বাড়ীতে গিয়ে দেখি চতুর্থীর পালা তখনো সাঙ্গ হয়নি, একটা বড় সামিয়ানার তলায় দুই ভাগে মেয়ে-পুরুষে বসে কীর্ত্তন না কি শুনছে! শুনলুম বাসন্তী তার মেয়ের বাড়ীতে আছে তাই কাছেই সেখানে গেলুম। বাড়ীটা বেশ ভাল। আগে কখনো যাইনি। উপরে গিয়ে যে ঘরে যেতে বল্লে তাতে দেখলুম একটা নীচের বিছানা ও কম্বল পাতা রয়েছে, তার ওপর বাসন্তী, অপর পাশে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর লেখক বসে, আর ঘরের চারি পাশে আত্মীয়-বন্ধু মেয়ের দল। বাসন্তীর রোগা চেহারা আরো কাহিল ও খদ্দরের সাড়ীর মোছা পাড় একেবারে মুছে গেছে, হাত খালি। আমাদের দেশের এই বেশভূষার তফাৎটা সাধারণতঃ যত চোখে ও মনে লাগে, ওর বেলা ততটা লাগল না। মহাত্মাজীর সেই কৌপীন-পরা সদাপ্রসন্ন মূর্ত্তি এত কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের আগে ঘটেনি। আমরা

যতক্ষণ কথাবার্ত্তা বলছি, তিনি একটা কি লিখতে লাগলেন। বাসন্তীর সঙ্গে স্বামীর অসুখের কথা, কালকের সমারোহ ও সমবেদনার কিছু কিছু কথা হল। তাঁর হপ্তায় হপ্তায় যে জ্বরটা দার্জ্জিলিঙে হচ্ছিল, সেইটেই এবার বেশী রকম কাঁপুনি দিয়েই এল: পরদিন জ্বর কমলেও পা ফুলে কি যে অসুখ হল কেউ বুঝতে পারল না। সারাতেও পারল না। অ্যালপ্যাথিতে শুনলুম তাঁর মোটেই বিশ্বাস ছিল না। তাই শুধু ডাক্তার ডি, এন রায়কেই দেখানো হয়েছিল; অন্য ডাক্তার ডাকবার কথা যখন মনে হল তখন আর সময় ছিল না। কেউ বলে এরিসিপেলস্, কেউ বলে কোন রকম বিষ শরীরে ঢুকেছিল,—যা হোক, এখন সে আলোচনা বৃথা! শেষ পর্য্যন্ত বিষেরই তো জয় হল। দু'টি কথা উল্লেখযোগ্য মনে হয়। এক, বাসন্তী বড় ঠিক কথা বল্লে যে তিনি যদি আমার জন্য লাখ টাকা রেখে যেতেন তাতে যা না হত, এই যে সম্মানের মুকুট আমাকে পরিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই আমার ভাল। তা তো নিশ্চয়ই,—ক'জন বাঙ্গালী মেয়ের কপালে এ যশ ঘটে? আর এক হচ্ছে, ওর শাশুড়ী না কি বলেছিলেন, কারো অসুখ থাকতে তাকে দার্জ্জিলিঙে নিয়ে যেও না,—তাঁর কথা অমান্য করে এই হল। বোধ হয়, তাঁর ছোট ছেলে ঐখানে মারা যায়, তাই বলে থাকবেন। প্রফুল্ল দাসের সঙ্গেও দেখা হল! চুল পেকে গেছে।

মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলছিলেন দেখে বাসন্তী প্রফুল্লকে বল্লে আলাপ করিয়ে দিতে, ও বল্লে জ্যাঠা মশায়কে তিনি বড় ভালবাসেন। আলাপ করানোর অপেক্ষা না রেখে আমি নিজেই হিন্দীতে আলাপ আরম্ভ করলুম। বল্লুম, আমাদের আপনি চেনেন না, কিন্তু আপনাকে সবাই চেনে। বাসন্তী আমাদের পরিচয়ও দিলে। সেই ১৯ নং বালিগঞ্জে কোন্ কালে উনি গোখলেদের সঙ্গে খেয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হেসে বল্লেন—সে বহু দিনের কথা, আর কোট-পেন্টলুন পরে' নীচে বসে' খাওয়া নিয়ে গোখলেজী কীঠ ট্রাই করেছিলেন। মেয়েরা বল্লে, তিনি যে এক কালে ঐ বেশ পরতেন, তা এখন কল্পনাও করা যায় না। গান্ধীজী না কি বলেন যে, তিনি এখন রাণীর (বাসন্তীর) সেক্রেটারী হয়েছেন, আর তাঁর ইচ্ছে যে ৫—৭টার মধ্যে লোকে দেখা করতে আসে, তার আগে বা পরে নয়। না হলে ভোর থেকে রাত পর্য্যন্ত জনস্রোত ও চিঠির স্রোত বাসন্তীর উপর দিয়ে যাচ্ছে। সত্যি, ঐ রকম একটা নিয়ম প্রচার ও রক্ষা করতে পারলে ভাল, না হলে সম্মান-সমাদরের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। সেই লেখাটা শেষ করে মহাত্মা আমার প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন, আরও কিছু দিন আছেন। আমি শেষে বলে এলুম যে, আপনি থাকলে এঁদের পক্ষে তো ভালই, তাছাড়া দেশের পক্ষেও ভাল। কারণ কোন্ অবস্থার কি কর্ত্তব্য, তা কে যে কাকে জিজ্ঞেস করবে বা পরামর্শ নেবে, এমন একটি লোক আজ এখানে নেই।

বিপ্লবের পথে মধুসূদন ও বঙ্কিম

শ্রীতারানাথ রায়

নব-ভারতের বীজ বুনেছিলেন রাজা রামমোহন। "He nursed a feeling of great aversion to the establishment of British power in India."

বঙ্কিমের জন্মের সাত বছর আগে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন— "Supposing that a hundred years hence the native character becomes elevated from the acquirement of general and political knowledge as well as modern art and sciences, is it possible that they will not have the spirit as well as the inclination to resist effectually any unjust and oppressive measures serving to degrade them in the scale of society ?"

এই "general and political knowledge" বিস্তার করবার যন্ত্র হয়েছিল ইংরেজ। রামমোহনের মৃত্যুর সময়ের ভারত-বাসী, বিশেষ ক'রে বাঙ্গালী, ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী না হলেও ইংরেজের সমর্থক হতে পারেনি—"there is no hostility, but in place of it a cold dead, apathetic indifference which would lead the people to change masters to-morrow" (William Adam's Report—1835)

লক্ষণ দেখে ওরা ভারতের শিক্ষাকে 'anglicise' করবার চেষ্টা করেছিল। ওরা বলেছিল, এতে নতুন এক জাত তৈরী হবে, যারা বর্ণে ও শোণিতে ভারতবাসী, কিন্তু রুচি ও নীতি, মত ও বুদ্ধিতে ইংরেজ। "(Macaulay)

বাংলায় সে মিশনারীদের যুগ। জাতকে নতুন ক'রে গড়বার জন্য ভাঙ্গার যুগ। গলিত প্রাচীনকে অস্বীকার করার যুগ। ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণে মরিয়া ভারতের নিপীড়িত ও ক্ষিপ্ত জনসাধারণকে শান্ত ভাবে, বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ করতে শেখাবার জন্য ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে ইংরেজপন্থী ইয়ং বেঙ্গল গড়বার আয়োজন তখন চলেছে পুরা দমে।

ইংরেজ তৈরী করেছে রাজনারায়ণ, ইংরেজ তৈরী করেছে মধুসূদন, লালবিহারী। ইয়ং বেঙ্গলকে দিয়ে ওরা ভারতের প্রাচীন ইমারত ভাঙ্গতে লেগেছে।

"বঙ্গদেশের প্রাচীন লোকেরা সভয়ে দেখিতেছেন যে নূতন বংশের অভ্যুত্থানশীল যুবকদের মধ্যে অতিশয় বিপ্লব চলিতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, কলির সন্ধ্যা কাল বুঝি উপস্থিত হইয়াছে ; কেহ কাহাকে মানে না, সকলে স্ব স্ব প্রধান, স্বদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের কাছে তাঁহারা পরামর্শ চায় না, বিদেশের সর্ববিদ্যাভিমানী গ্রন্থকারের কথাই তাহাদের বেদবাক্য।" (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৮৪ সাল)

এ যুগের অন্যতম মহাবিপ্লবী মধুসূদন। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন— "As a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism." (1860)

৩০।৩১ বৎসর বয়সের তরুণ বঙ্কিমও তখন ইংরেজের পাঠ নিয়ে ইংরেজ-শাসনের সাহচর্য্য করছেন। তখনও চলছে ইংরেজের ভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণের, অনুবাদের, অনুকরণের আর অভিনয়ের যুগ।

"ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজ বুঝে না, ইংরাজ না বুঝিলে ইংরাজের কাছে মান-মর্য্যাদা হয় না। ইংরাজের কাছে মান-মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না অর্থাৎ থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন ; ইংরাজ যাহা না দেখিল তাহা ভস্মে ঘৃত।"

"ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না।···তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র··· সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব ?" (বঙ্কিম—১৮৭২)

বাংলা ও বাঙ্গালীর এই গণ-বিপ্লবের যুগে মধুসূদন বাঙ্গালীকে ঘৃণা করেছেন। তাঁর ইয়ং বেঙ্গল যুগের বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি লিখছেন—"I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact."

৩৬ বছর আগে থেকে গণ-ধ্বনি উত্তর-ভারত মুখরিত—"ইংরেজ রাজ্য খতম, ইংরেজদের সাবাড় কর।" উমাজী নায়কের নেতৃত্বে পুণায় মারাঠী বিদ্রোহ। বাঙ্গালার ঘাটবাল অঞ্চলগুলোতে গণ-উত্থান। মধুসূদনের ভাষায় শেকল ছেঁড়ার তিন বছর আগে বারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ের গুলীভরা বন্দুক উঠিয়ে আহ্বান—"ওরে ওঠ তোরা ওঠ, সাদা মানুষগুলোকে গুলী কর!" ("Rise boys, rise and shoot the white men") পাল্টা জবাবে ওরা রাজা বাহাদুর শাহকে বন্দী করেছে, মঙ্গল পাঁড়েকে ফাঁসী দিয়েছে, তাঁতিয়া টোপিকে হটিয়ে দিয়েছে, ঝাঁসীর রাণীকে বধ করেছে।

মধুসূদন ও বঙ্কিমের যখন উত্থান তখনও শোণিতে এবং অশ্রুতে বিপ্লব। সাঁওতাল বিদ্রোহ। সেপাই বিদ্রোহ। নীল বিদ্রোহ। উত্তর বাংলায় কৃষাণ উত্থান।

মধুসূদনের বন্ধুদের তখন মোড় ফিরছে। যারা ইংরেজ আর তার ধর্ম্মকে সার বস্তু বলে মেনে নিয়েছিল, তারা সবার সাথে তাকেও অস্বীকার করতে সুরু করেছে—

"উগ্রমূর্ত্তি শৈব ও বৈষ্ণব-সমাজের ভয়াবহ তীর্থস্থানে ধিক্! ধিক্! ধিক্! খৃষ্টানদিগের শোণিতাক্ত মুণ্ডমালা-বিভূষিত ভয়ঙ্কর ক্রুসেড যুদ্ধের ক্রুশচিহ্নেও ধিক্! স্বসম্প্রদায়ের পক্ষপাত-মদে উন্মত্ত, দুর্দ্দান্ত মোসলমান সম্প্রদায়ের কর-সঞ্চালিত চাকচিক্য-শালী সুতীক্ষ্ণ তরবারেও ধিক্!" (অক্ষয় দত্ত)

'ইয়ং বেঙ্গল' তখন ইউরোপের বিদ্যুতাধার থেকে ফরাসী বিপ্লবের যেমন পাঠ নিয়েছে, ভারতে ইউরোপীয়দের অত্যাচারেও তেমনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। খৃষ্টান ধর্ম্মের হিঁদু-সংস্করণ ব্রাহ্ম সমাজও এই অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ওরা দেশের চাষীদের উপর এক দিকে যেমন জুলুম করছিল, অন্য দিকে অন্তঃপুর থেকে নারী ও শিশুদের চুরি করবার আয়োজন করছিল। ব্রাহ্ম-নেতারা ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন— "অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল···আর কত কাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রায় অভিভূত থাকিব ?···হিন্দু নাম যে চিরকালের মত লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইল। মিশনারীদিগের দৌরাত্ম্য এ পর্য্যন্ত সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু

এক্ষণে সহিষ্ণুতার সীমার বহির্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বাবধি তাহারা কেবল কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার সহিত প্রবল অন্যায় আচরণ সকল মিশ্রিত করিল।...কালসর্প মিশনারীদিগের শাসন না করিলে, তাহারা ভবিষ্যতে বল বা ছল পূর্ব্বক আমাদিগের সন্তানদিগকে খৃষ্টধর্ম্মের বিষপান করাইতে নিমেষ মাত্রও কি গৌণ করিবে?" (অক্ষয় দত্ত, ১৭৬৭ শক)

ইংরাজ সরকারের সমর্থনপুষ্ট খৃষ্টান মিশনারীদের এ ভাবে জাতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গবার কথা বঙ্কিম ভাল ক'রেই জানতেন। কিন্তু প্রতিবাদ করতে দেখিনি। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' হরিশ্চন্দ্র যখন ইংরেজ কুঠিয়ালের অত্যাচার, তথা ইংরেজ শাসকদের অবিচারের কথা দেশব্যাপী প্রচার করছিলেন আর গণ-সংগ্রাম পরিচালন করছিলেন, তখন সরকারী কর্ম্মচারী দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' লিখবার সংসাহস থাকলেও, দীনবন্ধুর বন্ধু বঙ্কিমকে তার ইংরেজি অনুবাদের ভার নিতে দেখাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা তিনি করেননি। মধুসূদন গোপনে 'নীলদর্পণের' ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন বলে সুপ্রিম কোর্টের চাকুরী থেকে তাঁকে বরখাস্ত হতে হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, খৃষ্টান ইংরেজ তাকেও যেমন অন্ন দেয় না, তার প্রিয় মাতৃভূমির জনসাধারণের উপর তার চাইতেও অত্যাচার করে। বিপ্লবী মধুসূদন যখন বুঝেছিলেন, ইংরেজ আর খৃষ্টধর্ম্মই প্রাচীনতার পঙ্ক থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়, তখন তিনি তৎকালীন খৃষ্টান মিশনারীদেরকেই গুরু মেনে নিয়েছিলেন। খৃষ্টান-সাহিত্যের প্রেরণায় বাংলা ভাষার বন্ধন তিনি যখন ঘোচালেন, তখন পাদরী জন লং 'তিলোত্তমাসম্ভবের' অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তার ওজঃশক্তি দেখে বলেছিলেন—"In the course of four or five years Dutt, if spared, will revolutionise the language of your country." তখন তিনি তা ঠিকই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। তবু সেকালের খৃষ্টান-ভক্ত অন্যান্য ইয়ং বেঙ্গলের মত তাঁরও ভুল ভাঙ্গছিল। হিন্দুধর্ম্মকে তিনি নিন্দে করলেও, ক্রমে বুঝছিলেন যে, "Our Bengalee is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up." ভারতের পরাধীনতায় তিনি ক্রমে ব্যথিত হয়েছিলেন।

"কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনী,
চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি?"

তিনি এ দুঃখে কেঁদেছিলেন—

আমরা, দুর্ব্বল ক্ষীণ কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ আবদ্ধ শৃঙ্খলে?

এ বিপ্লবের ছোঁয়াচ অন্যান্য ইংরেজি শিক্ষিতের মনেও তখন লেগেছে। গণ-বিপ্লবের সমর্থন তখন অনেকে করতে সুরু করছেন। বাংলার বিপ্লবীদের গুরু মধুসূদনের বাল্যবন্ধু রাজনারায়ণের প্রভাবে নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা স্থাপন করেছেন, আর তাকে সমর্থন করেছেন ঠাকুর-বাড়ী।

বঙ্কিম তখনও কিন্তু ইংরেজের বন্ধন-বেদনা অনুভব করতে পারেননি। তিনি তখন ইংরেজের যেমন কর্ম্মচারী, তেমনি মনে করেন ইংরেজের বন্ধন দৈবপ্রেরিত। ভারত বা স্বদেশ বলতে তিনি আর্য্যধর্ম্ম বা হিন্দুয়ানি বুঝেছিলেন। তাঁর মত—"ইংরেজ আগে রাজা না হইলে আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।...আর্য্যধর্ম্ম উদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক...ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে...যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, তত দিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় হইবে।" (আনন্দমঠ, ১৮৮৩)

"ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যম না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক-পরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরেজির দ্বারা সাধনীয়, কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে; বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলন-ভূমি ইংরেজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে...কিন্তু একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না।" (বঙ্গদর্শন, ১৮৭৩)

মধুসূদন ও তাঁর মহাবিপ্লবী কালাপাহাড়ী ইয়ং বেঙ্গল যেমন ভারতের মধ্যযুগের ও তৎকালীন সমাজ, সাহিত্য ও মানুষকে ঘৃণা করিয়া প্রত্যাখ্যান করেছে, ইংরাজির ঘিয়ে ভাজা বিদ্যাসাগর, ভূদেব ও বঙ্কিম থেকে বর্ত্তমানে ভারতের স্রষ্টা বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত হিন্দুর আওতায় থেকেও তেমনি তা ঘৃণা করেছে। পার্থক্য, মধুসূদন ও ইয়ং বেঙ্গল সব কিছু অস্বীকার ক'রে নতুন সৃষ্টি সম্ভব ক'রে তুলেছিলেন। মধুসূদন আগলভাঙ্গা নতুন ছন্দে যখন বললেন—"I deshise Ram and his rabble, but the idea of রাবণ elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow" তখন বিদ্যাসাগরের পর্য্যন্ত ধারণা হয়েছিল, এ সব "worthless issue of drunkenness and stupidity," কিন্তু বিপ্লবী বলেছিলেন, "would such abortions were plentiful in the country and men to know their value!"

বঙ্কিমের এই রাজনীতিক মতের প্রভাবে—এই ইংরেজ-তোষণ মতের প্রভাবে কংগ্রেসের নতুন বাঙ্গালী নেতারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যখন তিন ভাগের এক ভাগ বাঙ্গালী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, ইংরেজের কেতাব থেকে তার বর্ণনা নিয়ে বঙ্কিম মুসলমানদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে "নেড়ে মার" ধ্বনি তুলে ভারতের আজকের পর্য্যন্ত রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িকতা-বিষে বিষাক্ত করেছেন। কিন্তু এ সত্য কথা তিনি বলতে পারেননি যে, এই বেপরোয়া বাঙ্গালী হত্যার মূলে—

"The plunder of Bengal which, after the victories of Clive, flowed into the country (England) in a broad stream for about 30 years. This ill-gotten wealth played the same part in stimulating England's industries as the five milliards, extorted from France, did for Germany after 1870." (Dean Inge)

পরিণত বয়সে 'ধর্ম্মতত্ত্বের' এক জায়গায় ইউরোপীয় স্বাজাত্যবোধ যে লুণ্ঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত, বাঙ্গলার, কৃষকের সর্ব্বনাশ যে ইংরেজের মতলবের ফলে, এ কথা বলে ভাবী বিপ্লবীদের পথ-নির্দ্দেশের তিনি সুবিধা করেছেন। কংগ্রেস তাঁর প্রেরণা যেমন নিয়েছে, বাংলার প্রাথমিক বিপ্লবীরা অন্তরূপে প্রেরণা পেলেও তাঁর অতুলনীয়

প্রেরণারও সুব্যবহার করেছেন। বঙ্কিম তথা ইংরেজ রাজপুরুষের প্রেরণা-পুষ্ট কংগ্রেসী agitationকে এ সব বিপ্লবী patriotism বলে মেনে নিতে পারেনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব তখন অপ্রতিরোধ্য। তিনি আপনার সামনে বসিয়ে বিপ্লবী নব-ভারতকে যখন তৈরী করছিলেন, তখন বঙ্কিমের মতবাদকে এই যুগ-গুরু সমর্থন করতে পারেননি। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র মতকে তিনি ঘৃণা করেছেন—বলেছেন, "ঈশ্বরের প্রভাব কেমন ক'রে বিশ্বাস করবে? এ কথা যে ওঁদের ইংরাজি লেখা-পড়ার ভিতর নাই।"

নব্য ভারতের এই বাস্তব গুরুর কাছে বঙ্কিমের রচা কথা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের প্রেরণাদাতা হিউম এ প্রভাব জানতেন। জানতেন যে, ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মগুরুরা তখন "Presaging a mass outburst"—তাঁর 'Old man's Hope' থেকেও বাংলার বিপ্লবী গুরুরা প্রেরণা পেয়েছিল—

"Ask no help from Heaven or Hell ;
In yourselves alone seek aid ;
He that wills, and dares, has all—
Nations by themselves are made."

এই daring ভাবের পত্তন করেছিলেন মধুসূদনের প্রেরণাদাতা প্রিয়বন্ধু রাজনারায়ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাস্তব প্রভাব প্রত্যক্ষ করে ঋষি রাজনারায়ণ বলেছিলেন—

"আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর কুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেব-বিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নব-যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে। হিন্দু জাতির কীর্ত্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি—

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক ভারতের জয়!
জয় ভারতের জয়!
গাও ভারতের জয়!
কি ভয়—কি ভয়—
গাও ভারতের জয়।

(হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ১২৭৯)

'বন্দে মাতরম্' গান তখনই দেশে চালু হয়েছে। চালু করেছিলেন বঙ্কিমেরই মতই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। তাঁর 'অভিযানে' "গেরুয়া বসন-পরিহিত বালকবৃন্দ পতাকা হস্তে করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে চলিতে গাহিয়াছিল "বন্দে মাতরম্।"... বালকদিগের সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় ও যুবকের দলও ঐরূপে অভিযান করিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। নগরের প্রশস্ত রাজপথে যখন কোমল কণ্ঠে বালকগণ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়াছিল—

"জয় ভারতের জয়!
হোক ভারতের জয়!
কি ভয়, কি ভয়—
হউক ভারতের জয়!

তখনও পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতাদিগকে যেন একেবারে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল।" (সেকালের চিত্র, কালীকৃষ্ণ ঘোষ)

বঙ্কিমও বিপ্লবী ঋষি রাজনারায়ণের 'জয় ভারতের জয়ে' মুগ্ধ হয়ে সেদিন লিখেছিলেন—"এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হোক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।" (বঙ্গদর্শন)

মাত্র বাজেনি। এ সঙ্গীত যে মহা অভিযানের সূত্রপাত করে, বিপ্লবী নবভারত যা অকুতোভয়ে চালিয়েছে ৫০ বছর, তার প্রাথমিক প্রেরণা মধুসূদন ও বঙ্কিমের মত ইয়ং বেঙ্গলের—মাধ্যমিক প্রেরণা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের—চরম প্রেরণা বেপরোয়া অহেতুক মৃত্যু-স্পর্দ্ধীদের—যারা জাতের ক্লেদ শোধন করতে চেয়েছিল আগুন আর রক্ত দিয়ে—যাদের হাতিয়ার লেখনী নয় 'বোমা আর পিস্তল।' 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ছিল হুজুগে সাধারণের, এদের কোন ধ্বনি ছিল না। আনন্দমঠের কল্পনা এদের প্রেরণা দেয়নি, হয়ত দিয়েছিল তা থেকে রচা 'ভবানী মঠের' কল্পনা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
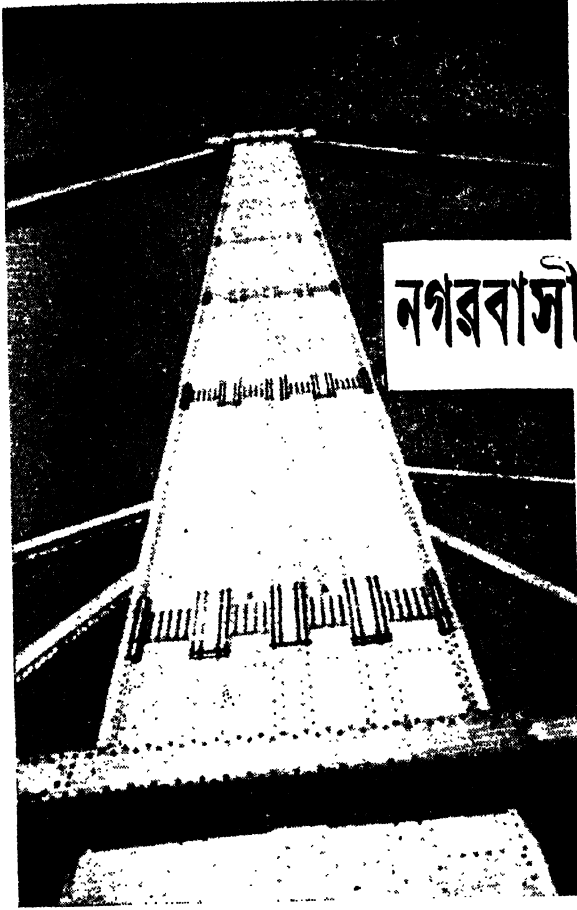
পরদিন মনস্থরকে দেখতে গিয়ে তার কাছে গিরীন যে অভ্যর্থনা পেল তা সত্যই চমকপ্রদ। দেখা মাত্র মনস্থর যেন তাকে কামড়ে দেবে। ছ' মিনিটে যে গালাগালিটা সে দিল ঝাঁঝের তার তুলনা হয় না—কবি মানুষ, তাতে আবার নজরুলের ভক্ত, ভাষায় তার জোর কত! মনস্থরের কাছে এ-সব শুনে বাড়ী বয়ে গিয়ে রশোনা যে বন্ধুত্ব খারিজ ক'রে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে আসবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। বিদায় হবার সময় তবু স্বভাবতই তার চোখে জল এসেছিল।

ডাক্তার ইসারা করে। গিরীন নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

আহত অসুস্থ মানুষ, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় যে চড়া জ্বর চলছে। সাময়িক ভাবে তার মাথাটা যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে কারো কিছু বলার নেই। সারা ভারতের মুসলমানদের মাথাও কি হিন্দুরাই এমনি প্রক্রিয়ায় আঘাত হেনে আহত করে বিগড়ে দিয়েছে, সংখ্যা-গরিষ্ঠতার চাপে ধ্বংস হবার আতঙ্কে হিংসার উগ্র জ্বর এনেছে? আত্মরক্ষার জন্য আঘাত হানা অবশ্য হিংসা নয়। ষোলোই আগষ্টের সংগ্রাম-ঘোষণায় কৈফিয়ৎ তাই। নেতাদের কৈফিয়ৎ অবশ্য, কিন্তু নেতা কি আকাশে ঝুলে থাকে, জনতার মাথাই সব নেতার পা দিয়ে দাঁড়াবার একমাত্র আশ্রয়, আত্মীয় নেতা ছাড়া। যে নেতা জনতার আত্মীয় সে শুধু সামনে এগিয়ে থাকে, মাটিতেই দাঁড়ায়। উপরে তাকিয়ে থেকে থেকে এতই কি উর্দ্ধ-সর্ব্বস্ব হয়েছে এদেশের মানুষ যে মাথায় চাপা নেতাদের কথার ঘায়েই মাথা খারাপ হয়ে যায়? অথবা মনস্থরকে ধরে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবার মতই অতিশয় পার্থিব, অত্যন্ত বাস্তব সংঘাত ও তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে আছে? হিন্দুর ঈশ্বর বা মুসলমানের আল্লার মত সর্ব্বশক্তিমান্ তো ইংরেজ নয়, তাদেরও নিজেদের গড আছে। রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির যতই কৌশল জানা থাক, ইংরেজেরও সাধ্য কি ভিত্তি ছাড়া ভেদ-সৃষ্টির এমন ভেল্কি দেখায়, কোটি কোটি হৃদয়ের শাণিত অভিশাপ থেকে গা বাঁচিয়ে ওই কোটিদেরই পরস্পরের গলা কাটতে নিযুক্ত করে?

সে ভিত্তিও কি ইংরেজের তৈরী? একা ইংরেজের?

'দাঙ্গার ভিত্তি' নাম দিয়ে গিরীন সেদিন সম্পাদকীয় লেখে, পূরো ছ'কলমের মত। ভাষা এমন জোরালো হয় যেন কালির হরফে প্রাণটা তার কথা কইছে। পড়তে পড়তে প্রধান সম্পাদক প্রবীণ সত্যহরি বার-বার আত্মবিস্মৃত হয়ে মাথা চুলকোতে যায়, বার-বার মসৃণ তেলাল টাকে আঙ্গুল পিছলে গিয়ে তার বিরক্তির সীমা থাকে না।

এটা কি লিখেছো গিরীন?

কোন্‌টা?

আগাগোড়া সবটা। ধর্মকে এ ভাবে গাল দেবার কোন মানে হয়?

ধর্ম নয়, ধর্মপ্রবণতাকে। জগতে ধর্মের পাট অনেক কাল চুকে গেছে, পাঁক সার হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস আজ তাই অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে দেশে যত বেশী জীইয়ে রাখা হয়েছে সে দেশের আজ তত বেশী সর্ব্বনাশ—

আহা, এ সব তো লিখেইছো, পড়লাম। কিন্তু ধর্ম কাকে বলে তুমি যে তাই জানো না গিরীন! ধর্মের নামে অধর্ম চললে সেটা কি ধর্মের দোষ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎ সব রইল, ধর্ম শেষ হয়ে গেল? ধর্মভ্রষ্ট হয়েছি বলেই আমাদের এত দুর্দ্দশা। তুমি লিখেছো উল্টোটা, ধর্মের জন্যই যেন যত ফ্যাসাদ!

—ধর্মের নামেই তো চলছে সব। রাজনীতি, হত্যা, জাল-জুয়াচুরি—

—আহা, কথাটাই তো তাই! ধর্মের নামে এ সব চলছে মানেই তো মানুষ ধর্ম মানছে না, অধর্মের রাজত্ব চলছে। গান্ধীজীর অহিংস নীতি শুধু রাজনীতি হলে কি এমন ফ্যাসাদ হত না আমরা এমন ফাঁদে পড়ে কোঁ-কোঁ করতাম? উনি নিলেন ধর্মের অহিংসা, তাকে করলেন রাজনীতির কৌশল। এটা অধর্ম, তার ফলও ফলছে। তুমি বরং এটা একটু ঘুরিয়ে লেখো গিরীন, ধর্ম্মভ্রষ্ট হলে জাতির কি অবস্থা হয়। এমনি বেশ হয়েছে লেখাটা কিন্তু—

ধর্ম কি বলুন তবে। কিসের থেকে ভ্রষ্ট হওয়ায় লোকে ধর্ম-ভ্রষ্ট হয়েছে? কেন ভ্রষ্ট হয়েছে তাও বলুন।

ধর্ম কি বুঝে এডিটোরিয়াল লিখতে হলেই হয়েছে! সত্যহরি একটু হাসে।

সত্যহরির হাসিটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গিরীন নাছোড়বান্দার মত বলে, ধর্ম বুঝতে চাই না সত্যহরিদা, ধর্ম সম্পর্কে একটা ধাঁধা মিটলেই আমার চলে যাবে। ধর্ম আছে বলছেন, ধর্ম যদি আছেই তবে মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে কিসের থেকে?

মানুষ যদি ধর্ম ছেড়েই থাকে, ধর্মটা তবে রইল কোথায়? মানুষকে বাদ দিয়েও ধর্ম বেঁচে থাকে? তা যদি বলেন, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-জল-স্থল-আকাশ-জীবজন্তুর ধর্মকে ধর্মের নামে মানুষের হানাহানির মধ্যে টানি কি করে?

সত্যহরি মিছেই সম্পাদকত্ব করে প্রবীণ হয়নি, খাঁ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্মিত মুখে সকৌতুকে বলে, তা হলে ও-ভাবেই ঘুরিয়ে লেখো না যে দেশে ধর্ম নেই। ধর্ম নেই বলেই মানুষ পশু হয়ে গেছে!

এবার গিরীন ক্লিষ্ট ভাবে একটু হাসে, এটা ছাপবার জন্য নয় সত্যহরিদা, এমনি লিখেছি। গায়ের জ্বালায়।

লেখা শ্লিপগুলি ছিঁড়ে গিরীন টুকরিতে ফেলে দেয়, সত্যহরি মাথা নেড়ে-নেড়ে বলে, উঁ হুঁ, ওটা মিছে বললে ভাই। প্রাণের কথাই লিখেছো, ছাপবার সাধ নিয়েই লিখেছো। তবে সাংবাদিক বটে তো, এও তুমি বেশ জানো, প্রাণের কথা স্বাধীন ভাবে ছাপবার সাধ প্রাণেই থাকে! এই আপশোষে মাথায় আমার টাক পড়ে গেল ভাই!

সত্যহরির মুখে মুচকি হাসি।

একই নিশ্বাসে সত্যহরি জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, ওই যে লিখেছো ওয়াহাবি রাখীবন্ধন খিলাফৎ চরকা হরিজন সব কিছুর উৎস স্বাধীনতার কামনা, কিন্তু বাধ্য হয়ে ধর্মের আবরণ নিতে হওয়ায় ভেস্তে গেছে। আসলে ওটা তুমি কি বলতে চেয়েছো গিরীন?

বলতে চেয়েছি, আমাদের ধর্মপ্রবণতা বাঁচিয়ে রেখে, মধ্যযুগে ঠেলে রেখে, শুধু এই একটা চালে ইংরেজ আমাদের—

ওঃ! বুঝেছি, বুঝেছি।

গিরীন চটে বলে, না, আপনি বোঝেননি। আপনারা বোঝেন না। স্কুলে-স্কুলে ইতিহাস কেন শেখায় বন্দুকের টোটা কামড়ালে গো-মাতাকে কামড়াতে হয় বলে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটেছিল, আপনারা তা বোঝেন না। বরং গর্ব্ব অনুভব করেন! এই যে নৌ-বিদ্রোহ হল, যে জন্য রাতারাতি মন্ত্রী মিশন এলেন, এটা একশো দেড়শো বছর আগে ঘটলে আমরা স্কুলের ইতিহাসের টেক্স্ট বুকে পড়তাম: যদিও জাহাজে ছাগলের মাংসই দেওয়া হইত তথাপি দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীরা গুজব রটায় যে গরু ও শূকরের মাংস খাওয়ানো হইয়াছে, তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমান নৌসেনারা বিদ্রোহ করে। পড়ে গর্ব্বে আমাদের বুক ফুলে উঠত। আর যাই হোক, আমাদের নৌসেনারা ধর্মের অপমান সহ্য করেনি, গরু-শূয়োরের মাংস খাওয়ানোর প্রতিবাদে বিদ্রোহ করেছে। কি মহান্ এই দেশ! কত প্রাচীন এই দেশের সভ্যতা!

বাস্ রে বাস্! একটা সোজা কথা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি একেবারে বক্তৃতা দিয়ে বসলে! তলে তলে কম্যুনিষ্ট হয়ে যাওনি তো?

হবো। এত ফাঁকিবাজি আর সয় না।

সত্যহরি ঘণ্টা বাজায়। উমেশ এলে বলে, দু'কাপ চা আন তো বাবা। চললি যে? শোন।

হাফপ্যাণ্ট সার্ট-পরা বেঁটে যোয়ান একুশ বছরের উমেশ ঝকঝকে দাঁত বার ক'রে হাসে, বলে, চা আনুম। আর কি আনুম কন?

তিন

ট্রাম চালু আছে, বাসও এলোমেলো চলে। কোন সেকশানে হাঙ্গামার ফলে এক বেলার জন্য বা দু'-এক দিনের জন্য ট্রাম বন্ধ থাকে, আবার সে লাইনে ড্রাইভার ট্রাম চালায়, কণ্ডাক্টর টিকিট কাটে। কোন কোন সাংঘাতিক এলাকার ট্রামে ড্রাইভারের পাশে রাইফেলধারী ইউনিফর্ম দেখা যায়, দৃশ্যটা হাস্যকর ঠেকে নগরবাসীর কাছে। অনেক মোড়েই রাইফেল ও ইউনিফর্মের, মিলিটারী ইউনিফর্মেরও ঘাঁটি বসেছে, রাস্তা কাঁপিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে সশস্ত্র ট্রাক, নগরে তবু ছুরি-ছোরা অ্যাসিড-বোমায় খুন-জখম, লুঠপাট, আগুন দেওয়ার সমারোহ বেড়েই চলেছে। নিরাপত্তা কমছে, শঙ্কা বাড়ছে, অরাজকতার সীমা-পরিসীমা নেই। নগরবাসীর তিতো অভিজ্ঞতা তিতো হতে হতে হাস্যকর মনে হওয়ায় ঠেকেছে, আগুনে লাল হতে হতে লোহা চোখ-ঝলসানো শুভ্র দ্যুতিতে ঝলসে ওঠার মত ক্রোধ আর ঘৃণার উত্তাপ বাড়তে বাড়তে যেমন উগ্র পরিহাস, উজ্জ্বল ঝকঝকে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি হয়ে দাঁড়ায়।

দাঙ্গা হানাহানি কর্ত্তাদের লীলা, চাকররা মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকে চেপে টহল দিয়ে তা থামাবে! হায় রে তামাসা!

বয়সের ভারে নানী বাঁকা হয়ে গেছে, ঢিলে হয়ে চামড়া ঝুলে গেছে, মাথা-ভরা শণের নুড়ি, নগরের ফুটপাতে গোবর কুড়িয়ে দেয়ালে, বেড়ায় ঘুঁটে থাবড়ে শুকিয়ে সেই ঘুঁটে বেচে বেঁচে আছে, সেও বার্দ্ধক্যের হাসিহীন বিদ্রূপের ভাষায় বলে, যত ঢং তত সং। ঢং দেখে সং দেখে বুড়িয়ে গেলাম, আল্লার দোয়ায় এবার গেলে বাঁচি। বড়-বড় ঘুঁটে বাছা, মোটে মাটি নেই, ন' আনা শ' দিবেন। আ লো নাতনী, তুই না দিলে কে দেবে বল? তোর কাচ্চা মোরে দেখলে বলে, ইলেলল্লায়লা নানী! আহা, বেঁচে থাক।

সরস্বতী বলে, কি বলছিলে নানী?

ততক্ষণে নীলিমা মণিরাও এসে দাঁড়িয়েছে। নানীকে পাড়ার সবাই ভালবাসে। নানীর উপযুক্ত একটা ছেলে আছে—পাঁচ-সাত বছর তাকেও পাড়ায় প্রায় সব ঘরের মেয়েরা মুখ-চেনা চিনেছে এই জন্য যে, বিয়ে ক'রে তিন-চার বছর ছেলেটা এই মাকে খেতে দেয় না। ছেলেটার বৌটা সুন্দরী। মাঝে-মাঝে রাস্তার কলে জল নিতে আসে, মাঝে-মাঝে দোকানে সওদা করতে যায়। শ্যাম সুশ্রী রঙ, ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, টিকলো নাকে নকল মুক্তোর নাকচাবি।

নানী বলে, বলছিলাম, মোড়ে যে কামান নিয়ে গাঁড়া গেড়েছে, সব সং, রাজা-বাদশারা ঢং করে এমনি সং দিত, রাণীও তাই দিয়েছে।

রাণী? সরস্বতীকে খানিক জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানতে হয়, রাণী মানে কুইন ভিক্টোরিয়া। নানী কি আর জানে না দেশের এখন অন্য রাজা, মহারাণীর যুগ বহু কাল গত হয়েছে, অত সে হাবা নয়, তাহলে এই মারাত্মক সহরে গোবররূপী খাদ্য কুড়িয়ে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না। তবে আজও প্রথম বয়সের রাজশক্তির সেই প্রতীকটি মনে তার গাঁথা হয়ে আছে। শুধু প্রতীক, কিছু এসে যায় না। নানী এও জানে যে টাকা-পয়সায় আঁকা মূর্ত্তি বদল হয়েছে বলেই গরীবের দুঃখ-দুর্দ্দশা বাড়েনি।

চলা-ফেরায় নানীও এখন খানিকটা সতর্ক, তাকে বেশী দেখা যায় না। তার ছেলের সুন্দরী বৌ এবং বস্তির আরও যে কয়েকটি অল্পবয়সী মেয়ে-বৌ রাস্তায় এ কলে আসত তারা বস্তির ছেঁড়া পর্দার আড়ালে লুকিয়েছে। বেশী বয়সের স্ত্রীলোকেরা সন্ত্রস্ত ভাবে আসে,

[৩৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

২৭ নবেম্বর

বুয়েনোস্ এয়ারিস।

'পূরবী' কাব্যের একটি পৃষ্ঠা

(কবিগুরুর চিত্রগুলি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পাইয়াছি—মা, ব)

রবীন্দ্রনাথের

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
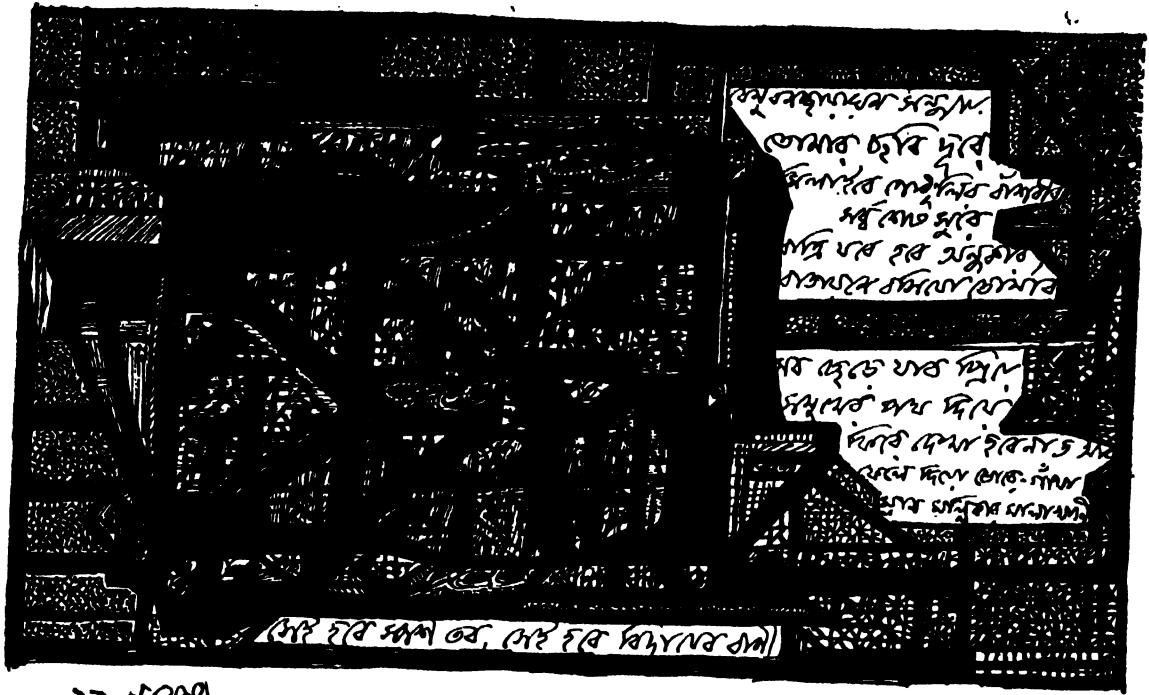
পঁচিশে বৈশাখ। প্রাতঃস্নানের পর রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে গোটা কয়েক কবিতা ও একটি প্রবন্ধ পড়লাম। মন-প্রাণ-বুদ্ধি তাজা হ'য়ে উঠল। দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম, সরকার আজ ছুটি দিয়েছেন এবং বহু অনুষ্ঠানে কবির জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব হবে। খবর ভালো, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছুটি ও উৎসবে, দু'টিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেন না বুঝে মনে যতটা ক্ষোভ জমেছিল তার খানিকটা কম্‌ল আমাদের প্রাস্তিয় সরকারের ঔচিত্য-বোধে। কিন্তু সহর ও বাংলা দেশব্যাপী উৎসবের খবরে মনটা বেশীক্ষণ উৎফুল্ল রইল না। পুরাতন অভিজ্ঞতা বিভীষিকাময়। আবৃত্তির উচ্চারণ, গানের বেসুর, নৃত্যের বেতাল, উদ্যোক্তাদের গণ্ডগোল, বক্তৃতার অবান্তরতা ও সর্ব্বোপরি প্রত্যেক অনুষ্ঠানের রাজকীয় মতের কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথকে পুরে দেওয়ার প্রাণপণ প্রয়াসের স্মৃতি কিছু পিপাসিত চিত্তের পানীয় নয়। তবু ছুটি, তবু উৎসব, তবু চারু-কলার সংস্পর্শ, তবু রবীন্দ্রনাথের নাম, গান, কবিতা! কোন অনুষ্ঠানে কি তাঁর ছবি দেখান হবে? সেখানে যেতে মন চায়।

একটু বেশী বয়সে কবি ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন ব'লে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, চিত্রাঙ্কন ছিল কবির বৃদ্ধ বয়সের বিলাস। বিলাস কথাটারই ওপর আমরা জোর দিয়েছি। অর্থাৎ সেটা তাঁর স্বধর্ম্ম ছিল না, এবং যে-কালে স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ ও পরধর্ম্ম ভয়াবহ, তখন কবি হিসেবে তাঁকে আমরা নিধন করলেও চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁকে দেখতে ভয় পাওয়াটাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক —এই প্রকার ধারণা আমাদের মনের মধ্যে কাজ করেছে। তবু ভয় পেলেও আমরা তাঁর ছবিকে অতটা অবহেলা করিনি যতটা তাঁর [illegible]

করা বেশী শক্ত, কারণ এই যে ছবির প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ কম, এবং কারণ এই যে চিত্রকর তখন যে কারণেই হোক জগৎবিখ্যাত, নোবেল লরিয়েট এবং বৃদ্ধ। আমার কিন্তু স্থির-বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁর কবিতা, গল্প, গানের মতনই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সঙ্গে এক প্রকার জৈব সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাঁর নিজের অনেক মন্তব্য অবশ্য আমাদের ভুল ধারণার সাহায্য করেছে। এই যেমন তিনি বলেছিলেন যে, সাহিত্য-রচনার সময়কার কাটাকুটি থেকেই তাঁর চিত্রের জন্ম, ছবি তাঁর খামখেয়াল, অশিক্ষিতপটুতা ইত্যাদি। (গান সম্বন্ধেও তাই: এই যেমন বলতেন, তিনি গান শেখেননি, তাল ভাল জানেন না।) এক দিক্ থেকে এ সব কথাই সত্য; আবার অন্য দিক্ থেকে এগুলো বিনয়ের চিহ্ন, বৈষ্ণবী বিনয় নয়, বহুমুখী ঐশ্বরিক প্রতিভা, তার প্রাচুর্য্য, তার অবিশ্রান্ত উৎসের সম্মুখে তার স্বত্বাধিকারী, এক জন মানুষের বিনয় মাত্র। আমরা এ কথাটা বুঝিনি, কারণ, না বোঝাই ছিল আমাদের সুবিধা।

তাই এক এক সময় সন্দেহ হয় যে, আমরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে অবহেলা ক'রে আমাদের নিজেদের সৌন্দর্য্য-বোধের অভাবই প্রতিপন্ন

ঘট—'মহুয়া'র মলাটের পরিকল্পনা

কয়েকটি কবিতা আছে তার জোরে তাঁদের কবি বলা চলে না। তবুও তাঁদের মতন চিত্রকরও যে ধর্ম্ম-বহির্ভূত ব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিলেন এইটাই এখানে লক্ষ্যণীয়। আর্টের মহাপুরুষদের মধ্যে এমন একটা শক্তি থাকে যেটা কোনো বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। সেটা উপ্‌চে পড়বেই পড়বে, কোথাও গোপনে, কোনো ক্ষেত্রে সর্ব্বজনসমক্ষে। এই গণ্ডী ছাড়িয়ে যাওয়াটা জীবনের তাগিদে হ'লেও তার প্রকাশ-পদ্ধতির দু'-একটা মোটামুটি নিয়ম আছে। একটা নিয়ম এই: যদি আর্টিষ্ট তাঁর বিশেষ, নির্ব্বাচিত রাজ্যের কার্য্যাবলীতে প্রধানতঃ স্ব-ইচ্ছা, স্ব-প্রকাশের চাহিদা পূরণ ক'রে থাকেন, তবে তাঁর নতুন ক্ষেত্রের, তাঁর উপানিবেশের শাসন একটু কড়া, একটু নিয়মিত হ'য়ে যায়। তখন তাঁর নতুন দায়িত্ববোধ আসে, তিনি নিয়মশীল হন। বিপরীত পন্থাটাও সত্য। আইনষ্টাইন বেহালার সুর সৃষ্টি করেন, ফরাসী সার্জ্জন ম্যালার্মে'র ওপর বই করেছি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে একটা ঘনতা আছে, এবং ঘনতাকে অশ্রদ্ধা করা সৌন্দর্য্যবোধের চিহ্ন নয়। তাঁর যে-সব কবিতা জনপ্রিয় তাদের মধ্যে অনেক সময় ঘনতার অভাব আছে। অবশ্য একটা বাহন কি পটভূমির নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কোনো ভাব প্রকাশ করতে গেলেই যে সেটি গাঢ়সম্বদ্ধ হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। উইলিয়ম ব্লেক ছিলেন একাধারে কবি, চিত্রশিল্পী ও মিষ্টিক, অর্থাৎ খানিকটা রবীন্দ্রনাথের সমজাতি, স্বগোত্র না হলেও। এই ব্লেকের কবিতা নিতান্ত গাঢ়, কিন্তু তাঁর ছবি প্রায়ই অসম্বদ্ধ, অলস, ঢিলে। আবার নামজাদা চিত্রকরও চিত্রে অসংযত, এক-রকম বেসামালই হ'য়ে পড়েন, যেমন টার্ণার। যাঁদের ডিজাইন নিতান্ত পাকা, যাঁরা ওস্তাদ ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান যেমন র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, তাঁদের যে লেখেন, প্যাস্‌কাল ভক্ত হন—এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একে ঠিক ক্ষতিপূরণ বলা যায় কি? ক্ষতিপূরণ ব্যাপারটা নিতান্ত যান্ত্রিক।

অন্য একটি নিয়ম এই, আর্টিষ্ট যে স্তরের বিশেষজ্ঞ, সেই স্তরের নিয়ম-কানুন মেনে নেওয়া যখন তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়, এবং যদি তাঁর প্রতিভার উদ্বৃত্ত কিছু থাকে, তবে তখন তিনি অন্য স্তরে যেতে চান। অলিভার লজ, ব্যারেট, রিশে প্রভৃতিকে আর্টিষ্ট বলা হয়ত যায় না, কিন্তু এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার তাঁরা সাধারণ দৃষ্টান্ত। ক্ল্যাসিক সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত অবশ্য গ্যেটে। তিনি শরীর-তত্ত্ব ও বর্ণ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর বাহাদুরী এই যে, তিনি এক স্তরের নিয়মকে অন্য স্তরে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।

অনেকে তা পারেন না, যেমন ড' ভিঞ্চি— তিনি মূলতঃ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এবং এই স্তরেই আবার ফিরে আসেন— অন্ততঃ এই হল ডাঃ মার্টিন জনসন নামক পদার্থবিদের মত। রবীন্দ্রনাথকে আমরা অন্ততঃ দু'টি স্তরে বিচরণ করতে অনুমতি দিয়েছিলাম, সাহিত্যে ও গানে। তবু তিনি পলিটিক্স, ইকনমিক্স, বিজ্ঞান, চিত্রচর্চা না ক'রে থাকতে পারেননি। এ সব তাঁর পক্ষে অনধিকার চর্চা হ'চ্ছে লোকে যে ভাবে, তা তিনি জানতেন। তবু মিস্ র‍্যাটবোনের চিঠির উত্তর, নাইট পদবী ত্যাগের চিঠি, স্বদেশী গান, দেশপ্রেম, ইম্পিরীয়ালিজমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আমরা উপভোগ করেছি, কেবল তাই নয়, অধিকাংশ ভারতবাসী ঠিক ঐ সবের জন্য তাঁকে আজও প্রভূত খাতির করে। আমরা, বাঙ্গালীরা জানি যে, তাঁর পলিটিক্স কাব্যধর্মী ছিল, এমন কি তাঁর বিজ্ঞানের বই, বিশ্বপরিচয়ে এ উপমার ছড়াছড়ি। অর্থাৎ আমরা এতটুকু মানতে রাজী যে, অন্য স্তরের কর্মে তার কাব্যস্তরের কৃতিত্ব প্রকাশ পেত।

দান্তে

কিন্তু ব্যাপারটা আরো একটু, তলিয়ে দেখা দরকার। তাঁর স্তর ছিল চেতনার ঊর্দ্ধাংশে যেখানে বাক্য ফুটে ওঠে, অর্দ্ধ গন্ধ ম্রিয়মান হয়, কথা লুটিয়ে পড়ে সুরের বাহুল্যতায়, এবং ভাসমান প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হ'তে চায়। এটা মনের উন্নতম অবস্থা নয়; সেখানেও তিনি বিচরণ করেছেন উপনিষদের হাত ধরে—প্রমাণ, শান্তিনিকেতন সিরীজ। এখানে তিনি উপনিষদের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাকে ঠিক সাহিত্যিক ব্যাখ্যা বলা যায় না। কিন্তু চেতনার নিম্নতলে তিনি সাহিত্যের সিঁড়ি দিয়ে কখনও নামেননি।
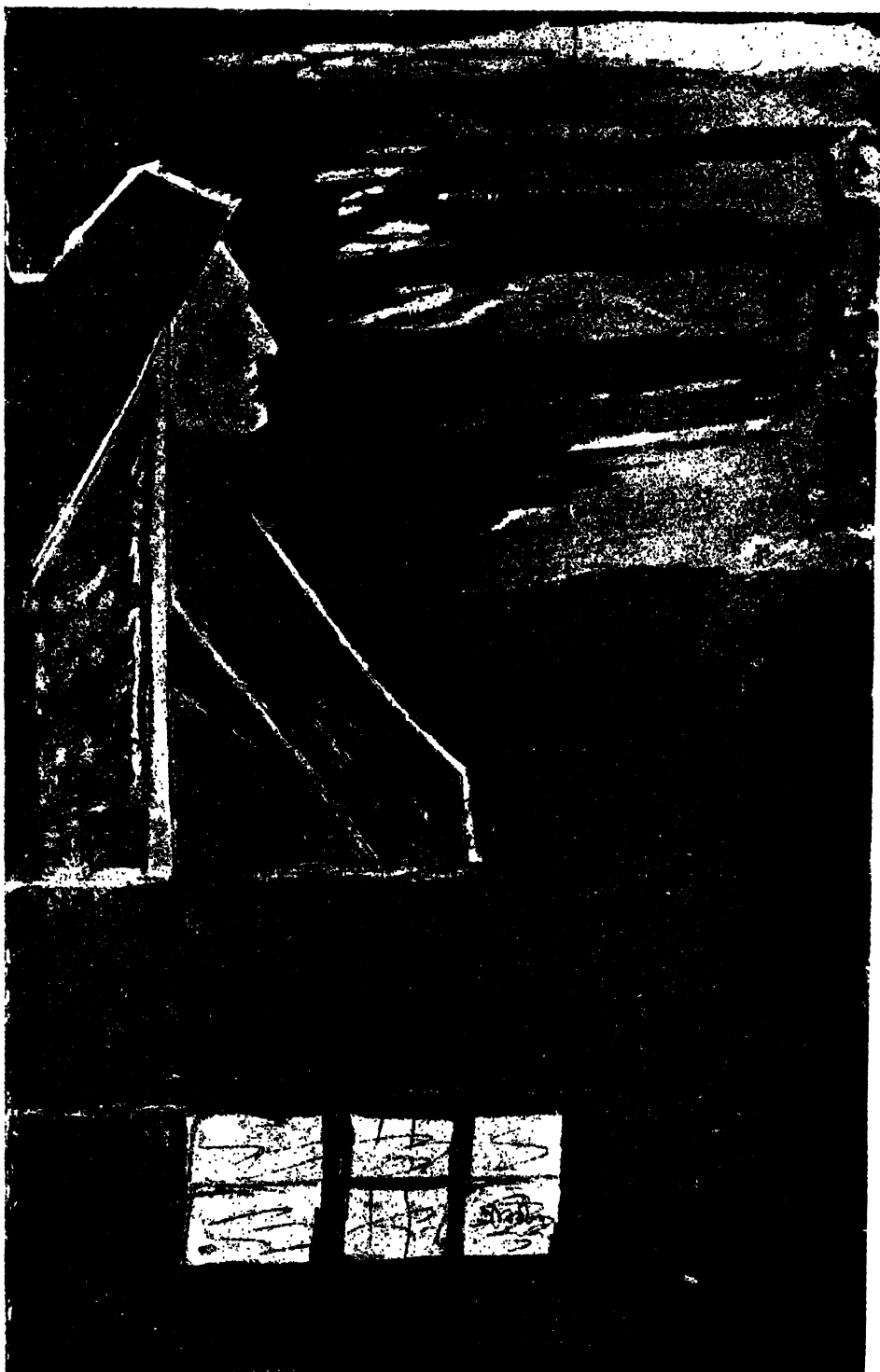
অদ্ভুত

অবচেতনার টান, ঠেল কিংবা ঠেশ তাঁর সাহিত্যিক রচনায় নিতান্ত কম, নেই বললেই চলে। এ-রকমের ভদ্র, প্রায় পিউরিট্যানিক সাহিত্যিক জগতে ছিলেন, কি আছেন কি.না জানি না। কিন্তু যে আর্টিষ্ট বড় তাঁর হাতে সব রুটেরই টিকিট থাকে, তা তাঁর যাতায়াতের অভ্যাস মাত্র চৌরঙ্গী রুটেরই হোক না কেন। তাঁকে উঠতে হয় আবার নামতেও হয়। তিনি স্বর্গের অধিবাসী হলেও মধ্যে মধ্যে তিনি পাতাল-প্রবাসী। দান্তে, মিলটন, দস্‌তয়েভস্কির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম—তাঁরা ছিলেন খৃষ্টান—কিন্তু ব্যাস বা কালিদাসকেও পাতালে না হয় অন্ততঃ প্রাসাদের তায়খানায় নামতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রঙের তুলির ও চিত্র-কল্পনার বিষয়ের সাহায্যে এই

অবচেতনার স্তরে প্রবেশ লাভ করেছিলেন। তাঁর চিত্রিত মূর্ত্তি তাঁর সাহিত্যে নেই; সেগুলি অর্দ্ধেক মানুষ, অর্দ্ধেক পশু, গোটা কয়েক পৌরাণিক দানব; তাদের রঙ ভয়ঙ্কর, তাদের লাল ঘন রক্তের; তাদের রেখা সর্পিল; এমন কি ফুলটি পর্য্যন্ত পারিজাত নয়, নারকীয়। এই বর্ণচ্ছটায় রবীন্দ্র-সাহিত্যে তথাকথিত চাঁদের আলো নেই; এই সব মূর্ত্তি আপন লালিত্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে না; তাদের শরীর আলোয় ভেসে যায় না, যেমন যায় রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকাদের; তারা সর্ব্বদা থাকে একটা কালো পর্দ্দার পিছনে, আড়ালে-আবডালে। তাদের দেখলে সন্দেহ হয়, বুঝি বা রবীন্দ্রনাথ আঁকবার পূর্ব্বে কাপড়ের ওপর একটা কালো পোঁচ দিতেন। কে বলবে এ সব অন্ধকারের জীব চিত্তরঞ্জন দাশের কল্পিত কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত! একেও আমি ক্ষতিপূরণ বলতে নারাজ।

আমার মতে ব্যাপারটা এই: জীবনের ধর্ম্ম কাব্যরচনা নয়; চিত্রাঙ্কনও নয়; জীবনের ধর্ম্ম প্রসার, সীমানার বাইরে, সর্ব্ব স্তরে। জীবনের ধর্ম্ম এই প্রসারণের সঙ্গে সঙ্কোচন; এবং এই দু'টি প্রক্রিয়ার সাহায্যে নিয়ম সৃষ্টি ও সেই নিয়মের অনুবর্ত্তিতা। পন্থাটিকে চক্রবলয়, কিংবা কম্বুরেখার আকারে হয়ত পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু পন্থার চেয়ে পথিকই প্রধান। তাই আজ পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ নামে পুরুষকে বুঝতে চেষ্টা করাই ভালো, তার সমগ্রতাকে, তার মূলকে গ্রহণ করাই মঙ্গল। চিত্রাঙ্কন তাঁর ধর্ম্ম-বহির্ভূত ছিল বলেই লোকের ধারণা, এবং ঠিক সেই জন্যই তাঁর অধার্ম্মিক ব্যবহারের সাহায্যেই তাঁর পুরুষত্বের (পার্সনালিটির) অদ্ভুত সন্ধান মিলবে, আমি আশা করছি আজ।

এই সন্ধানের সুবিধা বাঙালীরই আছে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষা আমাদের ভাষা, অন্ততঃ এখন। অন্য প্রদেশের ভারতবাসীদের এই সুবিধা নেই। তা ছাড়া, মনের দিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে তাঁদের একাধিক বাধা আছে। তাঁদের বিশ্বাস যে, বাঙালীরা তাঁকে নিয়ে একটু বেশী হুজুক করেছে, অবশ্য বাঙালীদের অভ্যাস বলেই। ভারতবর্ষে আজকাল ইকনমিক্স, পলিটিক্স ছাড়া আর কিছু নেই। সেই ইকনমিক্সে বাঙলার দাম মাড়োয়ারের উপনিবেশ ও কলকাতার দাম তার রাজধানী বলে; এবং পলিটিক্সে বাঙলার মূল্য যা না হওয়া উচিত তার দৃষ্টান্ত হিসেবে! কেন্দ্রীয় সরকারের মনে বাঙলার স্থান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। যা দেখছি, তাতে মনে হয় যে, আজ না হয় কাল পশ্চিম-বাঙলা চীফ কমিশনারের প্রদেশ কিংবা পাকিস্তানের সীমান্ত হয়ে দাঁড়াবে। এতে অভিমানের কিছু নেই, কর্ত্তব্য ও দায়িত্বই আছে। আমরা বাঙালীরা আজ মনেও খণ্ডিত-বিখণ্ডিত, অন্যান্য ভারতবাসী যা নয়। মানুষ হিসেবে কোনো সম্পূর্ণ বাঙালী চোখে ত পড়ে না; কারুর মূলের সঙ্গে যোগ আছে বলে সন্দেহ হয় না। রবীন্দ্রনাথের ছিল; তিনি ছিলেন গোটা আস্ত মানুষ। তাঁর সাহিত্য, তাঁর গান, তাঁর চিত্র সব একসূত্রে গ্রথিত। চিত্রকর হিসেবে তাঁকে ভিন্ন মনে হয়; কিন্তু বিচারের ফলে দেখি যে তা নয়; দেখি সবই একটি পুরুষের, একই মানবের, একই পার্সনালিটির বিকাশ। আরো দেখি যে সেই বিকাশের নিয়ম আছে। বিখণ্ডিত মনকে একত্রিত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় অখণ্ডিত, পূর্ণ পুরুষের মর্ম্ম-বিচার, তার ফলে প্রকাশের নিয়ম আবিষ্কার ও সেই নিয়মের সদ্ব্যবহার। এই জন্যই আমি রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসবে যোগ না দিয়ে তাঁর ছবি দেখতে চাই প্রধানতঃ, তার পর তাঁর গান ও কবিতা শুনতে চাই, এবং তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা থেকে দূরে পালাই।

সুস্বাগতম্ —বিভূতিভূষণ নাথ

সবিনয় নিবেদন,

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে প্রকাশিত সাময়িক ও মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'বসুমতী'র স্থান সন্দেহাতীত ভাবে শ্রেষ্ঠ। বাংলার নবীন ও প্রবীণ লেখক-গোষ্ঠীর বিচিত্র সমাবেশ বসুমতীকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। আজকাল অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকাই কোন না কোনো বিশেষ দলগত মতবাদ প্রচার করে এবং তাহার ফলে প্রত্যেক পত্রিকাতেই শুধু এক ধরণের লেখকদেরই লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বসুমতী নিঃসন্দেহে দলগত মতবাদের উর্দ্ধে। পাঠকবর্গের জন্য একটি আলাদা বিভাগ খুলিয়া বসুমতীতে প্রকাশিত গল্প প্রবন্ধ ও দেশের অন্যান্য নানা প্রকার সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। নমস্কারান্তে

বিনীতা—
সুকুমারী দেবী
পাহাড়পুর, দিনাজপুর।

মহাশয়,

মাসিক বসুমতীর রজত-জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করবার সঙ্কল্প আমার কাণেও এসে পৌঁছল। এতে আমি পাঠকরূপে গর্ব্ববোধ করবার যথেষ্ট অবকাশ খুঁজে পেয়েছি। মাসিক বসুমতীর সুউচ্চ মন্দিরের বেদী-নির্ম্মাণকার্য্যে—তুচ্ছ হয়ে থাকলেও—এক টুকরো উপলখণ্ড দান করবার সুযোগ পেয়েছি; এটা কি আমার গর্ব্বের কারণ হওয়া উচিত নয়? তবে আগামী 'রজত-জয়ন্তী' সংখ্যাতে প্রকাশ করবার জন্য আপনার প্রশ্নের কি জবাব দেব, আমি ভেবে পাইনি। তবু নিয়ে বহু কষ্টে সংক্ষিপ্তরূপে আমার মনের কথা কয়েকটি সাজিয়ে গুছিয়ে দিলাম।

(১) বসুমতীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দেনা-পাওনার সম্পর্কের চেয়ে উর্দ্ধে ব'লে আমি মনে করি। আমি অবাঙালী, তদুপরি ব্যবসায়ী লোক। তবুও কেন যে আমি বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহক—তাতে ভাববার কিছু আছে নিশ্চয়। আমরা সব জিনিষেরই অর্থনীতির কষ্টি-পাথরে যাচাই করে মূল্য নিরূপণ করে থাকি। বসুমতী তাতে খাঁটি সোণার দাগ রেখে যায়। তাই আমি মাসের পর মাস পথের পানে তাকিয়ে থাকি কিসের জন্য—যেমন চাষীরা বৃষ্টির জন্য আকাশের পানে চেয়ে রয়। ঐ আসবে, আসবে হঠাৎ এক দিন আমার কূলে নোঙর ফেলে বড় একখানা জাহাজ—সাত জাহাজ মণি-মুক্তোর সম্ভার ব'য়ে। আমার হৃদয়টা দুলে ওঠে উচ্ছল আনন্দে।—"এস, এস, বসুমতী এস।" এ যেন আমার ঘুমপাড়ানির গান

তা'ছাড়া আমার ছেলে-মেয়েরা আছে, তারা একটু সাহিত্যের আসরের খবর রাখে। তারাও মাসিক বসুমতীকে বড় ভালবাসে। তা ভালবাসবে না কেন? সমাজে মানুষ হয়ে—মাথা উঁচু করে থাকবার জন্য যত রকমারি জিনিষের প্রয়োজন তার সবই আমি ও আমার ছেলেমেয়েরা পেয়ে থাকি বসুমতীর পৃষ্ঠায়। চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে অশান্ত পৃথিবীটা, মরা মানুষের ক্রন্দন-হাহাকার আর শোষক দলের বিকট উল্লাস। তাই মাসিক বসুমতী আমার বড় আদরের। বসুমতী আমার ব্যবসায়ী জীবনের রূঢ় বাস্তবের মাঝখানে চাঁদমাখা একটি সোণার স্বপন।

(২) এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়াটা আমার মতো লোকের পক্ষে বড় শক্ত কাজ। তবু সামান্য একটা কথা বলতে সাহস করলাম। এ যুগের আণবিক বোমার মাঝখানে দুই জন ভারতবাসী মহামনীষী আমাদিগকে বহু দুর্লভ জিনিষ দিয়ে গেছেন। মহাত্মাজী আর কবিগুরুর জীবন-দর্শনের চর্চ্চার জন্য যদি আপনার কাগজের পৃষ্ঠায় একটু জায়গা করে দিতে পারেন,—তাহ'লে ভারতবাসী অনেক কিছু পাবার মতো জিনিষ পাবে নিশ্চয়। দাঙ্গার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যাওয়া ভারতবাসীর মধ্যে বসুমতীর জনপ্রিয়তা আরও বেশী হ'য়ে উঠবে। এত দিন আপনাদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহ বসুমতীকে বাঁচিয়ে রাখছে, তা কমবে না—আশা রাখছি। বসুমতীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। জয় হিন্দ, ইতি—

বিনীত—

শ্রীভুরামল আগরওয়ালা

রাজমাই চা বাগান

(আসাম)

হে বন্ধু, বিদায়

—শি. সু. বসু
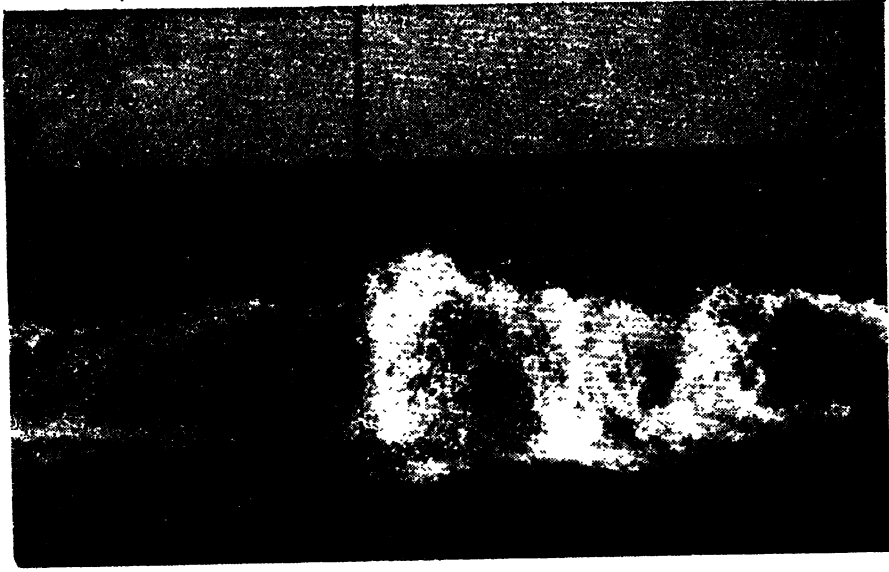
—প্রভাসকুমার চট্টোপাধ্যায়

আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আস কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্ব্বসুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে।" —রবীন্দ্রনাথ

দৃষ্টিকোণ

—রবীন সরকার

-শ্রীঅম্বুজা ঘোষ

পুর্ব্বরাগ

-সুশীল সেন

মহাশয়,

আমি ২৫।৫।৪৮ তারিখে আপনার মাসিক বসুমতীর রজত-জয়ন্তীর বিষয় পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার বক্তব্য এই যে, আমি আপনার মাসিক ও সাপ্তাহিক বসুমতীর অনেক বৎসর যাবৎ এক মাত্র ঐকান্তিক গ্রাহক। ইহা আপনার ২৫৫৬৯৮ এবং ৩৮০৬৫ গ্রাহক নং রেজিষ্টারীই জাজল্যমান প্রমাণ করিবে।

সুতরাং ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, মাসিক বসুমতীর লিখিত যাবতীয় বিষয় অত্যধিক ভালবাসি।

মা

—র, ক, দে

কারণ, ইহাতে [illegible] [illegible] সুগম করতঃ পৃথিবীর উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে।

আর ভগবানের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা যে, যেন তিনি মাসিক বসুমতীর দৈনন্দিন যথাসম্ভব শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করেন।

অনুগত—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কারবারী

(হেডম্যান)

সাং ভাসাক্ষা আদাম।

জেলা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।

মহাশয়,

'মাসিক বসুমতী'র পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে এজন্যে যে আনন্দোৎসব বা "রজত-জয়ন্তীর" আয়োজন আপনারা করছেন তার জন্যে আমার আন্তরিক শুভ-কামনা গ্রহণ করবেন।

যুদ্ধ, তার সঙ্গে সঙ্গে এত অভাব-অনটন আরও নানান্ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আমাদের বসুমতী কিন্তু আমরা পেয়েছি নিয়মিতরূপেই। আপনাদের অক্লান্ত সেবা আর যত্ন না থাকলে এ বোধ হয় সম্ভব হ'ত না।

আজ বসুমতীর এই রজত-জয়ন্তীর দিনে ভগবানের কাছে সমগ্র অন্তর দিয়ে আমি কামনা করছি, আজ থেকে বসুমতী যেন আরও উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সাফল্যতা লাভ করে। দেশের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে বসুমতী যেন ভারতের ও জাতির আদর্শ হয়।

জয় হিন্দ্।

ইতি—

মিসেস ভি এন কুঙ্কুন

(আসাম)

আরাধনা —রামকিশোর দে

সবিনয় নিবেদন,

বসুমতী সাপ্তাহিকরূপে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন হইতেই তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ। তৎপরে দৈনিকের সহিতও সে সম্বন্ধ বরাবর অক্ষুন্ন রহিয়াছে। কিন্তু মাসিক বসুমতীর জন্মের প্রথম হইতেই তাহার সহিত গ্রাহক-পাঠক ছাড়াও লেখকরূপে আর একটি নূতন সম্পর্ক ঘটিল। যিনি ইহার প্রথম সংযোজক ছিলেন, আজ অনুক্ষণ মনে পড়িতেছে—সেই বন্ধুবর স্বর্গীয় সতীশ বাবুকে। যাঁহার অসামান্য কৃতিত্বে ও কর্ম্মদক্ষতায় বাঙ্গলার সাময়িক সাহিত্য-জগতে মাসিক বসুমতী আজ এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। ইহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

পচিশ বৎসর তেমন বেশি সময় না হইলেও বাঙ্গলার সাময়িক পত্রিকার জীবনে ইহা নিতান্ত কম নহে। এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া মাসের পর মাস বহু চিন্তাশীল লেখক ও প্রথিত-নামা সাহিত্যিকের রচনা-সম্ভার চিত্র-সৌন্দর্য্য লইয়া ঠিক নিয়মিত ভাবে প্রকাশ হওয়া কম গৌরবের কথা নহে। আরও আনন্দের কথা, পরিচালকবর্গ এতেন সম্পদের অধিকারী হইয়াও নিশ্চিন্ত নহেন। কি করিলে ইহা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন ও মনোজ্ঞ হইবে সে জন্য তাঁহাদের চেষ্টার অবধি নাই।

বসুমতী আমাকে আপন-জন মনে করেন ইহা আমার পক্ষে গৌরবের কথা। প্রার্থনা করি, সকল শুভ প্রচেষ্টাকে যিনি জয়যুক্ত করিয়া থাকেন, সকল কল্যাণের নিদান সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার কৃপায় মাসিক বসুমতী যেন উত্তরোত্তর আরও শ্রীসম্পন্ন হইয়া সুদীর্ঘ কাল জনসেবায় ব্রতী থাকিতে পারে। ইতি—

বিনীত—শ্রীহরিহর শেঠ
চন্দননগর

মহাশয়,

মাসিক বসুমতীর রজত-জয়ন্তী সংবাদযুক্ত পত্রখানি পেয়ে যথোচিত আনন্দলাভ করলাম।

১। মাসিক বসুমতী একটি অফুরন্ত আনন্দের উৎস-স্বরূপ। এই উৎস থেকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও শিল্পকলা শতধারায় ঝরে পড়ে জনগণের চিত্ত প্লাবিত করে দিচ্ছে; একে এত সমাদর করি কেন? এতে পাইনি সস্তা কাচের চাকচিক্য, দেখেছি হীরক-দীপ্তি। এর রজত-জয়ন্তী উৎসবে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি-অভিনন্দন; আর এর স্বর্গীয় স্রষ্টাকে জানাই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা এবং যে সকল গুণিবৃন্দ অমূল্য রত্নরাজি নিত্য আহরণ করে বসুমতীর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ও জনগণকে পরিবেশন করছেন, তাঁদেরও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভ ইচ্ছা জানাচ্ছি।

২। এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকাতে আমি দুটি বিষয়ের স্থান দিতে অনুরোধ করি; একটি "অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ" বিভাগে রন্ধন-শিক্ষা, দ্বিতীয়টি ভ্রমণ-কাহিনী। আমার মনে হয়, এই দুটি বিষয়ই মানব-জীবনের প্রয়োজনীয় ও আনন্দময়। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

শ্রীবারি দেবী—
বিবেকানন্দ রোড,

গুল্ —ননী পাত্র

মহাশয় !

রজত-জয়ন্তী সংখ্যা ব্যাপারে আপনার প্রশ্ন দুইটির উত্তর লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। সমাদর তাকেই করি, যে আদরের কারণগুলিকে আপন স্বভাবজ মহিমায় সুপ্রকাশ করে। অপর পক্ষ প্রশ্ন তুলবে এ আদর করার ভঙ্গিটা একপেশে কি না। তাদেরকে জবাব গোড়ায় দিয়েছি। মাসিক পত্রিকার এত বিপুল গ্রাহক-সংখ্যা নিঃসংশয়ে তার ব্যাপক প্রচলন ও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী সকলের মনের খোরাক এক জায়গায় সমাবেশ করার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই "মাসিক"-পরিচালকের। ধর্মপিপাসু, নীতিবিদ্, সাহিত্যিক, চিত্রামোদী, কবি, মহিলা-মণ্ডল, শিশু-জগতের জন্য বিচিত্র নানান্ উপদেশ, কাহিনী, সংলাপ, প্রবন্ধ, দেশ ও দশের কথার এরূপ বিচিত্র পরিবেশ সত্যিই অভিনব ও আনন্দদায়ক। এ আনন্দকে অস্বীকার করা অনুদার বীর্যের লক্ষণ বলে মনে করি। কেবল ছিদ্রান্বেষী বাঙ্গালীর কাছে এর সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়, আজ সুদূর পৃথিবীর নানা জায়গায় এর ঠাঁই হয়েছে।

২। পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধির জন্য দু'টো কথা বলা ভাল বলেই জানাচ্ছি। বিজ্ঞাপনের হয়তো প্রয়োজন আছে তবুও বিজ্ঞাপনের আবর্জ্জন থেকে পত্রিকাকে উদ্ধার করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রত্যেক গ্রাহক যেন পত্রিকাখানি অন্ততঃ প্রকাশিত মাসের শেষ তারিখের মধ্যে পায়। পত্রিকার-পাঠকদের আনন্দ দেবার লক্ষ্য যেমন পরিচালক-মহলের বড় লক্ষ্য, তার চেয়ে বড় লক্ষ্যের প্রয়োজন পাঠকদের চোখের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য নূতন চলনসই বড় হরফ আর সম্ভবপর ভাল কাগজ ব্যবহার করা। উত্তরোত্তর পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি হউক ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

শুভার্থী

শ্রীদেবেন্দুশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মাসিক বসুমতীর জয়ন্তী উৎসবে উৎসাহিত পাঠক-পাঠিকাদের পত্রগুলি ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে: ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াও প্রাপ্ত পত্রগুলি শীঘ্র শেষ হইবে না। তজ্জন্য আগামী সংখ্যা হইতে কয়েক পৃষ্ঠা সম্পূর্ণই পাঠক-পাঠিকাদের উপহার প্রত্যর্পণ করিব স্থির করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকা, অধীর হইবেন না। —মা, ব,

হারাণো মাণিক

কোহিনুর হীরকখণ্ড-শোভিত রাজমুকুটের এই আলোক-চিত্রটি সংগ্রহ করতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হ'য়েছে। ছবিতে মুকুটের মধ্যস্থ সুবৃহৎ টুকরোটি আমাদের সেই হারাণো মাণিক কোহিনুর। যদিও কোহিনুরের বহু টুকরোর একটি মাত্র এই খণ্ডটি।

আপনারা প্রত্যার্পণের দাবী করুন।
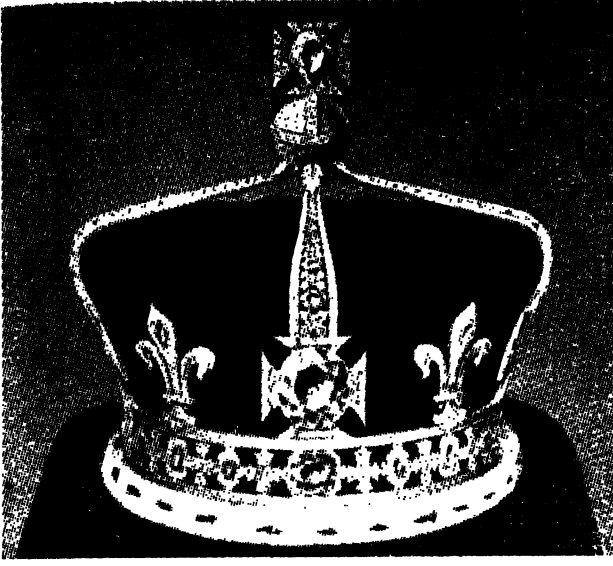
হায় কোহিনুর…!

ভারতে বৃটিশ শাসনের গত দু'শো বছরের ইতিহাস শুধু বেপরোয়া লুণ্ঠন ও নির্মম শোষণের ইতিহাস। গত দু'শো বছর ধরে ইংরাজরা ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে এবং ভারতবাসীকে শোষণ ক'রে বৃটিশ শক্তি ও আভিজাত্যের বনিয়াদ গড়ে তুলেছে। ইংল্যাণ্ডের শতকরা ২০ জন লোক ভারতের শোষিত অর্থে প্রতিপালিত হয়। কথাটা শুনতে বিস্ময় লাগে কিন্তু কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বৃটেনের জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত উলঙ্গ জনসাধারণকেই যোগাতে হয়।

লুণ্ঠনের ইতিহাস আরও বীভৎস। ইংরাজরা এদেশে কায়েমী হয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশের যত মণি-মুক্তা, সোনা-দানা সবই লুণ্ঠন ক'রে বিলাতে নিয়ে যায়। দিল্লী, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভারতের যে কোন স্থানে গেলেই ইংরাজ-দস্যুদের অবাধ এবং নির্মম লুণ্ঠনের চিহ্ন নজরে পড়বে। যেখানে যা-কিছু মূল্যবান তারা পেয়েছে, সেখানেই তারা তাদের দস্যুতার চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে রক্তাক্ত অক্ষরে। শুধু মণি-মুক্তা সোণা-দানা নয়, তাদের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে ভারতের প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে সুরু ক'রে সামান্য এক-টুকরো রঙীন পাথরও রক্ষা পায়নি। বিলাতের মিউজিয়মে এই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী করা হয়েছে। এখনও এক একটি লাট-বড়লাট যখন অবসর গ্রহণ ক'রে বিলাতে ফিরে যান, তখন তাঁরা কোটি কোটি টাকা মূল্যের গহনা-পত্র তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিলাতের বিশিষ্ট ধনীদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে পড়েন।

ভারতবর্ষ থেকে যে সমস্ত ধন-সম্পদ ইংরাজরা লুঠে নিয়ে গেছে, তার ওপর ভারতবাসীর স্বাভাবিক দাবী রয়েছে। ভারতবাসী আশা করেছিল, ভারত স্বাধীন হলে সে তার দাবী আদায় ক'রে নেবে। কিন্তু গত এক বছর ধরে ভারতের রাষ্ট্রনায়করা যে ভাবে চলেছেন তাতে সে আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। যে ইংরাজরা আমাদের ওপর অমানুষিক উৎপীড়ন ক'রে চেঙ্গিস খাঁ তৈমুরলঙ্গের মৃত আত্মাকেও লজ্জায় লাল ক'রে দিয়েছে, সেই ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অকারণ সখ্যতা আমাদের সমস্ত উৎসাহ নিবিয়ে দিয়েছে।

রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আজ আর বড়-কিছু আশা করার নেই। তাদের কাছে আজ একটি ছোট্ট দাবী নিয়েই উপস্থিত হচ্ছি। ভারতের অসংখ্য ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত কোহিনুর মণি আজ বৃটিশ সাম্রাজ্ঞীর মুকুটে শোভা পেয়ে জগদ্বাসীর কাছে গর্ব ভরে প্রকাশ করছে—ভারতবাসী এক দিন ইংরাজের দাস ছিল। ভারতের রাষ্ট্রনায়করা এই মণি ছিনিয়ে আনুন বৃটিশ সাম্রাজ্ঞীর মুকুট থেকে। এই মণি মুকুটে ধারণ করবার কোন অধিকার বৃটিশ-রাণীর নেই। মালব, মোগল এবং শিখ রাজবংশের স্মৃতি-বিজড়িত এই কোহিনুর মণি আমরা ফেরৎ চাই। কিন্তু ইংরাজ-রাজার জন্মদিনে পরম ভক্তি-ভরে যেখানে ইউনিয়ন জ্যাক ওড়ান হয়, সেখানে আমাদের এই দাবী অরণ্য-রোদনে পর্যবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশী।

কোহিনুর

এই সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল হীরাখানি কতকাল হল পাওয়া গেছে জানবার উপায় নাই। কেহ বলেন, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মসলিপত্তনের নিকট গোদাবরীগর্ভে এই হীরাখানি পাওয়া যায়, তৎপরে অঙ্গরাজ কর্ণের নিকট ছিল। আবার কেহ বলেন, কৃষ্ণ যে কৌস্তভ-মণি ব্যবহার করতেন, এখানি সেই মণি। কাহারও মতে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য এইখানি ব্যবহার করতেন।

গোলকুণ্ডার হীরক-খনিতে পাওয়া (!) কোহিনুর মণি মালব রাজ-বংশের সম্পত্তি ছিল। মোগল সম্রাটরা মণিটিকে মালব রাজবংশের কাছ থেকে কেড়ে নেন। ১৭৩৯ সালে পারস্যের নাদির শা এটিকে লুঠ ক'রে নিয়ে যান, কিন্তু শিখ-নেতা রণজিৎসিং মণিটির পুনরুদ্ধার করেন। ১৮৪৯ সালে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের পর ইংরাজরা মণিটিকে আবার লুঠ ক'রে নিয়ে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেয়। পঞ্চম জর্জের অভিষেকের সময় কোহিনুরকে কেটে রাণী মেরীর মুকুটে আটকে দেওয়া হয়। কোহিনুরের অর্থ—জ্যোতিষ্মান্ পর্বত। কোহিনুরের ওজন ছিল ১৮৬—১/১৬ ক্যারাট। কাটবার পর বর্তমান ওজন ১০৬—১/১৬ ক্যারাট। (১ ক্যারাট=৩—১/৮ গ্রেণ)।

প্যাব্‌লো

পিকাসো

গোপাল ঘোষ

দৌড় —পিকাসো

এ সমস্ত সেদিন ঘটেছিল।

ক'দিন দারুণ গুমট পড়ার পরই, পরের দিন আকাশময় বৃষ্টির দাপাদাপি; চুপ ক'রে বসে আগত ঝড়বৃষ্টির ক্ষ্যাপামি উপভোগ করছিলাম। রাত হতে-হতে ন'টা আন্দাজ সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজন-সম্মানিত শিল্পী শ্রদ্ধেয় রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এলেন।

আহারাদির পর আরাম-কেদারায় নয়, আরাম-তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে কথা উঠল। উঠল অনেক কথা—তার মধ্যে নন্দ-দা ও প্যারীর পিকাসোর কথা। খানিকক্ষণ উভয়ে কি জানি কেন চুপচাপ হয়ে রইলাম। সেটুকু নীরবতার মধ্যেই বারো বছর আগের ছবি ভেসে এল; যখন শিল্পাচার্য্যের সাক্ষাতে ধন্য হয়েছিলাম ঐ স্বনামধন্য শান্তিনিকেতনে।

শান্তিনিকেতনের ধুলি ধন্য! শান্তিনিকেতনের শন্‌-শন্‌ হাওয়া-আবহাওয়া আজও গুমরে গুমরে এই আকাঙ্ক্ষায় আছাড় খাচ্ছে যে, ওরে, তোরা বাঙালী হয়েই কেবল থাকিস্‌নে; মানুষ হ'!

কবি নেই! যা কথা উঠেছিল তাই-ই লেখা যাক। কবির কথাও থাক।

নন্দ-দাকে পেয়ে যে শান্তিনিকেতনের আকাশ-মাটি ধন্য হয়েছে সেটি ফলাও ক'রে লিখে তাঁর বিরাটত্ব বড় ক'রে দেখানো সম্ভব নয়; তাই তাঁকে শিল্পাচার্য বিশেষণ দিয়েও তাঁকে সব দেওয়া হয়নি। অবশ্য তিনি তাঁর সৃষ্টিতে এমন ভাবে ডুবে আছেন যেখানে কে শিল্পাচার্য উচ্চারণ করলে আর না করলে এ সব দিকে মাথা ঘামাবার ফালতু সময় তাঁর নেই। এই প্রসঙ্গে আর পাঁচটি কথা ক'য়ে প্যারীসের পিকাসোর প্রচণ্ড অহমিকার কথা কইবার বাসনা আছে।

নন্দ-দা তাঁর "শিক্ষায় শিল্পের স্থান" প্রবন্ধে প্রাণ নিংড়ে যা যা বলেছেন তার থেকে এই ক'টা কথা আবার উধৃত করলে বোধ

মা ও শিশু —পিকাসো

করি পাঠকের প্রাণ-মন উচ্ছন্নে যাবে না। তিনি বলেন—"শিল্প না বোঝার জন্য অনেক শিক্ষিত লোকও অগৌরব বোধ করেন না—আর জনসাধারণের তো কথাই নেই, তারা ফোটো ও ছবির তফাৎ বোঝে না :—"

তার পর বলছেন—"যাঁরা ঘরের দেয়ালে, পথে-ঘাটে, রেল-গাড়িতে পানের পিক ও থুথু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন তা নয়—জাতির স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেন।"

এ ছাড়া আবার আরো অনেক ইন্‌জেকশন্ আছে; একবারেই অতগুলি ফোঁড়া ভাল নয়। তৎসত্ত্বেও দেশের বিজ্ঞাপন, ব্যবসা, খবরের কাগজ প্রভৃতিরা নূতন বাণী চান। কিন্তু যে সব বলিষ্ঠ বাণী জাতের বুকে বিঁধে রয়েছে তা দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দেশ দু'দণ্ড শান্ত হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না। মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে হলে চাই যেমন সাহিত্য, তারও আগে যে শিল্প!

এ ক'টা কথা আগে এই জন্যে ক'য়ে নিলাম যে, সর্বাগ্রে ধাঁ ক'রে প্যারীতে পৌঁছে যাওয়া ভাল নয়। আর প্যারী পিকাসোর খবরদারি করবার মত লোক আমি নই—আমার দেশের আমি আর গাছের পাতাই যথেষ্ট। নাই বা রইল আমার সোণার দেশে পয়সা—

পিকাসোর কথাটি প্রথম তোলেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রাণতোষ ঘটক।

মা ও শিশু —পিকাসো

পিকাসো সম্বন্ধে তিনি লিখতে অনুরোধ করার আগেও তার একটু ঘটে গেছে অর্থাৎ রমেনদাকে সেদিন শিল্পীটি সম্বন্ধেই এই ভাবে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা রমেনদা, আপনি তো ইউরোপ ঘুরে এলেন অনেক বার, পিকাসোর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

তিনি টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—দেখা করবার চেষ্টা অনেক করেছি ভাই: লণ্ডন ও প্যারী থেকে চার-চারখানা চিঠি লিখেছি কিন্তু কোন জবাবই পাইনি—তা দেখা করা তো দূরের কথা! আর ফোনে তাঁকে পাবার জো নেই, ফোন থাকা সত্ত্বেও পিকাসোর ফোন-নম্বর গাইডে নেই।

তার পর থেমে আরও বললেন: ভাই, আমি তো কোন্ ছার, স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মত লোকও একবারটি চোখের দেখা দেখতে পান্‌নি। তিনি অনেক চেষ্টা-চরিত্র ক'রেও পিকাসোর পাশে দাঁড়াবার অনুমতিটুকু না পেয়ে লণ্ডনেই চলে যান।

এই যখন পিকাসোর কাণ্ড, তখন তো তাঁর সম্বন্ধে লেখা চাট্টিখানি কথা নয়! তবুও তাঁর সম্বন্ধে যে জোর ক'রে লিখতেই হবে, এমন মাথার দিব্বি কেউই দেন্‌নি। তবে বন্ধুবরেষুর এ অনুরোধটুকু ফেলবারও নয়। যত দূর টের পেয়েছি—পিকাসো আদতে অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। আজও ফর্সা আকাশ দেখে আনন্দে গান করতে থাকেন, তবে কেন এতো কঠিন! সেটা হচ্ছে কোমলতা বাঁচাতে হলে কঠিন না হয়েও বোধ হয় উপায় নেই।

অভাব-অনটনে আছাড় খাচ্ছেন। পকেট ফাঁকা, এক ফ্রাঁকও নেই কিন্তু ফর্সা আকাশ দেখে অবাক হয়ে আনন্দ পাচ্ছেন। প্যারীর কিছুই জানা নেই, চেনা নেই, তবুও মনে মনে কল্পনা করলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া ক'রে ফেললেন যে, এই প্যারীর বুকে প্যাবলো পিকাসো নিজেকে নিয়ে মজে থাকবে। পৃথিবী পিকাসোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও পিকাসো চাকরী বা দলাদলির দলে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না।

আর, আজ সত্তর বছরের কাছাকাছি এসেও তাঁর ঐ অন্তরের জ্বলন্ত আগুন এখনো নিবে যায়নি। সৃষ্টির বিরাম নেই—নতুনত্বের অন্ত নেই, ক্রমাগত কাজ ক'রে যাওয়াই তাঁর ব্রত। এই ধরণের আদর্শ ব্রত পৃথিবী-বোঝাই মানুষেরা নিতে পারেন না ব'লেই প্রতিভাকে সম্মান দিয়েও অসম্মান করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। পিকাসোর পায়রা, প্যাঁচা, কুচোপাখি, কুকুর প্রভৃতিরাই অত্যন্ত আপন ও যথার্থ অন্তরের আত্মীয়।* এঁই সব আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে Rue des Grands-Augustin'sএর একটি অত্যন্ত ভাঙ্গা বাড়ীর ওপর-তলায়

---

* পিকাসোর পশুপক্ষীর প্রতি অপত্যস্নেহের পরিচয় বৈশাখের মাসিক বসুমতীর আলোকচিত্র বিভাগে পূর্বেই প্রকাশিত।

—মাসিক বসুমতী

Parisএর বুকে Pablo Ruiz থাকেন। আদতে কিন্তু তাঁর আসল নাম Pablo Ruiz ; কিন্তু কী তাঁর মর্জি—মায়ের পদবীটাই Pablo পছন্দ করলেন। পৃথিবীর এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত Picasso পদবীতেই অবশ্য বেশী পরিচিত।

শ' যেমন লণ্ডনের বুকে বসে পৃথিবী কাঁপাচ্ছেন আইরিশ হয়েও ; পিকাসোও তেমনি প্যারীর জীবন্ত স্নায়ু, আদতে তিনি স্পেনের মানুষ। এই Spaniard প্যারীর অত্যন্ত পুরানো পাঁজরা-বার-করা প্রকাণ্ড একখানা বাড়ীতে এখন থাকেন—সে বাড়ীর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুর বেরিয়ে আসে—তখন সেই কুকুরই স্থির করে, আগন্তুককে অন্দরে এগুতে দেওয়া উচিত কি না।

তার পর সব দেশেই শিল্পীদের একই অবস্থা ; সবাই তাঁদের ঘাড়ে চড়ে বেড়াতে চান। সবাইকেই আর্ট বুঝতে হবে। মানে আকাশের রং না দেখে, গাছের ডালপালার দিকে চক্ষু জোড়া দু'টি না মেলে সবাই আর্ট বুঝে ফেলতে চান। এইখানে তিনিও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন "Everyone wants to understand art", he once complained, "Why not try to understand the song of a bird? Why does one love the night flowers, everything around one, without trying to understand them. But in the case of painting, people have to UNDERSTAND.

পাখীর গান, রাত, ফুল এ-সব দেখার নেশা সবাই কি সারা জীবন ধরে পালন করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর এই ভাবে দিলেই যথেষ্ট হবে যে, সেই মানুষই এ সব দেখে, কাণে শুনে সত্যিই ধন্য মনে করেন যিনি দৈনন্দিন কশাঘাতে থেঁতো হয়ে গেলেও পাখীর গানে আর বনের ফুলের গর্বেই বুক ফোলাতে জানেন।

পিকাসো যত অহংকারীই হোন—তিনি পাজি অহংকারী নন।

যাঁরা প্রাণের জিনিসের খানিকটা পেয়ে গেছেন তাঁরা বাইরের লোকের কাছে অহংকারী মনে হলেও আদতে তাঁরা এক এক জন আলাদা মানুষ। সেখানে অহংকারের অ-ও নেই।

তবে আমরা ভুলেও যেন দলে দলে ভারতবর্ষ ছেড়ে প্যারী প্রভৃতি দেশে পালিয়ে না যাই। আদত ব্যাপার যার যা পাবার তা না পেলে অন্য দেশে কেবল পালিয়ে গেলেই পাওয়া যায় না সব। প্যারীতে পিকাসো থাকতে পারেন, কিন্তু নিজেকে তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করতে পারা আবার যার-তার কাজ নয়। কারণ, ক্রমাগত এঁরা বাধা-বিঘ্নের মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে ছিটকে বেরিয়ে যাবার আর্ট জানেন বলেই সারা জীবন বেছে-নেওয়া-পথ ঐ আঁকা নিয়েই থাকতে পারেন। অ কাই কেবল আর্ট নয়, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করাই আদত কথা।

পিকাসোর মস্ত গুণ যে, নিজেকে তিনি ঠকাননি—অবশ্য শিল্প-সমালোচকরা তাঁকে নিয়ে গাছেও যেমন চড়িয়েছেন, আবার ধপাস্ ক'রে যেখানে-সেখানে ফেলতেও কসুর করেননি। তাতে এঁদের মত সদা-উৎফুল্ল মানুষদের মাথায় ঘা লাগলেও দেহে-মনে ঘা ধরে না।

পিকাসো তাঁর পিতার কাছ থেকেই আর্টের আগুন অর্জ্জন করেছেন প্রথম বয়সে। সেই শিক্ষাই তাঁকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছে। এ সৌভাগ্য সব হতভাগারা ক'রে আসে না।

আমরা সবাই জানি কি না জানি না ; আমরাই যে সবার আগে শতকরা পঁচানব্বুই জন শিক্ষিত ছিলাম—তাও আবিষ্কার করবার জন্য জার্মাণ পণ্ডিতকে কলম ধরতে হয়েছে। হার্টমুট পিলারের মত পণ্ডিতকে দুঃখে কাতর হয়ে আমাদের সম্বন্ধে এই ভাবে বলতে হয়েছে : "যে জাতি অন্য সকল জাতির চেয়ে অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা গৌরবের মনে করছে, আজ সে জাতির শতকরা ১৫ জন নিরক্ষর।"

এখানকার কালো-বাজারে চিত্রিত কৃষ্ণের ভারতবর্ষে চিত্রকলা সম্বন্ধে বলাও বোধ হয় অশোভন। সে যাই হোক, শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি সোনার সিংহাসনের অপেক্ষায় থাকে না। পিকাসোর দেশ শতকরা একশো জন শিক্ষিত হয়েও আর্ট-এর ব্যাপারে কশাঘাত না ক'রেও তাদের উপায় নেই। প্যারীর মত শহরে,

প্রেম —পিকাসো

যেখানে পাখী-পরীতে পথ-ঘাট পেছল সে দেশেও প্যাচা-পায়রা পুষে পুরুষ-সিংহ পিকাসো খুব কম লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। কারণ তাঁর সময়ের বড় অভাব যে মানুষ নাগাড়ে কাজ ক'রে যাচ্ছেন তাঁরই তো সময় বাড়ন্ত। জীবনে যাঁদের আদর্শ সোনার দিকে নয়, সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্তের প্রতি টান তিনিই তো যথার্থ প্রণম্য। পিকাসো এই স্তরের পাত্র।

তার পর এই ধরণের যাঁদের স্নায়ু—তাঁরাই নির্ভীক। এই সেদিনের কথা: আমাদের ঘাড়েও যেমন জাপানী বোমা পড়েছিল—কটা বোমার ঘায়েই "কলকাতা" মহানগরী একা যেমন ফাঁকা হয়ে কাঁপতেন তেমনি সমগ্র ইউরোপের মধ্যে পরম সুন্দরী প্যারীও শূন্য তখন, জার্ম্মাণ আক্রমণের আতঙ্কে ঐ মনোরম শহর ছেড়ে যে যার পালিয়ে যাচ্ছে—প্যারীর সুপ্রশস্ত পথ-ঘাট-কাফে-ক্লাবে কেউ নেই। তার মধ্যে Pablo Picasso ভয় না পেয়ে দারুণ তেজে তেড়ে তেড়ে ছবির পর ছবি এঁকে চলেছেন। সেই সময় স্পেনের বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক এসে পিকাসোকে বিশেষ অনুনয়-বিনয় ক'রে বলেছিলেন—প্যাবলো, আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসি। তার উত্তর পিকাসো গর্জে উঠে এই ভাবে বললেন "Guillermo, I wouldn't think of moving from here, shall be the last foreigner to leave Paris." তাই বলতে হয়, 'সাহস আগে চাই! শিল্প ও সমালোচকদের ভোঁতা কলমের তীব্র সমালোচনা তাই এঁদের মত নির্ভীকদের থামাতে পারে না।

পিকাসোর শিল্প-পদ্ধতি যাই হোক; এক কথায় কাজ ক'রে গেলেই পদ্ধতি প্রকৃতি প্রভৃতি স্বতস্ফূর্ত্ত হয়েই আসে—এ অটল বিশ্বাস তাঁর আছে।

আর বেশী না এগিয়ে পিকাসোর নিজের ভাষায় তাঁর শিল্প সম্বন্ধে নিজেই যা বলেছেন তার থেকে আর একটু অল্প তুলে দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করব।

গত ১৯২৬ সনে Ogoniok নামক রুশ দেশের পত্রিকায় পিকাসোর একখানি চিঠি প্রথম প্রকাশ পায়—তার সুরে পাওয়া যায় যা সেগুলি বই-পড়া কপ্‌চানি নয়, একেবারে অভিজ্ঞতায় শানানো জোরালো উত্তরের উৎস। তাঁকে অনেকে প্রশ্ন করেন—আপনি এত বিচিত্র ছবি আঁকেন কি ক'রে?

তার উত্তর অত্যন্ত সরল ভাষায় বলেছেন:—I do not seek, I find. এই ধরণেরই ধারালো কথা শিল্পাচার্য নন্দদাও বলেন—"নিত্য অভ্যাস চাই। ভয় আর লোভ বর্জ্জনীয়। যে আনন্দে সৌর জগতের আর পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, সেই আনন্দেই শিল্পী ছবি আঁকে।"

আর্টে হাঁকপাক ক'রে হাত্‌ড়াবার কিছু নেই—তাই Seek করবারও কিছু নেই, সোজা ভাবে দেখে সাজালেই সরল শিল্পের স্রোত বইবে।

পিকাসো আরো বলেন—"I have always worked for my duty time, I never worry about the spirit of research, I express what I see."

এইখানেই সার্থক তপস্যার সরল ভাষা, এ ভাষায় শক্ত শব্দ নেই কিন্তু এই সহজটি অর্জ্জন করাই সব চাইতে শক্ত। তিনি তা হাড়ে-হাড়ে হাতুড়ি-পেটা খেয়ে অর্জন করেছেন। তার পর নন্দদাও যেমন বলেন,—"শিল্প হল সৃষ্টি। স্বভাবের অনুকরণ নয়। বাহ্য স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টির যে আবেগ নিরন্তর ক্রিয়াশীল শিল্পীর স্বভাবেও তারই প্রেরণা, তারই ক্রিয়া; সুতরাং অনুকরণের কথা ওঠে না। শিল্প হল শিল্পীর ধ্যান বা 'চিন্তা'।"

পিকাসোর এই ভাবই অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেই ড'ঘণ্টা তুলি ধরেই সেই সব যারা Picasso হোতে যান, সেই সব নকলনবিসদের খুঁড়েছেন: "I feel almost physically ill every time that I find myself being imitated—" নিজস্ব আগুন অন্তরে যাঁদের নেই তাঁরাই তমুকের মত অমুক হোতে গিয়ে ঘুণে-ধরা imitator হোয়ে পড়েন।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে—তিনি যে খুব কম লোকের সঙ্গে দেখা করেন সেটা খুব অন্যায়ের নয়, যত অন্যায় ভাবে লোক-জন এটা দেখেন।

আর হিমালয়ের দেশের শ্রদ্ধেয় নন্দদার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বা শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষে কোন কালে ছিলেন কি না—সে আবিষ্কার করবার জন্য ওপার থেকে গবেষক আসার দরকার হবে হয়তো এক দিন। দেখা যাবে আজ থেকে পনেরো দিন পরে এক বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত আবিষ্কার করলেন: Dr. Abanindra Nath Tagore C. I. E. & Sri Nandalal Bose এরাই ভারত-শিল্পের সুস্থ পতাকা উড়িয়েছিলেন ইত্যাদি।

এই তো আমাদের অবস্থা—এ যুগে আজও আমরা স্বস্তি পরিষদ প্রভৃতি আউড়িয়ে এক-দম্‌ দম আটকে কাঠ হয়ে আছি। আমাদের এই কাঠযুগ কবে উত্তীর্ণ হবে তা একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিকরাই বাৎলাতে পারেন—কিংবা বর্মার লর্ড লুই ম্যাউন্টব্যাটেন॥

—আগামী সংখ্যা হইতে—

আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দু'টি লেখা দু'জনে লিখবেন—ললিত হাজরা ও সন্তোষ ঘোষ

পত্রগুচ্ছ

'পত্রগুচ্ছ' বিভাগটি উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুধী-মহলে আশাতীত প্রশংসা লাভ ক'রেছে। আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট থেকেও অজস্র ধন্যবাদ পেয়েছি। বিভাগটি আরও লোভনীয় ক'রে তুলতে চাই সাধারণের সহযোগিতা। 'চিঠি' যে কত ঐতিহাসিক কাহিনীতে চিরস্মরণীয় আখ্যানের সৃষ্টি ক'রেছে তার সন্ধান হবে আমাদের এই 'পত্রগুচ্ছ'। ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের বিখ্যাত পত্রের সঙ্কলন হিসাবে 'পত্রগুচ্ছ' যে কি ধরণের কার্য্যকরী বিভাগ তার প্রমাণ প্রতি মাসে আপনারা চোখের সামনে দেখতে পাবেন। 'পত্রগুচ্ছ' বাঙলা-সাহিত্যে এই প্রথম সাহিত্যিক মর্য্যাদায় সাহিত্যের অঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে—এ কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন।

—মাসিক বসুমতী

['বঙ্কিম শত-বার্ষিকী' সংখ্যায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি পত্র সংকলিত হয়। পত্রগুলি যদিও ব্যক্তিগত, তথাপি তাহার মধ্য দিয়াই তদানীন্তন বাংলা-সাহিত্যের নব জাগৃতির এক ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহেবী মনোবৃত্তির অন্তরালে জাতীয় চেতনার নূতন উন্মেষ তখন কত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে বঙ্কিমের রচনায়। 'মুখার্জ্জিস রিভিয়্যু' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট লেখা এই পত্রখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। পত্রিকা পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন আজও তাহার প্রয়োজনীয়তার হ্রাস হয় নাই।]

বহরমপুর—
১৪ই মার্চ, ১৮৭২।

মহাশয়—

আপনার এগারোই তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমাকে অপরিচিত চিন্তা করিয়া আপনি ভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়াছেন। আপনার সহিত পূর্ব-পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ইতিপূর্বে একাধিক বার আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।

আমার সম্বন্ধে আপনি অনুগ্রহ করিয়া যত প্রীতিপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে কি ভাবে ধন্যবাদ জানাইব ভাবিয়া পাইতেছি না। কিন্তু এই সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার ঋণ এত দীর্ঘ দিনের যে শুষ্ক ধন্যবাদ প্রদানের দ্বারা আমি তাহার গুরুত্ব লাঘব করিতে চাহি না।

আপনার পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জন-সমাজের মধ্যে চিন্তা ও সহানুভূতির আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে আমিও একখানি মাসিক পত্রিকা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিব মনস্থ করিয়াছি। আপনি যথার্থই লিখিয়াছেন যে, মঙ্গলের জন্যই হউক অথবা অমঙ্গলের জন্যই হউক, ইংরাজী ভাষাই এখন আমাদের বাহন হইয়াছে। এবং ইহার ফলে বঙ্গসমাজের উচ্চ এবং নীচ স্তরের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার ধারণায়, এমন হওয়া উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য, নিজেদের সাহেবীয়ানা কিছু পরিমাণ ত্যাগ করিয়া দেশের জনসাধারণের নিকট তাহাদের বোধগম্য ভাষায় বক্তব্য পেশ করা। বাঙলা মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনা আমার সেই উদ্দেশ্যেই। কিন্তু তাহাও আমাদের কর্মসূচীর অর্দ্ধাংশ মাত্র। শুদ্ধ বঙ্গভাষায় প্রচারিত কোন পত্রিকার দ্বারাই বঙ্গদেশের অধুনাতন সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত করা যায় না। বাঙলা দেশের বৃহৎ জনসমাজের নিকট আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করাও যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ভারতের অন্যান্য জাতি এবং আমাদের শাসক জাতির নিকটে তাহা গোচরীভূত করা। বাঙালী এবং পাঞ্জাবী, এই দুই জাতি যত দিন না পরস্পরকে জানে এবং পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে ও ইংরেজ জাতির উপর তাহাদের যৌথ প্রভাব বিস্তার করে, তত দিন ভারতবর্ষের কোন আশা নাই। কেবল মাত্র ইংরাজীর মাধ্যমেই তাহা সম্ভব এবং সেই কারণেই আপনার পরিকল্পিত পত্রিকাখানিকে আমি স্বাগত করিতেছি। ইংরাজী বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে আপনাকে আমার ধারণা বিস্তৃত ভাবে জানাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছি এই কারণে যে, অন্য সময়ে হয়ত আমাকে অন্য ধরণের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে শুনিবেন। মূলতঃ, যখন আমরা প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে নিযুক্ত, তখন প্রশ্নটির দুই দিকেই প্রখর আলোক-সম্পাত করা প্রয়োজন।

আমার পক্ষে এ কথা জানানো হয়ত নিষ্প্রয়োজন যে, আপনার

সহিত সহযোগিতা করায় আমার উৎসাহের অভাব ঘটিবে না এবং আপনি যদি মনে করেন যে, আমার সাহিত্যিক শক্তি আপনার কোন প্রয়োজনে লাগিবে, তাহা আপনি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন। যদিও বর্ত্তমানে আমি কিছুটা ব্যস্ত, অবশ্য সাহিত্য সংক্রান্ত কাজে নয়, আমার কর্মস্থলে অফিসারদের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার ফলে—তথাপি আপনার ও আমার পত্রিকার জন্য আমি কিছু সময় করিয়া লইব। আপনার পত্রিকার সদস্য-তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করা যদি আপনি উত্তম বিবেচনা করেন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই জানিবেন। আশা করি, কুশলে আছেন।

ইতি ভবদীয়
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[ক্যাথারিন ম্যানসফিল্ডের শেষ ন'টি বছর দারিদ্র্য আর ভগ্ন-স্বাস্থ্যের সঙ্গে নিরলস সংগ্রামের এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। কৃশাংগী তিনি চিরদিনই ছিলেন, কিন্তু ১৯০৩ খৃষ্টাব্দেই যক্ষ্মার লক্ষণ তার শরীরে প্রথম প্রকাশ পায়। তার পর যত দিন বেঁচেছিলেন, ভগ্ন-স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এক স্থান থেকে আর এক স্থানে অনবরত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে। যেন ক্লান্ত পথিকের একলা পথ চলা। সর্বক্ষণ মৃত্যুভয় মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তাই বুঝি জীবন ও সৌন্দর্যের প্রতি এত মমতা ছিল ক্যাথারিনের। তার দৃষ্টির শুভ্র স্বচ্ছতা, সত্য ও সাধুতার প্রতি ঐকান্তিক আসক্তিই তার অতি কোমল সংবেদনশীল মানসের আসল রহস্য। চিঠিপত্র, রোজনামচা ও ছোট গল্প—এই নিয়ে হোল তার রচনা-সম্ভার। এই রচনার পুঁজিও খুব কম নয়। তার প্রতিটি গল্প সৃজনী-প্রতিভার সূক্ষ্ম কারুকার্যের এক একটি অপূর্ব নিদর্শন। নীচের এই চিঠি দু'খানি তিনি তার স্বামী মিডিলটন মারীকে লিখেছিলেন। প্রথমটি প্যারিস থেকে আর দ্বিতীয়টি দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে।]

১

শনিবার, সন্ধ্যা, ১৫ই মে, ১৯১৫

বাতিফরাস তার নিত্য-কাজ বাতি জ্বালাতে বেরিয়েছে কিন্তু আমি এখনও অন্ধকারে বসে। এইমাত্র একটু বেড়িয়ে ফিরছি। গিয়েছিলাম নতরডামের বাগানে। সেখানেই অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছিল। সত্যি, পুষ্পিত শাখার মদির গন্ধ নিশ্বাসে ভরে নিতে কি আরাম! কোন কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। আমার বেঞ্চির শেষ প্রান্তে এক জন শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রৌঢ় মৃদু গুনগুন করছিলেন। আর কয়েকটি দুরন্ত ছেলে বল নিয়ে লাফালাফি করছিল। তাদের মাথা, হাঁটু আর উড়ন্ত হাত শুধু দেখা যাচ্ছিল। গাছের ডালগুলি কি মিশমিশে কালো আর আকাশের পটভূমিকায় পাতাগুলি কি পরিপাটি সুন্দর! আকাশ, বন আর সন্ধ্যা মিলে যেন প্রকৃতিতে এক সুরের ঐক্যতান রচনা করেছে। গাছের সারির মাথা ছাড়িয়ে নতরডামে সৌম্য সৌন্দর্য আচ্ছন্ন আলোয় মহিম দেখাচ্ছিল। গম্বুজ থেকে গম্বুজে ছোট ছোট পাখীরা কলরব ক'রে উড়ছে—তুমি ত জান, পোড়ো-বাড়ীতে এই পাখীগুলি এমনি ধারা ঘুর-ঘুর ক'রে বেড়ায়। এদের দেখে আমার একটি সনেট লেখার ইচ্ছা হচ্ছিল। বার্ধক্যে মানুষের মনের উড়ে যাওয়া আবার ফিরে আসা চিন্তারাশির সঙ্গে ঐ গম্বুজ থেকে গম্বুজে আনাগোনা-করা পাখীদের নিয়ে একটা নিখুঁত ছবি মনে এসেছিল। এক সময় বসে লিখবই সেটা।

আজ সারা বিকেল বই লিখেছি। এই পরিশ্রমের পর যে ক্লান্তি আসে তা ভারী মধুর।

দেখতে পাচ্ছি প্রেমিক-প্রেমিকরা তখনও অলস গুঞ্জন ক'রে ফিরছে। প্যারাপেটের উপর দেহকে এলিয়ে দিয়ে নৃত্যপরা জলধারার দিকে চেয়ে আছে তারা। আজকের রাত সত্যিই ভালবাসার জনের হাত ধরে ঘুরে বেড়ানর রাত। তোমার চিঠি ডাকে দেওয়ার পর বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু এখনও সারা আকাশে থরে-থরে মেঘ সাজান।

আমি পঁয়তাল্লিশ সেণ্ট দিয়ে এক লিটার সাদা মদ কিনেছি। খুব চমৎকার মদ। রান্না-ঘরের নর্দমায় বসান জলের পাত্রে রেখে দিয়েছি সে মদ। দুধ আর মাখন রান্না-ঘরের বাইরে একটি ইটের উপর বসিয়ে রেখেছি। 'যদি সেদিন আসে।' হায় রে দিন!

আরো বেশী বেশী চিঠি লিখো। অবশ্য আমার উৎসাহের সঙ্গে কেউ তাল রেখে চলতে পারে না। সে আমি ভাল ক'রেই জানি। ইংলণ্ডে তোমার একলা থাকার সঙ্গে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমার জীবনের নিঃসঙ্গতার অনেক— অনেক তফাৎ।

২

রবিবার, সকাল

এই মাত্র তোমার চিঠি পেলাম। লণ্ডন এখন ভালই লাগছে নিশ্চয়। আপেলের নির্যাস নিয়ে আমার ছোট্ট বাগানটিতে বসে থাকা সত্যিই লোভনীয়। এই বাগানটিকে আমি যেমন জানি তেমন আর কাউকে জানি না। লিখতে লিখতে তার রূপটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কেন জানি না, এক রহস্যময় কারণে আমি ওখানে শুধু কাঁদতেই যেতাম। নববর্ষের এক ভয়াবহ সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। আমি বাগানে গিয়ে একটি ছোট্ট বেঞ্চিতে বসে নীল ফিতে-বসান কালো ভেলভেটের দস্তানায় মুখ গুঁজে কাঁদছিলাম (পরে এলে, সেটি নিয়ে নিয়েছ)। মাথায় ছুঁচাল নরম টুপি-পরা কুশ্রী এক বুড়ী অনেকক্ষণ ধরে আমায় লক্ষ্য করছিল। শেষটায় সে এক গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বললে—'এমনিই হয়ে থাকে, মা।'

এখানে দেওদার ঘেরা চৌকো বাগান—দেয়ালের গায়ে লেবুর লতা জড়িয়ে উঠেছে। পাড় যেখানটায় ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমে গেছে সেখানে দু'টো ডিঙ্গী নৌকা ডাঙ্গায় চিৎ হয়ে শুয়ে আরাম করছে। আজ দেখি, সোলার টুপি মাথায় এক বুড়ো তার একটিতে হাতুড়ী পিটছে। আর অন্যটিতে দু'টি ছোট ছেলে জলেতে হাত ডুবিয়ে খল-খল ক'রে হাসছে। দেয়ালের গায়ে কয়েকটি গদি ঠেসান দেওয়া আর লাল সালুতে মোড়া কাঠের ফ্রেমের একটি চালুনী। মাথা আর থুতনি সাদা ফিতেতে বাঁধা পুষ্পিত লতা ছাপা গাউন পরে এক বুড়ী সেই চালুনীতে রোঁয়া আর সাদা পালক ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ছাঁকছে। আর একটি অল্প-বয়সী মেয়ে—মাথায় তার কালো টুপি—রোঁয়া আর পালক বেছে-বেছে বুড়ীর পাশে পাহাড় প্রমাণ ক'রে তুলছে। বেশ চড়া রোদ্দুর। রোঁয়া আর পালকগুলি

এত ধূলিমাখা যে মেয়ে ছ'টি বার বার কাসছিল আর হাঁচছিল। কিন্তু তাদের দেখে মনে হচ্ছে, ভারি সুখী তারা। যতক্ষণ না গদি তৈরী হোল এবং গদীগুলিকে পাটিসাপটার মত গড়িয়ে রাখা হোল ততক্ষণ আমি তাদের কাজ লক্ষ্য করলাম। তখন অল্পবয়সী মেয়েটি একটি ছোট জলচৌকি এনে ছুঁচ-সুতো নিয়ে গদি সেলাই করতে বসল আর বুড়ীটি শিকের মত লম্বা স্ফুচ দিয়ে ফাঁকে ফাঁকে বোতাম দিতে লাগল। থেকে থেকে ছোট ছেলে ছ'টি নাক ঝাড়তে দৌড়ে উপরে উঠছিল। কখনো বা বুড়োটি আপন মনে কি যেন সুর ভাঁজছিল আর ছেলে ছ'টিও অনুকরণ করছিল তাকে।

কার অভিশাপে আমাদের এই বিচ্ছেদ! ব্যর্থ এ জীবন—শুধু লেখা আর পড়া ছাড়া বাকী সময় ত খালি অপচয়ের ডালি ভরিয়ে তুলছি।

আমি আজ হেঁটে নতরডামের পিছনের বাগানে গিয়েছিলাম। সাদা আর বেগুনী ফুলের গাছগুলি এত মনোরম যে আমিও একটি বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। বাগানের মাঝখানে ঘাসের মখমল বিছান ছোট্ট এক ফালি জায়গা। আর তার পাশে মার্বেলের একটি ছোট্ট জলাধার। চড়ুইরা তাতে স্নান করছে আর চারি দিকে জল ছিটিয়ে ফোয়ারা সৃষ্টি করছে। পায়রারা সেই মখমলের উপর দিয়ে পালক খুঁটতে খুঁটতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাগানের প্রতিটি বেঞ্চে কেউ না কেউ বসে—মা, আয়া, বুড়ো ঠাকুর্দা। ছোট ছোট শিশুর দল খোন্তা আর বালতি-ভর্ত্তি মাটি নিয়ে পিঠে-পুলী তৈরী করতে লেগে গেছে। কেউ বা চেষ্টনাট গাছের ঝরা ফুল বালতি ভর্ত্তি করছে। কেউ বা আবার ঠাকুর্দার মাথার টুপি কেড়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত ঘাসের মখমলের ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে। এমন সময় এক জন চীনা আয়া ছ'টি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে এল বাগানে। মাথায় ছোট্ট পাগড়ি, সবুজ ট্রাউজার আর কালো ঘাঘরায় ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল মেয়েটিকে। সে তার সেলাই নিয়ে বসে গেল আর চলতে লাগল অনর্গল পাখীর মত কিচির-মিচির। মাঝে-মাঝে স্ফুচটাকে মাথার পাগড়িতে বিঁধিয়ে সে শিশু ছ'টির দিকে পিট-পিট ক'রে তাকাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হোল যেন আমি স্বপ্ন দেখছি। কেন আমার সত্যি-কারের ঘর নেই? এই ত আসল জীবন। সবুজ ট্রাউজার-পরা চীনা আয়া আমিও চাই, আর ওমনি ছ'টি শিশু—যারা দৌড়ে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজবে। আমি ত আর কিশোরী নই—আমি নারী! নারীর কাম্য সব কিছু আমি চাই। কোন দিন কি পাব না তা? সারা সকাল লেখা, তার পর তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে আবার বিকেলে লেখা—রাত্রে খাওয়ার শেষে একটি সিগারেট—তার পর শোয়ার আগে পর্যন্ত সাথীহীন নিরালা—এই আনন্দ আর ভালবাসা যা মুক্তির পথ খুঁজে মরছে, ঝরা মেয়ের বুকের ছুধের মত আমারও জীবন-রস ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে। জীবনকে আমি পরিপূর্ণ ভোগ করতে চাই! আমি চাই বন্ধু-বান্ধব, লোক-জন—নিজস্ব বাড়ী! বিলিয়ে দিতে চাই নিজেকে—সব বিলিয়ে ফুরিয়ে যেতে চাই যে।

[বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী চিত্রশিল্পী পল সিজান ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক এমিল জোলার বাল্যবন্ধু। তাঁদের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁদের বন্ধুত্বের কাহিনী নিয়েই বিরাট একটি বই লেখা যায়। খুব শিশুকাল থেকে প্রায় সারা জীবনই জোলা এবং সিজান নিয়মিত ভাবে পরস্পরের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। জোলাকে লেখা সিজানের অসংখ্য পত্র থেকে এখানে একটি পত্র প্রকাশ করা হল। নিজের ছেলে পলকে লেখা আর একটি পত্রও প্রকাশিত হল।]

এমিল জোলাকে

আইক্স, ২০শে জুন, ১৮৫৯

প্রিয়বরেষু—

হ্যাঁ ভাই, আগের চিঠিতে যা লিখেছিলাম তা বাস্তবিকই সত্যি। একটি মেয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ অনুভব করছি। মেয়েটির নাম জাষ্টিন। সত্যি, সে ভারি চমৎকার। কিন্তু আমি তো "ভারি সুন্দর" হবার সৌভাগ্য লাভ করিনি, তাই সব সময়ই সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি যখন তার চোখের দিকে তাকাই, তখনই সে চোখ নীচু ক'রে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। একই রাস্তা দিয়ে চলবার সময় সে আমার দিকে একবার মাথা হেলিয়ে দেখেই দ্রুতপদে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। একবার পেছনে ফিরেও দেখে না। মনে সুখ নেই, তা সত্ত্বেও দিনে তিনবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তার চেয়েও মজার কথা শোন ভাই: আমার সহপাঠী প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সিমার্ডকে তো তুমি চেনই। এক দিন সকালে সে এসে আমার সঙ্গে ভাব জমাল। আমার কাঁধে ভর দিয়ে পথ চলতে চলতে বলল, "এইবার আমি তোমায় আমার ছোট্ট সুন্দর প্রিয়াকে দেখাব। আমি তাকে ভালবাসি এবং সে-ও আমায় ভালবাসে।" কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভাই, আমার চোখের সামনে মেঘ ঘনিয়ে এল। আমি যেন বুঝতে পারলাম যে, ভাগ্যদেবী আমার প্রতি প্রসন্ন হাসি হাসবেন না। হলও তাই। ১২টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই জাষ্টিন বেরিয়ে এল তার দপ্তর থেকে। দূরে তার আকৃতিটা আমার নজরে পড়তেই সিমার্ড তাকে ইঙ্গিত ক'রে আমায় বলল, "ওই আসছে সে।" চোখে ধাঁধা লাগল আমার, মাথার মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেল। সিমার্ড আমায় টানতে টানতে নিয়ে গেল এবং সেই ছোট্ট মেয়েটির ঘাঘরা উড়ে এসে স্পর্শ করল আমায়…।

সেদিন থেকে রোজই প্রায় তাকে দেখি এবং অনেক সময়ই দেখি সিমার্ড তাকে অনুসরণ করছে…আঃ, কি স্বপ্নই না আমি রচনা করেছিলাম—উন্মাদনী স্বপ্ন, কিন্তু ভাই, ব্যাপারটা তো এই। মনে মনে আমি ভেবেছিলাম, ও যদি আমায় অপছন্দ না করে, তা হলে ছ'জনে আমরা চলে যাব প্যারিসে। সেখানে গিয়ে আমি হব শিল্পী এবং ছ'জনে আমরা থাকব সুখে। স্বপ্ন দেখেছিলাম, বাড়ীর পাঁচ তলার ঘরে একটি চিত্রশালা, স্বপ্ন দেখেছিলাম ছবির আর স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, তুমি আছ আমাদের সঙ্গে। ওঃ, কি মজা বল তো? তুমি তো আমাকে চেন, আমি ধনী হতে চাই না। কয়েক শ' ফ্রাঙ্ক পেলেই দিন আমার স্বচ্ছন্দে চলে যেত। কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই, সে এক বিরাট স্বপ্ন। আমি এত অলস যে এখন একটু পানীয় সেবন ক'রেই পরম তৃপ্তিলাভ করে বসে আছি। আমি অচল, নিস্পন্দ, অকেজো।

এবার আমার কথা শোন ভাই: তোমার চুরুটগুলো চমৎকার। এই চিঠি লিখতে লিখতে একটির স্বাদ আমি গ্রহণ করছি, এতে চকোলেটের

মিষ্টি-মধুর গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু আঃ হাঃ! সে এসেছে, এসেছে, দেখ কেমন দুলে দুলে ভেসে চলেছে, দেখ; হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ছোট্ট মানসী, আমার দিকে তাকিয়ে কেমন হাসছে। ধোঁয়ার মেঘে সে ভাসছে; দেখ, দেখ, সে উপরে উঠছে, নীচে নামছে, খেলছে, হেলছে, দুলছে······আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। জাষ্টিন, একবার তুমি আমায় বল যে, আমায় তুমি ঘৃণা কর না। নিষ্ঠুর মেয়ে, আমার দুঃখ-বেদনা তোমার উপভোগ্য! শোন, শোন জাষ্টিন······কিন্তু মিলিয়ে যাচ্ছে সে। উপরে উঠছে, উঠছে, উঠতে উঠতে মিলিয়ে যাচ্ছে। মুখ থেকে চুরুটটি আমার খসে গেল এবং সেখানেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমি পাগল হয়ে যাব। কিন্তু ধন্যবাদ তোমার চুরুটকে, আমার মন আবার ফিরে পাচ্ছে তার সত্তাকে। আর দশটা দিন, তার পর আমি আর জাষ্টিনের কথা চিন্তা করব না; না হয়, স্বপ্নে দেখা ছায়ার মত তাকে দেখব শুধু অতীতের চক্রবালে।···বিদায় ভাই, বিদায়—

—পি, সিজান

পুত্রকে

আইক্স, ১৪ই আগষ্ট, ১৯০৬

প্রিয় পল,

এখন বেলা দু'টো। আমি বসে আছি নিজের ঘরে। আবার গরম পড়তে সুরু হয়েছে—ভয়ানক গরম। ঘড়ীতে চারটে বাজার অপেক্ষায় আছি। গাড়ী এসে আমায় নিয়ে যাবে নদীর ধারে পোলের কাছে। সেখানে গেলে অনেকটা সুস্থ অনুভব করা যায়। গত কাল সেখানে গিয়ে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। ফনটেনব্লোতে আমি যে ধরণের জল-রঙ্গা ছবি আঁকতাম, কাল নদীর ধারে সেই রকম একটা ছবি সুরু করেছিলাম। জিনিসটা আমার কাছে আরও একাবয়ব বলে মনে হয়—যত দূর সম্ভব সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াই আসল কথা।

সন্ধ্যায় তোমার মাসিমা মেরীকে তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলাম। সেখানে মার্থার সঙ্গে দেখা হল। সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আমাকে কি রকম চিন্তা করতে হয় তা আমায় চেয়েও তুমিই ভাল জান। কাজেই তোমাকেই এখন আমাদের সমস্ত ব্যাপারের ভার নিতে হবে।—আমার ডান পা'টা সারছে। কিন্তু কি ভীষণ গরম! আবহাওয়ার গন্ধে বমি আসছে। চটি জোড়া পেয়েছি। প'রে দেখলাম আমার পায়ে খাপ খেয়েছে।

নদীর ধারে ছেঁড়া ময়লা পোষাক-পরা ভারী সজাগ একটি দরিদ্র শিশু এসে আমায় প্রশ্ন করেছিল, আমি ধনী কি না। তার চেয়েও বড় অপর শিশুটি তাকে বলল যে, এমন প্রশ্ন কাউকে করতে নেই। সন্ধ্যায় ফেরবার জন্য গাড়ীতে উঠে দেখলাম, সে আমায় অনুসরণ করছে। পোলের নীচে আমি তার দিকে দু'টো পয়সা ছুঁড়ে দিলাম। ওঃ, যদি দেখতে সে আমায় কি ভাবে ধন্যবাদ জানাল!

প্রিয় পল, ছবি আঁকা ছাড়া আমার আর অন্য কোন কাজ নেই। তোমাকে এবং তোমার মাকে সর্বান্তঃকরণে আলিঙ্গন জানাচ্ছি।

তোমার বৃদ্ধ পিতা
পল সিজান।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১৩২০ সালে ৫ই অগ্রহায়ণ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রান্তরে লিখিয়াছিলেন :—

রবীন্দ্র বাবুকে যদি সে সময়ে সংবর্দ্ধনা করা না হইত, এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট্ দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এত বড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না: আর আজ সাহেবি সার্টিফিকেট্ দেখিবা মাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের মুখখানা কতটুকু হইত? একেই ত কথা আছে, বিলাতি প্রশংসা-পত্র না দেখিলে আমাদের নিজের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইত না কি? আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখ রক্ষা হইয়াছে। আপনার কুশল প্রার্থনা করিয়া ইতি করিলাম। * *　　　ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
শান্তিনিকেতন,
বোলপুর।

মন, মানুষ ও দেহ

শ্রীমনতোষ রায়

অটুট স্বাস্থ্য না হলে পবিত্র মন এবং পবিত্র দেহ লাভ হয় না উন্নতির ভিত্তি "স্বাস্থ্যের কংক্রীট" ; তার উপর আপনি চার-তোলা তুললেও ফাটল ধরবে না।—যখন দেহের স্নায়ু-তন্তুর চলাচল ভুলপথে চালিত হয় তখন চিত্ত চঞ্চল হয়ে সর্ব্ববিষয়ে অসুর ভাবের অবতারণা ঘটে।

মনকে সত্ত্বলোকের রূপ দিতে পারলে ইহার অভ্যন্তরে এক মহাভাব সুশৃঙ্খল ভাবে সজ্জিত থাকে, যা' থেকে মনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়।

শুধু জমি হলেই কৃষিকার্য্য চলে না, তাতে ফসল ফলাতে প্রয়োজন নানাবিধ যন্ত্রের এবং আলো-বাতাসের। তেমনি আমাদের মন-ভূমিরও চাষের প্রয়োজন। মনের যে ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজ, তম—তার মধ্যে রজ এবং তম এই দু'টি গুণই মনকে চঞ্চল করে। যত দিন পর্য্যন্ত এই দুই শত্রুকে বিনাশ করতে না পারবেন, তত দিন পর্য্যন্ত মনোভূমিতে স্বর্ণশস্য ফলান আকাশ-কুসুম রচনার মতই হবে। জমি চাষ করতে প্রয়োজন লাঙ্গলের। সে লাঙ্গল আমাদের অধ্যবসায় এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি আমাদের জ্ঞানস্বরূপ।

সেই সঙ্গে চাই কাজ করবার ক্ষমতা—'বীর্য্য।' এই বীর্য্য পুষ্ট হয় কেমন ক'রে? যদি সর্ব্ববিষয়ে প্রকৃত সংযমী হওয়া যায়। সংযম মনের দাস, মন দেহের দাস, কাজেই দেহকে এবং মনকে পবিত্র না রেখে কোন উপায় নেই।

অভ্যাস যোগেই চঞ্চল মনের সুস্থিরতা আসে। তামসিক ও রাজসিক বৃত্তির দমনের চেষ্টাই হল মনুষ্যত্ব লাভের সাধনা। এ সব খুব কঠিন লাগবে তাদের কাছেই যারা কু-অভ্যাসের দাস। যেমন একটি নালা কেটে খালকে যথা ইচ্ছা নিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি অভ্যাস দ্বারা মনকে সুসংস্কারে পরিণত করে যথা ইচ্ছা নিয়ে যাওয়া যায়। কাজেই মনোযোগ যে অভ্যাসেরই ফল, সে বিষয়ে সকলেই একমত হবেন।

মনুষ্যত্ব লাভের অন্তরালে মন রয়েছে লুক্কায়িত। আর মনের অন্তরালে রয়েছে সুস্থ স্বাস্থ্য, যার কল্যাণে মনের পরম সত্তার বিকাশ হয়। শারীরিক অসুস্থতায় মনের বৃত্তিত্রয় লোপ পায়। তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে না।

বিপথগামী মনকে বাধা দেবার একমাত্র মালিক দেহশক্তির 'অণু-পরমাণু' যে মহাশক্তির ফলে বিপথে গেলেও স্বাস্থ্য-সাধনার অভ্যাস বন্ধুরূপে হুঁসিয়ার ক'রে দেয়।

যার শরীর সুস্থ আছে, তার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু সর্ব্বদাই সজাগ থাকে প্রহরিরূপে। তাই মনের পূর্ণ সত্তাকে প্রকাশ করতে হলে একান্ত প্রয়োজন অটুট স্বাস্থ্যের।

দু'হাত দু'পা থাকলেই মানুষ হয় না। মানুষ বলা যায় তাকেই, যে আপন দেহরক্ষা, সংগ্রন্থ অধ্যয়নাদি, এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভের উপায় উদ্ভাবন করতে পারে। এই ত্রি-শক্তির অন্তর্নিহিত পূত রস হতেই পশুত্বের সর্ব্ব বীজ ধ্বংস হয়। অর্থাৎ, তার সাহায্যেই ষড়রিপু এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে স্বীয় শাসনের কবলে রাখা যায়, এবং ইহাই মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম সোপান।

মানুষ চিন্তাশীল ; তার বহুরূপী চিন্তাকে কল্পনার সপ্তরঙয়ে রাচিয়ে গড়তে চায় এক অপূর্ব্ব রচনা। কিন্তু তার চিন্তা ও কল্পনার আধার হচ্ছে সুস্থ ও সবল স্বাস্থ্য যার থেকে সে পেতে পারে ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, বীর্য্য এবং কর্ম্মকুশলতা আর কর্ম্মসফলতা।

মানুষ তাকেই বলা যায়, যে দেশ ও দশের কল্যাণ সাধনে নিঃস্বার্থ ভাবে সুস্থ দেহে আজীবন খাটতে পারে। খাটতে পারে তারাই যাদের কর্ম্ম করার মতো শক্তি আর প্রাণ আছে। সৎ-প্রকৃতির মানুষের দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির এমন নিখুঁত চালনা-শক্তি আছে যে, সে যখন যেদিকে যেতে চাইবে, সেদিকেই নির্বিঘ্নে পৌছতে পারবে।

যারা মনে করে আমাকে "সর্ব্বসহা মানুষ" হতে হবে, তাদেরও জীবনে কত দুঃখকর ক্লেশ আসে, "সবই জীবনের পরীক্ষা"—এই ভেবেই সকলে পরীক্ষা দিয়ে যান ; কিন্তু তাদের ফল দেন ভগবান। তারা সে সব থেকে করেন মানসিক ও দৈহিক বল সংগ্রহ ; আর সেই বলেই বলীয়ান হয়ে সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হয়। দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা প্রভৃতি এতই দৃঢ় ও সরল হয় যে, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে বিপদের সম্মুখীন যখনই হয় মনকে কেবলই বুঝায়—"মন কেন হও উচাটন! ভুলিও না ; তোমার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল এই সুস্থ দেহ আর সুস্থ মন! ভুলিও না, তুমি যার সন্তান, তুমি যার প্রিয়তম পুত্র, তুমি এবার এ জন্মে তাঁর ক্রোড়ের কত নিকটবর্ত্তী।" ভগবানে বিশ্বাস মানুষেরই থাকে তাই আপনার ক্ষমতা, আপনার চেষ্টা, আপনার বাহুবল এবং হৃদয়-বলকে অস্বীকার ক'রে অলসতার প্রশ্রয় দেবেন না। আপনার যদি প্রতি কর্ম্মে পরম বিশ্বাস, ভক্তি এবং শ্রদ্ধা থাকে, তা'হলে ভগবান অযুত বাহু প্রসারিত ক'রে আলিঙ্গন দেবেন।

দেহ আর মন একই কষ্টি-পাথরে ধরা পড়ে—আসল কি মেকি। মনে রাখবেন, যাদের দেহ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ, মন তাদের সর্ব্বদাই চায় ক্ষণিকের সুখ ; দুর্ব্বল চিত্ত চায় অলসতায় দিন কাটাতে। এবং তাদের কুসংসর্গের সঙ্গে মিত্রতা সহজেই ঘটে। সেই সংসর্গ-দোষেই চায় বিনা পরিশ্রমে সুখার্জ্জন বা প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, পরকেও এবং নিজেকেও।

আর দেহ—পবিত্র দেহই শুদ্ধ চরিত্রের প্রতীক। যেমন গঙ্গা-জলের ওপর দিয়ে দিবারাত্র অস্পৃশ্য দ্রব্যাদি প্রবাহিত হয় তবু গঙ্গার জল পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ, তেমনি দেহ যাদের সবল ও দৃঢ় থাকে, লৌকিক কলঙ্ক তাদের স্পর্শ ক'রে কলুষিত করতে পারে না। চরিত্র গঠন মানেই "আমিত্ব"টুকুকে মহানন্দময় করে গঠন করা। যে দেহতত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব লাভের জন্য বিদ্যার আবশ্যক, সেই অমূল্য চরিত্রবলের বিনিময়ে তা'রা মিথ্যা গৌরব ক্রয় ক'রে থাকে। চরিত্র লাভই যে আমাদের বিদ্যার উদ্দেশ্য এ কথা বিস্মৃত হওয়ার ফলেই আজ আমাদের দেশে এই মহা দুর্দ্দশা।

★

পৃথিবীর রূপ

শুভেন্দু ঘোষ

পৃথিবীর কতোটুকু জানি? তাকে দেখে আসছি এই দীর্ঘকাল হতে, তবু সে দূরেই রইল।

বহু পুরাতন এই পৃথিবী। সৃষ্টির আদিকাল হতে সে কতো কি দেখেছে। শুনেছে কতো জয়-পরাজয়। কতো আনন্দ, কতো বেদনার মধ্যে দিয়ে চলে এসেছে সে! না-জানি জীবনের কতো রহস্যই সে জানে।

সত্যিই কি জানে? হয় তো সে দেখেনি কিছুই, শোনেনি কিছুই। শম্বুকের মত নিজের জড়িমায় আবৃত থেকে ঘুমিয়েছে। কাল-স্রোত বয়ে গিয়েছে তার উপর দিয়ে, তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

পৃথিবীকে প্রশ্ন করেছি, সৃষ্টির কতো কিছুই তো জানো, প্রকাশ করো না কেন?

পৃথিবী অচঞ্চল, নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর মেলে না।

রাগ হয় পৃথিবীর উপর, অভিমান হয়। কেন ও চুপ ক'রে থাকে, কেন বলে না?

প্রাণের কোন অন্ধকার কোণ হতে ফিস্‌-ফিস্‌ আওয়াজ শোনা যায়, জানে, পৃথিবী জানে, কিছুই না বলুক, ও জানে।

জানে বৈ কি! মানুষ আমরা, প্রাণের গোপনতম কথাটি ভেঙে বলার মত কাউকে যখন পাইনি, ওরই বুকে মাথা রেখে একান্ত বিশ্বাসে পরিপূর্ণ নিঃসঙ্কোচে পৃথিবী ছাড়া আর কার কাছে প্রাণের উৎসমুখ খুলে ধরতে পেরেছি? আমাদের নিভৃততম আনন্দ-বেদনার, গর্বের, লজ্জার সাক্ষী করেছি আর কাকে? শুধু ওরই কাছে আমাদের সমস্ত সত্তাকে নগ্ন ক'রে ধরেছি—সে কি ওকে নির্বোধ পাষাণ মনে ক'রে? ওকে একেবারে উদাসীন মনে ক'রে? না, শুধু ওরই দৃষ্টিতে স্নান ক'রে পুনরায় শিশুর মত অকলঙ্ক পূততনু হয়ে উঠেছি বলে? ওরই দৃষ্টি সর্বাঙ্গের গ্লানি ধৌত ক'রে নিয়েছে বলে? মানুষ আমরা, না বুঝেও প্রাণের গহন গভীরে আমরা মানি, এই পৃথিবী আমাদের মা, পরমা শান্তি, পরমা তৃপ্তি, পরমা সান্ত্বনার অফুরন্ত নির্ঝরিণী।

তবু তাকে সন্দেহ করেছি, প্রশ্ন করেছি, পৃথিবী, তুমি কি কিছুই জানো না? সৃষ্টির আদি হতে কি শুধুই নিদ্রায় কাটিয়েছ?

পৃথিবী মুখ পানে চেয়ে হাসে—সে হাসির যে কি অর্থ, কোনো মতেই ভেবে পাইনি।

ধরা সে কোনো দিনই দেয় নাই, তবু পৃথিবীর উপর দিয়ে একটা সহজ অন্ধ-বিশ্বাস—একান্তই অহেতুক। মানুষের সুখ-দুঃখে যে তার চিত্তে এতটুকু কম্পন জাগে, এর নিশ্চিত পরিচয় কোনো দিন পাইনি। মানুষের শোকে পৃথিবীর মুখে ছায়া পড়ে, মানুষের উল্লাসে পৃথিবীর চোখে দীপ্তি খেলে—এগুলো নিছক কবি-কল্পনা না হোক, মানুষেরই বাসনা-জাত বিশ্বাস মাত্র। পৃথিবী সত্যিই থাকে নির্বিকার, উদাসীন। তবু আমরা একমাত্র তাকেই ভেবে এসেছি পরমা স্নেহময়ী মা ব'লে!

এ সব ভেবে মানুষের দুর্বল হৃদয়কে কতো বার ধিক্কার দিয়েছি। দুর্বল প্রাণের অন্ধ-বিশ্বাসে বুদ্ধি সায় দেয় না মোটেই। নাঃ, পৃথিবীর পাষাণী রূপটাই সত্যি; হৃদয় বলে তার কিছুই নাই; থাকলে, ঘাঁটা পড়ে গিয়েছে।

কত বার মনে হয়েছে, আমাদেরই মত পৃথিবী বুঝি অস্তিত্বের বোঝা টেনে চলেছে,—নেহাৎ করতে হয় ব'লে গ্রীষ্মে উত্তাপ দেয়, বর্ষায় বৃষ্টি ঝরায়, বসন্তে ফুল ফোটায়;—নিছক চলার অভ্যাসে চলেছে। ভেবেছি, আমাদেরই মত কোনো অন্ধ নিয়তির ক্রূর খেয়ালে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন অতিবাহন ক'রে যাচ্ছে সে। বিস্ময় মেনেছি, তার সহন-শক্তি দেখে! প্রশ্ন করেছি, জীবন-চক্রে বাঁধা হয়ে এই অন্তহীন আবর্তনে হাঁফিয়ে ওঠো না, পৃথিবী? হৃদয়ে ঘাঁটা পড়লেও তো লোকে হাঁফিয়ে ওঠে!—স্তিমিত জীবনের একঘেঁয়েমিও শেষ পর্য্যন্ত অসহ্য হয়ে ওঠে!

পৃথিবী নীরব থেকেছে—ধরা দিতে চায়নি।

রূপ দেখবার জন্যে চোখ চায়! প্রাণ যদি রসহীন হয়ে যায়, চোখ যদি যায় শুকিয়ে, রূপ ধরা দেবে কোথায়?

জলেই ছায়া পড়ে, শুকনো মাটিতে নয়, কাদাতেও নয়।

চোখ ছিল না, প্রাণ ছিল না, তাই পৃথিবীরে দুষে এসেছি ধরা না-দেওয়ার জন্যে। তার পর এক দিন···

শিশু-সন্তানকে বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। সে প্রশ্ন করে, এটা কি? ওটা কি? গাছ-পাতা, ফুল-ফল, মাঠ-ঘাট, সূর্য্যি-চন্দর, মেঘ-আকাশ,—সবাইকে সে জেনে নিতে চায়। ছোট-ছোট হাত দিয়ে চোখ ঢেকে সকাল বেলায় সূর্য্যির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, বলে, 'মামা, তু ক্কি!' ফুলকে দেখে বলে, 'ফু যাবো।'—ওরা সব ওর খেলার সঙ্গী হয়ে উঠেছে প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণ থেকে!

বিজ্ঞ আমি, মনে মনে বলেছি, শিশুর মন! তবু অলক্ষিতে তার খেলাতে মেতে উঠেছি!

হঠাৎ এক দিন খেয়াল হল, পৃথিবী যেন তার রহস্য-গুণ্ঠন একটু-খানি সরিয়ে ফেলে উঁকি মারছে। ফুল-পাতা, পশু-পাখী—কিছু যেন আর আগেকার মত নাই—তারা যেন আমায় জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। শিশুর মত একটু এগিয়ে একটু পিছিয়ে আমার পরিচয় করতে চাইছে! ব্যাপার কি?

শিশুর সঙ্গে খেলতে গিয়ে চোখ যেন কখন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে, সরস হয়ে উঠেছে, জানতে পারিনি। চোখ সরস হয়ে উঠেছে তাই পৃথিবী এসেছে তার মধ্যে নিজের রূপ দেখতে; আলো ফুলের রঙ হয়ে উঠেছে—কতো বিচিত্র রঙ, উজ্জ্বল, মৃদু; গাছ-পালা সবুজ হয়েছে, আকাশের নীল—সে সব রঙ একেবারে নতুন, তাদের কোনো তুলনা নাই। সবুজ, নীল, এ সব নাম দিয়ে তাদের ধরা যায় না মনের মধ্যে।

আর শুধুই কি পৃথিবীর রূপ? তার রস, তার গন্ধ, তার শব্দ—সবই তাদের বৈচিত্র্য নিয়ে, প্রাচুর্য্য নিয়ে শিশুর মত আমায় ব্যাকুল করে তুলেছে।

পুরানো পৃথিবীর প্রতি রোমে সে কি প্রাণ-চঞ্চলতা! ক্লান্তি-ভরা মন-মরা উদাসীন পৃথিবীর সে কি অভিনব পরিচয়! কোথায় ছিল এতো রূপ, এতো গন্ধ, এমন মধুর তার স্পর্শ।

বুঝলাম, পৃথিবী কারও গোলামি করে না—ওর প্রাণের মধ্যে কোন গোপন আনন্দে সে চলেছে,—সেই আনন্দেরই ছন্দে ফুটে ওঠে ওর যতো সব কাজ—ফুলের মত সহজ সৌন্দর্য্যে।

কিন্তু এতো দিন বুঝিনি কেন?

পৃথিবীকে প্রশ্ন করি, উত্তর মেলে না। সে হাসে—সে হাসির মর্ম যেন একটু-একটু বোঝা যায়।

নিন্দুক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বন্ধু তোমারে নমস্কার !
কে বলে শত্রু ? মিত্র যে তুমি
বস্তু নিত্য প্রশংসার ।
যতই কুটিল যত হও খল—
নিষ্পাপ বুকে তুমি দাও বল,
কমাইতে গিয়া বাড়াও মূল্য
রীতি-নীতি তব চমৎকার !

হউক তোমার দুঃস্বভাব,
তোমার কথার হলাহলে হয়
সত্য-সুধার আবির্ভাব ।
তুমি শুধু জানো তিক্ত সাগর,—
দেখ—তাতে তার কমে না আদর
গুণিগণ কাছে—রত্নাকর সে
করে কত বড় আখ্যা লাভ ।

হাসে লোকে দেখে রঙ্গ সে,
পঙ্কের কথা সদা মুখে তব
হেলা করিবারে পঙ্কজে ।
সে যে উৎপল, সে যে শতদল,
বাণী কমলার অমল কমণ্ড,
পদ্মনাভের প্রিয়—তারে হেরে
পারিজাতও সবে সঙ্কোচে ।

তব কালি-পোঁচ রয় কি হে ?
সত্য শিবের জটার ঝাপ্টা
ধূম ঝাঁপা দেহে সয় কি হে ?
দ্বিজিহ্বত্ব তোমার হে মিতে
পারে কি সর্প সম বেড় দিতে
শুধাই বন্ধু তোমার ও বিষে
'সূচিকাভরণ' হয় কি হে ?

পৃথিবী ধরা দেয়নি আজও । নাই দিল । তার জন্যে ব্যস্ততা নাই । ধরা এক দিন সে দেবে—এ আশ্বাস পেয়েছি ।

ফাল্গুনের আজ কোন্ তারিখ হল কে জানে । সকাল-সন্ধ্যার হাওয়াতে এখনও শীতের স্মৃতি আছে জড়িয়ে । তবু শীতের সঙ্কোচ কাটিয়ে পৃথিবী চুপে-চুপে কোন্ উৎসবের বিপুল আয়োজন ক'রে চলেছে । ঐ যে গুলঞ্চ গাছটায়—এই তো সেদিন পর্য্যন্ত ন্যাংটা সন্ন্যাসীর মত ওটা দাঁড়িয়েছিল, না ছিল একটা পাতা, না এক গোছা ফুল—আজ দেখি সে তার রিক্ত শাখায় দু'থোকা ফুল ফুটিয়েছে, পাতা মেলবার উদ্যোগ করছে, আকাশের দিকে ফুলগুলো তুলে ধরে আপন মনের গোপন গন্ধে বিভোর হয়ে স্মিত-হাসি হাসছে ; রাস্তার ধারে ঐ সিন্দুর ঝরি গাছগুলো অজস্র ফুলে-ফুলে তাদের কামনা প্রকাশ ক'রে দিয়ে আকাশের দিকে বুক চিতিয়ে প্রায় কামমূর্চ্ছিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে—নির্লজ্জ হোক্, ভারি মিষ্টি লাগছে তার ঢলানি ! নাম-গোত্রহীন ঐ যে কিসের গাছটা সে-ও ফিকে-লালচে কচি পাতার মানান-সই একখানা সাড়ী পরে তৈরি হয়েছে ; সে-ও যে কখনো সাজে, এটা কি কারও জানা ছিল ? ঐ সলজ্জ ভাবটা বেশ মানাচ্ছে ওকে ! পৃথিবীকে প্রশ্ন করলাম, পৃথিবী, তোমার প্রাণে আজ এতো আনন্দ কিসের ? ঋতু-চক্রে বাঁধা থেকে নিত্যিকার কর্ত্তব্য পালনের পরিচয় এতো নয় ?

পৃথিবী স্পষ্ট কোরে উত্তর দিল না—একটু হাসল । বাক্যে রূপ পেলে সে হাসির অর্থ হত : তোরা আছিস্—এই আনন্দই কি কম ?

অন্তরের তমসা ভেদ করে বৈদিক মন্ত্র ধ্বনিত হল :

'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্ত সিন্ধবঃ···'

মন্ত্রের হস্ত প্রসারিত ক'রে আশীর্বাদ করলাম শিশুকে—নিজেকে—বিশ্বকে ।

মনে হয়, পৃথিবী ভারি একটা তৃপ্তির হাসি হাসছে ।

তিন

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম। কিন্তু ঠিক কলস্বর উত্থিত হোলো না। সন্তসুপ্তোত্থিতের জড়িমা ছিল ঘুম বাজারকে আচ্ছন্ন ক'রে। স্বল্পসংখ্যক দোকানে ক্রেতার সংখ্যা ছিল স্বল্পতর। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অবশ্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটা পণ্য ব্যতীত অন্য বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হোলো না। অর্ধমুদিত নয়নে মুদি বসে আছে ওই কোণের দোকানটায়। নানাবিধ শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত নিশ্চল, নিথর সেই মুদিকে ধ্যানমগ্ন মুনি বলেই ভুল হয়। তার চতুষ্পার্শ্বের চাল-ডালের স্তূপ যেন কতিপয় উপদিকাদ্রি—ঘিরে আছে নব-বাল্মীকিকে, যে রামায়ণ ভাববে কিন্তু লিখে উঠতে পারবে না। ক্রেতার অনাগমনে তার অচলা অনাসক্তি, আগমনই বোধ করি বিরক্তির কারণ হবে। প্রত্যেকটি দোকানীর স্বার্থলেশশূন্য অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে এমন একটা নির্লিপ্ত নির্লোভ বৈরাগ্য স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ ছিল যে ক্রয়েচ্ছুর তুচ্ছ প্রয়োজনের গন্ধময় বার্তা নিয়ে তাদের ধ্যানভঙ্গ করার কথা চিন্তা করা যেন চিন্তাহীনতারই নামান্তর।

আমার সহযাত্রীরা প্রাতরাশের আহ্বানে গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে-ছিলেন কেলনারের সন্ধানে। অদূরেই সেই পান্থপেয়াবাসে চায়ের আয়োজন ছিল। আমারও প্রয়োজন ছিল সেই পানীয়ের। হাতে সময়ও ছিল, কেন না ড্রাইভার জানিয়ে গিয়েছিল যে গাড়িটার কিঞ্চিৎ মেরামত চাই। তবু উঠিনি। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতো নিরীক্ষণ করছিলেম ধ্যানস্তব্ধ দোকানীদের তাপস রূপ আর অনুভব করছিলেম 'চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে।'

তবু যে আমি সফলসাজ সবয়ে পারহার কার তার পারপূণ ব্যাখ্যা আমার ব্যর্থতায় নেই। আছে আমার চরিত্রে। সহযাত্রী উদ্যোগী পুরুষসিংহ তাই আমার হৃদয়ে সৌহার্দ্যের উদ্রেক করেননি, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার কারণ হয়েছেন। তখনো জানতেম না যে আমার জন্যে অভাবনীয় বিস্ময়ও সঞ্চিত ছিল।

সহসা সহযাত্রী তাঁর ফ্লাস্ক্ থেকে গরম চা পরিবেষণ করতে-করতে বললেন, "খাবার বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ওদের চা-টা যে ভালো এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। আপনি যা অদ্ভুত লোক, তেষ্টা আছে অথচ তা মেটাবার চেষ্টা নেই! এত বার বললুম তবু সেই গাড়ি ছেড়ে উঠলেন না তো উঠলেনই না। কী আর করব? আমিই ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এলুম আপনার জন্যে! যাই বলুন মশাই, আপনার মতো লোকদের একা চলাফেরা করা উচিত নয়। তার যোগ্যতা নেই আপনাদের। তা আপনি আমার উপর রাগ করুন আর যাই করুন, সত্যি কথা বলবই।"

এতটুকু রাগ করিনি। আমার স্বপ্নভঙ্গে খুশি হইনি। সহযাত্রীর কল্পনাবিরহিত স্থূলতায় বিরক্ত হয়েছি, কিন্তু তার চাইতেও বেশী বিস্মিত হয়েছি তাঁর অযাচিত সহৃদয়তায়। লজ্জিত বোধ করলেম এই জন্যে যে, এই সহৃদয়তা ছিল আমার দিক থেকে একেবারেই অনর্জিত। ট্রেনে আমি তাঁর প্রশ্নের যে একশব্দসর্বস্ব উত্তর দিয়েছিলেম তার অসামাজিক রূঢ়তা আমি নিজেও অস্বীকার করতে পারব না। শিলিগুড়ি থেকে ঘুম পর্যন্ত একবারও তাঁর সঙ্গে বাক্য-বিনিময়ের প্রয়োজন বোধ করিনি, যদিও গাড়িতে বসেছিলেম

শীতে উপেক্ষিতা

'রঞ্জন'

অথচ এটা বাজার মাত্র। ইংরেজিতে যাকে বলে জান্তব প্রয়োজন, তারই দাবী মেটাতে এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মিলন। কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না এই রূঢ় সত্যটা। আমি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী নই—প্রথমে আমার অনুরাগ অনেক ক্ষেত্রেই অপর পক্ষের আহ্বানের অপেক্ষা রাখেনি! কিন্তু দ্বিতীয়ে আমার আসক্তি অবিশ্বাস্যরকম পরিমিত। শয্যাতলে কাঞ্চনের উপস্থিতি পরমহংসদেবের মতো আমার দেহে উত্তাপের সঞ্চার করে না, কিন্তু অর্থকে নেসেসরি ঈভ্‌ল বলেই মনে করি, ও-বস্তুটির অতি-নিকট আধিক্য আমার কাছে কি রকম যেন 'ভালগার' ঠেকে। তাই এই বাজারের পরিব্যাপ্ত অপার্থিবতার মধ্যে এ-কথা মনে করতে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল যে এখানেও সব-কিছু ক্রয় করতে হয় মুদ্রারই বিনিময়ে। আমি অর্থনীতিবিশারদ নই, কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছিল যে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতর স্থানে যা-খুশি হোক, এইখানে বার্টার-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন হলেই যেন সুসমঞ্জস হয়। এখানে অন্ততঃ দেবে আর নেবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে। এই ক্ষুদে-মানবের সাগরতীরে সেইটেই যেন শোভন হোতো।

সামাজিক পরিভাষায় যাকে সক্‌সেস্‌ফুল, সফল বলে, আমি তা নই। সেই সাফল্যাকাঙ্ক্ষা আমার একেবারে আয়ত্তাতীত ছিল না। আমি পুরোপুরি সেই ঈশপ-উপকথার আশাহত শৃগাল নই। একেবারেই পাশাপাশি; বরং তাঁর বহু প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাখ্যান করেছি অভদ্র অশ্রবণের অজুহাতে। এখন তাঁরই কাছ থেকে বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে সংকোচের আর সীমা রইল না। কৃতজ্ঞতা পাছে প্রকাশে কৃত্রিম হয়ে পড়ে, পেয়ালা মুখে তুলবার অছিলায় হাত দু'টো তুলে নমস্কার জানালেম ভদ্রলোককে। সেই সঙ্গে স্মরণ করলেম আরো বহু জনকে, সখ্যতায় আমার আপাত অনীহা সত্ত্বেও যাঁরা আন্তরিক সৌহার্দ দান করেছেন অকৃপণ ভাবে। সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ পোষণ ক'রে মনকে যখন বিষাক্ত তিক্ততায় ভরে তুলি এবং স্বরচিত নিঃসঙ্গতার নির্মোক পরিধান ক'রে সকল সান্নিধ্য পরিহার করি, তখন এমনি অপ্রত্যাশিত দাক্ষিণ্য রুদ্ধকক্ষে দক্ষিণ সমীরণের মতো ভেসে এসে স্মরণ করিয়ে দেয় যে পৃথিবীকে 'দিয়েছি যত, নিয়েছি তার বেশী'। অনেক, অনেক বেশী।

আমার সহাস্য নমস্কারে উৎসাহিত হয়ে সহযাত্রী তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করলেন, "জানেন, আসবার পথে ওই যে মাইলের পর মাইল বন-জঙ্গল দেখলেন না? ওই হচ্ছে স্টেট ফরেস্ট। এ-দেশের ব্যবসাই দু'টো: চা আর কাঠ। দু'টোই পরের হাতে, সরকারের বা বিদেশীর। তা'ছাড়া ছোটো-খাটো বেচা-কেনার যা কারবার আছে তাও মাড়োয়ারীদের দখলে। এখানকার লোকদের জায়গা নেই কোথাওই!"

দুর্বোধ অর্থনীতির এই সমস্ত দুরূহ সমস্যায় আমার কৌতূহল নিতান্তই সামান্য। তৃষ্ণা নিবারণ করে কয়েক মুহূর্ত মাত্র পূর্বে যিনি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ কিছু ভাববার দুরভিসন্ধিও ছিল না আমার মনে। কিন্তু অপ্রীতিকর বিস্ময়ে মন ভরে উঠছিল এই কথা ভেবে যে, প্রকৃতির এমন পূর্ণ প্রকাশ মহিমার তলায় দাঁড়িয়েও ভদ্রলোক কী করে ব্যবসায়িক চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করতে পারছিলেন! কিন্তু সত্যি বোধ হয় বিস্ময়ের কারণ ছিল না।

নীরন্ধ্র একমনস্কতা হচ্ছে ঐহিক সাফল্য লাভের একমাত্র পন্থা। সাফল্যের শাস্ত্রে চুল বাঁধা নেই, আছে শুধু বাঁধা। সার্থক অ্যাকাউন্টেন্ট শুধু আপিসেই অপরের অর্থের শেষ কপর্দক পর্যন্ত নির্ভুল হিসাব রক্ষা করেন না, তাঁর বাড়ীতেও বেহিসাব বেআইনী। সফল ডাক্তার শুধু রোগীকেই নাড়ী দেখে বিচার করেন না, নিজেকেও জ্ঞান করেন ফিজিওলজির বইয়ের চলন্ত একটা পৃষ্ঠা বলে, সত্যকার ব্যবহারজীবী তাঁর কূটনীতি শুধুমাত্র আদালতেই নিবদ্ধ রাখেন না, আপন স্ত্রীকেও জ্ঞান করেন তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর ধারিণী মাত্র বলে।

বরণীয় যাঁরা, স্মরণীয় তাঁরা, কিন্তু বৃত্তি ও প্রবৃত্তির এমন পরিপূর্ণ মিলন সকল ক্ষেত্রে ঘটে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবিকা আর জীবনে যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয় তার মতো অভিশাপ আর নেই পুরুষের জীবনে। এই দু'নৌকায় পা দিয়ে না হয় জীবিকায় উন্নতি, না জীবনে সুখ। জীবনকে বলি দিয়ে প্রমোশনের দড়ি বেয়ে সোনা-মোড়া স্বর্গে আরোহণ করা সম্ভব, আর সম্ভব জীবিকাকে অবহেলা ক'রে আপন স্বর্গ-রচনা ক'রে তাইতে জীবনকে সার্থক করা। প্রথমের জন্যে চাই স্থূল শক্তি, দ্বিতীয়ের জন্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি। প্রথমের আরাধনা আনে আরাম, দ্বিতীয়ের আনন্দ। প্রথমের প্রসাদ পায় ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয়ের অন্তর। এক হয় সফল, আর হয় সার্থক। উভয়ই দাবী করে অবিভক্ত নিষ্ঠা।

কিন্তু সেই দুর্লভ নিষ্ঠা যার নেই তার ঘর করতে হয় জীবন আর জীবিকা-রূপিণী দুই বিবদমানা সতীন নিয়ে। তার সেই অমিত রায়ের মতো ঘড়ার জল আর সরোবরের দুস্তর ব্যবধানে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় কষ্ট-কল্পিত সেতুবন্ধনে। সে না পারে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে, না পারে সর্বভোগী সংসারী হতে। তার দিনে চাই বাইরের কোলাহল, রাত্রে চাই গৃহের বিশ্রাম। এই দ্বৈতবাদীকে তাই দ্বিমনা হয়ে দুলতে হয় দ্বিধার দ্বন্দ্বে। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তার মস্তিষ্ক বা পেশী নিয়োজিত থাকে পরনির্ধারিত কর্মচক্রে, এতটুকু স্বাধীনতা নেই সেখানে। কিন্তু বিকেল পাঁচটা থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত সে সকল বাধাবন্ধহীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। মস্তিষ্কের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে তখন সে নিজেকে সমর্পণ করে হৃদয়ের স্বেচ্ছাদাসত্বে। তখন সে গান গাইতে না জানলে গান গায়, তুলি ধরতে না জানলে ছবি আঁকে। সমাজে তার পরিচয় নির্ভর করে দশটা-পাঁচটার কুশল সাফল্যের উপর, পাঁচটা-দশটার বিফল প্রেরণার উপর নয়।

আমার বিচারের মানটা কিন্তু একেবারেই আলাদা। আমি খবর নিইনে লর্ড ওয়েভেলের মধ্য-প্রাচ্য রণাঙ্গনের পরাক্রমের, খুশি হই লোকটার "আদার মেন'স ফ্লাওয়ারস্" নামক অক্ষম কাব্যসংগ্রহের পাতা উল্টে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ডেপুটিত্বে কী পরিমাণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তা নিয়ে আমার এতটুকু কৌতূহল নেই, কিন্তু তাঁর অসামান্য কাব্যপ্রিয়তা ও নাট্যপ্রিয়তার কথা স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধা না ক'রে পারিনে, যদিও, এ ক্ষেত্রেও, তাঁর কাব্যপ্রতিভা বা নাট্য-প্রতিভা কোনো মতেই অসামান্য ছিল না। কলকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান কর্ণধার আই-সি-এস-কুলতিলক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় যে পশ্চিম বঙ্গীয় মহাকরণে সর্বাপেক্ষা 'এফিসিয়েন্ট' কর্মচারী তা নিয়ে একবারও আমি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইনে, কিন্তু ভদ্রলোক যে অবসর-ক্ষণে আপন মনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধনা করেন বা বাঁশী বাজান সেকথা জেনে তাঁকে পৃথক, বিশিষ্ট বলে মনে করি।

আমার সহযাত্রী কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি তাঁর তথ্যবহুল আলোচনায় আদৌ মনোনিবেশ করিনি। অদম্য অমায়িকতার প্রেরণায় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, "এখানকার লেবু কিন্তু খুব সস্তা। দাঁড়ান, কিনে নিয়ে আসি কয়েকটা।"

সারাসরি আকাশের তলায় কমলা লেবুর পসরা নিয়ে বসেছিল জনা ছয় পর্বত-কন্যা। বাজারের অন্যান্য দোকানীদের মতো তাদের আননে ছিল না পারত্রিকতার গাম্ভীর্য। তারা শয্যা ত্যাগ করেছে, কিন্তু রজনীশেষের সুমধুর স্বপ্নের রেশটুকু বুঝি এখনো মিলিয়ে যায়নি। মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস যেন তাদের স্নিগ্ধ হাসিতে, ঘুমে-জাগরণে মেশা কী এক বিহ্বলতা ওদের চাহনিতে। কমলা লেবুর ঝুড়ি সামনে রয়েছে, কিন্তু পসারিণীদের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ নেই। মৃদু হাস্যোদ্দীপ্ত চঞ্চল চোখ দু'টি বিচরণ করছে চতুর্দিকে, এদিকে হাত জোড়া বুনে চলেছে রঙীন পশমের গরম জামা। ত্বরিত হস্ত সঞ্চালনে কখনো বা ক্ষণিকের জন্যে সূর্যের আলো পড়ছে ওদের অলংকারের 'পরে, স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য পরিহাস করছে স্বর্ণের ঔদ্ধত্যকে। ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই ওদের হাসিতে; স্নিগ্ধ তৃপ্তিতে তা পরিপূর্ণ; সূর্যের রৌদ্রের তা পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; প্রতিযোগী নয়, সহযোগী। ভোরের আলো সমস্ত জায়গাটাকে ভরে দিয়েছে অপরূপ এক অপার্থিবতায়। আলোকের সেই ঝর্ণাধারায় যেন ধুইয়ে দিয়েছে মৃত্তিকার স্পর্শের সকল মালিন্য। সব কিছুর উপর বিরাজ করছে নির্মল আনন্দের নির্ভুল প্রতিরূপ। এই অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে লেবুবিক্রেত্রী পর্বত-কন্যাদের প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন অংশ বলেই প্রতীয়মান হয়, ওরা যেন মানবীরূপিণী নির্ঝরিণী। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে ওদের নয়, ওরা প্রাণঝরণার উচ্ছল ধার। ওদের লজ্জা আছে কিন্তু জড়তা নেই, চপলতা আছে কিন্তু চটুলতা নেই। ওরা আমার দেখা বাঙালী মেয়ে থেকে একেবারেই বিভিন্ন।

আমার অনুচ্চারিত অভিলাষ অনুযায়ী পর্বত-কন্যাগণ যে ব্যবসার অপেক্ষা বিলাস সম্বন্ধেই অধিক মনোযোগী, সহযাত্রী কমলালেবু বিতরণ করতে করতে তারই সবিস্তার উল্লেখ করলেন, "লেবু বেচবে না জামা বুনবে? আমি লেবুর দাম জিজ্ঞেস করাতে ওদিকের ওই মেয়েটা তো হেসেই আকুল।"

কার সমর্থনে জানি না—ভদ্রলোকের অভিযোগের না অভি-যুক্তার—আমি বললেম, "হাসি ছড়ানো আছে এখানকার ভোরের হাওয়ায়। আর ওরা তো এখানে লেবু বেচতে বসেনি, বসেছে রোদ পোহাতে।"

"তা যা বলেছেন।" সহযাত্রী দৃশ্যতই খুশি হলেন, কমলা-ওয়ালীদের বয়নচাতুর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, "চমৎকার

ানে কিন্তু মেয়েগুলো! একবারও তাকাতে হয় না কাঁটাগুলোর দিকে, হাত চলেছে যেন মেসিন। এদের এইটে আমার বেশ লাগে, যে যার জামা নিজে নিজে বুনে নিচ্ছে॥"

শুধু যে নিজেরই জন্যে গরম জামা বোনা হয় না তার প্রমাণ ছিল আমার নিজেরই গায়ে। বিশেষ এক জনের উপহার সেটি। বিশেষ একটি মৃত্যুহীন মুহূর্তের মূল্যহীন স্মারক।

কালিদাসের কালে প্রিয়সখী তার প্রিয়বরের মেখলায় দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা। মহাকবির সঙ্গে সেদিনের সেই পৌরনারী নিপুণিকা চতুরিকা মালবিকার দল আজ চিরতরে অন্তর্হিত হয়েছেন। তাঁরা এখন অন্য নামে মর্তলোকে আছেন হয়তো, কিন্তু মাল্য-রচনায় সেই পারদর্শিতা আর নেই। আজকের উপহারের তাই ধারা পরিবর্তন করতে হয়েছে। আজকের নিপুণিকা তাঁর প্রিয়কে উপহার দেন স্বহস্তে রচিত জাম্পার, সুয়েটার বা পুলোভার। তা থেকে আজকের কবি মহাকাব্য সংরচনের অনুপ্রেরণা যদি না পান তা নিয়ে ক্ষোভ করব না। কিন্তু পৌষের শেষের দার্জিলিং-যাত্রীর অমন উপহারের জন্যে কৃতজ্ঞ না হয়ে উপায় নেই। কৃতজ্ঞতামুদ্রিত নয়নের সম্মুখে উপহারদাত্রীর আননের সুস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠল। সে দিকে গেলো কত কাল, তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল!

"আরে, তুমি যে!"

উত্তমর্ণ মুলতানীর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই নিতান্তই অপ্রীতিকর, দারোগার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াও নিশ্চয়ই কোনো আনন্দাপ্লুত অনুভূতির সঞ্চার করে না। কিন্তু চলতি ইংরেজিতে যাকে পুরাতনী শিখা বলে তার সম্মুখীন হওয়ার মতো বিড়ম্বনা বোধ হয় আর নেই।

অতি-পরিচিত সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী যে শিখা দেবীই তাতে সন্দেহের বাষ্প মাত্র ছিল না আমার মনে। দৃষ্টি তা নিমেষেই সমর্থন করল। বিমূঢ় প্রতিধ্বনির মতো বললেম, "আরে, শিখা যে!"

"যাক্, চিনতে পেরেছ তাহোলে?"

বাচনের জিজ্ঞাসা-চিহ্ন সত্ত্বেও উত্তর দেওয়া থেকে বিরত রইলেম এজন্যে যে আমি, ঠিক প্রশ্নকর্ত্রীরই মতো, স্পষ্ট করে জানতেম যে অদম্য জ্ঞানপিপাসা থেকে প্রশ্নটি উদ্ভূত হয়নি। জিজ্ঞাসা ছাড়া আর যা শ্লেষগর্ভ বিস্ময় নিহিত ছিল শিখার উক্তিতে, তার যোগ্য উত্তর দিতে হলে রূঢ়-ভাষণের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। বরিতার নারী অপর পক্ষের ভদ্রতার সুযোগ গ্রহণ করতে কখনোই দ্বিধা বোধ করে না—শিখা জানতো যে আমি উত্তর করব না।

"নেমে এসো গাড়ি থেকে। আমার সঙ্গে চা খাবে চলো।"

আদেশ অমান্য করব এমন সাধ্য ছিল না। শীতের ভয়ে গরম পোশাকের বোঝার বৃহৎ একটা অংশ ইতিমধ্যেই বাক্স থেকে দেহে স্থানান্তরিত করেছিলেম। বস্ত্রাধিক্য বশত গাড়ির অভ্যন্তরে একটু বুঝি গরমই লাগছিল। বেরুনো মাত্রই শীতের হাওয়া কোট-ওভার-কোট ইত্যাদি সব কিছু ভেদ করে সর্ব দেহে দংশন করল। কিন্তু শীতের হাওয়া যে মানবের কৃতঘ্নতার তুলনায় নিতান্তই অনির্দয়া, শেক্স্‌পিয়রের তদর্থক উক্তির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের সান্নিধ্যে শীতবোধ সহনীয় হোলো! নৈঃশব্দের যবনিকা তুলল শিখাই।

"হঠাৎ এমন দেখা হয়ে যাবে একবারও ভাবিনি!"

"আমিও না।"

"জানলে বুঝি আসতেই না এ-পথে?" আবার সেই অপর পক্ষের ভদ্রতার উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতা। দেবভাষার শব্দ-ঝংকারের অন্তরালে উষ্মা গোপন করে প্রসঙ্গান্তরে নিষ্ক্রমণের সন্ধান করলেম।

"প্রশ্নটা একান্তই প্রাকল্পিক। তার চেয়ে বলো, তুমি এখানে কেন?"

"কেলনারের দোকানে যিনি অপেক্ষা করছেন তাঁর কর্মস্থল সোনাডায়। ঘুমে আসতে হয় প্রায় রোজই। তাঁরই অনুগামিনী হ'য়ে এখানে এসেছি।" হঠাৎ, যেন কেউ শুনতে পাবে, গলার স্বর নামিয়ে বলল, "বসবে একটু ঐ ব্রিজটার তলায়, যেখানে পাথরের বুকে ঘাস উঠেছে?"

আমার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বেই শিখা আবিষ্কার করল যে, অপেক্ষমান ভদ্রলোক অধৈর্য হ'য়ে আমাদেরই অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। নিমেষে নির্বাপিত হোলো শিখার উপবেশনস্পৃহা, বলল, "থাক, চলো চা খেয়ে নেয়া যাক।" আমি নীরবে তার অনুগমন করলেম।

"ও এদিকেই আসছে। অন্য কথা বলো। তা নইলে ও হয়তো ভুল বুঝবে।"

"অর্থাৎ, ঠিক বুঝবে?"

নগ্ন-সত্যভাষণে শিখা আহত হোলো। কিন্তু সময় কোথা সময় নষ্ট করবার? তাড়াতাড়ি ব্যাগের থেকে একটা বই বের ক'রে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "এইটেতে পাবে আমার দার্জিলিঙের ঠিকানা। তিন দিন পরেই ওখানে যাবো দিন পনেরোর জন্য। দিব্যি রইল, একবার দেখা করবে।"

ভদ্রলোক কাছে আসতেই শিখা অদ্ভুত স্বাভাবিকতার সুরে পরস্পরের নাম ঘোষণা ক'রে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "ইনি হচ্ছেন আমার—"

ইংরেজি ব্যাকরণের পোসেসিভ্‌ প্রোনাউনটা ব্যবহার করে শিখা বিপদে পড়ল। আমি কথা জুগিয়ে বললেম, "বন্ধু।"

শিখার সেটা মনঃপূত হোলো না। বলল, "ইনি হচ্ছেন আমার দাদার বন্ধু।" পতিদেবতার অলক্ষ্যে বন্ধুভগিনী তাঁর জুতো দিয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে আমাকে শাসন করলেন। অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে আমি যখন তাঁদের সঙ্গে চা পান করছিলেম ভদ্রলোক সেই পুরাতন প্রশ্ন তুললেন, "এই অকালে দার্জিলিং চলেছেন যে?"

"ছুটিতে বেড়াতে।"

এই ভদ্রলোকও ঠিক আশংকানুরূপ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে যোগ করলেন, "এই শীতে দার্জিলিং এন্‌জয় করতে পারবেন না কিন্তু।"

"এনজয়মেন্টের জন্যে তো যাচ্ছিনে, যাচ্ছি পানিশ্‌মেন্টের জন্যে।" হেসে সত্যকে পরিহাসের রূপ দিতে চেষ্টা করলেম।

"শাস্তি কেন? কী ক্রাইম করলে আবার?"

"অপরাধটা অপরের, শাস্তিটাই শুধু আমার।"

স্বামীজি আমাদের কথা আর শুনছিলেন না, খবরের কাগজে মন দিয়েছিলেন। শিখা নিঃশব্দে হাসছিল। প্রাচীন রোমের কলীসিয়মের ক্রীড়া-উপভোগরতা দৃপ্ত-সম্রাজ্ঞীর পরিতৃপ্ত হাসি।

সেই হাসি লক্ষ্য ক'রে আমি কৌতুকবশে মনে-মনে আবৃত্তি করছিলেম, 'রথ ভাবে আমি দেব, কলা ভাবে আমি; মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।' শিখা সেই আবৃত্তি শুনতে পেলে বলে উঠতো। আমার ঘটতো বন্ধুবিচ্ছেদ। শিখার দাদার সঙ্গে নয়, তাঁর বোনের সঙ্গে।

কতগুলো মধুর ভুল আছে যা না ভাঙাই ভালো। [ক্রমশঃ

আপনার দৃষ্টিকে উন্নত করুন। দৃষ্টির প্রখরতা নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নতি চাই—যা দেখবেন তা যেন সত্যিই দ্রষ্টব্য বস্তু হয়। আজে-বাজে রঙ্গ-পটে অযথা অর্থ ব্যয় করলে আপনার সাময়িক আনন্দে অবসাদ আসবেই। আমরা তাই সাবধান ক'রে দিই, সত্যিকার ভাল জিনিষ দেখুন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত হলে বাঙলার রঙ্গ-পট উন্নত হবে—নয়তো যে তিমিরে সেই তিমিরেই।
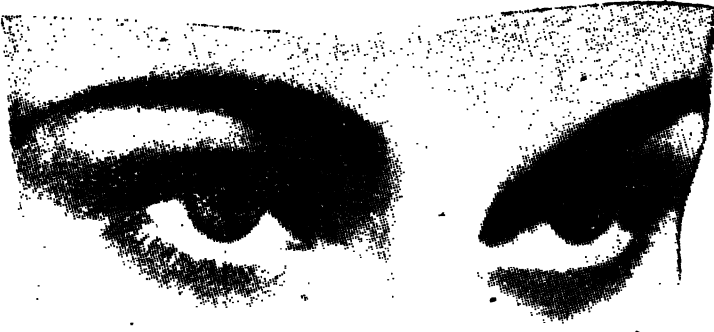
রঙ্গালয়

অতঃপর আমার আর একটি কাজ বাড়ল। 'বসুমতী'র পরিচালকবর্গ আদেশ দিয়েছেন, 'মাসিক বসুমতীর' পৃষ্ঠায় আমাকে নিয়মিত ভাবে রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্র নিয়ে খবরাখবর করতে হবে। তাঁদের আদেশ শিরোধার্য্য করলুম বটে, কিন্তু প্রস্তুত হবার জন্যে উচিত-মত সময় পাইনি, তাই এবারের আলোচনাকে সকলে 'অবতরণিকা' ব'লে গ্রহণ করলেই বাধিত হব।

কেউ কেউ হয়তো মনে করতে পারেন, সাধারণ মাসিক-সাহিত্যে আবার এ-সব বাহুল্য কেন? এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ, আজকালকার সাধারণ মাসিকপত্র-পত্রিকাগুলি রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্র নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। কিন্তু তাই ব'লে ও-সম্পর্কে মাথা না-ঘামানোই যে একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন কথাও বলতে পারি না।

নাট্য-সাহিত্য যে সাহিত্যেরই অন্যতম অঙ্গ, সে কথা বলাই বাহুল্য। অভিনয়ও হচ্ছে একটি উচ্চশ্রেণীর আর্ট। নাট্যকলা সর্ব্বসাধারণকে আকৃষ্ট করে এবং সাধারণ মাসিকপত্র হচ্ছে সর্ব্ব-সাধারণেরই জন্যে। সুতরাং 'মাসিক বসুমতী' নাট্যকলা নিয়ে অনায়াসেই আলোচনা করতে পারে।

আমাদের থিয়েটার ও সিনেমার মত আমাদের মাসিকপত্রেরও আদর্শ এসেছে পাশ্চাত্য দেশ থেকে। ওখানেও দেখি আঠারো ও উনিশ শতাব্দীর উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্রে ('লণ্ডন ম্যাগাজিন' ও 'ইংলিশ রিভিউ') টমাস হলক্রফ্‌ট্‌ ও উইলিয়ম হ্যাজ্‌লিটের মতন বিখ্যাত লেখক বিলাতের নট-নটীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারও আগে সতেরো শতাব্দী থেকেই বিলাতের প্রথম শ্রেণীর লেখকরা নাট্যকলা ও নট-নটীদের নিয়ে স্থায়ী আলোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি। স্যর রিচার্ড ষ্টীল, জোসেফ এডিসন, অলিভার গোল্ডস্মিথ, হাণ্ট, চার্লস্ ল্যাম্ব, ক্লেমেণ্ট স্কট, আর্থার সিমন্স ও উইলিয়ম আর্চার প্রভৃতি স্মরণীয় লেখকরা এ বিভাগে অনেক লেখনী চালনা করেছেন। নাট্যকাররূপে বিখ্যাত হবার আগে বার্ণার্ড শ' ছিলেন প্রসিদ্ধ নাট্য-সমালোচক। তাঁর অভিনয় সমালোচনা হচ্ছে পরম উপভোগ্য এবং তা স্থানলাভ করেছে উচ্চ-সাহিত্যে।

বাংলা দেশের অসীম দুর্ভাগ্য যে, এখানকার সাধারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীর সমালোচক দুর্লভ। সুতরাং নাট্যকলার সমালোচনা যে উচ্চ-সাহিত্য ব'লে গণ্য হ'তে পারে, এখানে এমন কথা কেউ ভাবতেও পারে না। অথচ এদেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতন অভিনেতা!

পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় নট-নটীরা আজও বেঁচে আছেন উচ্চশ্রেণীর নাট্য-সমালোচনার মধ্যে। কিন্তু এদেশের গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এর মধ্যেই হয়ে দাঁড়িয়েছে কথার-কথা মাত্র, আরো কিছু কাল পরে সে কথার-কথাও হয়তো আর শোনা যাবে না। অথচ কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের কাছে স্পষ্ট ভাষায় ব'লেছিলেন—"বিলাতে আমি ওখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্যর হেনরি আর্ভিংয়ের অভিনয় দেখেছি। তিনি গিরিশচন্দ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নট নন। "বলিদান" নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় অভিনয় যিনি দেখেছেন, তিনি কোন দিনই তা ভুলতে পারবেন না। বিলাতে জন্মালে গিরিশচন্দ্রও 'স্যর' উপাধি লাভ করতেন।"

প্রায় সত্তর বৎসর আগে স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার
র "সাধারণী" পত্রিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখে লিখেছিলেন :
লণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার কথা পুস্তকে পাঠ
রয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোন গ্যারিক যে অধিকতর
নতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না।"

শিল্পী অক্ষয়চন্দ্রের মত সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের চিত্তকেও এমন ভাবে
ভূত ও উচ্ছ্বসিত করতে পারেন, তাঁর আশ্চর্য্য প্রতিভার কথা
নায়াসেই কল্পনা করা যায়। কিন্তু এমন প্রতিভারও বিশেষত্বগুলি
শে স্থায়ী সাহিত্যে ধ'রে রাখা হয়নি, এটা কি কম দুঃখের কথা ?

আজকালকার মাসিকপত্রগুলি সব-দিক্ দিয়েই আগেকার চেয়ে
কা হয়ে পড়েছে, তাই নাট্যকলার দিকে তার দৃষ্টি দেবার শক্তি
। অথচ নাট্য-সমালোচনা এদেশী মাসিক সাহিত্যেও নূতন
পার নয়।

প্রায় ষাট বৎসর আগে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন
নিক লেখকও তাঁর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় দেশীয় রঙ্গালয়ের
ক ও অভিনয় নিয়ে একাধিক বার আলোচনা ক'রেছিলেন।

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ও দীনবন্ধুর প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের
নয়-শক্তি নিয়ে আলোচনা ক'রেছিলেন 'বঙ্গদর্শনে'।

'জন্মভূমি' পত্রিকাতেও নাট্যকলা নিয়ে আলোচনা দেখেছি
লে স্মরণ হ'চ্ছে। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালও তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী
সিক পত্রিকায় (নাম মনে পড়ছে না) তারাসুন্দরীর নাট্য-প্রতিভার
িচয় দিয়েছিলেন একটি সচিত্র প্রবন্ধে। আরো কোন কোন
সকপত্রে বাংলা রঙ্গালয় নিয়ে আলোচনা দেখেছি, সেগুলিরও নাম
ণ করতে পারছি না। ১৩০৮ সালের 'অর্চ্চনা' পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র
ষ্ঠ অভিনয় ও অভিনেতা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন।

সুতরাং 'মাসিক বসুমতী'র পৃষ্ঠায় নাট্যকলাকে আমন্ত্রণ ক'রে
মরা নতুন-কিছু করছি না, মহাজনেরই চলা-পথে চলবার চেষ্টা
ছি মাত্র।

কিন্তু আমরা কূপমণ্ডুকের মত কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ
ব না, বাংলা তথা ভারতের বাইরেও দেশ-বিদেশের নাট্যজগতের
শ এনে পাঠকদের হাতে উপহার দেব সাদরে।

চিত্রালয় ঃ

বাংলার চলচ্চিত্রকলার ভবিষ্যৎ আছে বটে অন্ধকারের গর্ভে, কিন্তু
বর্ত্তমানের সঙ্গে পরিচিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এবং তার অতীতও
স্বল্ করছে আমাদের চোখের সামনে। বোবা যুগের "বিদ্যাসুন্দর"
লাত-ফেরৎ" প্রভৃতি ছবি নিয়ে এই সেদিন যখন সে ভূমিষ্ঠ হয়,
রা তখন তো দস্তুরমত সাবালক। সে সময়ে আমার বন্ধুরাই
ন তার কর্ণধার—যেমন স্বর্গীয় অনাদিনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীতিশ লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি। মাঝে মাঝে তাঁদের কারুর কারুর ওখানে কৌতূহলী হয়ে উকি- ঝুঁকি মেরেও এসেছি। একবার নীতিশ-বাবু তাঁর 'সীতার বিবাহ' নামক অপ্রকাশিত চিত্রনাট্যের কয়েকটি দৃশ্যে আমাদের কয়েক জনকে (স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও

আমি) ধ'রে নিয়ে গিয়ে ধড়া-চূড়া পরিয়ে সঙ সাজিয়ে খানিকটা ছবি তুলেও নিয়েছিলেন! এ-সব তো কালকের কথা ব'লে মনে হয়!

(ওপরের)

কোন ছবিতে নয়, একটি হোটেলে বসে খাচ্ছেন এরল ফ্লিন্।
সঙ্গে এক বান্ধবী।

(মধ্যের)

ইউজিন ওনিলের 'মোর্ণিং বিকামস্ ইলেকট্রা' ছবিতে রোজালিণ্ড
রাসেল ও মিকায়েল রেডগ্রেভ জাহাজে তাদের মাকে আবিষ্কার

(হ্যামলেট) লরেন্স অলিভার | (পলোনিয়াস) ফেলিক্স আয়েলমার | (রাণী জাটরুড) এইলিন হার্লি | (রাজা ক্লডিয়াস) বেসিল সিডনে | (অপোলয়া) জীন সাইমনস্

তার পর কথা কইতে শিখলে বাংলা ছবি। সে কি কথা ব'লে কথা—ঠিক যেন শিশুর মুখে জ্যাঠা-মহাশয়ের ভাষা! শিশুরা নকল করে বড়দের—অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের। বাংলা ছবিও নকল করতে লাগল ফিরিঙ্গি ছবিগুলোকে এবং এখনো নকল করছে একটানা! গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটা এগিয়েও এল। আজ তার বিশ্বাস, সে হাঁটছে! কিন্তু শিশুদের হাঁটা মানেই যে হামাগুড়ি দেওয়া, সে জানে না বা মানে না এ কথাটা।

হ্যাঁ, বাংলা ছবি নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু তার বেশীর ভাগ কথাই হবে দুঃখের কথা, লজ্জার কথা। আরম্ভেই সে-সব কথা না তুলে, এবারে কেবল কালাপানির ওপারে আছে যে মজার ছবির বাজার, সেখানকার গুটিকয় টুকিটাকি খবরাখবর কুড়িয়ে এনে আপনাদের সামনে ধরব। গোড়াতেই লোকে তেঁতো খায়, কিন্তু মাসিক সাহিত্যের পড়ুয়ারা হচ্ছেন মধুলোভী, এবারে তাঁদেরই মন রাখব ভয়ে ভয়ে।

ইয়াঙ্কিস্থানের হলিউড! যৌবনের কল্পলোক! চিত্রপটে হানা দেন যে-বিশ্বপ্রিয়ার দল, ছবির বাইরে কামনার রাজ্যে গিয়ে তাঁরা নিত্যই দেখান বিধাসুতে বিচিত্র অভাবিত লীলাখেলা। ওদেশি পুরাণে চির-কুখ্যাত অন্ধ শিশু-দেবতাটির আধুনিক বিচরণ-ভূমি হচ্ছে ঐ বহু-বিজ্ঞাপিত হলিউড! সেখানে যখন-তখন আবির্ভূত হ'য়ে অন্তরালে থেকে তিনি ছোড়েন কেবল বাণের পর বাণ, তার পর তাঁর বাণে বিদ্ধ হ'য়ে চক্ষুষ্মান কারা অন্ধ হ'ল এবং যা-নয়-তাই ক'রে বসল, সে-সব কথা তিনি আমলে আনাই দরকার মনে করেন না!

সংপ্রতি হলিউডে লোককে সব-চেয়ে বেশী চমকে দিয়েছেন সাত-নয়ায় নামজাদা মার্লিন ডিয়েট্রিক্। এত কাল ধ'রে ছবির পর্দায় তিনি পয়লা নম্বরের রসময়ীর মত বহু রসিকতা ক'রে এসেছেন বটে, কিন্তু লোকে জানত, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হচ্ছেন এক রহস্যময়ী পরম সতী।

আচম্বিতে আজ হয়েছে বিনা মেঘে বজ্রপাত। মন্থরার কাছ থেকে অদ্ভুত কথা শুনে কৈকেয়ী না কি সবিস্ময়ে ব'লেছিলেন—"এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে!" আজ মার্লিনের ভক্তদেরও হয়েছে সেই অবস্থা। কারণ, মার্লিন ডিয়েট্রিক্ না কি অবিলম্বেই প্রকাশ্য আদালতে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের মামলা আনয়ন করবেন!

◗ পলেট গর্ডাড ও তার বিবাহিত স্বামী বার্গেস মেরিডিত। 'এ মিরাকল ক্যান হ্যাপেন' ছবিতে স্বামী স্ত্রীর ভূমিকাতেই দু'জনেই নেমেছ।

● শ্রীমতীর ক্রোধ, শ্রীমান করছেন মানভঞ্জনের চেষ্টা

মার্লিন বন্ধ্যা নন, জননী। জাতে তিনি জার্মাণ। তাঁর স্বামীর নাম রুডলফ সিবার। চব্বিশ বৎসর আগে যখন তাঁদের বিবাহ হয়েছিল, মার্লিনের বয়স ছিল তখন বিশ বৎসর। সুতরাং মার্লিনের বয়স এখন চুয়াল্লিশ—অর্থাৎ যে বয়সে বাংলা দেশের অনেক নারীই দিদিমা বা ঠাকুমা হয়ে নাতী-নাৎনীদের শোনান ব্যাঙমা বেঙ্মীদের রূপকথা!

শ্রীমানের ওজর শুনে শ্রীমতীর তাপমান-যন্ত্রের

● শ্রীমতীর উক্তি "আচ্ছা, এ যাত্রা মাপ করলুম কিন্তু মনে রেখো দুষ্টু ছেলে, ফের যদি—"

চিত্রনাট্য পড়ছেন 'এ ডাবল লাইফ' ছবির—কোলমান (ডান দিকে), তার স্ত্রী (মধ্যে) ও প্রযোজক জ্যানাক্।

অথচ মার্লিন এখনো বিশ্ব প্রিয়া! তাঁকে দেখে আজও অধিকাংশ লোক হৃদয় হারিয়ে ফেলে হারা হৃদয়কে অন্বেষণ করে তাঁরই রহস্যময় তনু-বল্লরীর মধ্যে! আজও হলিউডের সত্যিকার যুবতীদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তম এবং সুবিখ্যাত এবং সুন্দর এবং সুতরুণ চিত্রনটরা জাগরণে ও স্বপ্নে কামনা করেন ঐ বয়সের হিসাবে প্রৌঢ়া মার্লিন ডিয়েট্রিককে!

বার্লিন থেকে মার্লিনের উদয় হ'ল আমেরিকার চিত্র-

● 'এ ডাবল লাইফ' চিত্রের জন্য এ্যাকাডেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রথম অভিনেতা কোলমান, অভিনেত্রী লরেটা ইয়ং ও প্রযোজক ড্যারিল এফ, জ্যানাক্।

... এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হ'ল জনরবের পর ... ! মার্লিনের শিশু-কন্যাটিকে নিয়ে সুদূর ...নে ব'সে স্বামী রুডল্ফ, সিবার ক্রমাগত শুনতে ...লেন, তাঁর স্ত্রী না কি আজ এর সঙ্গে, কাল ...ঙ্গে খেলছেন হৃদয় লেন-দেনের খেলা! সিবার ...টা কিছুমাত্র চাঞ্চল্য জাহির করলেন না। ... বেড়ে ওঠে গুজব। শেষটা সিবারও আমেরিকায় হাজির। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা। প্রোষিত-...া তাঁকে কি বোঝালেন জানি না কিন্তু সিবার ...কে বললেন, "আহা, মার্লিন-বেচারীর নামে ...া কলঙ্ক দিও না। এর-ওর- তার সঙ্গে সে যা ...তা প্রেম নয়, বন্ধুত্ব মাত্র!" তিনি আবার ...গেলেন বার্লিনে।

● 'এ ডাবল লাইফ'এর অপর এক দৃশ্য। কোলমানের মুখাকৃতি লক্ষ্য করুন।

● 'এ ডাবল লাইফ' চিত্রে একটি অদ্ভুত ভঙ্গীতে কোলমান।

... দিন যায়। ... নয়া-নয়া ...জন্ম। ...মে শোনা ... ফরাসী ...নট মরিস ...লিয়ারের ...দাত্তুল্য-...র জন্যে ... না কি ...াগ কর-...ার অল্প ... পরেই ...কার কাজ ... শিভালি-...ঠটান ...ন স্বদেশে—

'এ ডাবল লাইফ'এ কোলমান। সেক্সপিয়রের 'ওথেলো'কে মনে পড়ছে না কি?

একাকী। তার পর উঠল ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের (ছোট) নাম। তিনি এবং মার্লিন সর্ব্বদাই না কি বিরাজ করেন মাণিকজোড়ের মত। বিয়ে হ'ল ব'লে। তার পর ফেয়ারব্যাঙ্কসেরও অন্তর্ধান। এমনি ভাবে এলেন-গেলেন চার্লস বোয়ার ও গেরি কুপার প্রভৃতি প্রভৃতি। "All Quiet on the Western Front"এর পৃথিবীবিখ্যাত লেখক এরিক্ মেরিয়া রেমার্কের নামও জড়িত হ'ল মার্লিনের সঙ্গে। এমনি আরো কত জন! জনরব মানলে বলতে হয়, মার্লিন আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছেন বাহান্নো জন খ্যাতনামা প্রেমিককে—বা-হা-ন্নো জন! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ হয়নি। তাঁর স্বামীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন

● ওথেলো ও ডেসডিমোনা মনে হলেও 'এ ডাবল লাইফ'এর একটি দৃশ্য।

● আবালবৃদ্ধবনিতা পছন্দ করে কিন্তু বব হোপকে। বব এক পার্কে বসে দুলছেন, আর গান গাইছেন। দোলা দিচ্ছে অবশ্য মেয়েদের দল।

এক এবং অদ্বিতীয় রুড লফ সিবারই।

কিন্তু যা রটে, তা কিছু বটে এবার না কি সত্যি সত্যাই বোমা ফাটতে দেরি নেই একেবারে পাকা খবর! অবশেষে চুয়াল্লিশ বছুরী প্রেমিকা মার্লিন যে ভাগ্যবান ছোকরাটির জন্যে তাঁর তেইশ-চব্বিশ বছরের পুরাতন ও বিশ্বস্ত স্বামীটিকে ত্যাগ করবেন, তাঁর নাম হচ্ছে জিন্ গেবিন—ইনিও চিত্র-তারকা', জাতে ফরাসী। এর সঙ্গে না কি স্বামীর নাকের উপরেই মার্লিনের লীলাখেলা চলছে আজ কয়েক বৎসর ধ'রে। স্বামী দেখেন সব, শোনেন সব, কিন্তু বলেন না কিছুই। অথচ তিনিও সহায়-সম্পদহীন নন—এক জন বড়-দরের চিত্র-পরিচালক অনেক লীলাময়ী মেয়ের পক্ষে তিনিই হচ্ছেন আদর্শ স্বামী!

এই তো হালের খবর। তবু বলা তো যায় না—মার্লিনের ভারি একটা বদ-স্বভাব আছে। তিনি মাছদের খেলান যথেষ্ট, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টেনে ডাঙায় তোলেন না, জলের মাছ ছেড়ে দেন জলেই। মাছদের খেলে সুখ, তাঁর সুখ খেলিয়ে। অতএব—

* * *

কাসানোভার আবির্ভাব হবে ছবির পর্দ্দার উপরে আমেরিকার "ইগল্ লায়ন ফিল্ম" তাঁকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে কাসানোভা ছিলেন নগণ্য লোক—কিন্তু 'অ্যাডভেঞ্চারে'র দিক্ দিয়ে দেখলে তাঁর মতন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। প্রেম নিয়েই তাঁর প্রধান কীর্ত্তি! সারা জীবন ধ'রেই তিনি ক'রে গিয়েছেন খালি প্রেম আর প্রেম আর প্রেম! ওদেশের লোক বলে, এমন প্রকাণ্ড প্রেমিক না কি ভূমণ্ডলে আর জন্মগ্রহণ করেননি। য়ুরোপের বড়-ঘরের যুবতীরা (এমন কি বৃদ্ধারাও) তাঁর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবার জন্য প্রকাশ করত বিপুল আগ্রহ! নখদন্তবিগলিত হয়ে প্রাচীন বয়সেও তিনি এই দারুণ প্রেমব্যাধির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন না। বড়-ঘরের রূপসীরা তখন তাঁর কাছে ঘেঁসত না ব'লে তিনি শিকার অন্বেষণ করতেন দাসী-বাঁদীদের মহলে!

কিন্তু কেবল প্রেম নয়, অন্যান্য নানা দিক্ দিয়েও তাঁর জীবন ছিল ঘটনাবাহুল্যে অতি বিচিত্র। স্বদেশ ইতালী থেকে বেরিয়ে পড়ে অভিশপ্ত ইহুদীর মত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন য়ুরোপের দেশে দেশে, বড় বড় রাজসভায় আর সম্ভ্রান্তদের সমাজে। কখনো তিনি গণৎকার, কখনো ফ্রান্সের 'ষ্টেট-লটারি'র পরিচালক, কখনো ভিনিস কর্ত্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচর, কখনো প্রুসিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেটের বন্ধু, কখনো বা সাহিত্যিক ভল্তারের সহচর, কখনো দুই হাতে টাকা রোজগার ও খরচ করছেন এবং কখনো বা হচ্ছেন কারাগারে আবদ্ধ! বারো খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিরাট আত্মজীবনী সারা য়ুরোপে জাগিয়েছিল বিষম উত্তেজনা! তাঁর ঐ "আত্মজীবনী" আজও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং তা পাঠ করলে বেশ বোঝা যায়, রচনা-কার্য্যেও তিনি ছিলেন এক জন পাকা ওস্তাদ। তিয়াত্তর বৎসর বয়সে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছোট ভাই ফ্রানসেস্কো কাসানোভাও ভাস্কর্য্য-শিল্পে অক্ষয় যশ অর্জ্জন করেছেন।

* * * *

ইংলণ্ডের চিত্র-নির্ম্মাতারা পড়েছেন সমূহ বিপদে। তাঁদের তোলা ছবি না কি প্রতীচ্যের দেশে দেশে বিষম অশ্লীল ব'লে ভীষণরূপে নিন্দিত হচ্ছে। অমন যে বিলাসী ফ্রান্স, যার রাজধানীতে আজও

● কোন ছায়াছবি নয়, নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওর আভ্যন্তরীণ একটি অংশ
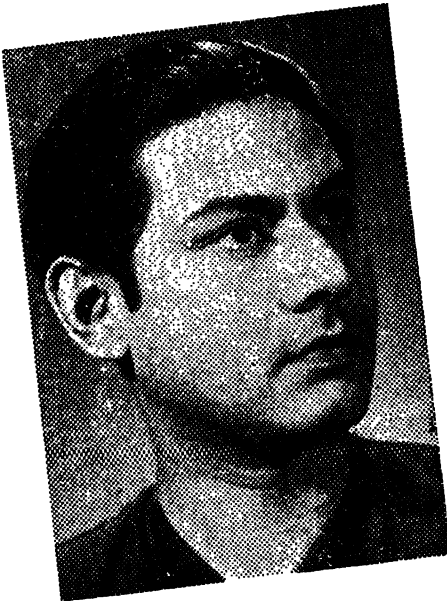
নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

প্রতিবাদ

কাহিনী-গৌরবে, শিল্প-সম্পদে, সঙ্গীত-মাধুর্য্যে অনবদ্য কথাচিত্র

●

পরিবেশক ঃ অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড.।

(নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক)

প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারীরা এসে নানান রঙ্গ দেখিয়ে যায়, বিলাতী ছবি সেখানেও না কি অশ্লীল ব'লে ধিক্কৃত হচ্ছে। অমন যে ছুষ্ট প্রেমের দেশ ইয়াঙ্কিস্থান, যেখানকার সবাক্ চলচ্চিত্রের যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় প্রগাঢ় আলিঙ্গন ও সশব্দ চুম্বনের উত্তেজনাপূর্ণ নমুনার পর নমুনা, সেখানেও না কি বিলাতী ছবির তথাকথিত অশ্লীলতা সুরুচির অগ্রদূতদের রীতিমত কাহিল ক'রে ফেলেছে! অথচ মজার কথা এই যে, বিলাতের চিত্র-নির্ম্মাতারা ও দর্শকগণ এত ধিক্কার ও তিরস্কারের পরেও বিলাতী ছবির ভিতরে অশ্লীলতার কোন জীবাণুই আবিষ্কার করতে পারছেন না! তাহ'লে আসল রহস্যটা কি? ইংরেজী ছবির বিরুদ্ধে 'প্রপাগাণ্ডা', না অন্য কিছু?

* * * *

ছবির দেশে আগেই প্রদর্শিত পুরাতন "হ্যামলেট" আবার নতুন রূপ ধ'রে আসছে। এবারকার পরিচালক হচ্ছেন স্যর লরেন্স অলিভিয়ার এবং ছবিখানি তৈরী করতে খরচ হয়েছে না কি প্রায় এক কোটি বিশ হাজার টাকা! পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ে বিভিন্ন প্রতিভাবান অভিনেতারা যুগে যুগে একই হ্যামলেটকে দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে। বিলাতে না কি এমন বড় অভিনেতা নেই যিনি অবতীর্ণ হননি হ্যামলেটের ভূমিকায়। আজও ঐ ভূমিকার মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করছেন নব নব সৌন্দর্য্য। সুতরাং চিত্রজগতেও একাধিক হ্যামলেটের আবির্ভাব দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই।

আমেরিকার জনৈক বিশেষজ্ঞ বলছেন: "হলিউডের চিত্র-নির্ম্মাতাদের প্রধান উদ্দেশ্য, সব-চেয়ে বেশী দর্শক আকর্ষণ করা। তাঁরা মন রাখতে চান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার। বিশেষ ক'রে তরুণদের নিয়েই তাঁদের কারবার।

যৌবনের মহোৎসব আকর্ষণ করে বৃদ্ধদেরও। যতই আমাদের বয়স হোক্, আমাদের সকলেরই মনের ভিতরে আছে খানিকটা ক'রে শিশুত্ব। তাই বৃদ্ধরাও তরুণদের উপযোগী চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচীনদের মনোজগতে থাকে যে-সমস্যা ও ঘাত-প্রতিঘাত, তা জানবার জন্যে তরুণরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না।

সমস্ত বড় বড় 'কমেডি' ও 'ট্রাজেডি'র ভিতরেই থাকে প্রাপ্ত-বয়স্কদের মনোজগৎ। যেখানে তারা তরুণদের চরিত্র-চিত্রণের ভার নেয় সেখানেও দেখাতে চায়, প্রবীণদের মনোজগতের সঙ্গে নবীনদের মনোজগতের ঘাত-প্রতিঘাত। এক্ষেত্রে জনপ্রিয় চিত্র-নির্ম্মাতাদের আবির্ভাব অনেকটা বোকামিরই সামিল।

তবু কোন কোন 'ভ্রান্ত' প্রয়োগ-কর্তা ডোষ্টোএভ্স্কি বা ও-নীলকে নিয়ে টানাটানি করতে অগ্রসর হন। কিছু কাল আগে জন ফোর্ড "ডোষ্টোএভস্কির 'The Informer'" অবলম্বনে চিত্র প্রস্তুত করেন। চিত্রপ্রিয় জনতার পক্ষে ছবিখানি হয়েছিল গুরুপাক। তাদের চিত্তবিনোদন করবার বস্তু তার মধ্যে ছিল না। তাই গোড়ার দিকে ছবিখানি তেমন দর্শক আকর্ষণ করতে পারেনি। তার পর ভাগ্যক্রমে তার দিকে আকৃষ্ট হ'ল বিদ্বজ্জন-সভা, কোন কোন স্থান থেকে ছবিখানি পেলে পুরস্কার। তখন প্রেক্ষাগারে জনসমাগম হ'তে লাগল।

সম্প্রতি ইউজিন ও-নীলের বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক "Mourning Becomes Electra" চিত্ররূপ লাভ করেছে। এর মধ্যেও দেখানো হয়েছে প্রধানতঃ প্রবীণদেরই মনোজগৎ। চলচ্চিত্রে এ-রকম নাটকের প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। তরুণদের উচিত নয়, দিনের পর দিন কেবল যা তা রাবিস দেখে বাজে আমোদ নিয়ে মেতে থাকা। নাবালকদেরও এক দিন তো সাবালক হ'তে হবে! সাহিত্য ও রঙ্গালয়ের সৃষ্টি কেবল হাল্কা আমোদ-প্রমোদের জন্যে নয়, মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করাই হচ্ছে তাদের কর্ত্তব্য।

এই কথাগুলি কি বাংলা দেশের চিত্র-নির্ম্মাতাদের কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করবে? হলিউড তো পদে আছে, বাংলা ছবির বাজারে বিক্রী হয় তার চেয়ে ঢের বেশী খেলো মাল!

● বিং ক্রসবির নিজের একখানা ঘর। মেঝেয় রেকর্ড ছড়িয়ে রাখা বা জানলায় নিজের ছবি ও আলমারীতে পুরস্কার পাওয়া মেডেল-কাপ প্রভৃতি তুলে রাখা বিংএর এক অভ্যাস।

আগামী সংখ্যা থেকে দেশী ও বিদেশী রঙ্গ-পটের বিস্তারিত চিত্র, সংবাদ ও সমালোচনা যথারীতি প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় মাত্র প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।
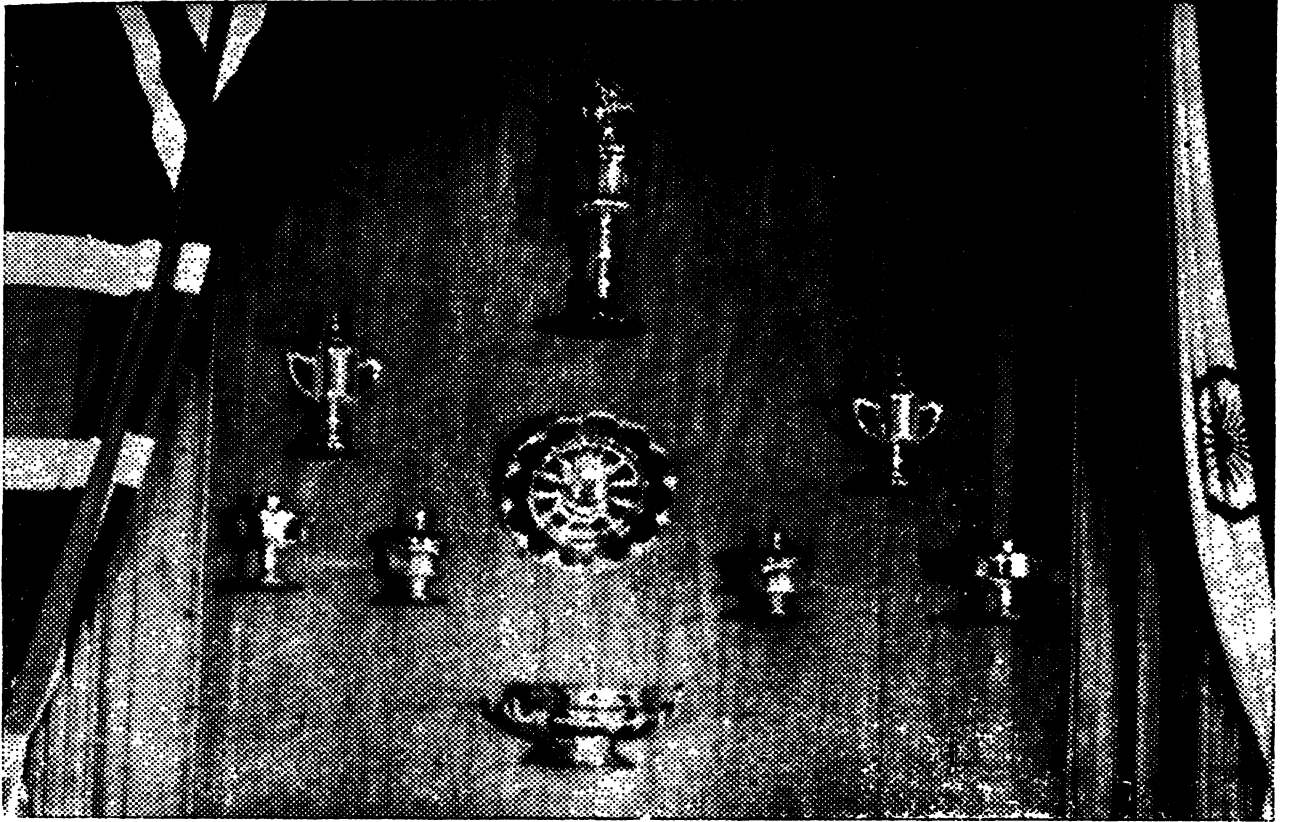
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে আর্ল মাউণ্টব্যাটেন গত ২০শে জুন তারিখে ভারতবর্ষকে এই সুবর্ণপাত্রগুলি উপহার দেন। পূর্ব্বে লণ্ডনের একটি খ্যাতনামা স্বর্ণকার-প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডেশ্বরকে এই পাত্রগুলি উপহার দেয়।

বন্দে মাতরম্!

বঙ্কিম ঋষিঃ—প্রাণঃ ছন্দ—বঙ্গজননী
দেবতা—ম্লেচ্ছনিধন কর্ম্মে বিনিয়োগঃ।
সপ্তকোটি হিন্দু বাঙ্গালীর সাধন মন্ত্র—
মন্ত্রপ্রকাশকাল—১৮৭২ খৃঃ
উপলক্ষ প্রসার—ভারতের স্বাধীনতা
সাধক—অরবিন্দ (১৯০৪) থেকে
সুভাষচন্দ্র (১৯৪৪)
সাধন-কাল—৪০ বৎসর

জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে!

গীত প্রকাশ—১৯১১ খৃঃ
[বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অবসানে]
রবীন্দ্র কবি—ইন্দ্র-রাজ দেবতা
বঙ্গ বিয়োগ কর্ম্মে বিনিয়োগ

প্রমাণ

ব্যালজাক

পোর্টিলো শহরের এক ধোবানীর গল্প। সকলেই জানেন যে পরে এই ধোবানীটি লা তাসচার্তে নামে পরিচিত হয়েছিল। বুড়ো তাসচেরুকে বিয়ে করার সাত বৎসর আগে এই ধোবানী যৌবনে পদার্পণ করলো। এই মেয়েটি ছিল সদা হাস্যময়ী সুতরাং যে কেউই তার সঙ্গে প্রেম করতে আসুক না কেন, তাদের কাউকেই সে বাধা দিত না আবার ধরাও দিত না কারো কাছে। তার জানালা দিয়ে অবশ্য অনেকেই উঁকি-ঝুঁকি মারতো—আসতো সাতখানা নৌকোর মালিক র‍্যাবেলিয়াসের ছেলে, আসতো জেহানের বড় ছেলে, দর্জ্জি মার্কেণ্ডু আর স্বর্ণকার পেকার্ড। সকলকে নিয়েই সে ঠাট্টা-তামাসা করতো, কিন্তু গীর্জ্জার অনুমোদন ছাড়া কারোর কাছেই ধরা দিতে সে রাজী ছিল না। আর এই থেকেই প্রমাণ হয় যে মেয়েটি ছিল অত্যন্ত ধর্ম্মশীলা। কোন রকমেই যাতে পদস্খলন না হয় মেয়েটি তার জন্য যথেষ্ট সাবধান থাকতো, তবে সে মনে করতো যদি কোন রকমে কলঙ্কের ছোঁয়াচ লাগেই তাহ'লে খুব ভাল করে ঘষা-মাজা করলেই সে কলঙ্ক-কালিমা মুছে ফেলা সম্ভব।

এক দিন দুপুরে মেয়েটি নদী পার হচ্ছে, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর আলোতে ওর যৌবনের লাবণ্য টলমল করছে, এমন সময় এক যুবক লর্ডের চোখে সে পড়ে গেল। এক বুড়োকে জিজ্ঞাসা করে লর্ড জানতে পারলেন যে মেয়েটি ধোবানী, সদা হাস্যময়ী এবং অত্যন্ত ধর্ম্মশীলা—পোর্টিলোর সুন্দরী বলে এ অঞ্চলে সে পরিচিত। লর্ড স্থির করলেন যে, তার দামী-দামী কাপড়-চোপড় সব এই ধোবানীর কাছ থেকেই ধোয়াবেন। লর্ডের এই সিদ্ধান্তে মেয়েটি তো দারুণ খুশী, কারণ এই লোকটি হল লর্ড দ্যু ফু, রাজার কঞ্চুকী। যেখানে-সেখানে পঞ্চমুখে মেয়েটি লর্ড দ্যু ফু'র কথাই বলে বেড়াতে লাগল।

এক বুড়ি ধোবানী তো ওর এই বকবকানিতে শেষ পর্য্যন্ত চটেই গেল। বুড়ি বললে—ঠাণ্ডা জলেই এত খলবলানি, গরম জলে না জানি কি করবে এ মেয়ে।

অবশেষে মঁসিয়ে দ্যু ফু'র হোটেলে মেয়েটি ধোলাই করা কাপড়-চোপড় ফেরৎ দিতে এলো। মঁসিয়ে দ্যু ফু পঞ্চমুখে ওর রূপ-যৌবনের প্রশংসা করলেন। বললেন, তুমি যা আশা করেছ তার থেকে ঢের বেশী মূল্য আমি তোমাকে দেব। ঘর থেকে অন্য লোকেরা বেরিয়ে যাবার পর মুখের কথা কাজে পরিণত হতে আরম্ভ হল। মঁসিয়ে মেয়েটিকে নানা ভাবে আদর করতে লাগলেন। এই বুঝি টাকার থলি বার করে—আশায় আশায় মেয়েটি কোন বাধা দিল না। লজ্জিত ভাবে বললে—এইবার আমার হাতে-খড়ি হবে!

মঁসিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এখুনি হচ্ছে।

কেউ কেউ বলে, ধোবানীকে বাগাতে মঁসিয়ের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি, কিন্তু অন্যেরা এ কথা মানে না। তারা বলে, ধোবানী যে রকম অবসন্ন ভাবে, গোঁঙাতে-গোঁঙাতে কাঁদতে-কাঁদতে জজের কাছে যাচ্ছিল তাতে বেশ বোঝা যায়, মঁসিয়েকে বেশ খানিকটা জোর-জবরদস্তী করতে হয়েছে। যা হোক, জজ সে সময় বাড়ী ছিল না সুতরাং ধোবানীকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। ইতিমধ্যে জজের চাকরের কাছেই সে সব কথা খুলে বলতে লাগল। মঁসিয়ে দ্যু ফু ওর যথাসর্বস্ব হরণ করেছে অথচ নিজের অপকর্ম্ম ছাড়া ওকে আর কিছু দেয়নি। ঠিক এই কাজের জন্যই কত লোক তাকে মোটা মোটা টাকা দিতে চেয়েছে। এই লোকটা তাকে টাকা-কড়ি তো কিছু দেয়ইনি, উপরন্তু এমন পাষণ্ডের মত ব্যবহার করেছে যে ওর কোন আরামও হয়নি। সুতরাং এক হাজার ক্রাউন ক্ষতিপূরণ হিসাবে তার পাওনা হয়েছে।

জজ আসতে মেয়েটি জানাল যে তার একটি অভিযোগ আছে। জজ বললেন, ধোবানীর আদেশ হলে দুষ্কৃতিকারীকে তিনি এই মুহূর্ত্তে ফাঁসিতে লটকাতে পারেন, কারণ জজ ধোবানীর মন পেতে চান।

ধোবানী জানাল যে, লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া হোক এটা সে চায় না, তার দাবী এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা, কারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কৌমার্য্য হরণ করা হয়েছে।

ঠিক! ঠিক! জজ বললে, লোকটা যা হরণ করেছে তার দাম ওর থেকেও বেশী।

এক হাজার ক্রাউনেই আমি সন্তুষ্ট হব! কারণ তাহ'লে আমাকে আর ধোবানীর কাজ করতে হবে না।

কিন্তু লোকটা কে? বেশ কিছু টাকা-কড়ি আছে তো তার?

তা আছে।

তাহ'লে তো তাকে নিশ্চয়ই ঐ টাকা দিতে হবে। কে সে?

মঁসিয়ে দ্যু ফু।

তাহ'লে তো মামলা গেল। জজ বললে।

কিন্তু ন্যায়বিচার! মেয়েটি বললো।

আমি তো বিচারের কথা বলিনি, বলেছি মামলার কথা। জজ উত্তর দিলেন, ঘটনাটা কি ভাবে ঘটল তা আমার জানা দরকার।

মেয়েটি অকপটে ঘটনাগুলি বর্ণনা করলে। সে জামা-কাপড়গুলি আলমারীতে গুছিয়ে রাখছিল, এমন সময় লর্ড তার ফ্রকের ঘাঘরা নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে থাকে, তার পর···

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে জজকে বললে—এইবার যা হয় করুন!

. তোমার তো কোন মামলাই হয় না দেখছি, তুমি তো কোন আপত্তি করোনি !

মেয়েটি প্রতিবাদ করলো যে, সে যথেষ্ট বাধা দিয়েছে, চিৎকার করেছে, সুতরাং এ অত্যাচার ছাড়া কিছু নয় !

ও তো লর্ডকে উত্তেজিত করার ছল। জজ মন্তব্য করলেন।

মেয়েটি বললে, মোটেই না। লর্ড জোর ক'রে তার কোমর ধরে তাকে শুইয়ে ফেলেছে, মেয়েটি পা ছুড়েছে, চিৎকার করেছে—কিন্তু অনেকক্ষণ যুঝবার পরও কোন সাহায্য না পাওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত আর তার সাহস বজায় থাকেনি।

বেশ ! বেশ ! জজ বললে, কিন্তু তুমি ব্যাপারটি থেকে একটুও আনন্দ পাওনি ?

না। বরং যে ব্যথা পেয়েছি এক হাজার ক্রাউনের বিনিময়েই তার নিরসন সম্ভব।

জজ বললেন, কোন মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে এই ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় বলে অমি বিশ্বাস করি না। সুতরাং তোমার মামলা আমি নিতে পারবো না বাপু !

মেয়েটি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললে, আপনার দাসীর কাছেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন—এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব কি না।

দাসী বললে, দু'রকমের অত্যাচার আছে—এক ধরণের অত্যাচার আরামদায়ক, অন্য ধরণের ব্যথা পাওয়া যায়। মেয়েটি যদি আরামও পেয়ে না থাকে, টাকাও না পেয়ে থাকে তাহ'লে যে কোন একটা পাওয়ার অধিকার তার আছে।

এই সুবিজ্ঞ পরামর্শে জজ সাহেব বেশ ভাবিত হয়ে পড়লেন।

তিনি বললেন,—জ্যাকুলিন, খেতে যাবার আগেই আমি এই সমস্যার সমাধান করতে চাই। তুমি চট্‌ ক'রে আমার আইনের নথিপত্র, সেলাই করবার স্চ আর খানিকটা লাল সুতো নিয়ে এসো তো !

জ্যাকুলিন ছুটে গিয়ে একটা বড় স্চ আর খানিকটা লাল সুতা নিয়ে এলো। জজ সাহেব চিন্তান্বিত ভাবে ধোপানীকে বললেন : আমি এই স্চটা হাতে ক'রে ধরে থাকবো—এর ফুটোটা যথেষ্ট বড়, তুমি যদি লাল সুতোটা এই ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পার তাহ'লে আমি তোমার মামলা নেব এবং ম'সিয়ে যাতে একটা আপোষ করেন তার ব্যবস্থা করবো।

মেয়েটি বললে—আপোষ আবার কি ! আমি আপোষ-টাপোষ মানতে রাজী নই।

এ হোল একটা আইনের শব্দ—এর মানে ন্যায়বিচার।

আপোষ মানে ন্যায়বিচার তো ?

এই অত্যাচারে তুমি দেখছি ভীষণ সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছ। যা হোক, তুমি তৈরী তো ?

হাঁ।

সুন্দরী লাল সুতাটা বেশ ক'রে পাকিয়ে শক্ত ক'রে স্চের ফুটোটার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য স্থির ক'রে যেই সুতোটা ফুটোর মধ্যে পরাতে যাবে জজ সাহেব হাত নাড়লেন, ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। মেয়েটি আবার চেষ্টা করলো জজও আবার হাত নাড়লেন। এই রকম মেয়েটি বার বার চেষ্টা করে, জজ সাহেবও বারে বারে হাত নাড়েন—ফলে স্চের সঙ্গে সুতার পরিণয়ও সম্ভব হয় না। ব্যাপার দেখে দাসীটা হাসতে হাসতে বললো ও তো সুতো পরাতে জানে না, পড়তেই জানে ! জজ সাহেবও হাসতে আরম্ভ করলেন ! মেয়েটা কাঁদ-কাঁদ হয়ে ধৈর্য্য হারিয়ে বলে উঠলো—ও-রকম ভাবে স্চটা নাড়াতে থাকলে আমি কখনই ওই ফুটোতে সুতো পরাতে পারবো না।

জজ বললেন, তাহ'লে সুন্দরী, তুমিও যদি এ রকম ভাব করতে ম'সিয়ে কখনই তোমার সতীত্ব হরণ করতে পারতো না।

মেয়েটি প্রতিবাদ ক'রে বললো, ও তো জোর-জবরদস্তী করেছে। তার পর খানিকটা ভেবে বললো—বেশ, তাই যদি হয় তাহ'লে লর্ড যা যা করেছিল আমাকেও তা করতে দিতে হবে—তাহ'লেই আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

জজ বললেন—বেশ, তাই হোক।

মেয়েটি মোমবাতির মোম দিয়ে সুতোটাকে বেশ শক্ত এবং সোজা করলো। তার পর স্চের ফুটোটার দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করলো : আহা কি চমৎকার ফুটোটি ! লক্ষ্যভেদের কি চমৎকার স্থান ! এমন সুন্দর রত্ন আমি আর কখনও দেখিনি। আহা, কি সুগঠিত ফুটোটি ! এসো, এই সুতোটা তোমার মধ্যে পরিয়ে দি। আহা, অমন করে নড়ো না, আমার সুতোটার আঘাত

লাগবে। আহা, নড়ো না। দেখ, কেমন সুন্দর ভাবে সুতোটা ঐ লৌহ-দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে!

এই ছলা-কলার বিদ্যায় মেয়েদের মত পারদর্শী আর কে আছে? মেয়েটি জজকে নিয়ে এই ভাবে খেলাতে লাগল। সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেল। ক্রমাগত হাত নাড়তে নাড়তে জজের হাতের কব্জি টন-টন করতে আরম্ভ করলো। অবশেষে ব্যথা অসহ্য হওয়ায় জজ সাহেব হাতখানা টেবিলের ওপর রাখতে বাধ্য হলেন। মেয়েটিও এই সুযোগে বিজয়িনীর মত সুতোটা সূচে পরিয়ে দিয়ে বললো—ব্যাপারটা এই ভাবেই ঘটেছিল।

কিন্তু আমার কব্জি ব্যথা করছিল যে!

আমারও গ্রন্থি ব্যথা হয়েছিল।

তরুণ লর্ডটি যে জোর ক'রেই মেয়েটির ওপর অত্যাচার করেছে, জজ সাহেবের সে সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইল না। তিনি মেয়েটির মামলা নিতে সম্মত হলেন। এদিকে এই ধরণের মামলার কথা রাজার কানে ওঠায় তিনি দ্যু ফু'কে ডেকে পাঠালেন। দ্যু ফু স্বীকার করলে অভিযোগ সত্য। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল কি?

না। দ্যু ফু নিরীহের মত জবাব দিল।

রাজা বললেন, তাহ'লে মেয়েটির দাম নিশ্চয়ই এক শত স্বর্ণমুদ্রা হতে পারে।

জজ এসে মেয়েটিকে জানালেন, এক শত স্বর্ণমুদ্রা ইতিমধ্যেই আদায় হয়ে গেছে এবং মেয়েটি যদি চায় তাহ'লে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা অবিলম্বেই সংগৃহীত হতে পারে। রাজ-দরবারের অন্যান্য লর্ডেরা মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারাই জজের কাছে প্রস্তাব করে যে, মেয়েটি রাজী হলে তারা পুরোপুরি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাই মেয়েটিকে দিতে পারেন। সৎভাবে জীবন যাপন করবার জন্য মেয়েটির এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাই প্রয়োজন, সুতরাং সে কোন আপত্তিই করেনি। অনেকে বলে, দশ জনের কাছ থেকেই মেয়েটি টাকাটা পেয়েছিল; আবার অনেকে বলে, দাতার সংখ্যা একশ' জন। কিন্তু দশই হোক আর একশ'ই হোক তাতে আমাদের কি?

অনুবাদ—রাণু সোম

"নূতন সংবাদ"

[১২৭০ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি কেবল মাত্র মহিলাদের উদ্দেশ্যেই রচনা প্রকাশ করিতেন। 'নূতন সংবাদ' নামে তৎকালীন বহু কৌতুকপূর্ণ সংবাদ মধ্যে মধ্যে পত্রিকাটিতে দেওয়া হইত। আমরা একটি সংখ্যার সংবাদ মুদ্রিত করিলাম।—মাঃ বঃ]

আমরা এই পৃথিবীর যে পিঠে বাস করি ইহার বিপরীত দিককে আমেরিকা বলে। উহার উত্তরাংশে ইউনাইটেড ষ্টেট দেশে একটি মহাযুদ্ধ চলিতেছে। ঐ রাজ্যের অনেক লোক, মনুষ্য সকল ক্রয় করিয়া বাটীতে রাখে এবং পশুর মত তাহাদিগকে খাটাইয়া লয়। ক্রীত-দাসেরা যদি কিছু ধন উপার্জ্জন করে তাহা প্রভুর, তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানেরাও প্রভুর অধীন, একটু অবাধ্য হইলে প্রভু তাহাদিগকে যত ইচ্ছা যন্ত্রণা দিতে পারে এমন কি প্রাণ লইতেও পারে। ঐ দেশের শাসন-কর্ত্তা লিঙ্কলন সাহেব দয়ান্বিত হইয়া ঐ হতভাগ্যদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। ইহাতে স্বার্থপর প্রভু সকল ক্রুদ্ধ হইয়া রাজবিদ্রোহী হয়েন এবং এক ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিছুকাল উভয় দলের জয়-পরাজয় সমান হইয়াছিল। এখন বিদ্রোহীদিগের ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়াছে। বোধ হয় অতি অল্পকালের মধ্যে তাহারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইবে। কালে সত্যের জয় হইবেই হইবে।

কলিকাতার ১৪।১৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে মজিলপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে বাঙ্গালা টীকা দিয়া অনেকের প্রাণবিয়োগ হইতেছে। অনেকের আরোগ্য-স্নানের পূর্ব্বে জ্বর বসন্ত না হইয়া তাহার পরে ভয়ানকরূপে দেখা দিতেছে। ইংরাজী টীকায় কোন ভয় নাই অথচ আশ্চর্য্য উপকার হয়; বাঙ্গালা টীকায় অনেক কষ্ট ও প্রাণনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের দেশের লোকে সাবধান হইবেন না?

মার্কস নামে এক সাহেব ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলেন। সম্প্রতি বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তির কেহ উত্তরাধিকারী না থাকাতে তিনি কলিকাতার উন্নতির জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকের এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনেক সদ্গুণ। ভারতবর্ষের মৃত গবর্ণর লর্ড এলগিনের স্ত্রী লণ্ডন নগরে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল সার জন লরেন্স্ গত ১৬ই চৈত্র বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ইংলণ্ডের (ইংরেজদের দেশের) কয়েকজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এদেশে আসিতেছেন। যদি এ-সম্বাদ সত্য হয় তবে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ অবলাগণের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

[বৈশাখ, ১২৭১

প্যারী যেতে না পারলে আর্টিষ্ট হওয়াই বৃথা!

'তুমি কি শুধুই ছবি, শুধু পটে লিখা?' রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ছবির বাজার সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত ক'রে এ ছত্রটি লেখেননি। কথাটা কিন্তু নিদারুণ সত্যে পরিণত হয়েছে আমাদের ছবি ও তার চাহিদা সম্পর্কে।

ছবিকে আমরা 'শুধু পটে লিখা'র চেয়ে বেশী মূল্য দিতে নারাজ। চিত্র সম্পর্কে আমাদের ঔদাসীন্যের অন্ত নেই। ছবি দেখতে চাই যেন শুধু তার ত্রুটি ধরার জন্যে। এখানে অতি বিজ্ঞ আমরা। অভিজ্ঞতার বালাই না থাকলেও আমরা আমাদের খুশীমত মতবাদ ছাড়তে দ্বিধাবোধ করি না।

কোনও এক ছবির সম্মুখীন হয়ে এক ভদ্রলোককে সেদিন বলতে শুনলাম, 'ও কি ছবি হয়েছে? যে কোনও লোক বাঁ হাতেই আঁকতে পারে ও রকম। হ্যাঁ, ছবি যদি হয় ত সে অবনীন্দ্রনাথের।' ভদ্রলোকের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা লেজুড় ছিল জানতাম। আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অবশ্য অকপটে স্বীকার করলেন যে অবনী ঠাকুরের কোনও ছবি তাঁর মনে পড়ছে না। শুধু তাই নয়, দেশের কোনও শিল্পীর সম্বন্ধে কোনও খোঁজই রাখেন না তিনি। ছবি ভাল লাগা না-লাগার অধিকারের কথা তুলছি না, আমি বলছি, ছবি সম্বন্ধে নৈরাশ্যজনক অজ্ঞতার কথা।

আর এক দিন এক জন সাংবাদিককে দেখেছিলাম উচ্ছসিত হয়ে উঠতে একটা ছবির সামনে। ছবিটি তৃতীয় শ্রেণীর, কিন্তু শিল্পী তৃতীয় শ্রেণীর নয়—কিছু প্রখ্যাতি আছে তাঁর। জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'আরে মশায়,—এঁর ছবি কি খারাপ হয়? আমরা কি বুঝি বলুন না ছবির? ও-রকম নাম-করা লোকের ছবি কি যা-তা হতে পারে?' বুঝলাম, শিল্পীর প্রতি অহেতুক গড্ডালিকা-শ্রদ্ধাই তাঁর কলা-সমালোচনার মূলধন।

বলতে আপত্তি নেই, আমরা অনেকে এই রকম না-বুঝতে-পারা ছবিকে অপূর্ব্ব সৃষ্টি, মাষ্টারপিস্ ইত্যাদি সার্টিফিকেট দিয়ে ভূষিত করতে ছাড়ি না। এটা অতি-বিনয়। নিজেকে তুচ্ছ ভাবা কিম্বা শিল্পী সম্প্রদায়ের ওপর প্রচলিত একটা অকারণ শ্রদ্ধাও হতে পারে। যা বুঝতে পারি না বা যা ভাল লাগছে না নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোনও অব্যক্ত রহস্য রয়েছে যা আমার নাগালের বাইরে। কিন্তু সেটা স্বীকার করতে লজ্জা পাই। আমার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। ভাল বলার কোনও বালাই নেই। খারাপ বললেই হাজার কৈফিয়ৎ লাগে এক কথায় সমঝদার ও কনইসিওর হওয়া যায়। আধুনিক ছবি এবং বেশ দুর্ব্বোধ্য ছবিও আমার বোঝার আয়ত্তের মধ্যে, আত্মতুষ্টির এটি একটি সনাতন স্বর্ণপথ।

অর্থবান খরিদ্দার যিনি দামী ছাঁটের চকচকে স্যুট পরে প্রদর্শনী-গৃহে এসে দাঁড়ান, কখনও টাইটা অনর্থক একটু নেড়ে কিম্বা দামী সিগরেটটা তর্জ্জনী দিয়ে ঠুকতে-ঠুকতে আপাত মনোযোগে ছবি দেখছেন, তাঁর পক্ষে প্রায়ই এ কথা খাটে। ট্যাকের ঐশ্বর্য্যই যে তাঁর সব নয়, মনের ঐশ্বর্য্যও আছে এটা তিনি দেখাবেনই। মানসিক কৃষ্টি, কলা-প্রীতি ও আভিজাত্য সবগুলিকে উগ্র ভাবে বিজ্ঞাপিত করতে গিয়ে হয়ত তিনি কিনে বসলেন একটি abstract art-এর আধুনিক নমুনা। এ শুধু দুর্ব্বোধ্য নয় তাঁর রসোপলব্ধির রাজ্যে এটি হয়ত একটি অত্যাচারবিশেষ। এটিকে তিনি হয়ত তাঁর সুরম্য ভবনে আলমারীর পাশে টাঙ্গিয়ে রাখেন অপ্রয়োজনের স্তুপে। অভ্যাগত বান্ধবদের কাছে কিন্তু তিনি স্বীকার করছেন পঞ্চমুখ হয়ে যে ছবিটি তাঁকে অধ্যাত্ম-রহস্যলোকের কতখানি প্রেরণা দেয় কিম্বা এই রকম আর কিছু।

আধুনিক হবার দুঃসাধ্য সাধনা ও কৃত্রিম আত্মবিড়ম্বনা চিত্রকলার ইতিহাসকে অনেকখানি কণ্টকিত করেছে। খাঁটি মন নিয়ে ছবির রসবোধ করার চেষ্টা চিত্র-রচনাকে সার্থক করে। খাঁটি মন নিয়ে ছবির সমালোচনা চিত্রকলাকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করে।

সাধারণের এই মেকী শ্রদ্ধা শিল্পীকে এক দিক্ থেকে একটু বেশী আত্মসর্ব্বস্ব করে তোলে, যেটা তার পক্ষে সব সময় কল্যাণকর নয়। এক শিল্পী বন্ধুকে বলতে শুনেছি, 'একটা ইজম্ খাড়া করতে না পারলে কিছুই হোল না: তাকে দেখেছি কতকগুলি ত্রিভুজ, বৃত্ত, সরল রেখা, চওড়া ব্রাস, primary colour, জলের বদলে albumen, তেলের বদলে মোম ইত্যাদি নিয়ে ভীষণ ভাবে কসরৎ করতে। দুঃখের বিষয়, যাই কিছু সে করে না কেন, পরিশেষে দেখা যায়, সবই ইতিপূর্ব্বে কোনো না কোনো 'ইজম্' নামে হয়ে গেছে। কিছু দিন চেষ্টার পর শেষে ছবি আঁকায় ইস্তফা দিয়ে ফিল্মে ঢুকে পড়ে সে।

ভ্যান গঁগ, কিম্বা গঁগার জীবনের অনুসরণে দেখেছি, কাউকে কাউকে বাস্তব জীবন থেকে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে। জীবনকে বর্জ্জন ক'রে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হবার আদর্শ যেন তাদের। কিন্তু জীবনকে ছাড়লেও, সমাজকে ছাড়লেও প্রকৃতি তাদের ছাড়ে না। ফলে হয়ত দেখা গেল, দুঃসাধ্য সাধনার পর সে হুইস্কির অনুরাগী হয়ে পড়েছে। কিম্বা তদভাবে শুধু সিগ্রেটই খেয়ে যাচ্ছে বেশী-বেশী। এটাকেই আবার সে তার হিসাবের খাতায় নীট লাভ বলে লেজার মেলাচ্ছে।

সাধারণের শ্রদ্ধা শিল্পীর প্রাপ্য। কিন্তু এর একটা কুফলও চোখে পড়ে—সেটা হচ্ছে আর্টিষ্টের চরম খেয়াল, যে খেয়ালকে আশ্রয় ক'রে তারা তাদের রচনাকে অহেতুক মর্য্যাদা দেয়। নিজেদের সমাজ ছাড়া এক শ্রেণীর উচ্চতর জীব বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আমি জানি এক শিল্পী বন্ধুর খেদোক্তি। তিনি বলতেন, 'ভারতবর্ষ এবং নেহাৎ বাংলা দেশ বলেই আমায় struggle করতে হয়—

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

কেনবার ইচ্ছে নেই।······পরে দেখা যাবে'খন······

য়ুরোপ হ'লে আমায় লুফে নিত···"। এটা ব্যর্থতার সুর সন্দেহ নেই। তবে আমার প্রশ্ন এই, দেশ যদি এই শিল্পীকে প্রতিষ্ঠাও দিত, তা হ'লে তিনি সার্থক কিছু সৃষ্টি করতে পারতেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এই শ্রেণীর শিল্পীরা এদেশে কিম্বা ও-দেশে চিত্রকলায় পাগলামির সৃষ্টি করে। উদ্ভট কল্পনার প্রসার দেখা যায় এদের। এই ভাবেই pointilism, sur-realism, futurism ইত্যাদির

বিক্রী হয় হ'ল, না'হলে কি আসে-যায় ?
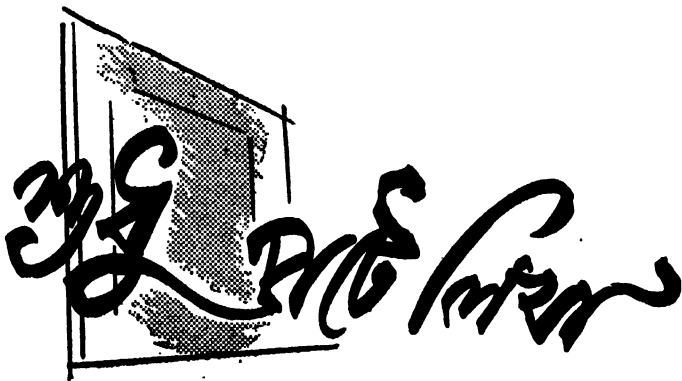
সৃষ্টি হয়েছিল ও-দেশে। ধরুন, Kandinsky কিম্বা Braque কিম্বা Wordsworthএর ছবি। এগুলি নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক কল্পনাপ্রসূত, তাই সাধারণে এর প্রতিষ্ঠা কম। সময়ের ধোপে টেকে না এগুলি। কতকটা curio হিসাবে থাকবার জন্যই যেন থাকে এরা। Abnormality আমাদের চমক লাগায়, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ কোথায় ?

তাই বলছিলাম, এক দিকে সাধারণের শিল্পী সম্পর্কে একটু কম বিনয় প্রকাশ করার প্রয়োজন। তাদের সবিনয় অনাগ্রহের চেয়ে আগ্রহশীল সহযোগিতা ও সান্নিধ্যের দাম অনেক বেশী। প্রতিদিনকার

দেখলে সে খুশী হয়। কিন্তু সেই দেওয়ালের মালিককে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না, এবং সেই মালিক যদি জাতীয় সরকার, জাতীয় মিউসিয়াম বা কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠান হয় ত কথাই নেই।

শিল্পীকে বাঁচতে হবে সমাজেই। সমাজ-মন নিয়ে তাকে খেলতে হবে। গণ-চেতনা ও রসবোধের মাটিতেই আর্টের ফসল ফলে। দেশের মনের সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছবির মধ্যে যদি না থাকে তাহ'লে সেই সৃষ্টিকে অন্ততঃ সেই দেশের এবং সেই কালের জন্য সার্থক হয়নি বলেই ধরে নেব। অবশ্য ক্ষণজন্মা প্রতিভাধরদের আমি দেশ-কালের পরিধির বাইরেই দেখতে চাই।

ঐ ছবিখানাই কিনবো !

বাস্তবতায় একমাত্র কল্পনার রঙীন বাতি জ্বালিয়ে আর্টিষ্ট চলে। নিরেট শ্বাস-অবরোধকারী শত সমস্যার কারা-প্রাচীরের পথে সেই স্নিগ্ধ আলোকের প্রয়োজন আছে। সাধারণের তাই দাবী হওয়া উচিত শিল্পীকে নিজস্ব করার, তার সঙ্গে গড়ে তোলা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, নিশ্বাস নেবার অবকাশ সৃষ্টি করা, রসলোকে ক্ষণিকের মত নিভৃত বিহারের আয়োজন করা। এদিক্ থেকে তার দাবী অনিবার্য্য হওয়া চাই। শিল্পীর কর্ত্তব্য যে শুধু নিজের কাছেই শেষ এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। অপরের দেওয়ালে তার নিজের আঁকা ছবি

আর্টিষ্ট কি সমাজ ছাড়া জীব না কি ?

"আজকের দিনে ভারতবাসীর মুখে "স্বরাজ" ছাড়া অপর কোনও কথা নেই। দেশের স্বরাজ্য পরের কাছে হাত পেতে পাওয়া যায় কি যায় না, তা আমি বলতে পারি নে; কিন্তু এ কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি যে, মনের স্বরাজ্য নিজ হাতে গড়ে তুলতে হয়। তার পর দেশের স্বরাজ্য ইংরাজি ভাষার প্রতাপে লাভ করা গেলেও, মনের স্বরাজ্য একমাত্র স্বভাষার প্রসাদেই লাভ করা যায়। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের পক্ষে একটা সখ নয়, জাতীয় জীবন গঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—কেন না, এ ক্ষেত্রে যা কিছু গড়ে উঠবে, তার মূলে থাকবে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব।" —প্রমথ চৌধুরী

বিরানব্বুই বছরের বিপ্লবী

বার্ণার্ড শ'

মণি বাগচি

মানুষের মনকে যেমন চার দিক্ থেকে বিপুল তমসা বেষ্টন ক'রে রয়েছে, তেমনই আবার সেই সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার-জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার মত ব্যক্তিরও কোনো দিন ইতিহাসে অভাব হয়নি। বারম্বার এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা সংগ্রামও করেছেন এবং নিজের অন্তরকে তমসার স্পর্শ থেকে নিষ্কলুষ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। বিংশ শতকের চিন্তা-জগতে এমন দু'জন পুরুষের সাক্ষাৎ আমরা পেলাম রবীন্দ্রনাথ ও শ'য়ের মধ্যে।

আজকের দিনের মানুষের চিন্তা-জগতের এমন একটি দিক্ নেই, এমন একটি প্রত্যন্ত প্রদেশ নেই, যেখানে শ'য়ের মৌলিক চিন্তার ও সূক্ষ্মতর অনুভূতির আলোকরশ্মি অব্যাহত ভাবে না গিয়ে পৌঁছেচে। বিংশ-শতকের অদ্বিতীয় চিন্তা-নায়ক তিনি। এমন কি আগামী দিনের মানব-মনও তাঁর চিন্তাধারায় অভিসিঞ্চিত হোয়ে রইলো। সক্রেটিশ, প্লেটো, পাইথাগোরাস, সেক্সপীয়র, ডারুইন, ভলটেয়ার, নীট্শে, মার্কস্—এই এতগুলো মনীষীর প্রতিভার সমষ্টিগত পরিণতি শ'। কথাটা শুনতে অদ্ভুত, কিন্তু আশ্চর্য্য রকমে সত্য। পৃথিবীর লোক তো তাঁর প্রতিভার মানদণ্ডই খুঁজে পেল না। শ' কি? নাট্যকার? ঔপন্যাসিক? দার্শনিক? ঐতিহাসিক? প্রচারক? কি তিনি? সাহিত্যের কোন মহলে তাঁর স্থান?—এই প্রশ্ন যখন আমাদের দিশেহারা ক'রে তুললো, নোবেল প্রাইজ পাবার পরও মানুষটার প্রতিভার স্বরূপ জানতে ও বুঝতে যখন মুস্কিল হোলো, তখন স্বয়ম্ভুর মত শ' নিজেই ঘোষণা করলেন: "I am an Artist-Philosopher"—আমি এক জন শিল্পি-দার্শনিক। এই শ্রেণীর প্রতিভা পৃথিবীতে এই প্রথম এবং সম্ভবতঃ এই শেষ।

আজকের এই বিরানব্বুই বছরে তাঁর রূপটি আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। হয়তো তার প্রতিটি রেখা স্পষ্ট নয়—হয়তো তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে হলে এখনো কিছু কাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যেটুকু ধরা পড়েছে তাতে শিল্প, সাহিত্য, নাট্য, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-চিন্তায় বারনার্ড শ'কে নিঃসন্দেহে বিপ্লবী ব'লে অভিনন্দিত করা যেতে পারে। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তথাকথিত যে-সব বিপ্লবীরা ভীড় ক'রে আছেন, শ' তাঁদের কারো সমগোত্রীয় নন। তাঁর বৈপ্লবিক মনীষার উৎসমূল হোলো তাঁর সৃজনীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভা—যে-প্রতিভার প্রখর আলোকে ইউরোপের মানসলোক আজ সমুদ্ভাসিত।

ভাবলেও আশ্চর্য্য হতে হয়, পৃথিবীতে এমন একটি মানুষ আজও বেঁচে রয়েছেন, যিনি এক জীবনে একটা শতাব্দীর শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছেন ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে। তাঁর ভ্রূভঙ্গে নির্ম্মম উপেক্ষা, হাতের কলমে শাণিত তরবারির তীক্ষ্ণতা, আর উচ্চারিত বাণীতে আছে সুকঠিন স্বচ্ছতা। মানুষের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে অতি-মানুষ। জাতে আইরিশ, থাকেন ইংলণ্ডে, লেখেন ইংরেজী ভাষায়। কিন্তু দেশ, কাল ও জাতির সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম ক'রে রবীন্দ্রনাথ, টলষ্টয় ও গান্ধী যে স্তরে উঠেছেন, এই মানুষটিও আজ সেই স্তরে এসে পৌঁছেচেন, অর্থাৎ সকল দিক্ দিয়েই মানুষটিকে বলা চলে unique ও universal এবং এই কারণেই আজ পরমায়ুর প্রশস্ত পথে বিরানব্বুইয়ের কোঠায় পা দিলেও জীবনকে তিনি তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরে রেখেছেন—এমনি অফুরন্ত এবং প্রচণ্ড তাঁর জীবনীশক্তি এবং জীবনের ওপর অনুরাগ। "I demand a lifetime of 300 years"—এই কথা তিনি বলেছেন ১৯৪৭ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে, যেদিন তিনি নব্বুইয়ের কোঠায় পা দিলেন। লোকে বলে, তিনি এক জন ঘোর নাস্তিক, ঘোরতর দাম্ভিক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, আর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করতে চান না বাইবেল ও গির্জ্জার অনুশাসনের ওপর। কিন্তু তিনি জানেন, তাঁর উপলব্ধ ভগবান, তাঁর দ্যুতিময় চেতনায় সুপ্রত্যক্ষ পরমাত্মা হোলো তাঁর জীবনীশক্তি—"Life Force",—এই শক্তিতেই তিনি শক্তিমান। অন্তরে বাইরে এই শক্তির অবিচ্ছিন্ন ও স্বচ্ছন্দ-প্রকাশ এই সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে তিনি বোধ ক'রে এসেছেন ব'লেই রাজা তো দূরের কথা, তাঁর স্রষ্টার পায়ে তিনি ভুলেও মাথা নত করেননি এবং ঠিক এই কারণেই কোনো কিছু বিষয়ে আপোষ ক'রে মানিয়ে চলা বা মেনে নেওয়া তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁর স্রষ্টা তিনি নিজে।

সেই মানুষটি আর কেউ নয়—জর্জ্জ বার্ণার্ড শ', সংক্ষেপে জি, বি, এস্।

১৮৭৬ সাল। এপ্রিল মাস। অজাতশ্মশ্রু-গুম্ফ কুড়ি বছরের একটি তরুণ তার মা'কে সঙ্গে নিয়ে নিজের জন্মভূমি আয়র্ল্যাণ্ড ত্যাগ ক'রে লণ্ডনের পথে পা বাড়ালেন। আমরা যাকে বলি 'লোটাকম্বল সম্বল' ক'রে, এই তরুণও ঠিক সেই ভাবে অর্থাৎ একটি মাত্র কার্পেট-ব্যাগ হাতে নিয়ে দেশত্যাগী হলেন। তিরিশ বছরের মধ্যে তিনি আর স্বদেশে ফেরেননি। যুবক লণ্ডনে এলেন কপর্দ্দক-শূন্য অবস্থায়, ভরসা মায়ের রোজগার। লণ্ডনে প্রবেশ করলেন

সদর দরজা দিয়ে নয়, ভবঘুরেদের খিড়কী দরজা দিয়ে। তাই সেদিন 'সেক্সপীয়রের" লণ্ডন তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়নি, এমন কি আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠিত হয়েছিল। একেবারে বাইরের লোক (তাঁর নিজের কথায় outsider) হিসেবেই তিনি এলেন লণ্ডনে। কিন্তু এই অভিজাত মহানগরীকে এবং এইখান থেকেই সমগ্র পৃথিবীকে অজ্ঞাতকুলশীল, খ্যাতিহীন, প্রতিপত্তিহীন এবং দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সেই যুবক পরবর্ত্তী বিশ বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে জয় ক'রে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। কলম ছিল তাঁর হাতে সৃষ্টি কাজের অব্যর্থ যন্ত্র।

এই যুবক বার্ণার্ড শ'।

তাঁর জন্মভূমি ডাবলিন চেয়েছিল তাঁকে জয় করতে, তাই ডাবলিনের ওপর তাঁর আজও কিছুমাত্র আকর্ষণ বা মমতা নেই। আর নিজের প্রতিভা বলে তিনি জয় করেছেন বিংশ-শতকের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনকে। তাই পৃথিবীর আর সকল দেশের চেয়ে শ' ভালোবাসেন লণ্ডনকে, যেখানে বসে তাঁর জীবন-যজ্ঞের আহুতির শিখা বছরের পর বছর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "No man prefers the city that conquered him than the city he conquered"—শ'য়ের এই কথাটির মধ্যেই তাঁর লণ্ডন-প্রীতি স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে।

শ' এলেন লণ্ডনে ১৮৭৬ সালে। এক দুই ক'রে কুড়ি বছর কেটে গেল। এতো দিনে আভিজাত্য-গর্ব্বী লণ্ডন জানতে পারলো এবং সবিস্ময়েই জানতে পারলো, তার অসংখ্য নাগরিকদের মধ্যে এমন একটি মানুষ রয়েছে যাঁর ভেতর কৌলীন্যগর্ব্বী প্রবীণ সাহিত্যিকরা এবং উন্নাসিক বিদগ্ধ-সমাজ এক জন নির্ভীক সমালোচকের, নতুন ঔপন্যাসিকের, প্রখর চিন্তাশীল মনের, বুদ্ধিদীপ্ত একটি নতুন প্রতিভার এবং—তখনকার দিনে যা সব চেয়ে দুর্লভ—এক জন শক্তিশালী নবীন নাট্যকারের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। ক্রমে শ' এসে দাঁড়লেন সকলের পুরোভাগে—ভিক্টোরিয়ান যুগের সাহিত্যিকরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। ইংলণ্ড তথা ইউরোপের চিন্তা-জগতে একটা সাড়া পড়ে গেলো। অনেক দিন বাদে ইংলণ্ডের ঘুণ-ধরা সমাজ আর স্তিমিত সাহিত্য-স্রোত সতেজ, চঞ্চল, প্রাণবান ও দুর্ব্বার হয়ে উঠলো শ'য়ের প্রতিভার ও তাঁর দুর্ব্বিনীত প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে। অতলান্তিকের পরপারে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে আমেরিকা চেয়ে দেখলো ইউরোপের চিন্তা-জগতে এই নব সূর্য্যোদয়।

১৯২৪ সালে আনাতোল ফ্রাঁসের মৃত্যুর পর সমগ্র ইউরোপের সকল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকবৃন্দ শ'কে সাহিত্যাচার্য্য বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিলো। গুণমুগ্ধ, কৃতজ্ঞ ইংলণ্ড তাঁকে রাজ-সম্মান—বৃটেনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজদত্ত উপাধি—"Order of Merit" এবং "Peerage" দিতে অগ্রসর হোলো; সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী এলো, ফরাসীর শ্রেষ্ঠ সম্মান "Legion of Honour" তাঁকে অর্পণ করতে। এ সবই বার্ণার্ড শ' প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে—"I believe the name Bernard Shaw needs no adornment—" এ কথা দাম্ভিকের নয়, বাচালের নয়, পাগলের নয়, এ কথা সেই মানুষের যাঁর জীবন জীবনকে অতিক্রম ক'রে একটা ঐতিহাসিক গরিমায় দেদীপ্যমান।

তার পর থেকে অর্থাৎ যে দিন থেকে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সমগ্র ইংলণ্ড অতিমাত্রায় কৌতূহলী ও সচেতন হয়ে উঠলো, সেই সময় থেকে শ'য়ের এক একখানা নাটক যেন পৃথিবীর এক একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সামিল হয়ে দাঁড়ালো। লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিনের থিয়েটারের প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হোলো তাঁর নাটকের অভিনয় নিয়ে। তাঁর মুখের অদ্ভুত এবং অপ্রীতিকর কথা শোনবার জন্যে পৃথিবীর লোক উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। তাঁর লেখনী থেকে চিন্তা-জগতে যেন নেমে এলো একটা প্রচণ্ড বন্যা-স্রোত—সমাজের ভণ্ডামী, শাঠ্য ও নীচতার জঞ্জাল ভেসে গেল সেই দুর্ব্বার বন্যা-স্রোতে। শ'য়ের সম্বন্ধে সেই বিস্ময়, সেই আগ্রহ আজও আমাদের সমান ভাবে রয়েছে। বিরানব্বুই বছরের জীবনের চাপে এই প্রতিভা নিঃশেষিত হয়নি—এ কি কম আশ্চর্য্যের কথা!

তবু যেন মনে হয়, অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ভগ্নহৃদয় এই মানুষটি। যা চেয়েছিলেন, যে অসাধ্য সাধন করতে সুদৃঢ় পণ করেছিলেন, তা যেন তিনি পারেননি। অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত এই আশ্চর্য্য জীবনের ব্যর্থতার কথা এইবার বলবো। নিজের জীবদ্দশায়, রবীন্দ্রনাথের পর পৃথিবীতে আর কোন লেখক এমন পৃথিবী-জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেননি যেমন করেছেন শ'। আর এত আলোচনাও এক জনকে কেন্দ্র ক'রে আর কখনো হয়নি যেমন হয়েছে তাঁকে নিয়ে। সহস্রাধিক প্রবন্ধ ছাড়া এ পর্য্যন্ত কম ক'রে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পঞ্চাশখানা পূর্ণাঙ্গ বই লেখা হয়েছে শ'য়ের সাহিত্য-সৃষ্টিকে উপলক্ষ ক'রে। পৃথিবীর সর্ব্বাধিক আলোচিত মানুষ তিনিই। কিন্তু কোনো আলোচনাই তাঁর জীবনের বিস্তীর্ণ গতিশীলতাকে সংকুচিত বা ব্যাহত করতে পারেনি। তর্জ্জনী তুলে প্রতিকূল-অনুকূল সব সমালোচনাকেই তিনি নিরস্ত করেছেন এই ব'লে: Life levels all men and death reveals eminent."—এর চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু হ'তে পারে না।

ফ্রয়েডের মতে শিল্পি-জীবনের কাম্য হোলো খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ভালোবাসা আর ক্ষমতা। এই দিক্ দিয়ে বিচার করলে শ'য়ের মতো সাফল্যমণ্ডিত জীবন আর কোন্ লেখকের? খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ভালোবাসা—এ সবই তিনি পেয়েছেন অজস্র ভাবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা ক্ষোভ, একটা অতৃপ্তি রয়ে গেছে তাঁর। বিচিত্র সম্পদপূর্ণ কীর্ত্তিও তাঁর মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারল না। যে-পৃথিবীকে তিনি আজীবন ভালোবেসেছেন, যে-পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-আনন্দকে তিনি ভাষা দিয়েছেন, কালের উত্তাল তরঙ্গ এক দিন তাঁর দেহকে সেই পার্থিব জগৎ থেকে লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যাবে বলে তিনি কি দুঃখিত। না—অন্ততঃ শ'য়ের সম্বন্ধে এ-রকম ধারণা করা চলে না। সম্মান, সম্পদ, খ্যাতি, ভালোবাসা—এ-সবই তিনি পেয়েছেন অপরিমিত প্রাচুর্য্যের সঙ্গে এবং এ সবের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকেও শ' এক জন নিরাসক্ত বৈরাগী। তবে কিসের জন্যে তাঁর অতৃপ্ত মনের বেদনা তাকিয়ে রয়েছে ভাবী কালের প্রতীক্ষায়?

কিন্তু ফ্রয়েড আর একটি জিনিষের কথা উল্লেখ করেছেন—ক্ষমতা। এই ক্ষমতা (Power) লাভই হোলো শিল্পি-জীবনের চরম চরিতার্থতা বা মোক্ষ। শ'য়ের বিরানব্বুই বছরের জীবনের মধ্যে যদি কোনো ব্যর্থতা থাকে তা এই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ কিম্বা ঐ রকম কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা-লাভের উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল না কোন দিন। এই ধরণের ক্ষমতা তিনি কামনাও করেননি।

ব্যক্তিগত জীবনের উচ্চাভিলাষের চরিতার্থতা তাঁর কাছে বড়ো কথা নয়। প্রতিভা মানুষকে যা দিতে পারে তার চেয়েও বেশী ছিল তাঁর কামনা এবং তার যোগ্যতাও ছিল তাঁর। তাঁর জীবন-বিধাতা তাঁকে বঞ্চিত করেছেন সেই দুর্লভ সম্পদ থেকে। যে অসীম আধ্যাত্মিক সম্পদ রয়েছে তাঁর মধ্যে, যাকে তিনি ব'লে থাকেন 'The consciousness of a message—" সেই বিষয়ে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। ইন্দ্রিয়-বোধ-তীক্ষ্ণ শ'য়ের চেতনায় যে জিনিষ সর্ব্বক্ষণের জন্য মদের মতো তার মাথায় উত্তেজনা আনতো, তার থেকে তিনি আজও বঞ্চিত।

শ' চেয়েছিলেন তাঁর এই অধ্যাত্ম ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীর রূপান্তর সাধন করতে আর সর্ব্বনাশ থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করতে। তাঁর অন্তরের কথা—message—কেউ গ্রহণ করলো না—তারা গ্রহণ করলো তাঁর দাম্ভিকতাকে—egoকে। মানব-সমাজে ভলটেয়ার বা লুথায়ের মতো অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করতেই তিনি চেয়েছিলেন—কিন্তু পারেননি। নিতান্ত আক্ষেপের সঙ্গে তিনি তাই দেখলেন, মানুষের মন আজও সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠলো না, সভ্যতা ধাপে ধাপে সর্ব্বনাশের পথেই চলেছে। তাই না পরম ক্ষোভের সঙ্গে এই মানুষটিকে স্বীকার করতে হোলো—"পারলাম না, কিছুই করতে পারলাম না"—"I have produced no permanent impression because nobody has ever believed me—" এমনি নৈরাশ্যের কথা এর আগে আমরা এক দিন শুনেছিলাম কার্লাইলের মুখ থেকে।

এলো বিংশ শতকের প্রখর মধ্যাহ্ন···এলো কাইজার, তোজো, হিটলার, মুসোলিনী। মানুষের ছদ্মবেশে কোন অজ্ঞাত অরণ্য প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এলো এই সব নখদন্তী হিংস্র জন্তু। সভ্যতার হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠলো, পৃথিবীর ভিৎ নড়ে উঠলো বারম্বার মহাপ্রলয়ের তুমুল আলোড়নে। এদের এবং এদেরই স্বজাতিদের একা একটি মানুষ চল্লিশ বছর ধরে সংগ্রাম করেছেন সভ্যতাকে এদের বিষাক্ত সংস্পর্শ থেকে বাঁচাবার মহৎ ও সুকঠিন সংকল্প নিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে নানা পর্ব্বে কত লোকোত্তর প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে, মানব-সভ্যতাকে তাঁরা সমৃদ্ধিশালী ক'রে গেছেন তাঁদের চিন্তার অজস্র দানে। কিন্তু সভ্যতার চরম সংকট যখন দেখা দিলো, তখন এই পৃথিবীতে ছিলেন মাত্র দু'টি মানুষ একে বাঁচবার জন্যে—ইউরোপে বার্ণার্ড শ' আর এশিয়াতে রবীন্দ্রনাথ।

শিল্পীর স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে সাহিত্যিকের নিশ্চিন্ত জীবনের আরাম-শয্যা থেকে এই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। তাই শ'য়ের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে হোলো "জি, বি, এস" নামক একটি নতুন মানুষকে। তাঁকে নামতে হোলো ভাঁড়ের ভূমিকায়, রূপসজ্জা নিতে হলো সার্কাসের ক্লাউনের। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের দুই তেজীয়ান ঘোড়ায় চড়ে অবতীর্ণ হলেন তিনি রঙ্গভূমিতে। চল্লিশ বছরের সাফল্যমণ্ডিত শিল্পি-জীবনের দুর্লভ চরিতার্থতা ঢাকা পড়লো "জি বি এস"এর মুখোসের অন্তরালে। নাট্যকারের জগৎজোড়া খ্যাতিকে ধুলোর মতো তিনি নিক্ষেপ করলেন বাতাসে। শ'য়ের জীবনের ইতিহাসে আত্ম-বিলোপের এই অধ্যায়টি আজও অনালোচিত রয়েছে। খ্যাতির শিখরদেশ থেকে অবতরণ ক'রে যেদিন থেকে তাঁর জীবন-দেবতার নির্দ্দেশে তিনি জি, বি, এস-এর মুখোস নিলেন, সেদিন থেকে পৃথিবীর মানুষ তাঁর মতের গুরুত্ব, কথার মূল্য অস্বীকার করতে সুরু করলো। তিনি যা বলেন, লোকে হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, পাগলের প্রলাপ, বলে ভাঁড়ামি। কিন্তু তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলো যে সুকঠিন সত্য, যে-আগ্রহ, যে-আন্তরিকতা, তা তারা বুঝতে পারল না কিম্বা বুঝতে চাইলো না ব'লেই শ' বারম্বার বলতে লাগলেন—এহো বাহ্য, অর্থাৎ তাঁর নিজের কথায়—"I have obeyed the Life Force, lived out my Destiny. Worn the mask of the mad man 'G, B, S,' only to assert that the real joke is that I am in earnest"—তবু পৃথিবীর লোক শুনল না। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি উপলব্ধি করলেন, তিনি ফুরিয়ে গেছেন—মানব-সভ্যতার ওপর প্রভাব-বিস্তারে ব্যর্থকাম হয়ে তাই তিনি বারম্বার স্বীকার ক'রে বললেন—পারলাম না, সত্যিকারের কিছু করতে পারলাম না।

তবু আজকের পৃথিবী তাঁকে প্রণাম জানায়, দেশ-দেশান্তরের শিল্পীরা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কারণ, তারা জানে, জীবনের বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে, সংশয়াচ্ছন্ন যুগের চিন্তাধারাকে একমাত্র শ'ই পেরেছেন নিজের মধ্যে আত্মসাৎ ক'রে নিতে। বিক্ষুব্ধ ও বিপর্য্যস্ত মানবতার সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তিকে তিনি কল্যাণের স্পর্শে অপরূপ ক'রে তুলেছেন। যে তিক্ততা, গ্লানি ও ক্লেদ সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে প্রবেশ করেছে, নীলকণ্ঠের মতো তার হলাহল তিনি কণ্ঠে ধারণ করেছেন সভ্যতাকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করবার জন্যে। বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের মধ্যে, ব্যষ্টি-জীবনের শূন্যতার মধ্যে তিনি আলোর পথ দেখিয়েছেন। মার্কসের পর ইতিহাসের তিনিই নতুন ব্যাখ্যাতা। রাজনীতিকে বুদ্ধি-বিলাসীদের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে পৃথিবী চিরকাল ঋণী থাকবে এই একটি মানুষের কাছে। বাইবেলের উপদেশের চেয়েও বড়ো উপদেশ তিনি এক দিন পেয়েছিলেন তাঁর গুরু ইবসেনের কাছ থেকে এবং সুযোগ্য শিষ্যের মতো সেই উপদেশকেই তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে। যা বলবার ছিল তা তিনি সম্পূর্ণরূপেই বলতে পেরেছেন—এইখানে তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে। আজ বিংশ শতকের ইউরোপের শ্মশানে ব'সে ধ্বংসের উগ্র আলোয় সৃষ্টির কোনো শান্ত স্নিগ্ধ শিখা এই সুপ্রাচীন মানুষটির দৃষ্টিপথে পড়ছে কি না কে জানে?

শ'য়ের মূর্ত্তি এক মহাক্ষত্রিয়ের মূর্ত্তির মতো। শ'য়ের অন্তর বৈরাগ্যদীপ্ত এক তপস্বীর মতো। মানব-সমাজের অভ্যুদয়ের পথে তিনি এক মহান্ আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। সমাজ-পরিবর্ত্তনের সাধনায় তিনি আজও একাগ্রচিত্ত। পরিশুদ্ধতম অন্তরের অন্তস্তলে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি আশার বাণী শুনিয়েছেন। এই তাঁর আধ্যাত্মিকতা—এই তাঁর বিপ্লবী মনীষা। শ' চলেছেন চিরদিনের তীর্থযাত্রীর মতো। তিমির-তরঙ্গ অবহেলায় অতিক্রম ক'রে অভিযাত্রী শ' চলেছেন সেই পথে যেখানে মানুষে মানুষে ভেদ নেই, কলহ নেই এবং শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর রক্তমাখা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। পথের সমাপ্তি নেই কোনো দিন। নির্ম্মম মৃত্যুর অকুণ্ঠ অস্বীকৃতিতে সে পথ ছায়াশূন্য। বিশ্বের সকল বিপ্লবের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন বলেই জীবনকে চরম হোমাগ্নির মধ্যে আহুতি দেবার জন্যে তিনি প্রস্তুত।

বার্ণার্ড শ' দীর্ঘজীবি হোন—এই আমাদের প্রার্থনা।

অনির্বাণ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

আজ আর সে কথা বলতে আমার সঙ্কোচ নেই, কারণ, সে বালিকা-সুলভ স্বপ্নচারিণী মনের অপমৃত্যু ঘটেছে, আমার সে ইতিহাস যেন কোন জন্ম-জন্মান্তরের বিস্মৃত অবাস্তব, তার সঙ্গে আজকের এই 'আমি'র কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ এই পাহাড়ী শহরের আরও পাঁচশ' মেয়ের সঙ্গে আমার কোনোই তফাৎ নেই, কিন্তু এক দিন যে মেয়েটির সঙ্গে এদের পার্থক্য ছিল তারই কথা না ব'লে থাকতে পারছি না।

যুদ্ধ লেগেছে। ইংরেজ আমাদের বাঁচাবার জন্য কি প্রচণ্ড চেষ্টাই করছে। শিলং শহরে, শহরের আশপাশে, চারি দিকে সৈন্য এনে জমা করেছে। সাংঘাতিক দুর্দ্দিন। ওদিকে থেকে যদি জাপানীরা

আসে বর্মীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তখন আমাদের অবস্থা যে রেঙ্গুনের চেয়েও সাংঘাতিক হবে। তবে আমাদের সহৃদয় বন্ধু ইংরেজ যে ভাবে আয়োজন করেছে তাতে ভরসা হয়—আশা হয়, আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারব, ওদের হটিয়ে দিতেও হয়ত তেমন কষ্ট হবে না। হাজার হ'লেও ইংরেজ রাজার জাতি, তারা কোন্ সমুদ্র ডিঙিয়ে ভারতবর্ষের বুকে রাজ্য চালাচ্ছে, শিলং-এ তারা কত গির্জা করেছে, আমাদের খৃষ্টান করেছে।·· আমরা খাশিয়া, ইংরেজকে আমরা খুব ভালোবাসি।

কিন্তু যুদ্ধের একটা জিনিষ আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সৈন্যরা আমাদের শহরময় যা-খুশি তাই ক'রে বেড়াচ্ছে। দিনে-দুপুরে পথে-ঘাটে তারা পাহাড়ী মেয়েদের কোমর বেষ্টন ক'রে পথ চলে, পথের পাশে পাইনের আবছা জঙ্গলে সন্দেহজনক ভাবে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে, আর এর চেয়ে বেশী কথা নাই বললাম। শহরময় একটা পাবাবতী আবহাওয়া বইছে। অবশ্য মেয়েদেরও দোষ নেই তা বলব না, তারা পণ্যের মত সাজগোজ ক'রে হাতের কাছে প্রজাপতির দিকে চেয়ে থাকে কেন। ওরা সৈন্য, ওদের সঙ্গে জানোয়ারের তফাৎ কিছু নেই। মানুষের মধ্যে পাশবিক বৃত্তির তাড়না তেমন প্রবল না হ'লে মানুষ কখনও আর পাঁচ জন মানুষকে অন্যায় কথা কল্পনাও করতে পারে না। আমি সৈন্যদের বিশেষ ক'রে এ কথা ব'লে ত তাদের দোষ দিচ্ছি না—যুদ্ধের কঠিন পেষণে তারা সভ্যতার আবরণ খসে পড়তে বাধ্য, তাই তারা তৃষ্ণার্ত চাতকের মত সামনে মেয়েদের দেখলে দ্বিগুণিত লালসায় মত্ত হয়ে ওঠে।

আমার স্বাতন্ত্র্য ছিল এইখানে। পথিকের পথকে যে মেয়েরা পিছল ক'রে রাখে আমি সে দলের নই। ওরা দামী এসেন্স মাখে, হরদম নতুন নতুন জেমসেন, জাইকুম, তাম্ম প'রে যখন-তখন ট্রাক অথবা জিপ গাড়িতে হাসিতে উচ্ছল হ'য়ে উড়ে বেড়ায়, আমার অতৃপ্ত বিদগ্ধ মন গর্জন ক'রে ওঠে।

যৌবন আমার কবে এসেছে তা মনে পড়ে না, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমি অসামান্য রূপসী ব'লে পাড়ার এবং বে-পাড়ার অনেকের প্রশংসা পেয়েছি। যখন ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে আমি তখন থেকে আদর করে সবাই, কাজেই যখন বড় হ'লাম তখনকার বিশেষ আদরটাকে আলাদা ক'রে বুঝতে পারিনি। ওই জন্যেই বোধ হয় আমার মনের একটা দিক্ সচেতন হয়নি যথাসময়ে। কেন যেন প্রশংসা আর আদর আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হ'ত। কারণ, ওর মধ্যে কোনো নূতনত্বের, বৈচিত্র্যের রস পাইনি, প্রাচুর্য্যের চাপে মাধুর্য্য বুঝি মরেই গিয়েছিল। এক এক সময়ে মনে হ'ত, হায়, যদি ভগবান আমাকে কুশ্রী কুরূপা ক'রে গড়ে তুলতেন তাহলে অন্ততঃ স্তুতির যন্ত্রণার দায় থেকে বাঁচতাম।

সৌন্দর্য্যের বিড়ম্বনা অসংখ্য।

ভোরবেলায় উঠে একটু বারান্দায় বসি যদি, মা বলবেন ঠাণ্ডা লাগবে···বাবা বলবেন, এলবিনা, ঘরে এসে ব'স···ওপাশের বাড়ী থেকে তরুণ টুইলটিগিবি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চেয়ে থাকবে। তার চোখের ভাষা যেন অন্য রকম, তার চোখের দিকে চাইলে আমার কেমন অস্বস্তি লাগে। কিন্তু কী-ই বা করি। সর্বদা আমাকে ঘিরে যেন অবিচ্ছেদ্য স্তব-কণ্টক রচিত হয় সেটাই জীবনকে কেমন বিষণ্ণ তিক্ত ক'রে তোলে।

ক্রমশঃ বুঝলাম, সৌন্দর্য্য শুধু বিড়ম্বনা নয়, ভগবানের অভিশাপ।

আমি কাউকে ভালোবাসতে পারলাম না, তার কারণ সে সুযোগ আমার আসেনি। শহরের যে কোনো তরুণ যুবক আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে সে-ই অযাচিত ভাবে সৌন্দর্য্যের পায়ে ডালি দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অমনি নিজের অন্তর থেকে কেমন একটা অস্বস্তি জেগেছে। বোধ হয়, বেদনার অনুভূতি দিয়ে তিলে তিলে অর্জন না করতে পারলে প্রেমেরও কোনো মূল্য বোঝা যায় না। মানুষ যা পায় অনায়াসে তার প্রতি বিন্দুমাত্র মোহ থাকে না। আমার জীবনে সে কথা সত্য—অভিশাপের মতই প্রকট সত্য।···আমি কাউকে ভালোবাসতে পারিনি একমাত্র নিজেকে ছাড়া। আপনাকে অবশ্যই ভালোবাসি। কত দিন নির্জনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার নিটোল গঠন দেখিছি অবাক-বিস্ময়ে। ভালো লেগেছে। বোধ হয়, নিজেকে আমি সব চেয়ে ভালোবাসি ব'লেই আর কাউকে সহ্য করতে পারি না। যাক্, যে কারণেই হোক আমার জীবনে কোনো পুরুষই রেখাপাত করতে পারেনি। তাদের স্তাবকতা, কূজন, গুঞ্জন অনেক সইতে হয়েছে—তাতে পুরুষ জাতির উপরে আমার অশ্রদ্ধা বেড়েছে। অতএব সাতাশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বিয়ের কথা কল্পনা-পথে না এনেই কাটিয়ে দিয়েছি। আমাদের মধ্যে ভালোবাসা না হ'লে বিয়ে হওয়ার প্রথাই নেই।

এদিকে স্কুলের পড়া শেষ ক'রে কলেজে ঢুকি যখন, তখনই বাবা মারা গেলেন, মা-ও তার পর মাত্র মাস ছয়েক বাঁচেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে প্রণয় ছিল প্রগাঢ় সেই জন্যই হয়ত মা বাঁচলেন না। তার পর ক্রমশঃ সংসার হয়ে উঠল জটিল সমস্যার সমুদ্র। ছোট বোন কোথায় যেন কার সঙ্গে প্রেমে পড়ল। হ্যাঁ, ছোট বোনের প্রিয়তমটি আসলে আমারই উদ্দেশে ঘোরা-ফেরা করত। সে যাই হোক, ওদের বিয়ে হ'ল। কাজে কাজেই আমাকে নিজের পথ দেখে নিতে হ'ল। বোনের আশ্রয়ে থাকব তেমন মেয়ে আমি নই। অতএব ডনবস্কোতে আমি চায়ের দোকান খুলে ফেললাম। অবশ্য ছোট বোন এতে ক্ষুণ্ণ হ'ল একটু। কিন্তু কি করি, আমি ত আর দেশের প্রথাকে লঙ্ঘন করতে পারি না—আমাদের এখানে নিয়ম হচ্ছে, কনিষ্ঠা কন্যাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। মাঝখান থেকে আমি কেন অনুগ্রহ নিতে যাই!

অবশ্য চায়ের দোকান আমার ভালোই চলে। খরিদ্দার প্রচুর। দোকানে চা আর বিস্কুট, মাখন-রুটি, আনারস আর টুকিটাকি ফল, তা ছাড়া লজেন্স, সাবান, পান এই সব রাখি। ছোট্ট একখানি ঘর, বেশী কিছু রাখবার ঠাঁই নেই।

আমার দোকানে লোক ধরে না। কিন্তু ওদিকে বুড়ী ডোরার দোকান কানা হয়ে গেছে। আহা, বেচারীর জন্য দুঃখ হয়, মনে মনে নিজেকে অপরাধী বোধ করি। সত্যি, আমার দোকান হওয়ার আগে এ সব খদ্দেরই ত ডোরার ছিল! আবার এক এক সময়ে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি জোগাই—এত খদ্দের কক্ষনো ডোরার ছিল না। তাহ'লে···!

সে প্রশ্নের জবাব হরদম পাই। প্রায়ই সন্ধ্যার পর দু'-চার জন পুরুষ টলতে টলতে আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমি বলি—রাত্রে এখানে চা পাওয়া যায় না। দোকান বন্ধ!

তার উত্তরে হাসে নানা ভঙ্গিতে, নানা ভাবে। হাসি পায় কোনো রকমে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে ভারী গলায় বলি—চলে যাও!

তাদের অনুনয়-আবেদন যত শুনি ততই রাগ হয় নিজের ওপর। অনেক বার ভেবে দেখেছি ওদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যাকে আমি ভালোবাসতে পারি? যাকে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, এই প্রাত্যহিক মত্ততার দৃশ্য থেকে মুক্তি পেতে পারি!…আমার মনের চেয়ে বুঝি কঠিন আর একটা অজ্ঞাত কিছু আছে আমার ভেতরে, সে তীব্র ভাবে প্রতিবাদ করেছে—না, না, না!

এমনি ক'রেই কাটছিল দিন। এমন সময়ে সরকারের যুদ্ধ শিল্প শহরকে গ্রাস করল। সারা শহরটা বুঝি সৈন্যরা পয়সা দিয়ে মুড়ে দেবে। এমন পয়সার বন্যাও কখনও দেখিনি।

আমার দোকানে আজকাল দু'জন চাকর। পথের ওপর দু'খানা বেঞ্চি পাতা আছে, সেটা সারা দিনের মধ্যে কখনও খালি থাকে না। আর ঘরের মধ্যে যেটুকু অবকাশ ছিল তাও অতি উৎসাহী খরিদ্দারদের আক্রমণে বিধ্বস্ত।

পাড়ার তরুণ দল আমায় এক দিন জানিয়ে গেল—ভালো চাও তো দোকান তুলে দাও দিদিমণি!

—কেন, কি হয়েছে?—কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি।

—হবে আর কি। আমরা আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। কোন্ দিন রাতে দোকান-ঘর ভেঙে তোমায় নিয়ে পালাবে পল্টনরা, তা জানো?

আমার ভারি হাসি পায়, খিল্-খিল্ ক'রে হাসি। ওরা রীতিমত দুঃখিত হয়ে বললে—হাসছ! কিন্তু বাজে কথা বলছি না একটুও। তোমার আবার সবেতেই বাড়াবাড়ি।

আমি বললাম—আমার দায়িত্ব তোমরা আমার হাতেই ছেড়ে দাও ভাই!

বাস্তবিক সৈন্যদের হুড়োহুড়ি খুব বেড়ে গেছে। তা ছাড়া সবাই যখন বারণ করছে তখন আমার সেটা শোনাই উচিত। কিন্তু দোকান উঠিয়ে দিয়ে করব কি? জীবিকা অর্জ্জনের কি উপায় হবে? অবশ্য বিনা চেষ্টাতেই সামরিক বিভাগে চাকরি একটা পেতে পারি—কিন্তু সে চাকরির পিছনে অন্য কোনো আশঙ্কার মেঘ দেখা দেবে না কি!…এই সব কথাই দিন কয়েক ভাবছি বসে। সে দিন সন্ধ্যার সময় একটু আত্মগত হয়ে গেছি নিজের কথা নিয়ে—সত্যি আমি নিজেকে বড় ভালোবাসি, নিজেকে কেন্দ্র ক'রে কত আকাশ-কুসুম কল্পনা করি। সেই অবাস্তব, অসম্ভব, আজগুবি সব কল্পনাই আমার চোখে বাস্তবের চেয়ে বড়। ওরা আমার মনে সত্যের চেয়েও মর্য্যাদা পায় অনেক বেশী। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ হিসাব-নিকাশটা আমার মনের খাতায় ষোল আনাই খরচ ব'লে ধ'রে রাখি। আসলে যা-কিছু মন দেওয়া-নেওয়া সবই মনে মনে। এ রাজ্য আমার একান্ত নিজস্ব।

হঠাৎ ভারী বুটের আওয়াজে চমকে উঠি। রাস্তা দিয়ে লোক চলে, কিন্তু এত প্রচণ্ড শব্দ বড় একটা শুনিনি। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, প্রায় আমার হাঁটুর কাছে একটি দীর্ঘকায় সৈনিক। সন্ত্রস্ত এবং বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। এখন রাত্রিবেলা, আমি কোনো খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলি না।

লোকটি ইংরেজি ভাষায় বললে—আমি দোকান বন্ধ হওয়ার অপেক্ষাতেই বসেছিলাম। যাক, এখন ত কেউ আসবে না। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

তার কথায় উদ্ধত স্পর্দ্ধার স্পষ্টতায় আমি চমকে উঠি, এ চমকে বিস্ময় ছাড়া আরও কিছু ছিল সেটা প্রতিরোধের প্রস্তুতি। আমি বলি—তোমার ভুল হয়েছে। আমি সে-জাতের মেয়ে নই, আমার সঙ্গে কোন গোপন কারবার চলতে পারে না।

হঠাৎ আমার পিঠ চাপড়ে সে বললে—না, না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। কেউ টেরও পাবে না।

তার এই সব কথা এবং আচরণে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। আমার বিস্ময় এবার সীমার উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে তার দীর্ঘ বিশাল আকৃতি কয়েক বার লক্ষ্য করি। তার পাশে আমি যেন বড্ড ছোট হয়ে গেছি। সে যে এ ভাবে আমার পিঠ চাপড়ে কথা বলছে, সেটা কিছুমাত্র বেমানান নয়।

তবু গম্ভীর ভাবে জবাব দিই—মোটেই ঘাবড়াইনি। তবে আমি আশা করি, তুমি আর এক মুহূর্ত্তও দেরি না ক'রে আমার সামনে থেকে সরে যাবে।

হো-হো ক'রে হেসে উঠল লোকটি। এক-মুখ দাড়ী তার—কিন্তু হাসলে বেশ বোঝা যায় রীতিমত হাসছে। তার হাসিতে মনে হ'ল ঘরখানা ভরে গেছে।

আমার কণ্ঠস্বরে অবিচল পরুষতা, আমি বলি—তুমি যাবে কি না শুনতে চাই।

—যাবো বই কি, তবে তোমায় নিয়ে যাবো। তা পোশাক যদি না বদ্‌লাও ত এখুনি যাওয়া যেতে পারে।

—তোমার স্পর্দ্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। লোক-জন জড়ো করব, দেখবে?

সে যেন অধীর হয়ে ওঠে। বলে—ঢের হয়েছে। আর নয়। রাত সাড়ে ন'টায় তোমায় হাজির করতে হবে কর্ণেল নেহায়ার কাছে। কত নেবে—একশ'?

আমি সরোষে চটিসুদ্ধ একটা পা ছুঁড়ে মারলাম লাথি। উঃ, কী ভীষণ শক্ত, লোহার চেয়েও যেন বেশী শক্ত ওর গা। রাগে আমার হাত-পা কাঁপছে, কণ্ঠস্বর কেঁপে যাচ্ছে—বেরোও, দূর হও, শয়তান, বেয়াদপ!

তার পর আমার আর জ্ঞান ছিল না যেন কতক্ষণ। শুধু এইটুকু মনে আছে, ওই বিরাট দেহধারী দৈত্যের মত সৈনিকটি আমাকে জাপ্টে ধ'রে একটা ঝাকানী দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের শিরা-ধমনী সমস্ত কেমন শিথিল হয়ে গেল।…তার পর যখন চেতনা ফিরল, তখন মনে হ'ল একটা চলন্ত গাড়ীতে আমি শুয়ে আছি। চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম, আমার মাথার শিয়রে সেই দানব সদৃশ সৈনিকটি বসে বসে চুরুট টানছে। আমাকে তাকাতে দেখে একটু হাসল। তার সে হাসি দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। কিন্তু কেমন একটা ভয়ও হচ্ছে। সত্যি, মানুষকে আমি এত ভয় কখনও করেছি ব'লে মনে পড়ে না।

তবু মরীয়া হয়ে বলি—এতে তোমার কি লাভ হ'ল? এ ভাবে একটি নিরপরাধ মেয়ের ওপর অত্যাচার কেন করছ বলতে পারো?

সে হেসে জবাব দেয়—তুমি ত সহজ কথায় এলে না!

—করব না? আমার মাইনে বাড়াতে হবে, তোমায় নিয়ে যাওয়ার ওপর আমার পদোন্নতি নির্ভর করছে। বেশ ত, তুমি না হয় পাঁচশ' টাকা নিও এক রাত্রের জন্য।

—তোমার টাকায় আমি আগুন ধরিয়ে দিই। সতীত্বের মূল্য টাকা দিয়ে দেওয়া যায়? তোমার মা-বোন নেই? তাদের যদি কেউ এমন ক'রে নিয়ে যায়, আর তোমায় তার বদলে টাকা দেয়, সহ্য করতে পারবে তা?

সতীত্ব! সতীত্বের কেউ মূল্য দেয় না, দেয় দেহের সৌন্দর্য্যের মূল্য, দেয় আত্মপ্রসাদের বকশীস্। কিন্তু এর মধ্যে মা-বোনের কথা তুলো না। ও-ভাবে আমার মধ্যে সদ্‌বুদ্ধি জাগাবার চেষ্টা করলেও পারবে না, পোড়-খাওয়া ছেলে আমরা। তা ছাড়া যার কাছে নিয়ে যাচ্ছি তোমায় তিনি রসিক লোক, চাই কি একটু তদ্বির করলে রাজরাণীর মত গুছিয়ে নিতে পারবে!···একটু মদ খাবে? দেখ, মদ খেলে হয়ত মেজাজ শরীফ হবে।

—দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও, নইলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ব।

গাড়ি চলেছে পাহাড়ের কোণ ঘেঁষে। ওপর দিকে উঠছে—তিন্‌টে গীয়ার ছেড়ে দিয়ে, প্রবল গর্জ্জনে বাতাসের স্তরে উত্তাল তরঙ্গ তুলে। অন্ধকারে পাইনের ঝোপগুলির আবছায়া দৈত্যের মত রহস্য সৃষ্টি ক'রেছে। আমার জীবনেও বুঝি ওই রকম একটা অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ অন্ধকার ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার বুক ঠেলে কঠিন কি একটা জিনিস ওপরের দিকে ঠেলে উঠতে চায়। মনে হয়, আমার কান্নায় ওই অন্ধকার, ওই বনস্পতি, এই পাহাড়, ওই দৈত্যের মত মানুষটি সব কিছু প্লাবিত হয়ে যাবে। পরক্ষণে নিজের অজ্ঞাতেই আমি ফুলে-ফুলে কাঁদ্‌ছি—দেখে আমিও আশ্চর্য্য হয়ে যাই। এ কি কান্না! অন্ধ আবেগে আমার সারা দেহ থর-থর ক'রে কাঁপছে। চোখের জলে আমার গণ্ডদেশ, বুকের কাপড় ভিজে ওঠে। এ কান্নার বেগ আমার নয়—কিছুতেই পারি না একে রোধ করতে।

লোকটা আমার দিকে মিনতি-মাখা দৃষ্টিতে তাকায়—তুমি কাঁদছ? কেন? চুপ কর।

আমি অসহায় ভাবে চোখের জল মুছি, কিন্তু পরক্ষণে বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত বুকের ওপর অশ্রুপুঞ্জ এসে পড়ে, দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়! কিছু দেখতে পাই না।

অকস্মাৎ কার একটা অত্যন্ত নিবিড় স্পর্শ অনুভব করি। হঠাৎ মনে হয়, যেন কোন্ অন্তরঙ্গ আত্মীয় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে চরম দুর্দ্দশার হাত থেকে ত্রাণ করবার জন্য। সে স্পর্শ যেমন অন্তরঙ্গ তেমনি নিবিড়। আমার কান্নার বেগ তাতে আরও যেন বেড়ে যায়!···কিন্তু আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিই। চোখ মেলে চেয়ে দেখি, সেই দাড়িওয়ালা কঠিন মুখখানা অপূর্ব্ব মমতায় পূর্ণ হয়েছে।

আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সে বললে—তোমার কোন ভয় নেই, চলো, তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে আসি। তার পর সম্ভবত ড্রাইভারকে উদ্দেশ ক'রে বললে—নওনেহাল সিং, গাড়ি ফেরাও। খুব ফূর্ত্তি চালাও।

—কিন্তু তাই ব'লে তুমি জোর করবে?

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। তখনও তার বুকের মধ্যে আমার দেহের অর্দ্ধাংশ তেমনি কোমল ভাবেই আবদ্ধ।

সে আমায় বললে—অবিশ্যি কর্ণেল নেহাল আর একটি মেয়ের কথা বলেছিলেন আমায়। কিন্তু সুন্দরী, এক দিন চা খেতে এসে তোমায় দেখে আমার ভারি মনে ধরেছিল। তাই আজ ইচ্ছে ছিল, নেহারার মাথা খারাপ ক'রে দেবো তোমায় দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সুপারিশ!···থাক্ গে, মেয়েছেলেকে কাঁদিয়ে কি হবে। যাক! আচ্ছা যাও, অন্য একটা মেয়ে নিয়ে যাচ্ছি না হয়। মেয়েদের কান্না অসহ্য!

লোকটি আমায় নামিয়ে দিল দোকানের সামনে।

আশ্চর্য্য, এরই মধ্যে কিন্তু লোকটিকে আমার ভারি ভালো লেগেছে। সত্যি আমি আশাই করতে পারিনি যে, ও আমায় এ-ভাবে সসম্মানে ছেড়ে দিয়ে যাবে।

ও যখন চলে যায়, আমি বললাম—আসবেন, আমার দোকানে চা খাবার নেমন্তন্ন রইল। আর আপনার ঠিকানা দিয়ে যান।

লোকটি বললে—আসব'খন। ঠিকানা দেবার সময় নেই। এই নাও আমার কার্ড। পরমুহূর্ত্তে গাড়িখানা গর্জ্জন করতে করতে ধোঁয়ার আড়ালে মিলিয়ে গেল।

তার পর দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী। সারা রাত কি একটা ভয় আমার মনের চারি পাশে ঘিরে থাকে। কেবলই মনে হয়, আমায় এখনই বুঝি কে নিয়ে চলে যাবে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হয়। আবার পরক্ষণে মনে হয়, তেমন বিপদে পড়লে সেই দীর্ঘকায় দাড়ী-ওয়ালা সৈনিকটি আমায় রক্ষা করবে। নিশ্চয়ই করবে!···আশ্চর্য্য, ওর ওপর আমার এত ভরসা কি ক'রে এলো?

যখনই চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে, ঘুম নামে শ্রান্ত হৃদয়ে, তখনই একটা তীব্র বেদনায় জেগে উঠি। হাত-পা, পিঠের পাঁজরা সর্ব্বত্র কি এক অসহ্য যন্ত্রণা! মনে হয়, যদি সারা দেহ আমার শক্ত দড়ি দিয়ে কেউ বেঁধে দেয় তাহলে বুঝি যন্ত্রণা কিছু কমে। বালিশের ওপর সজোরে বুকটা চেপে ধরি, আরও জোরে যদি পারতাম—!

বুঝতে পারি না আমার এ কী হ'ল! মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠছে—ঝাঁ-ঝাঁ করছে!···থেকে থেকে ওই দীর্ঘকায় সৈনিকটি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেন বিদ্রূপের হাসি হেসে চলে যায়।

সাতাশ বছর বয়স আমার। কিন্তু এমন তীব্র বোবা অসহ্য যন্ত্রণা ত কখনও অনুভব করিনি। বুঝি বা অকস্মাৎ বিপদের মুখে পড়েছিলাম সেই ভয়ের জের এখনও মেটেনি তাই—। সত্যি যদি ওই কর্ণেল নেহারার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করত—তার পর? তার পর যা হ'ত তা ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলে অনুমান করতে পারি। লুব্ধ কুকুর যেমন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ক'রেই কোন্ লম্পট আমাকে দলিত-মথিত-নিষ্পেষিত ক'রে ঘৃণ্য লালসার চরিতার্থতায় অবসন্ন হয়ে পড়ত!···না, না, না! সে দৃশ্যের কল্পনাও অসহ্য!

দীর্ঘ রাত্রি, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়ে। জেগে উঠল দিনের অরুণালোক। আমার শ্রান্ত অবসন্ন মন কিন্তু কি-এক অতৃপ্তিতে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে অতৃপ্তি, সে ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী। এর আগে ত এমন ক'রে চায়নি আমার মন একটা কিছুকে আঁকড়ে

ধরতে। সম্পূর্ণ অভিনব এ অনুভূতির বেদনা। মনে হয়, একটা কঠিন ঝাঁকানী দিয়ে কেউ নিস্তেজ করুক আমায়।

প্রতিদিনের মত সকালে সকল কাজই করি। তারই ফাঁকে ফাঁকে যেন আশা করি, কেউ আসবে আমার দোকানে। সেই বিশেষ ব্যক্তিটির আশা-পথ চেয়ে আমার বেলা বয়ে যায়। তার সে দয়া আমি ভুলতে পারব না। আহা, তার কঠিন অবয়বের অন্তরালে যে মাধুর্য্যের শতদল আত্মগোপন ক'রে আছে তা আমায় মুগ্ধ করেছে।

এত দিনের নিরুদ্ধ অবচেতন যৌবন-বেদনাকে যে জাগিয়ে দিয়ে গেল সে আর ফিরবে না? তার জন্য আমার সমস্ত সত্তা কাঁদছে। আসবে না? এক দিনও সে আমার এই পণ্যশালায় অতিথি হবে না? সে দিনের সেই দানের প্রতিদানে কিছুই দেবার সুযোগ পাবো না? শুধুই জ্বালা বইতে হবে?

আমার চায়ের দোকানে আর বেসাতীর আসবাব থাকে না, আনতেও মন যায় না। কিন্তু তবু দোকান খুলে বসে থাকি। যদি সে আসে, এসে ফিরে যায়!

জানি সে আসবে না। তার ঠিকানায় খোঁজ নিয়েছি। কবে কোন্ দিন তাদের সেনা দল চলে গেছে কোথায়! কিন্তু—

সেদিনের সেই কোমল স্নেহময় স্পর্শ জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার দেহের সমস্ত কামনা-দীপ, সে অনির্ব্বাণ দীপশিখা আজও তেমনি অম্লান, সমুজ্জ্বল। আমার সে আগুনে কত তরুণের সর্ব্বনাশ হয়েছে। বার বার মনে হয়েছে, বুঝি কোনো নবীন যুবকের স্পর্শে, তার পেষণে আমার এ যন্ত্রণার উপশম হবে—ছুটে গিয়েছি, তাদের কাউকে নিয়ে পাহাড়ের ঘন অরণ্যে, যেখানে দিনের আলো প্রবেশ করে না, যেখানে ঝরণার ঝর-ঝর শব্দ মুখর ক'রে রেখেছে বনভূমি, যেখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি, সেই গহন অরণ্যে ছুটিয়ে নিয়ে গেছি কত স্বপ্ন-রঙীন তরুণ যুবককে! কিন্তু যে তৃপ্তি পেয়েছি সেটা ক্ষণিকের, সে তৃপ্তি নয়—তাতে ক্ষুধার আগুন বেড়েছে শত গুণ।···আবার আর এক জনকে চোখের ইসারায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ওরা সব পতঙ্গ। ধেয়ে চলে আসে। আর আমি? আমি ওদের যে কোনো এক জনকে বারেকের চেয়ে বেশী সহ্য করতে পারি না। এক চুমুকে যেন ওদের রসের উৎস শেষ ক'রে নিয়ে ফেলে দিতে চাই রিক্ততার আবর্জ্জনাকে।···শিলং শহর জ্বলেছে। আমি পাগল হয়ে উঠেছি।···কিন্তু এর শেষ কোথায়? বুঝি বা এর শেষ নেই। এক এক সময়ে আতঙ্কে আমার বুক কেঁপে ওঠে। এত সর্ব্বনাশ করছি—এর কোনো বিচার নেই! এর দণ্ড কি ভীষণ হবে? হোক, তাই হোক—আমার হাতে গড়া এ সর্ব্বনাশের বোঝা আমারই মাথায় ভেঙে পড়ুক, অবসান ক'রে দিক আমার এ অসহ্য যন্ত্রণার।···কেন, কেন জাগিয়েছিল সেই সিংহের মত পুরুষ আমার এবং সর্ব্বনাশী রাক্ষসী নারীত্বকে। কেন সে সেদিন আমায় ফিরিয়ে দিয়ে গেল! কেন সে আমার সর্ব্বস্ব নিংড়ে নিয়ে পাহাড়ের গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে-চুরে দিয়ে গেল না! সে আমায় দয়া করল কেন? সর্ব্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়ে সে যে আমায় বৃহত্তর সর্ব্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সেই বিরাটকায় বলিষ্ঠ সৈনিক—যাকে পদাঘাত করতে গিয়ে আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে, তার মাধুর্য্যময় স্নেহ-স্পর্শে এত বিষ ছিল? যে বিষে শত শত তরুণকে ঝলসে দিয়েও নিস্তেজ হয় না।

যখন একা থাকি তখন ভয় করে। তখন মনে হয়, যদি কোনো বিপদে পড়ি?···তখন সেই দীর্ঘকায় সৈনিকটি আর দূরে থাকতে পারবে না, নিশ্চয় আসবে। সে আসবে। আমার নিমন্ত্রণ সে রাখবে না!···এসো, এসো, সুরে আমার সমস্ত সত্তা তাকে প্রতিনিয়তই ডাকছে। সে আসুক, আমায় অসতের হাত থেকে রক্ষা করুক।

যুদ্ধ থেমে গেছে। ইংরেজের জয় হয়েছে। শহরের শান্ত স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ ফিরেছে। কিন্তু আমার মনের যুদ্ধ এখনও থামেনি—আমি অবসন্ন, ক্লান্ত, বিপর্য্যস্ত, তবু—সারা দেহে আমার বিবিধ রোগের ছাপ আর গোপন করা যায় না। চাই-ও না—ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত আমার দেহ-মন। এই ত ভালো।

দোকান খুলি সকালে—চা, বিস্কুট, মাখন থাকে। খরিদ্দারও আসে। কিন্তু এক এক সময়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। দশটা বাজে, হাসপাতালে যেতে হবে একবার! সত্যি ইংরেজের দয়ার অবধি নেই। অত্যাচার ক'রে আমি অসুখ বাধিয়েছি, আর ওরা কি না বিনা-পয়সায় তার চিকিৎসা করবে!···

সেদিন দুপুরে প্রতীক্ষা করছি একটি শিকারের জন্য। আজকাল এইটাই মোটা রোজগার। দিন-কাল বড়ই খারাপ পড়েছে, দোকানের আয় দিয়ে আর চলে না। খাওয়া-পরা ছাড়া ওষুধ-পত্রও ত আছে!···চেহারা খারাপ হয়েছে, কিন্তু খুব খারাপ হয়েছে কি? এক একবার আয়নার সামনে দেখে নিই।···তা ছাড়া ব্যাপারটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরুষদের আমি ঘৃণা করি। তারা বড় নিষ্ঠুর, তাদের বুঝি অনুভূতি নেই!···নইলে সে আজও এলো না। আসবে বলেছিল কেন তবে?

···আজ যদি সে আসে? চিনতে পারবে কি আমায়?

যদি এসে চিনতে না পেরে আমাকেই প্রশ্ন করে—হ্যাঁ গো, এখানে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী ছিল, সে কোথায় গেছে জানো?

আমি বলব—সে মরে গিয়েছে।

তখন হয়ত আক্ষেপ ক'রে বলবে—আহা, কত দিন হ'ল মারা গেছে? বড় ভালো মেয়ে ছিল। সে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল—!

···মনে পড়বে সেই অন্ধকার রাত্রির কথা!

···সত্যি সে আমায় চিনতে পারবে না? চেহারা এতই খারাপ হয়ে গেছে? হবে না, শরীর ত অক্ষয় ধাতু দিয়ে গড়া নয়। প্রতি-দিন যদি উন্মত্ততার পঙ্ক-কুণ্ডে ডুবে থাকি ত শরীরের কি অপরাধ!···কিন্তু সে এসে আমায় চিনতে পারবে না?···সঙ্গে সঙ্গে তার কোমল আর্দ্র চোখের দৃষ্টি, তার পাষাণের মত বলিষ্ঠ বাহুর নিবিড় অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনের স্পর্শে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বুঝি সে এসেছে।

সহসা কার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠি। চিন্তার স্বপ্নপুরী ভেঙে পড়ে বাস্তবের ধাক্কায়। একটি পাহাড়ী ছোকরা। বয়স বেশী নয় ওর। কি রকম কুকুরের মত ওর চাহনি। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি।

সে বোকার মত দাঁত বার ক'রে হেসে বলে—আমি এসেছি।

—কেন? কি চাই?

সে অবাক হয়ে বলে—বাঃ, তুমি বেশ তামাসা জানো তো?

ওকে আমার ঘৃণারও অযোগ্য বলে মনে হয়। শুধু বলি—আজ শরীরটা খারাপ, আজ তুমি যাও। আর এসো না তোমরা, আমার ও-সব ভালো লাগে না।

চতুর্থ অঙ্ক

অনুপ গুপ্ত

(অধ্যাপক ধীরেন সরকারের ফ্ল্যাট। প্রতিমা একলা বসে একখানা বই পড়ছেন। দেখা গেল, পড়াতে মন বসছে না। বই বন্ধ ক'রে আপন মনে গান করতে লাগলেন)

প্রতিমা।

গান

বরষা নেমেছে মোর নয়নে।
বেদনার মেঘ আজিকে আমার
ঘিরিল রে মন-গগনে।
যক্ষ বিধুরা কাঁদে প্রিয়র তরে,
জলদে শুধায় ডেকে কাতর স্বরে,
বল ওগো বল মেঘদূত,
সে কি মোরে রেখেছে মনে ?
তোমার নয়নে জল কেন মেঘ,
আমার বঁধুয়া আছে তো ভালো ?
সে কি মোর তরে ফেলে আঁখি জল,
এখনও কি মোরে বাসে সে ভালো ?
নিশিদিন আঁখি ঝরে তাহারে স্মরি,
ভয় জাগে বুঝি মোরে গেছে পাসরি,
বল তার বল বারতা গো,
ঢালো অমৃত শ্রবণে।

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী। প্রতিমা, তোমার শরীর খারাপ। পাশের ঘরে খাবার দিতে বলেছি। মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।

প্রতিমা। খেতে আমার ইচ্ছা নেই।

তপতী। তা না থাকুক, তবু খেতে হবে। অসুস্থ শরীরে উপোস করা চলবে না। কুসুম—

(কুসুমের প্রবেশ)

কুসুম। কি দিদিমণি ?

তপতী। এঁকে চান করবার ঘর দেখিয়ে দাও।

কুসুম। (প্রতিমার প্রতি) আসুন—

[কুসুম ও প্রতিমার প্রস্থান।

(তপতী গীতার পাতা উল্টোচ্ছেন, এমন সময় ধীরেনের প্রবেশ)

তপতী। দাদা, কখন এলে ?

ধীরেন। এই একটু আগে, প্রতিমা এ ঘরে ছিল বলে আসতে পারিনি। তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তপতী। কাদের সঙ্গে ?

ধীরেন। স্যর হরপ্রসাদ আর রজনী বাবুর জেঠতুত ভাই নিশিকান্তর সঙ্গে।

তপতী। কোথায় ?

ধীরেন। হোটেলের সামনের বাগানে তাঁরা বেড়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে স্যর হরপ্রসাদ ডাকলেন। খোঁজ নিয়ে জানলুম যে, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে রজনী বাবু ফিরে গেছেন।

তপতী। বাড়ী গিয়ে দেখবেন সেখানে প্রতিমা নেই।

ধীরেন। আমি তাঁদের বলে এলুম যে প্রতিমা দেবী আপনাদের জীবন থেকে সরে গেছেন।

তপতী। কোথায় গেছেন কেউ প্রশ্ন করলেন না ?

ধীরেন। না, তবে আমার মনে হয়, স্যর হরপ্রসাদ বুঝতে পেরেছেন সে আমাদের কাছে আছে।

তপতী। তিনি আর কিছু বললেন না ?

ধীরেন। বললেন এ কথা রজনীকে জানাবার কোনও প্রয়োজন নেই।

তপতী। তুমি কি বললে ?

ধীরেন। বললুম, প্রার্থনা করি, ভবিষ্যতে যেন আপনাদের কারুর সঙ্গেই দেখা করবার প্রয়োজন না হয়।

তপতী। বেশ বলেছ।

(কুসুমের প্রবেশ)

কুসুম। আপনাদের সঙ্গে এই ভদ্রলোক একবার দেখা করতে চান।

(কার্ড দিল)

ধীরেন। (কার্ড দেখে) স্যর হরপ্রসাদ—

তপতী। স্যর হরপ্রসাদ!

ধীরেন। হ্যাঁ। (কুসুমের প্রতি) আচ্ছা, তাঁকে এইখানেই পাঠিয়ে দাও।

(কুসুম প্রস্থানোদ্যতা)

তপতী। কুসুম, প্রতিমা কোথায় ? (কুসুম ফিরে দাঁড়াল)

কুসুম। স্নান-ঘরে।

তপতী। আচ্ছা। স্যর হরপ্রসাদকে এই ঘরে পাঠিয়ে তুমি প্রতিমার খাওয়া দেখবে। তার পর তাকে শুতে যেতে বলবে। আমি না ডাকলে যেন সে এ ঘরে না আসে, বুঝলে ?

কুসুম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[কুসুমের প্রস্থান।

তপতী। তিনি আবার এখন কি করতে এলেন ?

ধীরেন। কিছুই বুঝতে পারছি না।

(হরপ্রসাদের প্রবেশ)

হরপ্রসাদ। আপনাদের অসময়ে বিরক্ত করলুম।

ধীরেন। না, না, বিরক্ত কিসের ? বসুন।

হরপ্রসাদ। (বসে) আর বলেন কেন মশায়, একে অসুস্থ শরীর তায় এই সব গণ্ডগোল, মানে বুঝলেন কি না —

ধীরেন। আজ্ঞে না, কিছুই বুঝলুম না।

হরপ্রসাদ। সবই আপনার কাণ্ড। মেয়েটিকে সরিয়েছেন, রজনী বাড়ী গিয়ে দেখে সে নেই, ফিরে এসে সে কি সিন! আমার পায়ে ব্যথা, কোথায় রাত্রে শুয়ে গরম জলের বোতলে সেঁক দোব, তা না এই ঠাণ্ডায় ছুটোছুটি।

ধীরেন। এ রকম যে হবে তা ত' আপনি জানতেন।

হরপ্রসাদ। তা জানতুম, তবে এতটা যে হবে তা আশা করিনি, সে যখন বাড়ী ফিরে দেখলে পাখী উড়েছে, তখন ফিরে এসে আমাদের কি যাচ্ছেতাই গালমন্দ। জোচ্চুরী, ষড়যন্ত্র আরও কত কি।

ধীরেন। আপনি কি বলতে চান, তিনি অন্যায় কিছু বলেছেন?

হরপ্রসাদ। না না, তা বলছি না, তবে অত উগ্র না হলেও চলত। কোথায় মালবী নিশিকান্ত মনে করছে যে, এইবার রজনীকে ঠিক চেপে ধরা গেছে তা নয় একবারে পাঁকাল মাছের মত বেরিয়ে গেল। আর সে কি মূর্ত্তি! যেন একেবারে উন্মাদ, মানে—বুঝতে পারছেন ত' লোকটা কি রকম।

তপতী। যে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না—

হরপ্রসাদ। ঠিক বলেছেন।

তপতী। নারী পুরুষকে ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে এটা পুরুষরা ঠিক সহ্য করতে পারে না। তাদের আত্মসম্মানে ঘা দেয়।

হরপ্রসাদ। পুরুষ নারীকে ত্যাগ ক'রে গেলে পরিত্যক্তা নারীর প্রতি সকলের করুণা জাগে, কিন্তু নারী পুরুষকে ত্যাগ ক'রে গেলে পরিত্যক্ত পুরুষকে দেখে করুণা জাগে না, হাসি পায়। বিশেষ ক'রে সেই পুরুষ যদি পাগলের মত প্রলাপ বকতে আরম্ভ করে তা হ'লে তো সোণায় সোহাগা। হেসে হেসে লোকের পেটে খিল ধরবার উপক্রম। বলে কি না, প্রতিমাকে ছেড়ে বাঁচবে না—বাঁচতে চায় না। মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি কিছু চায় না, চায় শুধু প্রতিমাকে। আমাদের সব চুলো নামক স্থানে প্রেরণ ক'রে সে প্রতিমাকে ফিরে পেতে চায়। এতে আর আমরা কি বলব বলুন?

ধীরেন। আপনি কি আমাদের কাছে পরাজয়ের গ্লানি দূর ক'রে সান্ত্বনা লাভ করতে এসেছেন?

হরপ্রসাদ। আজ্ঞে না। অতটা বুদ্ধিভ্রংশ এখনও হয়নি। আমি শুধু আপনাকে এই অনুরোধ করতে এসেছি যে মালবী যদি এখানে এসে প্রতিমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আপনি তাতে আপত্তি করবেন না।

ধীরেন। সাক্ষাতের কারণ?

হরপ্রসাদ। সে একবার প্রতিমাকে নিজ মুখে প্রার্থনা জানাতে চায়—

তপতী। আমি অবাক্ হচ্ছি, তিনি কি প্রকৃতির রমণী—এই কথা ভেবে।

হরপ্রসাদ। পাঁকে নিজের সোণার বালা পড়ে গেলে সে তুলে নিতে কুণ্ঠিতা হয় না।

তপতী। কেন? তিনি পাঁককে ভয় করেন না বুঝি?

হরপ্রসাদ। না, কারণ সে জানে পাঁক তার দেহে লাগতে পারে না।

ধীরেন। পরিষ্কার ভাষায় দাঁড়াচ্ছে যে, তিনি এসে মিষ্ট কথায় এই অভাগিনী নারীকে ভুলোতে চান—

হরপ্রসাদ। অভাগিনী কে? প্রতিমা না রজনীর স্ত্রী?

তপতী। স্ত্রীর উপযুক্ত কাজই বটে!

হরপ্রসাদ। যে শাস্ত্রে কুষ্ঠ ব্যাধিযুক্ত স্বামীকে পিঠে করে বেশ্যা-বাড়ী পৌঁছে দেওয়া সতীত্বের আদর্শ, সে শাস্ত্র তো আমাদের চেয়ে আপনারাই বেশী মানেন।

ধীরেন। (অস্থির ভাবে পায়চারী করতে করতে) তিনি কখন দেখা করতে চান?

হরপ্রসাদ। যখন বলেন। এখুনি, এই মুহূর্ত্তে। মালবী আর নিশিকান্ত বাইরে রিক্সায় বসে আছে।

ধীরেন। যদি আমি আপত্তি করি?

হরপ্রসাদ। তা হলে কাল দুপুরে ষ্টেশনে কতকগুলো অপ্রিয় সীনের অভিনয় হবে।

ধীরেন। আপনি নিশ্চয়ই এ সবের মধ্যে—

হরপ্রসাদ। থাকব না। কখনও থাকতে পারি? ওটা দিবানিদ্রার সময়। ও মেয়েদের ব্যাপারে আমি থাকা পছন্দ করি না। আপনাকেও বারণ করছি। তা'ছাড়া আপনি ওদের দেখা করতে দেবেন না কেন? এ যেন ডিটেকটিভ উপন্যাসের নারী চুরি অথবা গুম করার মত শোনাচ্ছে। আমার মনে হয়, ওরা দু'জনে হার্ট টু হার্ট কথা ক'য়ে একটা মিটমাট করে ফেলুক। আমরা যা সমস্ত জীবনে পারব না, ওরা তিন মিনিটে তা ক'রে ফেলবে। আর দেখুন, ব্যাপারটা ওদের—ওরাই বোঝা-পড়া করুক। আমাদের মাঝ থেকে অনধিকার চর্চ্চা করে কি লাভ বলুন?

ধীরেন। তপতী, কুসুমকে ওঁদের ডেকে দিতে বল গে।

[তপতীর প্রস্থান।

হরপ্রসাদ। আপনার বুদ্ধির তারিফ না ক'রে থাকতে পারছি না ধীরেন বাবু।

ধীরেন। ধন্যবাদ। তারিফের বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখছি না। রজনী বাবু কি জানেন যে প্রতিমাকে আপনারা চক্রব্যূহে ঢুকিয়ে মারতে চান? তিনি কি জানেন যে প্রতিমা এইখানে আছেন?

হরপ্রসাদ। নিশিকান্ত বুঝলেন কি না, বোকা হলেও মধ্যে মধ্যে ভারী বুদ্ধিমানের মত কথা বলে ফেলে। সেই বললে, রজনী এখানে এলে এদের কথাবার্ত্তা কইবার অসুবিধা হবে। যে রকম ক্ষেপেছেন দেখতেন যদি। তাই নিশিকান্ত সেই উদ্দাম বন্যার স্রোতটাকে একটু অন্য পথে চালিত ক'রে দিলে।

ধীরেন। মানে আপনারা তাঁকে মিথ্যা কথা বললেন?

হরপ্রসাদ। দেখুন প্রফেসর মজুমদার—

ধীরেন। মাফ করবেন। হয়ত' আমার কথাবার্ত্তা আপনার একটু রূঢ় বলে ঠেকছে, কিন্তু সত্য কথা প্রায়ই অপ্রিয় হয়।

হরপ্রসাদ। আপনার যা বলবার নিশিকান্তকেই বলবেন। তারা যখন এসে গেছে তখন আমার এর মধ্যে থাকবার আর দরকার দেখি না—

ধীরেন। মানে জলটাকে যতখানি সম্ভব ঘুলিয়ে কর্দ্দমাক্ত ক'রে আপনি সরে পড়তে চান।

হরপ্রসাদ। প্রফেসর আপনি, শুধু এক দিক্‌টাই দেখছেন। প্রতিমাকে বাঁচাবার সদিচ্ছাকে আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, কিন্তু রজনীকে রক্ষা করা আরও বেশী প্রয়োজন। সে আমার আত্মীয়—তার দিক্‌টাও তো আমায় দেখতে হবে।

ধীরেন। নিশ্চয়ই দেখবেন। স্যর হরপ্রসাদ, আপনি নিরপেক্ষ ভাবে একবার চিন্তা করে দেখুন। এই নারী অতি সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভালবাসার জন্য নিজের মান, ইজ্জত, এমন কি নারীর মর্য্যাদা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সে প্রস্তুত। আপনারা

সেই সুযোগ নিয়ে তাকে অধঃপতনের পথে ঠেলে দেবেন তা আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। আমি আপনাকেও অনুরোধ করছি, সরে দাঁড়াবেন না। তাকে টেনে তুলতে সাহায্য করুন।

হরপ্রসাদ। তিনি কি সাহায্য চান ?

ধীরেন। নিশ্চয়ই।

হরপ্রসাদ। কত টাকা ?

ধীরেন। বিদ্রূপেরও একটা সময়-অসময় আছে।

(নিশিকান্ত ও মালবীসহ তপতীর প্রবেশ)

হরপ্রসাদ। এঁদের তো আপনিই চিনতেই পারছেন ধীরেন বাবু। (নিশিকান্ত ও মালবীর প্রতি) ইনি তপতী দেবী, আর ইনি ওঁর দাদা অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ধীরেন। আপনারা বসুন। (নিশিকান্ত ও মালবী বসলেন)

নিশিকান্ত। আপনি যদি দয়া করে—

ধীরেন। তপতী, একবার প্রতিমাকে ডেকে দাও তো।

[তপতীর প্রস্থান।

নিশিকান্ত। যে কাজের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারছেন তো একটু ডেলিকেট—

ধীরেন। ডেলিকেসি জয় করবার ক্ষমতা আপনার আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

নিশিকান্ত। ধন্যবাদ। আপনার কথা বলার ভঙ্গীটা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। আপনি দয়া ক'রে একবার চিন্তা ক'রে দেখুন ; এক জন পুরুষকে—যার বিলক্ষণ সংকার্য্য করবার শক্তি আছে, তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা মহৎ কি না ?

ধীরেন। আপনাদের উদ্দেশ্যও সৎ এবং কার্য্যপ্রণালীও মহৎ।

নিশিকান্ত। আপনার শ্লেষের প্রচেষ্টায় আমার বিলক্ষণ আপত্তি আছে—

(তপতী ও তাঁর পশ্চাতে সাধারণ মলিন বেশে প্রতিমার প্রবেশ)

হরপ্রসাদ। (মালবীর প্রতি চাপা গলায়) এই সেই।

মালবী। (চুপি চুপি) এই !

হরপ্রসাদ। (সেই ভাবেই) এ ওর একটা রূপ মাত্র। আরও একটা রূপ আছে।

নিশিকান্ত। (প্রতিমার প্রতি) আমি রজনীর জ্যেঠতুতো ভাই, আর ইনি (মালবীকে দেখিয়ে) তার স্ত্রী।

হরপ্রসাদ। বারান্দা দিয়ে তো কাঞ্চনজঙ্ঘার চমৎকার ভীউ পাওয়া যায় ধীরেন বাবু—

(উত্তরের অপেক্ষা না করেই বারান্দায় চলে গেলেন)

ধীরেন। আপনাদের কথার মধ্যে আমাদের থাকা উচিত হবে না। তপতী এস—

[তপতী ও ধীরেনের প্রস্থান।

মালবী। (প্রতিমার প্রতি) আপনি দয়া করে বসুন।

(পুত্তলিবৎ প্রতিমা একটা চেয়ারে বসলেন)

অবশ্য যে জন্য আমি এসেছি, সে কাজটা ঠিক নারীর উপযুক্ত নয়, বিশেষ করে স্ত্রীর। তবুও—

নিশিকান্ত। তোমার এ কথায় আমি আপত্তি করি। তুমি উচিত কাজই করছ—

মালবী। ঠাকুরপো, তুমি দয়া ক'রে চুপ করো। (প্রতিমার প্রতি) তবুও আমাকে আসতে হলো। জানি না, কাজটা ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে—

নিশিকান্ত। তোমার এই 'কিন্তু' ভাবে আমি আপত্তি করি—

মালবী। দয়া ক'রে তোমার আপত্তিটা একটু বন্ধ করো। (প্রতিমার প্রতি) আমার স্বামী যখন শুনলুম এইখানে আপনার কাছে রয়েছেন তখন অবশ্য জানতুম যে শীঘ্রই উনি ফিরে যাবেন। কারণ, পুরুষেরা এ রকম লুকোচুরি-জীবন বেশী দিন কাটাতে পারে না। তাতে তাদের আত্মাভিমান খর্ব্ব হয়।

নিশিকান্ত। আমার এই কথায় একটু আপত্তি আছে।

মালবী। আঃ, চুপ করো না ঠাকুরপো। (প্রতিমার প্রতি) কিন্তু আমার শাশুড়ী এবং অন্যান্য আত্মীয়রা অত দিন ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে পারলেন না। থাকলে অবশ্য দেখতেন, আমার ভবিষ্যৎ বাণী ঠিকই ফলত। তাই তাঁদের কথায় আমায় আসতে হলো।

নিশিকান্ত। তোমার এই কথাটা বিলক্ষণ আপত্তিজনক।

মালবী। ঠাকুরপো, অনুগ্রহ ক'রে তুমি একটু আমাদের একলা কথা কইতে দাও।

নিশিকান্ত। বেশ, যদিও এতে আমার বিলক্ষণ আপত্তি আছে।

(বারান্দায় গেলেন)

মালবী। আমার আত্মীয়-স্বজনের মত—তাঁকে অবিলম্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, নইলে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে অত্যন্ত ক্ষতি হবে। মিথ্যা কথা দিয়ে বন্ধু-বান্ধব বিশেষ ক'রে শত্রুদের কত দিন ঠেকিয়ে রাখা যায়। তাই আমাকে তাঁরা এখানে পাঠিয়েছেন, আমিও এসেছি।

প্রতিমা। আমাকে কি করতে বলেন ?

মালবী। আপনার তাঁর উপর বিলক্ষণ প্রভাব—

প্রতিমা। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমার প্রভাব ?

মালবী। বাড়ী ফিরে আপনাকে দেখতে না পেয়ে তাঁর যা অবস্থা হয়েছিল তা যদি আপনি দেখতেন, তাহলে আপনার প্রভাব অস্বীকার করতে পারতেন না।

প্রতিমা। সময়ে তিনি আমাকে ভুলে যাবেন।

মালবী। আমরা জোর করে নিয়ে গেলে আপনার কথা চিরকাল মনে রাখবেন। আপনি যদি বলেন—

প্রতিমা। আমার বলবার কিছু নেই।

মালবী। বাড়ীতে তাঁর বৃদ্ধা মাতা।

প্রতিমা। তাঁর জন্য আমি দুঃখিত।

মালবী। আপনিও ত' তাঁকে ভালবাসেন ?

প্রতিমা। এ কথার কি কোনও প্রয়োজন আছে ?

মালবী। আপনি যদি তাঁকে ভালবাসেন তাঁর সর্ব্বনাশ করবেন না, তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেবেন না, আপনি তাঁকে বিবাহ করুন। স্ত্রীর যে কর্ত্তব্য আমি হয়ত পালন করতে পারিনি, আপনি তা নিজের হাতে তুলে নিন। তাঁকে নষ্ট হতে দেবেন না। কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার তাঁকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে উৎসাহিত করুন।

প্রতিমা। তা হয় না।

মালবী। কেন হবে না বলুন? আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনাদের নামে উইল করে দিয়ে আমি এইখান থেকে বিদায় নেব। (প্রতিমা কাঁদতে লাগল) কেঁদো না বোন, যে দুরূহ কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে তা'তে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আমি তাঁকে সুখী করতে পারিনি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যেন তাঁকে সুখী করতে পার।

প্রতিমা। (কাঁদতে কাঁদতে) না, না, আমি তা পারব না, আপনি এত মহৎ, এত উদার, আপনার সর্ব্বনাশ আমি করতে পারব না।

মালবী। এ আমার সর্ব্বনাশ নয়, এই আমার গৌরব। স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ। (বারান্দার কাছে গিয়ে) ঠাকুরপো—

(নিশিকান্তর প্রবেশ)

নিশিকান্ত। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে?

মালবী। হ্যাঁ, বাড়ী গিয়ে মাকে বলো, আমি পারলুম না—পারব না। তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন, আমি এইখান থেকেই বিদায় নেব।

(হন্তদন্ত হয়ে বেগে রজনীর প্রবেশ)

রজনী। প্রতিমা, তুমি এখানে কেন? আমার স্ত্রীই বা এখানে কেন?

প্রতিমা। আপনার স্ত্রী এসেছিলেন—

রজনী। ষড়যন্ত্র! সকলেই আমার বিরুদ্ধে। এমন কি তুমিও? যদি ত্যাগই ক'রে আসবে, তবে এত দিন আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলে কেন? তোমাকে নিয়ে ভেবেছিলুম দূরে—লোকচক্ষুর অন্তরালে নতুন নীড় গড়ব—

প্রতিমা। তা আর এখন হয় না রজনী বাবু, আমি আশ্রয় পেয়েছি।

রজনী। মানে? তুমি কি আমায় ছেড়ে চলে যাবে?

প্রতিমা। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। আমার ভুল আজ আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার স্ত্রীর আমি যে ক্ষতি করেছি তা এখনও পূরণ করা চলে, পরে আর সময় থাকবে না। আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঘরে ফিরে যান।

রজনী। স্ত্রীর সঙ্গে? কি বলছ তুমি?

প্রতিমা। ঠিকই বলছি। তিনি যে কত উদার—কত মহৎ, তা আপনি এখনও বুঝতে পারেননি, কিন্তু আমি বুঝেছি। নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে আনবেন না রজনী বাবু।

রজনী। কিন্তু তোমার?

প্রতিমা। আমার কথা ভাবতে হবে না, আমি আশ্রয় পেয়েছি। একটা কাজও পেয়েছি।

রজনী। কি কাজ?

প্রতিমা। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব ভগবানের চরণে। একাগ্র চিত্তে সারা জীবন ধরে। তাতেও কি তাঁর ক্ষমা পাব না?

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী। পাবে বোন, তিনি যে দয়ার সাগর।

প্রতিমা। (মালবীর প্রতি) যাও বোন, তোমার স্বামীকে নিয়ে যাও। তাঁর চরণে প্রার্থনা করব, তিনি যেন তোমাদের সুখী করেন। যদি কখনও এ অভাগিনীর কথা মনে পড়ে তো দু' ফোঁটা চোখের জল ফেল। রজনী বাবু, যান, আর দেরী করবেন না। স্বর্গের পারিজাতকে চিনতে না পেরে আপনি যে কাঁটাকে আদরে তুলে নিতে গিছলেন, সে ভুল আর যেন জীবনে না হয়।

[নিশিকান্ত, রজনী ও মালবীর প্রস্থান।

তপতী। প্রতিমা, আজ তুমি যে মহত্বের পরিচয় দিয়েছ ভগবান তাঁর আশীষ দিয়ে তোমার জীবনকে ধন্য ক'রে দেবে।

(প্রতিমা উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদতে লাগলেন।
বারান্দা থেকে হরপ্রসাদের প্রবেশ)

হরপ্রসাদ। তারা গেছে। যাক্, বাঁচা গেছে।

তপতী। (কঠোর ভাবে) আপনি কি তা জানতেন না?

হরপ্রসাদ। জানতুম। কিন্তু কি জানি, যদি আবার আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে। জানেন তো, প্রলোভন জিনিষটা গিয়েও যায় না।

তপতী। আপনার কাজ তো শেষ হয়েছে—

হরপ্রসাদ। এবার আমিও যেতে পারি, কেমন? তা যাচ্ছি, কিন্তু এখনও একটা কাজ বাকী আছে।

তপতী। আবার কারুর কোন ক্ষতি—

হরপ্রসাদ। (হেসে) ক্ষতি! তা বলতে পারেন। ক্ষতি একটু আপনাদের করব। লোকে কথায় বলে "স্বভাব না যায় মলে।" (প্রতিমার কাছে গিয়ে) প্রতিমা—

(প্রতিমা কথা কইতে পারলেন না। শুধু মুখ তুলে চাইলেন)

হরপ্রসাদ। প্রতিমা, তুমি জান আমার ছেলে-পিলে কেউ নেই। স্ত্রীও মারা গেছেন। আমি দূরে তোমাকে নিয়ে চলে যাব। সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করব। তুমি সেখানে গিয়ে আমার কাছে আমার মা হয়ে থাকবে। জীবনে অনেক পাপ করেছি। এইবার শেষ বয়সে তুমি আর তোমার এই বুড়ো ছেলে তাঁর চরণে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করব। যাবে মা—

প্রতিমা। যাব বাবা—

[প্রতিমা ও হরপ্রসাদের প্রস্থান।

(তপতী একলা দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে জল)

(ধীরে ধীরে যবনিকা পতন)

৭

অতি দূর একটা পল্লীগ্রাম—আধুনিক সমস্ত সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন—যেখানে একটা স্থায়ী পাঠশালা পর্য্যন্ত নেই—সেইখানে বিপ্রপদর বাস। সামান্য একটা গৃহস্থ মাত্র তিনি। কিন্তু একটু পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় তাঁর গৃহ একটা বিরাট শিক্ষা-মন্দির। এখানে শয্যা ত্যাগ থেকে রাত্রে আবার শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত ধর্ম্ম-নীতি-শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ঘুম ভাঙতেই কচি হাত দু'খানা কপালে ঠেকিয়ে সেবা বলে: দুগ্‌গাঃ দুগ্‌গাঃ! অমরেশ যায় ফুল তুলতে। ছোটবৌ গোবর-ছড়া দেয়। মেজবৌ মেয়েদের নিয়ে এত বড় ঘরখানা লেপে-পুঁছে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করে। প্রভাতী ভোজের আয়োজনে যান বৌদের মধ্যে বড় যিনি—স্বয়ং কমলকামিনী। এদের ক্লান্তি নেই, না আছে গ্লানি—এরা ভাবতেও শেখেনি যে এদের জীবন মাটি হলো এ সব বাজে কাজ ক'রে। অতি-বড় পরিশ্রমের কাজও এরা হাসিমুখে ক'রে আসে—একটা প্রাচীন সংহতি দেখা যায় প্রতি পদক্ষেপে। কোনও ইস্কুল-কালেজে এরা পড়েনি, প্রগতির সংগে পা মিলিয়ে চলতে সুযোগ এদের কেউ দেয়নি—তাই হয়ত ক্ষুদ্র গৃহকোণেই এরা পূর্ণ এবং সুখ যদি আপন আপন মনের মাধুরী হয় তবে এরা সুখী।...এতটুকু অশুভ অশুচি করতে এরা ভয় পায়, পদে পদে ধর্ম্মের বাঁধন, সামাজিক শ্লোক-শাসন এদের কলুষ গ্লানি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মা-মাসী-দাদা-দিদিদের মুখে এরা যা শোনে তাই ধ্রুব বলে মেনে নেয় এবং সে পথ ধরে চলতে চলতেই তারা এ জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কত দিনের পৌরাণিক সভ্যতা যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত এদের মধ্যে আজও বেঁচে আছে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়!

চঞ্চলা এসে বিপ্রপদকে বলে, 'মা'র কথা দিদিরা শোনে না, তুমি একটু বলে দাও বাবা। ও কি, হাতের কাজ রেখে উঠে এসে একটু বলে দাও—মা কিছু বললে ওরা হাসে।'

'কি ব'লে দেবো পাগলী, কি?'

'আমি মাঘ-মণ্ডলের ব্রত করব, ওরা একটু দেখিয়ে দেবে।'

'সাধে কি হাসে তোর দিদিরা—এখন যে মাঘ মাস উতরে গেছে মা।'

'তা হলে এটা ফাল্গুন মাস। এখন কোন ব্রত নেই বাবা?'

'আছে বই কি! তোর কাকীমা এসব জানে ভাল—তোর মাকে না বলে তাকে ধর গে শক্ত ক'রে।'

চঞ্চলা ছুটতে ছুটতে কাকীমার সন্ধানে যায়—চুলগুলোও তার যায় দুলতে দুলতে।

'কি রে, অমন ক'রে যে ছুটে এলি?'

'আমি এ মাসে একটা ব্রত করব, বলে দাও কি ব্রত?'

'এটা কি মাস? ফাল্গুন—গুন্‌-ফাগুনের ব্রত করতে পারিস্‌।'

'তা হলে এক্ষুণি দেখিয়ে দাও, বলে দাও কি করতে হবে?'

মেজবৌকে সে একেবারে ঘাট থেকে টেনেই তুলত যদি না সে ওকে আশ্বাস দিয়ে শান্ত করত। 'কাল খুব ভোরে উঠে আসিস্‌, আমি দেখিয়ে দেব। সকাল সকাল উঠতে পারবি তো?'

'হুঁ, খুব পারব।'

'মেজবৌ একটু তাড়াতাড়ি এদিকে এসো, আজ অনেক কাজ আছে, ও পাগলীর সাথে আবার কি বকবক্‌ করছ?'

'আসি দিদি, এই তো আমার ঘাটের কাজ শেষ হলো বলে।'

চঞ্চলার মন আবার উস্‌খুস্‌ ক'রে ওঠে। সে পুনরায় প্রশ্ন করে, 'বল না মেজমা, কাল কি করতে হবে? তোমার শাড়ীখানা আমি কেচে দেবো'খন।'

'পাগলী! তুই কি পারিস এত বড় শাড়ী সামলাতে? আচ্ছা বলি শোন, সুন্দর ক'রে আলপনা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা বৌ-ছত্তর আঁকতে হবে। তার পর একটা ছোট ঘটে জল ভরে রেখে, হাতে দূর্বা নিয়ে শুনতে হবে ব্রতকথা। খুব মন দিয়ে কিন্তু।' সে রান্নাঘরের দিকে চলতে থাকে আর বলে যায় এমনি আরো অনেক কথা। চঞ্চলা তার সাথে সাথে যায়।

'তা হলে আজ বিকেলে দূর্বা তুলে রাখতে হবে?'

'হ্যাঁ, রাখিস তুলে।'

'ঘট?'

'সে আমি কাল জোগাড় ক'রে দেব। এখন যা খেলা কর গে। ঐ তোর মা আসছে, এখন পালা।'

'এখনও তুমি ওর সাথে বকবক করছ মেজবৌ?'

'না দিদি, না। এই তো আমি আসছি। কি করতে হবে বলো তো?'

'আজ সকাল সকাল আরম্ভ না করলে কি অতগুলো চিঁড়ে শেষ করা যাবে? মেয়েদের সব ডেকে ডালা-কুলো নিয়ে ঢেঁকি-ঘরে যাও, আমি আসছি এক্ষুণি। ভিজে ধান ঢেঁকি-ঘরে রেখে এসেছি।'

কিছুক্ষণ বাদেই ঢেঁকি-ঘরে পারের শব্দ শোনা যায়। মেয়েরা-বৌরা মিলে চিঁড়ে কুটছে। ঢেঁকির পাড়ের শব্দে বিপ্রপদ এসে উঠানে দাঁড়ান। কমলকামিনী মেয়েদের শিখিয়ে দিচ্ছেন: এমনি ক'রে এতটুকু ভাজলে চিঁড়ে ভাল হয়। পাড়—প্রথম দিতে হবে ধীরে ধীরে তার পর জোরে। বিমলা ভাজে ধান, শ্যামলা আলায় চিঁড়ে। পাড় দেয় চঞ্চলা ও মেজবৌ। এর পর আবার অদল-বদল হবে। মেয়েরা আলাতে চায় বেশী, কিন্তু ওতেই ওদের ভয়ও বেশী—হঠাৎ ঢেঁকির

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

পাড় হাতে পড়লে সর্বনাশ! কিন্তু আশ্চর্য্য, বিপদের মুখেই ওদের হাত দিতে বেশী উৎসাহ। সোণালী ধান থেকে কেমন অজস্র সাদা ফুলের মত চিঁড়েগুলো বেরিয়ে আসে। কেমন একটা সুন্দর গন্ধ। নরম মোলায়েম কুঁড়োগুলো ছিটে ছিটে পড়ছে, হাতে-পায়-গায় পাড়ের তালে তালে।

বিপ্রপদ স্মিত মুখে বলেন, 'আইবুড়ো মেয়েদের দিয়ে তুমি এ সব করাচ্ছ—হাত সাবধান! আমার তো ভয় করে।'

'চোখ বুঁজে থাকলেই পারো। এ সব মেয়েদের কাজ, তোমরা বুঝবে না।'

'তুমি আলাতে পারো না?'

'আমার হাতের দামও তো তোমার মেয়েদের চেয়ে কম না? একটা কথা, তুমি আলালে দু'দিকই রক্ষা হয়!'

মেয়েরা-বৌরা হেসে ওঠে।

বিপ্রপদ একটু লজ্জিত হন।

'এই, এখন তুই আয় শ্যামলা। বিমলা আর কতক্ষণ ভাজবে?'

আগুনের গন্‌গনে আঁচে বিমলার মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে।

শ্যামলা মিনতির সুরে বলে, 'আচ্ছা, এবারেরটা আমি শেষ ক'রে যাই মা।'

বিমলা সাগ্রহে অপেক্ষা করে। আর একটু পরেই তার পালা। সে মুঠো মুঠো ধবধবে চিঁড়েগুলো নাড়বে, তুলে তুলে সরিয়ে রাখবে—পাড়ের তালে তালে সে নিপুণ হাতে যাবে কাজ ক'রে। তার মনটা উৎসাহ ও গর্বে ভরে ওঠে।

কমলকামিনীর বিশ্রাম নেই, তিনি এটা-ওটা-কত কি যে করছেন! সকল কাজেই তাঁর ছোঁয়া লাগছে, তাই সব সুন্দর ও মার্জিত হয়ে ওঠে। বিপ্রপদ যেতে পারেন না, চেয়ে চেয়ে দেখেন। গত রাত্রের কথা মনে ভেবে কেমন একটু লজ্জা-বোধ করেন। আজ এ বয়সে কমলকামিনীর প্রাচুর্য্য ও সার্থকতা বোধ হয় এখানেই। তিনি বুঝি সমস্ত সম্ভোগ-লিপ্সার বাইরে চ'লে গেছেন। তাঁর কাজের ছন্দে ছন্দে গৃহিণীপণার ললিত রাগিণীই বুঝি বেজে উঠছে। একের ধরার বাইরে যেতে যেতে তিনি সকলকে ধরা দিতে চান। সকলকে বিলিয়ে দিতে চান ওঁর শিক্ষা-সংযম-তিতিক্ষা! যুগপৎ সুখ ও দুঃখ এসে বিপ্রপদকে ঘা মারে। তিনি হাঁটতে হাঁটতে বাগানের দিকে চলে যান। কমলকামিনী জানতেও পারলেন না—যাঁর সংসারের জন্য তিনি এত খেটে মরছেন তাঁর অন্তর ক্ষুব্ধ, চিত্ত বিচলিত। একটা অদৃশ্য কাঁটা খচ্‌-খচ্‌ ক'রে তাঁর বুকে বিঁধছে।

কিছুক্ষণ পরের কথা।

'তোরা কেমন মানুষ মা, ওঁকে দু'টো টাট্‌কা চিঁড়ে মুখে দিতেও বলতে পারলিনি! আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু তোদের তো একটু খেয়াল থাকা চাই। কি ক'রে যে পরের ঘরে গিয়ে ঘর করবি তোরা তা আমি ভেবে পাইনে। তোরা—'

'বেশ, তোমার সামনে দিয়েই তো গেল। এখন আমাদের দোষ!' বিমলা জবাব দেয়।

কার দোষ কার গুণ এখন সে বিচারে কাজ নেই—এখন তোরা এক জন যা, গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়! গেল কোন্‌ দিকে?'

'ঐ নতুন কলা-বাগানটা যে—ঐ দিকে!'

'কাজে হাত দিলে আজ আর দুপুরের মধ্যে পেটে কিছু পড়বে না। হয়ত বেলা তৃতীয় প্রহর উতরে যাবে—নিজের ক্ষুধা-তেষ্টার দিকে তো এতটুকু নজর নেই। যা মা, কেউ ডেকে নিয়ে আয়!'

মেয়েরা এ ওর মুখের দিকে চায়—কে যাবে ডাকতে? সকলেরই কেমন যেন একটা লজ্জা-বোধ হয়।

উৎকণ্ঠিতা কমলকামিনী বলেন, 'এই তোদের ডালা-কুলো-চিঁড়ে ঝাড়া রইল, অমিই চললাম ডাকতে। বাপের কাছে যেতে বড় লজ্জা!'

মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে দ্রুত পদে কমলকামিনী চলেন। নতুন বাগান, পুরোন বাগান সবই তাঁর চেনা। কিন্তু বিপ্রপদ কোথায়? আলো-ছায়ায় তিনি এখানে-সেখানে অনেক খুঁজে দেখলেন। তন্ন-তন্ন ক'রেই বেশ খুঁজলেন। অবশেষে একটা খেজুর কাঁটার খোঁচা খেয়ে ঘরে ফিরলেন। তাঁর রাগ হ'লো। পেটটা তো আর তাঁর না। তবে কিসের জন্য এত মাথা-ব্যথা? ক্ষিদে পেলে ছুটে আসতেই হবে। এত মান-অভিমানের তিনি ধার ধারেন কি? রোজ-রোজ ওঁকে ডেকে কে খাওয়ায়? তিনিও তো একটা মানুষ! একটা কাঁটা দিয়ে ভাঙা কাঁটাটা তুলতে তুলতে তিনি অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের সাথে এক-তরফা লড়ে চলেন। তাঁর আর এত খেটে-খুটে লাভ নেই—শুধু ছাইতে জল ঢালা। আজ তাঁর বাল্য-কৈশোর ও যৌবন তিন কালের সব বাছা-বাছা দুঃখের কাহিনীগুলি মনে পড়ে। তার অনেকগুলির সাথে বেচারা বিপ্রপদ মোটেই জড়িত নয়—তবু সকল কাহিনীই যেন তাঁরই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। ক্রমে পায়ের টাটানি কমে কিন্তু বুকের জ্বলুনি কমে না।

তিনি আর ঢেঁকি-ঘরে যান না। সেবা কাছে এলে তাকে নিয়ে শুয়ে থাকেন।

'মা, ক্ষীর-বাতাসা দিয়ে কেমন চারটি চিঁড়ে মেখে এনেছি তোমার জন্য। উঠে দু'টো মুখে দাও। তুমি তো আর নিজের হাতে ধরে কিছু মুখে দেবে না। সকলে খেয়েছে, মেজমা সকলকে দিয়েছে—এখন তুমি শুধু বাকী!...তোমার কি হলো মা?' একটা বাটি ও এক গ্লাস জল নিয়ে বিমলা অপেক্ষা করতে থাকে।

'আমার পেটে তো আর রাক্ষস নেই মা, তোমরা গিয়ে খাও।'

বিমলা অপ্রস্তুত হয়ে চ'লে যায়। মাকে আর অনুরোধ করতে তার সাহস নয় না।

অপরাহ্ণ বেলায় বিপ্রপদ যখন বাড়ী ফেরেন, তখন রোদের উত্তাপ কমে গেছে। গরুগুলো বাগান থেকে বেরিয়ে চরতে নেমেছে মাঠে। ছেলেরা যাচ্ছে কলরব করে খেলতে।

বিপ্রপদর সর্বাংগ বেয়ে ঘাম ঝরছে। মুখমণ্ডল আরক্ত। কমলকামিনী তাড়াতাড়ি একটা কিছু বলতে গিয়ে পাখা নিয়ে আসেন। সেবা এসে বাপের কোল ঘেঁসে দাঁড়ায়।

'না বলে কোথায় গিয়েছিলে?'

'পোষ্টাফিসে।'

একটা লোক পাঠালেই হত। না খেয়ে-দেয়ে এই যে তাড়না ক'রে এলে তাতে লাভ হলো কি?...বিমলা, বিমলা, তেলের বাটি নিয়ে আয় মা।'

'আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। একখানা জরুরী চিঠি আজ ডাকে না দিলে চাকরী থাকত না। চিঠিখানা আগেই লেখা উচিত ছিল,

কিন্তু নানা কাজে কি সব কথা স্মরণ থাকে ? সেই জন্যই তো রোদে পুড়ে এত দূর হেঁটে যেতে হলো। যাওয়ার সময় অমরেশকে বলে গেছি—সে তোমাদের বলেনি ? হয়ত খেলতে খেলতে ভুলে গেছে। ছেলেবেলায় আমাদেরও ও-রকম হতো—নিতান্ত পাগল, পড়া-শুনো নেই, শুধু খেলা।'

ইতিমধ্যে কমলকামিনী দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলের ওপর যেটুকু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, সেটুকু আর থাকে না। কারণ, যাঁর প্রতি এ অপরাধ তিনিই তো অবহেলায় ক্ষমা ক'রে গেলেন।

কমলকামিনী আর অপেক্ষা না ক'রে নিজের আঁচল দিয়েই বিপ্রপদর বুকের, মুখের ও পিঠের ঘাম মুছে নেন। ততক্ষণে বিমলা তেল নিয়ে আসে। তিনি কোনও দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে বিপ্রপদর হাতে-পায়ে তেল মাখাতে বসেন।

থাক থাক, আমার এমন কোনও কষ্ট হয়নি। আমিই পারব। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো ?'

বিমলা বলে, 'সকলে খেয়েছে কিন্তু—'

'তোর মা খায়নি। ও ওঁর চিরকেলে স্বভাব। নিজে ইচ্ছা ক'রে কষ্ট করলে, অপরে কি করতে পারে ? যাক, এখন তুমিও স্নান করতে যাও—আমি তো এলাম বলে।'

'মা আর দিনের বেলা খেয়েছে! দু'টো চিঁড়ে পর্য্যন্ত মুখে দিল না। কত বললাম—তা—'

'চুপ কর বিমলা—নিজের কাজে যা।'

'কিন্তু এক বেলায় চাল বাঁচিয়ে তোমার লাভ হলো কি ? তোমার শক্তি-সামর্থ আছে, তুমি পেরেছ—আমি কিন্তু তা পারব না। আমায় ব্যবস্থা করো গে—যাও। এই তো একটা ডুব দিয়ে এলাম বলে।'

কমলকামিনী কিছুই বলেন না। এ জাতীয় অভিযোগ যেন তিনি জীবনে বহু বার শুনেছেন—এমনি একটা ভাব তাঁর মুখে ফুটে ওঠে।

বিপ্রপদ সবে একটা ডুব দিয়ে উঠেছেন, এমন সময় এক জন প্রতিবেশী মুসলমান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, 'বাবু, আইজ হাট বার, কেউরে দেহি না। আমার সাধের গরুডা বুঝি মরে।' তার সর্বাংগ কাদা ও মুখে দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন। মাথায় জড়ান গামছাটা খুলে পড়ছে কিন্তু সে বার-বার চেষ্টা ক'রেও ঠিকমত গুছিয়ে বাঁধতে পারছে না।

'কেন মরবে ?'

'কেউরে না পাইলে আর বাঁচবে ক্যামনে ? আমার গায় তো আর সে জোর-বল নাই। আমি একলা একলা অনেক চেষ্টা করইয়া দেখছি।'

'কি চেষ্টা ক'রে দেখেছ ? ব্যাপার কি আবদুল ?'

'কারডে কমু, কেউরে তো দেহি না।'

'কেন, এই তো আমি রয়েছি—আমাকেও কি দেখতে পাচ্ছ না ?'

'তুমি কি আর যাবা বাবু ? যে কাদা! আমার পোড়া-কপালে অমন লক্ষ্মী টেকুবে ক্যান ?' সে একটা নারকেল গাছের ওপর মাথা কুটে কাঁদতে থাকে।

'আরে, বল না আবদুল, হয়েছে কি ? শুধু শুধু কেঁদে কপাল কুটলে হবে কি ?' বিপ্রপদ জল থেকে উঠে গিয়ে আবদুলকে ধরেন।

পুকুর-ঘাটে ছেলে-মেয়ে স্ত্রীলোকের ভিড় জমে যায়। অনেক প্রশ্নের পর সে বলে যে তার একটা গর্ভবতী গাভী ঘাস খেতে খেতে খালের নরম কাদা-চরে কখন যেন নেমেছে। এখন একেবারে কাদায় পুঁতে বসে গেছে—উঠতে পারছে না। এতক্ষণ ছিল ভাটা, এখন আবার জোয়ার এসেছে। তাড়াতাড়ি তুলতে না পারলে এখনই জল খেয়ে মারা যাবে। কিন্তু লোক কোথায় ? কে এ বিপদে তাকে সাহায্য করবে ? বিপ্রপদকে সে অনুরোধ করতে সাহস পায় না। কারণ তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি কি যাবেন এই সামান্য কাজে ?

দেরী না ক'রে বিপ্রপদ দ্রুত ছুটে যান খালা পাড়ের দিকে। গরুটার অবস্থা দেখে তাঁরও মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। নিজে যে অভুক্ত—পরিশ্রান্ত সে কথা ভুলে যান। তাঁর নিজের শক্তির ওপর কেমন যেন সন্দেহ হয় একটা। তিনি কি পারবেন ওই ভারী জন্তুটাকে অতখানি কাদা থেকে টেনে তুলতে ? তাতে আবার যে হেউলী বাস কাদা-চরে! কেন পারবেন না ? নিশ্চয় পারবেন। বুকে বল ক'রে তিনি নেমে যান। গরুটার নাকের ডগা পর্য্যন্ত জল এসেছে। ঘোলা জল ঘুরে-ঘুরে ছাপিয়ে উঠছে কেবলি। গরুটা অনিবার্য মৃত্যুর দিকে মুখ তুলে কাতর চোখে চেয়ে আছে। পেটে একটা বাছুর—কি যে কষ্ট হচ্ছে ওটার! বিপ্রপদকে দেখেই ও দু'চোখের জল ছেড়ে দেয়।

'এখনও দাঁড়িয়ে আছ আবদুল—শীগ্‌গির নেমে এসো।' তিনি অসীম শক্তিতে গরুর শিং দু'টো ধরে খালের জলের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যান। খালের নীচের দিকের মাটি অনেকটা শক্ত। এখন গরুটা পায় জোর করে দাঁড়াতে পারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

'এবার এটাকে নিয়ে যাও সাঁতার কাটিয়ে ওপারের দিকে—ও-পারের মাটি শক্ত, উঠতে কষ্ট হবে না। খুব বরাত-জোর তোমার, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেল।'

'বাবু, এই পশ্চিম-মুখ ফির্‌্যা তোমারে দোয়া করি, তুমি লক্ষেশ্বর হও। তুমি আজ আমার যে উপগার করলা তা জান থাকতে ভুলুম না। কখনও ঠেকলে একবার ডাইক্যা দেইখ্যো।'

খালের জলেই স্নান ক'রে বিপ্রপদ একটা মরা খেজুর গাছের থাক-কাটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন। এখন আর বেলা নেই। সূর্য নীলাভ গাছগুলোর ফাঁকে দূরে ডুবে গেছে। ছোট-ছোট ডোঙা নায়ে হাটুরেরা ফিরে আসছে। দু'-একটা পাখীর ঝাঁক বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে। দু'-একটা দেখা যাচ্ছে আকাশের গায়।...

বিপ্রপদর হাসি পায়! আজ স্বামি-স্ত্রীর জন্য বিধাতা এক বেলাই বরাদ্দ ক'রে রেখেছিলেন। একটা ভক্তি-ভাবে তার মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কয়েকটি মুসলমান তখন অজু ক'রে নমাজ পড়তে খালা পাড়েই একখানা গামছা বিছিয়ে নিল। পাশে তাদের চাষের যন্ত্রপাতি—কোথায় যেন এইমাত্র কৃষাণ খেটে এসেছে তারা। একটু যেন দেরীই হয়ে গেছে তাদের।

তখন চার পাশের বামুন-কায়েত-তাঁতি-বাড়ী থেকে শাঁখের আওয়াজ, কাঁসর-ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা গেল। একটা আলোড়ন এলো সান্ধ্য বাতাসে। ক্ষণিকের জন্য মুখর হয়ে উঠল গ্রাম্য নীরবতা।

দীপালোক দেখা গেল দূরে অদূরে। সুগন্ধী ধূপের অপূর্ব আবর্ত্ত যেন ছড়িয়ে পড়ল খালা-পাড় পর্য্যন্ত।

মুসলমানদের নতজানু হয়ে নামাজ পড়ার প্রণালীটা বিপ্রপদর কাছে বড় মনোরম লাগে। তিনি চেয়ে থাকেন। ইচ্ছা করে, ওদের প্রার্থনার মাধুর্য্যটুকু আহরণ ক'রে নিতে। এ গাঁয়ের আশ-পাশের বাসিন্দারা হিন্দু, শুধু ওরা তিনটিতে মুসলমান—তবু যেন কি মধুর একটা সমন্বয় ঘটল আজ দিনান্তে!

তিনি সমস্ত পরিশ্রমের কথা ভুলে গিয়ে মুগ্ধ-হৃদয়ে বাড়ী ফেরেন।

৮

'একটা সুসংবাদ আছে মা ঠাকরুণ!'

'সংবাদটা কি সরদারের পো?'

'বাবু কোথায়?'

বিপ্রপদ আগ্রহে বেরিয়ে আসেন।

'তুমি যহন নিতাই সরদ্দারের মা তহন আমারও মা—নিতাই আমার মিতা। আদাব মাঠাইন, আদাব, বাবু আদাব।'

বিপ্রপদ প্রত্যভিবাদন করেন—কমলকামিনী বলেন, 'সুখে থাকো। বসো, বসো। তোমার নাম কি?'

'ওর নাম ইমাম।' তার পর খুব ছোট্ট ক'রে ওর মেয়ের বিবাহিত জীবনের করুণ কাহিনীটা বিপ্রপদ কমলকামিনীকে শুনিয়ে দেন।

অব্যক্ত বেদনা মুসলমান-কন্যার জন্য আজ এই পূর্ব-বাঙলার হিন্দু নারী আর চোখের জল সামলাতে পারেন না। তাঁর চোখ ঘন ঘন ভিজে ওঠে। তিনি কেন জানি অধীর হয়ে পড়েন।

ইমামের চোখে জল দেখা যায় না। ক্ষণিকের জন্য ওর চোখ দু'টো রক্ত-পিপাসু বাঘের মত জ্বলে ওঠে। সে বলে, 'কার জন্য কান্দ মাঠাইন? খোদার ধন খোদায় নেছে, তুমি-আমি করুম কি! কিন্তু ঐ শালা এন্তারে লক্ষীন্দরের খোপে রাখলেও আমি গিয়া ছোবল মারমু—ছাড়মু না।'

'মন সুস্থ করো মিতা। এখন তামাক খাও, তামাক খাও।'

ইমাম দাঁতে দাঁত চেপে হাতের লাঠিটা শক্ত ক'রে ধরে।··· সুস্থ হতে তার বেশ একটু সময় কেটে যায়। নিতাই তার হাতে সর্বদুঃখহারী তামাকের কল্কীটা দেয়। সে টানতে থাকে একমনে, আর কি যেন ভাবতে থাকে।

'বাবু, মামলায় জিত হয়েছে, নিলাম রদ হয়েছে। হুকুম শুনে বড় ঘোষালের মুখখানা একেবারে চূণ। আমি আর দেরী না ক'রে অমনি কাছারীর মধ্যে দিলাম একটা সেলাম ঠুকে। হাকিম হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? আমি ওর মিথ্যা রাইওৎ, উনি আমার মিথ্যা হুজুর। তবু একেবারে খালি-হাতে যাবেন কেন—একটা সত্যি সেলাম দিলাম ওকে পথ-খরচা। এজলাসের সব লোক হো-হো ক'রে হেসে উঠল।'

বিপ্রপদও একটু হাসেন।

শিবপদ কোথায় ছিল, এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তার পর, তার পর কি করল বুড়ো শয়তানটা? বললে না কেন যে, এমনি ধারা যদি মিথ্যে-মিথ্যে কেউকে হয়রান করো, দেবো ঘরের চালে রাঙা ঘোড়া ছুটিয়ে।'

'শিবে, তুই বড় উত্তেজিত হয়ে পড়িস একটুতেই। ও-সব মুখে আনতে আছে? ও-রকম পাপের কাজ করলে কি আছে—তোর আমার কার ও ভয় নেই বল তো? বুদ্ধিমানের ল[...] বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে—আদালতে। সাবধান, ও-কথা আর মুখেও আনিস কখনও।' বিপ্রপদর কথায় শিবপদ চুপ ক'রে যায়।

'তার পর শুনুন বাবু, বুড়ো ঘোষাল রাস্তায় বেরিয়ে আম[...] ডেকে নিয়ে বলল: 'তোর বাবা আমাদের জন্যে না করেছে কি[...] কত লাঠি-সড়কি চালিয়েছে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে—এখন [...] দোষে কিছু ঘটে গিয়ে থাকলে মনে রাখিস নে বাবা—বাড়ী [...] আমার সাথে দেখা করিস, তোর নিমন্ত্রণ রইল আমাদের বা[...] বল যাবি,·মনে রাখবি নে এই সব? আমি আর কি বলি, হয়[...] ক'রে তার হাত ছাড়িয়ে এলাম। কুমীরের চোখের জল কি আ[...] আর দেখতে বাকি আছে?'

'এখন কি করতে চাও?'

'সেই জন্যই তো এসেছি। আপনি একটা বুদ্ধি দিয়ে দেন য[...] ওরা আর আমাকে হয়রান না করতে পারে গোপনে আর্জ্জি দি[...] আমার বাড়ীতে আর আদালতের প্যাদা না আনতে পারে কো[...] সুযোগে। বড় ঝামেলা বাবু!'

'এর ওষুধ হলো, বলব কি—তুমি কি তা করতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারব—না পারলে চলবে কি ক'রে?'

'তোমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এক জন বিশ্বাসী লো[...] নামে বেনামী ক'রে রাখো গে। একটা মাত্র কবলা রে[...] করতে হবে।'

প্রতি বছর অযথা উৎপাত নিবারণের এমন যে সহজ এ[...] পথ আছে তা নিতাই জানত না। সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। 'ব[...] কি বাবু, এত সহজে নিষ্কৃতি পাবো, নির্বিবাদে ক্ষেত-খামার-[...] বাজার করতে পারব? এ বছর আমি সময়মত ধান কা[...] পারিনি, খড়-কুটো রাখতে পারিনি গরুর জন্য। উপোস ক[...] কেবলই ছুটোছুটি করেছি সদরে। তাতেও কি রেহাই পেত[...] আপনি না সাহায্য করলে? আর দেরী না ক'রে কালই আ[...] যাবো। কিন্তু এক জন লেখাপড়া-জানা পরিচিত চাই তো।'

'কেন, এই তো আমি রয়েছি সরদারের পো, তোমার ভাবনা কি[...]

সকলে অবাক্ হয়ে যায়। বাতির সুমুখে বসে বাইরের দি[...] চেয়ে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার শুধু গাঢ়তম মনে হয়। পেত্নীতে জ[...] দিল না কি? কিন্তু গলাটা তো সকলেই চেনে। একটু হা[...] হাসতে সুমুখে এসে দাঁড়ায় দীনু।

'আমি ব্রাহ্মণ, তুমি বৈদ্য—তোমার কাজে কোনও দ[...] চাই নে আমি—শুধু দু'টো টাকা ধার দিও, আসছে হপ্তায় [...] ক'রে দেব।'

'দু'টো টাকা কেন আড়াই টাকা দেব ঠাকুর ভাই, আপনি এ[...] দেখে-শুনে আমার কাজটা সেরে দেবেন—আমরা মুখ্যু লোক, ও[...] কাজ তো করিনি কোনও দিন।'

'তোমার কোনও ভাবনা ভাবতে হবে না সরদারের পো—এই [...] বিপ্রপদ—তোমাদের বাবু—আমায় সবিশেষ জানে—আমি সব [...] ক'রে দেবো। তুমি কেবল একটা সই ক'রে দিয়ে খালাস। আমি পিওনটি থেকে হাকিমটি পর্য্যন্ত আমার সব চেনা। দেখবে, [...]

কি খাতিরটাই না করে। উঠে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়, আমি বসলে তখন সকলে বসে। তামাক-টামাক পাবে কোথায়—হাকিম সুগন্ধি ছিকরেটের বাক্সটাই খুলে ধরে। একেবারে কতগুলো ছিকরেট, কি মিঠে গন্ধ সরদ্দারের পো—যদি একটা খেয়ে দেখতে!'

'আমরা চাষা-ভুষো লোক—ও-সব সাহেবী জিনিষ পাবো কোথায়, কে-বা দেবে আদর করে খেতে! ও-সব যুগ্যি লোকের জন্ম, আমাদের জন্ম নয়। আচ্ছা, একটা ছিকরেটের দাম কত?'

দীনুও তা জানে না।···

'টাকা টাকার কম না, কি বলো বিপ্রপদ?'

বিপ্রপদ চুপ ক'রে শোনেন। দীনু সগর্বে এমনি বাস্তব-অবাস্তব অনেক কথা বলে যায়। 'সরদ্দারের পো, তুমি তো জানো না, কেন হুজুর দুনিয়া-ভরা লোক থাকতে আমাকে এত খাতির করে। তুমি ভাবতে পারো মিছে কথা, কিন্তু একটি বর্ণও মিছে বলে না এই মনু ঠাকুরের ব্যাটা দীনু ঠাকুর। সেবার নাতি হবে হুজুরের মহা আনন্দের বিষয়—কিন্তু সন্তান ভুমিষ্ঠ হচ্ছে না। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা। ডাক্তার-বৈদ্য সব ফেল—আমারই জলপড়া ও মা মনসার বস্ত্র যে মুহূর্তে দিলাম সেই মুহূর্তেই খালাস। ব্যস—আর কি চাই। কাছারী শুদ্ধ, লোক আমাকে মাথায় ক'রে নাচবে না'কি করবে, তাই ঠিক করতে পারে না। শরীরে গুণ থাকা চাই, সরদ্দারের পো, খাতির পেতে হলে শরীরে গুণ থাকা চাই।'

'তা ঠিক বলেছেন ঠাকুর ভাই, ঠিক! গুণ থাকা চাই। বাবা বলতেন 'নির্গুণো পুরুষ ভুষা'—আমরা হয়েছি তাই। একে ছোট লোক, তাতে না জানি লেখা-পড়া।'

দীনু নিজের বাহাদুরী নিয়ে ব্যস্ত। তামাকে একটা জোর টান দিয়ে বলে, 'শোনো আর একটা ঘটনা—'

সকলে মসগুল হয়ে গিয়েছিল, বিপ্রপদ একটা বাধা দিয়ে বলেন, 'আর এক দিন শোনা যাবে। আজ রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'ও! ঠিক তো। আমারও যে গামছায় চাল বাঁধা। এই চাল যাবে, তবে ভাত রাঁধবে। এখন তা হলে উঠি—কাল একটু সকাল সকাল এসো, বুঝলে সরদ্দারের পো।' ঘরে তামাক নেই, ছিলিম তিনেক তামাক নিয়ে দীনু উঠে পড়ে।

আজ আড়াই টাকার লোভে ব্রাহ্মণ দীনু অসংকোচে কম পক্ষে আড়াই হাজার মিথ্যা কথা বলে যায়, এতে তার এতটুকুও চিত্ত-বিকৃতি ঘটে না।

বিপ্রপদ ভাবেন: এরা গ্রাম্য পরগাছা—এদের বাস্ত ভিটাটুকু মাত্র সম্বল। অন্য দেহের রস শোষণ ক'রেই এরা বেঁচে থাকবে। সেই জন্যই হয়ত তিনি রাগ করেন না। বরঞ্চ একটা সহানুভূতির সুরই তাঁর অন্তরে বেজে ওঠে। এদের অর্থ নেই, স্বাস্থ্য নেই, না আছে পুঁথিগত বিদ্যা—শুধু মাত্র সম্বল ক্ষুরধার বুদ্ধি। সেই বুদ্ধির বেসাতি না ক'রে এরা খাবে কি? কি ক'রে চলবে এদের জীবনযাত্রা? এদের বাঁচিয়ে রাখাও একটা ধর্ম্ম। গ্রাম্য রাজনীতিতে এদের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। সত্য-মিথ্যা সাক্ষী দিতে এরা ভয় পায় না—জাল-জুয়াচুরি করতেও এতটুকু চঞ্চল হয় না। এরা অর্থের বিনিময়ে সকল পরমার্থ বিসর্জন দিতে পারে, দিতে পারে অতি প্রিয় বান্ধবের গলায় শাণিত ছুরিকা বসিয়ে—তাই এদের সম্বল ক'রে প্রতিষ্ঠার সৌধ-শিখরে উঠতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে শক্তিগড়ের সমস্ত কলহের ইতিহাসে।···

'কিন্তু দলীলটার গৃহীতা কে হবে, নিতাই?'

'কেন আপনি।'

'না না, আমি তা হতে যাবো কেন? আর তুমিই বা তা করতে যাবে কেন? তোমার কাকা, খুড়ো কি মামার নামে কর গে।'

'এখন আর আমাকে পরামর্শ না দিলেও চলবে। আমার মন যাঁকে চাইবে, তাঁকেই লিখে দেব।'

এমন দৃঢ় ভাবে নিতাই বলে যে, বিপ্রপদ আর কোন উচ্চবাচ্য করেন না।

'রাত কম হয়নি, এখন খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাও সরদ্দারের পো। তোমাদের কথা বোধ হয় শেষ হয়েছে।' কমলকামিনী বলেন, 'চলো বাড়ীর ভিতর—ঠাঁই পিঁড়ি হয়েছে তোমাদের।'

'না না মা ঠাকরুণ—আজ আর খাব না? আর এক দিন···'

'না না, তা কি হয়! তোমার লজ্জা কি সংকোচের কিছু নেই। আমি ইমামের জন্যও ব্যবস্থা করছি। সে যখন তোমার বন্ধু আমারও ছেলে। কিন্তু মুসলমান ছেলে যে, ভাত খাবে না এই দুঃখ। তোমরা দু'জনে উঠে ভিতরে যাও—এখানে ইমামের কাছে আমিই রইলাম।'

একটা সুন্দর সতরঞ্চি বিছিয়ে তার ওপর একটা কাঁসার গ্লাসে জল এনে রাখেন কমলকামিনী। দু'খানা থালে আসে চিঁড়ে-মুড়ি। বাটি-ভর্ত্তি আসে দৈ ও ক্ষীর।···একটু পরেই বিমলা দিয়ে যায় এক বাটি মধু।···

'এখন তুমি ইচ্ছা মত নিয়ে খাও ইমাম। দেখো, লজ্জা করলে কিন্তু আমি রাগ করব—তোমার বাবুও।'

আয়োজন দেখে ইমাম সংকুচিত হয়ে যায়। সে কি ভাবে বসে কি ভাবে খাবে দিশাই করতে পারে না। অমন নতুন সতরঞ্চির ওপর পা তুলতেই সাহস হয় না তার। কত রাজ্যের মাটি যেন তার পায়ে রয়েছে।

কমলকামিনী দেখিয়ে-শুনিয়ে ভয় ভাঙিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেন কোন্‌টা আগে—কোন্‌টা খেতে হবে পরে।

ইমাম ধীরে ধীরে খায়। কিছুই ফেলতে পারে না পাছে। ইমাম শক্তিশালী এবং মহা সাহসী বলে দেশে তার খ্যাতি থাকলেও কমলকামিনীর সুমুখে কিছু পাতে ফেলে উঠে যেতে তার সাহসে কুলায় না। সুবোধ ছেলের মত তার সব-কিছু খেয়ে উঠতে হয়। সে উঠে এসে বলে, 'তুমি মিতার মা—আমারও মা। কও তুমি আইজ থাইক্যা আমারে ছাওয়ালের মত জানবা। না হইলে এ খাওন মিথ্যা।'

কমলকামিনী স্মিত মুখে সম্মতি জানাল।

'তুমি মধু দিয়া পরিচয় করলা, আমারে চিরদিন মধুর চোখেই দেইখ্যো মাঠাইন।'

এ কথার আর কি জবাব দেবেন কমলকামিনী। আনন্দে ছেলে মুখর হয়ে উঠলে জননীর এমন কি সাধ্য আছে যে তার আবোল-তাবোলের উত্তর দিতে পারেন!

এমন সময় নিতাই ও বিপ্রপদ খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাইরে আসেন। 'আমরা সব শুনেছি বড়বৌ, সব শুনেছি—এতগুলো ছেলের ঝক্কি কি তুমি একা সামলাতে পারবে?'

'একা সামলাব কেন, তুমিও তো রয়েছ।' বলে কমলকামিনী

ইমামের উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলো নিয়ে ঘাটের দিকে চলে যান—সংগে বাতি নিয়ে যায় বিমলা।

'তার পর তোমরা তো আর এলে না ইমাম। তালুক বিক্রির বিষয় তো আর কিছু জানালেও না।'

'সেন মশাই না কি এখানে নেই! বাড়ী গেছেন—কোন ঢাকার জেলার সদরে এলে এরা খোঁজ নিয়ে জানাবে আপনাকে। পথে পথে এ সব কথাই ইমাম বলছিল আমাকে। ওরা ওৎ পেতেই আছে—ওদের ঘুম নেই।'

'আচ্ছা বেশ।'

'মুখ যখন ওরা বের করেছে তখন কচ্ছপের মত মুড়ে ভিতরে টেনে নেবে না—সে রক্তে ওরা জন্মেনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

'বেশ, আমি যেখানে থাকি খবর দিও।'

অন্ধকার রাত। চোখে কিছু দেখা যায় না। দু'বন্ধুতে ছুটে নারকেল পাতার মশাল জ্বালিয়ে মঠের পথে নেমে পড়ে। জোয়ারের জল ছোট ছোট সোঁতা খাল দিয়ে তখন মাঠে এসে পড়েছে। আসছে মাসে আরো বেশী জল উঠবে মাঠে—চাষের মরসুম এলো বলে—এমনি নানাবিধ আলোচনা করতে করতে ওরা হেঁটে চলে। দূর থেকে ওদের চলার শব্দ শোনা যায়···ছপ, ছপ, ছপ।···

সেদিন রাত্রে হঠাৎ দীনুর তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়।···

আজ তার গভীর নিদ্রা হওয়ার কি জো আছে! কত চিন্তা তার মাথায়! আগামী কাল একটা ঘোর পরিবর্তন হবে শক্তিগড়ের রাজনৈতিক আকাশে। এমন পরিবর্তন দশ-বিশ বছরের মধ্যে যে হয়েছে তা তার স্মরণ হয় না। একটা গন্ধকের কাঠি জ্বলন্ত তুষের তাওয়ায় চেপে ধরে কেরোসিনের ডিবাটা সে জ্বালায়। আফিংয়ের কৌটোটা খুলে কয়েক রতি আফিং সে মুখে দেয়। এবার তামাক সেজে নিয়ে ভাবতে বসে:

বড্ড চাল চেলেছে বিপ্রপদ। একেবারে এক চালেই মাৎ। ঘোড়ার না বড়ের না—একেবারে দাবার। একটি পয়সাও ব্যয় না করে প্রায় আট-দশ বিঘে ধানী জমির ও হবে কবলা-গৃহীতা। আগামী কাল ওর জীবনের একটা শুভ-দিন। নিতাই বেটা চাষা, একেবারে বেকুব চাষা! তা না হলে কি এমন সোনার ফসল-ফলা জমি কেউ কারুর নামে করে বেনামী? শুধু জমি না, ঘর-বাড়ী মায় গরু-বাছুর পর্যন্ত। আর জরুটা বাকী না রেখে ওটাও কবলা করে দিলে হতো কি? এক দিন তো ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে ওর বাড়ী গিয়েই উঠতে হবে। সে পথ তো বেশ নিষ্কণ্টক করে দিল নিজের হাতেই ও। হায় রে মূর্খ! দলীলখানা বিপ্রপদ এক দিন মিঠা কথায় হাত করবে।

এ যে এক হিসেবে সেনের তালুকের চেয়েও ঢের মূল্যবান সম্পত্তি। আর কিছু নয়, ধানী জমি। বিনা টাকায়, বিনা ক্লেশে শুধু একটু বিশ্বাসের মূলধন খাটিয়ে কিনে নিল। আবার কেউ বিপ্রপদ—প্রবঞ্চকও বলবে না—কারণ নিতাই দিচ্ছে স্বেচ্ছায় লিখে। গৃহীতার নামটা উল্লেখ না করলেও কি দীনুর বুঝতে দেরী হয়! তার বুকটা যেন কাঁকড়া বিছায় দংশন করতে থাকে।···এই ত পাশাপাশি বাড়ী। ওঁর জুতের ঘর, আর তার কি না খড়ের। নিতাই কি তার নামে বিশ্বাস করে দলীল করতে পারে না? ও তো আর নিতাইর পাকা ধানে মৈ দেয়নি! তবে ওকে এত অবিশ্বাস কেন! দীনু একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাহ্নিক না করে জলও স্পর্শ করে না। ও কি যেতো ওর জমির ধান খেতে? শুধু একটা সম্মান। কি চাও মনু ঠাকুরের ছেলে দীনু ঠাকুর মহা বিশ্বাসী—মহা সৎ। ঠিক বাপের মত গুণী। তাই তো নিতাই ওর নামে করেছে এমন সোণার সম্পত্তি বেনামী! থুথু ফেলে সেদিকেও চাইত, কিন্তু নিতাই লিখে দিলেও সম্পত্তি তো দূরের কথা, হীরা-জহরৎ হলেও সে সেদিকে একটি বার ফিরেও তাকাত না। ভিক্ষা ক'রে যেমন দিন যাচ্ছিল তেমনি দিন কেটে যেত। ও কত দূর নির্লোভ, কতখানি নিষ্পাপ তা তো যাচাই করা হলো না।···

নিতাইটা একেবারে গজ-মূর্খ। তার চেয়েও বেশী না কি কে জানে? ওর সম্পত্তি পরের ভোগেই লাগবে। তবে বিপ্রপদর স্থানে দীনু ভটচায হলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! ওর অপরাধ ও দরিদ্র? ওর মানুষ বলে যতটুকু ওজন থাকা চাই তা নেই এ জগতে? ও নিঃসম্বল পিতার ঔরসে জন্মেছে—জন্মাবধি ও সুখের মুখ দেখেনি। যখন বিপ্রপদ লেহ্য-পেয় খায়, ও চুপ করে বসে থাকে দু'হাটু বুকে করে—এ সব যদি ওর অপরাধ হয় এবং তা দূর করার আর যখন কোনও পন্থাই নেই, তখন ও একটা রাহাজানী করবে—বুদ্ধির রাহাজানী। বিপ্রপদর নামের জায়গায় শুধু ওর নামটা বসিয়ে দেবে। আর ইংরেজ রাজার গোমস্তার হাতে দেবে টেবিলের তলা দিয়ে দু'টো মাত্র টাকা গুঁজে। এখন শুধু একটু হুঁ বললেই রেজেষ্ট্রী। নিতাইটা ভ্যাবাচাকা খেলে ও-ই না হয় নিতাইর মত করে আনুনাসিক স্বরে ছোট্ট বলে 'হুঁ'টা দেবে। তার পর টিকিটখানা বরাত নেওয়া অতি সহজ। দীনু জীবনে কখনও পাপের কাজ করেনি, পরম বৈষ্ণবের মতই দিন কাটিয়েছে। কেবল একটি বার ডাকাতি করবে—একটি বার! তার পর ঐশ্বর্যের অন্তরালে ব'সে শ্রীভগবানের নাম করতে করতে এই পার্থিব দিন কয়টা কাটিয়ে দেবে। সে আর কেউকে, এমন কি বিধাতাকে পর্যন্ত বিরক্ত করবে না।···

কিন্তু যখন নিতাইটা সব টের পাবে, যখন সমস্ত কারসাজী ধরা পড়ে যাবে তখন সে কি করবে? গোঁয়ার-গোবিন্দটা কেউকে কিছু বলবে না, তলিয়েও দেখবে না কিছু—একটা সুতীক্ষ্ণ ল্যাজা নিয়ে ছুটে আসবে—এসে ওর হৃৎপিণ্ডটা লক্ষ্য করে বসিয়ে দেবে। দীনু তন্দ্রার ঘোরে উঃ উঃ করে ওঠে।···

ওর কাজ কি এত ঝামেলায়! ওর আড়াই টাকাই ভাল। ওর এক সপ্তাহ দিব্যি কেটে যাবে মৌতাতে।

[ক্রমশঃ।

দুর্বোধ্য

শ্রীমায়া সিংহ

দরজার পাশে এসে দাঁড়ায় সুবর্ণা, বলে—আদিত্য, তুমি আমায় ডেকেছ কেন?

মুখ ফিরিয়ে আদিত্য জবাব দেয়—অদর্শনের বিরহে নয়, বিদায়ের অনুমতির আয়োজনে। পরিহাসের সুরে কথাগুলো বললেও সে সুরকে অতিক্রম ক'রে বিষণ্ণতাই বাজে বেশী।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে সুবর্ণা, তার পর উদাস ভাবে বলে—আমার অনুমতির প্রয়োজন কি? তোমায় ত আমি বেঁধে রাখিনি।

আবেগে আদিত্যর সুগঠিত দেহ চঞ্চল হয়ে উঠে, তবু শান্ত সুরে সে বলে—তোমার বাঁধনই আজ আমার পায়ে পায়ে বাঁধছে, এ তুমি নিজেই জান সব থেকে ভাল। কিন্তু এমন ক'রে বেঁধে রেখে কি লাভ তোমার? আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমার কাজ শেষ হবে। ফেরার দিন এসেছে ঘনিয়ে, তোমার কাছে কি পেলুম তা জানি না, কিন্তু দিয়ে গেলুম উজাড় ক'রে, বুকভরা তৃষ্ণার হাহাকার নিয়ে আমি ফিরে যাব। ওগো রজনীগন্ধা আমার, তোমায় কেমন ক'রে বোঝাব আমার সেই মর্ম্ম-বেদনার কথা। আজও তুমি মুখ ফিরিয়ে আছ অকরুণ নীরবতায়। বঞ্চিতের বেদনা কি মর্ম্মে তোমার বাজে না?

মৃদু হাসি ফুটে উঠে সুবর্ণার ঠোঁটে—আদিত্য, আমি যে নিজেই বঞ্চিত, বেদনা আমায় হয়ত বা বধির করেছে তবু তোমার কাছে আমি দুর্ব্বল। বাল্যের প্রথম উন্মেষেই আমার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বাঁধনের অংশীদার জীবনকে ব্যর্থ ক'রে অজানা লোকে পাড়ি দিল। তখনও তাঁর অনেকখানিই আমার কাছে অজানা ছিল। পড়ে রইলুম আমি আর বিপুল সম্পদ—বৈরাগ্যে তখন যার একমাত্র অধিকার, রাজার ঐশ্বর্য্য তাকে বিদ্রূপের দর্পে ঘিরে রইল। তখনও ঠিক কতখানি হারিয়েছি, সেটা বুঝবার বয়স হয়নি, তবু সঠিক সংজ্ঞাহীন মনে চিরাচরিত প্রথাগুলোকে মেনে নিলুম। প্রবৃত্তির পথ থেকে জোর ক'রে নিবৃত্তির আশ্রয় নিতে হল। কি কঠোর সে পথ, কি সুতীব্র জ্বালা যে শূন্যতার, রিক্ত নারীর বেদনাকে বিধানের জটিল রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শ্রান্ত ক'রে নীতির নিগড়ে দেয় বেঁধে। তাই পুরুষের চোখে তার তিলে তিলে জ্বলার রূপটা চোখে পড়ে না, নিরুপায় হয়ে পার্থিব জগতের ব্যথা বুকে নিয়ে পারমার্থিক সান্ত্বনা লাভ করতে চাইলুম, গড়ে তুললুম মন্দির, ভাবলুম, জীবনের বাকী দিনগুলো ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে কেটে যাবে। কিন্তু নিজের উপর আত্ম-বিশ্বাসে আমার ভুল হয়েছিল। তুমি এলে মন্দির চিত্রাঙ্কনের ভার নিয়ে,—প্রথম দেখায় আমার সংযত মন দুলে উঠল, বিপুল লজ্জায় ধিক্কার দিলাম নিজেকে। বুঝলুম, অন্তরাত্মাকে ফাঁকি দিলেও যৌবনকে মারতে পারিনি। তার পর এক দিন শুনলাম তোমার ডাক—ওগো রজনীগন্ধা আমার এত স্পর্দ্ধা তোমার কোথা থেকে এসেছিল জানি না, হয়ত বা আমারই কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের প্রশ্রয়ে। সেদিন থেকে তোমার আমার মাঝের সেখান থেকে অলঙ্ঘনীয়তা গেল টুটে। আদিত্য, আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি নেমে আসতে পারছি না। আত্মাকে যত কঠোর উপবাস দিয়েছি, যত বেশী নিজের সত্তাকে ভুলেছি, তত শ্রদ্ধা-ভক্তির উচ্চতা আমার দেবীত্বকে প্রমাণ করেছে নিশ্চিত ভাবে। আমি মানুষ, তাই এ সম্মানকে ছেড়ে যেতে পারি না। সুবর্ণা দৃঢ় স্বরে বলে—এ আমার মহাপাপ, তবু আমি ফিরতে পারি না।

আহত কণ্ঠে আদিত্য প্রতিধ্বনি করে—এ তোমার মহাপাপ?

হ্যাঁ মহাপাপ। চোখের জলে আর ব্যথার আগুনে এর প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে হবে। মুক্তি নিতে পারি না প্রেমের কাছ থেকে। মন বলে এ মহাপাপ। বিবেক নিরুত্তর সমর্থক। সেই জন্যে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকি। দূর হতে তোমায় দেখি তাই আমার আনন্দের যোগান দেয়, এইটুকু থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত কর না। তোমার আমার সম্পর্কের মাঝে স্থূল চাওয়া-পাওয়ার চুক্তি নাই বা রইল, তবু এ আমার প্রেমের সাধনা। তুমি, তাকে সার্থক করে তোল। আর আমায় ডেক না, তোমার ডাক আমার কাঙ্গাল মনে ঢেউ তুলে, স্থৈর্য্যহারা ক'রে দেয়। আমি না এসে পারি না।

আদিত্য বেদনার্ত্ত হয়ে উঠে বলে—কেন তুমি মনের দোটানার দ্বন্দ্বে দুঃখ পাও? তোমার অবাঞ্ছিতকে মুক্তি দেও নিজের হাতে। মিছে বেঁধে রাখা অস্পষ্ট ইঙ্গিতে?

সুবর্ণা কোন উত্তর না দিয়েই চলে যায়।

এমন ক'রে চলে আসার জন্যে সুবর্ণা নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে, আদিত্যকে সমস্ত খুলে বলার তার কি প্রয়োজন

ছিল? কেন সে উচ্ছ্বাসের স্রোতে তার নিজস্ব মর্য্যাদাকে হারিয়ে ফেলল? আদিত্যের উপর রাগ হয়। অথচ সমস্ত মনটাকে প্রখর ভাবে বিশ্লেষণ করে কোথাও এতটুকু সামর্থ্য খুঁজে পায় না যার সাহায্যে সে আদিত্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে। পরম নিরাশায় সে আবিষ্কার করে, এত দিন যে কঠোর সংযমের আচার-গুলোকে সে মেনে এসেছে সেগুলি সবই মিথ্যা। মনের উপর তাদের সত্যিকারের কোন প্রভাব নেই, তাই অন্তর্বিপ্লবে সে অবলম্বন-হীন। এত যে বাঁধন, অনুশাসন, বিধান, তারা ত পারে না অন্তরের অশান্ত বাসনাকে নির্ব্বাপিত করতে? ভুলতে পারে না আদিত্যকে? কোন দিন তাকে দূরে সরে যেতে হবে ভাবলে দুঃসহ বেদনায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। প্রেমের দুর্নিবার শিখা উঠেছে জ্বলে, সকল অনুশাসন আর বিধানকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে। কঠোর সাধনায় গড়া সুনামের প্রাচীর—তার দুর্ভেদ্যতা থাকবে চিরদিন অটুট, এই ছিল তার অহঙ্কার! সেই অহঙ্কারেই আজ তাকে সব চেয়ে বড় বঞ্চনার আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে—বঞ্চিত করছে জীবনকে।

অন্তরের দেবতা প্রকাশ হতে চায় নির্ম্মম আলোকে, সে অনাবৃত সত্যকে গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। তাই মিথ্যা বাক্যের মনোহর আবরণে ঢেকে রাখি প্রেম, দূরে সরিয়ে রাখি তোমাকে, পুঞ্জীভূত আঘাতের বেদনা মাথা পেতে নিয়ে আপন রচিত কারাগারে কেঁদে মরি, উত্তীর্ণ হতে পারি না সংস্কারের মোহ, ভাঙতে পারি না প্রাচীর। ওগো, আমি গর্ব্বিতা হৃদয়হীনা নই, আমি শক্তিহীনা, তাই আমি তোমার কাছে কঠিন—আড়ষ্ট—স্বতন্ত্র! ব্যর্থ আক্রোশে, ক্ষোভে সুবর্ণার চোখ ফেটে জল পড়ে।

প্রথম প্রভাতের আলো এসে পড়েছে মন্দিরের চূড়ায়, সদ্যস্নাতা শুভ্রবসনা সুবর্ণা এসে দাঁড়ায় মন্দিরের ভিতরে, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আদিত্য শেষ বারের মত তুলি বুলোচ্ছে, এক টুকরো আলো তির্য্যক্ ভাবে এসে পড়েছে মুখে, সমস্ত মুখ চেপে রয়েছে গভীর দৃঢ়তার সঙ্গে অবসাদের স্পর্শ। দীর্ঘ কয়েক দিনের অদর্শনের পর তার সাক্ষাৎ সুবর্ণার মনকে আর্দ্র ক'রে তুলে; মৃদু স্বরে ডাকে—আদিত্য!

চোখ তুলে তাকায় আদিত্য, ম্লান হেসে বলে—শুভ হোক তোমার প্রভাত!

সুবর্ণা শুধোয়—তোমার প্রভাত? অশুভ গ্রহ যার সঙ্গে ফেরে, শুভ গ্রহটা তাঁর কাছে চিরকালই সুদূরের। আজ আমার তুলির শেষ আঁচড় পড়বে, সেই সঙ্গে শেষের মত থাকাও। আকস্মিক এ কথায় সুবর্ণা বিহ্বল হয়ে যান। কথার রেশে সংগোপন দৃঢ়তা কাণে বাজে তার, প্রাণপণে উদ্বেলিত হৃদয়কে সংযত ক'রে বলে—আমায় এমন ক'রে দুঃখ দিয়ে তোমার কি আনন্দ লাভ হয়?

তোমায় আঘাত ক'রে আনন্দ পাব এত বড় নিষ্ঠুর আমি নই, কিন্তু এমন ক'রে আঁকড়ে থাকাটা যে বড় বেশী নিষ্করুণতা। আশা যেখানে নেই, মিথ্যে মরীচিকায় ঘুরে মরার চেয়ে বিচ্ছেদই শ্রেয়ঃ। সুবর্ণা, দিন যত যাবে, বিদায়ের পথও তত জটিল বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে। আমার জীবনের সমাধান একমাত্র দূরে চলে যাওয়ায়, আরেক সমাধান ছিল তোমার হাতে—আমার জীবনের অচঞ্চল ধ্রুবতারারূপে। কিন্তু সেটা অসম্ভব, তাই আমাকেই যেতে হবে। তৃষ্ণার অন্তর আমার শুষ্ক, পাছে তোমার করুণার অসম্মান করি, পাছে আমার রজনীগন্ধার ধূলো লাগাই, সেই জন্যে তোমার কাছ থেকে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করতে চাই। হয়ত বা আমি ভুল বুঝেছিলাম, তাই তোমায় বার বার আহ্বান ক'রে-ছিলাম তুচ্ছ ধূলায়, সে আসন গ্রহণ করনি বলে কত দুঃখই পেয়েছি। এই ক'দিন গভীর ভাবে চিন্তা করে পেয়েছি সমাধান, তুমি আমার জীবনের ঐশ্বর্য্য—এই পাথেয় সম্বল ক'রে এগিয়ে যাব ধরণীর বুকে। তোমার করুণার অনেক বেশী আমি চেয়েছিলাম, সে অপরাধ ক্ষমা কর।

সুবর্ণা কয়েক মুহূর্ত্ত বেদনায় স্তব্ধ থাকে, তার পর ধীরে ধীরে বলে—আদিত্য, এত দিন বাদে তুমি শুধু আমার করুণাই দেখলে, আর কিছু কি তোমার চোখে পড়ল না? তুমি যদি যেতে চাও, যাও, তোমায় বাধা দেবার কোন অধিকার আমার আজ নেই, কোন দাবী নেই তোমার ওপরে। আমাকে তুমি অস্বীকার করেছ আমার অন্তরের আগুন জ্বালানো দানকে করুণা বলে। দূরে গেলে যদি ভুলে যাও, জানব, পুরুষের কাছে এই স্বাভাবিক। তারা নারীকে জানতে চায় না, তাদের এড়িয়ে যায় অসীম—অজানা বলে। হায় রে, মেয়েরা যে কত অসীম! তুমি যাও আদিত্য, আমার বিলুপ্তি তোমায় সান্ত্বনা দিক। এগিয়ে যাও, পিছনে ফেরার দুঃখ যেন তোমায় না পেতে হয়। বিষাদাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর তার কেঁপে উঠে।

মাথা নত করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে আদিত্য।

একটু চুপ ক'রে থেকে সুবর্ণা প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেদনা ও অভিমানের সংঘাত মনকে ফেনিল ক'রে তুলছে, তাই সে আকুল হয়ে বার বার মিনতি করে, তোমায় যেতেই হবে আদিত্য, থাকাটা কি এতই অসম্ভব? শুধু দিনান্তে একবার দেখা। তুমি নিজের দিকটাই দেখছ—স্বপ্ন দেখছ অবাস্তব আদর্শের। কিন্তু আমি মাটির মানুষ ধুলো-মলিন বাস্তব বুঝি। তোমায় এত দিন যা বলেছি সে সব মিথ্যে—নিজেকে ভুলবার উপকরণ। তোমার থেকে কিছুই আমার বড় নয়। ওগো বন্ধু তোমায় দুঃখ দিয়েছি অনেক—সে দুঃখ নিজেও পেয়েছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো। আদিত্য, আমি নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি আমায় দয়া কর, তুমি যেও না।

অবিচলিত স্বরে আদিত্য বলে—তুমি আমায় ক্ষমা কর সুবর্ণা এ দয়ায় দুঃখই বাড়বে। আমায় যেতেই হবে।

ব্যর্থতায় আকুল হয়ে উঠে সুবর্ণা, সেই সঙ্গে জ্বলে ওঠে অসহ ক্রোধে। এত অনুনয়, মিনতির কোন মূল্যই নেই? কম্পিত কণ্ঠে সে বলে—তুমি যাও আদিত্য, তোমার বাধা আমি হব না। তার পর রুদ্ধ ক্রন্দনাবেগ সবলে চেপে ছুটে বেরিয়ে যায়।

সমস্ত দিন বিক্ষুব্ধ চাঞ্চল্যে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে, অনাহারে অশ্রান্ত কান্নায় দিন কাটাল, সন্ধ্যার পর পারিশ্রমিকের টাকা নিয়ে হাজির হল আদিত্যের ঘরে। অন্ধকারে চুপ করে শুয়েছিল আদিত্য ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে, উঠে ব'সে বলে—তুমি?

ভাবহীন কণ্ঠে সুবর্ণা জবাব দেয়—হ্যাঁ আমি, তোমার পারিশ্রমিকের টাকাটা দিতে এসেছি।

আদিত্য কথাটা কাণে না তুলে বলে—তুমি আসবে এ আমি ভাবিনি।

আঘাত করবে বলে সুবর্ণা এসেছিল, কিন্তু আদিত্যের গলার স্বর শুনে তার মনটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল, সর্ব্বহারার অসহ বেদ

কথার সুরে বেজে উঠে। অধীর হয়ে সুবর্ণা প্রশ্ন করে—তোমার কি হয়েছে?

ম্লান হেসে আদিত্য বলে— জীবনের কাছে যে দেউলে হয়ে গেছে নূতন ক'রে তার কি হতে পারে?

সুবর্ণা সমস্ত দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে, যে কঠিনতা নিয়ে সে এসেছিল তার সবটুকু গলে যায়। করুণ কণ্ঠে সে মিনতি জানায়—তুমি যেও না আদিত্য।

রজনীগন্ধা আমার, পিছু ডেক না। আমার যাওয়া নিশ্চিত, কাল ভোরেই আমি চলে যাব। তোমার এই টাকাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও, তোমার কাছে যা পেয়েছি সে ঋণ জন্মান্তরেও অপরিশোধ্য। এ অপমান তুমি আমায় ক'র না।

বিষাদভরে তাকায় সুবর্ণা—আদিত্য, অপমান তুমিও আমায় কম করনি।

অপমান করব তোমায়? ভুল বুঝেছ তুমি, তোমার মূল্য উপলব্ধি করার জন্যেই আমার সুদূরের পানে যাত্রা। আমার সাধনা থেকে বিচ্যুত ক'র না, আমায় যেতে দাও।

বার বার প্রত্যাখ্যানে সুবর্ণা আবার কঠিন হয়ে ওঠে।

রাতে ঘুমোতে পারে না সুবর্ণা। বেদনা, ক্রোধ, অভিমানের প্রবল আলোড়ন চলে তার মনে। আদিত্য চলে যাবে, এ কথা সে কিছুতেই ভাবতে পারে না। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, মনে মনে বার বার বলে, আদিত্যর কথা মিথ্যে। সে তাকে কোন দিনও ভালবাসেনি, তাই অনায়াসে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এ শুধু কল্পনার রঙিন ছবি আঁকা, তাকে সান্ত্বনা দেবার অতি উঁচু দরের খেলা, দু'দিন বাদে ওর জগতে সুবর্ণার কোন অস্তিত্ব থাকবে না, অন্য নারী এসে সেই স্থান দখল করবে। না, না! সুবর্ণা তা সহ্য করতে পারবে না। শূন্য মনে হাহাকার করে আমি কাটাব সারা জীবন? আর আদিত্য মনের সবটুকু দখল ক'রে আমাকে ভুলে যাবে? এ হতেই পারে না, কিন্তু আদিত্যর দোষ কি? সে ত তাকে বার বার আহ্বান করেছিল বাস্তবের পথে, এগোতে পারলুম না এক পা, ত্যাগ করলুম না যশের জয়মাল্য, আর আজ মিছে তাকে দোষী করছি। নিজের মনের দুর্ব্বলতাকে চাপা দিয়ে, ভাবার ছলে ভুলিয়ে রেখে, আদর্শকে অবাস্তব ক'রে তুলেছি নিজে, যেটার সত্যি-মিথ্যেকে যাচাই করার মত শক্তিও ছিল না, মনের জোরেরও ছিল অভাব। আর আজ যদি আদিত্য তারই কথাকে অবলম্বন করে চলে যেতে চায়, তবে অনুতাপ করা মিথ্যে! কিন্তু স্থির হতে পারে না, মনের ভিতর অশান্ত ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে, আদিত্যকে হারাবার ভয় মনকে ক্রমশ বিকারগ্রস্ত ক'রে তোলে। আদিত্য চলে যাবে—এ কথাটা ঠিক ভাবতেও তার কষ্ট হয়, তার থেকেও তীব্র বেদনাদায়ক মনে হয় আদিত্য তাকে ভুলে যাবে। আদিত্যকে সে যেতে দেবে না, হারাতে পারবে না, আদিত্য ব্যতীত সুবর্ণার মানসিক ঐশ্বর্য্য নিঃস্ব হয়ে যাবে। কিন্তু কেমন করে তাকে ধরে রাখা সম্ভব? অসংলগ্ন চিন্তায় সে অস্থির হয়ে ওঠে, তার অপ্রকৃতিস্থ মনে একটা আবেশিক অনুভব ভাল-মন্দর বিচারশক্তি লুপ্ত ক'রে দেয়। মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে এক সময় পাগলের মত ছুটে গিয়ে সিন্দুক খুলে গয়নার বাক্সটা বার করে, উত্তেজনায় তখন সমস্ত শরীর তার কাঁপছে, মুখে-চোখে পড়েছে বিকৃতির রেখাপাত। গয়নাগুলো নির্দ্দয় ভাবে ছড়িয়ে খুঁজে বার করে ছোট একটা মোড়ক, অত্যন্ত শ্রান্ত ভাবে আচ্ছন্নের মত বুকে চেপে ধরে মোড়কটাকে।—

ক্ষণেক পরে সেই রাত্রে ঘন তমসার বুকে আদিত্যর ঘরে ছায়া পড়ে, যেখানে চৌকীর ওপর থাকে তার চির-অভ্যস্ত এক গেলাস জল। * * *

সারা রাত্রি ধরে জানলার পাশে উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে থাকে সুবর্ণা। ভোর বেলা দাসীর করাঘাতে দরজা খুলে দেয়। ম্লান ভাবে দাসী বলে—আদিত্য বাবুর কি জানি কি হয়েছে, ডাকাডাকিতেও ঘুম ভাঙ্গছে না, কেমন যেন নিস্পন্দ হয়ে আছেন। দেওয়ানজী আপনাকে খবর দিতে বললেন।

দেওয়াল ধরে পতনোন্মুখ দেহকে সামলে নেয় সুবর্ণা, তার পর চোখ বুঁজে শান্ত ভাবে দাসীকে বলে—তুই যা, আমি এক্ষুণি আসছি। ঘরে ঢুকে চুপ ক'রে খানিকক্ষণ বসে থাকে, তার পর উঠে আয়নায় বার বার দেখে—মহাপাপের ছায়াহীন তার পাষাণের মত শুভ্র ললাট তেমনি সমুজ্জলতায় ভাস্বর।

হলিউডের আত্মকথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

৮

আর্থার ভাবপ্রবণ এবং চরিত্রবান। চরিত্রহীন হবার পর যারা চরিত্রবান হয় তারা চরিত্রটার স্বাভাবিক অবস্থাকে সকলের উপরে স্থান দেয়। যারা চরিত্র হারায়নি তারা চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর্থারের নূতন সাথী মাইকেল এবং রিচার্ডসন চরিত্র সম্বন্ধে কোন দিন চিন্তাও করেনি। আজ কিন্তু আর্থারের পক্ষে চরিত্রের কথাটাই বড় হয়ে দাঁড়াল। আর্থার এক দিন বাধ্য হয়ে জানতে পেরেছিল ধনীদের দুর্বলতা কোথায়? আজ তার মনে সেই কথাই পুনঃ পুনঃ জাগতে লাগল—আবার সেই পথে। কেন রিচার্ডসন এবং মাইকেল ত আগিয়ে গেলেই পারে? কথা হল এরা অভিনয় করতে পারবে না। ভয়ানক বদ্‌রাগী, হয়ত কাজ উদ্ধার হবে না। অনেক ভেবে-চিন্তে আর্থার মাইকেল এবং রিচার্ডসনকে বললে, বল ত কি ক'রে তোমরা শয়তানকে হত্যা করবে?

মাইকেল বললে, কাজ করতে বেশিক্ষণ লাগবে না, তোমাকে সে জন্য একটুও ভাবতে হবে না। আমার মনে হয়, তোমার মন বড়ই দুর্বল, উইলীও সে কথা আমাদের কাছে বলেছে। আজ যদিও আমরা এ পথে নূতন কিন্তু আমাদের চরিত্র অটুট। আমাদের তাজা রক্ত মাতা বসুমতী বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবেন। তুমিও এগিয়ে এস, দেখবে, মায়ের কাছে পাপী বলে কেউ নেই। মায়ের কাছে যে যা দেয় তাই তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু এ কথাটাও মনে রেখো, যখনই তুমি কিছু দিতে যাবে সেই দেওয়ার পেছনে যে পাওয়া থাকে তার মর্য্যাদা কতটুকু? আমরা প্রাণ দিতে আসছি এই ভেবে যে, আমাদের দেওয়ার পেছনে রয়েছে সর্বহারাদের পাওনা। আমরা কারো দালাল নই। তোমার দেওয়ার পেছনে যদি হুজুরের মতলব উদ্ধার হয় কিংবা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিক দিয়ে সুবিধা হয়, তবে আমাদের সংগে থেকো না। প্রেসিডেন্ট কে হল না হল, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। প্রোপাগাণ্ডা কাকে বলে তা আমরা ভাল করেই জানি। প্রোপাগাণ্ডা হতে রেহাই পাবার জন্যে আমাদের একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যার নাম 'পিপ্‌লস্‌ ওয়াল্ড'। ছয় পৃষ্ঠায় পত্রিকা পড়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকি। তোমাদের যে পত্রিকা বের হয় তার নাম হল 'সত্যম্‌-শিবম্‌-সুন্দরম্‌'। আমরা সেই পত্রিকার সংগে কোন যোগাযোগ রাখি না। সত্য বলতে কি বুঝায়, জানি না। শিবম্‌ বলতে কিছুই বুঝি না, সুন্দরম্‌ বলতে কিছুই দেখি না।

আর্থার এদের কথা কিছুই বুঝতে পারল না। সে কখনও এ সব বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামাত না। সে জন্য আর্থার শুধু চিন্তা করছিল, কি ক'রে কার্য্য উদ্ধার করবে। অবশেষে সে মাইকেলকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, কি পথ অবলম্বন করলে কাজ সত্বর সমাধান হবে?

মাইকেল বললে, আমি লোকটাকে হত্যা করব আর তোমরা অভিনয় করবে যেন আমাকে ধরতে চেষ্টা করছ। তোমরা আরও অভিনয় করবে যেন আমাকে ধরতে পারছ না। আমার কাজ শেষ হবার পর আমার হাতেরই পিস্তল তোমরা কেড়ে নিয়ে আমাকে হত্যা করবে। পুলিশকে বলবে, কখনও তোমরা আমাকে দেখনি, হত্যাকারীকে হত্যা করেছ মাত্র।

মাইকেলের প্রস্তাব শুনে আর্থার চিন্তিত হল এবং বলল— "রিচার্ডসন এবং তুমি একত্রে অনেক বৎসর থেকেছ সে সংবাদ পুলিশ পেয়ে যাবে, অতএব তোমাদের দু'জনার এক জন এই অভিনয় হতে সরে পড়। আমি বেরজিনকে হত্যা করব আর মাইকেল তুমিই আমাকে হত্যা করবে। আমেরিকাতে যখনই মতের গরমিল হয় তখনই তারা লটারী করে। মাইকেল এবং আর্থারের মধ্যেও লটারী হল। লটারীতে ঠিক হল আর্থার বেরজিনকে হত্যা করবে।

বেরজিন বৃটিশ এবং ফরাসীদের তাঁবেদার এবং সোভিয়েট-বিরোধী। তিনি সোভিয়েট-বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। অবশ্য এ সব কথা আর্থার অথবা মাইকেল জানত না; তারা জানত, এই লোকটা অনেক যুবক-যুবতীর চরিত্র নষ্ট করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও যুবক-যুবতীর সর্বনাশ করবার ফিকিরে আছে। হলিউডের প্রডিউসার এবং ডিরেক্‌টারদের বিরুদ্ধে আমেরিকার পুলিশ অর্থাৎ আইরিশ বড়ই খারাপ ধারণা পোষণ করত। যদি কোন ডিরেক্‌টার অথবা প্রডিউসার নিহত হতেন তবে তারা মামুলী তদারক করেই বিষয়টা চাপা দিয়ে দিত এবং হত্যাকারীকে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে দিত। অবশ্য হত্যাকারীর হত্যা করার উপযুক্ত কারণ আছে কি নাই, তাও খুঁজে দেখত'।

বেরজিন দিবাভাগে ঘুমাতেন এবং রাত্রে কাজ করতেন। তিনি ঘুমাতেন সকাল সাতটায় এবং গাত্রোত্থান করতেন আড়াইটে-তিনটার সময়। তার পরই তাঁর কার্য্য আরম্ভ হত। সে দিনও তার কার্য্য ঠিক সময়েই আরম্ভ হয়েছিল। তখন বিকাল পাঁচটা, অনেক-গুলি লোক এসে নানা কাজে ভিড় করেছে। এক-এক জন ক'রে তার কক্ষে প্রবেশ করছে আর ফিরে আসছে। কারো কাজ হচ্ছে, কারো হচ্ছে না। কেউ বা হেসে বের হচ্ছে আর কেউ মলিন মুখে মাথা নত ক'রে বাইরে চলে যাচ্ছে। আর্থার সকলের শেষে বেরজিনের ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে মাইকেলকে বললে, আমি একা গেলেই হবে। দরকার হলে তোমাকে আমি ডাকব।

সাতটার সময় যখন আর্থার বেরজিনের কেবিন হতে বেরিয়ে এল তখন তার মুখ ছিল শুষ্ক, হাত ছিল অপরিষ্কার। কেবিন হতে বেরিয়ে এসেই মাইকেলকে ডাকলে এবং নিকটস্থ একটা কফি-হাউসে গিয়ে উভয়ে বসে খাবার আনতে অর্ডার দিলে। কেউ সন্দেহ করতে পারলে না আর্থার নরহত্যা ক'রে এসেছে। কফি-হাউস হতে বের হয়ে আর্থার এবং মাইকেল হেঁটেই নিকটস্থ গ্রীক্‌ হোটেলের দিকে রওয়ানা হল। সেখানে রুম ঠিক ক'রেই আর্থার মাইকেলকে বলল, অতি অল্পে কাজ সেরে এসেছি। বুলেটের ব্যবহার করতে হয়নি। একেবারে ছোরাটা বুকের উপর বসিয়ে দিয়ে এ-পার ও-পার করেছি। লোকটি একটি কথাও বলতে পারেনি। যাদের মন দুর্বল তারা এমনি ভাবেই নিহত হয়। এর পরেই আর্থার মাইকেলকে রুমে বসিয়ে রেখে স্নান ক'রে এল। আর্থার স্নান ক'রে ফিরে আসার পর মাইকেল বললে, বড়ই অভিনব উপায় অবলম্বন করেছিলে আর্থার।

হাঁ, তাই করতে হয়। কেউ জানল না, কেউ শুনল না,

জানলাম শুধু আমি আর এই "সারজিকেল" ছুরি। ছুরিটা এতই ধারালো ছিল যে হাড়গুলা পর্য্যন্ত কচ্‌কচিয়ে কেটে গেল। ওহে মাইকেল, তুমি হলে আণ্ডার-গ্রেজুয়েট, বল ত লোকটা এত সহজে আমার কাছে গলা বাড়িয়ে দিল কেন? অনেক পুস্তক পড়েছ, নিশ্চয়ই তার একটা কারণ বলতে পারবে।

এ সব বিষয়ের কারণ বলা বড়ই শক্ত। মনস্তত্ত্ববাদীরাই বলতে পারেন।

রেখে দাও এ সব বাজে কথা, তোমার দ্বারা কিছুই হবে না, পরীক্ষা ফেল করেছ এবং কোথাও কিছু করবার না পেয়ে এদিকে ঝুঁকে পড়েছ। মনে রেখো, যে পথে এসেছ এ পথ বড়ই দুর্গম। নরহত্যা ক'রে এখানে প্রতিশোধ নেওয়া হয় না, কারো বাড়ী লুণ্ঠন ক'রে টাকা জমানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমোদ-প্রমোদের কথা একেবারেই ভুলে যেতে হবে। এখনও এ পথ থেকে ফিরে যাবার সময় আছে, তোমার পক্ষে এই পথ পরিত্যাগ করাই ভাল হবে।

আর্থার, এত রাগ করছ কেন?

রাগ করব না? তুমি বলছ মনস্তত্ত্ববাদীদের কথা, এ সব দিয়ে কি হবে। জেনে রাখো, এ সব আমরা মোটেই পছন্দ করি না। মানুষের সেবাই আমাদের একমাত্র পথ, যখনই আমরা দেখতে পাই, দেশের আইনের চোখে ধুলি দিয়ে নয়, আইন যারা প্রয়োগ করে তাদের কাণ মুচড়িয়ে কতকগুলি লোক দেশের এবং জাতের সর্বনাশ করছে, তখন তাদেরই শুধু আমরা হত্যা করি। সেরূপ হত্যার প্রেরণা থাকা চাই, নতুবা নরঘাতক আর আমাদের মধ্যে কি প্রভেদ রইল। তোমাকে আরও বলছি, এ সব নরহত্যা হতে রেহাই পাবার জন্য আমরা যদি অন্য কোন পথ খুঁজে পাই তবে এ পথ অতি সত্বর পরিত্যাগ করব। সত্বরই একটা সভা হবে, তাতে ঠিক হবে—কোন পথ অবলম্বন করলে আমাদের উদ্দেশ্য অতি সহজে সম্পন্ন হয়। এখন ভেবে নাও মাইকেল, এখানে মনের ক্ষুধা—শরীরের ক্ষুধা মেটাবার কোন পথ নেই। তুমি ভেবে না, আমাদের টাকা নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলতে পাবে। যদি টের পাওয়া যায়, তুমি বিপথগামী হয়েছ তবে এ লোকটার যে অবস্থা হয়েছে, তোমারও সেই অবস্থা হবে।

ইতিমধ্যে আর্থার স্বীয় পোষাক পরে নিল। তার পরই বললে, তুমি যে সংবাদপত্র পড় তা হল কমিউনিষ্ট সংবাদপত্র। কমিউনিষ্টদের মধ্যে অনেকেই ভাবের দিক দিয়ে অনুপ্রেরণাবিহীন। আছে শুধু কথার ভিবাজী। যদি ভাবের প্রেরণা থাকত, তবে ক্যানাডা, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব আমেরিকা ও মেক্সিকোতে আজ সোভিয়েট স্থাপন হয়ে যেত। সমুদয় উত্তর-আমেরিকাতে আজ লোক হা-অন্ন, হা-অন্ন করছে, আর তোমরা ঘরের কোণে বসে ডিসকাশন্ করছ আর ভাবছ; এই ক'রেই কার্য্য উদ্ধার করবে তা কখনও হতে পারে না। যে কোন কার্য্যের পেছনে থাকে উদ্দীপনা, প্রেরণা এবং কর্মক্ষমতা। থাক্ গে এ সব কথা, এখন এ্যালিভেটার ধরে আমরা আমাদের হোটেলে গিয়ে রিচার্ডসনের সংগে দেখা করব এবং যত সত্বর পারি কালিফর্ণিয়াতে চলে যাব।

১৯৩১ সালে এ্যালিভেটারে অতি অল্প লোকই চলাফেরা করত। মাইকেল এবং আর্থার প্রত্যেকে পাঁচ সেণ্ট দিয়ে লিফ্টে উঠার সময় ম্যানি-জেয়ার বললে, কি হে, তোমরা কি বিদেশ থেকে এসেছ?

আর্থার বললে, বিদেশ বলতে তুমি কি মনে কর?

এই ধরে নাও, অন্য কোন ষ্টেট থেকে।

তোমার ধারণা ঠিক, আমরা কালিফর্ণিয়া থেকে এ্যালিভেটার দেখতে এসেছি।

বেশ, ভাল করেছ। লিফ্টম্যান তোমাদের এ্যালিভেটারে বসিয়ে দেবে।

লিফ্টম্যানের সাহায্য না নিয়েই মাইকেল এবং আর্থার এ্যালিভেটারে গিয়ে বসল। এ্যালিভেটার হো-হো ক'রে চলল। আধ ঘণ্টা পর তারা এ্যালিভেটার হতে নেমে পড়ল এবং নিজের হোটেলে এসে রিচার্ডসনের সংগে মিলিত হল। রিচার্ডসন তখন একটা মস্ত বড় বই পড়ছিল। এদের দেখা মাত্র রিচার্ডসন বললে, দেখে সুখী হলাম।

মাইকেল কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রিচার্ডসন তখনই মুখে আংগুল দিয়ে ইসারা ক'রে বলবো,—শুন, পাশের ঘরে কি হচ্ছে।

করুণ কণ্ঠে, বলছিল, আমাকে যদি খেতে দাও তবে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে রাজী আছি।

তুমি পেট ভরে খেতে পাবে, এ বিষয়ে আমরা তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, কিন্তু সেই লোকটিকে আমাদের পাইয়ে দিতে হবে। যদি পাইয়ে দিতে না পার তবে তোমাকে আর একটি কাজের ভারও দিতে পারি, সেই লোকটার কফিতে তুমি এই ক'কৌটা ঔষধ ঢেলে দেবে তাতেই আমাদের কাজ হবে। যদি এই কাজটি করতে পার তবে দশ হাজার ডলার পাবে।

এর পর আর কিছুই শুনা গেল না।

রিচার্ডসন এবং তার বন্ধুগণ রুম হতে বের হয়ে সেন্ট্রাল পার্কের দিকে রওয়ানা হল। সেখানে পৌছার পর রিচার্ডসন বললে, আমার মনে হয়, কারো স্বর নষ্ট করার ব্যবস্থা হচ্ছে। গায়কের স্বর যদি নষ্ট ক'রে দেওয়া হয় তবেই তার জীবনের শেষ। গায়ক বোধ হয় অল্প টাকা নিয়ে গাইতে রাজী নয়, সে জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মাইকেল বললে, এরূপ প্রত্যহই অনেক কিছু ঘটছে, কিন্তু এর প্রতিকারের পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমরা ত শিক্ষিত লোক, এ সব পাপ হতে রেহাই পাবার একটা উপায় নির্দ্ধারণ কর। দেখবে, আমরাই সে পথ পরিষ্কার করে আমেরিকার জনগণকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হব।

রিচার্ডসন এ সম্বন্ধে কিছু না বলে কি করে রুশিয়ান লোকটাকে হত্যা করা হল, সে কথাই পুংখানুপুংখরূপে জিজ্ঞাসা করল। মাইকেল যা জানত সবই বলল, কিন্তু রুমের ভেতর কি হয়েছিল কিছুই বলল না। রিচার্ডসন সে কথাই আর্থারকে জিজ্ঞাসা করল।

আর্থার প্রশ্নটা শুনে কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না, শুধু বললে, চুপ কর, এ সব কথা জেনে কোন লাভ হবে না। আমি ত বলছিই, তোমাদের বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, সেই বিদ্যা-বুদ্ধি খাটিয়ে এমন একটা পথ বের কর যাতে আর পাপ না থাকে।

আর্থারকে প্রশ্ন করার মত সাহস কারো ছিল না। আর্থার সেন্ট্রাল পার্কের বৃক্ষরাজির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল, তার পর ঠিক করল, আজই সন্ধ্যার পর এখান থেকে রওয়ানা হতে হবে। মিঠারের সংগে এবার বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে হবে। চরিত্র-চরিত্র করে মাথা পিটালে চলবে না—এবার কিছু জানবার দরকার।

মূর্খ হয়ে আর কত দিন থাকা চলে। মনস্থির ক'রে আর্থার বললে, আজই আমরা এখান থেকে চলে যাব, চল আমরা এখনই যাই।

রিচার্ডসন এবং মাইকেলের পূর্ব দেশের সহরগুলি দেখে যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর্থারের আদেশ কেউ অমান্য করতে সাহস করল না। আর্থারের মুখ গম্ভীর এবং গভীর চিন্তামগ্ন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রেল-গাড়ীতে গিয়ে চড়ল। গাড়ী চো-চো ক'রে চলল। যাত্রীরা সবাই আপন-মনে বসে রইল। আমেরিকার রেল-গাড়ী বড়ই আরামদায়ক। প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর বয় এসে কারো কিছু চাই কি না জিজ্ঞাসা ক'রে যায়। অনেকেই কিছু চাইছিল না। হয়ত তাদের পকেটে বড় কিছু ছিল না। কিন্তু কয়েকটা লোক খানা-পিনার দিকে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছিল। ডাইনিং কারে গিয়ে হটগোল আরম্ভ করছিল। টাকার গরম বোধ হয় তারা সহ্য করতে পারছিল না।

এরা কে ?

এরা কে, জানবার বাসনা রিচার্ডসন এবং মাইকেলের একটুও হল না। আর্থার একেবারে বদলে গেছে। সে ডাইনিং কারে গিয়ে বসল এবং দু'খানা সস্ট বিস্কুট ও এক গ্লাস জল আনতে আদেশ দিল। আর্থারের অর্ডার পেয়ে বয় ভাবল, লোকটা নিতান্ত উপবাসী, কিছু পেটে না দিলে নয় বলেই কষ্ট ক'রে এখান পর্য্যন্ত এসেছে। আর্থারের প্রতি বয়ের দয়া হল।

বয় বললে, বস্, আজকাল আমরা পাই-জাতীয় এক রকমের পিষ্টক সর্বসাধারণকে বিনামূল্যে খেতে দিচ্ছি, আপনার জন্য তার কিছুটা আনব কি ?

নিশ্চয়ই প্রিয় বন্ধু! বুঝতেই ত' পেরেছ ব্যাপারখানা কি ? ইয়ে—কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম যদি কিছু মনে না করেন।

বলুন—বলুন, কিছুই ভাবতে হবে না।

এরা কে বন্ধু ?

এদের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। এককথায়—যাকে বলে চিত্রশিল্পী—যাদের দেখলেই গা-বমি করে।

একেবারে বিক্রি হয়ে গেছে ?

এর চেয়েও বেশী।

কোথাকার লোক ?

ব্রন্‌জ্।

ইহুদী না কি ?

না বস্, একেবারে খাঁটি আমেরিকান্।

এমন হবার কারণ কি ?

অর্থাভাব—

কথার শেষ এখানেই হল। আর্থার এদের কথাবার্ত্তা ও অংগ-চালনাই লক্ষ্য করছিল। বুঝল, এদের সব গেছে, তবে অতি অল্প মূল্যে বিক্রি হয়েছে। একটু সয়ে থাকলে বেশী মূল্যে বিক্রি হতে পারত।

লস্‌এঞ্জেলস্ পৌঁছার পর আর্থার নিজের ঘরে এসে মিষ্টারের কাছে সকল কথা খুলে বলল। মিষ্টার আর্থারের কথা চিত্রের মত শুধু শুনেই যাচ্ছিল। এর পরে যখন আর্থার বারংবার লোকের অর্থাভাবের কথা বলে উপসংহারে দুষ্কর্মের বোঝটা অর্থাভাবের উপরেই চাপিয়ে দিচ্ছিল, তখন মিষ্টার চেয়ার থেকে উঠে বললেন—হাঁ, সে কথাটাই চিন্তার বিষয়। কি ক'রে এই বিষয়ের সমাধান হয় তারই কথা ভাবতে হবে। সবই ভেবে দেখব বলছি, কিন্তু দেশের লোক মরতে বসেছে সে দিকে তোমার লক্ষ্য আছে কি ? আমেরিকার লোক ব্রেড-লাইনে দাঁড়িয়ে রুটি পাচ্ছে না তা কি তুমি লক্ষ্য করেছ ? আমি জানি, এ সব অত্যাচার হতে রক্ষা পেতে হলে বিদ্রোহ করা বিশেষ দরকার, কিন্তু রুশিয়া, ইউরোপ, চীন, জাপান—কোথাও রুটি নেই। যদি আমরা বিদ্রোহ করি তবে রুটি পাব কোথা হতে ? লোক চাইবে রুটি, বিদ্রোহ মুষ্টিমেয় কয়েকজন করবে মাত্র, তখন আমরা করব কি ? এক কাজ করা যাক্, যেমন ভাবে আমরা চুপ করে বসে আছি, তেমনি চুপটি করেই থাকা ভাল। দেখা যাক্, রুজভেল্ট কি করেন। ইতিমধ্যে যদি দরকার মনে কর তবে একটা লংগর খুলে ফেল, অনেক লোক খেয়ে বাঁচবে।

না মিষ্টার, তা হবে না—লুমপেণ্টদের খেতে দেওয়া আর নিজের বুকে নিজে ছোরা মারা একই কথা। সে দিন লুমপেণ্ট কথাটা অভিধানে দেখতে পেয়ে অনেক ভেবেছিলাম। লুমপেণ্টদের সংগে হবোদের বেশ মিল আছে, তারা কাজ করবে না অথচ ভিক্ষা করবে। নীরবে বসে সময় কাটাবে অথচ বিনামূল্যের লাইব্রেরীতে বসে বই পড়বে না। যারা প্রকৃত পক্ষেই সাহায্য পাবার উপযুক্ত তাদের পক্ষে সাহায্য পাওয়া কষ্টকর নয়, এখনও আমেরিকাতে অনেক হৃদয়বান লোক আছেন যাঁরা হুভার-শ্রেণীর লোককে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। শোন মিষ্টার, আজ আমি বড়ই পরিশ্রান্ত। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা সিনেমার কাজ পাবার জন্য কাজপ্রার্থীদের লাইনে দাঁড়াব। দেখব, যে লোকটা লোক বাছাই করে তার চরিত্র কিরূপ। যেতে পারবে ত ?

যেতে পারব নিশ্চয়ই, আর্থার, কিন্তু কথা হল, সেখানে গিয়ে যখন অত্যাচার-অবিচার দেখতে পাব তখন আর সহ্য করতে পারব না। হয়ত সেই লোকটাকে হত্যা করতে তখনই তোমাকে আদেশ করব। এর চেয়ে কাজ যাতে ন্যাশনেলাইজড, হয় তার চেষ্টা করলে হয় না ?

আর্থার চিন্তা করে বললে, কাজ কি করে ন্যাশনেলাইজড, হয় তা ত ভেবে পাচ্ছি না মিষ্টার। এ'সব কথা ছেড়ে দাও, কাল আমি সেখানে একাই যাব, তার পর যা দেখতে পাব তারই একখানা ছবি এঁকে তোমাকে দেব, কেমন রাজী আছ ত ?'

বৃদ্ধ বললে, তাই কর।

পরদিন সকাল বেলা ঠিক সাতটার সময় আর্থার লাইনে দাঁড়াল। তার পালা আসার পর তাকে ডাকা হল। আর্থারের মুখাকৃতিতে শয়তানীর বদলে শান্তি বিরাজ করছিল। যৌবন তার নাকে-মুখে উথলে পড়ছিল। কর্মকর্ত্তা আর্থারকে একটি কথাও না বলে কাজে নিযুক্তি-পত্র দিয়ে দিলেন। কাজে নিযুক্তি-পত্রখানা নিয়ে আর্থার গেল সুর পরীক্ষা করাতে। সুর-পরীক্ষক লোকটি খুবই ভাল। সে আর্থারের সংগে দু' একটি কথা বলেই পাঠিয়ে দিল ডাইরেক্টরদের কাছে।

ডাইরেক্টরগণ নানা মতে নানা ভাবে বসে কাজ করছিলেন। ডাইরেক্টরদের ঘরে প্রবেশ করা মাত্র এক জন আর্থারকে একটি রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। রুমে প্রবেশ করেই বুঝল, এটা লোক পরীক্ষার ঘর নয়, এই ঘরে লোককে বিপথগামী করা হয়। সে ধৈর্য্য

ধরে বসে থাকল। কতক্ষণ পর এক জন ডাইরেক্টর ঘরে প্রবেশ করেই জিজ্ঞাসা করলেন, কখনও বনে জংগলে বেড়িয়েছ ?

না, বস্‌।

তবে তুমি গোবেচারী বই আর কিছু নও দেখছি। সল্ট-লেকের তীরে গিয়ে থাকতে পারবে ?

নিশ্চয়ই, বস্‌।

সেখানে পাক ক'রে খেতে পারবে ?

নিশ্চয়ই।

কাউ-বয়ের পার্ট নিয়ে সেদিকের ঘোড়ায় চড়তে আপত্তি নেই ত ?

না বস্‌।

তুমি নিযুক্ত হলে—বলেই এক জন ডাইরেক্টর ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন এবং দ্বিতীয় ডাইরেক্টর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি আর্থারকে আরও কিছুটা উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। আর্থার ঘর হতে বিদায় হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল এবং অন্যান্য উমেদারদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় তাই দেখতে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। একটি যুবতী ঘর হতে বের হয়ে এসে চোখের জল মুছে হন-হন ক'রে চলে যাচ্ছিল। আর্থার দৌড়ে গিয়ে তার সংগে পা মিলালো এবং চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করল, মেম, তোমার কি হয়েছিল ?

তুমি কে হে—বলেই যুবতী থমকে দাঁড়াল।

আর্থার বললে, ভয় করো না মেম, যদি বল, তবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি। বল, তোমার কোন সাহায্যের দরকার আছে কি না ?

তোমাকে ত ডাইরেক্টরদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখেছিলাম, তুমি কি তাদেরই লোক ?

তা হবে কেন, আমি চাকরির জন্য গিয়েছিলাম, চাকরি আমি নেব না ঠিক করেছি।

যুবতী বললে, এরূপ সুবুদ্ধি হবার কারণ কি ?

ভবিষ্যতে গৃহী হতে চাই, সে জন্যই এ পথ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

যুবতী আর্থারের হাত ধরে বলল, যদি তোমার তাই ইচ্ছা থাকে তবে বড়ই ভাল কথা, চল আমাদের বাড়ীতে যাই।

আর্থার আপত্তি করল না।

যুবতী থাকত কালিফরণিয়া ষ্ট্রীটে। এদিকে পুরান পাপী এ্যকতর এবং একৃত্রেসরা থাকে। যখন যুবতীর পিতা এদিকে ঘর নিয়েছিলেন তখন কালিফরণিয়া ষ্ট্রীটে এই পাপীর দল আড্ডা গাড়েনি। যুবতী তার ঘরের সামনে এসেই আর্থারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে নিকটস্থ প্রভিসন ষ্টোর হতে এক বোতল দুধ এনে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল। নীচের তলায় তিন রুমের একটি ফ্ল্যাটে যুবতী প্রবেশ করল। সেখানে যুবতীর মা-বাবা যুবতীর অপেক্ষায় ছিল। যুবতীকে দেখেই যুবতীর মা বললে, কি হল মীসি ?

বেশ ভালই হয়েছে মা, সংগে এক জন লোক এনেছি, তিনিও সিনেমাতে কাজ করতে ভালবাসেন না।

মীসির মা চীৎকার ক'রে বললেন, চাকুরি হয়নি ?

না মা, সিনেমার চাকরি করব না।

এই যে লোকটিকে সংগে ক'রে নিয়ে এলে, তাকে ত এক পেয়ালা কফি দিতে হবে, দুধ যে ঘরে নেই, সে কথা জানিস্‌ ?

দুধ নিয়ে এসেছি। আর একটা কথা বলে দিচ্ছি মা, তোমরা টাকা চাও, আমি টাকা এনে দেব নিশ্চয়ই, কিন্তু সিনেমার কাজ ক'রে নয়, বারবনিতা-বৃত্তি অবলম্বন করতে আমি পারব না, এতে আমাদের পরিবারের একটি লোকও না থাকুক তাতেও দুঃখ হবে না।

পিতা স্ত্রীর দিকে মুখ ক'রে বললেন "আমি বলছিলাম না, আমার মেয়ে এ সব কাজ করতে পারবে না। এখন আমি বের হই, দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না ?

আর্থার বললে, আপনাকে বের হতে হবে না, আমি যার বাড়ীতে কাজ করি সেই বাড়ীর বৃদ্ধ এক জন পাচিকা চান, আপনার মেয়ে যদি পাচিকার কাজ করেন তবে সেখানে কাজ পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। দাঁড়ান, আমি ফোন করে আসি, নতুবা তিনি লোক নিয়ে নিবেন,—বলেই আর্থার বেরিয়ে গেল এবং নিকটস্থ ফোন-বক্সে বৃদ্ধকে আনুপূর্বিক সকল ঘটনা জানাল। যুবতীকে পাচিকার কাজে নিযুক্ত করতে হবে বলেও অনুরোধ করল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল, ওদের ফোন নম্বর কত বলতে পারিস্‌ ?

এখন ফোন নম্বরের দরকার নেই, ওদের ঘর হতে বিদায় নিয়ে আসবার সময় ফোন নম্বর নিয়ে আসব। আমি ঘরে আসবার পর ফোন করলে ভাল হবে বলেই আর্থার ফোন ছেড়ে দিল।

মীসির ঘরে এসে দেখলে তার দু'টি ছোট ভাই খাই-খাই ক'রে ঘর তোলপাড় করছে। সে তাড়াতাড়ি মীসিকে একটি ডলার দিয়ে বললে, এদের জন্য এখন কিছু খাবার নিয়ে এস, রুটি ত পাবে না, ফল পাবে, বিস্কিট পাবে, এ সবই নিয়ে আসবে। ভেব না, তোমাকে ডলারটি দান করছি, আমি হলাম মজুরের ছেলে, আমরা দান করি না, কর্জ দেই, তোমার চাকরি হলে ডলারটি ফেরত দিতে হবে।

আর্থারের কথা শুনে মীসির মুখ পরিষ্কার হয়ে গেল। মিসা নিকটস্থ প্রভিসন সপ হতে মস্ত বড় একটা রুটি, সামান্য মাখন এবং কতকগুলি সবজি নিয়ে এল। রুটিটা দেখা মাত্র মীসির ছোট ভাইটি আনন্দে নাচতে লাগল। তার বড়টির মুখ হতে লালা বের হতে আরম্ভ হল। মা এবং বাবা সতৃষ্ণ নয়নে রুটির দিকে চেয়ে থাকলেন। কফি হবা মাত্র প্রত্যেককে কফি এবং রুটি-মাখন দিয়ে মীসি সামান্য এক টুকরা রুটি মুখে দিয়ে এক গ্লাস শীতল জল খেল। আর্থার বুঝল, মীসি অন্তত দু'দিন কিছুই খায়নি, সে জন্যই জল খেয়ে নিচ্ছে।

জল খেয়ে নিয়ে মীসি একটু ঠাণ্ডা হয়ে আর্থারকে জিজ্ঞাসা করল, বৃদ্ধের সংগে তোমার কি সম্পর্ক ?

আর্থার বললে, কোন সম্পর্ক নেই। পূর্বে আমরা একই গোলা-বাড়ীতে কাজ করতাম। বৃদ্ধ আজীবন কাজ ক'রে ব্যাংকে অনেক টাকা জমিয়েছে। আমারও কাজ ছিল না, ভাবলাম, একবার শহরে গিয়ে দেখি সেখানে কিছু করা যায় কি না। বৃদ্ধের উপদেশেই সিনেমার কাজ পাই কি না দেখবার জন্য গিয়েছিলাম। কাজ পেলাম না, ডাইরেক্টর লোকটা বড়ই খারাপ, আমাকে সে পছন্দ করলে না। তার জন্য আমি চিন্তা করি না। আমার কাছে যা আছে তাই দিয়ে কয়েক মাস চলে যাবে। বৃদ্ধ আমার কাছ হতে

যদি বৃদ্ধের কাছে কাজ কর তবে সুখী হতে পারবে। বৃদ্ধের অনেক পরিচিত লোক আছেন। যদি বৃদ্ধ চায় তোমার বাবাও কোথাও একটা চাকরি পেয়ে যান তবে হয়ত তোমার বাবার চাকরি পেতে কষ্ট করতে হবে না। এখন আমি যাই, তোমাদের ফোন নম্বরটা বলে দাও, হয়ত বৃদ্ধ আমার পৌঁছার পরই তোমাকে ডেকে পাঠাবে। আর্থার মাসির ফোন নম্বর নিয়ে হলিউডের দিকে রওয়ানা হল।

ঘরে পৌঁছেই আর্থার মাসির কথা মিষ্টারের কাছে বলল। মিষ্টার মাসিকে চাকরি দিতে রাজী হল। মাসির সংগে আর্থারের কি কথা হয়েছিল সবই বৃদ্ধকে বলল।

বৃদ্ধ একটু হাসল, তার পর বলল, বেশ ভালই করেছ, এখন মাসিকে ফোনে ডেকে পাঠাও, তবে দ্বিপ্রহরে রেঁস্তোরায় যেতে হবে না।

বৃদ্ধের ঘরেই ফোন ছিল। ফোনের কাছে গিয়ে প্যান্টের পকেট হতে একটি নিকেল বের ক'রে যখন আর্থার শ্লটার-বাক্সে নিকেলটি ফেলতে যাচ্ছিল, তার হাত যেন কেঁপে উঠছিল, শরীরে বেশ একটা অস্বস্তি মনে হচ্ছিল। নিকেলটি শ্লটার-বাক্সে পড়া মাত্র ডায়েলের রিং বেজে উঠল। আর্থার ডায়েল ঘুরিয়ে রিসিভারটি কাণের কাছে আনা মাত্র শুনল, অস্পষ্ট স্বরে কা'রা আনন্দ প্রকাশ করছে। 'হ্যালো' বলা মাত্র আর্থার বললে, তুমি মিসী?

হাঁ।

তাড়াতাড়ি ক'রে চলে এসো। এ বেলা তোমাকেই পাক করতে হবে। আসছ ত?

হাঁ, আসছি বস্।

আর্থার হাত থেকে রিসিভারটা রেখে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

[ক্রমশঃ।

Walter de la mare অবলম্বনে

"অব দি গ্রাউণ্ড"

সলিলকুমার দাশগুপ্ত

তিন বন্ধু এক দিনেতে আচ্ছা খেয়ে তাড়ি;
বাজী তারা রাখলে নাচের বললে বুড়ো ধাড়ী।
জামা-কোট খুলে তারা, আগে গির্জ্জায় সোজ';
নাচতে তারা লেগে গেল, খুলে জুতো-মোজা।
জিতলে পাবে দু'টাকা, হারবে যারা দেবে,
নইলে তারা খুনোখুনির মতই কিছু ক'রবে।
এক—দুই—তিন, নামলে তা'রা কোমর দুলিয়ে,
তাড়ি খেয়ে মাথা তাদের যায় না ঘুলিয়ে।
তবুও না থামে তা'রা, লাফিয়ে সোজা চলে,
বেট্স্ নামের বন্ধু কিন্তু হাঁপিয়ে তাদের বলে,—
থাম না বন্ধুরা ভাই, আমি যে আর নারি;
এমন বাজী রেখে আমি নাচতে নাহি পারি।
বাদ গেল এক, থাকল দু'জন, জাইল্স ও টারভে,
এদের মাঝে জিতবে যে জন সেই ত' টাকা পাবে।
তিন মাইল-টাক্ নেচে তারা এলো নদীর তীরে,
জাইল্স, নাচা থামিয়ে ডাকে—বন্ধু টারভে ওরে—
জিতলে তুমি, এসো এখন, ক্ষান্ত লাগাও নৃত্যে,
নদীর ধারে বসে বন্ধু, হাওয়া লাগাও চিত্তে।
কে শোনে কার কথা; টারভে নামে জলে,
কিছুই তারা পায় না দিশা, কাঁদতে থাকে স্থলে।
ডাকাডাকি ক'রে যখন, পেল না তারে আর,
ফিরতে হ'ল, অনেক পরে, দুঃখ ক'রে তার;
কিন্তু তারা ভুল করেনি, ফেলতে টাকা জলে,
জানে তারা, দেবতা দেবেন; পাতাল-বাড়ী গেলে।

গোপাল ভাঁড়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

৯

ক্লাইবের প্রভাব খুবই বাড়িল নবাবকে কৌশলে পরাভূত করিয়া। বণিকের জাতি ব্যবসায় করিতে আসিয়া একটা বিরাট রাজ্যের পত্তন করিল একটা বাপে-তাড়ান-মায়ে-খেদান ছেলের দ্বারা। সে ছেলে ক্লাইব। দুর্ভাগা দেশ এটা। তাহা না হইলে সব থাকিতে এ দেশের লোক সর্ব্বহারা হইবে কেন ?

সর্ব্বহারা লোকদের কথা স্মরণ-পথে উদিত হইলে গোপালের চক্ষু হইতে মুক্তা-ধারা ঝরিয়া পড়িত অবিরাম। তিনি ভাবিতেন এবং লোকের আছে বলিতেন—ও-জাতটা এ দেশে না আসিলেই দেশের পক্ষে অশেষ মঙ্গল হইত। তাহাদের আগম-নির্গমের তিনি তুলনা করিতেন ছুঁচ ও ফালের সঙ্গে।

এই তুলনা-ব্যাপারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত এক দিন তর্ক-বিতর্ক হইল খুব। মহারাজের কথা—তাঁহার পুনর্জ্জীবন লাভ হইয়াছে ক্লাইবের সাহায্যে; সুতরাং কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হওয়া তাঁহার মানবোচিত সহজ ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে কৃতঘ্নতা-পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে। সে পাপ করিতে তিনি কিছুতেই রাজী নহেন।

গোপাল তাহার উত্তরে বলেন—'মহারাজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মহানুভবতারই পরিচয়। উপকার পাইয়া ভুলিয়া যায় যে সে উপকার, সে নরাধম। আমিও ক্লাইবের কাছে অশেষ ঋণী মহারাজের প্রাণ-রক্ষার জন্য। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না, নিমন্ত্রণ করিয়া যে শত্রুকে ঘরে ডাকিয়া আনিতেছি, সে আমার জাতি ও দেশের মিত্র হবে না কিছুতেই।'

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র হাসিয়া বলেন—'শ্যাম ও কুল দুই রাখছ গোপাল !'

গোপাল বলিলেন—'শ্যাম ও কুল দুই রেখেছিলেন রাধারাণী। আমি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। কিন্তু ফিরিঙ্গীকে বুঝে উঠা সাধ্য নহে আমার। তবে এটা নিশ্চয়ই বলব, নোংরা-ক্লাইবের নোংরা-পথ এখন বেশ সুপ্রশস্ত হবে; কিন্তু কায়েমী হবে না কিছুতেই। আজ হোক্, দু'শো বছর পরে হোক্, ক্লাইবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ওদের এ দেশ ছাড়তে হবে—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়লেই।'

'ওঃ, তুমি ত' ভবিষ্যৎ-বক্তা হয়ে দাঁড়ালে দেখছি গোপাল ! কিন্তু ক্লাইব যে দিন রাজবাটীতে এলেন, সে দিন তুমি ত' আগ্ বাড়িয়ে তাঁর হাতে হাত মেলালে। সেটা ভুলে যাচ্ছ বুঝি ?'

'ভুলব কেন মহারাজ ! মহারাজের জন্য প্রাণটাও দিতে পারি হাসতে হাসতে।'

তর্ক-বিচারের শেষ ঐখানে। যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল সংসার।

খুঁটিনাটি ধরিয়া রঙ্গ-বিদ্রূপ করা গোপালের প্রকৃতিগত স্বভাব। রাজ-দরবারে বসিয়া গোপাল দেখিলেন—একখানা পুঁথি কবি ভারতচন্দ্র মহারাজার হাতে দিতে দিতে বলিতেছেন—'ধরুন, ধরুন মহারাজ, রস উপচে পড়ছে।'

পুঁথি পাঠ করা হইল রাজ-দরবারে। সে পুঁথি "বিদ্যা-সুন্দর।"

আঁকিয়া-বাঁকিয়া রঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া গোপাল বলিলেন—'যা বাক্যরসাত্মক, তাই কাব্য। "বিদ্যাসুন্দরে" কবি রস ঢেলেছেন খুব; কিন্তু রসে গেঁজলা উঠেছে, রস তাড়ি হ'য়ে গেছে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ফলে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষটা কি, তা মহারাজাও জানেন, আর কবিও জানেন।'

কথাগুলো কাহারই ভাল লাগিল না। কিন্তু গোপাল রাজ্যের সুহৃদ ও মহারাজার চিরানুগত শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই সর্ব্বজনপ্রিয়, সর্ব্বত্র পরিচিত। সেই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইল না এ কথা বলার জন্য। তাহা হইলেও কাণাঘুষা চলিতে লাগিল, গোপাল নিশ্চয়ই বর্দ্ধমান হইতে কিছু অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে।

গোপালের কাণ, জিহ্বা দুই-ই সাফ। তাহার উপর তাঁহার বুদ্ধি ক্ষুরধার। গোপাল ভঙ্গী সহকারে বলিলেন—

'অনুগ্রহের কাঙ্গাল নহে কোনো দিন গোপাল,
নিগ্রহেতে ভয় পেয়ে সে হয় না অসামাল।
কৃষ্ণ ভ'জে চিনেছে সে কৃষ্ণচন্দ্র রায়,
সত্য যাহা বলতে তাহা তাই না ডরে কায়।'

এই ব্যাপার লইয়া বেশ একটা দলাদলি সৃষ্ট হইল। গোপালের মিত্রও ছিল যেমন, শত্রুও ছিল তেমনি। সুযোগ-সুবিধা পাইয়া তাহারা বেশ মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহাদের চেষ্টা হইল মহারাজার সাথে গোপালের বিরোধ সৃষ্টি করা। গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল গোপালকে উচ্ছেদ করিতে। কিন্তু কল্পনা যতটা সহজ, কাজ করা ততটা সহজ নহে। বিচ্ছেদের রন্ধ্র বন্ধ দেখিয়া রন্ধ্র-অন্বেষণকারীর দল সে পথ প্রত্যক্ষ ভাবে ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাদের মনের কোণে দ্বেষ-হিংসা-ক্রোধ বাসা বাঁধিয়া রহিয়া গেল এবং সেগুলা মূর্ত্ত হইয়া ভূতের মত উঁকি মারিতে লাগিল কামচরের চেহারায়।

গোপালের এক অহেতুক গুপ্ত শত্রু ছিল—নাম তাহার কম্বু। রঙ্গ-রহস্যে গোপাল তাহার নাম দিয়াছিলেন—স্বয়ম্ভু। স্বয়ম্ভু হইলেও, গোপালের ভাষায় কম্বুর ছিল পৈত্রিক প্রাণ। কম্বুর পিতৃদেব ছিলেন সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু চাকরী-স্থলে প্রভুর মাথায় হাত বুলাইয়া গাঁটরী বাঁধিয়া তিনি হইয়া পড়িয়াছিলেন মহাপ্রভু। তাঁহার চাল-চলন ও বলনে প্রকাশ পাইত তাঁহার তুল্য পরহিতব্রতধর মানুষ নাই সারা দেশে। টাকার ঝন্‌ঝনানিতে তিনি মানুষ বশ করিবার প্রয়াস পাইতেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাফল্যও লাভ করিতেন। গোপাল কিন্তু তাঁহার উদ্দেশে বলিতেন—'ক'রে যাচ্ছ যাও চাঁদ, কিন্তু ধোপে টি কুবে না।'

গোপাল ও মহাপ্রভুর মধ্যে দ্বন্দ্বের হয় এই প্রথম কারণ। সেই কারণ ডাল-পালায় বিস্তৃত হইয়া মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল কাল-প্রভাবে। ইচ্ছা করিলে গোপাল এই মহাপ্রভুকে কাৎ করিতে

পারিতেন মহারাজার কাছে দরবার করিয়া। তাহা না করিয়া তিনি শত্রুকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিলেন প্রেমের প্রভাবে। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে।

গোপাল ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও আঘাতের ব্যথা বড় দিতে চাহিতেন না। কিন্তু তাঁহার ঝাঁজাল রহস্য গণ্ডারের চম ও বিদ্ধ করিত। সেই দুর্ব্বিষহ ঝাজে মহাপ্রভু ও তস্য পুত্র অসামাল-বেসামাল হইয়া আজু গোঁসায়ের শরণাপন্ন হইল। আজু গোঁসাই বলিলেন—

'লড়াই দিতে পারি বটে রামপ্রসাদের সাথে,
গোপালভাঁকে কাং করিতে নাই হাতিয়ার হাতে।
কোন্ ফাঁকে যে কি করে সে নাইকো কারো জানা।
মনের মণিকুঠুরিতে দেয় সে হঠাৎ হানা।
আক্রমিত তখন বলে—গেছি বাপ রে বাপ।
ভাণ্ডারী ঐ গোপাল ঠাকুর পোষে কেউটে সাপ।
সাপের ছোবল সামলাবে কে, মৃত্যু যা'তে স্থির,
পার যদি দাও গে সামাল তোমরা দু'জন বীর।'

বিষয়-বিসে জর্জ্জরিত মহাপ্রভু ও তস্য পুত্র বুঝিল—আজু গোঁসাই গোপালের পক্ষভুক্ত ব্যক্তি। দ্বন্দ্ব-কলহে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া মহাপ্রভু রামপ্রসাদকে ধরিয়া গোপালের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। মহাপ্রভুর অভদ্র আচরণের কথা গোপাল ভুলিলেন অনায়াসে। কিন্তু মহাপ্রভু ও ছোট মহাপ্রভু গোপালের বিরুদ্ধে খুটখাট করিতে বিরত হয় নাই জীবনান্ত কাল। তবে তাহা খুব নীরবে। সরব হইলে সমাজ ও রাজ-দরবারে লাঠির ভয় তাহাদের ছিল যথেষ্ট!

"বিদ্যাসুন্দর" কাব্য লইয়া দেশে তখন হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কবি ভারতচন্দ্রের রস পরিবেশন সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু ওটা যে বর্দ্ধমানের বিরুদ্ধে অকারণ কুৎসা রটনা, সেটা বুঝিবার বুদ্ধি অনেকের না থাকিলেও গোপাল তাহা ভালই বুঝিয়াছিলেন এবং মহারাজাকে সে বিষয় সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা কিন্তু সফল হয় নাই—এতটুকুও নহে। বরং তাহার জন্য তাঁহাকে ঘরে-বাইরে লাঞ্ছিতই হইতে হইয়াছিল। এই লাঞ্ছনারই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল মহাপ্রভু ও তাহার বংশাবতংস।

গোপাল এইবার বেশ একটু তিক্ততা অনুভব করিলেন। তাহার ফল দারুণ বিরক্তি। এ বিরক্তি নিজের উপর। 'সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎমা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'—

—নীতিকারের যে কত মূল্যবান উপদেশ, সেটা তিনি উপলব্ধি করিলেন এত দিনে। চিরানন্দময় পুরুষের আত্মগ্লানির জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল অন্তরে অন্তরে। বৃশ্চিক দংশনের জ্বালার তুল্য সে জ্বালা। তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না গোপাল। তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প করিলেন তিনি। ঘরে আর মন টিকিল না তাঁহার।

ঠিক সেই সময়ে রাধানগর হইতে গোপালের জ্যেষ্ঠাগ্রজ কল্যাণ সাদর আহ্বান করিলেন গোপালকে। গোপালের বৃদ্ধ পিতা দুলাল-চন্দ্রও বহরমপুর হইতে অনুজ্ঞা করিলেন কল্যাণের সংবাদ লইবার জন্য; কারণ, বহুকালাবধি কল্যাণের সংবাদ তিনি পান নাই। নির্দ্দেশ ছিল—কল্যাণকে লইয়া গোপালকে বহরমপুরে আসিতে হইবে, কোনো মতে তাহার অন্যথা না হয়।

গোপালের হৃদয়ের বোঝা নামিয়া গেল এই অনুজ্ঞায়। মহারাজ-সকাশে গোপাল নিবেদন করিলেন পিতৃ-আদেশের কথা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে খুবই আপত্তি করিলেন গোপালের কৃষ্ণনগর ত্যাগের প্রস্তাবে। গোপাল ভিন্ন মহারাজা যে এক দণ্ডও থাকিতে পারিতেন না—এই আপত্তিই তাহা প্রমাণ করে।

পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যে একটা মহাপাপ, সে কথা গোপাল বলিবা মাত্রই মহারাজার মতের পরিবর্ত্তন হইল। "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা" বলিতেও গোপাল ভুলেন নাই। গোপালের পিত্রাদেশের মর্য্যাদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অক্ষুণ্ণই রাখিলেন।

সে কালের শিক্ষা ও এ কালের শিক্ষার প্রভেদ কতখানি, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান এই এতটুকু ব্যাপারে। অর্থকরী বিদ্যায় মানুষ মানুষ হয় না, বরং অমানুষ হইয়া পড়ে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ভুরি ভুরি।

সেই বিদ্যাই বিদ্যা, যার প্রভাবে নাশ হয় অবিদ্যা। সেই অবিদ্যাকে মানুষ যদি বিদ্যা বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে ধর্ম, সমাজ, জাতি, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব সব যায় রসাতলে; থাকে শুধু পরিণামে পরিতাপ আর অকেজো হাহাকার। দিন থাকিতে সাবধান না হইলে মানুষকে অভিভূত হইতে হয় অন্ধকারের উপদ্রবে।

তখনকার কালে এই শিক্ষাই ছিল বড় শিক্ষা। সেই শিক্ষার ফলে তাই তখন ছিল দুঃখের মধ্যেও সুখ, অশান্তির মধ্যেও শান্তি, অপ্রাচুর্য্যের মধ্যেও প্রাচুর্য্য, অধীনতাতেও স্বাধীনতা!

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজের দুর্ভাগ্য, এ দেশে মুক্তির আলো দিতে আসিয়া দেশের সংস্কৃতি ও ভাবধারার আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য এই মহাজাতি আপন জাতিকে ভীষণ ভাবে দায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। সেক্সপিয়ার-প্রমুখ মহাকবিদের বিশ্বকাব্য সে কলঙ্ক-কালিমা ঘুচাইতে পারিবে না কিছুতেই। যে জাতির আদর্শ পুরুষ পিতৃসত্য পালন করিতেন চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে যাইয়া, যাহাদের ভ্রাতৃ-প্রীতি প্রকাশ লক্ষ্মণ-চরিত্রে, যে জাতির 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী', গুরু-দক্ষিণার আদর্শ একলব্য, নারীর মহিমা প্রকাশ সীতা-সাবিত্রী, চিন্তা-দময়ন্তী প্রভৃতি চরিত্রে, যাহাদের অভাব ছিল না বীর্য্যবত্তা, উদারতা, মহানুভবতার। সেই জাতির মধ্যেই এখন দেখা যায়, প্রতীচ্য শিক্ষাভিমানী পিতৃ-মাতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃদ্রোহী নরপশু, দেশ-ধর্ম-সমাজদ্রোহী মহা পাষণ্ড, কৃতঘ্ন পিশাচ, মূর্ত্ত ব্যভিচার, মূর্ত্ত মিথ্যা, মূর্ত্ত কাপট্য—উচ্ছৃঙ্খলতা।

কিন্তু শুধু বিদেশী শিক্ষাধারাই কি এই সকল অকরণীয় ও অন্যায়ের জন্য দায়ী? মোগল-পাঠান রাজত্বকালেও ত' শিক্ষা-বিষয়ে অনেক কিছুর ওলট-পালট হইয়াছিল। তখন ত' দেশ ও জাতি এমন উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই। কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, তখনো দেশের লোক মানিত কঠোর সমাজ-শাসন। শাসন-শক্তিই পরাধীন জাতিকে ঠিক রাখিয়াছিল অনুকরণ-প্রিয়তা ও স্বেচ্ছাচারকে নির্মম কশাঘাত করিয়া।

কেবল বিদেশী শিক্ষাকে দোষ দিলে চলিবে কেন? নিজেদের গলদ নিজেদের বুঝিবার খুব দরকার। নতুবা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে দেশ ও জাতি। সেরূপ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের মূল্য নাই কিছুই এবং কোনোই।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়

শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্ত্তী

আমরা আজ কবি গোবিন্দ রায়ের নাম প্রায় ভুলতে বসেছি। বিশ্ব-ভারতীর মত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত-প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যেও যখন তাঁর জীবনী এবং কাব্য-গ্রন্থগুলির উল্লেখ বিষয়ে নানা ভুল-ভ্রান্তি দেখা যায় তখন চিন্তা হয়, সাধারণ পাঠক কি আর তাঁকে মনে রেখেছে? যোগেশ বাগল তাঁর মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থে যেন অতি কষ্টে 'ভারতবিলাপে'র কয়েকটি লাইন তুলে দিয়ে স্মৃতিটাকে কোন রকমে বজায় রেখেছেন। বর্ত্তমানে অনেক খ্যাতনামা সাহিত্য এবং সাহিত্য-রসিকদের মনে একটা ধারণা আছে যে, গোবিন্দচন্দ্র রায় 'ভারতবিলাপ' এবং 'যমুনা-লহরী' ছাড়া আর কোন কবিতাই লেখেননি। এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির মূলে আর যাই থাক্, গোবিন্দচন্দ্রের আত্মপ্রচার-বিমুখ মনের সাথে আমাদের অজ্ঞতাজনিত অবহেলা অন্যতম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে আমরা যতটুকু লিখেছি তাতে সাধারণ পাঠক থেকে বর্ত্তমান বাংলার বিজয়-পতাকাধারী সাহিত্যিকদের ভুল-ভ্রান্তিগুলিও যদি শুধ্‌রে যায়, তাহলেই এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য সার্থক হবে। আমরা ভবিষ্যতে তাঁর অপ্রকাশিত-প্রকাশিত রচনাও যথাসম্ভব সম্পূর্ণ জীবনী প্রণয়নের আশা রাখি। এ বিষয়ে কেউ সাহায্য করলে সাদরে তা গ্রহণ করা হবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাই শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার সাথে কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা তুলে দিয়েই বর্ত্তমান কর্ত্তব্য শেষ করব।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কানড়া গাঁ গ্রামে প্রসিদ্ধ রায়-পরিবারে ১২৪৫ সনের ৬ই কার্ত্তিক (১৭৬০ শক) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গৌরসুন্দর রায় ঢাকার প্রসিদ্ধ আর্ম্মেনিয়ান জমিদার ও নীলকর মিঃ ওয়াইজের ম্যানেজার ছিলেন। গৌরসুন্দর রায়ের তিন পুত্র। গোবিন্দচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দ্বিতীয় পুত্র ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননেতা আনন্দচন্দ্র রায় এবং তৃতীয় পুত্র মুকুন্দচন্দ্র রায় পশ্চিমে ওকালতি করতেন। গৌরসুন্দর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে বড় ছেলেকে আপন শিক্ষানুযায়ী গড়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট হন। ছোট বেলা থেকে দেব-দেবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে গোবিন্দচন্দ্রের মনে নানা প্রশ্ন জাগে এবং ক্রমে ক্রমে তা প্রবল হয়ে উঠে। কিন্তু পিতার শাসন ভয়ে তখন বিদ্রোহী হতে পারেননি।

গোবিন্দচন্দ্র সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ঢাকাতে তখন সংগীতের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। তিনি সংগীতে অনুরক্ত হয়ে অতি অল্প বয়সেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর লেখা সংগীতের সংখ্যা অসংখ্য।

সে সময়ে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল বলে গৌরসুন্দর গোবিন্দ-চন্দ্রের বিয়ে ঠিক করেন। তখন তাঁর বয়স ১৩|১৪ আর পাত্রীর বয়স ৫|৬। কিন্তু এমন সময় গোবিন্দচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হওয়ায় ৫|৬ বৎসর পর ১২৬৪ সনে ১৯|২০ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়।

বিবাহের পর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে এসে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হন। পিতা গৌরসুন্দর এ ব্যাপারে মনে আঘাত পেয়ে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। এই সময়ে তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করলে পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা শহরে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কারণ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ এখানে এই প্রথম। পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে গর্ভবতী স্ত্রী সহ তিনি কিছু দিন শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রয়ে থাকেন এবং এখানে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষের সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। তার পর কিছু দিন গোস্বামী মহাশয়ের সাথে আচড়ায় ও পরে বরিশালে দুর্গামোহন দাসের নিকট অনেক দিন থাকেন। তিনি সেখান থেকে পরিপূর্ণ আত্মনির্ভর হবার জন্য কাশী চলে যান।

কাশীতে তিনি সপরিবারে লোকনাথ মৈত্রেয় নামে এক ব্রাহ্ম ভ্রাতার আশ্রয় লাভ করেন। লোকনাথ এক জন হোমিওপ্যাথ ছিলেন। তাঁর কাছে এই চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষালাভ করে অতি অল্প দিনের মধ্যে সেখানে খ্যাতিলাভ করেন। এই চিকিৎসা সূত্রেই গোবিন্দচন্দ্র কাশীর তদানীন্তন জজ মিঃ আয়রনসাইডের সাথে পরিচিত হন। জজ সাহেব তাঁর চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে আগ্রা বদ্‌লি হয়ে যাবার সময় তাঁকেও আগ্রায় নিয়ে যান। এখানেই তাঁর শেষ জীবন কাটে।

এই সময় গৌরসুন্দর ব্যথিত ও অনুতপ্ত হয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী উইল রদ করে গোবিন্দচন্দ্রের চার পুত্রের নামেও সম্পত্তি যথোচিত ভাবে ভাগ ক'রে দিয়ে সকলকে স্বগৃহে ফিরিয়ে আনলেন। সেই সময় থেকে তিনি মাঝে মাঝে ঢাকা-আগ্রা যাতায়াত করতেন। কিছু দিন পর স্ত্রী অম্বিকা দেবীর মৃত্যু হলে কনিষ্ঠ আনন্দচন্দ্র ও আপন পুত্রদের অনুরোধ অস্বীকার করে আগ্রাতেই রয়ে যান। সেখানে আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন।

শেষ বয়সে প্রথমতঃ কেশব সেনের মুঙ্গের ঘটনা এবং দ্বিতীয়তঃ অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন বলে বাহ্য ধর্ম্মচর্চ্চা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে অবসর সময়টুকুতে ইংরেজী দর্শন শাস্ত্র ও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। নিরীশ্বরবাদ বিশ্বাস করতেন না—ঈশ্বরে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল।

তিনি আত্ম-প্রচারের চেষ্টা কোন দিনই করেননি। নিভৃতে যমুনা-তীরে বসে স্বদেশপ্রেমিক গোবিন্দচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত কবিতা ও গীতিকাব্যগুলি রচনা করেন। গদ্য-সাহিত্যেও তাঁর বিস্তর দান আছে। বাংলার বাইরে থেকেও বাংলাকে তিনি আপনার মধ্যেই দেখতে পেতেন। বাংলার বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে তাঁর অনেক রচনা আজও আত্মগোপন করে রয়েছে। তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনাও রয়েছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দু'-একটি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর ব্রাহ্ম সঙ্গীতের সংখ্যাও অগণিত। তাঁর কোন ভাল ফটো নেই। তিনি মাত্র দু'টি ফটো তুলতে দিয়েছিলেন—ইতিমধ্যে তার একটি সম্পূর্ণ ভাবে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অন্যটির মাত্র একটি 'কপি' আমাদের কাছে আছে। সুযোগ পেলে এক দিন সেটা পাঠকদের সামনে তুলে ধরব। ১৩২৪ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ (১৯১৭, ২রা ডিসেম্বর) তারিখে আগ্রাতে তিনি দেহরক্ষা করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি সেখানের লোকদের উপর আপন চরিত্র ও চিত্ত-মাধুর্য্যের জন্যে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন। তাই মৃত্যুর পর প্রবাসী বাঙ্গালীদের সাথে আগ্রাবাসীরাও তাঁকে অজস্র পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করে তাদের শেষ বিদায়-অভিনন্দন, জানিয়েছিল আর অনেকে তা' করতে না পেরে দুঃখ ও ক্ষতি অনুভব করেছিল।

রচনাবলী

১। গীতি কবিতা (গীতিকাব্য, ১২৮৮)। ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০, মূল্য /১০। 'ভারত-বিলাপ' ও 'যমুনা-লহরী' এই কবিতা দু'টিই মাত্র এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'ভারত-বিলাপ' অতি দীর্ঘ (১১ পৃঃ) কবিতা ;—তোটক ছন্দে রচিত। কবিতাটি লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে গান করা যেতে পারে।

২। গীতি কবিতা (ঐ, ১২৮৮)। ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪ ; মূল্য /১০। 'তাজমহল', 'বাঙ্গালার বর্ষা', 'বৈজ্ঞানিক ও ভট্টাচার্য্য', 'বিজ্ঞান উৎসব' ও কয়েকটি গানে এই খণ্ড সমাপ্ত।

৩। গীতি কবিতা (ঐ, ১২৯১)। ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে, পৃঃ ৪৫ ; মূল্য ৶০। তৃতীয় খণ্ডে বৃন্দাবন মঞ্জুরী (যমুনা-লহরীর অনুসরণ করে লেখা) ১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা। এ ছাড়া 'বারাণসী', 'বঙ্গীয় ভ্রমর' নামে দু'টি কবিতাও আছে। চতুর্থ খণ্ডে 'জীবন-সরোবর', 'অদৃষ্ট', 'বাদল', 'তাজমহলের প্রতি', 'নিশীথ তারকা', এবং আরো কয়েকটি সংগীত স্থান পেয়েছে।

কারও মতে গীতি কবিতার পঞ্চম খণ্ডও না কি বের হয়েছিল। আমরা তার কোন সন্ধান পাইনি। আমাদের মনে হয়, এ ধারণা ভুল।

পুস্তক তিনটিই বর্তমানে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই তিনটি পুস্তকই 'চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা'র উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা সম্বন্ধে জানা যায় যে, পল্লীগ্রামে (শ্রীবাটী) এই সভা স্থাপিত হয় ১২৮৭ সালে। পরে ১২৮৮ সালে কলকাতাতেও এই সভার একটি শাখা-অফিস স্থাপিত হয় জোড়াসাঁকোর ৮নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেনে। এই খণ্ডেই 'উৎসর্গ-পত্রী'তে দেখা যায়, প্রকাশক শ্রীরাজরাজেন্দ্র চন্দ্র ঢাকা সাহিত্য-সমালোচনা সভার সভ্যদের এই পুস্তক উৎসর্গ করেন।

৪। গঙ্গা-তরঙ্গ (অপ্রকাশিত ও রচনা-কাল অজ্ঞাত)। স্বদেশী ভাবে লেখা চারি শত লাইনের এক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। কয়েকটি ষ্ট্যানজা এ প্রবন্ধে তুলে দিলাম।

৫। নিত্য নূতন (নাটক)। এ পুস্তকটি সম্পর্কে বিস্তৃত এখনও কিছু জানা যায়নি। আমরা তাঁর কবিতাতে শুধু এর নামোল্লেখ পেয়েছি। এতে অনেক গান দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। একটি কবিতা দিলাম, তার নীচে লেখা আছে—'Extracted from my drama নিত্য নূতন।'

এ সব ছাড়া পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অনেক কবিতা নানা সাময়িক পত্রের পাতায় আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি: যেমন :—'ব্রততী', 'মৃগশিরা', 'দিন কি এমন হবে', 'নিশীথ মগ্ন' ইত্যাদি। ব্রাহ্ম-সংগীত রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বহু ব্রাহ্ম-সংগীত আছে।

বাংলা সাহিত্য ও গোবিন্দচন্দ্র রায়

বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেমন বাহুল্য বোধ হতে পারে, তেমনি এর অনুল্লেখেও একটি বিরাট কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে বলেই দু'-একটি কথা বলতে হচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যের এক মস্ত বড় প্রয়োজনের দিনে গোবিন্দচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল। সারা বাংলায় তথা সারা ভারতে নব জাতীয়তাবোধ জাগাবার জন্য যখন কর্ম্মের আহ্বান জানাবার প্রয়োজন ঘটল তখন হেমচন্দ্র, মনোমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ প্রভৃতির মত গোবিন্দচন্দ্রও সেই গুরুভার গ্রহণ করলেন। বাংলা সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের সেই কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের দিনে হেমচন্দ্র ও মনোমোহনের মত গোবিন্দচন্দ্রও সার্থক ভাবে কবিতায় ও গানে সেই দায়িত্বকে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। আমাদের মনে হয়, তাঁর এই সফলতার মধ্যে দিয়ে সে যুগের বাংলা সাহিত্যকে এমন একটি নূতন ও অভিনব জিনিষ দান করেছেন যা অন্য সবার চাইতে তাঁর লেখার স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বদাই পৃথক্ করে রেখেছে। এটাই বাংলা সাহিত্যে গোবিন্দচন্দ্রকে আরও অক্ষয় করে রাখবে।

গোবিন্দচন্দ্রের কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা

১

(গান)

তুলেছে কমল একবার,
যে সাঁতারে,
সে জানে,
কি ব্যথা কাঁটায় তার। ধ্রু।
আর সে জানে,
যে কেতকী-কাননে,
হরেছে সুরভি সুধাভার ;
সে জানে,
কি দুখ কাঁটায় তার।
আর সে জানে,
যে রমণী-রতনে,
গেঁথেছে প্রণয়ের তার ;
সে জানে,
কি কষ্ট গাঁথনে তার।

সুর :—কাফী ; খং

(অপ্রকাশিত রচনা)

২

(গান)

শরদের পূর্ণ শশী সৈ !
ডুব্‌ল রাহু আননে।
চকোর আজি কেমনে,
বল প্রবোধিবে প্রাণে ;
ঘেরিল যে অন্ধকারে
কৌমুদীর হো লো সখি !)
কৌমুদীরে গগনে।
বিধাতার লাঞ্ছনা,
ঘটায় আনি বিড়ম্বনা ;
নৈলে কেনে কামিনী ফুল
ফুটবে আসি (হা লো সখি !)
ফুটবে আসি শ্মশানে।

সুর :—কালেঙ্গরা।

(নিত্য নূতন নাটকের গান)

বাঙ্গালার বর্ষা

১

আসিল বরিষা কাল, নীল রঙ, মেঘ-জাল,
ঢাকিল আকাশ যেন দিনে রাতি করিয়া।
সুগভীর গরজনে, ঝিরি ঝিরি বরিষণে,
নদ-নদী খাল বিল, জলে দিল ভরিয়া।

২

ক্ষেত গোলা তলে তলে, ঢাকিল নূতন জলে,
মন-সুখে ডাকে কোড়া, ধান-বনে বসিয়া।
পুকুরের ধারে ধারে, ডাকে বেঙ উঁচু তারে,
ডাহুক-ডাহুকী ডাকে জল-রসে রসিয়া।

৩

লতা-পাতা গাছ-ঘাসে, ঢাকে ধরা কুশ-কাশে,
সকলি সরস রসে মেঘ-রস পাইয়া।
ভিজা বাস ভিজা গা, ভিজা ঘর-আঙ্গিনা,
হাট-মাঠ সব ভিজা পথ-ঘাট লইয়া।

৪

কোন মাঝি নৌকা খুলে, বাতাসেতে পাল খুলে,
ভিজিছে বাবুই যেন, পাল-দড়ি ধরিয়া।
কেহ বা লাগায়ে কূলে আকাশেতে স্বর তুলে,
ছৈয়ের ভিতরে দিছে, বারমাসি জুড়িয়'।

৫

কেহ বা নৌকায় চড়ে, জীবনের আশা ছেড়ে,
চলেছে চাকুরি-দায়ে তাড়াতাড়ি করিয়া।
নদীর তুফান দেখি, ভয়েতে মুদিয়া আঁখি,
ডাকিছে মাঝিরে ঘন গাজি গাজি স্মরিয়া।

৬

ধন-সুখে সুখী যারা, আজি দেখ ঘরে তারা,
চপলা চমক দেখে, বারান্দায় বসিয়া।
কাঁটালের বিচি ভাজা, তায় মুড়ি তাজা তাজা,
লবন মরিচ তেলে, খায় কেহ ঘসিয়া।

৭

সুরস ইলিস মাছে, কোল গাদা বেছে বেছে
রাঁধে কুলবধূ ঝোল সরিষা বাটিয়া।
বাতাসে বহিয়া গন্ধ, পথিকে করিছে অন্ধ,
জিহ্বায় ছুটিছে জল নদী-নালা কাটিয়া।

৮

কেহ বা করঞ্জ কাটি, চড়চড়ি পরিপাটি,
রাঁধিছে মনের সাধে, বাটি বাটি ভরিয়া।
শ্বশুর-শাশুড়ী ঘরে, ভয়েতে না কথা সরে,
কাঁদিছে কোণেতে কেহ প্রবাসীরে স্মরিয়া।

৯

আজি দেখ ঘরে ঘরে, উঠে ধুঁয়া চূড়া ফেড়ে,
দিনে দিনে রাঁধা সারে বরিষারে ডরিয়া।
ঘরেতে বিছানা পাতি, দিবসে রচিয়া রাতি
পান রুখে হুঁকা ধরি আছে কেহ পড়িয়া।

১০

বধূরা গিন্নির ডরে, কাদার সাগরে পড়ে
আজি দেখ হাবুডুবু খাইতেছে মরিয়া।
কেহ কাজ-কর্ম্ম সেরে পা ধুয়ে বসিয়া ঘরে
মাখিছে আঙ্গুলে তেল চূণে তপ্ত করিয়া।

১১

রসিক পুরুষ যারা আজি কোনখানে তারা,
বসে আছে রস ভরে ঢুলু-ঢুলু হইয়া।
পায়ের উপরে পা,—বাবুদের মোছে তা,
ঘরেতে পোয়াতি কাঁদে কাঁথা-কানি লইয়া।

যাঁরা ভাবেন যে, গোবিন্দচন্দ্র শুধু মাত্র 'ভারত-বিলাপ' আর 'যমুনা-লহরী'রই কবি, তাঁহাদের জন্যই বিশেষ করে এই কবিতাটির সম্পূর্ণ অংশ তুলে দেওয়া হল। বিভিন্ন বিষয়ে লেখা তাঁর এমন অনেক কবিতা আছে যার মধ্যে স্বদেশ-প্রেমিক গোবিন্দচন্দ্রের বাইরেও অন্য গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এ কথা সত্য যে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ এবং অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই স্বাদেশিকতার সুরটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাঁর কবিতার অন্যান্য সুরগুলিকে পরিত্যাগ করা মানে তাঁর প্রতি অন্যায় অবিচার করা।

গঙ্গাতরঙ্গ*

১

এলো শ্রোতভরে ও তট ছাই মাসিডন সেনা প্রণত মাথে
লই বিবাহের ভেট বিচিত্র উজলিয়া জাক-জমক সঙ্গে।

২

বিমল সে গ্রীক শশির হারে মিশিয়া ভারত কুমুদ পাঁতি
ফুটিল এ তবে প্রবাহ কাচে স্বাধীনা যে দিন তুমি তরঙ্গে।

৩

মিলিল আসিয়া জ্ঞানের ধারা মিলি ঝুলি তবে সে শ্রোতবেগে
শিখালে শিখিলে কত যে বার্ত্তা স্বাধীনা যে দিন তুমি তরঙ্গে।

৪

রবিতো ঐ তটে বিশালখানী পাটলিপুত্র সে উৎসব নাটে
উজলি গৌরবে হাসি যে কালে খেলিল সম্পদ বিহার রঙ্গে।

৫

বিপুল সে পুরী যোজনব্যাপী পাঁচশ' সত্তর বুরুজ মাথে
পরি কটিতটে পরিখা কাঞ্চী শোভিত চৌষটি দুয়ার সঙ্গে।

৬

ধ্বনিত সে ধানী সেনা সামন্ত উঠাই গ্রীকের মনে আতঙ্ক
উড়িতো তাঁবুরে খচি পতাকা স্বাধীনা যে দিন তুমি তরঙ্গে।

---

* আগেই বলেছি, এটি চার শত লাইনের এক অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র কাব্য। পাঠকদের সামনে একটুখানি তুলে ধরবার জন্যেই কয়েকটি লাইন তুলে দিলাম—কিন্তু পঙক্তিগুলি ধারাবাহিক নয়—মাঝে মাঝে তুলে দেওয়া হল।

৭

নিরভয়ে সদা সাহস দর্পে হাটিতো গৌরবে সবে এ পারে
মিলি বাহু বুকে যবন সঙ্গে স্বাধীনা যে দিন তুমি তরঙ্গে।

৮

স্বাধীনা যে দিন তুমি তরঙ্গে মেলি প্রসারিলে বুক সমুদ্রে।
খচিল কেতুতে তনু আদর্শ ছাই রণতরী বিহার বঙ্গে।

৯

রাজা প্রজা কত সে কোন কালে পর দুখে গলি কাতর মর্ম্মে
ছাড়িয়া পীড়ন, দয়া বিভূতি পরিল কৌপিনে কষাই অঙ্গে।

১০

না আছে গর্জ্জন না সে তরঙ্গ ডাকে রহি বহি কঙ্কর ফেরু
না উড়ে সে গেরু না সে পতাকা সব সুশায়িত কালের অঙ্গে।

১১

অহ! কি প্রকাণ্ড কাণ্ড মদান্ধ এ যত উৎপ্লব প্রাণ প্রবাহে
নিরর্থ এ হাসি কান্নার ক্রীড়া বহে যত সুখ দুখ প্রসঙ্গে।

১২

যায় নিতি বহি ধাই বিনাশে মত্ত প্রমাদে এ জীব তরঙ্গে
উঠি পড়ি নানা দশার শৈলে তবগতি প্রায় কালাব্ধি অঙ্কে।

গোবিন্দচন্দ্রের বিখ্যাত কবিতাগুলি এখানে উল্লেখ বাহুল্য ভেবে অপ্রকাশিত সুন্দর কবিতা কয়টিরই স্থান দেওয়া হল। তাই এই কবিতাগুলির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে কবি-প্রতিভাকে বিচার করে কেউ লেখকের উপর অবিচার করবেন না বলেই আশা করি। তাঁর ব্রাহ্ম-সংগীতের সংখ্যা অসংখ্য—একটি না দিলে অসম্পূর্ণ থাকবে ভেবে তাও দিলাম।

মুলতান—আড়ঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল! (বিভু)
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়াছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধিবল।
সঞ্চার না হতে আমি, স্বজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল!
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফলশস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।
এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে,
অযাচিত কৃপাগুণে রোপিয়াছ জ্ঞানবল।

মনীষীদের বিড়াল-প্রীতি

পৃথিবীর বড় বড় লোকেদের কত অদ্ভুত খেয়ালের কথাই না আমরা শুনতে পাই। এই সব অদ্ভুত খেয়ালের ভিতর বিড়ালের উপর অস্বাভাবিক অনুরাগ একান্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিড়ালের জন্য তাঁহারা কি না করিয়াছেন। যথেষ্ট ত্যাগও কেউ কেউ স্বীকার করিয়াছেন।

যুবরাজ 'পোটেমকিন' 'ক্যাথারিণ দি গ্রেটে'র জন্য একটি উপহার প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যুবরাজ ভাবিয়া পাইতেছিলেন না যে, কি পাঠাইবেন? ক্যাথারিণ দি গ্রেটের মনোরাজ্য জয় করা খুবই শক্ত ব্যাপার ছিল। তাঁহার কত হাজার হাজার গুণমুগ্ধ স্তাবক! কি দেওয়া যায়? হীরা জহরৎ? না, তাও না। দামী পোষাক? মৃগনাভি? তাও নয়? শেষ পর্য্যন্ত 'পোটেমকিন' পাঠাইলেন একটি বিড়াল-ছানা। "মিউ, মিউ, মিউ," দেবী প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইলেন! শেষ পর্য্যন্ত কি ঘটিয়াছিল ইতিহাসে তাহার নজির আছে।

'স্যার ওয়াল্টার স্কট'এর এক পোষা বিড়ালের একাধিপত্য ছিল তাঁহার বাঘা কুকুর 'হাউণ্ড'এর উপর। স্যার ওয়াল্টার খুশী মনে তাঁহার পেয়ারের বিড়ালের কৃতিত্ব উপভোগ করিতেন।

'বেন জনসন' মৎস্য-শিকারীদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাঁহার পোষা পুষীর জন্য শামুক খুঁজিতে।

ফরাসী সংস্কৃতির নব যুগে বিড়ালের উপর রাজা ও ধর্ম্মযাজকদের ছিল অযাচিত করুণা। রাজবংশীয়া এক ভদ্রমহিলা 'বীণা' বাদ্যে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন; সমঝদার ছিল তাঁর পোষা বিড়াল। যখন তাঁহার বীণা সুমধুর ঝঙ্কার তুলিত, তখন বিড়াল-ছানাটি আনন্দে ঘড়-ঘড় শব্দ করিত আর বাদ্যের তাল কাটিয়া গেলেই বিড়ালটি ভদ্রমহিলাকে আঁচড়াইয়া দিত।

'লর্ড চেষ্টারফিল্ড' তাঁহার পোষা বিড়ালের জন্য পেন্সন মঞ্জুর করিয়াছিলেন। 'ভিক্টর হুগো', 'কার্ডিন্যাল উলসি,' 'গ্রেগরী দি গ্রেট', 'ম্যাথু আর্ণাল্ড', 'হেনরী ওয়ালপোল, 'পে একি,' 'হেনরী জেমস' 'ব্রণ্ট ভগিনীরা', 'ম্যা হোমেত'—প্রভৃতি সবাই ছিলেন বিড়াল বা বিড়াল ছানার ভক্ত। অবসর সময়ে ক্লান্ত মুহূর্ত্তে বিড়াল-শাবকেরাই 'কার্ডিন্যাল রিচেন লিউ'এর জন্য হালকা হাসির খোরাক যোগাইত; তাহা স্ফূর্ত্তির সন্ধান দিত।

মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে আমেরিকার জনৈক ধনী মহিলা উইল করিয়া গিয়াছেন যে, "তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনটি বিড়াল যাহাতে পেট ভরিয়া মাছ, দুধ প্রভৃতি খাইতে পারে তাহার জন্য তিনি ত্রিশ হাজার ডলার রাখিয়া গেলেন।" কারণ, ক্লান্ত অবসন্ন মুহূর্ত্তে দুষ্ট চপল বিড়াল-ছানারা তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিত।

শ্রীকনককুমার বসু

ছোটদের আসর

পনের
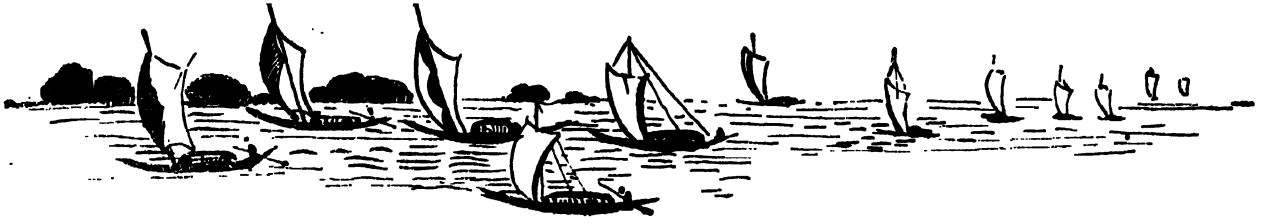
আবার মৃত্যু-পরশ

সুব্রত স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, বিপদের একটা কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। খুনী চুপ-চাপ করে বসে থাকবে না। ত্বই সে তার হিংস্র নখর নিয়ে আরো এক জনের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ার সতর্ক পদধ্বনি অন্ধকারের মধ্যে ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, সে এবারে কোন্ পথে অগ্রসর হবে?

রাত্রে যখন সুব্রত সুজিতদের বাসায় ফিরে এল, বাড়ীর সকলেই খন ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিদ্রার একটা গভীর প্রশান্তি নেমে এসেছে সমগ্র বাড়ীটার 'পরে।

আকাশের প্রান্তে যে চাঁদ জেগেছিল, দুলতে দুলতে আকাশের ান্তে হেলে পড়েছে।

বিলীয়মান চন্দ্রালোকে পাণ্ডুর পৃথিবী যেন কেমন বিষণ্ণ-বিধুর ল মনে হয়।

কোথায় কোন্ দূর গ্রামপ্রান্ত হতে একটা কুকুরের ডাক শোনা ল: স্তব্ধ ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে যেন শব্দের একটা ঢেউ!

ভৃত্য দরজা খুলে দেওয়ার পর সুব্রত নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সুজিতের র গিয়ে প্রবেশ করলো।

ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের 'পরে ডোমে-ঢাকা একটা ামবাতী জ্বলছে। ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলো-আঁধারী।

ঘুমে-বোজা চোখের 'পরে স্বপ্নের ছবির মত মনে হয় সমগ্র খানি।

উত্তরের দিকের জানালাটা খোলা: দূরে এক-টুকরো আকাশ যা যায়, কয়েকটা তারা টিপ-টিপ করে জ্বলছে।

* * * *

দিন তিনেক পরে, সন্ধ্যার পর।

সারাটা দিন আজ সুব্রত কোথায়ও বের হয়নি। সে অপেক্ষা রছিল সেদিনকার টেলিগ্রামের জবাবটা।

সুজিত বিকালের দিকে কলকাতায় গেছে, বলে গেছে, ফিরতে াত্রি দশটা হবে।

সুব্রত চেয়ারের 'পরে হেলান দিয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল। ত্য এসে ঘরে প্রবেশ করল, 'বাবু, আপনার নামে একটা তার আছে।'

সুব্রত তাড়াতাড়ি উঠে, কাগজ সই করে তারটা নিল।

তারটা পড়তে পড়তে তার মুখে একটা খুসীর ঢেউ খেলে যায়: াহলে তার অনুমান মিথ্যা নয়।

এখুনি একটি বার থানায় সুশান্তর ওখানে যাওয়া দরকার।

সুব্রত উঠে-পড়ে জামাটা গায়ে দিয়ে নীচে নেমে এল। সুজিতের ঠাকুরকে রান্না সম্পর্কে কি সব বলছিলেন, সুব্রত সামনে এসে দাঁড়াল: 'মাসীমা, আমি একটু বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে বোধ হয় ঘণ্টা ক'য়েক দেরী হবে। আমার জন্য আপনারা অপেক্ষা করবেন না। ভাত ঢাকা দিয়ে রাখবেন।'

'রান্না ত' প্রায় হয়ে এসেছে, খেয়েই যাও না বাবা!'

'না মাসীমা, ফিরে এসেই খাবো।'

সুব্রত গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে ষ্টার্ট দিল।

থানায় এসে যখন পৌছাল, সুশান্ত ব'সে ব'সে একটা দরকারী ডাইরী লিখছিল, সুব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে মুখ তুলে তাকাল: 'আসুন সুব্রত বাবু! বসুন।'

'সুসীমের 'পরে নজর রেখেছেন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, বিমল আর অমিয়কে সে কাজে দিয়েছি। বেশ চালাক চটপটে। এখন বিমল আছে, রাত্রি এগারটায় অমিয় তাকে রিলিভ করবে।'

'আমি ভাবছি, আজ অমিয়র বদলে আমিই বিমলকে রিলিভ করবো।'

'আপনি যাবেন পাহারা দিতে?' সুশান্ত বিস্মিত ভাবে সুব্রতর মুখের দিকে তাকায়।

এমন সময় এক প্রকার যেন হন্তদন্ত হয়েই এক জন কনষ্টেবল ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে: 'বড় বাবু! আপনাকে এখুনি একবার ষ্টেশনের দিকে যেতে হবে।'

'ব্যাপার কি?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না, বিমল বাবু ষ্টেশন থেকে ফোন করছিলেন, সুসীম বাবু না কি রাত্রি সাড়ে আটটার ট্রেণে কাটা পড়েছে।'

'ট্রেণে কাটা পড়েছে?'

'সর্বনাশ!' সুব্রত তড়িৎপদে উঠে দাঁড়ায়: 'চলুন সুশান্ত বাবু, এখুনি একবার যাওয়া প্রয়োজন। এইটাই আমি ভয় করছিলাম। আমি জানতাম—এ আমি ভাল করেই জানতাম।' সুব্রতর মুখের 'পরে যেন একটা দৃঢ় সংকল্পের কাঠিন্য নেমে আসে।

'এটাও কি আপনার খুন বলেই মনে হয়, সুব্রত বাবু?'

'মতামত প্রকাশ করবার যথেষ্ট সময় এখন পাওয়া যাবে, চলুন আগে অকুস্থানে যাওয়া যাক্। উঠুন, আর দেরী করবেন না।'

ষ্টেশন হতে প্রায় আধ মাইলটাক দূরে, একটা ঠিক লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে দু'জনে এসে গাড়ী হতে নামল।

টিপ্-টিপ্ করে তখন বৃষ্টি পড়ছে।

নাগপাশ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

শীতের ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া হু-হু করে বইছে। গায়ের হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে।

বাঁ-হাতি প্রকাণ্ড চষা জমি রাত্রির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

লেভেল ক্রসিং-এর হাত পনের দূরে একটা ছোট খুপরী-তোলা দোকান।

সেখানে একটা কেরোসিনের টেমি দপ-দপ করে জ্বলছে।

দোকানের সামনেই মাটির 'পরে সুসীমের রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহটা পড়ে আছে নির্জীব প্রাণহীন।

বুকের উপর দিয়ে বোধ হয় ইন্‌জিনের চাকা চলে গেছে, হাড়গুলো ভেংগে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেছে।

পাশেই দাঁড়িয়ে ও কে,···সুব্রত যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠে, অমৃতোষ বাবুর পুরাতন ভৃত্য সুখদাশ।

টেমির আলো লোকটার শান্ত নির্বিকার মড়ার মত মুখের 'পরে পড়েছে,···বীভৎস ভয়ংকর! দোকানের মালিক এক জন আধা-বয়েসী লোক, সেও সেখানে উপস্থিত, আর বিমলও আছে। সুশান্ত গাড়ী হতে নেমে প্রথমেই বিমলকে প্রশ্ন করল: 'ব্যাপার কি বিমল, কেমন করে সুসীম ট্রেণে কাটা পড়ল?'

'সুখদাশ! তুমি এখানে?'···সুব্রত সুখদাশের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

জবাব দিল বিমল, সুখদাশই প্রথমে চিংকার শুনতে পেয়ে, লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে গিয়ে দেখতে পায়, সুসীম ট্রেণে কাটা পড়েছে।

'ট্রেণটা কি? প্যাসেনজার না গুডস্?' সুব্রত আবার প্রশ্ন করে।

'গুডস্ ট্রেণ, স্যার!' বিমল জবাব দেয়।

'এসো হে সুখদাশ, আমাদের সংগে চল, তোমার সংগে কয়েকটা জরুরী কথা আছে। চলুন সুশান্ত বাবু, থানায় গিয়ে দেহটা ময়না-ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন!' সুব্রত বললে।

'তোমার নাম কি হে?' দোকানীকে সুব্রত হঠাৎ প্রশ্ন করে।

'আজ্ঞে, মণিমোহন।'

'তুমিও চল আমাদের সংগে।'

এক জন কনষ্টেবলকে মৃতদেহের প্রহরায় রেখে সুব্রত, সুশান্ত, বিমল, মণিমোহন ও সুখদাশ গাড়ীতে এসে উঠে বসল।

সুব্রত গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

বৃষ্টি যেন ক্রমেই চেপে আসছে। অন্ধকারে কর্দমাক্ত পথ। সুব্রত সাবধানে গাড়ী চালায়। থানায় পৌঁছে সুখদাশ ও মণিমোহনকে এক জন কনেষ্টবলের জিম্মায় রেখে বিমল, সুব্রত ও সুশান্ত অফিস-ঘরে এসে প্রবেশ করল।

'বলুন বিমল বাবু! আপনি কত দূর জানেন, ব্যাপারটা সব খুলে বলুন ত'?'

বিমল বলতে লাগল: 'আজ সকাল বেলা নয়টা থেকে সুশান্ত বাবুর নির্দেশ মত সুসীম বাবুর 'পরে নজর রেখেছিলাম। কথা ছিল, রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত আমি নজর রাখবো, তার পর অমিয় বাবু আমাকে রিলিভ করবেন। সমস্তটা দুপুর সুসীম বাবু তার বাড়ীতেই ছিলেন, কোথায়ও বের হয়নি। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা হবে, উনি বাড়ী থেকে বের হয়ে প্রথমে গিয়ে 'কালীতারা' রেষ্টুরেণ্টে ঢোকেন। সেখানে দু'-তিন কাপ চা খান। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিল, কোন কারণে তিনি যেন খুব বেশী চিন্তিত। আমারো

যেদিন সুশান্ত বাবু, প্রথম সুসীম বাবুর 'পরে দৃষ্টি রাখতে বলেন, তখন আমার মনে হয়েছিল, হয়ত' শংকর ঘোষের হত্যা-সংক্রান্ত ব্যাপারেই দারোগা বাবু সুসীম বাবুকে সন্দেহ করছেন, তাই ওর গতি-বিধির পরে আমাকে নজর রাখতে আদেশ করেছেন। কিন্তু আমি তখন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি যে, সুসীমের অন্য দিক হতে এত বড় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। আমি কিছুক্ষণের জন্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি এবং আমার এক জন চেনা বন্ধুর সংগে কথা বলতে বলতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলে যাই। ফিরে যখন আসি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখলাম, 'কালীতারা' রেষ্টুরেণ্টে সুসীম বাবু নেই। আমি আজ দু'দিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, সন্ধ্যার পরে 'কালীতারা' রেষ্টুরেণ্ট হ'তে বের হয়ে সুসীম বাবু লেভেল ক্রসিংয়ের ওখানে মণিমোহনের দোকানে সিদ্ধি খেতে যেতো। জানতে পেরেছিলাম পরে সে, মণিমোহনের দোকানটাই ছিল সুসীমের সিদ্ধি খাওয়ার প্রধান আড্ডা। যা হোক, আমি অন্ধকারে মণিমোহনের দোকানের দিকে এগুতে লাগলাম। লেভেল ক্রসিংয়ের কাছাকাছি আসতেই শব্দ পেলাম, একটা গুডস্ ট্রেণ আসছে। ট্রেণটা লেভেল ক্রসিংয়ের কাছাকাছি আসতেই একটা চিংকার শুনতে পেলাম। কে যেন চিংকার ক'রে উঠল, গেল, গেল!···ছুটতে লাগলাম, কেন না, লেভেল ক্রসিং থেকে তখনও আমি প্রায় হাত ২০।২৫ দূরে। সেই চিংকার বোধ হয় ট্রেণের ড্রাইভারও শুনতে পেয়েছিল, কেন না, গাড়ীটাও একটা শব্দ ক'রে লেভেল ক্রসিংটা পার হবার সংগে সংগেই থেমে গেছিল। আমি ওখানে পৌঁছে দেখি ঐ লোকটা ততক্ষণে সুসীম বাবুর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহটা গাড়ীর চাকার তলা হতে টেনে বের ক'রে ঠিক লাইনের ধারেই রেখেছে। ট্রেণের ড্রাইভার ও দু'-চার জন যাত্রী নেমে এসে সেখানে ভিড় করেছে। ঐ লোকটার মুখেই শুনলাম, হঠাৎ না কি কোন কারণে রাগ ক'রে সুসীম বাবু মণিমোহনের দোকান হতে বের হয়ে রেলের লাইনের দিকে ছুটে যান, ঐ লোকটিও ঐ সময় মণিমোহনের দোকানে উপস্থিত ছিল। সে সুসীমকে ছুটতে দেখে ওর পিছু-পিছু অনুসরণ করে, কিন্তু সুসীমের কাছাকাছি পৌঁছাবার আগেই সুসীম ইনজিনের সংগে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। এর পর আমি গিয়ে ষ্টেশন থেকে আপনাকে সংবাদ পাঠাই।'

সুব্রত বললে: 'আচ্ছা, আপনি পাশের ঘরে গিয়ে বসুন বিমল বাবু!'

এর পর সুখদাশকে আনা হলো।

সুখদাশ নির্জীবের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ঘরে ঢুকে মুখের রেখায় রেখায় একটা স্পষ্ট উদ্বেগের ভাব।

সুব্রতর প্রশ্নে সুখদাশ বললে: 'আমি সন্ধ্যার কিছু আগে মণিমোহনের দোকানে গেছিলাম, মণিমোহনের সংগে বসে গল্প করি এমন সময় সুসীম বাবু সেখানে এলেন। সুসীম বাবুকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, তিনি আজ ওখানে আসবার আগেই অনেকখানি সিদ্ধি খেয়ে এসেছেন। তার কথাবার্তাও নেশা করার মতই মনে হচ্ছিল। তিনি এসেই মণিমোহনকে প্রশ্ন করলেন, সিদ্ধি তৈরি আছে কি না। তাতে আমিই জবাব দিলাম, সুসীম বাবু, আজ আপনার নেশাটা মনে হচ্ছে একটু বেশীই হয়েছে; আজ আর খাবেন না সিদ্ধি। তাতে তিনি হঠাৎ আমার 'পরে চটে উঠে খাপ্পা হয়ে লাফালাফি দিকে ছুটে ঘর হতে বের হয়ে গেলেন, আমিও সংগে সংগে

তার অনুসরণ করলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না।' সুখদাশের কণ্ঠস্বর কান্নায় বুঁজে এল।

'হুঁ। কিন্তু তুমি আজ সন্ধ্যায় মণিমোহনের দোকানে গেছিলে কেন?' প্রশ্ন করলে সুব্রত।

'আমি আজ কয় দিন হতেই সুসীম বাবুর 'পরে নজর রেখেছিলাম, জানতাম, সন্ধ্যায় তিনি প্রত্যহ ওইখানেই যান, তাই সেখানে গেছিলাম।'

'সুসীমের উপরে নজর রেখেছিলে? কেন?'

'সেই দিন রাত্রে ভারতী-ভবনের সেই বিশ্রী ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর হতেই আমি চেষ্টা করছিলাম ওর সংগে দেখা ক'রে একটা মিটমাট ক'রে নিতে, কিন্তু ওকে ধরতে পারছিলাম না কিছুতেই একা একা।'

'হঠাৎ সে রাত্রে সুসীম তোমার 'পরে ও-রকমই বা ব্যবহার করলে কেন সুখদাশ?' আবার সুব্রত প্রশ্ন করলে।

সুখদাশ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'তোমার সংগে সুসীমের আগে কোন আলাপ-পরিচয় ছিল না কি?'

'তেমন বিশেষ কিছুই না, সামান্য।'

'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো সুখদাশ।' সুব্রত বললে।

এর পর মণিমোহনকে ডাকা হলো, সে বললে 'আজ মাস খানেক হবে, সুসীম নিয়মিত ভাবে মণিমোহনের দোকানে প্রায় প্রত্যহই আসে সিদ্ধি খেতে, তবে কখনো সন্ধ্যায়—কখনো একটু রাত্রে। মণিমোহনের নিজেরও সিদ্ধি খাওয়া অভ্যাস আছে, দু'জনে এক সংগে সিদ্ধি খেতো। সুসীমের সংগে মণিমোহনের পরিচয় হয় মাস দেড়েক আগে ষ্টেশনে পানিপাড়ের ঘরে। আগে সুসীম পানিপাড়ের ওখানেই সিদ্ধি খেতো। মণিমোহনও মাঝে মাঝে পানিপাড়ের ওখানে যেত। বাকী যা সে বললে, সুখদাশের কথার সংগেই মিলে গেল। এর পর মণিমোহনকেও সুব্রত ছেড়ে দিল।

'আপনার কিন্তু সুখদাশকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি মিঃ রায়।' সুশান্ত বললে।

'কেন?'

'আমার মনে হয়, সুসীমের মৃত্যুর জন্য সুখদাশই দায়ী। বিশেষ ক'রে ভারতী-ভবনের সে রাত্রের ঘটনার পর। ঘটনাটা আগাগোড়া পর্য্যালোচনা করলে কি সহজেই অনুমান করা যায় না যে, সুখদাশের সুসীমের 'পরে একটা বিদ্বেষ থাকা খুবই স্বাভাবিক? এবং সেই বিদ্বেষের বশেই সে কয়েক' দিন ধরে সুসীমকে অনুসরণ করছিল? এবং আজ রাত্রে সুযোগ পাওয়ায় তাকে চলন্ত ট্রেণের সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে? কারণ, যে সময় ব্যাপারটা ঘটে, তখন ত' সেখানে একমাত্র সুখদাশ ও সুসীম ছাড়া আর কেউই উপস্থিত ছিল না! বিশেষ ক'রে অন্ধকারের মধ্যে!'...

'আপনার কথাটার মধ্যে প্রচুর যুক্তি আছে বটে সুশান্ত বাবু। কিন্তু প্রমাণ কোথায় যে আপনার কথাই সত্যি, সুখদাশের কথা মিথ্যে? কিন্তু যাক্ সে কথা, ও নিয়ে এখন আমাদের খুব বেশী মাথা না ঘামালেও চলবে। ঘটনার গতির দিকেই এখন আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। দেখতে হবে, এর পর how the things take shape! রাত্রি অনেক হলো, এবার আমি আপনার কাছ হতে বিদায় নেবো। আবার দেখা হবে। Good night!...' সুব্রত ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। [ক্রমশঃ।

মা

ইন্দিরা দেবী

পলটুর কাবলী বেড়ালটাকে তোমরা দেখেছ? কি, তাকাচ্ছ কেন? দেখনি? যাঃ, বাজে কথা, অমন সুন্দর বেড়ালটাকে আবার না দেখে পারা যায়? লেজটা কি মোটা আর সাদা, মনে হয়, এক গোছা সাদা পশম কে যেন বেঁধে রেখেছে। পলটু যখন রাতে শোয় তখন ওর পায়ের কাছে লেজ গুটিয়ে শুয়ে থাকে। কত বাচ্চা থেকে এখন কত বড় হয়েছে। শুধু যে দেখতেই ভালো তাই নয়—গুণও কি কম! পলটু বা ভাই-বোনের খাবার আগলাতে বা ইঁদুর তাড়াতে ওর জোড়া নেই। ভাতের সঙ্গে মাছ দেওয়া আছে তবুও পলটু পুষুনকে বসিয়ে হাত ধুতে বা অন্য কাজে অনায়াসে চলে যেতে পারে। তোমরা ভাবছ এমন ধারা কি বেড়াল—যে মাছ তুলে খায় না? না, পুষুন মাছ খায় বৈ কি, তবে চোর নয় তো সে, কেন খেতে যাবে অমন করে? বাড়ীর সব্বায়ের যখন মাছ ভাগ হয়—পুষুনের নামও তার মধ্যে আছে—তাছাড়া ছোটদা থেকে আরম্ভ করে বাচ্চু, খোকন পর্য্যন্ত সকলে তাদের ভাগ একটু করে দেবেই। পুষুন সেই জন্য কুড়োনো এঁটো-কাঁটা একেবারে খায় না।

সকলেরই আদরের পুষুন—সবাই ভালবাসে। পলটুদের বাড়ীর পিছন দিকটা কতকগুলো খড়ের ঘর ছিল। এখন সেগুলো কোনো কাজেই আসে না—পড়ে আছে। মাঝে মাঝে পাখী, হাঁস, মুরগী দু'-চারটে দেখা যায়, কিন্তু তারা তো আর থাকে না সেখানে। যে যার জায়গায় চলে যায়। পুষুন কিন্তু মাঝে মাঝে সেখানে যেতো।

সেদিন রাতে খেতে বসে পলটু পুষুনকে দেখতে পেলো না। দু'-চার বার পুষুনকে ডেকে খেতে বসে গেল। ঠাকুর তরকারী দিতে এসে বললে: পুষুন তো ঐ দিকে গেছে, আসবে এখ্খুনি—এই বলে বাড়ীর পিছন দিকটা দেখিয়ে দিলো। কিন্তু পলটুর খাওয়া শেষ হয়ে গেল, পুষুন ফিরলো না। পলটু আর দু'-চার বার ডেকে উপরে চলে গেল।

রাতে বিছানায় শুতে গিয়ে পলটু দেখলো পুষুনের জায়গাটা খালি। উপর থেকে পলটু তখনি নীচে এসে দেখে, খাবার জায়গায় পুষুন চুপ করে বসে আছে।

—ঠাকুর ওকে ভাত দিয়েছিলে? পলটু জিজ্ঞাসা করলো।

—হ্যাঁ, পুষুন খেয়েছে।

—চল তাহলে, এই বলে পলটু পুষুনকে কোলে তুলে নিয়ে উপরে চললো।

খাটের উপর পুষুনকে ফেলে দিয়ে পলটু দেখলো, তার হাতে আর পুষুনের গায়ে দু'-চারটে মুরগীর পালক। সেগুলো ফেলে দিয়ে পলটু বললে: এগুলো কোথা থেকে আনলি রে?

পুষুন বললে: মিঞাও।

পলটু পুষুনের কথা বুঝেছিল কি না আমি জানি না।

কিন্তু তার পর থেকে প্রায় দিনই দেখা যেতো পুষুনের গায়ে মুরগীর পালকের লোম। পলটুও প্রায়ই তাকে বলে: তুই কোথায় যাস পুষুন?

পুষুন পলটুর দিকে চেয়ে বলে: মিঞাও।

—আর যাসনি—গায়ে নোংরা লাগে।

পুষুন তার নীল চোখ পলটুর দিকে তুলে আবার বললে: মিঞাও।

* * *

ঠাকুর চাকর সবাই পলটুকে বলে: তুমি একটুও দেখবে না দাদাবাবু, পুষুন বাড়ী থাকে না যে।

এক দিন পলটু পুষুনকে পাহারা দিতে লাগলো। পুষুন আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পেছন দিকে খড়ো ঘরগুলোর দিকে চললো। পলটু দূর থেকে দেখতে লাগলো, পুষুন গিয়ে সেই ঘরগুলোর মধ্যে ঢুকছে।

সেদিন যখন পুষুন বাড়ী ফিরলো, পলটু দেখলো পুষুনের গায়ে দু'-চারটে মুরগীর পালক।

ব্যাপারটা পলটু ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। পরের দিন সে পুষুনের সঙ্গে সঙ্গে গেল। দূর থেকে পলটু দেখলো খোড়ো ঘরের মধ্যে, রাজ্যের কাঠি-কুটি জড় করা, সেখানে এক মুরগী-পরিবার বাস করছে। পুষুন ঢুকতেই মোরগ-কর্তা আর মুরগী-গিন্নী বেরিয়ে গেল। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো চারি দিকে ছিটকে খেলে বেড়াচ্ছিল। পুষুন মিঞাও! মিঞাও! করতেই তারা এসে এক জায়গায় জড় হলো আর পুষুন মাঝখানে বসে রইল। এর বেশী দূর থেকে আর কিছু দেখতে না পেয়ে পলটু বাড়ী ফিরবার জন্য পা বাড়াতেই মুক্তির সঙ্গে দেখা। মুক্তি তাদের পাড়ার মেয়ে। পলটুকে দেখে মুক্তি বললো: পলটুদা, এখানে কি করছো?

—দেখ না ভাই, পুষুনটা কোথায় যায় তাই দেখতে এসেছিলাম।

—ও মা, জানো না, সকালে যখন আমার পোষা মুরগীগুলো ছেড়ে দিই তখন ওরা আসে এইখানে—আর তোমার পুষুনও আসে। আমি অনেক দিন দেখেছি।

—সে কি রে? মারে না?

—কই, না তো!

—তবু ভালো। পলটু আর মুক্তি দু'জনেই চলে গেল।

* * *

কয়েক দিন কেটে গেছে।

পলটুর ভাত দিয়ে ঠাকুর ডাকছে। পলটু উপর থেকে বললে: পুষুনকে একটু ভাতটা দেখতে বলো, আমি জামা পরে যাচ্ছি, খেয়ে ওখান থেকে ইস্কুল চলে যাবো।

ঠাকুর বললে: কোথায় পুষুন, সে কি আজকাল বাড়ী থাকে? তোমায় তো বলেছি, তুমি দেখবে না—কিছু না।

পলটু তর-তর করে উপর থেকে নীচে এসে বেরিয়ে গেল। সোজা সেই খোড়ো ঘরগুলোর দিকে গিয়ে পলটু রেগে ঢুকে পড়লো। কিন্তু কই, পুষুন তো নেই।

এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে পলটু দেখলো, কোণের দিকের খড়-কুটোর ঢিবি ছেড়ে এসে কচি মুরগী-বাচ্চাগুলো খেলছে উল্টো দিক্‌কার কোণে আর খড়-কুটোর ঢিবির উপরে পুষুন শুয়ে আছে। পলটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পুষুনকে তুলতে গিয়ে দেখলো: মুরগী-গিন্নীর নতুন কয়েকটা তাজা ডিমের উপর পুষুন নিজের শরীর ঢেলে দিয়ে গরম রাখছে। ডিমগুলো দেখে মনে হলো শীগ্‌গির ফুটবে।

পলটু কি যে করবে ভেবে না পেয়ে মুখ তুলে তাকাতেই দেখে সামনে মুক্তি দাঁড়িয়ে।

মুক্তি বললো: আমরা তো দেখিনি, কিন্তু কখনও কি শুনেছ পলটুদা, বেড়াল আর মুরগীর বন্ধুত্ব? ওরা—মুরগী বাবা-মা, পুষুনের কাছে বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

অবাক হয়ে পলটু পুষুনের দিকে তাকাতেই পুষুন অত্যন্ত করুণ স্বরে বললো: মিঞাও।

এক মিনিটের গল্প

বড়লোক

মনোজিৎ বসু

বড়লোক বলতে কি বোঝায় বল তো? যার রাশি রাশি টাকা আছে, বড় বড় বাড়ি আছে, দামী দামী গাড়ি আছে—তাকেই তো? আমি কিন্তু তোমার ঐ মত মেনে নিতে রাজী নই। আমি বড়লোক বলব তাঁকেই যাঁর টাকা থাক্ আর নাই থাক, বড় বাড়ি বা দামী গাড়ির তিনি মালিক হোন বা নাই হোন—আসলে তিনি হবেন মহৎ, উদার ও চরিত্রবান্। এই তিনটি গুণই মানুষকে বড়লোক ক'রে তোলে। আমাদের দেশে এ রকম বড়লোকের কিন্তু অভাব নেই। সেই রকম এক জন মহৎ ব্যক্তির ছোট্ট একটি গল্প শোনাচ্ছি আজ।

তোমার হয়তো বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডের নাম শোননি। কিন্তু এটা জেনে রেখো যে, তাঁর মতো মনীষী ভারতবর্ষে খুব বেশি জন্মাননি। তিনি শুধু যে বোম্বাই প্রদেশের এক জন শ্রেষ্ঠ বিচারপতি ছিলেন তা নয়, তিনি একাধারে বিচারপতি, পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। জীবনে তিনি প্রচুর উপার্জন করেছেন, অর্থাৎ অগাধ টাকার মালিক ছিলেন তিনি। কিন্তু কেউ কোনো দিন তাঁর ধনগর্ব দেখেনি। তিনি ছিলেন সহজ, সরল মানুষ। আচারে-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে রানাডে ছিলেন যেন এক জন সাধারণ গৃহস্থ। বিচারপতি হয়েও তিনি বেশির ভাগ সময় পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন, অর্থাৎ গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে বড়লোকি ফলানো তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না। রাস্তার ভিড়ে যখন তিনি মিশে যেতেন তখন কে টের পেত যে, বিচারপতি রানাডে চলেছেন? তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে স্বদেশী। দেশের সব-কিছু তাঁর কাছে প্রিয় ছিল। তোমরা শুনলে হয়তো একটু অবাক্ হবে যে, ইংরাজ রাজত্বের আমোলেও রানাডে তাঁর দেশী পোশাক প'রে বিচারকের আসনে গিয়ে বসতেন।

এক দিন হয়েছে কি, তিনি পুণার কোর্ট থেকে (রানাডে তখন পুণা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি) পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। হঠাৎ পথের মাঝখানে এক বুড়ি তাঁকে থামিয়ে বললে—"বাবা! শুনছ?" রানাডে তৎক্ষণাৎ থামলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"কি কি বলছ বুড়িমা?" বুড়ি বললে—"দেখ বাছা, এই জ্বালানি কাঠগুলো নিয়ে রাস্তা পেরুতে পারছি না, যা গাড়ি-ঘোড়া—কখন কে চাপা দেয়, তুমি যদি—।" বুড়ির কথা শেষ করতে না দিয়েই রানাডে জ্বালানি কাঠের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিলেন। তার পর বুড়ির অন্য হাত ধ'রে তাকে জনবহুল ও যান-বাহন পূর্ণ বিপজ্জনক রাস্তা পার করে দিলেন। ঘটনাটি খুবই ছোট্ট। কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমরা বিচারপতি রানাডের অন্তরের যে পরিচয় পাই, তার দাম যে অমূল্য। এইখানেই তিনি অসাধারণ, এইখানেই তিনি বড়লোক।

মহাভারতের শেষ-মহাবীর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

একাদশ

ভগ্নপ্রাণ সম্রাট

পুষ্পিত বকুল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় একটি মর্ম্মর বেদী, তারই উপরে ব'সে রাজকবি বাণভট্ট একমনে "হর্ষচরিত" রচনায় নিযুক্ত হয়ে আছেন।

এমন সময়ে সেনাপতি সিংহনাদ সেখানে এসে উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, "ওহে বাণভট্ট!"

বাণভট্ট মুখ তুলে বললেন, "ব্যাপার কি? কাব্যকুঞ্জবনে মত্ত-হস্তীর প্রবেশ কেন?"

সিংহনাদ বললেন, "একে তো তোমাদের মত মেয়েলি কবিদের পাল্লায় প'ড়ে মহারাজা অসি ছেড়ে মসীর ভক্ত হয়েছেন, তার উপরে ঐ চীনা পরিব্রাজকটা এসে আমাদের অন্ন যে একেবারে মারবার চেষ্টা করছে, সে খবর রাখো কি?"

—"তুমি পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের কথা বলছ?"

—"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! সে যে মহারাজকে নিজের হাতের মুঠোর ভিতরে পূরে ফেলেছে!"

—"পরিব্রাজকের হাতের মুঠো এমন প্রকাণ্ড যে তার মধ্যে আমাদের এত-বড় মহারাজার স্থান সংকুলান হয়েছে?"

—"তা ছাড়া আর কি বলি বল? ঐ চীনা পরিব্রাজক যাদু জানে হে, যাদু জানে! মহারাজা এত দিন হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন, প্রজারা তা পছন্দ না করলেও কোন রকমে সহ্য ক'রে থাকৃত। কিন্তু ঐ চীনা পরিব্রাজকের পরামর্শে মহারাজা এখন মহাযান সম্প্রদায়কেও মাথায় তুলতে চান। আহার নেই, নিদ্রা নেই,—দিন-রাত তিনি 'বুদ্ধ বুদ্ধ' ক'রে পাগল। হিন্দু হয়েও তিনি বুদ্ধের পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন। তাঁর কড়া হুকুম হয়েছে, সাম্রাজ্যের কোথাও আর জীবহিংসা করা চলবে না। যে আমিষ খাবে তার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।"

বাণভট্ট হেসে বললেন, "এ জন্যে তুমি উত্তেজিত হচ্ছ কেন বন্ধু? মহারাজা তোমার বেতন বন্ধ ক'রে দেবার আদেশ তো দেননি?"

—"বাণভট্ট, তুমি হচ্ছ একটি আস্ত পণ্ডিত-মূর্খ! বেতন এখনো পাচ্ছি বটে, কিন্তু তার পর? আমরা তোমাদের মত শাস্ত্রজীবী নই, আমরা হচ্ছি শস্ত্রজীবী। কিন্তু রাজ্যের সকলকেই যদি অহিংসার সাধনা করতে হয়, তাহ'লে তো সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রই হবে ব্যর্থ! সে ক্ষেত্রে শস্ত্রজীবীদের অকারণে বসিয়ে বসিয়ে মাহিনা দিয়ে পুষে রাখবেন, আমাদের মহারাজা এতটা নির্ব্বোধ নন।"

বাণভট্ট বললেন, "সিংহনাদ ভায়া, তোমার আর্ত্তনাদ থামাও। তুমি কি বলতে চাও, অহিংসা বলতে বোঝায়, সাপ কামড়াতে এলেও আমরা তাকে মারতে পারব না? কোন শত্রু দেশ আক্রমণ করতে এলেও আমাদের মহারাজা হাত-গুটিয়ে বুক পেতে দেবেন?"

সিংহনাদ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "কি জানি ভাই, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে!"

বাণভট্ট সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান ক'রে বললেন, "তাহ'লে তোমার সন্দেহ-ভঞ্জন কর; ঐ দেখ, মহারাজা নিজেই এই দিকে আসছেন।"

হর্ষবর্দ্ধন আসতে আসতে হাসতে হাসতে বললেন, "এক আসরে অসি আর মসীর সেবক! লক্ষণ তো ভালো নয়! দিগ্ধ মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কিছুক্ষণ কাব্যগুঞ্জনে যোগ দিতে এলুম, কিন্তু এখানেও নতুন কোন ষড়যন্ত্রের আয়োজন হচ্ছে না কি?"

—"ষড়যন্ত্র মহারাজ?"

—"হ্যাঁ বন্ধু, ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র—আমার বিরুদ্ধে চারি দিকেই চলছে বিষম ষড়যন্ত্র! তুমি কি এরই মধ্যে সব কথা ভুলে গেলে? রাজধানীতে পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের ধর্ম্মোপদেশ শোনবার জন্যে আহ্বান করেছিলুম বিরাট সভা। আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিল চার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ, তিন হাজার জৈন আর ব্রাহ্মণ। পবিত্র গঙ্গা-তটে বিপুল এক মঠ স্থাপন ক'রে আকাশচুম্বী দেউলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম আমার দেহের সমান উঁচু সোনার বুদ্ধদেবকে। কয় দিন ধ'রে চলল মহোৎসব। আমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়নের কোনই ত্রুটি হয়নি। বুদ্ধ, ধর্ম্ম আর সংঘের সম্মানরক্ষার জন্যে চারি দিকে মুক্তহস্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলুম মণি-মুক্তা, স্বর্ণ-রৌপ্য! কিন্তু তার ফল হ'ল কি? আমি বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী ব'লে ব্রাহ্মণরা চক্রান্ত ক'রে মঠে আগুন ধরিয়ে দিলে। অনেক কষ্টে কোনক্রমে মঠের কতক অংশ রক্ষা পেলে বটে, কিন্তু আমি নিজে হলুম এক নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের দ্বারা আক্রান্ত! ভগবান বুদ্ধের কৃপায় সে যাত্রা রক্ষা পেলুম। তার পর জানা গেল পাঁচ শত ব্রাহ্মণ লিপ্ত ছিল সেই হীন ষড়যন্ত্রে।"

বাণভট্ট বললেন, "জানি মহারাজ, এত শীঘ্র সে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কাহিনী ভুলিনি। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের দল তো আজ নির্ব্বাসিত?"

—"হ্যাঁ, কিন্তু রাজ্যে এখনো অসংখ্য দুরাত্মার অভাব নেই। নিরপরাধ, নির্ব্বিরোধী পরিব্রাজক হুয়েন সাং! ব্রাহ্মণরা তাঁকেও হত্যা করতে চায়, কেবল আমার জন্যেই তাদের সেই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হচ্ছে না! বোধ করি, এই সব দেখে-শুনেই পরিব্রাজক তাঁর স্বদেশে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমিও সম্মতি না দিয়ে পারিনি। আগামী সপ্তাহেই পরিব্রাজক তাঁর স্বদেশের দিকে যাত্রা করবেন।"

বাণভট্ট বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, পরিব্রাজকের উপরে দেশের লোক—বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণরা মোটেই খুসি নয় বটে!"

হর্ষবর্দ্ধন বললেন, "বন্ধু, তুমিও তো ব্রাহ্মণ?"

বাণভট্ট সহাস্যে বললেন, "হ্যাঁ মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছি বটে! কিন্তু কবি হয়ে আমি নিজের জাত খুইয়েছি!"

—"কি-রকম?"

—"কবির জাত নেই। কবির মানসী জন্মদান করে সর্ব্ব জাতির সর্ব্বশ্রেণীর মানুষদের। কিবা রাজা, কিবা কাঙাল, কিবা ব্রাহ্মণ, কিবা চণ্ডাল—কবির আত্মীয়তা সকলের সঙ্গেই, কবির সহানুভূতি সকলেরই উপরে।"

হর্ষবর্দ্ধন সানন্দে বললেন, "সাধু কবি, সাধু! বন্ধু, রাজাও হচ্ছেন কবির মত—তাঁরও উচিত নয় জাতবিচার করা। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সবাই তাঁর পুত্রস্থানীয়। প্রত্যেক ধর্ম্মকেই সম্মান করা হচ্ছে রাজার কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ত্তব্যই পালন করেছি ব'লে আজ আমার বিরুদ্ধে হচ্ছে এত ষড়যন্ত্র।"

সিংহনাদ বললেন, "না মহারাজ, চীনা পরিব্রাজক দেশত্যাগ করলেই ব্রাহ্মণদের আপত্তির আর কোন কারণ থাকবে না।"

হর্ষবর্দ্ধন তিক্ত স্বরে বললেন, "তাই না কি? রাজ্যে এখন যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই ব'লে নিশ্চয়ই আপনি দিবারাত্রব্যাপী নিদ্রাদেবীর সাধনা করছেন?"

সিংহনাদ আমতা আমতা ক'রে বললেন, "না মহারাজ, না মহারাজ। যুদ্ধও নেই, পরিশ্রমও নেই। তাই আমি আজকাল অনিদ্রা রোগে ভুগছি।"

—"তবে এ-কথা শোনেননি কেন যে, আমাকে হত্যা করবার জন্যে ব্রাহ্মণদের উত্তেজিত করেছিল আমারই অন্যতম অমাত্য অর্জ্জুনাশ্ব?"

সিংহনাদ সচমকে বললেন, "বলেন কি মহারাজ? কোথায় সেই পাষণ্ড? মহারাজের আদেশ পেলে আমি তাকে চুলের মুঠি ধ'রে এখানে টেনে আনতে পারি।"

—"পারবেন না সেনাপতি! অর্জ্জুনাশ্ব আপনার চেয়ে নির্ব্বোধ নয়। সে এখন পলাতক। তবে এইটুকু খবরও পেয়েছি, নির্ব্বাসিত সেই পাঁচ শত ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলে অর্জ্জুনাশ্ব আমার বিরুদ্ধে অসভ্য জাতিদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছে। বন্ধু বাণভট্ট, আমার মন ভেঙে গিয়েছে।"

—"কেন মহারাজ?"

—"বৃদ্ধ হয়েছি, পরলোকের দরজা চোখের সামনেই খোলা রয়েছে। সারা-জীবন ধ'রে যাদের জন্যে এই বিশাল সাম্রাজ্য গঠন ক'রে গেলুম, আমার দানের অধিকারী হবার মত যোগ্যতা তাদের কোথায়? আমি অপুত্রক। আমার অবর্ত্তমানে এই সাম্রাজ্যের কর্ণধার হবার মত কেউ নেই। অদূর-ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি—অরাজকতা, রক্তপাত, অত্যাচার! আমার এত সাধের সার্থক স্বপ্ন, কোথায় মিলিয়ে যাবে শরতের লঘু মেঘের মত!"

দ্বাদশ

তৈলহীন দীপ

মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের দুঃস্বপ্ন সত্যে পরিণত হ'তে বেশী দিন লাগল না।

চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন স্বদেশে যাত্রা করলেন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল আর্য্যাবর্ত্তের বাসিন্দারা। এই বৌদ্ধ পরিব্রাজকের অন্ধ ভক্ত হয়ে হর্ষবর্দ্ধন ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন গোঁড়া বৌদ্ধের মত। সেই জন্যে হুয়েন সাং হয়ে উঠেছিলেন দেশের লোকের চোখের বালির মত।

বুদ্ধভক্ত অহিংসাবাদী সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই বিশাল মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের ভাঙন আরম্ভ হয় এবং তার পর অর্দ্ধ শতাব্দী যেতে না যেতেই তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় (খৃঃ পূঃ ১৮৫)। আর্য্যাবর্ত্তে হয় হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ভারতে তখন হীনযান বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপতন। শক বা কুশান সম্রাট কণিষ্কের (১২০—১৬০ খৃষ্টাব্দ) যুগে তা আবার মাথা তোলবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কণিষ্কের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপরে ক্রমেই বেশী প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে হিন্দু-ধর্ম্ম।

হর্ষবর্দ্ধনের যুগে (৬০৬—৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট অবনতি হ'লেও হুয়েন সাংয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠ বা সঙ্ঘারামে তখনও বাস করতেন প্রায় দুই লক্ষ ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সুতরাং সে সময়ে গৃহী-বৌদ্ধের সংখ্যা যে অগুন্তি ছিল এটুকু অনুমান করা যেতে পারে অনায়াসেই।

বলা বাহুল্য, ওদের অধিকাংশই ছিল হীনযান সম্প্রদায়ের লোক। চৈনিক পরিব্রাজকের প্রভাবে প'ড়ে হর্ষবর্দ্ধন গ্রহণ করলেন মহাযান সম্প্রদায়ের মত—যার প্রতি হীনযানীদের এতটুকু শ্রদ্ধা তো ছিলই না, উপরন্তু আক্রোশ ছিল যথেষ্ট। হিন্দুদের শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং মুসলমানদের সিয়া ও সুন্নীদের মত তখনকার হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধদেরও মধ্যে দলাদলি ও হানাহানির অন্ত ছিল না। কাজেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুরাগী হয়েও হর্ষবর্দ্ধন হীনযানীদের তুষ্ট করতে পারলেন না।

একই অহিংসার মন্ত্র গ্রহণ ক'রেও জৈনরা এখনকার মতন তখনও ছিলেন বৌদ্ধ-বিরোধী। হর্ষবর্দ্ধনের বৌদ্ধ-প্রীতি তাঁরাও সহ্য করতে পারতেন না।

হিন্দুদের তো কথাই নেই। হর্ষবর্দ্ধন পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করেননি বটে, কিন্তু শিব ও সূর্য্যদেবের উপরে প্রাধান্য দিতেন বুদ্ধদেবকে। ব্রাহ্মণদের কাছে এটা ছিল অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

হর্ষবর্দ্ধন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন কি না এত দিন পরে তা জোর ক'রে বলা যায় না বটে, কিন্তু কি জৈন, কি হিন্দু—এমন কি বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরও বৃহত্তর সম্প্রদায় পর্য্যন্ত তাঁর উপরে হয়ে উঠেছিল রীতিমত খড়গহস্ত।

হুয়েন সাং দেশে ফিরে গেলেন। লোকে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলে, হর্ষবর্দ্ধন বোধ হয় বৌদ্ধদের নিয়ে আর বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না।

সত্য কথা বলতে কি, হর্ষবর্দ্ধন অল্প-বিস্তর বাড়াবাড়ি করতেও বাকি রাখেননি।

বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা হুয়েন সাংয়ের মত অসার ও ভ্রান্ত ব'লে প্রমাণিত করবার জন্যে প্রায়ই তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতেন। সে সময়েও (এখনকার মত) তর্কের সময়ে হাতাহাতি হ'ত যথেষ্ট!

কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন তাঁর প্রিয়পাত্রের প্রতিযোগীকে জয়লাভ করবার সুযোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

তিনি ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন: "যে কোন ব্যক্তি চৈনিক গুরুর গায়ে হাত দেবে বা তাঁকে আহত করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। যে কোন ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে কথা কইবে, তার জিভ কেটে ফেলা হবে। আর যারা তাঁর উপদেশ-বাণী শুনে লাভবান হ'তে চায় তাদের কোন ভয় নেই।"

বলা বাহুল্য, এই ঘোষণার পর আর কোন সাহসী পণ্ডিত হুয়েন সাংয়ের সঙ্গে তর্ক করতে অগ্রসর হননি। তর্কের খাতিরে জিহ্বাকে বলি দেবার জন্য কারুরই লোভ হ'তে পারে না।

কিছু দিন যায়। সাম্রাজ্যের কোথাও বহিঃশত্রু নেই। সিংহাসন নিষ্কণ্টক। বাণভট্টের সঙ্গে নিরুদ্বেগে কাব্যচর্চ্চা করেন রাজকবি

শ্রীহর্ষবর্দ্ধন। এ-জীবনের মতন তিনি কোষবদ্ধ করেছেন তরবারিকে। তাঁর কাছে রাঙা রক্তের চেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছে কালো কালি।

বৌদ্ধ চীনসম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সভায় এক রাজদূত পাঠালেন, নাম তাঁর ওয়াং-হিউএন-সি। দূতের সঙ্গে এল ত্রিশ জন অশ্বারোহী দেহরক্ষী।

আবার এক চীনা দূত! জনসাধারণের মনে নতুন ক'রে জেগে উঠল সন্দেহ ও অসন্তোষ। কে জানে, এই নবাগত কি গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে পদার্পণ করেছে ভারতবর্ষে! এর কুমন্ত্রণা শুনে এবারে হিন্দুদের মুখে ভালো ক'রে কালি মাখাবার জন্যে মহারাজা হয়তো প্রকাশ্যেই গ্রহণ করবেন বৌদ্ধধর্ম!

পলাতক মন্ত্রী অর্জ্জুনাশ্ব গোপনে কোথায় ব'সে দিন গুণছিল। এত দিন পরে এসেছে তার আত্ম-প্রকাশের লগ্ন! সে রাজ্যের চারি দিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলে। তারা চুপি-চুপি প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগল, "অতি-বার্দ্ধক্যে রাজার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করতে চান। প্রত্যেক হিন্দুর উচিত, এমন স্বধর্ম্মবিদ্বেষী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা।"

তার পর ভারতের দুর্ভাগ্য নিয়ে এল এক দুর্দ্দিন।

এক সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের সন্ধ্যারতি দেখে হর্ষবর্দ্ধন প্রাসাদে ফিরে আসছিলেন।

অন্ধকার ফুঁড়ে যমদূতের মত বেরিয়ে এল এক দল অস্ত্রধারী লোক। তারা হর্ষবর্দ্ধনকে আক্রমণ করলে একসঙ্গে।

রক্ষীরা প্রাণপণে বাধা দিলে, কিন্তু শেষ-রক্ষা করতে পারলে না। দলে তারা হালকা।

মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের রক্তাক্ত দেহ পৃথিবীর কোলে শুয়ে ত্যাগ করলে অন্তিম নিশ্বাস।

মহাভারতের শেষ-মহাবীর! আর্য্যাবর্ত্তের শেষ হিন্দু-সম্রাট!

[ক্রমশঃ

কেল্লা ফতে

শ্রীউমা মজুমদার

আমরা তখন ছোট। অর্থাৎ কেউ বা স্কুলের শেষ সীমায় পৌঁছেছি, কেউ বা সবে কলেজের উঠানে ঢুকেছি। আমাদের দুরন্তপনায় আর অত্যাচারে গ্রামবাসী বয়স্ক ব্যক্তিরা সর্ব্বদা তটস্থ। কারণ, কারুর গাছে আম পাকবার উপায় নেই, পুকুরে মাছ উধাও, ফুলবাগানের বেড়া ভাঙা, এ-সব উপদ্রব তো আছেই, তা ছাড়া স্নান করবার সময় হাত-পা ছুঁড়ে জল ঘোলা করে, গায় কাদা-গোলা জল ছিটিয়ে শুকনো কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে তাদেরকে নাস্তা-নাবুদ করে দিতে এই সুশান্ত ছেলেদের দলটি এত আনন্দ পেত যে তাঁরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন।

এক দিন মজুমদারদের চণ্ডীমণ্ডপে অবিভাবকদের এক সভা বসল। আলোচনার বিষয়, এই বাঁদরের একশেষ হতভাগা ছেলেগুলোকে কি করে শাস্তি দেওয়া যায়। এমন করে তো আর পারা যায় না!

সকলের চাইতে মুখুজ্জে মশাইয়ের রাগ বেশী। 'হায় হায়! আমার অমন নারকেল গাছগুলো! কি হাল করেছে দেখেছ তো? যেন নেড়া কার্ত্তিক! আহা, কি আলো করেই না থাকত গাছগুলো আমার উত্তরের ভিটেটা। ছোঁড়াগুলো কি বেহদ্দ পাজী, একেবারে নিকেশ করে দিলে গো! অহঃ!'

সত্যি বলছি ভাই, মুখুজ্জে মশায়ের আক্ষেপ স্মরণ করে আমারও আজ দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে!

সকাল বেলা পোষ্টাপিস থেকে ফিরছিল বেণু, হাতে একটা চিঠি পথে তাদের গ্রামের হিন্দুস্থানী চৌকীদারটার সঙ্গে দেখা।

—'এই যে খোকাবাবু, কাঁহা সে আয়া? মুখুজ্জে মশাই বলিয়েছে হামাকে, তোমাদের ধরিতে পারিলে পান্‌চ্‌ রূপেয়া বখশিস্‌ মিলেগা আউর—'

—'থাম বেটা মেড়ো ভূত! পারে না আবার বাঙলা বলতে এসেছেন!'

—'কি, হামি দশ বছর বাঙলা মুলুকমে আসিয়েছে না? হামি বাঙলা জানি না?' চৌকীদার বুদ্ধ্‌ সিং অপমানে রেগে আগুন।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম বটে, তুমি তো রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মপুত্তর! তুমি বাঙলা জান না, তা কি হয়?' বেণু হাসতে হাসতে চলে যায়।

—'আচ্ছা, এই হাসির ফল হামি দেখিয়ে লেবে! বুদ্ধ্‌ চীৎকার করে ওঠে ক্রোধে।

—'দেখাস ব্যাটা দেখাস্‌, তোর ঐ ভুঁড়ো পেটে যত বুদ্ধি আছে তাই দিয়ে দেখাস্‌।'

বুদ্ধ্‌ ভীষণ রাগে আস্ফালন করতে থাকে। কিন্তু বেণু তখন কথার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

সেটা ছিল কৃষ্ণপক্ষের রাত। গভীর রাতে ক্ষীণ চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় পথে-ঘাটে, গাছের মাথায়, ঝোপে-ঝাড়ে অদ্ভুত একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ একটা গাছের ডালকে নড়তে দেখলে মনটা অজানা আশঙ্কায় শির-শির করে ওঠে।

বামুনপাড়ার ভিতর যেখানে রাস্তাটা তিন-মুখো হয়ে গিয়েছে সেইখানটায় এসে থমকে দাঁড়ালেন মুখুজ্জে মশাই। কি একটা আওয়াজ আসছে না? যেন শব্দ হচ্ছে সর-সর, মর-মর! বোধ হয় ডালপালার শব্দ হবে। মুখুজ্জে বাঁ-দিকের রাস্তাটায় বেঁকবার উপক্রম করলেন। ওই দিকে আর একটু এগিয়ে গেলেই তাঁর বাড়ী। গিয়েছিলেন এক বড়লোক যজমানের বাড়ী, রাতের মেলে ফিরেছেন। ট্রেণ বড্ড লেট করে ফেলেছে আজ। ওঃ, কি বিশ্রী রাত্তিরটা! মুখুজ্জে তাড়াতাড়ি বাড়ীর পথে পা বাড়ালেন।

খড়-খড় খড়-খড়, মড়-মড় মড়-মড়। আবার শব্দ! আরো জোরে! সে যেন বলছে, 'ওহে নিঝুম রাতের একলা পথিক, ফিরে চাও আমার পানে, আমাকে অবহেলা করো না!'

সে আহ্বান উপেক্ষা করে কার সাধ্য! মুখুজ্জে নিরুপায়ের মত অথচ একটা কৌতুহল-মিশ্রিত ভয়ের সঙ্গে বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে মুখ ফেরালেন।

সাহসী বলে মুখুজ্জের বিশেষ নাম ছিল না। ফিরতে রাত হবে বলে বুদ্ধ্‌কে বলে রেখেছিলেন, 'বাবা বুদ্ধ্‌ সিং, মেলের সময় একটু ষ্টেশনের দিক হয়ে যেও, মানে আজকাল কেষ্টপক্ষ যাচ্ছে কি না। বুঝতে পারলে তো বাবা আমার কথাটা?'

সে খুব নুয়েছে এইটা আত্মপ্রসাদের সাথে সে মুখুজ্জে মশাইকে জানিয়ে দিলে।

এখন, সন্ধ্যেবেলা আচ্ছা করে সিদ্ধি ঠুকে প্রায় মাঝ-রাতে বুদ্ধু একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে টেলতে-টলতে পাকা বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে তো এগোচ্ছে ষ্টেশনের দিকে।

বামুনপাড়ার সেই তে'মাথায় এসে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, হাঁকল, 'কৌন্ হ্যায়?' আলো-আলো আধো-আঁধারে বুদ্ধু দূর থেকে চিনতে পারেনি মুখুজ্জেকে। অস্পষ্ট দেখা যায় তার পরনের কাপড়-খানা ও কাঁধের উপরের নামাবলী বৈশাখী বাতাসে মৃদু মৃদু উড়ছে। কাছে কোথায় কোন কামিনীর গাছে ফুল ফুটেছে, তার মিষ্টি গন্ধ এসে মনকে ভারি করে তোলে, চোখে তন্দ্রা আনে। বাতাসে ও ফুলের গন্ধে অস্পষ্ট পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় কি যেন মাদকতা আছে। সেটা যে খুব সুখদায়ক তা নয়, অথচ তার মায়াকে যেন উপেক্ষা করা যায় না।

হঠাৎ একটা ভুতুম-প্যাচা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল। চকিত হয়ে চৌকীদার আবার হাঁকল, 'কৌন হ্যায়?' উত্তর নেই। বুদ্ধু সিং এগিয়ে গেল। যেতেই চিনতে পেরে বলে ওঠে, 'আরে, ঠাকুর মশাই! আপ লোক তো বহুৎ জলদি আ গিয়া; হামার কি দেরী হয়ে গিয়েছে? মাপ কী জীয়ে!'

কিন্তু ঠাকুর মশায়ের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে সে অবাক হয়ে যায়। এতক্ষণে লক্ষ্য করে, মুখুজ্জের সমস্ত শরীর কাঠের মত আড়ষ্ট আর চোখের দৃষ্টি ডান দিকের যে বড় বাগিচাটা, তার কোথায় গিয়ে আটকে গিয়েছে। সে দৃষ্টিতে যে ভয়-স্তম্ভিত ভাব ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা অসম্ভব।

সে দৃষ্টির অনুসরণ করে চেয়ে দেখে মুহূর্ত্তে বুদ্ধুর দেহ ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

—'রাম, রাম! এ ঠাকুর মশাই কেয়া দেখতা হ্যায়? উ তো ভূত আছে! আরে রাম, রাম!'

বাগিচার ভেতর যে পচা ডোবাটা আছে, তাতে এখন সামান্যই জল, তার পাড়ে একটা আসশ্যাওড়া গাছের নীচে কোন অশরীরী যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে দাঁড়িয়ে আছে। আট ফুট লম্বা লিকলিকে দেহ, সাদা কাপড়ে ঢাকা। বাতাসে আঁচল উড়ছে সর-সর। তার উপরে মাংসবিহীন মুখখানা হা-হা করে হাসছে, তার সাদা দাঁতগুলো মুখ-গহ্বর থেকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। চোখের জায়গায় দেখা যাচ্ছে দু'টো অন্ধকারের গোলা। আর নাক তো নয়, বিভীষিকা! উঃ, কি ভয়াবহ সে মূর্ত্তি! তার চোখের শূন্যদৃষ্টি যেন বুকের রক্ত শুষে নেয়।

হঠাৎ খন্-খন কন্-কন, খড়্খড় মড়্মড়! ও কি? ওকি করছে? হাসছে খন্খনে গলায়? ডাকছে না কি? ওর হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে না? আর মাথাটাও নাড়ছে যে, একবার এদিক একবার ওদিক!

মুখুজ্জে ধপাস্ করে পড়ে গেলেন জ্ঞান হারিয়ে। আর সাহসী বুদ্ধু সিং? তার দাঁতে-দাঁতে ভীষণ ঠোকাঠুকি চলেছে যেন নর্থ বেঙ্গল আর ঢাকা মেলের কলিশ্যন। আর সেই কলিশ্যনের ভীষণ শব্দ ভেদ করে যাত্রীদের আর্ত্তনাদের মত তার গলা দিয়ে জড়িত স্বরে বিকট ভয়াতুর আওয়াজ বেরোচ্ছে—রাম রাম, ওহো! হাম মর গিয়া! ভূ—ত! ভূত হ্যায়! রাম রাম!'

কিছুক্ষণ পরের কথা বলছি। তে'মাথাটা পাড়ার লোকে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে। ভূতটা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাটা মাঝে মাঝে নড়ছে বটে কিন্তু হাসি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাকে দেখে সকলের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু একসঙ্গে অনেক লোক ও লণ্ঠনের আলোর উপস্থিতিতে জায়গাটা আগের মত ভীষণ মনে হচ্ছে না।

মুখুজ্জে মশাই রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর জ্ঞান আনবার চেষ্টা চলছে। কিছুতেই তিনি সামলাতে পারছেন না। একবার একটু জ্ঞান ফিরে আসে আর পর-মুহূর্ত্তেই 'ওরে বাবা গো' বলে আবার ঢলে পড়েন। আর বুদ্ধু ভূতটার দিকে পেছন করে বসে কামারের হাপরের মত হাঁপাচ্ছে।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন বোসদা। ছেলেবেলা থেকে অত্যন্ত ডানপিটে ও দুঃসাহসী ছিলেন। দেশে খুব কম আসেন। আসামের জঙ্গলে কি কাজ করেন। আজ বিকেলে বাড়ী এসেছেন ছুটিতে।

—'কি হে, ব্যাপারটা কি?'

সকলে আঙুল দিয়ে বাগিচাটা দেখিয়ে দিল। ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বোসদা বললেন, 'হু, ভয় পেয়েছেন বুঝি? দেখি একটা লাঠি।'

বুদ্ধুর লাঠিটা রাস্তার উপর পড়েছিল, তিনি সেটা তুলে নিয়ে আসশ্যাওড়া গাছটার পানে অগ্রসর হলেন। সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে লাগল।

কাছে গিয়ে বোসদা ঠক্ করে এক ঘা মারলেন ভূতটার গায়ে। কাপড়-জড়ানো বাঁশের কঞ্চিটা লকলক করে উঠল। আর এক আঘাতেই মড়ার মাথার খুলিটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। বোসদা এক টানে বাঁশের গা থেকে কাপড়টা ছাড়িয়ে ফেল্লেন।

—'হাঃ হাঃ, এই যে আপনাদের ভূত! বলিহারি সাহসের!' বোসদা হাসতে লাগলেন বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠে। 'ধন্য যে এই ফন্দি গজিয়েছে তার বুদ্ধিকে তারিফ না করে পারছি না, সাবাস্!'

আসলে সব ফাঁকা দেখে গ্রামের লোকের হাঁক-ডাক অত্যন্ত বেড়ে গেল। মিত্রদা তর্জ্জন করে উঠলেন, 'নিশ্চয়, এ সেই বখাটে পাজী নচ্ছার ছোঁড়াগুলোর কাজ। হতভাগাদের এবার নিতান্তই জেলের ঘানি না টান্লেই হচ্ছে না!

—'আগে তাদের দেওয়া ঘানি টেনে নিজেরা সামলান,' বোসদা তেমনি হাসতে হাসতে বলেন, 'তার পর অন্যের ব্যবস্থা করবেন! সাবাস ছোকরারা!'

পরের দিন বিকেলে সাড়াডিঙ্গির মাঠে। বিজয়ের আনন্দে চক্চক্ করছে সকলের চোখ। উল্লসিত কণ্ঠে ধেনু বললে, 'ওঃ, কি চমৎকার হ'ল বল্ ত। আমার লাফাতে ইচ্ছে করছে!'

—'আমার যে কি ইচ্ছে করছে, তা বলার ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না ভাই।' টুটুন বলে গদগদ স্বরে, 'ঠিক যেন—'

—'থাম থাম, আর কবিত্ব করতে হবে না, ও-সব ভাল লাগে না এখন! তার পর? একটু আগে তুই কি বল্ছিলি যেন, ঠিক শুনতে পাইনি গোলমালে। মুখুজ্জে মশায়ের কি হয়েছে?'

—'হবে আর কি? মাঠে আসবার সময় দেখলুম গুটি গুটি যাচ্ছে

তোদের বাড়ীর দিকে, বোধ হয় আবার কোন 'মিটিং' এ্যাটেণ্ড করতে! আমাকে দেখে তার মুখ-চোখের ভাব এমন ভয়াতুর হয়ে উঠল যে আমি আর না হেসে থাকতে পারলুম না! বোধ করি ভেবে থাকবে, "এই রে, সেরেছে, ছোঁড়া দেখতে পেল চণ্ডীমণ্ডপে যাচ্ছি, গিয়ে লাগাবে সর্দারের কাছে। এবার কপালে কি আছে মা-কালী জানেন।" আমার হাসি শুনে, বলব কি ভাই, এক রকম দৌড়েই তোদের ফটকের ভেতর ঢুকে গেল। ভূতের হাসিটা ওর মনে পড়ে গেল না কি ভাই?'

—'ওঃ হো হো! ভূতের হাসি!' সকলে গড়াগড়ি খেতে লাগল মাঠের ওপর।

—'কিন্তু ভাই, তোর হাসা কি উচিত হয়েছে?' আমি বললুম, উচ্ছ্বসিত হাসির বেগকে অতি কষ্টে গলার নীচে ঠেলে দিয়ে।

—'ওরে, কিছু ভয় নেই। মুখুজ্জের চণ্ডীমণ্ডপে যাওয়াই সার! কিছু দিন অন্ততঃ সব চুপচাপ থাকবে, শাস্তিটা তো নেহাৎ কম জোরালো হয়নি! আর বোসজা আমাদের হয়ে বেশ মিষ্টি মিষ্টি বলাটা বোলেছেন। ওঁর কাছে আমরা ঋণী থাকব চিরকাল, কি বলিস্?'

—'নিশ্চয়ই!' সবাই সমস্বরে বলে উঠে।

—'আর, বুদ্ধির ঝুঁড়ি বুদ্ধু সিংএর মুখের ফলাটাও খুব ভোঁতা হয়ে গিয়েছে! ব্যাটা বলে কি না, ধরিয়ে দিয়ে পাঁচ টাকা নেবে মুখুজ্জের কাছ থেকে!' বেণু বলে।

'যাক্ গে ও-সব কথা।' লীডার ধেনু বললে, 'এখন আমাদের পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য কি? মিত্তিরের গাছের আমগুলোর একটা সদ্গতি করা। ও ক্ষিপ্টেকে একটু সমঝে দেওয়ার দরকার, তবে তাতে কোন বাধা হবে বলে মনে হয় না! কেল্লা তো ফতে হয়ে গিয়েছে! ঠিক যেন সিজারের রোম জয় করার মত; আমরা বলতে পারি বটে—'দি রুবিকন্ ইজ ক্রশড্!'

স্বপ্নাদ্য ক্যালেণ্ডার

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

বেশী দিনের কথা নয়, এই সেদিনের কথা। নতুন বছর আসছে। আসছে তেরশ' পঞ্চান্ন সাল। চারি দিকেই আনন্দ। ক্যালেণ্ডারের ছড়াছড়ি। ছোট, বড়, মাঝারি, চার কোণা, গোল, তিন কোণা—নানান্ সাইজের, নানান্ ষ্টাইলের হাজার হাজার ক্যালেণ্ডার।

ঝকমকে সুন্দর নতুন ক্যালেণ্ডারটি আমার হাতে এসে পড়তেই আমার কিন্তু বিষম মুস্কিল বেধে গেল। প্রথম দৃষ্টিতেই দেখি, বৈশাখ মাসের পয়লা থেকে একত্রিশ তারিখ পর্য্যন্ত সব ক'টা দিন একাদিক্রমে সার সার লাল রঙে রঙানো। ওই লাল রঙয়ের দিনগুলিকেই আমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। শুধু ওই জন্তেই আমার ক্যালেণ্ডারের দরকার। কিন্তু এ কি সম্ভব? সমস্ত বৈশাখ মাসটাই কি ছুটী হতে পারে কখনও? বোধ হয় ক্যালেণ্ডারটাই লাল রঙয়ের কালিতে ছাপা। কিন্তু পরক্ষণেই আমার ভুল ভেঙে যায়। দেখি, তলায় মোটা মোটা হরফে ছাপা রয়েছে 'লাল চিহ্নিত দিনগুলি সরকারী ছুটীর দিন বলিয়া গণ্য হইবে।'

আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে যাই। সমস্ত মাসটাই সরকারী ছুটী—এমন অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হোলো কি করে? নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে এর পিছনে।

কিন্তু···!

ওই কিন্তুতে এসেই আমি থমকে পড়ি। ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে আমি লক্ষ্য করি যে, বছরের বারো মাস, বাহান্ন সপ্তাহ ও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের একটি দিনও কালো কালীতে ছাপা নেই। সব লালে লাল হয়ে গিয়েছে বোধ হয় রণজিৎ সিংয়ের অমর ভবিষ্যৎ বাণী অনুসরণ করেই। শুধু কি তাই? প্রত্যেক মাসের তলাতেই লেখা সেই এক কথা—'লাল চিহ্নিত দিনগুলি সরকারী ছুটীর দিন বলিয়া গণ্য হইবে।' তবে নিশ্চয়ই ক্যালেণ্ডারের নীচের লেখা ওই কথাটা ভুল। বোধ হয়, ওটা হবে 'লাল চিহ্নিত দিনগুলি সরকারী ছুটীর দিন বলিয়া গণ্য হইবে না।' শেষের 'না' কথাটা হয়ত ছেড়ে গিয়েছে প্রিণ্টারের দোষে।

তবু মনে একটা খটকা বাধে। তাক থেকে নামিয়ে নিয়ে আসি নতুন বছরের পঞ্জিকাখানা সন্দেহ নিরশনকল্পে। ওই আমার একটা স্বভাব। যখনই কোন কিছুতে আমার মনে সন্দেহ হয়, তখনই যতক্ষণ না তার নিরশন হয় ততক্ষণ মনে স্বস্তি পাই না আমি। পঞ্জিকা দেখতেই কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত সোজা হয়ে যায়। অবশ্য গঙ্গার ঘোলাটে জলের মত নয়, কাচের মত স্বচ্ছ ডিসটিলড ওয়াটারের মত।

আমি দেখতে পাই পয়লা বৈশাখ বাঙলা নতুন বছরের প্রথম দিন। ২রা শহীদ রামানন্দ বিশ্বাসের জন্মদিবস। ৩রা দক্ষিণ আফ্রিকা দিবস। ৪ঠা স্বামী নাগেশ্বরানন্দের তিরোভাব দিবস।

তার পর?

তার পর স্বাধীনতা দিবস, রসিদ দিবস, আজাদ-হিন্দ দিবস, নোয়াখালী দিবস, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, পরোক্ষ সংগ্রাম দিবস, লবণ আইন অমান্য আন্দোলন দিবস, মে দিবস, হিন্দু-মুস্লিম ঐক্য দিবস, বুদ্ধ দিবস, ডোমিনিয়ন দিবস, কারাগার দিবস, পাঞ্জাব দিবস, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা দিবস, কারাবরণ দিবস, গোলটেবিল বৈঠক দিবস, বঙ্গভঙ্গ দিবস, সিপাহী বিদ্রোহ দিবস, আগষ্ট দিবস, পাণিপথ দিবস, নাদির শা দিবস, সাতারা দিবস, ভিয়েটনাম দিবস, সাহিত্য দিবস, শিবাজী দিবস···।

আর কত বলব। সমস্ত দিবসের নাম করতে গেলে গোটা দশ পাতার একখানা লম্বা-চওড়া তালিকা তৈরী করতে হয়। অবশ্য তালিকার বদলে আমার মত পঞ্জিকার সাহায্যেও কাজ চালানো যেতে পারে।

স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিকদের অনুরোধে (অথবা চাপে) এই সব মহান্ দিবসগুলিকে আমাদের জনপ্রিয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ছুটীর দিন ঘোষণা না করে পারেননি। ধন্যবাদ আমাদের স্বদেশী গভর্ণমেণ্টকে!

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই আমি উল্লাসে আর আনন্দে ঠিক সেই স্বর্গতঃ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মতই চীৎকার করে উঠলাম, "ইউরেকা ইউরেকা। পেয়েছি, পেয়েছি।"

কিন্তু এ কি?

দ্বিতীয় বার ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত সোজা হয়ে যায়। আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। নিজের 'ইউরেকা, ইউরেকা' চীৎকারে নিজেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছে আমার। আমি তাহলে এতক্ষণ একটা অলীক স্বপ্ন দেখছিলাম মাত্র। এমন সুন্দর ব্যাপারটা তাহলে সত্যি নয়? শুধু মাত্র স্বপ্ন! কিন্তু যদি সত্যিই হোত এমন একটি ব্যাপার, তাহলে কি আনন্দেরই না হোত। শুধু একটুমাত্র ঘুমের জন্তই নষ্ট হয়ে গেল সব।

প্রসবকালে
জীবাণু-সংক্রমণ
সম্বন্ধে
কাণ্ডজ্ঞানহীন অসতর্কতা
প্রসবের পূর্বে
হাতের কাছে "ডেটল" যেন ঠিক থাকে
হ্যাঁ রাখব.
এদিকে মনে মনে ভাবছে "কিছু বিপদ হবে না— অযথা কেন "ডেটল" কিনে রাখা ?"
জরুরী অবস্থার জন্য ডাক্তার তৈরি হয়ে এসেছিলেন— তাঁর সঙ্গে "ডেটল" ছিল
এঁরা "ডেটল" এনে রাখেনি কেন
বিপদের ঝুঁকি নিতে যাবেন না— ঘরে সর্ব্বদা "ডেটল" রাখবেন।
ডাক্তার বলেন
আমি সমস্ত প্রসূতিকেই প্রসবের সময় "ডেটল" ব্যবহারের উপর নির্ভর করতে বলি এবং ঘরেও সর্ব্বদা "ডেটল" রাখতে বলি
DETTOL
'DETTOL'
এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ, ২০-১, চেতলা রোড, কলিকাতা
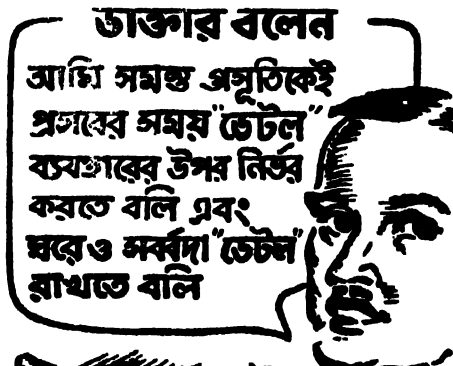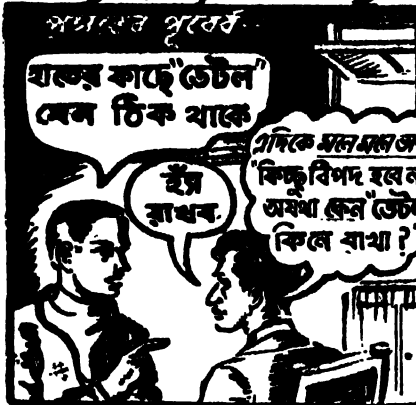
টাকার পাহাড়

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা লোক। তার নাম পচপচি। সে খুবই অলস—কোন কাজই করে না, তাই তার টাকাকড়িও মোটেই আয় হয় না।

তার বাড়ীর চার পাশে যে সব লোক বাস করে, তারা নানা রকম কাজ ক'রে টাকা আয় করে এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে। তাই দেখে পচপচি মনে মনে খুবই কষ্ট পায়; কিন্তু তবু খেটে-খুটে যে টাকা আয় করবে, সেদিকে কিছুতেই তার মন যায় না।

এক দিন হয়েছে কি, পচপচি বসে-বসে একটি চাষার সঙ্গে গল্প করছে। গল্প করতে করতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা ভাই, বলতে পার, টাকা পাওয়া যায় কোথায়?

সেই চাষাটি ছিল বেশ একটু আমুদে। তাই সে অমনি বললে, টাকা পাওয়া যায় পাহাড়ে!

চাষা যে তামাসা ক'রে ঐ কথা বলেছে, মূর্খ পচপচি তা মোটেই বুঝতে পারেনি। সে ভেবেছে, সত্যি বুঝি পাহাড়ে টাকা পাওয়া যায়! ঐ কথা ভেবেই পচপচি বললে, সব পাহাড়েই টাকা পাওয়া যায়?

চাষা তখন হাসতে হাসতে বললে, ওরে মূর্খ, সব পাহাড়েই টাকা পাওয়া যাবে, তা কি হয়? একটা পাহাড় আছে, সেইখানেই শুধু পাওয়া যায়!

পচপচি জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় সেই পাহাড়?

চাষা বললে, সেই পাহাড় এখান থেকে তিন দিনের পথ। যদি পারিস তো চলে যা সেখানে, টাকার পাহাড় থেকে অনেক টাকা নিয়ে আসতে পারবি।

তবে আমি এখনই যাচ্ছি—বলেই টাকা আনবার জন্য সংগে একটা বস্তা নিয়ে পচপচি চলল টাকার পাহাড়ের সন্ধানে। চাষার কথা মতো ঠিক তিন দিন চলবার পরেই সে এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়ে দেখে যে, সেখানে টাকার পাহাড় নেই, খুব বড় একটা মাঠ রয়েছে, আর সেই মাঠে চাষারা চাষ করছে।

পচপচি তখন চাষাদের জিজ্ঞাসা করলে, ভাই, বলতে পার, এখানে টাকার পাহাড় কোথায় আছে?

পচপচির কথা শুনে চাষারা সব অবাক—অমন অদ্ভুত কথা তারা কখনো শোনেনি। তারা হাঁ ক'রে পচপচির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

পচপচি বললে, তোমরা আমার কথার অর্থ বুঝতে পারছ না?

চাষাদের মধ্যে এক জন ছিল খুব চালাক। সে পচপচির কথা শুনেই বুঝেছে যে, লোকটা মহা মূর্খ! সে তখন বললে, তোমার কথার অর্থ কেন বুঝতে পারব না? খুব বুঝতে পেরেছি। টাকার পাহাড় কোথায় আছে, তাই জানতে চাও তো? টাকার পাহাড় আছে এখান থেকে একশো মাইল দূরে। এখান থেকে সোজা একশো মাইলে দূরে চলে যাও, তাহলেই টাকার পাহাড় দেখতে পাবে। এই বলেই চালাক চাষা গম্ভীর ভাবে আবার চাষ করতে আরম্ভ করলে।

পচপচিও আবার টাকার পাহাড়ের সন্ধানে চলল।

পচপচি একটু দূরে চ'লে যাওয়ার পরেই, সব চাষীরা হো-হো ক'রে হাসতে আরম্ভ করলে। তারা সবাই বুঝেছে যে, লোকটা একটা আস্ত বোকা।

আর একশো মাইল গেলেই টাকার পাহাড় পাব,—এই ভেবে পচপচি খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে চ'লেছে। যখন একশো মাইল চলা শেষ হয়েছে, তখন সে একটা নদীর ধারে এসেছে। সেখানে দেখে যে, নদীতে জেলেরা মাছ ধরছে, কিন্তু পাহাড়ের নাম-গন্ধও সেখানে নেই।

পচপচি তখন জেলেদের জিজ্ঞেস করলে, এখানে টাকার পাহাড় কোথায় আছে, বলতে পার?

পচপচির কথা শুনেই জেলেরা বুঝতে পেরেছে যে, ও একটা বোকা।

এক জন জেলে তাড়াতাড়ি বললে, টাকার পাহাড় ত' এত দিন এই নদীর পাড়েই ছিল; কিন্তু এই ক'দিন আগে সেটা নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেছে। তুমি ওপারে যাও, তার পরে কিছু দূর গেলেই টাকার পাহাড় দেখতে পাবে।

জেলেদের কথা শুনেই পচপচি নদীর অপর পারে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু দেখে যে, জেলেদের নৌকা ছাড়া আর কোন নৌকা সেখানে নেই। এখন সে মিনতি ক'রে জেলেদের বললে, ভাই, আমাকে একটু ওপারে পার ক'রে দাও না।

এক জন জেলে অমনি বললে, টাকার পাহাড়ে যদি যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে সাঁতার কেটেই নদী পার হতে হবে।

ঐ কথা শুনেই পচপচি অমনি লাফিয়ে পড়ল নদীর মধ্যে। তার পর সাঁতার কেটে নদীর অপর পারে গিয়ে উঠল, উঠেই আবার চলতে আরম্ভ করল।

অনেক পথ চ'লেছে; তবু টাকার পাহাড় কোথাও দেখে না।

তখন মনে মনে ভাবছে, টাকার পাহাড়টা নিশ্চয় হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চ'লে গেছে। এই ভেবে পচপচি টাকার পাহাড়কে ধরবার জন্যে খুব জোরে জোরে ছুটতে আরম্ভ করল।

এই সময়ে এক বণিকের সংগে তার দেখা। বণিক ওকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল; ওরে ভাই, এত জোরে জোরে ছুটছ কেন? কী ব্যাপার?

পচপচি বললে; টাকার পাহাড় নদীর ওপার থেকে এপারে এসেছে, তার পরে কোথায় চলে গেছে। আমি সেটা ধরবার জন্যে জোরে জোরে ছুটছি।

পচপচির ঐ কথা শুনেই বণিক বুঝতে পেরেছে যে, লোকটা একটা বোকা। তাই সে খপ করে পচপচির হাত ধরে বললে; টাকার পাহাড় কোথায় আছে, তার খবর আমি বলতে পারি। কিন্তু টাকার পাহাড়ের সন্ধানে কে তোমাকে আসতে বলেছে, তাই আগে বল দেখি।

পচপচি বললে; এক চাষী বুড়ো বলেছে।

বণিক বললে, সে ঠিক কি বলেছে, তাই বল ত'।

পচপচি তখন বললে, সে বুড়ো আমাদেরই গাঁয়ের লোক। সে এক দিন বললে, আমাদের গাঁ থেকে তিন দিনের পথ চ'লে গেলে পর টাকার পাহাড়ের কাছে যাওয়া যায়। বুড়োর সেই কথা শুনে আমি সেই দিনই চলতে আরম্ভ করি।

বণিক বললে, তার পর?

পচপচি বললে, তিন দিন চলবার পরে এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম। কিন্তু সেখানে টাকার পাহাড় কোথাও নেই। দেখলুম, প্রকাণ্ড একটা মাঠ, আর সেই মাঠে চাষারা চাষ করছে।

বণিক একটু হেসে বললে, ঐখানেই টাকার পাহাড় ছিল। কিন্তু তুমি অন্ধ, তাই দেখতে পাওনি।

ঐ কথা শুনেই পচপচি বললে, আমি অন্ধ? আমার এই চোখ দিয়ে যে আমি সব দেখতে পাই, আর তুমি আমাকে বলছ অন্ধ!

বণিক আবার হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ, ঐ চোখ দিয়ে তুমি সবই দেখছ, তবুও তুমি অন্ধ! সেই মাঠেই টাকার পাহাড় ছিল, কিন্তু তুমি দেখতে পাওনি!

পচপচি বণিকের কথা শুনে অবাক্ হয়ে ভাবছে, আমি অন্ধ? অথচ এত দিন তো আমি তা বুঝতে পারিনি! এ তো বড় আশ্চর্য্য!

বণিক তখন বললে, তিন দিন চলবার পর সেই মাঠের মধ্যে চাষাদের কাছে আসবার পর কি হ'ল তাই বল।

পচপচি বললে, আমি সেই চাষাদের জিজ্ঞেস করলাম, টাকার পাহাড় কোথায় আছে? তারা বললে যে, সেখান থেকে একশ' মাইল দূরে টাকার পাহাড় আছে। ঐ কথা শুনেই আমি আবার চলতে আরম্ভ করলাম।

বণিক তখন বললে, চ'লে চ'লে একশো মাইল যাবার পরে কি হল?

সামনে পড়ল এক নদী। কিন্তু টাকার পাহাড় সেখানেও দেখলুম না।

তার পর?

আমি যে নদীর পাড়ে এলুম, সেই নদীতে জেলেরা মাছ ধরছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে টাকার পাহাড় কোথায় আছে? তারা বললে, টাকার পাহাড় নদী পার হয়ে ওপারে চ'লে গেছে। আমি তখন সাঁতার কেটে নদী পার হ'য়ে চ'লে এলাম।

বণিক অমনি বললে সেই নদীর পাড়েও টাকার পাহাড় ছিল। কিন্তু তুমি অন্ধ, তাই দেখতে পাওনি!

বণিকের কথা শুনে পচপচি আবার অবাক্! বললে, আমি যদি অন্ধই হ'তাম, তা হলে কি আমার বাড়ি থেকে এই এত দূরে একা একা চ'লে আসতে পারতাম?

বণিক হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ, কোন কোন অন্ধ লোকে তা পারে!—আচ্ছা, তোমার বাড়ীর কাছে মাঠ এবং নদী আছে?

পচপচি বললে, তা আছে বৈ কি। মাঠের নাম দুধরিয়ার মাঠ, আর নদীর নাম কীর্ত্তনখোলা।

বণিক অমনি বললে, তা হ'লে সেখানেও টাকার পাহাড় আছে। তুমি অন্ধ, তাই সে পাহাড় দেখতে পাওনি। এখন যাও, সেই মাঠে বেশ করে চাষ দিয়ে বীজ বুনে দাও গে; আর সেই কীর্ত্তনখোলা নদীতে ফেল গিয়ে জাল। তা হলেই দেখবে, ক'দিন পরে তোমার ঘরের মধ্যেই টাকার পাহাড় গজিয়ে উঠবে!

পচপচি অবাক্ হয়ে বললে, এঁ্যা, তাই না কি?

বণিক একটা হাততালি দিয়ে বললে, হ্যাঁ তাই, তাতে আর সন্দেহ নাই।

পচপচি তখন সোজা চ'লে এল তার বাড়ীতে। তার পর মাঠে দিল চাষ, বুনল বীজ; কিছু দিন পরেই ফলল ফসল; নদীতে প্রতিদিন ফেলতে লাগল জাল, উঠতে লাগল প্রচুর মাছ।

পচপচি বাজারে গিয়ে সেই সব জিনিষ বিক্রি করতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যেই তার ঘরের মধ্যে সত্যি জেগে উঠল টাকার পাহাড় অর্থাৎ সে খুব ধনী হয়ে গেল।

বাড়ী থেকে তিন দিনের পথ গিয়ে পচপচি যে মাঠের মধ্যে হাজির হয়েছে সেখানে টাকার পাহাড় আছে; সেখান থেকে একশো মাইল গিয়ে যে নদী পেয়েছে, সেখানেও টাকার পাহাড় আছে; নদী পার হ'য়ে গেলে পর, অপর পারেও টাকার পাহাড় আছে; কিন্তু পচপচি অন্ধ ব'লে সেই টাকার পাহাড় দেখতে পায়নি;—এই সব কথা বণিক কেন ব'লেছিল, তা এখন পচপচি বেশ বুঝতে পারল। ঘরের মধ্যে টাকার পাহাড় গজাবে,—বণিক সে কথাই বা কেন ব'লেছিল, তাও পচপচি বুঝল।

তোমরা

প্রশান্ত দত্ত

খোঁচাখুঁচি দিয়ে জাগাতে পারিবে মনকে,
মগজেতে ঠাসা বিস্মৃতপ্রায় চেতনা?
সাবধান করে দিও আপনার জনকে—
নীরব কর্মী তোমরা কিছুতে মেত না।

শুধু চিৎকারে দেশের কি লাভ হবে;
কার্য্যোদ্ধার হবে কি ভেবেছো মস্তরে?
জান না কি করে দেশের সুনাম রবে?
হানাহানি ছেড়ে কাজ করে যাও অন্তরে।

তোমরা নিজেরা ভুলেছ আপন গৌরব,
টানাটানি করে আবার বাঁচাবে তাহাকে?
ভুলে যেও মনে অতীতের গড়া সৌরভ
পুন ফেরে না কো বিদায় দিয়েছ যাহাকে।

হালকা হাসিতে আপনার কাজ গোছাবে
মনে রাখা চাই তোমাদের কাজ বাঁচানো—
তোমরা দেশের অপমান-ভার মোছাবে
তোমরা জান না পুচ্ছটি তুলে নাচানো।

তোমরা মোদের ভবিষ্যতের কল্পনা,
নিমেষে ছেদিবে অন্ধ কারার রাত্রিকে;
তোমাদের মনে আশা ও আলোক অল্প না
প্রণাম জানাই তোমাদের মতো যাত্রীকে।

আত্মহত্যা কি পাপ?

অনাদিকুমার বসু

আত্মহত্যা কি সত্যই পাপ—না, একটু কষ্ট স্বীকার করে প্রকৃতিকে ঠকান—ইহাই আলোচ্য বিষয় এবং ইহা বিচার-সাপেক্ষ। এখন দেখা যাক, আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্য কি। যদি পাপ হয় তবে এইরূপ একটি পাপ মনে জাগিল কেন? এমন কি দুঃখ মনে উদয় হ'ল যার জন্য এই পাপকার্য্য! এমন সুন্দর পৃথিবী, তদুপরি এমন সুন্দর মানবদেহ কি আত্মহত্যার জন্য? উত্তরে বলিতে হয়, আমরা যে জগতে বাস করি সত্য কি সেটা প্রকৃত সুন্দর? আমাদের এই যে দেহ, সত্য কি ইহা প্রকৃত সুখময়?

জগতে সুখ বা জাগতিক সৌন্দর্য্য কোথায় বিদ্যমান্? যে দিকে তাকাই সেই দিকে দেখি, প্রকৃত সুখ বা সৌন্দর্য্য চারি আনা আছে কি না সন্দেহ! যদি বা চারি আনা থাকে তাও সেটা স্বল্পস্থায়ী ও দুঃখমিশ্রিত। তাই ত কবি দুঃখ করে বলিতেছেন—

"চলতি চক্কি দেখ, কর দিয়া কবীরা রো
দুপাটনকে বিচ আ সাবেত গিয়া ন কো"

জগতে প্রেম আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আছে বিরহ। ধর্মে সুখ বল—পৃথিবীতে ধার্মিক ক'টা? বিদ্যায় সুখ বল—পৃথিবীতে বিদ্বান্ ক'টা? বন্ধুত্বে সুখ বল—প্রকৃত বন্ধু বড়ই বিরল! ধনে সুখ বল—পৃথিবীতে ধনী ক'টা? এই অর্থই আবার ধনীদের নানা রকমে দুঃখ দেয়। তাই বলি, জগতে সুখ বা সৌন্দর্য্য বলতে কিছুই চোখে পড়ে না। দুঃখের জয়-জয়কার—

আমাদের এই যে দেহ ইহা কি সত্যই সুন্দর? না,—

"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধ-বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে পুরীষমূত্র-পূরিতে রমন্তি মূঢ়াঃ বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ।

প্রকৃত পক্ষে জগতে দুঃখের মাত্রাই বেশী। প্রত্যেকে যদি একবার তাঁর নিজের জীবন চিন্তা করে দেখেন, তাহলে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন। বাইবেল বলছে যে, মানুষ সারা জীবন কষ্ট ভোগ করে তার জীবিকা অর্জ্জন করিবে। প্রকৃতি এতই নিষ্ঠুর যে, কোন জীবই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে রেহাই পায় না। সদ্য ভূমিষ্ঠ জাতকেরও নিস্তার নেই। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক লোকবিশেষে ভোগ করতেই হবে। যেটুকু সুখ আছে তার চেয়ে এরা তীব্র ও স্থায়ী।

অর্থে সুখ বল, সে স্থায়ী হয় না—আবার সুখও দুঃখের কারণ হয়। বিদ্যায় সুখ বল, যতই পড়িবে মন ততই অতৃপ্ত হয়ে উঠিবে। ভালো না বাসার মধ্যে দুঃখ আছে—ভালোবাসার মধ্যে আরও বেশী স্থায়ী দুঃখ আছে। নারীর হৃদয়ে প্রেম আছে কিন্তু বিষ আছে বেশী। সংসারে সুস্থ মানুষের চেয়ে অসুস্থ মানুষ অধিক।

সুখ যা-ও বা আছে তা আবার ভোগ করলে কমে যায়—দুঃখ কিন্তু ভোগ করলে বেড়ে যায়। মানব-জীবন দুঃখের বলেই ত ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। মানুষ বুঝেও বোঝে না, এটা তার অজ্ঞতা। কাঁটা-ঘাস খেলে জিব দিয়ে রক্ত পড়ে তবুও ঘোড়া কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়ে না। বাস্তবিক জীবন দুঃখময়। কোন দিকেই সুখ নেই। মাঝে মাঝে দম নেবার মত সুখ অনুভব করি মাত্র। তা যদি না হবে—কৈ, কাহাকেও ত দেখিলাম না, সুখে-স্বাচ্ছন্দে বাস করতে—কাহাকেও ত' দেখিলাম না হাসতে, বরং যে দিকে তাকাই—যার দিকে তাকাই, শুধু দেখি নৈরাশ্য আর দুঃখ। ব্যক্তিগত জীবন যদি ওজন করা যায় তা হলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, নিক্তির কাঁটা কোন্ দিকে বেশী ঝোলে।

এ-হেন দুঃখময় জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সুখের বিষয়। যদি পাপ হত তা হলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, ঋষি সক্রেটিস্, সাধক বিজয় গোস্বামী এ পথ অবলম্বন করিতেন না। মহাত্মাদের পথ অনুসরণ করাটা নিশ্চয় পাপ বা অন্যায় নহে। উপরন্তু, আত্মহত্যা করার মধ্যে কষ্টও নেই। আত্মঘাতীর কথা শুনিলে আমরা মনে কষ্ট পাই এবং মরণ কালে তার কত না কষ্ট হয়েছিল ভাবি, কিন্তু এ সব আমাদের কল্পনা। বিখ্যাত ওয়ালাস সাহেব বলেছেন যে, হন্যমান্ জীবের হনন কালে বোধশক্তি লোপ পায়। সুতরাং আত্মঘাতী যত না কষ্ট পায় দর্শক বা শ্রোতা তার চেয়ে বেশী কষ্ট অনুভব করে।

ধার্ম্মিকগণ বলিবেন, কি আশ্চর্য্য! আত্মহত্যায় পাপ নেই ত পাপ কিসে আছে? উত্তরে বলিতে হয়, ওহে ধার্ম্মিক, আত্মহত্যা যদি পাপই হবে তবে রামচন্দ্র আত্মহত্যা করিলেন কেন? পাপ এবং পুণ্য বলে যদি কিছু থাকে তা হলে সেটা কি সহজেই অনুমেয়? পাপ এবং পুণ্য কি? সূক্ষ্ম ন্যায় ও অন্যায় হচ্ছে পাপ ও পুণ্য। আবার একের ন্যায় বা অন্যায় অন্যের পক্ষে ন্যায় বা অন্যায় না-ও হতে পারে। এক জন যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে, ভগবান অস্তি এবং তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করা অন্যায় বা পাপ। অপর পক্ষও যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝিয়ে দিল যে, ভগবান নাস্তি, তাঁর নাস্তিত্ব অস্বীকার করা পাপ ও অন্যায়। উভয়ের যুক্তি-তর্ক ফেলিবার নহে, ঠেলিবারও নহে। একের ন্যায় অন্যের পক্ষে প্রযোজ্য না-ও হ'তে পারে।

আর কর্মফল? তোমার কানে কানে কে বলিল যে, বর্ত্তমান দুঃখ আমার আরব্ধ কর্মের ফল? আমি যদি বলি, আমার এই আত্মহত্যাই গত কর্মের ফল স্বরূপ বা আরব্ধ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ।

এক শ্রেণীর সুধী-সমাজ আছেন যাঁরা বলেন, জীবের পরবর্ত্তী জীবনের মঙ্গলের জন্য বর্ত্তমান জীবনে আয়ু থাকিতেও মৃত্যু ঘটে। তাঁদের যুক্তি উপেক্ষার নহে। প্রদীপে তেল থাকিতেও প্রদীপ নেবে কেন?

আমার পরবর্ত্তী জীবন আরও উন্নততর হবার জন্যই যে এ আত্মহত্যা নহে তাহা কে নিশ্চিত করে বলিতে পারে? ধার্মিকগণ শুধু ঈর্ষা বশতঃ আমার শুভকর্মে বাধা দেন। তাই বলি, ধার্মিকের কথা কর্ণপাত না করা বুদ্ধিমানের কাজ।

আত্মঘাতী কি সমাজের কিছু ক্ষতি করে? আদৌ নহে। সমাজ কি? কতিপয় ব্যষ্টি যখন নিজেদের মঙ্গলের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলে তখনই সমাজ গড়ে উঠে। আগেই বলে রাখি, আত্মঘাতীর মন খুবই দৃঢ় ও সবল হওয়ার দরকার। এই রকম দৃঢ় ও সবল মনসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজে অত্যন্ত বিরল। দু'-একটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সমাজের দু'-একটি লোক যদি আত্মহত্যা করে, তা হলে সমাজের মাঙ্গল্যের হানি হয় না, আর সমাজ ভেঙ্গেও পড়ে না। বৃক্ষ হতে যদি একটি ডাল ভেঙ্গে যায় বৃক্ষের কিছু ব্যাপক ক্ষতি হয় না—বৃক্ষও ভেঙ্গে পড়ে না। যেটুকু ক্ষতি হয় তা সাময়িক ও পূরণীয়। আত্মঘাতীর জন্য যদি বা সমাজের কিছু ক্ষতি হয় তাহা সাময়িক এবং অপূরণীয় নহে।

আত্মহত্যা কোন দিক্ দিয়েই পাপ বা অন্যায় নহে। যে আত্মঘাতী সে বুদ্ধিমান, সে প্রকৃতিকে ঠকায়।

মাসির টান —শৈল চক্রবর্ত্তী

মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় সাহিত্য-পরিচয় দেওয়ার নতুন রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার জন্য এবং এ যাবৎ না করিয়া সহসা কেন করা হইতেছে তজ্জন্য আমরা একটি অজুহাত প্রদর্শন করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনেও' অনুরূপ কারণ ঘটিয়াছিল, কয়েক সংখ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার পর 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' নাম দিয়া একটি বিভাগ প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। আশা করি, বিলম্বের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃত উক্তিটুকুই যথেষ্ট হইবে। আমাদের ভাষা পৃথক্ হইলেও আমাদের উদ্দেশ্য ইহা হইতে কোন ক্রমেই ভিন্ন নহে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

"আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণ-দোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণেই এ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে গ্রন্থবিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে।

এই সকল কারণে আমরা যে সকল গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশের প্রায়ই কোন প্রকার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু আমরা তজ্জন্য অকৃতজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। গ্রন্থকারগণ যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন, যদি তাহা সিদ্ধ না করিলাম, তবে ঐ সকল গ্রন্থের মূল্য প্রেরণ আমাদিগের কর্ত্তব্য। তদপেক্ষা একটু লেখা সহজ, সুতরাং আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।"

—বঙ্গদর্শন, প্রথম বর্ষ, কার্ত্তিক, ১২৭৯।

বাঙলা

বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ): রাজশেখর বসু। প্রকাশক: এম্, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৫॥০ মাত্র।

"রামায়ণ" আদি মহাকাব্য এবং বাল্মীকি আদিকবি। হাজার হাজার বছর ধ'রে ভারতবর্ষের মানুষ এই রামায়ণ-কথা শুনে আসছে; কিন্তু আজও শোনার আগ্রহ তার ক'মে যায়নি। ভবিষ্যতে কোন দিন কমবেও না, রামায়ণ-কথা চির-নূতন থাকবে, পুরাতন হবে না কখনও। ব্রহ্মা রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকিকে বলেছিলেন:

> তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
> ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।
> যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
> তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
> যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।
> তাবদূর্দ্ধমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।

—"যা অবিদিত আছে সে সমস্তও তোমার বিদিত হবে, তোমার এই কাব্যে কোন বাক্য মিথ্যা হবে না। যত কাল ভূতলে গিরি-নদী সকল অবস্থান করবে তত কাল রামায়ণ-কথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকবে। যত কাল তোমার রচিত রামের আখ্যান প্রচারিত থাকবে তত কাল তুমিও আমার জগতের ঊর্দ্ধ ও অধোলোকে বাস করবে।" (অনুবাদ)

রামের ইতিবৃত্ত যথার্থরূপে জানবার জন্য বাল্মীকি যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন এবং সমস্ত ঘটনা করতলস্থ আমলকের মতো দেখতে পেলেন। তার পর তিনি বিচিত্র পদ ও অর্থযুক্ত রামচরিত রচনা করলেন। কাব্য-রচনার জন্য আদিকবি বাল্মীকির এই যোগাসনে উপবিষ্ট হওয়া এবং তার পর সমস্ত ঘটনা করতলস্থ আমলকের মতো দেখতে পাওয়ার কথা এখন এযুগের আধুনিক কবি ও সাহিত্যিকদের কাছে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, সাহিত্য বা কাব্য-রচনা তথাকথিত ভুইফোঁড় "প্রতিভার" বাহুকরী আত্মপ্রকাশের ব্যাপার নয়, রীতিমত ধ্যানলব্ধ অর্থাৎ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। আধুনিক কালের অসংখ্য "স্বয়ম্ভু প্রতিভাবানেরা" এই উক্তির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবেন।

রামায়ণ-রচনা শেষ ক'রে বাল্মীকি ভাবছিলেন কি উপায়ে এর প্রচার করবেন। এমন সময় মুনিবেশধারী রাজকুমার কুশ ও লব

এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। বাল্মীকি এই দুই ভাইকে সুকণ্ঠ ও মেধাবী দেখে সমস্ত রচনা তাঁদের শেখাতে লাগলেন। এ করা ছাড়া আর কি-ই বা করার উপায় ছিল সেই বাল্মীকির যুগে! তখন প্রিণ্টিং প্রেস আবিষ্কৃত হয়নি, কাগজ তৈরী করার বড় বড় ফ্যাক্টরীও ছিল না, আর এখনকার মতো সুশিক্ষিত পাঠকগোষ্ঠীও ছিল না। সুতরাং বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন দেশের সমস্ত মানুষের কথা মনে ক'রে, কোন বুদ্ধিজীবীর দল-উপদল শ্রেণী-উপশ্রেণীর পরস্পর পিঠ-চুলকানির বা বাহবার প্রত্যাশায় নয়। "রামায়ণ" আধুনিক কালের তথাকথিত "ইণ্টেলেক্চুয়াল পোয়েট্রির" মতো সর্ব্বজনদুর্ব্বোধ্য নয়, কবির ব্যক্তিগত জীবনের কিস্তূতকিমাকার অভিজ্ঞতার অথবা বিকৃত মানস-প্রতিমার প্রকাশও নয়। "রামায়ণ" এদেশের কোটি কোটি মানুষের একান্ত আপনার লোককাব্য। রামায়ণ তাই মৃত্যুহীন মহাকাব্য। কারণ তার উৎস মানব-জীবনের বাস্তব সত্য। রামায়ণের বাস্তবতাই রামায়ণের অবাস্তব সৌন্দর্য্য এবং তার এই অবাস্তব চিরন্তন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যই তার পরম সত্য। সুরে সঙ্গীতে চারণ আর গায়কের মুখে মুখে রামায়ণ তাই লোক-সমাজে প্রচারিত হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রযুগের সস্তা ছাপাখানার প্রাচুর্য্যের দিনেও তাই মুদ্রিত রামায়ণ পাঠ ক'রে মন ওঠে না, অন্তরের সাড়া পাওয়া যায় না, কথক ঠাকুরের গাওয়া রামায়ণ গান শুনতে মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাল্মীকি রামায়ণ ছাপিয়ে প্রচার করেননি। পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মানে এবং ষড়জ ঋষভ প্রভৃতি সপ্তস্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যের সমলয়ে গানের যোগ্য শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীর প্রভৃতি রস-সমন্বিত এই মহাকাব্য কুশ-লব দুই ভাই গেয়ে গেয়ে প্রচার করেছেন। সুরই রামায়ণের প্রাণ, এবং সুরই মানুষের আদি শিল্প।

মহাভারতের আদি পর্ব্বে একটি শ্লোক আছে—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।

অর্থাৎ কয়েক জন কবি এই ইতিহাস পূর্ব্বে ব'লে গেছেন, এখন অন্য কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন। এই উক্তি রামায়ণ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। রাম-বিষয়ক লোকগাথা ও জনশ্রুতি অতি প্রাচীন যুগ থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল, তাই অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কবি নিজের রুচি ও যুগের প্রয়োজন অনুসারে আখ্যান রচনা করেছেন এবং পূর্ব্ববর্তী রচয়িতার সাহায্যও নিয়েছেন। এই কারণে মহাভারত-পুরাণাদিতে বর্ণিত রামকাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে সর্ব্বত্র মেলে না। তা'ছাড়া বাঙলায় কৃত্তিবাস এবং হিন্দীতে তুলসীদাস প্রভৃতি কবিরাও অনুবাদের সময় বাল্মীকির যথাযথ অনুসরণ করেননি, আখ্যানের অনেক অংশ তাঁরা পুরাণাদি থেকে গ্রহণ করেছেন। বাল্মীকির রাম বিষ্ণুর অবতার হলেও তাঁকে সুখ-দুঃখাধীন অনুভূতিপ্রবণ সাধারণ মানুষ-রূপেই তিনি চিত্রিত করেছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসাদির যুগে দেখা যায়, রামের মানবত্বের চেয়ে দেবত্বটাই বড় হয়ে উঠেছে। আজকাল দেশ-বিদেশের প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতরাও সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "রামায়ণ" নামে এখন আমরা যে প্রচলিত মহাকাব্য দেখতে পাই সবটা কোন এক জন কবির এক-সময়ে রচনা নয়। রামায়ণ তো আর হঠাৎ প্রাচীন-যুগে দৈববাণীরূপে উচ্চারিত হয়নি! সুতরাং রামায়ণের একটা রচনা-কাল থাকাও স্বাভাবিক। প্রাচ্য-পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে মূল রামায়ণ রচিত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে অনেক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রক্ষিপ্ত যতই থাকুক না কেন, তাও বহু কাল পূর্ব্বে মূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং সমগ্র রচনাই এখন বাল্মীকির নামে চলে।

রামায়ণের বাঙলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা এইবার অনেকটা বোঝা সহজ হবে, বিশেষ ক'রে বাল্মীকির মূল রামায়ণের। বাল্মীকির রামায়ণ আমাদের জাতীয় সম্পদ, আদিকাব্য মহাকাব্য এবং শ্রেষ্ঠ লোককাব্য ব'লে এর অনুবাদ প্রত্যেক জাতীয় ভাষাতে হওয়া উচিত। শিশু যেমন তন্ময় হয়ে সব ভুলে গিয়ে রূপকথার আজগুবি ব্যাপার সত্য মেনে নিয়ে গল্প শোনে, আমরাও তেমনি পৌরাণিক অতিশয়োক্তি ও অসঙ্গতি মেনে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যসম্ভার উপভোগ করতে পারি। এর জন্য ধর্ম্ম-বিশ্বাস, দেবভক্তি বা অন্ধ-সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক তা নয়, উদার হৃদয় সংস্কৃতিবান পাঠক সর্ব্বদেশের পুরাণ সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন। বাল্মীকির রামায়ণে রূপকথা ও আরব্য উপন্যাসের মতো অতিপ্রাকৃত বর্ণনা অনেক আছে কাব্যরসের অভাব নেই, কিন্তু এর আখ্যানভাগের মধ্যে মানব-চরিত্রের সে অদ্ভুত সুনিপুণ বিশ্লেষণ, মানব-চিত্তের যে গভীর অনুভূতি ও আনন্দ-বেদনাবোধের পরিচয় আছে তা আধুনিক যুগের যে-কোন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসের চেয়ে কম মনোহর নয়। মনিয়ের উইলিয়মস্ বাল্মীকি-রামায়ণ সম্বন্ধে এই কথাই বলেছিলেন:

The classical purity, clearness and simplicity of its style, the exquisite touches of true poetical feeling with which it abounds, its graphic description of heroic incidents and of nature's grandest scenes, the deep acquaintance it displays with the conflicting working of most refined emotions of the human heart, all entitle it to rank among the most beautiful compositions that have appeared at any period and in any country.

গ্রীফিথ সাহেবও এই কথা বলেছেন। বাল্মীকির রামায়ণের বাঙলা অনুবাদের প্রয়োজন এই জন্য। রামায়ণের এই পৌরাণিক ও কাব্যিক মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য ছাড়াও আমাদের মনে হয়, ঐতিহাসিক সম্পদ হিসাবেও রামায়ণের মূল্য কম নয়! খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে যদি রামায়ণ রচিত হয়ে থাকে তাহলে রামায়ণ যে ভারতের আদি যুগসন্ধিক্ষণের মহাকাব্য তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর্য্যরা যখন ভারতবর্ষে অভিযান করে এবং তখন ভারতের আর্য্য-পূর্ব্ব আদি অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের যে বিরোধ সংঘর্ষ, এমন কি যুদ্ধ পর্য্যন্ত হয় তার বিবরণই রামায়ণে পাওয়া যায়। তাছাড়া আর্য্যদের এবং আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা, নগর ও রাজ্যের অবস্থার বাস্তব পরিচয়ও বাল্মীকির রামায়ণে যথেষ্ট আছে। গোরেসিও সাহেব রামায়ণের এই ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে বলেছেন:

The epopea received and incorporated the traditions, the ideas, the beliefs, the myths' the

উড়কি ধানের মুড়কি

(অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার যৎকিঞ্চিৎ অংশ)

হুতোম প্যাঁচার নকশা ও অন্যান্য সমাজচিত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা, মূল্য সাড়ে চার টাকা।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) শুধু মহাভারতের অনুবাদ সম্পাদন এবং প্রকাশ করিয়াই যশস্বী হন নাই, "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। "নকশা"য় তখনকার কলিকাতার অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে পাই। সচিত্র "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" প্রথমত দ্বিতীয় ভাগের সহিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "সমাজ কুচিত্র" (১৮৬৫ খৃঃ) ও রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণের "পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব" (১৮৬৮ খৃঃ) পরিষৎ-প্রকাশিত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

—প্রবাসী

তীর্থরেণু স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা। মূল্য ৩৷৷০

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা "শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচর" স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় থাকিয়া দীর্ঘকাল বেদান্ত ও ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির বাণী প্রচার করেন। তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজযোগ-গীতা-উপনিষদ সম্পর্কে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন! ঐ সকল অনুপম বক্তৃতার সারাংশ গ্রন্থকার সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং ঐ সকলের আলোচনা করিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, চিন্তার বলিষ্ঠতা আছে। এই মনীষীর বহুমুখী চিন্তার সামান্য অংশ-বা রেণু মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই গ্রন্থকার 'তীর্থরেণু' নামকরণ করিয়াছেন!"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। বুকল্যাণ্ড লিমিটেড, কলিকাতা, মূল্য তিন টাকা।

বিভিন্ন ব্যক্তিকে ও বিভিন্ন সময়ে লেখা 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী' যে একটি মূল্যবান সংগ্রহ হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহা আরও মূল্যবান হইয়াছে সাহিত্যিক ও সাহিত্য রচনার বিস্তৃত সন-তারিখের নির্ভুল উদ্ধারকারী, সুপ্রসিদ্ধ সময়পারম্পর্য্য গ্রন্থ-বিশারদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। বাংলা ভাষার ইহা একখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

—যুগান্তর

দম্পতি (চতুর্থ সংস্করণ), ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। মূল্য পাঁচ টাকা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে যৌনশাস্ত্র সম্বন্ধে এমন প্রামাণ্য পুস্তক থাকিতে এবং বিষয়টি প্রত্যেকের জীবনের মহা মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় হইয়াও আমাদের সমাজে প্রায় সকলেই সভয়ে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। জীবনযাত্রার যথাসময়ে আমাদের দেশের নরনারীদের যদি যৌন কথাটির তাৎপর্য্য এবং জীবনের উপর বিষয়টির কতটুকু কার্য্যকারিতা তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অজ্ঞতা বশতঃ বহু অপকর্ম হইতে আমরা বিরত থাকি। যৌন কথাটি উচ্চারণ করিতে এই ধরণের লজ্জাবতী ও ভীরু-প্রকৃতির নরনারীদের ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্তর 'দম্পতি' গ্রন্থটি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। স্বদেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতামতে ও নিজের অভিজ্ঞতা হইতে লেখা ডাঃ সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'দম্পতি' গ্রন্থটি প্রত্যেক পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, বধূ ও জামাতাদের বিবাহিত জীবনের নির্দ্দেশ বলিয়া আমরা মনে করি। —দৈনিক বসুমতী

AN ACRE OF GREEN GRASS.

"Budhadeva Bose, or any other critic, is quite at liberty to write or say, what he likes about this or that author. The danger lies in the fact that the forigner, for whom some of it is undoubtedly intended, may get an erroneous impression of affairs in Bengali literature."

—অমৃতবাজার পত্রিকা

---

symbols of that civilisation in the midst of which it arose, and by the weaving in and arranging of all these vast elements it became the complete and faithful expression of a whole ancient period. (Ramayana, vol I, Preface)

বেলুই সাহেব বলেছেন:

In the Slokas of the Ramayan and Mahabharat we have many important historical truths relating to the ancient colonisation of the Indian continent by conquering invaders…(Asiatic Quart. Review. Oct. 1911)

প্রাচ্যবিদ্‌রা সকলেই আজ বাল্মীকির রামায়ণের এই ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করেন। দশরথের তিনশ' পঞ্চাশ পত্নী, রামের পত্নী-ত্যাগ ও রাজ্যরক্ষা, ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণের পিতা দশরথকে মারার ইচ্ছা প্রকাশ এবং কৌশল্যার তাতে সম্মতি, হীন সন্দেহবশে লক্ষ্মণের প্রতি সীতার নির্মম ভর্ৎসনা, সতর্ক না ক'রে অথবা 'আল্টিমেটাম' না দিয়েই আড়াল থেকে রাম কর্তৃক বালীকে হত্যা, সীতার চরিত্রে সন্দেহ ক'রে তাঁকে প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি যে-সব ঘটনা তা নিছক কবিকল্পনা হওয়া সম্ভব নয়। এরই পাশে দশরথের গভীর পুত্রস্নেহ, রামের প্রতি অযোধ্যাবাসীর প্রগাঢ় অনুরাগ, নিষাদরাজ গুহের সহৃদয়তা, অরণ্যভূমি ও নগরীর বর্ণনা, বানরবীরদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও কর্মচেষ্টা, সীতার অপরিসীম মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব, রামের গাম্ভীর্য্য সত্যনিষ্ঠা উদারতা কর্ত্তব্যবুদ্ধি—এই সবও নিছক কবিকল্পনা নয়। তাছাড়া অযোধ্যার পুরনারীদের জন্য যে নাট্যশালা ছিল, কৌশল্যা নিজে যে অশ্বমেধের ঘোড়া কেটেছিলেন, দশরথ মোটা বেতন দিয়ে যে গৃহ-চিকিৎসক পুষতেন, বনবাসী রামলক্ষ্মণ যে আজকালকার শিকারীদের মতোই প্রচুর মাংস খেতেন, রামের আমলে "রামরাজ্যেও" যে রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা হ'ত, অবস্থাগতিকে মহর্ষি জাবালি পর্য্যন্ত যে নাস্তিক বা আস্তিক হতেন, হনুমান পর্য্যন্ত যে খাঁটি সংস্কৃত বলতে পারতেন, সেক্সপীয়রের হ্যামলেট-চরিত্রের সঙ্গে

অঙ্গদের যে অবস্থাগত সাদৃশ্য, দু'জনেরই পিতৃব্যের উপর আন্তরিক বিদ্বেষ, দু'ক্ষেত্রেই যিনি পিতৃব্য তিনিই বিপিতা, দু'জনেরই আত্মহত্যার ইচ্ছা, ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত-সৈন্যদের ফুর্তি, ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সঙ্গে সুরাপানে মত্তা তারার আলাপ, কুলপতি ও মঠস্বামীদের প্রতি বিদ্রূপ—এ-সব ঘটনা কি নিছক কবিকল্পনা ব'লে ব্যাখ্যা করা যায়, না, এ-সব তাৎকালিক সামাজিক চিত্র ?

বাল্মীকি-রামায়ণের কাব্য-সৌন্দর্য্য কোন মূর্খও অস্বীকার করে না, কিন্তু তার ঐতিহাসিক মূল্য এত বেশী যে, শুধু জাতীয় মহাকাব্য ব'লে নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহা যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস হিসাবেও রামায়ণ (মহাভারতও) সকলের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। বাল্মীকি-রামায়ণের বাঙলা অনুবাদের প্রয়োজন এই জন্যই আজ সব চেয়ে বেশী। আগেই বলেছি, কৃত্তিবাসাদির রামায়ণে অতি-প্রাকৃত অতি-মানবীয় ঐশ ভাবেরই প্রাধান্য বেশী ব'লে তার ঐতিহাসিক-সামাজিক মূল্য অনেক কম। মূল বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদের গুরুত্ব এই জন্য আরও বেশী।

৺রাজকৃষ্ণ রায় মূল বাল্মীকি-রামায়ণের পদ্যানুবাদ পূর্ব্বে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুবাদ একেবারে সঠিক অনুবাদ হয়নি। রাজশেখর বসুর অনুবাদ মূল বাল্মীকি-রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হলেও, সংক্ষেপের প্রয়োজনে এতে কোন মুখ্য বিষয় বাদ দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাল্মীকির রচনাবৈশিষ্ট্য এবং মূল শ্লোকার্থ যথাসম্ভব বজায় রেখে সহজ অথচ গাঢ়বন্ধ গদ্য ভাষায় রাজশেখর বাবু অনুবাদ করেছেন। বাল্মীকির মূল রচনার সঙ্গে পাঠকদের যাতে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, সেই জন্য তিনি স্থানে স্থানে নমুনা স্বরূপ মূল শ্লোক উধৃত ক'রে তার স্বচ্ছন্দ বাঙলা অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন। এই কারণেই এই অনুবাদ, বাল্মীকি-রামায়ণের সার-সঙ্কলন হলেও, অত্যন্ত মূল্যবান, বাঙলায় এই ধরণের বই আর আছে ব'লে জানা নেই আমাদের। আর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য যোগ্য পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তি আর কেউ বাঙলা দেশে আছেন কি-না তাও আমাদের জানা নেই। রাজশেখর বাবু এখন বার্দ্ধক্যে পৌছেচেন, তাঁর কর্ম্মশক্তি এখন অনেক ক'মে এসেছে, তা না হ'লে তাঁর কাছ থেকে আমরা দাবী করতাম, সপ্তকাণ্ড বাল্মীকি-রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুবাদ এবং মহাভারতেরও অনুরূপ অনুবাদ। তা হয়ত এই সময় তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়। তা না হ'লেও আমরা আশা করব যে, মূল মহাভারতের এই রকম একখানি বাঙলা সার-সঙ্কলন তৈরী ক'রে তিনি আমাদের বাঙলা সাহিত্যের দীনতা দূর ক'রে দিয়ে যাবেন। তার পর ভবিষ্যতে তাঁর মতো গভীর পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ, অসাধারণ শক্তিশালী গদ্যলেখকরূপে যদি কারও আবির্ভাব হয় বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে, তাহ'লে তিনিই না হয় মূল রামায়ণ ও মহাভারত সম্পূর্ণ অনুবাদ করার দায়িত্ব নেবেন।

শেষে প্রকাশকদের একটি বিষয়ে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বইয়ের ছাপা যত দূর সম্ভব নিভুর্ল ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে, কিন্তু বইয়ের আকার-নির্ব্বাচনের মধ্যে সুরুচির পরিচয় নেই, একথা আমরা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি। জানি না, এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অনুবাদকের কোন বিশেষ নির্দ্দেশ আছে কি-না। তা যদি না থাকে তাহ'লে এর দায়িত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশকের। প্রায় পৌনে পাঁচ শত পৃষ্ঠার বই ডবল ক্রাউন ১/১৬ সাইজে ছাপা, তাও আবার মোটা এ্যান্টিক কাগজে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় হোমিওপ্যাথির গৃহচিকিৎসার কোন বই, বাল্মীকি-রামায়ণ কল্পনাও করা যায় না। প্রচ্ছদপটের উপর কালির ছোপ্‌টা না দিলেই রামায়ণের মর্য্যাদা রক্ষা হ'ত বেশী।

—

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দের ভারতীয় কবি। তিনি শাকেতের এক ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, পরে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ৪১৪—৪২১ খৃষ্টাব্দে তাঁর বুদ্ধচরিত কাব্য চীন ভাষায় ধর্ম্মরক্ষ কর্ত্তৃক অনূদিত হয়, অষ্টম শতাব্দে ক্ষিতীন্দ্রভদ্র বা মহীন্দ্রভদ্র তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। শুধু চীন ও তিব্বতী ভাষায় নয়, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের ইংরেজ, জার্ম্মাণ, রুশিয়ান, জাপানী ইত্যাদি নানা ভাষায় একাধিক অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু ১৯৪২ সালে কৃত একমাত্র হিন্দী অনুবাদ ছাড়া বোধ হয় আর কোন ভারতীয় ভাষায় বুদ্ধচরিতের অনুবাদ হয়নি। তিব্বতী ভাষায় বুদ্ধচরিতের অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ, চীন ভাষায় অনুবাদ ভাবানুবাদ।

কাওয়েল সাহে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নেপাল থেকে বুদ্ধচরিতের পুঁথির এক প্রতিলিপি পান। এই পুথির প্রতিলিপি এবং নেপাল থেকে পূর্ব্বে সংগৃহীত আর একখানি পুঁথির প্রতিলিপি (কেমব্রিজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত) থেকে সম্পাদন ক'রে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মূল বুদ্ধচরিত প্রথম প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সব পুঁথির পাঠে অনেক ভুল থাকার ফলে নানা স্থানে কাব্যের অর্থ রীতিমত দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়ে। বোথলিঙ্ক, সিল্‌ভ্যাঁ লেভী, ফরমিকি-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দীর্ঘ দিনের কঠোর গবেষণার ফলে এই ভুল পাঠ ও দুর্ব্বোধ্যতার প্রতিবন্ধক অনেকটা অপসারিত হয়ে যায়। ১৯২৬-২৮ খৃষ্টাব্দে এফ্‌. ওয়েলের বুদ্ধচরিতের তিব্বতী অনুবাদখানি অনেক কষ্টে উদ্ধার ক'রে প্রকাশ করেন এবং তখন ভুল পাঠের স্থানে শুদ্ধ পাঠ এবং দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থবোধ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

সংস্কৃত বুদ্ধচরিতের কয়েকটি অসম্পূর্ণ সংস্করণ ভারতীয় পণ্ডিতেরাও প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

(ক) ভি, ভি, সোভানী : ১ম—৫ম সর্গ, আপ্পা শাস্ত্রীর সংস্কৃত টীকা সহ (পুণা, ১৯১১)

(খ) কে, এম, যোগলেকার : ১ম—৫ম সর্গ, টীকা ও অনুবাদ সহ (বোম্বাই, ১৯১২)

(গ) এন্‌, এস্‌, লোকুর : ১ম—৫ম সর্গ, টীকা ও অনুবাদ সহ (বেলগাঁও, ১৯১২)

(ঘ) জি, আর, নন্দারজিকর : ১ম—৫ম সর্গ (পুণা, ১৯১১)

(ঙ) জগন্নাথপ্রসাদ পাণ্ডে : ৮ম সর্গ (বাঁকিপুর, ১৯২০)

(চ) মহাদেব শাস্ত্রী ভাণ্ডারী : কাব্যসংগ্রহ (বুদ্ধচরিতের ২য় ও ৩য় সর্গসহ), বোম্বাই, ১৯২৯।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জনষ্টন সাহেব বুদ্ধচরিতের একখানি ভাল সংস্করণ সম্পাদন করেন। তিব্বতী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে বহু দুর্ব্বোধ্য

স্থানের অর্থনির্ণয় ক'রে তিনি এর একটা ইংরেজী অনুবাদও ঐ সঙ্গে দিয়েছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই খণ্ডে এই বই প্রকাশিত হয়েছে। কাওয়েল আর জনষ্টন সাহেবের সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। কাওয়েলের সংস্করণে প্রথম সর্গের শ্লোকসংখ্যা ১৪ কিন্তু জনষ্টনের ৭৩। কাওয়েলের সংস্করণে প্রথম ৮ শ্লোকে কপিলবস্তুর বর্ণনা, পরের ৬ শ্লোকে শুদ্ধোদনের বর্ণনা, এবং তার পরের ৪টি শ্লোকে মায়া দেবীর বর্ণনা। এর পর বোধিসত্ত্বের তুষিত স্বর্গ থেকে আগমন ক'রে মায়াদেবীর গর্ভে প্রবেশ এবং মায়াদেবীর লুম্বিনী গমন, সেখানে বৃক্ষশাখা অবলম্বনে দণ্ডায়মান অবস্থায় কুক্ষিভেদ ক'রে বোধিসত্ত্বের জন্ম ইত্যাদির বর্ণনা আছে। জনষ্টনের সংস্করণের বর্ণনা অন্য রকম।

মূল সংস্কৃত বুদ্ধচরিত ২৮ সর্গে রচিত হয়েছিল। তিব্বতী ও চীন ভাষায় এই ২৮ সর্গেরই অনুবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতে অর্দ্ধেকের উপর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় থেকে ত্রয়োদশ সর্গ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। প্রথম সর্গের কতক অংশ এবং চতুর্দ্দশ সর্গের শেষ অংশ থেকে বাকি কয়েক সর্গ পাওয়া যায় না।

যাই হোক, কাব্য হিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত রসিক ও পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বলা যায়। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিত-সমাজে বুদ্ধচরিত এক রকম উপেক্ষিত বললে ভুল হয় না। বৌদ্ধকাব্য ব'লে হয়ত হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে বুদ্ধচরিত যোগ্য সমাদর পায়নি। ইয়োরোপীয় ও জাপানী পণ্ডিতেরা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্য্যায়ের কাব্য ব'লে মনে করেন। মনে করার অবশ্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে অশ্বঘোষের কাব্যের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য এত বেশী যে মনে হয়, কালিদাসের উপর অশ্বঘোষের প্রভাব পড়াও বিচিত্র নয়। কালিদাসের রঘুবংশ এবং কুমারসম্ভব কাব্যের সঙ্গে বুদ্ধচরিতের এত দূর মিল দেখা যায় যে এই প্রভাব অস্বীকার করা কঠিন। যেমন বুদ্ধচরিতের তৃতীয় সর্গের ১৩—২৪ শ্লোকের দৃশ্য-বর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের রঘুবংশের সপ্তম সর্গের ৫—৩২ এবং কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের ৫৬—৬৫ শ্লোকের দৃশ্য-বর্ণনায় অদ্ভুত মিল দেখা যায়। বুদ্ধচরিতের তৃতীয় সর্গের কয়েকটি শ্লোকের রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত বাঙলা অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থ থেকে আমরা এখানে উধৃত করছি:

> "কুমার গমন করিতেছেন" প্রেষ্যজন হইতে এই বার্তা শ্রবণ করিয়া, নারীগণ গুরুজন হইতে অনুমতি লইয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষে হর্ম্যতলে গমন করিলেন॥ ৩ (১৩)
>
> শিথিলকাঞ্চী বন্ধনের দ্বারা বাধাগ্রস্ত, সদ্য জাগ্রত হওয়ায় আকুললোচনা, কৌতূহলপূর্ণা রমণীগণ, তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অলংকৃত হইয়া একত্রিত হইলেন॥ ৩ (১৪)
>
> কোনো বরাঙ্গনা কৌতূহল বশত দ্রুতগতি হইবার ইচ্ছা করিয়াও, পীন পয়োধর ও বিশাল শ্রোণিভারহেতু মন্থরগতি হইলেন। ৩ (১৬)
>
> বাতায়নবিনিঃসৃত পরস্পরসংলগ্নকুণ্ডলরমণীমুখপঙ্কজশ্রেণী, হর্ম্ম্যে বিরাজিত কমলরাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ৩ (১৯)

এই দৃশ্যবর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের দৃশ্যবর্ণনার অদ্ভুত মিল দেখা যায় না কি? শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙলা অনুবাদও যে মূল কাব্যানুসৃত প্রাঞ্জল অনুবাদ তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এই অনুবাদের কাজ তাঁর পিতৃদেব ৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশেই তিনি গ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ সালে বুদ্ধচরিত বাঙলায় তর্জমা করতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম তিন সর্গের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ নিজেই সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় অনেক শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ না হওয়ায় অনুবাদের কাজ দীর্ঘদিন স্থগিত থাকে। পরে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে যখন অর্থ বোধগম্য হয় তখন অনুবাদ শেষ করা হয়। এখন এই বাঙলা অনুবাদ বিশ্বভারতী গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রে বাঙলা সাহিত্যের অনেক দিনের অভাব পূরণ তো করেছেনই, বাঙলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন।

ইংরেজী

AN ACRE OF GREEN GRASS: By Buddhadeva Bose. Published, by orient lomgmans Ltd, 17 Chittaranjan Avenue, Calcutta—13, Rs 4/8/-

আধুনিক যুগে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু এক জন শক্তিশালী কবি ও সমালোচকরূপে সুপরিচিত। কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনদর্শন যাই হোক না কেন, এখানে তা নিয়ে আমরা কোন আলোচনা করব না। সে সম্বন্ধে আধুনিক যুগের আরও অনেক শক্তিশালী লেখকদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, রসবোধ এবং কাব্যপ্রতিভা আমরা স্বীকার করি এবং শ্রদ্ধাও করি। প্রারম্ভেই আমরা তাই একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আলোচ্য সাহিত্য-সমালোচনা গ্রন্থে তিনি এই শ্রদ্ধাকে অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে চালেঞ্জ করেছেন।

"এ্যান্ একার অফ গ্রীন গ্র্যাস্" আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ, ইংরেজী ভাষায় লেখা! ইংরেজী ভাষায় বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনা লেখার অধিকার বুদ্ধদেব বসুর আছে, কারণ, বাঙলা ভাষার মতো ইংরেজী ভাষাতেও প্রাঞ্জল গদ্য-রচনার কৃতিত্ব তাঁর আছে। তাঁর ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে কোন আলোচনার অবতারণা আমরা করতে চাই না, তবে এইটুকু আমরা বলতে পারি যে, তাঁর ইংরেজী গদ্য ভাষা সুদক্ষ রিপোর্টারের স্বচ্ছন্দগতি তরতরে হাল্কা ভাষা। সে ভাষায় রিপোর্টিং করা সম্ভবপর, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা লেখার যোগ্য ভাষা বোধ হয় তা নয়। যাই হোক, ভাষার কথা ছেড়ে দিয়ে ভাব বা বিষয়-বস্তুর কথাতে আসা যাক্। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, আধুনিক বাঙলা কাব্য এবং আধুনিক বাঙলা উপন্যাস, এই হ'ল তাঁর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষয়গুলো যে খারাপ তা নয়, বেশ চটকদার, ভালই বলা চলে। বইয়ের নামকরণের মধ্যেও বেশ সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি অনেকটা ব্যক্তিগত আলোচনার মতো লেখা, সমালোচকের পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টির অভাব তার মধ্যে অত্যন্ত প্রকট। আসলে বুদ্ধদেব

বাবুর কোন রচনার মধ্যেই এই পক্ষপাতশূন্যতার চিহ্নও নেই, সেই জন্য "হঠাৎ আলোর ঝলকানির" মতো তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলিই আমাদের কাছে বেশ উপভোগ্য মনে হয়েছে এবং সাহিত্য আলোচনা বা সমালোচনা করার মতো মানসিক গঠন তাঁর নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হয়েছে। বুদ্ধদেব বাবু লিখেছেন অনেক, সাম্প্রতিক ইংরেজী সাহিত্য হয়ত বা পড়েছেনও অনেক, এবং যা যখন পড়েছেন দেখা যায় প্রায় তারই প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে অনর্গল লিখে গেছেন। তাই স্রষ্টারূপে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর যতটা না পরিচয় পাওয়া যায়, বিদেশী চলতি সাহিত্যের স্বদেশী চাটুকার হিসাবে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিচয় বুদ্ধদেব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। কখনও তিনি লরেন্সের (D. H. Lawrence) বাঙালী-ভক্ত, কখনও আলডুস হাক্সলির (Aldous Huxley), কখনও বা সমারসেট্ মোম্-এর। তাই তাঁর রচনায় একটা "বুদ্ধদেবত্বের" ধারাবাহিক বিকাশ দেখা যায় না, শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের পরিপূর্ণতার পদচিহ্নও তাঁর লেখার মধ্যে নেই। বুদ্ধ-সাহিত্য তাই প্রাত্যহিক সাংবাদিকতার চেয়ে কিছু উচ্চ স্তরের এবং খাঁটি সাহিত্যের চেয়ে অবশ্যই নিম্ন স্তরের 'সংবাদ-সাহিত্য' বলা যেতে পারে। এই চলনসই সুখপাঠ্য সংবাদ-সাহিত্যের স্তর ছাড়িয়ে তাঁর "এক একর সবুজ ঘাস" যে উঁচু স্তরে উঠেছে তা আমাদের মনে হয় না।

সমালোচনার মধ্যে তাঁর উপদলীয় মনোভাব, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ইত্যাদি এত উগ্র হয়ে উঠেছে এবং তার প্রভাবে তিনি এত দূর কাহিল হয়ে পড়েছেন যে তাঁর আলোচনা পড়তে পড়তে প্রায়ই আমাদের ঘোর বিকারগ্রস্ত রুগীর প্রলাপ বলেই মনে হয়েছে। যেমন, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "he is either very gross or very subtle", "his feebleness of artistic conscience served him well in his popularity" ইত্যাদি। এই শ্রেণীর সাহিত্য-বিচার বুদ্ধদেব বসুর পক্ষেই করা সম্ভব, একথা আমরা ভালই বুঝি, কারণ যাঁর শিল্পবোধ ও রসবোধ সাইকোপ্যাথোলজির অন্তর্ভুক্ত এবং যাঁর বাস্তবতা-বোধ একমাত্র ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়, তাঁর কাছে শরৎ-সাহিত্য "common place reality" এবং "domesticity" মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বাবু লিখেছেন: "Tarashankar has a lot to write about, but does not seem to know how to write"—বাঙলা দেশের অন্যতম শক্তিশালী কথাশিল্পী সম্বন্ধে এই ধরণের মন্তব্য "কবিতা ভবনের" ড্রয়িংরুমে মোসাহেব-পরিবৃত হয়ে ব'সে করলে হয়ত বা শোভা পায়, কিন্তু তাই যদি ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহ'লেই বলতে হয়, এ সমালোচনা নয়, বিশুদ্ধ চালাকি ও ইতরামি। তাছাড়া এই বইয়ে সজনীকান্ত দাস, বনফুল এবং অন্যান্য শক্তিশালী সাহিত্যিক সম্বন্ধে ঔদাসীন থাকা হয়েছে। তাঁরাও কি কেউ লিখতে জানেন না?

পাঠকরা স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন, তাহ'লে বুদ্ধদেব বসুর মতে বাঙলা দেশে লিখতে জানেন কে? বুদ্ধদেব বসুর "সবুজ ঘাস" প'ড়ে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ লিখতে জানতেন, আর বর্ত্তমানে লিখতে জানেন যে দু'-এক জন তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী হলেন বুদ্ধদেব বসু নিজে এবং তাঁর বিবাহিত স্ত্রী প্রতিভা বসু। প্রতিভা বসুর অনন্যসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর কোন সংশয় নেই। আমাদেরও নেই, তবে সে-প্রতিভার পরিচয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে, অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রে সে-সম্বন্ধে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আমাদের সমালোচনা কঠোর হ'ল ব'লে আমরা দুঃখিত। অন্যদের সম্বন্ধে যাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই এবং যে-কারও সম্পর্কে এবং যে-কোন কঠোর উক্তি ও মন্তব্য করতে যাঁর কলমে বাধে না, তাঁর এইটুকু কঠোরতার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এই ধরণের বইয়ের যদি বহুল প্রচার হয় তাহ'লে বাইরের চোখে বাঙলা সাহিত্যের সমাদর বাড়বে ব'লে আমাদের বিশ্বাস হয় না।

দিশারী

রবি গুপ্ত

কার জয়বারি-সংঘাতে ওই শৃঙ্খল গেল টুটিয়া
মুক্ত-ভারত-মর্ম-সাধনা উথলে বিশ্ব-সাগরে,
কোটি সন্তান লভে নব জ্ঞান শরণ-সোপানে উঠিয়া
টানিছে জননী চরণে সবারে মণি-বৈভব-আদরে।

জননী-মন্ত্রে নবীন তপন ওঠে দিগন্ত রাঙিয়া,
মুখরে সিন্ধু স্বর্ণ-কিরণে ভবিষ্যতের স্বপনে;
মিলনের গান উঠিছে রণিয়া বিভেদ-গণ্ডি ভাঙিয়া
সুনীল পতাকা বিঘোষে ধরায় চির অভীপ্সা গগনে।

চির অতন্দ্র সাধনায় কার জাগিল সূর্য্য-সরণী
দিশারী সে নিজে জিনিয়া অমরে রচিল মর্ত্তে অমরা,
কাণ্ডারী আজ ধরিয়াছে হাল চলিছে লক্ষ্যে তরণী,
ধুসর ধরায় ধরিল যে রূপ ত্রিভুবন-আশা—অধরা।

নিবিড়-অন্ধ কালের কারায় দিল যে বহ্নি জ্বালিয়া,
শিখা উলঙ্গ গ্রাসিছে যুগের পুঞ্জিত যত তমসা;
নবীন সৃষ্টি স্পন্দনে যায় অসীম-আশীষ ঢালিয়া,
তাহারি পরশ-অমৃত ভুলায় সকল দুঃখ-বরষা।

তাহারি কণ্ঠে উঠিল প্রথম জননী-মন্ত্র ধ্বনিয়া,
তপস্যা তার চির জননীরে সাধিল পূর্ণ-প্রকাশে;
বন্দনা-গীতি আকাশে সাগরে সকল চিত্ত ভরিয়া—
জানি সে দেবতা আলয়ে সবার—জননী-জ্যোতির প্রভাসে।

আমাদের প্রেম

অপরাজিতা দেবী

আমার জীবনে প্রেম এসেছিল কবে গো
জানিবারে চেয়ে চিঠি লিখেছ
আমার জীবনে তুমি পশেছিলে যবে গো
তবে এসেছিল প্রেম বুঝেছ ?
হাজার তারকা-ঘেরা আকাশের কালো বুকে
চাঁদ ওঠে কোন দিনে বোঝ না ?
এত কি অবোধ তুমি এখনো রয়েছো গো !
শুধু কথা-লুকোচুরি ছলনা !
লিখিয়াছ—"আমাদের ভালবাসা ভাল নয়
ভুলায় সে পুরুষের মন গো !"
ভেবে দেখো তোমাদের ভালবাসা ভাল না কি
রাখিতে নারীর কুল-মান গো !
তোমরা ভুলিতে পারো দু'দিনের পরে গো
যুগ যুগ আমরা তা' পারি না ;
তোমরা যাইতে পারো মধু-লোভে মথুরায়
শুধু বহি মোরা সেই বেদনা !
কড়ি দিয়ে প্রেম কিনে প্রেমের বড়াই গো
কড়ি দিয়ে প্রেম কি সে কেনা যায় ?
ভাল যারে বাসিয়াছি এ জীবনে আমরা
জেনে রেখো তারে ভোলা বড় দায় ।

মাসী উচ্ছেদ

বনলতা মিত্র

ছোট সংসার, কিন্তু অশান্তির শেষ নাই। এক দিকে স্ত্রী এবং অন্য দিকে মাসীকে লইয়া নিশীথের হইয়াছিল বিপদের একশেষ। মাসীর সহিত নিশীথের আগে কোন পরিচয় ছিল না। মা যত দিন বাঁচিয়াছিলেন নিশীথ কোনদিন তাঁহার নিকট হইতে মাসীর নামও শোনে নাই। নিশীথের সংসারে মাসীর আবির্ভাব হইয়াছিল বোমার যুগে। তিনি আসিয়াই নিশীথের কর্ণধারহীন সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া বসিলেন। মাসীর দাপটে দুই দিন অন্তর ঝি-চাকর পলাইতে লাগিল। নিশীথের দুই বোন মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া নিশীথের সংসারের খবর লইয়া যাইত—মাসীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল তাহারা নিশীথের বাড়ী আসা ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু নিশীথের ইহাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। সে মাসান্তে উপার্জ্জনের প্রায় সমস্ত টাকাই মাসীর হাতে ধরিয়া দিত—মাসী তাহার ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখিতেন। অবসর ক্ষণটুকু মাসী মেশোর বিপুল সম্পত্তির পরিচয় দিয়া এবং নিজের ক্ষুরধার রসনার পরিচয় দিয়া পাড়ার লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। পাড়ার লোকে জনান্তিকে বলিত,—"নিশীথ জব্বর পাহারওয়ালা এনেছে, চোর ত দূরের কথা বাড়ীতে কাক-চিলও ঢুকতে পাবে না।" মাসীর সম্পত্তির ভিতর ছিল ম্যালেরিয়াগ্রস্তা, কৃষ্ণবর্ণা বিরলকেশা একটি মেয়ে। সে মাসীরই প্রতিচ্ছবি।

স্ত্রী নীতি মাত্র ছয় মাস হইল নিশীথের গৃহলক্ষ্মী-রূপে এ-বাড়ীতে আসিয়াছে। সেই হইতে চলিয়াছে মাসীর সহিত ঠোকাঠুকির পালা। নীতিকে ঝগড়াটে বলিলে অন্যায় হইবে, ঝগড়া করা তাহার স্বভাব নয়। মাঝে মাঝে টাকা-টিপ্পনী কাটা ছাড়া সে মাসীর কথার বিশেষ কোন উত্তর দেয় না। তাহার যত রাগ নিশীথের উপর। সুযোগ পাইলেই নিশীথকে ধরিয়া দু'কথা শুনাইয়া দেয়। নিশীথ বুঝাইতে গেলেই বলে—"থামো বাপু, আমাকে আর বোঝাতে হবে না, অনেক সহ্য করেছি! নিজের শাশুড়ী হলেও বা কথা ছিল, মাস-শাশুড়ী! অত হাঙ্গামা কেন পোহাতে যাব?" কাজেই নিশীথকে চুপ করিতে হইত। আর মাসীর কাছে ঘেঁসিবার সাধ্য তাহার ছিল না। এক কথা বলিতে গেলে মাসী দশ কথা শুনাইয়া ছাড়িতেন। এই দোটানার মাঝে পড়িয়া নিশীথ বেচারীর প্রাণান্ত হইবার জোগাড় হইয়াছিল।

বধূর উপর যতই বিরাগ থাক, মাসী প্রথম প্রথম তাহা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু যেদিন হইতে নিশীথ টাকা মাসীর হাতে না দিয়া নীতির হাতে দিল সেই দিন হইতেই আগুন জ্বলিল। মাসী উচ্চ চীৎকারে পাড়া মাথায় করিয়া জানাইয়া দিলেন যে কোথা হইতে ছোট লোকের মেয়ে আসিয়া তাঁহার সুখের সংসারে আগুন ধরাইল। এত দিন যে নিশীথ মাসী বলিতে অজ্ঞান হইত সেই নিশীথকে ডাইনীর মায়ায় এমন বশ করিল যে, দিনান্তে সে

একবারও মাসী বলে না। অনবরত এক কথা শুনিয়া শুনিয়া নীতি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, এক দিন বলিয়া ফেলিল,—"বেশ ত, অত যদি ডাইনীর ভয়, না দিলেই পারতেন বোনপোকে ডাইনীর হাতে তুলে?" মাসী নাচিয়া উঠিলেন,—"সাধ ক'রে কি আর দিয়েছি মা, ও-সব আজ-কালকার ছেলে—একখানা কচি মুখ দেখলেই হল, তখন মা-ই বা কে আর মাসী-ই বা কে! আর তাদেরই বা দোষ কি বাছা, আজ-কালকার ছুঁড়িগুলো কি কম, সব বৌড়শীর মত টোপ গেঁথে বসে আছে কাকে কখন গাঁথতে পারবে। ছি, ছি, ঘেন্নায় মরি—মেয়ের মায়েদেরও বলিহারি যাই—ধিঙ্গি-নাচ নাচবার জন্যে মেয়েগুলোকে দিয়েছে ছেড়ে রাজ্যের ছোঁড়াগুলোর মাথা খাবার জন্যে। তা দেবে নাই বা কেন? এ-সব না করলে কি আর মিনি-পয়সায় মেয়ে পার করা যায়? আমরা যাই না বোকা-সোকা মানুষ তাই এখনও মেয়ে গলায় গেঁথে বসে আছি।"

নীতি কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ঘরে ঢুকিয়াছিল; মাসী একলাই চীৎকার করিয়া লোক জড় করিতে লাগিলেন। নিশীথ বাড়ী ফিরিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে মাসীকে কিছু না বলিয়া ঘরে গিয়া নীতিকে বলিল—"তুমি একটু চুপ ক'রে থাকলেই পার। জানোই ত ওঁর ঐ স্বভাব—যত কথা বাড়াবে তত কথা বাড়বে।" নীতি বহুক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে মাসীর বাক্যবাণ সহ্য করিতেছিল, এখন নিশীথের এই অবিচারে জ্বলিয়া উঠিল; সে বলিল, "দেখো, একটা কথা বলি, তোমার মত লোকের বিয়ে করা উচিত নয়।"

নিশীথ অবাক হইয়া চাহিতেই বলিল—"যে লোক বিয়ে ক'রে স্ত্রীকে শান্তি দিতে পারে না, আর নিজেও অশান্তি ভোগ করে তার বিয়ে করা বিড়ম্বনা নয় কি? বেশ ত তোমরা মাসী-বোনপোতে ছিলে, মাঝ থেকে আমায় এনে সংসারে এত অশান্তি না ঘটালেই পারতে।"

নিশীথ অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"মিথ্যে রাগ করছ, আমি তোমারই ভালর জন্য বলছি।"—তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নীতি বলিল—"হ্যাঁ, আমার ভালো ভেবে ভেবেই ত তোমাদের সংসারের এই দশা। মাসী এতক্ষণ আমার ভাল ভেবেই মা-বাপ তুলে গাল দিচ্ছিলেন—এখন তুমিও আমারই ভালর জন্য মাসীর হয়ে ঝগড়া করতে এসেছো।"

মাসী এতক্ষণ দরজার কাছে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; নীতির কথা শেষ হইতেই ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"বেশ ত চাঁদপানা মুখ ক'রে বৌয়ের লাগানিগুলো শুনছিস্! এই তিন-চার বছর ধরে টাকা খরচ করে, গতর খরচ ক'রে তোমার যে এত করলুম, তুমি তার প্রতিফল বুঝি এমনি ক'রেই দেবে? নিজে পারছ না তাই বৌকে শিখিয়েছ ঝাঁটা মারতে। ভাল—যেমন আমার অদিষ্ট, নিজের ঘর-দোর ছেড়ে তোমায় নিয়ে পড়ে আছি মায়ায় বদ্ধ হয়ে। কর্ত্তা তখনই বারণ করেছিলেন, আমি পোড়াকপালি সে কথা শুনলুম না—বলি, নিশীথ আমার তেমন ছেলে নয়। তখন কি এত সব জানি।" মাসীর স্বর ক্রমশঃ করুণ হইতে করুণতর হইয়া কান্নায় পরিবর্ত্তিত হইল। নিশীথ বলিল—"ভাল জ্বালা—তুমি আবার কোথা থেকে এলে?" মাসী সরোদনে বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা, তা ত হবেই, মাসী হয়েছে এখন আপদ। তা পাপ বিদেয় করলেই হয়, দিলেই পার এক দিন গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে।" "যা খুসী কর তোমরা। সব হয়েছে সমান, কেউ কিছু বুঝতে চায় না।" নিশীথ গজ-গজ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। নিশীথ চলিয়া যাইতেই মাসী আবার আরম্ভ করিলেন,—"আমার নামে লাগানো—জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ! আমার যে অনিষ্ট করবে তার অনিষ্ট আগে হবে। ভগবান নেই কি? রোজ ঠাকুর-পূজো না ক'রে জল খাই না। জলজ্যান্ত ভাইগুলো পট-পট ক'রে মরে যাবে না!" নীতি হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"যথেষ্ট হয়েছে, এবার চুপ করুন।" মাসী চমকিয়া চুপ করিয়া গেলেন। তার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সেদিন ছিল রবিবার, নিশীথ ও নীতি গিয়াছিল সিনেমা দেখিতে। ফিরিয়া দেখিল, বাড়ীর দরজা বন্ধ। এক ঘণ্টা ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়া কোন ফল হইল না। ভিতর হইতে সকন্যা মাসী ও মেসোর কথার শব্দ পাওয়া গেল, কিন্তু দরজা খুলিবার আগ্রহ কাহারও দেখা গেল না। নিশীথ বলিল—"কালা না কি সব!" নীতি বলিল "হুঁ কালা! আমি ত পরের বাড়ীর মেয়ে খুবই পাজী, শুধু শুধু মাসীর সঙ্গে ঝগড়া করি, এবার নিজের মাসীর ব্যবহারটা দেখ।" সে-রাত্রে নিশীথকে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইতে হইল।

বেলা প্রায় আটটার সময় নিশীথ ও নীতি বাড়ী ফিরিল। মাসী গম্ভীর মুখে সরিয়া গেলেন। নিশীথ অফিস যাওয়ার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে মাসীর কন্যা ভগবতী আসিয়া নীতিকে জানাইল—"বৌদি, মা বললেন, তোমরা আজ থেকে ভেন্ন হলে। তুমি দাদাকে রেঁধে দাও, মা আজ থেকে তোমাদের রান্না করবেন না।" নিশীথ উষ্ণ স্বরে বলিল—"তা এতক্ষণ বলতে কি হয়েছিল—এত বেলায় রান্নাই বা হবে কখন, খেয়ে অফিস যাব কখন?" মাসীর মেয়ে তৈরীই ছিল, ঠোঁট উলটাইয়া বলিল—"তার আমি কি জানি, যা বলতে হয় মাকে গিয়ে বল না।" সেদিন নিশীথকে অভুক্তই অফিস যাইতে হইল।

মাসী নিশীথদের ভিন্ন করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের রাঁধিয়া খাইবার কোনরূপ সুবিধা দিলেন না। দুই-তিন দিন ধরিয়া নানারূপ অসুবিধা ও বাক্যবাণ সহ্য করিয়া নীতি বিব্রত হইয়া পড়িল। শেষে সে নিশীথকে বলিল—"এ রকম ক'রে আর ত পারা যায় না। তুমি মামা বাবুকে খবর দাও, তিনি এসে যা ভাল বুঝবেন করবেন।" মামা বাবু অর্থে নিশীথের মামা।—মামা বাবু কাছেই থাকিতেন, সব শুনিয়া তিনি মাসীকে বলিলেন—"শুধু শুধু ছেলে-মানুষকে কেন জ্বালাতন করছ? বেশ ত ছিলে—আলাদা হবারই বা দরকার কি আর এত কাণ্ডই বা করবার দরকার কি?"

মাসী রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধরিলেন—"কি বললি, ভিন্ন হবার দরকার কি? হব না ভিন্ন—আমার মনসা-পূজো, বেলা দশটা পর্য্যন্ত না খেয়ে উপোস ক'রে আছি, আর বউ গেলেন কিনা মজা ক'রে সিনেমা দেখতে। এ সব অনৈরণ আমি বলেই সয়ে থাকি, আর কেউ হলে অমন বউকে মুড়ো-খ্যাংরা মেরে দূর ক'রে দিত।" মামা বাবু বলিলেন—"থামো থামো, বেলা দশটা পর্য্যন্ত না খেয়েই মূচ্ছা যাচ্ছ। এত যদি পেটের জ্বালা তা'হলে উপোস করা কেন। আর ভিন্ন যদি হতে হয় তাহলে এক বাড়ীতে থেকে ও-সব হবে না, তুমি বাড়ী দেখে উঠে যাও, ওদের অসুবিধে করতে হবে না।"

মুখ বাঁকাইয়া মাসী বলিলেন—"উঃ, উঠে যাবে, উঠে যাওয়া অমনি মুখের কথা কি না, যাদের অসুবিধে হয় তারাই উঠুক না,

আমি কেন উঠতে গেলাম! ওঠ বললেই হল অমনি! কেন, এই যে তিন বছর ধরে ঝি-গিরি রাঁধুনি-গিরি ক'রে এসেছি, তার কোন দাম নেই? আর অসুবিধেটা হচ্ছে কি শুনি—হাসি-গল্পের ত কামাই নেই।" মাসীর ভঙ্গী দেখিয়া নীতি হাসিয়া ফেলিল। মামা বাবুও হাসিয়া বলিলেন—"বউমা, তুমি ছোড়দিকে এই তিন বছরের মাইনেটা হিসেব ক'রে দিয়ে দিও, তাহলে বোধ হয় ছোড়দির ওঠায় কোন আপত্তি থাকবে না।" মাসী আগেই নীতির হাসি লক্ষ্য করিয়া ফুলিতেছিলেন, এখন মামা বাবুর উক্তিতে আরও জ্বলিয়া উঠিলেন,—"আ মলো, সবাই মিলে আমার সঙ্গে মস্করা করতে লেগেছে। বউ বুঝি তোকে উকিল রেখেছে, কত ক'রে দেবে শুনি? সাত-সকালে এল কি না আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে। কেন বাপু, আমি ত' কারোর সাতে-পাঁচে নেই, এক ধারে পড়ে আছি। আমার সঙ্গে লাগতে আসা কেন?"

মাসীর উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া মামা বাবু আর বসিলেন না। যাইবার সময় নিশীথকে বলিয়া গেলেন—"যা হয় একটা ব্যবস্থা কর। বউমাকে না হয় দিন-কতক আমার ওখানে কিংবা বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দে। এ রকম ক'রে মানুষ কত দিন থাকতে পারে! আমি বলি কি, কোন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ কর।"

মামা বাবুর শেষের কথাটা নিশীথের খুব মনঃপূত হইল। সে পাশেই তার উকীল-বন্ধুর বাড়ী গেল পরামর্শ করিতে। উকিল-বন্ধু নিশীথের প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিল—নিশীথদা, চক্ষুলজ্জায় এত দিন তোমায় কিছু বলতে পারিনি ভাই। তোমার মাসীর জন্যে আমরাও পাড়া ছাড়ব-ছাড়ব করছিলাম। তুমি নিজে যখন প্রস্তাব করলে ভালই হল। কাল মাণিক রবীনদের ডেকে একটা উপায় স্থির ক'রে তোমায় জানাব।" নিশীথ বাড়ী ফিরিয়া নীতিকে সে কথা বলিতেই নীতি বলিল—"হ্যাঁ, সবাই ওকে জব্দ করেছেন বাকী আছেন শুধু তোমার বন্ধুটি!" নিশীথের মুখে নীতির মন্তব্য শুনিয়া উকিল-বন্ধু আসিয়া নীতিকে বলিয়া গেল—"ভয় পাচ্ছেন কেন বৌদি, দেখুন না, এক মাসের মধ্যেই মাসী-উচ্ছেদ-পর্ব্ব সমাপ্ত করব।"

ইহার পর হইতে দেখা গেল, নিশীথের বন্ধু-বান্ধবরা ঘন ঘন আসা-যাওয়া করিতেছে। প্রায়ই নীতির ঘরে তাহাদের আড্ডা বসিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া মাসী নীতিকে গালি পাড়িতে লাগিলেন—"এমন বেহায়া বউ ত কখনও দেখিনি! কলিকাল আর কাকে বলে! সোমত্থ মেয়ে নিয়ে এ-বাড়ীতে বাস করা দায়। আমার বাড়ীতে বসে ঢলাঢলি না ক'রে বিদেয় হও না।" নিশীথ বা নীতি মাসীর কথা গায়ে না মাখিয়া যাহা করিবার করিয়া যাইতে লাগিল।

নিশীথদের আড্ডাটির উপর মাসীর যতই বিরাগ থাক, কিন্তু আড্ডার একটি ছেলের উপর প্রবল অনুরাগ দেখা গেল। ছেলেটি দেখিতে বেশ সুন্দর, নাম রামেন্দু, রামেন্দুও মাসীর একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। সময়ে অসময়ে মাসীমা-মাসীমা করিয়া একেবারে অন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। মাসীর কন্যার জন্য নানারূপ উপহার-দ্রব্য আসিতে লাগিল, কন্যা লইতে আপত্তি করিলে মাসী বলিতেন—"নে না, তাতে কি হয়েছে, রামেন্দু কি আমাদের পর?"—তার পর উপর দিকে কটাক্ষ করিয়া রামেন্দুকে বলিতেন—"মেয়ের আমার বড় লজ্জা, বাবা! আর পাঁচ জনের মত বেটাছেলে-ঘেঁসা বেহায়া নয়। তা তোমার কাছ থেকে নেবে বৈ কি। তুমি রেখে যাও।" রামেন্দু অত্যন্ত আপ্যায়িতের ভঙ্গী করিয়া মাসীর হাতে সব জিনিষগুলি তুলিয়া দিত। কোন সময় কথায় কথায় মাসী বলিয়াছিলেন, তিনি অত্যন্ত সন্দেশ খাইতে ভালবাসেন। তার পর হইতে রামেন্দু প্রায় প্রতিদিন মাসীর জন্য সন্দেশ আনিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য, মাসী এ সব কথা নিশীথ বা নীতিকে জানিতে দিতেন না।

মাসী ভাবিয়াছিলেন, রামেন্দু তাঁহার কন্যার প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছে। রামেন্দুও তাহার চাল-চলনে সেইরূপ আভাস দিতে লাগিল। বিনা-পয়সায় অমন সুন্দর একটি জামাই পাওয়ার সৌভাগ্যে মাসী আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। এ আনন্দ তিনি বেশী দিন মনে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। এক দিন মনের ইচ্ছা রামেন্দুকে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন—"আমার ভগীতে আর তোমাতে ভারী মানায় বাবা! আমার বড় সাধ, ভগীকে তোমার হাতে দিয়ে যাই।"

বিনয়ে গলিয়া পড়িয়া রামেন্দু মাসীর কথার উত্তর দিল—"আমার কি এমন সৌভগ্য হবে—ভগীকে পাব।"

স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে মাসী বলিলেন—"আহা মরে যাই, বাছার আমার কি মিষ্টি কথা গো! ভগী ত তোমারই বাবা। তা তোমার মা-বাপের কাছে জানাতে হবে ত?"

সলজ্জ কণ্ঠে রামেন্দু বলিল—"মা-বাবাকে আমি আর কি বলব, আপনারাই জানাবেন।"

মাসী বলিলেন—"ও মা, তুমি কি আমার তেমন ছেলে যে হায়া-লজ্জার বালাই নেই? তোমার বাবার ঠিকানাটা আমায় দিও, আমি তাঁকে জানাব।"

"আমার বাবার নাম শ্রীনবকৃষ্ণ রায়", বলিয়াই কৈফিয়তের সুরে রামেন্দু বলিল,—"আমরা নমঃশূদ্র কি না, তাই রায় লিখি।"

মাসীর দুই চোখ গোল-গোল হইয়া উঠিল, "কি বললে নমঃশূদ্র! তার মানে চাঁড়াল?"

"আজকাল আবার চাঁড়াল কি—আমরা হরিজন।"

মাসী বলিলেন,—"হুঁ, চাঁড়াল হয়ে জেনে-শুনে তোমার ছোঁয়া আমাদের খাওয়ালে? আমি ত বাপু তোমার কোন অনিষ্ট করিনি। মেয়ে নিয়ে এক পাশে পড়েছিলাম, শুধু-শুধু আমার সঙ্গে লাগতে এলে কেন? এর পর আমার মেয়ের আর বিয়ে হবে?"

রামেন্দু বলিল—"আজ্ঞে জাত-টাত ও-সব কুসংস্কার। আর খান-খান বলে আমি ত সাধিনি! ভগীর জন্যে অত ভাবনা কেন—আমি ত আছি।"

মাসী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার মেয়ের বিয়ে হবে চাঁড়ালের সঙ্গে? ইয়ারকি করবার আর লোক পাওনি? বেরোও আমার বাড়ী থেকে।"

মাসীর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সভয়ে রামেন্দু বলিল,—"আপনিই ত বললেন বিয়ে দেবেন—।"

তাহার কথা শেষ হইল না, মাসী বলিলেন,—"আরে মলো, ভগী আন্ ত রে ঝাঁটাগাছটা, ছোঁড়ার বিয়ের সখ জন্মের মত ঘুচিয়ে দিই।" রামেন্দু উৰ্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

মাসীর চীৎকারে নিশীথ ও নীতি উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছিল। নীতি জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে মাসীমা?" তাহার

দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া মাসী বলিলেন—"আর বাকী রইল কি বাছা! তোমাদের জন্যে আমার জাত-ধর্ম্ম কিছু রইল না। রাজ্যের অজাত-কুজাত এনে বাড়ীতে ঢুকিয়েছ। আর এই হতচ্ছাড়ীও হয়েছে তেমনিই—যে যা দেবে হাত পেতে নেওয়া চাই—যেন কখনও কিছু চোখে দেখেনি।" হতচ্ছাড়ী নাকি-সুরে বলিল—"বা রে, আমার কি দোষ, তুমি ত নিতে বলতে। আর তোমাকেও ত কত সন্দেশ এনে দিয়েছিল।"

হতবুদ্ধির মত নিশীথ বলিল—"রামেন্দু, সন্দেশ! সে কি মাসী, রামেন্দু যে নমঃশূদ্র!" মাসী এবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"তবে আর বলছি কি গো—ছোঁড়া ভালমানুষ সেজে আমার জাত-ধর্ম্ম সব খেলে। ওমা, আমার কি হবে গো।" নীতি মাসীর মুখে হাত-চাপা দিয়া বলিল—"চুপ করুন, চুপ করুন, যা হবার তা ত হয়েছেই। লোক-জানাজানি হলে আর কিছু বাকী থাকবে না। আপনার ভগীর বিয়ে হবে না তাহ'লে।" কাঁদিতে কাঁদিতে মাসী বলিলেন—"কত আর বলব মা, ছোঁড়া আবার বলে কি না ভগীকে বিয়ে করবে। আর জানতে কারই বা বাকী আছে, ঝি-চাকররা ত সবই জানে। ওগো, আমার এ কি সর্ব্বনাশ হল গো!"

নীতি মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিতে করিতে বলিল—"ঝি-চাকরে জেনেছে? তাহ'লেই ত মুস্কিল!"

নিশীথ চিন্তিত মুখে বলিল—"আমিও ভাবছি—কি করা যায়।" তাহাদের ভাব দেখিয়া মাসীর কান্না আরও উচ্চগ্রামে উঠিতে লাগিল। অনেক বুঝাইয়া নীতি তাহাকে শান্ত করিলে নিশীথ বলিল—"একটা কথা বলি মাসী, কিছু মনে ক'রো না। তুমি যখন বলছ, ঝি-চাকরে সব জেনেছে—তখন দু'দিন পরে তোমার এখানে থাকা মুস্কিল হবে। তোমায় ত ভগীরও বিয়ে দিতে হবে। এখানে থেকে ভগীর বিয়ে আর কিছুতেই হতে পারে না। তুমি এক কাজ কর, দিন-কতক দেশে গিয়ে থাক। যা খরচ লাগে আমি দেব। ভগীর বিয়ের পর আবার এসো। তত দিনে সবাই এ-সব কথা ভুলেও যাবে।"

করুণ সুরে মাসী বলিলেন—"যা বল তোমরা, ভগবানই যখন মেরেছেন—"

দিন দুই পরে মেসোকে লইয়া সকন্যা মাসী চোখ মুছিতে মুছিতে দেশে চলিয়া গেলেন। নিশীথের বন্ধুর দল নীতিকে ধরিয়া বসিল—তাহাদের খাওয়াইতে হইবে। রামেন্দু বলিল—"শুধু খাওয়ালেই হবে না বৌদি, আমাকে সোণার মেডেল দিতে হবে। ঝাঁটা খেতে-খেতে বেঁচে গিয়েছি। উঃ বাবা, ঐ ত রক্ষেকালীর বাচ্চা—তার জন্যেও আবার এত!"

নীতি হাসিয়া বলিল,—"আচ্ছা আচ্ছা, অত ভাবছেন কেন, রক্ষেকালীর বদলে এবার দুর্গা-প্রতিমার ব্যবস্থা করা হবে।"

বোঝার ভুল

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী

১১

সুস্মিতার কথা

দিন পনেরো হলো কলকাতায় এসেছি। এখানে এসেই জ্বরে পড়েছিলাম। সে জন্যে কলেজে যাওয়া হয়নি—আর মেজরের হুকুম, এখনও দিন-ছয়েক যাওয়া হবে না। এতো রাগ হয় কিন্তু উপায় নেই। মা দত্তের কথাকে বেদবাক্যের মতো মনে করেন। আমার হয়েছে জ্বালা। উঃ! এ যেন বেড়া-জালের মধ্যে পড়েছি। কেন যে মেজরকে মা'র সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়েছিলাম।

সুমু, মেজর এসেছেন বলতে বলতে দিদি ঘরে ঢুকলো। চাদরটি মুখে চাপা দিতে দিতে বললাম, দিদি ওকে যেতে বলে দে, বল, আমি ঘুমুচ্ছি।

তোমার কথা আমি শুনতে পেয়ে গেছি মিস্ রায়, ব'লে মেজর ঘরে ঢুকলেন—আমি এলে তুমি বিরক্ত হও, মিস্ রায়?

কথার সাড়া না দিয়ে পাশ ফিরে শুলাম। দিদি বললে, আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না বিমানদা।' দিদির কথা শুনলে গা জ্বলে যায়—আবার সম্পর্ক পাতানো হয়েছে। মেজর বললেন, যদি ছেলেমানুষ এ কথা বলত' তাহ'লে না হয় রাগ করতাম না। কিন্তু তা তো নয়, সুস্মিতা যা বললে তা হচ্ছে দস্তুর মতো অপমানকর কথা! আচ্ছা, আমি আসি,—বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দিদি বললে, কী করলি সুমু, ভদ্রলোককে চটিয়ে দিলি তো? মা যা রাগ করবেন। মুখের আবরণ সরিয়ে বললাম, আপদ বিদেয় হয়েছে তো—আঃ, বাঁচা গেল! উঃ! দু'দিন তবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচব।

দিদি বললে, আহা, ভদ্রলোক তোর খুব সেবা করেছেন।

তবে তো আমায় কিনে নিয়েচে, তুমি ওর দিক্ টেনে কথা বোলো না দিদি!

দিদি বললে, না রে পাগলি, না, ওর দিক টেনে কথা বলবো না। এখন ওঠ দিকিন্, শুয়ে থাকলে তোর রাগ আরো বেড়ে যাবে।

* * * *

ভিতরের ঘেরা দালানে বাবার ও দাদার বৈকালিক জলযোগের জন্যে ফল কাটছিলাম। ঘরের ভিতরে মেজরের গলা শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, আমি আর দেরী করতে পারছি নে, এই আষাঢ়ে যাতে হ'য়ে যায় আপনি তার চেষ্টা করুন, মা।

মা বললেন, আচ্ছা বাবা, আজ ওঁকে বলবো আর সুমির কাণে যেন এখন এ-সব কথা না যায়।

আমি বঁটি কাৎ ক'রে রেখে একেবারে বাবার বসবার ঘরে গিয়ে হাজির হ'লাম।

আমায় দেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কি মা লক্ষ্মী?

বাবার কোলে মাথা রেখে বললাম, বাবা, তোমরা আমায় বিদায় করবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন হয়েছ বলো তো?

বাবা মাথায় হাত রেখে বললেন, কই, না তো মা, আমি বলেইচি যে তোমার কুড়ি বছর বয়স হবার আগে বিয়ের কথা তুলবো না। তা তার তো এখনো তিন বছর দেরী আছে, মা।

মুখটা লুকিয়ে বললাম, কিন্তু মা যে—

ঠিক সেই সময় মা'র সঙ্গে মেজর ঘরে ঢুকতে আমি থেমে গেলাম।

মা বললেন, ফল কাটা ফেলে চলে এসেছিস্ যে? বাবা তাড়াতাড়ি বললেন, আমিই ডেকেছি গো।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

* * * *

রবিবার। দিনটা মেঘাচ্ছন্ন। বাইরে বাতাসের আর্ত্ত ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে। ঘরে থাকতে ভালো লাগছিল না। রাস্তার ধারের বারান্দায়

এসে দাঁড়ালাম। নির্জন পথ! দু'ধারের গাছের সারি ঝোড়ো হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে, নিকষ-কালো মেঘে সমস্ত আকাশ অন্ধকার, এই দিন-দুপুরেই মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। থেকে-থেকে মেঘের ডম্বরু-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি নামল। প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তার পরেই সুরু হলো ঝড়ের সঙ্গে তাল রেখে বৃষ্টি-নটীর মধুর নৃত্য! বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যেন মনের সমস্ত গ্লানি আমার নিমেষে দূর হয়ে গেল।

হঠাৎ অনেক দূরে আমার নজর পড়লো। একটি লোক প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আসছে—অনেকটা অসিত বাবুর মতো মনে হওয়াতে আমি নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম—তিনিই। ডাকলাম, অসিত বাবু—ও অসিত বাবু!—তিনি চোখ তুলে তাকাতেই বললাম, —এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় ক'রে কোথায় চলেছেন? আমাদের ফটক খোলা আছে, ঢুকে পড়ুন। তিনি ঢুকতে আমি দাদার ধুতি ও পাঞ্জাবী আর একটা শুকনো তোয়ালে টেনে নিয়ে নীচে নেমে এলাম। দেখলাম, বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে তিনি ঠক-ঠক ক'রে কাঁপছেন।

হেসে বললাম, এই নিন কাপড়—ঐ বাথ-রুমে সাবান আছে, মুখ-টুক ধুয়ে কাপড় বদলে আসুন। উনি বাথ-রুমে ঢুকতে আমি একটা চাকরকে ডেকে চা আনতে বলে দিলাম।

অসিত বাবু বাথ-রুম থেকে বেরিয়ে একটা কৌচে এসে বসলেন। আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম। কি জানি, কথা কয়ে এই নির্জ্জনতা-টুকু নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না। বাইরে বাতাসের আর্ত্ত কান্নার সঙ্গে গাছগুলোর সনসনানি শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বাদলা বাতাস এসে জানালার পর্দ্দাগুলো এক-একবার কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

পাশের বাড়ীতে নীরু গাইছিল—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।

চাকরটা এসে চা ও খাবার দিয়ে গেল। অসিত বাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আজকাল কলেজে যান না?

বললাম, না, আরো দিন-তিনেক পরে যাবো। আচ্ছা, অনুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

উনি বললেন, হয়—মানে আমি রোজ যাই কি না।

ও! বলে চুপ করলাম।

আমার চিঠি পেয়েছিলেন সুমিতা দেবি?

বললাম, হ্যাঁ, পেয়েছিলাম তো।

তবে উত্তর দেননি কেন? জানেন, দিন-কতক এমন দুর্গতি হয়েছিল আমার। পিয়ন দেখলেই বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠতো। মনে হতো, এবার নিশ্চয়ই আপনার চিঠি এসেছে। তার পরে অবিশ্যি মনে হলো, আমি এক জন গরীব, আপনার চিঠির আশা করা দুরাশা মাত্র!

লজ্জিত হ'য়ে বললাম, আপনি নিজেকে অতো ছোটো মনে করেন কেন বলুন তো? আপনি আমার বন্ধু। আমার হাতটা একটু জোরে চেপে ধরে অসিত বাবু বললেন, ঠিক তো এটা, কখনো ভুলবেন না যেন।

ঠিক সেই সময়ে পরদা সরিয়ে মেজদা ঘরে ঢুকলেন। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, হিংসায় মেজদার মুখ কালো হ'য়ে উঠেছে। বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, বাঃ, এই বাদলায় আপনি কোথা থেকে এসে জুটলেন অসিত বাবু?

আমি বললাম, আপনি যেখান থেকে এসে জুটেছেন। অসিত বাবু উঠে-পড়ে বললেন, আজ আসি সুমিতা দেবি! আমিও উঠে ও'র সঙ্গে বাইরে যেতে যেতে বললাম, শনিবারে আসবেন অসিত বাবু, বিকেলে এখানে চা খাবেন, কেমন তো?

আচ্ছা, নমস্কার—বলে উনি পথে নেমে পড়লেন। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। মেঘমুক্ত সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে নানা রঙে রঙিন একখানি ছবি এঁকে পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন।

১২

বেলা চারটে থেকে প্রায় সন্ধ্যে অবধি অসিত বাবুর জন্যে অপেক্ষা করেও তিনি যখন এলেন না, মনটা তখন এতো খারাপ হ'য়ে গেল!

বাবা জিগ্‌গেস্ করলেন, আমার মা-জননীর মুখ এতো শুকিয়ে গেল কেন গো?

একটু হেসে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। সত্যি, মনটা এতো খারাপ হয়ে গেল। আজ আমি একটু বিশেষ যত্ন ক'রে সেজেছিলাম—বিশেষ এক জন পুরুষের জন্যে। দিদি হেসে বলেছিলো, তোর বর আসবে না কি সুমু? তাই এতো সাজ।

আমিও উত্তর দিয়েছিলাম, আসবেই তো, তোর হিংসে হচ্ছে না কি? না লো, না—বলে দিদি গালটা টিপে দিয়েছিল। মাহেন্দ্রক্ষণ এলো, কিন্তু সে কই? দেহ আজ সেজেছে পরিপাটি ক'রে, অন্তরের কামনাগুলো উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে আর এক জনের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্যে, মন বেপথু হয়ে উঠেছে আর একটি মনের সঙ্গে মিশে যাবার অত্যধিক আনন্দে—কিন্তু সে কই? আমার প্রিয়তম!

বাবা বললেন, চ', তোকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি মা। বললাম, চলো। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অন্তর তখন ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে!

এমন সময় মা ঘরে ঢুকে বললেন, কি গো, বেরুচ্ছো না কি? বাব্বাঃ! দিন-রাত বেড়িয়েও তোমাদের আশ মেটে না।

বাবা বললেন, কেন, তোমার দরকার আছে না কি গো?

মা বললেন, ছিল তো—বসো তো বলি। আমি একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, আগে একটু বেড়িয়ে আসি না মা, তোমার কথা তো আর পালাচ্ছে না।

মা রেগে উঠে বললেন, তোমার বেড়ানও পালাচ্ছে না। এতো কি মেম হয়েছো যে এক দিন না বেড়ালে চলে না। মেয়ে নয় তো যেন মানোয়ারী গোরা!

বাবা বললেন, সুমু, তুমি একটু বাইরে যাও তো মা।

আমি বাইরে এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। সেদিন বোধ হয় প্রতিপদ ছিল; কুমড়ো ফালির মতো সরু চাঁদ উঠেছে আকাশের এক প্রান্তে—তার আলোয় পৃথিবীর অন্ধকার ঘোচেনি একটুও। নীলাকাশ তারার মালায় সেজে হাসছে—উতলা দখিণ বাতাস যুঁথি-বেলির গন্ধ মেখে চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। পাড়ার একটা বখাটে ছেলে গান ধরেছে,—'রাই তোমার শ্যাম এলো মা—তোমার সাজন্-গোজন্ মিথ্যে হলো, রাধা গো, শ্যাম এলো না।'

হঠাৎ মা'র উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম; তিনি বলছেন, মেয়ের আবার মত কি, আমরা যাকে ঠিক করবো ও তাকেই বিয়ে

করতে বাধ্য। তার পরেই তিনি নরম হয়ে বললেন, ও তো তোমার কথা খুব শোনে, তুমি বললেই ও শুনবে—বলবে গো ?

বাবা বললেন, শোনে বলেই তো বলবো না। আমি পীড়ন করতে ভালোবাসিনে সে তো তুমি জানো অভয়া ! ও-সব কথা যেতে দাও।

মা আবার রেগে উঠে বললেন, নন্দার বেলায় ক'বার তার মত নিয়েছিলে, শুনি ?

বাবা আবার বললেন, এটি ভুলে যাচ্ছো কেন যে, সে ছিল বারো বছরের মেয়ে আর সুমিতা হলো আঠার বছরের। তার অমতে আমি কিছু করবো না।

দিদি এসে কখন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল জানি নে, বললে, সুমু, এতো যে সাজলি, কেউ তো এলো না ? কার আসবার কথা ছিল রে ?

ধরা-গলায় বললাম, অসিত বাবু বলেছিলেন আসবেন। দিদি একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, সুমু, একটি কথা বলবি ভাই ?

বললাম, দিদি, তুই যা বলবি সে আমি বুঝতে পেরেছি। আমি সব স্বীকার করছি—হ্যাঁ, ওঁকে আমি ভালোবেসেছি, আজ আমার কাছে এর চেয়ে বড়ো সত্য আর কিছু নেই।

দিদি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, অনুদের বাড়ী যাবি ? বললাম, চলো।

১৩

সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই অসিত বাবুর গান শুনতে পেলাম—

আমার পথ চাওয়াতেই আনন্দ
খেলে যায় রৌদ্র-ছায়া বর্ষা আসে বসন্ত।

সারা মনটা আমার রাগে-অভিমানে ফুলে উঠল। অন্তরের সমস্ত কামনা দিয়ে যে-মেয়ে তার পায়ে নিজেকে নত ক'রে দিতে চাইলে, তাকে পায়ে ঠেলে সে কি না আনন্দের স্রোতে ভেসে চলেছে আর একটি মেয়েকে সঙ্গিনী ক'রে ! এতো অবজ্ঞা আমায় ! আমি কি এতোই সস্তা ? দিদি বললে, এ কি রে, দাঁড়িয়ে পড়লি যে, ওপরে উঠবি নে ?

কথার জবাব না দিয়ে দিদির পিছু-পিছু ওপরে উঠে অনির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

দিদি ডাকলে, অনু কোথায় রে ? অনি ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, ওমা, আজ যে দেখি পশ্চিমে সূর্যোদয়, না, না, চন্দ্রোদয় ! একেবারে দু'বোনেই যে এসেছ সুমুদি' —এসো এসো, ঘরে এসো।

ঘরে ঢুকে কোণের দিককার একটা সোফায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। ছি ছি, অনির কাছে আজ আমার পরাজয় হ'ল—ঐ কালো মেয়ের এমন মোহ !

দিদিকে প্রণাম ক'রে অসিত বাবু বললেন, বৌদি, আজ উনি আমায় নেমন্তন্ন করেছিলেন—কিন্তু অনিটা কিছুতে যেতে দিলে না। জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেল মার্কেটে। মিস্ রায় নিশ্চয় আমার ওপর রাগ করেছেন ?

দিদি হেসে বললে, রাগ করা তো উচিত। সুমু আজ নিজের হাতে খাবার করেছিল, ঠাকুরপো, গেলে ঠকতে না।

অসিত বাবু চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন ঠক্‌তাম না, সে আমি এখন খুব ভালো ক'রেই বুঝতে পারছি কিন্তু ভাগ্যকে এড়িয়ে যেতে পারি, শুধু আমি কেন—কোনো মানুষেরই সে ক্ষমতা নেই। ঐ যে একটা মেয়েলি ছড়া আছে না— 'অদৃষ্টে নেইকো ঘি, ঠক্-ঠকালে হবে কি ?' আমার হয়েছে ঠিক তাই ! আজ আমায় ক্ষমা করেছেন তো ?

অনিতা জোরে হেসে উঠে বললে, তুমি বাপু থামো তো— আমায় একটু কথা বলতে দাও। হ্যাঁ রে বাঁদরি, রাগ করেছিস না কি ?

আমি কারুর কথারই উত্তর না দিয়ে এ মাসের প্রবাসীখান টেনে নিলাম।

১৪

কলেজ থেকে ফিরে ওপরে উঠছি, মা ডাকলেন, সুমি, শুনে যা। ঘরে ঢুকে দেখি, বাবা ও দাদা বিছানায় বসে রয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কি বলছো মা ? বোস্ এখানে, বলে তাঁর পার্শ্ব নির্দেশ করলেন। আমি বসতে মা বললেন, আমরা তোমার বিয়ে দিতে চাই, পাত্রকে তুমি চেনো বোধ হয় ? তাই তোমার মত চাইছি। আমি চুপ ক'রে রইলাম। মা আবার বললেন, কি রে, চুপ করে রইলি কেন ?

আমি থেমে-থেমে বললাম, আমার মত চাই, বিমান বাবুকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

মা ভয়ানক রেগে উঠলেন, বললেন, আমার মত আছে। আমি বিমানের হাতে তোকে দেবোই দেবো। এতো একগুঁয়ে জেদী মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি। যা, আমার সামনে থেকে সরে যা। ওই মাকাল ফল অসিতকে পেয়ে সকলেই ভুলে গেছো দেখছি সবাই ! আচ্ছা, আমিও দেখবো।

দাদা শান্ত মানুষ, ধীরে ধীরে বললেন, ওর যখন অতো অমত তখন না-ই বা এ বিয়ে হলো মা ?

তুই থাম তো সুবিমল। তোরাই তো ওর মাথা খেলি ! মেয়ের আবার এতো তেজ কেন শুনি ? তোরা আর ওর সুরে সুর মেলাস্‌নে।—ব'লে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাবা মথায় হাত দিয়ে বললেন, কেঁদো না মা-লক্ষ্মী। আমি চোখ মুছতে মুছতে আমার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি নে, দিদির ডাকে উঠে পড়লাম। দিদি বলছে, সুমু ওঠ, বাবা 'ভাগ্যচক্রে'র টিকিট কিনে এনেছেন। তোকে কাপড় বদলাতে বললেন। বললাম, আমি যাব না। দিদি বললে, ওঠ ভাই, বাবার মনে দুঃখ দিস্ নে। নিঃশব্দে উঠে বাথ-রুমে চলে গেলাম।

চিত্রার সামনে গাড়ী আসতে আমরা নেমে পড়লাম। ছবি তখন সুরু হয়ে গেছে। গার্ড টচ জেলে আমাদের আসন দেখিয়ে দিলে।

ইণ্টারভ্যালের সময়ে দিদি আমায় বললে, ওই দেখ, সুমু ! ঠাকুরপো, অনি আর একটা ছেলে কে এসেছে, ডাকবো ওদের ? রাগে মনটা জ্ব'লে উঠলে—বললাম, না। বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে, মা ? হেসে বললাম, ভালোই লাগছে বাবা। কেষ্ট বাবু কি সুন্দরই না গেয়েছেন ! তাঁর অভিনয়ও

হয়েছে চমৎকার! বাংলা দেশে অনেক গায়ক গলার কারসাজি দেখিয়ে তাঁর চেয়ে উঁচু দরের গান বলে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, কিন্তু তাঁর মত দরদী কণ্ঠ বাংলায় আর ক'জনের আছে বাবা? গানের ভাষা ও ভাবকে তিনি যেন সুরের মধ্যে দিয়ে মূর্ত্ত ক'রে তোলেন!

ছবি শেষ হ'বার পর আমরা বাইরে আসতে অসিত বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাল ওঁর সঙ্গে কথা বলিনি, সেই জন্যে আজ উনি আমার সঙ্গে কথা বললেন না। আমি ওঁদের দেখে মোটারে উঠে বসলাম। বাবা ও দিদি কাল ওদের চায়ের নেমতন্ন করলেন। অনিতা ঘাড় নেড়ে বললে, আমি যাব না জ্যেঠা মশায়। বাবা হেসে বললেন, যাস্ কি না যাস্, দেখা যাবে বেটি। হ্যাঁ, অসিত তুমিও যেও। তোমার সঙ্গেই আমার দরকার রয়েচে বিশেষ করে, বুঝেছো?

হ্যাঁ, যাব বৈ কি কাকাবাবু। আচ্ছা, আজ আসি। ওঁরা চলে গেলেন।

কোণে ঠেস দিয়ে বসেছিলাম। আজ মনে হলো, অনিকেই উনি চান—আর আমি বেহায়ার মতো ওঁকে চাইছিলাম। আমায় নিয়ে হয়তো ওরা ঠাট্টা-তামাসা করে। কাল অনির সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া ক'রে নেবো। আমি মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

১৫

অসিতের কথা

সুমিতা আমার ওপর চটে গেছে—দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আচ্ছা, আমি কি করবো? একে মীনার বিয়ের গোলমাল, তার পর অনিতার আবদার—কিছুতে যদি সেদিন সুমিতার নেমন্তন্নে যেতে দিলে মেয়েটা।

মীনা বিয়ের আট দিন পরে ফিরে এসে আমায় ধরলে, দাদা, এবার আর তোমার কথা শুনছি না। আমি তোমার বিয়ে দিয়ে তবে ও-বাড়ী যাব।

বললাম, তাই না কি রে, তবে তো মহামুস্কিল করলি দেখছি? তা কনেটি কে রে, একটু বল্ শুনি?

মীনা হেসে উঠে বললে, আহা গো! ছেলে যেন ন্যাকা, কিছু জানে না, না দাদা? কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম, জানি নাই তো। মীনা আবার হেসে উঠে বললে, তা কি আর জানো? তোমার সুমিতা গো সুমিতা—মনে পড়ছে না? ধমক দিয়ে বললাম, আরে গেল যা ফাজিল মেয়ে—পালা এখান থেকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মীনা হাসিমুখে বলে গেল, তা তো বলবেই গো, মনে করিয়ে দিলাম কি না।

* * * *

বিকেলে ওখানে চায়ের নেমন্তন্নে গেলাম—আশা করেছিলাম, সুমিতার দেখা পাব। তাহ'লে তার কাছে সেদিনকার অভদ্রতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেব। কিন্তু বৌদির মুখে শুনলাম, তিনি সকাল থেকে দু'টি সঙ্গিনীর সঙ্গে সোদপুরে বেড়াতে গেছেন।

অনিতা একটা কেক্ কাটতে কাটতে অভিমানে মুখটা ঈষৎ ম্লান ক'রে বললে, জানো সুমুদি, তোমার বোন আজকাল আমার দেখলে পাশ কাটিয়ে পালায়। বৌদিও ম্লান হেসে বললেন, না রে, ওর মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে, মার' সঙ্গে কি খিটিমিটি বেধেছে, মা-ও রাগ ক'রে সকালে মামার বাড়ী চলে গেছেন।

অনিতা বললে, কেন, ওর বিয়ের কথা কিছু হচ্ছে বুঝি সুমুদি? বৌদি বললেন, ঠিক জানি নে ভাই।

আমি বললাম, বৌদি, আজ উঠি, আমার শরীর ভালো লাগছে না। বৌদি বললেন, কিছুই যে খেলে না ভাই ঠাকুরপো? অন্য দিন পাব, আজ আসি—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

স্ফটিক জল

সাগরিকা বসু

বিজলী পাখার তলায় বসিয়া দিন কাটে—
তবু ভাবি এতে মলয়ানিলের নেশা কোথায়?
স্তব্ধ দুপুর—মাটির কান্না চষা মাঠে;
কলরোল ওঠে স্ফটিক জলের হেথা-হোথায়।

মন্দাকিনীর শুভ্র প্রবাহে জাগে না প্রাণ,
ধারা কি হারালো ঊষর মরুর মাঝখানে?
তপ্ত বালুর বিভীষিকাময় মহাশ্মশান
শান্ত শিবের প্রসাদ-বাণী কি আনে প্রাণে?

পাতা-ঝরা গাছ—মাথার উপরে রুক্ষ দিন—
আর্ত্ত-কণ্ঠে করুণ কামনা স্ফটিক জল
এ যেন নিখিল মানবাত্মারই কণ্ঠ ক্ষীণ,
অন্তিম সুরে অমৃতবারি যাচে কেবল।

কাল অপূর্ণ—মহাসিদ্ধির কিছু বাকী—
ওরে ধরণীর তৃষা-মুমূর্ষু চির চাতক!
এই ভরসায় তবু প্রাণপণে বেঁচে থাকি
এখনো যে করে মহা তপস্যা নব জাতক।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেশের কথা

পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের বিবিধ প্রকার স্বাস্থ্য-উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কোন এক সহযোগী বলিতেছেন: "শুধু যক্ষ্মা রোগ নিবারণে নহে, জন-স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি যে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাও প্রশংসনীয়, তবে এ বিষয়েও একটা কথা ভাবিবার আছে। বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে হাসপাতাল নির্ম্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু স্বাস্থ্যোন্নতির পরিকল্পনা কোথায়? উন্নতি দূরে থাকুক, মানুষ কি খাইয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিবে তাহা আরও কঠিন প্রশ্ন। সহরে বা গ্রামে কলেরা দেখা দিল, কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, "টিকা লও"। টিকা অবশ্যই লইতে হইবে, কিন্তু কলেরা যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা কি হইতেছে? আমাদের জনৈক বন্ধু বলিতেছিলেন, "আমরা বেশ আছি!" যাহারা কলেরা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে, তাহারাই বলে, কলেরার প্রতিরোধে টিকা লও। রেশনে পচা চাউল, সাদা, কালো, নরম এবং শক্ত পোকা-মিশ্রিত অখাদ্য আটা খাইতে দিয়া কলেরা ডাকার পরে টিকা দিবার হিতোপদেশ বিতরণ! ব্যবস্থা চমৎকার, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জলে, কলে, খাদ্যে কলেরার বীজাণু আর ডাক্তারের হাতে ইনজেকশন! স্বাস্থ্যোন্নতির আর বাকী রহিল কি?" ইহার জবাব দিতে একমাত্র ডাঃ বি, সি, রায়—পশ্চিম-বঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলীর নেতা মহাশয়।

*　*　*　*

বিহারের বাঙ্গালা-ভাষাভাষী অঞ্চল সম্বন্ধে 'শিল্প ও সম্পদ' মন্তব্য করিতেছেন: "বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাংলার অংশগুলি প্রত্যর্পণের দাবী জানাইয়া বাংলার বিভিন্ন মহল হইতে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছে ও হইতেছে। গণ-পরিষদের সহঃ-সভাপতি ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বাংলার এই একান্ত ন্যায্য দাবীর সমর্থনে যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে বাংলার জনমতই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সরকারী ভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও পশ্চিম-বঙ্গ গবর্ণমেণ্টও কংগ্রেসের তথা ভারত গবর্ণমেণ্টের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জনসাধারণের পক্ষ হইতে বাংলার দাবী পেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি, বাংলার এই জীবন-মরণ সমস্যার পশ্চাতে বাঙ্গালী তরুণ-তরুণীদের যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল, তাহার আজ একান্তই অভাব। ছাত্র ও যুব-সমাজের বলিষ্ঠ সহযোগের অভাবেই বাংলার এই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ দাবী আজ পর্য্যন্তও একটা নিয়মতান্ত্রিক কাগজ-পত্রের দাবীতেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এই আন্দোলনে যাঁহাদের অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়া আসা কর্ত্তব্য ছিল, সেই প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উভয়েই একটা প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। ক্ষমতা লাভের জন্য ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইঁহারা বর্ত্তমানে যে স্তরে নামিয়া গিয়াছেন তাহাতে বাংলার জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হইয়াছে। ইঁহাদের মতিগতির যে প্রমাণ নিত্য আমরা পাইতেছি, তাহাতে বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাংলার অঞ্চলগুলি প্রত্যর্পণের দাবীর প্রতিকূলে পুনরায় ইঁহারা অভিমত প্রকাশ করিবেন না এমন ভরসা করা যায় না। মেদিনীপুরে সম্মেলন করিয়া বাংলার কংগ্রেসকে পশ্চিম-বাংলায় সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য এক দল কংগ্রেসী পরিষদ-সদস্য যে উৎসাহ-উদ্যম প্রদর্শন করিলেন, বাংলাকে বাঁচাইয়া রাখিবার এই 'বৃহত্তর বাংলার দাবী' লইয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতেছি না। শুধু তাহাই নহে, দলীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্য ইঁহারা কংগ্রেসের কর্ণধার ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের দুয়ারে যে ভাবে ধর্ণা দিতেছেন, তাহাতে বাংলার দাবী সেখানে বিকাইয়া দিয়াও দলীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিবেন এইরূপ আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে।" ইহার উপর কোন মন্তব্যের অবকাশ নাই।

*　*　*　*

'আর্য্য' মন্তব্য করিতেছেন: "কংগ্রেস কি টকিয়া গেল? দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরিয়া ত্যাগ, সততা এবং নিষ্ঠার যে মহিম ঐতিহ্য কংগ্রেসকে শ্রেষ্ঠতম করিয়া রাখিয়াছিল, ক্ষমতার স্বাদ সে সমস্তকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। যে কর্ত্তব্য-জ্ঞান এক দিন সমস্ত লোভকে পরিহার করিতে শিক্ষা দিয়াছিল সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এখন ব্যবহারিকতায় পরিণত হইয়াছে। যে ত্যাগের মহান উদ্দেশ্য সন্তানকে জননীর স্নেহনীড় হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিল, আজ সেই ত্যাগ চরম ভোগে পরিণত হইয়াছে! তাই বলিতেছি—কংগ্রেস টকিয়া গেল। আর তাহার সহিত উচ্ছন্ন গেল সমস্ত দেশটা। ফিরিঙ্গী সরকারের শাসন-কালে যে সমস্ত দেশকর্ম্মী সরকারকে চোরাকারবারীদের পৃষ্ঠপোষক আখ্যায় আখ্যায়িত করিত, দেশের অগণিত জনসাধারণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপের জন্য হত্যাকারী বলিয়া ভূষিত করিত, আজ তাহাদের সহিত একাত্ম হইয়া সেই সব দেশকর্ম্মীরা দেশ-সেবায় ব্যস্ত। তাঁহাদের দেশ-সেবার ফল হিসাবে দেশবাসী পাইল দারিদ্র্য, অনাহার ও অর্দ্ধাহার, উলঙ্গতা। বৃটিশ আমলের যে শাসন-ঘটিত বিলাসিতা সমগ্র জাতির প্রাণে বেদনা সঞ্চার করিয়াছিল আজ স্বাধীন ভারতে দেশসেবীদের মধ্যেও সেই বিলাসিতা! এক দিন বক্তৃতায় মঞ্চে দাঁড়াইয়া যে শাসন সংক্রান্ত অপব্যয়কে দেশের দারিদ্র্য দৈন্যের কারণ বলিয়া বিঘোষিত করা হইয়াছিল আজ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যেও সেই স্বদেশী বিলাসিতার নগ্ন নৃত্য দেখিয়া মনে হয়, ১৯০৫ সাল হইতে '৪২ সাল পর্য্যন্ত ভারতের অগণিত জনসাধারণ যে রক্ত ক্ষয়

করিল, তাহা কি এই নূতন দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য ?" খুব সম্ভবত তাহাই। কংগ্রেসী সরকার ক্রমে জনসাধারণের মনে যে বিদ্রোহ ভাবের সঞ্চার করিতেছে—তাহাতে অদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতেও ভয় হইতেছে।

* * * *

'নীহার' পত্রিকায় প্রকাশ : "কাঁথি মহকুমার অভ্যন্তর ভাগ যে কয়টা বড় রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত—কালীনগর রাস্তা তন্মধ্যে অন্যতম! বর্ত্তমান এই রাস্তাটির দুর্দ্দশা যেরূপ চরমে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে যে কোন প্রকার যান-চলাচল এমন কি রাত্রিতে পায়ে হাঁটিয়া চলাও নিরাপদ নহে। দীর্ঘকাল রাস্তাটি অসংস্কৃত অবস্থায় থাকায় তদুপরি যুদ্ধকালীন মিলিটারী দৌরাত্ম্যে ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। পূর্ব্বতন প্রাণহীন জেলাবোর্ডের নিষ্ক্রিয় দক্ষতার সাক্ষি-স্বরূপ এই রাস্তাটি বৃষ্টি হইলেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীবদ্ধ ডোবা বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধোত্তর কালের বৃহৎ বৃহৎ সংস্কারের আশার আলোকে এই রাস্তাটির অবস্থা বিচার করিলে ইহাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন মহেঞ্জদাড়ো বা হরপ্পায় আবিষ্কৃত রাস্তার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিলে কিছু ভুল হইবে না। রাস্তার এইরূপ দুরবস্থা কেবল কালীনগর রাস্তার প্রতি কেন, কাঁথির সহিত সংযুক্ত প্রত্যেক প্রধান রাস্তার প্রতি অল্প-বিস্তর প্রযোজ্য। জেলার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বহু কাল ধরিয়া এই সকল রাস্তা দিয়া প্রয়োজন বোধে যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সদয় দৃষ্টি রাস্তাগুলির দুরবস্থা মোচনে কেন যে পতিত হয় নাই, তাহা বিস্ময়ের বিষয়! ইহা তাঁহাদের কর্ম্মদক্ষতার অভাব কি অসহায় অবস্থা তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। যাই হউক, বর্ত্তমান নবগঠিত জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ এই রাস্তাটির আবশ্যকীয় সংস্কার-সাধনে সত্বর যত্নবান হইলে ভুক্তভোগীরা কৃতজ্ঞ হইবেন। তাহা না হইলে রাস্তাটির অংশ-বিশেষ সেটলমেণ্টে ডোবা বলিয়া রেকর্ডভুক্ত হইবার উপযোগী হইয়া উঠিবে।" এ-বিষয় কলিকাতা, হাবড়া প্রভৃতি স্থানের পথ-ঘাটগুলির অবস্থাও প্রায় একই প্রকার। কলিকাতার বহু রাস্তার বহু স্থান ত প্রায় পাকাপাকি ভাবে 'খোট্টা'-গোয়ালাদের জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে! দুধ খাইতেছি বটে, তবে তাহা কি দুধ এবং ঠিক কি মূল্য দান করিয়া, তাহা পরে মালুম হইবে!

* * * *

'শিল্প ও সম্পদ'-এ প্রকাশ : "উল বা পশমের ব্যবহার সম্পর্কে বর্ত্তমানে বেশী লিখিবার দরকার করে না। পূর্ব্বে মেয়েদের উহা দ্বারা আসন, গেঞ্জি, সোয়েটার, মোজা, মাফলার প্রভৃতি বুনন করা সৌখীন বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইত—বর্ত্তমানে নিয়মিত কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ঘরে বুনিলে যেমন মেয়েদের কাজ-কর্ম্মে সময় অতিবাহিত হয় তেমনি অনেক কম মূল্যে জিনিষগুলি পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাঙালী মেয়েরাই উলের ব্যবহার করিয়া থাকে, ইঙ্গ-ভারতীয় রমণী-গণও কিছু কিছু ব্যবহার করে, কিন্তু মোট চাহিদার বারো আনা বাঙালীর ঘরেই কাটে অথচ এত বড় একটি ব্যবসায়ে আমাদের হাত পড়ে নাই! যাঁহারা ৪'৫ শত টাকা বা উহারও কম মূলধনে এই কারবার করিতে চান তাঁহারা দুইটি বাজার-প্যাকেটে মোটামুটি কয়েক প্রকারের পশম, কিছু ডি-এম-সি গুলি, ক্রচেট সুতা, পশম বুনিবার কাঁটা ও নানা রকমের সূচ ও সূচি-শিল্প সম্পর্কে ২।১খানি পুস্তক ইত্যাদি লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে পারেন। ইহাতে গৃহস্থগণ নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী মাল ঘরে বসিয়াই পাইবেন এবং যাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করিবেন তাঁহারাও দুই পয়সা স্বাধীন ভাবে উপায় করিতে সক্ষম হইবেন। এই ভাবে কাজ করিবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর প্রয়োজন নাই, হাজার হাজার টাকার মূলধনও দরকার করে না। শুধু দরকার হয় ধৈর্য্য ও একনিষ্ঠ পরিশ্রম। বাঙালী যুবকগণ যদি এখনও মিথ্যা আত্মা-ভিমান (False sense of prestige) ত্যাগ করিয়া তাহা না পারে তবে আর কিরূপে বেকার সমস্যা ঘুচিবে—প্রদেশের উন্নতিই বা কেমন করিয়া হইবে? আমরা অবিলম্বে বাঙালী যুবকদিগকে এই কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে দেখিতে চাহি।" 'শিল্প ও সম্পদ'-সম্পাদক আশা করিতে থাকুন, কিন্তু বাঙালী যুবকদের এখন এই প্রস্তাব মত কোন প্রকার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সময় নাই। খেলার মাঠে, সিনেমাতে, বাসে-ট্রামে, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাঙলার ভবিষ্যৎ আশা যুবকের দল নানা প্রকার বৃহত্তর সমস্যামূলক কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন!

* * * *

'নির্ণয়' প্রস্তাব করিতেছেন : "গ্রামে গ্রামে সহজলভ্য কার্য্য-করী সুশিক্ষার প্রচলন করতে হবে। গ্রামের লোক নিজের মাতৃ-ভাষায় কিছুটা লিখতে পড়তে শিখুক—যাতে তাদের চিঠি লেখা বা পড়ার জন্য গ্রামের একমাত্র শিক্ষিত 'বাবুকে' অনুনয়-বিনয় করতে না হয়, মহাজন বা জমিদার মিথ্যা দলিল রসিদে অক্ষরজ্ঞানহীন মূর্খ জনসাধারণের সর্ব্বনাশ চিরদিন যাতে না করে ;—দেশবাসী জনসাধারণ নিজের দেশ ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য কিছু ভূগোল ইতিহাস শিক্ষা করুক ; হিসাব-নিকাশ করবার মত প্রাথমিক গণিত শিক্ষা করুক। জনসাধারণের একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হবে স্বাস্থ্যতত্ত্ব। গ্রামের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির জন্য চিরন্তনী ম্যালেরিয়ায় জনসাধারণের কর্ম্মশক্তির শতকরা নব্বই ভাগই বিনষ্ট হয়, তার উপর আছে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শিক্ষা—জনসাধারণের নিজস্ব জীবিকার পথ যাতে সহজ, সরল অথচ সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত হয় সেই বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ, অথচ কৃষিকার্য্যের যে ধারা তা সেই অশোক যুগের সময়েও যা ছিল তার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি। অথচ অন্যান্য দেশে, যেখানে কৃষিকার্য্য গৌণ সেখানেও রীতিমত বৈজ্ঞানিক ও সুষ্ঠুভাবে কৃষিকার্য্য করা হয়, কৃষিকার্য্যের জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতি, নূতন নূতন সার এবং নূতন নূতন পথের চেষ্টায় দেশের কত প্রতিভাশালী মস্তিষ্ক দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। অথচ আমাদের দেশে কি বিসদৃশ অবস্থা! জনসাধারণের মনে নূতনত্বের মোহ জাগাতে হবে যাতে নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যোগে আবার তারা কৃষিকার্য্যের উন্নত ধারার দিকে লক্ষ্য রাখে। শুধু কৃষিকার্য্যেই নয়, কুটীর-শিল্পও আমাদের সম্পদ। প্রাচীন ভারতের কুটীর-শিল্প অমূল্য কিন্তু সেই সকল শিল্প আজ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটীর-শিল্পকে নূতন করে গড়তে হবে, মৃত-শিল্প সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। কিন্তু এই সকল কাজে অগ্রণী হবে কে? দেশের তরুণ-সম্প্রদায়কেই তো আজ এই শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগতে হ'বে, এই মহান্ কর্ত্তব্যে সাড়া দিতে হবে।"—তাহা হইলে

বর্ত্তমানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তরুণ-সম্প্রদায়ের এখন এ-দিকে দৃষ্টি দিবার সময় নাই।

* * * *

'দামোদর' পত্রিকার অভিযোগ : "বর্ধমানের মত একটি বৃহৎ ষ্টেশনে যাত্রিগণ টিকিট করিতে গিয়া দারুণ হয়রাণী ভোগ করে। এত বড় ষ্টেশনে একটি মাত্র কেরাণীকে আপ ও ডাউন তৃতীয় শ্রেণীর দুইটি জানালা এবং মধ্যম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর একটি জানালায় অসংখ্য যাত্রীদিগকে টিকিট দিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। এই জন্য বহু লোক টিকিট করিতে না পারিয়া ট্রেণ ফেল করে। উৎক্ষিপ্ত যাত্রিগণ এ জন্য টিকিট বিক্রয়কারী কেরাণীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। টিকিট দিবার কেরাণীর কার্য-সময় এইরূপ—ভোর ৪টা হইতে বেলা ১২টা, বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত একটানা ৮ ঘণ্টা করিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া ও ছুটাছুটি করিয়া কাজ করিতে হয়। মাত্র এক জন কেরাণীকে তিনটি কাউণ্টারে টিকিট তো দিতে হয়ই তাহার উপর প্রতি শ্রেণীর আবার তিন প্রকারের করিয়া অর্থাৎ মোট ১২ প্রকারের টিকিট বিক্রয় ও তাহার হিসাব দিতে হয়। অনেক ষ্টেশনের আবার ছাপা টিকিট নাই। সেগুলি আবার কার্ব্বন কপি করিয়া রসিদ কাটিয়া দিতে হয়। অথচ এই শ্রেণীর কেরাণীর বেতন মাত্র ৬০৲।৭০৲ টাকা। মহিলাদের জন্য টিকিট দিবার কোন পৃথক্ ব্যবস্থা না থাকায় বর্ধমান ষ্টেশনে মহিলা যাত্রীর দুর্দ্দশার অন্ত নাই। স্বাধীন ভাবে ট্রেণে যাতায়াতের জন্য বহু মহিলা অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করেন। বর্ধমান হইতে যে সমস্ত লোক্যাল ট্রেণ ছাড়ে সেগুলির কামরা ও পায়খানা কিছু দিন যাবৎ ভাল ভাবে পরিষ্কার করা হইতেছে না।" এ অভিযোগ কেবল বর্দ্ধমানের নহে। বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই এক-ই অবস্থা। বহু লোক সাধ করিয়া বিনা টিকিটে রেল-ভ্রমণ করে না। দায়ে পড়িয়াই বহু সময় এ পাপ-কার্য্য করিতে হয়।

* * * *

রামপুরহাটের 'দীপিকা' পাঠে জানা যায় : "রামপুরহাটে আজ দুই মাস কয়লার অভাব দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দুই মাস পূর্ব্বে রামপুরহাট সহর ও সহরতলীর সকল আড়তের কয়লা নিঃশেষ হওয়ার সময় হইতে কিছু দিন "পারমিট-কাটা কর্ত্তৃপক্ষ" কয়লার গুঁড়ার জন্য 'পারমিট' দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সুযোগে আড়তদারগণ তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত ধূলামাটিমিশ্রিত কয়লার গুড়া পর্য্যন্ত অবাধে বিক্রয় করিল—খরিদ্দারগণও পেটের দায়ে (?) নির্ব্বিবাদে তাহাই গ্রহণ করিয়া 'পারমিটদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন (?) এবং আড়তদারকে "দেঁতো হাসির" দ্বারা আপ্যায়িত করিল। রামপুরহাটের "বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত" গৃহস্থ ব্যতীত প্রায় সকল গৃহস্থের নিকট হইতেই কয়লার অভাবে দৈনন্দিন সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহে অশেষ দুর্গতির কথা অনবরত শুনিতেছি। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন, রামপুরহাট সহরে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মস্থান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় জন-সাধারণকে এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে কেন? কেবল জ্বালানির অভাবে প্রায় অনেককেই এক বেলা চিঁড়া-মুড়ি খাইয়া থাকিতে হইতেছে, কয়লা আমদানির ব্যবস্থা কেন এ পর্য্যন্ত হইল না? লোকে অতি কষ্টে চাল-ডাল যোগাড় করিয়া রান্না করিয়া খাইবে তাহাও কি কয়লার অভাবে তাহারা পাইবে না? তা যদি না পায়, জাতীয় সরকারের এত খরচ-পত্র করিয়া এত লোকজন রাখিয়া অসামরিক সরবরাহ বিভাগ রাখিবার কি প্রয়োজন? তাই আমরাও সখেদে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণকে বলি, আহা, এখন কেহ তুচ্ছ নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা তুলিয়া সোরগোল করিয়া শিশুরাষ্ট্রকে বিব্রত-বিরক্ত-বিপদগ্রস্ত করিও না—এই শিশুর অছি, উপ-অছিগণকে তাহাদের তথাকথিত স্বাধীনতা-সংগ্রামের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু কাল শান্ত আরামে ভোগ উপভোগ করিতে দাও—তাহাদিগকে তাহাদের যথাযথ (?) গদীতে অর্দ্ধশয়নে ঝিমাইতে দাও এবং নিজ শিরে করাঘাত করিয়া আরো কিছু দিন চুপ করিয়া সকল কষ্ট সহ্য কর।" তাহা হইলে কাঠ, কয়লা, চাউল, ডাল, বস্ত্রাদির আর কোন প্রয়োজন হইবে না। দেশের লোক কমিয়া গেলে সব সমস্যার সহজ সমাধান হইবে।

* * * *

'বরিশাল হিতৈষীর' মন্তব্য—"পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান অত্যন্ত গরীব। তাহাদের বাসগৃহ, তাহাদের পরিধেয়, তাহাদের বিছানা, তাহাদের আহার্য্য, তাহাদের আসবাব, থালা-বাসন, লেপ-কাঁথার অবস্থা দেখিলে যে কোনও মানুষের হৃদয় গলিবার কথা। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি, নেতৃবর্গের দৃষ্টি সেদিকে পতিতই হয় না। একমাত্র মৌলবী ফজলল হক সব কথা জানেন—তাই তিনি "ডাল-ভাতের" বন্দোবস্ত করিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন। জনাব খালিক-জ্জমান বা ইৎফিকারউদ্দিন বা ছোরাওয়ার্দ্দী এ বিষয় কিছুই জানেন না বা জানিতে চেষ্টা করেন না। ইহাদের আয় এবং আয়ের পন্থা অতি সঙ্কীর্ণ। পিতৃ-পিতামহদের আমলের জায়গা-জমি ভাগ হইতে হইতে এখন এক বিঘা আধ বিঘায় পরিণত হইয়াছে।" পূর্ব্ব-পাকিস্তানে বাঙালী মুসলমান সকল অভাবজনিত সকল কষ্ট আশা করি হাসিমুখে সহ্য করিতেছেন! হক্ সাহেব বৃথা আক্ষেপ করিতে গিয়া ঠোক্কর খাইয়া এখন চুপ মারিয়া বসিয়া আছেন! কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, 'বরিশাল হিতৈষী' মুসলমানের পক্ষ লইয়া কোন কথা বলিতে পারেন কি না?

* * * *

'যুগান্তর' সম্পাদক বলিতেছেন : "........সম্প্রতি রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বুদ্ধি একেবারে দূরীভূত হয় নাই। এই কারণেই আমাদের মনে হয়, একটি ঘটনা দ্বারাই ইহার উপসংহার হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বর্ত্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে যাহাতে কোনরূপ অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিতে না পারে, সে জন্য ক্ষুদ্রতম সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি কিংবা দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারও কঠোর ভাবে দমনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সামান্য অশান্তি সৃষ্টির জন্যও যে বা যাহারা দায়ী মনে হইবে, তাহাদিগকে কি পাকিস্তানে, কি ভারতীয় ইউনিয়নে কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। এই ধরণের ব্যাপারে ক্ষমা কিংবা উদারতার ক্ষীণ প্রশ্রয় দেওয়া হইলেও উহা রাষ্ট্রজীবন এক দিন অচল করিয়া তুলিবে। হরেন ঘোষের হত্যাকারী আইনের দণ্ড লাভ করিয়াছে। কিন্তু হত্যাকারী হইয়াও যাহারা অবাধ বিচরণের সুযোগ পাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কে সাবধান! চোর-জুয়াচোরের ন্যায় হয়তো তাহারাও নিকটেই রহিয়াছে।" সত্য কথা। সাবধানতার প্রয়োজন আছে।

'বর্দ্ধমানের কথা' বলিতেছেন: "জেলাবোর্ড সংক্রান্ত কয়েকটি পত্র গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি গুরুতর' রাস্তা মেরামতের জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ হয় তাহা খরচ হয় না—কণ্ট্রাক্টার চুক্তিমত কাজ না করিলে যেন-তেন প্রকারে সারিয়া দিয়া বিল দাখিল করিয়া টাকা আদায় করিয়া লয়। মজার কথা, রোড-সরকার কাজ তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন এবং কাজ হইয়া গেলে ওভারসিয়ার তাহা ঠিকই হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া দেন। ব্যবস্থা ঠিকই আছে তবুও জনসাধারণের অর্থ জনসাধারণের কাজে ব্যয় হয় না ইহা ভাবিবার কথা। আমরা মনে করি, পত্রোল্লিখিত রাস্তাটি বিশেষজ্ঞ দ্বারা অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়।" কলিকাতা কর্পোরেশনের আদর্শ বাঙ্গলার বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রমাণিত করিয়াছে—এ কথা কে অস্বীকার করিবে ?

* * * *

ভারত সরকারের 'মহাফেজখানার' ডিরেক্টর ডাঃ সুরেন সেন 'পরিভাষা' সম্পর্কে একটি বিবৃতির সঙ্গে কতকগুলি শব্দের তালিকাও প্রেরণ করিয়াছেন। কাজে লাগিতে পারে—এই ভাবিয়া নিম্নে তাহা দেওয়া হইল: "সমগ্র দেশে জনপ্রিয় শব্দ ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। সে শব্দটি পুরাতন হইলেও ক্ষতি নাই। যথা—পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট—কোতোয়ালী বিভাগ, কনেষ্টবল—সিপাহী, হেড কনেষ্টবল—জমাদার, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব ইন্‌সপেক্টর অফ পুলিশ—নায়েব দারোগা; সাব-ইন্‌সপেক্টর—দারোগা, ইন্‌সপেক্টর—সর দারোগা (এখানে 'পরিদর্শক' ঠিক হইবে না) 'ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ—নায়েব কোতোয়াল, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ—সহকারী কোতোয়াল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ—কোতোয়াল; এ্যাডিশন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—অতিরিক্ত কোতোয়াল, ইন্‌সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ—সব কোতোয়াল, ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর জেনারেল—নায়েব সর কোতোয়াল। 'ডিপার্টমেণ্ট অফ পোষ্টস্ এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফস'র পরিভাষা "প্রাদেশিক পেয়াধিকারিক" আমার কাছে নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। সব প্রদেশেই উহা ডাক ও তার বিভাগরূপে প্রচলিত আছে। ডাক ও তার বিভাগের অন্যান্য শব্দ সম্পর্কে:—রাণার—ডাক-হরকরা; পোষ্ট অফিস—ডাক ঘর: পোষ্টাল পিওন—ডাক পিয়াদা বা ডাকওয়ালা; পোষ্ট মাষ্টার—ডাক সরকার; ওভারসীয়ার—তদারককার (অবশ্য যদি বর্ত্তমান চালু শব্দ গ্রাহ্য না হয়), ইন্‌সপেক্টার—পরিদর্শক; টেলিগ্রাফ অফিসার—তার কর্ম্মচারী, টেলিগ্রাফ মাষ্টার—তার সরকার, টেলিগ্রাফ অফিস—তার ঘর; টেলিগ্রাফ পিওন—তার পিয়াদা বা তারওয়ালা; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পোষ্টস এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ্‌স—দপ্তরদার, ডাক ও তার; প্রেসিডেন্সি পোষ্ট মাষ্টার—সদর ডাক সরকার; পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল—প্রধান ডাক সরকার; ডিরেক্টার জেনারেল পোষ্টস এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফস—মুখ্যাধিকারী, ডাক ও তার বিভাগ; পার্শেল পোষ্ট—বাঙ্গী ডাক [পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত ছিল]; পোষ্টাল অর্ডার—ডাকহুণ্ডী; মনিঅর্ডার—নগদ চালান; ভ্যালু পে-এব্‌ল—দাম আদায়ী। মহকুমা, জেলা, বিভাগ, প্রকেশ বা প্রান্ত দীর্ঘ দিন ধরিয়া প্রচলিত আছে। কাজেই রাখিতে কোন বাধা নাই। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিতগুলিও গ্রহণ করা যায়। সাব ডিভিশন্যাল অফিসার—মহকুমাপাল: ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যাণ্ড কালেক্টার—জেলাপাল; ডিভিশন্যাল কমিশনার—বিভাগপাল; গবর্ণর—প্রান্ত বা প্রদেশপাল গবর্ণর জেনারেল—রাষ্ট্রপাল। মন্ত্রী, সচিব ও অমাত্য, এই ৩টি শব্দের ব্যুৎপত্তি বিভিন্ন হইলেও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এই অর্থে 'মন্ত্রী' শব্দটির ব্যবহার অধিক প্রচলিত। সুতরাং মন্ত্রিদের 'সেক্রেটারী'র পরিভাষা আমরা 'সচিব' করিতে পারি! তবে 'সেক্রেটারী'র পরিভাষা অন্যত্র অন্য রকমও হইতে পারে। শাসন বিভাগের বিভিন্ন শব্দের পরিভাষা হইবে:—সেক্রেটারী—সচিব; চীফ সেক্রেটারী—মুখ্য সচিব; সেক্রেটারী ফিন্যান্স ডিপার্টমেণ্ট—সচিব, রাজস্ব বিভাগ; এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী—অতিরিক্ত সচিব; জয়েণ্ট সেক্রেটারী—সহযোগী সচিব; ডেপুটি সেক্রেটারী—নায়েব সচিব; আণ্ডার সেক্রেটারী—উপসচিব; এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী—সহকারী সচিব; প্রাইভেট সেক্রেটারী—খাস মুন্সী; রেজিষ্ট্রার—দপ্তরদার; এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট—আমলা; এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট-ইন্‌চার্জ—ভারপ্রাপ্ত আমলা; ক্লার্ক—মুহুরী; টাইপিষ্ট—টাইপ মুহুরী। বিচার বিভাগ সম্পর্কে:—কোর্ট—আদালত; হাইকোর্ট—বড় বা প্রধান আদালত; স্মল কজেস কোর্ট—ছোট আদালত; ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট—জেলা আদালত; মুন্সেফ কোর্ট—মুন্সেফী আদালত; সিভিল কোর্ট—দেওয়ানী আদালত; ক্রিমিন্যাল কোর্ট—ফৌজদারী আদালত; মুন্সিফ—মুন্সেফ; সাব-জজ—সর, মুন্সেফ বা বিচারক; ডিষ্ট্রিক্ট জজ—জেলা আদালতের বিচারপতি; জজ স্মল কজ কোর্ট—ছোট আদালতের বিচারপতি; জজ হাইকোর্ট—ন্যায়াধীশ; চীফ জাষ্টিস—মুখ্য ন্যায়াধীশ। একাউণ্টস বিভাগ সম্পর্কে:—একাউণ্ট্যাণ্ট—হিসাবনবীশ; একাউণ্টস ক্লার্ক—হিসাব মুহুরী; একাউণ্টস অফিসার—হিসাব কর্ম্মচারী; একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল—মুখ্য হিসাবনবীশ; ডেপুটি একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল—নায়েক মুখ্য হিসাবনবীশ; এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল—সহকারী মুখ্য হিসাবনবীশ।"

[২৭২ পৃষ্ঠার পর]

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে মাটির কলসী, তারে ঝোলানো টিন বা লোহার পাত্রে জল ভরে চলে যায়। রসময় বাবুর মেজ ছেলে গজেন কিছু দিন থেকে নানীর ছেলের বৌটির দিকে একটু নজর দিচ্ছিল, অন্য কোন বাছ-বিচার ক'রে নয়, বৌটির ছিপছিপে সুন্দর চেহারার জন্যই। বৌটির নাম পরীবানু, বাপের বাড়ী বরিশাল জেলায়। নানীও বরিশাল থেকেই অল্প বয়সে স্বামীর সঙ্গে প্রথম কলকাতা এসেছিল। পরীবানুকে কেন, তার বাপ-মাকেও নানী চোখে ছাখেনি, ছেলের বিয়ের সময় সে শুধু ভেবেছিল, ও-বাড়ীতে মেয়ে যদি থাকে সে খাপসুরৎ হবে। সেই ভাবনার ফলে পরীবানু সায়েব-ফার্মের আপিসের দপ্তরী নাজিমের বৌ হয়ে কলকাতার বস্তিতে এসেছে। এই ক'বছরে ওদিকে জোতদার যুদ্ধ-মন্বন্তরের কল্যাণে পরীবানুর বাপ-চাচারাও ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরে পরিণত হয়েছে, চাষের সময় ছাড়া গাঁ ছেড়ে সদর সহরের বস্তিতে গিয়ে ডেরা বেঁধেছে খেটে খেয়ে মরবার জন্য।

তার দুঃখের কাহিনীর অঙ্গ হিসাবেই নানী এ সব শোনায়, তার দুঃখের কিন্তু হদিস মেলে না ছু'-একটা স্পষ্ট হা-হুতাশ ছাড়া। অন্যকে তার অবস্থা বুঝে দুঃখটা অনুমান ক'রে নেবার বরাত দিয়েই সে যেন খুসী।

তা, পরীবানু বাড়ীর সামনের কলে আসে না বলে ডিম-মুরগী কেনার ছলে গজেন বুঝি ছু'-এক বার বস্তিতে তাদের ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত আনা-গোনা করেছিল। নাজিম বৌ নিয়ে আরও উত্তরের বড় বস্তিটায় উঠে যাচ্ছে। এ বস্তিটা ছোট, প্রায় চারি দিকেই হিন্দু। মীরবাগান বস্তিতে শুধু বস্তিবাসী গরীব মুসলমানের সংখ্যার ভরসাই পাবে না, সংলগ্ন অবস্থাপন্ন ক্ষমতাশালী মুসলিম-পাড়ার রক্ষণাবেক্ষণও মিলবে। গজেনের অবশ্য এটা নিছক চ্যাংড়ামি, প্রশ্রয় না পেলে তার বেশী এগোবার সাহস তার হবে না, সে সাধ্যও নেই। হিংসায় যতই বিষিয়ে থাক মানুষের মন, গজেন জানে, বাড়াবাড়ি করতে গেলে বৌটি জাতে মুসলমান বলেই পাড়ার লোকে তার অন্যায় বরদাস্ত করবে না, সে ঠেঙ্গানি খাবে। একটা ফিঁচকে ছোঁড়ার ফিচলেমির জন্য বস্তি ছেড়ে পালাবার দরকার ছিল না। এই কথাটা নীলিমা নানীকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে। হিন্দু বলে একটা বজ্জাত ছেলের ভয়ে একটি গরীব মুসলমান-পরিবার ঘর-বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র উঠে যাবে এটা ভাবতেও তার গা-জ্বালা করছিল!

নানী সায় দেয়, বাঁকা পিঠ একটু সোজা ক'রে শান্ত-স্তিমিত চোখে তাকায়, বলে, নাতনি লো, ও ছোঁড়াটা করত কি? মোর যোয়ান ছেলে কি ও ছোঁড়াটাকে ডরায়?

যে ছেলে ডেকে জিজ্ঞাসা করে না তার গর্ব্বেই বুড়ী যেন লাঠির ভর ছেড়ে আরেকটু সিধে হয়ে দাঁড়ায়। না, ওই ভয় নাজিমের স্থানত্যাগের কারণ নয়, কথাটা অন্য রকম। সময় বড় খারাপ, মন-মেজাজ বড় বিগড়ে আছে মানুষের, মাথাগুলি সব বেঠিক। আগে যা হ'ত তুচ্ছ ব্যাপার, সামান্য হাঙ্গামা, ছু'-চার জনের বেশী লোকে টেরও পেত না কি ঘটছে না ঘটেছে, আজ হয়তো তাই থেকেই সাংঘাতিক কাণ্ড দাঁড়িয়ে যাবে। কোন্ ব্যাপার কি দাঁড়াবে কে বলতে পারে? নানী পারে না, নীলিমা কি পারে? বুঝি নীলিমার ঠাকুর নানীর আল্লাও পারে না! তাই এই সাবধানতা। নয়তো বজ্জাতের কি জাত থাকে না বস্তির গরীব ঝি-বৌদের বজ্জাতের নজর গায়ে না মেখে বা তাদের চ্যাংড়ামির চেষ্টা না ঠেকিয়ে দিন গুজরাণ হয়?

তা ঠিক নানী। তুমি ঠিক বলেছ।

কত না জানি বয়স হয়েছে নানীর, কবরের শেষ সমাপ্তির আবেশ কতখানি না জানি অবসন্ন অবশ করে এনেছে তার মাথার ভিতরটা, তবু সুদীর্ঘ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতায় পুষ্ট তার বাস্তব বুদ্ধি আজও বিহ্বল হয়নি। কত সুস্থ সবল বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষের মতামত কত অল্পে গুলিয়ে যায়, জীবনে কখনো সহজ বিচার-বিবেচনা খোলে না—ঘুঁটে-বেচা নানীর নিজের স্পষ্ট মত আছে, তলিয়ে বোঝার বুদ্ধি আছে। হয়তো ঘুঁটে বেচে খায় বলে, এই বয়সেও খেটে খাওয়ার বিরাম হয়নি বলে। মোটা নিয়ম মোটা কৌশল ভুলে গেলে এ লড়াই চালাবে কিসে?

বেদম বেখাপ্পা লড়াই। রেশন কার্ড হাতেই ছিল, এ বাড়ীর দরজায় সরস্বতীর কাছে ঘুঁটের দাম পেয়ে নানী যাদুগোপালের ওই রেশনখানার দোকানে ধন্না দেয়। মানুষ এ দোকানে লাইন দেয় না, কারণ যাদুগোপাল কার্ডগুলিকেই লাইন দেওয়ায়, কোন দিন পাশাপাশি কোন দিন উপরে-নীচে সাজায়। এতে একটা সুবিধা আছে, কার্ড বেছে খাতিরের লোককে আগে রেশন দেওয়া চলে। কিউ দিয়ে দাঁড়ালে অতিশয় মানী ব্যক্তিরও লাইন ভেঙ্গে আগে রেশন লেখানো মুস্কিল হয়—সমস্ত লাইনটা হৈ-হৈ ক'রে ওঠে। কার্ড সাজিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে আগে পরের নিয়ম রাখাও যায়, খুসীমত ভাঙ্গাও যায়।

ভীড় থেকে হয়তো ক্রুদ্ধ মন্তব্য আসে: আমরা ওর আগে এসেছি মশাই! যাদুগোপাল জবাব দেয়: উনি আগে কার্ড জমা দিয়ে গিয়েছিলেন দাদা!

লাইনের অভাবে নিয়মভঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় রাগ চেপে ভিড়ের মানুষটি চুপ ক'রে যায়। যাদুগোপাল এবং তার রসিদ লেখা কলমচিটি গ্রাহ্যও করে না। ছু'-এক জন সাধারণ মানুষের রাগ বিরক্তি প্রতিবাদ অতি তুচ্ছ। সাধারণ ভাবেই সমস্ত ভীড়টা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত—আজকাল ভিড় মানেই তাই, যেখানেই দশটা লোক জমা হবে সেখানেই উষ্ণ নিশ্বাস। বাজে কোন লোক যদি বেশী গোলমাল করে, যদি দাবী করে যে কে কবে কার্ড জমা দিয়ে হাওয়া খেতে গেছে তা তারা জানে না, আগে পরে যেমন যেমন মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছে সেই নিয়মে রেশন দিতে হবে—তাকে চিনে রাখে যাদুগোপাল।

তার পালা এলে কার্ডে তার কত যে খুঁত বার হয়—সে আটা না ভাতখোর সে ছাপ পড়েনি, ভাঁজ করে রেখে রেখে কার্ড ছিঁড়ে সিগারেট প্যাকেটের স্বচ্ছ মোড়কের কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে নম্বর পড়তে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে, এখানে সই বা টিপসই পড়েনি, ওখানে হপ্তার নম্বর ঠিকমত কাটা হয়নি! অথবা সোজাসুজি: রেজিষ্ট্রী খাতার সঙ্গে কার্ড মিলিয়ে দেখতে হবে, দেরী হবে রেশন পেতে।

হয়রাণ করার আরও আইনসঙ্গত উপায় আছে। জিনিষের মোট দাম হয়েছে এক টাকা তের আনা এক পয়সা। সে হয়তো একটা দু'টাকার নোট বাড়িয়ে দেয়।

গম্ভীর মুখে বলা হয়, চেঞ্জ নেই?

নোট ভাঙ্গিয়ে সে চেঞ্জ আনতে যায়। যে নিয়মভঙ্গের জন্য সে গোলমাল করেছিল সেই নিয়ম অনুসারেই দোকান থেকে চলে যাবার জন্য পালা পড়ে উপস্থিত সবার শেষে!

তুমিই তো বললে বাবা দোকান ছেড়ে গেলে চলবে না, যেমন আসবে তেমনি পাবে। তুমিই এখন উল্টো গাইছ?

বস্তিবাসীর সঙ্গে গা ঘেঁষে চাকুরে বাবুরাও দাঁড়িয়েছে, কয়েক জন ভদ্রমহিলাকেও দেখা যায়। আগে হয়তো কারো কারো চাকর বামুনেই বাজার-হাট করত, থলি হাতে আজ নিজেকেই আসরে নামতে হয়েছে—উঁচু থেকে পতনের ধাক্কা এ-সব উঁচু-তাকানেদেরই লেগেছে বেশী। এরাই একটু গা বাঁচিয়ে চলে, একটু সম্মান-সুবিধা খোঁজে যাদুগোপালের কাছে। আব্দার করে!

রাজেন বাবু বলে, আজ একটু তাড়াতাড়ি পেলে হত, আরেকটা জরুরী কাজ সেরে আফিস যেতে হবে।

কি করি বলুন।

আহা, সবাইকে বলে-কয়েই নিচ্ছি। বলে-কয়ে আমি আগে নিলে কেউ আপত্তি করবে না। আপিস আছে—

ভূষণ বলে, সবাই কাজে যাবে বাবু। আপিস সবারি আছে।

রুক্ষ চুলে খোঁচা-খোঁচা দাড়ী বোতামহীন ছেঁড়া সার্ট খালি পা—ভূষণেরও না কি আপিস আছে! সবার মনের কথাই সে মুখ ফুটে বলেছে, সকলের নিঃশব্দ সমর্থন মুখের নির্ব্বিকার কঠোর ভাবে ফুটে থাকে। কি বলেছে ভূষণ, কিসে এমন নিষ্ঠুর ভাবে সায় দিয়েছে দশ জনে? ভূষণ বলেছে, ও অমায়িক মধুর বচনে আর চিঁড়ে ভেজে না গো। সকলে মুখের ভাবে তিরস্কার জানিয়েছে, কত কাল চুকে-বুকে মাঠে মারা গেছে, আবার এ-সব ভাঁওতা কেন? তুমি কে যে তোমার তাগিদ সবার চেয়ে এত বেশী, মিষ্টি কথায় অনুমতি চাইছ জানিয়ে দিলে সেই খাতিরে আমরা গলে যাব!

নানীর কথা ভিন্ন। সে অন্য ভাবে দাবী জানায় এবং সবাই হাসিমুখে তার দাবী মেনে নেয়। ভিড়ের ফাঁক খুঁজে গলিয়ে ভিতরের দিকে যেতে-যেতে নানী বুকনি সুরু করে, চাল আটা মেপে কাপড়ে বেঁধে বিদায় হওয়ার আগে আর থামে না। তার অর্দ্ধেক কথা সকলের সঙ্গে, অর্দ্ধেক আপন-মনে এলোমেলো কথা।—নাতনিরা সব ভাল আছছ? আহা হা, বড় কষ্ট ভাল থাকা, কোন দিকে কিছু ঠিক নাই, সব গণ্ডগোল। আল্লায় নেয় না, গিয়াও তোমাগো মধ্যে খুঁটি গাইড়া আছি, তোমাগো ভালাই আমার ভালা, আমার আবার ভাল-মন্দ কি!—

রেশন নেবে না কি নানী?

হ, পোড়া পেট মানে না। নিজের রেশন নিজেই নিমু, নিজেই রাঁধুম, পোড়া পেটের সেবা করুম।

নাও, তুমি আগে নাও।

এই থুরথুরে নড়বড়ে বুড়ী নিজের চেষ্টায় বেঁচে আছে আজকের দিনে এ যেন সকলের আনন্দ, সকলের গৌরব! সহরের জীবনকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে মরণের বজ্র আঁটুনির যেন ফস্কা গিরো এই বুড়ী, শুধু টিকে থেকে একাই সে যেন ফাঁস করে দিচ্ছে মরণের বিরাট বড়যন্ত্রের আসল ফাঁকি! ইংরেজ লীগ কংগ্রেস চোরাবাজার গুণ্ডা সব কিছুকে তুড়ি দিয়ে চিরজীবি মানুষের এই গত শতকের লোল চামড়া বাঁকা পিঠ সোণালী পাটের মুকুট-পরা কনে দিব্যি টিকে আছে। বস্তির দিদিমা, কেরাণী-পাড়ার দিদিমা, যারা খেটে খায় তাদের খাটুনে ঘুঁটে-কুড়োনী দিদিমা। কে হিন্দু, কে মুসলমান!

নানীর ক'ছটাক আটা চাল ওজন হতে হতে সিল্কের অত্যধিক লম্বা বেখাপ্পা পাঞ্জাবী-পরা প্রৌঢ় বয়সী অমকালো একটা মানুষ আসে। এক কালে শক্ত জোয়ালো মানানসই চেহারা ছিল, এখন একটু নরম হয়ে মুটিয়ে যাওয়ায় বেঁটে-খেটে দেখায়, ছটাক মাপা আটা চাল তিন টাকা সের মাছ-মাংসের যুগে সহরের রাজপথে ছড়ি হাতে ছোটলোক জমিদারী সাজপোষাক চেহারা ও চাল-চলনে গুণ্ডা মনে হয়। চুলের টেরি থেকে পায়ের পাম্প-সু পর্য্যন্ত শান্ত-সমাহিত ভাবটাই সেকেলে রাজসাহী বাদসাহী প্রশান্ত উদার অত্যাচারের উগ্র হিংসাত্মক নকল। লোকটি সত্যই রাজা এবং তার প্রতাপও প্রচণ্ড—সে সহরের এই অঞ্চলের খ্যাতনামা গুণ্ডারাজ সুবোধকুমার সিংহ।

যাদুগোপাল, আজ আটা চাই যে?

পাবেন। কার্ডগুলো পাঠিয়ে দেবেন।

সুবোধ সিংহ একা মানুষ, তার বিয়ে-করা বৌও নেই, আইন-সঙ্গত বাচ্চা-কাচ্চাও নেই। তার তেত্রিশখানা রেশন কার্ড। সাথী-অনুগতদের সে একশোর উপর বাড়তি কার্ড বিতরণ করেছে। প্রত্যেকটি কার্ড রেজেষ্ট্রী করা।

সবাই চুপ ক'রে আছে, কেউ আড়চোখে তাকায়। সুবোধ একটা সিগারেট ধরায় আমেরিকান সিগারেট-লাইটার থেকে। এ ভাবে রেশন-শপে সে আসে না, আসার কোন মানেও নেই। এ যেন কোন উচ্চপদস্থ মিলিটারী, পুলিশ কর্মচারী বা কোন মন্ত্রীর পায়ে হেঁটে রেশনের দোকানে খামখেয়ালী আগমন।

গজেন বলে, কেমন আছেন সুবোধ বাবু?

আছি। চলে যাচ্ছে।

ন্যাকড়ায় বাঁধতে গিয়ে নানীর কিছু আটা পড়ে গিয়েছিল, তুলে লাভ নেই, সঙ্গে ধুলো-বালিও উঠবে। নানী আপন-মনে বলে, যাক, যাক। কাউয়া খাইবো, পিপড়া খাইবো!

মুখ তুলে সুবোধকে বলে, কেমন আছ?

সুবোধ বলে, আছি ভাল।

ভালই আছ? আল্লা!

সিগারেটে জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুবোধ বলে, তোমার ছেলের বৌ না কি ভেগেছে নানী? কার সঙ্গে ভাগল?

কি নিষ্ঠুর, কি কদর্য্য রসিকতা!

বৌ? বৌ বড় ভাল।—নানী কখনো খাঁটি বরিশালী, কখনো খাঁটি কলকাতায়ী, কখনো মেশাল ভাষায় কথা কয়। এখন তার সুর টান কথা সব কলকাতার। ওটা কি কথা বলছ? তুমি আমার নাতি, আমার ছেলের বৌ তোমার মা। তোমার মা ভাগবে কেন, কার সঙ্গে ভাগবে?

কয়েক জন হেসে ওঠে। সুবোধ ছড়ি ঘুরিয়ে নিঃশব্দে চলে যায়। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকিয়েও যায় না। বাজে গুণ্ডা হলে হয়তো বিব্রত বোধ করত, চটে উঠত, মুখে কিছু না বললেও অন্ততঃ ক্রুদ্ধ হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শাসিয়ে যেত। অথবা হয়তো নিজেও হেসে উঠে হাল্কা করে দিত অপমানটা। কিন্তু সুবোধ রাজা, বড়-বড় লোক তাকে খাতির করে, গভর্ণমেন্ট তাকে ভুলেও ছোঁয় না। উপযুক্ত গুণ ছাড়া এ পদমর্য্যাদা পাওয়া বা রাখা সম্ভব নয়। বেকুফ বনলেও আরও বেকুফ বনার লোভ যে সামলাতে পারে।

ভূষণ তারিফ করে বলে, বেশ বলেছ নানী, ঠিক বলেছ। জোর গলায় বলে, যেতে-যেতে সুবোধও যাতে শুনতে পায়।

পয়সা দিয়ে ছটাক মাপা খাদ্য নিয়ে নিয়ে কৃতার্থ হয়ে একে একে বিদায় নেয় ক্ষুব্ধ ক্ষুধার্ত মেয়ে-পুরুষ। ন'টা বাজে, আপিসের কাজ

অপেক্ষা ক'রে আছে, জরুরী কাজ, সম্পন্ন করতেই হবে। ভোরে যে কারখানার কাজ চালু হয়েছে ভোরেই সেখানে চলে গেছে কাজ-করার মানুষ, ধর্মঘট লক আউটে বন্ধ কারখানাগুলি ছাড়া। কোন কোন আপিস, কোন কোন কারখানা দশটায়, এগারোটায় খোলে। সাবান, লজেন্স, পাউডার, মাইকা, হ্যাণ্ডমেড পেপারের ছুটকো কারখানা, টাইম-সিফ্‌টের নিয়ম-কানুন এড়াবার এই কৌশল খাটায়। কাজ আরম্ভ করতে দশটা-এগারটা বাজায়, রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত এক সিফ্‌টে কাজ চলে! ওভারটাইমের বালাই নেই।

এগারোটা নাগাদ দোকান ফাঁকা হয়ে যায় যাদুগোপালের। তেল নুণ ডাল মশলার খদ্দের দু'-চার জন আসে যায়। টুন-টুন ঘণ্টা বাজিয়ে রিক্‌সা চলে, বড় রাস্তায় মাঝে-মাঝে ট্রামের আওয়াজ শোনা যায়। ধর্মঘটের সময় ট্রামের লাইনে মর্চে ধরেছিল, ধুলো-বালি আবর্জ্জনায় প্রায় বুজে গিয়েছিল ইস্পাতের খাদ। ট্রামের চাকা যখন বন্ধ ছিল তখন বন্ধই ছিল। আবার যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন চলতেই থাকবে।

দিগন্ত কাঁপিয়ে মিলিটারী ট্রাক যায়। দোকানের সামনে দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে রিক্‌সা গেলেও খানিকক্ষণ যেন নূপুর-ধ্বনির মত সেই মধুর টুংটাং শব্দ কাণেই পশে না।

রেশনের দোকান থেকে কেউ যায় বাজারে, কেউ যায় বাড়ী। বাজারে দু'-চার জন মাত্র যায়, নানীর মত যাদের আপিস নেই বা ভূষণের মত যাদের রেশন নেওয়া বাজার করাই কাজের অঙ্গ বা গজেনের মত যারা বেকার। আপিসগামী লোক সকাল সকাল বাজার না সেরে রেশন দোকানে ধন্না দেওয়ায় ধরা দেয় না—রেশন মেলার পর আর কোন দিকে দৃক্‌পাতের অবসর থাকে না। ঘড়ির কাঁটা যেন বুকের কাঁটা হয়ে চলেই চলে।

বাজারে দু'পয়সার পুঁই কেনে নানী দু'পয়সায় এক ছটাক কুঁচো চিংড়ি। কুঁচো চিংড়ি, একটু গন্ধ ছেড়েছে, তারও দেড় টাকা সের। বাস্, ওতেই নানীর বাজার খতম। ঘরে দু'টো পেঁয়াজ আছে, শিশিতে একটু তেল আছে, ভাঁড়ে নুণ আছে। একরত্তি উনানে কাঠির মত সরু করে চেরা কাঠ জ্বেলে নানী অন্ন প্রস্তুত করবে। আজকের দিনটিতেও নানীর অন্ন জুটল।

উলঙ্গ ছেলে-মেয়েরা বস্তির নোংরা মাটি-আবর্জ্জনার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গের মিতালি করে খেলা করছে। জল আনার যুদ্ধ শেষ হওয়ায় মেয়েরা এখন ঘরের কাজে মন দিয়েছে—

আল্লা, নানীর জল তোলা হয়নি! ঘরে এক ফোঁটা জল নেই। চোখ দু'টি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আসে, মাথা নেড়ে-নেড়ে নানী যেন নিজের চিন্তায় সায় দেয়। হুঁ, বড় রাস্তার টিউব ওয়েল থেকে গিয়ে জল আনতে হবে। জল তোলা বাকী পড়েছে, জল আনতে হবেই।

রেশন আনা নিয়েই মণির সঙ্গে নীলিমার কলহ হয়ে গেছে। গত রাত্রেই চাল আটা সব ফুরিয়েছে। রাত জেগে মণি শুধু ভেবেছে যে পরদিন সকালে কি উপায় হবে, বাড়ীর এতগুলি মানুষ কি খাবে!

তুমি কি মানুষ, নিশ্চিন্তি মনে নাক ডাকাচ্ছো?

সুশীল চমকে জেগে বলেছে, কি হল?

কি হল? আমায় বলে দিতে হবে, কি হল? অন্যের ঘাড়ে এসে চেপে ঝিমুচ্ছো, ঘুমুচ্ছো, তুমি কি গো! আমার মরণ হয় না!

সুশীল ভয়ে ভয়ে বলে, কি করতে হবে না বললে—

যতীন বাবুর সঙ্গে না তোমার আলাপ আছে?

ক্লাশ-ফ্রেণ্ড ছিল এক কালে, এই আর কি!

কাল ভোরে উঠে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে চালের যোগাড় করবে। শুধু অন্যের ঘাড়ে খেয়ে নাক ডাকালেই চলবে? আমি কিন্তু গলায় দড়ি দেব বলে রাখলাম!

আবছা আবছা রাত থাকতে মণি সুশীলকে ঠেলে তুলে দেয়, রাত্রে সে ঘুমিয়েছে কি না সন্দেহ। জামা পরে সুশীল পাড়ার সরকারী পার্কটার দক্ষিণে প্রায় পার্কের মতই বাগানওলা যতীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর সদর গেটে হাজির হয়। সেই কবে যতীন তার ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল, সে প্রায় ঐতিহাসিক ব্যাপার! মণির তাগাদায় সে মাঝে-মাঝে চেষ্টা ক'রে যতীনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে, যতীন কোন দিন তাতে খুসী হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আবার সেই যতীনের দরজাতেই তাকে মাথা খুঁড়তে হবে—মণির হুকুমে!

বাগানের গেটে তালা চাবি নেই, হুড়কোও নেই। স্পর্শ করতেই লোহার তৈলাক্ত গেট নিঃশব্দে খুলে যায়। বাগানে অবশ্য লাউ-কুমড়া-ঝিঙা-বেগুনের চিহ্নও নেই, শুধু মরসুমী বিলাতী ফুল। ফুল নিয়ে চোর কি করবে, লোহার গেট খুলে রাখলেও তাই এ বাগানে চোর ঢোকে না।

বাড়ীর দরজার সামনে নুড়ি-বিছানো ছোট্ট পথ, দু'পাশে দু'টি লোহার বেঞ্চি। একটা বেঞ্চিতে বসে মন খারাপ করে সুশীল নানা কথা ভাবে, মাঝে-মাঝে হাই তোলে। মণি যাই বলুক, যতীন তার যতই এক কালের ক্লাশ-ফ্রেণ্ড হোক, চারি দিকে আলো হয়ে রোদ ওঠার আগে যতীনের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার সাহস তার নেই। যতীন বিরক্ত হবে।

বসে বসে সুশীল ভাবে, শেলীর কবিতা যে-ভাবে পড়িয়ে আসছে এগার বছর, তার চেয়ে একটু অন্য-ভাবে পড়ানো যায় না এবার? ইংরেজ কবি ছাড়া জগতে কি আর কবি জন্মায়নি? ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক বলে কি তাকে শুধু ইংরেজ কবিদের ব্যাখ্যা করেই জীবন কাটাতে হবে? ভোরে চালের সন্ধানে বেরিয়ে বন্ধুর বাড়ীর সামনে লনে লোহার বেঞ্চে বসে এই কথা ভাবে সুশীল, তীব্র ক্ষোভে চোখের সামনে সুন্দর ফুলগুলিও দেখতে পায় না। এ কি অসময়ে মনের অবাধ্যতা? মন খারাপ হলেই ক্ষোভে-দুঃখে কাঁটা বনে গড়িয়ে গড়িয়ে এইখানে এসে ঠেকে সুশীল—ইংরেজ কবিদের চিবিয়ে নিজে সে আখের ছোবড়ার মত কাঠ-কাঠ হয়ে গেছে। ছেলেরা কত রস পায়, তার শুধু দাঁতের কনকনানি।

অনেক বেলায় যতীনের সঙ্গে তার দেখা হয়। যতীন প্রথমে তাকে চিনতেই পারে না, পরিচয় দেবার পর বড়ই যেন আশ্চর্য্য হয়ে বলে, ও!

তার পর বলে, কি খপর?

এমনি দেখা করতে এলাম।

যতীন হাসে। এ জগতে কেউ যেন এমনি দেখা করতে আসে তার সঙ্গে, কোন স্বার্থ ছাড়াই। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না যতীনের, স্বার্থের জন্ম মানুষকে সে মন্দ ভাবে না, জগতের সঙ্গে তার

নিজেরও স্বার্থ নিয়েই কারবার। সুশীল বিখ্যাত কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শুনে বরং একটু শ্রদ্ধাই যেন তার জাগে, কারণ এই পরিচয়টা শোনার পরেই সে তার জন্য চা আনতে বলে।

তার পর সুশীলের প্রয়োজন শুনে আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কাছে কেউ মণ-দুই চালের ব্যবস্থার জন্য দরবার করতে আসতে পারে ভেবেও তার আমোদের সীমা থাকে না, এ যেন এক ঘটি জলের জন্য সমুদ্রে গমন! সে তবু ছোট-খাট ব্যক্তি, কেউ যদি সত্যই এ রকম দু'মুঠো চালের অনুরোধ নিয়ে স্বয়ং ফাক্তখসানীর কাছে হাজির হয়? ব্যাপারটা কল্পনা করার চেষ্টাতেই যতীনের হাসি আসে। রাশি রাশি ধান-চাল নিয়ে লীলাখেলায় মশগুল হয়ে থাকায় যতীনের খেয়াল থাকে না যে দু'মণ কেন, দু'সের চালের জন্য এই সহরে কত লোক হন্যে হয়ে বেড়ায়, না পেয়ে উপোস দেয়!

শুধু দু'মণ?

সুশীল খুসী ও কৃতার্থ হয়ে বলে, বেশী দিতে পারবে? তা হলে তো ভালই হয়। তিন মণ দাও?

বেশ মজা লাগছিল কিন্তু পুরানো দিনের বন্ধুর সঙ্গে মজা উপভোগের সময় ছিল না। দেখা করার জন্য অনেক লোক অপেক্ষা করছে, কাজ ও দায়িত্ব কোনটারই তার অন্ত নেই। মৃদু হেসে খবরের কাগজের কোণটুকু ছিঁড়ে যতীন জড়ানো দু'টি অক্ষরে নিজের নাম লেখে। মুখে একটা ঠিকানা এবং এক জনের নাম বলে দেয়।

একখানা লরী-চলার মত চওড়া গলি, তার মধ্যে সেকেলে ধাচের পুরানো বাড়ী, যাতে বিশেষ ভাবে আড়াল করা অন্দর-মহল থাকত। দোতলা মস্ত বাড়ী কিন্তু সদর দরজাটি অত্যন্ত ছোট। নীচের তলায় সামনের ঘর আর উঠানে কেরাসিন কাঠের তক্তা আর সমাপ্ত ও অর্দ্ধ-সমাপ্ত প্যাকিং বাক্সের ছড়াছড়ি। কলকাতায় পুরানো দিনের কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর বাড়ীর নীচের তলায় প্যাকিং কেসের কারখানা হয়েছে—এক দিন যেখানে ঝাড়-লণ্ঠন-ফরাসের শোভায় আত্মীয় আশ্রিত চাকর-দারোয়ানের সমাবেশে জীবনের সমারোহ চলত। নাম বলতে পাশেই অনঙ্গভূষণের পার্টিসান-করা ছোট আফিস-ঘরে সুশীলকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরানো একটা রং-ধরা কালচে-মারা মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর খানকয়েক চেয়ার নিয়ে আফিস। মিলিটারী প্যাটার্ণের খাঁকি ট্রাউজার ও সার্ট-পরা বছর ত্রিশ বয়সের স্মার্ট চেহারা অনঙ্গকে এই পরিবেশে বড়ই খাপছাড়া দেখায়।

সুশীলকে অনঙ্গ খাতির করে বসায়। যতীনের ইনিসিয়াল করা ডাক-টিকিটের মত কাগজের টুকরোটি দেখে একটু বিস্মিত হয়েই তাকায়। কিন্তু ও-বিষয়ে কিছু বলে না। দিন-কাল, কংগ্রেস-লীগ সংঘর্ষ, মন্ত্রী মিশন, নোয়াখালি, কলকাতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাধারণ ভাবে আলাপ করে। এই সবই আজ-কাল এ-রকম চলতি আলাপ-আলোচনার বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যত্র ও সর্ব্বত্র চাল-ডাল আটা-ময়দা তেল-নুণ চিনি-কাপড় ও বেতন-মজুরির আলোচনা হয়।

কিছু চালের জন্য এসেছিলাম।

অনঙ্গ মৃদু হেসে বলে, তা জানি। কত চাই?

যতীন বললে মণ তিনেক পাওয়া যাবে?

অনঙ্গ থ' বনে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে। যতীনের চেয়েও সে যেন বেশী আশ্চর্য্য হয়ে গেছে তিন মণ চালের অনুরোধ শুনে। পরক্ষণে তার চোখে-মুখে ঘনিয়ে আসে সন্দেহ-সংশয়ের ছায়া। চালের কারবারের শত্রুপক্ষের চর নয় তো লোকটা?

একটু বসুন।

উপরে গিয়ে যতীনকে টেলিফোন ক'রে মুখভরা কৌতুকের হাসি নিয়ে সে ফিরে আসে, বলে, কিসে নেবেন চাল?

সুশীল কিছুই আনেনি।

এ সমস্যার সমাধান অনঙ্গই ক'রে দেয়। একটা সতরঞ্চিতে চালগুলি এমন কায়দায় বেঁধে দেয় যে দেখে অবিকল বাঁধা বিছানার বাণ্ডিল মনে হয়। একটা রিক্সাও সে-ই আনিয়ে দেয়।

এত কষ্টে যোগাড় করা চাল, দুর্ম্মূল্য দুষ্প্রাপ্য চাল, এ চাল পেয়েও যেন খুসী হল না বাড়ীর লোক, কৃতজ্ঞ হল না মণির কাছে।

নীলিমা যেন মুখ ভার ক'রেই জিজ্ঞাসা করে, কোথা পেলেন এত চাল?

বিব্রত সুশীল বলে, আমার এক জন জানা-শোনা লোক জোগাড় ক'রে দিয়েছে।

—এ ভাবে চাল কেনা ঠিক নয়!

মণি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, কেন, ব্ল্যাক মার্কেট থেকে চাল কেনা হয় না?

নীলিমা বলে, সে আমরা কিনি খোলা ব্ল্যাক মার্কেট থেকে। না খেয়ে তো মরতে পারে না মানুষ? দশ জনে কেনে, আমরাও যেটুকু দরকার কিনি। এ তো তা নয়।

কেন নয়? তফাৎটা কি হল? এক গাদা দাম দিয়ে কিনতে হত, এ চাল বরং কনট্রোলের চেয়ে সস্তা দরে পাওয়া গেছে।

সেটা বুঝি তফাৎ নয়? দশ জনের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে কেনা আর যারা ব্ল্যাক মার্কেট করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে চুপি-চুপি সস্তা দামে যোগাড় করা এক জিনিষ?

মণির আরক্ত মুখ দেখে প্রণব তাড়াতাড়ি বলে, যাক্। অত সূক্ষ্ম তর্কে কাজ নেই। কয়েকটা দিন তো নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে!

[ক্রমশঃ

প্রচ্ছদপট

সম্মুখে অনন্ত আকাশ ও অসীম সমুদ্র দেখে বিস্মিত কে এক জন! এই সংখ্যার প্রচ্ছদের ছবিটি তুলেছেন শ্যামাশঙ্কর মিত্র। গত সংখ্যার প্রচ্ছদের আলোকচিত্র শিল্পীর নাম ভুলক্রমে 'সুশীল' হয়েছে, আসলে 'সুনীল' হবে। আমরা দুঃখিত।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আবার বার্লিন-সঙ্কট—

বার্লিন-সঙ্কট আবার গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই: গত মার্চ্চ মাসে (১৯৪৮) বার্লিন লইয়া যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সাময়িক ভাবে ধামা-চাপা পড়িয়াছিল মাত্র। বার্লিন-সমস্যা প্রকৃত পক্ষে জার্ম্মানী সংক্রান্ত বৃহত্তর সমস্যারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। গত ১৫ই ডিসেম্বর লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আকস্মিক ভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ার মধ্যেই উপ্ত হইয়াছে বার্লিন-সঙ্কটের বীজ। জার্ম্মানী সম্পর্কে বৃহৎ মিত্র রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের একমত হওয়ার আশা এই সম্মেলনের আকস্মিক সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়। অতঃপর গত মার্চ্চ মাসে (১৯৪৮) রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও লণ্ডন সম্মেলনে জার্ম্মানীর মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলত্রয়ে যৌথ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরই বার্লিন-সঙ্কটের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। রাশিয়া উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদস্বরূপ মিত্রশক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধিবেশন হইতে বাহির হইয়া আসে এবং জার্ম্মানীর পশ্চিম অঞ্চলত্রয় হইতে সড়ক এবং রেলপথ বার্লিনে যাতায়াত ও মাল প্রেরণ ব্যবস্থার উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। সর্ব্বপ্রথম বার্লিন-সঙ্কটের সৃষ্টি হয় এইখানেই। অতঃপর জুন মাসের (১৯৪৮) প্রথম সপ্তাহে লণ্ডনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবার্গ এই ছয়রাষ্ট্রের সম্মেলনে জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে ঐক্যমত হইয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার জার্ম্মানী বিভাগ একরূপ অবধারিত হইয়া গেল। যে-টুকু বাকী ছিল তাহাও সম্পূর্ণ হইল জার্ম্মানীর মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়। মার্শাল শোকোলোভস্কি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মানীর পশ্চিম অঞ্চলত্রয়ে নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন 'Completes the division of Germany',—অর্থাৎ জার্ম্মানীর বিভাগকে সম্পূর্ণ করিয়াছে। তাঁহার এই উক্তি যে নিঃসংশয়-রূপে সত্য তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

২০শে জুন (১৯৪৮) জার্ম্মানীর পশ্চিম অঞ্চলত্রয়ে নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে সমগ্র জার্ম্মানীতে মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে আলোচনায় রাশিয়াও যোগদান করিয়াছিল। কম্যাণ্ডাটুরার অধিবেশনে ১৩ ঘণ্টা-ব্যাপী আলোচনার পর ১৬ই জুন রুশ-সদস্যগণ একযোগে অধিবেশন পরিত্যাগ করেন। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রুশ-অধিকৃত জার্ম্মানীর ভাগ্য নির্দ্ধারণের জন্য ওয়ারসতে রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের অপর সাতটি রাষ্ট্রের এক সম্মেলন হয়। জার্ম্মানী সম্পর্কে চতুঃশক্তি চুক্তির জন্য ওয়ারস সম্মেলন পাঁচ দফা সর্ত্ত সম্বলিত এক ইস্তাহার প্রকাশ করে। ওয়াশিংটনের সরকারী মহল এই নূতন প্রস্তাবকে 'a blatant attempt to win over the German people' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

২৩শে জুন (১৯৪৮) হইতে বার্লিনের পশ্চিমাঞ্চল এবং রুশ-অধিকৃত অঞ্চল পরস্পরের মুদ্রাকে নিজ-নিজ অঞ্চলে অচল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ফলে ২৪শে জুন হইতে বার্লিন লইয়া ঠাণ্ডা-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে নূতন করিয়া। বার্লিনের 'পাওয়ার ষ্টেশন' বা বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র রুশ-অধিকৃত বার্লিনে অবস্থিত। ২৪শে জুন প্রাতঃকাল হইতেই বার্লিনের পশ্চিম অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মার্শাল শোকোলোভস্কি ঘোষণা করেন যে, কম্যাণ্ডাটুরার অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে। জার্ম্মানীর পশ্চিম অঞ্চলের সহিত বার্লিনের পশ্চিম অঞ্চলের সংযোগকারী একমাত্র রেলপথও রাশিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ২৫শে জুন হইতে জার্ম্মানীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চল হইতে বার্লিনের মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহও রাশিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। রাশিয়া ২৪শে জুন তারিখে তাহার অধিকৃত জার্ম্মান অঞ্চলে নূতন মুদ্রা প্রচলন করিয়াছে এবং সমগ্র বার্লিনে এই নূতন মুদ্রা প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্পও তাহার আছে। পশ্চিম জার্ম্মানী হইতে জলপথে পশ্চিম বার্লিনের সহিত যে যোগাযোগ ব্যবস্থা তাহাও রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের ভিতর দিয়া। এলব নদীর সেতু মেরামতের অজুহাতে এই জলপথও রাশিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে! ইহার ফলে মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী অধিকৃত বার্লিনের ২৫ লক্ষ অধিবাসী যে ব্যাপক খাদ্য-সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে বৃটেন ও আমেরিকা বিমানযোগে খাদ্য প্রেরণ করিয়া তাহা নিরোধের চেষ্টা করিতেছে! কিন্তু বিমানযোগে খাদ্য প্রেরণ করিয়া এই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্যাভাব দূর করা প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ। প্রচুর ব্যয় করিয়া খাদ্যাভাব নিবারণ করা সম্ভব হইলেও ফ্যাক্টরীগুলির জন্য কাঁচা মাল ও জ্বালানী বিমানযোগে সরবরাহ করা সম্ভব বলিয়া কেহই মনে করে না। বার্লিন লইয়া এই যে ঠাণ্ডা-যুদ্ধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে কোন্ পথে তাহার সমাধান হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সকে হয় বার্লিন পরিত্যাগ করিতে হইবে, না হয় জোড়া-তাড়া দিয়া রাশিয়ার সহিত একটা মীমাংসা করিতে হইবে। সর্ব্বশেষ উপায় সশস্ত্র সংগ্রাম। বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স কোন্ পথ গ্রহণ করিবে ইহাই প্রশ্ন।

বার্লিন পরিত্যাগ করিলে তাহাদের মর্য্যাদা এবং আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, মর্য্যাদা ও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া অপেক্ষাও আর একটা গুরুতর বিষয়ের কথা তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন। বার্লিনের রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের শাসন পরিচালন কার্য্য চালাইতেছে সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টি। এই পার্টি কম্যুনিষ্টদের প্রভাবাধীনে পরিচালিত। কিন্তু বার্লিনের বৃটিশ, মার্কিণ এবং ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইতেছে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দল দ্বারা। বৃটিশ, আমেরিকা এবং ফ্রান্স বার্লিন পরিত্যাগ করিলে সমগ্র বার্লিন সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টির তাঁবে আসিবে। উহার প্রতিক্রিয়া বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের পক্ষে উপেক্ষার বিষয় নয়।

বার্লিন রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে অবস্থিত। পটসডাম চুক্তির বলেই বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স বার্লিনের অংশ পাইয়াছে! নতুবা বার্লিনের কোন অংশ পাওয়ার কোন অধিকার তাহাদের ছিল না। এই চুক্তি অনুসারে জার্ম্মানী যত দিন মিত্রশক্তিবর্গের দখলে থাকিবে তত দিন জার্ম্মানীকে একটি অর্থনৈতিক ইউনিট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে খনি ও শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন, কৃষি, বন এবং মৎস্য বিভাগ, মজুরি, মূল্য এবং রেশনিং ব্যবস্থা, আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থা, মুদ্রা-প্রচলন, ব্যাঙ্কিং, কেন্দ্রীয় শুল্ক এবং বাণিজ্য শুল্ক, ক্ষতিপূরণ এবং যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্পের অপসারণ এবং চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ নীতি গ্রহণের সর্ত্ত ঐ চুক্তিতে আছে। রাশিয়ার অভিযোগ এই যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন প্রথম হইতেই এই সকল সর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়াছে। এই সর্ত্ত লঙ্ঘন চরমে পৌঁছিয়াছে পশ্চিম জার্ম্মানীতে নূতন মুদ্রা প্রবর্ত্তন করায়। রাশিয়ার অভিযোগকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু বার্লিন-সঙ্কট সমাধানের অযোগ্য বলিয়াই মনে হইতেছে। রাশিয়া যে যুদ্ধ চায় না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের ক্ষতি সামলাইয়া উঠিতেই তাহার আজও কম পক্ষে ১ বৎসর লাগিবে। ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধ করাই অসম্ভব। বৃটেন ও আমেরিকাও যুদ্ধ চায় না বলিয়া আমরা শুনিতেছি। আপোষ মীমাংসা অনেকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু আপোষের যে পথ তাঁহারা প্রদর্শন করেন তাহা বৃটেন ও আমেরিকার অধিকতর দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া রাশিয়াকে তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা। কিন্তু ইহা কি অচল অবস্থা সমাধানের সহজ ও সরল পথ? এই পথেও সত্যই সমাধান হইবে কি? যদি না হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে কি? ত্রিশক্তির প্রতিবাদের যে উত্তর রাশিয়া দিয়াছে তাহাতে বার্লিন সমস্যার জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

লণ্ডনে ডক-শ্রমিক ধর্ম্মঘট—

গত জুন মাসে লণ্ডনে ৩০ হাজার ডক-শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট হইয়া গেলে শ্রমিক দল কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর ইহাই দ্বিতীয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট। ১৪ই জুন হইতে এই ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। ভিক্ষ অকসাইড জাহাজে বোঝাই করিতে আপত্তি করায় লণ্ডনের ১১ জন ডক-শ্রমিককে শাস্তি প্রদান করা হইতেই এই ধর্ম্মঘটের উদ্ভব হয়। এই ধর্ম্মঘট বার্কেনহেড এবং লিভারপুলের দশ হাজার শ্রমিকদের মধ্যে পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। গত ৩০শে জুন এই ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই ধর্ম্মঘট ছিল অন অফিশিয়াল অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ ছাড়াই এই ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট কেন ডক-কোম্পানীকে ধর্ম্মঘটীদের দাবী পূরণ করিতে কোন নির্দ্দেশ প্রদান করেন নাই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া মিঃ বেভিন বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ করিলে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে। বিলাতে ট্রেড ইউনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপ স্বৈরতান্ত্রিক এই উক্তি তাহারই পরিচায়ক।

মিঃ ডিউই প্রার্থী নির্ব্বাচিত—

আগামী নবেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবে। এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য রিপাবলিকান দল গবর্ণর টমাস ডিউইকে প্রার্থী নির্ব্বাচিত করিয়াছে। ১৯৪৪ সালের নির্ব্বাচনে ডিউই রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড়াইয়া পরাজিত হন। এক বার যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়াছেন তাঁহাকে দ্বিতীয় বার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নির্ব্বাচন করা রিপাবলিকান ইতিহাসে এই প্রথম। তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সিনেটের রবার্ট ট্যাফট এবং মিঃ ষ্টেসেন। রিপাবলিকান দলে সেনেটর ট্যাফটের সমর্থক মন্দ ছিল না। তিনি প্রাচীনপন্থীদের প্রিয়পাত্র। শ্রমিকবিরোধী ট্যাফট-হার্টলে আইনের তিনি অন্যতম রচয়িতা। শ্রমিক-নেতারা তাঁহাকে পছন্দ করেন না। মিঃ ষ্টেসেনের পক্ষে জনসাধারণের সমর্থন যথেষ্টই ছিল, কিন্তু দলের সমর্থন দৃঢ় ছিল না। কিন্তু মিঃ ডিউইর পক্ষে দলের সমর্থন যেমন ছিল, তেমনি ছিল জনসাধারণের সমর্থন। সমগ্র পৃথিবীতে মার্কিণ নেতৃত্বের তিনি গোঁড়া সমর্থক। ডেমোক্রাটিক পার্টির সম্মেলনে মিঃ হ্যারি ট্রুম্যানের নাম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের প্রার্থিরূপে অনুমোদন করা হইয়াছে।

যুগোশ্লাভ-কমিনফর্ম্ম বিরোধ—

যুগোশ্লাভিয়া এবং কমিনফর্ম্মের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সংবাদে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু বিস্ময়েরই সৃষ্টি হয় নাই, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গোপন আনন্দের একটা পুলক শিহরণও জাগিয়া উঠিয়াছে। কম্যুনিষ্ট সংহতির মধ্যে ফাটল ধরিলে ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলির আনন্দিত হইবার তো কথাই! বস্তুতঃ, গত ২৮শে জুন তারিখে প্রাগ হইতে রয়টার যে সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে কমিনফর্ম্মের ইস্তাহারকে কার্য্যতঃ কমিনফর্ম্ম হইতে যুগোশ্লাভিয়াকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। কমিনফর্ম্মের ইস্তাহারে অবশ্য বহিষ্কারের কথা কিছুই বলা হয় নাই। তথাপি কমিনফর্ম্ম-যুগোশ্লাভ বিরোধের মূল কোথায় এবং এই বিরোধের স্বরূপ কি, তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। যুগোশ্লাভিয়া নয়া গণতন্ত্রের আদর্শ-স্থানীয় বলিয়াই গণ্য হইয়া আসিতেছিল। যুগো-শ্লাভিয়ায় আভ্যন্তরীণ বিরোধ থাকার কথাও আমরা কখনও শুনি নাই। বলকান কম্যুনিষ্টদের মধ্যে মার্শাল জোসেফ টিটোকে শীর্ষ-স্থানীয় বলিয়াই গণ্য করা হইয়া আসিতেছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি তাঁহার মনোভাব বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, এরূপ কথাও এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। বরং জনৈক মার্কিণ সিনেটর মার্শাল টিটোকে 'a red pupet dancing to Joe Stalin's tune' অর্থাৎ জো ষ্টালিনের সুরের তালে তালে নৃত্যপরায়ণ লাল পুতুল বলিয়াই অভিহিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মার্শাল টিটো রাশিয়ার, বিশেষ করিয়া

ষ্ট্যালিনের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়াই সকলে জানে। আজ হঠাৎ তিনি রাশিয়ার অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন কেন? কমিনফর্মের ইস্তাহার বিশ্লেষণ করিয়া এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় কি না প্রথমে তাহাই দেখা আবশ্যক।

কমিনফর্মের ইস্তাহারে যুগোশ্লাভ নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ মার্শাল টিটো এবং তাঁহার তিন জন সহযোগী—কারদেলজী, জিলাস এবং র‍্যাঙ্কোভিসোর বিরুদ্ধে সাত দফা অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গঠিত সমাজতন্ত্রী ফ্রন্টে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শ্রমিকদের আন্তর্জ্জাতিক সংহতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতার দিক্ দিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষা কম অনিষ্টকর, যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ নীরবে এই বুর্জ্জোয়া জাতীয়তাবাদী মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিজকে এবং যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সম্মিলিত কম্যুনিষ্ট ফ্রন্ট তথা কমিনফর্মের বাহিরে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। চতুর্থতঃ, কম্যুনিষ্ট দলের আধিপত্য জোর করিয়া স্থাপন করা আবশ্যক, যুগোশ্লাভ নেতৃবৃন্দ মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং প্রতিবিপ্লবী ট্রটস্কীপন্থীদের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ, যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির ভিতরে ডিক্টেটরশিপ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহার ফলে তাঁহারা নির্ব্বাচন ও আত্মসমালোচনার পথ বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও মনোনীত সদস্যদের লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং কেহ কোন সমালোচনা করিলে তাঁহার উপর নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়। যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযোগ এই যে, যুগোশ্লাভিয়া সোভিয়েট সামরিক বিশেষজ্ঞদিগকে অপদস্থ করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সোভিয়েট অসামরিক বিশেষজ্ঞদিগকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয় এবং তাঁহাদের উপর খবরদারী করে যুগোশ্লাভ নিরাপত্তা পুলিশ। সপ্তম বা সর্ব্বশেষ অভিযোগ এই যে, কমিনফর্মের সাম্প্রতিক সভায় যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্টরা যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই সকল অভিযোগের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা কমিনফর্মের বিরুদ্ধে গুরুতর প্রত্যভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগই তাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন এবং কমিনফর্মের ইস্তাহারকে 'কল্পিত কুৎসা' (invented slander) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টিই যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির বক্তব্য না শুনিয়াই কমিনফর্ম এই সকল অভিযোগ সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা কমিনফর্মের বিরুদ্ধে, অন্যান্য সমস্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে এবং এমন কি সর্ব্বশক্তিমান রুশ পলিট বুরোর (Russian Polit-buro) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের গুরুতর অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গত ২৭শে মার্চ (১৯৪৮) যুগোশ্লাভিয়া ব্যতীত কমিনফর্মের অন্যান্য সকল সদস্যদের নিকটেই এক পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রেই যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা হয়, কিন্তু যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এই অভিযোগের বিষয় জানান হয় নাই এবং পত্রও দেওয়া হয় নাই। ইহার অল্প কাল পরেই হাঙ্গেরীর কেন্দ্রীয় কমিটি যুগোশ্লাভ কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট এবং ইটালী ও ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টি ব্যতীত অন্যান্য কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির কমিনফর্মের বুখারেষ্ট সম্মেলনে যোগদান না করার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যে-ভাবে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠান হইয়াছিল তাহাতে বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা ছিল না, কেবল একতরফা সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল।

যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি যে অত্যন্ত অস্পষ্ট তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কি কি তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এই সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে, সেগুলিকে বাদ দিয়া এইরূপ ব্যাপক ও অস্পষ্ট অভিযোগের কোন অর্থ হয় না। সুতরাং কেহ যদি মনে করে যে, যুগোশ্লাভিয়ার সহিত কমিনফর্মের তথা রাশিয়ার বিরোধের কারণ অন্যত্র সন্ধান করা আবশ্যক, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অনুকূল মতবাদ এবং ট্রটস্কীপন্থী মতবাদ প্রভৃতি একসঙ্গে জড়াইয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা কি সত্যই বিভ্রম সৃষ্টিই করে না? মার্শাল-পরিকল্পনা গ্রহণে টিটোর আগ্রহ থাকার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেলে অবশ্য টিটোর মতবাদকে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অনুকূল বলিয়া অনুমান করা যাইত। কিন্তু গত এক বৎসরে মার্শাল-পরিকল্পনার যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিই গভীর অস্বস্তি অনুভব করিতেছে। এই অবস্থায় মার্শাল টিটো মার্শাল-পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহশীল হইবেন, ইহা অনুমান করা কঠিন। কমিনফর্মের অভিযোগেও এইরূপ কোন আভাষ পাওয়া যায় না। টিটোর নীতি পুঁজিবাদের অনুকূল হওয়ার অভিযোগ খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহার অর্থ কি ইহাই যে, যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে পিপুলস্ ফ্রন্টের প্রাধান্যই বর্ত্তমান? টিটোর কৃষি-নীতি দিয়াই এই প্রশ্নের বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যুগোশ্লাভিয়ায় কম্যুনিষ্ট এবং অ-কম্যুনিষ্ট সকলেই একযোগে কাজ করিতেছে। ইহাকে নয়া গণতন্ত্রের বড় সাফল্য ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? এ কথাও অবশ্য সত্য যে, মার্শাল টিটো পল্লীর কৃষকদের দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন, কিন্তু কম্যুনিষ্ট মতবাদ বিশেষ করিয়া শ্রমিক-সংহতির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। কম্যুনিষ্ট মতবাদে কৃষকের স্থান গৌণ। কিন্তু টিটোর প্রধান সমর্থক পল্লীবাসী কৃষকরাই। কিন্তু ইহাকেই বিরোধের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করা কঠিন। যুগোশ্লাভিয়ায় জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই ত্রিয়েস্ত এবং করিন্থিয়া সম্বন্ধে তাহাদের দাবীর অনমনীয়তার মধ্যে। ত্রিয়েস্ত সম্বন্ধে যুগোশ্লাভিয়ার অনমনীয় দাবীই ইটালীর সাধারণ নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির জয়লাভ না করিবার কারণ বলিয়া ইটালীর কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অভিযোগ করিতে আমরা শুনিয়াছি। রাশিয়া কি এই অভিযোগ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে? মার্শাল টিটো বলকান সংহতির স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন; বুলগেরিয়া

এবং আলবানিয়াকে যুগোশ্লাভিয়ার নেতৃত্বাধীনে আনিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আছে বলিয়াও আমরা শুনিয়াছি। রোমের বাহিরে 'তৃতীয় রোমের' (third Rome) অস্তিত্ব সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ্য করিতে রাজী নয়, ইহাই কি এই বিরোধের কারণ? কিন্তু বার্লিন লইয়া যখন সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময় এই বিরোধ কি সত্যই বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না?

কমিনফর্ম হইতে যুগোশ্লাভিয়াকে বহিষ্কৃত করা হয় নাই, ইহাও উল্লেখযোগ্য বিষয়। ইস্তাহারে যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতাদিগকে তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিবার জন্য অন্যথায় নেতৃ-পরিবর্ত্তনের জন্য যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই অনুরোধের ফল হইয়াছে ঠিক বিপরীত, টিটোকে ব্যাপক ভাবে সমর্থন করা হইতেছে। কঠোর দমননীতির জন্য টিটোর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবার সুযোগ মিলিতেছে না, ইহাই কি ইহার কারণ, না কম্যুনিষ্ট পার্টির সকলেই এবং জনগণ সত্যই টিটোর সমর্থক? যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির সকলেই যদি টিটোর সমর্থক হয়, তাহা হইলে টিটোকে অপসারণের জন্য কমিনফর্ম বা রাশিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করিবে কি? কমিনফর্ম বা রাশিয়া এইরূপ হস্তক্ষেপ করিলে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা বলিয়া আর কিছুই থাকে না। যাহা হউক, এই বিরোধের পরিণাম সম্বন্ধে কোন কিছু অনুমান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই বিরোধ দেখিয়া সাম্রাজ্যবাদীদেরও আনন্দিত হইবার কিছুই নাই। বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্রী রেবেকা ওয়েষ্ট তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই বিরোধটা সম্পূর্ণরূপে একটা তৈয়ারী ব্যাপার (stage-managed) মাত্র। তিনি বলিয়াছেন যে, যুগোশ্লাভিয়ার রুশ-সৈন্য পাঠাইবার অজুহাত সৃষ্টি করিবার জন্য স্বয়ং ষ্টালিনই মার্শাল টিটোকে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এইরূপ অনুমানের মূলে সত্যই কোন সত্য আছে কি না, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে প্রাচ্য অঞ্চল বা Eastern Bloc পরিত্যাগ করা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়াকে পশ্চিমী ব্লকে যোগদান করিতে দিবে, ইহাও কল্পনা করা অসম্ভব।

মালয়ে কি ঘটিতেছে—

মালয়ে কি ঘটিতেছে? সিঙ্গাপুরের সরকারী মহল মনে করেন, ইহা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মালয়ের কম্যুনিষ্টদের যুদ্ধ ঘোষণা এবং মস্কোর নির্দ্দেশেই তাহারা এই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বৃটিশ কমিশনার জুন মাসের (১৯৪৮) শেষ ভাগে এক বেতার বক্তৃতায় মালয়ের অশান্তিকে 'a desperate attempt by Communist political agitators to impose the rule of the gun and knife in plantations, mines and factories' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ 'রবর বাগান, খনি এবং কারখানা সমূহে বন্দুক এবং ছুরির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইহা কম্যুনিষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের উন্মত্ত প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।' গত ৮ই জুলাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ ক্রিচ জোন্স কমন্স সভায় বলিয়াছেন, "This is not a movement of the people of Malaya. This the conduct of gangsters who are out to destroy the very foundation of human society and orderly life" অর্থাৎ 'ইহা মালয়ের জনসাধারণের আন্দোলন নয়। ইহা দস্যু দলের কাজ। এই দস্যু দল মানব-সমাজের ভিত্তি এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে।' মালয়ের এই অভ্যুত্থানের মূলে মস্কোর অনুপ্রেরণা আছে, এমন অভিযোগ মিঃ ক্রিচ জোন্স উপস্থিত করেন নাই। তিনি এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, চীনে যে বিবাদ চলিয়াছে মালয়ের ঘটনা তাহারই অনুরূপ। আজকাল যেখানেই কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় তাহাকেই কম্যুনিষ্টদের কাজ বলিয়া অভিহিত করা একটা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। মালয়ের এই অভ্যুত্থানের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব নাই, একথা হয়ত অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের পিছনে যে মালয়ের জনসাধারণেরও সমর্থন রহিয়াছে, এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খুনী এবং লুণ্ঠনকারী দস্যুরা খুনী ও লুণ্ঠনকারীদের জন্য মালয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে, এ কথা বলিয়া বৃটেনের শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদীরা আত্মপ্রতারণা করিতে পারেন। কিন্তু মালয়ের এই অভ্যুত্থানের মূল যে মালয়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। বৃটিশ টোরী দলের সদস্য মিঃ ওয়াল্টার ফ্লেবার যথার্থই বলিয়াছেন, "In Malaya for anyone who can read the signs this is a 'Quit Asia, movement" অর্থাৎ যাহাদের লক্ষণ বুঝিবার ক্ষমতা আছে তাহারাই মালয়ের ঘটনাবলীর মধ্যে 'এশিয়া ছাড়' আন্দোলন দেখিতে পাইবেন। বস্তুতঃ, মালয়ের এই আন্দোলন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন।

মালয়ের এই অভ্যুত্থানের উৎপত্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করাও কঠিন। বৃটিশ মূলধনের অবাধ শোষণ ক্ষেত্র মালয় এ পর্য্যন্ত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি খুব কমই আকর্ষণ করিয়াছে। এমন কি ভারতবাসী আমরাও মালয় সম্বন্ধে খুব কম খবরই রাখিয়া থাকি। মালয়ের বর্ত্তমান অভ্যুত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পূর্ব্বেই মালয়ের চীনা-কম্যুনিষ্টরা চীনা-শ্রমিকদিগকে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাপ আক্রমণের পূর্ব্বে মালয়ের রবার বাগানে যে শ্রমিক-অশান্তি দেখা দিয়াছিল সে-কথাও আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। জাপানীরা মালয় অধিকার করিলে চীনা-কম্যুনিষ্টরা আত্মগোপন করিয়া জাপানীদিগকে বাধা দিবার জন্য গরিলা বাহিনী গঠন করে। এই গরিলা বাহিনী জাপ-বিরোধী মালয়ী জনগণের বাহিনী (Malayan people's Anti-Japanese Army) নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই আত্মগোপনকারী কম্যুনিষ্টদের নিকট হইতেই মিত্রশক্তিবর্গ যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। তাহারা জাপানীদের সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় এবং মিত্রশক্তিবর্গ সেনাধ্যক্ষ বিভাগের সহিত রেডিও যোগে সংযোগ স্থাপন করে। মালয় পুনরায় অধিকারের জন্য মালয়ের কম্যুনিষ্টদের এই গরিলা বাহিনীর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা মিত্রশক্তিবর্গও অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্যারাসুট যোগে বহু অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা, গ্রেনেড প্রভৃতি এই গরিলা বাহিনীকে সরবরাহ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষ

ওয়ার পর কম্যুনিষ্টরা এই সকল অস্ত্র-শস্ত্র ফেরৎ না দিয়া লুকাইয়া রাখে। জাপানীদের বহু অস্ত্র-শস্ত্রও তাহাদের হস্তগত হয়। সেগুলিও তাহারা সযত্নে এবং গোপনে রক্ষা করিয়াছে। ইহার জন্য কম্যুনিষ্টদিগকে দোষ দিয়া লাভ নাই। জাপ কবল-মুক্ত হইলেও বৃটেন মালয়কে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দিবে, এ প্রত্যাশা কেহই করে নাই। বৃটিশ যখন আবার মালয়ে ফিরিয়া গেল তখন তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিল মালয়ের কুয়োমিণ্টাং চীনারাই, কম্যুনিষ্ট চীনারা নয়। যুদ্ধের পর চীনা কম্যুনিষ্টরা জাপবিরোধী মালয়ী জনগণের বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেয় এবং নিখিল মালয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করে। ১৯৪৬ সালে মালয়ে কম্যুনিষ্ট ও ন্যাশন্যালিষ্টদের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বৃটেন ইত্যবসরে মালয়ের জন্য এক ফেডারেল পরিকল্পনা গঠনের আয়োজন করে। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক ও বামপন্থী মালয়ীরা এই পরিকল্পনার প্রবল বিরোধিতা করায় উহা পরিত্যক্ত হয় এবং গঠিত হয় নূতন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাও বামপন্থীদের মনোমত হয় নাই। গত ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) যখন মালয়ে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইল, তখন সিঙ্গাপুরের ৩০ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল এবং মালয়ের চীনারা মালয়ের সর্ব্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল। মালয়ের বর্ত্তমান অশান্তির রাজনৈতিক কারণটি উপলব্ধি করিতে হইলে মালয়ের শাসনতন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্ট, সঙ্ঘবদ্ধ বৃটিশ-আশ্রিত মালয় রাজ্যসমূহ বা ফেডারেটেড্ মালয় রাজ্য সমূহ এবং অনফেডারেটেড বৃটিশ উপদেশাধীন মালয় রাজ্য সমূহ লইয়া মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গবর্ণমেণ্ট, রাজ্য সমূহের সুলতানগণ এবং মালয়ের ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারীদের প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড মালয় নেশন্যাল অর্গেনিজেশন এই ত্রিপক্ষীয় গোপন আলোচনার ফলে এই নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় মালয় ব্যবস্থা পরিষদে মোট সদস্য-সংখ্যা ৭৫ জন। তন্মধ্যে ১৪ জন সরকারী কর্ম্মচারী। অবশিষ্ট ৬১ জন সদস্যও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহেন, মনোনীত সদস্য। এই শাসনতন্ত্রকে স্বায়ত্ত-শাসন বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা হইলেও মালয়ের জনসাধারণ এই ফাঁকিতে ভুলে নাই। নিখিল মালয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ১ লক্ষ ২০ হাজার সদস্য যদি এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে উহা বিস্ময়ের বিষয় হয় না। বস্তুতঃ, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর হইতে মে মাসের প্রথম দিক পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়া এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চলিতেছিল অতঃপর তাহাই সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরিণত হইয়াছে। ইহা যে ক্ষুদ্র দস্যু দলের কাজ নয়, এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক নিয়োগের মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্যাম দেশের সীমান্তের উভয় পার্শ্বে এবং দক্ষিণে জোহর পর্য্যন্ত এই সশস্ত্রদলের তৎপরতা চলিতেছে। রাজনীতিকরাও যে কখনও কখনও ডাকাত বা দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহা নূতন কোন কথা নয়। আবার যাঁহারা সত্যই দস্যু, জয়লাভের পর তাঁহারাও

রাজনৈতিক সাজিয়া বসেন। এই অভ্যুত্থানের মধ্যে 'ভিয়াদগান' দলই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কম্যুনিষ্টদের মধ্যে ইহারাই না কি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বামপন্থী। এই দলের পতাকায় দৃঢ়মুষ্টিতে ধৃত প্রজ্বলিত মশাল এবং তারকা অঙ্কিত। মালয় ও শ্যামের সীমান্তবর্ত্তী বনাঞ্চল হইতেই এই সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। গত ২৭শে মার্চ্চ শ্যাম দেশের পুলিশ শ্যামে দুইটি সশস্ত্র চীনা-বাহিনীর অস্তিত্বের সন্ধান পায়। শ্যামের শাসকবর্গ ঘোরতর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী। তাঁহারা কম্যুনিষ্টদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কতক কম্যুনিষ্টকে গ্রেফতারও করা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, শ্যাম হইতে চীনা কম্যুনিষ্টরা মালয়ে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহীদের দলপুষ্টি করিতেছে। যদি এইরূপ ঘটিয়া থাকে তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

মালয়ের এই অভ্যুত্থানের প্রকৃত স্বরূপ গোপন রাখা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় এবং অর্দ্ধ সত্য বা বিকৃত সত্য প্রকাশ করা হইতেছে। মিঃ ক্রিচ জোন্স কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, মালয়ই একমাত্র ঔপনিবেশিক অঞ্চল যেখানে যুদ্ধের পর খাঁটি ইউরোপীয় বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই। মালয় সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে দেখা যায়, বহু বিত্তশালী চীনাও বিদ্রোহীদের গুলীতে নিহত হইতেছে। এইরূপ কথাও প্রচার করা হইতেছে যে, যে সকল চীনা ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারাই বর্ত্তমান অশান্তির মূল। মালয়ীরা সরল প্রকৃতির এবং আরামপ্রিয়। তাহারা এই বিদ্রোহের মধ্যে নাই। কাহারা মালয়ের সত্যিকার অধিবাসী তাহা স্থির করা সত্যই খুব কঠিন ব্যাপার। থাকুন, সেমাং প্রভৃতি আদিবাসীদের গায়ে সভ্যতার বাতাস এখন লাগে নাই। তাহারা এখনও সেই আদিম অবস্থাতেই বাস করিতেছে। এক সময়ে ভারতের হিন্দুরাও মালয়ে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। মধ্যযুগে মালয়ে আসে আরবরা। আদিবাসীদিগকে বাদ দিলে পূর্ব্ব কালে মালয়ে আসিয়া যাহারা বসবাস করিয়াছিল তাহাদের বংশধররা আজ মালয়ী নামে অভিহিত। মালয়ের মোট ৫০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মালয়ীদের সংখ্যা শতকরা ৪১ জন। মালয়বাসী চীনাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৩ জন তাহারাই। মালয়ে ভারতীয়দের সংখ্যা শতকরা ১৩ এবং ইউরোপীয়দের সংখ্যা শতকরা ৩ জন। ইউরোপীয়েরা শতকরা ৩ জন হইলেও মালয়ে তাহাদেরই প্রাধান্য। মালয়ের কুবের-ভাণ্ডারের অধিকাংশের মালিকই তাহারা। চীনাদের মধ্যেও বড় কনট্রাক্টার, খনির ও রবার বাগানের মালিক যে কিছু একেবারেই নাই তাহা নয়। চীনাদের মধ্যে কতক কুয়োমিণ্টাং দলের অনুবর্ত্তী। ভারতীয়দের মধ্যেও কিছু কিছু ব্যবসায়ী আছেন। কিন্তু অধিকাংশ চীনা, মালয়ী এবং ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণীভুক্ত। মালয়ের সুলতানরা, রবার বাগান ও খনির বৃটিশ ও চীনা মালিকরা, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এবং কুয়োমিণ্টাং-পন্থী চীনারা মালয়ের নূতন শাসনতন্ত্রের সমর্থক। আর সংখ্যায় যাহারা গরিষ্ঠ তাহারা উহার বিরোধী। বৃটিশ ও কুয়োমিণ্টাং চীনারাই বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হইতেছে। চীনা কম্যুনিষ্টরা হয়ত এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিতেছে, কিন্তু মালয়ীরাও পিছনে পড়িয়া নাই। মালয়ীরা অজ্ঞ, আলস্যপরায়ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারাও আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, রবার বাগান ও খনির মূল্য তাহারা বুঝিতে শিখিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে যে, যে-পর্য্যন্ত মালয়ের এই কুবের-ভাণ্ডারের মালিক তাহারা না হইতে পারিতেছে সে পর্য্যন্ত তাহাদের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা নাই। আরামপ্রিয় অজ্ঞ মালয়ীরা যদি চরম হতাশার আঘাতে জাগিয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে শুধু দমন-নীতির দ্বারা এই বিদ্রোহকে নির্ম্মূল করা সম্ভব নয়। মালয়ের জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে সৈন্যবাহিনী তাহাকে দূরীভূত করিতে পারিবে না। মালয়ের রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে সূচিত হইয়াছে তাহারই দাবী।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজম—

মার্শাল-পরিকল্পনার বাঁধ বাঁধিয়া ইউরোপে কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করা হইয়াছে ভাবিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিস্তৃত হইতে দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এই অঞ্চলের জনগণের কথা ভাবিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া উঠিবেন, ইহাও খুব স্বাভাবিক। সর্ব্বাপেক্ষা দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে বৃটেনের। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটেনের প্রচুর মূলধন খাটিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক শোষণে এবং রাজনৈতিক নিপীড়নে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণের পক্ষে কম্যুনিজম মতবাদ দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কাও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে উপেক্ষার বিষয় নয়। ১৫ কোটি নরনারী দ্বারা অধ্যুষিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ১০ লক্ষ বর্গ-মাইল পরিমিত অঞ্চলের প্রতি দীর্ঘদিন পূর্ব্বেই যে রাশিয়ার দৃষ্টি পড়িয়াছে, আজ সে-কথাও তাঁহারা স্মরণ না করিয়া পারিতেছেন না। এশিয়ায় কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, যদিও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় রাশিয়ার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের নিদর্শন পাওয়া যায় না, তাহা হইলেও "There is, however, plenty of evidence of Russia's hopes in the region and more to show how well many of the local leaders have been schooled in traditional communist tactis." অর্থাৎ 'এই অঞ্চল সম্পর্কে রাশিয়ার আশার যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং এই অঞ্চলের স্থানীয় নেতাদের অধিকাংশই যে কম্যুনিষ্টদের প্রচলিত কর্ম্ম-কৌশল সম্বন্ধে সুশিক্ষিত তাহার প্রমাণ আছে আরও বেশী।' ১৯৩০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের ষোড়শ কংগ্রেসে অভিভাষণ প্রদান উপলক্ষে ষ্ট্যালিন কি বলিয়াছিলেন, 'টাইমস' পত্রিকা ধৈর্য্য সহকারে তাহাও খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। ঐ অভিভাষণে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন, "As for India, Indochina, Indonesia... ...the rise of revolutionary movement in these countries, sometimes assuming the form of a national war for liberation, cannot be doubted." অর্থাৎ 'ভারত, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, তবে কখনও কখনও এই আন্দোলন স্বাধীনতা-সংগ্রামের আকার গ্রহণ করিতে পারে।'

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্টদের যে কার্য্যকলাপ চলিতেছে ঐ অঞ্চলের রয়টারের প্রতিনিধিগণ ও তাঁহাদের প্রেরিত সংবাদে সে-কথা

ল্লেখ করিয়াছেন। এই কার্য্যকলাপ সর্বত্র একরূপ নয় এবং আন্দোনের তীব্রতারও ইতর-বিশেষ আছে। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয় এবং ন্দোচীনে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে াহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে তাহাদের কার্য্যকলাপ তীব্রতর ইয়া উঠিয়াছে মালয়ে। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা আলোচনা রিয়াছি। বিলাতের উদার মতাবলম্বী 'নিউজ ক্রনিকল' পত্রিকা াশঙ্কা করিয়াছেন যে, মালয় যদি হাত-ছাড়া হইয়া যায়, তাহা ইলে বৃটেনের ডলারের অভাব পূরণ করিবার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ালয়ের অভ্যুত্থান বৃটেনের মর্ম্মস্থলের কোন্‌খানে আঘাত হানিয়াছে াহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। মালয়ের পরেই শ্যামের কথা ল্লেখ করা প্রয়োজন। গত ৮ই জুলাই পার্লামেণ্টের টোরী সদস্য ঃ ওয়াণ্টার ফ্লেচার কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, শ্যাম ক্রমশঃ ম্যুনিষ্টদের প্রভাবাধীনে আসিতেছে। রয়টারের ১১ই জুলাইয়ের ১৯৪৮) সংবাদে প্রকাশ, শ্যামের সরকারী মহল এই উক্তির তিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্যাম গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ঢতার সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। শ্যামে অবস্থিত রাজনৈতিক ও নৈতিক পর্য্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে শ্যাম সুদৃঢ় াকার-স্বরূপ। কিন্তু শ্যাম গবর্ণমেণ্ট যেরূপ কঠোর হস্তে কম্যুনিষ্ট মন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাতেই শ্যামে কম্যুনিষ্টদের যথেষ্ট াবের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্যামে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাহা না জানিলে শ্যামে কম্যুনিষ্টদের ভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করা কঠিন। শ্যামের ১ কোটি ৫০ লক্ষ ধিবাসীর মধ্যে চীনা আছে ৫০ লক্ষ। ইহাদের অধিকাংশই ম্যুনিষ্ট, অর্দ্ধ কম্যুনিষ্ট এবং কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। বশিষ্ট চীনারা চীনের কুয়োমিণ্টাং দলের অনুবর্ত্তী। শ্যামের এই কল চীনা অধিবাসীরা—তাহারা কম্যুনিষ্টই হউক আর কুয়োমিণ্টাং ভুক্তই হউক—শ্যামকে 'ক্ষুদ্র চীনে' পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখিয়া াকে। এই জন্য শ্যামীরা চীনাদিগকে মোটেই পছন্দ করে না বং শ্যামের চীনা কম্যুনিষ্টরা শ্যামীদের উপর প্রভাব বিস্তার রিতে অসমর্থ হইয়াছে। আবার শ্যাম 'ক্ষুদ্র কম্যুনিষ্ট চীনে' পরিণত , কুয়োমিণ্টাং চীনারা ইহার বিরোধী। এই সকল কুয়োমিণ্টাং নারা প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী এবং শ্যামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় াদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি। এই জন্য শ্যাম গবর্ণমেণ্টের ম্যুনিষ্ট দমন-নীতির ইহারা সমর্থক। কিন্তু কম্যুনিষ্ট এবং য়োমিণ্টাং উভয় দলের চীনারাই শ্যামের প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বকরামকে পছন্দ করে না। গত মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে শ্যামের লিশ বিভাগ শ্যামের গবর্ণমেণ্ট দখল করিবার জন্য চীনা কম্যুনিষ্টদের ক চক্রান্তের সন্ধান পায়। শ্যামে দুইটি সশস্ত্র গুপ্ত চীনা বাহিনীর স্তিত্ব ধরা পড়িবার কথা মালয় সংক্রান্ত প্রবন্ধে আমরা উল্লেখ রিয়াছি। গত জুন মাসে শ্যামের পুলিশ ৫৬ জন চীনা কম্যুনিষ্টকে গ্রেফ্‌তার করিয়াছে এবং অন্যান্য চীনা কম্যুনিষ্টদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি াখিতেছে। চীনা কম্যুনিষ্টদের সহিত সংগ্রামের জন্য উগ্র জাতীয়তাবাদী শ্যামীরা 'কৃষ্ণ হস্তী' নামে একটি গুপ্ত সমিতিও গঠন রিয়াছে। এই গুপ্ত সমিতি অনেকটা জাপানের অধুনালুপ্ত 'ব্ল্যাক াগন' সোসাইটির অনুরূপ! কিন্তু শ্যামের প্রতিবেশী দেশ ব্রহ্ম, ন্দোচীন ও মালয়ে কম্যুনিষ্টদের প্রবল প্রভাবের জন্য শ্যাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কম্যুনিষ্ট দমন করা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার হইবে না। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে মালয়ে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ শ্যামের পক্ষেও কম বিপজ্জনক নয়। মালয়ের কম্যুনিষ্টরা শ্যামে যাহাতে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করাও কঠিন। মালয়ের সংলগ্ন শ্যামের দক্ষিণ অঞ্চল মুসলমানপ্রধান। কিছু দিন পূর্ব্বে এই অঞ্চলের মুসলমানগণ শ্যাম হইতে পৃথক্ হইবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলন এখনও চলিতেছে। মালয়ের কম্যুনিষ্টরা এই সকল মুসলমানকে শ্যামে বিদ্রোহ করিবার জন্য প্ররোচনা দিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়।

ব্রহ্মদেশের কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থানের কথা গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসের 'বসুমতী'তে আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্মদেশের পররাষ্ট্র-সচিব ইউ, টিনটাট্ ১০ই জুলাই তারিখে পদত্যাগ করিয়াছেন। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নীতি ক্রমশঃ কম্যুনিজমের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে, এ কথা গত জুন মাসে তিনি দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এ কথা আপনারা অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, গবর্ণমেণ্টে কোন কম্যুনিষ্ট সদস্য গ্রহণের কথা আমরা মোটেই চিন্তা করিতেছি না।" কিন্তু প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু যে সাদা ঝাণ্ডা দলের সহিত আপোষ-মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাও আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ২০শে জুলাই তারিখে তাঁহার পদত্যাগ অবধারিত। কিন্তু ১৫ই জুলাই ব্রহ্মের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। আগামী বৎসরের প্রথম ভাগে নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত তাঁহারাই কাজ চালাইবেন। সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা কম্যুনিষ্ট দমন করা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে থাকিন নু আপোষের প্রস্তাব নিশ্চয়ই করিতেন না। কম্যুনিষ্টদের মুক্তি-ফৌজের সংখ্যা ৬০ হাজার হইতে ৮০ হাজার। শ্রমিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং পল্লীবাসীদের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকরী সমর্থকের সংখ্যা ১৮ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাহাদের পরোক্ষ সমর্থকও আছে ২ কোটির কম নয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মদেশ হইতে কম্যুনিজম বিতাড়ন বড় সহজ হইবে না।

ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য-সংখ্যা খুব বেশী নয়। ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রীর আলোচনায় কম্যুনিষ্টরা কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি যে খুব কৌশলী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহারা ট্রেড ইউনিয়ন, যুবসঙ্ঘ, মহিলা সমিতি প্রভৃতিতে তো বটেই, কতক পরিমাণে সৈন্য-বাহিনীতেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের কম্যুনিষ্টদের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মালয়ের কম্যুনিষ্টদের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্টদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ভিয়েটনামের হো চি মীনের গবর্ণমেণ্টকে কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া অভিহিত করিতে আমরা শুনিয়াছি। সিংহলে কম্যুনিষ্ট-সমস্যা যে একেবারে নাই তাহা নয়। কিন্তু বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ঐক্যের অভাবে তাহারা আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ভারত সম্বন্ধে এখানে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' মনে করেন যে, ভারতে যদি একবার বিপ্লব আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উহা চীনের বিপ্লব অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

স্কটল্যাণ্ডের রক্ষণশীল পত্রিকা 'স্কটসম্যান' সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন, "ভারতকে যদি এশিয়ার ইটালী বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি এশিয়ায় গ্রীসের ভূমিকা গ্রহণ করিবে।" এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শ্রমিক-বিরোধ প্রভৃতি যে সকল অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যুদ্ধোত্তর অনিশ্চিত অবস্থা, দুর্মূল্যতা ও জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়-বৃদ্ধির ফল, না কোন পরিকল্পিত কর্ম্মসূচীর প্ররোচনার ফল তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট বিজয়ের জন্য রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। প্রস্তাব পাশ করিয়া অথবা অস্ত্রবলে কম্যুনিজম দমন করা যায় না। জনগণের জীবনযাত্রা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াই কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব। কিরূপে তাহা সম্ভব, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহার কোন উপায়ের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ-বিরতির ব্যর্থতা—

কাউণ্ট ফোক বার্ণাডোটের অপরিসীম আশাবাদ সত্ত্বেও চারি সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধ-বিরতির মধ্যে প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের সামান্য আশার আলোকও দেখা যায় নাই। এমন কি এই চারি সপ্তাহের মধ্যেই ইহুদী ও আরব উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত ভঙ্গ করিবার অভিযোগ করিয়াছে। কোন পক্ষ যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত প্রথম ভঙ্গ করিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা হয়ত কঠিন। কিন্তু মিশরীয় স্পিটফায়ার বিমান ২৫শে জুন (১৯৪৮) তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষক বিমানের উপর গুলী বর্ষণ করায় যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত ভঙ্গ করিতে কাহার দুঃসাহস হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন হয় না। খাদ্যাভাবগ্রস্ত ইহুদী অঞ্চলে খাদ্য প্রেরণ করিতে মিশর বাধা দেওয়াতেও যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে আরবদের মনোভাব বুঝিতে পারা গিয়াছে। কাউণ্ট বার্ণাডোট একবার আরব কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আর একবার ইহুদী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার জন্য ঘোরাঘুরি করিয়া প্যালেষ্টাইন সমস্যার কোন কূল-কিনারা করিতে পারেন নাই। তিনি শান্তির যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন ১লা জুলাই তারিখে আরবরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। ১২ই জুন চারি সপ্তাহ-ব্যাপী যুদ্ধ-বিরতির প্রহসন আরম্ভ হয় এবং ৯ই জুলাই চারি সপ্তাহের শেষ হয়। অতঃপর যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য কাউণ্ট বার্ণাডোট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাও গৃহীত হয় নাই। কাউণ্ট বার্ণাডোটের শান্তি-প্রস্তাব ৫ই জুলাই ইহুদী ষ্টেট কাউন্সিল কর্ত্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হয়। অবশেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ-বিরতি কমিশন (Truce Commission) চারি সপ্তাহের যুদ্ধ-বিরতিতে ৩০ দিন করিবার যে প্রস্তাব করেন, ইহুদীরা তাহা মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেও আরবরা প্রত্যাখ্যান করে। ৯ই জুলাই প্রাতে যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু লণ্ডন হইতে প্রেরিত ৮ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যালেষ্টাইনে আবার রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ১০ই জুলাই ইহুদীরা লিড্ডা অধিকার করে। লিড্ডা প্যালেষ্টাইনের বৃহত্তম এবং আধুনিক কালের সর্ব্ববিধ সুবিধা-সমন্বিত বিমানক্ষেত্র। ১১ই জুলাই সর্ব্বপ্রথম নেজারাথের চতুষ্পার্শে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যিশুখৃষ্ট এই নেজারাথের অধিবাসী ছিলেন। প্যালেষ্টাইনে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে এবং কাউণ্ট বার্ণাডোট নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার ব্যর্থতার রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন।

১৪ই জুলাই তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ আমেরিকার নূতন যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। মার্কিণ-প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, প্যালেষ্টাইনে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ-নৈতিক অবরোধ বা সামরিক বল-প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গত ১৫ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ এক আদেশ জারী করিয়া আরব ও ইহুদীদিগকে তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়া একমত হইয়া দৃঢ়তার সহিত উদ্যোগী হইলে প্যালেষ্টাইনে শান্তি-প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন হইবে না। কিন্তু আমেরিকার রুশ-ভীতির জন্যই এত দিন তাহা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর কি হইবে তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারা যাইবে। বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদী সংঘর্ষকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে প্রতিনিধি দ্বারা সংগ্রাম (war by proxy) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহুদীরা আমেরিকার নিকট হইতে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য পাইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তাহারা যদি মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র পাইত, তাহা হইলে প্যালেষ্টাইনে যুদ্ধের গতি অন্যরূপ ধারণ করিত।

তোগলিয়াত্তিকে হত্যার চেষ্টা—

১৪ই জুলাই (১৯৪৮) পরিষদ-ভবন পরিত্যাগের সময় ইটালীর কম্যুনিষ্ট নেতা মঃ পালমিরো তোগলিয়াত্তি গুলীর আঘাতে গুরুতর আহত হন। আততায়ী কর্ত্তৃক চারি বার তাঁহার বক্ষে গুলী বর্ষিত হয়। তাঁহার বক্ষের বামদেশ বিদ্ধ বুলেট বাহির করিবার জন্য পাঁজরের হাড়ের খানিকটা অপসারণ করিতে হইয়াছে। আততায়ী এক জন ছাত্র বলিয়া প্রকাশ। তাহার নাম এন্টোনিয়ো প্যালান্টে। তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্যই যে গুলী করা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তোগলিয়াত্তিকে হত্যা করিবার জন্য এই ঘৃণিত চেষ্টার প্রতিবাদ ১৫ই জুলাই হইতে ইটালীর ৭০ লক্ষ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

মাসারিকের আত্মহত্যার মধ্যে যাঁহারা কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র দেখিয়া বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, ইটালীর কম্যুনিষ্ট নেতা তোগলিয়াত্তিকে হত্যার চেষ্টা সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলিবেন?

ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা পরিষদের সদস্য খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ শ্রী এ ভি শ্রফ বলিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা অতি দ্রুত হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা এবং অভিজ্ঞ পরিচালনার অভাবেই এইরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ইহার জন্য তিনি ভারতীয় শিল্পপতিদের দায়ী করেন নাই, দায়ী করিয়াছেন ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের অযোগ্যতাকে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত শিল্প সম্পর্কে দশ বৎসর কাল সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় নূতন শিল্পপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে শিল্পপতিদের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পে শান্তিরক্ষার জন্য যে সকল সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তাহাতে শ্রম ও মূলধনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রমিক ও মালিক উভয় শ্রেণীর মনেই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, মূলধনের উপর ন্যায্য মুনাফা ধার্য্য, ন্যায্য মজুরী ধার্য্য এবং মুনাফার অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করার ব্যাপারে যে জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাতে শিল্পপতিরা এবং মূলধন নিয়োগকারীরা ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। আমাদের রাষ্ট্রনায়করা পুঁজিবাদ রাখিবেন না কিন্তু পুঁজিপতি-শ্রেণী রাখিবেন, এই অদ্ভুত নীতিরই ইহা পরিণাম। ফলে উৎপাদন কমিয়াছে, নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না। শেয়ার বাজার এত পড়িয়া গিয়াছে যে ন্যূনতম দর বাঁধিয়া দিতে হইয়াছে। বহু ব্যাঙ্ক ফেল হইবার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক কথায় সমগ্র দেশ ঘোরতর অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছে। এখনও যদি রাষ্ট্রনায়করা কার্য্যকরী কোন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিতে না পারেন তাহা হইলে দেশ রসাতলে যাইবে। রক্ষা করিবার কোন উপায় আর থাকিবে না।

কাশ্মীর কমিশন

কাশ্মীর কমিশন ভারতে পদার্পণ করিয়াছে। দিল্লীর বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করিয়াই কমিশনের নেতা বেলজিয়ামের মঃ এগবার্ট গ্রাফী বলিয়াছেন যে, তাঁহারা খোলা মন লইয়াই আসিয়াছেন। নিরাপত্তা পরিষদ তাঁহাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন সাফল্যের সহিত তাহা সম্পাদন করাই এখন তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। 'খোলা মনের' সহিত আমাদের বিলক্ষণ পরিচয় আছে, ঘোলা মনেরই নামান্তর। এত দিন বৃটিশের শাসনাধীনে থাকিয়া নূতন করিয়া শিখিবার কিছুই নাই।

এপ্রিল মাসে কাশ্মীর সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গত ৩রা জুন সেই প্রস্তাবের সহিত জুনাগড়, ব্যাপক মুসলমান হত্যা এবং ভারত-পাকিস্তান চুক্তিও জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কমিশনের উপর এই সকল দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা ইহাই সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—'কমিশন যদি ভারতে আগমন করেন, তবে কোন কোন্ বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা করিবেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই তাহা জানিতে চান।' কমিশন কিছু জানাইয়াছিলেন কি না সে বিষয় ভারত সরকার নীরব। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, এপ্রিল মাসে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে কমিশনের আগমনের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইহার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পণ্ডিত অবশ্য এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, কাশ্মীর কমিশনের ভারতে আগমন যদি নিছক সৌজন্যসূচক হয়, তাহা হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের প্রতি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু কমিশনের নেতা স্পষ্টই বলিয়াছেন, প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতেই তাঁহাদের ভারতে আগমন।

এখন ভারত গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এত দিন তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া জনসাধারণকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখন তো হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার উপক্রম। শেষ অবধি সুড়-সুড় করিয়া কাশ্মীর কমিশনের প্রত্যেক নির্দ্দেশটিই হয়ত পালন করিয়া বসিবেন।

হায়দ্রাবাদ

হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, "হায়দ্রাবাদের সহিত আর কোন আলাপ-আলোচনা চলিতে পারে না।" কিন্তু এই নেতিবাচক নীতিই যথেষ্ট নয়। কারণ, তাহাতে হায়দ্রাবাদ সরকারের আজ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধিই নেই। হায়দ্রাবাদ চাহিয়াছিল ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইবার সময় এবং ভারত সরকারের গড়িমসীর জন্য তাহারা প্রভূত সময় পাইয়াছে। নিজাম ও তাঁহার শিষ্যবর্গের বিশ্বাস, বিদেশী সমর্থকদের সাহায্যে ভারত ইউনিয়নের নিরাপত্তা বিপন্ন করিবার মত শক্তি তাঁহারা রাখেন। এত দিন যে সন্দেহ ছিল বৃটিশ নিজামকে সাহায্য করিতেছে আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য জিয়াইয়া রাখিবার জন্য যিনি চিরদিন এ দেশের বিভেদপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন, সেই চার্চ্চিল সাহেব এই দুঃসময়ে নিজামের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সরাসরি আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃটিশ সরকারের মুখপাত্র মিঃ নোয়েল বেকার হায়দ্রাবাদ-ভারত সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে নিজামের উৎসাহ বাড়িবেই। বৃটেন হইতে হায়দ্রাবাদে যে গোপনে বিমান দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা হইতেছে সেরূপ কাণাঘুষাও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইতেছেন যে, ভারত যদি বৃটিশ কমনওয়েলথ হইতে বাহির হইয়া যায়, তবে হায়দ্রাবাদ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান না করিতেও পারে অর্থাৎ হায়দ্রাবাদকে পাইতে হইলে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিতেই হইবে। বাহির হইতে গেলেই হায়দ্রাবাদকে লেলাইয়া দেওয়া হইবে। হায়দ্রাবাদকে লইয়া পাকিস্তান ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইলে যে দূরদৃষ্টি ও দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন, দুঃখের মধ্যে আমাদের কংগ্রেসী শাসকবর্গের তাহার একান্ত অভাব। দান হিসাবে বৃটেনের নিকট হইতে ক্ষমতার ছিটেফোঁটা পাইবার পর, পাছে বৃটেন চটিয়া যায় সেই ভয়েই নেতারা শশব্যস্ত। তাহারই সুযোগে নিজাম সরকারের এতটা বাড়াবাড়ি। যে রাজার দল হানাদারের মত হায়দ্রাবাদের মধ্যে এবং সীমান্তে উপদ্রব ও অত্যাচার করিতেছিল, তাহারা এখন নিজামের সৈন্য-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

অনেক বিলম্বে ভারত সরকারের কিঞ্চিৎ সক্রিয়তা দেখা দিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে ভারতের বিমানগুলির উপর নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে যে, হায়দ্রাবাদের উপর দিয়া যাইবার সময় সেখানকার কোন বিমান-ঘাঁটিতে যেন বিমানগুলি অবতরণ না করে। এই নির্দ্দেশের পর ভারত সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন যে, নিজাম, নিজাম সরকার বা হায়দ্রাবাদ ষ্টেট ব্যাঙ্কের যে সকল সিকিউরিটি ভারতবর্ষে গচ্ছিত আছে, তাহা ভারত সরকারের সম্মতি ব্যতীত স্থানান্তরিত করা চলিবে না। ভারতের সহিত আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হইবার পর হইতেই নিজাম বিমানের সাহায্যে পাকিস্তান হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিতে শুরু করিয়াছেন। ভবিষ্যতে ভারতের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য রসদ সংগ্রহ করার কাজেই যে হায়দ্রাবাদের সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি নিয়োজিত হইতেছে, তাহা আজ আর গোপন নাই।

ভারত সরকারের কর্ণধারগণ নিজামের ভারত-বিরোধী চক্রান্ত সরাসরি ভাবে বিনষ্ট না করিয়া যে বাঁকা পথ ধরিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় সীমান্ত আক্রমণকারী রাজাকারদের পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য ভারত সরকার যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন এবং অর্থনৈতিক বয়কটের যে ভয় দেখাইয়াছিলেন, নিজাম তাহার বিন্দুমাত্র মূল্য দেন নাই। পাকিস্তান হইতে যে সকল বিমান হায়দ্রাবাদে অবতরণ করিবে, সেগুলির তল্লাসী করিবার কোন ব্যবস্থা ভারত সরকার এখন পর্য্যন্ত করেন নাই। সেই ব্যবস্থা না করিলে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ কি করিয়া বন্ধ হইবে? ভারতের অভ্যন্তরে অশান্তি ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করিবার জন্য পাকিস্তান যে এখন দান হিসাবেও হায়দ্রাবাদকে সশস্ত্র হইবার জন্য সাহায্য করিতে পারে এ কথা বিস্মৃত হওয়া কিছুতেই চলে না। যাহারা কাশ্মীরী হানাদারদের বিনামূল্যে রসদ জোগাইয়া এবং নিজেদের সৈন্যবাহিনী দিয়া বলশালী করিয়া তুলিয়াছে, তাহারা হায়দ্রাবাদ সম্বন্ধেও যে একই নীতি অনুসরণের চেষ্টা করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। নিজামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বলপ্রয়োগ করা ভিন্ন হায়দ্রাবাদের হিন্দুদের এবং ভারতীয় ইউনিয়নকে রক্ষা করিবার উপায় নাই। হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকার বিপদ সক্রিয় হস্তক্ষেপের বিপদের অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং প্রধান মন্ত্রী মহাশয় হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বলপ্রয়োগ প্রসঙ্গে যে বলিয়াছেন—যুদ্ধ করিতে আমরা পারি কিন্তু তাহার অনেক বিপদ আছে, তাহা লোক ভুলাইবার ফাঁকা কথা মাত্র। অবশ্য বিপদ যদি তাঁহাদের আসনটা টলাইবার হয় সে কথা ভিন্ন। আমরা কেবল এইটুকুই বলিতে চাই যে, দেশপ্রেমিক নামে খ্যাত নেতৃবৃন্দ কি গদীর মোহে দেশবাসীর বিপদকে অগ্রাহ্য করিবেন? মাউণ্ট-ব্যাটেনের মস্তিষ্কপ্রসূত নিজাম-তোষণ নীতি কি এখনও চলিতে থাকিবে? বৃটিশের আমলে কংগ্রেসের মুসলিম-তোষণ নীতির কি ফল ফলিয়াছে নেতারা কি তাহা দেখিতে পাইতেছেন না?

ভারতে ডি, ভ্যালেরা

আইরিশ জাতির বিপ্লবী নেতা, আয়ারের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইমন, ডি, ভ্যালেরাকে অল্প সময়ের জন্য নিজেদের মধ্যে পাইয়া স্বাধীন ভারতের নগরিকবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছে। ভারত এবং আয়ারল্যাণ্ড উভয়েই একই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে বলিয়া উভয় দেশের মধ্যে একটা আন্তরিক সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে তাহারা যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল। উভয়েরই সমস্যার মধ্যে একটি বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বৃটেন স্বাধীনতা দেওয়ার সময় আয়ারল্যাণ্ডকে যেমন বিভক্ত করিয়াছিল, ভারতকেও তেমনি বিভক্ত না করিয়া ছাড়ে নাই। প্যালেষ্টাইনেও সেই নীতিরই তাহারা আজ অনুসরণ করিয়াছে। উদ্দেশ্য, ছাড়িতেই যখন হইবে তখন উহাদেরও সুখে-শান্তিতে বাঁচিয়া থাকিতে দিব না। আমাদের আরও একটি কঠিন সমস্যা রহিয়াছে। ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হইবে কি না?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এক অঞ্চলের সহিত আর এক অঞ্চলের অর্থনৈতিক, জাতিগত এবং ধর্ম্ম-সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্যের যুক্তি দ্বারা দেশ বিভাগ সমর্থন করিয়া থাকেন। ডি ভ্যালেরা এই সকল যুক্তিকে প্রকৃত তথ্যের বিকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিভক্ত আয়ারল্যাণ্ডকে পুনরায় মিলিত করিবার আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু বিভক্ত ভারতের পুনরায় মিলিত হইবার কোন আশাই আজ চোখে পড়িতেছে না। ভারত ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, এই মিলন অসম্ভব। এমন কি পাকিস্তান সরকার অনুরোধ করিলেও আমরা তাহা গ্রাহ্য করিব না। পাকিস্তান যাহাতে এই মিলনে বাধা দেয় বৃটেন তাহার ষোল আনা ব্যবস্থা করিয়া তবে এই দেশ ছাড়িয়াছে। আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে এই ফাটলকে গভীর খাদে পরিণত করিবার।

ভারতকে বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে রাখিবার জন্য ঘরে-বাহিরে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের শেষ খসড়ায় ভারতীয় রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। গণ-পরিষদের অধিবেশনের দিন ক্রমাগত পিছাইয়া দেওয়া হইতেছে, বোধ হয় পণ্ডিত নেহরুকে মিঃ এট্লীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিবার সুযোগ দিবার জন্য। বিলাতেও বৃটিশ কমনওয়েলথের নাম বদলাইবার কথা চলিতেছে। ইহার উপর ডি ভ্যালেরা কমনওয়েলথের যে প্রশংসা করিয়া গেলেন, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত

পূর্ববঙ্গ হইতে কংগ্রেস কমিটির যে সমস্ত সদস্য পশ্চিম-বঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন, পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিতে তাঁহাদের লওয়া হইবে কি না সে সম্পর্কে মত-বিরোধ হওয়াতে, ব্যাপারটি বিবেচনার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। নয়া দিল্লীর অধিবেশনে এই প্রশ্নের তাঁহারা একটি মীমাংসা করিয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে দুই শ্রেণীর কংগ্রেস প্রতিনিধি নূতন পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেস কমিটিতে যোগদানের অধিকারী। প্রথমতঃ, যাঁহারা পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী, কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোন নির্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পশ্চিম-বঙ্গের ঠিকানা দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা ৩০শে এপ্রিলের পূর্বে বাস্তত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে সদস্য হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি গলদ রহিয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গের যে সকল প্রতিনিধি আজ পশ্চিম-বঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এখানে কাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন? পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেস কমিটির যাঁহারা সদস্য হইবেন, তাঁহাদের পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেসকর্মীদের ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। পাকিস্তান হইতে আগত প্রতিনিধিরা যদি এখানকার কংগ্রেস-কর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া কংগ্রেস কমিটিতে আসন লাভ করেন, তবে কাহারো পক্ষে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না। পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসকর্মীদের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান, সুতরাং কংগ্রেসকর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত নহেন এমন কোন ব্যক্তিই কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। ওয়ার্কিং কমিটি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত প্রতিনিধিরা এক নিজেদের ছাড়া আর কাহারো প্রতিনিধিত্ব করিবেন না। ফলে পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিত্বমূলক চেহারা বদলাইয়া যাইবে। পশ্চিম-বঙ্গের ভাল করিবার জন্য এই সকল পূর্ববঙ্গ হইতে আগত কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেস কমিটিতে ঢুকিতে চাহিতেছেন না, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কমিটিকে দখল করিয়া বসা। ভবিষ্যতে যাহাতে ক্ষমতা পূর্ববঙ্গবাসীদের হাতে থাকে সেই জন্যই এত তোড়জোড়। পশ্চিম-বঙ্গকে র‍্যাডক্লিফ সিদ্ধান্ত পঙ্গু করিয়াছে, কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব পদদলিত করিয়াছেন, ন্যায্য দাবী অস্বীকার করিয়াছেন। এখন আবার এই সিদ্ধান্ত দ্বারা চিরকালের জন্য ক্ষমতা কাড়াকাড়ির বিবাদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কংগ্রেস কমিটি আমাদের চিতা সাজাইতেছেন।

অপহৃতা নারীদের উদ্ধার

আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, উভয় ডোমিনিয়ন অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের জন্য কঠোর ভাবে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু পাকিস্তানে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারীদের সংখ্যা দেখিলে সর্ত প্রতিপালনে তাহাদের মনোযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে পর্য্যন্ত মোট ১২ হাজার ৫ শত ১৪ জন অপহৃতাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারত হইতে উদ্ধার করিয়া পাঠান হইয়াছে ৭ হাজার ৫ শত ৩৬ জনকে এবং পাকিস্তান হইতে প্রেরিত হইয়াছে মাত্র ৪ হাজার ৯ শত ৭৮ জন। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু ও শিখ-নারীকে অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া পূর্বে প্রকাশ পাইয়াছিল। সংখ্যা দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের উদ্ধারের জন্য পাকিস্তান সরকারের কোন তৎপরতাই নাই এবং এই হারে উদ্ধার-কার্য্য চলিতে থাকিলে অভাগিনীরা কোন দিনই পাকিস্তানের খপ্পর হইতে উদ্ধার পাইবে না। চুক্তি করিবার সময় যদি এমন কোন ক্ষমতার কথা উল্লেখ না থাকে, যাহার দ্বারা সর্ত প্রতিপালনে চুক্তিকারীকে বাধ্য করা যায়, তাহা হইলে এক লোক-ঠকান ছাড়া সেই ধরণের চুক্তিতে কোন কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে দেখা যাইতেছে যে, আগামী বৎসরে ৪৪ লক্ষ সাড়ে ১১ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে। ১২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ঘাটতি লইয়া এই বৎসর আরম্ভ হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে আয় হইয়াছে ৩১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত ৪০ টাকা আর ব্যয় হইয়াছে ৪৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭ শত ৩৭ টাকা। সুতরাং আগামী বৎসরের ঘাটতি জন্য দায়ী কিছুটা বর্তমান বৎসরের ঘাটতি এবং কিছুটা কয়েকটি নূতন ধরণের বড় বড় খরচ। উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ব্যয় হইবে ১৭ লক্ষ টাকা, মাগ্‌গী ভাতার জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী কর্ম্মচারীদের দেওয়ার জন্য খরচ পড়িবে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। বঙ্গবিভাগ প্রভৃতি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় প্রভূত পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর পরীক্ষার ফি বাবদ মাত্র ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭ শত ১৫ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আয় কমিবে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। প্রবেশিকা, আই-এ, আই-এস-সি প্রভৃতি পরীক্ষায় ছাত্রদের মাথা-পিছু ৫ টাকা হারে ফি বাড়াইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে আয় বাড়িবে মাত্র ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৬ শত ২৫ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট প্রয়োজনের ও ঘাটতির পক্ষে এই টাকা সামান্য একটি ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু দুর্দ্দশাগ্রস্ত অভিভাবকদের ঘাড়ে এই অতিরিক্ত ৫ টাকা পরীক্ষার ফি'র বোঝা সত্যই ক্লেশকর। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই যুক্তি পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

পশ্চিম-বঙ্গ কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক বৎসরেই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। এত দিন বিদেশী শাসকবর্গ অর্থাভাবের দোহাই দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যান্য জাতিগঠনমূলক কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা যে খুব সহজ নয়, এবং ইহার জন্য যে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু কোন স্বাধীন দেশে কঠিন বলিয়া অথবা অর্থাভাবের দোহাই দিয়া এই ধরণের পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা না হইলে, স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্যকেই অবহেলা করা হইবে।

পরিকল্পনানুযায়ী বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাবের জন্য একই সঙ্গে সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন হয় ত সম্ভব নয়। কিন্তু সেই কারণে পরিকল্পনাটিকে যদি ঠেকাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দু'-তিন পুরুষ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। আমাদের মনে হয় প্রথমে

বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করা উচিত। বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রশ্ন বাদ দিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করা হইলেই তাঁহাকে প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এই সকল নবনিযুক্ত শিক্ষকদের এবং বর্ত্তমান যে সকল প্রাথমিক শিক্ষক আছেন তাঁহাদের, পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময় বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাহা হইলে আগামী এক বৎসরের মধ্যেই সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইতে পারে। ক্রমে পাঠশালাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদিগকে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বুনিয়াদি শিক্ষকরূপে গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে। কমিটি প্রথমেই এই বিষয়ে এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে, তাহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে শুধু একটি মাত্র কারুশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা চলিবে না এবং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টেরই গ্রহণ করা উচিত, কমিটির এই দুইটি সুপারিশ সকলেরই সমর্থন লাভ করিবে। প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেই জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হাতেই থাকা সঙ্গত।

আগামী নির্ব্বাচনে ভোটার-তালিকা

ভোটার তালিকার প্রাথমিক প্রণয়ন-কার্য্য আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই শেষ হইবে। ইহা প্রস্তুত হইবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে। তালিকা পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে প্রণয়নকারিগণের জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। তালিকায় ভুলক্রমে অনেক ভোটারের নাম বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। নাম উঠাইতে হইলে ভোটারকে দরখাস্ত করিতে হইবে। নাম বসাইবার ব্যবস্থা যেন ঘোরালো এবং ব্যয়বহুল না হয়।

ভোটারের যোগ্যতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। বয়স ২১ বৎসর বা ততোধিক হওয়া চাই, ভারতীয় ইউনিয়নের অধিবাসী হওয়া চাই এবং ভোটার যেন বিকৃত-মস্তিষ্ক না হয়। ১৯২৮ সালের ১লা জানুয়ারীর পর যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা ভোটার হইতে পারিবেন না। ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ্চের পূর্ব্বে কেহ কম পক্ষে ১৮০ দিন ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাস করিয়া থাকিলে তিনি ভারতীয় ইউনিয়নের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটারের তালিকায় যেমন গুরুত্ব আছে, তেমনই গুরুত্ব আছে নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার। যদি এক জন মাত্র প্রার্থীই দাঁড়ান, তাহা হইলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইবেন। এইরূপ অবস্থায় ভোটের কোন মূল্যই থাকে না আর ভোটারের অভিপ্রায়ও জানা যায় না। সেই জন্য গণতন্ত্রে বিরোধী দলের প্রয়োজন। কাজেই নির্ব্বাচন যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন না হয়, জনসাধারণের সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব তথা ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রনায়কগণ যদি সমস্ত বিরোধী দলকে দাবাইয়া রাখেন, তাহা হইলে ভারতের গণতন্ত্র এক প্রহসনে পরিণত হইবে।

স্বাধীন ভারতে পুলিশের কর্ত্তব্য

পশ্চিম-বঙ্গের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীকিরণশঙ্কর রায় সম্প্রতি কলিকাতার পুলিশ অফিসারদের স্বাধীন ভারতে পুলিশের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, পুলিশের চাকুরীকে চাকুরী বলিয়া গ্রহণ না করিয়া উহাকে সেবাধর্ম্মের তুল্য মনে করিবে। সজ্জনকে রক্ষা করিতে হইলে এবং দুর্জ্জনকে দমন করিতে হইলে জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করা প্রয়োজন। ভদ্র, বিনয়ী, সাধু ব্যক্তিদের সহায় হইলে আপনা হতেই তাঁহাদের সহানুভূতি পাওয়া যাইবে। ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা প্রয়োজন। শিশুরাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে গেলে পুলিশকে দুর্নীতির উর্দ্ধে এবং সতত সক্রিয় থাকিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছেন যে, থানার ইমারতের বহির্ভাগে 'হাতকড়ি' প্রতীকচিহ্ন থাকা উচিত নয়। পুলিশ যত দিন আর্ত্তের ত্রাণকর্ত্তা এবং সাধু ব্যক্তিদের রক্ষক না হইতে পারিবে, তত দিন শুধু প্রতীক-চিহ্নের প্রবর্ত্তন দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বর্ত্তমানে আমাদের পুলিশ বাহিনীর উপরোক্ত গুণসমূহের একান্ত অভাব। শান্ত ও নিরীহ ব্যক্তিরাই আমাদের দেশে পুলিশ দেখিলে ভয় পায়। কারণ, পুলিশের হাতে প্রতিকারপ্রার্থীর দশা অপরাধী অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। তাই নেহাৎ দায়ে না পড়িলে কোন ব্যক্তি পুলিশের কাছে যান না। ফলে অনেক দোষী ধরাও পড়ে না। স্বরাষ্ট্র-সচিব যে পুলিশ বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত ও সক্রিয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন ইহা সত্যই আশার কথা। আমরা তাঁহার উদ্যমের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীজে সি দাশ

সুপ্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের স্থাপয়িতা ও বর্ত্তমান চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী জে সি দাশ বাংলার সর্ব্বসাধারণের

সুপরিচিত। ভারতের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সমুদয়ের পক্ষ হইতে ইনি ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইন্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারত সরকার শ্রীযুক্ত দাশকে এই পদের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া গুণীর যোগ্য সমাদর করিয়াছেন।

জিতেন্দ্রনারায়ণ শিশু বিদ্যালয়ে বাঙলার গভর্ণর মাননীয় কৈলাসনাথ কাটজু

কারা-সংস্কার

কলিকাতার বেতার কেন্দ্র হইতে পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু 'পাপ ও পাপী' সম্পর্কিত আলোচনার উদ্বোধন করিয়া বলেন যে, অতীত কালে কারাগারকে ইচ্ছা করিয়াই নরকের মত করিয়া রাখা হইত এবং অপরাধীর ব্যক্তিত্ব চিরকালের মত নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা চলিত। তাহাতে পাপ কমে নাই বরং বাড়িয়াছে এবং নূতন নূতন রূপও গ্রহণ করিয়াছে। মনুষ্যত্ব নষ্ট করিবার ফলে একই পাপীকে বহু বার কারাগারে আসিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কারা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন, শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশে কয়েদীদের আলাদা করিয়া রাখাই নিয়ম, কিন্তু আমাদের দেশে সেলের কয়েদী ভিন্ন অন্যান্যদের ব্যারাকে রাখা হয় বলিয়া তাহারা মেলামেশার সুযোগ পায়। ইহার কারণ উদারতা নহে, খরচ বাঁচান। তাঁহারা লোককে জেলে পুরিবার জন্য পুলিশরাজ কায়েম করিতে গিয়া অর্থব্যয়ে কদাচ কার্পণ্য করেন নাই, কিন্তু জেলে পুরিবার পর লোকগুলি যে মানুষ সে কথা বেমালুম ভুলিয়া যাইতেও কসুর করেন নাই।

আমাদের জেলগুলি নরক বলিয়াই কারা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু দিন ধরিয়া এদেশে প্রবল আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। কারা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়া যতীন দাস যে দিন সুদীর্ঘ অনশনে আত্মবলিদান করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের কারাগারের অবর্ণনীয় কু-ব্যবস্থার প্রতি তখন পৃথিবীর সকল দেশের লোকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বৃটিশ আমলের অবসান ঘটিলেও, আমাদের কারাগারগুলির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কংগ্রেস শাসনাধীনে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর কু-ব্যবহারের অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সে অভিযোগের প্রকৃতি বৃটিশ আমলের অভিযোগগুলি হইতেও সাঙ্ঘাতিক। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যে ব্যবহার করা হয়, যে কোন জেলে সাধারণ কয়েদীদের সহিত তাহা অপেক্ষা খারাপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমাদের কারা-সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন।

অশোকনাথ শাস্ত্রী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ মাত্র কয়েক দিন রোগ-ভোগ করিয়া ২৭শে আষাঢ় রবিবার বেলা ১১-১২ মিনিটে তাঁহার বাগবাজারস্থ আবাস-ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ২৪ পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত অমরনাথ বিদ্যাবিনোদের পুত্র ছিলেন। আই-এ, বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। অশোকনাথ খ্যাতনামা পণ্ডিত হইয়াও নিরভিমানী ছিলেন। তিনি তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যকে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি এবং শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহকে সাধারণের

কিছু কাল কাজ করেন। বাংলা দেশের পুষ্করিণী-সংস্কার বিষয়ে তিনি অনেক নূতন আইন ও ব্যবস্থা করিয়া দেশের ও দশের প্রচুর হিতসাধন করিয়াছেন। বয়স্ক শিক্ষা সংসদের তিনিই প্রথম ও প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ হন। সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া বয়স্কদের জন্য পড়ার বই প্রবর্ত্তন তাঁহার দ্বারাই হয়। রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারের প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অগ্রদূত। বহু সুধিবৃন্দের সহিত একত্র কাজ করিয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকা তুলিয়া পরে নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্পণ করেন। দেশের কুটারশিল্পের দ্বারা দরিদ্র দেশবাসীর কত সহজে যে জীবন যাপনের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন তাহাও বিস্ময়কর। তাঁহার খুল্লতাত শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভাপতি হন। বাঁকুড়া জেলা উন্নয়ন সমিতিরও তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে বাঁকুড়া মেদিনীপুরের দুর্গম পল্লী-অঞ্চলে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কার্য্য পরিচালনা করিতে করিতে তাঁহার একমাত্র কন্যার কঠিন রোগ-সংবাদ পাইয়া তাঁহার বৈবাহিক স্বনামধন্য অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মিহিজামের বাড়ীতে যান ও পরদিন সহসা কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনা হয়। ঐ সময় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুকুমার বাবুকে দেখিতে আসেন। ঐ দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও ডাঃ প্রসাদকে তাঁহার পুকুর পঙ্কোদ্ধারের বিষয় মন্তব্য জানান এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদও তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়কে ঐ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে নির্দ্দেশ দেন। রায় বাহাদুর পদবী, এম বি ই খেতাব, করনেশন ও সিলভার জুবিলী ইত্যাদি মেডেল সবই তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু তাঁহার সন্তানগণ পিতৃহারা হইল তাহা নহে, বাংলা দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

সহজবোধ্য করিবার কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 'মাসিক বসুমতী'র তিনি এক জন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

পরলোকে সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেশকর্ম্মী শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ৬ই জুন রবিবার তাহার ১১৩ নং ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, তিন পুত্র, একমাত্র জামাতা, কন্যা, এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী বন্ধু ও দরিদ্র আশ্রিতদের শোক-সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃঃ পিতা রায় বাহাদুর রামসদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্মস্থল যশোহরে শিশু সুকুমারের জন্ম হয়। বালক সুকুমার শিশুকাল হইতেই তাঁহার অসামান্য বিদ্যানুরাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই ইংরাজী সাহিত্যে বরাবর তিনি প্রথম হন। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান শুধু তাহাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্য ও রবীন্দ্র সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ১৯০৮ খৃঃ বি, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রচুর যোগ্যতা ও সুনামের সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯৩৬ সালে ইনস্পেক্টার জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু উচ্চপদ ও অর্থের মোহ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ১৯৩৮ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই তিনি রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্বভারতীর পল্লী উন্নয়ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময় চাকুরী ছাড়ার জন্য সুকুমার বাবু ন্যূনপক্ষে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা ক্ষতি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছেন। আই জি আর পদের ১২০০৲ মাহিনার পরিবর্ত্তে শ্রীনিকেতন সচিবের পদের জন্য যে ১০০৲ মাত্র লইতেন তাহাও প্রতি মাসে বাঁকুড়া রিলিফে দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অন্যান্য কর্ম্মীদের সহিত মত-বিরোধ হওয়ায় ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্ম্মকর্তা হইয়া সেখানে যান। ইহার পর পুষ্করিণী সংস্কারের স্পেশাল অফিসার হইয়া রাইটার্স বিল্ডিংএ

পরলোকে মৃণালিনী দেবী

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ হাওড়া জেলার অন্তর্গত সামতা গ্রামে 'মালঞ্চ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও অল-ইণ্ডিয়া পাবলিসিটি সার্ভিসের কর্ণধার শ্রীগিরিজাভূষণ মহাপাত্রের পত্নী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃণালিনী দেবী দানশীল ও ধর্ম্মপরায়ণা প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। গ্রামের সকল জনহিতকর কার্য্যেই তাঁহার উৎসাহ ও সমর্থন থাকিত। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পারলৌকিক আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

[illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"জীবন-খাতার অনেক পাতাই

এমনি শুধো শূন্য থাকে,

আপন মনের ধেয়ান দিয়ে

পূর্ণ করে লও না তাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ

আলোকচিত্র—ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী

এদের আপনি চেনেন ?

এই প্রশ্ন শুনলে সত্যিই যেন মনের আকাশে ভেসে ওঠে সেই সব হারিয়ে-যাওয়া দিন—যখন মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদে এদের দেখতে পাওয়া যেত। আর এদের অন্তরে থাকত কত শত সত্য মিথ্যা কাহিনী। গত পঁচিশ বছরের মাসিক বসুমতীর লেখা ও রেখার সার-সংগ্রহ হচ্ছে আমাদের জয়ন্তী সংখ্যা।

● মূল্য সডাক পাঁচ টাকা ●

● রজত জয়ন্তী সংখ্যা ঃ—রজত জয়ন্তী সংখ্যা ঃ—রজত জয়ন্তী সংখ্যা

সৌন্দর্য্যের স্বপ্নজাল বোনে
হিমানী
স্নো, সাবান, সেন্ট, কেশতৈল
লিপষ্টীক, বডি পাউডার
নখের পালিশ প্রভৃতি

হিমানী * কলিকাতা

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—শ্রাবণ : ১৩৫৫ সাল

[illegible]ম খণ্ড : ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর অনুভব না হ'লে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে;—তেমন মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে। তাই ভাবে—হাসে কাঁদে, নাচে গায়।

অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে ব'সে কেবল মুখ দেখ্‌লে লোকে পাগল মনে কর্‌বে!

কোন্নগরের ভক্ত। শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের দেখিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি করবে? তাঁর নাম কর্‌তে কর্‌তে কখনও ধারা পড়ে, কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান ক'র্‌তে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার এক দিন কিছুই হ'লো না।

"কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়। এক দিন ভাবে হালদার পুকুর * দেখ্‌লুম। দেখি, এক জন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে। যেন দেখালে. পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না—কর্ম্ম না কর্‌লে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান জপ এই সব কর্ম্ম, তাঁর নাম-গুণকীর্ত্তনও কর্ম্ম—দান, যজ্ঞ এই সবও কর্ম্ম।

মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাৎতে হয়। তার পর নির্জ্জনে রাখ্‌তে হয়। তার পর দই ব'স্‌লে পরিশ্রম করে মন্থন ক'র্‌তে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হাঁ, কর্ম্ম চাই বই কি! অনেক খাটতে হয়, তবে লাভ হয়। পড়্‌তেই কত হয়! অনন্ত শাস্ত্র!

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি)। শাস্ত্র কত প'ড়বে? শুধু বিচার ক'র্‌লে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ কর্‌বার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দিবেন।

বই পড়ে কি জান্‌বে? যতক্ষণ না হাটে পঁহুছান যায় ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো-হো শব্দ। হাটে পঁহুছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে। 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুন্‌তে পাবে।

সমুদ্র দূর হ'তে হো-হো শব্দ কর্‌ছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়্‌ছে, ঢেউ হ'চ্ছে,—দেখ্‌তে পাবে।

বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই শাস্ত্র, (Science) সব খড়কুটো বোধ হয়।

—কথামৃত।

---

* হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাড়ী। সেই বাড়ীর সম্মুখে হালদার পুকুর; একটি দীঘিবিশেষ।

জন্ম, ১২ই আশ্বিন, ১২২৭। মৃত্যু, ১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৫।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ মহামানবদের জন্ম-বৃত্তান্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অলৌকিক। সাধারণ মানুষের হিতার্থে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তি ও সামর্থ্যের বিনিময়ে যে সকল ব্যক্তি আত্মদান করেছেন সাধারণতঃ তাঁদের আমরা মহাজন আখ্যা দিয়ে থাকি। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বাঙলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেছেন এবং এই মহামানবের জন্ম-বৃত্তান্ত সত্যই এক অভিনব অলৌকিক কাহিনী।

শকাব্দা ১৭৪২, সন ১২২৭, ইংরেজী ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর পিতামাতার প্রথম সন্তান। কথিত আছে, বিদ্যাসাগরের গর্ভ অবস্থান কালে মাতা ভগবতী দেবী উন্মাদিনী অবস্থায় ছিলেন। বহু প্রকার ঔষধাদি সেবনেও কোন প্রকার সুফল পাওয়া যায় না, রোগ-মুক্তি দূরের কথা। আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জননী ভগবতী দেবী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন ও স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হন।

কিন্তু উদয়গঞ্জ-নিবাসী জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসন্নপ্রসবা বধূ ভগবতী দেবীর কোষ্ঠী গণনা করে মন্তব্য করেন যে বধূমাতার কোন প্রকার পীড়া হয়নি। অস্বাভাবিক অবস্থা হলেও বধূমাতা সুস্থ শরীরে নিরাপদে কালাতিপাত করছেন। ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবে, তাঁরই তেজঃপ্রভাবে প্রসূতি অধীরা হয়েছেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হলেই মাতা সুস্থ হবেন।

জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হতে দেখে গ্রামবাসীর মনে দৃঢ় ধারণা হয়—শিশু অবশ্যই এক বিশিষ্ট পুরুষ হবে।

লোকের মনে এ ধরণের সংস্কার হওয়ার অপর এক কারণ ঘটেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ ধর্ম্মপরায়ণ যোগী, তীর্থপর্য্যটনকারী প্রবাসী রামজয় তর্কভূষণ একদা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর বংশে এক বিচিত্র শক্তিশালী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষের আগমন হবে—যে শিশু উত্তরকালে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, যার কার্য্যকলাপে দেশের গৌরব বৃদ্ধি হবে, দয়ার অবতার হয়ে তাঁর গৃহে সে জন্মগ্রহণ করবে।

স্বপ্নে তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রতি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে, পরিবার-পরিজনদের সংবাদ নিতে এবং উক্ত সুসন্তানের শুভাগমনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে আদেশ হয়। তদনুসারে তিনি গৃহে ফিরে স্বপ্নাদিষ্ট বিষয়ের সফলতার অপেক্ষা করতে থাকেন।

সন ১২২৭, ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তর্কভূষণের স্বপ্ন সত্যে রূপান্তরিত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিশুর জিহ্বার তলায় আলতায় কিছু লিখে * দিয়ে বলেছিলেন: এ শিশু উত্তরকালে সকলকে পরাজিত করিবে, ইহার প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চারি দিক্ কম্পিত হইবে, ইহার দয়া-দাক্ষিণ্যে সকলে মুগ্ধ হইবে। আমিই ইহার দীক্ষাগুরু হইলাম, এ বালক আর অন্য গুরু গ্রহণ করিবে না। আমার স্বপ্নদর্শন আজ সফল হইল, আমার বংশ পবিত্র হইল।

তর্কভূষণ মহাশয়ের কথার সত্যতা সম্বন্ধে বাঙলা দেশ ও দেশবাসীর আজ আর কোন সংশয় নেই। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের শুভাগমনে বাঙলা দেশ পবিত্র হয়েছে, বাঙালী ধন্য হয়েছে—আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তি-গৌরবে—প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তির আলোকে বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি যেন উদ্ভাসিত।

—প্র

* কি লিখেছিলেন তা কাকেও বলেননি।

জাতীয় সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধের উৎস-সন্ধান

মহীমুদ্দীন চিশতি

এমন এক দিন কিন্তু ছিল যখন আমরা কষ্ট করেও বা চেষ্টা করেও "ভারতমাতার" কল্পনা করতে পারতাম না। কথাটা শুনে অনেকে হয়ত বিস্মিত হবেন। কিন্তু আমাদের এই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা কখন অবাক হবেন না। "ভারতমাতার" যে কল্পনা তার বয়স খুব বেশী নয়। অর্থাৎ দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ বলতে যা বুঝি, ইংরেজীতে যাকে "ন্যাশনালিজম" বা "প্যাট্রিয়টিজম্" বলা হয়, সেটাও বিশুদ্ধ স্বদেশী দ্রব্য নয়, বিদেশে তার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং বিদেশ থেকেই তার আমদানী এদেশে। আমাদের এখনকার যে দেশাত্মবোধ, যে সর্ব্ব-ভারতীয় জাতীয়তাবোধ, সেটা ইংরেজদেরই দান। ইংরেজ আমলেই তার উৎপত্তি ও বিকাশ। গুপ্তযুগ বা মোগল-যুগ, কোন যুগেই সর্ব্ব-ভারতীয় দেশাত্মবোধ আমাদের মধ্যে জাগেনি, রাজসিংহাসন নিয়ে, ক্ষমতা নিয়ে দেশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ সব সময় হয়েছে। এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে সমগ্র ভারতবর্ষকে বেঁধে দেবার স্বপ্ন অনেকে দেখেছেন, অশোক থেকে আকবর পর্য্যন্ত, কিন্তু সে স্বপ্ন তাঁদের দুঃস্বপ্নই রয়ে গেছে, সার্থক হয়নি।

ইংরেজ আমলে এই দেশাত্মবোধের জন্ম হল দু'টো কারণে। ভারতবর্ষে ইংরেজদের দু'টি পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে, একটি ধ্বংসের ভূমিকা, আর একটি নির্মাণ ও গঠনের ভূমিকা। নবজাগ্রত ইয়োরোপের যে দেশাত্মবোধ, যে জাতীয়তাবোধ তারই পরিচয় আমরা পাচ্ছি ইংরেজদের প্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। নতুন ফ্রান্স, নতুন ইতালী, নতুন জর্ম্মানী, নতুন ইংলণ্ডের কথা আমরা শুনছি, এই সব দেশের ইতিহাস পড়ছি এবং আমাদের মনে দেশাত্মবোধের বীজ উপ্ত হচ্ছে। এদিক্ দিয়ে বিচার করলে আমাদের এই বর্ত্তমান দেশাত্মবোধের যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রের দীক্ষাগুরু ইংরেজরা এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এ হল ইতিহাসের একটা দিক্ মাত্র, যে দিক্‌টায় ইংরেজদের প্রত্যক্ষ দানের (Positive) কথা বলা হল। এই ইতিহাসের আর একটা দিক্ও আছে, যে দিক্‌টা ধ্বংসাত্মক ও পরোক্ষ। ইংরেজদের অত্যাচার, ইংরেজদের শাসন-শোষণ, ইংরেজদের ঔদ্ধত্য ও জাত্যভিমান আমাদের মনে বিদ্বেষ ভাব থেকে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলেছে। ইংরেজের প্রতি এই যে বিদ্বেষ ভাব, বিজেতার প্রতি বিজিতের এই যে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনোভাব, উভয় জাতির এই পরস্পরবিরোধী স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা, একেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "জাতিবৈর"। এই জাতিবৈর আপাতদৃষ্টিতে অশুভকারী মনে হলেও আদৌ তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতি-বৈর বলিতেছি। প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরেজরা ও দেশীয় লোক এই জাতি-বৈরের জন্য দুঃখিত। তাহারা এই জাতি-বৈরকে অশুভকারী মনে করিয়া ইহার শান্তির জন্য যত্ন করেন। যে সকল সংবাদপত্রে এই জাতি-বৈরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আবার ইহার নিরাকরণার্থ নানাবিধ কূটার্থ, অলঙ্কারবিশিষ্ট প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিরাকরণার্থ দ্বিজাতীয় সমাজ, সভা, সোসাইটী, এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া শ্বেত-কৃষ্ণ উভয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সতরঞ্চের ছকের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার শমতার জন্য কত ইউনিয়ন ক্লাব সংস্থাপিত হইয়া সূপকার এবং মদ্যবিক্রেতাকুলের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই এ রোগের উপশম হইতেছে না। দুঃখের বিষয় যে, কেহ বিবেচনা করিয়া দেখিল না যে এই জাতি-বৈর শমিত করিয়া আমরা উপকৃত হইব কি না? আর উপকৃত হই বা না হই, বাস্তবিক ইহার শমতা সাধ্য কি না?···

"মানুষের স্বভাবই এমত নহে যে বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয়, অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী নিস্পৃহ মনে করে এবং জেতাও কখন বল-প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতে পারে না। আজ্ঞাকারী, আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেন না আমরা প্রাচীন জাতি, অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যত দিন এ সব বিস্মৃত হইতে না পারিব তত দিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতি-বৈর আমাদের প্রকৃত অবস্থার ফল, —যত দিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব্ব গৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতি-বৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতি-বৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে।"

—(সাধারণী, ১১ই কার্ত্তিক ১২৮০ : "জাতি-বৈর")

এই "জাতি-বৈর" থেকে আমাদের দেশাত্মবোধ যে জন্মলাভ ও পুষ্টিলাভ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের জাতীয়তাবোধ, ন্যাশনালিজম বা প্যাট্রিয়টিজম্ বলে যার বড়াই করি আমরা, এদেশে তার জন্ম নয়, এও এক বিদেশী "ইজম" এদেশের মাটিতে স্বদেশী বেশ ধারণ করে গৌরবান্বিত হয়েছে। ন্যাশনালিজমের জন্মদাতা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি, উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় ন্যাশনালিজমের আদর্শ এবং এই "জাতি-বৈর"।

দেশপ্রেমের আদি তীর্থ বাঙলা দেশ

এই যে ন্যাশনালিজম বা প্যাট্রিয়টিজম, এই যে জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ বা স্বদেশপ্রেম, এর জন্মভূমি হল বাঙলা দেশ, বাঙলাই এর আদি তীর্থস্থান, বাঙালীই এর প্রথম চারণ-কবি, প্রথম নেতা, প্রথম মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু। এটা বাঙালীয়ানা বা বাঙালিপ্রীতির কথা নয়, প্রাদেশিকতা বলে একে অট্টহাস্যে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভবপর নয়। এ হল খাঁটি ইতিহাসের কথা। তার ঐতিহাসিক কারণ হল—এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক সোনার বাঙলা দেশই ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কামধেনু। এই বাঙলার অর্থ, বাঙলার সম্পদ শোষণ করেই ইংরেজরা সারা ভারতে তাদের রাজ্যবিস্তার করেছে, বাঙলার অধীশ্বর তথা ভারতের অধীশ্বর হয়েছে। বাঙলার পলিমাটিতে ইংরেজ শাসক ও শোষকদের অত্যাচারের

কলঙ্ক-চিহ্ন যতটা গভীর ভাবে আঁকা রয়েছে ততটা আর অন্য কোথাও নেই। "জাতি-বৈরের" বীজ তাই এই বাঙলার মাটিতেই শাখা-পল্লব বিস্তার করে পরবর্ত্তী কালে বিশাল জাতীয় আন্দোলনের মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বাঙলার প্রজাশক্তির বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে জন্ম হয়েছে দেশাত্মবোধের। এই জাতীয়তা মন্ত্রের প্রথম দীক্ষাগুরু রাজা রামমোহন রায়। শুধু বাঙলার নয়, সমগ্র ভারতের দীক্ষাগুরু রামমোহন। রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ ফিরিঙ্গি ডিরোজিওর শিষ্যরা হলেন বাঙলার তথা ভারতের জাতীয়তা মন্ত্রের দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু। বাঙলার হিন্দুমেলা, বাঙলার ভারত সভা, বাঙলার রায়ত সভা, বাঙলার গুপ্ত সভা-সমিতি হ'ল সর্ব্ব-ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত। এমন কি, ভারতের যে জাতীয় কংগ্রেসকে আজ আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছি, জাতীয় আন্দোলন বা জাতীয়তাবোধের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে পর্য্যন্ত তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন দান নেই। আমাদের দেশাত্মবোধের যে সর্ব্ব-ভারতীয় রূপ তাও জাতীয় কংগ্রেসের দান নয়। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস তা গৌরবের নয়, কলঙ্কের। সমগ্র দেশব্যাপী খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে যে প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল, জাতি-বৈর থেকে যে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হচ্ছিল তাকে সংহত রূপ দেবার জন্যে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়নি, তাকে ধ্বংস করার জন্যে—তাকে প্রতিরোধ করার জন্যেই ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়, তাদেরই উদ্যোগে দেশীয় উচ্চশ্রেণীর ভক্তবৃন্দ ও অনুগতদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দুই বছর আগে ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় যে "ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স" অনুষ্ঠিত হয় সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে, তার উদ্দেশ্য ছিল নিখিল ভারতের প্রজা-শক্তির উদ্বোধন ও সংগঠন। এই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্যই ইংরেজদের চক্রান্তে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। জাতি-বৈরের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হবার ফলে, বাঙলার রাষ্ট্রীয় সাধনা ও চেতনার একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপ ও গতি ছিল। বাঙলার এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইংরেজরা এ দেশের রাজানুগত অভিজাত শ্রেণীর সহযোগিতায় নিয়মতান্ত্রিকতা ও আপোষ-রফার অলিগলিতে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয় আন্দোলনের ধারাকে পরিচালিত করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল এই বিষয়ে যা লিখেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য :

"সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-চেষ্টা প্রাদেশিক শাসনের ভাল-মন্দ লইয়াই বিব্রত এবং প্রাদেশিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।···কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা, পুণার সার্ব্বজনিক সভা ও মাদ্রাজের মহাজন সভা, এ সকলই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল। · সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উদ্যোগে যে ভারত সভার বা Indian Associationএর জন্ম হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ও চিন্তাকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক বিশাল কর্ম্মজালে আবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই ভারত সভার জন্ম হয় এবং অল্প দিন মধ্যে উত্তর-ভারতের বড় বড় শহরে শাখা-সভা সকল গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রয়াগে, কানপুরে, মীরাটে ও লাহোরে ভারত সভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে,···পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত সভাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথমে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করে। যে স্বদেশাভিমানকে আশ্রয় করিয়া ভারত সভা দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে বাড়াইয়া ও গড়িয়া তুলিতেছিল, কংগ্রেসের জন্ম-নিবন্ধন যদি তাহা একান্ত বহির্ম্মুখীন হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ প্রজাশক্তি কতটা পরিমাণে যে সংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত ইহা এখন কল্পনা করা সুকঠিন।

"ফলতঃ, কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব্বে হইতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারত সভার কর্ম্মনায়কগণ এক বিরাট জাতীয় সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা করেন। এই আদর্শের অনুসরণেই নানা স্থানে ভারত সভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে চতুর রাষ্ট্রনীতিক লাট ডাফরিণের যে কতকটা সম্বন্ধ ছিল ইহা এখন সকলেই জানেন। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ দেশে যে বিপুল প্রজাশক্তি জাগাইয়া তুলিতে-ছিলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও যে কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই একথা বলাও কঠিন। বোম্বাইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হইতেছিল, সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন ভারত সভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় একটি জাতীয় সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের সমকালেই কলিকাতার আলবার্ট হলে জাতীয় সমিতি বা National Conferenceএর অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের খবর রাখিতেন কি না জানি না, কিন্তু এই কনফারেন্সে দেশের নানা স্থান হইতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে কংগ্রেসের কথা কিছুই শুনেন নাই, ইহা জানি। ইঁহারা সকলেই এই ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার ভবিষ্যৎ প্রজা-শক্তির আধার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। আর কংগ্রেস যদি সহসা এই স্থানটি পূরণ করিতে অগ্রসর না হইত, তাহা হইলে আজ সুরেন্দ্রনাথের এই National Conference আমাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম শক্তিকেন্দ্র হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।···কংগ্রেস দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভারতের জেলায় জেলায় লোকমত গঠনের জন্য যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন, সেগুলির শক্তি হরণ করিয়া কংগ্রেস দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জীবনকে দুর্ব্বল করিয়াছে ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে।"—(চরিত-কথা)

জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেন তাঁদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এই পর্ব্ব সম্বন্ধে একটা সচেতন ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। এই উদাসীনতার কারণ যাই হোক না কেন, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বাঙলার নেতৃত্ব এবং বাঙলার দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশাত্মবোধের খাঁটি ইতিহাস লিখতে হলে একথা লিখতেও হবে, বলতেও হবে। আর সুর ও সঙ্গীত যে দেশের মাটি আর মানুষের নাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, যে দেশের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্পর্ক স্বরের বন্ধনে বাঁধা, সে দেশের দেশাত্ম-বোধ ও জাতীয়তার ইতিহাস যে অনেকাংশে জাতীয় সঙ্গীতের

ধারাবাহিক ইতিহাস তা বলাই বাহুল্য। জাতীয় সঙ্গীতেও তাই দেখা যায়, বাঙলার দান অবিস্মরণীয় এবং বাঙলার জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসই হল এদেশের জাতীয় আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস।

বাঙলার জাতীয় সঙ্গীত

বাঙলার জাতীয় সঙ্গীতের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে এক জন ফিরিঙ্গির কথা। এই ফিরিঙ্গির নাম ডিরোজিও। ফিরিঙ্গি ডিরোজিওই সর্ব্বপ্রথম ভারতমাতার অখণ্ড মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে তাকে সঙ্গীতের রূপ দিয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য অখণ্ড ভারতের ধ্যানমূর্ত্তি পুরাণকারদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। যেমন 'বিষ্ণুপুরাণে' দেখা যায়, "ভারতবর্ষকে" এই ভাবে বন্দনা করা হয়েছে :

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং যম্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

* * *

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে!
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম!
কদাচিল্লভতে জন্তুর্ম্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ।"

অর্থাৎ, "সমুদ্রকে দক্ষিণে রাখিয়া হিমগিরিকে মস্তকে ধরিয়া যে বর্ষ অবস্থান করিতেছে—সে বর্ষের নাম ভারতবর্ষ—ভরত-সন্ততিরা তথায় বাস করিয়া থাকেন, মহামুনে!…জম্বুদ্বীপ মধ্যে আবার ভারতবর্ষই পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীরাই ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া ব্যবহার করে, অপর সমুদয় ভূমি ভোগতৃপ্তির জন্য রহিয়াছে। প্রাণিগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যভূমি ভারতে মানবজন্ম লাভ করিয়া থাকে।"

অন্যান্য পুরাণেও এই ভারত-বন্দনার পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে দেখতে পাই, শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন: "নেয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা রোচতে মম লক্ষ্মণ! জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" কিন্তু এগুলিকে ঠিক স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি বলা যায় না। এক-জাতি এক-প্রাণ অখণ্ড ভারতের যে মাতৃমূর্ত্তি তার বন্দনা এ নয়। প্রাচীন কবিদের এ ছাড়া অখণ্ড ভারতের আর অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙলার কবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে দু'-চার ছত্র ভারতবর্ষ ও বাঙলা দেশ সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাকেও ঠিক দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি বলা যায় না। যেমন :

"সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ।
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান!
সাধ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান।"

অথবা বিদ্যা ও সুন্দরের কথোপকথনের মধ্যে—

"এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ।
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা।
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধাসম এ দেশের নীর।

* * *

সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।"

এই সব স্তুতি বন্দনা ও বর্ণনার মধ্যে ভারতবর্ষ অথবা জননী ও জন্মভূমির যে কথা আছে তা গভীর জাতীয়তাবোধ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। চিরাচরিত রীতিতে দেবদেবীর বন্দনার মতো এখানে এক রহস্যাবৃত অলৌকিক ভারতবর্ষ ও জন্মভূমির বন্দনা করা হয়েছে মাত্র। হিন্দু কলেজের যে ফিরিঙ্গি শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নব্য বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান দীক্ষাগুরু, বাঙলার চিন্তা-বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নায়ক, সেই ডিরোজিওই বাঙলার তথা সমগ্র ভারতের প্রথম স্বদেশী সঙ্গীত বা জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা। ডিরোজিও ফিরিঙ্গি হলেও তাঁকে আমরা নির্ভয়ে বাঙলার ডিরোজিও বলতে পারি। ডিরোজিও-রচিত ভারতের এই সর্ব্বপ্রথম জাতীয় সঙ্গীতের নাম "ফকির অফ্ জাঙ্গিরা" (Fakir of Janghire)। কবিতাটি এই—

"My Country! in the days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of the misery!
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sudlime.
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! One kind wish for thee."

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতার বাঙলা অনুবাদ করেছেন :

"স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ-বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কি বা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী।"

এই কবিতার মধ্যে স্বদেশের জন্য যে গভীর অনুভূতি ও বেদনাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তা আগেকার কোন কাব্যে বা সঙ্গীতে পাওয়া যায় না। দেশাত্মবোধই যে এই কাব্যের উৎস, তা এর

প্রত্যেকটি শব্দের ঝঙ্কারেই বোঝা যায়। তাই এই "ফকির অফ জাঙ্গিরা"কেই আমরা আমাদের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত বলতে পারি, এই ফিরিঙ্গি ডিরোজিওই সেই সঙ্গীতের রচয়িতা। ডিরোজিওদের শিষ্যদের তাই জাতীয়তা মন্ত্রের আদি দীক্ষাগুরুরূপে দেখতে পাই।

সঙ্গীতের দিক্ দিয়ে ফিরিঙ্গি ডিরোজিওর পরে মনে পড়ে হাড়ে-মজ্জায় বাঙালী কবি ঈশ্বর গুপ্তের কথা। গুপ্ত-কবি দেশাত্মবোধ জাগাতে গাইলেন—

"জাগ জাগ জাগ নব, ভারত-কুমার।
আলস্যের বশ হ'য়ে, ঘুমাও না আর॥
তোল তোল তোল মুখ, খোল রে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন॥
ভেঙ্গেছে শোবার খাট, পড়িয়াছ ভূমে।
এখনো তোমার এত সাধ কেন ঘুমে?"

কবিতা হিসেবে এ-যুগের কানে হয়ত ভাঙা ঢোলের মতো বাজবে এই গান, কিন্তু সে-যুগেই অনভ্যস্ত কানে ভাঙা ঢোলেরই ছিল প্রচণ্ড শক্তি। এই হল স্বদেশপ্রেমের আদি অকৃত্রিম বাঙলা গান—১২৫৫ সালের (বাং) ১লা বৈশাখ "সংবাদ-প্রভাকর" কাগজে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ঠিক এক শত বছর আগে।

গুপ্তকবির পরে রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন ঠাকুর, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর দিয়ে, এই দেশাত্মবোধ সঙ্গীতের দুর্ব্বার ধারায় রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়ে গেছে। ডিরোজিও ও গুপ্তকবির আক্ষেপ আবেদনের করুণ সুর ছেড়ে রঙ্গলাল বাঙলার জাতীয় সঙ্গীতে উদ্দীপনা, আবেগ ও বিদ্রোহের সুর-ঝঙ্কার তুললেন—

"স্বাধীনতা হীনতায়'কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়!
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়!"

বাঙলার নিজস্ব বিদ্রোহী সুরের এই হল সূচনা। জাতীয় সঙ্গীতে এই বিদ্রোহী সুরের ধারা বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গানের তূর্য্যনাদে পরিণতি লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত মাতৃমূর্ত্তি তাই বাঙলা মায়ের মূর্ত্তি হলেও, তাঁর 'বন্দে মাতরম্' গান সমগ্র ভারতের বন্দনা-গান। বাঙলার এই মাতৃমূর্ত্তি সমগ্র ভারতের অখণ্ড মাতৃমূর্ত্তির সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। বিদ্রোহী বাঙলার অন্তরের কথা ব্যক্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রোহী ভারতের বেদনা ও দেশাত্মবোধকেই রূপ দিয়েছেন—

"এই কি মা! হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত!..."

বন্দে মাতরম্!

জাতীয় সঙ্গীতে বাঙলার শ্রেষ্ঠ অবদান বঙ্কিমচন্দ্রের এই "বন্দে মাতরম্" গান। এই গানের বিদ্রোহী সুরের মধ্যে বিদ্রোহের প্রেতাত্মার পুনরাবির্ভাবের দুঃস্বপ্ন দেখে আজ যাঁরা "স্বাধীন ভারতের" জাতীয় সঙ্গীতরূপে এই "বন্দে মাতরম্" গান বর্জ্জন করতে চান, তাঁরা যেন ভুলে না যান যে, তাঁদের হাজার চেষ্টা ও কারসাজি সত্ত্বেও এ-গানের প্রত্যেকটা শব্দ ও তার ঝঙ্কার বাঙালীর তথা ভারতবাসীর অন্তরে চিরদিন গভীর দেশাত্মবোধের আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

"ঈশ্বরচন্দ্র"

(এই নাম কেন রাখা হয়?)

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহে ছিলেন না। নিকটবর্ত্তী কোমরগঞ্জ নামক এক স্থানে মঙ্গলবার ও শনিবার সপ্তাহে দু'দিন হাট বসত—তদনুসারে মঙ্গলবার আহারান্তে তিনি হাটেই ছিলেন। নাতি হওয়ার শুভ সমাচার দেওয়ার জন্য রামজয় তর্কভূষণ পুত্র ঠাকুরদাসের সন্ধানে কোমরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হয়। তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে বলেন,—এক এঁড়ে বাছুর হয়েছে। সে সময়ে তাঁদের গৃহে একটি আসন্নপ্রসবা গাভীও ছিল। ঠাকুরদাস গৃহে পদার্পণ ক'রেই সর্ব্বাগ্রে গোবৎস দেখার জন্য গোশালার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তর্কভূষণ তখন হাসতে হাসতে বলেন,—ও দিকে নয়, এ দিকে এসো। আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাচ্ছি। এই বলে পুত্রকে নিয়ে সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করেন এবং নব-জাতককে দেখিয়ে বললেন,—একে এঁড়ে বাছুর বলবার কারণ এই যে, এ বালক এঁড়ে বাছুরের মত একগুঁয়ে হবে। যা বলবে তাই-ই করবে। কাকেও ভয় করবে না। এ বালক ক্ষণজন্মা, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ও পরম দয়ালু হবে। এর যশোগীতে চারি দিক্ পূর্ণ হবে। এর জন্মগ্রহণে আমার বংশের অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ হবে, সে জন্য এর নাম রাখলাম ঈশ্বরচন্দ্র।

সমারসেট
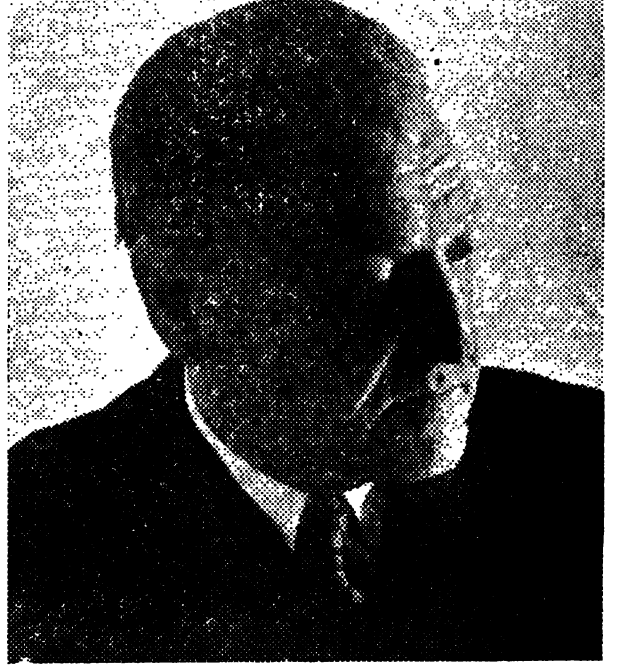
সমারসেট মম্

শিশিরকুমার সেনগুপ্ত

সাহিত্য-জগতে মম্ হলেন এক দুর্বোধ্য প্রশ্ন। আজকের যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তিনি, সাম্প্রতিক কালে নাটক উপন্যাস থেকে প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করেছেন। আর শুধু যে জনসাধারণ তাঁর গুণমুগ্ধ তা নয়, সমালোচক এবং সমসাময়িক লিখিয়েরাও মমের রচনার মুন্সীয়ানার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। তবু আসল মানুষটি আজও সকলের অপরিচিত—চলমান পৃথিবী থেকে আপনাকে তিনি তেমনি সরিয়ে রেখেছেন। আজকের দিনের জন্য সব সাহিত্যিকদের তুলনায় মানুষটি সম্বন্ধে লোকের ধারণা অতি অল্প। মমের ব্যক্তিত্ব তার নৈঃশব্দের দুর্গে বন্দী। আর সে নৈঃশব্দ তাঁর স্বেচ্ছাকৃত। যে সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মম দেখলেন যে তিনি যশস্বী হয়েছেন, তাঁর তিনখানি নাটক এক মাসে মঞ্চস্থ হয়েছে—সেই দিন থেকে এই নৈঃশব্দ তিনি অটুট রেখেছেন আজো অবধি। নিজেদের ডংকা বাজিয়ে যে ভাবে বহু আধুনিক সাহিত্যিক নামের বেসাতি করেন সে সম্বন্ধে তাঁর আতংকজনক অভিজ্ঞতা আছে। "কেকস এ্যাণ্ড এল" বইতে সেই সব দুর্বিনীত প্রচেষ্টাকে তিনি তীক্ষ্ণ লেখনী-মুখে শ্লেষের চাবুক হেনেছেন। তাঁর ধারণা যে ফিল্ম-ষ্টারের মত আত্মপ্রচার করা সাহিত্যিকের ধর্ম নয়।

তবু নিজেকে প্রধান হতে দেন না যে তিনি—তার আরো কঠিন যুক্তি আছে। তাঁর সাফল্য যত বাড়তির মুখে যাচ্ছে ততই তিনি উদাসীন হচ্ছেন, সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়েই তিনি নিরস্ত থাকেন। সাফল্য এসেছে বিলম্বে তাঁর জীবনে। প্রথম নাটক তাঁর সার্থক ভাবে মঞ্চস্থ হয় চৌত্রিশ বছর বয়সে। অনেকেই অবাক হয়ে ভাবেন যে, সাহিত্যিকের জীবনে এ আবার বিলম্ব কি? কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লিজা অফ ল্যামবেথ' প্রকাশিত হয়। সেই উপন্যাসের এমন সুন্দর সমালোচনা পেয়েছিলেন তিনি যে, এক কথায় ডাক্তারী ছেড়ে তিনি সাহিত্যিকের সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সেদিন ভাগ্যের সঙ্গে কি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছিলেন তা তাঁর উপলব্ধির মধ্যে ছিল না। পরবর্তী ক'টি বৎসর তিনি কিছুই পাননি। সব ক'টি উপন্যাস তাঁর ব্যর্থ হোল। প্রথম উপন্যাস প্রকাশের পর যে ভক্তের দল তাঁকে ঘিরেছিল তারা আবার কোথায় খসে পড়ল। তার পর আবার সাহিত্য-গগনে যখন মম এলেন, তখন নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েই এলেন তিনি।
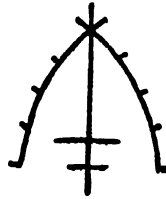
মমের সেই চিহ্ন

এগারোটি বৎসর দীর্ঘ সময় বই কি। বিশেষ করে তরুণ বয়সে শিল্পের সাধনায় যে একনিষ্ঠ সাধক—দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা যার প্রখর অনুভূতি-প্রবণতাকে প্রতি মুহূর্তে দুঃখ দেয়। আর সেই প্রতিঘাতে একটি সুন্দরের তপস্যা-ব্রতী তরুণের মনে চিরকালের জন্য মানুষের সততার উপর আস্থার বিনাশ ঘটল। পরিবর্তে এল এক অব্যয় রুক্ষতা—যা ভবিষ্যৎ কালের সাফল্য আর কোমল করে দিতে পারেনি। সেই ক'টি বন্ধ্যা-বৎসর তিনি শরীর ও মনে যে অশেষ দুঃখ সহ্য করেছিলেন তা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি। তাঁর উপন্যাসের বাজারে কাটতি ছিল না—তাঁর ছোট গল্প পত্রিকা অফিস থেকে নিয়মিত ভাবে ফেরত আসত। লণ্ডনের কোন থিয়েটারের প্রযোজক তাঁর নাটকগুলিকে মঞ্চস্থ করতে সাহস পেতেন না। সেই সময়ে তাঁর টেবিলে ধুলায় ধূসর হচ্ছিল তিনখানি নাটক 'লিডি ফ্রেডরিক', 'মিসেস ডট' এবং 'জ্যাক ষ্ট্র'—পরে অবশ্য সবগুলিই সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

ষ্টুডিওতে শেরীর সরঞ্জাম সহ মম্

তাঁর সব ক'টি রচনাতেই এই তিক্ততা প্রত্যক্ষ। আর মুখের ভাব যতই নিস্তরঙ্গ রাখুন না কেন, একবার সেদিকে তাকালেই তিক্ত চিন্তার ছাপ দেখতে পাওয়া যাবে তার ওষ্ঠাধরের বংকিম লেখায়। বিশেষ করে তাঁর দু'টি চোখে। গভীর ঘন কালো সে দু'টি চোখের দৃষ্টিতে মোহভঙ্গের স্বচ্ছতা।

মমের চোখের দৃষ্টিতে যাদুই আছে। অদ্ভুত অন্তর্ভেদী সেই চাউনি। এই দৃষ্টি যাদুই তাকে অত বড় বস্তুধর্মী লেখক করে তুলেছে। তাঁর নিজের ধারণা যে ক'টি রচনা তাঁর পাঠযোগ্য সেগুলির

দক্ষিণ ফ্রান্সে মমের বর্তমান আবাস-গৃহ ভিলা মরেস্ক. সংলগ্ন বাগিচা

সবই বাস্তব জীবন থেকে সংগৃহীত। সেই কারণে যত মানুষের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় সবাই তাঁকে লেখার খোরাক যুগিয়ে যায়।

চোখ ছাড়া তাঁর অবয়বে অথবা পরিপাটি বেশে কোথাও সাহিত্যিকের পরিচয় নেই। বরং তাঁর মধ্যে বিত্তশালী ব্যবসায়ীর ছাপ আছে—প্রাচ্য থেকে ব্যবসা করে যিনি বাণিজ্য-লক্ষ্মীর বর লাভ করেছেন।

সত্যি কথা। মমের মধ্যে কি যেন আছে যা প্রাচ্য দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় যেন কোন্ পূর্বজন্মে মম ছিলেন চীনা ভিক্ষু। আর মমের প্রাচ্য-প্রীতিও প্রখ্যাত। দক্ষিণ-ফ্রান্সে যেখানে তিনি এখন স্থায়িভাবে বসবাস করছেন, সেখানে তার বাসায় পরিপাটি করে সাজান রয়েছে পূর্ব-ভূখণ্ড থেকে আহরিত বুদ্ধমূর্তি, সোনার বুদ্ধ-মন্দির—চীনা দেবতাদের মূর্তি।

মমকে নিজের সম্বন্ধে কথা কওয়ানো দুরূহ। কাউকে দর্শন দেওয়ার কারণ ঘটলে তিনি বিব্রত বোধ করেন। তরুণ বয়সে যে হীনমন্যতা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আজো তা থেকে তিনি মুক্তি পাননি। তাঁর সমস্ত রচনায় এই হীনমন্যতার প্রতিঘাত। মানুষের নির্বুদ্ধিতার প্রতি তিনি নির্মম কশাঘাত করেছেন—বিশেষ করে মেয়েদের প্রতি তিনি ক্ষমাহীন। তাঁর নিজের জীবনে এই হীনমন্যতা কি ভাবে প্রতিক্রিয়া করে তা জানেন এক মাত্র তাঁর একান্ত বন্ধুজন। অবশ্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং এ-যুগের অন্যতম রচনা 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন যে সেটি তাঁর জীবন-আলেখ্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিছু দিন আগে আমি সে সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম। কাঁধ দুলিয়ে তিনি জবাবে বললেন যে, ঐ বইতে ঘটনা, কল্পনা ও শ্রুতি এমন ভাবে মেশামেশি হয়ে গেছে যে, আজ তা থেকে শুদ্ধ তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি পুনরাবিষ্কার দুঃসাধ্যেরই নামান্তর হবে। সেই কারণে আমি নিজে তাঁর বই থেকে বাস্তব ও কাহিনী অংশ উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি।

প্রথমতঃ গল্পাংশের কথাই ধরা যাক্। নায়ক জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই বাপ-মা হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়ে। তার এক কাকা তাকে নিয়ে মানুষ করেন। সেখানেই এক ক্যাথিড্রাল স্কুলে তার প্রথম শিক্ষা সুরু হয়। ছেলেমানুষটির একটি পা ছিল টান—সেই জন্য ইস্কুলের ছেলেদের ঠাট্টা ও ঘৃণার অত্যাচার সইতে হোত তাকে। সতের বছর বয়সে সে হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং একটি বছর সেখানে পড়াশুনা চলে। হিডেলবার্গে থাকার সময়ই তার কিশোর মনে শিল্পীর ঘুম ভাঙে।

লণ্ডনে ফিরে এক জন একাউণ্টেন্টের শিক্ষানবীশি করতে হয় তাকে কিন্তু সে কাজে তার মন বিদ্রোহ করে। কোন রকমে সেখানে এক বছর কাটিয়ে ছেলেটি পালায় প্যারিসে। সেখানে শিল্পে অধ্যয়ন সুরু করে। এই অধ্যায়টি এমন বাস্তব ভাবে বর্ণনা করেছেন মম তাঁর বইতে যে আমার কাছে তিনি স্বীকার করেন যে অন্ততঃ ঐটুকু অংশে কোন কল্পনার ছায়া পড়েনি তাঁর লেখায়।

এই সময় নায়কের কাকা মারা যান। তাকে ফিরে আসতে হয় ইংল্যাণ্ডে। সেখানে এক অপদার্থ মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম হয়। টাকা রোজগারের চেষ্টায় নায়ক তার স্বল্প মূলধন নিয়ে এক ব্যবসা ফাঁদে কিন্তু অচিরাৎ সে ব্যবসায় ফেল পড়ে। নায়ক কপর্দকহীন হয়। তখন থেকে সুরু হয় তার জীবন-সংগ্রাম। রুটি রোজগারের জন্য সর্বপ্রকার হীনতা সইতে হয় তাকে। ধীরে ধীরে তার মনের

সুস্থতার বিনাশ ঘটতে থাকে। সব কিছুর উপর এক বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস গাঢ় হয়ে ওঠে। যা হোক, অবশেষে আবার কপাল ফেরে। একটি পরিবারের সঙ্গে তার আলাপ হয়—তারা তাকে আশ্রয় দেয়। তাদের সাহচর্যে সে আবার দাঁড়ায়। শেষে সেই পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে নায়কের বিয়ে হয় এবং বইয়েরও যবনিকা পড়ে।

গল্পাংশ হোল এই অবধি। এর পর হোল বাস্তবাংশ। মমের বাবা প্যারিসে ব্রিটিশ দূতাবাসের আইনজীবি ছিলেন। সেই কারণে মমের ছেলেবেলা কেটেছিল প্যারিসে। আঠারশ' চুরাশি সালে তার বাবা মারা যান। মা গিয়েছিলেন তারও দু'বছর আগে। সেই সময় এক যাজক কাকার তত্ত্বাবধানে ছিলেন তিনি। ক্যাণ্টারবারিতে কিংস স্কুলে এবং পরে হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মম লেখাপড়া করেন।

এ এবধি গল্পে ও বাস্তবে চমৎকার সামঞ্জস্য আছে। গল্পের নায়কের পায়ের দোষ ছিল আর মমের আছে তোতলামি—যার জন্যে অবাধ আলাপ-আলোচনায় তাকে বড়ো বিব্রত হতে হয়। সুতরাং এই তোতলামির জন্য ছেলেবেলায় তিনিও যে সতীর্থদের ব্যঙ্গ-পরিহাসের পাত্র ছিলেন তা স্বাভাবিক। হয়ত সেই ছোটবেলা থেকে নিজের অক্ষমতায়' মনের মধ্যে জেগেছিল হীনমন্যতা—যা উত্তর কালে তার জীবনের উপর গভীর রেখাপাত করেছে।

মমের নায়ক গিয়েছিলেন একাউণ্টেন্সি শিখতে আর মম পারদর্শী হচ্ছিলেন চিকিৎসা-বিদ্যায়। অবসর সময় তাঁর কাটত লেখায়। আঠারশ' সাতানব্বই সালে ডাক্তারী পরীক্ষার শেষ—পরীক্ষায় পাশ করলেন। সেই বছরই তাঁর প্রথম উপন্যাস—'লিজা অফ ল্যামবেথ' প্রকাশিত হোল। এই সময় তাঁর মন দোটানায় পড়ল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান না শিল্পানুশীলন? তিনি মনস্থির করে প্রথম স্পেনে গেলেন (প্যারিসে নয়)—সেখানে তিন বছরে আরো কয়েকটি উপন্যাস লিখলেন। কিন্তু তার একটিও বাজার পেল না। তখন প্রায় সর্বস্ব খুইয়ে মম আবার ফিরে এলেন ইংল্যাণ্ডে বাঁধা চাকরীর খোঁজে। ভিক্টোরিয়ার কাছে ছোট্ট একটি বাসা নিয়ে তিনি পত্রিকা অফিসগুলির দোরে-দোরে ঘুরতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর ঘোরাই সার হোল। কোন প্রকাশকই তার বই নিতে রাজী হোলেন না। উনিশশ' চার! নৈরাশ্যে এত ভেঙে পড়েছেন তখন মম, তাঁর ইচ্ছা যে প্যারিসে পালিয়ে যান—সেখানে তার মত গরীব শিল্পী আরো অনেক আছে—তাদের মধ্যে তিনি একেবারে হারিয়ে যাবেন। বইতে তিনি প্যারিস-জীবনের নিখুঁত ছবিই এঁকেছেন। আমি শুধু সেই ছবিটিকে সম্পূর্ণ করবার জন্য আর্ণল্ড বেনেটের ডায়েরী থেকে ছোট একটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি।

—চায়ের আসরে এসে বসলেন মম। তার সমস্ত চেহারায় কেমন একটা নিস্তরংগতা। দু' কাপ চা খেলেন আনন্দ করে—তার পর তৃতীয় কাপের সময় এমন হাত গুটোলেন যে কোন কথাতেই আর এগোলেন না। অনেকগুলি বিস্কুটও খেলেন—বেশ লোভের সঙ্গেই খেয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি—তার পর এক সময় হঠাৎ থেমে···

এই সময় যখন মমের চতুর্দিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে তখন তাঁর নায়কের জীবনের মতই তাঁরও জীবনে এক আশ্রয়ের সুযোগ এল—অবশ্য এক সহৃদয় পরিবারের আকারে নয়। এই সময় ষ্টেজ সোসাইটি তাঁর নাটক—'এ ম্যান অফ অনার' মঞ্চস্থ করতে রাজী হলেন।

নিজের নাটক অভিনয় হবার প্রথম রাত্রে পেটে ক্ষিদে নিয়ে শূন্য পকেটে নাটকার মম বসেছিলেন বক্সে। নীচেকার হলে সমবেত লণ্ডনের উৎসাহী অভিনয় দর্শকদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন তিনি। অভিনয় চলার সময় তাদের ঘন ঘন করতালি ও উচ্চ কণ্ঠের হাসি শুনে মমের মনে পড়ল বহু দিন আগেকার কথা, যখন তাঁর 'লিজা অফ ল্যামবেথ' প্রকাশিত হয়ে জনসাধারণের চিত্ত জয় করেছিল। কিন্তু তার পর কত দ্রুততার সঙ্গে তারা ভুলেও গিয়েছিল তাঁকে। লেখক অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল কি না সে-কথা একবার ভুলেও ভাবেনি। তাঁর জীবনে আবার কি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে—সে-দিন ক্ষুধার্ত লেখকের মনকে এই সংশয়ই দিগখণ্ডিত করছিল।

কিন্তু এবার যশ রইল অচল হয়ে। তাঁর পুরানো ধূলি-মলিন নাটকগুলি মঞ্চস্থ হতে লাগল। একসঙ্গে তিনখানি নাটক লণ্ডনে প্রযোজিত হোল। সম্পাদকের দল ও প্রয়োজকের দল তাঁর বইয়ের জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। লণ্ডনের অভিজাতদের আসরে এই নব-আবিষ্কৃত সাহিত্য-রথীর ডাক পড়তে লাগল। তাঁর ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বাড়তে লাগল দিনে দিনে। কিন্তু মম সে-সব সামাজিক আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন না। তারা হতাশ হোল কিন্তু জানতেও পারলে না যে মমের মানসিকতা তখন এক ভিন্ন খাতে চালিত হচ্ছে। মম চাইছিলেন ভবিষ্যতের নিরাপত্তা।

ধীরে ধীরে অতি নিখুঁত ভাবে মম তখন টাকা জমাতে সুরু করেছেন যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো ক্ষুধা নিয়ে তাঁকে বাঁচতে না হয়, আর দোরে দোরে কাজের জন্য ঘুরতে না হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি বেশ কিছু সম্পত্তি করে ফেলেছেন। যুদ্ধের চার বৎসর তিনি তাঁর নিজের রাষ্ট্রের জন্য গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেন। নানা ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য সর্বত্র তিনি বিচরণ করতে
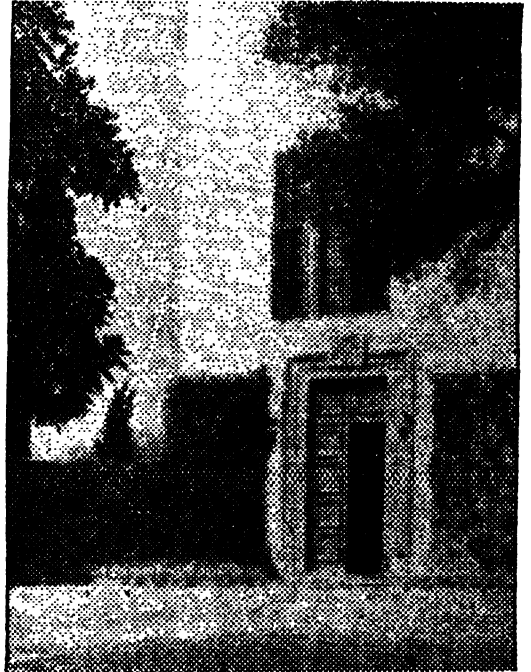
"ভিলা মস্কে"র সদর দরজার উপর যে রহস্যজনক চিহ্ন আঁকা রয়েছে, এই চিহ্ন মমের নোট বই, বইয়ের মলাট এমন কি ব্রিজ খেলার তাসে পর্য্যন্ত আঁকা থাকে।

পারতেন। এই সময় বহু দিন তিনি রাশিয়ায় কাটিয়েছিলেন। 'এ্যাসেনডেন' উপন্যাসে তিনি তাঁর সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন।

যুদ্ধের পর মম পৃথিবী দেখতে বেরোন। এই সময় মম তাঁর দু'টি চোখ খুলে রেখেছিলেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে তিনি প্রায় সর্বত্র ঘুরেছেন। 'ইষ্ট অফ সুয়েজ', 'বেইনস', 'দি লেটার', 'দে পেনটেড ভেইল', 'ক্যাসুয়ারিনা ট্রি', 'দি ন্যারো করনার'—এ সব বই তাঁর ভূ-প্রদক্ষিণের অভিজ্ঞতায় ভরা। নতুন ধরণের একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করেছেন।

তার পর হঠাৎ এক দিন ঘরের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি আবার ফিরে এলেন দেশে।

কিন্তু ইংল্যাণ্ড আর তাঁর ভাল লাগল না। উনিশশ' সাতাশ সালে দক্ষিণ-ফ্রান্সে এসে মম তার চিরস্থায়ী বাসা নিলেন। এখানকার প্রকৃতি তাঁর প্রিয়তমা। কখনো কখনো দেশে ফেরেন তিনি—যখন ব্যবসা তাঁকে ডাকে অথবা তাঁর নতুন কোন নাটক মঞ্চস্থ হয় লণ্ডনে।

মমের বাসার দরজায় একটি প্রতীক আছে। তাঁর লেখার কাগজে, তাঁর বইতে, মলাটে—এমন কি তাঁর ব্রীজের তাসে অবধি সেই প্রতীক থাকে। এই ধরণের প্রতীক ব্যবহার সম্বন্ধে মম কতখানি সংস্কারী তা অবশ্য তাঁর মুখ থেকে কখনো শোনা যায় না।

বাসাখানি তাঁর দুধের রঙের। অন্দরে-বাইরে সর্বত্র ঘুরে এলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অদ্ভুত মিলন চোখে পড়ে। বিশেষ করে প্রাচ্যের প্রতি তাঁর বিচিত্র আকর্ষণ।

নিজের পড়া-লেখার ঘর আছে তাঁর। সেখানে তিনি একবার দ্বার বন্ধ করলে আর কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না। এমন কি তাঁর সেক্রেটারী অবধি তাকে ডাকতে সাহস করে না। সেই ঘরে আসবাবের আতিশয্য নেই। আজো অবধি সেই পুরানো ওক কাঠের টেবিলে বসে তিনি লেখেন—বহু দিন আগে যে-টেবিলে বসে তিনি 'লিজা' লিখেছিলেন।

তাঁর লেখার টেবিলের পিছনের জানলা দিয়ে দেখা যায় পাহাড়। সেই জানলার একখানি পাল্লায় আছে একখানি গঁগের আঁকা ছবি। এখানি মম কি ভাবে সংগ্রহ করেছিলেন তার কাহিনীও অদ্ভুত।

মমের খুব ছেলেবেলার ছবি—কাকার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন।

গঁগে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন তাহিতি দ্বীপে। মম ঘুরে-ঘু[রে] এক সময় তাহিতিতে গিয়েছিলেন। সেই অপূর্ব শিল্পীর জীবন নি[য়ে] একখানি উপন্যাস রচনার মাল-মশলা খুঁজতে গিয়ে মম আবিষ্ক[ার] করলেন সেই কুঁড়ে—যেখানে গঁগে থাকতেন। সেই বাড়ীর দরজা[য়] শিল্পী একটি তাহিতি দ্বীপের সুন্দরী মেয়ের ছবি এঁকেছিলেন। মম সেই পাল্লাখানি খুলে নিয়ে এলেন। সেই বাড়ীর মালিকে[র] বিনিময়ে আর একখানি পাল্লা করিয়ে দিলেন। শিল্পীর একখা[নি] শ্রেষ্ঠ ছবি এক এক সময় গানের দামে বিকিয়ে যায় শোনা গে[ছে] কিন্তু দরজার বদলে বিকিয়ে যেতে এর আগে কেউ শোনেনি।

সারা দিনের মধ্যে সকালটুকু মম লেখার জন্য রাখেন। বা[কি] সময় বাগান দেখা, খেলা, পড়াশুনায় তাঁর বেশ কেটে যায়। বি[শেষ] ঝোঁক তাঁর টেনিস খেলায়।

মমের জীবন এক রহস্য। আত্মপ্রচারের জন্য মম একটু[ও] মাথা ঘামালেন না। নিজের অতীত জীবনের নৈরাশ্যের দি[কে] তাকিয়ে তিনি তাঁর সৎ জীবন যাপন করে যাচ্ছেন। সর্বপ্রকা[র] ভণ্ডামিকে তিনি ঘৃণা করেন আন্তরিক ভাবে।

নিজের নৈঃশব্দ নিয়ে মম সাহিত্য-জগতে রহস্যময় পুরুষ হ[য়ে] থাকতে চান।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে এলাহাবাদ দুর্গে রক্ষিত অশোক-স্তম্ভের আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসবের দিন চিত্রটি গৃহীত হয়। ছবিটি তুলিয়াছেন বারীন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

পৃঃ ৪১৯

সাহিত্য-পরিচয়

পৃষ্ঠা ৫০৪

আলোকচিত্র

পৃঃ ৪১৯

রঙ্গপট

৫১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

রঞ্জন

চার
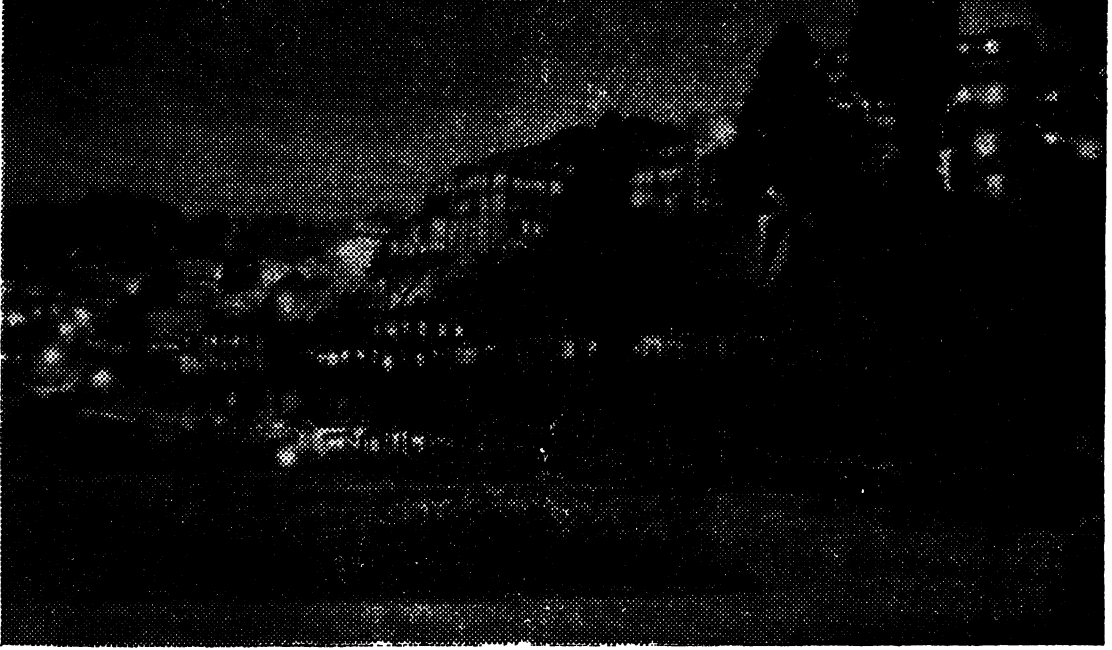
দীপান্বিতা রাত্রির অবসানে সূর্যোদয়ের পরে পুড়ে যাওয়া বাজী এবং নিবে যাওয়া প্রদীপগুলি যে করুণ দৈন্যের দৃশ্যের ছবি যাঁকে তার মর্মান্তিক প্রতিরূপ আছে পৌষের শেষের দার্জিলিঙে। মুখর উৎসবের স্তব্ধিত কলরব বিরহীর দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়ে জনহীন জনপদের শূন্য গৃহের রুদ্ধ বাতায়নে বৃথাই আঘাত করে ফিরছে। শরতের অতিথিরা বিদায় নিয়েছে, বসন্তের অতিথিরা আসেনি এখনো। বিগতের জন্যে নীরব বেদনা ও অনাগতের জন্যে অধীর প্রতীক্ষা, এই মিশ্রিত অনুভূতির আভাস আছে উতল হাওয়ার ব্যাকুল সুরে। আজকের দার্জিলিং তাই একেবারেই রিক্ত। এ যেন সকাল দশটায় ড্যালহৌসি স্কোয়ার থেকে ফিরতি ট্রাম—কিছুক্ষণ পূর্বেও যেখানে তিলধারণের স্থান ছিল না এখন সেখানে বিরাজ করছে অসহায় শূন্যতা। এ যেন দিনের বেলার নাইট ক্লাব, রাতের বেলার ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

এই শ্রীহীন বৈধব্যের করুণতম বিকাশ আছে ম্যাল নামক জায়গাটায়। দার্জিলিং শহরের এটা হৃৎপিণ্ড। কর্মক্লান্ত সমতলবাসী যখন বৎসরের নির্দিষ্ট পর্যায়ে সদলবলে এই শৈলাবাসে আরোহণ করেন, এই ম্যাল্ তখন নবরূপ পরিগ্রহ করে কর্মবীরদের অভ্যর্থনা-মানসে। ঋতুরাজ বসন্তের কাছে বর চেয়ে নেয় চিত্রাঙ্গদার মতো। তখন সকল ক্লান্তির সে যে বিশ্রামরূপিণী।

আমরা যারা ওল্ড টেষ্টামেন্টের প্রতিশোধপরায়ণ বিধাতার অভিশাপবশে স্বেদের বিনিময়ে অন্ন সংগ্রহ করি তারা এমন কথা শুনে হাস্য সম্বরণ করতে পারিনে যে সরকারী কর্মচারীদের আবার বিশ্রামের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে খেদ করে লাভ নেই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি আজ আর আইন আর শৃংখলা বিধানেই নিবদ্ধ নেই, তার দীর্ঘ বাহু আজ দীর্ঘতর হতে হতে ব্যক্তি-জীবনের বহু প্রশাখা পর্যন্ত প্রসারিত। কোনো দেশেই রাষ্ট্র আজ রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে ক্ষান্ত নেই, কোনো কোনো দেশে সে মনের আলো নিবিয়ে দেবারও ভার নিয়েছে।

কর্তব্যের বিস্তৃতি হওয়াতে কর্মের বৃদ্ধি হয়েছে কি না জানিনে কিন্তু কর্মীর ঘটেছে সংখ্যা-বৃদ্ধি। শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, শক্তি-বৃদ্ধি। নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে রাজকর্মচারীর প্রতিপত্তি আজ অপরিসীম, প্রচুরতম লোকের প্রভূততম কল্যাণসাধনের অছিলায় সে-প্রতিপত্তি আজ নিয়ত প্রসরমান। তা নিয়ে আজ আমাদের প্রতিবাদও বৃথা। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। তাঁর বদলে জার্মান দার্শনিক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করলেন। সে রাজত্বের সনদ রচনা করলেন অপর এক জন নির্বাসিত জার্মান। তৃতীয় এক জনের উপর ভার পড়ল সে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার। সেই সর্বক্ষম রাষ্ট্রকে স্থায়িত্বে অধিষ্ঠিত করতে চতুর্থ যে স্বয়ং নির্বাচিত নেতা তাঁর রক্তাক্ত হস্ত নিয়োজিত করলেন, তিনি প্রকাশ্য ভাবে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেছেন সত্য, কিন্তু তা সত্বেও প্রতি দেশেই অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে স্বনামে বা বেনামে বহু গুপ্ত বা প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠান। সে প্রতিষ্ঠানগুলির জনপ্রিয়তা অধিকাংশ দেশেই অত্যন্ত পরিমিত কিন্তু ওদের মতামতের সহজবোধ্য কয়েকটা বুলি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বহু সমাজের একাধিক স্তরে। পুনঃকথনের ফলে এ-ধারণা আজ বহুজনগ্রাহ্য হয়েছে যে রাষ্ট্রের

হাতে অধিক হতে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানই সকল সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান। এই বিশ্বাস আজ এতই ব্যাপক যে, যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি আজও রাষ্ট্র-স্বাধীন আত্মনির্ভর জীবনাদর্শে আস্থাবান তারা এ নিয়ে বিলাপ করলে বিলোপের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। আমাদের ভীরু অভিযোগ আজ তাই অরণ্যে রোদন মাত্র। বিকল্পে, পর্বতে।

ন্যূনতম কর্মের জন্যে উচ্চতম বেতনভোগী সরকারী কর্মচারী-বৃন্দ শরতের শেষে কর্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। রাষ্ট্ররথের রশ্মী আবার দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়েছে। দার্জিলিং মুক্তি পেয়েছে সেই উদ্ধত অভ্যাগতদের কবল থেকে। আজ আর অতিথির তুষ্টি-বিধানের দায় নেই। আবার দার্জিলিং আপনাতে আপনি সমাহিত হয়েছে। ম্যালের বেঞ্চিগুলিতে আজ আর সুখী দম্পতিদের প্রকোপ নেই, হিমালয়ের প্রতিনিধি কুজ্ঝটিকা হয়ে আবার তার জায়গা করে নিয়েছে সেখানে।

শুধু ম্যাল নয়, ম্যালের উচ্চতা থেকে যেদিকেই তাকাও কুয়াশা আর কুয়াশা। ভারী একটা দুশ্চিন্তার জগদ্দল পাথরের মতো, ভট্টয়ইয়েভস্কির গল্পের মতো, গভীর একটা শোকের মতো, কুয়াশা যেন তার অন্তহীন আয়তন নিয়ে চেপে আছে গোটা দার্জিলিঙের বুকের উপর। এ কুয়াশা যেন আদিকালের সৃষ্টির প্রথম জন্তু—এর চোখ নেই, কান নেই; আছে কেবল মস্ত একটা বিস্তৃতি। এর আবেগ নেই; কিছুতেই বিচলিত হতে জানে না, জানে শুধু গালে হাত দিয়ে ভাবতে। এর গতি নেই, মতি নেই; আছে শুধু স্থিতি, আছে শুধু ভার। আর আছে নিশ্ছিদ্র অনচ্ছতা। দু'হাত দূরের জিনিস দেখবার উপায় নেই, পুরোপুরি প্রসারিত করলে নিজের হাতকে নিজের বলে চিনতে কষ্ট হয়। আমি বসে আছি আমার বেঞ্চিটার এক প্রান্তে, অপর প্রান্ত কুয়াশার অন্তরালে অদৃশ্য। আমি এখানে একেবারে একা। আর কেউ থাকলেও দেখবার উপায় নেই। দৃষ্টি এখানে সম্পূর্ণ পরাভূত।

ফী ফ' ফাম্…

হঠাৎ একটা ক্ষীণ, স্তিমিত আলো অদূরে জলে উঠে পর মুহূর্তেই নির্বাপিত হোলো। কুজ্ঝটিজন্তুর এ যেন বিদ্রূপগর্ভ দন্তবিকাশ। ভীত বিস্ময়ে সমস্ত চেতনা আমার শিহরিত হয়ে উঠল। এর চেয়ে নিরবচ্ছিন্ন নিঃসংগতায়ও যে অনেক বেশী নির্ভয় বোধ করেছিলেম! তৎক্ষণাৎ উঠে যে আস্তানা অভিমুখে অগ্রসর হবো তারও উপায় ছিল না। শীতজর্জর দেহ অসাড় হয়েছিল পূর্বেই। ভয়ে এখন উত্থানশক্তির সর্বশেষ কণাটুকু যেন নিঃশেষিত হয়ে গেল।

আবার আলোটা জলে উঠে দপ করে নিবে গেল।

আমি দস্তানা দু'টো আরো জোরে টেনে অনাবৃত কব্জীটা ঢেকে দিলেম। তেমনি অনাবশ্যক ভাবে মোজা দু'টো বেঁধে নিলেম আরো শক্ত করে। গায়ের গরম জামাটার কলার তুলে দিয়ে ঘাড়ের দিকটার রক্ষার ব্যবস্থা করলেম। কিন্তু কিছুমাত্র নিরাপদ বোধ করলেম না।

আবার।

এবারে যেন আরো একটু কাছে। কুয়াশার কণাগুলি যেন কাঁটা হয়ে আমার গায়ে বিঁধতে থাকল। আমি ভয়ে চোখ বুজে রইলেম—যে-চোখ দেখতে পায় না, কাজ কি অমন চোখ খুলে রেখে? চোখ খুলতে হোলো কানের টানে। হঠাৎ নিঃসীম শূন্যতার মধ্য থেকে যে বীভৎস শব্দ ধ্বনিত হোলো তাকে মানববোধ্য কোনো ভাষ[illegible] অনুবাদ করলে শোনালো:

"গুড ঈভনিং!"

আমি যে তখনি তারস্বরে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চীৎকার ক[illegible] ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবন করিনি তার কারণ কণ্ঠ এবং পদদ্বয়ের পরি[illegible] নিষ্ক্রিয়তা। চীৎকার করলেও কেউ শুনতে পেতো এমন সম্ভাব[illegible] ছিল না। আমার দিক থেকে সামান্যতম চেষ্টা ব্যতিরেকেও আম[illegible] কণ্ঠ থেকে যে আর্ত স্বর নিঃসৃত হোলো 'শুভ সন্ধ্যা' আবাহনের অনু[illegible] বক্তা তাকেই আমার আন্তরিক প্রত্যুত্তর বলে ভ্রম করলেন বোধ হয়

"বসতে পারি এখানে?"

আমার ভীত নৈঃশব্দ্য প্রবাদ অনুযায়ী সম্মতি সূচনা করল।

একসঙ্গে বেদ, বাইবেল ও কোরাণের উপর হাত রেখে শ[illegible] করে বলতে পারি, আমার পার্শ্বে যে-বস্তুটি উপবেশন করল তা[illegible] জীবন্ত একটা মানুষ বলে মনে করবার কিছুমাত্র কারণ ছিল [illegible] অতিকায় একটা ওভার-কোট যেন এক-জোড়া প্যান্টালুনে চড়ে অ[illegible] ঘুরে শ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল। ম্যাজিকে ব্ল্যাক্ [illegible] দেখেছি, যাতে অসংখ্য জড় পদার্থ স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করে মঞ্চের উ[illegible] ঐন্দ্রজালিকের যষ্টির নির্দেশে। সূচীভেদ্য ধূসরতায় এ কে[illegible] যাদুক্রীড়া? হস্তপদযুক্ত এ কোন নিস্পন্দন প্রাণী?

প্রথম প্রাণের সন্ধান মিলল দীর্ঘ কতগুলি আঙুলের ধীর গতিশীলতায়। বাঁদুরে টুপিটা একটু সরলে যে বিকৃত, [illegible] মাংসপিণ্ড দৃশ্যমান হোলো, মানুষের মুখের সঙ্গে তার সা[illegible] সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ হয়নি, তার অবর্ণনীয় ভয়াবহতা স্পষ্টতর হ[illegible] মাত্র। বৃহদাকৃতি পরিচ্ছদের সহস্র ভাঁজের শূন্যতা থেকে এ[illegible] বুঝতে একটুও দেরী হয় না যে ওই পোষাকের গর্ভে অন্তত হি[illegible] পূর্ণাবয়ব মানুষের সুপরিসর স্থান হতে পারতো। বর্তমানে পোষাকের মধ্যে যে ছিল তাকে একটি মানুষ বললেও অতি-কথ[illegible] অপরাধ হবে। কম্পিত হস্তে একটা অর্ধসিক্ত সিগারেট এ[illegible] দিয়ে তিনি যা বললেন, দন্তহীনতাজনিত অবোধ্যতার জন্যে অর্থ উদ্ধার করা অসম্ভব হোতো যদি না তার ব্যাখ্যারূপে ক[illegible] হাতের মুদ্রা প্রত্যক্ষ হোতো।

"এটাকে ধরিয়ে দিতে পারো?"

এতক্ষণে বোঝা গেল এর আগে কেন আলো দেখেছিলে[illegible] আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার পকেট থেকে দেশলাইটা বের [illegible] অনাহূত আগন্তুকের সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করতে চেষ্টা কর[illegible] সিগারেট ধরাতে পারবার পূর্বেই দেশলাইর কাঠি নিবে গেল, সেই ক্ষণিক আলোতে ধূম-পিয়াসীর যে মূর্তি নিরীক্ষণ ক[illegible] তাতে মন একই সঙ্গে ভয়ে ও করুণায় ভরে উঠল।

ভদ্রলোক স্পষ্টতই ইংরেজ। উচ্চারণ-ভঙ্গী থেকে পূর্বেই অনুমান করেছিলেম, এখন আর সন্দেহ রইল না। এঁর [illegible] আসল দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটা ধারণা করবারও [illegible] ছিল না, কেননা তা বিস্তৃত ভাবে বক্র। সমস্ত মুখটা এমন [illegible] কুঞ্চনে ক্লিষ্ট যে তারও আসল চেহারাটা বোঝবার উপায় [illegible] বার্ধক্যের এমন স্পষ্ট বীভৎসতা, জড়তার এমন নগ্ন জীর্ণতা, স্থবি[illegible] এমন করুণ অসহায়তা এর আগে আর দেখিনি।

আমি আবার দেশলাই জ্বালিয়ে তাঁর সিগারেট ধরিয়ে

চেষ্টা করলেম। এবারেও হোলো না। আবারও না। যত বার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে, কেন না বৃদ্ধের দন্তবিহীন মুখ-গহ্বরে স্থিত সিগারেটের সামনে যেই মাত্র আলোটা এগিয়ে নিয়ে যাই অমনি সেই মুখ-নিঃসৃত বায়ুর ফুংকারে দেশলাই নিবে যায়, সিগারেট আর ধরানো হয় না। এমনি প্রায় দশ মিনিটের মর্মান্তিক প্রয়াসের পরে বৃদ্ধের শ্লথ হস্ত বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নৈরাশ্যমগ্ন কণ্ঠে বললেন, "থাক, হবে না!"

আমার গত জন্মদিনে পরিহাস করে বলেছিলেম, সাতাশ হলে না কেন এক শ' সাতাশ? আজ এই মুহূর্তে সে কথা সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাহার করলেম। ধূমপানের মতো সামান্য পিপাসা নিবৃত্তির সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত বার্ধক্যের এই মর্মন্তুদ অবস্থা দেখে অকাল-মৃত্যুকে পরম লোভনীয় মনে হোলো।

কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ্যের পরে মহাস্থবির আমার দিকে তাঁর লালাসিক্ত সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে! এটা তুমি মুখে দিয়ে ধরিয়ে দাও। আমার ওয়েস্ট-কোটের পকেটে বোধ হয় একটা হোল্ডার আছে, সেটা বের করে দিলে আমি তাইতে বসিয়ে সিগারেটটা খেতে পারি।"

সৌজন্য রক্ষার জন্য বৃদ্ধের সেই সিগারেটটা গ্রহণ করলেম বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর অলক্ষ্যে সেটা নিক্ষেপ করলেম বেঞ্চির অদৃশ্য পশ্চাতে। আমার নিজের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে দেবার আগে হোল্ডার অন্বেষণে উদ্যোগী হলেম।

ওভার-কোটটার বোতাম খুলতেই বৃদ্ধ এমন শিশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল যে আমি আর অগ্রসর হতে সাহস করলেম না। বৃদ্ধ ইঙ্গিতে জানাল যে, ও কিছু নয়! বুকের কাছটায় হাত দিয়ে আবার সেই ব্ল্যাক্ আর্টের চলন্ত কঙ্কাল প্রদর্শনের কথা স্মরণ হোলো। খান-কয় পাঁজর ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না বৃদ্ধের দেহে। মনে মনে বললেম, হায় ঈশ্বর, এ তোমার কেমন পরিহাস যে এমন অক্ষম বৃদ্ধকে কঠিনতম শীতের মধ্যে শৈলশিখরের নিঃসঙ্গতায় নির্বাসিত করে রেখেছ?

ধূমপান করে বৃদ্ধ যেন কিঞ্চিৎ শক্তি ফিরে পেল। প্রায় অশ্রুত-কণ্ঠে প্রশ্ন করল "তোমাকে দেখে তো এখানকার লোক বলে মনে হচ্ছে না। এমন অসময়ে এখানে কেন?"

দার্জিলিঙে অসময়ে অবস্থিতি নিয়ে বৃদ্ধের প্রশ্নে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বললেম, "এমনি এসেছি। কিন্তু তোমার এ-বয়সে তুমি এখানে পড়ে আছো কেন?"

বিকট হাসি হেসে বৃদ্ধ বলল, "আমি? আমি আবার কোথায় যাবো?"

"কেন, নিজের দেশে?"

"কুইট ইণ্ডিয়া?"

আমার প্রশ্নে রাজনীতির বাষ্পমাত্র ছিল না। কিন্তু আপন অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধের মনে ব্যথা দিয়েছি ভেবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেম, বুঝিয়ে বললেম, "রাজনীতি আলোচনা করব না তোমার সঙ্গে, তবে বিশ্বাস করো, তোমার দেশে যাওয়ার কথা বলবার সময় কেবল মাত্র তোমার বয়স ও দার্জিলিঙের আবহাওয়ার কথাই মনে ছিল, আর কিছু না।"

বৃদ্ধ আবার সেই হাসি হেসে বলল, "না না, কিছু মনে করিনি আমি। তা ছাড়া, আমাকে ভারত ছাড়তে বললেও তো ছাড়তে পারব না আমি। যাবো কোথায়?"

আবার সেই প্রশ্ন। আমি নিরুত্তর রইলেম। জানতেম যে বৃদ্ধ তার প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেবে।

"আচ্ছা, পঁয়ষট্টি বছর একটা দেশে থাকলেও সে-দেশ স্বদেশ হয় না?"

বৃদ্ধের সঙ্গে তর্ক করবার কিছুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু মনে মনে ভাবছিলেম সদ্য-সমাপ্ত ইঙ্গ-ভারত সম্বন্ধের কথা। প্রায় দু'শো বছর ধরে দু'টো জাতি পরস্পরের কাছ থেকে এত নিল, এত দিল; কিন্তু এক দিনের জন্যেও কেউ কাউকে আপন করে জানল না। দু'জনে রইল দু'জনের নির্দিষ্ট দূরত্বে। এক জন রইল আপন অপমানাহত বিদ্বেষ নিয়ে, অপর জন রইল তার দর্প আর দম্ভ নিয়ে। একবারও কেউ কাউকে বন্ধুভাবে পেতে চাইল না, বুঝতে চাইল না পরস্পরকে! দু'শো বছরের দেয়া-নেয়ার পরেও দু'জনে রয়ে গেল দু'জনের কাছে একান্ত অপরিচিত।

কবি-কথিত ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে ইংরেজ আজ ভারতের শাসন-ভার পরিহার করতে বাধ্য হয়েছে। শাসক-শাসিত সম্বন্ধের ঘটেছে সমাপ্তি। মহাসমারোহে আমরা সমাধি দিয়েছি প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটার ঘৃণ্য ইতিবৃত্ত। ক্ষমতা হস্তান্তরকালে উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের ওজস্বিনী বক্তৃতায় ধ্বনিত হয়েছে পরস্পরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন। কিন্তু এই সমস্ত রাজনৈতিক বক্তৃতা—সংবাদপত্রের শিরোনামায় যেগুলি ঐতিহাসিক বলে বর্ণিত হয়—মহাকালের পাতায় সেগুলির অবস্থিতি বড়ো সাময়িক, চিরন্তনীর পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির মূল্য বড়ো অকিঞ্চিৎকর। কালস্রোতে সেগুলি ভেসে যায় বড়ো সহজে। তার পরে বাকী রইবে কি? দু'শো বছরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের এমন কি থাকবে যা দু'জাতি স্মরণ করতে পারবে মধুর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে?

একেবারে কিছু না! ওরা মনে রাখবে, কুইট ইণ্ডিয়া। আর আমাদের স্মৃতিতে রক্ত ক্ষরবে জালিনওয়ালাবাগ।

এই ভুল বোঝায় দোষ নেই কারোই। অর্থাৎ দোষ দু'পক্ষেরই। বৃটেন ভারতকে শাসন করেছে, ভারতীয়গণ বৃটিশ জাতি কর্তৃক পদানত হয়েছে। অর্থাৎ, একটা দেশ আরেকটা দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে, একটা জাতি আরেকটা জাতিকে শোষণ করেছে। অর্থাৎ, দেশ নামক একটা প্রত্যয়ের নামে বৃটিশ নামক একটা লোকসমষ্টি এমনিতর আরো দু'টো অস্পৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ ধারণার উপর জয়লাভ করে মিথ্যা গর্বে স্ফীত হয়েছে। এক জাতি অপর জাতিকে অবজ্ঞা করেছে, এক দেশ অপর দেশকে ঘৃণা করেছে। ব্যাপারটা আগাগোড়াই জেনারালাইজেশন্। কিন্তু জীবন্ত এক জন বৃটন তার জাতি, দেশ, বর্ণ ইত্যাদির কথা বিস্মৃত হয়ে যখনই মানুষ হিসাবে জীবন্ত এক জন ভারতীয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই দেখা গেছে যে দু'জনের কেউই মনে রাখেনি বিজয়ের অভিমান বা পরাভবের গ্লানি। একক ব্যক্তি রূপে, মানুষ রূপে, যখনি দু'জনে মিলেছে তখনি দু'জনের মিল হয়েছে, সকল বিরোধ অপনীত হয়েছে অন্তরতম পরিচয়ে।

নখদর্পণে যাঁরা বিশ্বরূপ-দেখতে পান, একটি মাত্র বাক্যে যাঁরা একটা গোটা জাতির চরিত্রের পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন, তাঁদের সর্বজ্ঞতায় সন্দেহ করি না। কিন্তু আমি রাজনৈতিক নই। সমষ্টির নেতৃত্ব করা আমার পেশা নয়। আমার পরিচয় পৃথক পৃথক বিভি

ব্যক্তির সঙ্গে। বহু ঠেকে শিখেছি যে সেই সাধারণ সূত্রগুলি কী মারাত্মক রকম ত্রুটিপূর্ণ। আজ আর তাই বলিনে যে, 'ও। ইংরেজ জাতটাই অমন। কেন না আমি দেখেছি পঞ্চাশের মন্বন্তরে বৃটিশ সৈনিক স্বেচ্ছায় তার রেশনের অংশ দিয়েছে একান্ত অপরিচিত ভারতীয় বুভুক্ষুকে।' সাহস করে এমন কথাও আর বলতে পারিনে যে নারী জাতিই অমন বা তেমন; কেন না অমন যদি দেখে থাকি দু'জন, তেমন দেখেছি আধ ডজন।

একান্ত অক্ষম যে বৃদ্ধ আমার পাশে বসে করুণ কণ্ঠে পঁয়ষট্টি বছরের অবস্থিতির কথা নিবেদন করে নাগরিকতার আবেদন জানিয়েছে, একবারও তাকে শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে পারলেম না। এক মুহূর্তের জন্যেও এমন কথা মনে ঠাঁই পেল না যে এরই ভাই কলকাতায় গুলী চালিয়েছে, হিজলীতে ঘর জ্বালিয়েছে। সকল ঘৃণা, সকল বিদ্বেষ, সকল অভিযোগ নিমেষে কোথায় ভেসে গেল। মনে রইল শুধু অশ্রুসিক্ত অনুকম্পা। বার্ধক্যের কি বর্ণবৈষম্য আছে? না, দুঃখের আছে জাতিভেদ?

বৃদ্ধের কাছে একটু এগিয়ে বসে বললেম, "তোমার বয়সে এই ঠাণ্ডা কি ভালো?"

হঠাৎ দস্তানা থেকে হাত বের করে বৃদ্ধ তার হিমশীতল আঙুলগুলি রাখল আমার অনাবৃত মুখের উপর। আমি কেঁপে উঠতেই প্রবল হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "কেমন, খুব ঠাণ্ডা তো? ঠাণ্ডা হাতের মানে কি জানো?"

আমি প্রশ্নটার তাৎপর্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না করতে পেরে বললেম, "কী আবার? তোমার হাত ঠাণ্ডা মানে তোমার হাত গরম নয়!"

"হোলো না, হোলো না। কোল্ড হ্যাণ্ড্‌স্ মীন ওয়ার্ম হার্টস্। যার হাত যত ঠাণ্ডা, হৃদয় তার তত উষ্ণ।"

"তাই নাকি!" আমি তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গের শেষ করতে চাইলেম। হৃদয় নিয়ে আলোচনায় 'অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি!'

হঠাৎ কণ্ঠের লঘুতা পরিহার করে বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে স্বগতোক্তির মতো বলল, "এই দারুণ শীতেও যে এখানে এই শরীর নিয়ে আজো বেঁচে আছি সে তো এই হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়েই।"

প্রথম শৈশবের মতো দ্বিতীয় শৈশবেরও বৈশিষ্ট্য এই যে প্রকাশে তার আনন্দ। দু'য়েরই ধর্ম বাচালতা। আমি শৈশব বহু কাল ছাড়িয়ে এসেছি, বার্ধক্যে পৌছোতেও কিছু দিন বাকী। তার উপর শিখেছি যে কৌতূহল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিকতা-সম্মত নয়। আমি চুপ করে রইলেম।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ বলল, "আমার নাম কলিন, আর্থার কলিন।"

আমিও যথারীতি আমার নাম নিবেদন করলেম। কিন্তু তার বেশী নয়। অপর পক্ষ পাশেই উপবিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্যে অতি কাছের মানুষও হয়েছিল অদৃশ্য, নিকটও হয়েছিল দূর।

আমার অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্যে বৃদ্ধের বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বলল, "তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছিনে এই ভালো। জানি কাছে বসে আছো, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিনে।"

বৃদ্ধের দুর্বোধ উক্তিতে আমার রূপের প্রশংসা নিহিত ছিল না, কিন্তু তবু আমি পরিহাস করে বললেম, "সে জন্যে আপনার অনুশোচনার কারণ নেই। আপনি জানেন আপনি কি হারাইতেছেন।"

কলিন আমার রসিকতা উপেক্ষা করে আপন মনে বলে চলল, "না দেখার সুবিধে এই যে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী যাকে খুশী কল্পনা করে তার সঙ্গসুখ উপভোগ করতে পারো। আমি তো দিনের বেলায় চোখ খুলিনে, চোখ খুলি অন্ধকারে, যখন কিছু দেখা যায় না!"

"বিধাতার দেওয়া চোখ-জোড়ার এটা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার নয় নিশ্চয়ই।"

"বোধ হয় না। কিন্তু বিধাতার দেওয়া কল্পনাশক্তির এটা শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হতে পারে। সাধারণ ছেড়ে বিশেষের কথা বলি। আমার কথা ভাবো। চোখ দু'টো দিয়ে এমনিতেই ভালো দেখতে পাইনে। তাছাড়া যাকে দেখতে চাই তাকে তো চোখ দিয়ে দেখবার আর উপায় নেই।"

ভাবলেম বৃদ্ধ বুঝি ঈশ্বরের কথা বলছে, বললেম, "তোমাদের নিরাকারবাদের ওই অসুবিধে।"

"না, ঈশ্বরের কথা বলছিনে। বলছি নশ্বরবাদের কথা। মানুষ কত সহজে মরে যায়!" বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি বলতে পারতেম যে মানুষ জীবনের কত কঠোরতা সত্ত্বেও মরে না। বলতে পারতেম যে আমার চোখের সামনেই এমন এক জন ছিল যার পক্ষে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া কত কম বেদনাদায়ক হোতো। কিন্তু কিছু না বলে চুপ করে রইলেম। জড়ীভূত কুয়াসারই মতো।

কলিন আপন মনে বলে চলল, "জানো, এই দার্জিলিঙের জমির প্রতি ইঞ্চিতে জড়ানো আছে আমার জীবনের কোনো না কোনো স্মৃতি যা কোনো দিন ভুলতে পারব না। মরে না যাওয়া পর্যন্ত। এক দিন নয়, দু'দিন নয়। পঁয়ষট্টি বছর। মাঝে কয়েক বার দেশে গেছি কিন্তু সে অনেক দিন আগে। উনিশ শ' পঁচিশের পরে আর দার্জিলিং ছাড়িনি। আর কোনো জায়গা ভালোই লাগে না।"

'নিজের দেশও না?"

"নিজের দেশ কাকে বলো? বিশ বছর বয়সে দেশত্যাগী হয়ে ভারতে এসেছিলেম ভাগ্যান্বেষণে। ভাগ্যকে দোষ দিতে পারিনে। জীবনকে ভোগ করেছি মত্ত নাবিকের মতো। কিন্তু ইংল্যাণ্ডকে দেশ বলে অস্বীকার করেছিলেম সেই ধোঁয়াটে সকালে যেদিন ইংল্যাণ্ডের মাটি থেকে পা তুলে জাহাজে উঠলেম। নিজের দেশ ছাড়লেম, পরের দেশও নিজের করতে পারলেম না! না, দেশ বলতে আমার আর কিছু নেই! নিজের বলতে আছে শুধু ছ'ফিট জমি। সে এখানে, এই দার্জিলিঙে।"

বৃদ্ধের ভাব সুচিন্তিত, তার ভাষাও সুবিন্যস্ত, কিন্তু দন্তশূন্যতা-জনিত ধ্বনি-বিকৃতির জন্যে সহজবোধগম্য নয়। ভাব-বাহুল্যে উচ্চারণ আরো বিকৃততর হোলো। কলিন যে কাঁদছিল তা না দেখতে পেলেও জানতে আমার বাকী ছিল না। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেম। পরিচয়ের অগভীরতার প্রশ্ন বাদ দিলেও আমি এমন কি বলতে পারতেম যা থেকে বৃদ্ধের অশান্ত হৃদয় সামান্যতম সান্ত্বনা লাভ করতে পারতো? টলষ্টয়ের গল্পে ছ'ফিট জমির কথা পড়েছিলেম, অতএব অনুবৃত্তিটা অজ্ঞাত ছিল না। নিতান্ত সাধারণ ভাবে, লঘুতার প্রয়াস করে বললেম, "সে ছ'ফিট জমি সকলেরই আছে। তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তুমি এখনকার এই প্রাণান্তকর শীতের হাত থেকে পালিয়ে আর কোথাও গেলে সেখানেও অত টুকু জমির অভাব হবে না। অনায়াসে মিলে যাবে।"

"আমার কথা ভাবছিলেম না। ভাবছিলেম তার কথা যার ছ'ফিট জমি এখানে এগারো বছর আগেই মিলে গেছে।" কথা-গুলির মধ্যে এমন একটা অপরিমেয় বেদনার ও নৈরাশ্যের সুর ছিল যে সেগুলি আমার পাশের কলিন বলছিল, না কি কবরের তলা থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল, জানবার উপায় ছিল না।

এত শীতে আমি অভ্যস্ত নই। ভয় ছিল, পাছে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়ি। কলিনের জন্যে করবার কিছু নেই, কী হবে তার দুঃখের কথা শুনে? এমনিতে আমার নিজেরই মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। সকল কৌতূহল দমন করে বললেম, "আমি কিন্তু উঠব এবার।"

"আমিও। আমার শরীরটা যেন ঠিক ভাল লাগছে না! একটু পৌঁছে দিয়ে যেতে পারবে আমাকে?"

না বলবার উপায় ছিল না। বৃদ্ধের হোল্ডারে আরেকটা সিগারেট পরিয়ে দিয়ে নিজে একটা পান করতে করতে বললেম, "চলো।"

অশীতিপর আর্থার কলিন অক্ষম দেহটাকে কোনো-ক্রমে তুলে অতি ধীর পদক্ষেপে আমার সঙ্গে পথ চলতে থাকল। তার গমনের গতিতে আমার শংকার আর সীমা রইল না। কত দূর এর বাড়ী? এত আস্তে গেলে পৌঁছোতে লাগবে কতক্ষণ? এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এখানকার পথ-ঘাট আমার অচেনা। তার পর আমি নিজে ফিরব কী করে আমার আবাসে?

বৃদ্ধ বলল, "বাঁ দিকে চলো। ঐ দিকে আমার বাড়ী।"

আমার যাওয়ার কথা ডান দিকে। কিন্তু বৃদ্ধের আদেশ অমান্য করব এমন সাধ্য ছিল না। পথক্রমণ সহনীয় করবার জন্যে পুরানো উপদেশের পুনরাবৃত্তি করলেম, "আমার কিন্তু মনে হয় তোমার এখন আর কোনো জায়গায় থাকলেই ভালো।"

"আমার বাগানের ম্যানেজিং এজেন্টরাও তাই বলেছিল।"

"তুমি এখানে চায়ের প্ল্যাণ্টার বুঝি?"

"এখন আর নই। পনের বছর আগে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তখনও আমি অত্যন্ত কর্মক্ষম ছিলেম। তবু কলকাতার 'কর্তা'রা ছাড়িয়ে দিল নানান্ বাজে অজুহাতে। আসল কারণটা অবিশ্যি কাউকে বলবার উপায় নেই!" অর্থাৎ, তুমি জিজ্ঞাসা করলে তোমায় বলতে পারি কানে কানে।

"তোমার মতো অভিজ্ঞ লোককে বাজে কারণে ছাড়িয়ে দেওয়া তো ওদের ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচায়ক নয়!"

"অভিজ্ঞতার প্রশ্নটাই অবান্তর হয়ে গিয়েছিল। আমার অপরাধ ছিল আরো মারাত্মক।"

কলিন ওই পর্যন্ত বলে থামল। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলেম যে আমার দিক থেকে আরেকটু জিজ্ঞাসার উৎসাহ পেলেই বৃদ্ধের কাহিনীর অবশিষ্টাংশ সবিস্তারে উদ্‌ঘাটিত হবে। একটু হেসে বললেম, "অপরাধ আবার কী?"

"বললে বিশ্বাস করবে না। বলবে, পনেরই অগস্টের পরে বুড়ো পাপী কোট উল্টে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছে। কিন্তু বিশ্বাস না করলেও কথাটা সত্যি। আমার বাগানে একটা ষ্ট্রাইক্ হয়েছিল, মজুরি আর থাকবার জায়গা নিয়ে। হেড কোয়ার্টার্স থেকে হুকুম এলো, বাগান বন্ধ করে দাও, কুলী-লাইন থেকে সবাইকে বের করে দাও। রেশনের দোকানে তালা দিয়ে দাও। অর্ডারস্ আর অর্ডারস্! তাই করা হোলো। উঃ, সেদিনটার কথা ভুলতে পারব না কোনো দিন! আমার আদেশে এই নেপালী দারওয়ানরাই জোর করে বের করে দিল নেপালী কুলীগুলোকে। ভুটানী দালালরাই বন্ধ করে দিল সবগুলো মুদি দোকান। থালা-বাসন, জামা-কাপড়, যা কিছু সামান্য সম্পত্তি ছিল ওদের, সব ছুঁড়ে ফেলে দিল আবর্জনার মতো। এতগুলি লোকের এতখানি কষ্ট আর দেখিনি আগে। তার মধ্যে শিশু ছিল অন্তত একশ' জন—তিন থেকে পাঁচ বছর। আর ছিল তিনটি মেয়ে। সেদিন ছিল তাদের প্রসবের দিন।"

উত্তেজিত কণ্ঠে এত কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একটু থামল। আমি আরেকটা সিগেরেট দিয়ে বললেম, "তুমি তো ওদের হুকুম ঠিকই মেনেছ। তোমার আবার অপরাধ হোলো কোথায়?"

"তবু হোলো। সে রাত্রে আমার স্ত্রী সেই মেয়ে তিনটিকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলো। তাদের সেবা করল নিজ হাতে, রাত জেগে। সাত দিন ধরে চলল অক্লান্ত সেবা। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কোনো দিকে হুঁস নেই। সেবারতা নোরার সেই চেহারা আজো চোখের সামনে ভাসছে।"

একটু থেমে বলল, "এই সেবার খবরটা কলকাতার বড়ো কর্তাদের কানে উঠেছিল। তার দিন পনের পরেই বরখাস্তের চিঠি এলো। বলল, পেন্সন্ পাবে, দেশে যাওয়ার ভাড়া পাবে, এক্ষুনি দার্জিলিং ছাড়তে হবে।"

বৃদ্ধের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। পথ আর কতটা বাকী ছিল জানি না, কিন্তু তার চলবার শক্তি যে শেষ হয়ে আসছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল না। আর্থার কলিন তার অবসন্ন হাতটা আমার স্কন্ধে স্থাপন করে তার উপর ভর করল। এই ভরের তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমি সাধ্য মতো বৃদ্ধকে বয়ে নিয়ে চলতে থাকলেম শামুকের গতিতে।

কিছুক্ষণ পরে বললেম, "তখন পেন্সন্ নিয়ে চলে গেলেই পারতে।"

"ইচ্ছেও ছিল না, উপায়ও ছিল না। আগেই বলেছি, দেশের পাট চুকিয়ে দিয়েছিলেম বহু দিন আগেই। ও-দেশকে আর নিজের দেশ বলে মনেই হোতো না। শেষের দিকে যত বার গেছি, ভালো লাগেনি মোটে। জন্মভূমি থেকে আমার স্বেচ্ছা-নির্বাসনটা কেবল দৈহিক হয়নি, মানসিকও। তার উপর তখন সেই অমানুষিক সেবার পরেই নোরা নিজে পড়ল অসুখে!"

হঠাৎ পথের কিছু-একটায় হোঁচট খেয়ে কলিন পড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারে কিছু দেখবার উপায় ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে ধরে বৃদ্ধের পতন নিবারণ করলেম। তার সশব্দ নিশ্বাসের অবিশ্রান্ত দ্রুততা থেকে এতটুকু সন্দেহ রইল না যে এই স্থবিরের মৃদুতম পদস্খলনও পতন ও মূর্ছা হবে না, হবে পতন ও অনিবার্য মৃত্যু!

আবার পথ চলতে থাকলেম। একবার উঁচু, একবার নীচু। কিন্তু পথটার যেন শেষ নেই। আমাদের গতির মন্থরতায় পথ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকল। কলিনের অবস্থার এমন সান্নিধ্যে থেকে আমার নিজের বাড়ী ফেরবার কথা চিন্তা করবার সময় ছিল না।

কিছু দূর যাওয়ার পরে বৃদ্ধ আবার কথা বলার সামর্থ্য লাভ করল। অসুস্থা পত্নীর কাহিনীর সূত্রটি তুলে নিয়ে বলল, "নোরার কী যে অসুখ করল আজো জানিনে। আর, অসুখের ডাক্তারি নামটা জানলেই কি, না জানলেই কি। যে যাবার সে ঠিক গেলই!"

কলিন কাঁদছিল। শিশুর মতো। অসহায়, পথ-হারিয়ে-যাওয়া শিশুর মতো।

আমি কলিনের কেউ নই। তার সঙ্গে আমার পরিচয় পুরো একটা বেলারও নয়। আমি দেশপ্রেমিক ভারতীয়, আর কলিন আমার গতকল্যকার শাসক-জাতির অংশ। তার সঙ্গে আমার স্বাভাবিক সম্বন্ধ অবিমিশ্র সৌহার্দ্য-সমন্বিত হওয়ার কথা নয়। কলিন আর আমার বয়সের ব্যবধানও দুস্তর। কিন্তু যে লোকটি একেবারে অসহায় ভাবে আমার কাঁধে ভর করে পথ চলছিল, এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে বিদেশী বলে মনে করতে পারলেম না। পঁচাশি বছরের ভূতপূর্ব প্ল্যাণ্টার আর্থার কলিনকে মনে হোলো একান্ত আপন জন বলে, সখা বলে, বন্ধু বলে। তার দুঃখ আমার দুঃখ হোলো।

অশ্রু মুছে কলিন বলল, "নোরা এই দার্জিলিংকে ভালোবাসত প্রাণ ভরে। এক দিনের জন্য আর কোথাও গেলে হাঁপিয়ে উঠত। দার্জিলিঙের প্রত্যেকটা ঘাসের সঙ্গে তার ছিল নিবিড় পরিচয়, প্রতিটি ধূলি-কণার সঙ্গে ছিল হৃদয়ের যোগাযোগ। নোরা মরে গেছে বলেই কি তার সকল সম্পর্কের শেষ হয়ে গেছে ওই মেঘগুলোর সঙ্গে, ওই দেবদারু গাছটার সঙ্গে? কিছুতেই মানব না অমন কথা। কিছুতেই বিশ্বাস করব না যে মৃত্যুর মতো একটা সামান্য ঘটনা সব কিছু ধুয়ে-মুছে শেষ করে দিতে পারে। নোরা মরেনি। সে বেঁচে আছে এখানে, এই দার্জিলিঙে। তাই আমিও বাকী ক'টা দিনের জন্যে পড়ে আছি এই দার্জিলিঙে। প্রাণপণে নোরার স্মৃতি আঁকড়ে!"

বৃদ্ধ-কথিত 'দিন ক'টা' যে নিতান্তই স্বল্পসংখ্যক হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তবু বললেম, "যে চলে গেছে, সে তো গেছেই। তুমি তবু এই শত সহস্র স্মৃতির হাত থেকে পালিয়ে গেলে হয়তো বা ভুলতে পেরে একটু শান্তি পেতে।"

"নোরাকে ভুলব? নোরাকে ভুলে শান্তি পাবো? অমন শান্তি চাইনি তো। নোরার স্মৃতি ভুলে স্বর্গসুখও চাইনে। নোরার মৃত্যুর কথা চিন্তা করে যে ব্যথা পাই, মানুষের জীবনে এমন কোনো আনন্দ নেই যা সেই ব্যথার তুলনায় লোভনীয়। সেই ব্যথাই আমার ভালো। সেই ব্যথাই আমার ভালো।"

আর বলবার শক্তি ছিল না বৃদ্ধের। প্রয়োজনও ছিল না।

আমিই বা কী বলতে পারতেম? যে লোক ভুলতে চায় না তাকে মন-ভোলানো সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে লাভ কী?

পথ আর বেশী বাকী ছিল না। দার্জিলিঙের অন্যান্য বহু বাড়ীর মতো সাধারণ একটা দোতলা বাড়ীর সামনে পৌছোতে বৃদ্ধ ইঙ্গিতে জানাল যে এটাই তার বাড়ী। প্রবেশ-পথ এবং সিঁড়িটা ছিল একেবারে অন্ধকার। প্রতি পদক্ষেপ অনুভব করতে করতে কলিনকে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেম। কাঠের সিঁড়িগুলিতে আমাদের দু'জনের জুতোর শব্দ মরণ-দেবতার পদধ্বনির মতো ভয়াবহ হয়ে আমার কানে বাজছিল। সিঁড়ি বাওয়া বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হোলো। সে আমার কাঁধের উপর আরো জোর দিয়ে ভর করল।

শববহনে আমার অভিজ্ঞতা নেই। জানিনে মৃত্যুর পরে মানুষের ওজন বাড়ে কি কমে। কিন্তু আর্থার কলিনের বয়োভারাক্রান্ত দেহটাকে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে বহন করে যখন উপরের দরজা পর্যন্ত পৌছে দিলেম তখন আর আমার কোনো কিছু করবার মতো দেহের বা মনের অবস্থা ছিল না। "গুড নাইট" বলে বৃদ্ধ দুর্বল হস্তে দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হওয়া মাত্র আমি আবার সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলেম।

সর্বনিম্ন সিঁড়িটায় পদার্পণ করা মাত্র হঠাৎ উপর থেকে কানে এলো একটা অদ্ভুত শব্দ। কারো পড়ে যাওয়ার শব্দ যেন।

কিছুতেই সাহস পেলেম না উপরে উঠে দেখতে গিয়ে যে কী হয়েছে। আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ত্রস্তপদে ওই বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে পড়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেম সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মৃত্যুশীতল সায়রে। [ক্রমশঃ।

"নূতন সংবাদ"

গত সংখ্যায় আমরা 'বামাবোধিনী' পত্রিকা হইতে "নূতন সংবাদ" আহরণ করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিয়াছি, এইবার 'বঙ্গমহিলা' হইতে কিঞ্চিৎ দিলাম। মাঃ বঃ।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম যে, আগামী শীতঋতুর প্রারম্ভে ভারতেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামান্যবর প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, (আমাদিগের ভাবি রাজা) সস্ত্রীক ভারতবর্ষে শুভাগমন করিবেন।

মান্দ্রাজের এগ্‌মোর নগরে শ্রীমতী পি, সি, রাজভিয়া সেটীর বাটীতে মান্যবর শ্রীমতী হবার্ট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাজভিয়া জাতিভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বামীর সহিত গত বৎসর বিলাত গমন করিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

মাইমনসিংহের অন্তঃপাতী কৃষ্টগঞ্জের থানার অধিকাংশ পল্লিগ্রামে ভয়ানক ঝড় হওয়াতে তথাকার গরিব প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, একারণ বশতঃ শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী তাঁহার প্রজাগণের তিন মাসের খাজনা মাপ করিয়াছেন।

অযোধ্যায় রসুলপুর নামক গ্রামে সম্প্রতি একটি ভয়ানক সহমরণ হইয়া গিয়াছে। বিলাসী নামা এক জন ব্রাহ্মণ স্ত্রী এই দুঃসহ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বিলাসী স্নানান্তে উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিয়া স্বামীর মৃত দেহ ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক চিতার মধ্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দেবর পুত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে তিনি স্বহস্তে চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করিলেন। চিতা প্রজ্বলিত হইল এবং ক্রমে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল তথাপি পতিপ্রাণা বিলাসী মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও কোন কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তিন ঘণ্টা দাহর পর চিতা নির্ব্বাণ হয় এবং নির্ব্বাণ হইলে দেখা গেল পতিপ্রাণা রমণীর শরীর তাঁহার স্বামীর মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত হইয়াছে। পোলিস এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিলাসবতীর আত্মীয় স্বজন প্রায় ৩০ জনকে আবদ্ধ করে এবং তাহারা এক্ষণে বিচারাধীন রহিয়াছে।—(বঙ্গমহিলা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২)

পত্রগুচ্ছ

বাগ্মিবর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিধবা-বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলনার্থে ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তিনি কিছু টাকা লইয়াছিলেন। কিছু কাল পরে দুর্গাচরণ বাবু অর্থাভাবে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া একখানি পত্র লেখেন :—

"তুমি এতৎসহ প্রেরিত পত্র হইতে জানিতে পারিবে যে, আমার ঋণের ব্যাপার বিপদের আকার ধারণ করিয়াছে, আর বিলম্ব চলিবে না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণভারে কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ডাক্তার বাবুর পত্রের উত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই অতি স্পষ্টভাবে নিজের অবস্থা ও উৎসাহশীল বন্ধুগণের আচরণে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে।

"আমি ক্রমাগত কয়েক দিনই চেষ্টা করিলাম কিন্তু তোমার কাগজ খোলাসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবা-বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবা-বিবাহ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্যদান অঙ্গীকার করিয়াছেন তদ্দারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক, কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছেন না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এক-কালীনের অর্দ্ধ মাত্র দিয়াছ অবশিষ্টার্দ্ধ এ পর্য্যন্ত দাও নাই। এবং কিছু দিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্ব্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমি এই ঋণ-পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না এ জন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা-বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম! দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে-প্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না।

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"

বিধবা-বিবাহের আয়োজনে যাঁহারা আনন্দে দিশাহারা হইয়াছিলেন এবং লোকবল ও অর্থ সাহায্যের আশা দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে অধিকতর প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এরূপ এক জন ধন-কুবেরের একখানি পত্রের কিয়দংশ এখানে প্রদত্ত হইতেছে :—

"আপনি যে চাঁদার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এত দিন পাঠাইতাম, কেবল আমি ও আমার সহোদরগুলির মধ্যে পরস্পর মত-বিরোধ নিবন্ধন পাঠান হয় নাই। তাঁহারা বলেন, বিধবা-বিবাহ কার্য্যের যেরূপ মৃদুমন্দ গতি, তাহাতে কোন প্রকার সুফলের প্রত্যাশা করা যায় না। যদিও আমি এরূপ কার্য্যে দীর্ঘকালের জন্য নিযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এ বিষয়ে আমার বিবেচনানুসারে চলিতে এইরূপ বাধা পাওয়াতে এবং তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী

এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে তত ইচ্ছা না থাকায়, আমি গভীর দুঃখের সহিত বিধবা-বিবাহ বিষয়ের সংস্রব ত্যাগ করিতেছি। ভরসা করি, আমার যুক্তিগুলি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় উপরি-উক্ত পত্রের প্রত্যুত্তরে যে বহুবিস্তৃত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—

"এই বিধবা-বিবাহ বিষয়ে আপনার সাহায্য করিবার অভিপ্রায় হইতে বিরত হওয়ার সংবাদ যথাসময়ে না পাইয়া আমি এই সাহায্য-প্রাপ্তির উপর যথেষ্ট আশা স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ঐরূপ অর্থ সাহায্যের সম্ভাবনা থাকিলে যেরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাহাও করিয়াছিলাম এবং সেই জন্য এক্ষণে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইতেছে।"

বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত দূর বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল। আরও নানা সূত্রে ও বিবিধ উপায়ে বিপদের গুরুত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ সতীশচন্দ্র লিখিতেছেন :—

"আমার পরলোকগত পিতৃঠাকুর আপনার নিকট যে ১৮০০ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, আমার দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মারফৎ সে টাকা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম। আশা করি, আপনি কুশলে আছেন।

আপনার একান্ত বশংবদ
সতীশচন্দ্র রায়।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম সুহৃৎ ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ও তাঁহার সহোদরেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সকল কার্য্যে সর্ব্বদাই সহকারিতা করিয়াছেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর 'পেট্রিয়ট'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর মহাশয় যে সময়ে লক্ষ্ণৌএর ক্যানিং কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন :—

"মহাশয়ের ১০ই এপ্রেলের আজ্ঞা-পত্র আমি এই মাত্র পাইলাম। বিধবা-বিবাহের জন্যে মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। আমার সংস্কার ছিল যে, অনেক সমৃদ্ধ লোক এ বিষয়ে সাহায্য দান করেন। আপনাকেই সমুদয় ভার বহন করিতে হয়, আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি এক শত টাকার একখানা নোট পাঠাইতেছি, ইহাতে যদি অত্যল্প মাত্রও উপকার দর্শে, আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আমার যত দূর সাধ্য আমি সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না। কিন্তু মাসে মাসে আমাকে কত দিতে হইবে, তাহা আমার উপর রাখিবেন না। মহাশয়, দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে যাহা দিতে আজ্ঞা করিবেন, তাহার অন্যথা সম্ভবে না। মহাশয়ের আমাদের উপর অনেক দাওয়া, আমাদিগকে যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। আমাদের কাছে সঙ্কুচিত হওয়া আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।

আশীর্ব্বাদাকাংখিণঃ
শ্রীরাজকুমার সর্ব্বাধিকারী।

ইহার পর দ্বিতীয় পত্রখানি রাজকুমার বাবু ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল :—

"দাদার ১৮ই তারিখের পত্র পাইলাম। তাহাতে জানিলাম যে, এক শত টাকার নোটের প্রথমার্দ্ধ আপনার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার অপরার্দ্ধ পাঠাইতেছি।

দাদা আমাকে লিখিয়াছেন যে, আমাকে মাসে মাসে ১৫৲ টাকা করিয়া বিধবা-বিবাহের ধনভাণ্ডারে দিতে হইবেক। আপনার যদি কোন আপত্তি না হয়, তাহা হইলে ১৫৲ টাকার হিসাবে আগামী ছয় মাসের চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে পারি। মাসে মাসে পাঠান অপেক্ষা এইরূপে পাঠানই আমার পক্ষে সুবিধাজনক * * শেষার্দ্ধ নোট-সহ এই পত্র পাঠাইয়া ইহার পৌঁছান সংবাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত রহিলাম।

আপনার স্নেহভাজন
রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের সহায়তায় বঞ্চিত হইয়া এত দূর বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পরিশেষে পুনরায় রাজ-সরকারের কর্ম্ম গ্রহণের চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই সময় স্যর সিসিল বিডন বঙ্গের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। এই সময় এক দিবস কথোপকথন উপলক্ষে বিডন সাহেব জানিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্থাভাব নিবন্ধন নিতান্ত বিপদে পড়িয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে বিডন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন প্রকার উপযুক্ত কর্ম্ম-কাজের সুবিধা হইলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কি না? তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, নূতন করিয়া চাকুরি গ্রহণ করার চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, তবে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। লেপ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরকে এইরূপ উত্তর দিয়া সে সময়ে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু সাংসারিক অসচ্ছলতা উত্তরোত্তর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শেষে নিরুপায় হইয়া ছোটলাটের প্রস্তাব

মত কর্ম্মগ্রহণের চিন্তায় বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইতে বাধ্য হন এবং সেই অভাবের তাড়নায় বিপর্য্যস্ত হইয়া তিনি ছোটলাট মাননীয় বিডন সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন,

"মাননীয় সিসিল বিডন সমীপে :

প্রিয় মহাশয়,

আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন আমার জন্য কিছু করিতে আপনাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি খুব বিপদে পড়িয়াছি এবং কোন প্রকার নূতন আয়ের পথ না হইলে আমার ঐ সকল অসুবিধা দূর হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আপনি অনুগ্রহপরবশ হইয়া গত বৎসর এই সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি আর রাজ-সরকারে পুনরায় প্রবেশ করিতে প্রস্তুত আছি কি না? আমার বোধ হয় আমি সেই সময়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সময়ে যাহা আমার পছন্দের বিষয় ছিল, আপাততঃ তাহাই আমার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি এইরূপে বিরক্ত করার জন্য কিছু মনে করিবেন না।

বিশ্বাসভাজন
স্বাক্ষর ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।"

ইহার উত্তরে বিডন সাহেব যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়—

আমি আপনার অনুরোধ মনে রাখিব, কিন্তু আপাততঃ আপনাকে নিযুক্ত করিবার উপযোগী কোন কর্ম্ম-কাজের সুবিধা দেখিতে পাইতেছি না।

আপনার বিশ্বাসভাজন
সি, বিডন।"

ডি, এইচ, লরেন্সের চিঠি

[ইংলণ্ডের অন্যতম সৃজনীশক্তিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক ডি, এইচ, লরেন্স তাঁর জীবনের বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের কাছে লেখা একাধিক চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে লরেন্সের প্রতিভার একটা অংশ তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে আশ্চর্য্য ভাবে প্রতিবিম্বিত এবং এ-কথা আজ সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে, লরেন্সের পত্রাবলী ইংরেজী সাহিত্যের একটা বিশেষ সম্পদ। লেডি অটোলিন মোরেলকে লেখা এই চিঠিখানিতে লরেন্স, প্রথম মহাযুদ্ধের কি পরিণতি দাঁড়াবে মানুষের মনে, তাই আলোচনা করেছেন অত্যাশ্চর্য্য দূরদৃষ্টির সঙ্গে।].

গ্রিথাম, পাল'বরো, সাসেক্স;
সোমবার, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫

প্রিয় লেডি অটোলিন,

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় আশায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে—এই কথাটাই বলবার জন্যে এই চিঠি লিখছি। এই আশায় আমার অন্তরের শিশুটি উল্লাসে নেচে ওঠে। নতুন সমাজ-গঠনের কথা সেদিন আপনি বলছিলেন। এমন একটা সমাজের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করুন না যা আমাদের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করবে—সেই জীবন, যার একমাত্র সম্পদ হবে চারিত্রিক অখণ্ডতা। জীবনের দৈন্যই আমি লক্ষ্য করছি ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমাজে এবং এই দৈন্য দূর হতে পারে যদি আপনাদের মতন মেয়েরা একটু সচেতন, সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠেন। ব্যক্তিগত ভাবে সুখী এবং ধনী এমন অনেক পরিবারই লণ্ডনে আছে; কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো, এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের পর ব্যষ্টির সেই সুখ ও ঐশ্বর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না? মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে ভালোটুকু আমরা সাধারণতঃ অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করে থাকি, সেই ভালোর সন্ধানে আজ আমাদের প্রত্যেককে উন্মুখ হতে হবে—তবেই নতুন সমাজ গ'ড়ে তোলা সম্ভব।

পুরোনো সমাজ টিঁকবে না, টিঁকতে পারে না—অন্ততঃ এই যুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কা ইংলণ্ডের অতি সংরক্ষণশীল সমাজ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। একটা সস্তা দরের বর্ণ-বহুল ছবিকে খুব দামী ফ্রেমের মধ্যে বাঁধিয়ে রাখলে যেমন দেখায়, এই সমাজও তাই। বহুবিধ নৈতিক অনুশাসন আর অর্থহীন বিধি-নিষেধের নিঃশব্দ তর্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে আছে এই সমাজ। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, যে নির্দ্দয় নব-যৌবন ভাঙনের মহারথে চড়ে এগিয়ে আসছে ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে, তার সেই উদ্দাম গতি এই ক্লীব তর্জ্জনী-সংকেতে কিছুতেই নিরস্ত হবে না। এই যুদ্ধটা তারই একটা অভ্রান্ত ইঙ্গিত—সর্ব্বব্যাপী একটা পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত—মনের, চিন্তার এবং চরিত্রের। এই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করবার দায়িত্ব আমাদের, কিন্তু তাকে সার্থক করে তুলবার কাজে এগিয়ে আসতে হবে আপনাদের মত মেয়েদের। ছবি ও ফ্রেম দু'টোকেই আজ বর্জ্জন করতে হবে—যুদ্ধের আগুন দু'টোকেই ভস্মসাৎ করে দিয়ে যাবে।

এই নবীন অনুভূতিকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া আমি আমার জীবনের একটা পবিত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করি। এমন একটা সমাজ গড়তে চাই, যেখানে অতি ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিগত স্বার্থকে বৃহত্তম জীবনের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্যে বর্জ্জন করতে হবে। এক বৃহৎ মানব-পরিবারের গোষ্ঠী হিসেবে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্যে সচেতন ও সহৃদয় থাকবে। তারা নিজেদের ভালর জন্যে যা ভাল বুঝবে, স্বাধীন ভাবে তারই অনুসরণ করবে। ধর্ম্ম বলুন, আদর্শ বলুন—তাকে জীবনের দীপশিখায় আলোকিত করতে না পারলে উপলব্ধি পরিপূর্ণ হয় না, অনুভূতি শুদ্ধ হয় না। গীর্জ্জার প্রয়োজন আমাদের আর থাকবে না। আমরা গীর্জ্জা, বাড়ী আর দোকান সব একসঙ্গে মিলিয়ে দেবো। আমি ত মনে করি, ভদ্রলোক এখন যথেষ্ট পাওয়া যাবে এই কাজ আরম্ভ করে দেওয়ার জন্যে। নির্ব্বোধ ফ্রেঞ্চির মত আত্মার ক্ষুধা মেটাবার জন্যে এক টুকরো সরস হাড়ের অপেক্ষায় না থেকে, আমরা জনসাধারণের দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্যে এই কাজ সুরু করে দিই।

এই যুদ্ধের পর, মানুষের আত্মা এমন ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে যে তা ভাবতেও আমি শিউরে উঠি। কিন্তু নতুন আশার সংকেত সেখান থেকেই—নতুন জীবনের সুরু সেই দলিত পিষ্ট আত্মার ওপর দিয়েই। সেই জীবন—যেখানে অর্থ এবং ক্ষমতার উন্মাদ সংগ্রামের লেশমাত্র নেই—আমার চিরদিনের ঈপ্সিত জীবন। বর্ত্তমান-সমাজের সঙ্গে কোনও রকমের সম্পর্ক থাকলে চলবে না—কিম্বা এর ওপর প্লাষ্টারের কাজ করলেও চলবে না। আত্মিক শক্তিতে বলবান এমন প্রত্যেককেই বর্ত্তমানের এই সমাজ, এই সমাজের বৃথা গর্ব্ব এবং বিমূঢ় ভাব—সবই বর্জ্জন করতে হবে। সংস্কার-লেশহীন নির্ম্মল প্রাণ আর উলঙ্গ আত্মা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে হবে। হাত দু'খানি খালি আর দুই চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং সুদূরপ্রসারী হলেই চলবে। "হবে কি হবে না"—এ প্রশ্ন আজ নয়।—প্রশ্ন এই: কেমন করে আমরা এই সমাজ গঠন করবো। প্রথমে ধ্বংস করতে হবে ক্ষমতালোভীদের লোভ আর দম্ভের অজগরকে। "আমাকে অনুসরণ করো"—এই নীতির বদলে নতুন সমাজের নীতি হবে—"চেয়ে দেখো।" আত্মা নরকে যাক, তাতে কিছু যায়-আসে না, দেহ এবং মন সুস্থ ও সতেজ থাকলেই যথেষ্ট।

এ জিনিষ করতেই হবে—নইলে মানুষ বাঁচবে না। অনুশাসনের জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে থেকে জীবনকে উদ্ধার করতে হবে এবং তার মধ্যে নতুন করে সঞ্চার করে দিতে হবে চিত্তস্পন্দী আলো। নইলে যুদ্ধের পর ঘোরতর দুর্গতির অন্ধকার মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধিকে এমন ভাবে গ্রাস করে ফেলবে যে, হাজার ভগবান এলে মানুষকে আর রক্ষা করতে পারবে না। আত্মত্যাগের বাণী আজ নয়, আজ নিজেকে বোঝবার, জানবার ও চেনবার কথাই পরস্পরকে শোনাতে হবে।

[ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা ছিল কীটসের, কিন্তু তাঁর মৌখিক প্রতিভা তাঁকে ডাক্তারী অধ্যয়ন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল কাব্যজগতে এবং সে জগতে তিনি যে ঐশ্বর্য্য রেখে গেছেন তার পরিমাণ অল্প হলেও তার মূল্য অনেক। তেইশ বছর বয়সে কীটসের জীবনে আসে ফ্যানী। কবি তাকে ভালবাসেন এবং তার সঙ্গেই তাঁর বিবাহের স্থির হয়। কিন্তু কীটসের স্বাস্থ্য ছিল তার বাম চিরদিন এবং সেই সময় থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে সুরু করে দ্রুতবেগে। আঠার শ' উনিশ সালে কীটসের স্বাস্থ্য লাভের আশায় Isle of Wightএ যান। সেখান থেকে কিছুটা সেরে তিনি ফিরেছিলেন কিন্তু সেটুকু সাময়িক। সেই বছর আগষ্ট মাসে ফ্যানীর বাড়ীতে তিনি গিয়ে ওঠেন। এই সময় কবির ভালবাসার মানুষটি সেবা দিয়ে প্রীতি দিয়ে তাঁকে নীরোগ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কবিকে যেন অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেনি। পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে রোমে মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে কবি কীটস মরজগতের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কবির চিঠি অমর হয়ে আছে।]

"৮ই জুলাই, ১৮১৯

তোমার চিঠিখানি আমায় যত আনন্দ দিয়েছে তুমি ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ-ই তত আনন্দ দিতে পারে না। এই চিন্তায় আমি বিস্মিত বোধ করি যে অনুপস্থিত কোন মানুষ আমার অনুভূতির উপর এমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তোমার কথাও যখন ভাবি না, তখনো তোমার কোমলতা আমাকে ঘিরে থাকে, আমার সত্তাকে নিঃশব্দে জুড়ে বসে। আমার যত ভাবনা, আমার যত অসুখী দিনরাত্রি, কিছুই আমাকে সুন্দরের সাধনা থেকে ভ্রষ্ট করতে পারেনি। বরং তারা আমার সেই প্রীতিকে এমন বেগবান করে দিয়েছে যে আমার এই দুঃখ মর্মান্তিক হয়ে ওঠে যে তুমি আমার পাশে নেই। দুঃখ হয় এই জন্য যে তুমি আমার প্রতীক্ষায় এমন এক আনন্দহীন ধৈর্য্য বহন করছ যাকে বেঁচে থাকা বলা চলে না। তুমি আমার মনে যে ভালবাসাকে জাগিয়ে তুলেছ তা যে কী তা এর আগে আর এমন করে কোন দিন বোধ করিনি—বিশ্বাসও করিনি। আমার এই ভয় ছিল যে হয়ত সেই প্রেমাগ্নি আমাকেও গ্রাস করে নেবে। কিন্তু তোমার পরিপূর্ণ ভালবাসায় যদি কোন অনল থাকেও, তা আমাদের আনন্দের ধারায় সিক্ত হয়ে শান্ত হবে, সহনক্ষম হবে। তুমি সব বিশ্রী লোকের উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছ যে তাদের ইচ্ছায় আমাদের দেখা-শোনা নির্ভর করে কি না। আমার কথায় বিশ্বাস করো তুমি। তুমি আমার হৃদয়ের এতখানি জুড়ে আছো, তোমার কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলে আমি তোমার সৎ-উপদেষ্টা হয়ে উঠবই। তোমার দু'টি চোখে সুখ, তোমার অধরে ভালবাসা, তোমার চলায় আনন্দ, এ ছাড়া আর কিছুতেই আমার চোখ পড়বে না। তোমার মন যাতে আনন্দ পাবে তার মধ্যেই তোমায় আমি পেতে চাই। যে পরিবেশে তোমার মন স্বাভাবিক ভাবে পীড়িত হয়ে ওঠে সেখানে নয়, বরং যেখানে তুমি আনন্দে উচ্ছ্বল সেখানে আমাদের ভালবাসাও আনন্দে মঞ্জুরিত হয়ে উঠবে। তবু নিজে যে উপদেশ আমি দিচ্ছি, তা নিজে অনুশীলন করতে পারব কি না, সে বিষয়ে আমারও গভীর সন্দেহ। আর আমার প্রস্তাব যদি তোমায় দুঃখ দেয় তবে কি করে করব তা আমি। তার চেয়ে তোমার রূপের কথাই বলি না কেন, যা ভিন্ন তোমায় এমন ভালবাসা আমি বাসতে পারতাম না হয়ত? রূপ হল আমার সেই তীব্র প্রেমের আদি কথা। সত্যি ব্যঙ্গ না করেই বলছি, অপরের মধ্যে অন্য ধরণের ভালবাসা বিকশিত হচ্ছে দেখলে আমিও মুগ্ধ হই, কিন্তু আমার মন তার মধ্যে এমন ঋদ্ধি, এমন সুষমা, এমন পরিপূর্ণতা, এমন অপরূপতা খুঁজে পায় না। তাই তোমার রূপের কথাই লিখব, যদিও তাতে আমার সমূহ বিপদ ঘটতে পারে। বিপদ হবে—যদি নির্দয় হয়ে তুমি তোমার সেই সৌন্দর্য্যকে অন্যত্র প্রয়োগ কর পরীক্ষার জন্য। তুমি লিখেছ, আমার ভয় যে তুমি আমায় ভালবাস না। তোমার এত কাছে থাকি বলে তাইতে আমার দুঃখ আরো বাড়ে। এখানে বসে আমি হাত পাকাচ্ছি কখনো গদ্যছন্দে—কখনো ছন্দ মিলিয়ে। তুমি যে আমার জন্যেই ভালবাসো সেই বিশ্বাস তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে আরো প্রগাঢ় করে তুলেছে এ স্বীকারোক্তি করছি এইখানে।

তোমার লিপিখানিতে আমি অধরে ছুঁইয়েছি এই আশায় যে

ত তুমি তাতে একটু মধু দিয়েছিলে। তোমার স্বপ্নের কথা গো আমায়। সে স্বপ্নের অর্থ করে দেবো আমি। চিরদিনের মার, প্রেমমুগ্ধ।"

(২)

ফেব্রুয়ারী—১৮২০,

তোমার মাকে এ ধারণা থেকে নিবৃত্ত কোরো যে রাত্রে চিঠি গে তুমি আমায় দুঃখ দাও। কি জানি কেন তোমার গত রাত্রির ঠিখানি পূর্বের চিঠিগুলির মত হয়নি। আমি এই ধারণায় আজো সী যে তুমি আমায় আজো ভালবাসো। তুমি যে আনন্দে আছো ই আমার কতো বড়ো সান্ত্বনা। তবু বিশ্বাস করতে ভালো লাগে আমি নীরোগ হলে তোমার আনন্দ আরো বর্দ্ধিত হোত। সত্যি মি বড়ো নার্ভাস, নিজেকে আমার বড়ো সামান্য মনে হয় সময় য়। পূর্বতন সব চিঠিতে যতখানি কোমলতার প্রশ্রয় দিয়ে এসেছ মাকে তা থেকে বঞ্চিত করো না যেন। তোমাকে ছেড়ে কত দূরে স্থ্যের জন্যে গিয়ে কি দুঃখই না পেয়েছি—আবার তোমার কাছে রে এসে সুখের যে ঐশ্বর্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি সে সবই তোমার ন্দর্যের কারণে, যে অপার-সৌন্দর্য আমার মনে সেই যাদুকে জাগিয়ে খেছে। এই চিঠিখানি পাঠিয়ে সামনের ঘরে গিয়ে বসব, একটি মনিটের জন্যে তোমায় বাগানে দেখতে পাব সেই আশায়। তোমার মার মধ্যিখানে কি ব্যবধান রচনা করেছে এই রোগ। যদি সুস্থ কতাম এমনি ধারা দার্শনিকতাই হয়ত করতাম। এখন সে রোগ আরো বেড়েছে। এখন রাত্রে উৎকণ্ঠায় আমি জেগে কাটাই র চিন্তা আমার মস্তিষ্কে হানা দেয়। 'যদি মরে যাই' আপনার নে আমি উচ্চারণ করি, 'যদি মরে যাই, কোন অক্ষয় কীর্তিই ত মি রেখে যাব না আমার স্মৃতি নিয়ে গর্ব করার মত কোন ধন। র্ব বস্তুর সৌন্দর্যকে আমি ত' ভালবেসেছি। যদি আরো সময় তাম, স্মরণীয় করে তুলতে পারতাম নিজেকে। শরীরে যখন গ ছিল না, যখন শুধু তোমার জন্যই হৃৎস্পন্দন দ্রুত লয়ে ছুটত, ন এ সব চিন্তা আসত কদাচিৎ। কিন্তু এখন তোমার চিন্তাকে গুণিত করে দাঁড়িয়েছে এই চিন্তা। মহৎ মানসের সর্ব শেষ ক্ষমতা এই।'

(৩)

মার্চ, ১৮২০

তোমার বুঝি কখনো কখনো ভয় হয় যে আমি তোমায় তত লবাসি না। তোমায় চিরদিনই ভালবাসব—ভালবাসব অফুরন্ত প্রীতিতে। তোমায় যত দেখছি, আমার ভালবাসা ততই গভীর চ্ছে। আমার যত ঈর্ষ্যা সে আমার ভালবাসার বেদনাই—শরীরের সব থেকে দুরন্ত কষ্টের সময়েও তোমার জন্য আমি মরতে পারি। বড়ো বিরক্ত করেছি তোমায়। কিন্তু সেও ত প্রেমের জন্য। তুমি চির-নূতন। তোমার শেষতম চুম্বন সব থেকে মধুময়, তোমার শেষতম হাসি সব থেকে উজ্জ্বল, তোমার শেষতম ভঙ্গীটুকু সব থেকে অপরূপ। কাল তুমি আমার বাতায়নের সমুখ পথ দিয়ে যাচ্ছিলে, আমার মন এমন মুগ্ধ হয়েছিল যেন কালই তোমায় আমি প্রথম দেখলাম। মনে পড়ছে, এক দিন অর্দ্ধ অভিযোগ করেছিলে যে আমি শুধু তোমার রূপকেই ভালবাসি। তোমায় ভালবাসার আর কোন সম্বল কি আমার নেই? একটি আকাশ-সঞ্চারী প্রাণ-বিহঙ্গ যে আমার কারাগারে বন্দিনী হয়ে আছে, তা কি আমার চোখে পড়ে না? কোন আশাহীন ভবিষ্যৎ তোমার মনকে আমার থেকে কোন দিন ফেরায়নি। সে অনুভূতি যতটুকু আনন্দের, ততটুকুই দুঃখের। সে কথা আমি উচ্চারণ করব না। তোমার প্রেম যদি নাও পেতাম আমি, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ অচল থাকতই। তুমি আমায় ভালবাসো এই বোধে আমার অনুরাগ আরো কত গভীর হয়েই না ওঠে। আমার এতটুকু শরীরে অধীর সন্তোষহীন মন বন্দী হয়ে আছে। আমার যে মন কোন কিছুতেই বশ মানে না, সে শুধু তোমায় ঘিরেই এক পরিপূর্ণ বিরতিতে ধরা দেয়। তুমি যতক্ষণ আমার ঘরে থাকো, আমার মন কখনো বাতায়ন-পথে যায় না। আমার সব ইন্দ্রিয় তোমায় ঘিরে ধ্যানস্থ হয়ে থাকে। আমাদের ভালবাসা নিয়ে যে উদ্বেগ তুমি দেখিয়েছিলে, তোমার শেষ চিঠিতে তা যে কত আনন্দ দিয়েছে আমায়! এমন উৎকণ্ঠায় আর কখনো মনকে পীড়া দিও না। আমিও আর কখনো বিশ্বাস করব না যে তোমার কোন বিরাগ হতে পারে আমার উপর। এক জন অতিথি চলে গেছেন—আর এক জন রয়েছেন এখনো। তিনি চলে গেলে আমি শুধু তোমার জন্য জেগে প্রতীক্ষা করবো। তোমার মাকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও।

[নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাতৃভক্তি অপরিসীম স্নেহ ও শ্রদ্ধায় পূত। এই চিঠিতে তাঁহার ঈশ্বর-প্রীতি ও মাতৃভক্তি ব্যতীত বসুমতী হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের সুলভ মূল্য সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত আছে। সিগনেট প্রেস হইতে প্রকাশিত 'ভারত পথিক' বইটিতে চিঠিখানি আছে।]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় কটক

শনিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু

মা,

আজ সকালে আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, তাহার সঙ্গে মনিঅর্ডারে ৫০৲ পাইলাম।

আমি যে পত্র লিখি তাহার উত্তরের জন্য তাড়াতাড়ি করিবেন না—অবকাশ মত উত্তর করিবেন। আপনার যদি পড়িতে কষ্ট হয় তাহা হইলে অন্য কাহার দ্বারা পড়াইয়া লইবেন।

কলাইসুটি জোবরা বাগানে লাগান হইতেছে কিংবা শীঘ্রই হইবে। রঘুয়া আমার নিকট হইতে ৫।৬ দিন পূর্ব্বে কলাইশুটি লইয়া গিয়াছিল। জোবরা বাগানে আমি যাই নাই।

নগেনঠাকুর এবার পূজা করেন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি কি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন? আমি যত পূজা দেখিয়াছি তন্মধ্যে নগেনঠাকুর এবং শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গুরুদেব মহাশয়ের পূজা সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি আকর্ষণ করে। নগেনঠাকুরের চণ্ডীপাঠ বড়ই মধুর এবং অভক্তকে ভক্ত করিয়া ফেলে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব মহাশয়ের কোদালিয়াবাটীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমরা দেশে গেলেই সেখানে ছুটিব। দেখা

হইলে তাঁহাকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইবেন। বড়দিদির শরীর অসুস্থ হইয়াছে শুনিয়া কষ্ট পাইলাম। তিনি কেমন আছেন।

আপনার ডেঙ্গু হইয়াছিল শুনিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন।

বসুমতীর আপিসে শঙ্করাচার্য্যের সমুদয় স্তোত্র খুব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। একটি পুস্তকে তাঁহার সব স্তোত্রই আছে এবং মূল্য কেবল ৮০ কিংবা ১৲ টাকা। এ সুযোগ ছাড়িবেন না। পক্ষিমামাকে বলিবেন একটি ক্রয় করিয়া আনিতে। পুস্তকটি আপনার নিকট রাখিবেন এবং কটকে আসবার সময় লইয়া আসিবেন।

মা, আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে আমার আমিষ ত্যাগ করিবার বড়ই ইচ্ছা। কিন্তু পাছে কেহ কিছু বলেন বা মনে করেন সে আশঙ্কায় আমি সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিতেছি না। আমি এক মাস পূর্ব্বে মৎস্য ভিন্ন সমুদয় আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ ন'দাদা আমার পাতে জোর করিয়া মাংস দিলেন। কি করি! অগত্যা খাইলাম কিন্তু বড় অনিচ্ছায়। আমি নিরামিষাশী হইতে চাই কারণ "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" একথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রকারেরা বলেন নাই—স্বয়ং ঈশ্বর একথা বলিয়াছেন। আমাদের কি অধিকার আছে যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করিব? তাহাতে কি ঘোর পাপ করা হয় না? যাঁহারা বলেন যে মৎস্য না খাইলে চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হয় তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এরূপ মূর্খ নন যে লোককে দৃষ্টিহীন করিবার জন্য তাঁহারা মৎস্য খাওয়া বারণ করিবেন। আপনাদের এ বিষয়ে কি মত?

আপনাদের বিনা অনুমতিতে আমার কিছু করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সকলে ভাল আছি। আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার সেবক
সুভাষ

[আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে যে পত্র দেন তাহারই একটি প্রকাশিত হইল।]

ওঁ

প্রিয় ত্রিবেদী মহাশয়,

গরম দেখা দিয়েছে, ভারতবর্ষের যে স্থানে তুমি অধিকার স্থাপন করিয়াছ—মনো-motor car-এ ভ্রমণ করিয়া বেশ আমোদ পাইলাম। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ব্যতীত পত্রে কথাবার্ত্তা চালানো আমার পক্ষে সুকর নহে। একটি কথা আমার মনে উদয় হইতেছে যদিচ তাহার কোন গুরুত্ব নাই—"গালিলিওর সময়ে average man পৃথিবীকে সৌর জগতের কেন্দ্র বলিত। সুতরাং average manএর জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিলে বিজ্ঞানের উত্থানদ্বারে কপাট পড়িয়া যাইত। Average manএ আমার শ্রদ্ধাও তেমন নাই—আর তাহার উপরে আশা-ভরসাও স্থাপন করিতে পারি না।

তোমার গুণানুরক্ত
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

['সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় পত্রিকাটি রক্ষা করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। আর্থিক কষ্টে পড়িয়া আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে পত্র দেন। এই পত্রখানি তন্মধ্যে একটি।]

সাহিত্য কার্য্যালয়,
২।১, রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর।
কলিকাতা।

প্রিয়বরেষু—

আশা করি আপনি নিজে ভাল আছেন এবং পরিবারের সমস্ত কুশল। মে মাসের মধ্যভাগে আমি * * * * এর যে পত্র পাইয়াছি তাহা আপনাকে এই পত্রের মধ্যে পাঠাইতেছি পড়িবেন, আপনি যখন কলিকাতা আসিবেন তখন সঙ্গে আনিবেন। চিঠিখানি রাখিবার মত। বাঙ্গালা মাসিকের ইতিহাস লিখিবার সময় ভাবী লেখকের কাজে লাগিবে।

* * * * আপনার পত্রপ্রাপ্তির পর আমি প্রাণপণে সাহিত্যখানি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং বলা বাহুল্য যে নিরাশ হইয়াছি। যাঁর মন আছে তাঁর ধন নাই, যাঁর ধন আছে তাঁর মন নাই এবং আমার ধনীর মন জয় করিবার মত জিব, রক্ত বা সৌভাগ্য বা প্রাক্তন বা কেরামত যাই বলুন কিছুই নাই বরং চটাইবার অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে।

* * * *

এখন কি করি? আমি গ্রাহকদের কাছে ঋণী, চারি সংখ্যা দিতেই হইবে নতুবা চোর হইয়া থাকিব। এক সঙ্গে টাকা পাইবার কোন আশাই নাই। সে আশা ত্যাগ করিয়াছি।

এখন "একের বোঝা দশের নড়ি" করিয়া যদি ৮।১০ জনের কাছে পাওয়া যায়—আমার ২।১ জন নিঃস্ব বন্ধু এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি নিরুপায় হইয়া সেই পথই ধরিব স্থির করি। প্রথমেই * * * * কে পত্র লিখিয়াছিলাম যে শতাবধি টাকা যদি দেন, তাহা হইলে সাহিত্যটা বাঁচাইবার চেষ্টা করি। তিনি আজ পত্রযোগে কৃষ্ণকে জবাব দিয়াছেন। আমি হরেন বাবুকেও বলিব আপনাকেও লিখিতেছি, যদি আপনি নিজে শতাবধি দেন এবং ২।১ জনের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি রক্ষা পাই। আপনারা জ্ঞানী এবং বড়লোক, জ্ঞানে ও বড়ত্বে প্রায় মায়া-মমতা থাকে না। বোধ হয় আপনাতে একটু ব্যতিক্রম হইয়াছে। আর আমি এখনও আপনাকে আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ করিয়া তুলিতে পারি নাই। তাই ভরসা করিয়া লিখিলাম। আপনার মেজ ভায়াকে এই চিঠিখানি দেখাইবেন। তিনি আমাকে ভালবাসেন এবং তাঁহার মনটা এখনও তত উন্নত হয় নাই। অনেকটা সহজ সুতরাং মমতাময় আছে, তিনি হয়ত আমার হইয়া আপনাকে সুপারিস করিতে পারিবেন। যদি কিছু করেন শীঘ্র করিবেন। * *

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

প্রার্থনা —প্রদোষকুমার ঘোষ

মাসিক বসুমতীর রজত জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশের আয়োজনের ঙ্গ সঙ্গে আমাদের গ্রাহক ও গ্রাহিকাদের নিকট একটি ইস্তাহার রী করা হয়। তাহাতে আমরা দুইটি প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিলাম। য়: মাসিক বসুমতীকে আপনি কেন সমাদর করেন? ২য়: সিক বসুমতীর উন্নতিকল্পে আপনি কি কোন মতামত জানাইবেন?

তদুত্তরে গ্রাহকবর্গ যে পত্র দেন সেই সকল পত্রগুলির প্রয়োজনীয় শ মুদ্রিত হইল।

—মা, ব

"মাসিক বসুমতীর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আমি আমার শুভেচ্ছা াপন করিতেছি। একখানি বাংলা পত্রিকার পক্ষে সগৌরবে পঁচিশ বসর টিকিয়া থাকা কৃতিত্বের পরিচায়ক। 'বসুমতী' উচ্চ শ্রেণীর ংলা সাময়িক পত্রের দাবী সম্পূর্ণরূপেই করিতে পারে। শিক্ষা ও ংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানা ভাবে ইহা জনসাধারণের সেবা করিয়াছে। প্রাচীন ারতের আদর্শই 'বসুমতী'র স্বদেশপ্রীতিকে পরিমার্জ্জিত করিয়াছে। হার নীতি বরাবরই উদার এবং প্রগতিশীল। ইহা কখনও ভাব-বণতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় বীরদের যোচিত কর্ম্মের পন্থা জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। আমি ই পত্রিকার সমৃদ্ধি কামনা করি।"

স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র
৬ই আগষ্ট, ১৯৪৮

ভারত আজ বিদেশী রাজশক্তির হাত থেকে মুক্ত। কিন্তু সেই সুচতুর রাজশক্তির কূটনীতি যে বীজ বপন করে গিয়েছে তার বিষময় পরিণতিতে জাতীয় জীবন আজ জর্জ্জরিত। তবুও আজ আমরা মুক্ত এবং এই মুক্তির সঙ্গেই আজ এসেছে আপনাদের মাসিক বসুমতীর রজত জয়ন্তীর দিন। তাই আজ দেশের সকল সম্ভাবিত কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাই আপনাদের পত্রিকার সকল সুমহান সম্ভাবনাকে। সার্থক হোক এই পুণ্য বৎসরে আপনাদের পত্রিকার শুভ জন্মদিন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার সংবাদপত্র সমূহের দান অতুলনীয়। এবং তার মাঝে প্রাচীন বসুমতীর একটি বিশেষ দান আছে। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর এক জন অন্যতম দূরদর্শী গঠনশক্তি-সম্পন্ন কর্ম্মবীর, যাঁদের চিন্তা ও কর্ম্মের অমিতবীর্য গড়ে গিয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনের অটল ভিত্তি। ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার যে নিজস্ব সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতি রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ এবং তার প্রচেষ্টাই আমাদের মতে বসুমতীর বিশিষ্ট দান। বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বন্যায় যে যুগে আমাদের সাহিত্যের বহু অমূল্য রত্ন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল সেই যুগে বসুমতীর অদম্য চেষ্টায় সেই ধনরত্ন আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের বাণী-সেবা এবং মাসিক বসুমতীর প্রবন্ধাবলী একই সূত্রে বাঁধা এবং একই দেশাত্মবোধের পরিচয় দেয়।

বাঙ্গালীর চরিত্র ভাবপ্রবণ, সেই জন্য তাতে রয়েছে সাধারণত

একটি synthetic দৃষ্টির অভাব। তাই যাঁরা প্রগতিশীল তাঁরা জাতের রক্ষণশীল প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ মূল্য দিতে পারেন না। কিন্তু রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের চাইতে কম নয়, তবে তার বিপদ তখনই ঘটে যখন তারা জড় এবং প্রাণহীন হয়ে পড়ে। বসুমতীর রক্ষণশীলতা যে জীবন্ত তার পরিচয় আমরা পাই বসুমতীর প্রজ্বলিত জাতীয়তাবাদে এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের দুর্দিনে তার নির্ভীক সমালোচনা ও পরিচালনাতে।

কালের প্রভাবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। যা পুরাতন (ancient), যা পরম্পরাগত (traditional) তা নূতন কালের দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং আলোতে বাচিয়ে নিতে হবে এবং নূতন অর্থে সমুজ্জ্বল করে তুলতে হবে। আজ বিদেশী সভ্যতার চাপে আমাদের সংস্কৃতির বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা নেই। তাই বসুমতীর রজত জয়ন্তীর দিনে আমার প্রার্থনা যে বসুমতী ভারতের এবং বাংলার যে অমূল্য সংস্কৃতির রক্ষক ছিলেন সে সংস্কৃতিকে আজ যেন সৃষ্টিধর্মী করে তুলেন, এবং নব ভারতের নূতন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সংস্কৃতির সত্যকার পথপ্রদর্শক হন।

৩।৬।৪৮ লতিকা ঘোষ

★

১৪।৬।৪৮

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মানস-সন্তান মাসিক বসুমতী আজ ২৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল। তিনি ধর্ম, সাহিত্য ও সাধারণ বিষয়ের সমাবেশে পত্রিকাখানিকে সর্বশ্রেণীর রসপিপাসুগণের প্রিয় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার অকাল প্রয়াণে সুযোগ্য উত্তরবর্ত্তিগণের চেষ্টায় সে আশা ব্যাহত হয় নাই।

মাসিক বসুমতীকে সমাদর করি তাহার সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য ও পরিপুষ্টির জন্য। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছবি—সব ক্ষেত্রেই মাসিক বসুমতীর চয়ন অনবদ্য। নবীন-প্রবীণ, নারী-পুরুষ, স্বদেশী-বিদেশী, বালক-বৃদ্ধ সকলেরই ভাল ভাল রচনা ইহাতে থাকে। বিজ্ঞাপনের বহুল প্রাচুর্য্যও দৃষ্টি এড়ায় না। অনেক ভাল ভাল পুস্তকের সহিত পরিচয় লাভের সূত্র এই বিজ্ঞাপনগুলি মারফৎ পাওয়া যায়। মাসিক বসুমতীর দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

—সত্যকুমার বোস

★

৩০শে মে, ১৯৪৮

মাসিক বসুমতী দীর্ঘকাল সাহিত্য সাধনা দ্বারা বাঙ্গালীর মনোরঞ্জন করিয়াছেন। স্বাধীন বাঙ্গলাতে বাঙ্গালীর শক্তি যাহাতে সর্ব্ব দিকে বৃদ্ধি হয় এখন বসুমতী সেইরূপ মনোভাব সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হউন। বসুমতী পরিচালকদের শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হউক।

লেডী অবলা বসু

—দেবব্রত বাগচী

মাসিক বসুমতীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৩৩১ সালে। তখন হইতে আমি ও আমার পরিবারের সকলেই মাসিক বসুমতী পড়িয়া আসিতেছি এবং ইহা স্কুলের উপযোগী বলিয়া স্কুলের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

এই ১৮ বৎসরে ইহার ক্রমোন্নতিই হইয়াছে। ইহাতে পাওয়া যায় ধর্ম, ভূগোল, ইতিহাস সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। এবং ইহাতে আছে দৈনিক পরিশ্রমের পর রাত্রিকালে বিশ্রাম সময়ের পাঠ্য গল্প ও উপন্যাস। ইহার সমালোচনা সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেখি নাই।

আমার শুভ ইচ্ছা—যেন এই পত্রিকাটি দিনে দিনে আরও উন্নতি করে।

রেভারেণ্ড রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, সেণ্ট জন্স স্কুল
কৃষ্ণনগর

'সিরাজউদ্দৌলার গোলাম হোসেনের মত বলতে ইচ্ছে করে বাংলাকে ভালবাসতে গিয়ে বসুমতীকে ভালবেসে ফেলেছি। আমার অনেক কবিতা ছাপা হয়েছে। নূতন সাহিত্যিক সৃষ্টির এই সাধু প্রচেষ্টা ও ব্রতকে আমি প্রশংসা করি।

কাজী আহমদ
যশোহর।

●

মাসিক বসুমতী বাঙলার ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একমাত্র সুলভ মুখপত্র।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস,
হেড মাষ্টার, দৌলতপুর হাই স্কুল

●

...ধরা-বুকে 'বসুমতী' আনন্দের খনি
ভারতী-নন্দিনী দেবী, বঙ্গ মধ্যমণি।
কত রূপে বঙ্গ-জনে বিদ্যা বিতরণে
পঞ্চ বিংশতি বর্ষ চলে ক্ষণে ক্ষণে।...

শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ
যশোহর।

●

মাসিক বসুমতীর জন্মকাল হইতে আমাদের 'রাজর্ষি ভবনে' আগমন। ৺রাজর্ষি যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়-চৌধুরী মহাশয় ইহার আজীবন পাঠক ছিলেন। মাসিক বসুমতীর সহিত আমাদের পরিচয় অনেক দিনের। ইহা স্বতন্ত্র ভাব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

বধূরাণী নীহারিকা চৌধুরাণী
হরিপুর বড় তরফ এষ্টেট
পূর্ব্ব-দিনাজপুর।

●

যেদিন আমাদের বাড়ীটার সামনের পড়ো ভাঙ্গা বাড়ীটা ও তাল গাছটার ভেতর দিয়ে এক বিশ্রী কালো ছেঁড়া মেঘ এসে দেখা দিল, তখন আমার যৌবন বসুমতীর সাহায্যে লাভ করল এক নারীকে। সবাই তাকে বলত "জ্যোতিঃ"। পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বসুমতীকে কেন্দ্র করে আমরা দু'জনাই আরোহণ করলাম ভালবাসার শিখরে। হঠাৎ জ্যোতি পড়ে গেল শিখর থেকে। পৃথিবী বললে—"মৃত", আমি বললাম—"মৃত", কিন্তু বসুমতী বললে—"না, সে জীবিত আমার পাতায়।" কত বার জ্যোতি বলেছে—"গল্প টল্প লেখ না।" বলতাম—"কোথায় পাঠাব?" "কেন? আমাদের বসুমতীতে"। এই "আমাদের বসুমতী" কথাটায় সে কতখানি দরদ দিয়েছিল তার গুরুতায় আজ বুঝতে পারছি। তার মৃত্যুর দিন আজও চোখের সামনে ভাসছে। বলতে ভুলে গেছিলাম, জ্যোতি আমার স্ত্রী হয়েছে। এই বিবাহের জন্য সবাই ত্যাগ করল শুধু "বসুমতী" বাদে। চাঁদের একটা ঝলক জানালার ভেতর দিয়ে ঘরের এ-পাশে সে-পাশে এসে পড়েছে। জ্যোতি বললে—"জল"। জল দিলাম। "শোনো"—কাছে গেলাম। "দেখো, বোধ হয় বাঁচব না, তুমি বসুমতীটা কিনে নিও। উপর থেকে দেখেও শান্তি পাব।" শপথ করলাম, কিনব। সেই দিন থেকে বসুমতী আমার সঙ্গী।

অশ্বিনীকুমার সেন
মেদিনীপুর।

—চিত্তরঞ্জন ঘোষ

সাহিত্য ও শিল্পের অন্ধযুগ হইতে বর্ত্তমানের দীপ্তিমুখর দিনগুলি পর্য্যন্ত "বসুমতী" গুরু দায়িত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে চাই যে "বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহাবংশের ভগ্নাংশ, সে প্রাচীন আর্য্য জাতির ভাষা ও সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্নরাজীতে পরিপূর্ণ।" সে অমূল্য সম্পদ আহরণ করিয়া "বঙ্গবাণীর স্বর্ণ-মন্দির রচনায়" বসুমতীর দান ও সাফল্য অতুলনীয়। অতীতকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া—বর্ত্তমানের সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিয়া ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করিতে বসুমতীর চেষ্টা অক্লান্ত। সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহা প্রতি পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার একটি আদর্শ পত্রিকা।

শ্রীঅনিলকুমার চৌধুরী
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কুমিল্লা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই লিঃ
কুমিল্লা।

●

—জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বসুমতীর প্রচ্ছদপটের চিত্র প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বয়স তখন ৮।৯ বছর। তখন হতেই মাসের শেষপ্রান্তে একখানা, বসুমতী আমার চিত্ত-বিনোদনের জন্য যে নিতান্তই প্রয়োজন তা' মর্ম দিয়েই অনুভব করতুম যদিও প্রকাশ করার মতো শক্তি ছিলো না সেদিন। আজ আবার তার ভেতরকার মোহিনী শক্তি সত্য সত্যই আমায় যেন যাদু করেছে। সত্য কথা বলতে কি, আজ আমি যেন তার একটি ক্রীড়নক মাত্র—যে পৃষ্ঠায়

—বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত

—অজিতকুমার নিয়োগী

নিয়ে যায় কলের দম দেওয়া পুতুলের মতো তারি 'পর দু-চোখ দিয়ে বসে থাকি। শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত। নড়বার কোন উপায়ই যেন থাকে না সেখানে।

রুদ্রানীশংকর ঘোষ

* * *

—শ্রীকুমার ঘোষ

—রামকিঙ্কর সিংহ
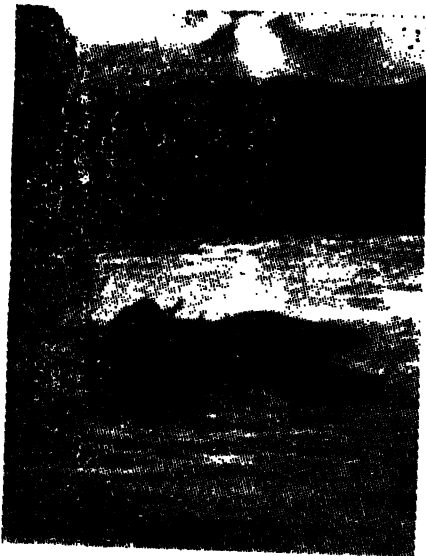
বসুমতী নিরপেক্ষ

সর্ব্বপ্রকার দল-নিরপেক্ষ মতামত ও সমালোচনার জন্যই "বসুমতী" আমার প্রিয়।

শ্রীহিমাংশুভূষণ দত্ত
বিহার।

আমাদের সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতির পরিপুষ্টির জন্য 'মাসিক বসুমতীর' সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরের বহুমুখী প্রচেষ্টা আজ সকল বাঙ্গালীর নিকট হইতে স্বীকৃতি লাভের অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে। দেশে এবং বিদেশে এই পত্রিকা বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্য অধিকারী।

সমীরণ মিত্র
সম্পাদক, গ্রন্থাগার বিভাগ,
বার্ণপুর, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটুট।

●

"মাসিক বসুমতী"—সাহিত্যরসের অপূর্ব্ব সমন্বয় ও শ্রেষ্ঠ পরিবেশক। আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক এবং সাহিত্য-ক্ষুধাবর্দ্ধক ও শিক্ষাপ্রদ।

শ্রীগোলোকনাথ মল্লিক,
উকীল, মুঙ্গের।

মাসিক বসুমতী উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলির Vanguard. প্রতি মাসে গল্প, রচনা ও কবিতার মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট যুগবাণী বহন করিয়া ইহা যে প্রতিটি বাংলা ভাষাভাষীর হৃদয় জয় করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনাদের ক্রমবর্ধমান গ্রাহক-তালিকাই বলিয়া দিবে। ইহার উন্নতি কামনায় আপনাদের বর্ত্তমান প্রচেষ্টা আপনাদিগকে দেশবাসীর নিকট ধন্যবাদার্হ করিয়া তুলিয়াছে। দেশের সম্পদকে, দেশের মনীষাকে সাধারণের সহজপ্রাপ্য করিয়া আপনারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীশৈলজানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ প্রধান শিক্ষক
২৪ পরগণা।

●

মাসিক বসুমতী বাংলার প্রাণ—বাংলার নিজস্ব গৌরবের ধন বাংলার সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। আপনভোলা বাঙালী জাতির সাহিত্যের ইতিহাস উদ্ঘাটনে বসুমতী কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা বাংলার সুধী-সমাজই বিচার করিবেন। বসুমতী বাঙালীকে আলোর সন্ধান দিয়াছে।

শ্রীমতী শান্তিসুধা দে
মণিপুর বাগান।

যে সব জিনিষ শাস্ত্র বা জ্ঞান ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ও গৌরবীয় তাহা সমস্ত আপনার মাসিক বসুমতীতে পাওয়া যায়। ইহা আমি আজ ২০ বৎসরের অধিক গ্রাহকরূপে পাইয়াছি।

শ্রীমতী কমলা দেবী
C/O রায়সাহেব কে সি ব্যানার্জ্জী
এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার ও সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট, নাগপুর।

বসুমতী!—এই মধুর নামটির মধ্যেই ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে বিশ্ব-সাহিত্যরত্নের প্রতি মনঃসংযোগ। তাই, পঙ্কী-সাহিত্যের কণ্টকাকীর্ণ বেষ্টনী ভেঙে-চুরে বসুমতী এমন অনায়াসে এগিয়ে চলেছে জয়-যাত্রার পথে।

শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সিংভূম।

●

কাগজ চালাইয়া অধিক লাভবান হওয়া অপেক্ষা অর্থব্যয়ে কার্পণ্য না করিয়া পাঠকগণকে আনন্দ দানের প্রচেষ্টা বসুমতীর অধিক।

পি, সত্যেন্দ্র
কুচবিহার ষ্টেট।

●

স্বাধীন ভারতের সমৃদ্ধিশালী পত্রিকা।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী (গোস্বামী)
জব্বলপুর।

●

মাসিক বসুমতীর সুচিন্তিত প্রবন্ধ, সরস গল্প ও উপন্যাস ইত্যাদি সময়ই আমাদের আনন্দ দিয়া আসিতেছে। মাসিক বসুমতীর জনপ্রিয়তার কারণ—তার অন্তর্নিহিত অমূল্য সম্পদ।

কালীপদ বিশ্বাস
নূতন দিল্লী।

●

সাহিত্যানুরাগী জীবনের সর্ব্ববিধ চিন্তার গতি-পথের নিয়ামক সহায়ক এবং অবসর কালের উন্নত চিত্তবিনোদনের প্রকৃষ্ট উপায় আত্মোন্নতির পরিবর্দ্ধক।

শ্রীশিবপ্রসাদ বিশ্বাস,
প্রধান শিক্ষক
কুঠিপাড়া রুয়্যাল হাইস্কুল।

●

মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে মাসিক বসুমতীকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সাময়িক প্রসঙ্গ শীর্ষক প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত গবেষণাপূর্ণ এবং সুচিন্তিত।

স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর
হবিগঞ্জ।

●

মাসিক বসুমতীর জন্ম জন-সমাজে সুলভে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণ ও সাহিত্য-ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করার জন্য। ইহা তাহার দ্বারা সম্যক্ প্রচার ও ঐকান্তিকতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। অতীতে চারণ ভাট-মুখ গান, গল্প, যাত্রাভিনয়, কথকতা প্রভৃতি আর্য্য ধর্ম্ম ও লোক-শিক্ষার বাহন ছিল, অধুনা যে সব অবজ্ঞাত, সাময়িক পত্র দ্বারা কাজ সাধিত হইতেছে সুতরাং তাদের উপর এক গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। আশা করি, মাসিক বসুমতী সে দায়িত্ব ভাল ভাবেই পালন করিয়া হিন্দুর চিন্তা ও ভাবধারা সরল ও সুগভীর প্রবাহিত করিবে দেশ ও কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির প্রচার করিবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে কৃষি

—অজ্ঞাতনামা

বাণিজ্য ও শিল্পের দিকে লোকে যাতে সম্যক্ আকৃষ্ট হয় সেরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিবে এবং দেশ যাতে শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও শুভ্র চরিত্রে অন্য সকল উন্নত দেশ থেকে একটুকুও পিছাইয়া না থাকে তাহা দেখিবে।

বসুমতীর কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হউক, তাহার যশ ও খ্যাতি চিরস্থায়ী হউক, তার আয়ু সুদীর্ঘ হউক এবং তার সহিত আমার সম্বন্ধ ও ভালবাসা আরও গাঢ় ও মধুময় হউক।

শ্রীদুর্গামাধব সিংহ দেও
বামপুর।

—অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

●

'মাসিক বসুমতী' আত্মপ্রকাশ করিবার পর হইতেই আমি নিয়মিত ভাবে ও অতি আগ্রহের সহিত উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আসিতেছি।

"দেশ-বিদেশের কথা", "ভ্রমণ-কাহিনী", "বৈজ্ঞানিক আলোচনা" মাসিক বসুমতীর বিশেষত্ব। সম্ভব হইলে কোন প্রসিদ্ধ শিকারীর শিকার-কাহিনী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি।

শ্রীব্রজগোপাল কুণ্ডু
২ই বৃন্দাবন পাল লেন
কলিকাতা—৪।

●

—স, ক, লাহিড়ী

—সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—বিশ্বনাথ রায়

—নির্ম্মলকুমার দত্ত

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও ছবির প্রাচুর্য্যে আপনারা অবহেলা করিবেন না বোঝা যায়। আলোকচিত্র সম্বন্ধে আমার নিম্নলিখিত কয়টি পরামর্শ দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

১। মামুলী দৃশ্যাবলী না দিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, আশুতোষ, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ অমর বাঙ্গালীর আলোকচিত্র।

২। তাঁহাদের মিলিত ছবি, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।

৩। আবার তাঁহাদের সহিত পৃথিবীর মহাপুরুষদের মিলন আলোক-চিত্র; যেমন রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজী, সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ ও রোঁমা রোঁলা, জগদীশচন্দ্র ও আইনষ্টাইন।

৪। এমন বাঙালী প্রতিষ্ঠান যে স্থান হইতে বাঙলা ভারত তথা বিশ্বের আদর্শ-যাত্রীর শোভাযাত্রায় অসংখ্য স্বয়ং-সেবক প্রেরণ করিতেছে। যেমন,—বেলুড় মঠ, শান্তিনিকেতন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সায়েন্স কলেজ, বসু গবেষণা-মন্দির, যাদবপুর কলেজ, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। কার্য্যরত কর্ম্মীদের, প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার আলোক-চিত্র যথাযথ ভাবে সাজাইবেন।

উপযুক্ত নাম দিয়া, ছবিগুলি সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রজত-জয়ন্তী সংখ্যায় একটি Photo galleryর স্থান দেন, আপনার সংখ্যা ছবির মধ্যে বাঙলার culture স্পষ্ট ভাবে জনসাধারণকে আনন্দ ও গভীর তৃপ্তি দিবে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
ফিসিক্স ডিপার্টমেণ্ট
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ
রাঁচী।

●

বাংলা সাহিত্য আমাদের দেশের ও জাতীর গৌরবের বস্তু—জগতের দরবারে ইহা শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারে। দেশের জনসমাজকে এই সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করা এক দুরূহ কাজ 'বসুমতী' সুসম্পন্ন করবার প্রয়াস পাচ্ছে।

'বসুমতী' তার নামের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করে চলেছে। পত্রিকাখানিতে ভারতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম্মের ভাবধারাও ভাল ভাবে প্রচারিত হচ্ছে। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমৃতময় কথামৃত পান করার সুযোগও এই পত্রিকাখানি আমাদের দিয়েছে। পত্রিকাখানির সর্ব্বদলীয় মনোভাব আমার খুবই ভাল লাগে। বর্ত্তমানে পত্রিকাখানি গল্পে, প্রবন্ধে, চিত্রে, সমালোচনায় খুবই উন্নতি লাভ করেছে।

শ্রীতারকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাহাদুরপুর, পোঃ শান্তিনিকেতন
বীরভূম।

'মাসিক বসুমতী' কোন পক্ষভুক্ত নয়। কেবল শুদ্ধ সত্যের উপাসক ও প্রকাশক। এই হেতু আমি এই পত্রিকার সমাদর করিয়া থাকি।

শ্রীমহান্ত গণপতি দাস গোস্বামী
দেবীপুর ষ্টেট, জিয়াগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ।

নগরবাসী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মণি ঝাঁঝের সঙ্গে না বলে পারে না, আপনাদের সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি! প্রণব আমায় বলে, যাক্, যাক্। যেতে দাও।

মেয়েদের নীতিগত তর্ক কলহেই পরিণত হয়। একটা প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেলে মণি খুসী হত। কিন্তু হাওয়ার সঙ্গে কলহ চলে না, প্রণবের হস্তক্ষেপের পর কেউ আর তার সঙ্গে ঝগড়া করতে রাজী নয়। এটাই অসহ্য ঠেকে মণির। নিজের ওপর ঘেন্না ধরে যায়। কি এমন বোঝাপড়া আছে ওদের মধ্যে সে যা বোঝে না? কি এমন মহাপাপ সে করে এসেছে সারা জীবন আর কি এমন মহৎ জীবন এরা যাপন করেছে যে সর্ব্বদা সে অস্পৃশ্য হয়ে আছে, কারো মনের ছোঁয়াচ পায় না? হিংসায় বুক জ্বলে যায় মণির। সেই জ্বালায় সে খুঁজে নেয় এ বাড়ীর সব চেয়ে নিরীহ মুখচোরা চিদানন্দের সঙ্গ। চিদানন্দ নামে এ বাড়ীতে যে কেউ এক জন থাকে এটা যেন সত্য সত্যই একমাত্র সে আবিষ্কার করেছে তার মমতা দিয়ে মানুষ বশ করার অদ্ভুত প্রতিভার জোরে। মমতায় সব মানুষ বশ হয় না আবার মনে-প্রাণে বশ না হলে, অথবা অন্ততঃ বশীভূত হবার যোগ্যতা না দেখালে, মমতা করাও সম্ভব হয় না মণির। তাকে তাই মানুষ খুঁজে-পেতে বেছে নিতে হয়। ডাইনীর মত।

বিয়ের ছ'মাস পরে চিদানন্দের টি-বি'র লক্ষণ ধরা পড়েছিল। তাই শুধু আতঙ্কে তার ফর্সা মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে যায়নি, সরস্বতীর কাছে লজ্জায় দুঃখে সে কেঁদেও ফেলেছিল। গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়ায় রোগটা কেটে গেছে, কিন্তু ছায়া রয়ে গেছে জীবনে। গাঢ় ছায়া

পরীক্ষার ফলটা জেনেছেন? মণি প্রথম প্রশ্ন করে। একটু উদ্বেগ—একটু ব্যাকুলতার সঙ্গে।

হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। তবে কি না—

চিদানন্দ নিশ্বাস ফেলে হতাশা-ভরা চোখে তাকায়। মণিকে দেখলেই তার ভয় বেড়ে যায়। মণি এত বেশী সহানুভূতি দেখায় যে মনে হয়, মণি জানে রোগটা তার সারেনি, তার আশা-ভরসা কম।

তার মানে? মণি বলে। তার ভাবটা এমন ভীতিকর!

ডাক্তার বাবু বললেন, স্বাস্থ্য আরও ভাল হওয়া দরকার। আরও পুষ্টি চাই। পুষ্টিকর জিনিষ খেতে বললেন, দুধ মাখন ঘি এই সব—

স্তন্য-বঞ্চিত শিশুর মত চিদানন্দ মণির দিকে তাকায়। কথা সে এমনি ভাবেই বলে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে একটু একটু করে অল্পে অল্পে।

তা সত্যি। সকালে শুধু আধ কাপ দুধ খান। ওতে কি হয়? আপনার বেশী করে দুধ খাওয়া উচিত।

এখানে পালিয়ে আসার আগে নিজের বাড়ীতে নিজের ব্যবস্থায় সে কি খেত তার ফিরিস্তি দিতে সুরু করে চিদানন্দ বেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে! বাড়ীটা তার নিজের, অর্দ্ধেক অংশ ভাড়া দিয়ে চাকরীর টাকায় এক রকম চলে যেত, তার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থাও সম্ভব হয়েছিল। এখানে আর কি করে কি সম্ভব!

তা বললে কি চলে? যার যেটুকু দরকার করতেই হবে। ঠাকুরপোকে বলে—

চিদানন্দ আঁৎকে উঠে বলে, না না, ও-সব বলবেন না! ও কি করবে; কেন করবে? ওর কিছু করার নেই। ঘি দুধ আমিই খেতে পারি, বাড়ী-ভাড়ার আয়টা গিয়ে মুস্কিল হয়েছে। বুঝলেন না?

এক পরিবারের মানুষের চেয়েও এ বাড়ীর লোকেদের মধ্যে এমন আপন-ভাব, প্রেমোচ্ছ্বাস বা হিংসা-বিদ্বেষের এমন অভাব যে, সব সময় মণির সত্যি খেয়াল থাকে না এখানে বাপ ভাই মা বোন ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়া একটি আদর্শ ঘরোয়া পরিবার বাস করে না। অতি বড় দুর্দ্দিনে নিদারুণ বিপদ তাদের এখানে একত্র করেছে, একসঙ্গে বসবাসের প্রয়োজনে সকলের সুস্থ বাস্তব একতা। তার বেশী কিছু নয়। প্রণব কাউকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে এ প্রশ্নও যেমন ওঠে না, কারও স্বার্থত্যাগ বা বিশেষ সুবিধা চাওয়ার প্রশ্নও তেমনি আসে না। এ মিলিত জীবন এদের খেয়াল নয়, নাটুকেপণা নয়,—জীবনকে যত দূর সম্ভব সুস্থ ও সুন্দর করায় সবারই লাভ। যতটুকু সামঞ্জস্য চলতে পারে, এ ভাবেই তা হয়েছে, এক জনের বিশেষ সুখ-সুবিধার প্রয়োজনকে তার বেশী বড় করা দুর্ব্বল মনের অবাস্তব অসার কল্পনা। সে ভাবপ্রবণতার লেজুড় জুড়লে এই অপরূপ আত্মীয়তাটুকু একবেলাও টিঁকবে কি?

তা টিঁকবে না। এ সত্যটার মুখোমুখি হলে মণি মোটামুটি আসল কথাটা বুঝতে পারে, কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি তার কাছে এমন অদ্ভুত আর অনভ্যস্ত যে জীইয়ে রাখতে পারে না, ভুলে যায়। সত্যই তো, এই খুন-জখম অগ্নিকাণ্ড কারফিউর জগতে এর চেয়ে স্বস্তিতে—এর চেয়ে ভাল ভাবে চিদানন্দ কোথায় আর থাকতে পারত? মরণের আতঙ্কে স্তব্ধ নিজেদের সেই এলাকায় গলির ভিতরে বাড়ীতে একক অসহায় দিনযাপনের কথা কল্পনা করে মণি শিউরে ওঠে!

ভূতপূর্ব্ব, টি-বি রোগী চিদানন্দ, ভাল থাকা ভাল খাওয়ার সঙ্গে তার মরা-বাঁচার সম্পর্ক, তার মন পর্য্যন্ত এতখানি সবল যে বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থার কথা প্রণবকে বলার নামেই সে আঁতকে ওঠে—সেও জানে যে তার প্রয়োজন আছে বলেই কারো কাছে অবাস্তব দাবী তোলার মানেই হয় না। হোক সে বন্ধু—হোক সে আত্মীয়।

সেই শুধু এ বাড়ীতে এসেও হৃদয়ের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করার সুযোগ খুঁজছে। স্বামি-পুত্রের ছোট্ট সংসারটিতে অবিরাম চেষ্টা করেছে যা হয় না তার কত ছোট ছোট্ট রকমারি কল্পনাকে সত্য করতে, এখানেও তারই জের টেনে চলেছে।

এখানে আপনার ভাল লাগছে তো?

চিদানন্দ ইতস্ততঃ করে বলে, ভাল লাগছে, তবে কি না—এ অবস্থায় কিছু ভাল লাগে? চার দিকে এত হাঙ্গামা, কষ্ট করে থাকা আর কি। সবারই সমান কষ্ট।

তবে? এ তো বড় মুস্কিল হল মণির! এখানে এভাবে থাকতে কষ্ট হয়, ভাল লাগে না, তবু থাকতে হচ্ছে বলে আপশোষ বাদ দিয়ে শুধু নয় একেবারে বাঁচার আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতেও হয়! এ কি খাপছাড়া কথা যে বিপদ-আপদে দুঃখ-কষ্টে মানুষ বিব্রত হবে না—হা-হুতাশ করবে না?

সরস্বতী বমি করছিল, শব্দ শুনে তারা বারান্দায় যায়। খালি-পেটে জল খেয়েছিলে, না? মণি সবজান্তার মত বলে।

বিছানায় গিয়ে সরস্বতী ক্রমাগত বেঁকে বেঁকে গুটলি পাকিয়ে শোবার চেষ্টা করে। দেখে বিছানায় উঠে তার জামার বোতাম আর কোমরে শাড়ীর বাঁধন আলগা করে দিতে দিতে মণি চিদানন্দকে বলে, আপনি একটু বাইরে যান, বমি করতে খিঁচ ধরেছে, জলে দিতে হবে।

নীলিমা ঘরে ঢুকতেই সমস্ত অপরাধ তার ঘাড়ে চাপিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে, মুখে রোচে না, না খেয়ে রয়েছে, একটু নজরও রাখতে পারেন না?

নীলিমা একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাকায়। কিছু বলে না।

অল্পক্ষণ পরেই সরস্বতী তার হাতটা বুকে চেপে ধরে মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে, তার পর ধীরে ধীরে উঠে বসে।

উঠলে কেন আবার? শুয়েই থাকো না?

না, উঠি, কমে গেছে। খবর শুনি গে একটু।

গা গুলিয়ে বমি করে পিঁচ ধরে বিছানা নিয়েছিল পোয়াতি মেয়েমানুষ, খবর শোনার তাগিদে সেও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে। ঘটনার পর ঘটনার সর্ব্বগ্রাসী বিরাট বন্যা নেমেছে জগতে, এ দেশে, এই নগরে, জীবনের সমস্ত ভিত্তি পর্য্যন্ত যেন ভেঙ্গে-চুরে ভাসিয়ে নিয়ে পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে নতুন করে গড়বে। কি হচ্ছে, কি হবে জানার জন্য দেহ-মন আকুল উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। রাত্রির আসরটির নেশা তাই প্রচণ্ড ভাবে পেয়ে বসেছে সকলকে। সারা দিন প্রাণের ধাক্কায় বাড়ীর মানুষ—পাড়ার মানুষ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, কুরুক্ষেত্রের রঙ্গভূমিতে পরিণত হলেও মানুষের ঘুরে বেড়ানো একেবারে বন্ধ হয়নি। হলে অবশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব কিছুও বন্ধ হয়ে যেত সেই সঙ্গে—যে শ্মশানে প্রেতও ঘুরে বেড়ায় না সেখানে হাওয়ার সঙ্গে হাঙ্গামা করার সাধ কার হবে। দিনান্তে একে একে সকলে বাড়ী ফেরে, ক্ষিদের তাগিদে তাড়াতাড়ি সকলের খাওয়ার পালা শেষ হয়, ধীরে ধীরে খোলা ছাতে বা কোন বড় ঘরের মেঝেতে আসর গড়ে ওঠে। পাড়ার জানা-শোনা লোক দু'-এক জন আসে, কিছুক্ষণ বসে, খবরাখবর বলাবলি করে, আলোচনায় যোগ দেয়, তার পর যেমন বিনা সমারোহে এসে বসেছিল তেমনি ভাবে উঠে চলে যায়। প্রথমে মণির কাছে যা শুধু গল্প-গুজব হাসি-খেলায় সময় কাটাবার খাপছাড়া আড্ডা বলে মনে হয়েছিল তার আর একটা দিক্ এখন স্পষ্ট হয়েছে। চারি দিকে যে সব কাণ্ড-কারখানা চলার ফলে ঝড়-বাদলের অন্ধকারে বন-বাদাড়ে হারিয়ে যাবার মত দিশেহারা ভাব জাগে, চব্বিশ ঘণ্টা ভীত বিভ্রান্ত হয়ে থাকতে হয়, সকলের এই আলাপ-আলোচনার মধ্যে সেটা অনেকখানি কেটে যায়।

কে কোথায় কোন্ সূত্রে কি দেখেছে শুনেছে জেনেছে বুঝেছে, কোন্ বিষয়ে কে কি ভাবছে, তাই কথা-গল্প তর্ক-বিতর্কের মধ্যে এলোমেলো ছাড়া-ছাড়া ভাবে জমতে জমতে ক্রমে একটা সংগঠিত ধারণার রূপ নেয়। বিহ্বল চিন্তা এগিয়ে চলার পথ পায়, শৃঙ্খলা পায়। আসরে গিয়ে বসার জন্য মণিও ক্রমে ক্রমে উৎসুক হয়ে উঠেছে।

ন'টার মধ্যে আজ প্রণবও বাড়ী ফিরেছে, তার শরীর ভাল নয়। আজ ঘরোয়া বৈঠকটি বেশ বড় হয়েছে, পাড়ার চেনা যারা মাঝে-মাঝে আসে তাদের ক'জন ছাড়াও নতুন তিন জন এসেছে—মণি বা সরস্বতীরাও যাদের আগে দেখেনি।

দু'টি অল্পবয়সী তরুণ, দেখে প্রথমেই অনুমান হয় যে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। কারণ, কম খেয়ে বেশী খাটার রুক্ষ কঠোরতার সঙ্গে অদ্ভুত দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা মেশানো চিরন্তন ছাপটা আছে, গান্ধীজীও যে ডিসিপ্লিনের প্রশংসা করেছেন তার সঙ্গে গভীর আত্মবিশ্বাস মেশার যা বাইরের রূপ। এ দেশে এ রকম রোগা রুক্ষ ছেলে একটু লাজুক আর চঞ্চল হয়, কখনো স্থির হয়ে বসতে পারে না, প্রায় উসখুস করার মতই অকারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের টুকটাক্ নড়াচড়া চলতেই থাকে, মুখের ভঙ্গি ক্রমাগত বদলায়, দৃষ্টি হয় নত হয়ে থাকে নয় তো উদ্দেশ্যহীন ভাবে এদিক্ ওদিক্ সঞ্চালিত হয়। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক, সংসারে অর্থ, সাজ-পোষাক আর ললিত কান্তির অভাব যে মোটেই তাদের অপরাধ নয় বরং দামী জামা-কাপড় আর প্রসাধনের পালিশে চকচকে চর্বির ভোঁতা লাবণ্য যাদের আছে তাদেরই, এ সহজ শিক্ষাটা তাদের কে দেবে? এ ছেলে দু'টির স্থির শান্ত ভাব, নির্ভীক সরল দৃষ্টি—এবং তাতে বাস্তবতার মর্ম্মগ্রাহী গভীরতা! অন্য জনের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, শ্যামবর্ণ সুশ্রী চেহারা, এক-মাথা ঘন কালো চুল। পাড়ার উকিল বিনোদ বাবুর সে মেজ জামাই, পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী, নাম মনমোহন। আজ ভোরে সে এসে পৌঁচেছে, তার কাছে নোয়াখালির কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ শোনা গেল। শুনতে শুনতে সকলে মূক হয়ে যায়, নরক এখানেও গুলজার হয়ে আছে তবু সেই সুদূর নোয়াখালির ঝাঁঝটাই যেন বেশী তপ্ত লাগে।

বৈঠকে নবগত ছেলেদের এক জন, অমল, আচমকা প্রশ্ন করে, ভাল দিক্ ছাখেননি কিছু?

ভাল দিক্? মনমোহন বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকায়, এই পাশবিক কাণ্ডের ভাল দিক্?

প্রণব বলে, খুন-জখমের ভাল দিকের কথা বলেনি। ও জানতে চায়, দাঙ্গা-বিরোধী কিছু অংশ যদি থাকে, তারা কি করছে।

কি করবে? দু'-চার জন হয়তো গোপনে আশ্রয় দিয়েছে, পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, তাতে কি এসে যায়?

এসে যায় বৈ কি। বোঝা যায়, এ অবস্থাতেও মনুষ্যত্ব মরে না। আচ্ছা, চাষীদের ভাব কি রকম?

ওখানকার চাষীরা কি জানো—যেমন সরল তেমনি গোঁয়ার। মৌলভীদের প্রভাব খুব বেশী। ক্ষেপিয়ে দিতে পারলে কথা নেই।

আমরা শুনেছি, অমল বলে, অনেক চাষী পাশের গ্রামে গিয়ে যা-তা করেছে, কিন্তু নিজের গ্রামের চেনা-জানা লোকেদের ক্ষতি করেনি।

মণি থাকতে না পেরে ফোঁস করে ওঠে, অত সূক্ষ্ম বিচার দিয়ে কি হবে? তুমি কেবল ওদের দিকে টেনে কথা কইছ! দু'-চার জন ভাল মানুষ সব জাতেই থাকে, ভাল ইংরেজও আছে। তা দিয়ে আমরা কি করব?

মণি আজ প্রথম মুখ খুলেছে। প্রণব একটু আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে তাকায়। ঘর-সংসারের কথা ছাড়া মণি যে আবার এ সব চিন্তাও করে এ ধারণা বোধ হয় তার ছিল না।

সে বলে, দু'-চার জন ভাল লোকের কথা নয়, সাধারণ লোকের মোট মনোভাবটা বোঝা দরকার তো? আগুন লেগে গেছে কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা? আগুন নিবিয়ে বাঁচতে হবে না? কোন্ শ্রেণীর কি রকম রিয়্যাকসন সেটা না বুঝলে বিচার চলে না। সব হিন্দু সব মুসলমান কি এক ভাবে দাঙ্গাটা দেখছে? উপর-তলার মুসলমান আর নীচের তলার মুসলমানের কাছে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের' দু'রকম মানে, হিন্দুরও তাই। আজকের অবস্থায় উপর তলা-নীচ-তলার তফাৎটা ভুলে গেলে আশা-ভরসা কিছু থাকে?

নীচের তলায় বুঝি হিন্দু-মুসলমান একাকার?

বাঁচার স্বার্থে একাকার বৈ কি। নমাজ পড়ে পূজো দিয়ে তো মানুষ বাঁচে না, বাঁচে বলেই নমাজ পড়ে, পূজো দেয়। ভেদ যা আছে সব ওপর থেকে চাপানো। কত জন্ম ধরে পায়ের তলায় পিষে মরছে, পেটের ধান্ধায় কাবু, তার ওপর হাজারটা কুসংস্কারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা, এদের ভুল বোঝানো কি কঠিন? তবু, একটু চেতনা এলেই আর ভেদ চাপানো যায় না। চোখের সামনে প্রমাণ আছে, ছাখো। মজুররা মারামারি করছে না। এখনো যে এই সহরে ট্রামে চেপে বেড়াও, হিন্দু-মুসলমান মিলে-মিশে ওই ট্রাম চালাচ্ছে। এদিকে নোয়াখালি, ওদিকে বিহার, কে বলতে পারে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কি হবে। আজ এ কথা ভুললে রক্ষা আছে এটা ওপর থেকে চাপানো দাঙ্গা, ওপরওলাদের স্বার্থে! উপর-তলার তুলনা কর, কারা বেশী অমানুষ, কাদের দায়িত্ব বেশী, প্রাণ খুলে শাপ দাও, বুকে ছ্যাঁকা লাগলে মানুষ তা দেবেই। আশা-ভরসা রাখো নীচের তলায়।

কি আশা? কি ভরসা?

মধ্যযুগে পারা যেত, এ যুগে শুধু ধর্মের জন্য গরীবকে দিয়ে আর হত্যা করানো যায় না। বেহেস্ত বা স্বর্গের নেশা থাকলেও সেখানে সবটা পুরস্কার পাবার আশায় থাকতে রাজী নয়, কিছু নগদ বিদায়ও চায়। পৃথিবীতে বেঁচে থেকে ভাত-কাপড়ের সুখ পেতে হলে এটা করা চাই-ই, এ বিশ্বাস জন্মিয়ে তবে সাধারণ লোককে দাঙ্গায় মাতানো গেছে। এই বাস্তব চেতনাটাই আশা, ভরসা এবং ভবিষ্যৎ। হিন্দু-মুসলমান যারা পরস্পরকে শত্রু ভাবছে, স্রেফ এই জন্য ভাবছে সে ওরা আমার বাঁচার পথের কাঁটা। আমার ধর্মের পথের কাঁটা, এটা আসল চিন্তা নয়। যে মুহূর্তে ভুল ভাঙ্গবে, টের পাবে যে বাঁচার পথের কাঁটার চাষটা শুধু ওপরতলায় হয়, সেই মুহূর্তে শত্রু-মিত্র চিনতে পারবে, আর—

বক্তৃতায় ভুল ভাঙ্গবে? কবে সাধারণ লোকের ভুল ভাঙ্গবে সেই আশায় বসে থাকব? তা হলেই হয়েছে।

তবে কোন্ আশায় বসে থাকবে? একটা আশা তো চাই।

অতি মৃদুস্বরে প্রণব প্রশ্নটা উচ্চারণ করে। জবাবের জন্য তার নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করাটা অর্থপূর্ণ ব্যাকুলতার মতই ঠেকে।

শেষে তেমনি মৃদুস্বরে সে-ই বলে, বসে থাকার জন্য আশা নয়। কিছু করতে হবে বলেই আশা। এখুনি না হোক, যত কাল সময় লাগুক, আশা নিয়েই মানুষ কাজ করে। নইলে বাঁচার মানে হয় না।

রসময় নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিল। কথার শেষে প্রণব বলে, বসুন।

গিরীন টেলিফোনে একটা খবর জানিয়েছে, রসময় এসেছে খবরটা বলতে। আজ সন্ধ্যার পরেই কাগজের আপিসে একটা ছোট-খাটো আক্রমণের চেষ্টা হয়, ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি, এক জন দারোয়ানের শুধু সামান্য চোট লেগেছে। গুজব শুনে বা অন্য ভাবে খবর পেয়ে বাড়ীর লোক ব্যস্ত হতে পারে ভেবে গিরীন জানিয়েছে যে, ভাবনার কোন কারণ নেই, আপিসটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিছু করতে পারবে না জেনেই হানা দিয়েছিল, আসল উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখানো। আরেকটা খবর গিরীন জানিয়েছে। কোন সূত্রে সে জানতে পেরেছে, তাদের এদিকের এলাকায় হাঙ্গামা সৃষ্টির পরিকল্পনা চলছে, কিন্তু ঠিক কোন্ পাড়ায় হবে, প্রণবদের পাড়া কি না, সেটা জানতে পারা যায়নি।

এ পাড়ায় কি হাঙ্গামা হতে পারে প্রণব বাবু? রসময় জিজ্ঞাসা করে।

কি জানি। সহজে বাধবে না, তার বেশী বলা কঠিন।

রসময় অল্পক্ষণ বসেই চলে যায়, মানুষটা অত্যন্ত নিরীহ এবং ঘুমকাতুরে। এ অঞ্চলে হাঙ্গামার সম্ভাবনার কথাটা গিরীন উল্লেখ না করলে নিজে আসত কি না সন্দেহ। রসময় চলে যাবার খানিক পরে কালু মিস্ত্রী যেন তার প্রশ্নেরই জবাব নিয়ে আসে।

কি খবর কালু?

জবর খবর। ইয়াসিন এসেছিল।

এ পাড়ায় এসেছিল? ইয়াসিন?

খবরটা সত্যই গুরুতর। ইয়াসিন অন্য এক এলাকার শক্তিশালী গুণ্ডারাজ বা গুণ্ডা-নবাব! নিজের দলের সীমানা ছেড়ে এ সব লোক সহজে অন্য এলাকায় যায় না, কারণ ওই একটা এলাকার মধ্যেই ক্ষমতাটা এদের সীমাবদ্ধ থাকে।

কালু বলে, দুপুর বেলা নাজের আলির বাড়ী এসেছিল, সন্ধ্যার সময় সিংহীকে তুলে নিয়ে তিন জন মোটরে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভার আজিজ বলল, চৌরঙ্গীর বড় হোটেলে খানাপিনা করেছে। আরেক জন কে এসেছিল, চার জনে সলা হয়েছে খুব। সিংহী সুবোধ সিংহের চলতি নাম।

প্রণব বলে, ইয়াসিন প্লাস সিংহী। একটু হুঁসিয়ার থাকতে হবে।

অমলের সঙ্গী সুধীর আগাগোড়া চুপ করে শুনছিল। দেখে মায়া হচ্ছিল মণির! কালু চলে গেলে সুধীর বলে, ইয়াসিনের একটা গুণ আছে, কথা দিয়ে কথা রাখে। মধু দত্ত লেনের কয়েক জনকে বলেছিল, আপনারা থাকুন, কোন ভয় নেই। নিজেই আমায় জানিয়েছিল, এবার পালান আপনারা, অন্য দিক থেকে চাপ আসছে, আমি সামলাতে পারব না। ঠিক দু'দিন পরে আর্মড্ গার্ডদের ব্যাপারটা ঘটল।

ওটা কি জান, প্রণব মৃদু হেসে বলে, ওদের বিলাস। গুণ্ডারাও সামাজিক জীব, সমাজের বিকার ওদের চালায়। বিনা খরচায় খানিকটা বাহাদুরী হল, ক্ষতি কি? লাভ থাকলে যাদের ভরসা দিয়েছিল নিজেই তাদের গলা টিপে মারত!

এবার একটু অন্য কথা বলো! দোহাই তোমাদের, মারামারি কাটাকাটি জিন্না গান্ধী গুণ্ডা ছেড়ে অন্য কথা বল! আর কি কোন কথা নেই?

মণির আর্তনাদ সকলকে চমকে দেয় কিন্তু বিভ্রান্ত করে না। গানের সুর যেমন খেলে বেড়িয়ে চড়তে চড়তে চরমে ওঠে, মণি যেন আলাপকে, মানে আলাপী মনগুলিকে চরম আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে এনেছে গোড়ায়।

সরস্বতী বলে, সত্যি, আমরা খালি নেতা নিয়ে, মন্ত্রীমিশন নিয়ে, দাঙ্গা নিয়ে, কংগ্রেস-লীগ-কম্যুনিষ্ট নিয়ে মেতে আছি। চব্বিশ ঘণ্টা সামলাও সামলাও ভাব। কেন, আমাদের সাধ-আহ্লাদ সুখ-দুঃখ নেই? নেতারা চুলোয় যাক, রাজনীতি মরুক, টুটু, তুই একটা গান গেয়ে শোনা দিকি লক্ষ্মীটি!

নীলিমা নিশ্বাস ফেলে বলে, টুটু, 'সার্থক জনম আমার' গানটা গা। সত্যি, আমরা সবাই যেন মহাপাপ করেছি, খালি দেশ আর সমাজ, সাম্রাজ্যবাদ আর, স্বাধীনতা, বিপ্লব আর সমাজতন্ত্র। কুলি-মজুররা পর্য্যন্ত হৈ-চৈ ফুর্ত্তি করছে, আমাদেরি যত দায় !

ঢোলক ঘুঙুর আর মোটা আওয়াজে মিলিত কণ্ঠের সস্তা সঙ্গীতের আওয়াজ সত্যই ভেসে আসছিল। প্রণব মণির কাছে প্রায় কৃতজ্ঞতা বোধ করে। বিপ্লব যে আতিশয্য নয়, আত্মহত্যা নয়, মানুষের সুখ-দুঃখের নিয়ম বিধানেই বিপ্লব হয়, সেও প্রায় ভুলতে বসেছিল।

টুটু ভূপেনের মেয়ে, বছর পনের বয়স। যেমন রোগা তেমনি কালো, ভয়-ভাবনায় ভীরুতা মাখানো মুখ। গান গাইবার অনুরোধের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে এর দিকে ওর দিকে তাকায় বার কয়েক ঢোঁক গেলে। তার পর মুখ উঁচু করে চারতলা বাড়ীর ছাত-ঘেঁষা মাঝারি চাঁদটার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায়। ধীরে ধীরে সে গাইতে আরম্ভ করে, গলায় গান যেন তার নব-বধূর মত বিয়ের মন্ত্রের স্বামী সম্ভাষণে চলেছে প্রথমে এই রকম ধরা-বাঁধা নিয়মতান্ত্রিক মনে হয়। ক্রমে মেয়েটা মসগুল হতে থাকে নিজের গানে, ক্রমে তার কণ্ঠ ও সুর জগতের সেরা অভিসারিকার মত ঘর বর হিংসা দ্বেষ হানাহানির সীমানা ছাড়িয়ে বিরাট প্রাণের মহাব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে পড়ে।

গান শেষ করে টুটু নীরবে উঠে গিয়ে আলসে ঘেঁষে দাঁড়ায়। কতগুলি মনকে সে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে তার খেয়ালও থাকে না।

একটি মেয়ের একটি গান বিব্রত অশান্ত পীড়িত মনগুলিকে কি ভাবে বদলে দিতে পারে তাই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে আবার যখন ধীরে-ধীরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। ছাড়া-ছাড়া ভাবে বিচ্ছিন্ন পীড়নের মত প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলি একে একে না এসে বৈঠকে এবার সমগ্র দেশ, বৃহৎ পৃথিবী, সমস্ত মানুষ, অতীত ইতিহাস ও আশাতীত ভবিষ্যতের ভূমিকা সৃষ্টি হয়। জগতের মানুষ আজ কোন্ দিকে চলেছে, জীবনের অভিযান কোন্ সার্থকতার উদ্দেশ্যে, ভারতের কোন্ মুক্তি জগতকে মুক্তির পথে এগিয়ে নেবে, সোভিয়েট রাশিয়ায় যে নূতন সভ্যতার ভিত্তি পত্তন হয়েছে তার কর্ম্মময় চেতন-মুক্তির মর্ম্ম কি, কিসে মানুষের স্বাধীনতা, কেন স্বাধীনতা। রাত্রি গভীর হয়ে আসে, লক্ষ লক্ষ স্পন্দিত হৃদয়ের বিচরণ-ক্ষেত্র মহানগরী আকাশ পর্য্যন্ত গুঞ্জনময় স্তব্ধতা বিস্তার করে যেন কান পেতে তাদের কথা শোনে।

ভোরে দেখা গেল নানী পথের ধারে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে। বোসেদের দোতলা বাড়ীর নীচের তলায় দালানের গঠনের সঙ্গে আত্মসাৎ মার্ব্বেল পাথরের মন্দিরটির ঠিক সামনে। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে নানীর সর্ব্বাঙ্গ, তাকে ঘিরে রাস্তায় ছড়িয়ে আছে চাপ-চাপ অজস্র রক্ত। নানীর ওই ক্ষীণ দেহে এত রক্ত কোথায় ছিল ? অথবা এ রক্ত শুধু নানীর রক্ত নয় ? এ মরণ শুধু নানীর মরণ নয় ? দালানসাৎ মন্দিরটির লোহার কোলাপসিবল দরজার খাঁজে লটকানো গরুর মাথাটি দেখলে তাই মনে হয়।

কিন্তু কেন এ মর্ম্মান্তিক হত্যা ? এ জগতে কার কাছে নানী কি অপরাধ করেছে ? সে তো প্রিয় ছিল সকলের, বয়সের ভারে বাঁকা হয়ে সে তো ঝুঁকে পড়েছিল কবরের দিকে, আজ বাদে কাল গোবর-কুড়ানো জীবন থেকে আপনা থেকেই সে মুক্তি পেত ? তার মৃত্যুর সঙ্গে কেন জড়িয়ে দেওয়া মন্দিরের এই বীভৎস অপমান ? এ এলাকায় হাঙ্গামা ঘটেনি, কিন্তু সারা সহরের মত এখানেও স্নায়ুগুলি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় টান-টান হয়ে আছে—এ যদি সেই স্নায়ুমণ্ডলীর ধৈর্য্য ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যে হয়, এত কাছাকাছি বিপরীত উস্কানি কেন ?

নানীকে কি আগে হত্যা করা হয়েছিল, মন্দিরের গায়ে লটকানো গরুর মাথাটি তার জবাব ? অথবা ওই গরুর মাথাটির জবাব নানীর এই মরণ ?

যেমন বীভৎস তেমনি রহস্যময় ঘটনা, অনেক প্রশ্নই মনে জাগে। কিন্তু প্রশ্ন করার রহস্য বোঝার অবসর মেলে কৈ ? এ কাণ্ড যাদের পরিকল্পনা তারা চুপ করে ছিল না। ভোরের আলো ভাল করে ফুটবার আগে তারাই আবিষ্কার করে নানী আর গরুর মাথাটি, তারাই সোরগোল হৈ-চৈ তুলে দেয় চারি দিকে। তার মধ্যে কোথায় তলিয়ে যায় বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা, কিসে কি ঘটেছে এবং কেন ঘটেছে আগে তা ভেবে নিয়ে তার পর উপযুক্ত প্রতিহিংসার চিন্তা আনা। মানুষের মনকে যখন বারুদে পরিণত করে রাখা হয়েছে তখন বড় জোর আগুনের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলার বিবেচনাটুকু তার থাকতে পারে, স্ফুলিঙ্গ এসে ছুঁয়ে ফেললে বারুদের জ্বলে ওঠা আর ঠেকানো যায় না।

[ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতীর সডাক চাঁদার হার

(ভারতীয়)		(বৈদেশিক)	
বার্ষিক	৯৲	বার্ষিক	১৮৲
ষাণ্মাসিক	৫৲	ষাণ্মাসিক	১০৲

স্থানীয় এবং বৈদেশিক রেজেষ্ট্রী খরচ ৩৲

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আজ আমি যে প্রতিষ্ঠানটি উৎসর্গ করছি সেটি মাত্র প্রয়োগশালা নয়—সেটি মন্দির। প্রয়োগ-বিজ্ঞান দ্বারা আমরা সেই সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি যে সত্য হয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর অথবা আমাদের সৃষ্ট কৃত্রিম যান্ত্রিকতার বিপুলা পরিধির মধ্যে গ্রাহ্য। প্রকৃতির জগৎ থেকে ধ্বনি যখন শ্রবণাতীতে পাড়ি দেয় তখনও তার হদিস আমরা পাই। মানুষের দৃষ্টি যেখানে রুদ্ধ সেই অদৃশ্য জগতেও চলে আমাদের অভিযান। কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অতীত যে বিশ্ব তার পরিধির তুলনায় দৃশ্যমান জগৎ অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু সেই অজানার সীমাহীন সমুদ্রেই মানুষ তার অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে চালিয়েছে নির্ভীক অভিযান। তবুও বিজ্ঞানের অতি কুশলী শক্তি ও আয়ত্তের বাহিরেও অবস্থান করছে বহু সত্য। তাদের উপলব্ধির জন্য চাই স্থির-প্রত্যয়—ক'টি বৎসরের অনুশীলনেই নয়—সারা জীবনের সাধনায় যা লভ্য। সেই পরম প্রত্যয় যার দ্বারা সেই সত্য জ্ঞান লাভ সম্ভব তার জন্যই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে ব্যক্তিগত, অথচ সমষ্টিগত, সত্য ও বিশ্বাসকে অর্জন করার জন্য এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা হোল এই—কোন বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ যখন নিজেকে উৎসর্গ করে তখন রুদ্ধদ্বার তার জন্য উদ্ঘাটিত হয়ই—আপাততঃ অসম্ভব বাস্তব হয় তার জীবনে।

বত্রিশ বছর আগে আমি বিজ্ঞান অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের দেশে এই ধারণা চালু যে ভারতীয়দের অদ্ভুত মানসিক গঠনের জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণার পরিবর্তে দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানের দিকেই আসক্তি বেশী। তা ভিন্ন সেদিন অনুসন্ধিৎসা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকলেও সেই ক্ষমতা প্রয়োগের কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। কুশলী যন্ত্রবিদদের জন্য একটি সুসজ্জিত প্রয়োগশালা অবধিও ছিল না। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানুষের শুধু বিবাদে মেতে থাকলেই ত চলবে না—সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হতে হবে। আর আমরা সেই মহাজাতিরই বংশধর—যাঁরা সামান্য মাল-মশলা নিয়েই বিরাট সত্যকে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন।

নিজের গবেষণায় ব্যাপৃত থাকা কালে আমি অজ্ঞাতসারেই এক দিন প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জীবতত্ত্বের সীমান্ত রাজ্যে এসে উপস্থিত হলাম। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে দু'য়ের সীমারেখা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে জড় ও জীব-জগৎ এক সীমানায় পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। অজৈব জগতও নিষ্প্রাণ নয়—বহু বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে সেখানেও প্রাণদ্বন্দ্ব। সর্বজাগতিক নিয়মের বন্ধনে ধাতু, উদ্ভিদ্ ও জীব-জগৎ এক হয়ে আছে। তাদের মধ্যেও ক্লান্তি ও মুহ্যমানতা যেমন তেমনি পুনঃ স্ফূর্তিপ্রাপ্তি ও সজীবতাও এক সার্বজনীন সাধারণ ব্যাপার—আবার তেমনি তাদের মধ্যে দেখা যায়, অন্তহীন সাড়াহীনতা যাকে আমরা বলি মৃত্যু। এই ঘটনার সার্বজনীনতা আমাকে বিস্ময়বিমূঢ় ক'রেছিল। বহু আশা নিয়ে আমি আমার সেই গবেষণার ফল রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম—পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করলাম আমার বক্তব্যকে; কিন্তু সেখানে সমবেত জীববিদ্রা আমার বক্তব্য শ্রবণের পর আমাকে জানালেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুসন্ধানেই যেন আমি ব্যাপৃত থাকি, যেখানে আমার সাফল্য প্রতিষ্ঠিত—তাঁদের রাজ্যে আমি যেন অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা না করি। আমি যেন অরসিকের মত এক অপরিচিত সমাজে পথ ভুলে এসে পড়েছিলাম। কাজেই এদের শিষ্টাচারের নিয়ম লঙ্ঘন করেছি। এক প্রকার ধর্মীয় সংস্কার ছিল তাদের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে যেখানে অজ্ঞানতা ও প্রত্যয় প্রত্যক্ষ ভাবে বিরাজ করত না।

যে বিরাট পুরুষ নব নব সৃষ্টির রহস্যজালে ঘিরে রেখেছেন চারি দিক, ধূলিকণার অণুজগতেও যে অবর্ণনীয় বিস্ময় লুকিয়ে রেখেছেন তার আণবিক সংগঠনে শৃংখলা ও নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, সেই বিরাট পুরুষই ত মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা ও অনুধাবনের ইচ্ছা অনির্বাণ জ্বালিয়ে রেখেছেন। সেদিন এই ধর্মীয় কুসংস্কারের সঙ্গে আরো মিলিত হয়েছিল ভারতীয়দের যোগ-সাধনা ও সীমাহীন কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে মারাত্মক ভুল ধারণা। কিন্তু যে জলন্ত কল্পনার সহযোগিতায় এই আপাতবিরোধী তথ্যাবলীর মধ্যেও নতুন শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেই কল্পনাকে ভারতে সংহত রাখা হয় ধ্যানের দ্বারা। এই সংযম সাধনা সত্যসন্ধানী মনকে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত রাখে, কঠোর স্থৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে বাধ্য করায়—বার বার প্রতিটি তথ্যকে পরীক্ষাসিদ্ধ করে নিতে প্রবুদ্ধ করে।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে বিজ্ঞানের রাজ্যেও নবাবিষ্কারের প্রতি ভ্রান্ত সংস্কার থাকবে। সুতরাং আরো অকাট্য যুক্তির দ্বারা এই প্রথম অবিশ্বাসকে জয় করার জন্য আরো অপেক্ষা করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন অনেক বাধা-বিঘ্ন ঘটল যা এত দূর থেকে নিরসন করা অসম্ভব ছিল। এর পর দীর্ঘ বার বছর ধরে যে যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার চেয়ে নিরুৎসাহসূচক আর কিছু হতে পারে কি না জানি না। আজ এত দিন পরে সেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দরকার হয়ে পড়েছে। কারণ, যে সত্যের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করবে তাকে উপলব্ধি করতে হবে সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়—সে পথ অনন্ত বাধা-বিঘ্ন-কণ্টকিত। তাকে লাভ-ক্ষতি জয়-পরাজয় সব কিছুকে এক মনে ক'রে জীবনকে দেবতার নৈবেদ্য'র মত উৎসর্গ করতে হবে। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালস্থায়ী মেঘ হঠাৎই অপসারিত হয়েছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এক বৈজ্ঞানিক দল নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম। তখনই পৃথিবীর বরেণ্য বৈজ্ঞানিকদের সমক্ষে আমার আবিষ্কারের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সে পরীক্ষায় আমার গবেষণালব্ধ বিষয়-বস্তুর সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ভারতের অবদানও স্বীকৃত হয়েছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, ভারতে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের কি বিপুল বিপর্যয়কারী বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এই ঘটনার পর যারা আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে তাদের পথ আরো সুগম করার সংকল্প আমার মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হোল। বহু বছরের সাধনায় ভারত যা অর্জন করেছে তার মুঠি সে ত শ্লথ করতে পারে না।

সে কি বস্তু যা ভারতকে অর্জন ও রক্ষা করতে হবে? স্বল্প বা সীমাবদ্ধ বস্তুতে ভারতের মন কি সন্তুষ্ট থাকতে পারে? তার ইতিহাস তার সংস্কৃতি কি তাকে বর্তমানের ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ লাভের জন্য তৈরী করেছে তাকে? এই মুহূর্তে ভারতের সামনে পরস্পর-বিরোধী

নয়, দু'টি পরিপূরক মহান্ আদর্শ রয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ঘূর্ণাবর্তে জোর ক'রে টেনে নামান হয়েছে তাকে। শিক্ষা বিস্তার, নাগরিক দায়িত্ব পালন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার দ্বারা ভারতকে সর্বতোভাবে উপযুক্ত হতে হবে। জাতীয় কর্তব্যের এই মুখ্য অপরিহার্য বিষয়গুলির যে কোনটির অবহেলা তার অস্তিত্বকেই বিপন্ন ক'রে তুলবে। ব্যক্তিগত সাফল্য ও উচ্চাকাংক্ষা পরিতৃপ্তির ইতিহাস থেকেই সে উৎসাহ উদ্দীপনা আহরণ করবে।

কিন্তু জাতীয় জীবনের নিরাপত্তার এই শেষ কথা নয়। পাশ্চাত্য দেশ শক্তি ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে বস্তুতান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের অভীষ্ট ফল লাভ করেছে। বিজ্ঞানের রাজ্যেও তাই আজ এই দুরন্ত অভিযান—বাঁচার জন্য নয়, ধ্বংসের মারণ অস্ত্রের সন্ধানে জ্ঞানের অপপ্রয়োগ চলেছে। তাই আজ নিয়ন্ত্রণ-শক্তির অভাবে মানব-সভ্যতা ধ্বংসের মুখে আর্তের মত কাঁপছে। এমন একটা অনুপূরক আদর্শ আজ চাই যা মানুষকে রক্ষা করবে এই উন্মত্ত অভিযানের মুখ থেকে, যার শেষ পরিণতি নিশ্চিত ধ্বংস। মানুষ আজ দুরন্ত বাসনার উত্তেজনা ও লোভের টানে ছুটে চলেছে—মুহূর্তের জন্যও চরম উদ্দেশ্যের কথা ভাববার অবসর নেই তার। সাফল্য শুধু সাময়িক উত্তেজনার ইন্ধন যোগায়। মানুষ ভুলে গেছে জীবনশিল্প সৃষ্টিতে প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতাই অধিকতর ফলপ্রসূ ও কার্যকরী। কিন্তু একমাত্র আমাদের ভারতবর্ষেই যুগ যুগ ধরে বহু মনীষী এই সাময়িক সাফল্যের মোহে বিভ্রান্ত না হয়ে সেই চরম আদর্শ উপলব্ধির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন—কর্মহীন অবলুপ্তির পথে নয়, নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম-সাধনার পথে। যে দুর্বল, সংগ্রামে পরাঙ্মুখ কিছুই সে অর্জন করেনি, কিছুই সে ত্যাগও করতে পারে না। যে সংগ্রামে জয়ী হয়েছে একমাত্র সেই বীর্যবান পুরুষ তার অমূল্য অভিজ্ঞতার ফল দিয়ে পৃথিবীকে ঐশ্বর্যবতী করেছে। ভারত কাজের মধ্য দিয়ে আদর্শ উপলব্ধির বহু দৃষ্টান্ত জীবন ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছিন্ন গ্রন্থি রচনা ক'রে এসেছে। তার সুপ্ত যৌবন সমতার বলে অনন্ত বিবর্তনের মধ্যেও নিজেকে সে বারে বারে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ব্যাবেলিয়ান আর নাইল উপত্যকার সত্তা কবে বিদায় নিয়েছে সেখান থেকে কিন্তু ভারতের আত্মা চিরযুবা—বার-বার সে নতুনকে নিজের মধ্যে গ্রহণ ক'রে সময়ের তালে তাল রেখে চলেছে।

মানবতার বৃহত্তর আহ্বানে যে আদর্শ, যে ত্যাগ, যে আত্মাহুতি সেই হোল অনুপূরক আদর্শ। ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থের মধ্যে এর সফলতা নয়। সমস্ত সামান্ততার উর্ধে ওঠার মধ্যেই এর সার্থকতা—অন্যের ক্ষতির দ্বারা লাভের যে মূঢ়তা তাকে বর্জনের মধ্যেই এর চরম সার্থকতা। আমি জানি, সমস্ত বাহ্যিক চাঞ্চল্যের কারণ দূরীভূত না হলে শান্তির শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে না পারলে এই জ্ঞান সম্ভব নয়।

বহু উচ্চাভিলাষী যুবকের পক্ষেই জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ বা অন্য নানা বৃত্তিই হয়ত উপযুক্ত হবে। কিন্তু আমার নির্দিষ্ট সংখ্যক শিষ্যবৃন্দ—যারা প্রকৃত অন্তরের আহ্বান শুনেছে তাদের আমি বলিষ্ঠ চরিত্র ও দৃঢ় মন নিয়ে সত্যের মুখোমুখী হতে, জ্ঞানের জন্য জ্ঞান আহরণের নিরলস সংগ্রামে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমার আন্তরিক ইচ্ছা, যত দূর পর্যন্ত স্থান সংকুলান সম্ভব হবে সকল দেশের শিক্ষার্থীর পক্ষেই এ শিক্ষায়তনের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। এ দিক থেকে আমি দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। পঁচিশ শতাব্দী পূর্বেও নালন্দা ও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় সারা পৃথিবীর বিদ্যার্থীকে স্বাগতম জানিয়েছিল। সত্য এক—বিজ্ঞানও এক। বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত।

পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতা লাভের বিপুল প্রয়াসে আসল সত্যকে হারিয়ে ফেলার বিপদ দেখা দিয়েছে। সত্য একম্ অদ্বিতীয়ম্—বিজ্ঞানও একক। সর্বজ্ঞানের সমষ্টিই হোল বিজ্ঞান। প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ কতই না বিশৃংখল মনে হয়। প্রাকৃতিক জগৎ কি নিয়মের জগৎ মানুষ যেখানে এক দিন নিয়ম-শৃংখলার সূত্র খুঁজে পাবে? ভারতবর্ষই তার মানসিক সৌষ্ঠবের দ্বারা সেই ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করবে—আবিষ্কার করবে বিশৃংখলার রাজ্যে নিয়মের জগৎকে। এই চিন্তাধারাই এক দিন আমাকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিরোধী সীমান্ত রাজ্যে এনে ফেলেছিল—সাহায্য করেছিল আমায় কাল্পনিক আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বার-বার পরিবর্তনের দ্বারা অজৈব জগৎ থেকে জীব জগতে, তার বিচিত্র বিকাশ, তার গতি ও অনুভূতির রাজ্যে অভিযান চালিয়ে আমার কর্মধারাকে স্বকীয় রূপদান করতে। গত তেইশ বছর ধরে দেড়শ' বিভিন্ন অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দৃষ্টি চালনা ক'রে আজ আমি তার মধ্যে একটি নিয়মের সুবর্ণসূত্র খুঁজে পেয়েছি।

জড়ের মধ্যে গতিছন্দ, জীব-জগতে প্রাণের লীলা, বিকাশ ও বৃদ্ধির দিকে তার নিরন্তর প্রয়াস। আবেগ সঞ্চারণে স্নায়ুমণ্ডলী সোৎসুক অনুভূতি—কত রূপে বিচিত্র কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি ঐক্যতান। এটাই বিস্ময়কর নয় কি যে স্নায়ুমণ্ডলীর কম্পন শুধু যে পদার্থ হতে পদার্থে ই সঞ্চালিত করা যায় না তা নয়—তাকে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব। দর্পণের মত তাকে প্রতিবিম্বিত করাও যায়। উত্তেজনা আর অনুভূতিতে, চিন্তা আর আবেগে জীবনের এ-ও এক বিচিত্র দিক্। এদের মধ্যে কোনটা সত্য—কায়া না ছায়া? বস্তু, না তার প্রতিবিম্ব? এর মধ্যে কোন্‌টি অবিনশ্বর—কালজয়ী?

বৈদিক যুগে এক জন নারীকে বর প্রার্থনা দ্বারা ধনের অধিকারিণী হতে বলা হয়েছিল। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—সেই ধনের দ্বারা কি অমরত্ব অর্জন করা যাবে? বৈভবে কি হবে যদি না সে মরণজয়ী জীবনের অধিকার দিতে পারে? সেই অমৃত লাভের জন্যই ভারতের সত্তার শাশ্বত পিপাসা। পার্থিব বন্ধনে বন্দী হতে চায় না সে—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সাধনার দুস্তর পথে নিজের ভাগ্যকে নিজে চালনা ক'রে অমৃতের অধিকারী হতে সে চায়। অতীতে অনেক সাম্রাজ্যই বড় হয়েছে—পেয়েছে পৃথিবী শাসনের দুর্লভ ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষণিক মদমত্ত মহা সাম্রাজ্যের স্মৃতিচিহ্ন আজ মাটির নীচে কয়েকটি ধ্বংসস্তূপে আবদ্ধ। কিন্তু এ সবের মধ্যেও এমন কিছু আছে যা বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করলেও—তার বিকার, আপাত মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে যায়। সেই কিছুই হোল চিন্তাধারার প্রজ্বলিত শিখা যা যুগ যুগ ধরে অনির্বাণ আলোক দান ক'রে আসছে।

বস্তুতে নয় মহীয়সী চিন্তায়, আজিও শক্তি বা অধিকারে নয় মহান্ আদর্শেই অমরত্বের বীজ লুকান আছে। পার্থিব সম্পদের আহরণে নয় মহৎ ভাব ও আদর্শের বিনিময়ের দ্বারাই বিশ্ব-মানবের সত্যিকার সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায়। একদা মহারাজ অশোক সমুদ্রস্তনিত বিপুল ভূভাগের অধীশ্বর হয়েও—সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিয়েও পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারেননি। যথাসর্বস্ব দান করতে করতে এমন একটা সময়ও এসেছিল তাঁর জীবনে যখন একটি আমলকীর অর্ধাংশ ভিন্ন আর দেবার মত তাঁর কিছুই ছিল না। সেদিন তিনি কেঁদে বলেছিলেন—এর অতিরিক্ত দেয় যখন আমার আর কিছুই নেই এই অর্ধ আমলকীই হোক আমার শেষ নিবেদন। সেই আমলকীর প্রতীক এই শিক্ষায়তনের কার্ণিশে খোদিত আছে। আর আছে সবার উপরে বজ্রের প্রতীক। মহর্ষি দধীচির অস্থি। সেই নিষ্কলুষ পবিত্র আত্মা অসত্যকে দমন ক'রে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার পুণ্যময়-ব্রতে নিজের অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমরা শুধু সেই অর্ধ আমলকীই এখন অর্পণ করতে পারি। তবু অতীত মহিম্ন মূর্তিতে আবার জাগবে। আজ আমরা সকলে এখানে সমবেত হয়েছি—আগামী কাল থেকে সুরু হবে কাজ। আমাদের একনিষ্ঠ সাধনা ও অবিচল বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা আমাদের ধ্যানের ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব।

কাশীধাম

[সেকালের কথা জানবার কৌতূহল আমাদের সকলেরই আছে। সেকালের সংবাদপত্রে বহু কৌতুকপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হত। পুণ্যক্ষেত্র কাশীধাম সম্বন্ধে সেকালের কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হল।—মা, ব]

"কাশী নগরে অনুমান আট লক্ষ লোক আছে। দশ বৎসর হইল কাশীতে হিন্দু ও মুসলমানের বড় বিরোধ হইয়াছিল মুসলমানেরা হিন্দুরদের দেবালয়ে গোহত্যা করিল তাহাতে হিন্দুরা কোপাবিষ্ট হইয়া মুসলমানেরদের এক প্রধান মসজিদ্ ইদগা সেখানে এক শূকরকে মারিয়া ফেলিল তাহারদের মিম্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহারদের কোরাণ ছিঁড়িয়া আপন২ পায়ের নীচে রাখিল। মুসলমানেরা ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দুরদের প্রধান মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও কালভৈরবের জাতা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও পুনর্ব্বার সেখানে আর একটা গোহত্যা করিল ও তাহার রক্ত সর্ব্বত্র ছিটাইল ও সে মৃত গো এক পবিত্র পুষ্করিণীতে ফেলিল। পরে হিন্দুরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনারদের শক্তিপর্য্যন্ত মুসলমানেরদিগকে মারিল তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিরা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আপনারদের সৈন্যদ্বারা উভয় পক্ষে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।"

(২৪ জুলাই ১৮১৯। ১০ শ্রাবণ ১২২৬)

"জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেবকৃত কাশী বিবরণে জ্ঞাত হওয়া গেল যে আট শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ কাশী এক পল্লীগ্রাম ছিল ক্রমে২ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ হইতে২ এখন নানাবিধ অট্টালিকাময়ী হইয়াছে। পারসীয় বিবরণকর্ত্তারদের গ্রন্থে বোধ হয় যে গজনেনের সোলতান মহমুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ঐ কাশী বানার নামে এক রাজার অধিকারে ছিল পরে ১০২০ ইংরাজী শালে মসঊদ নামে সেনাপতি কাশী শহর লুঠ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ইহার পরে ১১৯৩ ইংরাজী শালে কোতবুদ্দীন বাদশাহ পুনর্ব্বার ঐ শহর লুঠ করিয়াছিল। তাহাতে ঐ উভয়ে অনেক ধন পাইয়াছিল ও অনেক দেবপ্রতিমা বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৩০ শালে মহম্মদশাহ বাদশাহের কালে মনসারাম জমীদার আপন পুত্র বলবন্ত সিংহের নামে ঐ কাশীর রাজত্বের ও টাকশাল ও অদালতের শনন্দ পাইল। কাশীতে গঙ্গাতীরে মানমন্দির নামে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকাময়ী পুরী ১৫৫০ শালে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে। এবং ঐ পুরীতে যে সকল জ্যোতিষের যন্ত্র আছে সে সকল রাজা জয়সিংহ আহরণ করিয়াছিলেন। অনুমান বিশ বৎসর হইল একবার কাশীর লোক প্রভৃতি গণা গিয়াছিল তাহাতে জানা আছে যে তখন ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মনুষ্য ও একতালা অবধি ছয় তালা পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজার বাড়ী ছিল আর এক শত আশী বাগানবাড়ী ছিল এবং ছয় তালা যে২ বাড়ী তাহাতে দুই শত লোক বাস করিত এখন অনুমান হয় তদপেক্ষায় অধিক হইয়া থাকিবেক। কাশীর আশ্চর্য্য বিষয় তিন রাড় সাঁড় সিঁড়ি।"

(৩০ নবেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯)

"মহারাণী ভবানী দেবী কাশীতে অনেক২ কীর্ত্তি করাতে দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা নামে খ্যাতা ছিলেন তিনি দুর্গাদেবীর মন্দির উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার নাটমন্দিরের কেবল পোত্তামাত্র হইয়াছিল পরে তিনি পরলোকগামিনী হইলে মেরামত না হওয়াতে স্থানে২ মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল তাহাতে মহারাজ অমৃতরাও ঐ নাটমন্দির প্রস্তুত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত পারেন নাই। এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় অধিক ব্যয়ে ঐ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের বিশেষ জানা যায় নাই কিন্তু শুনা যাইতেছে যে ঐ মন্দিরে চতুর্ব্বিংশতি প্রস্তরময় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।"

(১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০)

রূপান্তর

বাসবেন্দ্র ঠাকুর

মেদিনীপুর জেলার ভিতর ছোট গ্রাম। মাইতিদের পুকুরের পশ্চিম পারে বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় খড়ের চাল-দেয়া বাড়ীখানা পাঁচ বছর পরে আজকে যেন হঠাৎ আবার সজীব হয়ে উঠেছে। অনেক ঝড় বয়ে গ্যাছে এই গ্রামের মাথার উপর দিয়ে; ১৯৪২ সালের আই, সি, এস অফিসারদের অত্যাচারে বন্যায় ও মহামারীতে অনেকে হয়েছে দেশছাড়া; আর কেউ কেউ দেহটা ছেড়ে চলে গ্যাছে এমন এক জায়গায় যেখানে একবার গেলে আর ফিরে আসা যায় না।

অজয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর অজয়ের মা শোকে ও চিন্তায় কিছু কাল অসুখে ভুগে ইহলোক ত্যাগ করে যান। পিতা মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টারি থেকে অবসর নেবার পর বছর খানেক হল নিউমোনিয়ায় মারা গেছেন। অন্যান্য আত্মীয়েরা সব কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। বংশের মধ্যে আছেন শুধু ভোলা ঠাকুরদা আর পদ্ম পিসি, যাঁদের জন্যে ওদের বাড়ীর চারটে খুঁটি আজও কোন প্রকারে সোজা হয়ে আছে।

পাঁচ বছর পর অজয় ফিরে এসেছে এ কথা সারা গ্রামে রটে যেতে বেশীক্ষণ লাগলো না।

পাঠশালার সঙ্গী শঙ্কর হাট থেকে ফেরবার পথে খবর পেয়েই পুকুরের পশ্চিম পারের খড়ো বাড়ীর দরজায় এসে ডাকে, "ও পদ্ম পিসি!" "কে? শঙ্কর না কি? এস বাবা, এস। পাঠশালার সঙ্গী তুমি আর ঐ রায়েদের বেণু সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকতে, তার সঙ্গে কি না পাঁচ বছরের ছাড়াছাড়ি···"

"আমি খবর পেয়েই ছুটে এসেছি পদ্ম পিসি।" "তা আর আসবে না। এস বাবা, এস। কেউ কি আর ভেবেছিল যে ও বেঁচে আছে! আমি কিন্তু ঠিক জানি, খোকা এক দিন না এক দিন ফিরে আসবেই। আহা! আজ যদি অভয় আর বৌমা থাকতো!···" ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়াকে স্মরণ ক'রে পদ্মাবতী ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে একবার চাইলেন।

শঙ্কর ঘরের ভিতর ঢুকে দেখতে পেল, এক-ঘর লোকের মাঝখানে বসে আছে অজয়। গায়ে একটা অপরিষ্কার মিলিটারী ধরণের খাঁকী কোট, পরনে একটা থান—খুব সম্ভব পদ্ম পিসির কাপড়খানা ধুতি ক'রে পরা। ঘরের এক কোণে ঝুলছে একটা খাঁকী প্যাণ্টলুন, তার নীচে রাখা আছে একটা চকচকে নূতন চামড়ার ব্যাগ।

পথে আসতে আসতে শঙ্কর ভেবে রেখেছিল, অজয়কে জড়িয়ে ধরে কেমন ক'রে সে কোলাকুলি করবে তার পর জিজ্ঞেস করবে কত কথা। পাঁচটা বছর কি কম কথা! তার পর নদীর পারে যেদিন অজয়ের জুতোজোড়া পাওয়া গেছিল সেদিন গ্রামের সবাই ভেবেছিল, ঐ নদীর স্রোতের মধ্যেই তারা চিরদিনের জন্য অজয়কে হারিয়েছে। সে কি আর ফিরবে? আর তার পর থেকে ভূষণ ডাক্তারের মেয়ে অঞ্জলিকে কুমারী হলেও থান পরে বিধবার বেশে বহু দিন লোকে দেখেছে ঐ নদীর পারে ঘুরে বেড়াতে।

ভূষণ ডাক্তার ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হলেও গ্রামের লোক তাঁকে খৃষ্টান বলেই ধরে নিত। তার পর অজয় যেদিন অঞ্জলিকে বিয়ে করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, সেই দিনই তো অভয় তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু সে যে সত্যিই চলে যাবে এবং সে যে আর ফিরে আসবে না তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি—সেই অজয় পাঠশালায় পড়বার সময় ছিল ওদের দলের সর্দ্দার—সাঁতারে খেলাধুলায় গাছে ওঠায় ও পরোপকারে সব দিক দিয়েই অজয় ছিল ওদের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী।

ঘরের ভিতর ঢুকে অজয়কে দেখবার পর শঙ্করের কিন্তু আর কিছুই বলা হল না। এ কি! অজয় যেন কত বদলে গেছে, যদিও তার মাথায় সেই কোঁকড়া চুল, গায়ের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটু যেন

লাফে হয়ে উঠেছে, ঠোঁটে সেই হাসি, কিন্তু কপালে ওর জোড়া ভূরুর মাঝখানে যেন এক নৃশংস ভ্রূকুটি। চোখের দৃষ্টির ভিতর লুকিয়ে আছে গ্রামবাসীর প্রতি যেন এক গভীর তাচ্ছিল্য।

সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বল্লেও সে যেন এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। শঙ্করের মনে হল, ও যেন সে অজয় নয়, ও যেন কোন্ এক অপরিচিত সুদূর দেশের লোক—অনেক চেষ্টার পর শঙ্কর কোন রকমে বল্লে, "এত দিন কোথায় ছিলে ভাই?"

"ছিলুম কি আর এক জায়গায়? সিংগাপুর, বর্মা, ইম্ফল, ব্যাংকক তার পর দিল্লীর লাল কেল্লায় কিছু কাল কাটিয়ে আসছি এই তোমাদের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে।"

ভোলা ঠাকুরদা হুঁকোর কলকেটায় বার করেক ফুঁ দিয়ে বল্লেন, "এখন কিছু দিন থাকবে তো বাবা?"

"কিছুই ঠিক ক'রে বলতে পারিনে। কর্ণেল সা নাওয়াজদের মতন আমারও ফাঁসি হবার আশংকা ছিল, কিন্তু পরে কমাণ্ডার-ইন-চীফের অনুগ্রহে আমিও তাদের মতন মুক্তি পেয়েছি। তবু পুলিশের উপদ্রবের আজও শেষ হয়নি। পুলিশ ভাবেনি যে, আমি এই গ্রামে আসবো। যদি জানতে পারে তা হলে হয়তো দেখা যাবে, এখানেও এক দিন পুলিশ এসে হাজির হয়েছে। হয়তো আমাকে অন্য কোন ছুতোয় আবার তারা ধরেও নিয়ে যেতে পারে।"

অজয় থামতেই শঙ্কর বল্লে, "না না, আর তোমাকে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারবে না ভাই।" বেণু বল্লে, "আমাদের গ্রামের কোলে এবার তোমাকে আটকে রাখা হবে।"

"কিন্তু পুলিশ যদি জানতে পারে আমি এখানে আছি, তা হলে তারা হয়তো কোন প্রকারে আমাকে ধরে নিয়ে যাবেই।"

"আমরা জানতে দিলে তো?"

কথাটা শুনে অজয়ের চোখে-মুখে একটি বিচিত্র হাসি খেলে গেল, যেটা সমবেত কারুর চোখেই পড়ল না আর পড়লেও তার অর্থ ওরা বুঝতে হয়তো পারতো না।

বেণু বললে, "কেউ জানবে না ভাই, কেউ জানবে না, তুমি এখানে আছো। আর দরকার হলে পুলিশের সঙ্গে লড়তেও আমরা পিছু-পাও হব না। কি বল শঙ্কর?"

"নিশ্চয়, যদি অজয়কে পুলিশে নিয়ে যায় তা হলে এ কথা জেন যে গ্রামশুদ্ধ সকলেই যাবে ওর সঙ্গে। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক জন বীর পুলিশের হাতে বে-ইজ্জত হবে, এ আমরা কাপুরুষের মতন সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পারবো না তা বলে দিচ্ছি।" বটুক তার একটা কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে শঙ্কর থামতেই জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা ভাই, নেতাজী যে কোথায় আছেন সে খবর তুমি ত নিশ্চয় জানো—তিনি জীবিত আছেন ত?" অজয় এ-কথার উত্তর তাড়াতাড়ি না দিতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়লেও কোন রকমে সামলে নিয়ে বল্লে, "তিনি হচ্ছেন অ-র··· ।

অজয় ফিরে এসেছে এ-কথা দুপুরের মধ্যে আরও চার দিকে রটে গেল। কয়েক বছর আগে গ্রামের লোক যাকে প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করেছে বলে ধরে নিয়েছিল, সে শুধু জীবিতই ছিল না, বর্মার জঙ্গলে—ইম্ফলের পর্ব্বতে পর্ব্বতে নেতাজীর বীর সৈন্যদের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ ক'রে আজ দেশে ফিরেছে, এটা কি কম গর্ব্বের বিষয়!···

কথাটা অঞ্জলির কাণে যেতে সে নিজেকে সামলাতে পারলে না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে অজয় যুদ্ধ করবে না তো করবে কে? কিন্তু অজয় যে জীবিত ফিরে এসেছে, এ-কথা যেন বিশ্বাস করতে ভয় হয়। এ স্বপ্ন নয় ত? শোবার ঘরের দরজায় খিল দিয়ে আলমারীর ভেতর কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে-রাখা অজয়ের ছবিখানা বের ক'রে সে বুকের উপর চেপে ধরে। চোখ দু'টো তার হয়ে উঠে সজল। অঞ্জলির মনে পড়ে এক সন্ধ্যার কথা—অজয় সহর থেকে সবে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফিরছে তখন। অজয় তাকে বলেছিল, মেট্রিকটা পাশ হলে সে তার ভবিষ্যৎ কি ভাবে গড়ে তুলবে। অভয়ের মত স্কুলের মাষ্টারী ক'রে কখনই সে তার জীবনটা কাটাতে পারবে না। অভয়ের যে ইচ্ছা থাক, সে নিশ্চয়ই সহরে যাবে, গিয়ে সে ব্যবসা করবে তার পর টাকা হলে আবার সে আসবে এই গ্রামে, ওদের খড়ের চাল মাটির দেয়াল ভেঙ্গে গড়বে সে ছোট এক কোঠা বাড়ী। অঞ্জলিদের দেয়ালে একটা আমেরিকান ঔষধের বিজ্ঞাপনের কেলেণ্ডারে যেমন একটা বাড়ীর ছবি রয়েছে ঠিক সেই রকম, যার সামনে এক আমেরিকান যুবতী একটি শিশুকে কোলে ক'রে আদর কচ্ছে—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল। অজয় বলেছিল, আমেরিকানরাও মানুষ, আমরাও মানুষ, কেন আমরা থাকবো এই জঙ্গলের মধ্যে নির্জ্জীব হয়ে? ভূগোলে আছে আমেরিকাও ছিল এক বিশাল জঙ্গল কিন্তু আমেরিকানরা সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে নিজেদের চেষ্টায় এক নতুন জগতের সৃষ্টি করেছে। আমরাও করবো এই গ্রামের মধ্যে এক নতুন জগতের সৃষ্টি। আমরা তৈরী করবো নতুন রাস্তা—তখন আর রেল-ষ্টেশন থেকে এগার মাইল পথ পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়ীতে আসতে হবে না। সেই রাশিয়ার একটি ছবিতে যেমন কাজ করবার দৃশ্য আছে তেমনি মেশিনে হবে কাজ। তখন আমাদের গ্রামের মেয়েরা সব কলসী নিয়ে পুকুর পাড়ে জড়-পদার্থের মতন ঘুরে বেড়াবে না কিংবা লুকিয়ে থাকবে না পর্দ্দার আড়ালে। তারা হবে ঐ আমেরিকান মেয়েদের মতন শিক্ষায় আত্মমর্য্যাদায় সমুজ্জ্বল। তখন শিক্ষিত লোকেদের কেউ আর ক্রিশ্চান বলে অবজ্ঞা করবে না। আমিও তখন আর এই রকম অজয় থাকবো না। আর তুমিও তখন আরো বদলে যাবে অঞ্জলি!

অঞ্জলি হেসে জিগেস করেছিল, আমি তখন কি রকম হয়ে যাবো?

ঐ কেলেণ্ডারের ছবিতে যে মেয়েটি রয়েছে অনেকটা ঐ রকম—অজয় বলেছিল কিছুক্ষণ ভেবে। অজয় তার ভবিষ্যৎ দুরাশার গল্পের মধ্যে দিয়া অঞ্জলির চোখের সামনে সেদিন কোন এক স্বপ্ন-লোকের দুয়ার দিয়েছিল খুলে।

তার পর এক দিন সেই স্বপ্নের তাসের প্রাসাদ অকস্মাৎ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে যায় যেদিন খবর আসে অজয় নিরুদ্দেশ হয়েছে।

অঞ্জলির বিয়ের কথা তখনও চলছিল কলকাতায় একটি ছেলের সঙ্গে, কিন্তু অঞ্জলির আপত্তিতে সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। বৃদ্ধ পিতাকে ফেলে সে কোথাও যেতে পারবে না এটা সে জানিয়ে দেয়। নাই বা হল এ জন্মে তার বিয়ে। যে ছেলেটির সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হচ্ছিল তার ছবি সে দেখেছে। সাধারণ চেহারা, দেখতে মোটেই খারাপ নয়। গবর্ণমেণ্টের আফিসে কাজ করে। মাসে ১০০ টাকা মাইনে পরে আরো উন্নতির আশা আছে। কিন্তু অঞ্জলি ভাবে, ঐ সাধারণ যুবকটির সংসারে গিয়ে শাশুড়ীর মন জুগিয়ে স্বামীর সেবায়

সে তার জীবন কাটাবে, এই তো সবাই আশা করে সেখানে। হয়তো কোন ত্রুটির জন্য এক দিন সে ওদের ধমক খাবে খুব, তার পর হয়তো এক দিন তারা ওকে একটা নতুন কাপড় কিনে দেবে কিম্বা একটা নতুন গয়না আর আদর করবে খুব···তার পর। এক দিন শেষে ওর বয়স হয়ে যাবে অনেক, স্বামী হয়তো পেনসন পাবে। তখন ওদের দুই-তিনটি হয়তো ছেলে-মেয়ে হয়ে গেছে। সেই গতানুগতিক জীবন, সেখানে নেই উচ্চ আশার স্থান—সেখানে নেই নতুন জগৎ-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।

ভূষণ ডাক্তার বুঝতে পারেন, অজয়ের মৃত্যু সংবাদে তাঁর মেয়ের মনে এক দারুণ আঘাত লেগেছে আর তাই সংসারের স্বাভাবিক গতির প্রতি সে হয়ে উঠেছে বিমুখ। তিনি ভাবেন, এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই তার মনের ভাব বদলাবে। কিন্তু কিছু দিন পর ভূষণ ডাক্তার ল্যাম্বেগোয় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। চলা-ফেরা করতে তার অসুবিধে হয়, তাই অঞ্জলি সারাক্ষণ তাঁর সেবায় ব্যস্ত থাকে। বাকী সময় ভূষণ ডাক্তারের গ্রাম্য রোগীদের বাড়ীতে গিয়েও কখনও কখনও যে অনেক সাহায্য ক'রে আসে। যেখানে অভাব সেখানে বিনামূল্যে ঔষধ এমন কি টাকাও সে দিয়ে এসেছে। গ্রামের লোক ক্রমে ক্রমে তার উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে। অনেকে ভাবে, ক্রীশ্চানরা সবাই যদি ভূষণ ডাক্তার আর তার মেয়ের মতন হয় তা হলে ওদের ধর্ম্মটা তো নিতান্ত মন্দ নয়। গ্রামের অন্যান্য ছেলেরা অঞ্জলির সৌন্দর্য্যের অনুরাগী হলেও ওর আত্মমর্য্যাদাপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের দিকে চোখ তুলে চাইতে না পেরে শ্রদ্ধায় হয়ে পড়ে নত।

অঞ্জলি নার্শিংএর জন্যে সাদা কাপড় পড়তো দেখে লোকে ভাবতো যে, অজয়ের মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর থেকে সে বিধবার বেশ ক'রে থাকে—হয়তো হবেও বা তাই।

সন্ধ্যের দিকে অজয়কে দেখবার জন্যে জড় হলো আরও অনেক লোক, তাদের মধ্যে অনেকে নিয়ে এল-ফল, সব্জি, মাছ, মিষ্টি ও ফুল ইত্যাদি। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার সামান্য নিদর্শন। অজয় শুধু ফিরে আসেনি সে সঙ্গে করে এনেছে সকলের এই শ্রদ্ধা।

পদ্মাবতী তার আনন্দ চেপে রাখতে পারে না। সে যে অজয়ের পিসি এই গর্ব্বের মধ্যে সে যেন হারিয়ে ফেলে এত দিনের নির্জ্জনতার, ভ্রাতৃ-বিয়োগের এবং নিজের বাল্য বৈধব্যের সমস্ত দুঃখ। এই তিপ্পান্ন বছর বয়সে সে যেন আজ যৌবনের সজীবতা ফিরে পেয়েছে।

লোকে নানা প্রকার প্রশ্নে অজয়কে উত্তপ্ত ক'রে তোলে। সে তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয় কিন্তু তা যেন এক পড়া-পাখীর মত। শঙ্কর লক্ষ্য করে, অজয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাই কয়েক জনকে বাইরে ডেকে নিয়ে সে বুঝিয়ে বলে, আজ ওকে রেহাই দাও ভাই, দেখছ না ও ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। আজই সকালে তো পৌঁছেচে আর সেই থেকে আমরা ওর উপর কি উপদ্রবই না করছি। আজাদ হিন্দ ফৌজে লড়াই ক'রে এসেছে ব'লে ও তো আর লোহায় তৈরী হয়ে যায়নি ?

তবুও লোকেদের যেতে যেন মন চায় না, নেতাজীর গল্প শুনে তাদের যেন আর তৃপ্তি হয় না। কিন্তু অবশেষে ভোলা ঠাকুরদা আর পদ্ম পিসীর অনুরোধে তারা সকলে একে একে বিদায় নেয়।

লোকেরা চলে গেলে পদ্ম পিসী রান্না-ঘরের ভিতর একেবারে [illegible]

প্রায় হুঁকাটি রেখে অভ্যাস মত ঝিমুতে শুরু করে দেন ভোলা ঠাকুরদা। অজয় যে ফিরে এসেছে এতে তার মনে চাঞ্চল্যের বদলে এসেছে এক নিবিড় নিশ্চিন্ততা। বংশের বাতী দিবার জন্যে অভয়ের ছেলেটা তো রইলো, এই তার মস্ত এক সান্ত্বনা।

ধীরে ধীরে নির্ব্বাক্ রাত্রির বুকে ডুবে যায় হাটের কলরব। কেনা-বেচা শেষ ক'রে ব্যাপারীর দল গেছে ফিরে। তারার আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে ইন্দ্রনীল গ্রামের আকাশ। খোলা জানলার পাশে নির্জ্জন ঘরের মধ্যে বসে সুবিস্তৃত মাঠের দিকে চেয়ে অজয় একাকী ভাবতে থাকে। অসংখ্য ভাবনা ভীড় করে আসে তার মাথার ভিতর—সাত বছর আগে এই গ্রাম ছেড়ে সে চ'লে গিয়েছিল এমনি এক অন্ধকার মাথায় ক'রে মাঝ রাত্রের ট্রেণ ধরবার আশায় রেলওয়ে ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে। খেয়ার আশা ছেড়ে ধুতি আর জামাটা মাথায় জড়িয়ে, জুতো জোড়া নদীর ধারে ফেলে রেখেই সে জলে নেবে সাঁতার দিয়ে ওপারে গিয়ে ওঠে। তার পর সর্ট-কার্ট করতে গিয়ে বন-জংগলের মধ্যে দিয়ে সে ছুটতে থাকে। লাগুক পায়ে কাঁকর, ফুটুক কাঁটা, রাত্রের ট্রেণ তাকে ধরতেই হবে। যে গ্রাম ছেড়ে আজ সে অজানার উদ্দেশ্যে চলেছে, সেখানে সে যদি কখন মানুষ হতে পারে এবং এই সমাজের কুসংস্কার ভেঙ্গে দেশবাসীকে মানুষ করবার ক্ষমতা তার হয় তবেই সে ফিরবে, না হয়তো এ গ্রামে সে আর কোন দিন ফিরবে না।···দরজার কাছে কারুর পায়ের শব্দ শুনে অজয়ের চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ে, ফিরে চেয়ে অজয় চমকে ওঠে, সবিস্ময়ে বলে, "এ কি ? অঞ্জলি !"

লণ্ঠনের আলোয় অজয় লক্ষ্য করে, চঞ্চল নদীর মতন সাত বছর আগে যে অঞ্জলিকে সে দেখেছিল, আজ সে যেন এক শান্ত স্থির গভীর হ্রদের রূপে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তার পর জানালার বাইরের অন্ধকার দেখে সে বলে, "এই রাত্রি বেলায় অন্ধকারের মধ্যে কেন এলে অঞ্জলি ?"

নতজানু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করে অঞ্জলি বলে, "শুনতে পেলুম তুমি ফিরেছ, আমি কি না এসে থাকতে পারি ! এই সুদীর্ঘ সাত বছর লোকে যে যাই বলুক, আমি ঠিক জানতুম যে তুমি এক দিন ফিরে আসবেই। তবু বছরের পর বছর নিরাশায় বেরিয়ে যায় দেখে মাঝে মাঝে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে টলে ওঠেনি তাও নয়, কিন্তু আজ যখন তুমি ফিরেছ তখন যে কাজের উদ্দেশ্যে সব কিছু ফেলে রেখে একাকী এক দিন বেরিয়ে গিয়েছিলে, সেই কাজের ভার এবার আমায় কিছুটা দাও।"

অজয় যেন একটু বিচলিত হয়ে ওঠে, বলে, "এখনও যে সে কাজ সুরু করতে পারিনি অঞ্জলি। সব কিছু ফেলে রেখে আবার যে আমায় চলে যেতে হবে।"

"কিন্তু তাই যদি যাও এবার আমিও যেন যেতে পারি তোমার সঙ্গে।"

"না অঞ্জলি, তোমাকে সঙ্গে নেবার সময় এখনো আমার হয়নি, তবে এইখানেই আছে তোমার কাজের জায়গা। শিক্ষার অভাবে দেশ কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকায় ঢাকা। এখানে করতে হবে শিক্ষার বিস্তার আর তা হলেই জাতি-ধর্ম্মের প্রভেদ লুপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে নতুন জ্ঞানের আলো। এবং সেই দিনই দেশ হবে [illegible]

রান্না সেরে পদ্মাবতী অজয়ের ঘরে এসে অঞ্জলিকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে যান। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, অঞ্জলি না এসে থাকতে পারেনি এবং পুরোনো সমস্ত কথা স্মরণ করে সজল হয়ে ওঠে তাঁর চোখ।

অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় শেষে ভোলা ঠাকুরদা আর অজয় আলো নিয়ে অঞ্জলিকে ডাক্তারখানা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। ভূষণ ডাক্তার অজয়কে দেখে আশীর্ব্বাদ করে বলেন, "অজয় তোমার সাধনা সফল হ'ক।"

অঞ্জলিকে পৌঁছে দিয়ে এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখনও অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুয়ে-শুয়ে অজয় ভাবতে থাকে। ওর আর যেন ভাবনার শেষ নেই, ঘুম যেন আজ আসতেই চায় না।

এই ভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেলে মনে হয়, চাপা-গলায় কে যেন কাকে ডাক দেয়। অজয় ভাবে, সে হয়তো ভুল শুনেছে। এত রাত্রে কে-ই বা হ'তে পারে। কিন্তু ভুল তো নয়, নিশ্চয় কেউ বাড়ীর কাছে ঘোরাঘুরি করছে। অজয় আস্তে আস্তে ব্যাগটা খুলে টর্চটা বের করে এক হাতে নেয় আর অন্য হাতে চামড়া দিয়ে বাঁধানো রুলটা নিয়ে নিঃশব্দে ফটক খুলে বেরিয়ে পড়ে।

বাঁশ-ঝাড়ের তলা দিয়ে এসে পশ্চিম দিকে ওদের ঘরের জানালার কাছে একটা আবছায়া মানুষের মূর্ত্তি দেখে অজয়ের সন্দেহ হয়। আস্তে আস্তে পেছন দিক থেকে গিয়ে আচমকা সে লোকটার গলাটা টিপে ধরে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখের আওয়াজ শুনে ছেড়ে দিয়ে টর্চটা জ্বেলে অবাক হয়ে বলে, "গঙ্গারাম, এখানে কি ক'রে এলে?"

নিজের গলায় হাত বুলোতে বুলোতে গঙ্গারাম বলে, "আরে রাজা, পরশু দিন ওরা আমায় ছেড়ে দিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়েই হরি সিংএর কাছে যাই। ওখানে শুনলুম, পুলিশের নজরে এমন অনেক জিনিষই পড়েছে যে আর তোমার কোনো সহরেই থাকা পোষায় না। তাই কোথায় এক বনগাঁয় গিয়ে উঠেছ না কি। তোমরা হয়ত ভেবেছিলে, পুলিশের হাতে পড়ে ভয়ে আমি সমস্ত ফাঁস করে দিয়েছি, কিন্তু গঙ্গারাম যে সে ছেলেই নয়, রাজা। তার পর তখনই ট্রেণে উঠে সোজা এই বনগাঁয় উপস্থিত। কিন্তু আর একটু হলে তোমার হাতেই প্রাণটা যেতে বসেছিল আর কি!"

গঙ্গারাম বার কয়েক আবার গলায় হাত বুলিয়ে নেয়—"বাবা, কম কষ্টে এই বাঁশ-ঝাড়ের বাড়ী খুঁজে পেয়েছি। জিগ্যেস করতে করতে আসছি, হাটের ফেরতা একটা লোক কি বল্লে জানো? আজ আর তাঁকে বিরক্ত করবেন না, দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজে থাকতে কত দিন ইম্ফলের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি যুদ্ধ করে আজ সবে এখানে ফিরেছেন। একটু বিশ্রাম করতে দিন তাঁকে, এখন আর যাবেন না তাঁর কাছে। আমি তাকে বলি যে, নেতাজীর কাছ থেকে খবর নিয়ে আসছি, আজ আমাকে তাঁর কাছে যেতেই হবে। তখন সে পায়ে পড়ে আর কি, সেই তো এই বাঁশ-বন অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল। এ এক বেশ চাল দিয়েছ রাজা! একেবারে নেতাজী—কিন্তু এতটা রাস্তা হেঁটে আসছি, একটু জল তো খাওয়াও, ঘরে একটু শোবার জায়গা হবে তো?"

অজয় গঙ্গারামের রসিকতায় কাণ না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, "এই মুহূর্ত্তেই এখান থেকে আমায় যেতে হবে। পুলিশে জানে যে তোমায় আটকে রাখলে আমার সন্ধান তারা পাবে না, কিন্তু ছেড়ে দিয়ে নজরে রাখলে তোমার পিছনে পিছনে এসে ঠিক তারা আমাকে ধরতে পারবে—হয়তো তারা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে, আর তা না হলেও তাদের এখানে আসতে খুব দেরী নেই। তুমি দাঁড়াও, আমি ব্যাগটা নিয়ে আসি।"

অজয় ব্যাগ আনতে বাড়ীর ভিতর গেলে গঙ্গারামের মুখটা কাগজের মতন ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে; তার নিজের বোকামিতে অজয় শুদ্ধ কি শেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে?

হাট-ফেরতা লোকদের মুখে মুখে অজয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের খবরটা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ায় পরের দিন সকালে রায়েদের দীঘির পাড়ে বহু লোকের ভীড় জমতে থাকে, তারা সঙ্গে এনেছে ফুলের মালা ইত্যাদি। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই বীর-সৈন্যের দর্শন চাই।

গোলমাল শুনে ভোলা ঠাকুরদা বেরিয়ে এসে দেখেন, বহু লোক অজয়কে অভ্যর্থনা করতে এসেছে। তিনি তাদের জন্য দরজা খুলে দিয়ে ডাকেন—"অজয়, উঠেছ বাবা? কত লোক এসেছে তোমাকে দেখতে! কিন্তু কোথায় অজয়? চার দিকে হাঁক-ডাক পড়ে যায়। এবং বহু খোঁজা-খুঁজির পর সবাইকে শেষে মেনে নিতেই হয় যে অজয় আবার নিরুদ্দেশ হয়েছে।

অজয়ের দর্শনপ্রার্থী লোকের দল এই অকারণ নিরুদ্দেশ-রহস্য ভেদে অসমর্থ হয়ে যখন ফিরে যেতে যাবে, ঠিক সেই সময় দেখা গেল কয়েক জন পাহারাওয়ালা সমেত দারোগা সাহেব সেই দিকেই আসছেন।

পুলিশের আগমনে গোলমালের আশঙ্কায় কয়েক দল লোক তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগের উদ্যোগ করছে দেখে শঙ্কর তাদের কঠিন সুরে বলে ওঠে—"যে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর-সৈন্যের আজ আমরা অভ্যর্থনা করতে এসেছিলুম, পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তাঁর এবং সেই অপূর্ব্ব মহাত্মা নেতাজীর পবিত্র নামে আমরা যেন কলঙ্ক লেপ না করি। ইম্ফলের পর্ব্বতে আজাদ হিন্দের পরাজয় হয়নি—হয়েছে গৌরবের বৃদ্ধি। সেই সংগ্রামের আজ এইখানেই হবে নতুন করে সুরু।—বল জয় হিন্দ!"

সমবেত লোকেরা শঙ্করের সঙ্গে সমস্বরে উচ্চারণ করে 'জয় হিন্দ!'

দারোগা সাহেব এই ভীড় দেখে আর জয় হিন্দ চীৎকার শুনে যেন হতভম্ব হয়ে যান—এ কি! লোকেরা তাঁকে জয় হিন্দ বলে অভ্যর্থনা করছে? তিনি কি পুলিশের দারোগা নন? না কি সেই দিল্লীতে বড়লাট আর কংগ্রেসের মধ্যে কি সব কথাবার্ত্তা চলছিল যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, শেষে কি তাই হল। কিন্তু অজয় বলে এক জন লোককে তিনি গ্রেফতার করতে এসেছেন বলা মাত্রই তাঁর সে ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল। তিনি বুঝতে পারেন, সেখানে সকলেই আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না, এর কারণ কি? একটি বেশ বড় ইট তার মাথার পাশ দিয়ে শন্ করে বেরিয়ে গিয়ে পুকুরের জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে। তিনি আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে উদ্দেশ করে বলেন, "পুলিশের কর্ত্তব্যে বাধা দেয়া আইনে ভীষণ দণ্ডনীয়—

এটা মনে রেখো। আজ যদি আমি জখম্‌ হই তাহলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ফৌজ নিয়ে এসে তোমাদের শিক্ষা দিয়ে যাবে। আমি এখানে অন্য কারুর ক্ষতি করতে আসিনি। রেল থেকে পান্নালাল জহুরির এক লক্ষ টাকার গয়নার বাক্‌স চুরি করা নিয়ে উনিশটা রেল-ডাকাতির ব্যাপারে অজয়ের নাম সংশ্লিষ্ট আছে। গত পাঁচ বচ্ছর ধরে ও আমাদের ফাঁকি দিয়ে এসেছে। সম্প্রতি দলের এক জন লোককে ধরা সত্ত্বেও তার কোন সন্ধান আমরা পাইনি। শেষে ঐ লোকটাকে ইচ্ছে করে জেল থেকে যেতে দিয়ে তার পিছে-পিছে লোক রেখে অজয়ের এই লুকোবার জায়গার আমরা সন্ধান পেয়েছি। এখন যারা আমায় ওকে গ্রেফতার করতে বাধা দেবে বাধ্য হয়ে তাদেরও আমায় গ্রেফতার করতে হবে।"

দারোগা সাহেবের বক্তব্য শেষ হবার আগেই কে এক জন বলে উঠলো, "মিথ্যে কথা—সমস্ত মিথ্যে কথা—এ হচ্ছে পুলিশের চালবাজী। তিনি আজ চার বছর সিংগাপুরে, বর্মায় নেতাজীর পাশে-পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন, তার পর লাল কেল্লা থেকে ছাড়ান পেয়ে কাল সবে এখানে এসেছিলেন। রেলের চুরিগুলো কি তাঁর অশরীরী আত্মা গিয়ে করেছিল না কি?"

দারোগা সাহেব এবার যেন সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেন। এই সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীদের অজয় যে কি ভাবে ভুলিয়েছে তা দেখে তিনি বেশ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। অতি কষ্টে হাসি চেপে তিনি জোর-গলায় বল্লেন, "চুপ করো বোকার দল, তোমাদের ধাপ্পা দিয়ে সে বেশ ঠকিয়ে গেছে। কিছু চাঁদা-টাদাও চেয়েছিল না কি? তোমাদের ভক্তির যা বহর দেখছি, চেষ্টা করলে সে ভাবেও বেশ কিছু করে নিতে পারতো।"

এর পর অজয় আবার নিরুদ্দেশ হয়েছে জানতে পেরে তিনি ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়লেন। বাড়ী সার্চ করে কিছুই খবর পাওয়া গেল না।

কাল রাত্রে এক জন লোক খাস নেতাজীর কাছ থেকে কোন গুপ্ত খবর নিয়ে এসেছিল এবং সেই খবর পেয়েই অজয় বোধ হয় নেতাজীর সঙ্গে কোন গুপ্ত স্থানে দেখা করতে গেছে—এই শুনে দারোগা সাহেব গঙ্গারামের কথা মনে করে হাসলেন। কিন্তু অজয় শেষ অবধি আবার তাঁদের বোকা বানিয়ে গেল! কালই গঙ্গারামের সঙ্গে সঙ্গে এসে তখনই যদি গ্রেফতার করা যেত তা হলে আজ আর এমন ভাবে অপদস্থ হতে হত না। কিন্তু কে জানত যে, তাঁদের মতলবটি বুঝতে পেরে অজয় রাতারাতি এখান থেকে সরে পড়বে।

ক্রমশঃ বেশীর ভাগ লোক দারোগা সাহেবের কথাই ঠিক বলে ধরে নেয় এবং যে অজয় তাদের এমন ভাবে বোকা বানিয়েছে তার কোন খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ওরা পুলিশকে জানাবে এটিও তারা জানিয়ে দেয়।

দারোগার কথা বিশ্বাস করে না শঙ্কর আর অঞ্জলি।

অঞ্জলি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে, অজয়ের মতন এক জন উদার এবং মহৎ লোক কখনও এত হীন ব্যাপারে জড়িত হতে পারে। পুলিশ নিশ্চয় কোথাও কোন ভুল করেছে। অজয়ের পক্ষে শুধু দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করাই সাজে।...

কয়েকটি মাস পার হয়ে যায় অজয়ের কোন খবর পাওয়া যায় না। অঞ্জলি ভাবে, জীবনটা যেন একটি বিচিত্র ছায়া-ছবি। এত বছর পরে হঠাৎ অজয় কেন ফিরেই বা এলো আর তার পর আবার কেনই বা সে চলে গেল? পুলিশে তার নামে এমন একটা মিথ্যা কলঙ্ক কেন যে দিতে চায়! তবে এর ভিতর সত্যিই কিছু কি আছে? না না, তা কখনই হতে পারে না। অজয় চোর! এ যে অসম্ভব—

হঠাৎ সাপ্তাহিক বসুমতীর সঙ্গে ডাকে কলকাতা থেকে একটা চিঠি আসে অঞ্জলির নামে। খামের উপর অপরিচিত হাতের লেখা—অঞ্জলি বুঝতে পারে না কে লিখেছে। সুলেখা ওর একমাত্র কনভেন্টের বন্ধু—মাঝে মাঝে সে ওকে চিঠি লেখে, কলকাতায় তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এ ত তার হাতের লেখা নয়। সে তাড়াতাড়ি খামটি ছিঁড়ে চিঠিটি পড়তে থাকে—

অঞ্জলি,

গত সাত বছরে এই জীবনে যা-যা ঘটেছে তার কিছুটা আজ তোমায় জানাবার ইচ্ছায় এই চিঠিখানা লিখছি। বাবার কাছে যেদিন তোমাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য প্রকাশ করি সেদিন তিনি উত্তরে আমায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। তুমি যদি আমায় একটুও চিনে থাকো তো বুঝবে যে, অমন একটা অপমান আমি নত-শিরে মেনে নেবার পাত্র মোটেই নই। তাই এই সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা যদি কোন দিন হয় তবেই ফিরবো না হলে আর ফিরবো না—এই স্থির করে সেই দিনই এক অজানার উদ্দেশ্যে ভেসে পড়ি।

তার পর সহরে এসে অনাহারে অনিদ্রায় কত দিন কেটে গেছে তার ঠিক নাই। অবশেষে সমস্ত উঁচু সংকল্প স্থগিত রেখে বাধ্য হয়ে কাজের চেষ্টা করি, কিন্তু কাজ মেলে না। ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার হয়ে ওঠে। যাদের ছোটলোক বলে ধরা হয় সেই সব কুলি-মজুরদের কৃপায় মাঝে-মাঝে কিছু খাবার জোটে। এক অসম্পূর্ণ কোঠা-বাড়ীতে রাত কাটাই। শেষে আমার ঐ নতুন বন্ধুদের পরামর্শে মজুরের কাজ করতে সুরু করে দিই। তার পর মজুর গঙ্গারাম নিয়ে যায় এক জুয়ার আড্ডায়। বেশ কিছু পয়সা পাই। কিন্তু শেষে হেরে গিয়ে মাঝে-মাঝে ফের না খেয়ে দিন কাটাতে হয়। ক্রমশঃ নেমে আসি আরো নীচে। রেলওয়ে ষ্টেশনে কুলিগিরি করবার সময়—কোন এক যাত্রী ভুলে বাক্‌স ফেলে উঠে যায় ট্রেণে। গঙ্গারামের পরামর্শে সেই বাক্‌স নিয়ে বস্তিতে আসি। তার ভিতর থেকে অনেক মূল্যবান জিনিষ পাওয়া যায়, সেগুলো বিক্রী করে বেশ কিছু পয়সা হয়। গঙ্গারামের প্ররোচনায় সেদিন প্রথম মদ্যপান করি, বেশ লাগে। জীবনের অনেক হতাশার দুঃখ যেন বাষ্পের মতন উবে যায়। সেই থেকে আস্তে আস্তে রেলের চুরিতে হাত পেকে ওঠে। বস্তির টিনের চাল ছেড়ে বোর্ডিং হাউস এবং বোর্ডিং হাউস থেকে ক্রমে বড় বড় হোটেলে উঠতে থাকি। শিক্ষকের পদ ত্যাগ করে গঙ্গারাম শেষে আমার ছাত্রে পরিণত হয়। এদিকে সহরে সহরে আমাকে ধরার জন্য পুলিশের দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার খবর কেউ পায় না। এক দিন এক জহুরির এক বাক্‌স চোরাই গয়না বিক্রীর সময় গঙ্গারাম বেকায়দা ধরা পড়ে যায়। ভাবি, জেলের ভিতর পুলিশের অত্যাচারে

হয়তো সে সব কথাই ফাঁস করে দেবে। পরে আমিও ধরা পড়বো। তাই কোথায় পালাই কিছু স্থির করতে না পেরে নিরাপদ ভেবে ট্রেনের থার্ড ক্লাসে উঠে সাত বছর পরে গ্রামের দিকে রওনা হই। সময় যেন কাটতে চায় না, তাই একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামতে তাড়াতাড়িতে একটি বই কিনি, বইটি যে কি বিষয় তাও ভালো করে লক্ষ্য করিনি। পরে দেখি, সেটি নেতাজীর জীবন-কাহিনী। কয়েক জন ছোকরা যাত্রী গায়ে আমার মিলিটারী ধরণের কাপড় আর হাতে নেতাজীর জীবন-কাহিনী দেখে ধরে নেয় আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক এবং আমায় প্রচুর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তাদের নিরাশ করতে ইচ্ছা হয় না। তাই জানিয়ে দিই, তারা ঠিক ভেবেছে। শেষে নামবার সময় গাড়ীশুদ্ধ লোক জয় হিন্দ বলে আমায় অভিনন্দন করতে থাকে। তার পর গ্রামে এসে দেখি সকলেই আমার জামা দেখে ভাবছে আমি লড়াইতে ছিলুম। ভাবি, এ তো মন্দ নয়, তাই আজাদ হিন্দ সম্বন্ধে নেতাজীর জীবন-কাহিনী থেকে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলুম তাই কাজে লাগিয়ে দিই।

কিন্তু ভণ্ড হলেও আমার প্রতি গ্রামবাসীর ঐ অসীম শ্রদ্ধা আর এত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় মনে হয় যেন নিজেকে আবার খুঁজে পেয়েছি। ভাবি, এ সমস্তই যেন এক ভাগ্যের ষড়যন্ত্র। যে হীন কাজে এত দিন লিপ্ত হয়েছিলুম সে কাজের জন্য এ জন্ম আমার নয়। তাই একের পর এক ঘটনার ইন্দ্রজালে জড়িয়ে গিয়ে আবার সেই মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে আটকে পড়েছি। এবার যে দিন দেখা হবে তখন আর আমি প্রতারক নয়—তখন সত্যিকারের সাধক। সে দিন ভুলক্রমে যে আসনে তোমরা আমায় বসিয়েছিলে সে আসনের সম্মান রক্ষা করাই আজ থেকে হল আমার ব্রত। অনিচ্ছায় এত কাল যে হীন কাজে লিপ্ত হয়েছিলুম, সে জন্য আমায় ঘৃণা কোরো না অঞ্জলি! তোমার কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ।

ইতি অজয়।

জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সবিনয় নিবেদন,

সমাজের বিজ্ঞান চেতনা গঠন লক্ষ্য রাখিয়া সমাজের কল্যাণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রায় ছয় মাস হইল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের বৈজ্ঞানিক মানস ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা। এতদুদ্দেশ্যে লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা প্রণয়ন করা, লোকপ্রিয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা পরিচালনা করা, লোকরঞ্জনী ছায়া ও আলোক-চিত্র সহকারে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা, স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপনা করা প্রভৃতি বহুবিধ অতীব প্রয়োজনীয় জাতীয় কর্তব্য সমাধান করার পরিকল্পনা পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, বাংলার বৈজ্ঞানিক সুধী-মণ্ডলীর সাহচর্য্য ও সাহায্যে পরিষদ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এ-যাবৎ কাল অর্থাভাবে আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

লোকশিক্ষায় বিশেষতঃ বিজ্ঞান প্রচারে ফিলম ও ল্যাণ্টার্ণ ছবি সহকারে বক্তৃতার কার্যকারিতা সর্বজনবিদিত। দেশের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইতেছে। পরিষদ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় কর্তব্য সত্বর পালন করিতে সমধিক আগ্রহান্বিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রয়োজন মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার, এপিডায়াস্কোপ ও সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শক যন্ত্র। যে সকল শিক্ষামূলক চিত্র পাওয়া যায় আপাততঃ তাহাই হইবে আমাদের বিষয়বস্তু। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলির সবাক চিত্র তোলা সম্ভব হয় তাহারই বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রারম্ভেই আমাদের আবশ্যক অন্ততঃ পক্ষে ২০,০০০৲ টাকা। দেশে এই অতি প্রয়োজনীয় ও আশু সম্পাদ্য কর্তব্য পালন করিবার দায়িত্ব সমগ্র দেশবাসীর। তাই আমাদের বিনীত অনুরোধ, দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রই যেন যথাসাধ্য চাঁদা পাঠাইয়া আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করেন। আমরা আশা করি, এক মাসের মধ্যেই এই অর্থ আমাদের নিকট পৌঁছিবে।

নাম ও ঠিকানাসহ চাঁদা নিম্ন ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। ইতি

নিবেদক

স্বাঃ অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

সভাপতি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

এক হো!

'৪৭এর ১৫ই আগষ্ট। সন্ধ্যা নামিয়া আসিতে মহানগরীর বুকে এক অভিনব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল আজ এক বৎসর পরে। বাড়ী-গুলির ছাদে, বারান্দায়, ফটকে আলোর সারি, দোকানে দোকানে অপরূপ আলোক-সজ্জা, রাজপথে উচ্ছ্বসিত মুখর জনস্রোত। গৃহের চূড়ায়, পথচারী বালক-বালিকা-তরুণ-তরুণীর হাতে, মোটরের বনেটে ত্রিবর্ণ চক্রলাঞ্ছিত পতাকা। ব্যাণ্ড বাজাইয়া পতাকা উড়াইয়া ট্রাক চলিয়াছে উল্লসিত নরনারীর ভার বহন করিয়া, পতাকার মালায় সজ্জিত ট্রাম চলিয়াছে অগণিত যাত্রীকে লইয়া। আকাশে-বাতাসে কেবল জয় হিন্দ্! বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্!

মহানগরীর লক্ষ লক্ষ প্রাসাদ ও কুটীর হইতে মানুষ আজ রাজপথে বাহির হইয়াছে, এক বৎসর পরে নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্ক হইয়া চলিবার পল্লী ও পথ সতর্ক ভাবে নির্বাচন করিবার প্রয়োজন আর নাই। পথচারীর দিকে সন্দিগ্ধ ভাবে চাহিবার আর প্রয়োজন নাই। অন্ধকার গলির মুখে লোক দাঁড়াইয়া দেখিলে আতঙ্কিত হইবার আর কারণ নাই। আজ দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে। রাজপথে তাই আনন্দের বান ডাকিয়াছে। আলোক-উজ্জ্বল রাজপথে অগণিত উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত জনতার স্রোত।

ভূপতি বাবু বসিবার ঘরের জানালা দিয়া রাস্তার দৃশ্য দেখিতে-ছিলেন। একখানি মানুষ-বোঝাই খোলা ট্রাক ভীড় ঠেলিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল। দুই জন লোক দুইটি পতাকা-দণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইয়া। দুইটি পতাকায় গিঁট বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত লীগ-পতাকা ও একটি চক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা। লাউড স্পীকার লইয়া এক জন লোক শ্লোগান দিতেছে—'ভাই ভাই এক হো! হিন্দু-মুসলমান এক হো!' বাকী সকলে চীৎকার করিতেছে—'এক হো! এক হো!' রাজপথের জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল,—'এক হো!'

ভীড় ঠেলিয়া লরী চলিয়া গেল। জনতা তখনও শ্লোগান দিতেছে 'এক হো! এক হো!' হঠাৎ ভূপতি বাবু কেন যেন কাঁপিয়া উঠিলেন। জানালা ছাড়িয়া তিনি ঘরের মধ্যে সরিয়া আসিলেন।

সম্মুখের অপরূপ আলোক-সজ্জা, অগণিত জনতার উচ্ছ্বসিত কোলাহল সব ছাপাইয়া তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিল এক মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের পৃথিবী। থাকিয়া থাকিয়া সেই অন্ধকার চিরিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে আগুনের লোল শিখা, প্রতিধ্বনিত হইতেছে হিংস্র উন্মত্ত তাণ্ডবের ভয়াল রব ও আর্ত্ত মানুষের মর্মভেদী চীৎকার।

'৪৬এর ১৬ই আগষ্টের মহানগরী। দুর্ভিক্ষের বিষাক্ত দংশন ও জাপানী বোমার ত্রাস কাটাইয়া মহানগরীর মানুষ একটু সুস্থ ভাবে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতে না পাইতে এক অচিন্তনীয় বিপর্য্যয়ের কালো মেঘ অতর্কিতে চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কোথায় কিসের গোপন আয়োজন চলিতেছিল কেহ জানিত না, হঠাৎ যেন সমুদ্র-সন্নিকট গঙ্গা-তীরের বালি-মাটি ভেদ করিয়া এক আগ্নেয়গিরি মাথা তুলিয়াই মহা গর্জ্জনে প্রলয় তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিল মহানগরীর বুকে। দুই শত বৎসরের পাকা প্যাক্স ব্রিটানিকার আচ্ছাদন এক যাদুমন্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে নিশ্চিহ্ন হইয়া উড়িয়া গেল।

১৬ই আগষ্টের দুই দিন পরের কথা ভূপতি বাবুর মনে পড়িল। সহরের অবস্থা দেখিয়া কেশব সেন ষ্ট্রীটের বাড়ী ছাড়িয়া হিন্দু-পল্লীতে উঠিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। তাঁহার পরিবার এবং তাঁহার প্রতিবেশী ও বন্ধু রাজেন বাবুর পরিবার একই বাড়ীতে উঠিবেন কথা হইল। নিজের আয়োজন প্রায় শেষ করিয়াছেন, রাজেন বাবুর অপেক্ষায় আছেন। অনেক ধরাধরি করিয়া পরিচিত পুলিশ কর্মচারীর সাহায্যে একখানি রক্ষিসহ ট্রাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাড়ী আসিতে দেরী হইতেছে। বিকাল হইয়া গেল, গাড়ী আসে না। কি উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন সকলের কাটিল বলা যায় না। সন্ধ্যার আগে, তখনও বেশ রৌদ্র আছে, পাড়ায় ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ হইল। চারি দিকে চীৎকার, সশস্ত্র গুণ্ডা-বাহিনীর দৌড়াদৌড়ি, সশব্দে চারি দিকের বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ হইতে আরম্ভ হইল।

সভয়ে ভূপতি বাবু দেখিলেন, রাজেন বাবুর বাড়ীর সম্মুখে লাঠিধারী লোক জড় হইতেছে। অনেকের হাতে ছোরা লোহার ডাণ্ডা। ছোরা বাগাইয়া ধরিয়া কেহ কেহ লাফাইতেছে ও চীৎকার করিতেছে। সশস্ত্র জনতার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। বন্ধ দরজা-জানালার উপর ইট বর্ষণ শুরু হইল। কয়েক জন নেড়া-মাথা, হাফ-প্যান্ট-পরা লোক পেট্রোলের টিন

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

হইয়া ভীড় ঠেলিয়া দরজার কাছে উপস্থিত হইল। শাবলের আঘাতের উপর আঘাতে দরজা ভাঙ্গিবার মত, একটা জানালার খড়খড়ির খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

দোতলার একটা জানালা খুলিয়া গেল। গরাদের ফাঁক দিয়া বন্দুকের নল বাহির করিয়া দিয়া রাজেন বাবুর ছেলে চীৎকার করিয়া কি যেন বলিল। সম্মুখের জনতা একটু হটিয়া গেল, কয়েক জন লোক বাড়ীর দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। পিচকারীর সাহায্যে দরজায় ও জানালায় তাহারা পেট্রোল ছিটাইতে লাগিল।

হঠাৎ ফট-ফট শব্দ করিয়া লাল মোটর-বাইক আরোহী এক জন স্থূলকায় সাহেব বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া জনতার মধ্যে থামিল, জনতা লোকটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত সুরে অভিযোগ করিতে লাগিল, এই বাড়ী হইতে গুলী চালাইয়া দুই জন লোককে খুন করা হইয়াছে। এখন আবার ছাত হইতে ইট মারিয়া কত লোকের মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক শালা ফের আবার বন্দুক চালাইয়াছে। শালা দুষমণকে পাকড়াও সাহেব।

সাহেব নির্দেশ মত উপরের দিকে চাহিয়া বন্দুক দেখিতে পাইল না, রাজেন বাবুর ছেলেকে দেখিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, যে দুইটা আদমীকে গুলী চালাইয়া মারিয়াছে তাহারা কোথায়?

উত্তর হইল—আরে সে ত সবেরে হয়েছে সা'ব, তাদের গোর দেওয়া হয়েছে গোবরায়।

—যাদের মাথা ফাটিয়াছে তারা কই?

—উ লোককে মাটিয়া কলেজে নিয়ে গেছে।

রক্ষী সহ একখানি ট্রাক আসিতেছে দেখা গেল। সাহেবের আদেশে রাজেন বাবু দরজা খুলিলেন। তাঁহার পাশে তাঁহার দুই ছেলে পিছনে অবগুণ্ঠনবতী তিনটি মহিলা ও গুটি কয়েক শিশু কাঁপিতেছে। রাজেন বাবুর বড় ছেলেকে দেখিয়া জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল,—শালা দুষমন, ওহি ত গোলী চালিয়েছে। মার মার শালাকো।

জনতার কয়েক জন দরজার দিকে ছুটিল। সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিল,—এই, তুম লোগ হট যাও নেহি ত গোলী খায়েগা।

তাহারা থামিল। রাজেন বাবু ও তাঁহার বড় ছেলেকে গুলী করিয়া মানুষ খুন করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইল। বন্দুকটি কাড়িয়া লওয়া হইল। বন্দুক হাতে লইয়া সাহেব সেটি খুলিয়া একবার নলটি চোখের সম্মুখে ধরিয়া পরীক্ষা করিল, একবার নাকের কাছে লইয়া শুঁকিয়া দেখিল। পরিষ্কার নল, বারুদের দাগ বা গন্ধ মাত্র নাই। মনে হইল, সাহেব একটু মুচকিয়া হাসিল।

পুলিশের ট্রাকখানি ভূপতি বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছিল। ভূপতি বাবু, পুত্র ও ভৃত্যের সাহায্যে কয়েকটি সুটকেশ ও বিছানা তাহাতে তুলিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া জনতার একটি অংশ চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া ট্রাক ঘিরিয়া ফেলিল; তাহারা মাল লইতে দিবে না। তিন-চার জন লোক ট্রাকের উপর উঠিয়া পড়িল, মাল নামাইতে উদ্যত হইল।

রক্ষীটি বলিল,—ভাগ যাও, ভাগ যাও, গোলী করেগা।

রক্ষীটি হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের লোক। ট্রাকের উপরে যাহারা উঠিয়াছিল তাহারা নামিয়া গেল। ইসারায় কি যেন একটা স্থির হইয়া গেল। কোথা হইতে একখানা ইট আসিয়া রক্ষীর পায়ে লাগিল। মহা উত্তেজিত হইয়া সে রাইফেল উঠাইল। আবার একখানি ইট আসিয়া ট্রাকের উপর পড়িল। রক্ষীটি লোকগুলির মাথার উপর দিয়া গুলী চালাইল। গুলীর শব্দে সাহেবটি সেই দিকে ছুটিয়া আসিল, রিভলবার উঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে গুলী চালাইল। ভূপতি বাবুর ছেলেটি চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, তাহার পায়ে গুলী লাগিয়াছে।

চারি দিকে তুমুল চীৎকার আরম্ভ হইল। সাহেব সরিয়া আসিতে রাজেন বাবু দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন। এখন জনতা ভূপতি বাবুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ছুটিল। পুত্রকে টানিয়া লইয়া তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। চীৎকার বাড়িয়া উঠিল। দরজায় ও জানালায় ইট-পাটকেল পড়িতে লাগিল।

ছেলের পায়ের ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইতেছে, মেয়ে ও ভগিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে ও তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। ভূপতি বাবু বার-বার ফোন করিবার চেষ্টা করিয়া জবাব না পাইয়া হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ইহার পরে যাহা ঘটিল, তিনি যেন সে সকলের উদাসীন দর্শক মাত্র ছিলেন।

সাহেবের চীৎকারে দরজা খুলিতে হইল। সে বলিল,—তোমরা ট্রাকে চলিয়া যাও, জিনিষ-পত্র লইবার চেষ্টা করিও না। তাহাতে গুণ্ডা লোগ চটিয়া তোমাদের মারিয়া ফেলিবে। কেওয়ারী বন্ধ করিয়া থাকিয়া কিছু লাভ হইবে না, গুণ্ডা লোগ ঘরে আগ, লাগাইয়া দিবে, জিনিষ-পত্র লইয়া নিজেরা পুড়িয়া মরিবে। নিজের লাইফ না জিনিষ-পত্র কোন্‌টা বড় বলো? শেষে সে বলিল,—তোমাদের এসকর্ট দিব লেকিন ব্যাগেজ লেগা নেহি। একঠো স্যুটকেশ এক এক আদমী। ব্য্, আওর কুছ নেহি। গবর্ণমেণ্টের অর্ডার ত ওহি হ্যায়, আদমীকো জান বাঁচাও, চীজ যানে দো। আপনার রেসপনসিবিলিটিতে আমি তোমাদের জন্য স্পেশাল ফেবার করছি। সমঝা? সাহেব শ্বাপদের মত বৃহৎ, লালচে দন্তপংক্তি দেখাইয়া একটু হাসিল।

বাড়ী ও বাড়ীর সকল জিনিষের মায়া ত্যাগ করিয়া দুইটি ভয়ার্ত পরিবারের কয়েকটি নর-নারী ও শিশু ট্রাকে আসিয়া উঠিল। রাজেন বাবু ও তাঁহার পুত্র লোক খুন করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া থানায় নীত হইবার জন্য রহিয়া গেলেন। ভূপতি বাবুর আহত ছেলেটি যন্ত্রণায় কাতরাইতেছিল। সাহেব তাহাকে গাড়ীতে উঠিবার সাহায্য করিল। মুখের একটা শব্দ করিয়া বলিল,—পুওর বয়! উপদেশ দিল, ডাক্তারকে পা দেখাবে লেকিন হসপাতাল মৎ যাও। বলিল, সে রিপোর্ট দিবে এসকর্টের গুলী তাহার পায়ে লাগিয়াছে। ভারী বদমাইস লোক উহারা, কেয়ারলেস। লেকিন হসপাতাল মৎ যাও, সমঝা?

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সোল্লাস চীৎকার শুনিয়া গাড়ীর কেহ কেহ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দুই অংশে ভাগ হইয়া জনতা পরিত্যক্ত দুইটি বাড়ী আক্রমণ করিতেছে, তালাবন্ধ দরজার উপর আঘাত করিতেছে। চারি পাশের এই তুমুল কাণ্ডের মধ্যে লাল রংয়ের মোটর বাইকে বসিয়া স্থূলকায় সাহেবটি ধীরে-সুস্থে পাইপ ধরাইতেছে।

আসিবার পথের বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া ভূপতি বাবুর কন্যা বেলা মূর্চ্ছিত হইল। ফুটপাতে, রাস্তায় নানা ভঙ্গীতে মানুষ মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। টাটকা মড়ার সঙ্গে বাসী মড়াও আছে। কাকে চোখঃ

ঠোকরাইয়া খাইয়াছে, কুকুর নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। মাথার উপর চিল ও শকুন উড়িতেছে, এক-এক বার নামিয়া মড়ার উপর বসিতেছে। চারিদিকে অসহ্য দুর্গন্ধ। সাধারণ অবস্থায় সকাল বেলা বস্তি অঞ্চলের অপরিসর রাস্তায় চলিতে বড় বড় মরা ইন্দুর এখানে-ওখানে পড়িয়া থাকে দেখা যায়। কাকে পেট চিরিয়া কণ্ঠনালী চিরিয়া খাইয়াছে, বিড়াল, কুকুর, কাক এ-ওকে তাড়াইয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে দেখা যায়। এও সেই রকম, শুধু মরা ইন্দুরের জায়গায় মরা মানুষ আর দুই-চারিটার জায়গায় শত শত।

এই দৃশ্য দেখিয়া রাজেন বাবুর ছোট দুইটি নাতনী আতঙ্কে মৃগী রোগীর মত চোখের তারা উল্টাইয়া গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। জায়গায় জায়গায় গাড়ীর উপর ইট-পাটকেল পড়িতে লাগিল। গুরুতর আক্রমণ হইতে আরোহীদের বাঁচাইবার জন্য সাত বার রক্ষীকে গুলী ছুঁড়িতে হইল—অবশ্য আক্রমণকারীদের মাথার উপর দিয়া। আদেশ সেইরূপ।

বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া ভয়ার্ত নারী ও শিশুদের ও আহত পুত্রকে লইয়া ভূপতি বাবু আত্মীয়ের গৃহে উঠিলেন। ক্রমে জানিতে পারিলেন, দুই বাড়ীর যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে। জানালা-দরজাগুলি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত। বাড়ী এখনও বেদখল। চারি মাস লাগিল পুত্রের সুস্থ হইতে। গুলী চালাইয়া মানুষ মারিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার রাজেন বাবু ও তাঁহার পুত্র তিন মাস হাজতে থাকিয়া জামিনে খালাস হইয়া আসিলেন। যথা-সময়ে মামলায় হাজির হইতে হইবে।

আগুনের অক্ষরে লেখা '৪৬এর ১৬ই আগষ্টের ইতিহাস।

'আল্লা হো আকবর! জয় হিন্দ্! এক হো! এক হো!'

রাজপথে সহস্র কণ্ঠের তুমুল চীৎকার। খোল-কর্ত্তাল বাজাইতে বাজাইতে এক লরী-বোঝাই কীর্ত্তনের দল চলিয়া গেল। খোল পিটিয়া কর্ত্তাল বাজাইয়া তাহারা চীৎকার করিতেছিল—'হিন্দু-মুসলমান এক হো! ভাই ভাই এক হো!'

অন্ধকার ঘরে আলোকিত রাজপথের দিকে অন্যমনস্কে চাহিয়া ভূপতি বাবু ভাবিতে লাগিলেন। কিসের জন্য ১৬ই আগষ্টের অভিজ্ঞয় অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল? সশস্ত্র গণবিপ্লব নয়, বিজয়ী বিদেশী সৈন্যের অভিযান নয়, স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় পৃথিবীর ইতিহাসে যাহার তুলনা মিলে না এমনি হিংস্র, বর্বর, বীভৎস, মর্মান্তিক নাটকের অভিনয় দেখাইবার জন্য যবনিকা সরাইয়া দেওয়া হইল। ঐ উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চ যে প্রস্তুত হইয়া সংকেতের অপেক্ষায় রহিয়াছে কে তাহা জানিত, কে তাহা অনুমান করিয়াছিল?

ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ভূপতি বাবুর বিধবা ভগিনী ঘরে প্রবেশ করিলেন, ভূপতি বাবুর চিন্তায় ছেদ পড়িল। তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—এক লরী, বোঝাই মেয়েদের সঙ্গে বেলা কোথায় গেল? ছাদে তাকে প্রদীপ সাজাতে দেখেছিলেন, কখন নেমে বাইরে গেল জানি না। তোমাকে কিছু বলে গেছে?

ভূপতি বাবু মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, তিনি কিছু জানেন না।

ভগিনী আবার বলিলেন,—এ পাড়াতেও দেখি মুসলমান-বোঝাই লরী ঘন ঘন যাচ্ছে, এত দিন দেখা যায়নি। আবার একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধবে না কি? আজ দেখি, 'এক হো এক হো' করে গলা ফাটাচ্ছে খুব। এক ত ছিলি রে বাপু, দুই হলি কার কথায়? দুই হবার জন্য এত খুনোখুনি করে আজ আবার···

কথা শেষ না করিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—ভরসার কিছু দেখি না ত। ঘরের পাশে বাস। দুর্ভিক্ষের সময় রোজ গামছা পেতে দোরের পাশে বসে থাকত, এক-মুঠো ভাতের জন্য, বাল-বাচ্চা ভুখা আছে। বলা নেই কহা নেই হঠাৎ এক দিন দল বেঁধে সকলের আগে এলি পেটে ছোরা বসাতে! এই এক হো নিয়ে আবার ফ্যাসাদ না বেধে যায় দেখো।

ভূপতি বাবু চিন্তিত ভাবে বলিলেন—না, দাঙ্গা বাধবে না। কিন্তু কাকেও না বলে বেলা গেল কোথায়? কার সঙ্গেই বা গেল? ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অতুল কি বাড়ীতে আছে? তার ত বাড়ীতে থাকবার কথা নয়!

ভগিনী উত্তর দিলেন,—অতুল দুপুরে খেয়ে উঠেই বেরিয়ে গেছে। কোন্ পাড়ায় তার পুরনো মুসলমান-বন্ধুর বাড়ী যাবে বলছিল। আমি যত ভয় দেখালেম হেসে উড়িয়ে দিল।

কিছুক্ষণ তিনি কি ভাবিলেন। তার পর পূর্ব-কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন,—আজ-কালকার ছেলে-মেয়েদের বোঝা ভার। কম্যুনিষ্ট হয়ে মিতালী করে বেড়ালি এত, মার খাওয়া থেকে রেহাই পেলি তাতে? লুঠপাট থেকে বাঁচতে পারলি কি? চোরাকে ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে কি লাভ হলো? গুলী খেয়ে চার মাস বিছানায় পড়ে রইলি। বিছানা থেকে উঠেই নেংচে নেংচে মিতালী করতে বেড়িয়েছিস!

ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—আর বোনের কথাই বা কি বলি? মা-মরা মেয়ে, এইটুকু থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করলেম। কুবাক্যি বলতে কিছু আটকায় না। গুরুজন বলে একটু ছেদ্দা নেই। এদিকে অহিংসের কেত্তনে মুখে খই ফোটে। আমি বলি, আরে মাথাটাই যদি না বাঁচাতে পারিস তবে কেত্তন গাইবার জন্য মুখখানা থাকবে কোথা? পিসীকে ঠাট্টা ক'রে ভাইঝি ছড়া কাটেন নাকী সুরে—মেরেছে মেরেছে কলসী কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না? অন্ধের কথায় হঠাৎ যা করেছে তার জন্য চিরকাল কাউকে দোষী মনে করে রাখব? আমার কি সাধ্যি এদের কিছু বোঝাই?

ভূপতি, বাড়ী আছ?—বাহির হইতে কে ডাকিল।

রাজেন বাবুর গলা। ভূপতি বাবুর ভগিনী ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। ভূপতি বাবু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন,—এসো ভায়া।

রাজেন বাবু অতিরিক্ত চা-খোর মানুষ। ভগিনীকে ডাকিয়া ভূপতি বাবু চা পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

ভূপতি বাবু ও রাজেন বাবু—এই দুই বন্ধুর চেহারা দুই রকমের হইলেও একটা বিষয়ে মিল ছিল, দুই জনেরই মাথায় সবগুলি চুল সাদা, মুখ অজস্র রেখাঙ্কিত। ভূপতি বাবু বলিষ্ঠ গঠনের মানুষ, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। এখন কোমর একটু বাঁকিয়া গেলেও শরীরে বাঁধুনি রহিয়াছে। কিন্তু দুই স্কন্ধের উপরের দেহের অংশটি এত বার্দ্ধক্যজীর্ণ, মনে হয় যে নীচের অংশের সহিত তাহা যেন বেমানান। রাজেন বাবু লম্বায় ও বহরে বন্ধুর তুলনায় ছোট মানুষ। আগে মেদ-বহুল দেহ ফুর্ত্তিবাজ লোক ছিলেন এখন হঠাৎ যেন অকালবার্দ্ধক্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। মেদ শুকাইয়া চামড়া ঢিলা হইয়াছে, সমস্ত চুল শাদা, মুখ অসংখ্য বলিরেখায় কুঁচকাইয়া গিয়াছে।

'৪৬এর ১৬ই আগষ্টের দুই বলি। প্রৌঢ় বয়সে আর্থিক ক্ষতির আঘাত ও মানসিক বিপর্যয়ের ফলে নোঙর-ছোড়া জীর্ণ নৌকার মত তাঁহাদের অবস্থা হইয়াছে। হঠাৎ-আসা ঝটিকার নিদারুণ ঝাপটায় নোঙর ছিঁড়িয়া জীর্ণ নৌকা দুইখানি লক্ষ্যহীন ভাবে অনভ্যস্ত পথে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছে। প্লাবনে, ভাঙ্গনে সেই পুরাতন ঘাটের চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে, ঘাটের উপরে শ্যামল বনানীর কোলে বিশ্রামসুখে আবিষ্ট ক্ষুদ্র কুটীরখানি আর নাই, তাহার আশ্রয় ও শোভা বনানী লুপ্ত। তাই ফিরিবার কোন উপায় থাকিলেও ফিরিবার আকর্ষণ আর নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পরে রাজেন বাবু বলিলেন,—ছেলেটার জ্বর আবার বেড়েছে, কাসিটাও বেড়েছে। ছোকরা লম্বা হাজতবাসটা কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না!

একটু হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—অতুল বাবাজীর খবর কি? আজ রাস্তায় রাস্তায় যে কাণ্ড দেখছি তার মত এক হো-বাদীর ঘরে থাকা মুস্কিল!

ভূপতি বাবুর কুঞ্চিত ললাট আরও একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন,—সেই দুপুর থেকেই বাড়ী নেই। শুধু দু'বেলা খাবার জন্য ও রাত্রে শোবার জন্যে বাড়ীতে আসে; বাকী সময়টা কোথায় থাকে, কি করে, সেই জানে। তোমরা আলাদা বাড়ীতে যাবার পর থেকে তার পার্টির কাজ এত বেড়েছে যে আমার সঙ্গে এক রকম দেখাই হয় না।

রাজেন বাবু হাসিলেন। বলিলেন,—আজ আবার জাতীয় পতাকা ও লীগ-পতাকায় গাঁটছড় বাঁধা হয়েছে দেখছি? আগে দুই সম্প্রদায়ের মিলন-আকাঙ্ক্ষা এই কমরেডী কায়দায় প্রকাশ করা হোতো, এখন দুই সম্প্রদায় আলাদা জাতি হয়ে যাবার পরেও পুরাতন মিলন-আকাঙ্ক্ষা কিছুমাত্র কমেনি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মাঝখানের ব্যাপারগুলো উড়িয়ে দেবার চেষ্টার অন্ত নেই।

কিছুক্ষণ তিনি কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর মুখ তুলিয়া আগ্রহের সঙ্গে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেশকে ভেঙ্গে দু'খণ্ড করবার পরেও একটা খণ্ডে এই মিলনের বাড়াবাড়ি, এই পতাকার গাঁটছড়া বাঁধবার অভিনয়ের মানেটা কি বলতে পার? কলকাতায় না হয়ে করাচীতে আজকের দিনে এই অভিনয় হচ্ছে এটা কল্পনা করতে পার?

ভূপতি বাবু একটু হাসিলেন। বলিলেন,—এর মানে আর বুদ্ধিতে ধরা পড়ছে না রাজেন। চল্লিশ বছর ধরে ইতিহাস পড়েছি আর ৩০ বৎসর ইতিহাস পড়িয়েছি, কিন্তু এর মানে বোঝবার ইঙ্গিত কোথাও পাচ্ছি না ভাই। বেলা বাড়ী থাকলে হয় ত কিছু বলতে পারত।

—সে এই হুল্লোড়ের মধ্যে গেল কোথায়?

—কাদের সঙ্গে না কি লরী চেপে স্বাধীনতার উৎসব দেখতে বেরিয়েছে।

রাজেন বাবু বলিলেন,—৪৬এর ১৬ই আগষ্টের লড়াইয়ের বিজয় উৎসব বলো!

রাজপথে এক লরী-বোঝাই উৎসবকারীরা শ্লোগান দিতে দিতে চলিয়াছে—আল্লা হো আকবর! ভাই 'ভাই এক হো। হিন্দু-মুসলমান এক হো!

ভূপতি বাবু বলিলেন,—ঐ শোন। ৪৬এর ৬ই আগষ্টের লড়কে লেঙ্গের দল আজ মিলন-গানের চারণ হয়েছে।

রাজেন বাবু অত্যন্ত তিক্তস্বরে বলিলেন,—হবে না কেন বল ত? তারা জানে, এক পক্ষ ঠকবার কৃচ্ছ্র সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছে। ব্রহ্মা বর দিয়েছেন, বাছারা যুগ যুগ ধরে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে ঠকেও তোমাদের কিছুমাত্র শিক্ষালাভ হবে না, তুষ্ট হয়ে এই বর দিলাম আমি। আর কোন বর ত তোমাদের মত মহাপ্রাণ, নিরামিষ ভক্তের যোগ্য নয়।

ভূপতি বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় লাফাইতে লাফাইতে তাঁহার কন্যা বেলা ঘরে প্রবেশ করিল। উল্লসিত কণ্ঠে সে বলিল—কোথায় গিয়েছিলাম জানো বাবা? পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে নাখোদা মসজিদে গিয়েছিলাম। কি আদর-অভ্যর্থনা কি বোলব? গোলাপ জল আতরের ছড়াছড়ি। সকলের জামা-কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে রূপোর পিচকিরিতে গোলাপ-জল ছিটিয়ে। মুঠো-মুঠো কাবুলী মেওয়া, হালুয়া দিচ্ছে সবাইকে। আমি অনেক খেয়েছি, কিছু এনেছি তোমার জন্য এই দেখো। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আমাদের সাধনা সার্থক হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান মিলে দেশের স্বাধীনতা আদায় করেছে। তাই আজ চার দিকে সবাই বলছে এক হো! এক হো!

ভূপতি বাবু একবার রাজেন বাবুর দিকে চাহিলেন, তার পর ধীর ভাবে মেয়ের দিকে চাহিলেন। বুকের কাছে জামা শাড়ী জলে চুপসিয়া আছে। হাতের মুঠায় কিসমিস, পেস্তা, বাদাম। চোখে-মুখে উল্লাসের দীপ্তি।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা সবাই মেয়েরা গিয়েছিলে, না পুরুষ কেউ সঙ্গে ছিল?

—আমরা তিন বাড়ীর দশ জন মেয়ে ছিলাম। ভুমুদা ড্রাইভ করছিল।'

—তিনি কে?

—ঐ যে ৭১ নম্বর বাড়ীর ছেলে, দাদার খুব বন্ধু। সিভিল সাপ্লাইতে কাজ করে। ভুমুদাই ত' আফিসের ট্রাক এনেছিল।

—আচ্ছা জামা-কাপড় ছেড়ে ফেল। আবার বেরুতে হবে কি?

—একটু পরে আবার গাড়ী আসবে। এবার জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলুটোলা, রাজাবাজার এ সব জায়গায় যাবার কথা আছে কি না? তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে। আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পাবে। রাজেন বাবুর দিকে ফিরিয়া সে বলিল,—আপনিও চলুন জ্যেঠা মশাই।

ভূপতি বাবু উত্তর দিলেন,—তুমি কাপড় ছেড়ে খেয়ে নিয়ে পিসীকে ছুটি দাও। তার পরে কথা হবে।

আজকের দিনেও পিতার গম্ভীর ও বিরস ভাব দেখিয়া বেলা বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। আর কোন কথা না বলিয়া আদেশ মত কাপড় ছাড়িবার জন্য সে চলিয়া গেল। পিতার ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে মনে মনে বলিল—লীগ ও জাতীয় পতাকা একসঙ্গে বেঁধে ব্যাণ্ড বাজিয়ে লরী-বোঝাই মুসলমান ভাইরা সব জায়গায় যাচ্ছে, তাদের ভুল ভেঙ্গেছে। বাবার বয়েস হয়েছে কি না তাই এত বড় ব্যাপারের সিগনিফিকান্স বুঝতে পারছেন না।

মেয়ে চলিয়া গেলে ভূপতি বাবু কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া রহিলেন। তার পর রাজেন বাবুর দিকে চাহিয়া একটু

হাসিলেন। হাসিয়া বলিতে চাহিলেন,—দেখছ কি, শুধু সিদ্ধিলাভ নয়, নির্বিকার সমাধির অবস্থায় উঠেছে নিরামিষ ভক্তের দল, আত্ম-পর, বিষ ও অমৃতে সমজ্ঞান হয়েছে।

রাজেন বাবু বন্ধুর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। বলিলেন,—মহাভারতের সেই উপাখ্যানটার কথা জানো? নির্বাচিত পতি অন্ধ শুনে গান্ধারী আপনার দুই চোখে আচ্ছাদন পরিয়ে স্বেচ্ছায় যাবজ্জীবন অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন। এটা একটা আদর্শের কাছে আত্মবলিদান নয় কি? আমরাও সেই রকম বুদ্ধিকে ঠুলি পরিয়ে গোটা জাত মানসিক অন্ধত্ব অভ্যাস করছি হয়ত কোন একটা আদর্শের জন্যই। আদর্শটা বোধ করি খুবই মহান্, কাজেই সে আদর্শে পৌঁছুতে অনেক আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন আছে।

রাজেন বাবুর কথার অর্থ ভাল বুঝিতে না পারিয়া ভূপতি বাবু জিজ্ঞাসু ভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন। অপেক্ষা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া বলিলেন—এই আদর্শটা কি?

রাজেন বাবু হাসিলেন। বলিলেন,—আন্দাজে বলছি, ঠিক না হতেও পারে। রুচিভেদে এর অনেক নাম দেয়া যায়, যেমন স্বর্গরাজ্য, ধর্মরাজ্য, রামরাজ্য, বিশ্বরাজ্য। বোঝা যাচ্ছে যে স্বরাজ্য থেকে এগুলো আলাদা বস্তু।

ভূপতি বাবু কোন উত্তর দিলেন না। রাজেন বাবুর কথার ইঙ্গিতে তাঁহার মনে নিজস্ব চিন্তার তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, তাই বুঝি সত্য। অন্ধ ভাবালুতার রসে পাক হইতে হইতে গোটা জাতি আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। অতুল আর বেলা, এরা ত অপরিপক্ক মস্তিষ্কের বালক-বালিকা।

আর কোন কথা না বলিয়া দুই জনে নিজ নিজ চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন।

তীব্র হেড-লাইট জ্বালাইয়া এক সারি লরী আসিতেছিল। এক ঝলক আলোক খোলা জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। বহু কণ্ঠের সমবেত ধ্বনি হইতেছিল—বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ! ভাই ভাই এক হো! ভারতমাতাকি জয়!

ভূপতি বাবু ও রাজেন বাবু অন্যমনস্ক ভাবে উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। চারি দিকে অপরূপ আলোক-সজ্জা। রাজপথে শিশু, বৃদ্ধ, বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী, অগণিত জনতার উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত কোলাহল! রাজপথে আজ আনন্দের বান ডাকিয়াছে। ত্রিবর্ণ চক্রলাঞ্ছিত পতাকা উড়াইয়া বিচিত্র সাজে সজ্জিত লরীগুলি আগাইয়া গেল। পাশের এক গলি হইতে ঢোল, কাঁসি ও সানাই বাজাইয়া এক শোভাযাত্রীর দল বাহির হইল, সঙ্গে এক দল মেয়ে শাঁখ বাজাইতেছে! দুই পাশের, সম্মুখের, পিছনের বাড়ীগুলি হইতে, নিকটের ও দূরের বাড়ীগুলি হইতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। রাজপথের অগণিত জনতার কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ!

জানালায় দাঁড়াইয়া নির্বাক হইয়া দুই বন্ধু মহানগরীর রাজপথের নূতন প্রমত্ত রূপ দেখিতে লাগিলেন। স্বাধীনতার আবাহন করিয়া শঙ্খ-ধ্বনিতে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগুনে ঝলসানো হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হইতেছিল কে জানে?

তিষ্ঠ। তিষ্ঠ! —রেবতীভূষণ ঘোষ

সুনীল বলিল—আরে বাবা, কতই দেখলুম। সেবারে ঐ এতে কি হ'ল? ছ'দলে সাজান নিয়ে মারামারি। এক দল বলে, মগপুরুষের কি আর জাতের ঠিক আছে না ধর্ম্মের ঠিক আছে, ওঁরা হলেন সর্বজনীন, অর্থাৎ সব দলের। আর এক দল বলে, তা কেন হবে। লাল ঝাণ্ডা ওড়ান চাই তে-রঙা ফ্লাগের সঙ্গে। চরকা হচ্ছে ওস্ত স্কুলের জিনিষ কিন্তু ওর ত ওস্ত আইডিয়ার নাম-গন্ধও ছিল না। শেষে হাতাহাতি হবার জোগাড়। অনেক কষ্টে শেষে রফা হ'ল, কিছুই উড়বে না, গত বছরের প্যাণ্ডেলের ফটোটা মাথার পরে টাঙান থাকবে আর মুভিং লাউড স্পীকারে কোরাসে 'যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন' গাওয়া হবে।

প্রবীণ—কার শব-যাত্রার কথা বলছিস্, সুনলে?

সুনীল—গরাণহাটার বোঁচা মিত্তিরের। সর্বজনীন দুর্গোৎসবের রেকারিং সেক্রেটারী। কলকাতায় আটখানা বাড়ী সর্বজনীনের কল্যাণে।

নামু—রেকারিং সেক্রেটারীটা কি রকম?

সুনীল—মানে সর্বজনীনের সুরু থেকে উনি বেঁচে থাকা ইস্তক সেক্রেটারী ছিলেন। বলতেন, পূজো-আচ্চা চ্যাঙড়ারা কি করবে? ওরা এখন ফুর্ত্তি করুক, ভলেন্টিয়ারী করুক, পূজো করবে বুড়োরা।

শ্রীঅজিতকুমার রায়চৌধুরী

নামু—তাই বলে শব-শোভা-যাত্রায় 'যদি ভালো না লাগে' গান?

প্রবীণ—না নামু, সবই হয়। আমি পোষ মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব হতে দেখেছি।

নামু—কোথায়?

প্রবীণ—নাম বললে তেড়ে মারতে আসবে। আর শুনেও দরকার নেই।

বিরিঞ্চি—বলই না, নাম-ধাম চেপে যাও না হয়।

প্রবীণ—বলছ? তবে বলি—তখন যুদ্ধ চলছে পুরো দমে। কলকাতায় দম ফুরিয়ে গেল, লোক-জন সব ভাগতে লাগল। আমিও ভাগলুম পশ্চিমে। যে জায়গাটায় গেলুম, বেড়ে জায়গা। লম্বা-লম্বা টানা-টানা পিচ-বাঁধানো রাস্তা, বোমার ভয় নেই। মিলিটারীর সামান্য উৎপাত, তা টাকাটা-সিকেটা দিলেই নিশ্চিন্ত। সহরে বাঙ্গালী আছেন, য়্যাভারেজে দলও জন-প্রতি একটা রয়েছে! দিব্যি খাই-দাই বগল-বাজিয়ে বেড়াই!

হঠাৎ শুনলুম ক্লাব থেকে কি একটা উৎসব হবে। রোজই ক্লাবে যেতুম, পনের মিনিট তাস খেলতুম, পঞ্চান্ন মিনিট মহাভারত শুনতুম।

সুনীল—বেড়ে ক্লাব ত? তাস আর মহাভারত একসঙ্গে রেখেছে। ভোগ আর নিবৃত্তির অপূর্ব সীনথিসিস্।

সুধীর—তুই মহাভারত শুনতিস্ যুদ্ধের ভয়ে না কি?

প্রবীণ—মহাভারত মানে পরচর্চ্চা।—উৎসবটা শুনলুম রবীন্দ্র-নাথকে নিয়ে। শুনে বড় আনন্দ হ'ল।

পরদিন ছিল জেনারেল মিটিং। মিটিং-এ একটু দেরীতেই গেলুম। গিয়ে দেখি ফাটাফাটি কাণ্ড। কি ব্যাপার, না প্রোগ্রাম নিয়ে গ্রাম-শুদ্ধু মারামারি। খোঁজ নিয়ে জানলুম, উৎসবটা রবীন্দ্র-নাথের জন্মতিথি উপলক্ষে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—পোষ মাসে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব—বোশেখ মাসে না ওঁর জন্ম? ওঁর অন্ন-প্রাশনও বোধ করি এর আগে হয়েছিল।

সম্পাদক নরেশ বাবু বললেন—তা' কি করব বলুন। সভাপতির বাড়ীতে পর-পর ক'টা বিয়ে-ছাদ্দ গেল, তার পর আবার মল-মাস পড়ল। কাজেই—?

প্রোগ্রাম নিয়ে কয়েকটা দল হয়ে গেল। তরুণেরা অর্থাৎ যারা সিগারেট খায় আর যাদের মিডিয়ম ইয়ুথ, তারা বললে—প্লে হোক, ওরিজিন্যাল নিয়ে।

সুনীল—ওরিজিন্যাল নিয়ে মানে?

প্রবীণ—মানে মেল ফিমেল কমবাইণ্ড হয়ে। এটা আমার বেশ ভাল লাগল।

সুধীর—তা আর লাগবে না!

প্রবীণ—তাতে ক্ষেতি কি।—যাক্ গে, শেষ কালে তিন দিন-ব্যাপী এক প্রোগ্রাম ঠিক হ'ল। প্রথম দিনের হ'ল—বক্তৃতা তিনটে, দু'টো প্রবন্ধ আর গান। দ্বিতীয় দিনের হ'ল—নাচ, শারীরিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী, আর—

নামু—শারীরিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী?

প্রবীণ—কেন, মনঃপুত হলো না? রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় নেংটা প'রে কুস্তি করতেন না? জন্মোৎসব মানে জীবনব্যাপী যা-যা করা যায় তারই একটা চিত্র খসড়া করে দেওয়া।

বিরিঞ্চি—মানে যাকে বলে নাটশেলে!

প্রবীণ—ও নাট বলটু একই কথা। হ্যাঁ, তৃতীয় দিনের ঠিক হ'ল অভিনয়। অভিনয় নিয়ে আর এক কেলেংকারী কাণ্ড। কি বই করা যায়? শারদোৎসব অচল, কারণ শীতকালে শারদোৎসব করা মানে মিডিয়মী ইয়ুথদের মতে গুরুদেবকে অপমান করা। রাজা করা যায় না, কারণ রাজা বেশীর ভাগ সময় অন্তরালে। হিরো ষ্টেজে না এলে চলে কি করে? বিসর্জন হয় না, কালীমূর্ত্তি আছে, কয়েক জন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের ঘোর আপত্তি। শেষে ঠিক হ'ল, 'দেবদাস' করা হবে তর্জমা করে।

নামু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—শরৎ বাবুর দেবদাস?

প্রবীণ—তবে কি বাঁটুল বাবুর ছেলে দেবদাস? কেন, শরৎ বাবুর দেবদাসে ক্ষেতি কি? রবীন্দ্রনাথকে শরৎ বাবু ত গুরুদেব বলেই স্বীকার করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ কবির জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের উপন্যাস। কবির 'ক' আর সাহিত্যিকের 'সা' কেমন 'কসা' মালটি হবে বল ত?

সুনীল—তা যেন হ'ল, কিন্তু তর্জমা করে কেন?

প্রবীণ—বাংলা ভাষার দিকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

বিরিঞ্চি—যাকে বলে লিটারারী ড্রাইভ।

প্রবীণ—ঠিক তাই। একে দেবদাস তায় আবার কচি প্রাণ, কি অবস্থাটা হবে ভাব দেখি। ধড়াধ্বড় সব ত্যাওড়াতে থাকবে। হ্যাঁ, তার পর বুঝলে, কলকাতার এক অধ্যাপক সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। ভদ্রলোক কোনও এক কলেজে অংক কষান আর মাসিক পত্রিকায় বাংলা ক্রশওয়ার্ডের ছক এঁকে দেন। রবীন্দ্রনাথ ম্যালজা্রাব কোন ফরমুলা অনুসারে কি কি চরিত্র এঁকেছেন আর ইউক্লিডের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ছবিতে পড়েছে, তার গবেষণা করে অধ্যাপক যশস্বী হয়েছেন।

সম্পাদক নরেশ বাবু বললেন—বুঝলেন প্রবীণ বাবু, সভাপতিটি চমৎকার। আগে রং ছিল কালো এখন হয়েছেন ফর্সা, স্রেফ অংক কষে।

—অংক কষে ফর্সা, বলেন কি ?

—হ্যাঁ, বোর্ডে অংক কষান ত, যত রাজ্যের চকের (chalk-এর) গুঁড়ো গায়ে পড়ে। বছর কয়েক ধরে পড়বার পর ইদানীং রংটা ফর্সা হয়েছে। আর ফর্সা হয়েই 'নারীর উক্তি' কবিতাটির উপরে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে কালো ও ফর্সা' সম্বন্ধে বিরাট এক প্রবন্ধ লিখে ফেলেছেন।

সভাপতি সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়ে নরেশ বাবু বললেন—বুঝলেন প্রবীণ বাবু, সে ক'দিন আপনার সাহায্য চাই। ঘাবড়াবেন না, খ্যাটের প্রচুর বন্দোবস্ত আছে। আমার আবার মশাই খ্যাট না হলে কেমন জুৎসই হয় না। আর সত্যি কথা বলতে কি মশাই, রবীন্দ্রনাথ ভোগী লোক—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'ই তার সাক্ষী। এ-হেন লোকের জন্মতিথিতে খ্যাট না হলে নেহাৎই বেমানান হয় না কি ? আর দেখুন, সভাপতি ওঙ্কেশ বাবুর বক্তৃতের পর বেশ কড়া করে হাততালি দেবেন, উনি আবার একটু হাততালি পছন্দ করেন। আরও একটা কথা বলি মশাই, সন্ধ্যে বেলা আপনার কাছে যাব, একটা প্রবন্ধ আছে ওঙ্কেশ বাবুর, আপনি একটু দেখে দেবেন।

—আমি আবার কি দেখে দেব ?

—তা জানি। তবে কি জানেন, গত ১৯২১ সালে ক্লাব ষ্টার্ট হবার সময় ওঙ্কেশ বাবুর ছোট শালীর ন'ছেলে একটা প্রবন্ধ লিখে দেয়। সেই লেখাটাই ওঙ্কেশ বাবু বছরের পর বছর পড়ে আসেন সভা-সমিতিতে, তা সে জন্ম-বার্ষিকীই হোক আর মৃত্যুবার্ষিকীই হোক। মাঝে-মাঝে একটু-আধটু বদলে নেন অনেকটা হুঁকোর জল-ফেরানোর মত। তা' মশাই দেখবেন, আপনি যেন আবার কারুকে বলে দেবেন না কথাটা।

উৎসবের প্রথম দিনেই বিঘ্ন। যে ঘরে রবীন্দ্রনাথের ফটো ছিল সেই ঘরের চাবিটা খুঁজে পাওয়া গেল না। উৎসাহী স্থানীয় সভ্য ভোজেশ্বরী যেচে গিয়ে বলল—কেয়া ঝঞ্জাটিয়া কারোবার। নরেশ বাবু দেখিয়ে না, খুলবার কোনও কুলু-উলু মিলে কি না।

সুধীর—কুলু-উলু মানে ?

প্রবীণ—মানে ক্লু-টুলু (clue-টুলু)। ভোজেশ্বরী বি-এ পাশ করেছে আর ইংরেজী ছাড়া ভাল করে কথা বলতে পারে না। যা হোক, আর এক জনের বাড়ী থেকে ছবি এল। ছবি দেখে আমি বললুম—ছবিটা তেমন পরিষ্কার নয়, তা ছাড়া দূর থেকে ডি, এল, রায়ের মত মনে হচ্ছে।

ভোজেশ্বরী বলল—হোবেই ত। রবীন্দরনাথ তো মোশা, বিশ্ব জুড়ে রইয়েচেন বিশ্বম্ভরের মত। পনচশরে দগ্ধ কোরে কইয়েচে কি সন্‌ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েচো তারে ছড়াইয়ে। মান লিজিয়ে কবি ভি বিশ্বময় ছড়াইয়ে পড়িয়েছেন। তা' ডি, এল্ রায় মত মোনে হইবে, বঙ্কিমের মত ভি হইবে, মগর সব্‌হি আলাক্ আলাক্।

উদ্বোধন সংগীত ছিল বন্দে মাতরম্ দিয়ে। গানটি গাইতে এল তিনটে মেয়ে, একটি তন্বী, অন্যটি শ্যামা আর একটি শিখরী-দশনা। ফুর ফুর করে শীতের হাওয়া বইচে আর গায়িকা ত্রয়ীর গলা ত তিন দিকে হাওয়ার সঙ্গে বইচে। কোরাসে এক জন যখন 'তুমি মা ভক্তি গাইছে', দ্বিতীয় জনের তখনও 'শক্তি' পালা চলছে আর তৃতীয় জন মন্দির গেঁথে 'দশপ্রহরণধারিণী'কে স্থাপিত করেছেন।

তার পর আরম্ভ হল বক্তৃতা। প্রথম বক্তৃতার সার মর্ম—রবীন্দ্রনাথ বেশ লেখেন। দ্বিতীয়টির—ক্লাবকে অর্থ-সাহায্য না করলে ক্লাব উঠে যাবে। তৃতীয়টির—আসন্ন ইলেকশ্যানে অমুক ভোট দিতে হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি তিনটে বক্তিমেতে কাৎ। তার পর গান যা হ'ল তা' আর কি বলব। প্রথম গানটা হল, 'এস হে বৈশাখ।' গাইলেন একটি আধা তরুণী, একে শীত তায় অত লোক, হাফ্ তরুণীর অবস্থা কাহিল। ভয়ে আর শীতে গলার স্বর বেরুতে চায় না। ম্যালেরিয়া রুগীর মত কাঁপতে কাঁপতে বোশেখকে যে ভাবে ডাকল তা'তে খানসামা হরু সেখও আসবে না বো-শেখ ত দূরের কথা। দর্শকদেরও দেখলুম তেমন ভাল লাগছে না। তার পর আর একটি গান হল। এবার আসর জমে একেবারে কুলপী। গাইতে এল শালোয়ার-পরা একটি বাঙ্গালী তরুণী, গ্রেটা গার্বোর কুইন ক্রিশ্চিনিয়ার ভঙ্গীতে আসরে তাকিয়ে গান ধরল, 'যারা নয়নাসে নয়না মিলায়ে যাও রে।' কচিদের ফিস্-ফিস্ চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। তরুণীটি অনেকের চিত্ত নাড়া দিয়েছে কিন্তু সাড়া দেয়নি কারুর ডাকে। গান শেষে প্রচণ্ড হাততালি, কয়েকটি চ্যাংড়া আস্তে আস্তে 'ঘি চপ্-চপ্' সিটিও দিলে। কয়েকটি মিলিটারী ছিল, তারা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করার জন্যে এগিয়ে এল।

সুধীর—প্রবণে, বাড়াবাড়ি করছিস্।

প্রবীণ—এক বর্ণও না। য়্যাল্ট্রা মডার্ণ তরুণী কাকে বলে জানিস্।

নামু—যারা সোলজারদের সঙ্গে হেসে কথা কইতে পারে।

প্রবীণ—কোনো কঁতিনেঁতাল অথর পড়েছিস্ ? তোরা খালি কচি কমুনিষ্টদের মত ক্যাটালগ খুলেই ত্যাওড়াস।

বিরিঞ্চি—তার পর কি হ'ল তাই বল।

প্রবীণ—তার পর হ'ল খ্যাট। খেতে-খেতে আসল টক্ (talk) সুরু হল। সভাপতি বেশ খাইয়ে দেখলুম। শাক-ভাজা থেকে দই-বড়া, পুদিনার চাটনী সবই দেখলুম দু'বার করে রিপীট্ করতে হল। খেতে-খেতে সভাপতি বললেন—আমি বহু জায়গায় গেছি মশাই, কিন্তু এখানকার মত এমন আবেষ্টনী আর কোথাও দেখিনি। ওটা কি চিংড়ির মালাইকারী ? গোটা কয়েক মাথা দিন, আমার আবার মাথা খাওয়া অভ্যেস।—বলেই গোটা কয়েক গলদা চিংড়ির মাথা মুখে ফেলে বললেন—বোঝেচেন, রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—

আর বলতে পারলেন না, কষ বেয়ে মাথার রস পড়ছে দেখে তা'তেই মন দিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ছিল নাচ আর শারীরিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী। শারীরিক ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে বক্সিং, ছোয়া-খেলা, কুস্তি সবই ছিল। মোষের মত হোংকা-হোংকা দু'জন লাল রং-এর জাঙ্গিয়া এঁটে কুস্তি সুরু করলে। আমি ছিলুম জাজ (judge), কিন্তু কুস্তির কিছুই জানি না। লড়ুয়েরা বললে—'কুছ জানবার জরুরৎ নেই। যখোন দেখবেন দোনোই মুশকিলমে গিরেছে তখন ছাড়িয়ে দিবেন।'

কুস্তি সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে 'মুশকিলে গিরলো'। এক জন আমায় বললে—ছাড়িয়ে দিন প্রোবিন্ বাউ।

কিন্তু ছাড়ান কি আমার সাধ্য। তাদের গায়ে হাত দিতে না দিতেই হাত পিছলে গেল। দু'বেটাই প্রচণ্ড ঘেমেছে, দু'টোর গা শোল মাছের মত হড়হড়ে। আমি বেগতিক দেখে তফাতে সরে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ ঝুটোপুটির পর এক জন আর এক জনকে বলছে শুনলুম—ছোড়্ দে বাই, দো ঘণ্টে হুঁয়া শ্বশুড়ালমে লোটা—অর্থাৎ দু'ঘণ্টা হল শ্বশুর-বাড়ী থেকে ফিরেছি, ছেড়ে দে ভাই।

আমায় ওরা ইসারা করল, আমি কুস্তি সমান সমান বলে ঘোষণা করলাম। মনে হল, রবীন্দ্রনাথ যেন ছবির মধ্যে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

তার পর আবৃত্তি ও নাচ। সামনে আবৃত্তি হচ্ছে পেছনে নাচের জোগাড় হচ্ছে। 'জাগর নৃত্য' অর্থাৎ মহাদেবের ধ্যানভগ্ন হবে পার্বতীকে দেখে। পাঁচ-ছ' বছরের একটি মেয়েকে মহাদেব সাজিয়ে খালি-গায়ে পাউডার মাখিয়ে সিঁড়ির ওপরে বসিয়ে দিয়ে সীন সাজান হচ্ছে। আমি মহাদেবের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। মহাদেবকে দেখে আমার মায়া হল, সিঁড়ির ওপর আসন-মুদ্রা করে বসে মহাদেব শীতে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ বাদে নাচ সুরু হল। মহাদেবের চেয়ে অন্ততঃ সাত বছরের বড় পার্বতী নাচতে-নাচতে মহাদেবের সামনে এল।

সুশীল—মহাদেবের চেয়ে পার্বতী সাত বছরের বড় ?

প্রবীণ—হুঁ, মহাদেব ধ্যান-ফ্যান করে রোগা হয়েছে আর পার্বতী রাজার মেয়ে। তাছাড়া বাড়ন্ত গড়ন, খাওয়া-দাওয়াও ভাল, নইলে বিয়ের জন্যে ধ্যান ভাঙ্গাতে আসে। পুরাণ-টুরাণ কিছু পড়িসুনি না কি ?

নান্নু—কেন আর সনাতন ধর্ম্মকে টানছ ? তার পর কি হল তাই বল।

প্রবীণ—পার্বতীর নাচ দেখেই মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হল।

সুনীল—মহাদেব তাহলে রেডি ছিল বল ?

প্রবীণ—নিশ্চয়ই। দেবতাদের ব্যাপার—ধ্যানেতেই সব জান্‌তে পেরেছিলেন, তাই রেডি হয়েই ছিলেন। যাক্ গে, ধ্যান ভঙ্গ হতেই নাচতে-নাচতে সিঁড়ি দিয়ে কচি মহাদেব নীচে নামতে লাগল। উইংসের ধারে গ্রামোফোন রেকর্ডে যন্ত্র-সঙ্গীত হতে লাগল—'হাম কোচম্যান হাম কোচম্যান হাম কোচম্যান্ প্যারে।'

বিরিঞ্চি—লে হালুয়া !

প্রবীণ—হুঁ। তার পর নাচ শেষে খাওয়া-দাওয়া। একপেট দালদার চাপাটী খেলুম, চাপাটী না শুকতলা ঠিক বুঝতে পারলুম না। খেয়ে-দেয়ে রাস্তায় এসে সবে বিড়িটি ধরিয়েছি এমন সময় শুনতে পেলুম নরেশ বাবুর গলা।

—প্রবীণ বাবু না কি ?

—আজ্ঞে।

—চলুন মশাই, একটু হোমিওপাথিক অষুধ দেবেন।

—কার অসুখ ?

—মেয়েটার। পই-পই করে মানা করলুম, খালি গায়ে মহাদেব সাজিস্‌নি, ফট করে ঠাণ্ডা লাগবে, শুনলে না তাই। দেখুন না, কেমন হাঁচছে।

দেখলুম, মহাদেব সত্যিই হেঁচে চলেছে।

পরদিন সকালে নরেশ বাবু আর ভোজেশ্বরী এসে হাজির, হাতে একটি খাতা। আমি বললুম—কি ব্যাপার ? এত সকালে কি মনে করে ?

ভোজেশ্বরী খাতাটা আমার হাতে দিয়ে বললে—এটা আপনাকে করেক্ট করিয়ে দিতে হোবে। ওক্কেশ বাবুর লেড়কা ট্রানসিলেশ্যন্ করিয়েচে, আচ্ছাও হইয়েচে। মগর বাঙ্গালী আদমী ত সমজিতে পারবে না।

নরেশ বাবু বললেন—আপনি একটু সোজা হিন্দীতে ট্রানস্লেট্ করুন।

—আমি ত ভাল হিন্দী জানি না।

—আরে মোশা, যা জানেন তাতেই হোবে। আউর দেখিয়ে, থোড়া হিউমার ঘুষিয়ে দিবেন, আউর আংরেজী ওয়ার্ড ভি বহুৎ সে লাগাইবেন।

নরেশ বাবু আর ভোজেশ্বরী ত চলে গেলেন। আমি পড়লুম মহা সমস্যায়, কি করা যায়। অবশেষে ঠিক করলুম, জায়গায় জায়গায় খালি হিউমার আর ইংরেজী ঘুষিয়ে দেবো।

দেবদাস প্লে যা' হোল তা আর কি বলব। সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। সভাপতি সভায় আমার প্রশংসা করে বললেন—হিন্দী যে দিন রাষ্ট্রভাষা হবে সেই দিন লোকে প্রবীণ বাবুর কদর বুঝবে আর শরৎ বাবুর বই গরম বেগুনীর মত বিক্রী হবে।

সুনীল—কেমন ট্রানস্লেট হয়েছিল তার একটু নমুনা দাও।

প্রবীণ—নমুনা আর কি দেব। তবে একটা সীন্ এখনও মুখস্থ আছে সেইটে বলতে পারি। কিন্তু তা'তে কি আর ভাল বুঝতে পারবে ?

সুনীল—খুব পারব, একটা সীনই বল।

প্রবীণ—তাই বলছি। কিছুটা বুঝতে পারবে ইংরেজী, হিউমার আর ড্রামাটিক্ টেক্‌নিকে আমার কেমন দখল। নান্নু, হিন্দীর ভুল ধরো না বাপু।

পার্বতী রাত দুপুরে দেবদাসের ঘরে ঢুকে ডাকল।—

পার্বতী—দেবদা', দেবদা', দেব ভাইয়া।

দেবদাস—আরে কৌন, পারওয়াতী ? পারওয়াতী, তুম ইত্‌নী dead of nightমে কেও আয়ী ? 'কৈ দেখা তো নেহি ?

পা—দেবদা', কৈ না কৈ দেখা, এক আদমী নে ফুকারা কৌন যা রহী হ্যায়। ম্যাইনে বোলিস্, মেরী নাম হ্যায় মিস্ পারওয়াতী চক্রওয়ার্তী।

দেব—কাল morningমে আদমী সব গুনকে ক্যে কহোগে পারওয়াতী ?

পা—দেবদা', riverমে কিত্‌নী water হ্যায়, উস্ waterমে মেরী rumour মেরী stigma ধো ধো ক্যর নিকাল নেহি যাউঙ্গী ?

দেব—পারওয়াতী, পিতাজীনে কহা, luying and sel'ing (বেচা-কেনা) চক্রওয়ার্তী কা লেড়কী মেরী dynesty (বংশ)মে বউরাণী নেহি হো সক্তী। তো ক্যা করুঙ্গা পারওয়াতী, তুহি বাতা।

পা—পিতাজীকো audacity দেখালে দেও।

দেব—তুম কহা রহুঙ্গী পারওয়াতী ?

পা—তুমহারা legমে।

[দেবদাস তখন পার্বতীকে তাড়াবার জন্য বললে—]

দেব—পারওয়াতী, আচ্ছা বাতা, তু সাচমুচ ব্রাহ্মণকী লেড়কী। কাহা হ্যায় তুহারা পৈতা, নিকাল তেরা sacred thread.

পা—দেবদা', কৈ লেডি sacred thread রাখতী ?

দেব—পারওয়াতী, তুঁহকো ক্যায়সে সমঝাউ মেরা দিল তুহারা লিয়ে কেত্না palpitate ক্যর রাহা হ্যায়।

পা—দেবদা', তোম্‌কো ভি ক্যায়সে সমঝাউ মেরী দিল হ্যায় মুহব্বৎকী রেফ্রিজারেটর।

দেব—পারওয়াতী, তুহারা দিল কেয়া stone হ্যায় পাথর হ্যায় যিসকো টুকরা টুকরা ক্যর রেস্তোঁরামে চপ বানাতা (হিউমার)।

পা—দেবদা', ইয়ে চপকা বাত নেহি হ্যায়, ইয়ে হ্যায় ডেভিল কী বাত।

[এমন সময় দেবদাসের বাবা ঘরে ঢুকে বললেন]

পিতা—কিস্‌কো সাত বাত করতে হো দেবদা'।

দেব—পারওয়াতীকে সাত।

পি—পারওয়াতীকে সাথ ! তুমকো কেত্না দফে মানা কিয়া, পারওয়াতীকে সাথ বাত মাৎ করো, শুনতা নেহি কেঁও ? পারওয়াতী, চলা যা হিঁয়াসে।

দেব—পিতাজী, ইয়ে twentieth centuryমে এক লেড়কা আউর এক লেড়কী যব মুহব্বৎসে গির পড়তা হ্যায়—

পা—পড়তা নেহি, গির পর চুকা।

দেব—হাঁ, গির পর চুকা, ইসমে কসুর কেয়া হায় ?

পি—দেখ, finally ক্যয়তে, পারওয়াতীকে সাথ বাত করো গে ত' হামসে ফুটি কৌড়ি বি নেহি মিলেগা।

দেব—চলী যা' পারওয়াতী, পিতাজীকো temper loss হোতা হ্যায়।

পা—যাতী হুঁ দেবদা', মগর—নেহি, ম্যয় যাতী হুঁ।

[এইখানে পার্বতী 'দিল কাহা লে যাউ আব কৌন ঠিকানা' গানটা ধরল। গান শুনে দেবদাসের চোখে জল দেখা গেল, সেই সঙ্গে দেবদাসের পিতারও]।

দেব—পারওয়াতী, পারওয়াতী !

পা—বাতাও দেবদা', বাতাও। দেবদা', মেরী দেবদা'—[এইখানে সমস্ত কচিনী দর্শকেরা অর্থাৎ তরুণীরা ছলছল চোখে ফোঁপাচ্ছিল] এক রাত শুন লেও।

দে—বাতাও পারওয়াতী।

পা—দেবদা', ম্যায়নে তুমারা সাথ মুহাব্বৎ করতী হুঁ আউর করতী রহুঙ্গী, মগর ইয়ে বাত private রাখনা—[তরুণীদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল]।

দেব—যানে কো পইলে মেরাভি এক বাত শুন্ যা। ম্যয়ভী তুমহারী সাত প্রেম করতাহুঁ, লেকিন sisterকা মাফিক্।

—কেমন লাগল ?

নানু—ইউনিক্।

সুনীল—না, যেই যা বলুক, হিন্দী ভাষার adaptability আছে।

নানু—প্রব্‌ণে, তুই হনলুলুর বইগুলো ট্রানস্লেট্ কর। তোর কড়া অরিজিন্যালিটি আছে।

বিরিঞ্চি—তার পর কি হল প্রব্‌ণে ? নানু, একটু চুপ কর।

প্রবীণ—তার পর আর কি। বাড়ী ফিরলুম নরেশ বাবুর সঙ্গে। নরেশ বাবু বললেন—ভাগ্যে আপনি ছিলেন মশাই তাই বাঙ্গালীর মুখ রক্ষে হোল। কালকের, 'Torch Light' পেপারে দেখবেন আপনার কেমন সুখ্যাতি বেরোয়।

পরদিন সকালে ভোজেশ্বরী এসে হাজির। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েই বললে—আপনাকে বহুৎ ধন্নবাদ প্রোবীণ বাউ।

—আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

—বাবু কেন ? ভাই বলুন। আপনি বংগালী হামভী বংগালী

—আপনি বাঙ্গালী ?

—হাঁ, জরুর। হামার নাম ভোজেশ্বরীপ্রসাদ মিত্তর। আমার ঠাকুঁরদাদা পন্দ্র বরষ উমরসে ইখানে আসিয়াছিল। মগর হাঁ, খাঁটী বংগালী ছিলেন, মান লিজিয়ে ইংলিশমে যিসকো ক্যয়তা—undiluted। হামি ঘরে বাংলা বাত কড়ি। হরেক বংগালী অথর ভি পঢ়িয়েচি। মগর হাঁ, ম্যায়সা টানসিলিশ্যন কভি নেই পড়হা !

এমন সময় সাত-আট বছরের একটি ছেলে এসে ভোজেশ্বরীকে বললে—বাপুজী, বাপুজী, মাসী বোলাতী।

ভোজেশ্বরী খ্যাঁক করে বলে উঠল—আরে হাট, বড়ে আয়া বোলানেওয়ালা। আচ্ছা প্রোবীণ বাউ, নোমোস্কার, my wife is calling,

"কৌতূহল এমন একটা বিষয় যা একবার
মিটে গেলে আর কোন কৌতূহলই থাকে না।"

—সমারসেট মম

স্বদেশী মিটিং

মুসাফির

আমার চিরদিনই জনসভা—বিশেষ স্বদেশী মিটিং ভাল লাগে না। ঐ যে কতকগুলো বাঁধা গৎ সবাই আউড়ে যাবেই—সেই অসাধ্য-সাধন উপদেশের ছড়া নানান সুরে আবৃত্তি করা হবে। শিবিরের সমস্ত মেয়ে গান্ধীজী সন্দর্শনে সোদপুরে গেছে—জেদ্ করে আমি শিক্ষা-শিবিরে একা আছি। পরম উপভোগ্য লাগছিল এ আলস্য ও কর্মবিহীনতা। তার মাঝখানে হঠাৎ কলকাতার জীবনের এক হৈ-হৈএর আস্বাদ বোধ হয় ভাল লাগবে ভেবেছিলুম। সে-দিন নদীর ঘাটে স্নান করছি খুব অন্যমনস্ক ভাবে ধীরে ধীরে; আজ আমি একা এ ঘাট, এ কাপড়-কাচা পাটার অধিকারী—পরার্থের প্রেরণায় চটপট স্নান সেরে কাপড় আছড়ে দৌড়তে হবে না শিবিরের ঘণ্টার সঙ্গে তাল রাখার জন্য। কাছেই ঢাকের বাদ্যি—চোখ তুলে দেখি, এক নৌকায় গান্ধীটুপীপরা একটি ছেলে ঢেঁটরা দিয়ে জানাচ্ছে—"পলাশীপাড়ায় মিটিং, কংগ্রেসের বহু খ্যাতনামা কর্মী বক্তৃতা দেবেন" ইত্যাদি।

স্নান সেরে ফেরার পথে বললুম, "দাশুদা, আমিও যাব—কখন বেরোচ্ছেন আপনারা?" উত্তর হোলো, "আপনি খেয়ে নিন, এখুনি যাবো।" বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বেলা তিনটায় পৌঁছানোর কথা আর আমরা তখন রওনা হলুম। নৌকা বেয়ে যাবার প্রবল লোভ ছিল। দু'-এক বার আভাস দিলুম—সুবিধে হলো না দেখে মেঠো ধূলোর পথে মাথাল মাথায় এগিয়েই চললুম।—(একটা আত্ম-বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার—যদিও এটা বাঙ্গলার পল্লী তবু আমি এখানে পাঞ্জাবী পোষাক পরি—ফলত অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি অথবা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই পরি)।

বাঙ্গালী হিসেবেও বেশী দেরী হয়ে গেছে জানাতে ছেলের দল বললে যে, আমার সহুরে ব্যস্ততা অকারণ—অযথা কালে সুরু হবে সভা। তথাস্তু। কিছু দূর চলার পর পথের পাশে দুর্ভিক্ষপীড়িত ইক্ষুদণ্ড দেখা গেল। অমিয়ের রসনা লোলুপ হোয়ে উঠলো। বললে, "যতা খুসী লাও—এ কোন কম্মের নয়"। টপাটপ কয়েকটা আমাদের হস্তগত হোল। দাঁতালো মানুষ হিসেবে খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও দন্তস্ফুট করতে পারলুম না। এমন অবাক লাগে এদের দেখে-শুনে। কেতাবে পড়েছি, বক্তৃতায় শুনেছি—বাংলার পল্লীর মাথা-পিছু দেড় আনা না তিন আনা কি একটা আয় আর তারা অশিক্ষিত ও হিংসুটে—অর্থনীতি, সমাজনীতি গোষ্ঠীগত স্বার্থ কিছু জানে না তথাকথিত সহুরে শিক্ষিত জনের মত। অথচ মজা এমন—যার বাড়ীতেই যাই (যাই মানে ২০।২৫ জনের দল) বলবে, "কিছু খেয়ে যাও, আজ রাতটা থেকে যাও"—যেন ডাল-ভাত-মুড়ি পথের ধূলো, যে খুসী যখন খুসী যতো খুসী খেলেই হলো। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে দিতে প্রস্তুত—নিতেও বলা বাহুল্য। এই সহজ দেওয়া-নেওয়াটা আমার মনকে খুব স্পর্শ করে—কিছুতে এমনটা আমরা তো পারি না—একটা সচেতনার [illegible]

আবার কিছু দূর যাত্রার পর আখের গুড় তৈরী হোচ্ছে দেখা গেল। "কি দিদি, রস খেয়ে আসবেন না কি?" হায় রে, পুরোনো সংস্কার! তখুনি বলে ফেললুম—"সঙ্গে ভাণ্ডতি পয়সা নেই তো?" "পয়সা কি হবে?" ওটা যে অবান্তর কল্পনা—মনে থাকে না। সঙ্গে যে রস খাবার পাত্র নেই এই হোল আসল বাধা—তাছাড়া দেরী হয়ে যেতে পারে।

চলতি পথের পাশে একটা আধ-ভাঙ্গা পাকা-বাড়ীর দরজায় কলস, গাঁদা ফুলের মালা, সামান্য কলরব। "এটা কি ব্যাপার দাশুদা?" ও জমিদারের পুণ্যে হচ্ছে। জমিদার, পুণ্যে—মনে পড়ে গেল, বিখ্যাত জমিদার ও নৃপকুলের পুণ্যাহের বর্ণনা— এও পুণ্যে!

গড়াতে গড়াতে গিয়েও গ্রাম্য ঢিলেমীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলুম না। তখনও এলোমেলো লোকারণ্য—বেয়াড়া পোষাক—সবাই এমন তাকাচ্ছে—দূরে পিছন ফিরে বসলুম সবাই গোল হয়ে। দু'-তিনটি চাষী এসে এই ক'টা প্রশ্ন শোনালো—"এড়া মেয়েছেলে না পুরুষ?" "তোমাদের সঙ্গে মেয়েড়া কোন্ গাঁয়ের গো?" "আচ্ছা, সুভাষ বোস হেঁছু না মুছলমান?"

নানাবিধ ধ্বনির হুঙ্কারে বুঝলুম—কিছু একটা আসন্ন। সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে দেখলুম—পতাকা, স্বেচ্ছাসেবক দল, কংগ্রেস-কর্ম্মী ও বক্তারা আসছেন। নির্বিচারে কলকাতাকে হার মানিয়ে গ্রামের অর্দ্ধরুগ্ন ছেলেরা গলা ভেঙ্গে চেঁচাচ্ছে "বন্দে মাতরম্, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ইংরেজ ভারত ছাড়ো, শেম শেম পুলিশ, নেতাজীকী জয়, জয় হিন্দ্।" আমার এক বদ অভ্যাস, এই শ্লোগান শুনলেই এমন রাগ হয় মনে হয়, ছুটে পালাই—ততোধিক কুশ্রী লাগে দল বাড়ানোর জন্য প্রোপাগাণ্ডা। হায় রে, তখনও জানি না—এ কলকাতা মেয়েভার কপালে কি আছে! জানলেই বা কি, একা ফিরতেও পারবো না (পথ মনে নেই)। কান বন্ধ করার কিছু ব্যবস্থা দেননি অদূরদর্শী ভগবান! ঈশ্বর জানতেন না—কোনও এক দিন মানুষ এমন কান-ঝালাপালা কাণ্ড বাধাবে!

সমস্যা হোলো, শিখণ্ডী বসবে কোথায়? মেয়েদের একটা দিক্ আছে কিন্তু মেয়ে নেই। তাছাড়া এ পুরুষকে যদি তাড়ায়, পুরুষরা গ্রামে এক জন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বসতে নাও চাইতে পারে। হঠাৎ এক জন দৌড়ে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন—শেষ পর্য্যন্ত দেশ-সেবকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট তক্তে ঠাঁই হোল—অনেক ওজরের ওজর গ্রাহ্য হোল না। অনুভব করলুম, একযোগে সহস্র সপ্রশ্ন দৃষ্টি আমাকে বিঁধছে। খুব দার্শনিক ভাবে দেখাতে চেষ্টা করা ছাড়া পথ নেই বুঝলুম। ওঃ, বলতে ভুলেছি, মাইকও ছিল এবং তার অপরিহার্য্য অঙ্গ "হ্যালো, হ্যালো, ওয়ান, টু, থ্রী…" তার পর কার্য্যকালে বেয়াদবী—কড়র কট্। মৎস্যজীবী, তন্তুবায়, তরুণ যুবক, কৃষকদের লাল-সবুজ পতাকা—বক্তা ও নেতাদের জন্য গাঁদা-ফুলের মালা।

মাতরম্ ইত্যাদি। মনে মনে ভাবছিলুম, দেশ যদি স্বাধীন হয় আর আমার যদি কিছু বলার অধিকার হয়, তবে দু'টো নিয়ম কোরবো। চাষী-মজুরের সভায় কেউ অশোভন শুদ্ধ ভাষায় ও ভাবের ব্যাখান দিতে পারবে না, কোনও অজুহাতেই নয়—বললে তাকে থামিয়ে নামিয়ে দিতে বা যা-খুশী করতে পারে, যেমন যে যা-খুশী করে প্রকাশ্যে। প্রস্তাব পাঠের ভাষা শুনলে মনে হয়—অনেক রাত জেগে শেখা রচনা মুখস্থ লিখছে কোনও পরীক্ষার্থী। সামনে ছড়িয়ে আছে যে জনসমাজ—তাদের ভীরু ক্লান্ত বোকা মুখভাব, হলদে নিষ্প্রভ চোখ, বলিরেখাঙ্কিত মুখ—কেন যে ওখানে এসেছে তাও ঠিক জানে না, তবু এসেছে। অবিশ্বাস্য শীত এ জায়গায়, সূর্য্য অস্ত গেছে, খোলা মাঠে এরা বসে আছে—যতো দূর মনে পড়ছে, কারো গায়ে পশমী কিছু চিহ্নমাত্রও নেই। সারা দিন মাঠে খেটে আসার পরও এদের এখানে দেখতে পাওয়াই এক বিস্ময়! এরা যে পরিমাণ অসহায়—বঞ্চিত, ঠিক সেই পরিমাণ এদের ধৈর্য্য আর বিশ্বাস—হয়তো তাই আজো টিকে আছে জগতে। ভাষণের হিজিবিজি চলছেই অজানা ভাষায় শব্দের মালা—রাষ্ট্র, নেতা, সংঘাত, শোষণ-নীতি, গঠনমূলক, পরিপন্থী! ভাবছিলুম, এগুলোর বদলে Physics, Chemistry, Time and space theory ইত্যাদি বললে কি তফাৎ হয়?—বোধ হয় শুনতে আরও অভিনব লাগতো। কতো বক্তা উঠছেন বসছেন বদল হচ্ছে প্রহসনের নট। মনে পড়ছে দুর্ভিক্ষের কলকাতা। তারাও তো ভাঙ্গা-হাঁড়ি নিয়ে ফ্যানের আশায় বসে থাকতো আমার গেটের সামনে। "দিন-রাত মা, মা, ফ্যান দাও; হবে না যাও" বলে হীরের গহনা পরে গাড়ীতে উঠছে সে গৃহের অধিবাসিনীরা। ওরা তো প্রতিবাদ করেনি! কি ভয়াবহ অহিংসক দেশ! এখানেও প্রতিবাদ করছে না অবোধ্য শব্দ-সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে। গান্ধীজীর স্বদেশী কথাটার যেমন একালে ব্যাপক ও গণ্ডীবদ্ধ ব্যাখ্যা আছে—স্বভাষারও তেমন কিছু দরকার।

হঠাৎ শুনি এক ভূমিকা—"আমি গ্রাম্য ভাষায় কথা বলবো সে জন্য ভদ্র শিক্ষিতদের কাছে ক্ষমা চাইছি।" নতুন লাগলো এ বাক্য কিন্তু গুমরে থাকা রাগ কমলো না। একান্ত প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য কাজে ক্ষমা চাওয়ার মানে কি? এরা পাগল না আমি? যেন অন্য ভাষায় কথা বলার কোন মানে হয়! বোকামী আমারই—কারণ এই দেশেই এখনও ভারতে অবস্থিত ইস্কুলের পড়ুয়ারা বাঙ্গলায় চিঠি লিখতে পারে না বা এখনও উচ্চপদস্থ সরকারসেবীর বেবী আমার সঙ্গে ভুল হিন্দী বলে—উভয় ক্ষেত্রেই পিতা-মাতারা প্রচ্ছন্ন গর্বে ভরপুর! কখন সে বক্তার ভাষণে মুগ্ধ হোয়ে গেছি টের পাইনি। অদ্ভুত শক্তি তাঁর উপমা-সংগ্রহে। অতি সহজ ঘরোয়া ব্যবহার্য্য বাসন-পত্র, মাছ, জাল, বাঁশঝাড়ের উল্লেখ করে স্পষ্ট ভদ্র ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছেন ইংরেজ-শাসন কি, আমরা—বিশেষ চাষীরা কি, আমাদের কি অবস্থা ও কি কর্ত্তব্য। অত্যন্ত ঝিমিয়ে পড়া লাঠি ধরে ব'সে থাকা বুড়োও চাঙ্গা হয়ে উঠলো। হঠাৎ এক ঝলক আলো পড়লে যেমন সব ঝলমল করে তেমনি এদের চোখ চকচক্ করতে লাগলো—মুখে একটা প্রাণের অনুমোদনসূচক খুসীর আলো দেখা দিল। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, যদি কোনও শিল্পী থাকতেন তো ছন্দে বা চিত্রে এ অবস্থাকে রূপায়িত করতেন। বলছেন আবদুল মালেক সাহেব। তাঁর প্রতি বাক্যের পিছনে আত্মবিশ্বাসের জোর আছে কিন্তু অক্ষমের হুল-ফোটানোর জ্বালা নেই। শুধু বলেননি সরকার পাজি। বলেছেন—চাষী হুঁশিয়ার হও, জাগো—এক হও। কোনও দলগত মতামতের প্রচার, প্রাবল্য নেই—নেই সাময়িক উত্তেজনার বুদ্বুদ সৃষ্টি। এর পর আর কিছু যে আমার ভাল লাগবে না তা জানতুম। এর পর দু'-চার জনের দু'-চারটে ছিটকে আসা পছন্দসই মন্তব্য আমার কানে এলো। গ্রামবাসীরা তেতে উঠলো—কয়েকটা অসম্ভাব্য প্রতিজ্ঞায় সায় দিল—হয়তো তারা ও-সব মানবেও কোন এক দিন। সর্ববাদিসম্মত যে ভোট নেওয়া হোল—সে ঝুলি-সংগ্রাহক আড়কাঠির টিপসই দেওয়ারই মতো। জনসাধারণকে কি করে শ্লোগান্ শেখাতে হয় বা স্বীয় প্রতিষ্ঠানে সর্বজনসম্মতিপুষ্ট প্রমাণের জন্য কতো দূর মর্য্যাদা নষ্ট করতে হয় জানলুম। সবাই 'করবো অথবা মরবো' বলতে শিখলো—কি করবে জানি না তবে মরবে নিশ্চিত। এই হিম লাগিয়ে অসুখে যদি না-ও মরে—সরকারের ভাবী বাঁধা-বরাদ্দ দৈনিক এক পোয়া চাল পেয়ে না খেয়ে মরবে।

তাছাড়া কলেরা-ম্যালেরিয়ার মরশুম আগতপ্রায়, রাম-রাবণের যুদ্ধও আছে। এদের মরতে বলতে ভাল লাগে কখনও কখনও। অন্ততঃ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে বাঁচলে স্বস্তি পাই—বিবেক একটু হাঁপ ফেলে বাঁচে। এ তো বিধির বিধান—বিনা চিকিৎসায় মরেছে তো কি হোয়েছে? লাখোপতির এক ছেলে কি মরে না—স্বাধীন দেশে জোয়ানরা লড়াইয়ে মরছে না? আরও কতো নজীর আছে। কিন্তু যখনই ভাবি, এদের বলতে হবে "তোমরাই দেশ, দেশের জন্য তোমাদের আরও কষ্ট সইতে হবে, আরও ত্যাগ করতে হবে"—তখন জিভটা থেমে যায়। আরও দুঃখ আরও ত্যাগ কাকে বলে—সব কিছুরই উর্দ্ধরেখ নিম্নরেখ মান আছে তো? গান্ধীজীর ব্যারিষ্টারী ত্যাগ, রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ বুঝি—একটা কিছু ছিল—যা দৃষ্টিভঙ্গিভেদে বাহুল্য বলা চলে—তাই তাকে ত্যাগও বলা সম্ভব। কিন্তু যার সত্যি কাপড় নেই, চালায় খড় নেই, ভাত ভিন্ন খাদ্য নেই (তাও ক্ষেত্রবিশেষে যথেষ্ট নয়), রাষ্ট্র-স্বার্থ বা জনগণ-দাবী বোঝার বুদ্ধি বা শিক্ষা নেই, বোঝবার স্বাস্থ্য নেই, তাকে কি বোলবো? "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান—" না শ্রেষ্ঠ ভিক্ষার কাহিনী? এমন অজ-কুলের মত অসহায় অবোধদের বলি না দিলে দেশমাতৃকার পূজো হবে না—হায় রে, সমাজ বিবর্ত্তনের নিয়তি-চক্র!

আমার কথা শুনে প্রশ্ন হোলো—আমি কমিউনিষ্ট কি না? সবিনয়ে জানালুম, প্রকৃত কমিউনিষ্ট হতে প্রচুর বিদ্যে-বুদ্ধি-আত্ম-শিক্ষা লাগে, তা আমার নেই—অতএব নই। সুরুর ও শেষের গান দু'টির ভাবের অনুরণন কানে লেগেই রইলো। সুরে ও ভাষায় ত্রুটি ঘটেছিল। এক জন বললেন, ওকে শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাতে হবে। আমার কেন জানি না—মনে হোল, ঐ ভুল স্থানীয় "নালটুপুর" (লাল টোপর স্থলে) শব্দটাই বেশ মানানসই—ঐ পুরোনো ঢঙে অস্থানে ঝোঁক দেওয়া বা সুর টেনে যাওয়াটা শ্রুতিকটু লাগেনি। এ পদগুলো নাড়া-চাড়া করতে করতে আলের পথে হোঁচট খেতে খেতে শিবিরে ফিরলুম।

ঘুমপাড়ানী

টুনু মাসী

[রাত্রে হয়তো অনেকের সহজে ঘুম আসে না। বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয় কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে। রাতের পর রাত এই ভাবে বিনিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অনেকে বলেন, ঘুম না আসার কারণ যাই থাক্ চেষ্টা করলে না কি নিদ্রাদেবীকেও লাভ করা যায়। কি ভাবে লাভ করতে পারি তারই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লেখিকা। বৈজ্ঞানিক মতে।—মা, ব]

গত রাত্রে কলকাতার চার লক্ষ লোক বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে, ঘুমুতে পারেনি। আরও দু'লক্ষ লোক ব্রোমাইড খেয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করে তবে একটু তন্দ্রামগ্ন হতে পেরেছে। এই ছ'লক্ষ নাগরিকের প্রতি নিদ্রাদেবীর এমন নির্দয় বিমুখতা কেন বলুন তো? না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব কেরাণী, অন্নবস্ত্র-সমস্যা-প্রপীড়িত বেকার যুবক এবং পাকিস্তানত্যাগী ধ্বংসোন্মুখ আশ্রয়প্রার্থীদের এই আট লক্ষের হিসাবে ধরা হয়নি। গরীব এবং মধ্যবিত্তদের নিদ্রা-অনিদ্রা নিয়ে মাথা ঘামাবে এমন বোকাও কেউ আছে না কি? যাদের প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত, তাদের আবার নিদ্রা! আমি বলছি কলকাতার গণ্যমান্য ধনী এবং তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট ভদ্র-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বড়-বড় চাকুরে এবং মাঝারী গোছের জমিদার ও ব্যবসায়ীদের কথা, কারণ বিছানা নামক নরম আরামদায়ক বস্তুতে গা এলায়িত করবার অধিকার আজকের দিনে একমাত্র তাঁদেরই আছে।

কলকাতার ছ'লক্ষ বিশিষ্ট নাগরিক গত রাত্রে ঘুমুতে পারেননি। শুধু গত রাত্রে নয়, ৩৬৫ দিনের মধ্যেই কম পক্ষে ২০০ দিন নিদ্রা-দেবীর কৃপালাভে তাঁরা বঞ্চিত হন। কিন্তু তাঁরা যদি জানতেন কেমন করে ঘুমুতে হয়, তাহলে বিছানায় শোয়া মাত্রই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হতে পারতেন। তাঁরা ভাবেন, তাঁরা অনিদ্রা রোগে (insomnia) ভুগছেন। কিন্তু জানেন না, তাঁদের মধ্যে অতি অল্প কয়েক জনই অনিদ্রা রোগগ্রস্ত। অনিদ্রা রোগের জন্ম হয় মানসিক অসুস্থতা অথবা যান্ত্রিক পীড়া থেকে। রাত্রে যাদের ঘুম হয় না, তাঁরা সকলেই অনিদ্রা রোগগ্রস্ত—এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকই নিজের অজ্ঞতার জন্যই সারা রাত জেগে কাটান। দেহ এলিয়ে আরাম করবার কথাই ধরুন। আপনি কি নিজের ইচ্ছামত তলপেট অথবা পায়ের পেশী শিথিল করে দিয়ে আরাম করতে পারেন? নিশ্চয়ই পারেন না। কিন্তু প্রক্রিয়াটি জানা থাকলে বুঝতেন, জিনিষটি কত সহজ এবং শুতে

আদিম যুগের মানুষ সারা দিন ঘুরে ঘুরে অতিশয় পরিশ্রম করে রাত্রে কুকুরের মত ক্লান্তি নিয়ে গুহা-গৃহে ফিরে আসত এবং সকাল পর্যন্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকত। স্বাভাবিক নিদ্রা আকর্ষণের জন্য দেহ-মনের প্রস্তুতির শিক্ষা তাকে গ্রহণ করতে হত না। আজ মানুষের জীবন ধারণের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাই আমাদের রোমশ পূর্বপুরুষদের কাছে যা ছিল স্বাভাবিক, আমাদের কাছে সেটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিজেকে শিথিল করে গা এলিয়ে দেবার কায়দা যদি আপনার অজানা থাকে, তাহলে আসুন, বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন, আর হাত দু'টো রাখুন ঠিক আপনার পাঁজরার নীচে তলপেটের উপর। এবার হাঁটু জোড়া সোজা রেখে পা দু'টো কয়েক ইঞ্চি তুলুন। পা তোলা অবস্থায় যতক্ষণ পারেন থাকুন। তলপেটের পেশীতে হাত দিয়ে দেখুন, পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে।

যখন পা দু'টো শূন্যে থাকতে থাকতে লেগে আসবে, তখন বিছানার উপর পা নামিয়ে রাখুন। এবার হাত দিয়ে তলপেটটা মলাই-মলাই করে নিন। দেখবেন, একেবারে ময়দার তালের মত নরম হয়ে গেছে। এমন কি, একটি পেশীও আপনি খুঁজে পাবেন না, কারণ পেশীগুলো সম্পূর্ণ ভাবে শিথিল হয়ে গেছে।

নিশ্বাস চেপে বার-বার ব্যায়ামটি করুন, তবে এবার আপনার হাত দু'টো পাশেই পড়ে থাকুক। পা দু'টো বিছানায় রাখলেই দেখতে পাবেন, আপনার তলপেট এবং জংঘায় কি রকম আরাম বোধ করছেন। এবার বিছানা থেকে পা না তুলেই উপরোক্ত পেশীগুলোকে শিথিল করার চেষ্টা করুন, দেখবেন কাজটি কত সহজে হয়ে যাবে।

এমনি ভাবে হাত দু'টো বিছানা থেকে তোলা-নামান করে আপনি আপনার কাঁধ ও বাহুর পেশী শিথিল করতে পারবেন এবং বালিশ থেকে মাথা ওঠানো-নামানো করে ঘাড়ের পেশী শিথিল করতে পারবেন।

শিথিল করার আরামটা উপলব্ধি করতে পারবেন। ক্লান্ত পেশী সুযোগ পেলেই শিথিল হয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুমের সমস্যায় যাঁদের ঘুম পালিয়ে গেছে তাঁরা সাধারণতঃ দৈহিক পরিশ্রম করেন না। কাজেই দিনের শেষে তাঁদের কোন দৈহিক ক্লান্তিও হয় না। গা এলিয়ে আরাম করার কায়দাটা তাদের শিখতে হবে।

আপনি ভাবছেন এ আবার কোন দেশী কথা, ঘুমোয় তো মস্তিষ্ক, ঘুমের ব্যাপারে পেশীর এত গুরুত্ব কেন? ভুলবেন না, আপনার মস্তিষ্ক থেকে শত-সহস্র শিরা-উপশিরা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। আপনার দেহে ৮০০ পেশী আছে এবং প্রত্যেকটি পেশী শিরা-উপশিরা মারফৎ ক্রমাগত একটা উত্তেজনা-তরঙ্গ ছাড়ছে। এই উত্তেজনা-তরঙ্গ গ্রহণের জন্য আপনার মস্তিষ্কের একাংশ বিশ্বাসী টেলিফোন গার্লের মত সদা-জাগ্রত।

দেহের অন্যান্য অংশ থেকেও উত্তেজনার তরঙ্গ উত্থিত হয়। রাত্রে গুরু ভোজন হলে পাকস্থলী থেকে উত্তেজনা-প্রবাহ আসে। অর্থাৎ তখন আপনার হজমের কল-কারখানা পুরা দমে কাজ করছে এবং প্রতি মুহূর্তে কাজের রিপোর্ট পেশ করছে মস্তিষ্কের কাছে। তেমনি একেবারে খালি পেটও খুব খারাপ। তাই শুতে যাবার আগে এক গ্লাস দুধ অথবা ফলের রস খেলে অনেকের খুব তাড়াতাড়ি ঘুম এসে পড়ে।

কিন্তু মনে করুন, আপনার পেশী শিথিল করা হয়েছে, আপনার হজমী-কারখানা নীরব—তা সত্ত্বেও আপনার ঘুম আসছে না। জানলাটা একেবারে খোলা রয়েছে না কি? আপনি কি বড় বেশী মুক্ত বায়ু পাচ্ছেন। হয়ত এটাই আপনার অনিদ্রার কারণ। মুক্ত বায়ু অবশ্যই আপনার চাই, কিন্তু জানলাটা দু'ইঞ্চি খোলা থাকলেই আপনি যেটুকু মুক্ত বায়ু পাবেন, তাই সেবন করেই শেষ করতে পারবেন না।

মনে রাখবেন, বাতাস ঠাণ্ডা হলেই সেটা মুক্ত বায়ু হয়ে যায় না। আপনার দেহ হয়ত চাদরের তলায় বেশ গরম হয়ে আছে কিন্তু মুখ এবং হাতটা তো আপনি ঢাকেননি। ঠাণ্ডা বাতাসে এই মুখ এবং হাতের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা সঙ্কুচিত হয়ে মস্তিষ্কে উত্তেজনা-তরঙ্গের আঘাত হানছে। তাই আপনি ঘুমুতে পারছেন না।

বাতাস যদি খুব ঠাণ্ডা হয়, তাহলে নিজেকে গরম রাখবার জন্য গায়ে যে লেপ-তোষক জড়াচ্ছেন, সেই লেপ-তোষক আপনার পেশীকে নিষ্পেষণ করে মস্তিষ্ককে এত বিরক্ত করতে পারে যে, সারা রাতই হয়ত আপনার ঘুম হবে না।

কাজেই একটু গরম ঘর এবং হাল্কা চাদর আপনার ঘুমের সহায়ক হতে পারে। ঘুমের আর এক বড় অন্তরায় আলো। সভ্য মানুষ মন খারাপ হয়ে ওঠে। ঘরে-বাইরে, আশে-পাশে অবিরত অসংখ্য আলো আপনার চোখে পড়ছে। চোখ বুজলেও আপনার চোখে আলো পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা-তরঙ্গ আপনার মস্তিষ্কে আঘাত করে। শোবার ঘরে এমন ব্যবস্থা করবেন, যাতে সুইচ অফ করলেই ঘরটি একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে যায়। বাহিরের আলো জানলা দিয়ে যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে, তার ব্যবস্থা করবেন। ঘরে কোন শব্দ যাতে না আসতে পারে, তার ব্যবস্থাও করবেন। অবশ্য আমাদের দেশটা এত গরম যে, দরজা-জানলা হাট করে খুলেও ঘুমের ব্যাঘাত হবার কোন কারণ নেই। তবে সে ক্ষেত্রে আলোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়াই দারুণ সমস্যা। সব সময়ই মনে রাখবেন, নিদ্রাদেবী আপনার কৈশোরের প্রথম প্রিয়ার মতই লাজুক এবং স্পর্শ-কাতর। স্পষ্ট আলোকে কিছুতেই তিনি আপনার কাছে ধরা দিতে পারেন না। নিবিড় ভাবে তাঁর সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে হলে নিবিড় আঁধারেই তাঁকে আহ্বান করতে হবে।

দেহের মত মনের কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় না। মনের শিথিলতা আসে ধীরে ধীরে। আপনার শোবার সময় যদি রাত ১১টা হয়, তাহলে মানসিক ক্রিয়া-কলাপ রাত ৯টা থেকে কমাতে সুরু করবেন। খোস গল্প, হাল্কা উপন্যাস—এই সব নিয়ে একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসবেন। খবর্দার, সারা দিনের সমস্যার কথা একটুও স্থান দেবেন না মনে। সেটা একেবারেই মারাত্মক।

আপনি যদি উপরোক্ত নিয়মগুলো মেনে চলেন, তাহলে স্বচ্ছন্দে রাত কাটাবার (অবশ্য নিজের বাড়ীতেই) অনেক সুবিধা হবে। এবার আপনি আসুন, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে পেশীগুলো শিথিল করে নিদ্রালু হয়ে উঠুন। কিন্তু নিদ্রালু হবার পরের কয়েকটি মিনিট ভারী সঙ্কটজনক। কি চিন্তা করবেন আপনি? মনকে তো আর আপনি পিপের মত ঘুরিয়ে দিতে পারেন না। মন শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত একটা না একটা বিষয় নিয়ে লেগে থাকবেই।

দুর্ভাগ্য বশত দুশ্চিন্তা আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুশ্চিন্তাকে মন থেকে তাড়াবেন কেমন করে? আপনি তা পারবেন না। কিন্তু একটা জিনিষ আপনি পারেন। দুশ্চিন্তাকে সরিয়ে আপনি ভাল কিছু চিন্তা করতে পারেন। আপনি 'দিবা-স্বপ্ন' দেখতে পারেন। 'দিবা-স্বপ্ন' আসল স্বপ্নের চেয়েও কোন অংশে কম আনন্দদায়ক (অবশ্য আসল স্বপ্নটা যদি দুঃস্বপ্ন না হয়) নয়। কোন একটা উত্তেজনাহীন মধুর স্মৃতি রোমন্থন করুন। বিশ বছর আগেকার একটি আনন্দোজ্জ্বল দিনের প্রত্যেকটি খুটিনাটি

আপনার বাল্যকালীন অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করুন। তাহলে দেখবেন, নিদ্রাদেবী একেবারে হাতের মুঠোয় (অর্থাৎ চোখের পাতায়) এসে ধরা দিয়েছেন।

আট-ন' ঘণ্টার গভীর নিদ্রায় আপনার জীবনে যে কি বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন হতে পারে, তা আপনার কল্পনাতীত। মেজাজটা ভদ্রলোকের মত হবে, স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, এমন কি ব্যক্তিত্বও বেড়ে যাবে। ঘুমের অষুধ না খেয়েই আপনি চমৎকার ঘুমুতে পারবেন, যদি ঘুমের পদ্ধতিটা আয়ত্ত করতে পারেন। কিন্তু দোহাই আপনার, 'সর্টকাট' করতে যাবেন না। উপরে যে পদ্ধতিটা প্রকাশ করলাম, সেটার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিই অত্যাবশ্যক। ঠিক ভাবে সেগুলোর অনুসরণ করলে নিদ্রাদেবী স্বেচ্ছায় আপনার মনের রাত্রিকালীন গবাক্ষে শান্তির যবনিকা টেনে দিতে আসবেন।

হিঁয়া বিলকুল খতম হো গিয়া। চল, বাঙলা মুলুকমে চল!

—শৈল চক্রবর্ত্তী

বিলাতী বারবনিতা

সকল সভ্য সমাজেই জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্যতম উপায় হিসাবে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেন পৃথিবীর অধিকাংশ নারী জাতি।

পতিতাবৃত্তি কি সমাজের প্রয়োজনীয় পাপ না অন্য কিছু একটা বিশেষ প্রয়োজনে নারী জাতির আত্মদান? বিলাতের 'নিউজ রিভ্যু' পত্রিকার তদন্তে যা বোঝা যায় তাই হল লেখাটির সার মর্ম্ম। পড়লে বিস্মিত হতে হয়।

লণ্ডনের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার তরফ থেকে একবার বারবনিতা সমস্যার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়। তদন্তকারী ব্যক্তিরা গ্লাসগো, লিভারপুল, মাঞ্চেষ্টার, লীডস ও নটিংহাম সহরে এ বিষয়ে তদন্ত করে এক বিবরণ দাখিল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই পুরানো ব্যবসার ব্যবসায়ীদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। অবশ্য কোন কোন পতিতা নারী বিয়ে করে চরিত্রের সংশোধন করে। কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশী নয়। আর খুব কম সংখ্যক পতিতাই শেষ বয়সের জন্যে টাকা বাঁচাতে পারে। লীডস সহরের এক বারবনিতা কুড়ি হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন লাখ টাকা রোজগার করেছিল। এছাড়া তার দু'খানা মোটর গাড়ীও ছিল। তবে এটা ব্যতিক্রম। অধিকাংশ মেয়েরাই রোগে বিকল না হলে মদ ও বিলাসব্যসনে টাকা ওড়ায় এবং শেষ পর্য্যন্ত কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করে। এটা যে তারা না বোঝে তা নয়। তাদের সঙ্গে আলাপ করে দেখা গিয়েছে যে, তারা নিজেদের অসুখী মনে করে। কিন্তু তারা কি জন্য এই পথে পা বাড়িয়েছে, তা সত্য করে বলতে চায় না। কেহ কেহ অবশ্য অন্যের উপর বা গৃহ-জীবনের অবস্থার দোষ দেয়। নটিংহামের এক তরুণী এ বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করে। তরুণীটি বলে যে, উপর্য্যুপরি কয়েকটা আঘাত সে পায়—বিমান আক্রমণে তার বাপ-মা মারা যায়, প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে তার বোন আত্মহত্যা করে আর তার ভাই আফ্রিকায় নিরুদ্দিষ্ট হয়। এই সব ঘটনার ফলে তার মন ভেঙ্গে যায়, সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। প্রথমে সে এক মার্কিণ সেনার সঙ্গে জোটে। তার পর যখন সে বুঝলে যে, এই পথে কম কাজ করে বেশ আরামে থাকা যায়, তখন সে পথে নামল। কেউ কেউ আবার আলস্য এবং অর্থলোভের জন্যও এ-পথে পা বাড়ায়।

তদন্তের ফলে আরও জানা যায়, পতিতাদের দু'টি শ্রেণী আছে। একটি "পেশাদার" অপরটি "আংশিক সময়ের" অর্থাৎ এরা দিনের বেলা নিজেদের কাজকর্ম্ম যথারীতি করে আর রাত্রে বেশ্যাবৃত্তি চালায়। পেশাদারদের সঙ্গে এদের চিরবিরোধ বর্ত্তমান। এই শ্রেণীর পতিতাদের মধ্যে খুব কম বয়সের মেয়ে—১৩ বছর থেকে ১৯ বছরের মেয়ে অনেক আছে।

লিভারপুল ও গ্লাসগো বন্দরে পতিতাদের ব্যবসা খুব জোর চলে। এখানে যত দেশের শ্বেত ও অশ্বেত নাবিকরা আসে। তাদের পকেটে পয়সাও থাকে প্রচুর। অশ্বেত নাবিকরা সহজেই শ্বেতাঙ্গিনীদের দ্বারা

জু:।১৫ তদন্তকারী একটি সহরের প্রধান পথে রাত্রি ৯টা থেকে রাত্রি ১টার মধ্যে ৩০।৪০ জন পতিতাকে লোক-ডাকাডাকি করতে দেখেন। এই সব পথচারিণী পতিতাদের বয়স ১৭ থেকে ২২। তাদের স্বাস্থ্য বলতে কিছু নেই, কুশ্রী এবং পোষাকও জীর্ণ। এদের মধ্যে এক জন তদন্তকারীকে বলে যে, তার জীবন বড় কষ্টের। একখানা ছোট সাধারণ ঘরের জন্য তাকে সপ্তাহে দু'পাউণ্ড (প্রায় ৩০ টাকা) ভাড়া দিতে হয়। কাজেই পয়সা উপায়ের জন্য তার পথে থাকা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

লিভারপুলের লাইম ষ্ট্রীটে এই সব মেয়েদের খুব ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে এক জন মেয়ে বলে যে, সে পয়সার এখানে আসেনি, সে এসেছে মজা লুঠতে। আর এক জন বলে যে, তার বাড়ীতে বাপ-মা আছে, তারা ভাল লোক, মেয়ে সন্ধ্যের পর যে কি করে, তা তারা জানে না।

গ্লাসগোর এক্সচেঞ্জ ষ্টেশন এলাকা ও হাই ষ্ট্রীট পতিতাদের প্রধান আড্ডা। কিন্তু তদন্তকারীরা এখানে বেশী মেয়েকে পথে লোক ডাকতে দেখেননি। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, গ্লাসগো সহরে পেশাদার পতিতার সংখ্যা এক শতেরও কম। পুলিশ বলে যে, বিশেষজ্ঞ নারী অফিসারদের দিয়ে পেশাদার পতিতাদের দূর করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ডক-ইয়ার্ডের এক জন শ্রমিক অন্য কারণ দেখায়। সে বলে, "এখানে আমরা মদ খাই বটে, কিন্তু বেশ্যায় আমাদের প্রয়োজন নেই। বরং কাউকে দেখতে পেলে আমরা তাড়িয়ে দিই।"

মাঞ্চেষ্টারে কিন্তু অবস্থা অন্য রকম। এখানে প্রতি আড়াই হাজার অধিবাসীর মধ্যে এক জন করে পতিতা দেখা যাবে। এখানকার লোক-সংখ্যা ৭ লাখ। সে হিসেবে এখানে পতিতার সংখ্যা ২৮০। এই সহরে সব চেয়ে বেশী খোলাখুলি ভাবে পতিতা-বৃত্তি চলে। আর এখানে অশ্বেত লোকদের প্রতি শ্বেতাঙ্গিনীদের দৃষ্টি বেশী। মাঞ্চেষ্টারে লুইস ষ্টোরের কাছে পিকাডেলী এবং মার্কেট ষ্ট্রীটের দক্ষিণ-প্রান্ত পথচারিণী পতিতাদের প্রধান আড্ডা। বিকেল থেকেই তারা শিকার করতে বার হয়। অনেকের পোষাক ভাল নয়। বয়স্কা রমণীদের খুব দেখা যায়। এদের মধ্যে বিবাহিতাও আছে। এক জনকে প্রশ্ন করা হলে সে বলে যে, তার দু'টি সন্তান আছে। তার স্বামী পতিতা-বৃত্তির কথা কিছুই জানে না। তার স্বামী যখন বেকার ছিল, তখন সে এই পথ অবলম্বন করে। আর এখন তার স্বামীর চাকরী হলেও অল্প বেতনের জন্য তাকে পথে বার হতে হয়।

মাঞ্চেষ্টার পুলিশ সহরের এই পাপ দূর করবার জন্য খুব চেষ্টা করছে বটে। এ'জন্য নারী-পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। তারা সাদা পোষাক পরে আসামী অনুসন্ধান করে বেড়ায়।

নটিংহামেও মাঞ্চেষ্টারের মত অবস্থা। এখানে দাগী পতিতার সংখ্যা তিন শত। এ ছাড়া "আংশিক সময়ের" মেয়েও আছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর এক জন মেয়ে বলে যে, সে দিনের বেলা পরিচারিকার কাজ করে সপ্তাহে ৫ পাউণ্ড উপায় করে, আর রাত্রে সপ্তাহে ১২ পাউণ্ড উপায় করে। এখানকার পেশাদার পতিতারা সংশোধনের বাইরে বলে মনে হয়। কিন্তু তবুও নটিংহামের সমাজসেবকরা হাল ছাড়েননি।

লীডসে পতিতা-বৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেকটা সফল হয়েছে। এখানে চীফ কনষ্টেবল মিঃ জে, ডব্লিউ বার্ণেটের চেষ্টায় খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, আগে এখানে পতিতার সংখ্যা ছিল তিন শ'—আর এখন এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সত্তরেরও কম।

হলিউডের আত্মকথা

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

৯

চাকুরীর জন্য হাঁটতে হাঁটতে জুতোর শুকতলী ক্ষয় হয়ে গেল, এ প্রবাদ-বাক্যটি আমাদের দেশে যেমন প্রচলিত আছে আমেরিকাতেও ঠিক তেমনি ভাবে সেই কথাটির প্রচলন রয়েছে। চাকরীর অন্বেষণ করতে গিয়ে মিসির জুতোর শুকতলী শুধু ক্ষয় হয়নি সম্মানেরও হানি হয়েছিল। কাজ অন্বেষণ করতে গিয়ে সম্মানের লাঘবতা বিশেষ করে স্ত্রীলোকের পক্ষে আমেরিকাতে নূতন নয়। বহু পুরাতন প্রথা। সেই প্রথা আজও বর্ত্তমান।

ফোন পাবার পরই মিসি মিষ্টারের বাড়ীর দিকে রওনা হবার উদ্যোগ করল। ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগাল। জুতা ভাল করে ব্রাস করল। ছেঁড়া ষ্টকিং সামান্য সেলাই করে পরল। পরনের এপ্রণটা একটু ব্রাস করে নিয়ে সামান্য কেশবিন্যাস করল, তার পর পথে বের হল। মিসি যে গতিতে চলছিল যেন একটি বক পাখী মাছের ঠিক অনুসন্ধান পেয়ে ধীরে অথচ দ্রুতগতিতে চলে, ঠিক সে রকমেই মিসি পথ চলছিল। তার পর সে যখন ষ্ট্রীট-কারে চড়ল তখন তার রূপের আলো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। যৌবন তার শরীর হতে ছিটকে বের হচ্ছিল, কিন্তু ষ্ট্রীট-কারে এমন লোক ছিল না যারা তার যৌবনের প্রাণ-মাতানো অনুপ্রেরণায় প্ররোচিত হতে সক্ষম হচ্ছিল। দারিদ্র্য কালিফরনিয়ার সর্বত্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ষ্ট্রীট-কার একরূপ খালিই ছিল।

মিসি বৃদ্ধের ঘরে পৌছার পর দেখতে পেল বৃদ্ধ তারই জন্য অপেক্ষা করছে। মিসিকে বৃদ্ধ দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়াল এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, মিসি, এই পাশের চেয়ারটাতে বস। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কঠিন অথচ উদারতায় পরিপূর্ণ। বসবার আদেশ অথচ স্নেহের অবদান তাতে ছিল। মিসি বসল।

বৃদ্ধ বলতে আরম্ভ করল, শোন্ মিসি, এখন আমি বৃদ্ধ, রেস্তোরায় গিয়ে খাওয়া পোষায় না। আর্থার যুবক, সে বিয়ে করবে বলে ভরসাও হয় না, এখন বুঝে নাও কোথায় তুমি এসেছ? ভাবার বিষয় কিছুই নেই, তোমাকে কাজে নিযুক্ত করা হল এবং তিন ডলার ক'রে পাবে এটাও ঠিক, কিন্তু এখানে পাক করতে হলে কতকগুলি আইন-কানুন মানতে হবে; যথা—লিপষ্টিকের ব্যবহার না করা, কোনরূপ ছেড়া কাপড় না পরা এবং সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন অবগাহন করা। এটা তোমাকে মানতেই হবে। ছেড়া কাপড় পরিবর্ত্তন করার জন্য তোমাকে এক সপ্তাহের মাইনে দিয়ে দিচ্ছি। কাল থেকে তুমি পাক করতে এস। এখন সামান্য কাফি তৈরী কর, তার পর আমরা সকলেই রেস্তোরায় দ্বিপ্রহরের খাওয়া খেয়ে আসব।

মিসি প্রতিবাদ করল এবং বলল, বাইরে গিয়ে কোনও লাভ নেই, তোমরাও আস, তিন জনে মিলে যদি পাক করি তবে দোষ হবে না, আমি না হয় বাসন ধুইবার কাজ করব,—তোমরা পাক করবে।

মিসির সাহসিকতা দেখে বৃদ্ধ সুখী হল এবং তিন জনে একত্রে পাক-ঘরে প্রবেশ করল। অনেক সপ্তাহ কেটে গেছে, পাক-ঘরে পাচিকার আগমন না হওয়াতে পাক-ঘরটি অপরিষ্কার ছিল। মিসি সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম পাক-ঘর পরিষ্কারে লেগে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পাক-ঘরটি ব্যবহারের উপযুক্ত করে বৃদ্ধকে পাক বসাতে বলল এবং কি রকমে পাক করতে হবে সেই উপদেশ এবং আদেশ দিয়ে গেল। মিসি গেল স্নানাগারে। স্নানাগারের অবস্থা দেখে মিসির বাস্তবিকই দুঃখ হল এবং সেখানেও প্রায় দু' ঘণ্টা কাটিয়ে যখন মিসি পাক-ঘরে ফিরে এল তখন তার ঠোঁটে লিপষ্টিকের রক্তিম আভা ছিল না। মিসি স্নান করে এসেছিল।

সদ্যস্নাতা মিসিকে দেখে বৃদ্ধ সুখী হল এবং বলল, মিসি এখন তুমি রান্না করতে পার। মিসি পাক করে একই সঙ্গে খেতে বসল। মিসি এবং আর্থার এক দিকে না বসে তিন দিকে তিন জন বসল। টেবিলের এক দিক খালি রয়েছে দেখে আর্থার বললে, উইলীকে ডাকলে ভাল হ'ত। বৃদ্ধ বললে, উইলী অন্য কাজে ব্যস্ত। সে প্লেন তৈরী করছে। রুজভেল্ট প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন, সে সংবাদ রেডিওতে পেয়েছি এখন কাজের সুরু, বুঝলে আর্থার। সত্বরই সভা হবে, সেই সভায় কি হয় না হয় তা আমাদের জানা নেই, হয়ত আমাদের এবং দেশের সুবিধাই হবে। আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি; আমাদের সমূহ উন্নতি করতে হবে। বসে শুধু চিন্তা করলেই চলবে না, সংবাদপত্রের মতামত দেখতে হবে না, রেডিওতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। উইলীর কথা ভুলে গিয়ে কিছু কাজ কর। মিসির জন্য কাছের দোকান হতে কিছু কাপড় এবং দুই জোড়া ষ্টকিং নিয়ে আসবে। মিসির আরও কাজ বাকী আছে। আমার রুমটা একবার দেখাতে হবে, সেখানে দুনিয়ার আবর্জ্জনা পড়ে আছে।

খাওয়া হয়ে গেলে আর্থার নিকটস্থ একটি দোকানে কাপড় কিনতে গেল। বৃদ্ধ এবং মিসি তার ঘরে প্রবেশ করল। ঘরের অবস্থা দেখে মিসি "জিসাস্" বলে চীৎকার করল। বৃদ্ধ এতে বড়ই লজ্জিত হল। বৃদ্ধ মিসিকে বললে, "এখন তুমি ঘর হতে বের হয়ে যাও, দেখি কি করতে পারি। বৃদ্ধ নিজেই ঘর হতে বের হয়ে গেল। মিসি ঘর পরিষ্কারে মন দিল।

ঘরের মধ্যে মাত্র দু'খানা টেবিল। প্রত্যেক টেবিলের পাশে দুখানা ক'রে চেয়ার, একখানা শোবার লোহার খাট। খাটে জাজিম বিছানো ছিল, কিন্তু নরম গদী অথবা বিছানার চাদর ছিল না। দু'টা বালিশের একটারও ওয়াড় ছিল না। প্রত্যেকটা টেবিলের উপর স্তূপাকারে বই। এমন কি বসবার চেয়ারের উপরও বই এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। শুধু কমফর্ট চেয়ারটা খালি ছিল, কারণ সেই চেয়ারে বসে বৃদ্ধ বই পড়ত। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরিশ্রম করে মিসি ঘরটাকে একটু ধাতে আনতে সক্ষম হল, কিন্তু বেড-সিট এবং বিছানা ঢাকবার কিছুই না থাকায় সে বড়ই বিরক্ত হল। অবশেষে বৃদ্ধের ঘর থেকে বের হয়ে মিসি বৃদ্ধকে বললে, শোন বৃদ্ধ, আমাকে জীর্ণ-বস্ত্র পরতে দেখে তুমি বেশ রাগ করেছিলে কিন্তু বালিশের ওয়াড় এবং বিছানার চাদর নাই, সে সংবাদ রাখ?

বৃদ্ধ একটু অপদস্থ হয়েই বললে, তোমাকে সবই কিনতে হবে,

আর্থারের ঘরটাও একবার দেখে নিও। আজ আর কিছুই করতে হবে না। রাত্রের খাওয়া আমরা বাইরেই খেয়ে নেব। এই নাও এক শত ডলার; যা দরকার সবই কিনে এনো। টাকার হিসেব তুমিই রাখবে, এখন যাও। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

আমরা ভাবি, আমেরিকার অথবা ইউরোপের স্ত্রীলোক সবই মেম সাহেব, কিন্তু কর্মযুক্ত মিসির মুখ দেখলে সকলেই মনে করতে বাধ্য হত, মিসি এক জন ঝরিয়া কোল-মাইনের মজুর স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কিছুই নয়। ঝরিয়া কোল মাইনের মজুর স্ত্রীলোক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখে না কিন্তু আমেরিকার স্ত্রীলোক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখে। মিসি পুনরায় হাত-পা ধুয়ে নিয়ে মুখখানা পরিষ্কার করল এবং এক শত ডলারের নোট নিয়ে বের হবার পূর্বে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে একটু হেসেই বের হয়ে পড়ল। আর্থারের দিকে তাকাল না দেখে আর্থার মোটেই দুঃখিত হল না।

পরের দিন সকাল বেলা মিসি দরকারী জিনিস সব কিনে নিয়ে এল এবং ঘরটাকে একেবারে পরিবর্তন করে ফেলল। বৃদ্ধ এবং আর্থার মিসির কাজ দেখতে গেল না কারণ তারা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে দেখতে পেল, মিসি ঘরখানার অবস্থা একেবারে বদলিয়ে দিয়েছে। রান্নাও চমৎকার হয়েছে। খেতে-খেতে বৃদ্ধ বললে, মিসিকে পেয়ে আমরা সুখী হয়েছি।

মিসি বললে, আপনাদের পেয়ে আমি সুখীও হইনি দুঃখীও হইনি। কিন্তু সুখী হয়েছি কাজ পেয়েছি বলে। গত ছয় মাস কত স্থানে গিয়ে কাজের সন্ধান করেছি তার হিসাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। অনেক স্থান হতে সাফ জবাব পেয়েছি, আবার কতকগুলি স্থান থেকে এমন কতকগুলি ইংগিত এবং ব্যবহার পেয়েছি যা এখন ভাবতেও ঘৃণা হয়। ভেবে পাচ্ছি না, এ সব দুর্ব্যবহার হতে আমার মত যুবতীর দল কবে রক্ষা পাবে। শুনতে পাই, আমেরিকার মত ধনী দেশ পৃথিবীতে একটিও নাই, আমেরিকার ধন-দৌলত, প্রাসাদতুল্য বিল্ডিং এবং ডলার-সাম্রাজ্যের বুকের উপর এত বর্বরতা লুকিয়ে থাকতে পারে? শুন বৃদ্ধ, কাল বিকালে আমি দু' ডলারের বই কিনেছি। প্রথম বইটাতেই আমেরিকার গর্ব-কাহিনী পড়লাম। বইটা আদ্যোপান্ত পড়ে মনে হল, আমাদের দেশের সুনাম পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। পৃথিবীর লোক আমাদের দেশকে স্বর্গ বলে গণ্য করে। কিন্তু এই নন্দনের নাগরিক আবহাওয়ার কথা ক'জন জানে! শুনতে পেলাম, এবারও বিদেশী মজুর আংগুর-বাগানে কাজ করবে। তাদের মজুরী এত কম হবে যে, দু'বেলা শুধু রুটিও তাদের জুটবে না। দেশের অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাচ্ছে তা কি আপনারা লক্ষ্য করেছেন?

বৃদ্ধ বললে, ভাল-মন্দ এখন আর চিন্তা করি না, এখন ভাবি কি করে মানুষ সুখী হবে। ছয়-সাত বৎসরের পুরাতন একটি ঘটনা বলছি—আমার পুরাতন মনিব কালিফর্নিয়া ষ্ট্রীটের দিকে হেঁটে চলছিলেন। পথে দেখা হয় বিখ্যাত হলিউডের ষ্টার মেকীর সংগে। মেকীও হাঁটছিল। মেকীকে হাঁটতে দেখে আমার পুরাতন মনিব অবাক হলেন। যার মাসিক আয় দশ হাজার ডলারেরও বেশী, সে কি না পায়ে হেঁটে চলেছে, এর কারণ কি?

মেকী আমার মনিবকে জানত এবং মেকী যখন না খেয়ে মরতে বসেছিল তখন আমার মনিবই তাকে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মেকী তাকে দেখা মাত্র দাঁড়াল এবং জিজ্ঞাসা করল, আমাকে চিনতে পার বৃদ্ধ?

আমার মনিব এক জন বৃদ্ধ লোক। তিনি বললেন, ভুলে গেছি দাদু, এখন সকল কথা মনে থাকে না।

মেকী আরও কাছে এসে বললে, আমি মেকী, তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে সে কথা কি ভুলে গেলে?

সবই ভুলতে হয়। মানুষ বৃদ্ধ হলেই ভুলতে বাধ্য হয়। আচ্ছা মেকী, তুমি কি সেই মেকী—যে হলিউডের প্রসিদ্ধ ষ্টার?

হাঁ দাদু, আমি সেই লোক, তবে বড়ই দুঃখী, আমার মত দুঃখী বোধ হয় এই পৃথিবীতে আর কেউ নাই।

কেন, কি হয়েছে? আমার সাধ্যের মধ্যে যদি থাকে তবে প্রতিকার করব। চল পার্কে গিয়ে বসি।

মেকী বললে, পার্কে বসবার ক্ষমতা নেই, তোমার সংগে যদি কথা বলতে হয় তবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে, নতুবা শুয়ে থাকতে হবে। আমি বলতে পারি না রোগ হয়েছে। যদি কিছু মনে না কর তবে আমার বাড়ীতে চল।

আমার বৃদ্ধ মনিব মেকীর প্রার্থনা মতে তার বাড়ীতে গেলেন। মেকীর বাড়ী একতলা। মস্ত বড় বাংলো। অনেকগুলি রুম। প্রত্যেকটা রুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোন রুমে ছবি অথবা আয়না ছিল না। দরকারী টেবিল এবং মামুলী আসবাব মাত্র। শোবার ঘরেও একই ব্যবস্থা। তার বালিশের পাশে বৃদ্ধ একখানা বই দেখতে পেলেন। বইখানা ধনতন্ত্রবাদ নিয়ে লেখা। মেকী বৃদ্ধকে বই দেখিয়ে বললে, এখন এই আমার পাঠ্য এবং চর্চার বিষয়। এ সব কথা তোমাকে বলব না। আমি বলব আমার জীবনের ঘটনা অতি সংক্ষেপে। তাতেই তুমি বুঝতে পারবে আমার মত দুঃখী লোক যেন পৃথিবীতে আর নেই।

যে দিন তুমি আমাকে এবং আমার মাকে উন্মুক্ত পার্ক হতে নিয়ে এসে ঘর ভাড়া করে থাকবার সংস্থান করে দিলে, সে দিন থেকেই আমাদের দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। প্রতিবেশীদের মধ্যে একটা লোক আমাদের ঘরে যাওয়া-আসা করত এবং সে আমার মাকে প্রায়ই বলত, মেকীকে সিনেমাতে ভর্তি করে দিলে ভাল হবে। প্রথম প্রথম আমার মা রাজী হননি, কিন্তু তোমাকে রোজ রোজ টাকার জন্য বিরক্ত করার চেয়ে আমাকে সিনেমাতে ভর্তি করে দেওয়াই ভাল মনে করলেন। আমিও ভাবলাম, পুরুষ ছেলের পক্ষে সিনেমাতে যোগ দিতে আপত্তি কি? মদ না খেলেই হল। প্রথমের দু'টা বৎসর বেশ ভালই কেটেছিল, তার পরই আরম্ভ হল পরোক্ষ ভাবে অত্যাচার। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমিই বশ্যতা স্বীকার করি। পুলিশ সে সংবাদ পেয়ে যায় এবং আমাকে সিয়াটেলে দু' বৎসরের জন্য এক্সপেল করে। সেখানেও আমি সুখে থাকতে পারিনি। প্রত্যহই পার্টিতে যেতাম। দু'বৎসরেই আমার শরীর ভেংগে যায়। শরীর দুর্বল হয়েছে সংবাদটি মাকে দেই। মা সিয়াটেল গিয়ে আমার সংগে থাকেন এবং শরীর একটু সুস্থ হবার পরই এখানে নিয়ে আসেন। এখন আমি মাকে সংগে নিয়েই চলাফেরা করি, এমন কি ট্রেনের ভেতরও মা সংগে থাকেন। কিন্তু মায়ের সংগ নিয়েছি অসময়ে। শরীরে রোগ ঢুকে গেছে। রোগের যদিও চিকিৎসা হচ্ছে তবুও আরোগ্য হবার আশা নাই। এ শরীর নিয়ে বেশী দিন

থাকব না। এটা কুৎসিত রোগ নয় বৃদ্ধ। কুৎসিত রোগ সারাবার ঔষধ আছে। কিন্তু এ রোগ অন্য রোগ, যার নাম মুখে উচ্চারণ করতেও ঘৃণা এবং লজ্জা হয়।

এখন বল বৃদ্ধ, কি করে প্রথমত রোগের হাত হতে রেহাই পাই, দ্বিতীয়ত, আমেরিকাতে আমারই মত অনেক যুবক আমি যে রোগে ভুগছি সেই রোগেই কষ্ট পাচ্ছে—তাদের রক্ষা করার কি কোনও উপায় নেই? আমার মনিব অতি বৃদ্ধ, সে জন্য আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। মেকীকে আমিই আরাম করেছি। এখন মেকী আমার ঘরে প্রায়ই আসে এবং নাম পরিবর্তন করে সিনেমা-জগৎ হতে বিদায় নিয়ে মজুরের কাজ করছে।

এ দেশ সম্বন্ধে তুমি আমার কাছে কি আর বলবে মিসি! অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, এখন বার্দ্ধক্য এসে দেখা দিয়েছে। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন যাতে সুখে এবং স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়, সে কথা তোমরাই ভাববে। আমার আছে বলতে কেউ নেই—আমি তোমাদের কথা ভাবব কেন বল? তোমরা খাবে-দাবে, মজা করবে, আর আমাদের মত প্রাপ্তবয়স্ক লোক তোমাদের জন্য মরবে তা হতে পারে না। মিসি এ সংসার তোমাদের জন্য নূতন, আর আমাদের জন্য পুরাতন। তবে বাঁচবার ইচ্ছা যেমন করে সবারই আছে, আমারও আছে—এর বেশী নয়। তোমাদের বিয়ে হবে, তার পর আসবেন কচি-মুখের মিষ্টি হাসি। সেই মিষ্টি হাসি মধু হতে মধুর তা আমি জানি, কিন্তু সেই মধুর হাসি যদি কচি অবস্থায়ই শুকিয়ে যায় সে জন্য দায়ী আমরা হব না। দায়ী হবে তোমরা। তোমরা দেখবে যাতে কচি মুখের হাসি অটুট রাখতে পার। এখন চিন্তনীয় বিষয় হল, কি করে তার প্রতিকার হয়? মিসি বলত, তোমার দুঃখের কারণ কি তা কি কখনও তুমি ভেবেছ?

নিশ্চয় ভেবেছি বৃদ্ধ! ভেবেও তার হদিশ পাইনি, গিয়েছিলাম পাদ্রীর কাছে, পাদ্রী বলে দিয়েছেন মানুষের পাপে মানুষ মরে, পাপ করো না তবেই সকল বিপদ হতে রক্ষা পাবে। এখন দেখছি, পাদরীর উপদেশ কামানের গোলার কাছে ছোট্ট একখানা টিনের থালা, যাকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করতে বলেছেন, আমাদের পাদ্রী মশায়।

বৃদ্ধ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল এমনি সময় পাশের রুমে টেলি-ফোনে ডাক পড়ল। বৃদ্ধ পাশের রুমে গিয়ে ফোন ধরল। ফোনে উইলী বলছিল, শোন বৃদ্ধ, আগামী পরশু সভার দিন ধার্য্য হয়েছে, তোমাকে সভাতে উপস্থিত হতে হবে। আর্থারের নামে ওয়ারেণ্ট বের হয়েছে, সে যেন সাবধানে থাকে। শুনলাম, তোমরা না কি মিসি নাম্নী একটি যুবতীকে রাঁধুনী রেখেছ, আপাতত যদি আর্থার এবং মিসি স্বামি-স্ত্রীর মত প্রহসন করে তবে পুলিশের চোখে সহজেই ধূলা দেওয়া যেতে পারে। তুমি সে ব্যবস্থা করতে পারবে?

বৃদ্ধ বললে, তুমি একবার এদিকে এস, আমি এ সব কম বুঝি, রাত তিনটায় এখানে পৌঁছবে এবং সকালে তোমার সংগে আমরা রওয়ানা হব, কেমন তাই হলে হয় না?

আচ্ছা, ভেবে দেখি বলেই—ফোন ছেড়ে দিল।

বৃদ্ধ জানত, ভেবে দেখি মানে কি? সে জন্য মিসিকে সে রাত্রে তার বাড়ীতে যেতে দিল না এবং ফোনে মিসির মা-বাপকে জানিয়ে দিল, মিসি তাদের বাড়ীতে রাতে থাকবে। আমেরিকার মা-বাপ এতে আপত্তি করে না, কারণ, তারা ভাল করেই জানে, নারীর অধিকার এবং নারীর সম্মান খাঁটি আমেরিকানরা দিতে জানে।

· আমেরিকাতে ইহুদী এবং আরব-রক্তের সংমিশ্রণ আছে, কিন্তু তা হলে ক্ষতি কিছুই হয় না। ইহুদী এবং আরব-রক্তের তেজপুঞ্জ আমেরিকান্ কৃষ্টিতে ডুবে যায় এবং কু-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মিসির মা-বাবা নিশ্চিত মনেই মিসিকে বাইরে রেখেও শুতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাত তিনটার সময় উইলী আসল এবং বাকী রাত কাটিয়ে সকাল বেলা সে-ই মিসেস্ এবং মিষ্টার কার্টার বলে মিসি এবং আর্থারকে সম্বোধন করল। আর্থার জবাব দিল, মিসি চুপ ক'রে থাকল এবং কতক্ষণ পর বৃদ্ধের দিকে তাকাল। বৃদ্ধ মাথা নেড়ে এমনই একটি ইংগিত করল যাতে মিসি মিসেস্ কার্টার বলে নিজেকে উইলীর কাছে পরিচয় দিতে বাধ্য হল। উইলী অন্য ঘরে চলে যাবার পর বৃদ্ধ মিসিকে বললে, তোমাকে গতকল্য অনেক কথা বলেছি, বোধ হয় তুমি আমার কথা অনেকটা অনুধাবন করছ, এখন তোমাকে মিসেস কার্টার বলে কয়েক সপ্তাহ অভিনয় করতে হবে, প্রত্যেক সপ্তাহের জন্য এক শত ডলার করে পাবে। কিন্তু অভিনয়ে যেন ভুল না হয়।

মিসি বললে, "ডাইভোর্স করার পূর্বে স্বামি-স্ত্রীতে যেরূপ ভাবে থাকে তেমনি করে যদি অভিনয় করি তবে চলবে ত?

নিশ্চয়ই মিসি, যা বলছ সেরূপ ভাবে অভিনয় করলেও চলবে।

তাই হবে বৃদ্ধ।

কতক্ষণ পরই মিসি তার মাকে জানালে, "স্যানফ্রান্সিসকো যাচ্ছি, দু'-এক দিন সেখানে মনিবের সংগে থেকে সেক্রেটারীর কাজ করব। সপ্তাহে এক শত ডলার পাব। সেখান থেকে এসেই বাড়ী আসব।

মিসির পদোন্নতির কথা শুনে তার মা-বাবা আনন্দিত হলেন এবং এই দুর্দিনে অন্নের সংস্থান হল ভেবে ঈশ্বরকে নানা প্রকারে ধন্যবাদ দিলেন।

সকাল সাতটার সময় চার জনে রেলগাড়ীতে বসে সন্ধ্যার পূর্বেই তারা ফ্রিস্কোতে পৌঁছল। সে-দিন গাড়ীর সৌভাগ্যই বলতে হবে। সন্ধ্যার একটু পরে ষ্টেশনে পৌঁছে উইলী আপন মনে গাড়ী হতে নেমে চলে গেল, বৃদ্ধও উইলীর অনুসরণ করল। আর্থার এবং মিসি ষ্টেশন হতে বের হয়ে ট্যাক্সি ভাড়া করে একটি মামুলী হোটেলে স্থান নিল।

দুই বিছানার রুম। দু'খানা বিছানাই পরিষ্কার। দু' জোড়া টেবিল-চেয়ার। মিসি ইচ্ছা করেই আর্থারের সন্নিকটে বসল এবং প্রথমতই বললে, সিনেমায় দেখেছি এরূপ ভাবে অভিনয় করেই অনেকের বিয়ে হয়। তুমি ভেবো না আমি সেরূপ ধরণের মেয়ে, চট করে বিয়ে করে ফেলব। প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি লক্ষ্য থাকে, আমার জীবনেরও একটি লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে গিয়ে যদি ইলেকট্রিক চেয়ারেও পৌঁছি তাতেও ভয় করবো না, অতএব হুসিয়ার আর্থার।

আর্থার বললে, আমি যদি তোমাকে আক্রমণ করি তবে তুমি কি আত্মরক্ষা করতে পারবে?

অতি গম্ভীর হয়ে মিসি বললে, তুমি আমার কাছে নগণ্য পিঁপড়ে, তোমার মত কুড়িটা যুবককে মিনিটের মধ্যে যমালয়ে পাঠাতে পারি। সে কথা এখন থাক। আমি স্নান ক'রে আসি, তার পর তুমি দরকার হলে স্নান করো। তার পরই রেস্তোঁরায় যাব। আজ আমারও এখানে আসার কথা ছিল, সেজন্যই তোমাদের

সংগে ক্লিস্কোতে আসতে কোনরূপ ওজর দেখাইনি। খাওয়ার শেষে আমি বেরিয়ে যাব, এবং হোটেলের ম্যানেজারকে বলে যাব, সে যেন তোমাকে কোথাও না যেতে দেয়। বুঝলে ত, তুমি হলে আমার অভিনয়ের স্বামী তাও আবার ডাইভোর্স করার পূর্বাবস্থা, এমতাবস্থায় তোমাকে কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

তাই হবে মিসি, বলেই টাওয়েল নিয়ে আর্থার মুখ মুছতে আরম্ভ করল।

মিসি স্নান করে রুমে আসল এবং আর্থারকে নিয়ে খাবার খেতে একটি ছোট্ট গ্রীক্ রেস্তোঁরাতে গেল। দোকানী বড়ই ভালমানুষ। দুর্দিনের দিনে ক্রেতা যাতে স্বল্প অর্থে পেট ভরে খেতে পারে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করছিল। অপরিষ্কার যবের রুটি, মাংস এবং সস্তা দরের সব্জি সে প্রচুর পরিমাণে রাখত। সাধারণত গ্রীকদের পাক-প্রণালী সকলেই পছন্দ করে। তার হোটেলে যাতে ভাল করে রান্না হয় সে জন্য তার স্ত্রী এবং প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা পাক করত। লোকে ছোট্ট রেস্তোরাতে খেয়ে তৃপ্ত হত। আর্থার এবং মিসি খেতে বসল। একটি একটি করে পাঁচ পদে খাদ্য শেষ করে মিসি রেস্তোঁরার মালিককে রান্নার প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানাল।

রেস্তোরার মালিক বললে, এটা দরিদ্রের রেস্তোঁরা, এখানে আমার স্ত্রী এবং কন্যা কাজ করেন, সে জন্যই এত ভাল খাদ্যের সংস্থান হয়েছে। রান্নার ভাল-মন্দ আমি ভাবি না, ভাবি, বেকারগণ যখন খেতে বসে কম খেয়ে উঠতে বাধ্য হয়। যারা আমার এখানে খেতে আসে তারা প্রত্যেকেই কাজ করতে প্রস্তুত এবং তাদের কার্য্যতৎপরতা সাধারণ মজুরের চেয়ে অনেক উচ্চে। এমতাবস্থায় তারা পেট ভরে খেতে পারে নাতা কি ভাববার বিষয় নয়? মদ, জুয়া চরিত্রহীনতা এদের মধ্যে নেই, কিন্তু বৎসরে দু'মাস কাজ করে যদি দশ মাস বেকার থাকতে হয় তবেই ত মহা বিপদ।

এই দেখুন, মিসেস মেনুয়েল এসেছেন, তাঁর সংগে তিনটি ছেলে-মেয়ে, তাদের খাওয়া আমিই দেই। মিসেস মেনুয়েল কাজ করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে কাজ কে দেয়। পাদ্রী বলেন, ভাগ্যের দোষ; ডেমোক্রেটিকরা বলে, দেশের দুর্দিন রিপাবলিকানরা এনেছে এবং রিপাবলিকানরা বলে, ডেমোক্রেটিকরাই দেশের অবনতির কারণ। এখন সাধারণ লোক কোথায় যায় বলুন?

মিসি রেস্তোঁরায় বসল না, সে মিসিগান ষ্টেটের প্রতিনিধি বহু পূর্ব্বে নির্বাচিত হয়েছিল এবং তাকে এখনই সভায় যেতে হবে, সে জন্য আর্থারের হাত টেনে রেস্তোঁরা হতে বের হয়ে হোটেলের দ্বারে আর্থারকে পৌঁছে দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ষ্ট্রীট-কারে বসল। সভার স্থান ধার্য্য হয়েছিল একটি ছোট্ট জাহাজে। জাহাজের নাম এখানে বলা হল না, কারণ আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের অবয়ব বদলি করা যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে নাম পরিবর্ত্তনের কোন প্রশ্নই উঠে না। জাহাজ হাওয়ার্ড ষ্ট্রীটের মোড়ে ছিল। কয়েক জন লোক মাত্র, জাহাজে এক জনের পর এক জন করে উঠছিল। রাত ঠিক বারটার সময় জাহাজ জেঠী ছেড়ে সমুদ্রের দিকে রওয়ানা হল।

জাহাজে উঠেই মিসি কাপ্তেনের হাতে একখানা পত্র দিল। এই পত্রেই ছিল মিসির পরিচয়। মিসিকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে কাপ্তেন সতের নম্বর কেবিনে যেতে বলল। এক জন বয় মিসিকে কেবিন নম্বর সতেরতে নিয়ে গেল এবং সেই বয়ই কেবিনের দরজা খুলে দিয়ে বললে, আমার নোট-বইয়ে লেখা রয়েছে, কেবিন নম্বর সতেরতে যিনি আসবেন তিনি কমিউনিষ্ট-ভাবাপন্ন, সে জন্য তার জন্যে অনেকগুলি পুস্তক রেডি রেফারেন্সের জন্য রক্ষিত হয়েছে। আপনি বইগুলা দেখে নিন্, আপনাকেই প্রথম লেকচার দিতে হবে। মিসি বয়কে ধন্যবাদ দিয়ে বইগুলা একবার দেখে নিল, তার পরই তার দৃষ্টি পড়ল ঘড়ির দিকে—সাড়ে বারটা। মিসি ফোন হাতে নিয়ে তার বক্তব্য বলতে আরম্ভ করল। ঠিক ত্রিশ মিনিট বলে মিসি ফোন রেখে দিল। সে অন্যের লেকচার শুনতে চায় না। চেয়ার ছেড়ে বিছানাতে শুয়ে কি ভেবে পাশের রিসিভার নিয়ে কাণে ধরল। শুনতে পেল, যার বাড়ীতে সে পাচিকার কাজ করে, সেই বৃদ্ধ গুরু-গম্ভীর স্বরে বলছে—"মিসি-গান যা বলেছে তার তীব্র প্রতিবাদ করছি, এখনও আমাদের দেশে সোসিয়েলিজম চালু করবার সময় হয়নি, যদি আমরা এখন সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ি তবে আমাদের অবস্থা হবে ইংলণ্ডের লেবার পার্টির মত।" তার পর অশ্রাব্য ভাষায় মিসির চৌদ্দ পুরুষের স্বর্গ-প্রাপ্তির কামনা করে বৃদ্ধ তার লেকচার শেষ করল। সেদিন মাত্র দু'ঘণ্টা সভা হয়েছিল তার পরই জাহাজ তীরের দিকে ছুটল। জাহাজ তীরে পৌঁছার পর সর্বপ্রথম মিসি অবতরণ করল এবং ট্যাক্সী-যোগে হোটেলে ফিরে এল।

আর্থার তখন গভীর নিদ্রায়। মিসি দরজা খুলে পাশের বিছানায় শুয়ে থাকল এবং নিদ্রা এসে তাকে কুলে উঠিয়ে নিল।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মিসি বৃদ্ধের সংগে দেখা করতে গেল। আর্থারও সংগে ছিল। বৃদ্ধ জেনারেল সেক্রেটারীর ঘরে ছিল। মিসিকে দেখা মাত্র বৃদ্ধ বললে, তোমাদের সুনিদ্রা নিশ্চয়ই হয়েছিল?

মিসি বললে, নিশ্চয়ই আমি সিনেমা হতে ফিরে এসে দেখি—ঘুমিয়ে আছে। আর্থারের নাম উচ্চারণ করতেও মিসি দ্বিধাবোধ করছিল, কারণ আর্থারের নাম কার্টার হয়েছে সে কথা সে ভুলে গিয়েছিল।

বৃদ্ধ মিসিকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি আজ দ্বিপ্রহরে কোথাও যাবে?

দ্বিপ্রহরে নয়, আর ঘণ্টা খানেক পরই আমি আমার কাকার বাড়ী যাব। সেখানে হয়ত দু'-এক দিন থাকতেও পারি। এ সব কথা চিন্তা করে তোমার দরকার নেই, আমরা ভালই আছি, এখন যাই তবে? মিসি আর্থারের হাত ধরে উঠাল এবং বলল, চল এখন আমরা যাই, এখানে বসে থেকে কি লাভ হবে? আর্থার যন্ত্রের মত চলছিল, সে দ্বিরুক্তি না করে মিসির সংগে চলল।

বাইরে এসে মিসি আর্থারকে বললে, তুমি এখন সোজা হোটেলে যাবে এবং হোটেলেই বয়ের সাহায্যে সামান্য খাবার এনে খাবে, আমি ফিরব ঠিক দশটায়, তখন একত্রে খাওয়া হবে। বুঝলে আর্থার, ভেব না, তুমি পুরুষ এবং আমি স্ত্রীলোক, সব সময় মনে রেখো, মিসি একটি বাঘিনী, যখন ইচ্ছা তখনই তোমার মত লোককে চিবিয়ে খেতে পারে। এখন তুমি যাও আমি দেখছি তুমি কোন পথ ধরে যাও।

আর্থার ষ্ট্রীট-কারে বসার পর মিসি তাদেরই অন্য একটি সভায় যোগ দিল। সেখানেও একই ব্যবস্থা, কারো মুখ দেখার উপায় ছিল না। প্রত্যেকে পৃথক্ রুমে বসে নিজেদের মন্তব্য করছিল। এই ব্যবস্থা থাকার জন্য আণ্ডার-গ্রেজুয়েট ক্লাবের সংগে গোয়েন্দা যোগ দিতে পারে না। এপ্রভাব হবারও সম্ভাবনা ছিল না। [ক্রমশঃ

১০

সেই বোসেদের সুপারী বাগানের এক প্রান্তে ছোট খালটার ওপর ভেসে যাওয়া সাঁকোটা কে যেন ঠিক জায়গায় এনে রেখেছে।

বিপরীত দিক থেকে এসে দু'জনের দেখা ঐ এক গাছের সাঁকোটার ওপর—উভয় প্রান্তে। বেলা তখন দুপুর উত্তরে গেছে। কিন্তু তা এই ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে দেখে বোঝা যায় না। এখানে রোদ তেমন নেই। বেশ স্নিগ্ধ। মাঝে-মাঝে গাছগুলো নড়লে ঝিকমিকিয়ে ফালি ফালি রোদ এসে পড়ে তির্যক ভাবে। সোণালীর মুখের ওপর ও চুলের ওপর অমনি একখানি আলো দুলছে, ছায়াও এসে পড়ছে।

'তোমায় যদি ফেলে দেই তবে কেমন মজা হয় সোণালীদি? এই—এই দিলাম ফেলে—এই সাবধান।'

'এই দুষ্টু ছেলে, চারটা দোলায় না, দোলায় না অমন করে! ওরে আমি যে পড়ে যাবো ভাই!'

'পড়ে গেলে আমার কি? অমরেশ আর একটু ঘন দোলা দিয়ে বলে, 'আমার কি পড়ে গেলে? আমার গায় তো আর কাদা লাগবে না?'

'থাম ভাই থাম—আমি আগে পেরিয়ে আসি।'

অমরেশ তবু দোলা দেয়—সোণালীর ভীতি-বিহ্বল মুখখানা দেখে হাসে। সে কি যে-সে ছেলে!

'অমরেশ ঐ দেখ, এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যাচ্ছে—গুণতে পারিস ক'টা? বাইশটা না পঁচিশটা—ক'টা দেখ ত গুণে!'

'কই, কোন দিকে?'

'ওই তো ঠিক তোর মাথার ওপরে। বলতে বলতে সোণালী সাঁকোটার অপর প্রান্তে এসে হাসতে থাকে। 'হিঃ হিঃ হিঃ, কেমন জব্দ!'

'এঁ্যা এঁ্যা, মিথ্যে হাঁস দেখালে কেন?'

'না হলে তুই যে দুষ্টু ছেলে আমাকে ফেলে দিতিস খালের মধ্যে—অসময়ে কাদা মেখে ভূত সেজে উঠতাম। হয়ত হাত-পা ভাঙতো, তোর খুব ভাল লাগত, না রে?'

'উঁহুঁ, এখন কোথায় যাবে বলো?'

'যে দিকে দু'চোখ যায়।' সোণালীর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ একটা অপূর্ব পরিবর্তন আসে। চল্ অমরেশ, আমরা চলে যাই যে দিকে দু'চোখ যায়, তোর সাথে এক পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে।···আমার আর ভাল লাগে না ভাই—ওরা কাল আবার আমায় নিতে আসবে।' সোণালীর দু'চোখ আজ কেন জানি জলে ভরে ওঠে। এই স্নিগ্ধ মেদুর আধো আলো আধো ছায়ায় ঘন বাগানের নির্জনতায় তার মনে হয়, ওই যে অতটুকু অমরেশও যেন রাজপুত্র। সমস্ত বিপদ বিঘ্ন থেকে ওকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে চলে যেতে পারে এক অজানা স্বপ্নের কল্পলোকে।

অমরেশেরও মন নেতিয়ে পড়ে। ও যেন কবে কার কাছে শুনেছে, সোণালীর মূর্খ স্বামীটা ওকে মার-ধর করে। ওর রাগ হয়—মূর্খটাকে ওদের ঘরের রামদাটা এনে কেটে ফেল্‌তে ইচ্ছে হয় তার।

'তুমি যদি না যাও, আমাদের ঘরে লুকিয়ে থাকো, কেমন হয় তা হ'লে? ওরা খুঁজে হয়রাণ হয়ে ফিরে চলে যাবে।'

'দূর পাগলা, তা কি হয় রে?'

এ যে কেন অসম্ভব তা সোণালী বুঝতে পারলেও অমরেশ পারে না। সে ম্লান মুখে কামিনী ফুল গাছটার তলে বসে পড়ে। সোণালীও এসে তার পাশে বসে।

আবার স্বপ্নলোক ভেসে আসে।···

'তার চেয়ে চল্, তুই আর আমি ময়ুরপংখী নায়ে চড়ে রূপকথার দেশে যাই।'

'কোন্ পথে যেতে হয় ভাই তা আমি জানিনে!'

'আমিও তো জানিনে অমরেশ!'

'ব্যাঙোমা-ব্যাঙোমীর কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবো।'

'তারা কোথায় থাকে, কোন্ বনে, কোন্ নদীর ধারে, কে বলে দেবে আমাদের?'

'কেন মেজ মা—সে-ই তো রোজ গল্প বলে। আজ জেনে নেবো তার কাছ থেকে।'

কৈশোরের ফুল-বাগিচায় নিরালায় ওরা বসে আছে। ওরা নিরালায় স্বপ্ন দেখে—কত দুঃখ জানায় সোণালী! তার বুকের বোবা ব্যথাগুলি ফুটে ওঠে কথায় কথায়। অমরেশ হয়ত বোঝে, হয়ত সকল বোঝেও না! তবু ভাল লাগে পাশটিতে বসে দরদ দিয়ে শুনতে। ইচ্ছা করে মুছিয়ে দিতে ওর সোণালীদির চোখের জল!···আবার নতুন ছন্দে কথা বলে সোণালী।

'হাঁ্যা রে অমরেশ, তুই গজমতির হার দেখেছিস্?'

'না।'

'পাতালপুরীর রাজকন্যা দেখেছিস্?'

'না'

'বলতে পারিস সে রাজকন্যা দেখতে কেমন?'

'হয়ত এই তোমার মত হবে দুধে-আলতা রঙ।'

অন্য দিন হলে সোণালী হয়ত লজ্জা পেতো, রাঙাই হয়ে উঠত

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

ওর কথায়। আজ সে কল্পলোকে মগ্ন হয়ে গেছে। তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা তার কল-কল্লোলিনী জলধারা দেখেছে।

'রাজকন্যার ক'মহলা বাড়ী?'

'সাত মহলা বাড়ী, চার দিকে তার ফুলের বাগান। হীরা-পান্নার সব ফুল দিয়ে ভুর-ভুর ক'রে গন্ধ বের হচ্ছে।'

'কোন্ পালংকে শোয় সে জানিস, বলতে পারিস্?'

'প্রবাল-পালংকে। শিয়রে তার মণি-দীপ জ্বলছে। আমি যেন দেখছি ঠিক তুমি শুয়ে রয়েছ।'

'গজমতির হার পেলে তুই কি করিস অমরেশ?'

'ঘুমন্ত রাজকন্যার গলায় পরিয়ে দি।'

সোণালী চোখ বুঁজে যেন স্পর্শ-সুখ অনুভব করে।

এভাবে বিভোর হয়ে তাদের যে কত সময় কাটত বলা যায় না। হঠাৎ একটা মেঘ ভেসে আসে দক্ষিণা বাতাসে। শুকনা লতাপাতা ঝর-ঝর করে ওঠে। সুপারি গাছগুলো মাথা দোলাতে থাকে যেন অনেকগুলো চামর চুলাচ্ছে কেউ। একটা রাধাঝুমকার লতা শিউলী গাছটার আশ্রয়চ্যুত হয়। অমরেশ ছুটে যায়। এক গুচ্ছ ফুল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। গাছটা একেবারে শীতলা-তলায়, তাই সে যাওয়ার সময় মা শীতলাকে মনে-মনে প্রণাম করে নেয়। সোণালীও উঠে আসে। ফুলের গুচ্ছটার প্রতি তারও নজর পড়েছে। সেও ছোটে। কে আগে আনতে পারে? সোণালী না অমরেশ? অমরেশেরই জয় হয়। প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে সোণালী হাঁপাতে থাকে। ধরি-ধরি করেও সে ধরতে পারল না! অমরেশই ছিঁড়ে নিল। ওর অন্য দিন হলে হয়ত দুঃখ হতো, আজ আর তা হয় না। নিলেই বা ও। সে তো চলেই যাচ্ছে। আর কত দিন পরে দেখা হবে কে জানে? আবার সোণালীর চোখে জল আসে। কার জন্য কেন সে কাঁদে সঠিক বুঝতে পারে না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

অমরেশ বলে, 'তুমি এই সামান্য ফুলের জন্য কাঁদছ? ছিঃ ছিঃ! এই নেও, এই নেও ফুল ও আমি কত পাবো, কত তুলব, কত বিলোব—তোমাকে তো আর দিতে পারব না! এই নেও, কেঁদ না সোণালীদি।' তার খোঁপায় রাধাঝুমকার গুচ্ছ পরিয়ে দেয় অমরেশ।

হাওয়া থেমে যায়—মেঘ অদৃশ্য হয়, ফালি-ফালি রোদ হাসতে থাকে—ওরাও হাসে। কতক্ষণ আর দুঃখ বাসা বাঁধতে পারে ওদের বুকে এই বয়সে!

খালের ওপারে অমরেশদের বাগানে একটা আম গাছ মুকুলে মুকুলে ভরে গেছে। মৌমাছিরা ঘুরে-ঘুরে গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদিকে নজর পড়তেই অমরেশ বলে, 'সোণালীদি, পাকা তেঁতুল দিয়ে আমের মুকুল মেখে খাবে? ঐ দেখো, কেমন দেখাচ্ছে থোকা-থোকা মুকুলগুলো।'

তেঁতুলের কথা উঠতেই দু'জনের জিভে জল আসে। কি মিষ্টি পাকা তেঁতুল! মুকুল দিয়ে মাখলে গন্ধে আমেজ করবে।

'মুকুল না হয় পাড়া গেল কিন্তু তেঁতুল পাড়বে কে? যে উঁচু গাছ, পড়লে কি আর রক্ষে আছে!'

'হুঁ, প'ড়ব না আরো কিছু। সেদিন কত বড় বটগাছে উঠে টিয়ার-ছা পেড়ে আনলাম। সেই উই কুমুদদের গাছ থেকে।'

'তবে যা, পেড়ে নিয়ে আয় তেঁতুল। মুকুল পাড়তে আমিই পারব।'

'তুমি পারবে? ভালই—আমি যাই তেঁতুল আনতে।'

'আমাদের বাড়ী যাস চুপ করে রান্না-ঘরের পিছনে, বুঝলি?'

সোণালী লাফিয়ে লাফিয়ে একটা আম গাছের ডাল টেনে ধরে—দু'-তিন থোকা মুকুল পাড়ে—পেড়ে বাড়ীর দিকে চলে যায় ডালটা ছেড়ে দিয়ে। ডালটা সড়াৎ করে ওপরের দিকে উঠে দু'-চার বার দোলা খেয়ে স্থির হয়।

নুণ-লংকা দিয়ে সোণালী বেশ ক'রে ওগুলো মাখতে থাকে রগড়ে রগড়ে। অমরেশও এসেছে কথা মত। যতক্ষণ সোণালীর মাখা শেষ না হয় ততক্ষণ ব'সে ও এক রগ তেঁতুল চাটে। কি মিষ্টি! চাটতে চাটতে জিভে কেবলই জল আসে।

'এমন তেঁতুল কোনও দিন খাইনি সোণালীদি।'

মাখা শেষ হ'লে নরম পাতলা জিভটার ডগায় ফেলে সোণালী একটু চাখে। 'ঠিক হয়েছে, এই নে অমরেশ।'

'তুমি এতখানি নেবে আর আমি এতটুকু? আর একটু দে ভাই, আর একটু—'

'নে—বেশী খেলে অসুখ করবে।'

'তোমার বুঝি করবে না—খুব চালাক মেয়ে!'

'আমার করলে তো ভালই!' একটু গাঢ় কণ্ঠে সোণালী জবাব দেয়, 'ওরা নিতে এসে ফিরে যাবে।'

'তা হ'লে আর একটু নেবে আমার ভাগ থেকে? নেও না, নেও!' অমরেশ বলে, 'একটু জ্বর হলে আর হয় কি! দিব্যি কাঁথা গায় দিয়ে হুঁ-হুঁ করবে—ওরা ফিরে যাবে—যাক চলে।'

'তুই ভেবেছিস, ওরা ফিরে যাওয়ার মানুষ! একটু জ্বর দেখলেই আমায় ফেলে যাবে? কক্ষনো না। ওরা যমের মত ব'সে থাকবে, না নিয়ে যাবে না।'

'তা হলে কি করবে?'

'সব চেয়ে ভাল হয় আমার জ্বর যদি খুব বেশী হয়—মরে যাই আমি। তবু মার কোলে শুয়ে তোদের দেখতে দেখতে মরব—কেমন অমরেশ, তাই ভাল না?' আবার সোণালীর চোখ ভিজে ওঠে।

অমরেশ তাড়াতাড়ি বলে, 'না না। তা হলে কাজ কি অতখানি তেঁতুল নিয়ে—বেশী বেশী টক খেয়ে।'

পরের দিন সোণালীর স্বামী আসে, ওকে নিয়ে যাবে।

লোকটা দেখতে নিতান্ত কদাকার।

অমরেশ কাছে ঘেঁষে না ওদের। দু'বার উঠানের ওপর দিয়ে রান্না-ঘরের কোণে এসে গোপনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুঁজে গেছে সোণালীকে। আজ সোণালীর বের হওয়া নিষেধ। মার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—শাসন রূঢ়।

হঠাৎ এক ফাঁকে অমরেশকে দেখতে পেয়ে রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সোণালী। হাসতে হাসতে ওকে নিয়ে একটা ঝাপড়া-ঝাপড়া পাতা-বাহার কামিনী-কুঞ্জের মধ্যে যায়। এখানে প্রায় প্রত্যহ দিনের বেলা বসে চব্বিশ গুটি বাঘ-চাল খেলে ওরা দু'জনে। স্থানটা বেশ পরিষ্কার ও খুবই নির্জন।

হাসতে হাসতে অমরেশের গায়ের ওপর সোণালী গড়িয়ে পড়ে, অতর্কিতে একটা চুমো খায় ওর গালে।

খাড়া ঝিলকির মত অমরেশ চমকে ওঠে। সে রাগ হবে না ছুটে পালাবে দিশা করতে পারে না। সে গন-গন করতে থাকে।

'দেখনা ছেলের রকম! দিদিরা বুঝি তোকে চুমো খায় না!'

'দিদিরা তোমার মত অসভ্য না।'

'আর গোঁজ হয়ে থেকো না—তোমার সংগে আর ঠাট্টা করব না।'

'তুমি ও-রকম করলে আর কক্ষনো আসব না তোমার কাছে।'

'দোষ হয়েছে, মাপ চাই—আর তোর সংগে ফাজলামি করব না —এখন হলো তো? অমরেশ, একটা রাক্ষস দেখবি? মারতে পারবি? একেবারে জ্যান্ত রাক্ষস!'

'কোথায় রাক্ষস?' অমরেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'কোথায় সোনালী'দি, রাক্ষস কই?'

'ঐ দেখ!' বলে সোনালী অমরেশের হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসে—একেবারে নিজেদের উঠানে। একটু আবডালে থেকে বলে, 'ঐ দেখ, আমাদের বারান্দায় খাটের ওপর বসে।'

'কই?'

'ঐ তো।' সোনালী নির্বিকার চিত্তে তার স্বামীটাকে দেখিয়ে দেয়।

অমরেশ বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে।

রাক্ষসই বটে!

১১

ইমাম ও নিতাই এসেছে আবার। ওদের সাথে দু'জন মানুষ। এক জন স্ত্রীলোক, অপরটি পুরুষ। স্ত্রীলোকটি হিন্দু—পুরুষটি মুসলমান। স্ত্রীলোকটি নিখুঁত সুন্দরী না হলেও ওর রূপে, গড়নে, চলনে এমন একটা কিছু নিহিত আছে যা দেখলে পুরুষের চোখ টাটায়। ও জাতে ধোপা, নাম সুখী। পরনে ওর একখানা দামী ছেঁড়া শাড়ী। এবার যখন এ-বাড়ীতে এসেছিল তখন ওর কাপড়ের অবস্থা দেখে কমলকামিনীই ওকে দিয়েছিলেন।···মুসলমান যেটি এসেছে তার দেহ ক্ষীণ—চোখে একটা নিরাশার দুর্বল ছায়া।

এদের উভয়ের নালিশ ঘোষালদের বিরুদ্ধে।

দেশের মধ্যে বিপ্রপদই এখন বুদ্ধিতে মানে-সম্মানে টাকা-পয়সায়। তার কাছে এলেই বোধ হয় সকল পুরান জটিল ব্যাধি, দুঃসহ ক্ষত নিরাময় হবে—সকল জ্বালা দূর হবে।

বিপ্রপদ সকলকে বসতে বলেন। স্ত্রীলোকটি ব্যতীত সকলে এসে উঠে পাশাপাশি বসে। শুধু সুখী একটু গুণ্ঠন টেনে দূরে সরে গিয়ে ভিন্নমুখো হয়ে একটু মুচকে মুচকে হাসে এবং আংগুলে আঁচলটা জড়াতে থাকে।

বিপ্রপদ জিজ্ঞাসা করেন, 'ওর নাম? বাড়ী কোথায়?'

ইমাম উত্তর দেয়, 'বাড়ী এই শিউড়ী, আপনার ভিডার খালের উত্তর। নাম রহিম সেখ—রমজানের ছাওয়াল—সেই ফকির রমজান। নাম শোনেন নাই তার?'

'শুনেছি। কি জন্য এসেছে ও? রমজান তো এখন আর বেঁচে নেই—সে-বার না কি মাথায় বাজ পড়ে মারা গেছে।'

'হয় বাবু। ওর মাথায়ও বাজ পড়ছে, তয় ওর জানডা শক্ত দেইখ্যা ও মরে নাই।'

'মিতা, এহন কও বাবুরে বুঝাইয়া।'

নিতাই বলে, 'ওর যেন বাবু স্মরণ-শক্তিটাই নষ্ট হয়ে গেছে। যদি একটা সুবিচার না হয় তবে হয়ত মানুষটার মাথাই খারাপ হয়ে যাবে। দুঃখ হয় ওর মুখের দিকে চাইলে!···ওর দু'টো ছেলে একটু বড় হয়ে উঠেছিল। চাষ-আবাদ ক'রত ঘোষালদের জমি। কুষাণ খেটে বাপ-মা ও ছোট ছোট ভাই-বোনকে খাওয়াত। ওরা ঐ ঘোষালদেরই ঘর ভিটি প্রজা। ডাকা মাত্র হাজির হওয়া চাই। প্রতি বছরের মত এবারও ওরা গেল ঘোষালদের ধান আনতে বিলে। একটা গেল বাঘের পেটে—আর একটা মরল সাপের ঘায়। সাক্ষাৎ যম যেন ওৎ পেতে ছিল দক্ষিণের বিলে। ঘোষালদের কিছু বেশী খরচ হল বটে, কিন্তু এক কণা ফসলও নষ্ট হয়নি এমন ভাবে খবরদারী করে রেখে ওরা মরেছিল।

'তুমি এ-সব এমন করে জানলে কি ক'রে নিতাই?'

'রহিমের বৌটা ঘোষালদের শেষ কালের ঘা-টা আর সামলাতে পারেনি, মারা গেছে এই অল্প ক'দিন হয়। সে-ই মরণ কালে ইমামকে খবর দিয়ে নিয়ে বলে গেছে। আমিও গিয়েছিলাম ওর সাথে।'

'তার পর?'

'কাল যখন আসে তখন কেউ তাকে রুখতে পারে না। ছেলে দু'টো মরল বটে, কিন্তু লোকে এখানে-সেখানে বলাবলি করত, এমন নেমকের গুণ মেনে চলে খুব কম লোকেই। ওরা না গেলে এ দেশে এমন কোনো লোক ছিল না যে ঐ বিলে যেতো ধান আনতে! বরাবর ওরা চাষ করে বিনা খরচে ধান ঘরে এনে দেয় ঘোষালদের, তাই ওরা পুরু ভরে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত মনে পরের সর্বনাশ করে।'···

'ইমাম, তামাক খাও।'

'রহিম নিতান্তই গরীব। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে পাঁচ-ছ'টা লোক একটার গায় আর একটা গাদা দিয়ে শোয়—শিথানের বালিশ নেই, না আছে একখানা কাঁথা—ক'টা মেটে বাসন আর কলসী মাত্র সম্বল—কলসীটা আবার ফুটা। রোজ চাল কিনে এমন পয়সা বাঁচে না যে একটা সামান্য মেটে কলসী জোটে। আমরাও গরীব বটে, নেবু আনতে পান্তা ফুরায়, কিন্তু এরা যে কি তা ধারণা করা যায় না! একটা দিন-সময়তে একটা বেলা না খাটলে হাঁড়ী চড়ে না। যদি খাটিয়ে ভাইদের কখনও শরীরের কল একটুও বেকল হয় তা হলেও অমনি উপোষ। সাত সরিকের বাড়ী—ভাগে একটা নারকেল গাছও পায় না, বছরে চার গণ্ডা পয়সা নেই আয়।'

একটু জিরিয়ে নিয়ে নিতাই আবার বলতে সুরু করে, 'এক দিন এদের পূর্ব-পুরুষেরা ভালই ছিল—বাড়ীতে সরিক-সরাক্ত ছিল না বেশী। জমিতে ধান, গোহালে অন্ততঃ চাষের গরু, গাছে প্রচুর ফল ছিল। দু' বিঘে ভদ্রাসন ভাগ হতে হ'তে একটা তামার টাটও রাখার স্থান নেই এখন। রাখলে অমনি ঝগড়া, অশ্লীল গালাগালি। তবু এরা ভদ্রাসন আঁকড়ে কুকুর-কুণ্ডলী দিয়ে কি মোহে যে পড়ে থাকে তা ওরাই জানে!···ফাগুন, চোত, বোশেখ, জোষ্ঠি ওরা দেশে করে কুষাণের কাজ—কোনও প্রকারে আধ-পেটা খেয়ে চালায়। তার পর চাষ-আবাদ করতে যায় কোনও বিল্-বাদাড়ে, জোঁক্-পোকের মুখে। চাষের মরসুমে মনিবেরা চারটি পেট-ভরা খেতে দেবে, এই তো প্রলোভন। আর ভাবে: যখন তারা চারটি ধান নিয়ে আরো

মাংস—ওরা আনন্দে হাসবে। দু'-এক দিন দু'-এক সের চা'ল নিয়ে হাটেও যেতে বলবে কিছু বেসাতি আনতে। কত দিন ওরা শুকনা লংকা খায়নি, একটু পেঁয়াজ-রসুনের মুখ দেখেনি!'

নিতাই কি ভেবে কি বলে একমাত্র সে-ই জানে কিন্তু বিপ্রপদ যেন শুনতে পান, ওর কণ্ঠে সমস্ত বাংলার ভূমিহীন কৃষাণ-মজুরের মর্মব্যথা ধ্বনিত হয়ে উঠছে। তিনি চুপ করে শুনতে থাকেন।

'রহিমের ছেলে দু'টো যখন আর দেশে ফিরল না, তখন তাদের কৃষাণ-খাটা ভাগের ধান ঘোষালদের গোলায়। রহিম অবশ্যি তা জানে না। ও প্রথম কিছু দিন শোকে-দুঃখে কাটায়। পরে ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীকে প্রবোধ দেয়: ভয় কি তোদের, বাবুরা রয়েছেন। যাদের জন্ত ছেলে দু'টো জান কবুল করল তাদের বুড়ো বাপ-মা-নাবালক ভাই-বোন কি না খেয়ে মরবে? ধান দেশে এলে দেখিস বাবুরা তোদের ভাগের ধান বাড়ী বয়ে দিয়ে যাবেন। আমরা নেমকহারাম হতে পারি, আমরা ছোট লোক। বাবুরা কক্ষনো তা হতে পারেন না। রহিম ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ভিক্ষা করে ধানের আশায় কাটায় কিছু দিন। এতগুলো পুষ্যির ভিক্ষায় পেট ভরে না। রোজ রোজ কেউ দিতেও চায় না। বলে: এখন টন্‌টানিয়ে বেড়াও, খাটতে পারো না? ছেলে মরেছে বলে তো খিদে মরেনি?…'

এমন সময় রহিম একটা চাপা শ্বাস ত্যাগ করে। বিপ্রপদর কানে তা যায়। তিনি মুখ তুলে ওর মুখের দিকে চাইতেও ভয় পান।

'রহিমের মনটা বাবু ঘোষালদের বাড়ী যাবো-যাবো করে। আবার লজ্জাও হয়। হয়ত ধান-পান আসেনি। তাই ওরা খোঁজ-খবর নিচ্ছে না এদের। যদি ও গিয়ে ওঠে লজ্জা পাবে বাবুরা। কাজ কি তাঁদের লজ্জা দিয়ে! ওর না হয় আরো দু'দিন কষ্ট হবে। ধান এলো বলে!'

নিতাই এবার গলার স্বর একটু পরিবর্তন করে একটু বিষাদের হাসি হেসে বলতে থাকে, 'এর মধ্যেও বেকুফ আবার স্বপ্ন দেখে। ধান ঘরে এলে ষাট যোয়ান ছেলে দু'টো খেত তো। তাদের খোরাকীটা এখন বেঁচে যাবে। আর ওদেরটা তো আছেই। কিছু দিন, এই হপ্তাখানেক ও একটু ফুরসুৎ পেলে—এর মধ্যে কয়েক কাঠি ধান ভেনে চাল তৈরী করে হাটে নেবে। চাল বেচে ধান কিনবে, বাড়তি চালটা খাবে। এমনি করে কায়ক্লেশে ওরা টিকে থাকতে পারবে—হয়ত কিছু ধানের জমা বাড়তেও পারে। এর কম তো ওদের গাঁয়ে কত লোক বেঁচে আছে। ওদের চেয়ে সুখেও আছে। কেউ উঠানে এসে দাঁড়ালে পান-তামাক দিয়ে আপ্যায়িতও করতে পারে। ছেলেমেয়েরা শীতে হিঃ-হিঃ করে কাঁপে না। ও সব জানে, সব বন্দেজ করতে পারে—কিন্তু এত দিন পারেনি শুধু জমার অভাবে। খেয়ে-দেয়ে ও কোন দিন আট কাঠি ধানের জমা কল্পনাও করতে পারেনি। আট কাঠি ধানের কি বা দাম! মাত্র চার টাকা। কত গেরস্থের তো হাঁস-মুরগীর খোরাকীও ওর চেয়ে বেশী। যোয়ান জল-জ্যান্ত ছেলে দু'টো মরেছে, মুস্কিল বটে!' কিন্তু যত মুস্কিল তত আসান। এ খোদারই মেহেরবাণী। ও বুড়ো মানুষ, একা খেটে সংসার রাখবে—তাই ওর জন্ত খোদাই না কি এ পথ করে রেখেছেন।'

নিতাই থামতেই বিপ্রপদ বাধা দেন, 'থেমো না—থেমো না, বলে যাও। তার পর—?'

'তার পর বাবু, কিছু দিন যায় ঘোষালেরা খোঁজ-খবর নেয় না। এখন উপোষে পেট-পিঠ কোঁড়া যায়। ছেলেমেয়েগুলোর বুঝি হাঁপাতেও কষ্ট হয়। ওরা জিজ্ঞাসা করে: আর কত দিন দেরী বাপজান ধান আসতে? ছোট মেয়েটা বলে: নুণ দিয়ে একটু ফ্যান খেতাম! কত দিন পেট ভরে খাইনি ফ্যান। রহিম না কি তখন আশ্বাস দেয়: সবুর কর—সবুর কর। ফ্যান খাবি কেন, দিব্যি মোটা চালের ভাত খাবি। আর দু'টো দিন! কিন্তু মনটা ওর হতাশায় ভেঙে পড়ে। বাবুরা কি আর ফাঁকি দেবেন? ও আবার নিজেকেই নিজে আশ্বস্ত করে। না, না, তা কিছুতেই সম্ভব না। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা! ও আর ভাবতে পারে না। সকাল বেলাই ঘরে ঢুকে শুয়ে থাকে। সেদিন ভিক্ষায়ও বের হয় না।'

শুনতে শুনতে বিপ্রপদ যেন অধীর হয়ে পড়েন। নিতাই একটু থামতেই তিনি আবার বলে ওঠেন, থামলে কেন নিতাই, বলে যাও।'

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে নিতাই বলে যায়, 'তার পর সব ক্ষেত্রে যা হয় এখানেও তাই হলো! না খেয়ে-খেয়ে ছেলে-মেয়ে দু'টো এমন হলো যে, মা-বাপের একটু চোখের আড়ালে যেতে পারলেই ওরা গিয়ে ঘুরত এ-ঘর-ও-ঘরের আনাচে-কানাচে। মনে আশা, কেউ সাধে না কি একটু ফ্যান নিয়ে, কেউ ডাকে না কি দু'টো ভাত নিয়ে। ওরা এক দিন বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওদের চাচির ঘরের নাদুস-নুদুস ছেলে দু'টোর খাওয়া দেখছিল। তাদের পাতের কাছে কত ভাত পড়ে! ওদের জিভ ভিজে ওঠে। চাচির চেহারা কেমন তেল-কুচকুচে—আর ওদের মার পাঁজরার হাড় ক'খানা গোণা যায়! ভিক্ষায় যা পাওয়া যায়, ওদের দিয়ে রহিমকে দিয়ে তবে থাকলে রহিমের বৌ খেত, নইলে খানিকটা পানি খেয়ে শুয়ে থাকত।… বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওদের চোখ চারটে জ্বলছে। ওদের চাচি তা দেখতে পায়। ছুটে আসে ঝ্যাটা নিয়ে—ওদের কপালে-মুখে-পিঠে ক' ঘা বসিয়ে দেয়। সোরগোলে রহিমের বৌ বেরিয়ে আসে, খেঁকিয়ে-খেঁকিয়ে ঝগড়া করে খানিক—তাও পারে না, ওতেও শক্তি চাই—কলিজায় বল থাকা চাই—পুরো-দস্তুর খানা-পিনা চাই।…

ইমাম মন্তব্য করে, 'খোদা!'

নিতাই থামে না, একটা গামছা দিয়ে মুখ মুছে বলতে থাকে, 'এখন ওরা চারটি প্রাণী বসে থাকে দাওয়ায়—চারটা পেত্নীর কংকালের মত। কখন হয়ত ঘোষালদের বাড়ীর প্যাদা আসবে, কাউকে না দেখলে হয়ত ফিরে যাবে। বাবুরা কি বাড়ী বয়ে ধান দিয়ে যাবে না কি? তাতে তাদের মান থাকে, না সম্মান বাঁচে? রহিমকে খবর দিয়ে নেবে। ওদের তো ধান পাওনা কম না! প্রায় বিশ কাঠি। বর্ষাকালে যা ধার করে এনে খেয়েছে সুদসমেত তা কেটে-কুটে দিয়েও পনর-ষোল কাঠি আনতে পারবে। না হয় আর দু'কাঠি কম হবে। অত চুল-চেরা হিসেব কি রহিম মনিবদের সংগে করতে যাবে? দূর দূর! লোকে বলবে কি? 'নিতান্ত ছোট লোক, তাই নজর গেছে ছোট হয়ে। রহিম বরঞ্চ দু'-দশ সের বেশীও ছেড়ে দিয়ে আসবে। ফের বর্ষাকাল আসবে, এই রোদ আর হপ্তার পর হপ্তা দেখা যাবে না। ওই আকাশটার গোঙানি আর চোখের জল থামবে না। চার দিকে করবে জল থৈ-থৈ। তখন যদি কিছু ধার

কর্জ্জ আনতে হয় ? এক দিন অসন্তুষ্ট হলে আর এক দিন দেবেন কেন ?···বাবু, বলব কি, তখনও এই মুখ্যুটা ঘোষালদের মন রেখে চলতে চায় !'

বিপ্রপদ বলেন, 'নিতাই, এ তো অস্বাভাবিক না। ওর মত অবস্থায় যে না পড়বে সে বুঝবে কি করে ওর দুঃখ। ওর কি তখন জ্ঞান-বিচার থাকতে পারে ?'

'তা ঠিক বাবু। যাক, তার পর শুনুন—ছেলে দু'টো ওর কি ভালই ছিল, মরে গিয়েও বাপ-মা ছোট ভাই-বোনদের জন্য রোজগার করে রেখে গেল। সত্যি সত্যিই এক দিন ঘোষালদের বাড়ী থেকে পেয়াদা এসে উঠল ওদের দাওয়ায়। ওরা ওদের কি করে যে সন্তুষ্ট করবে তা ভেবেই পায় না। একটু তামাক নেই, পান নেই ওদের। যে জা ঝাঁটা দিয়ে মেরেছিল ছেলে-মেয়ে দু'টোকে, সেই জা'র কাছেই গিয়ে হাত পাতল রহিমের বৌ এক ছিলিম তামাক আর গোটা দুই বড় পানের জন্য। আজ আর তার লজ্জা করে না। কেনই বা করবে ? আর দু'-এক দিনের মধ্যেই তো তাদের ধান আসছে। তখন তারা ইচ্ছামত হলুদ মরিচ পান তামাক কিনে আনবে, দরকার হলে দেবে ধার। ওদের এ অবস্থা খোদার দোয়ায় আর কদিন !'

'রহিম প্যাদার সংগে সংগেই যায়। কষ্ট হয় ওর ঠ্যাং দু'টো নিয়ে চলতে ওই যোয়ান তাগড়া মর্দটার সাথে। রহিমের সাথেই না কি যাবে ছেলে-মেয়ে দু'টো। মা শুধু জল দিয়ে মুখ মুছিয়ে আংগুল দিয়ে রুক্ষ চুল-গুলো একটু আঁচড়ে দিয়েছে। ওরা ঘোষালদের বৈঠকখানায় গিয়ে ওঠে। তখন অনেক লোক-জন—নানাবিধ কথাবার্ত্তা, নানাবিধ লেন-দেন হ'চ্ছে। ওদের দেখেই বড় ঘোষাল উঠে আসে। বলে : তোমার ছেলে দু'টো ছিল বড্ড নেমক-হারামি। কিন্তু হিসেব ছিল না মোটেই। মরে গিয়েও আমাদের যা সর্বনাশ ক'রে গেছে তা তোমাদের কাছে বলব কি। তোমারও হালে পানি রেখে যায়নি। বর্ষা কালে যা দাদন নিয়ে খেয়েছে, এখন আর এক গোটাও হিসেবে পায় না। তবু দেখ, আমাদের অধর্ম্মের সংসার না, তাই তোমাকে পেয়াদা পাঠিয়ে ডেকে এনে এক কাঠি ধান দিচ্ছি। তুমি ছেলে-পেলে নিয়ে খেয়ে দোয়া করো। ঐ ধান কাঠি বাপু উঠানে মেপে রেখেছি, নিয়ে যাও—ইচ্ছা হলে হিসেবটাও দেখে যেতে পারো।'

'ছোট ঘোষালটি মাঝখান থেকে বলে উঠল : দাদার বড় দয়ার শরীর। এজমালী জিনিষ দিয়ে দান-ধ্যান করতে উনি চিরদিনই পটু। শুনছ রহিম : ওই ধান থেকে আমার ভাগের বার সের ধান তুলে রেখে বাকীটা তুমি নিয়ে যেও। আমার ভাগেরটা আমি দিতে রাজী না।'

'বড় ঘোষাল তখন বলে : ছোট, তুই দিন-দিন বড্ড চামার হয়ে যাচ্ছিস, চুপ কর।···'

'রহিম তখন ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে জবাব দেয় : ও আমি কিছু নেব না, এই আমি চললাম। ও টলতে টলতে নেমে আসে।'

সব শুনে বিপ্রপদ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন। অবশেষে বলেন : 'নিতাই, এক কাঠি চাল আর আট কাঠি ধান আমার গোলা থেকে মেপে ওর বাড়ী এক্ষুনি পৌঁছে দিয়ে এসো।'

এত কাল পরে রহিমের চোখে জল দেখা যায়।

'বাবু, এডা তো এ্যাট্টা ব্যবস্থা হইল, বিচার ?'

'যে দিন বিধাতা আমাকে সে ক্ষমতা দেবেন সে দিন আমি চুপ করে থাকব না।'

সে দিন সুধীর কাহিনী আর শোনা হয় না। ওকে আর এক দিন আসতে বলা হয়।

[ক্রমশঃ

"এ সম্বন্ধে আমার দু'টি কথা বলবার আছে। আমার মতে ছোট-গল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই, তার পরে ছোট হওয়া চাই,—এ ছাড়া আর কিছুই হওয়া চাইনে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে "গল্প" কাকে বলে—তার উত্তর "লোকে যা শুনতে ভালবাসে।" আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন "ছোট" কাকে বলে—তার উত্তর "যা বড় নয়"।

এর উত্তরে পাঠক আপত্তি করতে পারেন যে definitonটি তেমন পরিষ্কার হ'ল না। এস্থলে আমি ছোট গল্পের তত্ত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা করছি। এবং আশা করি, সকলে মনে রাখবেন যে তত্ত্বকথা এর চাইতে আর পরিষ্কার হয় না। এর জন্য দুঃখ করবারও কোনও কারণ নেই, কেন না, সাহিত্যের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্য রচনা করা যায় না। আগে আসে বস্তু, তার পরে তার তত্ত্ব। শেষটি না থাকলেও চলে, কিন্তু প্রথমটি না থাকলে সাহিত্য-জগৎ শূন্য হয়ে যায়। এ বিপদ যে সুমুখে নেই, তাও ভরসা করে বলা চলে না। কেন না, মাসিকপত্রে লেখবার লোক অনেক থাকলেও, তাঁদের লেখবার বিষয় অনেক নেই,—আর লেখবার বিষয় অনেক থাকলেও, তা লেখবার অনেক লোক নেই। ফলে কথা—সাহিত্যের প্রবৃদ্ধি হয় যোগে, আর তার শ্রীবৃদ্ধি হয় গুণে।"

সবুজপত্র, ১৩২৩। বীরবল।

শেষশিক্ষা

(রবীন্দ্রনাথের "শেষশিক্ষা" নামক কবিতার ভাব অবলম্বনে লিখিত)

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

১ম দৃশ্য

(নির্জন সমতল ভূমি। গুরু চিন্তিত মনে পায়চারি করিতেছেন। অদূরে দু'-একটি তাঁবু দেখা যাইতেছে)

গুরু। কালের স্রোত মানুষের কীর্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে বিস্মৃতির কোন্ অতল তলে যে নিমজ্জিত করে, কে বলতে পারে? যৌবনের প্রারম্ভে ভারত-মুক্তির যে চিত্র আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়েছিল, যে আশা এক দিন সমগ্র ভারতকে গ্রাস করেছিল, যে চিন্তা আমাকে এত দিন নিমগ্ন করে রেখেছিল—সে আজ শতধা, সে আজ সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয়-সঙ্কুল, সে আজ সঙ্কটমগ্ন। আমার ভারত-মুক্তির মন্ত্র আজ ব্যর্থ!

(ভক্তদলের প্রবেশ)

রতন। গুরুদেব, আপনি এত চিন্তিত কেন?

গুরু। জান রতন, এক দিন আমি মনে করেছিলাম যে নিজ শক্তিতে এক শান্তিরাজ্য স্থাপিত করব। সেখানে হিংসার লেশ মাত্র থাকবে না, সকলেই সকলকে অন্তরে অন্তরে ভাই বলে গ্রহণ করবে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সকলের দিকে সকলে সমান দৃষ্টি রাখবে। সেইরূপ এক অপূর্ব স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করেছিলাম। কিছু অগ্রসরও হয়েছিলাম। কিন্তু মধ্যপথে তা' ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এখন আমার জীবন ব্যর্থ। এ কী দারুণ দ্বিধা!

রতন। আপনার জীবন ব্যর্থ হল কি করে? আপনি তো অক্ষম নন? আপনাকে যাঁরা জানেন তাঁরা আপনাকে অক্ষম বলতে পারবেন না।

২য়। আমরা তো দেখেছি আপনি দুই হাতে সমান ভাবে তীর ছোঁড়েন। আপনার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। আপনার তীর দেড় সহস্র হাত পার হয়ে যেত। এ সব তো আমরা দেখেছি।

৩য়। আপনার শিষ্যেরা যখন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠতেন না, তখন আপনি একাই যুদ্ধ করে শত্রুদের হটিয়ে দিতেন।

৪র্থ। আপনার যুদ্ধকৌশল অপূর্ব। আমরা আপনার মতো বীর আর দেখিনি।

গুরু। (বিরক্ত হইয়া) আঃ! সম্মুখ-প্রশংসা হলেও তোমরা যা বলছ তা সত্য। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি আজ দুর্বল। আমি যেন আমার জীবনে কিছুই করতে পারিনি।

(জনৈক পাঠানের প্রবেশ)

গুরু। শেখজি সেলাম।

পাঠান। দাম দাও।

গুরু। অশ্বের মূল্য তো?

পাঠান। হাঁ হাঁ, ঘোড়ার দাম। ভুলে গেছ বুঝি? তুমি যে ঘোড়া কিনেছ তার দাম দিতে হবে না?

গুরু। মূল্য দেব না তো কী ভাই। অন্য দিন নিয়ে যেও।

পাঠান। আজই চাই।

গুরু। আজ ফিরে যাও। মূল্য কাল পাবে।

পাঠান। আমি কাল দেশে চলে যাব। আজ দাম না পেলে আমার দেশে যাওয়া হবে না।

গুরু। এক দিন পরে দেশে গেলে তোমার ক্ষতি হবে?

পাঠান। আমাকে কাল দেশে যেতেই হবে।

গুরু। দেশে তোমার কোন বিপদ উপস্থিত?

পাঠান। হাঁ, সেখানে আমার ছেলের অসুখ। সেখানে আমাকে যেতেই হবে।

গুরু। দেশে যাবার পূর্বে তোমার প্রাপ্য নিয়ে যেও।

পাঠান। কাল দাম নিলে আমার দেশে যেতে দেরী হয়ে যাবে। দেরী হয়ে গেলে আমার ছেলেকে আর দেখতে পাব না। তোমার দাম দেবার ইচ্ছা থাকে, আজই দাও।

গুরু। আজ আমি কপর্দকহীন। আমি আজই অর্থ-সংগ্রহ করে কাল তোমার মূল্য দেব। আজ ফিরে যাও।

পাঠান। তোমার দাম দেবার ইচ্ছা নেই। তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে মনে করেছ?

ভক্তদল। (ক্রুদ্ধ স্বরে) ফাঁকি! আস্পর্দ্ধা তো কম নয়!

গুরু। ফাঁকি! আমি তো আজ পর্যন্ত কাউকে ফাঁকি দিইনি।

পাঠান। ঘোড়া কিনেছ, দাম দেবে না?

গুরু। মূল্য তোমার প্রাপ্য তা' তো অস্বীকার করিনি আমি।

পাঠান। টাকা নেই, তবে ঘোড়া কিনেছ কেন?

রতন। তুমি ঘোড়ার দাম পাবে, তা' এত রাগের কথা কেন?

পাঠান। দাম দিতে পারে না, আবার জোর দেখান!

ভক্তদল। সাবধান!

২য়। পাঠান, তুমি মাত্রা রেখে কথা বলবে। তুমি ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। ফের যদি এরূপ ভাবে কথা বল, তা হলে তোমার পরিণাম ভাল হবে না।

ভক্তদল। পরিণাম ভাল হবে না।

পাঠান। আমি যদি আগে জানতাম তুমি ঘোড়া কিনে ঘোড়ার দাম দেবে না, তা হলে আমি তোমাকে ঘোড়া দিতাম না।

ভক্তদল। খবরদার।

গুরু। সংযত হও, পাঠান।

পাঠান। বটে! তাই না কি? ভয় দেখাচ্ছ যে।

ভক্তদল। সহ্য হয় না।

পাঠান। অত খাতির কিসের?

গুরু। যদি পুনর্বার অসংযত ভাবে কথা বল, তবে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ভক্তদল। নিশ্চয়ই, শাস্তি পেতে হবে।

পাঠান। আমি তোমাকে ঘোড়া বিক্রয় করেছি। তার দাম চাওয়ার জন্য আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে? বাঃ, বেশ বলেছ হে। ভারতের লোকে না কি তোমার প্রশংসা করে, ভাল বলে জানে! কিন্তু আমি আজ দেখছি তুমি এক জন ভণ্ড, জোয়াচোর, ডাকাত—

[ইত্যাদি বলিতে বলিতে প্রস্থান]

(ভক্তদল ক্রুদ্ধ স্বরে 'সহ্য হয় না,' 'শাস্তি চাই,' 'কেটে ফেল' ইত্যাদি বলিতে লাগিল)

গুরু। অসহ্য— (তরবারি খুলিয়া দ্রুত পাঠানের অনুসরণ)

২য়। এইবার ঠিক হবে।

৩য়। নিশ্চয়ই।

৪র্থ। ঐ যে গুরুদেব আসছেন।

রতন। তরবারিতে রক্ত!

২য়। পাঠানের মুণ্ডচ্ছেদ করেছেন আর কি!

রতন। বেশ হয়েছে।

ভক্তদল। বেশ হয়েছে। গুরুদেবের সঙ্গে চালাকি! আমরা এর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

(গুরু রক্তাক্ত তরবারিটি দেখিতে দেখিতে মোহাচ্ছন্ন ভাবে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন)

গুরু। এ কি হ'ল! আজ আমি এ কি করলাম!

(তরবারি পড়িয়া গেল। ভক্তদল বিস্মিত হইয়া পরস্পর চাওয়া-চাইয়ি করিতে লাগিল)

গুরু। এক জন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আমি অস্ত্রাঘাত করলাম। সে তার প্রাপ্য নেবার জন্য এসেছিল, আমি তার ঋণ শোধ না করে, তাকে প্রস্তুত হবার সময় না দিয়ে, তাকে হত্যা করলাম! এক দিন আমার হৃদয় ছিল নিষ্পাপ, অন্তরের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। তখন আমার তলোয়ার ছিল নিষ্কলঙ্ক। সেই তলোয়ার আজ কলুষিত হল। এত ক্রোধ, এত ক্ষমাহীনতা যে আমার অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল তা আমি জানতাম না। সমগ্র ভারতের কাছে আজ আমি অপরাধী। ধুয়ে-মুছে যেতে হবে এ পাপ, এ লাজ, আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ। যেমন করে হোক্ আমি এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু কি উপায়?

রতন। গুরুদেব, এখন আর উপায় কি বলুন?

ভক্তদল। এখন আর উপায় কি?

গুরু। উপায় কি নেই! আচ্ছা, পাঠানের কি কোন শিশু-পুত্র আছে?

ভক্তদল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। পাঠানের একটি ছোট্ট ছেলে আছে।

গুরু। তা হলে উপায় আছে। আমার প্রায়শ্চিত্তের উপায় হবে। পাঠান-শিশুকে আমি নিয়ে আসব। তাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করব, পুত্রের ন্যায় পালন করব। তার দ্বারাই তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়াব।

ভক্তদল। এ কি বলছেন, গুরুদেব!

গুরু। কিছু না। যাও রতন। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কোরো না। আজই তাকে আমার চাই।

রতন। কিন্তু গুরুদেব—

গুরু। আমার আদেশ। তোমরা যাও।

[ভক্তগণের প্রস্থান।

গুরু। আজ থেকে আমি তার পিতা, তার গুরু, তার বন্ধু।

[রক্তাক্ত তলোয়ারটি কুড়াইয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

(বনের প্রান্তভূমি। গুরু পাঠান-শিশুকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইতেছেন)

মামুদ। গুরুজী, এইবার তীর ছুঁড়ি?

গুরু। অপেক্ষা কর, আর একটু টান, হাত সোজা কর। আমাকে আগে দেখ।

মামুদ। এইবার দেখুন গুরুজী।

গুরু। আচ্ছা, হয়েছে। এইবার ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় ঐ পাখীটিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ কর। (মামুদ তীর নিক্ষেপ করিল)

মামুদ। আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল গুরুজী। তীর শিকারের গায়ে ছোঁয়াতে পারলাম না।

গুরু। তার জন্য দুঃখিত হোয়ো না, মামুদ। তোমার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। ঐ শিকারটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তোমার তীর অত্যন্ত তীব্র বেগে ধাবিত হয়েছিল। দেখছ না, তোমার তীর ঐ বৃক্ষের কাণ্ডে সজোরে বিদ্ধ হয়েছে। তীর এখন পর্যন্ত থর-থর করে কাঁপছে। মামুদ, একবারে কেহ জয়ী হতে পারে না।

মামুদ। আমি তবে আবার চেষ্টা করব গুরুজী। এবারে কি লক্ষ্য করব আপনি বলে দিন।

গুরু। আচ্ছা, ঐ দেখ, মহুয়া বৃক্ষে একটি মধুচক্র রয়েছে। মধু আহরণের জন্য ঐটিতে শরাঘাত কর।

মামুদ। (শরনিক্ষেপ করিয়া) পেরেছি, পেরেছি, গুরুজী, পেরেছি। এবার আমার লক্ষ্য ঠিক হয়েছে। একেবারে মৌচাক ভেদ করে দিয়েছি।

গুরু। সার্থক, সার্থক মামুদ—তোমার সাধনা সার্থক! মানুষ সাধনার দ্বারাই জয়ী হতে পারে। মাত্র কয়েক দিনের শিক্ষাতেই তুমি কৃতকার্য হয়েছ। সে দিন রতনের সঙ্গে অসি-যুদ্ধে আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছিলে। আমি রতনকে আজ দুই বৎসর যাবৎ শিক্ষা দিচ্ছি, তবুও সে তোমাকে সহজে পরাজিত করতে পারেনি। তুমি এরই মধ্যে ব্যাঘ্র-শাবকের মত হয়ে উঠেছ। ভবিষ্যতে তুমি পুরুষ-শার্দূল হবে, মামুদ!

মামুদ। গুরুজী, তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি শিকার করতে যাব।

গুরু। কোথায় শিকার করতে যাবে?

মামুদ। কেন, পাহাড়ের ধারে যেখানে বড় বড় জঙ্গল আছে, সেই সব জঙ্গলে।

গুরু। কি করে শিকার করবে?

মামুদ। আপনার অন্য শিষ্যরা যে ভাবে শিকার করে, আমিও সেই ভাবে শিকার করব।

গুরু। কি শিকার করবে?

মামুদ। কেন? হরিণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, খরগোস। আরও কত রকমের বন্য জন্তু আছে, আমি সেই সব জন্তুও শিকার করব।

গুরু। তুমি কি দিয়ে ব্যাঘ্র শিকার করবে? কোন দিন তো জঙ্গলে শিকার করতে যাওনি?

মামুদ। আমার এই চক্চকে তীর দিয়ে। আর কাছে আসলে এই ধারাল অসি দিয়ে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলব।

গুরু। তুমি রাত্রে তীর লক্ষ্য করবে কি করে?

মামুদ। আপনি তো বলেছিলেন রাত্রে বাঘের চোখ জ্বলে। আমি সেই জ্বলন্ত চোখ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ব। গুরুজী, আমি শিকার করতে যাই?

গুরু। না, এখনো নয়। আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর। অস্ত্র-বিদ্যা আরও উত্তমরূপে আয়ত্ত কর।

মামুদ। (সহসা দূরে চাহিয়া চীৎকার করিয়া) ভালুক, ভালুক! গুরুজী, ভালুকের ছানা।

(খাপ হইতে অসি বাহির করিয়া প্রস্থানোদ্যত। গুরু ইতিমধ্যে নিজের খাপ হইতে অসি বাহির করিয়াছিলেন—মামুদকে ধরিলেন)

গুরু। স্থির হও। ভালুক তো গর্জ্জন করতে করতে চলে গেল। এখন বৃথাই তোমার যাওয়া হবে। এখন অন্বেষণ বৃথা।

মামুদ। এখনও বেশী দূর যায়নি গুরুজী! আমি ঐ ছানাটাকে ধরবই। আমাকে যেতে দিন।

গুরু। সে এতক্ষণে কোথায়? তার সন্ধান মিলবে না। বৎস, ধৈর্য্য ধর। আর একটু বড় হও, শিকার করতে যেও। তখন আর তোমায় বাধা দেব না। যেখানে খুশী সেখানে গিয়ে শিকার করে আনবে। হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে, তুমি না কি এক দিন সন্ধ্যায় ব্যাঘ্র-শিশু ধরতে গিয়েছিলে?

মামুদ। হ্যাঁ গুরুজী, আমার বাঘের ছানা পুষবার খুব ইচ্ছা হয়, তাই যাচ্ছিলুম। কিন্তু শঙ্কর ভাই আমাকে যেতে দিলেন না।

গুরু। আমারও একটি ব্যাঘ্র-শিশু পালন করবার খুব ইচ্ছা ছিল; তাই একটি ব্যাঘ্র-শিশু ধরে রেখেছি। (সহাস্যে মামুদের পিঠে হাত দিলেন)

মামুদ। কোথায় গুরুজী? আমাকে বলেননি তো? বলুন না কোথায় আছে? আমি তাকে নিয়ে খেলা করতে যাব। বাঘের ছানা নিয়ে খেলা করতে বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে।

গুরু। এই স্থানেই আছে বৎস।

মামুদ। কই, তবে আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না, আমার চোখে তো কোন দিন পড়েনি!

গুরু। সে এখন চক্ষুর অন্তরালে আছে, এক দিন প্রকাশ পাবে। বৎস, আশ্রমের নিয়ম অনুসারে এখন বিশ্রামের সময়। যাও, বিশ্রাম কর গে।

মামুদ। আপনি?

গুরু। আমি যাচ্ছি।

[মামুদের প্রস্থান।

(ভক্তদের প্রবেশ)

গুরু। তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

রতন। আমরা আপনার আদেশ পালনে ব্যস্ত ছিলাম।

গুরু। কার্য সম্পন্ন হয়েছে?

ভক্তদল। হ্যাঁ গুরুদেব, সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়েছে।

গুরু। এখন তোমাদের বিশ্রাম।

২য়। গুরুদেব, একটা কথা বলতে পারি কি?

গুরু। বল।

২য়। আপনার প্রাণ আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান্। সেই জন্যই বলছিলাম। আপনি পাঠান-পুত্রকে অত যত্ন করে লালন-পালন করছেন কেন? সে বড় হয়ে কোন দিনও আপনার অনুগত হবে না।

ভক্তদল। কোন দিনও না।

৩য়। দুধ-কলা দিয়ে কি কখন কালসাপ পোষে? পাঠান-পুত্রকে যতই যত্ন করুন না কেন, কোন দিন সে আপনার বাধ্য হবে না।

৪র্থ। বড় হয়ে সে ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হয়ে উঠবে। তখন আর তাকে ঠেকান যাবে না।

গুরু। তাই চাই। বাঘের বাচ্ছারে বাঘ না করিনু যদি, কি শিখানু তারে। আমি ওর পিতৃহন্তা, সুতরাং এখন আমিই ওর পিতা। তোমাদের আর কিছু বলবার আছে?

ভক্তদল। না গুরুদেব, আমাদের আর কিছু বলবার নেই।

(গুরু অন্তরালে গেলেন)

৪র্থ। গুরুদেবের মাথার ঠিক নেই রে, মাথার ঠিক নেই।

৩য়। তা নইলে পাঠান-পুত্রকে অত যত্ন করেন!

২য়। যে দিন ঐ পাঠান গুরুদেবের ইহলীলা শেষ করে দেবে তখন বুঝবেন।

[সকলের প্রস্থান।

(মামুদের প্রবেশ)

মামুদ। গুরুজী, গুরুজী!

(গুরুর প্রবেশ)

গুরু। কি বৎস?

মামুদ। ভালুকরা কোথায় বাস করে?

গুরু। ভালুক! কোথায় ভালুক?

মামুদ। সেই যে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, সেইটা। ওদের বাসা কোথায়? বাচ্চাটাকে ধরে আনব।

গুরু। মামুদ, বৃথা চেষ্টা। সে তার আহারের সন্ধানে আপন গন্তব্য পথে চলে গিয়েছে, সে এখন বহু দূরে। গভীর জঙ্গলে তার বাসা! কিন্তু তুমি বিশ্রাম করতে যাওনি যে?

মামুদ। বিশ্রামের জন্য গিয়েছিলাম। হঠাৎ ভালুকের কথা মনে পড়ায় ছুটে এসেছি।

গুরু। মামুদ, তুমি আশ্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করছ। ছিঃ! চল, আমরা বিশ্রাম করি গে।

[প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

(গুরুর শয়নকক্ষ। খাটের উপর গুরু একাকী বসিয়া আছেন)

গুরু। মানুষের ভ্রান্তি হয় কেন? মনের ভ্রান্তি বশতঃ যে দুষ্কার্য একবার সাধিত হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে মানুষের সারা জীবন কেটে যায়। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ভ্রান্তি বশতঃ সেই যে একবার হৃদয়কে কলুষিত করেছিলাম, তার সংশোধন করতে আমার সারা জীবন কেটে গেল। তবু আনন্দ, কলুষিত অন্তঃকরণকে মুক্ত করতে অনেকটা সক্ষম হয়েছি। যৌবনের প্রারম্ভে এক দিন মুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, স্বপ্ন স্বপ্নেই রয়ে গেল! স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে আমার শক্তিশালী বাহু অক্ষম হয়ে পড়ল। আমার নিষ্কলঙ্ক তলোয়ার—কলুষিত হল নিরর্থক রক্তপাতে।

(যুবক মামুদের প্রবেশ)

মামুদ। (সেলাম করিয়া) গুরুজী, আপনার কৃপায় আমার সমস্ত শিক্ষাই তো প্রায় শেষ হল। আমি আপনার কাছ থেকে যে বীরোচিত শিক্ষালাভ করেছি তাতে আমাকে বীরকুল থেকে স্থানচ্যুত করতে কেহই সক্ষম হবে না। এখন যদি আপনি আদেশ করেন, তাহ'লে রাজ-সৈন্যদলে যোগদান করে অর্থোপার্জনে মনোনিবেশ করি।

গুরু। না মামুদ, এখনও তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়নি। তোমার শিক্ষা শেষ হতে হয়তো এখনও দেরী আছে। তোমার মন এখনও এমন দৃঢ় হয়নি যে, তুমি অন্যায়ের প্রতিকার সাধন করতে পার এবং অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে পার।

মামুদ। কেন গুরুজী ! আপনি তো জানেন—

গুরু। না মামুদ, তোমার সে শিক্ষা এখনও হয়নি। আজ তুমি আমার কাছ থেকে সেই শিক্ষাই লাভ করবে। আজ তুমি শিখবে কেমন করে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হয়, অন্যায়কারীকে কেমন করে শাস্তি দিতে হয়। আমি এখন একটু কার্যান্তরে যাচ্ছি। তুমি একটু অপেক্ষা কর, অল্পক্ষণের মধ্যেই আসছি।

[গুরুর প্রস্থান।

মামুদ। গুরুজী যে মন্তব্য প্রকাশ করলেন তার সারমর্ম গ্রহণে আমি অক্ষম। তিনি বললেন, আমি অন্যায়ের প্রতিকার করতে জানিনে এবং অন্যায়কারীকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি না। কিন্তু গুরুজী তো জানেন, কোন অন্যায়কারী অন্যায় করে আমার কাছ থেকে পরিত্রাণ পায়নি; ভবিষ্যতে যে পাবে তারও আশঙ্কা নেই। এ জন্য লোকে আমাকে নিষ্ঠুর বলে। গুরুজীর ভক্তের দল আমাকে কত দোষ দেয়, আমার হিংসা করে। কিন্তু গুরুজী এই কথা বল্লেন কেন ? আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না !

(রতনের প্রবেশ)

রতন। গুরুদেব কোথায় হে মামুদ ?

মামুদ। তিনি কার্যান্তরে গিয়েছেন, এক্ষুনি ফিরবেন। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

রতন। তাই তো, মুস্কিল হল—

মামুদ। কেন, তোমার কি কোন বিশেষ দরকার আছে ?

রতন। দরকার না থাকলে কি এমনি এসেছি ! দরকার আছে বলেই এসেছি। তোমার মত আমরা তো গুরুদেবের আদুরে গোপাল নই যে, সময় নেই অসময় নেই তাঁর কাছে আব্দার করব, খেলা করব !

মামুদ। ছিঃ ছিঃ ! তোমার মুখে যা আসছে তাই বলছ ! সংযত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বল। গুরুজীর কাছে যত আব্দারই করি না কেন, তাঁর কাছে কোন দিন কচি ছেলের আব্দার করিনি তোমাদের মত।

রতন। কচি ছেলের আবদার কি রকম শুনি ?

মামুদ। আমি গুরুজীর কাছে এসেছি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে। তার ন্যায্য দাবী আছে বলেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি।

রতন। কিন্তু তোমার গুরুর প্রতি কোন ভক্তি দেখি না যে। গুরুর সঙ্গে কি শিষ্যের তর্ক করা, দাবা খেলা চলে ? তুমি তো তাও কর দেখছি। তুমি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর যেন তিনি তোমার সমবয়সী বন্ধু। গুরু-শিষ্যের কোন সম্বন্ধই রাখ না যে !

মামুদ। তোমরা তো শুধু বাহিরের তুচ্ছ জিনিসটাই দেখতে পাও, কিন্তু অন্তরের আসল জিনিসটা তো দেখতে পাও না। তোমরা ও-সব কথা বলতে পার। হৃদয়ের কত উঁচে যে তাঁকে স্থান দিয়েছি তা কি করে তোমরা বুঝবে। গুরুজী একাধারে আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, গুরু, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন—আপনার বলতে পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি।

রতন। সে তো ঠিকই ! (ব্যঙ্গভরে হাসি)

মামুদ। সেই জন্যই তাঁর কাছে এত ভালবাসা ও স্নেহ পাবার অধিকারী হয়েছি আমি ; তিনিও আমার কাছে এত ভক্তি-ভালবাসা পাবার অধিকারী। সে তো তোমরা জান না।

রতন। তা তো বটেই। তুমি যে তাঁকে খুব ভালবাস, ভক্তি কর, সে আর আমরা বুঝব কি করে ! তিনি তো তোমাকে খুব ভালবাসেন, তাহ'লেই হল। আমরা তাঁকে ভালওবাসি না, তিনিও আমাদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। তবে বলছিলাম কি, গুরুদেবের সঙ্গে ও-রকমটা করা ভাল নয়। আচ্ছা ভাই গুরুভক্ত মামুদ, গুরুর সঙ্গে এখন তোমার কি কাজ আছে দেখছি। অতএব তাঁর সঙ্গে আমার দেখা আর হবে না এখন। পরেই আসব !

[প্রস্থান।

মামুদ। গুরুজীর এই ভক্তের দল আমার খুব হিংসা করে। আমার প্রতি গুরুজীর এই ভালবাসা ও স্নেহ তারা মোটেই পছন্দ করে না। গুরুজী সকলকে সমান ভালবাসেন। তবুও তারা মনে করে আমাকেই তিনি বেশী ভালবাসেন। তাই আমার প্রতি তাদের এত হিংসা। কিন্তু তাদের এই সন্দেহের কারণ কিছু আছে কি ? সত্য সত্যই কি গুরুজী তাদের অপেক্ষা আমাকে বেশী ভালবাসেন ? যদি বেসেই থাকেন তবে কেন ? তাঁর কাছে আমিও যা, তারাও তো তাই !

(গুরুর প্রবেশ).

গুরু। না, তুমি তাদের অনেক উপরে। তোমার উপর আমার একটা কঠিন কাজের ভার ন্যস্ত আছে !

মামুদ। আমার উপর ! কি কাজ গুরুজী ?

গুরু। আছে। সেই কাজের উপযুক্ত ক'রে তৈরী করবার জন্যই তোমাকে আমি এই সব শিক্ষা দিচ্ছি। আশা করি, আমার শিক্ষা সফল হবে। তুমি জান, আমার জীবনে কত বড় একটা উদ্দেশ্য ছিল। এক দিন একটা পাপের জন্য আমার সে উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। সেই পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করা আমার সাধ্যাতীত ! একমাত্র তুমিই আমাকে সে পাপ থেকে মুক্ত করতে পার, আর কেহ নয় !

মামুদ। আপনাকে পাপমুক্ত করব আমি ?

গুরু। হ্যাঁ মামুদ, তুমিই। আমাকে পাপমুক্ত করার দিনও আগত। যাও, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এস। আজ আমরা গভীর বন-মধ্যে মৃগয়ায় যাত্রা করব।

(মামুদের প্রস্থান।

গুরু। এই সেই মামুদ! এক দিন যে তার নিরপরাধ পিতার মৃত্যুতে নিরাশ্রয় নিঃসহায় হয়ে পড়েছিল, আমার শিক্ষায় আজ সে অজেয়। পৃথিবীতে এমন কোন দুঃখ-বিপদ নেই যে তার দৃষ্টিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে। স্বাস্থ্যে, শৌর্যে, বীর্যে আজ সে আমাকেও অতিক্রম করেছে। আমার পার্শ্বে সে আমার দক্ষিণ-হস্তের মত শোভা পায়। সে এখন বীরচূড়ামণিদের অন্যতম। আমার আশা কি সে সফল করবে না?

(ভক্তদলের প্রবেশ)

রতন। গুরুদেব কি বেড়াতে যাচ্ছেন?

গুরু। হ্যাঁ।

২য়। এমন অসময়ে?

(গুরুর মৃদু হাস্য)

৩য়। আপনি তো আমাদের জানাননি কিছু?

গুরু। প্রয়োজন বোধ করিনি।

রতন। কোন লোকজন না নিয়ে একলা যাবেন বুঝি?

গুরু। মামুদ সঙ্গে যাবে।

২য়। আমরাও যাব।

গুরু। তোমাদের যাবার প্রয়োজন নেই। বিশ্রাম কর গে।

ভক্তদল। না গুরুদেব, সে হবে না। আপনাদের দু'জনকে একলা এই অসময়ে কিছুতেই যেতে দেব না।

রতন। অবশ্য যদিও আমরা জানি কোন বিপদই আপনার সম্মুখীন হতে পারবে না।

২য়। আমরা দেখেছি, অনেক রাত্রি, যখন কোলের মানুষ এমন কি তলোয়ারের খাপ পর্যন্ত দেখা যায় না, সেই সব অন্ধকার রাত্রে আপনাকে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছি।

৩য়। কোন বিপদই আপনাকে বাধা দিতে পারেনি। আপনি আপনার কাজ শেষ করে ফিরেছেন।

৪র্থ। যখন মোগলদের সঙ্গে আপনার যুদ্ধ বাধে, তখন আমরা তো আপনার কাছেই শুনেছি—

ভক্তদল। হ্যাঁ, আপনার কাছেই শুনেছি—

গুরু। আঃ! থাক্। ও-সব আলোচনার এখন আর প্রয়োজন নেই। তোমরা যাও।

২য়। আমরা আপনাদের ছেড়ে কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?

ভক্তদল। আমরাও সঙ্গে যাব, গুরুদেব!

গুরু। যাও, আমার আদেশ।

ভক্তদল। মামুদ যাচ্ছে, আর আমরা গেলে কি ক্ষতি হবে তা' বুঝিনে।

[প্রস্থান।

গুরু। মামুদের সঙ্গে এদের তুলনা হয় না। এরা কাপুরুষ। এদের মন কুটিলতায়,—হিংসায় পূর্ণ। আর মামুদের অন্তঃকরণ নির্মল। সে শিক্ষায়, শৌর্যে, বীর্যে, চরিত্রে এদের অপেক্ষা কত উচ্চে! এক দিন বলেছিলাম—'বাঘের বাচ্চারে বাঘ না করিনু যদি কি শিখানু তারে।' সত্যই আজ তাকে বাঘ তৈরী করেছি।

(মামুদের প্রবেশ)

মামুদ। গুরুজী, তীর-ধনুক আর তলোয়ার নিলাম। আর কোন অস্ত্রের প্রয়োজন আছে না কি?

গুরু। না, আর কোন অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। তীর-ধনুক না হলেও শুধু তলোয়ারেই আজকের কাজ চলত!

মামুদ। আপনি তো কোন অস্ত্র নেননি—মাত্র তরবারি নিয়েই চললেন। আপনার তীর-ধনুক, ছোরা আনব কি?

গুরু। যার সঙ্গে তোমার মত বীর পুরুষ-সিংহ যাচ্ছে, তার আবার অস্ত্রের প্রয়োজন! তুমিই তো আমার অস্ত্র, বৎস! অস্ত্র যেমন অস্ত্রধারীকে মরণোন্মুখ বিপদ থেকে রক্ষা করে, তুমিও আমাকে সেইরূপ পাপের যন্ত্রণা থেকে আজ মুক্ত করবে।

মামুদ। সে ঠিক্। আমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন বিপদ আপনার ঘটবে না।

গুরু। তবে আর আমার অস্ত্রের দরকার? তুমি কত নিরাশ্রয়কে রক্ষা কর। আমাকেও না-হয় তাদের এক জন বলে গণ্য করবে।

মামুদ। গুরুজী, আপনি কি আমাকে সে শিক্ষা দেননি? বিপন্নকে রক্ষা করা, দুর্বৃত্তকে দমন করা, অন্যায়ের যথাযোগ্য প্রতিবিধান করা—এ তো আপনার উপদেশ। আপনি তো জানেন, কোন দিন আপনার উপদেশ অমান্য করিনি, আর জীবনে অমান্য কোরবও না।

গুরু। চল মামুদ, আমরা যাত্রা করি। আজ ফিরতে তোমার বোধ হয় খুব কষ্ট হবে। তোমাকে আজ একটা কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

[প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য।

(নদী-তীর ; গুরু এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন)

গুরু। এই পাথর-ছড়ান উপকূল। বর্ষার জল-ধারা তার সহস্র আঙুলের ছাপ দিয়ে চলে গেছে। সেদিনের সে রক্তবর্ণ মাটি আর নেই। কিন্তু ঐ সারি সারি বিশাল শালের নীচে শিশু তরুদল আজও আকাশের অংশ পাবার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। নদীতে হাঁটু-জল, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। এখন নদী আর দুই কূল ছাপিয়ে নেই—গেরুয়া বালির কিনারায় সঙ্কীর্ণ ভাবে প্রবাহিত। সেই দিন, আর এই দিন! ঠিক এই রকম সময়েই আমি তাকে হত্যা করেছিলাম। সেদিনও সূর্য তাঁর যাত্রা শেষ করে পশ্চিম প্রান্তে ঢলে পড়েছিলেন। সেদিনও পাখীরা নিজ নিজ নীড়ে ফিরে যাচ্ছিল। ওঃ, নিরস্ত্র সে, সময় না দিয়ে, ঋণ শোধ না করে হত্যা করেছিলাম! সেই দিন থেকে আমার অন্তঃকরণ কলুষিত। মুক্তির দিন আজ আগত। দেখি, যদি আজ জয়ী হতে পারি!

(মামুদের প্রবেশ)

গুরু। এসো মামুদ।

(নীরবে একটি পাথরের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন)

গুরু। এই প্রস্তরখণ্ড!—কিছু দেখতে পাচ্ছ?

মামুদ। একটু লাল রং দেখছি মাত্র।

গুরু। এটা লাল রং নয়, মামুদ। এটা রক্ত। কিসের রক্ত জান?

মামুদ। কিসের রক্ত, গুরুজী?

গুরু। এক পাঠানের রক্ত!

মামুদ। (চমকিয়া) পাঠানের রক্ত? কে সে পাঠান?

গুরু। (দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) সে এক কাহিনী। কাহিনীটা তোমাকে বলছি, শোন। এক ব্যক্তি এই পাঠানের কাছ থেকে একটি অশ্ব ক্রয় করেছিল। তার প্রাপ্য মূল্য ঠিক সময় দেয়নি। এক দিন পাঠান এসে তার প্রাপ্য মূল্য চাইল; পাঠানের পুত্র তখন দেশে অসুস্থ। তাই সে দেশে প্রত্যাগমন করবার জন্য অর্থ সংগ্রহে এসেছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি পাঠানকে তার প্রাপ্য না দিয়ে, সময় না দিয়ে, অস্ত্র না দিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল!

মামুদ। (ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত স্বরে) হত্যা?

গুরু। হ্যাঁ, হত্যা। নিরপরাধ, নিরস্ত্র পাঠান সে, তাকে নির্মম ভাবে হত্যা।

মামুদ। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) গুরুজী, তার কেউ নেই?

গুরু। আছে, তার একটি মাত্র পুত্র আছে।

মামুদ। সে পুত্র জীবিত?

গুরু। জীবিত। সে-ও তার পিতার মত পুরুষ-সিংহ হয়ে উঠেছে। আচ্ছা মামুদ, তার এখন কর্ত্তব্য কি?

মামুদ। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া, পিতৃ-ঘাতককে বধ করা।

গুরু। আচ্ছা মামুদ, সেই নিরস্ত্র, নিরপরাধ পাঠান যদি তোমার পিতা হয়, তুমি কি করতে?

মামুদ। কি করতাম তা' বোধ হয় আপনার অজানা নেই গুরুজী!

গুরু। পারতে মামুদ, পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারতে? সে ঘাতক যদি তোমার কোন বন্ধু বা তোমার কোন নিকট-আত্মীয় হত?

মামুদ। তা যদি না পারি তাহ'লে আপনার কাছে এত দিন কি শিক্ষালাভ করেছি, গুরুজী!

গুরু। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) রে পাঠান, যদি তুমি আমার কাছে সত্য শিক্ষালাভ করে থাক, তাহ'লে খোল তলোয়ার। পিতৃঘাতককে বধ করে তার উষ্ণ রক্ত উপহারে তোমার পিতার তৃষাতুর প্রেতাত্মার তর্পণ কর।

মামুদ। (দ্রুত তাহার তরবারির খাপে হাত দিয়া) গুরুজী!

গুরু। সে পাঠান তোমার পিতা।

মামুদ। (উচ্চৈঃস্বরে) গুরুজী!

গুরু। আর সেই ঘাতক—আমি নিজে।

মামুদ। (নিমেষে তরবারি বাহির করিয়া) আল্লাহ আকবর!

(সহসা থামিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর তরবারি ফেলিয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে)

গুরু (আশা-আশঙ্কায় মৃদু হাসি সহকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

মামুদ। গুরুজী, এই শয়তানকে দিয়ে এমনতরো খেলা কোরো না। ধর্ম জানে—একাধারে পিতা, গুরু, বন্ধু বলে তোমারে মেনেছি। সেই স্নেহই আমার মনকে ছেয়ে থাক্! ঢাকা পড়ে মরে যাক্ যত হিংসা; যত ক্রোধ। কর আশীর্বাদ!

(মাথা নুয়াইয়া প্রণাম করিল ও ধীরে ধীরে চলিয়া গেল)

গুরু। হা ভগবান্! ব্যর্থ, ব্যর্থ এ জীবন!

৫ম—দৃশ্য

(গুরুর কক্ষ; গুরু উপবিষ্ট। শিষ্যরা অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে। মামুদ অনুপস্থিত)

গুরু। পাঠান-পুত্রকে আর সেদিন থেকে আমার কাছে আসতে দেখি না; সে যেন আমার কাছ থেকে কত দূরে চলে গেছে!

২য়। গুরুদেব, সে তো পাঠান-পুত্র। আপনার কাছে যা' কিছু শিখবার মত ছিল তা' খুব তাড়াতাড়ি করে শিখে নিয়েছে। আর কি আপনার কথা মনে আছে?

গুরু। প্রভাতে আর তো সে আমার নিদ্রাভঙ্গ করতে আসে না। রাত্রেও তো দরজার ধারে পাহারা দেয় না! পূর্বে রাত্রে আমার যখনই নিদ্রাভঙ্গ হত, তখনই দেখতাম মামুদ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান। আমার আদেশ না পেলে তার নিদ্রাভোগ হত না।

ভক্তদল। (পরস্পরের মধ্যে) আমরা সারা দিন পরিশ্রম করি। মামুদ তো আর দিনের বেলায় কোন কাজ-কর্ম করে না। সেই জন্যে রাত জেগে পাহারা দিতে পারে।

গুরু। মৃগয়ায় যাবার জন্য বারে বারে ডাকতে আসত। আমি একাকী বনের মধ্যে শিকার করে ফিরি। বনের মধ্যেও তো কোন দিন দেখা হয় না। সত্যই কি সে চলে গেছে?

৩য়। সে কোথাও যায়নি। চুপি-চুপি দুপুর রাতে আসে, ভোর না হতেই চুপি-চুপি চলে যায়।

৪র্থ। আপনার প্রতি তার মায়া-মমতা নেই। পাঠান-পুত্রের কি মায়া-মমতা কখনও থাকে?

২য়। আপনি গুরুদেব, তাকে অস্ত্রবিদ্যা শেখালেন, সেও তাড়াতাড়ি শিখে নিয়ে এখন অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় আছে। সে কি এখন আপনার সঙ্গে দেখা করে?

গুরু। সেই এক দিন নদী-তীরে শিলা'পরে তার পিতৃরক্ত দেখিয়ে এনেছি। সেই দিন থেকে আর তার দেখা নেই।

২য়। সে আপনার কাছে আসবে কি! তার কি কৃতজ্ঞতা-বোধ কিছু আছে? সে এখন হয়তো প্রতিশোধ নেবার জন্য গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করছে।

ভক্তদল। ঠিক্, ঠিক্। গোপনে ষড়যন্ত্র করছে সে।

গুরু। স্তব্ধ হও। মামুদ পাঠান-পুত্র; সে বীর, সাহসী, নির্ভীক। সে এ রকম শিক্ষা পায়নি যে, সে কাহারও বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করবে। সে সম্মুখে বাঘের মত লাফিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু গোপনে আঘাত হানতে পারে না।

(সকলে নীরব)

গুরু। যেমন করেই হোক, তাকে আমার কাছে একবার আসতেই হবে। (চিন্তা করিয়া) দাবা খেলায় তার নেশা আছে,

গভীর নেশা। দাবা খেলাতেই তাকে আহ্বান করব। নেশার আকর্ষণে সে নিশ্চয়ই আসবে। হ্যাঁ, তাই স্থির। রতন, মামুদকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসো। তাকে বল—এ আমার আদেশ, সে যেন আসে। তোমরাও যাও, তাকে অন্বেষণ করে বাহির করা চাই। যাও, এখনি।

ভক্তদল। মামুদই সব, আমরা তো কেউ নই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গুরুর কক্ষ। খাটের উপর গুরু বসিয়া আছেন, সম্মুখে দাবা খেলার সরঞ্জাম)

গুরু। দাবা খেলার নাম করে ডেকে পাঠিয়েছি; নেশার আকর্ষণকে যদি সে জয় করতে সমর্থ হয়, তবু আমার আদেশ অমান্য করতে পারবে না সে। সে আসবেই। আজ স্থির করেছি, বাঘের বাচ্ছারে খোঁচার পর খোঁচা দিয়ে, উত্তেজিত করে নিজের অভিপ্রায় সাধন করব, নিজের মুক্তি আদায় করব। তাকে দিয়ে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়াব। দেখি, আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে!

(মামুদের প্রবেশ)

গুরু। এই যে মামুদ, এসেছ। শেষ পর্য্যন্ত ভয় ভেঙ্গেছে তোমার। ভয় নেই তোমার। তোমার পিতা, আর তুমি—পার্থক্য অনেক। তোমাকে আঘাত করব না কোন দিন, তুমি দুর্বল, অতি দুর্বল। যাক্, শোন, যে জন্য তোমায় ডেকেছি। আমার মন আজ অত্যন্ত অস্থির—মনে হচ্ছে, যুদ্ধ করি। কিন্তু যুদ্ধ করব কার সঙ্গে—সবই তো ভীরু কাপুরুষ! তাই স্থির করেছি, অসির বদলে তোমাকে দাবা-যুদ্ধে আহ্বান করব। প্রতিবারই তুমি আমার কাছে পরাজিত হয়ে এসেছ, এবারও পরাজিত হবে। তবু এস, আহ্বান গ্রহণ কর।

(মামুদ নিরুত্তর)

গুরু। কি মামুদ, নীরব? খেলতে সাহস হচ্ছে না! এ তো অসি-যুদ্ধ নয়, এতে প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই। ভীরু পাঠান! (ব্যঙ্গভরে হাসি)

মামুদ। পাঠান কখনও ভীরু হয় না গুরুজী।

গুরু। উত্তম। এস।

(উভয়ে খেলিতে লাগিলেন)

গুরু। পরাজয়ের আর বিলম্ব নেই।

মামুদ। চেষ্টা।

গুরু। চেষ্টা!—(উচ্চ হাস্য)

মামুদ। (ক্রুদ্ধ স্বরে) হ্যাঁ চেষ্টা।

গুরু। চেষ্টায় কি হবে মামুদ, অদৃষ্টে তোমার যে পরাজয় লেখা রয়েছে।

মামুদ। পাঠান কখনও হতাশ হয় না গুরুজী।

গুরু। দেখা যাক, তোমার হৃদয়ে আশা কত গভীর।

(খেলিতে লাগিলেন)

গুরু। যে পাঠানের মস্তক আমার তরবারির এক আঘাতে স্কন্ধচ্যুত হয়ে পড়েছিল তার পুত্র খেলবে আমার সঙ্গে! নির্লজ্জ পাঠান-তনয়!

মামুদ। গুরুজী! (ক্রুদ্ধস্বরে)

(রতনের প্রবেশ)

রতন। গুরুদেব, আপনার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হয়ে এল।

গুরু। না রতন, আমার সময় এখনও হয়নি!

রতন। গুরুদেব, আপনারা নিবিষ্টচিত্তে খেলছেন বলে সময় বুঝতে পারেননি। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে!

গুরু। কি মামুদ, এখনও আশা আছে?

(দ্বিতীয় ভক্তের প্রবেশ)

২য়। গুরুদেব, আপনার বিশ্রামের সময় হয়েছে। আজকের মত খেলা বন্ধ করুন।

রতন। হ্যাঁ গুরুদেব, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। খেলা বন্ধ হোক্।

গুরু। আমার খেলা শেষ হয় কই! বিশ্রাম!—কি জানি!

(কিছুক্ষণ সকলে নীরব)

গুরু। (ভক্তদের প্রতি) যাও তোমরা।

(মামুদ ব্যতীত অন্য শিষ্যদের প্রস্থান।

গুরু। (সহসা ক্রোধভরে) নিরীহ পিতার ঘাতকের সঙ্গে বার বার খেলতে সঙ্কোচ হয় না, মামুদ?

মামুদ। বার বার পাঠান-পুত্রকে আঘাত করবেন না, গুরুজী!

গুরু। হীনবীর্য, অপদার্থ পাঠান-পুত্র আমার সঙ্গে খেলতে চায়, এতে অপমান আমার।

মামুদ। (উচ্চৈঃস্বরে) গুরুজী! (খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল)

গুরু। (দাবার গুটি ছুঁড়িয়া মামুদের কপালে আঘাত করিলেন) যে কাপুরুষ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে পিতৃহন্তার সঙ্গে খেলা করে এসে, জয় হবে তার? (হাসিয়া উঠিলেন)

মামুদ। তবে পিতৃহত্যার পুরস্কার নাও, দাম্ভিক।

(গুরুর বুকে ছোরা বসাইল। গুরু তৃপ্তির হাসি হাসিতে লাগিলেন। মামুদ হতভম্বের মত গুরুর দিকে চাহিয়া রহিল)

(রতন ও ২য় ভক্তের প্রবেশ)

উভয়ে। সর্বনাশ, সর্বনাশ! এ কি করলি রে হিংস্র পাঠান!

রতন। পাঠান-পুত্রকে আজীবন শিক্ষা দিলেন, তার এই পরিণাম!

গুরু। (ধীরে ধীরে) 'বাঘের বাচ্ছারে বাঘ না করিনু যদি কি শিখানু তারে! আয়, আয়, কাছে আয়, মামুদ।

(মামুদ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

গুরু। পুত্র, এত দিন যার জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম, সে আজ সম্পূর্ণ; আমার সাধনার সিদ্ধি লাভ হল। রে পুত্র, এত দিনে হল তোর বোধ,

কি করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ-শিক্ষা দিয়ে গেনু, আজি শেষ বার,
আশীর্বাদ করি তোরে রে পুত্র আমার।

(শুইয়া পড়িলেন)

রতন ও ২য় ভক্ত। গুরুদেব! (খাটে মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িল)

মামুদ। আল্লা—! (বসিয়া পড়িল)

(ধীরে ধীরে যবনিকা পতন)

[বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগের সচিব মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত].

ছোটদের আসর

ত্রয়োদশ

যোদ্ধা এবং কবি

কবি শ্রীহর্ষ, যোদ্ধা শ্রীহর্ষ, রাজর্ষি শ্রীহর্ষ! তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মীও হলেন আর্য্যাবর্ত্তের নাট্যশালা থেকে অদৃশ্য।

বিশাল সাম্রাজ্য হয়ে গেল খণ্ড-বিখণ্ড। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, মালবরাজ যশোধর্ম্মদেব এবং সর্ব্বশেষে স্থানেশ্বরের হর্ষবর্দ্ধন! তার পর আর্য্যাবর্ত্তে এমন কোন শক্তিধর মহাবীর আত্মপ্রকাশ করেননি, যিনি সম্রাট্ উপাধি ধারণ করতে পারেন। প্রায় দুই শতাব্দী পরে (৮৪০-৮৯০ খৃ) মিহির ভোজ কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, উত্তরাপথের অধিকাংশই ছিল যাঁর করতলগত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর যুগে মেগাস্থেনিস, ফাহিয়েন বা হুয়েন সাংয়ের মতন বিদেশী রাজদূত বা পরিব্রাজক আর্য্যাবর্ত্তে আসেননি এবং হরিষেণ বা বাণভট্টের মতন কবিও রাজসভা অলঙ্কৃত করেননি, কাজেই মহারাজাধিরাজ মিহির ভোজের কীর্ত্তি-কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাস কোন পরিচয়ই স্থাপন করতে পারেনি। কথায় বলে 'কৃপাণের চেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে লেখনী'। ভুল কথা নয়। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিস না থাকলে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের, কবি হরিষেণ না থাকলে সমুদ্রগুপ্তের, চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন না থাকলে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের এবং পরিব্রাজক হুয়েন সাং ও কবি বাণভট্ট না থাকলে হর্ষবর্দ্ধনের প্রকৃত পরিচয় ইতিহাস আজ জানতেই পারত না।

প্রামাণিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখি, হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে উত্তরাপথের দিকে দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন ক্ষুদে-ক্ষুদে রাজার দল, পরস্পরের সঙ্গে মারামারি-কাটাকাটি ক'রেই তৃপ্ত হ'ত তাঁদের রাজধর্ম্ম। একাধিক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য ছিল বটে, কিন্তু সেগুলিকে সাম্রাজ্য ব'লে সন্দেহ করা চলে না। বড় বড় সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতবর্ষের বরাবরই হয়েছে এই একই দুরবস্থা এবং বরাবরই এই একতাহীনতা ও দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছে পারসী, গ্রীক, শক, হুণ, মোগল ও ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী শত্রুরা। খৃষ্ট জন্মাবার তিন শত সাতাশ বৎসর আগে গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে এসে দেখেছিলেন ঠিক এই বিসদৃশ দৃশ্যই। আবার হর্ষবর্দ্ধনের কয়েক শত বৎসর পরে মুসলমানরাও ভারতের মাটিতে পা দিয়ে দেখেছিল ঐ-রকম দৃশ্যেরই পুনরভিনয়!

হর্ষবর্দ্ধনের ধর্ম্মমত ছিল সে যুগের পক্ষে যথেষ্ট উদার। বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি থাকলেও তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন না,

মহাভারতের শেষ-মহাবীর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

শিব ও সূর্য্যও লাভ করতেন তাঁর শ্রদ্ধা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রচণ্ড সংঘর্ষ। হিন্দু মাত্রই নির্ব্বিচারে ঘৃণা করত বৌদ্ধদের। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুদেরও মধ্যে ছিল দস্তুরমত অহি-নকুল সম্পর্ক। তারা কেউ ছিল শিবের, কেউ ছিল বিষ্ণুর এবং কেউ ছিল অগ্নির বা গণেশের বা সূর্য্যের বা ভৈরবের বা কার্ত্তিকের বা যমের বা বরুণের উপাসক। তা ছাড়া অনেকের পূজ্য ছিল আকাশ বা জল বা বায়ু বা বৃক্ষ বা সর্প—এমন কি ভূত-প্রেত পর্য্যন্ত!

কিন্তু সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল বৌদ্ধরা। সম্রাট্ অশোক, কণিষ্ক ও হর্ষবর্দ্ধন এবং তার পর পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে সব দিক দিয়েই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম। ওঁদের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের বাইরেও সুদূর দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল। সম্রাট অশোক বুদ্ধধর্ম্ম প্রচার করবার জন্যে ভারতের বাইরে এশিয়ার নানা দেশে—এমন কি য়ুরোপ ও আফ্রিকাতেও প্রচারকদের প্রেরণ করেছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনও চীন দেশের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কীয় যোগস্থাপন করতে ত্রুটি করেননি।

এই রাজ-সাহায্য হারিয়ে বৌদ্ধদের দুরবস্থার সীমা রইল না। ওদিকে উদয়ন বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা ক'রে শঙ্করাচার্য্যের জন্যে পথ তৈরি ক'রে দিলেন। সেই পথ দিয়ে অগ্রসর হলেন যখন (৭৮৮—৮২০ খৃঃ) অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য, বৌদ্ধদের অবস্থা হয়ে উঠল তখন এক'ন্ত অসহায়।

হর্ষবর্দ্ধনের চিতা প্রায় শীতল হ'তে-না-হ'তেই প্রতিক্রিয়া সুরু হ'ল। হর্ষবর্দ্ধন নিঃসন্তান ছিলেন। হত্যাকারী অর্জ্জুনাশ্ব যখন কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করলে, তখন তাকে বাধা দিতে পারে রাজবংশে এমন কেউ ছিল না।

অর্জ্জুনাশ্বের পক্ষে ছিল দলে দলে অসভ্যজাতীয় যোদ্ধা। অর্থ দিয়ে এবং বেপরোয়া লুণ্ঠনের লোভ দেখিয়ে অর্জ্জুনাশ্ব তাদের বশীভূত করেছিল। দেশের দিকে দিকে বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরের অভাব ছিল না এবং রাজানুগ্রহে সেগুলির মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল প্রচুর ধন-রত্ন ও বহু মূল্যবান দ্রব্য। প্রথমেই সেই সব মঠ-মন্দিরের ভিতরে আরম্ভ হ'ল অবাধ লুণ্ঠন-লীলা।

অধিকাংশ ব্রাহ্মণই ছিল বৌদ্ধদের পরম শত্রু। হর্ষবর্দ্ধনের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে এত দিন এই ব্রাহ্মণের দল কুঞ্চিতফণা ফণীর মত মনে মনেই পুষে আসছিল মনের যত রাগ ও আক্রোশ, এইবারে সুযোগ পেয়ে তারাও অর্জ্জুনাশ্বের সঙ্গে যোগ দিয়ে বৌদ্ধদের আক্রমণ করলে পৈশাচিক উল্লাসে!

কবি বাণভট্ট বললেন, "ওহে সেনাপতি সিংহনাদ!"

সিংহনাদ ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন, "আমাকে আর সেনাপতি ব'লে ডেকে ব্যঙ্গ কোরো না বাণভট্ট!"

—"ব্যঙ্গ?"

—"তা নয় তো কি? আমাকে যে সেনাপতি ব'লে ডাকছ, আমার সৈন্য কোথায়?"

—"মানে?"

—"স্বর্গীয় মহারাজের বৌদ্ধ-প্রীতির জন্যে সেনাদলের অনেকেই খুসি ছিল না। তাদের বেশীর ভাগ লোকই দুষ্ট অর্জ্জুনাশ্বকে রাজা ব'লে মেনে নিয়েছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে যারা অতটা নীচে নামতে পারেনি, তারাও চুপ ক'রে আছে নিরপেক্ষের মত।"

—"তুমি কি বলতে চাও, সেনাদলের মধ্যে মহারাজের বিশ্বাসী লোক ছিল না?"

—"ছিল বৈ কি! কিন্তু তারা দলে হালকা। তারা হতাশ হয়ে দেশ ত্যাগ করেছে।"

—"অতএব?"

—"অতএব আমি এখন হয়ে পড়েছি সোনার পাথরবাটির মত—অর্থাৎ সৈন্যহীন সেনাপতি!"

—"তাহ'লে এখন কি করা উচিত?"

—"উচিত, কান্যকুব্জের বাইরের দিকে দ্রুতবেগে পদচালনা করা।"

—"আরে নির্ব্বোধ, বিদেশ-বিভূঁয়ে গিয়ে খাব কি?"

—"বায়ু কিংবা ঘাস কিংবা ভুষি। এখানে থাকলে খাবি ভক্ষণ করতে বিলম্ব হবে না। সেটা অধিকতর ভয়াবহ। ঐ শোনো, বিদ্রোহীদের জয়-কোলাহল! ইচ্ছা হয়তো তুমি এখানে অবস্থান কর, এই আমি সবেগে প্রস্থান করলুম!"

—"তিষ্ঠ ভায়া, কিছুক্ষণ তিষ্ঠ! এখনো তুমি নিরস্ত্র নও, পথে-বিপথে বিপদ ঘটলে তোমার তরবারি আমাকে রক্ষা করতে পারবে।"

—"এস তা'হলে, দেরি করছ কেন?"

—"ব্রাহ্মণী যথাসময়ে মরে বেঁচে গিয়েছেন। এখন তোমার তরবারির মত আমারও প্রধান সম্বল কাব্যপুঁথিগুলি। দাঁড়াও, চটপট সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে বগলদাবা করি। হা মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন, হা আমার কাব্যকুঞ্জ, হা আমার এত সাধের 'হর্ষচরিত'!"

চতুর্দ্দশ

বিশ্বাসঘাতকের পরিণাম

অর্জ্জুনাশ্ব সকলকে সম্বোধন ক'রে বললে, "বন্ধুগণ, চীন-সম্রাট উত্তরাপথে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করবার জন্যে আবার এক দল লোক পাঠিয়েছে, এ কথা তোমরা সকলেই জানো। কিছু দিন আগে এই রকম এক প্রতারক প্রচারক এসে কেবল হর্ষবর্দ্ধনের ধর্ম্মনাশই করেনি, রাজার যোগ্য উপঢৌকন হস্তগত ক'রে আবার স্বদেশে পলায়ন করেছে। এবারের চৈনিক প্রচারকও যথেষ্ট মূল্যবান সামগ্রী উপহার পেয়েছে। তারাও পলায়ন করতে চায়। কিন্তু এবারে আমরা তাদের বাধা দেব, তাদের হত্যা করব আর তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন না ক'রে ছাড়ব না। হিন্দুর সম্পত্তি অহিন্দুর হস্তগত হবে, এ অন্যায় আমি প্রাণ থাকতে সহ্য করতে পারব না। বন্ধুগণ, সৈন্যগণ, অগ্রসর হও! জয় দেবাদিদেব মহাদেবের জয়!"

চৈনিক দূত ওয়াং-হিউয়েন-সি ও তাঁর সঙ্গিগণ তখন ত্রিশ জন দেহরক্ষী নিয়ে তিরহুতের কাছে গিয়ে পড়েছেন। এত শীঘ্র দেশে ফেরবার ইচ্ছা তাঁদের ছিল না, কিন্তু এই সুদূর বিদেশে প্রবীণ পৃষ্ঠপোষক হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর আর তাঁদের ভারতে থাকবার ভরসা হয়নি।

আচম্বিতে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অর্জ্জুনাশ্ব তার দলবল নিয়ে চৈনিক দূতমণ্ডলীর উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদেশীরা এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। দেহরক্ষীরা মারা পড়ল এবং সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হ'ল বটে, কিন্তু ওয়াং-হিউয়েন-সি তাঁর জন কয় সঙ্গী নিয়ে কোন রকমে পলায়ন ক'রে নেপালে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

নেপাল তখন তিব্বতের বিখ্যাত যোদ্ধা-রাজা স্রং-সান্ গ্যাম্পোর অধীন। তিনি লাসা নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় তাঁরই চেষ্টায়। রাজা গ্যাম্পো বিবাহ করেছিলেন চীন-সম্রাটের এক কন্যাকে।

তাঁর শ্বশুরের প্রেরিত দূতমণ্ডলীর উপরে বিশ্বাসঘাতক অর্জ্জুনাশ্বের অত্যাচারের কথা শুনে রাজা গ্যাম্পো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, "রাজদূত, আমি যদি আপনাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করি, তাহ'লে আপনি কি নিজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারবেন?"

—"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, আমার হস্ত অস্ত্রধারণ করতেও সক্ষম।"

—"উত্তম। আপনার সঙ্গে যাবে আমার বাছা-বাছা বারো শত সেরা সৈনিক। তার উপরে থাকবে সাত হাজার নেপালী অশ্বারোহী। হিমালয় ছেড়ে নেমে যান আবার সমতল ক্ষেত্রে, চীন-সম্রাটের মানরক্ষা আর ধার্ম্মিক হর্ষবর্দ্ধনের হত্যাকারীর শাস্তি-বিধান করুন।"

দুরাত্মা অর্জ্জুনাশ্ব তখনও তিরহুত পরিত্যাগ করেনি। গুপ্তচরের মুখে সে ওয়াং-হিউয়েন-সিয়ের পুনরাগমনের সংবাদ পেয়ে রীতিমত ভীত হয়ে উঠল; কারণ সে বেশ বুঝলে যে, তার অধীনে যারা অস্ত্র ধরবে তারা সংখ্যায় বেশী হ'লেও যুদ্ধে দক্ষ সুশিক্ষিত তিব্বতী ও নেপালী সৈন্যদের সমকক্ষ নয়। সে তাড়াতাড়ি বাগমতী নদীর তীরবর্ত্তী দুর্গের ভিতর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে।

কিন্তু পূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন অর্জ্জুনাশ্বের বিষের পাত্র। মাত্র তিন দিনের চেষ্টার পর ওয়াং-হিউএন-সি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন সদলবলে। অসভ্য জাতের অশিক্ষিত সৈন্যদের নিয়ে অর্জ্জুনাশ্ব দুর্গ ছেড়ে পলায়নের চেষ্টা করলে। কিন্তু তার দশ হাজার সৈন্য বাগমতী নদীর গর্ভে লাভ করলে সলিলসমাধি এবং তিব্বতীদের তরবারির মুখে উড়ে গেল তিন হাজারের মুণ্ড!

অর্জ্জুনাশ্ব পালিয়ে গেল, কিন্তু তখনও পরিতৃপ্ত হ'ল না তার রাজ্যলিপ্সা। তাড়াতাড়ি নূতন সৈন্য সংগ্রহ ক'রে আবার সে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল। কিন্তু ভগবান মুখ তুলে তাকালেন না তার মত প্রভুহন্তা বিশ্বাসঘাতকের প্রতি। এবারেও সে হেরে গেল। যুদ্ধে তার কত লোক মারা পড়েছিল সে হিসাব জানবার আর উপায় নেই। কিন্তু তিব্বতী ও নেপালীরা এক হাজার শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করেছিল এবং বন্দী করেছিল বারো হাজার লোককে। অর্জ্জুনাশ্বও ধরা পড়ল সপরিবারে। বিজয়ী তিব্বতীদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করলে ভারতের পাঁচ শত আশীটি প্রাকার-বেষ্টিত নগর।

ওয়াং-হিউয়েন-সি এবারে অর্জ্জুনাশ্বকেও ছাড়লেন না, তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেলেন সুদূর চীন দেশে। ছুটে গেল তার সাম্রাজ্যের স্বপ্ন।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মগধ-বঙ্গের অধিপতি শশাঙ্কের

উত্তরাধিকারী (মাধবগুপ্ত বা আদিত্যসেন) আবার স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছিলেন। তার পর কেবল মগধ-বঙ্গ নয়, উত্তরে পশ্চিমে দক্ষিণেও রাজ্যের পর রাজ্য করলে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা। আর্য্যাবর্ত্ত আবার ডুবে গেল অন্ধযুগের বিস্মৃতির মধ্যে। তাকে সূর্য্যের আলোকে আমন্ত্রণ করবার জন্যে আর কোন চন্দ্রগুপ্ত, আর কোন সমুদ্রগুপ্ত, আর কোন হর্ষবর্দ্ধন এসে দাঁড়াননি "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে"!

সমাপ্ত

বাদলা দিন

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

ঝম্-ঝম্ রিণিঝিন্
বাদ্‌লার ভেজা দিন—আসলো।
চারি দিক্ শুধু জল
আবার ধরণীতল—ভাসলো।
আকাশের অঞ্চল
ডানা মেলে চঞ্চল—আজ যে!
কা'র নাচ হ'লো শুরু—
ডম্বরু গুরু-গুরু—বাজছে?
রসাল-পিয়াল বন
শুধু কেন অকারণ—ভিজছে!
তালীবন খালি খালি
উল্লাসে হাততালি—দিচ্ছে।
করবী-কামিনী ফোটে,
কদম শিউরে ওঠে—গন্ধে,
কেয়াবনে মৌমাছি
ফেরে আজ নাচি' নাচি'—ছন্দে।
পাঠশালা, ইস্কুল
আজ, ভাই, বিলকুল—বন্ধ;
শুধু আজ রাত-দিন
বৃষ্টির রিণঝিন—ছন্দ।
আয় ভোলা, হুটু, পুশি
করবো যা আজ খুশি—আমরা,—
পেড়ে খাব জামরুল,
ডাঁশা ডাঁশা আমরুল,—আমড়া;
ভাস্‌বো নদীর জলে
আমরা, ছেলের দলে—আজ রে!
এসেছে নতুন দিন,
হৃদয়ে নতুন বীণ,—বাজ রে!

পি, কে, ওয়ান টু নাইন

শ্রীবীণা মজুমদার

—হ্যালো!···

···P. K. 129? বাসু আছে?

···কি বল্লে?—হারু বেরিয়ে গেছে? (ভড়কে যাই না, চট্ ক'রে মাথায় দুষ্টুমী পাকিয়ে ওঠে)···কত নম্বরে কথা বল্‌ছেন?

···P. K 129?···কে কথা বল্‌ছেন?

···মিন্টু?···ও! তা হারুকে বলো যে আমি কাল সকালে তার কাছে ফোন করব—হ্যাঁ···না, তার কোনও দরকার নেই—আর কিছুই বলতে হবে না। যা বলার আমিই কাল বলব—হ্যাঁ শোন, সে যেন অবশ্যই সকালে বাড়ী থাকে···

ঘরে গিয়ে ভাবতে বসি।···"দাদা খাবে এস।" চমকে ঘড়ির পানে তাকাই—এ কি সাড়ে ন'টা?···সামলে নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠি—দেড় ঘণ্টার চিন্তা সার্থক না হয়ে যায় না। চটপট্ খেয়ে এসে শুয়ে পড়ি—কিন্তু ঘুম আসে না···আবার ভাবতে বসি।—কতক্ষণ পরে বাইরে বৃষ্টি সুরু হয়। জানলার কাচ বন্ধ ক'রে তার পাশে গিয়ে বসি। সামনে কাল রাস্তা ভিজে আরো কাল হয়ে গেছে। ঝম্-ঝম্ তুমুল বেগে বৃষ্টি পড়ছে, সাথে সাথে মেঘের গজরানোর শব্দ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে—তারি বুক চিরে বিজলীর রেখা—মনকে ভারি ভাবিয়ে তোলে—ওর বুঝি মা নেই তাই ওর এত কান্না! মেঘের তাড়া ও দাঁত-খিচুনী খেয়ে ও আরও বেশী ডুকরে কেঁদে ওঠে—আমায় যদি কেউ অমন কোরে গাল দিত!—আতঙ্কে বুকটা কেঁপে ওঠে,—ভারি লজ্জা বোধ করি, যখন দেখি দুই গালে জলের ধারা।—

···জোর কোরে আবার মনে করি P. K. 129?

—মুহূর্ত্তে মনটা লাফিয়ে ওঠে—নানা ভাবে ভেবে দেখি কিছুতেই সুবিধা করতে পারি না।

···"ওরে পাগলা, চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছিস্ কেন?—ওঠ, বিছানায় যা। তোর হয়েছে কি আজ?"—পিসিমা হাত ধরে উঠিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন—তাঁর স্নেহের স্পর্শে প্রাণটা খুশী হয়ে ওঠে—মনের ভার নেমে যায় অনেকটা। পিসিমা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যান। আর একবার ঘুমের ঘোরে মনে পড়ে—'P. K. 129'

···P.K. 129কে কেন্দ্র কোরে কত উল্‌টো-পাল্‌টো ঘটনার সমাবেশ হয় মগজের মধ্যে স্বপ্নের মাঝে।—যখন চোখ মেলে চাইলাম দিনের আলোয় ঘর তখন হাস্‌ছে। পাশ ফিরে আর একটু গড়িয়ে নিতে ইচ্ছে যায়—ভিতর থেকে লাফিয়ে ওঠে 'P. K. 129!'—তড়াক্ কোরে লাফ দিয়ে শয্যা ত্যাগ করি।···

···হ্যালো!···"

···P. K 129?···হারু আছে? তাকে ডেকে দিন্ না প্লিজ—ও! তার সাথেই কথা বল্‌ছি? (বুকের মধ্যে দুর-দুর ক'রে ওঠে) ···না, আমি আগে নাম বল্‌বো না—বলো ত' কে?

···কি? পরিতোষ?···হ'ল না!

ওপাশের থেকে কোন শব্দ আসে না—।

(মা দুর্গাকে স্মরণ কোরে জোর গলায় অনুযোগ করি)···কি আশ্চর্য্য! এত কথার পরও আমায় চিনতে পারলে না?

…বাবা! এতক্ষণে চিনতে পারলে?—কবে এলাম? এই আজ শেষ রাত্রে। —কি ব্যাপার?—তাই তো বলবো—শোন ভাই, —আজ বিকেলে একটু আমার কাছে আসতে পারবে?

—কি…এখনই আসবে? (ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত nervous হয়ে পড়ি)…না না, তার দরকার নেই,,…ও! না, তোমায় আসতে বারণ করছি না—তবে কি জানো, অনেক দিন পরে দেখা হবে তো?—কাজেই প্রথম দেখাটা চায়ের টেবিলে হলেই জমবে ভাল।—কি বল্লে?…হ্যাঁ…তবে আমি আর একটা ঠিকানা দিচ্ছি ভাই—বাড়ীতে ঠাকুমার অসুখ—কাজেই স্থানান্তরে না যেতে পারলে আমাদের টেবিল জমবে না—কোথায়? …হ্যাঁ, ঠিকানা বল্‌ছি ভাল ক'রে লিখে নাও। …হয়েছে?—হ্যাঁ, শোন—

'—' নং '—' ষ্ট্রীট্।

…হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। আসবে কিন্তু অবশ্যই—সাড়ে চারটে আন্দাজ—না না, সে তোমার কোন ভয় নেই—ওটা আমার এক বন্ধুর বাড়ী, সে ছাড়া এখন কেউ নেই সেখানে। তার সাথে আলাপে তুমি নিশ্চয় খুশী হবে—আমি তিনটে থেকে সেখানে হাজির থাকব। তবে মনে করো, ঠিক তুমি আসবে যখন আমি বাড়ী না থাকতেও পারি। কাজেই শোনো—সেখানে গিয়ে 'বাসু মিত্র' বলে খোঁজ কোরো, বুঝলে? নিজের নাম বোলো আর কিছু কোরতে হবে না—তবে আমি সেখানে নিশ্চয় উপস্থিত থাকব—হ্যাঁ, আচ্ছা। দেখো, কিছুতেই যেন অন্যথা না হয়।…তা তো সত্যি—তবে আমারও কিছু কম লাভ হবে না তোমাকে পেলে। আচ্ছা!…

ফোন ছাড়ার সাথে সাথে প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাসও ছাড়ি নিজের অজ্ঞাতেই। তার পরই মা দুর্গার ওপর বড় বেশী কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ি। মনে মনে মানত ক'রে বসি—পাঁচ পয়সার ভোগ কালীঘাটে…!

* * *

…চারটে বাজার আগে থেকেই বাসুদের বাড়ীর সামনের 'ফুটপাথে' গিয়ে হাজির হই। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে—আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকে, ভয় করে, কি জানি এর শেষটা কেমন! যা হোক্, দেখা যাক কত দূর গড়ায়…।

…চারটে কুড়ি হয়ে গেল, অধীর আগ্রহে বাসুদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ ওদের দরজার কড়ায় হাত দেয় আমাদেরই বয়সী একটি ছেলে—ভারি সুশ্রী চেহারা আর আর্থিক স্বচ্ছলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তার সৌখীন পোষাক থেকে। তবে কি এই সেই হারু? আনন্দে ও ভয়ে মিশে আমি কেমন নিশ্চল বিহ্বল হয়ে পড়ি—তার পর? তার পর দেখতে পাই, অপর ফুটপাথে বাসু ও সেই ছেলেটির কথাবার্তা চলছে। কতক শুনতে পাই, কতক কাণে আসে না; বেশী এগোতে পারি না পাছে বাসু দেখে ফেলে! বাসুর গলায় শুনতে পাই—নীলু?…কই? সে তো এখানে থাকে না। আমি তার বন্ধু? কই, ও-নামে আমার কোনও বন্ধু আছে বলে তো মনে পড়ছে না!…কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার নাম বাসু মিত্রই বটে আর হ্যাঁ, এই তো আমার ঠিকানা। কার কারসাজী এ? সত্যিই হারু বলে কোনও নামের উল্লেখ নীলু বলে আমার কোনও বন্ধু করেনি।…হারু দমে যায় খুব, অপ্রস্তুত হয়েও পড়ে ভারি। একবার শেষ চেষ্টা করে—পকেট থেকে কাগজ বার কোরে বাড়ির ঠিকানা মিলিয়ে নেয়।

দু'জনেই চিন্তিত হয়ে পড়ে ভারি—ওরই মধ্যে হারু হয়তো ভাবে, ভাগ্যিস্ চা খাবার কথা সে উচ্চারণ করেনি—তাহলে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকতো না। ফিরে যাবে কি না ভাবছিল বোধ হয়, এমন সময় বাসু প্রস্তাব করে, যাকগে, যা হয়েছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। আসুন, চায়ের সময় হয়েছে, আমরা ভেতরে গিয়ে চাটা খাইগে, এতক্ষণে চা নিশ্চয়ই ready হয়ে গিয়েছে। হারু জোর আপত্তি জানায়—আবার ইচ্ছেও করে নিশ্চয়, কারণ বাসুকে নিশ্চয় ওর খুব ভালো লেগেছে—ও যে ভারি sweet! যে দেখে সেই যে ওকে ভালবাসে। আমার হারুকে দেখে মনে হতে লাগল, বাসুকে ওর বন্ধুর লিষ্টে ঢুকিয়ে নেবার ইচ্ছে কোরছিল নিশ্চয়। অবশেষে বাসুর কথাই থেকে যায়, ওরা দু'জনেই কথা বলতে বলতে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যায়।

এবার আমার ভেতর ঈর্ষা জেগে ওঠে। বাসু আমার অন্তরের বন্ধু, কে কোথাকার হারু, সে কি না ওর সাথে একা চা খাবে! না, এ কখনই হতে পারে না। তিন লাফে প্রায় ওদের সাথে সাথে আমি গিয়ে ঢুকে পড়ি। বাসু চমকে আমার দিকে চায় —আমি nervous হয়ে যাই, ও কি সব ধরে ফেললে?…

সে অনুযোগ জানায়—কি হে, তোমার দেখাই পাই না যে —ওর ডান হাতটা আমার পিঠের ওপর দিয়ে এসে আমার ডান কাঁধের ওপর পড়ে—জানিস্ ভাই, আজ ভারি মজা হয়েছে, কে বা কারা জ্ঞানে কি অজ্ঞানে এর এক বন্ধুর নাম করে এই ভদ্রলোকের কাছে ফোন করেন যে এঁর বন্ধু নীলুকে না কি এই সময়— আমার বাড়ীতে পাওয়া যাবে। শুধু তাই না, বিশেষ ভাবে অনুরোধ করে যে ক্ষেন অবশ্যই ইনি সময় মত এখানে উপস্থিত থাকেন।… আচ্ছা হারু বাবু, কোনও engagementএর ব্যবস্থা ছিল কি? কি, উত্তর দিচ্ছেন না যে—ও! হা—হা—চায়ের নেমন্তন্ন?—আচ্ছা, আপনার সে দিক দিয়ে যাতে কোনও ক্ষতি না হয় আমি তার ব্যবস্থা করছি। তবে আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু-মিলন তো আমার দ্বারা পূরণ হবে না, তবে যদি আমাকেও আজ থেকে আপনার এক বন্ধু বলে গ্রহণ করেন—দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মত। বাসু হাসতে থাকে। আমি ততক্ষণ গম্ভীর হয়ে হারুকে লক্ষ্য করি, ভারি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ও এই কথা শুনে। উচ্চকণ্ঠে বলে, আজ আপনার সাথে আলাপ হয়ে যে কি আনন্দ পেলাম বাসু বাবু! আজকের বিফলতার ভেতরে আমার জন্যে যে আনন্দ লুকানো ছিল তা সত্যিই অপূর্ব্ব! কিন্তু আপনি কিছু বলছেন না যে? আপনার সাথেও বন্ধুত্ব করতে পেলে ভারি আনন্দ পাব কিন্তু, আপনাদের ভারি ভাল লেগে গেছে আমার গোড়া থেকেই। বড় সুখী হই ওর এই সুন্দর নির্ম্মল সরলতায়। যেমনি সুন্দর চেহারা তেমনি অপরূপ কথা বলে। অনেকক্ষণ ধরেই ওর সাথে কথা বলার জন্য উস্‌খুস্ করছিলাম। বাসু বলে উঠল, ও আমার মামাত ভাই সতু—এক কথায় ওর পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় ভারি দুষ্ট, নিত্য-নোতুন দুষ্টুমী কোরতে ওর জোড়া মেলে না। হারু হাসতে থাকে—ভারি সুন্দর লাগে ওকে ও হাসে যখন। আমি ওর হাত ধরে বলি, আমি কিন্তু তোমায় আপনি বলতে পারব

না ভাই—। সে একগাল হেসে বলে, আমারও তাই ইচ্ছে, বলতে পারছিলাম না এতক্ষণ।

আমি বাস্তুর পিঠে হাত রেখে বল্লাম, কি রে, চুপ করে যে? ততক্ষণ চা ওটা এসে পড়ে—বাস্তু সেগুলো পরিবেশন করতে করতে বলে, ভাবছি তার কথা, যে আমাদের আজকের এই মহা-মিলনের নিমিত্ত। আমার কি মনে হয় জানিস্? সে নিশ্চয় আমাকে ও হারু বাবু—sorry ভাই, হারুকে অপ্রস্তুতে ফেলবার জন্যে এই চালাকী করে—, আমি নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসে বলি, আমার বিষয়ে হিসেবে তোকে কি কোন দিনও ভুল করতে নেই রে!—দু'জনের কেউ-ই কথার মানে ধরতে পারে না, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চায়। আমি আর চেপে রাখি না—ভেঙে দিই সব কথা। দু'জনেই তো হতভম্ব—বিশেষ করে হারুর মুখে তো কথাই সরে না! বোধ হয় তার নব-আবিষ্কৃত বন্ধুর দুষ্টুমীর দৌড় ঠিক করতে থাকে। বাস্তু তখনই সামলে ওঠে, সে বলে,„ ধন্য ছেলে তুই ভাই, আমি তো ও-রকম 'রং নাম্বারে ক্যানেকশ্যন্' হলে ভারি 'নারভাস্' বোধ করি।

আমি বলে উঠি, তাই বলে আমি তোমাকে শুক্‌নো মুখে ফেরাতাম না, Restaurantএ যাবার জোগাড় করে এসেছি। তা বাস্তুই যখন সে ভার নিল, রাত্রে আমার বাড়ী যেতে হবে কিন্তু! সেখানে আজ রাতে আমরা তিন জনে পিসিমার স্নেহের দৃষ্টির সামনে বসে খাব। হারু ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তোমার মা? বাস্তু ম্লান হেসে উত্তর দেয়, ও ধনে আমরা দু'জনেই বঞ্চিত, মাসীমাই ওর সব! হারু চমকে ওঠে, কি আশ্চর্য্য! মা যে আমারও নেই রে! সহানুভূতির দৃষ্টিতে আমরা ওর দিকে তাকাই। বাইরে তখন সূর্য্যদেব বিদায় নিয়েছেন। পশ্চিমাকাশ কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ রাঙা করে ফেলেছে। খোলা জানলা দিয়ে আমরা তিন জনেই সেদিক পানে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকি···।

প্রেস্‌ক্রিপসন্

প্রভাকর মাঝি

মশা যদি কামড়ায়—ঠিক রাত দুপুরে,
টুব ক'রে ডুব দিও 'টুবকী'র পুকুরে।
ঘাম-কোঁড়া চুলকালে কামরাঙা চিবিয়ে
মিট্‌মিটে বাতি দিও এক ফুঁয়ে নিবিয়ে।
চিনি-পাতা দৈ খেয়ে সর্দ্দি কি জমেছে?
চট্‌পট্ খৈ খেও—দেখবে তা' কমেছে।
পিলে যদি চমকায় কারো এক হাঁচিতে
তখুনি পাঠাও তারে একদম রাঁচীতে।
চিটে গুড় লাগে কেন দায়ে-কাটা তামাকে?
জিগ্যেস ক'রে দেখো ওর সেজো মামাকে।
প্যাঁচ-দেওয়া অঙ্কটা মিলবে না যখুনি।
গুণে গুণে ন'টা ডন টেনে দাও তখুনি।
জলসায় ভালো গান গাইতে কি চাও হে?
কোকিলের আধ-পোড়া মাংসটা খাও গে।
ভেবে ভেবে ছন্দটা না মিললে শেষটা
মোর কাছে এসে নিয়ে যেও উপদেশটা।

নাগপাশ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ষোল

রাতের অভিসার

সুব্রত কিন্তু থানা হতে বের হয়ে মোটর হাঁকিয়ে বরাবর অসীম বাবুর বাসাতেই এসে হাজির হলো।

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা।

অসীম বাবু তখনও বিনিদ্র ভাবে ছোট ভাইয়ের অপেক্ষায় বসেছিলেন।

দরজার কড়া নাড়তেই অসীম বাবু দরজা খুলে হ্যারিকেনের আলোর সামনে সুব্রতকে দেখে বিস্মিত ভাবে তার মুখের দিকে চাইল: 'আপনি?'

'হাঁ···চলুন ঘরের ভিতরে কথা আছে।'

সুব্রত এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল বিনা আহ্বানেই।

'অসীম বাবু, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, একটা দুঃসংবাদ আছে।'

'নিশ্চয়ই সুসীমের কিছু হয়েছে! বলুন, চুপ করে আছেন কেন?' একরাশ উৎকণ্ঠা যেন অসীমের কণ্ঠ হতে ঝরে পড়ল।

'হাঁ!···'

'বলুন! বলুন না, চুপ করে আছেন কেন? কি হয়েছে সুসীমের?'

'ট্রেণে কাটা পড়েছেন আপনার ভাই।'

একটা অস্ফুট আর্ত্ত চিৎকার করে অসীম বাবু দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। সুব্রত স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, একটা অবরুদ্ধ কান্নার আবেগ রোধ করবার জন্য অসীম বাবু প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

সুব্রত ব্যথিত দৃষ্টিতে অসীম বাবুর দিকে তাকিয়ে বসে রইলো।

প্রায় দীর্ঘ দশ-পনের মিনিট ওই ভাবে থাকবার পর অসীম বাবু মুখ তুলল। তার দু'চোখের কোল বেয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে; বললে, 'আমি জানতাম। আমি জানতাম সুব্রত বাবু' সুসীর ভাগ্যে এক দিন এই ঘটবে!···কিন্তু কি ক'রে এমন ঘটলো?'

সুব্রত সংক্ষেপে তখন আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বললে। 'আপনাকে এত বড় একটা দুঃসংবাদ দিতে হলো বলে সত্যিই আমি একান্ত দুঃখিত অসীম বাবু!'···

'না না, এতে আপনার কি দোষ সুব্রত বাবু!···আমি জানতাম এই এক দিন ঘটবে!···আমি জানতাম।'

'ভারতী-ভবনের সে রাত্রের সেই ঘটনার পর, আমার কেন যেন মনে একটা সন্দেহই হয়েছিল, হয়ত খুব শীঘ্রই আপনার ভাইয়ের বড় রকমের একটা বিপদ ঘটবে। এমন কি, তার জীবন-সংশয়ও হতে পারে!'···সুব্রত বললে।

'আমারই দোষ সুব্রত বাবু। আমারই বোঝবার ভুল। আমিই আপনাকে ঠিকমত বিচার করতে পারিনি। 'আপনার কি মনে হয়, কেউ তাকে ইচ্ছা ক'রেই গাড়ীর দিকে ঠেলে দিয়েছে?'

'তা ত বলতে পারি না অসীম বাবু, কেন না আসল ঘটনার সময় সাক্ষী সেখানে একমাত্র সুখদাশ ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউই ছিল না।'

'সুখদাশ বলেছে, তাকে সে বাঁচাইবারই চেষ্টা করেছিল।'

'মনে হচ্ছে, তাতে যেন আপনি একটু আশ্চর্য্যই হয়েছেন, কেমন না?'

অসীম বাবু চকিতে একবার সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল, তার পর বললে, 'সত্যিই ব্যাপারটা আমি এখনও যেন বুঝে উঠতে পারছি না সুব্রত বাবু।'

'আচ্ছা অসীম বাবু, ২'৪ দিন আগে ঠিক সন্ধ্যার আগে সুখদাশ কেন আপনাদের বাড়ীতে এসেছিল জানতে পারি কি?'

'কে বললে? সে কথা সে বলেছে না কি?

'না, সে বলেনি কিছু, আমিই তাকে এ-বাড়ী হতে বের হতে দেখেছিলাম সেদিন সন্ধ্যার দিকে।'

'না না, সে ত আসেনি, নিশ্চয়ই আপনার দেখবার ভুল হয়ে থাকবে সুব্রত বাবু।'

সুব্রত কতকটা দৃঢ় স্বরেই এবার জবাব দিল, 'না অসীম বাবু, আমার দেখবার ভুল নয়। পরে সুখদাশের কথায় কতকটা জানতে পেরেছি, কেন সেদিন সন্ধ্যায় সে আপনাদের এখানে এসেছিল। আমি আপনার, বক্তব্যটাও শুনতে চাই। দু'পক্ষের কথা শুনলে ব্যাপারটা ভাল করে আমার বুঝবার সুবিধা হতো।'

অসীম বাবু সুব্রতর কথায় সহসা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পরে ধীর-গম্ভীর স্বরে বললে, 'সে কথার আমি জবাব দিতে অক্ষম সুব্রত বাবু। ক্ষমা করবেন। আর সে যদি এ-বাড়ীতে সেদিন সন্ধ্যার সময় এসেই থাকে, সে এমনিই এসেছিল, তার আসার মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। এবং সে ব্যাপারের সংগে আপনার কোন সম্পর্কই নেই।'

'ওঃ! কিন্তু কাল যখন দারোগা বাবু এসে আপনাকে প্রশ্ন করবেন, আপনার ভাই সে-রাত্রে ভারতী ভবনে কেন সুখদাশকে গুলী করে খুন করতে গেছিল, তার কি জবাব দেবেন সে কথাটা ভেবে রেখেছেন কি?'

'কিছুই না! বলবো জানি না, বলতে পারি না! এর মধ্যে আবার ভাবাভাবির কি আছে?'

সহসা সুব্রত অসীম বাবুর দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললে, 'এখনও কি আপনি সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারছেন না অসীম বাবু? এখনো আপনি আমার কাছে সব লুকিয়েই রাখবেন? শুনুন অসীম বাবু, আমাকে ভুল বুঝবেন না, আপনি যা ভাবছেন তা আমি নই, আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতিই হবে না। আপনাকে এ বিপদে আমি সাহায্যই করতে চাই। এখনো আমাকে বিশ্বাস করে সব খুলে বলুন!···আপনাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

সুব্রতর কথায় সহসা যেন অসীম বাবু ভেংগে পড়ে। তার পর ক্লান্ত-অবসন্ন স্বরে বলে, ক্ষমা করুন সুব্রত বাবু, আমি সবই বুঝতে পারছি কিন্তু তবু কিছু বলতে পারবো না। না···না···না! আপনাকে সব কথা খুলে বলবার মত আমার মনের বল নেই! আশা এখনো আমি ছাড়িনি!···আশা আমি ছাড়তে পারবো না। অসম্ভব!··· আপনি জানেন না। আপনি বুঝতে পারবেন না।'

'বেশ, তবে তাই হোক! আপনি যখন নিজে থেকে কিছুতেই বলবেন না, বলতে পারেন না, আপনাকে এ জন্য আর পীড়াপীড়ি করবো না। তবে আপনিও জেনে রাখুন, সব আমি জানবোই, আজ হোক, আর কালই হোক। আমি সব জানবই! গোপন আমার কাছে কিছুই থাকবে না। যাক্ সে কথা, আপনার কাছে আমার আ'র একটি অনুরোধ আছে। বলুন, রাখবেন?'

'সাধ্যে কুলালে, সম্ভব হলে নিশ্চয়ই রাখবো।'

'এ-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে।'

'কেন?'

'বললুম ত', আমার অনুরোধ! এজায়গাটা বড় নির্জ্জন, আপনার বাড়ী হতে চিৎকার করলেও কেউ আসে-পাশে শুনতে পাবে না। বলুন, অন্য জায়গায় যাবেন ত।'

অসীম কি যেন একটু ভাবলে, তার পর বললে, 'বেশ যাবো, বাজারের দিকেই যাবো।'

'হাঁ কালই যাবেন।'

'এ বাড়াবাড়ি!'

'হাঁ! আচ্ছা, আজ তবে আসি, নমস্কার!' সুব্রত অসীম বাবুর বাড়ী হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

পরের দিন প্রত্যূষে।

চা-পর্ব্ব শেষ করে সুব্রত তার গাড়ীটা নিয়ে বের হলো। শীতের শান্ত প্রভাত। কাল সারাটা রাত্রি সুব্রত একবারও চোখের পাতা বোজাতে পারেনি। ঘটনার জাল ক্রমশঃ কি ভাবে জটিল হয়ে উঠছে একটু একটু করে, সেই কথাই সে সারাটা রাত অনিদ্রিত ভাবে শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছে। সুসীমের মৃত্যুটা এমন কিছু আকস্মিক নয়। সেটা ঘটনার স্রোতের মুখ দেখে স্পষ্টই অনুমান করেছিল; সুসীমের মাথার 'পরে মৃত্যু তার উদ্যত খড়্গ তুলে ধরেছে। তবে সে ভাবতে পারেনি, এত আচম্কা এই ভাবে মৃত্যু এসে হানা দেবে।

সুব্রত গাড়ী চালিয়ে সোজা ভারতী-ভবনে এসে প্রবেশ করল।

বাইরেই সুখদাশের সংগে দেখা হয়ে গেল। সুখদাশ অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নিচু করে বাইরের বারান্দা দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে চলছিল।

সুব্রত ডাকলে: 'সুখদাশ!'

ভূত দেখার মতই চম্‌কে সুখদাশ সুব্রতর আহ্বানে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল।

সুব্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুখদাশের মুখের দিকে তাকায়: এক রাত্রের মধ্যেই তার মুখের চেহারার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে! চোখের কোলে কালী; চোখের দৃষ্টিতে একটা সংকুচিত ভয় যেন ফুটে বের হচ্ছে।

সুব্রত লক্ষ্য করলে, সুখদাশের হাতের আংগুলগুলো যেন কাঁপছে।

'তোমাদের ছোট বাবু, মানে অনুতোষ বাবু আছেন?'

'আজ্ঞে, লাইব্রেরী-ঘরে বসে পড়ছেন।'

সুব্রত লাইব্রেরী-ঘরের দিকে অগ্রসর হলো। লাইব্রেরী-ঘরে পূব দিক্‌কার একটা খোলা জানালার সামনে, একটা কাউচে বসে অনুতোষ বাবু গভীর মনোযোগের সংগে কি একখানা মোটা বই পড়ছেন। পায়ের 'পরে একটা কমলা লেবু রংয়ের দামী শাল: খোলা জানালা-পথে শীতের এক টুক্‌রো রোদ পায়ের নীচের কার্পেটের 'পরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

'নমস্কার !'···

সুব্রতর কণ্ঠস্বরে অনুতোষ বাবু চমকে মুখ তুললেন ; সুব্রতকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে আহ্বান জানালেন : 'সুব্রত বাবু ! আসুন !'···

সুব্রত এগিয়ে পাশের কাউচটার 'পরে বসল ।

'চা আনতে বলি ?'

'চা ! তা বলুন !'···

কিন্তু আদেশ দেওয়ার পূর্বেই দেখা গেল, একটা ট্রেতে করে এক কাপ ধূমায়িত গরম চা নিয়ে সুখদাশ ঘরে প্রবেশ করছে । সুখদাশ চায়ের কাপটা সামনের টি'পয়ের 'পরে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ।

গরম চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে, সুব্রত বললে, 'কাল রাত্রের ঘটনা সব শুনেছেন বোধ হয় অনুতোষ বাবু ?'

'হাঁ, শুনলাম সব সুখদাশের মুখেই । বেচারা ত অত্যন্ত মুশড়ে পড়েছে ।'

'কেন ?'

ওর ধারণা, সুসীম বাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিশে না কি ওকেই সন্দেহ করেছে ! তাদের ধারণা, ওই হয়তো অন্ধকারে সুসীম বাবুকে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রেণের তলায় ফেলে দিয়েছে । কিন্তু আমি তা ভাবতেই পারি না । ও কেন সুসীম বাবুকে ওভাবে হত্যা করতে যাবে ? ওতে ওর স্বার্থই বা কি ?'

'না না, পুলিশে সুখদাশকে ত সন্দেহ করেনি ।' সুব্রত বললে ।

'সত্যি । আমারও ত তাই মনে হয় ; এ রকম ভাবাটাও আমার মনে হয় বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয় । আমারও বদ্ধ ধারণা সুব্রত বাবু, সুখদাশ সুসীম বাবুকে বাচাবার জন্যই ছুটে গেছিল । বাঁচাতে পারলে না বলে ওর আফশোষও কম হয়নি । আপনার কি মনে হয় সুব্রত বাবু ?'

অমি ত' ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না । সুব্রত মৃদু স্বরে জবাব দিল ।

'দেখুন সুব্রত বাবু, পুলিশের লোকেরা মনে হয় আমার সংগে যেন ঠিক ব্যবহার করছে না । দোষী হোক আর নির্দোষই হোক, আমার বাড়ীর ভৃত্য সুখদাশ যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, সে ক্ষেত্রে ঐ ঘটনার পর তাদের আমাকে একটা সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল না কি ? যে ব্যাপারে আমার বাড়ীরই এক জন ভৃত্য ঘটনাচক্রে সংশ্লিষ্ট, সে ব্যাপারটা জানবার কি আমার অধিকার নেই ? আমারও অবস্থাটা একটি বার ভেবে দেখুন সুব্রত বাবু ! প্রথমে আমারই বাড়ীর নায়েব খুন হলো । তার পর আর একটা দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যুর সংগে আমারই বাড়ীর আর এক জন ভৃত্য জড়িয়ে পড়লো, এর পর আর আমার বাড়ীতে যদি কেউ না চাকরী করতেই চায়, তবে ত তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না । বাইরের লোকের এ-বাড়ীর সম্পর্কে ধারণাটাই বা কি হবে ? আর পুলিশের লোক সুসীমের মৃত্যুর জন্য সুখদাশকেই বা সন্দেহ করবে কেন ? অবিশ্যি আপনি বলতে পারেন, বিপদে পড়লে অমন অনেক গল্পই হয়ত লোকে বানিয়ে বলতে পারে, কিন্তু সুখদাশের মত এক জন লোক ও-রকম কিছু গল্প বানিয়ে বলবে, আমার ত বিশ্বাস হয় না ।'

'কথাটা ঠিক তা নয় অনুতোষ বাবু ! সুখদাশ পুলিশের জবানবন্দীতে যা বলেছে, সেটা তার ঐ সময় রেলের লাইনের ধারে উপস্থিত থাকবার পক্ষে sufficiently explanation নয় ।'

'হাঁ, এখন ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি । সত্যি, আমিও তাকে এ-কথাটা জিজ্ঞাসা করতে একেবারেই ভুলে গেছি । কেন সেখানে ঐ সময় গেছিল, তার কি এমন দরকার ছিল ঐ সময় সেখানে যাওয়ার ।'

সুব্রত তখন গত রাত্রে সুখদাশের জবানবন্দীটা সংক্ষেপে খুলে বললে ।

'আশ্চর্য্য ! এ সব ব্যাপার কিছুই আমি জানি না সুব্রত বাবু ! আমার এখন মনে হচ্ছে, হয়ত সুখদাশ ও সুসীমের মধ্যে এমন কোন কারণ কোন দিন ঘটেছিল, যাতে করে সুখদাশের সুসীমের পরে একটা আক্রোশ ছিল । সে কথাটা সুখদাশ হয়ত একেবারেই চেপে গেছে ।'

'আমারও ত তাই মনে হয় অনুতোষ বাবু ।'

হঠাৎ এক সময় অনুতোষ বাবু প্রশ্ন করলেন, 'ভাল কথা, অসীম বাবু কি এখনও ঐ বাড়ীতেই থাকবেন না কি ?

'না, তিনি বোধ হয় এতক্ষণ সহরের দিকে কোথায়ও উঠে গেছেন । একা একা ও-রকম নির্জন জায়গায় থাকাটা ভাল হবে বলে আমার মনে হয় না ।'

'হাঁ ! জায়গাটা সত্যিই বড় নির্জন ! চিৎকার করে ডাকলেও আশ-পাশ হতে সাড়াশব্দ পাবেন না ।'

* * *

সুজিতকে অসীম বাবুর ওখানে পাঠিয়ে সুব্রতই তার একটা ব্যবস্থা করে দিল ।

গংগার ধারে সুজিতের বন্ধুর একটা একতলা বাড়ী খালি পড়ে ছিল, দুপুরের দিকে অসীম তার সামান্য কিছু জিনিষ-পত্র সংগে নিয়ে ভারী জিনিষগুলো ও-বাড়ীতেই রেখে সদরে তালা-চাবী দিয়ে নতুন বাসায় উঠে যাবে ঠিক হলো ।'

সুব্রত নিজেই গাড়ী নিয়ে এসেছিল ।

সদরে তালা-চাবী দিয়ে সামান্য কিছু অতি-আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র নিয়ে সুব্রতর সংগে অসীম বাবু সুব্রতর গাড়ীতে এসে উঠে বসল ।

অর্দ্ধেক পথ আসবার পর হঠাৎ সুব্রত গাড়ীতে ব্রেক কষে বললে : 'যাঃ, আমার দামী সিগ্রেটের কেসটা বোধ হয় আপনার বাইরের ঘরের টি'পয়ের 'পরে ফেলে এসেছি ।'

সুব্রত গাড়ী ঘুরাল ।

অসীমের বাড়ীর কাছাকাছি এসে সুব্রত বললে : 'আপনি বসুন গাড়ীতেই অসীম বাবু ! আপনার চাবীটা দিন, আমি চট্ করে ঘুরে দেখে আসি ।'

অসীম গাড়ীতে বসে রইলো, সুব্রত চলে গেল ।

মিনিট কুড়ি বাদে সুব্রত ফিরে এল, সিগ্রেট্-কেসটা হাতে করে ।

'পেলেন ?'

'হাঁ ! চলুন এবার ।'

সুব্রত গাড়ীতে উঠে বসে আবার ষ্টার্ট দিল ।

* * *

রাত্রে সুজিতদের বাড়ীতে সকলে টেবিলে রাত্রের আহারে বসেছে ।

সুব্রত একটা মাছের চপে কামড় দিতে দিতে বললে, 'মাসীমা, রাত্রে হয়ত আমি একবার বেরুতে পারি।'

'বল কি? এ শীতের রাত্রে আবার এখন কোথায় বেরুবে? প্রশ্ন করলেন সুজিতের বাবা।

'এখন নয়, তবে পরে বের হতে পারি।'

সুব্রত আহারের পরে উপরে শুতে গেল না। বাইরের ঘরেই বসে রইলো। একটা বই উল্টাতে লাগল।

রাত্রি ঠিক বারটার সময় ফোন বেজে উঠল, ক্রিং···ক্রিং···!

সুব্রত প্রস্তুত হয়েই ছিল। চট্ করে উঠে গিয়ে ফোন ধরলে: 'হ্যালো? yes! speaking.'

তার পর ফোনে কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা চললো। শেষে সুব্রত বললে: 'O. K. thanks!' ফোনটা ও নামিয়ে রাখল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে সুব্রত আবার ফোনটা তুলে বললে: 'হ্যালো!···put me···কে? সুশান্ত বাবু?'

ও-পাশ হ'তে জবাব হলো: 'হাঁ! হঠাৎ এত রাত্রে ব্যাপার কি?'

'কিছু না, দেখছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না?'

'এত রাত্রে ঠাট্টা সুরু করলেন না কি মিঃ রায়?'

'ঠাট্টা নয়, একটা বিশেষ জরুরী ব্যাপারে ডেকেছি। আমার সংগে এখন একবার বাইরে বের হতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই! কেন বলুন ত? কোথায় যাবেন?'

'জলদি সুজিতের এখানে চলে আসুন। সাক্ষাতে সব কথা হবে।'

'বেশ। আমার পা-গাড়ীতেই আসছি।'

'হাঁ আসুন। তার পর আমার গাড়ীতে বের হবো।' সুব্রত ফোনটা নামিয়ে রাখল।

* * * *

অন্ধকার রাত্রি। এখনো চাঁদ উঠতে বোধ হয় আধ ঘণ্টা দেরী। কাছের মানুষ পর্য্যন্ত নজর চলে না। নিকষ কালো অন্ধকারে কোন বিরাটকায় প্রেতের রক্তচক্ষুর মত যেন দপ্‌ দপ্ করে জ্বলছে।

শীতের রাত্রি নিঃসাড় নিঝুম।

সুব্রত মন্থর গতিতে তার গাড়ীখানা ড্রাইভ করে চলেছে; তার পাশেই ফ্রন্ট-সীটে বসে সুশান্ত সেন। কারও মুখেই কোন কথা নেই।

গাড়ী চলেছে অসীম বাবুর বাড়ীর দিকে।

'অসীম বাবুর আগের বাড়ীটার দিকেই যেন চলেছেন বলে মনে হচ্ছে মিঃ রায়?' সুশান্ত প্রশ্ন করে।

'হাঁ!···একটা সূত্র সেখানে খুঁজে পাবো আশা করছি। এক জন লোক এই রাত্রে অসীম বাবুর ঘরে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকবে, লক্ষ্য রাখবেন।'

'তাই না কি! অবিলম্বে তাহ'লে তাকে arrest করবো।

'না। আমরা যখন সেই লোকটিকে arrest করবো, তখন তাকে খুনের অভিযোগেই arrest করবো, চোরের মত অন্যের গৃহ-প্রবেশের জন্য নয়।'

সুব্রত আম-বাগানের কাছে এসে অন্ধকারে গাড়ীটার ইনজিন বন্ধ করে দিল।

গাড়ী হতে নেমে দু'জনে আগে-পিছে অন্ধকারে অসীমের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো।

অন্ধকারে একতলা বাড়ীটা একটা ছায়ার মতই মনে হয়।

কিন্তু সুব্রত সামনের দরজার দিকে না গিয়ে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে বাড়ীটার পিছনের দিকে অগ্রসর হলো।

বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে চষা জমি!···বাড়ীর সীমানা এক-বুক সমান প্রাচীরে ঘেরা।

বাড়ীতে প্রবেশ করবার পিছন দিকেও একটা দরজা আছে; সুব্রত দরজাটা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

দ্বিপ্রহরে সিগ্রেট-কেস্ আনবার ছল করে সুব্রত আগে হতেই দরজাটা ভিতর হতে খুলে রেখে গেছিল।

সামনেই একটা সরু ফালি মত বারান্দা: নিশ্ছিদ্র আঁধার!··· যেন কালো বাদুড়ের ডানার মত ছড়িয়ে আছে।

অন্ধকারেই সুব্রত সতর্ক পদ-সঞ্চারে এগিয়ে চলে। সুশান্ত সুব্রতকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে।

কবরখানার মত বাড়ীটা নিস্তব্ধ।···আকাশে বোধ হয় চাঁদ উঠেছে, একটু অগ্রসর হতেই দেখা গেল, মৃতের চাউনির মত খানিকটা ফ্যাকাশে চাঁদের আলো অলিন্দ-পথে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

দু'জনে এসে বড় ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করল।

বাগানের দিক্‌কার জানালার কবাট দু'টো খুলে দিতেই সামান্য একটু চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে পিছলিয়ে পড়ল।

সুব্রত বাকী জানালা দু'টোও ঘরের খুলে দিল।

'ব্যাপার কি? সব জানালাগুলো খুলে দিচ্ছেন।'

'বাইরে থেকে আগন্তুক মনে করবে, গৃহস্বামী আবার হয়ত রাত্রে ঘরে ফিরে এসেছেন। তার পর চাপা স্বরে সুশান্তর দিকে ফিরে তাকিয়ে সুব্রত বললে: 'Now listen to me Mr. Sen. আপনি যদি এখন আমার কথা মত কাজ করেন; তবে খুনীকে আপনি আজ রাত্রে এই মুহূর্ত্তে এই বাড়ীতেই ধরতে পারবেন।'

সুশান্ত যেন বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে। 'খুনী!'

'হাঁ, আসল ও অকৃত্রিম খুনী: কোন্নগর হত্যারহস্যের মেঘনাদ ও এখানকার ভূতপূর্ব জমিদার শ্রীযুক্ত বিলাস চৌধুরীর হত্যাকারী!···এখন কি করতে হবে শুনুন, আমি বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করবো। আর আপনি, এই যে অসীম বাবুর পরিত্যক্ত শয্যাটা দেখছেন খাটের 'পরে, ঠিক খোলা জানালাটার নীচে, ওটার 'পরে গিয়ে বেশ করে চাদর মুড়ি দিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ুন। সে এখুনি হয় ত এসে পড়বে। কিন্তু সাবধান, ঘুমিয়ে যেন পড়বেন না, আপনার আবার শুনতে পাই যেখানে সেখানে নিদ্রাটি আছে সাধা। কেন না যিনি এখানে আসছেন, তিনি হয়ত আপনাকে গলা টিপে মেরে ফেলবারও চেষ্টা করতে পারেন, অথবা ক্লোফরম করে একেবারে গায়েব করবারও চেষ্টা করতে পারেন।'

'আপনি কি বলতে চান মিঃ রায়, সুখদাশ অসীম বাবুকে খুন করতে বা গায়েব করতে এত রাত্রে এখানে আসছে?'

'না, যতক্ষণ আমি এখানে আছি, কেউ অসীম বাবুর মাথার একটি চুলও স্পর্শ করতে পারবে না। যান, আর দেরী করবেন না। চটপট শুয়ে পড়ুন! যিনি এখানে আসছেন, তিনি আপনাকে খুন করবারই চেষ্টা করুন অথবা গায়েব করবার চেষ্টা করুন, চেষ্টা করবেন তার মুখটা দেখে নিতে। মুখটা চিনে রাখতেই হবে।···আমি চললুম!' সুব্রত পাশের ঘরে চলে গেল।

পাশের ঘরে ঢুকে একটা খালি চেয়ারের 'পরে সুব্রত বসে গা এলিয়ে দিল। [ক্রমশঃ

গল্প হলেও সত্যি

অঞ্জলি আচার্য্য

...আমেরিকার যুদ্ধের সময়কার একটি ছোট্ট ঘটনা। ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদলের নায়ক তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে কোন একটি ভারী বস্তু তুলিতে আদেশ করিতেছিলেন। কিন্তু বস্তুটি অতিমাত্রায় ভারী হওয়ার দরুণ অল্পসংখ্যক সৈন্যগণ তাহা উঠাইতে অসমর্থ হইতেছিল। সৈন্যদলের নায়কটি দাঁড়াইয়া কেবল তাহাদের উহা তুলিতে আদেশই করিতেছিলেন।

ঠিক সেই সময় সাধারণ বেশ-ভূষায় সজ্জিত এক জন ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়িয়া সেই স্থানে উপস্থিত হন। তিনি সৈন্যদলের নায়ককে বলিলেন—"আপনি কি উহাদের দ্রব্যটি তুলিতে একটু সাহায্য করিতে পারেন না?"

ক্ষুদ্র সেনা-নায়কটি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া উত্তর দিলেন—"মহাশয়, আমি এক জন "কর্পোরাল" (সেনা-নায়ক)।

তখন ভদ্রলোকটি লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"সত্যি? আমি তাহা জানিতাম না; সুতরাং মিঃ কর্পোরাল, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।" বলিয়া তিনি তাঁহার মস্তক হইতে টুপী খুলিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

তার পর তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া সৈন্যগণকে ঐ বস্তুটি তুলিতে সাহায্য করিলেন এবং বহু পরিশ্রমের পর তিনি উহা উঠাইতে সমর্থ হইলেন। এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে তাঁহাকে খুবই পরিশ্রম করিতে হইল এবং তাঁহার কপাল হইতে ঘাম ঝরিতেছিল। কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি সৈন্যদলের নায়ককে বলিলেন—"মিঃ কর্পোরাল, আপনার যখন এইরূপ কার্য্য থাকিবে এবং প্রচুর লোক না থাকিবে, তখন আপনি যদি দয়া করিয়া 'কমাণ্ডার-ইন-চীফ'কে (প্রধান সেনাপতি) খবর দেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আসিয়া আপনাকে সাহায্য করিব।" বলিয়া তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন।

তখন সেই গর্ব্বিত ক্ষুদ্র সেনা-নায়কটি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঐ ভদ্রলোকই আমেরিকার যুদ্ধের সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি মিঃ "জর্জ্জ ওয়াসিংটন"।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীরঞ্জিতপ্রসন্ন সেন

বহু বৎসর পূর্ব্বে 'তেলিরবাগে' ঘুমন্ত এক মধ্য-রাত্রে একটা নৌকা এসে লাগল তীরে···

শীতের রাত্রি···ঘন কুয়াসা 'তেলিরবাগ'কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সুনসান। ভয়ানক শীত···

নৌকোর যাত্রীর এখানে কোনও গৃহ বা আত্মীয় নেই···যাত্রী ঠিক করলেন, সে রাত্রিতে স্থানীয় জমিদার···দাশ মশাইদের গৃহে অতিথি হবেন। জমিদারের পূরো নাম হল, চন্দ্রকান্ত দাশ। অতিথি-সেবা তিনি জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান ধর্ম্ম বলে মনে কোরতেন—দান করতেও তাঁর দক্ষিণ হস্ত মুক্ত ছিল। সারা জীবনই তিনি দান-ধর্ম্ম ক'রে কাটাতেন। তাই তাঁর গৃহ হতে কোনও দিন অতিথি বিমুখ হয়ে ফিরে যাননি···।

সেই দিবস চন্দ্রকান্ত কোনও কাজে গৃহে ছিলেন না।···গ্রামান্তরে যাওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। কিন্তু অতিথি-সেবার ভার নায়েব মশাইর ওপর অর্পণ ক'রে যান।···কোন সময়েই যেন অতিথি ফিরে না যান।···

বহু ডাকাডাকির পর নায়েব মশাইর সাড়া পাওয়া গেল। যাত্রী গিয়ে অন্ধকারপূর্ণ বাইরের কক্ষে বসলেন।

নায়েব মশাই ভৃত্যকে দিয়ে খবর নিলেন—অতিথি অভুক্ত··· ও ক্লান্ত।···

বিষণ্ণ ও অতিশয় বিরক্ত হয়ে নায়েব সামান্য ডাল আর ভাতের মাত্র আয়োজন ক'রে দিলেন।

খাবার সময় অতিথি বললেন—এত বড় প্রসিদ্ধ জমিদার-বাড়ীতে একটু মাছও নেই?

নায়েব অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে জানিয়ে দিলেন—কতখানি নির্লজ্জ তিনি।

পরদিবস প্রাতেই চন্দ্রকান্ত স্বয়ং ফিরে এলেন।

মধ্যাহ্নে খাবার সময়ে মাছ এবং অন্যান্য তরকারি সরিয়ে রেখে—ডাল-ভাত দিতে বললেন।

নায়েব উপস্থিত ছিলেন। বললেন—হুজুর, সরিয়ে রাখলেন যে? অতিশয় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ বললেন—যে বাড়ীতে অতিথি যেচে চেয়েও মাছ বা ভাল কোনও তরকারি পায়নি, সে বাড়ীর কর্ত্তা কোন লজ্জায় ভাল ভাল খাদ্য খাবে?···

নায়েব বুঝতে পারলেন। গত রাত্রিতে তাঁর প্রভু স্বয়ং অতিথির ছদ্মবেশ নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা কোরতে এসেছিলেন। মাথা নত হয়ে যায় নায়েবের ভয়ে ও লজ্জায়।

অবশ্যি পরে ক্ষমা করেছিলেন চন্দ্রকান্ত দাশ।

এই দাশ মশায় কে ছিলেন জান?···ইনিই হচ্ছেন দেশবন্ধুর প্রপিতামহ।

চিত্তরঞ্জনের দান-কাহিনী বাংলা দেশ—বাংলা দেশ কেন, সারা ভারতবর্ষ ভরা। তার কাছ থেকে কেউ কোন দিন নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে বলে আজও শোনা যায়নি। প্রতি মাসের প্রথমেই অজস্র মণি-অর্ডার মেঘখণ্ডের ন্যায় ভারতের দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ত। মণি-অর্ডারের সংখ্যা ক্রমশ এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ডাক-বিভাগ স্বতন্ত্র একটি পোষ্ট অফিস তাঁর বাড়ীতে খোলবার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

আদালতে যাবার সময় মোটরে উঠছেন। এমন সময় এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নমস্কার করে কুণ্ঠিত হয়ে জানালেন, দাশ সাহেবের সঙ্গে কি ভাবে দেখা করতে পারি বলতে পারেন? অনেক বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বাড়ীর লোকেরা···। আর বলতে পারেন না।

চিত্তরঞ্জন বুঝলেন যে লোকটি তাকে চেনে না। তিনি বললেন আপনার কি দরকার?

ব্রাহ্মণ অশ্রু-সজল চোখে বললেন, অনেক দূর থেকে এসেছি। আমি বড়ই দরিদ্র। মেয়ের বিয়ে [illegible]

গেছে। শুনেছি তিনি দেবতা—মহৎ। তাঁর কাছ থেকে কেউ বিমুখ হয় না। তাই···

চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মণকে গাড়ীতে তুলে বললেন—তিনি আদালতে গিয়েছেন, চলুন, সেইখানে দেখা করিয়ে দেবো!

গাড়ীতে ব্রাহ্মণের দু'-চোখ বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আদালতে নেমে ব্রাহ্মণকে এক জায়গায় অপেক্ষা কোরতে বলে তিনি চলে যান!

কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন কর্ম্মচারী এসে ব্রাহ্মণকে পাঁচশো টাকার চেক দিয়ে বললেন—দাশ সাহেব আপনাকে দিয়েছেন।

বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে বললেন—কিন্তু···তিনি যে আমাকে দেখেননি?···

লোকটি হেসে বললে, আপনি যে তাঁর সাথেই গাড়ীতে এসেছেন।

চিত্তরঞ্জনের দানের নেশা—সমস্ত জীবনকে তাঁর এক মহাদান মহোৎসবে ব্রতী করেছেন।

একটি মজার গল্প

শ্রীকনককুমার বসু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এক জন তরুণ 'লেফ্‌টেন্যান্ট'কে 'ক্যাপ্টেন' পদে উন্নীত করা হইয়াছিল। কিন্তু ভুলক্রমে "১লা এপ্রিল, ১৯৪১ সাল"এর পরিবর্ত্তে 'লণ্ডন গেজেটে' ১লা এপ্রিল, ১০৪১ সাল ছাপা হইয়াছিল।

'বন্ধুরা আসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিল: হাসি-খুশীতে 'মিলিটারী মেস' ভরপুর। ইহার মধ্যে কয়েকটি চপল প্রকৃতির বন্ধু 'ক্যাপ্টেন'কে পরামর্শ দিল যে, "যখন ১০৪১ সাল ছাপা হইয়াছে, তখন তুমি অতীত বৎসরের মাহিনা ও মাগ্‌গী ভাতা দাবী করিয়া আবেদন জানাও।" যথারীতি রাজকীয় বিধি আইনের ধারা ও উপধারা মতে আবেদন-পত্র পেশ করা হইল। নিছক ঠাট্টা-তামাসা করিবার জন্যই তাহারা এইরূপ করিল। কিন্তু কয়েক দিন পরেই সেই তরুণ ক্যাপ্টেন হৃদয়ঙ্গম করিল যে, হাসি-তামাসায় কি ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে!

কয়েক দিন পরে উত্তর আসিল "১০৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভাতা ও মাহিনার দাবী সম্পর্কিত আপনার আবেদন-পত্র ন্যায়-সঙ্গত ও বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং ১০৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আজ অবধি আপনার প্রাপ্য টাকার মোট পরিমাণ হইল ৩৯,৯৯৯ পাউণ্ড এবং তাহা আপনার নামে জমা দেওয়া হইল!" এই অবধি পড়িয়াই 'ক্যাপ্টেন' আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া সম্মুখস্থ বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিয়া 'ওয়ালটজ' নৃত্য করিতে লাগিলেন; নিকটস্থ দোকান হইতে কফি-চপ প্রভৃতি আসিল—বন্ধু-বান্ধবের দল আনন্দে হল্লা করিয়া মেসকে সরগরম করিয়া তুলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন বন্ধু বলিলেন: 'ওহে ক্যাপ্টেন, তুমি তো সবটা পড়লে না,—বাকীটা পড়ে শোনাও। ক্যাপ্টেন পড়িতে লাগিলেন—"তবে রাজকীয় বিধির আর একটি ধারা বোধ হয় আপনার নজর এড়াইয়া গেছে বলিয়া মনে হয়। অসাবধানতা এবং অবহেলার দরুণ যুদ্ধে যে কামান, বন্দুক ও অশ্বাদি বিনষ্ট হয়, সেই যুদ্ধে যিনি 'কম্যাণ্ডিং অফিসার' থাকেন, ক্ষতিপূরণের জন্য তিনিই ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী হন; যদি 'কম্যাণ্ডিং অফিসার' নিহত হন, তাহা হইলে তাঁহার পরবর্ত্তী প্রধান কর্ম্মচারী যুদ্ধ-ক্ষতির নিমিত্ত দায়ী হন। আপনার চিঠিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ১০৪৪ সালের হেস্টিংসের যুদ্ধের একমাত্র আপনিই জীবিত 'ক্যাপ্টেন'। অতএব সেই যুদ্ধে কম্যাণ্ডিং অফিসারের অসাবধানতার দরুণ নিহত প্রতি অশ্বের দাম ২ পাউণ্ড হিসাবে পনেরো হাজার অশ্বের দাম ৩০ হাজার পাউণ্ড, এবং বিনষ্ট ও নিখোঁজ তরবারি প্রতিটি ১ পাউণ্ড হিসাবে ত্রিশ হাজার তরবারির দাম ৩০ হাজার পাউণ্ড, মোট ৬০ হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ, রাজকীয় বিধির উপরিউক্ত ধারা অনুসারে আপনাকে দিতে হইবে। দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশে দেখা যায় যে, আপনার প্রাপ্য টাকা,—আমাদের প্রাপ্য টাকা হইতে বাদ দিলেও এখনও আপনার কাছে ২০,০০১ পাউণ্ড আমাদের পাওনা হয়। অতএব যত শীঘ্র পারেন তাড়াতাড়ি আমাদের টাকাটা শোধ করিয়া দিবেন!"

পুঃ—"টাকাটা শোধ হইলেই আপনি কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন, অন্যথা নহে।"

চিঠি পড়িয়া 'ক্যাপ্টেন' মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বেচারার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থের মোট পরিমাণ ১০,০০০ হাজার পাউণ্ড!

আয়েশ-আরামের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক যখন তখন চা খেয়ে থাকেন। কিন্তু ভালো চায়ের স্বাদ যে কী তা অনেকেই জানেন না। এটা কম দুঃখের কথা নয়। অথচ ভালো চা তৈরি করা কঠিন নয় এবং খরচও তাতে মোটেই বেশি পড়ে না। শুধু পাঁচটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই চমৎকার চা তৈরি করা যায়। স্বাদে গন্ধে সবদিক দিয়ে চা-টা ভালো করতে হলে এই নিয়ম ক'টি মনে রাখবেন এবং আপনার বাড়িতে চা করবার সময় সবাই যাতে এগুলো মেনে চলেন সে দিকে নজর রাখবেন।
চা তৈরির পাঁচটি সহজ নিয়ম
১। টাটকা জল একবার মাত্র ফুটিয়ে ব্যবহার করবেন ২। চা ভেজাবার আগে পটটা গরম করে নেবেন ৩। মাথা-পিছু এক চামচ আর ঐ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা নেবেন ৪। চা-টা তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ভিজতে দেবেন ৫। কাপে চা ঢালার পর দুধ চিনি মেশাবেন।
ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও তামিল ভাষায় "চা তৈরির খুঁটিনাটি" নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট একস্‌প্যান্‌শন্ বোর্ড, ১০১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ভাষার উল্লেখ করে চিঠি লিখলেই পুস্তিকাখানা বিনামূল্যে আপনার নামে পাঠানো হবে।
স ব চে য়ে ভা লো
ভা লো - তৈ রি
চা
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্‌প্যান্‌শন্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

অঙ্গন

প্রাঙ্গণ

সংঘাত

নীলিমা মুখোপাধ্যায়

ভোর বেলা। সবে মাত্র ক্লান্ত রাত্রি গুটিয়ে নিয়েছে তার শ্রান্ত শিথিল আঁচল। শরতের নরম মিষ্টি আলো সসঙ্কোচে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে ভীরু লজ্জাবনতা নববধূর মত। অপূর্ব এক মোহজাল ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীটার ওপর। কিন্তু সুমন্ত্র কি দেখছে এই সব! জানলার গরাদটা শক্ত ক'রে ধরে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তেলহীন এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিক পেশীবহুল শক্ত শুকনো মুখটার ওপর। প্রাণপণ শক্তিতে লোহার গরাদটা চেপে ধরেছে সে। সমস্ত চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে যেন এক উৎকট অভিযোগ। কেন, কেন গোটা পৃথিবীটাই তার বিরুদ্ধে কোরবে এমন ষড়যন্ত্র? কি করেছে সে? কেন সকলে মিলে এমন ভাবে শুষে নেবে তার প্রতিটি রক্তবিন্দু? গুঁড়িয়ে দেবে তার সমস্ত জীবনটাকে, তার বর্ত্তমান—তার ভবিষ্যৎকে? কি করবে কি সুমন্ত্র? কিন্তু কাকে, নিজেকে না সারা দুনিয়াটাকে? ওই প্যাঁচামুখো ডাক্তারটাকে খুন করতে পারলেই বোধ হয় সব চেয়ে খুশী হত সে। গরাদটা ছেড়ে অস্থির ভাবে সমস্ত ঘরময় পায়চারী করতে আরম্ভ করে সুমন্ত্র। চুলগুলো মুঠো মুঠো ক'রে টানতে থাকে পাগলের মত। হাঁড়ির মতন মুখ ক'রে বসে প্রেস্‌কিপ্‌সন করতে ত' আর পয়সা লাগে না! এই বাজারে দু'-তিন গুণ বেশী দাম দিয়ে কোথা থেকে এত ওষুধ আনবে সুমন্ত্র? আর সুলতা? এই কি সেদিনকার সেই সুলতা? প্রথম পরিচয়ের দিনে যার চোখে আঁকা ছিল ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্ন? কোথায় গেল তার সেই কল্পনাময় জীবন— কঠিন বাস্তবের উষ্ণ নিশ্বাসে কুৎসিৎ বীভৎস কঙ্কালটাই যার কেবল বেঁচে আছে? কিন্তু কি করবে সে, তার মত গরীবের ঘরে এমন কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি কেন? শুকনো চোখ দু'টো জ্বালা করতে থাকে। ডাক ছেড়ে চীৎকার ক'রে কাঁদতে ইচ্ছে করে ওর। কিন্তু পারে না। চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল পড়ে না। কে যেন ওর গলাটা চেপে ধরেছে নিষ্ঠুর নির্ম্মম মৃত্যু-শীতল হাত দিয়ে।

বাবা! ও বাবা! কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়ায় সুমন্ত্রর পাঁচ বছরের কচি মেয়েটা।—আর আমি বার্লি খাব না বাবা! রোজ খালি বার্লি আর বার্লি! ও বাবা, বাবা গো, গয়লা কবে দুধ দেবে বাবা? বারুদের স্তূপে যেন আগুন লাগে। এক মুহূর্ত্তে দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে সুমন্ত্র। এতক্ষণের রুদ্ধ আক্রোশ যেন প্রকাশের পথ পায়। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এসে বলে—বার্লি খাবে না ত কি খাবে? আমার মাথা? দুধ! দুধ খালে আমার হাড় ক'টা জুড়োলে। বেরো, বেরো আমার চোখের সামনে থেকে হারামজাদা মেয়ে।

মেয়েটা কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। অদ্ভুত ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বোকা-বোকা চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে। বড় মেয়ে অপর্ণা এসে ওকে কোলে তুলে নিয়ে যায়। ওর যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন লজ্জা পেয়ে যায় সুমন্ত্র। এই ত সবে তেরো বছরে পা দিয়েছে মেয়েটা। এর মধ্যেই যেন সারা সংসারটা নিষ্ঠুর নাগপাশের মতন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে

ধরেছে ওকে। সারা দিন অবিশ্রান্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে এর মধ্যেই চোখের কোলে পড়েছে কালির ছোপ। চোয়ালের হাড় দু'টো সদর্পে সাক্ষ্য দিচ্ছে সুমন্ত্রের উৎকট দারিদ্র্যের। পাগলের মত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে সুমন্ত্র। ওর ছেঁড়া রং-চটা সাড়ীটার দিকে লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কি করছে? কি করছে সুমন্ত্র? পিতার কর্ত্তব্য কতটুকু পালন করছে সে? কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য! সারা জগতটাই যেন বুভুক্ষের মত উৎকট হাঁ ক'রে আছে কেবল তার কাছেই একান্ত কর্ত্তব্যের আশায়। চোখ দু'টো আবার জ্বালা করতে থাকে ওর। অস্থির নিরুপায় আক্রোশে দাঁত কড়মড় ক'রে ওঠে, কপালের শিরাগুলো কঠিন হয়ে ফুলে ওঠে। কেন—কেন ওরা এল তার জীবনে? কে বলেছিল ওদের এমন অবাঞ্ছিতের মত এসে তার জীবনটাকে এমন ভাবে নক্কাক্ত ক্ষত-বিক্ষত ক'রে তুলতে?

পাশের বাড়ীর কোন একটা ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে আটটা বাজে। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চমকে ওঠে সুমন্ত্র। নিজের চিন্তায় নিজেই যেন লজ্জা পেয়ে যায় ও। সে না ওদের বাবা? নিজের ক্ষমতা যেখানে নেই সেখানে এ কি লজ্জাকর কাপুরুষতা? উঠে দাঁড়ায় সুমন্ত্র। ঘানিতে জোতা গরু। এক্ষুনি আবার ছুটতে হবে ডাক্তারের কাছে! পরদা সরিয়ে ক্লান্ত ভাবে গিয়ে ঢোকে সুলতার ঘরে। কেমন আছ আজ? অতোধিক ক্লান্ত স্বরে আবৃত্তি করে রোজকার মতন। কোটোরে ঢোকা ফ্যাকাশে চোখ দু'টো খোলে সুলতা। ভাল। ক্ষীণ দুর্ব্বল হাসি হাসে ও। সেই বুকের ব্যথাটা······অসহিষ্ণু ভাবে ফ্যাকাশে হাতটা দিয়ে ও চুপ করিয়ে দেয় সুমন্ত্রকে। না না, বুকের ব্যাথা-ট্যাথা আমার আর একটুও নেই। তোমার দু'টি পায় পড়ি আমার জন্যে আর মিছিমিছি টাকা নষ্ট ক'র না তুমি। আর অনর্থক কতকগুলো টাকা নষ্ট ক'রে কি হবে বল ত? আজ ছ'মাস ধরে কেবল জলের স্রোতের মতন টাকা যাচ্ছে। কি লাভ হচ্ছে বল? আস্তে আস্তে দম নেয় সুলতা।

সুমন্ত্র কি একটা বলবার চেষ্টা করতেই আবার তাকে চুপ করিয়ে দেয় ও। না না, তুমি আর আমাকে বাধা দিয় না লক্ষীটি। আমি ত যেতেই বসেছি, মিছামিছি আমার জন্যে আর অনর্থক টাকা নষ্ট ক'রে লাভ কি? ছেলেমেয়েগুলোর মুখের দিকে চাও, তোমার নিজের দিকে একটু তাকাও। চোখে জল পড়ে সুমন্ত্রর। ধরা-গলায় বলে সে, এখনও তুমি টাকার কথাই তুলছ লতা? তুমি থাকলে সংসার, ছেলে-মেয়ে তার পর ত টাকা?

না না, ওগো না। তোমার পায়ে পড়ছি। দুর্ব্বল কণ্ঠে প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে সুলতা। আমার জন্যে আর ভেব না তুমি। পূজো আসছে। সারা বছরে ভাল কাপড়-জামার মুখ ত একবার স্বপ্নেও দেখতে পায় না, কিন্তু এমন আনন্দের দিনেও যদি ওদের কেবল কাঁদতে হয়···না না, ওগো আমি বাঁচতে চাই না, কেবল বছরের একটা আনন্দের দিনে একবার ওদের হাসিমুখ দেখে মরতে চাই। আর তুমি না ওদের বাবা? সারা বছরে একটা মাত্র পূজোর দিন! এমন দিনেও তোমার কাছে ওদের কোন দাবী নেই? তোমারও কোন কর্ত্তব্য নেই? সুমন্ত্র যেন চাবুক খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। সারা মুখটা ওর ব্যথায় নীল হয়ে ওঠে এক মুহূর্ত্তে। সেই এক চিরন্তন অভিযোগ। কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য! ও কি মানুষ না যন্ত্র? কি করবে? কি করবে ও? ও কি পাগল হয়ে যাবে? নিরুদ্দেশ হবে? কালো হয়ে যায় শরতের আকাশ। পূজো আসছে। ছেলে-মেয়েদের কাপড় চাই, জামা চাই, ওদের মুখে হাসি ফোটান চাই। ওদের বাবা সে। পিতার কর্ত্তব্য ত তাকে করতেই হবে। সুলতার ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সুমন্ত্র। নিদারুণ ঘৃণায় ওর সারা শরীরটা শির-শির ক'রে ওঠে।

—বাবা তোমার অফিসের সময় যে হয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে এসে দাঁড়ায় অপর্ণা। সুমন্ত্র চমকে ওঠে। বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে অর্থহীন একদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। ওর সেই দৃষ্টিতে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ে মেয়েটা। একটু বুঝি ভয়ও পেয়ে যায়।

যন্ত্রের মত অফিসে এসে দাঁড়ায় সুমন্ত্র। অনুভূতিহীন চেতনা-বিহীন শরীরটাকে কোন রকমে টেনে এনে ফেলে চেয়ারটার ওপর। কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য! পিতার কর্ত্তব্য! উঃ, এই সুলতাই আজ এত নিষ্ঠুর এমন স্বার্থপর? কি করবে সুমন্ত্র? সুলতা কি জানে না যে, সে তারই জন্যে আজ সহায়-সম্বল-কপর্দকহীন? আর আজ সেই সুলতার কাছেই তাকে নিতে হচ্ছে কর্ত্তব্যের পাঠ? সুমন্ত্রর মাথার রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। চন-চন ক'রে জ্বলছে শিরা-উপ-শিরাগুলো। কি করে—কি ক'রে দেবে সে ঐ রোগ-পাণ্ডুর উদ্ধত স্বার্থপর মেয়েটাকে মুখের ওপর তার যোগ্য জবাব। হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ও। চেয়ারটাকে সশব্দে পেছনে ঠেলে দিয়ে কলমটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হয়েছে। কর্ত্তব্য বেছে নিয়েছে সুমন্ত্র। বাবা! হ্যাঁ, বাবার কর্ত্তব্যই এবার করবে সে। অফিসের কাকেও কিছু না বলেই সে সোজা ফিরে আসে বাড়ী। জোরে জোরে প্রাণপণ শক্তিতে কড়াটা নাড়তে থাকে। অপর্ণা তাড়াতাড়ি এসে দরজাটা খুলে এমন অসময়ে তাকে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। কিন্তু সে-দিকে কোন খেয়ালই পড়ে না সুমন্ত্রর। তাড়াতাড়ি তাকে এক রকম ঠেলে দিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও। দুপ-দাপ ক'রে এটা-সেটা ছুঁড়ে ফেলে খুঁজে আনে তার ঈপ্সিত ধন। দেয়ালরাখা থেকে পেড়ে আনে তার ছোট্ট সোনার হাতঘড়িটা। কয়েক মুহূর্ত্ত নির্নিমেষ চোখে সেটার দিকে চেয়ে থাকে। পরম স্নেহে তার গায়ে হাত বুলায় একবার। কত দিন আগে ফেলে আসা দিনের কত সুমধুর স্পর্শ—কত স্মৃতি-মাখান এই ছোট্ট জিনিষটি। আজও কি বেঁচে আছে সুমন্ত্র? সেদিনকার সেই কাঁচা সবুজ প্রাণবন্ত সুমন্ত্র! সেই সুমন্ত্রের আনন্দোজ্জ্বল ছাত্র-জীবনের এই একটি মাত্র চিহ্ন। জীবনের প্রথম ধাপে তখন সবে পা দিয়েছে সুমন্ত্র। খুব ভাল ক'রে ম্যাট্রিক পাশ করায় বাবা তাকে এটা দিয়েছিলেন স্নেহের উপহার। আজ কোথায় সেই বাবা আর কোথায় সেদিনকার সেই সুমন্ত্র? কেউই যখন বেঁচে নেই তখন আর কি হবে অকারণ এই জড় পদার্থটাকে বাঁচিয়ে রেখে? এক টানে সেটাকে পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ায় সুমন্ত্র। শ' আড়াই দাম হবে নিশ্চয়ই। ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে না তা দিয়ে? পারবে প্রকৃত বাপের কর্ত্তব্য করতে?

অপু, অপু! চীৎকার ক'রে ওঠে সুমন্ত্র। অপর্ণা আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ায় ঘরের ভেতর। ওর রং-ওঠা তালি দেওয়া কাপড়টার দিকে চেয়ে কেমন যেন হঠাৎ থমকে যায় সুমন্ত্র। পরক্ষণেই দ্বিগুণ উৎসাহে চীৎকার ক'রে ওঠে, কি সাড়ী নিবি, বল, কি সাড়ী নিবি এবার? পূজো আসছে। বুঝলি অপু, এখন আর ও-সব ছেঁড়া-ছেঁড়া সাড়ী

নয়। ভাল সাড়ী পরবি বুঝেছিস্? আর হাঁ, হাসবি বুঝলি না? পুজোর সময় খুব হাসবি—দিন-রাত কেবল হাসবি। পাগলের মতন সুমন্ত্র নিজেই হেসে ওঠে হো-হো করে। ওর বুকের শেষ রক্তবিন্দুটিও যেন ঝরে পড়ে ওর ওই হাসির বুক চুঁইয়ে। অবাক হোয়ে বোকার মতন তাকিয়ে থাকে অপর্ণা।

রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সুমন্ত্র। পুজোর বাজার করতে হবে। অপুর সাড়ী-ব্লাউজ। ছোট মেয়েটার একেবারে জামা নেই, ওর ক'টা জামা। ছেলেটার প্যাণ্ট-সার্ট। সব তাকে কিনতে হবে আজই। যেমন ক'রে পারে।

রাস্তা বেয়ে চলে সুমন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে অন্যমনস্ক হয়ে এঁকে চলে সুমধুর কল্পনার রঙ্গিন ছবি। পুজোর দিন শরতের এক ঝলক মিষ্টি আলোর মতন অপর্ণা ঘরে এসে ওকে প্রণাম করে। সর্ব্বাঙ্গে ওর ঝলমল করছে নতুন কেনা সাড়ীটা। চওড়া জরির ঝকঝকে আলোটার মতন ঝকমক করছে ওর বড় বড় চোখ দু'টো। ঝলমল করছে ওর সারা মুখটা। খুশী যেন আর চেপে রাখতে পারে না ও। ওর কালি-পড়া চোখের কোলে উৎকট ভাবে ঠেলে ওঠা চোয়ালের হাড়ের ওপর নেমে এসেছে কেমন একটা নতুন সজীবতা। শীতের ঝরে-যাওয়া ডালে আবার রং ধরেছে যেন অপূর্ব ভবিষ্যতের আশায়। নতুন জামা-জুতো পরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে দু'টোও জড়িয়ে ধরে ওকে। সুমন্ত্র চেয়ে চেয়ে দেখে ওদের। সমস্ত শরীরটা ওর আবার শির-শির ক'রে ওঠে—ঘৃণায় নয় অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত পুলকে।

অনেক দিন পরে সুলতা আবার হাসে। সজীব সরল হাসি। হাসতে তবে এখনও ভোলেনি সুলতা? একটু কাছে সরে এসে ও ফিস-ফিস ক'রে বলে, কোথায় পেলে গো এত টাকা? সুমন্ত্র হাসে হো-হো ক'রে। নির্ম্মল প্রাণখোলা হাসি। চুরি করিনি গো, চুরি করিনি। তবে? সুলতা যেন আগ্রহে কৌতূহলে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। অদ্ভুত এক হাসি ছড়িয়ে পড়ে সুমন্ত্রর সারা চোখে-মুখে। যাদু জানি, জান না? না, বল না! সুলতা একটু জিদ করে। না, সে আজ থাক। তার পর একটু থেমে হাসতে হাসতেই আবার বলে, জান, ডাক্তার আজ কি বলেছেন? কয়েকটা ভাল ইনজেকসান দিয়ে তোমাকে কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যেতে পারলেই তুমি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে, লতা! সমস্ত শরীরটা ওর অপূর্ব্ব সুখের আবেশে ঝিম-ঝিম করতে থাকে। গভীর নীল আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে পুঞ্জ-পুঞ্জ হালকা মেঘের রাশি। সুমন্ত্রর শরীরটাও বুঝি হয়ে উঠেছে ওদেরই মতন হালকা। ওদেরই মতন এখনই বুঝি সে নিজেকে উড়িয়ে নিতে পারে ওই গভীর নীল আকাশের স্পর্শে।

এই, এই—সামলে—সামলে! থামো থামো! ব্রেক কস। একসঙ্গে শত আকুল ভয়ার্ত্ত কণ্ঠের চীৎকারে সুমন্ত্র হঠাৎ চমকে ওঠে। কিন্তু ভাল ক'রে কিছু ভাববার—কিছু বুঝবার আগেই ওর শরীরের সমস্ত হাড়গুলো যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়। মাথায় একটা অদ্ভুত জ্বালা—সঙ্গে ঘাড় বেয়ে গড়িয়ে আসে কেমন যেন একটা চটচটে গরমের ধারা। ধীরে ধীরে সব যেন আবছা হয়ে আসে। অন্ধকারের ভেতর থেকে ও যেন মুহূর্ত্তের জন্য একবার ভাবতে চেষ্টা করে কোথায় চোলেছে ও। অস্পষ্ট অনুভূতির ভেতর থেকে কেবল মনে পড়ে ওর অপর্ণার সাড়ী; ছেলেমেয়ের জামা-কাপড়……সুলতার ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হাত অপর্ণার কালিপড়া পাণ্ডুর চোখ। সব যেন ঘুলিয়ে একাকার হয়ে যায়—আচ্ছন্ন করে দেয় তার আবছা চেতনাকে। বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার অবশ শিথিল হাত দিয়ে একবার চেপে ধরে পকেটে রাখা হাত-ঘড়িটাকে। বাবা। বাবার কর্ত্তব্য ত করা হল না সুমন্ত্রর। ওর রক্ত-নিংড়ান টাকায় ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে সুমন্ত্র। অন্যমনস্ক কল্পনা-রাজ্যের যাত্রী বাধা পেয়েছে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে। ভারী ট্রামের চাকায় থেঁতলে গেছে ওর কর্ত্তব্য-ভারাক্রান্ত মাথাটা। নিথর নীরব হয়ে গেছে বোঝা-বওয়া ঘূণে-ধরা মনটা।

বোঝার ভুল

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী

১৬

সুমিতার কথা

বাবার মোটারে আজ কলেজ এসেছি। মোটার থেকে নামতেই অরুণা বলে উঠলো, হাঁ রে মিতা, তোরা আজকাল কলেজে আসিস্ নে কেন? কাল তরুদি কি রকম রাগ করছিলেন।

বললাম, আচ্ছা করুন গে, অনি কোথায় জানিস? পাতলা ঠোঁট উল্টে অরুণা বললে, কে জানে বাপু, দেখ গে না কমন-রুমে আছে হয় তো। যেতে যেতে থার্ড-ইয়ারের মনুজাদি ডাকল, এই মেয়ে, শুনে যা। কী বলে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তুই এতো য়্যাবসেণ্ট হোস্ কেন রে আজকাল?—আগে তো দেখতাম রোজই সুমিতা রায় প্রেজেণ্ট থাকতো। সেকেণ্ড-ইয়ারের রঞ্জা হেসে বললে, তা বুঝি তুমি জানো না মনুদি—তা জানবেই বা কোথা থেকে? দিনরাত বইয়ে মুখ গুঁজড়ে থাকলে শুনবে কোথা থেকে? অনির যে বিয়ে গো! কাল পাকা দেখা। কাল ওর বাবা নাম কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। অনসূয়া ভারীক্কি চালে আমায় বললে, হাঁ রে মিতা, অনি তো তোর প্রাণের বন্ধু, আমাদের চেয়ে তুই নিশ্চয়ই এ সব কথা বেশী জানিস, নয়? বল না ভাই একটু শুনি!

আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা সজোরে চেপে ধরলাম। মনুজাদি বললে, ও কি রে মিতা, তোর অসুখ করছে না কি?

অনেক কষ্টে সামলিয়ে নিয়ে বললাম, রঞ্জা, দেখ না ভাই আমার গাড়ীটা আছে কি না। সুধীরা ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললে, রঞ্জাদি, মাণিকজোড়ের জোড় ভাঙ্গলো এবারে। অরুণা জিজ্ঞেস করলে, রঞ্জা, অনির বরের নাম কি জানো? বলো না ভাই। কে জানে ভাই, অসিত না অজিত ঐ রকম যা হোক কিছু হবে। আয় রে মিতা, দারোয়ান বললে তোর গাড়ী রয়েছে, তরুদিকে বলে ছুটি নিয়ে আয়, বলে রঞ্জা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

* * * *

ছুটি নিয়ে মোটারে বসতে আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠ্‌লো। খানিক পরে চোখ মুছে সোফারকে বললাম, মামার বাড়ী চলো, মাকে নিয়ে আসবো।

মন আমার দুঃসহ ক্রোধে জ্বলে উঠ্‌লো—এতো অবহেলা আমায়! আচ্ছা, এ অপমানের শোধ নিতে আমিও জানি।

* * * *

মা মামীমার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। প্রণাম করে বললাম, মা গো, আমায় ক্ষমা করো, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি—
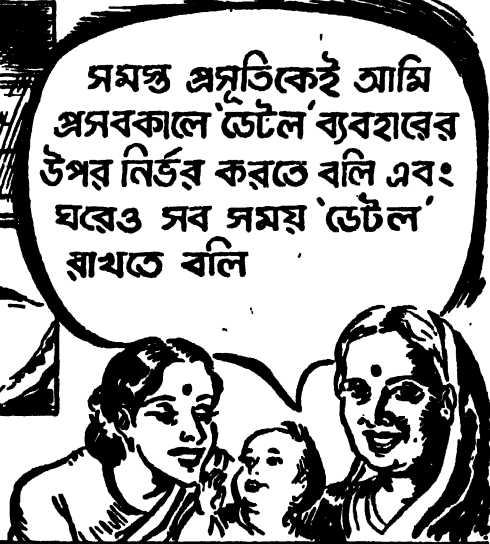
আমি ধরে রেখেছিলাম যে আমার মেয়ে
নির্বিঘ্নেই সন্তান প্রসব করবে
... আর প্রসবের আগে ও পরে সংক্রমণ যাতে না হয় সেজন্যে 'ডেটল' ব্যবহার করতে ভুলবেন না
'ডেটল' ছিল বলে আমি সত্যি খুশি; 'ডেটল থাকলে আর সংক্রমণের ভয় থাকে না
ভাবছে
মেয়ে ভালো আছে জেনে কতো যে শান্তি
সুন্দর সেরে উঠেছেন, 'ডেটল'-কে ধন্যবাদ দিতে হয়
সমস্ত প্রসূতিকেই আমি প্রসবকালে 'ডেটল' ব্যবহারের উপর নির্ভর করতে বলি এবং ঘরেও সব সময় 'ডেটল' রাখতে বলি
ANTISEPTIC
DETTOL
'DETTOL'
TRADE MARK
এটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ ২০/১, চেত্‌লা রোড, কলিকাতা
B 4

তোমার ঠিক-করা বরকেই আমি বিয়ে করবো, এখন বাড়ী চল মা। মা আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

মামীমা বললেন, দেখলে তো ঠাকুরঝি—আমি বলেছি তো, সুমু আমাদের সে রকম মেয়েই নয়—এই তোমায় নিতে এলো বলে।

দিদিমাও ছুটে এলেন। বললেন, কি লো নাতনী, এতক্ষণে মাকে মনে পড়লো।

বললাম, মনে তো অনেকক্ষণই পড়েছে দিদিমা, এখন কিছু খেতে-টেতে দাও।

১৭

সুনন্দার কথা

মাস ছয় পরের কথা। ফাল্গুন মাস, সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নেই। সুমিতা একটা চেয়ারে ব'সে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল—কোলের ওপরে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া'খানা পড়ে রয়েছে। আবাঁধা চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো। তার পাশে গিয়ে ডাকলাম, সুমু! দিদি, বলে সে তার আয়ত নেত্র আমার পানে তুলে ধরলে। তার মাথায় হাত রেখে বললাম, হ্যাঁ রে, তোর চোখের কোলে কালির রেখা যে দিন-দিন বেড়েই চলেছে, তোর জামাই বাবু বলছিলেন যে, তোর এখানে শরীর-মন দুই-ই টিকছে না—সত্যি রে সুমু? সে ম্লান হেসে বললে, না রে দিদি না, আমার জন্যে তোরা অতো বেশী করে ভাবিস্ নে। এখানে আমি বেশ আছি, কলকাতায় আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। এই গঙ্গার ধার—এই খোলা মাঠ ছেড়ে কোথায় যাবো দিদি? আমি দীর্ঘশ্বাসটা চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বিয়ের পরই বিমানের চরিত্র ধরা পড়েছিল। আমাদের এতো আদরের সুমিতা, তার গায়ে সে হতভাগা হাত তোলে, অসিতের নাম নিয়ে তাকে অশ্লীল কথা বলে।

নীচে নামছি, এমন সময় একটি পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলাম, কোথায় গো গেরস্তরা সব? এই বাদলা, তোর মা কই রে? বাদলা বললে, মা-মণি তো ওপোলে, তুমি কে, মাছি বুঝি? হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ, কই গো সুনুদি—কোথায় বাপু, বলতে বলতে অনিতা হাসিমুখে ওপরে উঠে এলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে বললে, বাক্যি হঠাৎ বন্ধ হলো কেন গো? বাপ্‌রে, কতো দূর থেকে এলাম—কোথায় আদর করবে—তা নয় হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে—আমি অনি গো অনি!

হেসে বললাম, সে তো দেখতেই পাচ্ছি রে, তা তুই হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলি? হলাম যেখান থেকেই হোক্। সুমিতা কোথায়? তার জন্যেই তো আসতে হলো, মেয়ে যেন বনবাসে এসেছে। চল ভাই, ওর কাছে যাই। আয়, বলে আমি সুমুর ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। সুমু তখন পড়ছিল—জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ

কাটল সারা দিন।
সামনে আসে বাক্যহারা স্বপ্ন-ভরা রাত
সকল কর্মহীন।
তারি মাঝে দীঘির জলে যাবার বেলাটুকু
এইটুকু সময়,
সেই গোধূলি এল এখন সূর্য্য ডুবু-ডুবু,
ঘরে কি মন রয়।

আমি ডাকলাম, সুমু, দেখ কে এসেছে। কে দিদি, বলে এদিকে ফিরে অনুকে দেখে ওর বিবর্ণ মুখ আরো বিবর্ণ হয়ে উঠলো। মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে ও ডাকলে, আয় অনু, ঘরে আয়!

অনিতা ঘরে ঢুকে বললে, ভাই, আমার বিয়ে, তোরা যাবি—বাবাও এসেছেন, নীচে জামাই বাবুর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি ও সুমিতা দু'জনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, তোর শ্রাবণ মাসে বিয়ে হবার কথা ছিল না, হয়নি?

অনিতা বললে, না, ওঁর মা হঠাৎ মারা গেলেন তাই হয়নি। সুমিতা আস্তে আস্তে বললে, অসিত বাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলো, আমি খুব খুশী হয়েছি।

অনিতা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, তিনি তো এখানে নেই, তিনি বিলাতে গেছেন কৃষিবিদ্যা শিখতে।

সুমিতা উত্তেজিত হয়ে বললে, তবে তোর বিয়ে কার সঙ্গে? অসিত বাবুর সঙ্গে নয়?

অনিতা বিস্মিত হয়ে বললে, না তো। তুই জানিস না, এঁর নাম অজিত মিত্র, অসিদার সম্পর্কে ভাই হন। উনিই তো এ বিয়ে ঘটিয়েছেন, আর এ বিয়ের কর্ত্তাও ছিলেন উনি। হঠাৎ বিলাত চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, বোন, তোমরা সুখী হয়ো। বললাম, দাদা, তুমি যেও না। বললেন, অনু, এক জন আমায় বড় ব্যথা দিয়েছে, আমি আর এখানে টিকতে পাচ্ছি নে ভাই! তোরা আমায় বাধা দিস্ নে—খুশী-মনে বিদায় দে দিদি। সুমিতা, আমি জানতাম, দাদা তোকে ভালবাসতেন—বাসতেন কেন, এখনও বাসেন, আর তুইও তাঁকে—ও কি রে—বলে অনিতা চেঁচিয়ে উঠলো। তাকিয়ে দেখলাম, সুমু চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়েছে—আমি গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম, চোখের জল তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে!

অনীতা ভয়-ব্যাকুলিত মুখে জিজ্ঞেস করলে, দিদি, ওর এমন কেন হ'লো?

চোখটি মুছে ওর কথা সব খুলে বললাম, শুনে অনি কাঁদতে কাঁদতে বললে, তাহ'লে আমার জন্যেই ওর এমন হলো। ওর বিয়ের খবর আমি ও অসিদা দু'জনেই পেয়েছিলাম। কিন্তু পাত্র কে তা জানতে পারিনি। খুব দুঃখ হয়েছিল আমার। ও আমায় একটা নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করলে না! আর বিমান মামাও এমন কাওয়ার্ড! এক স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও সুমিতাকে বিয়ে করলে। ছি ছি, আর তোমরাও খোঁজ-খবর না নিয়ে বিয়ে দিলে কেমন করে?

আমি বললাম, উঃ, কি ভয়ানক লোক! তাই বিয়ের আগে বাবাকে বলেছিলেন যে, সংসারে আমি একা। সব কাজ আপনাদেরই করতে হবে। একলা আমি সব দিক সামলিয়ে উঠতে পারবো না।

অনি ধরা-গলায় বললে, কি সর্ব্বনাশ ওর করেছো দিদি?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, তোর কথা পরে শুনছি—এখন ওই জলের কুঁজোটা নিয়ে আয় তো ভাই।

১৮

সুমিতা বিছানায় শুয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি মাটিতে বসে বেদানার রস করছিলাম, ও ডাকলে, দিদি!

কি রে? বলে আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার হাতটা ধরে বললে, মা'রা কখন এসে পৌছবেন?

ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, উনি তো সকালে খানাতে গেছেন, এই এলেন বলে। কিছু খাবি সুমু?

না, বলে সুমিতা আবার বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। বাইরে তখন মহা সমারোহে সূর্য্যাস্ত হচ্ছিল। বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের লাল আভা নদীর বুকের ওপরে পড়ে এক মোহজাল সৃষ্টি করেছে।

সুমিতা আবার ডাকলে, দিদি, অনির বিয়ে কাল হয়ে গেছে নয়?

আমি রসটুকু নিয়ে উঠে এসে বললাম, হ্যাঁ! এখন এটা খেয়ে ফেল তো ভাই!

সুমিতা রসটুকু খেয়ে বললে, এখন কি তুই নীচেয় যাবি দিদি?

না রে, এবারে তোর কাছে বসবো, বলে আমি বেতের চেয়ারটা টেনে নিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

বাইরের দিকে তার আয়ত নেত্র মেলে সুমিতা বললে, দিদি, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি পড় না। ভাই—সেই যে—দিনের শেষে—

আমি একটু রুষ্ট ভাবে বললাম, তুই কেবলি ঐ কবিতাটি কেন শুনতে চাস, সুমু?

আমার যে ঐটাই সব চেয়ে ভালো লাগে। তুই রাগ করছিস? তবে থাক গে—সুমিতা অভিমান ভরে মুখ ফেরালে।

নীচে মোটারের হর্ণ শোনা গেল। ঐ বুঝি বাবা-মা এলেন, বলে আমি দৌড়ে নীচেয় নেমে গেলাম।

মা উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করলেন, সুমু কেমন আছে রে নন্দা?

আমি প্রণাম করে বললাম, দেখবে চল না, এখনি তোমাদের জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিল।

মা চোখ মুছে বললেন, আমিই মেয়েটিকে মরণের পথে এগিয়ে দিলাম রে! ভগবান করুন, সুমু আমার তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক। তখন ওর মন যা চাইবে তাই করবে।

আমি ম্লান হেসে বললাম, মা, যখন সময় ছিল তখন যদি এ কথা একবার মনে করতে তাহ'লে মেয়েটি সুখী হ'তে পারতো জীবনে। যাক্ গে, গতস্য শোচনা নাস্তি—এখন ওপরে চল মা।

* * * *

সন্ধ্যা দেবী ধরার বুকে তাঁর কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন নামিয়ে দিয়েছেন। সুমিতা খাটের ওপরে অচেতন অবস্থায় শুয়েছিল। টেবিলের ওপরে মৃদু ভাবে একটা আলো জ্বলছিল, তাও বই দিয়ে আড়াল করা। একটা চেয়ারে ডাক্তার বসে, তাঁর পাশেই বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মা'র দেখা পাওয়া গেল না, সম্ভবতঃ তিনি ঠাকুর-ঘরে আছেন।

সুমিতার অবস্থা আজ ভালো নয়। বিকারের ঘোরে সে বার বার অসিত ও অনির নাম করছে। আর কখনো চাইছে ক্ষমা, কখনো করছে অভিমান, আবার কখনো কেঁদেই ভাসিয়ে দিয়ে বলছে, মা, মেজদাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না, আমায় ক্ষমা কর মা।

ঘরের পর্দা সরিয়ে অনিতা ঘরে ঢুকেই কেঁদে ফেললে।

ডাক্তার একবার উঠে হাতটা দেখে বিকৃত মুখে বললেন—তাপলেশ।

আমি আকুল হয়ে কেঁদে উঠলাম। মা পাগলের মত দৌড়ে ঘরে এসে বললেন, ওরে, সুমু কি চলে গেল! হ্যাঁ রে অনি, সত্যিই কি চলে গেল? আমায় একবার মা বলে ডাকলে না?

বাবা মাকে ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন।

সেই সময় সুমিতা একবার চোখ চাইলে। পাশে অনুকে দেখে বললে, অনু, উনি কি আসেননি?

রুদ্ধ কণ্ঠে অনীতা বললে, তিনি তো এখানে নেই, মিতা।

কান্না-ভরা কণ্ঠে সুমিতা বললে, সে জানি রে জানি। তাঁকে বলিস্ আমায় যেন ক্ষমা করেন। মা কই? ওরে দিদি, আমি যে দেখতে পাচ্ছি নে, তোরা এদিকে সরে আয়!

আমি ওর মুখের ওপর হেঁট হয়ে বললাম, সুমু, এই যে আমরা। এই যে বাবা তোমার পাশে রয়েছেন, অনু তোমার মাথার কাছে।

হতাশ ভাবে ঘাড় নেড়ে সুমিতা বললে, কাউকে দেখতে পাচ্ছি নে। ও মা, আমার এ কি হ'ল দিদি!…

আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে দু'-একটা তারা যেমন হঠাৎ কালের সীমাহীন গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, সুখ-দুঃখের দোলায় দুলতে দুলতে বুক-ভরা অতৃপ্ত কামনা নিয়ে সুমিতাও তেম্নি সেদিন শেষ রাত্রে যে-পথে যাত্রা সুরু করলে, সে-পথ দিয়ে আজ অবধি কোন মানুষই ফিরে আসতে পারেনি।

১৯

শেষ কথা

অসিত একখানা বই হাতে করে টেবিলের সামনে বসেছিল, কিন্তু তার দৃষ্টি বইয়ের পাতায় মোটেই ছিল না। অসিতের ভারতীয় বন্ধু কিংশুক ঘরে ঢুকেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললে, কি হে, দূরের পানে মেলে আঁখি, কেবল আমি চেয়ে থাকি, ও কি হচ্ছে শুনি?

অসিত উন্মনা দৃষ্টি ফিরিয়ে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করলে। কিংশুক আবার হেসে বললে, বলি তোমার তো কোনো নবযৌবনা প্রিয়া-টিয়া ফেলে আসনি, তবে অতো ভাবছো কেন হে?

অসিত ক্ষীণ হেসে বললে, কি যে বলো তুমি। তোমাদের তো ও-সব ছাড়া কথাই নেই, ভাবনা কি শুধু প্রিয়ারই?

কিংশুক টেবিল চাপড়ে বললে, নিশ্চয়ই, বাবা, যখন পৃথিবীতে জন্মেছি তখন চুটিয়ে ভোগ করবো না? তা নয়, মুখ উঁচু করে যতো রাজ্যির ভাবনা! আরে ছোঃ, সে আবার জীবন না কি? কবি কি বলেছেন জানো তো—"ভোগ করে নাও, ভোগ করে নাও, ভোগ করে নাও জগৎটাকে, দু'দিন বাদে মুদবে আঁখি তখন তুমি খুঁজবে কাকে?"

অসিত একটু রাগত ভাবে বললে, তোমার বাবা না ধার করে তোমায় মানুষ হতে পাঠিয়েছেন, আর তুমি ওই সব করে বেড়াচ্ছ কিংশুক?

কিংশুক আবার হেসে উঠে বলল, আরে বন্ধু, চটো কেন ভাই, আমরা হচ্ছি মধুপায়ীর দল, যেখানে মধু দেখি সেখানেই গিয়ে জুটি। জানি তো দেশে গিয়ে আবার সেই—থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। চলি হে, তুমি যা চটেছো তাতে যে এক কাপ চা চাইব সেটা ভরসা হচ্ছে না।

অসিত অপ্রতিভ হয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে গৃহকর্ত্রীর দাসীকে ডেকে চা-ডিম দিতে বলে কিংশুককে বললে, এতো বেলায় আর নাই বা হোটেলে ফিরলে, এখানে লাঞ্চ খেয়ে যাও না।

সিগারটা ধরিয়ে কিংশুক বললে, না হে না, লিলি আজ নেমন্তন্ন করেছে, না গেলে চটবে। কাজ কি তাকে চটিয়ে।

অসিত ভুরুটা ঈষৎ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে, লিলিটি আবার কে?

লিলি হল আমার নবলব্ধা বান্ধবী, ভারি মিষ্টি মেয়ে। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

এই সময় দাসী এসে চা দিয়ে গেল। চা-টা কোনো রকমে গিলে নিয়ে কিংশুক বললে, আজ আসি ব্রাদার। বাবাকে এ-সব কিছু লিখ না—মীনা বৌদিকেও নয়। ঠিক তো? আচ্ছা বাই বাই, গুডবাই। কিংশুক চলে গেল।

অসিতও বাইরে বেরোবার জন্যে পোষাক বদলাতে উঠলো—এই সময় দাসী এসে কতগুলো পত্র রেখে গেল। অসিত টাইটা বেঁধে একখানা খাম তুলে নিয়ে খুলে ফেললে। লিখেছে অনিতা—ভাই অসিতদা,

তোমার পত্রের উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। খুব রেগেছো নয়? দাদা একটা দুঃসংবাদ তোমাকে দিচ্ছি—সুমিতা মারা গেছে। সেই জন্যে আমার মন বড়ো খারাপ হয়ে রয়েছে। সে ছিল আমার ছেলেবেলার পুতুল খেলার সাথী—আজ তাকে হারিয়ে আমার অবস্থা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো!

ভাই, যে জন্যে আজ পত্র লিখতে বসেছি সেই কথাই বলি। সুমিতা মারা যাবার কিছু আগে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে, আর বলে গেছে, সে তোমারই আছে আর মারা যাবার পরও তোমার থাকবে। ভাই, তাকে ক্ষমা করো—পরলোকে সে তাহলে শান্তি পাবে। দাদা, আমি যদি ধূমকেতুর মতো তোমাদের দু'জনের মধ্যে এসে না পড়তাম তাহলে হয়তো পোড়ারমুখী অকালে এমন করে প্রাণ হারাতো না। ওর ধারণা ছিলো, তুমি আমায় ভালোবাসতে, মা গো, ছিঃ ছিঃ! মারা যাবার দিন দশেক আগে সব শোনে, শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। আজ আর আমি লিখতে পারছি ন। প্রণাম।

ইতি স্নেহের অনিতা।

অসিত থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে সোফার ওপরে বসে পড়লো। তার চোখের সামনে থেকে সব মুছে গেল। শুধু কাণে বাজতে লাগলো—সুমিতা তোমারই ছিলো এবং থাকবে। অসিত অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগলো,—মিতা বেঁচে থেকে যা দিতে পারোনি মরে গিয়ে আমায় এ কি দিয়ে গেলে—এ যে বিশ্বাস করতে পারছি নে! যদি পরলোক থাকে তাহলে আমার জন্য অপেক্ষা করো—আমিও তোমার কাছে যাবো মিতা। টেবিলের ওপর মুখ গুঁজে অসিত মেয়েদের মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

সমাপ্ত

বঙ্কিম-সাহিত্যে নারী-চরিত্র

অমিতা মিত্র

১

চরিত্র-সৃষ্টি সাহিত্যিকগণের একটি বিশেষ আর্ট। যে চরিত্র যত বেশী দ্বন্দ্বমুখর হইয়া উঠে সে চরিত্র সাহিত্যে তত বেশী উচ্চ স্থান অধিকার করে। প্রত্যেক প্রধান চরিত্রকে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া চলিতে হয়। এই বাধা কতকটা আসে বাহির হইতে, কতকটা আসে অন্তর হইতে। এই দ্বিবিধ সংঘাতের দ্বারা মানব হৃদয় জটিলতর হইয়া উঠে। বাইরের সংঘাতে যে চরিত্র বিপর্য্যস্ত তাহা কাব্যে, নাটকে বা উপন্যাসে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে না, কিন্তু যে চরিত্র অন্তর-দ্বন্দ্বের দ্বারা বিশেষ ভাবে চালিত মথিত ও বিপর্য্যস্ত তাহাই সাহিত্যে চিরদিনের জন্য স্থান পায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে নারী-চরিত্রে আমরা এই অন্তর-দ্বন্দ্বের বিকাশ দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের নারী-চরিত্রের দ্বন্দ্ব সমাজের সঙ্গে বা কোন বহিঃপ্রক্ষেপ নয়, তাহার জন্ম নিজেদেরই বিক্ষুব্ধ হৃদয়তলে এবং শুধু তাহাই নহে, ইহাদের বেগ-প্রাবল্য দেখিয়া মনে হয় যে বাহিরের কোন বৃহত্তর শক্তি ইহাদের প্রেরণা যোগাইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা করিলে আমরা নারী-চরিত্রে বিচিত্র রূপ দেখিতে পাইব।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মত বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রধান উপজীব্য নরনারীর প্রেম লইয়া। তবে এই তিন জনের প্রত্যেকের সাহিত্যের মধ্যে এই বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্যান-জীবনের আদর্শ মানে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রেমের রূপ ঠিক এ নয়; তিনি রবীন্দ্রনাথের মত নারীকে অর্দ্ধেক মানবী আর অর্দ্ধেক কল্পনা করিয়া দেখেন নাই। শরৎচন্দ্র একান্ত ভাবে বাস্তববাদী না হইলেও নারীর চরিত্র চিত্রণে তিনি বেশী করিয়া কল্পনার উপরেই জোর দেন নাই। তিনি নিজের সমাজকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাকে সেই ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। কল্পনার ইন্দ্রজালে তাহাকে নানা বর্ণে রূপায়িত করিয়া তুলেন নাই। সমাজের বুকে কঠিন আঘাতে নিষ্পেষিত নারী-হৃদয়ের দুঃখ-দৈন্য, ব্যথা-বেদনা, নৈরাশ্যকে তিনি আপন হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি চিন্তা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বিচারক হইয়া বসেন নাই বা এই দুঃখের কোন দার্শনিক মীমাংসাও করিতে চান নাই। এই জন্যই দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের প্রেম দৈনন্দিন গোপন-জীবনে বাসনা-বন্ধনে বন্দী থাকিয়াও বস্তুতান্ত্রিক বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে সম্মুখীন হইয়া যখন নৈরাশ্যধর্ম্মী তখনই তাহার তুলনা পাই না। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ধ্যান-জীবনের বিশিষ্টতায় অনুরঞ্জিত বলিয়া সাংসারিক দুঃখ-ক্লেশ, তুচ্ছতা, আত্মবিড়ম্বনা তাহার মধ্যে প্রকাশ পায় না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রেম একান্ত ভাবেই বস্তু-জীবনের সংস্পর্শে লীলায়িত। অন্তরে-বাহিরে মানুষ যা—সাংসারিক শাসন সত্ত্বেও মানুষ যা হইয়া আছে, শরৎ-সাহিত্যে আমরা তাহার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রকৃত জীবনের সমগ্র মানব-মনের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির বিকাশ যথাযথ ভাবেই দেখাইয়াছেন হৃদয়বৃত্তিকে তিনি কোন দিনই উপেক্ষা করেন নাই, পরন্তু বলিয়াছেন, উহাদের স্ফুরণ ও চরিতার্থতাই মনুষ্যত্ব, এই তো মানব ধর্ম্ম। আত্মনিগ্রহ মানব-ধর্ম্ম নহে, আত্মবিকাশই ধর্ম্ম। তবে এ হৃদয়বৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি অনুশীলনে যেখানে শালীনতার অভাব হইয়াছে বা ঐক্যসূত্র ছিন্ন হইয়া যেখানে ইহা সৎ আনন্দ লাভের অন্তরায় হইয়াছে, সেখানে তিনি ইহাকে মার্জনা করিতে পারেন নাই শরৎচন্দ্রের মত নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মত ছিল যে, যে প্রেম এক জনকে অবলম্বন করিয়া অন্য সকলকে তাড়ায় সে প্রেম প্রেম নয়, তাহা মোহ মাত্র। তাই বিচারকের আসনে বসিয়া তাহাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য

অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি।" তাঁহার কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নিছক সাহিত্য সৃষ্টি করা ছিল না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির মঙ্গল সাধন করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার প্রত্যেকটি উপন্যাস পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, কর্ম্ম—সর্ব্ব বৃত্তির সমন্বয়-মূলক একটি সত্যের সন্ধান তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং এই সত্যকে বাস্তব জীবনের সংস্পর্শরহিত করিয়া দেখিতে চান নাই, পরন্তু জীবনের সমগ্র বাস্তবতার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষের সহজাত বৃত্তিই মানুষের ধর্ম্ম এবং এই বৃত্তির মধ্য দিয়াই, মনুষ্যত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয়। কাজেই এই প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে মঙ্গলের পথে চালিত হইয়া মানব জাতিকে উন্নত জীবন যাপন করিতে অনুপ্রেরণা দেয় সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান —এই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত নির্মমতারই প্রয়োজন হউক না কেন তিনি তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। নিয়মকে লঙ্ঘন করিলে দণ্ড আপনি আসিবে—এই ছিল তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস। সেই জন্য গোবিন্দলালকে গৃহত্যাগী হইতে হইল এবং রোহিণীকেও অকালে মরিতে হইল, শৈবলিনীকেও নরকের দৃশ্য দেখাইতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে আদর্শবাদ-প্রবল বলা হয়।

যাহাই হউক, এই আদর্শবাদের মধ্য দিয়া নরনারীর মনবিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের যে অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে খুবই দুর্লভ। নারী-চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র নারীর গহন হৃদয়-রহস্যের একটি অপূর্ব্ব রস-মধুর জটিলতার উপর আলোক সম্পাত করিয়াছেন। হৃদয় দ্বন্দ্বমুখর—এই জাতীয় নারী-চরিত্রের আগমন বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র নূতন দরজা খুলিয়া দিলেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসখানির মধ্যেও তিনি নারীর হৃদয়-রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই গ্রন্থে চরিত্র বিশ্লেষণ বিশেষ করিয়া নারী-চরিত্রগুলি খুব সার্থক ভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। তথাপি বাঙ্গালা সাহিত্যে এই জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি হিসাবে ইহাদের যে যথেষ্ট মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করিবার নয়। কয়েকটি গ্রন্থের নারী-চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করিলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবিশ্লেষণী প্রতিভা এবং তাহার যথার্থতার পরিচয় পাইব।

'দুর্গেশ-নন্দিনী' উপন্যাসখানির মধ্যে আমরা বিশেষ করিয়া তিনটি নারী-চরিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পারি—বিমলা, তিলোত্তমা এবং আয়েষা। বিমলার চরিত্র একটু রহস্যাবৃত হইলেও তাহা হৃদয়-দ্বন্দ্বে আলোড়িত নয়। গ্রন্থের নায়িকা—তিলোত্তমা। তাঁহার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে বটে, কিন্তু তাহা উৎকট মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ প্রভৃতির মধ্যে সাধারণতঃ যতটুকু হৃদয়-দ্বন্দ্ব থাকে, 'পাব-কি-পাব-না'—ঠিক ততটুকুই আছে। পূর্ব্বরাগ অনুরাগে রূপান্তরিত হইলে মনে যে আনন্দ-মিশ্রিত বেদনার সৃষ্টি হয় তিলোত্তমার ভিতরে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। শৈলেশ্বর মন্দিরে জগৎসিংহকে দেখিয়াই তিলোত্তমার মনে অনুরাগের সঞ্চার হয়। তাই তিনি কিছু উন্মনা, কিছু উদাসীন, কিছু ম্লান! তিনি অন্যমনে "পালঙ্কের কাঠে এ ও তা 'ক', 'খ', 'ম' ঘর, দ্বার, গাছ, মানুষ ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন। আর কি লিখিয়াছেন—কুমার জগৎসিংহ।" এই স্বল্প কথাতেই বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমার অনুরাগের প্রগাঢ়তা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিলোত্তমা এক মুহূর্ত্তের জন্যও জগৎসিংহকে ভুলিতে পারেন না। তাঁহাকে এতটুকু দেখিবার জন্য, একটুকু কাছে পাইবার জন্য চঞ্চল প্রাণ সব সময়েই ব্যাকুল হইয়া থাকে; কিন্তু দেখা তাঁহার পাওয়া যায় না। প্রতিদিনের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিদিনের বাসনা প্রতিদিনই ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ হইয়া হৃদয়কে মথিত বেদনাহত করিয়া তুলে, কিন্তু তবুও আশা জাগিয়া থাকে মনের কন্দরে। আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান-হৃদয়ে তিলোত্তমা ভাবিতে থাকেন—'পাব কি পাব না।' তিলোত্তমার প্রেম গভীর হইতে পারে, কিন্তু তাহা তাঁহাকে বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে নাই। প্রবৃত্তির উৎকট তাড়নায় তিনি নিজেকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলেন নাই। তাই বিমলা যখন জানাইলেন যে, জগৎসিংহের সহিত বিবাহে তাঁহার পিতা কোন মতেই সম্মত হইবেন না, তখন হৃদয়ের অসহনীয় বেদনাকে সংহত করিয়া অতি স্থির শান্ত স্বরেই বলিলেন,—"তবে কেন?" যে প্রেম অতি স্বাভাবিক ভাবেই মনের নিভৃত কোণে সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতেছিল তাহা প্রকাশের পথ না পাইয়া অবরুদ্ধ হইয়াই কাঁদিয়া মরিল; কিন্তু তবুও তিলোত্তমার হৃদয়-পদ্মে সেই মুখচ্ছবিই বিরাজিত হইয়া রহিল। তাঁহাকে একেবারে বিস্মৃত হওয়া বা না-ভালবাসা তিলোত্তমার পক্ষে সম্ভব হইল না। তিলোত্তমার অন্তরের আরও পরিষ্কার পরিচয় আমরা পাই তখনই যখন জগৎসিংহ কারারুদ্ধ এবং তিনিও বন্দিনী। সেই সময়ে তিনি মনে মনে যে সকল আলোচনা করিতেছেন তাহাতে তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিলোত্তমাকে যখন জগৎসিংহের সহিত দেখা করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়, তখনকার দৃশ্যটি বঙ্কিমচন্দ্র খুবই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে যে ব্যঞ্জনা রহিয়া গিয়াছে তাহা সত্যই হৃদয় স্পর্শ করে। কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি ও মনোবিশ্লেষণী শক্তি থাকিলে মানুষের মনের গহনে প্রবেশ করিয়া তাহার মর্ম্ম-কথাটি উদ্ঘাটন করিতে পারা যায় তাহাই শুধু মনে হয়। প্রহরী তিলোত্তমাকে লইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। তিলোত্তমা কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিলেন। তিলোত্তমার ভাবে ভাবিত হইলে বুঝিতে পারা যায়, এখন তাঁহার মনের কি অবস্থা। যাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ব্যাকুল কাকুতি কোন সময়ের জন্য নিবৃত্ত হয় নাই, দুইটি চক্ষু-পল্লব কখন একত্র হয় নাই, তাঁহাকে আজ কোনরূপে দেখিব, কোন্ প্রাণে দেখিব, কোন্ ভাষায় তাঁহাকে সম্ভাষণ করিব—এইরূপ বিভিন্ন ভাব ও অনুভূতির সংঘর্ষে তাঁহার সত্তা আলোড়িত হইতে লাগিল। হৃদয়ের অদম্য প্রাণভরা আশা-আনন্দ লইয়া যখন তিনি সত্যই রাজকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন জগৎসিংহ তাঁহাকে প্রথমে চিনিতেই পারিলেন না। পরে চিনিতে পারিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। তিলোত্তমার 'ক্ষণ-প্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল।' এইটুকু কথার মধ্য দিয়া কবি নারী-হৃদয়ের গভীরতম গোপন ব্যথাটি অঙ্কিত করিয়া গেলেন। রাজকুমারকে দেখিবার

পূর্ব্বে তিলোত্তমার হৃদয়-পদ্ম বিচিত্র আশায় একটির পর একটি দল খুলিতেছিল; কিন্তু রাজকুমারের নিকট হইতে যখন কোন প্রতিদানই পাইলেন না পরন্তু অবজ্ঞাই পাইলেন, তখন হৃদয়ের অসহনীয় গ্লানি ও বেদনায় তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র কথার পর কথা, ঘটনার পর ঘটনা দিয়া তিলোত্তমার বেদনা ব্যক্ত করেন নাই, অতি অল্প কথায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, সহৃদয় পাঠক মাত্রই তাহার সম্পূর্ণতা গ্রহণ করিতে পারেন।

আয়েষার চরিত্রেও লেখক এই দিক্‌টাই অন্য উপায়ে দেখাইয়াছেন। জগৎসিংহ একবার পীড়িত হইলে আয়েষা তাঁহার শুশ্রূষা করেন এবং এই সেবার মধ্য দিয়াই অতি স্বাভাবিক ভাবে জগৎসিংহের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্তা হইয়া পড়েন এবং জগৎসিংহও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। আয়েষার প্রেমের মধ্যে একটা ত্যাগের মহান্ আদর্শ দেখা যায়—যাহা নারী-চরিত্রে খুব সুলভ নয়। আয়েষা জগৎসিংহকে খুবই ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহা কোন দিন সংযম ও শালীনতার বাঁধ অতিক্রম করিয়া যায় নাই। স্থির স্নিগ্ধ প্রদীপের শিখার মত সে প্রেম জ্বলিয়া আলোক বিকিরণ করিয়াছে, কিন্তু কোথাও অত্যুজ্জ্বল হইয়া অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে নাই। জগৎসিংহ যখন অচৈতন্য অবস্থায় একবার তিলোত্তমার নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন তখন আয়েষা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে জগৎসিংহের হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই অন্য নারী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া আছে, সেখানে তাঁহার স্থান লাভ করা সম্ভব নয়। তখন তিনি নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন। সেই জন্য যখন জগৎসিংহ বলিলেন যে, তিনি স্বপ্নে এক দেবকন্যা দেখিয়াছেন যিনি তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছেন, এবং আয়েষাকে প্রশ্ন করিলেন—"সে তুমি না তিলোত্তমা?" তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী আয়েষা বুঝিলেন, অচৈতন্য অবস্থায় কুমারের মুখ হইতে যে নারীর নাম উচ্চারিত হইয়াছে তিনি রাজকুমারের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা; তাই তিনি তাঁহার গোপন প্রেমকে বেদনায় নিষ্পেষিত করিয়া সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিলেন—"আপনি তিলোত্তমাকেই দেখিয়া থাকিবেন।" আয়েষা যখন বুঝিলেন যে, কুমারের হৃদয় অন্য নারী কর্ত্তৃক অধিকৃত তখন তিনি তাহাকে উৎখাত করিয়া কুমারের হৃদয়ে আপনার স্থান করিয়া লইতে প্রয়াসী হইলেন না বা কোনরূপ নীচতাও প্রকাশ করিলেন না। তিনি তিলোত্তমাকে কিছুমাত্র ঈর্ষা না করিয়া পরন্তু তাহার সহিত অতি মধুর ব্যবহারে নিজের ঔদার্য্যেরই পরিচয় দিলেন। যে প্রেম নীরবে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাকে সেইরূপ নীরবেই নিষ্পেষিত করিয়া তিনি তিলোত্তমার পথ মুক্তই রাখিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিলেন, কিন্তু তথাপি তিলোত্তমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার চিত্ত কোন দিনই সাড়া দেয় নাই। নারী-চরিত্রের এই ত্যাগের দিক্‌টাই বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার চরিত্রের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই দুইটি নারী-চরিত্রে হৃদয়-দ্বন্দ্ব খুব জটিল হইয়া উঠে নাই বটে, তবে এই ধরণের চরিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম প্রবর্ত্তিত করিতে সাহসী হইয়াছেন বলিয়া ইহাদের যথেষ্ট মূল্য আছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আমরা দুইটি নারী-চরিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পারি—একটি ভ্রমর ও অপরটি রোহিণী। ভ্রমরের ভিতর হৃদয়-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই, আছে শুধু স্বামীর প্রতি দুর্জ্জয় অভিমান—সুন্দর ও মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ভ্রমরের অভিমানে যথেষ্ট হিংসা আছে, কিন্তু তাহা বিকৃত নয়। এ অভিমান স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমেরই পরিচয় দেয়।

রোহিণীর ভিতর সত্য প্রেমজনিত অন্তর-দ্বন্দ্ব আছে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, রোহিণী ভালবাসার দ্বারা চালিত হয় নাই, হৃদয়-বৃত্তির দ্বারাই চালিত হইয়াছে বেশী বলিয়া মনে হয়। রোহিণী বাল-বিধবা। ব্রহ্মানন্দের গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনের বাকী অংশ কাটাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা-বাসনাকে সংযত করিয়া একটি মসৃণ পথে চলা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। জীবনে চলার পথে প্রথম বাধা হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল হরলাল। নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্য হরলাল রোহিণীর নিকট প্রেম-নিবেদন করিল, কিন্তু রোহিণীর উন্মুখ হৃদয় সত্যাসত্যের বিচার না করিয়াই তাহার জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার পর যখন নিজের ভুল ভাঙ্গিল, তখন আবার গোবিন্দলালকে তাহার না হইলেই চলে না,—গোবিন্দলাল ব্যতীত জীবন ব্যর্থ, নৈরাশ্যময়! এই ভাবেই রোহিণী সারাটি জীবন নিজেকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল, কিন্তু শান্তি কোথাও পাইল না। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র মনোবিশ্লেষণ যত না করিয়াছেন, তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে অসংযত চিত্তবৃত্তি দ্বারা মানুষ শুধু বিক্ষিপ্তই হয়, সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়,—শান্তি জীবনে কোন দিনই পায় না। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে তাহারা যে পথ বাছিয়া লয়, তাহাতে শালীনতার অভাব যেরূপ থাকে সেইরূপ মঙ্গল ও মাধুর্য্যের অভাবও যথেষ্ট থাকে। কাজেই যাহাতে মঙ্গল নাই তাহাতে জীবন কখনও সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে না। এই শিক্ষা দিবার জন্যই যেন বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

'বিষবৃক্ষ'তে আমরা যে কয়টি নারী-চরিত্র পাই, তাহার মধ্যে সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীই প্রধান। সূর্য্যমুখীর সহিত ভ্রমরের চরিত্রের প্রধান সাদৃশ্য এই যে, উভয়েই স্বামি-প্রেমে অভিমানিনী। ভ্রমর স্বামিপ্রেমে বঞ্চিত হইয়া তিলে তিলে জীবন বিসর্জ্জন করিল, আর সূর্য্যমুখী অসীম ধৈর্য্যশালিনী নারী হইয়া স্বামীর পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া মনক্ষোভে গৃহত্যাগিনী হইল। দুইটি চরিত্রই বাঙ্গালী-গৃহের আদর্শ নারী-চরিত্র। কিন্তু কুন্দনন্দিনীকে লেখক ক্ষমা করিতে পারিলেন না। কুন্দনন্দিনী বিধবা হইয়া নগেন্দ্রকে ভালবাসিল। যৌবনের প্রথম উন্মেষে স্বামীকে হারাইয়া সে পাইল নগেন্দ্রনাথকে। আশ্রয়দাতার দুর্দ্দমনীয় বুভুক্ষাকে সে প্রতিরোধ করিতে চাহিলও না বা পারিলও না। নিজের অতৃপ্ত ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সে নগেন্দ্রের সম্মুখ হইতেই সরাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না। নগেন্দ্রের উত্তেজনায় তাহা যেন ঘৃতাহুতি স্বরূপ হইল। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দর যথার্থ প্রেমের দিক্‌টা বিশেষ ভাবে অঙ্কিত না করিয়া তাহার অসংযত প্রকৃতির দিক্‌টাই দেখাইয়াছেন বেশী। কুন্দ আত্মসংযম করিতে শিক্ষা করে নাই, তাই সে নগেন্দ্রনাথের পাপ-প্রবৃত্তির সম্মুখে সহজেই আত্মহারা হইয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ নারী-চরিত্র সৃষ্টি বহু উপন্যাসে পাওয়া যায়। ইহারা বহিঃপ্রক্ষেপেই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে বেশী,—অন্তর-দ্বন্দ্ব ইহাদের মধ্যে খুব কম বলিয়া মনে হয়। অন্তর-দ্বন্দ্বের

'চন্দ্রশেখর' ও কপালকুণ্ডলা'র চরিত্রগুলি শুধু বাহ্য শক্তিতেই বিপর্য্যস্ত হয় নাই, অন্তরের ভিতর যে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহার দ্বারাই প্রধানতঃ বিশেষ ভাবে আলোড়িত হইয়াছে। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শুধু চক্রপিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বাহ্য শক্তির দ্বারা নিপীড়িত হয় নাই, অন্তরস্থিত কামনা-বাসনাই তাহাকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছে অধিক। যে প্রলয় ঝটিকা তাহাকে গৃহকোণ হইতে বিতাড়িত করিল সে ঝটিকা বাহির হইতে আসে নাই, তাহা উদ্ভূত হইয়াছে তাহারই হৃদয়-কোণ হইতে।

উপন্যাসের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেম। প্রতাপ জানিত, শৈবলিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে না, কিন্তু শৈবলিনী জানিত, 'প্রতাপের সহিত আমার বিবাহ হইবে।' এই দারুণ ভুলেই 'ট্র্যাজেডি'র সূত্রপাত হইল। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শৈবলিনী বুঝিতে পারিল যে, "প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই।" তার পর তাহারা একসঙ্গে জীবন বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিল। গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিতে দিতে প্রতাপ বলিল, "আর কেন, এইখানেই।" প্রতাপ ডুবিল কিন্তু শৈবলিনী পারিল না। যে মুহূর্ত্তে শৈবলিনী বলিতে পারিল, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই, ঠিক পরক্ষণেই সে ভাবিতে পারিল, "প্রতাপ আমার কে? কেন মরিব?" এইখানে আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, তবে কি শৈবলিনী প্রতাপকে যথার্থ ভালবাসে নাই? এ কি তাহার মোহ মাত্র? এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায় তাহাদের দ্বিতীয় বারের সমস্যার সমাধানে। এবারেও প্রতাপ ডুবিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শৈবলিনী অনায়াসেই বলিতে পারিল, "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি, কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" শৈবলিনী প্রতাপকে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল এবং মনে মনে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিল। বাল্য এবং কৈশোরের বন্ধু যখন যৌবনের প্রথম উষায় জীবনের সমস্ত মাধুর্য্যের সম্ভার লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখন 'চাই না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা ত সহজ নয়? শৈবলিনীও করিতে পারিল না। তাই বাস্তব জীবনে যখন তাহার প্রতাপের সহিত বিবাহ না হইয়া চন্দ্রশেখরের সহিত হইল তখনও সে প্রতাপকে মন হইতে একেবারে ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। পরন্তু তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আরও দুর্নিবার হইয়া উঠিল। চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ হইয়া যাইবার পর সে জানিল যে ইহ-জীবনে প্রতাপকে আর স্বামিরূপে পাইবার আশা নাই, এমন কি তাহাকে প্রকাশ্যে ভালবাসাও সম্ভব নয়, তখন পুঞ্জীভূত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন বিদ্রোহীরূপে দেখা দিল। সে মনে মনে বলিল, প্রতাপকে আমার পাইতেই হইবে—এইরূপ দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে শান্তিময় গৃহকোণ হইতে এক অজানা বিক্ষোভের মধ্যে লইয়া গিয়া ফেলিল। প্রতাপকে পাইবার জন্য সে দেবতুল্য স্বামী, গৃহকর্ম্ম, সমাজ, সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়া ফষ্টরের সহিত বাহির হইয়া আসিল। এইরূপে নিজ জীবনের ব্যর্থতা—চরম 'ট্র্যাজেডি' নিজেই বহন করিয়া আনিল। এ কথা সে নিজেই প্রতাপের নিকট স্বীকার করিয়াছে, "তুমি কি জান না যে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশার গতত্যাগিনী আত্ম-সম্মান, বংশ-মর্য্যাদা, সমাজ, সংস্কার ত্যাগ করিয়া এত করিয়াও প্রতাপকে লাভ করা শৈবলিনীর পক্ষে সুদূর-পরাহতই রহিয়া গেল। প্রতাপকে তাহার জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে—রামানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক তাহার এই কঠিন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইল। শৈবলিনী উন্মাদ হইয়াও প্রতাপকে বিস্মৃত হইতে পারিল না। উন্মাদ রোগের অবসানে সে নূতন জীবন লাভ করিল। স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিল বটে, কিন্তু এ ভক্তির মূলে জ্ঞানবৃত্তি থাক আর ধর্ম্মবৃত্তিই থাক, হৃদয়-বৃত্তিকে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারিল না। প্রতাপকে ঘিরিয়া যে প্রেম জীবনের প্রথম অধ্যায়ে শতদলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সে হৃদয় হইতে একেবারে নির্ম্মূল করিবে কোন শক্তির দ্বারা? জীবন ব্যাপারে যে দুর্জ্জেয় রহস্য মানুষকে পদে-পদে অভিভূত করিয়াছে, তাহাকে সে অস্বীকার করিবে কিরূপে? তাই সে প্রতাপকে আর মনে স্থান দেওয়া হইবে না এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। তাই প্রতাপকে বিস্মৃত হওয়া তাহার পক্ষে একেবারেই সম্ভব হইল না। শৈবলিনী এখনও নিজের মনকে বিশ্বাস করে না। তাই সে প্রতাপকে ডাকিয়া বলিল, "যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" ধর্ম্ম ও সমাজের কঠোর অনুশাসনে শৈবলিনী মুখে যাহাই বলুক না কেন, অন্তরের নিভৃততম স্থানটি হইতে সে প্রতাপকে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে পারিল না। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যাহার সহিত মধুর সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি কোন রামানন্দ স্বামীর যোগবলের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসখানিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিতে পারা যায়। এই উপন্যাসে যে চরিত্রগুলি স্থান পাইয়াছে, বিশেষ করিয়া মেহেরউন্নিসার চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র নারীর গহন-হৃদয়-রহস্যের একটি অপূর্ব্ব রস-মধুর জটিলতার উপর আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। হৃদয়-দ্বন্দ্ব-মুখর এই জাতীয় নারী-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিলেন।

এই উপন্যাসখানির মধ্য দিয়া আমরা কপালকুণ্ডলা, শ্যামা-সুন্দরী, মতিবিবি ও মেহেরউন্নিসা—চারিটি নারী-চরিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রগুলি শুধু সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির জন্যই কাল্পনিক বা অপার্থিব করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ইহার ভিতর তাঁহার মনোবিশ্লেষণের যে অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব।

জল যেরূপ বস্তুতঃ একই জিনিষ, শুধু বিভিন্ন আকারের পাত্রে রাখিলে বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এই চারিটি নারী-চরিত্রও ঠিক সেইরূপ। বস্তুতঃ, ইহারা রক্ত-মাংসে গঠিত এক একটি মানুষই বটে, কিন্তু বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার আবহাওয়ায় ইহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনোধর্ম্ম লইয়া আমাদের চির-বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে।

কপালকুণ্ডলার চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের, শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের কেন সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিতে পারা যায়। মানুষ মনুষ্য-

কিরূপ হইতে পারে, বা তাহাকে আবার সমাজে আনিলে সে সমাজের অন্যান্য মানুষের মত হইতে পারে কি না, এই সব সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই যেন বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি-পালিতা। কাপালিক ও অধিকারীর তত্ত্বাবধানে সে পালিতা ও বর্দ্ধিতা হইয়াছে। সামাজিক রীতি-নীতি আচার-জ্ঞানবিবর্জ্জিতা ধর্ম্মভীরু যুবতী সে। বাল্যকাল হইতে সে যাগ-যজ্ঞ, নরবলি দেখিয়া আসিয়াছে, কাপালিক ও অধিকারীকেও সে কালীর পূজারী হিসাবেই দেখিয়াছে। কাজেই দেব-দ্বিজে ভক্তি-ভাবই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সামাজিক রীতি-নীতি হইতে সে বহু দূরে বর্দ্ধিতা, কাজেই সমাজের কোনরূপ প্রভাবই তাঁহার উপর পড়ে নাই। ভক্তি, করুণা ও পরোপকার ভিন্ন তাহার নারী-চিত্তে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা বা বাসনার সঞ্চার হয় নাই। তাই নবকুমারকে প্রথম দেখিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবলে শুধু করুণার উদ্রেক হইয়াছিল; কিন্তু সেই করুণা স্বাভাবিক ভাবেই প্রেমে পরিণত হয় নাই। তাহার মনে কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না, তাই সে অতি সহজেই অপরিচিত যুবকের পৃষ্ঠদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিয়াছিল—"কোথা যাইতেছ, যাইও না, ফিরিয়া যাও, পলায়ন কর।" যৌবনের দুরতিক্রম্য প্রভাব তাহাকে স্পর্শ করিল না। নবকুমারের সহিত এক বৎসর স্বামি-স্ত্রী ভাবে বাস করিয়াও নারী-হৃদয়ের কামনা বাসনা তেমনি সুপ্ত রহিল।—এই জন্যই কপালকুণ্ডলার চরিত্রটি অপার্থিব বলিয়াই মনে হয়।

নারী-চরিত্রের আর একটি দিক্ দেখাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শ্যামাসুন্দরীকে সৃষ্টি করিলেন। শ্যামাসুন্দরীর চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু নিপুণ মনোবিশ্লেষণী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নয়, পরন্তু তিনি আমাদের সমাজের একাংশের একখানি নিখুঁত আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন।

শ্যামাসুন্দরী স্বামিপ্রেম-বঞ্চিতা, বেদনাময়ী নারী। স্বামীর প্রেম লাভ করিতে তাহার যত বাসনা, স্বামীকে প্রেম-নিবেদন করিতেও তদ্রূপ; কিন্তু নিয়তির নির্ম্মম বিধানে তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। তবুও বুকভরা বেদনার মধ্যেও তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া যায় নাই বা হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হইয়া উঠে নাই। অশেষবিধ দুঃখ-বিরহ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও নিজের অন্তরের নিগূঢ়তম আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্পেষিত করিয়াও সে তাহার কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। বঙ্গ-সমাজের এইরূপ কত নিষ্ফল অনাদৃত নারী-জীবন সংসার-সরোবরে আপনি প্রস্ফুটিত হইয়া আপন কর্ত্তব্য শেষ করিয়া সকলের অলক্ষ্যে নীরবেই ঝরিয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে?

বঙ্কিমচন্দ্র নারী-চরিত্রের আর একটি দিক্ উন্মুখ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন—মতিবিবির চরিত্র অঙ্কিত করিয়া। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহার প্রণয়হীনতা। শ্যামাসুন্দরীর ভিতর আমরা দেখি প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা আছে, তবে তাহা খুবই সংযত, শালীনতার অভাব কোথাও বিন্দুমাত্রও নাই। আজীবন স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়াও স্বামীর প্রতি কোনরূপ বিক্ষোভ বা বিদ্বেষ নাই। আর বিলাসময়ী, "কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরী।" প্রথম জীবনে দাম্পত্য-প্রেম জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই সে স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর আগ্রায় আসিয়া যৌবনের সুতীব্র আবেগের খরস্রোতে নিজেকে একেবারেই ভাসাইয়া দিল। আগ্রায় অতুল ঐশ্বর্য্য ও নানাবিধ প্রাচুর্য্য উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সে শুধু ইন্দ্রিয়-সুখই খুঁজিয়াছে, ভালো কাহাকেও বাসে নাই—এ কথা সে নিজ-মুখেই স্বীকার করিয়াছে। নবকুমারকে দেখিবার পর হইতে সে তাহার সঙ্গসুখ কামনা করিয়াছে, ইহার মূলে সত্যকার প্রেম ছিল কি না বুঝা যায় না। সেলিমের প্রতি তাহার যে প্রেম তাহাও সন্দেহ-জালে আবৃত। স্বার্থান্ধ মতির নিকট প্রেমের কোন মূল্যই ছিল না। সেই জন্যই সে বলিতে পারিয়াছিল যে, সে আগ্রার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া যাইতে রাজী আছে, তথাপি মেহের উন্নিসার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারিবে না। সেলিমকে সে যদি সত্যই ভালবাসিত, তবে নিজ-সুখে বঞ্চিত হইয়াও সেলিমকে সে নিজের কাছ ছাড়া করিতে রাজী হইত না। যথার্থ প্রেম ঐশ্বর্য্য-কুল-মান-ধর্ম্মকেও ম্লান করিয়া দেয়।

এইবার আমরা মেহেরউন্নিসার চরিত্র দেখিব। এই চরিত্র সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক মনোবিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেয়। এইরূপ চরিত্র-সৃষ্টি ইংরেজি সাহিত্যে বেশ প্রচলিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই এই প্রথম অবদান। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্য-জীবনের দ্বন্দ্ব-রহস্য স্বাভাবিক মানবীর চিত্তবৃত্তির এরূপ একটি নিখুঁত মনোবিশ্লেষণ করিয়াছেন যে তাঁহাকে অতি সহজেই এক জন বিপুল মনস্তত্ত্ববিদ্ বলা যাইতে পারে। যে জীবনে দ্বন্দ্ব নাই, সংঘাত নাই, দ্বৈতসত্তা নাই, কেবল আছে নিরবচ্ছিন্ন সুখ অথবা দুঃখ, সে জীবন কখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সেই দিক্ দিয়া আমরা বলিতে পারি যে, পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি চরিত্রের কোনটিই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। এই জন্যই মেহেরউন্নিসার চরিত্র সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে।

মেহেরউন্নিসার জীবনে দুইটি পুরুষের আবির্ভাব হয় এবং তিনি একই সঙ্গে দুই জনকে ভালবাসিতে থাকেন। সাধারণ দৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে ইহা অসঙ্গত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু মনোবিশ্লেষণকারিগণের মতে ইহা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। একই সময়ে একাধিক ব্যক্তিকে ভালবাসিতে পারা কোন কোন অসাধারণ নারীর পক্ষে অসম্ভব নয়। মেহেরউন্নিসা একই সঙ্গে দুইটি পুরুষকে ভালোবাসিয়াছিলেন—এক সেলিম—তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের সঙ্গী; আর এক শের আফগান—তাঁহার ধর্ম্মপতি। মেহের কায়মনোবাক্যে পতিপ্রাণা ছিলেন, কিন্তু অলক্ষ্যে সেলিমের প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিলেন। তাই বলিয়া মেহের দ্বিচারিণী বা অসতী নয়। সেলিমের প্রতি তাঁহার প্রেম অকৃত্রিম। বাল্যকালের সোণালী উষায় যাঁহার সান্নিধ্যে শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছেন, কৈশোরের মুকুলিত প্রেম যাহাকে অবলম্বন করিয়া যৌবনে শতদল সম প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহা যত আঘাতপ্রাপ্তই হউক না কেন, কোন দিন বিস্মৃত হইবার নয়। যৌবনের প্রথম উষায় এক দিন যাহাকে ভালবাসা গিয়াছিল, জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে তাহাকে তো বিস্মৃতির অতল তলে একেবারে নিমজ্জিত করা যায়

তথাপি তাহা তীক্ষ্ণতম হইয়া বিঁধিতে থাকে। তাই শের আফগানের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেও এবং তাহাকে সেলিমের নিকট হইতে দূরে প্রেরণ করিলেও সেলিমকে বিস্মৃত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অপর পক্ষে তিনি যতই আবেগময়ী বা প্রণয়শালিনী হউন না কেন, তথাপি সমাজ ও সংস্কারকে অবৈধ প্রেমের বেদীতে বলিদান করেন নাই। আফগানের প্রতি একনিষ্ঠ পতিপ্রেম তাঁহাকে কখনও আত্মবিস্মৃত হইতে দেয় নাই। তাই যখন মতিবিবি তাঁহাকে বলিলেন—"এ হিন্দুস্থানে কেবল মেহেরউন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত," তখন মনের গভীরতম প্রদেশে যে আকাঙ্ক্ষা বা বেদনাই আপন নীড় রচনা করিতে থাকুক না কেন, তবুও নারীদর্পে গর্ব্বিতা হইয়া তিনি লুৎফউন্নিসার নিকট বিনীত হইয়া বলিলেন, "তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি শের আফগানের দাসী তাহা ভুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।" কিন্তু এত দর্প ও সজাগ বিবেক-বুদ্ধিতেও অন্তরের নিভৃত পুরে সঞ্চিত থাকিতে সেলিমের প্রতি একটি নিবিড়তম অনুরাগ। তাহাকে কাছে পাইবার একটি করুণ আকুতি সর্ব্বদাই তাঁহাকে আকুল করিয়া রাখিত।

এই চরিত্র-বিশ্লেষণটি বঙ্কিমচন্দ্রের অদ্ভুত সৃষ্টি। অদ্ভুত সৃষ্টি এই জন্য যে, ঘাত-প্রতিঘাতের সমষ্টি লইয়াই মনুষ্য-জীবন গঠিত হয়। অন্তর যাহাকে একান্ত ভাবে কামনা করে অথচ বাস্তব সংসারে তাহাকে লাভ করা অনেক সময়ে মোটেই সহজ হয় না, কারণ সমাজ, সংস্কার, আদর্শ, উদ্দেশ্য তাহাকে নিবৃত্ত করিতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে, অথচ ভিতরকার সহজাত প্রবৃত্তি সমূহ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, তখনই এই বৈষম্য আনে বিদ্রোহ, বিপ্লব, বেদনা, বিরহ—যা জীবনকে তাহার প্রারম্ভিক ভিত্তিভূমি হইতে উৎখাত করিয়া অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে লইয়া গিয়া ফেলে। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের এই ট্র্যাজেডি দেখাইয়াছেন মেহেরউন্নিসার চরিত্রে।

মেহেরউন্নিসার চরিত্রে আমরা যে দ্বৈত-সত্তার সংঘাত দেখিতে পাই, তাহা একান্ত ভাবেই যে ইউরোপীয় তাহা সমস্ত দেশের নরনারীর মানসিক অনুভূতিগত জীবনেই জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই দ্বৈত-সত্তার প্রভাব অল্প-বিস্তর আছে। তবে যে সমাজ এই মনোবৃত্তি স্ফুরণের সুযোগ ও সুবিধা দেয়, সেই সমাজে তথা দেশে ইহা যেরূপ নির্দ্দোষ ও অপ্রতিহত গতিতে চলিতে পারে, অন্য দেশে সেরূপ পারে না। ভারতবর্ষের কথা যদি ধরা যায় তবে দেখিতে পাই যে, এইরূপ মনোবৃত্তি যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষতঃ নারীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়ে তবে তাহার শাস্তি অনিবার্য্য। দণ্ডধারী সমাজ তাহাকে কোন ক্রমেই নিষ্কৃতি দিবে না। ভারতীয় সমাজের ভিত্তিহীন অনুশাসন এইরূপ নির্ম্মম নিষ্ঠুর একদেশদর্শী যে মানুষের অন্তরে যত গভীর চাহিদাই থাক না কেন, তাহা যদি তাহার আদর্শের নিরিখে নীতি-বিগর্হিত হয় তবে সমাজ তাহাকে কোন প্রকারেই সহ্য করিবে না। নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য যে অনিবার্য্য শাস্তি, তাহা যত কঠোরই হউক না কেন, বিশেষতঃ নারীকে ভোগ করিতেই হইবে। কাজেই মেহেরউন্নিসার ভিতর আমরা যে দ্বৈত-সত্তা দেখিতে পাই তাহা যে আমাদের সমাজে একেবারেই বিরল, তাহা নয়। তবে সমাজ যাহাকে প্রশ্রয় দেয় না পরন্তু কঠোর শাসন করে, সেখানে এ প্রেম আপনার বহিঃ-প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কাজেই সাহিত্যে তাহার আর স্থান হয় না। তাই ভারতীয় সাহিত্যে অবৈধ প্রেমের সহজ প্রচলন বড় বিশেষ দেখা যায় নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ প্রেমকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তাহাদের নিকট প্রেমের আদর্শ আরও বিস্তৃত। তাহারা equality of sexকে কোন দিনই কোন ক্ষেত্রে অল্প মূল্য দেয় নাই। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাহাই। ও-দেশে একসঙ্গে একটি পুরুষ যেরূপ একই সঙ্গে একাধিক নরীকে ভালবাসিতে পারে, নারীর পক্ষেও সেরূপ ঘটা কিছু মাত্র অনধিকার চর্চ্চা বা ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য নয়। তবে শালীনতার সীমা যেখানে অতিক্রম হইয়া যায় সেখানে তাহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। এ নিয়ম ভারতেও যেরূপ ও-দেশেও সেরূপ মানা হয়। যাহাই হউক, ভৌগোলিক বেড়ার দ্বারা নরনারীর প্রেম যাচাই করা যায় না, পারিপার্শ্বিকতার আবহাওয়াতেই মানুষের চিত্তবৃত্তি অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইউরোপীয় সমাজে প্রেমের বহু প্রকার প্রকাশের নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহাদের সমাজের সহিত ব্যক্তি-জীবনের বেশ একটি সমন্বয় আছে। কাজেই সমাজ যেখানে উদার সেখানে প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সেই জন্য সাহিত্যে তাহার আগমন কিছু মাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রেমকে লইয়া যে ভাবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছে আমাদের সাহিত্যে ঠিক ততখানি দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এই ভাবধারা তাঁহার উপন্যাসে প্রবর্ত্তিত করিতে সাহসী হইলেন। আধুনিক লেখকগণ যদিও ইহাতে এখন হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা খুবই বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বহু পূর্ব্বেই কূপমণ্ডুক সমাজের মধ্যে একটি নূতন জীবনের সাড়া আনিয়া তাহাকে সুপ্রোথিত করিলেন। যে সমাজ ধর্ম্ম ও নীতিই কেবল মানিয়া আসিয়াছে, অন্তরের যে পরম তৃষ্ণা তাহাকে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই, বঙ্কিমচন্দ্রই অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত মানুষের অন্তরের সেই গোপন সত্যকে উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইলেন তাঁহার সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে continental artকে বঙ্গ-সাহিত্যে যে ভাবে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব!
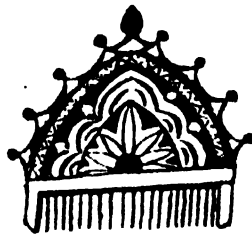
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি

ললিত হাজরা

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক হিসাবে আমরা সাধারণতঃ গণ্য করিয়া থাকি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীকে। আমরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি, সুরেন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী উভয়েই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রারম্ভ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সমাজের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন রাজা রামমোহন রায়। এই রাজা রামমোহন রায়কেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

এখন প্রশ্ন উঠিবে যে, রাজা রামমোহনকে কেন জাতির জনক বলা যাইতে পারে? তিনি এমন কি করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে সুরেন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর উপরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বহু কথা লিখিতে হইবে; কিন্তু বক্ষ্যমান প্রবন্ধে লেখকের সে সুযোগ না থাকায় অল্প কথায় বক্তব্য প্রকাশ করিব। রাজা রামমোহনের জন্ম হয় ১৭৭২ সালে, অর্থাৎ পলাশীর প্রান্তরে বাংলার সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইবার ১৬ বৎসর পরে এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার জন-সংখ্যার মোট এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যাবার দুই বৎসর পরে। রামমোহনের জন্মকালে বাংলার অবস্থা—সামাজিক এবং রাজনৈতিক—আমাদের জানা প্রয়োজন। সবে মাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রীতিমত ব্যবসায়ের নামে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছে—অত্যাচারী নায়েব-গোমস্তারা রুজি-রোজগারের আশায় রাজস্ব আদায়ের নামে স্বদেশের কৃষকদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইংরেজ ব্যবসায়ীরা মদ্য আমদানী করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা ও নীতিজ্ঞানহীনতার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র ১৬ বৎসরের ব্যবধানে একটি স্বাধীন জাতির নরনারী পশুর পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। এই সামাজিক পরিবেশে রাজা রামমোহনের আবির্ভাব হইল।

রাজা রামমোহন তদানীন্তন যুগের প্রচলিত শিক্ষা লাভ করিয়া কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়োজন মাফিক সরকারী চাকুরী

গ্রহণ করিলেন না। এই ক্ষণজন্মা পুরুষ যৌবনে জাতির সামগ্রীক অধঃপতনে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলেন। তৎকালে বিদেশী শিক্ষা, সভ্যতা, আচার সব কিছুই হিন্দু ও মুসলমানের নিকট ছিল পরিত্যাজ্য। নিজেদের সব কিছুই ছিল ভাল—বিদেশের সব কিছুই ছিল অতি ঘৃণ্য। এই সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন যৌবনেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তিনি বিদেশের সব কিছুই কদর্য্য—এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন ঘটাইবার বাসনায় তিনি প্রথমেই বারাণসী গিয়া সংস্কৃত কৃষ্টি এবং পরে পাটনায় আসিয়া পারসিক ও আরবী সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার পর সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া তিব্বতীয়, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিলেন।

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া

রাজা রামমোহন ইংরাজী চিন্তাধারা এবং পাশ্চাত্যের সভ্যতার মূলাদর্শ বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। তদানীন্তন যুগের প্রগতিশীল চিন্তানায়ক বলিয়া খ্যাত বেনথাম, রস্কো প্রভৃতি মনীষিগণ রাজা রামমোহনের বিপ্লবী চিন্তাধারার সহিত নিজেদের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাকে সহকর্ম্মী বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। এবার রাজা রামমোহন হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া অর্থহীন রক্ষণশীলতাকে ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের মহান্ আদর্শের সহিত পাশ্চাত্যের আদর্শের সমন্বয় সাধন করিতে লাগিয়া গেলেন। যুগের সঞ্চিত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা যে সে দিনে কত বিপজ্জনক ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। চারি দিক্ হইতে বাধা আসিতে লাগিল, কিন্তু নব জীবনের উদ্গাতা রাজা রামমোহন কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন না। যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ কিছুই হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ শুনিতে রাজী হইলেন না। রাজা রামমোহন তখন আশ্রয় লইলেন আইনের। বিদেশী শাসকের সাহায্যে তিনি সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটাইলেন।

পাশ্চাত্যের ভাবধারার সহিত স্বদেশবাসীদিগকে পরিচিত করাইবার জন্য রাজা রামমোহন ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ১৮১৭ সালে ২০শে জানুয়ারী তারিখে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

বাংলা সাহিত্যে রাজা রামমোহনের দান অসামান্য। তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গদ্যের অবতারণা করেন। From 1815, his translations, introductions and treats, with their clarity and vigour of expression, gave a new dignity to Bengali prose and established its claim as a vehicle of elegant expression in seniors subjects." (Amit Sen—Notes on Bengal Renaissance—page 8)। এই সময় হইতেই রাজা রামমোহন অতি পরিচিত সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ হইতে বাঙ্গালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদেশী শাসকের ষড়যন্ত্রে শতধা বিচ্ছিন্ন বাংলার সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য এবং সুখী পরিবার গঠনের জন্য সমগ্র জাতিকে বেদান্ত চর্চ্চায় অনুপ্রাণিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌত্তলিকতার প্রতিক্রিয়া এবং জাতিভেদ প্রথাই আমাদের অনৈক্যের প্রধান কারণ। এই অনৈক্য উৎসাদন করিতে প্রয়োজন জাতিভেদ প্রথার বিলোপসাধন। এই জাতিভেদ প্রথাই আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত করিতে পারে নাই এবং ইহার ফলেই আমাদের রাজনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নতির পথ চিরতরে বন্ধ হইয়াছে। এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই তিনি ধর্ম্মের নামে যে বীভৎস অনাচার চলিত তাহারই সংস্কার সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন।

ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন বহু যুবক বিদেশী শাসকের তাঁবেদারে পরিণত হইতে লাগিল, আবার অন্য দিকে নৈরাশ্য-বিক্ষুব্ধ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত দলের এক শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। এই শ্রেণীই হইল বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী। রাজা রামমোহন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দেখিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আসন্ন সংগ্রামের সংগ্রামী মনোভাব এবং প্রকৃত নেতৃত্ব।

১৮২৩ সাল হইতেই রাজা রামমোহন দেখা দিলেন নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের সেনাপতিরূপে। সে যুগে এই দৃঢ়তা অসমসাহসিকতার পরিচয়। সপারিষদ বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন দণ্ডায়মান হইলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা চলিবে না এই দাবী তিনি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইল। ১৮২৩ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে এই প্রেস আইন লিপিবদ্ধ হয়। "এই আইন অনুসারে কোন সাময়িক পত্র বাহির করিবার পূর্ব্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল; কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গবর্মেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইলে তবে লাইসেন্স বা অনুমতি পাওয়া যাইত, কিন্তু সে জন্য কোনও ফি দিতে বা খরচ করিতে হইত না। কি কি বিষয়ের আলোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক সম্পাদককে দেওয়া থাকিত। তাহা সত্ত্বেও আইন-বিরুদ্ধ কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে কাগজের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া হইত এবং বেআইনী ভাবে কাগজ চালাইলে চারি শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল"—(শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"বাংলা সাময়িক সাহিত্য" পৃঃ ১৩-১৪)। রাজা রামমোহনের নির্ভীক মতামত প্রকাশ বন্ধের জন্যই যে সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করা হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেলী তাঁহার ১৮২২ সালের ১০ই অক্টোবরের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া লিখিলেন: "বর্ত্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি বাংলায় এবং দুইখানি ফার্সীতে। চারিখানিই সাপ্তাহিক।···ফার্সী কাগজগুলির নাম—'জাম-ই-জাহান-নুমা' এবং 'মীরাৎ উল্-আখবার'।···দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকর।···(বাংলা সাময়িক সাহিত্য পৃঃ ১২-১৩)। যাহা হউক, সরকারী দমননীতির ফলে রাজা রামমোহন-সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্-আখবার'এর প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। রামমোহন সরকারী বিধানের নিকট নতি স্বীকার করিলেন না। "পত্রের শেষ সংখ্যায় (৪ঠা এপ্রিল, ১৮২৩) রামমোহন জানাইলেন যে, নূতন আইনের অপমানজনক সর্ত্তে রাজী হইয়া তিনি কাগজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ।"—(বাংলা সাময়িক সাহিত্য, পৃঃ ১৪)।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির সহিত রাজা রামমোহনের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রগতিশীল আন্দোলনের সহিত তাঁহার সহযোগিতা এবং সেই আন্দোলনের ধারার সহিত আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যাহাতে পরিচিত হইতে পারে, তাহার জন্য তাঁহার লেখনী ধারণের কথা আজ হয়ত আমাদের নিকট আশ্চর্য্য

বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেটা আশ্চর্য্য নয়। তাঁহার পত্রিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের মহাচীনের উপর নৃশংস অত্যাচার, গ্রীসের সংগ্রাম, আয়ারল্যাণ্ডের জমিদারদের কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের কাহিনী এবং তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রকাশিত হইত নিয়মিত। ১৮২১ সালে নেপলস্‌এ বিপ্লবের ব্যর্থতায় এক দিকে তিনি যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন, আবার ১৮২৩ সালে স্পেন-অধিকৃত আমেরিকায় স্পেনের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাফল্যে তিনি উল্লসিত হইয়া এক জলসার আয়োজন করিতেছেন। ১৮৩০ সালের ফরাসী-বিপ্লবের (ইতিহাসে জুলাই-বিপ্লব বলিয়া খ্যাত) সংবাদে তিনি পুলকিত হইয়া উঠেন এবং বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করেন। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী তিনি স্বদেশে বহন করিয়া আনেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন।

কেবল মাত্র ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বদেশের অত্যাচারিত কৃষকদের দুঃখের কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। কৃষকদের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য তিনি সরকারের সহিত সংগ্রাম চালাইতে লাগিলেন। ১৭৭০ সালের সর্ব্বনাশা দুর্ভিক্ষে বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া যায়। এই দুর্ভিক্ষের সময়েও সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করিয়া বাংলার নিরন্ন কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে লজ্জাবোধ করে নাই। ১৭৯৩ সালে আসিল কুখ্যাত "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত"। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে স্যার জন্ শোর-ই বলিয়াছেন: "এমন একটি নীতি স্বীকৃত হইল, যাহার সহিত হিন্দু অথবা মুসলমান কাহারও পরিচয় ছিল না। এই সর্ব্বপ্রথম জমির উপর জমিদারের মালিকানা-স্বত্ব স্বীকৃত হইল। ইহার ফলে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইল। এই নীতি এ দেশে ছিল অপরিচিত, অস্বাভাবিক এবং অন্যায়।"—(Peary Chand Mitra—The Zeminder and the Ryot)। এই নূতন ভূমির ব্যবস্থার ফলে জমিদারের সৃষ্টি হইল এবং জমিদারের অত্যাচারে বাংলার কৃষকদের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। জমিদার এবং কৃষকের মধ্যে আসিল তালুকদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার প্রভৃতি বহু শোষক। ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ অত্যাচার ও নির্য্যাতনে বাংলার কৃষক তথা বাংলার চরম দুর্গতির অবধি রহিল না। এক এক জন প্রভুর দাবী মিটাইয়া কৃষকেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। কৃষকদের দুর্দ্দশা চরম সীমানায় নামিয়া আসিল। ১৮২৬ সালে বিশপ হেবার লিখিলেন: "বর্ত্তমানে যে হারে রাজস্ব আদায় করা হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয়, ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় কৃষকদের পক্ষে উন্নতি করা অসম্ভব। মোট উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেকই সরকার রাজস্ব বাবদ দাবী করিতেছেন!...হিন্দুস্থানে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটি চাপা অসন্তোষ লক্ষ্য করিলাম। তাঁহারা বলিতেছেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, দেশীয় রাজ্যের অত্যাচারিত কৃষকগণও কোম্পানীর কৃষকদের অপেক্ষাও ভাল আছে। মাদ্রাজের ভূমি অনুর্ব্বর বলিয়া খ্যাত হইলেও যে হারে কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা হইতেছে তাহারও তুলনা নাই। আমরা এই দিক্ দিয়া অত্যাচারী দেশীয় রাজাদিগকেও হার মানাইয়াছি।"—(Bishop Heber—"Memoirs and Correspondence" 1830, vol—II, page 413)। যাহাতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা যায় তৎপ্রতি সরকারের আগ্রহ দেখা দিল। কৃষকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই সরকারী কর্ম্মচারিগণ রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। কৃষক অপারগ হইলে সরকারী সৈন্য ও পুলিশের সাহায্যে বলপূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করা হইত। কোম্পানীর পক্ষ হইতে ডাঃ ফ্রান্সিস্ বুকানন্ উনিশ শতকের প্রথম দিকে কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে এক তদন্ত করেন। এই তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল, আরও অধিক হারে কি করিয়া রাজস্ব আদায় করা যায়। বাংলা দেশের দিনাজপুর জেলার কৃষকদের উপর কি রকম অত্যাচার হইত সে সম্পর্কে তাঁহার তদন্ত রিপোর্টে লিখিলেন: "স্থানীয় অধিবাসিগণ অভিযোগ করিয়া বলিতেছে যে, মুঘল সরকারের কর্ম্মচারিগণ রাজস্ব আদায়ের সময়ে তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাহাদের জমি-জায়গা নীলামে চড়াইয়া তাহাদিগকে যে ভাবে বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহা মুঘল আমলের অত্যাচারকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। রাজস্ব বাকী পড়িলে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে যে ভাবে হয়রাণ এবং লাঞ্ছিত করিতেছে তাহা সহ্য করিবার শক্তি কৃষকদের ছিল না। এতদ্ব্যতীত উৎকোচের মাত্রা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। স্থানীয় অধিবাসিগণ অভিযোগ করিয়া বলিতেছে যে, কোম্পানীর আমলারা তাহাদের নিকট হইতে যে-হারে উৎকোচ আদায় করিতেছে, মুঘল আমলে তাহাদিগকে ইহার অর্দ্ধাংশ রাজস্ব বাবদ আদায় দিতে হইত।"—(Dr. Francis Buchanan—"Statisctial Survey"—vol IV, chap VII)। কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্রই জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, কোম্পানীর আমলারা কৃষকদের উপর অবাধ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। কৃষকদের উপর অত্যাচার রাজা রামমোহন সহ্য করিতে না পারিয়া সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়া লিখিলেন: "এই প্রদেশে কোন কোন স্থানে রাজস্বের পরিমাণ এত অধিক যে, রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শুধু আইন প্রণয়ন করিলেই চলিবে না, সরকারের উচিত হইবে, কৃষকদের দেয় কর এবং জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ মকুব করা। এই লোকসানের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সরকার বিলাস দ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিতে পারেন।"—(Peary Chand Mitra—The Zeminder and the Ryot)। ১৮৩০ সালে সরকার নিষ্কর জমির উপরে যে কর-ধার্য্যের প্রস্তাব করে রামমোহন তাহার ঘোর বিরোধিতা করেন। কোম্পানীর ভারতে ব্যবসা করিবার অধিকারের অবসান এবং ভারতীয় শিল্পের রপ্তানীর উপর সরকার যে অত্যধিক পরিমাণে রপ্তানী-শুল্ক ধার্য্য করিয়াছিল তাহারও তিনি অবসান দাবী করিলেন। ১৮৩১ সালে ভারতীয় কৃষকদের উপর অত্যাচারের প্রতিকারার্থে এবং প্রজাদের কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য তিনি পার্লামেণ্টে এক স্মারকলিপি পেশ করেন।

নারী জাতির দুর্দ্দশায় রাজা রামমোহনের বিদ্রোহী অন্তর বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিধবা নারীদিগকে স্বামীর মৃত্যুর পরে সন্তান, স্বামী অথবা অন্য কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইত। এই জন্য অসহায়া নারীদিগকে অযথা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত।

এক সময় এই নির্য্যাতনের মাত্রা এত দূর বৃদ্ধি পাইত যে, তাহাদিগকে আত্মহত্যা করিয়া নির্য্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইত বা পতিতালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। রাজা রামমোহন হিন্দু সমাজের নারী-জাতির প্রতি এই ঘৃণ্য অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৮২২ সালে নারী জাতির দাবী-দাওয়া সম্পর্কে—"Ancient Right of the Females" শীর্ষক এক প্রবন্ধে নারী জাতির প্রতি বর্ব্বরোচিত নির্য্যাতন-কাহিনী প্রকাশ করিয়া দেন এবং দাবী করিলেন, সম্পত্তির উপর নারী জাতির মালিকানা-স্বত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

আমরা দেখিলাম, একটি অধঃপতিত জাতিকে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিবার জন্য রাজা রামমোহন কি কি করিয়া গিয়াছেন। বিদেশী সরকারের অত্যাচার হইতে রেহাই পাইবার জন্য এবং আপন অধিকার কায়েম করিবার জন্য একটি জাতির প্রত্যেকটি স্তরে তিনি নূতনের প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন। আমরা যে কতকগুলি লোকের সমষ্টি নই—আমরা যে বিদেশী শাসকের হুকুম তামিল করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই—আমাদের জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হইবার, অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার নিরোধ করিবার অধিকার, একটি জাতি হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করিবার আমাদের অধিকার আছে—এই বাণীই রাজা রামমোহন আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি আমাদিগকে সভ্য রাষ্ট্র গঠন করিবার পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতি নেতাগণ তাঁহারই সৃষ্ট জমিতে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন মাত্র—জমি তৈয়ারী করিয়া বীজ বপন করিতে পারেন নাই। এই সত্য আমরা আজ স্বীকার না করিলেও ইতিহাস এই সত্য ঘোষণা করিয়া যাইবে। তাই রাজা রামমোহনকেই আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলিয়া ঘোষণা করিতেছি।

১৮৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডে রাজা রামমোহনের অকাল মৃত্যুর পরে আর ভারতবর্ষে তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারে এমন কোন নেতা রহিল না। রামমোহনের শিষ্যগণ আপন আপন ক্ষেত্রে তাঁহার আরব্ধ সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর সমগ্র দেশে কোম্পানীর আমলারা লুণ্ঠনের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। কৃষক, শিল্পী, দেশীয় রাজা, জনসাধারণ—সকলের নিকট হইতেই বলপূর্ব্বক টাকা-কড়ি কাড়িয়া লইতে লাগিল। এদিকে সমগ্র ভারতবর্ষ আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য কোম্পানী এক একটি দেশীয় রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাইতে লাগিল। যুদ্ধের খরচ জোগাইতে হইবে। কোম্পানী নিজ তহবিল হইতে কিছু দিবে না। ভারত লুণ্ঠন করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারাই ভারত অধিকার করিতে হইবে—ইহাই ছিল কোম্পানীর নীতি। যে উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারী লুণ্ঠন করিয়া যত বেশী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত কোম্পানী তাহাকেই রাজকীয় সম্মান দিতে লাগিল। শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে ভারত লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেল। দেশীয় নৃপতি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ এবং কৃষকগণের মধ্যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল। সর্ব্বত্রই বিদেশী শাসনের উৎখাতের প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। কিন্তু একটি কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের অভাবে অসন্তোষের প্রকাশ সুষ্ঠুরূপে দেখা দিল না। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের অসন্তোষের প্রকৃত কারণ দেশীয় রাজ্যের কায়েমী স্বার্থবাদের দল নিজেদের প্রয়োজনে বিভ্রান্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। তবুও একটি সৌসাদৃশ্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দেখা দিল এবং সেটি হইল সাধারণ শত্রু বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট অংশের সম্মিলিত ফ্রন্ট। একটি বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজ বণিকের সৃষ্ট জমিদার, মহাজন, ইংরাজী শিক্ষিত কেরাণিগণ এই সম্মিলিত ফ্রণ্টে যোগদান করেন নাই। এই সম্মিলিত ফ্রন্ট হইতে তাঁহারা নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করিয়াছে এবং সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে শুধু মাত্র কৃষক সম্প্রদায়। ভারতের মুক্তি-সাধনায় সর্ব্ব প্রথম সংগ্রাম করিয়াছে কৃষক সম্প্রদায়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কৃষকের সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং বিদেশী শাসকের ভাড়াটিয়া দালালরূপে বিদেশী শাসকের সৈন্য, পুলিশ প্রভৃতিকে কৃষক-অভ্যুত্থান দমন করিতে সাহায্য করিয়াছে। ইংরাজ-সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাঁহারা সকল সময়েই প্রভুর শ্রীচরণে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ সালের সনদে ইংরাজ কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসায় চালাইবার অধিকার লাভ করে। দেশীয় বেনিয়ান জমিদারগণ ইংরাজ ব্যবসায়ী ও প্ল্যান্টার্সদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করে। ইংরাজ প্ল্যান্টারদের নীল চাষ এবং তুলা চাষ ছিল। ইংরাজের অত্যাচারে কেহই তথায় মজুরী খাটিতে রাজী হইত না। অথচ মজুর না পাইলে আবাদ চলে না। প্ল্যান্টারদের এই দুর্দ্দিনে জমিদারগণ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলপূর্ব্বক নিজ নিজ জমিদারীর প্রজাদিগকে তথায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশ্য বিনা স্বার্থে জমিদারগণ যে এই কার্য্য করিতেন তাহা বলা যায় না। মজুর সংগ্রহ করিয়া দিবার কাজে জমিদারদিগকে ইংরাজ প্ল্যান্টারগণ সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার দিতেন নগদ ৬ শত পাউণ্ড।

যাহা হউক, ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখিয়াছি যে, রাজা রামমোহন মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজ শাসকের রাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় কৃষকের বিক্ষোভ বিভিন্ন আকারে বহু বার দেখা দিয়াছে। ১৮১৬ সালে সংযুক্ত প্রদেশের বেরিলিতে চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮৩১-৩২ সালে কোল-বিদ্রোহ হয়। ১৮৩১ সালে বাংলা দেশে দেখা দিল প্রবল কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলন "ফরাসী" আন্দোলন নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই আন্দোলন বাংলা দেশে ১৮৪৭ সাল পর্য্যন্ত চলে। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিল দক্ষিণ ভারতে মালাবার অঞ্চলে। মালাবারের মোপলা কৃষকদের উপর কোম্পানীর আমলাদের এবং জমিদারদের খাজনা আদায়ের নামে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলিয়াছে, সভ্য জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ১৮৪৯—৫৫ সাল এই ছয় বৎসরে মোপলাগণ বহু বার বিদ্রোহ করিয়াছে। ১৮৫৫—৫৭ সালে বিহার, বীরভূম এবং ভাগলপুরের সাঁওতালগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। ভারতের কৃষক সম্প্রদায় বার বার ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী শাসক এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে কৃষকই সর্ব্বাগ্রে সমগ্র ভারতবর্ষকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদ্রোহ কেন্দ্রীয়

নেতৃত্বের অভাবে জয়যুক্ত হইতে পারে নাই সত্য কথা, কিন্তু বিদেশী শাসকের সৈন্য, গোলা-বারুদ, নির্য্যাতন কিছুই কৃষককে বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে নিরস্ত করিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত বোয়ার বিদ্রোহ, আসামের মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ, ঠগী আন্দোলন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ত আছেই। ব্যারাকপুরের তিতু মিঞার নেতৃত্বে ওহাবী আন্দোলনের কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। এই আন্দোলন মূলতঃ হিন্দু-মুসলমান কৃষকের নূতন ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন। এই বহুমুখী কৃষক বিদ্রোহ পরিপূর্ণতা লাভ করিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে। সিপাহী বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল গণ-সমর্থন—হিন্দু-মুসলমান একযোগে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিক ম্যালেসন তাঁহার "হিষ্ট্রী অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি" পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন যে, অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড এবং নর্ম্মদা অঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহ গণ-সমর্থন লাভ করিয়াছিল। অশোক মেহতা লিখিত "১৮৫৭, দি গ্রেট রিবেলিয়ন" পুস্তিকায় বিদ্রোহের এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই ইস্তাহারে জানিতে পারা যায় যে, বিদ্রোহে যোগদান করিয়া বিদেশী শাসককে উৎখাত করিবার জন্য জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারী চাকুরিয়া, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মোল্লাদিগকে আবেদন করা হইয়াছিল। যাহাদিগকে আবেদন করা হইয়াছিল তাহাদের সকলেরই ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল।

দেশীয় রাজন্যবর্গের কথা ছাড়িয়া দিলেও বহু সংখ্যক জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দুর্দ্দশার আর অন্ত ছিল না। ইংরাজী জমিদারী প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এই দেশে প্রবর্ত্তন করা হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই দেশে এই প্রথার প্রবর্ত্তক। ইতিহাসে ইহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে পরিচিত। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় সর্ব্বপ্রথম এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। পরে উত্তর-মাদ্রাজের কিয়দংশে ইহা চালু করা হইল। ভূতপূর্ব্ব শাসকদের আমলে কমিশন ভিত্তিতে যাঁহারা রাজস্ব আদায় করিতেন তাঁহাদিগকে জমিদার করিয়া দেওয়া হইল। সাব্যস্ত হইল যে, তাহারা বৎসরে সরকারকে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে খাজনা আদায় দিবে। ভূতপূর্ব্ব শাসকদিগকে কৃষকগণ যে-হারে রাজস্ব দিত, তাহার মাত্রা আরও এগারো গুণ বৃদ্ধি করা হইল এবং ইহার দশ ভাগ সরকারের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। বাকী এক ভাগ জমিদারদের অংশ হিসাবে নিরূপিত হয়। এই নূতন ব্যবস্থা জমিদার ও কৃষক উভয়েরই পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠে, কিন্তু সরকারের পক্ষে হইয়া উঠে লাভজনক। এক বাংলা দেশের জমিদারদিগকেই বাৎসরিক ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কৃষকদের নিকট হইতে আদায় করিয়া সরকারের তহবিলে জমা দিতে হইত। ইতিপূর্ব্বে কোন শাসকই এত বিরাট পরিমাণের রাজস্ব কৃষকদের নিকট হইতে আদায় করেন নাই। পুরাতন শাসকের ঐতিহ্য যে সব জমিদার বহন করিয়া কৃষকদের দুঃসময়ে কৃষকদের দেয় রাজস্ব সম্পর্কে বিবেচনা করিতেন তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। ফলে ইংরাজ সরকার অনতিবিলম্বে এই সব জমিদারের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া জমিদারী নীলামে উঠাইতেন। এই শ্রেণীর জমিদারের উপর সরকারী বর্ব্বরতার বহু শোচনীয় কাহিনী আছে।...মুনাফাখোর এবং অত্যাচারী ব্যবসায়িগণ এই সব জমিদারী নীলামে ডাকিয়া লইলেন। এই হাঙ্গরগুলি কৃষকের দেয় রাজস্ব ব্যতীত আরও অনেক বেশী নির্ম্মম অত্যাচার করিয়া কৃষকদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" মতে যে 'ভদ্রলোক জমিদার' সৃষ্টি করিবার কথা বলা হইয়াছিল ইহারাই হইলেন সেই 'ভদ্রলোক জমিদার'। ১৮০২ সালে মেদিনীপুরের কলেক্টর এই সম্পর্কে এক রিপোর্টে লিখিয়াছেন: 'নীলাম এবং খাসকরণ প্রথার ফলে বাংলার বহু বিখ্যাত জমিদার মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভিক্ষুকে পরিণত হইয়াছেন। বাংলার ভূমি-প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোন দেশেই নামমাত্র এক আভ্যন্তরীণ আইনের বলে এত বড় অঘটন ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ রহিয়াছে।"—(রজনী পাম্ দত্ত—"ইণ্ডিয়া টুডে"—পৃঃ ১৯০-৯১)। বাংলার এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সর্ব্বস্বান্ত বিক্ষুব্ধ জমিদারগণের সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করিবার ইহাই হইল কারণ।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের কারণ বহু। কোম্পানী ১৮৩৩ সালে ভারতে ব্যবসায় করিবার অধিকার লাভ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মালের উপর অধিক শুল্ক বসায় কিন্তু নিজেদের মাল সস্তা দরে বাজারে চালু রাখে। ১৮৩৩ সালের পূর্ব্বে কোম্পানী ব্যবসা করিত না বলিয়া বোধ করি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইবে। ব্যবসায় করিত কিন্তু তাহাকে ব্যবসায় না বলিয়া লুণ্ঠন বলা উচিত। ১৭৬২ সালে বাংলার নবাব ইংরাজ গবর্ণরকে এক স্মারকলিপিতে জানাইয়াছিলেন: "ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এতদ্দেশীয় কৃষক, ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ন্যায্য মূল্যের মাত্র এক-চতুর্থাংশ দিয়া বলপূর্ব্বক মাল-পত্রাদি কাড়িয়া লইতেছে এবং বিলাত হইতে আমদানী মাল—যাহার মূল্য মাত্র এক টাকা তাহা বলপূর্ব্বক কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে পাঁচ টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছে।" জনৈক ইংরাজ ব্যবসায়ী উইলিয়াম বোল্টস্ ভারতে কোম্পানীর দালালদের অত্যাচার সম্পর্কে ১৭৭২ সালে প্রকাশিত "কন্সিডারেশন্স্ অন্ ইণ্ডিয়া অ্যাফেয়ার্স" পুস্তকে দালালদের লুণ্ঠন করিবার কায়দা বর্ণনা করিয়া লিখিলেন: "ইংরাজরা তাহাদের বেনিয়ান ও দেশীয় গোমস্তাদের সাহায্যে প্রত্যেক উৎপাদনকারী কত পরিমাণ দ্রব্য দিবে এবং মূল্য বাবদ কত পাইবে তাহা নিজেরাই ইচ্ছামত ঠিক করিয়া দেয়। দরিদ্র তন্তুবায়ের সম্মতির প্রয়োজন হয় না, কারণ গোমস্তারা সাদা কাগজে তন্তুবায়দের সহি আদায় করিয়া রাখিত। তন্তুবায়গণ মহা বিপদের আশঙ্কায় সহি দিতে বাধ্য হইত। মূল্য বাবদ নাম মাত্র টাকা দেওয়া হইলে তন্তুবায়গণ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে বাঁধিয়া প্রহার করা হইয়া থাকে।...এই ধরণের বহু সংখ্যক তন্তুবায়ের নাম কোম্পানীর গোমস্তাদের দাগী আসামীর খাতায় লেখা থাকে এবং অন্য কাহারও নিকট তাহাদিগকে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা হয়। এই প্রকার কল্পনাতীত অত্যাচার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।..."—('নববাণী'তে প্রকাশিত লেখকের "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লুণ্ঠন ব্যবসায়" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)। ব্যবসায়ের নামে ভারতে যে লুণ্ঠন-কার্য্য চলিয়াছে, ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের যে সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে তাহার কাহিনী এখানে বিবৃত করা সম্ভব নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশ-শাসনের নামে যে

অপকীর্ত্তি করিয়াছিল তাহার তুলনা ইতিহাসে মেলে না। ১৮৫৮ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্যার জর্জ্জ কর্ণওয়াল্ লুই ঘোষণা করিয়াছিলেন: "দৃঢ়কণ্ঠে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, পৃথিবীর বুকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত এত দুর্নীতিপরায়ণ, লুণ্ঠনকারী এবং বিশ্বাসঘাতক সরকার আর কখনও শাসন-কার্য্য চালায় নাই।" এই উক্তির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

তন্তুবায়দের উপর নির্ম্মম অত্যাচারের কাহিনী বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই। ল্যাঙ্কাশায়ারে প্রস্তুত বস্ত্র ভারতের বাজারে চালাইবার জন্য এবং ভারতীয় বস্ত্র বিলাতের বাজার হইতে উৎখাত করিবার জন্য এদেশীয় তন্তুবায়দের অঙ্গুলি ছেদন, তাঁতের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক ধার্য্যকরণ; তন্তুবায়দিগকে তাঁত পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে যোগদান করিতে বাধ্য করার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আর না বলাই ভাল। "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিশেষ করে ভারতে উৎপন্ন জিনিষের উপর শুল্ক বসিয়ে ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। ১৮৪০ সালে পার্লামেণ্টারী তদন্তের ফলে জানা যায় যে, ভারতে যে-সব ব্রিটিশ সূতো ও সিল্কের জিনিষ যেত তার উপর শুল্ক ছিল শতকরা ৩॥০ টাকা, উলের জিনিষ শতকরা ২৲ টাকা। কিন্তু ভারত থেকে সূতার জিনিষকে ইংলণ্ডে শতকরা ১০৲ টাকা, সিল্কের জিনিষে শতকরা ২০৲ এবং উলের জিনিষে ৩০৲ টাকা হারে শুল্ক দিতে হতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কেবল যন্ত্র-শিল্পের আধুনিক কৌশলের ভিত্তিতে ব্রিটেনের শিল্প দাঁড়ায়নি। প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এক দেশের জন্য স্বাধীন ব্যবসা চালাবার ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ ভারতে বিটিশ দ্রব্য ঢুকবার পথে কোন বাধা ছিল না। শুল্ক নামে মাত্র ছিল। অপর পক্ষে ভারতের জিনিষ বিটেন ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে বেচতে হলে পর্ব্বতপ্রমাণ শুল্ক; অন্যান্য আইনগত বাধা এবং জাহাজ চলাচল আইনের নাগপাশ অতিক্রম করতে হ'তো। এই ভাবে ভারতীয় কারখানা-শিল্পকে ধ্বংস করে বৃটিশ কারখানা-শিল্প গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে ভারতে প্রেরিত ব্রিটিশ কারখানার সূতা রপ্তানীর পরিমাণ ১০ লক্ষ গজ থেকে ৫ কোটি ১০ লক্ষ গজ সূতায় ওঠে। অপর দিকে ভারত থেকে ইংলণ্ডে পাঠানর পরিমাণ ১২॥ লক্ষ খণ্ড থেকে ৬ লক্ষ ৬ হাজার খণ্ডে নেমে আসে এবং দেখা যায়, ১৮৪৪ সালে ৬৩ হাজার খণ্ডে পরিণত হয়েছে।" (সুধী প্রধান—"শিল্প-ভারতের প্রতিরোধ"—পৃঃ ৩০—৩২)। ১৮৪০ সালে পার্লামেণ্টারী তদন্ত কমিটির নিকটে স্যার চার্লস্ ট্রিভেলিয়ান (Sir Charles Trevelyan) বলেন: "ঢাকা শহরের জনসংখ্যা দেড় লক্ষ হইতে নামিয়া আসে ত্রিশ অথবা চল্লিশ হাজারে। সমগ্র সহরে একাধিপত্য কায়েম হইল ম্যালেরিয়া এবং জঙ্গলের। ভারতের ম্যানচেষ্টার ঢাকা একটি বর্দ্ধিষ্ণু সহর হইতে অতি দরিদ্র এবং নগণ্য সহরে পরিণত হয়।..." (রজনী পাম দত্ত—"ইণ্ডিয়া টু-ডে" হইতে উদ্ধৃত)। ভারতীয় তন্তুবায় তথা বস্ত্র-শিল্পের কি ভাবে সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে বক্তব্য আরও পরিষ্কার করিয়া ১৮৯০ সালে স্যার হেন্‌রী কটন বলিলেন: "প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে একমাত্র ঢাকা সহরেই সমস্ত ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা এবং জনসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। ১৭৮৭ সালে ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী মসলিনের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা, কিন্তু ১৮১৭ সালে এই রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সূতা নির্ম্মাণ এবং বয়ন-কার্য্যে যুগ-যুগান্তব্যাপী যে সমস্ত শিল্পী জীবিকা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সমৃদ্ধিশালী পরিবার সহর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে...। এই অবনতি কেবল মাত্র ঢাকায় নয়, সমস্ত জেলাতেই হইয়াছে। প্রতি বৎসরই জেলার কর্ত্তৃপক্ষ এবং কমিশনারগণ জানাইতে থাকেন যে, দেশের সর্ব্বত্রই শিল্পী শ্রেণী দিন দিনই নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে।"—(একই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ১০২)

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে সমগ্র হিন্দুস্থানের কৃষক সম্প্রদায়ের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, সে সম্পর্কে ইংরাজ ইতিহাসকারদ্বয় টমসন্ এ্যাণ্ড গ্যারাট "রাইজ এ্যাণ্ড ফুলফিলমেণ্ট অব বৃটিশ রুল্ ইন্ ইণ্ডিয়া" পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন: "প্রাক্-বিদ্রোহ যুগে টাকায় রাজস্ব আদায় করিবার যে একটানা ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলিয়াছে, তাহার ফলে কৃষকের যাবতীয় উৎপন্ন ফসলই রাজস্ব বাবদে চলিয়া গিয়াছে। কৃষকের সমুদায় উৎপন্ন ফসলের সবটাই যাহাতে লওয়া যায় তজ্জন্য বার বার বাংলা-দেশের জমিদারী নীলামে উঠানো হইয়াছে। এই প্রথার ব্যর্থতার ফলেই সৃষ্টি হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের। মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্রথমতঃ কৃষকের মোট উৎপন্ন ফসলের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সরকারের রাজস্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু তাহাতে দেখা গেল, কৃষকদের সবই লোকসান হইতেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এই প্রথা চালু করা হইল, কিন্তু ১৮৪২ সালে বাধ্য হইয়া ইহা রদ করিতে হয়।...ঊনিশ শতকের প্রথম কোয়ার্টারে বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষককুলের খাজনা আদায় দিতে যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এমন কি পাঞ্জাবেও—যেখানে শিখ রাজাদের আদায়ীকৃত খাজনার চড়া হার বৃটিশ শাসকগণ কমাইয়া দিলেও বৃটিশ শাসকের টাকায় খাজনা আদায় এবং আদায়ে অতি কঠোর পন্থা অবলম্বনের ফলে পাঞ্জাবের কৃষকদের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের কৃষকদের মতই দাঁড়াইল।"—(Thompson and Garrat—"Rise and Fulfilment of British Rule in India"—page 427)। মোটের উপর বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সিপাহী বিদ্রোহের ইস্তাহারে যাহাদিগকে বিদ্রোহে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীরই বিদেশী শাসকের শোষণ-নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ বহু পূর্ব্ব হইতেই জমা হইয়াছিল। তাহারা গণ-অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ অবশ্য জয়যুক্ত হইতে পারে নাই। বিদেশী শাসক এই বিদ্রোহের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার বহু কারণ আছে। এই বিদ্রোহকে গণ-বিদ্রোহে রূপান্তরিত করিবার জন্য ইস্তাহারে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ভারতীয় বুর্জ্জোয়া শ্রেণী, কৃষক, তন্তুবায়, চর্ম্মকার, কর্ম্মকার, ফকির, পণ্ডিত সকলকেই আহ্বান করা হইলেও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেশীয় নৃপতিদের ও তাঁহাদের স্বার্থবাহী শ্রেণীর উপর ন্যস্ত থাকায় এই বিদ্রোহ গণ-বিদ্রোহে পরিণত হইতে পারে নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ভারতীয় বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর একাংশ এই বিদ্রোহে যাহাতে

অংশ গ্রহণ করিতে না পারে এবং এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব যাহাতে শেষোক্ত শ্রেণীর হস্তে চলিয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ বাধা দিয়া আসিয়াছেন এবং সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তবুও এক দল মধ্যবিত্ত ও বুর্জ্জোয়া এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিতে পান নাই। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার ইহাই প্রধান কারণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বুর্জ্জোয়া শ্রেণী এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিতে পারিলে বিদ্রোহের মোড় ঘরিয়া যাইতে পারিত এবং বিদেশী শাসককে তল্পী-তল্পা গুটাইয়া স্বদেশে চলিয়া যাইতে হইত। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। একটি গণ-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষ যে ইংরাজের হাতছাড়া হইয়া যাইবে সে বিষয়ে ইংরেজ শাসকগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ভারতবাসীর ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে চাপা অসন্তোষ তাঁহারা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেটকাফ লণ্ডনে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "সদা সর্ব্বদা সমগ্র ভারতবর্ষ আমাদের পতনের জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে। ভারতে সর্ব্বত্রই জনসাধারণ আমাদের পতনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। যে কোন উপায়ে আমাদের পতন ঘটাইবার লোকের সংখ্যাও কম নহে।"

যাহা হউক, সিপাহী বিদ্রোহ দলিত হইবার পর ভারতে বৃটিশ-নীতি ও বৃটিশ শাসনের রূপ পরিবর্ত্তিত হইল। ভবিষ্যতের গণ-অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় বৃটিশ শাসক ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন লাভের আশায় মনোনিবেশ করিল। ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদের প্রতি বৃটিশ শাসকের যে সহানুভূতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সন্দেহ এবং আশঙ্কায় পরিণত হইতে লাগিল। কারণ, বৃটিশ শাসক এই শ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাইল এক নূতন প্রগতিশীল শক্তির সমাবেশ। ধীরে ধীরে নবীন বুর্জ্জোয়া শ্রেণীকে বৃটিশ শাসক পরিত্যাগ করিতে লাগিল। একেবারে চটাইতে সাহস করিল না। স্বাধীন ভারতীয় নৃপতিবর্গের রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া নিজ সীমানা বৃদ্ধি করিবার নীতিও ইংরাজ শাসক পরিহার করিল। ইংরাজ ও ভারতীয় স্বেচ্ছাচারী নৃপতিদের মধ্যে একটি গোপন সন্ধি হইয়া গেল। ভারতীয় জনগণের বিদ্রোহ দমনে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিতে দেশীয় স্বাধীন নৃপতিবর্গ আপন রাজ্য ফিরিয়া পাইল। অবশ্য কথা থাকিল যে, বৈদেশিক ব্যাপারে ইংরাজ শাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিবেন না। তবে তাঁহাদের স্বেচ্ছাতন্ত্রে, প্রজাগণের উপর নির্ম্মম অত্যাচারে ইংরাজ শাসক কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

কৃষকগণ যাহাতে বিদ্রোহী না হইয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্য আপন স্বার্থের তাগিদায় ইংরাজ এ-দেশীয় কৃষকদের জমিদারদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভূমি-সংক্রান্ত আইন প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে লাগিলেন। ১৮৫৯ সালে এই সম্পর্কে এক আইন পাশ করা হয়। অবশ্য এই আইনের বিরুদ্ধে তদানীন্তন জমিদারগণ অত্যন্ত হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, সরকার জমিদারদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অবশ্য সরকার "সাপও মরিবে না অথচ লাঠীও ভাঙ্গিবে না" এই নীতি প্রবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু এই দিক্‌টার প্রতি কেহ অর্থাৎ জমিদারগণ লক্ষ্য রাখিলেন না। এদিকে প্রজা বনাম জমিদারের মামলা দেখা দিতে লাগিল। আদালতে মামলার হিড়িক পড়িয়া গেল। কয়েকটি মামলায় বিচারকগণ প্রজার অনুকূলে রায় প্রদান করায় জমিদারগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ১৮৬৫ সালে দিগম্বর মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক "অবজারভেশন্‌স্ ইন্ জাজমেণ্টস্ অব দি হাইকোর্ট ইন্ দি রেণ্ট কেস্" জমিদারী উন্মত্ততার পূর্ণ অভিব্যক্তি। এই মামলার ফলে সরকারের তহবিলে যথেষ্ট অর্থ আসিতে লাগিল। এই অনুসৃত নীতির ফলে এক দিকে কৃষকদিগকে নিজেদের পক্ষে টানিয়া লইবার যেমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আবার অন্য দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কৃষকদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর বিদেশী শাসক ভারতে কি নীতি প্রয়োগ করিয়াছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী দেশীয় রাজন্যবর্গকে গণ-অভ্যুত্থান দমনের জন্য ব্যবহার করিবার মানসে তাঁহাদিগকে কিছু সুবিধা প্রদান করা হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। শুধু তাহাই নহে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া রাখিবার নীতিও বৃটিশ শাসক এই সময়ে গ্রহণ করে। রাজা রামমোহনের আমলে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার সাধনে বৃটিশ শাসক বহুবিধ আইন প্রণয়ন করিয়াছিল এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বৃটিশ শাসক এদেশে প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। এমন কি, বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল ও স্বৈরতান্ত্রিক সামন্ত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে সংগ্রাম করিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল প্রথাগুলির বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম ত করিলই না, উপরন্তু যাহাতে প্রতিক্রিয়াশীল প্রথাগুলি কায়েম হইয়া থাকে তজ্জন্য তলে তলে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। ভারতবর্ষের শাসন-ভার বৃটিশ সরকার গ্রহণ করিবার পর ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন তাহাতে বলা হইল: "আমাদের প্রজাবৃন্দকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যত দূর সম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে সরকারী কার্য্যে নিয়োগ করাই হইল আমাদের একান্ত বাসনা। শিক্ষা, সামর্থ্য এবং ঐক্যের দ্বারা তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তাঁহারা সক্ষম হইবেন ইহাই আমাদের ধারণা।"—(The Queen's Proclamation 1858)। এই ঘোষণার ফলে ভারতীয় ও ইংরাজ প্রজাদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য না রাখিবার একটি ভাঁওতা দেওয়া হয় মাত্র। এই ঘোষণার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, "ভারতীয়দের ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত" বৃটিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল শক্তিগুলির নিকট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় "ভারতের প্রাচীন প্রথা, অধিকার এবং ধর্ম্মবিষয়ক প্রথার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইবে।" ১৮৭৭ সালে রয়েল টাইটেলস্ এ্যাক্ট (Royal Titles Act) অনুসারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "ভারত সম্রাজ্ঞী" হইলেন। ভারত সম্রাজ্ঞীর ঘোষণাকে লর্ড স্যালিসবেরী "রাজনৈতিক ভণ্ডামী" (political hypocracy) আখ্যা দিলেন। ভারত সম্রাজ্ঞীর ঘোষণায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি—শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন জাতিগত বৈষম্য থাকিবে না—পালন করিবার ইচ্ছা যে শাসকের ছিল না তাহা নগ্নরূপে প্রকাশ পায় তদনীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের ভারত সচিব

লর্ড ক্র্যানব্রুকের নিকট লিখিত এক গোপন পত্রে : "আমরা সকলেই অবগত আছি, ভারতীয়দের দাবী অথবা আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই আমরা পূরণ করিব না। ভারতীয়দিগকে এই দাবী লইয়া কোন কিছু করিতে বাধা দিব অথবা তাহাদিগকে সম্ভাব্য উপায়ে প্রতারিত করিব—এই দুই পথের মধ্যে আমাদিগকে একটি বাছিয়া লইতে হইবে। শেষোক্ত পথই বাছিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য।......" ১৮৭৭ সালে অন্যত্র লর্ড লিটন আরও বলিলেন : "যে নূতন নীতি আমরা ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিতে যাইতেছি, তাহাতে ভারতীয় শক্তিশালী অভিজাত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বার্থের সহিত ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বার্থের কোন পার্থক্য থাকিবে না।" এই সময় হইতেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়ার নীতি বৃটিশ শাসক গ্রহণ করে। আবার এই সময় হইতেই বৃটিশ শাসক এবং ভারতীয় সমাজের প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে ক্রম-বর্দ্ধমান বিরোধ দেখা দিল।

ইতিমধ্যে আন্তর্জ্জাতিক ও বৃটিশ পুঁজিবাদের রূপান্তর ঘটে। পুঁজিতন্ত্রের গোড়ার ইতিহাসে দেখা যায় যে, পুঁজিতন্ত্রের ধারক ও বাহকগণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রগতিপন্থী ছিলেন। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের নূতন সাম্রাজ্যবাদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বাভাষ লক্ষ্য করিয়া পুঁজিতন্ত্রের ধারক ও বাহকগণ উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিয়া ক্রম-বর্দ্ধমান প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিতে থাকে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক প্রভাব হইতে বৃটেন মুক্ত থাকিতে পারে না। আবার বৃটেনের আশ্রিত ভারতবর্ষও বৃটেন হইতে স্বতন্ত্র ধারা বহন করিয়াও চলিতে পারে না। সুতরাং ভারতে অনুসৃত বৃটিশ-নীতির রূপান্তর ঘটিতে বাধ্য হইল।

সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইবার পর কৃষককে পক্ষে টানিয়া লইবার চেষ্টা হইলেও উৎপীড়িত কৃষক বৃটিশ শাসকের ধাপ্পাবাজীতে ভোলে নাই। ব্যাপক আকারে কোন বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই সত্য কথা, কিন্তু কৃষকের স্থানে স্থানে জমিদার এবং প্ল্যান্টারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ স্থান হইতে সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৫৯-৬০ সালে দেখা দিল নীল অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ। যশোহর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি জেলায় নীল চাষীদের বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। নীল চাষে ইংরাজ প্ল্যান্টারগণ একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়া কৃষকদিগকে জমিদারদের সহযোগে বলপূর্ব্বক নীল চাষ করাইতে বাধ্য করাইতে থাকে। অন্যান্য চাষ অপেক্ষা এই চাষে আর্থিক লোকসান হইত। বলপূর্ব্বক কৃষকদিগের নিকট হইতে সাদা কাগজে টিপসহি আদায় করিয়া লইয়া কিছু কিছু টাকা প্ল্যান্টারগণ দাদন দিতেন। এই ঋণের দায়ে কৃষকদিগকে অক্টোপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। আর যায় কোথায়? [illegible]-ধোর করিয়া তাহাদিগকে নীল চাষে বাধ্য করান হইতে লাগিল। নীল চাষে একচেটিয়া অধিকার লাভ করিবার ফলে ইংরাজ প্ল্যান্টারগণ স্বেচ্ছামত দরে নীলের ব্যবসায় করিতে লাগিল এবং যথেষ্ট পরিমাণে মুনাফা করিতে লাগিল। এদিকে বাজারে নীলের চাহিদাও যথেষ্ট। অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া আরও মুনাফা লাভের অদম্য বাসনা ইংরাজ প্ল্যান্টারদের মনে জাগ্রত হইল। কৃষকগণ এই চাষে আর্থিক লোকসান খাইতে আর স্বীকৃত হইল না। এই অবাধ্য কৃষককুলকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য নীল-কুঠিয়ালগণ কৃষকদিগকে আপনাদের নিজস্ব হাজতে বে-আইনী ভাবে আটক রাখিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, তাহাদের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠনও আরম্ভ করিয়া দিল। কৃষকদিগকে প্রহার করিবার জন্য এক প্রকার বেত আমদানী করা হইল। এই বেত "শ্যামচাঁদ" নামে কুখ্যাত।...'শ্যামচাঁদ' নামে পরিচিত বেতের উপর চামড়া দিয়া মোড়া এক প্রকার লাঠির দ্বারা প্রহার করা হয়।"—(প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—"ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া" পৃঃ ২৮-২৯)। নীল-কুঠির সাহেবদের অত্যাচারের মাত্রা এত দূর বৃদ্ধি পাইল যে, সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ ইহার জন্য নিন্দা করিতে লাগিলেন। বৃটিশ শাসক কিন্তু এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। উপরন্তু কুঠিয়ালদের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত করিয়া তাহাদেরই হস্তে দরিদ্র নীল-চাষীদের বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন "খাঁটি বাঙ্গালী কবি" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লিখিত কবিতা উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া লিখিলেন :

"হলো নীলকরদের অনরারি
　　মেজেষ্টরী ভার।
কুইন মা, মা, মা গো।
হলো নীলকরদের অনরারি
　　মেজেষ্টরী ভার।
পড়েছে সব পাতর বক্ষে,　　অভাগা প্রজার পক্ষে,
বিচারে রক্ষে নাইক আর।
নীলকরের হদ্দ নীলে　　নীলে নীলে সব নিলে
দেশে উঠছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্ব্বনাশ।
কুঠিয়াল বিচারকারী　　লাঠিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হলো কালের খোন্তা,
লোন্তাজলে চাষ।
হলো ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা,
চাঁদের বাসায় মাছ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে,
　　শোনেনি কেউ শুনবে না।"
　　　—("নীলকর" শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য)

বৃটিশ প্ল্যান্টারদের অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহ গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। বিলাতের রয়েল ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশন্যাল্ অ্যাফেয়ার্স (Royal Institute of International Affairs) এই গণ-অভ্যুত্থানকে "জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায়" বলিয়া আখ্যা দিলেন।—(অমিত সেন—"নোটস্ অন বেঙ্গল রেণেশাঁ" পৃঃ ৩১)। অবস্থা বুঝিয়া সরকার নীল চাষ বাধ্যতামূলক নহে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কৃষকগণ নিজ অধিকার কায়েম করিবার জন্য ১৮৫৯ সালে নীলের চাষ করিতে অস্বীকার করিল। এই সময় স্যার জন পিটার গ্র্যাণ্ট নদীপথে ভ্রমণে বাহির হইলে সহস্র সহস্র নরনারী এই বাধ্যতামূলক নীল চাষ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিল। তিনিও প্রতিশ্রুতি দিলেন,

কিন্তু পল্লী অঞ্চলে প্ল্যান্টারগণ কৃষকদিগকে নীল চাষ করিবার জন্য জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া আনিয়া বাধ্য করাইতে লাগিল। সরকারী প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই দেখিয়া গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল। কৃষকগণ নিজেদের মধ্য হইতেই নেতা নির্ব্বাচন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। উত্তর-বঙ্গে ওহাবী রফিক্ মণ্ডল নামক কেন্দ্রীয় কৃষক প্রতিষ্ঠান নীল-চাষীদের সংগ্রামের নেতৃত্ব করিল। মধ্য-বঙ্গে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় প্ল্যান্টারদের অধীনে চাকুরী ত্যাগ করিয়া অত্যাচারিত কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্ল্যান্টারদের বিরুদ্ধে যাবতীয় মামলা তাঁহারা পরিচালনা করিতে লাগিলেন, আবার প্ল্যান্টারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষকদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতে বিলম্ব করিলেন না। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিনের পর দিন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'এ অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়া চলিলেন এবং কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক ও অন্যবিধ পরামর্শ দিতে লাগিলেন। মনোমোহন ঘোষ এবং শিশিরকুমার ঘোষ এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তদানীন্তন সরকারী কর্ম্মচারী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বেনামীতে কৃষকদের উপর প্ল্যান্টারদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বিখ্যাত নাটক "নীলদর্পণ" রচনা করিলেন। বাংলার শিক্ষিত সমাজে এই নাটক এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করিল। উদীয়মান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নাটকের ইংরাজী তর্জ্জমা করিলেন। রেভারেণ্ড লঙ্'এর নামে এই অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় প্ল্যান্টারগণ ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় উন্মাদ হইয়া উঠিল। আদালতে পাদরী লঙ্কে কঠোর শাস্তি দিবার জন্য মামলা দায়ের করিল। মামলায় লঙ্ সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরাজ জজ সাহেবরাই এই মামলার বিচার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আদালতে মামলার রায় বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় জরিমানার টাকা ফেলিয়া দিলেন। প্ল্যান্টারগণ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করিল, কিন্তু ১৮৬১ সালে তাঁহার অকাল-মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরেও প্ল্যান্টারগণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্তানদের ছাড়িয়া দিল না। মামলার পর মামলা দায়ের করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্তানদিগকে ফতুর করিয়া ছাড়িল। নদীয়ায় নীল সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের এক মামলায় নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী আবদুল লতিফ কৃষকদের অনুকূলে রায় প্রদান করিলে সরকার আবদুল লতিফকে অন্য জেলায় বদলী করিয়া দিল। যাহা হউক, আন্দোলন ব্যর্থ হইল না। সরকার ১৮৬০ সালে "ইণ্ডিগো কমিশন" বসাইল। এই কমিশনের তদন্তে অনেক কিছুই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধীরে ধীরে অত্যাচারের মাত্রা কমিয়া আসিতে লাগিল এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্ল্যান্টারগণ সংযত হইয়া গেল। কৃষক-আন্দোলনের সহিত বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর যোগাযোগে কৃষকদের উপর অত্যাচার বন্ধ হইয়া গেল সত্য, কিন্তু বাংলার প্রগতিশীল বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর সহিত বৃটিশ শাসকের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল এই সময় হইতেই।

একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গণ-অভ্যুত্থান অথবা কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিলেও ভারতবর্ষের বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিভিন্ন প্রদেশের বুর্জ্জোয়া শ্রেণী নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হয় নাই। কৃষক-আন্দোলনের সহিত বাংলা দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুর্জ্জোয়া শ্রেণী নিজেদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলিয়া সর্ব্বাগ্রে অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাই সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশই জাতীয়তাবাদের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালী সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। প্রাদেশিকতাকে বাঙ্গালী চিরদিনই ঘৃণা করিয়াছে এবং সর্ব্বদাই বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। সমগ্র ভারতের জাতীয়-চেতনা জাগ্রত করিবার জন্য বাঙ্গালীই সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তির ইতিহাস নিরূপণে তাই আমাদিগকে সিপাহী বিদ্রোহোত্তর আমলের বাংলার ইতিহাস বিশদরূপে আলোচনা করিতে হইবে। বাংলার সাহিত্য, বাংলার সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় সংস্কারের কাহিনী আমাদিগকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ, এইগুলির মধ্য দিয়া বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করিয়াছিল।

রাজা রামমোহনের তৈয়ারী ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি দিক্‌পালগণের আবির্ভাব হইল। এতগুলি বিরাট পুরুষের সমাবেশ সাহিত্যক্ষেত্রে যে যুগান্তর আনয়ন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাংলা দেশকে নূতন করিয়া গঠন করিতে রাজা রামমোহনের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরচন্দ্র কেবল মাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন নাই। ইংরাজী ভাষার উপরও তাঁহার যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ বাংলা ভাষার অমর কীর্ত্তি। গদ্য রচনা করিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার আপ্রাণ প্রচেষ্টা বাঙ্গালী কোন দিন বিস্মৃত হইবে না। তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় সর্ব্বসাকুল্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ২০টি মডেল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের ছাত্রদের ভর্ত্তি হইবার ব্যবস্থা হয়। তদানীন্তন রক্ষণশীল সমাজ এই ব্যাপারে তাঁহাকে প্রবল বাধা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি যাবতীয় বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। নারী জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার কতখানি আগ্রহ ছিল, তাহা আমরা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সংখ্যা দেখিয়াই অনুমান করিতে পারি। বালিকারা যাহাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য তিনি প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর সমাজ সংস্কারের সক্রিয় আন্দোলন কিছু দিনের জন্য স্তব্ধ হইয়া যায়। রামমোহনের মৃত্যুর পর বাংলা দেশে এমন এক জন স্বাধীনচেতা, নির্ভীক নেতার আবির্ভাব হইল না যিনি প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের অন্ধ বিরোধিতা চূর্ণ করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। রামমোহনের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে

দেখা দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্ম ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন এক জন গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থায় দলিত নর-নারীর পক্ষাবলম্বনে তিনি ছিলেন রাজা রামমোহনের একনিষ্ঠ শিষ্য। ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন এবং ১৮৭১—১৮৭৩ সালে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১৮৫৫ সালেই বিদ্যাসাগরকে হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল সর্ব্বাধিক। এই সময়ে তিনি হিন্দু সমাজে বিধবাদের চরম দুর্গতি নিরসনকল্পে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং বিধবাদের বিবাহের জন্য আইন প্রবর্ত্তনে আন্দোলন আরম্ভ করেন। হিন্দু-সমাজের প্রতিটি স্তরের বিশেষ করিয়া উচ্চ স্তরের ব্যক্তিগণ বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেন। বিরোধী পক্ষকে স্তব্ধ করিবার জন্য শাস্ত্রের যাবতীয় তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে, হিন্দু বিধবা নারীর বিবাহ শাস্ত্র-বিরোধী নয়—শাস্ত্রসঙ্গত। কিন্তু কে শুনিবে তাঁহার কথা? ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে সমাজ মনুষ্যত্ব অস্বীকার করিতে চায়, সেখানে যুক্তি আলোচনা সব কিছুই ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, শত বাধা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন পাশ করাইয়া লইলেন। স্বাধীন মতামতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় তিনি সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা বাংলার জনসাধারণকে এক নূতন প্রেরণা দিয়াছে। বিদ্যাসাগরের মানবতা-বোধ বাঙ্গালীর অমূল্য সম্পদ। বিদ্যাসাগর শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিজস্ব লেখক ছিলেন না। বিদ্যাসাগর ছিলেন সমাজের শোষিত, অনাদৃত জনগণের অভিন্ন বন্ধু। তাই বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ দিকে পাহাড়ীয়াদের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

সন্তোষ ঘোষ

১

কংগ্রেস-পূর্ব্বযুগ—(১৭৫৭-১৮৫৭)

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর প্রান্তরে বৃটিশ পক্ষের জয়লাভের পর হইতেই ভারতে বৃটিশ শাসন আরম্ভ হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর এক শত বৎসরের মধ্যে ইংরাজ রাজত্ব ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে বিস্তার লাভ করে। ভারতে রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে কোনরূপ নীতি না মানিয়া চলাই ছিল ইংরাজদের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি। ভারতে বৃটিশ-প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাস শঠতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও সর্বপ্রকার ন্যায়-নীতি-বিরোধী কার্য্যকলাপের কাহিনীতে কালিমালিপ্ত। জনসাধারণের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিদেশী শাসনের স্বরূপ সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত হয় বাংলা দেশে ১৭৭০ সালের মন্বন্তরে। এই মন্বন্তরে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক অর্থাৎ ১ কোটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দেশের জনসাধারণ কোন দিনই বিদেশী শাসন সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রতিকূল অবস্থার চাপে বহু দিন পর্য্যন্ত তাহার সুনিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হয় নাই, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অংশে বৃটিশবিরোধী বিচ্ছিন্ন কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানা ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে যাঁহারা সাহসের সহিত বিদেশী শাসকদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, মহারাজ নন্দকুমার তাঁহাদের অগ্রগামী। ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতে বৃটিশ-প্রভুত্ব বিস্তার ও কায়েম করিবার জন্য তিনি কোন কার্য্যকেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন না। মহারাজ নন্দকুমার ওয়ারেন হেষ্টিংসের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনয়ন করেন। হেষ্টিংসের কার্য্যের প্রতিবাদের ফলস্বরূপ মহারাজ নন্দকুমারকে শেষ পর্য্যন্ত ১৭৭৫ সালে ফাঁসীর মঞ্চে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়।

সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়ই নব-জাতীয়তার মন্ত্রে ভারত-বাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজিত ও সর্বপ্রকারে লাঞ্ছিত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষসিংহের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর। রাজা রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে তিনি সমগ্র জাতিকে নূতন আদর্শে ও নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিবার জন্য তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। স্বাধীনতা-পূজারী রাজা রামমোহন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful". তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষকে গ্রেট বৃটেনের বন্ধু ও এশিয়ার পথ-প্রদর্শক হিসাবে দেখিতে চাইয়াছিলেন।

তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন বৃটিশ পার্লামেন্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনদ সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল। নূতন সনদে যাহাতে ভারতের জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর বিধানসমূহ সন্নিবিষ্ট হয়, রাজা রামমোহন সে জন্য ইংলণ্ডে আন্দোলন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, পার্লামেন্টে রিফর্ম বিল গৃহীত না হইলে তিনি চিরদিনের জন্য ইংরাজ জাতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের অন্তর্গত বৃষ্টল নগরে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা রামমোহন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নব-জাতীয়তাবোধের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তী সময়ে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল। বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম ইংরাজ শাসন সুরু হয়। আবার বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হয়। ইংরাজেরা যখন এদেশে রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তখন তাহাদের কর্মচারী হিসাবে এক দল বাঙ্গালী রাজ্যবিস্তারে তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল। আবার বিদেশী শাসন অবসানের জন্য সমগ্র ভারতে জাতীয় ভাবধারা প্রচারে অগ্রণী হইয়াছিল বাঙ্গালীরাই।

১৮১৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে জাতীয় ভাবধারা প্রচারে হিন্দু কলেজের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী সময়ে দেশের মধ্যে নব-চেতনা জাগ্রত করিবার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় ভাবধারা প্রচারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন হেনরি ডিরোজিও নামক এক জন তরুণ অধ্যাপক। ডিরোজিও জাতিতে ফিরিঙ্গি হইলেও নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া মনে করিতেন। স্বাধীনতা ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র, সর্ববিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে তিনি ছাত্র-সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন। ডিরোজিও মাত্র পাঁচ বৎসর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব বাংলার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। পরবর্তী সময়ে ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই দেশের মধ্যে জাতীয়তার মন্ত্র-প্রচারে নেতৃত্ব করেন।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর কিছু দিন পরে সংঘবদ্ধ ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা দেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার চেষ্টা হয়। ১৮৩৮ সালে বাংলা দেশে ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভৃতি তৎকালীন সমাজের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ইহার সদস্য ছিলেন। এই সভা ভূমি-সম্পর্কিত বিষয় লইয়া সরকারের সহিত বহু আলোচনা করেন এবং ইহার ফলে জমিদার ও প্রজার পক্ষে কল্যাণকর কয়েকটি প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেন। ১৮৩৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়াম এডাম ভারতের কথা ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য 'বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী' স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি অবশ্য খুব বেশী দিন সক্রিয় ছিল না।

১৮৫১ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে অধিকতর প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র বৃটিশ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থরক্ষা করাই ছিল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য। রাজা রাধাকান্ত দেব এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তরফ হইতে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। মাদ্রাজে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের শাখা স্থাপিত হয় এবং বোম্বাইএ বোম্বাই এসোসিয়েশন নামে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই সময়ে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন আরম্ভ করার চেষ্টা হয়।

সেই সময়ে এক দিকে যেমন ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অপর দিকে ভারতের ভাগ্য-গগনে বিপ্লবের বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অগ্ন্যুৎপাতে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে কেবল মাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহ বলিয়া বর্ণনা করিলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হইবে। সিপাহী বিদ্রোহ হইতেছে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের গণবিপ্লব। ভারতে বৃটিশ শাসনের সুরু হইতে বিদেশী শাসকদের অত্যাচার ও কু-শাসনের ফলে দেশের জনসাধারণের মনের মধ্যে যে অসন্তোষ ও তিক্ততা জমিয়া উঠিয়াছিল, বিদ্রোহের বিরাট বিস্ফোরণের মধ্যে তাহারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল; ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে সিপাহীদের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ যোগদান করিয়াছিল এবং এই জন্যই বিদ্রোহের আগুন এত দ্রুতগতিতে ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্রোহের ফলে ভারতের কয়েক স্থানে ইংরাজ শাসনের সাময়িক অবসান ঘটে। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীরা যে গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছিল, তাহাতে গণতন্ত্রের ছাপ ছিল। বিদ্রোহের ফলে ভারতব্যাপী যে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপিত হয়, তাহাতে বিদ্রোহের জাতীয় ভাবটি পরিস্ফুট হয়। নানা কারণে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে কায়েমী স্বার্থের সমর্থকদের সহিত বৃটিশ পক্ষের যোগাযোগ। বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বিদ্রোহের প্রথম এক বৎসরে বৃটিশ পক্ষের সহিত যুদ্ধে ৬০ হাজার সিপাহী নিহত হয় এবং বে-সামরিক জনসাধারণের মধ্যেও ১০ হাজার লোক নিহত হয়। বিদ্রোহের শাস্তি হিসাবে অসংখ্য লোককে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়, কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয় ও ফাঁসী দেওয়া হয়।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সিপাহী বিদ্রোহে জন্মভূমিকে বিদেশী শক্তির কবল হইতে মুক্ত করার জন্য দুই লক্ষ লোক জীবন দেয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৮ সাল হইতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভারতের মৃত্যু ঘটিল। গণবিপ্লবের অগ্নিতে পরিশুদ্ধ ভারতে নবযুগ আরম্ভ হইল।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠাইবেন

সাহিত্য-পরিচয়

বাংলা প্রবাদ ঃ—ডাঃ সুশীলকুমার দে সম্পাদিত। প্রকাশক : রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলা ছড়া ও প্রবাদ-সংগ্রহ। সুপণ্ডিত ও সুলেখক ডাঃ সুশীলকুমার দে এই প্রবাদ-সংগ্রহ সম্পাদনা করেছেন। এই দুরূহ দায়িত্ব পালন করার মতো যোগ্য ব্যক্তি বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে খুব অল্পই আছেন এবং যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ সুশীলকুমার দে নিঃসন্দেহে অন্যতম। সে বস্তুনিষ্ঠা তথ্যনিষ্ঠা পক্ষপাতশূন্যতা ও গভীর অনুসন্ধিৎসা না থাকলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানান্বেষণ ব্যর্থ হতে বাধ্য, সুশীলকুমারের যে সেই সব দুর্লভ গুণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে তা অনেকেই জানেন। "বাংলা প্রবাদ" সংগ্রহ-গ্রন্থে সম্পাদকের এই সব গুণ রীতিমত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। "বাংলা প্রবাদ" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোকিত করবে এবং বাংলা দেশের বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যেতিহাসকে বিশেষ সমৃদ্ধ করবে এ কথা আমাদের প্রারম্ভেই স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই।

বাংলা ছড়া, প্রবাদ বা চলতি কথার 'সংগ্রহ' যে এর পূর্বে প্রকাশিত হয়নি তা নয়। ১৮২৫ সালে 'বঙ্গদূত'-সম্পাদক নীলরত্ন হালদার তাঁর "কবিতা-রত্নাকর" পুস্তকে ২০৫টি সংস্কৃত নীতিবাক্য সংগ্রহ ক'রে দেন এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে মার্শম্যান সাহেব বাক্যগুলির ইংরেজী অনুবাদ করেন। কিন্তু এই নীতিবাক্য-গুলির অধিকাংশই বাংলা প্রবাদ বলে গ্রহণ করা যায় না। উল্লেখযোগ্য প্রথম বাংলা প্রবাদগ্রন্থ বোধ হয় উইলিয়ম মর্টন সাহেবের সংগৃহীত "দৃষ্টান্ত-বাক্য-সংগ্রহ"। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে ৮০৩টি বাংলা প্রবাদ আছে, কিন্তু সেগুলি বর্ণ বা বিষয়ানুক্রমে সাজানো হয়নি। প্রত্যেক প্রবাদের ইংরেজী অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া থাকলেও তা একেবারে নির্ভুল নয়। এর পর ১৮৬৮ সালে পাদ্রী লঙ সাহেব দুই খণ্ডে "প্রবাদমালা" প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ডে ২৩৫৪টি বাংলা প্রবাদ বর্ণানুক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের প্রধান ভাষায় প্রচলিত কতকগুলি প্রবাদ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রাঞ্জল বাংলায় অনূদিত হয়েছে। পরবর্তী বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহগুলি প্রধানতঃ পাদ্রী লঙের এই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছে বলা চলে। এই সব "সংগ্রহের" মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হ'ল ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত দ্বারকানাথ বসুর "প্রবাদ-পুস্তক", সুবলচন্দ্র মিত্রের বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টের "প্রবাদ ও প্রবচন", আশুতোষ দেবের অভিধানের "প্রবাদ সংগ্রহ", কানাইলাল ঘোষাল সংকলিত "প্রবাদ-সংগ্রহ", মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়ের "প্রবাদ-পদ্মিনী"। এ ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এ, ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় "বাঙ্গালায় নারীর ভাষা", "পূর্ব্ব-বঙ্গের মেয়েলি শ্লোক" ইত্যাদি প্রবন্ধে অনেক মূল্যবান প্রবাদ ও ছড়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলার বিশেষ ধরণের প্রবাদ সংগ্রহও কেউ কেউ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে ডাঃ দে "Oxford Dictionary of English Proverbs" নামক বিখ্যাত প্রবাদ-অভিধানের সম্পাদন-পদ্ধতির আদর্শ অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। এই সম্পাদন-পদ্ধতিই আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক। তার জন্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যের, সুপ্রাচীন যুগ থেকে অতি আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত, গভীর অনুশীলন প্রয়োজন। ডাঃ দে'র সে যোগ্যতা ও নিষ্ঠা সম্পূর্ণ থাকলেও এই গ্রন্থে তা তিনি সযত্নে করেননি, তাই তাঁর গ্রন্থ অক্সফোর্ড প্রবাদ-অভিধানের মতো না হয়ে প্রবাদ-সংগ্রহই হয়েছে। তবে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রবাদ-সংগ্রহ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ডাঃ দে'র সম্পাদিত এই "বাংলা প্রবাদ" সব চেয়ে বেশী মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য। এই সংগ্রহে ৬৬৮১টি প্রবাদ সংগৃহীত হয়েছে এবং প্রবাদগুলি আগাগোড়া টীকা-টিপ্পনীসহ বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথমেই ডাঃ দে লিখেছেন : "প্রায় সকল দেশে ও সকল কালে প্রবাদ-বাক্যের প্রচলন আছে, কিন্তু কবে বা কিরূপে প্রবাদের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।" এ-কথা একেবারে ভুল এবং এই শ্রেণীর গ্রন্থের গোড়াতেই এ-কথার এমন ভাবে উল্লেখ না করাই উচিত ছিল। যদিও পরে নিজেই চমৎকার যুক্তিবিন্যাসে তিনি এ-কথার সত্যতাকে অনেকটা খণ্ডন করেছেন, তাহলেও প্রবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে শুরুতেই এমন "আধ্যাত্মিক" উক্তি একেবারেই শ্রুতিমধুর নয়। এর ফলে সাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে এবং এমন ভুল ধারণাও জন্মাতে পারে যে "প্রবাদ" আর "দৈববাণী" প্রায় একই ধরণের জিনিস। প্রবাদ যে তা নয় তা ডাঃ দে'ও স্বীকার করেছেন, তবু এই রহস্যোক্তির কারণ কি? সকলেই জানেন, "প্রবাদ" হ'ল সাধারণ মানুষের অতি-সাধারণ মুখের কথা, মুখ থেকে যে-কথা বেরিয়ে কেতাবের হরফের মধ্যে বন্দী হয়নি, মুখে-মুখেই দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে যে-কথা চলে বেড়ায়, মানুষের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার হিমালয় থেকে যার উৎপত্তি এবং সরলতা প্রত্যক্ষতা সহজবোধ্যতা ও সহজ স্মরণীয়তার জন্য যা অতি-সাধারণ হয়েও অনন্যসাধারণ। সখের সাহিত্য-বাগিচার গোলাপগুচ্ছ নয় "প্রবাদ"। "প্রবাদ" হ'ল

সহজ সুন্দর স্বাভাবিক প্রকৃতির বনফুল। ডাঃ দে বলেছেন: "এই যদৃচ্ছাকৃত খণ্ড তুচ্ছ বাক্যগুলি কবিতা নয়, তত্ত্বকথা নয়, নীতি-প্রচারও নয়, অথচ লোক-স্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।" এ-কথার অর্থও আমাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হয়, কারণ কবিতা কি? তত্ত্বকথা কি? নীতি কি? "কবিতা" ও "প্রবাদে"র উৎপত্তি-স্থল একই। আশা করি, এ-কথা ডাঃ দে স্বীকার করবেন। ছড়া, ছন্দোবদ্ধ গান, সুর ইত্যাদি মানুষের আদিম আত্মপ্রকাশের ভাষা এবং কবিতারও আদি অকৃত্রিম রূপ। এই দিক দিয়ে বিচার করলে কবিতা ও প্রবাদ সমধর্ম্মী এবং "প্রবাদ" নিশ্চয়ই কাব্যধর্ম্মী। তা ছাড়া চলতি লোক-প্রবাদের মধ্যে কাব্যের রূপ রস স্পর্শ গন্ধ নেই, এ-কথা ডাঃ দে'র মতো সুসাহিত্যিক ও সুকবি কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? আর প্রবাদের মধ্যে "তত্ত্বকথা" নেই, "নীতিকথা" নেই তাই বা কে বললে? "তত্ত্বকথা" বলতে যদি জটিল দুর্ব্বোধ্য দর্শনশাস্ত্র এবং "নীতিকথা" বলতে যদি নীতিবাগীশ পণ্ডিতের উদ্ভট শাস্ত্রবচন বোঝায়, তাহলে অবশ্য "প্রবাদ" তার কোনটাই নয়। কিন্তু লোক-প্রবাদের মধ্যে তত্ত্বকথা ও নীতিকথার ছড়াছড়ি, পার্থক্য হ'ল এই যে তার মধ্যের শাস্ত্রের কচকচানি নেই। পরবর্ত্তী কালে যে শাস্ত্র রচিত হয়েছে তার মধ্যে "প্রবাদের" প্রভাব কতখানি তা নিয়ে কি গবেষণা করা যায় না? আসল কথা হল, "প্রবাদ" কবিতা নীতিকথা তত্ত্বকথা সবই, তবে তার রূপ ও প্রকাশভঙ্গী হ'ল প্রাকৃত জনের সহজ সরল রূপ ও ভঙ্গী, সংস্কৃত মনের ছাপ বা প্রভাব তার মধ্যে সামান্যই আছে, যা আছে তা পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষেপ ও সংস্কার।

জাতির জীবনের নিরবচ্ছিন্ন ধারাই যেহেতু প্রবাদের উৎস, সেই জন্যই প্রবাদগুলি হল প্রত্যেক দেশের অমূল্য জাতীয় সম্পদ এবং জাতির জীবনেতিহাসও তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। যে কোন দেশের, যে কোন জাতির, যে কোন যুগের লোক-প্রবাদ যদি গভীর ভাবে অনুশীলন করা যায় তাহলে সেই দেশের, সেই জাতির সেই যুগের সামাজিক ইতিহাসের মোটামুটি পরিচয় তার মধ্যেই পাওয়া যায়। ছাপাখানা বা ছাপার হরফ যখন তৈরী হয়নি, গ্রন্থরচনার রীতি ছিল না যখন এবং মুদ্রিত গ্রন্থ লোক-সমাজে প্রচারেরও যখন কোন ব্যবস্থা ছিল না, তখন থেকেই প্রবাদের জন্ম। তারও অনেক আগে থেকে প্রবাদ লোক-সমাজে প্রচলিত। যখন থেকে ভাষার বিকাশ হয়েছে, মানুষের মনের ভাব ও জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশের বাহন হয়েছে মৌখিক ভাষা, লৈখিক ভাষার যখন প্রচলন হয়নি, তখন মানুষের আদিম "শিল্পকলা" বলতে বুঝাতে 'ছবি', 'নাচ', 'অভিনয়' ইত্যাদি এবং সাহিত্যের রূপ ছিল এই অলিখিত অমুদ্রিত "ছড়া" ও "প্রবাদ"। তার পর লৈখিক ভাষা তাঁর চিত্ররূপ ছেড়ে অক্ষর-মূর্ত্তি ধারণ করেছে অনেক যুগ ধ'রে, ভূর্জ্জপত্রের পাণ্ডুলিপির মধ্যে তখনও বন্দী হয়ে থেকেছে পণ্ডিতমণ্ডলীর তত্ত্বকথা, নীতিকথা, কবির কাব্য ইত্যাদি। লোক-সমাজে তার প্রচার হয়নি, সুতরাং প্রবাদ রচনার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাও নষ্ট হয়নি। প্রবাদের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি হয়েছে। তার পর আধুনিক যুগে, মুদ্রিত গ্রন্থের যুগেও যখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার সে-কালের পুরোহিত পণ্ডিত-শ্রেণীর মতো সমাজের এক মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সাধারণ লোক সেই শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত, তখন এ-যুগেও প্রবাদ রচনা থেকে অশিক্ষিত প্রাকৃত জন বিরত হয়নি। প্রবাদ তাই আজও সকলের অগোচরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে রচিত হচ্ছে, প্রাকৃত জন তার রচয়িতা। "প্রবাদ" মাত্রই তাই "প্রাচীন" না হ'লেও 'প্রাকৃত' নিশ্চয়ই। বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগের লোক-প্রবাদ তাই স্বচ্ছন্দে বৈষ্ণব যুগ উত্তীর্ণ হয়ে রবীন্দ্র-যুগ পর্য্যন্ত চলে এসেছে বাংলা দেশে এবং এই দুই শত বৎসরের ইংরেজ-যুগেও এমন অনেক প্রবাদ রচিত হয়েছে যাদের হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না। ইতিহাস যেমন রাজা-রাজড়ার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজস্ব ছন্দে তালে তালে এগিয়ে চলে, তেমনি সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় শিল্পী ও পণ্ডিতশ্রেণীর দুর্ব্বোধ্য কবিতা-কাহিনী-ইতিহাস-দর্শন রচনা সত্ত্বেও লোক-সমাজে জাতীয় জীবনের ইতিহাস রচনার কাজ চলতে থাকে। সেই ইতিহাস হয়ত ছাপা হয় না, তার রাজ-সংস্করণ অথবা তথাকথিত সুলভ সংস্করণ হয়ত প্রকাশিত হয় না। গ্রামের পঞ্চায়েতে, হাটে-মাঠে-বাটে, চণ্ডীমণ্ডপে, পূজা-পার্ব্বণে উৎসবে-আনন্দে 'প্রবাদ' রচিত হয়, মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে সমষ্টি-গত ভাবে তা গৃহীত হয়, তার পর তা সর্ব্বযুগের সর্ব্ব-সাধারণের

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

"আমরা প্রথামত প্রাপ্ত-পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণ দোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞান লাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণেই এ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে অবকাশানুসারে গ্রন্থবিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছামত কার্য্য হইতেছে।

এই সকল কারণে আমরা যে সকল গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশের প্রায়ই কোন প্রকার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু আমরা তজ্জন্য অকৃতজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। গ্রন্থকারগণ যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন, যদি তাহা সিদ্ধ না করিলাম, তবে ঐ সকল গ্রন্থের মূল্য প্রেরণ আমাদিগের কর্ত্তব্য। তদপেক্ষা একটু লেখা সহজ, সুতরাং আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।"

—বঙ্গদর্শন, প্রথম বর্ষ, কার্ত্তিক, ১২৭৯।

উত্তরাধিকার হয়ে যায়। এই ইতিহাসই আসল ইতিহাস, জীবন্ত জাতির ইতিহাস, লৈখিক ইতিহাসের চেয়ে এই মৌখিক ইতিহাসের মূল্য অনেক বেশী, অন্ততঃ সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে। সে-কালের রাজাদের যেমন 'পাবলিকেশন্‌স ও ইন্‌ফর্মেশন্‌স' বিভাগ ছিল না, 'রেডিও' ছিল না, তাই শিলাগাত্রে ও স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁরা তাঁদের রাজ্য-শাসনবিধির পরিচয় দিয়ে গেছেন, তেমনি চিরকালের প্রজাদের বা প্রাকৃত জনের যাদের শিক্ষার অধিকার নেই, তারা মুখে মুখে যে ইতিহাস, জীবন ও সমাজের যে প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা রচনা করে গেছে, তারই শ্রেষ্ঠ রূপ হ'ল ছড়া ও প্রবাদ। যদি কোন সমাজ-বিজ্ঞানী বিষয়-বস্তু অনুসারে এই সব ছড়া ও প্রবাদ সংকলন করেন এবং তাদের উৎপত্তি-কাল নির্ণয় করে সেগুলির মোটামুটি যুগ-বিভাগ করেন, তাহলে তা থেকে চমৎকার বাস্তব সামাজিক ইতিহাস রচনা করা যায়।

বাংলা প্রবাদ সম্বন্ধে যে মূল্যবান ভূমিকা ডাঃ দে লিখেছেন, তার মধ্যে বিষয়-বস্তু অনুসারে প্রবাদগুলির আলোচনা করে তার মধ্যে বাংলার সামাজিক জীবনের ছবি কতখানি ফুটে উঠেছে তাও আলোচনা করেছেন। এ-দিক্ দিয়ে তাঁর এই আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আরও একটু কষ্ট স্বীকার করে, আরও ধৈর্য্য ধরে অনুসন্ধান করে যদি তিনি প্রবাদগুলির একটা 'ধারাবাহিকতা' তৈরী করে দিতেন, বিষয়-বস্তুর অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করে তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন, তাহলে নিছক সংগ্রহ-গ্রন্থ না হয়ে "বাংলা প্রবাদ" বাংলা দেশের একখানি মূল্যবান সামাজিক ইতিহাস বলে গণ্য হত। এ-কাজ করা যে ডাঃ দে'র পক্ষে আদৌ সাধনাতীত ব্যাপার নয় তা আমরা জানি ও বিশ্বাস করি। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থে (বাংলার বৈষ্ণবধর্ম এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থে) তাঁর এই কাজের যোগ্যতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। সেই জন্যই আমরা তাঁর কাছ থেকে আশা করি, "বাংলা প্রবাদের" পরবর্তী সংস্করণে তিনি বইখানিকে 'সংগ্রহ-পুস্তক' থেকে "সামাজিক ইতিহাসে" রূপ দেবেন। "বাংলা প্রবাদ" এখনই যথেষ্ট মূল্যবান গ্রন্থ হলেও, "সামাজিক ইতিহাস" হিসাবে এর মূল্য আরও অনেক বাড়বে এবং বাংলা সাহিত্যও অনেক বেশী সমৃদ্ধ হবে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃ—(প্রথম খণ্ড) শ্রীসজনীকান্ত দাস। প্রকাশকঃ মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীসজনীকান্ত দাস বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এই ইতিহাস রচনা করা যে রীতিমত কঠিন গবেষণা সাপেক্ষ ব্যাপার তা বলাই বাহুল্য। সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ মাল-মশলা ও উপকরণের সাহায্যে সজনীকান্ত বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রায়ান্ধকার যুগের যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা তাঁর বাংলা সাহিত্যের প্রধান কীর্ত্তি বলে স্বীকার করতে কেউই কুণ্ঠিত হবেন না। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কবি, কথা-শিল্পী ও সাহিত্য-সম্পাদক হিসাবে সজনীকান্ত যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" সেই সুখ্যাতি আরও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সজনীকান্ত বাংলা গদ্যের প্রায়ান্ধকার প্রাথমিক যুগ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ ও আবিষ্কার করেছেন। সেই সঙ্গে আমরাও আবিষ্কার করেছি যে, সজনীকান্তের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ তথ্যনিষ্ঠ সত্যানুসন্ধিৎসু "জাগ্রত মন" রয়েছে, যে-মন বিজ্ঞানীর মন, বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মন, কল্পনাবিলাসীর মন নয়। বাংলা সাহিত্যের সমঝদার ও শুভকাঙ্ক্ষীদের কাছে এ আবিষ্কার মূল্যবান তো নিশ্চয়ই, আনন্দেরও। সাম্প্রতিক রাজনীতির একান্ত সাময়িক ঘূর্ণাবর্ত্তে যাঁরা সজনীকান্তের আজীবনের সাহিত্য-নিষ্ঠাকে কলঙ্কিত হতে দেখে বেদনা বোধ করেন, আশা করি, তাঁরাও বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক সজনীকান্তের এই নূতন পরিচয় পেয়ে আনন্দিত ও আশান্বিত হবেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় সজনীকান্ত পথিকৃৎ নন। তাঁর পূর্ব্বগামীদের মধ্যে ডাঃ সুশীলকুমার দে, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের রচনার পরিপূরণ ও সংশোধন হিসাবে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান তথ্যের সন্ধান সজনীকান্ত দিয়েছেন। শ্রীরামপুর কলেজের ও অন্যান্য নানা স্থানের দফ্‌তর থেকে অনেক পুরাতন কাগজ-পত্র পরীক্ষা করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন যা তাঁর পূর্ব্বগামীরা পাননি। এই দিক্ দিয়ে বিচার করলে তাঁর এই ইতিহাসখানিকে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অন্যান্য ইতিহাসের মধ্যে সব চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক বলা যায়। সজনীকান্তের নবাবিষ্কৃত তথ্য ও ঐতিহাসিক উপকরণ সম্বন্ধে আমাদের বলার কিছু নেই। বাংলা গদ্যের আদি প্রবর্ত্তক রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্ম্মা ও উইলিয়ম কেরী সম্বন্ধে তিনি যে-সব নূতন কথা বলেছেন এবং নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের শৈশব কালের ইতিবৃত্ত অস্পষ্ট কাহিনী না হয়ে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস হয়েছে। সে-দিক্ দিয়ে বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে ঋণী থাকবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের তথ্য-মূল্য স্বীকার করেও যে দু'-একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা পাঠান্তে আমাদের মনে হয়েছে তারই উল্লেখ করব এখানে। এই ত্রুটি তথ্যসংক্রান্ত নয়, সাহিত্যিক ত্রুটি! সজনীকান্ত যদি কেবল এক জন পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ বা গবেষক হতেন তাহলে তাঁর পর্ব্বতপ্রমাণ তথ্যস্তূপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেই আমরা সন্তুষ্ট হতাম। কিন্তু তিনি যে শুধু তথ্যসন্ধানী পণ্ডিত বা গবেষক নন তা সকলেই জানেন। তিনি সাহিত্যিক, তাই যদি আমরা প্রত্যাশা করি যে, তাঁর সাহিত্য-বোধ ও লিখন-নৈপুণ্যের গুণে তথ্যভারাক্রান্ত ইতিহাস নীরস প্রমাণপঞ্জী বা ক্রণিকেল না হয়ে, সরসতায় ও কল্পনায় অভিষিক্ত হয়ে সাহিত্যেতিহাস হয়ে উঠবে তা হলে নিশ্চয়ই অন্যায় করব না। সজনীকান্তের মতো এক জন শক্তিশালী সুদক্ষ গদ্যশিল্পীর হাতেও আলোচ্য ইতিহাস আশানুরূপ সরস ও সুখপাঠ্য হয়ে ওঠেনি, এ-কথা আমরা উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ, এই ধরণের একখানি অত্যন্ত মূল্যবান প্রামাণিক গ্রন্থের এই ত্রুটি অন্যের চোখে সামান্য ঠেকলেও, আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস খুব বেশী হলেও গত ১৫০ বছরের ইতিহাস মাত্র। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" মুদ্রিত হবার পর থেকেই

বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূচনা হয়েছে যদি বলা যায়, তাহলেও দেখা যায়, ২০০ বছরের বেশী বাংলা গদ্যের বয়স নয়। তার আগেকার যে-সব শিলালেখ তাম্রশাসন দলিল-দস্তাবেজ চিঠিপত্র পুঁথি ইত্যাদি গদ্যের আদি নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তাতে অনুসন্ধানীর কৌতূহল নিবৃত্তি হলেও গদ্যের ইতিহাস বিবৃত হয় না। প্রকৃত পক্ষে বাংলা গদ্য-ভাষা ও গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস ওয়েলসলি প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বলা চলে। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ঠা মে, ১৮০০ খৃঃ অব্দ। ১৮০১ খৃঃ অব্দে ১লা মে উইলিয়ম কেরী এই কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং তাঁর সহকর্মিরূপে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতি, শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যোগদান করেন। উইলিয়ম কেরী এবং এই পণ্ডিত-গোষ্ঠীই বাংলা গদ্যের আদি প্রবর্ত্তক। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাংলা গদ্য-ভাষার সূত্রপাত হয়েছে বললে ভুল করা হয় না।

বিষয়টা কিন্তু শুধু এই সন-তারিখের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। গদ্যভাষার (Prose) জন্মের ইতিহাস তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় ইতিহাসে দেখা যায়, সংস্কৃত—প্রাকৃত—অপভ্রংশ থেকে খৃষ্টীয় দশম শতকের কোন সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম হয়েছে এবং উড়িয়া, আসামী ও বাংলা সমগোত্রজ। ১৩০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বের বাংলা ভাষার নমুনা কয়েকটি শিলালেখে বাঙালী পণ্ডিত সর্ব্বানন্দকৃত "অমরকোষের" টীকায় এবং হরপ্রসাদ শস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গান ও দোহার মধ্যে পাওয়া যায়। এর মধ্যে বৌদ্ধ গান ও দোহাগুলিই প্রাচীনতম বাংলার নিদর্শন বলে সকলে স্বীকার করেছেন। তার পর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, শূন্যপুরাণ, চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য, বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষার বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই বাংলা ভাষার রূপ হল কাব্যরূপ (Poetry), গদ্যরূপ (Prose) নয়। প্রাচীনতম বাংলা চর্য্যাপদকে যদি ৯৫ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি রচিত বলে ধরা যায়, তাহলে সুদীর্ঘ ৮৫০ বৎসর ধরে বাংলা ভাষার কবিতার কোমল বেশ ধারণ ক'রে থাকার কারণ কি?

সজনীকান্ত ভূমিকাতে বলেছেন: "বাঙালী যে গীতিপ্রধান কবির জাতি, ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ; অন্য কুত্রাপি গদ্যের প্রাদুর্ভাব এত দীর্ঘবিলম্বিত হয় নাই।" তার পর তাসের দেশে রাজপুত্রের হঠাৎ আগমনে যেমন বিপর্য্যয় ঘটেছিল তেমনি ইংরেজদের আগমনেও এদেশে বিপর্য্যয় ঘটল। সজনীকান্ত লিখেছেন: "সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদ্‌রিদের আগমনে কবিতাপ্রবণ বাংলা দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি।" এ যুক্তি বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের নয়, কাকতালীয় অদৃষ্টবাদীর যুক্তি। বিপর্য্যয় ইংরেজরা ঘটালো কেমন করে? তার অনেক আগে বখ্‌তিয়ার যে বিপর্য্যয় ঘটিয়েছিলেন, তার ফলে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ না হয়ে ধীরে ধীরে বাংলার অপূর্ব্ব গীতিকাব্যের (চৈতন্য-সাহিত্য, বৈষ্ণবকাব্য ইত্যাদি) বিকাশ হয়েছিল কেন? "ইংরেজদের সোনার কাঠির স্পর্শের" কথা যদি সজনী বাবু বলেন তাহলে সেই "সোনার কাঠিটা" কি বস্তু তা ব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন হয়। বখ্‌তিয়ারের অশ্বারোহী বাহিনী ও ঢাল-তলোয়ারের মতো ইংরেজদেরও সিপাহী-সৈন্য কামান-বন্দুক যথেষ্ট ছিল। তাহলে "সোনার কাঠিটা" কি?

এইখানেই সজনীকান্তের আলোচ্য গ্রন্থের মারাত্মক ত্রুটি। বাংলা গদ্য-ভাষার জন্ম কেন উনবিংশ শতাব্দীতে হল সে সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা করা উচিত ছিল। "কুত্রাপি গদ্যের প্রাদুর্ভাব এত দীর্ঘবিলম্বিত হয় নাই" বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। গদ্যের অনেক আগে পদ্যের জন্ম, পৃথিবীর সমস্ত দেশে, প্রত্যেক ভাষায়। "গীতিপ্রধান কবির জাতি" শুধু বাঙালী নয়, বাঙালী বিহারী তামিল তেলেগু কানাড়া পাঞ্জাবী ইত্যাদি সকলেই, এমন কি ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ, রুশ ইত্যাদি জাতিও। কথাটা তা নয়। ছন্দোবদ্ধ কাব্য ও সঙ্গীতই হল মানুষের আদিম ভাষা, আদিম শিল্প। ছন্দের সাবলীল ধারাতেই মানুষের চিন্তার ধারা আত্মপ্রকাশ করে, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে। তাই বাঁধা ধরা ছন্দের কাব্যরূপই মানুষের প্রাচীন সাহিত্যের রূপ, সব দেশের সাহিত্যের এই একই ইতিহাস। প্রাচীন মানব-সমাজের সহজ সাবলীল একঘেয়ে একটানা বৈচিত্র্যহীন জীবনধারার বিকাশ কাব্যের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই হওয়া সম্ভবপর। যে-দেশে এই প্রাচীন স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা যত বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে, সেই দেশে সাহিত্য ও ভাষার কাব্যরূপ তত একঘেয়ে অপরিবর্ত্তনীয় থেকেছে। বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের কূপমণ্ডুক স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়িত্বই হল এদেশের সাহিত্যের একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন কাব্যবিষয় ও কাব্যরূপের মূল কারণ। গদ্য-ভাষার বিকাশের জন্য তো নিশ্চয়ই, কাব্যেরও বৈচিত্র্যের জন্য প্রয়োজন হয় সমাজ ও জীবনের গতিশীলতা, নানা জটিলতা, নানা সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাত। সর্ব্বদেশের গদ্যভাষা সমাজের এই প্রচণ্ড গতিশীলতা, সমস্যামুখর জীবনের এই জটিলতা ও দ্বন্দ্বকে সমাবৃত করে পরিপুষ্ট হয়েছে। বাংলা গদ্যভাষার ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চর্য্যাপদের যুগ থেকে নবাবী আমল পর্য্যন্ত বাংলার সমাজ-ব্যবস্থায় কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটেনি। বাঙালীর জীবনধারার মধ্যেও কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই চর্য্যাপদের অধ্যাত্মবাদ থেকে শুরু করে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক একঘেয়ে প্রেমের কাব্য, মঙ্গলকাব্য, ধর্ম্মসঙ্গীত, টপ্পা, পাঁচালী পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্য ও ভাষার বৈচিত্র্যহীন বিকাশ হয়েছে। মুসলমান নবাবরা আর যাই করুন, সমাজ-ব্যবস্থার কোন উন্নতিসাধন করতে পারেননি। বাংলার আত্মনির্ভর কূপমণ্ডুক গ্রাম্য-সমাজের কাঠামো ইংরেজরা আসার আগে পর্য্যন্ত একই অবস্থায় ছিল বলা চলে। ইংরেজরা আসার ফলে সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটে, অচল অটল গ্রাম্য-সমাজের ভিৎ পর্য্যন্ত ভেঙে যায়, নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় মানুষ, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ঘুমন্ত জাতির ঘুম ভাঙে, সমাজ-সংস্কারের সমস্যাও দেখা যায়। বাংলা সাহিত্য ও গদ্যভাষার ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যায়, এই শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রেরণা ও তাগিদ থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের থেকে আরম্ভ করে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্যভাষা সোজা হয়ে হাঁটতে শেখে। বঙ্কিম-যুগকে বাংলা-গদ্যের যৌবন কাল বলা যায়।

গদ্যভাষার জন্ম ও বিকাশের পাশাপাশি সাহিত্যের রূপও (Form) পরিবর্তিত হচ্ছে দেখা যায়। কাহিনী উপাখ্যান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা "উপন্যাসের" জন্ম হচ্ছে। চিরাচরিত কাব্যরূপ তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলালের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পরিণতি লাভ করছে।

এই সব বিষয়ের আলোচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে করা উচিত ছিল বলে আমাদের মনে হয়। বিশেষ করে, ভূমিকাতে যখন এগুলির অবতারণা করা হয়েছে তখন এই সব বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারও সচেতন নিশ্চয়ই। গদ্যভাষার প্রকৃতি ও উৎপত্তি, সমাজ-জীবনের সঙ্গে গদ্যভাষার সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা না করলে এবং তারই সঙ্গে গদ্যভাষার ক্রমবিকাশের ধারাটি বিশ্লেষণ না করলে, ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া, আলোচ্য গ্রন্থে কেবল ক্যাটালগিং না করে গ্রন্থকার যদি সাহিত্যিক সমালোচনার দিকেও নজর দিতেন, তাহলে এ ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠত। এই শ্রেণীর গ্রন্থের শেষে একটি "নির্ঘণ্ট" (Index) থাকা উচিত ছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা আট আনা।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য পাঁচ সিকা।

রামমোহন প্রসঙ্গ : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাংলার জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা (রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন) : শ্রীযোগানন্দ দাস। মূল্য আড়াই টাকা। প্রকাশক : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচ্য চারখানি গ্রন্থেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রাষ্ট্রীক ও সামাজিক ইতিহাসের আংশিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রভাতচন্দ্রের "ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া" ছাড়া আর কোনখানিই ঠিক ইতিহাস পদবাচ্য নয়, রচনা-সংকলন অথবা তথ্য-সংকলন মাত্র। ইতিহাসের সুবিন্যস্ত উপকরণ হিসাবে অবশ্য এগুলির মূল্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে অল্প নয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক জন অসীম ধৈর্য্যশীল ও অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্ম্মী হিসাবে ইতিমধ্যেই বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে বহু দিন শিক্ষানবীশী করে তিনি এই ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের কাজে সে বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করেছেন তা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। ১৮৬৮, ১৮৬৯ এবং ১৮৭০ সালের বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকার' ফাইল থেকে তিনি এই রচনা-সংকলন প্রকাশ করেছেন। এই ধরণের প্রাচীন সংবাদপত্রের রচনা-সংকলন সামাজিক ইতিহাস-লেখকদের উপকরণ-সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রাচীন সংবাদ-পত্রও সাময়িক পত্রের রচনা-সংকলন হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল : সীটন-কর সাহেবের "Selections from Calcutta Gazettes," ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "Selections from Writings of Harish Chandra Mookerji," শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", মন্মথনাথ ঘোষের "Selections from the Writings of Giris Chunder Ghose" (গিরিশচন্দ্র ঘোষ হলেন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক), চারুচন্দ্র মিত্রের "Speeches of Ram Gopal Ghosh" ইত্যাদি। বিষয়ানুসারে রচনাগুলি সংকলিত করে যোগেশ বাবু সংকলনের মূল্যবৃদ্ধি করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে পত্রিকার রাজনীতিমূলক প্রবন্ধগুলি সংকলন করা হয়েছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে যথাক্রমে সিবিল সার্ভিসের উৎপত্তি উদ্দেশ্য, বৃটিশের বিচার ও শাসন-পদ্ধতির স্বরূপ, রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও হিন্দু মেলার কথা, জমিদার-কৃষক সম্পর্ক, মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের কথা, কৃষি ও বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে। সংকলন ও সম্পাদনা ভালই হয়েছে, কিন্তু বইয়ের নাম "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা" কেন দেওয়া হল তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। যে কোন পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস হিসাবে বইখানি কিনতে পারেন। ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র না হলে তাঁর এই সংকলন-গ্রন্থ বিশেষ যে কাজে লাগবে না তা গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়েই জানেন। শুধু এই ব্যবসাদারী নাম দেওয়া কোন মতেই উচিত হয়নি।

ভারতে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পুস্তিকাকারে "ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া" প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তিকার মধ্যে প্রথম রাষ্ট্রীক চেতনার গুরু রামমোহন, তাঁর শিষ্য দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমারের "জমিদার সভা", টমসন সাহেব ও হ্যারি প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি," ইয়ং বেঙ্গল দলের রাজনৈতিক আন্দোলন ও দেশাত্মবোধ প্রচার, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, কালা আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া, নীল আন্দোলন, হিন্দু মেলা ও নব স্বাদেশিকতা, ভারত সভা, রায়ত সভা, কুলি সভা, ইণ্ডিয়ান লীগ, ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন, ন্যাশনাল কনফারেন্স, ইলবার্ট বিল আন্দোলন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে কি ভাবে বাংলার তথা সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীক চেতনার বিকাশ হয় এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান "ইণ্ডিয়ন ন্যাশনাল কংগ্রেসের" প্রতিষ্ঠা হয়, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হলেও প্রভাত বাবু কোন তথ্য বিকৃত করেননি।

তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রন্থ রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্বন্ধে লেখা। প্রভাত বাবুর "রামমোহন প্রসঙ্গ" রচনার উদ্দেশ্য হ'ল এদেশের এক দল হতভাগ্য রামমোহন-বিরোধী নানা কৌশলে রামমোহন সম্বন্ধে যে-সব মিথ্যা অপপ্রচার করেছেন, সেগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে খণ্ডন করা। এই উদ্দেশ্য প্রভাত বাবুর অনেকাংশেই সফল হয়েছে, তবে রামমোহনকে নিয়ে এই জাতীয় খেউড়ের অবতারণা না করাই বোধ হয় শোভন। ভক্তের উচ্ছ্বাস যে কতখানি অন্ধ ও উগ্র হতে পারে শ্রীযোগানন্দ দাসের গ্রন্থ থেকেই তা বোঝা যায়। যোগানন্দ দাস এক জন শক্তিশালী লেখক বলেই আমরা জানি। তাঁর কাছ থেকে এ-রকম একখানা কিম্ভূতকিম্বাকার গ্রন্থ আমরা প্রত্যাশা করিনি। রামমোহন কি করেছেন আর কি করেননি,

এদেশে তাঁর স্থান কোথায় ও কত উঁচুতে তা আরও অনেক সুন্দর ভাবে বলা ও লেখা যেত। তথ্য অবশ্য যোগানন্দ বাবু যোগাড় করেছেন অনেক, প্রগতিশীল যুক্তি ও দৃষ্টির পাশে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রক্ষণশীল যুক্তি ও অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয়ও আছে। অবিন্যস্ত তথ্যসম্ভার এবং এলোমেলো চিন্তাধারার পরিচয় তাঁর গ্রন্থের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। তারই সঙ্গে আবার হরেক রকমের হরফের ছাপে বইখানি আগাগোড়া ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বলে মনে হয়। তাঁরই সংগৃহীত এই তথ্যসম্ভার নিয়ে তিনি ভবিষ্যতে রামমোহন ও তাঁর যুগ সম্বন্ধে একখানি ভাল ইতিহাস রচনা করবেন বলে আমরা আশা করতে পারি। বর্ত্তমান গ্রন্থকে অবিন্যস্ত তথ্য-সংকলন ভিন্ন আর কিছুই আমরা বলতে পারছি না।

MAHARAJA RAJBALLABH—A Critical study based on Contemporary Records.— R. C. Majumdar. Published by the University of Calcutta. Rs. 2.

মহারাজা রাজবল্লভের জীবনের ইতিবৃত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বললেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজা রাজবল্লভের বংশধরেরা আজও কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে বসবাস করছেন। এই মহারাজারই এক জন বংশধর হলেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, যিনি রাজবল্লভের এই আলোচ্য জীবনেতিহাস রচনা করেছেন।

রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে রাজবল্লভের জীবনী আরও অনেকে লিখেছেন। বাংলায় রচিত এই সব জীবনীর মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন হল গুরুদাস গুপ্তের লেখা "মহারাজ রাজবল্লভের জীবনী"। গুরুদাস গুপ্ত-রচিত এই জীবনী অবলম্বনে উমাচরণ রায় আর একখানি জীবনী রচনা করেন এবং আবদুল করিম সাহেব এই জীবনী অনেক কষ্টে উদ্ধার ক'রে ১৩৩১ সালে (বাং) 'নবনূর' নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। চন্দ্রকুমার রায় "মহারাজ রাজবল্লভ" নামে আর একখানি জীবনী লেখেন। বাঙলা ভাষায় রচিত এই সব জীবনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রসিকলাল গুপ্তের "মহারাজ রাজবল্লভ সেন ও তৎসমকালবর্ত্তী বাঙলার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ।" এছাড়া কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাজবল্লভ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের এই আলোচনা যে একদেশদর্শী ও বিদ্বেষভাবাপন্ন তা আজ অনেকেই প্রতিপন্ন করেছেন। এ ক্ষেত্রে মহারাজা রাজবল্লভের জীবনী ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বনে রচনা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবেন। তৎকালীন সরকারী কাগজপত্র দলিল ইত্যাদি থেকে তথ্যসংগ্রহ করে এই কাজ সুসম্পন্ন করেছেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়।

আনুমানিক ১৭০৭ খৃঃ অব্দে রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার নৌ-বিভাগে এক জন সামান্য কেরাণী হয়ে ঢুকে তিনি পেশকার হন এবং পরে নৌ-বিভাগের প্রধান অধিনায়ক হন। তাঁর প্রতিপত্তি এত দ্রুত বেড়ে যায় যে অল্পকাল মধ্যেই তিনি কার্য্যতঃ পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকর্ত্তা হন। মুর্শিদাবাদের সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ির সময় রাজবল্লভ মহম্মদ ও ঘেসিটি বেগমের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার পর তিনি আবার মীরণের দক্ষিণ হাত হয়ে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। হলওয়েল সাহেবের কথা ও কাহিনী যদি বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে ওলন্দাজদের সহযোগিতায় বাঙলা দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার চক্রান্তের প্রধান নায়করূপে রাজবল্লভকেই স্বীকার করতে হয়। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শত্রুর সাময়িক সহযোগিতায় প্রধান শত্রুকে নিপাত করার যে রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি তা যে রাজবল্লভের যথেষ্ট ছিল তা বুঝতে দেরী হয় না। এত বড় ধুরন্ধর দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ সে-কালের বাঙলা দেশে আর কেউ ছিলেন বলে এখনও জানা যায়নি। সামরিক কলা-কৌশলও যে রাজবল্লভ কতটা আয়ত্ত করেছিলেন তা ইংরেজ গবর্ণরের প্রশংসাপত্র থেকেই বুঝা যায় এবং তাঁর এই ক্ষমতার জন্যই যে তাঁর শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মীরকাশিমের রাজত্বকালে তিনি বিহারের ডেপুটি গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাতেও সন্দেহের কোন কারণ নেই। গবর্ণর ড্রেক তাই বলে গেছেন যে, মহারাজা রাজবল্লভ "was esteemed the subtlest politician in the whole province."

রাজবল্লভের বহুমুখী রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও সামাজিক কর্ম্ম-জীবন কম উল্লেখযোগ্য নয়। রাজবল্লভ বৈদ্য ছিলেন, এবং বৈদ্য-সম্প্রদায়ের তিনি যথেষ্ট সংস্কার সাধন করেছেন। আগে বৈদ্যদের মধ্যে উপবীতের প্রচলন ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে মহারাজা রাজবল্লভ বৈদ্যদের উপবীত ধারণ যে শাস্ত্রসম্মত তা সমাজে প্রবর্ত্তন করেন। রাজবল্লভের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক সামাজিক কীর্ত্তি হ'ল, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের স্বপক্ষে আন্দোলন। বিদ্যাসাগরের প্রায় এক শত বছর আগে ১৭৫৬ সালে মহারাজা রাজবল্লভ দক্ষিণ ভারত, কাশী, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অনুমতিক্রমে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে প্রচার করেছিলেন। শোনা যায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য না কি তিনি এই সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করতে পারেননি। তাঁর প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এবং প্রায় শতবর্ষ পরে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই ধরণের আরও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য মহারাজা রাজবল্লভের জীবনী থেকে জানা যায়, যা বাঙলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে মূল্যবান।

উড়কি ধানের মুড়কি

(অন্যান্য পত্রিকায় সমালোচনার যৎকিঞ্চিৎ অংশ)

স্বদেশী সঙ্গীত—মুরারি দে সম্পাদিত। প্রকাশক বিজয় চট্টোপাধ্যায়। "ছোটদের পড়ার ঘর" প্রকাশিত

বইখানি পেয়ে মনে আশা হয়েছিল যে, কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের স্বদেশী সঙ্গীত পড়তে পাব। কিন্তু খুলেই দেখলাম, পুরাতনেরই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা হয়েছে। "রামধুন" গানটিকে স্বদেশী সঙ্গীতরূপে স্থান দেওয়ার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারলাম না। "সখি কে বলে পিরীতি ভাল" এই গানটি যদি কোন নেতার অত্যন্ত প্রিয় বলে বিবেচিত হয়, তবে মুরারি বাবু তাকেও কি স্বদেশী সঙ্গীত বলে চালাবেন? "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" গানটির

অন্তচ্ছেদ কেন করা হল ? স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের গান কি সঙ্কলনে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নয় ? মহাত্মাজীর মৃত্যুতে লেখা শোকোচ্ছ্বাসও স্বদেশী সঙ্গীতের আওতায় পড়ে বলে জানা ছিল না। তাছাড়া গানগুলির অধিকাংশই বহু পূর্ব্বে কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘের "স্বদেশী গান" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং মনে হয়, বইটি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়েছে।

—দৈনিক বসুমতী

Obscure Religious Cults as Back Ground of Bengali Literature—By Sasibhusan Dass-gupta M.A., Ph.D., University of Calcutta.

বাংলা ভাষা সাহিত্যের যে ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, মূলতঃ ইহা কতকগুলি গুহ্য ধর্মমতের ও উহার নির্দেশের বর্ণনা অবলম্বন করিয়াই উদ্ভূত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই ধর্মমত সমূহ কি ভাবে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহাই গ্রন্থের বিষয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপাল হইতে আবিষ্কৃত "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থই বাংলা ভাষার আদি রচনা বলিয়া স্বীকৃত। গ্রন্থকার উহা হইতে বৌদ্ধ সহজিয়াতন্ত্রের মতবাদ উল্লেখ করিয়া সাধারণ ভাবে সহজিয়া মতবাদের তত্ত্ব ও আচারের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর "বাউল," মতবাদ "নাথ" মতবাদ ও "ধর্ম" মতবাদ পর পর আলোচিত হইয়াছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

স্বপ্ন সম্ভব—বনফুল প্রণীত, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা, দাম তিন টাকা।

বনফুলের রচনা বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। তাঁহার স্বপ্ন সম্ভব বইখানিও স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। ল্যাণ্ডর-এর ইমাজিনারী কন্‌ভারসেশন-এর ন্যায় এই স্বপ্নালোচনাও পাঠকবর্গকে শুধু তৃপ্তি দিবে না, আজিকার বহু সমস্যা সমাধানের সন্ধান দিবে।

—যুগান্তর।

The Gioconda Smile—By Aldous Huxley.
(Chatto and Windus, 5s.)

"It is remarkable" write the publishers, how time and a new treatment, have transformed the brilliant, rather malicious story in 'Mortal Coils' (1922) into a play which strikes down to the fundamentals of human behaviour." It is indeed so new in fact and treatment that little further grooming was required by the mature artistic minds of Hollywood before the play was converted into a suitable vehicle for the suave and mellifluous M. Charles Boyer, under the startlingly original title "A Woman's Love." Only reactionaries will deplore a fairly good story being streamlined into a fairly mediocre drama.

—The Statesman.

পাহাড়িয়া কাহিনী—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, এস, কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

আসামের আদিবাসী খাসিয়া, মিকির, গারো, লুসাই, কাছাড়ী প্রভৃতির লোক-সাহিত্যে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং উপভোগ্য বস্তু আছে,—সাতটি পাহাড়িয়া কাহিনীতে লেখক এই সন্ধান দিয়াছেন। এই রূপকথাগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, আদিবাসীর রূপকথা বলিয়া এগুলি উপেক্ষণীয় তো নয়ই, বরং নানা দিক্ দিয়া এই পুরানো কাহিনীগুলি পৃথিবীর সমৃদ্ধ সাহিত্যের রূপকথার পাশাপাশি স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

রেকর্ড-পরিচয়

১৫ই আগষ্ট এসে গিয়েছে···দীর্ঘ পরাধীনতার বাঁধন-মুক্ত ভারতবাসী মাত্রেরই কাছে এই দিনটি পবিত্রতম। গত বছরের এই ১৫ই আগষ্টের হর্ষোচ্ছল পুণ্য-স্মৃতি আজও সবার মানস-পটে উজ্জ্বলতম হয়ে রয়েছে। এই পবিত্র দিনটিকে পবিত্র আনন্দে যাপন করবার যে ব্যবস্থা করেছেন হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস, তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ এঁরা বাংলার কয়েক জন বিশিষ্ট শিল্পী দ্বারা ভারতের গণ-জাগরণ মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" (N 27893) রেকর্ডে পরিবেশন করেছেন এবং তারই অন্য পীঠে যন্ত্র-গীতের পরিবেশনে সকলকে নিখুঁত ভাবে গানটি গাইবার সুযোগ দান করেছেন। বিশ্বকবির "আমাদের যাত্রা হল সুরু" ও "শুভকর্মপথে" (N 27882) গান দু'খানি সত্য চৌধুরী-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিবেশনে মনোরম হয়েছে। সুকৃতি সেন ও সম্প্রদায় পরিবেশিত "গান্ধী-কথা" (N 27886-90) রেকর্ড নাটকে পূর্বাপর স্বাধীনতা-সংগ্রামের গাথা-চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। সুকৃতি সেনের "বন্দে মাতরম্—চক্রশোভিত ওড়ে নিশান" ও "নয়ই আগষ্ট" (N 27879) ১৫ই আগষ্টের উৎসবকে প্রাণের স্পন্দন দিতে পারবে। এ ছাড়াও মণ্টু আচার্য্যের "মহাভারতের মুক্তিতীর্থ" (N 27880), সত্য চৌধুরীর "বল—নাহি ভয়" (N 27881) স্বাধীনতার আগামী স্মরণোৎসবকে মুখরিত করবে।

জাতীয় সংগীত ছাড়াও "হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস" এবার দু'খানি রবীন্দ্র-গীতি "বাদল দিনের প্রথম কদম" ও "এসেছিলে তবু আস নাই" (N 27883) নবাগতা শিল্পী শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠে উপহার দিয়েছেন, আর চারখানি আধুনিক গান N 27884 এবং N 27885 রেকর্ডে প্রচার করেছেন।

শিল্পী শ্রীমতী সুধা মুখোপাধ্যায় নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর "প্রতিবাদ" বাণীচিত্রের দু'খানি রবীন্দ্র-গীতি P 11896 রেকর্ডে প্রকাশ করেছেন। এ মাসের প্রত্যেক গানখানি ভাব বৈশিষ্ট্যে ও মাধুর্য্যে সকলের চিত্তজয়ে সক্ষম হবে, এ কথা আমরা বেশ আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার করছি।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"ত্রিস্রোতা" বলেন :—"পশ্চিম-বঙ্গের সরকারী অফিস সেক্রেটারীয়েটভবন ক্রমশঃ মিল-এলাকার সামিল হইতে চলিয়াছে। বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধর্ম্মঘট, বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি প্রভৃতির ইহাই হইয়াছে প্রশস্ত স্থান। বৃটিশ আমলে এই স্থানে এরূপ কোন প্রকার অবস্থা কেহ কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে বলিয়া যাঁহারা হাহাকার করিয়া উঠেন তাঁহারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা চান না, চান বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া সেই অবস্থার সুযোগ লইতে। গত বৃহস্পতিবার সরকারী অফিস-ভবন সেক্রেটারীয়েটে এইরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল অবস্থা কঠোর ভাবে আয়ত্তে আনিতে না পারিলে সরকারী অফিস-ভবন জুট মিলে পরিণত হইতে দেরী হইবে না।" কোন মন্তব্য করিবার সাহস নাই। এক দিকে রাম, অন্য দিকে রাবণ! কেহ না কেহ মারিবেই!

* * * * *

'নির্ণয়ে' প্রকাশ :—"এক সংবাদে প্রকাশ যে, পুরুলিয়ায় কয়েক জন বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়ীতে ও কয়েকটি দোকানে বিহারী পুলিশ ব্যাপক খানাতল্লাস চালাইয়াছে। বিস্ফোরক পদার্থের জন্যই না কি এই তল্লাসী করা হয়। ইতিপূর্ব্বেই পুলিশ স্থানীয় বাঙ্গালীদের বন্দুক লইয়া গিয়াছে, পুনরায় বাঙ্গালীদের গৃহে এইরূপ খানাতল্লাসী হওয়ায় সহরে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

সংবাদটি অসম্পূর্ণ। কি কারণেই বা উল্লিখিত গৃহস্থদের গৃহে বিস্ফোরক পদার্থ থাকিতে পারে বলিয়া সরকারের সন্দেহ হইল, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। সরকার প্রদেশের স্বার্থে এই সকল তথ্য গোপন রাখিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, প্রথম দফায় বাঙ্গালী অধিবাসিগণের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লওয়া এবং দ্বিতীয় দফায় গৃহে গৃহে খানাতল্লাসী চালানোর মধ্যে, স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে বিহারের বাঙ্গলা ভাষাভাষী অঞ্চল সমূহকে পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার যে দাবী প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহাকেই রোধ করিবার এক সুদূরপ্রসারী অভিসন্ধি নাই কি? বিহার সরকার যাহা করিতেছেন তাহা ত প্রকাশ্যেই করিতেছেন; এই ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন এক বিবৃতি দিবেন কি?" বিবৃতি দিবেন কাহাদের জন্য? ইহার পরে আরো যে-সকল ব্যাপার বিহারে ঘটিতেছে, তাহাতে স্থানীয় বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীদের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার শ্রাদ্ধ করিবার মহতী পরিকল্পনা এবং আয়োজন ব্যাপক ভাবেই সুরু হইয়াছে।

* * * * *

'রাঢ়দীপিকা'র সাবধান বাণী :—"দেশে যেরূপ অবস্থা চলিতেছে, ক্ষমতা লাভের জন্য যেরূপ দলীয় কলহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে বড় বড় পুঁজিপতির দল দেশকে শোষণ করিবার জন্য এবং রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে রাখিবার জন্য একটি দল খাড়া করিবেন আশঙ্কা হয় এবং টাকার জোরে ভোট লইয়া পরে দেশবাসীকে কদলী প্রদর্শন করিবেন। এইরূপ হইলে দেশের দুরবস্থা আরও বাড়িবে তাহার জন্য সময় হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক। দেশের লোক ভোটের সময় চায় মোটর গাড়ী, মদের ইলাম, জলখাবার খরচা ইত্যাদি। মন্ত্রীদেরও ভোটের জন্য ঘুরিতে দেখি। বারোয়ারীর নামে সতরঞ্চি, হাসাকৃ আলোর দাম, না হয় কুয়ো, টিউবওয়েল ইত্যাদির জন্য নগদ আদায় যে দেশের লোক করিতে পারে, দেশের ছেলেকে বাদ দিয়া বিদেশীর পিছনে যাহারা ছুটিতে পারে, শিক্ষিতকে বাদ দিয়া অশিক্ষিতকে ভোট দিতে অনুরোধ করিতে যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কুণ্ঠিত হয় না; মানুষের পরিবর্ত্তে লাঠিকে ভোট দিয়া যাহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, ভোটের পর তাহারা প্রতিনিধিকে কটূক্তি করে আর দুর্নীতির চাপে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। ইহা কৃত অপকর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি। এত দিন দেশ যে ভুল করিয়াছে তাহার মাশুল এখন দিতে হইতেছে। ভবিষ্যতে যদি আমরা আবার ভুল করি তাহা হইলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। ভ্রান্ত প্রচার ও দলীয় চক্রান্তের প্রভাব হইতে অজ্ঞ দেশবাসীকে রক্ষা করার মত মানসিক দৃঢ়তা যদি আমাদের না থাকে তাহা হইলে আমরা বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিব। ডাইনীর কান্নায় বিভ্রান্ত হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য।" আগামী সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে 'রাঢ়দীপিকা'র সাবধান বাণী মনে রাখার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কয় জন মনে রাখিবে তাহা বলা শক্ত। নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের আপাত মিষ্ট এবং সাধু বাণীতে সকলেই একেবারে গদগদ হইয়া পড়েন। বার বার এই একই নাট্যের অভিনয় আমরা দেখিতেছি।

* * *

'প্রদীপে' প্রকাশ : "গত ১-৭-৪৮ তারিখে—সুতাহাটা থানার ১০নং ইউনিয়নের বিজয়রামচকনিবাসী শ্রীসুধাংশুশেখর সেন বেড়াইবার সময় একটি বিষধর সর্পকে আঘাত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। উক্ত ঘটনার চতুর্দ্দিবস পরে অর্থাৎ ৪-৭-৪৮ তারিখে রবিবার রাত্রি প্রায় ১টার সময় সুধাংশু বাবু যখন তাঁহার অট্টালিকার দ্বিতলে খাটের উপর নিদ্রা যাইতেছিলেন তখন তাঁহার শিশুপুত্র জলপান করিতে চাহিলে তাঁহার স্ত্রী টর্চ্চের আলোকে দেখিতে পান যে এক সর্প তাঁহার স্বামীর পায়ের নিকট মশারির ভিতরে প্রবেশ

করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তিনি অতি সন্তর্পণে স্বামীকে জাগাইয়া গৃহের বাহিরে আসিলে এক জন গ্রামবাসী চৌকী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সর্পটিকে মারিয়া ফেলে। সর্পটি কেউটে জাতীয় ও লম্বায় প্রায় ৪। হাত। সুধাংশু বাবু বলেন যে তিনি উক্ত সর্পটিকেই আঘাত করিয়াছিলেন।" সাপটিকে প্রায় মানুষ বলা চলে।

* * *

'আর্য্য' পাঠে জানিতে পারি :—"আসানসোলের সংবাদে প্রকাশ, আসানসোলের কন্‌ট্রোলের আটা-ময়দার দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড়ের দোকানে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা হটিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালী অফিসারগণ এদিকে না কি একেবারেই দৃষ্টি দেন না।" প্রায় কলিকাতা আর কি! এই ব্যাপার আর একটু বেশী হইলে বিহার সরকার আসানসোলকে বিহার-জেলা বলিয়া দাবী করিতে পারিবেন।

* * *

'আর্য্য' আরও একটি সংবাদ দিতেছেন :—"বর্দ্ধমান সহরের প্রায় সর্ব্বত্র বদমাইসের দল জুয়া খেলিতেছে। মেহেদিবাগান অঞ্চলে সব চেয়ে বেশী জুয়া খেলা হয়। পুলিশ কি জানেন, মেহেদিবাগানে জনৈক হিন্দুস্থানী উক্ত অঞ্চলের লোকদের জুয়া খেলিবার জন্য উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়া থাকে? সর্ব্বত্র ব্যাপক খানাতল্লাসী করিলে আসল ঘাঁটাগুলি আবিষ্কার হইবে।" কেবল মাত্র বদমাইসের দলই জুয়া খেলে না এবং জুয়া খেলিলেই বদমাইস হয় না। বদমাইস হইলেই জুয়া খেলে না। 'আর্য্যের' আপত্তি কোন্‌খানে? বদমাইসের জুয়া খেলাতে? স্বরাষ্ট্র-সচীব শ্রীকিরণশঙ্কর রায় নজর দিবেন।

* * * *

'বীরভূমবার্ত্তায়' প্রকাশ :—"জেলার যে-সমস্ত সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ধান্য ও চাউল-বে-আইনী ভাবে চালান বন্ধ করার কার্য্যে রত আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই, বিশেষতঃ পেট্রোল লীডারগণ বিদেশ হইতে আগত এবং স্থানীয় লোক নহেন। তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত সহযোগিতা করেন নাই, বরং অধিক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের কার্য্যে দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছে এবং কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ উহা দেখাইয়া দিলেও তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, প্রকিওরমেণ্ট বিভাগের কর্ম্মচারিগণও সময়োচিত সহযোগিতা করেন নাই। যে সকল ক্ষেত্রে অবিচার করা হইয়াছে তাহা কর্ম্মচারিগণের দৃষ্টিগোচর করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্য চালনা করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। সেই জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছে আগামী ১লা আগষ্ট হইতে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন স্বেচ্ছাসেবক দেওয়া হইবে না।" শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয়ের দপ্তরে পেশ করিতেছি।

* * * *

জানিবার এবং ভাবিবার কথা যে :—"এ দেশে এক হাজার প্রসূতির মধ্যে ২৪ জন প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; নবজাত শিশুদের মধ্যে প্রতি হাজারে ১৬২ জন অল্প দিনের মধ্যে প্রাণ হারায়। শিশুদের ভবিষ্যৎ গড় পরমায়ু ২৭ বৎসরের বেশী নহে। জগতের আর কোন স্থানে এমন শোচনীয় অবস্থা দেখা যায় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি হাজারে তিন জন প্রসূতির মৃত্যু হয়; হাজার জন শিশুর মধ্যে ৫৪ জন মারা যায়। সেখানকার লোকের গড় পরমায়ু ৬২ বৎসর। ভারতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ লোক বসন্ত রোগে মারা যায়। বৎসরে ২০ লক্ষ লোক এই রোগে প্রাণ হারায়। এদেশে প্রতি চারি জন লোকের মধ্যে এক জন এই রোগে আক্রান্ত হয়। প্রতিদিন ২২ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে এবং প্রতিদিন ২ হাজার ৭৪০ জন এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ভারতে প্রতি বৎসর যক্ষ্মা রোগে ৫ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হইতেছে। ২৫ লক্ষ রোগী হাসপাতালে ও চিকিৎসা-কেন্দ্রের বাহিরে থাকিয়া জনসাধারণের মধ্যে ঐ রোগ ছড়াইতেছে। ভারতে প্রতি বৎসর কলেরা রোগে ২ লক্ষ লোক এবং আমাশয় ও পেটের অসুখে ২২ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইতেছে। ভারতে ১০ লক্ষ কুষ্ঠ রোগী আছে। এই চিত্র সভ্য-জগৎকে বিস্মিত করিবে। ভারত এখন স্বাধীন! স্বাধীন ভারতের চিত্র কি হইবে—বিধাতাই জানেন।"—কোন্ বিধাতা? বর্ত্তমানের না ভবিষ্যতের?

* * * *

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে শস্য বপন :—১। আমন ধান (রোয়া)—এঁটেল দো-আঁশ ও এঁটেল মাটিতে জন্মে, আষাঢ়-ভাদ্র মাসে ৯ ইঞ্চি × ৯ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়; অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ১০।১৫ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ২০।৩০ মণ ফলন হয়। ২। মাষকলাই—বেলে দো-আঁশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি হইতে মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ১২।১৫ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৪।৬ মণ ফলন হয়; পশুখাদ্যরূপেও ইহা বপন করা যায়। ৩। মুগ—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু হাল্কা জমিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; পৌষ মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ৮।১০ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ৮।১০ মণ ফলন হয়। ৪। বিরি কলাই—বেলে দো-আঁশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি হইতে মাঘ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ১২।১৫ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ৫।৮ মণ ফলন হয়। ৫। মিষ্টি আলু বা রাঙ্গা আলু—বেলে দো-আঁশ মাটিতে জন্মে; ৩ ফিট অন্তর "কাটিং" লাগাইতে হয়; মাঘ মাসের মাঝামাঝি হইতে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ফসল তুলিতে হয়; প্রতি একরে ৩।৪ হাজার "কাটিং" লাগে; একর প্রতি ১০০।১৫০ মণ ফলন হয়। ৬। শাক পালম—দো-আঁশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; ২ মাস পরে শাক হয়। ৭। মৌরী—দো-আঁশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; ফাল্গুন মাসে ফলন হয়; একর প্রতি ৪।৬ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ৪।৬ মণ ফলন হয়। ৮। পান—এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে জন্মে; ৩ ফিট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফিট অন্তর "কাটিং" বসাইতে হয়; আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পান-পাতা ব্যবহারের উপযোগী হয়; একর প্রতি ৩ হাজার "কাটিং" লাগে; একর প্রতি ৬০।৭০ কাহন পান হয়। ৯। তামাক—উঁচু বেলে দো-আঁশ মাটিতে জন্মে; ২-৩ ফিট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়; ফাল্গুন মাসে ফলন হয়; একর প্রতি ৩।৪ তোলা বীজ লাগে; জাতি হিসাবে একর প্রতি ৮।১২ মণ (শুকনা পাতা) ফলন হয়।—'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রিকা।

দেহের খাদ্য ও ক্ষুধা

শ্রীমনতোষ রায়

কেবল ব্যায়াম করে শরীর রক্ষা করা যায় না, সেই সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যেরও প্রয়োজন।

উনুনে কয়লা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই আগুন থাকে এবং উনুনে যেমন ভাবে তাপের সৃষ্টি হয় আমাদের শরীরেও সেই ভাবে কয়লারূপ খাদ্যের দ্বারা আগুন ও তাপের সৃষ্টি হচ্ছে। যখনই সেই তাপ কমে আসে, তখনই পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে সেই তাপকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। একটা কথা মনে রাখবেন—খাদ্য থেকে যে প্রকৃষ্ট তাপের সৃষ্টি হয়, তার মূলে থাকবে "দৈহিক ব্যায়াম" নয়তো যে তাপের উদ্ভব হবে তা আপনার দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবার পক্ষে যথেষ্ট হবে না।

আমাদের শরীরে সর্ব্বদাই রাসায়নিক ক্রিয়া হচ্ছে। আমরা কম-বেশী যাই খাই না কেন, সব কিছুর মধ্যেই অঙ্গারাম্লজান (Carbon) থাকে। সেই কারবনের সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরের যে অম্লজান (Oxygen) থাকে, তার সঙ্গে একত্র হয়ে 'দ্বি অক্সিদ্ কার্ব্বন' তৈরী হয়। এ-সব রাসায়নিক সংযোগের ফলেই দেহে তাপের সৃষ্টি হয়।

এই যে তাপের উদ্ভব এবং রাসায়নিক ক্রিয়াকে অক্সিজেন সাহায্য করে সেই অক্সিজেন দেহে পূরো মাত্রায় পেতে হলেই দরকার—যার যতটুকু প্রয়োজন প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করা। তবেই দেহে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি হবে এবং শক্তিসম্পন্ন রক্ত দেহের শিরা-উপশিরায় আন্দোলন করে দেহের পুষ্টি সাধন করবে।

খাদ্যের মধ্যে ঐ সব রাসায়নিক ক্রিয়া ছাড়াও আর একটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে—তাকে বলে 'হাইড্রোজেন'। নিশ্বাসের সময় আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, তার সঙ্গে ঐ আর্দ্রজান (Hydrogen) মিশে জলের সৃষ্টি হয়। সেই জলে অত্যধিক তাপ হলেই তাপযন্ত্রকে সাধারণ অবস্থায় আনতে সাহায্য করে।

খাদ্যের দ্বিতীয় কারণ হোলো—আমরা মানুষ, আমাদের কাজ করে খেতে হবে। সেই কর্ম্মশক্তিকে প্রখর করে খাদ্য। দেহের ক্ষয় অনেক পরিশ্রমেও হয়, কমেও হয়, আবার ঘুমোলেও হয়। কাজেই প্রত্যহ উপযুক্ত সময়ে সুখাদ্য খেয়ে দেহে রস, রক্ত, মাংস গড়তে হয় এবং তাতে শরীর বৃদ্ধি হয়। দেহের পুষ্টির জন্য ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস্, পটাসিয়াম, সালফার, সোডিয়াম্, আইওডিন, আয়রণ প্রভৃতির নেহাৎ প্রয়োজন। শরীরের যে অংশ যে উপাদানে গড়া, সেই অংশের উৎকর্ষতালাভ ও ক্ষয়পূরণের জন্য খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে ঠিক সেই সব উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে আমাদের শরীরে যাওয়া দরকার।

আমিষ, স্নেহ, শর্করা, লবণ এবং জল এই পঞ্চ জাতির পদার্থ প্রত্যহই পেতে হবে। নয়তো দেহ পুষ্টিসাধনে ব্যাঘাত ঘটবে।

শরীর মজবুত রাখতে উল্লিখিত সব পদার্থই উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়া দরকার। তবে লোক-বিশেষে খাদ্যের মাত্রা কম-বেশী করতে হয়। সাধারণতঃ বয়স, অবস্থা আর উপজীবিকা ভেদে খাওয়ার পরিমাণে পার্থক্য হয়। যেমন ধরুন, ছোট ছেলেদের যেটুকু খাদ্যে তাদের শরীর ভাল হতে পারে, বয়স্কদের তাতে হতে পারে না। এক জন কেরাণী বাবুর যেটুকু খাদ্যে শরীর ভাল হতে পারে, একটি মজুরের সেই খাদ্যের দ্বারা দেহের পূরণ সাধিত হতে পারে না। কারণ, যে যত বেশী মানসিক এবং দৈহিক পরিশ্রম করেন, তার তত বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

এক জন ব্যায়ামকারীর বিভিন্ন বয়সে দৈনিক কি কি এবং কতটুকু পরিমাণ খাওয়া দরকার এবারে তা বলছি।

খাদ্য	বয়স পনের	পঁচিশ	বয়স পঁচিশ	পঁয়ত্রিশ
	পরিমাণ		পরিমাণ	
	ছটাক	ছটাক	ছটাক	ছটাক
আমিষ	পৌনে দুই	দুই	দুই	আড়াই
তৈল বা স্নেহ	দেড়	দুই	সওয়া দুই	আড়াই
শর্করা	আট	সাড়ে আট	পৌনে নয়	সওয়া নয়
লবণ	সিকি	আধ	আধ	এক
জল	সাড়ে তিন	সাড়ে চার	পাঁচ	সাড়ে ছয়

এই তো হোলো খাদ্যের উপাদান কতটুকু পাওয়া দরকার। এখন জানতে হবে, দৈনিক কি কি খাদ্যের ভেতর উল্লিখিত উপাদানগুলি পেতে পারি এবং তা কতটুকু পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজন।

খাদ্য	বয়স পনের	পঁচিশ	বয়স পঁচিশ	পঁয়ত্রিশ
	পরিমাণ		পরিমাণ	
চাউল (ঢেঁকি ছাঁটা)	/৵০	/৷০	/৷০	/৷/০
আটা (যাঁতা ভাঙ্গা)	/৶০	/৷/০	/৷৵০	/৷৶০
ডাল (খেসারী বাদে)	/৷০	/৵০	/৶০	/৶০
মাছ	/৵০	/৵১০	/৵১০	/৵১০
মাংস	/৷০	/৷৵০	/৷৵০	/৷০
তরকারী (মূলা ও ক্ষেত কুমড়া বাদে)	/৷৵০	/৷০	/৷০	/৷০
দুধ (গাভী)	/৷০	/১	/১	/৷০
লবণ	ৎ১০	ৎ১৭	ৎ৫	ৎ১০
তৈল তোলা হিসাবে—	২	২৷০	২৷০	১৷০
ঘি ও মাখন "	২৷০	৩৷০	৩৷০	২
ছানা	/০	/৵০	/৵০	/০
চিনি তোলা হিসাবে—	২৷০	৩	৩	২

এবারে বোলবো, আমাদের এই পঞ্চ-জাতীয় উপাদান কোন্ কোন্ খাদ্যের অন্তর্গত।

১। আমিষ খাদ্যের—(Protin) মাছ, মাংস, ছানা, ডাল, ডিমের সাদা অংশ, দুধ, চাল, আটা, ময়দা, সুজি, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদিতে পাওয়া যায়—অভাবে দেহ পুষ্ট হয় না।

২। তৈল বা স্নেহ জাতীয় খাদ্যের—(Fat) মাছ, মাছের তেল, মাংসের চর্ব্বি, ঘি, মাখন, তেল—অভাবে স্নায়ুর পুষ্টি সাধন হয় না এবং শিশুদের রিকেট ব্যাধি হয়।

৩। শর্করা জাতীয় খাদ্যের—(Carbo-hydrate) চাল, গম, আলু, এরারুট, চিনি, গুড় ইত্যাদি—অভাবে পরিপাকে গোলমাল হয়ে থাকে। বিশেষ করে তৈল জাতীয় খাদ্যকে পরিপাকে দ্রুত সাহায্য করে।

৪। লবণ জাতীয় খাদ্যের—(Salt) শাক-শব্জী, ফলমূলের মধ্যে ফস্‌ফেট অব লাইম, পটাস (Potash), সোডা, সালফার ইত্যাদি—অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। বিশেষ উপকারের দিক বলা যেতে

পারে—হাড় মোটা, রক্ত পরিষ্কার এবং পরিপাকে সহায়তা করে। তাই খাওয়ার পর নুণ খেয়ে জলপান করার প্রথা আছে।

৫। জল জাতীয় খাদ্যের—(Water) সব খাদ্যেই কম বেশী জল পাওয়া যায়—অভাবে রক্ত গাঢ় হয়ে যায়, হজম-ক্রিয়া সুষ্ঠুরূপে হতে পারে না, মাংসপেশী ও স্নায়ুমণ্ডলী তেজোহীন হয়ে পড়ে।

ক্ষুধা পায়—খাই, তবু কেন রোগ হয়। কেন হবে না? আসল ক্ষুধা কি, আমরা তা জানি না। একদিন সকালে কিছু না খেয়ে দুপুর পর্য্যন্ত পরিশ্রমের কাজ করে আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর যে ক্ষিধে পায় তাকেই আসল ক্ষুধা বলে। তা তো কর্ম্ম-জীবনে সম্ভব নয়। কারণ সকালে একেবারে কিছু না খেলে দেহে পিত্তাধিক্য হতে পারে। সকালে খাবার স্বরূপ ঘি দিয়ে ফেনা-ভাত বা খই, মুড়ি, চিড়ে ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। তাহলে দুপুরে ক্ষুধা মরবে না। আর আমরা খাব যা হজম হবে তার চেয়ে বেশী। খাবার ইচ্ছা হলেই ভাবি ক্ষিধে পেয়েছে এবং তাই খাই। ক্ষুধা আত্মরক্ষার সময়েই জাগে। পাকস্থলীতে যতক্ষণ কোন খাদ্য থাকে, ততক্ষণ আসল ক্ষিদে পায় না, আর আসল ক্ষিদের আর একটি লক্ষণ হোলো পাকস্থলীর গায়ে যে মাংসপেশীগুলো থাকে, এমন কি অন্ত্র পর্য্যন্ত সে সবগুলিকে মোচড় মেরে অর্থাৎ যেন নাড়ী ছিঁড়ে যাবার মতো সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। সেই সময়ে পাকস্থলীকে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। নয় তো পিত্ত-রস আর অন্ত্ররস এবং পেট ও বুকের মাঝখানের প্যাংক্রিয়াসের রস অনাবশ্যক ভাবে সর্ব্বক্ষণ ঝরতে থাকে। তখন পাকস্থলীর একটুও রস ঝরতে পারে না বলেই ক্ষুধামন্দা, লিভার খারাপ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ইত্যাদি হয়ে শরীর খারাপ হতে থাকে। এর ফলে কতগুলি উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হয়। যথা—মাথা-ধরা, মাথা-ঘোরা, গা-বমি, কাজ-কর্ম্মে নৈরাশ্যতা, শৈথিল্যতা ইত্যাদি আসে। মনে হয়, যেন শুয়ে বা ঘুমিয়ে থাকলে ভাল লাগতো। এতে দেহের অন্যান্য ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস পেয়ে যায়। শরীরকে এই অবস্থায় পরিণত করানো সঙ্গত নয়।

শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাওয়া উচিত। যেমন ধরুন—সকাল ৬।৭টায়, ১০টায় (কলেজ, স্কুল অথবা অফিসে যাঁরা যান), নয় তো ১২টায়, আড়াইটায় টিফিন, সাড়ে পাঁচটায় জলযোগ, রাত ৯টায় আহার, দশটা সাড়ে দশটায় ঘুম, ভোর সাড়ে পাঁচটা ছয়টায় নিদ্রাভঙ্গ। তবেই শরীর-মন সুস্থ ও সবল হবে।

ব্যায়াম যাঁরা করবেন বা করছেন, তাঁরা কখন এবং কি কি খাদ্য খেতে পারেন, তার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

১। প্রাতে সাড়ে ছয়টা ৭টায় (ব্যায়ামের পূর্ব্বে) সামর্থ্যবান:—এক দিন ছোলা, কাঁচা মুগ, কাঁচা চিনাবাদাম ভিজান আদা দিয়ে পরিমাণ মত। অন্য দিন সিদ্ধ করে। তাছাড়া দেহের অবস্থাভেদে কাঁচা বা পাকা বেল, পাকা পেঁপে ইত্যাদি। সকালে যাঁরা ব্যায়াম করবেন না, তাঁরা ফেনা-ভাত ঘি দিয়ে খাবেন। সামর্থ্যবান:—ফল, পাঁউরুটি, মধু, মাখন এবং ডিম।

২। প্রাতে অথবা সন্ধ্যার পরে ব্যায়ামের পর (সাড়ে ৭টা, ৮টায়) অসামর্থ্যবান:—চিনি, মিছরি বা আখের গুড় পাতিলেবুর রস দিয়ে সরবৎ পান বা ঘোলের সরবৎ। সামর্থ্যবান:—পেস্তা, বাদাম, আখরোট মিহি করে বেটে দুধ বা দই রুচিভেদে নুণ বা চিনি মিশিয়ে পান করবেন।

৩। ১০টায় (কলেজ, স্কুল বা অফিসে যাঁরা যান) অসামর্থ্যবান:—ভাত, পালং শাক, করলা ভাজা। ডাল এবং তরকারী বেশী পরিমাণে। যে কোন সব্জী সিদ্ধ, মাছের তরকারী, টমেটো বা চালতের চাটনী। সর্বশেষে ২।৪টি বাতাসা, চিনি বা গুড় খেয়ে জলপান করবেন। সামর্থ্যবান:—দু'-একটি আপেল, নেসপাতি, লেবু খাওয়ার পর ভাত, পালং শাক ভাজা, ঢেড়স ভাজা, অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম, টমেটোর সস্ (sauce) দিয়ে। মাছ বা মাছের ডিমের তরকারী। আলু, কপি, গাজর, পটলের তরকারী। দই, পাঁপড়। সর্বশেষে দুই-একটি রসগোল্লা বা সন্দেশ।

৪। বেলা ২।টায় টিফিনে অসামর্থ্যবান:—মুড়ি, নারকেল, ছোলা, কড়াইশুঁটি সিদ্ধ, আদা ও লেবুর রস গোল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে। রুচিভেদে সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ এবং শশা দিতে পারেন। সামর্থ্যবান:—পোরিজ, লুচি, ফল। কোন কোন দিন আমলেট, টোষ্ট, হরলিক্স বা পানিয়ান। ভেজিটেবল, সেণ্ডুইচ। কোন দিন পাউরুটি ও মাংসের সুপ অর্থাৎ ষ্টু ইত্যাদি।

৫। বেলা ৫টা-৫।টায় বাড়ী ফিরে অসামর্থ্যবান:—যদি ব্যায়াম করেন—ভেজিটেবল সুপ। নয় তো, রুটি, তরকারী। দুধ-সাবু। দুধ-চিড়া। দই-চিড়া-খই। চালের পিঠা। মোহনভোগ ইত্যাদি। সামর্থ্যবান:—হরলিক্স বা দুধ। খেজুর, ডিমের বা মাংসের স্যাণ্ডউইচ যে কোন ফলের সস্ বা মোরব্বা দিয়ে। ভেজিটেবল সুপের সঙ্গে ডিম বা মাংসের কিমাম দিয়ে তৈরী করবেন। দুধ বা হরলিকসের বদলে দইয়ের ঘোল, দুধ বা ক্ষীর দিয়ে হালুয়া।

৬। রাত্রি ৮।টা-৯টায় অসামর্থ্যবান:—রুটি বা পরোটা, আলু-পিঁয়াজ ভাজা, ছোলা বা মটরের ঘন এবং সুসিদ্ধ ডাল। আলু, পটল, কপি, কাঁচকলা ইত্যাদির তরকারী, চাটনী, অল্প মাংস বা মাছ পরে দুধ (যে দিন মাংস খাবেন সে দিন শোবার সময় দুধ পান করতে পারেন)। নয় তো দেহের অবস্থা বুঝে এক গ্লাস গরম বা ঠাণ্ডা জল পান করবেন। সামর্থ্যবান:—লুচি, আলু-পেঁয়াজ ভাজা, বরবটি, গাজর, বীট, আলু-কপির তরকারী বা ডিমের তরকারী বা মাংসের সুরুয়া, ঘন ডাল। আনারস, আদা বা কিস্‌মিসের চাটনী; পাঁপড়; সন্দেশ। শোবার সময় পরিমাণ মত দুধ, হরলিক্স মিশিয়ে। মাংস খাওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যে যেন দুধ পান করবেন না, নয় তো গুরুপাক হয়ে বদ-হজম হয়ে যাবে।

"জীবনে আমি বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত গ্রন্থে অভিনয় করেছি। আমার অভিনয়ের উদ্দেশ্যের পেছনে আছে আমার দেশ ও জাতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি। সমাজের উঁচুতলায় যাদের বাস, তাদের জন্য চিন্তিত নই, দৃষ্টি আমার সমাজের নীচের মানুষদের দিকেই নিবদ্ধ—যারা জীবন্মৃত অবস্থায় রয়েছে।"

—গ্যারী কুপার

রঙ্গালয়

রবীন্দ্রনাথের বিপুল ও বিচিত্র প্রতিভার সমগ্রতা দেখাবার শক্তি আমার নেই। পৃথিবীর আর কোন শিল্পীই এত বিভিন্ন দিক্ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারেননি। আজ কেবল দেখাতে চাই নাট্যকলার ক্ষেত্রেও তিনি আমাদের কতখানি ঐশ্বর্য্য দান করে গিয়েছেন।

তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ নাট্যকলার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। তিনি কেবল "বাল্মীকি-প্রতিভা" রচনাই করেননি, অভিনয়ও করেছেন বাল্মীকির ভূমিকায়। প্রথম থেকে শেষ জীবন পর্য্যন্ত কোন কালেই তাঁর প্রবল নাট্যানুরাগ এতটুকু দুর্ব্বলতা জাহির করেনি, বরং দিনে দিনে অধিকতর বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

এই বিকাশের ধারাও যথেষ্ট বিচিত্র। পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়, অধিকাংশ নাট্যকারই প্রথম জীবনে যে নাটক রচনা করেছেন, তাকে যুগোপযোগী নূতন রূপ দেবার জন্য কোনই আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এখানকার সাধারণ নাট্য-জগতের গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতির সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। অসাধারণ প্রতিভা কখনো অতীতকে নিয়ে তুষ্ট থাকতে পারে না। সে কাল যা গড়েছে, আজ তা ভাঙে। এবং সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যেও গঠন করতে পারে নব নব সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ রূপ। প্রতিভা যে-দিন অতীতকে—এমন কি বর্ত্তমানকেও নিয়ে তুষ্ট হয়, নিজের সৃষ্টিকে যে-মুহূর্ত্তে চরম বলে স্বীকার করে নেয়, তখনি বুঝতে হবে যে, তার কাছ থেকে আর নূতন-কিছু পাওয়া হয়তো সম্ভবপর হবে না।

রবীন্দ্রনাথ বারংবার রচনা করেছেন পুরাতনের মধ্যে নূতনত্বের নীড়। প্রথম বয়সে লেখা "রাজর্ষি" উপন্যাস থেকে পরে "বিসর্জ্জনে"র জন্ম এবং "বৌঠাকুরাণীর হাট" থেকে আগে আত্মপ্রকাশ করে "প্রায়শ্চিত্ত" এবং তার পর "পরিত্রাণ"। আগেকার "রাজা ও রাণী" পরে হয়েছিল "ভৈরবের বলি" এবং তার পর ওর ভিতর থেকেই জন্ম গ্রহণ করলে "তপতী"। কিন্তু তখনও রবীন্দ্রনাথ খুশী নন। শিশিরকুমার যখন "তপতী"কে মঞ্চস্থ করতে চাইলেন, তখন তিনি আবার নূতন করে "তপতী"র সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। "রাজা ও রাণী" ছিল অনেকটা গত যুগের মেলো-ড্রামার মত। কিন্তু "তপতী" হয়েছে আধুনিক যুগের মনস্তত্ত্বপ্রধান আসল ড্রামা। তার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন পাত্র-পাত্রীরও অভাব নেই, যেমন নরেশ, ভার্গব, রত্নেশ্বর, বলভদ্র ও বিপাশা প্রভৃতি। "রাজা ও রাণী" কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির যে সঙ্ঘর্ষ আজ পৃথিবীর দেশে দেশে দেখা দিয়েছে, "তপতী"র মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা উজ্জ্বল ভাবে ও ভাষায়। এবং

প্রসাদ রায়

ষ্টেফান জুইগের বিখ্যাত গ্রন্থ 'অজানা মেয়ের চিঠি'র কয়েকটি দৃশ্য। লেখক ও অজানা প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন লুই জোর্ডান ও জোয়ান ফনটেইন।

এই দর্পিত রাজশক্তি ও ক্লিষ্ট প্রজাশক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন করুণাময় নারীত্বের প্রতিমূর্ত্তি—রাণী সুমিত্রা।

সাধারণ রঙ্গালয়ে "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র নাটকীয় রূপান্তর দেখেছি "বসন্ত রায়" পালায়। তার মধ্যে আছে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্য-রীতি—এ দেশের নাট্যকারগণ আজও যার অনেকটাই বর্জ্জন করতে পারেননি। "বসন্ত রায়ে"র প্রথম অভিনয় হয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু পালাটি জনসাধারণের এমন মনে ধরে যে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তা আবার নূতন ভাবে রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করত প্রতাপ, বসন্ত রায়, উদয়, সুরমা ও বিভা প্রভৃতি পাত্র-পাত্রীরা।

ঐ একই কাহিনীর সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ যখন রচনা করলেন "পরিত্রাণ", তখন কিন্তু উপরোক্ত পাত্র-পাত্রীদের বিশেষ প্রাধান্য আর রইল না। এর মধ্যে প্রধান হয়ে উঠল ধনঞ্জয় বৈরাগী—আসলে যা হচ্ছে একটি মহৎ 'আইডিয়া'র মূর্ত্তি। ইংরেজ শাসনে জর্জ্জরিত ভারতের জাতীয় জীবনের ছায়া পড়েছে ঐ ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপরে। তার গান ও কথা গদ্যে-পদ্যে ভাবের ধারা; তার প্রত্যেকটি উক্তি গভীর অর্থে পরিপূর্ণ। সাধারণ রঙ্গালয়ে "বসন্ত রায়" জমেছিল, "রাজা ও রাণী" জমেছিল, কিন্তু একেবারেই জমেনি "পরিত্রাণ" ও "তপতী"।

এর একটা কারণ শুনেছি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে। তিনি আমায় বলেছিলেন, "প্রকাণ্ড রঙ্গালয়ের যে কোন নামজাদা গায়ক-নটও ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে প্রহারের দ্বারা ধনঞ্জয়কে বিদায় করবার জন্যেই মনটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠবে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপযোগী কোন নট এখন নামজাদাদের ভিতরেও খুঁজলে পাওয়া যাবে না।"

কিন্তু কারণ ঐ একটাই নয়।

আমি আর তুমি

'নদীর শেষে' নামে একটি ইংরেজী ছবিতে ভারতীয় অভিনেতা সাবু। নায়িকার নাম বিবি ফেন্‌রিয়া, জাতিতে ইংরেজ। পরস্পরে এক সুখী প্রেমিক দম্পতির অভিনয় করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আগে রচনা করতেন ঘটনা-প্রধান নাটক, তাই তাঁর "রাজা ও রাণী" সাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরের জীবনে রচিত "ডাকঘর", "রাজা", "গৃহপ্রবেশ", "রক্তকরবী", "পরিত্রাণ" ও "তপতী" প্রভৃতি নাটকে আছে বাইরের ঘটনার পরিবর্ত্তে মানসিক ভাবের প্রাধান্য। রুশ-নাট্যকার লিওনিড আন্দ্রীভ যে 'প্যান্-সাইকি' বা আত্মাশ্রয়ী নাটকের কথা বলেছেন, ও-নাটকগুলি গিয়েছে অনেকটা তারই কাছাকাছি। ওগুলির মধ্যে বাইরের ঘটনা নয়, বিশেষ করে পাওয়া যায় মনের ভিতরকার ক্রিয়া। শেষ বয়সে গিরিশচন্দ্রেরও ইচ্ছা হয়েছিল এই শ্রেণীর নাটক রচনা করতে। তিনি বলেছিলেন: "দেখ, শঙ্করাচার্য্য লিখে আমার নূতন ভাবে নাটক লেখবার ইচ্ছা হয়েছে। * * * শুধু internal facts আর internal struggle. দেখ যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য

বুদ্ধ, শঙ্কর, কুমারিল ভট্টের জীবনের বাইরে dramatic events কিছুই নেই বললে চলে। কিন্তু এঁদের ভিতরের জীবন full of dramatic actions. এই যে ভিতরের দ্বন্দ্ব internal dramatic actions—যা সামান্য স্থূল ভাবে বাইরে প্রকাশ পায়, সেই internal actions এঁকে দেখানোই best literary art. * * * আমি ঠিক express করতে পারছি কি না জানি না। এখন দেখানো হয় বাইরের ঘটনাকে prominent করে মনের বিশ্লেষণ। তা নয়। actions through mind—actions in internal life—actions—intense actions in deep meditation." দুর্ভাগ্যক্রমে গিরিশচন্দ্রকে এ ইচ্ছা পূর্ণ করতে দেয়নি।

গিরিশচন্দ্র তখনও জানতেন না যে, রুশ-নাট্যকার লিওনিড আন্দ্রীভের মনের মধ্যেও ঠিক ঐ একই প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে: "Is action, in the accepted sense of movements and visible achievements on the stage, necessary to the theatre?" এ প্রশ্নের উত্তর তিনিও খুঁজে পেয়েছিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের মত তিনিও একই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বিশেষ ভাবে কেবল মানসিক ক্রিয়ার প্রাধান্য নয়, রুশিয়ার লিওনিড আন্দ্রীভ ও বেলজিয়মের মরিস মেটারলিঙ্কের মত আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাঁর আধুনিক নাটকাবলীতে যথেষ্ট ভাবে Symbol বা প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এই জন্যে ঐ তিন জন নাট্যকারই স্বাধীন ভাবে রচনা করলেও তাঁদের নাটকগুলির ভিতরে বিশেষ একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথই আমাদের নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে এনেছেন যুগধর্ম্মের উপযোগী আধুনিকতা। কিন্তু এদেশের জনসাধারণের মন আজও অতীতের অচলায়তনের বাইরে আসতে রাজী নয়। 'Internal' বা 'Internal action' বা 'Symbol' প্রভৃতি তাদের ধারণায় আসে না। অবশ্য এর কারণ যে যথোচিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য-রসবোধের অভাব, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ যখন মাঝে-মাঝে বাছা লোকের জন্যে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করতেন তখন কোন দিন আগ্রহান্বিত দর্শকের অভাব অনুভব করিনি। প্রেক্ষাগৃহ একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যেত এবং দর্শকরা কাঞ্চনমূল্য দিয়েই আসনে অধিষ্ঠিত হবার অধিকার লাভ করতেন।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকার উপযোগী নট নেই। সত্য কথা। কিন্তু "পরিত্রাণ" নাটকের ব্যর্থতার কারণ কেবল তাই নয়। আমার বিশ্বাস, ও-রকম নট খুঁজে পাওয়া গেলেও সাধারণ রঙ্গালয়ে "পরিত্রাণ" জমত না। ষ্টারে "গৃহপ্রবেশ" এবং নাট্যমন্দিরে "তপতী" যখন খোলা হয় তখন অভিনয় হয়েছিল সত্য সত্যই উচ্চশ্রেণীর। কিন্তু তবু ঐ দুইখানি নাটক এখানকার সাধারণ দর্শকদের মধ্যে কিছুমাত্র আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। অরসিকের কাছে রস নিবেদন করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ষ্টার সম্প্রদায় কোন ক্রমে ধাক্কা সামলে নিলে বটে, কিন্তু একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল নাট্যমন্দিরের দ্বার।

উচ্চশ্রেণীর আধুনিক নাটক গ্রহণ করেন না বলে প্রায়ই

"আমি রাত্রি দেখলাম......তার চোখের মত যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন।... আমি প্রভাতের আস্বাদ পেলাম......তার বাহুর মতই কমনীয়।... প্রিয়তমের হাতের মধ্যে দেখলাম সমগ্র পৃথিবী......ও...আমার নিজের জীবনাবশেষ।"—অ্যানা ক্যারানিনা

● টলষ্টয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ অ্যানা ক্যারানিনার নায়িকা অ্যানার ভূমিকায় ভিভিয়ান লে। এলিজাবেতীয় যুগের সাজ-সরঞ্জাম ও অলঙ্কার আধুনিক যুগেও ব্যবহার করেছেন ভিভিয়ান লে। বাঙলা দেশেও ফিরে এসেছে ঠাকুরমা, দিদিমাদের রুচি আর সেই পুরাকালের অলঙ্কার-শিল্প।

রঙ্গালয়ের মালিকদের দোষ দেওয়া হয়। কিন্তু এ জন্যে আসলে দায়ী কারা? রঙ্গালয়ের মালিকরা, না সাধারণ দর্শকরা? আমাদের রঙ্গালয়ের উন্নতি নির্ভর করছে, প্রধানত বাইরের প্রভাবের উপরেই। জনসাধারণ যত দিন না উচিত মত শিক্ষিত ও সংস্কৃতির অধিকারী হবে, তত দিন আমাদের নাট্য-জগতে আসবে না যুগোপযোগী আধুনিকতা।

এই সাধারণ নাট্য-জগতের বাইরে থেকেও রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরেই জনসাধারণের মন তৈরি করবার জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা করে গিয়েছেন। বারে বারে কত বার তিনি যে নিজের নাটক নিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখা দিয়েছেন, তার আর সংখ্যা হয় না। নাট্যকাররূপে আধুনিক নাটক উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হননি, নট-রূপে নিজেই নিজের সৃষ্ট চরিত্র বিশ্লেষণের এবং নাটকের মূল সুরটিও ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। "ফাল্গুনী" থেকে তিনি যতগুলি নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছিলেন আমি তার অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এ সুযোগে বঞ্চিত হলে জীবনে একটা মনস্তাপ থেকে যেত, কারণ তাহলে জানতে পারতুম না যে অভিনেতারূপেও তিনি ছিলেন কতখানি অসাধারণ!

তাঁর অভিনয় ছিল আবৃত্তিপ্রধান, তার মধ্যে আঙ্গিক চাঞ্চল্য বেশী থাকত না। কিন্তু তিনি যেটুকু অঙ্গভঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করতেন তা হত অত্যন্ত ভাবদ্যোতক। তাঁর আবৃত্তির কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে গদ্যরূপেও যা বেরিয়ে আসত, সঙ্গীতের অনুরণন ছাড়া তা আর কিছু নয়। অনেকে অভিনয়ে সুর পছন্দ করেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুনলেই বুঝতে পারতুম, লাগসৈ সুর কতটা অর্থবোধক। সুরপ্রধান হয়েও তাঁর আবৃত্তি কাণে বাজত না কেন? কারণ তাঁর সুর করত না কথার অর্থকে অস্বীকার। তাই অনেক স্থলে তাঁর আবৃত্তি সঙ্গীতের মতন শুনতে হলেও আমরা তন্ময় হয়ে বিচরণ করতুম ভাবের স্বপ্নলোকে। আর্টের মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য বা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধই হচ্ছে প্রধান কথা। এমন কি আমি একটা বিশেষ সুরেও কথাবার্ত্তা কইতে পারি অনায়াসেই, যদি তা অর্থবিরোধী না হয় এবং যদি তার আগাগোড়ায় থাকে সঙ্গতির ছন্দ। বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনেতাদের মধ্যে কেবল মাত্র শিশিরকুমারের আবৃত্তির মধ্যে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বিশেষত্ব।

এই সব নাট্যাভিনয়ে দেশীয় মঞ্চশিল্পের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট আধুনিকতা এবং সুরুচিসঙ্গত ও কলাসম্মত অভিনব শ্রী প্রকাশের জন্যে অল্প চেষ্টা করেননি। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে বহু-ব্যবহৃত সেকেলে দৃশ্যপট ও চলতি একঘেয়ে মঞ্চ-সজ্জার সঙ্গে এই সব নাট্যাভিনয়ের কোন সম্পর্কই ছিল না। এখানে যা-কিছু ব্যবহৃত হত সমস্তরই উপরে থাকত উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর পরিণত সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রভাব।

নাট্য-সাহিত্য, নট-চর্য্যা এবং মঞ্চ-শিল্পের দিক্ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ও পরিকল্পনা যে-সব যুগোপযোগী বিশেষত্বের সন্ধান দিয়েছে, তার অতুলনীয়তা ও অভিনবত্বের কথা চিন্তা করলে মনে বারংবার এই প্রশ্নই জাগে যে, তাঁর প্রগাঢ় রসানুভূতির ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ হারিয়ে আমাদের যে বিপুল ক্ষতি হল, তা যথাযথ ভাবে পূরণ হতে কেটে যাবে কত কাল—আরো কত কাল? এতক্ষণ ধরে আমরা রবীন্দ্রনাথের যে গুণগুলির উল্লেখ মাত্র করলুম তারও উপরে নাট্যশিল্প সম্পর্কীয় তাঁর আরো দু'টি বিশিষ্ট ও বিস্ময়কর দান আছে। বাংলার সঙ্গীতকলা ও নৃত্যকলার নব জন্ম সম্ভবপর হয়েছে প্রধানত তাঁরই প্রতিভার প্রসাদে। কিন্তু আপাতত গান আর নাচ নিয়ে আলোচনা করবার স্থান নেই।

বাংলার জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথের আধুনিক নাটকাবলীর মূল্য বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়েও তাঁর দান বড় সামান্য নয়। আগেই বলেছি, গত শতাব্দীর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ থেকেই আমাদের সাধারণ রঙ্গালয় রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কেবল তাঁর স্বলিখিত নাটক নয়, তাঁর গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনেও অনেকগুলি পালা রচিত হয়েছে। তার তালিকা এই: রাজা বসন্ত রায়। বাল্মীকি প্রতিভা। রাজা ও রাণী। চোখের বালি। কচ ও দেবযানী। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন—নাম মনে নেই। বশীকরণ। চিরকুমার সভা। গৃহপ্রবেশ। শোধবোধ। বিসর্জ্জন। পরিত্রাণ। শেষরক্ষা। তপতী। মুক্তির উপায়। গোরা। যোগাযোগ। ঘরে-বাইরে (শিশির সম্প্রদায়ে প্রস্তুত হচ্ছে)। শিশিরকুমারের অনুরোধে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথ "অর্জ্জুন" নামে একখানি নূতন নাটক রচনা করবেন বলেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে শেষ পর্য্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি। শিশিরকুমার স্থির করেছিলেন "তপতী"র পর তিনি রবীন্দ্রনাথের আর একখানি আধুনিক নাটক "রক্তকরবী" মঞ্চস্থ করবেন। কিন্তু জনসাধারণের অবহেলায় "তপতী"র দুর্দ্দশা দেখে ও-ইচ্ছা দমন করতে তিনি বাধ্য হন।

এখানকার সাধারণ দর্শকরা রবীন্দ্রনাথের আধুনিক নাটকাবলীর রসোপলব্ধি করবার শক্তি অর্জ্জন করেনি বটে, কিন্তু তাঁর আগেকার নাটকগুলি তাদের বোধশক্তিকে ততটা ভোঁতা করে দেয়নি! কতখানি সৌন্দর্য্য তারা আহরণ করতে পেরেছিল ভগবান তা জানেন, কিন্তু রাজা ও রাণী, চিরকুমার সভা, বশীকরণ, শোধবোধ, ও শেষরক্ষা প্রভৃতি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে অক্ষম হয়নি। অবশ্য তার একটা স্থূল কারণও আছে। রাজা ও রাণী মেলো-ড্রামা এবং অন্যগুলি হচ্ছে হাস্য-নাট্য।

আমাদের আর বেশী কিছু বলবার নেই। বিচার করলে বোঝা যাবে, রবীন্দ্র-নাথ যদি কোন কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধ রচনা না করতেন, তাহলেও কেবল নাট্যকলার ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন দানের জন্যে তিনি অর্জ্জন করে যেতেন চিরস্মরণীয় খ্যাতি। পৃথিবীর দেশে দেশে দেখা গিয়েছে, সাহিত্যাচার্য্যরা

বন্ধুমিত্রের কালো ছায়ায় সিপ্রা দেবী

বিস্ময়ের পর বিস্ময় ••• রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর প্রযোজনায় বসুমিত্রের রহস্যচিত্র

কালোছায়া

ভূমিকায় :

শিপ্রা দেবী
শিশির মিত্র
ধীরাজ ভট্টাচার্য
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নবদ্বীপ, হরিদাস, নৃপেন্দ্র প্রভৃতি

প্রেক্ষাগৃহের সুখাসনে আয়েস ক'রে দেখবার নয়, আসনে তটস্থ হয়ে বসে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখবার মত রোমহর্ষক ছবি হল 'কালোছায়া'। এ ছবি লিখতে ও তুলতে পারতেন পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায়, কোনান ডয়েল্স আর এডগার ওয়ালেসের পরামর্শ নিয়ে, কিন্তু তাঁরা কেউই আজ বেঁচে নেই। তাই তাঁদের অভাবে এ ছবি তুলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

যত কূট ছবি ••• তত কূট চক্রান্ত

বরাবরই জাতীয় রঙ্গালয়ের ও নাট্য-সাহিত্যের উন্নতির জন্যে সাগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছেন—যেমন গেটে, হিউগো, মেটারলিঙ্ক, ইবসেন, ষ্ট্রীণ্ড্‌বার্গ, শেকভ, বাইরণ, অস্কার ওয়াইল্ড, বার্ণার্ড শ, জন মেস্‌ফিল্ড ও ইয়েটস্‌ প্রভৃতি। এদেশের মাইকেল মধুসূদনও তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী সাহিত্য-জীবনে রঙ্গালয়ের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারেননি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথও যে নাট্য-ভারতীর আমন্ত্রণ সাদরে ও সাগ্রহে গ্রহণ করবেন, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা।

চিত্রালয়—

ইংরেজী ছবি ইয়াঙ্কি ছবির চেয়ে হয়ে উঠেছে অধিকতর গুণসুন্দর এবং রূপসুন্দর। আমেরিকার সমালোচকরা—এমন কি চিত্রজগতে সুবিখ্যাত সামুয়েল গোল্ডউইন পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের কাছে হেরে গিয়েছে আমেরিকা।

অনির্ব্বাণ চিত্রে কানন দেবী

ঠিক এই কারণে কি না জানি না, কোন কোন ব্রিটিশ ছবির বিরুদ্ধে রীতিমত 'প্রোপাগাণ্ডা' চলছে। সম্প্রতি একখানি ইংরেজী ছবিতে দেখানো হয়েছে কবি বাইরণের জীবন-কাহিনী। বাইরণের নামে একটা কুৎসিত অপবাদ আছে—গোত্রগমনের জন্যে। চিত্রনির্ম্মাতারা বুদ্ধিমানের মত ছবিতে কবির জীবনের সেদিকটা দেখাননি। কিন্তু তবু ছবিখানিকে অশ্লীল ব'লে জাহির করা হচ্ছে।

য়ুরোপে-আমেরিকায় কাসানোভাকে প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ বলে ডাকা হয়, গেল বারেই তাঁর কথা বলেছি। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে কবি বাইরণও বড় কম যান না। সারা জীবন ধরেই তিনি একসঙ্গে করে গিয়েছেন কাব্যচর্চ্চা আর প্রেমচর্চ্চা। এদিকে জার্ম্মাণ কবি গেটে অথবা তিনি—কে ছিলেন বেশী অগ্রসর বলতে পারি না, তবে কবি-সমাজে যে প্রেম-ব্যাধি হচ্ছে সব চেয়ে মারাত্মক, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খেয়েছেন কবি হিউগো বুড়ো বয়সেও। হাইনে তো পক্ষাঘাত-গ্রস্ত ও মৃত্যুশয্যাশায়ী হয়েও করে গিয়েছেন প্রেমের সাধনা। সুতরাং বাইরণকে দোষ দেওয়া যায় না। সব শেয়ালের এক রা।

প্রতিবাদ চিত্রে সুমিত্রা দেবী

কবিতা রচনায় অল্প-বিস্তর নাম কিনতেই বাইরণের সামনে খুলে যায় বিলাতের সম্ভ্রান্ত সমাজের দ্বার। সেখানে পদার্পণ করেই বাইরণ যে প্রথম প্রেমিকার দ্বারা আক্রান্ত হলেন তাঁর নাম লেডি ক্যারোলাইন ল্যাম্ব। বড় ঘরের তরুণী বিলাসিনী, তন্বী, সুন্দরী। কাব্য পড়তে ভালোবাসেন। লেডি বেস্‌বোরো তাঁর মা। লেডি মেলবোর্ণ তাঁর শাশুড়ী। লর্ড মেলবোর্ণের ছোট ছেলে উইলিয়ম ল্যাম্ব তাঁর স্বামী।

কারোলাইন সুশিক্ষিতা হলেও তাঁর স্বভাব ছিল বন্য। স্বামীর প্রকৃতি উদার, স্ত্রীর স্বাধীনতায় হাত দিতে চাইতেন না।

"Child Harold's Pilgrimage" তখনও ছাপার হরফে বেরোয়নি, কিন্তু তার পাণ্ডুলিপি পড়ে ক্যারোলাইন বলে উঠলেন, "কবিকে আমি দেখবই দেখব।" বন্ধুরা বললেন, "তার পা খোঁড়া।" ক্যারোলাইন বললেন, "হোক্‌। বাইরণ যদি ঈশপেরও মত কুৎসিত হন তবু তাঁকে আমি দেখতে চাই।" দু'জনে দেখা হল। ক্যারোলাইন নিজের ডায়েরীতে লিখে রাখলেন: "ঐ পরম সুন্দর পাণ্ডু মুখখানি হচ্ছে আমার নিয়তি।" কে বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম হয় না?

কিন্তু সে কি দুর্দ্দমনীয় প্রেম! দস্তুরমত প্রেমযুদ্ধ! তাকে সামলাতে পারেন এতখানি দম ছিল না বাইরণের।

ক্যারোলাইনকে তিনি আদরের নাম দিয়েছিলেন—'ক্যারো'। কিন্তু কবির আদর পেয়ে ক্যারো যেন পাগল হয়ে গেলেন। বাইরণ যদি এক দিন অনুপস্থিত থাকতেন, ক্যারো নিজেই বালক-ভৃত্য সেজে ছুটে আসতেন তাঁর কাছে। কোন উৎসব-সভায় বাইরণ একলা নিমন্ত্রিত হলে ক্যারো নির্লজ্জের মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতেন। পাছে বাইরণের চাকররা তাঁকে বাড়ীর দরজা খুলে না দেয়, সেই ভয়ে ক্যারো তাদের সঙ্গেও পাতালেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক! এমনি আরো নানা রকম অশোভন কাণ্ড। নিন্দুকদের রসনা মুখর হয়ে উঠল। বাইরণ পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ। ক্যারোর মা লেডি বেস্‌বোরো ও শাশুড়ী লেডি মেলবোর্ণ কত বোঝালেন, তাঁর কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই। সকলেরই আশঙ্কা, প্রমত্তা প্রেমিকা অবশেষে বুঝি স্বামীর সংসার ছেড়ে প্রকাশ্যে বাস করতে যাবে লর্ড বাইরণের সঙ্গে।

ভয় পেয়ে মা আর শাশুড়ী একসঙ্গে ছুটে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়লেন লর্ড বাইরণের কাছে। বললেন, 'ক্যারোলাইন শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করে আজ কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। তাকে ফিরিয়ে আনো, আমাদের মান বাঁচাও।" বাইরণ খোঁজ-খবর নিয়ে ক্যারোকে আবার আবিষ্কার করে পাঠিয়ে দিলেন।

টিটিকার পড়ে গেল চারি দিকে! বেগতিক দেখে মা, শাশুড়ী, স্বামী এবং

উপপতি সবাই মিলে ক্যারোকে একসঙ্গে মিনতি করতে লাগলেন, "লক্ষীটি, কিছু কালের জন্যে তুমি লণ্ডন ছেড়ে বাইরে যাও।"

ক্যারো অটল! বাইরণ আর তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না শুনে তিনি পত্র লিখলেন: "তুমি কি পাণ্ডু! যেন শ্বেত-মর্ম্মরের মূর্ত্তি! তোমাকে দেখলেই আমার কাঁদতে সাধ হয়! যদি কোন চিত্রকর তোমার ঠিক মুখখানি এঁকে আমাকে দিতে পারে, বিনিময়ে আমি তাহলে আমার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে রাজি আছি।"

লর্ড বাইরণ ক্যারোর কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সুন্দরী কাউণ্টেস অফ অক্সফোর্ডের হস্তগত হলেন! ক্যারো তবু নাছোড়-বান্দা! আবার এক দিন বাইরণের বাড়ীতে ছুটে গেলেন। কিন্তু কবির দেখা না পেয়ে লিখে রেখে গেলেন—"Remember me!"

তার উত্তরে বাইরণ তৎক্ষণাৎ এই ভয়াবহ কবিতাটি রচনা করলেন:

"Remember thee! Remember thee!
Till Lethe quench life's burning stream
Remorse and shame shall cling to thee,
And haunt thee like a feverish dream!
Remember thee! Ay, doubt it not.
Thy husband too shall think of thee!
By neither shalt thou be forgot,
Thou false to him thou fiend to me!"

কিছু কাল পরে এক উৎসব-সভায় অন্য নারীর সঙ্গে বাইরণকে দেখে ক্যারো পাগলের মতো ছুরি নিয়ে তেড়ে আসেন। বাইরণ বললেন, 'প্রিয়, আমার বুকে তো তুমি আগেই আঘাত করেছ। এইবারে নিজের বুকে আঘাত কর।"

'বাইরণ!" বলে চীৎকার করেই ক্যারো দৌড়ে চলে গেলেন। তার পরের ব্যাপার স্পষ্ট করে জানা যায়নি। কিন্তু ক্যারোকে পাওয়া যায় রক্তাক্ত দেহে, তবে জীবন্ত অবস্থায়।

* * *

প্রায় এগার বৎসর পর।

বাইরণ আবার ক্যারোর কাছে এলেন।

রাজপথ। গাড়ীর ভিতরে রুগ্না, শীর্ণা ক্যারো, গাড়ীর বাইরে অশ্বপৃষ্ঠে তাঁর স্বামী। পথ দিয়ে যাচ্ছে এক শবযাত্রার মিছিল।

স্বামী সুধোলেন, "কার শবযাত্রা?"

উত্তর হল, "লর্ড বাইরণের।"

স্বামী কিন্তু ক্যারোকে খবরটা দিতে ভুলে গেলেন। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা করেই।

* * *

হলিউডে তৈরী ছবিগুলি দেখলে মনে হয়, ওখানকার চিত্র-জগৎ কেবল যেন তরুণ ও তরুণীদের জন্যেই। কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে, আসল ব্যাপার তা নয়। ওখানে যাদের "এক্সট্রা" বা "অতিরিক্ত" বলে ডাকা হয় তাদের সংখ্যা সাত হাজার। তবে তারা চিত্রনটদের মধ্যে গণ্য হয় না। কিন্তু চিত্রনটদের মধ্যে আঠারো বয়সের যুবক থেকে ছিয়াত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ লোকও আছে। ওখানকার চিত্র-নটীরা বয়সে আরো কম হলেও তাঁদেরও অনেককেই আর যুবতী বলা সাজে না।

নিম্নলিখিত নটদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি বা পঞ্চাশের উপরে: রোলাণ্ড কোলম্যান, ফ্রেডরিক মার্চ্চ, উইলিয়ম পাওয়েল, গেরি কুপার, ক্লার্ক গেবল, স্পেন্সার ট্রেসি, চার্লস বোয়ার, মেলভিন ডগলাস, নেলসন এডি। নিম্নলিখিত নটীদের বয়স বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে: নর্ম্মা সিয়ারার, আইরিণ ডুন্, ক্লডেট কলবার্ট, মির্ণা লয়, মার্লিন ডিয়েট্রিক।

বাংলা চিত্র-জগতেও দেখি, চল্লিশের ওপারে গিয়েও ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী ও ধীরাজ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি আজও তরুণ নায়কের ভূমিকায় সচল হয়ে আছেন। এবং আজও যাঁরা নিয়মিত ভাবে বড় বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তাঁদের মধ্যে ফণী রায়ের বয়স ষাটের উপরে, নরেশ মিত্রের বয়স ষাটের কাছাকাছি, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর বয়স ছাপ্পান্নোর কম হবে না এবং অহীন্দ্র চৌধুরীর তিপ্পানো কি চুয়ান্নো।

হলিউডের নটীরা আসল বয়স লুকোন না। কিন্তু এদেশী নটীদের আসল বয়স বললে তাঁরা হয় রাগ নয় অস্বীকার করবেন। তবে প্রভা, কানন, চন্দ্রাবতী বা মলিনা প্রভৃতি আর যৌবনের সীমানার মধ্যে নেই, যদিও এখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি ওঁদের অভিনয়ের শক্তি।

* * * *

কিছু দিন আগে একখানি আংশিক ভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাংলা চিত্ররূপ দেখেছিলুম। পলাসীর যুদ্ধের কিছু কাল পরের ঘটনা ছিল ঐ উপন্যাসের আখ্যান-বস্তুর মধ্যে। সুতরাং তা বেশী দিনের কথা নয়। সামান্য চেষ্টা করলেই তখনকার ঐতিহাসিক চিত্র দেখানো যেতে পারত, কারণ সে যুগের ইতিহাসের মাল-মশলা এক রকম হাতের কাছেই পাওয়া যায়। এদেশে যতটা সম্ভব, ছবির মালিকরা অর্থব্যয় করতে ত্রুটি করেননি। কিন্তু পরিচালকদের অক্ষমতায় ছবির পর্দ্দায় অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধের বাংলার সহজলভ্য চিত্রটিও ফুটে উঠতে পারেনি।

বাংলা ছবির বাজারে হামেসাই বিকিয়ে যাচ্ছে এমনি সব বিকৃত ঐতিহাসিক চিত্রই। আজ পর্য্যন্ত একখানি মাত্র নির্ভুল ঐতিহাসিক বাংলা ছবি দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত আছি। কয়েক বৎসর আগে সম্রাট অশোককে নিয়ে একখানি চিত্র রচনা করা হয়েছিল। যেমন তার আজগুবি কাহিনী, তেমনি তার আজব চিত্রদৃশ্য, তার মধ্যে পড়ে ইতিহাস যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল! অথচ সম্রাট অশোক খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের লোক হলেও তাঁর সম্বন্ধে যত কথা জানা যায়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাঙালী বীর প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও তা জানা যায় না। অল্প চেষ্টাতেই ঐতিহাসিক অশোক এবং তাঁর সমসাময়িক যুগের ছবি ফুটিয়ে তোলা চলত।

কেবল ঐতিহাসিক নয়, পৌরাণিক ছবিতেও বাঙালী প্রয়োগকর্ত্তারা কিছুমাত্র মস্তিষ্কের পরিচয় দিতে পারেন না—বহু মুদ্রা ব্যয় করে খুব একটা জমকালো সমারোহ দেখাতে পারলেই তাঁরা লাভ করেন পরম আত্মপ্রসাদ। এ-বিষয় নিয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি গল্প বলতে পারি। "দক্ষযজ্ঞ" একখানি জনপ্রিয় কথাচিত্র। তা প্রস্তুত করবার সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ কোন কোন বিভাগে আমার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন স্থাপত্যের যে মূল চিত্রগুলি আমি দিয়েছিলুম, তারই সাহায্যে শিল্পী করেছিলেন দৃশ্য-সংস্থান। অল্প বিস্তর

ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও শিল্পী যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন পৌরাণিক যুগের প্রতিবেশ।

সতীর ভূমিকা নিয়েছিলেন চন্দ্রাবতী। তাঁর কবরীর জন্যে একটি প্রাচীন পরিকল্পনা আমি বেশকারের হাতে সমর্পণ করলুম। অপরিচিত আদর্শ, কাজেই বহুক্ষণ চেষ্টার পর বেশকার অনেক কষ্টে আদর্শ অনুযায়ী কবরী বন্ধন করতে পারলে।

সতী 'সেটে' এসে উপস্থিত। ছবি তোলার তোড়জোড় হচ্ছে, এমন সময়ে এক জন প্রধান কর্মকর্তা এসে বলে উঠলেন, "এ কি, সতীর মাথায় কাপড় নেই কেন ?"

আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, "দক্ষযজ্ঞের যুগে মেয়েরা মাথায় কাপড় দিত না।

কিছু তর্ক-বিতর্ক হল। তিনি নিজের গোঁ ছাড়লেন না। অবশেষে অত-কষ্টে-বাঁধা অমন চমৎকার কবরী ঢেকে দেওয়া হল গুণ্ঠনে। আমি বিরক্ত হয়ে ওঁদের সম্পর্ক ত্যাগ করলুম।

এখানকার এবং পাশ্চাত্য দেশের প্রয়োগ-কর্তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে কতখানি! একখানি ছবিকে নিখুঁৎ করে তোলবার জন্যে তাঁরা যে বিপুল অর্থব্যয় করেন, এদেশে এখনো সেটা স্বপ্নাতীত! কিন্তু সে অর্থ আজে-বাজে কাজে নয়, যথার্থ কাজের মত কাজে খাটানো হয়, তাই পরে ছবি দেখিয়ে খাটানো টাকা পূরোপুরি তুলে নিয়েও তাঁরা উপরি লাভ করতে পারেন যথেষ্টরও বেশী। কেবল মুখের কথায় ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলে অবুঝরা হয়তো বুঝবেন না, তাই হালের একখানি ছবির (এদেশে এখনো যা দেখানো হয়নি) প্রসঙ্গ দিয়ে দু'চার কথা বলতে চাই।

* * * *

সিসিল, বি, ডি-মিলে তিন বছর পরে আবার কথাচিত্রের আসরে ফিরে এসে যে ছবি তুলেছেন তার নাম হচ্ছে "Unconquered" বা "অপরাজিত"। আমেরিকায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে চিত্রকাহিনীর ভিত্তি. চিত্রনাট্যের নায়ক হচ্ছেন গেরি কুপার এবং নায়িকা পলেট গডার্ড।

ছবিখানি প্রস্তুত ও সম্পূর্ণ করতে খরচ হয়েছে প্রায় চল্লিশ লক্ষ ডলার (এক ডলার তিন টাকা বারো আনা)। প্রচার বিভাগ ও পদোন্নতি প্রভৃতির জন্যে খরচ ওর মধ্যে ধরা হয়নি। প্রধান ও অপ্রধান নট-নটীদের দিতে হয়েছে মোট দশ লক্ষ ডলার। পূরো দুই বৎসর গবেষণা-কার্য্যে ব্যয় করবার পর গোটা ছবিখানা তুলতে লেগেছে পূরো এক শত দিন। ছবিখানি রঙীন।

যুগোপযোগী ভাবসৃষ্টি করবার জন্যে চিত্র-নির্মাতারা পিটসবার্গের নিকটস্থ অরণ্যে দুই মাস কাল বাস করেছিলেন। এ ছাড়া আরো নানা দেশে আনাগোণা করতে হয়েছিল—মোট পাঁচ হাজার মাইল। গবেষণা করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন ছয় জন বিশেষজ্ঞ। ব্যবহার করা হয়েছিল আড়াই হাজার ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কেবল আমেরিকার বহু সরকারী দপ্তরখানা ও মিউজিয়ম নয়, বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকেও সংগৃহীত হয়েছে ইতিহাসের উপাদান। সেই সব উপাদান একসঙ্গে জড়ো করে হিসাব করে দেখা গিয়েছে, তা প্রকাশ করলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দশ খণ্ডে বিভক্ত এক গ্রন্থ হয় এবং প্রত্যেক খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা হয় মোট এক হাজার!

"অপরাজিতে"র মধ্যে কথা কয়েছে এমন নট-নটী আছে তিরানব্বই জন। "এক্সট্রা" বা "অতিরিক্ত" আছে চার হাজার দুই শত তেইশ জন। এই চিত্রনাট্যের পাত্র-পাত্রীদের সাজ-পোষাক পরিকল্পনার জন্যেও আঁকতে হয়েছে পাঁচ শতখানি ছবি।

অধিকতর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

* * * *

চৌত্রিশ বৎসর পরে চার্লি চ্যাপলিন ভবঘুরের সাজ-পোযাক খুলে ফেলেছেন। তাঁর নতুন ছবির নাম হচ্ছে Monsieur Verdoux ; চ্যাপলিনের মতে এখানি হচ্ছে "হত্যা-প্রহসন"। কেউ যদি সুধোন, খুন কেমন করে হাসির ব্যাপার হতে পারে? তাহলে তার জবাব হচ্ছে, "Arsenic and Old Lace" দেখলেই সেটা আন্দাজ করতে পারবেন।

গল্পের সারাংশ এই: ত্রিশ বৎসর চাকরি করার পর এক ব্যক্তিকে তার মনিব জবাব দেন। মাথায় ঢুকল তার অনাহারের আতঙ্ক, কারণ বাড়ীতে আছে তার রুগ্না পত্নী ও সন্তান। কিন্তু চট্ করে তার মগজে এক বুদ্ধি জুটে গেল। সে জানত, নারীরা তার কথাবার্তার চটকে খুব সহজেই আত্মহারা হয়। সে তখন বেছে বেছে নারী ভুলিয়ে, বিবাহ করে তার পর হত্যা করতে লাগল। নিহত নারীদের সঞ্চিত অর্থ সে ব্যয় করত নিজের রুগ্না পত্নী ও সন্তানের জন্যে। তার পর তার পত্নী ও সন্তানের মৃত্যু হল। সেও হল ভগ্নপ্রাণ। ধরা দিলে। তার প্রাণদণ্ড হল। আদালতে দাঁড়িয়ে সে বললে, "আমাকে হত্যা করেছে, সমাজ!"

গল্পটি অসাধারণ হলেও, অস্বাভাবিক নয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু কাল আগে ল্যান্‌ড্‌রু নামে এক ফরাসী হত্যাকারীর বিচারের সময়ে সারা পৃথিবীতে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সেও ঠিক উপরোক্ত উপায়ে নারীর পর নারী হত্যা করে অবশেষে ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। চ্যাপলিনের এই চিত্র-কাহিনীর জন্ম যে সেই ঘটনা থেকেই, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করতে পারি।

চ্যাপলিন বলছেন: "আমি এখন বুড়ো মানুষ। আমার ভবিষ্যতের দিনগুলি এখন গোণা, এর মধ্যেই আমি যা বলতে চাই তা আমাকে বলতে হবে। যদি কোন নতুন ভাব আমার মাথায় আসে, তাহলে আবার বলব আমি ভবঘুরের গল্প। আমি যা চাই, তাই আমি করি এবং এ-বিষয়ে আমার কোন কপটতাই নেই। লোকে তা জানে, তাই আমার কাজ পছন্দ করে।"

খুব সত্য! চ্যাপলিনের আত্মনির্ভরতা অত্যধিক। প্রথম জীবনে কিৰ্ণো কমেডি সম্প্রদায়ের 'কনট্রাক্ট' ফুরোবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি আর কারুর হুকুমেই কাণ পাতেননি। নিজেই গড়ে তুলেছিলেন আপন সম্প্রদায় এবং নিজেই হয়েছিলেন নিজের প্রভু। এই দিক্ দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর বেশ-খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বার্লিন-সঙ্কট সমাধানের সন্ধানে—

বার্লিনের উপর হইতে অবরোধ তুলিয়া লইবার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের দাবী রাশিয়া প্রত্যাখ্যান করায় বার্লিন-সঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ করিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। বিমানযোগে সরবরাহ ব্যবস্থাও রাশিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়ারও আশঙ্কা দেখা দেয়। এমন কি উভয় পক্ষে সৈন্য-সমাবেশের সংবাদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ জর্জ্জ মার্শাল রাশিয়াকে সাবধান করিয়া বলেন যে, বার্লিনে জার্ম্মাণীকে বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া কিছু করান সম্ভব হইবে না। অনেকের মনেই আশঙ্কা জাগিয়াছিল যে, বার্লিন-সঙ্কট বুঝি অবশেষে সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হইবে। কিন্তু সে আশঙ্কা আপাততঃ দূর হইয়াছে। রাশিয়াই প্রথমে এ বিষয়ে উদ্যোগী হয় মনে করিলে ভুল হইবে না। বার্লিন অবরোধের ফলে পশ্চিম-বার্লিনে যে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়, তাহা দূর করিবার জন্য রাশিয়াই দায়িত্ব গ্রহণ করে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রাশিয়া কর্ত্তৃক খাদ্য-সরবরাহকে 'নিছক প্রচার-কার্য্য' বলিয়া অভিহিত করেন। ইতিমধ্যে হেগে ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন কনফারেন্সে বার্লিন-সঙ্কট সমাধানের জন্য নূতন পন্থা গ্রহণ করা স্থির হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে নূতন কিছু সুবিধা দেওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাশিয়া যদি অবরোধ-ব্যবস্থা তুলিয়া লয়, তাহা হইলে পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে নূতন মার্ক মুদ্রার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব-বার্লিনের মার্ক মুদ্রাই প্রবর্ত্তন করা হইবে। যদিও ২১শে জুলাই মিঃ বেভিন কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, বার্লিন-সঙ্কট এমন যে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে, তথাপি সঙ্কট সমাধানের জন্য নূতন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পশ্চিমী শক্তিত্রয় বিরত থাকেন নাই।

বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সোজাসুজি রুশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতে গত ২৮শে জুলাই মস্কো যাত্রা করেন। প্রথমে তাঁহারা মার্শাল ষ্টালিনের সহিত আলোচনা করেন। ৩রা ও ৪ঠা আগষ্ট দুই দিন মার্শাল ষ্টালিনের সহিত তাঁহাদের আলোচনা হয়। অতঃপর ত্রিশক্তির প্রতিনিধিগণ তিন বার সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটভের সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার বিবরণ কিছুই জানা যায় না। কিন্তু গত ১২ই আগষ্ট বার্লিনে নূতন আর এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সশস্ত্র রুশ-সৈন্য বার্লিনের বৃটিশ ও মার্কিণ এলাকায় প্রবেশ-পথগুলি অবরোধ করে এবং বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের ৫০ গজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই নূতন পরিস্থিতি সত্ত্বেও বার্লিন-সঙ্কট লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, ইহা মনে করা কঠিন।

মস্কো আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত না হইলেও বার্লিন হইতে ৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, বার্লিন-সঙ্কটের সাময়িক মীমাংসা খুব দূরবর্ত্তী নহে। বার্লিন-সঙ্কট যে লণ্ডনের পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাওয়ারই প্রতিক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন লইয়াই এই সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যায়। মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ জর্জ্জ মার্শাল হঠাৎ হঠকারিতা করিয়া সম্মেলনের অবসান ঘোষণা করেন এবং সম্মেলন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয় রাশিয়ার উপর। কিন্তু রাশিয়া চায়, জার্ম্মাণী সম্পর্কে আলোচনার জন্য পুনরায় পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন হউক। বার্লিন অবরোধ প্রকৃত পক্ষে এই পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আহ্বানের জন্য বৃটেন ও আমেরিকার উপর চাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। মস্কো আলোচনার বিবরণ জানা না গেলেও পর্য্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, অবরোধ তুলিয়া লইলে পশ্চিম-বার্লিনেও সোভিয়েট মার্কই একমাত্র প্রচলিত মুদ্রা হইবে এবং পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আহ্বান করা হইবে, এইরূপ একটা মীমাংসা সম্বন্ধে উভয় পক্ষে মতৈক্য হইয়াছে। কিন্তু পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন আহ্বান করিলেই জার্ম্মাণী সংক্রান্ত সকল সমস্যা সমাধান হইয়া যাইবে, এইরূপ মনে করা কঠিন। পশ্চিম-জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে বিরত থাকিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় রাজী হইবে কি? এ সম্পর্কে যদি তাঁহারা রাজী হনও, তাহা হইলে বড় সমস্যা দেখা দিবে বর্ত্তমান উৎপাদন হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং চতুঃশক্তি কর্ত্তৃক রূঢ় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাশিয়ার দাবী লইয়া। রাশিয়ার দাবী ত্রিশক্তি মানিয়া লইবেন কি? রাশিয়া এই দুইটি দাবী পরিত্যাগ করিতে রাজী হইবে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের লণ্ডন অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় জার্ম্মাণী লইয়া চতুঃশক্তির মধ্যে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, বার্লিন অবরোধের চাপে তাহার অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ফ্রান্সে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ১৯শে জুলাই ফ্রান্সের সুম্যান গবর্ণমেণ্টের পতন হয় এবং ২৭শে জুলাই রেডিক্যাল দলভুক্ত মঃ এণ্ড্রি ম্যারির প্রধান মন্ত্রিত্বে নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। সুম্যান মন্ত্রিসভা খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে সারা ফ্রান্সব্যাপী শ্রমিক ধর্ম্মঘটের প্লাবনের মধ্যে সমাজতন্ত্রী প্রধান মন্ত্রী মঃ রামাদিয়ের যখন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন ফ্রান্সে আর একটা গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হইবে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আশঙ্কা নিবারিত হয় এবং সোশ্যালিষ্টদের সহযোগিতায় মঃ সুম্যান মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

তাঁহার এই গবর্ণমেণ্ট তৃতীয় শক্তির গবর্ণমেণ্ট বা Third Force Government আখ্যা লাভ করিয়াছিল। আসলে এই তৃতীয় শক্তি কম্যুনিজম-ভীতি হইতে উৎপন্ন কোয়ালিশন ছাড়া আর কিছুই নহে। এই কোয়ালিশনের মধ্যে সোশ্যালিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া গোঁড়া দক্ষিণপন্থী পর্য্যন্ত সকলেই রহিয়াছেন। একমাত্র কম্যুনিজম-ভীতি ছাড়া ইঁহাদের মধ্যে আর কোন যোগসূত্র ছিল না। এই দুর্ব্বলতার জন্মই সুম্যান মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর হইতেই উহার শক্তি ক্ষয় হইতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে তৃতীয় শক্তির স্রষ্টা সমাজতন্ত্রীদের হাতেই তাহার পতন ঘটিয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে সমাজতন্ত্রীদের সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করা এবং উহা গৃহীত হওয়াই সুম্যান গবর্ণমেণ্টের পতনের কারণ। ইহা অবশ্যই সত্য যে, ফ্রান্সের জাতীয় ব্যয় ইন্দো-চীনকে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিবার জন্য সামরিক ব্যয়ের সহিত নিবিড় ভাবে সংযুক্ত। লক্ষ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ব্যয় করিয়াও ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ইন্দোচীনে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। কাজেই সোশ্যালিষ্টদের ছাঁটাই প্রস্তাব সুম্যান গবর্ণমেণ্টের ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপক বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইন্দোচীন সম্বন্ধে মঃ রামাদিয়ের গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিতে-ছিলেন, সুম্যান গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, কম্যুনিষ্টরা যখন মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন তখন তাঁহারাও ইন্দোচীন সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সাম্রাজ্য রক্ষা সম্পর্কে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থীদের সহিত ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্টদের কোন মতবিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

ইন্দোচীনে ফ্রান্সের সামরিক কার্য্যকলাপের ব্যয় যে অত্যধিক হইতেছে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু এক জন সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী যে আগাগোড়া উপনিবেশ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত সচিব ছিলেন, এ-কথাও অনস্বীকার্য্য। সমাজতন্ত্রীরা যে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে মোট বাজেট-বরাদ্দের শতকরা এক ভাগের বেশী হ্রাস হইত না, এ-কথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং সমাজতন্ত্রীরা কেন সুম্যান গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটাইলেন তাহার কারণ সমাজতন্ত্রীদের নীতির মধ্যেই সন্ধান করা আবশ্যক। সমাজতন্ত্রীরা শ্রমিকদিগকে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের দলে টানিবার এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে কম্যুনিষ্ট-প্রভাবমুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসর ব্যাপক শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সময় শ্রমিক-দিগকে ধর্ম্মঘট হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা Force Ouvriere নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। কিন্তু তাঁহাদের সাফল্যের পথে প্রবল বাধার সম্মুখীন তাঁহারা হইয়াছেন। সমাজ-তন্ত্রীরা বুঝিতে পারিতেছেন যে, সরকারী নীতি নির্দ্ধারণে তাঁহাদের মতামতের বিশেষ কোন মূল্য নাই। সামাজতন্ত্রী দল গত বৎসর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব না হওয়ায় দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস হওয়ার আশঙ্কায় সমাজতন্ত্রীরা উদ্বিগ্ন না হইয়া পারেন নাই। রেডিক্যাল দলভুক্ত মন্ত্রী মঃ মায়েব-এর মুদ্রা-স্ফীতি নিরোধক নীতি গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের বোধ হয় উপায় ছিল না। অন্ততঃ জীবন-যাত্রার ব্যয় যাহাতে আরও না বাড়ে তাহার জন্ম ঐ নীতি তাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আরও দুই বার সুম্যান গবর্ণমেণ্টের পতনাশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এম-আর-পি দল সোশ্যালিষ্ট ও রেডিক্যালদের দাবী মানিয়া লওয়ায় সেই আশঙ্কা দূর হইয়াছিল। কিন্তু সামরিক ব্যয়ের ছাঁটাই তাঁহারা মানিতে পারেন নাই। কম্যুনিষ্টদের হাত হইতে শ্রমিকদিগকে টানিয়া আনিতে হইলে ক্রমবর্দ্ধমান জীবন-যাত্রার ব্যয় হ্রাস করিবার প্রয়োজনীয়তা সমাজতন্ত্রীরা উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই জন্মই সমাজতন্ত্রীরাও সামরিক ব্যয় সম্বন্ধে আপোষ করিতে রাজী হন নাই। তাঁহারা যদি আপোষে রাজী হইতেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টে দক্ষিণপন্থীদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইত এবং সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের অনুসরণকারীর সংখ্যা আরও হ্রাস পাইয়া কম্যুনিষ্টদের শক্তি বৃদ্ধি করিত। বস্তুতঃ, এক দিকে দক্ষিণপন্থী আর এক দিকে কম্যুনিষ্ট এই দুই দিকের চাপের মধ্যে পড়িয়া সমাজতন্ত্রীদের অবস্থা স্যাণ্ডউইচের মত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আত্মরক্ষার পথের সন্ধান করিতেছেন।

কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্ম কিছু সুবিধা যে সমাজতন্ত্রীরা আদায় করিতে পারেন নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের শক্তি বা জনপ্রিয়তা মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের প্রধান বিপদ এই যে, তাঁহারা একই সঙ্গে ধনতন্ত্র এবং কম্যুনিজম উভয়ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা চান যে, ধনতন্ত্র ও কম্যুনিজম উভয় পদ্ধতির যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তাহা দূর করিয়া তাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিবেন। কিন্তু কম্যুনিজমের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্ম দক্ষিণপন্থীদের সহিত সহযোগিতা করার ফলে সমাজতন্ত্রীরা ক্রমশঃ ধনতন্ত্রের মুখবিবরেই যাইয়া পড়িতেছেন। তৃতীয় শক্তি তাহার স্রষ্টা সমাজ-তন্ত্রীদের শক্তি ক্ষয় করিয়া ধনতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। সমাজতন্ত্রীরা ধনতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি দূর করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। আবার তাঁহাদের যে শক্তি ক্ষয় হইতেছে তাহাতে কম্যুনিষ্টরাই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। সেই জন্মই আত্মরক্ষার প্রেরণায় গত জুলাই মাসে প্যারীতে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের সম্মেলনে তৃতীয় শক্তির সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজতান্ত্রিক দল হিসাবে কাজ করিবার এবং অবিলম্বে মজুরি বৃদ্ধির জন্ম সংগ্রাম করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় শক্তির স্রষ্টা-ঋষি মঃ লিয়োঁ ব্লুম যে তৃতীয় শক্তি ভাঙ্গিয়া দিবেন তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা অভিজ্ঞতা হইতে কিছু শিখিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। মঃ ম্যারির গবর্ণমেণ্টেও সমাজতন্ত্রীরা আছেন বটে, কিন্তু এই গবর্ণমেণ্টও যে কত দিন স্থায়ী হইবে তাহা বলা কঠিন। সমাজতন্ত্রীদের স্ববিরোধিতার ফলে জেনারেল দ্য গলের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিবারই যে পথ প্রশস্ত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্য গলের হাতে ক্ষমতা গেলে তিনি যে ফ্রান্সের ডিক্টেটর হইয়া বসিবেন সে সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত।

ইটালীতে ধর্ম্মঘটের অবসান—

যে-ছাত্রটি ইটালীর কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা সিগনর তোগলিয়াত্তিকে গুলী করিয়াছিল তাহার পকেটে না কি একখানি 'মেইন ক্যাম্প' (Mein Kampf) পাওয়া গিয়াছে। গুলী-নিক্ষেপকারীর পকেটে

এই বইখানি আবিষ্কৃত হওয়ার মধ্যে কোন গুরুত্ব আছে কি না, তাহা লইয়া আলোচনা করিবার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু গুলী নিক্ষেপের পর ইটালীতে যে হাঙ্গামা এবং ৭০ লক্ষ শ্রমিকের যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল তাহার অবসান শুধু আকস্মিক ভাবেই হয় নাই সম্পূর্ণরূপেও হইয়াছে। হাঙ্গামা ও ধর্ম্মঘট দমনে গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট ট্রেড ইউনিয়নের নেতারাও ধর্ম্মঘট বন্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। সিগনর তোগলিয়াত্তিকে হত্যা করিবার চেষ্টার প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট করিতে তাঁহাদের না কি আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের সম্মতি ছাড়া ধর্ম্মঘট আহ্বান করায় তাঁহাদের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘ কালের জন্য ধর্ম্মঘট করিয়া সমগ্র ইটালীতে কম্যুনিষ্ট অভিযানের সুযোগ করিয়া দিতেও তাঁহারা রাজী ছিলেন না। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতা অধিকারের জন্য এই ধর্ম্মঘট আহ্বান করিয়াছিলেন কি না, অথবা শক্তি-পরীক্ষা করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। অনেকে মনে করেন যে, কম্যুনিষ্টদের একটা পরিকল্পনা আছে এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই এই পরিকল্পনা তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক। এই পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য উত্তর-ইটালীর শিল্পাঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা। অতঃপর ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের পুলিশ ও সামরিক শক্তি অধিকার করাই দ্বিতীয় লক্ষ্য।

ইটালীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও অবস্থা যে এখনও বিস্ফোরক পদার্থের মতই বিপজ্জনক হইয়া রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন যে, অতঃপর রাজনৈতিক বিরোধ

তীব্রতর হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মঘট এবং শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণের জন্য গবর্ণমেণ্ট নূতন আইন রচনার আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু ক্রমহ্রস্বমান মজুরি এবং ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা দূর করিবার কোন আয়োজন নাই।

যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্কট—

যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন গত ২৮শে জুলাই (১৯৪৮) সমাপ্ত হইয়াছে। গত ২১শে জুলাই এই কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ইউরোপের অন্যান্য কম্যুনিষ্ট পার্টি এই অধিবেশনে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করে নাই, ইহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে রাশিয়ার এবং পূর্ব্ব-ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট সংবাদপত্র সমূহের রিপোর্টারগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেসে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হওয়ায় টিটোর প্রতি যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির গভীর আস্থাই সূচিত হইতেছে। কমিনফরম মার্শাল টিটো এবং যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপাপন করিয়াছে, এই কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব তাহা অন্যায়, অসঙ্গত এবং মিথ্যা (unfair, unjust and untrue) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং কমিনফরমের সহিত সমস্ত বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত সম্ভাব্য পন্থা গ্রহণ করিবার সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধন করিয়া মার্শাল টিটো যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে প্রাগ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের জন্য কমিনফরমের নেতাদের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে এবং যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাও তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতে থাকা অবস্থাতেই 'প্রাভদা' পত্রিকায় যুগোশ্লাভ নেতাদের উপর তীব্র আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর 'প্রাভদা' পাবলিশিং হাউসের ছাপমারা কতকগুলি পুস্তিকা প্রচারিত হয়। এই পুস্তিকাগুলিতে অনেকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত মার্চ্চ (১৯৪৮) হইতে মে মাস পর্য্যন্ত রুশ ও যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে যে সকল পত্রালাপ হইয়াছে, এইগুলি না কি সেই সকল পত্রের নকল। যুগোশ্লাভিয়ার সহিত পূর্ব্ব-ইউরোপের অন্যান্য দেশের সম্পর্কটা ক্রমেই যেন অধিকতর তিক্ত হইয়া উঠিতেছে। হাঙ্গেরীর সংবাদপত্রে যুগোশ্লাভ নেতাদিগকে 'ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কার স্ফীত' (puffed with arrogance and conceit) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বুলগেরিয়ার সংবাদপত্রে মার্শাল টিটোর যে একটি ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে গোয়েরিংরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পত্রিকা 'গ্লস লুডু'তে (Glos Ludu) টিটোর বক্তৃতার কঠোর সমালোচনা করিয়া দুই দিন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে টিটোর বক্তৃতাকে ভণ্ডামী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, টিটোর দল, মার্কসবাদ ও লেলিনবাদের প্রতি আস্থা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার এবং জনগণের গণতন্ত্রের প্রতি বন্ধুত্বের মিথ্যা আশ্বাস দিয়া যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদিগকে প্রতারিত করিতেছেন।

বিরোধটা এখনও যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলির কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে এবং এই বিরোধ এখনও রাষ্ট্রের স্তরে আরম্ভ হয় নাই, এ-কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এই সকল দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সত্যই কোন পার্থক্য আছে বলিয়া বুঝা যায় কি? বস্তুতঃ পূর্ব্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যেই যুগোশ্লাভিয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দানিয়ুব সম্মেলন—

৩১শে জুলাই দানিয়ুব নদী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের জন্য বেলগ্রেডে এক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্মেলনে বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, ইউক্রেন, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া এই দশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছেন এবং অষ্ট্রীয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন দর্শক হিসাবে। বেলগ্রেড হইতে ১লা আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, দানিয়ুব কমিশনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য ত্রিশক্তির পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহার পক্ষে ৩ ভোট এবং বিপক্ষে ৭ ভোট হওয়ায় ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। দানিয়ুব নদীতে সকল জাতির বাণিজ্য-পোত অবাধে চলাচলের জন্য ফরাসী প্রতিনিধি যে-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও ৭-৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। ১৯২১ সালের চুক্তির পরিবর্ত্তে একটি নূতন চুক্তি সম্পাদনের জন্য রাশিয়ার পক্ষ হইতে যে পরিকল্পনা উত্থাপিত হয় তাহা ৭-২ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। বৃটেন কোন পক্ষেই ভোট দেয় নাই। এই রুশ-পরিকল্পনা অনুযায়ী দানিয়ুব নদীতে বাণিজ্য-পোত চলাচলে সকলের অবাধ অধিকার থাকিবে, কিন্তু নৌ-বাহিনী চলাচলের জন্য কেবল দানিয়ুব সন্নিহিত রাষ্ট্র সমূহ এই নদী ব্যবহার করিতে পারিবে। এই নদী নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকিবে রাশিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, চেকোশ্লাভিয়া এবং অষ্ট্রীয়ার হাতে। ইহারাই দানিয়ুব রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত। পুরাতন চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মাণী এবং রুমানিয়া দানিয়ুব নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মধ্যে ছিল।

বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল কমিটিতে গৃহীত উল্লিখিত রুশ-প্রস্তাবের সহিত একমত হইতে না পারায় দানিয়ুব সমস্যা কি আকার ধারণ করিবে তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। রাশিয়ার উক্ত খসড়া-চুক্তির ভিত্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা চালাইয়া যাইতে ইচ্ছুক। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রস্তাব এই চুক্তির অঙ্গীভূত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুতরাং চুক্তির খসড়া যখন চূড়ান্তরূপে রচিত হইবে, তখন বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স উহা দস্তখত করিতে যে অস্বীকার করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

দানিয়ুব নদী ইউরোপের ভূমধ্য জলপথ সমূহের মধ্যে দীর্ঘতম জলপথ। জার্ম্মাণীর উল্‌ম হইতে আরম্ভ করিয়া রুমানিয়ায় দানিয়ুবের মোহনা পর্য্যন্ত এক হাজার মাইল দীর্ঘ দানিয়ুবের খাতধারা নৌ-চলাচলের উপযোগী। বর্ত্তমানে লিনৎসের নিকটে রাশিয়া নৌ-চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এই নদী এখন দুই অংশে বিভক্ত। দানিয়ুবিয়ান শিপিং কোম্পানীর বাণিজ্য-পোতসমূহ লইয়া রাশিয়ার

সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদের ফলে নৌ-চলাচলও যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। এই কোম্পানীটি অষ্ট্রীয়ার। এই কোম্পানীর ৩,৩৭,০০০ টন জাহাজের সমস্তই জার্ম্মাণ-সম্পত্তি বলিয়া রাশিয়া দাবী করিয়াছে। তন্মধ্যে ২,০০,০০০ টন জাহাজ বর্ত্তমানে রাশিয়ার দখলে এবং অবশিষ্ট জাহাজ দানিয়ুবের মার্কিণ-অধিকৃত অংশে মার্কিণ দখলে রহিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই নদীপথে ৩,৫০০টি বাণিজ্য জাহাজ চলাচল করিত। বর্ত্তমানে উহার সংখ্যা ২৫০০টির বেশী নয়। উহাদের দুই-তৃতীয়াংশ রাশিয়ায় নিয়ন্ত্রাধীনে এবং অবশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। দানিয়ুব নদীতে অবাধ নৌ-চলাচলের অধিকার স্বীকৃত হয় ১৮৫৬ সালে। ঐ সময় ব্রেইলা হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত নদীর নৌ-চলাচলের উপযোগী অংশ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ইউরোপীয় কমিশন গঠিত হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক কমিশনের মারফৎ দানিয়ুবের অবশিষ্ট নৌ-চলাচল উপযোগী অংশেও অবাধ নৌ-চলাচলের অধিকার বিস্তৃত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দানিয়ুব অঞ্চলে ইঙ্গ-আমেরিকার দাবীর বিরুদ্ধে রাশিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন—

নিগ্রোদিগকে নাগরিক অধিকার দানের কর্ম্মসূচী ডেমোক্রাটিক কনভেনশনে অনুমোদিত হওয়ায় দক্ষিণ মার্কিণ অঞ্চলের ডেমোক্রাটরা উহার প্রতিবাদে বার্ম্মিংহামে (আলাবামা) সমবেত হইয়া গত ১৭ই জুলাই (১৯৪৮) মিঃ ট্রুম্যানের সহিত প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য দক্ষিণ ক্যারেলিনার গবর্ণর জে, ষ্ট্রম থারমণ্ডকে প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন। বিগত ৭০ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম দক্ষিণ মার্কিণ অঞ্চলের ডেমোক্রাটরা দলীয় নীতি হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিলেন। যদি শেষ মুহূর্ত্তে কোন মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ অঞ্চলের ডেমোক্রাটদের এই বিদ্রোহের ফলে রিপাবলিকান দল আগামী নবেম্বর মাসের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা। মিঃ ট্রুম্যানের জয়লাভের পক্ষে ইহাই একমাত্র বাধা নহে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নূতন তৃতীয় দল প্রোগ্রেসিভ পার্টি প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হেনরী ওয়ালেসকে প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন। হেনরী ওয়ালেস জয়লাভ না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ভোটের সংখ্যা যে নেহাৎ নগণ্য হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মিঃ ট্রুম্যানের ভোট ভাঙ্গিয়াই যে তাঁহার ভোট সংগৃহীত হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং মিঃ হেনরী ওয়ালেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রিপাবলিকান দলের বিজয় লাভের পক্ষেই সহায়ক হইবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

প্রোগ্রেসিভ পার্টির কনভেনশনের প্রাক্কালে আমেরিকার কম্যুনিষ্ট নেতাদের গ্রেফতার কাকতালীয় ন্যায়ের মতই কি না, তাহা বলা কঠিন। আমেরিকার কম্যুনিজম-ভীতি যে অত্যন্ত প্রবল তাহা কাহারও অজানা নাই। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ ও হিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য প্রচার-কার্য্য চালাইবার অভিযোগে কম্যুনিষ্ট নেতাদিগকে গ্রেফতার করা হয়। বলপ্রয়োগ হিংসামূলক কর্ম্মপদ্ধতি ব্যতীত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিতে সমর্থ কি না, সে আলোচনা করা এখানে নিরর্থক। মার্কিণ কম্যুনিষ্ট পার্টির হিংসামূলক পদ্ধতি গ্রহণের জন্য প্রচার-কার্য্য চালাইবার কোন প্রমাণও সংবাদে উল্লেখ করা হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পরে ধনতন্ত্র ও কম্যুনিজমের মধ্যবর্ত্তী একটা পন্থা আবিষ্কারের যে প্রয়াস চলিতেছে, তাহাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ফ্রান্সের তৃতীয় শক্তির অভ্যুদয়ের মত আমেরিকার তৃতীয় দল প্রোগ্রেসিভ পার্টির সৃষ্টিও এই প্রয়াসেরই ফল। কিন্তু এই তৃতীয় শক্তির কর্ম্মনীতি মূলতঃ হয় ধনতন্ত্রবিরোধী এবং কম্যুনিজমের অনুকূল, না হয় কম্যুনিজম বিরোধী এবং ধনতন্ত্রের অনুকূল না হইয়া পারিবে না। এইরূপ কর্ম্মনীতি লইয়া জয়লাভ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি শক্তিশালী শ্রমিক প্রতিষ্ঠানই ওয়ালেসের কর্ম্ম-নীতির বিরোধিতা করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আমেরিকার কৃষিপ্রধান অঞ্চল গোঁড়া রিপাবলিকান। সুতরাং তৃতীয় দলের জয়ের আশা দেখা যায় না। ধনতন্ত্র সম্পর্কে ডেমোক্রাট এবং রিপাবলিকান দলের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, রিপাবলিকান দলের ধনতন্ত্রবাদ উগ্রতর। রিপাবলিকান দল জয়লাভ করিলে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধ তীব্রতর হইয়া উঠিবে।

যুদ্ধ-বিরতির পর প্যালেষ্টাইন—

১৮ই জুলাই (১৯৪৮) অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা হইতে নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধ-বিরতির আদেশ প্যালেষ্টাইনে বলবৎ হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ-বিরতির এক মাস হইতে চলিলেও প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণই এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। যদিও ব্যাপক সংঘর্ষের অবসান হইয়াছে, তথাপি যুদ্ধ-বিরতি সত্ত্বেও ইহুদী-আরবের ছোটখাট সংঘর্ষ অব্যাহত ভাবেই চলিতেছে। আরবরা বলিতেছে, ইহুদীরা যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়াছে, আর ইহুদীরা বলিতেছে, যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়াছে আরবরা। এই অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের কোন মীমাংসার চেষ্টা করা নিরর্থক। কিন্তু ইহা অবশ্যই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইহুদীরাই সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ গ্রহণ করে। আরবরা অনেক গড়িমসি করিয়া যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও আবার সর্ত্তাধীনে! ইরাক এবং সিরিয়া যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত গ্রহণ করে নাই। আরবরা যে সর্ত্তাধীনে যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমতঃ, তাহারা দাবী করিয়াছে যে, ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে আগমন বন্ধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যে তিন লক্ষ আরব আশ্রয়প্রার্থী আছে তাহাদিগকে প্যালেষ্টাইন হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ, যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হইলে চলিবে না। যুদ্ধ-বিরতি কালের একটা সময় নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এ-কথা অবশ্যই সত্য যে, প্যালেষ্টাইন সমস্যার একটা সুমীমাংসা যদি সম্ভব না হয়, তবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যুদ্ধ-বিরতি চলিতে পারে না। অনিশ্চিত অস্বস্তিকর অবস্থার চাপে এক দিন যুদ্ধ-বিরতি ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য।

যে তিন-চারি লক্ষ আরব আশ্রয়প্রার্থী আছে তাহাদের নিজ বাসভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করাও কঠিন হইবে না। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে যদি ইহুদী-রাষ্ট্র বহাল রাখিতে হয়, তবে ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে আগমন বন্ধ করিলে চলিবে না। আসল সমস্যা,

প্যালেষ্টাইন সমস্যার স্থায়ী মীমাংসা করা। কিন্তু স্থায়ী মীমাংসার কোন পথ দেখা যাইতেছে না। প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ইজরাইল্ গবর্ণমেণ্ট আরব-রাষ্ট্র সমূহকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু আরব-লীগ এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আরবরা ইহুদী-রাষ্ট্রকে স্বীকার করিতে রাজী নয়। ইহাই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কারণ। আরবরা প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-রাষ্ট্র মানিয়া লইবে না। আবার ইহুদীরাও গঠিত ইহুদী-রাষ্ট্র বিসর্জ্জন দিতে রাজী হইবে না। সুতরাং প্যালেষ্টাইনে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা কোথায়?

মালয়ের যুদ্ধ—

মালয়ে বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা চলিতেছে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ নূতন জরুরী আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে মালয়ের কতকগুলি এলাকার অধিবাসীদিগকে নাম রেজেষ্ট্রী করার এবং নাম, অঙ্গুলীর ছাপ ও ফটো সহ পরিচয়-পত্র প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ পরিচয়-পত্রহীন কোন লোককে আশ্রয় দেওয়া গুরুতর অপরাধ। গত ২৩শে জুলাই মালয়ের কম্যুনিষ্ট পার্টি, নিউ ডেমোক্রাটিক ইয়ুথ লীগ, মালয় দেশরক্ষী ইয়ুথ লীগ এবং মালয় জাপবিরোধী এসোসিয়েশন, এই চারিটি প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনী, বৃটিশ পুলিশ, সৈন্য-বাহিনী ও গুর্খা-বাহিনী গরিলাদের উপর ব্যাপক অভিযান চালাইতেছে। মালয়ের আভ্যন্তরীণ অঞ্চল হইতে বৃটিশ নারী ও শিশুদিগকে অপসারণ করা হইয়াছে। গরিলাদের খাদ্য-সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মালয়ের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ না কি পাহাং অঞ্চলের ধানের ক্ষেতগুলি বোমা বর্ষণ করিয়া ধ্বংস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই গরিলারা কাহারা তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। বৃটিশ সামরিক শক্তির অভিযানের সম্মুখে আর কত দিন তাহারা টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে তাহা অনুমান করিবার মত কোন তথ্য আমাদের কাছে নাই। তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ বলিয়া শোনা যায়। অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব তাহাদের যথেষ্টই আছে। থানা এবং সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া অস্ত্র সংগ্রহ করা ব্যতীত অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহের আর কোন উপায় তাহাদের নাই। তথাপি শক্তিমান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকেও গরিলাদিগকে দমন করিবার জন্য যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে।

গরিলারা বৃটিশ অভিযান্ প্রতিরোধের চেষ্টা যে একেবারেই করিতেছে না তাহা নয়। গবর্ণমেণ্টের সামরিক তৎপরতা সত্ত্বেও গরিলারা মাঝে-মাঝে হানা দিতেছে। জুলাই মাসের শেষ ভাগে গরিলারা মালয়ের কয়লা উৎপাদনকারী একমাত্র সহর বাটু আরা-এর উপর হানা দেয়। তাহারা কয়লা খনির সমস্ত যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে এবং কয়েক জন এশিয়াবাসী কর্ম্মচারীও তাহাদের গুলীতে নিহত হইয়াছে। টিনের খনি এবং চা-বাগানের ইউরোপীয় ম্যানেজার তাহাদের হাতে নিহত হইয়াছে। গত ৭ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী একটি রবার বাগানে গরিলারা হানা দিয়া উক্ত বাগানের স্কটিশ ম্যানেজারকে সপরিবারে হত্যা করে। তাহারা ধান-চাউল লুঠ ও প্রত্যেকটি গৃহ পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

গরিলাদের এই সকল কার্য্যকলাপ নিছক সন্ত্রাসবাদীদের কাজ বলিয়া অভিহিত করা যায় না। প্রত্যেকটি হানার পরে তাহারা ঐ স্থানে প্রাচীর-পত্র ঝুলাইয়া দিয়া যায়। উহাতে লেখা থাকে— 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক।' দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বৃটিশ কমিশনার মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড গত ৩রা আগষ্ট মালয় রেডিও-যোগে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "মালয়ের সন্ত্রাসবাদিগণ ৩রা আগষ্ট তারিখে মালয়ে সোভিয়েট গণতন্ত্র ঘোষণার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এ জন্য তাহারা পূর্ব্বেই কম্যুনিষ্ট শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল।" তাহাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু গরিলাদের বিরুদ্ধে বৃটেনের সামরিক অভিযান খুব সহজে সাফল্য লাভ করিবে, অবস্থা দেখিয়া এরূপ মনে করা কঠিন। গরিলাদের পিছনে যে মালয়ের জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন রহিয়াছে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু সুশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর প্রবল আক্রমণের সম্মুখে জনগণের প্রতিরোধ কত দিন টিঁকিতে সমর্থ হইবে তাহা অনুমান করা সহজ নয়।

অশান্ত ব্রহ্মদেশ—

গত এক মাসের মধ্যে ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। শুধু কম্যুনিষ্ট-দমনে ব্রহ্ম সরকারের দৃঢ়তা অবলম্বনের কথাই কিছু দিন ধরিয়া আমরা শুনিয়া আসিতেছি। হঠাৎ রেঙ্গুন হইতে ১২ই আগষ্টের সংবাদে দলত্যাগকারী বর্ম্মী সৈন্যদের হাঙ্গামা সৃষ্টির আশঙ্কায় রেঙ্গুনে সান্ধ্য আইন জারীর সংবাদ পাওয়া যায়। ১৩ই আগষ্টের সংবাদে বলা হয় যে, ব্রহ্ম রাইফেল বাহিনীর যে সাড়ে তিন শত সৈন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, ১০ই আগষ্ট তারিখে তাহাদের উপর ব্রহ্ম বিমান ও স্থলবাহিনী আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতেছে। ঐ সংবাদে আরও প্রকাশ যে, লেৎপাদানের নিকটে সরকারী সৈন্যবাহিনী এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সৈন্যদলত্যাগী ৬ শত লোকের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধে। এই সকল দলত্যাগী সৈন্য থায়েৎমিওতে অবস্থিত ব্রহ্ম সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং তাহারা রেঙ্গুন আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছিল।

এই সকল সৈন্যরা কবে দলত্যাগ করিয়াছিল তাহা কিছুই প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহারা কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া দলত্যাগ করিয়াছে, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। এই বিদ্রোহী সৈন্য পরাজিত হওয়ার সংবাদ সগৌরবে ঘোষণা করা হইলেও বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশের বহু ট্রেজারী লুণ্ঠিত হওয়ার যে-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খুবই চাঞ্চল্যকর। বেসিনের ট্রেজারী হইতে তাহারা ৫০ হাজার টাকা লুঠ করিয়া একখানি বিমানে করিয়া উহা অপসারিত করিয়াছে। বদ্বীপ অঞ্চলের জেলাগুলি হইতেও আরও ট্রেজারী লুঠের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ওয়ানেৎচুয়াং নামক একটি বড় ষ্টেশন বিদ্রোহীরা দখল করে। ফলে ১০ই আগষ্ট মঙ্গলবার রেঙ্গুন হইতে যে ট্রেণ ছাড়ে তাহা মাউবী ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে খুবই অশান্ত তাহা বুঝা যাইতেছে, কিন্তু অবস্থার স্বরূপ কিছুই সংবাদ হইতে বুঝা যায় না।

স্বাধীনতা দিবসের প্রথম বার্ষিকী

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আমরা প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজের অধীন থাকিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলাম। আজ এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম বার্ষিকীর দিন স্বতঃই মনে হয়, আমরা কি পাইয়াছি তাহার হিসাব নিকাশ করি।

প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, অর্থলোলুপ বৃটিশ বণিক ভারত ত্যাগ করিয়া, দেশ শাসন করিবার ভার কংগ্রেস ও মুসলিম নেতাদের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল কেন? ভয়ে অথবা ভালবাসার জন্য নহে, অনন্যোপায় হইয়া। আমাদের অহিংস-নীতি অথবা প্রেম তাহাদের দ্রবীভূত করে নাই। ইংরেজ জাতি সে পাত্রই নয়। দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে ইংরেজের সামরিক শক্তি হ্রাস পাইয়াছিল এবং আর্থিক শক্তি একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ভারতকে বশে রাখিবার শক্তির অভাবে এবং নিজেদের অর্থ নৈতিক অবস্থা সামলাইবার জন্য ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাইবার সময় মুসলিম লীগ ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে কাজে লাগাইয়া, পাকিস্তান ও স্বাধীন দেশীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের যত দূর ক্ষতি সম্ভব করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাদের কার্য্যকলাপে প্রাচীন ভেদনীতিরই পরিচয় রহিয়াছে, হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই নাই।

আমরা সংগ্রাম করিয়াছিলাম অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য। পাইলাম খণ্ডিত ভারতের ভুয়ো স্বাধীনতা। এই আত্ম-প্রবঞ্চনার ফল হাতে হাতে ফলিল। চারি দিকে সমস্যার ঘনমেঘ আকাশকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া দিল। পাকিস্তান, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ সমস্যা, আশ্রয়প্রার্থীদের দুরবস্থা, দেশের লোকের অন্ন-বস্ত্রাভাবে হাহাকার স্বাধীনতাকে কোণঠেসা করিয়া দিল। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম। মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে, কেন এইরূপ হইল? কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া ইংরেজ-প্রদত্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুঃখ-কষ্টের মূল সেই সকল সর্ত্তের মধ্যেই নিহিত। নেতৃবৃন্দ এখন আত্মরক্ষায় অর্থাৎ পাছে হাত হইতে শাসনদণ্ড খসিয়া পড়ে সেই চিন্তায়ই ব্যস্ত। দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভাবিবার সময় তাঁহাদের কোথা?

আমরা স্বাধীন হয়ত হইয়াছি, কিন্তু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। কবে মনে-প্রাণে সত্যকারের স্বাধীনতার আস্বাদ পাইব, সেই আশা-পথ চাহিয়া রহিয়াছি। কিন্তু রকম দেখিয়া মনে হইতেছে সে আশা সুদূর-পরাহত।

ষ্টার্লিং চুক্তি

ভারতের অর্থ-সচিব শ্রীসন্মুখম্ চেট্টি দীর্ঘকাল ধরিয়া আলাপ-আলোচনার পর বৃটেনের সহিত ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে এক চুক্তি করিয়া আসিয়াছেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বৃটেনের নিকট পাওনা আছে। তাঁহার নবচুক্তি অনুসারে ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সমর-সম্ভার ও কল-কারখানাগুলির জন্য ১৩৩ কোটি টাকা ভারতবর্ষ বৃটেনকে দিবে। আপোষে স্বাধীনতা লাভের দণ্ডস্বরূপ বৃটিশ আমলের অফিসারদের পেন্সন দিবার জন্য আমাদের বৃটেনকে আরও দিতে হইবে ১১৭ কোটি টাকা। এই দুইটি ব্যয় ও পাকিস্তানের পাওনা দিবার পর বৃটেনের নিকট হইতে আমাদের পাওনা ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ থাকিবে ১০৬৭ কোটি টাকা। অথচ দয়ার সাগর বৃটেন আগামী তিন বৎসরের জন্য শোধ করিবেন মাত্র ১০৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই টাকার সমস্ত অংশ কিন্তু ভারত-সরকার অন্যান্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া ষ্টার্লিং এলাকার বাহির হইতে জিনিষ-পত্তর কিনিতে পারিবেন না। চুক্তি অনুসারে প্রথম বর্ষে মাত্র ২০ কোটি টাকা ষ্টার্লিং এলাকার বাহিরে যে কোন মুদ্রায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

না বুঝিবার মত ঘোরাল ব্যাপার নহে। বৃটিশ শিল্পপতিরা ভারতকে সত্যকার শিল্পোন্নত না করিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠিত নূতন শিল্পের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনেই আগ্রহশীল। ইহা অর্থ-সচিব মহাশয়ও জানেন। আর মাত্র ২০ কোটি টাকায় ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তাহাও তিনি বোঝেন। ইহার মধ্যে আবার ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা জাপানের সহিত বাণিজ্যে ব্যয়িত হইবে। অথচ জাপান কল-কব্জা তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি দিতে অক্ষম। বস্ত্র-শিল্পের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি দিতে পারে। কিন্তু তাহাতে নূতন বৃহৎ শিল্প স্থাপন করা যাইবে না।

প্রশ্ন জাগিতে পারে, ভারতের স্বার্থ এই ভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে কেন? কারণ স্বরূপ এই বলা যাইতে পারে যে, আমাদের নেতারা বৃটেনের দুঃখে এত কাতর যে দেশের লোকের দুঃখ আর চোখেই পড়ে না। হয় তাঁহাদের গোলামী-জনিত হীনমন্যতা এখনও কাটে নাই অথবা বৃটেনের হাতে কলের পুতুলের মত নৃত্য করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। এই ধরণের নৈরাশ্যজনক চুক্তির পর অর্থ-সচিব আবার সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন! আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। ইনিই এক সময় অম্লান বদনে বৃটিশ-কর্ত্তাদের ভারত শোষণের পথ প্রশস্ত করিয়া অটোয়াতে ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের চুক্তি করিয়া আসিয়াছিলেন। লোক-নির্ব্বাচনে ভারত সরকারের কৃতিত্ব সর্বজন-বিদিত। যে ভাবে বৃটেন ঋণ পরিশোধের আয়োজন করিয়াছে, তাহাতে ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইতে অনন্ত কাল কাটিয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়।

মুদ্রাস্ফীতি

১৫ই আগষ্টের এক বৎসর পরও ভারতের লোকেরা অভাব, অনটন ও অনাহারে জর্জ্জরিত, অথচ জিনিষ-পত্রের মূল্য হু-হু করিয়া বাড়িয়া

চলিতেছে। এই বৃদ্ধির মূলে যে চোরা-কারবারীদের হাত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক কথা, গবর্ণমেণ্টের বেপরোয়া মুদ্রাস্ফীতি নীতির ফলে এই চোরা-বাজার ও জিনিষ-পত্রের অভাব ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত চালু টাকার পরিমাণে তেমন ইতর-বিশেষ ঘটে নাই। এক বৎসরে উহা বাড়িয়াছিল মাত্র দুই কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি অকস্মাৎ উহা গত বৎসরের ঐ সময়ের অপেক্ষা ১৪৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে,—"বাজারে চলতি নোটের পরিমাণ বাড়িবার ফলেই টাকার সরবরাহ বাড়িয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে চলতি নোটের পরিমাণ বাড়িয়াছিল মাত্র ৫৪ কোটি টাকা, আর ১৯৪৭-৪৮ সালে বাড়িয়াছে ১৩০ কোটি টাকা।" কিন্তু মার্চ্চ মাসের পরও নোট ছাপাইবার প্রয়াসে ভাঁটা পড়ে নাই। মে মাসের প্রথম এক সপ্তাহেই ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার নূতন নোট বাজারে চালু করা হইয়াছে। দেশে যখন জিনিষ-পত্রের অভাব রহিয়াছে এবং চোরা-বাজার পূরা দমে চলিতেছে, সে সময় বিপুল ভাবে কাগজের নোট ছাপাইয়া বাজারে ছাড়িয়া দিলে আরও অবনতি ঘটিবে ইহা তো স্বাভাবিক। মুদ্রাস্ফীতির এখনই গতিরোধ করা না গেলে কিছু কালের মধ্যেই ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িতে বাধ্য।

মুদ্রাস্ফীতির জন্ত দেশের অবস্থা যে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, অবশেষে ভারত সরকার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর সার চিন্তামন দেশমুখ বলিয়াছেন—"এই বৎসর বিশেষ করিয়া ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের পর হইতে উৎপাদন ব্যবস্থা, খাদ্য এবং বস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ার ফলে জিনিষ-পত্রের মূল্য দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।" ইহার জন্ত দায়ী ভারত সরকার। কনট্রোল তুলিবার পর হইতে চোরা-কারবার দমনের কোন ব্যবস্থা না করিয়া গভর্ণমেণ্ট উপরন্তু বহুল পরিমাণে নোট ছাপাইয়া ছাড়িয়া দিয়া জিনিষ-পত্রের দাম চড়াইয়া দিতে সাহায্য করিয়াছেন। এখন কি করা যায় সেই সম্বন্ধে সার চিন্তামন বলিয়াছেন,—"মুদ্রানীতি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, বাহির হইতে অত্যাবশ্যক তৈরী মাল আমদানী করিতে হইবে।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহাতে কিছুই হইবে না, কারণ চোরাকারবারীদের উপর সরকারের বিশেষ স্নেহ আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। উৎপাদনের যদি সত্যই অভাব ঘটিত, তাহা হইলে অধিক মূল্যেও লোক নিশ্চয়ই কাপড় পাইত না। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"জনসাধারণের হাতে যে অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা আছে, তাহা যদি সরাইয়া লওয়া যায়, তবে অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনা যাইবে।" এ স্থলে জনসাধারণের অর্থ—শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত। কারণ পরেই তিনি বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতির সময় আয়ের উপর হইতে অত্যধিক করভার লাঘব করিয়া দিলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপাদন বাড়িবে বলিয়া আমার মনে হয়।" তাহা হইলে নীতির মূল কথা হইল এই যে, যাহারা প্রচুর মুনাফা করিয়াছে, সেই সকল ধনিকদের উপর হইতে কর হ্রাস করিয়া অধিকতর লাভের সুযোগ দেওয়া এবং সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি হইলে জন-সাধারণের হাতে অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা থাকিবে, সুতরাং জিনিষপত্রের দাম বাড়িতে আরম্ভ করিবে, অতএব বেতন বৃদ্ধি হইতে না দেওয়া। শেষে তিনি বলিয়াছেন,—"সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত অল্প খরচে অধিক উৎপাদন করা।" অর্থাৎ কম খরচায় উৎপাদন বৃদ্ধির নামে শ্রমিক কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই করিয়া, বেতন কমাইয়া ও অধিক ঘণ্টা খাটাইয়া ধনিকদের লাভের পরিমাণ বাড়াইতে সাহায্য করা। কংগ্রেস সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে দেশের যে বিপর্য্যয় আসিয়াছে, তাহার সমাধানের জন্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্বংস করা শুধু নিন্দনীয় নয়, মারাত্মক। আমাদের বক্তব্য কেবল এইটুকু যে, জনসাধারণের সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

বয়ন-শিল্প ও বস্ত্র-সমস্যা

নয়া দিল্লীতে ভারতীয় বয়ন-শিল্প সম্মেলনের অধিবেশনে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে, বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারী নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সুযোগ লইয়া ভারতের বস্ত্র-শিল্পের মালিক ও বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা লুণ্ঠন-কার্য্য চালাইয়াছেন।

ভারত সরকার যে নূতন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মূল কথাই হইল, বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ এবং আংশিক বণ্টন নিয়ন্ত্রণ। এই নূতন নীতির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চারি শত কাপড়ের কলের মজুত মাল আটক করা হইয়াছে। টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী এই সকল কাপড়ে 'ন্যায্য' মূল্যের দাগ মারিয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর প্রাদেশিক বা দেশীয় রাজ্য গবর্ণমেণ্টের মনোনীত পাইকারী ব্যবসায়ীদের সাহায্যে বিক্রয়ার্থে বণ্টন করা হইবে। কিছু পরিমাণ সরকার-পরিচালিত খুচরা ব্যবসায়ী মারফৎ বিক্রয় হইবে; অবশিষ্ট অংশের কতক ক্রেতাদের সমবায় সমিতির মারফৎ এবং কতক অংশ সাধারণ ব্যবসায়ীদের মারফৎ বিক্রয় করা হইবে। অবশ্য প্রাপ্য কোটার কতটা অংশ কি ভাবে বিক্রয় করা হইবে তাহা স্থির করিবেন প্রাদেশিক সরকার। তাঁহাদের হস্তে এমন ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে কোন সাধারণ ব্যবসায়ী নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত দরে কাপড় বিক্রয় করিলে তাহার সমস্ত মজুত ষ্টক আটক করা যাইবে। তাঁতের কাপড় এই নীতির আওতায় পড়িবে না।

নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারত সরকার টেক্সটাইল এডভাইসরী কমিটির সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই কমিটির ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন সদস্যই বড় বড় কাপড়ের কলের মালিক। যথা, কৃষ্ণরাজ থ্যাকার্সে, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, অম্বালাল সরাভাই প্রভৃতি। সরকারী পরিকল্পনা মিল-মালিকদের আগেই জানিতে দেওয়া হইল কেন? আংশিক নিয়ন্ত্রণের ফলে পরে মিল-মালিকদের লাভের বখরা কিছু কমিয়া যাইবে বলিয়া আগামী তিন মাস জনসাধারণের ঘাড় ভাঙ্গিয়া সেই ক্ষতি পুষাইয়া লইবার সুবিধা করিয়া দেওয়াই কি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য?

সরকারী বণ্টন-নীতির মধ্যেও অনেক দোষ রহিয়াছে। সরকার-পরিচালিত দোকানগুলিতে কাপড় মাথা-পিছু বরাদ্দ প্রথা অনুসারে বিক্রয় হইবে, না শুধু নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয় হইবে তাহার কোন উল্লেখ নাই। অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে, অনেক ব্যবসায়ী সামান্য কিছু কাপড় কনট্রোল দামে বিক্রয় করিয়া কাপড় ফুরাইয়া গিয়াছে

বলিয়া ক্রেতাদের ফিরাইয়া দেন এবং পরে সেই কাপড় চোর-বাজারের অতল গহ্বরে প্রবেশ করে। সরকার-পরিচালিত দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে হয়ত এই গলদ কিছুটা দূর হইতে পারে। বস্ত্র-উৎপাদনের উপর সরকারী কর্তৃত্ব কতখানি থাকিবে তাহাও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ বস্ত্রের উৎপাদন যদি চোরাকারবারী মালিকদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে পূরা রেশন-ব্যবস্থাও লোকের দুর্গতি দূর করিতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে চোরা-কারবারী বস্ত্র-শিল্পের মালিকদের তুষ্ট করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—"দশ বৎসরের জন্য শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে না" তাহা আমরা জানি। কিন্তু শিল্প-মালিকেরা মূল্যহ্রাসের প্রতিশ্রুতি যেখানে পালন করেন নাই, সেখানে সরকারই বা প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য থাকিবেন কেন? বিশেষতঃ সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া শিল্প জাতীয়করণ যাঁহারা স্থগিত রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের একটা সংকাজের জন্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে লজ্জিত হইবার কারণ কি? তবে যদি চোরা-কারবারীদের সহিত মন্ত্রী মহাশয়দের অন্য কোন সম্বন্ধ থাকে সে কথা আলাদা।

কৃষি সংস্কার

কৃষি-সংস্কার কমিটির সভাপতি ডাঃ জে, সি, কুমারাপ্পা বলিয়াছেন যে, জমীদারী প্রথার বিলোপ নিশ্চিত। ক্ষতিপূরণ দিয়াই যে এই ব্যবস্থা করা হইবে তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। প্রশ্ন রহিয়াছে, কৃষকদের দেয় খাজনার কি হইবে? কমিটি খাজনা সম্পর্কে অভিমত গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছেন, খাজনা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে জমির ফসল দ্বারা দেওয়ারই কৃষকরা পক্ষপাতী। অবশ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই ফসল মজুত রাখা এবং বিক্রয় প্রভৃতি করা অনেক হাঙ্গামা রহিয়াছে। কিন্তু কৃষকদের সুবিধার জন্য তাহা করিতে হইবে। নগদ দাম দেওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইবে কৃষকদের মধ্যে জমির পুনর্ব্বণ্টন। কে কি পরিমাণ জমি পাইবে? ভারতে যে পরিমাণ কৃষক-পরিবার আছে তাহাদের প্রত্যেককে পল্লীবাসীদের হিসাব মত দুই শত বিঘা করিয়া জমি দেওয়া সম্ভব কি? সম্ভব যে নয়, তাহা এমনিতেই বুঝা যায়। হিসাবের প্রয়োজন হয় না। কাজেই জমির বণ্টন এমন ভাবে হওয়া উচিত, যাহাতে প্রত্যেক কৃষক-পরিবারই অন্ততঃ সংসারের ব্যয় চালাইতে পারে। কিন্তু তাহাও সম্ভব নয়। ইহাদের শিল্পের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার উন্নতি ও সংস্কার না হইলে কৃষি-সংস্কার হইতে পারে না। তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক উপায় ব্যবহার না করিলে ফসল উৎপাদনও বাড়ান সম্ভব নয়। খরচ প্রচুর, কিন্তু দেশের ভবিষ্যতের জন্য ব্যয় দেখিয়া কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলন

বোম্বাই-এ নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী আশা প্রকাশ করিয়াছেন—"সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য দেশে যে
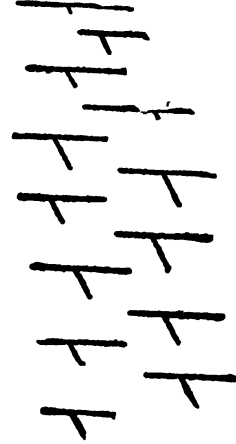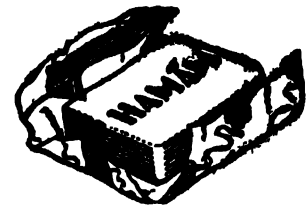
সমস্ত আইন প্রচলিত আছে, সেগুলির সংস্কারের জন্য সর্দার প্যাটেল একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটি ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার যে সকল আইন প্রচলিত আছে যথাসম্ভব শীঘ্র সেই সমস্ত আইন তুলিয়া লওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।" এ আশা কোন দিনই সফল হইবে না। সম্মেলন উপলক্ষে সমবেত স্যংবাদিকদের ভোজ-সভায় আপ্যায়িত করিতে গিয়া বোম্বাই-এর প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বি, জি, খের উপদেশ দিয়াছেন,—"গবর্ণমেণ্ট ও সংবাদপত্র সমূহ যদি পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা না করিয়া চলেন, তাহা হইলে দেশের উন্নতি বা সমৃদ্ধি সম্ভবপর হইবে না।" কথাগুলি আপাত দৃষ্টিতে সরল ও মধুর শোনাইলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গভর্ণমেণ্ট ক্রমাগত ভুল করিয়া চলিবেন,—পাকিস্তান, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া চোরা-কারবারীদের তোয়াজ এবং শ্রমিক কর্ম্মচারী নির্য্যাতন বৃটিশ আমলের মতই চালাইয়া যাইবেন, দেশের ও দশের দুঃখ-দুর্দ্দশা, অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না অথচ সংবাদপত্র তাঁহাদের সহযোগিতা করিয়া যাইবেন এরূপ আশা করা বৃথা। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য কি ইহাই নহে যে, চোখ-কাণ বুজিয়া সরকারের জয়জয়কার কর ভাল, নচেৎ—। ইহাই কি আমাদের নবার্জ্জিত স্বাধীনতার স্বরূপ?

বিহারে বাঙ্গালা-ভাষাভাষী

সাধারণ বাঙ্গালীদের মনে আজ এ ধারণা প্রবল হইয়াছে যে, কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙ্গালা ও বিহারের সীমা নির্দ্ধারণ ব্যাপারে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছেন না। কথায় ও কাজে তিনি বিহারের দিকে ঝুঁকিতেছেন। ন্যায়ের অবতার এই মিথ্যা অপবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালা-বিহার সমস্যা সম্বন্ধে আমি একটি কথাও বলি নাই; তবু লোকে আমার উপর পক্ষপাতিত্ব দোষ চাপাইতেছে।' কিন্তু তিনি নীরব কেন? কংগ্রেস বহু দিন হইতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথা বলিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেসের কার্য্য-বিবরণীর পুরাতন ফাইল ঘাঁটিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, কংগ্রেসের নেতারা ১৯১১ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু বার বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আজ যখন সেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখন তাঁহার নীরব থাকাটা কি বিসদৃশ ঠেকে না?

কিন্তু সত্যই কি তিনি চুপ করিয়া আছেন? হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষের নিন্দা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আপনারা হিন্দী ভাষা প্রচারের দিকে যথেষ্ট মনোনিবেশ করেন নাই। হিন্দী ভাষা যথোপযুক্ত ভাবে প্রচারিত হইলে আজ মানভূম প্রভৃতি বাঙ্গালা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন উঠিত না।" ইহার পরও কি বলা যায় তিনি নিরপেক্ষ? সময় বুঝিয়া তিনি মুখ বন্ধ করেন আবার সুবিধা মত মুখ খুলিয়াও থাকেন। এই সে দিন বলিয়াছেন যে, বিহারের কোন অংশ বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হইবে কি না, তাহা স্থির করিবার ভার ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর। গণভোট লইয়া তাহা স্থির করিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যায়। আপাত-দৃষ্টিতে প্রস্তাবটি সাধু, কিন্তু এই গণভোট গ্রহণ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা সম্প্রতি 'হরিজন' পত্রিকায় যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"রাজনীতি ক্ষেত্রে গণভোট গ্রহণই সর্ব্বশেষ পন্থা। রাজনীতিজ্ঞগণ আজ-কাল বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহার গতি ধরিয়া লইতে পারেন এবং গণভোটের ফল যাহাতে কোন বিশেষ পক্ষের অনুকূল হয়, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা সেই ব্যবস্থা করেন। স্বভাবতঃই যে দলের হাতে শাসন-ক্ষমতা থাকে, তাঁহারা তাঁহাদের অনুকূলে ভোট সংগ্রহ করিবার উৎকট সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকেন। দেখা যায়, বিহার গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে মানভূম জেলায় হিন্দী প্রচারকল্পে বিহার গবর্ণমেণ্ট এক পরিকল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গণভোট গৃহীত হইলে এই মানভূম জেলা যাহাতে বিহার হইতে বাহির হইয়া না যায়, সেই ব্যবস্থা করাই ইহার উদ্দেশ্য।" কাজেই মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলগুলির ভবিষ্যৎ গণভোটের উপর ছাড়িয়া দিলে ন্যায়সঙ্গত বিচারের কোন সম্ভাবনাই নাই। পশ্চিম-বঙ্গের গবর্ণমেণ্টও যে রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভয়ে মৌনী সাজিয়া বসিয়া আছেন, ইহাই দুঃখের কথা।

পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী

কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্ব্বসতি-সচিব শ্রীমোহনলাল সাকসেনা পূর্ব্ববঙ্গের দেশত্যাগী হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—"তাঁদের এ কথা অবশ্যই জানা উচিত যে, একসঙ্গে সকলে মিলিয়া দেশত্যাগ করিলে সমস্যার কোন সমাধান হইবে না।" কথাটা সত্য। কিন্তু কিসে সমাধান হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি নীরব। আজ যে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা গোঁজামিল দিয়া স্বরাজ লাভের চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল। দেশবিভাগে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন সম্মতি দিয়াছিলেন, তখন দেশবাসীর মত তাঁহারা লয়েন নাই। আজ কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদের সমস্যার কথা তুলিয়া এই সমস্যাটিকে ক্রমাগত ধামা-চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দায়িত্ব যে তাঁহাদেরই এ বিষয়ে তো কোন ভুল নাই!

শ্রীযুক্ত সাকসেনা স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তত্যাগ অহেতুক বলা চলে না। তাঁহার মতে "লোকজন হয়ত নিজ-নিজ গৃহে থাকা নিরাপদ বলিয়া মনে করেন না এবং সেই জন্যই তাঁহারা চলিয়া আসিতেছেন।" কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি জানাইয়াছেন, লোকজন পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসুক, ইহা তাঁহারা চান না। কেবল অসার আন্তঃ ডোমিনিয়ন চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে কি? পাকিস্তান তো সে চুক্তির কোন মর্য্যাদাই দেয় না। কংগ্রেসের গণ্য-মান্য নেতারাও তো সেখান হইতে পশ্চিম-বঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছেন। তাই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা সুখে দুঃখে পশ্চিম-বঙ্গে থাকাই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছেন।

প্রশ্ন, এই আশ্রয়প্রার্থীরা থাকিবে কোথায় এবং খাইবে কি? কেবল মাত্র পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। বিহারের বাঙ্গালা-ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন তাহা হইলে স্থানাভাবের সমস্যা কিছুটা

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৭শ বর্ষ—ভাদ্র ঃ ১৩৫৫ সাল

১ম খণ্ড ঃ ৫ম সংখ্যা

পুরানো স্মৃতির ঝরা পাতা

"দুর্গোৎসব নিকট হওয়াতে আমাদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং ভাগ্যবন্ত বা গরীব যাঁহারা তামাসা দেখিয়া সুখবোধ করেন তাঁহারা প্রফুল্ল মনে নিরীক্ষণ করিতেছেন দুর্গোৎসবের সে দিন কবে আসিবে আর আর স্থানে স্থানে পূজার তাবৎ প্রস্তুত হওয়াতে চতুর্দ্দিগে ক্রয়-বিক্রয়ের শব্দই শুনা যাইতেছে এবং ধনরূপ দেবতার আরাধনার্থে যাঁহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সামগ্রীসহিত দুর্গার আরাধনার্থ স্বদেশে গমন করিতেছেন ; অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্ব্বক আহারাদির ধূমেই কএক দিবস কাটাইবেন এবং পরিশ্রমী গরীব লোকেরাও ধনির নিকট তাঁহারদিগের জিনিসপত্র অধিক বিক্রয় করিয়া কএক দিবস সুখে থাকিবেন কিন্তু যদিও এই পুত্তলিকা পূজাদিকে আমরা ঘৃণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্ম্মেতে স্বদেশীয় লোকেরদিগের আহ্লাদেই আমরা আহ্লাদিত আছি কেননা যাঁহার যেপ্রকার মত তদনুসারে তিনি কর্ম্ম করুন তাহাতে আমরা প্রতিবন্ধক নহি পরন্তু যেমতে চলাতে যখন তাহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন সেই মতে দোষ দেখাইয়া আমরা অবশ্য বারণের চেষ্টা করিব। অদ্যকার জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিতৃপিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে ব্যয় করিতেছেন অতএব কহিতেছি এ সকলবিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির চক্ষুকর্ণের সুখের বিপক্ষ নহি কিন্তু আবশ্যক বিষয়ে শৈথিল্য করিয়া অনাবশ্যকবিষয়ে অধিক ব্যগ্র দেখিলে সে বিষয়ে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমারদিগের উচিত এবং নাচপ্রভৃতি অন্যান্য বিষয় যাহা দুর্গোৎসবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মের অংশ নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকেরা ঐক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ মহাশয়েরাও শুনিতে পারেন যে সকল ভারি ভারি বিষয়ে তাঁহারদিগের সাহায্য করা এবং তত্ত্ব নেওয়া অত্যাবশ্যক সেসকল বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া নাচ-প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্যে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি সর্ব্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয় দেখিতে পান না যে ঐ সকল বিষয়ে তাহারদিগের সাহায্য করিতে হয় আর ভারতবর্ষ কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্চে উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের তাবৎ গ্রামেই কি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে আর ভারতবর্ষস্থ তাবদ্দুঃখি ভিক্ষুকেরাও কি সুখী হইয়াছেন ইহাতে যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা স্বীকার করেন এ সমুদায়ই হইয়াছে তবে তাহারা নৃত্যাদিতে যে ব্যয় করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জনকের শ্রাদ্ধে এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দানের যে নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত বোধ করিলে নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্ত্তন করিয়া যে ধন বাঁচিবে তাহা কি কি বিষয়ে খরচ করিতে হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা তাহা না জানেন তবে কহিতেছি ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথবা বিলাতে গমনোপযুক্ত জাহাজ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা যাহা এতদ্দেশীয় লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন কিম্বা ঐ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন অথবা নানাবিধ শিল্প যন্ত্র এবং দেশের চাস বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নূতন নূতন অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে ব্যয় করুন কেন না ঐ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্ভ্রমের পত্তন যে প্রকার দৃঢ়তর ভাল নৃত্যাদি করাইলে তাহার লাভ সম্ভ্রম তদ্রূপ হইবেক না জ্ঞানান্বেষণে স্থান সঙ্কীর্ণপ্রযুক্ত পরিশেষে এই কহিয়া সমাপ্ত করিতেছি যে আমরা যাহা লিখিলাম দেশস্থ মহাশয়েরা তাহাতে মনোযোগ করেন ইতি।"

—জ্ঞানান্বেষণ, ৪ কার্ত্তিক, ১২৪০

(সংবাদপত্রে সেকালের কথা হইতে)

মহম্মদ আলি জিন্না

ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে জিন্নার আবির্ভাব নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার—ঐতিহাসিক এই কারণে যে, তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং ইতিহাসকে উদ্দীপ্ত করেছেন নিজের ক্ষুরধার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার আলোয়, যেমন করেছেন গান্ধীজী, নেতাজী। করাচীর রাজকোটের প্রসিদ্ধ খোজা-পরিবারে তাঁর জন্ম হয় ১৮৭৬ সালের বড়দিনের সন্ধ্যায়। সেদিন খৃষ্টমাস পর্ব্বদিনে করাচী সহরে যে জীবন নবীন জ্যোতিষ্কের মত উদিত হয়েছিল, পরবর্ত্তী কালে তা অনন্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত কিরণজালে সমগ্র ভারত আলোকিত ক'রে, সেই করাচীতেই পশ্চিম সমুদ্রতীরে অস্তমিত হোলো।

ভারতের বিংশ শতকের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে জিন্না অন্যতম বিরাট পুরুষ। ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় আর চরিত্রের দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। জিন্নার বয়স যখন মাত্র ষোল বছর, তখন তিনি ইউরোপে যান উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য। লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রের তালিকায় আজও তাঁর নাম আছে। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যুবক জিন্না যখন লণ্ডনের ছাত্র-সমাজে এক জন 'debator' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই সময় বাংলার দেশবন্ধুও এক জন কৃতি আইনের ছাত্র হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভবিষ্যতে যাঁরা এক দিন ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন—সেই জিন্না ও দেশবন্ধুর পরস্পর সাক্ষাৎ-পরিচয় এইখানে প্রথম। সেই সময় জেমস্ ম্যাকলিন নামে জনৈক ইংরেজ ভারতের প্রতি এক জনসভায় কুৎসা রটনা করে। যুবক চিত্তরঞ্জন অমনি তার প্রতিবাদ জানালেন প্রকাশ্য সভায় এক অগ্নিময়ী বক্তৃতা ক'রে। সেই জনসভায় শ্রোতাদের আসনে বসেছিলেন ক্ষীণদেহ, তীক্ষ্ণ-নাসা, প্রিয়দর্শন এক তরুণ। চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে সেই যুবক এগিয়ে এলেন বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে। বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে চিত্তরঞ্জনের অভিমতকে সমর্থন করে তিনিও এক বক্তৃতা দিলেন। সেই যুবক জিন্না। দু'জনের মধ্যে আলাপ হোলো এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ঠিক এই সময় দাদাভাই নৌরজী সেণ্ট্রাল ফিনসবেরী নির্ব্বাচন কেন্দ্র থেকে হাউস অব কমনস-এর সভ্যপদপ্রার্থী হন। চিত্তরঞ্জন তখন জিন্নাকে অনুরোধ করলেন দাদাভাই নৌরজীর নির্ব্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। বলা বাহুল্য, এক দিন দাদাভাই নৌরজীর বক্তৃতায় জিন্না এমন মুগ্ধ হলেন যে, তিনি চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। প্রকৃতপক্ষে, জিন্নার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রথম গুরুই ছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ এই দাদাভাই নৌরজী। তিনি লণ্ডনের 'ভারত সমাজে' যোগ দিয়া প্রথম রাজনীতি চর্চ্চা সুরু করেন।

১৮৯৬ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করে জিন্না ভারতে ফিরলেন এবং ১৮৯৭ সালে বোম্বাই হাইকোর্টে আইনের ব্যবসা আরম্ভ করলেন। প্রথম তিন বছর অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়। এই সময় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের জুডিসিয়াল মেম্বর স্যার চার্লস ওলিভ্যাণ্ট জিন্নাকে মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে একটি সরকারী চাকরী দিতে চান। জিন্না তা প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, তাঁর আকাঙ্ক্ষা দৈনিক দেড় হাজার টাকা উপায় করা। যে ভাবে মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাশ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে আইন-ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে পরবর্ত্তী কালে তীক্ষ্ণধী জিন্না বোম্বাইয়ের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যারিষ্টাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর নির্ভীক দৃঢ়তা, তাঁর যুক্তিজাল বিস্তারের নৈপুণ্য ছিল অনুপম। প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে তাঁর বুদ্ধি নির্ম্মল প্রভাময় তরবারির মত ঝলসে উঠতো। বিচারকগণ ব্যারিষ্টার জিন্নাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতেন। বহু কাল পরে যখন তাঁকে তাঁর সাফল্যমণ্ডিত জীবনের রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন জিন্না বলেছিলেন:—"Character, courage, industry and perseverence are the four pillars on which the whole edifice of human life can be built and failure is a word unknown to me."

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো। ক্রমে জিন্না রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হলেন। এই সময় (১৯০৫) ভারতের রাজনীতিতে গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথ দুই সূর্য্যের মত বিরাজ করছিলেন। দু'জনাই তরুণ জিন্নাকে প্রভাবান্বিত করলেন। ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো কলকাতায়। সভাপতি দাদাভাই নৌরজী। এই অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথম জিন্না ও দেশবন্ধুকে প্রথম কংগ্রেসী-মঞ্চে দেখা গেলো। ভাবাবেগহীন যুক্তিপন্থী জিন্নার তেজোগর্ভ বক্তৃতায় এক দিনেই তিনি নেতার আসন লাভ করলেন! এই বছরই ঢাকা সহরে মুসলিম লীগের জন্ম; কিন্তু জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জিন্না আবেদন-নিবেদনের ধামাবাহী লীগে যোগ দিলেন না। এর পর থেকে জিন্নার রাজনৈতিক জীবন দ্রুতবেগে ব'য়ে চললো। ১৯০৯ সালে বোম্বাই প্রদেশ থেকে তিনি ভারতীয় উচ্চ আইন সভার (Supreme Legislative Council) সভ্য নির্ব্বাচিত হলেন। কাউন্সিলের সভাপতি লর্ড মিনটোর সঙ্গে বাধলো তাঁর বিরোধ।

১৯১৩ সালে—জিন্না লীগে যোগদান করলেন। লীগে যোগদান করলেও তখনও পর্য্যন্ত জিন্নার মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ফুটে ওঠেনি—তখনও তিনি সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্ব্বাচন ও বিশেষ দাবীগুলির বিরোধিতাই করেছেন উদার জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। ১৯১৬ সাল—তাঁর নেতৃত্বে লীগ-কংগ্রেসের বিখ্যাত লক্ষ্নৌ চুক্তি। ১৯১৭ সাল—কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে তিনি লণ্ডন যান। ১৯১৮ সালে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে গান্ধীজীর অভ্যুদয়ের পর থেকে জিন্না নতুন ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলেন না, কারণ গোখলে-অনুপ্রাণিত জিন্না নিয়মতান্ত্রিক সীমার মধ্যে রাজনীতি চিন্তা করতে

অভ্যস্ত। ১৯২০ সাল—কংগ্রেস ত্যাগ করে জিন্না রাজনীতি ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ ও একক হলেন। কংগ্রেসের গান্ধী আন্দোলন তাঁকে পেলো না, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম রাজনীতি থেকেও তিনি দূরে রইলেন। দীর্ঘ আট বছর কেটে গেল। দূর থেকে জিন্না লক্ষ্য করছিলেন ভারতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী। তার পর চৌদ্দ দফা দাবী নিয়ে ১৯২৯ সালে পুনরায় নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন জিন্না। কিন্তু এবার আমরা যে জিন্নাকে পেলাম, এ সে জিন্না নয় যাঁর মুখ থেকে এক দিন উচ্চারিত হয়েছিল এই কথা : "We are all sons of this land, we have to live together. We have to work together and whatever our differences may be, let us at any rate not create more bad blood···believe me, nothing will make me more happy than to see a Hindu-Muslim Union."। অবতীর্ণ হলেন বটে, কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে তখন গান্ধীর অপ্রতিহত প্রভাব। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জাতীয়তার স্রোত তখন অন্য খাতে বইছে। লক্ষকণ্ঠে জয়ধ্বনি—মহাত্মাজী কি জয়! সেই জয়ধ্বনির মধ্যে তলিয়ে গেলেন জিন্না। গান্ধীর নেতৃত্ব জিন্নার নেতৃত্বকে গ্রাস করলো। জিন্না রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ এবং ইংলণ্ডে বাস করবার সংকল্প করলেন। এইখানেই জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অঙ্কের ওপর যবনিকা পড়ল।

সেই যবনিকা উঠলো আবার ১৯৩৫ সালে নয়া শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হবার পর। ১৯৩৭ সাল—জিন্না মুসলিম লীগের কর্ণধার রাজনৈতিক চেতনাহীন বিশাল মুসলিম সমাজে সাড়া জাগালেন জিন্না। তাদের করে তুললেন কর্ম্মচঞ্চল। সমগ্র সম্প্রদায়ের অন্তর-বেদনা তিনি অনুভব করলেন হৃদয় দিয়ে আর তার সমাধান করলেন প্রখর বুদ্ধি দিয়ে—অবশ্য সে বুদ্ধি উগ্র সাম্প্রদায়িকতার খাদ মেশানো। তাঁর কণ্ঠ আশ্রয় করে লীগের দাবী উঠলো—পাকিস্তান। চকিতে ভারতের রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল। কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—কায়েদে আজম জিন্না। জিন্না এবার কায়েদে আজম হলেন—এই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত লীগের তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।

পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস দ্রুততর বেগে বয়ে চললো। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যখন গান্ধীর নেতৃত্বে "কুইট ইণ্ডিয়া" দাবী নিয়ে ইংরেজকে বিস্মিত-বিমূঢ় করে দিল, ঠিক সেই সময় জিন্নার নেতৃত্বে লীগ দাবী জানালো—"Divide and quit"—এবং সেই দাবীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ যেন আশার আলো পেলেন। ১৯৪৪ সাল—স্মরণীয় গান্ধী-জিন্না আলোচনা। ১৯৪৫—সিমলার ব্যর্থ বৈঠক। জিন্না অটল—পাকিস্তান চাই। তার পর কিসে কি হয়ে গেলো, কেউ বুঝতে পারল না। যে জিন্না চিরকাল নিয়মতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের প্রতিবাদ ও নিন্দা করেছেন, কোন তৃতীয় পক্ষের নেপথ্য ইঙ্গিতে এবং প্ররোচনায় তিনি এক দিন মুসলমানদের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" আহ্বান করলেন—তা আজ বোঝা দায়। তার পর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভয়াবহ পরিণতি—কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাব, সিন্ধু। সেই রুধিরাক্ত ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো কীটদষ্ট বিকলাঙ্গ পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। সেই পাকিস্তান আজ দায় স্বরূপ জিন্না রেখে গেলেন পরবর্ত্তী বংশধর ও লীগপন্থীদের জন্তে।

আজ গান্ধী নাই, জিন্না নাই। গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে বিচ্ছেদ ভারতের এক প্রধান ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা। এই দু'জন মনীষী পৃথক্ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভারতের ইতিহাস ভেঙ্গেছেন, গড়েছেন। এক বছরের মধ্যেই এই দুই মহান নেতা জীবনের পরিপূর্ণ পরিণতির সম্মুখে শ্রদ্ধা-সম্মত চিত্তে আমরা আজ নতশিরে দাঁড়াব। আশা করবো, পাকিস্তান ও ভারত জিন্না ও গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বিকশিত হবে।

ক'লকাতা

সব্যসাচী সেন

কাক ডাকে জ্বলন্ত রোদ্দুরে
অবারণে তাবাই যদ্দুরে
প্রকাণ্ড পিচের রাস্তা
        ট্রাম বাস রিক্সা য় মুখর
ক'লকাতা শহর!

বহু উর্দ্ধে চির চেনা চির দেখা
        গম্ভীর আকাশে
প্রাঞ্জল রজত বর্ণ শঙ্খচিল
        চির অনায়াসে,
রৌদ্রস্নানে তন্ময় চঞ্চল!
ধূলি ধূম লৌহ কাষ্ঠ ইষ্টক প্রস্তরে ঘেরা
        জন-কোলাহল
ঐশ্বর্য্যের মায়াপদ্মে মধুলুব্ধ অযুত ভ্রমর
অযুত স্বার্থান্ধ হুল বিষতীক্ষ্ণ কামনা-জর্জর
ক'লকাতা শহর।
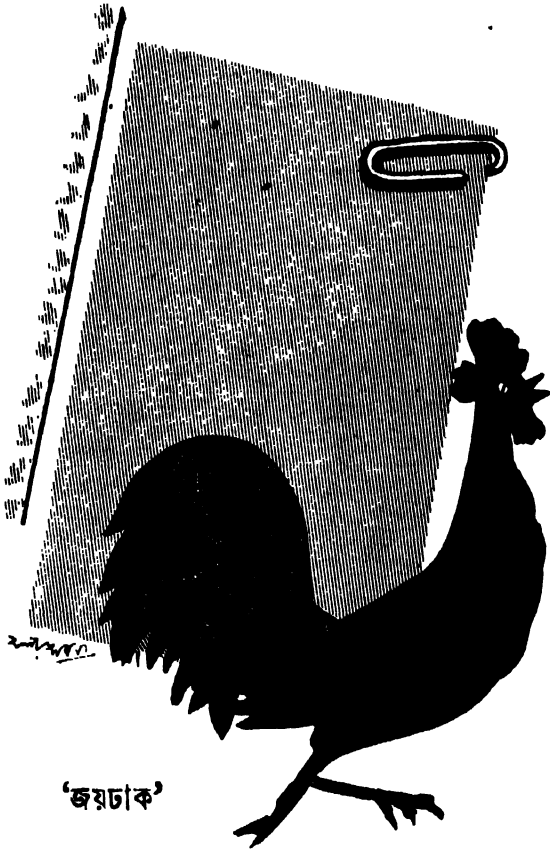
'জয়ঢাক'

প্রচারকলার উন্নতিকল্পে আধুনিক যুগে বহু রকমের প্রচেষ্টা ও গবেষণা চলেছে। এ বিষয়ে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, ভারতবাসীর দৃষ্টি পড়েছে বিজ্ঞাপনের দিকে। আজ জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টিদান না ক'রে উপায় নেই—পৃথিবীর দরবারে স্থানলাভ করতে হলে বিজ্ঞাপনের আশ্রয় ব্যতীত গতি নেই—ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় করতে হলে বিজ্ঞাপনের পদতলে লুটিয়ে পড়তে হবে—সংসার করতে হলেও বিজ্ঞাপনের গুণকীর্ত্তন করতে হবে। এমন কি মরণকালেও সেই বিজ্ঞাপনের 'অক্সিজেন গ্যাস' ব্যবহার করতে হবে—তার পর মরণ-বাঁচন সে আর এক জনের হাত।

বাঙ্গলা দেশ আজ প্রচারকলায় কতটা পারদর্শী তার পরীক্ষা হওয়ার দিন এসেছে। তার কারণ, বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠতম পণ্য-ব্যবসায়ীদের প্রচারের ভার কোন ইংরেজ কিংবা অ্যামেরিকান প্রচার-ব্যবসায়ীদের হাতে অর্পণ করা হয়নি। ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী টাটা কোম্পানীর নাম যেমন অ্যামেরিকান প্রচার-ব্যবসায়ী জে. ওয়াল্টার টমসন কোম্পানী প্রচারিত করেন, বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বটকৃষ্ণ পাল কিংবা বেঙ্গল কেমিক্যালের নাম অপর কেউ করেন না—যা করবার তারা নিজেরাই করেন।

হয়েছে যে "আমরা যেমন আমাদের প্রচারের কথা জানি, তা আর কেউ জানে না। আমাদের দেশের শিল্প ও পণ্য কিসের ধারে কাটে তা আমাদের মত আর কে জানতে পারে? আমাদের বিজ্ঞাপনের ভাষায় থাকবে আমাদের কথা, শিল্পে থাকবে আমাদের জাতীয় শিল্পধারার প্রতিচ্ছবি। আমাদের বিজ্ঞাপন দেখেই সাধারণে বুঝবে যে আমাদের বিজ্ঞাপন—তাতে কোন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের মাথা নেই, কোন বিদেশী শিল্পীর বিকৃত রেখা নেই। তার সবটুকুই আমাদের জাতীয় ধারার বিজ্ঞাপন।"

কথাগুলি কিন্তু আমাদের কথা নয়, স্যর বীরেন কিংবা নলিনীরঞ্জনের নয়, রাজশেখর বসু অথবা স্যর হরিশঙ্কর পালেরও নয়, কথাগুলি বলেছেন অ্যামেরিকার এক কোটিপতি ললনা। গোটা ছয়েক কোম্পানী আছে তাঁর, প্রত্যেকটির বাৎসরিক আয় প্রায় সাত কোটি টাকা।

বাঁঙলার ব্যবসায়ীদের অবসর সময়ে যদি কেউ প্রশ্ন করেন তাঁরা (তাঁদের মধ্যে যাঁদের সংস্কৃতির প্রতি নজর আছে) হয়তো ঠিক এই কথাই বলবেন। তাঁদের শিল্পমনকে যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায় তাঁদের মুখেও ঠিক এই ধরণের উক্তি শোনা যাবে। নলিনীরঞ্জন সরকার বলবেন—হ্যাঁ, আমি সাবিত্রীর হাতে দিয়াই তো নিশ্চিন্দি আছি।

রাজশেখর বসু নাম করবেন শিল্পী যতীন সেনের।

স্যার হরিশঙ্কর পাল দেখাবেন তাঁদের হোর্ডিং, যাতে বাঙালী আর্টের চরম নিদর্শন রয়েছে।

বাঙলার ব্যবসায়ীদের শিল্পদৃষ্টি তারিফ করার আগে বাঙলা সাহিত্যের একটি পুরাতন লেখা পড়লে কিন্তু তাজ্জব বনে যেতে হয়। ছয় যুগ পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে যে এই ধরণের আলোচনা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। রচনাটি ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখায় লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। লেখাটি বিজ্ঞাপনের উপকারিতা ও মহৎ গুণের কথায় পরিপূর্ণ হলেও প্রচারকলার ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন মনে করে উদ্ধৃত করলেম।

"—পাঁজীকে মাথায় করে রাখতে পারি কিন্তু দোহাই, পাঁজীর বিজ্ঞাপনের মায়াজালে পড়তে রাজী নই।" এই ধরণের কথা তো অনেকেই বলে থাকেন।

বাইরের চোখে বাঙলা দেশের বিজ্ঞাপনের অতীতেতিহাস স্মরণ করলে তাই মনে হয়, আজ বাঙলা দেশের কৃষ্টিক্ষেত্রে প্রথম খুঁজতে হবে স্বামী বিবেকানন্দের মত পাবলিসিটি অফিসার। তার পর বাঙলার বিজ্ঞাপন-ক্ষেত্র-কর্ষণের কাজে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অন্নদা মুনশী তো রয়েছেন। গুণেন রায়-চৌধুরী আর দিলীপ গুপ্তও আছেন।

লেখাটি উদ্ধৃত হল:—

"...বিজ্ঞাপন এক আশ্চর্য্য পদার্থ, এবং ইহার ক্ষমতা

মহিমা কীর্ত্তন করেন। স্তুতি এক জন কি একটি সম্প্রদায়কেই ভেড়া বানাইয়া থাকে; বিজ্ঞাপন ভোজরাজনন্দিনীর ভেল্‌কির মত, যুগপৎ সহস্র সহস্র লোকের চক্ষে ধাঁধা লাগায় এবং যেখানে যে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তাহাকেই ভেড়া বানাইয়াই মন্ত্রসাধকের সান্নিধ্যে টানিয়া আনে। স্তুতিমন্ত্রের আর এক দোষ এই, উহা জপ করিতে হইলে পরগুণ কীর্ত্তন করিয়া করিয়া জিহ্বাকে কলুষিত করিতে হয়, এবং ইহা কখনই সকল সময়ে সুখদ বোধ হয় না। বিজ্ঞাপনমন্ত্রের সাধনায় নিজগুণ বিনা জগতের আর কাহারও গুণ পরিকীর্ত্তন করিতে হয় না এবং নিজগুণ পরিকীর্ত্তনে যাহা কিছু নিন্দার সম্পর্ক থাকে, বিজ্ঞাপনের নামে তাহাও আর স্পর্শে না।

মনে কর, তোমরা তিনটি অজাতশ্মশ্রু যুবা, আর দুইটি অস্ফুটবুদ্ধি বালক কোন এক অন্ধকার গৃহে মিলিত হইয়া সংসারশৈল কি সমাজতরুর মূল ধরিয়া টানাটানি করিতে, অথবা রাজা-রাজড়া কি আর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে যথেচ্ছ গালি দিতে সংকল্পারূঢ় হইলে। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। ইহার জন্য অর্থ চাই, সামর্থ্য চাই, বুদ্ধি বৈভব এবং আর দশ প্রকারের ক্ষমতা চাই। অথচ তোমাদিগের ভাণ্ডারে তাহার একটিও দেখিতেছি না। তোমাদিগের ক্ষীণকণ্ঠ-নিঃসৃত ক্ষীণ ধ্বনি, তোমরা যেখানে উপবেশন কর, সেই স্থানের প্রাচীর চতুষ্টয়কে অতিক্রম করিয়া, কোন প্রকারেই সংসারে প্রতিধ্বনিত হয় না। নৈরাশ্যের এই সমস্ত নিষ্ঠুর লক্ষণ দেখিয়া তোমরা একবারে অবসন্ন হইতে পার। কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা কখনই অবসাদের কারণ নহে। তোমরা এই অবস্থায় থাকিয়াও, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কায়মনোবাক্যে বিজ্ঞাপনমন্ত্রের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও,—তোমাদের ঐ পাঁচ জনের সামান্য সম্মিলনকে ভারতশোধিনী কি ব্রহ্মাণ্ডপাবনী এইরূপ একটা কিছু ভৈরবনাদি তন্ত্রোক্ত নাম দিয়া সেই নাম গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, দেশে দেশে, এবং দিগ্‌-দিগন্তরে বিজ্ঞাপিত কর; দেখিবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভেড়া বনিয়া স্বয়মিচ্ছু বন্দীর ন্যায় তোমাদিগের দ্বারস্থ হইয়াছে, এবং তাহাদিগের অপকারের জন্য যে কোন সামগ্রীর আবশ্যক, ভক্তিসহকারে তাহা তোমাদিগকে সংকলন করিয়া দিতেছে।

যখন কতকগুলি লোককে ভেড়া বানাইয়া করায়ত্ত না করিলে সংসারে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, এবং বিজ্ঞাপনরূপ মহামন্ত্র প্রয়োগ বিনা কোন মনুষ্যই ভেড়া বনে না, তখন সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ীকেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইংলণ্ডের এক জন অধুনাতম তান্ত্রিক উপদেশ করিয়াছেন যে, যদি কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট ফল লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তিকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার ২৭ ভাগ প্রকৃত-কার্য্যে এবং ৭৩ ভাগ সেই কার্য্যের বিজ্ঞাপনে প্রয়োগ না করিয়া, শিঙা ফুকন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অর্থে দুই-ই এক। সে যাহা হউক, আমার নিকট এই বিভাগটি সুসংগত বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় প্রকৃত কার্য্যে মাত্র ১ ভাগ শক্তি এবং কার্য্যের ঘোষণায় ৯৯ ভাগ শক্তি প্রয়োগ না করিলে, দেখিতে দেখিতেই ফল ফলে না।

ভারতবর্ষে এইক্ষণ বাণিজ্যের উন্নতি নাই, স্বাধীন ব্যবসায়ের সম্মান নাই, উমেদওয়ারের চাকুরী নাই, বিবাহ-যোগ্যা কন্যার বর নাই, বরের পাত্রী নাই, বক্তার শ্রোতা নাই, লেখকের গ্রাহক নাই, এবং এইরূপ কোন বিষয়েই কাহারও আশার সাফল্য নাই। এই শোচনীয় অবস্থার যিনিই যে কারণ নির্দ্দেশ করুন, আমি অবধারিতরূপে বলিতে পারি যে, বিজ্ঞাপনমন্ত্রে উপেক্ষাই ইহার প্রধান কারণ। সত্য বলিতেছি, বিনা বিজ্ঞাপনে ভারতের কল্যাণ হইবে না। উকীল বিজ্ঞাপন দিতে জানেন না, মওয়াক্কেল কোন প্রকারেই ভেড়া বনে না। দোকানদার বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্য অনুভব করে না, খরিদদার দ্বারে আসিয়াও গৃহে প্রবেশ করিতে চায় না; এবং যাঁহারা যাজকতা ও পাঠকতা কি অন্যান্য ব্যবসায় আশ্রয় করেন, তাঁহারাও এই হেতু বাসনানুরূপ কৃতকার্য্য হন না।

বিজ্ঞাপনসাধনায় ইংরেজ সকল দেশের গুরু। ইয়োরোপ ও আমেরিকা বিজ্ঞাপনেরই বিলাসভূমি। কিন্তু তত্রত্য সকল স্থানের উপর লণ্ডনই এ বিষয়ে ললাটভূষণ। লণ্ডনে ঘাটে, মাঠে, হাটে, নগরোপান্তে, উদ্যানে, বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মাধিকরণে, ভজনামন্দিরে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপন। কেহ মরিল, তাহাতে বিজ্ঞাপন; কেহ জন্মিল, তাহাতেও ঐরূপ বিজ্ঞাপন। চক্ষু মুদিয়া যোগসাধন করিতে হইলেও লণ্ডননিবাসী আগে তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার বিজ্ঞাপন প্রচার না করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অন্যান্য দেশের লোকেরা বিদেশে গেলে, সঙ্গে অনেক সম্বল লইয়া যায়; লণ্ডনের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কএকখানি বিজ্ঞাপন মাত্র পকেটে পূরিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। তাঁহাদিগের কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না এবং কোন বিষয়েই তাঁহারা কোন অভাব অনুভব করিতে পান না। কারণ, ঐ বিজ্ঞাপন যাহার কপালে ছোঁয়ান যায়, সেই ভেড়া বনিয়া তাঁহাদিগের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

এদেশের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বহুমূল্য দ্রব্যাদিপূর্ণ দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকেন; লণ্ডন হইতে কেহ গায়ে একটি ছেঁড়া কোট এবং মাথায় একটি ভাঙ্গা হেট পরিয়া, এখানে আসিয়া, দুই একখানি বিজ্ঞাপন দেখাইয়াই সেই দোকানের সর্ব্বেসর্ব্বা অধীশ্বর হন; বাবুটি ভাবগদগদ ভক্তের মত মুচ্ছুদ্দির আসনে উপবিষ্ট হইয়া পদলেহন করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষে অনেক ইংরেজ বিস্তীর্ণ জমিদারি লাভ করিয়া এবং যাইবার সময় সেই জমিদারি একগুণে পঞ্চাশ-গুণ মূল্যে বন্ধক দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, ঐ সকল ইংরেজেরা যখন প্রথম শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন একখানি লাঠি আর কএকখানি

[পর পৃষ্ঠায় অবশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য]
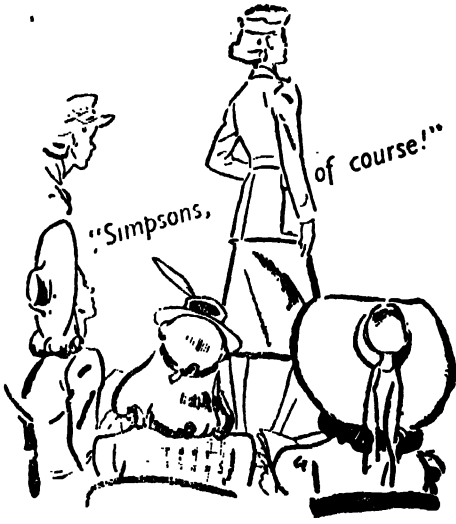
প্রেস্ লে আউট ডবলু, এস্, ক্রাফোর্ড, লিঃ
(সিম্পসন্ কোম্পানীর প্রেস্ বিজ্ঞাপন)

বিজ্ঞাপন ও প্রচারকলা

শিল্পপ্রচারণী

আজ থেকে একশ' বছর আগে যখন এই কলকাতা শহরের বাবুরা 'ফেটিং, সেল্ফড্রাইভিং বগি ও ব্রাউহামে' চ'ড়ে মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন, এমন কি 'বিবিজানের' সঙ্গে একত্রে বসেই চলতেন—'খাতির নদারৎ', তখন কলকাতার পথের উপর 'বেলফুল' 'বরফ' 'মালাই' ইত্যাদির চীৎকার শোনা যেত, মেছোবাজারের হাড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণাগাজীর গলি, আহীরিটোলার চৌমাথা লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকত, ইংরেজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে ছোটলোক ভদ্দরলোক আর চেনবার জো থাকত না। একালের মতন সেকালের শনিবারের ও ছুটি-ছাটার রাত্তিরেও শহর গুলজার হয়ে থাকত। কিন্তু এখনকার গুলজার কলকাতার সঙ্গে তখনকার গুলজার কলকাতার চেহারার কোন সাদৃশ্যই নেই বলা চলে। তখন ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর ক'রে বেরিয়ে যেন শহর মাতিয়ে তুলত। রাস্তার ধারে বড় বড় বাড়ীতে খ্যামটা নাচের তালিম হত, অনেকে রাস্তায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে ঘুঙুর আর মন্দিরার রুণুরুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ করতেন। যত সব বরাখুরে উনপাঁজুরের দল আর বারফটকা বাবুরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে হাসির গর্‌রা ছুটিয়ে মৌ লুটতে বেরুতেন আবার উড়ে বামুনদের দোকানে ময়দা-পেষা দেখে এবং বারবনিতাদের বারান্দায় কোকিলের ডাক শুনে ঘরমুখো হতেন। একালের কলকাতার সঙ্গে এদিক্ দিয়ে সেকালের কলকাতার আজও হয়ত অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কলকাতার সেই সন্ধ্যা-মূর্তির কোন চিহ্ন নেই আজ। আছে হয়ত, কিন্তু সে চীৎপুরের কোন চোরাগলিতে, টেরিটি বাজার অথবা মেছুয়াবাজারের আনাচে-কাণাচে গলি-ঘুপচিতে। একশ' বছর আগে কলকাতা শহরের রাস্তার দু'ধারে কাটা কাপড়, কাঠকাটরা ও বাসনের দোকান ছিল, পানের খিলির দোকানে বেল-লণ্ঠন আর দেয়ালগিরি জ্বলত, ঠাকুররা দুর্গাপ্রদীপ সামনে নিয়ে কাঁসর ঝাল দিত দোকানে, শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে ক'রে পচা মাছ আর লোণা ইলিস বিক্রী করত, কিন্তু আজকের কলকাতার মতন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুতিক আলো জ্বল্-জ্বল্ ক'রে জ্বলে উঠতো না চোখের সামনে, ল্যাম্প-পোষ্টে, দেয়ালের গায়ে, বাসে-ট্রামে-ট্রেণে, হোটেলে-কাফে-রেস্তোঁরায়, হাজার হাজার দোকানের সামনে, বাজারে-বন্দরে, চৌমাথার মোড়ে প্রাসাদ-শিখরে হরেক রকমের পোষ্টার, সাইনবোর্ড, শোকার্ড, উইণ্ডো-ডিসপ্লে, আলোকচিত্র ও আলোক-অক্ষর ঝলমলিয়ে উঠত না, ধাঁধিয়ে ঝলসিয়ে দিত না শহরের লোকদের। "ডোঙ্গরের বালামৃত" থেকে "ডি গুপ্তর পাঁচন", "মৃতসঞ্জীবনী সুধা" থেকে দেবজনের উপভোগ্য স্কচ হুইস্কি "হোয়াইট লেবেল", উইলসের 'ক্যাপষ্টান' থেকে গণি মিঞার নীল সুতোর "মিঠেকড়া বিড়ি," ফেরাজিনি-অরিজোনার "কেক্-প্যাটিস্ট্রিজ" থেকে রাজাবাজারের কসাইয়ের দোকানের কাটা গরুর বাসি দাবনা, চৌরঙ্গীর "গ্র্যাণ্ড" থেকে ছাতাওয়ালা গলির "মৃণালিনী কাফে", ডায়মণ্ড নেক্‌লেস, স্বর্ণচূড় থেকে ডেন্‌টিষ্টের দোকানের সাজানো মেকী দাঁতের পাটি, হ্যাট কোট শার্ট স্কার্ট ফ্রক ব্লাউস গাউন থেকে 'মানে-না-মানা' 'দিল্লী-চলো' 'জয় হিন্দ' ভয়েল ক্রেপ জর্জ্জেটের শাড়ী। ট্রাই-বাইসাইকেল পেরাম্বুলেটার থেকে ষ্ট্রীমলাইণ্ড পণ্টিয়াক ষ্টুডিবেকার পর্যন্ত সব একসঙ্গে অথবা একে-একে উৎসুক-নিরুৎসুক ঘোলাটে-চকচকে চোখের সামনে চমকে উঠে আমার আপনার এবং আরও অনেকের সেন্‌ট্রাল নার্ভাস সিষ্টেমের গোড়া পর্যন্ত এমন ভাবে নাড়া দিয়ে হকচকিয়ে দিত না। শহরের কোন এক অদৃশ্য কোণ থেকে যেন কোন অপারেটার সুদীর্ঘ একটি চলচ্চিত্রের রীল ঘুরিয়ে চলেছে, আর আমরা সকলেই যেন অসহায় দর্শকবৃন্দ। অসহায় বলছি এই জন্য যে, সারা কলকাতা

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর]

বিজ্ঞাপন বই কিছুই তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিল না। লণ্ডনের পুরুষ কেন, বায়ুভরবিলোলিতা অবলাও, বিজ্ঞাপনের বলে সময়ে সময়ে তেমন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ভেড়া বানাইয়া, তাহার স্কন্ধে চড়িয়া, সাংসারিক সম্পদের উচ্চতম স্থানে আরোহণ করেন। যেই ভেড়ারূঢ়া বিশ্বমোহিনীর নিরুপম মুখমাধুরী দর্শন করিলে, কেহই উচ্ছলিত প্রেমাশ্রু সংবরণ করিতে সমর্থ হয় না।"—বান্ধব, চৈত্র, ১২৮১]

শহরটাই যেন একটা বিচিত্র প্রেক্ষাগৃহ, আর তার ভেতরেই চলে-ফিরে বসে-দৌড়ে হাঁপিয়ে-হাই তুলে স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন দেখে আমরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছি। এই আজব প্রেক্ষাগৃহ থেকে মুক্তি নেই আমাদের। নেশাখোরের ট্যাঁকে কাণাকড়িও নেই, রাস্তায় বেরুতেই হোটেলের জ্যাজ-জিটারবাগ ঝনঝনিয়ে উঠলো, চোখের সামনে বৈদ্যুতিক অক্ষরে ঘোষণা করা হ'ল "স্কচ হুইস্কি হোয়াইট লেবেল" পান করুন। পেটে হয়ত বুভুক্ষু তাড়কা বৈঠক দিচ্ছে, এমন সময় ক্যাসানোভার মেনুবোর্ডের কাবাব-কোপ্তা-বিরিয়ানির ঝল্‌কানি উঠলো; গায়ে আধময়লা ছেঁড়া জামার পকেট থেকে ছারপোকা আর আরশুলার বাচ্চারা বেরিয়ে যখন সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে পিঠের ওপর ঘু'রে বেড়াচ্ছে তখন হয়ত গোলাম মহম্মদের উইণ্ডো-ডিস্‌প্লের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ভদ্দর-বেকারের ঝাপসা দৃষ্টির সামনে কাচের শার্সীর ভেতর দিয়ে ষ্ট্রীমলাইণ্ড ইউডিবেকার বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্ত্রীর হাতের নোয়াবাঁধানোটাও যখন বন্ধক পড়েছে তখন ঠাকুরলালের মুক্তাগার দেখে কি মনে হয়? কোলের শিশুটার অদৃষ্টে যখন পোড়া গয়লার পিটুলিগোলাও এক ফোঁটা জুটছে না, তখন 'বনি বেবির" হাতে হর্লিক্স আর গ্ল্যাক্সো অথবা লিলি বার্লির ফটোই গোলগাল বাচ্চাদের দেখে চোখে জল এলেও রেহাই নেই। মুক্তি নেই আধুনিক মানুষের। সংসারের মায়া যদিও বা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে ওঠা যায়, বিজ্ঞাপনের বেড়াজাল আর প্রচারের মোহমায়াজাল থেকে আধুনিক যুগে মুক্তি কোথায়?

দিনের আলোর কথা বলছেন? ইলেক্‌ট্রিক আর নিয়ঁন সাইনস হয়ত দিনের সূর্যের আলোয় চোখের সামনে জ্বলে উঠবে না, কিন্তু শত শত সংবাদপত্র সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন, লিফলেট পোষ্টার শোকার্ড, সাইনবোর্ড, দেয়ালের গায়ে, ট্রামে-বাসে-ট্রেণে আপনাকে সারাক্ষণ বিব্রত ক'রে তুলবে। আপনি হয়ত মনে করছেন যে রুদ্ধ কারার মতন এই মাটির পৃথিবীতে যখন বিজ্ঞাপন আর প্রচারের কবল থেকে মুক্তি নেই, তখন উদার উন্মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। কিন্তু হায়! তারও উপায় নেই। আকাশের দিকে চেয়ে দেখবেন, লম্বা ষ্টীমার আর ব্যানারের লেজ নিয়ে কোন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীর পণ্যবারতা ঘোষণা ক'রে হাওয়ায় উড়ছে রঙিন ঘুড়ি, আপনার মাথার ওপর। খেলার মাঠের অথবা ময়দানের ভীড়ের ঠিক ওপরে। শুধু কি তাই! দিনের আকাশ কলঙ্কিত ক'রে উড়োজাহাজ কেবল ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়ার অক্ষরে লিখে জানাচ্ছে, সাবান যদি মাখতে হয় তাহলে "পিয়ার্সের"। আর রাতের আকাশে ষ্টীমারের সার্চলাইটের আলোর অক্ষরে আঁকা পণ্যপ্রচার দেখে মুগ্ধ হবেন, না, শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদের সৌন্দর্যে আত্মহারা হয়ে কবিতা লিখবেন?

উপায় নেই রেহাই নেই, মুক্তি নেই, বিজ্ঞাপন আর প্রচারের মায়াজাল থেকে। সেকালে সংসারত্যাগীর জন্য নির্জন অরণ্য ছিল অনেক। একালে এমন কোন অরণ্য নেই যা পণ্যমালিকের প্রচারসীমান্ত ছাড়িয়ে। এ-যুগ পণ্যের যুগ, পণ্যই পুণ্য, মুনাফাই কাম্য, প্রতিযোগিতাই সাম্য। সুতরাং পণ্যের প্রচার আর বিজ্ঞাপনই এ-যুগের দৈববাণী। পণ্যই মন্ত্র, পণ্যই ধর্ম, পণ্যই

আর্ট-ওয়ার্ক—হ্যারী বেকফ, মিউওয়েল-ইমেট অঙ্কিত
(হোয়াইট রক্‌এর বিজ্ঞাপন)

জপ-তপ-ধ্যান। মুনাফাই তার ঐশী প্রেরণা। তাই অবাধ প্রতিযোগিতার অবিরাম ঘর্ষণের মধ্যে যদি হঠাৎ-আলোর টুকরোর মতন ঝল্‌কে উঠতে হয়, লক্ষ জোড়া চোখের সামনে যদি দেবতার মতন আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা করতে হয় "মা ভৈঃ! আমি আছি! আমি আছি!" তাহ'লে বিজ্ঞাপন চাই, প্রচার চাই।

বিজ্ঞাপনের জন্মকাল

এই সব ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, অনাদি অনন্ত কাল থেকে মানুষের সমাজে 'বিজ্ঞাপন' অথবা 'পণ্যপ্রচার' বলে কিছু ছিল না। শ্রমশিল্প ও যন্ত্রযুগেই এই 'বিজ্ঞাপনের' জন্ম হয়েছে এবং যান্ত্রিক শ্রমশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য (Free Enterprise) ও প্রতিযোগিতার (competition) যত তীব্রতা বৃদ্ধি হয়েছে, বিজ্ঞাপন ও পণ্যপ্রচারের ছলা-কলারও তত উন্নতি হয়েছে। এই মধ্যযুগের কথাই ধরা যাক। মধ্যযুগের সমাজে বিনিময়-ব্যবস্থা যখন টাকার (Money) মাধ্যমে না হয়ে সরাসরি জিনিসের বদলেই হত তখন বিজ্ঞাপনের কোন গুরুত্ব না থাকাই স্বাভাবিক। পণ্যের উৎপাদনও খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কারিগর ও কারুশিল্পীরা যা কিছু উৎপাদন করত তার চাহিদা তৈরী করতে হত না, তৈরী হয়েই থাকত সমাজের মধ্যে। তাছাড়া, তার বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও থাকত না বাজারে। মধ্যযুগের বাজারে গরু-ঘোড়া-উটের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের ভীড় জমত ঠিকই, কিন্তু সে ভীড় আর হট্টগোল আধুনিক যুগের বাজারের হট্টগোল নয়। বেচা-কেনার পালাটা বেশ নিরিবিলিতেই শেষ হয়ে যেত, বিনিময় হত জিনিসের মাধ্যমেই বেশী, যার যে জিনিস দরকার সে তাই নিয়ে তার বদলে

—জ্যোতিষ সিংহ অঙ্কিত
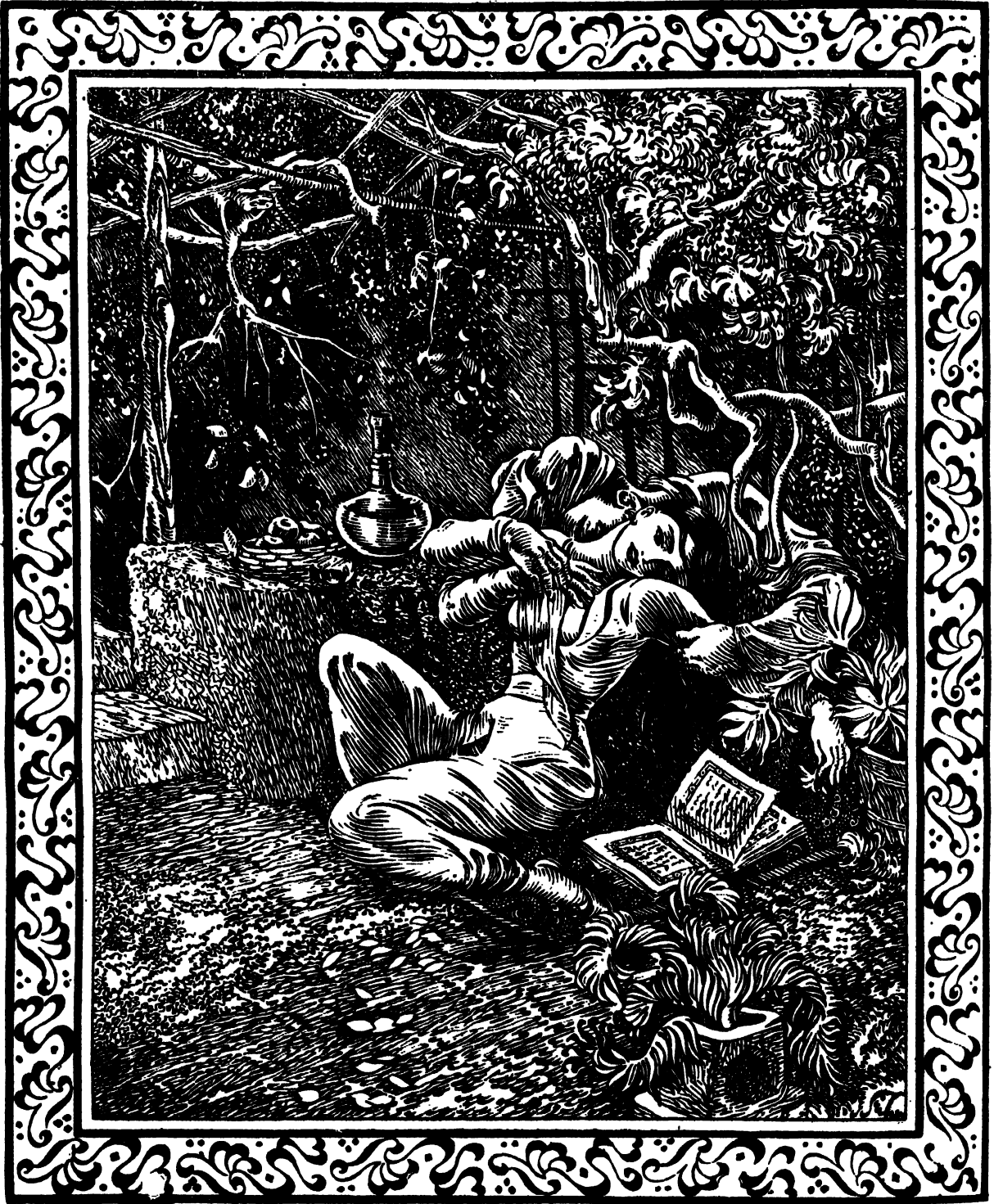
"কর্ম্ম-ক্লান্ত জগতের শ্রান্ত এ জীবনে যতটুকু অবসর পাও,
তোমার ও দু'টি ব্যগ্র বাহুর বেষ্টনে প্রিয়তমে বুকে টেনে নাও ;
সার্থক করো এ জন্ম আপনা বিলায়ে, প্রাণ তব ভালবাসে যা'রে,
হয় তো জননী লবে মুহূর্ত্তে ডাকিয়া সমাধির আঁধার-দুয়ারে,
নিশীথের মতো তাঁ'র শান্ত অন্তরের গাঢ়তর স্নেহ-আলিঙ্গনে,
চিরনিদ্রা যেতে হবে চিররাত্রি-দিন সংজ্ঞাহীন অনন্ত শয়নে।"

—রোবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম

তার নিজের তৈরী ও উৎপন্ন জিনিস দিয়ে যেত। সর্বশক্তিমান একব্রহ্ম "টাকা-মাধ্যমের" সৃষ্টি হয়নি তখনও। টাকা আর পণ্য-উৎপাদনের যন্ত্রদানবের যখন আবির্ভাব হ'ল সমাজে, হাড়গিলা মুনাফা-শকুন যখন লুব্ধ নখদন্ত নিয়ে সমাজের বুকে চেপে বসল, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আর অবাধ বাণিজ্যের নীতি যখন হাতধরাধরি করে হৈ-চৈ শুরু করল চারি দিকে, 'পার্লামেণ্ট' থেকে 'ফুটপাথ' পর্যন্ত, তখন বিজ্ঞাপন ও প্রচার-মাহাত্ম্যও ঘোষিত হল মুক্তকণ্ঠে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পণ্য-স্বাতন্ত্র্যও জোর-গলায় জাহির করা চায়। হ্যারিংটন আর হরিহর শেঠ স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠার তাদের অবাধ স্বাধীনতা, এই সব বাণী যখন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হল সমাজের মধ্যে তখন কারখানার যন্ত্রে উৎপন্ন 'পণ্যরও' একটা স্বতন্ত্র সত্তা, অশরীরী হলেও গজিয়ে উঠলো, পণ্যেরও আত্মপ্রতিষ্ঠার অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার করা হল। সাবান, মাথার তেল, মোটর গাড়ী, এ সব জিনিসের শতনাম সহস্রনাম ও গুণসাদৃশ্য যতই থাকুক না কেন, তবু কিউটিকুরা লালেবাই পিয়ার্স ক্যালকেমিকো টাটা মোদি, মরিস ষ্টুডিবেকার ক্রাইসলার ফোর্ড সকলেরই আত্মমাহাত্ম্য জাহির করার অবাধ স্বাধীনতা আছে এবং প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে যা ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কারও নেই। এই যে বিচিত্র 'পণ্যস্বাতন্ত্র্য' এরই চরম পরিণতি হল "ট্রেড মার্ক" ও "পেটেণ্টের" মধ্যে। বহুরূপী মানুষের হাজার রকমের রুচিগন্ধ স্বাদ-অভ্যাস-মিশ্রিত কলরবমুখরিত বাজারে বেরিয়ে মালিকের মূলধনজাত "পণ্য" সদম্ভে ঘোষণা করল "আমিই ব্রহ্ম, আমি এক অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় নাস্তি"। মার্কিণ ধনকুবের ডু'পণ্টের 'ক্যাণ্ডিই' হোক, আর বাঙলার ছেলে দুলালের 'মিছরিই' হোক, প্রত্যেকেরই অদ্বৈতসত্তা প্রত্যেকেই একক অদ্বিতীয়। প্যাকেট লেবেল আর নামটাই কিন্তু ব্রহ্মত্বের সর্বস্ব, যা-কিছু স্বাতন্ত্র্য তা ওর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। "আমার প্যাকেট আমার, আমার লেবেল আমার, আমার নাম আমার"—ডু'পণ্ট থেকে দুলাল পর্যন্ত সকলেরই এই একই ঘোষণা। তার পর কিন্তু নিউ ইয়র্কের মর্গান থেকে নিমতলার মদনমোহন সকলেই প্রায় সমান। এ-বাজারে 'প্যাকেট' আর 'লেবেল'-টাই আসল, আর সব ঠিক নকল না হলেও নগণ্য নিশ্চয়ই। "প্যাকেট' 'লেবেল' আর 'পেটেণ্ট নামটাকে' যদি ঝাণ্ডা উড়িয়ে জাহির করা যায়, অথবা ঠারেঠোরে নানা ছলা-কলা-ভঙ্গীতে যদি নাম আর লেবেলটাকে লোকের মনের মধ্যে ব্যাধের অব্যর্থ তীরের মতন বিঁধিয়ে ফেলা যায়, তাহলেই বাস্। বাজার মাৎ! চুঁচড়োর দুলাল দু'বছরের মধ্যে চড়চড় করে চিকাগোর ডু'পণ্ট হয়ে উঠলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিজ্ঞাপন ও প্রচারকলার এমনই ঐন্দ্রজালিক শক্তি!

বিজ্ঞাপন ও প্রচারমাহাত্ম্যের মোহিনীশক্তি অস্বীকার করার সহজ অর্থ হল পণ্যবাজারে একান্ত অকারণে অকাতরে আত্মহত্যা করা। বিজ্ঞাপনের নীতি-দুর্নীতি নিয়ে যাঁরা বচসা করেন, তাঁরা আপাততঃ সেই বচসার ব্যাপারটা স্বচ্ছন্দে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্ম মুলতুবী রাখতে পারেন। কথা হচ্ছে, বর্তমান সমাজ এবং তার উৎপাদন ও বিলি-ব্যবস্থা নিয়ে। যত দিন ব্যক্তিগত ভাবে মূলধনের মালিকের মুনাফা ও অবাধ বাণিজ্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে, তত দিন পণ্যের বাজারে, কেনা-বেচার বাজারে রীতিমত হৈ-চৈ হট্টগোল হবে, হল্লার চোটে কাণের পর্দা ফেটে যাবে, "মনমোহিনী মোচার চপ" থেকে

শো-কার্ড　　গ্রামের শেষ—জে, এফ, বী, অঙ্কিত

(লোটাস্ সুএর পোষ্টার)

'বনস্পতির' ভেঁপুর শব্দে পথচারীর পথচলা দায় হয়ে উঠবে। পণ্যের সাদৃশ্যের চেয়ে তার তথাকথিত সত্তার স্বাতন্ত্র্য যত দিন মহত্তর বলে স্বীকৃত হবে, তত দিন,—তত দিন তো নিশ্চয়ই, প্যাকেট ও লেবেল-মাহাত্ম্যমাথা হেঁট করে মেনে নিতে হবে, প্রেস ও পোষ্টারের মহিমাও কীর্তন করতে হবে। 'বিজ্ঞাপন' জিনিসটা ভাল কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক করার অবসর নেই এ সমাজে। বাজারের পণ্য-প্রতিযোগিতায় নির্মম নিষ্করুণ বাণিজ্যিক নির্বাচন ক্ষেত্রে, ডারুইনের বিবর্তনবাদের মূলসূত্র অনুযায়ী, যোগ্যতম হিসাবে আপনার উর্দ্ধতন ও উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হবে না, যদি বিজ্ঞাপনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আপনি ব্যবসায়ী হয়েও অকুণ্ঠচিত্তে না স্বীকার করেন; "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এ-কথা বলেছেন বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস। এ যুগে যদি সত্যিই কোন রসিক চণ্ডীদাস থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন—শুধু বলবেন না, বেতার-কেন্দ্র থেকে বার-বার ঘোষণা করবেন—"সবার উপরে বিজ্ঞাপন সত্য, তাহার উপরে নাই।"

বিজ্ঞাপনের রূপভেদ ও প্রচারকলা

বিজ্ঞাপনের রূপবৈচিত্র্যের অন্ত নেই বললেও ভুল হয় না। প্রচারকে উন্নাসিক কলাবিদ্‌রা চিরকাল অবজ্ঞা ক'রে এসেছেন, কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। আমাদের দেশে না হলেও, ইয়োরোপে আমেরিকায় 'প্রচার' এত দ্রুত 'প্রচারকলায়' রূপান্তরিত হয়েছে ও হচ্ছে যে তা ভাবলেও অবাক্ হতে হয়। প্রচারশিল্পী যাঁরা তাঁরাও আজ আর অবজ্ঞার পাত্র নন, চারুশিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য যা-ই থাকুক না কেন, এ-সমাজে পণ্য আর টাকার ষ্টীমরোলার সমস্ত পার্থক্য, সমস্ত ব্যবধান-প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে।

অনেক খ্যাতনামা চারুশিল্পী আজ প্রচার-শিল্পের সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাঁরা বাণিজ্যের হাড়িকাঠে আত্মবলি দিয়েছেন কি না সে সব গুরুগম্ভীর বড় বড় শিল্পশাস্ত্রকথার বা নীতিসূত্রের অবতারণা করে লাভ নাই। 'প্রচার' যখন করতেই হবে, 'বিজ্ঞাপন' যখন দিতেই হবে এবং প্রচার ও বিজ্ঞাপন যখন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলে-মিশে রয়েছে, তখন তাকে শিল্পকলার স্তরে ঠেলে তুলতেই হয় সমাজের মানুষের তাগিদে। নির্জন ষ্টুডিওতে বসে যে অভিজাত চারু-শিল্পী তাঁর কল্পনা-উর্বশীর সতীত্ব রক্ষা করে তাকে তুলির আগায় পটের উপরে রূপায়িত করেন এবং করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, তিনি আঁকেন কার জন্যে, কাদের জন্যে? উত্তরে তিনি বলবেন, মানুষের জন্যে, কিন্তু এই সমাজে সেই মানুষ কারা? নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের জন্যে না, কারণ তারা তাঁর অভিজাত চিত্রের অর্ঘ-মূল্য দিতে পারবে না, সুতরাং তারা চিত্রের সমঝদারও নয়। মূল্য দিতে পারবেন রাজা মহারাজা আর বিত্তবানেরা, এবং নগদ তা দিতে পারেন বলেই এ-সমাজে অভিজাত চারুশিল্পীদের শ্রেষ্ঠ সমঝদার তাঁরাই। অভিজাতরা এইটুকু বুঝলেন না যে তাঁদের অভিজাত্যটা ধোপে টিঁকল না। অরসিক ও বদরসিক মহারাজার হলঘরে যখনই তাঁর কল্পনাসতী দেয়ালের গায়ে ঝুলে পড়ল তখনই তাঁর গলাতেও ফাঁস পড়ল। চারুশিল্পীদের "চিত্রপ্রদর্শনী" বস্তুটাই বা কি? চিত্রের পসরা সাজিয়ে সঙ্গতিপন্নদের দ্বারস্থ হয়ে হাতজোড় করে পায়ের ধূলো দিতে বলা ছাড়া "চিত্রপ্রদর্শনীর" আর কি সার্থকতা আছে এ সমাজে? ওটাও কি বিত্তবান ক্রেতাদের জন্যে চিত্রপণ্যের দোকান সাজিয়ে বসা নয়?

এটুকু ব'লে নেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল, চারুশিল্পীদের (Fine Artist) নিরুৎসাহ করা নয়, মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করাও নয়, প্রচারশিল্পীদের (Commercial Artist) উৎসাহ দেওয়া, মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা। লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, প্রচারশিল্পী যাঁরা তাঁদের মনের কোণে কোথায় যেন একটা আত্মগ্লানির ভাব আত্মগোপন করে থাকে। এই আত্মগ্লানি ও আত্মদীনতাবোধের (Inferiority complex) জন্যেই প্রচারশিল্পীরা বিজ্ঞাপন ও প্রচারক্রিয়াকে আজও তেমন ভাবে শিল্পকলার স্তরে তুলতে পারেননি। প্রচার-শিল্পীদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তাঁদের চিত্রাবেদন সর্বজনের কাছে, সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছানো দরকার। বিজ্ঞাপন বা প্রচারের এইটাই সব চেয়ে বড় কথা। ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকলের কাছে সমান ভাবে তাঁর আবেদন যদি পৌঁছয় তাহলেই তাঁর প্রচারের সার্থকতা। এর মধ্যে এ কথাও ভুললে চলবে না যে, তিনি তাঁদের কাছেও আবেদন করছেন যাঁরা সমাজের মধ্যে বুদ্ধিমান রুচিবান ও সুরসিক বলে সুপরিচিত। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন ও পণ্য-প্রচার সকল শ্রেণীর সকল স্তরের লোকের জন্যে, তার মধ্যে বিত্তবান থেকে বিত্তহীন, রুচিবাগীশ থেকে স্থূলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি সকলেই আছেন। সুতরাং প্রচারশিল্পীর দায়িত্ব অনেক এবং দেশের সাধারণ লোক সকলেই সমান রুচিবান না ব'লে "বিজ্ঞাপন" স্থূল বা চলনসই হওয়া উচিত ব'লে মহাবিজ্ঞ সবজান্তার মতন যুক্তির অবতারণা করেন, তাঁদের যুক্তিও একেবারে অর্থহীন। "প্রচার" সার্থক করে তুলতে হলে তাকে "প্রচারকলার" পর্য্যায়ে ঠেলে তুলতেই হবে, তা না হ'লে তার শেষ পরিণতি নিশ্চিত ব্যর্থতা।

'বিজ্ঞাপন' ও প্রচারের এই শিল্পকলা ও সুরুচির দিক্‌টার গুরুত্ব না ভুলে গিয়ে তার রূপবৈচিত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। বিজ্ঞাপনের যে সব বিভিন্ন রকমের মাধ্যম আছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হল: প্রেস; পোষ্টার ও বাইরের বিজ্ঞাপন; ডাক-বিজ্ঞাপন; বহিরঙ্গ-বিন্যাস; বেতার ও ফিল্ম ইত্যাদি।

মোটামুটি এই পাঁচ শ্রেণীর প্রচার-মাধ্যমের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর "প্রেস" মাধ্যমই সর্বপ্রধান। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেসের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে এ কথা কতটা সত্য বা তর্কসাপেক্ষ। সোজাসুজি এবং তাড়াতাড়ি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র মারফৎ হাজার হাজার লোকের কাছে পণ্যবারতা পৌঁছে যায় বটে, কিন্তু এদিক্‌ দিয়েও বেতার ও সিনেমা আজকাল প্রেসের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া প্রেসের আধিপত্য লিখতে-পড়তে-জানা লোকসংখ্যা যে দেশে বেশী সে দেশে যতটা থাকার কথা, অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিতের সংখ্যা যে-দেশে বেশী সে দেশে ততটা থাকার কথা নয়। আমাদের দেশে প্রেসের চেয়ে বেতার ও সিনেমার প্রভাব অনেক বেশী হ'তে পারে যদি বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে এগুলি ব্যবহার করা যায়। এছাড়া আমাদের দেশে পোষ্টার ও বাইরের বিজ্ঞাপন (Outdoor Advertisement) প্রেসের চেয়ে কোন মতেই কম মূল্যবান বা সার্থক নয়। রেল-ষ্টেশনে, বাসে-ট্রামে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পণ্যবাহী ভ্যানে, প্রাচীরে, পোষ্টে সার্থক পোষ্টার-প্রচার প্রেসের চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্রদ হতে পারে। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে। বড় বড় শহর মহানগর বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে মফঃস্বল শহর, গ্রামের হাট-বাজার মজলিসকেন্দ্র তীর্থকেন্দ্র পর্যন্ত পোষ্টার বা প্রাচীরপত্র যদি লট্‌কে দেওয়া যায় তাহলে তা প্রেসের চেয়ে এ দেশের লোকের কাছে যে অনেক বেশী সার্থক হয়ে উঠবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? বেতার ও ফিল্মের সম্ভাবনাও সেই জন্য প্রচারমাধ্যম হিসেবে খুব বেশী। বিশেষ ধরণের প্রচার, বিশেষ শ্রেণীর ও স্তরের লোকের কাছে প্রচারের জন্যে ডাক-বিজ্ঞাপনও (Direct Mail) যথেষ্ট সার্থক হ'তে পারে। আর দোকান বাজার ও নানা রকমের পণ্যবিপনির বহি-রঙ্গবিন্যাস (Window Display) যে যথেষ্ট মূল্যবান তা তর্ক করে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। এর মূল্যটা যদিও আঞ্চলিক (Local), তাহলেও বিন্যাসের মানসিক প্রতিক্রিয়াটা স্থায়ীও ব্যাপক।

প্রচারের প্রত্যেকটা মাধ্যমের নানা দিক্‌ নিয়ে বিবাদ আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। না থাকলেও, একটা কথা অত্যন্ত সত্যি যে প্রচারের কোন মাধ্যমই সার্থক হ'তে পারে না, যদি না প্রচার "প্রচারকলা" হয়। একমাত্র বেতারের আবেদন শ্রবণেন্দ্রিয়ে, এছাড়া আর সবগুলি মাধ্যমের প্রধান আবেদন দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর এবং মানুষের স্বাভাবিক রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের উপর। প্রচারকর্তা যদি সাধারণ মানুষের রুচিবোধ নেই ব'লে মনে করেন, বা জনসাধারণকে স্থূলরুচি "জনতা" ব'লে অবজ্ঞা করেন তাহলে তাঁর প্রচার ব্যর্থ হবেই হবে। সাধারণ মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও বোধশক্তি তথাকথিত অসাধারণদের চেয়ে অনেক বেশী সুস্থ ও স্বাভাবিক। সুন্দর জিনিষের আবেদন সর্বজনীন—এই মূল্যবান সহজ সত্য কথাটা যেন বিজ্ঞাপনদাতারা না ভুলে যান।

এখানে যে কয়েকটি নমুনা বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল সেগুলি সবই বিদেশী হলেও তার রূপবিন্যাস (Lay-out) ও বিশিষ্টতা এ দেশের

প্রচারশিল্পী ও পণ্যমালিকদের লক্ষ্য করা উচিত। পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ী সিম্‌পসন কোম্পানী "প্রেস" বিজ্ঞাপনের রূপবিন্যাসের আবেদনটি অত্যন্ত সহজে সোজাসুজি রুচিবাগীশ অভিজাত মহিলামহল থেকে সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছে যায়। ছবি, অক্ষর ও বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর এমন সহজ-সুন্দর সমাবেশ, এমন সামঞ্জস্য যদি না থাকে তাহ'লে অধিকাংশ 'প্রেস' বিজ্ঞাপনই ব্যর্থ হয়। চোখের মণিতে ধাক্কা লেগে দর্শকের চোখ অন্য দিকে যদি ঘুরে যায় তাহলে বিজ্ঞাপন যতটা 'স্পেস্' জুড়ে থাকুক না কেন তার আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য। তেমনি ঠিক "হোয়াইট রক" বিজ্ঞাপনটির ড্রয়িং এবং টাইপের বিন্যাসটি লক্ষ্য করার মতন। হুইস্কির কাছে সোডার জল কিছুই নয়। কিন্তু তাহলেও চোখের মণিতে সোডার জলের যে বোতলটি ভাসছে সেটি পাশ্‌নের সুতো ধ'রে এলে "হোয়াইট রক্‌" ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। "হোয়াইট রক" সহজেই মনেতে খোদাই হয়ে যায় না কি? জুতোর যে শোকার্ডখানি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে জুতোটা অনেক উঁচুতে থাকলেও কেউ বিরক্ত বা অপমানিত বোধ করবেন না, তার সঙ্গে টাইপের সেটিং ও বিন্যাস দেখে বরং জুতোখানা মাথায় ক'রে নাচতে ইচ্ছে করবে। "লোটাস্‌ সু"-এর পোষ্টারখানিও ঠিক তাই। গ্রীষ্মের পরিবেশ যদি অমন সুন্দর ভাবে ছবিখানার মধ্যে না ফুটে উঠতো তাহ'লে গ্রীষ্মের দিনে লোটাস্‌ সু কেউ ব্যবহার করার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করত না। "প্রচারকলা" ও "চারুকলার" ব্যবধান যে দ্রুত ঘুচে যাচ্ছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

বোঝা গেলেও, আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনদাতারা, প্রচারকর্তা (Publicity Officer) ও প্রচারশিল্পীরা (Commercial Artists) এই সহজ সত্য কথাটা কবে বুঝবেন? দিন দিন তাঁরা বুঝবেন অবশ্য, সেইটাই আশার কথা। তাহলেও, এমন অনেক জুতোর সমাচার, তেল সাবান প্রসাধনের সমাচার, ব্যাঙ্ক-বীমা পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির সমাচার এমন ভাবে কি আমাদের কাছে জানানো হয় না, যা দেখলে মনে হয় চুলে জট্‌ পাকিয়ে গেলেও তেল মাখবো না, অর্ধনগ্ন হয়ে থাকলেও পোষাক পরব না, দরকার নেই ব্যাঙ্কে টাকা রেখে আর জীবনটাকে অনর্থক বীমা কোম্পানীতে বন্ধক দিয়ে? এ দেশের বড় বড় জুয়েলার্স ও স্বর্ণকাররা এমন কদাকার ভাবে অলঙ্কার ক্যাটালগে ফোল্ডারে পোষ্টারে এবং প্রেস বিজ্ঞাপনে সাজিয়ে দেন যা দেখলে ভুলেও কোন দিন ভালবেসে কেউ প্রেমিকাকে একটা গলার হার উপহার দেবে না, স্ত্রীকে স্বর্ণচুড় গড়িয়ে দেবে না। মনে হবে নিরাভরণ প্রেয়সীই অনেক বেশী সুন্দরী, তার হাতে বেড়ী আর গলায় শিকল পরিয়ে দিয়ে লাভ কি? এর জন্যে মালিক বিজ্ঞাপনদাতা, তাঁর প্রচারকর্তা বা প্রচারশিল্পী কেউ একা দায়ী ন'ন অবশ্য। মালিকের ইচ্ছা থাকলেও প্রচারকর্তার রুচিবোধ শিল্পবোধ থাকা সত্ত্বেও প্রচারশিল্পী তাকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করতে পারেন না। সার্থক প্রচারের জন্যে এই তিন জনেরই সহযোগিতা থাকা দরকার। প্রচারটাকে যদি ঢাকের বাদ্যি না মনে ক'রে এঁরা তাকে শিল্পকলার মর্যাদা দেন, এবং সাধারণ লোক, প্রধানতঃ যাদের জন্যে সমস্ত প্রচার ও বিজ্ঞাপন, তাদের যদি এঁরা স্থূল রুচির জড়ভরত "জনতা" ব'লে অবজ্ঞা না করেন তাহলেই "বিজ্ঞাপন" প্রথম শ্রেণীর "প্রচারকলার" স্তরে উঠতে পারে। প্রচারের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হবে—সুন্দরের জয় সুনিশ্চিত, সুন্দরের আবেদন সর্বজনীন।
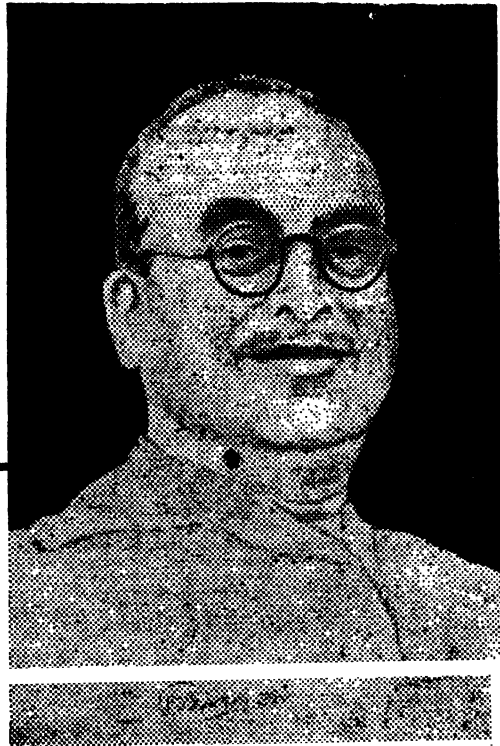
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই চিত্রটি একটি চতুর্দশ বৎসরের বালক কর্তৃক অঙ্কিত। শিল্পীর নাম গোপালকৃষ্ণ চৌধুরী। চিত্রটি প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

আমার মাতা রামপ্যারী সোহাগরাণী কাটজু

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু

আমার মা

সকল সন্তানই আপনার মাতাকে ভালবাসে এবং সংসারে অন্য কাহাকেও তাঁহার সমতুল্য মনে করে না। কিন্তু আমার মাতা শুধু যে আমারই আদরণীয়া ছিলেন তাহা নয়; তাঁহার পরিচিত এবং আত্মীয় সকলেই মনে করিতেন যে এরূপ ভদ্র মহিলা হাজারে এক-আধটি হয়। মাতার উন্নত ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া আমার মনে হইত যে তাঁহার যে যুগে জন্ম হওয়া উচিত ছিল তার ৫০ বৎসর পূর্ব্বেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আরও ৫০ বৎসর পরে জন্ম হইলে তিনি আমাদের দেশের মহিলা-সমাজের বিবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া সমাজে প্রভূত যশলাভে সমর্থ হইতেন। আমার বিশ্বাস, পাঠক-পাঠিকাগণ এরূপ এক জন বিদুষী মহিলার জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। এই জন্যই আমি আমার মাতার বিষয় কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। এই প্রচেষ্টায় আমি নিজেও তৃপ্তিলাভ করিব এই ভাবিয়া যে আমার জীবদ্দশাতেই আমার মায়ের সহিত অপর সকলের পরিচয় করাইয়াছি।

আমার মা ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা পণ্ডিত নন্দলাল, কাশ্মীরী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথমে পাঞ্জাবের হিসার জেলায় এবং পরে দীর্ঘকাল হোসিয়ারপুরে সরকারী আধিকারিক ছিলেন। মা'র জন্ম হয় হিসার জেলার সিরসা গ্রামে ১২৬৫ সালের মাঘ মাসে (জানুয়ারী ১৮৫৯)। বাপ-মা তাঁর নাম রাখিয়াছিলেন রামপ্যারী। শ্বশুরালয়ে সকলে তাঁহাকে সোহাগরাণী বলিয়া ডাকিত। বস্তুতঃ, তাঁহার দুইটি নামই ছিল সুন্দর এবং রাখাও হইয়াছিল শুভক্ষণেই। তিনি ভগবান রামের প্রিয় ছিলেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ, বিবাহের ৭১ বৎসর পরে তিনি আপনার সোহাগের প্রতীক—শাঁখা ও সিন্দুর লইয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

নন্দলাল নিজের কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। গৃহে রামপ্যারীর মাতা এবং পিতামহী উভয়েই বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। কিন্তু সেকালের চাল-চলন ছিল ভিন্ন ধরণের। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার কোনই চর্চা ছিল না। মা বলিতেন যে তাঁহার পিতামহীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল রুশিয়ার অধিবাসীদের মুখ হয় ঘোড়ার মত। বাষ্পীয় শকট তখন সবেমাত্র চলিতেছে, কিন্তু তাঁহার পিতামহী জীবনে কখনও রেল গাড়ীতে চড়েন নাই এবং বাষ্পের সাহায্যে গাড়ী চলার সম্ভাব্যতা আমরণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বাড়ীর মহিলাদের অবস্থা ছিল এমনিধারা। কিন্তু আমার মাতামহের বিদ্যানুরাগ ছিল অসাধারণ: স্বীয় পত্নীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি আপনার কন্যাকে নিজেই লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে আমার মাতার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি পিতার নিকট হিন্দী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, গণিত এবং ভূগোলও তিনি যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—জ্যোতির্বিদ্যাতেও তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছিল বিস্তর। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার এতই ব্যুৎপত্তি ছিল যে প্রধান প্রধান জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা চলিত। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ফারসী ভাষার গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ এক

দীবান হাফিজ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার বিচারশক্তি ছিল উচ্চ স্তরের। যাহা একবার পড়িতেন বা শুনিতেন তাহা চিরকাল তাঁহার মনে থাকিত। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেই চলে।

১২৭৫ সালে নয় বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় আমার পিতৃদেব পণ্ডিত ত্রিভুবননাথ কাটজুর সহিত। আমাদের আদি নিবাস (মালবা প্রান্তের) জাবরা গ্রামে। সহর হইতে দূরবর্ত্তী এক প্রান্তে এই গ্রাম অবস্থিত। ইহাতে ১২৭৫ সালে কোন রেলপথ ছিল না। এই ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রাচীন আবহাওয়া ও রীতি-নীতির আবেষ্টনীর মধ্যে মাতা ৫০ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত বন্দিনী ছিলেন। তাঁহার খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং কিয়ৎকাল পরেই সংসারের সমস্ত ভারই তাঁহার উপর পড়ে। তাঁহার দেবর এবং ভাশুরগণের সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ সংসার ছিল। গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম—রান্নাবান্না, ছেলে মানুষ করা, জামা-কাপড় সেলাই করা, ইত্যাদি—সব কাজই তিনি নিজেই করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার লেখাপড়ায় বিশেষ অনুরাগ ছিল, নিজেও পড়িতেন, অন্যকেও পড়াইতেন। দ্বিপ্রহরে (বেলা ১টা কি ২টায়) যখন সাংসারিক কাজকর্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতেন তখন পাড়ার মেয়েরা তাঁহার কাছে আসিত এবং বাড়ীতে একটি ছোটখাট পাঠশালা বসিয়া যাইত সেই মেয়েদের—তাতে শিক্ষকতা করিতেন মা নিজেই।

কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে শ্বশুর-ভাশুরের সম্মুখে ঘোমটা দেওয়ার রীতি নাই। তাঁহাদের পর্দ্দার ব্যবস্থা কেবল মাত্র অপর লোকের জন্য। আমাদের আত্মীয়-স্বজন সংখ্যায় কম ছিলেন না। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই আমার মাতাকে ঘিরিয়া থাকিতেন। পুরুষ ও বালকগণ তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিত। কখনও সংবাদপত্র পাঠ, কখনও পৃথিবীর নানা স্থানের ঘটনাবলীর আলোচনা, কখনও রাজনৈতিক চর্চ্চা, আবার কখনও বা মামলা-মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত আলাপ হইত। এই সমস্ত বিষয়ই তিনি শুনিতেন ও বুঝিতে পারিতেন। তিনি একবার আমার নিকট একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে একবার তোমার জেঠামশাই সন্ধ্যাবেলা আসিয়া বলিলেন, 'সোহাগরাণি! আজ নবাব সাহেবের বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক একটি প্রশ্নের উল্লেখ করেন। প্রশ্নটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহই তাহার সমাধান করিতে পারে নাই'। প্রশ্নটি কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কোন ব্যক্তির নয়টি পুত্র ছিল। তাঁহার নিকট ৮১টি মুক্তা ছিল। ঐ মুক্তাগুলির ১মটি হইতে আরম্ভ করিয়া ৮১তমটির মূল্য যথাক্রমে ১৲ হইতে ৮১৲ টাকা। প্রত্যেক পুত্রকে ৯টি করিয়া মুক্তা কি ভাবে ভাগ করিয়া দিলে তাহারা সমপরিমাণ মূল্যের মুক্তা পাইবে? প্রশ্নটি শুনিয়া জটিল বলিয়া বোধ হইল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সকলে নিদ্রিত হইলে আমি কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রশ্নটির সমাধান করিলাম। পরের দিন তোমার জেঠামশাইকে উত্তরটি দিতেই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহা নিয়া নবাব সাহেবের দরবারে গেলেন। তথায় তিনি গর্ব্বভরে তাঁহার ভাদ্রবধূ প্রশ্নটির সমাধান করিয়াছেন বলাতে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্ হইলেন"। মা আমাকে উক্ত প্রশ্নের উত্তরটি যাহা বলিয়াছিলেন, আজও আমার মনে আছে। পাঠক-পাঠিকাগণে[র] কৌতূহল নিবারণের জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১৯	২
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	২৮	২৯	৩
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৩৭	৩৮	৩৯	৪
৫১	৫২	৫৩	৫৪	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫
৬১	৬২	৬৩	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬
৭১	৭২	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭
৮১	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮
৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬৯	৩৬

স্বগৃহে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখিয়া ২০-২২ বৎ[সর] বয়স্কা কোন মহিলার পক্ষে এরূপ জটিল প্রশ্নের সমাধান করা অতি বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।

আমার মা সাধারণ মেয়েদের মতই গৃহকর্ম্ম করিতেন, কিন্[তু] তদানীন্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়ার পক্ষে তাঁহা[র] ভাবধারা ও জীবনাদর্শ ছিল অনেক উচ্চ স্তরের। তাঁহার এ[ই] ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে পুরুষগণ স্ত্রীলোকদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছে। তিনি বলিতেন, পুরুষেরা মেয়েদের গৃহপালিত পশুর মত নিজ[স্ব] সম্পত্তি বলিয়া মনে করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি যদি ৫ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে আধুনিক মেয়েদের আন্দোলনে (ফেমিনিষ্ট মুভমেণ্টে) তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন। তি[নি] বলিতেন, মেয়েদের ক্রিয়াকলাপ কেবলমাত্র উনানের পাশেই সীমাব[দ্ধ] রাখা হইয়াছে। খাওয়া-পরা দিয়া পুরুষেরা তাহাদিগকে বাড়ী[র] দাসী বলিয়া মনে করে। আমি বড় হইয়া এই সব কথা যখ[ন] বুঝিতে পারিতাম তখন হাসিয়া মা'কে বলিতাম, "মা, রান্নাঘরে উনানের পাশে তোমাকে যেন ঠিক অন্নপূর্ণা দেবীর মতই দেখায়।" তিনি খুবই রাগান্বিত হইয়া বলিতেন, "তোমরাই ত' এই সব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমাদের অকেজো করেছ।" তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে প্রত্যেক মেয়েমানুষ এমন লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখুক যাহাতে অন্নের জন্য তাদের পুরুষের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই তার সংস্থান করিতে সমর্থ হয়। তিনি বলিতেন, "বিবাহের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই, কেন না ঘর-সংসার করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। কিন্তু আমি চাই না যে মেয়েরা ভীরু হয়ে থাকে।" তিনি স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকারের সমর্থক ছিলেন এবং চাইতেন যে পতি-পত্নী সমানাধিকারের ভিত্তিতেই ঘর-সংসার করুক। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। যখনই শুনিতেন কিংবা সংবাদপত্রে পড়িতেন যে আমাদের দেশে কোন মেয়ে বি, এ, এম্, এ পাশ করিয়াছে অথবা অন্য কোন সম্মান লাভ করিয়াছে তখনই তিনি আনন্দে আত্মহারা হইতেন। ইহা আজ প্রায় ৬০-৬৫ বৎসরের কথা; তখন গ্রামাঞ্চল ত' দূরের কথা বড় বড় সহরেও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয় নাই।

সন্তানোৎপাদন বিষয়ে তাঁহার মতামত আধুনিক মতবাদেরই অনুরূপ ছিল। ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং সেই উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন, এক একটি সন্তানের

জন্ম অন্ততঃ চার বৎসর অন্তর হওয়া উচিত। একটি সন্তান মাতৃস্তন্য দ্বারা বিশেষ বর্দ্ধিত হইলেই পরবর্ত্তী সন্তান উৎপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বৎসর সন্তান হইতে শুনিলে তিনি ঘৃণা বোধ করিতেন এবং তিনি আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট ইহার সমালোচনা করিতেন।

বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত ছিল স্বতন্ত্র। বাল্যবিবাহ তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। বিবাহকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করিতেন না। সমস্ত ব্রাহ্মণকেই তিনি এক মনে করিতেন। প্রত্যেক বর্ণ, শ্রেণী, বর্গ এবং পর্য্যায়ে অসংখ্য বৈষম্য হেতু যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না।

তাঁহার জীবন যথার্থই পুণ্যময় ছিল। তিনি একান্ত শিবভক্ত ছিলেন এবং প্রত্যহ যথারীতি উপাসনা করিতেন। এই কারণেই তিনি যথাক্রমে আমার ও আমার ভাইয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কৈলাসনাথ ও অমরনাথ। তিনি অনেক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। আহারাদিতে বিধি-নিষেধ তাঁহাকে মানিতে হইত, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ গোঁড়ামী ছিল না। তিনি বলিতেন, "শাস্ত্রে যে সমস্ত আহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহার সহিত ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কোন সম্পর্ক নাই। ইহা করিয়াছিলেন আমাদের ঋষিগণ শরীরকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে, যেহেতু আহারের দোষে নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে। এই সকল ব্যবস্থাকে ধর্ম্মের রূপ দান করা হইয়াছে শুধু জনসাধারণের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে, অন্যথায় এসব ডাক্তারী শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

১৩১৫ সালে আমি কাণপুরে ওকালতি করিতে যাই। তথায় ৬ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ১৩২১ সালে আমি প্রয়াগ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করি। ইতিপূর্ব্বে সংযুক্ত প্রদেশের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। বর্ত্তমানে আমরা প্রয়াগেই বাড়ীঘর করিয়াছি। আমার ওকালতির প্রারম্ভেই মা তাঁহার বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি ১৩১৬ সাল হইতে আমার নিকট কাণপুরে ও প্রয়াগে যাতায়াত করিতে থাকেন। ছিলেন তিনি মুসলমানী এষ্টেট জাবরায়, যেখানে পর্দ্দা ছাড়া এক পা-ও চলিবার উপায় ছিল না; এমন কি মন্দিরে যাওয়া-আসারও চলন ছিল না; আর আসিলেন কাণপুর এবং প্রয়াগের জাহ্নবীতটে—তাঁর গতি সেখানে হইল অবাধ। সাংসারিক কাজকর্ম্ম তাঁর জাবরাতে যেমন ছিল কাণপুরেও ঠিক তেমনই। আমার নতুন ওকালতি আর নতুন জায়গার ঝঞ্ঝাট—তিনি তাহাতেই মগ্ন থাকিতেন। ছেলের ঘর-সংসার সাজানই কি তাঁর কম আনন্দের বিষয় ছিল! অধিকন্তু পর্দ্দার কড়াকড়ি এখানে বিশেষ না থাকায় প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন এবং কৈলাস-মন্দির দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতেন। এখানেও আমাদের স্বজাতি এবং অন্যান্য অনেক পরিবারের সহিত আমাদের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। মা তাঁহাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে ভালবাসিতেন। এসব স্থানেও নানা প্রকার আলাপ-আলোচনা হইত এবং তাহা হইতে তিনি নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতেন।

আমি প্রয়াগে ৭-৮ বৎসর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিলাম এবং পরে ১৩২৬ সালে নিজস্ব বাংলা ক্রয় করি। এত কালের পর মা তাঁহার নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার পূর্ণ সুযোগলাভ করিলেন। প্রয়াগে আসিয়া তিনি প্রায়ই দুই এক বৎসর করিয়া থাকিতেন। প্রত্যহ ত্রিবেণী, গঙ্গা ও যমুনায় স্নান এবং শিব-কুটী ও পঞ্চমুখী মহাদেবের মন্দিরে গিয়া বিগ্রহ দর্শন করিতেন। ঝুঁসী ও দারাগঞ্জের সাধু মহাপুরুষদিগের সেবা করা তাঁর একটি বিশেষ কাজের মধ্যে গণ্য ছিল। বাড়ীতেও সর্ব্বদা পূজা, পাঠ, কথা, হোম ইত্যাদি চলিত এবং এই সূত্রে পণ্ডিত পূজারীদের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। পূজার কোন অঙ্গহানি করা বা কোন মন্ত্রের অশুদ্ধ উচ্চারণ করার উপায় কোন পণ্ডিত মহাশয়েরই ছিল না। তাঁর সকল মন্ত্রই জানা ছিল এবং মন্ত্রসমূহের অর্থবোধ থাকায় সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হইতেছে কি না তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি দানশীলা ছিলেন এবং গুপ্তভাবে দান করিতে ভালবাসিতেন। তিনি কাহাকে কখন কি ভাবে সাহায্য করিতেন কেহই জানিত না। ভ্রমণ ও বায়ুসেবন করিতে তিনি সতত উৎসুক ছিলেন। সহরের বাহিরে গিয়া বাস করিবার আগ্রহ তাঁর ছিল, তাই গঙ্গার ধারে আমি একখানি বাগান কিনিলাম। বাগান করিবার বিদ্যা তাঁহার কতদূর ছিল আমি তাহা উপলব্ধি করি তাঁহার প্রয়াগে আসার পরেই। মালীদিগকে ডাকিয়া তিনি নিজে উপদেশ দিতেন। অনেক ফুল ও ফলের গাছ নিজ হাতে রোপণ করিয়াছিলাম—আম, পেয়ারা, চামেলী ও গোলাপের বহু গাছ আজও আমার বাংলাতে এবং বাগানে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

মা সর্ব্বদাই সাধ্যমত গো-সেবা করিতেন। প্রসবকালে তিনি গরুকে বাড়ীর বৌ-ঝির মতনই সেবা করিতেন। প্রসবের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই তিনি গরুকে ঘরে আনাইয়া নিজেই তার পরিচর্য্যা করিতেন। প্রসবান্তে গরুকে মাসের পর মাস খুব যত্নের সহিত খাওয়ান হইত। বকনা বাছুর হইলে মার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। ঐ বাছুরকে বাড়ীতেই পালন করা হইত। আমার মায়ের আমলের কয়েকটি গরু এবং ইহাদের বকনা বাছুর আমাদের বাড়ীতে আজও বর্ত্তমান আছে। তাঁহার আদেশ ছিল বাছুর বড় না হওয়া পর্য্যন্ত গরুর একটি বাঁট যেন দোহন করা না হয়। পশু চিকিৎসাতেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষিত হইত। তিনি কুকুর বিড়াল দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না; বলিতেন, কুকুর নোংরা আর বিড়াল বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু রঙ-বেরঙের টিয়া, ময়না প্রভৃতি পাখী তিনি খুব পছন্দ করিতেন ও পুষিতেন।

ডাক্তারী বিদ্যার প্রতি মা'র বিশেষ অনুরাগ ছিল। বর্ত্তমান কালে জন্ম হইলে তিনি অবশ্যই লেডী ডাক্তার হইতেন। কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়াও তিনি চিকিৎসায় সবিশেষ অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ ছিলেন। মানব-দেহের গঠন (এনাটমী), হৃদয়, মস্তিষ্ক, কাণ ও চোখের ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। আমাদের আত্মীয়-স্বজনবর্গের অনেকেই ডাক্তার। জাবরা ও ইন্দোরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হরিরাম পণ্ডিত আমার সহোদরোপম বন্ধু। ইঁহার সহিত মা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনিও আমার মা'কে সুযোগ্য পাত্রী বিবেচনা করিয়া সসম্মানে এবং সাদরে তাঁহার সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতেন ও অতি নিগূঢ় তথ্যও তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতি

বিদ্যায় তিনি এক জন ভাল লেডী ডাক্তারেরই সমকক্ষ ছিলেন। বাড়ীর বৌ-ঝি ছাড়া পাড়া-প্রতিবেশী ও চাকর-বাকরদেরও চিকিৎসা তিনি করিতেন। টোটকা এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধপত্রও তাঁহার জানা ছিল। তিনি অশেষ যত্ন ও আন্তরিকতার সহিত রোগীর পরিচর্য্যা করিতেন।

এ সকল গুণ ভিন্ন অন্য যে কারণে সকলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত তাহা ছিল তাঁর স্বভাবের মাধুর্য্য। আবালবৃদ্ধযুবা সকলেই তাঁহার সান্নিধ্যে পাইত আনন্দ। সেকালের প্রাচীনাদের মধ্যেও তাঁর প্রতিপত্তি কম ছিল না। সামাজিক রীতি-নীতি, বিবাহের দেনা-পাওনা, শাস্ত্রবিধিমতে পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁর মতামত অগ্রগণ্য ছিল। বাড়ীর স্কুল-কলেজগামী ছেলেমেয়েগণ মা'র কাছে থাকিতে পছন্দ করিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁহার চিরকাল মনে ছিল। আজকাল গান-বাজনার চর্চ্চা হয়। কিন্তু তিনি গান শিখেন নাই, গাহিতেও জানিতেন না; তবে গান শুনিতে খুব ভালবাসিতেন। আমার মেয়ে লীলার গলা ভাল ছিল। সে যখন ভক্তিভরে মীরার ভজন গাহিত মা তাহা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হইয়া শুনিতেন। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পুরুষেরাই মা'কে শ্রদ্ধা করিত বেশী। ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের পরিবারে কেহ জজ, কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনিয়র, ব্যবসায়ী আবার কেহ বা সরকারী আধিকারিক। সকলেরই সর্ব্বদা আসা-যাওয়া ছিল। চাকরকে যখনই জিজ্ঞাসা করিতাম, "অমুক বাবু কোথায়?" উত্তরে শুনিতাম তিনি মা'র কাছে। যেই আসিত সেই তাঁরই কাছে গিয়া নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলিত। তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলকে সদুপদেশ দিতেন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত তাঁহার কাজের আলাপ করিবার বিষয়-বস্তুও ছিল বিভিন্ন রকমের। ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এবং ডাক্তারের সঙ্গে ডাক্তারী বিষয়েই আলোচনা হইত। এদিকে আমি প্রায় প্রত্যহ রাত্রিবেলায় আহারের পর তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইতাম আর আমার মামলা-মোকদ্দমার কথা বলিতাম। তিনি এ সমস্ত বিষয় বেশ ভাল বুঝিতেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার বলে এমন সব যুক্তির অবতারণা করিতেন যাহাতে আমার কাজের অনেক সুবিধা হইত।

দুঃখের সময়, আমার মায়ের মত সান্ত্বনা দিতে বোধ হয় কম লোকই পারে। শোকে মুহ্যমান ব্যক্তিও তাঁহাকে দেখিলে এবং তাঁহার শান্তিপূর্ণ উপদেশবাণী শুনিলে সান্ত্বনা লাভ করিত। মনে পড়ে, আমার ভাগিনেয় পিতামাতার বিনা অনুমতিতেই জাহাজে চড়িয়া আফ্রিকা ভ্রমণে বাহির হইলে আমার ভগিনী অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবেই বার বার মায়ের কাছে আসিতেন। তিনি আমার একদিন বলিলেন যে 'সোহাগরাণী চাচী'র কাছে আসিলে মনে যে অপূর্ব্ব শান্তিলাভ হয় তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। স্বর্গীয়া স্বরূপরাণী নেহেরুর সঙ্গে মা'র ঘনিষ্ঠতা ছিল খুব বেশী। মা'কে তিনি নিজের বড় বোনের মতন মনে করিতেন এবং সেই সূত্রে আমাকেও ছেলে বলিয়া ডাকিতেন। তিনি বলিতেন, "সোহাগরাণীর কথাবার্ত্তা, বিচার-বিবেচনা এবং উপদেশ আমার বড়ই ভাল লাগে। ওঁর সঙ্গে কথা কহিলে আমার সকল কষ্টের লাঘব হয়।" এরূপ আরও যে কত কথা মনে আসে কি বলিব।

যদিও আমার মা'র কোন জনসভায় যোগদানের অথবা কো প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করার সুযোগ হয় নাই, তথা প্রয়াগের বিস্তীর্ণ সুহৃজ্জন সমাজে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপ যথেষ্টই ছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার খুবই উৎসাহ ছি এবং সর্ব্বদাই সে বিষয়ে তিনি ওয়াকিফহাল থাকিতেন। হিন্ মুসলমান সম্পর্কিত প্রশ্নে তিনি খুব দৃঢ় মতই পোষণ করিতেন তিনি বলিতেন যে হিন্দুদের উপর অবিচার হইতেছে; যেহে এই দেশ হিন্দুদের, ইহার বৃহত্তর অংশের ন্যায্য অধিকারী তাহারাই তিনি আমার পিতৃদেবের সঙ্গে সারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন মুসলমানী আমলে ভারতবর্ষের মন্দির ও শিবালয়গুলির ধ্বংসলী তাঁহার হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল। কখনও সে প্রসঙ্গের অবতারণা হইলে অন্তরে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিতেন।

ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তা প্রতিনিয়তই তাঁহা হৃদয়ে জাগরূক ছিল। এই সম্পর্কে তিনি সর্ব্বদাই গান্ধীজীর মহৎ প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী মদ্যপান নিবারণ নীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেন। চা-পানের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রয়াগে মাঘ মেলা উপলক্ষে একবার তিনি ত্রিবেণী স্নান করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা কোন বন্দোবস্ত করিতেছ না—গরীবদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হ'ল মা?" উত্তরে জানিলাম চা-পান প্রসারের জন্য চা-বাগানের মালিকগণ গঙ্গার তীরে তাঁবু ফেলিয়া বিনামূল্যে চা বিতরণ করিতেছে। এরূপ বিতরণের উদ্দেশ্য লোককে চা-পানে অভ্যস্ত করা। আমার চা-পান মা পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মতে ভারতীয়দের খাদ্য দুধ এবং দই; তাহা না খাইয়া চা-পান করিলে ইহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ক্ষুধালোপ অবশ্যম্ভাবী। আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমরা গভর্ণমেণ্টের লোকেরাই সামান্য আয়ের লোভে দেশের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছ।

মা'র কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও গম্ভীর ছিল। তিনি বাজে কথা বলিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও তিনি নতুন কিছু শিখিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে সমুৎসুক ছিলেন। তিনি শান্তির প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। আমি কখনও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে অথবা আনন্দে অধীর হইতে দেখি নাই। মনে তাঁর বিদ্বেষ ভাবের লেশমাত্র ছিল না। সুখ ও দুঃখকে তিনি তুল্য জ্ঞান করিতেন। মূর্খ স্ত্রীলোকের মত কান্নাকাটির অভ্যাস তাঁর ছিল না। আমাদের পরিবারে অনেক মেয়েরই বিবাহ হইয়াছে। বিবাহান্তে বিদায়কালে বাড়ীর প্রায় সকলেই অশ্রুমোচন করে, কিন্তু মা'র ছিল সদাই প্রশান্ত মূর্ত্তি—কখনও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে তাঁহাকে দেখি নাই। যদি কখনও তাঁর কোন মেয়ে অথবা নাতনী আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় কাতর হইত, তিনি বলিতেন, "ছিঃ, কাঁদতে নেই। তুই নিজের বাড়ী যাচ্ছিস্—আজ কত আনন্দের দিন!" মা আমায় দুঃখও পেয়েছেন অনেক। তাঁর বড় আদরের নিজহাতে মানুষ করা বিবাহিতা মেয়ে ও নাতনী চোখের সামনে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই সুকঠিন অগ্নিপরীক্ষাতেও তিনি অসীম ধৈর্য্য সহকারে শান্ত ভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কখনও মানসিক বল হারান নাই।

তিনি প্রত্যেকের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেন। পিত্রালয়ে তাঁহার এক ভাই ছিল—পোষ্যপুত্র। ভ্রাতৃবধূর সহিত তাঁর ভাব ছিল ঠিক আপন বোনেরই মত। আমার মামীমাও আমাকে নিজের ছেলের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং আমিও তাঁহাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করিতাম। লাহোরে পাঁচ বৎসর তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়াই আমি বি, এ পাশ করি। আমার মামা বাবুর মেয়ে ও জামাই দেওয়ান বাহাদুর ব্রজমোহন নাথ জুত্‌শী আমার মা'কে এত ভক্তি করিতেন যে তাহা বর্ণনাতীত। বাড়ীতে মা তাঁর মেয়েদের চেয়ে বৌদের আদর করিতেন বেশী। তিনি বলিতেন, মেয়েরা পরের বাড়ী গিয়াছে—বৌয়েরাই এখন ঘর আলো করিয়া রহিয়াছে। ফলে বাড়ীতে কোন কলহ বিবাদ ছিল না, প্রত্যেকেই আনন্দে ভরপূর থাকিত। বৌয়েরাও তাদের শাশুড়ীকে আপন মায়েরই মতন দেখিত। ভগবানের কৃপায় আমাদের পরিবারে বৌ-ঝিয়ের সংখ্যা বড় কম নয়। মা'কে তারা সকলেই যে ভাবে সম্মান করিত এবং ভালবাসিত তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেকেই তাঁহার কাছে কিছু না কিছু সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। আধুনিক বি, এ, এম, এ পাশ করা মেয়েরা এবং প্রাচীনাগণ সকলেই মাকে বুদ্ধিমতী ও অভিজ্ঞা মনে করিতেন এবং তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েরা তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা অবাক হইয়া ভাবিতেন যে ইংরাজি না জানিয়া এই প্রাচীনার পক্ষে এত ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, বিজ্ঞান ও ডাক্তারী শিক্ষা কি করিয়া সম্ভব হইল ? সর্ব্বোপরি তাঁর নানা বিষয়ে নিজস্ব একটা মতামত ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রয়াগে জনৈক পারসী লেডী ডাক্তার ছিলেন—নাম মিস্ কামশরিয়েট। তিনি বিলাত ও আমেরিকা হইতে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছিলেন, গুণও ছিল তাঁর যথেষ্ট। মহিলাটি মা'কে এত ভক্তি করিতেন যে, তাঁকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং নিজেকে তাঁর মেয়েরই মতন মনে করিতেন। এরূপ আরও অনেক কথা মনে হয় যাহা বিবৃত করিলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া উঠিবে।

অভ্যাসের ফলে মা'র জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বেশ দখল ছিল। প্রয়াগে থাকা কালে তিনি বাড়ীর চাকর-বাকরদের সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হইলেই তাদের কোষ্ঠী তৈয়ার করিতেন। বস্তুতঃ এই শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। আমার নিকট যখনই কোন জ্যোতিষী আসিতেন আমি তাঁকে সোজা মা'র কাছে পাঠাইতাম ও বলিয়া দিতাম, "মশাই, আমি ত' ও সবের কিছুই জানি না, আপনি মা'র সঙ্গে আলাপ করুন"। ফলে আমিও তাঁদের হাত হইতে রক্ষা পাইতাম এবং তাঁদেরও মুখোস খুলিয়া যাইত। আমি যতদূর জানি মা'র অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিক মিলিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন কলেজে পড়ি তখন তিনি আমার কোষ্ঠী করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৪০ বৎসরের ঘটনাবলী হুবহুই মিলিয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনে কি ঘটিবে অন্তর্য্যামীই জানেন, তবে আমার আয়ু কবে ফুরাইবে মা আমাকে তাহাও বলিয়াছেন।

আহারাদির বিষয়ে মা'র খুব গোঁড়ামী ছিল। আমার ছোঁয়া পাক করা কোন খাদ্য তিনি খাইতেন না কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতা মানিতেন না। আমি তাঁহাকে চামার ও মেথরের ছেলেমেয়েদিগকেও নিজের কাছে আদর করিয়া বসাইতে এবং তাহাদের শিশু-সন্তান কোলে করিতে দেখিয়াছি।

সাদাসিদে ভাবে থাকাই ছিল তাঁর অভ্যাস। তিনি সংযমী ছিলেন। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে মাছ-মাংস খাওয়া প্রচলিত আছে, তাঁহাদের ইষ্টদেবতাও শারদা ভগবতী। তথাপি মা বহুকাল মাছ-মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি এক বেলা আহার করিতেন নিজের হাতে রান্না করিয়া অথবা "কুকারে" সিদ্ধ করিয়া। রাত্রিবেলা এক পেয়ালা দুধ মাত্র খাইতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট ছিল, তবে চক্ষুতারকার দোষে মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্টিশক্তিহীন হন। তথাপি তাঁহার স্বভাব মধুর এবং জ্ঞানপিপাসা অদম্য ছিল।

আমরা পাঁচ ভাই-বোন। সকলকেই তিনি ভালবাসিতেন সমান ভাবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই নিজের প্রতি তাঁর স্নেহাধিক্যের গর্ব্ব অনুভব করিতাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমার ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয়নি। কিন্তু সেজন্য আমার বিশেষ দুঃখ ছিল না, কারণ সন্তানের অভিলাষ আমার ছিল না ও ইহাকে আমি ঝঞ্ঝাট মনে করিতাম। যখন আমার প্রথম সন্তান কন্যা হইল, তখন স্বভাবতঃই পুত্র-সন্তানের কামনা মনে জাগিল এবং শিব ঠাকুরের কাছে অনুরূপ প্রার্থনাও জানাই। চার বছর পরে যখন তোমার জন্ম হইল তখন আমার শাশুড়ী বলিলেন যে কাটজু বংশে দুই পুরুষ যাবৎ পুত্র-সন্তান জন্মে নাই, পোষ্যপুত্র নিয়েই বংশরক্ষা হইয়াছে। আমার ভাগ্যে কি আর এই ছেলের সুখভোগ করা ঘটিবে ? তাঁর কথা ঠিকই হইল আট মাস পরেই তিনি গেলেন পরলোকে। আমিও অসুখে পড়ি। আঁতুড় থেকে উঠিবার পর থেকে প্রায় দু' বছর চল্‌লো জ্বর—ভাবিতাম যক্ষ্মা হইয়াছে। কিন্তু মরতে মরতে শেষে বাঁচিয়া গেলাম। রাত্রিবেলা মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, চোখ দিয়া জল ঝরিত। ভাবিতাম এত কামনার ছেলে না জানি কার হাতে পড়িবে, কোন্ মেয়ে এর বিমাতা হইবে, কেই বা একে পালন করিবে। শিব ঠাকুরের কাছে বার বার প্রার্থনা জানাইয়াছি যে ঠাকুর! তুমিই আমায় এই সন্তান দিয়াছ এখন তুমিই দাও আমাকে আয়ু যেন ইহাকে আমি পালন করিতে পারি। ভগবান আমার প্রার্থনা অবশ্যই শুনিয়াছিলেন, তাই দেখ না শুধু তুমি কেন, তোমার ছেলেপুলে এবং তাদেরও ছেলেপুলে মানুষ করিয়া আজ আমি কত সুখ লাভ করিতেছি। তুমিও কিন্তু সদাই আমায় জড়িয়ে থেকে চার বছর বয়স অবধি আমার দুধ খেয়েছ"। এমন মায়ের ঋণ কেহ কি কখনও পরিশোধ করিয়াছে, না করিতে পারে ?

জীবনের শেষভাগে চক্ষু নষ্ট হওয়াতে মা'র চলাফেরার অন্তরায় ঘটে। তথাপি তিনি চাকরের হাত ধরিয়া সকালবেলা বাগানে বেড়াইতেন স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে। তাঁর বয়স যখন ৮০ বৎসর তখন গৌতম বুদ্ধের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন যে এ শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই ইহাকে এখন পরিত্যাগ করাই উচিত। অবশ্য স্বাস্থ্যও তাঁর খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি অন্তিম-কালের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গহনাপত্র সব মেয়ে, বৌ এবং তাহাদের সন্ততিগণের মধ্যে নিজ হাতে বণ্টন করিলেন। অপর যাহা কিছু তাঁর দান করিবার ইচ্ছা ছিল সবই দিলেন। মাত্র

একটা বাক্সে মরিবার পর তাঁহাকে পরাইবার জন্ম এক জোড়া শাড়ী অবশিষ্ট রাখিয়া অন্তিম যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। মা চিরকাল নিজেই গীতা পাঠ করিতেন ও শুনিতেন। গীতার অষ্টম অধ্যায় তাঁর খুব ভাল লাগিত। ১৩৪৬ সালের শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে প্রদোষের দিন বেলা দেড় ঘটিকায় জাজ্বল্যমান দিবালোকে মহাত্যাগ-ভূমি প্রয়াগরাজ্যে আমার পরমারাধ্যা মাতা তদীয়া কামনানুরূপ ভাবেই দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই—কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুশয্যাপাশে আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। কেবলমাত্র আমার স্ত্রী অসুস্থতা নিবন্ধন নৈনীতালে ছিলেন বলিয়া তাঁর আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। মুমূর্ষু অবস্থায় মা বার বার তাঁহার কথা বলিয়াছিলেন এবং কয়েক বার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, "কই, লক্ষ্মীরাণী এল না? কখন আসবে?" অবশেষে স্থিরচিত্তে ভগবান যেমন বলিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২।২২

অর্থাৎ মানুষ যে প্রকার পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, মা'ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁর জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

লক্ষ্মীরাণী কয়েক ঘণ্টা পরেই আসিয়া পৌঁছিলেন এবং মাতৃদেবীর অন্তিম দর্শনলাভ করিলেন। সেই দিনই আমি বুঝিয়াছি কেন হিন্দু রমণীগণ শাঁখা-সিন্দুর লইয়া পরলোকগমনের আকাঙ্ক্ষা করে। মা আমার বহুদিন ধরিয়াই রঙীন পাড়ওয়ালা সাদা শাড়ী পরিতেন। কেহ রঙীন রেশমের শাড়ী পরিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর করিতেন, "বুড়ো বয়সে কি আর ওসব মানায়?" কিন্তু অন্তিম যাত্রার জন্ম যে শাড়ী তিনি বাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ছিল সুন্দর লাল শাড়ী। মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্নান করাইয়া যখন সেই শাড়ী পরান হইল এবং তাঁর সীঁথিতে সিন্দুর দেওয়া হইল তখন তাঁহাকে এতই সুন্দর দেখাইল যেন মনে হইল কোন নববধূ। ভগবানের মায়াবলেই যেন তাঁহার মৃতদেহ হইতে বার্দ্ধক্যের সকল চিহ্ন অপসারিত হইল এবং সোহাগরাণী নিজের সোহাগের প্রতীক শাঁখা ও সিন্দুর লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে আমি ব্যথিত হই নাই, কিন্তু মনে দুঃখ হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে, আমি তাঁর যথোপযুক্ত সেবা করিতে পারি নাই। অর্থের সাহায্যে সেবার কথা বলিতেছি না, কারণ বাড়ীতে যাহা কিছু ছিল সবই ছিল তাঁরই। আমি বলিতেছি আমার শরীর দিয়া সেবার কথা। নিজের কাজকর্ম্ম লইয়া এমনই ব্যস্ত থাকিতাম যে সে রকম সেবার অবসরই পাই নাই। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অসুখে-বিসুখে আমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁর কিছুই করিতে পারি নাই। এখন আমার একমাত্র অভিলাষ ও প্রার্থনা—যেন পরজন্মেও তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক বজায় থাকে। তিনি যেন হন আমার গুরু আর আমি হই তাঁর শিষ্য, অথবা তিনি যেন হন আমার পিতা কিম্বা মাতা আর আমি হই তাঁর সন্তান। তবেই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

কলিকাতার কুম্ভকার

(প্রচ্ছদপট দ্রষ্টব্য)

লিউইস হেগ

ভারতবর্ষের কুম্ভকারেরা শত শত বৎসর ধরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈয়ারী করে আসছে, প্রতি সহরে, গ্রামে, বাড়ীতে, জঙ্গলে নানা প্রকার অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক দিনই হিন্দুদের পূজো-পার্ব্বণ উপলক্ষে ছুটি থাকে। আমি বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রধান উৎসব দুর্গাপূজার ঠিক আগে কলকাতার কুম্ভকারদের কেন্দ্র কুমারটুলীতে যাই। একসঙ্গে পাঁচটি দেবদেবীর পূজো হয়। কুম্ভকারদের তখন খুব কাজের চাপ পড়ে যায়। হিমালয়ের কন্যা দুর্গার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই উৎসব। দুর্গা শক্তির প্রতিমূর্ত্তি, এবং দশভুজা। তিনি সিংহবাহিনী এবং তাঁর হাতে খড়্গ। তাঁর সাথে আছেন ময়ূরের উপর উপবিষ্ট রণদেবতা কার্ত্তিক, মূষিকারূঢ় হস্তিমুখ দেবতা গণেশ, বীণাবাদিনী ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী।

কুমারটুলীতে ছোট ছোট কুটিরে প্রায় এক হাজার কুম্ভকার বাস করে। আমি এই মৃৎশিল্পীদের মধ্যে গিয়ে এদের অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় পেলাম। তারা এতই তাড়াতাড়ি কাজ করে যায় যে, তাদের হাত ও আঙুলের ছন্দোময় ভঙ্গী খুব কমই বোঝা যায়। তাদের চার দিকে শত শত মূর্ত্তি দেখলাম—তার ভেতরে কোনটা অর্দ্ধেক, কোনটা সম্পূর্ণ হয়েছে। দেখলাম, কুলীরা গঙ্গার তীর থেকে প্রচুর মাটি মাথায় করে নিয়ে আসছে। আমি জি, পাল এণ্ড সন্স-এর বিরাট ষ্টুডিওতে গেলাম। এইখানে সমস্ত বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি তৈয়ারী করা হয়, এরা বাংলা দেশের কুম্ভকারদের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন এবং বিশিষ্ট পরিবার। এই পরিবারটি প্রথম কৃষ্ণনগর থেকে আসে। কুম্ভকারেরা প্রথমে একটি কাঠের কাঠামো তৈয়ারী করে। তার পর খড়ের সাহায্যে দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈয়ারী করে। এই খড়ের মূর্ত্তির ওপরে প্রথমে এক প্রলেপ মাটি দেওয়া হয়, তার পর আর একবার মোটা করে মাটি দেওয়ার পর মূর্ত্তি তৈয়ারীর কাজ শেষ হয়। মাটি শুকিয়ে গেলে রং করা হয়।

পালদের মধ্যে এক জন আমাকে তাদের কঠোর জীবনের কথা বলে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার মূর্ত্তিকারক কোন প্রকারে জীবন যাপন করে, কেবল মাত্র বড় বড় উৎসবের আগে তারা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করে, সমস্ত মূর্ত্তিই বায়না দিয়ে তৈয়ারী করা হয়। এক জন কুম্ভকার সমস্ত বৎসরে গড়ে মাসিক ২৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা আয় করে। পরে আমি নিখিল বঙ্গ কুম্ভকার সমিতির উৎসাহী সেক্রেটারী মিঃ এ, পালের সঙ্গে দেখা করি। এই সুসংগঠিত ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা না কি ৩ লক্ষ। তাদের স্ত্রী এবং শিশুদেরও এর মধ্যে ধরা হয়, কিন্তু কেবল মাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরাই ত্রৈমাসিক ৪ আনা চাঁদা দিয়ে থাকে। বাংলার শতকরা ৬০ জনের বেশী কুম্ভকার এই সমিতির সদস্য, এই সমিতি বহু কাজ করে থাকে।

—ফিনিক্স ম্যাগাজিন হইতে

অমিতাভ বসু রায়

"হারাই হারাই ভয়ে গো তাই বুকে চেপে রাখতে-যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে—
জানিনে কোন্ মায়ায় কেঁদে বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ আমি বসুমতী মাসিক পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। বাংলার এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব অনুভূতি এবং কর্মধারার পূর্ণ বিকাশ আমি একমাত্র বসুমতীতেই সর্ব্বদাই দেখিতে পাইয়াছি। ইহাই আমার বসুমতী-প্রীতির কারণ। আমাদের সেবাসঙ্ঘ বর্ত্তমান বৎসরে রজত-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করিবে এবং বসুমতীরও ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আমরা আপনাদের সমসাময়িক ভাবিয়া গৌরবান্বিত।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বসুমতীর সর্ব্ব-বিভাগীয় ক্রমোন্নতি এবং বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিণতি আমরা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি এবং আশা করি, পরিচালকগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান নীতি বজায় রাখিয়া বসুমতীর সাময়িক পত্রিকা-জগতের শীর্ষস্থান বজায় রাখিবেন। ইতি

শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক, হাওড়া সেবা-সঙ্ঘ।

বসুমতীর রজত-জয়ন্তী উৎসবে আমার আন্তরিক প্রীতির উৎস-মূলে আছে রসোপভোগের সুখ-স্মৃতি। বসুমতী বাণী-সেবার এক বিশিষ্ট আয়োজন। এর পূজার ডালি গত সিকি শতক বহু সুখ-দৃশ্য মধুর-রস ফল-ফুলে সমৃদ্ধ। নবীন নিখিলের ভাব-প্রবাহে বসুমতী ভারতের প্রকৃত কৃষ্টির দাবী বিস্মৃত হয়নি। তাই ঐ পত্রিকা নবীন ও প্রাচীন রস-ধারার মধুচক্র। আজ মনে পড়ছে অক্লান্তকর্মী বন্ধু সতীশচন্দ্রকে। তার জীবন-বৃক্ষের সুফল বসুমতী। আজ এই আনন্দের দিনে বহু শুভানুধ্যায়ীর শুভ-বাসনার সঙ্গে আমিও সমস্বরে বলি—বসুমতী দীর্ঘ-জীবন লাভ করুক, সাহিত্য-রসপ্লাবনের শুভকর্মে আত্ম-নিয়োগ করে দেশের ও দশের হিত-সাধন করুক।

ভবদীয়
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

—অঞ্জলি সেনগুপ্ত

—[illegible]

নূতন যুগের নব পরিকল্পনায় মৈত্রী, সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী নিয়ে বসুমতীর আবির্ভাব হোক বাঙ্গালীর প্রতি ঘরে ঘরে। বসুমতীর মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের নব-জীবনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হোক। দু'শো বৎসরের সুপ্তচেতনা জাগ্রত ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠুক তার ললিত বাণীর মধ্যে দিয়ে। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবগুলিই বসুমতীকে বহন করিতে দেখি কিন্তু একটি প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ললিতকলার বাহন হিসাবে দেখি না। সেটি হচ্ছে সঙ্গীত। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে একটি সঙ্গীত বিভাগ করিয়া বসুমতী আমাদের পরিতৃপ্ত ও উৎসাহিত করিবে।

শ্রীঅশোককুমার বসু
পোঃ বজবজ,
ডি, এ, ঘোষ রোড

"বিহানবেলা আঙিনাতলে এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণদুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া।"

—রবীন্দ্রনাথ

'বসুমতী' সগৌরবে ছাব্বিশ বছর অতিক্রম করে পদার্পণ করেছে সাতাশে। বিগত-ইতিহাস গৌরব-প্রভ! পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকে যত মাধুরী র আহরণ করে সে সাজিয়ে তুলেছে নিজের মধু-চক্র। এই পঁচিশ বছরে যত র্তন সংঘটিত হয়ে গেছে, তাদের ইতিহাস তার নখ-দর্পণে। বিশ্বের চিরন্তন র্য্যের মাণিক্য-কণা সে তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। পৃথিবীর মনীষিগণের রেণু সে অক্লান্ত ভাবে বর্ষণ করে গেছে তার পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে। আমরা কাছে চির-কৃতজ্ঞ।

বসুমতী গ্রহণ করে কি দান করে, এ কথা আমি এখনো ভেবে উঠতে পারিনি। সুন্ধরার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ হতে সুগন্ধিত ফুল কুড়িয়ে এনে আমাদের সামনে সাজি নিঃশেষ করে দেয়। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের উজ্জ্বলতা টেনে নিয়ে তাকে য় দেয় ধরণীর বুকে, বসুমতীও তেমনি ভাবে জগতের জ্ঞান-জ্যোতিঃপুঞ্জ আহরণ আগ্রহান্বিত পাঠকদের সম্মুখে বিকিরণ করে সাহিত্যের সুধাকণা। বসুমতীর ও একটা বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের—প্রবাসী বাঙ্গালীর কাছে। বহু দূরাবস্থিত

—নন্দরাণী দেবী

—সুনীল সেন

ভূমির শ্যামল স্পর্শ যেন আমরা পাই তার পাতায় পাতায়। তাই বসুমতী আমাদের কাছে আরও বৈচিত্র্যময় আরও আকর্ষক!

আজ স্বাধীন ভারতের মেঘমুক্ত সুনীল আকাশের তলে, ত্রিরঞ্জিত বিজয় জয়ন্তীর স্নেহছায়ায় অনুষ্ঠিত হবে তার জীবনের শুভ সমারোহ। তার জীবনে স্মরণীয় মঙ্গল-মুহূর্ত্তে আমরা প্রার্থনা করি যেন নব যশ-কিরীটে ভূষিত হোক র মস্তক। তার সাহিত্য-ধারা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক নবীন প্লাবনে। এক র অক্লান্ত করদ্বয় যেন চিরদিন দান করে থাক নবোজ্জ্বল আনন্দের সপ্তবর্ণ কুমকণা। ইতি

শ্রীমতী লতিকা চট্টোপাধ্যায়
ডেরাডুন।

—অ. ন. সেন

উদার, বলিষ্ঠ, দলীয় প্রভাবশূন্য, সংযত অথচ স্পষ্ট ও নির্ভীক মতবাদই মাসিক বসুমতীর অত্যধিক সমাদরের প্রধান কারণ। তার পর সুনির্ব্বাচিত কবিতায়, প্রবন্ধে, গল্পে ও ধারাবাহিক উপন্যাসে সমৃদ্ধ হইয়া মাসিক বসুমতীর প্রতিটি পৃষ্ঠাই পাঠকসাধারণকে আনন্দ ও রস পরিবেশন করে।

চলতি ছায়াচিত্রের নির্ভীক ও পক্ষপাতশূন্য পুষ্ট সমালোচনার জন্য প্রতি মাসেই জনপ্রিয় মাসিক বসুমতীর মূল্যবান কয়েকটি পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইলে আমাদের মতন সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ উপভোগ্য হইবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি যথার্থ দেশনেতৃবৃন্দের জীবনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ কৃতজ্ঞ রহিবে।

শ্রীআশালতা রায়চৌধুরী
একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ।

"ভিখারি ওরে, অমন করে শরম ভুলিয়া
মাগিস কিবা মায়ের গ্রীবা আঁকড়ি ঝুলিয়া।
ওরে রে লোভী, ভুবনখানি গগন হতে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি দিব কি তুলিয়া।"

অ, ক, চট্টোপাধ্যায়

"ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে,
দাদা বলত "কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।"
—রবীন্দ্রনাথ

●

আমাদের সামাজিক রুচি ও সংস্কৃতির সুযোগ্য বাহক হবার ক্ষমতা ইহা রাখে, এ বিশ্বাস আমি পোষণ করি। ইহার পাতায় পাতায় বাংলার তথা ভারতের নিজস্ব বাণী সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে রূপায়িত হয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠুক, ইহাই আমরা দেখতে চাই। পত্রিকাখানি রচনা-সম্ভারে ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ২।৪টি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্প ঠিক ধারাবাহিক মত প্রকাশিত না হওয়ায় আমাদের কৌতূহলবৃত্তি নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে পত্রিকা মারফৎ বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ ধারাবাহিক ভাবে জানতে পারলে আমরা অধিকতর তৃপ্ত হতে পারতাম।

শ্রীতারকচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি
বীরভূম।

আমি মাসিক বসুমতীকে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করি। ইহার প্রথম কারণ, আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি অন্যান্য পত্রিকা যাহা লিখতে ভয় পায় বসুমতী তাহা নির্ভীকচিত্তে নিঃসংকোচে লিখে যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই পত্রিকার ভাষা বাস্তবিকই বঙ্গ-ভাষায় গৌরবদান করেছে যাহা অন্য পত্রিকার নিকট থেকে আশা করা যায় না। তৃতীয়তঃ, এই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে যে রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ দেওয়া হয় উহা যদিও সামান্য, উহার মহত্ত্ব ঢের বেশী। উহা আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তার পর ফটো প্রতিযোগিতা ও ছোটদের আসর ইহা আমাকে বড়ই আনন্দদান করে। ইহা ছাড়া বড় বড় কবিদের ধারাবাহিক লেখা ত আছেই। এই সমস্ত কারণে অন্যান্য পত্রিকার চেয়ে আমি বসুমতীকে অধিক সমাদর করি। আমার মতে এই পত্রিকায় প্রতি মাসে—সেলাই, ঘরকরণার টুকিটাকি ও রান্নাঘর এবং একটি করিয়া সঙ্গীত ও স্বরলিপি দিলে এই পত্রিকাখানি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয় এবং বহু মহিলা ইহার সমাদর করে এবং গ্রাহিকা হয়। এইগুলি দিয়া নারী জাতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করাইবেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী রায় মণ্ডল
২৪ পরগণা

"আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা—"
—রবীন্দ্রনাথ

—সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

—সতীশ কর

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে একদিন যে মাসিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দেখিতে দেখিতে তার পচিশ বর্ষকাল উত্তীর্ণ হইল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক অবস্থায় ইহার উপর দিয়া বহু ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তবু সতীশ বাবুর কর্ম্মপ্রেরণাকে একটুও শিথিল করিতে পারে নাই। তাঁহার একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা ছিল এই পত্রিকাকে বাঙালীর একমাত্র মুখপত্র করিয়া তোলা। সেই মহাপুরুষের সে-দিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আজ মাসিক বসুমতী বাঙালীর একমাত্র মুখপত্র, তাহাতে কাহারো কোন সন্দেহ নাই। এই পত্রিকায় বাংলার খ্যাতনামা লেখক-লেখিকারা অংশ গ্রহণ করিয়া তাদের ভাব-ভাষার অমূল্য রত্নে সারস্বত কোষাগারকে উজাড় করিয়া এই বসুমতীর সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক দি ইভিনিং ক্লাব, গোলমুড়ি।

"ছিলি আমার পুতুলখেলায়, প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।"
—রবীন্দ্রনাথ

"একটি মেয়ে আছে জানি, পল্লীটি তার দখলে—
সবাই তারি পূজো জোগায়, লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায় কথায় যদি মন দেহ,
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে আছে আমার সন্দেহ।"

—রবীন্দ্রনাথ

—রবীন মুখার্জী

ধন্যবাদ, সকলের জন্যে আমাকেও স্মরণ করিয়াছেন বলিয়া মাসিক বসুমতীকে সমাদর করিবার কারণ এই যে, ইহা সকল বিষয় সুষ্ঠুরূপে, সরল ভাবে আলোচনা করে। যা দেশের উন্নতি কামনায়, আপনার যাহা কিছু অদেয় দিতেছে, তার উন্নতি কামনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে হইবে।

গোপেন মল্লিক,
রামগড়

—ললিতা সরকার

"তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্যকোলে ডাকবি যখন খোকা ব'লে
বলব আমি, "নাই সে খোকা নাই"।
মা গো যাই।"

"পূজার সময় যত ছেলে আঙিনায় বেড়ায় খেলে,
বলবে "খোকা নেই রে ঘরের মাঝে"।
আমি তখন বাঁশির সুরে আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে।"

—রবীন্দ্রনাথ

"মাসিক বসুমতী"র আলোকচিত্র বিভাগ সর্ব্বজনপ্রিয়, রুচি-সম্মত ও উচ্চ ধরণের। কিন্তু আলোকচিত্রগুলি যদি "আর্ট অথবা আইভরি" পেপারে ছাপা হয় তাহলে খুবই ভাল হয়। কারণ এমন কতকগুলি চিত্র বেরোয় যাকে যত্নে রাখতে গেলেও তা হাতে হাতে খারাপ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ছোটদের বেশ উপভোগ্য। আরও অধিকতর উপভোগ্য হতে পারে যদি আসরটিতে "ব্যায়াম বিষয়ক" কোন বিষয় প্রকাশিত হয়। কিশোরবর্গের নিকট স্বাধীন ভারতে অধ্যয়ন ব্যতীত একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত খেলাধূলা ও ব্যায়াম।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোষ
বেলেঘাটা ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

আমি যাহা চাই তাহা মাসিক বসুমতীর মধ্যেই পাই, অর্থাৎ মাসিক বসুমতীর মধ্য দিয়া আমি আমাদের দেশের সাহিত্য ও সভ্যতাকে জানিতে ও চিনিতে পারি। তাহা ব্যতীত মাসিক বসুমতীর কয়েকটি বিষয়ও আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। যেমন "অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ" এবং "এ্যামেচার ফটোগ্রাফি" বিভাগ। আর একটি জিনিষ যাহা সত্যই সমাদর করিবার যোগ্য। সেটি হইতেছে আপনাদের রস-পরিবেশন করিবার শক্তি, যাহা বর্ত্তমান কালের অন্য কোন মাসিক পত্রিকার পাতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বসুমতীর পাতায় মাঝে মাঝে বিদেশী বিখ্যাত উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হয়, তথাপি মাত্র তাহা দ্বারা সকল পাঠক-পাঠিকার রস-তৃষ্ণা সম্পূর্ণ হয় না, সুতরাং বসুমতীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণের সহিত দেশ-বিদেশের সাহিত্যের পরিচয় যাহাতে আরও ঘনিষ্ঠ হয় তাহার জন্য ইহার পরিধি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীমতী মীরা বিশ্বাস
লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

"আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি—"

—রবীন্দ্রনাথ

—জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক

শীতে উপেক্ষিতা

"রঞ্জন"

পাঁচ

একমাত্র মাদ্রাজীরা ছাড়া আমরা ভারতীয়রা সাধারণত আমাদের নামের মধ্যে আদি নিবাসের বিশদ বিবরণ বহন করে বেড়াইনে। কিন্তু তবু, অস্পষ্ট একটা আঞ্চলিক পরিচয় অদৃশ্যভাবে কোথায় যেন লেখা থাকে। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্য নিয়ে আজ থীসিস্ রচনা করা নিরর্থক। ইংরেজের সহায়তায় কায়েদ-ই-আজম সে-প্রশ্নের যে নৃশংস মীমাংসা করেছেন তা আমরা সানন্দে না হলেও সম্পূর্ণভাবে শিরোধার্য করে নিয়েছি। আজ আমাকে তাই দার্জিলিং আসতে হলে বিদেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান পার হয়ে আসতে হয়। কিন্তু, কই, সারা পথে এমন তো একজনকেও দেখতে পেলেম না যাকে দেখেই মনে হয় যে, ইনি নিঃসন্দেহে অভারতীয় এবং বিশুদ্ধ পাকিস্তানী! রাজনৈতিক ঘোষণা দ্বারা নতুন নিশান করা যায়, করা যায় নতুন নিশানা; মানচিত্রের চেহারা বদলানো যায় কালির দাগ মুছে দিয়ে রক্তের দাগ কেটে। কিন্তু আকৃতিগত পরিচয়ের পরিপূর্ণ পরিবর্তন সাধন ঠিক এতটা সহজসাধ্য নয়। আদৌ সম্ভব কি না তাও সন্দেহসাপেক্ষ। চোদ্দই অগষ্ট যে দুই ব্যক্তি রহিমতুল্লা ও কৃষ্ণ মেনন বলে পরিচিত ছিলেন, হঠাৎ পনেরই অগষ্ট প্রভাতে তাঁরা যখন তাঁদের প্রতিবেশীকে গিয়ে বললেন যে তাঁরা দু'টি বিভিন্ন জাতির লোক, সুপ্তোত্থিত প্রতিবেশী তখন নিশ্চয়ই এটাকে বৃহৎ একটা পরিহাস মনে করে তাঁর ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, তারিখটা সত্যি পনেরই অগষ্ট না পহেলা এপ্রিল!

শুধু দেশের নয়, প্রদেশেরও একটা পরিচয় প্রত্যক্ষ থাকে আমাদের প্রত্যেকের আকৃতিতে। দীনেশ সরখেলকে দীন্‌শ' সাকলাৎওয়ালা বলে ভুল করবার আশংকা নিতান্তই অল্প, মুখ না খুললেও; আসন্ন শ্মশ্রুমুক্ত হলেও যোধরাজ সিংকে ভ্রম হয় না সুন্দরম্ রঙ্গস্বামী বলে। এ প্রসঙ্গে সভয়ে ও সসম্ভ্রমে এ কথারও উল্লেখ করব যে সম্প্রতি যে বঙ্গললনাগণ অঙ্গে সালোয়ার-পায়জামা ধারণ করে প্রাদেশিক পরিচয়ের অবলোপ সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন, আমি অন্তত কখনোই তাঁদের কাউকে রাজপুত রমণী ভেবে বিভ্রান্ত হইনি।

যেমন মানুষের বেলায়, তেমনি জায়গার। তারও ভৌগোলিক পরিচয় একমাত্র রেলওয়ে ষ্টেশনের সাইনবোর্ডেই লিপিবদ্ধ থাকে না; ছড়ানো থাকে তার মাটিতে, জলে আর হাওয়ায়। বোলপুর ষ্টেশনে অবতরণ করলে কাউকে বলে দিতে হয় না যে জায়গাটা সাঁওতাল পরগণার, চব্বিশ পরগণার নয়। হরিণাভির রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্ধজনও জানে যে সে হরিদ্বারে নেই। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো আর'—এ কথা প্রায় প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধেই বলা যায়, কেননা প্রত্যেক দেশেরই আছে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য। বাঙলার শ্যামলতা যেমন একান্তই বাঙলার।

এই সাধারণ নিয়মের বৃহৎ ব্যতিক্রম হচ্ছে দার্জিলিং। বাঙলা কেন, সারা ভারতবর্ষেই দ্বিতীয় দার্জিলিং নেই। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই মনোরম শৈলাবাসে এসে তাই একবারও মনে এই সন্দেহ জাগে না যে স্থানটি পশ্চিম-বঙ্গ নামক প্রদেশের অংশ।

একমাত্র আমলাতান্ত্রিক বিচারেই বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত, আসলে সে শাংরিলার শাখা।

বস্তুত বর্তমান দার্জিলিঙের উদ্ভবই সম্ভব হয়েছে তার অবাঙালীদের কল্যাণে। এ যেন অতি ফর্সা এক বাঙালী মেয়ে, বিদেশী যাকে বিদেশিনী ভেবে ভুল করে প্রেমে পড়েছে। তার পর ভুল ভাঙলেও মোহ ভাঙেনি, চেষ্টা করেছে পিগম্যালিয়নের মতো আপন স্বপ্নকে রূপ দিতে, প্রাণ দিতে। আশা করি এ-কথা স্বীকার করলে দেশদ্রোহিতা হবে না যে আজকের দার্জিলিং বিলাসী ইংরেজদের কল্পনা দিয়ে রচা। তারা এই স্থানটিকে গড়তে চেয়েছিল স্বদেশের প্রতিবিম্ব করে। দূর দেশে নির্বাসিত স্বামী যেমন প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীর প্রতিকৃতি কাছে রেখে বিরহকাতর হৃদয়কে শান্ত করে।

প্রাগবৃটিশ দার্জিলিঙের ইতিহাসের অধিকাংশই অতীতের অজ্ঞেয়তায় লুপ্ত; বাকিটা হয় ঐতিহাসিকদের পাণ্ডিত্যে আবৃত, নয়তো ইংরেজদের লেখা অপ-ইতিহাসে বিকৃত। বহুদূর-বিস্তৃত সিকিম রাজ্যের এই অনুর্বর অংশটি ছিল একেবারেই অবহেলিত। স্বল্পসংখ্যক লোক বাস করতো গভীর অরণ্যের অনিচ্ছাদত্ত অনুমতি নিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জন্তু-সম্প্রদায়ের অবাধ আধিপত্য বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে—আজকের হিন্দু যেমন পূর্ববঙ্গে। তারা ছিল, তারা নেই—ইতিহাস তাদের মনে রাখেনি।

দুরন্ততম সন্তানের জন্যে যেমন মায়ের স্নেহ থাকে সব চেয়ে বেশী, ইতিহাসের তেমনি পক্ষপাতিত্ব আছে রক্তলোলুপ হিংস্রদের জন্যে। তার পাতায় তাই রামদাসের জন্য যদি থাকে চার লাইন, শিবাজীর জন্য আছে চার পাতা। ইতিহাসের বিচারে কালিদাসের জন্যে এক লাইনই যথেষ্ট, বিক্রমাদিত্যের জন্য চাই পুরো একটা অধ্যায়। ইতিহাসের পাতায় নামাঙ্কন করতে হয় শোণিতাক্ষরে, তার বক্ষ ব্যেপে তাই অবাধে বিচরণ করে নেপোলিয়ন আর বিসমার্ক আর ক্লাইভের দল। স্থানাভাব ঘটে শেলী, শিলার আর কবীরের বেলায়। বিদ্বান আর যেখানেই পূজ্যতে হোক, ইতিহাসে নয়। রাজা ও রাজনীতিকদের সেখানে অপ্রতিহত মনোপলি!

যেমন চরিত্রের বেলায়, তেমনি ঘটনার। সেখানেও ইতিহাস সুকৃতির মান মেনে চলে না। নীতিপালনের উল্লেখ থাকে সংক্ষিপ্ততম, অন্তহীন বিস্তৃতি আছে লঙ্ঘনের জন্যে। পাতার পর পাতা জুড়ে আছে রাজ্যজয়ের ইতিহাস, লেখা নেই কোনো রোগবিজয়ের সবিস্তার কাহিনী। দেশে দেশে বা জাতিতে জাতিতে যখন মৈত্রী ও সম্প্রীতি থাকে তখন ইতিহাস তাকে উপেক্ষা করে। ব্যাখ্যান শুরু হয় বিরোধ বাধলে।

ইতিহাসে তাই দার্জিলিঙের আবির্ভাব বিরোধকেই কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভুটানীরা সিকিম রাজ্যের যে-অংশটা দখল করে নিল আজ তা কালিম্পং নামে পরিচিত। তার পরে এলো গুর্খারা। নেপাল অধিকার করে আক্রমণ করল সিকিম, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে চলল ছোটো-বড়ো নানা আকারের খণ্ডযুদ্ধ। সিকিমের সাধ্য ছিল না গুর্খাদের উন্নততর যুদ্ধ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার। তিস্তা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তারা পদানত করল সমগ্র তেরাই ভূমি। নেপাল রাজ্যের পরিধিই শুধু প্রসারিত হোলো না, প্রতিপত্তিও।

উনবিংশ শতাব্দীর বয়স তখন বছর পনের। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা ভারতের বৃহৎ অংশেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবার প্রয়োজন বিস্তৃতির। য়ুরোপের প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রায় সবাই একে একে রণক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। ভারতের অভ্যন্তরের অন্তর্দ্বন্দ্ব সকল প্রতিরোধকে অক্ষম করেছে অনেক দিনের জন্য। সম্মুখে অগ্রগতির পথ অন্তহীন এবং প্রায় বাধাহীন।

কিন্তু উত্তরপূর্ব দিগন্তে দেখা দিল অপ্রত্যাশিত কালো মেঘের আভাস। নেপালের শক্তিবৃদ্ধি। কোম্পানির হস্তক্ষেপের সমর্থনে অজুহাত উদ্ভাবনে অযথা কালক্ষয় হয়নি। আহা, সিকিমের এমন বিপদের সময় ইংরেজ কি পারে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে? বিধিনির্ধারিত কর্তব্য কি নেই ইংরেজের? সিকিমের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় নেপাল! ইংরেজ থাকতে এমন ঘটনা হতেই পারে না। পরের স্বাধীনতা হরণ যে ইংরেজের জন্মগত অধিকার। সে-অধিকারে আর কারো হস্তক্ষেপ অক্ষমণীয়।

তাই যুদ্ধ ঘোষিত হোলো স্বাধীনতার শত্রু নেপালীদের বিরুদ্ধে। সে সকল যুদ্ধের সঙ্গে আজকের যুদ্ধের সাদৃশ্য সামান্য। মানবের উদ্ভাবনী-শক্তি তখনো এমন পরিপূর্ণভাবে ধ্বংসের সেবায় আত্মনিয়োগ করেনি। সে-যুদ্ধের প্রকৃতি এমন ভীষণ ছিল না, ক্ষেত্র ছিল না বিশ্ববিস্তৃত। কিন্তু আজ যেমন প্রত্যেকটা যুদ্ধের জন্যে নতুন নতুন নাম আবিষ্কার করতে না পেরে বলি, বিশ্বযুদ্ধ এক বা বিশ্বযুদ্ধ দুই তেমনি নেপাল যুদ্ধগুলিরও নম্বর দেওয়া আছে ইতিহাসের বইয়ে। এক, দুই, তিন। সেই যুদ্ধের অন্তত এক জন বীরের স্মৃতির উদ্দেশে কলকাতায় আজো আছে আকাশ-ছোঁয়া এক স্তম্ভ—অক্টরলোনি মনুমেণ্ট।

ইংরেজ অপরের স্বাধীনতা সত্যি রক্ষা করে, কিন্তু বিনামূল্যে নয়। মূল্যটা সাধারণত বড়োই উচ্চমূল্য, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে-মূল্য দিতে হয় রক্ষিত স্বাধীনতাকেই সমর্পণ করে। সিকিমের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হোলো না। তিতালিয়া-য় স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রে নেপালীরা সিকিম থেকে নেওয়া সমগ্র তেরাইভূমি ফিরিয়ে দিল, কিন্তু সবটা সিকিমের হাতে পৌঁছোলো না—সলিসিটরের আদায়ীকৃত অর্থের কতটুকু বাকি থাকে তার পাওনা মিটিয়ে দেবার পরে?

মেচি থেকে তিস্তা পর্যন্ত জায়গাটা কোম্পানি সিকিমকে ফিরিয়ে দিল বটে, কিন্তু বিনা সর্তে নয়। নেপাল আর ভুটানের মধ্যে অবস্থান করে সিকিম হোলো ইংরেজিতে যাকে বলে বাফার ষ্টেট। কোম্পানি রইল সে-রাষ্ট্রের স্বাধীনতার রক্ষক, কোম্পানি গ্যারাণ্টি করল সিকিমের সভরেন্‌টি! ইংরেজের অধীন থাকা যে পূর্ণ স্বাধীনতারই নামান্তর কোম্পানির সাহেবদের মনে সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সেই পূর্ণ স্বাধীনতায় একটু বা কিন্তু ছিল তা শুধু এই যে প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সিকিমের যদি বিরোধ বাধে তাহোলে কোম্পানিকে ডাকতে হবে মধ্যস্থতার জন্য। আর কিছু নয়, শুধু পরোপকার!

বিরোধের জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি ইংরেজকে। নেপাল-সিকিম সীমান্তে এমনি এক বিরোধ মেটোবার জন্য মহামান্য গবর্ণর জেনেরাল প্রেরণ করলেন দু'টি বিশ্বস্ত অফিসার—ক্যাপ্টেন লয়েড এবং মিষ্টার গ্রাণ্ট। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লয়েড ছ' দিন কাটিয়েছিলেন "in the Old Goorkha Station of

Darjeeling." তিনি এলেন, তিনি দেখলেন, দার্জিলিং তাঁর চিত্ত জয় করল। একশ' উনিশ বছর পরে যেমন করেছে আমার।

মিষ্টার গ্রাণ্ট তদনুযায়ী রিপোর্ট করলেন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড বেণ্টিংকের সমীপে। বললেন, রণক্লান্ত সৈনিক ও শাসনশ্রান্ত কর্মীদের স্যানিটরিয়মের জন্যে এমন উপযোগী স্থান আর নেই। কেবলমাত্র অবসর-বিনোদন জন্যই নয়, সামরিক কারণেও দার্জিলিঙের প্রয়োজন ছিল। নেপালের উপর প্রহরিতার জন্য। ক্যাপ্টেন হার্বার্ট ও মিষ্টার গ্রাণ্টের পরিদর্শনের পরে দার্জিলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হোলো। কোম্পানির ডিরেক্টররা সে-সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। আর যা বাকী রইল তাকে বলে ফর্ম্যালিটি।

১৮৩৫-এর পয়লা ফেব্রুয়ারী সিকিমের রাজা যে দানপত্রে স্বাক্ষর করলেন তাতে লেখা রইল:

"The Governor General, having expressed his desire for the possession of the hill of Darjeeling on account of its cool climate, for the purpose of enabling the servants of his Government, suffering from sickness, to avail themselves of its advantages, I, the Sikkimputtee Rajah, out of friendship for the said Governor General, hereby present Darjeeling to the East India Company, that is, all the land South of the Great Rangit river, East of the Balasun, Kahail and Little Rangit rivers and West of Rungnu and Mahanadi river."

সিকিমের রাজার সঙ্গে জেনেরাল লয়েডের কী আলোচনা হয়েছিল জানিনে। সে-আলোচনার ফলে কি অবস্থায় রাজাকে ইংরেজের হাতে দার্জিলিং সমর্পণ করতে হয় তারও বিশদ কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। অন্ততঃ কাগজে-পত্রে লেখা রইল যে ইংরেজ দার্জিলিং হরণ করেনি, উপহার পেয়েছে।

উপহারপ্রাপ্তির চার বছর পরে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডক্টর ক্যাম্পবেলকে দার্জিলিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিয়োগ করা হোলো এবং তখন থেকেই সুরু হোলো দার্জিলিঙের উন্নতি। দশ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা একশ' থেকে দশ হাজার হোলো। ১৮৫২ সালে এক জন সরকারী পরিদর্শক লিখলেন, "দার্জিলিঙের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার সবটুকুর জন্য সকল কৃতিত্ব ডক্টর ক্যাম্পবেলের প্রাপ্য। দুরধিগম্য অরণ্যভূমিকে তিনি পরিণত করেছেন অপরূপ শৈলাবাসে; আবাসের অযোগ্য পার্বত্য উপত্যকা থেকে সৃষ্টি করেছেন অনুপম ভূস্বর্গ।"

নির্মল, উজ্জ্বল, প্রাণদায়ী রৌদ্রে উদ্ভাসিত ম্যালে উপবেশন করে ডক্টর ক্যাম্পবেল ও তাঁর স্বজাতির সকল দুষ্কৃতি ক্ষমা করলেম সানন্দ চিত্তে।

অর্থনীতির ভাষায় যাকে স্ক্যার্সিটি ভ্যালু বলে—দুষ্প্রাপ্যতার মূল্য—দার্জিলিঙের রৌদ্রের তা আছে। বিশেষ করে জানুয়ারীর শেষে। সেই দুর্লভ রৌদ্র যখন আবির্ভূত হয় তখন ঘরে থাকে না কেউ। সবাই ছুটে আসে আকাশের উন্মুক্ততায়; প্রাণ ভরে, দেহ ভরে রোদ পোহাতে। ম্যালে তাই আজ বেশ ভীড়, অর্থাৎ অন্ততঃ জন কুড়ি লোক বিভিন্ন বেঞ্চিতে বসে প্রার্থনা করছে রোদটা যেন একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়। পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কিন্তু সাদা চোখে দূরত্বটা এত বেশী মনে হয় না। এমন অপরূপ প্রভাতে সব কিছুকে কাছে মনে হয়—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে, ঐ বেঞ্চির ঐ ভূটানীগুলিকে, পরের বেঞ্চির ঐ ইংরেজকে, তার পাশের ঐ অবাঙালী কিশোরকে।

রৌদ্রের স্বচ্ছতায় অপরিচয়ের ব্যবধান সাময়িক ভাবে অপনীত হয়। এক জন আরেক জনকে ডেকে বলে, "Glorious sunshine, isn't it?" অপর জন সানন্দে উত্তর দেয়, "Isn't it?"

ইংরেজ ভদ্রলোক আলাপটাকে আরো একটু প্রসারিত করে বললেন, "এমন সুন্দর রৌদ্র যে হাতের কাজ ফেলে বেরিয়ে পড়েছি। জলে আর মাটিতে হাত দু'টো প্রায় জমে গিয়েছিল।"

"জল আর মাটি কেন?"

"ওই আমার রুটি আর মাখন। আমি ভাস্কর।"

আর কৌতূহল দমন করতে পারলেম না, বললেম, "কার মূর্তি গড়ছেন এখানে?"

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে হাসলেন, "দাঁড়ান, তাঁর নামটা লেখা আছে আমার ডায়েরিতে। ঠিক ভাবে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারিনে।"

ডায়েরিতে নামটা পড়লেম, ভানু ভক্ত।

ক্রমে জানলেম যে ভানু ভক্ত নেপালীদের সব চেয়ে বড়ো কবি। তাঁর ভক্তিরসাত্মক কাব্য নেপালীদের শুধু আনন্দই দেয় না, প্রেরণাও। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত হচ্ছে আবক্ষ মর্মরমূর্তি বা স্থাপিত হবে ম্যালে। ভাস্কর, যাঁর নাম টম্‌সন্, বললেন, "আমার ইচ্ছে ছিল পূর্ণাবয়ব মূর্তি গড়বার। কিন্তু অত খরচা করবার সামর্থ্য নেই এখানকার কর্তাদের। তাই অল্পেই তুষ্ট থাকতে হবে।"

ভাস্কর টম্‌সনের সঙ্গে আলাপ করতে অত্যন্ত ভালো লাগছিল। ভদ্রলোক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন না করে অনেক কথা বলতে পারেন। অনেক দেশ ঘুরেছেন, জানেন অনেক কিছু। বললেন আমেরিকার কথা, অষ্ট্রেলিয়ার কথা। বললেন, "আমার কাঁধে একটা ভূত আছে যে কোথাওই বেশী দিনের জন্য একটা জায়গায় থাকতে দেয় না। কিছু দিন পরেই বলে, আবার ঝুলি কাঁধে তোলো, চলো আর কোথাও।"

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "ভারতে কত দিন থেকে আছেন?"

"অনেক দিন। প্রায় তিন বছর হতে চলল।"

"অনেক মূর্তি গড়েছেন তাহোলে এই তিন বছরে?"

"না, খুব কম। যে-ভূতটা আমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে বেড়ায় সেই ভূতটাই মাঝে মাঝে মনটাকে বিষিয়ে দেয় বাটালী আর হাতুড়ির বিরুদ্ধে। তখন মূর্তি রেখে আর কিছু করি।"

"যথা?"

"এই তো, গত বছর এমন সময় ছিলেম সীমান্ত প্রদেশে। একটা হাসপাতালে কাজ করছিলেম।

বিস্মিত হলেম। ভদ্রলোকের চেহারায়ই যেন কী রকম একটা ভাব ছিল যা সচরাচর এ দেশে নিরাপদ প্রাচুর্যে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর ফরাসী ধরণের দুগ্ধ শ্মশ্রু ও উদাসী দৃষ্টি থেকেই

[৬৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

উন্নত বাহু, দেহ গৌরবর্ণ, গম্ভীর অথচ সুরসিক সুরেশচন্দ্র বাংলার সাহিত্য-জগতে এক দিন অসাধারণ প্রভুত্ব করে গেছেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চারিত্রিক তেজ কিছুটা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। সে যুগে 'সাহিত্য' একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা ছিল। এর বার্ষিক দক্ষিণা ছিল মাত্র দু'টি মুদ্রা। ছবি থাকতো না, কাগজও উৎকৃষ্ট ছিল না; তবুও এর পসার ছিল খুব। উমেশচন্দ্র বটব্যাল, অক্ষয় মৈত্র, নবীন সেন, নিখিলনাথ রায়, অক্ষয় বড়াল, রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এই কাগজে নিয়মিত লিখতেন। এ কাগজের বৈশিষ্ট্য ছিল 'সমালোচনা'। সহযোগী সাহিত্য-সমালোচনাই লোকে আগ্রহের সঙ্গে পড়তো। সে প্রণালীর সমালোচনা আর দেখি না। বেশ ঝরঝরে, সুরুচির বাধক নয়, অথচ উপভোগ্য। সমালোচনা-সাহিত্যে যে 'আর্ট' থাকতে পারে, তা সুরেশ বাবুর 'সাহিত্য' এক কালে সপ্রমাণ করে দিয়েছিল।

এক জন লিখলেন তাঁর কবিতার বইয়ে, 'অক্ষম তুলিতে ফুল তুলিয়াছি কাঁটা' সুরেশ বাবু সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় ঐ পংক্তিটি উদ্ধৃত করে বললেন, 'এরূপ সত্যবাদিতা দুর্লভ', বাস্তবিকই অন্য কোনও সাহিত্য-সমালোচক সুরেশ বাবুর মতো এমন সরস সমালোচনায় নিপুণতা দেখাতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় সুরেশচন্দ্র অনেক সময়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেন। এক দিন আমরা মনে করলাম, সুরেশ বাবুর এই অতিরিক্ত দোষদর্শন-বুদ্ধির প্রতিবাদ করতে হবে। রবি বাবুর 'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতাটি সবে বেরিয়েছে, আমরা অপেক্ষা করে রইলাম সুরেশ বাবুর সমালোচনা দেখবার জন্যে—কারণ, কবিতাটি আমাদের খুবই ভালো লেগেছিল। কিন্তু সুরেশ বাবুর সমালোচনা 'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি' এই সুন্দর আবেগ-ভরা আবেদন এখনও যেন কানে বাজে। এবারে অভ্যস্ত রীতি পরিত্যাগ করলো এবং তাঁর সে সমালোচনা এত সুন্দর, গুণগ্রাহিতার এত পরিপাটী নিদর্শন যে, সে সমালোচনা সেই উৎকৃষ্ট কবিতার মোটেই অনুপযুক্ত হয়নি।

সুরেশ সমাজপতি

কিন্তু এর থেকে সুরেশচন্দ্রের রবীন্দ্র-প্রীতি প্রমাণিত হ'ল না, কারণ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনা করবার দিকেই ছিল তাঁর আন্তরিক ঝোঁক। ওদিকে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ আর এদিকে সুরেশ সমাজপতি। এই উভয় পাষাণ-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-স্রোত বয়েছিল। ভালই বলতে হবে—পণ্ডিতকে নিয়ে পাতালে যাওয়াও ভাল। সুতীব্র সমালোচনায় কবির কোন ক্ষতি হয়ত হয়নি—কিন্তু উপকার যে হয়নি এ-কথা জোর করে বলা চলে না। নির্ঝরিণীর স্রোত উপলখণ্ডে আঘাত না খেলে তার বেগ বাড়ে না।

আমাদের আড্ডা ছিল হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়ী—৮২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। হেমেন্দ্রপ্রসাদের সাহিত্য-প্রীতির জন্যই হোক্ আর সুরেশচন্দ্রের চির অর্থাভাব গতিকেই হোক, সাহিত্য কয়েক বছর ৮২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদের মাতা সম্পর্কে আমার দিদি ছিলেন, আমার বন্ধু যতীন্দ্রনাথ ছিল সম্পর্কে হেমেন্দ্রপ্রসাদের ভাগিনেয়, এই পরিবেশের মধ্যে আমার যখন ঐ আড্ডায় যাতায়াত ঘটেছিল, তখন আমি বি-এ পড়ি। সেই সময়ে আমার লেখা সাহিত্যে বেরিয়েছিল—সহযোগী সাহিত্যের মধ্যে 'কার্লাইল' ও 'যবদ্বীপ' (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত)। আমার সাহিত্য-জীবনের এই প্রথম উন্মেষ। সুরেশ বাবুর মতো লোকের কাছে আমার হাতেখড়ি—এ কথা বলতে আমার একটুকু কুণ্ঠা নেই। যদিও তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়েই আমার মতের মিল ছিল না।

আমি যখন এই আড্ডার মধ্যে থেকেও এম-এ পাশ করলাম প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে, তখন এই আড্ডায় এক সান্ধ্য সম্মেলনে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন আমাকে 'আড্ডার জয় হোক্' এই বলে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন সে কথা মনে করে আমি গর্ব অনুভব না করে পারিনে। যে সব বন্ধু ডোবাতে চেয়েও ভরাডুবিতে কৃতকার্য হননি তাঁদের উদ্দেশে যোড়করে নমস্কার করি।

সুরেশ বাবুর সম্বন্ধে সব চেয়ে মনে পড়ে এই কথাটি যে, তিনি বড় স্পষ্ট বক্তা ছিলেন, কারও খাতির করে কথা কইতেন না তা সে যত বড় লোকই হোক। এর সঙ্গে তাঁর একটু দোষও ছিল। কোন বড় লোককে তিনি দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছেন, সেটা আমাদের কাছে বেশ ফলাও করে গল্প করতে ভালবাসতেন

বস্তুতঃ, তাঁর স্পষ্টবাদিতায় সব সময়েই একটু হুলের খোঁচা থাকতো।

সুরেশ বাবু শুধু সমালোচনায় যে দক্ষ ছিলেন, তা নয়, তাঁর কতকগুলি ছোট গল্প আছে, সেগুলি অজস্র সুখ্যাতি লাভ করেছিল। তাঁর 'বাঘনখ' গল্পটির সুখ্যাতি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত করেছিলেন। 'সাজি' বলে তাঁর গল্পের বই আছে—হয়তো এখন দুষ্প্রাপ্য। একটি গল্পের নাম বোধ হয় 'প্রতিশোধ'—আমাদের নাম আছে। আমি সে গল্পে দার্শনিক—যদিও তখন থার্ড ইয়ারে দর্শনশাস্ত্রের ক, খ (অনার্স) পড়ি—সুগায়ক ও সুদর্শন যতীন্দ্রনাথ আছেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, অনাদিনাথ প্রভৃতি আমাদেরই বন্ধু-বান্ধবকে নিয়েই তাঁর সে গল্পটি লেখা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরই মেসের ছাত্র। অদ্ভুত ছিল তার প্রতিভা—তার অনেক জিনিস আমরা (আমি ও যতী) অনুকরণ করেছিলাম। সে গান জানতো না, আমরা জানতাম—যতী তো অত্যন্ত সুগায়ক বলে সর্বত্র পরিচিত ছিল—কিন্তু অনাদিনাথ ইশারা-ইঙ্গিতে আমাদের গান গাইবার সঙ্কেত শিখিয়ে দিত। তার পরিহাসপ্রিয়তা (wit) ছাত্র-মহলে এত পসার লাভ করেছিল যে, অনেকে সে সব শুনতে আসতো। পরবর্ত্তী কালে চিত্তরঞ্জন গোঁসাই যে কমিক করতেন, তার মধ্যেও অনাদিনাথের কিছু কিছু ছাপ ছিল। গোঁসাই অবশ্য অনাদিনাথের কাছ থেকে নেননি—তিনি পেয়েছিলেন আমাদের কাছ থেকে—বিশেষতঃ যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। আমরা পেয়েছিলাম অনাদিনাথের কাছ থেকে। সেই অনাদিনাথের মুখে যে গানটি সুরেশ বাবু দিয়েছেন, সে গানটি অনাদিনাথেরই।

বাউল

এসো হে পিওন সখা।
তোমার ঐ রূপে দেও দেখা।
তোমার কাঁধে শোভে চামড়ার ব্যাগ হে
তায় ঝম্-ঝম্ কেবল বাজে টাকা।
ঐ রূপে দেও দেখা।
তোমার পায়ে শোভে নাগরার জুতো হে
তার আগা-গোড়া কাদা মাখা।
ঐ রূপে দেও দেখা॥ ইত্যাদি

অনাদিনাথ মুখে মুখেই এই সব গান রচনা করতো, ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা পদ্ধতি, কথক ঠাকুরের ভঙ্গী, যাত্রার দলের মাত্রাহীন অভিনয়—এ সব অনাদিনাথ হুবহু অনুকরণ করতো। ব্রাহ্ম সমাজের প্যারডি—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পর্য্যন্ত সানন্দে শুনতেন। তার মধ্যে অবজ্ঞার ভাব কিছু থাকতো না। উপাসনার পর আচার্যের মতো গম্ভীর ভাবে বলতেন, 'সঙ্গীত ৩৭২ পৃষ্ঠা'। তখন আমি আর যতী—এক জন মেয়েলি সুরে, অপর জন বাজখাঁই সুরে গান ধরতাম

বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি।

সুরেশ বাবুও অনাদিনাথের পরিহাস-রসিকতায় মুগ্ধ হতেন।

আমার সঙ্গে সুরেশ বাবুর খুব সৌহার্দ্য ছিল—সেটা আরও বেড়েছিল একটি ঘটনায়, তারই উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। রামানন্দ ভারতী এক জন সন্ন্যাসী। পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম এবং তাঁর নাম ছিল রামকুমার বিদ্যারত্ন। কবি-অধ্যাপক সুরেন মৈত্র তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। পণ্ডিত লোক—সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয় ভ্রমণ করে তিনি 'হিমারণ্য' নাম দিয়ে এক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখেন। আমি পুরীতে সমুদ্রকূলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই এবং সাহিত্যের জন্য ঐ হিমারণ্য তাঁর কাছ থেকে নিয়ে আসি। সাহিত্যে ধারাবাহিক ভাবে এই হিমারণ্য যখন প্রকাশিত হয়, তখন অনেকের নিকট ইহা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এই কারণে সুরেশ বাবু আমার উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন। 'হিমারণ্যের' মতো সরস ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেশী নেই।

ভারতী মশায় একবার ব্যারাকপুর এসে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে কিছু দিন বাস করেছিলেন। সুরেশ বাবুর উদ্যোগে আমরা উভয়েই আজ-যাই, কাল-যাই করে এক দিন তাঁর দর্শনে যাত্রা করলাম। স্বামীজী সকলকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। আমরা যাবা মাত্র তিনি তাঁর নেপালী ঠাকুর দেবীকে (পুং) বললেন আমাদের খাবার দিতে। দেবী প্রথমে বললো, 'কিছুই ত নেই।' তার পর স্বামীজী বললেন, 'কেন, আমি যে রাখতে বলে দিয়েছিলাম?' তখন দেবী বললো, 'সে তো খোকন বাবুর জন্যে'।

স্বামীজী বললেন, 'এই তো খগেন বাবু রে।'

দেবী একখানি পরিষ্কার নেকড়ায় বাঁধা কয়েকটি কানাইবাঁশী কলা, নেংড়া আম ও সন্দেশ আমাদের দিল।

আমরা খেয়ে-দেয়ে আবার ট্রেণে ফিরলাম। সুরেশ বাবু খুব গম্ভীর। বললেন, 'আপনি স্বামীজীকে খবর দিয়েছিলেন?'

আমি বললাম 'না তো'

সুরেশ বাবু—'খাবার রেখে দিয়েছেন আপনার জন্যে, আর আপনি বলছেন খবর দেননি! আপনি এর আগে কবে এসেছিলেন?'

আমি—'এই ত প্রথম। ব্যারাকপুরে এর পূর্বে কখনও আসা তো ঘটেনি।'

বুঝলাম, সুরেশ বাবু সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতার বিশ্বাস করেন না। আমার কথায়ও সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না।

আমাদের সেই কামরায় আসছিলেন এক জন উদাসী-গোছের ভদ্রলোক। উসকো-খুসকো চুল, দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা। তিনি অনেকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনার উপর কোনও সাধুর নজর পড়েছে।'

সুরেশ বাবু চমকে উঠলেন। ভদ্রলোক আমাদের কথোপকথন কিছুই শুনতে পাননি। খানিকটা দূরে একখানি বেঞ্চিতে বসেছিলেন।

আমরা উভয়েই সেই শ্যামায়মানা সন্ধ্যার অন্ধকারে অসমাধেয় এক রহস্যের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলাম।

উইলিয়াম সেক্সপীয়রকে নিয়ে গবেষকরা বহু বিনিদ্র রজনী তপ্ত-মস্তিষ্কে কাটিয়েছেন। আর যারা সাহিত্য-রসপিপাসু তাঁরা তাঁর নাটক ও কবিতা নিয়ে নিজেদের মনের ক্ষুধা মিটিয়েছেন। আমরা যারা সেক্সপীয়রের পরবর্তী যুগের মানুষ, যারা তাঁকে দেখিনি, তাদের যে সেই অসামান্য মানুষটি সম্বন্ধে আরো জানবার কৌতূহল থাকবে তাতে সন্দেহ কি? যদিও সেক্সপীয়র সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট জানতে পারিনি তথাপি যতটুক জানা গেছে তাঁর পরিচয়, তাতে অন্ততঃ এ সন্দেহের অবকাশ নেই যে উইলিয়াম সেক্সপীয়র তৎকালের কোন সার্থক-সাহিত্যিকের ছদ্মনাম।

লেখাপড়া যা শিখেছিলেন, তার দ্বারা অত বড়ো সাহিত্যিক হবার যোগ্যতা তিনি পাননি। ষ্ট্রাটফোর্ডের এক মধ্যবিত্ত ঘরে তিনি জন্মেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে সাত বছরের বড়ো এক মহিলাকে বিবাহ করে তিনি তিনটি সন্তানের পিতা হন। এই সময় পিতার আর্থিক অবস্থা পড়তির মুখে যাওয়ায় সেক্সপীয়র বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লণ্ডনে আসেন ভাগ্য-অন্বেষণে। এই সময় বেশ কিছু দিন ধরে তিনি নানা কূলে জীবন-তরী ভিড়িয়েছিলেন। সেক্সপীয়রের সেই অজ্ঞাতবাস নিয়ে গবেষকরা বহু অনুসন্ধান চালিয়েছেন। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে, এই সময়েই তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। রঙ্গমঞ্চ এবং তার অন্তরালে যে জীবন কলংকে মহিমায় নিয়ত আবর্তিত তার আবর্তে তিনি নিজের গা ভাসিয়েছিলেন কিন্তু আত্মহারা হননি। সেই অভিজ্ঞতা এক দিকে তাঁকে সফল নট হবার সুযোগ দেয়, অপর দিকে নাট্যকারের মৌলগুণ আরোপিত করে তার মনে। খোলা চোখ এবং প্রখর ধীসম্পন্ন মন নিয়ে যে মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাঁর সাফল্য সুনিশ্চিত। আর তার প্রমাণ শত বার করে সেক্সপীয়রের জীবনে।

সেক্সপীয়র ইংলণ্ডের এক স্বর্ণযুগে জন্মেছিলেন। লণ্ডনে থেকে তিনি সেই যুগের অমৃত পান করেছিলেন আকণ্ঠ। মিলিত হয়েছিলেন ধীমানদের সঙ্গে, দেখেছিলেন ইংলণ্ডের বিক্রম ধীরে ধীরে বাড়ছে। রাজনৈতিক চক্রান্ত ও হত্যা তাঁর চোখের উপর সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং তিনি যে শক্তিশালী লেখনী ধরবেন এ তো অবশ্যম্ভাবী। স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর হত্যার ঘটনা তাঁর লণ্ডন-বাসের দ্বিতীয় বছরের গোড়ায় ঘটেছিল। তার পর স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ। এলিজাবেথের মৃত্যু। এই হোল সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক পট-ভূমিকা। তা ভিন্ন তখন ইংল্যাণ্ডের আকাশে শত তারকা। ড্রেক, আর্ল অফ ডরসেট, র্যালে, এসেক্স, আর্ল অফ্ সাদেম্পটন, স্পেনসার, কামডেন, পীল, লজ, কিড, চ্যাপম্যান, ড্রেটন, ন্যাস, ওয়েবষ্টার, বেন জনসন প্রমুখ আরো কত জন।

এই স্বর্ণযুগের ফসল কুড়িয়েছিলেন তিনি। তার অফুরন্ত ঐশ্বর্যও তিনি রেখে গেছেন ভাবী কালের জন্য।

বহু অর্থের মালিক হয়ে সেক্সপীয়র শেষে ষ্ট্রাটফোর্ডে ফিরে যান। জীবনের শেষ কুড়ি বছর নিজের দেশে তিনি বড়লোকের মত বেঁচেছিলেন।

বাহান্ন বছর বয়সে সেক্সপীয়র লোকান্তরিত হন। সেদিন ষোলোশো ষোলো সালের তেইশে এপ্রিল। সেই দিন থেকে নিজের দেশের গীর্জার সমাধি-ভূমিতে তিনি শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন।

আর সারা পৃথিবীর মানুষ সেই এ্যাভনের ধারে ষ্ট্রাটফোর্ডে তীর্থযাত্রা করছে। ভৌগোলিক সীমারেখা তাঁকে বেঁধে রাখতে

কিং লীয়রের প্রচ্ছদপট

সেক্সপীয়রের নাটক ও অন্যান্য রচনা সমূহ আদপে সেক্সপীয়রের লেখা, না অন্য কোন প্রতিভার বিকাশ—তা নিয়ে বহু গবেষণা চলে। এই দুষ্প্রাপ্য ছবি দু'টি সেই ভ্রান্ত ধারণার সংশোধক। কিঙ্ লীয়র নাটকের প্রচ্ছদ ও উৎসর্গপত্র। প্রচ্ছদের চতুর্দ্দিকে সেক্সপীয়রের স্বাক্ষর ও উৎসর্গ-পত্রের হস্তলিপি ও স্বাক্ষর লক্ষ্যণীয়। ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে আজও রক্ষিত আছে সেক্সপীয়র-সোসাইটির তত্ত্বাবধানে।
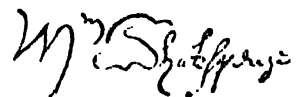
সেক্সপীয়রের দেশে

অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ষ্ট্রাটফোর্ডের জীবনস্রোত শান্ত নদীধারার মতই নিরুচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হয়, কিন্তু এপ্রিলের সুরুতেই ব্যবসা-বাণিজ্য কেনা-বেচার উত্তেজনায় এই সুপ্রাচীন সহরটি সরগরম হয়ে ওঠে। বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই হোটেলগুলি ভর্ত্তি হয়ে যায়। সেক্সপীয়রের জন্মস্থান, তাঁর মা'র শৈশব কেটে ছিল যে কটেজে, কোন-দিনই যে টাকা আনতে পারবে না ঘরে সেই লোকটিই এক দিন টাকার মালিক হয়ে ফিরে এসে যে-সম্পত্তি ক্রয় করেছিল সেই বিষয়-সম্পত্তি দেখবার জন্য শিলিং দক্ষিণা দিয়েও স্থান-সংগ্রহের জন্য রেল-ষ্টেশনে রীতিমত হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক দেখতে আসে এই স্থানটিকে এবং খুব কম করেও অন্ততঃ পক্ষে এর অর্দ্ধেক জন স্মৃতি থিয়েটারে একটি-না-একটি সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ে উপস্থিত হয়ই।

ব্রিটেনে একমাত্র লণ্ডন ছাড়া পর্যটকদের এমন প্রিয় স্থান আর একটিও নেই। যুদ্ধের পর এই ছোট্ট সহরটি আজ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে নড়বড়ে 'সেক্সপীয়র হোটেলটি' আপাদ-মস্তক চূণকাম করার প্রথম সুযোগ পেয়েছিল। এখানে এখনও ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডে যে সুবিধা আর কোথাও মেলে না।

সহরটি যেন আন্তর্জাতিক চৌমাথার মোড়ে: গত বছর বিদেশে পর্যটন ও বিদেশী মুদ্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট কড়াকড়ি সত্ত্বেও তিপান্নটি বিভিন্ন দেশের লোক এসেছে ষ্ট্রাটফোর্ডে। সেক্সপীয়রের বাড়ীতে অতিথিদের যে নামের পুঁথি আছে তার পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে গেলেই পর পর যাদের নামগুলি চোখে পড়বে তারা হলেন রউনের এক জন রাজপুরুষ, ইস্তাম্বুলের গভর্ণর, পেরুবাসী কূটনীতিজ্ঞ, মাথায় শ্বেত শিরোভূষণ ও ঢিলা আল্‌খাল্লা গায়ে সুদানের পার্ব্বত্য জাতির এক জন প্রধান সর্দার, এক দল ফিনিসীয় নট-নটী ও পেনসিলভিনিয়ার এক জন ব্যাংকার ও তাঁর স্ত্রী।

ছুটিতে সৈনিক আসে এখানে; আসে বহু ক্লাবের মেয়েরা এক দিনের জন্য পিকনিক করতে আর আসে ল্যাংকাশায়ারের মিল ও খনি থেকে পেশীবহুল শ্রমিকের দল। সহরের চারি দিকের সবুজের আস্তরণ বিছানো ময়দান খচিত হয়ে ওঠে সহস্র সহস্র তাঁবু আর পদচিহ্নে।

পয়সা খরচের উপযোগী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরও অভাব নেই। চতুর ষ্ট্রাটফোর্ড-বাসিন্দারা তাদের সহরটিকে সত্যিই 'সেক্সপীয়র-অন-এ্যাভনে' পরিণত করেছে—নানা স্নানাগারের ব্যবস্থা করে পরিণত করেছে রাণী এলিজাবেথের 'মেরী ইংলণ্ডে'। এখানে নিভৃত নির্জ্জন পথে সাপের মত আঁকা-বাঁকা গলি-ঘুপচি আর টিউডর যুগের কাঠের বাড়ীর ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায়! সেক্সপীয়র যখন জন্মেছিলেন তখনই যাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল তেমনি সব সময়ের পদচিহ্ন-মলিন কালচে ছাদের নীচে দিব্যি নিদ্রা দেওয়া যায় নিশ্চিন্ত আলস্যে।

সুদীর্ঘ আড়াইশ' বছর পরে ষ্ট্রাটফোর্ডের লোকেরা বুঝতে পেরেছে তাদের সহরের সেক্সপীয়র-মূল্য। সেক্সপীয়র যখন বেঁচে ছিলেন তখনই তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে সংশয়িত আশীর্ব্বাদ বলে গণ্য করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর লোকগুলির অন্ধ-গোঁড়ামির দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী। থিয়েটার তাদের কাছে ছিল নানা পাপের নরককুণ্ড। বস্তুতঃ, ১৬২২ সালে নাট্যকারের মৃত্যুর মাত্র ছ'বছর পরে তাঁর পুরোন বন্ধুরা রাজার বিশেষ অনুমতি নিয়ে নাটক অভিনয় করতে ষ্ট্রাটফোর্ড এলে নগর-প্রধানেরা তাদের ছ'শিলিংএর একটি পার্স্ উপঢৌকন দিয়ে অভিনয় না করার অনুরোধ জানিয়েছিল।

তার পর দেড়শ' বছর ষ্ট্রাটফোর্ড সম্বন্ধে কোন প্রকার ঔৎসুক্য দেখিয়েছে তারা হলেন অনুসন্ধানী স্কলাররা—যারা মাঝে-মাঝে আনাগোণা করতেন সেখানে। ক্রমশঃ এই সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং ১৭৬৯ সালে হোয়াইট লায়নের জমিদার তার জমিদারীর সকলকে সেক্সপীয়রের বার্ষিকী উৎসবে মিলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ষ্ট্রাটফোর্ডে। বিখ্যাত নট গ্যারিক তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এলেন লণ্ডন থেকে এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে। এঁরা এসে সহরের প্রধানদেরও চিত্ত জয় করলেন। তার পর সুরু হোল তোপধ্বনি সহকারে উৎসব, খানা-পিনা, বাজী-পোড়ান। সবই ছিল উৎসবে—ছিল না শুধু একটি জিনিষ—। ছিল না সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ের কোন ব্যবস্থা।

একটি শতাব্দী এই ভাবে গ্যারিক-প্রদর্শিত পথে বার্ষিক উৎসব চলল। স্থানীয় ব্যবসাদাররা বছরের একটি সময় বহু জন-সমাগমে পকেট-ভরানোর সুযোগ পেলে, কিন্তু সহরটির ভাগ্যে তখনও যেন লেখা ছিল চিরকাল বৃহৎ নীরস গ্রাম হয়ে থাকা।

কিন্তু এই দুর্ভাগ্য থেকে ষ্ট্রাটফোর্ডকে উদ্ধার করেছে শ্মশ্রুমণ্ডিত এক দৈত্যকায় মদওয়ালা—নাম তার চার্লস এডোয়ার্ড ফ্লাওয়ার। ১৮৭০ সালে স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের প্রশ্ন গুরুতর হয়ে উঠল। চার্লস চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে মত দিলেন: 'সেক্সপীয়রকে বললে তার নাটককেই বোঝায়। স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করতেই যদি হয় তবে সে হবে একটি রঙ্গালয়, যেখানে লোকেরা এসে তাঁর নাটক অভিনয় দেখতে পারবে।

একটি রঙ্গালয়ের জন্য তিনি ইংলণ্ডবাসিগণের কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু লণ্ডনের খবরের কাগজগুলি আর পলিতকেশীরা তার এই পরিকল্পনাকে নির্ম্মম উপহাসের দ্বারা জর্জ্জরিত করতে লাগল। 'এ পরিকল্পনা এত বড় মনীষীর প্রতি, জাতীয় সম্মান প্রদর্শনের এক হাস্যকর প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।' তাদের বক্তব্য—বৃটিশ সংস্কৃতির লীলাভূমি লণ্ডনই তার উপযুক্ত স্থান। ষ্ট্রাটফোর্ডকে তারা প্যানসে পরিত্যক্ত গ্রাম আর সেখানকার অধিবাসীদের 'কেউ নয়' বলে টিটকারি দিতে লাগল।

কিন্তু ফ্লাওয়ারও প্রতিগর্জ্জন করে উঠলেন—'আমরা তিনশ' বছর ধরে 'কেউ কেটা-দের দ্বারা উল্লেখযোগ্য কিছু হবার আশায় চাতক পাখীর মত চেয়ে আছি। কিন্তু এবার এই 'কেউ নয়'রাই কি করতে পারে দেখাব।'

ফ্লাওয়ার নদীর ধারে ছ'একর জমি দিলেন। কিন্তু সারা ইংলণ্ডে মাত্র এক হাজার পাউণ্ড সংগৃহীত হোল। পরিকল্পনাটিকে সমাপ্ত করতে লেগেছিল কুড়ি হাজার পাউণ্ড এবং সে সব টাকাটাই ফ্লাওয়ার দিয়েছেন নিজের পকেট থেকে। ফ্লাওয়ারের কোন ছেলেপুলে ছিল না। স্বামি-স্ত্রী তাঁদের সম্পত্তির মোটা অংশই রঙ্গালয় চালানোর জন্য তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেক্সপীয়র স্মৃতি-সংসদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

১৮৭৯ সালের এপ্রিল মাসে যেদিন লণ্ডনের একটি কম্পানী কর্তৃক 'মাচ এ্যাডো এবাউট নাথিং' বইখানি অভিনয়ের জন্য সর্বপ্রথম প্রেক্ষা-গৃহের যবনিকা উত্তোলিত হোল, সেদিন রঙ্গালয়টিকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন একটি অশুভ শ্বেতহস্তীর মত। এমন কি উৎসব-সপ্তাহের দিনগুলিতেও রঙ্গালয়ের আটশ' পঞ্চাশটি আসনের বেশীর ভাগই শূন্য পড়েছিল।

ফ্লাওয়ার তখন ফ্র্যাঙ্ক বেনসেন আর তার দলের সঙ্গে চুক্তি করলেন। বেনসেনকে আবিষ্কার করেছেন এ্যালেন টেরী আর হেনরী আর্ভিং। তখনও তিনি অক্সফোর্ডের ছাত্র। বেনসেন হোল সেই দলের যারা বিশ্বাস করেন যে থিয়েটার শুধু লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের একচেটিয়া নয়—থিয়েটার জনসাধারণেরও। তিনি এই মতবাদকে কাজে পরিণত করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

ইংলণ্ডের থিয়েটারের হৃৎপিণ্ড হবে ষ্ট্রাটফোর্ড। এই মহান্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বেনসেন অভিনয়-কৃতিত্বের দ্বারা যেমন, তেমনি স্বকীয় ব্যক্তিত্বের চুম্বকাকর্ষণে সারা ইংলণ্ডের জনসাধারণকে নিয়ে আসতে লাগলেন এ্যাভনের তীরের ছোট্ট সহরটিতে। থিয়েটারের জনপ্রিয়তা এমন বেড়ে গেল যে উৎসব-সপ্তাহকে এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন সপ্তাহে বাড়িয়ে দেওয়ার দাবী উঠতে লাগল। এখন তাই ছয় মাস ধরে উৎসব চলে—দু'শো বার অভিনয় দেখান হয়। নব-নির্মিত রঙ্গালয়ে বারশো দর্শকের আসন-ব্যবস্থা সত্ত্বেও শুধু দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখার জন্যই বহু টাকার টিকিট বিক্রী হয়। বেনসেন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অপ্রতিহত ভাবে ষ্ট্রাটফোর্ডে তাঁর রাজত্ব চালিয়েছেন। এই অখ্যাত নগরী আর তার রঙ্গালয়ের নাম আজ সারা জগতের লোকের মুখে-মুখে।

১৮৯২ সালে চার্লস ফ্লাওয়ার ইহলোক ত্যাগ করেন। জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে শেষ কুড়িটি বছর অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করতে হয়েছে তাকে। চার্লসের মৃত্যুর পর সে-দায়িত্ব এসে বর্তাল তার দশ ছেলের উপর। ছেলেদের মধ্যে সব চেয়ে নাম-করা হোল আর্কিব্যাল্ড ডেনিস ফ্লাওয়ার।

১৯২৬ সালে থিয়েটারটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার কথা শুনে আর্কিব্যাল্ড বললেন—'যাক। ভালই হোল। থিয়েটারটিকে বড় করার সময় অনেক দিন হয়ে গেছে।' তাই বলে থিয়েটারটি বন্ধ রইল না—স্থানীয় বায়স্কোপ-হলে অভিনয় দেখান চলতে লাগল।

টাকা তোলার জন্য তিনি আর তার স্ত্রী আমেরিকা ভ্রমণে গেলেন—স্মৃতি-সংসদ কি করছে এবং কি করতে চায় বুঝিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন সারা আমেরিকায়। প্রায় দু'হাজার দাতা সেক্সপীয়র-প্রতিষ্ঠানের হাত দিয়ে ছ'লক্ষ ডলার প্রদান করল তাঁকে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকেও যে দান এল তার পরিমাণও দশ লক্ষ ডলার। এতেই নতুন থিয়েটার তৈরী করার খরচ উঠে [illegible]— পুরান ধ্বংসাবশেষের সমাধির উপর রচিত হোল নতুন স্মৃতি-মন্দির।

সেক্সপীয়রের স্মৃতি-সংসদের প্রতীক হোল একটি ফুল। এখন এই ফুলের সংখ্যা সাতটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩০ সালে আর্কিব্যাল্ড ফ্লাওয়ারকে নাইট উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে—গত বছর তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর পুত্র কর্ণেল ফোর্ডহাম ফ্লাওয়ারের এ্যাভনের তীরে একটি সেক্সপীয়র-বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার বাসনা আছে। যেখানে সারা পৃথিবীর শিক্ষার্থী এসে নাটক অভিনয়, অভিনয় পরিচালনা, নাটক রচনা শিক্ষা করবে।

যে ছ'মাস ষ্ট্রাটফোর্ড শীতের ঘুম ঘুমায় না তখন এর কাজ হোল শুধু পান, আহার আর সেক্সপীয়রকে নিয়ে গল্প-গুজব করা। আজ যখনই কোন বিপদ মুখ ভ্যাঙচায় এই পবিত্র সংসদকে অমনি ষ্ট্রাটফোর্ডের কৃষক আর দোকানীরা সংসদের পিছনে এসে দাঁড়ায়।

যেদিন থেকে চার্লস ফ্লাওয়ার তন্দ্রাতুর ষ্ট্রাটফোর্ডবাসীদের ঘুম ভাঙ্গিয়েছেন সেদিন থেকেই সুরু হয়েছে নতুন সংগঠনের পালা। ঘর-বাড়ী, দোকান আর রেস্তোরার রং-চটা কুৎসিত পলেস্তারা দেওয়া সম্মুখ ভাগ ধ্বসিয়ে সেই সেক্সপীয়রের দিনের মত সুন্দর কাঠের পুরোভাগ রচনা করা হয়েছে। অগ্নিকুণ্ডের চারি ধারে কাবার্ডে; করিডরের গায়ে সেই এলিজাবেথের দিনের সুশ্রী সুষমা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রায় সোত্তর বছর ধরে তারা সেক্সপীয়রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি গৃহ, স্মৃতি যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছে। কিন্তু আজ সারা সহরটিই যেন সেক্সপীয়রের জীবন্ত স্মৃতি-সৌধ। ষ্ট্রাটফোর্ডের প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে সারা পৃথিবীর অগুণতি সেক্সপীয়র-পাগল লোকেরাও ষ্ট্রাটফোর্ডের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার।

একটি সকাল

অতন্দ্র রায়

মেঘের শাদায়, আকাশের নীলে গলাগলি,
গাছের পাতায়, হাল্কা হাওয়ায় বলাবলি
কতো কী সে কথা এতো ফিসফাস এতো গোপনের—
বসে ভাবি মনে তাই আনমনে—সবুজ-বনের!
শীতের সকাল, হিমেলা সকাল আলো ঝিলমিল,
ধূসর আকাশ, ধূসর পৃথিবী মৌন :—শিথিল
কুয়াশা এখানে, মেঘেরা ওখানে ঘোমটা দিয়ে
উধাও সবুজ পৃথিবী, নীলাভ আকাশ নিয়ে।
মনে হয় যেন এসে গেছি কোনো পরীর দেশে
পায়রার মতো আলগা ডানায় আজকে ভেসে,
স্বপ্নের ঘোরে, তন্দ্রার ফাঁকে পার কখন
এসেচি জানি না হয়ে সমুদ্র-পাহাড়-বন।
রূপকথা-গল্পের এটাই কী স্বপন-পুর?—
ভাবি মনে মনে এলাম যখন অনেক দূর!
এদিক্ ওদিক্ যতো দূর চোখ যায় তাকাই,
কোথায় রাজ-প্রাসাদ?—ধোঁয়া শুধু দেখতে পাই?
এতো কষ্ট সে আমার হবে কী তবে বিফল?—
চলি আর ভাবি পক্ষিরাজের লাগামে ঢল।
কোথায় সে গাছ বুড়ো শুক-শারী যেখানে থাকে,
রাজকুমারীর খোঁজ তারা বলে দেবে আমাকে?—

মানুষের শত্রু চার্চিল

ফ্রেড লংডেন

বর্তমান যুগে বিশ্ব-শান্তির প্রধান অন্তরায় মিঃ উইনষ্টন চার্চিল। চার্চিলের মত প্রথম শ্রেণীর নির্লজ্জ দুর্মুখ এবং মেহনতকারী মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু এ যুগে আর দ্বিতীয়টি নেই। এ শুধু আমার একার কথা নয়। আমি জানি, বিশ্বের অধিকাংশ নরনারীই আমার এই বক্তব্য সমর্থন করবেন।

চার্চিলের সারা জীবনের কু-কীর্তির বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে দু'হাজার পৃষ্ঠার একখানা বই লিখতে হয়, কিন্তু মাসিক পত্রিকায় স্থানাভাব, তাই সংক্ষেপে তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

১৯১০ সালে চার্চিলের "বিশেষ ভাবে শিক্ষিত" পুলিশ সাউথ ওয়েলস্‌এর খনি-শ্রমিকদের একেবারে তচনচ করে দেয়। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে খনি-শ্রমিকদের জীবন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। রাস্তা ঘাটে পুলিশের মার-খাওয়া শ্রমিকদের রক্তাক্ত কলেবরে আর্তনাদ করতে শোনা যেত। ক্রমাগত তাদের সেই করুণ আর্তনাদ শুনতে শুনতে পাশের গ্রামের অধিবাসীরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

১৯১১ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারে এবং ইয়র্কশায়ারে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। পুলিশ দু'জন শ্রমিককে হত্যা করে এবং ২৫ জনকে জখম করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিলাতের খনি-শ্রমিকদের জব্দ করবার জন্য জার্মাণী থেকে পর্যন্ত কয়লা আমদানী করা হতে থাকে। খনির মালিকরা জনসাধারণকে বলেছিল, "জার্মাণী যখন আপনাদের শত্রু ছিল, তখন জার্মাণদের আপনারা খেতে দেননি, কাজেই খনি-শ্রমিকদেরই বা আপনারা খেতে দেবেন কেন?" বলা বাহুল্য, চার্চিল মালিকদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন।

নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারিণী মহীয়সী বীরাঙ্গনাদের উপর চার্চিল এবং তাঁর দালালরা যে কুৎসিত এবং নৃশংস ব্যবহার করেছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

হোয়াইটহ্যাভো খনিতে এক বার বহু শ্রমিক মাটি চাপা পড়ে জীবন্ত সমাধিস্থ হন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী খনির মালিকদের চার্চিল সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন।

১৯২৬ সালে চার্চিল যখন ইংল্যাণ্ডকে স্বর্ণমানের বাহিরে নিয়ে যান, তখন সারা দেশব্যাপী এক ধর্মঘট হয়। মূল্যহ্রাসের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের বেতন শতকরা দশ ভাগ কমান হয়। খনি-শ্রমিকরা বেতন-হ্রাসে আপত্তি করে ধর্মঘট করে। ট্রেড ইউনিয়ন তাদের উৎসাহ দেয়। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চার্চিল তখন পূর্ণমাত্রায় লড়াইয়ের ভিত্তিতে সৈন্য সংগঠন করে। শ্রমিকদের আতঙ্কগ্রস্ত করার জন্য বিরাট ট্যাঙ্ক, বেয়নেট এবং বল কার্তুজের সমাবেশ করা হয়। চার্চিলের দপ্তর থেকে প্রকাশিত কুখ্যাত বৃটিশ গেজেটে মিথ্যা প্রচার করা হত যে, "ওটা ধর্মঘট নয় বিপ্লব।"

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেনাবাহিনী ভাঙ্গবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চার্চিল অসমর্থ হন। কেম্পটন পার্কে সৈনিকরা ধর্মঘট করে সরকারের দালালী করতে অস্বীকার করে। তখন অন্য এক সেনাবাহিনীর দ্বারা তাদের ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে চার্চিলের রাগ সব চেয়ে বেশী। গত মহাযুদ্ধের পর প্রথম যখন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন চার্চিল এই রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্য সাসেক্স রেজিমেণ্টকে রুশিয়া অভিমুখে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই রেজিমেণ্টের সৈনিকরা মুরমুনস্কে নামতে অস্বীকার করে। তখন দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন সৈনিকদের দ্বারা তাদের ঘেরাও করে মেসিন গান এবং বেয়নেট চালান হয়। ঠিক এর পরই চার্চিল বিভিন্ন রেজিমেণ্টের কাছে এক সার্কুলার দিয়ে জানতে চাইলেন: (১) ধর্মঘট ভাঙতে কোন কোন বাহিনী রাজী আছে; (২) কোন কোন বাহিনী রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছে; (৩) ট্রেড ইউনিয়নের কোন ধরণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন।

চার্চিলের রুশ অভিযানের দুঃসাহসিক অপকর্মের জন্য ব্রিটেনের রাজকোষ থেকে প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হয়েছিল। তাছাড়া বহু ব্রিটেন এবং রুশের রক্ত-বন্যায় স্নান করে তবে চার্চিলের রক্ত-পিপাসার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের নাজি-ভক্ত ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান দলের বীভৎস কার্য্যকলাপ চার্চিল সমর্থন করতেন।

জাপানীরা যখন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে সেখানকার নিরীহ মানুষদের নৃশংস ভাবে হত্যা করতে থাকে, তখন চার্চিল জাপানীদের সেই সভ্যকরণ-নীতির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

আবিসিনিয়ার উপর মুসোলিনী যখন বর্বর অভিযান সুরু করেছিলেন, তখন চার্চিল একটা মিটমাটের জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ভূমধ্যসাগরে শান্তির খাতিরে ইঙ্গ-ইটালী বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তার খাতিরে আবিসিনিয়াকে ইটালীর হাতে তুলে দেবার জন্য কুখ্যাত লাভাল-হোর চুক্তি চার্চিলের আশীর্বাদ লাভ করেছিল। তিনি মুসোলিনী এবং তার শাসনের পরম ভক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে চার্চিল বলেছিলেন, "আমি ইটালীতে থাকলে ফ্যাসীবাদ সমর্থন করতাম এবং লেনিনবাদের বর্বর ক্ষুধার বিরুদ্ধে ফ্যাসীবাদের সংগ্রামে যোগ দিতাম।" হিটলার সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "হিটলার অত্যন্ত দক্ষ এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি। তাঁর আচার-ব্যবহার চমৎকার।" তিনি ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ ও [illegible]
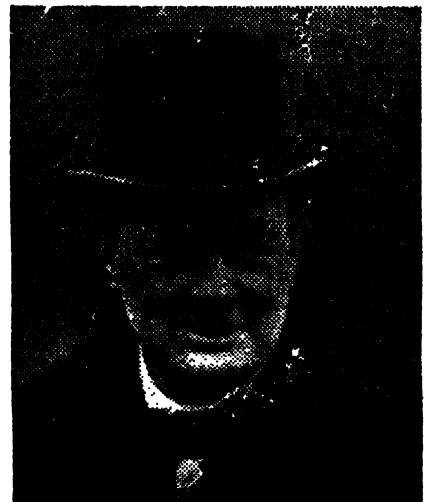
চার্চিল

তাণ্ডব সমর্থন করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'রক্ষণশীল দলের অধিকাংশ সদস্যই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর প্রশংসা করেন।"

এবারকার যুদ্ধের সময় তিনি গ্রীক রিজেন্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, গ্রীসের রাজাকে গ্রীসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং 'এলাস' (E.L.A.S.), ও 'ইয়াম' (E.A.M,) এর গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের কিছুতেই গবর্ণমেন্টে ঢুকতে দেওয়া হবে না। স্থির হয় যে, গ্রীক গবর্ণমেন্ট থেকে উদারপন্থীদেরও তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আজ তাই আমরা গ্রীসে দেখাচ্ছি, হাজার হাজার নরনারী-শিশুকে গ্রীক গবর্ণমেন্ট পাইকারী হারে হত্যা করে সারা বিশ্বের লোককে আতঙ্কগ্রস্ত করে দিয়েছেন। দেশভক্ত গ্রীক নরনারীর রক্তে আজ এথেন্সের রাজপথে জোয়ার নেমেছে। গ্রীক দক্ষিণপন্থী একনায়কত্বের পাশবিক তাণ্ডবলীলা আরও কত নরনারী ও শিশুর রক্ত পান করে যে শেষ হবে, তা একমাত্র ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রান্তকারীরাই বলতে পারেন।

চার্চিল গান্ধীজীকে "উলঙ্গ ফকির" বলে উল্লেখ করতেন এবং গান্ধীজীকে "ধ্বংস" করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

আজকের জগতে চার্চিলের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ড মার্শাল স্মাট্স্। এই লোকটির নির্লজ্জ বর্ণবিদ্বেষ সারা বিশ্বের সভ্য মানুষের ঘৃণার উদ্রেক করে, কিন্তু চার্চিলের আশীর্বাদ থেকে স্মাট্স্ কখনও বঞ্চিত হননি।

নিজামের মত মধ্যযুগীয় বর্বর নৃপতির পক্ষ নিয়ে এবং ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চার্চিল জন্তুবিশেষের মত যে রকম লম্ফ-ঝম্ফ করছেন, তাতে ভারতবাসীর কাছে তার পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন হবে না।

এই সব ঘটনার পর চার্চিল যখন পশ্চিম-ইউরোপ ব্লক গঠনের জন্য উঠে-পড়ে লাগেন তখন স্বভাবতই মনে হয় যে, পশ্চিম-ইউরোপ ব্লক-গঠনের আসল উদ্দেশ্য আমেরিকার সঙ্গে চক্রান্ত করে পূর্ব-ইউরোপের সর্বনাশ সাধনের আয়োজন করা।

চার্চিলের জীবনী রচনাকারী সেনকোর্ট চার্চিলের সম্বন্ধে বলেছেন, "চার্চিল যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং যখন ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল, তখন তাঁর কথাবার্তা এবং কার্য্যকলাপ ছিল স্বেচ্ছাচারীর মত।"

অপর জীবনী-লেখক মার্টিন চার্চিলের সম্বন্ধে বলেছেন, "চার্চিল নির্বাচকমণ্ডলীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করাকে সময় নষ্ট করা বলে মনে করতেন। তিনি মুসোলিনীর পদ্ধতি সমর্থন করতেন এবং মুসোলিনীকে প্রথম শ্রেণীর মাথাওয়ালা মহামানব বলে প্রশংসা করতেন।

সমাজতন্ত্রবাদকে চার্চিল চিরদিন "বর্বর ও ক্লীব" ভাবধারা বলে বর্ণনা করেছেন। এক যুগ আগে এই উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী লোকটি বলেছিলেন, "জার্মাণ সমরলিপ্সার অবসান হয়েছে, এখন বৃটিশ সভ্যতার প্রধান শত্রু লেবার পার্টি"। আজ লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসীন। চার্চিল হয়ত দেখে খুশী হয়েছেন যে, লেবার পার্টি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সারা বিশ্বে যথাযথ ভাবে কায়েম রাখার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করছেন না। মালয়, ব্রহ্ম, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং বিশ্বের সর্বত্র 'লেবার' নামধারী তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদীরা যে নৃশংস পদ্ধতিতে মানুষের স্বাধীনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে তাতে চার্চিলের মনে নিরানন্দ হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন, তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে চান, তাই আজও তিনি পার্লামেন্টে বসেই লেবার পার্টিকে খিস্তির চূড়ান্ত করেন, কিন্তু লেবার পার্টির সদস্যরা এত হীনমন্যতায় ভুগছেন যে, তারা চার্চিলের খিস্তির জবাব দিতেও ভয় পান।

অনুবাদক—শ্রীসু···

হিন্দুধর্ম্ম

"যখন ধর্ম্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্ম্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে? তবে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখাইয়াছি যে, শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম্ম তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না—এখনও চলিতেছে না এবং বোধ হয় কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আছে, তৎকর্ত্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের কি সপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা হিন্দু সমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম, সেটুকু সার ভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথবা প্রত্নতত্ত্ব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস, অথবা কেবল কল্পিত ইতিহাস, কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মেরই নাই। সেইটুকু সার ভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম্ম। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।"

প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ভাষায় টেলিগ্রাফি

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

কিছু কাল আগে পর্যন্ত ইংরাজীতে চিঠি লেখা একটা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজও দেখি, কোনো কোনো ইংরাজীশিক্ষিত লোক আত্মীয়-স্বজনকে, বন্ধু-বান্ধবকে এমন কি বাবাকে পর্যন্ত ইংরাজীতে চিঠি লেখেন। বাঙ্গালা চিঠির গোড়ায় My dear এবং শেষে Yours-এর ব্যতিক্রম এখনও কাটে নাই। তবে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে হেয়তা বোধ ক্রমশঃ কমিতেছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন তাঁহারাও বাঙ্গালীকে চিঠি লিখিতে হইলে মাঝে মাঝে বাঙ্গালায় লিখিতেছেন। মাতৃভাষার প্রতি এই করুণা বোধ যদি চিঠিপত্র পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে তো টেলিগ্রাফ পর্যন্ত আসিয়া উঠিতেছে না কেন? অথচ টেলিগ্রাফের ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন সর্বাধিক। আমাদের দেশে বিবাহের অভিনন্দন অপেক্ষা মৃত্যু বা আসন্ন-মৃত্যুর সংবাদটাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফের সাহায্যে পাঠানো হইয়া থাকে। সহরে ইংরাজী-জানা লোক ততটা বিরল নয়। কিন্তু আমাদের এই দেশটায়—শুধু বাঙ্গালা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বলিতেছি—নাগরিক অপেক্ষা পল্লীবাসীর সংখ্যাই অধিক। পল্লীর লোকের পক্ষে, অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে একটি টেলিগ্রাম পড়াইয়া লওয়া যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। একটি টেলিগ্রাম লিখাইয়া লইতে হইলেও সারাটা গ্রাম তোলপাড় করিতে হয়। গ্রামে কেন, নগরেও এমন ঘটনা নিত্য ঘটে। হয়তো গৃহকর্তা গিয়াছেন আপিসে, বাড়ীতে গৃহিণী আছেন একলা, তিনি ইংরাজী জানেন না। পিওন টেলিগ্রাম লইয়া উপস্থিত হইল। টেলিগ্রামটা বাঙ্গালায় লেখা থাকিলে সংবাদটা তিনি নিজেই পড়িতে পারিতেন, কিন্তু ইংরাজীতে লিখিত বলিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহাকে উৎকণ্ঠা দমন করিয়া রাখিতে হইবে, অথবা ইংরাজী জানা কোনো প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়া টেলিগ্রামটি পড়াইয়া লইতে হইবে।

এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে এইরূপ অসহায়তা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। তবে এই অত্যাবশ্যক দৈনন্দিন ব্যাপারেও পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতেছি না কেন? এ প্রশ্নের, একমাত্র না হইলেও, প্রধান উত্তর—মুক্তি তো আমরা চাহিতেছি না।

বাঙ্গালায় টেলিগ্রাম আদান-প্রদানের আইনগত কোনো বাধা নাই। আমি যদি বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে কোন সংবাদ টেলিগ্রাফ করিতে চাই, তার-আপিস তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

একটি মাত্র বাধা আছে। সে বাধা লিপির বাধা। যে মর্স-সংকেত (Morse code) সাহায্যে তার-বার্তা আদান-প্রদান হইয়া থাকে রোমান লিপিতে সে বার্তা লিখিত হওয়া আবশ্যক।

রোমান লিপিতে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে লেখা যায় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:

Mahendra,

Tar pailam. Sateroi Mangalber Bombay jaitechi. Tirishe phiribar pathe Nagpure namite pari. Bhabener sambad tar kario.

টেলিগ্রাফের ভাষা সেই চিরাচরিত ইংরেজী ভাষায় না লিখে যদি কেউ বাঙলা ভাষায় লেখেন? লেখকের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত, তবে ভাষাতত্ত্ববিদের সাহায্য এ বিষয়ে অপরিহার্য্য। —মা, ব

মহেন্দ্র,

তার পাইলাম। সতেরোই মঙ্গলবার বোম্বাই যাইতেছি। তিরিশে ফিরিবার পথে নাগপুরে নামিতে পারি। ভবেনের সংবাদ তার করিও।

সুরেন।

বলা যাইতে পারে, এরূপ লিপ্যন্তরণ নির্দোষ নহে। 'namite' শব্দটিকে যদি কেহ 'নামিতে' না পড়িয়া 'নামাইট' পড়ে তো দোষ দেওয়া যায় না। স্বীকার করি, পূর্বাপর পড়িলে ঠিক এই স্থানে এই কথাটিতে ভুল হইবে না। কিন্তু অন্যত্র ভুল হইতেও পারে। সত্য সত্যই এ রকম ঘটনা ঘটে। ট্রামে যাইতে যাইতে একটি প্রাচীর-পত্র নজরে পড়িল, PAPER PATHE; মনে মনে পড়িলাম, 'পেপার পেদ'। অবশ্য এক মুহূর্ত পরেই বুঝিলাম 'পাপের পথে'।

রোমান ২৬টি অক্ষর বাঙ্গালা সব কয়টি অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। তাহার ফলে গণ্ডগোল ঘটে। অনেক সময় একই অক্ষরকে একাধিক ধ্বনির প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন—T দিয়া ট ও ত ধ্বনি প্রকাশ করা হয়; D দিয়া দ ড ও ড় ধ্বনি প্রকাশ করা হয়। আবার TH-এর দ্বারাও দ ধ্বনি প্রকাশিত হইয়া থাকে। থ বুঝাইবার জন্যও TH ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি বাঙ্গালা অক্ষর বুঝাইবার জন্য একটি করিয়া সুনির্দিষ্ট রোমান অক্ষর বা অক্ষর-সমষ্টি ব্যবহৃত হয় না বলিয়াই লিপ্যন্তরণে ত্রুটি ঘটে। আবার সেই ত্রুটির জন্য উচ্চারণেও বিকৃতি দেখা দেয়। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। কলিকাতা পশ্চিমা ভারতীয়দের মুখে উচ্চারিত হয় 'কলকাত্তা', ইংরেজ তাহাকে লিখিল Calcutta, আমরা তাহাকে নূতন করিয়া পড়িলাম 'ক্যালকাটা'। যে ছিল কলকাত্তা, রোমান হরফের খাল পার হইতে না হইতেই সে ক্যালকাটা বনিয়া গেল।

সাধারণ ক্ষেত্রে যদি এইরূপ বিপত্তি ঘটে, টেলিগ্রাফের ক্ষেত্রে সে বিপত্তি আরও গুরুতর হইতে পারে। সুতরাং এখানে লিপ্যন্তরণের যথাতথ্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক। টেলিগ্রাফের জন্য বিজ্ঞানসম্মত লিপ্যন্তরণ-প্রণালী অবলম্বন করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইলে তদনুসারে মর্স-সংকেতকে (Morse codej) ভারতীয় ভাষার জন্য কার্যোপযোগী করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। কি ভাবে তাহা করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। বর্তমান লেখক কিছু কাল যাবৎ সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। সে পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবে কি না এবং হইলে কবে হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা রোমান লিপিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় টেলিগ্রাম লিখিয়া পাঠানো আরম্ভ করি না কেন? তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য এই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ সফল হইবে না সত্য, কিন্তু সিদ্ধির পথটা কিছু প্রশস্ত হইলেও হইতে পারে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের লোক টেলিগ্রাম আদান-প্রদান করিতে চাহে এটুকু পর্যন্ত সরকার জানুন। কোন্ উপায়ে জনসাধারণের সে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ মিটিবে তাহা আবিষ্কার করিতে

আ লিঙ্কন

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ক্রূর হিংসার হাতে মহত্তের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে বারংবার। কয়েক জন মহামানবের মহৎ জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি আমাদের স্মৃতিকে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট ভারাক্রান্ত করিয়া লজ্জা ও কলঙ্কের কারণ হইয়াছিল। মানুষের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই হিংসা-কোলাহল-কলহ-মুখরিত পৃথিবীতে, হিংসার বন্যা রোধ করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ চিত্তে আত্মবলি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের আমরা সর্বদা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করিলেও এ কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, এতগুলি শ্রেষ্ঠ মানুষের চরম আত্মনিবেদনও আমাদের হিংসা-উন্মত্ততা দূর করিতে পারে নাই, আমরা বার বার ভুল করিয়াছি। বার বার আঘাত হানিয়াছি সেই সমর্পিতপ্রাণ মানবসেবকদের বুকে, তবু আমাদের চৈতন্য হয় নাই। মহাজ্ঞানী সক্রেটিসকে আমরা বাধ্য করিয়াছি বিষপানে আত্মহত্যা করিতে, মহা বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের মস্তক আমাদেরই তরবারির আঘাতে ছিন্ন হইয়াছে, মহাপ্রেমিক যীশুকে আমরা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছি, মহামানবী জোয়ান অব আর্ককে আগুনে দগ্ধ করিয়া মারিয়াছি, মুক্তির মহাসৈনিক আব্রাহাম লিঙ্কনকে খুন করিয়াছি অতর্কিত গুলীর আঘাতে; তবু মানুষের জয়যাত্রার কাহিনী হইতে এই হীন হিংসার ভয়াবহ প্রভাব দূর করিতে পারি নাই। মানুষের সভ্যতার আপাতত শেষ অর্থাৎ বর্তমান অধ্যায়ও মাত্র সেদিন (গত ৩০শে জানুয়ারি) রক্তরঞ্জিত হইয়াছে, একাধারে হীনতম ও নিষ্ঠুরতম হিংসার আঘাতে—মহান্ আত্মা গান্ধীজীর প্রাণবায়ু যেদিন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়াছে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী নগরীর বুকের উপর। গত তিন হাজার বছরের ইতিহাসে একই নিষ্ঠুরতা বার বার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমাদের কাহারো কাহারো মনে সন্দেহ জাগিতেছে, প্রেম ও হিংসার দ্বন্দ্বের শেষ কখনো হইবে না—আমাদের এই মর্ত্যধামে ভগবান ও শয়তানের লীলাভিনয় এমনি করিয়াই চলিতে থাকিবে অনন্ত কাল; হিংসোন্মত্ত পৃথিবী সাময়িক ভাবে শান্ত হইবে প্রেমের শীতল রক্তসিঞ্চনে—একেবারে শান্ত হইবে না কোনো দিন। শান্ত হইবে না বলিয়াই সক্রেটিসের হত্যাকারীরা বাঁচিয়া থাকিবে আর্কিমিডিসের ঘাতকদের মধ্যে, আর্কিমিডিসের ঘাতকরা বাঁচিবে যীশুর ক্রুশবিদ্ধকারীদের মধ্যে, তাহারা বাঁচিবে জন্ উইল্‌কিস বুথের অন্তরে, বুথ বাঁচিবে গান্ধীজীর হত্যাকারীর মধ্যে। আমরা কোথা হইতে যে কোথায় গিয়া পৌঁছাইব, তাহা ভাবিতে গিয়া লজ্জাই পাইব মানুষের সভ্যতার ব্যর্থতা দেখিয়া। হিংসাকে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে পশু, তাহাকে মহাকালের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া দিয়াও আমরা শেষ করিতে পারিলাম না, প্রেম ও করুণা সর্বব্যাপী হইতে পারিল না।

আজ আমরা এই মহাপুরুষ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিব আব্রাহাম লিঙ্কনকে—যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান তাঁহার সেই বিখ্যাত "ক্যাপটেন, মাই ক্যাপটেন" অর্থাৎ কর্ণধারের গান গাহিয়াছেন।

তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের কাহিনী সর্বজনবিদিত। তিনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার ওহিওর এক গরীব চাষীর খামারে (রকস্প্রিং ফার্ম) খুঁটিবাঁধা কুটীরে (লগ কেবিন্) জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার পিতার নাম ছিল টমাস লিঙ্কন এবং মা ছিলেন ন্যান্সি হ্যাঙ্কস, তাঁহার জন্মের ১৮ দিনের মধ্যে ইলিনয় ভূখণ্ডের গ্রামগুলি এক হইয়াছিল। জীবনের প্রথম ১৯ বছর চাষের কাজে বাবাকে সাহায্য করা ছাড়া কিছুই তিনি করেন নাই, তাহার পর সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া যথাক্রমে কেরানী ও ভাণ্ডাররক্ষীর (ষ্টোর-কীপার) কাজ করিয়াছিলেন, ৯ বছর বয়সে ১৮১৮ সালে তিনি মাতৃহীন হইয়াছিলেন। ওই বছরেই ইলিনয় প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকার পাইয়াছিল। উনিশ বছরে অর্থাৎ ১৮২৮ সালেই আব্রাহাম ঘর ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছিলেন নিউ অর্লিন্সের দিকে নৌকাতে। ১৮৩০-এর মার্চ মাসে লিঙ্কন-পরিবার ইলিনয় প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ২১ বছরের আব্রাহাম স্বয়ং এখানেও খুঁটির কুটীর নির্মাণে তাঁহার পিতাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই কর্তব্যটি সম্পাদন করিয়া আব্রাহাম স্বাধীন ভাবে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসিতে ভাসিতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাইশ বছর বয়সে নিউ সালেমে উপস্থিত হইয়া নিজেকে সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কেরানীরূপে। এখানেই তিনি অবসর-সময়ে নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। আইন ও রাজনীতি ছিল তাঁহার বিশেষ অধ্যয়নের

আব্রাহাম লিঙ্কন

বিষয়। পরের বছরেই তিনি নিজেকে এমনই তৈয়ারী মনে করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। এই বছরেই তিনি রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ব্ল্যাক হক যুদ্ধে ক্যাপটেন হইয়া অভিযান করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে এই একুশ দিনের সেনানায়কত্বের মধ্যে তিনি এক জনকেও হত্যা করিতে পারেন নাই সুতরাং সেখান হইতেও তাঁহাকে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালে তিনি শেষ পর্যন্ত নিউ সালেমের একটি ডাকঘরে পোষ্টমাষ্টারের পদ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই পদে তিনি পুরা চার বছর ছিলেন। পোষ্টমাষ্টার থাকিতে থাকিতেই ১৮৩৪ সালে তিনি আবার নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। পরিষদের কাছে তিনি এমনই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন যে, ১৮৩৬, ১৮৩৮ এবং ১৮৪০-এর দ্বন্দ্বেও তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ সালে তিনি নিউ সালেমের পোষ্টমাষ্টারী চাকরি ছাড়িয়া স্প্রিংফিল্ডে উপস্থিত হইয়া জন টি· ষ্টুয়ার্টের অংশীদাররূপে ব্যবসায়ে নামিয়াছিলেন, ১৮৪১ পর্যন্ত ষ্টুয়ার্ট ও লিঙ্কনের এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চলিয়াছিল। ওই বছরে লিঙ্কন ষ্টিফেন টি· লোগানের অংশীদার হইয়া ব্যবহারজীবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এ ব্যবসা ১৮৪৪ সালে শেষ হইয়া গেলে তিনি উইলিয়াম এইচ· হার্নডনের সঙ্গে লিঙ্কন ও হার্নডন এই নামে স্প্রিংফিল্ডেই তৃতীয় বার ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই অংশীদারী কারবার তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৮৪৭-৪৮ সালে তিনি কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার পান। ১৮৫১ সালে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৫৬ সালে লিঙ্কন রিপাবলিকান দলভুক্ত হন। ১৮৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের এক জন প্রার্থিস্বরূপ দাঁড়াইয়া তিনি পরাজিত হন। কিন্তু ১৮৬০ সালে ষ্টেট রিপাবলিক্যান কনভেনশন তাঁহাকে যুক্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য খাড়া করেন এবং ওই বছরের ৬ই নবেম্বর তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার আব্রাহাম লিঙ্কন সপরিবারে স্প্রিংফিল্ডের খুঁটি-ঘর বা লগ-কেবিন পরিত্যাগ করিয়া ওয়াশিংটনের শ্বেতপ্রাসাদ বা হোয়াইট হাউসে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। ওই বছরের ৪ঠা মার্চ লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গদীতে আসীন হন। ১৮৬৪ সালে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল দক্ষিণ রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিনায়ক জেনারেল রবার্ট ই· লির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ-বার্তা ঘোষিত হয় অর্থাৎ দাস-ব্যবসায়ের সমর্থনকারীর দল হারিয়া যায়। ১৪ই এপ্রিল তারিখ সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের "ফোর্ডস থিয়েটারে"র প্রেক্ষাগৃহে জন উইলকিজ বুথ-নিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন; পরদিন সকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

লিঙ্কনের জীবনের এই সব মামুলি খবর আজিকার দিনে আমাদের কাছে বড় নহে। মেরি ওয়েনস্ বা সারা রিকার্ডের সঙ্গে তাঁহার প্রেমের কথা, এমন কি, ১৮৪২ সালে ৪ঠা নবেম্বর তারিখে মেরি টডের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথাও আমাদের না জানিলে চলিবে। কারণ, ছোট-বড় প্রায় দুই হাজার খণ্ড জীবনীগ্রন্থে তাঁহার জীবনের সামান্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে। বিখ্যাত কবি ও সমালোচক কার্ল স্যাণ্ডবার্গ সুবৃহৎ ছয় ভলুম জীবনীতে লিঙ্কনের জীবনের কয়েক বছর মাত্র বিবৃত করিয়াছেন এমিল লাডভিগ, লর্ড চার্নউড্, উইলিয়ম ই· বার্টন, এইচ· জ্যাক ল্যাং ফিলিপ ভ্যান ডোরেন ষ্টার্ন, ইলিওনর ফারজিয়ন, লয়েড্ লিউয়িস্, জেসি টেকে, ওয়ার্ড হিল লামন, জন জি· হল্যান্ড, আইজাক এন· আর্নল্ড, নিকলে অ্যাণ্ড হে, আইডা এম টার্বেল—কত জীবনীকারের নাম করিব? শুধু লিঙ্কনের হত্যাকাণ্ড ও তাহার বিচার লইয়া সতেরোখানি সুবৃহৎ বই লেখা হইয়াছে। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা এই সব বই হইতে লিঙ্কনের জীবনের আনুপূর্বিক ইতিহাস সহজেই জানিতে পারিবেন। জন ড্রিঙ্কওয়াটার প্রভৃতি অনেকে নাটকও লিখিয়াছেন তাঁহাকে লইয়া।

ফিলিপ ভ্যান ডোরেন ষ্টার্ন তাঁহার 'দি ম্যান হু কিলড্ লিঙ্কন' অর্থাৎ 'লিঙ্কনের হত্যাকারী' গ্রন্থে যে দৃশ্যে এবং যে ব্যক্তির হাতে লিঙ্কনের জীবনান্ত ঘটে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। হত্যাকারী ছিল রঙ্গমঞ্চের এক জন ব্যর্থ অভিনেতা, তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সে সস্তায় নাম কিনিবে। তাহার রাজনৈতিক মতামত লিঙ্কনের বিপক্ষে ছিল সন্দেহ নাই, বিশেষ করিয়া ক্রীতদাস প্রথা রহিত করার ব্যাপারে লিঙ্কন যেদিন হইতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সেদিন হইতে বুথের মতো অনেকেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। কিন্তু এই মতভেদই লিঙ্কন-হত্যার একমাত্র কারণ নহে। বুথ-বন্ধুদের নিকট হইতে এমনও সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে জীবনে সর্বদিক্ দিয়া সে যখন বিফলমনোরথ হয় তখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মানব লিঙ্কনকে হত্যা করিয়া তাঁহার হত্যাকারিরূপে ভবিষ্যৎ কালে বাঁচিয়া থাকার কল্পনাও সে করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহার মনের এই ভয়াবহ প্রবৃত্তিই তাহাকে হত্যায় বাধ্য করাইয়াছিল। এই রঙ্গমঞ্চের ব্যর্থ অভিনেতা রঙ্গমঞ্চকেই বাছিয়া লইয়াছিল তাহার চরম কীর্তির উপযুক্ত স্থানরূপে; দিনটি ছিল ১৪ই এপ্রিল (১৮৬৫) গুড্ ফ্রাইডের স্মরণীয় দিন, ফোর্ডস থিয়েটারে লিঙ্কন সস্ত্রীক দেখিতে গিয়াছিলেন টম টেলরের 'আওয়ার অ্যামেরিকান কাজিন' নাটকের অভিনয়। এই সুযোগ বুথ হারাইল না।

"He peers into the box—The high back of the armchair is in front of him, and he can see a dark head rising above it. Mrs. Lincoln is leaning toward her husband, speaking to him··· There can be no hesitation. This is the moment!··· He must make his entrance. His pistol is ready in his hand. His breath rushes into his lungs— can they hear the terrible sound of it? His left hand turns the door-knob—the door opens, letting in the light—his feet move silently on the carpet···The people in the box are all watching the stage. They do not notice him. He steps forward, raising his hand with the deringer in it, he holds it close to that hated head. There must be no chance of missing. Now! Now!···And then the report, sharp and loud—the pistol

almost seemed to go off by itself, kicking his hand upward. "Sic semper tyranuis ?" he cries. He has done it ! He has killed Linclon ? The man in the chair never moves. He sits there, his head sagging forward, white smoke billowing around him."

[সে বক্সের দিকে তাকাইল। আরাম-কেদারার পিছন দিক্‌টা তাহার সম্মুখে। ইহার উপর সে একটি কালো মাথা দেখিতে পাইল। মিসেস্ লিঙ্কন তাঁহার স্বামীর দিকে হেলিয়া কথা বলিতেছেন··· ইতস্তত করিবার কারণ নাই। ইহাই উপযুক্ত সময় !···সে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। হাতে পিস্তল লইয়া সে প্রস্তুত। তাহার শ্বাস রুদ্ধ—কেহ কি তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছে ? বাঁ হাত দিয়া সে দরজা খুলিল এবং কার্পেটের উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। বক্সের দর্শকবৃন্দ সকলেই অভিনয় দেখিতেছেন। কেহই তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সে হাতে পিস্তল লইয়া অগ্রসর হইল এবং সেই ঘৃণিত মস্তকের নিকট তুলিয়া ধরিল। ব্যর্থ হইলে চলিবে না। এইবার ! এইবার !···তার পর একটা তীব্র আওয়াজ···পিস্তলটা তাহার হাত হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। উল্লাসে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। সে লিঙ্কনকে হত্যা করিয়াছে। চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটিকে নড়িতে দেখা গেল না। তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথা সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল, আর তাঁহার চার দিকে সাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইতে লাগিল।]

গত ৩০ জানুয়ারী দিল্লীতে বিড়লা-ভবনের প্রাঙ্গণে বৈকাল পাঁচটায় যে ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার হতভাগ্য নায়ককে লইয়া যদি কেহ কোন দিন গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহাকেও অনুরূপ বর্ণনার সাহায্য লইতে হইবে। উভয় ব্যক্তিকেই সাময়িক ভাবে একই উন্মত্ততা গ্রাস করিয়াছিল। এক উদ্দেশ্য লইয়া একই ভাবে দুই জনেই অগ্রসর হইয়াছিল পৃথিবীর দুই হীনতম কীর্তির অন্বেষণে। মানব-সভ্যতার কলঙ্কিত ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলি সম্ভবত একই ছাঁচে ঢালা।

আব্রাহাম লিঙ্কনের যে মহৎ আদর্শ, যে প্রাণস্পর্শী বাণী, যে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠা পৃথিবীকে চিরদিন সত্যপথের সন্ধান দিবে তাহাই আমাদের সর্বদা স্মরণীয়। মানুষ তাহার জীবনের খুঁটিনাটি সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া পৃথিবী হইতে সরিয়া যায়, কিন্তু মহৎ যে, মহাবীর যে, তাহার আদর্শ দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, তাহার বাণী কালের ভালে সোনার অক্ষরে লেখা হইয়া জ্বল্‌জ্বল্ করিতে থাকে; আমাদের দুঃখ ও বিপদের দিনে তাহাই হয় আমাদের সঙ্গী, তাহারাই যোগায় আমাদের মনে সাহস আর ভরসা। তাঁহার কয়েকটি চিরন্তন বাণী তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

১। You can fool some of the people all of the time ; and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.

[(১) কয়েক জন লোককে সকল সময় বোকা বানানো যায় এবং সকল লোককে কিছু কাল বোকা বানান যায়, কিন্তু সকল লোককে চিরকাল বোকা বানানো যায় না।]

২। Let us have faith that right makes might ; and in that faith let us to the end dare to do our duty as we understand it.

[(২) আমাদের এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, ন্যায্য অধিকারই ক্ষমতা আনয়ন করে এবং সেই বিশ্বাস লইয়া আমাদের বোধ অনুযায়ী কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে।]

৩। The ballot is stronger than the bullet.

[(৩) বুলেটের চেয়ে ভোট অধিকতর শক্তিশালী।]

৪। I don't know who my grandfather was, but I am much more concerned to know what his grandson will be.

[(৪) আমার পিতামহ কে ছিলেন, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তাঁহার পৌত্র কি হইবে, তাহা জানিতেই আমার আগ্রহ অধিক।].

৫। No man is good enough to govern another man without that other man's consent.

[(৫) যিনি যত ভাল লোকই হউন না কেন, কাহারও সম্মতি ব্যতীত তিনি কাহাকেও শাসন করিবার যোগ্য হইবেন না।]

৬। Killing the dog does not cure the bite.

[(৬) কুকুরকে মারিয়া ফেলিলে তাহার দংশন হইতে আরোগ্যলাভ করা যায় না।]

লিঙ্কন বক্তৃতায় ও কথাবার্তায় বাহুল্য ভালবাসিতেন না। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বদা বাক্‌সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যখন লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তখন কাগজ কেনার মতো সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। তিনি দেওয়ালে কয়লা দিয়ে রচনা অভ্যাস করিতেন, সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সংক্ষেপে সারা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। আর একটি কারণে বাক্যের উপর তাঁহার অসাধারণ দখল জন্মিয়াছিল, তিনি নামতা পড়ার মতো পাঠ অভ্যাস করিতেন। জোরে জোরে আবৃত্তি না করিয়া কোনও কিছু পড়িতেন না। ফলে শব্দের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার একটা স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিয়াছিল। বাল্যকালে অধীত দুইটি জিনিস হইতে তিনি জীবনের যুক্তি ও প্রাঞ্জলতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, একটি হইতেছে ইউক্লিডের জ্যামিতি, অন্যটি বাইবেল। আইনের শিক্ষাও তাঁহাকে কম সংযমী ও যুক্তিবাদী করে নাই। হ্যারিয়েট বুচার স্টো তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন—

"We say of Lincoln's writing, that for all true, manly purposes of writing, there are passages in his state papers that could not be better put—they are absolutely perfect. They are brief, condensed, intense, and with a power of insight and expression which make them worthy to be inscribed in letters of gold."

লিঙ্কনের রচনাবলীর মধ্যে এমন রচনা আছে, যাহা সম্পূর্ণ নিত এবং তিনি যে ভাবে লিখিয়াছেন, তদপেক্ষা ভাল ভাবে আর

লেখা যাইতে পারে না। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁহার লেখা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মত।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে লিঙ্কন যখন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ইলিনয়ের প্যাপসভিলেতে একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন—এইটি তাঁহার সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসাবে রক্ষিত হইয়াছে। বক্তৃতাটি সম্পূর্ণ এই—

"Fellow-citizens: I presume you all know who I am. I am humble Abraham Lincoln. I have been solicited by many friends to become a candidate for the Legislature. My politics are short and sweet, like the old woman's dance. I am in favour of a national bank. I am in favour of the internal improvement system, and a high protective tariff. These are my sentiments and political principles. If elected, I shall be thankful, if not it will be all the same."

["নাগরিকবৃন্দ: আমার ধারণা আপনারা সকলেই আমাকে জানেন। আমি দীনহীন এব্রাহাম লিঙ্কন। আমার বন্ধুরা আমাকে আইন-সভার প্রার্থী হইবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমার রাজনীতি বৃদ্ধার নৃত্যের ন্যায় সংক্ষিপ্ত ও মিষ্ট। আমি একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা এবং আভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রথা ও উচ্চ রক্ষণশুল্ক প্রবর্তনের পক্ষপাতী। ইহাই আমার মনোভাব ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নীতি। নির্বাচিত হইলে আমি বাধিত হইব, না হইলেও কোন ক্ষতি নাই।"]

ডেমোক্রেসি বলিতে তিনি কি বুঝিতেন, একটি অটোগ্রাফে নিজের হাতের লেখায় ও স্বাক্ষরে অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখিয়াছিলেন:

"As I would not be a slave, so I would not be a myrter. This expresses my idea of democracy; whatever differs from this, to the extent of the difference, is no democracy."

["আমি যেমন ক্রীতদাস হইব না, তেমনই আমি প্রভুও হইব না। গণতন্ত্র সম্বন্ধে ইহাই আমার ধারণা। ইহার সহিত যদি না মিলে, তবে তাহা গণতন্ত্র নহে।"]

লিঙ্কনের চরিত্র একটি চিঠিতে অতি চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লিঙ্কন-পাণ্ডুলিপির বিখ্যাত সংগ্রাহক মিঃ ম্যাডিগান এই চিঠিখানিকে ষোড়শ প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের "most characteristic letter, both in sentiment and phraseology" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনরেবল উইলিয়ম ডি. কেলি তাঁহার একটি আইন-গ্রন্থ লিঙ্কনের নামে উৎসর্গ করিতে চাহিলে তাঁহাকে তিনি লিখিয়াছিলেন:

"Private

Springfield, Illiönis, Oct. 13, 1860.

My dear Sir,

Yours of the 6th asking permission to inscribe your new legal work to me, is received. Gratefully accepting the proffered honour, I give the leave, begging only that the inscription may be in modest terms, not representing me as a man of great learning, or a very extraordinary one in any respect.

Yours very truly
A. Lincoln."

["ব্যক্তিগত

স্প্রিংফিল্ড, ইলিনয়েস,
১৩ই অক্টোবর, ১৮৬০

প্রিয় মহাশয়,

আপনার নূতন আইন-পুস্তকখানি আমার নামে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহিয়া ৬ই তারিখে আপনি যে পত্র দিয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। আপনি আমাকে যে সম্মান দিতে চাহিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু উৎসর্গপত্রে আমাকে বড় পণ্ডিত বা বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত
এ, লিঙ্কন"]

গান্ধীজীর জীবনের সঙ্গে লিঙ্কনের জীবনের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। দুই জনের চরিত্রও অনেকটা এক ধরণের ছিল। লেখায় ও বক্তৃতায় সংযম-ব্যাপারে অবশ্য লিঙ্কন গান্ধীজী অপেক্ষাও সাবধান ছিলেন। তাঁহার আর একটি চিঠি অত্যন্ত কৌতুহলপ্রদ বলিয়া শোনাইতেছি। নিউইয়র্কে ওয়েষ্টফিল্ডের একটি ছোট মেয়ে তাঁহাকে লেখে:

"I am a little girl, eleven years old···have you any little girls about as large as I am···if you will let your whiskers grow···you would look a great deal better for your face is so thin···I must not write any more, answer this right off, good-bye."

Grace Bedell.

["আমি একটি ছোট বালিকা। আমার বয়স ১১ বৎসর···আমার মত বড় আপনার কোনও মেয়ে আছে কি···আপনার মুখ এত সরু যে, আপনি যদি গোঁফ রাখেন, তাহা হইলে আপনাকে অনেক ভাল দেখাইবে···অধিক বাহুল্য, উত্তর দিবেন, বিদায়।

গ্রেস বেডেল"]

লিঙ্কন তৎক্ষণাৎ জবাব দেন—

স্প্রিংফিল্ড, ইলিনয়, অক্টোবর ১৮, ১৮৬০

"My dear little Miss,

Your very agreeable letter of the 15th is received. I regret the necessity of saying I have no daughter. I have three sons—one seventeen, one nine and one seven years of age. They with their mother, constitute my whole family. As to the whiskers, having never worn any, do you not think people would call it a piece of silly affectation if I were to begin it now?

Your very sincere well-wisher
A. Lincoln"

["তোমার ১৫ই তারিখের পত্র পাইলাম। দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমার কোন কন্যা নাই। আমার তিনটি পুত্র

আছে—একটি ১৭ বৎসরের, একটি ৯ বৎসরের এবং একটি ৭ বৎসরের। তাহারা ও তাহাদের মাতাকে লইয়াই আমার সংসার। আমি কখনও গোঁফ রাখি নাই। এখন যদি গোঁফ রাখি, তাহা হইলে লোকে আমাকে চালিয়াৎ মনে করিবে, এ কথা কি তোমার মনে হয় না?

তোমার একান্ত শুভার্থী
এ. লিঙ্কন"]

গ্রেস বেডেলকে গোঁফ রাখার অক্ষমতা জানাইয়া চিঠি লিখিলেও লিঙ্কন এই ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই দাড়ি-গোঁফ রাখিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে নিউ-ইয়র্কের ওয়েষ্টফিল্ড দিয়া তাঁহাকে এক বার অন্যত্র যাইতে হয়; তখন তিনি গ্রেস বেডেলের সন্ধান করেন ও তাহাকে হাসিতে হাসিতে জানান, "You see, I let these whiskers grew for you, Grace."

সব শেষে প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের "সর্বশেষ, সংক্ষিপ্ততম ও শ্রেষ্ঠতম" বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করিয়া লিঙ্কন-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। ১৮৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুর পাঁচ মাস আগেই এটি তিনি নোয়াব্রুকসের এক জন সংবাদপত্রসেবীর হাতে দিয়াছিলেন—

"On Thursday of last week two ladies from Tennessee came before the President asking the release of their husbands held as prisoners of war at Johnson's island—They were put off till Friday, when they came again; and were again put off to Saturday.—At each of the interviews one of the ladies urged that her husband was a religious man—On Saturday the President ordered the release of the prisoners and them said to this lady—

["গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার টেনেসি হইতে দুই জন মহিলা প্রেসিডেণ্টের নিকট আসিয়া জনসন দ্বীপে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক তাঁহাদের স্বামীদের মুক্তি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা প্রেসিডেণ্টের সহিত তিন বার সাক্ষাৎ করেন। প্রতিবারই এক জন মহিলা তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার স্বামী ধার্মিক ব্যক্তি। তৃতীয় দিনে প্রেসিডেণ্ট বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেন এবং সেই মহিলাটিকে বলেন—

[এইটিই প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের শেষ ভাষণ]

"You say your husband is a religious man; tell him when you meet him, that I say I am not much of a judge of religion, but that, in my opinion, the religion that sets men to rebel and fight against their government, because, as they think, that government does not sufficiently help some men to eat their bread in the sweat of other men's faces, is not the sort of religion upon which people can get to heaven.

A. Lincoln."

["আপনি বলিতেছেন যে, আপনার স্বামী ধার্মিক ব্যক্তি। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিবেন, আমি ধর্মের বিচারক নহি; কিন্তু আমার মতে যে ধর্ম লোককে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করায়—যেহেতু তাহাদের মতে সেই সরকার কয়েক জন লোককে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইতে দিতে সাহায্য করে না—সেই ধর্ম স্বর্গে যাইবার ধর্ম নহে।

এ. লিঙ্কন"]

এই মহাসত্যের উপযোগিতা ভারতবর্ষে আজ সর্বাপেক্ষা বেশি অনুভব করিতেছি।

হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও;—আমার সর্ব্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫।

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর; বড় ২ কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস্ কর, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৬।

আমার স্পীচ্ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহ্বা দাও,—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭।

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন! আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। ২৮।

—ইংরাজস্তোত্র। বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৭৯।

ক্লার্ক-ফুলাম

হত্যা-কাহিনী

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ভালবাসার জন্যে, প্রেমের জন্যে মানুষ পৃথিবীতে করেনি এমন কাজ নেই। নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বিড়ম্বিত হয়ে স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানের যেমন সে চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তেমনি মোহাবিষ্ট কামাতুর হয়ে সমাজ-সংস্কার ন্যায়-ধর্ম কোন কিছুই ভ্রূক্ষেপ করেনি—বর্ব্বরতার চরম সীমায় নেবে গেছে, কুৎসিত ঘৃণিত নৃশংসতার আশ্রয় নিয়েছে অকুণ্ঠিত ভাবে। কিন্তু পরিণামে দুষ্কৃতির ফল মানুষকে ভোগ করতেই হয়েছে, এর হাত থেকে কেউই নিষ্কৃতি পায়নি—বিচারের ন্যায়দণ্ডে তার জীবনান্ত ঘটেছে হয় ফাঁসির মঞ্চে, না হয় অপঘাতে আততায়ীর হাতে।

এমনি একটি মানুষের নিছক কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের অতি নীচ তুলনাহীন কাহিনীই এই রচনার বিষয়-বস্তু। একাধারে এই কলঙ্ক-কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, অন্য দিকে তেমনি হত্যাকাণ্ডে বীভৎস।

ভাগ্যচক্রের অদৃশ্য ইঙ্গিতে কর্ম্মোপলক্ষে দুই পরিবারের মিলন ঘটে মীরাটে। এবং এইখানেই বাস্তব-জীবনের এই রোমাঞ্চকর নাটকের সূত্রপাত হয় ১৯০৯ সালে। এদের এক জন ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের নিম্নপদস্থ ব্যক্তি, নাম লেফটেনেন্ট ক্লার্ক; অপর জন মিলিটারী একাউণ্টসের ডেপুটি একজামিনার এডোয়ার্ড ফুলাম।

লেফটেনেন্ট ক্লার্ক ছিলেন জাতিতে ফিরিঙ্গি এবং তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪২ বৎসর। শিক্ষা-দীক্ষা বলতে তাঁর বিশেষ কিছুই ছিল না এবং চরিত্রের দিক থেকেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কামাতুর ও নৃশংস প্রকৃতির। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের মহিলা, এবং স্বামীর চেয়ে তিনি প্রায় ছ' বছরের বড় ছিলেন। অর্থাৎ এই বীভৎস ঘটনার সূত্রপাতে (১৯১০ সালে) তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বৎসর। জাতিতে এই মহিলাটিও ছিলেন ফিরিঙ্গি এবং বিবাহের পূর্ব্বে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে নার্সের কাজ করতেন। এক কথায় অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও সাদাসিধে ভালো-মানুষ গোছের মহিলা ছিলেন মিসেস্ ক্লার্ক। পুত্র-কন্যা প্রতিপালন ও সুচারুরূপে সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ। শেষ নিশ্বাসপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি তাঁর বিষময় জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, সমস্ত নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করে গিয়েছেন—কোন দিনও মুখ ফুটে কারুর কাছে একটি অভিযোগের কথাও প্রকাশ করেননি।

এডোয়ার্ড ফুলাম এই বীভৎস ইতিহাসের অপর হতভাগ্য ব্যক্তি। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির ধার্ম্মিক পুরুষ বলে সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি মিলিটারী এ্যাকাউণ্টসে ডেপুটি এগজামিনারের কাজ করতেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪৪ বৎসর এবং তাঁর স্ত্রী আগাথা ফুলাম বয়সে তাঁর চেয়ে প্রায় আট বছরের ছোট ছিলেন। এই ভদ্র-মহিলা ছিলেন জাতিতে ইংরেজ, উচ্চশিক্ষিতা এবং সাহিত্যানুরাগিণী। ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর যেমন স্নেহপ্রবণতা ছিল, তেমনি ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম্মেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নানা প্রকার সামাজিকতা, লোক-লৌকিকতা, ও আমোদ-আহ্লাদে

হেসে-খেলে দিন কাটানোই ছিল তাঁর জীবনের বিশেষ অঙ্গ। বাইরের দিক থেকে তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্রের মহিলা বলে মনে হলেও তাঁর চরিত্রের সবটাই ছিল বোধ হয় লোক-দেখানো।

১৯০৯ সালে মীরাটে এই দুই পরিবার বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হলেও প্রকৃত ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৯১০ সালে। মিসেস্ ফুলাম তখন সবে মাত্র একটি সন্তান প্রসব করে রোগশয্যাশায়িনী, লেঃ ক্লার্ক ডাক্তার হিসাবে তাঁকে দেখা-শুনা করতে আসেন। ডাক্তার নির্দ্দেশ দিয়ে যান, রোগিণীর পরিচর্য্যা চলে—অতি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু এরই মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে ভালোবাসার সূচনা দেখা দেয়—পরস্পরের দুর্ব্বার আকর্ষণ গভীর প্রেমে পরিণত হয়।

প্রেমের এমনি বিচিত্র ধারা। সে কোন কিছুরই ধার ধারে না—কোন বাচ-বিচারই তার নেই—সমস্ত যুক্তি-তর্কই তার কাছে উপেক্ষিত। তাই মিসেস্ ফুলামের মত বিদুষী, সুন্দরী, রুচিস্মিতা মহিলাও এক দিন ক্লার্কের মত অতি নীচ স্বভাবের মানুষকেই তাঁর সর্ব্বস্ব বলে স্বীকার করে নিল—তাঁর কামনার হোমানলে নিজেকে উৎসর্গ করল।

এই সময়ে ক্লার্ককে হঠাৎ একবার অফিসের কাজে আগ্রায় বদলি হতে হয়। প্রেমের প্রারম্ভেই এই ব্যবধান উভয়েরই কষ্টকর হলেও, দূরত্বই তাঁদের মিলন-বাসনাকে আরও উদ্দাম ও উগ্রতর করে তোলে। প্রেমের দুর্দ্দমনীয় গতি-পথ খুঁজে পায় পত্রের ভেতর দিয়ে। দিনের পর দিন বিরহ-বেদনার কথা, উদগ্র আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ পেতে থাকে পত্রের সাহায্যে—পরস্পরকে একান্তে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পাবার কথা নিয়ে অবৈধ প্রেমের গতি চিঠিপত্রের সাহায্যে বেড়েই চলে ক্রমাগত। প্রতিদিনই চিঠি লেখেন মিসেস্ ফুলাম। কেবল মাত্র শনিবার ও রবিবারটি বাদ যায় বাড়ীতে স্বামীর উপস্থিতির জন্য। ক্লার্কও নিয়মিত প্রতিটি পত্রের উত্তর দেন এবং সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতি বার মীরাটে এসে গোপনে আগাথার সঙ্গে দেখা করে যান।

এই সময়কার শত-সহস্র পত্রের মধ্যে প্রায় চারশ' চিঠি বিচারকের হস্তগত হয়, এবং এই প্রেমপত্রগুলিই শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের

ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। যে পত্রগুলি এক দিন তাঁদের প্রগাঢ় প্রণয়ের সহায়ক হয়েছিল, সেইগুলিই শেষ পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় জীবনান্তের প্রধান কারণ। প্রেমপত্র জমিয়ে রাখার অভ্যাস যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, ক্লার্ক-ফুলাম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পূর্ব্বে এমন ভাবে বোধ হয় আর প্রমাণিত হয়নি। যেন এক অদৃশ্য শক্তির অভিশাপ ছিল এই চিঠিগুলির উপর। এগুলি কেন যে নষ্ট করা হয়নি তারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পত্রগুলিই ধীরে ধীরে এই রোমাঞ্চকর হত্যা-রহস্যের সমস্ত গোপনীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন করে বিচার ও শাস্তির সহজ পথ নির্দ্দেশ করে। যে চিঠিগুলি পুলিসের হস্তগত হয়, সেগুলি সবই ক্লার্কের কাছে মিসেস্ ফুলামের লেখা। ক্লার্কের লেখা কোন চিঠি পাওয়া যায়নি। মিসেস্ ফুলামকে ক্লার্ক যে চিঠিগুলি লিখতেন, সেগুলির শিরোনাম দেওয়া থাকত: 'মিসেস্ ক্লার্কসন' (Mrs. Clarkson), এবং এই চিঠিগুলি মিসেস্ ফুলাম পোষ্ট অফিস থেকে নিজেই 'ডেলিভারি' নিয়ে আসতেন।

এই সব পত্রের ভিতর দিয়ে এক দিকে তাঁরা যেমন অবৈধ প্রেমের অতলে নিজেদের ডুবিয়ে দিতে থাকেন, অন্য দিকে তেমনি মিলন-পথের বাধা-বিঘ্ন দূর করার জন্য পৈশাচিক ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন গোপনে গোপনে। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, ন্যায়-ধর্ম্ম সব কিছুই আচ্ছন্ন হয়ে যায় তাদের হীন আকাঙ্ক্ষার পাপ-প্রভাবে।

এই সময়কার একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, তাঁদের এই অবৈধ ঘনিষ্ঠতায় মিসেস্ ফুলাম অন্তঃসত্ত্বা হন। এই চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম লেখেন:

"প্রিয়তম হ্যারি, আমার সব চেয়ে বড় ভীতি আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে এবং আমি যে আবার ধরা পড়েছি সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। গত দু'দিন বিকাল থেকেই অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছিলাম, গত কাল বিকালে হঠাৎ খুব খানিকটা বমি হয়ে গেল। এ ব্যাপারে 'এডি' (স্বামী) খুবই হাসতে লাগল এবং বললে যে, 'আমার মনে হয় এবার তুমি পুরোপুরোই অন্তঃসত্ত্বা। অতএব প্রিয়তম, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। অনেক কষ্ট ও যুদ্ধ করেছি আমরা এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারি না এবং তা করতেও চাই না। বিনা অভিযোগেই এ-ভার আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।"

কিন্তু শীগ্‌গিরই তাঁর এই ভীতির উপশম হয়। ওষুধের সাহায্যে ক্লার্ক মিসেস্ ফুলামকে তাঁর এই ভার থেকে মুক্ত করে দেন।

ইতোমধ্যে মিঃ ক্লার্ককে আবার বদলি হতে হয় অন্যত্র। কিন্তু তাঁদের চিঠিপত্রের লেন-দেন এবং নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ চলতেই থাকে। কিন্তু এই সময় মিঃ ফুলামের চোখে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে দেখা দেয়। মিসেস্ ফুলাম ও ক্লার্কের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা ও আরো নানা খুঁটিনাটি কারণে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু সুচতুরা মিসেস্ ফুলামও স্বামীর মনোভাব সহজেই বুঝতে পারেন, এবং ক্লার্ককে একখানি চিঠি লিখে এ বিষয় সতর্ক করে দেন। চিঠিখানি হচ্ছে:

"প্রিয়তম, ডার্লিং—বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার স্বামী আজ ভোর পাঁচটার সময় আমার শোবার ঘরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি দেখে ভীষণ রেগে গিয়েছেন। তোমার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা ছাড়া অবশ্য আর কিছুই দেখতে পায়নি। নাইট গাউন পরে আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, এতে তিনি খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন। এর পর থেকে আমাদের খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে। আমার সঙ্গে আর দেখা না করে আগ্রায় চলে গেলেই ভালো হ'ত। প্রিয়তম হ্যারি, আমরা দু'জনে পরস্পরকে এতো ভালবাসি, তবু হায়! এই রকম বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে নিয়ত যুদ্ধ করা কতো কঠিন! ভগবান আমাদের সাহায্য করুন। তোমার জন্যে আমার খুব দুঃখু হচ্ছে—যদি সামর্থ্য থাকত সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম। কিন্তু আমি একেবারে শক্তিহীনা। তুমি আমার সব চেয়ে ভালোবাসার জিনিষ; আমার একান্ত অনুরোধ, আমার জন্যে আর কিছু দিন অপেক্ষা করো—তার পর আমি তোমার কাছে একেবারে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে ধরা দেব।..."

এই সব শোনার পর থেকে ক্লার্কের মনে নানা দুরভিসন্ধি জাগতে থাকে। তাদের মাঝখানে, অবাধ মেলা-মেশার অন্তরায় মিঃ ফুলামকে চিরতরে সরিয়ে, শ্রীমতী ফুলামকে সম্পূর্ণ ভাবে পাবার জন্য ক্লার্ক বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন।

সেদিন ২০শে ফেব্রুয়ারী—এই বীভৎস ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ক্লার্ক যেমন নিয়মিত আসেন তেমনি সেদিনও মিসেস্ ফুলামের সঙ্গে দেখা করতে আসেন মীরাটে। এবং সেই দিনই ক্লার্ক প্রথম মিসেস্ ফুলামের কাছে তাঁর স্বামীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র উত্থাপন করেন। ঠিক হয়, আরসেনিক (সেঁকো) বিষের সাহায্যে আস্তে আস্তে মিঃ ফুলামকে হত্যা করা হবে এবং এই বিষ ক্লার্ক আগ্রা থেকে মিসেস্ ফুলামকে পাঠাবেন। এই বিষের প্রক্রিয়া এতই মন্থর হবে যে, মিঃ ফুলামের মৃত্যুর জন্য কখনো কেউ কোন সন্দেহের অবকাশই পাবে না।

মিসেস্ ফুলাম এই (Arsenic) বিষটিকে 'টনিক' নামে অভিহিত করতেন এবং তাঁর স্বামীর শরীরে কি ভাবে এই মারাত্মক বস্তুটি ক্রিয়া করে চলেছে তার নিখুঁত বিবরণ ক্লার্ককে নিয়মিত লিখে পাঠাতেন। এই সম্পর্কে তাঁর কয়েকখানি চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল:

"প্রাণপ্রতিম—আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার এই 'পাউডার' আমি মোটেই অনুমোদন করি না। এ ভাবে আর কত শক্ত বছর কাটবে! এবং এর জন্যে সারাক্ষণ আমরা কি ভীষণ সংশয়ের ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছি তা একবার ভেবে দেখ!..."

"আমার সর্ব্বস্ব হ্যারি, তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ—ভালো করে একবার ভেবে এমন একটা উপায় স্থির করো, যাতে শীগ্‌গিরই আমরা আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ করতে পারি। কোন ছোট পার্শ্বেল যদি আমায় পাঠাও, তাহ'লে তা রেজেষ্ট্রী করে পাঠিয়ো।"...

এই ধরণের চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের মধ্যেও ক্লার্কের আসা-যাওয়া কিন্তু বন্ধ ছিল না। তিনি প্রায়ই আগ্রা থেকে মীরাটে আসতেন, এবং নিজের হাতেই 'টনিক'টি গোপনে মিসেস্ ফুলামের হাতে দিয়ে যেতেন। এই ভাবে ঘৃণিত অপরাধের পর অপরাধ করে চলেন লেঃ ক্লার্ক এবং তাঁকে উৎসাহিত হয়ে সাহায্য করে চলেন মিসেস্ ফুলাম দিনের পর দিন। মিসেস্ ফুলামের একটি প্রেমপত্র থেকে সেই সময় এক দিন ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমতী ফুলাম লিখছেন:

"ডারলিং, সেদিনকার সেই আবছায়ার মধ্যে দীর্ঘ মোটার-বিহার, সাভার্স লেনে বেড়ানো—ছ'জনে একসঙ্গে সেই আনন্দপূর্ণ দিনটার মধ্যে ডুবে যেতে তোমার কতখানি ভালো লেগেছিল বল তো? সেই ঘণ্টাগুলো যেন সুখ-শান্তির সর্বাঙ্গসুন্দর একটি নিখুঁত স্বপ্ন! আমি ব্যাকুল আগ্রহে আবার সেই স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে হারাবার জন্তে অপেক্ষা করছি!"...

এমনি গোপন চিঠিপত্র, দেখা-সাক্ষাৎ ও প্রেমের তন্ময়তার মধ্যে দিয়ে আরো একটি বছর কেটে যায়—আসে ১৯১১ সাল। ইতোমধ্যে তিলে তিলে মিঃ ফুলামকে হত্যা করার যে হীন চক্রান্ত আরম্ভ হয়েছিল, তার ফল ফলতে আরম্ভ হয়। ২১শে জুন প্রথম দেখা দেয় সেই বিষের প্রক্রিয়া। মিঃ ফুলাম অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কলেরার নানা উপসর্গ প্রকাশ পায় তাঁর শরীরে। বাধ্য হয়ে সেই সময় দশ দিনের ছুটি নিয়ে তিনি মুশৌরীতে বায়ু পরিবর্ত্তনে যান। কিন্তু, কপাল যার ভেঙেছে—বিধাতা যার ললাটে আগে থেকেই দুর্গতির লিপি লিখে রেখেছেন, স্থান-পরিবর্ত্তনে তার আর কি উন্নতি হবে!

মিঃ ফুলামের এই ক'দিনের অনুপস্থিতিতে ক্লার্কের যথেষ্ট সুযোগ জুটে যায়। মীরাটে এসে তিনি যেন স্বর্গরাজ্য হাতে পান। প্রেমের উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহ সভ্যতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে, পরস্পরকে নিবিড় ভাবে উপভোগ করতে থাকেন তাঁরা। কিন্তু ফুলাম বেঁচে থাকতে এই প্রেমলীলা আর কত দিন নিঃসংশয়ে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই এরই সঙ্গে তাঁরা তাঁকে হত্যা করার নূতন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করতে থাকেন। আরশেনিক খাওয়ানো হচ্ছিল মাত্র আড়াই মাস এবং ইতোমধ্যে বিষের প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু প্রেমের উন্মত্ত গতির কাছে বিষের এই মন্থর গতি অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়েই অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন, হত্যাকাণ্ডের শেষ দৃশ্যের জন্য—কামনার উত্তেজনায় তাঁদের মন আরও নৃশংস হয়। অল্প অল্প করে বিষ দেওয়ার পরিবর্ত্তে এক দিনেই তাঁরা সমস্ত শেষ করে দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হন। ঠিক হয়, আরশেনিকের পরিবর্ত্তে Heat-strokeএর তীব্র ওষুধ খাইয়ে দু'-এক দিনেই তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। মীরাটের মত উষ্ণপ্রধান স্থানে Heat-strokeএ মৃত্যু হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়—আর এতে সন্দেহেরও কারু কোন কারণ থাকবে না।

ইদানিং মিঃ ফুলাম স্ত্রীর এই ব্যভিচারে খুবই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্লার্কের সঙ্গে মিসেস্ ফুলামের মেলা-মেশায় যথেষ্ট বিরক্তও হয়েছিলেন। এমন কি, ক্রমশঃ স্ত্রীর প্রতি তিনি এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে, অনেক সময় তাঁর হাতের রান্না পর্য্যন্ত খেতেও তিনি ঘৃণা বোধ করতেন। এটা কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তবুও এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তারা তাঁকে হত্যা করার জন্ত স্থিরচিত্তে এমন এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে! এটা সত্যিই মিঃ ফুলামের কাছে স্বপ্নাতীত ছিল। কিন্তু এই প্রেম-প্রমত্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রী স্বামি-হত্যার জন্ত কি ভাবে যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, তার সামান্ত পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত আর একখানি চিঠির অংশ থেকে। সেই চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম লিখছেন:

"প্রিয় হ্যারি, পরের চিঠিতে অতি অবশ্যই জানাবে যে, সর্দ্দিগর্মীর (Heat-stroke) মৃত্যুতে কি মুখের আকৃতি ও রঙ কালো হয়ে যায়? এর মৃত্যু কি খুবই কষ্টকর, না এতে মানুষ শীগ্‌গিরই অজ্ঞান হয়ে যায়?"...

এমনি সব পরিণতির মধ্যে যতই দিন যেতে থাকে, ততই আরো উদ্দাম হয়ে ওঠে মিসেস্ ফুলামের প্রেম। তার সমস্ত চিঠিগুলির মধ্যেই লেলিহান লালসার চিহ্ন—প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে নিবেদন করার নানা রঙ-ঢঙ ও ভাষায় পরিপূর্ণ।

তাঁর এই সময়কার আর একখানি চিঠিতে স্বামি-হত্যার দুর্দ্দমনীয় কামনার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। এই চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম লিখেছেন:

"প্রিয়তম, আমি মন স্থির করে ফেলেছি। এই বৃহস্পতিবার ২৭শে খাবার সময় সেই তরল পদার্থটি নিশ্চয়ই ওকে খাওয়াব। পাচককে আমি ভালো করে মুর্গীর ঝোল রাঁধতে বলেছি। এই ঝোলে লেবুর রস মিশিয়ে ভাতের সঙ্গে খাওয়ানো হবে। লেবুর রস মেশানো টক ঝোলে, তেতো বিষের কোন স্বাদ পাওয়া যাবে না এবং এতে সন্দেহেরও কোন কারণ থাকবে না। তাছাড়া প্রিয়তম, বৃহস্পতিবার দুপুরে আমরা তোমার সেই পুরানো হাসপাতালের সামনে Berkshire Sports দেখতে যাব। একে এই ভীষণ দুপুরের আবহাওয়া, তার উপর কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টির চিহ্নবাষ্প নেই—কাজেই, এহেন সময়ে রোদ লেগে যাওয়াটা কিছুই অবিশ্বাস্ত নয়। সুতরাং বৃহস্পতিবারই বোধ হয় আমাদের এই ভীষণ কাজটির পরিসমাপ্তির শেষ দিন। তোমারও কি তাই মনে হয় না প্রিয়তম?"...

তার পর সত্য সত্যই চিঠির উল্লিখিত ভয়াবহ তথ্য অনুযায়ী কাজ হয়। দ্বিচারিণী ফুলাম-পত্নী স্পোর্টস্ দেখে ফেরার পর, ২৭শে জুলাই রাত্রে খাবার সময় এক ডিস স্যুপের সঙ্গে 'হীট্ স্ট্রোকের' ওষুধটি মিঃ ফুলামকে খাইয়ে দেন। খাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এই অসুস্থতার মধ্যে যে কারো কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে তা কেউই সন্দেহ করে না, কারণ ডাক্তাররাও মিঃ ফুলামের অসুস্থতাকে Heat-strokeএর আক্রমণ বলে সিদ্ধান্ত করেন।

সে যাত্রা মিঃ ফুলাম কোন রকমে সামলে উঠলেও কিছু দিন পরে আবার তাঁকে খাওয়ানো হয় এই ভীষণ কালকূট এবং পুনরায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্ত। এবারের আক্রমণ কিন্তু মিঃ ফুলামকে একেবারে অকেজো করে দেয় এবং তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে। ২রা সেপ্টেম্বর মেডিক্যাল বোর্ড তাঁকে চাকরির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর পক্ষে বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই বলতেও তাঁরা দ্বিধা করেন না।

এই ভাবে বার বার মারাত্মক আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে, অসুস্থতায় ও জীবন সম্বন্ধে হতাশায় প্রথম দিকে মিঃ ফুলাম সপরিবারে বিলেতেই ফিরে যাবেন বলে স্থির হয়, কিন্তু পরে উক্ত মত পরিবর্ত্তন করে ভারতবর্ষে থাকাই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন। এবং ভাগ্যচক্রে শেষ পর্য্যন্ত আগ্রায় গিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা হয়। এই স্থান নির্ব্বাচনের মধ্যে মিসেস্ ফুলামের কতখানি প্রভাব ছিল তা জানা যায় না।

এর পর আমাদের ঘটনার পট পরিবর্ত্তিত হয় আগ্রায়। ১৯১১

সালের ৮ই অক্টোবর ফুলাম আগ্রায় পৌছান, এবং তার দু'দিন পরেই অর্থাৎ ১০ই অক্টোবর রাত্রেই বহির্বাটীর বারান্দায় খাবার সময় তৃতীয় বার আবার তাঁকে হাঁটু-ষ্ট্রোকের সেই ওষুধটি খাওয়ানো হয়। মিসেস্ ফুলাম নিজের হাতে স্বামীর থালায় মাংস ও ঝোলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে পরিবেশন করেন। ঐ মারাত্মক ঝোল গলাধঃকরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ ফুলাম অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। একে আগে থেকেই শারীরিক অবস্থা তাঁর খারাপ ত হয়েই ছিল, তার উপর আবার এই বিষ শরীরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বমি করতে আরম্ভ করেন। সেদিন ক্লার্ক সেখানে সান্ধ্য-ভোজের অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ঔষধের অছিলায় তিনি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেন। হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের সাহায্যে সেই অবস্থার উপরেই ক্লার্ক ফুলামের শরীরে আরো বিষ ইনজেকসন করে দেন। বিষে বিষে জর্জ্জরিত শরীরের পক্ষে তা আর সহ্য করা সম্ভব হয় না—মিঃ ফুলাম তৎক্ষণাৎ শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন —এই নৃশংস ষড়যন্ত্রের হাত থেকে চিরতরে তিনি রেহাই পান। মিসেস্ ফুলাম ও ক্লার্কের এত দিনের দুরভিসন্ধি সফল হয়। সে দিনটা ছিল ১০ই অক্টোবর; তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয় তার পরের দিন এবং কোন কিছু ধরা পড়া বা সন্দেহ করার মত কোন কারণও ঘটে না।

এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী ছিল মিঃ ফুলামের এক দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা ক্যাথারিন। কিন্তু মার জন্য তার কণ্ঠ নীরব হয়েই থাকে।

বিধবা মিসেস্ ফুলাম আজ বহু দিন পরে অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। অনেক দুর্ভাবনা আজ দূর হয়ে গেছে তাঁর মন থেকে। তাঁর এবং ক্লার্কের মাঝখানের একটা বড় বাধা এতো দিন পরে তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে, সেই অনাগত অসীম সুখ-সাগরে নিজেকে তলিয়ে দেবার দিনটির জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন—অপেক্ষা করতে থাকেন কবে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ক্লার্কের স্ত্রীরূপে ঘোষণা করতে পারবেন সেই শুভ দিনটির জন্য। তাঁর সেই সময়কার আর একটি চিঠি থেকে এই কামনার গুরুত্ব ভাল ভাবেই প্রকাশ পায়:

"আমার মিষ্টি মণি, কি অপরিসীম আনন্দেই কেটেছে গত দিনের রাত্রি—বিদায়-ক্ষণে আমায় 'হৃদয়েশ্বরী' বলে তোমার সেই সম্ভাষণ; 'অমূল্য প্রিয়া আমার' বলা—তার পর সারা রাত্রি কি সুখ ও শান্তিতে কাটিয়েছি আর অনুভব করেছি যে, জগতে সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসে আমাকে আমার হ্যারি। আর কেউই আমাকে এমন করে ভালোবাসেনি—এত গভীর, সত্য ও নির্মল ভাবে। প্রিয়তম, এ যে কি—এমনি এক জন শক্তিমান পুরুষের উজাড় করা ভালোবাসা পাওয়া যে হীরা-মাণিকের চেয়েও মূল্যবান মনে হয়।"

আর একখানি চিঠিতে মিসেস্ ফুলাম ক্লার্ককে লেখেন:

"প্রিয় আমার,

সুখ-শান্তির চরম ক্ষণটি এখনো আসেনি আমাদের জীবনে। এখন কেবল একান্ত-চিত্তে আশা ও প্রার্থনা যে, এই চরম মুহূর্তটি যেন আমাদের আনন্দ-মিলনের, দীর্ঘ-বিবাহিত জীবনের, তোমার চিরসাথী হয়ে থাকার দিন হয়ে, আর পিছিয়ে না যায়। আমি নিশ্চিত জানি যে আমাদের বিবাহিত জীবন হবে অত্যন্ত সুখের, কারণ আমাদের এ-বিবাহ সত্যিকারের ভালোবাসার বিবাহ—তাই নয় কি, প্রিয়তম?"

মিঃ ফুলামের মৃত্যুতে, এক দিকের পথ পরিষ্কার হলেও, অপর দিকে তখনও রইলেন মিসেস্ ক্লার্ক—মিঃ ক্লার্কের পত্নী। তিনিই এখন প্রেমিক-প্রেমিকার চির-মিলন-পথের একমাত্র বাধাস্বরূপ হয়ে দেখা দিলেন। মিসেস্ ফুলাম এ কথা ভালো ভাবেই জানতেন যে ঐ সৎচরিত্রা, শান্তিপ্রিয়া, নীরব মানুষটি বেঁচে থাকতে ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর বিবাহের কোন উপায় নেই।

ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কের কথা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। কোনও স্ত্রীর পক্ষে স্বামিগৃহে এরূপ যন্ত্রণাদায়ক দুঃখের জীবন কল্পনাতীত হলেও, মিসেস্ ক্লার্ক সকল নির্য্যাতন অদ্ভুত দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে চিরদিনই মুখ বুজে সহ্য করে এসেছেন ক্লার্ক বহু বার তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিলেন, এবং তাঁর এ সব কাজের বহু প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু মিসেস্ ক্লার্ক স্বামীর এই সব ঘৃণ্য কার্য্যকলাপ বা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন বলে, নিজের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সকল সময়েই খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। অথচ এ সব সত্ত্বেও কোন দিন তিনি স্বামি-ত্যাগ বা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করার জন্য কোনরূপ উৎসাহ দেখাননি। এবং সে জন্য ক্লার্কও চাকরদের টাকা দিয়ে, বিষ খাইয়ে, নানা ভাবে স্ত্রীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেও এ যাবৎ কৃতকার্য্য হতে পারেননি।

এদিকে মিসেস্ ফুলাম অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন ক্লার্ককে বিবাহের জন্য। তাঁর আর একখানি চিঠির কয়েকটি লাইনে এই মনোভাবের পরিচয় মেলে:

"আমাদের এই দু'টি প্রেমোৎসর্গিত হৃদয়, ভগবানের রাজ্যে সব চেয়ে মধুর বিবাহ-বন্ধনের ভেতর দিয়ে যেন আরও ভালোবাসায় ও আরও মধুরতর বন্ধনে পরস্পরের নিকটতর হয়।"...

ক্রমশঃ এই সব চিঠির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বীভৎস ভাবে। মিসেস্ ক্লার্ককে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হয়ে মিঃ ক্লার্ক তাঁর স্ত্রীকে সুনিশ্চিত হত্যা করার এক ঘৃণিত পথ অবলম্বন করেন।

এই হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি লোকের নাম পাওয়া যায়। (১) বুদ্ধু, ক্লার্কের ভূতপূর্ব্ব চাকর। ক্লার্কের প্ররোচনায় এই একবার মিসেস্ ক্লার্ককে বিষ খাওয়াতে গিছল। (২) বুদ্ধা; (৩) সুখ্‌খা; (৪) মোহন ও (৫) রামলাল। খুনে গুণ্ডা বলেই এদের পরিচয় ছিল শহরের মধ্যে। ক্লার্কের সঙ্গে এদের এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে, এরা ডাকাতির ভাণ করে মিসেস্ ক্লার্কের বাংলোর ঢুকে তাঁকে খুন করবে এবং কৃতকার্য্য হলে পুরস্কারস্বরূপ এক শত টাকা পাবে। ধরা পড়ার পর বুদ্ধার স্বীকারোক্তিতে এই একশ টাকা পুরস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এ-ও প্রমাণ হয় যে, এই সময় মিসেস্ ফুলামের দেওয়া একখানি একশ' টাকার চেকও ভাঙানো হয়।

১৯১২ সালের ৭ই নভেম্বর এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়। রাত্রের দিকে দুর্ব্বৃত্তরা গোপনে মিসেস্ ক্লার্কের বাংলোয় প্রবেশ করে। [illegible]

করার অছিলায় রাত্রি ১২-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত রেল-ষ্টেশনে কাটিয়ে বাড়ী ফেরেন। ক্লার্ক এটা নিশ্চিত জানতেন যে, বাড়ী ফিরেই তিনি সব শেষ হয়ে গেছে দেখবেন এবং তার স্ত্রীর হত্যাকাণ্ড ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই হৈ হৈ হচ্ছে শুনবেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন যে, যা ঘটা উচিত ছিল তা কিছুই ঘটেনি। বাড়ির পোষা কুকুরের চীৎকারে ভাড়া-করা হত্যাকারীরা তাদের গোপন স্থান থেকে বেরুতে পারেনি। এ ব্যাপার চাক্ষুষ করার পর প্রভু নিজেই কুকুরটিকে তাঁর নিজের একটি বিছানার চাদরে মুড়ে বেঁধে বহির্বাটীর একটি ঘরে বন্ধ করে রাখেন।

ক্রমশঃ রাত্রি আরো গভীর হয়, কুকুরের বিরক্তকর আওয়াজ তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রায় দেড়টা নাগাদ আস্তে আস্তে সয়তানরা প্রবেশ করে মিসেস্ ক্লার্কের ঘরে। তার পর তারা ঐ অসহায়া নারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় তরবারির সাহায্যে মাথায় ও শরীরের নানা স্থানে আঘাত করে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। ডাকাতির উদ্দেশে খুন হয়েছে, ব্যাপারটাকে এই ধরণের রূপ দেবার জন্য হত্যাকারীরা ঘরের আসবাবপত্র ছত্র-ছত্রাকার করে যায় বটে, কিন্তু নিজেদের জন্য কিছুই তারা নিয়ে যায় না এবং মিসেস্ ক্লার্কের পাশে ঘুমন্ত ছোট ছেলেটিকেও তারা স্পর্শ করে না।

হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই পুলিসে খবর দেওয়া হয় এবং পুলিস তৎক্ষণাৎ তদন্তের ভার নেয়। কিন্তু এই ঘটনার পূর্ব্বে থেকেই ক্লার্কের সঙ্গে মিসেস্ ফুলামের অবৈধ ঘনিষ্ঠতার কথা আগ্রায় প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর জেনে গেছল, এবং তাঁর সঙ্গে মিসেস্ ক্লার্কের অশান্তিকর সম্পর্কও কারো অজানা ছিল না। কাজেই পুলিসও খুব সহজে হত্যাকাণ্ডটিকে নিছক ডাকাতি বলে গ্রহণ করতে পারেনি। এ ছাড়া আরো অনেক ব্যাপারে পুলিসের সন্দেহের উদ্রেক হয়! প্রথমতঃ, ঘটনা কালে কুকুরের চীৎকার শুনতে পাওয়া যায় না এবং সেই রাত্রেই ক্লার্কের বিছানার চাদর অন্তর্দ্ধান হওয়ার ব্যাপারও পুলিসের নজর এড়ায় না। দ্বিতীয়তঃ, দুর্ব্বৃত্তেরা কিছু না নিয়েই বিদায় হওয়ায় বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক করে। তৃতীয়তঃ, ক্লার্ক পুলিসের কাছে তাঁর জবাবদিহিতে একটি মারাত্মক ভুল করেন। তিনি বলেন, যে, ঘটনা কালে তিনি দিল্লী থেকে বোম্বাই যাত্রী এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রেল-ষ্টেশনে যান। কিন্তু এ কথা যে কত দূর মিথ্যা পরে তা প্রমাণিত হয়। দিল্লী থেকে বোম্বাই যাওয়ার কোন ট্রেণ আগ্রার লাইনে যে পড়ে না, সে কথা তখন তাঁর খেয়ালই হয়নি।

এত দিনে দুষ্কৃতির যস ফলতে শুরু হয়! ১৪ই নভেম্বর তদন্ত শেষে পুলিস ক্লার্ককে গ্রেপ্তার করে। তার পরেই পুলিস মিসেস্ ফুলামের বাংলোয় যায় খানাতল্লাসীর জন্য। এই সময় মিসেস্ ফুলামের বিছানার তলা থেকে একটি টিনের বাক্সের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত চার শত প্রেমপত্র পুলিসের হস্তগত হয়।

ক্লার্কের বাংলো খানাতল্লাসী হওয়ার সম্ভাবনায় ধরা পড়ার ভয়েই বোধ হয় এই চিঠিগুলি মিসেস্ ফুলামের কাছে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত প্রেমপত্রগুলিই শেষ পর্য্যন্ত যেন নিদারুণ নির্ম্মমতায় প্রেমিক-প্রেমিকার অতি নীচ প্রেমধারার প্রতিটি দিনের প্রতিটি কাজের, প্রতিটি পাপের নিখুঁত বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও প্রত্যক্ষ ভাবে জগতের সামনে এবং বিচারকদের সম্মুখে দু'টি হত্যা-কাণ্ডেরই সম্পূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটিত করে। এই চিঠিগুলি এমন ভাবে রক্ষা করার মধ্যে ক্লার্কের যে কি অভিসন্ধি ছিল তা সত্যিই বোধগম্য হয় না। এই চাক্ষুষ প্রমাণগুলি সরিয়ে ফেলতে পারলে হয়ত তিনি বেঁচে যেতে পারতেন। কিন্তু তা হবার নয়, তাই শেষ পর্য্যন্ত এই চিঠিগুলিই যেন সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পথকে সুগম করে দেবার জন্য।

১৯১৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ক্লার্ক এবং মিসেস্ ফুলামের মামলার শুনানি আরম্ভ হয় এবং মাত্র তিন দিনেই বিচার শেষ হয়ে যায়। এই মামলায় দু'জনকেই দু'টি অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগে মিঃ ফুলামকে এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত হত্যা করার প্রচেষ্টায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়, এবং দ্বিতীয় অভিযোগে ১০ই অক্টোবর মিঃ ফুলামকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে সকল প্রমাণ বিচারালয়ে উপস্থিত করার পর, ক্লার্ক নিজে তাঁর সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেন এবং তাঁর জবাবদিহিতে বলেন যে, 'একমাত্র আমিই সব কিছু অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দোষী। মিসেস্ ফুলাম আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছেন মাত্র। তাঁর উপর আমার প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল, সে কারণ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তাধীন। তিনি যা করেছেন তার জন্য তাঁকে অপরাধী বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কিছুর জন্যে একমাত্র আমি নিজেই দায়ী। ধর্ম্মাবতার কি আমাকে প্রথম থেকে সব কথা বলবার অনুমতি দেবেন?—গোড়াতে আমারই অভিপ্রায় ছিল তাঁকে অসুস্থ করে ফেলা, এবং অল্প অল্প বিষ খাইয়ে এমনই রুগ্ন করে ফেলা,—যাতে দীর্ঘ দিনের ছুটিতে তাঁকে দেশের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।...”

এই সমস্ত অমানুষিক বীভৎস ঘটনার মধ্যে ক্লার্কের চরিত্রে কেবল মাত্র এই একটি গুণই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি মিসেস্ ফুলামের সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে তাঁকে রক্ষা করার জন্য—অকৃতকার্য্য হলেও, তাঁর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বিচারালয়ে তিনি শেষ অনুরোধ করেন মিসেস্ ফুলামের সঙ্গে একবার সাক্ষাতের অনুমতির জন্য। কিন্তু অনুমতি তিনি পেলেও মিসেস্ ফুলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হন। এই যন্ত্রণাদায়ক সাক্ষাৎ অপেক্ষা দেখা না হওয়াই হয়ত শ্রেয়ঃ মনে করেন মিসেস্ ফুলাম।

আত্মপক্ষ সমর্থনে মিসেস্ ফুলামও যথাসাধ্য ভাবে এই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, তিনি তাঁর স্বামীকে কখনোই হত্যা করতে চাননি, তবে তাঁকে চিররুগ্ন করে রাখাই ছিল তার একমাত্র অভিপ্রায়। কিন্তু এ বিষয়ে চিকিৎসকগণের বিরুদ্ধ মতামতের সম্মুখে উভয় আসামীরই উক্ত ধরণের যুক্তিহীন উক্তি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়—প্রমাণিত হয় না।

মিঃ ক্লার্ক ও মিসেস্ ফুলাম উভয়েই শেষ পর্য্যন্ত কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সম ভাবে প্রাণদণ্ডাদেশে দণ্ডিত হন।

এই মামলার বিচার কালে যখন মিঃ ফুলামের ছোট মেয়ে ক্যাথারিন সজল অশ্রুপূর্ণ নয়নে তার বক্তব্য বলতে থাকে, তখন

বাসকসজ্জা

শ্রীশান্তি পাল

বঁধু, কেন কর ভুল ? ভাঙিস্ না কূল !
মানের রঙ্গ ছাড়,
বিরলে বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
ফেল না নয়নাসার !
যৌবন নিয়ে এ-কি হেলা-ফেলা
পথ পানে চেয়ে কাটে সারা বেলা ;
আকাশে ঘনায় ঘোর মেঘ-মেলা
ঘর হ'ল আঁধিয়ার ;
স্বপন-বিলাসী সুদূর-পিয়াসী
ফিরে আয় এইবার !

বিজুরী ঝলকে থমকে থমকে
চমকি উঠিছে বুক,
নয়নের জল মুছিল কাজল
মলিন হইল মুখ।
কেয়া-কদম্ব বৃথা ফুটে বনে
কলাপী নাচিছে মিছাই ভবনে,
মন-ভাঙা গানে পবনের স্বনে
উচ্ছ্বসি উঠে বুক ;
কোথা সে মায়াবী নাহি প্রাণে যা'র
দয়া-মায়া এতটুক !

কি যে হ'ল ব্যাধি দিন কাটে কাঁদি,—
এ-কথা কহিব কা'রে ?
যে-জন ঠেকেছে সে-জন বুঝেছে
বিঁধেছে এ-কাঁটা যা'রে !
জাতি-কুল-মান সব তেয়াগিয়া
না ডরি কাহারে দেয় সে ডারিয়া
তন-মন দিয়া অরঘ রচিয়া
ভজে সে নিয়ত তা'রে ;
নয়নের ধারে ভিজায়ে ভিজায়ে
নিছিয়া এ-উপচারে !

শোন্ লো সজনি, এ কাল-রজনী
কাটিবে না জানি তোর,
অবুঝ বাঁশীর নিশান শুনে লো
পরাণ হ'য়েছে ভোর !
যাস্‌নেক' আর বন-পথে ভুলে
গাগরী ভরিতে যমুনার কূলে,
বৃথা পূজা তা'র তুলসী ও ফুলে
মিছে ফেলা আঁখি-লোর ;
বাসক-শয়ান শূন্য রহিবে
আসিবে না মনচোর !

বিচারালয়ে এক করুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখা দেয়, অনেকের পক্ষেই অশ্রু-সংবরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ক্যাথারিন বলে, "বাবা বললেন, ক্যাথারিন আমার, আমি চললুম। লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে থেকো, ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন। লিওনার্ডকে আমার ভালোবাসা দিও আর বলো, সে যেন ক্ষোভ না করে।" তার পর তিনি আরো বললেন, "তোমার মা কোথায় ?" উত্তরে আমি বললাম, "খাবার ঘরে আছেন, আমি তাঁকে ডেকে দেব ?" বাবা বললেন, "না মণি, তাকে আর আমার প্রয়োজন নেই।"

এর পর মিসেস্ ক্লার্ককে হত্যার দ্বিতীয় মামলা আরম্ভ হয় ১৯১৩ সালের ১০ই মার্চ্চ এবং এর বিচারও মাত্র তিন দিনে, অর্থাৎ ১৩ই মার্চ্চ শেষ হয়ে যায়। এই মামলায় আসামীর সংখ্যা ছিল সর্ব্বসমেত ছ'জন। [illegible]

ক্লার্ক। মিসেস্ ফুলাম ও ক্লার্ক সাহেব অপরাধ স্বীকার করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বুদ্ধু অপরাধ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হওয়ায় বেঁচে যায়। রামলালের অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় তাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকী সকলকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এবং মিসেস্ ফুলাম ব্যতীত প্রত্যেকটি আসামীকেই ফাঁসি দেওয়া হয়। মিসেস্ ফুলাম শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে পরিত্রাণ পান। কারণ তিনি তখন গর্ভবতী। আইনতঃ গর্ভবতী থাকা কালীন ফাঁসি হয় না। তবে তিনি এত বড় অপরাধের হাত থেকে একেবারেই মুক্তি পান না ; ফাঁসির পরিবর্ত্তে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু এই কারাদণ্ডও বেশী দিন তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। ১৯১৪ সালের মে মাসে এলাহাবাদের নৈনী জেলে একটি শিশু-সন্তান প্রসবের পরই তিনি মারা যান—অবৈধ প্রেমের পরিণতি, নির্ম্মল [illegible]

১২

গ্রাম্য রাজনীতির ক্ষেত্রে পট-পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে। স্বভাব-ভীরু তাঁতিরাও তাঁদের মাকু ঠেলার তালে তালে রাজনীতির আলোচনা করে। লাঙ্গল চালাতে চালাতে গ্রাম্য চাষারাও নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে। প্রাচীনপন্থীরা ঘোষালদের কায়েম রাখতে চায়। নবীনপন্থীরা চায় নতুন কোনও ব্যক্তিত্বকে সিংহাসনে বসাতে। মুখে-মুখে জনমত গঠন হয়ে ওঠে। প্রচার চলে মুখে-মুখে। দ্বন্দ্ব হয় নবীনে-প্রবীণে। যে যার প্রতিপক্ষকে দমন করে—আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করতে চায়।

বুধবার প্রত্যূষে এমনি একটা আলোচনা হচ্ছিল ধোপা-বাড়ীর প্রাংগণে। রজনী শীল জাতে নাপিত, কিন্তু পেষা তার ডাক্তারী, কখনও কবিরাজী কখনও বা ওঝাগিরি। ও এসেছে ধোপা-বাড়ী অষুধ দিতে। সংগে একটা পুরোন পিতলের ঝাঁপি। তার মধ্যে ওর ডিসপেন্সারী। ঐ ঝাঁপির মধ্যে এক কোণে একটা ডিপার্টমেন্টও আছে, যাকে ইংরেজীতে বলে সার্জিকেল ডিপার্টমেন্ট। একটা দেশী নরুণ, একটা দেশী ক্ষুর ও একখানা কাঁচি নিয়ে এই ডিপার্টমেন্টটি বহু দিন ধরে খাড়া হয়ে আছে। ব্যাখ্যা করে বললে বলতে হয়, মান্ধাতার আমল থেকে। তত্ত্বজ্ঞরা বলেন: রজনী ঘরে বসে যে ক্ষুর দিয়ে সংগোপনে ক্ষৌরি হয়, বাইরে এসে সেই ক্ষুর দিয়েই দুষ্ট ব্রণ নির্ম্মূল করে।

সে পান চিবোতে চিবোতে আরম্ভ করে, 'বিদেয়-আদায় চিরদিনই ঐ ঘোষাল বাবুদের বাড়ী ভাল। ও-বাড়ীতে আমার অষুধ-পত্তর যেমন চলে, তেমনি মাসুলটাও মেলে। বনেদী ঘর, একটু সর্দি হলেই ডাক্তার চাই।'

ধোপা-বৌ জবাব দেয়, 'কিন্তু বাবুরা কোন দিন একখানা কাপড়ও কাচায় না বা মা-ঠাকরুণরা থান কাপড় ছাড়া একখানা শাড়ীও ধুতে দেয় না। আমরা পান-চূণও ফেরি করি, কখনও তো একটি পয়সার পান চূণ ও কোনও ভাই কেনে না! ওরা মানুষ দেখলে যে আবজ্ঞা! ভুলে গেছ সেদিনের কথা?

কথাটায় রজনীর বুকেও আঘাত লাগে। কারণ এই শক্তি-গড়ের হিন্দু সমাজে শুভ কাজে যাওয়ার সময় তার মুখখানা দেখাও না কি ঐ ধোপা-বৌর মুখ দেখারই সামিল! সে তো স্পষ্টই এক দিন নিজের কানে শুনেছে—ছোট ঘোষাল যাবে সদরে কি একটা কাজে, বড় ঘোষাল বলছে: আগে ধোপা পাছে নাই (নাপিত), সে কাজে যেও না ভাই। ধোপা-বৌও এসেছিল তখন কাপড় নিতে না কি করতে যেন উঠানে, এমনি অশুভ যোগাযোগ! রজনী বলে, 'আরে ও-সব সামাজিক বড়-বড় কথা নিয়ে তোমার আমার মাথা ঘামান চলে না। তবে ঐ যে পান-চূণ-কাপড়-কাচানর কথা বললে, ওসব তারা ব্যয়-বাহুল্য মনে করে—হাজার হলেও তারা বনেদী হিসেবী লোক কি না!'

'তা হলে তারা বাবু না ঘোড়ার ডিম! আর আমাদের বোসেরা উঠতি ঘর হলেও বাবু বটে! গেলে দু'সের চূণও কিনবে, দশখানা শাড়ীও কাঁচতে দেবে। ঘরে মজুত পান থাকলেও মা-ঠাকরুণ দু'গোছ পান কিনে রেখে দামের চেয়েও বেশী এক সের চাল দিয়ে দেবে। আর ওদের বাড়ীর এতটুকু ছেলে-মেয়ে পর্য্যন্ত দেখলেই বসতে বলবে—পানের বাটাখানা তাড়াতাড়ি এনে দেবে। বাবু কত দিন ঘুম থেকে উঠে আমার মুখ দেখেছেন, কই, হেসে ছাড়া তো কথা বলেননি!'

'আরে ও হাসি মুখের, মনের না। সব শেয়ালের এক রা।'

ধোপা-বৌ সজোরে প্রতিবাদ করে, 'মিথ্যা কথা। তোমার অষুধ আমরা খেতে পারি, ঘোষালেরা রাখতে পারে, কিন্তু যাদের দু'টো কাঁচা পয়সা আছে, বিদেশে পাঁচটা ডাক্তার-বদ্যি দেখেছে তারা রাখবে কেন? ওঁদের ওপর তোমার রাগ তো সেই জন্য? বোসেদের আর সেদিন নেই যে তোমার মেটে বড়ি সস্তা কড়ি দিয়ে গিলবে।'

ওর কথার ঝাঁজে রজনী জ্বলে ওঠে: 'যত বড় মুখ না তত বড় কথা! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি ঘোষাল বাবুদের বাড়ী, এক্ষুনি গিয়ে বলছি তোমার অহংকারের কথা।'

মুখরা সুধীর মাও সহজ পাত্রী নয়, সে বলে, 'যাও না, যাও—আমি কারুর খানাবাড়ীর রাইওৎ না যে ভয়ে গর্ত্তে ঢুকোব!'

ধোপা-বৌর উচ্চ কণ্ঠ শুনে দু'-চার জন করে লোক জড়ো হয়। দাঁড়িয়ে দেখে আর হাসে।

রজনী শ্লেষের স্বরে বলে, 'মানুষ দেখলে অবজ্ঞা করে ঘোষাল বাবুরা। ধোপা দেখলে কি নাচবে তারা, না বাজনা বাজিয়ে তুলবে ঘরে?'

কোমরে কাপড় জড়িয়ে চূণের পাতিলে জল ঢালতে ঢালতে ধোপা-বৌ জবাব দেয়, 'মুখ সামলে কথা বলিস্ নাপিতের পো, ভুলে যাস নে যে তোর মুখ দেখলেও অযাত্রা!'

'কি, নাপিত-ছাপিত যা-তা বলবি?'

ধোপা-বৌ ঘরে যায়। লোকে ভাবে, এই রে, ঝাঁটা আনতে গেল বুঝি—নিয়ে আসে অন্য জিনিস। 'এই নে তোর মেটে বড়ি, আর কক্ষনো আমার বাড়ীমুখো হসনি মুখ্যু-বদ্যি।'

'আমি মুখ্যু! আর তোকে ছুঁলে যে জাত যায়, তুই হলি বুদ্ধির ঢেঁকি!'

'হারামজাদা নাপিত, তোর এত বড় কথা, দাঁড়া হারামজাদা, তোকে একটু শিক্ষে দিয়ে দি। বলে, ধোপা-বৌ চূণের পাতিলটা

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

তুলে রজনীর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। পাতলা পাতিলটা ভেঙে-চুরে চুরমার হয়ে ওকে চূর্ণে-চূর্ণে একাকার করে দেয়।

রজনী ধবলবর্ণ শৃগালের মত ঝাঁপিটা ফেলে পালায়।

ধোপা-বৌ গোখ্‌রা সাপের মত ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করতে থাকে। 'জনমে-মরণে যাদের না হলে চলে না, তাদের ছুঁলে জাত যায়—একটু বসতে দিতে হাত খসে পড়ে!' তার ইচ্ছা করে যে এই সব অবজ্ঞাকারী বুড়ো মরদগুলোকে তার মুড়ো ঝাঁটাটা দিয়ে এক চোট ঝেঁটিয়ে বায়ু-রোগ ছড়িয়ে দিতে।

সেই সময় নিতাই প্রবেশ করে, 'ধোপা-বৌ তোমার মেয়ে কোথায়?'

নিতাইকে দেখেই ধোপা-বৌ ত্বরায় ক্ষিপ্রা অভিনেত্রীর মত রূপ পরিবর্তন করে—সংহারিণী মূর্তি সহসা অতিথিবৎসলা হয়ে ওঠে। 'এসো এসো সরদারের পো, এই দাওয়ায় উঠে বসো। সুখী একটু তামাক দে মা। তোমরা কি চাও, এখন বাড়ী যাও।'

ধোপা-বৌকে সকলে চিনত, কেউ আর দেরী করতে সাহস পায় না।

'কাল বাবুর সময় হয়নি, আজ সব শুনবেন।'

ধোপা-বৌ বলে, 'আমরা কোনও দর-দস্তর করব না—একটা পয়সাও চাই নে, ওর যা ধম্মে-কম্মে নেয় তাই যেন করেন।'

'তোমাদের কোনও ভয় নেই। তোমরা তো কিছু পাচ্ছ না—যদি তোমাদের একটা পথ করে দিতে পারি, তা হলে চিরদিন বসে বসে খেতে পারবে। বাবু কোন দিন জাল-জুয়াচুরি ঠগা-ঠগি পছন্দ করেন না—তোমাদের এমন সুযোগ ছাড়া উচিত না।'

'সে কথা কি আমরা বুঝি নে! অত-বড় লোক কি আমাদের ঠগাবে? এমনি কত লোকের উবগার করছেন।'

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে একটি মৃতকল্প লোক বলে, 'সুখীমা, আমাকে একটু জল দে।'

সুখী জল নিয়ে যেতেই সে জলের ভাণ্ডটা পাশে রেখে পিপাসার চেয়েও বড় কথাটা বলে, 'ধম্ম ঠেকিয়ে কান্না-কাটি করে তুই দে গে লিখে বাবুকে। কপালে থাকলে তোদের ওতেই সুখ হবে। দেশের ছোট-বড় থাকে বিশ্বেস করে তাকে তোরাও বিশ্বেস কর গে। মরণ-কালে বলে যাচ্ছি, তোদের ওতেই ভাল হবে। তোর মা-মাগীকে কিন্তু বিশ্বেস নেই—ওর মন টুস-টুস করছে।'

সুখী একটু হেসে চলে যায়।···

নিতাই বসেছিল—একটু পরেই সেজে-গুজে নিতাইর সাথে সুখী রওনা হয়। ধোপা-বৌ তাকে সাজিয়ে দেয়। যে কাজের জন্য সুখী যাচ্ছে—সজ্জাটা তার চেয়েও বেশী বলে মনে হয়।

১৩

বিপ্রপদ অন্দর-মহলে বসে যেন কি একটা দলিল দেখছিলেন।

নিতাই গিয়ে পায়ের ধুলো নেয়—সুখীও তদনুকরণ করে। দু'জনকেই ইংগিতে বসতে বলেন বিপ্রপদ। 'আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, বিশেষ কাজে আমাকে কোথায় যেন শিবচর কাছারীতে বদলী করেছে। সেই জন্য এখন আর বড়-বৌর আমার সাথে যাওয়া হবে না। ভালই হলো—উনি বাড়ী থাকলে মেয়েদের দু'-একটা সম্বন্ধ আসতে পারে। কিন্তু আমার একটু অসুবিধা হবে। তা হোক।'

'কবে পর্যন্ত যেতে চান?'

'এই দু'-চার দিনের মধ্যেই—বলতে গেলে কি, এখন আর পরের গোলামী করতে ইচ্ছা করে না।'

কমলকামিনী ছিলেন নিকটেই দাঁড়িয়ে, বলেন, 'এত বুড়োও তুমি হওনি বা এমন পয়সাও তোমার নেই যে বসে-বসে খাবে। ও আলস্য!'

'তা ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ!'

'মেয়েদের বিয়ে হলো না, ছেলে মানুষ হয়নি—এর মধ্যে এত আলস্য হলে চলবে কেন?'

বিপ্রপদর মনে একটু আঘাত লাগে, বলেন, 'না না, ও কথার কথা বলেছি—জীবনে এমন কিছু করিনি যে ছুটি চাইতে পারি।'

নিতাই ও সুখী বুঝতেই পারে না যে এই ধনী পরিবারের অভাব কোথায়। এত থাকতেও কেন এরা সুখী নয়!

কমলকামিনী যা বলেছেন তা বর্ণে-বর্ণে সত্য। এতগুলো যাঁর পোষ্য, তাঁর চাই বিস্তীর্ণ ধানী জমি। দেশে যে জমি আছে তা অতি সামান্য-তিন মাসের খোরাকীও হয় না। নগদ টাকা এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘোরে—বছরে এক সময় চাল কেনা পড়ে। লোকে বুঝতে পারে না, পুরোন ধান সর্বদা গোলায় মজুত থাকে। ও ধান খোরাকীতে খরচ না করে বর্ষাকালে ধার কর্জ দেওয়া হয়। মাঘ-ফাল্গুনে তা আদায় হয়ে যায়। এত যে জৌলুস তার কোথায় গলদ তা গৃহিণী কমলকামিনী মর্মে মর্মে জানেন। বিপ্রপদ যে জমি চান, তা এ দেশে মিলবে কোথায়? এখানে বহু লোকের বাস, যদিও বা পাওয়া যায় তা লবণ-পোড়া দর। তা কিনে কি এগুন যায়, না আশ মেটে! তিনি চান বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড—বিঘার পর বিঘা তাঁরই জমি, তাঁরই ধান। কোনও সরিক নেই, ভাগী নেই—শুধু তাঁর, একান্ত তাঁরই, জমি। এক-নজরে সীমানা নির্দেশ করা যায় না, বর্ষায় সবুজের বন্যা, পৌষে সোনার ঢেউ। এ জমির সন্ধান তাঁকে কে দেবে?

নিতাই বলে, 'দু'শো কি আড়াইশো বিঘে নাল জমি এক-বন্দে। তার দক্ষিণ সীমানায় একটা বিল—তাতে যেমন মাছ, তেমনি পাখী। এই মেয়েটি একমাত্র ওয়ারিশ।'

বিপ্রপদ চমকে ওঠেন, 'বলো কি! দু'শো কি আড়াইশো বিঘে নাল জমি এক বন্দে—তার একমাত্র ওয়ারিশ আমাদের ধোপা-বৌর মেয়ে সুখী?'

'হ্যাঁ বাবু, আমি কি মিছে বলছি? এই দেখুন নক্সা, এই দেখুন পরচা।'

উপস্থিত সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ওর কাপড়-চোপড় যতই ধোপ-দুরস্ত হক, তার সাথে এ ঐশ্বর্য্যের সামাঞ্জস্য কোথায়? অন্ধকারে যেমন একটা স্ফুলিংগ জ্বলে ওঠে, তেমনি করে মুহূর্ত্তের জন্য এই ধোপার মেয়ে সুখী জ্বলে উঠে—এমন কি কমলকামিনীকেও ম্লান করে দেয়।

কাগজ-পত্র বিপ্রপদ দেখে বলেন, 'এখন ও চায় কি?'

'বেচতে চায়?'

'জমি এখন কার দখলে?'

'ঘোষালদের।'

'ঘোষালদের!' বিপ্রপদ প্রশ্ন করেন, 'তার মানে?'

নিতাই বলে, 'বড্ড কষ্ট করে ওর এক দাদাশ্বশুর, এই জমি করেছিল। তখন জমিতে ধান হতো না—হতো শাপলা আর শালুক, পানিফলের জলো লতা। পাঁচ-সাত হাত জল! শাপলা আর শামুক বেচে খাজনা দিয়েছে এই আশায় যে পর-পুরুষে হয়ত বিল জাগবে, চর পড়বে, তারা সুখ-সচ্ছন্দে ভোগ-দখল করবে। কিন্তু বুড়োর এমনি কপাল, নিজের দু'-দু'টো বিয়ে—একটা বৌরও ছেলে হল না। বরঞ্চ ধারে-কাছে যারা ওয়ারিশ হবে তারাও গেল মরে। তখন বুড়ো সুখীর নামে একটা দানপত্র করে যায়। সে আজ প্রায় দশ বছরের কথা। ঘোষালরা এই সব কেমন করে যেন টের পায়। একটা জাল মেয়েমানুষ খাড়া করে একটা ভুয়া দলীল নেয় রেজিষ্ট্রী করিয়ে। এবার করে সুখীকে বেদখল। ওরা গরীব, দলিল-পত্র ও বোঝে না, সেই থেকে চুপচাপ।'

'হুঁ।' বিপ্রপদ একটু চিন্তা করে বলেন, 'ব্যাপারটা বেশ জটিল এবং কঠিনও বটে—ঘোষালদের মর্ম্মস্থলে গিয়ে ঘা লাগবে। কিন্তু এ বিবাদ তো কেউ টাকা দিয়ে কিনবে না। প্রতিপক্ষ দুর্দ্দান্ত ও মামলাবাজ। সুখীরা কি চায়?'

'ওরা টাকা-পয়সা কিছু চায় না। মামলা-মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হলে কিছু জমি চায়।'

'তা মন্দ না। আচ্ছা, যদি বছর বছর কিছু-কিছু ধান দেই তবে কেমন হয়?'

'সে ব্যবস্থা আরো ভাল—ওদের কোন ঝঞ্চাট পোয়াতে হলো না।'

'কিন্তু জমি দখল করতে লোকজন চাই—দাংগা-হ্যাংগামা খুন-জখম হতে পারে, এ সব করবে কে?'

'তার জন্য ভাববেন না বাবু। আমি আর ইমান থাকলে হাজার লোক ফিরিয়ে দিতে পারব দু'খানা লাঠি দিয়ে।'

'কিন্তু তোমরা তা করতে যাবে কেন? কি স্বার্থ তোমাদের?'

'আমরা চাষা-ভূষো লোক স্বার্থ-টার্থ বুঝিনে—বুঝি, ডাক পড়লে জান দিয়ে মান রাখতে হবে।'

'তা হলে কালই দলীল রেজিষ্ট্রী হবে।'

নিতাই বলে, 'আমারও তাই ইচ্ছা। তোর মত কি সুখী?'

আগুনের টুকরার মত সুখী শুধু হাসে।

কমলকামিনী ভাবেন: ছোট লোক!

বিপ্রপদ বিরক্ত হন।

নিতাই বলে, 'বাবু, ওর মত আছে।'

১৪

পরের দিন অবশ্য দলীল রেজিষ্ট্রী হওয়া অসম্ভব। এত বড় একটা দলীল লিখতেই প্রায় দু'-তিন দিন সময়ের দরকার। নিতাইকে পাঠান হলো ষ্ট্যাম্প কিনতে। সে ষ্ট্যাম্প কিনে খুঁটি-নাটি কথা জেনে আসবে। সন্ধ্যার সময় নিতাই ছ'ক্রোশ পথ হেঁটে বৃথাই ফিরে এলো। এখানের আফিস ছোট, এত দামী ষ্ট্যাম্প পাওয়া যাবে না। জেলা থেকে আনতে হবে। আর একটা কথা নিতাই জেনে এসেছে, সেইটাই বিশেষ জটিল কথা: কবলার মূল্য কত লিখতে হবে এবং নিয়ম সে টাকাটা কবলা-দাতার স্বীকার করে নিতে হবে যে নগদ বুঝে পেয়েছি। সাধারণতঃ দাতা স্ত্রীলোক হলে এ নিয়মটা বিশেষ কড়াকড়ি ভাবেই প্রযুক্ত হয়। বিপ্রপদ নগদ টাকা দেবেন না। যদি আফিসে গিয়ে রেজিষ্ট্রীর সময় সুখী কারুর পরামর্শ মত গোলমাল করে, কিম্বা হাকিমের কাছে বলে, আমি নগদ কিছু পাইনি। তখন দলীল তো রেজিষ্ট্রী হবেই না বরঞ্চ এই ষ্ট্যাম্পের টাকা ও অন্যান্য যাবতীয় খরচের ব্যয় সম্যক্ নষ্ট হবে। আগে ওদের ডেকে বিস্তারিত বুঝে-সুঝে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাজে লাগতে হয়। স্ত্রীলোকের মন টলতে কতক্ষণ? নিজের দলীল রেজেষ্ট্রী করতে গিয়ে ইদানীং নিতাই পাকা হয়ে গেছে। অনেক ভাল-মন্দ দেখেছে সে। তাই পূর্ব্বাহ্নেই আঁট-ঘাট বেঁধে যাবে। বাবুর টাকার মমতা ওর নিজের টাকার চেয়েও বেশী। দলীল লেখার পর যদি এমনি একটা গোলমালে রেজিষ্ট্রী পণ্ড হয়ে যায়, লোকে মুখে চুণকালি দেবে—যারা ভিতরের কথা না জানবে তারা ঠগ-জুয়াচোর বলবে। একটা বিধবা স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করতে এসেছে এতগুলো লোক দল বেঁধে। এ কথা গ্রামেও এসে পড়বে কাকের মুখে।

বিপ্রপদ নিতাইর মুখে সব শোনেন। তাঁর মনে বিগত দিনের সুখীর হাসির ভংগিটা চকিতে খেলে যায়। কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়। মনটা সংগে সংগে তিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন: 'নিতাই, কাজ নেই এত ঝঞ্চাটে—সুখী সহজ মেয়ে নয়।'

নিতাই বলে, 'বিনা ঝঞ্চাটে কি হয় বাবু? কোনও কাজই তো হয় না। এতগুলো জমি, বিশেষ করে উঠতি জমি, বিল শুকিয়ে যাচ্ছে—আর কি কখন কোন সুযোগে হবে?'

কথাবার্ত্তা শুনে কমলকামিনীও এসে বিপ্রপদর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেন,' ওঁর চিরদিনই ঐ এক দেখলাম—এগোতে সংকোচ পিছোতে লাজ। ও করে কি কোনও কাজ হয়? যা করব তা ধর-মার করে করে ফেলতে হয়।'

'আমি কি না বলছি না কি? তবে দেখে-শুনে তো করতে হবে।'

'বেশী কিছু দেখার দরকার নেই—দলীলটা শুদ্ধ কি না তাই শুধু দেখ।'

'আমিও তো তাই বলছি!' বিপ্রপদ ধাক্কা খেয়ে বলেন, 'আমিই তো তাই বলছি।'

'বেশ, তা হলে আমার কথা তুলে নিলাম।'

নিতাই বলে, 'বাবু ধান যখন উঠবে তখন ধানের রাশ হবে পাহাড়ের মত উঁচু। কি করে সে সকল জমি আবাদ করে ফসল জন্মাতে হয়, তা ঘোষালেরা জানে না, ওরা ধানের বিলের চরে দু'-চার বিঘে চাষ করিয়ে সারা বছর বসে খায়। কিন্তু আমি চাষার ছেলে, আমি সব জানি। দিব্য চোখে দেখছি মা-লক্ষ্মী হাসতে হাসতে বোসের বাড়ী নেমে আসছেন। এখন একটু ঝঞ্চাট করে মাকে বরণ করে ঘরে তুলতে হবে।'

বিপ্রপদর মন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'তুমি বরণ-কুলো সাজাও নিতাই তোমার মা-ঠাকরুণকে নিয়ে—আমি তো তোমাদের সাথে-সাথেই আছি।'

বিদায় নিয়ে নিতাই চলে যায়।

কত দূর গিয়ে নিতাই হঠাৎ ফেরে। একটা কথা তার মনে পড়েছে। সে মেঠো-পথ ছেড়ে আবার গ্রামের দিকে ঘুরে-চলে।

রাতও মন্দ হয়নি—অন্ধকারও কম নয়। মাঠের মধ্যে তবু তারার আলোতে দিশা পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রাম্য পথে যেন অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। যে ঘন নারকেল-সুপারি বাগান! মোটে কিছু ঠাহরই করতে পারে না নিতাই। কোন রকমে সে এক বাড়ীতে উঠে নারকেল পাতা চেয়ে নিয়ে ছোট ছোট গোটা চারেক মশাল তৈরী করে। এবং একটা জ্বালিয়ে নিয়ে হাঁটতে থাকে। তবু পথের পাশের ঝোপ-জংগল এড়ান যায় না। বেতের আঁকড়া পরম বান্ধবীর মত নিতাইর কাপড়-চোপড় টেনে-টেনে ধরে। জরুরী একটা বৈষয়িক পরামর্শের জন্য যাচ্ছে, এখন আর যেন তার এ সব ভাল লাগে না—সে মহা বিরক্ত হয়ে আঁকড়াগুলো ছাড়াতে গিয়ে কাঁটার ঘা খায়। আর একটু এগোতেই পড়ে একটা সাপের সুমুখে। সাপটা কোঁস-কোঁস করে একেবারে ফুঁসিয়ে মাথা তুলে ওঠে। এখনই বুঝি ছোবল মারবে। নিতাই একটা আর্তনাদ করে ভিন্ন পথে লাফিয়ে পড়ে ঘুর চলে। বাপ রে, কি কাল কেউটে! তার বুকের ধড়ফড়ানি থামতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। সে মশালটা ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সাপটা পিছনে পিছনে আসছে না কি। ওগুলো যে হিংস্র! নিতাই মনে মনে ভাবে, যে মাগীর পাল্লায় পড়েছি তার সুরুতেই এই, এখন শুভে-লাভে কাজটা হলে বাঁচি।'

'ঠাকুর ভাই, ঠাকুর ভাই, সজাগ আছেন?'

'এত রাত্রে কে ডাকে?' দীনুর বুকটা ধুক-পুক করে ওঠে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করে, 'চোর-টোর না কি?'

দীনু বলে, 'চোরে ডাকে, না মশাল নিয়ে আসে মাগী?

'তবে ভূত-পেত্নী না কি?' গৃহিনী দীনুকে জড়িয়ে ধরে।

'কি করে বলি, অসম্ভব না!'

গৃহিণী আর একটু শক্ত করে ধরে।

'একটু ঢিল দে মাগী, আমার যে শ্বাসরোধ হওয়ার জোগাড়।'

নিতাই আবার ডাকে, 'ঠাকুর ভাই, ঠাকুর ভাই!'

দীনু মনে মনে গনে, 'এই, দুই…।' তিনবার ডাকলে নিশ্চয় মানুষ!

ফিস-ফাস করে কথা বলে অথচ জবাব দেয় না। নিতাইর মন এমনি তে-খিঁচড়ে হয়েছিল, এখন একটু বেশী বিরক্ত হয়ে ওঠে। সে বেড়ার ওপর বেশ জোরে একটা চড় মেরে ডাকে: 'ঠাকুর ভাই, ঠাকুর ভাই! আমি নিতাই সরদার।'

গৃহিণী তখনও ছাড়ে না দীনুকে, বলে, 'নিতাই না গো ডাকু। হাতে মশাল যে!'

'ডাকু আসবে তোর ঘরে কি লুটে নিতে রে মাগী? তোর কি সে দিন আছে?'

নিতাই মশালটা নিবিয়ে ফেলে।

'ছাড়, ছাড়, বাতিটা জ্বালি।'

অগত্যা গৃহিণী দীনুকে ছেড়ে দিয়ে এই দারুণ গ্রীষ্মের রাত্রেও আপাদ-মস্তক একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে।

'এত রাত্রে যে সরদারের পো?'

নিতাই চড়া গলায় বলে, 'দোর খুলুন, কাজ আছে।'

দীনু চমকে ওঠে। এ কি নিতাইর গলা? ওর তো শত্রু-মিত্রের অভাব নেই!

নিতাই এবার রীতিমত চটে যায় ন্যাকামী দেখে। সে গোটা আষ্টেক কিল-চড় মেরে দোরটার কলজে নড়িয়ে দেয়। 'আপনি কি ভাবলেন? আপনার হলো কি? দোর খুলুন!'

দীনু কাঁপতে কাঁপতে এক হাতে হুঁকো-কল্কি ও কেরোসিনের ধূমায়মান ডিবাটা এবং অন্য হাতে একটা বাঁশের ঠ্যাংগা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

'এই নেও' বলে নিতাইর হাতে হুঁকোটার বদলে ঠ্যাংগাটা এগিয়ে দিয়ে নিরস্ত্র সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

'এ কি লাঠি-সোটা কেন?' নিতাই বলে, 'চোখ মেলে দেখুন, আমি নিতাই।'

দীনু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে, 'এত রাত্রে যে?'

'বাবু কাল সকালেই কোথায় যাবেন যেন—এই টাকা দু'টো দিয়ে বললেন যে, তুমি যাওয়ার পথে দীনুদাকে দিয়ে যেও—কাল হাট-বার আবার, আমার সাথে দেখা হয় কি না কে জানে!'

নিতাইর রচিত কাহিনী অবিশ্বাস করার আগেই দু'টো রজত মুদ্রা গিয়ে দীনুর হাতে পড়ে। দীনু গলে যায়। 'বিপ্রপদ তোমাকে পাঠিয়েছে টাকা দিয়ে! এমন ভাল লোক আর এ গাঁয়ে নেই সরদারের পো, কেমন সত্যি কি না? বসো বসো—তামাক খাও!'

এই তো নিতাই চায়! সে তামাক খেতে-খেতে সব সমস্যার কথা খুলে বলে। সুখীর কথা, বিপ্রপদর কথা কোনওটা বাদ যায় না। এখন কি করা উচিত তাই জিজ্ঞাসা। কেবল জমির পরিমাণ ও মূল্যের কথাটা চতুরতা করে এড়িয়ে যায়।

একটা একটা করে সব শুনে দীনু জবাব দেয়, 'তুমি গিয়ে এখন একটু ঢিল দাও—বলো গে, সুখীর মা, তোমরা ঘোষালদের কাছে যাও। কাকুতি-মিনতি করে যা পাও তাই নিয়ে ঘরে ওঠো। বাবু টাকা দিয়ে কেন, এমনিও কোন বিবাদ কিনতে রাজী না। দেখবে তখন ধোপা-বৌ খুব ধরা-পড়ি করবে তোমাকে। কারণ, ওরা কিছুতেই ঘোষালদের কাছে যাবে না এবং গেলেও দাম পাবে না। বরঞ্চ তোমাদের কাছেই পায়ে ধরে ফিরে আসবে। তুমি তার পর দু'চার দিন বাদে বলো: যদি তোমরা একেবারে কোনও দাবী-দাওয়া না করো তবে আর একবার বাবুকে বলে-কয়ে দেখতে পারি। কথার ফাঁকে-ফাঁকে জমি-জমা দখল হলে সে ওদের প্রচুর পরিমাণ ধান দেবে, এই আশ্বাসটা খুবই দিও। তার পর দেওয়া না দেওয়া তো নিজের হাতে, আমার কথা-মত চলো দেখবে বিনা পয়সায় কাজ হাঁসিল হবে। কিন্তু শীতলাতলা থেকে একটা কিরে-কাণ্ড করিয়ে নিও। ছোটলোক, একবার প্রতিজ্ঞা করলে আর কাঁচাখেগো দেবতার ভয়ে ফিরবে না?' তামাক টানতে টানতে দীনু জিজ্ঞাসা করে, 'জমি কতটা?'

নিতাই মিথ্যা কথা বলে, কারণ পরশ্রীকাতর দীনু না আবার একটা ভেজাল বাধায়। 'জমি বিঘে দশেক হবে।'

'দশ বিঘে দক্ষিণা জমির জন্য এত তেল-নুণ খরচ?'

'তেল-নুণ ঠিক না হলে খেতে ভাল লাগবে কেন? এখন উঠি তাহলে, ঠাকুর ভাই, পেন্নাম।'

'এসো, তা হলে আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

'কাল-পরশু যখন এদিকে আসব।'

'সংবাদটা জানিয়ে যেও, বুঝলে?'

কবলার বহায় ধার্য্য হয়েছে তিন হাজার টাকা। সুখীর মা গত্যন্তর নেই দেখেই রাজী হয়েছে। কিন্তু তার প্রাণটা আগাগোড়াই ব্যথায় টনটনিয়েছে। এতগুলো টাকা সুখীর হাত-ছাড়া হলো! কবে জমি-জমা সুসার হবে, কবে তার ধান পাবে, কে জানে! এখন তো যথাসর্বস্ব লিখে দিয়ে টাকা না পেয়েও টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিতে হবে! ঘোষালদের কাছে গেলে তারা গ্রাহ্য করবে না, এদিকে বাবুও অসন্তুষ্ট হবেন, তাহলে ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। অতএব নিতাই যা বলে তাই করা ভাল। কিছু ফসলের তো আশা রইল।

আরও একটা দুরাশা তার অন্তরে উঁকি মেরে যায়—সে দুরাশা গৃহস্থ-ঘরের মা অন্তত নিজের মেয়ের জন্য কামনা করে না। যদি বিপ্রপদর সুখীর ওপর চোখ পড়ে!

তাই দলীল রেজিষ্ট্রীতে কোন বিঘ্ন ঘটে না।

আফিস থেকে ফেরার পথে বিপ্রপদ সুখীর মা'র হাতে একশো এক টাকা গুণে দিয়ে বলেন, 'একেবারে কিছু না দিয়ে কোনও সম্পত্তি করার আমার ইচ্ছা নাই—সেই জন্য আজ এই সামান্য কিছু দিলাম। একেবারে শুধু হাতে তোমরা ফিরলে কি ভাল দেখায়, না আমার মনে ভাল লাগে। যাক্ ভবিষ্যতে আমি তোমাদের ঠগাব না।'

সুখীর মা মহা ওস্তাদ। সে আঁচলে টাকা বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'বাবু টাকা দিয়ে আমরা করব কি—এই মেয়েটার ওপর একটু নজর রাখবেন। ও তো যথাসর্বস্ব আপনাকে নিবেদন করে দিল। এখন ও-ই আমার লক্ষ্য। বাপটা তো ওর মরে মবে। এ টাকা আমরা নেব না—আপনি ফিরিয়ে নেন।' বলে বাঁধা আঁচলটা দেখায়।

'না, না—তা কি হয়? তোমাদের আপদে-বিপদে তো রয়েছি! যখনি ঠেকবে আমাকে জানিও—আমি যথাসাধ্য করব।'

সংবাদটা অতি সহজেই গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে। দীনুর বুকটা ফেটে যেতে চায়। নিতাই শালা ওকে ফাঁকি দিয়েছে। দশ বিঘে নয়, তিনশো কি চারশো বিঘে—দক্ষিণা বিলের জমি। ওর তো কোনও মাপ-ঝোপ নেই। হয়ত আরো অনেক বেশী হতে পারে! বিপ্রপদ রাতারাতি রাজা হয়ে গেল! এবং তার পথ একেবারে নিষ্কণ্টক করে দিল, ও নিজে—মাত্র দু'টো টাকা খেয়ে! ও মূর্খ, ওর চোদ্দ গোষ্ঠী মূর্খ! এখন আর কোনও উপায় নেই। এখন আর কি করবে, তবু গিয়ে সংবাদটা ঘোষালদের দিয়ে আসবে। 'স্বজাতি পরম বান্ধবঃ'। বিপদে-সম্পদে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। বিপ্রপদর যে বুদ্ধি, একেবারে অজবুদ্ধি! ও কি শুদ্ধ দলীল গ্রহণ করতে পেরেছে? সম্ভব না। ঠগুক, বুদ্ধিমান পাড়া-পড়শীকে তো ডাকবে না?

ঠিক দুপুর বেলা গিয়ে দীনু ঘোষালদের কাছারীতে হাজির। একটি জনপ্রাণীও নেই। দীনুকে এক ছিলিম তামাক পর্যন্ত কেউ খাওয়াবে এমন বান্ধবও নেই। এক জন অনাহারী ব্রাহ্মণ যে ঠিক মধ্যাহ্নে না খেয়ে ফিরে যাবে, সে খবরটাও কি নেওয়ার কোনও লোক আছে এদের? এরা নিতান্ত অপদার্থ—এদের বারটা বেজে গেছে। এখানে মান-মর্যাদার আর কোনও আশা নেই।···দেখি, বিপ্রপদকে কে হটায়? দলীল একটা হলেই হলো! সাক্ষী-সাবুদ ঠিক থাকলে, জেরায় সত্যি-মিথ্যা গুছিয়ে বলতে পারলে, কত মরা দলীলও খাড়া হয়ে ওঠে। অর্থবলের সাথে জনবলের যোগ চাই—তা বিপ্রপদর আছে, যখন দীনু ঠাকুর পিছে রয়েছে। একটু খামখেয়ালী হলেও বিপ্রপদ লোক ভাল। কবলাদাতাকে যদিও বা বুদ্ধি করে ঠগিয়ে থাকে, কিন্তু দীনুর দক্ষিণাটা তো আগে-ভাগেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফেরার পথে দীনু বোসের বাড়ীর ওপর দিয়ে যায়। এবং সত্যযুগীয় প্রথায় উপবীত-হস্তে বিপ্রপদকে আশীর্বাদ করে, 'মহারাজের জয় হক!'

বিপ্রপদ একটু সগৌরবে হেসে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি সমাচার দীনুদা?'

'ব্রাহ্মণ অভুক্ত।'

আরও অন্যান্য অনেকের সংগে দাঁড়িয়ে কমলকামিনী সং দেখছিলেন। এবার উঠে গিয়ে যোড়শোপচারে একটা সিদে এনে দীনুর সুমুখে রেখে প্রণাম করেন।

১৫

বিপ্রপদ কার্য্যস্থলে রওনা দিচ্ছেন। সাথে কেউ যাবে না—কেবল ইমাম যাবে ষ্টীমার-ঘাট পর্যন্ত। নৌকা-পথ ব্যতীত যাওয়ার উপায় নেই। একখানা ডিঙি-নাও কেরায়া করে আনা হয়েছে। সে এই মাত্র চাল ডাল তেল নুণ নিয়ে গেছে। ভাড়ার টাকা ছাড়া মাঝি-মাল্লাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কিম্বা যত দিন পর্যন্ত ভাড়া খাটান যায় সেই অনুপাতে সম্যক্ খোরাকী ও পান-তামাক দেওয়া এ-দেশীয় রীতি। এর জন্য কোনও গরীব গৃহস্থও ঝগড়া করে না। বরঞ্চ যত্ন করেই তার যা প্রয়োজন পূর্ণ করে। মাঝিরাও দেশে দেশে সুনাম করে বেড়ায়।···কি-ছুদিন হয় নতুন ষ্টীমার-লাইন এদিকে হয়েছে। তা না হলে বড় কষ্ট ছিল যাতায়াতে।

মাঝি বলে, 'এহন আর দেরী করলে জাহাজ পাবা না বাবু—জহুরের ওক্ত উৎরা গেছে। ভাডা পরায় শ্যাষ।'

মাঝির কথায় সকলেই তাড়াহুড়া করতে থাকে।

এবার কমলকামিনী স্বামীর সাথে যাবেন না কিন্তু বিপ্রপদর যাতে বিদেশে অসুবিধা না হয় তার জন্য কত কি যে দেবেন আর ইয়ত্তা নেই। একটু আচার, চারটি চিঁড়ে, কিছু ঘি, কয়েকটা গাছের বারমেসে ফল ইত্যাদি করতে করতে দশটা-পাঁচটা শিশি-বোতল-পোঁটলা-পুঁটলী জমা হয়। কিন্তু পুরুষের পক্ষে এ সব গুছিয়ে রেখে খাওয়া অসম্ভব। তবু কি স্ত্রীলোকের মন মানে! অল্প শীতে পাতলা কাঁথা, বেশী শীতে লেপ—কোনটা কখন লাগে বলা যায় না! সবই বেঁধে দেওয়া হয়। বিপ্রপদ হেসে বলেন, 'এ সব রাখবে কে ঠিক-ঠাক করে?'

'কেন, একটা চাকর জুটবে না?'

'মাইনে, খোরাকী, মাসে কত টাকা বাজে খরচ—নিজেরটা নিজেই করে নেব।'

'চাকরী করে তা করা অসম্ভব—আর তুমি সেখানে কর্তা,—তোমার তো একটু মান-সম্মান রেখে চলতে হবে।'

'সত্যিই আমার এখন এক জন চাকরের দরকার। তুমি থাকলে একটা ঝি-টি রাখলেই চলত—কি বলো?'

'না গো, এখন আর তা চলে না। ঘরের কাজ না হয় ঝিতে করল, বাইরের কাজ করে কে? লোক না থাকলে এখন মান বাঁচান দায়।'

'যাক, সাবধান-মত বাড়ীতে থেকো।'

বহু লোক বাইরে অপেক্ষা করে আছে। পুরুত ঠাকুর এসেছেন শালগ্রাম শিলা নিয়ে যাত্রা করিয়ে দিতে। দীনু এসেছে দেখা করতে, বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছেন দু'-এক জন। নাট-মন্দিরে ভীড় জমে গেছে।

সকলকে অল্প কথায় তুষ্ট করে দেবালয়ে প্রণাম করে বিপ্রপদ নৌকায় গিয়ে ওঠেন। 'ইমামও আসছে না, নিতাইকেও দেখা যাচ্ছে না—এরা কেউ আমার সংগে যেতে পারবে না, তা আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। আমার আর দেরি করে ষ্টীমার ফেল করাও তো অসম্ভব।'

আজ-কাল বিপ্রপদকে খুব সাবধানে চলা-ফেরা করা দরকার। প্রতিষ্ঠা যত বাড়ে শত্রুতার বীজও তত বৃদ্ধি পায়।

একে একে সকলে খাল-পাড়ে এসে জমা হয়েছে। ছেলেরা এসেছে, মেয়েরা এসেছে, সেবাও টলতে-টলতে বলতে-বলতে আসে—'উই বাবু যায়।' এ বিচ্ছেদ দীর্ঘ দিনের নয়—এ বিচ্ছেদ স্থায়ী কোনও দুঃসংবাদ নয়, তবু পোড়া বাঙালীর প্রাণে বিষাদ আনে। যারা ভালবাসে তারা ঘন ঘন চোখ মোছে। যারা পাড়া-প্রতিবেশী তারাও অশ্রুরোধ করতে পারে না। বিদেশী পথিক পথের কথা ভুলে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ায়—এ বিদায়-দৃশ্যে তারও প্রাণ কেঁদে ওঠে। সে হিন্দু হক, মুসলমান হক—সেও তো বাঙালী। এক বাঙলার কোমলতা দিয়ে তারও তো মন গড়া।

অমরেশ বিপ্রপদর দিকে তাকাতে পারে না। তার জীবনে এ দৃশ্য এই প্রথম। চোখ দু'টো বারণ মানে না।

কমলকামিনী ছেলেকে কোলের কাছে টেনে এনে গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'কাঁদে না বোকা ছেলে। আবার তো উনি এলেন বলে।'

মাঝি নৌকা খুলতে চায়, কিন্তু কমলকামিনী বাধা দেন, 'আর একটু দেরী করে দেখো—পথে কত আপদ-বিপদ আছে, একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলা ভাল। ঘাটে পৌছুতে রাত তো কম হবে না।'

'কিন্তু ওদিকে যে আমার ষ্টীমার না পেলেও ভীষণ ক্ষতি। বাবুদের তাগিদের কথা তো তুমি জান।'

কে যেন বলে, 'ঐ নিতাই আসছে।'

কমলকামিনী এবং উপস্থিত সকলের মনেই একটা আনন্দ হয়।

বিপ্রপদ বলেন, 'ইমাম কোথায়? তুমিও যে এত দেরী করলে? যাক সে না আসে তুমিই চলো একটু সংগে।'

'বাবু, ইমামের ছেলেটার কলেরা।'

'কোনটার?'

'বড়টার—সিরাজের।'

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি নৌকা ছেড়ে ওঠেন। বলেন, 'আজ আর আমার যাওয়া হবে না। মাঝি তুমি খেয়ে-দেয়ে এখানে থাকো—কাল যাবো।' তিনি দেশের মধ্যে ভাল ডাক্তারটিকে ও প্রয়োজনীয় অষুধ-পত্র নিয়ে রওনা দেন।

কমলকামিনী বলেন, 'আমিও যাবো—তোমরা একটু দাঁড়াও।'

'তুমি যাবে? বলো কি?'

'আজ আর কোনও বলা-বলি নেই—ওদের তো কোনও কাণ্ড-জ্ঞান নেই। এ রোগ যে কি ভীষণ এবং ছোঁয়াচে তা ওরা জানেই

'তুমি গেলে কি বাঁচাতে পারবে?'

'রোগীকে বাঁচান ঈশ্বরের হাত—তবে নিরোগীকে রক্ষা করা মানুষের সাধ্যের মধ্যে—তাই আমি যাবো—এই নৌকাতেই ওদের ঘাটে যাওয়া যাবে। আমি উঠলাম, তোমরাও এসো—আর হেঁটে যেয়ে দরকার নেই।'

কোলের মেয়ে সেবার দিকে একবার ফিরে না চেয়েও, আধ-ময়লা শাড়ীখানা না বদলেই কমলকামিনী নৌকায় গিয়ে ওঠেন।

খালপাড়ের স্ত্রী-পুরুষের জনতা স্তব্ধ হয়ে থাকে। থাকার কথাও। আজ পর্য্যন্ত কেউ কখনও শোনেনি যে কোনও হিন্দু-মহিলা কোন নৈতিক দায়িত্ব কিম্বা আর্থিক প্রয়োজনেও কোন দিন কোন মুসলমান-বাড়ী গেছে। শক্তিগড় কেন, আশপাশ গাঁয়ে এ এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি!

কমলকামিনী সকলের সাথে-সাথেই ওপরে ওঠেন। তাঁকে দেখে এ-ঘর ও-ঘর থেকে বৌ-ঝিরা অস্ফুট বিস্ময়ের শব্দ করে ওঠে। ইমামের বৌ রোগী ফেলে দৌড়ে যায়! একটা অভাবনীয় তোলপাড় পড়ে যায় মুসলমানপাড়ায়। একে একে গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে ব্যাপারখানা দেখতে। গর্বে-আনন্দে আশ্বাসে-দুঃখে ইমামের চোখে জল আসে। তার মা এসেছেন যত মুস্কিল আছান করতে!

দিনের বাকী অংশটুকু এবং সারা রাত যমে-মানুষে টানাটানি চলে। জল খাওয়ান, মাথা ধোয়ান, মল-মূত্র পরিষ্কার—এমন কোন কাজ নেই যা না কমলকামিনী সাবধান ও পরিচ্ছন্ন মত করেন। বিপ্রপদ ডাক্তারটিকে ও নিতাইকে নিয়ে সারাটা রাত উঠানে পায়চারী করে কাটান। ছেলেটা ভাল হয়ে ওঠে। ডাক্তার বলে, 'তলপেটে হাত দিয়ে বুঝলাম প্রস্রাব এসে জমেছে—একটু বাদেই হয়ে যাবে। ইউরেমিয়ার ভয় নেই। এখন আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যেতে পারেন—আর তো সকালের বেশী দেরী নেই, মোরগ ডাকছে, ঐ তো শোনা যাচ্ছে।'

কমলকামিনী সাবধানতা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক করে ফের নৌকায় গিয়ে ওঠেন। তখন পাশের মসজিদ থেকে একটা একটানা মধুর আজানের ধ্বনি ভেসে এসে ওঁদের দু'জনার চিত্ত প্লাবিত করে দেয়। সবই খোদার মেহেরবাণী।

কমলকামিনী না এলে সত্যিকার যম হয়ত ছেলেটাকে ফেলে যেত, কিন্তু অজ্ঞ ও মূর্খরূপী যম সে কি করত বলা যায় না।

পরের দিন আবার সেই বিদায় অংক আসে।···

খাল-পাড় লোকে ভরে যায়।

সেই অশ্রু, সেই বিষাদ, সেই করুণ দৃশ্য মর্ম্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

বিপ্রপদ নায় উঠেছেন—ইমাম শক্ত একটা পাকা-বাঁশের লাঠি নিয়ে গলুইতে দাঁড়িয়ে—এক্ষুনি নৌকা ছাড়বে।···ছাড়লও তাই।

কমলকামিনী জনতার সুমুখ দিয়ে ত্বরায় বাড়ী ফেরেন। তাঁর কোনও দুর্বলতা অশোভন। ফিরে চলে রিক্তমনে অমরেশ ও সেবা।

ধীরে ধীরে ভীড় মিলিয়ে যায়।···

একটা ঘুঘু ব্যর্থ সংগীত গেয়ে চলে পাশের আমরুল গাছটা থেকে।

ডুবন্ত সূর্য্যের রাঙা আলো কে যেন বাটিতে গুলে গোলাপী

ছড়িয়ে যাচ্ছে। দু'-একটা পাখী এখনও সেই রঙের লোভে লোভে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে, ডুব দিচ্ছে—আবার স্থির হয়ে ভেসে চলেছে অনির্দিষ্ট মহাকালের দিকে। নিবিড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে পথ করে শক্তিগড়ের খাল চলেছে নদী-সংগমে। কত আঁকা-বাঁকা পথ তার! অন্ধকার তরুশ্রেণীর মধ্যে যেন তার শ্বাসরোধ হয়ে যাবে—তাই তার স্রোত-বেগ দ্রুত, নৌকা চলেছে তীরের মত। হুঁসিয়ার মাঝি বৈঠা ধরেছে শক্ত করে। এখনি একটা ঘূরপাক খেয়ে কচুরীপানা-গুলোর সাথে নৌকা গাঙে গিয়ে পড়বে।

এখন একটানা নদী—সিধে মেহেরপুরের বাঁক। তার পর মাত্র দেড়-বাঁক জল। কতটুক বা পথ এই তরতরে ভাটায়!

মাঝি সুবিধা বুঝে একটা ভাটিয়ালী গান ধরে। ইমাম তালে তালে মাথা নাড়তে থাকে।

নিরক্ষর একটা বাঙাল মাঝির মুখে কি অপূর্ব গান! কণ্ঠে কি অপূর্ব মাধুর্য্য! ছন্দে-ছন্দে কি অপূর্ব লালিত্য। যেন সমস্ত সুকুমার সাহিত্য ছেনে, নিংড়ে এনে অতি সুকোমল কাব্য—এ পল্লী-গীতি রচিত হয়েছে। এর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে রস, এর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে লাবণ্য—এ যেন সংগীতের মধুচক্র। এ সংগীতের রচয়িতা যে কবি তার নাম হয়ত সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পায়নি, কেউ কোনও দিন তাকে খুঁজেও দেখবে না, তবু সে যুগ-যুগান্ত ধরে এমনি নিরক্ষর গায়কের মুখে নিরক্ষর সমঝদারদের বুকে বেঁচে থাকবে পূর্ব-বাঙলার সান্ধ্য নদীপথে।

গান থেমে যায়, অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে থাকে।

বিপ্রপদ যে ছইর ভিতর আছেন তাও অনেকক্ষণ ধরে বোঝা যায় না।

'ইমাম?'

'বাবু!'

'তোমার ছেলে ভাল আছে শুনে সুখী হলাম। একটু থেমে ফের বিপ্রপদ বলেন, জমি তো কেনা হলো—চাষ-আবাদ করবে কে? দক্ষিণ দেশে লোকে যেতেই ভয় পায়—যে সাপ-কোপ বাঘ-ভালুকের হামলা। শুনেছি না কি দিনের বেলা বাঘ এসে বসে থাকে বিলের ধারে। বিলের দক্ষিণে না কি একটা চরা নদী তার পর সুন্দরবন।'

'বাবু, হে ডর আমাগো নাই—কত জ্যাতা শিয়াল (বাঘ) ধরইয়া আনুম আপনাগো আশীর্বাদে!'

মাঝি হেসে বলে, 'কয় কি বাবু, শিয়ালে করতে পারে কি? আমাগো বাড়ী থিইক্যা দক্ষিণের বিল দেহায়—আমরা আছি না সে তাশে!'

ইমাম বলে, যে ওর জন্ম কোনও চিন্তা নেই। বিপ্রপদ একটু তাড়াতাড়ি কিছু বেশী দিনের ছুটি নিয়ে ফিরে এলেই ভাল হয়। জমি দখল করার সময় দু'-একটা খুন-টুন হতে পারে—তা তারা চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে লাস সরে জমিন থেকে গায়েব করে ফেলবে, পুলিশের বাপেও টের পাবে না। চাষ-আবাদের জন্যও তারা ভাবে না। 'জো' মত জমি চাইষ্যা 'গোন' মত রুমু বীজ—তার পর খোদার ইচ্ছা লক্ষীর দয়া। যতক্ষণ আমরা দুই মিতায় বাইচ্যা আছি ততক্ষণ আপনার জনের অভাব নাই বাবু।'

বলে যে তাদের বাড়ীও বিলের কাছে যেলের চর—সঙ্গে দরকার হয় সেও দু'-দশ জন লোক নিয়ে যেতে পারে। কিছু জমি তাকে বর্গা দিতে হবে। সে-ও না কি এক জন ভাল চাষী, ও-দেশের সব হাল-চাল জানে!

'আচ্ছা, তোমাকে খবর দেবো।'

কথাবার্তায় ষ্টীমার-ঘাটের বাঁকে নৌকা এসে পড়ে। দূরের লাল আলোটা অন্ধকারে একচক্ষু রাক্ষসের মত দেখায়। ঐটাই ঘাটের নিশানী আলো।...

নৌকা ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে ষ্টীমারও এসে পড়ে। মাঝি ও ইমাম চটপট বিছানা-বাক্স লট-বহর ষ্টীমারে তুলে দিয়ে ফ্লাটে এসে দাঁড়ায়।

'সেলাম বাবু।'

সেলাম, সেলাম।'

ষ্টীমার ঘটঘট-খটখট করে নোঙর টানতে টানতে ঘাট ছাড়ল।...

কেবিনে গিয়ে বসতেই বিপ্রপদর নজর পড়ে ষ্টীমারটার নামটার দিকে। এই তো সেই জাহাজ! এখানেই তিনি কুলী হয়ে মোট মাথায় ঢুকেছিলেন। আজ আবার বাবু সেজে এসেছেন। সেই আলো, সেই সিঁড়ি, সেই দোকানী—সব ঠিক। শুধু তাঁরই ভাগ্যের অসীম পরিবর্ত্তন ঘটেছে। হয়ত আরো ঘটবে—ঐ সুদূরে দক্ষিণের বিলে সোনা ফলবে। তিনি শুধু শ্রম করে যাবেন, যত্ন করে যাবেন, যাবেন দিনের পর দিন ক্লেশ করে। তার পর তাঁর করণীয় কিছু নেই।...

আজ যা জটিল বলে মনে হচ্ছে কাল তা সরল হতে কতক্ষণ!

অদৃষ্টই সব। এমন দিন তাঁর গেছে যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেটেও তাঁর বিশ্রাম মেলেনি, পেট ভরে নিজে খেতে পারেননি। পরিবারবর্গ রয়েছে অর্দ্ধাহারে। হয়ত কেউ কিছু মুখ ফুটে বলেনি, তিনি তো মনে মনে সব বুঝেও বোকার মত চুপ করে রয়েছেন। সামান্য চেষ্টায়, বলতে গেলে এক দিনের চেষ্টায় তাঁর ভাগ্য ফিরল। তার পর তিনি কত লোক কত আত্মীয়-অনাত্মীয়কে যে খাইয়েছেন তার মাপ-ঝোপ নেই। হিসেব করতে গেলে তিনি তাঁর এই সামান্য জীবনে কম করে পাঁচিশটি শ্রাদ্ধের খরচ জুগিয়েছেন। কত মেয়ের বিয়ের রোশনাই জ্বালালেন। এ সব তিনি অন্তরালে বসেই করেছেন—তবু আজ একটা তৃপ্তিতে তার মন ভরে ওঠে। এ সব ভাগ্য তাঁর না সকলের? তিনি হয়ত নিমিত্ত মাত্র। অন্ধকারে সকলেই সহযাত্রী, তাঁর দায়িত্ব শুধু পুরোভাগে মশাল জ্বালিয়ে চলার।

বিপ্রপদ ঘুমিয়ে পড়েন।

শেষ রাত্রে ষ্টীমারের একটা একঘেয়ে তীব্র হুইসেলে বিপ্রপদর ঘুম ভেঙে যায়। কেবিনে খুব ভীড় হয়েছে। যাত্রীরা ঠাশাঠাশি করে ঝিমাচ্ছে। কেউ বা ষ্টীমারের গতির তালে তালে দুলছে। বাক্স-পেটরা-বিছানা-পত্রে কেবিনটা একেবারে বোঝাই। পা রাখার স্থান পর্য্যন্ত নেই। বিপ্রপদর জুতো-জোড়ার ওপর কে যেন এক ব্যক্তি একটা ক্যানভাসের ব্যাগ রেখে, তার ওপর পা দু'খানা ছড়িয়ে দিব্যি আরামে নাক ডাকাচ্ছে। হাঁটু পর্য্যন্ত মোজা-পরিহিত কোনও বৃদ্ধের পা। এক পায় একটা সাদা অপর পায় একটা লাল রঙের মোজা। দেখলে ঠিক ক্লাউনের পা বলেই সন্দেহ হয়। মনে হয়;

হক গে। এখন আর পারিপাট্য দিয়ে কি হবে—শীত নিবারণ হলো বিষয়। চামড়া তো ঢিলা হয়ে গেছে, এখন আর ভাল-মন্দে কি এসে যায়!

বিপ্রপদর দামী জুতা-জোড়া যেন কলার মত চ্যাপটা হয়ে গেছে। তিনি জুতা-জোড়া টেনে বের করতেই মোজা-পরা পায়ের মালিক সামনের দিকে খানিকটা হড়কে যান। মহা ত্রস্ত হয়ে উঠে বসে প্রশ্ন করেন, 'মহাশয়ের নিবাস?'

বিপ্রপদ জুতা-জোড়া সমান করতে করতে জবাব দেন, 'হিন্দু হয়ে আপনি দেখি চামড়া-জোড়ারও কাশী বাস করে ছেড়েছেন।'

মো-মুড়া পায়ের মালিক একটু বিব্রত হয়ে জবাব দেন, 'দেখুন, আমি বুঝতে পারিনি!'

'আপনি তো অবুঝও না—প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে।'

'আপনিও তো নবীন না, কথায় বেশ প্রবীণ বলেই মনে হচ্ছে।'

চোখ তুলতেই বিপ্রপদ দেখেন যে বুড়ো সেন মশাই। তিনি এতটা লজ্জিত হন যে জুতো হাতেই হাত জোড় করে বলেন, 'নমস্কার সেন মশাই, কিছু মনে করবেন না।'

'কে বিপ্রপদ বাবু না কি? আরে ওতে মনে করা-করির কি আছে, বিশেষত, আমার—ক্ষতি হলে হয়েছে আপনারই। তার পর কোথায় চলেছেন? নমস্কার, নমস্কার।'

'এই চাকরি-স্থলে—শিবচর নামে একটা নতুন জায়গায় বদলী হয়েছি।'

'আপনার কথাই ভাবছিলাম। যাক, দেখা হয়ে গেল!'

'আপনাকে তো আমারও দরকার, কিন্তু এখন থাক।'

'না না, বলুন না—তালুক বিক্রীর কথা জিজ্ঞাসা করবেন তো? যে যা শুনেছেন কথা ঠিক। তা, আপনার অভিপ্রায় কি?'

'যদি দয়া করে—'

'বিপ্রপদ বাবু, আপনি ক্রেতা আমি হচ্ছি বিক্রেতা—দয়া কে কা'কে করবে?'

'সে কথা বলছি নে—সে কথা বলছি নে—তবে কি জানেন, যদি উচিত মূল্যটা শুনতে পারতাম—তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম। তালুক বিক্রী করতে চাইলেও এখনও আপনারা বড় লোক। আপনাদের তুলনায় আমরা নগণ্য—মানে-সম্মানে-অর্থে সব দিক দিয়ে।'

বৃদ্ধ মনে মনে সন্তুষ্ট হন। 'আপনি মিষ্টভাষী, আপনার সংগে কাজ করায় সুখ আছে। টাকা-পয়সা কিছু কম-বেশীতে এসে, যায় না। এস্তেজালি পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত উঠেছে। ঘোষালেরা কিছু বেশীও দিতে চায়। তাদের ইচ্ছা, যে-কোনও মূল্যে সম্পত্তি খরিদ করা। খারিজা ষোল-আনী তালুক, একটা মস্ত জমিদারির সামিল, বিশেষতঃ স্বদেশে—আপনার তো স্বগ্রামে। এটা খরিদ করা মানে গৌরব ও প্রতিষ্ঠার চরম শিখরে ওঠা। মাত্র তিনটি প্রজা শাসন করতে পারলেই সদর খাজনা আদায় হয়ে গেল। তার পর সারা বৎসর নিশ্চিন্ত। যখন আপনার দু'টো পয়সা আছে তখন এ সুযোগ আপনার ত্যাগ করা বিধেয় নয় বিপ্রপদ বাবু।'

বিপ্রপদ বোঝেন, বৃদ্ধ ঝানু-লোক—পাকা জমিদার। কেনা-বেচার ব্যাপারে যে কি করে দু'টো-চারটে মিথ্যা কথা বেশ শ্রুতিমধুর করে বলতে হয় তা তিনি জানেন। এবং এ-ও জানেন যে, এটুকু সত্যের অপলাপে বিশেষ কোনও ক্ষতিই হয় না। 'দেখুন দরাদরি করে এ-সব জিনিস কেনা খুবই কঠিন—যদি অনুগ্রহ করে উপযুক্ত লোকের হাতে দিয়ে যান তবে প্রজারা আশীর্ব্বাদ করবে। অন্যথায় এ বুড়ো বয়সে অভিশাপের ভাগী হবেন। যদি এতগুলো লোককে কোনও অত্যাচারীর হাতে বলির পশুর মত বেঁধে দিয়ে যান, তবে স্বর্গে গিয়েও সুখী হবেন না।'

'এ অতি সত্য কথা—অতি সত্য কথা! টাকা-পয়সা দু'দিনের—যশ চিরদিনের। আপনি কি দিতে পারবেন তা তো বললেন না?'

'ওই তো বললাম দর-কষাকষি করে এ-সব খরিদ করা যায় না। আমি একও বলতে চাই নে দশও বলতে চাই নে। অংকটা তৃতীয় ব্যক্তির মত আপনিই স্থির করে দেবেন।'

'আচ্ছা—আচ্ছা, সে তো ভাল কথাই। আপনাকে না জানিয়ে কোনও কিছু করা হবে না। ঘোষালদের চরিত্র আমার অজ্ঞাত নয়—তাদের আমি এ সম্পত্তি কিছুতেই দেব না—লাখ টাকায়ও না।'

বিপ্রপদ মনে মনে ভাবেন: তবে ঘোষালদের মাঝখানে রাখার অর্থ দাম চড়ান! বুড়ো সহজ পাত্র নয়। এর কাছে নীতি-কথা স্তব-স্তুতি সব এক দিকে, আর টাকা এক দিকে।

আর একটা প্রমাণও সংগে সংগে পাওয়া যায়।

নিকটবর্তী ষ্টেশনে ষ্টীমার থামতেই সেন মশাই সবিনয়ে নমস্কার করে নেমে যান। বিপ্রপদও দোতলার রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ান। ফ্ল্যাটে ও কারা দাঁড়িয়ে? প্রথম ও দ্বিতীয় ঘোষাল না? হ্যাঁ, তারাই তো! তারাই তো বুড়ো সেন মশাইকে অভ্যর্থনা করে ভীড় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেন মশাই কখন কোন ষ্টীমারে নাববেন তাই বা এরা জানল কি করে? এ সব পূর্ব-পরিকল্পিত, না হলে শেষ রাত্রে নিতান্ত অসময়ে ওদের এখানে আসা অসম্ভব। আর একটি লোক কে? দীনুদা? ঠিক চেনা যায় না—এর মধ্যে ষ্টীমার ছেড়ে দেয়। বিপ্রপদ একটা মানসিক অস্বস্তি নিয়ে নিজের কেবিনে এসে বসে পড়েন।

দীনু পাখীও না পশুও না। ওর পক্ষে সকলই সম্ভব। কিন্তু ঐ যে প্রাচীন সেন, সেও কি তার সমগোত্রীয় একটা সুবিধাবাদী প্রাণী? আশ্চর্য্য!

বিপ্রপদর অন্তর ঘৃণায় ভরে উঠে···তার পর একটা আক্রোশ হয় সকলের ওপর। তিনি এক্ষুনি নেমে যাবেন। ঘোষালদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যা-হক বলে আসবেন, তাতে যদি সেন মশাই চটে চটুক।

কিন্তু নামার উপায় নেই, ষ্টীমার সশব্দে ডানা পিটিয়ে মাঝনদীতে এসে পড়েছে।

[ক্রমশঃ
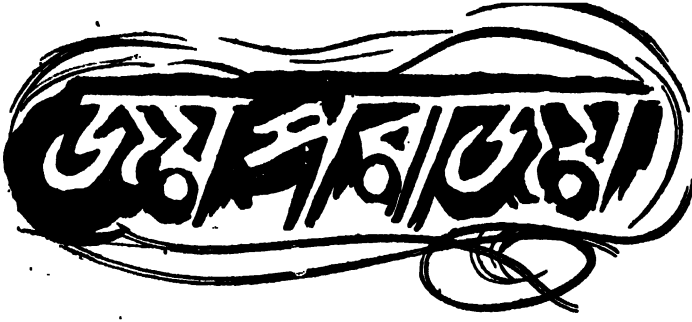
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশ

"প্রেমে পড়ার সঙ্গেই আমি প্রেমে পড়েছিলাম। তুমি ঠিকই বলেছ, হে বিদেশী যুবক।"

হঠাৎ এ-রকম কথা শুনে খুব ঘাবড়িয়ে গেলাম। মনে মনে অবশ্য আমি বলছিলাম—হ্যাঁ, ক্যাসানোভা আবার প্রেমে পড়েছিল? যত সব বাজে কথা। প্রেমে পড়াই ছিল ওর ফ্যাসন, বড় জোর প্যাসন। হ্যাঁ, ফ্যাসন কিংবা প্যাসন।

বেশ জুতসই একটা বাক্যের বাহার দেখাতে পেরে মনে মনে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াচ্ছিলাম।

কিন্তু কে জানত যে এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাসানোভা সশরীরে এসে উপস্থিত হবে আমার সামনে? তালপ্রাংশু, মহাভুজ যাকে বলে, কন্দর্পকান্তি নয়, নারীর মনুষ্যত্ব নয়; ঘোর বাদামী বর্ণ ও দীর্ঘ তীক্ষ্ণ নাসা তাকে সকল পুরুষ থেকে পৃথক্ করে রেখেছে। তবু মুখখানা দেখে মনে হয় যে ভালবাসার জন্তই এ মুখ সৃষ্টি হয়েছিল; কামের কার্মুকের মত ভ্রু-যুগলের তলায় আয়ত আক্রমণোন্মত্ত দু'টি চক্ষু কখনো মুগ্ধ কখনো বা স্নিগ্ধ করবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে। অবশ্য শুধু মুখ নয়, সমস্ত দেহের মধ্যে একটা শক্তির প্রাচুর্য্য ও ঔদার্য্য রয়েছে যার প্রভাব অস্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার ভিতর একটা দাম্ভিকতা, একটা আত্মপ্রত্যয় যা অবলা নারীকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সবলাকে করতে পারে পরাভূত। তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম।

বললাম—আমি আশা করিনি যে আপনি আমার কথা শুনতে পাবেন। মার্জনা করবেন আমার কথাগুলি।

মার্জনা? তিনি হেসে বললেন—মার্জনা আমি কখনো কাউকে করিনি। জান যুবক, তোমার বয়সের মেয়েদেরও আমি মার্জনা করিনি কখনো।

আস্তে আস্তে সাহস হতে লাগল। বললাম—তবে কি করতেন তাদের নিয়ে?

খুব আত্মতৃপ্ত ভাবে হেসে তিনি বললেন—মার্জনা করতাম না, মজাতাম।

অসম সাহস ভরে বলে ফেললাম—মজিয়ে মজা দেখতেন বুঝি?

সাবাস, ছোকরা, সাবাস! তোমারও দেখছি ভাবার উপর বেশ দখল আছে। এটা বড় প্রয়োজন এ ব্যাপারে। চলে এস, তোমাকে আমার চেলা করে নিই।

সবিনয়ে বললাম—চটবেন না, চেলা হবার জন্ত চলতে চাই না, চালাব নিজেকেই যখন চাইব। কিন্তু আপনার পটীয়সী বিদ্যার পাঠ না নিলেও জানবার কৌতূহল হচ্ছে অনেক।

জানতে চাওয়া ভাল, কিন্তু মানতে চাওয়া আরও ভাল—বললেন ক্যাসানোভা।

মানুষ যদি মনে নিতে পারি—বললাম সপ্রতিভ ভাবে।

—বেশ, তাহলে তোমার মন বলে একটা জিনিষ আছে মনে হচ্ছে।

—মনও আছে, মানও আছে। আপনার মত মনীষা অবশ্য না থাকতে পারে।

—সাবাস ছোকরা, স্বীকার করছ তাহলে যে এ ব্যাপারে আমার মনীসা আছে। তুমি সমঝদার বটে। তবে শোন আমার কাহিনী।

—তার আগে বলুন, আপনার কি কোন লজ্জা-সরমের বালাই ছিল না অথবা কোন দার্শনিকতা দিয়ে দামী করে রাখতেন আপনার কীর্ত্তিকলাপ?

—বৎস (বুঝলাম যে আমার প্রশ্নে একটু অসন্তুষ্ট হয়েই এই সম্বোধন করছেন), আমি হচ্ছি রতি দেবীর পূজারী এবং নারী হচ্ছে আমার মন্ত্রমালা। জপ করতে করতে আমি এগিয়ে গিয়েছি চিরকাল।

—(মনে মনে) নরকের পথে অবশ্য।

—কি, 'শকড্' হয়ে গেলে না কি?

—না, না, আপনার তথ্যটা শুনি।

—তাই ত' বলছি—তবে তত্ত্বকথা যে তা নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। আমি কাউকে দেখে মুগ্ধ হতাম প্রথম তার মুখখানি দেখে, তার পর তার বাক্-বিদগ্ধতা, তার ব্যক্তিত্ব এ সব আসত। মন দিয়ে আমি ভালবাসতাম, মৃন্ময় ছিল না আমার কোন কাহিনী। প্রেমে আমার ছিল মতি, মাটি মেশাইনি কখনো তাতে।

—তাই যদি হবে তবে এত বার কি করে প্রেমে পড়লেন; এত নারীকে মজালেনই বা কেন?

আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন তিনি এ প্রশ্নে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মুখ-বিবর বড় হয়ে গেল। তিনি

আহত অভিমানের সুরে বললেন—জান না, কি ভাল বই ভালবাসার কি আনন্দ? সব বই-ই এক রকম আনন্দ দেয়, কিন্তু প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে, স্বকীয়তা আছে। প্রথম মলাটের মুখবন্ধেই আকর্ষণ করে বই, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত না পড়ে দেখলে তা উপভোগ করাই সম্পূর্ণ হয় না। তোমার যেমন বই দেখলেই পড়ে দেখতে ইচ্ছে করে সেই রকম আর কি?

অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করতে লাগলাম এ কথাতে। বই পড়া আমি ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি, তার সঙ্গে এমন একটা উপমা দেওয়াতে নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেই বোধ হয় তিনি বললেন—দেখ, তোমাদের নীতিবাদীরা সুখ-তৃষ্ণাকে নিন্দাই করে থাকে, কিন্তু কেন জান? নিজেদের সুখী হবার মত সংসাহস নেই বলে। সুখই যদি না চাইব তবে সারা জীবন ধরে সন্ধান করছি কিসের? অবশ্য তুমি লেমনেড পান করেই সুখী আর আমার শ্যাম্পেন না হলে চলে না। আমি বাসনার বশ, সাধনা সাধ্যে কুলায় না আমার। তা বলে আমার পথটা পাপের হবে কেন?

সঙ্কোচ কেটে আসছিল, বললাম—কেন নয়? এই সান মার্কোর গীর্জায় আসতে খারাপ ও ভাল দু' রকম পথই ত আছে।

পরম প্রশান্ত একটা হাসি হেসে সে বলল—তা আছে, কিন্তু আমার মনে যদি কষ্ট না হয় তাহলে খারাপটা হল কোথায়? আমি যে পথে চলেছি তাতে ত আমার কোন ব্যথা বা বিতৃষ্ণা নেই।

—ব্যডেলিয়ার বলেছেন যে পাপ করছি এ কথা ভাবাতেই একটা সুখ পাওয়া যায়, যেমন ধরুন—অবৈধ প্রেমে।

—তা হতে পারে; কিন্তু আমি জীবনকে ভোগ করি, ভোগ করে পাপ-পুণ্য নিয়ে মাথা ঘামাই না। এই ধর না অষ্ট্রীয়ার রাণী মেরিয়া থেরেসার কথা। উনি ভিয়েনার মত সুন্দর সহরটাকে নষ্টই করে ফেললেন চরিত্ররক্ষীর দল প্রতিষ্ঠা করে। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, ওরা ওদের কাজে যা আনন্দ পেয়েছে, ওদের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিজের কাজ হাঁসিল করে আমি তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি।

সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই আমার—বললাম আমি, পৃথিবীতে চিরকালই সৃষ্টির চেয়ে সংহারে বেশী সুখ পায় লোকে। তার জন্যই যে তা ভাল, তা ত নয়। সমাজ গড়তে লেগেছে হাজার হাজার বছর, ভাঙবার জন্য একটা বিপ্লবই যথেষ্ট।

হেসে ক্যাসানোভা বললেন—তবেই দেখ, বিপ্লবেরই বিক্রম বেশী; তারই পূজা করা উচিত। ভাঙো, ভাঙো—রাঙিয়ে দাও তোমার প্রাণ। ভগবান ত সে জন্যই হৃদয়ে লাল রক্ত দিয়েছেন, শাদা জল নয়। অনুরাগের রঙ দিয়ে রাঙা সে রক্ত, ভালবাসবার জন্য, তাতে ডুবে যাবার জন্য, না না, বরং বলতে পার, তাতে ভেসে-ভেসে বেড়াবার জন্য।

—আপনি শুধু ভেসেই বেড়িয়েছেন সম্ভবত—ভালবাসেননি।

—ভালবাসা কাকে বল তুমি?

—(বিব্রত ভাবে) সে ত সবাই জানে।

—ওঃ, তুমি একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বলছ? তা ওই জিনিষটি কি অনেককে ভালবাসার চেয়ে বেশী ভাল? দেখ, এ হৃদয়ে ভালবাসা একটা সীমাবদ্ধ বস্তু; ধর, জলের মত। হয়তো গভীর হয়ে একটা স্রোতোধারা সৃষ্টি করবে, না হয় চার দিকে ছড়িয়ে হাজারটা স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। আমি যে বিশ্বময় উদার ভাবে ভালবাসা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাই একটি মানুষের মধ্যে তাকে সঙ্কীর্ণ করে রাখি কি করে? আমি যে ব্যাকুল হয়ে—চঞ্চল হয়ে চার দিকে অনন্ত প্রেম-তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে বেরিয়েছি। কোথাও সে তৃষ্ণা মেটেনি, শান্তি পায়নি, সমাপ্তি পায়নি। আমার ভালবাসা কি তোমাদের চেয়ে কম?

—কবি যাকে বলেছেন!

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী"

আপনি বোধ হয় সে দার্শনিকতার পিছনে আশ্রয় নিয়েছিলেন?

—না, আমি কারো আশ্রয় নিইনি; আমি নিজেই আশ্রয় দিয়েছি আমার মধ্যে সব কিছু দার্শনিকতাকে, যেগুলি তোমরা পছন্দ কর না। আমার জীবনের ছোট-ছোট দীপবর্ত্তিকার আলো তোমাদের এক আকাশের একমাত্র চন্দ্রমার চেয়ে কম ছিল না। তারা প্রত্যেকেই সার্থক, সম্পূর্ণ এবং সে সম্পূর্ণতাই তাদের সব চেয়ে বড় পরিচয়।

—আপনি বোধ হয় কবি ব্রাউনিংএর ভক্ত; তিনি কোন কাজকেই ছোট মনে করতেন না যদি তা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

—ব্রাউনিং? তার বহু পূর্ব্বেই আমি এ পৃথিবীতে আমার লীলা সাঙ্গ করেছি।

—আচ্ছা, আপনি কখনো কি সত্যিই ভালবেসেছিলেন? এই আমরা যেমন ভাবে ভালবাসি তেমন ভাবে!

হেসে উঠলেন ক্যাসানোভা। বললেন—অর্থাৎ প্রেমে পরাজিত হয়েছি কি না? কাউকে ভালবেসে হৃদয় হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি কি না? হ্যাঁ, একবার তা হয়েছিলাম। সে জন্যই আমি অতৃপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখনো। হায়! এত বার জয়ের পরও মাত্র এক বারের পরাজয় এখনো ভুলতে পারলাম না। সে কাহিনীটা তোমার রুচিতে বাধবে না বোধ হয়, কারণ তোমরা চাও হারতে এবং অন্যের হারের খবর জানতে। তবে শোন আমার ভালবাসার কাহিনী। আশ্চর্য্য! আমিও পৃথিবীতে এক জনের কাছেই শুধু পরাজিত হয়েছিলাম, এবং তোমার শুনে ভাল লাগবে যে, সে হারই আবার হৃদয়ে মণিহারের মত বিরাজ করছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নীল ভূমধ্যসাগরের সুদূর সকরুণতা সান মার্কোর চত্বরের নিকটে—অতি নিকটে এসে অস্তরাগের মধ্যে বিচিত্র হয়ে দেখা দিচ্ছে। সে বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিস্তারের মধ্যে ক্যাসানোভার কণ্ঠস্বর ব্যাকুল বিহ্বল শোনাতে লাগল।

সর্পিলাকে আমি সত্যই প্রার্থনা করেছিলাম মনে-প্রাণে। তুমি বিশ্বাস করবে না যুবক, আমি তখন যুবক ছিলাম না কিন্তু যৌবনেও কখনো এত চঞ্চলতা, এত মাদকতা অনুভব করিনি। যৌবনেও কখনো এমন ভাবে এক জনকে সব ভুলে অনুসরণ করিনি।

একটু আঘাত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম—অস্তরাগ চিরকালই মধ্যাহ্ন-দীপ্তির চেয়ে মাদকতর; কারণ প্রথমে জাগে দেহের দাহ, পরে আসে মনের মত্ততা।

—আঃ, শোন না একটু ধৈর্য্য ধরে; শ্রবণ কর, দর্শন এনো না এখন তুমি।

চুপ করে গেলাম। সত্যই ত; ভদ্রলোক যদি চুপ করে যান তাহলে হয়ত আর কথা কওয়াতেই পারব না।

তিনি বলে চললেন—কণ্টিনেণ্টে ও ইটালীর মধ্যেও বহু জায়গায় উল্কার মত নারী-রাজ্যের আকাশে উড়লাম ; ঈর্ষান্বিত বন্ধুরা বলল—হ্যাঁ, এ সব দেশে জয় সহজ ; চেষ্টা কর না একবার ইংলণ্ডে। সে দেশ পরাজিত হয়নি কখনো ; সে দেশীয়ারা প্রেমেও পড়ে না কখনো।

আমি রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হলাম। বটে ? যুদ্ধে ওরা পরাজিত হয় না সমুদ্রের আড়ালে থাকে বলে, কিন্তু প্রেম-পারাবার ত পারাপার মানে না, সব তীরে—সব ঘাটে হৃদয়-তরণীকে বানচাল করে বেড়ায়। আচ্ছা। বন্ধুদের বিদ্রূপে জেগে উঠলাম। বয়স তখন প্রায় চল্লিশ, কিন্তু চব্বিশের চঞ্চলতা এলো চরণে, ব্যাকুলতা এলো বুকে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম নূতন সমুদ্রে।

নিজের মনেই যেন বলে যেতে লাগলেন তিনি স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে-করে।

—হ্যাঁ—সমুদ্রই বটে। সে দেশে অমিশ্রিত সুরা ছাড়া আর সবই লবণাক্ত আস্বাদে ভরা—সাগরে ঘেরা দেশ, সাগরিক তার লোকগুলি আর সবার সেরা নাগরিকা সর্পিলা হচ্ছে সেখানে সাগরিকা।

প্রায় বলে উঠতে যাচ্ছিলাম—কেন, তিনি কি সেখানকার রাণী না কি ? এমন সময় আবার আরম্ভ হল সে কাহিনী।

—অনেক লেডীর সঙ্গেই ত মিশলাম কিন্তু চিনলাম না কাউকে। কারণ ধরা দেয় না কেউ ; প্রত্যেকেরই চার দিকে দুস্তর সাগরের ব্যবধান। মনের মধ্যে জমা হয়ে উঠতে লাগল জেদ এবং সর্পিলা হল ওই বিদেশী দ্বীপের প্রতিনিধি ভিন্নদেশী প্রিয়া।

সে আমায় খোলাখুলি বলল এক দিন—তোমায় আমি হারাতে চাই ; নিষ্ঠুর ভাবে নাচাতে চাই। যেমন ভাবে তুমি সব মেয়েদের নিয়ে খেলা করেছ, তেমন ভাবে তোমায় খেলাব। তোমার জয়ের ঔদ্ধত্যকে রূঢ় পরাজয়ে নীচু করে ধূলিসাৎ করে দিব।

শুনে আমি চমকিত হলাম না, কিন্তু চমৎকৃত হলাম। তার মুখরতাকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখলাম। সুন্দরীর দর্পে থাকে দীপ্তি ; সে আলোয় যে ঝলমল করছে ঝলসিয়ে দিব কি তাকে রাগের অনলে ? অনুরাগের আহুতি দিলাম তাই তাকে তার বদলে। এই যে সন্তোভিন্ন-যৌবনা কিশোরী পুরুষসিংহের কেশরে অঙ্গুলিচালনা করছে সাহসে তাকে লেহন করব কি করে ক্ষুরধার রসনা দিয়ে ? লম্বা ফ্রক কোটের লাঙ্গুল হেলনে তাকে সস্মিত ভাবে অভিবাদন করলাম তার এই পরোপকার-নিষ্ঠার জন্য। অনিষ্ট করতে কি পারবে সে আমার ? নিষ্ঠা দিয়ে তার নিষ্ঠুর বাণীকে গানে গলিয়ে নিব আমি—বিশ্বনারী-বিজয়ী ক্যাসানোভা।

এর মধ্যেই আমি মুগ্ধ হতে আরম্ভ করলাম এই অবলার সরল সবলতায়, দুঃসাহসী দ্বৈরথ দ্বন্দ্বের আহ্বানে। সে দিন থেকে শুরু তাকে জয় করবার অভিযান।

কিন্তু পারলাম কই ? কত প্রেম-নিবেদন করলাম, কত প্রমোদ নিকেতনে নিয়ে গেলাম, বহুমূল্য উপঢৌকনে ঢেকে দিলাম তার শোভন উপবেশন-কক্ষ। তবু তার নাগাল পাই না। না হয় তার মন অনুরক্ত, না হয় দেহ আসক্ত। শুধু ফিরে-ফিরে যাই ভ্রমরের মত গুঞ্জন-ধ্বনি করে ; মধু রয়ে গেল অনাস্বাদিত, যাদুমন্ত্র তার রইল আমায় মন্ত্র-শৃঙ্খলিত করে।

হঠাৎ বলে ফেললাম—ভদ্র, মার্জনা করবেন, মুগ্ধ হয়ে গিয়ে আপনি মূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।

শাণিত ছুরিকার মত তার আঁখিতারকা জ্বলে উঠল। তিনি বললেন—মূর্খ ! প্রেমে কি কখনো পড়নি নিজে ?

চুপ করে আছি দেখে তিনি আবার বললেন—হ্যাঁ, তা ভালবেসে থাকতে পার কিন্তু ভালবাসাতে যাওনি বোধ হয় কাউকে, তাই বুঝতে পারছ না। আমি চাইনি শুধু ভালবাসতে, শুধু জয় করতে ; আমি চেয়েছিলাম জয় করে পরাজিত হতে। তার কাছে যে পরাজয় সে ত জয়ের চেয়ে বড় হত। পরাজয়েই হত আমার চির বিজয় !

হ্যাঁ ; তার পর কি হল শোন। আমার সময় নেই বাকী ; এখনি ভেনিসের প্রমোদ-কাননগুলিতে শোভা পেতে আরম্ভ করবে কামিনীকুসুমদাম। রজনীগন্ধার সুরভির মত ভোগ করব সে আনন্দ-সম্ভার আমি অদৃশ্যপথে থেকে। সময় আর আমার হাতে বেশী নেই।

জান, এক দিন প্রেম-নিবেদন করতে করতে ব্যর্থ হয়ে অক্ষম ক্রোধে এমন মনে হল যে, যে হাত দু'টি দিয়ে তার চরণতল পর্য্যন্ত স্পর্শ করেছি অনুনয়ে তা দিয়ে তার গলদেশ বেষ্টন করে দিই—আলিঙ্গনে নয়, কণ্ঠরোধ করে হত্যা করার প্রলোভনে।

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম—সত্যি ?

হ্যাঁ—সত্যি। ব্যর্থতার আক্রোশে তাও আমি করতে পারতাম। যদি করতাম তা হলেও ভাল হত। তাহলে তার এমন করে হার হত না।

কেন ? কেন আপনার এত হৃদয়ের আকর্ষণ হল তার উপর ? আপনার বিজয়-ক্ষেত্র ত ছিল অনন্ত ; দেশে দেশে আপনি ত প্রেমের খেলা খেলে বেড়িয়েছেন।

তা বটে। কিন্তু এই এখানে ত আমি তা করতে চাইনি। শোন তার পর কি হল। এক দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তার বাগানের সাইপ্রেশ গাছগুলির ছায়ার আড়ালে থেকে-থেকে তার ঘরের বারান্দার তলায় এসে দাঁড়ালাম। তার কণ্ঠনিঃসৃত কলোচ্ছ্বাস সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত এসে আমায় আঘাত করল। আমি থমকিয়ে দাঁড়ালাম। এত আনন্দ-কাকলী তার কণ্ঠে কখনো শুনিনি। মানস-চক্ষুতে দেখতে লাগলাম তার প্রফুল্ল হাসির শোভায় সন্ধ্যার অন্ধকার তরল হয়ে উঠছে।

হিংসা হল না কি আপনার ?—সকৌতুকে প্রশ্ন করলাম।

হিংসা ? তা হিংসা বলতে পার। মনে মনে ভাবলাম, আমি যদি ওই ঘরের দেওয়াল হতাম তাহলে তার হাসির উচ্ছ্বাস এসে আমাতে প্রতিহত হয়ে ফিরত ; হতাম যদি তার কবরীর পুষ্পমাল্য প্রত্যুত্তরে দিতাম একটু সৌরভস্রোত তাকে।

বাঃ, এ যে একেবারে 'ওরিয়েণ্টাল' মনোভাব হয়ে গেল।

দেখ, প্রেমের ব্যাপারে ওরিয়েণ্ট্যাল বা 'অক্সিডেণ্টাল' নেই। প্রেম হচ্ছে নিখিল বিশ্বের সার্বজনীন বস্তু। আমরা তোমাদের মতই ও-জিনিষটি অনুভব করি। তোমরা ভাষায় তাকে প্রকাশ কর, আর আমরা ভাবে তাকে বিকাশ করি, এই যা তফাৎ। তোমরা উপহার দাও রজনীগন্ধা, আমরা দিই গার্ডেনিয়া।

মোট কথা, আপনার হিংসা হয়নি তাহলে ?

না ; সত্য কথা বলতে কি, কি হয়েছিল তার বর্ণনা করতে পারব না। অনেকক্ষণ তার হাস্য-লহরী হৃদয়ে সঞ্চয় করে নিলাম। তার পর ধারে-ধারে গোপনে বারান্দার কার্ণিশে উঠে উঁকি মেরে কি

দেখলাম জান? দূর্বাদলের মধ্যে স্থির স্তিমিত নিশ্চল একটা কালসর্প! সর্পিলার সুন্দর সবুজ গাত্রাবরণের চারি ধারে বিসর্পিত হয়ে রয়েছে এক যুবকের দুই বাহু, আলিঙ্গনে বদ্ধ সর্পিলা মুক্তিলাভের কৃত্রিম চেষ্টা করতে করতে হাস্যোচ্ছল কৌতুকে লুটোপুটি খাচ্ছে, মুখে তার পরম পরিতৃপ্তির আভা। আঃ—চোখ কেন অন্ধ হয়ে গেল না তখন?

আপনি কি চোখ বন্ধ করে ফেললেন আর বারান্দা থেকে পড়ে গেলেন?

আঃ—তুমি কিছুই বোঝ না যুবক! আমি পড়ে গেলাম না, উঠে গেলাম, অনেক উর্দ্ধে, সংসারের হিংসার অনেক উর্দ্ধে উঠে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম—সর্পিলা আমার সঙ্গে কখনো সুখী হয়নি, কখনো এত আনন্দে নিজেকে ভুলতে পারেনি। আমি কি সে অবস্থায় স্বার্থপরের মত নিজেকে তার উপর জোর করে চাপাতে পারি? ওই অপরিচিত যুবকের সাহচর্য্যেই যদি সে সুখী হয়, হোক সে সুখী। সে যে সুখী হয়েছে তা ভেবে নিয়েই নিজেকে সুখী করে রাখব, ভাবব তার সুখেই আমার হোক সুখ।

বলতে বলতে তার চোখ দু'টি অন্ধকারের মধ্যে তারার মত জ্বলতে আরম্ভ করল। তার দিকে তাকিয়ে মনে একটা বিচিত্র অনুভূতি এল। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম—আহা!

না, না, আহা বলো না। অন্তরালে থেকেই অজ্ঞাতসারে সরে আসব এই মনে করে সংগোপনে সর্পিলার দিকে একটি চুম্বন ছুঁড়ে দিলাম। সুখী হও তুমি সুন্দরী অপরিচিত নবীন যুবকের প্রেমে, প্রবীণ প্রেমিক ক্যাসানোভা আর তোমায় অনুসরণ করে দুঃখ দিবে না। বলতে বলতে হঠাৎ পদস্খলন হওয়াতে বারান্দা থেকে নীচে পড়ে গেলাম।

চোট লাগেনি ত বেশী?

চোট? ক্রুদ্ধ স্বরে ক্যাসানোভা বললেন—চোট? তা লেগেছিল, তবে আমার আসুরিক বলবান দেহে নয়, অমৃতের আস্বাদময় মনে। আমার আদর্শময় স্বপ্নময় ক্ষমা মরে গেল সে আঘাতে। জেগে উঠল সুপ্ত রক্ত-মাংসের মানব। এক লাফে বারান্দা পার হয়ে এসে সেই অপরিচিত যুবককে এমন প্রহার দিলাম যে তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে নগর-প্রহরীরা ছুটে এল আর বিভ্রান্ত সর্পিলা সর্পগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল অলক্ষিতে অন্ধকারে—গাঢ় অন্ধকারে আমায় ডুবিয়ে।

চার দিকে তাকে খুঁজতে বের হল সবাই। কোথাও পাওয়া গেল না তার সন্ধান। সন্ধ্যা কি নেমে এল তার উজ্জ্বল জীবনের উপর? তমসা নদীর জলে সে কি জুড়াল আমার প্রেম-নিবেদনের জ্বালা? কি জানি। ভ্রষ্টপুচ্ছ ময়ূরের মত লক্ষ্যভ্রষ্ট ঘুড়ের মত ফিরে এলাম নিজের গৃহে।

পরদিন সকালেই ছুটলাম তার বাড়ীতে; দেখি, বহু লোকের ত্বরিত পদে ত্রস্ত ভাবে আনাগোনা চলছে; কথা কয় না কেউ। সর্পিলা রাত্রেই ফিরে এসেছিল কিন্তু শুয়ে আছে মরণের দুয়ারে; দেখা হওয়া অসম্ভব; ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশও মিলল না।

হায়! নিজের ঘরে স্তিমিতপ্রায় আগুনের আভায় তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে বসে-বসে ভাবলাম, কেন তাকে এমন ভাবে প্রেম-সংগ্রামে আহ্বান করলাম, কেন রণাঙ্গনে অনুসরণ করলাম তাকে দুর্বার শত্রুর [illegible] না তাকে [illegible] আমাকে প্রথম দিন উপেক্ষা করার পরই? সে কি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে আমার উপর নিজে প্রাণদান করে? তার কাছে যে জয় চেয়েছিলাম সে কি এই? তার হাতে যে পরাজয় প্রার্থনা করতাম মনে মনে সে কি এই?

প্রত্যেক দিন তার বাড়ীর দুয়ারে ঘোরা-ফিরা করতাম। প্রত্যেক দিন তার স্বাস্থ্য-সংবাদ ক্রমেই বেশী চিন্তা ও ভীতিজনক হয়ে উঠতে লাগল। প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম তার বাড়ীর চারি দিকে।

এক দিন অন্ধকারে এক জন লোককে বাড়ী থেকে বের হতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—এই কি ডাক্তার যাচ্ছেন না কি? চাকর উত্তর দিল—ডাক্তার? দিদিমণি ডাক্তারের হাতের বাইরে চলে গেছেন। উনি হচ্ছেন পুরোহিত।

ক'দিন পরে ওর বাড়ী থেকে যেচে খবর পাঠাল যে, সর্পিলার মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী আছে। আমি যদি সত্যই তার কল্যাণ কামনা কখনো করতে চেয়ে থাকি তাহলে যেন অন্তত এখন গীর্জায় প্রার্থনা করতে চাই।

হায়! এই গীর্জাতেই ত যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে নিয়ে, তাকে ছাড়া নয়। তার পরমাত্মীয় হিসাবে, পরমাত্মার জন্য নয়। তাই সেখানে যেতে পারলাম না।

আমার কামনার দাবানলে বেষ্টিতা বনহরিণী সর্পিলা যে দীর্ঘশ্বাস সেতুর উপর থেকে তমসা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জ্বালা জুড়িয়েছে বলে সন্দেহ করেছিলাম, সে দিন সেই সেতুর উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। মৃত্যুর দুয়ারেও আমি পরাজিতের মত দাঁড়াব না। সব চেয়ে ভাল সান্ধ্য পোষাকটি পরে এসেছিলাম। এক পকেটে দু'টো পিস্তল, অন্য পকেটে যতগুলি নেওয়া সম্ভব ততগুলি গুলী, বুকের মধ্যে একটা করুণ অসহায় স্তব্ধতা। আমার মুক্তি ও আসক্তি-মোচনের একমাত্র পথ আত্মহত্যা।

কিন্তু এমন সময় এসে উপস্থিত হল আমার এক বন্ধু। সে কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে। মুখ দেখেই বোধ হয় সন্দেহ করেছিল মারাত্মক রকমের কিছু গোলমাল। জোর করে নিয়ে গেল একটা রেস্তোরাঁয়। বাধাও দিতে পারি না। যদি আসল উদ্দেশ্য সন্দেহ করে ত বিপদ। আত্মহত্যা করতে পারলে কোন শাস্তিই নেই; কিন্তু চেষ্টা করে বিফল হলে আইনে শাস্তি দেবে। ভয়ে-ভয়ে তার সঙ্গেই যেতে হল। খেতেও হল। তিন দিন কিছু খাইনি; তার পর এই অভিজাত ভোজনশালায় যা খেলাম তাকে উদরোৎসব বলা চলে। উপায় ছিল না; বাহিরের আবরণ ত রাখতে হবে; অন্যথায় আচরণ যে হয়ে উঠবে সন্দেহজনক। সুরাপাত্রের উষ্ণ অন্তরঙ্গতা ক্রমে ক্রমে বুঝিয়ে দিতে লাগল যে, প্রেম আনন্দ থেকেই জন্মায়, আনন্দের জনক নয়।

সুরা ত নয় যেন সুধা; ক্রমে ক্রমে নিজেকে ফিরিয়ে পেতে লাগলাম। মনে এল সাহস, দেহে এল উৎসাহ। বন্ধু যখন আমার মৌন আত্মতন্ময় ভাবকে প্রেমবিহ্বলতা বলে খেপাতে শুরু করল সুরা তখন আমায় দিল প্রেরণা। বললাম—ছোঃ, আমি কি প্রেমে পড়েছিলাম না কি? আমি—আমি ত শুধু আমার জয়-মালায় আর এক ফুল যোগ করবার চেষ্টায় ছিলাম।

মধুর হেসে বন্ধু বলল—তা বলেছ বটে ঠিক। না হলে পারে তুমি এই শীতে আর অন্ধকারে টেমস নদীর উপর দীর্ঘশ্বাস সেতু

উপর দাঁড়িয়ে থাকতে একা-একা। বন্ধু, তুমি বন্ধনে পড়েছ এবার নির্ঘাত; তবে বলে দিচ্ছি, বন্ধুর এ পথ তোমার জন্য নয়। প্রেমে পড়ে কলেজের ছোকরারা ও কবিরা—যারা কখনো পরিণত বয়স্ক হয় না। আর তুমি? তোমার চল্লিশ বছর বয়সে এত জয়ের কাহিনী পিছনে রেখে এ রকম মায়া-মৃগের পিছনে ছোটা তোমার মানায় না।

কাতর—হ্যাঁ, এখনো কাতর বই কি—কাতর স্বরে বললাম—কিন্তু সর্পিলা যে পরপারের পথে চলেছে; সে ত শুধু আমার রাহুর প্রেমের দুর্বার অভিযানের ফলেই।

শ্যাম্পেনের পাত্রটি আবার ভরে দিয়ে সে বলল—তুমি ত চির-কালই মনে মেরেছ; এক জনকে যদি প্রাণে মারার কারণ হয়েই থাক তাতে দুঃখের কি আছে? তুমি ত মৃগয়ার ব্যাধ, কোন্ শরে কাকে হত বা আহত করলে সে খবরে ত তোমার দরকার নেই। যাই হোক্, চল এখন একবার নাচ-ঘরে যাওয়া যাক। লোকে তোমায় বদ্নাম দিতে সুরু করেছে যে তুমি প্রেমে পড়েছ।

গেলাম তার সঙ্গে নাচ-ঘরে। মরণের সঙ্গে অভিসার হল না বটে কিন্তু চরণের সঙ্গে অভিনয় অর্থাৎ যাকে বলে নাচ—তাও আমার উপভোগ করা হল না। হঠাৎ যেন চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল; নাচ-ঘরের বাতিগুলিও চোখে যেন নাচতে লাগল; বাজনার তালে তালে মাথাটাও নাচতে লাগল; বিশ্ব-জগৎ নাচের মধ্যে পাগল হয়ে গেল না কি?

ওই ত সর্পিলা নাচছে। লঘু চঞ্চল চরণে যে নাচছে সে ত শুরু মরণ-পথের যাত্রিণী নয়। তবে? তবে? হায়! ও যদি মরে থাকত বা আমিই যদি আত্মহত্যা করতে পারতাম, আর যাই হোক, এমন ভাবে আমার পরাজয় হত না।

কয়েক মিনিট যেন কেমন করে যুগান্তের মত দীর্ঘ ও প্রতীক্ষার পরীক্ষায় অসহ মনে হত লাগল। তার পরই অবশ্য নিজেকে সামলিয়ে নিলাম।

নাচতে নাচতে সবাই আত্মহারা হয়ে উঠছে দেখে আমিও আত্ম-সংবরণ করে নিতে পারলাম। নাচ-ঘরের বাতি তখন চোখে আবার উজ্জ্বল ঠেকছে। একটি মেয়ে নিজে থেকে যেচে আমার সঙ্গে নাচতে চাইল। প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। তার বাহুলগ্ন হয়ে নৃত্য-সাগরে ভাসতে ভাসতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাড়ি দিতে আরম্ভ করলাম। নাচতে নাচতে সর্পিলার পাশ ঘেঁষে গেলাম এক বার। তার দীর্ঘ বিসারিত পোষাকের প্রান্তে কি দিয়েছিলাম ঈষৎ আকর্ষণ? উষ্ণ-শিহরণ কি জেগেছিল আমার দেহে তার পার্শ্ব-সঞ্চরণ কালের কবোষ্ণ উত্তাপে?

জানি না। কি হয়েছিল জানি না। কিন্তু সেই সেদিনকার সন্ধ্যার সবুজ পোষাকের রাশি রাশি তরঙ্গভঙ্গের মাঝখান থেকে একটি শুভ্র আনন—সবুজ পত্রালিকার মধ্যমণি শ্বেত গোলাপের মত মুখ—ভেসে ভেসে দূরে চলে যেতে যেতে একটা ব্যঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সে ব্যঙ্গ বাক্যের চেয়ে বলশালী, বাণের চেয়ে বিষাক্ত মনে হল। বাণবিদ্ধ হরিণের মত টলতে টলতে নৃত্যচ্ছন্দে আবার তার কাছে ভেসে এলাম নৃত্যস্রোতে; মৃদু স্বরে কিন্তু স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেন বলে গেলাম সর্পিলাকে—আমার স্বপ্নের সর্পিলাকে—জয়ের চরম মুহূর্তেই হল তোমার পরম পরাজয়।

কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, যুবক, তার কাছে আমি এই জয় চাইনি। দেশে দেশে যে ভাবে নারীর কাছে জয়মালা পেয়েছি কখনো হেলায়, কখনো খেলায়, সে ভাবের খেলা ত এ ছিল না। আমি যে চেয়েছিলাম হারতে, ব্যাকুল হয়ে বিপুল ভাবে হারতে। তার বদলে এ কি পেলাম জয়? এ জয়ে না আছে জয়ের আনন্দ, না পরাজয়ের বেদনা। একবার যদি দুঃখ পেতাম, তাহলে সে পরাজয়ই আমার চিরজয় হয়ে থাকত।

উদাস উৎসুক দু'টি চোখ ক্যাসানোভার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্যে সন্ধ্যা-তারার মত জ্বল-জ্বল করে তাকিয়ে রইল। এক বার ভাবলাম যে তার হাত ধরে মিনতি করে বলি, যেন এই পরাজয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সে বেদনা অনুভব না করে; জয়-পরাজয়ের হিসাবের মধ্যে এ কাহিনী যেন না টেনে আনে; কিন্তু এই চারি ধারের অনন্ত করুণতার মধ্যে ভাষা খুঁজে পেলাম না; মনে হল যেন তাকেও খুঁজে পাচ্ছি না আর।

অদূরে সান মার্কো গীর্জার ঘড়ি ঘণ্টাধ্বনি করে উঠল। হঠাৎ নড়ে-চড়ে জেগে উঠলাম; ক্যাসানোভার কাহিনীর মায়াজাল ছাড়িয়ে আত্মসংবরণ করতে না করতেই বন্ধুদের চীৎকারে সচকিত হয়ে উঠলাম। কাসুন্দি, কাসুন্দি করে ওরা চেঁচিয়ে আমায় খুঁজছে।

দেখ্, কাসুন্দি, তোকে নিয়ে পারা গেল না। গণ্ডোলা থেকে হোটেলের ঘাটে নেমে দেখি তুই নেই। খোঁজ খোঁজ, আমাদের কাসুন্দি কোথায় গেল। একবার ভাবলাম, সুবিধা মত একা সটকিয়ে পড়েছে কোন একটা বিশেষ মতলবে; আবার ভাবলাম, যা স্বপ্নবিলাসী ছেলে সান মার্কোতেই বসে হয়ত স্বপ্ন দেখছে। তাই এখানে ছুটে এলাম। যাক্, বাঁচালি।

বন্ধুদের বললাম, ক্যাসানোভার স্বপ্ন-কাহিনী; এত কাছে পেয়েছিলাম তার স্বপ্নময় উপস্থিতি ও প্রাণময় অনুভব যে নিশ্চয়ই গল্পটার মূলে সত্য আছে। ইতিহংস (ইতিহাসে হংস্ অর্থাৎ অনার্স নেওয়ার জন্য এই নাম তাকে দিয়েছি আমরা) বলল—নেহাৎ স্বপ্ন অবশ্য নয় ব্যাপারটা; লা সার্পিল নামে একটি মেয়ের সঙ্গে এ রকম একটা ঘটনার কথা আছে বটে; তবে দেখ, কাসুন্দি, ছোট্ট নীরস একটা ব্যাপারকে কাসুন্দি মাখিয়ে বেশ মুখরোচক করে তুলেছিস দেখছি; দে ওটা কাগজে ছাপিয়ে। তবে নিজের নামে নয়; আমাদের সচ্চরিত্র দেশে লোকে ভুল বুঝতে পারে।

সে কথাটা গৌণ। গুন-গুন্ করে যে কথাটা মনে ধ্বনিত হচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে সত্যই কি ক্যাসানোভার অতৃপ্ত আত্মা এই ইটালিয়ান সহরে প্রমোদ-নিশির উৎসবগুলিকে অদৃশ্য ভাবে অংশ নিয়ে উপভোগ করে যায় এমনি করে রোজ রাত্রিতে? আজকের প্রাণ-চঞ্চল লীলাসুন্দর কপোত-কপোতীদের অভিনয় কি অভিনব সাড়া জাগায় তার পরলোকান্তরের আত্মাকে? হৃদয়ের ব্যর্থ বাসনা কি ব্যাকুল করে রাখে পরলোককে যার জন্য নব নব যুগের নব প্রণয়-লীলায় নিজের জয়-পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি দেখে যাবার এমন ইচ্ছা হয়? কে জানে?

বার্ধক্য

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

দুই বন্ধু খাওয়া শেষ করলেন। কাফের জানলা দিয়ে দেখলেন বেলিভার্ড পার্ক একেবারে লোকে লোকারণ্য। তাঁরাও মৃদুমন্দ বাতাসের পরশ পেলেন হঠাৎ। এই ক্লান্তিহারী বাতাস উপভোগ করবার জন্যে প্যারীর অধিকাংশ লোকই রাত্রে হাওয়া খেতে বের হয়েছে, তারা নিরর্থক ভাবেই ঘুরে বেড়াচেছ এদিক্-ওদিক্। সেতুর নীচ দিয়ে নদী বয়ে যাচেছ, জলে পড়েছে চাঁদের আলো, কোথায় যেন নাইটিংগেল গানও ধরেছে।

দুই বন্ধুর মধ্যে এক জন, হেনরী সিমন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে গভীর ভাবে বলে উঠলেন, "ওঃ, বড্ড তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে পড়ছি আমি। আগে এই রকম রমণীয় সন্ধ্যা বেলায় কি রকম যেন আসুরিক প্রেরণা পেতাম। আজ খালি অনুতাপ হয় সে-সব দিনের কথা ভেবে।

সিমন এখনো বেশ স্বাস্থ্যবান, মাথা-ভর্ত্তি প্রকাণ্ড টাক। বয়স বোধ হয় বছর পঁয়তাল্লিশ হবে।

আর এক জন, পিটার কারনিয়াঁ, একটু বেশি বয়স্ক, পাতলা ছিপছিপে কিন্তু বেশ প্রাণবন্ত, উত্তর দিলেন: "জগতকে ভালো করে উপভোগ করবার আগেই বুড়ো হয়ে গেলাম ভাই। তুমি তো জানো, আমি সদা-সর্ব্বদা কি রকম হাসি-খুসি নিয়ে থাকতাম, কি রকম স্ফুর্ত্তিবাজ লোক ছিলাম আমি। লোক আয়না দেখে বলতেই পারে না যে বয়স আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে শেষ সীমার দিকে। মুখের চেহারা পালটায় বড্ড আস্তে আস্তে। আজকে এই ভেবে দুঃখ হচেছ যে মানুষ ভীষণ তাড়াতাড়ি মারা যায়, জীবনে সব কিছু উপভোগ করে যেতে পারে না ইচেছ থাকলেও।

"ভেবে দেখো, সব চেয়ে বেশি কষ্ট মেয়েদের, কেন না তাদের আনন্দ, শক্তি, জীবন-উৎস, সৌন্দর্য্য তাজা থাকে মাত্র দশটি বছর!

"আমার বুড়ো হয়ে যাবার অবশ্য একটা কারণ আছে, সে কথা না বললে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না আমার কথা।

"বিশ্বাস করতাম আমি তরুণ, যদিও তখন বয়স হয়েছিলো পঞ্চাশ। কখনো কোন অবসাদ অনুভব করিনি, দিনগুলো আনন্দের জোয়ারে রঙীন হয়ে থাকতো সর্ব্বদাই।

"আমার পতন নেমে এলো অত্যন্ত চুপি চুপি, অতি নিষ্ঠুর ভাবে, ২ মাসের মধ্যেই আমাকে পঙ্গু করে দিয়ে গেলো।

"বলতে লজ্জা নেই ভাই, এক দিন আমিও প্রেমে পড়লাম অন্য পাঁচ জনের মতোই, তবে চোখ বুজে নয়। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় সমুদ্রের ধারে প্রায় কুড়ি বছর আগে, মানে যুদ্ধের পরেই। স্নানের সময় সমুদ্রের ধারের সৌন্দর্য্য হয়তো দেখনি কোন দিন। ঘোড়ার ছোট্ট খুরের মতো একটু খাড়াই ফিয়র্ড জল-দৈত্যের পায়ের মতো গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। এক দল মেয়ে এসে জুটেছে উত্তর কিনারায়, দেখে ফুল-বাগান বলে ভুল হয়! সূর্য্য মাথার ওপর, রোদ পড়ে সমুদ্র নীলাভ হয়েছে। সবাই চটুল, সবাই খুশি। সকলের চোখেই আনন্দের ফোয়ারা। সমুদ্রের ধারে বসে বসে তাদের স্নান দেখতাম। তারা ছোট ছোট ঢেউয়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতো, পরিশ্রমের চাপে তাদের মুখ রাঙা হয়ে উঠতো গোলাপ ফুলের মতো। সমুদ্রের তীরে আরো কেউ কেউ হয়তো ছিলো দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের দৃষ্টি তাদের পরিপুষ্ট দেহের ওপর।

"এমনি ভাবে প্রথম সেই মেয়েটিকে দেখি। দেখে বলতে কি, বেশ উল্লসিতই হয়ে উঠি, সেও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। মনে হলো মেয়েটির সঙ্গে আমার যেন জন্ম-জন্মান্তরের আলাপ।

"এমন করে নিজেকে একটা মেয়ের কাছে বিলিয়ে দেওয়া আমার ইতিহাসে এই প্রথম। প্রথম দৃষ্টিতেই সে যেন আমার হৃদয় লুঠ করে নিলো! ভয়ঙ্কর কথা এটা যে এক জন নারীর করকমলে বন্দী হতে চলেছি আমি। এটা যেন একাধারে শাস্তি এবং শান্তি। তার হাসি, তার চাউনি, তার সোনালী চুল, তার মাংসল ঘাড়, তার লোভনীয় মুখ,—সবই যেন পুলক জাগিয়ে তুললো আমার মনে। তার চলনে, বলনে, ব্যবহারে আমি মুগ্ধ—আমাকে সে যাদু ক'রে ফেললো।

"পরে জানলাম সে বিবাহিতা, তার স্বামী প্রতি শনিবারে আসে আর সোমবারে চলে যায়। তবুও মনে হলো, জীবন একটুও অসার নয়, কোন অভিযোগ নেই আমার তার ওপর।

"তার প্রেমে না পড়লে বুঝতাম আমার সৌন্দর্য্যবোধ নেই। তার তারুণ্য আমাকে পাগল করে তুললো। সে যুবতী, মনোহরা, আর সুশ্রী। মেয়েরা যে এতো সুন্দরী হতে পারে, তা আগে জানতাম না। এতো পরিচছন্ন আর আকর্ষণী শক্তি মেয়েদের থাকতে পারে, সে কথা আগে অন্যে বললে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। তার গালের খাঁজে যে কি সৌন্দর্য্য তা ভাষায় বলতে পারবো না। গোলাপের মতো গাল, সিঁদুরের মতো ঠোঁট, তিল-ফুলের মতো নাক!

হঠাৎ কাজ পড়ে যাওয়ায় তিন মাস পরে আমাকে আমেরিকা চ'লে আসতে হয়। তাকে দেখতে না পেয়ে আমার অবস্থা হয় মৃতপ্রায়। তার চিন্তাই আমার মনকে পীড়িত করে তুললো সমস্ত সময়। একবার শুধু তাকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে যেতাম। দূরে এসে বুঝতে পারলাম, তার ওপর আমার টানটা কতো তীব্র।

"বছর কয়েক কাটলো, তাকে ভুলতে পারলাম না। তার প্রতিমা সদৃশ মুখখানি আমার ধ্যান হয়ে রইলো। তার কথা চিন্তা করতে করতেই আমার দিন কেটে যেতে লাগলো। মনে হলো আমার এই অনুরাগ খাঁটি, অদর্শনার মুখ ভুলতে বসলেও প্রেম বন্ধ্যা হয়নি। জীবনে যে সত্যিকারের একটি প্রতিমা দেখেছি সেই আনন্দেই আত্মহারা আমি!

"সুদীর্ঘ বারো বছরের পরও তার কথা ভুলতে পারলাম না। কোথা দিয়ে কখন যে বারোটি বছর কেটে গেছে বুঝতে

পারিনি। নিরীহ মুহূর্তের চক্রান্তে মানুষ যে বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, তার খোঁজ বোধ হয় রাখে না মানুষ।

"গত বসন্তে ম্যাসিঅস্ ল্যাফিটিতে এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে খেতে চলেছি, হঠাৎ ট্রেণ ছাড়ার মুখে লম্বা একটি মেয়ে ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার কামরাতেই উঠে পড়লেন। এতো লম্বা এবং এতো সুন্দরী মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। মুখটা পূর্ণচন্দ্রের মতো, মাথায় রয়েছে বিবর্ণ টুপি।

"এতোটা ছুটে আসার দরুণ তখনো হাঁপাচ্ছিলেন মেয়েটি। ছোটরা আরাম করে ব'সে গল্প জুড়ে দিয়েছে, অগত্যা আমি কাগজে মন দিলাম।

"গাড়ী যখন এ্যাস্নিয়ার ছাড়লো তখন সহযাত্রিনীটি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করলেন: 'মাপ করবেন, আপনার নাম কি ম্যঁসিয়ে ক্যারনির্গাঁ?'

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"আমার জবাব শুনে ভদ্রমহিলা মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন আপন মনে। হাসির মধ্যে কোন জড়তা নেই, তবে কেমন যেন বিষণ্ণতা।

—"আমায় চিনতে পারছেন না?"

"দ্বিধায় পড়লাম আমি, মন বলছে এ মুখ নিশ্চয়ই কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায়? কত দিন আগে? আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম: হ্যাঁ, তবে ঠিকমতো চিনতে পারছি না। যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার নামটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

"খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে কিছু ভেবে নিয়ে বললেন, নিসেস্ জুলি লফিভ্যাঁ।'

"এমন আঘাত আর কখনো খাইনি। কিছুক্ষণের মতো পাথর হয়ে গেলাম। মনে-হলো, পায়ের তলা থেকে মাটী দ্রুত সরে যাচ্ছে। এই আমার মানসপ্রিয়া? ঈশ্বর, এর আজ কি রূপ হয়েছে। এ তো সাধারণ এক জন নারী। আমার অবর্ত্তমানে চারটে ছেলে-মেয়ের মা হয়েছে, মেয়েগুলোও হয়েছে ঠিক মায়ের মতো। ছোটরা দেখলাম খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"একে এমন ভাবে দেখব আশা করিনি কোন দিন। প্রচণ্ড একটা আঘাত এসে লাগলো বুকে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার ইচ্ছে হলো আমার।

"আস্তে আস্তে তার হাতটা ধরলাম, চোখটা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তার রূপের নিঃস্বতায় কান্না এলো আমার। কোন দিন এর সঙ্গে পরিচয় ছিলো বলে ভাবতেও কষ্টবোধ করতে লাগলাম।

"সে-ও বুঝলো আমার মনের কথা, তাই এক সময় বললো: 'খুব পাল্টে গেছি, না? দেখছো না, মা হয়েছি। জীবন পাল্টে ফেলেছি একেবারে, চিনতে কষ্ট হবেই তোমার। তুমিও তো সব পাল্টে গেছো। এই বারোটা বছর নিশ্চয়ই খুব আনন্দে কাটিয়েছো তুমি—ওঃ বারোটা বছর। আমার বড় মেয়ের বয়সই হলো দশ!

"তার মেয়েদের দিকে করুণ চোখে তাকালাম। ট্রেণের গতিবেগ মনে হলো হাজার গুণ বেড়ে গেছে। বুকের মধ্যে ঝড় উঠছে—একটা কথাও বলতে পারলাম না, শুধু ছবির মতো চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইলাম তার মুখের দিকে তাকিয়ে।" *

---

* মোপাসাঁর একটি গল্প

রাত তখন ভোর হল

লোকনাথ ভট্টাচার্য

যত বড় আকাঙ্ক্ষা তোমার তত বড় আঘাত তোমায়
পেতেই হবে ভাই, বন্ধু বললেন শক্ত করে আমার
মুঠি চেপে ধরে। বুঝতে পারি না এ কী হাওয়া
এ কি দিন না রাত অথবা প্রদোষ বেলা
আকাশে কি সূর্য অথবা তারায় খেলা
জানা নেই—কাজ নেই জেনে
শুধু বুঝলাম শুধু জানলাম বন্ধু আমার হাত ধরেছেন।

হয়তো তখন কোলাহল ছিল পাশেরই কোনো সরাইখানায়
হয়তো তার মাতাল গন্ধে বাতাস আবিল হল
তবু কান কিছুই শুনবে না শুধু শুনবে বন্ধুর স্বর
বন্ধু বলছেন, নীরব কেন ভাই?
আর যে পারি না বন্ধু, আমি চললাম, তুমি যা বোঝাও
মন তো তা বোঝে না
সে শুধু ভাবে কোথায় কী ফেলে এলাম
কোথায় যেন আরো কিছু পাওয়া উচিত ছিল
বন্ধু বললেন, সে যে তোমার মন—তাকে তুমি ভাবতে দাও।

তবে এ সব কী? শুধু আজীবন দুশ্চিন্তার সিঁড়ি বেয়ে
আমি কি কেবলি নামব?
নামবে কেন ভাই?—বন্ধু বললেন, তুমি যে কেবলি উঠবে
এ সত্য তোমাকে বোঝাবার যদি আর কেউ না থাকে—
আমি তো আছি।
তোমার এই ওঠার ধাপে ধাপে
তুমি তোমার ইচ্ছাকে কেবলি অতিক্রম করছ
তাই যে মুহূর্তে সফল তুমি সে মুহূর্তে তোমার বেদনা নতুন
এ ক্লান্তির শেষ নেই তো।

তুমি বললে হবে কী? আমি যে নিত্য দেখি
প্রাণ পেল না আশীর্ব্বাদ, তৃষ্ণার্ত হৃদয়
মরুর মাঝখানে কেবলি মরীচিকা দেখল
গেল বিলাস-ব্যসন গেল আহার
গেল জীবনকে জীইয়ে রাখার মত অভিপ্রায়
জ্বলে উঠল লক্ষ গ্লানি রাত্রি কাটল দুঃস্বপ্নে
অবসন্ন চোখ বুকে নিয়ে গুরুভার
কেবলি বাহিরে তাকাল—শুধু প্রতীক্ষায়
কখন ভোর হয়।

বন্ধু বললেন, সে-ই তো তোমার প্রেম।
তাকে তুমি প্রেম বল?
সে যে দুঃখ সে যে মৃত্যু সে যে বিকৃত সে যে বীভৎস—
বন্ধু হেসে বললেন, তবু এমনি তোমার প্রেম।
অধৈর্য হলাম, বললাম—তাতে আমার প্রয়োজন?
বন্ধু হেসে বললেন, ধীরে বন্ধু ধীরে
যে গান বুকে কান পেতে শোনবার
চেঁচিয়ে তাকে না শোনার চেষ্টা করো না—
প্রেমে তোমার প্রয়োজন?
এর প্রয়োজন তোমার অস্থি-মজ্জায় তোমার ক্লান্তিতে চোখ বোজায়
তোমার নবীন আশায় ভোরের সূর্য-প্রণামে
এর প্রয়োজন তোমার প্রয়োজনের সীমা ছাড়াল।
যে প্রাণ মরুতে দেখল মরীচিকা
যে প্রাণ পেল না আশীর্বাদ
সে প্রাণ ভুলে গেছে
তাকে আশীর্বাদ করার স্পর্ধা রাখে কে
সে যে লক্ষ তারাকে চমকে দিতে পারে
তাই তোমরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর
তারা মহান
যারা বিশ্বাস করো না, তারা আরো মহান্।
তখন বললাম, তবু আমি যে অপরাধী, আমি খুনী
বারে বারে আমার পথ রঞ্জিত করেছি আমি
আমারি কামনার রঙে আমারি হিংস্রতার রক্তে?
বন্ধু হাসলেন, বললেন, লজ্জা দিও না ভাই—
তুমি অপরাধ করবে কার কাছে
তোমার অপরাধ নেবে এমন সাধ্যই বা কার?
আর বড় এক দিক দেখ তুমি
এমন দুঃখ কি তুমি কখনো পেয়েছ
যা তোমায় আনন্দ দেয় না?
পাইনি? কী তোমার আনন্দ আমি জানি না—
আমি দেখেছি কুষ্ঠরোগীকে আমি দেখেছি ভিক্ষাজীবীকে
আমি দেখেছি সেই অসহায় পথিক বালক
আর্তনাদ করে উঠল
যখন রাতারাতি অন্ধকারে পথ হল অরণ্য
মানুষ হল পশু, দেবতার অমৃত-ভাণ্ড
নিঃশেষ হবার আগে যেটুকু তলানি ছিল আশীর্বাদের
হঠাৎ বিষবাষ্পে ঘুলিয়ে উঠে তা হল অভিশাপ:
কী তোমার আনন্দ আমি জানি না
এরা কী আনন্দ পায় তাও জানি না
শুধু জানি এরা যখন কেঁদে ওঠে, বলে
আমি কেন আছি
আমি তো গেলেই বাঁচি
তখন আকাশ-চোখ বোঁজে বাতাস কথা কয় না
গাছেরা শিউরে ওঠে।

এবার বন্ধু বললেন: গম্ভীর তাঁর স্বর
যেন বহু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে সমুদ্র-স্বনন—
তোমার সমস্ত সংশয় আমি ঘোচাব না ভাই
সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমি দেব না,
তা হলে প্রেম হবে ব্যর্থ
পরিচয়ের রূঢ় সম্পূর্ণতায় যাত্রা হবে শেষ।
শুধু এইটুকু জানো ভাই:
তোমার আনন্দ মরে না রোগে ঢাকে না ভোগে
তোমার আনন্দ ধরে না এই
ফুল-গাছ মাটি-মানুষের হৃদয়ে
নাম-না-জানা পাখির গানে খোঁজ-না-রাখা ঘাসের শিষে।
আরো তুমি শোনো: তোমার যেখানে কাঁটা
সেখানে সুখ গভীর হল
সেখানটা টিপেই তোমার আনন্দ
যেখানে ব্যথা তোমার সেখানেই মধুচক্র মুখর হল
মন-মধুপের গুঞ্জরণে।

বন্ধু বলে চললেন, এই অমৃত আস্বাদনের
কত-না উপায় তুমি খুঁজেছ
নিত্য-নতুন করে গড়েছ পেয়ালা নানান্ রঙের
নাম দিয়েছ ধর্ম নাম দিয়েছ সমাজ
আদর করেছ সভ্যতা বলে
তবু তারা ক্ষণভঙ্গুর, তারা আসে যায়, তারা নিত্য নবীন
শাশ্বত সেই আনন্দ—শাশ্বত তোমার প্রাণ।

বন্ধু শেষে বললেন, এইটুকু জানো ভাই
আর বেশী জেনো না
বিশ্বাস কর আমাকে
তার চেয়ে বড় কথা তুমি তোমাতে বিশ্বাস রাখো।

দু'জনে নীরব হলাম। আমার হাত রইল তাঁর হাতে
আমরা দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছি
এখন মনে হচ্ছে এটা বুঝি রাত ছিল,
ঐ ভোর হয়ে আসে
একটি-দু'টি পাখি ডাকে।

চাইলাম আকাশের দিকে যে আকাশ জন্ম দিচ্ছে
আরো একটি সকাল
যেন শুনতে পেলাম
যে প্রাণ-মরুতে দেখল মরীচিকা
যে প্রাণ পেল না আশীর্বাদ
সে প্রাণ ভুলে গেছে
তাকে আশীর্বাদ করার স্পর্ধা রাখে কে
সে যে লক্ষ তারাকে চমকে দিতে পারে
তাই তোমরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর
তারা মহান
যারা বিশ্বাস কর না, তারা আরো মহান।

অন্তহীন

রণেশ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর তরুণ কবি ছাত্র প্রবীর দত্ত। বয়স তার বড় জোর একুশ কি বাইশ, কিন্তু কবি হিসাবে তার মনের বনে অনুরাগের রঙ ধরেছে পাতায় পাতায়। তলোয়ারের মত নাকটা, আবেশ-মাখা দু'টি চোখ, ব্রিলিয়ানটাইন মাখানো লালচে চুলগুলো অযত্নভরে পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া। খুব স্বাস্থ্যবান সে নয়, তবু চাবুকের মত তার দেহটা যেন মেয়েদের মত একটা ছন্দোময় গীতি-কবিতা। এক কথায়, তাকে দেখলেই মনে হয় কবি সে। ছাত্র হিসাবে তার সম্বন্ধে বেশ গর্ব্ব করেই বলা যায় সে ভাল ছেলে। মেয়েরা তাকে পায় সরস আলোচনার খোরাক হিসাবে, অথচ মেয়েদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন সে। কলেজীয় মেয়ে-বন্ধুরা তাকে চায় নিজেদের ভেতরে, কিন্তু চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে থেকে যায় স্পষ্টই একটা সম্ভ্রমভরা ব্যবধান।

সেদিন ছিল কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী। সকলে মিলে ধরলে প্রবীরকে একটা কবি-বন্দনা লিখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে। প্রবীর তার কাব্যভাণ্ডার মন্থন করে লিখলো কবি-বন্দনা। সভা-মঞ্চে সেটা পাঠ করবার ভার পড়লো বন্দনা বলে একটি মেয়ের ওপর। সম্প্রতি ভর্ত্তি হয়েছে মেয়েটি। তার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব মিশে গিয়ে সত্যিই সম্মানের আসন পেয়েছিলো সে বন্ধুদের মধ্যে।

তাকে এক-দেখাতেই বোঝা যায়, যেন অনুরাগী শিল্পদৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় জড়িয়ে রয়েছে তার দেহের প্রতি ভঙ্গিমায়—প্রতি ছন্দে। ভাল লাগে মেয়েটিকে দেখতে, কিন্তু ভালবাসবার কল্পনা করবার দুঃসাহস জাগে না কারো মনে। সে যেন চির সৌন্দর্য্যের প্রতীক, আর কলেজ-ছাত্ররা তারই সৌন্দর্য্য-মন্দিরে নিষ্ঠ পূজারী, প্রেমের ভিখারী হবার কামনা ফুল হয়ে ওঠে তার পূজার নৈবেদ্যে। তাই সে অপরূপ।

পড়তে পড়তে বন্দনার গলা কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো, সারা দেহে যেন একটা শিহরণের প্রলেপ! "কি মিষ্টি আপনার লেখা, আর কি সুন্দর!" অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় চোখ দু'টো বড় বড় করে বন্দনা বলে প্রবীরকে।

"আপনি কিন্তু বড় বেশী করে বলছেন, যতখানি সৌন্দর্য্য আরোপ করছেন ওর ওপর, অতটা ওর প্রাপ্য কি না সেটা বিচার করবার আছে।" অনুরাগে দুলে ওঠে প্রবীরের দেহ।

"বা রে, আপনার লেখা কি খারাপ হতে পারে?" বন্দনার কণ্ঠে বিস্ময়ের ছোঁয়াচ।

"আপনার অসীম করুণা।" প্রায় মুখস্থের মত বলে যায় প্রবীর।

জমে ওঠবার আগেই চন্দন সেন প্রবীরকে টেনে নিয়ে যায় দলের ভেতর। প্রবীরের কবি-কুশলতা সত্যিই আজ তাদের মুগ্ধ করেছে, তাই তারা চায় প্রবীরকে নিয়ে একটু মাতামাতি করতে। বসন্তের জ্যোৎস্না উজ্জ্বল, হেমন্তের জ্যোৎস্না সংহত। চন্দনদা বসন্তের জ্যোৎস্না—বন্দনা হেমন্তের!

পরের দিন ট্রামে করে কলেজে চলেছে প্রবীর। মন তার স্বভাবসিদ্ধ উদাস,—ক্লান্ত।

"নমস্কার প্রবীর বাবু!"—পিছনে তাকিয়ে প্রবীর দেখে বন্দনা। "আসুন না এই দিকে, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"—বন্দনার সুরে মিনতি ভরে ওঠে কানায় কানায়। প্রবীর নিঃশব্দে গিয়ে বসে বন্দনার পাশে। বন্দনা বলে চলে,—"সেদিন ভাল করে আলাপই হলো না আপনার সঙ্গে। আপনার বন্ধুরা বুঝি খুব ভালবাসে আপনাকে?"

প্রবীর বলে, "বন্ধুরা সাধারণতঃ বন্ধুকে ভালই বেসে থাকে। আর আলাপের কথা বলছেন সে তো হয়েই গেল।"

বন্দনা বলে,—"বার বার আপনাকে আর প্রবীর বাবু বলতে পারি না—প্রবীরদা বলেই ডাকব? আপত্তি নেই তো?'

"স্বচ্ছন্দে এবং আনন্দের সঙ্গেই উত্তর দেব।" প্রবীর হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।

বন্দনা খুসিভরে পা দোলাতে থাকে। কলেজে দু'জনে পাশাপাশি বসে বন্ধুদের বাঁকা চোখ উপেক্ষা করেই বন্দনা চায় প্রবীরকে নিকটে, প্রবীর চায় এড়িয়ে যেতে। আরম্ভতে না কি এমনিই হয়, তবে উল্টোই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে।

বিকেল বেলা প্রবীর প্রত্যহই যায় বেড়াতে। আজও তার প্রিয় কবিতার খাতাখানা নিয়ে লেকের ধারে গিয়ে বসে নরম ঘাসের ওপর। তার পর নিজের কবিতাই আবৃত্তি করে চলে মৃদু স্বরে বাতাসের কানে কানে। দিন কয়েক বন্দনা কলেজে আসেনি,—প্রবীরেরও তাই মনটা বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে আজ। দূরে দূরে কয়েকটি তরুণ-তরুণী পায়চারী করছিলো, এবং সুযোগ বুঝে আড়াল খুঁজে সবার চোখ এড়াবারও চেষ্টার ছিল না শেষ। প্রবীর একা একা এক মনে পড়ে যাচ্ছিলো,—

"প্রেমময়ী ধরণীর বুকে—
প্রেমহীন একান্ত নিভৃতে……।"

"প্রেমহীন বেদনার কাঠামোকেই তো প্রেমহীন রহস্যঘন রূপ দেওয়া যেতে পারে প্রবীরদা!"

বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যায় প্রবীর। চকিতে ফিরে দেখলে,—"ওঃ, বন্দনা দেবী!" প্রবীর খাতাখানা বুজিয়ে রাখে।

কলহাস্যে ভেঙ্গে পড়ে বন্দনা বসলো প্রবীরের পাশে। "ওটা কি

আপনার মনের কথা প্রবীরদা ? অনেকে তো খেয়ে আবার খাইনি বলে নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়ে বেড়ায় !"

বড় বড় চোখ ছ'টো তুলে তাকালো প্রবীর। মুখে একটা কঠিন জবাব এসে গিয়েছিলো, সেটাকে চেপে রেখে হেসে বললে, "দেখুন বন্দনা দেবি, ভালবাসা জিনিষটার সাধারণ লোকে করে অপব্যবহার, আর নারী করে খেলার উপকরণ হিসাবে প্রয়োজন মত ব্যবহার। আমি ভালবাসা বস্তুটিকে অতটা ছোট করে দেখতে চাই না, তাই হয়তো,—'প্রেমহীন একান্ত নিভৃত'—তাছাড়া সমস্ত ফুলটিকে জাগিয়ে তুলতে কোন মৌমাছিই তো চেষ্টা করেনি এখনও।"

"ক্ষমা কর প্রবীরদা, তোমাকে আঘাত করেছি বলে। তবে নারীর ভালবাসাকে অত ছোট করে দেখবার অধিকার তোমার নেই। পরিচ্ছেদ কোরো, তাতে তৃপ্তি পাবে। তুমি যদি জানতে……তোমার কাছে আমার শুধু এতটুকু চাইবার আছে,—আমাকে তোমার যোগ্য করে নাও, তোমার নিভৃত কুঞ্জের কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা দেব তোমাকে, তুমি অধিকার দাও।" অনুরাগে ফুলে ফুলে ওঠে বন্দনা, হেসে পড়ে প্রায় প্রবীরের ওপর। "জানো প্রবীরদা, জীবনে এই প্রথম, যাকে আমি প্রাণভরে ভালবেসেছি, বল কবি, সরিয়ে দেবে না আমাকে !" বন্দনা মুখ ঢেকে ফেলে।

প্রবীর বাক্যহীন, সে ভাবে, এ কি আবেগ এই নারীর ! এ রকম ভাবে কেন চায় এ নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে ! কি মূল্য পেতে চায় তার বদলে ? তার ভালবাসা ? কিন্তু এতই মূল্যবান সে জিনিষ ? সে তো যাচাই করেনি কোন দিন ? মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, এরই মধ্যে পরিপূর্ণ করে ভালবাসা যায় না কি কাউকে ? নারীর ভালবাসা তো এত সহজে পাওয়া যায় না শুনেছে। কত গল্পেই তো তার প্রমাণ পাওয়া যায় ! দু'একটা অবশ্য এই রকম ঘটনার উল্লেখ আছে,—তারা তো ভাগ্যবান ! সে-ও কি তবে তাই ? নারী তো পুরুষকে করে অবিশ্বাস ? তবে ?……সব গোলমাল হয়ে যায় প্রবীরের। বন্দনার পিঠে হাত রেখে বলে, "দেখো বন্দনা, ভালবাসা পাওয়া খুব সহজ, কিন্তু ভালবাসতে পারাটাই কঠিন। পারবে সেটা ?"

বন্দনা ককিয়ে ওঠে, "উঃ কবি, এখনও অবিশ্বাস ! নিজেকে তো শূন্য করেই দিয়েছি তোমায়, এখনও সন্দেহের কালো মেঘ ঘনিয়ে রয়েছে তোমার মনে ?"

প্রবীর বলে চলে, "সন্দেহে নয় বন্দনা, ভুল বুঝো না আমাকে তুমি। বর্ত্তমানে একটা ভুল যদি হয়, ভবিষ্যতে সারা জীবন সেই ভুলের ফসল কাটতে হবে ! সত্যিকারের ভালবাসা যখন গড়ে ওঠে নারী এবং পুরুষের মধ্যে, তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার পরিণাম হয় ব্যর্থতা। বন্দনা, তুমি হয়তো ভাবছো, কি নিষ্ঠুর এই পুরুষ, আর এমন অরসিক যে, পুরুষ হয়েও ভালবাসার বন্যায় বাঁধ দেয় ! সত্যি বন্দনা, ভাল আমি বাসতে জানি, কিন্তু কোনও নারীকে আজও ভালবাসবার সাহস হয়নি, সেটা হয়তো আমার অপরাধ—আমার কবিত্বের কলঙ্ক !"

বন্দনা ভাবে, কি কঠিন এই কবির ভেতরটা ! বলে, "তবে চলি কবি, ভুলে যেও, ক্ষমা কোরো।"

"তা হয় না বন্দনা, আজ তুমি আমাকে যা দিলে, তাই আমার পাথেয়, ভবিষ্যতের পথচারী দেখবে শুধু তোমাকে আর আমাকে, তুমি আমার, স্বেচ্ছার উপহারকে হৃদয় ভরে উপলব্ধি করবার সাহস তুমি আমাকে দাও।" যেন নেশা লেগেছে প্রবীরের।

বন্দনা প্রবীরের হাতখানা নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বসে থাকে, বোধ হয় উপলব্ধি করে।

এই ভাবে এগিয়ে চলে প্রবীর এবং বন্দনার স্বপ্নমধুর দিনগুলি। প্রবীর আজকাল প্রায়ই যায় বন্দনাদের বাড়ী। কত কথা দু'জনে। বন্দনা বলে, "কি সুন্দর তুমি কবি !"

প্রবীর বন্দনার দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে, হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠে, "যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।"

বন্দনা বলে, "এই পৃথিবীতে একটা জায়গা আছে, যার অমৃত-নির্ঝরের কোলে এলে সব ব্যথা ভুলে যাই।"

প্রবীর বোঝে, তবু না বোঝবার ছল করে বলে, "কোথায় বন্দনা ?"

বন্দনা হেসে ওঠে, "দুষ্টু কবি, কিছু বোঝ না।" বলে প্রবীরের বুকের কাছে এগিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে বলে, "এইখানে।" প্রবীরের চোখ বুজে আসে। বন্দনা বলে, "তবু তো ভিক্ষা করে চেয়ে নিয়েছি কিন্তু কি আনন্দ কবি !" প্রবীর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

* * * *

আজ শরীরটা ভাল নেই প্রবীরের, তাই সে কোথাও বার হয়নি। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, কোলের ওপর 'সঞ্চয়িতা'খানা খোলা। পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখে বন্দনার দাদা ! সসম্ভ্রমে উঠে চেয়ার এগিয়ে দেয় প্রবীর।

বন্দনার দাদা বসে পড়ে বললেন, "হ্যালো কবি, তোমার শরীরটা একটু খারাপ মনে হচ্ছে ?" প্রবীর ঘাড় নাড়ে। উনি বলে চলেন, "আগামী বুধবার বন্দনার বিয়ে, সব ঠিক হয়ে গেছে, তোমাকে তাই বলতে এলুম। এই নাও ইনভিটেশন কার্ডখানা। দেখো, তোমাকে আবার এসে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে হবে না তো ? এ ক'দিন ভাল থেকো, শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বন্ধু, তুমিই তো করবে সব ! আচ্ছা, আসি তাহলে এখন, চিয়্যারো মাই ডেড পোয়েট।" অকস্মাৎ উঠে চলে যান বন্দনার দাদা।

উঃ, মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ছে বড় ! রগ দু'টো টিপে ধরে প্রবীর, —শিরাগুলো যেন চামড়ার খাপ ফেটে বেরোতে চায় ! কি নিষ্ঠুর সত্য আজ তার ভাগ্যে ফলতে চলেছে ! চিঠির সোণালী অক্ষরগুলো যেন বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক-মারা হাসি। প্রবীর আর ভাবতে পারে না, শুয়ে পড়ে মাথাটা জোর করে টিপে ধরে, হাতড়ে ফেরে নিজেকে ডুবে যাবার পূর্বক্ষণে।

বন্দনার বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পর প্রবীর আজ এই প্রথম গেল বন্দনাদের বাড়ী। বন্দনা কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে প্রবীরের—স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় তার। এক সময়ে বন্দনা প্রবীরকে ডেকে নিয়ে যায় তার ঘরে। নিভৃতে পেয়ে প্রবীর বলে, "ভুলতে চেষ্টা কোরছ বন্দনা ?"

জলভরা চোখ দু'টো তুলে ধরে বন্দনা বলে, "আমি মানুষ তো, পাথর নই তো কবি !"

প্রবীর আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে, বলে, "কিন্তু তুমি বিয়ে করলে কেন বন্দনা ? তোমার বিনা অনুমতিতে তো তোমার

বিয়ে হতে পারতো না। আর বিয়েই যদি করবে, আমাকে তবে ভালবাসলে কেন? জেনে-শুনে আমাকেই তোমার খেলার উপকরণ করলে?"

বন্দনা বলে, "সত্যি কবি, অনুমতি যে কি করে দিয়েছি, তা যদি জানতে! বাবার মৃত্যুকালের অনুরোধ এবং দাদার জিদ্,—শাস্ত্র আর সমাজ মতে বিয়ে করা। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে তো সমাজ এবং শাস্ত্র মানবে না!"

"তা বলে সমাজ-শাস্ত্রের কাছে ভালবাসার হবে পরাজয়?"

বন্দনা ধীরে বলে,—"বাবার অনুরোধ! ভালবাসার জয় ঘোষণা করবে আমার হৃদয়। যে ভুল করেছি কবি, জীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, মরণই আমার এখন একমাত্র কাম্য।" ডুকরে ওঠে বন্দনা।

প্রবীর বলে, "তোমার স্বামীকে ভালবাসতে পারনি বন্দনা?"

জবাব আসে, "স্নেহ, মমতা সব কিছুই দিয়েছি উজাড় করে, কিন্তু···"

"এর মধ্যে 'কিন্তু' নেই বন্দনা, নিষ্ঠুর সত্যকেই আজ স্বীকার করে নিতে হবে। পথের পরিচয়কে শেষ করে দাও বন্দনা—আশ্রয় কর দূর-পথের যাত্রীকে,—এই জীবনের পথচারী যাত্রীকে—তোমার স্বামীকে। চলি আমি।"

বন্দনা প্রবীরের হাত দু'টো চেপে ধরে বলে,—"আমাকে ভুল না কবি, আমার বলবার কিছুই নেই।"

* * * *

বোম্বাইয়ের একটা সুন্দর ছোট্ট বাড়ী। তারই একটা ঘরে পীড়িত প্রবীর। প্রবীরের ক'দিন ধরে ভীষণ জ্বর, চন্দন সেবা করছে প্রবীরের, প্রাণ দিয়ে। ডাক্তার বলেছে, আজকের দিনটা ভালয় ভালয় কেটে গেলে তবে জীবনের আশা করা যেতে পারে।

জ্বরের ঘোরে বেসুরে প্রবীর গেয়ে ওঠে,—"বাঁধিনু মিছে ঘর, ভুলের বালুচরে।" এক-এক সময় আরক্ত চোখ মেলে বলে ওঠে, "কে, বন্দনা? সরে যাও, সরে যাও, আমার নিশ্বাস বিষিয়ে গেছে, বাঁচতে চাও তো পালাও।"

বন্দনাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে চন্দন। আজই হয়তো এসে পড়তে পারে।

প্রবীর বলে চলে, "ওঃ, কে চন্দন? ভাই, আমার জীবনে এক দিন বসন্ত এসেছিলো, কিন্তু কই? কোথায় গেল? সব মরুভূমি, সব—সব! গাছের পাতা ঝরে গেছে, আমি বোধ হয় বাঁচবো না আর। চন্দন, তোর কাছে আমার একটা অনুরোধ ভাই, আমি মরে গেলে—কে? বন্দনা? উঃ, কি অন্ধকার!"

চন্দন নীরবে আইস্-ব্যাগটা চেপে ধরে—টপ-টপ করে ঝরে পড়ে তার কয়েক ফোঁটা চোখের জল।

প্রবীর হঠাৎ খুব শান্ত হয়ে যায়, চন্দনকে বলে, "চন্দন, ভাই, বন্দনার সঙ্গে যদি তোর দেখা হয় তো তাকে বলিস্, 'কবি তোমাকে ভোলেনি, আর বলিস্, যাকে পেয়েছে, তাকেই যেন ভালবাসে, এইটা কবির শেষ অনুরোধ।' আমি জানি, বন্দনা আমার অনুরোধ—আদেশ বলে মানবে।"—হঠাৎ ছটফট করে ওঠে প্রবীর, তার পর চিরশান্ত হয়ে যায়।

চন্দন ছেলে-মানুষের মত প্রবীরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

দূরে একটা ট্রেণের বাঁশী বেজে ওঠে। বন্দনা হয়তো আসছে ঐ গাড়ীতে—তার কবি প্রেমিককে দেখতে।···

আমি

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

নর্ত্তনশীলা প্রকৃতির প্রতিনিয়তই ছন্দের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—কখন শান্তির ধারা প্রবাহমানা, কখনও তাণ্ডব নৃত্যের বিভীষিকা! উভয় অবস্থাই চিত্তের অবস্থানুযায়ী দৃশ্যমান হয়। এই নিত্য পরিবর্ত্তনের মূল একমাত্র চিত্তে, বাহিরে নহে। জড় জগতের বিচিত্র মূর্ত্তি প্রকৃতপক্ষে চিত্তই সৃষ্টি করে। চৈতন্যশীল না থাকিলে কোন জড় বস্তুই অন্যকে আকর্ষণ করে না। চৈতন্য কিন্তু ভাবাতীত ও সাক্ষী মাত্র।

চৈতন্যের পরিবর্ত্তন নাই এবং জড় জগতের পরিবর্ত্তন যদি চৈতন্যের ছায়াপাত ভিন্ন না সম্ভব হয়, তবে এ পরিবর্ত্তন কাহার? চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কল্পনাচ্ছন্ন চিত্তের পরিবর্ত্তনের ফলে স্থাবর, জঙ্গম বা প্রকৃতির সর্ব্ব বস্তুই কল্পনানুযায়ী মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। সকল পরিবর্ত্তনের আধার চিত্তই—না চৈতন্যের, না জড় জগতের?

জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের পার্থক্যে বিভিন্ন মানব এবং জাতি স্ব-স্ব সংস্কারানুযায়ী সংসার ও জাতীয় জীবন গঠন করে। দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এবং পার্থিব উন্নতির জন্য আমরা সদাই আগ্রহান্বিত। কেহ কেহ সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া তাহার ঝঞ্ঝাবাত হইতে দূরে থাকিতে চায়। আদর্শের পার্থক্য থাকিলেও সকল কর্ম্মশীলতার পশ্চাতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি প্রধান উদ্দেশ্যরূপে অবস্থান করে। বুদ্ধিশক্তির চালনায় নানাবিধ আবিষ্কার, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের এত উপকরণ সত্ত্বেও সুখ সুদূর-পরাহত হয় কেন? ঐশ্বর্য্যসম্ভার যুদ্ধোপকরণ বা পার্থিব—সকল প্রকার বস্তুর সমাবেশ সত্ত্বেও কোন বস্তুই সুখের স্থায়িত্ব সাধন করে না। কত চেষ্টায় গঠিত সংসার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া লোকের শান্তিবিধানের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলের কালিমা সকলের মনকে সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলে। অবস্থার এত বৈচিত্র্যের কারণ নির্দ্ধারণ করিবার যত্ন যুগে যুগেই হইয়াছে।

সংস্কারের উপরে এক অব্যক্ত শক্তির লীলা-খেলা চলিতেছে। এক চিৎশক্তিই প্রাকৃতিক সর্বকর্ম্মশীলতার পশ্চাতে বর্ত্তমান, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ইহা বুঝিয়াছেন এবং জগতের মঙ্গলের জন্য সেই সত্য উপলব্ধির উপদেশ দিয়াছেন।

সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের তাড়নায় ভীত হয় না, এইরূপ জীব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অশান্তির হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য জীবমাত্রেই ব্যস্ত। কিন্তু সেই অশান্তি দূর করিবার চেষ্টা, সংস্কারের পার্থক্যে নানাবিধ হইলেও, শান্তি পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আদর্শের ও কর্ম্মের পার্থক্য। সাধনাও সংস্কারানুযায়ী। পথ থাকিলেও প্রকৃত শান্তির পথের পথিক অনেকেই হইতে পারে না।

আর্ত্ত সন্তান যখন জননীর ক্রোড়ে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, জননী তখনই সন্তানকে ক্রোড়ে লইবার জন্য ধাবিতা হন, নচেৎ নহে। যাহা অশান্তির মূল তাহা হৃদয়ঙ্গম করতঃ আন্তরিকতার সহিত কায়-মনোবাক্যে শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণা সেই জগজ্জননীর প্রতি

মানসিক গতি চালিত করিলেই জগন্মাতা তাঁহার আর্ত্ত সন্তানকে তাঁহার ক্রোড়ে তুলিয়া লন। অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সাধারণ মানব সেই শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। ফলে, মঙ্গলময়ীর দৃষ্টিপাত কদাচিৎ ঘটে। নিজেই দূরে আসিয়া পড়িতেছি। সংসারের অনিত্যতা প্রতিদিন উপলব্ধি করিলেও ইহা যে চৈতন্যের লীলাক্ষেত্র সেই সত্য জ্ঞানগোচর হয় না।

স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব স্থানে একই চৈতন্য সত্তা নিজ পরিচয় দিতেছে। "আমি" বা "আমার" এই মিথ্যা জ্ঞানের প্রাবল্যে এই সত্য চিন্তার অবকাশই চিত্তে থাকে না। সর্ব্ব কর্ম্মের পশ্চাতে "আমি" এত স্থূল ভাবে পরিচয় দেয় যে, চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে চিন্তাধারা সেই "আমিত্বের" গণ্ডীর বাহিরে যাইবার শক্তি হারাইয়াছে. সংস্কারের বৈচিত্র্যে, সংসারের পেষণে জর্জ্জরিত হইলেও সংসারের আধারভূতা শক্তির অস্তিত্বের কথা মুখে বলি মাত্র. কার্য্যতঃ সংসারের উদ্বেলিত তরঙ্গে উঠা ও নামা ভিন্ন অধিকাংশ জীবনেই অন্য কিছু ঘটে না। সাধারণ জীব সংসারের ভারে নিষ্পেষিত হইলেও, পূর্ব্ব সংস্কারের প্রাবল্যে প্রকৃতপক্ষে সেই নিষ্পেষণই চায়, ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করে না। কণ্টক চর্ব্বণে ওষ্ঠ রক্তাপ্লিত হইলেও উষ্ট্র যেমন কণ্টক চর্ব্বণে ব্যগ্র, জীবও তেমনই অমঙ্গলদায়ক সংস্কারের হাত হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করে না। নিজ সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতেই হইবে, কিন্তু তাহা যে দুঃখদায়ক এ জ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও দুঃখ-মোচনের চেষ্টা বিরল। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই, গৈরিক বসন ধারণেই বা ধর্ম্মধ্বজী হইলেই সেই সুখতারার দৃষ্টিলাভ ঘটে না।

যত অশান্তির স্থান মনে, বাহিরে নহে। প্রকৃত শত্রু অন্তরে, বাহিরে নহে; ভগবৎ কৃপায় এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রন্থ পাঠ ও সাধু-সংসর্গের প্রয়োজন। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই, শত্রু কোথায় জানিতে পারিলেই, বিধাতার মঙ্গলময় স্পর্শ অনুভূতি হইতে আরম্ভ হয়, তাঁহার সিংহদ্বারের অর্গল যথাসময়ে খুলিয়া যায়। তখন সংস্কারের সকল অশান্তি দূরীভূত হইতে আরম্ভ হয়, হৃদয়ে বলাধান ঘটে, নতুন দৃষ্টি আসিয়া পড়ে, ও সর্ব্বস্থানে যে এক সচ্চিদানন্দময়ের পরিচয় ঘটিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়; এবং অসূয়া, হিংসা-দ্বেষাদি হৃদয়কে আর কলুষিত করে না—অন্ততঃ তাহার মাত্রা কমিতে থাকে। কারণ তখন "আমি" ও "আমার" জ্ঞান কমিতে থাকে।

সেই উপলব্ধির প্রতিবন্ধক কি? সেই শত্রুর মূর্ত্তি কিরূপ? কে জীবের এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল?

মানব স্ব স্ব কল্পনানুযায়ী জীবনাতিপাত করে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ধনী-নির্ধন, সাধু-পাপী সকলেই সময়ে সময়ে নিজের বোঝা নামাইতে চায়। সংসারের সুখ তাহার আকাঙ্ক্ষিত শান্তির মাত্রা পূর্ণ করিতে পারে না—আশা-পূরণের পূর্ব্বেই সংসার-লীলা শেষ হইয়া পড়ে, ও পুঞ্জীভূত বাসনার ভারে অবসন্ন মন লইয়া দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। প্রশ্ন উঠে, জীবমাত্রের অনন্ত সুখের আশা কি কাল্পনিক? অনন্ত কাল হইতে শান্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল? বর্ত্তমান কাল্পনিক বন্ধনে বদ্ধ সঙ্কীর্ণ মন এত সুখের আশা পোষণ করে কেন?

চিত্তের সীমাহীন বাসনা তাহার অসীম প্রসবিতার পরিচয় দিতেছে। চিত্ত তাহার আধার সচ্চিদানন্দের নির্দ্দেশক মাত্র। চিত্তই এই বর্ত্তমান কাল্পনিক "আমিত্বের" স্রষ্টা। চিত্ত বা মনের স্রষ্টা প্রকৃত "আমি," কিন্তু তাহা বর্ত্তমান "আমিত্ব" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সেই প্রকৃত "আমিত্বের" কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই—অহঙ্কার তথায় স্থান পায় না। অহঙ্কার-বিমূঢ় চিত্তই আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। জ্ঞান এরূপ ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহার স্রষ্টার চিন্তা লুপ্তপ্রায়। তাহার কল্পিত রূপ লইয়া এত ব্যস্ত, তাহাকে এত সত্য বলিয়া বুঝে যে, তাহার অকল্পিত মূর্ত্তি তাহার বর্ত্তমান জ্ঞানের অতীত।

সকল সময়ে কল্পিত রূপের খুঁটি ধরিয়াই সর্ব্বকর্ম্ম করিতেছি, সেই কারণেই এত কর্ত্তৃত্বাভিমান। সেই অভিমানজাত সর্ব্ব ক্রিয়াই সংসারের সর্ব্ব দুঃখের কারণ। এই "আমিত্বের" স্থিরতা কিছুই নাই, কারণ তাহার ভিত্তি কল্পনা মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তেই এই 'আমির' পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তথাপিও সেই "আমি"কেই অপরিবর্ত্তনীয় মনে করি। এই মনে করা, বর্ত্তমান কল্পনা-জাত মানসিক অবস্থার বা গরজের অবশ্যম্ভাবী ফল।

সর্ব্ব বাসনার সৃষ্টি "দৈহিক সুখে"। প্রকৃত পক্ষে মনকেও "আমি" মনে করি না। আমার "আমি" দেহ। বর্ত্তমান ভ্রান্তজ্ঞানে অপরের "আমি"ও তাহার দেহের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। যত কিছু স্নেহ, মমতা, প্রেম ইত্যাদি বর্ত্তমান জ্ঞানে ওই দৈহিক আকর্ষণ। দেহ আসে যায়, দেহ লইয়া জীব উৎফুল্ল হয়, তাহার পতনে কাঁদে। অথচ এই আসা-যাওয়ার গতির উপর কোন জীবেরই আধিপত্য নাই; সেই চিন্তা চিত্তে উদীয়মান হইলেই মানব স্থির হইয়া দাঁড়ায়। সেই দিকে মন আকৃষ্ট হইলেই বুঝিতে পারে যে, এই ভাঙ্গা-গড়ার কর্ত্তা সে নহে, তাহা এক অব্যক্ত শক্তির ক্রিয়া-মাত্র। দেহের এই আকর্ষণ জীবের চিত্তকে সম্মোহিত করিয়াছে, এই বুঝিয়াই বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন :—

"তয়ং তদ্দর্শনদ্বারে দেহো হি পরমার্গলঃ"

বর্ত্তমান জ্ঞানে দেহের কাল্পনিক মূর্ত্তি এবং উপরোক্ত কল্পিত "আমি"র কোন পার্থক্য নাই। সেই জন্য দেহই "আমি" হইয়া বসিয়া আছে। অস্থি-মাংস-সংঘাত এই দেহের প্রকৃত সত্তা কি, বিচার করিলে ক্রমে দেহের আকর্ষণ কমিতে থাকে এবং পরিণামে আর আকর্ষণ থাকে না। সকল দেহের মৃত্যুই যথাসময়ে জ্ঞানে ফুটিয়া ওঠে ও তৎপ্রতি মানসিক আকর্ষণ ঐ উপলব্ধির মাত্রার তারতম্যানুসারে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। সেই মানসিক সংস্কারের খাঁটিগুলি একে একে আপনা হইতে উঠিয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতে মনের লয় হয় না। মানসিক ধারা তখন অন্তর্ম্মুখীন হইয়া উঠে—দেহাভ্যন্তরস্থিত চিৎ সত্তার কথা তখন মনে উদীয়মান হইতে থাকে। আনন্দময় চৈতন্য-সত্তাই তাহার সাধনাকে ফলোন্মুখী করিয়া দেন। তখন মনের রূপের বিচার আরম্ভ হয়, মন শান্তির প্রকৃত আস্বাদ পায়, ও বর্ত্তমান কাল্পনিক "আমিত্বের" প্রকৃত রূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল এই "আমিত্বের" বিচিত্র রূপ এবং তাহার অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিতে করিতে তাহার কোনটিই যে "আমি" নয়, এই চিত্তই হৃদয়ঙ্গম করে। তাহার ভিত্তি যে কল্পনা, নিত্য-পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও জ্ঞান তাহাকে স্থির মনে করিয়া বর্ত্তমান কল্পনাজাত "আমিকে" আঁকড়াইয়া বসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারে। কল্পনাকে কল্পনা বলিয়া বুঝিলে তাহার যেমন অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ প্রবল কাল্পনিক "আমি"ও বলহীন হইয়া পড়ে। শুদ্ধ চিত্তাকাশে কল্পনারূপ মেঘ যে মাত্রায় ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, চির বর্ত্তমান চিদাদিত্যের জ্যোতিঃ তাহার চিত্তাকাশে সেই মাত্রায় উদ্ভাসিত হইতে থাকেন।

তখনই প্রকৃত শান্তির অবিচ্ছিন্ন ধারায় চিত্ত প্লাবিত হইতে থাকে। মানব যে শান্তিবিধানের জন্য লালায়িত, সেই প্রকৃত শান্তির আস্বাদ পাইয়া ক্ষণভঙ্গুর সুখের মোহে আর প্রতারিত হয় না।

সেই সুখের এ বাদ কে সাধিল? রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত দ্বেষাদি, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি সকল অনিষ্টের মূল বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের কেন্দ্রস্থল ঐ "ভ্রান্ত আমি"। স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তারের ইচ্ছা বা কাল্পনিক আমিত্ব-জ্ঞানের প্রাবল্য সকল চিত্তেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অহঙ্কারের দর্প, আত্মাভিমান, আভিজাত্যের গরিমা, অভিলাষানুযায়ী বিষয়লাভের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সকল প্রকার আস্ফালনই স্থূল-সূক্ষ্ম ভাবে ঐ 'আমিত্ব'। মানসিক ভাবের বা কল্পনার পরিবর্তনের সহিত যে 'আমিত্বের' পরিবর্তন প্রতি মুহূর্তেই ঘটে, সেই 'আমিত্বেরই' অবস্থানুসারে সকল মানবেরই কর্মপ্রবৃত্তি, এবং সেই 'আমি' যখন দ্বন্দ্বভাবাপন্ন, তদনুযায়ী প্রতি মানবেরই সংসার প্রতি সম্প্রদায়ের ব্যবহার ও প্রতি রাজ্যের কর্ম্মপ্রেরণা। কিন্তু সেই "আমি" প্রতিনিয়তই অতিশয় চঞ্চল; তাহার কারণ, তাহা অস্তিত্বহীন ও অসত্য হইলেও, কল্পনার প্রভাবে তাহাকে সত্য মনে করি। মানসিক অবস্থার পরিবর্তনজাত কর্ম্মের ফল সংসারের সর্ব্ব অমঙ্গলের চালক হইলেও এই "আমি"র প্রেরণাতেই সর্ব্ব বিষয়ে ধাবিত হই। যুদ্ধের ফলে মহা বিক্রমশালী জাতির অধঃপতন, সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব; সংসারের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি, সকল অশান্তির মধ্যে সেই কাল্পনিক "আমিত্বই" নিজ পরিচয় দিতেছে। সকল অশান্তির মূলে ঐ "আমি" ক্রিয়াশীল। এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের বাসনায় বা সাম্প্রদায়িক "আমিত্বের" গর্ব্বে বর্ত্তমান ঘোর অশান্তির স্রোত বহিয়াছে। সাংসারিক যত কিছু অকল্যাণের মূলে এই "আমিত্বের" বা অভিমানের মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই পরিবর্তনশীল "আমিত্বে" স্থিরবুদ্ধি রাখিয়া অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল সৃষ্টি করি। এই অসৎ পুরুষকার মানবকে প্রতিনিয়তই ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করে। যাহার মূল নাই, যাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক সেই জন্য নিত্যই চঞ্চল, তাহার প্রেরণায় সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া থাকি বলিয়াই অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া চলিতেছে।

শরীর মানসিক-বৃত্তির ক্রীড়নক মাত্র। মানসিক ভাব যেমন, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশীলতাও তদনুযায়ী আভ্যন্তরিক কর্ম্মপ্রেরণার অবর্ত্তমানে দেহের বা কোন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশীলতা থাকে না, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মানসিক অবস্থার দিকে বুদ্ধি চালনা করা কর্ত্তব্য। তাহার পরিণাম চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধ চিত্ত-মুকুরেই চিৎ সত্তার প্রতিবিম্বপাত হয়, অন্যত্র নহে। চৈতন্যশক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ বুদ্ধি চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে" এই উক্তি এইজন্যই চণ্ডীতে উল্লিখিত। কিন্তু এই বুদ্ধি বর্ত্তমানে কল্পনাচ্ছন্ন।

যাহা সত্য তাহা কখনই কল্পিত হইতে পারে না। চিৎ সত্তার সহিত কল্পনার কোন সম্পর্ক নাই—তাহা অকল্পিত। অন্তঃকরণকে কল্পনামুক্ত বা ঐ কল্পিত "আমির" হাত হইতে মুক্ত করা উচিত।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বিষয় ঐ কাল্পনিক "আমি"। তাহার প্রকৃত রূপ যে কল্পনা—তাহা যে অসত্য, না বুঝিলে বা সেই কাল্পনিক "আমিত্বকে" সত্য বলিয়া বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে, জ্ঞান তাহার ভ্রান্তি কখনই বুঝিবে না। তাহার ফলে, যে শান্তি পাইবার বাসনা প্রতি জীবের অন্তরেই বিরাজ করিতেছে, সেই শান্তি দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। এই "আমিত্বের" তাড়নায় শান্তি কখনও আসিতে পারে না—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম না হইলে, ওই ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা না করিলে, সুখের আশা নাই; কেবল "আমিত্ব"জাত বাসনা ও অভিমানের বোঝা লইয়াই ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে।' বর্ত্তমান মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া স্ব স্বরূপ চিনিবার চেষ্টা বা তাহা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি, বিচার করিয়া না জানিলে জীবন অশান্তি ধারার মধ্যেই চলিবে, শান্তি কখনই মিলিবে না। এই "আমি" আস্ফালন করিতে করিতে আপনিই অবসন্ন হইয়া শান্ত হইবে।

"Men are in bondage becouse they have not realised the idea of 'I'."

মহাভারতে—"মম" এই দ্ব্যক্ষর শব্দকে 'মৃত্যু' বলিয়া বর্ণনা আছে :—

"মমেতি চ ভবেন্মৃত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্।" গীতায় আছে—"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।"

এই মিথ্যা কাল্পনিক "আমি" এবং তদ্জাত আত্মাভিমানের মধ্যেই থাকিয়া বিচার করিলে, ভুলের উপর ভুলের বোঝা বাড়িবে।

সকল সাধনার উদ্দেশ্য শান্তি। শান্তি চির বিরাজমান। কেবল চিত্তের ভ্রান্ত অবস্থার নিরাকরণ বা শুদ্ধ চিত্ত পুনঃপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সাধন ঐ "আমি" ভুল না বুঝিলে কখনই সম্ভব হইবে না, শান্তিও ফিরিবে না ও দেহান্তকাল পর্য্যন্ত "আমি" অপমানিত, "আমার দুঃখ" ইত্যাদি চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী ঐ সাধনায় অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ জগৎ তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

কারাগারমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে হইলে কারাগারের দ্বার কোথায় সর্ব্বপ্রথম স্থির করা উচিত, নচেৎ সর্ব্ব স্থানে অর্গল খুলিবার চেষ্টায় কেবল দেহ ও মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ে, কিন্তু কারাগারের বাইরে যাওয়া যায় না। জীবের এই ভীষণ অবস্থায় "আমি"র বর্ত্তমান রূপ বুঝাইবার জন্যই বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :—

"যস্যেক্ষিতস্য নো সত্তা নাধারো ন চ কিঞ্চনঃ।
সোঽহমিত্যেব যো যাজ্ঞো ন জানে কুত উত্থিতঃ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন :—"আমি" মোলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

এই সত্তাহীন কল্পিত "আমাকে" জানিবার প্রবৃত্তিই সেই 'আমির' বিনাশক, এবং সেই প্রবৃত্তিই পরিণামে শুদ্ধচিত্ত মুকুরে 'আমির' প্রকৃত স্বরূপের প্রতিবিম্বপাত করায় তাহার ফল পরম শান্তি লাভ বা মুক্তি।

এই সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে এবং "আমিত্বের" ও আত্মাভিমানের মোহে মুগ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে শান্তির আশা নাই। সেই জন্য যত অনর্থের নাড়ী ঐ "কাল্পনিক আমিকে" চাপিয়া ধরিতে হইবে। তখন কারাগারের অর্গল আপনিই খুলিয়া যাইবে।

এই "আমিত্ব"-জ্ঞানের সহিত প্রতি জীবের শারীরিক ক্রিয়ার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে। যেমন জ্ঞান, তদনুযায়ী শারীরিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। যেমন শারীরিক ক্রিয়া, তদনুযায়ী জ্ঞানের পরিবর্ত্তনও না হইয়া থাকিতে পারে না। জীব এই জন্য মানসিক ক্রিয়ার পুতুল। এই চিন্তা করিয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল সাধনার জন্য যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। এই সৎ পুরুষকারের ফল—জয় ও শান্তিলাভ, পরাজয় ও অশান্তি নহে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ললিত হাজরা

অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা বাংলার জাতীয় জাগরণে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে 'তত্ত্ববোধিনী' ব্রাহ্ম-সমাজের আন্দোলনের কথাই প্রচার করিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই যুগের বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তা-নায়কগণ 'তত্ত্ববোধিনীর'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে সন্দর্ভ রচনা করিতে লাগিলেন। রাজনারায়ণ বসু ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ ও বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া যাহাতে বাংলার জনসাধারণ প্রাচীন যুগের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন তজ্জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।—(Bipin Chandra Pal —Memories of My & Life Time, vol. I. p. 226-227).

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা কাব্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্রোহের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। "মেঘনাদ বধ" কাব্য বাংলার শিক্ষিত সমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। বাংলা-সাহিত্যের গতানুগতিক ভাবধারা পরিহার করিয়া তিনি কাব্যে বিদ্রোহের সুর তুলিলেন। এমন কি, ভাষা ও ছন্দেও নূতনের প্রবর্ত্তন করিলেন। তদানীন্তন যুগের রক্ষণশীল সাহিত্যিকগণ তাঁহাকে ইতর ভাষায় সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। নাটকেও তিনি গতানুগতিক প্রণালী নির্ম্মম ভাবে ছাঁটাই করিয়া ইউরোপীয় ধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলা-সাহিত্যে "সনেট"এর প্রবর্ত্তন তিনিই করেন। মোটের উপর, মাইকেল মধুসূদন বাংলা-সাহিত্যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। এক দিকে একঘেয়ে ধারার ছাঁটাই এবং অন্য দিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের নূতন মূল্য বোধ তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বাংলার জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান "নীলদর্পণ"। অত্যাচারী নীল সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ ঘোষণার চিত্রাঙ্কনে তিনি যে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। অদ্যাবধি বাংলার তথা ভারতের কোন নাট্যকারই এই বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্রকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে "নীলদর্পণ" নাটক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং তাহারই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

দীনবন্ধু মিত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসের সাহায্যে বাংলার তরুণ সমাজকে কিরূপ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহাই আমরা আলোচনা করিব। "বন্দে মাতরম্"এর স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণ বাংলা ত দূরের কথা সমগ্র ভারতবর্ষই কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইউরোপীয় চিন্তাধারার সহিত সংযোগ ঘটাইয়া বাংলা-সাহিত্যে দে রেনেসাঁ দেখা দিল তাহার মূলে ছিলেন ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক প্রাবন্ধিক এবং সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র। এই রেনেসাঁর মুখপত্র হইল 'বঙ্গদর্শন'। "১৮৭৩-৭৪ সালের মধ্যে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যোগ দিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইতে লাগিল। "ফরাসী এনসাইক্লোপিডিষ্ট" অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় এবং ফরাসী সাহিত্যে যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল 'বঙ্গদর্শন' বাংলার সাহিত্য-জগতে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিল।" (Bipin Chandra Pal —Memories of My Life & Times, Vol I, p. 226) বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যালোচনা অনাবশ্যক। বাংলার সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কীর্ত্তি হইল সংস্কৃত-ভারাক্রান্ত বাংলা ভাষা এবং টেকচাঁদ ঠাকুর অনুসৃত অশ্লীল চলতি ভাষার অবসান ঘটাইয়া সহজবোধ্য অথচ সুমার্জ্জিত ভাষার প্রবর্ত্তন। উপন্যাসের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক। ১৮৮২ সালে "আনন্দমঠ" উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করিলেন। জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্" এই উপন্যাসেরই অন্তর্ভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রই ভারতবাসীকে মাতৃপূজার মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তিনিই প্রথম স্বদেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করিতে শিখাইলেন। আমাদের জাতীয় জাগরণে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের স্থান যে কোন শ্রেষ্ঠ নেতার অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ত গরম-করা কবিতাগুলি বাংলার তরুণ সমাজে স্বদেশ-প্রেমের বন্যা আনিল। "হেমচন্দ্রের আবেগময়ী ভাষায় লিখিত কবিতাগুলি আমাদের তরুণ-মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ইতিপূর্ব্বে কোন কবির এই জাতীয় কবিতা আমাদের অন্তরে রেখাপাত করিতে পারে নাই। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী নূতন শাসনতন্ত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আইন, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতিতে নব্য-বাংলার সন্তানগণ বৃটিশ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণদের কথাবার্ত্তায় স্বাধীনতার এবং স্বীয় অধিকারের এক নূতন ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলে দেশে বৃটিশ ও এদেশীয়দের মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এই নূতন দ্বন্দ্ব, জাতিগত আত্মসম্মান এবং তীব্র স্বদেশপ্রেমের নূতন যুগে কবি হেমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়।" (Bipin Chandra Pal —Memories of My Life & Times, vol I. p. 229)

পাশাপাশি কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম-সমাজ ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্যের এক নূতন বাণী প্রচার করিবার ফলে নব্য-বাংলার শিশু জাতীয়তাবাদের উপর দেখা দিল এক প্রতিক্রিয়া। খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত কেশবচন্দ্রের মতবিরোধের কাহিনী বাংলার জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে সংবাদপত্রে পাঠ করিতে

লাগিল। অবশেষে তর্কে মিশনারীদের পরাজয়ের বার্ত্তা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর নিকট ইংরাজের পরাজয় জাতীয় চেতনায় আনিল এক নূতন বাণী। কেশবচন্দ্রের বিলাত ভ্রমণ এবং তথায় তাঁহার সাফল্য বাংলা দেশের জনসাধারণকে জানাইয়া দিল যে, শাসক ইংরাজের নিকট আমরা আর হীন নহি। আমরাও শ্রেষ্ঠ। ইংরাজদের তুলনায় আমরাও যে শ্রেষ্ঠ এই সত্য সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। সমগ্র বাংলা দেশে এক নূতন মানসিক এবং নৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হইল।

১৮৭৪ সালে আনন্দমোহন বসু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "র‍্যাংলার" হইয়া ফিরিয়া আসিলে বাংলা দেশে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা দেখা দিল। ইংরাজের দেশে ইংরাজ ছাত্রদিগকে পরাভূত করিয়া বাংলার ছেলের সাফল্য লাভ আমাদের জাতীয় গৌরবে এক নূতন চাঞ্চল্য আনিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাঙ্গালীর বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্রই আনন্দমোহন "কলিকাতা ছাত্রসঙ্ঘ" (Calcutta Student Association) নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৮৭৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ "সিভিল সার্ভিস"এ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার আবেদন-নিবেদন মামলা সব-কিছুই করিয়া অবশেষে ব্যর্থকাম হইয়া বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়ে তিনি কি করিবেন মনস্থ করিতে পারিলেন না। অবশেষে মনস্থ করিলেন যে তিনি "স্বদেশের জন্য কিছু করিবেন।" (Surendranath Banerjee—"A Nation in Making" দ্রষ্টব্য)। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া শিক্ষা বিস্তারকল্পে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন নামে (বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে বেকার বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বেদনা অনুভব করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে নিজ কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক পদে চাকুরী করিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ পিতৃবন্ধুর আদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া চাকুরী লইলেন। কলিকাতার ছাত্রসমাজের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ মিলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুর্জ্জোয়া রাজনীতিতে ধর্ম্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বিশেষ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের একাধিপত্যই রাজনীতির প্রধান অঙ্গ ছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা আমরা কিছুতেই বলিতে পারি না। বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বলিয়া ভারতবর্ষে কোন কথাই ছিল না। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন যতই প্রবল হইতে থাকে, ততই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিত ভারতবর্ষে "মুসলমান রাজত্ব" অধ্যায় একেবারে ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন। মুসলমান বাদশাহগণ কখনই হিন্দুকে বাদ দিয়া শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন নাই। সামরিক বেসামরিক সব কিছুতেই যে হিন্দুগণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহার অজস্র প্রমাণ ইতিহাসে আছে। যাহা হউক, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা হিন্দুগণ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন মুসলমানগণ তাহা গ্রহণ করা ত দূরের কথা, অত্যধিক আগ্রহ সহকারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। মোল্লা, মৌলভীদের সঙ্কীর্ণতা, ইসলামের অপব্যাখ্যা, মুসলমান সমাজকে পাশ্চাত্যের সভ্যতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান-বিরোধী করিয়া তুলিল। ফলে মুসলমান সমাজ এক অতি সঙ্কীর্ণ পরিবেশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। হিন্দুগণ কিন্তু পাশ্চাত্যের সভ্যতা, সংস্কৃতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রসর হইয়া গেল। বৃটিশ-শাসনের এক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমান সমাজের অনগ্রসতার মূলে রহিয়াছে ইসলামের সঙ্কীর্ণচেতা ভাষ্যকারদের সঙ্কীর্ণতম অপব্যাখ্যা। ব্যক্তিগত কারণে ইসলামের অপব্যাখ্যা যতই করা হইয়াছে ততই ভারতীয় বিশেষ করিয়া বাংলার মুসলমান সমাজের সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে রাজনারায়ণ বসু এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের কেন্দ্র করিয়া হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় জাগরণ দানা বাঁধিয়া উঠে। ১৮৬১ সালে তিনি মেদিনীপুরে "সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব দি ন্যাসন্যাল গ্লোরী" নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং "সোসাইটি ফর ষ্টিমুলেটিং ন্যাশন্যাল সেণ্টিমেণ্ট"র পক্ষ হইতে একটি ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন। হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা তাঁহার আন্দোলনের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। রাজনারায়ণের সহকর্ম্মী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাজনারায়ণের বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করিতে লাগিলেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে হিন্দু রাজাদের কাহিনীর উপর নূতন করিয়া রঙ চড়াইয়া পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রাজনারায়ণের প্রধান সঙ্গী নবগোপাল মিত্র একটি জাতীয় বিদ্যালয়, একটি জাতীয় পত্রিকা এবং একটি জাতীয় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রত্যেকটি কাজে ও কথায় "জাতীয়" শব্দ প্রয়োগ করিবার ফলে তৎকালীন বাংলার শিক্ষিত সমাজ তাঁহার নাম দিল "ন্যাশন্যাল মিত্র"। নবগোপাল মিত্র ১৮৬৫ সালে "প্যাট্রিয়ট্‌স্ এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিলেন রাজনারায়ণ বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাতীয় জাগরণে তাঁহাদের অমর অবদান হইল "হিন্দু মেলা"। হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন: "জাতিকে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বাবলম্বী করিয়া তোলা এই মেলার একমাত্র উদ্দেশ্য।" বৎসরে একবার করিয়া এই মেলা হইত। বর্ত্তমানে এই ধরণের মেলাকে আমরা প্রদর্শনী বলিয়া থাকি। হিন্দু মেলায় লেখক, শিল্পী ও ব্যায়ামবীরদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত এবং অন্য দিকে ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পকলা, কৃষিজাত পণ্যাদির প্রদর্শনী চলিত। জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করিবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থাও থাকিত। মনোমোহন বসুর বাংলা ভাষায় স্বদেশী বক্তৃতা এই মেলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজনারায়ণ বসুই সর্ব্বপ্রথম জনসভায় বাংলায় বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্ব্বে এবং পরেও আমাদের নেতৃবৃন্দ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই তাঁহাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকিত। জাতীয় সঙ্গীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রথম গীত হয় এবং এই জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহা ব্যতীত বহু জাতীয় কবিতাও এই মেলায় পাঠ করা হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া "হিন্দু মেলা" কলিকাতায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

কিছু দিন পরে হিন্দু মেলার উদ্যোক্তাদের গোঁড়া হিন্দুয়ানীর

কিছুটা শিথিল হয়। হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃস্থাপনের পরিবর্ত্তে মিলিত হিন্দু-মুসলমান-শিখ-পার্শী ও জৈনদের আধিপত্য সংস্থাপনের পথে বিদেশী শাসনের কবল হইতে ভারতবর্ষের মুক্তি হইবে এই ধারণা জন্মিল। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দুদের সহিত একত্রিত হইল। ফলে বর্ত্তমান আকারে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিল। এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে ব্রাহ্ম-সমাজই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। "একদা ব্রাহ্ম-সমাজ বাংলা দেশে যে প্রগতিশীল আন্দোলন এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকপাত করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।..." (Netaji Subhas Chandra Bose—"An Indian Pilgrim," P. 17, Chapter III)

মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সূত্রপাত এই যুগেই হয় কিন্তু এই চেতনা এতই দুর্ব্বল ছিল যে, তাহা বলিষ্ঠরূপে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ওহাবী আন্দোলনের কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানদের মধ্যে আর কোন আন্দোলনই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। নবাব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় "জাতীয় মুসলমান সঙ্ঘ" (National Mohammedan Association) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এমন এক জন লোকের হস্তে চলিয়া যায় যে মুসলমান জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসিতে পারে নাই। এই যুগে মুসলমান বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব না হওয়ায় কোন জাতীয় আন্দোলনও মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। কোন স্থানেই এক জন বিশিষ্ট মুসলমান নেতার আবির্ভাব হয় নাই। অথচ মুসলমানদের মধ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্যও দেখা দিল না। অবশেষে ১৮৭৪ সালে স্যার সৈয়দ আহম্মদ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় ভাবী যুগের জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ হইল। "আমার বিশ্বাস, সমগ্র ভারতবর্ষের জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানগণ প্রাক্-বৃটিশ অথবা বৃটিশ আমলে ভারতীয় জনকল্যাণে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে কখনও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বর্ত্তমানে যে কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান শাসকের হস্ত রহিয়াছে। আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথলিক-প্রটেষ্ট্যাণ্টদের মধ্যে বৃটিশ শাসক যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে এখানেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রাক্-বৃটিশ আমলের ভারতের রাজনৈতিক সংস্থাকে বৃটিশ শাসক মুসলমান আমল বলিয়া আখ্যা দিয়াছে, কিন্তু এই আখ্যা যে অপভাষণের নামান্তর ইতিহাস তাহা সমর্থন করিবে। দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের কথাই ধরি আর বাংলার মুসলমান নবাবদের কথাই ধরি—তাহাতে আমরা দেখি যে হিন্দু-মুসলমান একত্রে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে সম্রাট আকবরের হিন্দু প্রধান সেনাপতিগণের অবদান অমূল্য।......১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে একই পতাকাতলে সমবেত হইয়া এবং পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সাধারণ শত্রু বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে।" (Natajl Subhas Chandra Bose—An Indian Pilgrim, Chapter III, P. 16-17)

রাজনীতি হইতে ধর্ম্মের আধিপত্য অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিবর্ত্তন হয়। সুরেন্দ্রনাথই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি পরিবর্ত্তন করিলেন। "সুরেন্দ্রনাথ স্বাধীনতার এক নূতন বাণী ও প্রেরণা লইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আবেদন ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক।" (Bipin Chandra Pal—Mem'ries of My Life and Times, Page 234) মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপক হইয়া বাংলার ছাত্র-সমাজ তথা তরুণ-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ সুরেন্দ্রনাথ লাভ করিলেন। আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ছাত্র-সঙ্ঘের নিকট সুরেন্দ্রনাথের সংযোগ স্থাপিত হইল। "তদানীন্তন যুগে পুলিশের খাতায় (Govt. Black List যাহাদের নাম উঠিত সমাজে তাহার স্থান মিলিত না। সুরেন্দ্রনাথের অবস্থাও তাহাই ঘটিল কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সুরেন্দ্রনাথকে সমাজের বুকে টানিয়া আনিয়া একটি জাতির নেতৃত্ব করিবার সুযোগ দিলেন।" (Bipin Chandra Pal—Memorics of My Life and Times, Page 238) কলিকাতা ছাত্র-সঙ্ঘের উদ্যোগে বাংলার ভাবী জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। "পাঞ্জাবে শিখ-শক্তির অভ্যুদয়" এই বিষয়ের উপর সুরেন্দ্রনাথ প্রথম বক্তৃতা দিলেন। "সম্ভবতঃ বক্তৃতার বিষয়বস্তু বৃটিশ ঐতিহাসিক ম্যালকমের 'হিষ্টরী অব দি শিখস্' পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় সর্ব্বপ্রথম আমাদের নিকট শিখ আন্দোলনের মূল কথা উপস্থাপিত করিলেন। শিখদের আন্দোলন যে স্বাধীনতার আন্দোলন এবং এই আন্দোলন প্রথমতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের শিখ সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়তঃ; শিখ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে পরিচালিত আন্দোলন দমনে মুঘল সম্রাটদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং তৃতীয়তঃ, বৃটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিখ সম্প্রদায় পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে তাহাই সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন।...শিখ সম্প্রদায়ের আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃটিশ ইতিহাসকারদের অপপ্রচারের মুখোস খুলিয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথ অগ্নিগর্ভ ভাষায় শিখ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যের ন্যায্যতা স্বীকার করিলেন। প্রকাশ করিলেন, খালসার প্রতি শিখ সম্প্রদায়ের আনুগত্য এবং চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাতে শিখ-শক্তির নিকট বৃটিশের সামরিক শক্তির ভীষণ পরাজয়ের কাহিনী। সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা আমাদের শিশু স্বদেশপ্রেমকে তারুণ্যে রূপান্তরিত করিল এবং আমাদের তরুণ সমাজকে তীব্র বৃটিশ-বিরোধী করিয়া তুলিল।" (Bipin Chandra Pal—Mamories of My Life and Times, p. 242-243) ইতালীর মুক্তি-সংগ্রামের নেতা ম্যাটসিনি এবং তাঁহার "নব্য ইতালী আন্দোলন" সুরেন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ম্যাটসিনি হইলেন সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শগুরু। বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ ম্যাটসিনির আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে নানা গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ এই ধরণের বহু গুপ্ত সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত আমাদের নূতন রঙ্গমঞ্চ এবং জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে। ১৮৭০ সাল হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন

দিকে যে বিকাশ দেখা দিল তাহাতে আমাদের রঙ্গমঞ্চ এবং জাতীয় সঙ্গীতের অবদান অসামান্য। ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। নূতন সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হইতে লাগিল নূতন নাটক এবং নূতন রঙ্গমঞ্চ। আমাদের নিজস্ব নাটক ছিল এবং সে সংস্কৃত নাটক বিখ্যাত গ্রীক নাটকগুলির সহিত পাল্লা দিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা আমাদের কথিত ভাষা না হওয়ায় তাহার মূল্য কমিয়া যাইতে বাধ্য হইল। বাংলা দেশ নিজস্ব ভাষা লাভ করিয়া সংস্কৃত ভাষাকে কথিত ভাষায় গ্রহণ করিতে পারিল না। ফলে বাংলা দেশ নিজস্ব তাগিদায় বাংলা ভাষায় 'যাত্রা'র প্রচলন করিল। এই সব যাত্রার বিষয়-বস্তু কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থাকে স্থান দিল না। ধর্ম্মই হইল 'যাত্রা'র প্রধান ও একমাত্র উপজীব্য। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়ে যাত্রার আবির্ভাব হয়। মহাপ্রভুর কীর্ত্তন যাত্রার জন্মদাতা। যাহা হউক, তদানীন্তন যুগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে উপজীব্য করিয়া নাট্যকারগণ "যাত্রা" রচনা করিতেন। বৈষ্ণব গীতিকাব্য যাত্রার খোরাক যোগাইত। ক্রমশঃ বৈষ্ণব গীতিকাব্য জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুষ্টিমেয় পেশাদার গায়কের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং আরও অনেক বৈষ্ণব-কবির প্রাণবন্ত গীতি-কবিতা বাংলার জনসাধারণের নিকট অপরিচিত হইয়া উঠে। অবশেষে অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব কবিদিগের পুনঃ আবির্ভাবের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল। মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং বুর্জ্জোয়া ধনতন্ত্রের প্রকাশের ফলে সামন্ত যুগের ধর্ম্মপ্রভাবান্বিত নাটকের পরিবর্ত্তন হয় এবং তৎস্থলে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর নিজের প্রয়োজনের তাগিদায় ও তাহাদের সৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন নাটকের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। প্রয়োজন হইল রঙ্গমঞ্চের। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী মহলে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় নাই। যাহা হউক, উত্তর কলিকাতায় "বেঙ্গল থিয়েটার" এবং "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" নামক দুইটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইল। নারীর ভূমিকায় যাত্রার ন্যায় পুরুষ অভিনেত্রী অবতীর্ণ হইতে লাগিল। পরে নারীর ভূমিকায় নারী অভিনেতৃ অবতীর্ণ হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে নৈতিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ প্রবল বাধা দিলেন। অবশ্য তাঁহাদের বাধা টিঁকিতে পারিল না নানা কারণে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখনও পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক নাটকের অভিনয় হইল না। রাজনৈতিক বিষয়-বস্তু লইয়া নাটকের অভিনয়ে বিলম্ব ঘটিল। এই সময়ে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলেও সমাজের বুকে ধর্ম্মের রবার ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া যে সমস্ত জঘন্য প্রথা চালু ছিল, সেগুলি বিলোপের দিকে তৎকালীন যুবক সম্প্রদায়ের আগ্রহ ছিল প্রবল। সামাজিক কুপ্রথার তীব্র নিন্দা করিয়া যে নাটক মঞ্চস্থ করা হইত তাহার প্রতিই শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের পূর্ব্বে যে সামাজিক কু-প্রথা মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই অবসান বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নব্য রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া "ভারতমাতা" নামক নাটকের অভিনয় হয়। বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়া এবং কুলীন ব্রাহ্মণদের "বহু বিবাহের" তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বহু নাটক রচিত হয় এবং অভিনীত হয়। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদ। "নীলদর্পণ"ই সর্ব্ব ভারতের প্রথম রাজনৈতিক নাটক। এই নাটকের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। "নীলদর্পণ"এর পরে দেখা দিল উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত "শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকদ্বয়। ১৮৭৬ সালে তদানীন্তন যুবরাজ এলবার্ট এডওয়ার্ড (পরে ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারত পরিদর্শনে কলিকাতায় আগমন করিলেন। তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল এবং সরকারী উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে অভিনন্দন করিবার জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের পর্দ্দানশীন মহিলাদের লইয়া একটি "পর্দ্দা পার্টির" আয়োজন করেন। হিন্দু সমাজ এই ব্যাপার লইয়া ভীষণ হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়া দেয়। সমগ্র হিন্দু সমাজের ভিত্তির উপর আঘাত হানা হইল। হিন্দু নারী পিতৃ-মাতৃ ও শ্বশুর-কুলের নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের সম্মুখে ব্যতীত অন্য কাহারও সম্মুখে বাহির হইতেন না—তাহাদিগকে বিদেশী ও খৃষ্টান যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে এত বড় অপমান হিন্দু সমাজ সহ্য করিতে পারিল না। এতদ্ব্যতীত ইহা লজ্জাজনক কাণ্ড বলিয়া হিন্দু সমাজ মনে করিল। হিন্দু নারীর পবিত্রতার উপর এত বড় নিষ্ঠুর আঘাত হিন্দু সমাজ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পরে অবশ্য জানা যায় যে, কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মহিলাগণ এই "পর্দ্দা পার্টি"তে যোগদান করেন নাই। পতিতালয় হইতে নারী আনাইয়া জগদানন্দ মুখো-পাধ্যায়কে "পর্দ্দা পার্টি"র ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উপেন্দ্রনাথ দাশ বিদ্রূপাত্মক নাটকদ্বয় রচনা করেন। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলিতে থাকা কালে গভর্ণমেণ্ট নাটকের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে অবগত হইলেন। যুবরাজের কলিকাতা আগমনের উপর এই ধরণের বিদ্রূপাত্মক নাটকের প্রকাশ্য অভিনয় আত্মাভিমানী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহকদের সহ্য হইল না। তৎক্ষণাৎ একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া এই নাটকদ্বয়ের অভিনয় নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং এই সময় হইতেই রঙ্গমঞ্চের উপর পুলিশী সেন্সারের পাকা ব্যবস্থা হইল।

এই সময়ে জাতীয় সঙ্গীতের হিসাব-নিকাশ দেওয়া সম্ভবপর নয়। এই যুগে যে কয়েকখানি জাতীয় সঙ্গীত বাংলার যুব-সমাজকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহারই হিসাব দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। আগ্রার বাঙ্গালী অধিবাসী এবং কবি গোবিন্দ-চন্দ্র রায়ের নিম্নলিখিত সঙ্গীত দুইখানি তরুণ সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল :—

কত কাল পরে বল ভারত রে—
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে ?
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে
পর হাতে দিয়ে ধন-রত্ন সুখে
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।

পর দীপ-মালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।
এবং
নির্ম্মল পুলিনে বহিছ সদা—
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।
যুগ যুগ বাহি প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও।

কবি হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত"এর :

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত জ্ঞানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

* * * * *

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রথম দিকে এই জাতীয় সঙ্গীতগুলি বাংলার তরুণ-সমাজকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে। সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহন এই তৈয়ারী ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন।

[ক্রমশঃ।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

২

সন্তোষ ঘোষ

কংগ্রেস-পূর্বযুগ (১৮৫৮-১৮৮৫)

সিপাহী বিদ্রোহ অবসানের সংগে সংগে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নব অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই সময়ে ভারতীয় সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক বিরাট কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল। সমাজ-সংস্কারে জাতীয় সাহিত্য রচনায়, সংবাদপত্র পরিচালনায়, ও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে, ভারতের এই নবযুগ কর্মমুখর ও প্রাণময় হইয়া উঠিল। নবজাগ্রত ভারতের এই বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার নেতৃত্ব করে বাংলা দেশ। বাংলার নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রথম সমাজ-সংস্কারে ও শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী হন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, জাতি হিসাবে ভারতবাসীকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বপ্রথম ভারতীয় সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে—বিবিধ কুসংস্কার মুক্ত করিয়া সমাজের কাঠামো দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে হইবে। রাজা রামমোহনের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এক-জাতীয়তাবোধ প্রচারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের বাণী লইয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষিত মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি ও ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে এক দিকে যেরূপ সমাজ-সংস্কারকগণ সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ভিতর দিয়া জন-চিত্তে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের চেষ্টা করিতেছিলেন, অন্য দিকে বাংলার সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দ অগ্নিবর্ষী ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহ যখন চলিতেছিল, তখন কবি রঙ্গলাল নির্ভীক কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন :

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।'

ইহার কিছু দিন পরে ১৮৬০ সালে প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নামক নাটক প্রকাশিত হয়। 'নীলদর্পণে' বাংলার নীলচাষীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা বর্ণনা করা হয় এবং নীলকর সাহেবের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। মাইকেল মধুসূদন নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং লং সাহেব তাহা প্রকাশ করেন। এই অপরাধে লং সাহেবের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়। 'নীলদর্পণ' সে যুগে জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ইহার কিছু দিন পরে বাংলা দেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিবারিত হয়। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই সময়ে তাঁহার 'মেঘনাদবধ' কাব্য প্রকাশ করেন। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবের পুষ্টি-সাধনে এই কাব্যটির দানও সামান্য নহে। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি বাঙ্গালী সাহিত্যিকবৃন্দ কাব্য ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয় ভাবধারার যে স্রোত বহাইতে আরম্ভ করেন, পরবর্তী সময়ে তাহা সুসংহত করিয়া সাগরাভিমুখে পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' কেবল মাত্র সুমধুর সঙ্গীত নহে, ইহা জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র। পরবর্তী সময়ে এক দিন সমগ্র ভারত এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া ত্যাগ ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন।

ভারতে জাতীয় ভাব প্রচারে বাংলার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণের অবদানও কম নহে। সিপাহী বিদ্রোহ চলিবার সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নির্ভীক ভাবে জনসাধারণের মতামত ব্যক্ত হইতে থাকে। হরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম নীলচাষীদের পক্ষ হইয়া নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এ জন্য তাঁহাকে লাঞ্ছনা ভোগও করিতে হয়। পরবর্তী যুগে কৃষ্ণদাস পাল বহু দিন ধরিয়া নির্ভীক ভাবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনা করেন। অন্যান্য সাংবাদিকদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, অক্ষয়কুমার দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, শিশিরকুমার ঘোষ সংবাদপত্রের মারফৎ জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন।

১৮৬৭ সালে চৈত্র বা হিন্দু মেলা স্থাপন সে যুগের অন্যতম বিশিষ্ট ঘটনা। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারের জন্যই উক্ত মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগোপাল মিত্র ছিলেন এই মেলার প্রাণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই মেলার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই মেলার সম্পাদক। হিন্দু মেলাই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু মেলায় কৃষি, শিল্প, স্ত্রীলোকদের সূচী ও কারুকার্য্য, দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় বিষয় সমূহ প্রদর্শিত হইত। এই মেলায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হইত ও জাতীয় সঙ্গীত গীত হইত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলা সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "সেই সময়ে স্বদেশপ্রেমের সময় না হইলেও আমাদের বাড়ীর সাহায্যে যে হিন্দু মেলা বলিয়া একটি মেলার সৃষ্টি হয়, ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।" এই মেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন।

শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম দিকে মনোমোহন ঘোষ, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ লীগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে এঁদের মধ্যে অনেকে লীগ ত্যাগ করেন। শিশিরকুমার 'ইণ্ডিয়া লীগের' মারফৎ ভারতে ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রতিনিধিমূলক শাসনের জন্য আন্দোলন করেন। ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' স্থাপিত হয়। নিখিল ভারতীয় আদর্শ লইয়াই 'ভারত-সভা' গঠিত হয়। জনমত গঠন, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়াই 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'ভারত সভা' সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে একাধিক বার ভারত ভ্রমণ করিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া দিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 'ভারত সভা' সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি পার্লামেন্টের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য 'ভারত সভার' তরফ হইতে ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' নামক একটি আইনের সাহায্যে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। ভারতবাসীকে ব্যাপক ভাবে নিরস্ত্র করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড লিটন 'অস্ত্র আইন' নামে আর একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন।

'ভারত সভা' এই দুইটি আইনের বিরুদ্ধেই তীব্র আন্দোলন করেন। লর্ড লিটনের পর লর্ড রিপণ ভারতে বড়লাট হইয়া আসিয়া 'প্রেস অ্যাক্ট' তুলিয়া লন। এই কার্য্যের ফলে তিনি এ দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই সময় 'বেঙ্গলী' নামক সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন। ১৮৮৩ সালে আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথের দুই মাস জেল হয়। ইহাতে সমগ্র ভারতে তীব্র আন্দোলন হয়। 'ভারত সভার' উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় একটি 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' বা জাতীয় সম্মেলন আহূত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আগমন করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। এই ভাবে জাতীয়-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। ভারতের অন্যান্য অংশেও এই সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ১৮৭৫ সালে 'পুণা সার্বজনীন সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ সালে 'মাদ্রাজ মহাজন সভা' ও ১৮৮৫ সালে 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন' নামে আর একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে স্বদেশ-প্রেমিক ভারতীয় নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য যে বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার অবতারণা করেন, তাহার বিভিন্ন ধারা নানা খাতে প্রবাহিত হইয়া ভারতীয় জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবার জন্য যে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য জনসাধারণ বহু দিন হইতে আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, জাতীয় কংগ্রেসই সেই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। কালক্রমে কংগ্রেসই ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত-প্রতীক হইয়া উঠিল। সমগ্র জাতি কংগ্রেসের নেতৃত্বে দ্রুতগতিতে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

উজ্জীবন

অমিতাভ চৌধুরী

হাজার বছর পরে আমি জাগলাম,
সূর্য্যেতে বাড়ায়ে হাত যে ভিক্ষা মাগলাম,
সে তো স্বপ্ন নয়
আমি মৃত্যুঞ্জয়।

ফসিলের ভীড়ে
আর সচঞ্চল জটায়ুর নীড়ে
আমার এ প্রাণ,
মৃত্যুর ওপারে গিয়ে করে আরো নূতনে সন্ধান।

কিছু নয়, কিছু নয়, সে এক বিস্ময়,
এখনো আকাশ ভেদে নগ-হিমালয়।
প্রাণের মশাল জেলে হোক অঙ্গীকার,
উদ্ধত বহ্নিশিখা করে নি ক' অন্তিম স্বীকার।
এই তো অতীত আমি এ নহে সংশয়,
অনাদি কালের স্রোতে আমি মৃত্যুঞ্জয়।
কালের চরণ-ধ্বনি শুনি অবিরাম
হে সূর্য্য, তোমারে প্রণাম।
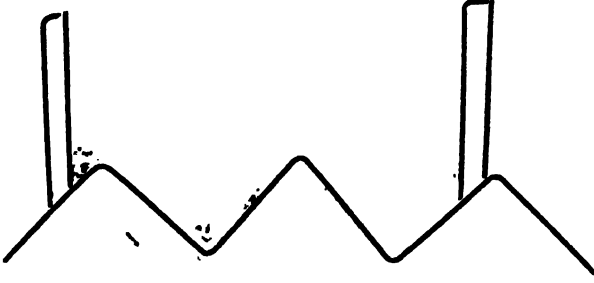
কল-কারখানায় শ্রমিক-সমস্যা

শ্রীমনকুমার সেন

শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বিরোধের ফলে ভারতে শিল্পপণ্যের উৎপাদনে কিরূপ মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে তাহা আজ আর কাহারও অজানা নহে; বস্তুতঃ, জনসাধারণ তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের দ্রব্য-সামগ্রীর অপ্রতুলতা ও দুর্মূল্য হইতেই এই গুরুতর অবস্থা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। অবস্থার এইরূপ দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গত ডিসেম্বর মাসে মালিক, শ্রমিক ও সরকারী প্রতিনিধিগণ একটি শিল্প-সম্মেলনে সম্মিলিত হন। সম্মেলন একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেন,—তাহা এই যে, 'যেহেতু শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পূর্ণ সহযোগ এবং মৈত্রী সম্পর্ক বজায় না থাকিলে শিল্প-পণ্যের উৎপাদন সম্ভব নহে' তজ্জন্য আগামী তিন বৎসর কাল সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মঘট, 'লক-আউট' বা অবরোধ বন্ধ রাখিয়া শ্রম-শিল্পে শান্তি বজায় রাখিবার নিমিত্ত শ্রমিক ও মালিক এই উভয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হইতেছে। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনাও রচিত হয় এবং সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, সম্মেলন-পরবর্ত্তী গত কয়েক মাসের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে, উক্ত প্রস্তাব আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই এবং তাহার কারণ, প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকিলেও পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ কার্য্যকরী ভাবে পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন নাই।

কল-কারখানার শ্রমিকগণ তাহাদের অভাব-অভিযোগ পূরণের নিমিত্ত ধর্ম্মঘটের পন্থা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন গত ১৯১৯ সাল হইতে। এই বৎসরে ব্যাপক শ্রমিক-বিরোধের উৎপত্তি হয় এবং ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইতে থাকে। এই সময়ে যে সকল 'ধর্ম্মঘট কমিটি' গঠন করা হয়, উত্তর কালে সেগুলিই 'ট্রেড ইউনিয়ন'রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের বৎসর কয়টিতে শিল্প-ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ও ব্যাপক কর্ম্ম-সংস্থান ঘটে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্প-জাত পণ্যের লাভের অঙ্কও স্ফীত হয়। যুদ্ধের অবসানে স্বাভাবিকরূপেই উৎপাদন বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং শিল্প-ব্যবসায়ের সঙ্কোচনের ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়ে। ১৯২৪ সালের প্রারম্ভে এই 'মন্দা'র গুরুতর প্রতিক্রিয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। শিল্পপতিগণ শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস করেন এবং বোনাস ও অতিরিক্ত ভাতা প্রভৃতি বাতিল করিয়া দেন। এইরূপে যে অর্থ-সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ শ্রমিক-মালিক বিরোধের উদ্ভব হইতে থাকে। এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যে 'রাজকীয় কমিশন' (Royal Commission on Labour) নিয়োগ করা হয়, তাঁহাদের মতে '১৯১৮—৩০ সালের মধ্যে যতগুলি ধর্ম্মঘট হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিই প্রধানতঃ বা সম্পূর্ণরূপেই এই অর্থসঙ্কটজনিত।'

ট্রেড ইউনিউন এ্যাক্ট: ১৯২৬

ধর্ম্মঘটের ফলে শ্রমিকগণ একটি ঐক্যবদ্ধ সূত্রে অগ্রসর হইতে থাকেন, এবং ১৯২৬ সালে 'ট্রেড ইউনিয়ন আইন' পাশ হইলে শ্রমিক আন্দোলন প্রভূত শক্তিলাভ করে। ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৮৭টি এবং ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৮৩ হাজার। গবর্ণমেণ্ট, জনসাধারণ ও মালিকদের মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের কতকগুলি ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই পূর্ব্বের ন্যায় বিরোধ সৃষ্টি হইতে থাকে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ভারতে যে আন্দোলন প্রসার লাভ করিতে থাকে, অনিবার্য্যরূপেই তাহার প্রভাব শ্রমিকগণকে অধিকতর সচেতন করিয়া তোলে এবং শ্রমিক আন্দোলনে বৈপ্লবিক ধ্বনি ও নিজস্ব পতাকার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯২৯ সালে 'শ্রমিক বিরোধ আইন' (Trade Disputes Act) পাশ করিয়া 'সহানুভূতিসূচক ধর্ম্মঘট' এবং গবর্ণমেণ্টকে অসঙ্গত উপায়ে নতি স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মঘট অবলম্বন দণ্ডার্হ ঘোষণা করা হয়। ১৯২৮ সালের 'জন-নিরাপত্তা আইন' (Public Safety Bill) ভাইসরয়ের অনুমোদন-প্রাপ্ত হইয়া বামপন্থী শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে থাকে। এই সময়ে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকূলে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিছু কালের মধ্যে সমগ্র ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বামপন্থিগণের পরিচালনাধীন হইয়া পড়ে এবং অসন্তোষ বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিক-বিরোধের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধিকন্তু, আকস্মিক ভাবে গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিভিন্ন স্থান বিধ্বস্ত হয় এবং অবস্থার জটিলতা সবিশেষ বৃদ্ধি পায়।

শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ ও আন্দোলন প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ জে, এইচ হুইটলির নেতৃত্বে 'রাজকীয় কমিশন' শ্রমিক-বিরোধ সম্পর্কে তদন্তে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে শ্রমিক মহলে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয় এবং ভারতের 'ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' দুইটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই দলীয় গোলযোগের জন্য ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত শ্রম-শিল্পে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই।

অতঃপর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে এবং বামপন্থিগণের পরিচালিত শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যাও আবার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৩০—৩৬ সালে শ্রমিক-বিরোধের সংখ্যা ছিল ১০৩৯, আর ১৯৩৭—৩৯ সালেই এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮৪। সুতরাং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ, বিশেষরূপে বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ এই বিষয়ে তৎপর হইয়া শ্রমিক-বিরোধ নিষ্পত্তির কার্য্যে অগ্রণী হন। তাঁহারা শ্রমিক তদন্ত কমিটিও

নিযুক্ত করেন এবং শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার নিমিত্ত উপযুক্ত বিধি-বিধান রচনায় প্রবৃত্ত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ায় প্রাদেশিক তদন্ত কমিটি সমূহ তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিতে পারেন নাই। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের প্রলয়ঙ্কর নিনাদ শ্রুত হয়—অকস্মাৎ সকল দেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা এবং অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইতে থাকে। যুদ্ধোদ্যমের ক্রমবর্দ্ধিত চাহিদার ফলে নূতন নূতন কল-কারখানা ও শিল্প-ব্যবসায়ের পত্তন অথবা পুরাতন কারখানাগুলির প্রসার হইতে থাকে। ১৯৩৯—৪৫ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যাপক কর্ম্ম-চাঞ্চল্যে লক্ষ লক্ষ নূতন শ্রমিক কর্ম্মের সন্ধান পায়। সঙ্গে সঙ্গে মজুরী, দুর্ম্মূল্য ভাতা, বোনাস প্রভৃতি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বিরোধেরও উৎপত্তি হইতে থাকে। দ্রব্য-সামগ্রীর মহার্ঘতায় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বহু গুণ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের সর্ব্বত্র অতিরিক্ত ভাতা, যুদ্ধকালীন লভ্যাংশের অংশ দাবী প্রভৃতির ভিত্তিতে শ্রমিকগণ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' আরম্ভ করে। উৎপাদন অব্যাহত রাখিয়া যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ভারত সরকার ১৯৪২ সালে 'ভারত রক্ষা আইনের' ৮১-এ ধারা জারী করিয়া ধর্ম্মঘট, লক-আউট প্রভৃতি বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং তৎস্থলে সালিশীর প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে প্রয়াস পান। ঐ বৎসরের মে মাসে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহও ভারতরক্ষা আইনের এই নূতন ক্ষমতার অধিকার লাভ করেন। যে সকল শিল্প-ব্যবসায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রহিয়াছে তাহাতে বিরোধ এড়াইবার জন্য ১৯৪৫ সালে একটি স্থায়ী সালিশী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয়। রেলওয়ে, কয়লার খনি, তৈল খনি, প্রধান প্রধান বন্দর সমূহের পরিচালনা এবং অনুরূপ অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্বাধীন, তাহাতে এই সালিশীর কার্য্য অনুসৃত হইতে থাকে। এই সালিশী ব্যবস্থায় রহিয়াছেন এক জন চীফ লেবার কমিশনার এবং ডেপুটী লেবার কমিশনার। ইঁহাদের প্রধান দপ্তর নয়াদিল্লীতে অবস্থিত। ইঁহাদের কার্য্যে সহকারী হইতেছেন বোম্বাই, কলিকাতা ও লাহোরস্থিত (বর্ত্তমানে লাহোরের কার্য্যালয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে) রিজিওনাল কমিশনারগণ। ইহা ছাড়া আছেন এক জন ক্যাণ্টিন ইনস্পেক্টর, নয় জন সালিশী কর্ম্মচারী এবং ৬০ জন লেবার ইনস্পেক্টর। কয়লার খনি ও চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য পৃথক্ সংস্থা রহিয়াছে। এই স্থায়ী সালিশী ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিক-বিরোধ কতটা এড়ানো সম্ভব হইয়াছে, নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত সালিশী বোর্ড এই সকল মামলা প্রাপ্ত হন :—

মাস	ধর্ম্মঘট ও ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা	আপোষ-নিষ্পত্তির সংখ্যা
১৯৪৬—এপ্রিল	৩১	২৫
মে	৩৩	২৩
জুন	১৮	১৫
জুলাই	১৯	১৪
আগষ্ট	১০	৯
সেপ্টেম্বর	২৬	২৩
অক্টোবর	২৪	২৪
নভেম্বর	২৪	২২
ডিসেম্বর	৩৩	৩১
১৯৪৭—জানুয়ারী	৪১	৩৮
ফেব্রুয়ারী	৫৬	৪৭
মার্চ্চ (১লা হইতে ১৫ই)	১৬	১১
	৩৩৯	২৮৯

কিন্তু আইনানুযায়ী ব্যবস্থার দ্বারা শ্রম-শিল্পে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না বা হইলেও তাহার সীমা কতটুকু তাহা বিবেচনা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। আইনের প্রয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির ফলে দেশে কোনও 'আপৎকালীন অবস্থা' বর্ত্তমান না থাকে, তখনও যদি আইনের প্রয়োগ দ্বারা কল-কারখানার উৎপাদন-কার্য্যে শ্রমিককে ও মালিককে নিযুক্ত রাখিতে হয় তাহা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইতে পারে না। তাছাড়া, শ্রমিক ও মালিক সকল বিরোধের ক্ষেত্রেই বাহিরের সালিশীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে—শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের স্থায়ী নৈকট্য সাধন করিতে হইলে তাহাও অবাঞ্ছনীয়। মালিক, শ্রমিক ও এতদুভয়ের কল্যাণকামী রাষ্ট্র এই নৈতিক দিক্‌টির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিলে এবং তদনুযায়ী প্রভাব-প্রচার প্রয়োগ করিলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের তিক্ততার স্থায়ী অবসান ঘটিতে পারে; অবশ্য তৎপূর্ব্বে সকল পক্ষেরই কালোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

মহাত্মা গান্ধী ও চীনা যুবক

মীরা ঘোষ

মহাত্মা গান্ধীর সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহারাই গান্ধীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। গান্ধীজীর চরিত্র ছিল ইস্পাতের স্থায় দৃঢ় ও ফুলের মত কোমল। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজের মধ্য দিয়া তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজী পাপকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু পাপীকে সংশোধন করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। গান্ধীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া কিরূপে এক চীনা যুবকের বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে নিম্নে প্রদত্ত গল্প হইতে তাহা জানা যাইবে।

১৯২৫ সাল। গান্ধীজী তখন কলিকাতায়। ভারতের অন্যতম নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি প্রথম ভিক্ষাপাত্র হস্তে আবেদন জানান দেশবাসীর নিকট। ঠিক সেই সময়ে একটি চীনা যুবক ভারতে আসে। সেই যুবকটি ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ—গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের নাম খুব শুনিয়াছিল। সেই জন্য ঐ দুই পুরুষদ্বয়কে দেখিবার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিখ্যাত শান্তিনিকেতনে সে আতিথ্য গ্রহণ করে। সাহিত্যে ও কাব্যে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল ঐ যুবকটির। তাহার মধ্যে বেশ একটা স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব ছিল, সেই জন্য শান্তিনিকেতনের সকলেই তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন। দৈবক্রমে এক অঘটন ঘটিয়া গেল। কিছু দিন পরে সেই যুবকটি জানিতে পারিল যে, শান্তিনিকেতনের অনেকেই তাহাকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। ঐ কথা জানিতে পারিয়া যুবকটি খুবই মর্ম্মাহত হইল এবং গান্ধীজীর দর্শন লাভের জন্য তাঁহাকে একটি পত্র লিখিল। গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই তখন জীবিত ছিলেন। তিনি যুবকটিকে গান্ধীজীর সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র দিলেন। যুবকটি কলিকাতায় আসিয়া মহামানব গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিলেন। গান্ধীজী যুবকটির সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে যুবকটি সত্যই ভাল, কোনরূপ দুরভিসন্ধি তাহার নাই। সেই জন্য তিনি যুবকটিকে বলিলেন, তিনি স্বয়ং তাহার হইয়া জামিন থাকিবেন এবং তিনি যদি গুরুদেবের নিকট তাহার সম্বন্ধে একটু কিছু লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আর কেহ তাহাকে অযথা অবিশ্বাস করিবে না। অপরিচিতের প্রতি গান্ধীজীর এই সহানুভূতি দেখিয়া যুবকটি মুগ্ধ হইয়া গেল এবং গান্ধীজীর প্রতি সে আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। যুবকটি শান্তিনিকেতনে যাইতে অসম্মতি জানাইল এবং গান্ধীজীর আশ্রমের স্থান ভিক্ষা করিল। বাপুজী নানা প্রকারে যুবকটিকে বুঝাইলেন যে তাঁহার আশ্রম কষ্টের স্থান, সেখানে আরাম নাই। বাপুজীর আশ্রমে তাহার খুব কষ্ট হইবে, শান্তিনিকেতনে সে অনেক আরামে থাকিতে পারিবে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের যোগাযোগ আছে, কারণ তাহারা সকল দেশের লোককে সাদরে আহ্বান করেন। যুবকটি বলিল, "শান্তিনিকেতনের লোকেরা খুবই ভাল এবং তাহারও শান্তিনিকেতনের আশ্রম খুবই ভাল লাগিয়াছে, এখন সে দিন-কতক তাঁহার আশ্রমে থাকিতে চায়।" অবশেষে যুবকটির বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া বাপুজী তাহাকে অনুমতি দিলেন।

যুবকটির চীনা নাম গান্ধীজীর স্মরণ থাকিত না। সেই জন্য তিনি যুবকটির নাম দেন শান্তি। শান্তি আশ্রমে ছোট ছেলে-মেয়েদের আনন্দের উৎস ছিল। শান্তি সারা দিন আশ্রম বালক-বালিকাদের সহিত নানারূপ খেলাধূলা করিয়া কাটাইয়া দিত।

প্রথমে আশ্রমের রান্নার ভার, জল তুলিবার ভার পড়িল শান্তির উপর। শান্তি আশ্রমের অন্যান্য সকলের ন্যায় চরকা কাটিবার চেষ্টা করিত খুব। এই ভাবে মাস চলিয়া যাইতে লাগিল। শান্তির মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে লাগিল। সে কঠিন পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিল। আস্তে আস্তে সে আশ্রমের সকল কাজ শিখিয়া ফেলিল। তখন এমন কোন কাজ রহিল না যাহা শান্তির পক্ষে করা অসম্ভব।

গান্ধীজীর সমস্ত লেখা সে গভীর মনযোগ দিয়া পড়িত এবং তাহা হইতে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিত। হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, শান্তি কি যেন তন্ময় হইয়া লিখিতেছে। অজস্র পাতা সে লিখিয়া ফেলিল। লেখা শেষ করিয়া সে আস্তে আস্তে বাপুজীর ঘরে প্রবেশ করিল এবং বলিল,—সে যখন সিঙ্গাপুরে অন্যান্য চীনা যুবকদের সহিত বাস করিত তখন সে বহু অন্যায় কাজ করিয়াছে, সে অহরহ তাহার দুষ্কর্ম্মের জন্য কষ্ট পাইতেছে, তাহার বিশ্বাস, গান্ধীজীই কেবল মাত্র তাহাকে ঐ পাপ হইতে মুক্তিদান করিতে পারেন। সেই জন্য সে ঠিক করিয়াছে, সাক্ষাৎ দেবতা গান্ধীজীকে সাক্ষী রাখিয়া সে দশ দিন উপবাস করিয়া দেহকে পবিত্র করিবে এবং তাহা হইলেই সে পাপ হইতে মুক্তি পাইবে। বাপুজী শান্তির কথা শুনিয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি দেখিয়াছি তোমার লেখাটি খুবই বড় হইয়াছে। আমাকে প্রথমে সময় করিয়া উহা পড়িতে দাও তার পর তোমার উপবাসের পালা—আমার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি কোন কিছু করিও না।"

গান্ধীজী তাঁহার সময় মত ঐ লেখাটি পড়িলেন এবং তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে বার বার এই কথাই মনে হইতে লাগিল, আশ্রম-বাসে শান্তির কি বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিল—জীবনে সে একটা সত্য পথ খুঁজিয়া পাইল। অন্যায় দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহার কি

গভীর অনুতাপ ! মুক্তকণ্ঠে ও নিঃসঙ্কোচে সে তাহার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। আত্ম-সংশোধনের জন্য কি ব্যাকুলতা তাহার ! প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র জীবন যাপনের জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। শান্তির এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার শক্তি দেখিয়া বাপুজী অভিভূত হইয়া পড়িলেন, শান্তির প্রতি তাহার ভালবাসা আরও গভীরতম হইয়া উঠিল।

বাপুজী শান্তিকে উপবাস করিবার অনুমতি দান করিলেন। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিলেন সত্যই শান্তি অনুতাপানলে দগ্ধ, তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই। শান্তি উপবাস আরম্ভ করিল। সে বেশ স্বচ্ছন্দে উহা পালন করিতে লাগিল। কোনরূপ ক্লান্তি ও কষ্টের ভাব তাহার মুখে-চোখে দেখা যাইত না। গান্ধীজী প্রতিদিন এক-বার করিয়া শান্তিকে দেখিতে যাইতেন। ১৫।২০ মিনিট ধরিয়া শান্তি গান্ধীজীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিত। দশ দিনের দিন শান্তি তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিল। তাহার সেই পূর্ব্বের লেখাটি আবার সে অন্য একটি পৃষ্ঠায় লিখিল। গান্ধীজী ঐ দ্বিতীয় লেখাটিতে স্বাক্ষর করিলেন। ঐ দ্বিতীয় লেখাটি শান্তির নিকট রহিল। তাহার প্রথম লেখাটি সে গান্ধীজীর নিকট অর্পণ করিল।

গান্ধীজীর আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতিতে শান্তি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। গান্ধীজীর মানবতার সন্ধান সে পাইয়াছিল। সেই জন্য ঐ বিরাট পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া শান্তি মনে শান্তি ও তৃপ্তি পাইল।

কিছু দিন পরে শান্তি তাহার জন্মভূমি চীনে চলিয়া গেল। তথায় সে একটি খবরের কাগজের সম্পাদক হইল, কিন্তু গান্ধীজীর দেওয়া সেই সুন্দর নামটি শান্তি ভুলিতে পারে নাই। শান্তি নামেই সে কাগজটি চালায়। তাহার ইচ্ছা ছিল, জীবনের বাকী দিনগুলি সে গান্ধীবাদ পড়িয়া ও চীনে তাহা প্রচার করিয়া কাটাইবে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারী নায়িকা

শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায়

পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ কর্তৃক ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন চলিয়া আসিতেছিল—এত দিনে তাহার অবসান হইয়াছে—ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। নিজের মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য শত শত শহীদ অকুণ্ঠিত চিত্তে সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁহারা জীবন দিয়াছেন—তাঁহাদের এই আত্মদানের কাহিনী জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মৃত্যুভয় তাঁহাদের ছিল না—তাঁহারা জানিতেন যে প্রত্যেকের জীবনেই মৃত্যু অনিবার্য্য—কিন্তু বরণীয় মৃত্যু চিরদিনই অমরতার গৌরবে মহীয়ান্। তাঁহারা সেই গৌরবময় মৃত্যু বরণ করিয়া জাতীয় জীবনে অমর হইয়া রহিলেন। অধীনতা-পাশ হইতে স্বদেশকে মুক্ত করিবার প্রয়াস বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছিল ১৮৫৭-১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্রোহী হিন্দু, মুসলমান, মারাঠা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বীরা মিলিত ভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থান প্রথমে বিদ্রোহের আকারেই প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাই পরিশেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার ঘটনাচক্রে যে তিন জনের স্কন্ধে পড়িয়াছিল—ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই তাঁহাদের অন্যতমা। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিতে গেলে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সৈন্যরা কেন বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে জানা দরকার।

যে সময় এই বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। সেই সময় ভারতের সর্ব্বত্র ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটা অশান্তি এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন সৈন্যদিগকে এনফিল্ড রাইফেল নামক নতুন ধরণের বন্দুক প্রদান করা হয়—এই বন্দুকে টোটা বা কার্ত্তুজ ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষের বহু স্থানে এইরূপ একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল যে, সরকার বাহাদুর গরু এবং শূকরের চর্বি মিশ্রিত কার্ত্তুজ ব্যবহার করিবার জন্য সিপাহীদিগকে বাধ্য করিয়াছেন। এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইবার পর প্রথমেই বাংলা দেশে কলিকাতার নিকটস্থ বারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল ; কিন্তু প্রকৃত বিদ্রোহ আরম্ভ হইল মীরাট এবং লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে। তার পর বিদ্রোহীরা দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল। দিল্লীর অধিবাসীদের কিয়দংশ বিদ্রোহী সেনাদের সহিত যোগদান করিয়া দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। এই সকল বিদ্রোহী সিপাহীদের হস্তে অনেক স্থানেই ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রাণ হারাইয়াছিল। বিদ্রোহীদের কণ্ঠে শোনা গেল—

"দিল্লী চলো ভাইয়া—দিল্লী চলো।"

দেখিতে দেখিতে কাণপুর, মধ্য-ভারত, ঝাঁসী প্রভৃতি দেশেও বিদ্রোহ-বহ্নি ছড়াইয়া পড়িল। সে সময়ে ঝাঁসী ইংরেজের অন্তর্ভুক্ত করদ রাজ্য ছিল। নিজের একমাত্র পুত্র জীবিত না থাকাতে গঙ্গাধর রাও তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি-ভ্রাতার পুত্র দামোদর রাওকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে মহারাজা গঙ্গাধর রাও ইংরাজ সরকারকে তাঁহার পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিষয় জানাইলেন এবং ইহাও উল্লেখ করিলেন—যে পর্য্যন্ত বালক দামোদর রাও বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহারাণী লক্ষ্মীবাই তাঁহার হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বড়লাট বাহাদুর গঙ্গাধর রাও ও রাণীর আবেদন মঞ্জুর করিলেন না। সে জন্য গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর ঝাঁসী ইংরেজ অধিকারে আসিল। রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য মাসিক মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, এই অর্থে রাণীর ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। ঝাঁসী হিন্দুরাজ্য—সেখানে গো-বধ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ইংরাজ প্রভুরা সেখানে এই পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহার পর গবর্ণমেণ্ট হইতে রাণীকে তাঁহার স্বামী গঙ্গাধর রাও কর্তৃক গৃহীত ঋণ-পরিশোধের জন্য আদেশ দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে রাণীর মাসিক বৃত্তি হইতে কিয়দংশ হ্রাস করা হইল। এইরূপে সর্ব্ববিধ বিষয়ে কোম্পানীর অনুদার ব্যবহারে রাণীর চিত্ত ক্রমশঃ তিক্ত ও ব্যথিত হইয়া উঠিল। ইংরাজের দুর্ব্ব্যবহারে এক দিন এই পুণ্যবতী মহীয়সী মহিলার হৃদয়েও জ্বলিয়া উঠিল

টাট্‌কা ও স্বাদু রাখার ব্যবস্থা

পদে পদে সুরক্ষিত রাখা
হয় বলেই ব্রুক বণ্ড চা
টাট্‌কা থাকে

সদ্য তোলা চায়ের পাতা থেকে বাগানের কারখানায় তৈরী হয় ব্রুক বণ্ড চা। সযত্নে সংমিশ্রণের পরেই প্যাক করা হয় এবং কোম্পানীর অতুলনীয় সরবরাহ ব্যবস্থায় পৌঁছয় গিয়ে দোকানে দোকানে। খুচরা বিক্রেতাদের ঘন ঘন মাল সরবরাহ করা হয় শুধু তাদের উপস্থিত দরকার মেটানোর জন্যে। ব্রুক বণ্ড চা পুরোণ হতে পারে না, কারণ এর সরবরাহে যেমন দেরী হয় না, তেমনি দোকানেও বেশি-দিন পড়ে থাকতে পায় না।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ★

এঁর উপরে থাকে অনেকগুলি ক'রে ব্রুক বণ্ড ডিপোর কাজ নিয়ন্ত্রণের ভার। এই সব ডিপো থেকেই খুচরা বিক্রেতাদের চা সরবরাহ করা হয়। আর ব্রুক বণ্ডের ফ্যাক্টরী থেকে এই ডিপোগুলিতে ঘন ঘন চায়ের চালান ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের তত্ত্বাবধানে সুনিশ্চিতরূপে এসে পৌঁছায়। এঁদের সুনিয়ন্ত্রণের ফলে সারা বছরই সর্ব্বজনপ্রিয় টাট্‌কা ব্রুক বণ্ড চা সহজেই পাওয়া যায়।

ব্রুক বণ্ড চা

দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি
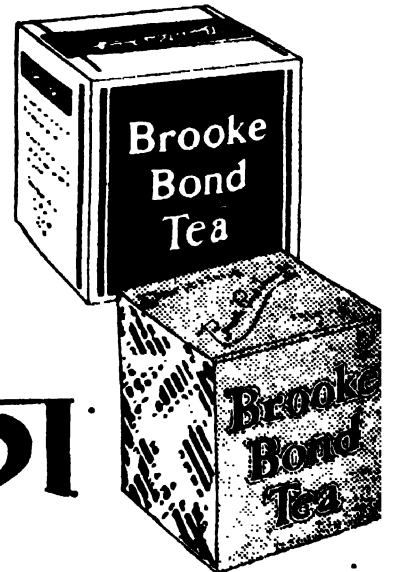
বিদ্রোহের অনল। লক্ষ্মীবাইয়ের মনের কোণে ইংরেজের প্রতি যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধুমিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা এক সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

ঠিক এমনি সময়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন ঝাঁসীর সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানকার ইউরোপীয় অধিনায়ক ও অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই উন্মত্ত সিপাহীদের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত উত্তেজিত ভাবে দলে দলে আসিয়া ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিল। দলের অধিনায়ক রাণীর নিকট তিন লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। অবশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া রাণী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া এক লক্ষ টাকা বিদ্রোহী দলের সর্দারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্রোহীরা টাকা পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে দিল্লী অভিমুখে চলিয়া গেল। বিদ্রোহী সিপাহীদের আক্রমণেই ঝাঁসীতে ইংরাজ কোম্পানীর প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঝাঁসী রাজ্য সম্পূর্ণরূপে রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের শাসনাধীনে আসিল।

এই সময়ে রাণী তাঁহার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাজ্যের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং দেশের সর্ববিধ সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মীবাই যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন, সেইরূপ ছিল তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ সুনিপুণ ভাবে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা। তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও কূটবুদ্ধির পরিচয় ইংরাজ রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণ ভাবে অবগত ছিলেন। ঝাঁসী রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণে রাণীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রুদ্ধ সদাশিব রাও করায়া দুর্গ অধিকার করিয়া নিজেকে ঝাঁসীর রাজা বলিয়া প্রচার করেন। রাণী অসীম সাহসের সহিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সদাশিব রাওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অনায়াসে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ঝাঁসীর দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন।

ব্রিটিশ প্রভাব বিলুপ্ত হইবার পর নিকটবর্ত্তী রাজা ও নবাবেরা ঝাঁসীর রাণীকে অসহায় মনে করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বার বার প্রলুব্ধ হন। তাঁহার প্রবল শত্রু ওর্চা রাজ্যের বন্দেলা রাণা তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ নথেখাঁর অধিনায়কত্বে ঝাঁসী বিজয় করিবার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলে রাণী যে অদ্ভুত সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের নেতৃত্বাধীনে পুরুষ সেনাবাহিনীর সহিত নারীসেনাও রণবেশে সজ্জিতা হইয়া নথেখাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। লক্ষ্মীবাইয়ের অসাধারণ বীরত্বপ্রভাবে শেষ পর্য্যন্ত নথেখাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এদিকে কর্ত্তব্য-পরায়ণা রাণী তাঁহার এই বিজয়বার্ত্তা গবর্ণর জেনারেলের এজেন্ট কর্ণেল হ্যামিলটনের নিকট প্রেরণ করেন কিন্তু বন্দেলার ধূর্ত্ত কর্ম্ম-চারিগণ কৌশলে সেই লিপিখানি সংগ্রহ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাণীর সম্পর্কে অনেক অসত্য কথা লিখিয়া এজেন্টের নিকট পাঠাইয়া দিল। বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের ফলে কোথায় রাণী দশ মাস কাল ঝাঁসী রাজ্য সংরক্ষণ করিবার জন্য পুরস্কৃত হইবেন—তাহা না হইয়া হইল তাহার বিপরীত।

ইংরাজের অনুপস্থিতি কালে রাণী লক্ষ্মীবাই দশ মাস কাল পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের শাসনকার্য্যে যে নিপুণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্মকার্য্য, অধ্যয়ন, পারিবারিক কার্য্য ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। লক্ষ্মীবাই তখন মাত্র তেইশ বৎসর বয়স্কা যুবতী—তিনি ছিলেন সুন্দরী এবং গুণবতী। অশ্বা-রোহণে ছিল তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র তিনি অশ্বারোহণে পর্য্যটন করিতেন। তিনি প্রকাশ্য দরবারে বিচার-প্রার্থীদের আবেদন ও নিবেদন শুনিতেন এবং সমীপস্থ কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ দিতেন। বিচার-কার্য্যে, শাসন-সংরক্ষণে, সৈন্য-পরিচালনে এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিবিধানে যেমন ছিল তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা আবার তেমনি তিনি দয়া, দাক্ষিণ্য ও সৌজন্য প্রভৃতি নানাবিধ গুণের আধার ছিলেন। তিনি হতভাগ্য, আহত ও গৃহহারা সৈনিকদিগের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতেন, আহারের জন্য অন্নসত্র খুলিয়া দিতেন। আহতদের চিকিৎসা কালে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন এবং সেবা ও অজস্র সান্ত্বনা বাক্যে উৎসাহিত করিয়া তাহাদের দুঃখের লাঘব করিতেন। এক দিকে যেমন ছিল তাঁহার চরিত্রের কঠোরতা, অন্য দিকে ছিল তেমনি তাঁহার চরিত্রের কোমলতা।

রাণীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার একমাত্র পুত্র দামোদর রাওকে ঝাঁসীর ভাবী উত্তরাধিকারিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরিশ্রম ও শাসন-নৈপুণ্যের পুরস্কার দিবেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। এদিকে ইংরাজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ বিদ্রোহ দমন করিতে ঝাঁসীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় রাণী কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকট সমুদয় বিষয় বিবৃত করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ইংরাজ সেনাপতির ঔদ্ধত্যপূর্ণ অপমানজনক ব্যবহারে রাণী প্রাণে আঘাত পাইলেন। তিনি আপনাকে যারপর-নাই অপমানিত মনে করিয়া নিজের আত্ম-সম্মান ও রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন; কারণ, অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ—ইহাই ছিল রাণীর মূলমন্ত্র। ইংরাজ চাহিলেন ঝাঁসী দখল করিতে, কিন্তু রাণী লক্ষ্মীবাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি।"

২৩শে মার্চ্চ। রাণী ও ইংরেজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই বিপদের মধ্যে পড়িয়াও সুন্দরী তরুণী লক্ষ্মীবাই কোনরূপে বিচলিত না হইয়া আক্রমণকারীদের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রকৃত বীর-রমণীর ন্যায় সাহস ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করেন। ইংরাজের সুসজ্জিত রণনিপুণ সৈন্যবাহিনীর তুলনায় রাণীর সৈন্যসংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু তথাপি ঝাঁসীর রাণীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া শক্তিশালী ইংরাজের বিরুদ্ধে ঝাঁসীর সৈন্যদল অসাধারণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এক দিকে প্রজাদের রক্ষণ ও পালন, অপর দিকে যুদ্ধের আয়োজন ও পরিচালন—এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়িয়াও রাণী ভীতিবিহ্বলা হইয়া হাল ছাড়িলেন না। এমন কি, ইংরাজ সেনাপতিরা পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে রাণীর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। এই ভাবে একাদশ দিন পর্য্যন্ত সমান ভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল। কখনও বিজয়িনী হইতেন ঝাঁসীর রাণী—আবার কখনও হইত ইংরাজের জয়। এই সময় বিদ্রোহী দলের নেতা তাঁতিয়া টোপী ঝাঁসীর রাণীকে সাহায্

করিবার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু রণদক্ষ কৌশলী হিউ রোজের আকস্মিক আক্রমণে তাঁতিয়ার অগ্রগামী সৈন্যদল পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াও রাণী নিরাশ হইলেন না বা তাঁহার উৎসাহ কমিল না। তিনি আত্মসমর্পণ না করিয়া নিজের দেশ, জাতির সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত নবীন উদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে কয়েক দিনব্যাপী ভীষণ সংগ্রামের পর যখন রাণী দেখিলেন যে আর কিছুতেই রাজ্য রক্ষা করা যাইতেছে না, তখন একবার আপনার দুর্গের দিকে শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া গভীর নিশীথে মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ তিনি ঝাঁসীর দুর্গ ত্যাগ করেন।

স্যার হিউ রোজ রাণীকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করিবার জন্য লেফটেন্যান্ট ওয়াকারকে প্রেরণ করেন; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, রাণীর ভাগ্যে কোন অসম্মান ঘটে নাই। কর্ণেল ওয়াকার বিদ্যুদ্বেগে পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে রাণীর নিকটবর্তী হইলেন, কিন্তু রাণী তৎক্ষণাৎ শাণিত তরবারি দ্বারা ওয়াকারকে আঘাত করেন। ওয়াকার ভূপতিত হইলে রাণী সেই সুযোগে নির্ব্বিঘ্নে কাল্পিতে পৌঁছিলেন এবং বিদ্রোহী দলের অধিনায়ক নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী ও রাও সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন—রাণীর অনুরোধ রক্ষিত হইল। এই সময় রাণী পুরুষের বেশে সজ্জিতা হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা যে কোন রণ-নায়কের পক্ষে গৌরবের বিষয়। কাল্পির যুদ্ধে রাণী যে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাহার তুলনা নাই। কিন্তু রাওসাহেব পলায়ন করায় তাঁহাকেও রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। গর্ব্বিত রাওসাহেব এক জন সামান্য মহিলাকে নেতৃত্ব দিতে এবং তাঁহার নিকট যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন—যদিও পরে তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরে রাণীর অপূর্ব্ব বীরত্ব-প্রভাবে রাও সাহেব বিজয়-গৌরবে গোয়ালিয়র দুর্গ হস্তগত করেন।

গোয়ালিয়র পতনের সংবাদ অবিলম্বে স্যার হিউ রোজের নিকট পৌঁছিলে তিনি সসৈন্যে গোয়ালিয়রের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহার স্যায় রণকুশল বীরও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে ঝাঁসীর রাণী এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। স্যার হিউ রোজের সহিত দেশীয় সৈন্যদের মোরারিতে ভীষণ যুদ্ধ হইল। মোরার শীঘ্রই স্যার হিউ রোজের অধিকৃত হইল। এদিকে রাণী লক্ষ্মীবাই রণরঙ্গিণী বেশে বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উজ্জ্বল কৃপাণ-হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এই অগণিত ইংরাজ-সেনার পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখা রাণীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। এই ভাবে তিন দিন ধরিয়া অনবরত যুদ্ধ চলিবার পর রাণীর পক্ষের পরাজয় হইল এবং ইংরাজ পক্ষ জয়ী হইল।

রাণী যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের আর জয়ের আশা নাই, তখন একান্ত নিরুপায় হইয়া কতিপয় অনুচর সহ তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইতেই রাণী ইংরাজ-সেনার বেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এইরূপ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পড়িয়াও এই অসামান্যা তেজস্বিনী মহিলা অদ্ভুত শৌর্য্য ও বীরত্বের সহিত তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া তড়িদ্বেগে ধাবিত হইলেন এবং অন্তিম মুহূর্ত্তেও কতিপয় ইংরাজ অশ্বারোহীর সহিত কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অসি-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তার পর এক জন ইংরাজ অশ্বারোহীর অসির আঘাতে রাণীর মস্তকের দক্ষিণ ভাগ বিচ্ছিন্ন হইল এবং একটু পরেই রাণীর প্রাণহীন দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হইল—বীর-নারীর শোণিতস্পর্শে ধরণীর ধূলি পবিত্র হইয়া গেল। শত্রুর রক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে রাণী লক্ষ্মীবাই পরলোকে মহাপ্রয়াণ করেন। প্রকৃত বীরাঙ্গনার কাম্য-মৃত্যুই তাঁহার ঘটিয়াছিল।

রাণী মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে বলিয়াছিলেন—"আমার দেহ যেন ইংরাজের হাতে পড়িয়া কলঙ্কিত না হয়—আমি জীবনে ও মরণে বিজয়িনী—আমার সেই কথা রক্ষা করো তোমরা।"

সিপাহী বিদ্রোহের যুগে ঝাঁসীর রাণীর এই অনবদ্য বীরত্ব-কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। নৈতিক চরিত্রে বলবতী, কঠোর ব্রতাবলম্বিনী এই ভারত-বীরাঙ্গনা ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্না মহীয়সী মহিলা। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পরাক্রমে এই মনস্বিনী নারী সমাজের শীর্ষে আপনার ও নারী জাতির সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভোগ-বাসনা, বিলাস-ব্যসনাদি তাঁহাকে কখনও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এই মৃত্যু-বিজয়িনী নারী অমর লোকে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু—"মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি"—বীর রাণীর এই অগ্নিগর্ভ বাণী যুগে যুগে তাঁহার বীরত্বের কাহিনী চিরস্মরণীয় ও চির বরণীয় করিয়া রাখিবে। যে বীর-সম্রাজ্ঞী শতবর্ষ পূর্ব্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য ভীষণ সমরানলে আত্মবিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না, তাঁহারই পুণ্য অবদান-কাহিনী যুগে যুগে শুভ স্মরণীয় স্বাধীনতা উৎসবের দিনে বিশ্ববাসীর অন্তরে নব প্রেরণা ও আশার বাণী সঞ্চারিত করিয়া দিবে। রাণীর পুণ্য-নামেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র 'ঝাঁসীর রাণী সৈন্যবাহিনী' গঠন করিয়াছিলেন।

আমায় যদি প্রশ্ন কর

এলেনর রুজভেল্ট

[নানা বিষয়ে প্রশ্ন-সম্বলিত বহু চিঠি পান মিসেস্ রুজভেল্ট। তিনি আমেরিকার মেয়েদের কাগজ 'জার্ণালে'র মারফৎ সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। এখানে উদাহরণ-স্বরূপ কতকগুলি প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে দেওয়া হোল।]

প্রশ্ন :

কুড়ি বছরের বহু তরুণ-তরুণীর মত আমিও স্বামিহীন নিরালা ভবিষ্যতের ভয়াবহতার মুখোমুখি হতে চলেছি। কাউকে ভালবাসবার নেই—নেই কোন জীবন-সাথী। আমরা যারা বিয়ে করি না তাদের নিঃসঙ্গতার ভয়মুক্ত, পরিপূর্ণ, সুখময় জীবন যাপন করতে আপনি কি উপদেশ দেবেন? আপনি কি মনে করেন, অধিক শিক্ষা যা বুদ্ধিধর্ম্মী মানসের ক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষদের উপরের তলায় পৌঁছে দেয় তা ব্যর্থ তাদের জীবনে?

উত্তর :

যে সমস্ত মেয়েরা বিয়ে করে না তাদের আমি ছোটদের নিয়ে মেতে থাকতে উপদেশ দি, তাহলে নিজের সন্তান থাকলে যেমন হোত তেমনি পরের শিশুদের নিয়েও সমান সুখ-শান্তি পাওয়া যেতে পারে। আরো আমি তাদের উপদেশ দেব—তারা যেন সখ্যতার

প্রসবকাল সম্পূর্ন নিরাপদ হবে—
যদি আপনি
সংক্রমণের বিরুদ্ধে
সতর্কতা
অবলম্বন করেন
ডাক্তার আমায়কে 'ডেটল' ব্যবহার করে সংক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে বলেছেন
স্বামী ডাক্তারের কথামতো 'ডেটল' কিনে নিলেন
ফলে...
আমি সমস্ত প্রসূতিকেই প্রসবের সময় 'ডেটল'-এর উপর নির্ভর করতে বলি, তাছাড়া ঘরেও সব সময় 'ডেটল' রাখতে বলি
সব কাজ নির্ব্বিঘ্নেই সমাধা হল এবং 'ডেটল'-এর কল্যাণে সংক্রমনের হাত থেকে প্রসূতি সম্পূর্ন নিরাপদে রইলেন
এ কথা ডাক্তার বলেন
DETTOL
'DETTOL'
এটলাণ্টিস (ইষ্ট) লিঃ, ২০-১, চেতলা রোড, কলিকাতা
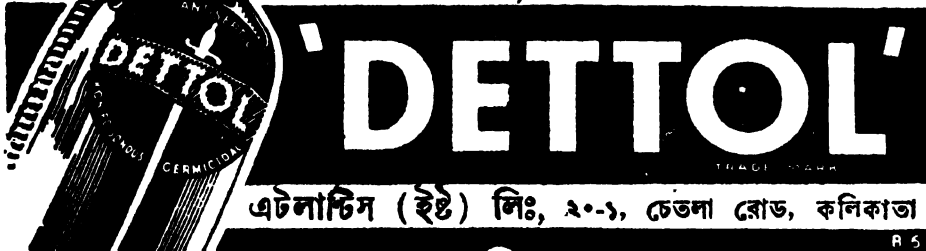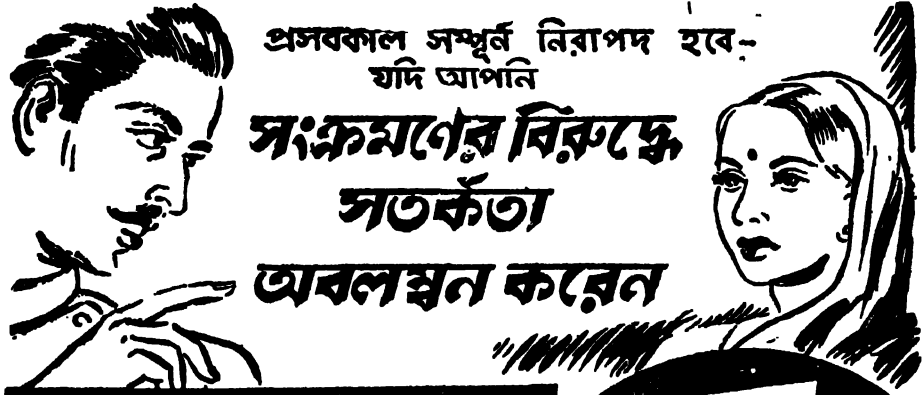
বন্ধন আরো নিবিড় করে তোলো—এমন কোন কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করে যা' তাদের বাধ্য-বাধকতার ডোরে বেঁধে রাখবে। তাহলে সময় আর তাদের ঘাড়ে দুর্বহ বোঝার মত চেপে বসবে না—জীবনও মনে হবে না অর্থহীন বিরাট শূন্য।

আমার মতে অধিক শিক্ষা বলে কিছু নেই এবং ভাগ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষা জুটেছে বলেই পুরুষদের সঙ্গে পার্থক্যের গণ্ডী টানা যায় না। সুবিধা-সুযোগ পেলে যে কোন চরিত্রবান লোকই সে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। দেখা গেছে, বই-পড়া বিদ্যালাভের সুযোগ পায়নি এমন বহু লোকই যারা পেয়েছে তাদের চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞানবান। শিক্ষা যদি পরিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মত যথেষ্ট বুদ্ধি না যোগায় যাতে গুণাগুণ বোঝবার ক্ষমতা আসে, নিজের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পরের আরো সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার যোগ্যতা যদি না দেয় যার ফলে তাদের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থের অবিরত সংঘর্ষ বাধে—সে ক্ষেত্রে আমাকে বলতেই হবে শিক্ষা ভালর চেয়ে মন্দই করেছে বেশী।

* * * *

প্রশ্ন :

আমার বয়স ষোল। আমার সমস্যা হোল, আমার বাবা-মা এই বয়সের আমোদ-প্রমোদ দেখতে পারেন না। আমি খেলাধূলা পছন্দ করি এবং স্কুলের খেলাধূলা নিয়ে অন্য সহরে যেতে চাই। কিন্তু বাবা-মা এর ঘোর বিরোধী। তাঁদের ইচ্ছে সপ্তাহের ছ'দিনই আমি বাড়ীতে থাকি। রবিবারে চার্চে যাই। বাড়ীতে থাকাও আমি পছন্দ করতুম কিন্তু বাড়ীতেও আমার আমোদ-আহ্লাদের সীমানা বেড়া দেওয়া। কোন হত্যাকাহিনী সিরিজ পড়া বা রেডিয়ো শোনা নিষেধ। আরো বাবা নিজেই সারা সন্ধ্যা রেডিও আগ্‌লে বসে থাকেন। আমি তাহলে কি করব? মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাব? এ কথাটা তাঁকে কি ক'রে বোঝাব যে আমার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন—বাইরে যেতে আমি ভালবাসি?

উত্তর :

না, আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তুম কখনই মা'র বিরুদ্ধে যেতাম না। আমার মনে হয়, যখন তুমি স্কুলের খেলাধূলা নিয়ে অন্য সহরে যাও তখন তোমাদের অভিভাবিকাকে যদি মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও তিনি হয়ত তোমায় যেতে দিতে আরো বেশী আগ্রহান্বিত হবেন। হয়ত এক সময় বাবা-মা তোমার সম্পূর্ণ ব্যবহারের জন্য একটি রেডিও কিনে দিতেও পারেন। কিন্তু রহস্য সিরিজ পড়তে না দিয়ে এবং যখন অন্য অনেক কাজ করার আছে তখন রেডিও শোনা বন্ধ করে দিয়ে আমার মতে ভালই করেছেন তাঁরা। তোমাদের বয়সে প্রাত্যহিক করণীয় বহু কাজ আছে। বাবা-মা'র সঙ্গে আলোচনা করে এমন একটি সময় ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে যখন নিজের খেয়াল-খুশী মত চলতে পারবে এবং সে সময় ইচ্ছা মত রেডিও প্রোগ্রামও শুনতে পার। কাদের সঙ্গে তোমরা বাইরে যাচ্ছ অভিভাবকরা জানতে পারলে নিশ্চয়ই তাঁরা তোমায় খুশী-মনে বাইরে যেতে দেবেন। পড়া, রেডিও-শোনা এবং যাদের সঙ্গে মিশবে সেই সঙ্গী নির্বাচনে সুরুচির প্রমাণ পেলে তাঁরা এ সব ব্যাপারে তোমাকে অধিকতর স্বাধীনতা দিতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না।

* * * *

প্রশ্ন :

এক বছরের বেশী হবে আপনার 'মাই ষ্টোরি' পড়েছি। এ সম্বন্ধে আরো জানতে চাই। এ নিয়ে আরো লেখার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর :

আমি এখন আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে ব্যস্ত। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে আশা করি।

* * * *

প্রশ্ন :

উনবিংশ শতাব্দীর যে উদারনৈতিক দল ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়ে ষ্টেট বা সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে আজকের দিনে তারাই অধিকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা করছেন। কিন্তু কেন?

উত্তর :

কারণ, আজকের তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর লোকেরা কম স্বাধীনতা ভোগ করত। ব্যক্তিমাত্রই কতকগুলি মৌলিক অধিকারের দাবী করতে পারে, এ কথা সরকার-পক্ষ স্বীকার করতেন না সেদিন। দাক্ষিণ্য দেখান হোত বটে কিন্তু চিরকালের মত এ-প্রথা উঠিয়ে দেবার কথা তারা কল্পনাও করতে পারতেন না। কিন্তু আজকের দিনে এটা স্বীকৃত যে, সরকারকে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার এমন সতর্ক ভাবে রক্ষা করতে হবে যে সেই দাক্ষিণ্য প্রকাশের সুযোগ কোন মতেই যাতে না ঘটে।

আজকের দিনে উদারনৈতিকরা অধিকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সরকারের পক্ষে ওকালতি করছেন তার উদ্দেশ্যই হোল আধুনিক কালের জটিল পৃথিবীতে এমন কতকগুলি অধিকার রক্ষা করা যা' জনসাধারণ অতি মৌলিক বলে দাবী করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা দাবী করে থাকি, কর্মপ্রার্থী প্রত্যেককে তার দক্ষতামত কাজ যোগাড় করে দিতে হবে এবং এমন মাহিয়ানা দিতে হবে যাতে তার ও তার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিকদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হোত না—কাজেই সেদিন অধিকার নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। অধিকার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এসেছে তখনই যখন সভ্যতার জটিলতায় তাদের অপরিহার্যতা অনতিক্রমণীয় হয়ে উঠেছে।

প্রীতি উপহার

কৃষ্ণসুচিত্রা মিত্র

সুপ্রীতিদের বিয়ের তারিখ আজ।

ঠিক তিন বছর আগে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুপ্রকাশ তার একটি মাত্র মালার বিনিময়ে সুপ্রীতির সমস্ত কিছু জয় করে নিয়েছে।

সুপ্রীতি মেনেছে পরাজয়। এই পরাজয়ের মাঝে জয়ের চেয়েও বেশী পরিমাণ সাফল্য লুকিয়ে আছে।

সেদিন গোধূলি লগ্নে সে পুরানো দিনের আবেষ্টনী ছেড়ে এসে দাঁড়াল নতুন এক জগতে। সেখানে নূতন আলোর স্পর্শে সব কিছুই রাঙা।

ছোট তাদের সংসার। অভাবের নগ্নতা সেখানে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে না। বিলাসের প্রাচুর্য্য শান্তিভঙ্গ করবার সাহস

পায় না। সুপ্রীতির ছোট্ট শান্তির নীড়টি শান্তময় হয়েই থাকে। মাসের শেষ দিনটিতে সুপ্রকাশ যখন তার সারা মাসের উপার্জ্জন এনে সুপ্রীতির হাতে তুলে দেয় তখন সুপ্রীতির সুন্দর চোখে নেমে আসে জল।

এর বেশী তার প্রয়োজন হয় না, কাম্যও নয়।

সুপ্রীতির বাবা মারা গেলে ওর বিমাতার সঙ্গে তার ভাইয়ের বাড়ীতে যে কয়েক বৎসর আন্দামানের নির্ব্বাসিত কয়েদীর মত কাটিয়েছে তা ওর চিরদিন মনে থাকবে।

বৈমাত্রেয় ভাই-বোনগুলির অন্যায় অত্যাচার ও তাদের পরিবার-বর্গের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, এ সব থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে সুপ্রকাশ।

দু'খানি ঘরের মাঝে ছোট এক-ফালি বারান্দা। রান্না আর বাথরুম দু'টি বারান্দার এক ধারে।

এতটুকু জায়গার মধ্যে বাস করেও সুপ্রীতি সুখী, সত্যিই সুখী।

ছোট ঘর দু'টির ওপর সুপ্রীতির অসীম মমতা। মায়ের মত স্নেহ নিয়ে বার বার সাজিয়ে তোলে মনের মত করে।

ছোট্ট উনানটি আগুন ধরিয়ে মাঝে মাঝে কিছু নতুন জিনিষ রান্না করে। সুপ্রকাশের পাতে পরিবেশন করে সে চায় প্রশংসা।

মাঝে মাঝে সাধ যায় সুপ্রকাশের অজ্ঞাতে কিছু জিনিষ কিনে রান্না করে সুপ্রকাশকে একেবারে বোকা বানিয়ে দেয়। নীচের রাস্তা দিয়ে পসারীর দল গেলেও তাদের আচরণ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ডাকার সাহস থাকে না।

আজ সত্যিই সুপ্রকাশ বিস্ময়ে অভিভূত হবে। রান্না চড়িয়ে বিকাল বেলা সুপ্রীতি বসে বসে ভাবতে থাকে।

খেতে বসেই সুপ্রকাশ চমকে যাবে। ভাবতে বেশ মজা লাগে সুপ্রীতির।

মাংসের কোর্ম্মা, চিংড়ী মাছের মালাই কারী, কাঁচা আমের মিষ্টি চাটনী, মাছের চপ, পেঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল আর সুপ্রকাশের প্রিয় কয়েকটা তরকারী···

সুপ্রীতি হিসেব করে মনে মনে।

সুপ্রকাশ সত্যিই ভেবে স্থির করতে পারবে না যে সুপ্রীতি এত আয়োজন করলে কি করে?

এক দিন বাজার আনতে ভুল করলে ওর ভাত-ডাল ভিন্ন অন্য তরকারী জুটবে না, সে সুপ্রীতি সুপ্রকাশের সাহায্য ছাড়া এত জিনিষ জোগাড় করলে কোথা থেকে, বেশ ভাববার কথা বৈ কি!

তিন তলার ফ্ল্যাটের চাকর হরিয়াকে দিয়ে সুপ্রীতি এ জিনিষগুলি যোগাড় করেছে, বিনিময়ে সে নিয়েছে একটি টাকা। তাছাড়া, আজই না কি বাজারের সব জিনিষ-পত্রের দাম বেড়ে গেছে। সুপ্রীতি বুঝেছে সব—কিন্তু একটা দিন ত' মোটে।

সুপ্রীতি জানে, সুপ্রকাশ আজ খেতে বসেই আশ্চর্য্য হয়ে তাকে প্রশ্ন করবে—এত সব যোগাড় করলে কোথা থেকে? আলাদীনের পিদ্দীম ঘষে না কি?

হাতের ওপর নেমে-আসা গোলাপী রেশমী শাড়ীটাকে কুঞ্চিত করে কাঁধের ওপর তুলে দেয় সযত্নে।

এই শাড়ীটা গত বছর উপহার দিয়েছে সুপ্রকাশ। মনে পড়ে সেই দিনের ছোট্ট ঘটনাটি।

সেদিনও সুপ্রীতি এমন উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করছিল সুপ্রকাশের ফেরার পথ চেয়ে। যে সুপ্রকাশ বাড়ী ফেরে প্রতিদিন আটটায়—রাত্রি দশটার সময়ও সে ফিরল না। শঙ্কাকুল চিত্তে সে বার বার ঘরে-বাইরে ছোটাছুটি করছিল।

কিছুক্ষণ পরে তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তার অবসান করে হাতে একটা কাগজের প্যাকেট নিয়ে ঢুকল সুপ্রকাশ।

প্যাকেটটা সুপ্রীতির কোলে দিয়ে সে বললে, প্রীতির "প্রীতি উপহার", যাও চট করে পরে এস, দেখি আমার পছন্দ কেমন।

অত রাত্রে নূতন শাড়ী পরার কোন সার্থকতা খুঁজে পেলে না সুপ্রীতি। কিন্তু সুপ্রকাশের জিদে সে পরতে বাধ্য হল।

নতুন শাড়ীটা পরে এসে সুপ্রীতি সলজ্জ ভঙ্গীতে একটা প্রণাম করল।

শাড়ীটা বেশী দামী না হলেও সুপ্রীতির গোলাপী দেহের সঙ্গে খুব মানিয়েছিল। প্রণাম করতেই সুপ্রকাশ পরিহাস ভরে হেসে উঠল।

অস্থানে মনুসংহিতাকে টেনে এনে তুমি আয়েষাকে অপমান করলে। সমস্ত কবিত্ব নষ্ট করে দিলে—আচ্ছা আমি যে এত খুঁজে এমন পছন্দসই শাড়ীটি এনে তোমায় আরো সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী করে তুললুম, সে জন্যে কই একটা ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিলে না?

সুপ্রীতি সহাস্যে বললে যদিও লুচি-ভাজার বদলে পাখী হয়ে যাওয়াই আয়েষার পক্ষে সম্মানজনক ছিল, কিন্তু তোমার এ পরী এখন ডানা-কাটা পরী—উড়তে পারবে না। কাজেই মনুসংহিতার মান রাখাই ভাল।

গত বছরের সেই স্মৃতিটা আজ সুপ্রীতির স্পষ্ট মনে পড়ে।

দুই

ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজতেই সুপ্রকাশ কাজ ছেড়ে উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি নেমে এসে ট্রামে চড়ে বসল। খানিকটা পথ গিয়ে হলদে রং-এর একটা বাড়ীর সামনে নেমে পড়ল।

ছাত্র পড়ান শেষ করে সাতটার সময় সে এগিয়ে চলল ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে কলেজ ষ্ট্রীটে।

সুপ্রকাশের আদেশ মত রাশি রাশি শাড়ী বার করলে দোকানদার।

সমস্ত এড়িয়ে সে সাদার ওপর লাল প্রিণ্টেড একটা জর্জ্জেট তুলে নিলে। বেশ মানাবে সুপ্রীতিকে।

—এটার দাম কত?

—ছাপ্পান্ন টাকা নয় আনা তিন পাই সেলস্ ট্যাক্স শুদ্ধ।

—তাহলে একটু পড়েছে—

—আজ্ঞা—

সুপ্রকাশ মুখ তুলে চাইলে পাশের ভদ্রলোকটির দিকে। মনে হল যেন চেনা, কিন্তু···

আবার মুখ তুলে চাইতেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে চোখ মিলে গেল। তিনি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সুপ্রকাশের পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বললেন—আরে, প্রকাশ যে? গলার স্বরে সুপ্রকাশ চিনতে পারলে।

—ভাই মণিশঙ্কর?

—চিনতে ভুল হচ্ছে না কি ?

—নিশ্চয়ই, কত দিন পরে দেখা—তার পর ?

—তখন থেকে মনে হচ্ছে চিনি—তার পর যখন মুখ তুললি—তখন আর একটুও সন্দেহ রইল না। সত্যি, কত দিন পর দেখা। শাড়ী নিচ্ছিস্ না কি ? কার ? সুপ্রকাশের কাণের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করলে—মানসীর ?

—আঃ মণি, কি হচ্ছে একটু লজ্জা-সরম নেই ?

—দূর, লজ্জা কি আমাদের অলঙ্কার ? বল না শুনি ?

—আমার স্ত্রী···

—সত্যি ? লুকিয়ে লুকিয়ে শেষটায়···

—তোর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে লুকিয়ে নয়। সত্যি কত খোঁজ করলুম তোদের সেই পুরানো বাড়ীতে গিয়ে, কিন্তু কেউই খোঁজ দিতে পারলে না। ছিলি কোথায় ?

—সে অনেক কাহিনী, পরে হবে—তা হঠাৎ শাড়ীর দোকানে ?

—তুই কি মুড়ি বেচতে ঢুকেছিস্ ?

—না, কিন্তু হঠাৎ শাড়ী কেন ? ম্যারেজ য়্যানিভারসারী না কি ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই···

—হাউ লাকি আই য়্যাম। যাক্, আজ আর ফাঁকি দিস নে প্রকাশ—খুব দিনে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

—নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার বন্ধু-স্ত্রী কেমন হলেন ? কোন্ রং মানাবে তাঁকে ?

—মানে ? ও—না না, ভুল ভুল—বিয়ে করবার সময় পাইনি এখনও। মণিকার জন্যে কিনতে এলুম। মণিকাকে নিশ্চয়ই মনে আছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু তুই নিয়ে নে এইবার, নয় ত দেরী হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, ওহে, একটা একজোড়া বেনারসী দেখান ত।

বিক্রেতার মুখ লাভের আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বেনারসীর গাঁটরী বার করে। সুপ্রকাশ অনিমেষে চেয়ে থাকে বেনারসীর শাড়ী চোখ-বাঁধানো রূপে।

সারা গায়ে সোণালী নক্সা করা সবুজ একখানি শাড়ী তুলে নিয়ে সুপ্রকাশকে প্রশ্ন করে মণিশঙ্কর,—এটা কেমন হবে বল ত' ?

সুপ্রকাশ শাড়ীর দাম দেখতে চায় মণিশঙ্কর বাধা দেয়,—আগে দাম কেন ? শাড়ীটা কেমন তাই বল না।

—দামে চললেই সব ভাল।

—থাম থাম, অত আধ্যাত্মিক বচন ঝাড়িস নে।

—তোর মত হলে কি বলতুম না কি ?

—থাক না বাপু তোর তত্ত্বকথা—এটাই নি, কি বল ?

এর জোড়া আর একটা দিন—দু'টো জায়গায় দেবেন। কথা শেষ করে মণিশঙ্কর সিগারেট ধরালে। সুপ্রকাশের দিকে এগিয়ে দিলে কেসটা।

—আচ্ছা মণি, এক রকমের দু'টো নিলি ? পছন্দ করবে না।

—পছন্দ করবেই, কারণ দু'জনের দু'খানা—কই বিলটা দিন।

সুপ্রকাশ একটু লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সাড়ে চারশো—সাড়ে চারশো—ন'শ, আবার সেলস ট্যাক্স—উঃ !

ওদের সঙ্গে মণি মাত্র একটি বছর পড়েছিল। ব[illegible]কের হয়ে নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। সেবার অকৃতকার্য্য হয়ে কলেজ ছেড়ে দেয়—বড়লোকের ছেলে। পড়ার আগ্রহ ছিল না তেমন—দরকারও হয়নি।

—চল। প্যাকেট দু'টো বগলে নিয়ে মণিশঙ্কর উঠে দাঁড়ায়।

—চল। সুপ্রকাশও এগিয়ে আসে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে প্রশ্ন করে তার পর প্রকাশ, এখন কি করিস্ ?

—চাকরী আর দু'-একটা ট্যুইশনী—তাচ্ছিল্যস্বরে উত্তর দেয়।

—তবে বোধ হয় বেশী নয় আয় ?

—কম যে তাও নয়—তুই কিছু করিস্ ?

—হ্যাঁ, যুদ্ধের বাজারে অনেকগুলো ব্যবসা লাগিয়ে দিয়েছি আর কনট্রাকটারীতেও অনেক পয়সা···

—ভাল, তাই বুঝি বিয়ে করবার ফুরসৎ পাসনি ?

—খানিকটা তাই, কিন্তু তোর মানসীর কি হল ?

—কল্পলোকের মানসী কল্পনাতেই রয়ে গেলেন।

—বাস্তবে এলেন অন্য মানবী—কি ?

—তাই বটে।

—কিন্তু ইনিও কি পূর্ব্ব-পরিচিতা ?

—কেন ?

—নামটা কি বললি যেন ? সুপ্রীতি না ?—বেশ মিল ভাই, আর মনের মিলও নিশ্চয়ই খুব, না ?

সুপ্রকাশ হেসে উঠল।—হ্যাঁ, আজ পর্য্যন্ত ত তা বজায় আছে।

—প্রার্থনা করি চিরদিনই থাক, আয়—

ফুটপাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে মণিশঙ্করের সাদা গাড়ীখানা।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল মণিশঙ্কর—প্রকাশ, আজ আমি যেতে পারব না—ভীষণ দেরী হয়ে গেল, মণিকার আজ আশীর্ব্বাদ, একবারে ভুলে গেছি। এই শাড়ীটা বৌদিকে দিস। আমার কার্ডে নাম রইল—আসিস এক দিন এলোমেলো ভাবে কথাগুলো বলে গেল মণিশঙ্কর। গাড়ীর ষ্টার্টের শব্দে সম্বিত ফিরে এলো সুপ্রকাশের।

—এটা মণিকাকে দিস, জানলা গলিয়ে জর্জ্জেট শাড়ীর মোড়কটা মণিশঙ্করের পাশে ফেলে দেয়।

—আচ্ছা। মণিশঙ্করের সাদা গাড়ীটা একটা ঝাঁকুনী দিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

কাপড়ের মোড়ক আর নামের কার্ডটা নিয়ে অভিভূতের মতই সুপ্রকাশ ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়ালো ট্রামের অপেক্ষায়।

তিন

ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুপ্রকাশ···ভাবনার জাল বুনে চলে। মণিশঙ্করের উপহারের দামী শাড়ীটা সুপ্রীতিকে মানাবে চমৎকার। অকস্মাৎ চারি দিকে একটা গোলমাল ভরে উঠল।

—এই—এই—গেল—গেল—

সুপ্রকাশের মাথার ভেতরেও একটা ঝড় বয়ে গেল এলো-মেলো ভাবে। পিছন থেকে সজোরে একটা ধাক্কা এসে লাগলো। আঘাত বেশী না হলেও গাড়ীটাতেই ভর করে স্থির হয়ে দাঁড়াল সুপ্রকাশ। কালো "প্যাকার্ড" দামী গাড়ী

মহিলাটি সুপ্রকাশকে চলে যেতে দেখে বল্লেন—শুনি—

কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে দাঁড়াল সুপ্রকাশ। সেই মুখ—সেই কণ্ঠস্বর—একটুও সন্দেহ নেই—শুধু বিস্ময় এনেছেন ওর মাথার উজ্জ্বল রক্তবিন্দুর মতই এক কৌটা সিন্দুর-রেখা! সুপ্রকাশ আবার পিছন ফিরে চলতে সুরু করে।

গাড়ীর ভেতর থেকে মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে আসে—প্রকাশ—সুপ্রকাশ—

এড়াতে পারে না সে আহ্বান। এগিয়ে আসে—কেন?

—কি সর্বনাশ! সুপ্রকাশ—কি সর্বনাশ হচ্ছিল—

—এমন আর বেশী কি? আমাদের জীবনের কতটুকু মূল্য আছে বলে মনে হয়?

—জানি না। উঠে এস, সত্যি ভীষণ ক্লান্ত তুমি—এস।

—না—সুপ্রকাশ উত্তর দেয়।

পরম বিস্ময় ভরে জনতা লক্ষ্য করে রাস্তার এই ঘটনাটুকু তাদের হাত থেকে—দৃষ্টির রাহু থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সুপ্রকাশ উঠে বসে কালো গাড়ীটার কোলে—মঞ্জুলার পাশে।

—আমার ক্লান্তিটা খুব সাময়িক—ঠিক তোমার সামান্য ক্ষণস্থায়ী এই খেয়ালটুকুর মত। কেন মিছে তুলে আনলে, খেয়াল মিটলে ত আমি ছুটে যাব সংগ্রামময় জীবনে—আর তুমিও অদৃশ্য হবে ডানায় ভর করে—দু'জনে ত আবার ছিটকে যাব দু'দিকে।

সুপ্রকাশ নেমে যেতে চায়। তার ছোট্ট আস্তানাটির সামনে আভিজাত্যের প্রাচুর্য্যবতী রূপসী মঞ্জুলা, আর বিলাসের নিদর্শন এই প্যাকার্ড গাড়ীটি কিছুতেই নিয়ে যেতে পারে না। তার দৈন্যতাকে ভীষণ আঘাত করবে। তীরে আছড়ে-পড়া ঢেউএর মতই সেই আঘাত তরঙ্গ তুলে আঘাত করবে সুপ্রকাশের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত।

সুপ্রকাশের বিদ্রূপটি হজম করে মঞ্জুলা। কোন কিছু গ্রাহ্য না করে পরিহাসের ভঙ্গীতে বলে—দোহাই তোমার, ও ইণ্টারেষ্টিং লেকচার থেকে আমায় রেহাই দাও। জানই ত, শুধু লেকচারের জ্বালায় কলেজে আমার বড় বিরক্ত ধরত, আমি যেতুম না।

—জানি, আর আমার—শুধু বক্তৃতা কেন অনেক কিছু থেকেই রেহাই দিয়েছি তোমায়—বক্তৃতা ভাল লাগছে না? কিন্তু জানো মঞ্জুলা দেবি, এক দিন, হ্যাঁ সে দিনটা ছিল বসন্ত পঞ্চমীর গোধূলি সন্ধ্যা···

—আর শুনতে চাই না—

—অনেক বার শুনেছ—একঘেয়ে লাগছে, না? আমার কাছে কিন্তু ওটা রোজই নতুন। শোন শোন একটু—আমাদের সেই মায়ের ঠাকুরমার আমল থেকে শোন। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত আর সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ত এখন পর্য্যন্ত পুরানো হয়নি। আচ্ছা সংক্ষেপেই বলি, বিরক্ত হচ্ছ? কিন্তু নিরুপায়—একটু শোনই না! সে দিন বসন্ত পঞ্চমীর নতুন বসন্ত আমার যুব-মনের সর্ব্বাঙ্গই রাঙিয়ে দিয়েছিল। প্রফেসর ব্যানার্জ্জীর কাছে আমার আবেদন-পত্র পেশ করতেই তিনি বসতে দিলেন তার চেয়ারটিতে, পিঠ চাপড়ে সোৎসাহে বললেন—ছাল্লো মাই বয়! আশার, আনন্দের বন্য লাগল! তিনি হাসতে হাসতে ছুরিকাঘাত করলেন আমার আশা-লতাটির মূলে। সমূলে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাতায়ন হতে—আর দিলেন পুরো দু'টি ঘণ্টা লেকচার! ওঃ, অসহ্য সেই বৃদ্ধের উপদেশ। বিরক্ত হয়ে বললুম—ধন্যবাদ! তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—যা বলার তা বলেছি এইমাত্র। উত্তর দিলাম—বুঝেছি। তার পর?

—তার পর মঞ্জুলা, তার পর কি হল?

—একই কথা বার বার পুনরাবৃত্তিতে আমি আনন্দ পাই না।

—আমি পাই যদিও আমারই ঘটল শোচনীয় পরাজয়, তবুও বেশ চমৎকার লাগে।

—ছিঃ, এত ভাবপ্রবণ তুমি! আমি তা জানতুম না—

সুপ্রকাশ হেসে ওঠে, সেইটাই মুস্কিল, নইলে তোমার মত অর্থ-প্রতিপত্তিশালীর মেয়েকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা আমার মত দরিদ্র যুবকের হোত না।

—আজ যদি তোমাকে আমি না দেখতুম তবে কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না তুমিই সেই সুপ্রকাশ। মঞ্জুলা বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে।

হঠাৎ সুপ্রকাশের চমক ভাঙ্গে। গাড়ী খোলা ময়দানের ওপর দিয়ে চলেছে দ্রুতবেগে। সুপ্রকাশের গন্তব্য-স্থল ত এদিকে নয়—ঠিক বিপরীত দিকে, কিন্তু তবু চুপ করে থাকে—যাক না যত দূর খুসী—মাত্র একটি দিনের তরে এই কাছে পাওয়াকে কেন সে তুচ্ছ করবে?

—আমাকে আগের মত দেখলে কি কিছু লাভ হোত? মঞ্জুলার কথার জবাব দেয় সুপ্রকাশ।

—দেখ, তুমি বিয়ে কর সুপ্রকাশ, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হঠাৎ দার্শনিকের মত পরামর্শ দেয় মঞ্জুলা। সুপ্রকাশ একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ কি করছে সে?

—আমার অনেক দেরী হয়ে গেল মঞ্জু, এবার নামি, শুধু শুধু অনেকটা পথ চলে এলুম।

—শুধু শুধু—দীর্ঘশ্বাস চাপলে মঞ্জুলা। শুধু শুধু তোমায় এতটা পথ আনিনি, আজ তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব, ভয় নেই। পৌঁছে দেব আবার।

সুপ্রকাশ উসখুস করে—সুপ্রীতির কথা মনে পড়ে যায়।

—কিন্তু বড্ড কাজ ছিল যে। কণ্ঠস্বরে দ্বিধা-মাখানো দুর্দমনীয় আকর্ষণ দু'দিকেই সমান—মঞ্জুলা আর সুপ্রীতি দু'জনকে কেন্দ্র করে মনের ভেতর একটা বেশ দ্বন্দ্ব সুরু হয়। বিবেক বলে—ছিঃ! অন্তরাত্মা জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পায় না। শিক্ষা আর কামনার ভেদ এক হয়ে যায়।

—যত কাজই থাক, আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না—যখন এত দিন পরে দেখা। আপন মনে মঞ্জুলা বলে।

—কেন বল ত? আজ কি? সুস্পষ্ট আগ্রহ জেগে ওঠে ওর স্বরে।

—আজ? আজ থেকে ঠিক এমনি দিনে—একটি বছর আগে আমি যাকে পেলুম সে আমার স্বামী, আমার সমস্ত অতীতের ব্যর্থতা মুছে দিয়ে নতুন করে আঁকলে বর্ত্তমান উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

হঠাৎ যেন একটা চাবুক এসে লাগলো সুপ্রকাশের সুন্দর মুখটায়। অপমানে কালো হয়ে গেল ওর মুখ। ওর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করল না মঞ্জুলা।

—আজ আবার সেদিন এসেছে প্রকাশ—ও কি? কি হল?

মঞ্জুলার দৃষ্টি পড়ল সুপ্রকাশের দিকে।—অসুস্থ বোধ করছ প্রকাশ? স্নেহময়ী বোনের মতই প্রশ্ন করে স্নিগ্ধ কণ্ঠে।

সেই স্নিগ্ধতাকে চূর্ণ করে কঠিন কণ্ঠে সে বলে—না, কিন্তু মঞ্জু, আমাকে বিনা কারণে এত শাস্তি দিয়েও কি সন্তুষ্ট হওনি তুমি? তাই আজ আবার ডেকে এনেছ চূড়ান্ত অপমানের মাঝে?

মঞ্জুলার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায় গোলমাল হয়ে যায় মাথার ভিতর, পরক্ষণেই লজ্জিত হয়—মনে পড়ে, সুপ্রকাশ যে এক দিন এই অধিকার চেয়েছিল—তারও আপত্তি ছিল না, শুধু মাঝ থেকে নিয়তির চক্রান্ত তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আগের মত না হোক, মঞ্জুলা এখনও তাকে ভালবাসে—এখনও স্মরণ করে ওর কথা। স্বামীর কথা 'মঞ্জুর তোলা উচিত হয়নি সুপ্রকাশের সামনে, ভ্রান্তি স্মরণ করে সে অনুতপ্ত হয়ে বলে—আমায় ক্ষমা কর প্রকাশ, তোমাকে অপমান করবার জন্যে আমি নিয়ে আসিনি।

—তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না তা আমি জানি, এখন আর নতুন করে কি দেখাবে? নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করে ওঠে সুপ্রকাশ।

—সুপ্রকাশ! তীব্র স্বরে মঞ্জুলা বলে। একটু চুপ করে থেকে ব্যথিত স্বরে বলে—সুপ্রকাশ!

সুপ্রকাশ নীরবে চেয়ে থাকে অন্ধকার আকাশের দিকে।

—প্রকাশ আমায় ক্ষমা কর। মঞ্জুলা সুপ্রকাশের হাত দু'টি চেপে ধরে। কব্জির হীরার বালা আর অনামিকার হীরার আঙটি দু'টি ঝকমক করে ওঠে।

সুপ্রকাশ ওর হাতটা মঞ্জুলার দিকে বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু কিছু বলার আগেই গাড়ীটা একটা আলোকোজ্জ্বল বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

টালীগঞ্জের নীরব নির্জ্জন এক প্রান্তে চমৎকার বাড়ীটি। চারি দিকে আলো, চারি দিকে লোকজন, অভ্যাগত। মঞ্জুলার গাড়ীটা দাঁড়াতেই ছুটে আসে চাপরাসীর দল। মঞ্জুলা হুকুম দেয় জিনিষপত্র নামাতে। নিজে নেমে পড়ে, সুপ্রকাশকে ডাকে, এসো।

—যাই—হাতের প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে নামে সুপ্রকাশ। এক জন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে কর্জ্জন—এত দেরী হল কেন মঞ্জু?

সুপ্রকাশ ভাবে—মঞ্জুলা বলে ডাকাই এখন সঙ্গত, মঞ্জু নামটা এখন সকলেই ব্যবহার করছে, আর সুপ্রকাশ হারিয়েছে সে অধিকার।

—এই বন্ধুটিকে রাস্তা থেকে আবিষ্কার করে আনতে আনতে একটু দেরী হল, এর নাম সুপ্রকাশ সেনগুপ্ত আর প্রকাশ, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ ইনি কে?—আমার স্বামী মিঃ চ্যাটার্জ্জী।

ভদ্রলোক করমর্দ্দনের ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে দেন।

সুপ্রকাশ হাত তুলে নমস্কার জানায়।

একটু অপ্রতিভ হয়ে মঞ্জুলার স্বামীও প্রতি-নমস্কার জানায়।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম, সুপ্রকাশ বলে।

—"অল সো আই"—মঞ্জুলার স্বামী বলেন—কারণ মঞ্জুর কাছে আমি আপনার কথা সবই শুনেছি, মঞ্জু আপনার প্রতি অত্যন্ত—শা আপনি আসেন না কেন মাঝে মাঝে পুরানো বান্ধবীর গৃহে দয়া করে…

পুরানো স্মৃতির এক তন্ত্রীতে সজোরে নাড়া লাগে মিঃ চ্যাটার্জ্জীর কথায়।

—মাঝে মাঝে না ছাই!—আজই বড্ড আসছিল, নিতান্ত আমার পাল্লায় পড়েছিল তাই। কলকণ্ঠে মঞ্জুলা বলে।

—তাই না কি মিঃ সেনগুপ্ত? "আমার মঞ্জু"র এ গুণটি আছে, সহজে ওর হাত থেকে পালাতে পারে না কেউ। মিঃ চ্যাটার্জ্জী সপ্রশংস দৃষ্টিতে চান মঞ্জুলার দিকে।

—"আমার মঞ্জু!" দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সুপ্রকাশ—"কেউই পালাতে পারে না এমনই ওর গুণ"—অথচ সুপ্রকাশ এক দিন ধরা দিতে চেয়েও—

মঞ্জুলার চোখে ধরা পড়ে সুপ্রকাশের হৃদয়ের কথাগুলো।

—এস প্রকাশ, ওখানে অনেকে আছে, এস—মঞ্জুলা আহ্বান জানায়।

বাড়ীর পাশ দিয়ে লাল কাঁকরের সরু রাস্তা। একটু গিয়ে পিছন দিকটা একটা বাগান। সেখানে গোল করে প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। চারি দিকে চারটে চেয়ার মাঝে ছোট ছোট টেবিল।

সুপ্রকাশ এক কোণে এসে বসে। মঞ্জুলা উঠে যায় অতিথিদের খোঁজ নিতে। সুপ্রকাশ চুপ করে বসে থাকে।

মঞ্জুলা বেশ বড়ঘরের বধূ হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে চ্যাটার্জ্জী সাহেব নামজাদা ব্যারিষ্টার। ভদ্রলোক ময়লা হলেও কুশ্রী নন।

—এই যে প্রকাশ বাবু! সুপ্রকাশ চমকে মুখ তোলে। ওর অফিসের একটি বাবু—নতুন কাজে এসেছে।

—আপনি?

—আরে আমার ত মা'র পিসতুত ভাইয়ের ছেলে অমরদা—

—আপনি বুঝি তাই আজ তাড়া করছিলেন অফিসে?

—না, অন্য কাজ ছিল।

মঞ্জুলা কাজ সেরে এসে বসে। আবার চলে যায় অন্য কাজে। মঞ্জুলার স্বামী আসেন।

—কি রে, কতক্ষণ এলি?

—একটু আগে দাদা, সুপ্রকাশের অফিসের বাবুটি বলে—তা সুপ্রকাশ বাবু, বৌদি ভাল আছেন ত?

—হ্যাঁ, ভাল আছেন।

—আচ্ছা, আমি যাই ওদিকে একটু—বুঝতেই পারছেন, আমরা একটু টানব-ফুকব—তা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রয়েছেন, এদের সামনে—

—যা না, কে বারণ করছে—অমর বাবু বিরক্ত হয়ে বলেন।

—মঞ্জুলা আবার এসে বসে।

—একটা ভুল করেছ মঞ্জু!

—কি?

—মিসেস সেনগুপ্তকে ধরে আনলে ভাল করতে।

—মিসেস সেনগুপ্ত? মানে প্রকাশের স্ত্রী? তাঁকে পাব কোথায়? কে সে ভাগ্যবতী কোথায় অপেক্ষা করছেন কি করে জানব বল?

—বাড়ীতেই ছিল নিশ্চয়।

—ছিল না কি প্রকাশ? মঞ্জুলার মুখে যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পায় প্রকাশ।

—হ্যাঁ, বাড়ীতেই আছে সুপ্রীতি, প্রকাশ বলে।

—সুপ্রীতি, বেশ নামটা। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলেন অমর চ্যাটার্জ্জী।

—প্রকাশ, আমরা কি এত পর হয়ে গেলুম যে বলনি—মঞ্জুলার কণ্ঠ অভিমান ভরা।

অমর বাবু কার আহ্বানে চেয়ার ছেড়ে উঠে যান।

সুপ্রকাশ হাসে—ভুলে যাচ্ছ মঞ্জুলা, সেই বসন্ত পঞ্চমীর গোধূলি সন্ধ্যার পর আজ প্রথম দেখা।

ওদের যখন আলাপ সীমা অতিক্রম করে যায়, সকলেই যখন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে সুপ্রকাশের আঁধার ঘরে মঞ্জুলা স্বর্ণদীপ জ্বালবে, তখনকার সম-সাময়িক পরিচিত কয়েক জন পরিচিত সমবয়সী এসেছে আজকের এই আনন্দের উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে। মঞ্জুলার সঙ্গে সুপ্রকাশকে দেখে ওদের চোখে মুখে একটা চাপা হাসি ফুটে ওঠে।

মঞ্জুলার নারীসুলভ দৃষ্টি এড়ায় না ওদের এ সাঙ্কেতিক ইঙ্গিত। —এস সুপ্রকাশ, আমায় একটু সাহায্য করবে এস, মঞ্জুলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—চল।

—কোথায় যাচ্ছ মঞ্জু ?

—একটু ওদিক্‌টা দেখে আসি।

—আচ্ছা যাও,। সুপ্রকাশ বাবু, বান্ধবীকে একটু help করুন। আপ্যায়িতের হাসি হেসে চকিতে সরে যান অমর বাবু।

মঞ্জুলা বাড়ীর পেছন দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে। মস্ত হল-ঘর, চমৎকার সাজানো। গৃহস্বামীর রুচিবোধ যে উঁচু-দরের তা একবার চোখ চাইলেই অনুমান করা কষ্টকর নয়। সাদা পাথরের মেঝে। চৌকাঠের পরিবর্তে প্রতি দরজার কাছে সরু কালো পাথরের নক্সা বা আলপনা।

ঘরের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারলে না সুপ্রকাশ। মাঝখান দিয়ে কালো বর্ডার দেওয়া সাদা পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়ির এক ধারে টেলিফোন।

মঞ্জুলা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলে—একটা রিং করে দেব তোমার বাড়ীতে ?

—কেন ?

—তোমার সুপ্রীতি ভাবছে না ?

—তা ভাববে বৈ কি, কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে আমার কিংবা অন্য কারুর ফোন নেই।

—ওঃ আচ্ছা, এস।

—তোমায় কি কাজে সাহায্য করতে হবে বল ত মঞ্জু ? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রশ্ন করে সুপ্রকাশ।

—কিছু করতে হবে না তোমায়।

—তবে ? বিস্মিত হয় সুপ্রকাশ।

—তবে আর কি ? ওদের দৃষ্টির কি ইঙ্গিত। এমনিই ডাকলুম।

—ওঃ—সুপ্রকাশ হাসে।

দোতালার একটা ঘরে মঞ্জুলা ঢোকে। একটা সোফার ওপর এলিয়ে পড়ে ক্লান্ত ভাবে। বোস।

চারি দিক নিরীক্ষণ করছিল সুপ্রকাশ। বললে—বসি। কিন্তু না বসে এগিয়ে গেল সামনে লেপ-ঢাকা কালো পিয়ানোটার কাছে।

এটা মঞ্জুলার নিজস্ব। এই পিয়ানোর বুকে আজ সুপ্রকাশের আঙুলের চিহ্ন বিলীন হয়ে গেলেও এক দিন ওর আঙুলের পরশেই মুখর হয়ে উঠত নীরব যন্ত্রটি। আর মুখর হ'ত মঞ্জুলার হৃদয়।

—তোমার স্ত্রী কেমন হল প্রকাশ ?

—আমার স্ত্রী ? ঠিক আমারই ঘরণী হবার উপযুক্ত।—সুপ্রকাশ ফিরে এসে বসল ওরই পাশের সোফাটায়।

—মঞ্জুলা সোজা হয়ে বসল। আচ্ছা প্রকাশ, তুমি কি বিদ্রূপ ছাড়া সহজ ভাবে কথা বলতে পার না ?

মঞ্জুলার শান্ত দৃষ্টিটা বড্ড অস্বস্তিকর বলে মনে হয় সুপ্রকাশের। তবু ওর স্বভাব-সুলভ হাসি হেসে বলে—মঞ্জুলা, নিশ্চয়ই এখন গানগুলো ভুলে যাওনি—শোনাও না একটা।

—তুমিই শোনাও না সুপ্রকাশ, অনেক দিন শুনিনি তোমার গান।

—আমি ? সে কি ? তোমার স্বামী আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কি মনে করবেন বল ত' ?

হঠাৎ অমর বাবু ঘরে এসে বললেন—কিছু না, কিছু না—আমাদের এত বেরসিক মনে করিবেন না সুপ্রকাশ বাবু, আমার অথিতিরাও তৃপ্ত হবেন আপনার সঙ্গীতে। কিন্তু একটা অনুরোধ—নীচেকার হল-ঘরে আসুন, কারণ এ-ঘরে সবাইকে ধরবে না। পাঁচ মিনিট, আমি ওদের ডাকি আপনি নেমে আসুন। মঞ্জু তুমি ওঁকে আনো, তার পর খাওয়াটা শেষ করে দিই।

অমর বাবুর নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুলাও উঠে দাঁড়ালো, তার পর সেই সাদা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। অমর বাবু চাকরদের সাহায্যে বাগান থেকে চেয়ারগুলি হল-ঘরে তোলাচ্ছেন। মঞ্জুলাও স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সাহায্যের অভিলাষে।

ঘরের কোণে আর একটা পিয়ানো, তার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল—একটা ফুলদানীতে সাদা রজনীগন্ধার ঝাড়। অমর বাবু মঞ্জুলাকে বললেন—তুমি যাও ওঁকে নিয়ে, আমি এদিক দেখে নেব।

সকলকার দৃষ্টি অতিক্রম করে সুপ্রকাশ বাজনার সামনের আসনটিতে গিয়ে বসল। বাজনার ঢাকনী খুলে পরিচিত একটা সুর বাজায়।

চমকে উঠে মঞ্জুলা, না সু, ওটা না—ওটা বাজিও না। অনুরোধ জানিয়ে সুপ্রকাশের কাছ থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে।

—ভগবান তোমার ওপর সুপ্রসন্ন যে, তোমার মুক্তার মালা এ দীনের কণ্ঠে পড়েনি! সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মঞ্জুলাকে বলেছিল সুপ্রকাশ। মঞ্জুলার চোখে বুঝি একটু অশ্রু!—নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল সুপ্রকাশের মুখে। তার পর পিয়ানোর বুকের ওপর দিয়ে দ্রুত আঙুল চালনা করে সুর ধরল;

ওগো নিঠুর, ওগো নিঠুর, দেখতে পেলে তা কি ?
আমার ভুবন ত আজ হল কাঙ্গাল, কিছু ত নাই বাকী—
তার সব ঝরেছে, সব মরেছে
জীর্ণ বসন ঐ পরেছে······

সুপ্রকাশের সুমিষ্ট, দরদ-ভরা গম্ভীর কণ্ঠের গান সকলকে মুগ্ধ করল। এ ভাষা সকলেই জানে, সকলেই এর সুরের সঙ্গে একটু না একটু পরিচিত, কিন্তু সুপ্রকাশের সুললিত কণ্ঠে সকলেই নূতন করে শুনলেন যেন।

সুপ্রকাশের গান শেষ হল, কিন্তু বড় হল-ঘরটাকে কেন্দ্র করে

ওর সুমিষ্ট কণ্ঠ আর গানের একটি কলি বার বার ছুঁয়ে গেল অভ্যাগতদের মুগ্ধ হৃদয়।

অভ্যাগত ব্যক্তিরা অমর বাবুর সঙ্গে উচ্ছ্বসিত স্বরে প্রশংসা করলেন সুপ্রকাশ বাবুর উদাত্ত কণ্ঠস্বরের।

সুপ্রকাশের মনটা যেন তীব্র মাদক দ্রব্যের ঝাঁঝালো প্রভাবে আপনাকে একান্ত ভাবেই তার হাতে সঁপে দিয়েছিল।

কল্পিত নেশার প্রভাবে তার গল্পের কথা খেই হারালো না, উপরন্তু সকলকে সরসতায় অভিভূত করে ছাড়লে। সুরসিক সুপ্রকাশের রসিকতার সাহচর্য্যে অভ্যাগতবৃন্দের খাবার সময় তারা খাদ্যের চেয়ে সুপ্রকাশের বাক্যের প্রতি অধিক মনোযোগ দিল। অমর বাবু খুসী হয়ে উঠলেন সুপ্রকাশের কৃতিত্বে। তার পার্টিটা একা মাৎ করে রাখলেন সুপ্রকাশ বাবু।

গল্প-গুজবের মাঝ দিয়ে সময়টা কতখানি এগিয়ে চললো তা সুপ্রকাশ খেয়াল করেনি। রাত্রি এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

—যাঃ, এত রাত্রি হয়ে গেল, নিশ্চয় লাষ্ট ট্রামটাও ছেড়ে গেছে—না অমর বাবু?

—সে ১০টার সময় চলে গেছে, কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? আজ না হয় থেকেই যাবেন—জলে ত আর পড়ে নেই!

—পাগল না কি? সুপ্রকাশের বদলে উত্তর দেয় মঞ্জুলা। থাকবেন কি করে? জলে পড়ে থাকলে সাঁতরে চলে যেতেন। যেতে না সুপ্রকাশ?

—বোধ হয়—স্মিত হাস্যে উত্তর দেয় সুপ্রকাশ। জলে পড়ে থাকার চাইতে দুঃসাহসিক অভিযানে মর্য্যাদা বাড়ে বেশী, কিন্তু এখন সে চিন্তা করবার দরকার নেই।

মিথ্যা কথা!—মঞ্জুলা প্রতিবাদ করে বলে। মিথ্যে কথা বলছ প্রকাশ, তোমার মন পড়ে আছে সেই ছোট্ট ঘরটিতে।

সুপ্রকাশ কিছু বলার আগেই অমর বাবু জবাব দেন—সেটাই ত স্বাভাবিক মঞ্জু, এই দেখ না, আমি হাইকোর্টের অত বড় হলে থাকি, কিন্তু তখন আমার মনটা পড়ে থাকে এই ঘরটার মাঝে!

মঞ্জুলার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। পরিত্রাণ পাবার জন্য কথা পাল্টিয়ে বলে—আচ্ছা প্রকাশ, তুমি রবি বাবুর ও-গানটা না গেয়ে তোমার নতুন কোন গান শোনালে না কেন? অনেক দিন শুনিনি।

—আপনি কি গান লেখেন না কি?

—শুধু গান? গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান, কবিতা সব কিছু, গান ত শুনলে আবার আঁকতেও পারে, এ ছাড়া সব চেয়ে বড় গুণ এম-এতে স্কলারশিপ পেয়েছেন। একটু গর্ব্বের সঙ্গে উত্তর দেয় সুপ্রকাশ নয়—মঞ্জুলা।

—যাক, আপনার মত গুণী লোকের বন্ধুত্ব কামনা করি, কিন্তু মঞ্জু, তুমি ত আগে কিছু বলনি? সুপ্রকাশ বাবুর নাম শুনেছি কিন্তু এ সব ত শুনিনি?

—আমার সঙ্গে সুপ্রকাশ লোকটার বন্ধুত্ব ছিল, গুণের সঙ্গে নয় তাই শুধু সেটাই শুনেছ, এবার ত শুনলে?

—সত্যি আপনার এত গুণ জানতুম না।

—আপনি অহেতুক এত প্রশংসা করছেন।

—অহেতুক কেন? এ গুণগুলো নিশ্চয়ই আছে।

—তা—তা আছে, কিন্তু 'কোন গুণ নাহি যার কপালে আগুন' হয়েছে আমার—জানেন, এতগুণ থেকেও আমি অনেকের কাছে নির্গুণ; কারণ অর্থ নেই।

—না—না কি যে বলেন? অর্থ দিয়ে গুণের বিচার যিনি করেন তিনি—তিনি—হাঁা, তিনি মূর্খ!

মঞ্জুলার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

সুপ্রকাশ বলতে চায়—আপনার যদি অর্থ না থাকত তবে আমার মত আপনিও হতেন গুণহীন। কিন্তু বলতে পারে না।

—আচ্ছা, একটু বসুন, আমি দেখি ডাক্তার রায়কে পৌঁছে গাড়ী ফিরল কি না, এলেই আপনাকে ছেড়ে দেব ততক্ষণ কষ্ট করে একটু··· বলতে বলতে অমর বাবু উঠে যান।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা চলে যাওয়ার পর ওরা উঠে এসেছিল দোতলার পূর্ব্বোক্ত ঘরটিতে। অমর বাবু চলে যেতেই সুপ্রকাশ মঞ্জুলার সামনে এসে বসল।

—কষ্ট করে কেন আনন্দ করেই—কি বল মঞ্জু? কবির ভাষাকে একটু বদলিয়ে মনের মত করে বলি—'ধন নয় মান নয়—নয় ভালবাসা—শুধু ক'টি ভাষা করেছি আশা'···

মঞ্জুলা সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করল—আচ্ছা প্রকাশ, আজ তোমার কি হয়েছে বল ত? বড্ড বেশী···

—কি? মুখর হয়ে উঠেছি না?

—হ্যাঁ, তাই দেখছি।

—দেবি, যদি ভাষার উৎস ভারতী দেবী সম্মুখে অবতীর্ণ হন, তবে কোন্ কালিদাস মুখরতা ত্যাগ করে মূক হয়ে থাকতে পারে বল দেখি?

মঞ্জুলার রক্তিম মুখ হতে নিঃসৃত হয়—আচ্ছা প্রকাশ, তুমি আজ আমায় এত অপমান করছ কেন বল ত?

—অপমান? মঞ্জু, তোমায় আমি করব অপমান? আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিলুম, কিন্তু এক দিন যখন এ কথাগুলো তোমায় শোনাতুম তখন তুমি খুসী হয়ে···

—প্রকাশ, ভুলে যাচ্ছ অতীত আর বর্ত্তমান, এ দু'টোর অনেক প্রভেদ, সেদিন যা ছিল আজ তা নেই।

—জানি, মানুষ গড়ে আর দেবতা ভাঙেন···

—এ কথা যদি জান, তবে কেন শুধু শুধু সেই পুরানো কথা মনে আনো বল ত?

—মঞ্জু—মঞ্জু, তোমার কি একবারও সেদিনের কথা মনে পড়ে না? সেদিনের জন্যে আপশোষ হয় না?

মঞ্জুলা চুপ করে থাকে।

—বল মঞ্জু—সেদিন তুমি কেন আমার সঙ্গে চলে আসনি?

মঞ্জুলা মৃদু রহস্যের সুরে বলে—হাতটা ধরে আছ যদি সুপ্রীতি এসে দেখে কি অবস্থা হবে তোমার?

মঞ্জুলার হাতটা ছেড়ে দেয় চকিতে। তার পর উঠে দাঁড়ায় সুপ্রকাশ।—নিষ্ঠুর—না হয় আমার চাইতে অনেক অর্থ আছে তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে, কিন্তু তা বলে এত অহঙ্কার ভাল নয়।

মঞ্জুলা শান্ত স্বরে বলে—কোথায় যাচ্ছ?

—তোমার পাশে। মঞ্জুলার পাশে এসে বসে সুপ্রকাশ।

মঞ্জুলা চকিতে উঠে দাঁড়ায়।—তুমি বোস, আমি দেখি উনি কোথায় আর গাড়ী এসেছে কি না।

সুপ্রকাশ হাসলে।—ভয় পাচ্ছ মঞ্জু?

—ভয়?. না, কিন্তু ভরসাও পাচ্ছি না তেমন।

—মেয়ে-চরিত্র বোঝা সত্যই আমাদের কর্ম্ম নয়, আজ ভয় পেয়ে পালাতে চাইছ অথচ কত দিন—

—সে কথা ঠিক যে আমি তোমার সঙ্গে একা অনেক দিন ও অনেক রাত গল্প-আলোচনা-গান করে কাটিয়েছি, কিন্তু সেদিন আর আজ সমান নয়—সেদিন মঞ্জুলা ব্যানার্জ্জী আজ মঞ্জুলা চ্যাটার্জ্জী। প্রকাশ, অতীত আর বর্ত্তমানকে সমান পর্য্যায়ে ফেলে বিচার করতে চেও না, আর তাছাড়া সে সময় তুমি এত বোধ হয় অসংযত ছিলে না। আজ তোমার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলুম, ইচ্ছা-অনিচ্ছার যে দ্বন্দ্ব চলছে তার চেতনা আজই—তোমাকে না আনলে হয়ত ভালো ছিল।

সুপ্রকাশের শিক্ষিত মনের ওপর সপাং করে চাবুক এসে পড়ল যেন। আপন চরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখে লজ্জিত হয়ে উঠল।

—কিন্তু তবু সুপ্রকাশ, তুমি আমার অতিথি—আজকের দিন থেকে সমস্ত অতীত ভুলে যাও, আমরা আবার নতুন করে নতুন বন্ধুত্ব স্থাপন করি···

—বোস মঞ্জু, আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর। অতীত আর বর্ত্তমানকে একসঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে ভুল করেছি, তোমার কথায় আমি ভুল বুঝতে পেরেছি, আর বুঝতে পেরেছি কেন এই দুর্ব্বলতা। বোস ভয় নেই। মঞ্জুলা বসল আরেকটি সোফায়।

—এর আগে তোমার সঙ্গে অনেক মিশেছি, তখন জানতুম তুমি একান্ত ভাবেই আমার। জান ত', নিজের অধিকার জানলে তার ওপর লোভ কমে যায়। তখন তাই আমার কোন আচরণ অসঙ্গত ছিল না, কিন্তু আজ আমি শুধু মাত্র কয়েক ঘণ্টার অনাহূত অতিথি। প্রতিহিংসার আগুনে আমার বিবেক মুহূর্ত্তের জন্য দগ্ধ হয়ে গিছল। তুমি তাকে বাঁচিয়েছ। ক্ষমা কর মঞ্জু—বল ক্ষমা করেছ।

মঞ্জুলা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে প্রসঙ্গ বদলে বল্লে—

—তোমার বিয়ে কত দিন হল? বলেছিলে যে—

—বলেছিলুম, কিন্তু দেখলুম, আমার মত দরিদ্রের পক্ষে এ বড্ড বাড়াবাড়ি। তাই—তিন বছর হল আজ থেকে। মঞ্জু, এবার আমার বাড়ী যাবার বন্দোবস্ত করে দাও। এ কি সাড়ে বারোটা! সুপ্রকাশ চঞ্চল হয়ে উঠল।

—এস, দেখি—মঞ্জুলা উঠল।—প্রকাশ, ওটা কি ফেলে যাচ্ছ?

—এটা, এই নাও তোমায় দিলুম—আজকের উপহার।'

মঞ্জুলা প্যাকেট খুলে শাড়ীখানি বার করলে। সবুজের ওপর সোনালী জংলা কল্কা পাড়—ইলেকট্রিক আলোয় ঝকঝক করে উঠল।

মঞ্জুলার মনে পড়ল—এ রংটা সুপ্রকাশের খুব প্রিয়।—কি প্রীতি উপহার?···মঞ্জুলা সহাস্যে বলে।

সুপ্রকাশ চমকে উঠল। দোতলার ফ্ল্যাটে বেচারী সুপ্রীতি সুপ্রকাশের আর প্রীতি উপহারের অপেক্ষা করছে।

ওর ব্যস্ততা দেখে মঞ্জুলা বলে—এস।

. নীচে নেমে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যায়। হল-ঘরের সোফায় [illegible] আচ্ছন্ন রয়েছে অমর বাবু।

—কেমন গাড়ী দেখতে এসেছেন দেখছ প্রকাশ। ওগো, এই এই—ওঠ—আঃ ওঠ না—প্রকাশ যে অপেক্ষা করছে। মঞ্জুলা অমর-বাবুকে ঠেলা দেয়।

অমর বাবু উঠে দাঁড়ান।

—দাঁড়াও আগে ড্রাইভারকে ডাকাই। সে-ও হয়ত নাক ডাকাচ্ছে—মঞ্জুলা বলে।

—না না, তবে আর তাকে ডেক না। চল, আমরাও ঘুরে আসি, কি বল মঞ্জু?

—এ্যাকসিডেণ্ট করবে না ত?

—পাগল! না না, চল, আসুন প্রকাশ বাবু।

ওরা তিন জনে অন্ধকারের মত কালো গাড়ীটাতে এসে বসল। সুপ্রকাশ আর মঞ্জুলা পিছনে। অমর বাবু ষ্টিয়ারিং ধরে বসলেন।

অন্ধকারের বুক চিরে চোখের মত জ্বলে উঠল দু'টি হেড লাইট। তার পর দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল অন্ধকার ভেদ করে।

চার

ঘড়ির কাঁটাটা যেন আজ সুযোগ বুঝে খোঁড়া হয়ে বসে আছে। দু'ঘণ্টার সময় নিয়ে তবে যেন এক-একটি সংখ্যা অতিক্রম করে চলেছে। অস্বস্তি বোধ করে সুপ্রীতি।

অন্য দিন তার কাজ-কর্ম্ম শেষ না হতেই সুপ্রকাশ এসে পড়ে। সুপ্রকাশ যেদিন কাজ শেষ হবার আগেই আসে সেদিন সুপ্রীতি একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। কোন কাজ করতে দেয় না সুপ্রীতিকে। হয় কোন নূতন লেখা বার করে শোনাবে, নয় ত বিশ্বকবির একখানি বই বার করে আবৃত্তি করবে। সুপ্রীতির এ সব ভালো লাগে না। তার মন পড়ে থাকে রান্না-ঘরের আছড় আনাজগুলির ওপর, উনুনের ওপর কড়ায় ডাল ফুটছে হয়ত বা পুড়েই গেল—ওর কাণে যায় না সুপ্রকাশের সুললিত আবৃত্তি—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী।"

সুপ্রকাশ ছন্দ মিলিয়ে আবৃত্তি করে চলে, আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুপ্রীতিকে বসতে হয় শোনার ভাণ করে, মনে মনে হয়ে ওঠে বিরক্ত। কিন্তু যখন গভীর রাত্রে চারি দিকের নির্জ্জনতার অবসরে এক-এক দিন সুপ্রকাশের সঙ্গীত-চেতনা জেগে ওঠে তখন সুপ্রীতির মনে হয়, আরো একটু জোরে যদি গায়···কিন্তু সাহস হয় না—ফ্ল্যাট বাড়ী, অন্য অংশীদাররা বিরক্ত হবেন।

দূর ছাই, কি সব ভাবছি···

রান্না সমস্ত শেষ হয়ে গেছে, তবু কেন সুপ্রকাশ ফেরে না! বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে ভাবনা-চিন্তার পাখা মেলে দে[illegible] তার মনে······

* * * *

রাত্রি একটা বাজলো। নীচে এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড কালো মোটর কার। তীব্র আলো তারই তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে ওরই অভি[illegible] ঘোষণা করছে।

গাড়ীর পেছন দিকের দরজা খুলে নামল সুপ্রকাশ। গলা[illegible] একটা ফুলের মালা। আর পিছনে পিছনে নামলেন এক সুসজ্জিতা সুন্দরী মহিলা। সামনের দরজা খুলে মহিলাটি সামনে গিয়ে বসেন।

—এই আমার বাড়ী মঞ্জু।

—প্রকাশ, আমার ওখানে যেও, বুঝলে, ভুল না, ভাগ্য ভালো যে আজকেই তোমার দর্শন পেয়েছিলুম···

—না না, ভুলব না—নিশ্চয়ই যাব।

—আচ্ছা, ধন্যবাদ, এবার যাও, তোমার সুপ্রীতি দেবীর ঘুম ভাঙ্গাও গে যাও, বেচারী হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

কলকণ্ঠে হেসে উঠলেন মঞ্জুলা দেবী।

ওপর থেকে জ্বালা-ভরা জল-ভরা দৃষ্টি মেলে দেখছে সুপ্রীতি। কে এই মঞ্জু? রাতের অভিসারিকা নয় ত? চালকটিই বা কে? "প্রকাশ যেও" তোমার সুপ্রীতি···কি রকম কথাবার্তা, কি তীব্র শ্লেষ ওর কথার মাঝে···

—আচ্ছা প্রকাশ গুড নাইট, আজকের রাত্রি স্মরণীয় হয়ে থাকবে জীবনে···গুড নাইট।

—তা সত্যি, গুড নাইট।

গাড়ীটা চলে গেল।

সুপ্রকাশ শীষ দিতে দিতে উপরে ওঠে। তার পদধ্বনির শব্দ অনুসরণ করে গণনা করে ক'টা সিঁড়ি অতিক্রম করল। এক··· দুই···উনিশ।

এই বার শেষ।

খট্ খট্ খট্।

এবার সত্যিই দরজা ঠেলছে। সুপ্রীতি দরজা খুলে দেয়। সুপ্রকাশ কৈফিয়ৎএর সুরে বলে—বড্ড রাত্রি হয়ে গেল, ঘুমিয়ে পড়েছিলে না কি? সু!

—না ঘুমাইনি, রাত্তির বেশী হয়নি—সবে একটা।

—রাগ করেছ সু?

—কই? না ত···

—আঃ বাঁচালে। যাক, কাপড়টা ছেড়ে ফেলি এবার—সুপ্রকাশ ঘরে চলে যায়।

সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে সজল চক্ষে সুপ্রীতি দু'জনের আহারের স্থান করে পাশাপাশি।

খাবার সাজিয়ে ঘরে গিয়ে দেখে সুপ্রকাশ গায়ে লেপ টেনে শুয়ে পড়েছে। মায়া লাগলো সুপ্রীতির।

—ওগো, শুলে কেন? খেয়ে নাও, তার পর শুয়ে পড় এসে। খাবার দিয়েছি।

—খাবার—

—হ্যাঁ—খাবে না? এসো—

—আমি খাব না—তুমি খেয়ে নাও। অনেক রাত্রি হল, এখনও তোমার খাওয়া হয়নি?

—মানে?

—এক বন্ধুর বিয়ের দিন ছিল আজ। ছাড়লে না ধরে নিয়ে গেল। খাইয়ে-দাইয়ে পৌঁছে দিলে। খুব ভাল মেয়ে মঞ্জু, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। যাও যাও, খেয়ে এস লক্ষীটি, রাত হয়ে গেল অনেক।

—ওঃ—আচ্ছা। সুপ্রীতির চোখ বেয়ে অজস্র ধারে মুক্তাবিন্দু ঝরে পড়ে মাটিতে। সুপ্রীতি রান্নাঘরে চলে আসে। সুপ্রকাশ পাশ ফিরে শোয়।

সুপ্রীতির চোখের বাঁধ অতিক্রম করে দুকূল ছাপিয়ে বন্যা নেমে আসে।

মঞ্জু—বন্ধু? বন্ধুনীর বিবাহ বার্ষিকী-রাত্রি! একটার সময় এসে জিজ্ঞাসা কোরছ আমার খাওয়া হয়নি—এলোমেলো ভাবে কথাগুলি ভাবে সুপ্রীতি।

গামলায় আবার লুচিগুলো রাখে—তার পর মাংসের বাটি থেকে সমস্তটা ঢেলে দেয় তার ওপরে—ডাল, মালাইকারী, তরকারী, ক্ষীর সমস্ত একত্রে মিশিয়ে দু'হাতে চটকায়।

কিছু নষ্ট হবে না—তার সাধের রান্না কিছু নষ্ট হবে না—সকাল বেলা মার্জ্জার প্রভু সমস্তটা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় করে খেয়ে ওর রান্নার তারিফ করবে মিউ-মিউ করে। সাধের রান্না···

কর্ম্মযোগী

[দেশকর্ম্মী সুকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে]

উর্ম্মিলা দেবী

জীবনের যত কাজ সাঙ্গ হল কি আজ
পেয়েছ কি তব ভগবানে?
পেয়েছ আঘাত যত দুঃখ বেদনা শত
এখনও কি বিঁধে আছে প্রাণে?
সারাটি জীবন ধরি যত কাজ গেলে করি
পূর্ণতা পেল কি আজ সবই?
কর্ম্মের দিবস শেষে সন্ধ্যা এলো অবশেষে
অস্ত গেল কর্ম্ম-দৃপ্ত রবি—।
বিশাল ও হৃদি-গেহ ভরা ছিল যত স্নেহ
দিয়েছ সবারে প্রাণ ভরে
কর্ত্তব্য করেছ তুমি দেশবাসী, মাতৃভুমি,
দীন দুঃখী সর্ব্বজন তরে—।
তোমারে বুঝিতে কেহ— পেরেছে, পারেনি কেহ
তার তরে ছিল না ত দুখ—
দিয়ে গেছ দুই হাতে দেবার আনন্দে মেতে
দান-সুখে তৃপ্তি ভরা বুক
করে গেছ যাহা তুমি নহ তার ফলকামী
গীতার দৃষ্টান্ত তুমি কর্ম্মযোগী বীর—
তাই তব প্রাণভরা শান্তি রাজে দুঃখ-হরা
কর্ত্তব্যে অটল তুমি সাধনায় ধীর—।
যেখানে গিয়েছ আজ সেখানে কি আছে কাজ
তোমা লাগি চেয়ে আছে পথ—?
পৃথিবীর দেহ ত্যজি অমরায় গেলে আজি
দেবতা পাঠায়ে দিল রথ।
এখনও কি দূরে থেকে আমাদের সুখে-দুখে
পাঠাইবে তব আশীর্ব্বাদ?
সেথা হতে দেখিবে কি প্রাণ দিলে যার লাগি
পূর্ণ যদি হয় সেই সাধ?

হাই সার্কেল

হরিপদ হাজরা

প্রফেসর সুনীল মুখার্জ্জীর বাড়ী—জোর উৎসব, আনন্দের হল্লা চলছে। তাঁর বিয়ের বার্ষিক উৎসব। বাইরে মোটরের লাইন দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আধুনিক উগ্র সাজ-গোজে নবাগতাদের অবিশ্রাম আনাগোণা চলছে।

সুনীল বাবু মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকুরীতে ঢোকেন। আজকাল দু'শো টাকা পান। কিন্তু বাড়ীতে মোটরে ড্রাইভারে দরোয়ানে আই, সি, এসও হার মানে। এটা অবশ্য সবাই জানে বাড়ীটি ওঁর বাপ রায় বাহাদুর শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া। শুধু সুনীল বাবু ও তাঁর স্ত্রী সেটা স্বীকার করতে চান না।

দুষ্টু লোকেরা পাঁচ কথা বলে। পাশের যে পোড়ো জমিটা সুনীল বাবুর দুই ভায়ের—শুধু ভিত-গাঁথা হয়েই পড়ে রয়েছে—সেটা দেখিয়ে বলে, 'উদার দেবতুল্য বাপ পেয়ে নাবালক ভাই দু'টোকে পথে বসালে গো! প্রফেসর নামের কলঙ্ক!' আবার কেউ বলে, চোরাবাজারে ভদ্রলোকের না কি যাতায়াত বড্ড বেশী। যাক্ গে, বলা-মুখ আর চলা-পথ কেউ বন্ধ করতে পারে না।

দরজায় একটি কিশোরী মেয়ে ফুলের মালার গোছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পাশের বাড়ীতে থাকি। আমার কাকীমার নেমন্তন্ন হয়েছিল। তিনি এঁদের পারিবারিক অনেক কিছুই জানেন। তাই নিজে না এসে আমায় দিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করেছিলেন। কাকীমার কাছেই শুনেছিলুম, এই প্রফেসরের স্ত্রীর অত্যন্ত দুর্ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে শ্রীকুমার বাবু এই বয়সে নিজের বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হন। শ্রীকুমার বাবু রোজগার যথেষ্টই করেছেন—যা কিছু উপার্জ্জন সবই এনে বড় ছেলের হাতে তুলে দিতেন। কারণ, তাঁর স্ত্রী ছিলেন অপ্রকৃতিস্থা। ভদ্রলোকের যথা-সর্ব্বস্ব গ্রাস করেও এদের আশ মেটেনি। শেষে তাঁর পেন্‌সনের টাকাও কমিউট করিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ের নামে আত্মসাৎ করেছেন। শেষে তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থের বাড়ী মানে তাঁর শেষ বিশ্রাম-আশ্রয় থেকে তাঁকে সরিয়ে তবে এঁরা নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। এই সব ভাবতে ভাবতে ওপরে উঠতেই নজর পড়লো প্রফেসরের স্ত্রীর উৎকট সাজের দিকে। ঘোরতর শ্যামবর্ণ বিরাট দেহ। তার ওপর নীলাম্বরী ও চেলি ব্লাউজে তাঁকে আরও অদ্ভুত লাগছে! মাথায় উগ্র আধুনিক সাজে দু'টি খোঁপা—ঠোঁটের লিপষ্টিকের আতিশয্য, রাজশেখর বসুর উক্তি—'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হো'ক' মনে করিয়ে দেয়। ভুরু কামানো—আই ল্যাস মেক্-আপের সাহায্যে কৃত্রিম ভুরু আঁকা। একেই বিরাট মোটা তার ওপর নূতন তাঁতের শাড়ী পরে তাঁকে একটি মস্ত ধোপার বাড়ীর পুঁটুলী বলে ভুল হচ্ছে।

আমি বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়েছিলুম কিংবা কেন জানি না, তাঁর বিরক্তিটা বড্ড বেশী চোখে ফুটে উঠেছিল। কৃত্রিম হাসি দিয়ে সেটাকে ঢেকে মেমী-টোনে আমায় বললেন—"এসো ভাই রেণু, তোমার কাকীমা বুঝি আর আসতে পারলেন্ না?" এই তিরিশ বছরের গৃহিণী আমাদের ভাই বলে কিশোরী সাজার চেষ্টায় মনে মনে হাসি পেল। বললুম—"না, কাকীমার আবার রান্নার হাঙ্গামা আছে তো? ঠাকুরটার জ্বর হয়েছে।"

এমন সময় উঠলেন প্রতিমা সেন। বিখ্যাত লোকের মেয়ে, মস্ত অফিসারের স্ত্রী। একটি সুন্দর ভ্যানিটি ব্যাগ প্রফেসরের স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন—"এই নাও ভাই প্রীতি, সামান্য একটু স্মৃতি-চিহ্ন তোমাদের আজকের দিনে।" মহিলাটি সত্যিই খুব ভালো। স্বামী বড় চাকরী করলেও শ্বশুর সাধারণ গৃহস্থই ছিলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলা সত্যিকারের আভিজাত্যপূর্ণ বংশের মেয়ে—হাই সার্কেলে মিশেও শ্বশুর-শাশুড়ীকে বাড়ী থেকে দূর করবার চেষ্টা করেননি।

প্রীতি দেবী বললেন—"এবার তুমি একটা গাড়ী কেন প্রতিমাদি, কর্ত্তাটি তো তোমার কম রোজগার কচ্ছেন না!"

প্রতিমা দেবী বলেন—"কোথায় টাকা ভাই? ননদের বিয়ে মাথায় মাথায়। ওঁর ইচ্ছে দেওরটিকে বিলেতে পাঠান।"

কথায় বাধা দিয়ে প্রীতি দেবী বলেন—"ঐ সবই তো মুস্কিল! আমার দেওর গুণধর আজ চার বছর বিলেতে বসে ফুর্ত্তি কচ্ছেন আর ভাই টাকা পাঠিয়ে পাঠিয়ে হায়রাণ।"

কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও সম্মুখ শান্তিরক্ষার জন্য প্রতিমা দেবী "তা তো সত্যি।" বলে কথা চাপা দেন।

এমন সময় ওঠেন প্রীতি দেবীর বোন গীতি দেবী। একটা রূপার সিঁদুর-কৌটো হাতে দিয়ে বলেন—"বেড়ে আছিস্ তুই প্রীতি! একেবারে স্বয়ং স্বাধীন। তোকে দেখলে হিংসে হয়। আর আমার হয়েছে সব দিকে জ্বালা। কোন সকাল বেরুব বেরুব কচ্ছি—ছুটি আর মেলে না। তবু তো আজ এখানে আসবো বলে সেই শেষ রাত্রে উঠে কুটনোর পাহাড় নিয়ে বসেছি—গুষ্টী তো কম নয়! নামে বামুন আছে। জল-খাবার দু'বেলা সব এই একা হাতে করতে হয়। এমন কি, মেথে-বেলে অবধি উপকার করবে না। তার ওপর জায়ের কোলের মেয়েটা তো দিন-রাত্রি কাঁদে—তেমনি কাঁদুনে মেয়েও হয়েছে বাপু। ঐ মেয়ে যখন ছ'-মাসের, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে ভাসুর-জা গেলেন দার্জ্জিলিংএ। জা-এর সখের তো কমতি নেই। এখন আবার কথায় কথায় বলেন কেন গো বোনের মত স্বাধীন হবার সখ হয়েছে বুঝি? ওসব ট্যাঁ-ফোঁ এখানে চলবে না।' ভাসুরঝিগুলি তো এক-একটি নবাব-কন্যা—কাকীমা, প্লীজ, ছ'কাপ চা পাঠিয়ে দাও না।' আর এক জন বললেন—'দাও না কাকীমা আমার শাড়ীটায়
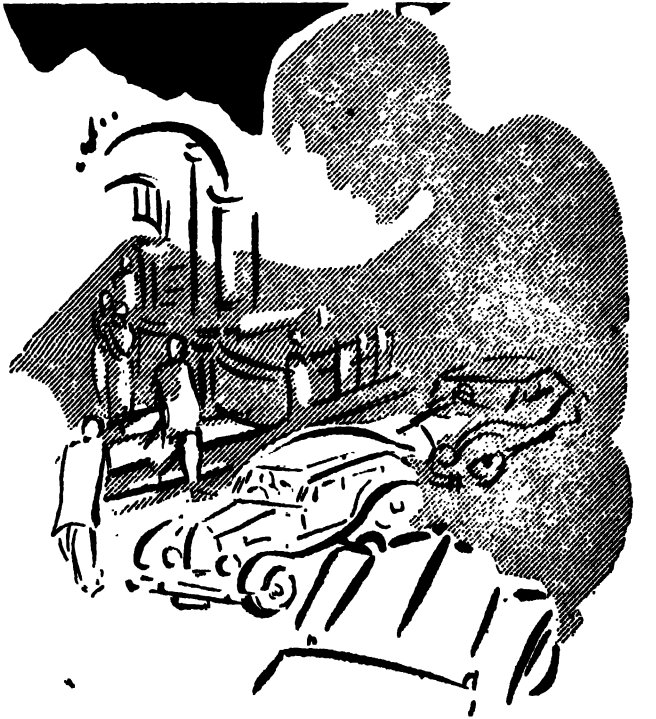
একটু ইস্ত্রি চালিয়ে।' এক-একটি ফ্যাসানের অবতার অথচ গতর বলে কোন পদার্থ নেই। ভাসুরপো-বৌটিও হয়েছে তেমনি—'কাকীমা, আজ আমার গানের রিহার্সাল—মেয়ে রইল দেখবেন।' 'কাকীমা, খোকনের জ্বর হয়েছে—ও আজ আপনার কাছে শোবে নইলে মেয়েটার আবার ছোঁয়াচ লাগবে।' নামে কাকীমা—আসলে যেন বাড়ীর ঝি হয়েছি আমি। ভাসুরপোদের তো কথাই নেই—'কাকীমা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু'-কাপ কফি করে ফেল দেখি! আজ বিকেলে একটু পুডিং কোরো, রমেন আর বিদ্যুৎটাকে নেমন্তন্ন করেছি।' যেই বলেছি আজ বিকেলে যে নেমন্তন্ন আছে প্রীতিদের ওখানে—অমনি একেবারে ফোঁস্! 'ওঃ, নেমন্তন্ন তো রোজই আছে—হাঁচলে কাশলে বাপের বাড়ীর গোল ফ্যামিলির নেমন্তন্ন। বাপ্ রে, কাকীমাকে একটা কাজ বলার উপায় নেই—যাই মাকে বলি গে কাকীমা পারবে না, ওদের না হয় কফি-হাউসেই নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো।' তখন আবার হাতে-পায়ে ধরে ছেলের খোসামোদ করে তাদের পুডিং ডিমের কচুরী খাইয়ে তবে এতক্ষণে ছুটি মিললো। তোর গাড়ী গিয়ে চারটে থেকে দাঁড়িয়েই আছে।" এমন সময় প্রতিমা দেবী উঠে বাথরুমের দিকে যেতেই গীতি দেবী গলাটা একটু নামিয়ে বললেন—"হ্যাঁ রে, তোর শ্বশুরের না কি আজ খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছে? আজ সকালে তোর শ্বশুরের ভাগ্নে এসেছিল—আমাদের বাড়ীতে, আমার ভাসুরপো মণ্টুর খুব বন্ধু কি না। বললো—'মামার যা অবস্থা রাত কাটে কি না সন্দেহ।' তার পর আমার দিকে চেয়ে একটু শ্লেষের সুরে বললে—'মেজ-বৌ, খুব সেবাটা কচ্ছে—ভালো বংশের মেয়ে তো?' আমি কি আর বুঝি না আমায় ঠেস দিয়ে কথাটা বলা হল মানে তোমার বোনের মত স্বার্থপর নয়।"

বাথরুম থেকে প্রতিমা দেবী বেরুতেই কথাটা চাপা পড়ে। এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন প্রীতি দেবীর মা ও ভাজেরা। আনন্দ-কলরবে মুমূর্ষু গৃহকর্ত্তার কথা চাপা পড়ে যায়। প্রীতি দেবী বলেন—"হ্যাঁ মা, বাবার শরীরটা না কি খারাপ যাচ্ছে? কেন বল দেখি? আপেলের রসটা বন্ধ করলে কেন? কাল তো তাই শুনে সেই রাতে গাড়ী মার্কেটে পাঠিয়ে আপেল আনাই, তার পর এই বালীগঞ্জ থেকে শ্যামবাজারে পাঠানো। শুধু কুরে রসটুকু করে দেওয়া—তা আর তোমার বৌদের দ্বারা হয়ে ওঠে না?" তিনি যে শ্বশুরের প্রতি কি ব্যবহার করেছেন সে কথা বলে অনর্থক হুলুস্থুল ঘটানোর সাহস ভাজেদের হয় না। তার পর গানে কমিকে গ্রামোফোনে হৈ-হৈ করে—খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ী ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা। এসে দেখি দরজায় ডাঃ কে, সি, মল্লিকের গাড়ী—কাকার ছোট ছেলে সানু পড়ে গিয়ে কপাল ফেটে রক্তগঙ্গা—কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। কাকীমা ডাক্তার বাবুর কাছে অনুযোগ করছেন—"কখন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি ডাক্তার বাবু! এতো দেরী করতে হয়?" ডাঃ মল্লিক বললেন—"কি করব বৌদি, এই মাত্র শ্রীকুমার বাবু মারা গেলেন—এই আপনাদের পাশের বাড়ীটা যাঁর। দু'ঘণ্টা তাঁর পাশে বসে। বড় ছেলে তো সর্ব্বস্ব গ্রাস করেই নিশ্চিন্দি—মেজ বিলেতে। ছোট ছেলে তো একবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। আহা, ছেলে মানুষ, বাপ যাবার তো বয়েস হয়নি। সামান্য টেম্পরারি চাকরি করে, বাপের এই কঠিন রোগের চিকিৎসা চালানো আর সারা রাত্রি বাপের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে। কি সেবা যে করলো বলার নয়! জানি বড় ডাক্তার করলো। এই যে বড় ছেলের বৌ এতো দুর্ব্যবহার করলো—শ্রীকুমার বাবুর মুখে কখনও কোনও অনুযোগ শুনিনি, ব্যাপারটা সব প্রথম আমিই জেনেছিলুম কি না। সেই যে দু'বছর আগে হঠাৎ ব্লাড্-প্রেসার খুব বেড়ে গেলো—সেইটা তো আর কমাতে পারা গেল না। আমার সঙ্গে তো ওঁর ডাক্তার-রোগী সম্পর্কে ছিল না, ঠিক ছেলের মতই ভালোবাসতেন। ওঁকে আনতে কার্মাটারে তো আমিই যাই। কি কাণ্ড করে আন'—মনে হয়েছিল এসে পৌছোন কি পৌছোন না। এমন বড় ছেলে যে অমন কঠিন রোগ শুনে কার্মাটারে তো যায়ই-নি—ষ্টেশনে পর্য্যন্ত যায়নি। আমি তো দেখে অবাক! আর রোগের আর অপরাধ কি, এই ষাট বছর বয়েসে দু'বছর ধরে এক বেলা এর বাড়ী—এক বেলা ওর বাড়ী—কখনও কখনও দু'চাকা পাঁউরুটি, কখনও দু'টি খই খেয়ে কাটিয়েছেন। মানী লোক তো—অপরের বাড়ী থাকতেও সম্মানে বাধে। সুনীল বাবু পেন্সনটাও কমিউট করিয়ে নিয়েছিলেন তো? শেষের দিকে আর্থিক অনটনেও বড় কষ্ট পেলেন। যে বৌ শ্বশুরকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় তার প্রতিও কি মমতাই ছিল! সেবার যখন ঐ বৌয়ের অপারেশন হয়, চার দিকে গুলী-গোলা চলছে—সুনীল বাবু যেতে চান না স্ত্রীকে দেখতে, তখন ঐ ষাট বছরের বৃদ্ধ ভবানীপুর থেকে হেঁটে মেডিকেল কলেজে গিয়ে পুত্রবধূকে দেখে এসেছেন। ট্রাম-বাস সব বন্ধ। তখন ১১ দিন অপারেশন হয়ে গিয়েছে প্রীতি দেবীর—রীতিমত আউট অফ্ ডেঞ্জার। কত করে বোঝালুম আমরা। সেই এক কথা—'আমি বুড়ো মানুষ, আমার আবার জীবনের দাম কি?' মনের কষ্টে যে মানুষ মারা যায় তা এই প্রথম দেখলুম। পরশু রাত্রে আমি পাশে বসে, ডেলিরিয়ামের মধ্যে বলছেন—'এটা কার বাড়ী? কোথায় আছি আমি?' ওটা তো ভাড়া বাড়ী তাই শুনে বললেন—'হায় হায়।' এদের এতো দুর্ব্যবহারের পর উইল করেছেন তাতে এঁদের মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়ার খরচ সবই দিয়ে গিয়েছেন—শুধু বলেছিলেন—'সুনীলকে বোলো, শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধের প্রহসন যেন ও না করে।' আচ্ছা, উঠি বৌদি—একবার শ্মশানে যেতে হবে—ঐখান থেকেই যেতুম কিন্তু এ পোষাকে যেতে ইচ্ছে হল না বলে একবার ধুতি-চাদর নেবার জন্যে বাড়ী এসে দেখি আপনার লোক বসে! নেহাৎই এক্সিডেন্টের ব্যাপার, নইলে আজ আর কলে বেরুতুম না। অসাধারণ মানুষ ছিলেন, দেশের ও দশের দুর্ভাগ্য তাই অমন অমূল্য প্রাণ অকালে গেলো চলে!" এমন সময় পাশের বাড়ীতে হৈ-হৈ করে একটা বাস্ থামলো—এক দল মেয়ে বিচিত্র সাজে শাঁখ বরণ-ডালা ফুলের-মালা নিয়ে গান গাইতে গাইতে নামলো:

—প্রেমের মিলন-দিনে সত্য সাক্ষী যিনি
অন্তরযামী নমি তাঁরে আমি···।

প্রীতি দেবী ও সুনীল বাবু এগিয়ে এলেন এঁদের সম্বর্দ্ধনা করতে। এখন প্রীতি দেবীর পরণে লাল জংলা বেনারসী, গলায় গড়ে-মালা, কপালে চন্দন। এরা ভেতরে যেতেই দেখি, সাইকেলে করে একটি কিশোর ছেলে—খালি-পা রুক্ষ-চুল—এসে নামলো—কেঁদে কেঁদে চোখ টকটকে লাল—গাড়ীটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দরোয়ানকে বললো—"বাবুকে একবার খবর দিতে পারো?"

ইংরেজী কথা-সাহিত্যের ত্রয়ী

বর্তমান ইংরেজী কথা-সাহিত্যের যে তিন জনকে নিয়ে এই আলোচনা, তাঁদের প্রত্যেকেই সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক; শুধু লেখক নন, তাঁদের তিন জনেরই প্রতিভা সমালোচকদের দরবারে স্বীকৃত এবং সম্মানিত। সমর্সেট মম, অল্ডাস হক্সলে ও ক্রিষ্টফার ইসারউড—বিংশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে এঁদের প্রত্যেকেই স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের প্রগতিশীল সাহিত্য-সংসদের পক্ষ থেকে নোবেল প্রাইজ কমিটির কাছে একটা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এই মর্ম্মে যে, সাহিত্যে এঁদের প্রত্যেকেই নোবেল প্রাইজ পাবার জন্য অনেক কাল আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই সংসদ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, কেন যে এঁদের কাউকে এ পর্য্যন্ত নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি তা ভেবে দেখবার বিষয়। এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে মমের দাবী সকলের আগে। অবশ্য ইংলণ্ডের এখনকার শ্রেষ্ঠ কবি টি, এস, এলিয়টের নামও এই প্রসঙ্গে উঠেছে, এলিয়টের কবি-প্রতিভা স্বীকৃত এবং সমাদৃত হলেও তিনি খাঁটি ইংলণ্ডীয় নন, যেমন নন বার্ণার্ড শ'। কাজেই ইংরেজী সাহিত্যিক হিসাবেই মম, হক্সলে ও ইসারউডের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ও সংযুক্ত আলোচনা এখানে করা গেলো।

প্রথমে ঔপন্যাসিক মমের কথা বলি। তিয়াত্তর বছরের বলিষ্ঠ দেহ এই মানুষটির লেখনী আজও অক্লান্ত। গত পঞ্চাশ বছর ধরে ইংরেজী কথা-সাহিত্যে তিনি নেতৃত্ব করে আসছেন। তিনি জনপ্রিয় লেখক এই অর্থে যে, তিনি তাঁর নিজের চোখে দেখা বিষয়-বস্তুকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরল ভাবে এবং সরলতম ভাষায় প্রকাশ করেন। কথা-সাহিত্যের কারবারী হলেও ঠিক যেটুকু বলবার সেইটুকু বলেন অনন্যকরণীয় ভাষায় এবং ভঙ্গীতে। বাহুল্যতা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মমের জীবন বড় বিচিত্র, যেমন বিচিত্র তাঁর জীবনের উপলব্ধি, অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা দৈবের দান নয়; সাহিত্যিক তিনি হয়েছেন নিজের একনিষ্ঠ চেষ্টা, যত্ন এবং সাধনায়। এই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভও করেছেন অপরিসীম। ১৮৭৪ সালে প্যারীতে তাঁর জন্ম। সেখানে বৃটিশ এম্বেসিতে মমের বাবা ছিলেন সলিসিটর। মম যখন মাত্র আট বছরের তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়-এবং তার ঠিক দু'বছর বাদে তাঁর বাবা মারা যান। দশ বছর বয়স অবধি মম ইংরেজী ভাষা কিছুমাত্র শেখেননি এবং তার ওপর তিনি ছিলেন তোতলা। পিতৃমাতৃহীন মম এলেন ইংলণ্ডে তাঁর কাকার কাছে। কাকা ছিলেন এক জন ধর্ম্মযাজক এবং ভাইপোটিও যাতে সেই বৃত্তি অনুসরণ করে তার জন্যে তিনি মমকে তেরো বছর বয়সে ক্যাণ্টারবারীর কিংস্ স্কুলে পাঠালেন। পাদ্রীর বৃত্তি মমের পছন্দ হলো না। তাই শেষ পরীক্ষা না দিয়েই তিনি স্কুল ছেড়ে দিলেন। হিসাব-পরীক্ষকের বৃত্তির জন্যে তিনি অন্য একটা স্কুলে ভর্ত্তি হলেন এবং তাতে কৃতকার্য্য হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। এই সময় তিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন এবং চিকিৎসার জন্যে এলেন দক্ষিণফ্রান্সের এক স্বাস্থ্যনিবাসে। সেখানে থেকে রোগমুক্ত হয়ে প্যারিতে এসে চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় মন দিলেন এবং অধ্যয়ন অসমাপ্ত রেখে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে সেণ্ট টমাস হাসপাতালে চিকিৎসা বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভের এক বছর আগে মমের

অল্ডাস হাক্সলে

প্রথম উপন্যাস "লিজা অব ল্যামবেথ" প্রকাশিত হয়। পাঠকমহলে বইখানি সমাদৃত হলো দেখে মম অবশেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে তিনি লেখকের বৃত্তিই গ্রহণ করবেন। চিকিৎসক মম লেখক মম হলেন। প্রথম জীবনে তিনি অবশ্য নাট্যকার হতে চেষ্টা করেন এবং কিছু নাটকও রচনা করেন। এর কিছুকাল বাদে "অব হিউম্যান বণ্ডেজ" নামক বহু খ্যাত উপন্যাস লেখবার পর পাকাপাকি ভাবে ঔপন্যাসিক হিসেবেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করলেন।

মমের লেখার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ তাঁর অসামান্য পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং তার সুনিপুণ প্রকাশ। মম অত্যন্ত সহৃদয় প্রকৃতির লেখক। কথা-সাহিত্যে তিনি এক জন রিয়ালিষ্ট কি সিনিক, এ তর্ক আমি তুলতে চাই নে। লোকটির মানস গঠন স্বতন্ত্র রকমের। একটু উদাসী প্রকৃতির, কিন্তু তাই বলে রক্তমাংসের মানুষকে উপেক্ষা করেননি কোনও দিন। আত্মকেন্দ্র বটে, কিন্তু স্বভাবে অকৃতজ্ঞ নন; তীক্ষ্ণদৃষ্টি বটে, কিন্তু শুধু ব্রণান্বেষীই নন। তিনি মানুষের

ইসারউড

ও জগতের নানা নিহিত সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও পূর্ণ সচেতন। তাঁর নিজের জবাববন্দী এই: "আমাকে অনেকে বলেন সিনিক। মানুষ যত খারাপ, আমি না কি তাকে তার চেয়েও খারাপ করে এঁকেছি। আমার মনে হয় না, এ অভিযোগের ভিত্তি আছে। আমি যা করেছি তা এই যে, মানুষের চরিত্রের এমন অনেক গুণাগুণকে বড় করে দেখিয়েছি, যাদেরকে লোকে দেখেও দেখতে চায় না।" (Summing up—৫৮ পৃষ্ঠা)। প্রতিভার চেয়ে বড় কথা হলো সদাশয়তা—এ কথা এ যুগে বলতে পেরেছেন একমাত্র সমর্সেট মম্। তাঁর এই মনোবৃত্তিকে নিয়ে সমালোচকরা হাসাহাসি করেছেন। কিন্তু তাঁরাও আজ এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, মম্ আমাদের অনেক কিছু দেখতে শিখিয়েছেন। তাঁর মৌলিক চিন্তাশক্তির উজ্জ্বলতায় আমাদের অনেক গতানুগতিকতার পথ তিনি মেরে দিয়েছেন; সকলের ওপর মানুষকে বুঝতে, চিনতে ও জানতে শিখিয়েছেন তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণে ও নৈতিকতায়। অসাধারণ তাঁর পর্য্যবেক্ষণ শক্তি। মধ্য-জীবনে যখন তিনি দক্ষিণ সাগর দ্বীপে এবং প্রাচ্য দেশে ঘুরে বেড়াতেন, তখন সৌখীন পর্য্যটকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর আশে-পাশের মানুষকে দেখতেন না। দেখতেন সেই স্বচ্ছ চোখ দিয়ে যে চোখের দৃষ্টিশক্তি মাইক্রোস্কোপের চোখকেও হার মানায়। তাই এই মানুষটির চোখ দু'টি সত্যিই অসাধারণ—অতল অবগাহী—যেমন অসাধারণ তাঁর মন। সেই জন্যেই মম্ বলে থাকেন—"দেখতে জানা চাই—"But you must know how to look. And it is not nearly so easy." এই দৃষ্টিশক্তির নিদর্শন মিলবে তাঁর "দি মুন এ্যাণ্ড সিক্স পেন্স," "রেজর্স এজ", "কেকস্ 'এ্যাণ্ড এল্" প্রভৃতি উপন্যাস এবং অজস্র গল্পের বহু ও বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে। এই দৃষ্টিশক্তি এবং তার উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত প্রকাশ দীর্ঘকাল মমকে কথা-সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিল। সমালোচকরা তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না এই জন্যেই এবং ঠিক এই কারণেই তাঁর অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম (আজও যে খুব বেশী, তা নয়)। আর্ট-সর্ব্বস্বতাই যে তাঁর জীবনের প্রধান বাণী হয়ে ওঠেনি—তারও মূলে আছে তাঁর এই দৃষ্টিশক্তি। "আর্টের পরিসমাপ্তি সৌন্দর্য্যে নয়, ন্যায়কর্ম্মে—"এমন কথা ইংলণ্ডের আর কোন্ ঔপন্যাসিক বলেছেন আত্মপ্রত্যয়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে? অথচ মম্ এক জন সুদক্ষ সুকুমার শিল্পী এবং গলসওয়ার্দ্দি প্রমুখ অনেকের চেয়েই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর শিল্পী। তাঁর উপন্যাসের কথা নাই বা তুললাম। বিংশ শতকে এত উৎকৃষ্ট ছোট গল্প আর কেউ লিখেছেন? এমন চক্ষুষ্মান্ লেখক এ যুগে সত্যিই বিরল। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের এখনকার প্রসিদ্ধ সমালোচক সিরিলী কনোলী তাই বলেন: "As a craftsman, Maugham is simple in his devices, yet subtle in that simplicity; and his hand never fatters or hesitates. And what is striking is the formidable glance of his iceberg eyes that pierces the inner-most part of human mind."—এ উক্তি যে অত্যুক্তি নয় তা মমের বিদগ্ধ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

* * * *

প্রখর চিন্তাশীল এবং প্রিয়দর্শন লেখক অল্ডাস হক্সলে এখন রীতি-মতো এক জন বানপ্রস্থী। দক্ষিণ আমেরিকার এক নির্জ্জন পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি সুন্দর আশ্রমে তিনি এখন বাস করেন। সেখানে সঙ্গী তাঁর স্ত্রী মারিয়া এবং হিন্দু সন্ন্যাসী কৃষ্ণমূর্ত্তি। এখন তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বছর। চুলে ঈষৎ পাক ধরেছে। পুরো ছ' ফুট লম্বা এই মানুষটির লেখার দুঃসাহসিকতা এক দিন তাঁর প্রথম যৌবনে ইংলণ্ডের সাহিত্যে একটা সাড়া এনেছিল। তাঁর চেহারায়, বিশেষ মুখে প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। যে-পরিবারে তাঁর জন্ম, সেই হক্সলে-পরিবার ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ পরিবার—সে প্রসিদ্ধি জ্ঞানের, বিদ্যার এবং পাণ্ডিত্যের। তাঁর পারিবারিক আভিজাত্য সম্বন্ধে এই কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে: "No British writer, in any period, has had such a formidable literary ancestory as Aldous Huxley." ইংলণ্ডের ভিক্টোরীয় যুগের তিন জন চিন্তানায়কের প্রভাব তাঁর জীবনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট—টমাস হেনরী হক্সলে, ম্যাথ্ আর্ণল্ড এবং হামফ্রে ওয়ার্ড।

অল্ডাস হক্সলে কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক। ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম এবং প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্র-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে কিছু কাল কাব্যচর্চ্চা করবার পর হক্সলে গল্প লেখায় হাত দেন এবং তার পরে উপন্যাসে। তাঁর প্রথম উপন্যাস "ক্রোম ইয়লো" তাঁকে এক জন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের প্রতিষ্ঠা এনে দিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ের পটভূমিকায় বিরচিত তাঁর পরবর্ত্তী প্রত্যেকখানা উপন্যাসই (এ্যান্টিক হে, দোজ ব্যারেন লিভস্, পয়েন্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট, ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড প্রভৃতি) চিন্তা-জগতে একটা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। তার পর সুরু হয় তাঁর ভ্রাম্যমানের জীবন। জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি কিছু কাল ভারতবর্ষে এসে এর প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পর্য্যটন করেন। ঠিক এই সময়েই তাঁর জীবনে আসে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। সমাজ ও সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বৈরাগ্য এবং এর পেছনে ছিল বেদান্তদর্শনের প্রভাব। রোঁলা, রাসেল এবং ই, এম, ফর্ষ্টারের পর হক্সলেই উল্লেখযোগ্য বিদেশী লেখক যিনি ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছেন মনে-প্রাণে। ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিকতা যেমন তার প্রভাব বিস্তার করেছে এঁদের প্রত্যেকের মনে এবং চিন্তায়, সেই সঙ্গে এ দেশের বৈচিত্র্যেও এঁরা মুগ্ধ। ইংলণ্ডের আর কোনো ঔপন্যাসিক আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন গভীর ও আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেননি—যেমন করেছেন অল্ডাস হক্সলে। এই প্রাচ্য-প্রীতি অনেক বিদেশী লেখকের কাছেই একটা নিছক বিলাসিতা, কিন্তু হক্সলের এই বিষয়ে আন্তরিকতা যে কত গভীর এবং ব্যাপক তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর "পেরিনিয়াল ফিলোজফি" নামক বইখানিতে। "But India—that is above all the place···Nothing is so fascinating as the Indian mind and the Indian intelligence"—এই কথা ইংলণ্ডের আর কোনো ঔপন্যাসিকের মুখ থেকে আমরা আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর ভারতবর্ষের আত্মার মহিমাকে হক্সলে সত্যিই উপলব্ধি করেছেন বলেই আজ তিনি বৈরাগ্যের উত্তরীয় সম্বল করে আশ্রমবাসী হয়েছেন। লস্ এঞ্জেলসের সেই অনাড়ম্বর আশ্রমে হক্সলে নিজের

হাতেই সব কাজ-কর্ম্ম করেন—রান্না থেকে বাসন-মাজা পর্য্যন্ত এবং তাঁর স্ত্রী মারিয়া এ-কাজে তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী। জীবনে যে চরম সত্য তিনি এখন উপলব্ধি করেছেন তাকে তিনি ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে: "I insist that politics are never enough, and that the human problem is insoluble unless it be attacked simultaneously on all its fronts—the personal front as well as the political, the religious and philosophical as well as the economic—"আজকের দিনের ইউরোপ বানপ্রস্থী হক্সলের এই কথায় কান দেবে কি না, কে জানে?

* * * *

ইসারউড—সন্ন্যাসী ক্রিষ্টফার ইসারউড সম্পর্কে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে ইসারউডের রচনার সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হওয়া একটা কর্ত্তব্যের সামিল এবং পুনরায় তা অনুশীলন করা অনাবিল আনন্দের বিষয়।

১৯০৪ সালে চেলসায়ারে এক ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবারে ইসারউডের জন্ম। রেপ্টন এবং কেমব্রিজের তিনি এক জন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সতেরো বছর বয়সে কেমব্রিজের তিনি স্কলারসিপ লাভ করেন। তাঁর বাপ-মায়ের ইচ্ছা ছিল, ছেলে এক জন অধ্যাপক হবে। কিন্তু শেষ পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর না লিখে কলেজের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে রচনা করলেন এক অনবদ্য ছড়া—ফলে কলেজ থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন। তার পর ১৯২৮-২৯ সালে লণ্ডনের কিংস কলেজে তিনি ডাক্তারী পড়তে সুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ভাগ্যে চিকিৎসক হয়ে ওঠা ঘটল না। এ্যানাটমী ও ফিজিওলজীর কণ্টকাবৃত অরণ্য থেকে তিনি এক দিন কন্টিনেন্টের পথে পা বাড়ালেন—বাইরের বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে।

১৯৩০ সাল। ইসারউড বার্লিনে এলেন। ১৯৩০ সালের বার্লিন। হিটলারের আসন্ন অভ্যুদয় এই সময় বার্লিনে যে প্রাণচাঞ্চল্য, এর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে যে জাগরণ এনে দিয়েছিল—তার অন্তরালে ক্ষমতালোভী ডিক্টেটরের যে নিরঙ্কুশ চক্রান্ত ধীরে ধীরে অক্টোপাশের দুর্ভেদ্য জাল বুনছিল—নবাগত ইসারউডের চক্ষে সেই বার্লিন আশ্চর্য্য ভাবে প্রতিভাত হল। একটা বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ে জুয়াড়ীর মনোবৃত্তিসম্পন্ন এক অজ্ঞাতকুলশীল অধিনায়ক সদম্ভে যে রকম ছিনিমিনি খেলা সুরু করছিলেন, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাবার সুযোগ পেলেন ইসারউড বার্লিনে এসে। তিনি উদ্বুদ্ধ হলেন এই সময়কার বার্লিনের পটভূমিতে একখানি উপন্যাস রচনা করতে। একটা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনকে তিনি কথা-সাহিত্যে যে-ভাবে রূপ দিলেন, তার মৌলিকত্ব সমালোচক ও পাঠকদের দৃষ্টি ও প্রশংসা সহজেই আকর্ষণ করল। "মিঃ নোরিস চেঞ্জেস দি ট্রেনস" এবং "গুডবাই টু বার্লিন"—এই দু'খানি বই লিখে ইসারউড এক জন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

মম্

এর আগে তাঁর তিনখানা বই প্রকাশিত হয়! কিন্তু "মিঃ নোরিস চেঞ্জেস দি ট্রেনস্" প্রকাশিত হবার পর থেকেই ইসারউডের মধ্যে সমালোচকগণ মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন এক জন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীকে আবিষ্কার করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে সকলে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁর বার্লিনের গল্পগুলিতে রচনাশৈলীর অনন্যসাধারণতা লক্ষ্য করবার বিষয়। সেই সঙ্গে চরিত্র-চিত্রণের সরস অথচ ট্র্যাজিক ভঙ্গী পাঠকের মন ও চিন্তাকে সহজেই অভিভূত করে।

উপন্যাস ও গল্প ছাড়া, কবি অডেনের সঙ্গে তিনখানা নাটকও ইসারউড লিখেছেন। তাঁর রাজনৈতিক বইখানিও কম প্রসিদ্ধ নয়, সেটির নাম হল "জার্নি টু এ ওয়ার"—এর বক্তব্য বিষয় সমসাময়িক চীনের অন্তর্বিপ্লব। কিন্তু ভারতবাসীর কাছে আজ ইসারউড যে জন্য প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন, সে হল গীতার অনুবাদের জন্য। ঠিক অনুবাদ নয়, গীতার প্রত্যেকটা শ্লোকের মর্ম্মবাণীকে তিনি কবিতায় রূপায়িত করে তুলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকাপ্রবাসী স্বামী প্রভাবানন্দ তাঁকে এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বর্ত্তমানে ইসারউড ক্যালিফর্নিয়ার কাছে একটি আশ্রমে বাস করেন। তাঁর চিন্তায় ও চরিত্রে এসেছে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ঔপন্যাসিক ইসারউড আজ তলিয়ে গেছেন—বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের কাছে এ এক মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ।

ছোটদের আসর
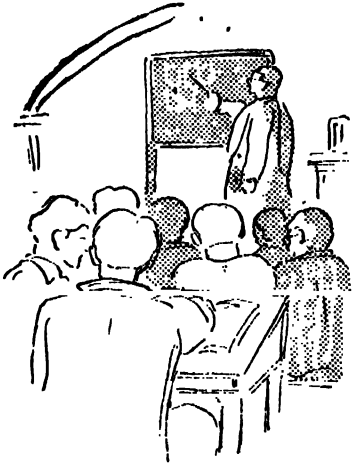
গোলক-ধাঁধা

শ্রীসুজিতকুমার মহলানবিশ

শ্রীমান্ গোলোকচন্দ্র ধর, ওরফে গোলু, ওরফে গোলক-ধাঁধা ছেলেটি নেহাৎ মন্দ নয়। গোলোক থাকে তার এক বিধবা পিসী ও বাবার সঙ্গে দূর-পশ্চিমে, গোলুর বাবা গোকুল ধর একটি মাইকা ও কয়লা কোম্পানীর কেরাণী হয়ে ১৩২৫ সালে প্রথম এই পশ্চিমে বাস সুরু করেন। মাতৃহীন গোলু তখন শিশু। বাড়ীতে তার বিধবা পিসীই তার দেখাশুনা করতেন। তারা যে জায়গাটায় থাকত, তার নাম ছিল 'মহুয়া'—বোধ করি, মহুয়া গাছের প্রাচুর্য্যের জন্যই। এই জায়গার দৃশ্য অতি মনোরম। এক দিকে গভীর শালবন, অন্য-দিকে উঁচু পাহাড়ে-জমী এবং দূরে একটি ছোট পাহাড়ে-নদী। রেল থেকে নেমে দুই ক্রোশ পথ গেলে এই জায়গায় পৌঁছান যায়। আগে সেখানে প্রায় কিছুই ছিল না, এখন সেখানে কয়েক ঘর ভদ্রলোকের বাস সুরু হয়েছে এবং সপ্তাহে এক দিন হাটও বসে। তবে শহর বলতে যেটুকু বোঝায়, তা ছিল ষ্টেশনের কাছে, অর্থাৎ সেখানে আরও কয়েক ঘর ভদ্রলোকের বাস ছিল এবং একটি ছোট স্কুল ও একটি ডিস্পেনসারী ছিল।

মহুয়া থেকে আধ মাইলের মধ্যে গোলুর বাবার আপিস। তিনি রোজ দশটায় খেয়ে বেরোতেন এবং কোন দিন সাড়ে পাঁচটা অথবা কোন দিন আরো দেরীতে ফিরতেন। গোলু রোজ দু' ক্রোশের উপর পথ হেঁটে স্কুলে যেত। বাড়ীর কাছাকাছি তার কোন সঙ্গী না থাকাতে তার অভাবটি সে বড়ই বোধ করত। বাড়ীতে তাই তার প্রধান সঙ্গী ছিল কালু বলে একটি প্রকাণ্ড কালো কুকুর। কালুকে গোলু বাচ্চা অবস্থা থেকে পালন করেছিল এবং এই বুনো-প্রকৃতির কুকুরটি একমাত্র গোলুকেই ভালবাসত এবং ভয় করত। কালুর অদ্ভুত বুদ্ধি ছিল। সে গোলুর আদেশ ও সঙ্কেত আশ্চর্য্য রকম বুঝত। এই প্রকাণ্ড কুকুরটি গোলুর গর্ব্বের বিষয় ছিল, কারণ, মাসের পর মাস ধৈর্য্য ধরে সে তাকে নিজের হাতে নানা রকম কাজ করতে শিখিয়েছিল।

গোলু এখন সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে। পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে, পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে ও নানা রকম শারীরিক ব্যায়াম করে তার গায়ে অসম্ভব জোর হয়েছিল। শুধু যে তার শারীরিক শক্তি ছিল তা নয়, ছেলেবেলা থেকে একা-একা ঘুরে তার সাহসও খুব হয়েছিল।

এই সময় তার মাথায় নানা প্রকার আজগুবি কল্পনা খেলতে সুরু করে। এর মূল কারণ বোধ হয় কয়েকটি (অপাঠ্য) পুস্তক। গোকুল বাবু মাঝে মাঝে সময় কাটাবার জন্য বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ডিটেক্‌টিভ নভেল ধার করে এনে পড়তেন। গোলু এক দিন ঘটনাক্রমে সেই সব নভেল পড়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। এই বয়সে ছেলেরা যা পায় তাই আগ্রহ করে পড়ে। আমাদের গোলোকচন্দ্রও তাই গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে তন্ময় হয়ে যেত। যাই হোক, এক দিন হঠাৎ গোকুলচন্দ্রের নজরে পড়ে যাওয়াতে তার নভেল পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার পর থেকেই গোলুর মনে মনে গোয়েন্দা হবার একটি প্রবল ইচ্ছা জন্মায়। গোয়েন্দা-কাহিনীর নায়ক গজেন্দ্র তার আদর্শ পুরুষ হয়ে উঠেছিল। এই সময় হঠাৎ এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেল যে গোলু তার মনের সখগুলি মেটাবার সুযোগ পেয়ে গেল।···

গোলুদের বাড়ী সবশুদ্ধ তিনটি পাকা ঘর ছিল। একতলায় দু'টি ও দু'তলায় একটি। একতলার একটি ঘরে গোকুল বাবু থাকতেন ও অন্যটিতে পিসী থাকতেন। গোলু কিছু কাল হোল উপরের ঘরটি দখল করেছিল। এই ঘরটি তার বড়ই প্রিয়। ঘরের এক কোণে একটি তক্তাপোষ ও আর এক কোণে একটি ছোট টেবিল ছিল। এই ঘরের জানালা দিয়ে বহু দূর দেখা যেত। বাড়ীর ভিতর দিকে একটি পাঁচিল-ঘেরা ছোট উঠান ছিল এবং বাড়ীর গায়ে লাগান একটি চাতাল ছিল। এই চাতাল থেকে একটি ছোট সিঁড়ি দিয়ে গোলুর ঘরে যাওয়া যেত।

এক দিন রাত্রে গোকুল বাবু খেতে বসে গল্প করলেন যে, 'টিলাডি' অর্থাৎ ষ্টেশনের কাছের পাড়াতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মহুয়া থেকে টিলাডি যেতে পথে একটি প্রকাণ্ড মাঠ আছে। সেই মাঠের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ী আছে। এই বাড়ীর অর্দ্ধেক ঘরই ভাঙ্গা। বাড়ীটি এক সময় কয়লা কোম্পানীর সাহেবদের ছিল, কিন্তু বহু দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকে এখন পোড়ো-বাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর সাহস করে কেউই সেই বাড়ীর কাছে যেত না এবং বাড়ীটার সম্বন্ধে নানা রকম আজগুবি গল্পও রটেছিল। ষ্টেশন-ক্লার্ক রামরতন বাবু এক দিন বাড়ী ফেরবার সময় এই পোড়ো-বাড়ীতে আলো দেখতে পেয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেন যে, কে বা কারা সেখানে আছে। কিন্তু উত্তরে তিনি শুধু বিকট হাসি ছাড়া আর কিছু শুনতে পাননি। ভয়ে তিনি ছুটে বাড়ী পালিয়ে যান এবং এই ঘটনার পরে আরও অনেকে সেখানে হাসি ও শব্দ শুনতে পায়।

গোকুল বাবু খেতে বসে নানা রকম গল্প করছিলেন আর গোলু নিবিষ্ট মনে তাই শুনছিল। পরের দিন গোলু 'টিলাডি'তে স্থানীয় চৌকিদারদের আখড়ায় গেল। এই আখড়ায় গোলু ছুটীর সময় নিয়মিত কুস্তি লড়ত। এখানে গয়ারাম ছিল গোলুর প্রধান শিক্ষক। গয়ারামের গায়ে যে পরিমাণ শক্তি ছিল, মাথায় সেই পরিমাণ বুদ্ধি ছিল না। গোলুকে দেখে, গয়ারাম সাদর সম্ভাষণের পর জিজ্ঞেস করল যে, গোলু 'পোড়ো-বাড়ীর' গল্প শুনেছে কি না? গোলু ঘাড় নেড়ে বলল যে, সে শুনেছে এবং সে নিজে এই রহস্যের কিনারা করতে চায়। গয়ারাম সভয়ে বলল, "ওসি বাত বোলো না গোলু বাবু, আপনার কি জানের ভয় নেই? সেখানে দানা আউর পিরেত কি আড্ডা।" গোলু দেখল যে, গয়ারাম আগেই ভয় পেয়ে গেছে। যাই হোক, গয়ারামের কাছে বিদায় নিয়ে সে

আবার বেরিয়ে পড়ল। চিন্তিত মনে কিছু দূর অগ্রসর হবার পরই সে দেখল যে আকাশে মেঘ করেছে। সুতরাং সে বাড়ীর দিকেই ফিরে চলল। একটু পরেই সে পোড়ো-বাড়ীটার কাছে এসে পড়ল এবং সেটার সামনে দিয়ে যাবার সময় নিস্তব্ধ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে গোলুর গত রাত্রের কথাগুলি সম্পূর্ণ আজগুবি বলে মনে হোল। গোলু যখন নিজের বাড়ীর কাছে এসেছে তখন ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে সুরু করল। গোলু দরজার কড়া নাড়তেই ঘেউ-ঘেউ করে কালু সাড়া দিল এবং দরজা-খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের মত সে গোলুর গায়ে লাফিয়ে উঠে আনন্দ জ্ঞাপন করতে লাগল।···

সেদিন রাত্রে খাবার পর গোলু যখন নিজের ঘরে গেছে, তখন খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। সে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুমাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। খাটের নীচে ঝুঁকে সে দেখল যে কালু নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমোচ্ছে। বাইরে অন্ধকারে বৃষ্টি আর ঝড়ের গর্জ্জন। হঠাৎ তার মনে হোল যে, পায়ের দিকের জানলাটা দিয়ে দূরে পোড়ো-বাড়ীটা দেখা যায়। সে আস্তে আস্তে উঠে জানলাটা একটু ফাঁক করে অন্ধকারে পোড়ো-বাড়ীটা দেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এক-এক বার জলের ঝাপটা এসে তার মুখ-চোখ ভিজে যাচ্ছিল, কিন্তু তবুও জোর করে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মিনিট এই ভাবে যাবার পর হঠাৎ সে অবাক হয়ে দেখল যে একটা তীব্র আলোর রেখা অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে মিলিয়ে গেল।

এই ভাবে কয়েক মিনিট অন্তর সেই আলোর রেখাটিকে সে আরও কয়েক বার দেখতে পেল। সে একদৃষ্টিতে বাড়ীটার দিকে লক্ষ্য রাখছিল বলে একটা জিনিষ দেখতে পেল না। দূরে একটা লাল আলো কয়েক বার মিট-মিট করে জ্বলে নিবে গেল। গোলু আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন কিছু দেখতে পেল না, তখন এসে শুয়ে পড়ল আর একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে উঠে গোলু গতরাত্রের ঘটনার কথা বাড়ীতে কাউকে বলল না। স্কুল থেকে ফিরে এসে সে কালুকে সঙ্গে নিয়ে সেই পোড়ো-বাড়ীটার অভিমুখে যাত্রা করল। এই বাড়ীটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের। আসল বাড়ীটা ঘিরে অনেকগুলি ছোট ঘর ছিল এবং একটা পাঁচিল-ঘেরা বড় উঠান পেরিয়ে আসল বাড়ীটায় ঢুকতে হোত। বাড়ীটার ভিৎ খুব উঁচু ছিল, এবং নীচে অনেক চোরা-কুঠরী ছিল। ভগ্নদশা প্রাপ্ত হবার পর বাড়ীটায় সাপ, ব্যাঙ ও নিশাচর পশুপক্ষীর আড্ডা হয়েছিল।

গোলু মাঠ পেরিয়ে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ীটা দেখে মনেই হয় না যে সেখানে কারুর বাস আছে। সামনের সব ঘরগুলিই ভাঙ্গা। সূর্য্য তখন বাড়ীর পিছন দিকে হেলে পড়াতে বাড়ীর ভিতরটা একটু অন্ধকার মনে হচ্ছিল। গোলু সাহস করে সামনের ঘরটায় ঢুকল। অন্য সময় হলে কালু আগে ছুটে যায়, কিন্তু আজ সে গোলুর সঙ্গে সঙ্গেই রইল। গোলু সামনের ঘর পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু অন্ধকার একটা মস্ত ঘরে ঢুকল। গোলুকে ঢুকতে দেখে কয়েকটা চামচিকা উড়ে পালাল। গোলু উপর দিকে তাকাতেই, তার পায়ের কাছ দিয়ে কি যেন একটা তাড়াতাড়ি চলে গেল! কালু তেড়ে গেল না, অথবা ধরতে পারল না এমন কি জীব পায়ের কাছ দিয়ে চলে গেল, এই কথা ভাবতে ভাবতে গোলু ভিতরের দিকে পা বাড়াতেই একটা কিচ্-কিচ্ শব্দ শুনে সভয়ে তাকিয়ে দেখে যে প্রকাণ্ড একটা কেউটে সাপ একটা মস্ত ইঁদুর ধরেছে। ইঁদুরটা গোলুদের দেখে, বাইরে পালাতে না পেরে ভিতর দিকে পালাতে গিয়েছিল ও তাইতে সাপের মুখে পড়েছে। চারি দিকে ভাঙ্গা ইটের স্তূপ থাকাতে সেখানে সাপের বাসা হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। গোলু আস্তে আস্তে পেছু হটে কালুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। সাপটা ইঁদুর গিলতে ব্যস্ত থাকায় তেড়ে এল না। বাইরে এসে গোলু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কুকুর-বাঁধা শিকলটা বার করে কালুর গলায় আটকে দিল—যাতে সে কোথাও ছুটে না যেতে পারে। গোলু মনে মনে ভাবল যে, ভাঙ্গা-বাড়ীর ভিতরে যাবার পথটি যদি এই ভীষণ প্রহরীর পাহারায় থাকে, তাহলে নিশ্চয় কোন প্রাণীই এই পথে যেতে পারে না। গোলু যতই ভাবতে লাগল ততই তার সন্দেহ হতে লাগল। সেদিন অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে আর দেরী না করে গোলু বাড়ীর দিকেই ফিরে চলল।

রাত্রে খাওয়ার পর গোলু শুয়ে শুয়ে পোড়ো-বাড়ীর কথাই ভাবছিল। বাড়ীটার সামনের সব ক'টা ঘরই প্রায় ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল। এই ক'টা ঘর দিয়েই ভিতরের বড় ঘরটায় যাওয়া যেত এবং ভিতরের উঠানে যেতে হলে এই বড় ঘরটা দিয়ে যেতে হোত। গোলুর মনে হোল যে, ভিতরের বড় ঘরটায় যখন ওই রকম ভীষণ প্রহরী রয়েছে তখন উঠানে এবং ভিতর-বাড়ীতে যাবার নিশ্চয় অন্য কোন গুপ্ত পথ আছে, এবং এই পথে নিশ্চয় নির্ভয়ে যাতায়াত করা যায়। নানা রকম কথা ভাবতে ভাবতে গোলু ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে গোলু তার অন্তরঙ্গ বন্ধু দু'টিকে সব ঘটনা বলার সুযোগ খুঁজতে লাগল। বরেন দাস ও কানাই ঘোষ দু'জনেই গোলুর সহপাঠী। বরেন বয়সের পক্ষে যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। গায়ে তার সাঁওতালদের মত শক্তি। কানাই ছিল ছোট-খাট ছিপছিপে চেহারার। গোলুর মনে পড়ল, সে কানাইয়ের হাতে একটা টর্চ্চ বাতি দেখেছিল এক দিন। সে নিজে একটা টর্চ্চের অভাব বড়ই বোধ করছিল। কানাইকে ছুটির পরে সে বললে, "দেখ, তোর টর্চ্চটা আমায় কয়েক দিনের জন্য ধার দিতে পারিস?" কানাই বললে "আগে কি জন্যে বল, তার পর আমি দেব।" গোলু বললে, "আগে তুই দে, পরে সব বলব।" কানাই বললে, "আচ্ছা পাশে আমার বাড়ী থেকে নিয়ে যাস, পরে কিন্তু আমায় সব বলতে হবে।" গোলু চলে যেতে যেতে বললে, "আচ্ছা, তাই নিয়ে যাব।"

সেদিন বাড়ী ফিরে গোলু, যা যা জিনিষ দরকার তারই একটা ফর্দ্দ করে ফেলল। একটা টর্চ্চ, একটা শক্ত লাঠি, একগাছা দড়ি ও একটা বড় ছুরি। কেন যে এই জিনিষগুলি দরকার, তা সে ঠিক করতে পারল না, তবে তার মনে হোল যে এইগুলি ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে গোলু তার বাবাকে পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে খবর জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন যে, পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে

নতুন খবর কিছু নেই বটে, তবে তাঁর আপিসের ভূধর বাবুকে হাটের দিনে এক জন সম্পূর্ণ অচেনা লোক ওই পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। ভূধর বাবু বললেন যে সেই লোকটির প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে তার একটু সন্দেহ হয়, উপরন্তু তিনি কোন কালেই লোকটিকে এই অঞ্চলে দেখেননি। লোকটি যদিও বাঙলা ভাষায় কথা বলেছিল, কিন্তু সে বাঙালী কি না এ বিষয় তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে গোলু ভূধর বাবু-কথিত সেই অজানা লোকটির কথা ভাবছিল। সে ভেবে দেখল যে এক জন অজানা লোক—যাকে সে তল্লাটে কেউ কখনও দেখেনি—যখন হঠাৎ পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে খোঁজ নেয়, তখন সে নিশ্চয় জানতে চায় যে বাড়ীটার সম্বন্ধে কি গুজব রটেছে। তার আরও মনে হোল যে ওই লোকটা নিশ্চয় বাড়ীটার অদ্ভুত ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত। গোলুর হঠাৎ মনে পড়ল যে গোকুল বাবুর তক্তাপোষের নীচে একটা কাঠের বাক্সে ভাঙ্গা-চোরা জিনিষের সঙ্গে একটা পুরান সাইকেলের ল্যাম্প দেখেছিল। এই ল্যাম্পটি ভবিষ্যতে কত কাজে লাগতে পারে এই ভাবতে ভাবতে গোলু ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই গোলুর মনে পড়ল যে সেদিন রবিবার। গোকুলচন্দ্র সকালে চা-পান শেষ করে যেই বেরোলেন, গোলু অমনি ল্যাম্পের সন্ধানে তার ঘরে ঢুকল। ল্যাম্পটাকে সে খুঁজে বার করল। অনেক দিন পড়ে থেকে মরচে ধরে ময়লা হয়ে গিয়েছিল। গোলু সারা সকাল ল্যাম্পটা পরিষ্কার করল ও সেটার গায়ে কালো আলকাতরা মাখাল। ল্যাম্পটার রং শুকিয়ে গেলে সেটাতে তেল আর পলতে ভরে নিজের ঘরে রেখে দিল। সারা সকাল এই ভাবে কাটিয়ে বিকেল বেলা গোলু কানাইয়ের খোঁজে বেরোল। কিছু দূর যাবার পর সে দেখল যে বিশাল বপু নিয়ে হরদেও বানিয়া তারই দিকে আসছে। টিলাডিতে হরদেওর একটি দোকান ছিল, এছাড়া সে অনেক প্রকার ব্যবসা করত। হরদেও সামান্য ভাবে থাকলেও, গুজব ছিল যে তার অনেক টাকা। গোলুকে দেখে হরদেও দাঁত বার ক'রে জিজ্ঞেস করল, "কি গোলু বাবু খবর কি?" গোলু বললে, "খবরের মধ্যে ত পোড়ো-বাড়ীতে ভূতের আড্ডার মিথ্যা গুজব।" হরদেও দাঁত বার করে ভূড়ি দুলিয়ে বললে, "ঝুট নেই—একদম সাচ্চ খবর।—হামি দেখেছি, ২।৩ দিন আগে হামি একা ওই বাড়ীকো সামনে দিয়ে ঘর ফিরছি, এমন সময় আঁধারে হাসি শুনে তাকিয়ে দেখি কি ভাঙ্গা-বাড়ীর ছাতে একটা ১৫।২০ হাত লম্বা আদমী গোড় দু'টা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে। তার আঁখ দু'টা চিমনীর মত জ্বলছে। হামি রামনাম করতে করতে জানের ডরে পালিয়ে গেলাম।" গোলু হরদেওর কথায় কান না দিয়ে বললে, "তোমার যদি ভূতের ভয় থাকে তাহলে ওদিকে যেও না, তোমার মত আমার ভূতের ভয় নেই।" গোলু তাড়াতাড়ি চলে গেল। সে যদি পিছন ফিরে তাকাত, তাহলে দেখতে পেত যে হরদেও তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

কানাইয়ের বাড়ী গিয়ে গোলু দেখে, সে একমনে একটা ছেড়া ঘুড়ি আঠা দিয়ে জুড়ছে। গোলু যে কখন তার কাছে চলে এসেছে, তা সে টেরই পায়নি। গোলু হেসে বললে, "কি রে, একমনে এত বড় একটা দরকারী কাজ করছিস যে টেরই পেলি না আমি এসেছি?" গোলু বললে, "নে নে, আর ঘুড়ি ওড়াতে হবে না, চল একবার বরেনের কাছে, দেখি ও কি করছে।"

গোলু আর কানাই বরেনের বাড়ীর দিকে কিছু দূর যাবার পরই দেখে, বরেন একটা মস্ত বাঁশের লাঠি হাতে তাদের দিকে আসছে। বরেনকে দেখে গোলু আর কানাই হেসে উঠল। গোলু বললে, "কি রে, লাঠি হাতে এই সময় চলছিস কোথায়?" বরেন গোলুকে বললে "তোর না একটা লাঠির দরকার আছে বলেছিলি?" গোলু বললে, "হ্যাঁ, দরকার ও আছেই। এখন চল, তিন জনে কোথাও বসে পরামর্শ করা যাক।

তিন বন্ধুতে ষ্টেশনের দিকে চলল। পথে হরদেওর দোকানের সামনে গোলু একবার দাঁড়াল। হরদেও তখন পিছন ফিরে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। গোলু লক্ষ্য করে দেখল যে কয়েক ডজন খালি কেরাসিনের বোতল নিয়ে হরদেও দর-দস্তুর করছে। এই সময় কানাই গোলুকে চিৎকার করে ডাকতে অন্য লোকটা হঠাৎ ফিরে তাকাল এবং গোলুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। গোলু তাকে ভাল করে দেখবার আগেই সে চট করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। গোলুর হঠাৎ মনে পড়ল যে, এই লোকটাকে সে গোকুল বাবুর আপিসে এক দিন দেখেছিল। যাই হোক, তারা তিন জনে আবার পথ চলতে সুরু করল। বরেন বললে, "বাড়ী ফিরে আমার আবার এক্সারসাইজ করতে হবে। আমি আজকাল সন্ধ্যার সময় এক্সারসাইজ করে স্নান করি, সকালের এক্সারসাইজ বাদ দিয়েছি।" কানাই কিছু না বলে থাকতে পারল না। সে বললে, "আমি বাড়ীতে দুটো মোটা দড়ি ঝুলিয়ে রিং বানিয়ে নিয়েছি এবং তাইতে নিয়মিত এক্সারসাইজ করি।" গোলু হেসে বললে, "তাই করতে আরও পাকিয়ে যাচ্ছিস।" বরেনের গায়ে যদিও গোলুর চেয়ে বেশী শক্তি ছিল, কিন্তু সে মনে মনে জানত যে মারামারিতে গোলুর সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত। গোলুর গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল, এ ছাড়া সে অত্যন্ত ক্ষিপ্র ছিল। গল্প করতে করতে তিন বন্ধু ক্রমে ষ্টেশনে এসে পড়ল। কানাইয়ের ইচ্ছামত তিন বন্ধু ষ্টেশন পেরিয়ে কাছেই একটা শাল-বনে ঢুকল। এক জায়গায় কতকগুলি বড় বড় পাথর পড়েছিল, সেইখানে এসে তারা তিন জনে তিনটে বড় পাথরের উপর বসল। গোলু বললে, "কয়েক দিনের মধ্যে যে অনেক ব্যাপার ঘটে গেল তার খবর কিছু রাখিস তোরা?" কানাই বললে, "খবরের মধ্যে ত এক পোড়ো-বাড়ীর খবর, তা-ও এত দিনে পুরান হয়ে গেছে, নূতন কিছু হয়েছে বলেও শুনিনি।" গোলু বরেনকে জিজ্ঞেস করলে, "পোড়ো-বাড়ী সম্বন্ধে তুই কি জানিস?" বরেন হেসে বললে, "ও নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাইনি, তাছাড়া আমি মনে করি, গুজবকে প্রশ্রয় দিলেই সে বেড়ে যায়।" গোলু গম্ভীর হয়ে বললে, "আমার কিন্তু মনে হয় যে মাথা ঘামানই দরকার, কারণ কেউ মাথা ঘামাবে না জেনে নিয়েই কোন বদমাইস লোক ওখানে কিছু করছে বলে মনে হয়।" গোলুর কথায় কানাইও অবাক হয়ে গেল। গোলু তখন গোড়া থেকে যা যা ঘটেছিল সব বলল। বরেন বললে "এক কাজ করা যাক, চল আমরা সকলে মিলে এক দিন পোড়ো-বাড়ীতে গিয়ে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখি কোথায় কি আছে।" গোলু শুনে বললে, "যতটা সহজ মনে করেছিস, কাজটা তত সহজ নয়। কারণ ভেবে দেখ, যে আমরা

কাজেই আগে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে অন্য কোন প্রবেশ-পথ আছে কি না। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা যদি টের পায়, তাহলে নিশ্চয় আমাদের বাধা দেবে।" কানাই এই কথায় বললে, "তাহলে ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে মনে হয়, দিনের আলো থাকতে আমাদের ঐ বাড়ীতে প্রবেশ সম্ভব নয়। কিন্তু গোলু যে প্রহরীর কথা বলছে, ঐ রকম আরও ২।৪টি থাকলে ত আর রক্ষা নেই,—কেবল একটি মাত্র উপায় ছাড়া—" কানাই চুপ করাতে বরেন বললে, "কি রে, চুপ করলি কেন? কি উপায় বল।" কানাই বললে, "পকেটে করে কয়েকটা বোমা নিয়ে যাওয়া ছাড়া।" বরেন হো হো করে হেসে বললে, "বাহবা কানাই!" গোলু বললে, "এতে হাসবার কিছুই নেই, উপায় থাকলে তাই করা যেত, তবে আমাদের এখন উচিত প্রহরীদের এড়িয়ে চলা।" নানা রকম গল্পে সূর্য্য অস্ত যেতেই তিন বন্ধু উঠে দাঁড়াল। তারা সেখান থেকে টিলাডি অভিমুখে যাত্রা করল। তারা যখন ষ্টেশনের কাছে এসেছে, তখন দূর থেকেই গোলু লক্ষ্য করল যে, কে একটি লোক শেডের নীচে তখনও কাজ করছে। আর একটু কাছে এসে গোলু দেখল, লোকটি দু'টি বড় কাঠের 'প্যাকিং কেস'এর উপর আলকাতরা দিয়ে নাম লিখছে। গোলু ইচ্ছা করেই লোকটির কাছ ঘেঁসে চলে গেল। লোকটি একমনে কাজ করছিল বলে আর তাদের দিকে তাকাল না। গোলু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই দু'টি জিনিষ লক্ষ্য করেছিল। প্রথমটি হচ্ছে যে, সেই লোকটি ষ্টেশন-ক্লার্ক রামরতন মল্লিক ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সে বাক্সের গায়ে মাত্র ২১ মাইল দূরের একটি ষ্টেশনের নাম লিখছিল। বরেন আর কানাই কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করেনি।

তারা ক্রমে পোড়ো-বাড়ীর কাছে এসে গেল। সূর্য্য অস্ত গেলেও তখনও বেশ আলো ছিল বাড়ীটার চার দিকে অনেকখানি জমি। দূরে জমির পাঁচিল সবই প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। বাড়ীটার সামনে—যেখানে কোন সময় ভিতরে ঢুকবার একটা 'গেট' ছিল, তিন বন্ধুতে সেইখানে এসে দাঁড়াল। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই—চারি দিকে একটা থম্‌থমে ভাব। গোলু লক্ষ্য করল, একটা কাঠবেড়ালী কাছের একটা গাছ থেকে নেমে এসে সামনের ভাঙ্গা ঘরটার কাছে লেজ উঁচু করে বসল। গোলু মজা দেখবার জন্য একটা ঢিল কুড়িয়ে নিল। কাঠবেড়ালীটা তখন সন্তর্পণে সামনের ঘরটার দিকে যাচ্ছিল। গোলু ঢিলটা টিপ করে কাঠবেড়ালীটার গায়ে ছুঁড়ে মারতেই সেটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বিদ্যুৎবেগে তাদের দিকেই ছুটে এল এবং পাশ কাটিয়ে ছুটে পালাল। গোলু লক্ষ্য করল যে, ঘরটার সামনে ও পাশ দিয়ে পালাবার যথেষ্ট জায়গা থাকতেও কাঠবেড়ালীটা তাদের দিকেই ছুটে এল। বরেন গোলুর কাণ্ড দেখে বললে, "তোর ছেলেমানুষী এখনও গেল না। চল, একবার সামনের ঘরটায় ঢুকে দেখি কি ব্যাপার।" গোলু বরেনের হাত ধরে বললে, "খবরদার, অমন কাজও করিস না, তার চেয়ে চল, আলো থাকতে থাকতে আমরা বাড়ীটা একবার প্রদক্ষিণ করে দেখি।" বরেনের হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে গোলু আগে আগে চলল ও তার পিছনে কানাই ও বরেন চলল। বাড়ীটার চার পাশের জমিতে বড় গাছের মধ্যে দুটো মহুয়া গাছ, একটা জাম গাছ ও গোটা ৪।৫ আম গাছ ছিল। এছাড়া বাকী জমি আঁতা গাছ, আগাছা ও ঝোপ-ঝাড়ে ভরে গিয়েছিল। গোলু সজাগ হয়ে আগে আগে চলছিল। তারা যখন বাড়ীর পিছন দিকে চলে এসেছে, তখন সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। গোলু সেই আলোতেই লক্ষ্য করল, একটা পায়ে চলা পথ দূরে চলে গেছে। গোলু সেই পথটি ধরে একটু যেতেই একটা কাচের বড় টুকরা দেখতে পেয়ে তুলে পকেটে ভরল। বরেন হেসে জিজ্ঞেস করল, "কি অমূল্য রত্ন পেলি রে?" গোলু উত্তরে বললে, "পরে দেখিস।" যতক্ষণ তারা এই ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল, ততক্ষণ গোলুর মনে হচ্ছিল যে বাড়ীর ভিতর থেকে কারা যেন লুকিয়ে তাদের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করছিল। কানাইয়ের এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। সে বললে, "কতক্ষণ আর ঘুরবি, এবারে ফিরি চল।" কানাইয়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ধপ করে মস্ত একটা ইটের টুকরা এসে কানাইয়ের পায়ের কাছে পড়ল। তিন জনেই চমকে উঠল। কানাই বললে, "আর একটু হলেই মাথাটা গিয়েছিল আর কি!" বরেন বললে, "বাড়ীর ভিতর থেকে কেউ ছুঁড়েছে বলে ত মনে হয় না।" বরেনের কথায় গোলু বলল, "আমি হলপ করে বলতে পারি যে বাড়ীর ভিতর থেকে কেউ ছোঁড়েনি।" কানাই উত্তেজিত ভাবে বলল, "ভারী শয়তান ত—কেন এরকম ইট ছুঁড়বে?" গোলু একটু হেসে বললে, "যদিও আমরা বিনা অনুমতিতে এখানে ঘোরাঘুরি করছি, কিন্তু তবুও এই থেকে দু'টি জিনিষ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি এই ইট ছুঁড়েছে, সে চায় না যে আমরা এখানে ঘোরাঘুরি করি, এবং অন্যটি হচ্ছে যে, সেই একই ব্যক্তি খুবই শক্তিশালী লোক।" কথা শেষ করে গোলু ইটের টুকরাটা হাতে তুলে নিল। কানাই সেটা দেখে বললে, "ওরে বাবা, এ যে আধখানা ইটেরও উপর।" গোলু তখন কানাই আর বরেনকে, বললে, "দূরে ওই ঝোপের দিকে দেখ; অত দূর থেকে যে এই এত বড় ইটের টুকরা ছুঁড়ে মারতে পারে সে সাধারণ লোক নয়।" বরেন মাথা চুলকে বললে, "তাহলে এখন কি করা যায়?" গোলু বলল, "করবার মধ্যে তাড়াতাড়ি সরে পড়া, তবে সরে পড়বার আগে একটা কাজ কর। এই ইটের টুকরাটা যেখান থেকে এসেছিল, অর্থাৎ ওই ঝোপের পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দে।" বরেন একটু অবাক হয়ে ইটের টুকরাটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে দিল। সকলেরই সন্দেহ ছিল, ইটটা ঝোপ অবধি পৌঁছাবে না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পড়বার সময় ইটটা ঝোপটা পেরিয়েই পড়ল। গোলু অত্যন্ত খুশী হয়ে বললে, "সাবাস বরেন!" কেন যে গোলু ইটটা ছুঁড়তে বললে, তা না বুঝেই বরেন আর কানাই গোলুর পিছন পিছন চলল এবং বাড়ীর জমি পার হয়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, কাজেই গোলু বরেনকে বললে, "তোদের বাড়ী একই দিকে, তোরা একসঙ্গেই চলে যা; আজ আর আমি ওদিকে যাব না। কাল সকালে দু'জনে আসিস, একবার হাটে যাওয়া যাবে।" চলে যাবার আগে বরেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, তুই আমাকে ওই ইটটা, ঝোপের ওপাশে আবার ছুঁড়ে ফেলতে' বললি কেন?" গোলু একটু হেসে বললে, "আমি যখন বুঝলাম যে ইটটা ঝোপের ও-পাশ থেকে এসেছে, তখনই আমার মনে হোল যে লোকটা আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চায়, এবং লোকটা গায়ে অসাধারণ শক্তি রাখে। কাজেই আমাদের এখন উচিত, তাকে জানিয়ে দেওয়া যে ভয় আমরা মোটেই পাইনি এবং আমাদের গায়েও যথেষ্ট জোর আছে। এই দু'টিই সে ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছে; কারণ সে ঝোপের আড়াল থেকে আমাদের

লক্ষ্য করছিল, এবং যখন দেখল যে আমরা ছুটে ত পালাইনি উপরন্তু ইটটা ছুঁড়ে তাকে ফেরৎ দিলাম, তখন সে বুঝেছে যে আমরা ভয়ও পাইনি এবং দেহেও যথেষ্ট শক্তি রাখি।" কানাই এতক্ষণ কিছু না বলতে পেয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল। সে এবার সুযোগ পেয়ে বললে, "এমন ত' হতে পারে যে ওই লোকটা ইচ্ছা করেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছিল যাতে ঐ অবসরে বাড়ীর ভিতরে অথবা অন্য পাশে কোন কাজ আমাদের অলক্ষিতে সেরে নিতে পারে?" এই শুনে গোলু বলে উঠল, "সাবাস কানাই, আমারও একবার ঐ কথা মনে হয়েছিল; যাই হোক, কাল সকালে সব বিবেচনা করে দেখা যাবে, আজ এই পর্য্যন্ত থাক।" বরেন ও কানাই এক সঙ্গে বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করলে, গোলুও বাড়ী ফিরে গেল। [ক্রমশঃ।

কিশোর পরিষদ

টি, সি, ডেসংগু

(নিউ ইয়র্ক ষ্টেট সিনেটের সদস্য)

[আমেরিকায় 'আদর্শ ব্যবস্থাপক সভার আন্দোলন সাম্প্রতিক হলেও দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। বর্ত্তমানে এগারটি ষ্টেটে আদর্শ ব্যবস্থাপক সভা আছে এবং আমেরিকার নাগরিকেরা আশা করে যে আগামী তিন বছরের মধ্যে আমেরিকার আটচল্লিশটি ষ্টেটেই আইন সভা গড়ে উঠবে। অতি কিশোর বয়স থেকেই ছোটদের মধ্যে গণ-তান্ত্রিক-বোধ উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে এ আন্দোলন অতি কার্যকরী। এই আদর্শ ব্যবস্থাপক সভাতেই হবে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনেতার জন্ম। অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের দেশেও এই রকম আন্দোলন গড়ে তোলার দিন এসেছে। রাষ্ট্রনায়করা এদিকে দৃষ্টি দিলে দেশের অনেক উপকার হবে।]

—'আমি কিশোরদের পক্ষ থেকে বলছি। এ বিল অনুমোদন করতেই হবে'—

নিউ ইয়র্ক ষ্টেট সিনেটের মার্বেল চেম্বারে একটি ষোল বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল। জিমি ওয়াকার, ফ্রাংক্লিন ডি, রুজভেল্ট প্রমুখ সিনেটররা এক দিন এখান থেকেই প্রথম নাম কিনেছিলেন।

আমার সহসিনেটরদের সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া দেখে প্রাক্ বিবাহ ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পর্কিত বিল যে পাশ হবেই সে সম্বন্ধে আমার ধারণা বদ্ধমূল হোল।

'ভদ্রমহোদয়গণ!'—আর্ভিং বার্ডসাইয়ের তরুণ কণ্ঠে তখনও ধ্বনিত হচ্ছিল—'প্রতি বছর তের হাজার সিফিলিস-আক্রান্ত মেয়ে-পুরুষকে বিয়ের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। এই ব্যবস্থা আপনাদের রদ করা চাই-ই।'

ওয়াই, এম, সি, এ, কর্ত্তৃক সংগঠিত 'আদর্শ ব্যবস্থাপক সভার' সদস্য আর্ভিং একটি সংশোধিত বিলের খসড়া করেছে। বিলটি আমি পড়ে দেখেছি—আমার পছন্দও হয়েছে। এ্যালবানীতে আমি বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করেছি।' গোঁড়া আর অজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা প্রতিকূলতাও সুরু করেছেন। আর্ভিংকে আমি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে বলেছি।

—'আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি আমরা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে পাশ করেছি।' এই মাত্র ছেলেটিকে সিনেটরদের উদ্দেশ করে বলতে শুনলাম—'বিলটি অনুমোদিত হলে আপনাদের নয় আমাদেরই এই আইনের 'বাধ্যবাধকতার মধ্যে বিয়ের দরখাস্ত করতে হবে।'

বিলটি সিনেটে পাশ হয়েছে। দশ বছর পরে আজ আমরা বুঝতে পারছি, এর ফলে সহস্র সহস্র যুবক-যুবতীর জীবন চিরন্তন অশান্তি ও দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আমেরিকার এগারটি আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় যে সমস্ত কিশোর কিশোরীদের নেতৃত্ববিকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যারা দেশের আইন-কানুন রচনা করার জ্ঞান লাভ করছে আর্ভিং তাদের এক জন। বার বছর আগে নিউইয়র্কে সর্বপ্রথম এই আন্দোলন চালু হয় এবং এখন ষ্টেট থেকে ষ্টেটে এই আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করছে। ইতিমধ্যেই আমাদের হাইস্কুলগুলিতে ওয়াই, এম, সি, এ, কর্ত্তৃক পরিচালিত হি-ওয়াই (কিশোরদের জন্য) ও টি-ওয়াই (কিশোরীদের জন্য) ক্লাবের দু'লক্ষ সদস্যের মধ্যে এ আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যেই আমেরিকার আটচল্লিশটি ষ্টেটের প্রত্যেকটিতে এক-একটি আদর্শ ব্যবস্থাপক সভা গড়ে উঠবে নিশ্চিত আশা করা যায়। আমার মতে দেশকে গণতন্ত্রের দিকে চালিত করার পক্ষে এটি সুষ্ঠু আন্দোলন।

প্রতি বছর হেমন্ত কালে নিউবার্গে আমার অফিস এই সমস্ত কিশোর পরিষদ সভার নব-নির্বাচিত উৎসুক সদস্যদের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে।

ন্যানসি হালাস নাম্নী সুশ্রী মেয়েটির কথাই ধরা যাক। তার মিটিংয়ের সাজ হোল নীল জীনের উপর একটি ফোঁপান সাদা শার্ট। তার চরম লক্ষ্য হোল স্কুলের লাঞ্চের উন্নতিসাধন করা। সে ক্লাশ থেকে ক্লাশে ঘুরে ঘুরে একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে প্রত্যেককে—'কাফেটেরিয়াতে যে লাঞ্চ দেওয়া হয় তোমরা তা পছন্দ কর কি? যদি না কর, কেন কর না?'

স্বল্পমূল্যে স্কুলগুলিতে পুষ্টিকর লাঞ্চ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্যের জন্য একটি বিলের খসড়া করতে সেও আমার সাহায্য চায়। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েটি বলল—"ভারী ত কেকের সঙ্গে একটু ক্যাণ্ডির ছোপ লাগিয়ে দেওয়া হয়! ছোটরা একটুও ভাল খেতে পায় না।'

বহু বছর ধরে এ্যালবানিতে এই রকম একটি বিল আমি নিজেই আইন-সভাতে পাশ করাতে চেষ্টা করেছি। ন্যানসি তার স্কুলের ক্লাব এবং স্থানিক আইন সভার আলোচনা থেকে আসল আইন সভার ভিতর দিয়ে অতি সাফল্যজনক ভাবে বের করে নিয়ে এসেছে বিলটি। ন্যানসির সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে আমি স্কুলের লাঞ্চের জন্য পঁচিশ লক্ষ ডলার আইন সভা থেকে পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। নিউ ইয়র্কের স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা আজ যে দুধ সুপ মাংস তরকারি প্রভৃতি খেতে পায় লাঞ্চের সময় তার জন্য প্রকৃত ধন্যবাদ ন্যানসিরই প্রাপ্য।

হি-ওয়াই আদর্শ ব্যবস্থাপক সভার পরিকল্পনাটি ওয়াই, এম, সি,-এর এক জন পুরোনো অভিজ্ঞ কর্মী ডুরান নামক ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক প্রসূত। আজকাল তিনি বছরের অধিকাংশ সময়ই ষ্টেট থেকে ষ্টেটে কিশোর পরিষদ সভা গড়ে বেড়ান—সরকারী কর্মচারী,

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রধানদের উপদেশ সংগ্রহ করে কিশোর-কিশোরী সদস্যদের সাহায্য করেন।

অবশ্য ষ্টেটে ষ্টেটে কার্যপ্রণালী আলাদা আলাদা কিন্তু মূলনীতি সর্বত্র একই। প্রত্যেকটি বিল হি-ওয়াই ক্লাবে আলোচিত ও ভোটে পাশ করাতে হবে। পাশ-করা বিলটি সহর বা কাউণ্টির আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় যায়। সেখানে তরুণ প্রতিনিধিরা স্থানীয় অফিসারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে—সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে।

তার পরে বছরে একবার ষ্টেটের রাজধানীতে বিলটি বিধিবদ্ধ করবার জন্যে ব্যবস্থাপক সভা বসে। একে 'একদিনকো কিশোর মেয়রের' প্রচার অভিনয় বলে অভিহিত করলে ভুল হবে। সমস্ত পরিবেশ রীতিমত উত্তেজনামূলক হয়ে ওঠে। সত্যিকারের গবর্ণর ও পরিষদ সদস্যরা ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ করে বক্তৃতা করেন। ছেলে-মেয়েদের মধ্য থেকেই এক জন গবর্ণর, সভাপতি, যাজক প্রভৃতি নির্বাচিত হয়। গবর্ণর তার বাণী পাঠ করার পর তরুণ প্রতিনিধিরা যথারীতি আইন সভার কাজে লেগে যায়।

এই সমস্ত প্রতিনিধি সভায় যে সব আইনের পাণ্ডুলিপি অনুমোদিত হয় তাতেই তরুণদের আদর্শ সুপ্রতিফলিত হয়। কিশোর-কিশোরীরা উন্নততর শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষকদের জন্য বেশী মাহিনার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করেছে। যৌন-বিজ্ঞান, বিবাহ-বিজ্ঞান, মোটর-চালনা প্রভৃতি বিষয়ে অপরিহার্য অংশের আবশ্যিক পঠন-ব্যবস্থারও দাবী জানানো হয়েছে। দুঃস্থ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা যারা অর্থের অনটনের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত তাদের জন্য দরাজ বৃত্তির ব্যবস্থা চাই। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর পুরানো পাঠ্য পুস্তক পাল্টে নতুন পাঠ্য-তালিকার ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়ে জর্জিয়ার আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের পাণ্ডুলিপিও উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এই ভাবে চারি দিকের পারিপার্শ্বিকে সংস্কারযোগ্য যা-কিছু দেখে তারা এমন আরো অনেক ব্যাপার আছে। রেষ্টুরেন্টে উন্নততর স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, উৎকৃষ্টতর অগ্নি-আইন এবং সামর্থ্য-সাধ্য আরো বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্যও তারা আইনের পাণ্ডুলিপির খসড়া তৈরী করেছে।

অনেক ষ্টেটের আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় যে সমস্ত বিল অনুমোদিত হয় প্রকৃত ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনার সময় প্রায়ই সেই সব বিলের বিষয় উল্লেখিত হচ্ছে আজকাল। স্কুলের ব্যায়ামবীরদের জীবনবীমা ব্যবস্থার বিলের আলোচনার সময় এক জন সিনেটের প্রতিকূলতা করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ আর এক জন প্রতিনিধি উঠে বললেন—'মাননীয় সদস্য বোধ হয় জানেন না যে তাঁর প্রদেশের হি-ওয়াই পরিষদে তরুণ প্রতিনিধিরা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে বিলটি অনুমোদন করেছেন?' এর পর সদস্য মহাশয় তাঁর মত বদলাতে বাধ্য হলেন।

গোড়ার দিকে বহু আইন-প্রণেতা তরুণদের এই প্রচেষ্টাকে বিজ্ঞজনোচিত স্মিতহাস্যের দ্বারা উপেক্ষা করতেন, কিন্তু এখন অনেকেই তাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে সানন্দে ভাব গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন না। বস্তুতঃ নিউ ইয়র্ক সিনেট ও এ্যাসেমব্লিতে সদস্যরা এমন অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন—তরুণ সদস্যরাই যার প্রথম পথ-প্রদর্শক। সর্বত্র একই রকম ট্রাফিক আইন প্রণয়ন, ষ্টেট-স্কলারশিপের সংখ্যা বৃদ্ধি, হোটেল ও কক্ষগুলিতে অগ্নি-নিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কিত আইনের পাণ্ডুলিপি এই সব তরুণদের দ্বারাই পরিকল্পিত।

একটি কি দু'টি ষ্টেটের আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় ভোটাধিকারের বয়স সর্বনিম্ন আঠার বছর ধার্য্য করে বিল পাশ করা হয়েছে। কিন্তু নিউ জার্সিতে আইন-প্রণেতারা নিজেদের সম্বন্ধে তত সুনিশ্চিত ছিল না। তুমুল আলোচনা আর বাক্-বিতণ্ডার পর কিশোর সদস্যরা (বেশীর ভাগের বয়স সতের) এই বিল নিয়ে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সভাপতিকে তখন কাষ্টিং ভোট দিতে হোল। তিনি বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। অন্যান্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা আরো পরিণত-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে—তাদের মতে আঠার বয়স হলেই ভোটাধিকার পাবার মত বুদ্ধি পরিপক্ক হয় না!

বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে এই তরুণের দল প্রবীণদের তুলনায় ঢের কম ছেলেমানুষি দেখিয়েছে। মিনেসোটা আদর্শ ব্যবস্থাপক সভায় দু'জন নিগ্রো, দু'জন চীনা ও এক জন জাপানী-রক্তসম্ভূত সদস্য আছে। নিউ জার্সিতে একটি নিগ্রো ছেলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বর্ণ-বৈষম্য বন্ধের জন্য একটি বিল আনয়ন করেছে। প্রচুর গরম গরম বক্তৃতার পর প্রকৃত ব্যবস্থাপক সভায় ঐ রকমই একটি বিল পাশ হয়েছে। আজকের ফেয়ার এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাক্ট (**Fair Employment Act**) নিয়ে নিউ জার্সি গর্ব করতে পারে বই কি!

এই সমস্ত কিশোর পরিষদ সভার কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, আধুনিক যুগের তরুণদের হাতে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। গণতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ বোধ আছে—তার মূল্য জানে তারা এবং তাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করবেই।

মাদাম মণ্টেসরি ও শিশু-শিক্ষা

শ্রীহেমেন মল্লিক

১৮৬৯ সালে ইটালীর অন্তর্গত "আনকোণার" (**Ancona**) নিকট "চিয়ারভেল"তে (**Chiarvalle**) বিখ্যাত শিশু-শিক্ষা বিশারদ "মাদাম মেরিয়া মণ্টেসরি" জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে ১৮৯৪ সালে ডাক্তারী পাশ করেন। ইটালী দেশের মধ্যে একমাত্র তিনিই সর্বপ্রথম মহিলা ডাক্তার হন। তাঁহার এই সাফল্যে দেশবাসী তাঁহার সম্বন্ধে উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু ডাক্তারী পাশ করার পর মতের হয় পরিবর্তন এবং তিনি এই ব্যবসা পরিত্যাগ করে শিশু-শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

রোমের কবর-স্থানের নিকট পরিত্যক্ত এক রাস্তার অর্দ্ধ-নির্মিত সব বাড়ীতে বাস করে তস্কর, কারাগার-মুক্ত কয়েদী এবং এই রকম সব অপরাধী ব্যক্তি—যাদের সহরের মাঝে নেই কোনো বাসস্থান। এই ভয়াবহ এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানটি ক্রমে মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা হয় বাসোপযোগী সংস্কার এবং প্রার্থীর প্রয়োজন মত সেগুলির বিতরণ তার পর একটা বড় বাড়ী নিয়ে একত্র করা হল হাজার হাজার ভবঘুরে সংসার। মহা সমস্যা উপস্থিত হল এই সব হাজার হাজার সংসারের শিশুদের নিয়ে। এই সব শিশুদের বাপ-মায়েরা যখন দিনের অধিকাংশ সময় বাইরে কাটিয়ে দিত দৈনন্দিন জীবন যাপনে

প্রয়োজন মেটাবার জন্য, তখন শিশুগুলিকে দেখবার থাকত না কেউ। কিন্তু এই শিশুগুলিকে যদি এই ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কালে এই সংস্কার মুক্ত বাড়ীটি আবার ভরে উঠবে দুষ্ট আবর্জ্জনায়।

এই সব শিশুদের এবং এই সংস্কারমুক্ত পল্লীর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করা হল মেরিয়াকে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ছোট-বড় খান বারো ঘর সংযুক্ত একটি বাড়ীতে এই সব শিশুদের একত্র রাখার ব্যবস্থা করেন। তিনি এই কাজ সুরু করেন ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে এবং বাড়ীটির নূতন নামকরণ হয় "কাসে-ডি মেম্বিনো।"

মেরিয়া প্রথমে ফরাসী চিকিৎসক "সেগুঁই"'র (Seguin) প্রথামত শিশুশিক্ষা-বিষয়ক গবেষণা করে পেলেন অদ্ভুত ফল। তিনি দেখলেন, এই শিক্ষায় মূর্খ ছেলেরা পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ছেলেদের সঙ্গে লেখা-পড়ায় সরকারী পরীক্ষা পাশ করে যাচ্ছে। এই দেখে তিনি ভাবলেন যে, যদি বোকা, মূর্খ ছেলেরা এই শিক্ষায় এত ভাল ফল করে তাহলে স্বাভাবিক-বুদ্ধির ছেলেরা না জানি এর চেয়ে আরও কত ভাল ফল করবে।

স্বাভাবিক-বুদ্ধির শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি একবার য়ুরোপের শিশু-শিক্ষা প্রথা ভাল ভাবে দেখেন। সর্ব্বত্র দূষিত বিদ্যাশিক্ষার প্রথা দেখে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিলেন যে, বিদ্যালয়ের ক্লাস-ঘরে শিশুদের "পিনবিদ্ধ প্রজাপতির সার করে রেখে" তাদের অচল করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা দিয়ে তাদের বাঁচতে না দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। এই সব দেখে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের নিয়ম-ধারা করলেন বিপরীত। তাঁর নিয়ম হল যে ভদ্রতা, সামাজিকতা এবং ঐক্যের সীমার মধ্যে থেকে যা মন যায় কর। পরে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই উপায়ে ছোট ছোট শিশুরা কত নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা পায় এবং স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে একত্রে ঘোরাঘুরি করে কেমন তারা বড়দের মত কাজ করে।

তিনি এর চেয়ে আরও ভাল কাজ করেছিলেন শিক্ষা-বিষয়ক সামগ্রীর উদ্ভাবন করে। তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি যে শিশু-মনের উপযোগী খুব সহজ এবং উপযুক্ত উপায়ের কোন বস্তু দিয়ে তার সাহায্যে শিক্ষা দিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। এই উপায়ে শিক্ষা দিয়ে তিনি দেখলেন যে, শিশুরা প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে এক একটি উদাহরণ তিন-চার বার করে কত অনায়াসে করছে এবং তার পর নূতন কিছু প্রথার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এই উপায়ে শিক্ষা পেয়ে কত অল্প সময়ে তাদের সুখ, সমৃদ্ধি, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বেড়ে যেতে লাগল। তখন তাদের সামনে যে জিনিষ ধরা গেল, দেখা গেল, তাতেই তাদের আগ্রহ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেল যে শিশুদের মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে তাদের ঘর-দোরের পরিবর্ত্তন। ঘরের যাবতীয় আবর্জ্জনা দূর করে দিয়ে সেখানে তারা রাখছে প্রয়োজনীয়, সুন্দর সুন্দর জিনিষ। এই সব পরিবর্ত্তন দেখেও কিন্তু তিনি অন্য কোন নূতন শিক্ষা-প্রথা গ্রহণ করেননি। তিনি শিশুদের নিজ নিজ গতির দিকে লক্ষ্য রেখে জানতে পারলেন যে, তাদের যদি স্বচ্ছন্দে তাদের মতে চলতে দেওয়া হয় তাহলে তাদের বুদ্ধি এবং স্বতঃপ্রবৃত্তিতা বৃদ্ধি পায়। এই শাসনবিহীন প্রথা অবলম্বন করে তিনি দেখলেন, সে বছরের শেষে শিশুরা সব ছোট-ছোট চিঠি লেখা-পড়া করতে শিখে গিয়েছে, এই উপায়ে শিক্ষা দিয়ে তাঁর অনেক সুবিধা হয়েছিল। পরে প্রত্যেক শিশুকে পৃথক্ ভাবে তাদের সময়োপযোগী নূতন সামগ্রী দিয়ে ছোট-ছোট পাঠ দিতেন। যখনই যে শিশুর গতি যে দিকে দেখেন তাকে সেই পথেই এগিয়ে চলার খবর দেন। এই উপায়ে শিক্ষার উপকারিতা এই যে, এতে কোন বদ অভ্যাস প্রশ্রয় পায় না।

এই অত্যাশ্চর্য্যের ফল যখন চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন দলে দলে লোক দেশ-বিদেশ থেকে এল বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। বড়-ছোট সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই শিশুরা নির্ভয়ে এবং ভদ্রতার সহিত কথা কয়ে তাদের জিনিষ দেখাতে লাগল। সরকার থেকে তাঁর কাজের জন্য খুব প্রশংসা করা হ'ল এবং দেশ-বিদেশে তাঁর নাম পড়ল ছড়িয়ে, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল এই প্রথা শিক্ষা করতে এবং সেই থেকেই টিচার্স ট্রেনিং কোর্স'র (Teachers Training Course) হ'ল প্রবর্ত্তন।

হুকুম তামিল

আমিনুর রহমান

বাকিংহাম প্যালেসের নাম নিশ্চয় তোমরা শুনেছ। এটি ইংলণ্ডের রাজার লণ্ডনস্থ বাড়ী। বাড়ী বললে ভুল হবে, কেন না তুমি-আমি বাড়ীতে থাকি কিন্তু রাজা-রাজড়াদের কথাই আলাদা—তাঁরা থাকেন প্রাসাদে। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ তৈরি করান বাকিংহামের ডিউক জন শেফিল্ড। প্রাসাদটি তৈরি হবার আগে ঐ স্থানটির নাম ছিল মালবারী বাগান। ঐ সময় এই বাগানটির খুব নাম ছিল, এমন চমৎকার সাজান বাগান শীত-প্রধান দেশে বড় একটা দেখা যেত না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ বাগান সমেত প্রাসাদটি কিনে নেন মাত্র একুশ হাজার পাউণ্ডে। সেই থেকেই এটা ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ হয়ে গেল এবং এখনও পর্য্যন্ত আছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন—বোধ হয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হবে—তোমরা না হয় ইতিহাস বইটা খুলে তারিখটা দেখে নিও, কারণ গল্প বলতে বসে হয়ত সঠিক তারিখ না-ও মনে থাকতে পারে। যাহোক, সেই সময় এক দিন সকালে রাণী বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এক প্রান্তে গিয়ে দেখেন যে দু'টি সশস্ত্র প্রহরী খানিকটা জায়গা জুড়ে টহল দিচ্ছে। ঐ স্থানে বিশেষ কিছুই নেই অথচ প্রহরীর ব্যবস্থা কি জন্য রয়েছে ঠিক বুঝতে না পেরে রাণী এগিয়ে গিয়ে তাদের, প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এখানে কি পাহারা দিচ্ছ?" প্রহরী দুজন জানাল যে তারা শুধু হুকুম তামিল করছে, কেন করছে তা জানা প্রয়োজন মনে করেনি। রাণী আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে ঐ স্থানটি দিবা-রাত্র পাহারা দেবার ব্যবস্থা আছে এবং পালা ক'রে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী সব সময় মোতায়েন রাখা হয়। মস্ত বড় বাগান, রাণী এ দিক্‌টাতে কোন দিন আসেননি তাই ব্যাপারটা তাঁর নজরে পড়েনি। ঐ স্থানটিতে কি এমন বিশেষত্ব আছে কিম্বা রহস্য আছে যার জন্য এত কড়াকাড়ি—চব্বিশ ঘণ্টা পাহারার ব্যবস্থা, তা জানবার জন্য রাণীর কৌতূহল হল। তিনি প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করলেন। সে

কিছুই বলতে পারল না। সৈন্যাধ্যক্ষের ডাক পড়ল। সে বলল যে ঐ স্থানে পাহারা দেবার ব্যবস্থা বহু কাল থেকে চলে আসছে, তবে কবে থেকে এবং কেন তা সে জানে না এবং এ প্রশ্ন এর আগে কেউ কোন দিন তোলেনি।

রাণী সহজে ছাড়বার পাত্রী ছিলেন না। তিনি জেদ্ ধরে বসলেন, তাঁকে জানাতেই হবে কেন বাগানের ঐ কোণে পাহারা দেওয়া হয় এবং ওখানে কিই বা আছে। মহা সমস্যা, রাজপ্রাসাদে আরও পাঁচটা রীতির মত এটাও চলে আসছে; কেউ কোন দিন এ সব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এখন রাণীর এই সব উদ্ভট প্রশ্নের জবাবই বা কেমন করে দেয়? রাজা-রাজড়ারা পূর্ব-পুরুষদের আচার-ব্যবহার কার্য-প্রণালী অনুসরণ করেই রাজকার্য চালিয়ে থাকেন, কেউ কখনও আপত্তি করেন না—কৈফিয়ৎ তলব করেন না, কিন্তু এই আঠারো বছর বয়স্কা রাণী বড় গোলমাল সুরু করছেন অথচ রাণীর হুকুম অমান্য করাও চলে না। রাজকার্যে যতই গলদ থাকুক না কেন তবু বিলাতের লোক কখনও রাজাকে অসম্মান করে না।

একে একে বড় বড় রাজপুরুষদের ডাক পড়ল, শেষ পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর ডাক পড়ল, কিন্তু কেউই রাণীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। প্রধান মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন এই ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেবার অভিপ্রায়ে মহারাণীকে বললেন যে তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে বাগানের ঐ স্থানে পাহারা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু রাণীর মোটেই তা ইচ্ছা নয়। তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব চান, কার আদেশে, কবে থেকে এবং কি কারণে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে এ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব যেমন করে হোক এবং সত্ত দিনে হে দিতেই হবে—ছাড়াছাড়ি নেই। অবশেষে তদন্ত কমিটির বৈঠক বসল হোয়াইট হল, রাজকার্য ও শাসন পরিচালনার কেন্দ্রীয় অফি সেখানে পুরানো নথি-পত্রের জন্য তোলপাড় সুরু হল। একুশ দিন ক্রমাগত পুরানো কাগজ-পত্র নাড়া চাড়া করার পর একটা ফাইল পা গেল যাতে রাণীর প্রশ্নের জবাব আছে।

তদন্ত কমিটি সেই নথি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ক প্রধান মন্ত্রী মারফৎ মহারাণীর কাছে যে রিপোর্ট পেশ করে তা থেকে জানা গেল যে, রাজা তৃতীয় জর্জ বাকিংহাম প্যালে কেনার পর প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানটির অত্যন্ত যত্ন নিতেন। তো হয়ত জান না যে বিলাতে ঝাউ গাছের কদর খুব বেশী। রাজপ্রা তখন সবে ছোট্ট একটি ঝাউগাছ বড় হচ্ছে। যাতে পোকা-মা কি পাখীতে গাছটা নষ্ট করে না ফেলে সেই জন্য রাজা ঐ গাছটে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। রাজার খেয়াল— সঙ্গে হুকুম হল, পালা করে দু'জন প্রহরী দিবা-রাত্র ঐ গাছ পা দেবে।

তার পর কত রাজা এলো, গেলো, ঝাউ গাছ করে শুকিয়ে গেছে, কিন্তু হুকুম প্রত্যাহার করবার খেয়াল কারো হয়নি। গাছের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই অথচ প্রায় একশ বছর ধরে ঝাউ পাহারা দেবার হুকুম তামিল হয়ে আসছে। ভাগ্যিস মহ খোঁজ নিয়েছিলেন নইলে হয়ত আজও অমনি ভাবে পাহারা চলত

ভাল কি এ কাজটা ?

শ্রীরবিদাস সাহা-রায়

হারাধন মিত্তির ঘোষদের পুকুরে,
ছিপ নিয়ে মাছ ধরে রোজ ভরা দুপুরে।
　　কোন মাছ নাহি পায়,
　　বসে থাকে এক ঠাঁয়,
শুধু চোখ-লজ্জায় কাঁদে না সে ডুকুরে।
ঝাঁ-ঝাঁ রোদে মাথা ফাটে রোজ ভরা দুপুরে।

ওপারেতে মাছ ধরে তিনকড়ি শর্ম্মা,
ঝটপট ধরে ফেলে কই, শোল, গরমা;
　　ক্ষোভে আর হিংসায়,
　　পিত্তি জ্বলে যায়,
হারাধন হয়ে যায় রাগে অগ্নিশর্ম্মা।
বলিহারি তিনকড়ি—কি কবিত্তকর্ম্মা!

আজকালো বড়শীতে সেদিন কি মাছটা,
আহ্লাদে আটখানা, দেখ তার নাচটা।
　　প্রাণপণে মারে টান,
　　হারাধন সে জোয়ান,
তাই বলে বল দেখি, ভাল কি এ কাজটা?
উঠে এল বড়শীতে মরা পচা গাছটা।

পত্রগুচ্ছ

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শেষ পত্র

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব জীবনে ধর্ম্মের নামে বহু অপকর্ম্ম এবং সিংহাসনের লোভে বহু হত্যা করেছেন। নিরপরাধ হিন্দুদের শাস্তি দিয়েছেন মুসলিম রাজ্য বিধর্ম্মীদের ছায়ামুক্ত করার চেষ্টায়। জীবনের সায়াহ্নে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথে তিনি অভীষ্ট লাভ করতে পারেননি। যে রাজ্য নিষ্কণ্টক করতে চেষ্টা করেছেন, তা কণ্টকাকীর্ণ। যে রাজপুত মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল, তারাই ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছে ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্রই শত্রু।

ঔরঙ্গজেব মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। পুত্রেরা সিংহাসনের আশায় মৃত্যুর জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। পুত্র আজম তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কামবক্সকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছেন। সম্রাটের দৃষ্টির সম্মুখে চলেছে এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র! মুঘল সম্রাটেরা পুত্রবৎসল, কিন্তু সম্রাট-পুত্রেরা প্রায় সকলেই পিতৃদ্রোহী। একদা যে সম্রাট পুত্র ঔরঙ্গজেব পিতৃদ্রোহিতা, আত্মীয়-হত্যা ও প্রজা-নিপীড়ন অকুণ্ঠিত চিত্তে করেছিলেন, সেই সম্রাট-পিতা পুত্রের কল্যাণের জন্য অস্থির হলেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। ব্যাকুল হয়ে লিখলেন এই পত্র।]

[শাহজাদা আজমকে]

শাহজাদা আজম,

তোমার শান্তি হোক।

আমার বার্দ্ধক্য এসেছে, আমার দুর্ব্বলতা ক্রমবর্দ্ধমান—আমার অঙ্গ শিথিল হয়ে উঠেছে। আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম একাকী, চলে যাচ্ছি একাকী। জানি না আমি কে, জানি না আমি কি করেছি। আমার উপবাসের দিনগুলি ভিন্ন সমস্ত দিবসের কর্ম্মধারা আমার জন্য একমাত্র অনুশোচনাই রেখে গেছে। আমার সাম্রাজ্যের শাসনও সুষ্ঠু হয়নি—আমি ত প্রজার মঙ্গল কামনা করিনি।

আমার জীবন—আমার এই মূল্যবান জীবন বিফলে গেল, আমার প্রভু আমার ঘরে এসেছিলেন, আমার অন্ধ নয়ন ত প্রভুর বিভূতি অবলোকন করেনি। জীবন চিরস্থায়ী নয়, অতীত দিনের চিহ্নমাত্রও আজ অবশিষ্ট নাই, ভবিষ্যতের সমস্ত আলো নিবে গেছে।

আমার দেহের উত্তাপ চলে গেছে, রয়েছে শুধু লোল চর্ম্ম, শুষ্ক মাংসপিণ্ড। আমার পুত্র কামবক্স বিজাপুরে—সে আমার অতি নিকট, তুমি তার চেয়ে আমার নিকটতর। প্রিয় পুত্র শাহ আলম বহু দূরে। পৌত্র মহম্মদ আলম আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হিন্দুস্থানে এসে পৌঁচেছে।

আমি ঈশ্বরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি—আমি ভয়ে কম্পমান; আমার সৈন্যগণও আজ আমার মত অসহায়, বিপর্য্যস্ত, ব্যাকুল। সৈন্যরা ধারণা করে না যে, ভগবান আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমি পৃথিবীতে কিছু সঙ্গে নিয়ে আসিনি, কিন্তু বিদায়ের সময় আমার পাপের ফল নিয়ে যাচ্ছি। যদিও আল্লাহ্‌র কৃপা ও করুণার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তবু আমার কর্ম্মফলের চিন্তা থেকে আমি মুক্তি পচ্ছি না। আমি স্বয়ং যখন আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছি, তখন কে আমার সহযাত্রী হবে?

বায়ু অনুকূল কি প্রতিকূল তা জানি না। আমার তরী আমি অজানা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম।

যদিও জানি, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের রক্ষাকর্ত্তা, তবু বৃহত্তর জগতের দৃষ্টিতে আমি আমার পুত্রদের বলব, তারা যেন আল্লাহ্‌র বান্দা এবং মুসলিমদিগকে বিনা দোষে হত্যা না করে।

আমার পৌত্র বিদারবক্সকে আমার বিদায়-আশীর্ব্বাদ জানাবে। আজ আমার চিরবিদায়ের দিনে আমি তাকে দেখতে পেলাম না, তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা আমার অপূর্ণ রয়ে গেল। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখাচ্ছে বেগম সাহেবা শোকাকুলা—তাঁর অন্তর্দ্রষ্টা একমাত্র ভগবান। দূরদৃষ্টির অভাব মানুষের নিকট নিরাশাই বহন করে আনে। বিদায়!

—সম্রাটের মোহর

[শাহজাদা কামবক্সকে]

কামবক্স,

আমার পুত্র, আমার হৃৎপিণ্ড! আমার যখন ক্ষমতা ছিল আমি তোমাদের উপদেশ দিয়েছিলাম—আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে। আমি সেই জন্যে চেষ্টাও করেছিলাম যথাসাধ্য; কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা কেউ আমার উপদেশ পালন করনি। আজ আমি মৃত্যুপথযাত্রী—আজও আমার অনুষ্ঠিত পাপের শাস্তি আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। কি আশ্চর্য্য! আমি এই পৃথিবীতে একা এসেছিলাম—আর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি দুর্ব্বহ পাপের বোঝা। যে দিকেই আমি দৃষ্টিপাত করি, পথদ্রষ্টা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন পথ-প্রদর্শক আমার দৃষ্টিতে আসছে না, আমার সৈন্যদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা আমার মনকে শঙ্কাকুল ও ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যদিও আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের রক্ষা করবেন, তবু এই বিষয়ে আমার পুত্রদের অবহিত হওয়া উচিত। যখন আমার শক্তি ছিল, তখনও আমি তাদের রক্ষা করিতে পারিনি, আর আজ আমার নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও

নাই। এখন আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলচ্ছক্তিবিহীন। যে নিশ্বাস একবার স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার পুনরাগমন অসম্ভব। এই অবস্থায় আমি প্রার্থনা ছাড়া আর কি করতে পারি?···

···আমি তোমাকে ও তোমার সন্তানদের আল্লাহ্‌র হস্তে সমর্পণ করে যাচ্ছি, আমি ভয়ে কম্পমান। আমি তোমার নিকট চির-বিদায় নিচ্ছি। সাংসারিক মানুষ শঠ, তাদের উপর বিশ্বাস করে কোন কাজ করো না। কাজ করবে অঙ্গুলীর নীরব সঙ্কেত দ্বারা। দারা সেকো নির্বোধের মতন রাজকার্য্য পরিচালনা করেছিল; সুতরাং, সে তার অভীষ্ট লাভ করেনি। সে তার অনুচরদের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী বর্দ্ধিত করেছিল—কিন্তু প্রয়োজনের সময় সে বেশী বেতন দিতে পারেনি, সুতরাং, সে সফল হতে পারেনি। মোট কথা, তোমার শক্তি অতিক্রম করে কাজ করো না।

আমার যা বক্তব্য তোমাকে বলেছি, এবার তোমার নিকট বিদায় নেব। দেখ, যেন কৃষক ও প্রজাকুল অন্যায় ভাবে ধ্বংস না হয়; দেখো, যেন মুসলমানের রক্তপাত না হয়—অন্যথা আমার উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতরণ করবে। বিদায়!

—সম্রাটের মোহর

['সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শেষ পত্র' শীর্ষক দুইটি পত্র অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী-রচিত 'ঔরঙ্গজেবের অনুশোচনা' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল দৈনিক পত্র "হিন্দুস্থানে"।]

জন মিল্টনের চিঠি

[১৬৫০ সালে মিল্টনের বাম চক্ষুটি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর দ্বিতীয় চক্ষুটিও ক্রমশঃ খারাপের দিকে যায়। এথেন্সবাসী এক সহৃদয় বন্ধুর কাছে জীবনের এই আসন্ন বিপর্যয়ের কথা নীচের চিঠিখানিতে অতি করুণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। মূল চিঠিখানি লাটিন ভাষায় লেখা।]

ওয়েষ্টমিনষ্টার, ২৮শে সেপটেম্বর, ১৬৫৪।

গ্রীক, বিশেষ করে এথেন্সের সাহিত্যের চিরদিনই গোঁড়া ভক্ত আমি। এথেন্স যে এক দিন আমার এই প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উচিত মূল্য দেবে এ বিশ্বাস আমি কোন দিনই পরিহার করিনি। আপনার বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধা লাভে আপনাদের ঐতিহ্যময় সুপ্রাচীন দেশ সেই ভবিষ্যৎ-বাণীকেই সফল করেছে। শুধু লেখার মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং আমাদের মধ্যে এত দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও আপনি আমাকে একখানি অতি শিষ্টাচারপূর্ণ পত্র লিখেছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই হঠাৎ এক দিন আপনি লণ্ডনে এলেন—এসে দেখা করলেন আমার সঙ্গে—যে চোখে দেখতে পায় না। আমার দুঃখ আজ কারুরই মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে না—হয়ত অনেকে অবজ্ঞার চোখেই দেখে। কিন্তু আমার দুঃখ আপনার মনে গভীর সহানুভূতি ও দুশ্চিন্তার রেখাপাত করেছে। দৃষ্টিশক্তি যে এক দিন ফিরে পাবই এ আশা আমায় আপনি কিছুতেই ত্যাগ করতে দেবেন না। প্যারিসে ডাঃ থেভেনো নামক আপনার যে চক্ষুরোগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু আছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আমার ব্যাধির লক্ষণগুলি জানাবেন কি না জানতে চেয়েছেন। আপনার ইচ্ছায় আমি নিশ্চয়ই বাধা দেব না। এ সুযোগ অবহেলা করার অর্থই হবে হয়ত ঈশ্বর-প্রেরিত সাহায্যকেই প্রত্যাখ্যান করা। প্রায় দশ বছর আগে—যত দূর মনে পড়ছে, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ দু[র্বল] হতে থাকে আর তার সঙ্গে মূত্রাশয়ে ও পেটে ব্যথা। সক[াল] চিরদিনের অভ্যাস মত পড়াশুনা আরম্ভ করতে বসলেই চোখে ভয়া[নক] যন্ত্রণা হোত, কিন্তু একটু শারীরিক কসরতের পরই যেন সুস্থবো[ধ] করতাম। যে মোমবাতীর আলোকে পড়তাম তার চারি দি[কে] রামধনু ঘিরে থাকত। এর কয়েক দিন পর থেকেই বাম চ[ক্ষু] (অন্য চক্ষুটি এর আগেই নষ্ট হয়েছে) দৃষ্টি ক্রমশঃ তিমিরাচ্ছন্ন হ[য়ে] এল এবং বাম-পার্শ্বে আর কোন-কিছুই দৃষ্টিগোচর হোত [না।] আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার চারি দিকের দৃশ্য-[বস্তু] ইতস্ততঃ ঘুরতে থাকে। কেমন একটা নিশ্চল মেঘল বাষ্প কপ[াল] ও কপালের দু'পাশের রগের উপর জমাট বেঁধে আছে—চো[খের] উপর কেমন একটা তন্দ্রালু জড়ভাব চা[পা] অনুভূত হয়—বি[শেষ] করে দুপুরে খাওয়ার পর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। আরগোনটি[কস] কবি ফিনিয়ুস সম্বন্ধে যে উক্তি করা হয়েছে আজ-কাল প্রায়ই মনে পড়ে।

বিছানায় শুয়ে যে দিকেই পাশ ফিরতাম আমার নিমীলিত অ[ক্ষি] পল্লব থেকে মনে হোত যেন আলোর ঝরণাধারা নেমে আস[ছে।] এখনও যেটুকু দৃষ্টি আছে তাতে এ কথা উল্লেখ না করা অনুচিত আমার পক্ষে। দিন দিন দৃষ্টিশক্তি যতই নিষ্প্রভ হয়ে এ[সেছে] বর্ণাঢ্যের ঔজ্জ্বল্যও ততই ম্লান হয়ে এসেছে এবং মনে হয়েছে, [চোখ] থেকে কেমন একটা শব্দ করে সেই রঙ নির্গত হচ্ছে। বর্ত[মানে] সর্বপ্রকার আলোকই নির্বাপিত আমার দৃষ্টিতে। শুধু চারি [দিকে] একটা তরল অন্ধকার কিংবা বলা যেতে পারে ছাই রং মেশান বাদ[ামী] জংলাকাটা আঁধিয়ার। তবু যে নিঃসীম অন্ধকার-সমুদ্রে [আমি] নিমজ্জিত কালোর চেয়ে শাদার দিকেই যেন তার প্রবণতা। চো[খের] কোটরে মণি যখন নড়ে-চড়ে, সরু ফাটল দিয়ে আসা আলো[র] মত আলোর সূক্ষ্ম কণা মনে হয় প্রবেশ করে চোখে। আ[পনার] ডাক্তার হয়ত আশার ক্ষীণ রশ্মি উদ্দীপিত করতে পারেন [কিন্তু] আমার এ ব্যাধিকে আমি দুরারোগ্যই মনে করি। বিজ্ঞ ব্য[ক্তিরা] সাবধান করে গেছেন, সকলের জীবনেই এক দিন তিমিরঘন [দিন] আসবে—সে কথাটা আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে। কিন্তু দে[বতার] অসীম করুণায় সাহিত্য-চর্চা আর বন্ধুজনের প্রীতি-অভিন[ন্দনের] মাঝে দিনগুলি অতিবাহিত হওয়ায় কবরের অন্ধকারের চে[য়ে এ] অন্ধকার কম পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে। লেখা আছে—'মানুষ [শুধু] উদরপূর্তির জন্যই জীবন-ধারণ করে না—ঈশ্বরের মুখ-নি[ঃসৃত] বাণীও তার প্রধান উপজীব্য।' এ কথা যদি সত্য হয় ভগবান যখন মন ও বিবেককে এমন চক্ষুষ্মান্ করে রেখেছেন কেন আমরা দৃষ্টিহীনতার জন্য অনুযোগ করব? ভগবানই মুখের অন্ন যোগাচ্ছেন এবং নিজে হাত ধরে পথ দেখিয়ে চলেছেন, তখন দৃষ্টিহীনতার জন্য শোকের পরিবর্তে আমি অ[ভিনন্দন] করব আর তাই যখন করুণাময়ের অভিপ্রায়। প্রিয় বন্ধু ফিলি[প্পস,] আমার জীবনে যাই ঘটুক না কেন, আমি তোমায় বিদায় জা[নাই] তেমনি ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে যেমন হোত যদি আমার [থাকত] বন-বেড়ালের চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ইতি

জন মিল্টন

মাইকেল মধুসূদনের চিঠি

[মধুসূদন পঠদ্দশায় তাঁর বন্ধু বাবু গৌরদাস বসাককে যে সব পত্র লিখেছেন নীচে তার কয়েকখানি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই সমস্ত পত্রে মধুসূদনের বাল্য-প্রেমের প্রগাঢ়তা, তাঁর সাধারণ প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাঁর ছাত্রাবস্থার অনেক ঘটনার কথা জানা যায়। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন রিচার্ডসন সাহেব সেই সময় কিছু দিনের জন্য ছুটিতে যান এবং কার সাহেব তাঁর স্থলে কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। কোন কারণে তিনি মধুসূদনকে তিরস্কার করলে মধুসূদন অভিমানে কলেজ ত্যাগ করার সংকল্প করেন। নীচের পত্রে তারই আভাস পাওয়া যায়।]

খিদিরপুর, ২৫শে নভেম্বর, ১৮৪২
রাত্রি

প্রিয় বন্ধু,

ডি, এল, আরে'র (ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন) অবর্তমানে কলেজে না যাওয়ার সংকল্প বা অভিপ্রায় সম্বন্ধে এক সময় যে ইংগিত করিয়াছিলাম বোধ হয় মনে আছে। এইবার সেই সংকল্পকে কার্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিতেছি অর্থাৎ যত দিন না ডি. এল, আর ফিরিতেছেন কলেজে যাইব না—তাহা সে যত দিনই হউক না কেন, আমি একটুও মাথা ঘামাই না। কলেজের কয়েক জনকে ভিন্ন যাহারা আমায় ভালবাসে এবং আমি যাহাদের ভালবাসি কাহাকেও আমি সামান্য মাত্রও পছন্দ করি না—বিশেষতঃ ঐ কারকে (মিঃ কার) আমি ঘৃণা করি ইহাতে আমার কিছুমাত্রও ক্ষতি হইবে না। অবশ্য একটু ক্ষতি হইবে—সে ক্ষতিও বিরাট অর্থাৎ আমি তোমার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইব—যাহা এত গভীর ভাবে আমি কাম্য করি। অনেকটা চাটুবাদের মতই শোনাইতেছে কিন্তু তাহা নয়। ইহা অতীব সত্য কথা। এই বিরাট পৃথিবীতে তোমাকে ছাড়া আর কিছুকেই আমি এমন মূল্য দেই না। তোমার ভিতর আছে যাহা কিছু মহৎ, উদার, নিঃস্বার্থপর, কোমল সকল কিছুই! কি নাই? ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। 'আমাদের এই শয়তানি-পূর্ণ পৃথিবীতে' তোমার মত এমন প্রকৃত বন্ধুত্বপ্রবণ সত্যনিষ্ঠ হৃদয় পাইব স্বপ্নেও আশা করি না। যত দিন বাঁচিব—ভাগ্য পৃথিবীর যেখানেই আমাকে লইয়া যাউক না কেন তোমায় চিরদিন স্মরণ করিব—স্মরণ করিব বন্ধুত্বের কোমলতম মন লইয়া। যখন ইংলণ্ডে যাইব—সেদিন আশা করি আর বেশী দূরে নয় (আগামী শীতে), ইচ্ছা করিতেছি তোমার একখানি তৈলচিত্র সাথে লইয়া যাইব—যাহাই খরচ লাগুক না কেন। ইহার জন্য পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত বিক্রয় করিতে আমি রাজী আছি—অবশ্য ছোট্ট তৈলচিত্র। এখন রাত্রি দিনের ইহাই আমার একমাত্র চিন্তা। আমাকে ইহা করিতেই হইবে। যদি অবস্থা অনুকূল হয় ইংলণ্ডে যাইবার অগ্রেই একখানা লইব। দেশী বা বিদেশী কোন চিত্রকর জানা থাকিলে আমাকে জানাইও। তোমার একখানি তৈলচিত্র পাইতে আমি বদ্ধপরিকর। ভয় হইতেছে এ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়া ফেলিয়াছি। ইহাকে চাটুবাদ মনে করিও না—না—না—না। আগামী রবিবার তোমাদের কবিকে দেখিতে আসিবে কি? যদি এস মতিকে সঙ্গে আনিও। অগ্রে জানাইও যাহাতে তোমার মত সুন্দর অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত হইতে পারি। কিন্তু তুমি আসিবে না—ইহা আশা করা বৃথা। তুমি সব করিতে প্রস্তুত কিন্তু আমার পর্ণকুটীর তোমার শ্রীচরণের পদধূলি দ্বারা ধন্য করিবার তোমার কোনই আগ্রহ নাই। পত্রখানি ইতিমধ্যেই অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক, আরো কয়েকটি ছত্র লিখিতেছি। বাবা আগামী কল্য তাঁহার এক মাননীয় বন্ধুর নিকট যাইতেছেন। যাত্রা হইবে না। কলেজে যাইলে মতি, মাধব, বংকুকে আমার কথা বলিও—অবশ্য হ্যাংলারা যদি কলেজে আসে। ভুলিও না। টম মুর লিখিত আমার প্রিয় বাইরণের জীবনী পড়িতেছি—চমৎকার বই। যদি কোন দিন বড় কবি হইতে পারি—ইংলণ্ডে যাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব—তাহা হইলে তুমিও আমার জীবনী লিখিবে দেখিতে ভারী ইচ্ছা করে।

তোমার অতি প্রিয় বন্ধু
এম, এস, দত্ত

পুনঃ—পত্রের উত্তর সাদরে গৃহীত হইবে।

পুনঃ—জানি উত্তর দিবার যোগ্য কিছু নাই তবুও লিখিও—লিখিও—লিখিও !!!

এম, এস, দত্ত

[মধুসূদন পিতার সঙ্গে তাঁর কোন বন্ধুকে দেখিতে মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকে গিয়েছিলেন। পত্র দু'খানি সেখান থেকে লেখা।]

(১)

তমলুক
২৮শে অক্টোবর, ১৮৪২

প্রিয় গৌরদাস,

তোমায় যে পত্র লিখিয়াছিলাম পাইয়াছ কি? সত্যি বলিতেছি, এই অনিশ্চয়তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক—দুঃসহ বিরক্তি ও যাতনাকর। তোমার অবশ্য দোষ নাই। আমি নিজেই তোমাকে চিঠি লিখিতে সতত প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। যেমন দেখিয়া আসিয়াছি এখনও কি স্বভাব তেমনি আছে? যদি হৃদয়াবেগ ও অনুভূতির আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে সদা-সর্বদা তোমায় পত্রাঘাতে জর্জরিত করার অমূলক ভীতি লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ কি? দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি, অল্প যাহা ইংরেজী শিখিয়াছিলাম তাহার অর্ধেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আমার কাব্য-প্রতিভাও বিলুপ্ত। এখানে কোন বিষয়ে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু চারি ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও একটি ছত্র অবধি লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। হয় আমার কাব্যলক্ষ্মীকে তোমার নিকট রাখিয়া আসিয়াছি আর নয় ত সে পলাতকা। তবে ঘুণাক্ষরেও এ কথা মনে স্থান দিও না যে 'আমার দিন বিগত'। আমার স্থির বিশ্বাস, তমলুক অর্থাৎ যে স্থান হইতে আমি লিখিতেছি কাব্যলক্ষ্মী তত্র উপস্থিত হইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। কিন্তু একবার কলিকাতায় যাইলে তোমায় কবিতায় ধারা-স্নান করাইয়া দিব। তমলুক হইতে বোধ হয় ইহাই আমার শেষ চিঠি। হয় আজ নয় কাল যাত্রা করিব। আগামী সোমবার কলেজে সাক্ষাৎ হইবে। মনে রাখিও—

চিরবিশ্বস্ত, অতি অনুগত
এম, এস, দত্ত।

(২)

তমলুক
সোমবার

প্রিয় বন্ধু,

গত শুক্রবার তোমাকে একখানা পত্র লিখিয়াছি, আশা করি যথা-সময়ে পাইয়াছ। কল্পনাতীত দ্রুততার সহিত পত্রখানি লিখিত। মনে পড়িতেছে সেই পত্রে লিখিয়াছিলাম—'আজ রাত্রেই যাত্রা করিব' কিন্তু যাত্রা করা হয় নাই। কয়েক দিনের মধ্যেও যে যাওয়া হইয়া উঠিবে তেমন মনে হইতেছে না। জানি আগামী কাল কলেজ খুলিবে। কিন্তু কলিকাতায় উড়িয়া যাইবার ক্ষমতাও আমার নাই। অভিসম্পাত করি সেই মুহূর্তকে যখন পিতার সহিত এই কুৎসিত স্থানে আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কাল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না জানিয়া নিরতিশয় দুঃখিত। কিন্তু গৌর, একটি মাত্র সান্ত্বনা আমার সম্বল। আমি সেই সমুদ্রের নিকটবর্তী হইয়াছি 'ইংলণ্ডের গৌরবোজ্জ্বল তটরেখার' জন্য যে সমুদ্রবক্ষ এক দিন (আশা করি খুব দূরে নয় সেই দিন) অতিক্রম করিতে হইবে। এই স্থান হইতে সমুদ্র খুব দূরে নয়। কত জাহাজ ইংলণ্ডের পানে যাইতেছে দেখিতে পাইতেছি। যাক্, এবার অন্য কথায় আসা যাউক—যে লোকের নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া যায় না সে রকম লোকের সমীপে পত্র লেখা অতি জঘন্য ব্যাপার। জঘন্য কেন? কেন না, লেখক হয়ত জানিতেই পারে না যে যাহার নিকট পত্র লেখা হইতেছে সে পত্র পাইয়া বিরক্ত না খুশী। কিন্তু গৌর, এই লেখার জন্য তুমি যে বিরক্ত হইতে পার, এই রকম অমূলক ভয় আমি মনে স্থান দিতে পারি না। যদি বিরক্তই হও অন্ততঃ বদান্যতা হিসেবেও তাহা গোপন রাখিও। আমাকে আর পত্র লিখিও না, কারণ আমার থাকা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। বিশ্বাস কর, তোমার নিকট হইতে এত দূরে আসিবার জন্য খুব সুখী।

তোমার দত্ত।

পুনঃ

যদি কোন ভুল হইয়া থাকে ক্ষমা করিও। কারণ, সময়াভাব বশতঃ যাহা লিখিয়াছি দ্বিতীয় বার দেখিবার ফুরসুৎ পাই নাই।

[মধুসূদন ইউরোপ প্রবাসকালে দারুণ আর্থিক বিপর্যয়ে পতিত হয়েছিলেন। বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষীরা—যাঁরা তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অনেকেই শেষে পরাঙ্মুখ হল। এমন কি, মধুসূদন চিঠি লিখলে তাঁরা উত্তর পর্যন্ত দিতেন না। উপায়ান্তর না দেখে মধুসূদন তখন দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও সহৃদয়তার সহিত যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলেন মধুসূদনকে। এই চিঠিগুলি ফ্রান্স থেকে লেখা।]

(১)

ফ্রান্স, ভারসেলিস
২রা জুন, ১৮৬৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি সাধারণ লোক হইতেন এত দিন পত্র না লেখার জন্য আমি ক্ষমাসূচক সুশোভন কথার মুখবন্ধ সহকারে এই পত্র আরম্ভ করিতাম। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন যে আমরা বিপদে পতিত না হইলে কখনই তেমন লোকের দ্বারস্থ হই না যাহাকে আমরা আমাদের শুভার্থী ও বন্ধুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৎ ও অকপট বলিয়া জানি।

আপনি শুনিলে চমকিত হইবেন, আমার বিশ্বাস, খুব ব্যথিত হইবেন যে, দুই বৎসর পূর্বে যে দৃঢ় ও সবল লোকটি আপনাকে অদম্য হৃদয় লইয়া বিদায় জানাইয়াছিল আজ সে তাহার ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। এবং আমি এই বিপর্যয়ে পতিত হইয়াছি সেই সব লোকের নিষ্ঠুর ও দুর্জ্ঞেয় আচরণে যাহাদের অন্ততঃ এক জনকেও আমি আমার শুভার্থী বলিয়া ভাবিতে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছি।

কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে আমার স্ত্রী ও দুইটি শিশু ওখানে থাকিয়া যায়। আমার এবং আমার পত্তনীদারের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে সে আমার পরিবারবর্গকে মাসিক ১৫০ টাকা প্রদান করিবে। অর্থের একাংশ ওরিয়েন্টাল ব্যাংকে অগ্রিম জমা দেওয়া হইয়াছিল। সে ১৮৬২ সালের কথা! শ্রীমতী দত্তের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হইয়াছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার ধৈর্য আমার নাই। তাহারা তাহার জীবন এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল যে সে শিশু দুইটিকে লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৮৬৩ সালের ২রা মে সে ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি ভারতবর্ষ হইতে একটি কপর্দকও পাই নাই। তালুক হইতে প্রাপ্য ১৮৬২ সালের এক[illegible] গত ডিসেম্বরের দেয় টাকাও আমার হস্তগত হয় নাই। আমায় [illegible] শেষ পত্র লেখা হইয়াছে তাহাও দশ মাস আগেকার ঘটনা। ইহার পর কমপক্ষে আটখানা পত্র লিখিয়াছি কিন্তু এ পর্যন্ত একটি ছত্রও উত্তর আসে নাই।

ভারতবর্ষে যখন আমার প্রাপ্য মুদ্রার পরিমাণ হইয়াছে ৪০০০ টাকা তখন আমি ফ্রান্সের জেলে যাইতেছি এবং আমার স্ত্রী-পুত্রকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় সন্ধান করিতে হইতেছে। গ্রেস ইনের বেঞ্চারদের নিকট ৪৫০ টাকা অগ্রিম লইতে বাধ্য হইয়াছি এবং তাহারা আমাকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করিয়াছে। এই বৎসর এইবার লইয়া তিনটি টার্ম নষ্ট হইল। মন্নুর নিকটও আমি ২৫০৲ টাকা ঋণী। পরিশোধে অসামর্থ্য হেতু সে বেচারাও নিঃসন্দেহ দারুণ অসুবিধায় পতিত হইয়াছে।

আপনিই একমাত্র বন্ধু যিনি আমাকে এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও আপনাকে আপনার বুদ্ধি ও পুরুষোচিত উদ্যমের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। একটি দিনও বৃথা নষ্ট করিবার নাই।

আমার অস্থাবর সম্পত্তি যাহা আছে তাহার বাৎসরিক আয় ১৫০০৲ টাকা। সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং সম্পত্তিতে আমার দাখিলা-স্বত্ব অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কলিকাতার জমি-বন্ধকী সমিতি শতকরা দশ টাকা হারে টাকা ধার দেয়। কাজেই আপনি আমার জন্য পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। দিগম্বর মিত্র ও বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র আমার সম্পত্তির আইনানুগ তত্ত্বাবধায়ক। তাহারা নিশ্চয় আপনাকে আবশ্যকীয় কাগজপত্র দিয়া দলিল মুসাবিদা সম্পন্ন করিতে সাহায্য করিবে।

তাহার সুযোগ লইয়া অতি সহজেই আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন যে আপনি যুদ্ধবন্দী। ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে আপনি যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন তাহা এতই মারাত্মক যে সরাসরি সেগুলিকে অগ্রাহ্য করিলেই চরমতম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না।

পত্রোল্লিখিত মত বাধ্যতামূলক শ্রম-ব্যবস্থাকে আপনি 'নির্মম বোঝা,' 'বলপূর্বক কার্যে নিয়োগ,' 'নির্বাসন' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। বলশেভিজিমের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক বিশ্ব-সংগ্রাম চলিয়াছে সে সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানের দুর্জ্ঞেয় অভাব তাহাতেই প্রমাণিত হইয়াছে। বলশেভিজম আপনার দেশের পক্ষেও বিভীষিকার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই ভয়াবহ ইউরোপীয় যুদ্ধে, যাহার দায়িত্ব মুখ্যতঃ জার্মাণ জাতির স্কন্ধেই পড়িয়াছে— আপনার দেশের এই সামান্যতম সহযোগিতা যে বেলজিয়ামের আত্মরক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থামাত্র তাহাও আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন।

জার্মাণীতে একমাত্র হতভাগ্য বেলজিয়াম কিশোরীরাই নৈতিক বিপদের সম্মুখীন কল্পনা করা এবং নিজের দেশের নারী জাতির নৈতিক শুচিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস পোষণ করা কেবল আপনার পক্ষেই শোভন। তথাপি এই চরম বিপদ আপনার দেশের পক্ষেও সমান গুরুতর।

১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের পত্রের মত এমন দায়িত্বহীন কাজ করিতে আশা করি ভবিষ্যতে বিরত থাকিবেন এবং আপনার সাম্প্রতিক অবস্থানুযায়ী আচরণ করিবেন। ভবিষ্যতে যদি ইহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হন, যুদ্ধবন্দী হিসাবে বর্তমানে যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেখান হইতে আপনাকে বেলজিয়ামের সীমানার বাহিরে অন্যত্র প্রেরণ করিতে বাধ্য হইব।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

ফুরারের সদর কার্যালয়
এ, হিটলার

বাঙলা নাটক

[চন্দ্রশেখর (নাটক): রসরাজ অমৃতলাল বসু। প্রকাশক: বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।]

বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন বাঙলার অন্যতম নাট্যকার ও অভিনেতা রসরাজ অমৃতলাল বসু। 'চন্দ্রশেখরের' এই নাট্যরূপ অমৃতলাল বহু দিন পূর্ব্বেই দিয়েছিলেন এবং এত দিন ত পাণ্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিতই ছিল। ১৮৯৭ সালে এই নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয় হয় এবং রসরাজ নিজে বেদগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অভিনয় করেন, ৺তারাসুন্দরী শৈবলিনীর চরিত্রাভিনয় করেন, ৺অক্ষয়কালী কোঙার করেন প্রতাপের অভিনয় এবং বিখ্যাত লাটু বাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি আমিয়টের অভিনয়। এই নাট্যাভিনয় আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কলিকাতা সহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। চাঞ্চল্যটা শুধু কলিকাতার দর্শক-মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার যে কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সেই কল্পনাকে এমন সার্থক নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অমৃতলাল এবং তাঁর অভিনয়-কলার গুণে তা এমন বাস্তব সত্তারূপে ফুটে উঠেছিল মঞ্চের উপর যে বিদেশী শাসকরা চন্দ্রশেখর নাটকাভিনয় বে-আইনী ঘোষণা না করে পারেনি। চন্দ্রশেখর নাটকের পাণ্ডুলিপি সেই জন্যই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা এত দিন সম্ভব হয়নি। কিছু দিন পূর্ব্বে এই "চন্দ্রশেখর নাটক" নিষেধাজ্ঞার কবল-মুক্ত হয়েছে এবং তার পর বসুমতী সাহিত্য মন্দির তা প্রকাশ করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'চন্দ্রশেখর' নাটকের মূল্য ও গুরুত্ব এই ইতিহাসটুকু থেকেই ভাল বোঝা যায়।

বাঙলা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের বিষয়বস্তু কি এবং তার গুরুত্ব কতটা তা জানেন না এমন লোক আমাদের দেশে খুব অল্পই আছেন। ১২৮০ (বাং) সাল থেকে ১২৮১ (বাং) সাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'বঙ্গদর্শনে' "চন্দ্রশেখর" প্রকাশিত হয়। ১২৮২ (বাং) সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম পুস্তকাকারে "চন্দ্রশেখর" প্রকাশ করেন তখন তার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে "চন্দ্রশেখরের" আরও দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এই দু'টি সংস্করণেও তিনি অনেক পরিবর্ত্তন করেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্রিকা থেকে শুরু করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত এবং তার পরের প্রত্যেক সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন দেখা যায়। তার কারণ কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিনের বাসনা ছিল, বাঙালীর বীরত্ব ও মহত্ত্বের আদর্শকে উজ্জ্বল করে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক সমাজ-জীবনের মধ্যে সেই আদর্শের সুস্থ ও স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি তিনি বিশেষ দেখতে পাননি। "বিষবৃক্ষ," "ইন্দিরা" ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করে তাঁর রোমান্টিক মন ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হয়েছিল। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের জন্য ইতিহাসের সাহায্য নেওয়ার খুব বেশী প্রয়োজন ছিল না তাঁর। রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, রামচরণ সকলেই তাঁর নিজের মানসসৃষ্ট। ইতিহাসের পশ্চাদ্‌ভূমিতে তাদের সজীব ও সক্রিয় করে তোলার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষের কাহিনীকে অবলম্বন করেছিলেন। এখানে রোমান্স রচনার সুযোগও তাঁহার প্রশস্ত হয়ে গেল। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে প্রতাপ আর শৈবলিনীকে নিয়ে তিনি এতটা অগ্রসর হতে পারতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু রোমান্স হলেও, "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী রোমান্সের হুবহু সাদৃশ্য নেই। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মূল ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বের সঙ্গে সমসাময়িক মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অনেকটা মিল আছে। "চন্দ্রশেখরের" মূল্য এইখানে।

'চন্দ্রশেখর' অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মন্মথনাথ রায়-চৌধুরী ১৯০৪ খৃঃ অব্দে চন্দ্রশেখরের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, পরের বছর দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক আর একটি ইংরেজী অনুবাদ করেন। এছাড়া তামিল ভাষায় দু'টি অনুবাদ এবং তেলেগু ভাষায় একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এত দিন পর্য্যন্ত "চন্দ্রশেখরের" কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্করণ ছিল না। সেই দিক্ দিয়ে রসরাজ অমৃতলালের এই "চন্দ্রশেখর" নাটক একটি অভাব পূর্ণ করবে। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক নাটকের মিশ্রিত অভিনয়ের সুযোগ "চন্দ্রশেখর" নাটকে যতটা আছে, ততটা অন্য কোন নাটকে দুর্লভ। এখন "চন্দ্রশেখর" যখন নাটকাকারে প্রকাশিত হয়েছে তখন বাঙলা সর্ব্বত্র এবং বাঙলার বাইরে বাঙালীরা স্বচ্ছন্দে এই নাটক উৎসবে অনুষ্ঠানে অভিনয় করতে পারেন এবং করবেন বলে আমরা আশা করতে পারি।

অমৃতলাল বসু

প্রকাশকরা নাটকখানির গোড়াতে যদি একটি 'ভূমিকা' লিখে দিতেন তাহলে ভাল হত। পরবর্তী সংস্করণে আশা করি তাঁরা এই ভূমিকাটি যোগ করে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

বাঙলার নব জাগরণের ইতিহাস

[বাঙলার 'নবজাগৃতি প্রথম খণ্ড: বিনয় ঘোষ। প্রকাশক: ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা]

অনেক দিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন: "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি আজও বর্ণে বর্ণে সত্য। বাঙলা দেশের ইতিহাস যে নেই তা নয়, কিন্তু তার প্রায় সবগুলিকেই যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'উপন্যাস' অথবা 'পরপীড়কদের জীবনচরিত' মাত্র বলা যায় তাহলে খুব ভুল হয় না। ঘটনা-সংকলন বা ব্যক্তির জীবনচরিত কোন দেশের ও জাতির ইতিহাস নয়। তা না হলেও এই শ্রেণীর ইতিহাসই বাঙলা ভাষায় রচনা করা হয়েছে বেশী। ষ্টুয়ার্ট, হিল, মার্শম্যান ইত্যাদি বিদেশীর রচিত ইংরেজী ভাষায় বাঙলার যে সব ইতিহাস আছে তা ঘটনাপঞ্জী অথবা ইংরেজ রাজপুরুষ ও মহাপুরুষদের মহিমা-কীর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের যে সব ইতিহাস আছে তাও অধিকাংশ ইংরাজীতে লেখা এবং তার মধ্যে গবেষণালব্ধ তথ্য যথেষ্ট থাকলেও কোনটাই একটা জাতির জীবনেতিহাস হয়ে ওঠেনি। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ইতিহাসই হয় বাঙলার রাজনৈতিক কাহিনী, না হয় বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি এই ধরণের ইতিহাসের মাল-মশলা অনেক সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রন্থরচনাও করেছেন। বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর গবেষণাবৃত্তি জাগিয়ে তুলতে তাঁরা যে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে জন্য সকলেই তাঁদের কাছে ঋণী, বিশেষ ক'রে বাঙলার বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাস-রচয়িতারা।

বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতির একখানি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের অভাব দীর্ঘ দিন ধরে আমরা অনুভব করেছি। বিনয় ঘোষের "বাঙলার নবজাগৃতি" সে-অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করবে এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। লেখকের বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, অপূর্ব গদ্যভাষা ও প্রকাশনৈপুণ্য, অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা একত্রে মিলিত হয়ে আলোচ্য গ্রন্থখানিকে একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য হিসাবে সার্থক রচনা করে তুলেছে। প্রত্যেক শ্রেণীর বাঙালীর কাছে যে এ-বই বিশেষ ভাবে সমাদৃত হবে এবং সকলেই যে গ্রন্থকারকে এই শ্রেণীর ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শকরূপে স্বীকার করবেন তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে ইংরেজ আমল থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এই নবযুগের সূত্রপাত। বৃটিশ ধনিকতন্ত্রের প্রভাবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড আঘাতে সর্বপ্রথম এদেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, গ্রামে ও নগরে পুরাতন গ্রাম্যসমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হতে থাকে। এদেশে যন্ত্রপাতি আমদানি হতে থাকে, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা হয়, যান্ত্রিক যানবাহন সমাজের আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙে দেয়। এই যুগের নতুন জীবনধারা, নতুন সমাজ-ব্যবস্থা, নতুন কর্মতৎপরতার মধ্যে জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। সামন্ততন্ত্রের সুদীর্ঘ জড়তার অন্ধকূপ থেকে মানুষ মুক্তি পায়, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, বুদ্ধি ও যুক্তি বাস্তব অর্থনীতি ক্ষেত্র থেকে জ্ঞানরাজ্য পর্যন্ত সর্বত্র নিত্য-নতুন অভিযান করে মুক্তডানায় ভর দিয়ে। ইয়োরোপের এই যুগসন্ধিক্ষণকে বা নবযুগকে ঐতিহাসিকরা "রেনেসান্সের যুগ" বলেছেন। বাঙলার এই যুগবিপ্লব বা নবযুগকেও আমরা বাঙলার নবজাগৃতির যুগ বলতে পারি। এই যুগের ধারাবাহিক ইতিহাসই লেখক আলোচ্য গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

"নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা" শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে লেখক কলিকাতা মহানগরীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ থেকে আলোচনা শুরু করেছেন, কারণ নবযুগের অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বাঙলার নতুন রাজধানী কলিকাতা। কলিকাতার ইতিহাস কেন্দ্র করে লেখক প্রাচীন যুগের গ্রাম্যসমাজ, নগর ও নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্য, ইয়োরোপে ও ভারতবর্ষে দাসযুগ, সামন্তযুগ ও বণিক-ধনিকযুগের বিকাশ, বৃটিশযুগের ঘাত-প্রতিঘাত, নবযুগের অর্থনৈতিক রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করে নবজাগরণের স্বরূপ ও গুরুত্ব কোথায় তার বিশ্লেষণ করেছেন। "বাঙলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস" শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক বাঙলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য, বাঙলার নতুন জমিদারশ্রেণী, ধনিকশ্রেণী, নতুন বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিশ্রেণী এবং মজুর-শ্রেণীর উদ্ভব, ঐতিহাসিক ভূমিকা ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী কেন হিন্দুপ্রধান, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণও লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। "ইসলাম ও বাঙলার সংস্কৃতি-সমন্বয়" শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য, ইসলামের প্রভাবে ভারতের, বিশেষ করে বাঙলার সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারা এবং পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির ঘাত প্রতিঘাতে নবযুগের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। "নবজাগৃতির ভাববিপ্লব" শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে নবযুগের ভাববিপ্লবের (Ideological revolution) স্বরূপ ও মূল কারণ কি, যন্ত্রযুগের শৈশব কালের ইতিহাস, রেলপথ, বাষ্পীয় শক্তি, প্রিন্টিং মেশিন, ঘড়ি ও বিভিন্ন উৎপাদন-যন্ত্রের আবিষ্কারের বৈপ্লবিক
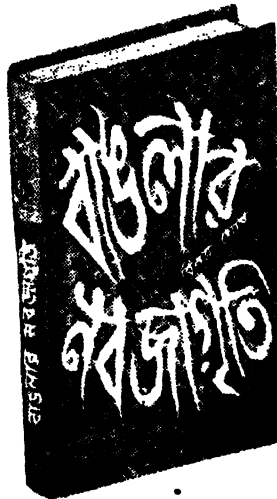
নবজাগৃতির প্রচ্ছদপট

গুরুত্ব, বুদ্ধি ও যুক্তির দুঃসাহসিক অভিযান, বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই সবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, বাঙলার নবজাগৃতির প্রবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে লেখক আলোচ্য গ্রন্থ শেষ করেছেন। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ঐতিহাসিক তথ্য-সংকলনে লেখকের যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বুদ্ধি দিয়ে সেই তথ্য বিশ্লেষণে তাঁর যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা যায়, তা সত্যই আমাদের দেশের চিন্তাশীল লেখক বা ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাসই বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ইতিহাস। এই বৈপ্লবিক যুগসন্ধিক্ষণেই বাঙলার নবজন্ম হয়, বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত এই নবজাগরণের প্রবাহ বিচিত্র পথে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। এ যুগের ইতিহাস রচনা করা আদৌ সহজসাধ্য নয়। যে তথ্যনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনানৈপুণ্য থাকলে এই ইতিহাস রচনা সার্থক হয়ে ওঠে তা লেখকের আছে বলেই "বাঙলার নবজাগৃতি" সার্থক সৃষ্টি হয়েছে। বাঙলার হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত মহলে এ বইয়ের সমাদর হওয়া উচিত এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হিসাবে নিরপেক্ষ আলোচনা ও সমালোচনাও যথেষ্ট পরিমাণে হওয়া উচিত।

বইয়ের ছাপা ও রূপসজ্জার মধ্যে যে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন প্রকাশকরা, তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাঙলা কাব্য

[অনুপূর্ব্বা: যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশক: সমবায় পাবলিশার্স। কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান: বুক ফোরাম, ১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা]

'রবীন্দ্রোত্তর যুগ', 'আধুনিক যুগ', 'সাম্প্রতিক যুগ' ইত্যাদি বহু যুগের বিশেষণে আধুনিক বাঙলা কাব্যকে বিভূষিত করেছেন কাব্য-সমালোচকরা। কাব্যবিচারে 'আধুনিক' কথাটার কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা কেউ নির্দ্ধারণ করতে পারেননি, করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। আর 'রবীন্দ্রোত্তর' কথাটা যদি রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী কবিদের জন্মকাল বা কাব্য-রচনা কাল বিচার ক'রে বলা হয় তাহলে তা অনেকের ক্ষেত্রে সত্য হলেও, কাব্যপ্রকৃতি নিয়ে বিচার করলে একেবারেই সত্য হয় না। বাঙলার কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠে কাব্যবীণার তারে একটা নতুন সুরের ঝঙ্কার তুলবেন, এরকম আশ্চর্য্য কিছু আশা করাও বাতুলতা মাত্র। তাহলেও এ কথা কোন সজাগ কাব্যানুরাগীই অস্বীকার করতে পারেন না যে বাঙলার কাব্যলোকে একটা তুমুল আলোড়ন চলেছে, কাব্যের আঙ্গিক আর উপাদান নিয়ে বাঙলার কবিরা নির্ম্মম ভাবে পরীক্ষা ক'রে চলেছেন। 'মুটেশন' (Mutation) মাত্রই

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যেমন স্থায়ী হয় না, নতুন পরীক্ষা মাত্রই যে স্থায়ী হবে এমন কথা কেউ বলবেন না। তাহলেও আধুনিক বাঙলা কাব্যলোকের এই বিক্ষোভ ও আলোড়ন বিক্ষুব্ধ কবি-মানসের ছবি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এ-ও সত্য যে বর্ত্তমান সামাজিক পরিবেশের প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনশীলতা গতিশীলতা বিক্ষোভ ও সংঘাতই এর মূল কারণ।

রচনা কালের দিক্ থেকে বিচার করলে যতীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রপরবর্ত্তী যুগের কবি বলা যায় না, কিন্তু কাব্য-প্রকৃতির দিক্ থেকে বিচার করলে তাঁকে নিঃসন্দেহে বাঙলার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি" বলা যায়। এই উক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা এখানে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পরিমণ্ডল মূলতঃ রোমান্টিক বা কল্পনাধর্ম্মী আর যতীন্দ্রনাথের রিয়ালিষ্টিক বা বাস্তবধর্ম্মী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা শেলীর 'স্কাইলার্কের' মতন, এক ঝাঁক বলাকার মতন। যতীন্দ্রনাথের কবিতা "ভালচার" বা শকুনের মতন, যত উঁচু দিয়েই সে উড়ে যাক না কেন, দৃষ্টি তার নিবদ্ধ থাকে এই মাটির পৃথিবীর ভাগাড়ের দিকেই। নিটোল বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস, সুস্থ মানববোধ ও জীবনবোধ, সত্যশিবসুন্দরের সর্ব্বত্যাগী সাধনা, এই হ'ল রবীন্দ্রকাব্যের বনিয়াদ। যতীন্দ্র-কাব্যের বনিয়াদি হ'ল অশিব অসুন্দর ও অসত্যের বিরুদ্ধে সমগ্র কবিসত্তার আপোষহীন বিদ্রোহ। তাই "কবি-কাহিনী", "সন্ধ্যা-সঙ্গীত", "প্রভাত-সঙ্গীত" ইত্যাদি থেকে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু, আর যতীন্দ্রনাথের অভিযান শুরু "মরীচিকা", "মরুশিখা", "মরুমায়া" থেকে। স্নিগ্ধ শ্যামল বাঙলা কাব্যে তাই দেখতে পাই যতীন্দ্রনাথ মরুভূমির পর মরুভূমি আমদানি করেছেন। কবি দুঃখ ক'রে "আমার কথার" মধ্যে বলেছেন যে "তবু লোক জোটেনি।" শস্য-শ্যামল স্নিগ্ধ সবুজ বাঙলা দেশে, বন্যা-বাদলের দেশে মরুকবির লোক জোটা কি এতই সহজ? যে বাঙলার কাণে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী থেকে রবীন্দ্রকাব্যের অপূর্ব্ব সুর-ঝঙ্কার পর্য্যন্ত ঝঙ্কৃত হয়েছে, সেই বাঙলার কাণের ভিতর দিয়ে মর্ম্মে মরু-সঙ্গীত পৌঁছবে কেন?

"আনন্দের সে অগ্নিমূর্ত্তি ভালবেসেছিনু ব'লে
মন উঠেনিকো এই বাংলার শ্যামল স্যাঁতানো কোলে।
জলে ও আগুনে আপোষ করিয়া যে
বোশেখ হেথা আসে,
যার তেজ মোরা মাপি কুপোদকে,
শুকনো ডাঙার ঘাসে,
যে আসে মোদের রন্ধনশালে
ভিজা কাঠে চুলা জ্বালি,
ধুঁয়ার ছলনে কাঁদিয়া আকাশে
মাখাতে মেঘের কালি,
আমে আর জামে ঘামে আর প্রেমে
বৈশাখী সৈ-জীবন,
অসহ্য বোধে চিরদিন আমি চেয়েছিনু বর্জ্জন।
বন্ধু জানতো তুমি—
বাংলার ছেলে ভালবেসেছিনু
কেন আমি মরুভূমি।"

(সায়ম্—'চিরবৈশাখ')

যতীন্দ্রনাথের এই পরিচয় বাঙলা দেশ পায়নি, তাঁর এই বিদ্রোহ ও বেদনা বাঙলার লোক মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেনি, তাই শ্যামল বাঙলার কাব্যে এত ক'রে মরুভূমি আমদানী করেও কবির লোক জোটেনি। আজ তাঁর লোক জুটছে, আরও জুটবে। মরুবাংলার আর্ত্তনাদ আজ আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ব'লে কি আমরা বাঙলার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী কবি যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সবেমাত্র সচেতন হ'তে শুরু করেছি? "লোহার ব্যথা" যে কবির অন্তরের ব্যথা তা আমরা এত দিন অনুভব করিনি—

"আগুনের তাপে শাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ,
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ?
তোমার হস্তে ইস্পাত হ'য়ে সহি' শান, পান, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিন-রাত মরে খেটে,
না-বুঝে চাতুরী নেহাই হাতুড়ি ভাই হয়ে ভায়ে পেটে।"
(মরুশিখা—"লোহার ব্যথা")

কবির এই বিদ্রোহ ও বেদনা, মানুষের প্রতি এই গভীর মমত্ববোধ এত সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে যে তার মধ্যে যে এতটুকু বিলাস, এতটুকু সৌখিনতা, এতটুকু কৃত্রিমতা নেই তা অত্যন্ত সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই বিদ্রোহ-বেদনাবোধ কবির নাড়ীর সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে শীতের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ কচি ডাবওয়ালার সামনে তিনি বলছেন—

বেসুরো ধরিনু গান— হায়, হত ভগবান!
মোর ভাগ্যে এ হেন দুর্ভোগ!
অপরের কাব্য-ভালে মিলাও ত কালে কালে
অনুকূল কত-না সুযোগ!
সে-সব কবির বেলা— শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পশারিণী,
তনুদেহ সিক্ত বাস, নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।
আরো ভাগ্যবান যিনি আসে তাঁর পশারিণী
কোমল করুণ ক্লান্তকায়,
'শয্যা শুভ্র ফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব'
সাধে কবি সমবেদনায়।
এ ভালে তেঁতুল-গোলা— অতি বৃদ্ধ ডাবও'লা!
তাও নহে বৈশাখী দুপুরে;
মিটাতে প্রাক্তন দেনা শীতরাত্রে ডাব কেনা!
তাই কি কাটারি আছে ঘরে?"
(সায়ম্—'কচি ডাব')

যতীন্দ্রনাথের এ-বিদ্রোহ সাধারণ বিদ্রোহ নয়; সখের সৌখিন 'রোমান্টিক' বিদ্রোহ নয়। গভীর বেদনা, তার চেয়েও গভীরতর যন্ত্রণা থেকে এই আপোষহীন তিক্ত তীব্র বিদ্রোহ উৎসারিত। যতীন্দ্র-কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাই বিপুল বাধাবন্ধহীন আবেগ-বন্যার অভাব। যতীন্দ্রনাথের কাব্য তাই নিরাভরণ, সংযত, কঠোর, নির্ম্মম; উচ্ছ্বাস ও আবেগপ্রবণতা তাঁর কাব্যধর্ম্ম নয়। তাঁর মানস প্রতিমা তাই অসাধারণ কল্পনার ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করে ওঠে না, অভিজাত কল্পনার দৌলতখানায় লালিত হয়ে তাঁর ইমেজগুলি অনন্য-সাধারণ হয় না, অতি-তুচ্ছ অতি-সাধারণ বাস্তব জগৎ থেকেই তাদের উৎপত্তি এবং সেই জন্যই তাদের অসাধারণত্ব একান্ত নিজস্ব। যতীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহ তাই সার্থক বিদ্রোহ এবং এ-বিদ্রোহ চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙলা-কাব্যের চিরশ্যামলতা মহান প্রেম-উদারতার ধারার বিরুদ্ধে আপোষহীন বিদ্রোহ, পরিপূর্ণ বিদ্রোহ।

যতীন্দ্রনাথকে যাঁরা "দুঃখবাদী" কবি বলেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। আমরা বলব, তাঁদের কাব্যোপলব্ধি ব্যর্থ হয়েছে। যতীন্দ্রনাথের কবিসত্তা এবং তাঁর কাব্য-প্রকৃতি কোনটাই তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। হতাশার সুর, ক্লান্তির সুর যে যতীন্দ্র-কাব্যে নেই তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে অমেরুদণ্ডের নাকী-কান্না নেই, অবসাদ বা জড়তার চিহ্ন নেই কোথাও। হতাশার মধ্যেও বিরক্তির ঝাঁঝ আছে, অস্বস্তি আছে, ক্লান্তির মধ্যেও শ্রমক্লান্তের ঘামের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। এইটাই সব চেয়ে বড় কথা। জীবনকে তাই কবি কোন দিন অস্বীকার করতে পারেননি, অথবা আধুনিক অনেক কবির মতন তিনি জীবনকেন্দ্রচ্যুত হননি। জীবনকে কেন্দ্র করেই তাঁর হতাশা, তাঁর বিরক্তি, তাঁর বেদনা, তাঁর তিক্ততা, তাঁর বিদ্রোহ। এইটাই যতীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যের যথাযথ সমাদর যে বাঙলা দেশে হয়নি তা আমাদেরই দীনতার জন্য, এ কথা আমাদের লজ্জার সঙ্গেই স্বীকার করা উচিত। 'অনুপূর্বা' কাব্য-সংকলন প্রকাশ করে প্রকাশক যে শুধু কাব্যপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, সাধারণের ও সমঝদারদের মধ্যে তাঁর কাব্যের ন্যায্য সমাদর লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। আন্দাজ ১৩১৭ সাল থেকে ১৩৪৭ সাল পর্য্যন্ত রচিত কবির সমস্ত কবিতার রচনা-কালের যথাসম্ভব আনুপূর্ব্য রক্ষা করেই "অনুপূর্বা" সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলি পূর্বে মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্—এই চারখানি স্বতন্ত্র স্বল্প-প্রচারিত কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে প্রকাশক মহাদেব সরকার যে মূল্যবান ভূমিকাটি লিখেছেন তা বিশেষ ভাবে প্রণিধেয়। রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চয়িতা" ও "চয়নিকার" মতন যতীন্দ্রনাথের "অনুপূর্বা" বাঙলার ঘরে ঘরে স্থান পাবে না কি?

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

[প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস: ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক: সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য ৪৲]

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এক জন স্বার্থত্যাগী অক্লান্ত দেশকর্মী হিসাবে এদেশের সকলের কাছেই সুপরিচিত। কিন্তু তিনি যে এক জন সুপণ্ডিত ও সুলেখক, প্রাত্যহিক রাজনীতির হট্টগোলের মধ্যে সে-খবর হয়ত অনেকেই রাখেন না। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ ঘোষের পাণ্ডিত্য যে কত গভীর তা উৎসাহী ও অনুসন্ধানী পাঠকরা আলোচ্য গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া, বাঙলা লেখ্য-ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ [illegible]

দমদম জেলে এবং ১৩৫° সালের শেষে আমেদনগর ফোর্টে বন্দী থাকার সময় প্রফুল্লচন্দ্র এই গ্রন্থ রচনা করেন। রাজনৈতিক জীবনের অবিরাম ঝড়-ঝঞ্ঝা ও নানা গুরু দায়িত্বের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অধ্যয়ন গবেষণা ও গ্রন্থরচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু তা হ'লেও আগাগোড়া তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও ভাবার স্বচ্ছন্দ-প্রবাহ ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না, অথবা বিষয়-বস্তুর ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে ব'লে বোঝা যায় না।

আলোচ্য গ্রন্থে ডাঃ ঘোষ প্রাচীন কাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন, এখনও করছেন এবং তাঁদের এই শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য ভারতীয় ইতিহাসের প্রায়ান্ধকার ক্ষেত্রগুলিতে আলোকসম্পাত করেছে। আজ তাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আর অনুমানসাপেক্ষ নয়, ইতিহাস লেখবার উপযোগী অনেক মাল-মশলা আজ হাতের কাছেই ভারতবিদ্ ও প্রত্নবিদ্দের অনুসন্ধানের ফলে মজুত রয়েছে। ডাঃ ঘোষ আলোচ্য গ্রন্থে কোন মৌলিক গবেষণা করেননি, পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত তথ্যের উপরেই তিনি তাঁর গ্রন্থের কাঠামো রচনা করেছেন। কিন্তু তা হলেও তাতে তাঁর গ্রন্থের এতটুকুও মূল্যহানি হয়নি।

প্রাচীন ভারতের গৌরবকে খর্ব্ব করার অপচেষ্টা অনেক বিদেশী ইতিহাস-লেখক করেছেন। কিন্তু তাঁরা মুষ্টিমেয় এবং তাঁদের পাণ্ডিত্য ও তথ্যনিষ্ঠা কারও কাছে কোন দেশেই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে পারেনি। তাঁদের কথা একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়, তার কারণ অধিকাংশ বিদেশী পণ্ডিতদেরই গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে আমরা ভারতবাসীরাই আজ আমাদের নিজেদের সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, তার বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসম্ভার ও ভাবসম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছি। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ও ভারত-বিদ্দের মধ্যে জার্ম্মান ও ইংরেজ পণ্ডিতদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই পণ্ডিতদের মধ্যে ম্যাক্সমূলর, জোন্স্, উইলসন, কাউয়েল, ডান্‌কান, কোলব্রুক, মুইর, হ্যাভেল, মার্শাল, ম্যাকে, শ্লেগেল, রথ, বিউহ্লার, ভিনটারনিস্, ওল্ডেনবার্গ, ডয়সেন, বেবার, য়্যাকবি, কিলহর্ণ, গ্লাজেনাপ, সেনা, গুরুসে প্রভৃতির দান ভারতবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করবে। এঁদেরই অনুসন্ধানের পথ ও ধারা অনুসরণ ক'রে যে কয়েক জন ভারতীয় পণ্ডিত প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বিদেশী লেখকদের মধ্যে যেমন এক দল আছেন যাঁরা ভারতীয় সভ্যতার 'অন্ধকার' দিক্‌টাকেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখেছেন, তেমনি আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এক দল তথাকথিত 'ঐতিহাসিক' আছেন, যাঁরা মনে করেন যে "আমাদের দেশে যা হয়েছে এমনটি ছিল না, হবারও নয়" এবং "আজকাল যা কিছু দেখা যায় তার সবই 'ব্যাদে' আছে।" দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাস-প্রণেতা দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, রামচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের বানরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা দেখে মনে হয়, সেকালে আর্য্যরা বিজ্ঞানে এত দূর উন্নতিলাভ করেছিল যে তারা বানর প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে বাক্যালাপ ও ভাবের আদান-প্রদান পর্য্যন্ত করতে পারত। দুর্গাদাসের মতো আরও অনেক "বুদ্ধির বৃহস্পতি" মনে করেন যে, রামায়ণে পুষ্পক রথ আর ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করা প্রাচীন ভারতের উড়ো-জাহাজের অস্তিত্ব প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে। ডাঃ ঘোষ এই ধরণের "ঐতিহাসিক" নন। তাঁর একটা সুস্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত না হলেও, অপাঠ্য বা যুক্তিহীন নয়।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর ১৮৮২ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe…may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India."

—(India—what can it teach us ? Lec. 1.)

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, শিক্ষা, রাজকাহিনী ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ম্যাক্সমূলরের এই উক্তি উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছেন। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মহাকবি ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, নাট্যকার শূদ্রক, গল্পলেখক বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতিদের সাহিত্যিক গুণাগুণের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রসঙ্গে বেদ,

সিন্ধুর মৃৎশিল্প

উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এবং বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে ভারতীয় ধর্মের সর্ব্বতোমুখী বিকাশের আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি প্রাচীন হিন্দু গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নবিদ্যার সাধনা ও গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, পদ্মনাভ, ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহির, নাগার্জ্জুন, সুশ্রুত, চরক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান সম্বন্ধে লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও প্রণিধানযোগ্য। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই ছয় প্রসিদ্ধ হিন্দু-দর্শনের প্রণেতা যথাক্রমে গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বাদরায়ণ বা ব্যাস। এই ষড়্দর্শন ও তার প্রণেতাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে গ্রন্থকার যে আলোচনা করেছেন তাতে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় যে কোন সাধারণ পাঠকও পেতে পারেন। প্রাগৈতিহাসিক মহেন-জোদড়ো হড়প্পার যুগ থেকে গুপ্তযুগ এবং বাঙলার পাল রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পকলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তাও শিল্পালোচনার ভূমিকা হিসাবে মূল্যবান। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, মহেনজোদড়ো হড়প্পার সভ্যতা এবং বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে আলোচনাও তথ্যবহুল ও শিক্ষাপ্রদ।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তথ্য সংকলন সম্বন্ধে সমালোচনা করার মতো বিশেষ কিছু নেই। ডাঃ ঘোষ প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এমন একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস-গ্রন্থের বিষয়-বিন্যাসে একটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, শুধু তারই উল্লেখ করব এখানে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রত্যেকটি দিক্ নিয়ে ডাঃ ঘোষ আলোচনা করেছেন এবং কোন আলোচনার মধ্যেই তাঁর অন্ধ-গোঁড়ামি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়নি। সুস্থমন ও মুক্তবুদ্ধি নিয়েই তিনি এই ইতিহাস আলোচনা করেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে "প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" সম্বন্ধে কোন আলোচনা কেন করা হয়নি, তা যে কোন পাঠকেরই মনে হবে। প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ প্রাণনাথ, ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ ঘোষাল, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করা হলেও, আলোচ্য গ্রন্থে এই বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উদাসীনতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই উদাসীনতা ও উপেক্ষার জন্যই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণ ভাবে বিজ্ঞান-সম্মত হয়ে ওঠেনি এবং আলোচ্য ইতিহাস অনেকটাই কাহিনী ও তথ্য সংকলন হয়েছে মাত্র। প্রাচীন ভারতের যে-সভ্যতা সাহিত্য-শিল্পকলা-বিজ্ঞান-দর্শন ইত্যাদির সাধনায় উন্নতির সৌধশিখরে উঠেছিল, পরবর্ত্তী যুগে তার অমন সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি হল কি ক'রে? এ-প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর কোন জবাব দেননি গ্রন্থকার। শুধু "ভূমিকার" এক স্থানে—"হিন্দুরা অশেষ চেষ্টা ও সাধনার বলে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করেছিল। কালক্রমে তাদের অবনতি ঘটেছে।"—এইটুকু উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন: "প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু-প্রতিভার বিকাশ নানা দিক্ দিয়ে হয়েছিল। মুসলমান বিজয়ের ফলে সে বিকাশের পথ কিছু দিনের জন্য রুদ্ধ হয়।" এ কথা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রাচীন হিন্দুবিজ্ঞানের নানা দিক্ নিয়ে সারা জীবন গবেষণা করেছেন। তাঁর প্রাচীন "হিন্দু-রসায়নবিদ্যার ইতিহাস" একখানি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি এই ইতিহাসের মধ্যে বলেছেন যে, বৌদ্ধপরবর্ত্তী যুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করল তখন অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটল। যাজক-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মনু প্রভৃতি পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা নতুন নতুন বিধি-নিষেধের নাগপাশে সমগ্র সমাজকে বেঁধে ফেললেন। হতভাগ্য হিন্দু জাতির ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অপরিমিত মনীষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে কুসংস্কারের গোলকধাঁধায় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করল। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতের অচল অটল অপরিবর্ত্তনশীল কঠোর সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের বাস্তব উন্নতি ও প্রগতির প্রেরণাও ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। এই সব দিক্ দিয়ে কোন আলোচনা বা বিচার-বিশ্লেষণ ডাঃ ঘোষ করেননি। তার কারণ তাঁর একটি কথাতেই অনেকটা বোঝা যায়। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম।" কোন সভ্যতার ভিত্তিই ধর্ম নয়, ভারতীয় সভ্যতারও নয়। সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের বিকাশও একটা দিক্। সভ্যতায় লোকধর্ম্মের দান আছে যথেষ্ট, কিন্তু ধর্ম্ম কোন সভ্যতার ভিত্তি নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষ যখন আলোচনা করেছেন তখন এ কথা স্বীকার করতে বোধ হয় তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। তা ছাড়া, লোকধর্ম আর শাস্ত্রধর্ম, অর্থাৎ মানবপন্থী ধর্ম্ম আর শাস্ত্রপন্থী ধর্ম্মের মধ্যে কি পার্থক্য নেই? ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কি এই পার্থক্য দেখা যায় না?

এই সব প্রশ্নের উত্তর ডাঃ ঘোষ নিশ্চয়ই খুঁজে পেতেন যদি তিনি প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করতেন। তা না করার জন্যই পূর্ব্বোক্ত অনেক প্রশ্নই মনে জাগে, যার উত্তর তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশ্য এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ডাঃ ঘোষের এই "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস" সে বাঙলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান তা যে কেউ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করবেন। ভারতীয় সভ্যতার সমৃদ্ধি ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে উৎসুক যাঁরা—তাঁরা এই গ্রন্থ পাঠ করে যে বিশেষ লাভবান হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ডাঃ ঘোষের ভাষা ও বাচনভঙ্গী এত প্রত্যক্ষ ও প্রাঞ্জল যে ইতিহাস্-খানি রীতিমত সুখপাঠ্য সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থের ছাপা ও সুরুচিপূর্ণ রূপবিন্যাসের জন্য প্রকাশক "সিগনেট প্রেস"কে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থপ্রকাশ যে ভিন্ন জাতের ব্যবসা এবং তা যে সংস্কৃতি ও শিল্পকলারই একটা অঙ্গ, এ-সত্য অনেকেই উপলব্ধি করেন না। "সিগনেট প্রেস" এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য রূপসজ্জার চিত্রগুলি সিন্ধু-সভ্যতার মৃৎশিল্পের নানা রকমের নমুনা থেকে গ্রহণ করে তাঁরা যে শুধু সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে গ্রন্থসজ্জাকে শিল্পকলার স্তরে উন্নীত করেছেন।

ইংরেজী

ভারতের ইতিহাস

A Survey of Indian History By K. N Panikkar, Published by The National Information and Publications Ltd., Bombay. Price Rs 7-8.

সর্দার পানিক্কর ইতিহাসের এক জন সুপণ্ডিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম: মাদ্রাজ ও অক্সফোর্ডে তিনি শিক্ষালাভ করেন, পরে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। 'হিন্দুস্থান টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদকও তিনি ছিলেন। পানিক্করের রচিত ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে "Malabar and the Portugeese", "Malabar and the Dutch, "Sriharsha of Kanuj". "Hinduism and the Modern World", "Evolution of Hindu Kingship", "Caste and Democracy" ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক বৃটিশ-যুগ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ভারতের ইতিহাসের একটা খসড়া রচনা করেছেন। মাত্র ৩০০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫০০০ বছরের ইতিহাস লেখা যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। অনুসন্ধানী পাঠকদের জন্য বিশেষজ্ঞদের রচিত আরও অনেক ভারতের ইতিহাস রয়েছে। গ্রন্থে সর্দার পানিক্কর ভারতীয় ইতিহাসের একটা "Survey" করার চেষ্টা করেছেন সাধারণ পাঠকদের জন্য। কিন্তু এত অল্প পরিসরের মধ্যে পাঁচ হাজার বছরের একটা খসড়া রচনা করাও যে রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই ভারতীয় ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগের আলোচনায় গ্রন্থকার সমান ভাবে সুবিচার করতে পারেননি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে "ভারতবর্ষের" উৎপত্তি বা সৃষ্টি হ'ল কি ক'রে তার ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিবরণ এত সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে সাধারণ পাঠকদের কাছে তা মোটেই সহজবোধ্য হবে না। প্রস্তর-যুগ থেকে সিন্ধু-সভ্যতা পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রাগৈতিহাসের বিবরণও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে এবং এই যুগের ইতিহাসের তেমন কোন গুরুত্ব নেই ব'লে লেখক যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা-ও আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। বৈদিক যুগের ইতিহাসও এত সংক্ষিপ্ত হয়েছে যে সে যুগ সম্বন্ধে পাঠকের কোন স্পষ্ট ধারণা হতে পারে না। বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত এই ইতিহাস (যার গুরুত্ব, আমাদের মতে, অত্যন্ত বেশী) এত সংক্ষেপে লেখক বিস্তৃত না করলেও পারতেন।

মৌর্য্যযুগ ও গুপ্তযুগের ইতিহাস, এক কথায় হিন্দুযুগের ইতিহাস মোটামুটি বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। এই যুগের সামাজিক অবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে রাজকাহিনী আলোচনা করার ফলে বৌদ্ধ ও হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থে সুপাঠ্য হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাব, ঘাত-প্রতিঘাত এবং তার ফলে ভারতীয় সভ্যতার পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে লেখক সংক্ষেপে হলেও সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন। বৃটিশ-যুগের ইতিহাসও সংক্ষিপ্ত হলেও শিক্ষাপ্রদ হয়েছে।

গোড়াতে যে ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছি, তাছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে ভারতীয় ইতিহাসের খসড়া হিসাবে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ত্রুটি নেই। লেখকের ভাষার ও বর্ণনার গুণে এই ইতিহাস সুখপাঠ্যও হয়েছে। আলোচ্য ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইতিহাস রচনার ধারা। এ দেশের ইতিহাস রচনার প্রচলিত ধারা হল, রাজকাহিনী অথবা ঘটনাপঞ্জী রচনার ধারা। পানিক্কর এই প্রচলিত ধারা অনুসরণ না করে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির বাস্তব পটভূমিতে এই খসড়া-ইতিহাস রচনা করেছেন। এদিক দিয়ে তাঁর এই ইতিহাসের একটা বৈজ্ঞানিক মূল্যও আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আগাগোড়া এ-ইতিহাস রচিত না হ'লেও, এই বৈশিষ্ট্যের মূল্যটুকু লেখকের ন্যায্য প্রাপ্য।

[India on Planning—By A. K. Shaha B. Sc, (Dacca) Aspitant (Moscow) Candidate of science (U. S. S. R.) Published by the Globe Library. 2, Shyama Charan De St, Calcutta—12, Price Rs 7/8/-]

"জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে সোভিয়েট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক কে টি, শাহ-র সহিত দীর্ঘদিন কাজ করিয়া ইনি ভারতের সর্ব্বপ্রকার উৎপাদন ব্যবস্থা ও অন্যান্য শিল্প-সংক্রান্ত তথ্যের সহিত পরিচিত হন। সোভিয়েট রুশিয়ার কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত এই পুস্তকখানিতে আমাদের আজিকার সমাজ-ব্যবস্থার সামগ্রিক অগ্রগতির প্রতি বাস্তব পথ নির্দেশ করা হইয়াছে। পুস্তকখানি সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত।"

—দৈনিক বসুমতী

[Indian Constitutional Documents: Vol I, 1757—1858. Edited by Anil Chandra Banerjee, M. A. P, R. S. Ph. D. Published by A. Mukherjee & Co. 2, College Square, Calcutta, Rs 10/- only]

"In his learned 'Introduction' the editor traces in broad outline the important changes in administrative and constitutional development from 1600 and 1858. Hardly less important are the notes and references added by him. This volume will remain for a long time an indispensible source—book for the study of constitutional devolopments during the first century of British rule in India."

—Amrita Bazar Patrika.
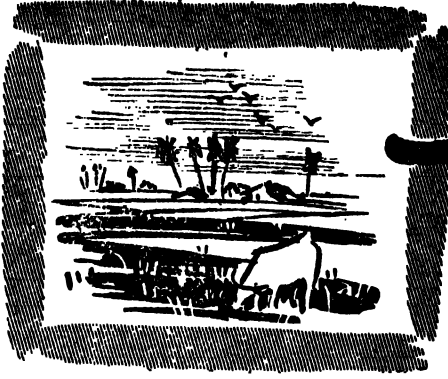
'বর্দ্ধমানের কথা' পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায়:—"প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে জামালপুর থানার অন্তর্গত পাড়াতল ডাকঘরের অধীন পাড়াতল গ্রাম নিবাসী শ্রীদাশরথি ঘোষের একখানি ঘর পুড়িয়া যায়। তিনি কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত দাশরথি তা মহাশয়কে ধরিয়া ছয় বাণ্ডিল করগেটের "পারমিট" পাইয়া ঐ ঘরখানি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে। কিন্তু কি দুর্জ্ঞেয় কারণে জানি না, বিগত এপ্রিল মাসে সে পুনরায় দ্বিতীয় বার ছয় বাণ্ডিল করগেটের পারমিট পাইল এবং মেমারী বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে মাল লইয়া আসিল। উপস্থিত ঐ দ্বিতীয় দফার সম্পূর্ণ ছয় বাণ্ডিল করগেটই তাহার বাড়ীতে অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে—কেউ মাসের পর মাস করগেট মিটিং-এর দিন বন্ধ দুয়ারে ধর্ণা দিয়াও চোখে জল ছাড়া মুখে হাসি আনিতে পারিতেছে না আর কেউ অবলীলাক্রমে পারমিটের উপর পারমিট পাইতেছে ঘরে বসিয়া বিনা প্রয়োজনে। কোথাও বর্ষার জলে স্কুল-ঘর ধ্বসিয়া পড়িয়া যাইতেছে আবার কারো বা ঢেঁকিচালা ছাওয়া হইতেছে পারমিটের করগেটে। (পাড়াতল স্কুল-গৃহ পতনোন্মুখ ও দাশরথি ঘোষের ঢেঁকিচালা করগেটাচ্ছাদিত)। এর বিচার করিবার কি কেউ নাই?" পশ্চিম-বঙ্গের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় এ-বিষয় প্রতিকার করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি চাউল-সমস্যা লইয়া বিব্রত, কাজেই 'চাল' বা 'চালা'র বিষয় ভাবিবার সময় হইবে কি না জানি না। সিভিল সাপ্লাই বিভাগে এই প্রকার আরো নানা বিচিত্র ব্যাপারের সংবাদ দুষ্ট লোকমুখে প্রচারিত হইতেছে। যথাকালে এই সব সংবাদের প্রতিবাদ সরকারী মহল হইতে না হইলে—লোকে স্বভাবতই ইহা সত্য বলিয়া মনে করিবে। কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিবেন কি?

* * * *

'প্রদীপ' বলিতেছেন:—"বালিচক, হাউর, পাঁশকুড়া, মেচাদা প্রভৃতি ষ্টেশনে সাময়িক ভাবে কোর্ট বসিত এবং পুলিশ হাওড়াগামী ট্রেণ সমূহ খানাতল্লাসী করিয়া বিনা টিকিটে চাউল লইয়া গমনকারীদের ধৃত করতঃ সেই কোর্টে সাজা দেওয়াইত। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত মে মাস পর্য্যন্ত এইরূপ ৪৩৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং তল্লাস করিয়া তাহাদের নিকট ১৩০০ মণ চাউল উদ্ধার করা হইয়াছে। আসামীদের এই সংখ্যা ও উদ্ধারীকৃত চাউলের পরিমাণ পুলিশ বা রেল-কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে খুব গৌরবজনক বলিতে পারিলেই সুখী হইতাম, কিন্তু প্রথমের দিকে যখন প্রত্যহই প্রায় হাজার মণ চাউল বাহির হইয়া যাইত তখন শেষের দিকে ধর-পাকড়ে অনেকটা কমিলেও পাঁচ মাসে সর্ব্বসমেত মাত্র ১৩০০ মণ

সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন শুনা যায়, ঐ সব বেআইনী চাউল চালানকারীদের অনেকে দিনের গাড়ী ছাড়িয়া রাত্রের গাড়ীগুলি ব্যবহার করিতেছে। সে সম্বন্ধে পুলিশ ও রেল-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।" মন্তব্য—নিষ্প্রয়োজন। তবে বর্ত্তমানে চোরা-কারবার এখন প্রায় প্রকাশ্য কারবারে পরিণত হওয়াতেই বোধ হয় পুলিশ হালে পানি পাইতেছে না।

* * * *

'নীহার' মন্তব্য করিতেছেন:—"কাপড় ডিলার নির্ব্বাচন বিভ্রাট—সরকার হইতে বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলেও অযথা মূল্য বৃদ্ধির শয়তানী বৃত্তির জন্য সরকারকে বাধ্য হইয়া পুনরায় ঐ নিয়ন্ত্রণের প্রবর্ত্তন করিতে হইতেছে। এ জন্য কাপড়ের ডিলার নির্দ্ধারণের ভার কংগ্রেসের উপর অর্পিত হওয়ায় কংগ্রেস কর্ত্তৃক ডিলার নির্দ্ধারণ করা সত্ত্বেও আবার কোথাও কোথাও উপদল কর্ত্তৃক আর এক নূতন ডিলার নির্দ্ধারণ কার্য্য চলিয়াছে এবং এই নির্দ্ধারণে কোন ব্যক্তিকে ডিলার নিযুক্ত করিলে জনহিতকর অনুষ্ঠানে কত মুনাফা দিতে পারিবেন, তাহা লইয়া একটা দর-কষাকষির কথাও শুনা যাইতেছে এবং কোন কোন ইউনিয়নে ঐ কাণ্ডও হইয়াছে। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি স্বার্থপরতা নয়? বিদেশী সরকারের আমল হইতে যে ভূত ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, আজ জাতীয় সরকারের সময়ও যদি তাহা অপসারিত না হয়, তবে আশা কোথায়? আমাদের অসামরিক সরবরাহ-সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় সেদিন সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে, প্রধানতঃ দেশের লোকই এই দুর্গতির জন্য দায়ী। তাঁহার এই উক্তি যে অলীক নহে, বহু ক্ষেত্রেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং যে সরিষার দ্বারা 'ভূত' ভাগানো হইবে, তাহার মধ্যেই যদি ভূত বাসা গাড়িয়া বসে, তবে এই ভূত ভাগানো যাইবে কি উপায়ে, তাহা দেশবাসী সকলেরই বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া কার্য্য করা উচিত।" আমরা আর বলিব কি? এক দিকে রাম অন্য দিকে রাবণ। এখন কোন ক্রমে ভালয় ভালয় নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব। ইহার বেশী আর কোন আশা বা বাসনা আমাদের নাই!

* * * *

'দীপিকা' জিজ্ঞাসা করিতেছেন গণতন্ত্র কোথায়?—"আমরা এখন গণতন্ত্রের যুগে স্বাধীনতার স্বর্গসুখ ভোগ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছি। বৃটিশ আমলের শেষ অধ্যায়ে আমরা গণতন্ত্রের যে নমুনা পাইয়াছি তাহাতে মনে হয়, এ গণতন্ত্র দেশে না থাকাই মঙ্গল। 'গণ' বলিতে প্রকৃত 'গণের' অস্তিত্ব দেখি না। এ দেশে গণ নাই সুতরাং গণতন্ত্রও নাই বা তাহা আদৌ এখন প্রসারলাভ করিতে সক্ষম নহে।

নিজের ভাগ্য ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ জন্য যে শাসন-পদ্ধতির উপায় নির্দ্ধারণে নিজের বিবেক-বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া শাসনযন্ত্রের সহায়ক হইবে সে ভরসা নাই। কোটি কোটি দেশবাসী পরমুখাপেক্ষী। জমিদার, মহাজন, ব্যবসাদার, গৃহস্থ প্রভৃতির নিকট সর্ব্বদা নানা দায়ে বাধ্য ও বদ্ধ। কাজেই যখন শাসনযন্ত্র গঠনের সময় তাহাদের মতামতের আবশ্যক হয়, তখন তাহারা নির্ব্বিচারে নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশে অক্ষম হয়। বাধ্য-বাধকতার চাপে পড়িয়া ভয়ে সঙ্কোচে নিজ বিবেকের সামান্য শক্তিটুকু হারাইয়া ফেলিয়া অবাঞ্ছিত ব্যক্তির জন্যই ভোট দিয়া থাকে। তার পর সমষ্টিগত ভাবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পদানত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করে।" এ কথার প্রতিবাদ করিবার কিছু আছে কি? আমরা ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু পাইলাম না, তবে বর্ত্তমানে যাঁহারা 'গণতন্ত্র'-রাজ চালাইতেছেন, তাঁহারা হয়ত কিছু বলিতে পারিবেন।

* * *

'দীপিকা' আরো বলিতেছেন :—"এখন আবার কংগ্রেস ক্ষমতার মালিক, কাজেই কংগ্রেসের কুকর্ম্মিগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের দশের শাসন পরিচালনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে, তাহার ফলে ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তারা ত' ভয়ে ত্রস্ত, পুলিশ পর্য্যন্তও সত্যাসত্য অনুসন্ধানের উৎস ঐখানে পাইতেছে। আক্রোশমূলক কত কাজ এখন অবাধে চলিতেছে। সেই জন্যই বলি, গণতন্ত্রের নাম দিয়া এখন দলবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির পালা পড়িয়াছে। এ গণতন্ত্র অপেক্ষা একাধিপত্য ও একনায়কত্ব শতগুণে বাঞ্ছনীয়। এ গণতন্ত্র 'কাঁটালের আমসত্ব'।" উপরি-উক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই—সর্ব্বসাধারণ এবং ভুক্তভোগী ইহার এই বিষম অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার করিবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, 'কথাটা ভাল নয়'!

* * * *

'বীরভূম-বাণী'তে প্রকাশ :—"স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু কোন সমস্যারই তো সমাধান হল না—বরং সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অভাব লেগেই রয়েছে। অন্নাভাব বস্ত্রাভাব, তৈলাভাব, শান্তির অভাব—আরও কত কি? অর্ডিনান্স, বিনা বিচারে আটক আইন, ১৪৪ ধারা, পুলিশের লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, ব্যয়বাহুল্য, অপব্যয়, দুর্নীতি, চোরাবাজার, পক্ষপাতিত্ব, অনাচার প্রভৃতি ইংরাজ আমলের বহু নিন্দিত জিনিষগুলি বৃদ্ধিই পাইতেছে। তোষণনীতি অধিকতর বাড়িয়াছে। সরকারের বিভাগীয় কাজকর্ম্ম পূর্ব্ব মতই আছে। বর্ষার পর সারের আমদানী, ধান কাটার সময় বীজ ধান আমদানী, প্রভৃতি কৃষি বিভাগের কুখ্যাত ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ বলবৎ আছে। অবশ্য সরকারী বিবৃতি বা বড় বড় বক্তৃতা, বা নূতন নূতন প্ল্যান, স্কীম, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচনাদি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহার কোনটাই কার্য্যকরী হইতেছে না। সকলেই গদী রাখিতে ব্যস্ত। কেহ বা বন্ধুর ত্যক্ত কেন্দ্রে নির্ব্বাচন লাভ করিয়া বন্ধুর কাছে আরও কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইতেছেন, কেহ বা বিতাড়িত মন্ত্রীকে বড় চাকরী দিয়া ত্যক্ত আসন অধিকারে ব্যস্ত, কেহ বা অবাঙ্গালীর কৃপায় নির্ব্বাচিত। কোটি কোটি লোক কয়েক শত কাপড়-কল মালিকের কাছে হয়ে পড়েছে বিকল। কংগ্রেসীরা বাঁধা পড়েছে তাঁদের কবলে। কংগ্রেসের টাকার দরকার—টাকা আছে কাপড়-কলওয়ালাদের। গরু মারিয়া জুতা দানের মত মিল-গান্ধী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দিয়া সকল পাপমুক্ত হইতেছেন। তাঁহাদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারছেন না। পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুকে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগে নিষেধ করে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে যে সব বড় বড় কংগ্রেসীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি প্রগাঢ় দরদে পূর্ব্ব-বঙ্গ থেকে কংগ্রেসী সদস্য আমদানী করে গদী ঠিক রাখবার ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের নৈতিক বলের প্রশংসা করতে হয়। তাঁহারা কি মনে করেন যে পূর্ব্ব বঙ্গবাসী হিন্দুরা স্বাধীনতা পাইয়াছে এবং তাঁহাদের মুক্তির জন্য কংগ্রেসের আর কিছুই করণীয় নাই?" মন্তব্য করিবার কোন অবকাশ পাইলাম না। কথাগুলি পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিবার মতোও নহে। নেতারা কি বলেন? বলিবার কিছু আছে কি?

* * * *

'মেদিনীপুর-হিতৈষী' জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—"ইহা কি সত্য?—বাবু ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় চারিটি গুদামে আটা-ময়দা ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাদের দুর্গন্ধে না কি কবাট খোলা যায় না, অথচ তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ না কি এস, ডি সি অর্থাৎ সিভিল সাপ্লাই কন্‌ট্রোলার দেন নাই বলিয়া বাজারে গুজব। ইহা কি সত্য যে ১১৪৬ সালের ময়দা এবং আটা না কি আরও পুরাতন? ইহা কি সত্য—যে এ-হেন ময়দা-আটা পাচার করিবার আদেশ না পাইয়া ধীরেন বাবু না কি সাপ্লাই বিভাগকেই তাঁহার টাকার দায়ী করিতেছেন? মন্তব্য—ইহা যদি সত্য হয়, তবে যুদ্ধের সময়ে ইংরাজের কার্য্য-প্রণালীর অনুকরণ এখনও চলিতেছে। ইংরাজ না খাইতে দিয়া খাদ্যদ্রব্য আটক রাখিয়া পচাইয়া ফেলিয়া দিত এই জন্য যে, খাইতে না পাইলে লোক আহার-চিন্তাতেই মজগুল থাকিবে, তাহার বিরুদ্ধে কেহ বিদ্রোহ করিবে না। এখনও কি সেই কারণ বর্ত্তমান আছে? এ ইঙ্গিতও লোকে না করিবে কেন?" আমাদেরও প্রশ্ন—সত্যই ইহা কি সত্য?

* * * *

'বর্দ্ধমানের কথা' বলিতেছেন :—"দোকান-কর্ম্মচারী সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি কর্ম্মচারীদের অভাব-অভিযোগ বা দাবী পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই—ডালপালা মেলিয়া অন্যত্রও গিয়াছে। তাহারা বৃহত্তর বঙ্গের কথা বলিয়াছে, ডাক্তারী শিক্ষার কথা বলিয়াছে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার কথা, নিজেদের বিশেষ শিক্ষার কথা তাহারা বলে নাই, বর্দ্ধমান জেলার কৃষি উন্নয়ন, শিল্প সম্প্রসারণ সম্বন্ধে তাহারা নীরব। দোকান কর্ম্মচারীরা অধিকারের কথা সু-উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছে—ইহার জন্য পাঁচ-দশটা প্রাণ দিবার কথাও বলিয়াছে, কিন্তু তাহারা বলে নাই জনসাধারণকে চোরাকারবার হইতে বাঁচাইব—দেশকে কালো-বাজারের কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিব। সম্মেলন যদি দোকান কর্ম্মচারিগণকে কর্ত্তব্যের আহ্বান জানাইয়া বলিত—আজ হইতে কোন কর্ম্মচারী চোরাকারবার চালাইতে, অন্যায় লাভ করিতে মালিককে সাহায্য করিবে না, যদি বলিত মিথ্যা হিসাব দিয়া জাতীয় সরকারকে আয়কর প্রভৃতি ন্যায্য কর ফাঁকি দিতে মালিককে সহায়তা করিবে না, তাহা হইলে বুঝিতাম দোকান কর্ম্মচারীরা কর্ত্তব্য পালন করিতেও প্রস্তুত। অধিকার অর্জ্জন ও কর্ত্তব্য পালন একই সঙ্গে করিতে হইবে নতুবা দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় দোকান কর্ম্মচারী সমাজদেহে অকল্যাণ সৃষ্টি করিবে।" দোকান কর্ম্মচারী সমিতি সম্বন্ধে আমরাও দু'চার কথা বলিতে পারিতাম, সাক্ষাৎ জ্ঞান হইতে। বর্ত্তমানে এই সমিতিকে তাহাদের দলগত 'কালো-

আমেরিকা আগে ছিল কেবল লাল-মানুষদের স্বদেশ, তার পর সেখানে গিয়ে সাদা-মানুষরা তাদের এমন ভাবে কোণঠাসা করলে যে তারা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হয়ে আছে আজ পর্য্যন্ত। সাদা-মানুষরা আবার সঙ্গে করে ধরে নিয়ে গেল কালো-মানুষদের। আগে সেই কালোদের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল, সাদাদের গোলামী করা। এখন তারা কোন রকমে পায়ের শিকল খুলে ফেলতে পেরেছে বটে, কিন্তু সাদার কাছে আজও কালোর কোন মর্য্যাদাই নেই। তবু মাঝে মাঝে কালোরা ঘুসির জোরে মর্য্যাদা আদায় করে নেয়—যেমন নিয়েছে জ্যাক জনসন ও জো লুইস প্রভৃতি।

কিন্তু কেবল ঘুসির জোরে কেনই বা বলি? সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও নাট্যকলাতেও বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে আমেরিকান নিগ্রোদের প্রতিভা। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রেও অধিকাংশ শ্বেত-চর্ম্মধারীই তাদের বাধা দিতে চায় পদে পদে।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিগ্রো গায়িকা মেরিয়ান অ্যাণ্ডারসনের কথা বলতে পারি। মেরিয়ান কেবল আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী নয়, তাঁর সঙ্গীত-নৈপুণ্যও হচ্ছে অসাধারণ। তিনি এমন প্রতিভাশালিনী যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও তাঁর সহধর্ম্মিণী এবং ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী পর্য্যন্ত তাঁর গান শোনবার জন্যে তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

কিন্তু সাধারণ ইয়াঙ্কিরা তাঁকে দু'-চক্ষে দেখতে পারে না। বিখ্যাত প্রমোদ পরিবেশক সলোমন হিউরকের "Impressario" নামক পুস্তকে মেরিয়ানের নির্যাতনের বহু কাহিনীই লিপিবদ্ধ আছে। ট্যাক্সিওয়ালারা তাঁকে গাড়ীতে উঠতে দেয়নি, হোটেলওয়ালারা তাঁকে হোটেলে থাকতে দিতে নারাজ এবং থিয়েটারওয়ালাদের ষড়যন্ত্রে কোন রঙ্গালয়ই তিনি ভাড়া পাননি। এক দিন তিনি আহত হয়ে বলেছিলেন, "ঈশ্বরের নিশ্চয় কোন কুসংস্কার নেই, নইলে এক নিগ্রো এমন ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠস্বর লাভ করত না।"

কোথাও ঠাঁই না পেয়ে অবশেষে অনুষ্ঠাতারা মেরিয়ানের গানের আসর বসালেন মুক্ত আকাশের তলায়। আর্ট যে কত বড় ঐন্দ্রজালিক, তখন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ সেই বিস্তৃত আসরে টিকিট কিনে মেরিয়ানের গান শুনতে এসেছিল পঁচাত্তর হাজার শ্রোতা!

নিগ্রোদের নাট্যনৈপুণ্যও সামান্য নয়। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা অধিকৃত রঙ্গালয়ে শ্রেষ্ঠ নিগ্রো নট-নটীদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ না হলেও তাঁরা সাধারণত যে সব ভূমিকা পান তা তুচ্ছ বা নগণ্য বলাও চলে। শক্তি থাকলেও শক্তির সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ তাঁদের নেই। এই অভাব দূর করবার জন্যে বিখ্যাত নিগ্রো অভিনেতা ফ্রেডারিক ও-নীল আট বৎসর আগে একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম হচ্ছে "আমেরিকান নিগ্রো থিয়েটার।"

সম্প্রদায়ের শিল্পীর সংখ্যা ষাট জন। তাঁরা কেউ মাহিনা নেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই পান লাভের অংশ। তাঁদের দ্বারা অভিনীত "Anna Lucasta" নাটকখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। আমেরিকায় ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলেছিল তার একটানা অভিনয়। ফ্রেডারিক ও-নীল সম্প্রতি লণ্ডনে এসেছেন।

ইংরেজ-নিগ্রোদের সংগ্রহ করে তিনি লণ্ডনের রঙ্গালয়েও ঐ পালাটি খুলেছেন এবং সেখানেও দর্শকের অভাব হচ্ছে না। কিন্তু কেবল লণ্ডনে নয়, ওখানকার কাজ শেষ হ'লে পর ও-নীল তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে য়ুরোপের অন্যান্য বড় বড় সহরও ঘুরে আসবেন। Anna Lucastaর পর তিনি যে দু'খানি নাটক নির্ব্বাচন করেছেন তার একখানি হচ্ছে Romeo and Juliet।

ও-নীলের মত হচ্ছে, সেক্সপিয়ার এই নাটকের মধ্যে কোথাও দেখাননি কাপুলেটদের সঙ্গে মণ্টাগুদের পারিবারিক বিবাদের আসল কারণ কি? অতএব নাট্যকারের একটি মাত্র কথা না বদলে নিগ্রো প্রয়োগকর্ত্তা কাপুলেটদের ও মণ্টাগুদের পরিচিত করেছেন যথাক্রমে মুর ও ইতালীয়রূপে। তিনি বলেন, "এ জন্য ইতিহাসের মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হবে না। কারণ যে সময়ের কথা নিয়ে এই নাটক রচিত, তখন উত্তর-ইতালীতে যে মুরদের একটি বড় উপনিবেশ ছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নেই।"

মুরদের প্রতি ও-নীলের এই পক্ষপাতিতার কারণ বোঝা কঠিন নয়। নিগ্রোদের মত মুররাও কৃষ্ণাঙ্গ। সুতরাং এ-শ্রেণীর ভূমিকায় নিগ্রোরা অভিনয় করলেও রসভঙ্গ হবে না।

কিন্তু সেক্সপিয়ারের মত প্রতিভা যে কেবল সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বলৌকিকই নয়, সার্ব্বকালিকও বটে, তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিছু কাল আগে বিলাতের এক নাট্য-সম্প্রদায় সেক্সপিয়ারের নাটকে বর্ণিত মধ্যযুগের পাত্র-পাত্রীদের আধুনিক যুগের সাজ-পোষাক পরিয়ে মঞ্চের উপরে উপস্থিত করেছিলেন এবং সে অভিনয়ও করেনি রসভঙ্গ।

বাংলা নাট্য-জগতেও সেক্সপিয়ারের প্রভাব যে কতখানি, আজও তার যথোচিত আলোচনা হয়নি। এখানকার সর্ব্বপ্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র স্বয়ং বলেছিলেন : "মহাকবি সেক্সপীরই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি। * * * * বিয়োগান্ত মিলনান্ত নাটক ইউরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষ ইংরেজী সাহিত্যে যে রকম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, মহাকবির প্রতিভাদীপ্ত তুলিকায় নাট্যকলার যে অপূর্ব্ব শ্রী পরিস্ফুট হয়েছে, তা ভবিষ্যতে যিনিই নাটক রচনা করুন তাঁর আদর্শকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে।"

গিরিশচন্দ্র নিজে "ম্যাকবেথ" অনুবাদ ক'রে বাংলা দেশে মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রই। সেই অভিনয় দেখে 'ইংলিশম্যান' মত প্রকাশ করেন : "A Bengali Thane of Cowdor is a lively suggestion of incongruity, but the reality is an admirable reproduction of all the conventions of an English stage." বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সু-অভিনীত নাটকখানি সাদরে গ্রহণ করলেও, জনসাধারণের মধ্যে তার বিশেষ আদর হয়নি।

গিরিশচন্দ্র তাই দুঃখ ক'রে বলেছিলেন : "মনে তো করেছিলাম যে ম্যাকবেথের পর ওথেলো, হ্যামলেট, কিং লিয়ার প্রভৃতি অনুবাদ ক'রে অভিনয় করব। কিন্তু যদিও সকলে ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদের প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু দর্শকের অভাবে রঙ্গালয়ে অভিনয় সত্বর বন্ধ হ'ল। অথচ অভিনয় বেশ সুন্দর হয়েছিল। কাজে কাজেই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির অনিচ্ছা দেখে আর অনুবাদ করলাম না। ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য না হ'লে আমার হাত-পা বাঁধা। বেশীর ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে আর গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়। বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া এই নাটক সাধারণের উপযোগী হয়নি। শিক্ষিত-সম্প্রদায় একবার দেখে আর বড় বেশী দেখে না।"

কিন্তু তবু বাংলা দেশে সেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে বড় কম নাড়াচাড়া হয়নি। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "Romeo and Juliet" ও "Tempest" নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও প্রথম বয়সে হয়েছিলেন সেক্সপিয়ারের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনিও "ম্যাকবেথ"কে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সেক্সপিয়ারের নাটক বাংলায় তর্জ্জমা করেছিলেন এবং আরো কারুর কারুর অনুবাদও দেখেছি ব'লে স্মরণ হচ্ছে।

বাংলা নাট্যজগতের সঙ্গে সেক্সপিয়ারের সম্পর্ক বহু কালের। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে "জুলিয়াস সিজারে"র ইংরেজী অভিনয় হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সেক্সপিয়ারের একাধিক নাটক অভিনয় করেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ। মেট্রোপলিটান একাডেমিতে "জুলিয়াস সিজার"।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজদের "সাঁসুসি রঙ্গালয়"। "ওথেলো" নাটকের নাম-ভূমিকায় বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। অন্যান্য নট-নটী ইংরেজ।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দ। ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয় "মার্চেন্ট অফ ভিনিস"।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ। ওরিএন্টাল সেমিনারীর ছাত্ররা সেক্সপিয়ারের নাটকাবলী অভিনয় করবার জন্যে নাট্যশালা স্থাপন করেন। ওখানে অভিনীত হয় "ওথেলো," "মার্চেন্ট অফ ভিনিস" ও "চতুর্থ হেনরি" প্রভৃতি।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ। প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় "জুলিয়াস সিজার"।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। "হ্যামলেট"। নাম-ভূমিকায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন।

তার পর আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ও অনেক বার সেক্সপিয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং সেই সম্পর্ক আরম্ভ হয় "গ্রেট

মীরা সরকার

বিস্ময়ের পর বিস্ময় ●●● রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর প্রযোজনায় বসুমিত্রের রহস্যচিত্র

কালোছায়া

ভূমিকায় :

শিপ্রা দেবী
শিশির মিত্র
ধীরাজ ভট্টাচার্য
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নবদ্বীপ, হরিদাস, নৃপেন্দ্র প্রভৃতি

প্রেক্ষাগৃহের সুখাসনে আয়েস ক'রে দেখবার নয়, আসনে তটস্থ হয়ে বসে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখবার মত রোমহর্ষক ছবি হল 'কালোছায়া'। এ ছবি লিখতে ও তুলতে পারতেন পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায়, কোনান ডয়েল আর এডগার ওয়ালেসের পরামর্শ নিয়ে, কিন্তু তাঁরা কেউই আজ বেঁচে নেই। তাই তাঁদের অভাবে এ ছবি তুলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

যত ফুট ছবি ●●● তত কুট চক্রান্ত

ন্যাসনাল থিয়েটারে"র "রুদ্রপাল" (ম্যাকবেথ) নাটক নিয়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। অনুবাদক ছিলেন হেয়ার স্কুলের হেড-মাষ্টার হরলাল রায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঐখানেই "ওথেলো" খোলা হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে "বীণা থিয়েটার" মঞ্চস্থ করে "ভ্রান্তি বিলাস" (কমেডি অফ এররস্)। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে "মিনার্ভা"য় গিরিশচন্দ্রের "ম্যাকবেথ"। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "ক্লাসিকে" "হরিরাজ" .(হ্যামলেট)। বোধ করি ১৯০১ বা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ সরকারের আমলে "মিনার্ভা"য় অভিনীত হয় "মধু যামিনী" (এ মিডসামার নাইট্‌স্ ড্রিম)। ১৯১৪খৃষ্টাব্দে "মিনার্ভা" খোলে "ক্লিওপেট্রা"। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে "ষ্টারে" মঞ্চস্থ হয় "সওদাগর" (মার্চ্চেন্ট অফ ভিনিস.)। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে "ষ্টারে" অভিনীত হয় "ওথেলো"।

গিরিশচন্দ্রের কথা ছেড়ে দিলেও আরো কোন কোন বিখ্যাত বাঙালী নাট্যকারের রচনায় সেক্সপিয়ারের স্পষ্ট প্রভাব আবিষ্কার করা যায়। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর সাজাহান চরিত্রটি কি অল্পবিস্তর পরিমাণে কিং লিয়রের অনুসরণ করেনি ?

সেক্সপিয়ারের নাট্য-জগতে নিগ্রো ও বাঙালী শিল্পীদের আবির্ভাবের কথা বললুম, কিন্তু পার্সীদের কথা এখনো বলা হয়নি। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। কলকাতার পার্সীদের কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে "কিং লিয়ার" খোলা হয়েছে শুনে কৌতূহলী হয়ে দেখতে গিয়ে ফিরে এসেছিলুম চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে। কারণ প্রথমত, "কিং লিয়ার" সেখানে একাই আসর রাখতে পারেনি। "কিং লিয়ারে"র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল নৃত্যগীতপ্রধান একখানি চটুল হাস্যনাট্য এবং অভিনয় চলছিল খানিকটা "কিং লিয়ারে"র ও খানিকটা সেই হাস্যনাট্যের। দ্বিতীয়ত, "কিং লিয়ারে"র পাত্র-পাত্রীরা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করছিলেন নাচের পা ফেলতে ফেলতে! তৃতীয়ত, সর্ব্বশেষে একটি উজ্জ্বল দৃশ্যে "কিং লিয়ার" হয়ে উঠেছিল সুমধুর মিলনান্ত নাটক!

আর একবার ওখানেই দেখতে গিয়েছিলুম "মার্চ্চেন্ট অফ ভিনিসে"র অভিনয়। কিন্তু সে অভিনয়েরও কথা বলা বাহুল্য, তবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। "মার্চ্চেন্ট অফ ভিনিসে"র একটি দৃশ্যে দেখেছিলুম, নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে একেবারে আধুনিক ষ্টীমার!

যেমন সাধারণ রঙ্গালয়ে, তেমনি চিত্রজগতেও অত্যন্ত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নট-নটীদের জন্যে চিত্রশালার মালিকদের দুর্ভাবনার সীমা থাকে না।

কিন্তু মঞ্চের ও পর্দার শিল্পীদের মধ্যে পার্থক্য বড় কম নয়। মঞ্চের উপরে উঠে সাধারণত কেউ হঠাৎ-নবাবের মত হঠাৎ-নট হয়ে উঠতে পারে না। দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার পর সেখানে উপরে উঠতে হয় ধাপে-ধাপে। শিশির-কুমার ভাদুড়ী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরীর খ্যাতি হঠাৎ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

'জয়যাত্রা' ও অঞ্জনগড়ের নায়িকা সুনন্দা দেবী

কিন্তু চিত্রাভিনেতা বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারেন অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের মধ্যেই। মঞ্চাভিনেতাকে প্রধানত নির্ভর করতে হয় নিজের শক্তি, সাধনা ও ব্যক্তিত্বের উপরে মঞ্চের উপর। তিনি থাকেন একা এবং সমুজ্জ্বল পাদপ্রদীপের আলোকে তাঁর এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে সংখ্যায় অগণ্য তীক্ষ্ণচক্ষু। কিন্তু চিত্রনট বাহির থেকে সাহায্য পান সর্ব্বদাই। অভিনয়ের সময়ে তিনি ষোলো আনা সাহায্য পান প্রয়োগ-কর্ত্তা, পরিচালক, আলোক-শিল্পী ও শব্দধর প্রভৃতির কাছ থেকে। চিত্রাভিনয় এক জায়গায় খারাপ হ'লে যতবার খুসি আবার ছবি তোলা যায়। এমনি সব নানান কারণে যে কখনো অভিনয় করেনি সেও প্রথম চিত্রেই আত্মপ্রকাশ করতে পারে সম্পূর্ণ ও পরিপক্ক শিল্পীরূপে। তার দুর্ব্বলতা ও অসম্পূর্ণতা গোপন হয়ে থাকে চিত্রশালার মধ্যেই, বাইরের দর্শকরা ও-সবের কোনই পরিচয় পায় না। পাশ্চাত্য দেশের অনেক পরিচালক এই রকম কাঁচা মাল নিয়ে কাজ করতেই বেশী ভালোবাসেন।

যে কখনো মঞ্চে অভিনয় করেনি অথচ চিত্রাভিনয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, এ দেশে এমন সব শিল্পীর অভাব নেই। পাদপ্রদীপের আলোকে এসে দাঁড়ালে তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা দস্তুরমত কাহিল হয়ে পড়তে পারে।

আসল অভিনেতা দুই-এক দিনে তৈরি হয় না। বাংলা দেশে অনেকেই হয়তো চিত্রশালায় পদার্পণ ক'রেই "শিল্পী" হয়ে পড়েন, কিন্তু আমেরিকার হলিউডে হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে, ওখান-কার চিত্রাভিনেতাদের অধিকাংশই (৮৪.৭ পারসেন্ট) চিত্রশালায় আসবার আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন অল্প-বিস্তর।

গোড়াতেই যা বলছিলুম। অত্যন্ত জনপ্রিয় চিত্রশিল্পীদের নিয়ে প্রয়োগকর্ত্তারা বড় বিপদে পড়েন।

ছবিতে দর্শকরা সর্ব্বাগ্রে দেখতে চায় তাদের প্রিয় মুখগুলিকে। নতুন কোন ছবির নাম শুনলেই তারা জিজ্ঞাসা করে, ওর মধ্যে অমুক বা তমুক 'তারকা' আছে কি না ?

ছবির মালিক বা প্রয়োগকর্ত্তার কাছে এমন জিজ্ঞাসা কর্ণকটু বলে মনে হয়। তাঁরা চিরদিনই চেয়ে এসেছেন জনসাধারণের মনের মধ্যে নিজেদের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, কিন্তু তাঁদের এ কামনা পূর্ণ হয়নি কোন দিনই। লোকে তাঁদের আমল দেয় না

আগে তারা দেখতে চায় বিশেষ বিশেষ নট-নটীকে। এবং বিপদ হয় এইখানেই। নট-নটীদের যত নাম, তত দাম।

প্রায়ই বিখ্যাত নট-নটীদের অসম্ভব মাহিনার কথা শোনা যায়। কিন্তু সেই অসম্ভবও সম্ভবপর হয় কেবল মাত্র জনতার দাবীর জন্যেই। ছবির মালিকরা খুসি হয়ে অত টাকা দান করেন না, তাঁরা দান করেন বাধ্য হয়েই। কিছু কাল আগে আমেরিকার প্যারামাউণ্ট ও ইউনিভার্সাল চিত্র-সম্প্রদায় ব্যয়সংক্ষেপের জন্যে অতিরিক্ত মোটা মোটা মাহিনার চিত্র-তারকাদের কাজ থেকে জবাব দিয়েছিলেন। অল্প দিন পরেই দেখা গেল, খরচ কমার সঙ্গে সঙ্গে লাভ কমে আসছে যথেষ্ট পরিমাণে। উপরন্তু তাঁদের পরিত্যক্ত তারকাদের সাদরে গ্রহণ করে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ও মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের আর্থিক উন্নতির সীমা রইল না!

'জয়যাত্রা'য় সুমিত্রা দেবী

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স সম্প্রদায় শিশু-নটী সিরলে টেম্পলের ছবি দেখিয়ে মোট লাভ করেছিল সাত কোটি টাকারও উপর! ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউনিভার্সাল সম্প্রদায়কে রক্ষা করে একমাত্র ডিয়েনা ডার্বিনের জনপ্রিয়তাই। সে সময়ে ডার্বিনের বাৎসরিক মাহিনা ছিল কিছু, বেশী ছয় লক্ষ টাকা। ইউনিভার্সাল এই মোটা মাহিনা দিতে কোনই আপত্তি করেননি, কারণ ডার্বিনের কোন ছবি থেকেই নয় লক্ষের চেয়ে কম টাকা লাভ হত না! এবং সেই সময়েই ইউনিভার্সালের কর্ত্তৃপক্ষ মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, ডার্বিনের আকর্ষণী-শক্তি এমন অসামান্য যে, নগদ সাড়ে তিন কোটি টাকার বিনিময়েও তাঁকে আমরা ছেড়ে দেব না!

ডেভিড সেল্‌জ্‌নিক যখন "Gone with the Wind" ছবিখানি তোলবার সংকল্প করেন, তখন জনসাধারণ দাবী করলে রেট বাটলারের ভূমিকায় ক্লার্ক গেবল্‌কে দেখবার জন্যে। সে এমন জোর-দাবী যে তা না মেনে সেলজ্‌নিকের আর উপায় রইল না। কিন্তু গেবল তখন মেট্রোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ—বার্ষিক মাহিনা পান নয় লক্ষ টাকারও বেশী। মেট্রোর কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে সেলজ্‌নিক যথামূল্যের বিনিময়ে গেবলকে ধার চাইলেন। মেট্রোর দল জো পেয়ে এমন অসম্ভব টাকা দাবি ক'রে বসল যা কেউ কোন দিন শোনেনি! দায়ে পড়ে সেলজ্‌নিককে সেই দাবীই মানতে হল। কিন্তু ফল হল আশাতীত। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ভিতরে "Gone with the Wind" ছবি দেখিয়ে লাভ হয়েছিল প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকা!

কিন্তু যে-সব মহা মূল্যবান তারকাকে নিয়ে এমনি টাকার ছিনিমিনি খেলা চলে, তাঁদের ঔজ্জ্বল্য কত দিন স্থায়ী হয়? তিন যুগের মধ্যে দেখলুম কত তারকারই আনাগোণা!

ম্যাক্স লিণ্ডারের নাম আজ ক'জন জানে? জাতে তিনি ছিলেন ফরাসী, সারা পৃথিবীতে হাসির ছবির বাজার তিনি মাৎ করে রেখেছিলেন। চার্লি চ্যাপলিনও তখন পটে এসে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু ম্যাক্স লিণ্ডারের কৌতুকাভিনয় ও তাঁর ছবির আখ্যানবস্তু উচ্চতর শ্রেণীর রসিকের কাছে অধিকতর উপভোগ্য। এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে লিণ্ডার যদি চিত্র-জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সৈনিক-ধর্ম্ম অবলম্বন না করতেন, তাহলে চ্যাপলিন এমন ভাবে বাজার দখল করতে পারতেন ব'লে বিশ্বাস হয় না।

বৃদ্ধ রোনাল্ড কোলম্যান আজও চিত্র-জগতে বিদ্যমান, কিন্তু তিনি দুই যুগ আগেকার কোলম্যানের ছায়া মাত্র। সেদিনকার সেই তরুণ প্রেমিক কোলম্যানের সঙ্গে তরুণী প্রেমিকা ভিলমা ব্যাঙ্কির প্রেমাভিনয় দর্শকদের চিত্ত কতটা চঞ্চল ক'রে তুলত! জন গিলবার্টের সঙ্গে গ্রেটা গার্ব্বোর এবং চার্লস্ ফ্যারেলের সঙ্গে জ্যানেট গেনরের প্রণয়-লীলা আজও আমাদের চিত্রপটে ম্লান হয়নি বটে, কিন্তু চিত্রপটে আর তাঁদের অস্তিত্ব নেই। মেরি পিকফোর্ড, রুডলফ ভ্যালেন্টিনো, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, পোলা নেগ্রি, মে ওয়েষ্ট—কত আর নাম করব? অধিকাংশেরই আর্ট শুকিয়ে গিয়েছে মরুভূমি ফুলের মত।

সম্প্রতি স্যামুয়েল গোল্ডউইন সাহেব মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন: "চলচ্চিত্রকে আজ এমন পরম উপভোগ্য করে তুলেছে যে নিছক রোমান্স ছাড়া আর কিছু নয়।" আমাদের কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর চিত্র প্রেরণা সংগ্রহ করেছে রোমান্সেরই ভিতর থেকে। যদিও হলিউড ঐদিকে আজকাল আর বড় একটা দৃষ্টি দেয় না, কিন্তু তবু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, অনধিক কালের মধ্যেই রোমান্স আবার চিত্র ও চিত্রজগতে জাগ্রত হয়ে দাবী করবে নিজের জন্যে যথাযোগ্য আসন। আজ আমাদের কাম্য হচ্ছে, আরো কম খুনখারাপি এবং আরো কিছু চাঁদের আলো।

হুইটিয়ার লিখেছেন: 'রোমান্স' হচ্ছে সর্ব্বদাই যুবক।' সেই সঙ্গে আমি বলি, "এবং যৌবন হচ্ছে সর্ব্বদাই রোমাণ্টিক। ঐ যৌবনের মধ্যেই বিরাজ করছে হলিউডের ভবিষ্যৎ।"

'সীতা' নাটকের নূতন অভিনেতা ভবানীকিশোর ভাদুড়ী

পেশাদারি অভিনয়

জনৈক পেশাদার

পেশাদারি থিয়েটারের দল স্বভাবতঃই সংখ্যাল্প। তাদের নিয়মিত রিহার্সেল দিতে হয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ পরিচালকদের কর্তৃত্বাধীনে। তা ভিন্ন নিয়মিত ভাবে বিচিত্র ভূমিকায় অবতরণ করার ফলে দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে তাঁরা অভিজ্ঞ শিল্পী হয়ে ওঠেন। দেখা যায়, যত অভিজ্ঞতা বাড়ে শিল্পীও তত সহজ ভাবে অভিনয়কে জীবন্ত করে তুলতে পারে। অবশ্য তরুণ নটনটীর পক্ষেও অনেক সময় স্বাভাবিক অভিনয়-শৈলী দেখানো সম্ভব—সে ক্ষেত্রে চরিত্রের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক মানসের এক নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে সহজ ভাবে, সে কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু সৌখীন নাট্যশিল্পীর পক্ষে অভিনয়ে এই সহজক্রিয়া ভাব আনা রীতিমত ভাবনার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিনয়ে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকে না ভাবী নট-সূর্যদের।

অভিনয়ের সংজ্ঞা কি?—অমুকের অভিনয়-ক্ষমতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়—তা তিনি যত বড়ো অভিনেতাই হোন না কেন। অথচ নতুন চরিত্র-শিল্পীর পক্ষে সর্বদা এই বীজমন্ত্র জপ করা প্রয়োজন—আমি জীবনকে ফুটিয়ে তুলব—আমার নিজের নয় আর এক জনের। সেই জন্য পাদপ্রদীপের সামনে আমি যা বলছি, যা করছি অথবা মুখে যে ভাব এনে ভাবছি তার মধ্যে জীবনের সহজ প্রকাশভঙ্গী থাকা চাই—স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবের ব্যঞ্জনা। জীবনকে ফুটিয়ে তুলব—এই বীজমন্ত্র মনে মনে জপ করছে যে অভিনেতা তার পক্ষে অভিনয়ে এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সম্ভব করে তোলা একেবারে দুঃসাধ্য নয় মোটেই।

হেনরী আরভিং একবার তার বক্তৃতায় বলেছিলেন—'মনে রাখবেন, অভিনয় আবৃত্তি নয় অভিনয় হোল চরিত্র-চিত্রন।' এই চরিত্র-চিত্রণ কথাটা'র মধ্যেই রাজ্যের প্রশ্ন থাবা উঁচিয়ে দাঁড়ায়। চরিত্র চিত্রণ অভিনেতার নিজের চরিত্রের নয়—অপরের। তাও শুধু আকৃতিতে বা বাচন-ভংগীতে নয়—নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তনশীল এক অপরিচিত মানুষকে।

বেতারে যে ধরণের অভিনয় তার মধ্যে বাচন-ভঙ্গীই চরিত্র-সৃজনের মূলাধার। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মাত্র আবৃত্তির পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

এই ধরণের চরিত্র-চিত্রণের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে এইবারের যুদ্ধে। জেনারেল মন্টোগোমারির এক জন ডবল ছিলেন যিনি নাগরিক জীবনে এক জন প্রসিদ্ধ অভিনেতাও বটে। ফ্রান্স আক্রমণের কিছু দিন আগে এই ভদ্রলোককে বিমানে জিব্রাল্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জেনারেল সাজিয়ে। সেখানে তিনি গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জনসাধারণের সম্মুখেও উপস্থিত হন। এই ভাবে জার্মাণদের ভুল বোঝান হয়েছিল যে, জেনারেল জিব্রাল্টার থেকে প্রত্যাগত না হলে আক্রমণ সুরু হতে পারে না। অনেকে বিশ্বাস করেন, শুধু যে জেনারেলের ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা তা নয়, এই ভাবে পৃথিবীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও মিত্রপক্ষ সাফল্য লাভ করবার সুযোগ পেয়েছিল।

জেনারেলের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তিনি এক জন জীবন্ত কর্মীকে সাময়িক ভাবে অনুকরণ করেছিলেন কিন্তু পাদ-প্রদীপের সামনে যাকে অভিনেতা অনুকরণ করেন তিনি সব সময় বাস্তব না-ও হতে পারেন! কিন্তু দু'ক্ষেত্রেই অভিনেতাকে সমান নিখুঁত ভাবে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হয়।

আবৃত্তির আভিধানিক মানে হোল পুনরুচ্চারণের দ্বারা কণ্ঠস্থ করা। অবশ্য অভিনেতা পুনরুচ্চারণের দ্বারাই চরিত্রের কথোপকথন কণ্ঠস্থ করেন এবং জন-সমক্ষে তা আর একবার পুনরুচ্চারিত প্রাণবন্ত অভিনয়ের বাহবা নেন; রাত্রির পর রাত্রি সেই একই কথার মালা বলে বলে অভিনেতার মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি নষ্ট হতে বসে—সে কথা সত্যি। কিন্তু তবু শ্রেষ্ঠ নাট্যচালকরা বারে বারে অভিনেতাকে স্মরণ করিয়ে দেন—অভিনয় আবৃত্তি নয়। নূতন অভিনেতার পক্ষে এ বড়ো জটিল ধাঁধা। অথচ যত বার হোক না—প্রত্যেক বারই এক কথা উচ্চারণ করার সময় সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি শুধু কণ্ঠে নয় ভঙ্গীতেও প্রকাশ করা প্রয়োজন। শত রজনী কেন সহস্র রজনীর অভিনয়েও অভিনেতাকে সেই স্বতঃউৎসারিত ভাবটি জাগিয়ে তুলতেই হয়—নয় ত অভিনয় সমগ্র ভাবে জমে উঠতে পারে না। দর্শকরা নিরাশ হয়ে মন্তব্য করেন—আজকের অভিনয় যেন প্রাণহীন আবৃত্তি মাত্র। দর্শক বাস্তব-ঘেঁসা সজীব অভিনয় চায়—তোতা-পাখীর মত বুলি আওড়ান চায় না। অভিনেতার মুখের প্রতিটি কথা যেন তার হৃদয়ের সেই মুহূর্তের ভাবের সরব প্রকাশ, এমনি ধারণা হওয়া চাই দর্শকের। অথচ ঠিক এই জিনিষটা ফুটিয়ে তোলা যে কত কষ্টসাধ্য তা যে-কোন অভিজ্ঞ দক্ষ শিল্পীর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যেতে পারে। অনেকে ভাবেন যে, অভিনেতারা একই বইয়ের দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভিনয় পছন্দ করেন। কেন না একবার মাত্র রিহার্সেল দিয়ে পাঠটুকু তুলে নিতে পারলে এবং একবার পাঠটুকু সড়গড় হয়ে গেলে আর খাটুনির ভাবনা থাকে না। একমাত্র শারীরিক কষ্টটুকু ভোগ করেই রোজগার করা যায়। কিন্তু তা সত্য নয়। দীর্ঘ দিন এক বই চললে অভিনেতার পক্ষে সেই সজীব চরিত্র-চিত্রণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। চরিত্রের ভঙ্গীর সঙ্গে অতি পরিচয় এবং একই বাচনের একঘেয়েমিতে অভিনেতার মনের রোমাঞ্চ মরে যায় এবং সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি নিত্য ব্যবহারে ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। তার ফলে অভিনেতার যশোদীপ নিব-নিব হয়ে আসতে থাকে।

'অঞ্জনগড়' চিত্রে পারুল কর

স্বাভাবিকতা

এ কথা আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়ত নিষ্প্রয়োজন যে স্বাভাবিকতাই হোল অভিনয়ের প্রাণ ও ধর্ম। জীবনের নক্সা নিয়ে কারবার অভিনেতার এবং সেই নক্সাকে তুলে ধরবার আয়না হোল তার নিজের শরীর ও স্বর।

অনেকের ধারণা আছে যে, সহজিয়া ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে হলে অভিনেতাকে স্বাভাবিক হতে হবে। স্বাভাবিক হতে হবে অঙ্গভঙ্গীতে এবং বাচনে কৃত্রিমতা-দোষ বর্জ্জন করতে হবে। কিন্তু এ ধারণা অতি ভ্রান্ত।

অনির্ব্বাণ চিত্রে কানন দেবী

অভিনেতা স্বাভাবিক হবেন। 'স্বাভাবিক হতে হলে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রতি বাচন-ভঙ্গীতে নিজের চরিত্র ও নিজের বলার ভঙ্গীকে অজান্তেই প্রকট করে তুলবেন। অথচ অভিনেতার চরিত্রের সঙ্গে হয়ত অভিনীত চরিত্রের আসমান-জমিন ফারাক। এইখানে আবার বাস্তব জীবনের কথা এসে পড়ল। পাদ-প্রদীপের আলো যেই জ্বলল—উঠে গেল যবনিকার ব্যবধান—স্বল্পালোকিত প্রেক্ষাগৃহের অগণিত দর্শকের কৌতূহলী চোখ ও নিবিষ্ট মনের সামনে এসে দাঁড়াল এক জন জীবন্ত মানুষ তার বাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়ে। তখন অভিনেতার পক্ষে সব থেকে প্রয়োজন হোল নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি। এবং সেই আত্মবিস্মৃত মানুষটির দেহ-মনকে আশ্রয় করল আর এক জন দ্বিতীয় ব্যক্তি। সেই দ্বিতীয় মানুষটি তখন তার স্বাভাবিক জীবনের সমস্যা নিয়ে আসা-যাওয়া করতে লাগল। কিন্তু আদর্শবাদী আলোচনা ছেড়ে একে একে বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিশ্লেষণ করলে ধারণাটা হয়ত আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারবে।

প্রথমতঃ, যদি অভিনেতা স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখতে নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলেন তাহ'লে দর্শকদের প্রথম সারি অবধিই হয়ত তার কথা পৌছোবে না। লাউডার প্লীজের ঠেলায় অভিনেতার নিজের স্বাভাবিকত্ব বাঁচিয়ে রাখাই হয়ে উঠবে দুর্ঘট। অন্ততঃ স্বর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা যে একেবারে অচল তা একটি মাত্র মারাত্মক উদাহরণই আমরা উপলব্ধি করে নিয়েছি। বরং এ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতাই হোল স্বাভাবিকতা। পার্ট ভাল হোক আর নাই হোক, অভিনেতার কণ্ঠ প্রেক্ষাগৃহের দূরতম কোণে কোণে নাট্যরস-পিপাসু দর্শকদের কানে বাজা চাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌখীন শিল্পীর পক্ষে এইখানেই ভুল ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। এবং সেই কারণে প্রথম দিকেই তাকে যে ভাবে অপ্রস্তুত হতে হয় তাতে তার পরবর্ত্তী অভিনয়ও জখম হয়ে যায়। এই সঙ্গে অবশ্য এ কথাও ভুললে চলবে না যে, দূরতম দর্শকের কানে কথা-বার্ত্তা পৌছিয়ে দেবার জন্য অভিনেতাকে যেটুকু উচ্চ-কণ্ঠ বার করতে হয় তার মধ্যে যেন অস্বাভাবিক চীৎকার না বেরিয়ে পড়ে। সেইটুকু স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে না পারলে দর্শকদের মেজাজ বজায় থাকার আশা সুদূর-পরাহত। এখানেও তরুণ অভিনেতা আর এক সমস্যার মুখোমুখী হবেন। আলাপ করছেন প্রিয়তমার সঙ্গে নায়ক—প্রত্যেকটি কথা যেমন নিপুণ নাট্যকারের লেখনীতে রসসিক্ত হয়ে আছে সেই কথাগুলিকে সংহত আলাপের কণ্ঠেই বলতে হবে অথচ স্বর উঠবে উচ্চে। এ সমস্যা বটে।

শুধু উচ্চ নাদই নয় দর্শক আরো কিছু আশা করে প্রেক্ষাগৃহে বসে। সে চায়, অভিনেতার মুখের প্রত্যেকটি কথার অর্থ ও সংগতি সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতে। আমাদের ঘরোয়া আলাপে আমরা উচ্চারণকে তত বেশী প্রাধান্যই দেই না। আবার শ্রোতার যদি কোন কথা ধরতে ভুল হয় অথবা কোন কথা যদি তার কান এড়িয়ে যায়, সহৃদয় ভদ্রলোক মাপ চেয়ে আর একবার বক্তব্যটুকু শুনে নিতে চান। সুতরাং বক্তাকে আর একবার গুছিয়ে সবটুকু বলতে হয়। অভিনেতার কাছে দর্শক দু'রকমেরই সহযোগিতা কামনা করে। প্রথমতঃ, উচ্চ কণ্ঠ এবং দ্বিতীয়তঃ, উচ্চারণের পরিচ্ছন্নতা। অর্থাৎ দর্শককে কথা শোনাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবও বুঝিয়ে দিতে হবে। এই দু'রকম করতে গিয়ে অভিনয়ে স্বাভাবিকত্ব বলি হয়ে যায়। অথচ স্বাভাবিকত্ব হোল অভিনয়ের প্রাণ।

বসুমিত্রের রোমাঞ্চকর রহস্যনাট্য 'কালো ছায়া' চিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

তৃতীয় উপাদান হোল প্রকাশ-ভঙ্গীর স্বাভাবিকতা। এখানেও নানা সমস্যা জট পাকিয়ে ওঠে। অভিনেতার নিজের জীবনে কথা-বলার ভঙ্গী এবং শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ আছে কিন্তু তা করলে হয়ত অভিনীত চরিত্রটির সঙ্গে তা খাপ খাওয়ান চলবে না। কেবল মাত্র সাজ-পোষাকের দ্বারা অভিনেতার চেহারাকে বদল করলেই সব কিছু হোল না—সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু করা দরকার। এবং সে দরকারটুকু হোল নিজের ব্যক্তিত্বকে গলা টিপে ধরে তার অভিনেতাকে প্রয়োগ-কৌশল দেখাতে হবে। অর্থাৎ কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে না পারলে অভিনয় জমবে না। অথচ স্বাভাবিকত্বই হোল অভিনয়ের মৌল প্রয়োজন—অভিনয়ের প্রাণস্বরূপ।

প্রয়োগ-শিল্পের চরম হোল অভিনয়। এখানে বাস্তব মানুষ নড়ে বসে হেসে কেঁদে জীবনের চলমান লীলাকে রূপায়িত করে তোলে। আর সেই একমাত্র কারণেই শিল্পের মূল বস্তু যা, তা এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠা দরকার। সংযম, সংহত প্রয়োজনা; বিচিত্র রঙ, রস ও ব্যঞ্জনার সমাবেশে একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে দর্শকের চোখের সামনে। কোন একটি বিশেষ দৃশ্যে ঘটনা-স্রোত বেগবান বলে অথবা কোথায় গল্প ভাঁটায় মন্থর বলে ছবিখানি খণ্ডে খণ্ডে সুন্দর বা ভাল নয়। দর্শক যখন বই দেখা শেষ করলেন—তার মনের মধ্যে একটি সামগ্রিক ভাব ফুটে উঠল। সেই ভাবটিই হোল তার রসতৃষ্ণার রূপ। তার পর বুদ্ধিজীবী মন বিশ্লেষণ সুরু করলে। তখন খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করে সমালোচনা হতে লাগল।

অভিনেতাদের পক্ষে এই সামগ্রিক ভাবটি ফুটিয়ে তোলা প্রথম দরকার। একা কেউ নয়—সকলে মিলে এই ভাবটি ফোটাবার চেষ্টার নামান্তর হোল নাট্য জমানো। এর পিছনে অবশ্য থাকেন নাট্যকার ও পরিচালক। সেই নাটকই জমে উঠেছে বলতে বাধা থাকে না দর্শকদের যখন তারা সমগ্র সময়টুকু নিজেদের ইন্দ্রিয়-গ্রাম, চক্ষু ও কর্ণের উপর কেন্দ্রীভূত করে মন্ত্রমুগ্ধের মত। সেই-খানেই নাটকের চরম স্বার্থকতা। এবং শিল্পের সংজ্ঞায় তখনি তা উত্তীর্ণ। অবশ্য ঘটনাকে শিল্পের স্তরে তুলে ধরবার জন্য নাট্য-কারের দায়িত্ব অনেক বেশী।

বাস্তব জীবনে কোন ঘটনা যখন ঘটে তখন যত বাক্য ব্যয় হয়, নাটকে তাকে দানা বাঁধাতে হয় অনেক স্বল্প কথায়। অথচ সেই স্বল্প কথার মধ্যে শুধু ঘটনাটি স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলেই হয় না—তার মধ্যে দিয়েই চরিত্রগুলির হৃদয় উদ্ঘাটন হওয়াও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নাট্যকারের এই দুরূহ কাজের ফলে দর্শকের পক্ষে হয়ত সব কিছুকে তৎক্ষণাৎ হৃদয়গত করার অসুবিধা ঘটতে পারে। কিন্তু এইখানেই অভিনেতা অভিনেত্রী নাট্যকারের সাহায্যে এসে দাঁড়ান। নাটকের চরিত্রগুলিকে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করে তোলার দায়িত্ব নিতে গিয়ে তারা আপন ব্যক্তিত্ব বলিদান দিয়ে এক ভিন্ন মানসের নারী-পুরুষকে তুলে ধরেন দর্শকদের সামনে। সুতরাং শিল্পী কৃত্রিম হতে বাধ্য এখানে। এবং এই কৃত্রিম স্বাভাবিকত্বের মোহ রচনা করতে পারলেই তবেই অভিনেতার যশোভাতি এবং তার বাজার-দর হু-হু বর্ধমান। তা ছাড়া সমস্ত শরীরের ভঙ্গী ও মুখের ব্যঞ্জনা বক্তার বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলা প্রয়োজন। এর দ্বারা শুধু নিজের বক্তব্য নয়—ঘটনার আবর্তে সেই বিশেষ চরিত্রটির মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও ফুটে ওঠা চাই।

দেখা যায় যে, অধিকাংশ লোকের মুখে চরমতম ঘটনা—যেমন মৃত্যু, হত্যা বা হঠাৎ ঘটা কোন আতংকজনক পরিস্থিতি অতিরিক্ত ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলে না। অন্ততঃ যেটুকু তোলে সেটুকু স্বাভাবিক হলেও তা দিয়ে অভিনয়ের কাজ চলে না। সুতরাং অভিনেতাকে মুখে কৃত্রিম ভাব ফুটিয়ে তুলতে হয়। যা মূল ব্যঞ্জনার অতিরঞ্জন এবং যা করার জন্য ভিতর থেকে শক্তি ব্যয় হয় না। এই কৃত্রিমতা এবং আতিশয্য স্বাভাবিকত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে। অথচ যৎপরোনাস্তি স্বাভাবিকতাই হোল সব অভিনয়ের প্রাণ। এবং উদীয়মান নট-নটীর পক্ষে এ আর এক প্রধান অন্তরায়। বাচনের উচ্চগ্রাম এবং পরিচ্ছন্নতা এবং সেই সঙ্গে কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে পারলেই তবেই অভিনয় সহজ ও জমাট হবে। অথচ এর প্রতি ধাপে স্বতঃ-উৎসারিত স্বাভাবিকতার মৃত্যু বা হত্যা। সৌখীন অভিনয়ে তার পক্ষে এইগুলি হোল দুরারোহ সোপান। এবং নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধি দিয়ে এই সিঁড়ি না ভাঙতে পারলে নটলোকের স্বর্ণ শীর্ষ বাইরেই থেকে যাবে।

সিরাজদ্দৌল্লা নাটকে যিনি সিরাজের পাট করেছেন এবং যিনি গোলাম হোসেনের চরিত্র রূপায়িত করছেন, দু'জনে দুই ভিন্নধর্মী অভিনয় করতে বাধ্য। যদিও চরিত্র-দু'টির মৌলিকত্বে আকাশ-পাতাল তফাৎ, তথাপি অভিনয়ের সময় দু'জনকেই সমান কৃত্রিম স্বাভাবিকতা ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ সম্বন্ধে পরিচালককে সুরুতেই ধারণা করে নিতে হবে যে কত দূর কৃত্রিমতা ও ব্যক্তিত্ব বলিদানের দ্বারা দু'জন লোক ঐ দু'টি চরিত্রকে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করতে পারবে। লোক-নির্বাচনের সময় এইটুকু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। অভিনেতাদের দায়িত্ব তার চেয়েও গুরুতর। যে নাট্য-রস সিরাজ ফোটাবে সে নাট্য-রসে গোলাম হোসেনের অপমৃত্যু।

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক অভিনয়ে বাচন-ভঙ্গীর আর এক বাধা আছে। যেখানে চরিত্রের মুখে বক্তব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্যকার বসিয়েছেন সেখানে বাচনের স্বাভাবিকতা প্রথমেই বিপন্ন হয়ে ওঠে। অথচ দেখা গেছে যে, অনেক অভিনেতা সেই ছন্দোবদ্ধ বাণী উচ্চারণ করে অপূর্ব রস জমিয়ে তুলেছেন। ছন্দে কথা বলা অবাস্তব। কোন লোক তা বলে না বা শুনতে অভ্যস্তও নয়। সুতরাং দর্শক যখন—'দাও মাগো সন্তানে বিদায়'—চলে যাই লোকালয় ত্যজি'—শোনে, তখন তার মন বেঁকে বসবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বাচনের ভঙ্গীতে সেই ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে স্বাভাবিক করে তোলাই হোল আবৃত্তির আর্ট। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অভিনেতা যখন কথা কইছেন—সে কি গদ্যে কি পদ্যে—তার ভঙ্গীতে এইটুকু ফোটা উচিত যে বক্তব্যগুলি সেই মাত্র তার মনে কল্লোল তুলেছে এবং তিনি তা উচ্চারণ করছেন। মুখস্থ করা অথবা পুনরাবৃত্তিতে পুরাতন বাক্য প্রয়োগ করছেন না তিনি। এইটুকু হোল স্বাভাবিকতার দাবী। সেই কারণে আপাততঃ শ্রবণে কটু ও কৃত্রিম হলেও নাটকের ছন্দে গাঁথা সংলাপ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

পড়া-পাগলা, সংসার-অনভিজ্ঞ প্রফেসারের চরিত্রের মধ্যে অনেকখানি কৃত্রিমতা থাকেই। সেটুকু ফোটাবার জন্যে কৃত্রিমতারই প্রথম প্রয়োজন। এবং সেই কৃত্রিমতার দ্বারাই সেই চরিত্রের স্বাভাবিক অভিনয় হতে পারে।

এই ধরণের উদাহরণ বাড়িয়ে দেওয়া যায় অজস্র। বিশেষ করে যারা বহু দিন বহু ধরণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁরা এর সঙ্গে আরো একশ' যোগ করতে পারবেন। কিন্তু উদাহরণ বাড়িয়ে গেলে সমস্যায় হয়ত আরো জট পাকিয়ে যাবে বলে আমরা নিরস্ত হলাম।

[ক্রমশঃ

[শীতে উপেক্ষিতা—৫৬০ পৃষ্ঠার পর]

সন্দেহ হয় যে ইনি শিল্পী। বেশ পরিচ্ছন্ন কিন্তু এককত্বের ছাপ নির্ভুল। ওভার কোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে, সেখানে একটা সেফটি পিন্ ঝুলছে। দেখলেই মনে হয় ইনি মুক্ত, কোনো নির্দিষ্ট ঘাটে বাঁধা নেই এঁর জীবনের তরী। পথে বেরিয়েছেন কিসের সন্ধানে কে জানে। হয়তো কিছুর সন্ধানেই নয়। হয়তো আমারই মতো ; বাইরের আকর্ষণে ততটা নয়, যতটা গৃহের বিকর্ষণে।

কিন্তু এ সমস্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না, বললেম, "হাসপাতালের কাজের পরে এই মূর্তি গড়বার অর্ডার পেয়ে দার্জিলিং এসেছেন বুঝি ?"

"না, না, দার্জিলিং এসেছি অনেক দিন। মূর্তির কথা উঠল তো মাত্র মাস তিনেক আগে। তার আগে ওই জলাপাহাড়ে মাষ্টারি করছিলেম।"

"মাষ্টারি ?"

"হ্যাঁ," ভদ্রলোক হেসে বললেন, "ইংরেজি পড়াতেম। এক জন মাষ্টার ছুটিতে গিয়েছিল, তারই বদলি হয়ে, মাস ছয়েকের জন্যে।"

দার্জিলিঙের প্রায় পাঁচশ' ফিট উপরে জলাপাহাড়ে আছে সেন্ট পলস্ স্কুল। স্কুলটির খ্যাতি আছে। গোড়াতে ছিল কলকাতায়, ১৮৬৪ সালে চলে আসে এখানে। ভারতশাসনরত ইংরেজদের সন্তানদের শিক্ষার জন্যেই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সেইটেই ছাত্রসংখ্যা সাধারণত পরিমিত রাখে। তার উপর আছে নিয়ম, যাতে শতকরা পঁচিশ জনের বেশী ভারতীয় ছাত্র ভর্তি করা হয় না। স্কুলটির ইংরেজি চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

টমসন বললেন, "ওই যে ছেলেটি বসে আছে ও আমার ছাত্র। নাম মোহন।"

ছেলেটি কাছেই একটা পেন্সিল দিয়ে কী যেন লিখছিল। নিজের নাম শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে ভূতপূর্ব শিক্ষককে দেখে এগিয়ে এলো, "গুড মর্নিং, সার, প্লেজেন্টলি ওয়ার্ম, ইজনট্ ইট্, সার ?"

"ইয়েস্, কিন্তু আমাকে উঠতেই হবে। আবার কাজ সুরু করতে হবে। তুমি বসে এঁর সঙ্গে কথা বলো।" টমসন যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন। ভদ্রলোককে ভালো লাগল।

সব কিছুই ভালো লাগছিল সেই সকালে। ভালো লাগল মোহনকে। কিশোরটি অত্যন্ত সপ্রতিভ কিন্তু দুর্বিনীত নয়। জানে কোথায় আলাপের শেষ ও বাচালতার সুরু। কৈশোরের কৌতুহল আছে, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সে কৌতুহল স্বাস্থ্যকর। ক্রিকেটের বিশেষ উৎসাহী। চিত্তচাঞ্চল্য নেই চিত্রতারকাদের জীবনকাহিনী নিয়ে।

মোহনের পুরো নাম মোহন কৃপালনী। সিন্ধি। কনগ্রেস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আত্মীয়তা নেই, নাম বলেই সেকথা যোগ করল। কারণটা তখনো জানিনে।

মোহনদের দোকান আছে দার্জিলিঙে। দামী কাপড়ের দোকান। এখানে আছে মাস পাঁচেক হোলো। তার আগে ব্যবসা ছিল লাহোরে। মোহন এখন শীতের ছুটীতে জলাপাহাড় থেকে এসেছে মা-বাবার কাছে। মাঝে-মাঝে সে নিজেও চৌরাস্তার দোকানের তদারক করে। পরিবারে কেউই চাকরি করে না। সবারই আছে কোনো না কোনো ব্যবসা। বয়স কম হলেও মোহনের ব্যবসাপ্রীতি মজ্জাগত। চাকরিতে অভিরুচি নেই, বলল সেকথা। কথায়, ব্যবহারে, অভিলাষে—মোহন বাঙালী সমবয়সীদের থেকে সব ব্যাপারেই বিভিন্ন।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "বলুন দেখি, পাঁচ অক্ষরের কথা, যার মানে Kingdom."

বললেম, "Realm হতে পারে।" মোহন ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল করতে সুরু করেছে অল্প কিছু দিন হোলো। উৎসাহ অপরিসীম, কিন্তু অনভিজ্ঞতার জন্যে পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য নয়। আমার এ-বিদ্যায় কিঞ্চিৎ অভ্যাস ছিল, তাই মোহনের সহজ ধাঁধাগুলির উত্তর দিতে কষ্ট হোলো না। মোহন মুগ্ধবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "আপনি এত সহজে করতে পারেন অথচ উত্তর পাঠান না কেন ? এবারে তো ফার্ষ্ট প্রাইজ কুড়ি হাজার। অনায়াসেই তো আপনি এতগুলি টাকা পেতে পারেন।"

"না, অনায়াসে নয়। এই পাজ্‌লগুলিতে অসংখ্য অলটারনেটিভ থাকে। ঠিক উত্তরটা নির্ভর করে পাজ্‌লকর্তার মর্জির উপর, যুক্তির উপর নয়। তাছাড়া প্রাইজ আছে বলেই করতে ভালো লাগে না। আমি মাঝে-মাঝে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের পাজ্‌ল্ করি। সেটা অনেক ভালো।"

"কিন্তু তাতে তো প্রাইজ নেই।"

"সেইজন্যেই তো করতে ভালো লাগে।"

"বা রে, তাহোলে কী লাভ করে ? মিছিমিছি পরিশ্রম।"

"তুমি যে ক্রিকেট খেলো সেও তো পরিশ্রম। কী পুরস্কার তার আনন্দ ছাড়া ?"

"সে আলাদা, সে তো খেলা।"

"ক্রসওয়ার্ডও তো খেলা। প্রাইজের প্রশ্ন উঠলেই খেলাটা মাটি হয়ে যায়। লাভের আশংকা থাকলেই তো সেটা ব্যবসা হয়ে গেল। তখন সেটা কাজ মনে হয়। ভালো লাগে না।"

মোহন আমার নির্বুদ্ধিতায় হতবাক হোলো। অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকলেও যা নিরর্থক তাই নিয়ে সময় নষ্ট করতে মোহন কাউকে দেখেনি এর আগে। আমার কথাকে অবিশ্বাস্য পরিহাস মনে করে বলল, "কিন্তু আমি যে ক্রসওয়ার্ড করছি সেটা করলে তো খেলা আর লাভ দুই-ই একসঙ্গে হতে পারে।"

"মনে হয় হতে পারে, কিন্তু হয় না। দু'টোর মধ্যে বিরোধ আছে। যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে কোনো কারণ নেই ধনী কেন ধার্মিক হতে পারবে না। কিন্তু হয় না। God আর Mammon-এর উপাসনা যেমন একসঙ্গে হয় না, তেমনি আনন্দ আর ব্যবসাও একসঙ্গে হয় না।"

মোহন কী বুঝল সে-ই জানে। চুপ করে রইল। আমি ভাবছিলেম নানা অসংলগ্ন ভাবনা। সমৃদ্ধি কেন সমাধি দেয় আদর্শকে ? শারীরিক বিলাস কেন বিনাশ করে মানসিক সুস্থতা ? কোনো কারণ নেই, কিন্তু একথা অস্বীকার করবারও উপায় নেই যে তাই হয়। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান থেকে সাধক হয়নি কেউ, তাকে বেছে নিতে হয়েছে কণ্টকের আসন। দারুণ গ্রীষ্মে সে সম্মুখে প্রজ্বলিত করেছে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, দারুণ শীতে সে সাধনা করতে গেছে হিমমণ্ডলের সর্বোচ্চ শিখরে।

মোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ষ্টেটস্‌ম্যান যদি নিয়ে আসি আমাকে দেখিয়ে দেবেন কি করে তার পাজল্‌ করতে হয় ?"

"সানন্দে।"

দার্জিলিঙে আসা অবধি খবরের কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। ইচ্ছা করেই রাখিনি। চেয়েছিলেম নীচের সব কিছু ভুলে থাকতে। পালিয়ে এসেছিলেম সব কিছু থেকে। কিন্তু পালানো কি যায় ? পালানো যায় একটা জায়গা থেকে, একটা লোক থেকে। কিন্তু নিজেরই আরেকটা অংশ থেকে নিষ্কৃতি এত সহজ নয়। শিয়ালদহ ষ্টেশনে শহুরে আমি-কে পরিত্যাগ করে এলেও পোড়াদহতে পৌঁছে দেখি, হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে অতি পুরাতন ভৃত্য। তাই নৈসর্গিক স্বর্গ উপভোগ করতে করতেও খবরের কাগজের নাম শুনলে দুর্মর কৌতূহল জাগ্রত হয়ে ওঠে নীচে-ফেলে আসা জগৎটার সম্বন্ধে। জানতে ইচ্ছে হয়, কোথায় ভূমিকম্প হোলো আর কোথায় বন্যা।

ভূমিকম্প সারা পৃথিবীতে, বন্যা প্রতি মানবের চোখে। কাগজ খুলেই দেখি, মহাত্মাজী অনশন করেছেন। কলকাতার সাম্প্রদায়িকতার দাবাগ্নি নির্বাপিত করে গান্ধীজী যাত্রা করেছিলেন ঘৃণাদগ্ধ পাঞ্জাবের দিকে। তখনো জানতেন না দিল্লীর দাঙ্গার কথা। রাজধানীতে পৌঁছে আর এগুতে পারলেন না। শিবির স্থাপিত হোলো নয়াদিল্লীতে। যুদ্ধের শিবির নয়, শান্তির শিবির। সমগ্র ভারতবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন গান্ধীজী একা, জাতীয় অবমাননার অবসান ঘটাবেন আত্মবলি দিয়ে। অগণ্য জনতার হিংস্র মত্ততাকে শান্ত করবেন আত্মঘাতনের মধ্য দিয়ে।

সূর্য তখন মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। সবটুকু আলো নিঃশেষে মুছে গেছে। ধরণীর বুকে আবার নেমেছে কুয়াশার গাঢ় অন্ধকার। আমার কথা বলবার শক্তি ছিল না।

মোহন বলল, "ক্রস্‌ওয়ার্ড তো শেষের পাতায়। প্রথম পাতায় কী দেখছেন ?"

"আজ পারব না ভাই, আরেক দিন দেখিয়ে দেবো। এখন আর কিছু ভালো লাগছে না।"

মোহন কাগজ পড়ে। সে জানতো গান্ধীজীর অনশনের কথা। বোধ হয় ভাবল সেই আলোচনায় আমি উৎসাহী হবো। বলল, "গান্ধীর অনশনের আজ চার দিন হোলো।"

"এ-বয়সে চার দিন মানে চার বছর।"

"কী দরকার ছিল উপোস করবার তাহোলে ?"

"তা বটে !" কারো সঙ্গেই তর্ক করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। অপরিণতমনস্ক কিশোরের সঙ্গে তো নয়ই।

মোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, "আই.হোপ হী ডাইস্‌। বুড়োর এখন মরাই ভালো।"

মানব জাতির পঞ্চমাংশের স্বাধীনতা দেওয়ার সঙ্গে মহাত্মাজীর কর্তব্যের অবসান হয়েছে, ভারতবর্ষকে দেবার তাঁর আর কিছু নেই, এই সকল অর্বাচীন মতবাদ এর আগেও শুনেছি। কিন্তু এতটুকু শিশুর মুখে এমন স্পষ্ট উক্তি শুনতে হবে এমন আশংকা করিনি। মহাত্মাজীর মৃত্যু কামনা এমন নির্লজ্জ ভাষায় এর আগে আর শুনিনি। বিরক্তিতে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল। ক্রোধ সম্বরণ করে আস্তে বললেম, "তোমার বয়সে সব কিছু বোঝবার কথা নয় এবং যা বোঝো না তা নিয়ে কথা না বলাই ভালো।"

"আমি না হয় বুঝিনে। আমার বাবা তো বোঝেন। তিনিও আজ সকালে এই কথাই বলেছেন। ওরা আমাদের মেরে শেষ করে দেবে আর আমরা বুঝি থাকব কাপুরুষের মতো হাত-পা গুটিয়ে ?"

মোহনের পিতৃভক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু তর্ক এড়াবার জন্যেই বললেম, "তোমাকে তো মারেনি, তাহোলেই হোলো।"

"আমাকে মারেনি কিন্তু আমার বোনকে মেরেছে। চার বছরের ছোটো বোন। আমার দুই ভাইকে মেরেছে। এক পিসীকে মেরেছে।" মোহন প্রায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, "আমার দিদিমাকে মেরেছে। আমাদের লাহোরের বাড়ীতে যে ক'জন ছিল সবাইকে মেরেছে।" মোহন ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেম।"

মোহনের ক্রোধ মিথ্যা নয়। অস্বাভাবিক নয়। এতটুকু শিশুর ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত ক্ষোভ, এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়েছে দেখে মন তিক্ত বিস্ময়ে ভরে ওঠে। কায়েদ-ই-আজম ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করেছেন, সেটা বৃহৎ ক্ষতি। কিন্তু তিনি এতগুলি সুস্থ মনে এতখানি ঘৃণার সঞ্চার করেছেন, এই শিশুটির সুকুমার হৃদয়ে পর্যন্ত এতখানি হিংস্রতা সঞ্জাত করেছেন যে তাঁর এ-অপরাধের বোধ হয় ক্ষমা নেই। এ-অপরাধ তো শুধু মানবদেহকে ক্লিষ্ট করেনি, মানবাত্মাকে লাঞ্ছিত করেছে।

মোহনের অশ্রুও মিথ্যা নয়। এবং মোহনও একা নয়। অতি সত্য তাদের সকলের দুঃখ। তাদের বেদনা অস্বীকার করিনে। কিন্তু একথাই বা অস্বীকার করি কী করে যে প্রতিহিংসায় তার প্রতিকার নেই ? কলকাতার দৃষ্টান্তের কথা স্মরণে ছিল। তবু অবিশ্বাসী মন প্রশ্ন করে একটি মানুষের প্রচেষ্টায় কি সম্ভব হবে এত দুর্বৃত্তের বক্ষ থেকে এত পাশবিকতার নিরসন ? বিশ্বাসঘাতকের ছুরিকা কি মানবে বিশ্বাসের বারণ ? শান্তির লোলিত বাণী কি ব্যর্থ পরিহাসের মতো শোনাবে না ? এক পক্ষের নিষ্ক্রিয়তা কি অপর পক্ষের উৎসাহের কারণ হবে না ? গান্ধীজী একা কি পারবেন এতগুলি ক্ষুব্ধ হৃদয়ের এতখানি ক্ষোভ ঘোচাতে ? এতগুলি আঁখি থেকে এতখানি অশ্রু মোছাতে ?

সমস্ত জগৎ সেদিন শংকিত চিত্তে রুদ্ধনিশ্বাসে এই প্রশ্নেরই উত্তর প্রতীক্ষা করছিল।

[ক্রমশঃ

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে নির্মেয়মান শ্রীদুর্গা মূর্তির আলোক-চিত্র মুদ্রিত হল। ছবিতে শিল্পী মণি পালকে মূর্তি নির্মাণ করতে দেখা যাচ্ছে।

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নানীকে হত্যা করার গোরগোলে মন্দির অপবিত্র করার দিকটা চাপা পড়ে থাকে, ধর্মস্থানের কুৎসিত অপমানের হৈ-চৈএ নানীর মরণ মর্য্যাদা পায় না। কোন্ অন্যায়টা বড় তা নিয়ে অবশ্য বচসা সুরু হবার সুযোগ ঘটে না, ভীড় জমে উঠতে না উঠতে সংঘর্ষ সুরু হয়ে যায়,—পরিকল্পনাটা যাদের তারা সত্যই তৎপর। মানুষকে চিন্তা করার সুযোগ দিলে যে চলবে না এটা তারা ভাল করেই জানে। বেঁচে থাকতে মাকে খেতে না দিক, তার অপমৃত্যুর সংবাদে নাজিম বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ছুটে এসেছে, সাথে-সাথে কিম্বা আগে-পরে এসেছে বস্তি আর বস্তির ওপারের মুসলিমপ্রধান এলাকার অনেকে। বুড়ী মাকে পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে নাজিম সবে হাঁটু পেতে বসে মায়ের মুখখানা বুঝি উঁচু করতে গিয়েছিল, সোডার বোতলের ঘায়ে মাথা ফেটে গিয়ে তার জীবন্ত তাজা রক্ত ঝরে নানীর চাপ-বাঁধা রক্তে মিশতে থাকে,—শুধু নানীর রক্ত নয়, তাতে নিরীহ একটি গরুর রক্তও মেশান ছিল। এটাও দাঙ্গা চালু করে দেবার প্রাথমিক ঘটনাবলীর অঙ্গ—সোডার বোতল নিয়ে লোক তৈরী হয়েই ছিল। তবে নাজিমের মাথাটাই যে ফাটবে সেটা কেউ ভেবে রাখেনি। কয়েক মিনিটের জন্য তার পর এলোমেলো মারপিট খুন-জখমের চেষ্টা চলতে থাকে, কাপড়ের ভাঁজের আড়াল থেকে ঝকঝকে ছোরা বেরিয়ে এসে রতন সান্যালের পাঁজরে ঢুকে যায়, অ্যাসিডের বালব ফেটে হিন্দু-মুসলমান দু'জাতেরই কয়েক জনের কালো চামড়ার কিছু কিছু ঝলসে জ্বলে-পুড়ে ইংরেজী সাদা চামড়া হয়ে উঠবার প্রতিশ্রুতি জানায়। আচমকা কোথা থেকে অনেকগুলি লাঠি এসে হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো করে দিতে থাকে।

নাজিমকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে নিয়ে বস্তির দিকের লোকেরা পিছু হটে পালিয়ে যায়, সংখ্যায় তারা কম ছিল। পুলিশ আসে না কেন, সৈন্য? রসময় টেলিফোনের যন্ত্রটায় ঝাঁকি মারে, সাড়া পেয়ে ব্যাকুল ভাবে আহ্বান জানায়, কিন্তু পুলিশও আসে না, সৈন্যও আসে না। জবরদস্ত বৃটিশ-রাজের সৈন্য-পুলিশের কি হয়েছে? ঘরের কোণে খেলার ঝোঁকে সাত বছরের ছেলে বন্দে মাতরম্ বললে তারা যে শুনতে পেয়ে তাকে সায়েস্তা করত!

বহু নিরীহ লোক যখন হতাহত হয়েছে, লুঠপাটের চরম পালা চলছে, দলবলে এক দল উন্মাদ যখন গিয়ে বস্তিতে সাত-আটটা ঘরে আগুন দিয়েছে, চোরাবাজারে যে পেট্রোলের টানাটানি সেই পেট্রোল রাশি রাশি ঢেলে আগুন দিয়েছে, তখন দিগন্ত কাঁপিয়ে ট্রাকে চেপে মিলিটারী এল। বস্তি তখন দাউ-দাউ জ্বলছে।

জ্বালানির অভাবে উনান ধরে না কাঁকর-মেশানো চাল সিদ্ধ করতে, নানীর রাস্তায় কুড়োনো গোবরের ঘুঁটে চড়া দামে বিকোয়, মানুষের মাথা-গোঁজার ঘর-জ্বালানো আগুন আকাশ লাল করে জ্বলছে। এদিকে পূর্বাকাশে যে সূর্য্য উঠছে তিনি পর্য্যন্ত যেন ম্লান হয়ে গেছেন আগুনের আঁচে আর আলোয়।

গিরীন সচকিত ভাবে গলিতে ঢুকছিল, মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল অবস্থা দেখে। কাল বিকালে যখন আপিসে গিয়েছিল হত্যা আর অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ সম্পাদনা করে পরিবেশন করার কর্ত্তব্য পালনে, খবরের কাগজের আপিসে যখন হানা দিয়েছিল এক দল উন্মাদ, রাত জেগে সাজিয়ে-গুছিয়ে জগতের অসভ্য অসুর আর মানুষের চরম বীভৎসতম যুদ্ধের খবরগুলি মানুষের এবং মালিকের গ্রহণযোগ্য করে পরিবেশনের কর্ত্তব্য পালন করছিল। তার পর কাজের টেবিলে পা গুটিয়ে ঘণ্টা তিনেক যে ঘুমিয়েছিল, তার মধ্যে এ ভাবে বাড়ী ফেরার ইঙ্গিতও ছিল না। জগতে ধ্বংসের ও সৃষ্টির দ্বন্দ্ব চলুক, তার নিজের পাড়া, তার বাড়ী, তার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-বৌ-ছেলে-মেয়ে নিরাপদে থাকবে, এটা যেন ধরেই নিয়েছিল গিরীন।

হেই শালা, কাঁহা যাতা? পাকড়ো!

লালমুখো বীরপুরুষদের রুচি-রীতি বিচার-বিবেচনা গিরীনের জানা ছিল, সে ভয়ানক ভয়ে কাছা বেসামাল হবার ভাব দেখিয়ে রসময়ের বাড়ীর পাশের এক হাত সরু অন্ধ-গলিতে ঢুকে যায় এবং মিনিট খানেক পরে গলি থেকে বেরিয়ে লালমুখের প্রায় পাশ কাটিয়েই তিনটে বাড়ী পেরিয়ে নিজের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে।

কোন্ পথ দিয়ে এলে? নীলিমা জিজ্ঞাসা করে।

রোজ যে পথে আসি।

নীলিমা গালে হাত দেয়।

কেন, ওদিকের গলিটা দিয়ে ঘুরে এলে হত না? খানিকটা নয় দেরীই করতে। ওনারা এসে বীরত্ব দেখাচ্ছেন, যাকে পাচ্ছেন ধরছেন পিটছেন চালান দিচ্ছেন, ওর ভেতর দিয়ে আসবার দরকার?

গিরীন হেসে বলে, তাড়া করেছিল। আমরা ও-সব ট্যাকটিক্‌স জানি। খবরের কাগজের ঘুঘু আমরা। কখন লাগল, কি করে লাগল? কি নিয়ে ঘটনা সুরু হল—

ওরে উমেশ, নীলিমা ডাকে, হেড কম্পোজিটরকে ডাক, মস্ত নিউজ, ডবল হেডলাইন হবে, সাব এডিটর বাবুর নিজের নিউজ!

নীলিমার কাছে মোটামুটি বিবরণ শুনে গিরীন চারি দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে ছাতে যায়। ইতিমধ্যে ছাতে অনেকে এসেছে গিয়েছে, চোখ মেলে চারি দিক চেয়ে দেখেছে, মণি সেই যে ছাতের কোণে আলসে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে আর নড়েনি। বেলা বেড়ে রোদ কড়া হয়েছে, ঘামে গরমে সে সিদ্ধ হচ্ছে, তবু ঠায় দাঁড়িয়ে সে চোখ পেতে রেখেছে পথে, তাকিয়ে থেকেছে আগুন-ধরা বস্তির দিকে। গিরীন কাছে এসে দাঁড়াতে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

দেখুন কাণ্ড, তপ্ত খোলায় ছিলাম আগুনে এসে পড়লাম! কোথাও কি মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না? কি আরম্ভ হয়েছে এ সব? দেশশুদ্ধ লোক কি পাগল হয়ে গেল?

উপায় কি বলুন? যারা ধনের মালিক মনের মালিক তারা যদি এই খেলা চান, পাগল করার কল টেপেন, আমাদের পাগল হতে হয়। ওদের হাতেই চাবিকাঠি দিয়ে রেখেছি।

অল্প কয়েক দিনেই মণি এ-সব কথার মর্ম্ম খানিক বুঝতে শিখেছে। সে অস্ফুট স্বরে বলে, কী ভয়ানক!

ভয়ানক তো বটেই। যারা রাজত্ব করে, রাজত্ব যেতে বসলে তারা ভয়ানক কাণ্ডই জুড়ে দেয়। রাজত্বের লোভ চরমে উঠে গেছে, শেষ অবস্থার বিকার কি না!

আচ্ছা, হিন্দু-মুসলমান একটা আপোষ করে ফেলে না কেন? দেশের লোকের দল তো দু'টোই, এটুকু কি বোঝে না নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসা হলেই সব হাঙ্গামা চুকে যায়? দেশটা বাঁচে?

গিরীন [illegible] আসে না। এই [illegible]

পরিচয় আছে, এ শুধু মণির একার প্রশ্ন নয়। কত শিক্ষিত বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ বন্ধু রাজনীতির জট খুলতে খুলতে হয়রাণ হয়ে আন্তরিক আপশোষে এই সহজ কথাটায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আপোষ মীমাংসার কত ভিত্তিই তো রয়েছে, সাধারণ মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে পর্য্যন্ত সে ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁজে পায়। সাধারণ লোকের কাছে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সত্যই বেখাপ্পা, উদ্ভট, অর্থহীন। জগতের সেরা পাকা খেলোয়াড় কোন্ চোখ রাখে জনসাধারণের দিকে, কোন্ চোখ রাখে কংগ্রেস আর লীগের দিকে, কার দিকে কোন্ হাত বাড়ায়, কি খেলা খেলে, কি চাল চালে—এ জটিল ব্যাপার বোঝা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ শুধু জানে যে কংগ্রেস আমার বা লীগ আমার, এ জগতে কে একান্ত ভাবে কার জানা যেন এতই সহজ!

কেন মীমাংসা হয় না, দেশটা বাঁচে না? পুরানো পচা অসহায় মানুষের এ প্রশ্ন তাকে পর্য্যন্ত যেন আজ বিচলিত করে। আশ্চর্য্য হয়ে গিরীন আজ প্রথম টের পায় এটা আসলে প্রশ্ন নয়, এ শুধু হৃদয়াবেগ!

আপোষ যদি হবে, বৃটিশ আছে কেন?

ওটাই তো আমি বুঝতে পারি না গিরীন বাবু। সংসারে দু'জনের যদি একটি বড় শত্রু থাকে ওই শত্রুর জন্যই তাদের মিল হয়, এমনি যতই ঝগড়া-ঝাঁটি থাক। এ দেখছি ঠিক উল্টো ব্যাপার, আসল শত্রু কোথায় গেল—নিজেদের মধ্যে শত্রুতা!

কিসের শত্রু? বৃটিশের শত্রু তো নয়!

নয়? বৃটিশ-রাজের শত্রু নয় কংগ্রেস লীগ?

না। বিপক্ষ। হিংসা শত্রুতা এ-সব কংগ্রেস মানে না। লীগ আরও নরম। শত্রু যদি হত আপনার সংসারের ওই নিয়মটাও খাটত, একজোট হয়ে যেত। ইংরেজ এ দেশে বিপক্ষ গড়তে দিয়েছে, শত্রুকে ফাঁসি দিয়েছে—দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্রু হয়ে উঠছে, এখন বিপক্ষরাই ইংরাজের ভরসা। চার দিকে লাখ-লাখ শত্রু মাথা তুলছে, বোম্বেতে নৌ-সেনা বিদ্রোহ করল, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মিশন—

সন্ধ্যার বৈঠকে এ-সব কথা মণি কিছু কিছু শুনেছে, অত দূর সে এগোতে চায় না, তার ঘরোয়া হিসাব গুলিয়ে যায়।

এ মারামারি এখন থামাবে কে?

দেশের লোক উদ্যোগী হয়ে থামালেই ভাল হত, তা সেটা বোধ হয় হবে না। লক্ষণ সে রকম নয়, আগুন আরও ছড়াচ্ছে। কর্তাদের মধ্যে একটা মীমাংসা না হলে কিছু হবে মনে হয় না। কে জানে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে অবস্থা! তবে গরীব বেচারী আপনার আমার দফা নিকেশ হবে সেটা বলে দিতে পারি। স্বাধীনতার আশা আপাতত বেশ কিছু কালের জন্য ঘুচে গেল। এত কাল ধরে স্বাধীনতার সংগ্রাম করে এসে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল, যে পথে এত দূর এগোলাম সেই পথ আগুনের প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দিলাম—এটাই আমার সব চেয়ে বড় জ্বালা! নইলে হিন্দু-মুসলমান অনেক শো বছর ধরে এ দেশে আছি, আজ নয় কাটাকাটি করে একটা সম্প্রদায় শেষ হয়ে যেতাম, হয় হিন্দু থাকতাম নয় মুসলমান থাকতাম—তাতে আমার এত কষ্ট হত না। রাজনৈতিক সংগ্রাম যে দেশে ধর্মের লড়াই-এ দাঁড়ায় সে দেশের বরাত বড় খারাপ। শেষ পর্য্যন্ত কি হবে আমি জানি না, কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হয়নি, স্বাধীনতার সমস্যা রয়ে গেছে। আবার আমাদের আদা-জল খেয়ে দু'টো সমস্যারই মীমাংসার জন্য লড়তে হবে, প্রাণ দিতে হবে।

গিরীনের রাত-জাগা চোখে নিজের বিহ্বল চোখ রেখে মণি কৃতজ্ঞ ভাবে বলে, আপনি এমন সহজ ভাবে সব বুঝিয়ে দিতে পারেন!

ওদিকে বস্তির রসদ কমে-আসা ঝিম-ধরা আগুন, নীচে রাস্তায় সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি ও টহল, মাথার উপরে মেঘহীন আকাশের দীপ্ত সূর্য্যের খটখটে রোদ, দম-আটকানো গুমোট আর গা-পচানো ঘাম, এর মধ্যে মণির ন্যাকামিতে গিরীন সত্যই চটে যায়। অকারণে মণিকে প্রায় চমকে দিয়ে সে ব্যঙ্গ করে বলে, আমিও তো আপনার মতই বোকা-হাঁদা, পরস্পরের সহজ কথা আমরা তাই সহজে বুঝি।

মণিকে সবাই আঘাত করে, সবাই তার ঘরোয়া মেয়েলী মায়েলী এবং দেশী রকম প্রিয়া-লী হাব-ভাব চাল-চলন আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা তেজ-নম্রতাকে অবজ্ঞা করে, সবাই তার অসীম ঔৎসুক্য অনন্ত জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতাকে ন্যাকামি মনে করে চটে যায়। একমাত্র মণি ছাড়া এ-বাড়ীর সবাই যেন দেশের ধন-সম্পদ দুঃখ-দারিদ্র্য আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা ধর্ম-মোক্ষ-কাম ইত্যাদির বিলি-ব্যবস্থা পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ ব্যক্তি, ছেলে-পিলে কুকুর-বেড়াল পর্য্যন্ত। এ দেশে ঘরে ঘরে মণি আছে, দু'-একটা নয়, কোটি কোটি আছে, এই ক্ষোভে যেন প্রণব থেকে নীলিমার ভাই গোলোক পর্য্যন্ত, নীলিমা থেকে বাড়ীর ঝি দুর্গা পর্য্যন্ত মনে মনে সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে আছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেহেতু একটা বিশেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেচে সেই হেতু এ দেশে মণির মত বৌ মা মেয়েমানুষের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ ও অন্যায় হয়ে গেছে। দেশে যে শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই, সেটাই হল বিদেশী শাসনের কুফল, সুতরাং শিক্ষাহীনা দীক্ষাহীনা মেয়েরা এ দেশের অভিশাপ, ওই কুফলের ধারিকা বাহিকা। দেশের কোটি মা ও-রকম হোক, কোটি মেয়ে কোটি বৌ ও-রকম হোক, হয়েছে বলেই হলে চলবে না আর।

ঘরে গিয়ে মণি বিছানায় আশ্রয় নেয়। ভাবে, বিদ্বান বিদুষী ও বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতীরা ত্যাগে আদর্শে কর্মে প্রেরণায় সারা দেশের ভাগ্য নিয়ে যে গৌরবময় জীবন যাপনের অধিকার পেয়েছে, সে অধিকার থেকে সে বঞ্চিতা হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! সংসারে টুকিটাকি কাজ করে স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশ অবধি পড়েছে, বিয়ের পর স্বামী চাওয়া মাত্র আলিঙ্গন দিয়েছে, রেঁধেছে বেড়েছে, ছেলে-মেয়ে প্রসব করেছে, আবার রেঁধেছে বেড়েছে ছেলেমেয়ে মানুষ করেছে—তার উচিত হয়নি এ-বাড়ীতে আসা। এ-বাড়ীতে সাময়িক ভাবে আশ্রয় লাভের যোগ্যতাও তার নেই, বড় বড় ব্যাপার কিছুই সে বোঝে না। তার উচিত ছিল, দেশের কোটি কোটি মেয়েছেলে যে রান্নাঘরে ভাঁড়ার-ঘরে শোয়ার ঘরে মুখ গুঁজে আছে তাদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় খোঁজা।

হ্যাঁ, অন্ধকারের জীব সে, অন্ধকারে থাকাই তার উচিত ছিল বড় সে ভুল করেছে এই সচেতন আলোর জগতে এসে—এ আলোতে শুধু তার চোখ ঝলসে যায়, সে অন্ধকার ভাখে। এ-বাড়ীতে সে শুধু পিছনে পড়ে থাকা অবজ্ঞেয় জীব!

নিজেকে এত ছোট মনে হয় মণির। গান্ধী জওহরলাল সুভাষের তুলনায় নিজেকে সুশীল যত হেয় যত ছোট মনে করে তার চেয়েও অনেক ছোট। মহাপুরুষদের মহান্ এই দেশ, তাদের মত তুচ্ছ অবজ্ঞেয় অগণিত নরনারী কেন এই দেশে বেঁচে আছে ?

ঘণ্টা দুই পরে প্রণব তার ঘরে আসে। ইতিমধ্যে কয়েক জন এসেছিল খবর নিতে কি হয়েছে জানতে, তাদের মণি গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাতে বাড়ীতে একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি হয়েছে। শুধু বিছানায় শুয়ে পড়ে আর যে ঘরে আসে তাকেই টাকা দিয়ে বাড়ীতে এ রকম একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি করতে পেরেছে জানলে, বিশেষতঃ পাড়ায় যখন বস্তি পুড়ছে আর ঘরের সামনে মিলিটারী টহল দিচ্ছে, মণি টের পেত, মোটেই সে তুচ্ছ নয়—অবজ্ঞেয় নয়!

প্রণব বলে, হল কি মণি-বৌদি ?

মণি বলে, বেরোও আমার ঘর থেকে, দূর হয়ে যাও। ইয়ার্কি করেতে এসেছ, না ?

প্রণব এগিয়ে এসে বিছানার পাশে বসে। বসে গায়ের ভেজা ময়লা পাঞ্জাবী আর তার তলায় ছেঁড়া গেঞ্জিটা খোলে, দু'হাতের তালুতে সমস্ত মুখটা একবার ঘষে মেজে নেয়। তার পর হাঁটুর নীচে মণির পায়ে হাত দিয়ে দেখে বলে, কই, জ্বর তো হয়নি ? গা তো বেশ ঠাণ্ডা।

জ্বর হয়েছে কে বলল ?

কেউ বলেনি। শুনলাম তোমার কি যেন হয়েছে, ভয়ানক ছটফট কচ্ছ, সবাইকে ধমকাচ্ছ—

মণি চুপ করে থাকে।

এখন বুঝতে পারছি, আসলে তোমার হয়েছে জ্বালা। তুমি ভাবছ, কি সর্ব্বনাশ, এখানে পালিয়ে এলাম, এখানেও দাঙ্গা ? ভাবতে গিয়ে তোমার সারা জীবনের ক্ষোভটা নাড়া খাচ্ছে, এই বিশ্রী বাস্তব থেকে কি কিছুতে মুক্তি নেই ? কি তুচ্ছ মানুষ, কত অসহায়, জীবনটা কি বিশ্রী! রাগে-অভিমানে তোমার মেজাজটা গিয়েছে বিগড়ে।

যদি গিয়েই থাকে ? আমার রাগ অভিমান হওয়া কি অকারণ ? আমার মেজাজ বিগড়োতে পারবে না এমন কোন আইন আছে ?

প্রণব আশ্চর্য্য হয়ে জবাব দেয়, আছে বৈ কি। তুমি অকারণে অন্যের উপর রাগ অভিমান করবে কিসের অধিকারে? মেজাজ খারাপ করে কেন তুমি অন্যকে দোষী বানাবে, কেউ তো কোন দোষ করেনি!

আমি যদি নিজের মনে—

নিজের মনে ? অভিমান হল তোমার দশ জনের ওপর, সেটা নিজের মনে হয় কি করে ? তুমি কি বনে একা আছ—গাছ-পালার ওপর রাগ করছ ? দশ জন তোমার মনের মত নয় বলেই তো তোমার জ্বালা ?

মণি চুপ করে থাকে।

প্রণব গলা পালটে বলে, তুমি কি সুধীনের জন্য ভাবনায় পড়েছ ? ছেলেটা বিগড়ে যাবে, বিপদ-আপদ ঘটবে বলে—?

কি আশ্চর্য্য ঠাকুরপো, মণি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, এখানে এসে থেকে ছেলেমেয়ের কথা আমার খেয়ালও থাকে না! সুধীনটা সত্যি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় বল ত? কি করে? [illegible]

যদি আমার গোল্লায় যায়, আমি তোমায় দুষবো কিন্তু। আশাটার কি হয়েছে ত্যাখো, দু'দণ্ড কাছে থাকে তো আর সারা দিন পাত্তাই নেই। ছেলেমেয়েরা আমায় ত্যাগ করছে না কি ?

তুমিই হয় তো ওদের ত্যাগ করছ! প্রণব হেসে বলে।

সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় দুঃস্বপ্নের মত, দেহ-মন যেন ভোঁতা হয়ে আসে দুশ্চিন্তা ও হতাশার অবসাদে। সন্ধ্যার পর মণির দেহ-মন এক আশ্চর্য্য বিশ্রামের সুযোগ পায়।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে সরস্বতী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মণি কলতলায় ছিল, সেইখানে গিয়ে সরস্বতী বমি আরম্ভ করে। চোখের পলকে মণি ভুলে যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অশান্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এমন ভাবে যে সরস্বতীকে সামলে উঠতে সাহায্য করে, শরীরের এই অবস্থায় বাড়াবাড়ি করার জন্য বকে, বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় যে মনে হয় একটি অসুস্থ মেয়েকে সেবা করার সুযোগের জন্য তার দেহ-মন যেন উৎকর্ণ হয়েছিল। পাখার বাতাস করতে করতে মায়ের মত সে সরস্বতীকে বকে, মেয়েছেলের এটুকু হিসেব থাকা দরকার। সময় মত খাবে না, আগুনের আঁচে পঞ্চাশ জনের পিণ্ডি রাঁধবে, একটা তোমার বিপদ হতে কতক্ষণ ?

চোখ বুজে শুয়ে শুয়েই সরস্বতী বলে, কিছু হবে না। আমাদের কিছু হয় না।

হয় তো তাই। কারণ, এত বলার পরেও কয়েক মিনিটের মধ্যে সরস্বতী উঠে বসে।

উঠলে কেন আবার ? শুয়ে থাকো না।

কমে গেছে। একটু খবর শুনি গে।

গা গুলিয়ে বমি করে বিছানা নিয়েছিল পোয়াতি মেয়েমানুষ, খবর শোনার তাগিদে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে! খবর শোনার এই একটা অদ্ভুত নেশা আছে এ-বাড়ীর মানুষের। সারা দিন প্রাণের ধাক্কায় এই উদ্ভট নগরে এদিক্ ওদিক্ চরে বেড়ায় এ-বাড়ীর মানুষ, এ-পাড়ার মানুষ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মত মহা দাঙ্গাও সে চরে বেড়ানোকে একেবারে রদ করতে পারেনি। পারলে অবশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব কিছুই রদ হত সঙ্গে সঙ্গে। যে নগরে কেউ নড়ে-চড়ে না সে নগরে কে দাঙ্গা করে, কে-ই বা চায় স্বাধীনতা, আর কে-ই বা লড়ে নেয় পাকিস্তান। শ্মশানে বা কবরখানায় দাঙ্গাকারীরা ভুলেও উঁকি মারবে না, সেখানে তাদের কোন স্বার্থ নেই। সবাই চরে বেড়াবে, সকলকে মজাসে চরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর জন্যই তো এ কারসাজি। এ নগরটা কেন, সারা জগতে তাই।

জীবনের ধাক্কায় দাঙ্গায় উন্মত্ত নগরে সারা দিন চরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার সূত্রপাতে তাড়াতাড়ি সবাই বাড়ী ফেরে, সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে তপ্ত ডাল-ভাত পেটে পুরে দেয়, যেন মন্বন্তরের জলজ তরল খিচুড়ি-ভোগের আসামী এরা সকলেই। তার পর ছাতে বসে পরস্পরের সঙ্গে খপরা-খপর আদান-প্রদান করে। পাড়ায় দু'-চার জন মেয়ে-পুরুষও আসে। সারা দিন তারা কি দেখেছে কি বুঝেছে কি জেনেছে সাধারণ আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্কের মধ্যে তারই আদান প্রদান।

পাড়ায় একটা শক্তিশালী শান্তি কমিটি গঠনের কাজে [illegible]

বাধা-বিঘ্ন-প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, তবে তার সঙ্গতিটা অনুমানযোগ্য। দাঙ্গা আপনা থেকে অকারণে বাধেনি, যে সক্রিয় শক্তি দাঙ্গা চায় স্বভাবতই শান্তি তার পছন্দসই হতে পারে না। সেদিন সকালের হাঙ্গামায় নানীকে ধরে মোট খুন হয়েছে চার জন, চার জনেই বস্তির লোক। আহত আঠার জন, প্রায় অর্দ্ধেক বস্তির। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, দু'দিক থেকে সংঘর্ষ বাধবার মুখে মাঝখানে আটক-পড়া সত্ত্বেও বস্তির একাংশ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাধা দিয়ে দাঙ্গা ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল, বস্তির উপরেই আঘাতটা পড়েছে বেশী। ভস্মস্তূপের এক দিকে কয়েকটা আগুনে ঝলসানো ধোঁয়ায় বিবর্ণ ঘর ও কয়েকটা ভাল ঘর বস্তির চিহ্ন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। লুঠপাট হয়েছে প্রচুর—লুঠপাটের হিসাব করতে বসলে সন্দেহ জাগে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে অথবা এটা বড় রকমের একটা ডাকাতি? বড় ঘটনার পর ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'-একটা ছোরা মারা, ইট ও এসিড ছোঁড়ার বিভিন্ন ঘটনা ঘটে চলেছে। উত্তেজনা আকাশে চড়ে আছে, গুজবের পর গুজব ছড়াচ্ছে। বিকাল পাঁচটা থেকে সকাল পাঁচটা অবধি কারফিউ। দিনের বেলা কোন্ রাস্তায় কতটায় কাদের চলা নিরাপদ, কোন্ অংশে বিপদের ভয় আর কোন্ অংশে পদার্পণ মাত্র সুনিশ্চিত মরণ, মোটামুটি নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় দিন কালু প্রণবের সঙ্গে দেখা করে, অন্যত্র। তার কাছে শোনা যায়, দাঙ্গা ঘটাবার এই নূতন পরীক্ষার পরামর্শ ও নানীর ভাগ্যের কথা। একসঙ্গে এক ঘটনায় দু'টি সম্প্রদায়ের লোককেই ক্ষেপিয়ে তোলার বুদ্ধিটার আদি উদ্ভব নাজেরালির মস্তিষ্কে। তার প্রস্তাব ছিল এদিকের এই মন্দির আর ওদিকে বস্তির উত্তর দিকের পাড়ায় যে ছোট মসজিদটি আছে সেটি অপবিত্র করা। ইয়াসিন এটা সংশোধন করে, স্পষ্ট জানায় যে অন্তত একটা খুন চাই, নইলে এদিকের যা অবস্থা তাতে সুফল আশা করা যায় না। সিংহী এতে সায় দেয়, খুনের রক্ত না দেখলে মানুষের মাথায় না কি খুন চড়বে না। তার পর তাদের মধ্যে না কি জোরালো কথা-কাটাকাটি চলে কাকে উষ্কানির বলি করা হবে তাই নিয়ে। সে কোন্ ধর্ম্মের হবে তাই নিয়ে তর্ক নয়, এ বিষয়ে তাদের এতটুকু মতানৈক্য ছিল না। এদিকে মুসলমানরা একটু দুর্ব্বল, তারা হাঙ্গামা এড়িয়ে গা বাঁচিয়েই চলতে চায়, সুতরাং তাদের ক্ষেপাতেই খুনের তেজী উত্তেজনা দরকার। সিংহী বলেছিল নানীর নাম, ঝগড়া হয় ওই নানীকে নিয়ে। নাজেরালির এক শত্রু আছে, পাড়াতেই থাকে, পাঞ্জাবের এক জন মুসলমান ভদ্রলোক। এ লোকটিকে মেরে ফেলে রাস্তায় ফেলে রাখলে হৈ-চৈ উত্তেজনা বেশী হবে, এ থাকতে বস্তির তুচ্ছ নানীকে কেন? অনেক তর্কের পর শেষ পর্য্যন্ত ইয়াসিনও সিংহীর মতে সায় দিলে নানীকে শেষ করা ঠিক হয়। ইয়াসিন একটা জোরালো যুক্তি দেয়। নাজেরালির শত্রুটিকে কাজে লাগালে উত্তেজনা বেশী হবে বটে, কিন্তু যতই হোক মানুষটার খানিক ওজন আছে, শেষ কালে অন্য দিকে হাঙ্গামা হলে ধাক্কা সামলাবে কে? ওর মধ্যে ইয়াসিন নেই! তার চেয়ে বস্তির তুচ্ছ নানীই ভাল।

কি কুক্ষণেই নানী রেশনের দোকানে সিংহীকে অপমান করেছিল! অন্য সময় অন্য অবস্থায় এ অপমান হজম হয়ে যেত সিংহীর, তুচ্ছ নানীর তুচ্ছ খোঁচা বিকারের উঁচু সুরে বাঁধা তার কর্ম্মবহুল জীবনের মজাদার চিন্তার ফাঁকে কোথায় তলিয়ে যেত। দাঙ্গা বাধাবার প্রস্তুতি সম্পর্কে পরামর্শ করতে গিয়ে নানীর কথাটা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। কথাটা ভাবতে বড় মজা লাগল সিংহীর।

এমনি সময় সকালে এক দিন যতীন আচমকা সুশীলকে ডেকে পাঠাল। তার আহ্বান নিয়ে একেবারে তার গাড়ী এসে দাঁড়াল দরজায়।

সুশীল বলল, চালের কথা বলব না কি?

মণি বলল, না। এরা চায় না, আমাদের বাহাদুরী করে দরকার?

অনেক কৌতূহল ও প্রত্যাশা নিয়ে সুশীল লাখপতি বন্ধুর কাছে যায়, অভ্যর্থনা পায় কল্পনাতীত। তাকে বসতে বলে ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে যতীন ঝাঁঝালো গলায় বলে, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক! এত বড় বজ্জাত তুমি! আমি তোমার উপকার করলাম, তার বদলে তুমি আমার ষোল হাজার টাকার চাল ধরিয়ে দিলে?

[ক্রমশঃ
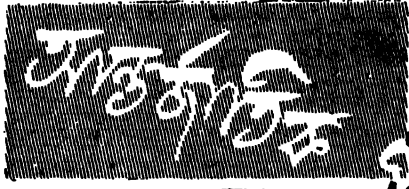
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জাতিপুঞ্জের প্যারী সম্মেলন—

২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) মঙ্গলবার প্যারী নগরীর Palaise De Chaillot-এ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর ৫৮টি জাতি এই অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। পৃথিবীর ৭০টি গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবে। সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ১০ হইতে ১২ সপ্তাহ ধরিয়া চলিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই অধিবেশনের কর্ম্মসূচী যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়া এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল সমস্যা যে দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে, সে-কথাও অনস্বীকার্য্য। গত এক বৎসরে জাতিপুঞ্জ যে-সকল সমস্যার সমাধান করিতে ব্যর্থ হইয়াছে তন্মধ্যে পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস করার ব্যবস্থা, আন্তর্জ্জাতিক পুলিশবাহিনী গঠন, প্যালেষ্টাইন, কোরিয়া ও বল্‌কান সমস্যা এবং ভেটো সমস্যা অন্যতম। পরমাণু-শক্তি কমিশন পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে এই সমস্যা লইয়া আলোচনা হইবে। কিন্তু আলোচনার ফল কি হইবে? আমেরিকা যে রাশিয়ার প্রস্তাব মানিয়া লইবে না, সে-কথা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আমেরিকা ও বৃটেনের উপগ্রহের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং সাধারণ পরিষদ যে পরমাণু-শক্তি কমিশনের ব্যর্থতার দায়িত্ব রাশিয়ার ঘাড়ে চাপাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিবে, এ-কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। ভেটো সমস্যা আর একটি দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। যদিও বৃটেন ও আমেরিকা ভেটো ক্ষমতার ব্যবহার কম করে নাই, তথাপি ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়িত্ব রাশিয়ার ঘাড়েই চাপান হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বৃটেন এবং আমেরিকার উপগ্রহের সংখ্যাই বেশী। সংখ্যাধিক্যের জোরে তাহাদের পছন্দমত যে কোন প্রস্তাব তাহারা পাশ করিয়া লইতে সমর্থ। ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়া রাশিয়ার আর কোন গত্যন্তর নাই। বর্ত্তমান অধিবেশনে বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চকের ভেটো ক্ষমতা বিলোপ বা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য জাতিপুঞ্জ সনদের ১০১ ধারা অনুযায়ী সাধারণ সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা হইবে কি? রাশিয়ার মুখপাত্রগণ বহু বার দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভেটো ক্ষমতাকে কোনরূপে সীমাবদ্ধ করিতে তাঁহারা রাজী হইবেন না। অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তিবর্গ ভেটো ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য খুব বেশী জেদ প্রকাশ করিলে জাতিপুঞ্জের সহিত রাশিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় হইবে না। রাশিয়া যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহা হইলে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘই যে শুধু দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তাহা নয়, আন্তর্জ্জাতিক সহ-যোগিতাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান অধি-বেশনে জার্ম্মাণী ও জাপান সম্পর্কে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের একমত হওয়ার প্রশ্ন যে বিশেষ স্থান গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্যারও কোন সমাধান সম্ভব হইবে কি? বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে ফ্রান্স বর্ত্তমানে গুরুতর সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়করা যে বৃটেন ও আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছেন তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও জার্ম্মাণীর প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁহারা বৃটেন ও আমেরিকার সহিত একমত নহেন। আবার জার্ম্মাণী সম্পর্কে রাশিয়ার মতও তাঁহারা সমর্থন করেন না। তাঁহারা চান জার্ম্মাণীর উপর তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আরও দৃঢ় করিতে। কিন্তু ফ্রান্স বৃটেন ও আমে-রিকার বিরুদ্ধে চলিবে তাহাও আশা করা যায় না। জার্ম্মাণীর সমস্যার ক্ষুদ্র সংস্করণ বার্লিন-সমস্যা লইয়াও জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। মস্কো নগরীতে দীর্ঘ সাত সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পরেও বার্লিন-সমস্যা সম্বন্ধে কোন কূলকিনারা হয় নাই। হয়ত বার্লিন পরিস্থিতিও সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোরিয়া সম্পর্কে রাশিয়া ও আমেরিকার বিরোধ মিটাইবার জন্য জাতিপুঞ্জের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। রাশিয়া ও আমেরিকা কোরিয়ায় তাহাদের অধিকৃত নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে এই সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হইবে কি? রাশিয়া ও আমেরিকা যে নিজ নিজ সুবিধা ছাড়িতে চাহিবে তাহার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। উত্তর আফ্রিকার স্বাধীনতা কমিটি (The Committee for Freedom of North Africa) এই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা টিউনিশিয়া-ফরাসী বিরোধটি প্যারীতে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করিবেন। ফ্রান্স টিউনিশিয়াকে তাহার ন্যায়সঙ্গত সার্ব্বভৌম অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে—টিউনিশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা অভিযোগ করিতেছেন। বৃটিশ পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ (British West Indies) হইতে এক দল প্রতিনিধি স্বায়ত্তশাসন দাবী করি-বার জন্য লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের দাবী জাতি-পুঞ্জের সমক্ষে উত্থাপন করিবার কথাও চিন্তা করিতেছেন। ঔপ-নিবেশিক সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতেও এক দল প্রতিনিধি লণ্ডনে যাইবেন। জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ঔপনিবেশিক প্রশ্নও উত্থাপিত হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উপ-নিবেশগুলি সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ১৬টি দেশের ১৬ জন প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি সম্পর্কে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ এশিয়া ও আফ্রিকার ৭৪টি দেশ শাসন করিতেছে। এই সকল দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র-পুঞ্জের নাই। ট্রাষ্টীশিপ হইয়াছে সাম্রাজ্যের নূতন নাম। সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জ যদি এই ৭৪টি দেশের স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা কিরূপে করা সম্ভব ?

এই অধিবেশনে নূতন সদস্য গ্রহণের প্রশ্ন আবার উত্থাপিত হইবে। সিংহল যে জাতিপুঞ্জের সদস্য হইবার জন্য আবার আবেদন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিলি ইটালীকে জাতিপুঞ্জের সদস্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। কিন্তু ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও আলবানিয়াকে জাতিপুঞ্জের সদস্য করা সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকা যদি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করা পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে রাশিয়া সিংহল, ইটালী ও অন্যান্য দেশের সম্পর্কেও ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করা ছাড়িবে না। আর্জেণ্টিনা আবার হয়ত স্পেনকে জাতিপুঞ্জের সদস্য করিবার প্রস্তাব করিবে। আয়ারও সদস্য হওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করিবে। স্পেনকে জাতিপুঞ্জের সদস্য করার সম্ভাবনা খুব কম। তবে আয়ারের আবেদন মঞ্জুর হইতেও পারে। কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্ট, দক্ষিণ-আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসন পরিচালন সংক্রান্ত রিপোর্ট, এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারতের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ও সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত ও আলোচিত হইবে। কাশ্মীর কমিশন সম্ভবতঃ কাশ্মীর বিভাগের সুপারিশ করিবে। কিন্তু কি ভারত ও কি পাকিস্তান কেহই কাশ্মীর বিভাগে রাজী হইবে না। ট্রাষ্টীশিপ কাউন্সিলের ব্যাপারও যে আলোচিত হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নিরাপত্তা পরিষদের ছয় জন অস্থায়ী সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যাপারও এই অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে। ভারত এই ছয়টি সদস্যপদ ন্যায়সঙ্গত ভৌগোলিক ভিত্তিতে বণ্টন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। ভারতের এবার নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। নিজাম আত্মসমর্পণ এবং তাঁহার প্রতিনিধিমণ্ডলীকে জাতিপুঞ্জে আবেদন উত্থাপন করিতে নিষেধ করিলেও কতগুলি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র হায়দ্রাবাদের প্রশ্নও জাতিপুঞ্জে উত্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান তৃতীয় অধিবেশনে উল্লিখিত এবং আরও অনেক গুরুতর বিষয় উত্থাপিত এবং আলোচিত হইবে। কিন্তু জাতিপুঞ্জ এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিবে কি ? তৃতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজনকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘকে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে জাতিপুঞ্জের প্রতি বিশ্ববাসী আস্থা রাখিতে পারিবে কি ? গত এক বৎসরের অবস্থা আলোচনা করিলে মনে হয়, সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনেও রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তির মধ্যে মতানৈক্যই শুধু প্রতিফলিত হইবে মাত্র।

উপনিবেশ ও জাতিপুঞ্জ—

স্বায়ত্তশাসনহীন দেশগুলি সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, জেনেভা সহরে উক্ত কমিটির দশ দিনব্যাপী অধিবেশন গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ হইয়াছে। পৃথিবীর ৭০টি উপনিবেশের উপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিদর্শন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিল, কমিটি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কমিটি সিদ্ধান্ত করেন যে, এইরূপ প্রস্তাব তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। ভারত যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার ভিত্তিতে একটি আপোষ প্রস্তাব কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে উপনিবেশগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল রিপোর্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রেরিত হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আগামী বৎসর এই কমিটির অনুরূপ কমিটির অধিবেশন হইবে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, একমাত্র মিশর ছাড়া আর কোন দেশ রাশিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করে নাই। উপনিবেশগুলি সম্পর্কে যে-সকল রিপোর্ট পাওয়া যাইবে, সেগুলি বিবেচনা করিয়া সাধারণ পরিষদের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য এই বিশেষ কমিটির স্থায়ী অস্তিত্ব রক্ষা করিতে উপনিবেশের মালিকগণ রাজী হন নাই।

উপনিবেশ সম্পর্কে রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার সার মর্ম্ম এখানে উল্লেখ করা হইল। (১) উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসনের অগ্রগতি সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট নিয়মিত ভাবে রিপোর্ট প্রদান করিতে উপনিবেশ সমূহের মালিকগণ বাধ্য থাকিবেন। (২) উপনিবেশগুলির অবস্থা পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষক প্রেরিত হইবে। (৩) উপনিবেশের জনগণকে জাতিপুঞ্জের বিবেচনার জন্য আবেদন করিবার অধিকার দিতে হইবে। (৪) মালিকগণ উপনিবেশগুলির অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে বিবরণ প্রদান করিবেন তাহার সহিত যুক্ত হইবার জন্য উপনিবেশ হইতে কাহারও ব্যক্তিগত ভাবে প্রেরিত বা স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট প্রেরণের সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। যাঁহারা উপনিবেশ সমূহের স্বাধীনতা-কামী তাঁহারা রাশিয়ার এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিতে পাইবেন না। তবু রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল কেন ?

নিম্নলিখিত ১৬টি রাষ্ট্র লইয়া এই কমিটী গঠিত :—(১) বৃটেন, (২) বেলজিয়ম, (৩) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, (৪) ফ্রান্স, (৫) অষ্ট্রেলিয়া, (৬) ডেনমার্ক, (৭) হল্যাণ্ড, (৮) নিউজিল্যাণ্ড, (৯) রাশিয়া, (১০) ভারত, (১১) চীন, (১২) মিশর, (১৩) সুইডেন, (১৪) কলম্বিয়া, (১৫) কিউবা, (১৬) নিকারাগুয়া। এই ১৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম আটটি এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশ সমূহের মালিক। ইহাদের অধীনে ৭৪টি উপনিবেশ রহিয়াছে। একা বৃটেনেরই উপনিবেশ ৪২টি। এইরূপ ক্ষেত্রে অন্ততঃ ৮টি ভোট রাশিয়ার প্রস্তাবের পক্ষে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাশিয়ার প্রস্তাবের পক্ষে রাশিয়া এবং মিশরের ভোট ছাড়া আর কাহারও ভোট পাওয়া যায় নাই। উপনিবেশ সমূহের মালিকগণ চিরকাল উপনিবেশগুলিকে তাহাদের অধীনে রাখিতে চায় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ দেশই মালিকদেরই সমর্থক।

ইউরোপীয় পার্লামেণ্ট—

ইণ্টারলেইকেনে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় পার্লামেণ্টারী কংগ্রেসের অধিবেশনে গত ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য দশ দফা-সম্বলিত একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। একটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে সমগ্র ইউরোপকে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ইউরোপের তেরটি পার্লামেণ্টের দুই শত বেসরকারী সদস্য এই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন।

১লা সেপ্টেম্বর এই কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক-সদস্য মিষ্টার আর, ডব্লু, জি, মেক্যে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পরিকল্পনা উত্থাপন করেন। তিনি প্রথম যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছিলেন তাহা হইতে অনেক বাদ দিয়া এই পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়। তাঁহার মূল পরিকল্পনায় ইউরোপীয় পার্লামেন্টকে কূটনৈতিক বিভাগ, রক্ষা-ব্যবস্থা, পুলিশ বাহিনী, চলাচল-ব্যবস্থা, জন-স্বাস্থ্য, ইমিগ্রেশন, শুল্ক-ব্যবস্থা এবং মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। মূল পরিকল্পনাটি সংশোধিত আকারে উত্থাপিত হইলেও বৃটিশ রক্ষণশীল দল হইতে প্রেরিত প্রতিনিধির উহা পছন্দ হয় নাই। বৃটিশ রক্ষণশীল দল এবং উদারনৈতিক জাতীয় দল ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়া পছন্দ করেন না। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির একটা শিথিল ইউনিয়নই তাঁহারা পছন্দ করেন। উল্লিখিত পরিকল্পনার প্রতিবাদ বৃটিশ রক্ষণশীল প্রতিনিধি মেজর রবার্ট অধিবেশন হইতে চলিয়া যান।

এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ইউরোপের ১৬টি রাষ্ট্র এবং পশ্চিম জার্ম্মাণী লইয়া একটি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে এবং ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার অধিকার থাকিবে। ইউরোপীয় পার্লামেণ্ট সিনেট এবং চেম্বার অব ডেপুটাস্ এই দুইটি পরিষদে বিভক্ত হইবে। এই পার্লামেণ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং উভয় পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একটি পরিষদের হাতে পরিচালন ক্ষমতা (Executive Power) ন্যস্ত থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভালরূপে গবর্ণমেণ্ট পরিচালনের জন্য এই পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। বিচার-ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত থাকিবে। ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্য শুল্ক এবং সমান শুল্ক প্রবর্ত্তন সম্পর্কে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারিবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত কোন রাষ্ট্র বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী বা সামরিক বাহিনী গঠন করিতে পারিবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীরাই সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ সমূহের সমস্যা তদন্ত করিবার জন্য ইউরোপীয় পার্লামেণ্ট কমিশন গঠন করিবেন। পার্লামেণ্ট নূতন কোন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন। উভয় পরিষদের সংখ্যাধিক্যের ভোটে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে।

ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ব্রিঁয়েও এক সময়ে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবিয়াছিলেন। বেলজিয়ম ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সরকারী ভাবে উহা সমর্থন করিতেছেন। এই পরিকল্পনা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টেরও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার সময় এখনও আসে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত অর্থের বণ্টন লইয়া মাসব্যাপী যেরূপ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলে, ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভরসা করা কঠিন। এই অচল অবস্থার সমাধান হইয়া মার্শাল-সাহায্য বিভিন্ন সাহায্য-প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা অবশ্য হইয়াছে।

চতুর্থ রিপাবলিকের সঙ্কট—

প্রায় ১ বৎসর ৪ মাস পূর্ব্বে যখন মন্ত্রিসভায় কম্যুনিষ্টদের গ্রহণ না করা স্থির হয়, সেই সময় হইতে ফ্রান্সে যে পুনঃ পুনঃ মন্ত্রিত্ব-সঙ্কট দেখা দিতেছে তাহার ফলে চতুর্থ রিপাবলিকের অস্তিত্বই এখন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গত ২৬শে জুলাই মঃ আঁদ্রে ম্যারী যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন ২৮শে আগষ্ট উক্ত মন্ত্রিসভার পতন হয়। কয়েক দিনের চেষ্টার পর মঃ রবার্ট সুম্যানের প্রধান মন্ত্রিত্বে ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মঃ সুম্যানের ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা। গত জুলাই মাসে তাঁহার প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কিন্তু ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভারও পতন হয়। অতঃপর রেডিক্যাল দলের নেতা মঃ হেরিয়েট মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সম্মত না হওয়ায় সোস্যালিষ্ট রেডিক্যাল নেতা মঃ আঁরি কোয়েল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর ফরাসী নেশন্যাল এসেম্বলীতে ৩৫১—১৯৬ ভোটে তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব অনুমোদিত হয়। তাঁহার মন্ত্রিসভা কত দিন স্থায়ী হইবে তাহা বলা কঠিন। ফ্রান্স যেন ক্রমশঃ জেনারেল দ্য গলের আশা পূর্ণ করিবার পথেই অগ্রসর হইতেছে।

জার্ম্মাণীতে যে অবস্থার মধ্যে হুইমার রিপাবলিকের পতনে হিটলারের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থা প্রায় তাহারই অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালীন জার্ম্মাণীর মত ফ্রান্সেও শ্রমিক-শ্রেণী দ্বিধা-বিভক্ত, সোশ্যালিষ্টরা 'lesser evil' নীতি অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ-পন্থীদেরই শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ লোক যে ভাবে হিটলারের নেতৃত্বে সমবেত হইয়াছিল, জেনারেল দ্য গল তাঁহার জনপ্রিয়তার অভাব সত্ত্বেও সেই অবস্থার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন।

অমীমাংসিত বার্লিন-সঙ্কট—

তিন মাস ধরিয়া যে বার্লিন সঙ্কট চলিতেছে তাহার সমাধানের কোন সম্ভাবনা আজিও দেখা যাইতেছে না। ২৪শে জুন রুশ-কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিম-জার্ম্মাণী হইতে বার্লিনে যাওয়া-আসার পথ রুদ্ধ করায় এই সঙ্কট আরম্ভ হইয়াছে। এই সঙ্কট সমাধানের জন্য বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ৩রা আগষ্ট হইতে সোজাসুজি রুশ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। এক সময়ে মস্কো আলোচনা সাফল্য লাভ করিবে বলিয়া সকলের মনেই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। মুদ্রা-সমস্যা ও অবরোধ-সমস্যা সমাধানের জন্য জার্ম্মাণীর বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিণ এবং রুশ সামরিক গবর্ণর-চতুষ্টয় মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ-গৃহে (Allied Control Council building) আলোচনা চালাইতেছিলেন। বার্লিন হইতে ৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে দেখা যায়, মতৈক্য হওয়া সম্বন্ধে তখনও প্রবল বাধা বর্ত্তমান। ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্টরা বার্লিনে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। গত ২৭শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কম্যুনিষ্ট বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারীরা দুইবার বার্লিন সিটি-

হইতে প্রেরিত ৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ঐ তারিখে দুই হাজার হইতে চারি হাজার কম্যুনিষ্ট-পরিচালিত বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারী রক্তপতাকা লইয়া এবং আন্তর্জ্জাতিক সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বার্লিন সিটি-হলে হানা দিয়া সিটি-এসেম্বলীর অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে তিন বার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা সত্ত্বেও মীমাংসার কোন লক্ষণ দেখা না দেওয়ায় প্যারী নগরীতে সম্মিলিত বৃটিশ, ফ্রান্স এবং মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মস্কো হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। রাশিয়ার নিকট নূতন করিয়া পত্র দিবার জন্য তিন জন সদস্য লইয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিও গঠিত হইয়াছে। প্যারীতে ত্রিশক্তির বৈঠককে ঠিক সম্মেলন হয়ত বলা যায় না। কিন্তু বার্লিন সম্পর্কে কোন মীমাংসা হওয়ার আশা করা যায় কি না, ত্রিশক্তির প্রতিনিধিদের নিকট মঃ মলোটভের শেষ উত্তরের মধ্যে আরও আলোচনা চালাইয়া ফল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় কি না, এই বিষয়ে তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। মলোটভের উক্তি হইতে আলাপ-আলোচনার দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া না কি বুঝা যায় না। কিন্তু বার্লিণ সংক্রান্ত আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এইরূপ ভরসা করার মত কোন ইঙ্গিতও না কি তাঁহার উক্তিতে নাই। বস্তুতঃ, আরও আলাপ-আলোচনা চালাইবার দায়িত্ব ত্রিশক্তির উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে।

পশ্চিমী শক্তিত্রয় আরও আলোচনা চালাইবেন, না সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিষয়টি উত্থাপন করিবেন, ইহাই এখন প্রশ্ন। বার্লিন সমস্যা জাতিপুঞ্জের নিকট উপস্থিত করার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, পশ্চিমী নীতি এখনও সুনির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে নাই। প্রকৃত পক্ষে ত্রিশক্তিকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। নিরাপত্তা পরিষদে বার্লিন-সমস্যা উত্থাপিত হইলে রাশিয়া ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। সাধারণ পরিষদে অবশ্য ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের সমস্যা নাই। কিন্তু কিছু করিবার ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের নাই। 'প্রাভদা' পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, বার্লিন-সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এলাকার বহির্ভূত। কিন্তু শীতকাল ঘনাইয়া আসিতেছে, সে-কথাও সকলের মনে না পড়িয়া পারিবে না। শীতকালে পশ্চিম-বার্লিনে বিমানযোগে খাদ্য সরবরাহ করা আরও কঠিন হইয়া পড়িবে। রাশিয়ার চাপ আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নহে। অবশ্য পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের সৈন্য পশ্চিম-বার্লিনে থাকিবেই। কিন্তু বার্লিন সহরটি সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর রুশ এলাকার মধ্যে এ-কথাও উপেক্ষার বিষয় নহে।

বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে মারগেটে (Margate) বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহাকে ব্ল্যাকপুলের সম্মেলনের প্রতিধ্বনি বলিলেও খুব বেশী ভুল হয় না। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির বর্ত্তমান সদস্য-সংখ্যা ৮০০ লক্ষ। যুদ্ধের সময় হইতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব যাঁহাদের হাতে তাঁহারা তাহাদিগকে কোন পথে পরিচালিত করিতেছেন তাহার পরিচয় এ সম্মেলনে বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। আইন করিয়া মুনাফা নিয়ন্ত্রণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা বিপুল সংখ্যাধিক্যের ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু নেতৃস্থানীয় বক্তারা এক দিকে সরকারী নীতি সমর্থন করিয়াছেন আর দিকে দাবী করিয়াছেন কঠোর হস্তে মূল্য-হ্রাসের জন্য। চলাচল ও সাধারণ শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী মিঃ ডিয়াকিন বলিয়াছেন, "My members want to see the pound buy a pound's worth of goods." অর্থাৎ 'আমার ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ চান যে, এক পাউণ্ডে যেন এক পাউণ্ড মূল্যের পণ্যই পাওয়া যায়।" শিল্পপতিদের মুনাফা হ্রাস করা হইবে না, শ্রমিকদের মজুরিও কমিবে না অথচ দাম কমিবে, এই অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইবে কিরূপে? গবর্ণমেণ্ট যদি মূল্য বৃদ্ধি নিরোধের জন্য কঠোর হস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই মজুরি বৃদ্ধির জন্য দাবী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের কোন সার্থকতা আছে কি? মজুরি বৃদ্ধি করিলে শিল্পপতিরাও লাভের হার বৃদ্ধির জন্য দাম বাড়াইবেন। ফলে মজুরি বৃদ্ধিই শুধু অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে না, পণ্যের দাম বাড়িয়া বৃটিশের রপ্তানী-বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। উহার প্রতিক্রিয়া বৃটিশ শ্রমিকের পক্ষে বড় সুবিধাজনক হইবে না। এই কারণেই উল্লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি নিরোধ সম্বন্ধে নিশ্চিত ভরসা নাই বলিয়াই সাহায্য বা 'সাবসিডি' বৃদ্ধি এবং ক্রয়-কর হ্রাস করিয়া শ্রমিকদের ক্রয়শক্তিকে বহাল রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই সম্মেলনে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন (W. T. U. C.) সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করা হইয়াছে। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নকে সমর্থন করিবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা বিপুল সংখ্যাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়াছে। মিঃ ডিয়াকিন বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নকে সোভিয়েট নীতির একটি অস্ত্র এবং আর একটি প্ল্যাটফরম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মালয়ে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন চলিতেছে সে সম্বন্ধে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদে দেখিতে পাইলাম না। সম্মেলনে মিঃ ডিয়াকিনের বক্তৃতার মধ্যেই কে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মালয়ে হাজার হাজার সৈন্য পাঠাইতেছে কাহারা?" তাহার উত্তরে মিঃ ডিয়াকিন বলিয়াছেন, "যেখানেই কম্যুনিষ্ট সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট-দর্শন প্রচার করা সম্ভব সেইখানে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ডেপুটেশন প্রেরণ করাই বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য।" মালয় সম্বন্ধে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অভিমতের পরিচয় এইখানেই পাওয়া যায়। বৃটিশ শ্রমিকরা যে বৃটিশ পুঁজিপতিদের মতই সাম্রাজ্যবাদী, মালয়ের ব্যাপারে তাহাই কি নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইতেছে না?

পরলোকে ডক্টর বেনেস—

৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) চেকোস্লোভাক জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যতম স্রষ্টা, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট ডক্টর এডোয়ার্ড বেনেস তাঁহার সেজিমোভো উস্তি-স্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পূর্ব্ব-ইউরোপের এক জন বিশিষ্ট বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রবাদীর জীবনাবসান হইল। গত জুন মাসের (১৯৪৮) প্রথম ভাগে দুর্ব্বল স্বাস্থ্য ও চেকোস্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি হইতে উদ্ভূত সমস্যা সমূহের অজুহাতে তিনি প্রেসিডেণ্টের

পদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পল্লীর বাসভবনে অবসর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে চেকো-শ্লোভাকিয়ায় অবিমিশ্র কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভায় ডাঃ জ্যান মাসারিক পররাষ্ট্র-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে ডাঃ মাসারিক অনিদ্রারোগ ও অসুস্থতার জন্ম আত্মহত্যা করেন। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে ডাঃ বেনেসের প্রাণে যে গভীর আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ মাসারিকের মৃত্যুর পরেও প্রায় তিন মাস তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পদত্যাগের তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনাবসান হইল।

১৮৮৪ সালের ২৮শে মে চেকোশ্লোভাকিয়ার কোসৃরাণী (Kozrany) গ্রামে ডাঃ বেনেসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা দরিদ্র ছিলেন বলিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথেই তাঁহার জীবনের যাত্রা সুরু হইয়াছিল। ১৯০৯ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত তিনি প্র্যাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর হইতেই মাতৃভূমি মুক্তি-সংগ্রামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রথম বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চেক ও শ্লাভ জাতি অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের নিপীড়নের মধ্যে বাস করিতেছিল। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যাপক ডাঃ বেনেস প্রথম মহাযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তির একটি ঐতিহাসিক সুযোগ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের শরৎকালে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক গুরুস্থানীয় ডাঃ টমাস মাসারিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পরিকল্পনার কথা তাঁহাকে জানান। ডাঃ টমাস মাসারিকও ঠিক অনুরূপ পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে মত-বিরোধের কোন অবকাশ ছিল না। উল্লিখিত প্রথম আলোচনার পরেই ডাঃ টমাস মাসারিক সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া যান এবং ডাঃ বেনেস প্র্যাগে থাকিয়া 'মাফিয়া' (Maffia) নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। তিনিই ছিলেন ঐ গুপ্ত সমিতির সেক্রেটারী। ডাঃ টমাস মাসারিক চেকোশ্লোভাকিয়ার বাহিরে যে আন্দোলন চালাইতেছিলেন ঐ আন্দোলনের সহিত মাফিয়ার সংযোগ রক্ষা করাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। অষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তিনি এড়াইতে পারেন নাই। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার গ্রেফ্তার হওয়ার আশঙ্কা যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন জাল পাশ-পোর্টের সাহায্যে তিনি ফ্রান্সে পলাইয়া যান। যাওয়ার সময় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই। অতঃপর অষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার স্ত্রীকে বন্দী করিয়াছিলেন।

প্যারী নগরীতে চেকোশ্লোভাক নেশন্যাল কাউন্সিল গঠিত হয় এবং ১৯১৬ সাল হইতে ডাঃ বেনেস উহার সেক্রেটারী-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৭ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মঃ ব্রিয়ঁ প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট এক পত্র লিখিয়া জানান যে, চেকোশ্লোভাক জাতির মুক্তি-যুদ্ধের মিত্রপক্ষীয় উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং এই সময় হইতেই ডাঃ মাসারিক ও ডাঃ বেনেসের প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯১৮ সালের ৯ই আগষ্ট মিত্রশক্তিবর্গ সরকারী ভাবে চেকোশ্লোভাক জাতিকে স্বীকার করেন এবং ১৯১৮ সালের ১৮ই অক্টোবর প্যারী, লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন হইতে স্বাধীন চেকোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট গঠনের কথা যুগপৎ ঘোষণা করা হয়। ডাঃ মাসারিক এই স্বাধীন চেকোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট এবং ডাঃ বেনেস পররাষ্ট্র এবং স্বরাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায় এবং যুদ্ধের শেষে স্বাধীন চেকোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চেকোস্লাভ প্রজাতন্ত্র গঠন করেন। ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত ডাঃ বেনেস চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন। কেবল মাঝখানে কিছু দিনের জন্ম তিনি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁহার মর্য্যাদা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরে বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার জন্ম ডাঃ মাসারিক প্রেসিডেণ্টের পদ পরিত্যাগ করায় ডাঃ বেনেস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। চেকোস্লাভ পার্লামেণ্টের ৪৪০ ভোটের মধ্যে ৩৪০ ভোট তাঁহার অনুকূলে হইয়াছিল।

১৯৩৩ সালে হিটলার কর্ত্তৃক জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত হওয়ার পর হইতেই ডাঃ বেনেস আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপকে সমষ্টিভূত নিরাপত্তার ভিত্তিতে গঠন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। অষ্ট্রীয়া অধিকার করিয়া হিটলার নজর দিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে। হিটলারের পৃষ্ঠপোষকতায় সুদেতেন জার্ম্মাণদের নেতা হেনলেইন স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। কিন্তু চেক-গবর্ণমেণ্ট যে অধিকার দিতে স্বীকৃত হন তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। ১৯৩৮ সালের মে মাসে সীমান্ত প্রদেশে জার্ম্মাণী সৈন্য সমাবেশ করে এবং চেকো-শ্লোভাকিয়াও আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে থাকে। আগষ্ট মাসে বৃটেন লর্ড রান্‌সিমেনকে (Lord Runcimen) মধ্যস্থতা করিবার জন্য প্রেরণ করে এবং চেক গবর্ণমেণ্ট আরও বেশী অধিকার দিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু সুদেতেন জার্ম্মাণদের দাবী আর স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তাহাদের দাবী জার্ম্মাণীর সহিত সংযুক্ত হওয়ার অধিকারের দাবীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) তারিখে হিটলার যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সুদেতেন জার্ম্মাণদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্রগুলির প্রতি হুমকী দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর আপোষের আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায় এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর হিটলার বলেন যে, তাঁহার দাবী পূরণ করা না হইলে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিবেন। চেক গবর্ণমেণ্ট এই দাবী অগ্রাহ্য করিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। অতঃপর মিঃ চেম্বারলেনের চেষ্টায় ২৯শে সেপ্টেম্বর মিউনিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। এবং চেকদের স্বার্থ বলি দিয়া সাময়িক ভাবে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হইয়াছিল। নাৎসী আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিলেন ডাঃ বেনেস। দেশের আরও অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়া নিবারণ করার জন্ম ১৯৩৮ সালের ৫ই অক্টোবর ডাঃ বেনেস পদত্যাগ করেন এবং ২২শে অক্টোবর তিনি লণ্ডনে চলিয়া যান। ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে চেকো-শ্লোভাকিয়া সম্পূর্ণরূপে নাৎসী-কবলিত হয়।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্ম আমন্ত্রিত হইয়া ডাঃ বেনেস লণ্ডন হইতে আমেরিকায় গমন করেন। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে আবার তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন এবং সপ্তাহ

নাৎসী-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ১৯৪০ সালের ২১শে জুলাই অস্থায়ী চেক গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। ১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসে তিনি মস্কো গমন করেন এবং ১২ই নবেম্বর চেকোস্লাভ-সোভিয়েট চুক্তি সম্পাদিত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া নাৎসী-কবল হইতে মুক্ত হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ৩রা এপ্রিল সাড়ে ছয় বৎসর নির্ব্বাসিত জীবন কাটাইয়া ডাঃ বেনেস এবং তাঁহার গবর্ণমেণ্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পুনরায় চেকোস্লাভ প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নেশন্যাল সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদের কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট দুই বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ভাল ভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল। বৃটেন ও ফ্রান্সের বন্ধুত্ব ডাঃ বেনেসের যেমন কাম্য ছিল, তেমনি সোভিয়েট রাশিয়ারও তিনি এক জন গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ায় দক্ষিণ-পন্থীদের চক্রান্ত আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই কোয়ালিশনের অবসান ঘটে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় গণতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে কি না, সে বিচার করিবে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ। ডাঃ বেনেস চেকোশ্লোভাকিয়ায় এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নাই। হয় তাঁহার প্রতিবাদ করিবার সুযোগ ছিল না, না হয় এই পরিবর্ত্তনকে অকাম্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র এবং কম্যুনিজমের মধ্যে গাঁটছাড়া বাঁধা সম্ভব কি না, অথবা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন পথ আছে কি না, বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহাই প্রধান প্রশ্ন।

কাউণ্ট বার্ণাডোট নিহত—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্যালেষ্টাইনের সালিশ কাউণ্ট ফোক বার্ণাডোট গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ইহুদী এলাকায় যাইবার সময় সামরিক পোষাক-পরিহিত আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। কাউণ্ট বার্ণাডোট নিহত হওয়ায় আরব-ইহুদী মীমাংসার পক্ষেই শুধু ক্ষতিকর হয় নাই, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন এই যে, কাহারা তাঁহার আততায়ী? ইহুদী সন্ত্রাসবাদী দল ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা না গেলেও এই সন্দেহটাকেই সত্য বলিয়া যে ভাবে প্রচার করা হইতেছে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইজরাইল গবর্ণমেণ্ট ষ্টার্ণ গ্যাঙ্গ-এর সমস্ত লোককে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য সৈন্যবাহিনীকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এবং প্রয়োজন হইলে গুলী করিবারও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার বিশেষ কিছুই নাই। ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ কর্ত্তৃক কাউণ্ট বার্ণাডোট নিহত হইয়াছেন এই সন্দেহ যে শিশু ইহুদীরাষ্ট্রের প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইজরাইলের বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণ না কি ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ-এর স্প্লিণ্টার গ্রুপের নিকট হইতে এই মর্ম্মে পত্র পাইয়াছেন যে, যেহেতু বার্ণাডোট বৃটিশের পক্ষে কাজ করিতেন এবং বৃটিশের হুকুম তামিল করিতেছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন। এই পত্র সত্যই ষ্টার্ণগ্যাঙ-এর লিখিত কি না, তাহাও প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। অবশ্য এই হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন পূর্ব্বে গত ১০ই সেপ্টেম্বর ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ-এর মুখপত্র 'মিভ্‌রাকে'র (Mivrak) প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কাউণ্ট বার্ণাডোর্ট ইজরাইলে ইহুদীদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করিয়া দিলে জাতিপুঞ্জের পরিদর্শকদিগকে হত্যা করিবার প্ররোচনা দেওয়াই না কি উক্ত পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিবার দিবার কারণ। সকলের সন্দেহই যখন ষ্টার্ণগ্যাঙ্গ-এর প্রতি পড়িবার সম্ভাবনা সেই সময় ইহুদীদের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছুক এইরূপ কেহ এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে কি না, তাহাও তদন্ত করিয়া দেখা আবশ্যক।

কাউণ্ট বার্ণাডোট গত ২০শে মে প্যালেষ্টাইনে আরব-ইহুদী বিরোধের মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক সালিশ নিযুক্ত হন। পাঁচ দিন পরে তিনি প্যারী হইতে বিমানযোগে প্যালেষ্টাইনে যাত্রা করেন। ৬ই জুন তারিখে চারি সপ্তাহব্যাপী আরব-ইহুদী যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাব ঘোষিত হয়। কাউণ্ট বার্ণাডোট শান্তি-প্রস্তাবের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাতে আরব ও ইহুদী-রাষ্ট্র লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ছিল। এই খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী জেরুজালেম পড়িয়াছিল আরবদিগের ভাগে। চারি সপ্তাহ পরে পুনরায় লড়াই সুরু হয়। কাউণ্ট বার্ণাডোট বিনা সর্ত্তে আরও দশ দিন যুদ্ধ বন্ধ রাখিতে উভয় পক্ষের নিকট আবেদন করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় গত জুলাই মাসে জাতিপুঞ্জ উভয় পক্ষের নিকট যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁহার চেষ্টাতেই এই নির্দ্দেশ বাস্তবরূপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। প্যারী নগরীতে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তাঁহার প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করার কথা ছিল।

সম্রাট নেপোলিয়নের খ্যাতনামা সেনাপতি মার্শাল বার্ণাডোট কাউণ্ট ফক বার্ণাডোটের পূর্ব্বপুরুষ। প্রিন্স অস্কার বার্ণাডোটের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র এবং সুইডেনের বর্ত্তমান রাজা গুষ্টভের ভ্রাতুষ্পুত্র। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল।

প্যালেষ্টাইনে দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি—

কাউণ্ট বার্ণাডোট নিহত হওয়া যে অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি নিহত হওয়ার ফলে প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানে নূতন বাধা বা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ, তাঁহার মীমাংসার দ্বারা যুদ্ধ-বিরতির সামান্য মাত্রও উন্নতি হইয়াছে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব। দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতি আরম্ভ হওয়ার পরেও পুনঃ পুনঃ আরব-ইহুদী সংঘর্ষ ঘটিতেছে। এই সকল সংঘর্ষ সত্ত্বেও কাউণ্ট বার্ণাডোট আশাপূর্ণ দৃষ্টিতেই প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎকে দর্শন করিতে অভ্যস্থ ছিলেন। প্রথম যুদ্ধ-বিরতির পর অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে। জেরুজালেমের অবস্থার যাহাতে আরও অবনতি না ঘটে তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কাউণ্ট বার্ণাডোট নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। তদনুসারে গত ১১শে আগষ্ট (১৯৪৮) নিরাপত্তা পরিষদ আরব এবং ইহুদী উভয় পক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়া বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও কানাডার যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে কাউণ্ট বার্ণাডোট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের প্যারী সম্মেলনে উপস্থিত করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনায় মন দিয়াছিলেন। প্যালেষ্টাইন সমস্যা যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়াছে, ঠিক তাহা নয়; বরং মীমাংসা আরও অধিকতর কঠিন হইয়াছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব আরবরা একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ

করিতে বাধ্য হইয়াছে। নানা কারণেই দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব তাহাদের গ্রহণ না করিয়া উপায় ছিল না। ১৫ই মে তারিখে (১৯৪৮) আরব রাষ্ট্রসমূহ যখন প্যালেষ্টাইন অভিযান আরম্ভ করে, তখন তাহাদের সৈন্যবাহিনী যে অপ্রতিহত সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তাহাদের ছিল না। সদ্যজাত ইহুদী রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সম্বন্ধেও তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল। আরবরা মনে করিয়াছিল যে, আরব সৈন্যবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হইলেই ইহুদীদের পরাজয় ঘটিবে এবং সমগ্র প্যালেষ্টাইন হইবে আরবদের করতলগত। কিন্তু ১৫ই মে হইতে ১১ই জুন তারিখের প্রথম যুদ্ধ-বিরতি পর্য্যন্ত আরবদের সামরিক অভিযানের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? দেখিতে পাওয়া যায় যে, আরবরা যাহা আশা করিয়াছিল তাহা হয় নাই। অবশ্য ট্রান্সজর্ডানের বৃটিশ অফিসার পরিচালিত আরব লিজিয়ন বিশেষ সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা তেল-আবিব ও জেরুজালেমের মধ্যে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও জলের পাইপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তেল-আবিব হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী রামলেহ্ এবং লিড্ডা বিমান-ঘাটিতে সড়কের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ-স্থলে অনিয়মিত মুক্তিবাহিনীর শক্তিও আরব লিজিয়ন বর্দ্ধিত করিয়াছিল। জেরুজালেমের পুরাতন নগরীর ইহুদী-অধ্যুষিত অঞ্চল আরবরা দখল করিয়াছিল এবং ইহুদী-অধ্যুষিত নূতন সহরও চারি দিকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। দক্ষিণ দিকে মিশরীয় সৈন্য গাজা, বীরসেবা এবং হেব্রন দখল করিয়া নেজেব আক্রমণ করিয়াছিল। তেল-আবিবের ২০ মাইল দক্ষিণে তাহারা ইহুদী সৈন্যদের কাছে প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। ইরাকী সৈন্যরা বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। জর্ডন নদী বরাবর ইহুদীদের রক্ষা-ব্যবস্থার কাছে তাহারা পাইয়াছিল প্রবল আঘাত। সিরিয়া ও লেবাননের সৈন্যরা গ্যালেলী সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে রাস্-এল-নাকোরার সাগর হইতে সামাখ পর্য্যন্ত সীমান্ত ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং ইহুদীদের কাছে তাহারা প্রবল আঘাত-প্রাপ্ত হয়। ইহুদীরা লেবানন রাজ্যের ভিতরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। সৌদী আরবের সৈন্যরা মিশরীয় সৈন্য ও সিরিয়ার সৈন্যদের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধবিস্তার পরিচায়ক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

আরবদের উল্লিখিত বিজয় সত্ত্বেও প্রথম যুদ্ধ-বিরতির প্রাক্কালে ইহুদীর অবস্থাও অসন্তোষজনক ছিল না। নেজেব তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ নেজেব কার্য্যকরী ভাবে ইহুদীদের দখলে ছিল না। কিন্তু পশ্চিম গ্যালেলী, আক্রা, জাফা এবং আরব-হাইফা ইহুদীরা দখল করিতে সমর্থ হয়। আরবরা অবশ্য বলিয়া থাকেন যে, যদি প্রথম যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব তাহারা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে খুব তাড়াতাড়ি তাহারা জয়লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাদের এই দাবী সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রথম যুদ্ধ-বিরতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ৯ই জুলাই (১৯৪৮) হইতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১১শে জুলাই তারিখে দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতি আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সময়টুকুর মধ্যেই ইহুদীরা রামলেহ্ এবং লিড্ডা দখল করে এবং মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে এমন ভাবে আঘাত করে যে, দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতি আরম্ভ না হইলে আরবদের পরাজয় ঠেকাইয়া রাখা কঠিন হইত। এই অবস্থায় আরবরা সামরিক শক্তি দ্বারা প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান করিতে গিয়াছিল কেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইয়া থাকে। নিরাশা এবং অসহায় অবস্থার জন্য আরবরা বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ১৫ই মে (১৯৪৮) তারিখে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হইবে, ইহা জানা কথাই ছিল, অথচ জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের ২৯শে নবেম্বরের (১৯৪৭) প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ কোন সামরিক শক্তির ব্যবস্থা করিলেন না। আরবরা ইহাকে প্যালেষ্টাইন আক্রমণের ইঙ্গিত মনে করিয়া থাকিলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। আরব রাষ্ট্রগুলির নিয়মিত সৈন্যবাহিনী আছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদের কোনও সৈন্যবাহিনীই থাকিবার কথা নয়। হাগানা ও ইরগুন জাই লেউমিকে কিছুতেই নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। এই অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদের নীতিই অতি সহজে প্যালেষ্টাইন অধিকার করার আশা আরবদের মনে সঞ্চার করিয়াছিল।

প্যালেষ্টাইনে আরবদের প্রধান বিজয় ছিল পুরাতন জেরুজালেম দখল করা। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতি যখন আরম্ভ হয় তখন পুরাতন জেরুজালেমে আরব লিজিয়নের ব্যূহ ইহুদীরা প্রায় ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জেরুজালেম-তেল-আবিব ফ্রণ্টে আরবদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব সম্বন্ধে আরবরা যে সকল সর্ত্ত আরোপ করিয়াছিল সেগুলি আমরা গত মাসে উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল সর্ত্ত সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, নিরাপত্তা পরিষদ এই সকল সর্ত্ত গ্রাহ্যযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সালিশ কাউণ্ট বার্ণাডোটকে প্রথম যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্তানুসারে মীমাংসার চেষ্টা করিতে নিরাপত্তা পরিষদ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এই সকল সর্ত্তের মধ্যে একটি প্রধান সর্ত্ত এই যে, যে সকল ইহুদীর সৈন্য-বিভাগে যোগদান করিবার উপযোগী বয়স হইয়াছে তাহাদিগকে বন্দি-শিবিরে আটকাইয়া রাখিতে হইবে। যুদ্ধ-বিরতি যেখানে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সেখানে এই সর্ত্তে ইহুদীরা আপত্তি করিবে ইহা স্বাভাবিক। সালিশ মহাশয়ের পক্ষে এই আপত্তির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইন প্রবেশে বাধা দিলে সে-সম্বন্ধে সালিশ মহাশয় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। তিন লক্ষ আরব আশ্রয়প্রার্থীকে ইহুদী-রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে দিতে ইহুদীদের আপত্তি করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে-সকল নূতন ইহুদীর আগমন হইবে, তাহাদের জন্য ইহুদী-রাষ্ট্রে স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করা অবশ্যই প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই সকল আরব আশ্রয়প্রার্থীরা যে ইহুদী-রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ইহুদীরা দাবী করিয়াছে তেল-আবিব-জেরুজালেম সড়ক এবং জলের পাইপ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। কাউণ্ট বার্ণাডোট ইহুদীদের এই দাবী আরবদের দ্বারা মানাইয়া লইতে পারিয়া-ছিলেন কি? চীন প্রস্তাব করিয়াছিল যে, যে সকল বিষয়ে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে মতানৈক্য সেই সকল বিষয়ে উভয় পক্ষই অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধপথে মীমাংসা করিবে। জাতিপুঞ্জ এই প্রস্তাব

গ্রহণ করেন এবং কাউণ্ট বার্ণাডোট অন্ধ ভাবে বৃটিশের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা ইহুদীদের আত্মসমর্পণের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই হইত না।

কাউণ্ট বার্ণাডোট তাঁহার শান্তি প্রস্তাবে আরবদিগকে জেরুজালেম দিতে চাহিয়াছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় জেরুজালেমের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীই ইহুদী এবং উহার অধিকাংশ অঞ্চলই ইহুদী সৈন্য দ্বারা রক্ষিত। কাউণ্ট বার্ণাডোটের এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য জাতিপুঞ্জ এক জন শাসক নিযুক্ত করেন। আরবরা পুরাতন জেরুজালেমের জন্য এক জন শাসকের নাম প্রস্তাব করে। এই অবস্থায় ইজরাইল গবর্ণমেণ্ট ইহুদী জেরুজালেমের জন্য ইহুদী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। হাইফা সম্বন্ধে কাউণ্ট বার্ণাডোট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে আরবদিগকে এবং আন্তর্জাতিক শক্তিগুলিকে বিশেষ অধিকার দেওয়ার কথা আছে। অথচ এই সহরটি ইহুদীদের কর্তৃত্বাধীনে। ইহাই বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনের অবস্থা। জাতিপুঞ্জের প্যারী সম্মেলনে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে কি নীতি গৃহীত হয় সকলেই তাহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে।

চীনের গৃহযুদ্ধ—

চীনের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহা হইতে প্রকৃত অবস্থা বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু উত্তর-চীনে জনগণের গবর্ণমেণ্ট বা কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার যে-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ, উত্তর-চীনের কোনও স্থানে প্রাদেশিক জন-প্রতিনিধি কংগ্রেসের অধিবেশনের পর এই গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আরও অনেক পূর্ব্বে এই গবর্ণমেণ্ট কেন গঠিত হয় নাই, এই প্রশ্নই বরং জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। গত দেড় বৎসরে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্টদের সহিত যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। চীনের জাতীয় সৈন্যবাহিনীর বহু-ঘোষিত সাফল্যের সংবাদ সত্ত্বেও ইহা সত্য যে, কার্য্যতঃ সমগ্র মাঞ্চুরিয়া এবং ইয়াংসি নদী পর্য্যন্ত উত্তর-চীনের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলই চীনা কম্যুনিষ্টদের দখলে। ডাঃ ওয়াং ওয়েন-হাও প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পরে আইন-পরিষদ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, উত্তর-চীন ও মাঞ্চুরিয়া দখলের জন্য ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে তাঁহারা রিজার্ভ গঠন করিতেছেন। ডাঃ ওয়াং যখন প্রধান মন্ত্রীর ভার গ্রহণ করেন সেই সময় জেনারেল চিয়াং কাইশেক অনিচ্ছার সহিতই একরূপ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, কিছু দিন পর্য্যন্ত পুনরায় মাঞ্চুরিয়া দখলের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইয়েলো নদী ও ইয়াংসি নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশগুলি হইতে কম্যুনিষ্টদিগকে বিতাড়ন করিবার অভিপ্রায়ের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। ইহার পর চারি মাস পার হইয়া গিয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে ইয়াংসি নদী পর্য্যন্ত উত্তর-চীনের অধিকাংশ অঞ্চল কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া গিয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ার বৃহত্তম সহর মুকডেন প্রায় এক বৎসর ধরিয়া কম্যুনিষ্টরা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। মুকডেন ও চ্যাংচুনের সহিত শুধু বিমান-পথেই বহির্জ্জগতের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অবস্থা কত দিন চলিতে পারিবে তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
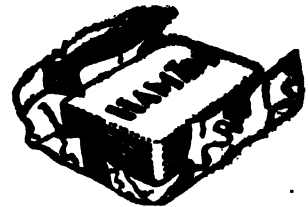
এই দুইটি সহর এবং শানহাইকওয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া চিনচাও পর্য্যন্ত অল্পপরিসর সমুদ্রোপকূল ব্যতীত মাঞ্চুরিয়ার আর সমস্তই কম্যুনিষ্টদের দখলে। চীনের গৃহযুদ্ধের পরিণাম অনুমান করা সম্ভব নহে। জনসাধারণের অসন্তোষ যে কম্যুনিষ্টদের জয়লাভের প্রধান সহায় তাহাতে সন্দেহ নাই। মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠিয়াছে, জনসাধারণের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়-সঙ্কুলান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। চারি দিকেই উচ্ছৃঙ্খলতা। কম্যুনিষ্টরা আবার ব্যাপক ভাবে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট টিকিয়া আছে এবং থাকিবেও, কিন্তু দুঃখ-দুর্দ্দশা যাহা কিছু সমস্তই জনসাধারণের।

ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান—

ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্টরা গত ২০শে সেপ্টেম্বর সশস্ত্র বিদ্রোহের পর জাভা প্রদেশ এবং মাদিউন সহরে বিপ্লবী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করায়, ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। হল্যাণ্ডের সহিত ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের কোন আপোষ-মীমাংসা এখনও সম্ভব হয় নাই, হওয়ার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। জাতিপুঞ্জের সদিচ্ছা কমিটির নেতৃত্বে যুদ্ধ-বিরতি প্রতিপালিত হইতেছে বটে, কিন্তু ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে যে অর্থনৈতিক দিক্ হইতে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার কোন প্রতিকারই হয় নাই। সম্প্রতি হল্যাণ্ড এই মর্ম্মে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে যে, প্রজাতন্ত্রের সৈন্তরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ডাচ অঞ্চলে হানা দিতেছে। প্রজাতন্ত্রের দিক্ হইতে এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে হল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে হল্যাণ্ডের সহিত ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের আপোষ-মীমাংসার কোন সুবিধা হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনা দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর কন্যা জুলিয়ানার হাতে শাসন-ভার অর্পণ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। ডাঃ বীল নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে তাঁহাকে বাদ দিয়াই। কিন্তু হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতিতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে বাদ দিয়াই ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা অবশিষ্ট ডাচ ইষ্ট-ইণ্ডিজ লইয়া অস্থায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের চেষ্টা করিতেছেন।

উল্লিখিত অবস্থার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট অভিযানের পরিণাম কি হইবে তাহা অনুমান করা সহজ নয়। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণের হাতে জরুরী ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রী দলের পুলিশ বাহিনী যোগাকার্ত্তা হইতে ২ শত কম্যুনিষ্টকে গ্রেফতার করিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের এই অভ্যুত্থান যে শুধু ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের এলাকাতেই নিবদ্ধ থাকিবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় যদি কম্যুনিষ্টদের অভ্যুত্থান হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সংঘর্ষ বাধিবে ডাচ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত।

ব্রহ্মের গৃহযুদ্ধ—

আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কম্যুনিষ্টদের হাতে রেঙ্গুনের পতনাশঙ্কা নিবারিত হওয়ার পর ব্রহ্মদেশের গৃহযুদ্ধের অবস্থা তো শান্ত ভাব ধারণ করে নাই, বরং কারেন বিদ্রোহ গৃহযুদ্ধকে অধিকতর কঠিন ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। পি-ভি-ওর হোয়াইট ব্যাণ্ড কম্যুনিষ্টদের সহিত যোগ দেওয়ার এবং অনেক সৈন্য সৈন্যবাহিনী ছাড়িয়া কম্যুনিষ্টদের সহিত সহযোগিতা করায় কম্যুনিষ্টদের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে থাকিন-নু বলিয়াছিলেন যে, কম্যুনিষ্টদের প্রতি জনগণের সহানুভূতি নাই। জনগণ যে কম্যুনিষ্টদের বিরোধী তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

ব্রহ্মদেশের ভিতরের অবস্থা কিছুই প্রকাশ করা হয় না। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন ভাবে যেটুকু প্রকাশ করা হয় তাহাতেই কম্যুনিষ্টরা কিরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। জেলাগুলির প্রধান সহর সমূহ সমস্তই ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের দখলে। কিন্তু চারি পাশের পল্লী অঞ্চলের উপর বিশেষ কোন আধিপত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয় বিমান-যোগে। থায়েটমিও ও প্রোম ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট পুনরায় দখল করার সংবাদ হইতে বুঝা যায়, ঐ দুইটি সহর কম্যুনিষ্টরা দখল করিয়াছিল। টৌংগু অঞ্চলেই কম্যুনিষ্টদের প্রধান ঘাটি। মান্দালয়ের উত্তরে শোয়েবো হইতে রেঙ্গুণের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পায়াপেন পর্য্যন্ত একটি এবং পায়াপেন হইতে আরাকানের পালেৎওয়া পর্য্যন্ত আর একটী রেখা কল্পনা করিলে এবং শোয়েবোর সহিত পালেৎওয়ার সংযোগ করিয়া যদি আর একটি রেখা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে যে ত্রিভুজ পাওয়া যাইবে, ঐ ত্রিভুজের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চল কম্যুনিষ্ট-অভ্যুত্থান দ্বারা সংক্ষুব্ধ।

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও কারেন নেশন্যাল ইউনিয়নের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র কারেন রাজ্য গঠনের আন্দোলনও কিছু দিন ধরিয়া বেশ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আন্দোলন না বলিয়া বিদ্রোহ বলাই ঠিক। তাহারা মৌলমেন এবং থাটন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। টৌংগু ও মৌবিন জেলার কতক অংশ তাহাদের দখলে। কারেনদের এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারেনরা এমন একটি শক্তিশালী কারেন রাষ্ট্র গঠন করিতে চায় যাহার চারি দিকে শান, চিন, কাচিন এবং অন্যান্য কম্যুনিষ্ট-বিরোধীরা ব্রহ্মের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মদেশের সত্যিকার স্বার্থের জন্য কাজ করিবে এইরূপ লোক লইয়া গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য সমবেত হইবে। 'টাইমসে'র এই মন্তব্যে এই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, কারেনদের এই বিদ্রোহের পিছনে সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানি রহিয়াছে। তবে কারেনদের সকল দল যে কারেন নেশন্যাল ইউনিয়নের স্বতন্ত্র কারেন-রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যের সমর্থক, তাহা মনে হয় না। কিন্তু থাকিন-নু ২১ জন মন্ত্রী লইয়া যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন তাহাতে কারেন নেশন্যাল ইউনিয়ন দলের কোন সদস্য নাই। শান রাজ্যের মধ্যেও একটা বিক্ষোভের ভাব দেখা গিয়াছিল। সেখানেও সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। এ সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে ২১শে সেপ্টেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট থাটন ও মৌলমেন পুনরায় দখল করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের এই গৃহযুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। আগামী এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মদেশের সমস্যা আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আগমনী

আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল। স্বাধীন ভারতে ইহা দ্বিতীয় দুর্গোৎসব। একে আমরা বহু দিন পরে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহার উপর বৎসরের শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া পূজা আসিয়াছে, কিন্তু তবু আমরা তেমন আনন্দিত হইতে পারিতেছি কই? সানাই-এর সুরে, আগমনী-গানে আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিতেছে না কেন? কারণ আমাদের জীবনে আনন্দ নাই। বিদেশীদের অত্যাচারে, লাঞ্ছনায় আমরা ছিলাম জর্জ্জরিত। ক্রমাগত অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে আমরা হইয়া পড়িয়াছিলাম অর্দ্ধমৃত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট আমরা যে উদ্দাম উল্লাসে মাতিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কিছুটা ছিল স্বাধীন হবার আনন্দ এবং বেশীটা ছিল আবার পেট ভরিয়া খাইতে পরিতে পাইব—সেই আশার হর্ষ। কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়াও ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে সেরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে না।

অন্ন-বস্ত্রের অভাব পূর্ব্ব হইতে ভীষণ হইয়াছে। উপরন্তু বাসাভাব এমন প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে যে, গল্পের গাছতলা এখন বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি তো সীমা ছাড়াইয়া গগন ভেদ করিতে বসিয়াছে। বাস্তহারাদের সমস্যা এখনও সমাধান হয় নাই। পাকিস্তানকে যত বার আমরা প্রেমালিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইয়াছি তত বারই গুঁতা খাইয়াছি। কিন্তু প্রেম কমে নাই। বৃটিশ-শক্তি এখনও পরোক্ষ ভাবে আমাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এবং যখনই সুবিধা পাইতেছে দংশন করিতেছে অথবা করাইতেছে। অতি সহজে গদীর লোভে ভারত বিভক্ত হইয়াছে। অনর্থক ইতস্ততঃ করিবার ফলে কাশ্মীর ভাগ হইতে বসিয়াছে। আমরা স্বাধীন অথচ বিদেশী শক্তির কথায় আমাদের চলিতে হইবে, এ স্বাধীনতার অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। শিল্পপতি ও শ্রমিকদের বিরোধের অবসান ঘটে নাই। সরকার দুই নৌকায় পা দিয়া এক বেসামাল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু দিন রাজাকার দস্যুদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া, প্রাণ-মান-ধন হারাইয়া যখন হায়দ্রাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নিজেদের রক্ষার চেষ্টায় নিজেরাই তৎপর হইয়া উঠিল তখন ভারতীয় ইউনিয়ন হায়দ্রাবাদ অভিযান আরম্ভ করিলেন। মাত্র চারি দিনের মধ্যেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। আগে এই অভিযান চালাইলে হয়ত এতগুলি লোকের সর্ব্বনাশ হইত না। এই সকল কারণে আমরা ঠিক প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে পারিতেছি না। মা আসিতেছেন। সর্ব্বদুঃখহরা, দুর্গতিনাশিনী ইচ্ছা করিলেই আমাদের দুঃখ-দুর্গতি নাশ করিতে পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা যদি স্বেচ্ছায় দুর্গতির বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া রাখি তাহা হইলে কোন্ মুখে দয়াময়ীকে বিপদজাল ছিন্ন করিয়া আমাদের মুক্ত করিতে প্রার্থনা করিব?

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

এত দিন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার-হোল্ডার্স ব্যাঙ্ক ছিল। এখন ইহার উপর রাষ্ট্রের মালিকানা-স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইতেছে। পূর্ব্বেও এইরূপ প্রচেষ্টার কথা উঠিয়াছিল কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা তখন শেয়ার-হোল্ডার্স ব্যাঙ্ক হওয়ারই পক্ষে ছিলেন। কারণ আগে গবর্ণমেণ্ট ছিল বিদেশী। পরাধীনতার মধ্যে বাস করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর জাতীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার কোন অর্থ হয় না। তাহাতে ভারতবাসীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ারই আশঙ্কা ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদিও প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের হাতে আসে নাই, তথাপি আমাদেরই নেতৃবর্গ এখন দেশ শাসন করিতেছেন। কাজেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবী যে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার অর্থ প্রস্তাবিত বিল অনুসারে এই দাঁড়াইবে যে, শেয়ার-হোল্ডারদের সমস্ত স্বত্ব উপযুক্ত মূল্যে গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইবেন। তৎসহ কিছু ক্ষতিপূরণও দিবেন। কিন্তু যে হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত বেশী। শেয়ার হোল্ডারগণ যথেষ্ট পরিমাণে লভ্যাংশ পাইয়া আসিতেছেন, কাজেই তাঁহাদিগকে এত অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার প্রয়োজনেও এত অধিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া অসঙ্গত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তদ্দারা ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় খুব বেশী বাড়িবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণের হার অত্যধিক হওয়ায় ব্যয় বাড়িবে। জাতীয় করণের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল এই যে, লাভটা জন কতক অংশীদারের পকেটে না যাইয়া জাতির কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয় তাহার ব্যবস্থা করা। অত্যধিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থার ফলে জাতীয় করণের এই মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহাতে আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যই বাড়িবে। দেশবাসীর বিশেষ কোন উপকার হইবে না।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখনই প্রকৃত পক্ষে আধা-সরকারী ব্যাঙ্ক। দেশের অর্থ নৈতিক কল্যাণ অনেকখানি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিচালনার নীতির উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর দায়িত্ব অর্পিত আছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ সম্পর্কে কিছুই করেন নাই। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পর যে কিছু করিবেন, সে ভরসাও আমাদের নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা আবশ্যক। কিন্তু ইউরোপীয় মালিকানা-স্বত্বের ব্যাঙ্ক বলিয়াই বোধ হয় কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে কিছু বলেন নাই।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার

সম্প্রতি কলিকাতায় অর্থনীতিবিদদের সম্মেলনে অধ্যাপক বিনয়-কুমার সরকার তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"প্রতিকারের যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে ব্যবসায়ীদের উপর ক্রমোচ্চ হারে কর ধার্য্য করা ও যাঁহারা কর এড়াইয়া যান তাঁহাদের কঠোর শাস্তি বিধান করা। দ্রব্যের চাহিদা ও দ্রব্য ক্রয়নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও দ্রব্যাদির রেশন প্রথায় বন্টনও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমদানী ও রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণের উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উৎপাদন বৃদ্ধিও আবশ্যক।"

কলিকাতায় যখন এই আলোচনা চলিতেছিল, তখন দিল্লীতে অর্থনীতিবিদরা ভারত সরকারের নিকট যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে—বার্ষিক পাঁচ শত টাকার অধিক কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্য্য করিতে হইবে, মুনাফা-করের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে, কোম্পানী সমূহের লভ্যাংশ বন্টন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, ডিভিডেণ্ড প্রদানের পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা আইন করিয়া অকেজো করিয়া ফেলিতে হইবে, যাহাদের বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার টাকার উপর তাহাদের বাধ্যতামূলক অর্থসঞ্চয় করাইতে হইবে এবং মুদ্রা সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সুপারিশের মূল কথা হইল এই যে, লাভের জন্য উৎপাদনের নীতিটা বজায় রাখিয়াও লাভের অংশ কমাইয়া আনিতে হইবে।

এই নীতি চালাইতে গেলে যে শিল্পপতিরা প্রবল বিরোধিতা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, দেশে আজ অর্থসঙ্কট দেখা দিয়াছে, কারণ গবর্ণমেণ্টের নীতির ফলে শিল্পপতিরা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে উৎসাহ পান নাই। গোড়ার দিকে সরকারী মুখপাত্রেরা সমাজতন্ত্রের কথা বলিয়া ভড়কাইয়া দিয়াছিলেন। পরে অবশ্য দশ বৎসরের মধ্যে শিল্প জাতীয় করণ হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু দশ বৎসর অত্যন্ত কম সময়। একটা শিল্প চালু করিতেই তো দশ বৎসর কাটিয়া যায়। সুতরাং আপাততঃ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শিল্প জাতীয় করণের প্রশ্ন পিছাইয়া দিতে হইবে। এই সঙ্গে উৎপাদনের খরচ কমাইবার জন্য, কর্ম্মচারী ছাঁটাই ও বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জন্য সরকারী অনুমোদন চাহিয়াছেন। অনেকে আবার শিল্পের উপর হইতে করভার হ্রাস করার পরামর্শও দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার ব্যাপারে দেশের শিল্পপতিদের সহিত অর্থনীতিকদের মতের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কোন পথ অবলম্বন করিবেন? গবর্ণমেণ্ট যদি শিল্পপতিদের কথা শোনেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকের দুরবস্থার অন্ত থাকিবে না। আর যদি সত্যই লোকের দুরবস্থা দূর করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে শিল্পপতিরা উৎপাদন বন্ধ করিয়া সরকারী পরিকল্পনা বানচাল করিবার চেষ্টা করিবেন। একমাত্র উপায় প্রধান শিল্প, ব্যাঙ্ক ও পাইকারী ব্যবসা ব্যক্তিগত মালিকদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া সরকারী মালিকানায় আনা।

আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী বিল

ভারতীয় পার্লামেণ্টে আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী বিল গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন এই যে, আলোচ্য সৈন্যবাহিনী বিল দ্বারা দেশরক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কি না? পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলিয়াছেন যে, এই বিলটি শুধু বিলম্বেই উপাপিত হয় নাই, ৭নং ধারা (এই ধারায় সামরিক কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে) বাদে এই বিলটির কোন গুরুত্বই নাই। ভারতীয় পার্লামেণ্টের বিগত অধিবেশনে আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী গঠনের কথা উত্থাপিত হয়। যদি সেই অধিবেশনেই এই বিল গৃহীত হইত তাহা হইলে আরও এক লক্ষ ত্রিশ হাজার ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীর রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইতে পারিত।

এই বিলের প্রধান ত্রুটি এই যে, আঞ্চলিক বাহিনীতে মাত্র এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে। ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে ইহা মোটেই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। দেশরক্ষা সচিব অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন, নির্দ্ধারিত সৈন্যসংখ্যা গৃহীত হওয়ার পরই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইবে, কিন্তু কেবল আশ্বাসেই দেশরক্ষা হয় না এবং বিলম্বও হইবে অনর্থক। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে এবং প্রয়োজন হইলে আঞ্চলিক বাহিনীর সৈন্যদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা বিলে রাখা হইয়াছে। এ জন্য সংখ্যাবৃদ্ধি করাই উচিত নয় কি?

বিলে নগরবাহিনীর কোন উল্লেখ নাই। দেশরক্ষা সচিব তাঁহার সাফাইয়ে বলিয়াছেন যে, আরবান্ ইউনিট থাকিবে না, তাহা নয়। প্রশ্ন, তাহা হইলে বিলে তাহার উল্লেখ নাই কেন? আমাদের সন্দেহ হইতেছে, আরবান্ ইউনিট সম্বন্ধে আমাদের শাসকবর্গ আইনের বিধান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে চান। ফলে কোন নগরে আঞ্চলিক অথবা আরবান্ ইউনিট গঠন না করিলে সরকারকে কেহই কিছু বলিতে পারিবেন না। আঞ্চলিক বাহিনীতে নারীদের নিয়োগের কোন বিধানই করা হয় নাই।

আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী বিল উত্থাপিত করিতে দেশরক্ষা সচিব এক বৎসর বিলম্ব করিয়াছেন। পরে যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য-গ্রহণের বিধান করা হয় নাই। এই বাহিনীকে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার কাজ করিতে হইবে। ভারতের সুদীর্ঘ উপকূল-ভাগ রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইবে এই বাহিনীই। ইহার উপর প্রয়োজন হইলে এই বাহিনীকে দেশের বাহিরেও প্রেরণ করা হইবে। যখনই নিয়মিত বাহিনী পাওয়া যাইবে, তখনই আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীকে সরাইয়া আনিতে হইবে, এইরূপ বিধান থাকা উচিত। বস্তুতঃ, আঞ্চলিক বাহিনী নিয়মিতদের মত বেতনভুক্ত স্থায়ী সৈন্যবাহিনী নয়। তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চাকরী, কৃষি অথবা অন্য কাজ করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের বিশেষ কতকগুলি অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু এই অধিকার সম্বন্ধে কোন বিধানই এই বিলে নাই। কতকগুলি বিষয় রুল্সের উপর নির্ভর করা হইয়াছে। ইহা আদৌ সঙ্গত নয়। আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য অল্প ব্যয়ে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা। সে জন্য যাহারা এই বাহিনীতে ভর্ত্তি হইবে তাহাদের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কোন দিক দিয়াই এই বিলকে সন্তোষজনক বলা চলে না।

প্রেস আইন তদন্ত কমিটির সুপারিশ

সংবাদপত্রগুলিতে এবং আইন সভায় পুনঃ পুনঃ দাবী উত্থিত হওয়ায় ১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও প্রেস আইন তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ আশানুরূপ না হইলেও তথ্যপূর্ণ পুস্তক হিসাবে তাহার মূল্য আছে। কমিটিকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম, ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের সংবাদপত্র-মুদ্রণ আইন পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট প্রদান করা। দ্বিতীয়, ভারতীয় গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক রচিত মৌলিক অধিকারের সহিত ভারতীয় সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন সমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তাহার পর্য্যালোচনা করা। তৃতীয়, সেই পর্য্যালোচনার ভিত্তিতে কমিটি যেরূপ সঙ্গত মনে করেন, সেইরূপ ভাবে সংবাদপত্র-মুদ্রণ আইন সংশোধনের সুপারিশ করা। কমিটি তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন গত মে মাসে। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতার দাবী পূরণ হইতে পারে এমন কোন সুপারিশ কমিটি করেন নাই। তাঁহাদের সুপারিশগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে সংবাদ-পত্র-মুদ্রণ আইনের কঠোরতা সামান্য কিছু হ্রাস পাইবে মাত্র। কিন্তু সুপারিশও যে সবগুলি কার্য্যকরী হইবে এমন ভরসা করিবারও কোন কারণ নাই।

অন্ন-বস্ত্র সমস্যা

সাধারণ লোকেরা মোটা ভাত-কাপড় পাইলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু তাহাও যদি না মেলে তাহা হইলে দুঃখিত হইয়া বলা স্বাভাবিক যে, স্বাধীন হইয়া এ কি অবস্থা দাঁড়াইল? কর্ত্তারা সেই জন্য বার বার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে মূর্খের মত এ সব কথা বলা ঠিক নহে। স্বাধীনতার সহিত অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার কি সম্পর্ক? কিন্তু অল্পবুদ্ধি লোকেরা তবু ঐ একই কথা বলিতেছে, অন্নাভাবে মরিয়া গেলে স্বাধীনতা পাইয়া আর লাভটা কি হইল? অবশ্য ভারতের খাদ্য-সচিব শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম হইতে শুরু করিয়া পশ্চিম-বঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন এত দিন ভরসা দিয়াছেন—ভয় নাই, দেশের খাদ্যাবস্থা বেশ ভালই আছে, সরকারী চাউল-সংগ্রহও খুব ভালই চলিতেছে। অথচ ২৮শে ভাদ্র হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে মাথা-পিছু এক সের এগারো ছটাক চাউলের পরিবর্ত্তে এক সের পাঁচ ছটাক করিয়া মিলিতেছে। যা দেওয়া হইতেছিল তাহাই ছিল প্রয়োজন হইতে অনেক কম, এখন যা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আধপেটাও চলে না। অবশ্য চাউলের পরিমাণ কমাইবার সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার গমজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের লোকের পক্ষে সরকারী দোকানের অপূর্ব্ব আটা খাওয়া এবং খাইয়া নিরাময় থাকা অসম্ভব।

কাপড়ের অবস্থাও তদ্রূপ। ভারত গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলে মজুত কাপড় আটক করিবার পর মাসাধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু কাপড়ের দর এখনও কমে নাই। এই সেদিন বাঙ্গালার মিল-মালিক সমিতির সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, মিলের গুদামগুলিতে প্রচুর কাপড় জমিয়া আছে, সরকার ডেলিভারী লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন না। হাজার লোক বেকার হইবে। উত্তরে সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন বলিয়াছেন যে, ইহার জন্য দায়ী মালিকেরা। জুলাই মাসে যে দাম কাপড়ের উপর ছাপিয়া দিয়াছেন তাহা সরকার-নির্দ্দিষ্ট সাময়িক দর অপেক্ষা বেশী। সুতরাং সরকার নূতন দর না ছাপিয়া তো কাপড় বাজারে ছাড়িতে পারেন না। এক মাসেও দর ছাপা হইল না, ওদিকে জনসাধারণের তো লজ্জা নিবারণের উপায় আর থাকিতেছে না। এই দীর্ঘসূত্রতায় লাভবান হইতেছে কেবল ব্যবসায়ীরা। সরকারের কি তাহাই উদ্দেশ্য?

পশ্চিম-বঙ্গের দাবী

১৩ই ভাদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনষ্টিটিউট হলে বাঙ্গালী সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব লইয়া বাঙ্গালা, আসাম ও বিহারের মধ্যে যে বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ করিলে এই সত্য প্রমাণিত হইবে যে, স্বদেশপ্রীতি তখনই অন্যায় ও অমঙ্গলের হেতু হইয়া উঠে, যখন ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে আমরা অগ্রাহ্য করিয়া অপর প্রদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী এবং ঐকান্তিক ইচ্ছাকে তুচ্ছ করিয়া জাতীয়তাবোধের অপমান করি।" পশ্চিম-বঙ্গ তাহার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য বিহারের বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী অঞ্চল দাবী করিলেই উহা ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা হইয়া দাঁড়ায়, ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং জাতীয়তাবোধ ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু বিহার বা আসাম যখন পশ্চিম-বঙ্গের ন্যায্য দাবী অন্যায় করিয়া দাবাইয়া রাখে, তখন উহা প্রাদেশিকতা বলিয়া গণ্য হয় না, এমন কি জাতীয়তাবোধ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। সভাপতি মহাশয় আরও বলিয়াছেন,—"আমাদের পক্ষে এই সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, বাঙ্গালার দাবী যদি বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীকে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করিয়া লইতে হইবে।" স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙ্গালী প্রথম অগ্রগামী হইয়াছে, সংগ্রামের সর্ব্বস্তরেই বাঙ্গালী রহিয়াছে পুরোভাগে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা অর্জ্জিত হওয়ার পর স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। যদি হীন ভাবে আপোষ না করিয়া গৌরবময় সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে ভারত বিভক্ত করার প্রয়োজন হইত না, বাঙ্গালীকেও তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কঠিন হইয়া উঠিত। সভাপতি মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—"আজ বাঙ্গালার ন্যায্য দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদের আন্দোলন করিতে হইবে বিহারের অশিক্ষিত চাষী-মজুরদের বিরুদ্ধে নয়, বিহারের জন কতক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে—যাঁহারা আজ বিহার সরকারের নীতি পরিচালিত করিতেছেন।"

বাঙ্গালার এই ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করা পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য আজ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব জনমতকে উপেক্ষা করিয়া ভারত বিভক্ত করিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিম-বঙ্গে আসিতেছেন তাঁহাদের

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। বিহারের বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলি পাওয়া গেলে এই সমস্যার সমাধান অনেকখানি সহজ হইবে সন্দেহ নাই। আজ আসামে বাঙ্গালীর স্থান নাই। বিহারে পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালীরা বাস করিতে গেলে তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি কিছুই রক্ষিত হইবে না। বাঙ্গালার দাবী কংগ্রেসের নীতির দ্বারা অনুমোদিত। কিন্তু আজ সেই কংগ্রেসই বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। বাঙ্গালীর বাঁচিয়া থাকিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত হয়ত যুদ্ধই ঘোষণা করিতে হইবে।

উপনির্ব্বাচন

মালদহ-দিনাজপুরের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ও শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ উভয়েই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সর্ব্বাধিক ভোট পাইয়াছেন শ্রীযুক্ত রায়। কংগ্রেস-মনোনীত শ্রীযুক্ত বর্ম্মণ পাইয়াছেন ১৭০১৮ ভোট এবং কংগ্রেস-দ্রোহী শ্রীযুক্ত রামহরি রায় পাইয়াছেন ১৫৩২৫ ভোট। দুই হাজারেরও কম ভোটের পার্থক্য! কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কি কংগ্রেসের প্রতি লোকের উৎসাহ কমিয়া যাইতেছে?

কাশ্মীর সমস্যা

সম্মিলিত রাষ্ট্র-পরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কাশ্মীর কমিশনের রায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ও পাকিস্তানীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উপদেশ মানিয়া লইবার চার দিনের মধ্যেই উভয় রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, হানাদার ও কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের সৈন্যরাই যুদ্ধ করিতেছে। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের এই যুদ্ধের সহিত কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী প্রকাশ্য ভাবেই যুদ্ধে লিপ্ত। কাজেই যুদ্ধ-বিরতির পর পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টকে কাশ্মীর হইতে সমস্ত সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, পাকিস্তানের যে সমস্ত নাগরিক ও উপজাতিদিগের যে সকল হানাদার এখন কাশ্মীরে আছে, তাহাদেরও সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকেই করিতে হইবে। তাঁহাদের অপসারণ-কার্য্য শেষ হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজেদের অধিকাংশ সৈন্য কাশ্মীর হইতে সরাইয়া লইবেন। পরিশেষে কাশ্মীর পাকিস্তান অথবা ভারতবর্ষ কাহার সহিত যুক্ত হইবে তাহা সেখানকার অধিবাসীরা গণভোট দ্বারা নির্দ্ধারিত করিবেন।

পণ্ডিত জওহরলাল মোটামুটি প্রস্তাবগুলিকে মানিয়া লইয়াছেন। কদর্থ নিবারণের জন্য কেবল কমিশনকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, (১) যেন পাকিস্তান বাহিনী কর্ত্তৃক কাশ্মীর পরিত্যাগের পর যে ভূখণ্ড হইতে পাকিস্তানী বা হানাদারবাহিনী অপসৃত হইবে সেখানে কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয়; (২) তথা-কথিত আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব যেন কোনরূপে স্বীকার করা না হয়; (৩) কাশ্মীরে শান্তিরক্ষার জন্য যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করিবার সময় পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট যেন তাহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে না পারে।

পাকিস্তানের বৈদেশিক মন্ত্রী সার মহম্মদ জাফরুল্লা কিন্তু অন্য সুর গাহিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরে যুদ্ধ চালানো বা বন্ধ করা পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। এক মাত্র আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টই সে সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে পারেন। অর্থাৎ পাকিস্তান প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধে যোগদান করে নাই ইহা প্রমাণ করা এবং আজাদ কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করা। যদি তাঁহার কথা সত্য বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে কমিশনের তদন্ত মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে যুদ্ধ চালাইতেছে। পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে বৃটিশ অফিসাররা ছিল এ কথাও সার জাফরুল্লা নিছক উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পাঠান হানাদারেরা কাশ্মীরের যে অংশ অধিকার করিয়া আছে তাহা ত্যাগ না করা।

শেখ আবদুল্লা বহু বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাশ্মীর কমিশন যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন না কেন, যত দিন পর্য্যন্ত হানাদারেরা কাশ্মীর ত্যাগ না করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত কাশ্মীরের জনসাধারণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইবে না। ভারত গভর্ণমেণ্টও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট একান্ত শান্তিকামী, কিন্তু কাশ্মীর এখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিদেশীর আক্রমণ হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা এবং সেখানে শান্তি স্থাপন না করিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের আত্মসম্মান রক্ষা করা অসম্ভব।

খসড়া শাসনতন্ত্র

পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্র আলোচিত হইয়াছে। দুইটি অভিমত বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক জন এই খসড়া শাসনতন্ত্রকে গঠনমূলক রাজনৈতিক জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর এক জন বলেন যে, যতখানি যত্ন লইয়া খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা উচিত ছিল, ততখানি যত্ন লওয়া হয় নাই। কেবল জটিলতাই বৃদ্ধি হইয়াছে। সমগ্র ভাবে খসড়ার আরও একটি দিক্ আছে। উহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র, না কেন্দ্রগত শাসনতন্ত্র? মোটের উপর মনে হয়, ইহা কেন্দ্রগত শাসনতন্ত্র। কেহ কেহ বলেন যে, উন্নয়ন কার্য্য সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিতে হইলে কেন্দ্রের এইরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে প্রদেশগুলির হাতে যেটুকু স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা ছিল, ইহাতে তাহাও নাই।

উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কি, তাহা এখনও জানা যায় নাই। ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের খাওয়া-পরা, শিক্ষা, চাকুরী, বার্দ্ধক্যে পেন্সন প্রভৃতির কথা আছে, রাষ্ট্রের সম্পদ সমতার সহিত বণ্টনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার জন্য রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই। ভারত 'সার্ব্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র' হইবে, না 'সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হইবে ইহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'স্বাধীন' শব্দটি ব্যবহার করিলে ভারতকে কমনওয়েলথের বাহিরে আসিতে হয়,

শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাই যদি বহাল থাকে, তাহা হইলে ভারতকে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিবার কোন সার্থকতাই নাই। রাষ্ট্রপাল ও প্রদেশপালের অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রের বিরোধী।

শাসনতন্ত্রের ৩ নং ধারায় প্রদেশগুলির সীমানা সংশোধন সম্পর্কে যে বিধান আছে তাহার মধ্যেও গলদ রহিয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়াছে, সেই কমিশনের নিকট পশ্চিম-বঙ্গের দাবী প্রেরিত হয় নাই। নূতন সীমানা নির্দ্ধারণের জন্ম আবেদন তখনই গৃহীত হইবে, যখন যে প্রদেশ হইতে ভূখণ্ড কাটিয়া লওয়া হইবে, সেই প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের গরিষ্ঠ সংখ্যা তাহা অনুমোদন করিবেন। অর্থাৎ মানভূম, সিংভূম ইত্যাদির সম্পর্কে পশ্চিম-বঙ্গের দাবীই যথেষ্ট নহে। বিহার ব্যবস্থা পরিষদ যদি দিতে রাজী হন, তবেই কেন্দ্র সে প্রশ্ন কাণে তুলিবেন। এক কথায় তাহা অসম্ভব। অতএব নূতন শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

গভর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী দুই-ই জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। অথচ প্রধান মন্ত্রী অপেক্ষা গভর্ণরকে অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। দুইটি বিভিন্ন পদের প্রয়োজন কি? হয় গভর্ণরকেই নিজ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিবার ভার দেওয়া উচিত, সে ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রীর প্রয়োজন নাই: না হয় প্রধান মন্ত্রীকেই নিজ মন্ত্রিসভা গঠন করিতে দেওয়া হউক, সে ক্ষেত্রে গভর্ণরের কোন প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ গভর্ণরের হাতে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, তাহাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন একটা পরিহাসের বস্তু হইয়াছে মাত্র। সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইতেছে যে, বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণই স্বাধীনতা পাইয়াছেন। জনগণ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

হায়দ্রাবাদ

২১শে ভাদ্র রাত্রি ৪ ঘটিকায় হায়দ্রাবাদ রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বাহিনীর পঞ্চমুখী অভিযান আরম্ভ হয়। হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করা ভিন্ন যে ভারত গভর্ণমেণ্টের আর গত্যন্তর ছিল না, তাহা নিজাম বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই বুঝা যায়। রাজাজী নিজাম বাহাদুরকে শান্তিরক্ষার জন্ম রাজাকার-দিগকে দমন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। উত্তরে নিজাম লিখিয়াছিলেন যে, রাজ্যের সীমান্তে যে উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একটু শান্ত হইলেই তিনি রাজাকারদিগকে দমন করিবেন। সীমান্তে যে অশান্তি তাহা রাজাকারদিগেরই সৃষ্টি, সুতরাং রাজাকার-দিগকে দমন করিবার পূর্ব্বে সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এক কথায় শান্তি কামনার ভাণ করিয়া যুদ্ধের জন্ম আরও অধিক প্রস্তুত হওয়া। তাই ভারত গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়াই যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইল।

চারি দিন যুদ্ধ করিবার পর অতিদর্পী নিজাম ভারতীয় সৈন্ত-বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ৩রা আশ্বিন অপরাহ্ণে অভিযান আরম্ভ হইলেই যে এইরূপ অবস্থা ঘটিবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। ভারত গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে আরও অনেক দিন পূর্ব্বেই নিজাম আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেন এবং রাজাকারদের অত্যাচার হইতে হায়দ্রাবাদের অধিবাসীরা বহু পূর্ব্বেই নিষ্কৃতি পাইত। ভারতীয় ইউনিয়নের প্রজাদের উপরেও রাজাকারগণ অত্যাচার করিতে পারিত না।

বৃটিশ সম্রাটের আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়াছে। নিজামও আশা করিয়াছিলেন, বৃটিশের পক্ষপুটের আড়ালে থাকিয়া স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই দুরাশার আগুনে ইন্ধন জোগাইতে বৃটিশ টোরীগোষ্ঠী কখনও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হইয়াই ভারতের বন্ধন-রজ্জু শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের লোভাতুর দৃষ্টি হায়দ্রাবাদের উপর হইতে কখনও অপসৃত হয় নাই। ভারতের অন্তরদেশে একটা দুষ্টক্ষত সৃষ্টি করিয়া ভারতকে হীনবল করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা সংযত করিতে পারেন নাই। রাজাকার বাহিনীর সৃষ্টির ইতিহাস এখনও রহস্যাবৃত, কিন্তু এই বাহিনীর কার্য্যকলাপ দেখিলে এই সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠে যে, পাকিস্তানের মুসলিম লীগের সহিত ইহার একটা নাড়ীর যোগ আছে।

নিজাম এবং নিজামী ফৌজের আত্মসমর্পণের পর মেজর জেনারেল জে, এন, চৌধুরী হায়দ্রাবাদের সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন। অবশ্য ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সাফল্যের সহিত তিন জন বাঙ্গালী বীরের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে—মেজর জেনারেল জে, এন, চৌধুরী, মেজর জেনারেল এ, এ, রুদ্র এবং ভাইস এয়ার-মার্শাল এস, মুখার্জ্জি। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' ও পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকা উভয়েরই অভিমত যে, নিজাম আত্মসমর্পণ করিলেও নিরাপত্তা পরিষদে হায়দ্রাবাদের সমস্যা উত্থাপিত এবং আলোচিত হওয়া উচিত। বৃটিশ ও পাকিস্তানের এইরূপ মনের ও মতের মিল আশ্চর্য্যজনক। টোরীগোষ্ঠীর মুখপাত্র 'টাইমস' পত্রিকা বলিয়াছেন, —"নিজাম বাহাদুরকে এখন ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে বটে, কিন্তু সারা জগৎ ভারতবর্ষকে ন্যায়ের বিধান লঙ্ঘন করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিবে।"

সকল গণ্ডগোলের মূল বীরকেশরী কাশিম রাজভী হায়দ্রাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এক গুহায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদী সৈন্তরাই তাঁহাকে গুহার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ভারতীয় ফৌজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

নিজাম বাহাদুর নিরাপত্তা পরিষদে হায়দ্রাবাদ সম্পর্কীয় অভিযোগ বাতিল করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার ভারত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের মুখপাত্র স্যার জাফরুল্লা খাঁর তাহাতে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই আদেশ হয়ত নিজাম বাহাদুরের নহে। অপপ্রচার এবং দুর্নীতিরও একটা সীমা আছে। কিন্তু ইনি যেন সকল সীমাই ছাড়াইয়া

অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্ত নিজাম তার প্রেরণ করা সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

হায়দ্রাবাদের ব্যাপার লইয়া যখন ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ও বৃটেনের নেতৃত্বে প্রবল অপপ্রচার সুরু হইয়াছে, তখন হায়দ্রাবাদের প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিয়া নিজাম ওসমান আলি হায়দ্রাবাদ বেতার হইতে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। বিলাতের টোরী দলের ঝানু সংবাদপত্রগুলি পাকিস্তানের জাফরুল্লা খাঁ ও লিয়াকৎ আলির সুরে সুর মিলাইয়া সম্প্রতি বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, হায়দ্রাবাদে ভারতীয় সৈন্ত প্রেরণ করা খুবই গর্হিত কার্য্য এবং ইহার ফলে একটি ক্ষুদ্র দেশের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। কিন্তু এই সব প্রচারকার্য্য যে একেবারেই ভিত্তিহীন, সে কথা উল্লেখ করিয়া নিজাম তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"আমি পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনরূপ প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত না হন।" কারণ, হায়দ্রাবাদে যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় সৈন্তের হায়দ্রাবাদে প্রবেশ না করিয়া উপায় ছিল না। ভারতীয় সৈন্তের হায়দ্রাবাদে প্রবেশের পূর্ব্বে তথায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিজাম বলিয়াছেন—"রাজাকার দল ও লায়েক আলির আট মাসব্যাপী সন্ত্রাসমূলক শাসন আমার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া আমাকে অসহায় করিয়া ফেলা হইয়াছিল। কাশিম রাজভীর নেতৃত্বে এই দল হিটলারী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া সমাজের সকল স্তরের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। যে সকল হিন্দু ও মুসলমান ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহাদের উপরই ইহারা অত্যাচার করিয়াছে। বিশেষ করিয়া হিন্দুদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং লুঠতরাজ করিয়াছে। এই সন্ত্রাসবাদী দল হায়দ্রাবাদে এমন একটা রাজত্ব সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল, যাহাতে কেবল মাত্র মুসলমানদেরই নাগরিক অধিকার থাকিবে।" স্বয়ং নিজাম বাহাদুরের নিকট হইতে হায়দ্রাবাদে সুশাসনের এই বর্ণনা পাঠ করিবার পরও যাহারা হায়দ্রাবাদে ভারতীয় বাহিনীর প্রবেশকে একটা শান্তিপূর্ণ রাজ্যের উপর জুলুম বলিয়া রটনা করিতে পারে—তাহাদের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষ হইতে নিজামের এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন উঠিবে, সত্য কথাটা আবিষ্কার করিতে নিজামের এত বিলম্ব ঘটিল কেন? হায়দ্রাবাদে যে জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার চলিতেছে, এ কথাটা ভারতীয় বাহিনী হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নিজাম বাহাদুর বুঝিতে পারেন নাই কেন? এই প্রশ্নের কৈফিয়ৎ স্বরূপই যেন নিজাম বলিয়াছেন, রাজাকারদের শাসন জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া তাঁহাকে অসহায় করিয়া ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু এই কৈফিয়ৎ কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? হায়দ্রাবাদের সৈন্য-বাহিনী শেষ পর্য্যন্ত যে নিজামেরই অধীন ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হায়দ্রাবাদের জনসাধারণের উপর রাজাকার দল যখন সংগঠিত ভাবে লুঠতরাজ, খুন-জখম, পাশবিক অত্যাচার চালাইয়াছে, তখন নিজামী ফৌজ যে এক দিনও তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত তো একটিও নাই। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজাকার ও নিজামের সৈন্যরা একই সঙ্গে লুঠপাট চালাইয়াছে, এ কথা হায়দ্রাবাদের যে কোন লোকই ভাল করিয়া জানে। তাহা ছাড়া নিজাম তাঁহার বক্তৃতায় স্বয়ং "আট মাসব্যাপী রাজাকার অত্যাচারের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, আট মাস পূর্ব্বে যে সব অত্যাচার হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব অন্ততঃ নিজাম এড়াইয়া যাইতে পারেন না। হায়দ্রাবাদের সহিত ভারতের স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, নিজাম ওসমান আলি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। সে সময় যাহারা হায়দ্রাবাদকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানে বাধ্য করিবার জন্ত প্রজা আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর অত্যন্ত কঠোর ভাবে অত্যাচার চালাইতে নিজাম ও তাঁহার পরামর্শদাতারা কার্পণ্য করেন নাই। হায়দ্রাবাদের উপর নিজামের সৈন্যরা যখন নির্য্যাতন চালাইতেছিল, তখন ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত তুলনা করিয়া নিজাম বলিয়াছিলেন—"ভারতে যখন রক্তপাত হইতেছে, তখন আমার সুশাসনে হায়দ্রাবাদে অটুট শান্তি বিরাজমান।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, আজ যাহাকে নিজাম সন্ত্রাসমূলক অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, সেদিন তাঁহার চক্ষে তাহাই অপার শান্তি বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। রাজাকারদের সহিত নিজামও যে হায়দ্রাবাদবাসীদের অসীম দুর্দ্দশা, দুঃখ ও রক্তপাতের জন্ত দায়ী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় কোথায়? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে এবং অব্যবহিত পরে প্রজা আন্দোলনের কর্ম্মীদের উপর অত্যাচারের জন্ত, ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানে অস্বীকার করিয়া সমস্যাকে ঘোরাল করিয়া তুলিবার জন্ত নিজামই যে প্রধানতঃ দায়ী, তাহাতে ভুল নাই।

নিজামের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা লইয়া আজ যখন নয়াদিল্লীতে আলোচনা সুরু হইয়াছে, তখন গদী রক্ষার জন্য নিজে সাধু সাজিবার এই চেষ্টা নিজামের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারতীয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও নিজামকে রাজ্যচ্যুত করার পক্ষপাতী নহেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অন্তান্ত দেশীয় রাজ্যের রাজাদের যে ভাবে মোটা মাহিনা দিয়া পুষিয়া রাখা হইয়াছে—নিজাম ওসমান আলি বা তাঁহার বংশধরদের সেই ভাবে পুষিয়া রাখাই না কি নেতাদের অভিপ্রায়। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, অন্য রাজাদের জিয়াইয়া রাখিবার যেটুকু যুক্তি আছে, নিজামকে রাখিবার পক্ষে সেটুকু যুক্তিও নাই। অন্তান্ত রাজারা তবু স্বেচ্ছায় ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছেন, কিন্তু নিজাম ভারতের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং শেষে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এখন কাণমলা খাইয়া ভুল সংশোধনের ভাণ করিতেছেন। আর তাহা ছাড়া নিজামের খেসারত দিবার জন্ত হায়দ্রাবাদের হাজার হাজার নর-নারীকে অভূতপূর্ব্ব নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। এই অবস্থায় নিজামের সহিত আপোষের বিন্দুমাত্র ভিত্তি নাই—থাকিতে পারে না। সর্দ্দার প্যাটেল পূর্ব্বে জানাইয়াছেন, হায়দ্রাবাদবাসীদের নির্ব্বাচিত গণ পরিষদ হায়দ্রাবাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রাপ্তবয়স্কের গণভোটে হায়দ্রাবাদে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন. নিজাম-তন্ত্রের ন্যায় অত্যন্ত

প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া হায়দ্রাবাদে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রহসনে পরিণত হইতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন এই, গণভোটের মারফৎ হায়দ্রাবাদে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ অধিকার হায়দ্রাবাদবাসীদের দিতে ভারতীয় ইউনিয়নের নেতারা কি প্রস্তুত আছেন? এই সম্পর্কে ভরসা করিবার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে করা কঠিন। হায়দ্রাবাদ আক্রমণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে পণ্ডিত নেহরু নিজামকে যেরূপ অভয় বাণী শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে ইতিমধ্যে অসাধারণ কিছু না ঘটিলে হায়দ্রাবাদবাসীরা সে সুযোগ পাইবে কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক

টাটা স্টিল ডিলার্স (নিয়ন্ত্রিত মাল) কলিকাতা লিঃ-এর চেয়ারম্যান এবং পশ্চিম-বঙ্গীয় লৌহ-ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক মহাশয় ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত উপদেষ্টা কমিটির

সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ব্যবসায়ের সম্মুখে বর্ত্তমানে যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত ঘটক বিশেষজ্ঞ এবং আশা করা যায় যে, তাঁহার সহযোগিতায় ইস্পাত বণ্টন সম্পর্কীয় বহু সমস্যার সমাধান হইবে।

শ্রীযুক্ত ষন্মুখম্ চেট্টির পদত্যাগ

ভারতের অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত সন্মুখম চেট্টিকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। ষ্টার্লিং ব্যালেন্স সম্বন্ধে বিলাতে তিনি যে চুক্তি করিয়াছেন, সাধারণ ভারতবাসী তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু সরকারী মহল তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনাই জানাইয়াছিল। সুতরাং ইহা পদত্যাগের কারণ নয়। আয়কর অনুসন্ধান কমিটি কার্য্যকালে দেখিলেন যে, দেশের কয়েক জন বিখ্যাত ধনী সরকারকে আয়কর ফাঁকি দিয়াছেন এবং এই সকল ব্যক্তির সহিত শ্রীযুক্ত চেট্টির বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তিনি স্বয়ং ইঁহাদের নাম কমিটির কাগজপত্র হইতে কাটিয়া দিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভাবার পদত্যাগের সময়ও পারমিট সংক্রান্ত অনেক কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল।

আত্ম-সমর্থন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত চেট্টি বলিয়াছেন যে, তদন্ত কমিশনের মত না লইয়া কাহারও নাম বাদ দেওয়া চলিবে না, ইহাই ছিল তাঁহার ১লা মার্চ্চ তারিখে আনীত বিলের মূল কথা। কিন্তু তাহা হইলেও ১২ই মার্চ্চ তিনি কয়েক জনের নাম প্রত্যাহার করিয়া কিছু অন্যায় কাজ করেন নাই। কারণ, ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল ১১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। সুতরাং বিলকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট। বলিয়াছেন যে অর্থ-সচিব সন্দেহের ঊর্দ্ধে। তথাপি অর্থসচিব পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ লোকের মনে যখন তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছে তখন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে যত সরল ও উদার মনে হইতেছে, আসলে তাহা নহে। আয়কর ফাঁকি দিবার সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট নাম পেশ করিবার সময় সরকারী দপ্তর নিশ্চয়ই বাছিয়া বাছিয়া কয়েক জনের নাম পাঠান নাই। যাঁহাদের নাম পেশ করা হইয়াছিল তাঁহাদেরও নিশ্চয়ই কোন গলদ পাওয়া গিয়াছিল, নতুবা তাঁহাদের উপর সরকারী দৃষ্টি পড়িবার কারণ ছিল না। দেশের কয়েক জন খ্যাতনামা শিল্পপতির নাম সহসা তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল কেন? চিন্তা করিলেই সন্দেহ জাগে, শিল্পপতিদের সহিত অর্থ-সচিব এবং সেই সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগাযোগ নাই তো?

শ্রীযুক্ত চেট্টি ওটোয়া বৈঠকে ইম্পিরিয়াল চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছিলেন। ষ্টার্লিং ব্যালেন্স সম্পর্কে যতটা গোলযোগ করা যাইতে পারে করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে এই পদে অধিষ্ঠিত করিবার কারণ কি? তাঁহার ভুলকে সরকারী ভাবে ঢাকা দিবারই বা অপপ্রচেষ্টা কেন? কোথাও যেন কি একটা হীন ব্যাপার রহিয়াছে, যাহার উদ্‌ঘাটন সরকার চাহেন না।

বিচারপতির ডক্টর উপাধি

মনস্বী বিচারপতি এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ বর্ত্তমানে কলিকাতার ছোট আদালতের অন্যতম বিচারক

তিনি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল হিন্দু আইনে নিক্ষেপ (Bailment) ডাঃ দাশ বসুমতীর অকৃত্রিম সুহৃৎ। মাসিক বসুমতী তাঁহার অজস্র রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ। তাঁহার অবদানে বঙ্গসাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হউক—ইহাই আমাদের কামনা।

মহম্মদ আলি জিন্না

পাকিস্তান ডোমিনিয়নের গবর্ণর জেনারেল কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না ২৬শে ভাদ্র রাত্রি ১০টা ২৫ মিনিটের সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ভারত বিভক্ত হইয়া মুসলিমদের পৃথক্‌ রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে পাকিস্তান তাহার স্রষ্টা, তাহার শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, তাহার শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ্‌কে হারাইয়া মর্ম্মান্তিক বেদনায় মুহ্যমান।

তিনি দ্বৈতজাতি মতবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সেই দাবীকে তিনি পূরণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কার্য্যকরী করিবার জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত অন্য কোন পথ তিনি দেখিতে পান নাই। এই পথেই ভারতীয় মুসলিমদের কল্যাণ হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার, তাঁহার দৃঢ়তা ছিল বিপুল, আইন-ব্যবসায় ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবহারাজীবী এবং দ্বৈতজাতি মতবাদী ভারতের মুসলমানদের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নেতা। এক সময়ে তিনি যে বিশিষ্ট কংগ্রেস-সেবী ছিলেন, এ কথাও আমরা স্মরণ না করিয়া পারি না।

সত্যপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

তেলিনীপাড়ার স্বনামখ্যাত জমিদার শ্রীযুত স্বর্গীয় সত্যশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র ও চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্‌ সত্যপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, গত ২১শে ভাদ্র মঙ্গলবার ভোর সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় মাত্র একুশ বৎসর বয়সে দুরন্ত টাইফয়েড রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীমান্‌ এই বৎসরই হুগলী কলেজ হইতে সাফল্যের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল কৃতী ছাত্র ছিলেন তাহা নহে, অমায়িক ব্যবহার এবং দয়ার্দ্র চিত্তের জন্য তিনি সকলেরই স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জগদীশচন্দ্র সরকার

গত ১২ই আগষ্ট প্রাতে, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন সিটি আর্কিটেক্‌ট্‌ জগদীশচন্দ্র সরকার ৬২ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯১২ সালে তিনি কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় কর্ম্মদক্ষতা ও প্রতিভাবলে ১৯৩৪ খৃঃ সিটি আর্কিটেক্‌ট্‌ পদে উন্নীত হন। তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে তিনি কর্পোরেশনের স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ৩রা আগষ্ট অপরাহ্ণে সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ২৮ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আইন ব্যবসা ব্যতীত বহু শিক্ষা ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বহু দিন কলিকাতা সরস্বতী ইনষ্টিট্যুশানের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ২০ বৎসরাধিক স্যার গুরুদাস ইনষ্টিট্যুশানের প্রধান সভ্য এবং বীরনগর পল্লী উন্নয়ন সমিতিরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সদাচারী ও নিরভিমান ব্যক্তি দুর্লভ। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার অমায়িক সরল ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থে সাহায্য করিতেন এবং গোপনে বহু দরিদ্র পরিবারকে অর্থ সাহায্য করিতেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র, এক কন্যা ও জামাতা ও বহু নাতি-নাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন।

সুবর্ণবালা দেবী

কলিকাতার বিশিষ্ট লৌহ-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মেসার্স কে, সি, ঘটক এণ্ড সন্স লিমিটেডের অন্যতম স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় আশুতোষ ঘটক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সুবর্ণবালা দেবী প্রায় ৫৯ বৎসর বয়সে ২১শে ভাদ্র সোমবার রাত্রি ১-৪৫ মিনিটে কলিকাতায় ৫।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি

দুই পুত্র (ঈশানীতোষ ও নির্ব্বাণীতোষ ঘটক), দুই কন্যা, নাতি নাতনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মশীলা, পরহিতব্রতী ও আদর্শ হিন্দু-রমণী ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

এই মুখখানি —অন্নদা মুনশী

বাজারে বেরিয়েছে

"'One of the oldest literary periodicals in Bengal, 'Masik Basumati' has been serving the noblest cause of Bengali literature for the last twenty-five years as the vehicle of various literary trends of thoughts and expressions through the different phases of our literary movements. 'Masik Basumati' is astonishingly free from all bias with which our contemporary literary periodicals are so miserably infected. This has been one of the noblest achievements of 'Masik Basumati' which its founders, makers and shapers can claim to be rightly proud of. The story of this superb achievement is now, for the first time, recorded in the 'Silver Jubilee Volume' of Masik Basumati, published by Basumati Sahitya Mandir. We have no hesitation to say that it is a monumental work. It is a history of Bengali literature during the last quarter of a century, a quarter crowded with the most significant literary movements, accompanied by some of the boldest experiments in literary forms and contents. * * * * here a most interesting and informative movement of Bengali literature is faithfully represented in the 'Silver Jubille Number', with the original writings, photographs and life-sketches of about two hundred writers. It is a volume worth buying and worth-preserving in the shelf of all libraries and lovers of literature.

We gratefully acknowledge our debt to 'Basumati Sahitya Mandir' for this valuable publication and we congratulate the Editor * * * for his remarkable editing and artistic production of the volume."—Amrita Bazar Patrika.

মূল্য সডাক পাঁচ টাকা

নব্যভারত

প্রবন্ধটি শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিক 'নব্যভারত' নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত। ইহাতে নব্যভারত পত্রিকাটির কথা বলিতে গিয়া 'নব্যভারত'-এর সমাজ ও মনস্তত্ব লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ সালে নব্যভারত সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আজও কি তাহা প্রযোজ্য নহে?

ভারত-ইতিহাস লেখকগণ কলম ধরিয়া লিখুন—১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাচীন ভারত 'নব্যভারত' নামে অভিহিত হইল। পৃথিবীর যদি বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে পৃথিবী বুঝিবে—প্রকৃত পক্ষেই ভারত, বর্ত্তমান সময়ে 'নব্যভারত' নামে পৃথিবীর কাহিনীতে আখ্যাত হইয়াছে। একি অহঙ্কারের কথা? যাঁহারা বিদ্রূপপ্রিয়—উপহাস করাই যাঁহাদিগের স্বভাব,—তাঁহারা একথা বলিবেন, তাহা জানি; তাঁহাদিগকে একথা বলিতে দেও। দরিদ্রের কুটীরে যখন নব সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই দরিদ্র যখন আহ্লাদ সহকারে সেই সংবাদ দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে যায়,—তখন ধনি-জগৎ যে তাহাকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু দরিদ্রের কি আহ্লাদ করিবার কিছুই নাই? নিবিষ্টচিত্তে ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারেন—দরিদ্রেরও আহ্লাদ করিবার বস্তু আছে—দরিদ্রের জন্যও পৃথিবীতে সুখ রহিয়াছে, দরিদ্রও সত্য কথা বলিতে অধিকারী। প্রাচীন ভারতের নব জীবনের নূতন সংবাদ প্রচার করিতে কতিপয় দরিদ্র লোক অগ্রসর হইয়াছেন—লোকে ঠাট্টা করিবে, উপহাস করিবে, আশ্চর্য্য কি? সত্য কাহিনী প্রচার করিবার সময় বাধা বিঘ্ন স্মরণ করিয়া যে নিরস্ত থাকে, সে মূর্খ! প্রাচীন ভারত 'নব্যভারত' [illegible] জগতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, আমরা একথা বলিব—কাহারও কথা শুনিব না। ইতিহাস-লেখকগণও সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কলম ধরিয়া এই কথা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিবেনই রাখিবেন।

কি—ভারত নূতন? প্রাচীন ভারত আবার নূতন হইল? বৃদ্ধও কি যুবকে পরিণত হইতে পারে? এ কি শাস্ত্র? পুনর্জ্জন্মে কি তবে বিশ্বাস করিতে হইবে? প্রাচীন ভারত আরও প্রাচীন হইলেন, না পুনঃ নবীনত্বে পরিণত হইলেন? আমরা বলি, এ সকলি সম্ভব। জড়জগৎ হইতে প্রাণি-জগৎ পর্য্যন্ত সকলেরই উত্থান ও পতন আছে। বৃক্ষের পুরাতন পত্র ঝরিয়া পড়ে—আবার নূতন পত্র শাখা-প্রশাখাকে শোভিত করে;—মনুষ্যের নিস্তেজ ও মলিন অঙ্গও এক সময়ে সতেজে কত শোভা ধারণ করে। একবার মনুষ্য নীতি সম্বন্ধে হীন হয়—পতিত হয়—আবার উজ্জ্বলবর্ণে শোভিত হয়—সুনীতিতে ভূষিত হয়। এই মর্ত্ত্যজগতে এমন লোকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, যে একবার পতিত হইয়া না উঠিয়াছে,—একবার মরিয়া যে না বাঁচিয়াছে। মনুষ্য একবার মরে, আবার বাঁচে; একবার বৃদ্ধ হয়, আবার নবীন হয়—আবার নব রসে পূর্ণ হয়। মনুষ্য সম্বন্ধে যাহা, দেশ সম্বন্ধেও তাহা, ইহার একটুও ব্যতিক্রম নাই। পৃথিবীর অবিশ্রান্ত গতিতে ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে কোন দেশ ডুবিতেছে, কোন দেশ উঠিতেছে,—কোন দেশের মৃত্যু হইতেছে,—কোন দেশের পুনর্জ্জন্ম লাভ হইতেছে। কালের অনন্ত লীলায় একবার যে দেশ মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিল, সে দেশ সময়ে আবার জীবন লাভ করিতেছে। এই প্রকার জন্ম মৃত্যু যেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরিতেছে। একবার ইটালীর উত্থান, আবার পতন, আবার উত্থান। ইতিহাসে যাহা ইটালী সম্বন্ধে ঘটিয়াছে—ইতিহাসে তাহাই

হতভাগ্য ভারত সম্বন্ধে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতের স্মৃতি নব্যভারতের এক সম্পত্তি বিশেষ বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের আর কি আছে? সকলেই জানেন—কিছুই নাই। সে গার্গী নাই, সে খনা নাই, সে লীলাবতী নাই, সে সাবিত্রী নাই, সে যুধিষ্ঠির নাই, সে ভীম নাই, সে রামচন্দ্র নাই, সে কণিষ্ক নাই, সে চার্ব্বাক নাই, সে কালিদাস নাই, সে আর্য্যভট্ট নাই, সে বরাহমিহির নাই,—সে কালের আশা ভরসা কিছুই নাই। কিছুই নাই—ভারতের পূর্ব্বকাহিনী স্বপ্ন হইয়া অতীত কালের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে;—সে কালের কোন বস্তুর সহিত এক্ষণকার আর সাদৃশ্য নাই। সহস্র বৎসর স্তব স্তুতি করিলেও আর সে সকল ফিরিবে না। সে ভ্রান্ত, যে আজও সেই সকল মায়াময় স্বপ্ন ভারতবর্ষে—এই হিন্দুস্থানে বর্ত্তমান শতাব্দীতে দেখিয়া ভুলিতেছে। সে কালের কিছুই নাই। স্মৃতি লইয়া পূজা করিতে চাও, কর, কিন্তু ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবেই দিবে যে, সে কালের কিছুই নাই। ভারতের পূর্ব্বের সকলই কালের অনন্ত সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে—কিছুই নাই। ভারতের পূর্ব্ব জীবনী-শক্তি যখন একেবারে বিলুপ্ত হইল, যখন একে একে সকল রত্ন ভারত-বক্ষকে শূন্য করিয়া পলায়ন করিল, তখন ইতিহাস-লেখকগণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে চক্ষের জলের দ্বারা ইতিহাসে লিখিলেন—ভারত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সেই হইতে ভারতগগন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল,—সেই ভীষণ বিভীষিকাময় অন্ধকারে হীনচেতা পশু সকল দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল;—কেহ কাহাকে দেখে না,—কেহ কাহাকে চেনে না;—এই প্রকারে ভারত কতকাল মৃত্যুতে পড়িয়া রহিল। ভারতের দুর্দ্দশার সে কাহিনী কেবা বলিতে পারে, কেবা শুনিতে জানে? সেই সময়ে মৃত ভারতের ইতিহাস আর কেহ লিখিল না। কত শত বৎসর চলিয়া গেল—দরিদ্র ভারত যে মৃত সেই মৃত। সকলের আশার দীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল—ভারত আবার জীবন পাইবে, এ আশা আর কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইল না।

আমরা ভারতের সেই অতীত কাহিনী সকল স্মরণ করিয়া আজ চক্ষের জলে ভাসিতেছি—সকল ঘটনা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে না;—সকল কথা ব্যক্ত করিতে হৃদয় অগ্রসর হইতেছে না। এই মরুভূমিতে আবার সরসী সৃজিত হইবে,—অন্ধকার গৃহে আবার উজ্জ্বল আলোক শোভা পাইবে—ভারতে আবার সূর্য্য উদিত হইবে, এ চিন্তা তখন কাহারও মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস এই সময়ে কি দেখিল? সবিস্ময়ে জগৎ দেখিল—ধীরে ধীরে ভারত-গগনে আবার নবীন সূর্য্য উদিত হইতেছে। ভারত অন্ধকারে আবার দীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া সেই সময়ে পৃথিবী কলরব করিয়া উঠিল। ভারত তখন ঐ আলোকের মর্ম্ম কিছুই বুঝে নাই—ভারতের তখন বুঝিবার শক্তি ছিল না। ভারত-ভূমির সেই সূর্য্যোদয়ের কাল ইংরাজ রাজত্বের সময় হইতে গণনা করা যায়। যে কারণেই হউক, ইংরাজ ভারতকে উদ্ধার করিলেন,—ভারতকে জীবিত করিলেন। তার পর কি হইল?—সূর্য্য ধীরে ধীরে গগনে উঠিতে লাগিল; যে জাতি শত শত বৎসর অন্ধকারে বাস করিয়া চক্ষুর জ্যোতি হারাইয়াছিল, সেই জাতির আলোক সহ্য হইল না,—তাহারা কলরব করিয়া উঠিল,—অত্যাচার—অবিচার—অধীনতা, এই প্রকার কত কর্কশ ধ্বনি আকাশে তুলিতে লাগিল। ইংরাজ রাজত্বকে দুঃখের বলিতে চাও বল, কিন্তু ভাই নিশ্চয় জানিও, ঐ সূর্য্য কখনও এত শীঘ্র ভারত-গগনে উদিত হইত না, যদি ইংরাজ ভারতে পদার্পণ না করিত। যা'ক সে কথায় আজ প্রয়োজন নাই। সূর্য্য ভারতকে আলোকিত করিবার জন্য আসিয়াছিল—আলোকিত করিল। ভারতের সকলে তখন মুখ চেনাচিনি করিতে লাগিল—'জয় ভারতের জয়' এই শব্দ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল,—পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল,—কেহ বক্ষে আঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল,—কেহ ক্রন্দন করিতে লাগিল,—কেহ ইংরাজকে তাড়াইবার জন্য অলীক আশার স্বপ্ন দেখিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। কিন্তু এ সময়ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না,—সৌভাগ্যবশতঃ শিক্ষার সহিত ভারতের উষ্ণ রক্ত একটু শীতল হইল,—ভারতবাসী স্বাভাবিক কোমলভাবে পূর্ণ হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ভারত জীবন পাইলেন; কেবল জীবন নহে, শক্তি পাইলেন;—ভাল মন্দ বুঝিবার জ্ঞান জন্মিল,—নীতির আদর বুঝিলেন। ভারত তখন ইংরাজকে নমস্কার করিতে শিখিলেন,—ভারতের মস্তক নত হইল। এই সময়ে আমরা ভারতকে 'নব্যভারত' বলিয়া অভিহিত করিলাম,—পৃথিবীর সভ্য, অসভ্য অসংখ্য জাতি এই সময়ে ভারতকে একবাক্যে 'নব্যভারত' বলিয়া ব্যাখ্যা করিল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—সেই প্রাচীন ভারতই যে এই, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ চাও?—ঐ হিমালয় অদ্যাবধি মস্তক উত্তোলন করিয়া—আপন বক্ষে স্মৃতির চিহ্ন সকল অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া তোমার কথার উত্তর দিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে;—ঐ আর্য্যাবর্ত্ত রহিয়াছে,—ঐ গঙ্গা যমুনা রহিয়াছে,—ঐ অযোধ্যা রহিয়াছে। আর কি চাও?—ঐ দেখ, ভারতবাসীর হৃদয়ে, সহৃদয়তার উজ্জ্বল অক্ষরে প্রাচীন ভারতের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে,—দেখ, ধর্ম্ম-প্রধান প্রাচীন ভারতের দয়া ধর্ম্ম কি প্রকারে নব্যভারতের হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, দেখ, ঐ স্তূপাকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল 'নব্যভারতের' ভাষার শোভা সৌন্দর্য্য কি প্রকারে বৃদ্ধি করিতেছে,—ভাষার মূলে কি প্রকার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। সে ভ্রান্ত, যে প্রাচীন ভারতের অসংখ্য অসংখ্য প্রমাণ পাইয়াও তাহাকে তুচ্ছ করে—এবং প্রাচীন ভারত যে নব ভূষণে ভূষিত হইয়া পৃথিবীর চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতেছে, তাহা সে অস্বীকার করে। ভারত-ইতিহাসের গূঢ় অভ্রান্ত সত্য সকলকে যে অস্বীকার করিল, তাহার কি বিড়ম্বনা!!

প্রাচীন ভারতের সহিত নূতন ভারতের কি প্রভেদ, একথার আলোচনায় আমরা অদ্য প্রবৃত্ত হইব না। প্রাচীন ভারত শ্রেষ্ঠ, কি 'নব্যভারত' শ্রেষ্ঠ, সে বিষয় লইয়াও তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা এই মাত্র বলি, সে সময়ের ভাল সেই সময়েই ভাল লাগিয়াছে—আর এ সময়ের ভাল এ সময়েই ভাল লাগিতেছে। কিন্তু একটা কথা আমরা এস্থলে বলিব, সে সময়ে বাহুবলে যাহা সংসিদ্ধ হইত, এ সময়ে বুদ্ধিবলে ও জ্ঞানবলে তাহা সংসাধিত হইবে, আশা হইতেছে। 'নব্যভারত' এখন বুঝিতে পারিতেছেন—নীতিবলের ন্যায় পৃথিবীতে আর বল নাই, পাপের ন্যায় আর ভয়ানক শত্রু নাই। 'নব্যভারত' আর কি বুঝিতে পারিতেছেন?—বুঝিতেছেন, একতাই মানবের মহাশক্তি,—প্রেম একতার মূল সূত্র,

নীতি ও পুণ্য একতার প্রাণ,—বুঝিতেছেন—এক সময়ে পৃথিবী হইতে পাশব শক্তির আদর উঠিয়া যাইবে,—নীতির আদর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে;—শোণিতপাত—অত্যাচার—হিংসার চরমফল যুদ্ধবিগ্রহ এক সময়ে পৃথিবী হইতে পলায়ন করিবে! ইহা বুঝিয়া নব্যভারত দিন দিন সেই বলে বলীয়ান হইতেছেন। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, 'নব্যভারত' ও 'নব্য ইটালী' একই প্রকার। আমরা বলি 'নব্যভারত' ও 'নব্য ইটালী' এক প্রকার নহে। 'নব্য ইটালীতে' নীতির আদর থাকিলেও অস্ত্রের সহিত একেবারে ইহার সম্বন্ধ রহিত হয় নাই—কিন্তু অস্ত্রের সহিত 'নব্যভারতের' কোন সম্পর্ক নাই,—'নব্যভারত' একমাত্র নীতি ও পুণ্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পৃথিবীর চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতেছেন। 'নব্যভারত' শরীরের বলের আদর দিন দিন বিস্মৃত হইয়া জ্ঞানবলে ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতেছেন। 'নব্য ইটালীর' আবার পতন হইতে পারে,—আবার অত্যাচার আসিয়া ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই, 'নব্য-ভারত' যদি অটলভাবে আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারেন, তবে ইহার সে পতনের আর সম্ভাবনা নাই। ম্যাট্‌সিনি 'নব্য ইটালীর' অধিনেতা ছিলেন—স্বয়ং ঈশ্বর 'নব্য ভারতের' নেতা! পতন ভারত হইতে কতদূরে, একবার কল্পনা কর। নির্ব্বোধ ভারতবাসী! কেন বালকের ন্যায় ম্যাট্‌সিনির অভ্যুত্থান কামনা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছ? সময়ের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগদীশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া একবার মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে 'নব্য ভারতের' সেবা কর দেখি, নীতি পাও কি না, শক্তি পাও কি না, একতা পাও কি না।

'নব্যভারত' নব বেশে দেশে নব যুদ্ধ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এই সময়ে যদি কেহ অগ্রসর হইয়া 'নব্যভারতের' গুপ্ত অস্ত্র কি, এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা তাহাকে নির্ভর-চিত্তে বলিব—নব্যভারতের এক হস্তে পবিত্রতা, অন্য হস্তে উদারতা—মস্তিষ্কে জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা, হৃদয়ে প্রেম,—আর সমস্ত শরীরে ওতপ্রোত ভাবে মানবের রাজা স্বয়ং ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। 'নব্য ভারতের' শক্তির পরিমাণ কে করিতে অগ্রসর হইবে? ভারতের পূর্ব্ব স্মৃতি ভারতকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে—ঈশ্বর বিশ্বাসই সকল শক্তির মূল। ভারতবর্ষের যাহারা এই মন্ত্র অস্বীকার করিল—তাহারাই পাপে ডুবিল—অত্যাচারে মরিল—পৃথিবীতে কলঙ্কের পূতিগন্ধযুক্ত নিশান তুলিয়া রাখিয়া অপসৃত হইল। 'নব্যভারতে' যদি এ প্রকার লোক থাকেন, তবে 'নব্যভারত' সতর্কভাবে, যত্ন সহকারে, প্রেমের দ্বারা তাহাদিগকে আবার লক্ষ্য পথে আনিবেন, একজনকেও অন্য পথে যাইতে দিবেন না। 'নব্যভারত' জানেন, শরীরের এক অঙ্গের পতনে অন্য অঙ্গের বল হ্রাস হয়। 'নব্যভারতের' হৃদয়ে ও মনে ঘৃণা থাকিবে না, অহঙ্কার থাকিবে না;—উদারভাবে বিনীত অন্তরে 'নব্যভারত' সকলের সেবা করিবেন। ঠাট্টায় 'নব্যভারত' বিচলিত হইবেন না, নিন্দায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন না,—গুপ্ত মন্ত্র সাধনে রত থাকিলে পৃথিবীর সকলকে তুচ্ছ করিতে পারিবেন। 'নব্যভারত' জানেন, অন্তরে বাহিরে এক থাকাই মহত্ত্ব—কপটতা সর্ব্বনাশের মূল,—যেখানে অন্তরে কিছু নাই, সেখানে বাহিরে আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিয়া জগতের প্রশংসা পাইলেই উন্নতি লাভ করা যায় না। নব্যভারতের আর কি লক্ষ্য আছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে জগতের নিকট অপ্রকাশিত থাকাই ভাল; বৃথা আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন, 'নব্যভারতের' ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইল কেন? যে দেশে বহু ভাষা প্রচলিত, সে দেশে ইহার এক ভাষা হইল কেন? একথার উত্তর এই—বাঙ্গালা ভাষাই 'নব্যভারতের' ভাষা—আজ না হইলেও কালে হইবে। ভাই, তুমি ইংরাজি ভাষার উন্নতির চেষ্টায় রত হইয়া দিন দিন উন্নত হইতেছ, তোমার নাম সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে, তুমি কি আত্মাভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া কখনও বাঙ্গালা ভাষার গভীরতা অনুভব করিয়াছ—ইহার উন্নতির পরীক্ষা করিয়াছ—আর ভারতের সমস্ত ভাষার হীনাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ? যদি তোমার পক্ষে এসকল সম্ভব হইয়া থাকে, তবে তুমি ভাই দরিদ্রের এই কথাটাকে স্মরণ করিয়া রাখ,—বাঙ্গালা ভাষাই কালে সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে। যে হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীর সহিত একত্রে ছয় মাস কালযাপন করিয়াছে, সে হিন্দুস্থানী আর বাঙ্গালীর সহিত হিন্দিতে কথা কহিতে ভালবাসে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভারতের এমন স্থান নাই, যেখানে বাঙ্গালীর গমন হয় নাই; সুতরাং ভারতের এমন স্থান নাই, যেখানে কোন না কোন লোক একটু বাঙ্গালা না জানে। তারপর বাঙ্গালা যে ভাষা হইতে উৎপন্ন, ভারতের আর প্রায় সমস্ত ভাষাই সেই মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন; না হইলেও মূলের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। এই কারণে সহজ জ্ঞানে বুঝা যায়, বাঙ্গালা ভাষা কালে ভারতের ভাষা হইবে। জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না; ভারতের সেই পরিমাণে উন্নতি হইবে, যে পরিমাণে ভাষার উন্নতি হইবে। এক দেশে বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে যেমন একতা অসম্ভব, একদেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সেইরূপ একতা অসম্ভব। প্রাচীন ভারতে এক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল বলিয়াই ভারতের হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল। এক প্রকার স্বর, এক প্রকার অভাব, এক প্রকার ধর্ম্ম, এক প্রকার ভাষা—এ সকলই একতার জন্য চাই। যাঁহারা বলেন, ইংরাজ-শাসনে সমস্ত ভারত শাসিত, এক শাসনাধীন সকলের অভাবই এক প্রকার, অতএব ভারতের একতার জন্য ধর্ম্ম, ভাষা প্রভৃতির একতা চাই নাই; পৃথিবীর ইতিহাস তাহাদের এ কথাকে নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং আমরা আর এই কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহি না। একতার মূল কি, এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস, ও ভাষা-জগতের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে উদাহরণ দিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে এ কথা আমরা বলি না যে, পৃথিবীর কোন দেশেই এ সত্য অপ্রমাণীকৃত হয় নাই। এক ধর্ম্ম এবং এক ভাষা প্রচলিত হওয়া সময়-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ কার্য্য একদিনে সম্পন্ন হয়? যাঁহারা মানবজাতির অভ্যুদয়ের মূল ইতিহাস নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—এক ধর্ম্ম, এক ভাষা ভিন্ন কখনও কোন দেশে এক-হৃদয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যদি ভারতে ইহা অসম্ভব হয়, তবে ভারতে একতাও অসম্ভব। এক খৃষ্টধর্ম্ম ও ইংরাজি ভাষা পৃথিবীর অসংখ্য জাতিকে কি প্রকারে একতাসূত্রে বাঁধিতেছে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাঁহারা জাতীয় ভাষার উন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল রাজনীতির অনুসরণ করিয়া

পরানুকরণে রত আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা পণ্ডশ্রমে রত দেখিয়া সময়ে সময়ে অশ্রুপাত করিয়া থাকি। আমরা বলি, ভারতে ভাষার একতা এবং ধর্ম্মের একতা সময়-সাপেক্ষ হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে; যদি অসম্ভব হইত, তবে ভারতকে আজ আমরা 'নব্য-ভারত' নামে অভিহিত করিতে প্রয়াস পাইতাম না। কেহ কেহ মনে করেন, ইংরাজি ভাষাই কালে ভারতের ভাষা হইবে; ইহা মনে করিয়া অসংখ্য ভারতসন্তান ইংরাজির সেবায় জীবন ক্ষয় করিতেছেন,—ঐ ভাষার কাল্পনিক অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে-ছেন। ইঁহারা জানেন না, জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন ভাষা হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না, হৃদয়স্পর্শী ভাষা না হইলে ছোট বড় সকলের তাহা ভাল লাগে না,—সকলে তাহা গ্রহণ করে না। অসংখ্য নর নারী যে ভাষা গ্রহণ না করিল, সে ভাষাও কি জাতীয় ভাষা—একতার ভাষা হইতে পারে? এই জন্য আমরা বলি ইংরাজি ভাষা, নব্যভারতের শিক্ষার বস্তু হইলেও, হৃদয়স্পর্শী—একতার মধ্যবিন্দু হইবে না। এই জন্য আমরা মনে করিয়া থাকি, যাঁহারা ইংরাজির উন্নতির চর্চ্চায় রত আছেন, তাঁহারা কেবলই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করিতেছেন। এই কাল্পনিক একতার কাল্পনিক পথ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহারা যদি জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনে রত হইতেন, তবে ভারতের কত অভাব দূর হইত। বাঙ্গালা ভাষা অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই ভাষাই যে কালে ভারতের ভাষা হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়েই বাঙ্গালা ভাষার কোন কোন পুস্তক ভারতের অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরিত হইতেছে। কেবল অনুবাদে যখন লোকের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইবে না, তখন এই ভাষা শিক্ষা করিতে সকলেরই রুচি হইবে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা কালে কেবল বঙ্গ-দেশেই ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে না:—ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন ভারতে একতা অসম্ভব। এই জন্য 'নব্যভারতের' ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইল, কালে এই হৃদয়স্পর্শী ভাষা ভারতের নরনারী সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করিবে,—কালে সকলের মুখেই এই এক ভাষা শ্রুত হইবে। 'নব্য-ভারতের' এই অভিনব ভাষা ভারতকে সজীব করিবে—এক করিবে, প্রাণে প্রাণে মিলাইবে।

আর একটি কথা বলা হইলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়। 'নব্যভারতের' কাল দশ বৎসর পূর্ব্বে হইতে ধরা যায় কি না? আমরা বলি, তাহা যায় না। যখন সুপ্তোত্থিত ভারতবাসী ইংরাজকে অন্তরে অন্তরে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার কামনা করিত, মুখে 'ভারতজয় ভারতজয়' গান করিয়া সুখ পাইত, বিদ্যাশিক্ষাকে চাকুরী বা দাসত্বের কেন্দ্র বলিয়া তাহার অনুসরণ করিত, স্ত্রীশিক্ষাকে ঘৃণা করিত, বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত, পরানুকরণে জীবনকে ডুবাইয়া সুখী হইত, ধর্ম্মের নামে উপহাস না করিয়া জলগ্রহণ করিত না, একজন আর এক-জনকে কাঁদিতে দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিত না, ভারত-বাসী দেশহিতৈষী নাম গ্রহণ করিত কেবল যশমানের জন্য, পরোপকার করিত ইংরাজের কৃপা পাইবার জন্য—এবং ভাই ভাই কাটাকাটী করিয়া মরিত, সে সময়কে 'নব্যভারতের' কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে আর ভারতের সে সময় নাই;

এক্ষণে ভারত জাতীয় ভাবের ও জাতীয় ভাষার আদর শিখিতেছেন—এক হৃদয়ের দুঃখে অন্য হৃদয় কাঁদিতেছে: জাতিভেদকে সর্ব্ব-নাশের মূল বলিয়া বুঝিতেছেন, স্বাধীনতার আদর বুঝিতেছেন, জ্ঞানের মর্য্যাদা ও বিদ্যার জন্য বিদ্যার আদর করিতে শিখিতেছেন আর মুখে 'জয় ভারতের জয়' বলিয়া ইংরাজকে তাড়াইতে ভারত-বাসীর ইচ্ছা নাই;—এক্ষণ ভারতবাসী বুঝিতেছেন—আরও অনেক-কাল ইংরাজের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। ভারতবাসী এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার আদর বুঝিতেছেন, ধর্ম্মের নামে আর উপহাস করিতে ইচ্ছা নাই,—কাহারও কৃপা পাইবার জন্য বা যশের জন্য পরোপকার করাকে ঘৃণার কার্য্য বলিয়া বুঝিতেছেন। এক্ষণে বিদ্যা শিখিয় ভারতবাসী দেশের উপকার করিতে ধাবিত হইতেছেন;—বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতে আসিয়া জাতীয় ভাব ও ভাষার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। এই সময়ে ভারতের যে কি এক অপরূপ শোভা হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। এই অভিনব সময়কেই আমরা 'নব্যভারতের' সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। স্বায়ত্ত-শাসনের আন্দোলনে ভারত দেখাইয়াছেন, ভারত রাজনীতি চায়,—ভারত একতার জন্য উৎসুক। ফৌজদারী কার্য্যবিধির বিল সম্বন্ধী আন্দোলনে ভারত দেখিয়াছেন, ভারতকে আর পদতলে রাখিতে উদারচেতা ইংরাজগণের ইচ্ছা নাই,—ভারতও নানারূপে দেখাইয়া-ছেন ভারত আর বিভিন্ন নাই—একের সুখে অন্যের হৃদয় ফুল্ল হয় একের দুঃখে অন্যের হৃদয় ব্যথিত হয়। ভাষার আদরের সহিত সংবাদপত্রের আদর বাড়িতেছে, ভারত আলস্য পরিহার করিয়া কার্য্যদক্ষ হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রজা ভূম্যধিকারীর বিলের আন্দোলনে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, ভারতে দুঃখী প্রজাদের জন্য কাঁদিবার অনেক লোক আছে। আরও অসংখ্য কারণে আমরা উদারচেতা মহামতি লর্ড রিপণের শাসন কালকে 'নব্যভারতের' কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। ইঁহার ন্যা উদারনৈতিক শাসনকর্ত্তা আর কখনও ভারতবর্ষে পদার্প করেন নাই। ইনিই যেন ভারতকে নবভূষণে সাজাইয়া তুলিতেছেন।

'নব্যভারত' সুসময়ে পৃথিবীর নিকট পরিচিত হইলেন,—কত কাল ইহার রাজত্ব থাকিবে, ঈশ্বরই জানেন। 'নব্যভারতের' উন্নতিতে যাঁহারা আনন্দিত হন, তাঁহারা অবশ্য 'নব্যভারতে'র উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিবেন। ইহার অবনতিতে যাঁহারা আনন্দিত হন তাঁহারা অবশ্য ইহার অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন। 'নব্যভারত' সুখে অধীর হইবেন না, দুঃখেও বিষণ্ণ হইবেন না। ধীরচিত্তে বীরের ন্যায় 'নব্যভারত' কর্ত্তব্য সাধনে রত থাকিবেন। সত্য পৃথিবীতে জয়যুক্ত হইবেই হইবে। 'নব্যভারত' যদি সত্য প্রচার করিতে পারেন, তবে কেহই সে সত্যের অপলাপ করিতে পারিবে না মিথ্যা জগতে কখনও স্থায়ী হইবে না, সুতরাং নব্যভারত যদি মিথ্যা প্রচার করেন, তবে তাহাও কেহ ধরিয়া স্থায়ী করিতে পারিবে না। বন্ধু বান্ধব সকলে 'নব্যভারতকে' আশীর্ব্বাদ করুন তাঁহাদের ও ঈশ্বরের কৃপা মস্তকে ধারণ করিয়া উদারভাবে 'নব্য-ভারত' জগতে সত্য প্রচারে রত থাকুক। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, স্বাধীনতা, পবিত্রতা ও উদারতা ইহার মূলমন্ত্র হউক;—একতা—শান্তি এবং সাম্য ইহার চরম লক্ষ্য হউক।

—নব্যভারত, ১২৯০

(রূপকথা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বহু-পরিচিত 'বিম্ববতী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষে। ১২৯৮ সালে 'সাধনা' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাধনায়' প্রকাশিত উক্ত বিখ্যাত কবিতাটির অপর এক বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত কবিতার চিত্ররূপ। বিস্ময়ের বিষয়, অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র কুড়ি আর রবীন্দ্রনাথের একত্রিশ. আমরা এখানে মূল কবিতা ও অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত দুইটি দৃশ্যই পুনর্মুদ্রিত করলাম

"যতনে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী
নব ঘন স্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে!
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!
তার পর দিন রাণী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি' দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি'।

সুবর্ণ মুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—কহ সত্য করে'
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশি।
কাঁপিয়া কহিল রাণী, "অগ্নিসম জ্বালা—
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে' সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।"

তার পরদিনে,—আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—"কহ সত্য করি'
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।"
উজ্জ্বল কনক পটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রাণী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে।

তার পর দিনে,—আবার সাজিল সুখে
অলঙ্কারে ; বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইল গ্রীবা।
পরিল যতন করি' নব রৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে'
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—"সত্য কহ মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।"
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি'
মোহন মুকুরে। রাণী কহিল জ্বলিয়া—
"বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।"

তার পর দিনে রাণী কনক রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে'।
ছুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি'
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে।—অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মত।
চীৎকারি' কহিল রাণী কর হানি' বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

ঘষিতে লাগিল রাণী কনক মুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিম্ব নাহি হল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল, তবুও ত গলিল না সোনা।
আছাড়ি' ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে
ভাঙ্গিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রাণী, টুটি' গেল প্রাণ ;—
সর্ব্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে ; ভূমে পড়ি' তারি পাশে
কনক দর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।"

কলিকাতার

দুর্গোৎসব

সেকাল আর একাল

কালপেঁচা
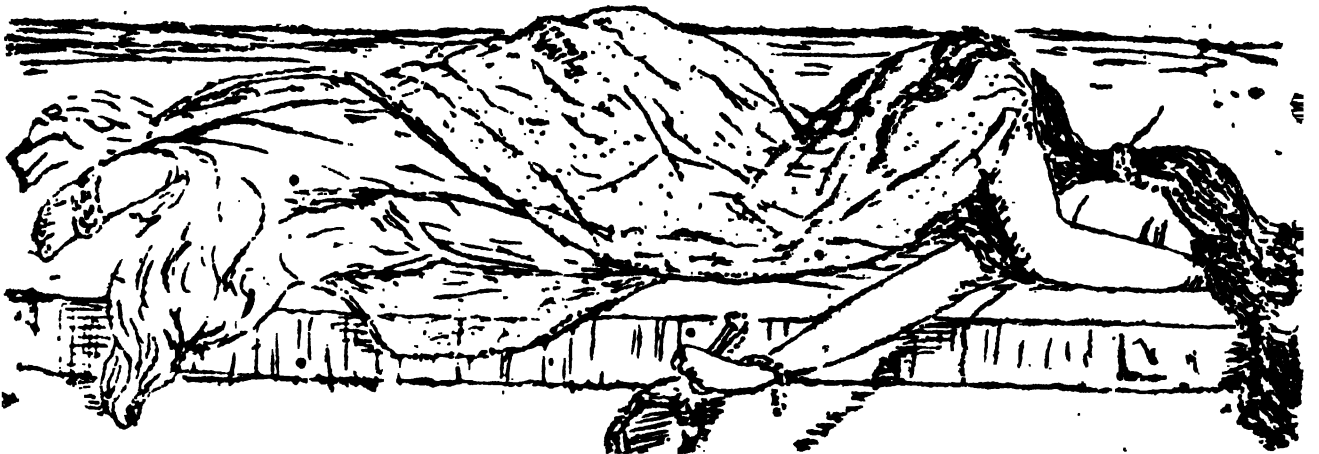
প্রায় ১০০ বছর আগে কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে "হুতোমপ্যাঁচা" তাঁর নক্‌শার মধ্যে "কলিকাতার বারোইয়ারী পূজো," "দুর্গোৎসব," "বাবুদের দুর্গোৎসব" ইত্যাদি কথাচিত্র এঁকেছিলেন। এবারের কলকাতায় স্বাধীন দেশের বারোয়ারী পূজো দেখে হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম। একশ' বছর আগে হুতোম যা লিখেছিলেন, আজও তা হুবহু মিলে যায় দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এই একটা শতাব্দী সাঁতরে পার হয়ে এলাম আমরা, অথচ একটুও পরিবর্ত্তন হ'ল না আমাদের। বাস্তবিকই আশ্চর্য্য আমাদের প্রতিরোধ-শক্তি! যা কিছু ভাল, যা কিছু মহান্, উদার এবং মনুষ্যত্বজীবোচিত, তা আমরা অত্যন্ত সহজেই হাসিমুখে বর্জ্জন করতে পারি, তার বিরুদ্ধে আমাদের দুর্জ্জয় দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ-শক্তি গ'ড়ে তুলতে পারি। অন্ততঃ এবারের কলকাতার দুর্গোৎসব দেখে তাই মনে হ'ল। মানুষ যে কতটা অমানুষ হতে পারে এবং তার জন্যে যে কত সাধ্য-সাধনা করতে পারে তা ১৩৫৫ সনের বারোয়ারী পূজোয় কলকাতা শহরে যা দেখলাম তা জীবনে ভুলব না কোন দিন। তার মধ্যে আবার আমাদের "স্বাধীন" হওয়ার কথাটা বার-বার মনে হয়েছে। স্বচক্ষে দেখলাম, সত্যিই আমরা "স্বাধীন" হয়েছি, যে বলবে "স্বাধীন" হইনি আমরা, তার ঊর্দ্ধতন চোদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত পেশাদার মিথ্যাবাদী। "স্বাধীন" যদি না হতাম আমরা, তা হ'লে আমাদের ভেতরের সমস্ত জঘন্য পাশবিক প্রবৃত্তির এমন স্বাধীন শিকল-ছেঁড়া উন্মত্ত উৎসব (শুধু উৎসব নয়, "ধর্ম্মোৎসব") কি দেখতে পেতাম?

আমাদের "স্বাধীন" হওয়ার পরিচয়টা অবশ্য আগে থেকেই আমরা পাচ্ছিলাম। যখন দেখলাম, এ-দেশের নেড়াবুনেরা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে হয়ে উঠলো, জলঢোঁড়ারা পর্য্যন্ত রাতারাতি কালকেউটে আর গোখরো হয়ে উঠলো, সাতপুরুষের সনাতন "খচ্চর" (Mule) আর "গর্দ্দভরা" সব বিদ্যার দিগ্‌গজ আর বুদ্ধির বৃহস্পতি হয়ে উঠলো, তখনই বেশ হাড়ে-হাড়ে মালুম হ'ল যে আমরা "স্বাধীন" হয়েছি। ভারত মহাসাগর মন্থন ক'রে এমন "লোভ আর হিংসার" হলাহল তুলতে স্বর্গের দেবতারাও পারতেন না কোন কালে। স্বাধীন দেশের পুঁজিবাদী চোরাকারবারীরা কয়েক দিনের মধ্যেই কোটি কোটি টাকার মুনাফা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, "লোভ" নামক রিপু যদি একবার "স্বাধীন" হয় তাহ'লে কি নৈরাকার কাণ্ডই না সে করতে পারে! দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা যাঁরা হলেন তাঁরাও ডাণ্ডাবাজি ক'রে দেখিয়ে দিলেন, ডাণ্ডা যদি স্বাধীন ভাবে ঘোরানো যায় তাহ'লে মাথার খুলি নিয়ে কি ভয়ানক ডাণ্ডা-গুলি খেলাই না খেলা যেতে পারে! এবারের পূজোতেও তাই আমরা অনেকেই দেখিয়ে দিলাম, পূজো যদি স্বাধীন পূজো হয়, উৎসব যদি স্বাধীন উৎসব হয়, তাহ'লে এই কলকাতার মতন বিরাট মহানগরীকেও আমরা পুরাণ-বর্ণিত "মহানরকে" পরিণত করতে পারি।

"হুতোমপ্যাঁচা" আর "কালপেঁচার" যুগ

হুতোমপ্যাঁচার দুর্গোৎসব, আর কালপ্যাঁচার দুর্গোৎসবে মূলতঃ বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সামান্য যে পার্থক্যটুকু দেখা যায় তা বাইরের সাজ-পোষাকের পার্থক্য, চেহারার পার্থক্য। হুতোমের যুগে, কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা কুমোরটুলি ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে ব'সে যেত, রং-করা পাটের চুল, তবলকীর মালা, অসুরের টিন-পেতলের ঢাল-তলোয়ার, প্রতিমার রঙিন কাপড় ইত্যাদি বিক্রী করত। দর্জ্জি, ফিরিওয়ালা, আতরওয়ালা, যাত্রার ও খেমটার দালালরা শহরের চার কোণে ঘুরে বেড়াত। আজও এ-সবের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা এ বছরেও এসেছিল, তবে তাদের বাপ-ঠাকুরদার মতো কারিগরি তাদের জানা নেই। দর্জ্জি, ফিরিওয়ালারা এ বছরেও ঘুরে বেড়িয়েছে অনেক। তবে জাত-ফিরিওয়ালাদের এবারে আর বিশেষ পথে পথে ঘুরতে দেখা যায়নি, তারা সব "হকার্স কর্ণারে" বাজার খুলে বসেছিল। রাস্তার ফিরি-ওয়ালাদের মধ্যে এবার অনেক পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রলোক বাস্তুহারাদের কাপড় চোপড় ফিরি করতে দেখা গেছে। কিন্তু যে-সব মধ্যবিত্ত পাড়ায় পাড়ায় তাঁরা ফিরি ক'রে বেড়িয়েছেন, সে-সব পাড়ায় এ-বছর একেবারেই কোন কেনা-কাটার হিড়িক তো ছিলই না, মেজাজ পর্য্যন্ত ছিল না। অনভিজ্ঞ ভদ্রলোক বাস্তুহারার "ঢাকাই শান্তিপুরে কাপড় চাই" ডাক শুনে কৌতূহলী ক্রেতাদের ভিড় করতে দেখেছি, কিন্তু সেটা কেনা-কাটার জন্যে আদৌ নয়, সুযোগ পেয়ে পূর্ব্ববঙ্গীয়কে দু'একটা পশ্চিমবঙ্গীয় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্যে। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে তাল দিয়ে ঘরের মা-বোনেরা পর্য্যন্ত যে কতটা হৃদয়হীন ও তামাসাবাজ হয়ে উঠেছেন তা এবারের পূজোয় বাস্তুহারা ফিরিওয়ালাদের প্রতি তাঁদের আচরণ দেখেই বোঝা গেছে। বিহারী ফিরিওয়ালাদের কড়া-কড়া সাফ জবাবের কাছে যাঁরা দেশী কুত্তার মতো লেজ গুটিয়ে থাকেন, তাঁদেরই দেখেছি, বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনার মতো বাস্তুহারা বাঙালী ফিরিওয়ালাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে, তর্জ্জন-গর্জ্জন করতে, চোখ-রাঙাতে। হুতোম-যুগের ফিরিওয়ালা-দের একটা পেশাগত সম্মান ও মর্য্যাদা ছিল। আজকের দিনে দেখলাম, বাঙালী সেই আত্মমর্য্যাদাবোধ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছে। শক্তের ভক্ত, দুষ্টের ক্রীতদাস হয়েছি আজ আমরা। নেড়ী কুকুরের স্বভাব এমন হুবহু নকল করতে বাঙালীর মতো আর কোন জাতকে দেখা যায় না। "প্রাদেশিকতা" প্রীচ করছি না, স্বজাতি-মর্য্যাদার কথা বলছি।

উৎসব, না, উন্মত্ততা?

'দুর্গোৎসব' প্রসঙ্গে হুতোম লিখছেন: "কোনখানে দাঙ্গা, কোনখানে খুন, কোথাও সিঁদচুরি, কোনখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে দু' ভরি রূপো গাঁটকাটায় কেটে নিয়েচে; কোথাও মাগীর নাক থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে; পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিস বদমাইস পোরা, চোরেরা পূজোর মরশুমে দেদার কারবার ফলাও কচ্চে, 'লাগে তাক্ না লাগে তুক্কো, কিনি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার' তাদের জপমন্ত্র হয়েচে...।" এ হ'ল একশ' বছর আগেকার কথা।

একশ' বছর পরে 'দুর্গোৎসবের' এই সব উপসর্গ একটিও লোপ পায়নি, হাজার গুণ বেশী বিকট ও বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করেছে মাত্র।

একশ' বছর আগে যা হঠাৎ-বড়মানুষ, অথবা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা শহরে বাবুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রায় সমস্ত স্তরের নর-নারীকে স্পর্শ করেছে! উৎসবটাকে যদি জাতীয় সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ হিসেবে ধরা যায়, তাহলে নিঃসংশয়ে বলতে হয়, ব্যাধিগ্রস্ত জাতীয় সংস্কৃতির আজ ঘোর বিকারের দিন এসেছে। তাই সমাজের মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণতা, লুচ্চামি, ইতরামি আজ ব্যাপক মূর্ত্তি ধারণ করেছে।

হুতোম সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম, চুরি-চামারির কথা বলেছেন, এধারের দুর্গাপূজোয় কালপ্যাঁচা তা যথেষ্ট দেখেছে। উল্লেখযোগ্য হ'ল, এ বছরে বারোয়ারী পূজোর সংখ্যাবৃদ্ধি। অনেকে মন্তব্য করেছেন, এটা না কি শুভ লক্ষণ, জাতির প্রাণ-চাঞ্চল্যের লক্ষণ। কিন্তু বদ্ধ পাগল এবং পাঁড় বদমাইস ছাড়া সকলেই স্বীকার করবেন যে বারোয়ারী পূজোর সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে জাতীয় জীবনীশক্তির কোন পরিচয় নেই, পৈশাচিক শক্তির অপচয়ের পরিচয় আছে মাত্র। হিসেব করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক বছরে বারোয়ারী পূজোর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তার কারণ, দলাদলিটা আমাদের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে, চুরির ভাগ-বখরা নিয়ে খেয়োখেয়ি বাড়ছে; আগে যে দলাদলি রেষারেষিটা পাড়ায় পাড়ায় ছিল, সেটা ক্রমে একই পাড়ার মধ্যে মাথা-চাড়া দিচ্ছে। তাই একই পাড়ার উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম কোণে এবারে পূজো হয়েছে এবং তার সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়েছে। এটাও আমাদের "স্বাধীন" হওয়ার আর একটা মোক্ষম প্রমাণ। "স্বাধীন" হয়েছি বলেই আজ দলাদলি ও কামড়াকামড়িটা চরমে উঠেছে, তাই বারোয়ারী পূজো এবারে প্রত্যেক ফুটপাথে, পার্কে পার্কে হয়েছে। এটা জীবনীশক্তির শুভ লক্ষণ নয়, জাতীয় অপমৃত্যুর অশুভ লক্ষণ।

হুতোমের যুগে বাইজী নাচ, খেমটা নাচ, খেউড়, হাফ-আখড়াই ও তরজা গানের রেওয়াজ ছিল খুব বেশী। এখন আর সে সব নাচওয়ালী খেমটাওয়ালীও নেই, গায়েনরাও নেই। যাত্রা-থিয়েটার কলকাতায় এবার অনেক হয়েছে অবশ্য, এমন কি দু'-এক জায়গায় তরজা গানও হয়েছে, সে খবরও পেয়েছি। তবে এখন আর এ সবের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। রাস্তা-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, উৎসব-মণ্ডপে যে-সব ভদ্রবেশী "স্বাধীন" নর-নারীর জমায়েত হয় তাতেই সকলের সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়ে যায়। হুতোম মেয়েদের নথ ছিঁড়ে নেবার কথা বলেছেন। কালপ্যাঁচা মেয়েদের কানের ঝুমকো আর কানবালা ছেঁড়ার অনেক কাহিনী জানে। তাছাড়া মেয়েদের চিমটি কাটা, খামচে খাবলে নেওয়া, দলাই-মলাই করা ইত্যাদি নিয়ে সোরগোল হয়নি এমন কোন বারোইয়ারি তলা বোধ হয় একটিও নেই। এই ব্যাপার উপলক্ষ ক'রে মা দুর্গার খাঁড়া নিয়ে পর্য্যন্ত অনেক পাড়ায় তুমুল মারামারি হয়ে গেছে। "পুরুষ" ও "নারী" সকলেই সমান স্বাধীন, সমান বেপরওয়া, সুতরাং এক শ্রেণীর ঘাড়ে দোষ চাপানো যায় না। মাঝখানে পড়ে ভদ্র মেয়ে-পুরুষদের অনেক জায়গায় বেইজ্জৎ হ'তে দেখেছি। আবার এ-ও দেখেছি, যে-জায়গায় যত বেশী দলন-মর্দ্দন, খামচানো-খাবলানোর ব্যাপার হয়েছে, যত বেশী কানবালা ছেঁড়া আর খোঁপা খুলে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সেইখানেই তত বেশী দল বেঁধে ঘটা ক'রে ভদ্রবেশী মেয়েরা ভিড় ক'রে গেছেন, কোথাও স্বাধীন ভাবে, কোথাও পুরুষ-লাইসেন্স বগলে ক'রে। এবারের বারোয়ারী পূজোর এই বৈশিষ্ট্যটাই উল্লেখযোগ্য। যৌনবিকারের এ রকম বীভৎস তাণ্ডব সচরাচর দেখা যায় না। অবদমিত পশুপ্রবৃত্তিগুলো পূজোর ক'দিন শহরে যেন মত্ত হাতীর মতো নেচে বেড়িয়েছে।

বাঙালীদের প্রতি আবেদন

হাজার হাজার বাস্তুহারা পরিবার যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, শহরের হাজার হাজার বেকার মধ্যবিত্ত পরিবারের যখন যখন দু'বেলার অন্নের সংস্থান নেই, তখন আমরা "বারোয়ারী দুর্গোৎসবের" নামে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়েছি, আর আমাদের অবদমিত বিকারগ্রস্ত পশুপ্রবৃত্তিগুলোকে চরিতার্থ করেছি। আমাদের মতো এমন নির্লজ্জ বেহায়া নির্ব্বুদ্ধি জাত পৃথিবীতে আর ক'টা আছে জানি নে। একশ' বছর আগে হুতোম "বাবুদের দুর্গোৎসব" দেখে বঙ্গবাসীর প্রতি মনের দুঃখে যে কয়েকটা কথা নিবেদন করেছিলেন, কালপ্যাঁচাও আজ তাই করছে। হুতোম বলেছিলেন :

"হা বঙ্গবাসিগণ! তোমরা এইরূপেই আপনাদিগকে সভ্য বলে পরিচয় দিয়ে থাক! যাঁদের ধর্ম্মকর্ম্ম এইরূপ, যাঁদের আমোদ-প্রমোদের প্রণালী এই, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এইরূপ হিপক্রিট, তাঁরা আবার সভ্য ব'লে পরিচয় দেন!...আপনাদের জাতির গৌরব করেন! তোমাদের মধ্যে যাঁরা প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরা বাহিরে হরিনামের ভাণ দেখিয়ে গোপনে যাবতীয় ঘৃণিত কর্ম্মে আসক্ত হয়ে থাকেন; আর যাঁরা নব্য সম্প্রদায়, তাঁরা তো...মদ মুরগী খেয়ে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের ন্যায়, প্রথম কাকের দল, শেষে ময়ূরের দল হতেও চ্যুত হচ্চেন। এ সকল দেখে শুনেও কি তোমাদের মনে একটু লজ্জা বা ঘৃণার উদয় হয় না? তোমরা লেখাপড়া শিখে কোথায় স্বদেশের উন্নতি করবে, না মদ মুরগী খেয়ে 'টুপ-ভুজঙ্গ' হয়ে বঙ্গমাতার মুখে চূণকালি দিচ্চ! এই সকল গুণেই কি তোমরা উচ্চ পদ প্রার্থনা কর? এই ক্ষমতাতেই কি আপনাদিগকে রাজ্যশাসনের উপযুক্ত জ্ঞান কর?...অতএব তোমাদিগকে ধিক্! তোমাদের প্রকৃতিকে ধিক্! অনুষ্ঠানকে ধিক্!..." (হুতোমপ্যাঁচার নক্শা)।

এবার পূজার "ফ্যাশন"

কালুমিঞা

"বাঙালীর বৈশিষ্ট্য" কথাটি বাঙালীর সভ্যতা বিকীর্ণ হওয়ার শুরু থেকেই আলোচিত হতে শুরু হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর বিশিষ্টতার প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। যে সাহিত্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান নেই তা যে আদপেই সাহিত্য হয় না সাহিত্যিকরা ছাড়া এত দরদ দিয়ে কে আর বুঝলো!

আচারে, ব্যবহারে ও পোষাক-পরিচ্ছদে বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব আজ লুপ্ত হতে বসেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙালী জাতির লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে সামান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে যাওয়া যদিও আজ হাস্যকর পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই নয়, তথাপি অনেক দুঃখে কাঁচি ফেলে আজ কলম ধরেছি। সত্যি কথা বলতে কি, কলম আমি ধরতেই জানি না। কসুর মাফ করবেন হুজুরের দল।

কলকাতা—সর্ব্বনাশের মূলকেন্দ্র

আমি এক জন মেটিয়াবুরুজের সামান্য দর্জ্জি। কাঁচি, কল আর সূতোর জালে জট পাকিয়ে আছি গত ত্রিশ বছর ধরে। আদার ব্যাপারী হয়ে সাহিত্যের আলোচনা করতে বসিনি মশাই, পেটের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সাহিত্যের দরবারে এসে জমায়েৎ হয়েছি। নিদ্রিত সিংহের নিদ্রাভঙ্গের দাওয়াই অনেকে জানেন, কলকতার নিদ্রিত বাঙালীর ঘুম ভাঙানোর কি যে উপায় তার কোন হদিস জানেন কেউ? নিরুপায় হয়ে কিছু করতে না পেরে কলকাতাকে হুতোমপ্যাচার ভাষায় আর একবার বন্দনা করি—"আজব সহর কলকাতা।

রাঁড়ী বাড়ী জুড়ী গাড়ী মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা।"

তবুও এই বক বিড়াল আর বদমায়েসির ডিপো কলকাতা শহরকে বাঙলার শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র বলে অভিহিত করা হয়! কলকাতায় একবার বে-বিষয় ও বস্তুর প্রচলন হয় সারা বাঙলা দেশে না কি তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়! কলকাতার বাবুরা যা করেন বাঙলার যুবসম্প্রদায় চক্ষু মুদিত ক'রে না কি তাঁদেরই অনুকরণ করেন। কলকাতার চালু ফ্যাশন না কি সারা বাঙলা দেশটাকে চালু করে রাখে। তবুও কলকাতার বাবুদের "বাঙালী বাবু" বলতে আমি দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করি আর শহর কলকাতাকে বাঙলার কৃষ্টির উৎস-মূল বলতেও আমি দস্তরমত লজ্জিত হই। কারণ, কলকাতায় আজ বাঙালী বাবুদের কোন খাতির ও প্রতিপত্তি নেই। আসলে যাঁরা আজ গদীয়ান তাঁরা ভাঙ্গা বাঙলা বলতে পারেন বটে, পৈত্রিক পরিচয়ে দ্বারবঙ্গ ও পাটলীপুত্রের নাম করেন। তাছাড়া এ-কথাও হলপ ক'রে বলছি, কলকাতায় যে ফ্যাশন প্রথম প্রচলিত হয় তাতে বাঙালীদের কোন চিহ্ন কোন কালে ছিল না, আজও নেই। হুতোমপ্যাচার ভাষায় সে যুগের বাঙালী ব্রকোদর (বৃকোদর) বাবুদের বর্ণনা শুনুন: "*** বাবুর ট্যাসেল দেওয়া টুপী, পাইনাপোলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন; অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুর-বাড়ী শোন, আর সেনেদের বাড়ী বসবার আড্ডা। পেট ভ'রে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফরমেশনের জন্যে রাত্রে ঘুম হয় না (মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ)।"

কলকাতার মধ্যবিত্ত অভাবী গৃহস্থ বাবুদের এই হালের পর 'ইয়ং বাঙালীদের' প্রসঙ্গে হুতোমপ্যাচা বলছেন: "*** বাবু বড় হিন্দু—একাদশী-হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস, উত্থানও নির্জ্জলা ক'রে থাকেন; বাবুর মেজাজ পবিত্র। সৌখীনের রাজা! ১২১৯ সালে সাবরবন্ সাহেবের নিকট তিন মাস মাত্র ইংরেজী লেখা-পড়া শিখেছিলেন; সেই সম্বলেই এত দিন চলচে—সর্ব্বদা পোষাক ও টুপী প'রে থাকেন; (টুপীটি এমনি হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে বাবুর ডান কান আছে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়); লক্ষ্ণৌ ফ্যাশানে (বাইজীর ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাটা ও মাথায় বাঁকা টুপী; তাঁর মনোমত পোষাক।"

এই মনোমত পোষাকের লিষ্টির মধ্যে বাঙালীদের নিদর্শন কৈ? এত কথায় কাজ কি, আজকের লেখা-পড়া-জানা কালেজী বাবুদের (বাঙলাকে মাতৃভাষা করিতে হইবেই বলিয়া যাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন) পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে একবার দৃক্‌পাত করলেও দেখা যাবে—মাথায় চুল এ্যালবার্ট কাটা, চোখে অ্যামেরিকান ফ্রেমের চশমা, মুখে বার্ডসাই, পরনে হাওয়াইয়ান সার্ট ও প্যাণ্টলুন, হাতে রিষ্ট-ওয়াচ, পায়ে কাবলি জুতা। ভাগ্যক্রমে মামা আর জামাইবাবুরা গদীতে থাকলে এঁরা ঠেলায় পড়ে খদ্দর ধারণ ক'রে চাকরী করেন। আরও কথঞ্চিৎ সৌভাগ্য থাকলে মামার জোরে দিল্লীর সেক্রেটেরিয়েটে যান। কাশ্মীরী পণ্ডিত আর মাদ্রাজী মূর্খদের পায়ে তৈল দেওয়ার অভ্যাস করেন। আর কি করেন? ঘুষ লন, জাত খুইয়ে এটা-সেটা আহার ও পান করেন, সস্ত্রীক ডিনারে পার্টিতে গিয়ে বাঙলার মান ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন। এরোপ্লেনে ওড়েন। লালদীঘির পার্লামেণ্ট থেকে রাস্তায় রং-পালিস-করা বাবুদের আজ সব শিয়ালের 'এক রা'! কেউ বলেন—কাজের খাতিরে প্যাণ্টলুন পরিধান করি, কেউ লাজে বলতে পারেন না যে কাঞ্চিন দেবীর কথায় এই পোষাক ধারণ করেছি।

সুতরাং, জাতির মজ্জাগত অধিকার স্বাধীন হয়েছি বলেই কী ত্যাগ করব? ইংরেজ আমাদের ত্যাগ ক'রে চলে গেছে ব'লে আমরাও তাদের চাল-চলন আদব-কায়দা ত্যাগ করব তার কি মানে আছে?

ঠিক সে-যুগের 'ইয়ং বাঙালী' বাবুদের মতই এ যুগের স্মার্ট বাবুদের দৌলতে কলকাতার শহর আজও গুলজার হয়ে আছে। ক্যাসানোভা থেকে কমলা কাফে, গ্রেট ইষ্টার্ণ থেকে মা কালী মার্কা দেশী সরাপের দোকান, মেট্রো থেকে মতিমহল আর টালা থেকে টালিগঞ্জের সর্ব্বত্র এই স্মার্ট বাবুদের দেখতে পাওয়া যায়। কথায় তুবড়ীতে ভূরি-ভূরি গুল ঝাড়ছেন এবং জীপ আর কাঞ্চিনদের পাশে নিয়ে শহর গুলজার ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যাঁদের কাঞ্চিন জোটেনি তাঁরা পরের স্ত্রীর দিকে আড়চোখে হানা দিচ্ছেন। তাঁদের সতীত্ব-রক্ষার অজুহাতে ট্রামে-বাসে লড়াই করছেন, আর কথায় কথায় স্বাধীন হওয়ার বড়াই করছেন। সুতরাং এই ধরণের বারোইয়ারী বাবুদের যে-কলকাতায় বাস তা যে আবার রুচি ও কৃষ্টির মূলকেন্দ্র হতে পারে, তা যেন বরদাস্ত করা যায় না। কলকাতার পাঁচ-মিশেলী ফ্যাশনও তাই বাঙালীর জাতীয় ফ্যাশন কখনও নয়। তখনও ছিল না, আজও নেই। তাই বলছিলাম, কলকাতা শিক্ষা ও কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল নয়, সর্ব্বনাশের মূলকেন্দ্র।

এবার পূজার ফ্যাশন

'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি' কথাটি বলতে যারা গর্ব্ব অনুভব করেন আমি তাদের দলে নেই। এ-বিষয়ে বাঙালী মেয়েদের রুচির উল্লেখ

প্রথমেই করতে হয়। অলঙ্কারের দিক্ দিয়ে আধুনিক কবিদের মত তাঁরা আবার সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করছেন—পাঁচ বছর আগে নিরাভরণা থেকে যাঁরা প্রিয়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন আজ তাঁরাই ঠাকুমা দিদিমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁদেরই রুচির অনুকরণ করতে বসেছেন। আশার কথা সন্দেহ নেই। বাঙালী মেয়েদের দেখলে যদি ডিনার পার্টি আর সিনেমার নায়িকাদের মনে না প'ড়ে আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের মনে পড়ে, তা হলে বদ্‌রুচির পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। এলিস সাহেবের Exhibitionism-এর বৃত্তি অঙ্গপ্রকাশক ব্লাউজ সেমিজ পরেই শুধু যে প্রকাশ করতে হবে তার কি মানে আছে? বাঙালী মেয়েরা যদি পারেন তো দেখান না ভারী ভারী ওজনের সেই কানবালা, স্বর্ণচূড়, চন্দ্রহার আর ঝুমকো, সাতনরী, ঝাপটা! শাড়ীর আঁচল যথাস্থানে থাক্ না, তাকে স্থানচ্যুত করলে কেউ কেউ খুসী হতে পারেন, সকলের মন হয়তো তা চায় না।

কলকাতার মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবার পূজায় বেশ লক্ষ্যণীয় হয়েছিল। লজ্জাহীনতার চরম পর্য্যায়ে নেমে কলকাতার কয়েক সম্প্রদায়ের মেয়েরা এবার যে-সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করলেন তাতে বাঙালী নারীর সম্মান যথার্থই রক্ষিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, বারোইয়ারী তলায় পিঠের কাপড় ফেলে দিয়ে যে দৃশ্য তাঁরা দেখালেন, তাতে তাঁদের কানে তুলো আর পিঠে কুলো বাঁধা আছে বলেই ধারণা হয়। নির্লজ্জতা, বাচালতা যদি পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায়, আর তাই যদি ফ্যাশনে রূপান্তরিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তা হলে 'লজ্জা নারীর ভূষণ' কথাটি স্মরণ ক'রে সুন্দরবনে পালানো ব্যতীত আর কোন পথ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, কলকাতার রক-পালিস-করাবাবুরা আর গরাদ-রেলিঙ-পালিস-করা মেয়েরা যদি ফ্যাশনের জন্মদাতা আর গর্ভধারিণী হতে পারতেন তা হলে আর কথা ছিল না। 'ফ্যাশন' কথাটির পরিপূর্ণতার জন্য যে সংযম ও রুচির প্রয়োজন তা কলকাতার এই দুই দলের একেবারেই নেই। আর তাই কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালীর নেই কোন সর্ব্বজনীন ফ্যাশন, পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নেই। জলসা-ঘর আর নাইট-ক্লাব ভোগ্য হওয়ার সৌভাগ্য সকলের থাকে না, ট্যাসেল দেওয়া টুপী, গলার গার্ডচেন, ঝাপটা, সাতনরী কিংবা গ্যাবাডিন, ব্রোকেট, ব্রোচ প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তুও সকালে চোখে দেখতে পায় না। অথচ সকলে যে বস্তুকে গ্রহণ করতে পারলো না তাও কস্মিন্ কালে 'ফ্যাশন' হতে পারে না। ফ্যাশন চিরকাল সর্ব্বজনীন।

এবারের ফ্যাশন দেখতে তাই কলকাতার সর্ব্বজনীন বারোইয়ারীতলার আনাচে কানাচে ঘোরা ফেরা করেছি। হাতে কাজ নেই, ঘরে মাল নেই, পকেটে নেই পয়সা, মনে নেই আনন্দ। এলোমেলো ঘোরা ফেরা ক'রে চরণ দু'টি ক্লান্ত ও দেহ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। দেশপ্রিয় পার্কের এক কোণে বসে বসে চীনে বাদাম দাঁতে কাটছি। দূরে পূজামণ্ডপ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা উৎরে গেছে কখন, চারি দিকে বিজলী আলো জ্বলছে। হাওয়াইয়ান সার্ট আর পাৎলুন-পরা বাবুরা এই ফাঁকে যে যার কেটে পড়ছেন—হয়তো কাজিন দেবীর কাছে টাইম দেওয়া আছে! মধ্যে মধ্যে মাইক্রোফোনের গান বদল হচ্ছে। শ্যামা-সঙ্গীত শুনছেন এক দল, কেউ শুনছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কেউ সিনেমা-সঙ্গীত। পল্লিয়া এসেন্সের গন্ধ বইতে শুরু করেছে, থেকে থেকে ইভনিং ইন প্যারী। পার্কের এখান-সেখান থেকে সাড়ে বত্রিশ-ভাজা, গ্যাস-বেলুন, কাগজের ফুলওয়ালারা চিৎকার ক'রে উঠছে। কিশোর-কিশোরীর দল নেচে উঠছে তা শুনে। সপ্তমীর রাত্রি হাস্যে-লাস্যে যেন মশগুল হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা লাভের পর শারদীয়া উৎসবে শহর কলকাতার কী মাইফেলী মেজাজ! সর্ব্বহারা বাস্তুহারার দল হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। যা দেখছে তাতেই অবাক। এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। একেবারে আমার কাছাকাছি এসে ব্যস্ত হয়ে বললেন,—আপনি দেখেছেন মশাই?

চমকে উঠেছিলাম প্রথমে। বললাম,—কি দেখেছি? কাকে দেখেছি? ভদ্রলোক মাটিতে বসে গলা নামিয়ে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন,—সেই মেয়ে দু'টিকে? এদিক্ দিয়ে যেতে দেখেছেন?

বিস্মিত হলাম।—হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি? কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম।—আপনার আত্মীয়? তা নিশ্চিন্ত হয়ে যে বসে পড়লেন? খুঁজে দেখুন!

ভদ্রলোক হাসলেন, অর্থহীন হাসি। বললেন—অনেক খুঁজেছি! সেই বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বারোয়ারীতলায় খুঁজেছি! যাদেরই দেখছি মনে হয়েছে যেন তারা দু'জন! সেই মাদ্রাজী জামা আর শাড়ী! কাছে গিয়ে দেখছি, না তারা নয়, অন্য কারা।

এতক্ষণে বুঝলাম ভদ্রলোকের কথার তাৎপর্য্য। এবার পূজায় বাঙালী মেয়েদের সর্ব্বজনীন ফ্যাশনের বিভ্রাটে পড়েছেন। ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলাম,—কোথায় চললেন?

অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বললেন,—যাই, খুঁজতে যাই। কথার শেষে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন মুহূর্ত্তের মধ্যে।

আমিও উঠে পড়লাম মনের দুঃখে। হাতে কাজ নেই, মনেও নেই আনন্দ। সেলাই-কলে মরচে ধরে গেছে। বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। আমিও যেদিকে তাকাই দেখতে পাই সেই মাদ্রাজী জামা আর মাদ্রাজী শাড়ী। চলির জামা কল্পনা শাড়ী! এবার পূজায় আমাদের অন্ন মারা গেছে। তাই অনেক দুঃখে মনে মনে শরৎ বসুর ভাষায় বললাম,—Go back, Rajagopalachari! Go back!

তাই বলছিলাম, কলকাতার ফ্যাশন এত দিনে সর্ব্বজনীন হয়ে উঠলেও বাঙালীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোষাক আদপেই হয়ে ওঠেনি। ইডেন উদ্যানের একজিবিসনের পর থেকে একজিবিসনইজম্'এর চরম হয়েছে,. কিন্তু বাঙালী মেয়েরা কৈ দেশী কিছু দেখাচ্ছেন? সেকালের অলঙ্কার-প্রীতি আর মদ্রদেশীয় পোষাক—কলকাতার ফ্যাশনে কি চিরকাল ভেজাল! হাওয়াইয়ান সার্ট আর পাৎলুন—আলালের ঘরের দুলাল!

দোহাই বঙ্গদেশবাসি, রক-পালিস ও রেলিঙ-পালিস-করা মেয়ে-ছেলেদের ফ্যাশন তোমরা কখনও চোখেও দেখো না—তোমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। বরং একটা স্বদেশী রফা হোক তাতে যথার্থ দেশের কাজ হবে—আমাদের মত অধমদের দু'মুঠো অন্ন জুটবে।

আমার পূজার বাজার

ঘুঘু

"দাদু, এবার পূজোয় কিন্তু আমার শাড়ী চাই।"

চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার ত্রয়োদশী নাতনীটি বঙ্কিম গ্রীবা হইয়া টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাসিয়া বলিলাম—"তা চাই বই কি দিদি, শাড়ী নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু ফ্রকে তোমার অরুচি ধরল কেন দিদি?"

ঘাড় নাড়িয়া নাতনী উত্তর করিল—"ও-সব আমি কিছু বুঝি না, এবার শাড়ী পরে পূজো দেখতে যাব।"

আরজী মঞ্জুর হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহই বোধ হয় তাহার ছিল না, তাই আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ত্রস্তা হরিণীর মত লঘু পাদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আমাকে ডুবাইয়া গেল চিন্তার অকূল সমুদ্রে। তাই তো, পূজার বাজার করিবার সময় যে আসিয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়রা পূজা সম্পর্কে যে সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে আশ্বাসই তাঁহারা দিয়াছেন যে, পূজার আনন্দের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য হইলেও সকল দুঃখ-দৈন্যের বেদনা আমরা ভুলিতে পারিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যে আমার সম্মুখে মহা সমস্যা—পূজার বাজার। দুঃখ-দৈন্য ভুলিবার উপায় কি? গত বৎসরের তুলনায় এবার জিনিষ-পত্রের দাম এত বেশী বাড়িয়াছে যে দৈনন্দিন সংসার খরচ চালানই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, পূজার বাজার করিবার মত সংস্থান কোথায়?

"বাবা!"

হঠাৎ চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, ছোট নাতিটিকে কোলে লইয়া বৌমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বৌমা বলিলেন, "বাবা, ঝি বলে গেল, মিহি শাড়ী না হলে সে নেবে না।"

তাই তো, সমস্যা চারি দিকেই! আমার মুখের দিকে চাহিয়া বৌমা বোধ হয় আমার মনের ভাবটা বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন, বলিলেন, "বাবা, আমার জন্য এবার আর শাড়ী কিনতে হবে না।"

বৌমা বোধ হয় ভাবিলেন, ইহাতেই সব সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সমাধান না হইলেও মনে মনে দুঃখ অনুভব না করিয়া পারিলাম না। কি বলিব তাই ভাবিতেছি, এমন সময় খুড়তুতো ভাই আসিয়া বলিল, "কি দাদা, বৌমার সঙ্গে পূজোর বাজারের ফর্দ্দ নিয়ে আলোচনা করছো বুঝি?"

বলিলাম, "কতকটা তাই বটে, তবে ফর্দ্দটা হচ্ছে পূজোর বাজার কতটা না করে চলে তারই।"

"তোমার আবার পূজোর বাজারের ভাবনা কি? মেয়ে নেই, কাজেই মেয়ের বাড়ী তত্ত্ব পাঠানোও নেই। নাতনীর বিয়েরও দেরী আছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমার! ভেবেছিলুম, মেয়ের বাড়ীতে তত্ত্বের জিনিষ পাঠাবার বদলে টাকা পাঠিয়েই কাজ সারবো। একশো টাকা পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু বেয়ান টাকা ফেরৎ পাঠিয়েছেন, জানিয়েছেন, তত্ত্বের জিনিষ পাঠাতে হবে, ফর্দ্দও দিয়েছেন একটা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ফর্দ্দটা শুনি তো একবার।"

খুড়তুতো ভাই বলিল—"সে এক মহাভারত—বেয়ানের জন্য গরদ, জামাইয়ের জন্য ফরাসডাঙ্গার ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, মেয়ে আর মেয়ের দুই জায়ের প্রত্যেকের জন্যে একখানা করে 'মানে না মানা' শাড়ী, নাতির জন্য কোট-প্যাণ্ট, আরও অনেক কিছু…"

"কি করবে ঠিক করলে?"

"কি আর করবো, যা ফর্দ্দ—আড়াইশো টাকার কম কিছুতেই পার পাওয়া যাবে না। কাজেই তত্ত্ব আর পাঠানো হবে না। মেয়েকে এর জন্য অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হবে, কিন্তু উপায় কি?"

তত্ত্বের কথা শুনিয়া বৌমার মুখখানাও ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কোথায় লাগিয়াছে বুঝিতে কষ্ট হইল না, বলিলাম, "তুমি দু'দিকেই ঠকলে বৌমা! আমার কাছ থেকে পূজার কাপড় তুমি নিজেই নিতে চাইলে না, আর আমি তোমার বাবাকে জানিয়েছি, এবার তিনি যেন পূজোর তত্ত্ব না পাঠান।"

মুহূর্ত্তে বৌমার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার চোখটি চক্‌চক্ করিতেছিল—বোধ হয় চোখের জলেই।

* * *

বিকালে নাতনী ও দুই নাতি লইয়া পূজার বাজার করিতে বাহির হইলাম। পনের-কুড়ি দিন আগে এক বন্ধুর সঙ্গে তিন-চারি দিন আমার বাজারে বাহির হইতে হইয়াছিল। তখন দোকান-গুলিতে তেমন ভীড় দেখি নাই। সাধারণতঃ পূজার এক মাস দেড় মাস পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতায় পূজার বাজার জমিয়া উঠে। এই ভীড়টা হইত মফঃস্বলের ক্রেতাদের—বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ীদের এবং কতকটা পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবসায়ীরা পূজার মাসাধিক কাল পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে কাপড়ের চালান নিয়া তাঁহাদের দোকান সাজাইতেন মফঃস্বলের ক্রেতাদের জন্য। এবার তাহাদের অভাবটা কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যে বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়াছেন, বাজারের অবস্থা দেখিয়া আমিও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চবিত্ত মধ্যশ্রেণীর অনেক লোকও কলিকাতায় আসিয়া পূজার বাজার করিতেন। এবার তাহারাও আসেন নাই। চাকরী-বাকরী উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোক কলিকাতায় বাস করেন। প্রতি বৎসরই পূজার বন্ধে বাড়ী যাইবার সময় পূজার জামা-কাপড় ইত্যাদি কলিকাতা হইতেই কিনিয়া লইয়া যাইতেন। এবার পূজা উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের খুব কম লোকই বাড়ী গিয়াছেন এবং যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারাও শুল্ক-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের জন্য কলিকাতা হইতে জামা-কাপড় লইয়া যাইতে পারেন নাই। পূজার দুই-তিন দিন পূর্ব্বে নাতি-নাতনীকে লইয়া পূজার বাজার করিতে বাহির হইয়া দেখিলাম, দোকানে দোকানে ভীড় মন্দ জমে নাই।

নাতনীটি ত্রয়োদশী হইলেও ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে। তার পর সাংবাদিকের নাতনী। বাড়ীতে রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতির কচকচি শুনিতে শুনিতে কতকটা ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছিল। ভীড়ের জন্য কয়েকটি দোকানে প্রবেশ করিতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া নাতনী বলিল, "দাদু, আজ সকালেই ছোট দাদুমণি যে বলিয়াছিল এবার পূজোয় দোকানে খদ্দেরের ভীড় জমে নাই?"

কি উত্তর দিব? বলিলাম, "বুঝলে না দিদি, কোলকাতার লোক ৬০ লক্ষেরও উপর হয়েছে। কেউ কেউ বলেন প্রায় ৮০ লক্ষ। সংখ্যাটা যাই হোক, গতবারের চেয়ে অনেক বেশী লোক কোলকাতায় আছে। সেই তুলনায় ভীড় বাড়ে নাই। তা ছাড়া—

বলিতে বলিতে একটা বেশ বড় দোকানে প্রবেশ করিলাম। নাতনী নিজেই ফরমাইস করিল—"শাড়ী দেখান তো।"

অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বিক্রেতাটি একবার ফ্রক-পরা আমার নাতনীটির দিকে আর একবার আমার দিকে চাহিয়া আমাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দামের মধ্যে চাই।"

এবার নাতনীও আমার মুখের দিকে চাহিল। নিজের দারিদ্র্যকে যথাসম্ভব ক্ষুণ্ণ না করিয়া বলিলাম—"এই কম দামের মধ্যেই।"

কম দামের যে-সব শাড়ী আসিল সেগুলির কোনটা ৪০৲ টাকা, কোনটা ৪৫৲ টাকা, কোনটা ৫০৲ টাকা, আমার সাধ্যের অতীত। আরও কম দামের যখন চাহিলাম, তখন আমার প্রতি বিক্রেতার আগ্রহ একেবারেই কমিয়া গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। দেখিলাম, বিক্রেতারা সকলেই আমাদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ, তাঁদের অনেকেই দেখিলাম, ৬০।৭০ টাকা দামের কম কোন শাড়ী কিনেন নাই।

নাতনীটি আমার হাতে টান দিয়া বলিল, "চল দাদু এখান থেকে।" পথে বাহির হইয়া বলিলাম, "বুঝলে দিদি, এবার পূজায় ভীড় জমাচ্ছে কারা ?"

"বুঝলাম বৈ কি দাদু, তোমার ভাষায় যাঁরা বুর্জোয়া এবার শুধু তাঁদেরই ভীড়।"

হাসিয়া বলিলাম, "দূর পাগলী, ও-কথা বলতে নেই। তোমার দাদু যে গরীব তা তো লোকে বুঝবে না, ভাববে বুঝি কম্যুনিষ্ট। আসল কথা কি জানো দিদি, দামী শাড়ী-জামার বাজারই এবার জমেছে।"

এক দোকানে ২৪।২৫৲ টাকা দামের শাড়ীও দেখাইল। কিন্তু তাহাও কিনিবার ক্ষমতা আমার নেই। বিক্রেতা শাড়ীগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "মিলের শাড়ী কিনুন গে মশাই।"

সে দিনের জন্য শাড়ী কেনা মুলতুবী রাখিয়া দুই নাতির জন্য হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট কিনিলাম। হাফসার্ট, হাফপ্যাণ্ট, ফ্রক, ব্লাউজ, সায়া প্রভৃতি কাটা কাপড়ের প্রাচুর্য্য মন্দ নয়। দাম অবশ্য বাড়িয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় প্রায় শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী। এইগুলির বিক্রয় প্রায় গত বৎসরের সমানই হইয়াছে। কম হইলে শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগের বেশী কম নয়। যেমন করিয়াই হউক, ছোট ছেলেমেয়েদের পূজার কাপড় না দিলে চলে না।

দুইখানা ধুতি, বিধবা কাকীমার জন্য একখানা সাদা ধুতি এবং ঝিয়ের জন্য একখানা মিলের শাড়ী না কিনিলেই নয়। অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বক্তৃতা হইতে জানিয়াছিলাম, ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ৫২০০ গাঁইট মূল্যাঙ্কিত কাপড় কলিকাতার বাজারে এবং ১০২২ গাঁইট মূল্যাঙ্কিত কাপড় বিভিন্ন জেলায় প্রেরিত হইয়াছে। তা ছাড়া আরও ২ হাজার গাঁইট কাপড় বাজারে ছাড়া হওয়ার কথাও তিনি বলিয়াছেন! কাজেই অনেক ভরসা লইয়াই বাজারে বাহির হইলাম। বহু দোকান ঘুরিলাম, কিন্তু মিহি কাপড় পাইলাম না।

অনেক দোকান ঘুরিয়া শ্রান্ত দেহে ও ক্লান্ত মনে ধীরে ধীরে ফুটপাথের ভীড় অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। হাবলুর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখিয়াই বলিল, "ঠাকুরদাও বাজারে বেরিয়েছেন।"

হাসিয়া বলিলাম, 'না বেরিয়ে উপায় কি! কিন্তু এত মাটি কাটিয়াও যে কোহিনুর মিলিল না।"

"কোহিনূরটা কি ঠাকুর দা।"

"তাও বুঝলে না ভাই, মিহি ধুতি।"

হাবলু এক গাল হাসিয়া বলিল, "যা বলেছেন ঠাকুরদা, কোহিনুরই বটে!" বলিতে বলিতে বগলের পুঁটলিটা একবার হাত দিয়া নাড়িল। "বুঝলেন, দোকানের মালিকের যাঁরা বিশেষ পরিচিত বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, তাঁরাই মিহি ধুতি শাড়ী পেয়েছেন। তাও কি দাম জানেন ? ছাপ-মারা আছে ১২।/০ আনা, কিন্তু ১৮৲ টাকা জোড়ার কম কিছুতেই দেয় না।"

মিহি কাপড়ের আশা ছাড়িয়া সুশীল সুবোধ বালকের মত যাহা পাওয়া যায়, তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মূল্যাঙ্কিত-বিহীন মোটা ধুতি-শাড়ী কিছু কিছু পাওয়া গেল। দাম ১০৲ টাকা জোড়া ধুতির ১৫৲ টাকা। অনেক ধুতি-শাড়ী দেখিলাম, মূল্যের ছাপের উপর কালির ছাপ মারিয়া উহাকে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। দাম প্রায় শতকরা ৩০৲ টাকা বেশী। যেখানে নিয়ন্ত্রিত দরে কাপড় পাওয়া যায় সেখানে সুদীর্ঘ লাইন।

* * * *

নাতনীর শাড়ীর জন্য ষষ্ঠীর দিন আবার বাহির হইতে হইল। দশ দোকান ঘুরিয়াও একটা পছন্দমত জিনিষ পাওয়া যায় নাই—বিশেষ করিয়া আমাদের গরীব লোকের কিনিবার উপযোগী দামে। 'এই আছে মশাই, আর কিছু নেই, নিতে হলে এরই মধ্যে পছন্দ করে নিতে হবে,'—এ কথা প্রায় সব দোকানেই শুনেছি। এই অবস্থা অবশ্য আমার মত নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর সাধ্যায়ত্ত দামের জিনিষ সম্বন্ধেই। ৬০।৭০৲ টাকা বা ১০০।১৫০৲ টাকা দামের শাড়ীর ভেরাইটি মন্দ ছিল না। ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। হঠাৎ নাতনীটি বলিয়া উঠিল, "যাই বল দাদু, এবার পূজোয় ২০।২৫৲ আর ৪০।৫০৲ টাকা দামের শাড়ী কিন্তু খুব বিক্রি হয়েছে।" শাড়ীর ব্যাপারে মেয়েদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা খুব বেশী। তাহার কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ শাড়ী বিক্রি হয়ত শতকরা ত্রিশ ভাগ কম হইয়াছে। কিন্তু দাম বৃদ্ধির জন্য বরং বেশী হইয়াছে। কাহারা কিনিয়াছে এই শাড়ী? বাজার ঘুরিয়া মনে হইল, এই নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর একটা বিরাট অংশ পূজার বাজারে খুব সামান্য পরিমাণ জামা-কাপড়ই কিনিয়াছেন। নিজের অবস্থা দিয়াই বুঝি, গত বারের মত এবার পূজার বাজার করিতে গেলে, অবশিষ্ট মাসের বাজার-খরচ চলিবে না।

কোন দোকানই দেখা বড় বাকী ছিল না। যে দুই-একটা বাদ পড়িয়াছিল, নাতনীকে লইয়া তাহাই একবার দেখিলাম। দামের মধ্যে শাড়ী মিলে তো পছন্দ হয় না, আবার পছন্দমত যা শাড়ী পাওয়া যায় তাহার দাম আমার সাধ্যাতীত। নাতনীর জন্য একটা পছন্দমত শাড়ী কিনিয়া দিতে পারিতেছি না, এই দুঃখ আমাকে মর্ম্মান্তিক ভাবেই পীড়িত করিতেছিল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া নাতনীর বোধ হয় তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। হঠাৎ শাড়ী পছন্দ করা ছাড়িয়া আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, "থাক্ গে দাদু, এবারের পূজোয় আমার শাড়ী নাই বা হলো।"

আমার হাত ধরিয়া টানিয়া নাতনী যখন দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পূজা-মণ্ডপে বোধনের বাজনা বাজিতেছে।

সাহিত্য-পরিচয়

এবারের শারদীয়া সাহিত্য, ১৩৫৫

শারৎকালে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ফসলের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তার প্রধান কারণ অবশ্য কোন সাহিত্যিক প্রেরণা নয়, বাজার-দর। এই সময় বাংলা দেশের দুর্গা পূজো উপলক্ষে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ব্যবসায়ীদের মধ্যে "পূজা সংখ্যা" বা "শারদীয়া সংখ্যা" নামে এক বিচিত্র রচনা-সংকলন প্রকাশের হিড়িক প'ড়ে যায় প্রধানতঃ বিজ্ঞাপনের জন্যে। পণ্য-ব্যবসায়ীরা পূজোর জন্যে বিজ্ঞাপনের একটা স্পেশাল বাজেট ক'রে রাখেন, পত্রিকা ব্যবসায়ীরা সেই বাজেটের সদ্ব্যবহার করেন এবং সাহিত্যিক ও লেখকরা এই মরশুমে কিছু কামিয়ে নেবার জন্যে কলম কামড়ে-চিবিয়ে কুঁতে-মুতে যা প'রেন তাই লেখেন। এইটাই বাংলার তথাকথিত "শারদীয় সাহিত্যের" অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ-বছরেও এই বৈশিষ্ট্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সম্পাদকের দায়িত্ব

যে-কোন পত্রিকার "বিশেষ সংখ্যা" সম্পাদনা করার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। সম্পাদকের বিদ্যা-বুদ্ধি থাকা তো দরকারই, তার চেয়েও বেশী থাকা দরকার সাহিত্যবোধ এবং রুচিবোধ। বাংলা দেশের অধিকাংশ পত্রিকা-সম্পাদকের এই সাহিত্য ও শিল্প-রুচিবোধ একেবারে নেই বললেও ভুল হয় না। কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত বাংলা পত্রিকার "শারদীয়া সংখ্যাগুলি" পঞ্জিকার আকারে, পঞ্জিকার সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বাজারে বেরুত আর চাকুরে বাবুরা বৌ-ছেলে-মেয়ের ব্লাউস শায়া-সেমিজ-ফ্রকের সঙ্গে দু'-একখানা পাঁচসেরী পূজো সংখ্যা কিনে নিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করতেন পূজোর ছুটি কাটাবার জন্যে। অর্থাৎ আগে "শারদীয়া সংখ্যার" শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করত নীরেট দৈহিক ওজনের উপর, রুচি শ্রী সৌন্দর্য্য ও সুসাহিত্য পরিবেশনের কোন বালাই ছিল না বলা চলে। সজনীকান্ত দাসের শারদীয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা" সম্পাদনায় কৃতিত্বলাভের পর ১৩৫০ সনে, "যুগান্তর" পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার সম্পাদনায় বিনয় ঘোষ সর্ব্বপ্রথম যুগান্তর আনেন বলা চলে। সাহিত্যবিচার-বুদ্ধি ও শিল্পরুচিবোধ সজাগ থাকলে, দৃষ্টিভঙ্গী বলিষ্ঠ হ'লে সাহিত্য পত্রের সম্পাদনা কতটা উচ্চস্তরে উঠতে পারে, বিনয় ঘোষ তা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। এ-যুগের এক জন অন্যতম বলিষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে ন'ন শুধু, সম্পাদক হিসাবেও তাঁর এই নতুন অবদান সকলেই স্বীকার করবেন। তার পর থেকেই বাংলা পত্রিকা-সম্পাদনার গতানুগতিক স্থূলরুচিসম্পন্ন ধারায় একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এসেছে বললে ভুল হয় না।

কিন্তু তা হ'লেও এই পরিবর্ত্তন স্থায়ী হয়নি বা পরিণতিলাভ করেনি দেখা যায়। তার প্রধান কারণ, পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর বলিষ্ঠ সাহিত্যিকের শোচনীয় অভাব। এ-বছরের শারদীয়া সংখ্যার সম্পাদনায় নতুনত্বের চিহ্ন তেমন পাওয়া যায় না। একমাত্র দেখা যায়, "বসুমতী রজত জয়ন্তী সংখ্যা" ও "শারদীয়া বসুমতী"র সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক, বয়সে তরুণ হলেও, পক্ষপাত-শূন্য সাহিত্য-বিচার-বুদ্ধি, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, সুস্থ সচেতন সুতীক্ষ্ণ শিল্পরুচিবোধ নিয়ে সম্পাদনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। প্রাণতোষ ঘটক তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে এক জন অত্যন্ত বলিষ্ঠ লেখক। কিন্তু সম্পাদক হিসাবে তিনি ইতিমধ্যে যে প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ বললেও আদৌ অত্যুক্তি হয় না। "বসুমতী রজত জয়ন্তী সংখ্যার" মধ্যে তিনি আশ্চর্য্য সম্পাদনশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শুধু এই রজত জয়ন্তী সংখ্যার জন্যেই তিনি স্থায়ী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। এছাড়া এ-বছরের সমস্ত "শারদীয়া সংখ্যাগুলির" মধ্যে প্রাণতোষ ঘটক-সম্পাদিত "শারদীয়া বসুমতী" রচনা-সম্ভারে, শিল্প-সৌষ্ঠবে ও রূপ-পরিকল্পনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়েছে বলা চলে। এমন পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্পন্ন পত্রিকা আর কোনটাই হয়নি। অনেক দিন পরে অবশ্য বিনয় ঘোষ "শারদীয় সংবাদ" পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং এ-বছর যে-কেউ এই পত্রিকা দেখেছেন তিনিই স্বীকার করবেন, বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়-প্রতিভা সাহিত্যপত্রের উৎকৃষ্টতার জন্য কতটা আবশ্যক। এছাড়া, "শারদীয় দেশ" পত্রিকার সম্পাদনার কথাও উল্লেখ করা উচিত। রচনা সংকলনে "দেশ" পত্রিকার কোন অভিনবত্ব না থাকলেও, সম্পাদনায় ও রূপসজ্জায় যথেষ্ট রুচিবোধের পরিচয় আছে।

এ-বছরের শারদীয়া সংখ্যাগুলির মধ্যে রচনায় ও রূপসজ্জায় নিকৃষ্ট স্তরের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করতে হয় "পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা" ও "স্বরাজ" পত্রিকার। গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকার মধ্যেও বোধ হয় এর চেয়ে পঠিতব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয় অনেক বেশী আছে। গতানুগতিকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হ'ল "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "যুগান্তর" শারদীয়া সংখ্যা—এঁরা দু'জনেই আজ-কাল শুধু পুরনো নামের জোরে আর স্থূলদেহের ওজনে বাজারে বিকোচ্ছেন।

নতুন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার মধ্যে অনেকগুলির সম্পাদনা সত্যই প্রশংসনীয়। তার মধ্যে বিশেষত্বের দিক্ দিয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল—"দ্বন্দ্ব", "মধ্যবিত্ত", "অগ্রণী" ও "সাহিত্যপত্র"। এঁদের পুঁজিপাটা বেশী নেই, বাহুল্য বা বাহ্যাড়ম্বরও নেই, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। এঁদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেক কিছু আশা করব। নিরাভরণ বেশে সুসমৃদ্ধ সাহিত্য-পরিবেশনের গৌরবময় ঐতিহ্য "মাসিক বসুমতী", "শনিবারের চিঠি", "বিশ্বভারতী পত্রিকা" ও "পরিচয়" আজও যে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—এটাও আজকের দিনে কম আশার কথা নয়।

পত্রিকার রূপসজ্জা

পত্রিকার রূপসজ্জা ও রূপ-পরিকল্পনার সার্থকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্রিকা-সম্পাদকের শিল্পবোধের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে কোন সাহিত্য-পত্রিকার শিল্প-সম্পাদক (Art Editor) ব'লে কিছু নেই, তাই আজও সমস্ত দায়িত্বটা প্রায় সম্পাদককেই বহন করতে হয়। কিন্তু সম্পাদকের শিল্পবোধ থাকলেও, শিল্পী যদি শক্তিমান না হন, তাঁর যদি সাহিত্যবোধ না থাকে তাহ'লে সাহিত্য-পত্রিকার রূপসজ্জা কিছুতেই রুচিসম্মত করা সম্ভব নয়। এ-বছরের শারদীয় সংখ্যাগুলিকে যে-সব শিল্পী চিত্রিত করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েক জন অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিভাবান্ শিল্পীর পরিচয় আমরা পেয়েছি। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় গোপাল ঘোষ, মাখন দত্তগুপ্ত, সূর্য্য রায়, শৈল চক্রবর্ত্তী ও কালীকিঙ্করের। এবারের অনেক শারদীয়া সংখ্যা এঁদের তুলির ঐশ্বর্য্যে অনেক বেশী সমৃদ্ধ

হয়েছে সাহিত্য-রচনার তুলনায়। এছাড়া অক্ষরকলাও (Art of Lettering) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-বছরে তরুণ শিল্পী খালেদ চৌধুরী ও বাণীকুমার অক্ষরকলায় তাঁদের প্রতিভার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে যে-কেউ তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবেন। ব্যঙ্গচিত্রে রেবতীভূষণের শক্তির পরিচয় এবার স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে এবং তাতে অন্ততঃ এইটুকু আশা করা যায় যে, "কাফি খাঁ" ওরফে "পিসিয়েলের" একঘেয়েমি থেকে খানিকটা আমরা মুক্তি পাব।

সুসাহিত্যের অভাব

বাংলা সাহিত্যে যে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মহামারীও দেখা দিয়েছে তা এ-বছরের শারদীয় সাহিত্য পড়লেই বেশ বোঝা যায়। মহামারীটা হ'ল রাজনৈতিক। এত দিন প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের মধ্যে একটা আদর্শগত দ্বন্দ্ব চলছিল, এবারে সেই দ্বন্দ্ব ও বিরোধটা অনেক বেশী তীব্র ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহামারীর মতো রাজনৈতিক ব্যাধি সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। একথা অবশ্য বলছি না যে, রাজনীতি বর্জ্জন করতেই হবে সাহিত্যে। জীবনে যা বর্জ্জন করা যায় না তা সাহিত্যে কি ক'রে বর্জ্জন করা সম্ভব হবে? তবে ময়দানের লাঠালাঠি আর বক্তৃতা মঞ্চের হাত ছোড়াছুড়িটা যদি গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে তাহ'লে তাকে সাহিত্য-মর্য্যাদা দিতে রুচিতে বাধে। এ-বছরের শারদীয়া সংখ্যায় যে তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে "আনন্দবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত বনফুলের "মানদণ্ড" উপন্যাসখানি পড়লে এই উক্তির তাৎপর্য্য যে-কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন। বনফুলের মতো এক জন প্রবীণ শক্তিশালী সাহিত্যিকের জানা উচিত ছিল যে, কথাসাহিত্যে সব সময় রাজনৈতিক বা দার্শনিক বিদ্যা জাহির করা যায় না, করা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। তারাশঙ্করের "তিমির-তীর্থ" উপন্যাস ('স্বরাজ' পত্রিকায়) পড়লে মনে হয় তাঁর কিছু দিন বিশ্রাম নেবার সময় এসেছে। "অভিবাদন" পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম কিস্তি পড়লে তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবসাদ সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশই থাকে না। ভাল গায়ক যাঁরা, তাঁরা যেমন আসরে গান শুরু করতে জানেন, তেমনি শেষ করতেও জানেন। আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের এই বোধশক্তি নেই। সাহিত্যের আসর থেকে আজ অনেকেরই বিদায় নেবার সময় হয়েছে, কিন্তু তাঁদের সে হুঁশ নেই। উপন্যাসের মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের "একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী" (শারদীয়া বসুমতী) সহজ সাবলীল ঝর ঝরে রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস হিসাবে কোন অভিনবত্ব না থাকলেও অচিন্ত্যকুমারের রচনার মুনশীয়ানার জন্যে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হয়েছে। ছোট গল্পের মধ্যে এ-বছর প্রেমেন্দ্র মিত্রের "আয়না" (পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ছোট বকুলপুরের যাত্রী" (শারদীয় সংবাদ) ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনেক লিখেছেন, কোন পত্রিকাই বাদ দেননি এবং প্রাণে যা এসেছে তাই লিখেছেন। সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়ে পয়সা কামাবার এবং সর্ব্বঘটে কাঁঠালি কলা সাজার একটা অদম্য প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এই সাহিত্যাভিযান থেকে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক-নিষ্ঠা সম্বন্ধে আজ সন্দেহ জাগার অনেক কারণ ঘটেছে। নবেন্দু ঘোষের গল্প লেখা অনতিবিলম্বে ছাড়া উচিত, মনের দুঃখে গল্প না লিখেও আরও যে অনেক ভাল কাজ করা যায় এ-কথা তাঁর জানা উচিত। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য অনেক দিন পরে গল্প লিখতে আবার আরম্ভ করেছেন, কিন্তু তাঁর আগেকার ক্ষমতার বিশেষ কোন পরিচয় এবারে অন্ততঃ আমরা পাইনি। গল্পের চেয়ে এ-বছরের রসরচনাগুলি অনেক বেশী ভাল হয়েছে দেখা যায়। নন্দীভৃঙ্গীর রচনাগুলি (শারদীয়া বসুমতী, অরণি, যুগান্তর) অন্যান্য বছরের তুলনায় এ-বছর অনেক জোরালো হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী, রমাপদ চৌধুরী ও আশাপূর্ণা দেবীর রস-রচনাও (শারদীয়া বসুমতী) বেশ ভাল হয়েছে। মারীচের "রামরাজ্য—সেকাল ও একাল" (শারদীয়া বসুমতী) উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গরচনা। এছাড়া বিনয় ঘোষের "বাবুপুরাণ" ("মধ্যবিত্ত" পত্রিকা) এবং ননী ভৌমিকের "কার্য্যকারণ" (শারদীয় সংবাদ) এ-বছরের শক্তিশালী ব্যঙ্গ-রচনা হিসাবে উল্লেখ করতে হয়। ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে বনফুলের "ভাবী মন্ত্রীর অবশ্যম্ভাবী বক্তৃতা" (শারদীয়া বসুমতী) এবং বিমলচন্দ্র ঘোষের "পঞ্চভূতের পাঁচালী" (শারদীয় সংবাদ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

কবিতা এ-বছর যা প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই অপাঠ্য। বুদ্ধদেব বসু ও জীবানন্দ দাশ (শারদীয়া বসুমতী) যে দু'-একটি কবিতা লিখেছেন তা রোমান্টিক ও মিষ্টিক হলেও ভাল কবিতা। বিষ্ণু দে এ-বছর এমন ভাবে বানচাল হয়ে গেলেন কেন? তরুণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনেক দিন পরে এ-বছরে কয়েকটি কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা (শারদীয় সংবাদ, পরিচয়, অরণি, অগ্রণী) আশ্চর্য্য সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবিতার ক্ষেত্রে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গোপাল ভৌমিক প্রভৃতি কয়েক জনের এখনও অনধিকার প্রবেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত।

বাংলা দেশে কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখকদের মতো তথাকথিত "অরিজিন্যাল" ও "ক্রিয়েটিভ" লেখক প্রতিদিন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠলেও, চিন্তাশীল শক্তিশালী প্রবন্ধ-লেখকের অভাব অত্যন্ত বেশী। এ-বছরের প্রবন্ধ-লেখকদের মধ্যে ডাঃ সুশীলকুমার দে (আনন্দবাজার পত্রিকা), ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী (বিশ্বভারতী পত্রিকা), গোপাল হালদার (পরিচয়) যোগেশচন্দ্র বাগল (শারদীয়া আনন্দবাজার) এবং বিনয় ঘোষের (শারদীয় সংবাদ ও অরণি) নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের "ভদ্রলোক মজুর" রচনাটিও (শারদীয় সংবাদ) সুরুচিত ও সুচিন্তিত রচনা হিসাবে উল্লেখ করা উচিত।

১৩৫৫ সনের শারদীয় বাংলা সাহিত্যের এই হ'ল মোটামুটি খসড়া পরিচয়।

এ বছরের শারদীয়া বিজ্ঞাপন

শিল্পপ্রচারণী

বিজ্ঞাপন হ'ল মালিকের মালবিক্রীর প্রতিনিধি বা "সেল্‌স-ম্যান"। এ কথাটা বিজ্ঞাপনদাতারা, অর্থাৎ পণ্যের মালিকরা জেনেও জানেন না বলে মনে হয়। তা যদি জানতেন তাহ'লে বিজ্ঞাপনের মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁরা আরও অনেক বেশী সচেতন হতেন। মালিকরা যখন তাঁদের জিনিসের কাটতির জন্যে কোন "সেল্‌সম্যান" নিযুক্ত করেন তখন নিশ্চয়ই যাকে-তাকে করেন না। মনে করুন, প্রসাধনের সামগ্রী বাজারে চালু করার জন্যে যদি কেউ "সেল্‌সম্যান" চান তাহ'লে এ্যাপ্লায়েড কেমিষ্ট্রীতে বিশেষজ্ঞ এক জন ভারিক্কি মেজাজের লোক সে কাজে বহাল করলে তাঁকে আফশোস করতে হবে। কারণ কেমিষ্ট্রীতে পাণ্ডিত্য প্রসাধন দ্রব্যের সেল্‌সম্যানের অন্যতম গুণ হিসেবে গণ্য না করলেও চলে। সেল্‌সম্যান যিনি হবেন তাঁর সর্বপ্রথম "স্মার্ট" হওয়া দরকার, কুণ্ঠা ও জড়তার ভাব যদি তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে তাহ'লে তিনি এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি কিছুতেই হতে পারবেন না। স্মার্ট তাঁকে হতেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে অতিরিক্ত স্মার্ট হ'লে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ স্মার্ট সেল্‌সম্যান বলতে ফাজিল-ফক্কোড় বাচাল সেল্‌সম্যান বুঝায় না। কোন্ ব্যক্তির কাছে কি কথা বলতে হবে, কতটা কথা বলতে হবে এবং কি ভাবে বলতে হবে, সেটা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা ক'রে যিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় কার্যক্ষেত্রে দিতে পারেন, তিনিই সার্থক সেল্‌সম্যান হতে পারেন। এ ছাড়া, সেল্‌সম্যানের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে আচার ব্যবহার, স্বভাব পর্যন্ত যদি সাধারণ মানুষের মনের মতন না হয় তাহ'লে যে তাঁর দ্বারা কোন কাজই হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। পোশাক-পরিচ্ছদ যত দূর সম্ভব রুচিসম্মত ও পরিচ্ছন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়, আচার-ব্যবহার ও স্বভাবের মধ্যে শিষ্টতা, মিষ্টতা ও শালীনতাবোধ বেশী পরিমাণে থাকাই কাম্য। পোশাক-পরিচ্ছদে বা ব্যবহারের মধ্যে যদি উগ্রতা বা কষ্ট-কল্পিত উদ্ভট্ব প্রকাশ পায় তাহ'লে কোন জিনিস সম্বন্ধে লেকচার শোনার আগেই যে কোন সুস্থ লোকের হাড়-পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে উঠবে সেই সেল্‌সম্যানকে দেখে। অনেকে বলবেন, তাহ'লে তো "তানসেন গুলি" বা "আশ্চর্য্য মলম" চলন্তি ট্রেনে একেবারেই বিক্রী হ'ত না এবং পাড়ায় পাড়ায় বহুরূপী ক্লাউনবেশী চোঙাফোঁকা নকুলদানা বিক্রেতাকে দেখেও ছেলেপিলের ভীড় জমত না। এ কথার উত্তর হ'ল, তানসেন গুলি বা নকুলদানা যারা এই ভাবে বিক্রী করে তারা জানে বিক্রীর বহরটা তাদের কি রকম, এবং তাতে তাদের পেট চলাও দায় হয়। যে জিনিসের কোন রকম বাজারী চাহিদা হবার কোন সম্ভাবনা নেই তাকে কিছুটা চালিয়ে নিজের পেটটা চালু রাখার জন্যেই এই শ্রেণীর ক্লাউন-সেল্‌স-ম্যানের আবির্ভাব। লোকে চারটে পয়সা দিয়ে একটা আশ্চর্য্য মলম কেনে, মলমের আশ্চর্য্য গুণের জন্যেও নয়, অথবা বিক্রেতার আশ্চর্য্য প্রচার-পটুতার জন্যেও নয়, পেটের দায়ে মানুষ যে সার্কাসের ক্লাউনও হ'তে পারে তারই প্রত্যক্ষ পরিচয়ে আশ্চর্য্য হয়ে। কলকাতায় যাঁরা থাকেন তাঁরা কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলের "Help me, Sir!" ব্যক্তিটিকে নিশ্চয়ই এক-আধ বার দেখেছেন। কত দিন আমি নিজের চোখে দেখেছি, লোকে পয়সা দিয়ে তার কাছ থেকে পান কিনে দূরে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ট্রেনের আশ্চর্য্য মলম থেকে কলেজ ষ্ট্রীটের দু'খিলি পান পর্যন্ত এই "Help me, Sir" ব্যাপার, "Salesmanship" নয়। পণ্যের মালিক যদি মনে করেন যে ক্রেতাদের কাছে তাঁর পণ্য-প্রচারের অর্থ হ'ল "Help me, Sir" আবেদন, তাহ'লে বলার কিছু নেই। কিন্তু সেল্‌সম্যানশিপ নিশ্চয়ই তা নয়, এবং সেল্‌সম্যানকেও তাই কিছুতেই "ক্লাউন" ভাবতে পারা যায় না।

ক্যাসেলস্ লিঃ

শুভেচ্ছা প্রীতি সম্ভাষণ

এই উৎসবের দিনে আমরা আপনাদের সুখ ও শান্তি কামনা করি।

ই.আই • বি.এন

ই আই—বি, এন

বিজ্ঞাপনটা হ'ল মালিকের সেল্‌সম্যান, এবং ভাল বিজ্ঞাপনেরও ভাল সেল্‌সম্যানের প্রত্যেকটি গুণ থাকা দরকার। ভাল 'বিজ্ঞাপন' প্রথমত "স্মার্ট" বা "এ্যাট্রাকৃটিভ" হবে, যত দূর সম্ভব ভদ্র, শিষ্ট ও সুরুচিসম্মত হবে, কোন রকম উগ্রতা বা "ওভার স্মার্টনেস্" তার মধ্যে থাকবে না। তাছাড়া, ভাল সেল্‌স্‌ম্যানের পোশাক ও চেহারা যেমন মনোরম হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি ভাল বিজ্ঞাপনের বহিরঙ্গসজ্জা দৃষ্টিপ্রিয় হওয়া একান্ত কাম্য। তাই বিজ্ঞাপন-কলা সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ বলেছেন: "The Advertisement is the manufactuer's Salesman, and its physical dress should be in keeping with the presentability he could expect of his representative."—(Frank H. Young, Director, American-Academy of Art).
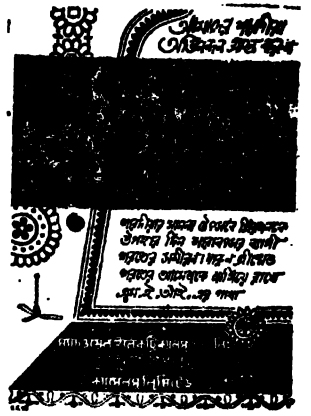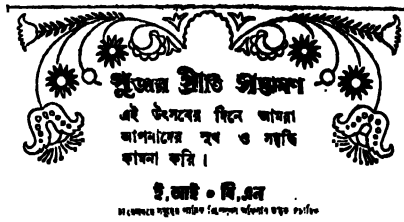
হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

পূজোর বাংলা বিজ্ঞাপন

এ বছরে পূজোর বাংলা বিজ্ঞাপনগুলি দেখলে এ কথা সবার আগে মনে পড়ে। "বিজ্ঞাপনটা" যে তাঁদের "সেলস্‌ম্যান", এ-সম্বন্ধে অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতাই সচেতন নন। অথচ তাঁরা যথেষ্ট পয়সা খরচ করেছেন এবং করেন। তবু এই চেতনাটুকু না থাকার দরুণ তাঁদের অর্থের অপচয় হয়েছে বললেও ভুল হয় না। কোন পত্রিকার পৃষ্ঠাতে এ কথা বলা হ'চ্ছে দেখে অনেকে হয়ত বিস্মিত হবেন, কারণ তাঁদের ধারণা যে "বিজ্ঞাপন" যত দৃষ্টিকটুই হ'ক না কেন তা নিয়ে সমালোচনা করা ঠিক নয়, যেহেতু বিজ্ঞাপনদাতারা পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক এবং পত্রিকার মালিককে পয়সা দেন। কিন্তু আমাদের ধারণা ঠিক উল্টো। বিজ্ঞাপনদাতারা পত্রিকার মালিকের পৃষ্ঠপোষক বলেই প্রত্যেক পত্রিকার এটা প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত বিজ্ঞাপনের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা। আমাদের দেশে, অত্যন্ত দুঃখের কথা, আজও এই আলোচনার রীতি প্রচলিত হয়নি। ইউরোপে ও আমেরিকায় এটা অত্যন্ত বেশী প্রচলিত। ও-সব দেশের যে-কোন উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত পত্রিকার মালিকেরা নিজেদের একটা "প্রচার-বিভাগ" বা "ষ্টুডিও" রাখেন। বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপনের "কপি" বা "ব্লক" পাঠালে সোজা সেটাকে প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয় না। পত্রিকার প্রচার-বিভাগ থেকে সেটাকে পরীক্ষা করে দেখা হয়, সামান্ত অদল-বদল ক'রে যদি কোন "কপি" আরও সুন্দর ও সার্থক করা যায় তাও তাঁরা ক'রে দেন অথবা "সাজেশান" দিয়ে আবার বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পাঠিয়ে দেন, তার পর সেটা ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে কোন রকমে পয়সা মারা যাঁদের উদ্দেশ্য তাঁরা এ-কাজ করার প্রয়োজন বোধ না করতেও পারেন। কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে বিজ্ঞাপনদাতারা যেহেতু পয়সা দেন, সেই জন্ত তাঁদেরও দেখা উচিত যাতে বিজ্ঞাপনদাতারাও দু'টো পয়সা পান, তাঁরা 'বিজ্ঞাপন' নিয়ে আলোচনা করবেনই। যে হাঁস ডিম পাড়ে তাকে একেবারে খেয়ে ফেলার ব্যবস্থা না করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত নয় কি? অবশ্য এ কথা ঠিক যে আজকাল অনেক "পাবলিসিটি ষ্টুডিও" হয়েছে, তাঁরাই বিজ্ঞাপনদাতাদের সমস্ত কাজকর্ম করেন। কিন্তু সমস্ত পাবলিসিটি ষ্টুডিও একই স্তরের নয়, সকলেরই সুদক্ষ শক্তিশালী শিল্পী বা "লে-আউট"-বিশেষজ্ঞ নেই, সুতরাং তাঁদের সমালোচনা করাটাও অন্যায় নয়। তাছাড়া, এমন হাজার হাজার মধ্য শ্রেণীর এবং ছোট ব্যবসাদার আছেন যাঁরা পাবলিসিটি ষ্টুডিওর দ্বারস্থ হতে পারেন না, অথবা উপযুক্ত বেতন দিয়ে পাবলিসিটি অফিসারও রাখতে পারেন না, নিজেরাই কোন রকমে কপি তৈরী করে পাঠিয়ে দেন। এ কথা সব সময় মনে রাখা উচিত যে, ব্যবসাক্ষেত্রে এঁদের সংখ্যাই বেশী এবং পত্রিকার "বিজ্ঞাপনের আয়" এঁদের কাছ থেকে অল্প অল্প ক'রে নিয়ে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে সংগৃহীত হয়, অথচ এঁরাই অবহেলিত হন অত্যন্ত বেশী। এঁদের জন্ত প্রধানতঃ বিলেত ও আমেরিকার প্রত্যেক ভাল পত্রিকার নিজের ষ্টুডিও বা "আর্ট এডিটার" থাকে। আমাদের দেশে এ-সম্বন্ধে পত্রিকা-পরিচালকেরা কবে সচেতন হবেন? অনেক ছোট-মাঝারি বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রায়ই অভিযোগ করতে শোনা যায় যে যথেষ্ট জনপ্রিয় পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়েও তাঁরা তেমন "সাড়া" (Response) পান না। কারণটা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, পত্রিকা জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বিজ্ঞাপনটি যেহেতু "জনপ্রিয়" বা "দৃষ্টিপ্রিয়" হয় না, সেই জন্যই তা পাঠক-ক্রেতাদের নজরে পড়ে না এবং তাঁরা ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যান।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সিকি পৃষ্ঠা ও আধ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন

মুশকিল হ'চ্ছে ছোট ও মাঝারি বিজ্ঞাপনদাতাদের নিয়ে। অর্থাৎ যাঁরা সিকি পৃষ্ঠা, আধ পৃষ্ঠা, এক কলাম, আধ কলাম ইত্যাদি সাইজের বিজ্ঞাপন দেন তাঁদের সমস্যাটাই সবচেয়ে জটিল। এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনদাতাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলব। একটা কোন "পত্রিকা" ধরেই আলোচনা করলে সুবিধা হয় এবং তার জন্তে এ বছরের "শারদীয়া বসুমতী" (১৩৫৫) বেছে নিচ্ছি। এর মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁরা অন্যান্য অধিকাংশ পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এবং আকারেও যেহেতু "শারদীয়া বসুমতী" প্রামাণ্য পত্রিকা, সেই জন্ত বিজ্ঞাপনের সাইজেরও বিশেষ কোন পার্থক্য কোথাও হবে ব'লে মনে হয় না। মোটামুটি সমস্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার ছোট বিজ্ঞাপনদাতাদের সম্বন্ধে আলোচনা "শারদীয়া বসুমতীর" মারফতেই হবে ব'লে মনে হয়।

ছোট সাইজের বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন। তাঁদের প্রথম মনে রাখা উচিত যে, একই পৃষ্ঠায় আরও অনেক বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞাপনও থাকবে। সিকি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন যাঁরা দেবেন তাঁদের ভাবা উচিত যে চারটে সিকি পৃষ্ঠার, অথবা একটা আধপৃষ্ঠা আর দু'টো

শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ

সিকি-পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন সাজিয়ে পূরো এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ছাপা হবে। আধ পৃষ্ঠা, এক কলাম, আধ কলাম বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও তাই। পাঠ্য বস্তুর সঙ্গে যাঁরা একাই প্রকাশিত হতে চান তাঁদের সমস্যাও কম নয়। প্রথমতঃ, পাঠ্য বস্তু চারি দিক থেকে এসে ভীড় করবে, এবং তার সঙ্গে "illustration" বা ছবিও থাকতে পারে। সুতরাং পূরো এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন যাঁরা না দেবেন তাঁদের সকলেরই কম-বেশী একই সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। সমস্যাটা হ'ল, অন্যান্য বিজ্ঞাপন এবং পাঠ্য-বস্তু ও চিত্র থেকে নিজের ছোট বিজ্ঞাপনটিকে "স্বতন্ত্র" (isolate) করা। ছোট বিজ্ঞাপনের এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সব চেয়ে বড় সমস্যা। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে সবার আগে বিজ্ঞাপনের "জায়গা" (space) সম্বন্ধে চেতনা থাকা দরকার। সিকি পৃষ্ঠার বা আধ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের সবটুকু জায়গা জুড়ে কপি তৈরী ক'রে যদি মনে করেন যে পত্রিকার কাছ থেকে বিজ্ঞাপন-মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নিলেন, তাহ'লে মারাত্মক ভুল করবেন। বর্ডার বা রুল দিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের সীমানা টেনে রাখতে পারেন, কেউ তার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করবে না। তার পর তার মধ্যে বিজ্ঞপ্তিটুকু যদি তাঁরা চারি দিকে খানিকটা "সাদা জায়গা" (white space) ছেড়ে দিয়ে সাজিয়ে দেন তা'হলে স্বচ্ছন্দে সেটা অন্যান্য বিজ্ঞাপনের গাত্রস্পর্শ না করেও একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এবং সহজেই পাঠক-ক্রেতার নজরে পড়তে পারে। তা না করে সকলেই জ্ঞাতব্য তথ্য আর পাঠ্য দিয়ে বা ব্লক দিয়ে যদি সমস্ত জায়গাটা জুড়ে থাকেন, তা'হলে ঠাসাঠাসি আর ভিড়ের চাপে সকলের ব্লক, পাঠ্য-বস্তু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, কারও কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না, ক্রেতাদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় না। ভিড়ের মধ্যে ব্যক্তির যেমন ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তেমনি বিজ্ঞাপনেরও অস্তিত্ব থাকে না। এই "সাদা জায়গার" গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞাপনদাতা সচেতন নন, তাঁদের ধারণা যেটুকু জায়গা পাওয়া যায় তা জ্ঞাতব্য বিষয় দিয়ে আগাগোড়া ঠেসে দেওয়া উচিত। তাতে বিজ্ঞাপন একেবারে খোঁড়া হয়ে যায়। পত্রিকার মালিকরা এদিক্ দিয়ে বিশেষ কিছুই করতে পারে না, কারণ সমস্ত ছোট বিজ্ঞাপন কোন পত্রিকার পক্ষেই "স্বতন্ত্র" ভাবে ছাপা সম্ভবপর নয়। বেশী বা বিশেষ মূল্যের বিনিময়ে কয়েকটি হয়ত তাঁরা "স্বতন্ত্র" ছাপার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাও সেখানে আবার পত্রিকার পাঠ্য বস্তু ছবি ইত্যাদির সমস্যা রয়েছে। সুতরাং ছোট বিজ্ঞাপন মাত্রই চারি দিকে পরিমিত "সাদা জায়গা" ছেড়ে দিয়ে "স্বতন্ত্র" করার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সাধারণ নিয়মটির অসাধারণ গুরুত্ব সম্বন্ধে ছোট বিজ্ঞাপনদাতাদের অত্যন্ত সচেতন থাকা দরকার। "সাদা জায়গা" ছাড়া সম্বন্ধেও কয়েকটি নিয়ম আছে যা জানা উচিত। বিজ্ঞাপনের দু'টো পাশে (side) সমান জায়গা থাকবে, আর মাথার উপরে (top) যতটা জায়গা ছাড়া হবে, নীচের দিকে (bottom) অন্ততঃ তার দেড় গুণ জায়গা অবশ্যই ছাড়া দরকার। তা না হ'লে বিজ্ঞাপন "তলা-ভারি" (Bottom-heavy) হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, এবং সেটা সাধারণতঃ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। এইটুকু মনে রাখলেই অনেক কাজ হয় এবং ছোট বিজ্ঞাপন-দাতারা অনেক বেশী উপকৃতও হতে পারেন।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

"শারদীয়া বসুমতীর" ছোট বিজ্ঞাপনদাতারা সকলে এ-নিয়ম পালন করেননি ব'লে তাঁদের বিজ্ঞাপন যতটা সার্থক (effective) হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। প্রথমতঃ সূচীপত্রের তলায় যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁদের অনেকেই লক্ষ্য করলেই এটা বুঝতে পারবেন। "শারদীয়া বসুমতীর" ১২২ পৃষ্ঠায় যে চারটি সিকি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন আছে তার প্রত্যেকটি অতিরিক্ত বক্তব্যের ভারে নড়া-চড়ার শক্তি তো হারিয়ে ফেলেছেই, স্বতন্ত্র সত্তা পর্য্যন্ত তাদের হারিয়ে গেছে। কুকার ইন্‌সিওরেন্স যন্ত্রপাতি সব একাকার হয়ে গেছে। অথচ বক্তব্য একটু অল্প ক'রে চারি দিকে খানিকটা "সাদা জায়গা' ছেড়ে দিলে, চারটে কেন আটটা বিজ্ঞাপন এক পৃষ্ঠায় সাজিয়ে দিলেও ক্ষতি হত না। ১২৪ পৃষ্ঠায় যে দু'টি সিকি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন আছে তাতে এই নিয়ম মোটামুটি রক্ষা করা হয়েছে ব'লে তা অনেক বেশী সার্থক হয়েছে। ১৩২ পৃষ্ঠার ও ১৩৩ পৃষ্ঠার "ডবল কলাম" বিজ্ঞাপন দু'টিও এই কারণে সার্থক হয়েছে অনেক বেশী। ছোট বিজ্ঞাপনদাতাদের তাই "সাদা জায়গা" সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সচেতন থাকা দরকার। সেই জন্যই পত্রিকার বিজ্ঞাপনে "সাদা জায়গার" গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শিল্পী যে মন্তব্য করেছেন তা প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতার ও প্রচারশিল্পীর মনে রাখা উচিত। "সাদা জায়গা" সম্বন্ধে মিঃ ইয়ং বলেছেন :

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স

"For attentive value, white space is as powerful as solid black. The layout man should realise that white space is one of the most valuable materials with which he has to work, and perhaps no one has so many uses."

এম, এল বসু এণ্ড কোং লিঃ

'শারদীয়া বসুমতীর' ছোট বিজ্ঞাপনের মধ্যে লে-আউট ও পরিকল্পনার দিক্ থেকে উল্লেখযোগ্য হ'ল, "ই, আই ও বি, এন রেলওয়ে" "লিষ্টার এ্যাণ্টিসেপটিক্স্" ও "ক্যাসেলস্ লিঃ"। রেলওয়ের বিজ্ঞাপনটি আধ পৃষ্ঠার হলেও অল্প কথা এবং "সাদা জায়গা" থাকার জন্তে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছে। "লিষ্টারের" আধ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনটির পরিকল্পনা ভাল, কিন্তু আরও অনেক ভাল হ'ত যদি "পাঠ্য-বস্তুর" টাইপটা স্মল পাইকায় এবং লোগোটাইপটা হস্তাক্ষরে আরও বোল্ড ক'রে দেওয়া হ'ত। "ক্যাসেল্সের" বিজ্ঞাপনটিতেও যথেষ্ট সুরুচির পরিচয় আছে। উপর-নীচে আরও একটু "স্পেস্" নিয়ে রুল দিয়ে যদি বিজ্ঞাপনটি সাজানো হ'ত তাহ'লে বিজ্ঞাপনটা খুলত অনেক বেশী। এই জন্তই বলেছি যে ছোট বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের মোট "স্পেসের" দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞপ্তির বিষয় তৈরী করা উচিত।

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

বড় "ফুলপেজ" বা পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন

পত্রিকাতে "ফুলপেজ" বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক বিন্যাসের যেমন সুযোগ আছে তেমন আর কারও নেই। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সমস্তা ফুলপেজীদের অনেক কম হলেও একেবারেই যে নেই তা নয়। পাশের পৃষ্ঠার পাঠ্য-বস্তু ও চিত্রের সমস্তা থেকেই যায়। তাছাড়া, ডান-বাঁর সমস্তাও আছে। ফুলপেজ বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক বিন্যাস সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলা উচিত। পূরো এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের যদি বক্তব্য বিষয় ঠেসে দেওয়া হয় তাহ'লে তা পাশের পৃষ্ঠার পত্রিকার পাঠ্য-বস্তুর সঙ্গে মিশে গিয়ে তার বিশিষ্টতা সহজেই হারিয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং এখানেও সেই চারি দিকে পরিমিত "সাদা জায়গা" ছাড়ার প্রশ্ন আসে। তাছাড়া, যদি ছবি পাঠ্য-বিষয় দিয়ে বিজ্ঞাপন তৈরী করা হয় তাহ'লে ডান দিক্ ও বাঁ দিকের পৃষ্ঠা সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। বাঁ দিকে যাঁরা ফুলপেজ বিজ্ঞাপন দেবেন তাঁদের বিজ্ঞাপনের ছবি যদি থাকে সেটা বাঁ দিকে এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় যাঁরা দেবেন তাঁদের ডান দিকে থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহ'লে পত্রিকার ছবির সঙ্গে কোন রকমে "clash" করার সম্ভাবনা থাকে না। এই কথা মনে রেখেই "লে-আউট"-শিল্পীর বিজ্ঞাপনের কপি তৈরী করা উচিত এবং কপি প্রেসে দেবার সময় বিশেষ নির্দ্দেশও দেওয়া দরকার। মোটামুটি এই নিয়ম মেনে বিজ্ঞাপনের ছবির সঙ্গে "Text", "Caption" ও "Logotype"এর যদি সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় তাহ'লে ফুলপেজ বিজ্ঞাপন বেশ সার্থক ও সুন্দর হতে পারে।

লিষ্টার এ্যাণ্টিসেপটিকস

এ বছরের শারদীয়া "ফুলপেজ" বিজ্ঞাপন অন্তান্ত বছরের তুলনায় অনেক বেশী সুন্দর ও সার্থক হয়েছে ব'লে মনে হয়। আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনদাতারা ও প্রচারশিল্পীরা বিজ্ঞাপনের আঙ্গিক বিন্যাস সম্বন্ধে যে যথেষ্ট সজাগ হয়েছেন তা "শারদীয়া বসুমতীর" কয়েকটি ফুলপেজ বিজ্ঞাপনের নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। প্রথমে চতুর্থ কভারের "লক্ষ্মী ঘির" বিজ্ঞাপনটি দেখলেই বোঝা যায় যে বিজ্ঞাপনের লে-আউটের কতটা উন্নতি হয়েছে। এছাড়া "শ্রীদুর্গা কটন মিল", "সি, কে, সেন", "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর", "ওরিয়েণ্টাল মেটাল", "এম্, এল, বসু", "হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স", "রায় ব্রাদার্স" প্রভৃতি কয়েকটি বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। শ্রীদুর্গা, সি, কে, সেন, হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর, হিন্দুস্থান, রায় ব্রাদার্স, ওরিয়েণ্টাল মেটাল ও এম, এল, বসু—প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনার মধ্যে এমন ভাবে সঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছে যা সচরাচর বাংলা বিজ্ঞাপনে হয় না। প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনই ডান দিকের পৃষ্ঠার বিশেষ উপযোগী এবং শারদীয়া বসুমতীতে ডান দিকেই ছাপা হয়েছে। কেবল "শ্রীদুর্গা কটন মিলে"র বিজ্ঞাপনটি যদি আকারে চারি দিকে আর আধ ইঞ্চি আন্দাজ ছোট হত তাহলে আরও অনেক বেশী effective হত বলে মনে হয়। আবার তাই বলছি, প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতার ও প্রচারশিল্পীর "white space" সম্বন্ধে আরও অনেক বেশী সজাগ হওয়া দরকার। "সাদা জায়গা"র সদ্ব্যবহার যদি বিজ্ঞাপনের চারি দিকে ঠিক প্রয়োজন মতন করা যায় তাহ'লে সেটা "ফ্লাডলাইটের" কাজ করে, সমস্ত বিজ্ঞাপনটা তারই গুণে আলোকিত হয়ে ঝলমল করে চোখের সামনে। এ কথাটা সবার আগে সব সময় মনে রাখা উচিত। *

* এই প্রবন্ধে বিজ্ঞাপনের ক্ষুদ্রাকার প্রতিলিপি ব্যবহার করার জন্ত মেশার্স ডি, জে, কেমার এণ্ড কোং লিঃ, ক্যালকাটা পাবলিশিটি সার্ভিস, নিউ ইণ্ডিয়া পাবলিশিটি, প্রিমিয়ার পাবলিশিটি সার্ভিস, ভারতী পাবলিশিটি সার্ভিস, সার্ভিস এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী, লাকি এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী, অ্যালকা এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সী, মীনা পাবলিশিটি, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স ও কলিকাতা রেলওয়ে সমূহের পাবলিক রিলেসনস অফিসের সৌজন্ত স্বীকার করি।

পত্রগুচ্ছ

নেপোলিয়ানের চিঠি

[ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয়ের পর নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করেন। দেশবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসা ও পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কয়েক জন সহকর্মীর হীন ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁকে এই পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। এর পর তিনি বৃটিশ আইনের ছায়াতলে আশ্রয়ের আশায় স্বেচ্ছায় ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বৃটিশ শাসকবৃন্দের মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ হয়ে নেপোলিয়ান 'বেলোরো ফোন' নামক জাহাজে পদার্পণ করা মাত্রই বন্দী হন এবং সেই অবস্থাতেই তাঁকে 'সেন্ট হেলেনা'তে প্রেরণ করা হয়। নেপোলিয়ান বৃটিশ-প্রজা ছিলেন না এবং ইংলণ্ডের আইনভুক্ত এলাকাতেও নেপোলিয়ান কর্তৃক কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়নি। কাজেই ইংরেজের আইন তাঁর ক্ষেত্রে প্রযুজ্য ছিল না। ইংলণ্ডের জনসমাজ ও সংবাদপত্র তখন এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু করে। এই রকম অবস্থায় সুবিচারের আশায় এক জন ইংরেজ আইনজ্ঞের উপদেশে সম্রাট্ নেপোলিয়ান বৃটিশ সরকারকে এই তেজোদৃপ্ত চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন।]

১

আমার প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে এবং আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া আমার পবিত্রতম অধিকারে যে-ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, ঈশ্বর ও মানবতার নামে আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। আমি স্বেচ্ছায় 'বেলোরো. ফোনে' আসিয়াছি। আমি বন্দী নই—আমি ইংলণ্ডের রাজ-অতিথি। জাহাজের ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবক্রমেই আমি এ স্থানে আসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, আমাকে এবং আমার ইচ্ছা হইলে আমার অনুচরবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। ইংলণ্ডের আইনের ছায়াতলে আশ্রয় লইবার মানসে আমি পূর্ণবিশ্বাসে অগ্রসর হইয়াছিলাম! 'বেলোরো ফোনে' পদার্পণ করা মাত্রই বৃটিশ জাতির আতিথ্য পাইবার অধিকারী আমি। যদি সরকার 'বেলোরো ফোনের' ক্যাপ্টেনকে আমাকে স্বাগতম্ জানাইবার অধিকার দিয়া শুধু একটি ষড়যন্ত্রের জাল পাতিবার সংকল্প করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিব, ইহার দ্বারা জাহাজের সম্মান ক্ষুণ্ণ এবং বৃটিশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হইয়াছে মাত্র। যদি এই অন্যায় চরমরূপে প্রকটিত করা হয় তাহা হইলে ইংরেজ জাতি ভবিষ্যতে স্বাধীনতা, ধর্মাধিকরণ ও সততায় মিথ্যা বড়াই করিবে। 'বোলোরো ফোনের' এই আতিথেয়তায় বৃটিশ জাতির বিশ্বাসের মর্য্যাদা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইবে। আমি পৃথিবীর ইতিহাসের নামে আবেদন করিতেছি। ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে—যে-শত্রু দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে, ভাগ্য-বিপর্যয়ের দিনে স্বেচ্ছায় সে তাহাদের আইনের ছায়াতলে আশ্রয় যাচ্ঞা করিয়াছে। তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ইহার চেয়ে এত-বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইংলণ্ড এই মহানুভবতার কি ভাবে উত্তর দিল? শত্রুর নিকট আতিথ্যের হস্ত প্রসারিত করিবার ছল করা হইল এবং শত্রু পূর্ণবিশ্বাসে আত্ম-সমর্পণ করিলে তাহাকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করার আয়োজন করা হইল।

নেপোলিয়ান।

সমুদ্রবক্ষে 'বেলেরো ফোন' জাহাজ, ৪ঠা আগষ্ট; ১৮১৫

[নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যস্ততা, রণ-কোলাহল, কামানের গর্জন ও আহতের আর্ত্তনাদের মাঝখানে থেকেও প্রিয়তমা মহিষীর কথা মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হতেন না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে নিয়মিত জোসেফিনকে চিঠি লিখতেন। অবশ্য চিঠিগুলি খুব সংক্ষিপ্ত হোত। কিন্তু এই চিঠিগুলি পড়লে দেখা যায়, নেপোলিয়নের অতুল শৌর্য-বীর্য অপেক্ষা তাঁর স্নেহ-মমতা প্রেম প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলিও কোন অংশেই কম প্রবল ছিল না। * * *

নেপোলিয়ান তখন পোল্যাণ্ডে। পোল্যাণ্ডের উষর প্রদেশেও স্বামিস্ত্রীর মান-অভিমানের পালা চলেছে। প্রত্যহ নোপোলিয়ান জোসেফিনকে দু'খানি করে পত্র লেখেন।]

পোসেন, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮০৬, মধ্যাহ্ন।

তোমার ২৬শে তারিখের চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে দু'টো জিনিষ লক্ষ্য করলাম। তুমি লিখেছ, আমি তোমার চিঠি পড়ি না। এ রকম কল্পনা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এ রকম অন্যায় ধারণার জন্য আমি তোমার প্রশংসা করতে পারি না। তুমি আরো লিখেছ, এই অবহেলা অন্য কারুর মূর্তি-ধ্যানের ফল। তবুও তুমি বলতে চাও তুমি আমার প্রতি একটুও সন্দিহান নও। আমি বহু দিন ধরে লক্ষ্য করে আসছি—যে রাগ করেছে সেই 'আমি রাগিনি' বলে সবাইকে বোঝাতে চায়, ভয় পেয়েছে যে সেই বলে—'কই, ভয় পাইনি ত।' কাজেই আমার প্রতি তোমার সন্দেহ ধরা পড়ে গেছে। আমি খুশী হয়েছি এতে। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার মস্ত ভুল হয়েছে! ঐটি ছাড়া আর সব কথাই আমি ভাবি। পোল্যাণ্ডের মরু-প্রান্তরে

সুন্দরীর স্বপ্ন দেখার সুযোগ কমই মেলে। এখানকার অভিজাতদের জন্য কাল একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলাম। অনেক রূপসীর সমাগমও হয়েছিল। কেউ কেউ খুব জমকাল সাজগোজ করে এসেছিল—কেউ বা অতি সাধারণ ধরণের। তবুও প্যারিসের ফ্যাশান ত বটে। বিদায় প্রিয়ে! ভাল আছি।

একান্ত তোমারই
নেপোলিয়ন

২

পোসেন, ৩রা ডিসেম্বর ৬ পি. এম্।

২৭শে নভেম্বরের চিঠি পেয়েছি। চিঠি পড়ে এইটুকু বুঝলাম যে তোমার মুণ্ডুটি বিলকুল ঘুরে গেছে। কবিবাক্য মনে পড়ে—

রমণীর প্রেম—জ্বলন্ত পাবক-শিখা

শান্ত হও দেবি! তোমায় ত লিখেছি, আমি পোল্যাণ্ডে আছি এবং আমাদের শীতাবাস স্থাপিত হওয়া মাত্রই তোমাকে নিয়ে আসব এখানে। আরো কয়েক দিন অপেক্ষা করতেই হবে। যত বড় হওয়া যায় ততই কাজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। তোমার চিঠির উত্তাপে এটুকুও প্রমাণিত হোল যে, তোমরা সুন্দরীরা 'কোন বাধা নাহি মান'। আমার কথা বল যদি, আমি ত ক্রীতদাস মাত্র। আমার মনিবের আমার প্রতি একটুও দয়া নেই। কাজই আমার মনিব। বিদায় প্রিয়ে! সুখী হও। যাঁর কথা বলতে চেয়েছিলাম তিনি মাদাম ল—। সবাই তিরস্কার করছে তাঁকে। আমার মতে মহিলাটি বড্ড প্রগল্‌ভা। তাঁর কথাবার্তা ভারী অসঙ্গতিপূর্ণ।

একান্ত তোমারই
নেপোলিয়ান।

তারিখ না দিয়ে নেপোলিয়ান এই চিঠিখানি লিখেছিলেন জোসেফিনকে। বীর নেপোলিয়ান কি ভাবে অভিমানিনী পত্নীর মানভঞ্জন করতেন এটি তার একটি চমৎকার নিদর্শন।

৩

প্রিয়ে! তোমার ২০শে জানুয়ারী তারিখের চিঠি পড়ে মনে বড় ব্যথা পেয়েছি। এ বড়ই দুঃখের। হৃদয়ে আত্মত্যাগের অনুভূতি না থাকলে কি যে বিপদ হয় তাই দেখছি। তুমি বল, তোমার সুখই তোমার গৌরব। এ ত উদারতার লক্ষণ নয়। বলা উচিত, অন্যের সুখেই আমার গৌরব। এ-ও দাম্পত্য বিধিমত হোল না। তবে বল, আমার স্বামীর সুখেই আমার গৌরব। কিন্তু তা-ও আবার মাতৃসুলভ হোল না। বলতে হবে, আমার সন্তানের সুখেই আমি গৌরবান্বিতা। কিন্তু অন্যেরা, তোমার স্বামী, তোমার সন্তানেরা একটু গৌরব ছাড়া যদি সুখ না পায়, ছি-ছি করো না। সে খুব লোভের হবে। জোসেফিন, তোমার হৃদয় বড় সুন্দর কিন্তু তোমার যুক্তি সারবান্ নয়। তোমার অনুভূতির প্রশংসা করি কিন্তু তোমার চিন্তার শৃংখলার অভাব আছে।

যাক্। ছিদ্র অন্বেষণ এই পর্যন্ত। মন প্রফুল্ল রাখো—ভাগ্যে যা ঘটে তাই নিয়ে খুশী থাকতে হবে। তবে শোকার্ত হৃদয়ে চোখের জলে অদৃষ্টকে মেনে নিও না—প্রফুল্ল হৃদয়ে, কিছুটা সন্তোষের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে ভাগ্যের সঙ্গে। আজ রাত্রেই অগ্রগামী সৈন্যদলের সঙ্গে ছুটতে হবে।

নেপোলিয়ান।

জোসেফিনের চিঠি

[অষ্ট্রিয়ার রাজপুত্রীকে সাম্রাজ্ঞী হিসেবে গ্রহণ করায় জোসেফিনকে তাঁর এত দিনের সম্মানিত আসন থেকে চিরবিদায় নিতে হোল। জোসেফিন এই ভাগ্য-বিপর্যয়কে অতি শান্ত ভাবে গ্রহণ করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান নববধূকে নিয়ে প্যারিসে ফিরে আসার তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিনি নেপোলিয়ানকে যে মর্মস্পর্শী চিঠিখানা লিখেছিলেন তাতেই তাঁর শোকার্ত হৃদয়ের বেদনা অতি স্বচ্ছ ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।]

নেভা, ১১শে এপ্রিল, ১৮১০

১

মালমাইসনে ফিরে আসবার সম্রাটের অনুমতি আমি পুত্র মারফৎ পেয়েছি। এই অনুগ্রহে আমার উৎকণ্ঠা, এমন কি আপনার দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য যে শংকার ভাব এনেছিল মনে, বহুলাংশে তা অপসৃত হয়েছে। ভয় হয়েছিল আপনার স্মৃতির রাজ্য থেকে বুঝি আমার চির-নির্বাসন ঘটেছে। কাজেই আজ আর আমি তত দুঃখিত নই—এমন কি, এই অবস্থায় যতটুকু হওয়া সম্ভবপর ততটুকুই সুখী আমি। সম্রাটের কোন আপত্তি নেই যখন এই মাসের শেষেই মালমাইসনে ফিরে আসব। তবে এ-ও ঠিক যে, আমার আর আমার পার্শ্বচরদের স্বাস্থ্যের জন্য যদি নেভার বাড়ীর সংস্কারের প্রয়োজন না থাকত তাহলে সম্রাটের এই অনুমতিতে আশু বিশেষ উপকৃত হতাম না। মাত্র কিছু দিনের জন্যই আমি মালমাইসনে থাকব। তার পর আবার আমি সম্রাটের নিকট হতে দূরে—বহু দূরে চলে যাব। মালমাইসনে যখন থাকব, সম্রাট নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এমন ভাবে আমি বাস করব যেন প্যারিস থেকে শত-সহস্র যোজন দূরে আছি আমি। আমার পক্ষে এ বিরাট আত্মত্যাগ এবং যতই দিন যাচ্ছে এর অসীম গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করছি। যাই হোক, যেমন হওয়া উচিত তেমনিই হবে—এ আত্মত্যাগ হবে সম্পূর্ণ আমারই। আমার দুঃখে সম্রাটকে কখনও অসুখী হতে দেব না। নিরন্তর আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, সম্রাট সুখে থাকুন। এ বিষয়ে সম্রাটের যাতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে তার জন্য আমি সম্রাটের নতুন অবস্থান্তরের প্রতি সর্বদা সম্মান দেখাব। নিঃশব্দেই হবে শ্রদ্ধার্ঘ্য অঞ্জলি। অতীতে আমার প্রতি সম্রাট যে ভালবাসা পোষণ করতেন তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এর আর নতুন কোন প্রমাণ আমি যাচ্ঞা করব না। সম্রাটের ন্যায়পরায়ণতা ও হৃদয়ের অনুশাসনের প্রতীক্ষায় দিন গুণব। একটি মাত্র অনুগ্রহ আমি ভিক্ষা করছি: সম্রাটের স্মৃতির রাজ্যে এখনও যে আমার একটুও স্থান আছে এবং বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার আজও যে আমি সেখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছি, মাঝে মাঝে আমার এবং আমায় ঘিরে যারা থাকে তাদের মনে এই বিশ্বাসটুকু উৎপাদনের জন্য সম্রাট যেন কৃপা করে একটা কিছু করেন। আমার জীবনের সব চেয়ে প্রিয়ধন—সম্রাটের সুখের কিঞ্চিৎ মাত্র অপহৃত না ঘটিয়েও এই কৌশল যাই হোক না কেন আমার দুঃখের অনেকাংশ লাঘব করবে।

২

নেপোলিয়ান উপরের চিঠিখানির যে উত্তর দিয়েছিলেন তা পাঠ করে জোসেফিন এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে কোন মতেই আর হৃদয়াবেগকে রুদ্ধ করে রাখতে পারেননি। নীচের তারিখহীন চিঠিখানি তারই স্বীকারোক্তি।

আপনাকে শতকোটি ধন্যবাদ যে আপনি আজও আমাকে বিস্মৃত হননি। আমার ছেলের হাত দিয়ে পেয়েছি আপনার চিঠি। কী আগ্রহ নিয়ে পড়েছি চিঠিখানা! পড়তে অনেক সময় লেগেছে, কারণ ওর প্রতিটি কথা কাঁদিয়েছে আমায়। কিন্তু এই চোখের জল অতি মধুর। আমার হৃদয়ের বোঝা সম্পূর্ণ হাল্কা হয়ে গেছে আর চিরদিনই এমনি থাকবে। মানুষের এমন কতকগুলি আবেগ আছে যা জীবনেরই সামিল এবং একমাত্র জীবনের সঙ্গেই তারা ছেড়ে যায় আমাদের। আমার ১১শে তারিখের পত্র আপনার মনে ব্যথা দিয়েছে জেনে বড় হতাশ হলাম। আজ আর সে চিঠির সব কথা সম্পূর্ণ মনে নেই। কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক আবেগের তাড়নায় লিখেছিলাম সে চিঠিখানা। আপনার নৈঃশব্দে গভীর মর্মবেদনায় পীড়িত হয়ে লেখা সে চিঠি। মালমাইসন ছেড়ে আসবার সময় চিঠি দিয়েছিলাম আপনাকে। তার পর কত বার চিঠি লেখার ইচ্ছা হয়েছে। আপনার নৈঃশব্দের কারণ আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। হয়ত আমার একখানা চিঠির দ্বারাই সেখানে অনধিকার প্রবেশ করা হোত। আপনার চিঠি আমার হৃদয় জুড়িয়ে দিয়েছে। আপনি সুখী হউন! সুখী হউন—যেমন হওয়া উচিত। এ আমার সমস্ত হৃদয়ের কথা। আমার প্রাপ্য সুখ আপনি এই মাত্র আমায় দিয়েছেন এবং এর যথোচিত মূল্যাবধারণ করি। আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার চেয়ে এমন মূল্যবান আর কিছু নেই। বিদায় বন্ধু। চিরদিনের যেমন তেমনি মধুর ভালবাসা ও ধন্যবাদ জানাই।

জোসেফিন।

মার্ক টোয়াইনের চিঠি

[প্রিয় লিভির সঙ্গে মার্ক টোয়াইনের পূর্বরাগের পরিণতি হয়েছিল শুভ পরিণয়ে। লিভির কাছ থেকে যখনই দূরে গেছেন মার্ক টোয়াইন প্রায় প্রতিদিনই অন্তত একখানা, কখনো বা দিনে চারখানা পর্যন্ত চিঠি লিখেছেন তাকে। এমন কি বাড়ীতে থাকলেও চিঠি লেখা বন্ধ হোত না। কখনো প্রাতরাশের ট্রেতে থাকত এক টুকরো লিপি, কখনো বা যাওয়া-আসার ফাঁকে দীর্ঘ চিঠির তাড়া হাতে গুঁজে দিতেন প্রিয়ার। বিয়ের সতের বছর পরে ১৮৮৫ সালের ২৭শে নভেম্বর প্রিয়তমার চত্বারিংশৎ জন্মদিনে মার্ক টোয়াইন নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।]

জীবনের যাত্রাপথের আর একটি প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেচি আমরা। যেখান থেকে যাত্রার সুরু সেখান থেকে আজ দূরে—বহু দূরে এসে পড়েছি। কিন্তু পিছনে ফিরে অতীতের দিকে তাকালে ভেসে ওঠে এক মনোরম দৃশ্যপট—আজো যার উপত্যকা সবুজে ঘন, মাঠ-প্রান্তর কুসুমে আকীর্ণ, আজো যেখানে পাহাড়শ্রেণী দূরে মধুর স্মৃতির ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় অঘোর ঘুমে অচেতন। এরাই আমাদের যাত্রাপথের প্রিয় সহচর—এদের সাহচর্য কানে শোনার আশার বাণী, বিমণ্ডিত করে রাখে মন অপূর্ব মাধুর্য-সুষমায়। হিসেবের কষ্টিপাথরে এদের মূল্য নিরূপিত করা যায় না। এরা পথের বোঝা কত হাল্কা করে। এখন অস্তাচলের দিকে আমাদের মুখ, কিন্তু এরা রয়েছে আমাদের নিত্য-সহচর—এরা আমাদের হাত ধরে টেনে রাখে পিছনে, বিলম্বিত করে চলার গতি। আমাদের প্রেম আজো একটু পরিম্লান হয়নি,——দিন দিন গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে। আমাদের চলার পথের দু'পাশে আজো থাকবে ফুল আর সবুজে-ভরা মাঠ, অতীত প্রত্যুষের ম্লানায়মান স্নিগ্ধ আলোর মত মধুর সান্ধ্য দীপ-শিখা।

কবিগুরুর চিঠি

(প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমারি দোষ। শরৎ চাটুজ্জে একটা নতুন কাগজ বের করে তাতে আমাকে সমালোচনা লিখ্‌তে অনুরোধ করছিলেন। তার জবাবে আমি তাঁকে বলেছিলুম যে, আজকাল আমার লেখার উৎসাহ একেবারে ছুটে গেছে, এমন কি, সবুজ পত্রে লেখাও আমার আর চলচে না। এর থেকেই কথাটা নিশ্চয় উঠেচে। সত্যিই আমার কেমন লেখা সম্বন্ধে জড়তা এসেচে। বারে বারে এই কথাই কেবল মনে হয় আমাদের দেশের পাঠক লেখকদের উপর আজকাল অত্যন্ত বেশি মুরুব্বিয়ানা করে। আমাদের যখন বয়স অল্প ছিল বঙ্কিমবাবুদের প্রতি আমাদের মনের ভাব ঠিক উল্টো ছিল। এমনতর পাঠক-সমাজের কাছে লিখ্‌তে কোনো মতেই গা লাগে না। এর ফল হয় এই যে, নিজের ভিতরে যতটা পূর্ণতা আছে বাইরে তার প্রকাশের পথ অনেকটা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কেননা বাইরে থেকে আদায় করে নেবার ব্যবস্থা না থাক্‌লে ইচ্ছা থাকলেও দেওয়া যায় না—মন ত আমাদের সম্পূর্ণ নিজের বশ নয়—আমাদের নিজের যা সম্পদ আছে তা দিতে গেলে ভিতর বাহিরের যোগে সেটা ঘটতে পারে। এই সকল কারণে, এবং হয়ত অন্য নানা কারণও আছে, আমার কেবলি দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মনে মনে কেবলি জিনিসপত্র প্যাক্ করচি, এবং টাইম টেব্‌ল দেখচি—এমন অবস্থায় মনটাকে কলমের ঘানিতে জুড়ে দেওয়া ভারি শক্ত হয়। আজকাল কবিতা লেখায় হাত দিয়েছিলুম, তারও দেখচি ইষ্টিম্ ফুরিয়ে আসচে। এই রকম মানসিক উড়ুক্ষুতা রোগের একমাত্র ওষুধ হচ্চে খুব ভরপুর বেগে একেবারে উড়ে যাওয়া। চেষ্টা ত করচি, কিন্তু আজকাল পথও চারদিকে বন্ধ, আবার পাথেয়ও তথৈব চ। সেইজন্য দিনরাত কেবল চলি-চলিই করচি অথচ চলা হচ্চে না, সেইটেতে ক্ষতি হচ্চে। যাই হোক্—আপাতত তোমাকে একটা কবিতা পাঠাই তার পরে গন্ত একটা লেখবার চেষ্টা করব। ইতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
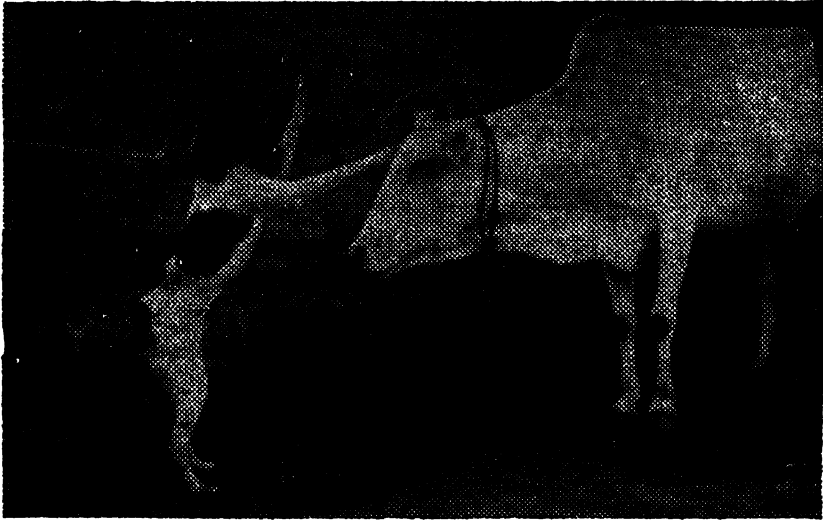
পরকীয়া —সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেম
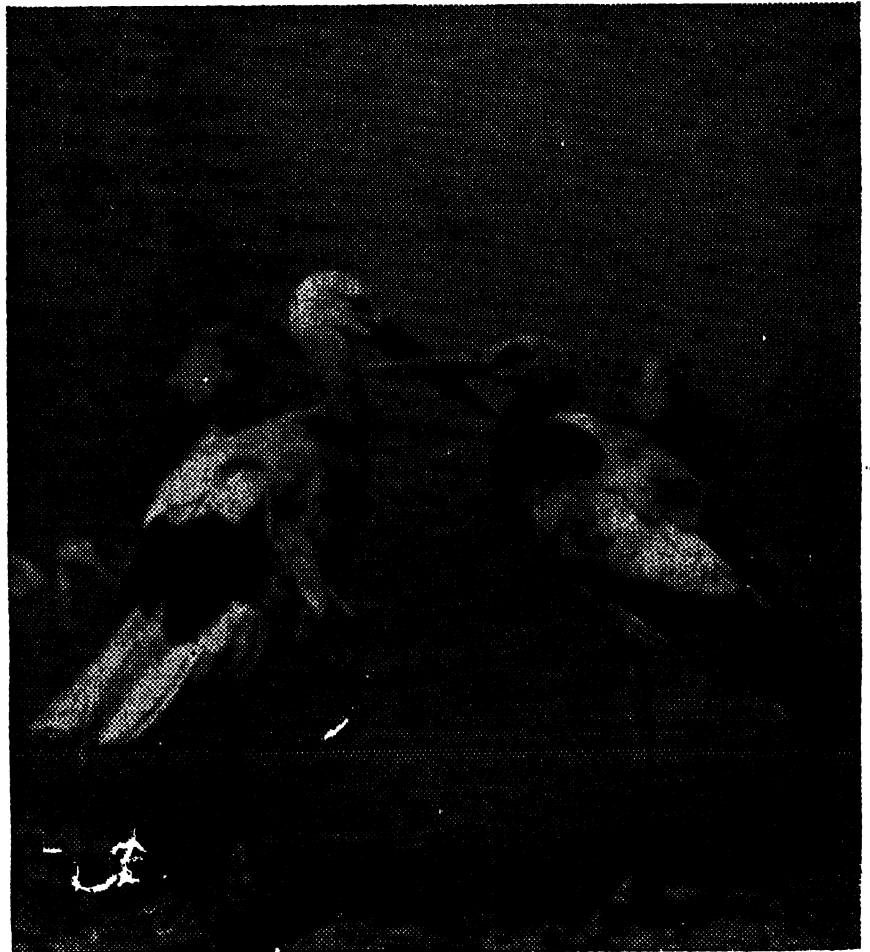
স্বকীয়া

—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—নির্মলকুমার দত্ত

—বিজয়েন্দ্রকুমার সিংহ

—সনৎকুমার বসাক

—দেবু বসু

—প্রতিমা দে

শিশু-মঙ্গল

অনুরূপা দেবী

একটি জিনিষ বাপ-মায়েরা প্রায়ই ভুল করিয়া থাকেন : ছেলেয়-ছেলেয় বিবাদ ঘটিলে কখন কখন সেটা তাহাদিগের অভিভাবকদিগের মধ্যেও শোচনীয় ভাবে বিস্তৃতি

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

—উষারঞ্জন রায়

লাভ করিতে দেখা যায়। অথচ ছেলেদের ঝগড়ায় একটুখানি ধৈর্য্য ধরিয়া দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক সুবিচার করিয়া দিলে অতি সহজেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-সখ্য পুনঃ-সংস্থাপিত হইতে পারে। ছোটদের কোন কাযকেই বড় করিয়া লইতে নাই ; ইহা দ্বারা কলহ-প্রিয়তা ও দলাদলির অভ্যাস তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়।

আর একটা জিনিষ আমাদের সমাজের বড়ই ক্ষতিকর হইয়া আছে। আমাদের দেশে "রাঙা বউ এনে দেবো পায়ে তেল দিতে।" 'বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশী, কত শত মিলবে দাসী।' ইত্যাদি রূপ শৈশব-শিক্ষার ফল সর্ব্বদাই বিষময় হইতে দেখা যায়। একে ত বৌ জিনিষটার প্রতি ছোট হইতেই একটা প্রবল লোভ জাত হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ বৌটি যে তাহার বরের পায়ে তেল দিবার দাসী, এবং তাহা যে চূড়া বাঁশী বজায় থাকিলেই শত শত সংখ্যায় পাওয়াও সম্ভব, এই উচ্ছৃঙ্খল স্বার্থান্ধ শিক্ষা শুধু নারী-মর্য্যাদারই নহে, পুরুষের আত্ম-মর্য্যাদারও ইহা অপমানকর। এগুলি ছেলে-ভুলান ছড়া হইতে উঠিয়া যাওয়াই সঙ্গত। আবার ঠাকুরমা দিদিমা শ্রেণীর লোকরা একটি ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দেখলেই তাহাদের বর-বধূ সম্পর্ক পাতাইয়া দিয়া বসেন, সেই অদূরদর্শিতার ফলটি সর্ব্বথা ভাল বলিয়া আমি মনে করি না। শিশুজীবনে ছেলেদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ সমস্তই উচ্চাভিমুখী তৈয়ারী করিয়া দেওয়া মা-বাপের কর্ত্তব্য। ভীষ্মের ত্যাগ; কর্ণ, একলব্যের আত্মোন্নতি ; অর্জ্জুনের বীর্য্যবত্তা ; পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ, প্রতাপাদিত্যাদির 'বীরত্ব কাহিনী' ; শতমন্যু, বাদল প্রভৃতির দেশের জন্য আত্মত্যাগ ; ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ভগবদ্‌ভক্তি, এই সকলই তাহাদের সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিতে হইবে। কারণ, বার বার বলিয়াছি এবং আবারও বলিব যে, শৈশব-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, শৈশবের আদর্শই চিরজীবনের আদর্শ, শৈশবের আশয়ই চিরদিনের আশয়, শত বর্ষেও ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না, কখনও তাহা হইতে পারে না, আর শিশুর সেই শৈশব-শিক্ষয়িত্রীই তাহাদের মা। ইহার উপরেই আজ সমগ্র জাতীয় উন্নতি অবনতি—ইহার উপরেই আজ জাতীয় জীবন-মরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।
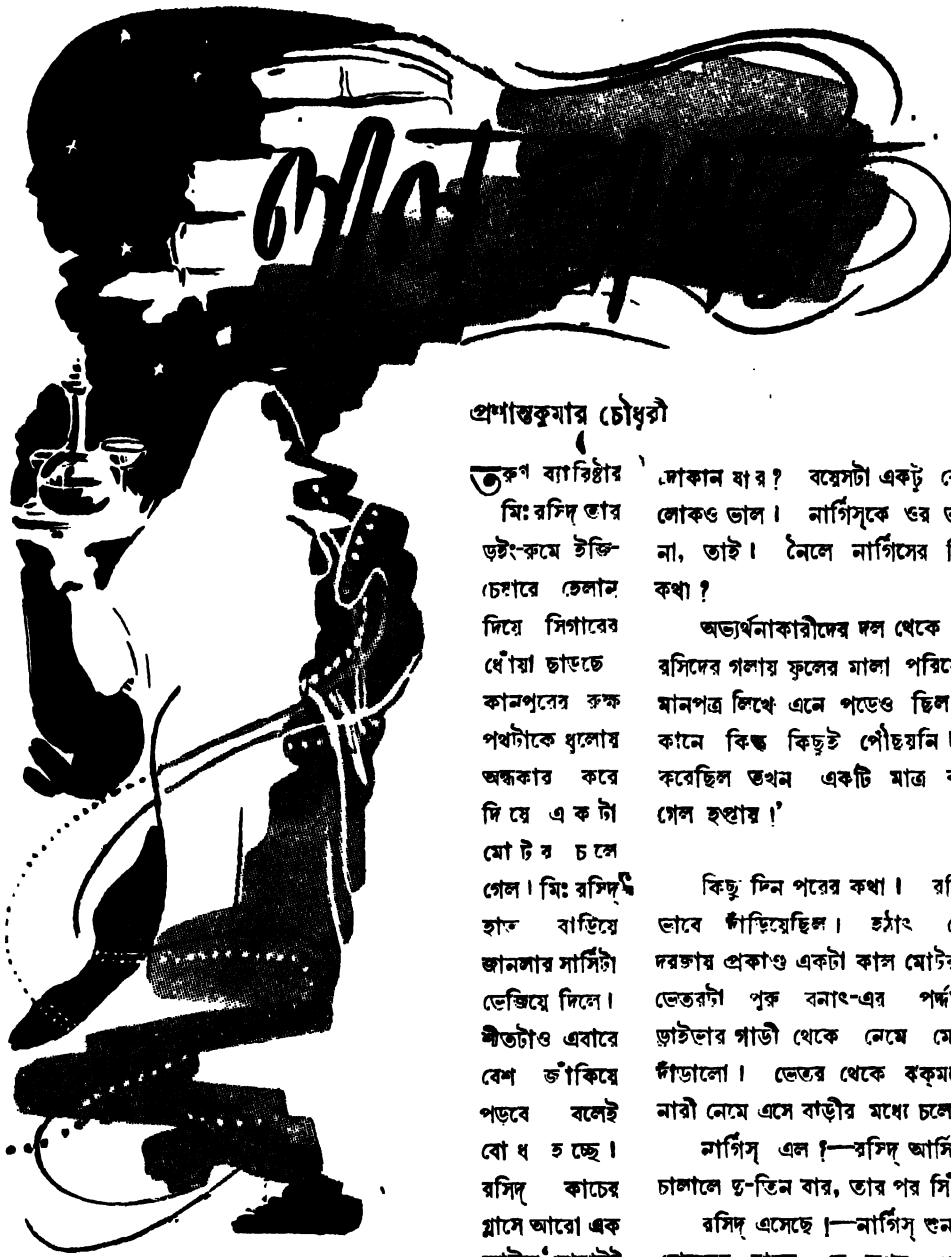
প্রশান্তকুমার চৌধুরী

তরুণ ব্যারিষ্টার মিঃ রসিদ্ তার ড্রইং-রুমে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারের ধোঁয়া ছাড়ছে কানপুরের রুক্ষ পথটাকে ধুলোয় অন্ধকার করে দিয়ে একটা মোটর চলে গেল। মিঃ রসিদ্ হাত বাড়িয়ে জানলার সার্সিটা ভেজিয়ে দিলে। শীতটাও এবারে বেশ জাঁকিয়ে পড়বে বলেই বোধ হচ্ছে। রসিদ্ কাচের গ্লাসে আরো এক আউন্স 'হোয়াইট লেবেল' ঢেলে চুমুক দিলে একটা। তার পর অলস ভাবে ডাকের চিঠিগুলোর খাম ছিঁড়তে লাগলো ছুরি দিয়ে। একটা চিঠি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ কোরে রসিদ্ নিজের চিঠি লেখবার কাগজ টেনে নিয়ে খস্‌খস্ কোরে লিখে চললো—মিঃ আনোয়ার, বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ আপনার এই নিমন্ত্রণের জন্য। চিরকাল কানপুরে মানুষ হয়েও ফতেপুরসিক্রি দেখা হয়নি আজও, এটা সত্যিই লজ্জা এবং দুঃখের কথা। দু-এক দিনের মধ্যেই আপনাকে বিরক্ত করতে যাচ্ছি। আশা করি, নার্গিস্ ভালই আছে। আপনার শরীর কেমন? বন্দুক নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই আমার ভুল হবে না। নার্গিস্‌কে আমার ভালবাসা দেবেন, আপনি আমার প্রীতি-নমস্কার নেবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
রসিদ্ আলি

* * * *

এই তরুণ ব্যারিষ্টার বিদেশের পাঠ সাঙ্গ কোরে প্রথম যেদিন কানপুর ষ্টেশনে ফিরে এসেছিল, সেদিন সে আশা করেছিল সমবেত অভ্যর্থনাকারী ও কারিণীদের মধ্যে প্রথমেই নজরে পড়বে সে—যার কাল চোখের নজরে আছে হরিণীর চঞ্চলতা, নাম যার নার্গিস্।

নার্গিস্‌কে খুঁজছো রসিদ্?—তরুণ ব্যারিষ্টারের কাকা এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন :—তার যে সাদি হয়ে গেছে গেল হপ্তায়। আনোয়ারকে মনে পড়ে তোমার? সেই ব্রে চকের পশ্চিম দিকে জহরতের দোকান যার? বয়েসটা একটু বেশি হল বটে, কিন্তু টাকার কুমীর, লোকও ভাল। নার্গিস্‌কে ওর ভয়ানক চোখে লেগে গেছলো কি না, তাই। নৈলে নার্গিসের কি আর অমন বনেদী ঘরে পড়বার কথা?

অভ্যর্থনাকারীদের দল থেকে কে যেন এগিয়ে এসে ব্যারিষ্টার রসিদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। কে এক জন একটা মানপত্র লিখে এনে পড়েও ছিল যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। রসিদের কানে কিন্তু কিছুই পৌঁছয়নি। তার সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করেছিল তখন একটি মাত্র কথা—'নার্গিসের সাদি হয়ে গেছে গেল হপ্তায়!'

কিছু দিন পরের কথা। রসিদ্ তার জানলার ধারে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ চোখে পড়লো নার্গিস্‌দের বাড়ীর দরজায় প্রকাণ্ড একটা কাল মোটর-কার এসে দাঁড়ালো। মোটরের ভেতরটা পুরু বনাৎ-এর পর্দ্দা দিয়ে ঘেরা। জরির উর্দ্দিপরা ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে মোটরের দরজা খুলে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে ঝক্‌মকে সাটিনের বোর্‌খা-ঢাকা একটি নারী নেমে এসে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

নার্গিস্ এল!—রসিদ্ আর্সির সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় বুরুশ্ চালালে দু-তিন বার, তার পর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

রসিদ্ এসেছে!—নার্গিস্ শুনলো তার মার মুখ থেকে। ভাই-বোনদের হাতে সে তখন খেলনা বিতরণ করছিল। খবরটা শুনেই বাইরের ড্রইং-রুমের দিকে ছুটলো। রসিদ্ তখন গল্প করছে নার্গিসের বাবার সঙ্গে। দৌড়ে এসে দরজার পর্দ্দাটা দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে নার্গিস্ এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।

নার্গিস্!

রসিদ্!

কিছুক্ষণ দুজনেই নির্ব্বাক্। নিস্তব্ধতা ভাঙলো নার্গিস্। আঙ্গুল নেড়ে রসিদ্‌কে বললে—এসো। তার পর ওরা দু'জনে চলে গেল নার্গিস্‌দের পেছনের বাগানের দিক্‌টায়।

ঘণ্টাখানেক পরে ওরা ফিরে এল ঘরে। ঘরে ঢুকেই আব্দারের সুরে নার্গিস্ বললে—বাবা, রসিদের সঙ্গে বিকেলে গাড়ী কোরে একটু বেড়িয়ে আসবো? ওর নতুন গাড়ী আমার চড়াই হয়নি যে।

বাপকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বললে,—আমার শ্বশুরবাড়ীর কথা ভাবছো তো তুমি? অতো কেউ দেখতেই পাবে না। তাছাড়া তারা পর্দ্দানসীন বলে বাপের বাড়ীতে এসেও আমি বেড়াতে পারবো না? তার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

বললে—তাহলে বিকেলে কিন্তু বেরোচ্ছি, য়্যাঁ? রসিদ, ঠিক চারটের সময় গাড়ী বের কোরো কিন্তু।

বিকেলে ওরা বেরিয়ে পড়ে। গাড়ী চালায় রসিদ, পাশে বসে নার্গিস্। কতো কথা হয় ওদের। ছেলেবেলার, বিলেতের, শ্বশুরবাড়ীর। উদ্দেশ্যহীন ভাবে গাড়ী ওদের ছুটেই চলে। কানপুরের প্রান্তে একটা হোটেলের সামনে গাড়ী থেকে নেমে ওরা ঢুকে যায় হোটেলের ভেতর।

আধ ঘণ্টা পরে আবার ওদের দেখতে পাওয়া যায়। হাত ধরাধরি কোরে ওরা বেরিয়ে আসছে হোটেল থেকে। কি একটা কথায় নার্গিস হো-হো কোরে হেসে ওঠে বেশ জোরেই। রসিদ ঠাট্টা কোরে বলে—উঁহু, অত জোরে তোমাকে হাসতে নেই নার্গিস; মনে রেখ, তুমি কানপুরের এক বনেদী মুসলমান পরিবারের পর্দ্দানসীন বৌ। তার পর দু'জনেই হো-হো কোরে হেসে ওঠে। গাড়ীর কাছে এসেই দরজা খুলে ধোরে রসিদ বিরাট এক কুর্ণিশ কোরে বলে—'আইয়ে বেগম সাহেবা, গোলাম খাড়া হায় আপকে লিয়ে।' নার্গিস খিল্-খিল্ কোরে হেসে উঠে বলে—'বান্দা, তোমার ব্যবহারে বহুৎ সন্তুষ্ট হয়েছি আমি, কি ইনাম চাই বলো?' রসিদ বলে—'বেগম সাহেবার মেহেরবাণী, আগে তিনি গাড়ীতে উঠুন, তার পর গোলাম আর্জ্জি পেশ করবে।'

নার্গিস ছুটে এসে গাড়ীর পা-দানীতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সর্ব্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায় যেন! মুখখানা ওর রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে নিমেষেই!

গাড়ীর ভেতর অন্ধকারে বসে আছেন নার্গিসের স্বামী আনোয়ার!

আনোয়ার স্মিত কণ্ঠে বললেন,—কি হোল নার্গিস, শরীরটা কি খারাপ লাগছে? এসো, ভেতরে উঠে এসো। মিঃ রসিদ, অবাক্ হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই আমাকে এ ভাবে আপনারই গাড়ীতে বসে থাকতে দেখে? কিন্তু এমন ভাবে ছাড়া আপনার সঙ্গে আলাপ করবার কোন উপায়ই ছিল না যে। আপনি তো আর গেলেন না কোন দিন আমার গরীবখানায়, তাই আমিই এলাম আপনার গাড়ীতে। আসুন, একসঙ্গে বেড়ানো যাক্ কিছুক্ষণ।

অদ্ভুত মানুষ এই আনোয়ার। নার্গিস্ আর রসিদ ভেবেছিল কিছু একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপার করবে বুঝি সে। কিন্তু ঠিক তার উল্টো। আনোয়ার বরং অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তেই রসিদকে বললেন—দেখুন, ব্যবসার দায়ে দোকানেই থাকতে হয় বেশিক্ষণ। যাবেন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে, নার্গিস্ তাতে খুশীই হবে।

এর পর থেকে আনোয়ারের প্রাসাদের ভেতরকার মহলের কার্পেট-বিছানো প্রশস্ত ঘরটিতে প্রায়ই নার্গিস্ আর রসিদ্‌কে দেখা যেতে লাগলো। আনোয়ার ব্যস্ত থাকে দোকানের কাজে।

এমনি ভাবে মাস চার-পাঁচ কাটবার পর হঠাৎ এক দিন রসিদ্ আনোয়ারের বাড়ী গিয়ে শুনলে, ভোরের ট্রেণে নার্গিস্‌কে নিয়ে আনোয়ার কোথায় বেড়াতে চলে গেছেন।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই নার্গিস্‌কে নিয়ে কোথায় গেল আনোয়ার? এই কথাই ক'দিন ধোরে ক্রমাগত ভাবছিল রসিদ্। এমন সময় আজ আনোয়ারের চিঠি এলো—ফতেপুরসিক্রিতে রসিদ্‌কে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে। সে কথা গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে।

দিন চারেক হোল ফতেপুরসিক্রিতে এসেছে রসিদ্। সেদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে আনোয়ার বললেন,—চাঁদনী রাতে ফতেপুরসিক্রির কেল্লা দেখেননি তো মিঃ রসিদ্? রসিদ্ চায়ের পেয়ালায় চামচ দোলাতে দোলাতে বললে—চাঁদনী রাতে তাজমহল দেখবার প্রসিদ্ধিই তো শুনেছি। ফতেপুরসিক্রির কেল্লা···

বাধা দিয়ে আনোয়ার বললেন—চাঁদিনী রাতে দেখবার কথা কখনও কোথাও শোনেননি, এই তো? কিন্তু আমি বলছি, চাঁদনী রাতে এই ফতেপুরসিক্রির পরিত্যক্ত বিরাট কোর্ট যে না দেখেছে, সে এর কিছুই দেখেনি। সকালে—বিকেলে—দুপুরে এর হাত-পা-গলা-মাথা-চুল-দাঁত-নোখ সবই দেখতে পায় লোকে। কিন্তু এর হৃদয়? তার হদিস্ মেলে রাত্রে। চাঁদনী রাতে এর পঞ্চ্‌মহলের তলাকার বিরাট চত্বরের ওপর বসলে শুনতে পাওয়া যায় এর বুকফাটা চাপা কান্না, এর ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস, এর শরাব্-জড়িত প্রণয়-প্রলাপ!—যতো অসি-ঝঞ্ঝনা, যতো নূপুর-নিক্কণ, যতো প্রেমগুঞ্জন, যতো নিষ্ঠুর গোপন-মন্ত্রণা এর পাথরের খাঁজে-খাঁজে নিঃশব্দ হয়ে আছে—চাঁদনী রাতে তারা সবাই একে একে বেরিয়ে আসে, কথা কয়, কাঁদে, গান গায়, নাচে, তলোয়ারে শাণ দেয়।

মিঃ রসিদ্ টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠলো,—ব্যবস্থা করুন কবে যাবেন, আমি তৈরী।

আনোয়ার বললেন—কাল রাত্রেই।

* * *

পরদিন রাত্রে ফতেপুরসিক্রির জনহীন বিরাট প্রাঙ্গণে দীর্ঘ ছায়া ফেলতে ফেলতে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল আনোয়ার আর রসিদ্‌কে। পঞ্চ্‌মহলের গুম্বুজগুলো আলো-আঁধারে কেমন যেন হাল্কা বলে মনে হচ্ছে। যেন হাওয়া লেগে দুলছে একটু একটু। ওধারে 'বুলন্দ দরোয়াজা'র খিলেনে খিলেনে চাম্‌চিকের ঝটাপটি। এধারে সেলিমচিস্তির কবরের সম্মুখের বিরাট উঠোনের একধারে কুঁকড়িয়ে শুয়ে একটা কুকুর থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠছে শীতে।

চলতে চলতে রসিদ্ বললে—আচ্ছা মিঃ আনোয়ার, আপনি হঠাৎ আমাকে বন্দুক সঙ্গে নিতে বললেন কেন বলুন তো?

আনোয়ার কেমন যেন থম্‌থমে গলায় বললেন—আত্মরক্ষার জন্যে।

—আত্মরক্ষা? এখানে জানোয়ার বেরোয় বলে তো শুনিনি?

তেমনি থম্‌থমে গলায় আনোয়ার বললেন—জানোয়ার নয় মিঃ রসিদ্। কতো অতৃপ্ত হৃদয় কতো বাসনা-কামনা নিয়ে এইখানেই অসময়ে থেমে গেছে, কতো নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়ে গেছে এখানকার অন্ধকূপে—চাঁদনী রাতে সেই সব অশরীরী আত্মারা·····।

হো-হো কোরে হেসে উঠে রসিদ্ বললে,—ভূত? বিশ্বাস করেন? আর ভূতই যদি আসে, বন্দুকে কি হবে?

তেমনি আড়ষ্ট কণ্ঠে আনোয়ার বললেন—হাসবেন না মিঃ রসিদ্। প্রথম যেবার চাঁদনী রাতে আমি এখানে আসি, তখন আমার সঙ্গে ছিলেন গজনবি সাহেব। এমনি এক রাত্রে দেওয়ান্-ই-খাসের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি, হঠাৎ ওধারে দেখতে পেলুম একটি দীর্ঘকায় কাফ্রী ক্রীতদাস···হাতে-পায়ে তার লোহার শিকল···মুখটার ঠিক মাঝখানে কে যেন ধারালো তলোয়ারের কোপ্ বসিয়ে দিয়েছে··· গাঢ় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেই গভীর ক্ষত থেকে···দেহের তলার

দিক্‌টা অন্ধকারে যেন বেমালুম মিশে গেছে···ক্রীতদাসটি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। গজনভি সাহেবকে নাড়া দিয়ে বললুম—'দেখতে পাচ্ছেন?' গজনভি সাহেব বললেন,—'কী?' আমার গলা দিয়ে তখন স্বর বেরুচ্ছে না। বললাম—'কে ঐ কাফ্রী ক্রীতদাস?' গজনভি সাহেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন—'ফায়ার'। পর পর তিনটে গুলী ছুঁড়লুম। তার পর ধাতস্থ হয়ে দেখলুম, ছায়া-মূর্ত্তি কোথায় মিলিয়ে গেছে! জিজ্ঞেস করলুম—'গজনভি সাহেব, আপনি দেখতে পেয়েছিলেন তো?'

গজনভি বললেন—'না'। বললুম—'তবে গুলী করতে বললেন যে?' গজন্‌ভি বললেন—'তাছাড়া উপায় কি ছিল বলো? যাকে তুমি দেখলে, গুলী তাদের গায়ে লাগে না বটে, কিন্তু তোমার বুকে কতোখানি সাহস এনে দিল বল তো?'

রসিদ্ বললে—আপনিও কি ঐ জন্যেই আমাকে বন্দুক আনতে বললেন আজ মিঃ আনোয়ার?

—হ্যাঁ।

—আমার বুকে কিন্তু বন্দুক না ছুঁড়েও সাহস থাকে।

আনোয়ার শুধু বললে—তাই যেন থাকে মিঃ রসিদ্।

কথা কইতে কইতে এগিয়ে চলছিল ওরা। একটি একটি কোরে প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য স্থানের ঐতিহাসিক মূল্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আনোয়ার। কেমন কোরে সম্রাট্ আকবর ফতেপুরসিক্রিতে উঠিয়ে আনলেন তাঁর রাজধানী, কেমন কোরে কতো কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় কোরে গড়ে উঠলো ফতেপুরসিক্রির এই বিরাট কেল্লা, তার পর কেমন কোরে দারুণ জলকষ্টে এই সাধের ইন্দ্রপুরীকে মরুভূমির বুকে ফেলে রেখে রাজ্যপাট নিয়ে আবার সবাইকে ফিরে যেতে হল আগ্রায়, সব কিছুই জেনে নিচ্ছিল রসিদ্।

যোধাবাঈ-মহলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ছোট-খাটো গোলাকার পাথর-বাঁধানো বেদীর দিকে রসিদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে আনোয়ার বললেন,—এই বেদীর মধ্যে চোখে পড়ছে কিছু?

—কৈ না তো।

—বেদীর উপরকার সমস্ত পাথরগুলিই সাদা, তার মাঝে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে ঐ দু'টো লাল পাথর দেখতে পাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—সাদা পাথরের মাঝখানে হঠাৎ ঐ লাল পাথর দু'টো কেন বসলো, কে বসালো জানেন? শুনবেন ঐ লাল পাথর দু'টোর ইতিহাস? - কিন্তু তার আগে আসুন ওধারটায় গিয়ে বসা যাক্।

অনেকটা এগিয়ে ওরা দু'জনে হিরণ-মিনারের তলায় এসে পৌঁছলো। মিনারের গায়ে বসানো বড়ো-বড়ো হাতির দাঁতগুলোর ছায়া মিনারের সর্ব্বাঙ্গে বিচিত্র একটা চোখ-ধাঁধানো হিজিবিজির সৃষ্টি করেছে। অতীতে হাতীর লড়াই হতো এইখানে। বিচারক বসতেন ঐ মিনারের চূড়োয়। পরাজিত হস্তীর দাঁত দু'টো উপ্‌ড়ে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হোত ঐ মিনারের গায়ে। বর্ত্তমানে এর আশে-পাশে কেবল ভগ্নস্তূপ আর এবড়ো-খেবড়ো মাটি। খানিকটা দূরে অনেকগুলি কবরের সারিকে ঘিরে ছোট-খাটো একটা জঙ্গল মাথা চাড়া দিয়েছে, একটা বড়ো চটকা গাছ একরাশ ডাল-পালা ছড়িয়ে জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে।

আনোয়ার ও রসিদ্ এসে বসলো হিরণ-মিনারের পাথরের চত্বরের ওপর। রসিদ্ বললে—এবার তাহলে সুরু হোক্ সেই লাল পাথরের গল্প।

আনোয়ার কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগটা থেকে একটা মিনে-করা রূপোর সুর্ম্মাদানী বের কোরে বললেন,—তার আগে আসুন চোখে একটু সুর্ম্মা লাগিয়ে নেওয়া যাক্। পাগলামী ভাবছেন?—নিজের সাদা চোখ দিয়ে ফতেপুরসিক্রিকে তো অনেকক্ষণ দেখলেন, এবারে নবাবী-চোখ দিয়ে একটু দেখুন। নবাবরা সুর্ম্মা দিতেন চোখে।

হো-হো কোরে হেসে রসিদ্ বললে,—বহুৎ আচ্ছা। আপনাকে আজ কিন্তু বেশ লাগছে মিঃ আনোয়ার।

সুর্ম্মা পরানো শেষ হতেই ব্যাগ থেকে ছোট একটি আতরের শিশি বের হল। চাঁদের আলোয় কাটগ্লাসের শিশিটা ঝকঝকিয়ে উঠলো একবার। দু'জনের গোঁফের প্রান্তে আতর ছোঁয়ানো হল, দু'-টুকরো তুলোর গুলি আতরে ভিজিয়ে দু'জনের কানে গোঁজা হল।

রসিদ্ হেসে বললে—আবহাওয়াটা এবার যেন নবাবী-নবাবী মনে হচ্ছে বটে!

আনোয়ার বললেন—এখনো একটু বাকি আছে মিঃ রসিদ্।—তার পর ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ছিপি-আঁটা বোতল আর দু'টো ছোট কাচের গ্লাস বের কোরে মৃদু হেসে বললেন,—সঙ্গে শরাবের বোতলও এনেছি।

* * *

শরাবের চতুর্থ গ্লাসে যখন চুমুক দিলে রসিদ্, লাল পাথরের গল্পটা তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ডান হাতে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বাঁ-হাতে ঠোঁট-মুছে রসিদ বললে—তার পর?

আনোয়ার বলে যেতে লাগলো,···সেই সৈনিক যুবকটি ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করলো, সাকিনা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সব সময়। বাঁদী-মহলে খোঁজ নিতে গেলেই শোনে, হয় তার বেগম-মহলে কাজের চাপ, না হয় ভীষণ মাথার যন্ত্রণা, না হয় গতকাল রাত্রের নাচের মজলিসে অধিক রাত্রি-জাগরণে ঘুমিয়ে পড়েছে অবেলায়।

সৈনিক যুবকটি ভাবে—সাকিনা আজকাল তার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করছে? আজ সাত দিন সাকিনার সঙ্গে দেখা হল না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় যথারীতি বাঁদী-মহলের পেছনের বাগানের ঝাউ গাছের তলায় বৃথাই অপেক্ষা করেছে সে সাকিনার জন্যে। সাকিনার এই ভাবান্তরের কোন কারণই খুঁজে পায় না সৈনিক।

সেদিনও প্রতিদিনের মতোই সে ঝাউ গাছের নিচে বসে অন্যমনস্ক ভাবে ঘাস ছিঁড়ছে আঙুল দিয়ে, হঠাৎ ওপাশের একটা ঝাউয়ের ঝোপ থেকে ভেসে এল সাকিনার কণ্ঠ। সাকিনা কাকে যেন বলছে—'এ বাঁদী হুজুরের নাগরার ধূলির যোগ্যা নয়। তবু যে তার প্রতি হুজুরের কৃপাদৃষ্টি পড়েছে, সে হুজুরেরই মেহেরবাণী, আর সাকিনা বাঁদীর নসিবের জোর।' পুরুষ-কণ্ঠটি বললে—'চোখে তোমার গোলকুণ্ডার হীরার দ্যুতি সাকিনা!' সাকিনা সলজ্জ কণ্ঠে বললে—'সে-ও হুজুরেরই নজরের গুণে।' পুরুষ-কণ্ঠটি বললে—'তাহলে আজ রাতে যোধাবাঈ-মহলের দক্ষিণ চত্বরে পাথরের বেদীর কাছে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো, মনে থাকে যেন।' সাকিনা বললে—'শুধু হাতে যাবে না

কিন্তু এ-বাঁদী, ওমর-খৈয়ামের সাকীর মতো শরাবের পাত্র নিয়েই যাবে হুজুর।' হুজুর বললেন—'সাবাস্।' সাকিনা নম্র কণ্ঠে বললে—'বেগম-মহলে এ-হাতের তৈরী শরাবের সামান্য কিছু সুখ্যাতি আছে হুজুর, সেটা সত্যি কি না হুজুরের কাছ থেকেই শোনা যাবে আজ।' হুজুর হেসে উঠে বললেন—'মঞ্জুর।'

ঝাউ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সৈনিক যুবকটির রক্ত গরম হয়ে উঠলো। নাঃ, এ অসহ্য! বিশ্বাসঘাতিকা সাকিনা!···কিন্তু দেখতে হবে ঐ হুজুরটি কে? সৈনিক ঝাউ গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল। কিছুক্ষণ বাদেই যখন সাকিনার সেই প্রেম-প্রার্থীটি চলে গেলেন আতরের খুসবু উড়িয়ে, সৈনিক বিস্ফারিত চোখে দেখলো তিনি বাদশার উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ওমরাহদেরই এক জন!

রাত্রে সেই বেদীর কাছে ওম্রাহ অপেক্ষা করছেন। দূরে দেখা গেল, জরির চুমকি-বসানো পাৎলা সাদা ওড়না জড়িয়ে সাকিনা আসছে। হাতে তার শরাবের পাত্র, কোমল দুটি পায়ের মখমলের ছোট্ট চটিজোড়া ক্ষীণ একটু শব্দ করছে পাথরের বুকে। সাকিনা আসছে···সাকিনা আসছে! হঠাৎ নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধতার বুক চিরে দড়াম্—দড়াম্ কোরে দু'টো বন্দুকের শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা আর্ত্তনাদ কোরে সাকিনার হাল্কা দেহটা ছিটকে পড়লো পাথরের ওপর। সেই ওম্রাহটি অবাক্ হয়ে দেখলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে ওদিকের একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি সৈনিক!

এই অবধি বলেই আনোয়ার আর এক গ্লাস শরাব তুলে ধরলো রসিদের দিকে। শরাবের গ্লাসে চুমুক দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে রসিদ বললে—'তার পর?' সেই প্রচণ্ড শীতেও তার তখন ঘাম হচ্ছে!

'আনোয়ার আবার সুরু করলেন—মরবার সময় সাকিনা বলে যে, সে বিশ্বাসঘাতিকা নয়। ওম্রাহের অত্যাচারের ভয়েই সাকিনা এ ক'দিন তার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। মিথ্যা প্রেমের অভিনয় কোরে আজ সে শরাবের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে এনেছিল ওম্রাহকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্যেই।···

রসিদের দু'পাশের রগ দু'টো তখন দপদপ করছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—তার পর?

—তার পর নিশীথ রাতের বুক চিরে আরো একবার বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। সৈনিকের বন্দুক থেকে আরো একবার ধোঁয়া উঠতে লাগলো। সৈনিক আত্মহত্যা করলো।

—তার পর?

—ঐ যে ঐ বেদীর ওপর দু'টো লাল পাথর দেখলে, ও-দু'টো ঐ ওম্রাহই বসাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন ওদের দু'জনের প্রেমকে স্মরণীয় কোরে রাখবার জন্যে।

* * * *

লাল পাথরের গল্প এইখানেই শেষ হল। অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থেকে রসিদ্ হঠাৎ শরাবের খালি গ্লাসটা তুলে ধোরে বললে, —আর একটু শরাব, মিঃ আনোয়ার।

শরাবের নেশায় বুঁদ্ হয়ে রসিদ চেয়ে রইল অনতিদূরের কবর-গুলোর দিকে।

কবরগুলোর পাশ থেকে সাদা ধোঁয়ার মতো ওটা কি উঠছে? ···ধোঁয়া?···নারীমূর্ত্তি! জরির চুমকি বসানো পাৎলা মস্‌লিনের ওড়না···তলা দিয়ে রেশমের জামাটা চক্‌চক্ করছে···! হাতে ওটা কি ওর? শরাবের পাত্র?···কে ও?

রসিদ্ ভীত কণ্ঠে বললে—মিঃ আনোয়ার, দেখতে পাচ্ছেন ঐ নারীমূর্ত্তিকে?···আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে ও! দেখতে পাচ্ছেন?

—না।

—কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি মিঃ আনোয়ার। ঐ তো সে আসছে···সাকিনা আসছে···মিঃ আনোয়ার?

আনোয়ার দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বললেন,—ফায়ার!

দড়াম্-দড়াম্-দড়াম্! নিশীথ রাতের বুক চিরে রসিদের বন্দুক গর্জ্জে উঠলো। কিন্তু অশরীরী নারীমূর্ত্তি অমন আর্ত্তনাদ কোরে ছিটকে পড়লো কেন? অশরীরীর আর্ত্তনাদ!-সে কেমন কোরে হয়? ও কার আর্ত্তনাদ?—কে?—কে?—কে তুমি?

স্খলিত পায়ে টলতে টলতে এগিয়ে যায় রসিদ্।

ভূ-লুণ্ঠিতা নারীমূর্ত্তির মুখের দিকে হেঁট হয়ে তাকিয়ে রসিদের মনে হোল, সমস্ত হিরণ-মিনারটা বুঝি চুরমার হয়ে তার মাথায় ভেঙ্গে পড়লো!···

···নার্গিস্! নার্গিস্ তুমি! এমন অদ্ভুত বেশে, এখানে, এত রাতে, কাউকে না বোলে শরাবের পাত্র নিয়ে তুমি কেন এসেছিলে? কেন?—কেন?—বলো নার্গিস্, বলো!

নার্গিসের মুখের শেষ কথাটি শোনবার জন্যে রসিদ্‌কে ঘিরে ফতেপুরসিক্রির পাষাণ-কেল্লাও বুঝি সে রাত্রে হেঁট হয়ে নার্গিসের মুখের কাছে কান পেতে দাঁড়ালো! কি একটা বলতে গেল যেন নার্গিস্, কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রিনীর অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে চাপা দিয়ে দূর থেকে আনোয়ারের অট্টহাস্য ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো ফতেপুরসিক্রির গম্বুজে গম্বুজে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। সে হাসিকেও ছাপিয়ে রসিদের হাতের বন্দুক আর একবার গর্জ্জন করে উঠলো!

আত্মহত্যা করা ছাড়া রসিদের উপায় ছিল কি?

বিষয়ীর ঈশ্বর

"কিন্তু দৃঢ় হ'তে হ'বে; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকৃতে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জান? যেমন খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা কর্‌বার সময় পরস্পর বলে, 'আমার ঈশ্বরের দিব্য'। আর যেমন কোন ফিট্ বাবু, পান চিবুতে চিবুতে, হাতে (stick) ক'রে, বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে;—'ঈশ্বর কি beautiful ফুল করেছেন!' কিন্তু এ বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে। একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

এবার পূজায়
পাকিস্তান

বাস্তুহারা

আজ সে দেশ পাকিস্তান। আমার জন্মভূমি। চল্লিশ বছর আগে দিয়েছিল প্রেরণা। প্রেরণা বন্ধনমুক্তির। মনে বনে কোনে, তার প্রতি নগর ও পল্লীতে আমাদের মৃত্যুস্পর্দ্ধী—"মায়ের জন্ম বলি প্রাতে" বলে তিলে তিলে গড়ে তোলা হয়েছিল। 'সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমায়' হিন্দুয়ানী আমরা দেখিনি। দেখেছি গরীব-চাষী, মজুর, শিল্পী আর অস্পৃশ্য অনুন্নতদের প্রাণমূর্ত্তি।

বঙ্কিম কল্পনা করেছিলেন, "একদিন দেখিব দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে বাণী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।" কল্পনার অবসর আমাদের ছিল না। কাল-সমুদ্র তাড়িত মথিত করবার জন্য আমরা দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়েছিলাম—পূজা পূজা, খেলার জন্যে নয়, আপনাদের অন্তরে ও পেশীতে শক্তি সঞ্চয়ের আর প্রাণহীন মানুষ নামধেয়দের মান ও হুস্ স্থাপনের জন্যে।

কিন্তু সেদিন থেকেই ওরা বাধা দিয়েছিল। ইংরেজ—মূর্খ, অত্যাচারী। আমাদের নাগালই পায়নি। স্বয়ংসিদ্ধ নেতারাও পাননি। তাঁরা ছিলেন ইংরেজের খোসামোদে আর আপনাদের বচন আস্ফালনে ব্যস্ত। কেউ আপনাদের শক্তিহীনতা উপলব্ধি করে অলৌকিক শক্তির সহায়তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

পদ্মার ওপারের দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা আমাদের প্রেরণা দিয়েছিল। আমরা তাদের জন্যেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—'বাপ-মা, ভাই-বোন, বাড়ী-ঘর এ সবের আকর্ষণে আমি আবদ্ধ হব না, কোন প্রকার ওজর আপত্তি না করে পরিচালকের আদেশ অনুসারে মণ্ডলের সব কার্য্য পালন করব। চাঞ্চল্য ও চপলতা ত্যাগ করে শান্ত ও সংযত ভাবে আমি সব কাজ সম্পাদন করব।'

কত পূজা এসেছে—কত পূজা চলে গেছে। জন্ম-সংস্কারবশে দণ্ডবৎ যে আমরা করিনি তা নয়—শ্বেত ছাগ-বলির ঘোষণায় উল্লাসও যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু এ উল্লাস ম্লান হয়েছিল। বয়স তখন ৭।৮ বছর। আমাদের অঞ্চল মুসলমান-প্রধান, ওদের মধ্যেই আমাদের বৈপ্লবিক শিক্ষা। ওদের ভাঙ্গা চালা, ওদের মেরুদণ্ডস্পর্শী উদর, ওদের ব্যাধি, অনাহার আমাদের পাগল করত।

লর্ড মিণ্টোর "a possible counter poise to Congress aims"—আমাদের অন্নদাতা বাপ-মার মাত্র নয়, সহকর্ম্মীদেরও আত্মীয়-স্বজনকে যখন বিপন্ন করল, তখন আমাদের আয়ুধ সজ্জিত হবার সুযোগ মিলেছিল—মাত্র গুণ্ডা মারবার জন্যে নয়, গুণ্ডার নিয়োক্তাদেরও শায়েস্তা করতে।

বোধ হয় ১৩১৪ সাল। পূজারই সময়। মুসলমান গুণ্ডা ও গুণ্ডা-প্ররোচিত জনসাধারণ উন্মাদের মত হিন্দুদের আক্রমণ করছে। প্রত্যহ হাট লুঠ, ঘরে আগুন। মনে আছে, ভয়ার্ত্ত ও মা-বোনদের তত্ত্বাবধানে আমাদেরও সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। তবু দেখেছি, সেই শিশু-বয়সে চোখের সামনে—বেইজ্জত করেছে মেয়েদের। দেখেছি, ওরা প্রতিমা ভেঙ্গেছে আমাদের চোখের সামনে। আমাদের রাগ হয়েছে—বড়রা আমাদের এগিয়ে যেতে দেয়নি।

লাঠি আর পিস্তল নিয়ে আমরাও যেমনই গিয়ে দাঁড়িয়েছি বাস্তু ভিটার সামনে আর মা-বোনদের পাশে—অমনি অসুররা ভয়ে পালিয়েছে। অন্য দিকে 'ওয়াহ্‌, গুরুজি কি ফতে' ধ্বনি জাতের নামে বজ্জাতির উৎপাটন করেছে। যারা ছুরি ও লাঠি উঠিয়েছিল তাদেরই রোগশয্যার পাশে—বন্যা-বিপন্ন, দুর্ভিক্ষ-তাড়িত কঙ্কালের পাশে আমাদের দেখে ওরা লজ্জা পেয়েছে। ওরা আমাদের বিশ্বাস-করেছে—আমাদের উপর নির্ভর করেছে। ওদের সঙ্গে আমরা নির্ব্বিবাদে মিশতে পেরেছি—ওদের বুঝাতে পেরেছি, কেন ওরা খেতে পায় না; কেন ওরা নিত্য মরে।

নয়া ভারতকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন স্বামীজী। তিনি তখন ইউরোপে। সে আজ ৫২ বছর আগের কথা। এমনি পূজার সময়। বাংলার জনসাধারণ তখনও মরছে। পদ্মার ওপারে চালের দর তখন নেমেছে টাকায় পনের সের থেকে পাঁচ সেরে। সেদিনকার সে বুভুক্ষুর মূর্ত্ত প্রেরণা পরের ২০ বছর বিপ্লবীদের গণ-সংগঠনে যে কাজে লেগেছিল তা আজ মনে না থাকবারই কথা।

গ্রাণ্টের ডেসপ্যাচ থেকে বঙ্কিমের মন্বন্তরের ছবি—'মা যাহা হইয়াছেন মূর্ত্তি।' কিন্তু সেদিন বিপ্লবীদের মহাপূজার এক অদ্ভুত মাতৃমূর্ত্তি আমাদের অন্তর জুড়ে বসেছিল—

চারটি শীর্ণ সন্তান নিয়ে অভাগিনী জননী দাঁড়িয়ে। স্বামী কলেরায় মরেছে। যা-কিছু ছিল সব বিক্রী করেছে মা। আর কানা-কড়ি নেই। তাই বাচ্চাদের নিয়ে একা দাঁড়িয়েছিল পথে। কিন্তু আর না পেরে জ্বালা জুড়িয়েছে। বাচ্চাগুলো মরা মা'র চার পাশে ক্ষিদের চোটে ঘুরছে। একটা বাচ্চার বয়স ছয়। মিশনারী জিজ্ঞেস করে—

—বাপ?

—মরেছে—ওলাউঠায়।

—মা?

—মরেছে—না খেয়ে।

—তুই?

—তিন দিন খাইনি!

এ মা সেদিনও আনন্দমঠের পৃষ্ঠায়। 'বন্দে মাতরম্' আওয়াজের বদলে কংগ্রেসের নেতারা সেদিন কলকাতায় বিডন স্কোয়ার ফাটাচ্ছিলেন হিপ্‌-হিপ্‌-হুররে রবে। হিন্দু সেদিন মত্ত—বিলেত-ফেরত বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে তাড়াতে। আর মোছলমান মত্ত নয়া নবাব সলিমুল্লার ইঙ্গিতে মা-বোনকে বেইজ্জত করতে।

আমরা তা রোধ করেছি সবল মুষ্টিতে—অকুতোভয়ে মহাবীর্য্যে। বিপ্লবীদের মহানায়ক আশা দিচ্ছিলেন—মা'র প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবেই তোমাদের দিয়ে—উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"One vision I see clear as life before me, that the Ancient Mother has awakened once more, sitting on hir throne rejuvenated, more glorious than ever"—আমরা তা বিশ্বাস করেছিলাম। বিশ্বাস করেছিলাম বলে পদ্মার
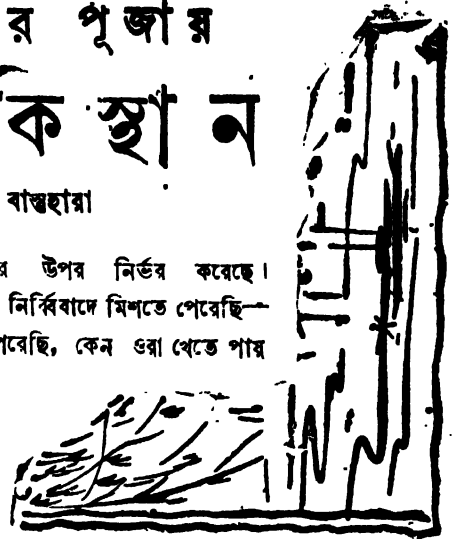
তটে তটে হিন্দু ও মুসলমান নর ও নারী আমাদের প্রেরণা দিচ্ছিল। ওরা আমাদের হাতিয়ার খেলা শেখায়, ওদের সুখ-দুঃখের কাহিনী বলে আমাদের পাগল করল। মজা-নদীর দু'ধারে অরণ্যে পরিণত ওদের ফৌতি গাঁগুলোর রূপ বদলে দেব বলে স্পর্দ্ধা আমাদেরও হয়েছিল বৈ কি।

তার পর?

ইংরেজের শেকল। ঠাণ্ডি গারদে কত রাত কেটে যায়। গভীর নিশীথে পিঞ্জরের কয়েদীরা সুর করে রোল কল করে যায়—এক দো তিন চার···আর আমরা ভাবি আর কাঁদি। ডাকি মাকে। প্রাণ মন্থন করে প্রার্থনা জানাই—

কারাপাষাণ-ভেদি জাগো! নারায়ণ!

হুঁ! নারায়ণ জেগেছিল। কারা-প্রাচীর ভেঙ্গে আমাদেরই আহ্বানে দলে দলে হিন্দু ও মুসলমান বেরিয়ে এসেছিল সুশৃঙ্খল পাদক্ষেপে—হাতে নিয়ে হাতিয়ার। ইংরেজ তাদের সম্মুখীন হতে গেছল, পারেনি। আমাদেরই আহ্বানে ঐ পদ্মার তটে তটে কৃষাণরা মাথা তুলেছিল। কুঠিয়াল ইংরেজ মাত্র নয়, আমাদের কংগ্রেসী নেতারাও চমকে গেছল।

আজ কৃত্রিম মহাপূজার অভিনয়ের দিনে সে সব কথা মনে পড়ে স্বতঃই।

তার পর কেটে যায় ২৫ বছর। উন্নত বাংলার জনসাধারণের দিকে আর কেউ চাইল না। জাতের অর্থনীতিক দুর্দ্দশা ক্রমে বেড়ে চলে। ফিউডাল লর্ডদের প্রেতরা শত সরিকে বিভক্ত বাস্তু-ভিটার ভাঙ্গা মণ্ডপে মাটির পুতুল পূজো করে এসেছে কোন মতে। কিন্তু আমার বৃত্তিহীন নবশাক সম্প্রদায়, ভূমিহীন মুসলমান চাষী তাতে যোগ দিতে পারেনি।

আবার ওদের ডাকবার সময় এসেছিল ইংরেজ চলে যাবার পর। ওরা আমাদের বিশ্বাস কিন্তু আর করল না। নতুন রাষ্ট্র পেয়েছে বলছে দুঃখে-কষ্টে চাষীর এই রাষ্ট্র কায়েম করে ওরা দানা-পানির সুব্যবস্থা করবে আশা করছে।

তাই আবার দেখতে গেছলাম। শিউলি তেমনি ফুটে ফুটে চণ্ডীমণ্ডপগুলোর পাশের গাছতলা সাদা করে ফেলেছে। মণ্ডপে পূজারীও নেই; প্রতিমাও নেই। রাজধানী শ্মশান। যারা পূজো করত তারা পালিয়েছে। ঢাকায় প্রায় দু'শো প্রতিমার পূজো হ'ত। এবার ৫০টাও হবে না, সর্ব্বজনীন ত নেই-ই। পূজোর ছুটিতে সবাই গাঁয়ে ফেরে, এবার যেন কালা-অশৌচ! যে সব যায়গায় ভয়ে ভয়ে পূজা হয়েছে, সেখানে ২।১ জন কোন মতে গিয়ে কোন রকমে দায় সেরে এসেছে। বিক্রমপুরের গ্রামগুলোতে প্রায় হিন্দু নেই। নশঙ্কর গাঁয়ের সর্ব্বজনীন পূজোয় মুসলমানরাও পূজা-ঘরে প্রবেশ করেছিল। উয়ারীর পূজোয়, আরও দুই-একটি বড় পূজোয়, ময়মনসিংএর আঠারবাড়ীর পূজোয় মুসলমানরা হিন্দুদের অভিভাবক মনে করে পূজোর তত্ত্বাবধান করেছে।

এই একই অবস্থা প্রায় সব জায়গায়। পদ্মার তটবর্ত্তী সহরগুলোয় সারা রাত যে বাইচ খেলা হত আর তটে তটে যে মেলা বসত, তা হতেই মনে হত শারদীয়া উৎসব রাঢ়ের উৎসব নয়। সেই একশ' হাতি ছিপ আর একশ' বৈঠার যুগপৎ 'ঝুপ'—আর মুসলমান ও নমঃশূদ্র জোয়ানদের নৌ-প্রতিযোগিতা—ভারতের কোথাও তা কল্পনাও করতে পারে না। তার সাথে বঙ্গের ঢাকীর বিরাট ঢাকের রকম রকমের বোলের প্রাণ-মাতান ধ্বনি—এ ছিল আমাদের কিশোর জীবনের মহা আনন্দ। এবার তার চিহ্ন কোথাও দেখলাম না। সন্ধ্যার আগেই অনুৎসাহ—শোকার্ত্ত পূজকদের পুলিশ-পাহারায় শোভাযাত্রা—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন।

আর বিসর্জ্জনের পর? নীরবে সজল নয়নে কোলাকুলি। বাস্তু-জননীর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলা। তার পর তালা-চাবি লাগিয়ে ভিটা-ত্যাগ। যারা থাকে তারা কথা বলে না। জননী-ভগিনীরা দিনেই থাকে শঙ্কায়, সন্ধ্যা হলেই ত্রাস।

১৯১৬তে যা হয়েছিল, ১৯২৪শে যা হয়েছিল, তেমনি এবারও ওরা অবশিষ্ট প্রতি পরিবার থেকে ব্যাপক ভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিশোর জোয়ানদের। একটু ধনী যারা, তাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। হাটে পণ্য নেই, হাঁড়িতে অন্ন নেই, রাতে বাতি জ্বলে না—কেরোসিন মিলে না, দেশলাই বার পয়সা, সরষের তেল সাড়ে ৪ টাকা সের। যারা সংস্থান করতে পারছে তারা পুঁটলি-পাটলা গুটিয়ে ভিটে ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করছে। যারা পারছে না, তাদের ঘরে ঢুকে ওরা তল্লাস করছে হাতিয়ারের—অপবাদ দিচ্ছে, এরা পঞ্চম-বাহিনী। অনেক জায়গায় এমন অবস্থাও দেখলাম, যেখানে হিঁদুরা বলছে, এর চাইতে মুসলমান হওয়াও ভাল। ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থানায় সুভড্যার জেলেদের ঘর-বাড়ী লুঠে নিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রায় ৭৫০ জন ঢাকায় সরকারী কুড়ে বেঁধে রেখেছিল। বিজয়া দশমীর দিন পুলিশ এসে কুড়েগুলো ভেঙ্গে ফেলে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

তবু বলতে হচ্ছে আরামে আছি। যাদের জন্যে এ জন্মটা আমরা বিলিয়ে দিয়েছিলাম, তাদের আর আমরা বাঁচাতে পারছি না। তারা আজও দেয় প্রেরণা। কিন্তু পেশী আজ শিথিল—দেহ ও মন অতি-ক্লান্ত—পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন কল্পনাতীত! সেকালের ভারত আমাদের ঘেন্না করত, একালের ভারতও আমাদের ঘেন্না করছে। নয়া কিশোর মাথা তুলছে না। অন্ন আজ তুচ্ছ, পতাকা বড়। মানুষ হয়ে যারা আজ রাষ্ট্রের গদিতে বসেছে আমাদেরই শবসাধনায়, তারা আমাদের আদর্শকে সন্দেহ করছে।

তবু আজ যারা পদ্মার তটের বুকে পড়ে আছে, আর পড়ে মার খাচ্ছে; হয়ত তারাই জয়ী হবে। ব্যস্ত হলে চলবে না।

আশ্চর্য্য অভ্যর্থনা

ব্যবহার বশতঃ নানাবিধ কুৎসিত ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির নিকটে সমাদরণীয় হইয়াছে। নিম্নলিখিত আচরণ যাহা আমাদিগগের পক্ষে ব্যঙ্গ বোধ হইবেক তাহা তিব্বত জাতি মধ্যে সুসভ্যাচরণ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। পাদরি হক্ সাহেব তাঁহার রচিত "চীন ও তাহার দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত" গ্রন্থে লেখেন যে "উত্তর তিব্বত দেশীয় মনুষ্যেরা পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে অভ্যর্থনা বিধায়ে উভয়েই বাম হস্তে আপন আপন বাম কর্ণ ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে মস্তক কণ্ডুয়ন করে, ও আপন আপন জিহ্বা নিঃসৃত করিয়া পরস্পর দেখায়।—বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ৭ম সংখ্যা।

রাস্তার ধারেই পড়বার ঘর। সেই ঘরের রাস্তার দিকের দু'টো জানলা খুলে আমরা দুই ভাই বসে আছি—পথের দিকে চোখ ও মন খুলে। একটু আগেই শিশি-বোতল বিক্রিওয়ালার কাছে এক সের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা দু-আনায় বেচে ছ'-পয়সায় ছ'টা কালো জাম কিনে এক-এক জন তিনটে করে খেয়ে দেহ ও মন পরিতৃপ্ত। এ কালো জাম গাছে ফলে না, ফলে ময়রার দোকানের এক রকম ছানার পান্তুয়া-গোছের জিনিষ। পান্তুয়াকে একটু বেশী ভেজে ওপরটা কালো করে রসে চোবানো হয়—আজকাল সে দ্রব্যটির আর দেখা পাওয়া যায় না।

বাকি দু'টো পয়সা হাতে নিয়ে বসে আছি—লজঞ্চুসওয়ালাকে দিতে হবে, তার কাছে ধার করে লজঞ্চুস খাওয়া হয়েছে। ধারের কথা জানতে পারলে বাড়ীতে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

রাস্তার ধারে বসে আছি—গ্রীষ্মের দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বাড়ীতে গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম চুকে গেছে। মা-রা সব ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। দুপুর বেলা একটু শব্দ কোথাও হবার জো নেই—রাতে ঘুম হোক্ বা না হোক, দিনে ঘুমের ব্যাঘাত হলে অনর্থ হবে। আমাদের চলা-ফেরা, অকার্য ও কার্যালাপে একটু শব্দ হলেই তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় অথচ পার্শ্বে শায়িত শিশুর চীৎকারে পাড়ার লোক বিরক্ত হয়ে গাল পাড়তে থাকে তবুও তাঁদের নিদ্রা ভাঙে না। আমাদের অপরাধে ঘুম ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইস্কুলের কর্তৃপক্ষকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন—গর্মির ছুটির জন্য। বোধ হয়, তার ফলেই ইস্কুল-মাষ্টারদের দুঃখ-দুর্দশা আজও ঘুচলো না।

রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি দুই ভাইয়ে—ঐ অনাথের মা বুড়ী স্নান করে ভিজে-কাপড়ে চলে যাচ্ছে। অনাথের মাকে পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই চেনে। এ পাড়ায় প্রায় সব বাড়ীতেই সে কাজ করেছে, প্রায় পঞ্চাশ বছর এ পাড়াতেই তার কাটল। কোমর ভেঙে গিয়েছে তবুও আজও তাকে খেটে খেতে হচ্ছে। তার বাসা সেই গড়পারের কোন বস্তীর মধ্যে। এখন গিয়ে সে রান্না-বান্না করে খাবে, তার পরে আবার বেলা চারটে বাজতে না বাজতে কাজে এসে লাগতে হবে। আবার রাত্রি আটটা-ন'টায় বাড়ীতে গিয়ে রান্না করে খেয়ে-দেয়ে শোবে। অনাথের মা বলে সবাই তাকে ডাকে বটে, কিন্তু অনাথ তার ছেলে নয়—তার এক বোন-পোকে সে মানুষ করেছিল, তার নাম ছিল অনাথ। সে-ও মরে গেছে শৈশবে, পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু আজও লোকে তাকে অনাথের মা বলে ডাকে।

অনাথের মা কিছু দিন আমাদের বাড়ীতেও কাজ করেছিল, কিন্তু কাজের ঠেলায় পালাতে পথ পায়নি। সে সময়ে অনাথের অনেক গল্প সে আমাদের কাছে বলত। কেমন সুন্দর দেখতে ছিল সে, সে তাকে মা বলে ডাকত—সেই ডাক এখনো তার কানে লেগে রয়েছে। এক দিন রাতে তার জ্বর হয়েছিল—রাত দুপুরে অনাথ তার গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—মা, তোর জ্বর হয়েছে।

অনাথ সম্বন্ধে এই গল্পটি অনেক বার সে আমাদের কাছে করেছে আর প্রত্যেকবারেই তার চক্ষু সজল হয়েছে, গলা ধরে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে মরে-যাওয়া অচেনা অনাথের দুঃখে আমাদেরও কণ্ঠরোধ হয়েছে, আমাদের গল্পের আসর ভেঙে গিয়েছে।

অনাথের মা চলে গেল। বসে আছি লজঞ্চুসওয়ালার আশায়। দু-পয়সা শোধ দিয়ে আবার দু'-পয়সার লজঞ্চুস খাব—ঐ যায় রিপুকর্ম্মওয়ালা—রোগা, একেবারে হাড়গোড় বার করা, নুয়ে পড়া। সুরে গেঁড়িয়ে গেঁড়িয়ে চলে যায় রি-পু-কম-মও, দূর থেকে শুনতে লাগে যেন—কি-কু-ম্-মও।

দূরে গলির মোড়ে লজঞ্চুসওয়ালার পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ল্যাওনচুস্—ল্যাঞ্চ স—

তড়াক্ করে বেরিয়ে গিয়ে রকে দাঁড়ান গেল। লজঞ্চুসওয়ালা কাছে আসতেই ইসারায় তাকে ডেকে আমরা ভেতরে ঢুকে গেলুম। আমাদের দ্বিপ্রাহরিক গৃহবিধির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সে বাড়ীর সামনে এসে হাঁক-ডাক থামিয়ে কিছুক্ষণ এদিক্-ওদিক্ দেখে টপ্ করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে পা টিপে-টিপে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকত, আমরা দরজাটা বন্ধ করে দিতুম। এত সাবধানতার কারণ এই যে, কোনো রকম শব্দ হলে ওপরওয়ালাদের ঘুম ভেঙে যাবে—যার ফলে আমাদের নানান অসুবিধা, এমন কি বিপদ-আপদ ঘটবার সম্ভাবনাও ছিল। ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে দেনা-পাওনার কথা হোতো, তার পরে লজঞ্চুস খেতে খেতে গল্প চলত। বলা বাহুল্য, এক ভাগ লজঞ্চুস তারও প্রাপ্য ছিল। সব দিনই তাকে ভেতরে আনবার সুবিধা হোতো না, মধ্যে মধ্যে রাস্তা থেকেই তাকে বিদেয় দিতে হোতো।

এই লজঞ্চুসওয়ালা ছিল আমাদের বন্ধু। আমাদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবধান ছিল বটে, কিন্তু এই মিলনের দৌত্য করেছিল আমাদের কৈশোর আর তার দিকে ছিল প্রাণৈশ্বর্য।

সে ছিল মুসলমান। বিহারের কোন এক জেলায় তাদের বাড়ী ছিল, কিন্তু দেশের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই—অনেক দিন থেকে তারা ব্যারাকপুরে বাস করছে। তার আপনার জন বলতে কেউ নেই। তার বড় বোনের স্বামী ব্যারাকপুরের কাছে কোন এক কলে কুলীগিরি করে, সেই সূত্রেই ওখানে বাস। বড় বোনও বেঁচে নেই, ভগিনীপতি আবার বিয়ে করেছে, এ বৌয়ের ছেলেপুলেও হয়েছে। ঐখানেই সে থাকে, কারণ, তাদের ওপরে মায়া পড়ে গিয়েছে, ছাড়তে পারে না। বছরের মধ্যে কয়েক মাস সে-ও কলে কাজ করে। বাকী কয়েক মাস লজঞ্চুস বিক্রি করে কলকাতায়। রোজ বেলা ন'টা-দশটার সময়ে ট্রেণে চড়ে আসে এখানে আর রাতের ট্রেণে ফিরে যায়। রামবাগানে কোথায় দিশি লজঞ্চুসের কারখানা আছে, সেখান থেকে পাইকারী দরে মাল খরিদ করে।

তার নাম ছিল মুখিয়া। মুখিয়া মানে সর্দার। কিন্তু পৃথিবীর

প্রভাত-সঙ্গীত

মহাস্থবির

কোনো দেশের মনুষ্য জাতি অথবা সম্প্রদায়ের সর্দার হবার মতন গুণ বা চেহারা ভাব ছিল না। অশিশ্যি এ জন্য তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। মানুষের নাম অতি অল্প ক্ষেত্রেই গুণবাচক হয়ে থাকে। দেখা যায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নামের গুণাবলীর সঙ্গে মানুষের অহি-নকুল সম্পর্ক দাঁড়াতে থাকে। নামকরণ সংস্কারটি মানুষের মৃত্যুর পরই হওয়া উচিত।

আমরা তখন বালক হলেও মুখিয়ার চাইতে মাথায় উঁচু ছিলুম। বামনের মতন মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের বড় হলেও তাকে ঠিক বামন বলা চলত না। তার রং ছিল কালো। কিন্তু বাপ রে, সে কি কালো! ডান দিকের মাথার মাঝখান থেকে আরম্ভ করে একেবারে চিবুক অবধি পোড়া। এতখানি জায়গা একেবারে মসৃণ ও চকচকে এবং তার মাঝে মাঝে সাদা দাগ, ধবলের মতন—অমাবস্যার অন্ধকার আকাশে যেন তারা ঝকঝক করছে। পুড়ে যাওয়ার ফলে ডান চোখের কোণটা যেন টেনে ধরা হয়েছে গোছের, আর চোখের তলার দিকের লালটা বেরিয়ে এসেছে—যেন দগদগে ঘা। ডান দিকে মাথায় চুল, ভুরু, গোঁফ কিংবা দাড়ি এক গাছিও নেই। বাঁ দিকের মাথায় চুল এবং ভুরু আছে বটে, কিন্তু দাড়ি এখানে দু'টি ওখানে চারটি—গোঁফও সেই রকম। এক দিককার দাড়ি-গোঁফ চেঁচে ফেলে তাকে ভদ্র হতে বললেই সে তার সেই কয়েক গাছা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলত—ওরে বাবা, তা হয় না—আমি নেমাজী লোক, দাড়ি ফেলতে পারি কখনো? বয়স ছিল তার ত্রিশের ওপর। একবার কল্পনা করুন সেই চেহারাখানা। কিন্তু সেই কুৎসিতের মধ্যে বাস করত একটি সুন্দর প্রাণ।

মুখিয়া মাসে প্রায় পনেরো-ষোলো টাকা রোজগার করত, কিন্তু তা থেকে নিজের সম্ভোগের জন্য একটি পয়সাও খরচ করত না, সব ভগিনীপতির হাতে তুলে দিত। সে বলত—ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে বড় ভালবাসি তাই তাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারি না। নইলে এত বড় দুনিয়ায় কি থাকবার জায়গার অভাব আছে?

অথচ তারা তার নিজের বোনের ছেলেপিলে নয়। তার ভগিনীপতির দ্বিতীয়া স্ত্রীও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না। সে মুখিয়াকে 'পোড়ারমুখো' বলে ডাকত।

আমরা বলতুম—তুই কিছু বলতে পারিস্ না!

মুখিয়া বলত—কি আর বলব! সত্যিই তো আমার মুখ পোড়া।

এই সবের জন্য তাকে আমাদের বড় ভাল লাগত ও পরে সেই আকর্ষণ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। তার সঙ্গে কেমন করে বিচ্ছেদ হোলো সেই কাহিনীটাই বলি।

আমাদের সেই দ্বিপ্রাহরিক আড্ডাটা সেবার গরমের ছুটির সময় খুবই জমে উঠেছিল। মুখিয়া ছাড়াও লজঞ্চুসের লোভে লোভে পাড়ার আরও দু'টি তিনটি ছেলে এসে রোজ জমতে লাগল সেখানে। বাড়ীর কেউ জানে না, খুবই সন্তর্পণে আড্ডাধারীরা যাওয়া-আসা করে। আমরা দুই ভাই বাড়ীর মধ্যে উচ্চহাসির জন্য কুখ্যাত ছিলুম, কিন্তু আড্ডা ধরা পড়বার ভয়ে সে সময়টা আমরা প্রাণপণে হাসি সামলে রাখতুম। একটি ছেলে ছিল, সে ভারি মজার মজার সব গল্প ও কাহিনী বলতে পারত। সেই বয়সেই গল্প বলবার বেশ একটা চাল সে আয়ত্ত করেছিল। মাঝে মাঝে তার গল্প শুনে হাসি সামলাতে না পেরে আমরা মুখে কাপড় ঠেসে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে প্রাণ খুলে হেসে আসতুম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সে নিজে একটুও হাসত না বরং আমাদের মুখের দিকে এমন জিজ্ঞাসু ভাবে চাইত যে মনে হোতো সে বলতে চায়—কি রে, হাসছিস কেন—এতে হাসবার কি আছে রে?

মুখিয়া ভাঙা-ভাঙা বাংলা জানত বটে, কিন্তু সব কথার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সে সব সময়ে ধরতে পারত না—আমাদের হাসতে দেখে সে হাসবার চেষ্টা করত মাত্র।

সেদিন সেই ছেলেটি একটা মজার গল্প বেশ জমিয়ে বলছিল, এমন সময় গল্পের মাঝখানেই হঠাৎ মুখিয়া তারস্বরে চীৎকার করে উঠল—ঠিক বাচ্ছা গাধার মতন।

হঠাৎ তার সেই চীৎকার শুনে আমরা তো ভড়কেই গেলুম কিন্তু একটু পরেই টের পাওয়া গেল যে সেটা তার হাসি।

হাসি আর থামে না। আমরা যত বলি, এই মুখিয়া, চুপ কর—চুপ কর ভাই, মা উঠে পড়বেন—

আর চুপ কর! একটা দম দেওয়া কলের মতন মুখিয়া সেই ভাবে গাধার ডাক ছেড়ে চলল। হাসির সময় তার মুখের চেহারা হয়ে উঠল একেবারে বীভৎস। তার মুখের সেই পোড়া দিকটা কি রকম কুঁকড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়া চোখটা যেন আরও ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল। কিছুতেই তাকে থামাতে পারি না। ওদিকে মা'র ঘরের দরজা খুলল, তাকে তাড়াতে চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু কে কার কথা শোনে! হাসির ধমকে সে-সব কথা সে বুঝতেই পারলে না। ইতিমধ্যে মা এসে আমাদের দরজা খুলে দাঁড়াতেই মুখিয়ার হাসি গেল থেমে। হাসি থামল বটে কিন্তু মুখখানার অবস্থা সেই রকমই বেঁকে-চুরে তুবড়ে রইল।

মা বোধ হয় প্রথমে মুখিয়াকে দেখতে পাননি। ঘরে ঢুকে সেদিকে চোখ পড়তেই তাকে দেখে চমকে—এটা কে রে! বলে এক পা পিছিয়ে গেলেন।

মুখিয়া ততক্ষণে তার লজঞ্চুসের ডালাটা সামলে নিয়ে মাকে ছোট একটা সেলাম করে সরে পড়ল—তার পেছন পেছন পাড়ার অন্য দু'টি ছেলেও সরে পড়ল। হাঙ্গামার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমরাও তখনকার মতন চিলের ছাতে উঠে আত্মগোপন করলুম।

বাবা আপিস থেকে ফেরবার পর বিকেলে একটা খোলা বারান্দায় মাদুর পেতে রোজই আমাদের এক পারিবারিক বৈঠক বসত। বাড়ীতে কয়েক জন মহিলা থাকতেন, তাঁরা আমাদের সংসারেরই লোক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখের ওপরে চোপরা করা অথবা প্রকাশ্যে তাঁদের সম্বন্ধে কোনো রকম অসম্মানকর মন্তব্য করলে আমাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হোতো। প্রাত্যহিক এই পারিবারিক সভায় তাঁরাও উপস্থিত থাকতেন। এইখানে প্রতিদিনই—বাবা আপিসে চলে যাবার পর এতক্ষণ পর্যন্ত—অর্থাৎ যতক্ষণ আমরা তাঁর চোখের আড়ালে ছিলুম—আমরা কি করেছি, অর্থাৎ কেমন ভাবে দিন কাটিয়েছি, তার একটা কৈফিয়ৎ পেশ করতে হোতো। বলা বাহুল্য, রোজই আমরা বলতুম, এগারোটা থেকে চারটে অবধি লেখাপড়া করেছি—প্রমাণ-স্বরূপ, হাতের লেখা,

অঙ্ক কষা প্রভৃতি তিনি রোজই নিয়ম মত দেখে তাতে সই করে দিতেন।

সেদিন আসরে ডাকের ধরণ দেখেই বুঝতে পারলুম, আজ বরাতে কিছু দক্ষিণা আছে।

আসরে উপস্থিত হতেই বাবা গম্ভীর সুরে বললেন—বোসো।

একটু নিরাপদ ব্যবধানেই গুটি-সুটি হ'য়ে বসে পড়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সনাতন প্রশ্ন—আজ দুপুরে কি কি করলে?

যদিও জানতুম যে, আজ দুপুরের কাহিনী বেশ পল্লবিত হয়েই তার কানে পৌঁচেছে তবুও বুক ঠুকে সেই সনাতন উত্তরই দিয়ে চললুম—এগারোটা থেকে পৌনে বারটা অবধি অঙ্ক কষেছি, পৌনে বারোটা থেকে পৌনে একটা অবধি ভূগোল পড়েছি, পৌনে একটা থেকে একটা অবধি ম্যাপ দেখেছি—

আর বেশী অগ্রসর হবার আগেই একটি মহিলা বলে উঠলেন—ম্যাপ দেখেছ না ছাই দেখেছ!

তার পরে বাবার দিকে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—সারা দিন খালি হুল্লোড়, হাসি, আড্ডা, গল্প এই তো চলে দেখছি, পড়ে কখন তা তো জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন সুরু করলেন—দুপুর বেলা ওদের অত্যাচারে চোখের পাতাটি বোজবার যো আছে। হৈ-হৈ চলেইছে!

আর এক জন মন্তব্য করলেন—এই বয়সে এত বন্ধুই বা এদের জোটে কি ক'রে তাই ভাবি। রাজ্যের লোকের সঙ্গে গলাগলি!

এবারে মা বললেন—আর সে সব বন্ধুর চেহারাই বা কি!

বাবা বললেন—সারা দিন হি হি হি হি আর হো হো হো হো ক'রে ক'রে নিজেদের যে রকম চেহারা হয়েছে, বন্ধু-বান্ধবও তো জুটবে সেই মেকদারের—

যা হোক্, সেদিনকার সভায় ঠিক হয়ে গেল যে দুপুর বেলা আমাদের সায়েস্তা রাখবার এক জন জবরদস্ত শিক্ষক রাখা হবে, আর সকাল-সন্ধ্যের জন্য বাবা তো আছেনই। তাঁর সন্ধানে এমন লোক আছে এ কথা তিনি সভাক্ষেত্রে প্রকাশ করলেন।

পরের দিন দুপুর বেলায় আড্ডায় দুঃসংবাদটি প্রকাশ করা গেল। মুখিয়াকে বললুম—বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে একবার দু'বার 'ল্যাবেঞ্চুস' বলে হাঁক দিলেই আমরা বেরিয়ে আসব।

দিন দুই বাদে আমরা দুপুরের মাষ্টার মশায়কে দেখলুম। আফিস থেকে ফেরবার সময় বাবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। বেশ চেহারা, দিব্যি ভদ্র অমায়িক ভাব। আমাদের দুই ভাইয়ের গাল টিপে-টিপে আদর ক'রে বললেন—এরা তো বেশ ছেলে! আপনি যে রকম বললেন দেখে তো তা মনে হয় না।

বাবা একটু হেসে বললেন—এক একটি বর্ণচোরা। দু'-দিনেই পরিচয় পাবেন।

ঠিক হয়ে গেল কাল দুপুর থেকেই তিনি আমাদের গুরুভার গ্রহণ করবেন।

সেদিন রাত্রি বেলা আমাদের পড়াতে-পড়াতে বাবা বললেন—আমি মাষ্টার মশায়কে বলে দিয়েছি, তোমাদের প্রাণে মেরে ফেললেও আমি তাঁকে কিছু বলব না, অতএব সাবধান হয়ে চোলো।

প্রাণধারণের উপকরণগুলির দুর্মূল্যতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ জিনিষটি আজকাল যে রকম সুলভ হয়ে উঠেছে সে যুগে তা ছিল না, কাজেই আত্মরক্ষার তাগাদায় সাবধান হবারই সংকল্প করতে লাগলুম মনে মনে।

ছুটির সময় দুপুর বেলা এই রকম সাজার ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবার ওপরে হাড় চটে গেলুম; আমরা যে রকম সন্তর্পণে কথা বলতুম, চলতুম এবং যে রকম সাবধানতার সঙ্গে দরজা খোলা ও বন্ধ করা হোতো তাতে কারুরই কখনো ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া উচিত নয়। অবিশ্যি এক দিন মুখিয়া তার অদ্ভুত হাসি হেসে সবাইকে চমকে দিয়েছিল স্বীকার করি। অদ্ভুত রসে চমক লেগেই থাকে—সেটা তাঁরা সহজেই উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই একবাক্যে রায় দিলেন যে দুপুর বেলা আমাদের অত্যাচারে কোনো দিনই তাঁরা ঘুমুতে পারেন না! কি ক'রে তাঁদের সেই আরামের দ্বিপ্রাহরিক সুখস্বপ্নটির ব্যাঘাত জন্মাতে পারা যায়, তারই পরামর্শ আঁটতে লাগলুম দুই ভাইয়ে।

পরের দিন দুপুর বেলা এগারোটা বাজতে না বাজতে মাষ্টার মশায় এসে হাজির হলেন। এগারোটা থেকে চারটে অবধি কবে কখন কি পড়া বা লেখা হবে প্রথমেই তার একটা রুটিন তৈরী হোলো, তার পরে আসল পড়া সুরু হোলো।

পড়তে লাগলুম মনে মনে। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে মাষ্টার মশায় বললেন—চেঁচিয়ে পড়, তা না হোলে আমি বুঝব কি ক'রে যে তোমরা পড়ছ না ফাঁকি দিচ্ছ। চেঁচিয়ে পড়ার আর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, যা পড়বে সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ হয়ে যাবে।

ব্যস্! আর বলতে হোলো না, সঙ্গে সঙ্গে হদিশ লেগে গেল। সেই থেকে সুরু ক'রে বেলা চারটে অবধি আমরা এমন চেঁচিয়ে পড়লুম যে বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুম তো দূরের কথা, ডাকাত পড়েছে মনে ক'রে কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ ক'রে ওপর-নীচ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

যথাসময় মাষ্টার মশায় চলে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারা গেল যে আমাদের পড়া মুখস্থ করার আগ্রহটি তিনি ভালো ভাবে গ্রহণ করেননি।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখলুম, সবারই মুখ বেশ গম্ভীর—বুঝলুম ওষুধ লেগেছে।

দিন কতক এই রকম চলল—কিন্তু কাঁহাতক রোজ পাঁচ ঘন্টা ক'রে চেঁচানো যায়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পেটে ও কোঁকে ব্যথা ধরে গেল। তার ওপরে দিনে ঘুমানো যাদের অভ্যেস, তারা ইঞ্জিন তৈরির কারখানায় পড়েও দিব্যি ঘুম লাগাতে পারে, দু'-এক দিন একটু কষ্ট হয় মাত্র।

বাড়ীতে দিন কয়েক মিস্ত্রি খেটেছিল। উদ্বৃত্ত বিলিতী মাটি বালি, চুণ ইত্যাদি বাড়ীর এক জায়গায় যত্ন ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছিল, ভবিষ্যতের জন্য। এর কাছেই মিস্ত্রিদের ছোট-বড় কর্ণিক ইত্যাদি সব জড় করা ছিল। মিস্ত্রিদের কাজ ও সরঞ্জাম দেখতে দেখতে আমাদের স্থপতি-প্রতিভা মাথা-চাড়া দিলেন—ঠিক করা গেল, একটি ছোট বাড়ী তৈরি করতে হবে।

ক'দিন ধরে ছোট-বড় দেশলাইয়ের মধ্যে এঁটেল মাটি পূরে সেগুলোকে রোদে শুকিয়ে একরাশ ইট ও টালি তৈরি করা হোলো। এক দিন রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের এক কোণে মেজে খুঁড়ে বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করা গেল। সকাল বেলা বাড়ীর চারি দিকে

লোক-জন চলাফেরা ইত্যাদি নানা ব্যাঘাতে কাজ তেমন অগ্রসর হোলো না। ঠিক হোলো দুপুর বেলা পড়বার সময় এক-একবার এক এক জন ক'রে উঠে এসে কাজ করা যাবে।

যথা-সময়ে মাষ্টার মশায় এলেন। ওপরওয়ালীরা সব শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করবার পর আমি উঠে গিয়ে আধ ঘণ্টাটাক কাজ ক'রে ফিরে এলুম। ভায়া উঠে গেল তার পর, সে ফিরল প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে। এই রকম ক'রে দু'জনে বার দু'-তিন গিয়ে কাজ করা গেল। মনে হোলো, এই রেটে কাজ চালাতে পারলে পরের দিনেই একতলার কাজটা শেষ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু হায় রে পরের দিন! সেদিনটায় তিথি-নক্ষত্রের যে কি সমাবেশ ছিল তা আজও ভাবি।

সেদিন মাষ্টার মশায় এসে বসতে না বসতে আমি উঠে গেলুম, কারণ সিমেণ্টটা মাখা হয়েছিল, দেরী হোলে আবার শুকিয়ে যাবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে একখানা বই হাতে নিয়ে ফিরে এলুম— অর্থাৎ মাষ্টার মশায় যেন মনে করে বই খুঁজতে দেরী হয়েছে। আমি কিছুক্ষণ বসতে না বসতে ভায়া উঠে গেল ও প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এসে গুটিগুটি নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে যাচ্ছে এমন সময় মাষ্টার চেঁচিয়ে উঠলেন ইংরেজীতে—You boy, come here.

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে আমরা ভড়কে গেলুম। মাষ্টার মশায় আমাকেও ডাক ছাড়লেন ইংরেজীতে, ঐ সুরেই।

আমরা দু'-জনে তাঁর কাছে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালুম। তিনি বললেন—কাল থেকে দেখছি পড়তে পড়তে উঠে যাচ্ছ—কোথায় যাও—এ্যাঁ—

এই বলে, আমাদের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না ক'রেই দু'-জনের মাথায় টাঁই-টাঁই ক'রে কয়েকটি শ্রীগাঁট্টা জমিয়ে দিলেন। উঃ, মাথা একেবারে চিড়বিড়িয়ে গেল। যে কখনো মারে না তার হাতের আঘাতে লাগে বেশী, কারণ দেহ ও দেহাতীত দু'-জায়গাতে লাগে সে আঘাত।

যা হোক্, মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে তো নিজের জায়গায় এসে বসলুম। মাষ্টার মশায়ের রাগ তখনো পড়েনি। তিনি গর্জে-গর্জে বলতে লাগলেন—চারটের আগে এখান থেকে এক পা নড়েছ কি দেখবে মজা।

ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা সামনে খোলা পড়েছিল। মাথার যন্ত্রণায় মনে হোতে লাগল সমস্ত ভারতবর্ষের বুক জুড়ে সর্ষের ক্ষেত ভরে উঠেছে।

মাষ্টার মশায় আবার গর্জে উঠলেন—তোমাদের বাবা যে তোমাদের 'বর্ণচোরা' নাম দিয়েছেন তা ঠিকই দিয়েছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি।

নামকরণ করার ব্যাপারে বাবার প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহই ছিল না, কারণ আমাদের নামের জোড়া সেদিন জগতে দুর্লভ ছিল, আজও সুলভ নয়। তাই সেদিক্ দিয়ে না গিয়ে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীর অনেক লোকই বর্ণচোরা—যেমন আপনি একটি।

নানা রকম আবোল-তাবোল চিন্তা পাক খাচ্ছে মগজের মধ্যে, এমন সময় গলির মোড়ে আওয়াজ হোলো—ল্যা—বেন—চুওস্—

মুখিয়ার কাছে এক পয়সা দু'-পয়সা ক'রে সেবার প্রায় চার আনা ধার হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন থেকে পয়সার জন্য তাগাদা করার সেদিন তাকে নিশ্চয় দিয়ে দেবার কথা ছিল—পয়সার জোগাড়ও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কি ক'রে উঠে গিয়ে তাকে পয়সা দেওয়া যায়। ওদিকে মুখিয়া হাঁকতে হাঁকতে বাড়ীর সামনে এসে সাঙ্কেতিক ডাক ছাড়লে—ল্যাওনচোস্!

আমাদের ভাবান্তর দেখে মাষ্টার মশায়ের সজাগ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হ'য়ে উঠল। ওদিকে মুখিয়া আরও দু'-তিন বার অতি বিনীত ভাবে ল্যাবেন-চোস্—ল্যাওনচোস্ বলে হঠাৎ বীরদর্পে চোওওস্ বলে এমন একটা হাঁক ছাড়লে যে দেশকালপাত্র ভুলে আমরা দু'জনেই হেসে ফেললুম।

আমাদের হাসতে দেখে মাষ্টার মশায় রেগে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—হাস্‌ছ কেন?

ঠিক সেই মুখে ছুঁচোবাজীর চালে মুখিয়া আর এক হাঁক ছাড়লে—চোই ওঁই ওঁই ওঁই ও ও ওস্।

ব্যস্, আর যায় কোথায়! আর হাসি চাপা সম্ভব হোলো না, এবার আমরা জোরে হেসে উঠলুম।

আমাদের ধৃষ্টতা দেখে মষ্টার মশায় বললেন—আচ্ছা, তোমাদের কাঁদিয়ে ছাড়ছি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের ওপর এলোথাপাড়ি কীল, চড়, গাঁট্টা পড়তে লাগল। আমাদেরও কি রকম রোখ চেপে গেল—মাষ্টার মশায় যতই মারুন না কেন কিছুতেই হাসি থামাব না।

ওদিকে সেদিন যেন মুখিয়ার প্রতিভা খুলে গেল। সে অদ্ভুত রকমারী বাঁটকর্ত্তবে 'ল্যাবেঞ্চুস' শব্দটি হাঁকতে শুরু করে দিলে। মোট কথা, লজঞ্চুস্ চুষে চুষে উপভোগ করার বাণীমূর্ত্তি সে ফুটিয়ে তুলতে লাগল সেই তৃতীয় প্রহরের রোদে পথে দাঁড়িয়ে।

এদিকে মাষ্টার মশায় দুই হাতে বাজনা বাজাচ্ছেন আমাদের ওপর—চটাচট, পটাপট। মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে একই সঙ্গীত—কাঁদিয়ে তবে ছাড়ব। আর আমরা কাঁদতে কাঁদতে উচ্চস্বরে হেসে চলেছি হা হা, হো হো, হি হি—

এই অদ্ভুতপূর্ব কনসার্টের শব্দে বাড়ীর সবার দিবানিদ্রা ছুটে গেল, তাঁরা দুদ্দাড় ক'রে এক রকম ছুটেই নীচে নেমে আসতে লাগলেন। কিন্তু তখন দু-পক্ষই অর্ধক্ষিপ্ত। তাঁদের দেখে মাষ্টার মশায়ও হাত থামালেন। আমরাও আগের মতনই হাসতে থাকলুম।

ইতিমধ্যে মা এসে ঘরে ঢুকলেন—উভয় পক্ষেরই ইজ্জৎ বাঁচল। মাকে দেখে মাষ্টার মশায় ও আমরা থেমে গেলুম। মা আমাদের বলতে লাগলেন—তোমরা বড় বাড় বেড়েছ। আচ্ছা হচ্ছে তোমাদের—

মা আরও কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শুনতে পাওয়া গেল। অনেক লোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ও মধ্যে মধ্যে মুখিয়ার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল। অন্য সময় হোলে আমরা ছুটে বেরিয়ে যেতুম, কিন্তু মাথার ওপরে অত-বড় একটা অপরাধের বোঝা থাকায় তখনকার মতন উত্থান-শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল।

গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। হঠাৎ যেন তারই মধ্যে বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। কি রকম হোলো তাই ভাবি এমন সময় মনে পড়ল আজ যে শনিবার।

আবার বাবার আওয়াজ ছোটে—মা আমাদের বললেন—দেখ তো, কি হয়েছে ?

বলা মাত্র তড়াক ক'রে বেরিয়ে গেলুম। বাইরে গিয়ে দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার। রাজ্যের লোক দাঁড়িয়েছে মুখিয়াকে ঘিরে। তার লজঞ্চুস রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে, কাঠের কাণা-উঁচু ডালাটাও এক দিকে পড়ে রয়েছে। মুখিয়ার হাত-পা ও মুখের স্থানে স্থানে ছ'ড়ে গিয়েছে—দু'চোখ দিয়ে জল ঝরছে, কিন্তু কান্নার শব্দ হচ্ছে না। করুণ সে দৃশ্য দেখে আমাদের চোখে জল বেরিয়ে এল। সেখানকার তর্কাতর্কি শুনে ব্যাপারটি যা বুঝলুম তা হচ্ছে এই—

পাড়ার গুটিকয়েক লোক ছিলেন বেকার। মুখিয়া না কি প্রতিদিন বীভৎস হুঙ্কার ছেড়ে তাঁদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়। এত দিন তাঁরা নীরবে তার এই অত্যাচার সহ্য ক'রে আসছিলেন, কিন্তু আজ না কি খুবই বাড়াবাড়ি করায় নিতান্ত সহ্য করতে না পেরে অসময়ে স্বপ্নাগার ছেড়ে এই রোদে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন তাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে। অধ্যাপনার কার্যটি প্রায় সুসম্পূর্ণ হ'য়ে এসেছিল, এমন সময় বাবা এসে তাঁদের হাত থেকে মুখিয়াকে উদ্ধার করেছেন—এই সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

বাবা বলতে লাগলেন—ছি ছি, আপনারা কি মানুষ! এই পঙ্গুকে ধরে তিন-চার জনে মিলে মারতে একটু মায়া হোলো না আপনাদের ?

তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললে—মশায়, আপনি যা রাগী, আপনি হোলে মেরেই ফেলতেন ওকে।

বাবা চুপ করে আছেন দেখে আর এক ব্যক্তি বললে—আপনিও তো মশায় আচ্ছা লোক! পাড়ার লোকে একটা কাজ না হয় করেই ফেলেছে। আপনি কোথায় সেটা চেপে যাবেন, না উল্টে ওর হয়ে লড়াই শুরু করেছেন! আশ্চর্য!

তিনি কোনো জবাব দেবার আগেই আর এক জন বলে উঠ্‌ল—ছেলেদের বন্ধু যে!

ভীড়ের লোকেরা হো-হো করে হেসে উঠল।

বাবা আর তাদের কথার কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা না করে ছেলেদের বন্ধুর রূপখানি দেখতে লাগলেন। রূপ-তরাস কেটে গেলে মুখিয়ার একখানা হাত ধরে তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

মুখিয়ার অবস্থা দেখে বাড়ীর সবাই দুঃখ করতে লাগলেন। মা তাকে জেরা করলেন—তুই এ বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে চেঁচাচ্ছিলি কেন ?

তার পরে আমাদের দু'জনকে দেখিয়ে বললেন—নিশ্চয় এদের ডাকছিলি। বল, তোর কোনো ভয় নেই।

মুখিয়া বললে—চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেঁচানোই আমার অভ্যেস—ওদের ডাকবার আমার কি দরকার!

মা বললেন—আমি জানি, এরা তোর কাছে ধার ক'রে লজঞ্চুস খায়—এদের কাছে কিছু কি পাবি ?

সঙ্গে সঙ্গে মুখিয়া প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না না না, কিছু পাব না—ওরা আর ধারে খায় না।

এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে খেয়ে মুখিয়া তার শূন্য ডালাটা বগলে নিয়ে চলে গেল।

মুখিয়া চলে যাবার পর এই ব্যাপার নিয়ে বাড়ীর সকলেই আলোচনা করতে লাগলেন। বাবা ও মাষ্টার মশাই দু'জনেই এই নিয়ে অনেক কথা বললেন। বাবা বললেন—কেউ কারুকে ধরে মারছে, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যখন উল্টে মারতে পারবে না।

মাষ্টার মশায়ও দেখলুম এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে একেবারে একমত।

সেদিন দিবানিদ্রার ব্যাঘাতের জন্য যাঁরা মুখিয়ার অঙ্গে ব্যথা দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই দিবানিদ্রা থেকে গভীরতর নিদ্রায় অপসৃত হয়েছেন—জানি না, আজও নিদ্রা ভেঙেছে কি না। মাষ্টার মশায় কিন্তু পরদিন থেকে আর এলেন না। সে জন্য দুঃখ নেই, কারণ মাষ্টারের অভাব জীবনে কোনো দিনই ভোগ করতে হয়নি, কিন্তু মুখিয়া আর এল না, যার অভাবে মনের একটা জায়গা আজও খালি হয়ে আছে।

[ক্রমশঃ।

এক দিন ছিলে তুমি

মৃণালকান্তি দাশ

যে প্রাণপুষ্পের মধু মৃত্যু এসে গেছে পান করে,
পুরানো পাতার মত যে দিন হাওয়ায় গেছে ঝরে
ইতস্তত বহু দূর দিক্‌হারা দক্ষিণে, উত্তরে—
বৈশাখের রৌদ্ররাগে ফুরায়েছে যে কাল্গুন, ফুলের প্রহর—

জ্যোৎস্না, চাঁদ, নীল রাত, নক্ষত্র, নির্ঝর ভোরের আলোয়।
সে দিনের পরিপূর্ণ গানখানি, রামধনু বর্ণ, মধু, মায়া
এখন তাহারা কোন বিগত দিনের গর্ভে বিমলিন ছায়া!
সেই সব আজ শুধু ছায়ার শরীর,—কোন দূর স্মৃতি বিস্মৃতির :

এক দিন ছিলে তুমি, অনুভব করিতেছি আজিকে তোমারে—
নিঃসঙ্গ প্রাণের রাতে, হৃদয়ের নির্জন তিমিরে॥

নগরবাসী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুশীলের হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে ওঠে, তার মুখ শুকিয়ে যায়। খাঁটি বিবেক হয়তো মানুষকে নির্ভয় করে, কিন্তু কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধ করেনি বলেই বিবেক কারো খাঁটি হয় না। ধনীর পা ধরে তুলবার চেষ্টায় যে এত কাল কাটাল ধনী বন্ধুর মিথ্যা সন্দেহে অবিচলিত থাকার সাহস সে কোথায় পাবে? সুশীল সভয়ে বলে, আমি তো কিছুই জানি নে ভাই!

ত্যাখো, আমরাও ভাত খাই। শুধু ভাত খাই না, চোরা বাজারে চাল বেচে ভাত খাই।

—কি বলছ তুমি? আমাকে বিশ্বাস কর না?

যতীন তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়।—এত কাল তোমার টিকিটি দেখতে পাইনি কখনো, হঠাৎ তুমি উদয় হলে দু'মণ চালের জন্য। আমার কাছে কেউ দু'মণ চালের জন্য আসে? তখনি সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, ছুতো করে গুদোম দেখে রাশিয়ার এজেন্টগুলোকে লেলিয়ে দেবার মতলবে তুমি এসেছো। লেখাপড়া শিখেছ, কলেজে পড়াও, এমন বিশ্বাসঘাতক বজ্জাত স্পাই তুমি হতে পার কে তা ভেবেছিল। আমি বরং মনে মনে হেসে ভেবেছিলাম, তেমনি হাবাগোবা ভাল-মানুষটিই রয়ে গেছ তুমি।

এ রকম চাছাপোছা গালাগালি সুশীলের সহ্য হয় না, ক্ষোভে অপমানে তার মুখ বাদামী হয়ে যায়। একটু ঘুরিয়ে একটু মার্জিত ভাবে গম্ভীর অবজ্ঞার সঙ্গে এই একই ঘৃণা আর ভর্ৎসনা প্রকাশ করে যতীন তাকে কেবল মর্মাহত নয় একেবারে মরমে মেরে ফেলতে পারত। চোরা-কারবারীদের বাড়াবাড়িতে ক্ষেপে গিয়ে পাড়ার লোক যা করেছে তার সঙ্গে সুশীলের সত্যই যে কোন সংশ্রব ছিল না, তার চোরা-চালের গুদাম ধরিয়ে দিতে গুদামের একটা নেংটি ইঁদুরের ভূমিকাটুকুও যে তার ছিল না, কিছুই তাতে আসত-যেত না। এত দিন কিছুই হয়নি, আচমকা সে সামান্য চালের খোঁজে উদয় হবার পরেই তার বিশ হাজার টাকার চাল ধরা পড়ে গেছে বলে যতীন তাকে সন্দেহ করে, এতেই তার আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা সুরু হয়ে যেত। তারও তো সেই যুক্তি-সর্বস্ব মন যাতে প্রকৃত সত্য-মিথ্যার চেয়ে যুক্তি বড়। নীতিগত বিচারে তার দোষ না থাক, ওই নীতিটাই যে এখন যতীনের অনুমোদন-সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

তার মুখ দেখে যতীন সুখ পায়। সে আবার বলে, ছি! ছি! কত বড় নীচ কত বড় ছ্যাঁচোড় হলে বন্ধুর সঙ্গে এমন করতে পারে!

এবার আর সইতে না পেরে সুশীল চশমা খুলে হাতে নিয়ে মাথায় একটা ঝাঁকি দেয়—ক্লাশে ছেলেদের বে-আইনী বেয়াদপিতে মেরুদণ্ড জ্বলে গেলে এমনি ভাবে আগে চোখের চশমাটি সামলে ক্রোধ প্রকাশ করা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তুমি চাষা বনে গেছ যতীন! তুমি ছোটলোক হয়ে গেছ!

সুশীলের ভাবান্তর দেখে যতীন সত্যই একটু ভড়কে গিয়েছিল। টেবিল থেকে পেপার-ওয়েটটা তুলে যদি ছুঁড়েই মারে? সে একটু নরম সুরে বলে, তুমি কি বলতে চাও—?

নিশ্চয় বলতে চাই, একশো বার বলতে চাই আমার কোন দোষ নেই, আমি কিছু করিনি। একবার শুনবে হয় তো আমার কথাটা? এমন কি হতে পারে না যে, অ্যাকসিডেন্টালি আমি ঠিক এই সময়ে চালের জন্য এসেছি, তোমার গুদোমের খবর আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল? কিছু না জেনে-শুনে এমন অভদ্রের মত তুমি আমায় গালাগালি দেবে

এ প্রায় মেয়েলি অভিমান। যতীন মজা পায়। আরও একটু নরম সুরে বলে, তা হতে পারে, তুমি ইচ্ছে করে হয়তো করনি। কোথায় চাল পেয়েছো বলে বেরিয়েছিলে তো?

না। কাউকে বলিনি।

এটা মিছে কথা, মণিকে সে সব কথাই বলেছে, চালের গুদাম যে গলিতে তার নামটা পর্যন্ত! কিন্তু মণি তো 'কেউ' নয়, সে ধর্মপত্নী। মুখে যাই বলুক, মনে সুশীলের খটকা লেগেছে। বেশ একটা তোলপাড় উঠেছে। মণিই কি তবে বলে বেড়িয়েছে? অথবা হয়তো মণির কোন দোষ নেই; নিজে থেকে সে কিছুই ফাঁস করেনি, প্রণবরা কৌশলে তার কাছে সব জেনে নিয়েছে যে এ বাজারে এত চাল সুশীল কোথায় বাগাল? ওদের অসাধ্য কিছু নেই। পরের আধ ঘণ্টা সময় এই সিদ্ধান্তটাই তার মনে পাক খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রায় বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়।

যতীন কেমন নরম হয়ে গেছে। যেমন হঠাৎ বন্ধুকে দোষী সাব্যস্ত করে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ যেন সে বিশ্বাস করেছে তার দোষ নেই। তাই বলে ক্ষমা কি চায় যতীন, দুঃখ প্রকাশ করে? ও-সব তার জবরদস্ত লোকের জন্য, বড় নেতা লাট-বেলাটের জন্য তোলা থাকে। তাদের গাল দেওয়া দূরে থাক, কড়া কথা বলার স্বপ্নও অবশ্য ত্যাখে না যতীন। সুশীলের মত যে সব মানুষকে সে খুশী হলে জুতো মারে, ভুল করে জুতো মারার জন্য তাদের কাছে অনুতপ্ত হওয়া তার ধাতে নেই।

সে করে কি, চা আর খাবার আনতে হুকুম দেয়। তাতেই গলে জল হয়ে যায় সুশীল। খাবার খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একাগ্র গভীর চিন্তায় মুখ-চোখ কুঁচকে বলে, ত্যাখো যতীন, একটা কথা ভাবছি। যে রিক্সায় চাল নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই রিক্সাওলাটা হয়তো বজ্জাতি করেছে।

যতীন মুচকে হাসে।

সস্তা সিরিজের ডিটেকটিভ বই পড় বুঝি খুব?

মোটেই না।

সুশীল আহত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তবে ধন ও শক্তির মালিকদের আঘাতে আহত হওয়া তার চিরদিনের অভ্যাস। অল্পেই সামলে নিয়ে বলে, খুব বেশী রকম ক্ষতি হয়েছে ভাই?

যতীন নাক সিঁটকে বলে, বিশ-বাইশ হাজারের মাল গেছে বয়ে গেছে। গুদামটা গিয়ে অসুবিধা হল। কি আর হবে, ঠিক করে নেব সব।

তোমার তো কোন ভয় নেই? তোমাকে তো ধরবে না? এই কথাটা ভেবেই আমার এমন খারাপ লাগছে। তোমায় যদি অ্যারেষ্ট করে, জেলে দেয়—

কে অ্যারেষ্ট করবে? কে জেলে দেবে?

তাই বলছিলাম। সুশীল হঠাৎ বোকার মত হাসে।

যতীন বলে অন্য কথা।

প্রণব আজ কাল কি করছে? সিনেমায় গিয়েছে শুনলাম? ডিরেক্ট করে না অ্যাক্টিং করে?

কিছুই করে না। আড্ডা মেরে বেড়ায়।

বাড়ীতেই তো ওর বিরাট আড্ডা। কংগ্রেস-লীগ আর গান্ধী-জিন্নার মিলনের ভাঁটিখানা গড়ছে, না কি বল?

না না, মাঝে মাঝে ও-সব কথা বলে, বেশীর ভাগ কথা হয় দেশের কুলি-মজুর চাষা-ভূষা নিয়ে। কি যে ওরা বলাবলি করে আমি ভাল বুঝিনে।

দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না।

ওটা রোজ বলে।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ এমনি ভাসা-ভাসা আলাপ চলে। সুশীল মনে অস্বস্তি নিয়ে বাড়ী ফেরে। যতীনের অবিশ্বাস যে দূর হয়েছে, এতেও কেমন সুখ পায় না। বিদায় দেবার সময় যতীন বলেছে, কাল-পরশু আরেক বার এসো।

মণিকে সব কথা খুলে বলতে সাহস হয় না, অনেক কথাই গোপন করে যায়। মোটামুটি বিবরণ শুনে সুশীলের প্রশ্নের জবাবে মণি বলে, আমি? আমি কেন বলতে যাব? ও-সব কথাই তোলেনি কেউ! তবে—

চিন্তায় মুখ কালো হয়ে আসে মণির, দাঁড়াও, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করছি।

না না, সর্ব্বনাশ!

তুমি থামো। আর যাই হোক্, ঠাকুরপো মিছে কথা কইবে না।

প্রণবকে সে বলে, ঠাকুরপো, ওই যে চাল আনিয়েছিলাম, কে দিল কোন ঠিকানা থেকে এল এ সব জানতে চাওনি। কিন্তু রিক্সওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে বা অন্য রকমে খোঁজ নিয়ে তোমরা কি চালের গুদাম ধরিয়ে দিয়েছ?

—কানাই দত্ত লেনের ব্যাপারটার কথা বলছ? না। আমি কাগজে পড়ে প্রথমে জেনেছি। কিন্তু কেন বল ত? তোমাদের অংশ ছিল না কি?

—উনি যেদিন চাল আনলেন, পরদিন গুদামটা ধরা পড়ল। ওঁর বন্ধু ওঁকে সন্দেহ করছে।

সন্দেহ করাই ওদের বাতিক। জগৎশুদ্ধ লোককে শত্রু ভাবতে হয়, তাই বন্ধুকেও সন্দেহ না করে পারে না। কিন্তু ভদ্রলোকের ক্ষতিটা হল কোথায়?

ক্ষতি হয়নি?

কিসের ক্ষতি? একটা দলিল বাগিয়েছে, ফুরিয়ে গেছে। কিছু বে-আইনী কাজ হয়নি, অনেক দিন থেকে ওখানে প্রকাশ্য ভাবে আইনসঙ্গত ভাবে ওর চালের গুদাম। চালের মস্ত এজেন্ট তো। ঘুষ-টুষ দিতে কিছু খসে থাকতে পারে, সে-সব ওদের গায়ে লাগে না।

সুশীল আশ্চর্য্য হয়ে বলে, ব্যাপার মিটে গেছে?

গেছে বৈ কি। মুস্কিল তো ওইখানে। আইনমতে যে গুদাম করতে পায়, সেই চোরা গুদাম করে। চোরা গুদাম কাগজ-পত্রে খাঁটি করতে পাঁচ মিনিটও লাগে না।

তার মৃদু কথা এমন ঝাঁঝালো শোনায় যে সুশীল অপরাধীর মত উসখুস্ করে। মণি খানিকক্ষণ চুপ করে বলে, এবার বুঝতে পারছি ঠাকুরপো, পেটের জন্য সবার সঙ্গে ব্ল্যাক মার্কেটে চাল কেনার সঙ্গে ওই দু'মণ চাল আনার তফাৎ কি ছিল?

প্রণব সায় দিয়ে বলে, বুঝতে চাইলে আজকাল অনেক কিছুই বোঝা যায়। অনেক পাপ অনেক অন্যায়ের আগে তবু একটা নীতিধর্ম্মের লোকদেখানো কোটিং থাকত, আজকাল স্পষ্ট উলঙ্গ ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ হল ফ্যাসিষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব। অনেক কিছুই এখন শুধু ফাঁকি দিয়ে ধোঁকা দিয়ে করতে চায় না, গায়ের জোরে দাবড়ানি দিয়ে মানিয়ে নেয়।

এ-সব কথা সুশীলের কাছে দুর্ব্বোধ্য ঠেকে। মণি কিছু কিছু বুঝতে পারে, তার অনুভূতির গভীরতা দিয়ে।

অন্যায়ের গোপন ও নগ্ন রূপ? জীবনের আড়ালে করা আর উলঙ্গ ব্যভিচার? তা ঠিক। এমন ভাবে মুখোস খুলে লোভ হিংসা অনাচার অবিচার বীভৎসরূপে প্রকট হয়ে উঠেছে, হত্যা লুণ্ঠন বঞ্চনাকারীর সঙ্গে আপোষকারী আত্মীয়তার এমন বর্ব্বর চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভক্তিভাজন মানুষেরও, যে নিজের সমস্ত বিশ্বাস আর ধারণা সম্পর্কে নিজেরই মনে খটকা লেগে যায়! কিসে কি হয়, কেন কি হয় ভাল করে না বুঝেও এই কথাটা বড় হয়ে উঠেছে, এত যে বড় বড় বিশ্বাস আর বদ্ধমূল ধারণা চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়তে দেখা গেল, অন্য সব ধারণা বিশ্বাসগুলিও যে সেই পর্য্যায়ের নয়, কে তা বলতে পারে?

আশা আর ভরসা, এই তো সম্বল ছিল। অপ্রাপ্যের আবর্জ্জনায় ভরে উঠে নোংরা হয়ে উঠেছে জীবন, লক্ষ বার আত্মহত্যা ঘটেছে আশার, তবু শেষ পর্য্যন্ত এইটুকু ভরসা যে যেটুকু আছে যেটুকু পাওয়া যায় ততটুকু আজও রইল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই অবলম্বনও শেষ হয়ে গেছে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই-ই অনিশ্চিত, অন্ধকার। প্রচণ্ড দুঃখ দুর্ভোগ ক্রমাগত নাড়া দিয়ে দিয়েই যেন শুধু আজ সচেতন করে রাখতে পারে, তুমি মানুষ, তুমি জীবন্ত মানুষ—তোমার প্রাণ-ধারণটাই তোমার বিচিত্র জীবন! দুর্ভোগের মধ্যে ডুবে থেকেই যেন নতুন করে আবার সব জানতে বুঝতে সাধ যায়।

তাই, পরদিন আবার যতীনের কাছ থেকে ঘুরে এসে সুশীল যখন একটা সুসংবাদ দেয় যে যতীন তাদের একেবারে নিরাপদ অঞ্চলে আশ্রয় পাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে বলেছে, তখন প্রথমটা আগ্রহে প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেও পরক্ষণে মণি ঝিমিয়ে যায়।

বলে, থাক গে। আজ এখানে কাল ওখানে আর ছুটোছুটি করতে পারি না। কত পালিয়ে বেড়াব?

এই বিপদের মধ্যে থাকবে?

অ্যাদ্দিন তো আছি? আর সবাই তো থাকবে?

সে উপায় ছিল না বলে, কি করা। ভাল পাড়ায় গিয়ে থাকার সুযোগ যখন পাচ্ছি, কেন যাব না?

দু'জনে কলহ বেধে যায়, নতুন রকমের কলহ। ঝগড়া-ঝাঁটি তাদের আগেও হয়েছে, এমন জোরালোও হয়েছে যে এক বেলা খাওয়া বন্ধ, কথা বন্ধও ঘটেছে তার ফলে। নিরীহ এবং মণির একান্ত

রাত্রি-শেষ

সব্যসাচী সেন

রাত্রির গম্ভীর ঘড়ি বাজে। তারার দোলকে দোলে স্বপ্নের পাহারা।
উড়ো পাখি ছায়া ফেলে কাক-জ্যোৎস্নালোকে
মিলায় গভীর শূন্যে।   নীলকান্ত মণি বলয়িত
স্বপ্নপ্রেমমুক্তিরস-পিপাসিত দিগন্তের চাঁদ। নিঃসঙ্গ নিথর
প্রহরের সিঁড়ি বেয়ে রাত্রির মন্দির গর্ভতলে
জ্যোৎস্নার অতলে ডুবু ডুবু।
ডুবু ডুবু মগ্ন-মন মন্থর ঘুমের তন্দ্রাবেশে
নিবিড় চুম্বন চায় কার ?
যুগ যুগ প্রতীক্ষিত আতপ্ত অধীর আলিঙ্গন
শিহরায় নিশিগন্ধা কুসুমের ঘ্রাণে
কেশবতী নায়িকার যৌবন-লাবণ্যে ঢল ঢল
উচ্ছ্বল চঞ্চল ছন্দে।   তবু সে কোথায় ?
কোথায় কোথায় তার কামনার তন্বু-দীপাধার
নীল শূন্যে শুভ্র চাঁদে কোথা সে ?   কোথায় ?
হীরাজ্বলা পাহাড়ের নীরব সত্তায়।   রোমাঞ্চিত রাত্রির মুকুটে
অগনিত রৌপ্য শুভ্র নক্ষত্রের শিখায় শিখায়
কোথা সে কোথায় ?

তুমি বলেছিলে আসবে সবাই ঘুমালে
প্রাণ-পদ্মের মৃণালে
তুমি বলেছিলে চাঁদ ডুবে গেলে
শেষ রজনীতে সংসার ফেলে
নীল জ্যোৎস্নায় হংস-মিথুন অলস পক্ষ ভাসালে
তুমি বলেছিলে আসবে আকাশ ঘুমালে।
তোমার তনুতে মহাপৃথিবীর আদিম ছন্দ জাগায়ে
আঁখিতে কাজল লাগায়ে
যে মায়া-কাজলে অন্তর তলে
সহস্রশিখা মায়া-দীপ জ্বলে।   প্রেমের স্বপ্নিলোকে
রেখায় রেখায় শরীরি স্বপ্ন কামনার নির্মোকে।
তুমি বলেছিলে সংসার ফেলে
শেষ রজনীতে চাঁদ ডুবে গেলে
চির প্রত্যাশা মিটাবে আমার নির্জন অভিসারে
তুমি বলেছিলে আসবেই চুপিসাড়ে।

রাত কেটে গেল তবুও এলে না তুমি
কাক-জ্যোৎস্নায় মূর্চ্ছিত তাই বিবশ স্বপ্ন ভূমি
ভোরের আলোয় শ্যাম আঙিনায় ধূসর কুয়াশা ঘেরা
শেষ অঘ্রান হাই তোলে ঘুম ভেঙে
তোমার ললাটে চন্দনলেখা মুছে গেছে চুম্বনে
পূবের জানালা ধরে
তুমি চেয়ে আছো দিগন্ত পানে।   প্রবাল-শৈল শিরে
মহা পৃথিবীর প্রাণ-স্পন্দন কাঁপে
তুমি এসে ঘুম ভাঙালে আমার
সুদীর্ঘতম প্রেম-সাধনার শেষে
প্রাণপদ্মের স্বর্ণ-মৃণালে জ্বালালে সৌরশিখা
তুমি নও প্রিয়ে স্বপ্নের মরীচিকা।

বশম্বদ হলেও শাস্ত্রোক্ত দাম্পত্য কলহে সুশীলকে অপটু দেখা যায়নি। আজ একটা নূতন তীব্রতা, নতুন তিক্ততা দেখা দেয় তাদের মতান্তরে। এত দিন যত মত-বিরোধ ঘটেছে সব ছিল একাভিমুখী দু'টি মতের তুচ্ছ অমিল, দু'টি মতেই তারা এবং তাদের সংসারটাই বড়, দু'টি মতেই কাজ হয়, শুধু কারটা খাটবে বেছে নেওয়ার ঝগড়া। আজ যেন দু'মুখী মনের বিপরীত স্বার্থের সংঘাত বেধেছে তাদের মধ্যে, ঘরোয়া সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ভেদ।

সুশীলের মত মানুষ সে যেন গালাগালি দেবার ভঙ্গিতে বলে, মাথা বিগড়ে গেছে তোমার, শয়তানি কুবুদ্ধি ঢুকেছে মাথায়। বুড়ো বয়সে ঢং শিখেছ।

তীব্র জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে মণি ঝেঝে বলে, ভীরু কাপুরুষ অপদার্থ তুমি, তুমি ঢং দেখবে না? মানুষ তো নও, কত কি তুমি দেখবে।

যতীন বালীগঞ্জে ছোট একটি ফ্ল্যাট তাদের দিতে চেয়েছে এ সৌভাগ্য এক দিন তাদের উল্লসিত করে দিত, জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকত না, আজ ওই নিয়েই পরস্পরকে তারা প্রথম ঘৃণার আঘাত হানল, ফাটল ধরে আলগা হয়ে গেল এত দিনের সম্পর্কের ভিত্তি।

ভোলানাথের বৈঠকখানাটি প্রথমে স্থির করা হলেও এ বাড়ীটিই পাড়ার শান্তি কমিটি গড়বার আসল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই প্রতিবাদে সুবোধ সিংহদের ইঙ্গিতে একদিন রাত তিনটের সময় গুণ্ডা দলের হানা দেবার চেষ্টা হয়। ইতিমধ্যে শান্তি কমিটি অনেকটা সুগঠিত ভাবে গড়ে না উঠলে সেদিন সত্যই বিপদ ঘটতে পারত।

এই আক্রমণের সুযোগে পরদিন সকালে সুশীল অনেকটা নরম সুরে মণির কাছে আবার বালীগঞ্জের নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার আবেদন জানায়। সত্যই আবেদন জানায়, চিরদিন যেমন জানিয়েছে।

আমি যাব না। ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পার।

আমি যাব না, তুমি যেতে পার। এমন অনায়াসে মণি যে এমন কথা বলতে পারে কে কল্পনা করেছিল? শুধু কথা শুনে নয়, মণির চোখ-মুখ দেখে মনে হয় সে যেন মায়া-মমতা ভুলে গেছে।

সহরের অসংখ্য মানুষের রসুইঘর নেই, একটি উনান জ্বালাবার ঠাঁই নেই, রান্না করে খাবার সম্বল বা সময় নেই। মেস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, চা-খানা, খাবারের দোকান, চিঁড়ে-মুড়ির দোকান থেকে ফলমূল ছাতু-লঙ্কার ফিরিওলা পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহের বিচিত্র ব্যবস্থা। সখের বা সখ-ধর্মী প্রয়োজনের সায়েবী খানা যে প্রকাণ্ড ঝকঝকে হোটেলগুলিতে, তারই সামনা-সামনি রাস্তার অপর দিকে ময়দানের গাছতলায় হয়তো এক জন বসেছে ছাতুর থালা নিয়ে। তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে ও সস্তায় পেট ভরাবে গরীব মজুর, মাজায়-ঘষায় ঝকঝকে পিতল-কাঁসার থালায় ছাতু মেপে নিয়ে জল দিয়ে মেখে সে পেটে চালান করে দিল, তার পর মুখে ঢালল এক ঘটি জল। থালাটি ছাতুওলার, জলও সেই দেয়। [ক্রমশঃ।

শীতে উপেক্ষিতা

ন”

ছয়

কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে আমার মনোভাব স্পার্টান নয়। বরং কিছুটা চৈনিক বলতে পারি। স্বেদস্নাত কলেবরে ধনিদলকে টেনিস খেলতে দেখলে আমিও গল্পের সেই চীনা কুলির মতো ভাবি: এদের নিশ্চয়ই বেশ পয়সা আছে, তবু কেন এমন কৃপণ এরা? অল্প কিছু পয়সা খরচ করলেই অনায়াসে কয়েক জন লোক ভাড়া করে তাদের দিয়েই খেলাতে পারে! তাই আমি শেষ যে-বল দিয়ে ফুটবল খেলেছি তা ফুটবল নয়, প্রত্যাখ্যাত টেনিস বল; শেষ যেবার ক্রিকেট খেলেছি তার ষ্টাম্প এবং বেল ছিল কয়েকখানি ইট মাত্র, উইকেট নয়। আমি স্যাণ্ডো নই, সেটা বিস্ময়কর নয়। কিন্তু যা শুনলে হয়তো স্বয়ং স্যাণ্ডোর মূর্চ্ছা ও পতন ঘটতো তা হচ্ছে এই যে স্যাণ্ডো হবার ক্ষীণতম অভিলাষও নেই আমার মনে।

কিন্তু জায়গার গুণ আছে। কলকাতায় আমি লায়ন্স রেঞ্জ থেকে জি, পি, ও, হেঁটে যেতে হলে হাঁপিয়ে উঠি, অথচ, এই দার্জ্জিলিঙে এসে প্রতিদিন যে রবার্টসন্ রোড থেকে ম্যাল্ হয়ে বার্চ হিল্ পর্যন্ত ধাবন করছি, একেবারে অযথা, এমন কি গল্‌ফ্.-বলের সন্ধানে পর্যন্ত নয়, তাতে এতটুকু ক্লান্ত বোধ করিনে। বরং প্রফুল্ল বোধ করি। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই একটা আছে, অন্ততঃ মনোবৈজ্ঞানিক, কিন্তু আমার তা নিয়ে অহেতুক কৌতূহল নেই। আমি এত দূর যে হাঁটতে পারি তাইতেই নিজেকে অভিনন্দন জানিয়ে খুশি থাকি।

একাধারে তৃতীয় দিন এই অসাধ্য সাধন করে আপন ক্ষমতায় চমৎকৃত হয়ে বার্চ হিলে বিশ্রাম উপভোগ করছিলেম। অন্যান্য ঋতুর কথা জানিনে কিন্তু এখন, জানুয়ারীর শেষার্ধে, এই জায়গাটা একেবারেই নির্জ্জন। প্রাণী বলতে আমি এবং শ্রীরামচন্দ্রের শতাধিক অনুচর ছাড়া আর কারো সাড়া নেই। উপরে নীচে চার-দিকে ঘিরে শুধু রয়েছে নানা রকমের গাছপালা। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের মতে তাদের নিশ্চয়ই প্রাণ আছে কিন্তু তারা আমার সঙ্গে কথা কয় না। কইলেও তারা যে-ভাষায় কথা কয় তা আমি শুনতে পাইনে। আমি না উদ্ভিদ্‌বিদ্, না কবি। বৃক্ষ তাই আমার কাছে বৃক্ষই, নিগূঢ় কোনো তত্ত্বের অভিব্যক্তি নয়। অনায়াসেই তাই জন্তুকে প্রাণবান মানি, কিন্তু বৃক্ষকে নয়।

সেদিন অভিনন্দনের একটা অতিরিক্ত কারণ ছিল। পদব্রজে পর্বতারোহণের চাইতেও দুঃসাহসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেম। অশ্বারোহণ করেছিলেম। শৌর্য নিয়ে সাধারণত দম্ভ করিনে কিন্তু সত্যের খাতিরে এখানে সবিনয়ে যোগ করতেই হবে যে সে-ঘোড়াটির নাম ছিল "অ্যাটম্ বম্"।

বি-এ পাশ করে টুপি মাথায় এবং বিয়ে করে টোপর মাথায় ছবি তোলার যেমন প্রায় অলংঘনীয় একটা বিধান আছে, তেমনি দার্জিলিঙে এসে ঘোড়ায় চড়ে সঙ্গীর ক্যামেরার সম্মুখীন হয়নি এমন ব্যক্তির সংখ্যা বেশি নয়। সাধারণ বাঙালীর পক্ষে ঘোড়ায় চড়া দৈনন্দিন অভ্যাস নয়, দুর্লভ অভিজ্ঞতা। সেই অপরূপ দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তাদের সকল অবিশ্বাস ভঞ্জন করবার জন্যেই এই প্রতিকৃতির ব্যবস্থা। ক্যামেরা না কি মিথ্যা বলে না।

আমার ছবি তোলবার মতো কেউ কোথাও ছিল না। থাকলে

আমার ঘোড়ায় চড়াই হোতো না। অশ্বারোহণে আমার অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে গেলে বাহনের কাছ থেকে সে-লজ্জা গোপন করবার উপায় নেই, কিন্তু তার আরও সাক্ষী রাখব এমন দুঃসাহসী আমি নই।

ষড়যন্ত্রটা সুরু হয়েছিল আমার দার্জিলিঙে পৌঁছোবার পরের প্রথম প্রভাত থেকেই। রোজই সকালে ম্যালে এসে বসবার একটু পরেই কয়েক জন ছেলে আমাকে ঘিরে ধরে বলে, "রাইডিং সাব?" সায়েব প্রতিবারই সবিনয়ে বলেছে, "নো, থ্যাংক্স্"। কিন্তু ওরা দমেনি। এই বালক সহিসদের অধ্যবসায় বীমার দালালদের অনুকরণ-যোগ্য। একবার বারণ করে দিলেও কিছুক্ষণ পরে এসে বলে, "ফাস্ ওয়ান্ হর্স, সার, থরো ব্রেড।" অশ্ব-সমাজের কৌলীন্যে আমার কৌতূহল উদ্দীপিত হয় না দেখেও, ওরা নিরাশ হয় না। আবার কিছুক্ষণ পরে এসে বলে, "য়ু ভেরি গুড হর্সম্যান, সার।" একমাত্র চক্ষু দ্বারা দর্শন ব্যতীত ঘোড়ার সঙ্গে যার আর কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই তার সম্বন্ধে এমন অসত্য অতিশয়োক্তি অশ্বকুলের বোধগম্য হলে তাদের অট্টহাস্যের কারণ হোতো।

আমিও জানতেম যে সেই বালক সহিসের স্তুতি একেবারেই মিথ্যা। কিন্তু তবু, প্রশংসা তো! আর প্রলোভন জয় করা বড়ো শক্ত। মানব-চরিত্রের বহুবিধ দুর্বলতার মধ্যে এইটেকে জয় করাই বোধ হয় সব চাইতে দুরূহ। নিন্দায় বিচলিত হয় না এমন লোক যদিবা থাকে, প্রশংসায় পুলকিত হয় না এমন কেউ নেই। সে-পুলক এমন একটা মোহ বিস্তার করে যে তখন সকল পরিমিতবোধের ঘটে অবসান। প্রশংসার প্ররোচনায় তখন স্বীয় প্রতিভার নির্দেশ ও অবজ্ঞা করে গুণিজন পর্যন্ত নিজেদের নিয়োজিত করেন এমন কাজে যাতে তাঁদের দক্ষতা নেই। গায়ক দিলীপকুমার তখন উপন্যাস রচনা করেন, লেখক তারাশঙ্কর ফ্যাসি-বিরোধী বিবৃতি প্রচার করেন এবং ডাক্তার বিধান রায় রাজনীতি করেন। বিদ্যা তাতে সমৃদ্ধ হয় না, দেশও উপকৃত হয় না।

আর সব আবেদন-নিবেদন তাই উপেক্ষা করতে পেরেছিলেম কিন্তু সহিস বালক যখন আমাকে ভেরি গুড হর্সম্যান আখ্যা দিল তখন আর লোভ বুদ্ধির বাধা মানল না। দেবদূতগণ যেখানে পদ-সঞ্চরণ করতো, আমি সেখানে ঝাঁপ দিলেম। বললেম, "যাবো, কিন্তু তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে ঘোড়াকে ধরে রেখে।" ভেরি গুড হর্সম্যানের মুখে এমন করুণ স্বীকারোক্তি শুনে সহিস বিস্মিত হোলো না। আমার অনুরোধে রাজি হোলো। আর পশ্চাদপসরণের পথ রইল না।

অচিরেই আবিষ্কার করলেম যে অন্যান্য আরো অনেক বিপদের মতো অশ্বারোহণের ভয়াবহতাও বহুলাংশে নির্ভর করে দূরত্বের উপর। কাছে এলে দেখা যায় যে বিভীষিকা অনেকখানি মিলিয়ে গেছে, রোদ উঠলে কুয়াশার মতো। অ্যাটম বমের ভীতিপ্রদ নামের অধিকারী জন্তুটি আসলে নিতান্তই নিরীহ। শীতে বেচারী আড়ষ্ট হয়ে আছে। অমন জানোয়ারের কাঁধে চাপতে যারা ভয় পায়, অন্তত হওয়াই উচিত। কিন্তু অমন আধমরা না হলে আমার যে ঘোড়ায় চড়াই হয় না।

ভয়ে ভয়ে এবং ভয় গোপন করতে করতে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আসীন হলেম। লাগামের কোন দিক কী ভাবে টানলে অশ্বের মস্তিষ্কে কী বার্তা বাহিত হয় তার কিছুই জানিনে, তাই লাগাম এমন ভাবে ধরে রইলেম যেন ঘোড়া জানতেই না পারে আমার কী উদ্দেশ্য। সহিস তার জিহ্বা ও চক্ষুযুগলের সংযোগে অদ্ভুত একটা ধ্বনি করতেই ঘোড়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকল। সে গতি কোনো শামুকের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক করতো না। স্লো-মোশন্ ছবি দেখতে যেমন হাসি পায়, আমি তেমনি কৌতুক বোধ করছিলেম।

লয়েড বটানিক গার্ডেন, মুজিয়ম, লেবং রেস্-কোর্স্, মনাস্টেরি, অবজার্ভেটরি ইত্যাদি নানা দর্শনীয় স্থানের উল্লেখ করে সহিস জিজ্ঞাসা করল আমি কোথায় যাবো। আমি বললেম বার্চ হিল্।

বার্চ হিল এবং জলাপাহাড়ের অরণ্য অঞ্চল ছাড়া পুরানো দার্জিলিঙের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই। এখান থেকে সমস্ত গাছপালা সমূলে ধ্বংস করে তৈরী হয়নি সুদৃশ্য বাগান বা মানুষের আবাসের যোগ্য বাসস্থান। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক রক্ষিত এই পার্কে তাই এখনো আছে অসংখ্য রকমারি গাছ, আছে বহু শ্যাওলা-পড়া জায়গা আর ছায়ায় ঢাকা পথ। উপরে উঠবার ও নীচে নামবার পথটা ঘোরানো, স্পাইর‍্যাল সিঁড়ির মতো। অনেকগুলি বাঁক আছে যেখান থেকে অল্প দূরে কেউ আসছে কি না তাও দেখবার উপায় নেই। অনেকগুলি জায়গা আছে যেখানে বসে থাকলে কারো সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। বার্চ হিল পলাতকের স্বর্গ।

ঘোড়ায় চড়া শেষ করে এমনি একটা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলেম। এই রকম জায়গায়ই আমি ভালো বোধ করি, যেখানে আমার সঙ্গী আমিই। আমার চরিত্রের এই ব্যাধিটা আর কিছুতেই সারল না। অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিতদের মধ্যে অনেকে পারেন নিজেদের পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে। আমি পারিনে। আমি একা থাকতে পারি। পারি বিশেষ এ কজনের সান্নিধ্যে সময় সম্বন্ধে বিস্মৃত হতে, পারিনে অর্ধ-পরিচিতদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনান্তরিক হাসির অন্তরালে লৌকিকতার বিনিময় করতে। তাই আবার একা থাকতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট ধরালেম এবং মনে আবৃত্তি করতে থাকলেম :

Just—
Watch the smoke rings rise in the air.
You'll find your share
Of memories there.

এই তো হোলো বিপদ। স্মৃতি থেকে পলায়ন করতে পারিনে। ফ্রান্সিস টমসনের সেই হাউণ্ড অব্ হেভেনের মতো স্মৃতি আমাকে অনুসরণ করছে প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্ত। সকল চক্ষুর অন্তরালে দার্জিলিং বার্চ হিলের এই নিভৃততম কোণে এসেও সেই স্মৃতি থেকে নিষ্কৃতি নেই। অল্প কিছু দিন পূর্বেও যার চিন্তা ছিল অপরিসীম আনন্দের উৎস আজ তার কথা মনে হলেই হৃদয় দগ্ধ করে শুধু সেই বেদনাদায়ক স্মৃতির স্ফুলিঙ্গগুলি যারা প্রলাপে জড়ানো স্বপ্নময় মুহূর্তগুলির তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু পরবর্তী তিক্ততার মধ্যে কোথায় তারা হারিয়ে গেছে। ব্যথা দিয়ে শেষে যা কয়েছিল, শুধু তাই মনে রইল ; তার আগের সহস্র সুমধুর কথা কোন্ বিস্মৃতির অতলে মিলিয়ে গেল।

জোর করে মনকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেম। পকেট থেকে পাঠ্য কিছু বের করে তাইতে নিয়োজিত করতে চাইলেম মনকে। যে বইটা বেরুলো সেটা সস্তা একটা রোমহর্ষক। অপ-সাহিত্যের

এ-শাখায় আমার রুচি নেই, কিন্তু বইটা খুলতেই আত্মচিন্তাক্লিষ্ট মনটা অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল, হাওয়া যেমন করে মেঘকে উড়িয়ে দেয়। সেদিন ঘুম ষ্টেশনে শিখা এই বইটা সেই হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে আমার হাতে পুরে দিয়েছিল। আমাকে ঠিকানা জানাবার জন্যে।

সত্যি, পুরো দু'টো দিন শিখা এবং আমি একই জায়গায় রয়েছি, দু'জনের দেখা হওয়া এত সহজসাধ্য, অপর পক্ষের নিমন্ত্রণও রয়েছে, তবু দেখা করার কথা মনে হয়নি। মাত্র তিন বছর আগেও এমন অবস্থা অভাবনীয় ছিল। তখন শিখার সঙ্গে একটু দেখা করবার জন্যে কী না করতে পারতেম? কী না দিতে পারতেম? শেষ দিন ক'টার কথাও মনে পড়ছে। বিচক্ষণা শিখা তখন মোহমুক্ত। আমাকে এড়াতে পারলে বাঁচে। আমাকে আর তার প্রয়োজন ছিল না। এদিকে আমি তখন দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মতো অসহায়। উঃ, কী অসহ্য যন্ত্রণায় সেই দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। জীবনকে মনে হয়েছিল অর্থহীন, পৃথিবীকে প্রাণহীন। একমাত্র শিখার হৃদয়হীনতা আমার ভুবন থেকে সেদিন সব আলো নিঃশেষে মুছে দিয়েছিল।

আর আজ। হাসি পেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই কান্না পেল এই কথা ভেবে—আজ যার চিন্তা আমার শয়ন, জাগরণ, সমগ্র সত্তা এমন মর্মান্তিক ভাবে আচ্ছন্ন করে আছে সে-ও কি একদিন এই শিখারই পর্যায়ে পর্যবসিত হবে? একদা শিখার যেথা শেষ, সেথায় তোমারও অন্ত? ভেদ নাহি লেশ? আজকের যে বেদনা সে গভীর, কিন্তু এ বেদনা যে পরম রমণীয়; এ-বেদনাতে যে পুলক লাগে গায়ে। না ভগবান, আর যাই করো, এইটে করো না। বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাংকে নিষ্ঠুর হত্যার শাস্তি দাও আমাকে, কিন্তু প্রহসনের নায়ক করো না!

নাঃ, আবার সেই বিভীষিকাময়ী চিন্তাগুলি মনের মধ্যে ভীড় করছে। শিখার দেওয়া বইটা হাতে করে উঠে পড়লেম। একা থাকার এই বিপদ। যাবো কি শিখার কাছে একবার? কী জন্যে? যে-আগুন নিবে গেছে এখন তাইতে ফুঁ দিলে আগুন আর জ্বলবে না—শুধু ছাই উড়বে আর ধোঁয়ায় চোখে আসবে জল। যাবো কি? না, যাবো না?

মিষ্টার হাইড শেষ পর্যন্ত স্থির করল। বার্চ হিল থেকে নামতে সুরু করলেম।

বেশী দূর যেতে হোলো না। একটু অগ্রসর হতেই দূরে দেখলেম এক অশ্বারূঢ়া মহিলাকে। আমার দৃষ্টিশক্তি নিখুঁত নয়। চশমার কাচ পুরু, কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টি থেকে আমি চিরতরে বঞ্চিত। দূরের জিনিস যা ঠিক ভাবে দেখতে পাই তার অর্ধেকটা চোখের কাজ, বাকিটা অনুমিতি। কিন্তু যে বীরাঙ্গনাকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখলেম তিনি যে শিখাই তাতে সন্দেহ ছিল না। ভুল করিনি।

কাছে আসতেই শিখা ঘোড়া থেকে নামল। আমি তার সপ্রতিভ, স্বাভাবিক গতিভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হলেম। ঠিক সেই শিখাই আছে! এখন দেখলে বোঝবারও উপায় নেই বিবাহের মতো বৃহৎ একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে শিখার উপর দিয়ে। সাধারণত বাঙালী মেয়েদের বিবাহের সঙ্গেই ঘটে একটা অসম্ভব পরিবর্তন। বিবাহের পূর্বে যিনি হাস্যময়ী চঞ্চলা থাকেন, পরে তাঁকে দেখলে ক্যাথলিক নান বলে ভুল হয়। আর লজ্জাশীলা কুমারীগণ বিবাহের কিছু দিনের মধ্যে নানা শারীর প্রক্রিয়া নিয়ে এমন প্রকাশ্য আলোচনা করেন যে রুচিশীল ব্যক্তির পক্ষে শোনা দায়। শিখা কিন্তু শিখাই আছে।

শিখা নিঃশব্দে কাছের একটা গাছের গায়ে তার বাহনকে বাঁধল। আমি চুপ করে রইলেম। ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি এই সমস্ত বীরত্বব্যঞ্জক কাজগুলি শিখা এমন সহজ এফিসিয়েন্সির সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে যে মনে হয় এগুলি যেন তার দৈনন্দিন কর্ম-বিধির অন্তর্ভুক্ত। একটি মাত্র কথাও না বলে শিখার নীরব নেতৃত্বের নির্দেশে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দু'জনে গিয়ে বসলেম একটা বিরাট গাছের তলায়। নিভৃতে বসবার পক্ষে এমন জায়গা পৃথিবীতে দুর্লভ।

শিখা জানে কী ভাবে কথা বলতে হয়! বাঙলা ছবির সংলাপ যে একেবারে অবাস্তব নয় তা একমাত্র শিখার কথা শুনলেই বিশ্বাস করা যায়। ওর ভাষায় আছে অস্পষ্ট একটা সাহিত্যিকতার আভাস। কণ্ঠে আছে ভাবগর্ভ গভীরতা। জানে কখন কী বলতে হয়। তার চেয়েও বিস্ময়কর, জানে কখন কিছু না বললেই সব চেয়ে বেশী বলা হয়।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকবার পরে শিখা অন্য দিক থেকে তার উদাস দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, আমাদের গেছে যে দিন, একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি?"

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা আমিই একদিন শিখাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেম। একদিন সেই উদ্ধৃতিটা আমারই উপর এমন ভাবে প্রয়োগ করা হবে সেদিন মনে উদয় হয়নি এমন আশংকা। বিস্ময় গোপন করে আকাংখিত উত্তর দিলেম, "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"

"ওটা তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।"

"তোমার প্রশ্নেরই মতো।"

"কিন্তু আমার প্রশ্নটা আমারই ছিল, ভাষাটা শুধু কবির।"

"আমার উত্তরটাও যে তাই নয় তাই বা জানলে কী করে?"

শিখা এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অসীম তার প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্ব। অনায়াসেই বিস্ময় গোপন করে বলল, "কবিতাটার পরের লাইনগুলি ভুলে গেছ বোধ হয়। তোমার উত্তরের পরের লাইনেই আছে উত্তরদাতার আত্মজিজ্ঞাসা, 'খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি!' তোমার তেমন কোনো সন্দেহ জাগেনি তো?" শিখা জানে শ্লেষকে কী করে হাসিতে ঢেকে সহনীয় করতে হয়।

"এত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হোলো কি ঝগড়া করবার জন্যে?"

আমি শিখার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেম, "ঝগড়া রেখে তার চেয়ে ভালো কথা বলো। যা বলতে তোমার ভালো লাগবে, শুনতে আমার।"

শিখা খুশি হোলো। বলল, "আচ্ছা, আমাদের সেই একসঙ্গে কাটানো দিনগুলি তোমার মনে আছে?"

"মনে থাকলেও তোমার মুখ থেকে আবার শুনতে ভালো লাগবে।"

"আমার সব চেয়ে স্পষ্ট মনে আছে সাতাশে ডিসেম্বরের সন্ধ্যাটার কথা। মনে আছে তোমার?" শিখা আরো একটু কাছে সরে এলো, "খুব শীত ছিল। তুমি তোমার গরম কোট খুলে আমাকে পরিয়ে দিলে আর আমি খুলে তোমাকে দিলুম আমার স্কার্ফ?"

"হ্যাঁ, মনে আছে। সেদিন কী করে তাড়াতাড়ি সরকারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেম আমরা দু'জনে মনে আছে তোমার?"

"হ্যাঁ। তুমি তো আমি না বলা পর্যন্ত বুঝতে পারোনি।" দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলেম। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা যেন পুনর্বার উপভোগ করলেম। শিখা আবার বলতে থাকল, "আমি ওদের বাড়ি গিয়েই সবাইকে লুকিয়ে সুযোগ মতো সবগুলি ঘড়িকে দিলুম দেড় ঘণ্টা ফাষ্ট করে। জানতুম যে ন'টার আগে কিছুতেই উঠতে দেবে না। তার পর আর তোমার সঙ্গে বেড়াবার সময় থাকবে কতটুকু? তাই তো ঐ চুরি করতে হোলো।"

"কিন্তু পরদিন তো ধরা পড়ে গেলে।"

"তার আগে তোমার কাছে ধরা দিয়েছিলেম, তাই ক্ষোভ ছিল না একটুও।" শিখার কথা বলার সেই মধুর চাতুরী আজো অক্ষুন্ন আছে।

আমার শুনতে ভালো লাগছিল। হোক মিথ্যা, হোক অভিনয়।

এমনি আরো অনেক মধুর কাহিনীর কুশল বর্ণনা করল শিখা। সে সকল কাহিনীর নায়িকার কী মনে হচ্ছিল জানিনে কিন্তু নায়কের কৌতুকের সীমা ছিল না। নিজেকে সেই সব ছেলেমানুষীর দৃশ্যে পুনরায় মনশ্চক্ষে দেখে নিজেকে মনে হোলো চরম নির্বোধ বলে। নির্বুদ্ধিতা—কিন্তু মধুর। জাগ্রৎ বুদ্ধি নিয়ে কে কবে প্রেমে পড়েছে?

শিখা কিছুক্ষণ পরে বলল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি আমায় কিছুতেই বুঝলে না। বাকি জীবনের জন্যে পাথেয় হয়ে রইল শুধু ভুল-বোঝা।" শিখা জানে কণ্ঠে কী করে করুণ রস সিঞ্চন করতে হয়।

'এ-আলোচনাটা যদি তুললেই, শিখা, তাহোলে বলি, আমি তোমায় ভুল বুঝিনি।"

"ভুল বোঝা নয় তো কী? তুমি সবাইকে বলেছ যে আমি আমার সুবিধে মতো তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি।"

"সবাইকে কেন, কাউকেই আমি অমন কথা বলিনি, কিন্তু," একটু থেমে যোগ করলেম, "কিন্তু যদি বলতেম তাহোলে মিথ্যা বলা হোতো না।"

"আজো কি তুমি তাই মনে করো?" রাগে শিখার সাহিত্যিক মুখোসের অনেকখানি খসে পড়ল।

"তা জেনে আর কী হবে? আগেই বলেছি, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না।"

"ঝগড়া করতে আমারও নিশ্চয়ই ভালো লাগে না। কিন্তু তোমার ভুল-বোঝা ভাঙব বলেই ঘুমে তোমার সঙ্গে দেখা হতেই এখানে আবার দেখা করতে বলেছিলুম।"

"আমি ভুল বুঝলেম কি ঠিক বুঝলেম তাতে কী এসে-যায় তোমার? তিন বছর আগে জানুয়ারী মাসে যার পালা শেষ করে দিয়েছ আজ তার ময়না-তদন্ত করে কী লাভ হবে কার?"

"লাভ-ক্ষতির কথা নয়। তুমি সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়াই ভুল বুঝেছিলে।"

"হবেও বা।"

"তোমার ওই কথা এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দি আমার অজানা নয়।"

এই অপ্রীতিকর আলোচনায় আমার রুচি ছিল না। নিশ্চয় জানতেম আমি কোথাও ভুল বুঝিনি। আমি যা জানতেম তার কোনো কিছুই শিখারও অজানা ছিল না। বিরোধ তো ঘটনা নিয়ে নয়, তার ব্যাখ্যা নিয়ে। ঘটনা নিতান্তই সাধারণ। শিখার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এক বন্ধুর বাড়িতে। তার পর আরো কিছু দিন সেখানেই দেখা হয়। তারও পরে বাইরে—সিনেমায়, লেকে, ময়দানে। ক্রমে ঘনিষ্ঠ হই। তখন রোজ দেখা হোতো, নয়তো টেলিফোনে কথা। শিখার আত্মীয়দের আপত্তি হয়নি। Euphemistically, ওদের বাড়িকে এদিক্ থেকে উদারই বলতে হবে। মাঝে দিন দুই দেখা হয়নি। টেলিফোনও নয়। তৃতীয় দিন গিয়ে দেখি শিখা বাড়ি নেই। শিখার দিদির অভ্যর্থনার শীতলতা থেকেই কম্পিতবক্ষে অনুমান করেছিলেম। তার দিন সাতেক পরেই হলদে চিঠি পেয়েছিলেম, সঙ্গে ছিল শিখার চিঠি। কী লিখেছিল তার সব কথা মনে নেই। কিন্তু বেশ মনে আছে যে সে চিঠিতে বহু মূল্যবান উপদেশ ছিল, তাঁর পুত্রের কাছে লিখিত পত্রগুচ্ছের মধ্যে লর্ড চেষ্টারফিলডও এত নীতিকথা লিখতে পারেননি। শিখা লিখেছিল, আমি যেন অযথা শোক না করি, আমি যেন আমার অমূল্য জীবন এ জন্যে নষ্ট না করি, আমি যেন আমার স্নেহপরায়ণ পরিবারবর্গের কথা বিস্মৃত না হই, আমি যেন আমার প্রতিভার এবং কর্তব্যের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত না হই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শিখা যা করেছে তা ছাড়া তার উপায় ছিল না, আমার বন্ধুত্ব সে কখনো ভুলবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আরো মনে আছে, সর্বশেষে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছিল, আমি যেন চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলি। অত আবেগের মধ্যেও এই বিচক্ষণ ব্যবস্থাটির কথা বিস্মৃত হয়নি শিখা।

আমার মনে একটুও সন্দেহ ছিল না এ সবই শিখার মনে ছিল। কিন্তু এগুলির সঙ্গে তার বর্তমান জীবনের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। তাই তার স্মৃতিতে অতীতের ঘটনাগুলিকে নতুন করে সাজাতে হয়েছে। পরকে, এবং তার চাইতেও বেশী নিজেকে বোঝাতে হয়েছে যে সে যা করেছিল তাই স্বাভাবিক এবং আমার উপর বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হয়নি। আমি যে আঘাত পেয়েছি সে আমারই দোষ। গোড়াতে হয়তো এ কথাটা শিখার নিজেকে বোঝাতে নিজের সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছে সত্যের সঙ্গে। কিন্তু ক্রমে নিয়ত পুনরাবৃত্তির দ্বারা এখন তা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আমি যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছিনে এবং স্বীকার করছিনে, শিখার তাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল, "তুমি আগাগোড়াই ভুল বুঝেছ। কে কখন কী মনে করে বসে থাকবে আমি তো আর সে জন্যে দায়ী হতে পারিনে।"

"তুমি দায়ী এমন কথা কি বলেছি কখনো?"

"বলোনি, কিন্তু মনে করেছ।"

"আগেই বলেছি, মনে করলেই বা তোমার কী আসে যায়?"

"সে কথা হচ্ছে না।" শিখা হঠাৎ গলার স্বর একেবারে নামিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল, "অবশ্য দোষ আমারই। কেন আমি—?"

আমি বিব্রত বোধ করলেম। শিখার কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেম, "না, না, তোমার দোষ কী? আমারই দোষ।"

শিখা কিছুতেই মানবে না। বারে বারেই বলতে থাকল যে দোষটা তারই। দোষ বলতে যে আমি এক কথা বুঝছিলেম এবং শিখা আর, তা একটু পরে বোঝা গেল। শিখা বলল, "আমারই দোষ। লোকের ভালো করলে সে যে পরে সেজন্তে দোষ দেবে একথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। গোড়া থেকেই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ভদ্র, ভালো ব্যবহার কারো সঙ্গে করলে তার মনে যে এত কথার উদয় হতে পারে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। সামান্ত বন্ধুত্বের যে এমন গুরুতর অর্থ করবে তুমি এ আমি একবারও ভাবিনি।"

"আবার অন্যায় করছ, শিখা। তোমার আমার যে সম্বন্ধ ছিল তার দু'টো নাম নেই। তা নিয়ে দ্বিমতেরও অবকাশ ছিল না। তুমি আপন বিবেচনা অনুযায়ী তা অস্বীকার করেছ। সে জন্তে তোমাকে দোষ দিইনি, আজো দেব না।"

"মোটেই নয়। তুমি আমার দাদার বন্ধু ছিলে। সেই চোখেই বরাবর তোমাকে দেখেছি।"

"দাদার মতো, না?" আমি হাস্য সম্বরণ করতে পারছিলেম না।

"না, দাদার বন্ধুর মতো। একা ছিলে, বিশেষ কারো সঙ্গে পরিচয় ছিল না, বিশেষ কোথাও যাওয়ার ছিল না, তাই আমাদের বাড়িতে আসতে, আমি হেসে তোমার সঙ্গে কথা কয়েছি। তোমার অনেকগুলি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আমার কম্প্যানি দিয়ে আতিথেয়তা করেছি। এই তো আমার দোষ।"

"এইটে কেন, কোনোটাই তোমার দোষ নয়। সবটাই আমার দোষ।"

"তোমার ভদ্রতা রাখো। তুমি নিশ্চয় মনে করো আমার দোষ।"

"প্রেমে পড়া তো আমি কখনোই দোষের মনে করিনে।"

এটা শিখা আশা করেনি। হঠাৎ কী বলবে ভেবে পেল না। বাঙলা প্রেম কথাটাতেই কোথায় যেন একটা অবৈধতার আভাস আছে। বৈধ ভাবে বিবাহিত শিখা দেবীর কান এ কথাটায় অভ্যস্ত নয়। তাই চমকে উঠেছিল। একটু পরেই আত্মসম্বরণ করে শিখা তার সেই পুরানো মোহিনী হাসি দিয়ে শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, "সেইটেই তো তোমার ভুল। ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রেম ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ হতে পারে বলেই জানো না তুমি।"

"হতে পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন অবান্তর। আমরা তো সাধারণ ভাবে নর-নারীর সম্পর্ক দিয়ে অ্যাকাডেমিক আলোচনা করছিনে। বিশেষ একটি দৃষ্টান্তের কথা বলছি।"

কণ্ঠে আরো একটু শ্লেষ দিয়ে শিখা বলল, "তাহোলে তুমি ঠিক ভেবে বসে আছো যে আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলুম।" শিখা জোরে হেসে উঠল।

আমি বললেম, "আমার বেলা হয়ে গেছে। এবারে অনুমতি দাও তো উঠব।" আমি শিখার হাসিতে বিচলিত হইনি, কেন না জানতেম যে আমি উত্তর দিতে পারি ইচ্ছা করলেই। কিন্তু শিখাকে আমার অপমান করবার ইচ্ছা ছিল না। আমার নৈঃশব্দ্য ও উঠবার ইচ্ছায় শিখার বোধ হয় করুণার উদ্রেক হোলো। বলল, "বসো আরেকটু।"

বসলেম। শিখা আবার অনেক ভালো কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু, যে দেশলাইয়ের কাঠি একবার জ্বলে নিবে গেছে তা কি আবার জ্বলে?

আমি শিখার পাশেই বসেছিলেম, কিন্তু তাঁর সব কথা ভালো করে শুনেছিলেম না। ভাবছিলেম শিখার অপরিসীম আত্ম-প্রবঞ্চনার কথা। হঠাৎ শিখা প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তুমি কী করে মনে করলে যে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি?"

এবারে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললেম, "দেখো শিখা, আমি যদি মনে করে থাকি যে তুমি আমার প্রেমে পড়েছিলে তবে তোমার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

"মানে?"

"মানে খুশি হওয়া উচিত।"

"কেন?"

"কারণ, তাহোলে I took the most charitable view of what you did. জানো শিখা, কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, এরা সব ষড়যন্ত্র করে প্রেমের এমন একটা মহীয়সী ছবি এঁকেছে যে এর জন্তে অনেক অপরাধ ক্ষমা করা হয়। অনেক কাজ যা সাধারণত গর্হিত বলে স্বীকৃত, উপন্যাসে দেখবে তার মুখর সমর্থন, কেন না সে কার্যের উৎস ছিল ব্যর্থ বা সার্থক প্রেম। কাব্যে দেখবে বহু অবৈধতার সুললিত ব্যাখ্যান ও জয়গান—কারণ একই, প্রেম। এ জন্তে অন্যান্য অপরাধ তো সামান্য কথা, হত্যার পর্যন্ত ক্ষমা আছে। তুমি আর আমি সেই প্রলাপমুখর দিনগুলিতে যা করেছি কঠোর সমাজনীতিতে তার সমর্থন নেই। তোমার আমার অন্তরঙ্গতার কথাই মনে করো। আজ যদি তোমার কথা অনুযায়ী সেগুলির এই বিচার করি যে তার সব কিছুই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক পক্ষের প্রেমহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে তাহোলে তোমার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতে হয় সেটা কি শুনতে ভালো লাগবে তোমার?"

"কী বলো।"

"না, বললে কুৎসিত শোনাবে। তুমি জানো নিষ্প্রেম অন্তরঙ্গতার সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবিকার প্রভেদ নিতান্তই সামান্য। কী হবে তার নাম করে? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল তা তুমি নিজ হাতে শেষ করে দিয়েছ। ভালোই করেছ হয়তো। তর্ক করব না তা নিয়ে। তবে কি জানো, যদি কখনো নিজের মনের মধ্যে সে-অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করো তাহোলে অন্তত নিজের কাছে এইটে স্বীকার করাই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে যে তুমি প্রেমে পড়েছিলে। সেইটেই তোমার সব চেয়ে ভালো ডিফেন্স।"

এবারে শিখার বলার পালা যে তার সময় হয়েছে এবং তাকে উঠতেই হবে। আমি বাধা দিলেম না।'

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

জীবন-মৃত্যু সহজে পিছু হটার লোক না বিপ্রপদ।

তিনি সন্ধ্যার কিছু আগে গন্তব্য ষ্টেশনে নেমে একখানা খামের চেষ্টা করেন। তখন পোষ্ট অফিস আর খোলা নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিকট থেকে চেয়ে-চিন্তে নেওয়া ছাড়া এখন আর উপায় কি? কিন্তু তাও পাওয়া যায় না। পত্রখানা জরুরী, লিখতেই হবে। বাড়ীতে সমস্ত সংবাদ জানালে ইমাম, নিতাই এবং অন্যান্য সকলে মিলে বুঝে তদ্বির করতে পারবে। তালুকটা খরিদ করতেই হবে। লাভের জন্য নয়, লোভের জন্যও নয়—এখন জিদের জন্যই করতে হবে অর্থব্যয়। জিদ-জমিন-জেনানা এই নিয়ে তো পুরুষে পুরুষে সংগ্রাম।

শিবচরের গয়নার নৌকা ছাড়বে—একটা মাঝি ঘা দেয় চামড়ার 'নাগরাটায়'। 'নাগরা'র শব্দে একটা সতর্কতার ধ্বনি ছড়িয়ে যায় অনেক দূরে। কূলের যাত্রীরা সচকিত হয়ে ওঠে। তাড়া-হুড়ো করে যে যার খাদ্য বিছানা বাক্স নিয়ে নৌকায় এসে জড়ো হয়। বারুর অর্দ্ধেক খাওয়ার ফলের খণ্ডটা জলে বিসর্জন দিয়ে আসা ছাড়া উপায় থাকে না। বিপ্রপদও উঠে একপাশে এসে বসেন। নৌকাখানা একশো কি সোয়াশো হাত লম্বা—যেন নদীর বুকে একখানা ভাসান বাড়ী। কত দড়ি-কাছি নোংগর-বৈঠা-দাঁড়। কেমন সুশৃঙ্খল করে সাজান বয়রা বাঁশের লাগি, চিকণ গাব-রঙান গুণের দাড়িগুলো। কত বাঁশ-বাখারী দিয়ে ছৈইটা নিপুণ হাতে বাঁধা! পয়সা ব্যয় করে সার্থক করেছে বটে। ষ্টীমারের আসবাব সাজ-সজ্জা দেখলে হকচকিয়ে যেতে হয়—কিন্তু গয়নার নৌকায় উঠলে বিপ্রপদকে মোহিত করে। একটা গ্রাম্য শিল্প-চাতুর্যের ছন্দ দেখতে পান নৌকাখানার সর্বাংশে।

হুঁকো-কল্কী তামাক-টিকা পিছনের খোপে যাত্রীদের জন্য গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ঐদিকেই মাঝিদের খাবার-স্থান—পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ আসছে। তার পরই তেল-কুচকুচে প্রকাণ্ড একটা আস্ত গাছের হাল—দড়ি দিয়ে শক্ত করে একটা খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা। অমনি করে না বাঁধলে ঝড়-তুফানে, ঝাপ্টা বাতাসে নৌকা আয়ত্তে রাখা যায় না। ঐটাই নৌকার প্রাণ।

কপিকল ঘুরিয়ে যেমনি প্রকাণ্ড পাল তোলা হলো মাস্তুলের মাথায় অমনি একটা ঝাঁকুনী দিয়ে নৌকা ছুটল তরতরিয়ে। কোথায় লাগে এর তুলনায় চিল! যাত্রীরা একটা ধাক্কা খেয়ে টাল সামলে নিয়ে যে যার জায়গা মত বসে থাকে। কেউ চেয়ে থাকে বাইরের দিকে, অনেকে আবার ওদিকে চাইতে পারে না।

না বুঝেই যেন ভুল করলে মাঝিরা—কিন্তু ভুলটা হলো মারাত্মক রকমের। চৈত্র মাস, এখন পলকে আকাশে কাল-বোশেখীর সঞ্চার হয়। ও কি? একটা বিদ্যুৎ চিলিক মেরে যায় কে যেন কাকের ডিম ছড়িয়ে দিয়েছে বায়ু-কোণে। কী কালি—ওদিকে আর চাওয়া যায় না! সুস্পষ্ট একটা ত্রাসের ভাব ফুটে ওঠে যাত্রীদের মুখে। তারা বুঝল নদীপথে সন্ধ্যা-সমাগমে মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা এসে যেন দাঁড়াল বায়ু-কোণে। হঠাৎ হাওয়া থেমে গিয়ে ঘুরে উঠল কালিলেপা মেঘলা কোণে। চিলিক্ মারল আরোও গোটা কয়েক। তার পর ছুটল হাওয়া, বিষম হাওয়া—বেদম করে দিল মাঝিকে।

'আসমান জমিন পানি' মাঝি মনে মনে বলে, 'আল্লা না রাখলে এ বাতাসে নাও সামলান যাবে না।'

কালো জল নৃত্যরত সাপের মত আকাশে ছোবল মারছে। এপার ওপার দেখা যায় না। নৌকাটা কাৎ হয়ে এক ঢলক জল গলুই বেয়ে ওঠে। যাত্রীরা চমকে তাকায়।

'সামাল, সামাল—কেউ যেন নড়ে না জায়গা ছেড়ে।' নৌকা উড়ে যাচ্ছে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একবার উঠছে, ঢেউয়ের খাদে আবার ডুবছে—আবার উঠছে ঢেউয়ের মাথায়। তুফান—শুধু বিষম তুফান। তাকান যায় না বাইরে দিকে।

বিপ্রপদ দেখেন যে হাল-বাঁধা খুঁটোটা মড়-মড়িয়ে ভেঙে যাচ্ছে। মাঝি চীৎকার করে ওঠে। আর বুঝি রক্ষা নাই! ভিতরের মানুষ-গুলো হাঁউ-মাঁউ করে ওঠে। কেউ বা ইষ্টনাম স্মরণ করে। বিপ্রপদ ছুটে যান। তাঁর শিরায় শিরায় শক্তিপ্রবাহ খেলে যায়। তিনি চট করে একটা বয়রা বাঁশের দাঁড়ের হাতল ভেঙে বসিয়ে দেন খুঁটোটার পাশে। মাঝি প্রাণপণে চেপে ধরে হাল। তবু বুঝি পারবে না—পারবে না কিছুতেই রুখতে। হাল বিগড়ে পাল বেসামাল হয়ে নৌকা ডুববে মাঝ-নদীতে। বিপ্রপদ একটা দড়ি টেনে এনে শক্ত করে হালটাকে খুঁটোটার সাথে বাঁধেন। 'এবার আমার হাতে দাও।'

ক্লান্ত মাঝি অবাক্ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে। পাখীর মত উড়ে চলে নৌকা। জলের ছাটের ঝাপটায় যাত্রীরা ভিজে যায়। জলখোপ থেকে দুজন মাল্লায় জলডুবি চালায়। বিপ্রপদর প্রথম যৌবন আবার ফিরে এসেছে যেন। তিনি ঐরাবতের মত জড়িয়ে ধরেছেন হাল।

নৌকা ছুটছে হু-হু করে এগিয়ে। আসছে ঢেউ ভাঙছে গায় তবু চলছে ফুঁপিয়ে! আবার একটা দমকা এলো। চুরমার হয়ে গেল তুফানের মাথা! এতো সাংঘাতিক ঢেউ! এই মাথা-ভাঙা ঢেউয়ে দিশা রাখা অতি সুকঠিন। বিপ্রপদর আশংকা হয়, কিন্তু নিরাশ

হওয়ার মানুষ না তিনি। দমকা ক্ষেপুনীটা যাওয়া মাত্র বিপ্রপদ বলে ওঠেন, 'ভয় নেই, ভয় নেই। ঐ কূল দেখাচ্ছে।' কোথায় কূল—কোথায় কিনারা! এ তো শুধু আশা দেওয়া, সন্দেহ রাখা মানুষের মন। আবার ঝাঁকুনি, আবার ক্ষেপুনী, আবার দুরন্ত হাওয়া। মাস্তুল না ভাঙে, পাল না ছেঁড়ে—হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার! তুফানের দাপটে যেন চিরে যাবে নৌকার তক্তিটা। ঈশ্বর ভরসা নইলে আর ভরসা নেই মানুষের। বিপ্রপদ স্থিরচিত্তে হাল সামলে থাকেন। তুফানে খাদে খাদে নিয়ে চলেন নৌকা। এত বড় গয়নাখানাও যেন মনে হয় মোচার খোলা—এ নিয়ে খেলছে এক দুরন্ত রাক্ষসী।

ক্রমে যেন থেমে আসে ঝড়। মাঝিরা বলে যে কূল দেখাচ্ছে—ঐ তো পশ্চিম পাড়। কিন্তু নৌকা তো এখন কূলে নেওয়া যাবে না। তাহলে পাড় ধ্বসে এখনই নৌকার ওপর পড়বে। এ কি? —আবার সোঁ-সোঁ শব্দে গর্জে এলো বাতাস! আবার ঢলকে ঢলকে জল! এবার যাত্রীরা যেন ভেঙ্গে পড়ে—আর্তনাদে। বিপ্রপদ ভাবেন, শক্তিগড়ের বসু-পরিবারের মতই তিনি আজ এই পথিক-পরিবারের ভাগ্য-নিয়ন্তা। আজ তাঁকে দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও এদের রক্ষা করতে হবে, পূর্ণ করতে হবে ক্ষয়-ক্ষতি। তিনি আবার অশ্বাস দেন।...

দর-দর করে ঘাম ছুটছে। তবু বিপ্রপদ আজ স্থির। মাঝি-মাল্লারা মনে মনে এ-বাবুকে ওস্তাদ বলে মেনে নেয়। হঠাৎ একটা গাছ মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ে মাস্তুলের ওপর। নৌকাটাও তখনি এসে ঠেলে ওঠে একটা বালির চরে। ঝর-ঝর করে বৃষ্টি নামে—শুভ লক্ষণ। হাওয়া মন্থর হয়ে আসে। আর কোনও আশঙ্কা নেই দেখে বিপ্রপদ হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকার গলুইয়ের দিকে এগিয়ে যান। গাছ না, গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়েছে—তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না। মাঝিরা সহজে সরিয়ে ফেলতে পারবে।

চরে বসে জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়—জল না ভরলে এ নৌকা নামবে না এখান থেকে। তার পর যাবে গয়না ঘাটে।

বিপ্রপদর জন্য পাঁচ-সাতটা লণ্ঠন ও লোক-জন এসে ঘাটে বসেছিল। তারা তাঁকে দেখা মাত্রই সেলাম দেয়। তিনি নৌকা ছেড়ে যখন ওপরে ওঠেন তখন রাত কম হয়নি। তাঁকে উঠতে দেখে যাত্রী ও মাঝিরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়।

বাসায় এসে তিনি আহারান্তে চিঠিপত্র লিখতে বসেন। সব কথা খুলে লেখেন এবং হুঁশিয়ার হয়ে টাকা-পয়সার টোপ ফেলতে বলেন। অগাধ জলের মাছ, যেন ছুটে না পালায়।

তিনি শয্যা গ্রহণ করে ঝড়ের চিন্তা করেন—কি দুর্দান্ত ঝড়! আবার সব শান্ত হয়ে গেল। আকাশ এখন জ্যোৎস্নায় ভরা, ঝল-মল করছে আলো। তাঁর জীবনটাও তো অমনি ধারা চলেছে। তিনি এখনও ঝড় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এখনও তাঁর অর্থ চাই, মান চাই, চাই গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। স্থিরচিত্তে সে সাধনা তাঁকে করতে হবে—করতে হবে বলেই তিনি দেশের মায়া মাটির মায়া কাটিয়ে এখানে এসেছেন। তিনি তাঁর জীবনে জ্যোৎস্নার জোয়ার আনবেন—তখন অর্থের ফুল ফুটবে, খ্যাতির সৌরভ ছুটবে।

বিপ্রপদ সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে চুপ করে আরাম অনুভব করেন।

এবার সদর থেকে কড়া হুকুম এসেছে যেন একটা টাকাও প্রজাদের কাছে বকেয়া থাকে না। যে নেহাৎ না দেবে তার ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে দিতে হবে। ভয় দেখিয়ে জোর করে যে কোনও ভাবে টাকা আদায় করা চাই। বাবুদের মধ্যে কে কে যেন বিলেত যাবেন খরচ জোগাড় করতে হবে। নায়েব-মুহুরীদেরও তো দু' পয়সা কামাই করা দরকার—নইলে তারা খাবে কি! তারা প্রজাওয়ারি হিসেবের মধ্যে যারা অল্প খাজনা দেয় তাদের নাম লিষ্টিভুক্ত করে পেয়াদা পাঠায়, হৈ-চৈ করে খুব—মার-ধরও চলে, কিন্তু তাতে আসলে পয়সার কাজ হয় না। মনিবের তহবিল প্রায় শূন্য পড়েই থাকে। বড় বড় প্রজারা ঘুষ দেয়—তারা থাকে ঘুষের আবডালে লুকিয়ে। বিপ্রপদ সব খাতা-পত্তর খুলে, রাত জেগে, নায়েব মুহুরীর কারসাজি ধরে ফেলেন। ফলে তারা গালি মন্দ শোনে—শুনে, কানে জল যায়। তখন অন্তরালে লুকান জীবগুলো ধরা পড়ে। কংকরিয়ে টাকা আদায় হতে থাকে। খাজাঞ্চীর খাটুনী বাড়ে, বাবুদের তহবিল ভারী হয়। বিপ্রপদরও পেট ভরে। সপ্তাহে দু'বার সিন্দুক বোঝাই হয়ে টাকা সদরে চালান হতে থাকে।

সেদিন কার যেন একটা গরু এনে কাছারীতে বাঁধল। গরুর মালিক সভয়ে করজোড় করে এসে দাঁড়াল। কিন্তু নায়েব কাজে ব্যস্ত ওদিকে নজর নেই তার। বেচারী কিছু বলতেও পারে না, করজোড়ও খুলতে পারে না—ঠায় জোড়-হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। নাকে এসে কয়েকটা মাছি পড়ছে, কখনও কানে, ভীষণ বিরক্ত! সে এ-পাশ ও-পাশ মুখ ঘুরাচ্ছে তবু হারামজাদা মাছি পালায় না। উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে এসে বসে। সে করজোড়ও খুলতে সাহস পায় না, যদি সেই মুহূর্তে বেটা বদমেজাজী নায়েব ওর দিকে চোখ ফেরায়। অতএব সে দাঁড়িয়ে নাক-কান সংকুচিত ও প্রসারিত করতে চেষ্টা করে।

ভাগ্যক্রমে সেই সময় বোধ হয় হরগৌরী সেই পথ দিয়ে অন্তরীক্ষে যাচ্ছিলেন। তাঁদের আশীর্বাদে ও গরুর পুরুষকারে বন্ধনরজ্জু শিথিল হয়। গৃহপালিত জীবটা বারান্দা থেকে গৃহে প্রবেশ করে। সুমুখে নায়েবকে পেয়েই তার সলোম দেহটা চাটতে আরম্ভ করে দেয়। ক্রমে দেহ ছেড়ে দাড়ি। হয়ত ওটা তাকে এক জাতীয় জীব বলে ভ্রম করে। নায়েব চুপ করে আরামে কার যেন সর্বনাশের মুশাবিদা করছিল।

এমন সময় বিপ্রপদ কাছারী ঘরে ঢুকেই অবাক্। 'ও কি নায়েব মশাই, ও কি? গরুতে চাটে বাঘের গাল—শিবচর কাছারীর বাঘ! অবাক্ করলেন যে! বুড়ো হয়েছেন বলে এত অপমান?'

তড়াক করে উঠেই নায়েব লাগিয়ে দেন একটা লাইন-টানা রোলারের বাড়ি। বাড়িটা অপমানের অনুপাত মত জোরেই পড়ে। বেচারী গরুটা হাম্বা-ম্বা-ম্বা করে ওঠে।

এবার ওটার মনিবের পালা।

বিপ্রপদ বললেন, 'তুমি কি চাও হে বাপু?'

'আমি—আমি—দু'সন খাজনা আমার বকেয়া...মাত্র দু'সন ঐ একটা গরু।'

বিপ্রপদ সব বুঝতে পারেন। 'তোমার বাড়ী কত দূর?'

'এই তো নিকটেই।'

'তুমি একটু দুধ-টুধ দিতে পারো ?'

'কেন পারব না বাবু, খুব পারি—এক্ষুনি দুইয়ে দিতে পারি। দেবো এক্ষুনি ? এই শ্যামা !'

গরুটা আবার একটা শব্দ করে—অর্থাৎ অসময়ে তার ওলান টনটন্ ক'রলেও মনিবের জন্য সে যে-কোনও দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে রাজী।

'কাকে দিতে হবে হুজুর দুইয়ে ?' একটা পাত্রের সন্ধান ক'রতে থাকে লোকটা।

বিপ্রপদ বলেন, 'আমাদের শিবচরের বাবু বুড়ো হয়েছেন—গলিত নখ-দন্ত, পলিত কেশ—এখন আর মাছ-মাংস খেতে পারেন না, হবিষ্যান্নভোজী, তুমি এক সের করে রোজ দুধ দিতে পার না ? তোমার বছর খাজনা কত ?'

'ছ পয়সা।'

'মাত্র। এর জন্য তুমি ভাবো ? তুমি নিতান্ত বোকা। রোজ এক সের করে দুধ দিলে তিনশো ষাট সের কি কিছু বেশী হয়. বছর—তোমারও ভার কমে। উনিও হাল্কা হন—বকেয়া খাজনার জের টানতে হয় না।'

কর্ম্মচারীর দল মুখ টিপে-টিপে হাসে।

'তুমি এখন যাও হে বাপু। কাল কি আজ বিকালে তোমার বাড়ী যাবো, একটু দুধ-টুধ জোগাড় রেখো।'

বিপ্রপদ মুচকে একটু হাসেন। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তুমি এখন দাঁড়িয়ে থেকো না—যাও, আমাদের কাজ আছে।'

লোকটা গরুটাকে নিয়ে বিদায় হয়। যাওয়ার সময় সর্বাগ্রে প্রণাম করে নায়েবকে—তার পর অন্যান্য সকলকে।

'নায়েব মশাই শক্তের ভক্ত, নরমের যম। তা না হলে তিন আনার জন্য অগ্রিম একটা গরু ক্রোক !'

নায়েব আর মাথা তুলতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় বাস্তবিকই বিপ্রপদ বেড়াতে বেড়াতে গরুওয়ালার বাড়ী যান। সংগে কাউকে নেন না। তাকে দেখেই গরুওয়ালার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। শিবচর কাছারীর ম্যানেজার, যম যাকে দেখলেও ভয় পায়—তিনি সশরীরে তার দ্বারে।

ও কেঁদে ফেলে। 'হুজুর, আমার একটি মাত্র মা-মরা মেয়ে, আমাকে ধরে নিলে ও মরেই যাবে। আমি আজ দুধটুকু দিয়ে আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু মেয়েটা কখন যেন বেচে চাল কিনে এনেছে। কাল থেকে আর আমার ভুল হবে না।'

ওর কান্না দেখে বিপ্রপদ কি যে বলবেন কি যে না বলবেন, তা ঠিক করতে পারেন না। 'ভয় নেই তোমার, তোমার কাছে কেউ দুধ চাইতে আসেনি। সকাল বেলা আমি ঠাট্টা করে বলেছি। তুমি কেঁদ না হে, কেঁদ না।'

একখানা তেরর বন্দ খড়ের ঘর। চার আনা কি পাঁচ আনার মেটে বাসন, ক'খানা ছেঁড়া কাঁথা ও খান দু'-তিন পুরোন কাপড় নিয়ে একটা সংসার। আয়ের জিনিষ ঐ গরুটার দুধ। ওদের মত প্রজার দু'-দশ টাকা তমাদি হ'লে হয় কি ? সদরে ঐ সব নিয়ে জানান যাবে না—কারণ ওপরওয়ালারা শাসন চায়, শৈথিল্য পছন্দ করে না। তারা ঠিক ধনি-দরিদ্র বুঝতে চায় না—এ সব স্থানীয় কর্ম্মচারীদেরই বোঝা দরকার।

ফেরবার পথে বিপ্রপদ ভাবেন : তিনিও তো তালুক কিনবেন। তাঁরও প্রজার মধ্যে এমনি অন্নহীন, কত আশ্রয়হীন প্রজা থাকবে—তাদের বেলা তিনি কি ব্যবস্থা করবেন ? তাঁর কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধেও তো কত নালিশ কত অনুযোগ শোনা যাবে। কত প্রজারা রাত কাটাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে। তিনি আর মুনাফার টাকা কয়টা ঘরে তুলবেন না। যা লাভ হয় ওদের হিতার্থে ব্যয় করে দেবেন। নিজের সংসার নিজেই খেটে চালাবেন। তালুক থাকবে সম্মান ও খ্যাতির জন্য। দরিদ্র সাধারণের অন্তর থেকে স্বতস্ফূর্ত সম্মান ও খ্যাতিই তাঁর কাম্য।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর গ্রাম্য নির্জ্জন পথ দিয়ে চলতে ওঁর ভালই লাগছে। এ ক'দিন আর মাটির সংগে পরিচয় হয়নি। বন্ধ ঘরে বসে বসেই সময় কেটেছে। ধূলোগুলো উড়ে এসে জুতো-জোড়ায় একটা প্রলেপ পড়িয়ে দিচ্ছে। গাছ-পালাগুলো চোখে লাগছে বড় সুন্দর। সারি সারি নধর নারকেল-সুপারি গাছ, তার ভিতর দিয়ে চলেছে পথ,—সেই পথের দু'পাশে আম জাম খেজুর রয়েছে সাজিয়ে। বাগানের ভিতর স্যাঁতসেঁতে জায়গাগুলোও বাদ যায়নি—সেখানে অজস্র আনারসের গাছ। তার আশে-পাশে কেয়া ঝোপ। ঢেঁকির লতা কখন বড় গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে, নয় তো এড়িয়ে গেছে। কোথাও বা অজস্র গাছে সহস্র কাঁটা শানিয়ে রেখেছে। ওঁর বাগানগুলোও তো এমনি পূর্ণ। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। বাড়ী থাকতে নিজের হাতেই যত্ন করেন। সারে জলে তারা বেড়ে উঠেছে। একবার দেখতে ইচ্ছা করে নতুন কলমগুলো এত দিনে কত বড় হলো। রোজই একটু একটু করে বাড়ে, দু'-চারটে পাতা মেলে। বিকাল বেলা জল দিলে ওদের সবুজ হাসি খোলে। ওরা যেন কি বিপ্রপদকে বলতে চায়। বোবা ভাষা, বোবা চাহনিতে কত যে ব্যঞ্জনা তা শুধু তিনিই বোঝেন। বাড়ীর জন্য সহসা মন ব্যাকুল হয়। অমরেশ কমলকামিনী সেবা সকলে এক সাথে ওঁর মনের বাগানের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এসে দাঁড়ায়। অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকেন বিপ্রপদ। সকলের শেষে আসে পাড়ার মেয়েরা—হাত-ধরাধরি করে অর্দ্ধবৃত্তাকারে। তারা হাসে, গান গায়, করতালি দিয়ে নাচে। তার পর ওরা শ্যাম সন্ধ্যার তরল আঁধারে বাগানের গহনেই মিলিয়ে যায়। বিপ্রপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

বিপ্রপদ কাছারীতে ফিরে সকল চিঠি ঠেলে রেখে বাড়ীর চিঠিটা খুলে পড়তে বসেন। মৃদু আলোটা উসকে দিয়ে দেখেন একগাদা চিঠি খামের ভিতর। সকলেই লিখেছে। সেবা শুধু লিখতে পারেনি—একটা কচি হাতের ছাপ পাঠিয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা কসরৎ করে, অনেক অকার-ইকার যোগ-বিয়োগ করে বিপ্রপদ চিঠি পড়া শেষ করেন। বাবাকে সকলের দেখতে ইচ্ছা করে, কবে পর্য্যন্ত তিনি বাড়ী ফিরবেন তাই সকলে জানতে চেয়েছে। এই গেল ছেলে-মেয়েদের কথা। 'বুড়োদের কথা : ইসলাম মিঞারা দু'-এক দিনের মধ্যে সেন মশাইর সাথে দেখা করে সংবাদ জানাবে। একখানা খামের একেবারে দাম তুলে নেওয়া হয়েছে। পাকা-কাঁচা. নানা রকমের

[৭৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ধাপে ধাপে জলে উঠল হাজার ওয়াটের বিজলী বাতি—লাল, নীল, ধূসর। জলে উঠল মঞ্চের পাদপ্রদীপ। চোখ-ধাঁধানো আলোর বন্যা ভেদ করে ভেসে উঠল কয়েকটি কৃত্রিম পর্বতশ্রেণী। গোলাপ ফুলের মালা গলায় দিয়ে রূপোর কাঁচি হাতে মাননীয় অতিথি এসে কেটে দিলেন রেশমের ফিতা। সকলে সমস্বরে কণ্ঠে ধ্বনি দিয়ে উঠল—"বন্দে মাতরম্"। উদ্বোধন হল একটি সর্বজনীন দুর্গা-মণ্ডপের।

এবারে কলিকাতার

এমনি সর্বজনীন দুর্গাপূজো এবার কলকাতায় হয়েছে ১ শত এবং এবারের পূজোয় সেইটাই সব চেয়েও বড় বৈশিষ্ট। প্রত্যেক সর্বজনীনে যদি গড়ে ২ হাজার টাকা করে খরচ হয়ে থাকে, তাহলে মোট খরচের পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকা। এই ১ শত সর্বজনীন ছাড়াও বিভিন্ন নাগরিকের গৃহে আর ৪ শ' পূজো হয়েছে, তাতে আরও ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে ধরে নিলে এবার শুধু পূজো বাবদ কলকাতায় মোট খরচের পরিমাণ২৫ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য, টাকাটা কলকাতার ৫০ লক্ষাধিক নাগরিকের পকেট থেকেই আদায় হয়েছে। দুর্গাপূজোর আনন্দ-উৎসবের জন্য প্রত্যেক নাগরিক গড়ে ৮ আনা করে দিয়েছেন।

পূজা

(মাসিক বসুমতী'র নিজস্ব প্রতিনিধি লিখিত)

কলকাতার এই ৫০ লক্ষ নাগরিকের হিসাব থেকে কয়েক জন ধনী ব্যবসায়ী (অধিকাংশই বড়বাজার অঞ্চলের অধিবাসী), বড় চাকুরিয়া, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং জমীদারদের বাদ দিলে যাঁরা বাকী থাকেন তাঁরা হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত (কেরাণী, সাংবাদিক, ছোট দোকানদার, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি) না হয় মজুর শ্রেণীর লোক। নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মজুর শ্রেণীর মধ্যে কোন ধনবৈষম্য নেই, আছে সংস্কৃতি-বৈষম্য। নিম্ন-মধ্যবিত্তদের পেছনে গোলদীঘির ছাপ থাকে আর বাইরে বেরুনোর সময় তাঁরা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরোন। তাঁদের রুচি মার্জিত এবং চালচলন কৃত্রিম। মজুর শ্রেণীর মধ্যে এর অনেক গুণেরই অভাব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের জীবন যে কি রকম অসহনীয় হয়ে উঠেছে, তা বোঝাবার জন্য বসুমতীর পাতা খরচ করবার প্রয়োজন নেই। মুদ্রাস্ফীতি, চোরাবাজার, মুনাফাবাজী এবং দুর্নীতির চাপে পড়ে সারা বাঙলা দেশেরই আজ ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। তার ওপর আপোষ-নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেশবিভাগের সৌজন্যে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা। বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে পাঞ্জাব এবং বাঙলায় কত লক্ষ নর-নারী-শিশুর জীবন-নৈবেদ্য ধরে দিতে হয়েছে তার হিসাবও সকলেই রাখেন।

২০ লক্ষ লোকের সহর কলকাতায় আজ ৫০ লক্ষ লোক কি ভাবে বাস করছেন, তাও বুঝিয়ে বলতে হয় না। আমরা সকলেই ভুক্তভোগী। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চেয়েও বর্ণনা নিশ্চয়ই বেশী স্বাভাবিক হবে না। দালালদের ঘুষ দিয়ে, বাড়ীওয়ালাদের কল্পনাতীত অঙ্কের সেলামী দিয়ে বহু মাসের চেষ্টার পর একখানা মাত্র ঘর সংগ্রহ করে সেখানেই হয়ত বাস করছেন এক ডজন পরিবার। যাত্রা-দলের মত ঢালা বিছানায় হয়ত শুয়ে আছেন পিতা, পুত্রবধূ, পুত্রব, কন্যা, জামাতা এবং অনূঢ়া কন্যা। লজ্জা নেই, সম্ভ্রম নেই, শালীনতা-বোধ নেই। ঘর ভেঙেছে, মন ভেঙেছে, স্বাস্থ্য তো চিরদিনই ভাঙা। স্বাস্থ্যরক্ষার কোন্ উপাদানটি তাঁদের আয়ত্তের অধীন? আহার নেই, স্থিতি নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই—আছে কেবল দিগন্তবিস্তৃত জমাট তমসা, অনিশ্চয়তা এবং ক্ষয়। এত লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা সত্ত্বেও শরতের হাওয়া গায়ে লাগলেই বাঙ্গালীর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মরা গাঙে আবার উৎসাহ, উদ্দীপনা, আনন্দের বান ডাকে—বুক ভরে উঠে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতায়। তাই এই ১১৫৪ সালের মুদ্রাস্ফীতি, অভাব-অনটন, অকাল-মৃত্যু এবং বন্যার মধ্যে যখন সব ছাপিয়ে আগমনীর সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল, তখন কলকাতার ৫০ লক্ষাধিক নাগরিক সাময়িক ভাবে তাঁদের অতীত-বর্তমান ভুলে শারদোৎসবের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। পাড়ায়-পাড়ায় ছেলেরা বেরুলো চাঁদার খাতা হাতে করে। কুমারটুলীর শিল্পীরা প্রতিমা গড়বার জন্য কাঠামো তৈরী করতে লেগে গেলেন। ডেকরেটর আর মাইকওয়ালারা নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম গোছাতে লাগল। ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে "পূজোর পোষাক" যোগাড় করতে লাগলেন। ভীড় জমে উঠল কমলালয় ষ্টোর্সে, কলেজ ষ্ট্রীট বাজারে আর আর্মি নেভী-স্টোরে। দোকানে দোকানে স্বচ্ছ শো-কেসে ঝলমলিয়ে উঠল রঙ-বেরঙী সাড়ী-ব্লাউসের বাহার। সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাঁদের অর্ঘ্য সাজাতে লাগলেন বিভিন্ন পত্রিকার পূজা-সংখ্যা মারফৎ। হাটে, বাজারে, অলিতে-গলিতে পূজার ধুম লেগে গেল। কলকাতার ৫০ লক্ষ নাগরিক বাৎসরিক আনন্দ আয়োজনের জন্য ব্যয় করলেন ৩২৫ লক্ষ টাকা। হিসাবী বুদ্ধিমানরা বললেন, "ক্ষণিক আনন্দের জন্য এত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল কি? ২৫ লক্ষ টাকা তুলে একটা হাসপাতাল করা চলত, একটা প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগার হত, আরও

না জানি কত 'সংকাজ' হত ! কয়েকটি পূজা-মণ্ডপকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন হৈ-চৈ করে শক্তি ব্যয় করে কি পরমার্থ লাভ হল ?" তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে দূর থেকে বিদায় নেওয়াই ভাল। তাঁরা তাদের বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সারা জীবন ধরে লাভ-লোকসান ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করুন, আমরা তাঁদের দলে নই।

শারদোৎসবে নতুন পোষাক পরে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতা বিনিময় করা বাঙলা দেশের প্রাচীন রীতি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের ভাগ্যেই এবার নতুন পোষাক জোটেনি। কারণ, অধিকাংশ লোকেরই "দিন আনি দিন খাই" গোছের অবস্থা। "পূজোর বাজারে" যোগ দেবার মত উদ্বৃত্ত অর্থ কারও হাতেই ছিল না। তার উপর কাপড়-চোপড়ের বাজার-দর ছিল সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাইরে। সত্যি কথা বলতে কি, পূজোর বাজার এবার ভাল জমতে পারেনি। বিভিন্ন দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, অন্যান্য বছরের তুলনায় বিক্রয় নেহাৎ মন্দ হয়নি, কিন্তু কলকাতার লোকসংখ্যার তুলনায় বিক্রয়ের পরিমাণ নিতান্তই কম ছিল। এক পাতলা রবারের রঙচঙে বেলুন ছাড়া আর কিছুই গরম পিঠার মত বিক্রয় হয়নি। মহালয়ার আগে পর্যন্ত দোকানে দোকানে তেমন ভীড় জমেনি। মহালয়ার দিন থেকেই আসল "পূজোর বাজার" সুরু হয়। অন্যান্য বার পূজোর ছুটীতে কলকাতার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কলকাতার বাইরে চলে যেতেন। পূর্ববঙ্গগামী যাত্রীর সংখ্যাই ছিল বেশী। উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং ধনীরা যেতেন পুরী, দার্জিলিং-এ হাওয়া বদলাতে। এবার পূর্ববঙ্গগামী যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। বায়ুসেবীদের সংখ্যাও অত্যন্ত কম ছিল, কারণ রেল কোম্পানী এই সমস্ত অতিরিক্ত যাত্রীদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করতে নারাজ হন।

প্রতিমা নির্মাণ এবং প্রতিমা ও মণ্ডপ সাজানোর ব্যাপারে এবার নানা বৈচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ সর্বজনীন মণ্ডপেই দেখা গেছে, প্রত্যেক দেবতা পৃথক্ ভাবে এক-একটি পাহাড়ে স্থান গ্রহণ করেছেন। মা দুর্গার একান্নবর্তী সংসারে এই ভাঙনের মধ্যে কেউ কেউ বাঙলার তথা বিশ্বের সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছেন।

এক সর্বজনীনে প্রতিমাকে কালো রঙে রঞ্জিত করা হয়। উদ্যোক্তাদের অক্ষম অন্তর্দাহের এই অপূর্ব বিকাশ দেখে রাষ্ট্রনায়কদের কেউ কেউ মর্মদাহ লাভ করেছেন বলে জানা গেল। এর ভিতরে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছিল কি না কে বলতে পারে? কয়েক জায়গায় পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারারা সর্বজনীন পূজোর আয়োজন করেছিলেন।

পূজোর ক'দিন কলকাতায় যে বিরাট আনন্দোচ্ছ্বাসের ঢেউ উঠেছিল, তা বর্ণনার অতীত। বুকে পাথর চাপা দিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে কলকাতার লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশু তাঁদের গৃহ নামক অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁৎসেতে গুহা ছেড়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে মুক্ত বায়ু সেবন করেছিলেন পূজোর ক'দিন রাত্রে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্বেও পরিচ্ছন্ন সাজে সজ্জিতা পুরনারীরা দল বেঁধে অসঙ্কোচে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দেখে বেড়িয়েছেন। লক্ষ লক্ষ নারীর এই বিরাট সমাবেশ কলকাতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পূজোর ক'দিন রাত্রে রঙ-বেরঙের জমকালো সাজ-পোষাক-পরা কলহাস্যমুখরিতা মেয়েরা পুরুষদের সমস্ত স্মার্টনেস ম্লান করে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেছেন। স্বেচ্ছাসেবকদের সুষ্ঠু ব্যবস্থায় কোন পূজা-মণ্ডপেই বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি। বৈকাল থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত রাজপথে কেবল নর-নারী-শিশুর মিছিল দেখা গেছে।

কিন্তু উচ্ছ্বাস কেবল উচ্ছ্বাসই। তার পেছনে সত্যিকার কোন জোর নেই।

অপেক্ষাকৃত নির্জন ওয়েলস্‌লির সর্বজনীনের মণ্ডপের বাইরে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টানছিলাম। কাছাকাছি এসে দাঁড়াল একটি তরুণ-তরুণী। আবছা আলোয় তাদের চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না, শুধু শুনতে পেলাম তাদের কথোপকথন।

—এমন ভাবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবতে পারিনি।—মেয়েটি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আরম্ভ করল।

—তোমায় আবিষ্কারের আশা নিয়েই তো ঘুরে বেড়াচ্ছি কয়েক মাস ধরে। কিন্তু এ তোমার কি শ্রী হয়েছে নীলা! ঢাকা থেকে যখন আস, তখন···

—থাক থাক। জানো, আমাদের কি সর্বনাশ হয়ে গেছে? ছোট ভাই মারা গেছে ক্যাম্পে, মা শয্যাশায়ী, বাবার অবস্থাও খারাপ। অচল সংসার চালাবার জন্য পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে টেলিফোনে চাকরী নিয়েছি। তোমরা কোথায় আছ সুরঞ্জন? তোমার মা বাবা?···

তাদের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে মাইকে রেকর্ড বেজে উঠল "আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব করিতে চুর"। বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল কঠোর বাস্তব। পূজোর ক'দিনে শিয়ালদহ রেল-ষ্টেশনে আশ্রয়প্রার্থীদের সাতটি শিশু কলেরায় মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ লোক যারা এক দিন জ্ঞানে-গরিমায়, শিক্ষা-দীক্ষায়-সংস্কৃতিতে একটা জাতকে অগ্রগতির আলোক দেখিয়েছিল, তারা আজ জীব-জন্তুর মত এসে পরের অনুগ্রহজীবী হয়ে বাস করছে বিভিন্ন ক্যাম্পে, ক্ষয় হচ্ছে তিলে তিলে। এমনি কত সুরঞ্জন আর নীলার পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতার বিরাট শূন্যে বুদ্‌বুদের মত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কে তার খোঁজ রাখবে?

খালি বাজতে লাগল কানে, "আমার সকল রকমে কাঙাল করেছ"। ১৩৫০ সালে ৪০ লক্ষ নরনারীর প্রাণের আহুতি পেয়ে যে কাঙালপণার আগুন জ্বলে উঠেছিল, তারই লেলিহান শিখা আজ সমগ্র বাঙলা দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত। এই অনন্ত অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে কে আমাদের বাঁচাবে? অসুরবিনাশিনী মহামায়ার অলৌকিক শক্তিতে আস্থা রাখতে পারি কি? সন্দেহ হয়। যুগ যুগ ধরে অলৌকিক শক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? এবার আমাদের মুক্তিদাতা বোধ হয় ভগবান নয়, মাটির মানুষ।

বসুমতী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলবায়ুর দোষে ও কীটাদির উৎপাতে এদেশে পুরাতন কাগজপত্র বেশী দিন টিকে না, তাহার উপর পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যকলাপের নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার আগ্রহ আমাদের নাই বলিলেই চলে। এই দুই কারণে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা সম্বন্ধেও কোন দলিলপত্র বা পুস্তকাদি অনেক প্রসিদ্ধ বাঙালী-পরিবারে এখন আর বড় দেখা যায় না।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' : সংবাদপত্র জগতে 'বসুমতী'র নাম সুপরিচিত। পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইহা গত শতাব্দীর শেষভাগে সাপ্তাহিক-পত্ররূপে জন্মলাভ করে। কিন্তু পুরাতন সংখ্যাগুলি অপ্রাপ্য হওয়ায় ইহার জন্মকাল নির্ণয় করা গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু ব্যাপারটি দুরূহ হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। আমি এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই নিবেদন করিব।

সাপ্তাহিক বসুমতী যে ১৩০৩ সালে বিদ্যমান ছিল, অগ্রে তাহার দুইটি প্রমাণ দিতেছি :

(১) 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১ম বর্ষের সাপ্তাহিক বসুমতীর উপহার-স্বরূপ ১৩০৩ সালে 'অতুল-গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ' মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন।

(২) সরকারী রিপোর্টে আমি ৬ অক্টোবর ১৮৯৬ (আশ্বিন ১৩০৩, মহালয়া) তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর উল্লেখ দেখিয়াছি।

১৩০৩ সালের আশ্বিন মাসে সাপ্তাহিক 'বসুমতী' বিদ্যমান ছিল সত্য, কিন্তু ঠিক কোন তারিখে ইহা সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে, তাহা জানিবার জন্য মন কৌতূহলী হয়। সুখের বিষয়, ইহার নির্দ্ধারণের সূত্রও মিলিয়াছে :

সাপ্তাহিক বসুমতী ২৩শ বর্ষে পদার্পণ করিলে সত্যচরণ মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'প্রতিবাসী' ১৭ই ভাদ্র ১৩২৫ তারিখে লিখিয়াছেন :—

> "নব্যবঙ্গের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বসুমতী' বিগত ২৫শে শ্রাবণ, ২৩ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।"

ইহা হইতে ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র প্রকাশকাল—২৫ শ্রাবণ ১৩০৩, শনিবার (৮ আগষ্ট ১৮৯৬) পাওয়া যাইতেছে। আমার মনে হয়, ইহাই 'বসুমতী'র জন্ম-তারিখ।

প্রথমাবস্থায় প্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

'দৈনিক বসুমতী' : শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত দৈনিক বসুমতীতে লিখিয়াছেন :—"সাপ্তাহিক বসুমতী পরে ১৩২০ সালে যখন দৈনিকে রূপান্তরিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়" (দু'চার কথা, ৫ চৈত্র ১৩৫৪)।

'মাসিক বসুমতী' : ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদকত্বে, 'মাসিক বসুমতী' প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরে শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক হন এবং ইহার পর সতীশচন্দ্র একা সম্পাদক হন। ১৩৫১ সালের বৈশাখ হইতে সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদক নিযুক্ত হন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "পত্র-সূচনায়" এইরূপ লিখিত হয় :—

> "আমরা যথাসাধ্য সাহিত্যের সহায়তায় দেশের সেবা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।...আজকাল রাজনৈতিক সমস্যাই দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি রাজনৈতিক উন্নতি সাপেক্ষ। সেই জন্য আমরা রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিব। বিজ্ঞানের কথা—শিল্প-বাণিজ্যের কথা—ঐতিহাসিক কথা—কৃষি প্রভৃতির উন্নতির আলোচনা—সামাজিক সমস্যার আলোচনা—এই পত্রিকায় থাকিবে। আর পাঠকদিগের চিত্তবিনোদন করিবার উদ্দেশ্যে গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি ইহাতে প্রকাশিত হইবে। যাহাতে ইহার চিত্রসম্পদ প্রবন্ধগৌরবের উপযোগী হয়, সেদিকেও আমরা দৃষ্টি রাখিব। এই সঙ্কল্প লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।"

'মাসিক বসুমতী' এখনও সগৌরবে চলিতেছে।

'বার্ষিক বসুমতী' : ১৩৩২, ১৩৩৩ ও ১৩৩৪ সালে শারদীয়া পূজার সময় 'বার্ষিক বসুমতী'র তিনটি সংখ্যা স্বতন্ত্র ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। বহু খ্যাতনামা লেখকের রচনা এগুলির কলেবর পূর্ণ করিয়াছিল। 'বার্ষিক বসুমতী' পুনঃ প্রচারিত হওয়া উচিত।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ললিত হাজরা

১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামক সঙ্ঘ গঠন করিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সঙ্ঘের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" বা "ভারত সভা"র পূর্ব্বেকার দুইটি সভা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ১৮৪৩ সালে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ইন্ বেঙ্গল" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়—"ভারতীয় প্রজাদের প্রত্যেক শ্রেণীর স্বার্থ, অধিকার এবং উন্নয়নের ব্যবস্থাকল্পে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল।" ১৮৫১ সালে এই সমিতি "বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন"এর সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং ১৮৫২ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট এক সুদীর্ঘ দরখাস্তে ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব প্রথা, ভারতীয় শিল্পীদের প্রতি সুবিচার, শিক্ষার বিস্তার, সরকারী উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ প্রভৃতি দাবী করিয়া জানাইল, "সদাশয় বৃটিশ সরকারের সাহচর্য্য লাভ করিয়া তাহারা যে উন্নতির আশা করিয়াছিল তাহা সম্ভব হয় নাই।···ভারতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্ভাব্যরূপে জনগণের মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিতে হইবে।" এই সমিতির সহিত "বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডারস্ সোসাইটি"ও মিশিয়া যায়। মোটের উপর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, উক্ত সমিতিগুলি জনসাধারণের উন্নতিকল্পে বড় গালভরা বুলিই প্রচার করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে জমিদারের স্বার্থরক্ষাই তাহাদের একমাত্র ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত সমিতিগুলির সদস্যদের চাঁদার পরিমাণ এত অধিক করা হইয়াছিল যে কেবল মাত্র বিত্তশালী জমিদারগণই তাহাদের সদস্য হইতে পারিতেন। জনসাধারণ ত দূরের কথা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ করিয়া নিজেদের দাবী-দাওয়া লইয়া আলোচনা করিতে না পারে তজ্জন্যই সদস্যদের চাঁদার পরিমাণ অত্যধিক করা হইয়াছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় বাহকদের বিরোধিতা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের অনুগামী লইয়া এই "ভারত সভা" প্রতিষ্ঠা করিলেন। জনমত গঠন করিবার উদ্দেশ্যে "ভারতসভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ যাহাতে দলে দলে এই সভায় যোগদান করিতে পারে তজ্জন্য চাঁদার হার অত্যন্ত স্বল্প করা হইল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় "ভারত সভার" শাখা স্থাপিত হওয়ার পর সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষে "ভারত সভার" বাণী বহন করিয়া লইয়া গেলেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ তাহার সভার মুখপাত্র হিসাবে 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনী "নেশন ইন মেকিং"এ লিখিয়াছেন যে, "বেঙ্গলী" পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম রয়টার এর সার্ভিস্এর গ্রাহক হয়। ইতিমধ্যে জনমত বৃটিশবিরোধী হইয়া উঠিলে ভারত গবর্ণমেন্ট অত্যাচারের পন্থা অনুসরণ করিল। ১৮৭৮ সালে ভারত গবর্ণমেন্ট দুর্ভিক্ষ তহবিলের অর্থ আফগান যুদ্ধে নিয়োগ করায় সমগ্র দেশে প্রবল হৈ-চৈ আরম্ভ হয়। এই হৈ-চৈ দমন করিবার জন্ত ভারত সরকার নির্মম অত্যাচারের নীতি প্রয়োগ করিল। এই বৎসরেই দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের জন্ত প্রয়োগ করা হইল কালা কানুন "প্রেস্ অ্যাক্ট" এবং ভারতীয়দের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া জারী হইল "আর্ম্‌স্ এ্যাক্ট"। 'বেঙ্গলী' পত্রিকার উপর বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করিতে বিলম্ব ঘটিল না। সুরেন্দ্রনাথকে এক আপত্তিজনক প্রবন্ধ লেখার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত করা হইল। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক মিঃ জাষ্টিস্ নরিস, কোন এক মামলায় হিন্দুধর্ম্মের দেবতাদের উপর কটাক্ষপাত করিয়া মামলার রায় প্রদান করিবার এক সংবাদ 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সংবাদের উপর মন্তব্য করিয়া 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: "জেফরীস্ এবং স্ক্রগস্-এর আমলের কথা যদি তাঁহার স্মরণ না থাকে তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, আমরা এমন এক জন বিচারক পাইয়াছি যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকের অযোগ্য।···" এই মন্তব্য প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথের উপর এক সমন জারী করা হইল।—"সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় আদালত অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।" (Bipin Chandra Pal—Memories of My Life & Times)। "আদালতের রায় বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা ও ছাত্রবৃন্দ আদালতে হৈ-চৈ বাধাইয়া দিলেন। এই বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে ছাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। এই আশুতোষ পরে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"—(Surendra Nath Banerjea—"A Nation in Making")। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে এক চাঞ্চল্য দেখা দিল। যাহা হউক, সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিদেশে ভারত সভার শাখা স্থাপিত হইয়া গেল। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "ভারত সভা" জমিদারবিরোধী ছিল। ১৮৮৩ সালে ভারত সভা কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিল। আনন্দমোহন বসু এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলার বহু প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। আনন্দমোহন তাঁহার অভিভাষণে ঘোষণা করিলেন যে, এই সম্মেলন জাতীয় পার্লামেন্টের প্রথম অধ্যায়। প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের, অস্ত্র আইনের অবসানের, সিভিল সার্ভিসের সংস্কারের এবং টেকনিক্যাল্ শিক্ষার দাবী করিয়া এই সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারত সভার জনপ্রিয়তা এবং ভারত সভার নেতা সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনকে পল্লী অঞ্চলে কৃষকের সভা আহ্বান করিয়া অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদিগকে দণ্ডায়মান হইতে উপদেশ দিতে দেখিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল। কৃষক সম্প্রদায়কে ভারত সভার আধিপত্য-মুক্ত করিবার মানসে জমিদারদিগকে না চটাইয়া

১৮০৩ সালে "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" পাশ করিবার কথা কাউন্সিলে লর্ড রিপণ ঘোষণা করিলেন। এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাউন্সিলে লর্ড রিপণ বলিলেন: "...আমরা এক বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছি। এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ নিজেদের অর্জিত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। আবার অন্য দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তালুকদার, রায়ত এবং কৃষকদিগকে তাহাদের স্বার্থরক্ষার্থে ব্যবস্থা করিবার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আমরা বহু দিন ধরিয়া অবহেলা করিয়া যে নিলর্জ্জতার পরিচয় দিয়াছি তাহার অবসান ঘটাইয়া আমরা কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইতেছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রায়তের যে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাকে সেই পর্য্যায়ে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নীত করিতে চাহি এবং বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা যে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি।"—(Selections from papers relating to the Bengal Tenancy Act, 1885—পৃঃ 140-141)। এই ভাষণে প্রজাস্বত্ব আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং "বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা একান্ত আবশ্যক" ইহার তাৎপর্য্য যে কি তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। জমিদারদিগকে অভয় দান করা হইয়াছে আবার কৃষকদিগকে ছিটে-ফোঁটা অধিকার দেওয়া হইয়াছে। জমিদারদের প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্ত্তন হইল না। নব্য জাতীয়তাবাদ যাহাতে পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারিত না হয় তজ্জন্য এই ব্যবস্থা করা হইল। ১৮২৯ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্ক-এর নীতি: "ভারতে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তাহার বিরুদ্ধে যদি আমাদিগকে কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে আমি বলিতে পারি যে যাবতীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভারতে যে সব জমিদারের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারাই আমাদের পক্ষ হইয়া বিদ্রোহ দমন করিবে, কারণ তাহারা জানে, বৃটিশ ডোমিনিয়নের নিরাপত্তার উপর তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে।" —(A. B. Keith.—"Speeches and Documents on India Policy 1750—1921", Vol. I পৃঃ 215)। এই নীতি এখনও কার্য্যকরী থাকিল। ভারত সভার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র পুনরায় আরম্ভ হইল। ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের প্রবর্ত্তন করিয়া এবং লর্ড লিটনের ঘৃণ্য সংবাদপত্র দমন আইনের অবসান ঘটাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার কূটনৈতিক চাল দিল। এক আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইহাতেও শান্তি পাইল না। এই আসন্ন বিপ্লব হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অন্য কিছু করা আবশ্যক ভাবিয়া সন্ত্রাসমূলক নীতির পরিবর্ত্তে এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করিল। এলান্ অক্টেভিয়ান হিউম নামক জনৈক বৃটিশ কর্মচারী সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। হিউম সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে পুলিশের বহু গোপনীয় দলিল ও রিপোর্ট আলোচনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে এক বৃটিশ-বিরোধী অসন্তোষ প্রবলাকারে দেখা দিয়াছে এবং বৃটিশ শাসককে উৎখাত করিবার জন্য বহু স্থানে গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিপর্য্যয়ের মুখ হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার্থে হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কার্য্য সুরু করিয়া দিলেন। এই উদ্দেশ্যের পশ্চাতে যে সরকারী ষড়যন্ত্র ছিল তাহা বুঝিতে ভরসা করি বিলম্ব হইবে না। "বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমান অসহযোগিতা এবং জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আসন কণ্টকময় করিয়া তুলিতেছে—এই সম্পর্কীয় সাবধান-বাণী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বন্ধুবান্ধবগণ উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং হিউমকে পত্র দিয়া জানাইতে লাগিল।" —(স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ—"এ্যালান্ অক্টেভিয়ান হিউম, ফাদার অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস"—পৃঃ ৫০)। "১৮৫৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসর ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর দুর্দ্দিন গিয়াছে। ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র হিউমই আসন্ন সর্ব্বনাশের বীভৎসতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এবং ধ্বংসের হাত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার চেষ্টাও করিয়াছিলেন।... পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য হিউম সিমলা ছুটিলেন। সম্ভবতঃ নূতন বড়লাট লর্ড ডাফরিণ. তাঁহার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রাক্তন বড়লাটের নীতি পরিত্যাগ করিলেন এবং হিউমকে কংগ্রেস সংগঠনে উৎসাহ দান করিলেন। নিখিল ভারতব্যাপী আন্দোলনের পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল। যে কোন কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষিত সমাজ নূতন আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারে এবং এই আন্দোলনের মধ্যে আপামর জনসাধারণ ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল।..."—(এ্যাওরুজ এ্যাণ্ড মুখার্জ্জি—"রাইজ এ্যাণ্ড গ্রোথ অব দি কংগ্রেস ইন ইণ্ডিয়া"—পৃঃ ১২৮-১২৯)। "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে প্রকৃত পক্ষে ভারতের বড়লাট মারকুইস অব ডাফরিণ এ্যাণ্ড আভার সৃষ্টি এই সত্য অনেকের নিকট সম্ভবতঃ একটি সংবাদ হিসাবে পরিবেশিত হইবে। ১৮৮৪ সালে মিঃ এ, ও, হিউম্ মনস্থ করিলেন যে, বৎসরান্তে একবার ভারতের নামজাদা রাজনীতিবিদদের এক সভায় একত্রিত করিয়া ভারতীয় সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগ করিয়া দিতে পারিলে দেশের পক্ষে মঙ্গল হইবে। এই আলোচনা যে রাজনীতি বর্জ্জিত হইবে ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য।...এই ব্যাপারে লর্ড ডাফরিণ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছু দিন যাবৎ এই সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া তিনি মিঃ হিউমকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে নিজের মতামত বলিলেন। মিঃ হিউমের প্রস্তাব বিশেষ ফলবতী হইবে না দেখিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইংলণ্ডের ন্যায় এ দেশে সরকারের বিরোধী পক্ষ বলিয়া কোন দলই নাই। সুতরাং শাসক ও শাসিত উভয়েরই হিতার্থে—ভারতীয় রাজনীতির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে বৎসরান্তে একবার একটি সভায় মিলিত হইবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং এই সভায় শাসন-কার্য্যে সরকারের গলদ কোথায় দেখা দিয়াছে এবং শাসন-কার্য্য উন্নততর করিতে হইলে কি কি পন্থা অনুসরণ করা যায় সে সম্পর্কে তাঁহারা পরামর্শ দিবেন। তিনি প্রস্তাবে আরও বলিলেন যে, এই ধরণের বাৎসরিক সভায় কোন প্রাদেশিক গবর্ণর সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না, কারণ, তাঁহার উপস্থিতিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মনের

কথা ব্যক্ত করিতে সংকোচ বোধ করিবেন। মিঃ হিউম্ লর্ড ডাফরিণের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সম্মুখে তাঁহার নিজের এবং লর্ড ডাফরিণের পরিকল্পনাদ্বয় উপস্থাপিত করিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ লর্ড ডাফরিণের পরিকল্পনাটি স্বীকার করিয়া লইলেন। অবশেষে উক্ত নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করিবার জন্য লাগিয়া গেলেন। লর্ড ডাফরিণ এই ব্যাপারে মিঃ হিউমকে একটি সর্ত্ত পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সেই সর্ত্তটি ছিল—লর্ড ডাফরিণ যত দিন এই দেশে থাকিবেন তত দিন যেন তাঁহার নামটি প্রকাশিত না হয়।" —(ডবলু, সি, ব্যানার্জী—"ইনট্রোডাকসন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স")। "বাংলার জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের ভারত সভার দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সবান্ধব হিউম বোম্বাই নগরীতে সভা আহ্বান করিলেন। বাংলার বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়ী ডবলু, সি, ব্যানার্জীকে এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইলেও সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন ও অন্যান্য 'বিদ্রোহী'দের এই সভায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইল না।"—(অমিত সেন—"নোটস অন বেঙ্গল রেনেশাঁ।—পৃঃ ৪৮) ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বাংলার জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে আর সম্মেলনের বাহিরে রাখা সম্ভব হইল না। বাংলার জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেসের মধ্যে না লইবার কারণ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাব বৃটিশ-ভক্ত নেতৃবৃন্দের এবং উগ্রপন্থীদের মধ্যে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া বৃটিশ-ভক্তদের মতামতকে জনগণ-সমর্থিত মতামত বলিয়া গ্রহণ করাই ছিল লর্ড ডাফরিণের আসল উদ্দেশ্য। লর্ড ডাফরিণ তাঁহার উদ্দেশ্য গোপন করিয়া রাখেন নাই। ১৮৮৬ সালে অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর-বৎসরেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতায় তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন: "ভারতবর্ষের মত দেশে নিরাপদে ইউরোপীয় প্রথায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলিতে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে যে সব দাবী উত্থাপিত হইয়াছে সেগুলি সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া তৎসম্পর্কে ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে যে, আগামী দশ অথবা পনের বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের সময় সুবিধাগুলি ভারতীয়গণ লাভ করিবে। ইতিমধ্যে জনসভা এবং ঐ সভায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

"উগ্র-পন্থীদের দাবীগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইতেছে যে, অগ্রগামী দলের দাবীগুলি বিপজ্জনক নহে। শুধু তাই নয়—এই দাবীগুলির মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই।···কর্ম্মঠ ও আত্মসম্মানী বহু ভারতীয়ের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে এবং তাঁহাদের ব্যবহারে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের সহযোগিতা এবং আনুগত্যের উপর আমরা পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করিতে পারি। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সরকারের সমর্থনে বহু আইন যাহা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হইতেছে, সেগুলি জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে এবং সরকারকে জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইবে না।"—(স্যার এ্যালফ্রেড লায়াল—"লাইফ অব দি মারকুইস অব ডাফরিণ এ্যাণ্ড আভা" ; Vol II, পৃঃ ১৫১-১৫২)। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহনকে মিঃ হিউম সম্মেলনে কেন আহ্বান করেন নাই তাহার প্রকৃত কারণ হইল ইহাই। হিউমের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মেলনে লর্ড ডাফরিণের বক্তৃতা মত কার্য্য হইয়া গেল। পূরা মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া নয়টি প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। এইগুলির মধ্যে শাসনবিধি সংস্কারের অনুরোধ করা হয় এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক দাবী পূরণের জন্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কয়েক জন নির্ব্বাচিত সদস্য গ্রহণের অনুরোধ জানান হয়।

১৮৮৬ সালে পুরাতন জাতীয় সম্মেলন এবং হিউমের জাতীয় কংগ্রেস একত্রিত হইয়া যায়। ইহার ফলে এই প্রথম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দল হইতে প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সর্ব্বপ্রথম অভ্যর্থনা সমিতির সৃষ্টি হয় এবং সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৮৮৭ সালে মাদ্রাজ সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রভূত জনপ্রিয়তা দেখা দিল। অভ্যর্থনা সমিতির প্রয়োজনীয় অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে আসিল। কংগ্রেস জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে দেখিয়া সরকারী মহল অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সরকার তাহাতে প্রকাশ্যে বাধা প্রদান করিল।

কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে বাংলার নেতৃবৃন্দের দান অসামান্য। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দকে প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করিতে দেখিয়া বাংলার তরুণ নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মাদ্রাজ সম্মেলনে অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে বিপিনচন্দ্র পাল এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে বিষয়-নির্ব্বাচনী কমিটি গঠন করিতে বাধ্য করান। তখন হইতেই প্রকাশ্য সম্মেলনের জন্য প্রস্তাব-গুলির খসড়া বিষয়-নির্ব্বাচনী কমিটি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া আসিতেছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া অতীতের বহু কাহিনী হয়ত বাদ পড়িয়াছে। এ জন্য দুঃখিত। তবুও যত দূর সম্ভব রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়াছি। এই বিশ্লেষণের মধ্যে বাংলা দেশের অনেক ঘটনা অনিচ্ছায় বাদ পড়িয়াছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনের তাগিদায় হইয়াছিল তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস যে বাংলার নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হইতে পারে নাই সে কাহিনী পরের ঘটনা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সে কাহিনী বিবৃত করিবার সুযোগ নাই।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস

৩

সন্তোষ ঘোষ

(কংগ্রেস যুগ,—১৮৮৫—১৯০৫)

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এক জন ইংরাজ সিভিলিয়ান—হিউম সাহেব। হিউম সাহেব এই কার্য্যে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিণেরও অনুমোদন লাভ করিয়াছিলেন। হিউম সাহেব ভারতবাসীর কল্যাণকামী ছিলেন, ইহা সত্য; কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার

মূলে ছিল ভারতে ইংরাজ-শাসনের স্থায়িত্ববৃদ্ধির মনোভাব। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতে ইংরাজ-শাসনের প্রায় অবসান ঘটিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার কিছু দিন পর হইতে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুনরায় পুঞ্জীভূত হইতে আরম্ভ করে। এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ যাহাতে বিদ্রোহের আকার ধারণ না করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথ ধরিয়া চলে, ভারতের তদানীন্তন ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায় সে জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া হিউম সাহেব সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতে ইংরাজ-শাসনের স্থায়িত্ববৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে কংগ্রেস কালক্রমে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কংগ্রেসের এই ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক রূপের কথা চিন্তা করিয়া লর্ড ডাফরিণ পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই সহরে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। পুণা সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু অধিবেশনের নির্দিষ্ট তারিখের কিছু দিন পূর্বে পুণায় প্লেগ আরম্ভ হওয়ায় বোম্বাই-এ অধিবেশন করিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সবশুদ্ধ ৭২ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করিয়া এবং দেশের শাসন-সংস্কার দাবী করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে একটি রয়াল কমিশন নিযুক্ত করিয়া ভারত শাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান দাবী করা হয়। অন্যান্য প্রস্তাবে সৈন্যব্যয় হ্রাস, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের উচ্চতম বয়স বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবী করা হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, পরবর্তী কয়েকটি অধিবেশনে অল্পাধিক পরিমাণে সেই দাবী সমূহেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনসভা প্রভৃতির সাহায্যে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি জনপ্রিয় করার চেষ্টা করা হয়। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল কলিকাতায়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরজী। এই অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী সর্বপ্রথম কংগ্রেসকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে চারি শতাধিক প্রতিনিধি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইংরাজ শাসন সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতবাসীর মত ব্যক্ত করিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, "We live not under a national Government but under a foreign beauracracy, our foreign rulers are foreigners by birth, religion, language and habits—by everything that divides humanity into different sections. They cannot possibly dive into our hearts. They cannot ascertain our wants, our feelings and our aspirations."

১৮৮৭ সালে বদরুদ্দীন তায়েবজীর সভাপতিত্বে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। তৃতীয় অধিবেশনে ছয় শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এইরূপে কংগ্রেস ক্রমশঃ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকে।

কংগ্রেসের প্রথম যুগকে আবেদন-নিবেদনের যুগ বলা চলিতে পারে। প্রথম কয়েক বৎসর ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শাসক সম্প্রদায়ের গোচরে আনাই ছিল কংগ্রেসের প্রধান কার্য্য। নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করিয়া ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার লক্ষ্য লইয়াই সে যুগের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিতেন। প্রথম দুই-এক বৎসর কংগ্রেস ভারতের বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়ের সুনজরে ছিল। খুব শীঘ্রই বিদেশী শাসকগণ কংগ্রেসকে সন্দেহ ও ভয়ের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ভারতের বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য বলিয়া বর্ণনা করেন এবং কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও শাসন-কার্য্যে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ, ইহাই ছিল কংগ্রেসের প্রথম যুগের প্রধান দাবী। এই দাবী পূরণের জন্য কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ভারতে জনমত গঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং বিলাতেও আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল বিলাতে গমন করেন এবং ভারতের দাবী সম্পর্কে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করিবার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের কয়েকটি দাবী আংশিক ভাবে গৃহীতও হয়। কংগ্রেস ক্রমশঃ শক্তি অর্জন করিতে থাকে। কংগ্রেসের আদর্শ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রচার হইতে থাকে। ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন বড়লাট হইয়া ভারতে আগমন করেন। তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কার্য্যের ফলে ভারতের সর্বত্র বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। তিনি কংগ্রেসের উপর খুব বিরূপ ছিলেন। ১৯০০ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখে তিনি ভারত-সচিবকে এক পত্রে লেখেন, "আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, শীঘ্রই কংগ্রেসের পতন ঘটিবে। ভারতে অবস্থিতি কালে কংগ্রেসের বিলোপ সাধন করা আমার অন্যতম প্রধান অভিপ্রায়।" লর্ড কার্জনের স্বৈরতান্ত্রিক কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিয়া কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ লর্ড কার্জনের স্বৈরতান্ত্রিক কার্য্যাবলীর সক্রিয় প্রতিবাদ করার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ১৯০১ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। ১৯০২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল আমেদাবাদ সহরে। সভাপতি হিসাবে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "স্বাধীনতার জয়-পতাকা এক দিনেই উত্তোলন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। এ জন্য দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত সাধনার প্রয়োজন।"

১৯০৫ সালের শেষ দিকে লর্ড কার্জন কার্য্যে ইস্তফা দিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। যাইবার পূর্বে তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া যান। বাঙলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার ফলে বাঙলা দেশে যে বিরাট আন্দোলন হয়, তাহাই 'বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন' নামে প্রখ্যাত। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ হইয়া যায়।

সমগ্র দেশে এক নূতন জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। দেশের স্বাধীনতার জন্য অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদের জন্য দেশের জনসাধারণ সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে। বিপ্লবমুখীন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে কংগ্রেস ক্রমশঃ বৈপ্লবিক গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। [ক্রমশঃ।

হিরণ্ময়ী

শ্রীশান্তি পাল

ধরণীর পুরী প্রান্তে উষা দেখা দিল
আনত-যৌবনা এক লাবণ্য-লতিকা,
মহুয়া-মদির গন্ধে অলি চঞ্চলিল
ত্রিকূটের তুঙ্গ শিরে জ্বলে বহ্নি-শিখা।
একচক্র রথ ছুটে কনক-লাঞ্ছিত,
নিশীথের ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে কুটি-কুটি,—
সুপ্তোত্থিতা একা তন্বী ধরণী-বাঞ্ছিত,
ঢল ঢল ছল ছল চারুনেত্র দু'টি।

পাহাড়ের শীর্ণ পথ ধীরে অনুসরি
উঠিতেছি পায় পায় অভ্রভেদি শিরে,
শাল-পলাশের বনে পথ ভুল করি'
জুড়াই প্রাণের জ্বালা ময়ূরাক্ষী-নীরে।
প্রেমের রহস্য-কথা কহি কানে কানে,—
গুঞ্জরিত মধুকরে ;—মত্ত মধুপানে ;—
অরণ্যের মর্ম্ম ভেদি গিরি-তট ধরি'
ওই বুঝি আসে মোর ধ্যানের ঈশ্বরী।

এসো এসো কাছে এসো, ব'স শিলা 'পরে
ব'লে যাও অকুণ্ঠিতা সেদিনের কথা,—
প্রিয়ারূপে জন্মান্তরে ছিলে কা'র ঘরে ?
পুলক-বেদনা ল'য়ে,—অয়ি স্বর্ণলতা!
কোথায় লুকায়ে ছিলে কেমনে কি বেশে,
কোন্ মায়া-পুরী মাঝে বিস্মৃতির দেশে ?
একান্তে শুনায়ে যাও আলোকের রাণী
চির মিলনের গান যৌবনের বাণী!

এ কি তব চতুরালি,—এ কি তব প্রেম,
এ কি তব ভালবাসা,—এ কি অভিমান!
সুপ্তিলীন চিত্ত তীরে নিকষিত হেম,—
প্রকাশিয়া চারুকান্তি এ কি রে প্রয়াণ!
অরুণ-বরণা অয়ি আলোক-বসনা
রূপের নিছনি দিয়া এ কি জাল বোনা!
উদ্ভাসিয়া পূর্ব্বাশায় নভঃ-প্রান্তসীমা
কোথা যাও ফেলি মোরে স্বপন-প্রতিমা ?

ওগো মোর জীবনের লীলা-সহচরী
বিরহের সুধা-পাত্র এক হস্তে ধরি'—
আর হস্তে লিখে যাও পাষাণের গায়ে
আজিকার দিনে যত ব্যথা বাজে পায়ে!
সন্ধানী পথিক দল যদি আসে কেহ
অর্থ তা'রা করি লবে যা আছে দুর্জ্ঞেয় ;
যৌবন-পীড়িত বক্ষে অনাগত দিনে
দিগন্তের প্রান্ত শেষে পথ লবে চিনে!

* * *

ভাস্করের দীপ্ত জ্যোতি হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
উঠিয়াছে ইন্দ্রধনু অর্দ্ধচক্রাকারে—
রেণু রেণু স্বর্ণবৃষ্টি নীলারণ্য পারে,
গৈরিকের রসে ভেজা নভ উদাসীন!
যাদুকর মন্ত্র জপে বসি' একাসনে,—
আধ-নিমীলিত আঁখি ; বিরহ-ব্যথিত ;
বিহ্বল কেশের গন্ধ উড়িছে বিজনে,—
গন্ধ তা'র ভেসে আসে চির অভীপ্সিত!

নির্ব্বিকার সর্ব্ব অঙ্গ :প্রেম-রস-সার,—
ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে মূর্তিখানি কা'র ?
হেরিতেছি ডাহুয়ার শালতরু ছায়ে,—
হেলাইয়া গ্রীবাখানি অলক্তক পায়ে,
অসংশয়ে আসে বালা বন-পথ ধরি'—
দাবদগ্ধ দিন শেষে উড়ায়ে উত্তরী ;
শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াঘন নির্ঝরিণী কূলে,
মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকি ত্রিভুবন ভুলে!

ঝিল্লীমন্ত্র-মুখরিত ধূসর প্রান্তরে,
রাখাল ফিরিছে একা গোচারণ হ'তে ;—
কচিৎ একটি পাখী দূরে বনান্তরে,
নীড়ের লাগিয়া নামে ভাসি' বায়ু-স্রোতে।
ধ্যান-মৌন গিরি-তটে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
নিবিড় নির্জ্জন এক বকুলেরি তলে,
একা আমি ব'সে আছি ; হেরি তন্দ্রাপ্রায়,—
অসীমের পদপ্রান্তে স্মৃতি-চিতা জ্বলে!

ত্রিলোক মন্থন করি' পাইনু যে মণি
কৌস্তভ রতন এক,—লাবণ্যের খনি!
চঞ্চল উল্লাস ভরে বেই গলে পরি
কাটে মোর মর্ম্মতল অহি-রূপ ধরি'!
অমৃতের মধুভাণ্ড পূর্ণ বিষে ভরা
মত্ত অলি সম ধাই,—ধূলিময়ী ধরা
সকৌতুকে চেয়ে থাকে, আঁখি অচপল,
তিমিরের খেয়া চলে, বুকে নামে ঢল!

কত দিন, কত সন্ধ্যা, কত শ্রান্ত নিশা
কেটে গেছে নাহি জানি ; নাহি পাই দিশা,
ঘুরিতেছি ক্লান্তিহীন, দেশ-দেশান্তরে,—
রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝা-বাত্যা ল'য়ে শির 'পরে,
উন্মত্ত পথিক এক ;—ডাহুয়া চূড়ায়
আবার আসিনু ফিরে গোধূলি বেলায় ;
অপরাহ্ণ বেলা শেষে কে ডাকিল মোরে—
"আয় আয় এইখানে সর্ব্বহারা ওরে"!

ওগো মোর জীবনের মানস-প্রতিমা,
রহস্যের অধিনেত্রী রুদ্র বহ্নি-শিখা,—
সুদূর গগনচারী আশা-নীহারিকা
তোমার অস্তিত্ব খুঁজি ;—হারায়েছি সীমা!
সায়াহ্নের হৈমীশস্য বুলাইয়া শিরে
কোন্ পুরূরবা সাথে যাও একা ফিরে ?
বিদায়-পাণ্ডুর বুকে রেখে গেলে খেদ
সহিতে পারি না সখি পরম বিচ্ছেদ!

আর একবার এসো ভুবন ভুলায়ে,
পারিজাত মাল্য গলে দুকূল দুলায়ে ;
তন্বী শ্যাম ছটা তব দিগন্তের শেষে
গোধূলির রঙ্ লাগি কেমনে সে মেশে,
দেখিতে বাসনা মোর ; সব যাই ভুলে,—
কি বিচিত্র বর্ণ-আভা! আঁখি ঘুমে ঢুলে—
সান্ধ্য-বায়ু-জর্জ্জরিত—পল্লবদল ভরা ;
যোগনিদ্রালীন হও তুমি নিরুপমা!

“মাসিক বসুমতীর” এক জন সুশিক্ষিত পাঠক, এই সমালোচনা লিখিয়াছেন। তিনি বাঙলা দেশের এক জন সুপরিচিত সুলেখক। কিন্তু আমাদের এক জন প্রবীণ পাঠক হিসাবে যেহেতু তিনি এই সমালোচনা লিখিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার পরিচয় গোপন রাখাই সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। পাঠক হিসাবেই তাঁহার পরিচয় থাকুক, ইহাই লেখকের ইচ্ছা, আমাদেরও।

বাঙালীর বসুমতী

সুবোধ পাঠক

“মাসিক বসুমতীর” রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে। সাতাশ বছর তার বয়স হ'ল। এই সাতাশ বছর ধ'রে “মাসিক বসুমতী” যাঁরা নিয়মিত পড়ছেন, যাঁরা এই দীর্ঘ সাতাশটা বছরের তিন শত মাস ডাক-পিয়নের প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমিও এক জন। এর মধ্যে দেশের উপর দিয়ে কত ঝড় ব'য়ে গেছে, দেশের লোকের জীবনধারার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে তা ভাবা যায় না। বসুমতীরও যে পরিবর্ত্তন হয়নি তা নয়। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে “মাসিক বসুমতী” দৃঢ়পদে স্থিরচিত্তে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে। এই লক্ষ্য তার কি, এবং এই লক্ষ্যের দিকে কতখানি সে এগিয়ে গেছে তার একটা হিসাব-নিকাশ করার প্রয়োজন আছে আজ।

হাসপাতাল

সাহিত্যের সমৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানের বিস্তার যার চলার পথের অন্যতম লক্ষ্য, তার সেই লক্ষ্য কতখানি চরিতার্থ হ'ল-না-হ'ল তার আবার হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন কি? জমার অঙ্কে কত নামল আর খরচ হয়ে গেল কত তার খতিয়ান সাহিত্য-পত্রিকার করতেই হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। না করাটাই প্রচলিত প্রথা এবং পাঠক-মহল থেকে কোন দিন তা দাবী করাও হয় না। কিন্তু বসুমতীর ক্ষেত্রে এই প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক। হিসাব-নিকাশটাও পাঠকমহল থেকে হওয়া উচিত, কারণ, তা না হ'লে তাতে গলদ থাকার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। বাঙলা দেশের সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে বসুমতীর দান এবং সেই দানের মূল্য নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা পাঠক-গোষ্ঠীর তরফ থেকেই তাই হওয়া উচিত।

কেন হওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ নেই। উচিত এই জন্য যে, “মাসিক বসুমতী” কেবল সাহিত্য-পত্রিকা নয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে তার প্রয়োজন এত বেশী থাকত না। “বসুমতী” আজ একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং বাঙলা দেশের মধ্যে বসুমতীকে নিঃসন্দেহে অন্যতম শিক্ষা ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। শত্রু-মিত্র কেউ এ কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুখপত্র হিসাবেই “মাসিক বসুমতীর” পরিচয়। তারই বার্ত্তা চারি দিকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে “মাসিক বসুমতী” সুনাম ও লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। লোকপ্রিয়তা যদি স্থায়ী হয় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে তাকে স্বল্পবুদ্ধি বিকৃতরুচি জনতার সমাদর বলা যায় না। অনেকে এই কথা ব'লে “বসুমতীর” আলোচনা সুরু এবং শেষ করেন। তাঁদের জানা উচিত, সাহিত্যের সস্তা আসর জমিয়ে অথবা চালাকির দ্বারা সাহিত্যের ঠিকাদারী ক'রে “বসুমতীর” লোকপ্রিয়তা কিছুতেই অর্জ্জন করা যায় না। “মাসিক বসুমতী” আমার কাছে প্রিয়, আমার মতন হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকার কাছে হয়ত আরও বেশী প্রিয়। তার কারণ নিশ্চয়ই আমাদের রুচিবিকার বা মনোবিকার

কলেজ

মাদ্রাসা

মহারাণী

নয়। দেশের সাধারণ পাঠক-মহলের যে রুচির বালাই নেই এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যে তারা উপাদেয় ভোজ্যের মতন মনে করে, এ কথা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। স্বীকার করি, প্রাকৃত জনের শিল্পকলার মধ্যে আধুনিক প্রকাশভঙ্গিমার কোন বাহাদুরি বিশেষ নেই, কিন্তু তাই ব'লে লোকশিল্পকে যেমন অপাংক্তেয় ও অস্পৃশ্য বলা ভুল, তেমনি "মাসিক বসুমতীর" লোকপ্রিয়তাকে জনতার রুচিহীনতার পরিচয় বলাও ভুল।

বাংলা মাসিক পত্রিকার ঐতিহ্য

কোথায় এবং কত দূর পর্য্যন্ত "মাসিক বসুমতীর" লোকপ্রিয়তার মূল কারণ রয়েছে তা অনুসন্ধান করতে হ'লে বাংলা মাসিক পত্রিকার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। বাংলা মাসিক পত্রিকার শতাব্দীব্যাপী ঐতিহ্য সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে "মাসিক বসুমতীর" প্রসারের ইতিবৃত্ত আজগুবি রূপকথা ব'লে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

বাংলা মাসিক পত্রিকার একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, যা বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের মাসিক পত্রিকার নেই। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই বাংলা মাসিক পত্রিকার জন্ম। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শিক্ষা সংস্কৃতির সংস্পর্শে যখন বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দী থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নব জাগরণের সূত্রপাত হয়, তখনই "মাসিক পত্রিকা" ভূমিষ্ঠ হয়। বাংলা গদ্যভাষা, বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জন্ম হয় এই সময় একই সঙ্গে। তার পর বাংলা গদ্যভাষা হামাগুড়ি দিয়েছে, হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ক'রে চলতে শিখেছে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, নবযুগের পুনরুজ্জীবিত ও রূপান্তরিত শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন ও মাধ্যম হয়েছে। এই বাংলা গদ্যভাষাকে লালন-পালন করেছে বাংলা সাময়িক পত্র। দৈনিক সংবাদপত্র যখন ছাপাখানার অসুবিধার জন্য প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব ছিল বলা চলে, তখন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাই যে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রধানতঃ বাংলা মাসিক পত্রিকার কোলেই বাংলা সাহিত্য আশৈশব লালিত হয়েছে দেখা যায়। বাংলা উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে বাংলা উপন্যাস, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য, আধুনিক বাংলা কবিতা, সব কিছুরই জন্ম হয়েছে বাংলা সাময়িক পত্রিকার গর্ভে, এবং তার মধ্যে বাংলা মাসিক পত্রিকার ভূমিকা অন্যতম। বাংলা মাসিকের আদি যুগের এই আদর্শ-গৌরব, এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুষ্টির উত্তরাধিকার আধুনিক যুগে ক'খানা মাসিক পত্রিকা বহন করছে জানি না, তবে তাদের সংখ্যা যে অত্যন্ত অল্প তা আজ বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। আধুনিক মাসিক পত্রিকার বাইরের প্রসাধনটাই বোধ হয় অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিষয়-ঐশ্বর্য্য, আদর্শ-গৌরব ও উদারতা সে যুগের মাসিক পত্রের মতন এ যুগের মুদ্রণ-প্রসাধন-পটু কোন মাসিকের আছে কি না সন্দেহ। মুষ্টিমেয় যে কয়েকখানা মাসিক পত্র আজও সেই ঐতিহ্য বহন ক'রে এগিয়ে চলেছে তাদের মধ্যে "মাসিক বসুমতী" আজ পর্য্যন্ত অন্যতম বললে বেশী বলা হয় না।

জমিদার

ছোটরাণী

"দিগদর্শন" থেকে "বঙ্গদর্শন"

বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র "দিগদর্শন"। "দিগদর্শন" মাসিক পত্রিকা। "দিগদর্শন" ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। "দিগদর্শন" থেকে "বঙ্গদর্শন" পর্য্যন্ত বাংলা মাসিক পত্রিকার নামের তালিকাটি দেখলেই তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কারণ পত্রিকার আদর্শ, বিষয় বস্তু ও

পণ্ডিত মহাশয়

ভাবধারা পত্রিকার নামের মধ্যেই সে যুগে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠত। তালিকার মধ্যে হয়ত দু'-একটি মাসিক পত্রিকার নাম বাদ যেতে পারে, কিন্তু মোটামুটি এই তালিকাই সম্পূর্ণ বলা যেতে পারে :

১৮১৮ : দিগ্দর্শন
১৮১৯ : গস্পেল ম্যাগাজীন
১৮২২ : পশ্বাবলী
১৮২২ : খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি
১৮৩১ : জ্ঞানোদয়

পাঠশালা

১৮৩২ : বিজ্ঞানসেবধি
১৮৩২ : জ্ঞানসিন্ধুতরঙ্গ
১৮৩৫ : সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়
১৮৪০ : আয়ুর্ব্বেদ-দর্পণঃ
১৮৪২ : বেঙ্গাল স্পেক্টেটর
১৮৪২ : বিদ্যাদর্শন
১৮৪৩ : মঙ্গলোপাখ্যান
১৮৪৩ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
১৮৪৬ : সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা
১৮৪৬ : জগদ্বন্ধু
১৮৪৭ : উপদেশক
১৮৪৭ : দুর্জ্জন দমন মহানবমী
১৮৪৭ : হিন্দুধর্ম্মচন্দ্রোদয়
১৮৪৭ : হিন্দুবন্ধু
১৮৪৮ : জ্ঞানচন্দ্রোদয়
১৮৪৯ : সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা
১৮৪৯ : কৌস্তুভ কিরণ
১৮৫০ : দূরবীক্ষণিকা
১৮৫০ : ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা
১৮৫০ : সত্যার্ণব
১৮৫০ : সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা
১৮৫১ : মেদিনীপুর ও হিজলী অঞ্চলের অধ্যক্ষ
১৮৫১ : বিবিধার্থ-সংগ্রহ
১৮৫২ : জ্ঞানারুণোদয়
১৮৫৩ : ধর্ম্মরাজ
১৮৫৩ : বিদ্যাদর্পণ
১৮৫৩ : সুলভ পত্রিকা
১৮৫৩ : ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা
১৮৫৩ : চিকিৎসা-রত্নাকর
১৮৫৪ : রসার্ণব
১৮৫৪ : মাসিক পত্রিকা
১৮৫৪ : প্রকৃত মুদগর
১৮৫৫ : সিদ্ধান্তদর্পণ

১৮৫৫ : বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা
১৮৫৫ : সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্র
১৮৫৬ : মর্ম্ম ধুরন্ধর ; সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা ; সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিকা।
১৮৫৭ : বিজ্ঞানমিহিরোদয় ; সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা ; লোকলোচন চন্দ্রিকা।
১৮৫৮ : রচনা-রত্নাবলি ; হিতৈষিণী পত্রিকা ; কলিকাতা পত্রিকা।
১৮৫৯ : হিতবিলাসিনী পত্রিকা ভারতবর্ষীয় সভা।
১৮৬০ : সত্যপ্রদীপ ; জ্ঞান-চন্দ্রিকা ; কবিতাকুসুমাবলী ; মনোরঞ্জিকা ; নব্য ব্যবহার সংহিতা ; রাজপুর পত্রিকা ; বিজ্ঞান-কৌমুদী ; ত্রিপুরা জ্ঞান-প্রসারিণী ; সংস্কার সংশোধনী।

টোল

১৮৬১ : শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা ; গদ্যপ্রসূন ; গদ্য মাসিক।
১৮৬২ : শুভকরী পত্রিকা ; চিত্তরঞ্জিকা ; অমাবস্যা ; অবকাশরঞ্জিকা।
১৮৬৩ : রহস্য-সন্দর্ভ ; গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা ; অবোধবন্ধু ; সাহিত্য সংক্রান্তি ; বামাবোধিনী পত্রিকা ; উদ্যোগবিধায়িনী।
১৮৬৪ : রচনাবলী ; কাব্যপ্রকাশ ; পাবনাদর্পণ ; শিক্ষাদর্পণ ; ধর্ম্ম-প্রচারিণী ; ধর্ম্মতত্ত্ব ; পরিদর্শন
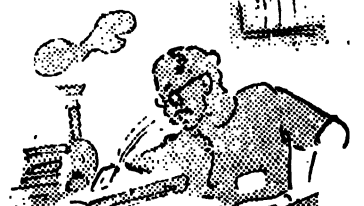
নায়েব মহাশয়

কুলবধূ

১৮৬৫ : সত্যান্বেষণ ; বিদ্যোন্নতিসাধিনী ;
হিন্দুরঞ্জিকা।
১৮৬৭ : তত্ত্বপ্রকাশিনী
পল্লীবিজ্ঞান
প্রত্নকম্রনন্দিনী
অবকাশবন্ধু
নব পত্রিকা
১৮৭২ : বঙ্গদর্শন

হোষ্টেলে

পত্রিকার নামের বাহার থেকেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাসিক পত্রিকা বলতে আজকাল আমরা সাধারণত যা বুঝে থাকি, সে যুগে তা বোঝাত না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অধিকাংশ সাময়িক পত্রের মতন মাসিক পত্রিকাও সংবাদ পরিবেশনের কাজ করত। ছাপাখানার শৈশব কালে এইটাই স্বাভাবিক, ইয়োরোপের ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। আমাদের দেশে মোগল বাদশাহদের আমলে প্রত্যেক প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর থাকত। এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ ক'রে কখনও মাসে একবার, কখনও বা প্রতি সপ্তাহে তাঁদের লিখে পাঠাত। গোপনীয় রাজকীয় সংবাদ না থাকলে এই সব চিঠি রাজ-দরবারে প্রকাশ্যে পড়া হ'ত, সেখান থেকে লোকের মুখে-মুখে সমাজের নানা স্তরের লোকের মধ্যে সেই সংবাদ প্রচারিত হ'ত। প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও নিজ-নিজ সংবাদলেখক "ওয়াকেয়া-নবিশ" রাখতেন। এই সব সংবাদলিপির নাম ছিল "আখ্বার"। এই ছিল সংবাদ পরিবেশনের অবস্থা। সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র রাজসভায় বন্দী হয়ে ছিল, পুঁথির পাণ্ডুলিপি সমাজের সর্ব্বসাধারণের কাছে পৌঁছত না।

সম্পাদক

ইংরেজ-আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঙলা দেশে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হ'ল। জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ শুরু হ'ল, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশ তারই একটা দিক। সংবাদপত্রের চেয়ে সাময়িক পত্রের সংখ্যা খুব বেশী। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিপুষ্টিসাধন থেকে সংবাদ বিতরণ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় এই সব সাময়িক পত্রে স্থান পেত। বাঙলার প্রথম মাসিক "দিগ্দর্শন" পত্রিকার প্রথম ভাগের বিষয়-সূচী থেকে এ সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে :

'দিগদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচী

আমেরিকার দর্শন বিষয়।
হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ।
হিন্দুস্থানের বাণিজ্য।
বলুনদ্বারা সাদলর সাহেবের আকাশগমন।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবরণ।
শঙ্কর তরঙ্গের কথা।

ব্যারিষ্টার

১৮১৮ সনের প্রথম বাঙলা সাময়িক পত্রিকার আলোচ্য বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্য্য ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে আজকের সাময়িক পত্রিকারও তুলনা হয় না। এই গাম্ভীর্য্য ও বৈচিত্র্য যে সমস্ত সাময়িক পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল তা নিশ্চয়ই নয়। ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে প'ত্রিকাই বেশী, অন্যান্য পত্রিকার বিষয়ের সঙ্কীর্ণতাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'দিগ্দর্শন', 'বেঙ্গল স্পেকটেটার "বিদ্যাদর্শন", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' 'রহস্য-সন্দর্ভ' ও 'বঙ্গদর্শনের' মতন মাসিক পত্রিকা

চা-বাগান

সিষ্টার

বাঙলা ভাষায় আজকালও বিশেষ নেই। এই সব পত্রিকায় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি সমস্ত বিষয় নিয়মিত আলোচিত হ'ত এবং বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নব জাগরণের দীক্ষা-গুরুরা, উদ্‌যোগী নেতারা আলোচনায় যোগ দিতেন। পত্রিকাগুলির স্পষ্টবাদিতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে আজকালকার পত্রিকার চরিত্রহীনতার তুলনা করলে যে কেউ লজ্জিত হবেন। তাছাড়া সেকালে মাসিক পত্রিকার আর এক ধরণের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। পশুপক্ষী, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্য বাঙলা ভাষায় 'পশ্বাবলী', 'বিজ্ঞানসেবধি', 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়,' 'বিজ্ঞান-কৌমুদী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় পত্রিকার অস্তিত্ব নেই বললেও বিশেষ ভুল বলা হয় না।

পাদ্রী

"বঙ্গদর্শন" থেকে "মাসিক বসুমতী"

দিগদর্শন, বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এক-একটি সাংস্কৃতিক পর্বান্তরের প্রতীক বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার প্রকাশের মধ্যে এই যুগের ভাবধারার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল বলা চলে। বঙ্গদর্শনের পরে 'প্রচার', 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' একটা বিশেষ ধারার প্রবর্ত্তন করেছিল, কিন্তু 'বঙ্গদর্শনের' প্রভাবের মতন এর কোনটাই ব্যাপক ও স্থায়ী হতে পারেনি। এমন কি তার পরেও ভারতী, প্রবাসী, মানসী, ভারতবর্ষ, সাহিত্য, নব্য ভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাও আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনের মতন একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি, যদিও বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই সব পত্রিকার অবদান সামান্য নয়। "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার পত্র-সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যে আদর্শের ও সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন তা একনিষ্ঠ ভাবে সার্থক ক'রে তুলতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাঁর সেই আদর্শ এত উদার, মহৎ এবং প্রগতিশীল যে আজও যে কোন মাসিক পত্রিকা তার আধুনিকতা বজায় রেখেও তারই পুনরাবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু আদর্শ ও সঙ্কল্প ঘোষণা করা এক জিনিস, এবং সেই আদর্শ সার্থক ক'রে তোলার নিষ্ঠা ও উদ্যম স্বতন্ত্র জিনিস। গত পঁচিশ বছরের "মাসিক বসুমতীর" বিষয়-সূচী ও লেখক-গোষ্ঠীর পর্য্যালোচনা করলে এ কথা আজ নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও "বঙ্গদর্শনের" উত্তরাধিকার "মাসিক বসুমতীই" অবিচলিত-চিত্তে বহন করার চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা সার্থকও হয়েছে। ১২৭৯ সনের বৈশাখে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার পত্র-সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

লেঃ কর্ণেল

"আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।...আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা পাঠোপযোগী হইলে আদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবে না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না।

রায় বাহাদুর

সাহিত্যিক

যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না...। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণ শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।"

"বঙ্গদর্শন" পত্রিকার সঙ্কল্প-বাক্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী রচনার প্রকাশ করাই পত্রিকার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, বাঙলার কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ আজকাল আমরা যাঁদের বুদ্ধিজীবী বলি তাঁদের, মুখপত্র হয়ে, তাঁদেরই বার্ত্তা বহন ক'রে, তাঁদের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে, "বঙ্গদর্শন" বাঙলা দেশে জ্ঞানের প্রচার করবে। কোন বিশেষ গোষ্ঠীর বা দলের পক্ষপাতিত্ব "বঙ্গদর্শন" করবে না এবং কোন সম্প্রদায়বিশেষের মুখপত্রও হবে না—এ কথা তখনকার দিনে বলা এবং কাজে পরিণত করা যে কতখানি মানসিক বলিষ্ঠতা ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া তা আজ আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। এ যুগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার কথা বাদ দিলেও, কোন মাসিক পত্রিকাকেই নিজস্ব দল বা গোষ্ঠীর গণ্ডী-বহির্ভূত বলা যায় না, এবং কারও উদারতা বা বলিষ্ঠতা ব'লে কিছুই নেই। এই দিক দিয়ে "মাসিক বসুমতী" নিঃসন্দেহে "বঙ্গদর্শনের" আদর্শের উত্তরাধিকারী ব'লে আজও নিজের পরিচয় দিতে পারে। বাইরের সমাজের সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ যে "মাসিক বসুমতীকে" কলুষিত করেনি তা নয়। পঁচিশ বছরের পাঠক হিসাবে সে কথা অস্বীকার করলে আমার দিক থেকে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই "মাসিক বসুমতীর" পৃষ্ঠায় তো দেখেছি, প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর বাঙলা-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রবন্ধসমষ্টি এবং বাঙলার অদ্বিতীয় মুসলমান কবি নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হয়েছে!

বিশপ

অন্যান্য কৃতবিদ্য মুসলমান লেখকদের রচনাও 'মাসিক বসুমতীর' পৃষ্ঠায় হিন্দুধর্মশাস্ত্র আলোচনার পাশে স্থান পেয়েছে। এই উদারতা যে-পত্রিকার বরাবর ছিল তাকে সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট বলা যায় কি? হিন্দুই হ'ন আর মুসলমানই হ'ন, সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী সুলিখিত রচনা প্রকাশ করতে "মাসিক বসুমতী" কোন দিন কুণ্ঠিত হয়নি, আজও হয় না। কিন্তু তার চেয়েও "মাসিক বসুমতীর" বড় পরিচয় হ'ল তার গোষ্ঠী ও দলনিরপেক্ষতা। এই দলাদলিমুক্ত গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতাই বোধ হয় "মাসিক বসুমতীর" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। রক্ষণশীল বা প্রগতিশীল যাই হোক, বাঙলা দেশে আজ এমন একখানিও মাসিক পত্রিকা আছে কি না সন্দেহ, দলাদলির উর্দ্ধে রচনার উৎকৃষ্টতা যাচাই ক'রে তাকে প্রকাশ ও প্রচার করা যার উদ্দেশ্য। "মাসিক বসুমতী" সে-বৈশিষ্ট্য গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত বজায় রেখেছে। তাই প্রাচীন লেখকদের পাশাপাশি নবীন লেখকদের এমন অদ্ভুত সমাবেশ আর অন্য কোন পত্রিকায় আজও দেখা যায় না। প্রাচীন রক্ষণশীল ভাবধারা ও শাস্ত্রালোচনার পাশে এমন বৈপ্লবিক ভাবধারা ও মতবাদের প্রচার আর অন্য কোন পত্রিকাকে করতে দেখা যায় না। এই উদারতাই সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য। "মাসিক

কারখানার ফোরম্যান

বেগম সাহেবা

"বসুমতীর" প্রত্যেকটি সংখ্যা যেমন আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির পুরাতন আদর্শ ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি নতুন ভাবধারা প্রকাশ ক'রে, নতুন ভাবসম্পদ পরিবেশন ক'রে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণধর্ম্ম প্রগতিশীলতাকেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না। এই দিক দিয়ে "মাসিক বসুমতী" বাঙলা সাময়িক পত্রের গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ব'লে নিশ্চয়ই দাবী করতে পারে।

"বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র পত্র-সূচনাতে এ কথাও বলেছেন যে পত্রিকা "সর্ব্বজনপাঠ্য" হবে। সর্ব্বসাধারণের উন্নতি যাতে হয় না, তার দ্বারা কারও উন্নতিই হয় না। পরবর্ত্তী কালের মাসিক পত্রিকার মধ্যে "মাসিক বসুমতীর" মতন আর কোন পত্রিকা এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়নি। বাঙলার চিরদিনের উপেক্ষিতা নারীসমাজ, বাঙলার স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের পাঠোপযোগী বিচিত্র রচনাসম্ভার নিয়ে "মাসিক বসুমতী" প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যাদের "আপামর সাধারণ" বলেছেন তাদের কাছে তাই সব চেয়ে প্রিয় হয়েছে "মাসিক বসুমতী"। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছে বসুমতীর তাই এত আদর এবং বাঙলার গৃহকোণে নির্ব্বাসিতা মা-বোনেদের কাছে "মাসিক বসুমতী" রামায়ণ-মহাভারতের মতন অপরিহার্য্য সঙ্গী।

তাই ব'লে যে "মাসিক বসুমতী" সস্তা সাহিত্য পরিবেশন ক'রে দেশের লোকের সাংস্কৃতিক রুচি-বিকৃতির সহায়তা করছে তা নয়। "মাসিক বসুমতী" সম্বন্ধে এই অভিযোগ অনেক রুচিবাগীশকেই করতে শুনেছি। কিন্তু এই অভিযোগ যদি মেনে নিতে হয় তাহ'লে কোন মাসিক পত্রিকা, এমন কি ব্রাহ্মগন্ধী রুচিনীতিশুচিবায়ুগ্রস্ত পত্রিকাও এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দাবী করতে পারে না। "মাসিক বসুমতীর" গোয়েন্দার কাহিনী বা চমকপ্রদ প্রেমের গল্প উপন্যাস যে অনিষ্ট করতে পারেনি তার চেয়ে অনেক বেশী অনিষ্ট করেছে রুচিবাগীশ পত্রিকার ছদ্মবেশী আধুনিকতা। কিন্তু সে তর্কের এখানে প্রয়োজন নেই। "মাসিক বসুমতীর" প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমবর্দ্ধমান লোকপ্রিয়তা এই অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে রুচিহীনতা ও চমকপ্রদতার পরিচয় দিয়েছে "মাসিক বসুমতী" মধ্যে মধ্যে, কিন্তু একটা মূলত উদ্দেশ্যরূপে তাকে প্রশ্রয় দেয়নি কোন দিন। তা যদি দিত তাহ'লে আজ "মাসিক বসুমতী" বাঙলার রুচিবান কৃতবিদ্য সম্প্রদায় থেকে আপামর সাধারণের কাছে পর্য্যন্ত এত প্রিয় হ'ত না, এবং সমান মর্য্যাদালাভ করত না। সেই গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতা, সেই দীনতা ও চরিত্রহীনতা তার কোন দিনই ছিল না। তাই "মাসিক বসুমতীর" পৃষ্ঠায় পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ-প্রমুখ পণ্ডিতদের শাস্ত্রালোচনার পাশে এ যুগের অন্যতম ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা প্রকাশিত হয়েছে, উপনিষদের দর্শনতত্ত্বের পাশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আধুনিক রসায়নবিদ্যার বৈজ্ঞানিক আলোচনা স্থান পেয়েছে, শিল্পী হেমেন্দ্র মজুমদারের পাশে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসুও রয়েছেন। কথা-সাহিত্যেও দেখতে পাই, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দার কাহিনীর সঙ্গে আধুনিক যুগের অন্যতম কথাশিল্পী শৈলজানন্দের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল বস্তুবাদী রচনা "কয়লা-কুঠি" প্রকাশিত হয়েছে। রসরাজ অমৃতলাল, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, লোকশিল্পী মুকুন্দদাস এই "মাসিক বসুমতী"র পৃষ্ঠায় দেখা দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। কবি কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের সঙ্গে বাঙলার নব যুগের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল স্বচ্ছন্দে এসে দাঁড়িয়েছেন পাশাপাশি। এই অদ্ভুত সমাবেশ ও সমন্বয়সাধন "মাসিক বসুমতীর" পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়েছে, কারণ মাসিক বসুমতীর দলীয় অনুদারতা অথবা তথাকথিত আদর্শানুগত্যের নামে গোঁড়ামি ব'লে কোন দিন কিছু ছিল না।

আপামর সাধারণের প্রিয় পত্রিকা হ'তে গিয়ে বসুমতী কোন দিন বঙ্কিমচন্দ্রের এই মূল্যবান কথাটিও ভুলে যায়নি, "যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণ শিক্ষার মূল।" এই মূল্যবান কথার তাৎপর্য্য "মাসিক বসুমতী" যে উপলব্ধি করেছিল তাতে কোন ভুল নেই। প্রাচীন ও নবীন, গোঁড়া ও প্রগতিশীল, হালকা ও গম্ভীর সর্ব্ব শ্রেণীর কৃতবিদ্য লেখকদের

বার্ম্মা দেশ

বিচিত্র সমাবেশ থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সস্তা ও হাল্কা বিষয়, যা সহজেই সুরুচির প্রশ্রয় দিতে পারে, তা যে "মাসিক বসুমতীর" পৃষ্ঠায় পরিবেশিত হয়নি তা নয়, হয়েছে। কিন্তু "মাসিক বসুমতীর" লেখা ও লেখকদের বিচার ক'রে বলা যায়, এই সস্তা বিষয় পরিবেশন কেবল হাতছানি আর প্রলোভন মাত্র, পত্রিকার নীতি নয়। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার। যে দেশে দুর্নীতি, কুসংস্কার, কুশিক্ষা ও অন্ধ গোঁড়ামি সাধারণ মানুষের অস্থি-মজ্জায় পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে, সে দেশের মানুষের কাছে হঠাৎ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে নীতিকথা, শাস্ত্রকথা, সুসাহিত্য ও সুশিক্ষার উচ্চাদর্শ প্রচার করতে গেলে তা অরণ্যে গলা ফাটিয়ে রোদন করার সামিল হবে। তাদের নেশার খোরাক যুগিয়ে, লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে সুশিক্ষা, সুসাহিত্য ও সুচিন্তার প্রশস্ত রাজপথের উপর এনে দাঁড় করাতে হবে। তা না হলে সাহিত্যের মজলিস এ দেশের চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত, অন্দর-মহলের হেঁসেল ঘর-পর্য্যন্ত কোন দিনই জমবে না, শিক্ষার আলোকও জ্বলবে না। এ কথা "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের" প্রতিষ্ঠাতারা যেমন ভাবে বুঝেছিলেন, ঠিক তেমন আন্তরিক ভাবে আর কেউ বোঝেন নি। বাঙলা দেশে তাই "বঙ্গবাসী"র মতন আদর্শ সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানও মরে গিয়েছে, কিন্তু বেঁচে আছে "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির" আর তারই শ্রেষ্ঠ মুখপত্র "মাসিক বসুমতী"।

"মাসিক বসুমতী"র পাঠকগোষ্ঠী

এই বারে "মাসিক বসুমতীর" পাঠক-গোষ্ঠী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে প্রবন্ধ শেষ করা যাক। পাঠক-গোষ্ঠীর বিস্তারিত পরিচয় ও সামাজিক বিশ্লেষণ ভিন্ন কোন মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও লোকপ্রিয়তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে পত্রিকার পাঠক-গোষ্ঠীর সামাজিক বিশ্লেষণের রীতি নেই। ইয়োরোপে ও আমেরিকায় এই রীতি আছে ব'লে সেখানে জনমত ও জনরুচির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। যাই হোক, এখানে "মাসিক বসুমতী"র পাঠক-গোষ্ঠীর যে সামাজিক বিশ্লেষণ করা হবে তা একেবারে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সঠিক না হলেও, মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। "মাসিক বসুমতীর" গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকার যেটুকু পরিচয় আমি যোগাড় করতে পেরেছি তার সামাজিক বিশ্লেষণ করলে পাঠকগোষ্ঠীকে মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করা যায় :

(ক)

জমিদার
বধূরাণী
বড়রাণী, মেজরাণী, ছোটরাণী
বেগম সাহেবা
ষ্টেটের ম্যানেজার
নায়েব
(বড় তরফ, মধ্যম তরফ, ছোট তরফ)
কারখানার ম্যানেজার

(খ)

রায়বাহাদুর, রায়সাহেব
লেফ্‌টন্যান্ট কর্ণেল
ডাক্তার
অধ্যক্ষ, অধ্যাপক
উকিল, ব্যারিষ্টার
সরকারী অমাত্যবর্গ
সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী
(দিল্লী, সিমলা ইত্যাদি)
সরকারী কর্ম্মচারী
পণ্ডিত, শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক
সিভিলিয়ান শ্রেণী
সম্পাদক

(গ)

সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান :
সাধারণ প্রতিষ্ঠান,
কৃষি, কর্ম্মচারী ইউ-
নিয়ন, নারীসঙ্ঘ,
যুবসঙ্ঘ, দাতব্য
প্রতিষ্ঠান, প্রবাসী বাঙালী
ক্লাব, ভারতের বাইরে
বিদেশের বাঙালী ক্লাব,
বাবুদের ক্লাব ইত্যাদি।
স্কুল, কলেজ, টোল, মাদ্রাসা
হাসপাতাল
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান
সাহিত্যসঙ্ঘ

(ঘ)

কন্‌ভেণ্টের সিষ্টাররা
মিশনের পাদরিরা
বাঙালী পাদরিরা

(ঙ)

ইংলণ্ড ও আমেরিকার
বিদেশী পাঠক

এই হ'ল "মাসিক বসুমতীর" পাঠকগোষ্ঠীর মোটামুটি সামাজিক পরিচয়। ক-শ্রেণীর পাঠকগোষ্ঠী বাঙলা দেশের অবস্থাপন্ন অভিজাতশ্রেণী। বাঙলা দেশের ধনিক জমিদার, নবাব এবং সেই জমিদার-পরিবার ও নবাব-বাড়ীর বধূরাণী বেগম সাহেবা থেকে আরম্ভ ক'রে ম্যানেজার, নায়েব আমলারা পর্য্যন্ত "মাসিক বসুমতীর" পাঠক! জমিদার ও নবাবদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদের নির্জ্জন অন্তঃপুরে যেখানে বড় মেজ ছোট তরফের বউরাণীরা থাকেন এবং যেখানে সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত সহজে উঁকি-ঝুঁকি দিতে পারে না সেখানে কোন দিন কোন মাসিক পত্রিকা প্রবেশাধিকার পেয়েছে কি না তা গবেষণার বিষয়। তবে "মাসিক বসুমতী" যে সহজেই সেই সব প্রাসাদের অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যাদের অন্তর পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে পেরেছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ম্যানেজার নায়েব গোমস্তাদের গৃহিনীরা যে বধূরাণীদের পাঠাভ্যাস অনুকরণ করতে ছাড়েননি, তাও বেশ অনুমান করা যায়। বধূরাণী ও বেগম সাহেবারা বিশাল অট্টালিকার নিরালা কক্ষে ফেনশুভ্র শয্যায় বিলাসী অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে "মাসিক বসুমতী"র পাতার পর পাতা যখন চোখ বুলিয়ে যেতেন, ম্যানেজার ও নায়েব গোমস্তাদের গৃহিনীরা তখন নিশ্চয় দ্বিপ্রহরের পড়্‌শিনীদের গাল গল্পের মজলিসে নিজেদের বিদ্যার ও আধুনিকতার বড়াই করতেন "মাসিক বসুমতীর" গল্প শুনিয়ে। শুধু সেকালের জমিদার-পরিবারে নয়, একালের কারখানার মালিক ও ম্যানেজাররাও "মাসিক বসুমতীর" পাঠক ছিলেন দেখা যায়। যন্ত্রপাতি ও কল কারখানার ঘর্ঘরানির মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যস্ততা ও হিসাবনিকাশের মধ্যেও "মাসিক বসুমতী"তে মনোনিবেশ করার মতন যথেষ্ট খোরাক তাঁরাও পেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁদের "কৃতবিদ্য" বলেছেন, খ-শ্রেণীর পাঠক-গোষ্ঠী হ'লেন বাঙলার সেই সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী: এঁরা সবাই আধুনিক যুগের প্রতিনিধি এবং এদেশে আধুনিকতা ও সামাজিক নব জাগরণের অগ্রদূত। সিভিলিয়ান ও সিমলা দিল্লীর অমাত্যদের থেকে শুরু ক'রে অধ্যাপক, উকিল, ব্যারিষ্টার, সম্পাদক, ডাক্তার, কেরাণী, শিক্ষক সকলেই "মাসিক বসুমতীর" নিয়মিত পাঠক। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী" না হ'লে "মাসিক বসুমতীর" এই শ্রেণীর নিয়মিত পাঠক-গোষ্ঠী কখনই গড়ে উঠত না। গ-শ্রেণীতে যে সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, নারীসঙ্ঘ, যুবসঙ্ঘ, বাবুক্লাব, সাহিত্যসঙ্ঘ ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যবর্ত্তিতায় "মাসিক বসুমতী" অভিজাত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্তর ভেদ ক'রে সাধারণ ও নিম্নমধ্যবিত্তের স্তরে নেমে এসে লোকপ্রিয় হয়েছে বোঝা যায়। এছাড়া "মাসিক বসুমতীর" প্রতিপত্তি যে কত দূর বিস্তৃত তা বিদেশী পাঠকদের পরিচয় থেকেই জানা যায়। রাজা-বাদশাহের প্রাসাদ থেকে, সিভিলিয়ান, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তারের আধুনিক ড্রয়িং-রুমে বিহার ক'রে "মাসিক বসুমতী" সাধারণ ক্লাব ও সঙ্ঘের মারফত সর্ব্বজনপাঠ্য ও প্রিয় হয়েছে এবং দেখা গিয়েছে যে শেষ পর্য্যন্ত কনভেণ্ট ও গির্জ্জার পবিত্র নীরবতাকে মুখরিত ক'রে বিদেশে পর্য্যন্ত যাত্রা করেছে। সেখানে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বিদেশের বাঙালী-দের ক্লাবে "মাসিক বসুমতী" তো পৌঁছেছেই, এমন কি একেবারে বিদেশী বাঙলা জানা পাঠকদেরও মন জয় করতে তার বিশেষ কষ্ট হয়নি। "মাসিক বসুমতী" আজ তাই বাঙালীর বসুমতী, বাঙলার বসুমতী।

বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার পত্র-সূচনার পুনরুল্লেখ ক'রে প্রবন্ধ শেষ করি। "বঙ্গদর্শন" সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলে-ছিলেন: "বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের (কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের) বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক।" "মাসিক বসুমতী" বাঙলার কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের এই বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় যদি না দিত, তাহ'লে বাঙলার সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে এবং বাঙলার বাইরের বাঙালী অবাঙালীদের মধ্যে তার এই প্রভাব বিস্তার করা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না, হ'লেও তা এ রকম স্থায়ী হ'ত না অথবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত না। বঙ্কিমচন্দ্র আরও একটা সবচেয়ে মূল্যবান কথা বলেছিলেন, "যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে"। "মাসিক বসুমতী" এ কথার তাৎপর্য্য যদি না বুঝত এবং তাকে কাজে পরিণত না করত তাহ'লে তার লোকপ্রিয়তা সমাজের সমস্ত স্তরের মধ্যে এমন ছড়িয়ে পড়ত না। এই আদর্শ, এই উদারতা ও বলিষ্ঠতা আজ পর্য্যন্ত "মাসিক বসুমতীকে" বাঁচিয়ে রেখেছে এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতেও রাখবে। বাঙলার সংস্কৃতির ইতিহাসে "মাসিক বসুমতীর" "দান কেউই তাই সামান্য বলবেন না, এবং বাঙালীরা চিরদিন, যেখানেই থাকুন, মাসিক বসুমতীকে" বাঙালীর "বসুমতী" ব'লে মনে করবেন, ভালবাসবেন, তার উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করবেন।
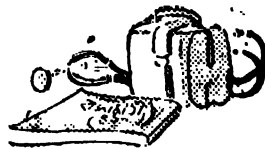
ডাক্তার

প্রচার ও

বর্ত্তমান যুগে প্রচার-পদ্ধতির বহুল প্রসার এবং উন্নতি হইয়াছে, প্রচার-কার্য্যকে বিশেষ এক প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছে, এ-কথা বলা অন্যায় হইবে না। ব্যবসায়ী মহলে হাজার বৎসর পূর্ব্বেও কোন না কোন ভাবে প্রচার-কার্য্য প্রচলিত ছিল এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। সে-কালে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিও যেমন বর্ত্তমান অপেক্ষা বহু ভাবে এবং গুণে নিম্নস্তরের ছিল, তেমনি বিজ্ঞাপন বিষয়েও তাহারা সরল এবং সহজবোধ্য পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিত। বলা বাহুল্য, জ্ঞানবুদ্ধি বলিতে আমি ব্যবসা-সংক্রান্ত জ্ঞানবুদ্ধির কথাই বলিতেছি, অন্য কোন বিষয়ে নহে। পূর্ব্বকালে ব্যবসায়ী তাহার বাণিজ্য-সম্ভার এবং পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য ব্যক্তিগত আবেদনের সহায়করূপে সামান্য পরিমাণে কিছু কিছু প্রচার বা 'বিজ্ঞাপনের' সাহায্য গ্রহণ করিত। সেই কালে বিজ্ঞাপন' অপেক্ষা—'ব্যক্তিগত আবেদনের' মূল্য অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত। নানা প্রকার চিহ্ন বা 'সাইন' দ্বারা পণ্য-প্রতিষ্ঠানে ক্রেতা টানিবার উপায় বহু শতাব্দি পূর্ব্বেও পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত ছিল। চিহ্ন বা 'সাইন' দেখিয়া ক্রেতা পণ্য-প্রতিষ্ঠানে আগমন করিলে পর ব্যবসায়ী বা তাহার নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্রব্য বা পণ্য-বিশেষের গুণাবলী মুখে বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা করিত। বিশেষ চিহ্ন বা সাইন পণ্য-প্রতিষ্ঠানে কেবল মাত্র ক্রেতাকে আকর্ষণ করিবার উপায়রূপেই ব্যবহৃত হইত। কাজেই ব্যক্তিগত আবেদনের মূল্যই বেশী ছিল ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে 'সেল্সম্যানসিপ' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পূর্ব্বকালে ব্যবসায়ী মহলে তাহার প্রচলন যে সামান্য পরিমাণে ছিল, তাহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পদ্ধতি এবং প্রয়োগ অবশ্যই ভিন্নপ্রকার ছিল।

পূর্ব্বকালে প্রায় সকল দেশেই যে-প্রকার হাট-বাজার বসিত, তাহাকে বর্ত্তমানের 'মার্কেট' বা রাজপথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দোকান বা পণ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কোনক্রমেই তুলনা করা যাইতে পারে না। হাট এখনও পৃথিবীর নানা দেশে, বিশেষ করিয়া প্রাচ্যদেশগুলিতে বসে এবং এই সকল হাটের ধারা এবং বিক্রয় পদ্ধতিও প্রায় সেই পূর্ব্বকালের হাটের মতই রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে বিশেষ বিশেষ হাটে বা মেলাতে লোকে এবং ব্যবসায়ীরা বিশেষ বিশেষ পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় করিতে যাইত। এই সকল হাট বা মেলার 'বিজ্ঞাপন' লোকের মুখে-মুখেই দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হইত। এই প্রচারের জন্য বিশেষ করিয়া প্রচারক নিয়োগের প্রয়োজন ঘটিত না। ব্যবসায়ীদের ইহার জন্য কোন প্রকার খরচও করিতে হইত না। কোন্ সময় কোথাকার কোন্ মেলা বা হাটে কোন্ পণ্য বিশেষ ভাবে পাওয়া যাইবে—তাহাও মুখে মুখে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সে সকল বিখ্যাত হাট বা বাৎসরিক মেলা বসে, তাহার প্রচার-কার্য্য ঐ সকল হাটের ব্যবসায়ীরা করে না—করে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি কোম্পানী। খানিকটা সরকারী ভাবেও করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, রেল বা ষ্টীমার কোম্পানী নিছক প্রেমের জন্য এই প্রচার চালান না। মেলা বা হাটে লোক-সমাগম যত বেশী হইবে, তাহাদের লাভের অঙ্কও হইবে তত বেশী। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা মেলা বা হাটের প্রচার করেন। সরকার হইতে যে প্রচার-কার্য্য করা হয়, তাহাও লাভের আশায়। হাট বা মেলার খাজনা এবং অন্যান্য প্রকারে দেয় রাজকরের পরিমাণ নেহাৎ কম হয় না।

বিগত যুগের পণ্য-প্রচারকাহিনীর বিশেষ কোন আলোচনার অবকাশ কম। এ বিষয় অধিক কিছু বলিতে গেলে ইউরোপের কথাই বেশী করিয়া বলিতে হয়। কারণ, আমাদের দেশে লোক-সমাজে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যে প্রচেষ্টা ছিল, তাহার শতাংশের এক

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

প্রচার-পদ্ধতি

অংশও ব্যবসায় বা পণ্য-প্রচারের জন্য নিয়োজিত হইত না। প্রাচীন ভারতের শত শত শিলালিপিগুলিকে প্রচার বলিয়া অবশ্যই ধরিতে হইবে। কিন্তু তাহা একান্ত ভাবে ধর্ম বা তৎকালীন রাজা এবং সম্রাটদের অনুশাসন প্রচার মাত্র। আমার আলোচনা এবং নিবন্ধের সহিত ধর্ম্ম-প্রচারের কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই প্রাচীন ভারতে প্রচার বা বিজ্ঞাপন বলিয়া কোন বস্তু ছিল না, এ-কথা বলিলে পাঠক বুঝিবেন আমি কেবল মাত্র ব্যবসায় এবং পণ্য-প্রচারের কথাই বলিতেছি।

আমার যত দূর জানা আছে তাহাতে মনে হয়, ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ জাতিদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোন প্রকার প্রচার বা 'জাননী' বিদ্যার প্রচলন ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের আসিবার পূর্ব্বে ভারতের বিখ্যাত পণ্যদ্রব্যগুলির প্রচার ভ্রমণকারীদের মৌখিক এবং লিখিত বর্ণনার মধ্য দিয়াই হইত। অনেক সময় ভ্রমণকারীরা ঐ সকল পণ্যের নমুনা সঙ্গে লইয়া যাইতেন, যেমন মসলীন, কার্পেট, তাঁতের বহুপ্রকার বস্ত্রাদি, রূপার বাসন, লাক্ষা-নির্ম্মিত দ্রব্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ভাবে ভারতীয় বিবিধ পণ্য-সামগ্রীর খ্যাতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। দেশীয় ভ্রমণকারীরাও এক স্থানের পণ্য অন্য স্থানে বহু কষ্ট করিয়া বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পৌঁছিতে যদিও বৎসরাধিক কাল সময় লাগিত, তাহা সত্ত্বেও ঢাকার পণ্যদ্রব্য বোম্বাই এবং মাদ্রাজের পণ্যদ্রব্য লাহোরে এক দিন না এক দিন অবশ্যই পৌঁছিত। বিদেশী ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া এবং নমুনা দেখিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীর দল ক্রমে ভারত ছাইয়া ফেলিল এবং এই সকল ব্যবসায়ীদের দ্বারাই ভারতের পণ্য ক্রমে পৃথিবীখ্যাত হইয়াছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং পণ্য-নির্ম্মাতাদের সাক্ষাৎ ভাবে নিজ পণ্যের জন্য কোন প্রকার 'প্রচার-কার্য্য' চালাইতে বা 'জাননী' বিদ্যার পরিচয় দিতে হয় নাই, তাহার কোন প্রয়োজনও ঘটে নাই। গতকালে ভারতবর্ষে ব্যবসায়ে কোন প্রকার অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকাতে প্রচার বা বিজ্ঞাপনের কথাও হয়ত ব্যবসায়ী মহলে কাহারো মনে হয় নাই, ইহাও ধরা যাইতে পারে।

প্রাচ্য দেশের লোকদের ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের দেশের লোকদের অপেক্ষা প্রখর, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই কারণে প্রথম হইতেই তাহারা নিজেদের ব্যবসায় প্রসার এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকে। এই চিন্তার ফলে তাহারা এমন নানা উপায় এবং ব্যবসায় পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়, প্রচার বা 'জাননী-বিদ্যা' যাহার একটি বিশেষ অঙ্গ বা হাতিয়ার বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্রথম দিকে প্রচার অত্যন্ত সোজা এবং সহজ হইলেও, যেমন ভাটিখানার সামনে মদের পিপা ঝুলান, কামারের দোকানের দরজায় কোদাল টাঙ্গান, কাপড়ের দোকানের সামনে বিশেষ কোন প্রকার জামা-কাপড় প্রদর্শন, ছুতারের দোকানের দরজার মাথায় লাঙ্গল বা অন্য কোন প্রকার প্রত্যহ-ব্যবহার্য্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্য রাখা, ক্রমে প্রচার-পদ্ধতির উন্নতি এবং 'বৈজ্ঞানিক' ক্রম-বিকাশ হইতে থাকে। এই ক্রম-বিকাশ গত শতাব্দির শেষ দিকেও তেমন প্রখর বা দ্রষ্টব্য হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দির প্রথম হইতেই প্রচার-কার্য্য এবং বিজ্ঞাপনী-পদ্ধতি একটি বিশেষ 'বিজ্ঞান' বলিয়া পরিচিত লাভ করে। ইহাদের ব্যবসায় বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়াও শিল্পপতিগণ ক্রমশঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এমন কি, বহু শিল্পপতি এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ী, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ব্যক্তিগত আবেদন অপেক্ষা প্রচার এবং বিজ্ঞাপনের মূল্য বহু গুণে অধিক বলিয়া মনে করেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ইহা বহু ভাবে প্রমাণিত হয় এবং এখনও হইতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে বিবিধ প্রকার প্রচার-কার্য্য এবং বিজ্ঞাপনে মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট সহায়তা গ্রহণ করা হইতেছে। পণ্যবিশেষের প্রচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্থান-বিশেষের জনগণের মানসিক বৃত্তি, প্রবৃত্তি এবং রুচির বিষয়ে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইহা হয়ত তেমন ভাবে হয় না, কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্রে প্রাক্-প্রচার-তথ্য সংগ্রহ একটি অতি আবশ্যকীয় কার্য্য। কোন এক বিশেষ স্থানে দ্রব্য বা পণ্যবিশেষের প্রচার-পদ্ধতির মান কি হইবে, তাহা সেই বিশেষ স্থানের বাসিন্দাদের শিক্ষা এবং বিদ্যাবুদ্ধির মানের উপরেই বহুল পরিমাণে নির্ভর করিবে। কারণ, এই সামঞ্জস্য না ঘটাইতে পারিলে প্রচার-কার্য্য ফলপ্রদ হইতে পারে না। সহজ বুদ্ধিতে মানুষ যদি বিশেষ কোন এক প্রচার-পদ্ধতি এবং বিজ্ঞাপনে সঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রচারের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

প্রদ্যোৎ গুহ

পুলিস-ক্যাম্পের মধ্যে অস্থির পদে পায়চারী করেন দারোগা অবনীমোহন। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তার। কতগুলি বিসর্পিল কুটিল রেখায় নিষ্ঠুর মুখটা বীভৎস দেখায়।

ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত ধরিত্রীর মত শান্ত দেখায় এলাকাটা। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে ধ্বংসস্তূপ—পুড়ে-যাওয়া ঘর-বাড়ীর রিক্ত কাঠামো, ঝলসে যাওয়া বাদামী গাছ। বিস্তীর্ণ রিক্ত ধানক্ষেত ধু-ধু করে। আল বেয়ে মানুষের পায়ে চলার পথ সাদা হয়ে তকতক করে। একটা বোবা নিঃসঙ্গতায় থমকে থাকে গ্রাম-প্রান্তর।

একটা নেড়ী কুকুর এসেছে কোথা থেকে আর চিৎকার করছে অকারণ। একটা কিছু করা দরকার! কেস থেকে হঠাৎ রিভলবারটা টেনে বার করেন অবনীমোহন। আর অবনীমোহনের লক্ষ্য অব্যর্থ তাই কুকুরটা আর শব্দ করবে না কোন দিন।

অপদার্থের দল। দাঁতে দাঁত চেপে হঠাৎ বলে ওঠেন অবনীমোহন। বন্দুক কেড়ে রেখে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বিদেয় করে দিতে হয় সবগুলিকে।

কিন্তু ওদেরই বা কি দোষ! কখন্ কোথা দিয়ে আক্রমণ আসবে অবনীমোহনই কি তা কল্পনা করতে পারেন? রাত্রির অন্ধকারে কখন্ ক্যাম্পে আগুন ধরে উঠবে, কখন্ কোথা দিয়ে একটা বিষাক্ত তীর এসে লুটিয়ে দেবে এক জন বন্দুকধারী সিপাইকে—কার সাধ্যি তা আগে থেকে বলতে পারে? আক্রমণের পর অবশ্য বে-পরোয়া গুলী ছোড়া হয় চারি দিকে। কিন্তু গুলী লাগল কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তাই কি বোঝবার উপায় আছে? মৃতদেহগুলি কোথায় লুকিয়ে ফেলে, কোথায় কোন্ ঝোপের মধ্যে পুঁতে রাখে—কে তার সন্ধান দেবে?

অস্থির পদে পায়চারী করেন অবনীমোহন। অপদার্থের দল! বেরিয়েছে তো আর পাত্তা নেই। A bunch of cowards! হয়ত অবনীমোহনের চোখের আড়ালে গিয়ে সিদ্ধি ডলছে শালারা!···

বেশ ছিল মানুষগুলো। অবনীমোহনের কড়া শাসনে শিরদাঁড়া নিচু করে বেড়াত সবাই। মাঠে চাষ দিত, চণ্ডীমণ্ডপে জটলা করতো এলোমেলো ভাবে। তার পর ফসল উঠলে জমিদার-বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতো। আবার চাষের সময় এলে একটা অস্থির উৎসাহে হাল নিয়ে মাঠে নেমে যেত ওরা। স্বপ্নের জাল বুনতো, শূন্য গোলা মাটি দিয়ে পরিপাটি করে নিকিয়ে দিত মেয়েরা। রাত্রে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে রূপোর মল, কি নাকছাবি, কি নীল শাড়ীর বায়না ধরতো। আর মানুষগুলাও প্রতিশ্রুতি দিতে কার্পণ্য করতো না। এমনি একঘেয়ে নিয়মে গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি। এক-এক সময় এই এক-ঘেয়েমী অসহ্য মনে হত অবনীমোহনের।

বৈচিত্র্যহীন জীবন। একটা ভারী গোছের চুরিও কদাচিৎ যদি ঘটে, তাকেই ভাগ্য বলতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ এক দিন এই সর্ব্বংসহ বাসুকির দল মাথা-চাড়া দিল আর আগুন জ্বলে উঠলো। থানা পুড়লো, পোষ্ট অফিস পুড়লো—পাশাপাশি পনের-বিশটি গাঁ থেকে বনেদী সাম্রাজ্য-বাদের অতি পুরাতন চিহ্নগুলি বিলীন হয়ে গেল। তার পর সেই ভস্মস্তূপের ওপর ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল কর্কশ চওড়া হাতে। আর তার পর একটা অস্পষ্ট কম্পিত আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো ওরা—মুক্ত স্বাধীন। কোন রকমে, একবস্ত্রে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দারোগা অবনীমোহন।

কেউ বলে দেয়নি, তবু ওরা মনে মনে অনুভব করলো এই দিগন্তবিসারী ফসলের সোনা, এই মাটি, এই পৃথিবীর অকৃপণ আলো-বাতাস এ সব কিছুর ওপরই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে থাকে ঈশান। চোখ জুড়িয়ে যায়। রুক্ষ কঠিন মুখটা যেন অপত্য-স্নেহে কোমল হয়ে আসে।

পথ দিয়ে আসছিল রসিক, ঈশানকে অমন সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো:

আরে কেও, ঈশান না—অমন নিঝুম মেরে দাঁড়িয়ে আছ ক্যানে?

দেখতেছি; কেমন লজ্জিত ভাবে হাসে ঈশান—এই জমি-জমা সব আমাদের হয়ে গেল; তার পর একটা কম্পিত আবেগে ফেটে পড়ে মানুষটা।

বোঁচা বোঁচা মাস ছয়েকের শিশুটাকে মাই দিতে দিতে স্বপ্নালু ভাবে তাকিয়ে থাকে রাধা। ঐ উধাও মাঠের ওপর দিয়ে এক দিন এ গাঁয়ে এসেছিল রাধা।
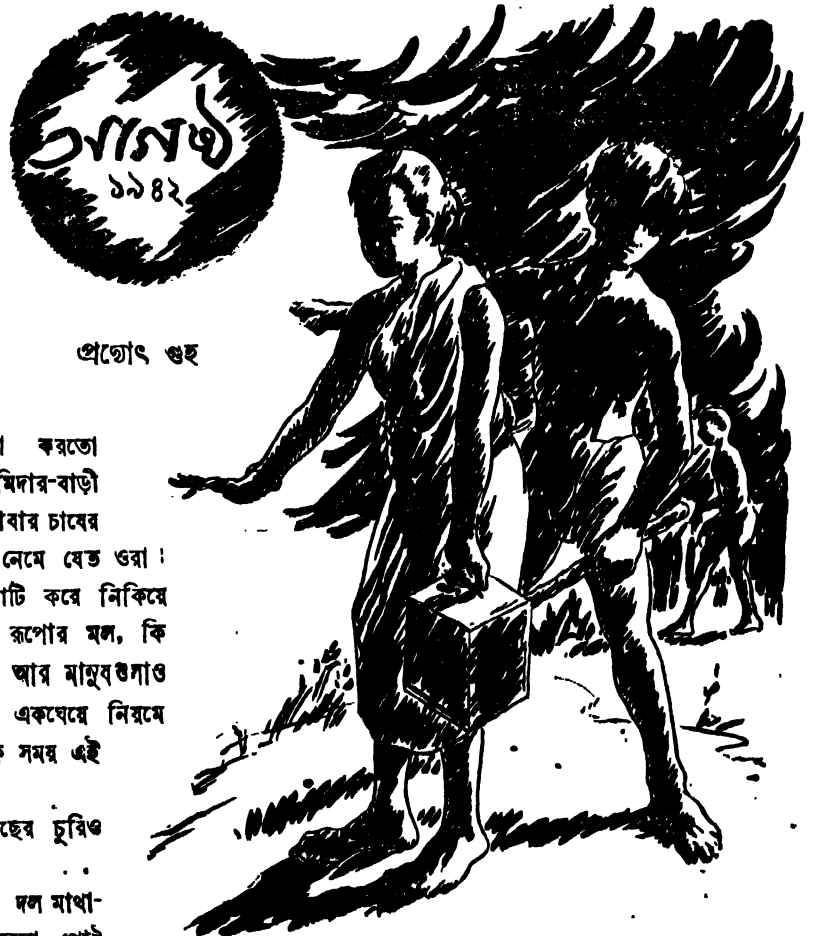
অল্প কিছু জমি-জমা ছিল, আর ছিল শক্ত সবল বাহু ঈশানের। স্বপ্ন ঘনিয়ে এসেছিল ওদের জীবনে—ঈশানের রুক্ষ কঠিন মুখে লেগেছিল কেমন একটা পরিতৃপ্ত প্রসন্নতার ছাপ। একটা অভাব শুধু পীড়া দিত, একটা শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করত ঘর-বাড়ী। কত কবচ মাদুলী, কত তুক্‌তাক্—তবে না বাঁজা দুর্নাম ঘুচলো রাধার!

ঘোলাটে হলুদ রঙ লেগেছে ধানের ক্ষেতে—আর স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছে মানুষগুলার জীবনে।

কিন্তু চুপ করে বসে থাকার লোক নন অবনীমোহন। ওরা আসছে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে। তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ পড়ছে গ্রামে-প্রান্তরে।

"রুক্ষ নোংরা মানুষগুলো আবার জটলা করলো, তামাক খেলো, কাশল আর চিৎকার করলো এলোমেলো ভাবে। তার পর আধ-পাকা ধান কেটে এনে আগুন লাগিয়ে দিল থমথমে গম্ভীর মুখে।

কিছু খয়ে যাব আটকুড়ের বেটাদের জন্য—মুখে ছাই সুমুন্দিদের!

ধানের স্তূপ সামনে নিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে ঈশান।

বসে আছিস যে, আগুন দে—এসে পড়বে যে ওয়ারা।

তার পর ঈশানের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে নিজেই আগুন লাগিয়ে দিল রাধা।

যা, পুড়ে গেল!

একটা ফাটা আর্তনাদের মত শোনাল ঈশানের কণ্ঠস্বর। পুড়ে গেল, পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওদের সযত্ন-লালিত স্বপ্ন-সম্ভাবনা। আর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকল ভস্ম-স্তূপ।

তার পর সুরু হয় হিংস্র শ্বাপদের মনুষ্য-শিকার। পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ীতে আগুন জ্বলে, শেষে মানুষ খুঁজে না পেয়ে গুলী চালাতে থাকে ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে।

একটা গুলী এসে লেগেছিল রাধার কোলের ছেলেটার পিঠে। ঝোপের আড়ালে কালো কালো স্তব্ধ মুখগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু করবার নেই—শুধু হাতে তো বন্দুকের মহড়া নেওয়া যায় না!

কুকুরগুলা—দাঁতে দাঁত চেপে পেছন থেকে কে এক জন বলে ওঠে।

আর চারি দিকের আবহাওয়াটা কেমন অপ্রাকৃত হয়ে থমথম করে। অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে দূরের পুলিস-ক্যাম্পের আলোগুলো মিটমিট করে জোনাকীর মত। জনমানবহীন ভূতুড়ে গাঁ একটা দম আটকে আসা নিস্তব্ধতায় মূর্ছিত হয়ে থাকে।

· দূরে ভারী বুটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—ফিরে আসছে টহলদার বাহিনী।

হুজৌর এক আদমী কো পাকাড় লাতা—

দূর থেকে একটা লোককে হিঁচড়ে টেনে আনতে দেখে সুসংবাদটা বড়বাবুকে না জানিয়ে থাকতে পারে না ক্যাম্পের পাহারাদার সিপাই।

কিন্তু আসামী একটা বোকা-বোকা চাষী মেয়ে। হাবিলদার জানাল, পা টিপে-টিপে ক্যাম্পের দিকে আসছিল মেয়েটা। হাতে ছিল কেরাসিনে ভেজানো ন্যাকড়া আর দেশলাই।

হুঃ, কি করতে আসছিলি এদিকে? হাবিলদার অবধি ভয় খেয়ে যায় এমনি ভাবে হুংকার দিয়ে উঠলেন অবনীমোহন।

আগুন দিবার চাইছিলাম ক্যাম্পে···আর—শান্ত অবিচল ভাবে জবাব দিল মেয়েটা।

আগুন দিবার চাইছিলাম···হঠাৎ যেন সব রক্ত মাথায় চড়ে যেতে চাচ্ছে অবনীমোহনের। গুলী করে ওর ঐ নোংরা খুলিটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করলেও উদ্যত ক্রোধ চেপে জিজ্ঞাসা করলেন: কি নাম তোর?

রাধা।

রাধা! ভেংচে উঠলেন অবনীমোহন, কেষ্টরা সব কোথায় গেল তোর?

হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে হাবিলদারটা। বড়বাবুর রসিকতা উপভোগ করেছে সে।

চোপ রও শালা—খ্যাপা কুকুরের মত হঠাৎ খেঁকিয়ে ওঠেন অবনীমোহন। তার পর মেয়েটার হাতটা মুচড়ে ধরেন অবনীমোহন।

গাঁয়ের লোক সব কোথায় গেছে?

জানি না।

জানি না—ঠাস করে একটা চড় পড়ল মেয়েটার মুখে। এবার চোখে কয়েক ফোঁটা জল দেখা গেল মেয়েটার—আশান্বিত হলেন অবনীমোহন।

কোথায় গেছে লোক সব?

জানি না।

বলবি না তুই—দে তো শালীকে উলঙ্গ করে।

মেয়েছেলে হুজুর—পেছন থেকে কে এক জন একটা ক্ষীণ মন্তব্য করে।

দয়ার অবতারটি কে—এদিকে নিয়ে আয় তো বেটাকে। শালা কত দিন ঢুকেছে পুলিস লাইনে?

দু'হাতে কাপড়টা চেপে রাখার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করলো মেয়েটা।

নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছে অবনীমোহনের। ভদ্রলোক হলে কথা ছিল না—একটা সামান্য চাষী মেয়ে। একটা কিছু করা দরকার—খুন চড়ে যাচ্ছে অবনীমোহনের।

বলবি না? এই হাবিলদার ইস্‌কো বাহার লে যাও—সওয়াল করো।

জঙ্গলের মধ্যে স্তব্ধ কঠিন মুখে বসেছিল ওরা। শেষে এক সময় গিয়ে রক্তাক্ত নগ্ন মৃতদেহটা টেনে নিয়ে এলো। অন্ধকারের মধ্যে ত্রস্ত নিঃশব্দে মা আর ছেলেকে পুঁতে রাখল একসঙ্গে। একটু মাটি উঁচু করে রাখল—স্মারক-চিহ্ন।

প্রতিবিধান হবে এবার—হবে, হবে,—আনাড়ীর মত কে এক জন সান্ত্বনা দিল।

নিরর্থক একটা বিনিদ্র রাত কাটল অবনীমোহনের।

এই শালা উল্লু! হঠাৎ ক্রুদ্ধ হুংকারে চমকে ওঠে হাবিলদারটা। আপনা কোম্পানী লে'কর তামাম জঙ্গল ঢুড়কে দেখো!

বোকা বোকা মুখ করে বেরিয়ে যায় হাবিলদার। বাইরে ভারী বুটের সার দিয়ে দাঁড়ানোর আওয়াজ পাওয়া যায়—টেন্‌শন্।

তার পর চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে সশস্ত্র দলটা।

একটা নিমন্ত্রণ

মোড় ফিরতে গিয়ে রাস্তাটার হাঁটুটা এখানে ভেঙে গেছে। যেন ভাঙা হাঁটুর সমবেদনায় সামনে থেকে একটা রাস্তা ছুটে এসে থমকে গেছে—মোড়টা তে-মাথা হয়ে গেছে।

রাস্তাটার বাঁকে ত্রিভুজাকৃতি খানিকটা ফাঁকা মাঠ। মাঠের কিনারায় রাস্তা ছুঁয়ে একটা বৃদ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছ। প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাছটার মাথায় রক্ত জমাট হয়ে ওঠে। পাড়ার পূজা-পার্বণে মাঠটার ওপর সামিয়ানা ওঠে। তা' ছাড়া বছরের বেশীর ভাগ সময় মটর-মেকানিকদের কারখানার আটচালার কাজে লাগে: ভাঙা মাডগার্ড, ফাটা টায়ার, মরচে-ধরা নাট্-বল্টু, ষ্টিয়ারিং-এর ভাঙা হাতল, মণ-দরে-কেনা মান্ধাতা আমলের মটরকারের হাড়-পাঁজরা বার-করা খোলস প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর বোবা দেহাবশেষের মত। এক পাশে সরিয়ে-রাখা ঐ জগদ্দল মটরখানা পাড়ার ছোট ছেলেদের 'ট্রেনিং কার'—তেল না-খাওয়া, ষ্টার্ট না-নেওয়া গাড়ীটা ছেলেদের দাপাদাপিতে সময় সময় নড়ে ওঠে, জং-ধরা চাকায় ঘূর্ণন-আবর্তন বুঝি বা সুরু হয়। কোন কোন দিন নির্জন খাঁ-খাঁ দুপুর যখন কুকুরের জিভে হাঁফ ফেলে তখন পাড়ার কয়েক জন অসম-সাহসিক অর্বাচীন গাড়ীটাকে পিছন থেকে ঠেলে রাস্তায় নামাতে চেষ্টা করে। কারখানার মালিক-মেকানিক হৈ-হৈ করে ওঠে, তাড়াবার আগেই ছেলেগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। মটর গাড়ীর তেলে রাস্তার ধুলোয় কারখানা-মালিকের গায়ের জামাটা এমন দেখায় যেন তাতে জামাটাই ঘেমে উঠেছে।···

তিন মাথার তিন রকম নামকরণ, তিন রকমের বাড়ী-ঘর-দোর। মাঠের ওপর সব বাড়ীগুলো সেকেলে দাঁত-ভাঙা চিরুণীর মত। মাঠের ওপারে মোড়ের ডাইনে-বাঁয়ে ফ্ল্যাট ও বাগান-ঘেরা বনেদী অট্টালিকা। ফ্ল্যাট বাড়ীটার মাথায় বাঁশের ডগায় রোদ-বৃষ্টি খাওয়া বিবর্ণ জাতীয় পতাকা। খাড়া বাড়ীটার চাদিতে পেলেস্তারার পদ্ম-কোরকের মাঝখানে সন-তারিখের সংখ্যাগুলোয় সবুজ শেওলার ভেপনা ধরেছে: সন ১৩৪১, ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ফ্যাকাশে চোখে জাপান মাছের মত ঘরবার করে—ছোট ছোট ঢাকা-বারান্দা থেকে নীচের রাস্তার দিকে যখন চেয়ে থাকে তখন মনে হয়, এই বুঝি লাফিয়ে পড়ে। অপর দিকে বাগান-ঘেরা বাড়ীটার রাস্তার দিকের অংশ কৃষ্ণচূড়ার ডাল-পালার ফাঁকে দেখা যায় ছায়া-ছবির মত—আশ-পাশের স্পর্শ বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ওপর অংশে বাড়ীটার টানা বারান্দা, আবক্ষ রেলিং দেওয়া, দিনের বেশীর ভাগ সময় রেলিং-এর ওপর কাক বসে, রাস্তার দিকে মুখ করে ডানা আর ল্যাজ ফাঁক করে ডাকাডাকি করে। ওপর-নীচে সৌখিন পর্দা-ঢাকা সব কটা জানালা-দরজা নিয়মিত সকাল সন্ধ্যা হাট করে খুলে দেওয়া হয়। মাঠের ওপর একতলা প্রথম বাড়ীটাই হিমাংশুদের। বাড়ীটা রাস্তা-খাওয়া ধুলো-খাওয়া। কবে এক দিন পথচারীর বেহায়া কটাক্ষে সরম পেয়ে এ বাড়ীর জানালায় ছেঁড়া সাড়ীর ঘোমটা উঠেছিল। পাড়ের ফালির মুখে পর্দার গলিত অংশটা আজো হাওয়ায় ওড়ে। জানালাটা বেহায়া চোখে রাস্তার ওপর চেয়ে থাকে।

হিমাংশু যখন-তখন জানালায় এসে দাঁড়ায়। খোপে বদ্ধ পারাবতের চোখে হিমাংশু বাগান-ঘেরা বাড়ীটা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ঘুম ভাঙলে দেখা যায়, বাড়ীটার ওপর-নীচে সব দরজা-জানালাগুলো কখন খোলা হয়ে গেছে, বারান্দার এক কোণে যেখানে অপরাজিতার দেহবল্লরী তৃণরজ্জু আশ্রয় করে ঘনঘোর হয়ে উঠেছে, সেখানে একটা মেয়ে রেলিং-এ বুক চেপে নীচে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। অরুণোদয়ের প্রথম স্পর্শে বাড়ীটা ঝলমল করছে। চেয়ে থাকতে থাকতে হিমাংশুর কখনো কখনো মনে হয়, মেয়েটার চাহনি বাড়ীটার দরজা-জানালার উদয়-অস্ত চাওয়ার মত নিরর্থক, বোবা! তবু মেয়েটি নিয়মিত বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। তবু হিমাংশু প্রত্যহ সে চাহনির অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করে। বিশেষ সময়ে বিশেষ ভঙ্গিতে মেয়েটির রেলিং ধরে দাঁড়ান' লক্ষ্য করে আনন্দ-বেদনার সঙ্গে হঠাৎ শো-কেসে সাজান বড় পুতুলের কথা মনে পড়ে—চিত্রার্পিত! নিজের অজ্ঞান্তে হিমাংশু আকৃষ্ট হয়। যত বার বাড়ীটার দিকে চায় তত বার নিজেকে নানা প্রশ্ন করে হিমাংশু: ও-বাড়ীর মানুষগুলো কেমন? ওরা কি খুব অহঙ্কারী? আশ-পাশের পড়শীদের সম্বন্ধে ওদের ধারণা কি? মেয়েটি কাউকে ভালোবাসে না কি, তাই রোজ এসে বারান্দায় দাঁড়ায় ছবির মত? ও-বাড়ীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা হয় না কোন দিন?

অপরিচয়ের দুরন্ত উৎসুক কৌতূহলে বেদনা আনে।

* * *

নিজের মনে কোথায় যেন একটু লুকোচুরি আরম্ভ হয়। হিমাংশু যেন একটু সজাগ হয়েই থাকে। অসতর্ক মুহূর্তে মালতী নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ায় গা ঘেঁসে। হিমাংশু আপত্তি করে না, একটু যেন সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। বাইরের দিকে চেয়ে দু'জনেই চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। মালতী চেয়ে থাকার এই নিরর্থকতায় অসহ্য বোধ করে। উসখুস করে কথা আরম্ভ করে: ফ্ল্যাট বাড়ীতে লোকে যে কি করে বাস করে কে জানে—কোন রাখ-ঢাক নেই?

হিমাংশু কোন সাড়া-শব্দ করে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমরা কিন্তু বেশ আছি—পুরনো হোক, দিব্যি একানে বাড়ী পেয়েচি! মালতী আর দাঁড়াতে পারে না, কোন একটা কাজ মনে পড়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এসে স্বামীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলে, এ-পাড়ার ঐ বাড়ীটাই খুব সুন্দর—কি বড় বড় জানালা-দরজা!

মালতীর কণ্ঠস্বরের ঔৎসুক্য চোখ বাড়িয়ে দেবার মত। সত্যিই বাড়ীটা দেখবার মত—অপরাজিতার ঘন ছায়ায় বারান্দার কোণে ও-বাড়ীর মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে। এরা দু'জনেই দেখেছে: গালার ছাঁচে সোনার লেখা—মেয়েটাকে আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে!

মালতী জিগ্যেস করে, এ-পাড়ার ওরাই বুঝি খুব বড় লোক?

হিমাংশু আলগোছা উত্তর দেয়, মনে তো হয় তাই!

হঠাৎ যেন মালতী আর কোন কথা খুঁজে পায় না। স্বামীর জবাবটা থতমত খাইয়ে দেবার মত। কি মনে করে নিজের

মনেই বলে, মেয়েটার আর কোন কাজকর্ম নেই। খালি দেখ, সেজে-গুজে বেহায়ার মত রাস্তার দিকে চেয়ে আছে—রাত-দিন কি যে দেখে ?

হিমাংশু তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মালতী জিগ্যেস করে, আচ্ছা, মেয়েটা কি দেখে বল দিকি ?

হঠাৎ হিমাংশুর মনে হয়, মালতী তার সম্বন্ধে ঐ রকম একটা প্রশ্ন করতে পারে না বলেই ও-বাড়ীর সৌখিন, সুন্দরী মেয়েটির দ্রষ্টব্যের কথা জিগ্যেস করছে—বারান্দায় দাঁড়ানর উদ্দেশ্যটা জানতে চাইছে। মালতী কি তাকে সন্দেহ করে ? মেয়েটির বারান্দায় দাঁড়ানর সঙ্গে হিমাংশুর জানালায় দাঁড়ানর কোন যোগাযোগ আছে না কি ? যদি সন্দেহ করেও, কি সন্দেহ করেছে মালতী ?

জানালা থেকে সরে এসে হিমাংশু ঘরের ভিতর চেয়ারে বসে। মালতী কিন্তু জানালায় দাঁড়িয়েই থাকে। দু'জনের কেউ-ই কথা বলে না। ও-বাড়ীর মেয়েটি চিত্রার্পিতের মত ঠায় বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তে তে-মাথার সমস্ত মুখরতা যেন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। একটা ভারি গাড়ী আছাড় খাওয়ার কাৎরানি অনুরণিত হয়ে স্তব্ধতাটাকে ভারি করে রাখে। হঠাৎ মুখ ঘসে দেওয়ার মত আশপাশের বাড়ীগুলো ক্ষত-বিক্ষত, বিবর্ণ দেখায়। মাঠের ওপর জং-ধরা মান্ধাতা আমলের মটর গাড়ীটার ওপর একটা ছেঁড়া ত্রিপল ঢাকা দেওয়া। সাড়ী-ছেঁড়া পর্দাটা বাতাসের মুখে অযথা দুলতে থাকে।

চুপ করে থাকাটা যেন আরো আপত্তিকর মনে হয়। হঠাৎ নীরব হয়ে মালতী অবোধ্য একটা সন্দেহকে যেন খুঁচিয়ে তুলেছে, নিঃশব্দ বাচনিকতায় একটা কিসের বোঝা-পড়া ক'রতে চাইছে।

নিজের দৃষ্টির ভাবার্থে ও-বাড়ীর মেয়েটির দৃষ্টি-শূন্যতার কি অর্থ করেছে মালতী, স্পষ্ট করে বলুক না। আর মেয়েটি রোজ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি দেখে তা হিমাংশু কি জানে। হিমাংশু মনে করতে পারে না, মেয়েটি কোন দিন চোখ তুলে এ-বাড়ীর জানালায় চেয়েছে কি না।

জানালায় দাঁড়িয়ে যখন-তখন তুমিই বা কি দেখ ? গম্ভীর ভাবে হিমাংশু প্রশ্ন করে।

মালতী জবাব দিতে পারে না। জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর মুখের ওপর চেয়ে থাকে। মরা মাছের চোখের মত দৃষ্টিহীন সে চাহনি। হিমাংশুর মনে হয়, হয়তো কিছু না-ভেবেই মালতী ও-প্রশ্ন করেছিল—মেয়েটিকে নিয়ে স্বামীর সম্বন্ধে ও-বেচারা কোনই সন্দেহ করে না হয়তো ! মিছিমিছি হিমাংশুই একটা মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। জানালার বাইরে স্বামীর চোখকে আটকে রাখবার উদ্দেশ্য মালতীর হয়তো নয়।

সহজ হয়ে মালতী বলে বসে : অমন বেহায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকার কি মানে হয় ! পাড়ার ছেলেগুলোর মাথা খাবে কোন্ দিন ! বাপ-মা বিয়ে দিলেই পারে।

মালতীর দুশ্চিন্তার কারণ তা হলে পাড়ার হৃদয়সর্বস্ব ছেলেগুলো ! তবু কেন জানি না, হিমাংশুর সন্দেহের নিরসন হয় না। চেয়ার থেকে উঠে এসে মালতীর পাশে দাঁড়িয়ে হিমাংশু দেখলে : ও-বাড়ীর মেয়েটি কখন্ সরে গেছে। তে-মাথা রাস্তার মোড়টা চড়া রদ্দুরে ভাজা-ভাজা হচ্ছে—ধারে-কাছে কোন উৎসুক হৃদয়-সর্বস্ব ছেলে দাঁড়িয়ে নেই ! বৃদ্ধ কৃষ্ণচূড়ার তলায় পাগলা বুড়ি ইট-পাতা উনুনে খড়কুটো জেলে ধোঁয়ার আবর্ত সৃষ্টি করেছে।...

* * * *

কাচের পাত্রে জল ধরে রাখার মত চাঁদের আলোয় চারি দিক্ টল্-টল্ করছে। সদ্য রঙ-করা বড় বাড়ীটায় মোম গলার মত জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে পড়ছে। কৃষ্ণচূড়ার নিষ্কম্প পাতাগুলো ভিজে-ভিজে মনে হয়। তে-মাথা রাস্তায় ছায়াতে-ছবিতে নির্বাক্-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।

বোধ হয় একটু গুমোটও করেছে আজ। হিমাংশু বিছানা ছেড়ে জানালায় বসে। রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে বাইরেটা—জ্যোৎস্নালোকিত বাড়ীটা কোথায় কবে যেন দেখা কোন মনোরম স্মৃতির অস্পষ্ট রূপ। অপরাজিতায় শাখায়িত দেহলতা ছায়াচ্ছন্ন। হিমাংশুর চোখ দু'টো উৎসুক হয়ে জেগে থাকে—ঘুম-ভাঙা রাতে অভূতপূর্ব সম্ভাবনার কথা মনে হয়। ও-বাড়ীর অপরাজিতার ছায়ান্ধকারে বারান্দার কোণে কোন ছায়ামূর্ত্তি নড়া-চড়া করছে না কি ? এই নিস্তব্ধ চন্দ্রালোকে হিমাংশু

প্রভাত দেবসরকার

ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না? ভিতরটা তো অসহ্য গরম! জেগে উঠে স্বামীকে পাশে না-দেখে মালতী কি কোন সন্দেহ করবে.?

মালতীরও গরম হয়। কখন নিঃশব্দে উঠে এসে স্বামীর পাশে বসে। জিগ্যেস করে, আজ বড্ড গরম হচ্ছে, না?

জবাব না-দিয়েও গরম লাগাটা বোঝান যায়। হিমাংশু চুপ করে থাকে।

হঠাৎ আশ্চর্য্য হবার মত মালতী বলে; আজ কেমন জ্যোৎস্না হয়েচে দেখ, ফিন্‌কি দিয়ে পড়চে! বাইরেটা কি চমৎকার দেখাচ্চে!

মালতীকে হঠাৎ বড় রসিকা বলে মনে হয়। মালতীর মুখে আজ নতুন কথা শুনছে যেন। চাঁদের আলোয় মেয়েমানুষের মাথা বড় একটা খারাপ হয় না, হিমাংশু জানে। ভেবে পায় না মালতীর কথার কি জবাব দেবে—জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মনে মনে একটু যেন বিরক্তও হয়। কিছু না বলে উঠে এসে বিছানায় শোবার চেষ্টা করে।

বাইরের দিকে চেয়ে জানালার কপাটে ঠেস দিয়ে মালতী দাঁড়িয়ে থাকে। স্বামীর জ্যোৎস্না ভাল না-লাগার কারণটা বুঝতে পারে না।

বাইরে চাঁদের আলো ঠায় নষ্ট হতে থাকে, রাস্তার হাইড্রাণ্টের মুখে ঝাঁঝরি বেয়ে চাপা কলের ঘোলা জল একটানা সুর করে পড়ে। বাতিদানে বাতি পুড়ে যাওয়ার মত প্রহর শেষ হয়ে যায়।

হঠাৎ মালতী হৈ-হৈ করে ওঠে: শীগ্‌গির এদিকে এস—দেখে যাও, এস এস!

উত্তেজনায় মালতীর কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে। বাইরে যা ঘটছে তা যেন ওর বহু দিনের প্রতীক্ষিত আকাঙ্ক্ষিত। মালতী ডাকের ওপর ডাক দেয়: এস, এস লক্ষ্মীটি, শীগ্‌গির!

ডাকের তাড়ায় হিমাংশুকে বিছানা ছেড়ে উঠে আসতে হয়। জানালায় দাঁড়িয়ে হিমাংশুর মনে হ'লো, হঠাৎ চাঁদের আলো নিবে গেল না কি? আশে-পাশে যত বাড়ী ছিল সব বাড়ী থেকে আলো ঠিক্‌রে এসে রাস্তার মোড়টাকে ভ্রূকুটি করছে, দিনের বেলার মত রাস্তাটার হাড়-পাঁজরা দেখা যাচ্ছে। বড় বাড়ীর সমস্ত ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। বুড়ো কৃষ্ণচূড়ার মাথার ওপর বায়স দম্পতী জেগে উঠে একক কলরব সুরু করেছে। বোধ হয় একটা চুরির চেষ্টা হয়েছিল। চেষ্টাটা আপাততঃ ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়: বড় বাড়ীর তলায় পাড়ার বহু লোক জড় হয়ে হৈ-হৈ করছে, সমবেত কণ্ঠস্বরে বিজলী আলোর প্রখরতায় বড় বাড়ীর রহস্য যেন ফাঁস হয়ে গেছে—বড় ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে এখন বাড়ীটা।

মালতীর মুখে-চোখে একটা খুশী-খুশী ভাব। হিমাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি গো, বুঝতে পারলে না কিছু?

হিমাংশু কিছু একটা বোঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা কি বলবার আগেই মালতী বলে, চেয়ে দেখ, অপরাজিতার ঐখানে চোখ দাও! এবার বুঝতে পারলে? ভাল করে দেখ!

বোঝবার মধ্যে একটা ডুরে সাড়ী মোটা দড়ির মত বাড়ীটার রেলিং থেকে নীচে রাস্তায় নেমে এসেছে, দেখা যায়। মনে হয়, সাড়ীটা পাকিয়ে ফেলে চোরকে ওপরে ওঠাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু উপস্থিত চোর কোথায়, চোরাই মালই বা কই? আর পালান চোরকে নিয়ে রাত দুপুরে এত হৈ-হৈ করে লাভই বা কি?

হিমাংশু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে হয়তো।

মালতী মুখ টিপে বলে, মেয়েটাই পাজি! মা গো মা, বাপের জন্মে কখনো শুনিনি এমন কথা, সাড়ী ফেলে কেউ ভাব করে!

মালতী হেসে সব কথা স্পষ্ট বলতে পারে না—পেটে-মুখে মানুষটা কেমন যেন করতে থাকে। আর তাও যা বলে হিমাংশুর বিশ্বাস হয় না। পাড়ার ছেলে অনাদি এমন দুঃসাহসের কাজ করবে? সত্যিই কি সে সাড়ী-পাকান ধরে মেয়েটার ঘরে উঠতে চেষ্টা করেছিল? এইটুকু সময়ের মধ্যে মালতীই বা এত কথা জানল কি করে? ব্যাপারটা বড় মামুলী মনে হয় হিমাংশুর।

তখনো মালতী বলছে, ঐ যে গো লঙ্কা-মার্কা ছেলেটা, অনাদি! মা গো মা, পাড়ার মধ্যে একটা কেলেঙ্কারী! ঢলাঢলির একটা সীমা আছে, দিন-রাত বারান্দায় দাঁড়ানর ফল!

সাড়ীর দড়ির কথা বলে আর মালতী হেসে ডুকরে ওঠে। হিমাংশু ভেবে পায় না এ ব্যাপারে মালতীর এত আগ্রহ কেন, এত খুশীই বা সে হয় কি করে! চোর ধরা পড়ার ব্যাপারটা মালতীর আগাগোড়া মন-গড়া হতে পারে তো!

ধক্ করে হিমাংশুর মনে হয়, স্বামীকে নিয়ে একটা নিদারুণ দুর্ভাবনার হাত থেকে বেঁচে গেছে বলেই মালতী আজ এতো আনন্দ করছে। ঐ অনাদির মত সে কি একটা দুঃসাহসের কাজ করতে পারে না কোন দিন? মালতী কি হিমাংশুকে ধরতে পেরেছে?

* * * *

মালতীর কথাই ঠিক। অনাদির কাজটা সত্যিই নিন্দনীয়। ক'দিন ধরে এই ব্যাপারের ছি-ছিটা রসিয়ে রসিয়ে পাড়ায় হতে থাকে। বড় বাড়ীর গাম্ভীর্য্য এরা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। অনাদি পূর্ব্বের মতই চলাফেরা করে—পাড়ার ইতর-ভদ্রও যেন তাকে নিঃশব্দে বাহাদুর বলে সমর্থন করছে।

জানালায় দাঁড়ালে মেয়েটিকে আর দেখা যায় না। বড় বাড়ীর উপর-নীচে নিয়মিত দরজা-জানালা হাট করে খুলে দেওয়া হয়। কখনো কখনো কৃষ্ণচূড়া গাছের বায়স-দম্পতী উড়ে এসে বারান্দার রেলিংএর ওপর বসে ল্যাজ ফাঁক করে অযথা হাঁক-ডাক সুরু করে। কখনো বা বায়সটা চোখ দু'টো আধ-বোজা করে ঘাড় কাৎ করে থাকে—পাশে গা-ঘেঁসে বসা বায়সী ঠোঁট দিয়ে মাথার পোকা বেছে সুড়সুড়ি দেয়। আরামে বায়সের চোখের সাদা পর্দ্দাটা নেমে আসে।

জানালার বাইরে হিমাংশুর দৃষ্টিটা সোজা অনেক দূরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে আসে: একটা তিন-চারতলা বাড়ীতে বাঁশের মাচায় অস্পষ্ট ক'টা ছায়া-মূর্ত্তি ওঠা-নামা করছে—বাড়ীটায় বোধ হয় রঙ করা হচ্ছে!...

মালতী আজ পরিপাটি করে সেজেছে। বেশ-বাসে বয়েস কমানর ইচ্ছেটাই বাচনিক হয়ে উঠেছে। না, দরকার মত মালতী সাজতে জানে। হিমাংশুর খেয়াল হয়: আজ তাদের নিমন্ত্রণ। লঙ্কা-মার্কা অনাদির সঙ্গে বড় বাড়ীর সৌখিন মেয়েটির বিয়ে। পাড়ার

সকলেরই নিমন্ত্রণ হয়েছে। বড় বাড়ীর কর্তা নিজে এসে প্রত্যেককে বলে গেছেন, সামাজিকতা করেছেন। কারো কোন ক্ষোভ থাকবার আর কথা নয়।

একটু আগে থাকতে প্রস্তুত হয়ে মালতী এসে তাড়া দিলে: কই, এখনো তুমি ওঠোনি? নাও ওঠ—ওঠ, শীগ্‌গির নাও!

হিমাংশু ওঠবার কোন গা করলে না। কেন উঠবে যেন বুঝতে পারছে না।

ঘুমন্ত মানুষকে ঠেলে জাগানর মত করে মালতী ফের তাড়া দিলে, এখনো উঠলে না? কি, তুমি নেমন্তন্ন যাবে না? কি গো!

হিমাংশুর জানালার বাইরে মোড়ের মাথায় বড় বাড়ীটার আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁশের মাচা বাঁধা—ত্রিপলে সামিয়ানায় বাড়ীটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে।

বাইরে চোখ রেখে হিমাংশু বললে, না, বড়লোকের বাড়ী সবাই মিলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। তুমিই যাও।

এ কথায় আর মালতী কি উত্তর দেবে? বড় বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় স্বামীর আজকের ব্যবহারটা। আজ ও-বাড়ী নেমন্তন্ন না গিয়ে কি যে মান বাড়বে, মালতী বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ সেজে-গুজে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে মালতী বেরিয়ে যায়।

বিয়ে-বাড়ীর সানাই-এর পোঁ-টা শুধু শোনা যাচ্ছে একঘেয়ে একটানা। রাস্তার দিকে বারান্দার রেলিং-এ অনেকগুলো লাল নীল ইলেক্‌ট্রিক আলো লাগান হয়েছে—সন্ধ্যের সময় জ্বালা হবে, রাতের অন্ধকারে বাড়ীটাকে চোখের ওপর তুলে ধরবার জন্যে দু'পাশ থেকে দু'টো বড় সার্চ লাইটও বসান আছে—বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরখ ক'রতে একবার আলো দু'টো জ্বালা হয়েছিল, এখনো নেবান হয়নি—দিনের আলোয় মিট্‌-মিট্ করছে।

হিমাংশুর চোখ পড়ল: বারান্দার কোণে অপরাজিতার লতাগুল্মের ঝাড়টাকে টেনে-ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে! বাঁশের ভারা বাঁধবার সুবিধের জন্যে বোধ হয়!

বরষা-মঙ্গল

নির্ম্মলাবালা দেবী

আতপ-তাপে তাপিত ধরা,
চাতক-মুখে বেদনা ভরা
তৃষিত-কাতর আবেদন!—
এস হে রাজ! নীরদ-রথে
আসুক নেমে বিমান-পথে
জীবন-ভরণ-বরষণ!

পূরব বায়ু করুণা ঝরা
শ্যামল স্নেহে এসেছে ত্বরা
পুলকি ধরণী হরষণে।
তোরণ নভে বিজুরী জ্বালা,
দোদুল দুলে বলাকা-মালা;
মাদল-মন্দ্রে গরজনে।

কানন সভা সবুজ ঢালা,
নাচিছে লতা, ময়ূর-মালা;
উৎসব আজি নীপবনে।
শণের বনে কনক দুলে,
মুরছে মায়া তিলের ফুলে;
অশোক আকুল গুঞ্জরণে।

নিলাজ নদী বাঁধন-হারা
তোমারে চাহি পাগল-পারা
কি গান গাহে যে আনমনে!
দাদুরী গায় বিজয় গান,
কৃষাণ-বধূ সজল প্রাণ,
করুণ নয়নে দিন গ'ণে।

এস হে এস বরষা-রাজ
পিনাক তুলি হানিয়া বাজ
দানব-দুখেরে কর তল!
অশনহীন, বসন-হারা,
শোষণ-দীন, পীড়ন-সারা;
শরণ মাগিয়া কৃষীদল!

জন্মদিন

শ্রীঅমলা দেবী

রাত্রি প্রায় ন'টা। গাঙ্গুলী মশায়ের বৈঠকখানায় পরামর্শ-সভা বসিয়াছে। একটা চৌকির উপরে ধূলি-ধূসর শতরঞ্চি পাতা। তাহার উপরে দেওয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া আছেন গাঙ্গুলী মশায়; একটু দূরে তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে—স্কুলের হেড-পণ্ডিত মহেশ ভট্‌চায, আর, স্কুলের মাষ্টার বিনয় বাঁড়ুজ্জে। সকলেই হেঁটমুখে চিন্তামগ্ন। চিন্তার গভীর বলীরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে সকলের কপালে। জ্যৈষ্ঠ মাস। ঘরের ভিতরে গুমোট গরম। হাতের কাছেই তিনটা হাত-পাখা রহিয়াছে। কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। অজস্র ঘামিতে ঘামিতে তাঁহারা একটি জটিল সমস্যার সমাধান সন্ধানে নিবিষ্ট। একটু দূরে, স্কুলের হেড-মাষ্টার মশায় হাত-পাখার বাতাস খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

চিন্তার বিষয় আগামী ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেক্‌শান। প্রতিপক্ষ রাধানাথ এখন হইতেই তোড়-জোড় সুরু করিয়া দিয়াছে। অবশ্য 'তোড়-জোড়'এর অভাব কোন দিন তার থাকে নাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সুবিধা করিতে পারে নাই। সদাশয় ইংরাজদের রাজত্বে হাকিমরা ছিলেন দয়ার অবতার'। রীতিমত তোয়াজ করিতে পারিলে, যথা-মাত্রা রাজানুগত্য দেখাইতে পারিলে, তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করা দুঃসাধ্য ছিল না। তা'ছাড়া তাঁহারা নিমকহারামী করিতেন না। পুকুরের মাছ, বাগানের কলার কাঁদি, খাঁটি ঘৃত-ভাণ্ড, যেমন বিমল হাস্য-বিকসিত মুখে গ্রহণ করিতেন, তেমনি সুপ্রসন্ন চিত্তে, দরাজ হাতে অনুগ্রহ দান করিতেন। বিশ্বাসভাজন লোকদের উপরে তাঁহাদের নেক-নজরের কোন দিন বৈলক্ষণ্য ঘটিত না। আজকাল আবহাওয়া অন্যরূপ। কংগ্রেসী লোকেদের হাতে আসিয়াছে রাজ্য-শাসনের ভার। এই লোকগুলা মোটেই সুবিধার নয়। যেমন মোটা ক্যাটকেটে খদ্দর ইহাদের পরনে, তেমনই ক্যাটকেটে ইহাদের কথাবার্ত্তা ও আচরণ। যা' বলে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে, বিন্দুমাত্র খাতির করিয়া বলে না। জেল খাটিয়া খাটিয়া ইহাদের মেজাজ এমন কড়া হইয়া উঠিয়াছে, বিন্দুমাত্র ত্রুটি পাইলে কাহাকেও জেলে পাঠাইতে ইহাদের বাধে না। তা'ছাড়া, ইংরাজ-রাজত্বে ভক্তিমান প্রজা বলিয়া যাহাদের সুনাম ছিল, তাহাদের ইহারা রীতিমত সন্দেহের চক্ষে দেখে। ইহারা বুঝে না—যে কুকুর একবার পোষ মানিয়াছে, সে বরাবরই পোষ মানিবে—প্রভু যেই হোক। এই বিচারবুদ্ধিহীন, হিতাহিত-বোধশূন্য, মাথা-ফোলা লোকগুলার আওতায় পড়িয়া কাঁচা হাকিমদের তো কথাই নাই, পাকা হাকিমরাও হকচকিয়া গিয়াছেন।

কথায়-বার্ত্তায়, চাল-চলনে, কাজে-কর্ম্মে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা। তা'ছাড়া খদ্দর-ভীতি ভয়ঙ্কর। রামা-শ্যামা খদ্দর পরিয়া সামনে দাঁড়াইয়া কথার উপর কথা দিলেও টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করেন না। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, ইহারা শাক্তমত ছাড়িয়া দিয়া রাতারাতি বৈষ্ণব হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের কাছে পুরাতন আমলের লোকদের কোন সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

গাঙ্গুলী মশায় আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হঠাৎ একটু আশার আলো দেখিতে পাইয়াছেন। আজ সকালে এস-ডি-ও সাহেব আসিয়াছিলেন। এ জেলায় ছিলেন আগে। গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ছিল যথেষ্ট। এবারে আসিয়া যেন চিনিতেই পারিলেন না! অথচ রাধানাথের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিলেন যেন কত দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাধানাথের মত ভণ্ড, কূট-কৌশলী লোক যে দুনিয়ায় বেশী নাই। কংগ্রেসী আমল হওয়া অবধি খদ্দর পরা সুরু করিয়াছে—খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী, মায় টুপী পর্য্যন্ত। খদ্দর যেন গায়ের চামড়া করিয়া তুলিয়াছে হতভাগা। যেন আজন্ম পরিয়া আসিয়াছে এমনই ভাব। তা'ছাড়া সুবিধা হইয়াছে তাহার। তার এক মামাতো ভাই কংগ্রেসের লোক। বার-দুই জেলে গিয়াছিল। সেই এখন জেলার এক জন মাতব্বর ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হাকিমরা না কি কোন কাজ করেন না। ইহাকেই মুরুব্বি ধরিয়া রাধানাথ ইলেক্‌শান কাটাইয়া উঠিবে ভাবিয়াছে। এই লোকটি হাকিমের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাধানাথ তো তার গা ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিল। তিনি তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া পিছনে রহিলেন। হাকিম কংগ্রেসী লোকটির সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। রাধানাথও তাহাতে ফোড়ন দিতে লাগিল। অথচ হাকিম মহাশয় একবার পিছন ফিরিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন না পর্য্যন্ত। ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে আসিয়া তিনি খাতা-পত্র পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত

একটি কথাও বলিলেন না। অথচ রাধানাথের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা পর্য্যন্ত করিলেন। মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল তাঁহার। সাহেবের সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণা হইয়াছিল। এত মাছ, ঘি, ফল ও সরু চাল খাওয়াইয়াও, মাত্র খদ্দর না পরার অপরাধে, যে লোক এক জনকে এমন করিয়া ভুলিয়া যাইতে পারে, সে হাকিম হইলেও ভাল লোক নয়। কিন্তু পরে ভুল ভাঙ্গিল গাঙ্গুলী মশায়ের। রাধানাথ তাহার আত্মীয়কে বাড়ীতে লইয়া গেল। লোকটি আফিস হইতে বাহিরে পা দিবা মাত্র সাহেবের ভাবান্তর ঘটিল, ঠিক সেই আগের দিনের ভাব। হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া এক গাল হাসিয়া কহিলেন—তার পর গাঙ্গুলী মশায়, কি খবর আপনার? গাঙ্গুলী মশায় অনুযোগের স্বরে কহিলেন—চিনতেই পারলেন না, সার! সাহেব বলিয়াছিলেন—খুব চিনেছি, মশায়! আপনাকে চিনব না! আপনার বাগানের কানাই-বাঁশী কলা, পুকুরের রুই মাছ, আর চাষের রামশাল চাল কি সহজে ভোলা যায়? তবে কি জানেন—দিন-কাল বড় খারাপ। ঐ লোকগুলো টিকটিকির মত পিছনে পিছনে ঘুরছে; একটু কিছু ইতর-বিশেষ দেখলেই জানিয়ে দেবে, উপরে। তখন চাকরী নিয়ে হয়তো টানাটানি করতে করতে প্রাণান্ত হতে হবে—সঙ্কোচে বলিয়াছিলেন—সরকারী চাকরী আর পোষাচ্ছে না মশায়! আর ত'বছর মাত্র আছে। কোন রকমে কাটিয়ে দিয়ে ভালয়-ভালয় পেন্সনটি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি।

গাঙ্গুলী মশায় ইলেক্‌শানের কথাটা পাড়িলেন। সাহেব কহিলেন—খদ্দর পরেছেন কই?

গাঙ্গুলী মশায় সবিনয়ে কহিলেন—সব কেনা আছে সার। ভারী গরম বলে পরতে পারিনি। সর্ব্বাঙ্গে ঘামাচি হয়েছে কি না। তবে একটু শীত পড়লেই পরব।

সাহেব হাসিয়া কহিলেন—তাই পরবেন। ইলেক্‌শানের কিছু দিন আগে থাকতে পরলেই চলবে। কিন্তু—আপনার মুরুব্বি কই? দেখলেন তো, কি রকম জবর মুরুব্বি। আপনার আছে কেউ তেমন? ওর চেয়েও একটু বেশী জবর হলেই ভাল হয়।

গাঙ্গুলী মশায় সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—আজ্ঞে, আছে হুজুর! তবে এখানে থাকে না, কলকাতায় থাকে।

সোৎসাহে সাহেব কহিলেন—কে বলুন তো?

গাঙ্গুলী মশায় নাম করতেই সাহেব একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—আরে! শ্যামলাল বাবু আপনার আত্মীয়! বলেন কি? তিনি তো মস্ত লোক। মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা-বসা তাঁর। দু'-দিন পরে হয়তো মন্ত্রী হয়ে যেতে পারেন। শ্যামলাল বাবু যদি আপনার জন্যে চেষ্টা করেন তো কিছু ভাবনা নাই আপনার।

এস, ডি, ও সাহেবের মুখে এ রকম আশার কথা শুনিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। হাস্য-বিকশিত মুখে কহিলেন—তাকে কি আসতে লিখব, হুজুর?

সাহেব কহিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—দেখুন, এক কাজ করুন। শ্যামলাল বাবু আসুন। আপনি কোন একটা উপলক্ষ করে আমাদের জন কয়েককে এখানে ডাকুন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও। তিনি লোক ভাল। আমি বলে-কয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে পারব। আপনি কিন্তু বেশ ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি দেখে যান শ্যামলাল বাবু আপনার আত্মীয়, তাহলে আসছে ইলেক্‌শানে বোর্ডের প্রেসিডেন্টশিপ আপনার কেউ ঠেকাতে পারবেন না।

এখন চিন্তা হইতেছে উপলক্ষ লইয়া। সকলে সেই চিন্তায় একেবারে সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছেন।

মহেশ ভট্‌চায সহসা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সশব্দে এক টিপ নস্য লইল। গাঙ্গুলী মশায় ও বিনয় মাষ্টার সচেতন হইয়া উঠিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। ভট্‌চায কোঁচার খুটে নাক মুছিয়া কহিল—পুষ্যিপুত্তুর নেন—বেশ ধুমধাম করে—

মহেশের অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। একটিকে কোন মতে গাঙ্গুলীর ঘাড়ে চাপাইতে পারিলে তার ভার কিঞ্চিৎ লঘু হয়।

বিনয় মাষ্টার কহিল—যেমন টোলো বুদ্ধি!

ভট্‌চায বিনয়ের দিকে জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল—বুদ্ধিটা খারাপ নয়, যাদের ঘটে বুদ্ধি আছে তারা ঠিক বুঝবে। বলি, গাঙ্গুলী মশায়ের বয়স তো কম হয়নি। এখন থেকে ব্যবস্থা করার তো দরকার।

সমস্বরে প্রশ্ন হইল—কিসের ব্যবস্থা?

—সম্পত্তির। এত বড় সম্পত্তি—সব তো বেহাত হয়ে যাবে। পাঁচ জামাই মিলে লাঠালাঠি করে, মামলা-মোকদ্দমা করে সব তছনছ করে দেবে। একটি নিজস্ব ছেলে থাকলে কেউ আর দাঁত ফোটাতে পারবে না।

বিনয় কহিল—তাহলে পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া কেন? বিয়ে করাই ভাল।

বিনয়ের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে। পার্টিশনের হিড়িকে তিনটি অবিবাহিতা, অভিভাবকহীনা, শ্যালিকা সম্প্রতি তাহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে। তাহাদের একটিকে কোন মতে গাঙ্গুলীর স্কন্ধে চাপাইতে পারিলে তাহারও ভারের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

পণ্ডিত কহিল—বুদ্ধিটি বেশ! বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা! অম্বুলে রোগীর আমড়া খাওয়ার ব্যবস্থা! দু'দিনে সাবাড় হয়ে যাবেন যে! তা ছাড়া তেমন পাত্রীই বা কোথায়?

বিনয় কহিল—পুষ্যিপুত্তুর নিলেই যে সে পোষ মানবে তার মানে কি? তা ছাড়া তেমন ছেলেই-বা কোথায়?

পণ্ডিত কহিল—ছেলে পাওয়া শক্ত হবে না। সদ্বংশের ছেলে, নেহাৎ কচি—

বিনয় কহিল—পাত্রী পাওয়াও শক্ত হবে না। সদ্বংশের, বেশ ডাগর-ডোগর, মানান-সই—

গাঙ্গুলী মশায় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া ইহাদের বাগ্‌-বিতণ্ডা শুনিতেছিলেন। বিনয়ের প্রস্তাবটি তাঁহার বেশ মনে লাগিতেছিল। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব। কারণ, গৃহিণী তাঁহার এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং তাঁহার মত বুদ্ধি-বিবেচনাহীন, বদ-মেজাজী মেয়েমানুষ সংসারে বেশী নাই। তা ছাড়া ঐ যে লোকটি নিশ্চিন্ত ও নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজ পড়িতেছে, ও গৃহিণীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ওর মারফত কথাটা যদি কোন মতে গৃহিণীর কাণে পৌঁছে, তাহা হইলে তিনি নিজে নাজেহাল হইবেনই। তা'ছাড়া সব ব্যাপারটা হয়তো পণ্ড হইয়া যাইবে। গাঙ্গুলী মশায় আড় চোখে মাষ্টারের মুখের চেহারাটা একবার দেখিয়া লইলেন।

মুখ টিপিয়া হাসিতেছে না কি! শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন—কি সব বাজে তর্ক করছ তোমরা? ও সব ছেড়ে দাও। হেড-মাষ্টারকে কহিলেন—কি হে নাতি, তুমি একটা কিছু বল—

হেড-মাষ্টার খবরের কাগজটা সরাইয়া রাখিয়া কহিলেন—আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করে রেখেছি।

গাঙ্গুলী মশাই সাগ্রহে কহিলেন—কি বল দেখি?

মাষ্টার কহিলেন—আজকাল, দেশের যাঁরা গুণী ও জ্ঞানী, দেশ ও দশের উপকারে যাঁরা যত্নবান, তাঁদের 'জন্মতিথি' উৎসব করে সকলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানায়। আপনি তো অনেক দিন ধরে গ্রামের অনেক উপকার করেছেন, স্কুল, লাইব্রেরী, রাস্তা-ঘাটের সংস্কার, সব বিষয়েই আমরা আপনার সাহায্য সব সময়ে পেয়েছি। কাজেই আমাদেরও আপনাকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। আমার ইচ্ছা, আমরা সবাই মিলে আপনার 'জন্মতিথি' উৎসব করব। এতে দু'কাজই হবে। আপনার প্রতি আমাদের সম্মান দেখানো হবে; হাকিমরাও আপনার কাজের পরিচয় পাবেন এবং আমরা সারা গ্রামের লোক আপনাকে কতটা শ্রদ্ধা করি, তা বুঝতে পারবেন। এতে আপনার কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সুবিধা হবে।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—কথাটা মন্দ নয় ভায়া? তবে গাঁয়ের লোক রাজী হবে কি? জানো তো সবাইকার মনের ভাব! আর বছর রেখো হারামজাদা বাগ্‌দীদের নাচিয়ে কি কাণ্ডটাই করালে।

এ গ্রামে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে বাগ্‌দীরা মনসা পূজা করে। বিসর্জনের দিন তাহারা সং বাহির করে। নানা রকমের সাজ-সজ্জা করিয়া তাহারা ভদ্রলোকদের পাড়ায় যায়, ঘরে ঘরে নাচ দেখাইয়া, গান শুনাইয়া পয়সা আদায় করে, সেই পয়সায় মদ খায়। অশিক্ষিত লোকদের সহজ নিরাবিল আনন্দ। কাহারও নিন্দা থাকে না, কুৎসা থাকে না। বর্ত্তমান জীবনযাত্রাপ্রণালীর বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাহাদের মনে যে প্রতিচ্ছায়া ফেলে, তাহাই সহজ ভাবে তাহারা নাচে-গানে প্রকাশ করে। কিন্তু গত বৎসর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। গত বৎসর গাঙ্গুলী মশায় পুষ্করিণী-সংস্কার বিভাগ হইতে টাকা আদায় করিয়া গ্রামের দুইটি পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়াছিলেন।

দুই-চারি জন ছোট-খাটো অংশীদার বাদ দিলে পুষ্করিণী দুইটি এক রকম তাহারই। তা' ছাড়া অনেকের অর্থাৎ রাধানাথের দলের লোকদের বিশ্বাস ইহাতে তিনি মোটা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই ইঙ্গিত করিয়া গত বৎসর সং বাহির হইয়াছিল। ঘটনা উপযোগী গানও কে রচনা করিয়া দিয়াছিল। পরে প্রকাশ পাইয়াছিল যে ইহা রাধানাথেরই কীর্ত্তি।

সকলে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—সত্যি!

পণ্ডিত কহিল—তার চেয়ে পোষ্যপুত্র নেওয়াই ভাল, এতে বাগড়া দেওয়া চলবে না।

বিনয় কহিল—বিয়েই যুক্তিযুক্ত—এমন যায়গার পাত্রী যে সেখানেও বাগড়া দেওয়া চলবে না।

গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—ভারী ফ্যাসাদে লোক তোমরা! একটা বিপদ না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি! বলছি, ও-সব কথা বাদ দাও। হেড-মাষ্টারকে কহিলেন—ভায়া, তুমি যে কিছু বলছ না?

মাষ্টার কহিল—গত বৎসর বাগ্‌দীদের রাধানাথ হাত করেছিল। ওদের মনসা-মেলা সাজিয়ে দিয়েছিল, ছাইয়ে দিয়েছিল। তাই বাগ্‌দীরা ওর কথা মত কাজ করেছিল। তবে ওদের হাত করা শক্ত হবে না। ওদের ভারী ইচ্ছে মনসা-মেলার মেজেটি সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। আমার কাছে এসেছিল ক'দিনই আপনাকে বলবার জন্যে।

গাঙ্গুলী মশায় তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমার কাছে কেন, রেধোর কাছে যাক্।

হেড-মাষ্টার কহিল—তা তো যাবেই—আপনি যদি কিছু না করেন। তবে আমার মনে হয়, ওদের জন্য কিছু খরচ করা ভাল।

গাঙ্গুলী মশায় শুষ্ক স্বরে কহিলেন—কত খরচ?

মাষ্টার কহিল—কত আর খরচ? বস্তা দুই সিমেণ্ট হলেই হয়ে যাবে। সব শুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার বেশী খরচ হবে না।

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া রহিলেন।

হেড-মাষ্টার কহিল—গাঁয়ের ছোকরাদেরও হাত করতে হবে! তাও শক্ত হবে না। লাইব্রেরীর জন্যে শ'খানেক টাকার বই কিনে দিলেই ওরা আপনার জন্যে যা বলবেন করবে।

গাঙ্গুলী মশায় করুণ কণ্ঠে কহিলেন—তুমি যে প্রায় দু'শো টাকার ধাক্কায় ফেললে ভায়া! তার উপর খাওয়ানো-দাওয়ানোর খরচ!

মাষ্টার কহিলেন—কিন্তু ফলটি বিবেচনা করুন। বাগ্‌দীদের কীর্ত্তনের দলটি যখন প্রশেসান করে আপনার গুণ-কীর্ত্তন করতে করতে সভাতে আপনাকে নিয়ে যাবে, তখন কি রকম একটা 'এফেক্ট' হবে বলুন দেখি? হাকিমরা বুঝবে, শুধু ভদ্রলোকদের উপরেই নয়, দুর্গত জনদের উপরেও আপনার কতটা প্রভাব। আজকাল দেশের শাসনকর্ত্তাদের দুর্গত জনদের উপরে ভারী দরদ। তারা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে এমন লোক চান, যারা তাদের উপর দরদী।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—ছোকরাগুলো কি করবে?

—তারাই তো সব করবে। সভা সাজাবে, গান করবে, তরুণদের পক্ষ থেকে মানপত্র দেবে, হামেসা আপনার জয়ধ্বনি করবে, তা' ছাড়া আসল কাজ—প্রতিপক্ষদের দাবিয়ে রাখবে। ওরা দলে থাকলে রাধানাথের দল ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে না।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—সত্যি? যা বলেছ—

হেড-মাষ্টার কহিলেন—স্কুলের পক্ষ থেকে মানপত্র দেব আমি; গ্রামের পক্ষ থেকে দেবেন পণ্ডিত মশায়; ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে মানপত্র দেবার ব্যবস্থা করতে হবে; তবে তা শক্ত হবে না, ইউনিয়ন বোর্ডে যখন আমাদের দল ভারী।

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত কহিল—জন্মদিন করা আজকালকার ফ্যাসান বটে—তবে পাড়াগাঁয়ে ও-সব মানায় না।

হেড-মাষ্টার কহিলেন—মানাবে না কেন? পাড়াগাঁয়ে যদি মানুষের মত মানুষ জন্মাতে পারে তো তার জন্মদিনও হতে পারে।

বিনয় মাষ্টার সমর্থন করিয়া কহিল—সত্যি। বানিয়ে বানিয়ে নভেল-নাটক লিখে যারা নাম করেছে তাদের মধ্যে গাঙ্গুলী মশায়ের

মস্ত মানুষ ক'জন আছে ?. যদি তাদের 'জন্মদিন' হতে পারে, গাঙ্গুলী মশায়ের একশ' বার পারে। হোক জন্মদিন, আমি অন্ততঃ এর সাফল্যের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব। গ্রামের নারীদের পক্ষ থেকে মানপত্র দেবার ব্যবস্থা করব। তারা ওঁকে উলুধ্বনি করে, মাল্য-চন্দন দিয়ে বরণ করবে।

পণ্ডিত মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—মাল্যদানটা করবে কে ?

বিনয় কহিল—কেন আমার বড় শালী। রীতিমত স্কুলে-পড়া মেয়ে; সহরে থাকত, এ সব ব্যাপারে ওস্তাদ; মানপত্রও ও পড়বে।

পণ্ডিত কহিল—ও ধাড়ী মেয়েকে দিয়ে মালা পরানো ভাল নয়। লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। তার চেয়ে একটি ছোট ফুটফুটে সুন্দর ছেলেকে দিয়ে পরানোটাই ভাল হবে। আমার ছোট ছেলেটা দেখতে-শুনতেও বেশ; তেমনই চটপটে—ওই পারবে।

হেড-মাষ্টার কহিলেন—ও-সব বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে পরে। এখন কথা হচ্ছে, জন্মদিন উৎসবটির আয়োজন সুরু করতে হবে কাল থেকেই। বেশী দেরি করা চলবে না। এদিকের সব ব্যবস্থা, সহরে গিয়ে হাকিমদের নিমন্ত্রণ করা, মানপত্র লেখা ও ছাপানো, আরও অন্যান্য ব্যবস্থা—আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ফেলতে হবে। কিন্তু হৈ-চৈ চলবে না—কারও কাছে কোন কথা ফাঁস করা চলবে না। যেন রাধানাথের দল কোন কথা আগে থাকতে জানতে না পারে—বলিয়া হেড-মাষ্টার বিশেষ করিয়া পণ্ডিতের দিকে তাকাইলেন।

পণ্ডিত কহিল—নিশ্চয়! নিশ্চয়! তা আবার করে! এত বড় গুরুতর একটা কাজ!

২

জন্মদিন উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। আয়োজন অবশ্য প্রকাশ্য ভাবেই হইতেছে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা গোপন রাখা হইয়াছে। ছোকরারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। গাঙ্গুলী মশায় লাইব্রেরীর জন্য একশ' টাকা দিয়াছেন। শুধু তাহাতেই হয় নাই। ঘর মেরামত প্রভৃতির জন্য আরও পঞ্চাশ টাকা দিতে হইয়াছে। গাঙ্গুলী মশায় খুঁৎ-খুঁৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাষ্টার বুঝাইয়াছেন—কাজে নামিতে গেলে প্রত্যেক পদে দ্বিধা করিলে চলিবে না। সাফল্যের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে হইবে। লাইব্রেরী-ঘর মেরামত আরম্ভ হইয়াছে। লোকের কাছে প্রচার করা হইতেছে—লাইব্রেরীর বার্ষিকী উৎসবের জন্যই এই আয়োজন। বাগ্‌দীদের মনসা-মেলাটির মেজে বাঁধানোর ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। গ্রামের এক জন তরুণ কবি দুইটি গান রচনা করিয়াছে। তাহাতে গাঙ্গুলী মশায়ের এত অত্যধিক পরিমাণে প্রশংসা করা হইয়াছে যে তাহা শুনিয়া গাঙ্গুলী মশায়ও এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়—ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছেন। তথাপি মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি যে আজীবন গ্রামের মঙ্গল-সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন ইহা মিথ্যা নহে। অবশ্য নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ ভাবে অনবহিত ছিলেন (যদিও গান দুইটিতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতী বলিয়া কীর্ত্তিত করা হইয়াছে) তাহা নহে; তবে রাধানাথের মত তাহাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তা' ছাড়া, নিজের প্রশংসা শোনার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। শুনিতে শুনিতে মনে নেশা লাগে। বার বার শুনিতে ইচ্ছা হয়। যেমন ভালো ফটোগ্রাফারের হাতে তোলা নিজের ছবি বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয় তেমনই। যে জীবনকে খণ্ড খণ্ড ভাবে পথে ছড়াইয়া আসা হইয়াছে, তাহারই সমাবিষ্ট, সমগ্র রূপ দেখিয়া সার্থকতার আনন্দে মন ভরিয়া উঠে। জীবনকে আরও সুন্দর ভাবে যাপন করিবার জন্য মনের মধ্যে সঙ্কল্প জাগে।

বিনয় মাষ্টার 'গাঙ্গুলী মহাশয় প্রশস্তি'—নাম দিয়া একটি লম্বা কবিতা লিখিয়াছে। তাহাতে গাঙ্গুলী মহাশয়ের নানা গুণাবলীর সঙ্গে তাঁহার চির-তারুণ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তাঁহার দীর্ঘ জীবনের জন্য মঙ্গলময় বিভুর কাছে প্রার্থনা জানানো হইয়াছে। মহেশ ভট্টচায সংস্কৃতে একটি কবিতা লিখিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিজের পুত্র নাই বলিয়া তিনি গ্রামের সমস্ত ছেলেদের নিজের পুত্র বলিয়া জ্ঞান করেন; অচিরে তিনি পুত্রবান হইয়া দীর্ঘজীবন সুখে যাপন করুন। শুনিয়া গাঙ্গুলী মশায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিয়াছেন—ও-সব কথা আবার লেখা কেন? লোকে হাসবে যে? বিশেষ করে আবার রেখো! কত রকম কদর্থ করবে—

মাষ্টার বলিয়াছেন—সংস্কৃত কেউ বুঝবে না। পণ্ডিত মশায় যখন কষ্ট করে লিখেছেন, থাক্।

এমনই করিয়া দিন কয়েক কাটিয়া গেল। এক দিন বিনয় মাষ্টার আসিয়া গোপনে গাঙ্গুলী মশায়কে বলিল—আমার ওখানে একটি বার যেতে হবে যে।

গাঙ্গুলী মশায় মনে-মনে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ডাগর-ডোগর মেয়েটির কথা বিনয়ের মুখে অনেক বার শুনিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চোখে দেখা ঘটিয়া উঠে নাই। কহিলেন—কেন বল দেখি?

—রেবতীভূষণ ঘোষ

বিনয় কহিল—আমার লেখা. কবিতাটি তো মিনুই পড়বে। ক'দিন ধরে অভ্যেস করেছে। আপনাকে একটি বার শোনাবে—

গাঙ্গুলী মশায় অন্তরের আগ্রহ সবলে চাপিয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন—আমাকে আবার কেন? আমি তো এ সব বুঝি না। মাষ্টারকে ডেকে নিয়ে যাও বরং। ও সব বোঝে।

বিনয় কহিল—ওর কাছে লজ্জা করবে মিনুর—

গাঙ্গুলী মশায় হাসিয়া কহিলেন—আর আমার কাছে করবে না?

—না, না, আপনার কাছে আবার লজ্জা কি?

গাঙ্গুলী মশায় ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন—তা বটে! বুড়িয়ে মরতে যাচ্ছি, আমার কাছে ছেলে মানুষ মেয়েদের লজ্জা করবার দরকার কি?

'হিতে বিপরীত' ঘটিবার উপক্রম দেখিয়া বিনয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি কহিল—না, না, তার জন্যে নয়। মানে, আপনার সঙ্গে ইয়ের কথা, মানে, আমার স্ত্রী তো ঠারে-ঠোরে বলেছেন কি না। তা' ছাড়া ছেলে মানুষ নয় যে; আমার স্ত্রীর চেয়ে দু'বছরের ছোট, আমার স্ত্রীর এখন বত্রিশ চলছে—

গাঙ্গুলী মশায় কৃত্রিম অনুযোগের স্বরে কহিলেন—তোমার স্ত্রী অন্যায় করেছেন। যা অসম্ভব তাই বলে মিছেমিছি বেচারার মন খারাপ করে দেওয়া!

বিনয় কহিল—মন খারাপ হবে কেন? আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে বর্তে যাবে—

গাঙ্গুলী মশায় ত্রস্ত কণ্ঠে কহিলেন—না, না, ও-সব কথা আর আলোচনা কোরো না। ঠাট্টা করেও না। বাড়ীতে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে আছে সব। তারা অত সব বুঝবে না। পাঁচ কাণ করে একটা কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে বসবে।

বিনয় কহিল—ছেলে-মেয়েদের সামনে ও-সব কথা কেউ বলে না কি! গোপনে বলে। আপনার নাম সব অনেক শুনেছে কি না! আমার স্ত্রী তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ!—দিন-রাত বলে অমন মানুষ হয় না। হবেই না বা কেন। কত দিক দিয়ে কত সাহায্য আপনার কাছে পেয়েছি বলুন দেখি? এখনও পাচ্ছি। আপনার বাগানের তরী-তরকারী পুকুরের মাছ তো দিনই খাচ্ছি। আপনার ঋণ শুধবার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয়তো আমরা প্রস্তুত। শেষ দিকটায় বিনয়ের কণ্ঠ আবেগে গদ্‌গদ হইয়া উঠিল।

বিনয়ের কথাগুলি শুনিতে ভাল লাগিল গাঙ্গুলী মশায়ের। অনেকের অনেক উপকার করিয়াছেন তিনি, কিন্তু এমন করিয়া স্বীকার করে না কেউ।

বিনয় কহিল—মিনু বলেছে ও-রকম লোকের পায়ে স্থান পাই তো স্বর্গে যাব, দিদি। গৌরী শিবকে বিয়ে করবার জন্যে তপস্যা করেছিলেন; বল তো আমিও তপস্যায় বসে যাই।

গাঙ্গুলী মশায় সবিস্ময়ে কহিলেন—বল কি? বলেছে ও-সব কথা! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ফিকে হাসি হাসিয়া কহিলেন—কিন্তু ভায়া, শিবের তো আমার মত জাঁদরেল প্রথম পক্ষ ছিল না, থাকলে গৌরীর তপস্যা বার করে দিত!

বিনয় কহিল—বলেন কি? মা কালীর মত রণ-রঙ্গিণী মেয়ে তপস্যায় রত হন, আর আপনার গিন্নী বশ হবেন না? ওঁকে ও হাত করে নেবে দেখবেন। এমন মেয়ে—

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বিনয় কহিল—কখন যাবেন? আজ সন্ধ্যায় তো? সেই বেশ হবে।

গাঙ্গুলী মশায় চিন্তিত মুখে কহিলেন—একলা যাওয়াটা কি ভাল হবে? মাষ্টার কি ভাববে। তার চেয়ে এক কাজ কর ভায়া! মাষ্টারকেও একবার বলে যাও।

বিনয় কহিল—মাষ্টার মশায়কেও বলতে হবে? একটু ভাবিয়া কহিল—তাই বলে যাই। মিনুকে বলে দেব মাষ্টার মহাশয়ের কাছে লজ্জা না করতে—

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—লজ্জা করলে চলবে কেন? আমাদের কাছেই যদি লজ্জা করেন তো সভায় পড়বেন কি করে, এঁ্যা?

বিনয় কহিল—সে পড়বে ঠিক। অভ্যাস আছে যে। সহরের মেয়ে কি না। তবে কি জানেন, ওর ধারণা মাষ্টার মশায় ভিতরের ব্যাপারটা জানেন হয়তো। তাই লজ্জা—

গাঙ্গুলী মশায় সন্দিগ্ধ স্বরে কহিলেন—ভিতরের ব্যাপার আবার কি?

—আপনার সঙ্গে বিয়ের কথা।

গাঙ্গুলী মশায় ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন—ও-সব কথা বাদ দাও—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠেই কহিলেন—আমার গিন্নীর মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনেছ আর হাসি-খুশী ভাবটাই দেখেছ, কিন্তু মেজাজ খারাপ হলে উনি যে কি হয়ে ওঠেন দেখনি তো! উনি বেঁচে থাকতে ওটা অসম্ভব। যাক গে, আর অন্যান্য ব্যবস্থা সব করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার স্ত্রী সব ব্যবস্থা করেছেন। উনি থাকবেন, আমার বোন থাকবে, মিনু আর আমার আরও দু' শালী থাকবে, এই পাঁচ জনে মিলে উলুধ্বনি করে, শাঁখ বাজিয়ে, খৈ ছড়াতে ছড়াতে আপনাকে সভায় আবাহন করে নিয়ে যাবে, তার পর মিনু মাল্য-চন্দন দিয়ে আপনাকে বরণ করবে।

গাঙ্গুলী মশাই কহিলেন—সভাতে মেয়েদেরও বসবার ব্যবস্থা হবে না কি?

বিনয় কহিল—নিশ্চয় হবে। হেড-মাষ্টার মশায় বলেছেন, এক পাশে কতকটা যায়গা চিক দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হবে।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—শুধু চিক দিয়ে কেন? বেশ বড় করে বেড়া দিয়ে দাও না। কেউ যেন ডিঙ্গোতে না পারে—

বিনয় কহিল—ভলান্টিয়ার থাকবে। কেউ মেয়েদের ওখানে যেতে পারবে না।

—যদি মেয়েরা আসে?

বিনয় ঘাবড়াইয়া গেল। পুরুষদের মাঝে আসিয়া ঢুকিবে—এমন মেয়ে গাঁয়ে কেউ আছে না কি?

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন—আমার গিন্নী যদি সভায় থাকেন, আর ঐ সব চোখে দেখেন তো চিক্-ফিক্ ঠেলে ভিতরে ঢুকে আমাকে টেনে বার করে নিয়ে যাবেন।

বিনয় সবিস্ময়ে কহিল—বলেন কি?

গাঙ্গুলী মশায় শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন—হ্যাঁ, রেগে গেলে সব পারেন উনি। কাজেই মেয়েদের জন্যে কোন ব্যবস্থা করে কাজ নাই ভায়া! আমাদের উদ্দেশ্য তো হাকিমদের সব দেখানো-শোনানো; তা ওঁরা থাকলেই হবে। [ক্রমশঃ।

বিজন ভট্টাচার্য

মুকুন্দ মালাকারের আইবুড়ো বোন আজুরীর কাঁধে ভর নামিয়াছে।

অসুখ নাই বিসুখ নাই সমর্থ বয়সের দামড়া মাগী, তিনটা বাঘ খাইতে পারিবে না এমনই গতোর, হঠাৎ কথা বলিতে বলিতে সেই যে কাটা কলাগাছের মত কুয়োতলায় ভাঙিয়া পড়িল হাত-পা ছড়াইয়া আর উঠিবার নামটি নাই। আজ পাঁচ দিন। মুখে হুঁ না কোন বাক্যি নাই আজুরীর।

চোখ তাকাইয়া নাক ঢাকায় আজুরী। কোন সময় হাসে, কোন সময় কাঁদে। কিছুই কিন্তু সজ্ঞানে নয়। উল্টা-পাল্টা রূপ দেখিয়া কেমন যেন একটু বিদ্‌ঘুটে লাগে সচেতন মনে। মনে হয়, শরীর ও মনের কোথায় যেন আজুরীর অসাড় হইয়া যাইতেছে চুপিসাড়ে।

মালাকার-বউ লক্ষ্মীর পায়ের তলাটা শির-শির করিয়া ওঠে আজুরীর চোখে চোখ মিলাইয়া। গলাটা ঢিলেঢালা মনে হয়। পাঁজরার এক ফালি পেশী থর-থর করিয়া কাঁপিয়া ডিভি মারিয়া ওঠে বুকের মাঝখানে। ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী স্বামীকে বলে, মেয়ের লক্ষণ আমি ভাল বুঝি নে, তুমি ওঝা ডাকো।

মালাকার কোন সাড়া দেয় না। ডাবডোবে চোখ করিয়া সে শুধু লক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া থাকে। চিন্তা-পারাবারের কূল-কিনারা নাই। জীবন-সংগ্রামে শতেক সামাজিক শত্রুর চোট সামলাইয়া আবার আধিভৌতিক অদৃশ্য শত্রুর তাল সে যে কি করিয়া সামলাইবে, এই কথাই সে আকাশ-পাতাল ঠোঁট করিয়া ভাবে।

মালাকারের এই হাবাগোবা গোবেচারী ভাব লক্ষ্মীর কিন্তু ভাল লাগে না। মনে হয়, মরদটা যেন মুহূর্তে মাদী হইয়া গিয়াছে দুর্বিপাকের ধমক খাইয়া।

তিড়বিড় করিয়া ওঠে লক্ষ্মী অস্বস্তিতে। কাঁকালের মেটে কলসীর জল ছলকে পড়ে মাটিতে। সশব্দে কলসীটা বারান্দায় নামাইয়াই লক্ষ্মী ঘুরিয়া দাঁড়ায় মালাকারের দিকে: কি, ব্যাপার কি!

দেমাকী বউয়ের শ্যামা মায়ের ঠমক। যে লক্ষ্মী সেই কালী! গুরুর চরণ স্মরণ করিয়া মালাকার বারান্দা হইতে উঠানে ঠ্যাং নামাইয়া দেয়। পিছমোড়া দুইখানা হাত কোমরের কাপড়ের ভিতর ঢুকাইয়া উঠানে পায়চারি করে আর বলে, ওঝা ডাকতে বলছো কিন্তু ডেকেই বা হবে কি? হয়েছে দেবতার ভর, কালীতলায় পুজো মানত কর, বুড়ো শিবের মাথায় দুধ দাও, পেঁচো-পেঁচীর দোর-ধরুনীদের ডেকে এনে সেবা-যত্ন করাও, ভর করেছেন যিনি তিনি চলে যাবেন তুষ্ট হয়ে। ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে খামখা বিবাদ বেধে কি কোন লাভ আছে?

বিশ্বাস হয় না লক্ষ্মীর মালাকারের কথা। অথচ সোনা কথার নজির দেখাইয়া সোয়ামীর মুখের উপর একটা পাল্টা কটু জবাব দিতেও বুক আসে। একটু ভাবিয়া বলে, তা ঠিক, তবে তাও তোমার গিয়ে অপদেবতারাও তো একরকম দেবতা। ঘাড়-ফুঁ না করলি কি ছেনারা যাবে? যে দেবতার যে নৈবিদ্যি।

বিয়ে-থা পাল-পার্বণের মাস। খাটিয়া-পিটিয়া দুইটা পয়সা হয় যদি তো এই মাসেই। বিঘ্ন ঘটিল। এমন বিঘ্ন যে এড়াইবার পথ নাই। এদিকে এক জোড়া বিয়ের মুকুট আর কপালির বায়না লইয়া খাইয়া বসিয়া আছে, সোলায় এ পর্যন্ত ছুরি ধরিতে পারিল না। সামনে হাট-বার। চার কদম আর একটি পাখীওয়ালা খান-আষ্টেক খাঁচা বানাইতে পারিলে কাজের কাজ হইত। এখন সবই পণ্ড হইতে চলিল। ভাবিয়া থই পায় না মালাকার কি দিয়া কি করিবে। পায়চারি করিতে করিতে উঠানের ডালিম গাছের কয়টা পাতা ছিঁড়িয়া মালাকার কাজে গিয়া বসে।

ভর লক্ষ্মী আগে দেখিয়াছিল এক খুব ছোটবেলায়। ভাল করিয়া মনেও নাই তাহার আজ সব কথা। চোখ বুঁজিয়া খানিকক্ষণ ভাবিবার পর শুধু একটি ছবিই অস্পষ্ট ভাবে তার মনে পড়ে, তাহার বিধবা পিসীমা মাটির দাওয়ার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা কুটিতেছেন; আর সধবা-বিধবা মিলাইয়া জনা কয়েক স্ত্রীলোক ভরগ্রস্তা পিসীমাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। পিসীমার মুখের কথাটারই না কি তখন মূল্য অনেক। সকলেরই বিশ্বাস, বুড়ী যাহা বলিবে তাহাই ফলিবে। সত্য মিথ্যা লক্ষ্মী জানে না। তবে দেখিয়া-শুনিয়া ভর সম্বন্ধে ধারণাটা তাহার এই রকমই।

কিন্তু আজুরীর বেলায় তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া খটকা লাগিয়াছে লক্ষ্মীর মনে। এ ভর ঠিক ভর না। অন্য কিছু। ধারণাটা বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে আবার কালিদাসীর বাঁকা হাসির খোঁচা খাইবার পর হইতেই। ননদিনীর ভরের খবর শুনিয়া কালিদাসী সাদা মনে আসিয়াছিল নিজের মনেরই একটা সংশয় নিরসন করিতে। পাপ মনে আসে নাই। আজুরীর ভাব-সাব দেখিয়া সে-ও রা বাক্যি না কাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এ-কথা সে-কথা বলিয়া। সংশয় কি আর এমনি আসে মনে! দেবতাই যদি ভর করিবে আজুরীকে তো মালাকার-বাড়ী এতক্ষণ তীর্থক্ষেত্রের সামিল হইত। আশ-পাশের দুই-দশটা গ্রামের লোক সিধা লইয়া আসিয়া আজুরীর পায়ের কাছে ধর্ণা দিয়া পড়িত। মুখে মুখে নাম সঙ্কীর্তন হইত অহর্নিশি। অতি ভালবাসে বলিয়াই হয়তো লক্ষ্মীর মনে হয়, বোন আজুরীর সম্পর্কে মালাকার মোহান্ধ। আর নয় তো আত্যোপান্ত সব কথা জানিয়া-শুনিয়াই বোকা সাজিয়া আছে স্বেচ্ছায়। মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই অবশ্য সব সমস্যার সামাধান হইয়া যায়, কিন্তু প্রশ্নটা আবার এমনই ঠোঁটকাটার মত হইয়া পড়ে যে দুই চোখের চামড়া থাকিতে পরাণ ধরিয়া জিজ্ঞাসাও করা যায় না। ছের পাপে মরণ-দশা হয় মানুষের। লক্ষ্মীরও যেন তাহাই হইয়াছে।

বাঁশকাঠির উপর সোলার বাঁদর নাচাইয়া রং তুলি দিয়া চক্ষুদান করিতেছিল মালাকার। হঠাৎ লক্ষ্মী আসিয়া হলুদ রংএর খুলিটা পা দিয়া উল্টাইয়া দিল। তাম্বুল-রংরা ঠোঁট দুইখানির ভিতর হোপখরা ক'রেকটা সাদা দাঁত ভাঙিয়া বলিল, যাওন খাওয়াবার ব্যবস্থা করব আমি, পূজো দেব মানত করব আমি, ওঝা ডাকপো—সে-ও আমি, আর তুমি শুধু বসে-বসে তাজ নাড়বা আর দু'বেলা সমানে পেট পুরে-পুরে খাবা, কেমন? আজুরী আমার সোহাগের বুন—ননদাও

করে না বুলতি। এদিকে পথে ঘাটে আমি তো কান পাতৃতি পারি নে। কলঙ্কডা কি আমার!

এমনিতে সাত চড়ে রা কাড়ে না মালাকার। কিন্তু রং-এর কাজের সময় ব্যাঘাত ঘটাইলে মুকুন্দর আর মাথার ঠিক থাকে না। মেজাজে আগুন ধরিয়া যায়। রাগ চণ্ডাল। লক্ষ্মীর চুলের মুঠি ধরিয়া তখন কঁৎ-কঁৎ করিয়া লাথি মারিতেও মালাকারের পা এতটুকু কাঁপে না।

কিন্তু এবার মালাকার বড় জোর সামলাইয়া গেল। 'কিসির কলঙ্ক রে মাগী—বলিয়াই লক্ষ্মীর পায়ের গোছটা থাবা মারিয়া ধরিয়াই কেন যেন ছাড়িয়া দিল আচমকা। অবরুদ্ধ আক্ষেপ তখন গিয়া পড়িল সোলার হনুমানগুলির উপর। বাঁশের কলগুলিকে দুই হাতে মট-মট করিয়া ভাঙিয়া সোলার তাড়াগুলিকে লাথি মারিয়া সব উঠানে ফেলিয়া দিল। তার পর সেই পাখী-বসানো শোলার খাঁচা —রীতিমত মেহনতের কাজ—সেই খাঁচা দুই পায়ে মাড়াইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল উন্মাদের মত।

জ্বালা বাড়িল লক্ষ্মীর। পায়ের গোছ ধরিয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া পিঠে দুই চারিটা লাথি মারিলেও সমানে সমানে যাইত। অন্তর্দাহনের কিছুই ঘটিত না। কিন্তু যে অঘটন ঘটিয়া গেল তাহা নেহাৎই একতরফা! মুখ ভার করিয়া ইহার পর আর দাঁতে দাঁত লাগাইয়া পড়িয়া আদর কাড়িবার অবকাশ থাকিল না।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া লক্ষ্মী ছুটিল ভিঁটেকপালীর মাঠের দিকে। মালাকার তখন মাথা-ভাঙা আমতলা—লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া জেলা-বোর্ডের রাস্তার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বাবরি চুলগুলি হইয়াছে শিবের জটা—প্রতি পদক্ষেপে মাথার উপর সাপের মত নাচিতেছে।

খুব চটিয়াছে মালাকার। হয়তো সাড়াই দিবে না ডাকিলে। মঙ্গলবার—হাট-বার। চরি দিকে হাটুরিয়াদের ত্রস্ত আনাগোনা। গৃহস্তের বৌ হইয়া আর আগাইয়া যাওয়া চলে না। লক্ষ্মী ভিঁটে-কপালীর মাঠের শেষ প্রান্ত হইতে লজ্জার মাথা খাইয়া চেঁচাইয়া ডাকে, দে শুনছো, এই যে। খোলামেলা তেপান্তরের মাঠ। বাতাসের ঝাপটায় লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর শিমুল তুলার মতই টুকরা হইয়া উড়িয়া গেল। মালাকারের কানে গেল না। লক্ষ্মী অগত্যা ফট-ফট শব্দে জোর জোর কয়েকটা হাততালি বাজাইল। পরিচিত সাংকেতিক আহ্বান—কানে গেলেই মালাকার হয়তো মুখ ঘুরাইবে। কিন্তু এবারও মালাকার ফিরিয়া তাকাইল না। স্বামীলোক—গুরুজন ব্যক্তি, গরু ছাগল না যে ফাঁকা মাঠে কুক্ ছাড়িয়া ডাকিয়া লক্ষ্মী মালাকারের দৃষ্টি ফিরাইবে। তার পর চলনের যে কদম তাহাতে ডাক শুনিলেই যে মালাকার ফিরিয়া আসিবে এমন ভরসা নাই। উপায় না দেখিয়া লক্ষ্মী ফিরিয়া আসে। ক্ষোভ আর অভিমানে দুইখানি চরণ সর্বংসহা বসুধার পিঠের উপর চাপড় মারিয়া চলে।

এদিকে আজুরীর হাব-ভাবের কোন কিন্তু বৈলক্ষণ্য নাই। সুখ-দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া ঢেঁকিশালের বারান্দায় সে ঠিক তেমনই পড়িয়া আছে। বদলাইয়াছে শুধু চোখটা। বাছুরের চোখের মত ডাগর হইয়া ছল-ছল করিতেছে।

লক্ষ্মী আস্তে আস্তে কাছে গিয়া বসে আজুরীর। গা-টা যেন ঠাণ্ডা পাথর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আজ ছয় দিন ছয় রাত পার হইয়া সাত দিনের দিন পড়িল। লক্ষ্মী ভাবে, পাষাণ হইয়া যাইবে না তো আজুরী? কথাটা মনে করিতেই সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া ওঠে আজুরীর। চোখ বুঁজিয়া ওলাইচণ্ডীতলা সোয়া পাঁচ আনার লুটের মানত করে সে।

—বৌ!

যেই মানত সেই বল। চমকে ওঠে লক্ষ্মী! আজুরী কথা বলিতেছে!

—বৌ রে!

দুই আঁচলে চাপিয়া ধরে লক্ষ্মী আজুরীর মাথাটা। মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলে, ঠাকুরঝি!—এই তো আমি, তুই কি বলতি চাচ্ছিস বল। তোর যা মনে নেয় তাই বল। আমি থাকতি তোর কোন ভয় নেই। আর কষ্ট পাস্ নে। আমি সহ্ করতি পারি নে।

বাঙ্ময় হইয়া ওঠে মুহূর্তে আজুরীর সারা মুখখানা। তবু মুখে কথা সরে না। শুধু নীচের বিম্বোষ্ঠটি নিদারুণ একটা আবেগে থর-থর করিয়া কাঁপে।

অব্যক্ত যাতনার মূক অভিব্যক্তি যে দেখে তারও কষ্ট হয়। ত্রস্ত হাতে আজুরীর মাথা-মুখ সাপটাইয়া লক্ষ্মী ধরা-গলায় বলে, ঠাকুরঝি, তুই থির হ। দু'খান পায়ে পড়িছি তোর তুই এট্টু থির হ, ধৈর্য্য ধর। আমারে বুঝতি দে।

ডাঙায়-তোলা মাছের মত হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া ওঠে আজুরীর সারা দেহ। অদৃশ্য বেদনার একটি তীব্র অঙ্কুশ দাঁত টিপিয়া সহ্য করে আজুরী।

ঠাকুরঝি: চীৎকার করিয়া ওঠে লক্ষ্মী ভয়ে।

আজুরী কথা কয় না। চোখ তাকাইয়া কান পাতিয়া শোনে। বেদনার একটা কালো ছায়া জলভরা মেঘের মতই আজুরীর মুখখানির উপর হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। যেন এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে মুখের উপর। ঘামিয়া গিয়াছে আজুরীর গোটা কপালটা। মুখানন এখন বেশ পরিচ্ছন্ন। ধোয়া আকাশের মত। মুখে কথা নাই। শুধু দুইটি সজল চোখ লক্ষ্মীর দিকে স্থির হইয়া জাগে।

সমব্যথিতের বেদনা ঝন-ঝন করিয়া ওঠে লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরে, ঠাকুরঝি!—স্বার্থপরের মত শুধু কেঁদেই গেলি। অপরের দিকি ফিরে চেয়ে দেখলি নে—এই কথাই বলি। কাঁদিয়া ফেলে লক্ষ্মী।

চোখের জল গঙ্গাজল। দুইটা কথা যদি ভরসা করিয়া লক্ষ্মীকে বলিতে হয় তো এখনই। আর হয়তো সময় পাওয়া যাইবে না।

সরু সরু দুই হাতে রক্তের বাঁধ বাঁধিয়া নেয় আজুরী। লক্ষ্মীর মুখখানা কানের কাছে টানিয়া নামাইয়া আস্তে আস্তে বলে, বৌ রে!—আমাকে ধরেছে ভূতে। সতী-সাবিত্রী সমান তুই বৌ, তোর কানে কথাটা বলতেও শেল বেঁধে আমার বুকি। তবু মা জননীর সামিল তুই বৌ, তুই ছাড়া আমার আর কেউ নাই। বলি শোন, গত কার্তিক মাসে—মালাকার দাদার সোণার টুপী নিয়ে আমি যখন হাটখোলার রাস্তায় ফিরি করতি যেতাম···তখন··· দাদার হাতে তখন এটা পয়সা নেই···সংসার চলে না এমনিই অবস্থা···তুই তো সবই জানিস···তখন···আমাকে টাকা দিত রাক্ষসটা···সেই যে মোটাপানা ঘোষবাবু···আর বলতি পারিনে বৌ তুই আমারে মেরে ফেল···আলকুশীর বিষ বেঁটে দে আমি খেয়ে জুড়োই।

ছোট-খাটো সুন্দর আজুরী পাখীর মত লক্ষ্মীর কোলের ভিতর থর-থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। লক্ষ্মী কোন কথা বলে না। শুধু গভীর একটা মমতায় আজুরীকে বুকে চাপিয়া ধরে। কানে কানে বলে, ভয় করিস নে ঠাকুরঝি, আমি আছি।

—তুই থাকিস। আজুরী চোখ বুঁজিল।

আজুরীর দেহ বেড়িয়া লক্ষ্মী বিস্তার করিয়া বসে তার বরাভয়ের পক্ষপুটচ্ছায়া ভয়চকিত ঈগল-মাতার মত। বেটা-পুত নাই—ননদিনীর মাতৃত্বটা যেন মায়াগর্ভের মতই লক্ষ্মীকে পাইয়া বসিয়াছে।

* * * * *

বিকালের দিকে মালাকার বাড়ী ফিরিল। পরিশ্রান্ত চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল, এক হাঁটু কাদা,—সঙ্গে এক বৃদ্ধ গুণীন। এত দিনের ঘটনা-রটনার যা হয় একটা আজই মীমাংসা হইয়া যাইবে। পাড়ার লোকেও ভিড় করিয়া আসিয়াছে গুণীনের পিছু-পিছু।

এই সেই চরসমন্তিপুরের যশস্বী রামনাথ ওঝা। লোকটা ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী। ডাকিলে লক্ষ টাকা দিলেও আসে না, আবার আসিবার হইলে এমনিই আসে। ফুটা আদলাও গ্রহণ করে না। দক্ষিণ্য হালের ছোট-খাটো লোকটার এমনি প্রতাপ।

রামনাথ ওঝা আসিয়াছে। আশপাশের তিনখানা গ্রামে এ একটা মহা সংবাদ। পাড়ার ছেলে-বউরা তো যাত্রা দেখার মত সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়া মালাকার-বাড়ীর দুইখানি দোচালা ঘরের বারান্দায় জাঁকিয়া বসিয়াছে। তা ছাড়া ঘটনার জটিয়তি করিয়া চূড়ান্ত রায় সাব্যস্ত করিবেন, এমন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও মালাকার-বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়াছেন। আসিয়াছেন বিপ্রদাস ঠাকুর, গ্রামের প্রতিভূ স্থানীয় বেণীমাধব ঘোষ, কাছারীর তহশীলদার মোহিনী বাবু, সিধু ভট্‌চায, হারাণ মিত্তির, প্রসন্ন মালাকার প্রভৃতি নামী ভদ্রজন। বিনা নোটাশেই আগ বাড়াইয়া আসিয়াছেন ইঁহারা। কাজেই মুকুন্দ মালাকার ইঁহাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিতে পারে নাই। তাড়াতাড়িতে পশ্চিম ঘরের দাওয়া খালি করিয়া শুধু মাদুর বিছাইয়া দিয়াছে। বিপ্রদাস ঠাকুর আর বেণী ঘোষের জন্য পাড়িয়া দিয়াছে দুইখানা জলচৌকি। সারা দিনের পরিশ্রমের পর মুখে হাসি টানিয়া সভক্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে পিঠের শিরদাঁড়াটাই বুঝি ভাঙিয়া যায় মালাকারের।

বিপ্রদাস ঠাকুর অভয় দিয়া বলেন, এদিকে ব্যস্ত হয়ো না মালাকার, তুমি রামনাথের কাজে যোগান দাও গে। আমরা ঠিক আছি।

পিছনেই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়াছিলেন বেণী ঘোষ। বিপ্রদাস ঠাকুরের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, ও হুঁকো-কোলকের ব্যবস্থার জন্যে অন্য লোক আছে, তুমি ওদিকে যাও। অনুষ্ঠানে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে।

সিধু ভট্‌চাযের মুখ চুলকাইতেছিল। সে বলিল, বিঘ্ন অবশ্য জোর করে না ঘটালে ঘটবার কোন কারণ থাকবে না। কেন না রামনাথ ওঝা অভ্রান্ত। মুনি-ঋষিরা পর্য্যন্ত এ কথা মানে।

হারাণ মিত্তির খুক্ করিয়া হাসিয়া খুঁটে মুখ মুছিল। প্রসন্ন মালাকার, সিধু ভট্‌চাযের মুখের দিকে তাকাইয়া অর্থপূর্ণ ভাবে মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

কথাটা বেণী ঘোষের দিকে ভট্‌চাযের একটু ঘুরাইয়া ছাড়া। বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হইল না।

ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছে সিধু ভট্‌চায। ফোঁস করিয়া উঠিলেন বেণী ঘোষ। ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া গুরুগম্ভীর ভাবে শূন্যে ধমকাইয়া উঠিলেন, এখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার জন্যে কেউ-ই উপস্থিত হননি। যদি কারো জানা না থাকে কথাটা তো জেনে নিন!

বজ্রকঠিন ফক্কা গেরোর মতই বেণী ঘোষের হুঁসিয়ারী ভীরুকে না সমঝাইয়া উল্লসিত করিয়া তুলিল বালখিল্যদের। সিধু ভট্‌চাযেরই হাতের একটা অকালপক্ব ছোঁড়া আবার বিপ্রদাস ঠাকুরের চোখের সামনে ছেঁড়া চটিটা উল্টাইয়া রাখিল। বেণী ঘোষের কানে গেল, দেব-দেবীর নামের সঙ্গে নারদ নামটির ছন্দে আবৃত্তি চলিতেছে পিছন দিকে।

সূত্রপাতেই অশান্তির আভাস পাইয়া বিব্রত বোধ করিলেন বিপ্রদাস ঠাকুর। ভ্রূ কুঁচকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সিধু ভট্‌চাযকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বড্ড বাহুল্য হচ্ছে বলে মনে করো না কি সিধু?

বৃদ্ধ বিপ্রদাসের প্রতি সকলেই সশ্রদ্ধ। সিধু ভট্‌চায দূর হইতে হাত জোড় করিয়া হাসিয়া ছোট একটি নমস্কারে অবনত হইয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে বালখিল্যের দলও হাত-মুখ গুটাইয়া ভদ্র হইয়া বসিল।

হারাণ মিস্ত্রি লাঠি দিয়া উল্টা চটিটা সোজা করিয়া বলিল, কই এবার সুরু হোক বাঘের খেলা। ছেলের দল গোল করিলনি।

আধময়লা একখানা সাদা চাদরে মাথা-মুখ ঢাকিয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়াছিল রামনাথ ওঝা ঢেঁকিশালের বারান্দায়। পাশেই আজুরীকে কোলে করিয়া বসিয়াছিল মালাকার-বৌ লক্ষ্মী। রামনাথের নিকট আত্মোপান্ত সমস্ত ঘটনা অকপটে স্বীকার করিতে তাহার এতটুকু দ্বিধা হয় নাই।

রামনাথ বলিয়াছে, ইষ্ট বই অনিষ্ট করে না আমার তন্ত্র। ভোলা মহেশ্বরের জটা-ধোয়া জল এই আমি ছিটিয়ে দিলাম তোমার মাথায়। মনের অগোচরেও কোন কথা পুষে রেখো না। তা হলে সেই কথাই কালসাপ হয়ে আজুরীরে দংশাবে। আর রক্ষে হবে না। সত্যি কথা কবা যাও ফাটকে যাবা ; তবে জানবা আমি রামনাথ রামেরও নাথ—বাবার বাবা হরের দয়া আমার মাথায়···ইষ্ট বই অনিষ্ট করি নে জীবের।

রামনাথের কথায় ভরসা করিবার অবকাশ ছিল। সুতরাং লক্ষ্মী কোন কথাই গোপন করে নাই।

এইবার সুরু হয় রামনাথ ওঝার মন্ত্র-তন্ত্র। সমাগত ভদ্রজন, বিশেষ করিয়া বিপ্রদাস ঠাকুর আর বেণী ঘোষের সম্মতি লইয়া আসরে নামিল রামনাথ। রহস্যের কালো যবনিকা একটু পরেই উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে শতচক্ষুর সম্মুখে। অধীর আগ্রহে সকলেই স্থির হইয়া বসিল। বিপ্রদাস ঠাকুর এতক্ষণ পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। এখন গুটাইয়া লইলেন জলচৌকির উপর। এখন শুধু নিরীক্ষণের পালা। চৈতন্যের সমস্ত শক্তিটাকে শিখার মত চোখে উস্কাইয়া দিয়া শুধু তন্ত্রের মাহাত্ম্য অবলোকন করা।

বেণী ঘোষের দৃষ্টি বিপ্রদাস ঠাকুরের কাঁধ ডিঙ্গাইয়া রামনাথ ওঝার দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া রামনাথ ওঝা প্রথমে প্রস্তাবনা শেষ করিল। তার পর দিক্-বন্ধন করিয়া আজুরীর চারি দিকে গণ্ডী দিল। এক রামনাথ ভিন্ন আজুরীর উপর এখন আর অন্য কোন আধিভৌতিক শক্তির প্রভাব বিস্তার সম্ভব নহে। পঞ্চভূত এখন রামনাথের করায়ত্ত। এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিয়া গেল রামনাথ :

ছেড়ে দে পথের মাথা
কব তোর আদ্যির কথা,
আউলা বায়ে বাসনা পাই,
মানুষ কি
গরু হোক,
ভূচর কিংবা
খেচর হোক
কারো সম্বন্ধে এড়াএড়ি নাই।

পর-পর কয়েকটা ফুঁ পাড়িয়া নিশ্বাস আটকাইয়া রহিল রামনাথ। গায়ের রক্ত লাফাইয়া উঠিল রামনাথের মাথায়। কপালের দুই দিকের শিরা টঙ্কার দিয়া ফুলিয়া উঠিল। চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল রক্তোচ্ছ্বাসে। ক্রমেই রামনাথ যেন বাঘ হইয়া উঠিতেছে। এমনই দাপট।

কিছুক্ষণ ঝিম্ ধরিয়া থাকিয়াই রামনাথ আজুরীর আপাদমস্তক তিন বার ফুঁ পাড়িয়া ঝাড়িল। তার পর চক্ষের নিমিষে এক লাফে কয়েক হাত পিছাইয়া মাটি কামড়াইয়া ধরিল। সকলে তো থ! করে কি রামনাথ!

কামড় সে বিষম কামড়। মাথা-মুখ গুঁজিয়া দুই পাটি বড় বড় দাঁত দিয়া যেন শিকার ধরিয়াছে রামনাথ। মাঝে মাঝে আবার ঝাঁকুনি দিতেছে দস্তর আক্রোশে। ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিক রামনাথের অপার্থিব প্রক্রিয়া সব। সাধারণ মানুষ কি বুঝিবে!

নাক তুলিয়া নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তাকাইয়া আছেন বিপ্রদাস ঠাকুর। পঞ্চেন্দ্রিয় উৎকর্ণ। স্বতঃস্রাবী মুখের লালা নীচের সৃক্কণীটিকে রসসিক্ত করিয়া পড়িবার অপেক্ষায় একটি মুক্তাফল হইয়া ঝুলিতেছে। তবু খেয়াল নাই।

বেণী ঘোষ বিস্মিত হইয়া গিয়াছে রামনাথের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া। সত্যই জীবনের বহু ক্ষয়ক্ষতির তালিকায়, রামনাথের এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকাটা একটা অপূরণীয় লোকসানের মতই হইয়া থাকিত। তবু এখন তো সবে আরম্ভ। প্রস্তাবনা শেষ করিয়া শুধু একবার একটি ঝাড়ান দিয়াছে মাত্র।

বেণী ঘোষের চোখটা যেন পাথরের। নিস্পন্দ অপলক। সিধু ভট্চাযের দল একেবারে ঠাণ্ডা। রামনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে তাহাদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনা। ছেলে-বউ-মেয়ে-মরদ কারো মুখে একটা কথা নাই।

কয়েকটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইয়া যায়। হঠাৎ হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে আজুরী। কাঁদে আর বলে, উরি বাবা-রে, আমারে ছেড়ে দে তুই—আমি মলাম।

মন্ত্র ক্রিয়া করিতেছে অব্যর্থ ভাবে। আপাত দৃষ্টিতে আজুরীই কাঁদিতেছে বটে, আসলে কিন্তু বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে সেই ভর-করা দানব রামনাথের নখ-দন্তের আক্রমণে।

উঠানের ধূলা নস্যের মত করিয়া দুই আঙুলের টিপে তুলিয়া রামনাথ বলিয়া ওঠে :

কার্ত্তিক গণেশ হাই আমলা
যে বিষ্ণু সেই বিসমিল্লা
সাক্ষী করে এ মামলা
শোনবে কানে এক মোল্লা,
পক্ষপাত
পক্ষাঘাত।
সত্য বই মিথ্যা নাই
হরকালীর ভরসা পাই।
যে দেখে আর যে শোনে
কিংবা মনে অনুমানে,
মাত্তি ভিক্
স্বীকার ঠিক্।

বার-বার তিন বার আজুরীর দেহে ঝাড়-ফুঁ করিয়া রামনাথ শিয়রে গিয়া বসিল টিপ ধরিয়া। মালাকারকে ডাকিয়া বলিল, কালো পাথরের বাটি ক'রে খানিকটা সরষের তেল আন।

হাঁটু গাড়িয়া মালাকার এতক্ষণ নলচিতার মত দাওয়ার এক

কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ঘটনা এখন লোকলজ্জা-ভয়ের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিষ্ঠুর বিধান যার একটু পরেই অনিবার্য্য ভাবে খাঁড়ার মত আসিয়া পড়িবে তাহার মাথায়। তবু দুঃখের চেয়ে মালাকারের শরীরে এখন রাগের মাত্রাটাই বেশী। রাগ বিশ্ব-সংসারের উপর। সকলেই আজ যেন তাহার শত্রু হইয়া গোটা বাড়ীটা অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছে। হিংস্র একটা আক্রোশ থাকিয়া থাকিয়া চক্‌-চক্‌ করিয়া ওঠে মালাকারের চোখে।

লক্ষ্মীর ঘরে এক বাটি তেলের সংস্থান ছিল না। কিন্তু তাহাতে আটকাইল না। চোখের পলকে এক বাটি তেলের জায়গায় তিন বাড়ী হইতে তিন বাটি তেল আসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ বিরামের পরই আবার আসর জমিয়া উঠিল দেখিতে দেখিতে। কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল আগ্রহের আতিশয্যে দুই দিক্‌ হইতে চাপিয়া পড়িয়াছিল তেলের বাটির উপর। সিধু ভটচাযের ধমক খাইয়া তাহারা আবার যথাস্থানে সরিয়া গেল। সাময়িক বিবতির ফাঁকে বর্ষীয়ান ও প্রবীণদের মধ্যে মাথা ঘুরাইয়া আর চোখ টিপিয়া এতক্ষণ যে সাংকেতিক আলোচনা চলিতেছিল রামনাথ ওঝা উঠিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও স্তব্ধ হইয়া গেল।

মালিকুল সাঁই আল্লাআলির দোহাই পাড়িয়া রামনাথ ওঝা লাফাইয়া উঠিল ঢেঁকিশালের বারান্দায়। চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে গুণীনের। কোথাও যেন বাহুল্য শব্দ নাই। রামনাথের কটাক্ষে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে।

দুই ঠোঁটে মন্ত্র আওড়াইয়া রামনাথ এতক্ষণে মাটির টিপটি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, হে সজ্জন!—হরের দয়ায় মন্ত্রপূত এই মাটি এখন আমি গুরুর নাম স্মরণ করে তৈলপাত্রে ছেড়ে দেবো। পঞ্চভূতের সানুগ্রহে এই মাটির মায়া তখন তৈলাধারে ধরবে কায়া। ভূতাদি প্রেত, নিসুপ্ত কি জাগ্রত—তা সে আকাশেই বাসা বাঁধুক আর মাটিতেই বিচরণ করুক দেখবেন বাঁধা পড়েছে ঐ তৈলাধারে। আমি হলাম হরের পেয়াদা। প্রকৃত আসামী হাজির করে দেওয়াই আমার কাজ। তার পর বিচার—সে আপনারা করবেন। বলেছি—পক্ষপাত পক্ষাঘাত, এমন-তেমন হলে দেবাদিদেব সেই ক্ষ্যাপা ত্রিশূলীর তৃতীয় নয়নের পাবক-রোষ কেউ-ই এড়াতে পারবেন না।

> পঞ্চভূতের জনমদাতা বাপের বাবা হরা
> তিন নয়নে জেগে আছেন সাক্ষীসাবুদ খাড়া,
> ইষ্ট ছাড়া দৃষ্টি যিনি দেবেন বাঁকা চোখে
> ঠিকরে আগুন ত্রিনয়নের মরবে সে জন ধুঁকে।

ছড়া কাটিয়া দুই গালে ডমরু বাজাইয়া উঠিল রামনাথ গম্ভীরে। যে শুনিল তাহার বুকের ভিতরটাও গুর-গুর করিয়া উঠিল শঙ্কায়। কে জানে, ভূতসিদ্ধ তান্ত্রিক রামনাথ তাহাদিগকে আজ কি পরীক্ষায় ফেলিবে! অনেকেরই এখন মনে হইতে লাগিল, ঘটা করিয়া আগে-ভাগে আসিয়া আসর না জমাইলেই ভাল হইত।

সূর্য্যদেব সাক্ষী করিয়া সব কাজ নিষ্পন্ন করিতে হইবে। রামনাথ আস্তে আস্তে আগাইয়া গিয়া মন্ত্রপূত মাটির টিপটি সযত্নরক্ষিত তৈলাধারে গুঁড়া-গুঁড়া করিয়া ছিটাইয়া দিল। তার পর তেত্রিশ কোটি দেবতার শুভেচ্ছা গোটা অনুষ্ঠানের মাথায় টানিয়া অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের চরণ-বন্দনা করিল।

বদ্ধকৃতাঞ্জলিপুট তান্ত্রিক রামনাথের সে এক অপূর্ব্ব ভক্তিগাথা। মনে মনে সকলেই মাথা নোয়াইয়া দিল রামনাথের চরণে।

কিছুক্ষণ পরে রামনাথ ধ্যান ভাঙিয়া চোখ খোলে। আজুরীর কপালে খানিকটা গোলা সিঁদূর লেপিয়া দিয়া বলে, একটা জানবে ধরেছে মা-লক্ষ্মীরে বাবুরা। তৈলাধারের দিকে চেয়ে এইবার আপনারা বিধান দেবেন আসুন।

রামনাথের কথায় সকলেই নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু তৈলাধারের দিকে আগাইয়া যাইতে সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সুকঠিন কর্ত্তব্যের আহ্বানে হালকা কৌতূহলের আতিশয্য এখন আর নাই বলিলেই চলে।

বিপ্রদাস ঠাকুর ঢোক গিলিয়া বেণী ঘোষের হাঁটুতে ঠেলা মারিয়া বলেন, যান দেখুন বিচার করুন গিয়ে।

রাসভারী বেণী ঘোষ সহজে বিচলিত হইবার পাত্র নহে। খ্যাক্‌-খ্যাক্‌ করিয়া হাসিয়া বলে, আপনি থাকতে······যা হয় একটা দেখে-শুনে সাব্যস্ত করে দিন।

পিছনেই বসিয়াছিল সিধু ভট্‌চায। কর্ত্তব্যের গুরুত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া বেণী ঘোষকে শুনাইয়া বলে, 'যা হয় একটা সাব্যস্ত' করাটা কি নেহ্য হবে!

'যা হয় একটা সাব্যস্ত' কথাটাতে সত্য অপলাপের যে কিছু মাত্র ইঙ্গিত করা হয় নাই বেণী ঘোষ হয় তো সেই কথাটাই জোর-গলায় বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় মিত্তির-গিন্নী "এ কি দেখলাম রে হারাণ" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। কপালের উপর দুই চোখ ঠেলিয়া উঠিল মিত্তির-গিন্নীর।

শত চেষ্টা করিয়াও কৌতূহল চাপিতে পারে নাই বুড়ী। হঠাৎ তেলের বাটির উপর নজর পড়িয়া গিয়াছে।

সিধু ভট্‌চাযের পিছনেই বসিয়াছিল হারাণ মিত্তির। চীৎকার শুনিয়া সে এক লাফে বেণী ঘোষের মাথা ডিঙাইয়া বৃদ্ধা মা-কে আগলাইয়া ধরিল, কি হয়েছে কি মা?

বৃদ্ধার মুখে কথা জোরায় না। ফোকলা মুখের ভিতর হইতে অনর্গল একটা ছি ছি শব্দ তুবড়ির মত বাহির হইতে থাকে।

দুর্নিরীক্ষ্য বন্যার অস্পষ্ট বাঁধ অনিরুদ্ধ কৌতুকোচ্ছ্বাসে কুটার মতো ভাসিয়া যায় মুহূর্ত্তে। দেখিতে দেখিতে শত চক্ষু উপুড় হইয়া পড়ে তৈলাধারের উপর। বিপ্রদাস ঠাকুর ছুটিয়া গিয়া চক্ষুকে মাথাটা হারাণ মিত্তিরের কাঁধের পাশ দিয়া গুঁজিয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। সিধু ভটচায চেঁচাইয়া বলে, একবার দেখুন পণ্ডিত মশাই আছেন কোথায়! কোন সমাজের মাথা হ'য়ে আছেন একবার দেখে যান চোখ খুলে। একেবারে হৈ-চৈ বাধাইয়া দিল চীৎকার করিয়া সিধু ভটচায।

বার-বার তিন বার—তৈলাধারের উপর মুখ ঝুঁকিয়া দেখিয়া বিপ্রদাস ঠাকুর সিধু ভটচাযের ঘাড়ে হাত দিয়া সরিয়া দাঁড়ান। মাটিটাই হয়তো তাঁহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছিল।

এত উদ্দীপনা এত উৎসাহ কিন্তু তৈলাধারের দিকে তাকাইবার পর হইতেই সকলে যেন কেমন হতভম্ব হইয়া যাইতেছে। খটকা লাগে বেণী ঘোষের। কেমন যেন একলা-একলা মনে হয় হঠাৎ। বিশেষ করিয়া সিধু ভটচাযের সহিত বিপ্রদাসের যোগাযোগটা তাঁহার আদৌ ভাল লাগে না।

সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাপট অমনি চাড় দিয়া ওঠে বেণী ঘোষের মাথায়। বিপ্রদাস হইতে সিধু ভট্টচায পর্য্যন্ত সমস্ত মানুষগুলাকে মনে হয় নগণ্য—ছোট-ছোট। এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত আলোচনার কেন্দ্রগুলি মনে হয় গরু-বাছুরের জটলা। হাসি পায় বেণী ঘোষের।

দূরে ঢেঁকিশালের বারান্দায় মালাকার গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ বেণী ঘোষকে সামনে দেখিয়া সে উঠানে নামিয়া আসিল। করজোড়ে বলিল, এইবার তা ইনি আপনারা যা হয় এটা আদেশ করুন বিচার করে। আমি আর কি বলব।

বেণী ঘোষের কথায় ক্ষুব্ধ অভিমানের ঝনঝনা বাজে: আমি আর দেখে কি করবো? ঐ তো ওঁরাই দেখলেন, ওঁরাই শুনলেন···

আপ্যায়ন করিয়া ডাকিয়া দেখান হয় নাই—সেই অভিমানে কর্ণমূল লাল হইয়া ওঠে বেণী ঘোষের।

ছুটিয়া আসেন বিপ্রদাস ঠাকুর বেণী ঘোষের গলা শুনিয়া। বাধ্যবাধকতার শতসূত্রে বাঁধা এই যজমানী জীবন বেণী ঘোষের বীতরাগে মুহূর্ত্তে বিকল হইয়া যাইতে পারে। বুড়া শিবমন্দিরের সেবাইতিটা গেলেই তো জগৎ অন্ধকার। অথচ সত্য ঘটনা বিকৃত করিয়া কোনক্রমেই বেণী ঘোষের মনতোষণের অবকাশ নাই—জীবন বিপন্ন হইবে ত্রিশূলীর কটাক্ষে। মহা মুস্কিল বিপ্রদাস ঠাকুরের।

বেণী ঘোষই আগে কথা পাড়ে: তা হ'লে বিচার করে সাব্যস্ত করে দিন একটা। গরীব মানুষ···রায় আর কতক্ষণ ঝুলিয়ে রাখবেন!

গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লইতে সিধু ভটচায সিদ্ধহস্ত। হঠাৎ আলোচনার সূত্র ধরিয়া রৈ-রাই করিয়া চেঁচাইয়া বলে, বাঃ, তা কি করে হয়। ঘোষ মশাই না দেখলে রায় সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না। ঘোষ মশাই আর পণ্ডিত মশাই—এঁরাই তো বলবেন। আমরা তো ফালতু। চুলের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ঠেকাইয়া নিজেকে এমন অকিঞ্চিৎকর করিয়া তোলে সিধু ভটচায যে বেণী ঘোষ খুশী না হইয়া পারেন না।

সিধু ভটচাযের কথা শুনিয়া বিপ্রদাস ঠাকুরও হাউ-মাউ করিয়া চেঁচাইয়া বলেন, না সে তো অবশ্যই, ঘোষ মশাই না দেখলে···

না চাহিতেই শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে চারি দিক্ হইতে এই অনকুণ্ঠ আনুগত্যের স্বীকৃতি বেণী ঘোষের অন্তর রসায়িত করিয়া তোলে। এক গাল হাসিয়া বলে, দেখতে বলছেন দেখছি। তবে প্রত্যক্ষ সত্য যা তা তো আপনারাও দেখলেন। আপনাদের কথাই আমাদের কথা।···কই, কোথায় তৈলাধার?

হর্ষ দুঃখ কৌতুক—যুগপৎ অনেকগুলি ভাবের সংমিশ্রণে পিছনে দাঁড়াইয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল হারাণ মিত্তির। এত বড় নাটকীয় ঘটনা জীবনে সে আর কখনও দেখে নাই। রুদ্ধ নিশ্বাসে সে শুধু নিরীক্ষণ করিতে লাগিল বেণী ঘোষকে।

বিপ্রদাস ঠাকুরের মুখে কথা নাই। তিনি শুধু সিধু ভটচাযের মুখের দিকে তাকাইয়া বার বার বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন।

ঘটনা এখন একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অনিবার্য্য গতিতে আগাইয়া যাইতেছে। অভিনেতা সিধু ভটচায এখন সেই নেশায় মাতাল হইয়া টলিতেছে। বিমূঢ় বিপ্রদাসকে আশ্বস্ত করিবার মত এখন আর তাহার মেজাজ নাই। গুরুগম্ভীর পরিস্থিতির মাঝখানে বিপ্রদাস ঠাকুরের হাতে সজোরে একটা চাপ মারিয়া সে বলিয়া ওঠে, কি করছেন, সরে যান আপনি এখান থেকে।

সামনেই মন্ত্রপূত সেই তৈলাধার। ভূতসিদ্ধ রামনাথ ওঝার তান্ত্রিক ক্ষমতার অপূর্ব্ব স্বাক্ষর ঝিম ধরিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া আছে কালো পাথরের বাটিতে। বেণী ঘোষ ঝুঁকিয়া তাকান।

অনিরুদ্ধ আবেগ হঠাৎ হারাণ মিত্তিরের নাভিস্থল হইতে ফাটা শঙ্খের আওয়াজে ঠেলিয়া বাহির হয়: আই রে সিধু···

আনন্দে নয়, আচমকা ভয় পাইয়াই শিহরিয়া উঠিল, সে শব্দ যার কানে গেল।

নির্ভয় শুধু বেণী ঘোষ। চোরা খাদে পা ফেলিয়া বেণী ঘোষ এখন মদমত্ত ঐরাবত। লজ্জা আর ক্ষোভে প্রকাণ্ড বনিয়াদী মুখখানা তাহার রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মাথাটা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে অপমানে। পলাইবার পথ নাই। নিথর একটা স্তব্ধতার গুমোট যেন অবরোধের প্রাচীর তুলিয়া ধরিয়াছে তাহার চার দিকে। সহস্র কণ্ঠ তাহার কানে-কানে যেন একটা কথাই বার বার বলিতেছে, বিচার চাই বিচার চাই।

কারো মুখে টুঁ শব্দটি নাই। অস্বাভাবিক রকম থমথমে একটা অবস্থা যেন বুক চাপিয়া ধরিয়াছে প্রত্যেকটি মানুষের। এমন সময় দৈব আর মানুষী শক্তির বিরুদ্ধে বেণী ঘোষ হঠাৎ দানবের চীৎকার করিয়া উঠিল, আমি মানি না তোমাদের বিচার, যাও।

আসুরিক পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল বেণী ঘোষ।

রামনাথ ওঝা ঢেঁকিশালের বারান্দায় এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ফোঁস করিয়া লাফাইয়া উঠিল আল-কেউটের মত। ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তান্ত্রিকের দুইটা চোখ।

সকলেই দেখিল, বিদ্যুৎএর মতই একখানি আগুন বন্-বন্ করিয়া বেণী ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া গেল।

সিধু ভটচাযের কৌতূহল অপরিসীম। ত্রস্ত পায়ে আগাইয়া গিয়া সে দেখিতে লাগিল আগুনটা ঠিক বেণী ঘোষের গায়ে লাগে কি না।

পলাতকা

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

বহু দিন পরে রজত লাহিড়ীর চিঠি পেল যূথিকা।—'কেমন আছো? আশা করি রজতকে ভোলোনি। সত্যিই কলকাতায় যাচ্ছি। তোমাদের বাসাটা চিনে যেতে পারব না। হয়ত বা সে বাসাতে নেই-ই তোমরা। সাতই তারিখে বিকেল পাঁচটায় এসপ্লানেডের ট্রাম-ছাউনীর নীচে দাঁড়িয়ে থাকো যদি খুব খুশী হব। দেখা হওয়া চাই-ই।'

এ চিঠি এসেছিল দুপুরে। যূথিকা যখন ফিরল স্কুল থেকে তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আজ সারা দিন তার বড় খাটুনি গিয়েছে। ক্লাস নিতে হয়েছে পাঁচটা—তার পর মিটিং ছিল। সে সব শেষ করতে বেলা পড়ে এল। তার পর বাদুড়-ঝোলা ট্রামের আশা ছেড়ে দিয়ে হেঁটেই রওনা হোল যূথিকা। সারা শরীর ঘামে টস-টস করছে। মাথার ভেতর যেন চরকী ঘুরছে, বন-বন—বন-বন। মুখের চেহারাটা পানের দোকানের আয়নায় দেখে যূথিকা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বাড়ীতে ঢুকেই যূথিকা প্রথমে কল-ঘরে গিয়ে ঢুকল। ভালো করে গা না ধুয়ে সে স্থির হতে পারছে না।

কল-ঘরে জলের শব্দ হতেই মায়ের গলা পেল সে। 'কে রে, যূথি এসেছিস না কি?'

গুন-গুন করে গান গাইছিল যূথিকা—মায়ের সাড়ায় জবাব দিল না সে।

অনেকক্ষণ ধরে শরীর জুড়োতে লাগল যূথিকা। ঠাণ্ডা হয়েছে গা। জলের ধারায় যেন সারা-দিনের ক্লেদ ধুয়ে-মুছে গেল, শুধু শরীর থেকেই নয়—মন থেকেও। বড়ো করে একটা নিশ্বাস নিলে সে। আঃ, কি আরাম! একটা আয়না যদি থাকত কল-ঘরে। স্নানের আনন্দ আরো কত বেশী করে পাওয়া যেত। মৃদু হাসল যূথিকা। আয়না! সখ বৈ কি। স্নানের বালতিটা ফুটো হয়ে গিয়েছে। ছড়-ছড় করে জল পড়ছে।—ঘরটুকুটি অন্ধকার। ছোট দরজাটি বন্ধ করে দিলে আর নিজেকে চেনা যায় না। দেওয়ালগুলি জল লেগে লেগে নোণা ধরে গেছে। মাথার উপর ঝুল আর মাকড়সা। আরসোলারা ঘোরাফেরি করে। ওদের কেমন একটা গা-ঘিন-ঘিন করা গন্ধ।

যূথিকা ভিজে কাপড়ে বেরিয়ে এল। তার পর নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলে। ভাইটি এখনও খেলে ফেরেনি। তার বই-পত্তর ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে বিছানার ধারে।

ভায়ের কথা মনে হতেই যূথিকার মুখটা ভারী হয়ে গেল। আজ রাত্রে সে রবিকে ধমকাবে। দরকার হলে মারবে। মা যাই বলুক—কিছুতেই সে তাকে ছাড়বে না। সকাল বেলা সে পরিষ্কার দেখেছে বারো বছরের ভাই রবি সাহাদের ছেলেটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। ও যদি উচ্ছন্নে যায় এ সংসার কে আর ধরে থাকবে।

বারো বছরের রবি মানুষ হয়ে এক দিন তাদের সংসারকে বাঁচাবে এ আশা করে যূথিকা। বড়দা এখন থেকেই যে সুর ভাঁজছেন তাতে আর বেশী দিন তার ভরসা করে না যূথিকা। শুধু মাকে আর ছোট ভাইকে বোনের রোজগারের ভরসায় ফেলে রেখে গেলে হয়ত সম্ভ্রম হানি হবে তাই তিনি এখনো টিকে আছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি কি আর চিরকাল সকলের সঙ্গে এমনি দুঃখের ভাত সুখে করে খেতে রাজী নন।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে মা ডাকলেন তাকে। 'কই রে যূথি, তোর হোল না এখনও।' যূথির ততক্ষণে সারা হয়ে গেছে। সময় একটু বেশীই লেগেছে। তার দোষটাই বা কি। শাড়ীগুলো গুছিয়ে পরতে আজকাল বড়ো সময় লাগে। ফাটাফুটি ঢাকা দিয়ে সামনে গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে বড়ো টানাটানি পড়ে যায়। ছিঁড়েও আসছে সব কাপড়গুলো।

মা তাকে দেখেই আহ্লাদে আটখানা হলেন। বললেন—'বাঁচলুম বাবা! এত দিনে ছেলের যে মনে পড়েছে এই না ভাগ্যি।'

যূথি ত অবাক। 'সে আবার কে? কার মনে পড়ল?'

মা বললেন—'রজত চিঠি লিখেছে রে। তোকে কাল ছাউনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে লিখেছে।' বলে মা তার হাতে

চিঠিখানা দিলেন—'নে, পড়ে দেখ—আর কাল বাপু একটু সকাল করে ছুটি নিয়ে গিয়ে ঠিক দাঁড়াস। সে আবার না ফিরে যায়।'

খামখানা হাতে নিল যুথি। ঘরের হ্যারিকেনের আলোর পাশে গিয়ে বসে সে চিঠি খুলল। নীল কাগজখানা মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে পড়তে লাগল যুথি। আর তার মনের সমুদ্রে অজস্র তরঙ্গ-ভঙ্গে কতো হারাণো ঘটনার উত্থান-পতন হতে লাগল।

ছোট, একটুখানি চিঠি লিখেছে রজত। হাতের লেখা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। তা হবে না-ই বা কেন? সাহেব হয়েছে যে আজকাল। বাংলায় কি আর দরদ আছে?

ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই। যুথিকার কাঁদতে ইচ্ছে হোল একবার। ভুলে যাওয়া বড় সহজ কি না সংসারে? যে শূন্য হাতে থাকে সে ভোলে না। যার চারি পাশে ঐশ্বর্য জমে উঠতে থাকে সেই বরং মনে রাখতে পারে না সব। তুমি যদি না ভুলে থাকো—আমি ভুলিই বা কি করে? ভাবতে পারলে?

বৌদি পিছনে দাঁড়িয়ে বললে—'কি লো কন্যে, রাজপুত্তুরের চিঠি নিয়ে যে একেবারে উন্মন হয়ে গিয়েছ!'

ধড়মড় করে উঠে বসল যুথিকা। 'কি যে ঠাট্টা কর তোমরা। কোন মানে-মাথা নেই।'

ঠোঁট বেঁকিয়ে বৌদি বললে—'ও-সবের বাপু আমরা সত্যিই কিছু বুঝি না। সমাজে দাঁড়িয়ে আরো পাঁচটা মেয়ের মত বাপ-মায়ের পছন্দ-করা বরের গলায় মালা দিয়েছি—তোমাদের মত গন্ধর্ব বিয়ে কাকে বলে তা জানিও না—জানতেও চাইও না বাবা কোন দিন।'

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল যুথিকা। বৌদির গলার তিক্ততায় তার মনের অমৃতটুকু বিষিয়ে উঠল। একটা তেমনি ধরণের জবাব দিতে গিয়েও সে থেমে গেল। ভিতরের থেকে কে যেন তার গলা চেপে ধরল।

বৌদি বললেন—'তা আজ কি খাবার-দাবার সব বন্ধ না কি? ঐ চিঠির বাক্যি গিলে কি পেট ভরছে না কি ঠাকুরঝির।'

যুথিকা শুধু বললে—'আমি যাচ্ছি বৌদি? তুমি এগোও।'

বৌদি চলে গেলে অনেকক্ষণ বসে বসে এলোমেলো কি সব ভাবলে যুথিকা। অসংলগ্ন সব চিন্তা মনের নানা চোরাবালি হতে সরীসৃপের মত আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। তাদের কোনটায় সে শিহরিত হোল, কোনটায় বা সে লজ্জায় মুখ ঢাকলে।

মা বৌদি সবাই তার চিঠি খুলে পড়েছেন। ট্রাম-ছাউনির কাছে গিয়ে ঠিক সময়ে দাঁড়াবার কথা মা-ই প্রথম বলেছিলেন মনে পড়ল। রজতের চিঠি এসেছে এ আনন্দ সংবাদে তখন আর ও-সব কথা খেয়ালই করেনি সে। এখন এই অনধিকারের কুৎসিত চেহারাটায় তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

চায়ের দু'টি বাটি হাতে করে মা এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—'যুথি, চা'টা খেয়ে একটু জিরিয়ে বস দেখি। রজত এলে তাকে কি করে আপ্যায়িত করা যাবে একটু বলাবলি করে নি।'

চায়ের বাটি মায়ের হাত থেকে নিয়ে যুথি থিতিয়ে বসল। তার পর বললে—'তুমি আমার চিঠি খুলেছ কেন মা?'

—'তাতে হয়েছে কি? কে তোমায় চিঠি দিচ্ছে সেটা আমার জানা দরকার নয়? আইবুড়ো সোমত্থ মেয়ে, যে-সে তোমায় চিঠি দেবে না কি?'

আজ সন্ধ্যায় কিছুতেই নিজের মস্তিষ্কের সুস্থতা হারাবে না এ পণ যেন করেছিল যুথিকা। তাই তেমনি কোমল কণ্ঠেই বললে—'তাই বলে খুলবে?'

—'তুমি কোথায় কার সঙ্গে কি করছ, সেটা আমাদের জানার এক্তিয়ার নেই বুঝি? তুমি একটা কাণ্ড করে শেষে লোক হাসাবে, এ হতে দেবো আমি জ্যান্ত থাকতে? তোর বাপ থাকলে তাহলে সাত জুতো মারত তোর মুখে।'

একটুখানি বাঁকা পথে গেলেই এরা কতো কটু আর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তাই ভাবলে বুঝি যুথি। তার পর বললে—'থাক্ তাহলে, রজত আসবে এই তোমার ধারণা ত মা?'

মা একগাল হাসলেন—'আসবে বই কি। তার মাসিমার খবর নিতে আসবে না? তাছাড়া তোর বাপ দেখে যেতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখে যাবো বৈ কি। রজত কি না করেছে আমাদের জন্যে? তুই ত সব জানিস।'

—'মা'—বৌদির গলা পেল যুথিকা। দ্রুত পায়ে আসছে বৌদি—হাতের চুড়ি খন-খন করে বাজছে।

'কি হোল?'—মায়ের গলা যেন ঝিমোনো।

—'এক কৌটো চিনি থাকতে দেবেন না বাড়ীতে? কাল এক-পো চিনি আনিয়েছি—এরি মধ্যে সাবাড় করে বসে আছেন?'

—'আমি বুঝি ডেলা-ডেলা চিনি খাচ্ছি, না? মুখপুড়ী বৌয়ের কথা শোন। আর যদি খেয়েই থাকি তোমার তাতে কি বৌমা? আমার সংসারে আমি চিনি খাই—চাল খাই—তোমার তাতে কি? আর কাল সকালে বেশী করে চিনি চা আনিয়ে রেখো—রজত আমার বড্ডো চা খায়।'

বৌদিও মনের ঝাল মেটালেন—'রজত চা খায়—তার চা-চিনি যোগাবে তার মায়ের চেয়ে মাসী বড়ো। আমি তার সামনেই বেরুতে চাই না। কোথাকার না কোথাকার একটা ছোকরা—আকালের দিনে হাত উপুড় করেছিল আপনাদের সংসারে—তার জন্যে দরদে আর বাঁচি না!'

—'তুমি রজতকে নিয়ে কোন কথা বলো না বৌমা। তুমি তার কি জান—কি জান শুনি না?'

বৌদি জ্বলে উঠলেন—'দেখিনি বলে কি কানে শুনিনি না কি? সবই জানি। বলতে গেলে এখুনি ত কাঁদতে বসবেন পা ছড়িয়ে। তাই কোন কথা কই না।'

'বল—বল না—কি জান? কি জান বল না—তোমার বড্ড বাড় বেড়েছে। বলো—বলো কি জান? আমার মাথার দিব্যি দিলাম—বলো না কি শুনেছ—কি জেনেছ?'

—'সোমত্থ মেয়ে এগিয়ে দিয়ে সংসারের রাহা-খরচ আদায় করেছিলেন আবার কি? এমন জানলে আমার বাবা থোড়াই আমাকে দিতেন আপনাদের ঘরে।' সেই রজতকে আবার মুখ দেখাতে পারবে ত ঠাকুরঝি?'

মুহূর্তে কি যেন একটা ঘটে গেল। চায়ের বাটিটা মায়ের হাত থেকে ঠিকরে গিয়ে লাগল বৌদির কপালে। কাটল কি কাটল কিছুই দেখতে পেল না যুথি। শুধু তার বিশ্বভুবন অন্ধকার করে একটা কালো ঢেউ গর্জে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর সেই তরঙ্গের ধাক্কায় কখন যেন অচেতন হয়ে গেল সে।

'বৌদি !'

আবার মৃদু কণ্ঠে ডাকলে যুথি—'বৌদি !'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বৌদি বসেছিলেন। কপালের ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে—সেখানে কিছুটা রক্ত জমে আছে।

কাপড়ে রক্তের দাগ।

—'তুমি মুখটা ধুয়ে ফেল বৌদি—ওটুকু আমি বেঁধে দি।'

—'থাক—তুমি আর কষ্ট করো না ঠাকুরঝি। তোমার দাদা আসুন, এর একটা ফয়সালা হয়ে যাক।'

—'দাদা ? তুমি দাদাকে ও-কথা বলতে পারবে বৌদি ?'

বৌদি তেমনি শান্ত সুরে বললেন,—'আমায় বলতে হবে না—তোমার মা-ই আগে বলবেন।'

—'আমি মা'র মুখ চাপা দেবো। তুমি শুধু একটু মিথ্যা বানিয়ে বলো।'

—'সত্যি-মিথ্যে জানি না। জিজ্ঞেস করলে স্বামীকে সত্যি কথা বলাই আমার ধর্ম।'

—'তবে তাই হোক'—বলে যুথি উঠে এসে নিজের ঘরে বসল।

রবি এসে ঘরে ঢুকল। দিদিকে দেখে বললে—'বড় ক্ষিদে পেয়েছে—আমায় খেতে দাও।'

—'আমি দিতে পারব না। মা'র কাছে যা।'

ঝড়ের সমস্ত ঝাপটাটুকু ধুয়ে-মুছে একেবারে পরিষ্কার করে দেবার পণ যুথির। আজ ও কিছুতেই হার মানবে না।

রবি ততক্ষণে মার কাছে গিয়ে তম্বি করছে—'দেবে কি দেবে না বলে দাও—আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

মা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'চুলোয় যা—চুলোয় যা হারামজাদা।' কিন্তু রবি ছাড়বার পাত্র নয়—চেঁচামেচি শুরু করে দিল। তখন মা উঠে তাকে দুড়দাড় করে পিটতে সুরু করলেন—'হারামজাদা —অলপ্পেয়ে ছেলে! মর না—মর না। কেন তোদের আমি গরভে ধরেছিলাম। তোরা বৌ-চলানো পুরুষ—ঘরের কথা সেই ত আবার কাল সাপের কানে ফিসফিসিয়ে বলবি।'

যুথি দৌড়ে উঠে এল। রবিকে বুক দিয়ে আড়াল করে বসল।

মা তাকে দেখে বললেন—'যা যা—যার সঙ্গে হয় চলে যা না। তোর বাপ যদি তোর চলানির পয়সায় ওষুধ খেয়ে থাকে—যদি খেয়ে থাকে সে যেন নরকে পচে। আর তোর দাদা! সে কম নেশা করেছে রজতের পয়সায় ? সে পয়সায় যেন তার কাল ধরে।'

রবিকে বুকের ভেতর আড়াল করে যুথি বসে রইল। মা কখন সরে গেছেন—তাও টের পায়নি সে। এখন তার কান্নার গোঁঙানি কানে আসছে।

রাত সরছে।

দাদা এলেন। বৌয়ের কপালের ক্ষত দেখে রাগারাগি করলেন প্রথমটা। সব শুনল যুথি। আর মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল যে সে যেন মরে যায়। তার সম্ভ্রম নিয়ে আবার যদি কুৎসিত ঝগড়া বেধে ওঠে মায়ে-বেটায়, শাশুড়ী-বৌতে—তাহলে সে জানবে ভগবান নেই। কোথাও নেই। কোন দিন ছিল না।

কিন্তু দাদা অদ্ভুত ভাবে শান্ত হয়ে রইলেন। বৌদিই তাকে ঠাণ্ডা করেছেন। দুটি হাত জোড় করে যুথি এক বিরাট শূন্যতাকে প্রণাম করলে। কি যে বললে তা সে নিজেই জানলে না।

সমস্ত বাড়ীটা নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। আজ কেউ খায়নি। মার খেয়ে অবধি রবি সেই যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে যুথির কোন আদরেই আর সাড়া দেয়নি।

রবির গায়ে হাত দিয়ে যুথি শুয়ে শুয়ে এক অন্ধকার জগতে হাতড়ে বেড়াতে লাগল। তাকে ঘিরে চারি পাশে ঝম-ঝম অন্ধকার। কোথাও আলো নেই—দয়াহীন, মমতাহীন, আশ্রয়হীন এক নিষ্ঠুর অন্ধকার যেন তার বুকের উপর জগদ্দলের মত বসে রইল। আর একটুখানি আলোর জন্যে যুথি আকুলি-বিকুলি করতে লাগল।

তার পর এক সময় সেই অন্ধকার যেন পাতলা হয়ে এল। একটা টিম-টিম আলো সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন কার চোখের স্নিগ্ধ আলোর জ্যোতি অনির্বাণ ভাবে জ্বলতে লাগল।

রজত! কতক্ষণ বাদে তবে যুথির স্মৃতির পটে রজত এসে দাঁড়াল। কেমন যেন আধ-চেনা-চেনা লাগছে রজতের চেহারা।

রজতের কথা মনে হতেই যুথির বাবার কথা মনে পড়ল। বাবার চোখে কি যে নিরীহ ভীরু চাউনি ছিল। যেন সবেতেই হার মানছেন—যেন দুনিয়ার কোথাও তার নিজের জমি নেই।

দাদার বন্ধু ছিল রজত। দাদাই তাকে পরিবারে এনে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। তখন যুথি কলেজে মাত্র ঢুকেছে।

'দিদি!'

রবির কাঁপা গলায় যুথি চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি পা ফিরিয়ে বললে—'কি রে ?'

—'মা কেন আমায় মারবে ?'

—'তুমি দুষ্টুমি করলে তোমায় মারবে না ? তুমি সাহাদের ছেলের সঙ্গে বিড়ি টানছিলে কেন ?'

দিদির বুকের ভেতর মুখ গুঁজে রবি চুপটি করে পড়ে রইল।

যুথি তখন ভাইকে আদর করে বলতে লাগল—'তুই ভালো ছেলে হবি ত রবি—নইলে আমাদের কত দুঃখু হবে বল ত ?'

কতক্ষণ রবি চুপ করে রইল। তার পর ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে—'দাদা জুতো মারবে কথায় কথায়—মা বলবে, হারামজাদা মর না। তোমাদের দুঃখু ঘোচাতে আমার বয়ে গেছে। আর একটু বড়ো হয়ে আমি যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না।'

—'তাই ভালো। তোরা সবাই চলে যাস। তুই ভায়েতে চলে যাস। আমি আর মা ভিক্ষে করে চালিয়ে যাব যত দিন পারি। তাতে তোদের বেশ মুখ উঁচু হবে ত ?'

তার পর দু' ভাই বোন আবার চুপ-চাপ হয়ে গেল।

আবার একটা অন্ধকার দেয়াল আড়াল করে দাঁড়াল যুথির দৃষ্টি।

দাদা সিগারেট চেয়ে চেয়ে খেত। দোকানে গিয়ে চপ-কাটলেট খেয়ে আসত। সিনেমা-থিয়েটারে সঙ্গী হোত রজতের। তখন দাদা ছিল বেকার। এক পয়সা রোজগার ছিল না।

বাবা সেই রিটায়ার হয়েছেন। সংসারে আয় তখন একেবারে শূন্যের পাতায়। অথচ খরচ কত সংসারে।

সদ্য ঘুম-ভাঙা একটি কিশোরীর মনে যদি রেখাই পড়ে থাকে তাতে কি-দোষ ছিল কিছু ? সেদিন ত কোন অন্যায় ছিল না তার মধ্যে—কোন লোভ-প্রতারণার পিচ্ছিলতা! পৃথিবীকে ভালো লাগার আলোয় চোখ ছিল স্নিগ্ধপ্রভ। তখন কে জানত, আলোর

আড়ালে সংসারের কোটরে কোটরে বাস করে পাপ? হিস-হিস করে চড়ে বেড়ায় বীভৎস সাপ?

পাঁচটি বছর পরে আজ সেই পাপ কথা তুলে তাকে ভয় দেখিয়েছে। ছোবল মেরে তার সমস্ত জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে।

এক সময় ঘুম তাকে মুক্তি দিলে। যুথির দু'টি ক্লান্ত চোখ ভরে ঘুমের বিভোরতা এল জোয়ারের মত। ভাসিয়ে নিলে তাকে ক্লেদ থেকে—নোংরামি থেকে—বেঁচে থাকার তিক্ত বিড়ম্বনা থেকে।

ভোর বেলা স্বপ্ন দেখলে যুথি। ট্রাম-ছাউনির কাছে দাঁড়িয়ে আছে রজত। পুরো বৈমানিকের সাজ। দুই কাঁধে দু'টি ঈগলের প্রতীক। পা থেকে মাথা অবধি গাঢ় নীল ভারী পোষাক। চেহারাটা আরো যেন ভারিক্কি হয়েছে। ধুতি-পাঞ্জাবীর চেনা রজতকে যেন ডাকতেই সাহস হচ্ছে না।

কিন্তু রজত এগিয়ে এসে যুথির লজ্জা ভাঙলে।

—'তাহলে তুমি এলে? চিঠি পেয়েছিলে ত? পেয়েছিলে নিশ্চয়ই—নইলে কি আর এসেছ?'

—'এক নিশ্বাসে এত কথার জবাব দেওয়া যায় না কি? দাঁড়াও, একটু দেখতে দাও। দু' দণ্ড ভাবতে দাও।'

কিন্তু রজতের আর তর সয় না। 'বাঃ—কথা কইছ না যে? এ্যাদ্দিন বাদে দেখা—চল ট্যাক্সি করি।'

যুথির আর ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই। একটা অশরীরী যাদুতে যেন সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে।

—'কোথায় যাবে বল? রজতের দুরাসন্ন প্রত্যাশা। সে প্রত্যাশা কিসের?

সহসা যুথিকা যেন আত্মহারা হয়ে গেল। রজতের কোলে উপুড় হয়ে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

—'কি হোল যুথি?'

—'তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে চল। আমায় বাঁচাও সংসারের হাত থেকে।'

রজত হাসল—'সংসারের হাত থেকে? বটে! তবে তাই চলো।'

কপালে চিন-চিন করে ঘাম হচ্ছে। ব্লাউজটা গায়ে রাখা যাচ্ছে না। ঘুম ভাঙতেই কি যে অস্বস্তি হতে লাগল।

রবির গা থেকে কখন হাত সরে গিয়েছিল। বালিশে মুখ গুঁজে কি বিশ্রী স্বপ্ন দেখলে সে। ভালো করে চোখ চাইলে যুথি ফরসা হয়ে এসেছে পূবে।

সতেরো বছরের মন তার মরে গেছে কখন তা সে জানতেও পারেনি এক বছরে। আজ বাইশ বছরে তাতে পচন সুরু হয়েছে বুঝি।

সকাল বেলা দরজা খুলে বেরোতেই প্রথমে দাদার সামনাসামনি পড়ে গেল সে। অথচ এইটুকুই ভয় ছিল তার—ভয় ছিল তার সব থেকে বেশী। ইস্কুলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে বলে সে সকাল সকাল পালাবে মনস্থ করে রেখেছিল। তার পর স্কুল সেরে আড্ডা দেবে কোন শিক্ষয়িত্রী বান্ধবীর বাড়ী। সেখান থেকে ফিরবে সন্ধ্যা ঘেঁসে।

তাহলে রজত? রজতকে আর সে দেখা দেয়? এতোতেও যদি তার জ্ঞানচক্ষু না ফুটে থাকে তবে আর কি! এর পরও যে অভাগী তার পিছনে ধাওয়া করবে তার যেন মরণ-দশা ঘটে।

—'কি রে যুথি, আজ না কি রজত আসবে লিখেছে?'

নিস্পৃহ কণ্ঠে যুথি বললে—'দয়া করে লিখেছে।'

দাদা যেন আপন মনেই বললেন—'ওঃ, কত দিন পরে ওর সঙ্গে দেখা হবে। ছেলেটা কিন্তু ছিল বেশ। হাবা-গোবা গোছের। কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল ছোঁড়াটা। কখন আসবে রে? আজ একটু সকাল সকাল ফিরতে হবে।'

—'তুমি বরং এসপ্লানেডে গিয়ে অপেক্ষা করো না তার জন্যে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।'

—'হ্যাঁ—আমি গেলে আবার চলে? তোকে লিখেছে তুই যাবি। আমায় তো আর লিখেনি।

—'আমার যাবার সময় হবে না বোধ হয়।'

যুথিকার গলার ঔদাসীন্যে দাদা একেবার গভীর করে তাকালেন তার দিকে। তার পর ঈষৎ শ্লেষ মিশিয়ে বললেন—'যাবি—যাবি। নিজের পায়ে কুড়ুল মারবি এমন বোকা মেয়ে তুই নস।'

আবার সেই অন্ধকারটা যুথিকাকে তাড়া করে এল। বললে —'তুমিও এ কথা বললে দাদা? বলতে পারলে এত বড় মিথ্যে কথাটা?'

তার কাঁধ চাপড়ে দাদা আবার বললেন—'সংসারটা কাজ গুছিয়ে নেবার জায়গা। না নিলে মরবি—পস্তাবি। যাস ঠিক সময় মত। আমারও দরকার আছে তার সঙ্গে। সামনে পূজোটা আসছে। তোদের সংসারে ঢালতে ঢালতে আমি একেবারে ফতুর হয়ে যাচ্ছি তো?'

—'তার মানে তাকে বাড়ীতে এনে একটা নোংরামি না করলে তোমাদের কারুর ভাল লাগছে না, এই ত? তার ঋণ সেই ভাবেই তোমরা শুধতে চাও—তাই না?'

তার দাদার মুখে এক বিচিত্র হাসি দেখতে পেলে যুথিকা। 'জানিস রে খুকী, স্বার্থপর হই আর যা হই অমানুষ নয় তোর দাদা। সাংসারিক জীব আমরা, আমাদের জন্যে তুই কেন দুঃখ পাবি? তুই ত লেখাপড়া শিখেছিস?'

এই সকাল বেলা দাদার মুখের কথায় কি যে ভালো লাগল যুথিকার। তার মনের কালো কালো পুঞ্জীভূত মেঘ যেন দাদার ঈশান কোণের ঝড়ের তাড়ায় কোথায় উড়ে চলে গেল—আর তাদের কোন দিশা রইল না।

—'যাস কিন্তু—ভুলিসনি।'—বলে দাদা কল-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

যাব—যাব। যুথিকার মনের ভেতর মাদলের তালে বাজতে লাগল দু'টি কথা।—যাবো—যাবো।

সারা সকাল সে উঠতে-বসতে নাইতে-খেতে সাজতে-গুজতে খালি শোনাতে লাগল নিজের মনকে—যাবো—যাবো।

কাল সন্ধ্যেবেলা যা হয়ে গেছে তা দুঃস্বপ্ন। দাদাকে সে যা ভাবে তা সত্যি নয়। মানুষ চেনা বড়ো শক্ত। তা সে রক্তের সম্বন্ধ হোক নাই বা কেন?

মা কথা কইলেন না তার সঙ্গে সারা সকাল ধরে। কিন্তু বৌদি তাকে আদর করলে।

—'কাল সারা রাত মাথার কটকটানিতে ঘুমুতে পারিনি ভাই ঠাকুরঝি। কি যে ক্ষ্যাপা রাগ হয়ে গেল কাল। এখন যন্ত্রণায় মরছি। তোমার দাদারও ত' হাজারো কৈফিয়ৎ। হবে নাই

না কেন—পুরুষ মানুষ, খেটে-খুটে এলো অফিস থেকে। হাসিমুখ করে না দেখা দিলে একটা তিতিভাব আসতেই পারে তার মনে।'

—'তুমি কি বললে বৌদি ?

—'বললাম, ঠাকুরঝির সঙ্গে হাডুডু খেলতে গিয়ে পড়ে মাথা ফাটিয়েছি।'

হেসে বললে যূথি—'তাতে দাদা কি বললেন ?'

যূথিকার বাহুতে চিমটি কেটে মধুর হাসি হাসলেন বৌদি—বললেন 'কি গো ঠাকুরঝি—কি করলেন বলো।'

'যাঃ' বলে যূথি স্নানের জন্য প্রস্তুত হলো। খেয়ে-দেয়ে বেরুচ্ছে যখন যূথি তার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন বৌদি। বললেন—'ছিঃ এ কি সাজ ?'

—'কেন বৌদি ?'

—'ঘরে এস'—বলে বৌদি তাকে ঘরে ডেকে নিলেন।

তার পর যূথিকার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে আঙুল তুলে বললেন—'সাজতে বলছি না আমি। তবে অনেক দিন পরে প্রথম দেখা হবে—একটু ছিমছাম হয়ে যাওয়াটা কি ভাল নয় ?'

—কিন্তু ইস্কুলে সবাই কি ভাববে বলো ত ?

—'বলবে নেমন্তন্ন যাবে।'

সুতরাং আত্মসমর্পণ করলে যূথিকা বৌদির কাছে। বৌদি তাকে নিজের একখানা পাতলা দুধ-শাদা শাড়ী দিলেন। গায়ে পরতে দিলেন ভয়েলের জামা। হাতে-মুখে একটু সাবান মাখিয়ে দিলেন। তার পর বললেন—'জানি না বাবা, তোমাদের আজকালকার মেয়েদের সাজের ঢঙ কি। চুলটা হাতে জড়িয়ে কাঁধের শিওরে রেখে দিও বাপু! তোমার ও-চুল নিয়ে এখন বসলে আমার বেলা পুইয়ে যাবে।'

যূথি একবার দেয়ালে ঝোলানো আয়নার দিকে তাকালে। অভিসারিণীর মত দেখাচ্ছে না কি তাকে ? সাজে-গোজে যতই মানান হোক—তবু কেমন যেন এলোমেলো ছড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। সেটুকু তার চোখে পড়বেই।

মধুর মন নিয়ে যূথি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রোজকার মত মা'র পায়ে প্রণাম করে সে ইস্কুলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মুখ ফেরানোই ছিল মায়ের। যূথি শুধু শুনলে তার পিছনে মা বললেন—'বোকা মেয়ে।'

মায়ের কথায় আর সে সাড়া দিলে না।

পিরিয়ডের পর পিরিয়ড এগিয়ে চলল একটানা। তার মধ্যে ভাববার অবকাশ নেই—একটু হাঁফ ছাড়ার অবধি সময় পাওয়া যায় না। ইতিহাসের নানা যুগে রয়েছে মেয়েরা। কোন শ্রেণী পড়ছে কনিষ্কের পর ভারতবর্ষের অন্ধকারময় যুগ—কেউ পড়ছে ইংলণ্ডের স্বেচ্ছাচারী রাজাদের কীর্তি-কাহিনী।

মধ্যে একটা পিরিয়ড ছুটি ছিল। সে সময়টুকুও জিরোতে পারলে না সে। বাংলার একটা ক্লাস নিতে হোল তাকে।

যাক্, শেষে ছুটির ঘণ্টা পড়ল।

যূথি আর অপেক্ষা করলে না। সোজা বেরিয়ে পড়ল এসপ্ল্যানেডের ট্রাম-ছাউনির উদ্দেশ্যে। রজত যদি কথা ঠিক রাখে তাহলে যূথি গিয়েই ধরতে পারবে তাকে। আর সামরিক শৃংখলায় আবদ্ধ রজত কথার ঠিক রাখবে বই কি!

ট্রামে উঠে বসল যূথি। চলো—চলো। এগিয়ে চলো—পালিয়ে চলো।

তাই বলে সংসার থেকে পালিয়ে নয়।

সংসার থেকে পালিয়ে। ভোর রাত্রের দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ল যূথির। আর সেই দিনের বেলা তার সমস্ত সত্তা রী-রী করে উঠল। রজতকে নিয়ে পালিয়ে সে কি আবার সংসারের ঘূর্ণাবর্তেই আটকা পড়বে না ? কি করে অমন স্বপ্ন দেখল সে ? তার অবচেতন মন কি কুশ্রী মানসকেই না বহন করছে।

ভাবতে ভাবতে ট্রাম-ছাউনি পৌঁছে গেল যূথি। নিরালা দেখে একটি জায়গা বেছে সে দাঁড়াল রজতের প্রতীক্ষায়। হয়ত রজত আসবে মিলিটারী পোষাকে। হয়ত হাত ধরে দাঁড়ালেও যূথি তাকে চিনে নিতে পারবে না।

বোকা মেয়ে! তার পিঠের কাছে মায়ের গলা শুনতে পেল যেন সে। বোকা কিসে ? সেজেছে বলে ? বৌদির সঙ্গে ভাব করেছে বলে ? দাদাকে বিশ্বাস করেছে বলে ?

ধীরে ধীরে যূথির মনে সেই ধূসরতা নেমে এল। মন নীচ সন্দেহে দুলতে লাগল। হয়ত যূথিকাকে মাঝে রেখে দাদা তাকে আরো বেশী করে শোষণ করবে। জানতেও পারবে না যূথি। হয়ত দাদা বৌদি মিলে সেই ষড়যন্ত্রই করেছে। নইলে অত-বড় কথার পর বৌদি তাকে সাজাতে বসবে কেন ?

মা আর রবিকে ভাসিয়ে দেবে না কি সে নিজের সুখের জন্যে!

কি একটা অস্বস্তি হতে লাগল যূথির মনে। বিপরীত তরঙ্গের ধাক্কায় ধাক্কায় তার ক্লান্ত মন ভেঙে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে শরীরও যেন শ্লথ হয়ে এল।

ঠিক সেই সময় ট্যাক্সি থেকে নামল রজত। ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা সেই পুরোনো রজত। ঠিক তেমনি! ঠিক তেমনি।

আর একটা দুরন্ত ভয়ে যূথিকা কেঁপে উঠল। তার পর সারা শরীর ঝাঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে দৌড়লো উল্টো দিকে।

তার পিছনে সহস্র কণ্ঠে মায়ের কথা প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। বোকা মেয়ে! বোকা মেয়ে!

ভূকম্পনের উৎস নির্ণয়

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

ভূমিকম্পের মত ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় পৃথিবীতে আর দু'টি নেই। বন্যাও ভূমিকম্পের চেয়ে কিছু কম নয়, তবে বন্যা পৃথিবীর সর্ব্বত্র হয় না। যেখানে বিরাট জলরাশি আছে তারই আশ-পাশে বন্যা হয়। ভূমিকম্পের প্রকোপ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কোন বিরাট জলরাশির তীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে ভূমিকম্প হলে সে জলরাশিও তার প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারে না। জল-বক্ষে প্রথমে ওঠে উত্তাল তরঙ্গরাশি, তার পর তা বিরাট আকারে বন্যার সৃষ্টি করে সমস্ত আশ-পাশ ধ্বংস করে দেয়।

গাছের শেকড় যেমন মূল থেকে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, ভূগর্ভেও তেমনি একটি মূল কেন্দ্র হতে বহু শেকড় বার হয়ে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাটার ঐ শেকড়ের ভেতর দিয়ে তীব্র বিদ্যুৎ-শিহরণের মত তীরবেগে ভূকম্পন ছুটে চলে দূর-দূরান্তরে, আর সেই সঙ্গে ওঠে শত-সহস্র নর-নারী, জীব-জন্তুর আর্ত্তনাদ; কড়-কড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ে অট্টালিকা, মন্দির, গীর্জ্জা; মাটী ফেটে বেরিয়ে পড়ে বড় বড় ফাটল। ফাটলের ভেতর থেকে বেরোয় উত্তপ্ত জল। আহত ও নিহত জীব-জন্তুর তপ্ত রক্তে রাঙ্গা হয়ে ওঠে ভূকম্পনের ধ্বংসলীলার পথ। কয়েকটি মুহূর্ত্তের মধ্যেই মানুষের শত-সহস্র বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যায় একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে। ইটালীর ভিসুভিয়স্, আইস্‌ল্যাণ্ডের হেক্‌লা, জাপানের ফুজি প্রভৃতি আগ্নেয়গিরির দেশে বন্যা-প্রপীড়িত পূর্ব্ববঙ্গের মত ভূমিকম্প নিত্যই লেগে আছে। আগ্নেয়গিরির সঙ্গে মাটীর শেকড়ের যোগ থাকে, এই কারণে অগ্ন্যুৎপাতের তারতম্যে এই সব অঞ্চলে নিত্যই ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভূমিকম্প ঘটে থাকে। যেমন মজবুত বাঁধ দিয়ে বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে, বৈজ্ঞানিকরা আজ ভূমিকম্প প্রতিরোধেরও তেমনি একটা উপায় আবিষ্কার করেছেন। কীট-দষ্ট দাঁতকে সমূলে উৎপাটন করে দন্তরোগ নিরাময় করার মত মাটীর দুষ্ট শেকড়কে নির্মূল করে তুলে ফেলে দিলে, দেখা গেছে সে অঞ্চলে আর আদৌ ভূমিকম্প হয় না। ভূমিকম্পের মূল কেন্দ্রটি (EPicentre) নির্ণয় করে সাধারণতঃ সেটিকে উৎখাত করে দেওয়া হয়।

ভূমিকম্পের মূল কেন্দ্র নির্ণয় :—

ভূকম্পনের উৎস নির্ণয়ের পেছনে একটু ইতিহাস আছে। ১৮৯১ সালে জাপানে উপর্য্যুপরি কতকগুলি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে যায়। সেই সময় তরুণ জাপানী বৈজ্ঞানিক ফুসাকিচী ওমোরী (Fusakichi Omori) জাপানের ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটি থেকে সদ্য ভূকম্পন বিদ্যায় গ্রাজুয়েট হয়ে আসেন। ভূকম্পনের ধ্বংসলীলা দেখে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, বড় বড় পাথরের দীপাধার, যাকে জাপানী ভাষায় বলা হয় 'সিবুমী' (Shibumi)-গুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। পর্য্যবেক্ষণ করে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, ভারি দীপাধারগুলি নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেও তাদের অধিকাংশই যেন পড়েছে বিশেষ একটা দিকে। এতে তিনি একটি অতি মূল্যবান ইঙ্গিত পেলেন। তাঁর মনে হলো, ভূপতিত দীপাধারগুলি সঙ্কেত করছে,—কোন্ পথ ধরে ভূকম্পনের তরঙ্গগুলি ছুটেছে। তাঁর মনে হলো, ভূকম্পনের গতিপথ খুব সম্ভবতঃ পতিত সিবুমীগুলির সঙ্গে সমান্তরাল হবে। যদি তাই হয়, তাহলে ভূকম্পন-বিধ্বস্ত অঞ্চলের বিভিন্ন দিকে পতিত দীপাধারগুলির সমান্তরাল কতকগুলি রেখা অঙ্কন করলে, ঐ রেখাগুলি গিয়ে যে বিন্দুতে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হবে, সেইটাই হবে ভূকম্পনের মূল কেন্দ্র। তিনি প্রথমে একখানি মানচিত্রের ওপর সমস্ত দীপাধারগুলির পতনের দিক্ অঙ্কন করলেন, তার পর তাদের পতনের দিকের সমান্তরাল করে কতকগুলি রেখা টানলেন। সেই রেখাগুলি মানচিত্রের যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদন করলে সেইটাকেই তিনি ঐ ভূকম্পনের মূল কেন্দ্র বলে স্থির করলেন। পর্য্যবেক্ষকরা ওমোরীর মানচিত্রে প্রাপ্ত বিন্দুটির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন যে, সেই অংশের ধ্বংসলীলার দৃশ্যই সব চেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর। ফুসাকিচী ওমোরী এই উপায়ে বিশ্ববিখ্যাত "মিনোওয়ারী" ভূমিকম্পের উৎস সন্ধানে কৃতকার্য্য হলে, তাঁর এই 'থিওরী' ভূ-বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়। তাঁর এই থিওরী অবলম্বন করে আজকের ভূকম্পন-বিশারদরা ভূমিকম্পের পর গুরুভার স্তম্ভ-জাতীয় বস্তুর পতনের দিক্ নির্ণয় করে ভূকম্পনের মূল কেন্দ্র আবিষ্কার করে থাকেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর ফুসাকিচী ওমোরী-প্রদর্শিত প্রথায় বিভিন্ন গোরস্থানের ভারি পাথরের স্তম্ভ-জাতীয় বস্তুর পতনের দিক্ নির্ণয় করে লস্ য়্যাঞ্জেলিসের পার্শ্ববর্ত্তী কম্পটন সহরের নিচে ঐ ভূকম্পনের মূল কেন্দ্র পাওয়া যায়। ডক্টর টমাস্ ক্লিমেন্টস্ এই কেন্দ্র আবিষ্কার করেন। এই কাজের জন্যে তাঁকে বিধ্বস্ত অঞ্চলের চৌদ্দটি গোরস্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়। ঐ অঞ্চলের ইতিহাস অনুশীলন করে পরে জানা যায়, বহু বার কম্পটন সহরে অনেক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেছে। কম্পটন সহর সম্বন্ধে মন্তব্য করে তখন তিনি লিখলেন,—"The fault-line under the Compton area, was marked for ever as a potential destroyer."

সাইজমোগ্রাফ :—

মান-মন্দিরে যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের তীব্রতা, দূরত্ব ও উৎস নির্ণীত হয় তার নাম সাইজমোগ্রাফ। বৈজ্ঞানিক 'মাইন' (Mline) ও বৈজ্ঞানিক 'স' (Shaw) নামক দু'জন বিশ্ব-বিখ্যাত ভূকম্পন-বিশারদের মস্তিষ্ক হতে এই যন্ত্রের উদ্ভব; তাই এর নাম হয়েছে "মাইন-স-সাইজমোগ্রাফ" (Mline-Shaw-Setismograph).

ভূকম্পন-অনুলেখক যন্ত্রটি অতি সূক্ষ্ম হলেও তার পরিকল্পনা আদৌ কঠিন নয়। প্রথমে বেশ গভীর করে মাটী খনন করে তার ওপর কংক্রিট্ করে একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। তার পর ঐ মঞ্চের ওপর বেশ মজবুত করে 'লম্ব' ভাবে একটি ইস্পাতের সুদৃঢ় দণ্ড বসান হয়। ঐ দণ্ডের গায়ে মাটার সঙ্গে সমান্তরাল আর একটি দণ্ড সংযোগ করা হয়। দ্বিতীয় দণ্ডটি এমন ভাবে লাগান হয় যাতে প্রথম দণ্ডটি সামান্য আন্দোলিত হলেই সেটি 'পেণ্ডুলামের' মত মুক্ত ভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হতে পারে। মাটীতে কম্পনের সূত্রপাত হবা মাত্র দ্বিতীয় দণ্ডটি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হতে থাকে। ঐ দণ্ডের প্রান্তে একটি অতি সূক্ষ্ম সূচ লাগান থাকে। সূচটি আলতো ভাবে পড়ে থাকে একটি ঘূর্ণনশীল 'ড্রামের' ভূষো-পরান কাগজের ওপর। সূচীবাহক বাহুটি সঞ্চালিত হবা মাত্র সূচটি কাগজের গায়ের ভুষোর ওপর আঁচড় কাটতে সুরু করে। ড্রামটি ঘূর্ণনশীল হওয়ায় সূচ আঁচড় কাটার সঙ্গে সঙ্গে আঁচড় কাটা অংশ সূচের নিচে থেকে সরে যায় এবং ভূকম্পনের স্বাক্ষরটি ঐ ড্রামের কাগজের ওপর পরিষ্কার ভাবে লেখা হয়ে যায়। প্রত্যেক মান-মন্দিরে ভূমিকম্পের দিক্-নির্ণয়ের জন্যে একসঙ্গে এমনি দু'টি করে যন্ত্র লাগান থাকে। একটি উত্তর-দক্ষিণমুখো ও অপরটি পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখো। এমনি দু'টি সাইজমোগ্রাফ যুগপৎ কাজ করায়, ভূমিকম্প যে দিকেই হোক না কেন তা ঠিক একটি না একটি ড্রামে অনুলিখিত হয়ে যাবেই। ড্রাম দু'টির সঙ্গে ঘড়ি সংযুক্ত থাকায় ড্রাম দু'টির কাগজের গায় সময়ও লেখা হয়ে যায়।

ভূকম্পনের তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য :—

প্রত্যেক ভূমিকম্পে তিন রকমের তরঙ্গ দেখা যায়; (১) প্রাথমিক, (২) মাধ্যমিক, ও (৩) চরম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তরঙ্গ পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তর দিয়ে ছুটে আসে; চরম তরঙ্গটি পৃথিবীর দীর্ঘতম পথ ধরে পৃথিবীর একেবারে ওপরের স্তর দিয়ে আসে। এই তরঙ্গটির গতি প্রায় সর্ব্বদাই স্থির। এই তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে চার 'কিলোমিটার' পরিমাণ হিসাবে ছোটে। প্রধাবিত তরঙ্গের গতি হিসেব করে এবং এক একটি তরঙ্গ কত কত সেকেণ্ড পর পর এসে পৌছচ্ছে, তা জানা গেলে তার থেকে কত দূরের কোন্ স্থানে ভূকম্পের সূত্রপাত হয়েছে তা অনায়াসেই সঠিক ভাবে বলা যায়।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূকম্পন-বিশারদদ্বয় :—

মিষ্টার জে, জে, স (J. J. Shaw) হলেন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূকম্পনবিশারদ। তিনি দীর্ঘ আটত্রিশ বছর যাবৎ ভূকম্পনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে চলেছেন। পশ্চিম ব্রোমউইচে মাটার নিচে একটি মদ রাখবার ঘরে তাঁর বিজ্ঞানাগার। ঘরখানি অন্ধকার, সেঁতো, চতুর্দ্দিকে ধুলো, মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ; এদিকে-ওদিকে ছড়ান মদের বোতল; তারই মাঝে বসান তাঁর নিজের আবিষ্কৃত বিশ্বের সূক্ষ্মতম সাইজমোগ্রাফ্‌টি। সেইখান থেকে তিনি, কোনও ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই "ব্রড-কাষ্ট" করে সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষদের জানিয়ে দেন—অমুক জায়গায় এত বেজে এত মিনিট এত সেকেণ্ডে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়ে গেল।

মিষ্টার জে, মাইন্ (J. Mline) আর এক জন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূকম্পনবিশারদ। তিনি টোকিয়ো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভূকম্পন বিষয়ের অধ্যাপক। সুদীর্ঘ কাল ধরে তিনি জাপানের বহু শত ভূকম্পন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এ বিষয়ে বহু প্রকার যন্ত্রপাতিও নির্ম্মাণ করেছেন। এখন তিনিও মিষ্টার স-র মত আইল-অব-ওয়াইট' (Isle of Wight) নিউপোর্টের নিকটস্থ সাইড্ নামক এক জনমানবহীন স্থানে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। সেই নিভৃত গবেষণাগারে একাই তিনি ভূকম্পন বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন।

একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সূচনা :—

ভূকম্পনবিশারদ মিষ্টার 'স' এক জায়গায় বলেছেন,—"আমার একটি নিজস্ব বেতার-যন্ত্র ছিল। এক রাত্রে হঠাৎ ভূকম্পন-যন্ত্রে এক ভূকম্পনের স্বাক্ষর সুরু হলো। আমি ঘোষণা করলুম,—একটি ভয়ঙ্কর ভূকম্পনের সূচনা হচ্ছে।

"তার কয়েক মিনিট পরেই এক জন আগন্তুক আমার দরজায় এসে উপস্থিত। তিনি আমার ঘোষণা শুনে আমার গবেষণাগার খুঁজতে খুঁজতে আসছেন। আমি কি ভাবে ভূকম্পন নির্ণয় করি, তিনি নিজের চোখে তা দেখতে এসেছেন। আমি তাঁকে ভূকম্পন-অনুলেখক যন্ত্রের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে লাগলুম; তখন আমার সাইজমোগ্রাফের কাঁটা দু'টি বিদ্যুৎবেগে ভূমিকম্পের স্বাক্ষর লিখে চলেছে। দেখতে দেখতে প্রাথমিক তরঙ্গ রেকর্ড করা হয়ে গেল। এর কয়েক মিনিট পরেই সুরু হলো মাধ্যমিক তরঙ্গ রেকর্ড করা। প্রাথমিক কম্পন অতি মৃদু। একখানি মাল-বোঝাই লরি চলে গেলে কাছের মাটীতে যেমন কম্পন অনুভূত হয়, এ কম্পন ঠিক তেমনি। সাইজমোগ্রাফের ড্রামে প্রাথমিক কম্পনের রেকর্ডগুলি ছোট ছোট আঁচড় দিয়ে লিখিত হয়। মাধ্যমিক কম্পনের তরঙ্গ ড্রামের ওপর আরও বড় বড় আঁচড় কাটে। চরম তরঙ্গের রেকর্ড এত বড় হয় যে আগের দু'রকম তরঙ্গের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। শেষ তরঙ্গটি এসে পৌছুতে অনেক দেরি লাগে। এ ক্ষেত্রে শেষ তরঙ্গটি প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে এসে পৌছুল।"

রাত্রে অনেক সময়ই মিষ্টার 'স'র ভয় হয়—তাঁর সাইজমোগ্রাফটি থেমে যায়নি ত? তিনি ঘুমের মাঝে উঠে প্রায়ই আলো জ্বেলে যন্ত্রটি পরীক্ষা করে দেখেন। সে রাত্রেও তেমনি দেখতে এসে আলো জ্বেলেই তাঁর চোখে পড়ল হঠাৎ সাইজমোগ্রাফের কাঁটা দুলতে সুরু হলো। জীবনে তিনি চোখের ওপর ভূমিকম্পের সূত্রপাত হতে এই প্রথম দেখলেন। প্রাথমিক তরঙ্গের পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সর্ব্বশেষ তরঙ্গটি এসে পৌছুল। দু'টি তরঙ্গের মধ্যে এর চেয়ে বেশী সময়ের পার্থক্য আর হতে পারে না। এর থেকে অনুমিত হয়, যেখানে সেই ভূকম্পন হয়ে গেল সে স্থানটি মিষ্টার 'স'র গবেষণাগারের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত অর্থাৎ নিউজিল্যাণ্ডে। পরের দিন পৃথিবীর বিখ্যাত পত্রিকাগুলির শিরোনামাতে মোটা হরফে ছাপা হয়ে বেরুল,—

"গত রাত্রে নিউজিল্যাণ্ডে পৃথিবীর প্রচণ্ডতম ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ভূকম্পনবিশারদ মিষ্টার জে, জে, 'স' এই ভূকম্পনটি প্রথম প্রত্যক্ষ করেন।"

"I was the first man in Britain to know of the terrible Newzealand earth-quake, which next morning, was the topic of a million breakfast table"—J. J. shaw.

পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ডক্টর এ, এম্, হেরণ (A. M. Heron) সিমলা হতে এক বেতার বক্তৃতায় বলেন,—পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মাটীর ওপরের স্তূপে কল-কারখানা, বাড়ী, যান-বাহনের চাপ অসমান ভাবে প্রতিনিয়ত মাটীর ওপর পড়ায় ভূপৃষ্ঠে কতকগুলি ফাটল-রেখার সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই পৃথিবীতে ভূকম্পনের প্রকোপও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

গড় পড়তায় সারা পৃথিবীতে বছরে ২,৭৫০,০০০ লোক ভূমিকম্পে মারা যায়। প্রত্যেক বছরে পৃথিবীতে প্রায় চারশ' ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। গড় পড়তায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর এক একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। গত তিন শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে চলেছে।

দামোদরগুপ্ত প্রণীত

কুট্টনী মত

অনুবাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

[১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ পিটারসন ক্যাম্বের শান্তিনাথ মন্দিরের পুঁথিশালায় আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত 'কুট্টনীমত'র একটি পুঁথি প্রাপ্ত হন। পুঁথিটি খণ্ডিত এবং তাহার নাম ছিল 'শম্ভলীমতম্'। তাহার পর জয়পুর মহারাজের আশ্রিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ আরো দুইখানি জীর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই তিনখানি পুঁথি অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় ১৮৮৭ অব্দে বোম্বায়ের নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত 'কাব্যমালা'র তৃতীয় গুচ্ছকে ইহা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে যান। সেইখানে বঙ্গীয় অক্ষরে লিখিত কুট্টনীমতের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি প্রাপ্ত হন। এই পুঁথির নকলের তারিখ ২১২ নেবার অব্দ অর্থাৎ ১১১২ খৃষ্টাব্দ। ইহা অপেক্ষা পুরাতন বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই পুঁথিটি এখন 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলে'র সম্পত্তি ও তাহার পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে স্বর্গীয় পণ্ডিত তনুসুখরাম ত্রিপাঠী কুট্টনীমতের একটি সম্পূর্ণ ও সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ইনি এশিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি ও অন্যান্য পুঁথি এবং কাব্যমালার মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্টে এই সংস্করণটি প্রকাশিত করেন এবং স্বয়ং 'রস-দীপিকা' নাম্নী টীকা সংযোজিত করেন। তাহার পর স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এক কাশ্মীরী ছাত্র শ্রীমধুসূদন কৌল এশিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিটি সম্পাদন করিয়া দিলে বহু কাল পরে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহা 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের' Bibliotheca Indica গ্রন্থমালার অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হয়।

আমরা তিনটি মুদ্রিত সংস্করণ দৃষ্টে এই অনুবাদ করিয়াছি, এক্ষণে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিতেছি—

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষার্ধে কবি দামোদরগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। কর্কোট-বংশীয় নৃপতি মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য যখন কাশ্মীরের সিংহাসনে (খৃ ৭৭৯—৮১৩) তখন ইনি তাঁহার মধ্য মন্ত্রী ছিলেন। দামোদরগুপ্তের রচনা-ভংগী অতি সুন্দর—অলংকার ও শব্দ-সম্পদে ইহা অপূর্ব। পরবর্তী বহু কবি ও সুভাষিতকার দামোদরের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'কুট্টনীমত' ব্যতীত সম্ভবতঃ ইনি অন্তত আরও একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার নামে উদ্ধৃত বহু শ্লোক এই কাব্যে দেখিতে পাই। এই কাব্যটি 'কামসূত্রে'র 'বৈশিক' অধিকরণ অবলম্বনে রচিত। সুললিত কাব্যের ভিতর দিয়া কবি দেখাইতে চান, কিরূপে চতুর গণিকাগণ ছলা-কলা, কৌশল প্রভৃতির সাহায্যে দুর্বলচিত্ত যুবকদিগের সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহাদিগকে সর্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যায়। 'কাব্যশেষে কবি বলিয়াছেন—

"কাব্যমিদং যঃ শৃণুতে সম্যক্কাব্যার্থপালনেনাসৌ।
নো বঞ্চ্যতে কদাচিদ্বিটবেশ্যাধূর্তকুট্টনীভিরিতি।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই কাব্য শুনিয়া তাহার উপদেশ মত কার্য করে সে কখনও বিট, বেশ্যা, ধূর্ত ও কুট্টনীগণের দ্বারা বঞ্চিত হয় না]

অনুরক্তা কামিনীর কটাক্ষে যাঁহার বাস, রতির শতদল সদৃশ মুখে যিনি ভ্রমরের ন্যায় চুম্বনরত সেই মনোভবের জয় হউক। (১).

হে সজ্জনবৃন্দ, দোষ সমূহ উপেক্ষা করতঃ যে লেশমাত্র গুণ ইহাতে আছে তাহাতে মনঃসন্নিবেশ করিয়া দামোদরগুপ্ত রচিত এই "কুট্টনীমত" শ্রবণ করুন। (২)

সমস্ত পৃথিবীর ভূষণ-স্বরূপা ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যশালিনী এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান জনগণ দ্বারা অধ্যুষিতা বারাণসী নামে এক নগরী আছে। সেই স্থানের এমনি মহিমা যে তথাকার জীবগণ আসক্তি সহকারে সেই সমস্ত ঐশ্বর্য উপভোগ করিলেও তাহাদিগের পক্ষে শশধরখণ্ডবিভূষিত (মহাদেবের) দেহসাযুজ্যলাভ দুষ্প্রাপ্য

নহে। তথাকার বারনারীগণ চন্দ্র (১)-বিভূষিত দেহ, বিভূতি-শালিনী (২) ও বিশিষ্ট ভুজঙ্গ(৩) সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পশুপতির তনু-তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তথায় অত্যুচ্চ দেবায়তনগুলির শিখরে বিচিত্র পতাকা সমূহ বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় আকাশ মঞ্জরিত উদ্যানের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। অবলাগণ অবিরত (ইতস্ততঃ) সঞ্চরণ করায় তাঁহাদিগের চরণতলের অলক্তকরাগে রঞ্জিত হইয়া তথাকার ধরাতল স্থলকমলবনের শোভা ধারণ করিয়া থাকে। তাহার চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডল রমণীগণের অলংকার-ঝংকারে এইরূপ মুখরিত হইয়া থাকে যে অধ্যয়নরত ছাত্রগণের পাঠস্খলন আচার্যগণ (শুনিতে না পাওয়ায়) সংশোধন করিয়া দিতে পারেন না। (৩—৮)

বিন্ধ্যাটবী যেরূপ মত্তবারণসমাকীর্ণ সেইরূপ বারাণসী নগরী মত্তবারণ(৪) সমূহ দ্বারা শোভিত এবং কৃষ্ণপক্ষের রজনীর আকাশ যেরূপ উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত সেইরূপ সেই নগরী সুধা-ধবলিত গৃহ সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত*। ছন্দঃশাস্ত্র যেরূপ যতি (৫) ও গণ (৬) রূপ গুণালংকৃত সেইরূপ বারাণসী নগরী যতিগণের(৭) গুণরাশি দ্বারা নিত্য প্রসিদ্ধ। বনপংক্তি যেরূপ তরুসমাচ্ছন্ন উহাও সেইরূপ প্রাকার-বেষ্টিতা তুরুষ্কবাহিনী যেরূপ বহুলগন্ধর্বা (৮) তথায় সেইরূপ বহু গন্ধর্ব (৯) বাস করিয়া থাকে। (৯-১০)

তথায় (সকলেই কুলীন) কেবল তারাসমূহ অ-কুলীন (১০)। সেখানে (কেহই দোষযুক্ত নহে) কেবল পেচকগণ সর্বদা দোষ (১১) ভালবাসে। সে স্থানে (মনুষ্যগণ বৃত্ত (১২) ভংগ করে না) কেবল গদ্যেই বৃত্ত (১৩) ভংগ হইয়া থাকে। অক্ষক্রীড়ায় ব্যতীত পরগৃহ রোধ (১৪) তথায় অজ্ঞাত। সেই স্থানে তপস্বিগণই কেবল শূল ধারণ করিয়া থাকেন (অন্যথা শূলরোগ তথায় নাই)। সেই স্থান কেবল মাত্র বৈয়াকরণগণ ধাতু লইয়া বিবাদ করেন (অন্যথা স্বর্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে কোন বাদ-বিসম্বাদ (১৫) নাই।) তথায় (দুর্বলের উপর কেহ বল-প্রয়োগ করে না) কেবল সুরতকালেই অবলাগণকে আক্রমণ করা হইয়া থাকে (১৬)। তথায় হস্তিগণ মদচ্যুতি কালে দানচ্ছেদ (১৭) করিয়া থাকে (অন্যথা দাতাগণ দানচ্ছেদ (১৮) করেন না)। তথায় কেবল মাত্র সূর্যই তীব্রকর (অন্যথা রাজকর তীব্র (১৯) নহে)।

১ স্বর্ণালঙ্কার। ২ ঐশ্বর্য। ৩ বিট, নাগর।

৪ প্রাসাদ-অলিন্দ। * মূলে আছে 'প্রোজ্জ্বল ধিষ্ণোপ-শোভিতা'। 'ধিষ্ণ' অর্থে এক পক্ষে 'নক্ষত্র' অন্য পক্ষে 'গৃহ' এবং 'প্রোজ্জ্বল' একপক্ষে 'উজ্জ্বল কিরণযুক্ত' অন্যপক্ষে 'উত্তমরূপে সুধা-ধবলিত' বা চূণকাম করা। ৫ ছেদ। ৬ মগন প্রভৃতি অষ্টগণ। ৭ সন্ন্যাসিগণ। † মূলে আছে 'সশালা'। 'শাল' অর্থে এক পক্ষে 'বৃক্ষ' অন্য পক্ষে 'প্রাকার'।

৮ গন্ধর্ব—অশ্ব; বহুলগন্ধর্বা—যথায় অশ্বারোহী সেনার প্রাচুর্য। ৯ গায়ক। ১০ কু—ভূমি; অকুলীন—ভূমিসংলগ্ন নহে। ১১ রাত্রি। ১২ সদাচার। ১৩ ছন্দঃ। ১৪ পাশাখেলায় যুগ্ম শারী বা ঘুঁটি দ্বারা প্রতিপক্ষের গৃহ বন্ধ করা। ১৫ মূলে আছে 'পরবেদিষু যত্র ধাতুবাদিত্বম্'; পরবেদি—বৈয়াকরণ। ১৬ মূলে আছে 'সুরতেষ্বলাক্রমণম্' অবল—দুর্বল; অবলা—স্ত্রীলোক। ১৭ মদোদক-ক্ষরণ। ১৮ দানকার্যে অস্ত্যহানি। ১৯ দুঃসহ।

তথায় সুহৃদ্‌গণের হৃদয়ের অবিবেক (২০) দৃষ্ট হয় (অন্যথা কোন অবিবেক (২১) নাই)। তথায় যোগিগণ কেবল দণ্ডগ্রহণ করে (অন্যথা দোষ করিয়া কেহ রাজদ্বারে দণ্ড গ্রহণ করে না)। তথায় কেবল (ব্যাকরণের) প্রগৃহ্য সংজ্ঞায় সন্ধিচ্ছেদ (২১) হয় (নচেৎ তস্করগণ সন্ধিচ্ছেদ করে না)। ছন্দের প্রস্তারবিধিতেই কেবল গুরুসকল বক্ররেখা দ্বারা জ্ঞাপিত হয় (নচেৎ তথায় ব্রাহ্মণাদি গুরু সকলের অনার্জবস্থিতি (২২) নাই) *। তথায় বীণায় পরিবাদ (২৩) ব্যবহৃত হয় (অন্যথা কোন পরিবাদ নাই)। তথায় দ্বিজগৃহেই কেবল অপ্রসন্নতা (২৪) (অন্যথা কোথাও অপ্রসন্নতা নাই)। (১১—১৪)

তথায় যেরূপ সৎকবি রচিত দৃশ্যকাব্যে অনুরূপ বৃত্ত ঘটনা (২৫) হয় সেইরূপ লোকের মধ্যেও অনুরূপ বৃত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় রমণীর বচনে ও কাব্যে মাধুর্যের বিকাশ (২৬) দেখা যায়। তথায় উপবনবীথিতে যেরূপ তমালপত্র পড়িয়া থাকে সেইরূপ যুবতীর বদনে তমালপত্র (২৭) অংকিত হইয়া থকে। তথায় তন্ত্রী-বাদ্যে ও সুরতকলহে উভয় ক্ষেত্রেই নখরপ্রহারের ধ্বনি শ্রুত হয় †।

অমরাবতী যেরূপ নন্দন বন দ্বারা শোভিতা, বিবুধ-(২৮) সমূহ দ্বারা অধ্যুষিতা এবং নাকবাহিনী (২৯) দ্বারা সেবিতা সেইরূপ সেই বারাণসী নগরী বিবুধ (৩০) গণদ্বারা অধ্যুষিতা ও নাকবাহিনী (৩১)-দ্বারা সেবিতা হইয়া বিশ্বস্রষ্টার নির্মিত জগতের অপর অমরাবতীর ন্যায় বিরাজমানা। (১৫—১৭)

তথায় মনসিজের শরীরিণী শক্তির ন্যায় বেশ্যাকুলের ভূষণ-স্বরূপা মালতী নাম্নী এক বাররামা বাস করিত। গরুড়কে দেখিয়া যেরূপ বিলাসিনী (৩২) নাগিনীগণের হৃদয়-শোক জাগিয়া উঠে তাহাকে দেখিয়াও সেইরূপ বিলাসিনীগণ ঈর্ষাকুলিত হইয়া উঠিত। হিমালয়-দুহিতা (পার্বতী) যেরূপ ঈশ্বরের (৩৩) হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন সে সেইরূপ ধনেশ্বরদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিত। (সমুদ্র-মন্থন সময়ে) মন্দর পর্বত যেরূপ ভোগী (৩৪) রূপ নেত্র (৩৫) দ্বারা সংসক্ত

২০ অভিন্নতা। ২১ প্রমাদাদি।

২১ এক পক্ষে 'ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' অর্থাৎ দ্বিবচন-নিষ্পন্ন ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত পদের সহিত পরবর্তী পদের সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও সন্ধি হয় না এই অর্থে 'সন্ধিচ্ছেদ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; অপর পক্ষে 'সিঁধকাটা'। ২২ অসরল অবস্থা, অস্বাচ্ছন্দ্য। * ছন্দের গুরুলঘু বুঝাইতে এইরূপ (—) বক্র ও সরল রেখা ব্যবহৃত হয় ইহাকে প্রস্তারবিধি বলে। ২৩ 'পরিবাদ' এক পক্ষে জোয়ারি' অন্যর পক্ষে 'অপবাদ'। ২৪ 'প্রসন্ন' অর্থে সুরা সুতরাং 'অপ্রসন্নতা' অর্থে সুরার অভাব। ২৫ অতীত চরিত্রের বা ঘটনার অনুরূপ অভিনয়; অন্য পক্ষে 'একই প্রকার বৃত্ত' অর্থাৎ একই রূপ ব্যবহার যথা গুরুপূজা, ঘৃণা, শৌচ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও হিত-প্রবর্তনা। ২৬ মাধুর্য এক পক্ষে 'সরসতা'। অন্য পক্ষে কাব্যগুণ ২৭ 'তিলক-বিশেষ' †। তন্ত্রীবাদ্যে (string Instrument) নখ দ্বারা তারে আঘাত করায় রণন বা ঝংকার শ্রুত হয় সেইরূপ কামাতুর নায়ক-নায়িকা সুরতকালে যে নখাঘাত করে তাহাতে চটচটা ধ্বনি উত্থিত হয়।

২৮ দেব। ২৯ দেবসেনা। ৩০ পণ্ডিত। ৩১ গংগা। ৩২ 'বিল' অর্থাৎ গর্তে বাস করে। ৩৩ মহাদেব। ৩৪ 'ভোগী' অর্থে সর্প অর্থাৎ শেষ নাগ। ৩৫ মন্থনরজ্জু।

(৩৬) ছিল সেইরূপ (সর্বদা) ভোগিগণের নেত্র তাহার প্রতি সংসক্ত থাকিত। অন্ধকাসুরের দেহ যেরূপ (শিবের) শূলের উপর রক্ষিত ছিল সেও সেইরূপ শূলদিগের (৩৭) শীর্ষস্থানীয়া ছিল। সে ছিল চারু ভাষণের বসতি, লীলার আলয়, প্রেমের স্থিতি, পরিহাসের ভূমি এবং বক্রোক্তির আবাসস্থল। (১৮—২১)

একদা সে তাহার ধবলালয়ের পৃষ্ঠদেশে অবস্থানকালে তাহার চিন্তানুরূপ নিম্নলিখিত আর্যাটি কে যেন গাহিতেছে শুনিতে পাইল,

"দাও ফেলে দূরে হে বারবনিতা
যৌবন আর রূপের মদ
শেখ সযতনে কৌশল সেই
কামিগণ হয় যাহাতে বধ।"

ইহা শুনিয়া বিপুলজঙ্ঘা মালতী মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল, "ঐ সজ্জন এই আর্যাটি পাঠ করিয়া আমাকে মিত্রের ন্যায় অতি উপযুক্ত উপদেশই দান করিয়াছেন, অতএব সকল সংসার বিষয়ে বিকরালা—যাহার দ্বারে বিলাসী পুরুষগণ দিবারাত্রি পড়িয়া আছে—তাহার নিকট গিয়া পরামর্শ লইব।" এই মনে করিয়া সে সৌধশিখর হইতে দ্রুত অবতরণ করিয়া সহচরীগণ-পরিবৃতা হইয়া বিকরালার গৃহে গমন করিল। (২২—২৬)

বিকরালা বৃদ্ধা—তাহার অধিকাংশ দন্তই পড়িয়া গিয়াছিল, যে-কয়টি অবশিষ্ট ছিল তাহাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, গণ্ড শুষ্ক হইয়া হনুদেশ প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল; নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল ও বিস্তৃত; কুচদ্বয় শুষ্ক হওয়ায় চুচুকদ্বয় উৎকট হইয়া কুচস্থানের নির্দেশ করিতেছিল; শরীরের চর্ম শিথিল, চক্ষু দুইটি কোটরগত ও রক্তবর্ণ এবং ভূষণহীন কর্ণপালী ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মস্তকের অধিকাংশ কেশই উঠিয়া গিয়াছিল কেবল মাত্র কয়েকটি পক্বকেশ অবশিষ্ট ছিল; দেহের শিরা সকল প্রকট এবং গ্রীবা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরিধানে ধৌত বস্ত্র ও উত্তরীয়, গলদেশে সূত্র-বিলম্বিত বহুবিধ ঔষধি ও মণি, শীর্ণ অংগুলীতে সুবর্ণ অংগুরীয়। সে গণিকাগণের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া বেত্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া কামিগণ যে সকল উপচার প্রদান করিয়াছিল তাহা দেখিতেছিল।(২৭—৩০)

মালতী বিকরালার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করতঃ প্রণাম করিয়া তাহার কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে বসিবার জন্য আসন দিল।(৩১)

অনন্তর (যাহারা আসিয়াছিল তাহারা কার্য্যসিদ্ধি অন্তে চলিয়া গেলে) অবসর পাইয়া মালতী আসন হইতে উঠিয়া করজোড়ে সবিনয়ে বিকরালাকে বলিল:

"আপনার বুদ্ধি-কৌশলে পড়িয়া নিশ্চিতই হরি তাঁহার কৌস্তুভ, সূর্য তাঁহার রথাশ্বসকল, ইন্দ্র তাঁহার ঐরাবত এবং কুবের তাঁহার ধন-ভাণ্ডার হারাইতে পারেন। যে সকল কামুক লোক এক্ষণে হৃত-বৈভব হইয়া জীর্ণ বস্ত্রে দেহাবরণ করিয়া অন্নসত্রে ভোজন করিতেছে তাহারা আপনার বুদ্ধি-কৌশলের এইরূপই প্রশংসা করিয়া থাকে। আপনারই উপদেশের ফলে ধনবর্মা সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নর্মদার পদযুগলে সকল সম্পদ সমর্পণ করতঃ তাহার চরণতলে পড়িয়া আছে। সাগরদত্তের মধ্যম পুত্র নরদত্ত পিতৃগৃহ ধনশূন্য করিয়া মদনসেনার শরণাগত হইয়া তাহার প্রীতি বিধানের চেষ্টা করিতেছে। ভট্টপুত্র নরসিংহের প্রতি মঞ্জরী লীলাভরে তাহার চরণযুগল অগ্রসর করিয়া দিলে সে দুই হস্তে ধীরে ধীরে তাহা সংবাহন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। ভবদেব দীক্ষিতের পুত্র শুভদেব নিঃসম্বল হইয়া ভর্ৎসিত হইয়াও কেশবসেনার গৃহদ্বার পরিত্যাগ করে না এবং অন্যান্য সাধারণ বেশ্যাগণও কামীদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে কপর্দকশূন্য করিয়াছে। অথচ আমি হীনকুলজাত, গুণহীন, রোগী এবং কুৎসিত পুরুষগণকেও অতিশয় প্রীতি প্রদর্শন করিয়া সেবা করি। মাতঃ, কি করিব, পোড়া বিধাতা বাম, সেই জন্য নিজ দেহ সাজাইয়া রাখিয়াও ইষ্টলাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব মাতঃ, আমার ভজনার উপযুক্ত কাহারা, তাহাদের কি নাম এবং তাহাদের বেশ ও কার্য কিরূপ ও কিরূপে তাহাদিগকে কামশরজালে আবদ্ধ করা যায় তাহার উপায় আমাকে বলিয়া দিন।"(৩২—৪২)

সুন্দরী মালতী এইরূপ বলিলে বিকরালা তাহার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া মধুর বাক্যে তাহাকে বলিল:

"সুন্দরি, দহ্যমান কামের দেহনির্গত ধূমরেখার ন্যায় তোমার এই কেশভার কামিগণকে (অনায়াসে) বশীভূত করিতে পারে; কৃশোদরি, মধুর স্মিতহাস্যসহকারে ঈষৎ ভ্রূভংগের সহিত বিভ্রমের আধারস্বরূপ তোমার অসামান্য নয়নভংগী ধৈর্যশীল ব্যক্তিদিগকে অধীর করিয়া দেয়। তোমার এই বদনকান্তির কথা শ্রবণ মাত্রই কামিগণের মন নিশ্চিতই মদনাকুল হইয়া থাকে (না জানি দেখিলে কি হইবে)। তড়িদ্দামসমকান্তি তোমার এই দশন-পংক্তি পুরুষের মনে নিশ্চয়ই মদন-দাহ-বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে। লীলাবতি, কোকিলধ্বনি-নিন্দিত তোমার এই বচনবিলাস সমস্ত ভুজংগগণকে (৩৮) আকর্ষণোপযোগী সিদ্ধমন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়। হে বিলাসবতি, মকর-কেতনের নিবাসস্বরূপ তোমার এই বিশাল কুচযুগল ভোগিগণের ভোগসাধনের উপায়—ইহা ব্যতীত অপর উপায় ব্যর্থ। হে বরোরু, তোমার এই বাহুযুগল মৃণালের ন্যায় সুন্দর—হে সুতনু, ইহা সুবর্ণবলয় শোভিত হইয়া কাহার না মদনোৎপাদন করে? কন্দর্পকে আদেশ করিতে পটু* তোমার এই মধ্যদেশ এত কৃশ তথাপি বিশালদেহ ব্যক্তিকেও ইহা মন্মথের দশমী দশায় লইয়া যাইতে পারে। মনসিজের ধনুর্গুণের ন্যায় তোমার এই রোমাবলী যুবক-গণকে স্মরবাণবিদ্ধ করিয়া বিহ্বল করিয়া ফেলে। হে করভোরু, সুবর্ণের ন্যায় কান্তি এবং শিলাতলের ন্যায় বিশাল তোমার এই জঘন তরুণগণকে বশীকরণ এবং যতিগণের সংযম ভংগ করিতে পারে। বল দেখি সুন্দরি, তোমার এই রম্ভাকাণ্ডের ন্যায় (শীতল ও) মনোহর উরুযুগল স্পর্শে কাহার না মদনজ্বরতাপ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে? তোমার যৌবন কল্পতরুর সহিত যুক্ত এই কনকলতার মত সুগোল জংঘাযুগলের মিলনে কে এ জগতে

৩৬ আবদ্ধ। ৩৭ গণিকাসমূহ।

৩৮ ভুজংগ—'বিট' ওপক্ষে 'সর্প'। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ—"মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্পবৈদ্যগণ যেরূপ সর্প সকল আকর্ষণ করিয়া আনে সেইরূপ তোমার কোকিলনিন্দিত বচনচাতুর্যে সকল 'বিট'গণ আকৃষ্ট হয়।" * 'কন্দর্পাদেশকরণ চতুর' ইহার প্রকৃত অর্থ কন্দর্পকে উদ্দীপ্ত করিতে পটু অর্থাৎ যাহার দর্শনে ত্বরায় মদনোদ্দীপিত হয়।

কামফল প্রাপ্তির ইচ্ছা না করে? স্থলকমলিনীর শোভাকেও পরাজিত করিতে সক্ষম, দাড়িমরাগনির্জিত তোমার এই রক্তিম চরণকমলযুগল কাহার না মনে আনন্দ দান করে? লীলাবতি, তোমার এই ললিত গমনভঙ্গী গজেন্দ্রকেও লজ্জা দেয়, হংসকেও উপহাস করে—ইহা যুবকদিগের হৃদয় মন্থন করিতে পারে। এতৎসত্ত্বেও যদি তোমার কৌতূহল হইয়া থাকে হে ক্ষীণকটি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর আমি যাহা জানি তোমাকে বলিতেছি—" (৪৩—৫৮)

"হে সুতনু, যদি অতুল সম্পদ নিজ করতলগত করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে প্রথমে রাজকর্মচারী ভট্টের পুত্রকে অতি সাবধানে বশীভূত কর। এই ভট্টপুত্র চিন্তামণি নিকটবর্তী গ্রামেই বাস করে; তাহার পিতা সর্বদা রাজধানীতে বাস করায় সে নিজেই নিজের অভিভাবক; সুতরাং বৎসে, চেষ্টা করিলে সে (সহজেই) আকৃষ্ট হইবে। হে চারুহাসিনি, যাহাতে সে সত্বরই বসন্তসখার কুসুমশরের লক্ষীভূত হয় (সেই জন্য) তাহার বেশ ও আচরণ কিরূপ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—" (৫৯—৬১)

"তাহার মস্তকের কেশ পঞ্চাংগুলী পরিমাণ দীর্ঘ এবং তাহাতে স্থূল শিখা বর্তমান, তাহাতে দীর্ঘ শ্রবণযুক্ত (৩৯) করাতের ন্যায় দন্তপংক্তিসমন্বিত কংকতিকা (৪০) সন্নিবিষ্ট। অংগুলীতে অংগুরীয়, কণ্ঠে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্র, গাত্র কুংকুমচূর্ণ দ্বারা পরিস্পৃষ্ট হইয়া সর্বাংগ ঈষৎ পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে *। সুবর্ণসূত্রনির্মিত কুসুমদাম বিলম্বিত গলশোভাযুক্ত, সিক্থ দ্বারা সিক্ত, শিহ্লক দ্বারা রঞ্জিত এবং লৌহপট্টিকাসমন্বিত পাদুকা তাহার চরণে (৪১)। তাহার বিস্তৃত কেশ নানা বর্ণে গ্রথিত উজ্জ্বল বর্ণের প্রান্তভাগসমন্বিত সূত্র দ্বারা সংযত (৪২)। কর্ণের এক অংশে 'দন্তপত্রক' অপর অংশে 'সীসপত্রক' (নামক অলংকার)। পরিধানে তাহার উজ্জ্বল সুবর্ণসূত্র-নির্মিত প্রান্তবিশিষ্ট (৪৩) কুংকুমবৎ পীতবর্ণের বস্ত্র।" (৬২-৬৬)

"কণ্ঠে স্থূলতর কাচবর্তকের মালা (৪৪) পরিহিত, কুরবক পুষ্পরাগে নখ রঞ্জিত করিয়া শংখবলয়শোভিত হস্ত, অল্পবয়স্ক তাম্বুলকরঙ্কবাহী তাহার অনুগমন করিয়া তাহার সেবা করে। সে (সদলে) শ্রেষ্ঠি-বণিক্-বিট-কিতব-পরিপূর্ণ বিশাল রংগশালার মধ্যে রংগশালাধ্যক্ষ কর্তৃক স্থাপিত কয়েকটি চর্মরজ্জু নির্মিত আসনের উপর বসিয়া থাকে। পাঁচ-ছয় জন যথাতথ্যভাষী মদোদ্ধতপ্রকৃতি অস্ত্রজীবী কটিদেশে তরবারি ধারণ করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। চতুরতর কোন সেবক তাহাকে 'পৃষ্ঠদেশ' অর্পণ করিলে সে তাহাতে পূর্বদেহাংশ এলাইয়া দিয়া মুখমধ্যস্থিত তাম্বুল দ্বারা গণ্ড স্ফীত করিয়া হস্তে একটি পাণ ধারণ করিয়া থাকে। অকারণে ভাবসহকারে ভ্রূ উন্নত করিয়া কবিতার মত করিয়া কোন গাথা অশুদ্ধ ভাবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। বিস্ময়ে মাথা নাড়িতে নাড়িতে রসাবেগে পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিগণকে হস্ত দ্বারা তাড়না করিয়া অপরের রসালাপ শ্রবণ করিতে করিতে 'কি বিশ্রী, সাধু' ইত্যাদি মন্তব্যে আলাপের মধ্যে অন্তরায় সৃজন করে। 'পিতা গোপনে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে অথবা রাজা পিতাকে এই কথা বলিয়াছিলেন' এইরূপ উক্তি দ্বারা রাজার সহিত তাহার পিতার প্রণয় ও বিশ্বাসের কথা জানাইতে চাহে। পত্রচ্ছেদ্য (৪৫) কৌশল জানিয়া বা না জানিয়া সর্বদা হস্তে পত্রকর্তরী (৪৬) ধারণ করিয়া জনসমাজে জানাইতে চাহে যে সে সেই কলায় দক্ষ"। (৬৭—৭৪)

"'ভট্টপুত্র ব্রহ্মোক্ত নাট্যশাস্ত্রে, সংগীতে, মুরজ প্রভৃতি বাদনে নারদাদিকেও পরাজিত করেন। বসু, নন্দ, চিত্রক, দণ্ডক প্রভৃতি (পবিক্রম মণ্ডলে) (৪৭), মুক্তায়ুধ (৪৮) চালনায়, অসি ছুরিকা প্রভৃতি শস্ত্রপ্রয়োগে ইঁহার এত নৈপুণ্য যে, পরশুরামও নিত্য তাঁহার ভার্গবত্ব ত্যাগ করেন। ইনি কামশাস্ত্রে এমনি পণ্ডিত যে বাৎস্যায়নও ইঁহার কাছে বোকা হইয়া যান, দণ্ডকাচার্য দূরে পড়িয়া থাকেন, রাজপুত্রও (৪৯) পশুতুল্য গণ্য হন। যে রাধাসুত কর্ণ চাহিবা মাত্র সযত্নে (সহজাত) কবচ কাটিয়া দিয়াছিলেন তিনিও ইঁহার অবিচিন্তিত অর্থবর্ষণের ও ত্যাগের নিকট উপহাসের পাত্র হইয়া পড়েন *। পলায়নপর মৃগের প্রতিও যে সিংহ বিক্রম প্রদর্শন করে তাহার শৌর্য ভট্টপুত্রকে লজ্জা দেয়। ইনি মৃগয়ায় আনন্দ পান বটে, চললক্ষ্যভেদে ইঁহার কৃতিত্বও আছে কিন্তু পিতার (অসন্তুষ্টির) ভয়ে ভট্টপুত্র মৃগয়া-ক্রীড়া করেন না ইহা সহজেই অনুমেয় †। এইরূপ নিজ সেবকগণ কর্তৃক কথিত রমণীয় বচনে পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে আনন্দিত মুখে বলিতে থাকেন—'ইহারা আমার শ্লাঘা করিতেছে'।" (৭৫—৮১)

'কোন কোন্ প্রস্থান (৫০) তাহার জানা আছে, কোন্ নর্তকী শ্রেষ্ঠা, শিঙ্গটকে (৫১) কোন্ নর্তকী কোহল ও ভরতাদি কথিত ক্রিয়ার সহিত নৃত্য করিতে পারে, লয়, ধ্রুবকরচিত তাল বা প্রেংখনাদি বিষয়ে তাহার কিরূপ জ্ঞান আছে' নৃত্যোপদেশককে সযত্নে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করে। কণ্ঠ হইতে ফুলের মালা লইয়া নর্তকীকে দান করে। যখন-তখন তাম্বুল দান করিয়া সাধুবাদ করে। 'হস্তসঞ্চালন, গাত্রসংস্থিতি, লালিত্য, উদ্বহন (৫২), পার্শ্ব-বলিত (৫৩) এই সকল বিষয়ে ইঁহার এত বিশুদ্ধতা ও চাতুর্য দেখিয়া মনে হইতেছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝি ইহারই সৃষ্টি। ভাব, রস ও অভিনব ভংগীর পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্তি এবং বিচিত্র পরিক্রমে (৫৪) এ রম্ভাকেও পরাজয় করিতে পারে সাধারণ মর্ত্যের নর্তকী তো ছার!' নৃত্যের প্রত্যেক বিরামের সময় নৃত্যে তন্ময় হইয়া সে কেবল মাত্র তাল গুনিয়া (কারণ, কৌশলাদি বুঝিবার সামর্থ্য তাহার নাই) অবিরত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নর্তকীর এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকে।" (৮২—৮৭)

[ক্রমশঃ।

৩৯ শ্রবণ—হাতল। ৪০ চিরুণী। * তনুসুখরামের সংস্করণের অনুসারে—"...গাত্রকুংকুমচূর্ণ দ্বারা পরিস্পৃষ্ট এবং পরিধানে ঈষৎ পীতবর্ণ বসন।'

৪১ জরির ফুল তোলা সাজ (instep) যুক্ত, মোম ভিজান, গুগ্‌গুল দ্বারা রং-করা লোহার নাল বাঁধান জুতা তাহার পায়ে। ৪২ বর্তমানে রমণীগণ যেরূপ tassel ব্যবহার করে। ৪৩ জরি-পাড়। ৪৪ পুঁথির (beads) মালা। † তনুসুখরাম সং—"একত্র আবদ্ধ বৃহৎ কাষ্ঠবেদীর উপর।"

৪৫ পত্র কাটিয়া তিলকাদি নির্মাণের কলা। ৪৬ ছোট কাঁচি। ৪৭ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পাঁয়তাড়া। ৪৮ শর, ভল্লাদি নিক্ষেপ। ৪৯ প্রাচীন কামশাস্ত্রকার। * এই শ্লোকটি R. A. S. B সংখ্যা 'কাব্যমালা' সং এ নাই। † এই দুই শ্লোকে ভট্টপুত্রের মৃগয়ায় অক্ষমতা চাটুকারগণ কিরূপ কৌশল করিয়া গোপন করিতেছে অথচ ব্যক্ত করিতেছে তাহা দেখান হইতেছে। ৫১ নৃত্যগীতপ্রধান নাটক। ৫২ Carriage. ৫৩ Side movement. ৫৪ Dancing movement.

যোগে ব্যায়ামবিদ্যা

শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যোগবিদ্যার প্রবর্ত্তন হয়েছিল। তাম্রযুগে (খৃঃ-পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে) ভারতীয়গণ যোগাভ্যাস করতেন। খৃঃ পূঃ ২১৮০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় যোগবিদ্যা মিশরে প্রচারিত হয়েছিল। যোগের সুপরিচিত পদ্মাসন এবং আরও কতকগুলি আসন মিশরীয় নৃত্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। বৈদিক যুগে এবং তৎপরে যোগাচার্য্যগণের দ্বারা যোগের প্রগতি ভারতে অব্যাহত ভাবে চলেছিল।

নব জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত মানবতত্ত্বের উপর যোগবিদ্যা সংস্থাপিত। দেহাতীত বস্তুর সত্তা যোগে স্বীকৃত হয়েছে। রাসায়নিক, ঐন্দ্রিয়ক এবং সংবিদাতীত মানব-সত্তা শারীর-শাস্ত্রের সীমাবহির্ভূত হলেও যোগবিদ্যার্জ্জনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এখানেই মানুষের প্রকৃত মানবত্ব এবং মহত্বের বীজ নিহিত। যখন মানবের এই অজ্ঞাত অংশস্থ সুপ্ত শক্তির জাগরণ হয় তখনই মানব মহাপুরুষে পরিণত হয়। আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং নানা প্রকার অতীন্দ্রিয় কার্য্যাবলী মানবের এই অজ্ঞাত অংশেরই বহির্বিকাশ। পক্ষান্তরে এই অংশের অপুষ্টাবস্থায় মানব হয়ে পড়ে দানব। কল্পিত দেবতার প্রীতি উদ্দেশ্যে তৎবেদীমূলে অনুষ্ঠিত নরমেধ যজ্ঞের রক্ত পুনঃ পুনঃ পান করেও তাদের তৃপ্তি হয় না, কারণ তাদের বাসনা ও চেষ্টা সীমাশূন্য স্বার্থপরতা ও হীনতা-রঞ্জিত।

ডক্টর কোনস্টানটিনে ফোন একোনোমো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষ যে কেবল মাত্র প্রকটিত মনোবৃত্তির উন্নতি সাধনেই তৃপ্ত থাকবে তা নয়, ভবিষ্যতে সে নূতন চিন্তাশক্তির বিকাশ করতে সমর্থ হবে। মস্তিষ্কের ক্রমিক উন্নতি-পদ্ধতি এবং মস্তিকস্থ অসাধারণাংশের উন্নতি বিধানকে তিনি "ক্রমোন্নতি-শীল মস্তিষ্ক ক্রিয়া" এই সংজ্ঞা দিয়েছেন। বস্তুতঃ শরীরস্থ কোষ সমূহের মধ্যে যে অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে তাহা যদিও সাধারণাবস্থায় সুপ্ত, কিন্তু বিশেষাবস্থায় তাহা বাস্তবরূপ ধারণক্ষম। প্রকৃতপক্ষে মানুষ বাস্তব ও সম্ভাব্য ক্রিয়াশক্তির সমবায়ে গঠিত। সম্ভাব্য শক্তি বাস্তব শক্তির ন্যায় সত্য এবং বিশেষাবস্থায় তাহা অভিব্যক্ত হয়। ইন্দ্রিয় সহায় ব্যতীত বহির্জ্জগতের জ্ঞানলাভ এবং নানা প্রকার অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ, এমন কি শারীর পরিণাম নিরোধ ও শূন্যোত্থান এ সমস্তই সম্ভবপর। যোগাচার্য্যগণ দেখিয়েছেন যে, বহু অসাধারণ সুপ্ত শক্তিনিচয়কে উদ্বুদ্ধ করা এবং সাধারণ শক্তির ন্যায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

সাধু হরিদাসের প্রতিপাদন

কতকগুলি পর্ব্বপদী প্রাণী শারীর পরিণাম সাময়িক ভাবে নিরোধ করে প্রচ্ছন্ন জীবনাবস্থায় অবস্থান করতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে মানুষের পক্ষে এই ধরণের অস্তিত্ব অসম্ভব, কারণ মানব শারীর পরিণাম নিরোধ অথবা হ্রাস সাধন করিতে অপারগ। ইহা অনুমিত হয় যে শারীর পরিণামের সাময়িক নিরোধ দেহের উপর সুদূরপ্রসারী ফল উৎপাদন করতে পারে। নানা সুপ্ত শক্তির জাগরণ, অতি দীর্ঘ জীবন লাভ, দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়, এবং অন্যান্য অনন্যসাধারণ শারীর মানস শক্তির বিকাশ ইহার সহিত জড়িত বলে মনে হয়। যোগীরা বলেন যে, শারীর পরিণাম নিরোধ করা যেতে পারে। এই অসম্ভব কার্য্যের একটা বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে :—

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সাধু হরিদাস নামে জনৈক যোগী পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মহারাজা রণজিৎ সিংহ, রাজসভাসদবর্গ এবং কতিপয় ইংরাজ ও ফরাসী ভদ্রমহোদয়গণের সমক্ষে ৪০ দিন ভূগর্ভে প্রোথিতাবস্থায় থাকার ক্রিয়া দেখান। প্যারীর জেনারেল ভায়নটায়া, কর্ণেল সার পি, এম, ওয়েড এবং কয়েক জন বৈদেশিক চিকিৎসকও উপস্থিত ছিলেন। যোগী একটি বিশেষ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্রদ্বয় এবং কর্ণকুহরদ্বয় মোম দ্বারা বন্ধ করা হল। যোগী জিহ্বা উল্টাইয়া স্বর-যন্ত্রদ্বারও বন্ধ করলেন, তার পর তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে একটা কাষ্ঠের বাক্সের ভিতর রাখা হল এবং তাহা বন্ধ করা হল। মহারাজা নিজে তাতে দৃঢ় তালা লাগাইয়া দিলেন। বাক্সের কয়েক স্থানে মহারাজার নামাঙ্কিত শীলমোহর করা হল। তৎপর বাক্সটিকে প্রোথিত করে যব বপন করা হল, স্থানটিকে প্রাচীর বেষ্টিত করা হল এবং প্রাচীর-দ্বার সুরক্ষিত করা হল। চত্বারিংশ দিবসে বাক্সটি ভূগর্ভ হতে তোলা হল এবং খোলা হল। দেখা গেল যে, যোগী প্রথমে যে আসন অবলম্বন করেছিলেন তাতেই অবস্থান করছেন। এক জন চিকিৎসক যোগীর শরীর পরীক্ষা করে দেখলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল যে, তাঁহার হৃদয়-ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ, শরীর কঠিন এবং শীতল। কেবল মাত্র মস্তকে তাপ অনুভূত হয়েছিল। আর একটি কৌতূহলজনক ব্যাপার এই যে, প্রোথিত হবার দিনে যোগী মুণ্ডিত-মস্তক হয়েছিলেন, কিন্তু সমাধি হতে উত্তোলনের সময় দেখা গেল যে তাঁর গণ্ডদেশে কোন কেশ জন্মে নাই। যাহা হউক, তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে যান।

যোগীর এই ক্রিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, মানুষ শ্বাসযন্ত্রকে ইচ্ছানুরূপ করতে পারে, শ্বাসকর্ম্মকে দীর্ঘ দিন নিরোধ করতে পারে, হৃদয়ের স্পন্দন দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা যায়, এবং শারীর কোষ সমূহের ক্রিয়াও নিরুদ্ধ করা যায়।

মাদ্রাজের ব্রহ্ম নামক এক যোগী সম্প্রতি হৃদয়-স্পন্দন এবং নাড়ীর গতি বন্ধ করতে এবং এক ঘণ্টারও অধিক কাল কুম্ভক করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি বলেন যে, তাঁর গুরু কর্ত্তিত ধমনীর রক্ত বন্ধ করতে পারেন।

শূন্যোত্থান

যোগীরা বলেন যে, যখন প্রাণায়াম দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়ে মূলাধার হতে উর্দ্ধে উত্থিত হতে থাকেন, তখন সেই উর্দ্ধগামী শক্তির বলে যোগীর শরীর ভূমি হতে উর্দ্ধে উত্থিত হতে পারে। মাদ্রাজস্থ তিনিভেলি নামক স্থানের সুব্বায়া পল্লভার নামক এক যোগী সম্প্রতি এই ক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন। তিনি একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত যষ্টির উপর এক হাতে সামান্য মাত্র ভর রেখে তাঁহার সমস্ত দেহকে শূন্যে শয়নাবস্থায় প্রায় ৪ মিনিট কাল রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তৎপরে তিনি ঐরূপ শয়নাবস্থায় থেকে যষ্টির উপরিভাগ হতে তলদেশ পর্য্যন্ত—যাহার দূরত্ব প্রায় দুই হাত—৫ মিনিটের মধ্যে নেমে আসতে পারেন। ঐ সময় যোগী সমাধি অবস্থায় থাকেন এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর এরূপ আড়ষ্ট ও কঠিন হয় যে

EVEREADY
পুরাতন
গিয়ে নতুন এল
EVEREADY
Fresh Power
BRIGHTER LIGHT
LONGER LIFE

চার পাঁচ জন লোকেও কোন অঙ্গ বাঁকাতে পারে না। ক্রিয়ার পর তাঁহার অঙ্গ মর্দন করা এবং মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালা হয়। ইহার পর তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

যোগে শারীর শিক্ষা

এখন বুঝতে পারা যায়, কেন যোগীরা আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কেন তাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনাকে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মচেষ্টার উপরে স্থান দেন। কিন্তু তত্রাচ তাঁহারা মনুষ্যের শারীরিক দিকটা অবহেলা করতে বলেন নাই। যোগীরা দেখেছেন যে, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক ব্যাপারের সহিত শারীর ব্যাপার অবিচ্ছিন্নরূপে সম্বন্ধযুক্ত, যদিও বর্ত্তমানে এই সম্বন্ধের বিষয় ভাল জানা নাই। মানবের অজ্ঞাত সত্তা শরীরাভ্যন্তরে এবং দেহাতীতরূপে অবস্থিত হয়ে শারীর যন্ত্রের মধ্য দিয়ে নানা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই অশরীরী সত্তার প্রথম জ্ঞানগম্য আত্ম রূপ হচ্ছে সজ্ঞান মন। এই মন কেবল মাত্র যে শারীর-তন্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ তাহা নহে, পরন্তু ইহা শারীর গতির সীমা অতিক্রম করেও অবস্থান করছে। শরীর মনের উপর যে নানা প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করতে পারে, তাহা মনের উপর শারীর পরিবর্ত্তনের প্রভাব দ্বারা প্রমাণিত হয়। অপর পক্ষে শরীরও মানস ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কারণ দেখা গিয়াছে যে, চিন্তার দ্বারা শারীর-তন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। মানস-ক্রিয়া কেবল মাত্র মনের উপরই নির্ভর করে না। উপরন্তু মস্তিষ্ক-কোষসমূহ, আন্তরস্রাবী গ্রন্থিনিচয়, শোণিত, আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সকল এবং পেশী সমূহের উপরও নির্ভরশীল। যোগীরা শারীর শিক্ষায় আধ্যাত্মিক বিজয় লাভের রক্ষাকবচের সন্ধান পেয়েছেন। শারীর দৌর্ব্বল্য আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তিলাভের অনুকূল নয়। নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য শারীর সংযমের প্রয়োজন হয়।

মনের ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য সমস্ত যন্ত্র—যাহা রক্ত ও লসীকা দ্বারা মস্তিষ্কে প্রতিভাত হয়—তাদের উপর নির্ভর করে। কার্য্য সম্পাদনের দিক থেকে মাংসপেশীগুলি মস্তিষ্কের অংশস্বরূপ। সুনিয়ন্ত্রিত পৈশিক চেষ্টা দ্বারা আমরা মস্তিষ্ক ও শারীর-রস সমূহকে এবং তাহাদের দ্বারা মনকে প্রভাবান্বিত করতে পারি। যোগিগণ-প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামবিদ্যায় উক্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। যোগে প্রকৃতপক্ষে শারীর শিক্ষার অর্থকে সংপ্রসারিত করা হয়েছে। যোগে ব্যায়াম শারীর সাধনের সহিত চিত্ত ও ভাব সাধনের পদ্ধতিরূপে পরিণত হয়েছে।

যোগবিভাগ

যোগ প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত :—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ। সমস্ত যোগেই শারীর শিক্ষার উপদেশ আছে। দেহ-শুদ্ধির জন্য মন্ত্রযোগে স্নান-পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে। ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য এবং বারুণ-স্নান বিশেষ ভাবে শারীর-স্বাস্থ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভৌম-স্নান অর্থে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার দ্বারা শরীর মর্দন। আগ্নেয় স্নান অর্থে বাষ্প-স্নান এবং সূর্য্যকিরণ সেবন। খোলা গায়ে মুক্ত বাতাস লাগানকে বায়ব্য স্নান বলে। বারি-স্নানকে বারুণ-স্নান বলে। ব... প্রাচীন কালেই যোগীরা এই সকল স্নানের উপকারিতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

লয়যোগের স্থূল ক্রিয়া ও সূক্ষ্ম ক্রিয়া শারীর শিক্ষার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আসন ও মুদ্রা স্থূল ক্রিয়ার অন্তর্গত। প্রাণায়ামকে সূক্ষ্ম ক্রিয়া বলে। এইগুলি যোগোক্ত ব্যায়ামের অন্তর্গত। ধারণা ধ্যান ও সমাধি রাজযোগের প্রধান অঙ্গ। এই অঙ্গগুলির প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক মোক্ষ ও বিভূতি লাভ। যাহা হউক, এইগুলি উপযুক্ত ভাবে পরিবর্ত্তিত করে শারীর শিক্ষার অঙ্গরূপে পরিণত করা যায়। এই মানস ব্যায়াম তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—কোন প্রকার স্থিরাসনে ধ্যানাভ্যাস; প্রাণায়ামের সহিত ধ্যানাভ্যাস; এবং ঐচ্ছিক শৈথিল্যকরণাভ্যাস।

হঠযোগ

হঠযোগেই বিশেষ ভাবে ব্যায়ামবিদ্যা উপদিষ্ট হয়েছে। ষট্‌কর্ম্ম, আসন, মুদ্রা এবং প্রাণায়ামই হঠযোগোক্ত ব্যায়ামবিদ্যার প্রধান অঙ্গ। ষট্‌কর্ম্ম হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত শোধন প্রণালী। ইহা দ্বারা মল নিষ্কাষিত হয়ে নির্ম্মল দেহ লাভ হয়। ইহা একটি অন্ত্র ধৌতির পদ্ধতি। ইহার নিম্নোক্ত অঙ্গগুলিই প্রধান :—

নেতি (সূত্রদ্বারা নাসাভ্যন্তর মার্জ্জন)
ব্যুৎক্রম কপালভাতি (নাসাগ্রমণিকা বারি ধৌতি)
৩ শীৎক্রম কপালভাতি (নাসাগ্রমণিকা বারি ধৌতি)
৪ দণ্ড ধৌতি (দণ্ড দ্বারা অন্ননালিকা মার্জ্জন)
৫ বমন ধৌতি বা গজকরণী (আমাশয়ের বারি ধৌতি)
৬ বাসো ধৌতি (বস্ত্র দ্বারা আমাশয়ের মার্জ্জন)
৭ বস্তি (বৃহদন্ত্রের বারি ধৌতি)
৮ মূল শোধন (অঙ্গুলির দ্বারা পায়ু ঘর্ষণ)
৯ বারি সার (মহাস্রোতের বারি স্নান)

আসন ও মুদ্রা দ্বারা পেশী নিচয় এবং তদ্দ্বারা আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ, আন্তরস্রাবী গ্রন্থিনিচয় এবং নাড়ীতন্ত্রকে প্রভাবান্বিত করা যায়। প্রাণায়াম যোগের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যায়াম। প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের অশেষ মঙ্গল বিধান করা যায়। এই স্বাস্থ্যফল ব্যতীত ইহার সুদূরপ্রসারী ফল আছে। নাড়ীতন্ত্র এবং চিত্তকে সংযত এবং দৃঢ় করিবার ইহা একটি শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী। ইহা মনে করবার কারণ আছে যে ইহার দ্বারা নাড়ীতন্ত্রের পুনর্গঠন ও শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

দুগ্ধ

বর্ণচেতনা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলা থেকে মা-ঠাকুমার কাছে গল্পচ্ছলে আমরা শুনে আসছি সূর্যদেব না কি সাতটা ঘোড়ায়-টানা রথে চড়ে প্রাতর্ভ্রমণ সুরু করেন,—ঘরে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যে হয়ে যায়। সেই সাতটা ঘোড়ার না কি আবার সাত রকমের রঙ।

কথাটা কিন্তু সত্যি। সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করে আমরা পাই সাতটা রঙ—যেগুলো একসঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের চোখে সাদা হয়ে গিয়েছে। এই রঙেরা আমাদের চোখে ধরা পড়ে বৃষ্টির পর যখন আকাশ জুড়ে জলকণারা ছড়িয়ে থাকে—আর তারি কুজ্ঝটিকা ভেদ করে আসে সূর্যের আলো; আমরা দেখি আকাশে এক বিচিত্র সাত রঙের ধনুক। ঐ রামধনু যে সাত রঙের সমাবেশ, সূর্যের আলো সেই সাত রঙের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। এই সাতটা রঙ হচ্ছে:—বেগনি (Violet), নীলান্বিত বা নীলাভ বেগনি (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow) কমলা (রক্তান্বিত বা লোহিতাভ হলদে, (Orange) এবং লাল (Red)।

আমরা আরো জানি, এবং যাঁরা ফোটো তোলেন তাঁরা আরো ভালো করেই জানেন যে ফোটো খুব সুন্দর আর সফল করে তুলতে হলে কাচপুট বা Lens-এর মুখে ফোটোর বিষয়-বস্তু এবং প্রতিফলিত আলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নানা রকম রঙের কাচ (যাদের বলা হয় Filters) লাগিয়ে নিলে ফল ভালো পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে, ঐ রঙীন কাচগুলো নিজের নিজের রঙ অনুযায়ী কোনো একটা রঙকে দ্বিগুণিত করে দেয় বা কোনো একটা রঙকে প্রতিরোধ করে (Filter নাম থেকেই এই আভাস পাওয়া যায়—আলোকে ছেঁকে তোলা—পরিশ্রুত রশ্মি)।

কিন্তু এ সব হোল বিজ্ঞানের কথা। দৃশ্য অথবা অদৃশ্য রঙের এই যে প্রভাব এবং প্রকৃতি, এর সঙ্গে কি কেবল মাত্র বাইরের জগতেরই সম্পর্ক? আমাদের মানসিক জগতের ওপর রঙের কি কোনো প্রভাব আছে? কোনো একটা বিশেষ রঙের প্রভাবে আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটা কি সম্ভব?

আমরা সকলেই জানি যে আলো না পেলে গাছ মরে যায়। আবার কোনো একটা বিশেষ রঙের বিশেষ প্রয়োগে বৃক্ষবিশেষকে সবিশেষ উন্নত করাও সম্ভব। আমরা আরো জেনেছি, দৃশ্য আলোর পশ্চাতে যে অতি-বেগনি বা Ultra-violet রশ্মি, তা আমাদের স্বাস্থ্যের প্রভূত সহায়ক, কেবলমাত্র ঐ রশ্মির—ঐ রঙোত্তর রঙের প্রয়োগে স্বাস্থ্যের গতি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ যে সাতটি রঙ এবং তার বিন্যাসে বা সংমিশ্রণে আরো যে অনেক রকম রঙের সংস্রবে আমরা আসি, জানি না বলে আমরা বুঝি না—এ সব রঙ আমাদের ওপর কি প্রভাব রেখে গেলো; আমরা টেরও পাই না—কিন্তু আমাদের মানসিক বিকাশের মূলে তাদেরও কিছু অংশ থেকে যায়।

আমাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা বিশেষ রঙের দিকে ঝোঁক থাকে, যেমন জীবনের বিশেষ বিশেষ দিকে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণ থাকে। ঐ আকর্ষণ বা প্রবণতার বিভিন্ন-তার মূলে আমাদের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, পারিবারিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা রকম কারণ থাকে। মানসিক কতকগুলি বিশেষ কারণও আছে; তার মধ্যে রঙের প্রভাবও অন্যতম।

কথাটা শুনতে আশ্চর্য্য লাগে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই কথাটা আর অস্বীকার করা যায় না। দু'-চারটা অতি স্বাভাবিক জিনিষ নিয়েই বিবেচনা করে দেখা যাক। সাদা রঙটা আমাদের জীবনে অপরিহার্য্য; আমরা যেন সাদা রঙের সংস্পর্শে একটা স্বাভাবিক সরলতা, সঙ্কোচহীনতা বা সর্বজনীনতার আভাষ পাই। অন্যায় কাজটা সাদা আলোয় করতে আমাদের বাধে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে হয়ত সহজেই সেটা করে ফেলা যায়। গেরুয়া রঙ হোল পথের রঙ; তার মধ্যে যেন একটা উদাসীনতার ভাব আছে। মাটির কথা—ধূলোর কথা ভাবলে আমাদের মন উন্মনা হয়ে ওঠে না কি? এই জন্যই বৈরাগী বরণ করে নিয়েছে গেরুয়া রঙ,—পথই যে তার চিরদিনের সঙ্গী। সবুজ রঙটা যেন চিরনূতন। প্রতি বছর যখন গাছে গাছে দেখা দেয় নতুন পাতা, মন যেন আমাদের মুক্ত হয়ে যায়। সবুজের সংস্পর্শে যেন আমরা প্রাণ পাই—পাই প্রেরণা। আর এরই পাশে আরেকটা রঙ এসে দাঁড়ায় বা আমাদের মনে একটা অনুভূতিময় উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়। সে হচ্ছে লাল রঙ। নতুন পাতার সাথে সাথে পলাশে শিমূলে যেন আগুন ধরে যায়; আপনাকে আমাদের ভালো লাগে, জগৎকে ভালো লাগে।

এক-একটা রঙ চোখে দেখলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে আমাদের মনে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে এক-একটা ভাবের উদয় হয়। শিশুরা লাল রঙ দেখলেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এর কারণ, লাল রঙটা খুব গভীর রঙ, হঠাৎ চোখে লেগে যায় খুব। ঐ রঙের রশ্মিগুলি চোখের শিরায় শিরায় ধাক্কা দিয়ে উত্তেজিত করে তোলে। এই কম্পনের বেগ এক-একটা রঙে এক এক রকম। সব চেয়ে কম ধাক্কা দেয় কালো রঙ। রঙ প্রতিফলিত হয়ে ইথর-তরঙ্গে যে কম্পনের সৃষ্টি করে তাতেও এক রকমের শব্দ হয়। এর সাহায্যে কানের কাছে নিয়ে ধরলে অন্ধেরা কোন্ জিনিষের কি রঙ বলে দিতে পারে।

সাধারণতঃ আমাদের মনের ওপর কোন্ রঙ কি কি ধরণের ক্রিয়া করে বা কি জাতীয় প্রভাব বিস্তার করে, গবেষণার ফলে তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। নীল-লোহিত বা Magenta রঙ আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে এমন একটা অলস আমেজের ভাব এনে দেয় যাতে আমরা বেশ স্বচ্ছন্দ বা আরাম বোধ করি। বেগনি বা Violet রঙ আমাদের মনে এনে দেয় অবসাদ, আমরা যেন এর সংস্পর্শে কেমন বিষণ্ণ বোধ করি। হলদে রঙ আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা নাড়া দিয়ে যেন জাগিয়ে তোলে (stimulates our nerves), আমরা এর সংস্রবে বেশ উত্তেজিত বা উদ্দীপিত বোধ করি। লাল রঙটা খুব গভীর হওয়াতে আমাদের দৃষ্টিপথের ওপর একটা স্পন্দন দিয়ে যায়, আমাদের শিরা-উপশিরায় আর অনুভূতিতে এনে দেয় একটা কম্পনময় উত্তেজনা। হয়তো এই কারণেই বিপদের সঙ্কেতটা হোল লাল। রেলওয়ে বিভাগকে প্রথম প্রথম এই বিশেষ রঙ ব্যবহার নিয়ে অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছিল। নীল রঙের সংস্পর্শে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী শান্ত হয়, এবং ফলে আমাদের সজীবতা (vitality) ফিরিয়ে আনে। পরীক্ষা
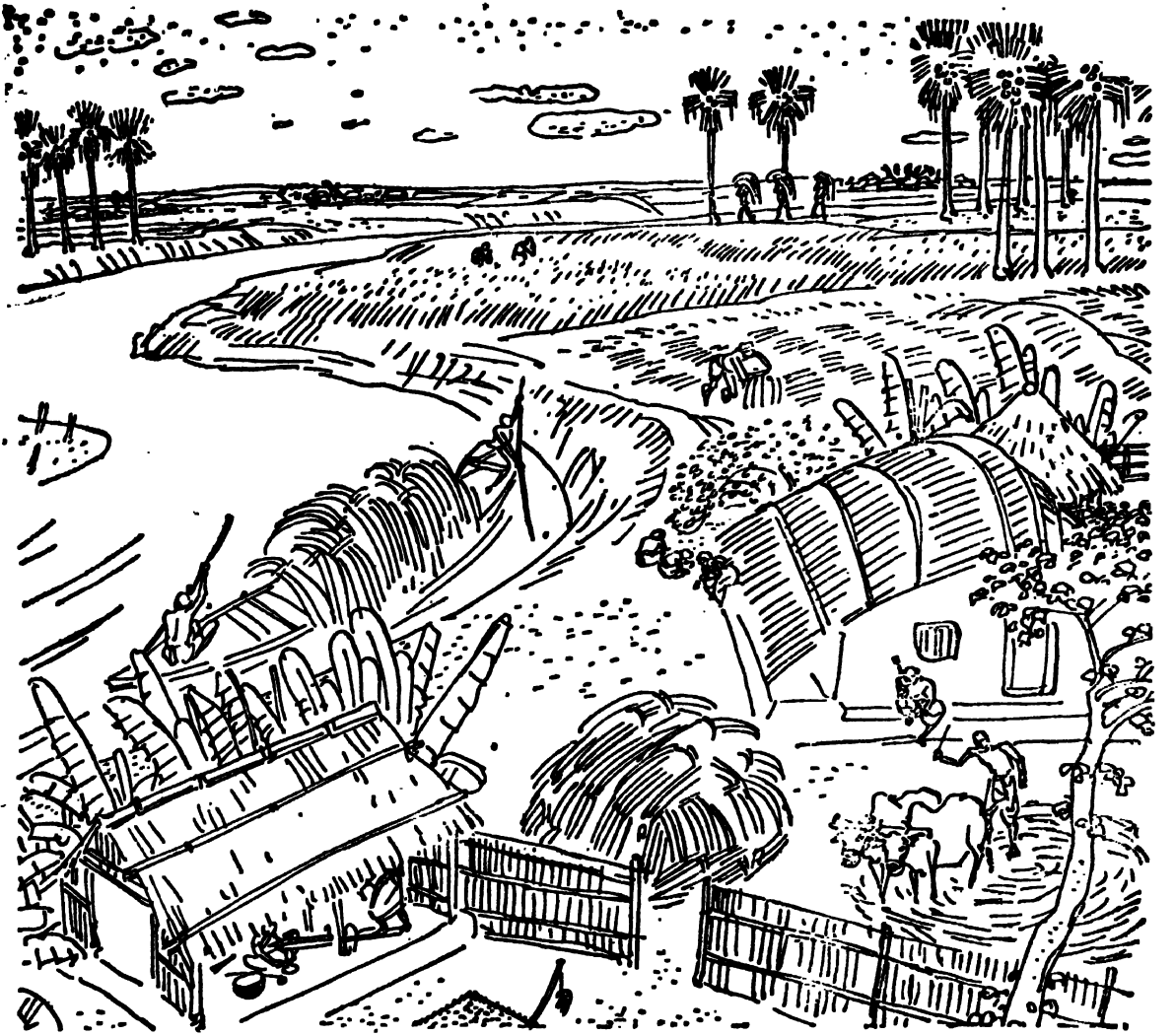
করে দেখা গেছে যে কোনো কোনো বীজের থেকে অঙ্কুর বেরোতে সাদা আলোতে যেখানে আট দিন লাগে, নীল রঙের কাচের আড়ালে রাখলে দু'দিনেই তা ফুটে বেরোয়। কৃষ্ণাভ বা ঘোর লাল রঙ (purple) না কি নিদ্রার সহায়তা করে। ১৯২৮ সালে আমেরিকার কোনও ফুটবল শিক্ষা কেন্দ্রের বিশ্রাম করবার বা সাজ-গোজ করবার ঘরটি নীল রঙ এবং খেলাধুলা সম্পর্কে কথাবার্তা বলার বা শিক্ষা দেবার ঘরটি লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নীল এবং ঘোর লাল রঙের কাচ জানালায় লাগানোর রীতি স্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হোত।

পুরাকালে আবেগ বা ভাবধারাকে (emotions) বিশেষ বিশেষ রঙে সূচিত করা হত। এর মধ্যে লক্ষ্যণীয় যে, অনেক ক্ষেত্রে একই রঙে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ভাব প্রকাশ পেত; আবার একই রঙের সামান্য তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব সূচিত হোত। যেমন, আগেই বলা হয়েছে, নীল-লোহিত (magenta) রঙ আমাদের প্রমোদিত বা স্বচ্ছন্দ করে তোলে; কিন্তু অনেক সময়ে ঐ রঙ দিয়েই প্রকাশ করা হোত দৃঢ়তার ভাব। লাল রঙে সাহসিকতা বা কর্মকুশলতার প্রকাশ; আবার অরাজকতা বা রক্তলোলুপতার চিহ্নও ছিল লাল। খাঁটি হলদে রঙে গৌরব, উৎকর্ষ, প্রফুল্লতা, উৎসাহ, সমৃদ্ধি সৌভাগ্য—এই সব বোঝাতো; কিন্তু খাঁটি হলদে না হয়ে এরই নানা রকম রূপান্তরে বোঝাতো ভীরুতা, স্বাস্থ্যহীনতা অথবা ব্যক্তিত্বের অভাব। ঘোর রক্তবর্ণ (purple) ছিল শৌর্য বীর্য ঐশ্বর্য বা মহত্ত্বের চিহ্ন; আবার অনেক সময়ে ঐ একই রঙের ব্যবহারে ফুটে উঠতো রিপুগত উত্তেজনা (passions), দুঃখ ক্লেশ, কিম্বা একটা রহস্যজনক অবস্থার (mystery) আভাস।

কিন্তু একই রঙে কি করে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই ভাবের প্রকাশ সম্ভব হোল সেটা গবেষণার বিষয়। মনে হয়, এর মূল কারণ রুচিভেদ। অষ্টাদশ বা তৎপূর্ব শতকে মানুষের রুচি যেমন ছিলো এখন আর তেমনটি নেই। আবার দেশভেদেও রুচিভেদ হয়ে থাকে। শীতের দেশের লোকের পোষাক যেমন অনিবার্য কারণে গরম দেশের থেকে আলাদা, রুচির বেলাতেও তেমনি পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক। অনুসন্ধান করলে হয়তো দেখা যাবে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা বা স্বাজাতিক চিহ্নের বর্ণগত বৈষম্যের মূলে ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও রয়েছে রঙ সম্বন্ধে তাদের পৃথক্ পছন্দ-অপছন্দ-বোধ। এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে রঙ সম্বন্ধে এই বিশেষ রুচির যোগাযোগও অবিচ্ছেদ্য।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে দেবদেবীর রূপ-বর্ণনা এবং পূজা-পদ্ধতির মধ্যে রঙ সম্বন্ধেও যে উল্লেখ এবং নির্দেশ থাকে, তার তাৎপর্য ভিত্তিহীন নয়। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপের মধ্যে রূপ-পরিকল্পনাও তিন রকম; প্রত্যূষে রক্তিমাভ, দ্বিপ্রহরে নীলাভ, এবং সন্ধ্যায় শ্বেত। রূপ-কল্পনাতেও তেমনি প্রভেদ,—কিশোরী, যুবতী এবং বৃদ্ধা। কিশোরীর চাঞ্চল্য এবং প্রীতিমুগ্ধ ভাব ফুটে ওঠে না কি রক্তিম রঙে? যুবতীর স্নিগ্ধ এবং ধরিত্রী প্রেমের স্পন্দন কি নেই নীল রঙের মধ্যে? প্রৌঢ় প্রশান্তি কি ফুটে ওঠে না শুভ্রতার মাধ্যমে? তান্ত্রিক শাস্ত্রেও এই একই জিনিষ দেখা যায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই পূজাবিধির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে রঙের ব্যবহার;—যেমন ভাবে হিংসা-ক্রোধ ইত্যাদির সাথে যোগ রেখে মানুষের মন, তথা হাবভাব চাল-চলনের হয় পরিবর্তন। তন্ত্রপূজায় শান্ত, পুষ্টি, মোক্ষ, বশীকরণ, আকর্ষণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচাটন, মারণ প্রভৃতির সাধনায় বিভিন্ন আসন, উপচার ইত্যাদির সঙ্গে সাধকের পরিধেয় বস্ত্রের রঙের বিভিন্নতারও নির্দেশ আছে। পূজ্য দেবদেবীর বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বিধান। শান্ত, পুষ্টি ও মোক্ষের ক্ষেত্রে শুভ্রবর্ণ; বশীকরণ, আকর্ষণ ও স্তম্ভনে পীত বর্ণ; বিদ্বেষে স্বচ্ছ বা মিশ্র-বর্ণ এবং উচাটন ও মারণে যথাক্রমে কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ ও ঘোর রক্তবর্ণ। কল্পনা এবং প্রেরণার সাহায্যে পূজ্য বিষয়-বস্তুর এবং তার ফলাফলের একটি যোগসূত্র এই রঙগুলির ব্যবহারের মধ্যে ফুটে ওঠে।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণও বহু দিন আগে প্রত্যেকটি রস এবং তার প্রকাশের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গতি বা যোগাযোগের কথা লিখে গেছেন। তাঁদের মতে মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ রকমের;—শান্ত, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর (বা উজ্জ্বল)। শান্তরসের প্রকাশে শ্বেতবর্ণ, প্রীতিরসে বিচিত্র (বা মিশ্র) বর্ণ; সখ্যে লাল; বাৎসল্যে সোনালি এবং মধুর-রসের প্রকাশে ঘোর অথবা উজ্জ্বল রঙের সম্বন্ধ নির্ণীত হয়েছে। সাত রকমের গৌণ রসের বেলাতেও তেমনি; যেমন—হাস্যরসে পাণ্ডুর রঙ, অদ্ভুতরসে পিঙ্গল বা তামাটে রঙ, বীররসে গৌর বা পীতবর্ণ, করুণ রসের বেলায় ধূসর বা মেঁটে রঙ, রৌদ্ররসে গাঢ় লাল রঙ এবং ভয়ানক ও বীভৎস রসের প্রকাশ যথাক্রমে কালো এবং (ঘোর) নীল রঙের ব্যবহারে। এমন কি, যুগাবতারদের রঙ সম্বন্ধেও উল্লেখ দেখা যায়—যার থেকে বিভিন্ন যুগ এবং অবতারদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও আভাস পাই। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ।

আধুনিক কালে মনোবৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের বিশ্লেষণের মধ্যে অবচেতন মনের ওপর নানা রকম রঙের প্রভাব এবং প্রাধান্যের আবিষ্কারও স্বীকার করেছেন। মানসিক বিশ্লেষণের সাহায্যে কার মনে কোন্ রঙের কি প্রভাব তা বার করে নিয়ে তাঁরা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এ বিষয়ে আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক ও মনোবৈজ্ঞানিক ডাঃ ওয়ারথ্যামের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মনোবিকারগ্রস্ত রোগীকে নানা রকম রঙের নানা রকম ঢঙের কতকগুলো পদার্থ দিয়ে সেগুলির সাহায্যে তাকে নিজের ইচ্ছামত রঙ সাজিয়ে নক্সা তৈরী করতে বলা হয়। এই নক্সার ব্যবহৃত রঙের ওপর ভিত্তি করে রোগী কি ধরণের লোক বা তার বিকারের মূলে কোন্ বৃত্তি আছে তা জানা যায়। যেমন ধরুন—যার অবচেতন মনে খুনের, প্রতিশোধের বা রক্তপিপাসার প্রবৃত্তি আছে তার নক্সায় গাঢ় বা ঘোর রঙ—বিশেষ করে টুকটুকে লাল রঙের প্রাধান্য দেখা যায়। শুধু রঙ ব্যবহারেই নয়, নক্সার বিচিত্রতায়ও তার মনোবৃত্তি ধরা পড়ে। যারা অদ্ভুত প্রকৃতির, তাদের নক্সার ধরণও অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক হয়।

লণ্ডনে Blackfriars Bridge-এ একদা আত্মহত্যার হার বড় বেশী ছিল। বর্ণবিদ্ (colourist) এসে বললেন, এর জন্য দায়ী সেতুর ঐ মিটমিটে কালো রঙ। রঙটা দেখলে যেন একটা অবসাদ, একটা বিষাদ এসে মনকে আচ্ছন্ন করে দিতে চায়; সেই জন্যই আত্মনাশেচ্ছু ব্যক্তিরা এখানে এলেই আত্মহত্যার ইচ্ছা বেড়ে যেত। নতুন করে ঐ সেতুকে, তখন

প্রসবকালে দুষ্ট-জীবাণুর সংক্রমণ
সম্পর্কে আমরা তখন ডাক্তারের কথা শুনেছিলাম বলে আজ আনন্দ হয়
দুষ্ট জীবাণুর সংক্রমণ সব সময়ই বিপজ্জনক, ঘরে তাই 'ডেটল' রাখবেন
শীগ্গির চলুন ডাক্তার...
অত ব্যস্ত হবেন না — স্বাভাবিকভাবে যা হওয়ার হতে দিন— আমাদের কাজ তার পরে
ফুটফুটে একটি খোকা হয়েছে আপনার — 'ডেটল'-এর গুণে খোকার ও আপনার স্ত্রীর আর কোন ভয়ের কারণ নেই
আমি সমস্ত প্রসূতিকেই নিরাপদে প্রসবের জন্য 'ডেটল'-এর উপর নির্ভর করতে বলি, তাছাড়া ঘরেও সব সময় 'ডেটল' রাখতে বলি
এ কথা ডাক্তার বলেন
'DETTOL'
এটলাণ্টিস (ইষ্ট) লিঃ, ২০-১, চেতলা রোড, কলিকাতা
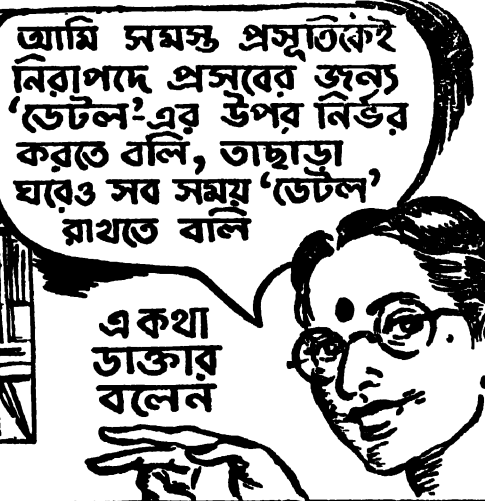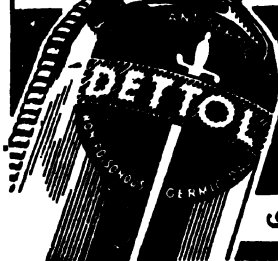
উজ্জ্বল সবুজ রঙে রঞ্জিত করা হয়। তার ফলে আত্মহত্যার হার কিন্তু পূর্ব অনুপাতে এক-তৃতীয়াংশের থেকেও কমে গেলো।

সম্প্রতি দেখা গেছে যে রাস্তাগুলোকে যদি সাধারণ পিচ রঙের বদলে গাঁদাফুলের রঙে (marigold) অথবা অনুজ্জ্বল কমলা রঙে (dull orange) রঞ্জিত করা যায় তবে দুর্ঘটনা ঘটবার ভয় অনেক কমে যাবে। কারণ, সূর্যের কিম্বা চলতি গাড়ীর আলো সাধারণ রাস্তার চেয়ে এতে চল্লিশ শতাংশ হিসেবে কম প্রতিফলিত হবে,—যার ফলে পথ-চলতি লোকদের বেশ ভালো করে দেখা যাবে।

চোখের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি বই ছাপাতে হয় তাহলে সাদার ওপর কালো হরফের বদলে সামান্য হলদে রঙের কাগজের ওপর ধূসর (grey) রঙের হরফ ছাপানো উচিত। হলদের ওপর কালো রঙটা সব চেয়ে বেশী খোলে, কিন্তু কড়া বলে বেশীক্ষণ সহ্য করা যায় না।

আজকাল বিলিয়ার্ড খেলার টেবিলে না কি সবুজের বদলে লাল মদের মতো রঙ (claret colour) ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রঙ না কি বেশী দিন স্থায়ী হয়, কারণ এর ওপর ব্যবহারজনিত ছাপ পড়ে কম।

দেখা গেছে, জাহাজের যে-অংশটা জলের নিচে থাকে তাতে চিরাচরিত প্রথায় কালো রঙ না দিয়ে যদি উজ্জ্বল গোলাপী (pink), হলদে, সবুজ, সাদা প্রভৃতি হাল্কা রঙ দেওয়া যায় তবে জাহাজের খোল অনেক বেশী দিন টেঁকে। কারণ, এই সব রঙে শ্যাওলা বা শামুক প্রভৃতি জলজ প্রাণী আকৃষ্ট হয় কম।

এই সব বিষয় থেকেই বোঝা যায়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নানাবিধ রঙের নানান রকম আধিপত্য অপরিহার্য। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। প্রকৃতির ভেতর অসংখ্য রঙের সমাবেশ,—মানুষের মনও রঙদার; মানুষ সেখানেই মানুষ। রঙের যাদুতে প্রাণীরাও বিমোহিত হয়। আমাদের বর্ণ-সচেতনা জৈব-চেতনার একেবারে গোড়ার কথা, মজ্জার ভেতর রুচির সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে। রঙ-চঙে জিনিষ দেখলেই শিশু পুলকিত হয়ে ওঠে। এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি কোনো একটি বিশেষ রঙের শাড়ীতে স্ত্রীকে বেশী সুন্দর না দেখেন। আজকাল ছায়া-ছবির প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখনোর আগে পর্দার ওপর নানা রকম রঙ খেলানো হয়। এর পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে, এতে রঙের পরিবর্ত্তন দেখতে চোখ অভ্যস্ত হয়,—চোখের স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা ভালো।

কিন্তু কোনো একটি বিশেষ রঙকে সর্ব্বজনীনতা দেওয়া যায় না। এ-কথা জোর করে বলা চলে না যে 'অমুক' রঙটা সকলেরই ভালো লাগবে। প্রত্যেক মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত, রুচিও বিভিন্ন। হয়তো কোনো একটা বিশেষ রঙকে নির্দ্দিষ্ট একটা বিষয়ের মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত এবং ব্যষ্টিগত বা জাতিগত পছন্দ অপছন্দ বাড়ে বা কমে না। জাপানের বাজারে লাল রঙের গাড়ী বিক্রী করা সম্ভব নয়, কেন না, লাল রঙটা সেখানে ডাকঘর এবং অগ্নি-যোদ্ধাদের ব্যবহৃত গাড়ীর রঙ। চীন দেশে সাদা রং শোকের চিহ্ন, বিলেতে কালো রঙ। তারজেও শোকের প্রকাশে সাদা রঙেরই ব্যবহারই চলে আসছে, যেমন বিধবাদের পোষাক। চীনে একদা কোনো এক পেট্রোল কোম্পানি তাদের প্রত্যেকটি বিক্রয়কেন্দ্র সাদা রঙে সুন্দর করে সাজাতে গিয়ে খুবই বিপদে পড়েছিলো; বেচারাদের ধারে-কাছেও কোনো খদ্দের ঘেঁসেনি। সকলে ভেবেছিলো তাদের বুঝি খুব একটা দুঃখের কাণ্ড ঘটেছে। অবশেষে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তারা আবার রঙ পাণ্টায়।

আরেকটি ব্যাপার থেকে বোঝা যাবে, বাইরের রঙ আমাদের মনের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে। আমেরিকার কোনো এক ব্যবসায়ী তার স্ত্রী-কর্ম্মচারীদের টিফিনের জন্য একটি আলাদা ঘর তৈরী করে দেয়। কিন্তু কর্মীদের কাছ থেকে ক্রমাগত নালিশ আসতে লাগলো ঘরটা না কি বেজায় ঠাণ্ডা। অথচ উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে ঘরটিকে যথারীতি গরম রাখবার ব্যবস্থা ছিলো। অনেক রকমের অনেক ব্যবস্থা করা হোল, তবু নালিশ থামে না। ঘরটা না কি হিমের মতো ঠাণ্ডা—ভেতরে ঢুকলেই মনটা দমে যায়। অবশেষে এক জন বর্ণতত্ত্ববিদ্ (colourist) এসে দেখলেন যে ঘরের দেয়ালগুলির রঙ কেমন একটা ফিকে নীল ধরণের, এমন কি চেয়ার-টেবিলের ঢাকনাগুলোরও ঐ একই রঙ। তাঁর পরামর্শ মতো তখন ঐ রঙ বদলিয়ে ঘরের দেয়াল, চেয়ার-টেবিলের ঢাকনা, কুশন সব কমলা রঙের করে দেওয়া হোল। তার পর থেকে নালিশও বন্ধ হয়ে গেলো।

আজকালকার ফ্যাশানের যুগে ব্যবসায়ীরা তো রঙের ব্যবহার নিয়ে রীতিমতো মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। সিনেমার দৌলতে নতুন ধরণের নতুন গড়নের নতুন নতুন রঙের শাড়ী-ব্লাউজ যে কতো গৃহস্থের ঘরে ঝড়ুগের হাওয়া এনে দিয়েছে, কতো চায়ের কাপেই যে ঝড় উঠেছে, উদাহরণ-স্বরূপ তার ভুক্তভোগী বোধ হয় আর খুঁজে বার করতে হবে না। যুরোপে আমেরিকাতে এ-ব্যাপারটা রীতিমতো জটিল। কে কোন জলসায় কোন ডিজাইনের গাউন পরে এলো, কোন চায়ের আসরে কে কি রঙের পোষাক পরলো, তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। ফ্যাশান প্রবর্ত্তনের কেন্দ্র হচ্ছে প্যারিস। আজ যে রঙটি বা যে ঢঙটি প্যারিসে চালু, সেটি কতো তাড়াতাড়ি আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পাঠিয়ে ব্যবসায়ে লাভ করা যায় তা নিয়ে ফ্যাশান-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও চলেছে প্রতিযোগিতা। ঠিক মতো রঙের সূত্রটি (formula) বা মিশ্রণটি (combination) অবিলম্বে নিজ নিজ ব্যবসাকেন্দ্রে বা এজেন্টদের কাছে বেতারযোগে পাঠানোর জন্য এক রকম যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে, যার সাহায্যে কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যেই সেটিকে পৌঁছে দেওয়া চলে। তৎপর-ব্যবসায়ী তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সেই রঙের পোষাক অন্যান্য প্রতিযোগিদের আগেই বাজারে ছড়িয়ে দিতে পারে।

আমাদের আহারের গোলমালে কিম্বা শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেমন আমাদের মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়, তেমনি পরিবর্ত্তন কোনো বিরক্তিকর রঙের সাহায্যেও ঘটতে পারে। আমরা হয়তো সব সময়ে কারণটা ঠিক ধরতে পারি না, কিন্তু আমাদের খাবার, শোবার বা বসবার ঘরে যদি ঠিক মতো রঙটি ব্যবহার করা হয় তাহলে আমাদের মন অনেক স্বচ্ছন্দ-বোধ করবে। এই জন্যই প্রকৃতিতে এত বিচিত্র রঙের সমাবেশ। প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেওয়ার আড়ালে আছে পছন্দ মতো রঙের কাছে আমাদের গোপনতম চেতনার আত্মনিবেদন; যাকে বলা যেতে পারে অবচেতন বর্ণচেতনা।

তোমায় দিলাম

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

তোমায় দেবার মত কি যে আছে ভেবে তা পাই না।
পুকুরের পাড়ে বসে ভাবি—খালি ভাবি,
এদিকে প্রহরে প্রহরে চাঁদ ওঠে মাথার ওপরে।
জলের বুকেতে জমা কালো ছায়াটা তো
সরে সরে পাড়েতে দাঁড়ায়।
শিরশিরে ভিজে বাতাসের একটু আমেজে
মনটাও ছলে ছলে ওঠে।
এমন রাতেতে যদি আসতে এখানে
চুলগুলো উড়ে উড়ে পড়তো চিবুকে।
আর আমি তোমার চোখেতে চেয়ে নীরব ভাষায়
বলতাম জমে থাকা কত—কত—কথা।
বড় ভাল হত।

থাক্ গে আপনি তুমি
তাই, দাঁড়ালাম ফুলে-ভরা শিউলি তলায়।
ছিঁড়লাম কিছু ফুল কিছু ঝরে পড়লো মাটিতে।
তার পর ব্যথার নিশ্বাস
সেইখানে ফেলে রেখে ফিরলাম আমি।

কালকে সকালে শিউলি কুড়োতে এসে যদি পার তবে
ফুল থেকে শুনে নিও এ প্রাণের কথা
আর জেনো শিশিরের জল
আমার হতাশা ভরা গোপন কান্নার
ঠিক প্রতিচ্ছবি।
এইটুকু দিলাম তোমায়।

[দক্ষিণের বিল—১৩৬ পৃষ্ঠার পর]

চিঠি। তিনি রাত্রে আর নিজের কোনও কাজে মন দিতে পারেন না। এক একখানা করে সব চিঠির জবাব লেখেন। কাউকে তিনি বঞ্চিত করেন না, এমন কি সেবাকেও। পত্রের উত্তর লিখে তিনি একটা তৃপ্তি বোধ করেন।

সকাল বেলা উঠে আবার কাছারীর কাজে মন দিতে হয়। কিন্তু মন কিছুতেই কাজে বসতে চায় না। বাড়ীর জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। দক্ষিণের বিলের কথা মনে পড়ে। সেখানে যেতে হবে, কত কি যে করতে হবে! নিতাই ইমাম তার জন্ম অপেক্ষা করে বসে আছে। তিনি দেশে না গেলে জমি দখল হবে না। এবার দেশে আউসের বীজ বুনে চারা তুলে নিয়ে বিলে লাগাতে হবে। সারি দিয়ে নুয়ে নুয়ে কৃষাণেরা রুয়ে যাবে, গান গাবে—বর্ষা আসবে পশলায় পশলায়। একবার ভিজে যাবে, আবার শুকাবে ওদের দেহ। সারা দিন ভরে খাটছে, তবু তারা হাসছে—প্রাণখোলা হাসি। কিন্তু বিপ্রপদ তো হাসতে পারেন না। হাসলে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়—অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা মানবে কেন? রাইওৎ প্রজারাই বা শাসনে থাকবে কেন? হুজুর হয়ে শুধু শাসন—মানুষকে পীড়ন। উনি একটা যন্ত্রবিশেষ। ওর ভিতর দিয়ে যেন কতগুলো টাকা তৈরী হয়ে চালান হচ্ছে সদরে। তার পর সেখান থেকে আরও কত দূরে যাবে কে জানে! যাবে হয়ত পারীর কোনও রাঙা ঠোঁটের দাম দিতে—নয়তো যাবে লণ্ডনের কোনও টুকটুকে মেয়েকে ঘর থেকে বের করে আনতে। বাংলা দেশের তাজা রক্ত, চাষীর রক্ত নিংড়ে পাঠাবেন বিপ্রপদ, চুষে নেবে, ফেলে-ছড়িয়ে খাবেন বিদেশী বিবিরা! পাঁচশালা নয়, দশশালা নয়—এ সব বাবুদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পৈত্রিক ক্ষয় রোগ—অক্ষয় হয়ে রয়েছে জমিদার বাবুদের ঘরে।

এ কাজে আর মন বসে না—ছুটি চান বিপ্রপদ। চান ফিরে যেতে নিজ গৃহে নিজ পরিবারে। কিন্তু ফিরে গেলে তার সংসার চলবে কি করে? কত যে ব্যয়বহুল কাজ পড়ে আছে তার তো অন্ত নেই! সেগুলো সংকুলন হবে কি করে? অতএব আরও কিছু দিন ওঁকে চাকুরী করতে হবে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ওঁর মন ভেঙে পড়ে। উনি কি যুপকাষ্ঠে বাঁধা বলির পশু? ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কি থাকতে হবে বাঁধা? এ ভাবে আর কত কাল কাটবে?

উনি চান মুক্তি—উদার অসীম মুক্তি। কেউ কি ওকে বলে দিতে পারে কোন পথে গেলে মুক্তি পাবেন? এ হুজুরের অভিনয়, গোলামীর পালা ওঁকে ছাড়তে হবে, কাটতে হবে মোহের বাঁধন। এর চেয়ে নিজের জমি একখানার পর একখানা নিজেই করবেন চাষ. সাথে সাথে নিতাই ও ইমাম চালাবে লাঙল। তার পর ছড়াবেন সহস্র সহস্র ধান্যের বীজ। সেগুলি ওঁদের মনের খুশীর মত সরস মাটির স্নিগ্ধতায় অংকুরিত হয়ে চাইবে প্রভাতী আলোর দিকে। মায়ের বুকে শিশু যেমন দিন দিন পলে পলে বাড়ে, মাটির বুকে তেমনি দিন দিন পলে পলে বাড়বে নবীন ধান্য।

আষাঢ়ে ঘন সবুজের ঢেউ—কার্ত্তিকে ওদের বুকে আশার সঞ্চার—পৌষে ভূমিষ্ঠ হবে সোণালী ফসল। ওঁরা বুকে জড়িয়ে কেটে তুলবেন আঙিনায়, ভরে রাখবেন গোলা—তার পর সারা বছর স্বচ্ছন্দ নিরালা। কাজ কি ওর গোলামীতে? এক কথাই নানা ভাবে ঘুরে-ফিরে মনে আসে। দক্ষিণের বিল ওঁকে পাগল করেছে—উন্মাদ করেছে ওঁর মন।

তিনি আবার ছুটির দরখাস্ত করেন।

সদর থেকে কয়েক দিন বাদে উত্তর আসে—

'আপনি পুরাতন কর্ম্মচারী, নূতন একটা কাছারীর ভার আপনার উপর ন্যস্ত। যদিও আপনার কার্য্য প্রসংশনীয় বটে, তবুও আপনি এক্ষণে ছুটি পাইবেন না।'

বিপ্রপদ রেগে ওঠেন। কিন্তু তাতে লাভ কি! হঠাৎ চাকুরী ছাড়ার সাহস তাঁর বুকে কোথায়? তিনি নীরবে অপমান সহ্য করে কাজ করে যান। বাস্তবিক যে চাকরীতে তাঁর ঐশ্বর্য্যের সূচনা, সে চাকরীর মোহও কম না। তা ছাড়ার মত অবস্থা এখনও তাঁর হয়নি। যখন হবে তখন বুঝে-সুঝে একটা কিছু করা যাবে।

একটা পেয়াদা এসে সেলাম দিয়ে বলে, 'হুজুর, যারা কাছারী-বাড়ীর পুকুর কাটতে এসেছে, তাদের দু'দলের মধ্যে একটা হাংগামা বেধেছে—কথা শুনছে না, একটা খুনোখুনি হতে পারে।'

বিপ্রপদ মহা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'চলো।' [ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

পুরুষরা কি মানুষ?

ইডা লুপিনো

[অ্যামেরিকার ছায়াছবি মারফৎ ইডা লুপিনোর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। অভিনেত্রী হিসাবে ইডার প্রতিভা আজ স্বীকৃত। পিতার নাম তিনি যথার্থই রক্ষা করেছেন।]

পুরুষদের মানুষ বলে কে? অন্তত আমি তো বলি না। এই ধরুন না, তাদের সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালীটাই কত অসম্ভব রকমের সহজ। পুরুষ ছাড়া রাত্রে শুতে যাবার সময়কার চাকচিক্য ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আর কে সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে বলুন? ঘুম থেকে উঠেই সামান্য অবিন্যস্ত চুলের উপর চিরুণী চালিয়ে দাড়ি কামাবার সরল কর্ত্তব্যটুকু সমাপন করেই তার কাজ হচ্ছে তাড়াতাড়ি পোষাক পরে সকাল আটটার সময় প্রাতর্ভোজনে বসা। ভাবলে আমার কাঁপুনি ধরে যায়। সকাল আটটার সময় নিশ্চয়ই কোন মেয়ে সামাজিক হয়ে উঠতে পারে না।

মেয়েরা বুঝতে পারে না বটে, কিন্তু আমাদের দেউলে করে দেবার একটা সুসংগঠিত চক্রান্ত আছে পুরুষদের। নতুন নতুন ফ্যাসানের কথা মেয়েরা আগে চিন্তা করে কি? নিশ্চয়ই নয়। পুরুষরা কিন্তু গত বছরের ডবল ব্রেষ্ট চতুর্ভুজ কোটটি জড়িয়েই নিজেকে ভীষণ সুসজ্জিত মনে করে নতুন ফ্যাসানের কথা চিন্তা করেছে। পুরুষরা কখনও নিজেদের ষ্টাইল বদলাবার কথা ভাবে কি? আমি বলব, তারা তা করে না। তারা বড্ড বেশী স্মার্ট।

একটি হ্যাট পরলেই প্রায় সব পুরুষকেই চমৎকার দেখায়। কিন্তু আমি যখন একটি মস্তকাবরণ কেনবার জন্য অকস্মাৎ উন্মাদনী প্রেরণা অনুভব করি তখন কি হয় বলুন তো? মনের আনন্দে গুন-গুন স্বরে তাললয়বিশুদ্ধ গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে আসি আর ভাবি, এর চেয়েও চমৎকার মস্তকাবরণ আর কোন মেয়ে চোখেও দেখেনি। রাত্রে 'তাকিয়ে দেখ—কেমন মানিয়েছে'-গোছের আবহাওয়া সৃষ্টি করে সেটা মাথায় পরে বার বার আয়নার দিকে ঘুরে-ফিরে তাকাই। তার পর ভদ্রলোক কথা না বলে আমার দিকে শুধু একবার দৃষ্টি ফেরান। আমার চমৎকার হ্যাটটি চায়ের বাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, নিজের দম্ভস্ফীতি হয়েছে বলে মনে হয় এবং সারা সন্ধ্যাটা হয়ে যায় পরিপাটী রকমের বিশ্রী।

কোন পুরুষ-বন্ধু আমায় কোন বিশেষ উৎসবে আমন্ত্রণ করলে আমি যখন তাঁকে প্রশ্ন করি—"আচ্ছা বলুন তো, উৎসবে কোন্ পোষাক পরে গেলে আমায় মানাবে?" তিনি উদাসীন ভাবে জবাব দেন—"যা হোক একটা কিছু ছোটখাট পরে যাবেন।" তখন নব্বই লক্ষ গাউন-বোঝাই বাক্স নিয়ে আমায় ভাবতে বসতে হয়। অন্য মেয়েরা কি পোষাক পরে আসবে তাই আন্দাজ করতে চেষ্টা করি, আন্দাজটা সব সময়ই হয় ভুল। তখন আবার ঘর-বোঝাই ভোজের পোষাক-পরা লোকের সামনে আমায় ব্যাখ্যা করতে হয়, কেন আমি ককটেল স্যুট পরে এসেছি, আমার সঙ্গী পুরুষ ভদ্রলোকটির কথা বলছেন? আ-হা! আপনাকে ধন্যবাদ, ঘননীল স্যুটেই তাঁকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

কোন পুরুষ যখন নির্দিষ্ট সময়ে কোন মেয়ে-বন্ধুর কাছে আসেন তখন একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিটফাট ফুলবাবুটি হয়ে আসেন। ভাবেন মেয়ে-বন্ধুটিও একেবারে তৈরী হয়ে বসে আছে। তার ঠিক দশ মিনিট আগে হয়ত মেয়েটি কাজ সেরে বাড়ী ফিরেছে। নিজের চেহারা লোকের সামনে প্রকাশ করতে তখনও তার এক ঘণ্টা কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন। ভাবুন তো অবস্থাটা? আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগে পুরুষদের এই ব্যবহারটি আবার ধরুন পুরুষটি হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে এসেছেন। মেয়েটি তৈরী হয়ে আধ ঘণ্টা ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল···আঃ তখন অবস্থাটা কি দাঁড়ায় বলুন তো? নিশ্চই ভাবছেন, পুরুষটির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন। আজ্ঞে না, মোটেই তা হয় না। মানসিক উদ্বেগ নিয়ে এই আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার ফলে মেয়েটির চেহারায় যে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল, সেটা মুছে ফেলে বাইরে বেরুতে আরও ২০ মিনিট প্রয়োজন হবে। এই বিলম্বের সমস্ত দোষটাই অবশ্য পড়বে মেয়েটির ঘাড়ে।

শাদা চুলে পুরুষদের যে বৈশিষ্ট্য দান করে, সেটা আমি ভারি ভালবাসি। কিন্তু কোন মেয়ে যখন দুঃসাহস দেখিয়ে নিজের পাকা চুল প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন না, তখন কয়েক জন ছাড়া অধিকাংশ লোকই মন্তব্য করেন, "ইনি যে একেবারে বুড়িয়ে গেছেন।" এমন মন্তব্য করা নিশ্চয়ই অনুচিত।

সান্ধ্য পোষাকই আমার সব চেয়ে প্রিয়। এ ক্ষেত্রেও পুরুষরা মেয়েদের অর্থনৈতিক ভাবে দেউলিয়া করবার জন্য উন্মুখ। ভদ্রলোক যদি পুরুষ-প্রজাপতি না হন এবং প্রত্যেক রাত্রেই যথারীতি বেশভূষা করেন, তাহলে তাঁর সব চেয়ে কম পোষাক হচ্ছে: একটি ভোজের স্যুট, দু'টি ড্রেস শার্ট, এক জোড়া কালো জুতো, দু'জোড়া

কালো মোজা, এক সেট কব্জি-বন্ধ এবং দু'টি কালো টাই। কিন্তু মেয়েদের কি চাই বলুন তো ? এক জন অভিনেত্রী হিসাবে আমি বলতে পারি যে, একই সান্ধ্য পোষাক পরে একবারের বেশী দু'বার নিজেকে প্রকাশ করতে আমি সাহস পাই না। কিন্তু আমার মনে হয়, পুরুষদের আমি কিছুটা বোকা বানাতে পেরেছি। আমি আমার পোষাকটা এমন ওলটপালট করে পরি, পুরুষরা বুঝতেই পারে না যে একই পোষাক আমি দু'বার পরছি।

পোষাক-পরিচ্ছদে জুতোর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হাই-হিল জুতো আমার পছন্দ নয়। অনেক চেষ্টা করে পাতলা হিল এবং পাতলা সোল লাগান এক জোড়া জুতো আমি যোগাড় করেছিলাম। পরতে পরতে ছিঁড়ে ফেলেছি। হাই-হিল জুতো আবিষ্কার করল কে ? পুরুষ ! মেয়েদের দেহাকৃতি খারাপ দেখান ছাড়া হাই-হিল জুতোর আর কি সার্থকতা আছে ? এক জোড়া কব্জি-বন্ধের জন্য পুরুষরা ৫ থেকে ৫০০ ডলার খরচ করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা একই অলঙ্কার বার বার পরতে পারে না, কেন-না, একই কানের দুল, ব্রেসলেট, গলার হার এবং ক্লিপ সব পোষাকের সঙ্গে মানায় না। অলঙ্কারের ব্যাপারটি বেশ একটু অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি।

ফার-কোটের কথাই ধরুন। ফার-কোটের জন্য মেয়েদের প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়। নতুন ফ্যাসানের ধুয়ো উঠলেই আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আপনার বাক্সে হয়ত দুনিয়ার সেরা গাউনটি তোলা রয়েছে, কিন্তু তা হলে হবে কি, সেটার গায়ে পুরোনো গন্ধ লেগে গেছে। আর কি সেটা আপনি পরবেন ? আমি জানি আপনি কি করবেন, জানলা গলিয়ে ফেলে দেবেন আপনার ফারটিকে, কিন্তু লুপিনো তা করে না।

একটি পুরুষের কথা বলি। তাঁর মতামতের উপর আমার ভারি শ্রদ্ধা। তিনি আমায় সাবধান করে বলেছিলেন যে, আমি যেন তাঁর সামনে কখনও লম্বা স্কার্ট পরে না দেখা দি। তিনি বলেন যে, মেয়েদের ভাল পা খারাপ পা নিয়ে পুরুষরা মোটেই মাথা ঘামায় না। আমি অলস, মিতব্যয়ী এবং ফ্যাসনের নতুন ধরণটার প্রতি বিরূপ বলে তাঁর উক্তি শুনে মনের আনন্দে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে বসেছিলাম। আমার এই বে-পরোয়া ভাবটি এক দিনের জন্য স্থায়ী ছিল। পরদিনই তিনি এসে বললেন, "লম্বা ঘোরানো স্কার্ট-পরা একটি মেয়েকে আজ দেখলাম, আমার মনে হয় জিনিষটি তোমাকেও বেশ মানাবে।" আর যাবে কোথায়। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম। বাক্স-বোঝাই করে কিনে আনলাম নতুন ঘোরানো স্কার্টের এক বোঝা। যখন কোন পুরুষ "অপর" একটি মেয়েকে কোন একটি বিশেষ পোষাকে দেখেছেন, তখনই পোষাকের দোকান অভিমুখে ছুটতে সুরু করুন। বুদ্ধিমতী মেয়েরা পুরুষদের খুশী করবার জন্তই সাজ-পোষাক করে, অন্য মেয়েকে খুশী করবার জন্য নয়। এর থেকেই চমৎকার প্রমাণ হয়, তাঁরা আমাদের কি রকম বজ্রমুষ্টিতে পুরে রেখেছেন।

পুরুষরা যে মানুষ নয়, তার একটি প্রমাণ হচ্ছে এই যে, মেয়েদের মত তারা আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় না। কোন মনো্রম পার্টির পরের দিন সকালে বেচারীদের কেউ বলতে আসে না, "গত রাতে আপনাকে এত চমৎকার দেখাচ্ছিল !" তাঁরা কখনও ফুল উপহার পায় না। পুরুষরা কিছুই খেয়াল করে না। তাদের মন সব সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মগ্ন থাকে।

পুরুষরা বাড়ী ফিরে ছাইদানীটিকে পরিষ্কার অবস্থায় দেখলে অথবা ভাল একটি ভোজ পেলে, সেগুলোকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করে। কিন্তু পুরুষের এই ব্যবহারে উপেক্ষা আবিষ্কার করে অনেক মেয়েই হিষ্টিরিয়া বাধিয়ে ফেলবে—একটা নীরস জানোয়ার। কিন্তু এই নীরস ব্যক্তিটি যদি সরস হয়ে স্ত্রীর জন্ত একটি নতুন ছাইদানী কিনে আনে, অথবা তাকে নিয়ে রেস্তোঁরায় যায় তা হলেই ব্যাপারটাকে সে তার জীবনের মস্ত বড় ঘটনা বলে মনে করে। মেয়েদের সম্বন্ধে প্রধান কথাই হচ্ছে, ছোট জিনিষকে তারা বড় করে দেখে। পুরুষরা সব সময়ই আমাদের বোকা বানাচ্ছে।

আমার মনে হয়, মনোমুগ্ধকারিতায় তারা আমাদের শতকরা ৩০ জনকে টেক্কা দেয়। পুরুষরা মনোমুগ্ধকর হাত চাইলে সব কিছুই পেতে পারে। মেয়েরাও পুরুষদের মত আকর্ষণীয় এবং তাদের চেয়েও অনেক বেশী স্মার্ট হতে পারে কিন্তু পুরুষের ধার তারা পাবে না, কারণ মেয়েরা পুরুষদের মত নিষ্ঠাবতী হতে পারে —এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না। কথায় বলে, মেয়েদের মন !

বন্ধুত্বের কথা যদি বলেন, তাহলে জানবেন পুরুষরাই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সম্পর্ক যদি রোমান্সের না হয়, তাহলে জানবেন, আপনার পুরুষ-বন্ধু আপনার মেয়ে-বন্ধুর চেয়ে অনেক ভাল। আপনার গোপন কথা নিয়ে তিনি কখনও খোসগল্প করে বেড়াবেন না এবং আপনার বিপদে সব সময়েই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

বিমর্ষ অবস্থাতেও পুরুষরা কখনও আত্মবিস্মৃত হয় না। পুরুষরা যে কোন বিমর্ষ পুরুষের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারে কিন্তু কোন বিমর্ষ মেয়ের সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য তারা কথা বলতে রাজি নয়। মেয়েরা বিমর্ষ মেয়ে দেখলে এক মাইল দূরে ছুটে পালাবে, কিন্তু বহু কষ্টে হাসি টেনে এনে বিমর্ষ পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দ্বিধা করবে না।

পুরুষের স্বার্থপরতা এত প্রত্যক্ষ যে, সে স্বার্থপরতা যে করে হোক স্বীকার করে সয়ে যেতে হয়। মেয়েরা উদ্দেশ্য সাধনের (সাধারণত বিবাহ) আগে পর্যন্ত স্বার্থপরতা গোপন করে রাখে। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের পরমুহূর্তেই মেয়েরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্বার্থপরতার ব্যাপারে পুরুষরা এত অকপট এবং স্পষ্ট যে বিস্মিত হতে হয়। পুরুষরা—বিশেষ করে বিশিষ্ট অবিবাহিত পুরুষরা ভীষণ রকমের করিৎকর্মা লোক। কি অক্লান্ত ভাবে তারা ঘর-সংসার রক্ষণাবেক্ষণ করে লক্ষ্য করবেন। সব সময়েই প্রত্যেকটি জিনিষ একেবারে ফিট-ফাট ছিমছাম। এই অদ্ভুত জীবেরা শোবার ঘরে বসেই অপার্থিব খাবার রান্না করতে পারে। তাদের রান্না এমন চমৎকার হয় যে, মেয়েদের সমস্ত 'নারীত্ব' এক মুহূর্তে তারা হরণ করে নেয়, ঠিক যেমন ট্রাউজার পরে কোন কোন মেয়ে পুরুষদের পুরুষত্বের উপর আক্রমণ চালায়। অবশ্য মেয়েদের এই প্রচেষ্টা একেবারেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কিন্তু "নারীত্ব" অপহরণকারী যে কোন প্রথম শ্রেণীর এ্যামেচার পুরুষ পাচক নারীর কাছ থেকেই প্রশংসা আদায় করে তবে ছাড়ে।

অবিবাহিত পুরুষরা যে ভাবে জীবনযাত্রায় খুঁটিনাটি কাজ যথারীতি করে যায়, তাতে আমার আতঙ্ক লাগে।

ধোপা-বাড়ীতে কাপড় পাঠান, জামা-কাপড় ইস্ত্রি করা, বাজার করা, চুল ছাঁটা,—এ সব তারা নিখুঁত ভাবে সুসম্পন্ন করে। বড়দিনের বাজারটাও তারা অনায়াসে শেষ করে। সত্যি কথা বলতে কি, এ সব ব্যাপারে তারাও ঠিক মেয়েদের মতই অসুবিধায় পড়ে, কিন্তু এ নিয়ে তারা চেঁচামেচি করে না। কোন পুরুষ সুন্দর ভাবে বাস করতে চাইলে ঘর-দুয়ার ভাল করে সাজায়, ফুলগুলোকে ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখে। চারি দিকে একটা মনোরম আমেজের সৃষ্টি করে, কিন্তু কোন অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে তেমনি আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হলে ডেকরেটারকে (নির্ঘাৎ পুরুষ) অন্ততঃ দ্বিগুণ মূল্য ধরে দিতে হয়।

এবার অভিনেতাদের কথায় আসা যাক। পুরুষরা ১০ মিনিটের মধ্যে ৯ মিনিট সেটে ঘোরা-ফেরা করে দশম মিনিটে একখানা প্যানম কেক ঘষে মুহূর্তেই একেবারে তৈরী হয়ে পড়েন। আর আমার মত সামান্য মেয়েদের দুর্দশাটা একবার বুঝুন। ভোর থেকে কেশ-সজ্জা, প্রসাধন, পোষাক-পরিচ্ছদ—এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি যখন মাথা কোটাকুটি করছি তখন 'তিনি' হয়ত স্বার্থপরের মত নিশ্চিন্ত আরামে বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। স্যুটিংএর শেষে তিনি মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ালেই ব্যাস। তিনি একেবারে ছিমছাম ফিটফাট ফুলবাবুটি বনে গেলেন। ইচ্ছে করলে ষ্টুডিও থেকে সোজা তিনি ডিনার টেবলে গিয়ে হাজির হতে পারেন। একটুও বে-মানান হবে না। ম্যাগাজিনে আপনারা পুরুষ অভিনেতাদের যে ছবি দেখেন, সে সব ছবি তোলবার জন্য তাদের একটুও কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। নিজেদের পুরুষত্ব প্রকাশের জন্য সার্টের কলার ধরে সামান্য একটু টেনেই তাঁরা ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ান। কিন্তু ক্যামেরার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবার আগে মেয়েদের অন্তত কয়েক ঘণ্টা লাগে সাজ-সজ্জা ঠিক করতে। মেয়েদের সাজ-সজ্জা এবং প্রসাধন করতে যে সময় লাগে ততটুকু সময়ে পুরুষদের একটা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি এঁকে ফেলা যায়।

প্রসাধন দ্রব্যের প্রস্তুতকারক কারা? অধিকাংশই পুরুষ! আমি লিপষ্টীক ঘৃণা করি, কারণ লিপষ্টীকে রুমাল, কাপ সব কিছুতে দাগ পড়ে যায়। এই উঁচু স্তরের জীবেরা দাগ-নিবারক লিপষ্টীক আবিষ্কার করে না কেন? ক্রিম, লোসন, কাজল, পাউডার এই সব তথাকথিত সৌন্দর্যসাথী না থাকলে মেয়েদের কি আরও ভাল দেখাত না? নিশ্চয়ই দেখাত এবং তাহলে মেয়েরা বাহির-বিশ্বে মনোযোগ দিয়ে মনের খোরাক যোগাবার মত অনেক সময় হাতে পেত। পুরুষরা আর তাহলে এ ব্যাপারে একচেটিয়া সুযোগ ভোগ করত না। পুরুষরা এই সমস্ত সীমাহীন, অপ্রয়োজনীয় রীতিনীতি বর্জন করে তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। আমি যতক্ষণে গত সপ্তাহে দেখা ছবিটার নাম মনে করবার চেষ্টা করছি, ততক্ষণে পুরুষ ভদ্রলোকটি ১৯২৪ সালে দেখা ছবি এবং তার নায়ক-নায়িকার নাম পর্যন্ত করে দিতে পারেন। আমি পারি না কেন? কারণ আমি মানুষ এবং পুরুষদের আমি মানুষ মনে করি না।

ভদ্রের ব্যাপারে আসুন। কোন মেয়ের সিগ্রেট ধরাতে ধরাতেই যে-কোন পুরুষ ব্রীজ খেলার হিসাব জুড়তে পারেন। একবারও তার হিসাবে ভুল হয় না কেন? যখন কোন পুরুষ আমায় ব্রীজ খেলার হিসাব জুড়তে বলেন, তখনই হঠাৎ আমার খেয়াল হয় যে, আমার একটা টেলিফোন করবার কথা আছে। তখন আমি ফোনের নম্বর ঠিক আছে কি না তাই চিন্তা করতে থাকি।

আমি জানি, যে কোন পুরুষই একটা গাধার টুপি মাথায় পরে বেড়াতে পারে, মাথার উপর ভর করে আকাশের দিকে পা তুলে দিতে পারে। মেয়ে-পুরুষ সকলেই তাতে হেসে বলবে, "লোকটা বেশ মজার।" মেয়েরা এমন করতে পারে কি? পুরুষদের ছল-ছুতো সহজেই লোকে ভুলে যায়, কিন্তু মেয়েরা একটু ছল-ছুতো করলে তার আর রক্ষা নেই। পুরুষরা যে কোন সময় একাই যত্র-তত্র যেতে পারে। তাড়া লড়াইয়ে, রেস খেলায়, ফুটবল খেলায়, এবং ভোজ-সভায় একাই যেতে পারে। পেছুটানবিহীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে কোন পুরুষই পার্টির পরম সম্পদ। যে সমস্ত পুরুষ পার্টিতে মেয়ে আনার কষ্ট স্বীকার করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এই ভদ্রলোকটি যে-কোন মেয়ের সঙ্গে যা খুশী নাচতে পারেন। সঙ্গিবিহীন কোন মেয়ে সেই পার্টিতে গেলে ঘরের অন্য মানুষের দৃষ্টি এড়িয়েই সব সময় তাকে কাটাতে হয়।

বাইরে বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, পুরুষরা দু' সপ্তাহের জন্য বাইরে গেলে গোটাকতক সার্ট, দাড়ি কামাবার যন্ত্রপাতি, টুথব্রাস, সাঁতারের পোষাক, এবং কয়েকটি টাই নিয়েই তাঁরা যেতে পারেন। আমাদের চাই সকালের পোষাক, দুপুরের পোষাক, বিকালের পোষাক, সান্ধ্য পোষাক ইত্যাদি। তা ছাড়া সুসজ্জিতা চাকচিক্যময়ী সুন্দরী হলে তার আরও জামা, প্রসাধন এবং সাজ-পোষাকের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিষ তাকে বয়ে বেড়াতে হয়।

পুরুষের চেহারা যতই রোদে-পোড়া জলে-ভেজা হোক না কেন, তাদের সময় সময় খেলোয়াড়সুলভ তেজস্বী এবং চমৎকার দেখায়। দিনের শেষে আমার চেহারাটি কি রকম দাঁড়ায় বলুন তো? একেবারে গলদা চিংড়ির মত লাল, কুঁকড়ে যাওয়া অধর এবং নোণা হাওয়ায় উস্কো-খুস্কো হয়ে যাওয়া চুল—আমি ইডা লুপিনো। ওঃ! প্রকৃতি আমাদের প্রতি কত নিষ্ঠুর!

আমার মনে হয়, পুরুষরা পশু, আধা ভগবান এবং অত্যন্ত উঁচু স্তরের জীব। আমার মনে হয়, তাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্য আমরাই দায়ী।

সেই জন্যই পুরুষদের আমি ভালবাসি—তারা সত্যিই মানুষ নয়।

আশার সাগরতীরে

শ্রীমতী নিশারাণী দেবী

ডাক্তার ঘোষের ল্যাবরেটারীতে বসে কথা হচ্ছিল দু'জনে। প্রবীর ও সুশ্রী। এক জন ডাঃ ঘোষের প্রিয়তম ছাত্র, অপরটি ডাঃ ঘোষের শ্যালিকা-কন্যা। সুশ্রী বিদ্রূপের স্বরেই বললে—জানি বলবেন, বাবার মুখের ওপর না বলতে পারলুম না, তাই। কিন্তু দু'দিন আগেও পাঁচ বছরের মধ্যে কিছুতেই বিয়ে করবো না বলেও একেবারে হৈ-হৈ জোরে যাকে বলে রাজকন্যে আর রাজত্ব নিয়ে টোপর পরে ফিরলেন?

কথাটা সত্যিই। প্রবীরের বিয়ে করবার ইচ্ছেটা ছিল না। ডাক্তারী পাশ করে কি একটা রিসার্চ করছিল। পিতা অবনীনাথের

একমাত্র পুত্র সে। বাবার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারেনি। না পেরে ঠকেওনি কিন্তু সে। নববধূ পরমা সত্যই পরমাসুন্দরী।

পরমা পিতৃমাতৃহীনা। ধনী দিদিমা ও দাদুর শিবরাত্রির সলতে। প্রচুর আদরে, পর্য্যাপ্ত সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই প্রতিপালিতা।—অবনীনাথ পুত্রবধূকে পেয়ে কন্যার শূন্য-স্থান ভরিয়ে তুললেন। প্রবীরেরও এমন অসামান্যা রূপবতীকে বধূরূপে পেয়ে খুশীর আর অন্ত নেই।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটলো। ডাঃ ঘোষ কিছু দিন থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। প্রবীর রোজই দেখা করতে যায়। ক্রমেই বাড়ছে অসুখটা। প্রবীর ও সুশী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। হঠাৎ এক দিন মুমূর্ষু ডাঃ ঘোষ সুশীকে সরিয়ে দিয়ে প্রবীরকে গোটা-কতক গোপনীয় কথা বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুশী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। প্রবীর ডাঃ ঘোষের শয্যার পার্শ্বে এসে বসে। হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তেজিত কণ্ঠে ডাঃ ঘোষ যা বলেন, তার সার মর্ম্ম হল এই যে—সুশীর জন্ম-বৃত্তান্ত কলঙ্কময়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেবচরিত্র ডাঃ ঘোষের আকস্মিক পতনের ইতিহাস। স্খলিতা বিধবা শ্যালিকার প্ররোচনায়···।—ডাঃ ঘোষের শেষ সাধ, সুশীর ভার যেন প্রবীর নেয়, সুপাত্র দেখে যেন তার বিয়ে দেয়।

মৃত্যুপথযাত্রী অধ্যাপকের শেষ সাধ পূর্ণ করতে প্রবীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং তারই ফলে তার নব-বিবাহিত জীবনে আসে ভুল বোঝাবুঝির কালো মেঘ।

ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে সুশীর থাকবার ব্যবস্থা হয়। প্রবীর রোজ তার খবরাখবর নেয়। এতগুলি ব্যাপার ঘটে যায় প্রবীরের বিয়ের কয়েক দিনের ভেতরেই। ফলে নব-বিবাহের অনেক ছোট-খাটো অনুষ্ঠানেই প্রবীরের অনুপস্থিতি ঘটে এবং সেটা সকলের চোখেই কেমন বিসদৃশ লাগে, বিশেষ কোরে পরমার দিদিমার চোখে, এবং তার চেয়েও বিশেষ কোরে পরমার চোখে।

প্রবীর মাঝে মাঝে অনুভব করে যে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য হয়তো তার করা হচ্ছে না, কিন্তু ডাঃ ঘোষের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার আগে তাঁর ছুটি নেই। তাছাড়া পরমার কাছ থেকেও তেমন কোন আহ্বানও তো সে পায় না। তাকে কাছে পাবার জন্যে পরমার আগ্রহটাও তো সে টের পায় না তেমন। তবে কি···?

পরমা অনুভব করে স্বামীর ঔদাসীন্য। তবে কি আমায় মনে ধরেনি ওঁর? ধনীর আদরিণী দৌহিত্রী। চিরকাল আদরে মানুষ। আব্দার জানাবার আগেই সব-কিছু পেয়েছে সে। তাই স্বামীর আদরটাও সে আব্দার জানাবার আগেই পেতে চায়।

ঘটনাচক্রে এমনি কোরেই দু'টি নিষ্পাপ তরুণ-হৃদয় দু'জনের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে যায়।

সুশী ছাড়াও আর একটা দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়েছে প্রবীরের। দুঃস্থদের সেবা, বিনা পারিশ্রমিকে বস্তিবাসীদের রোগের চিকিৎসা করা। ফলে অধিকাংশ দিনই তার বাড়ী ফিরতে রাত হয়, সকালেও অর্দ্ধেক দিন বাড়ীতে খাওয়া হয় না। সন্দেহটা আরো গাঢ় হয়ে ওঠে সকলের মনে সন্দেহটা চরম আকার ধারণ করে সেই দিন, যেদিন নিখিলের কাছ থেকে প্রবীরের পিতা অবনীনাথের কাছে একটি গোপনীয় চিঠি এসে হাজির হয়।

এই নিখিল হচ্ছে প্রবীরের সহপাঠী এবং ডাঃ ঘোষের অন্যতম ছাত্র। সুশীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল প্রবীরেরই মতো। সুশীর ফ্ল্যাটে সে প্রায়ই আসতো। সুশীকে নিয়ে মাঝে-মাঝে বেড়াতে যেত, হোটেলে ডিনার খাইয়ে আনতো, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতো। ক্রমে সুশীর সঙ্গে নিখিলের ঘনিষ্ঠতা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছল, যখন প্রবীরকে বলতেই হল,—নিখিল তুমি সুশীকে বিয়ে কর।—নিখিল অক্লেশে উড়িয়ে দিলে প্রস্তাব। বললে,—পাগল হয়েছ? উত্তেজিত হয়ে প্রবীর নিখিলকে অত্যন্ত কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দিলে সুশীর ফ্ল্যাট থেকে।

প্রতিশোধ নিলে নিখিল অত্যন্ত হীন উপায়ে। এই মর্ম্মে প্রবীরের পিতার কাছে চিঠি দিলে যে,—প্রবীর সুশী নাম্নী একটি মেয়ের প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। তারই কাছে থাকে সে দিনের অধিকাংশ সময়। তার গহনা গড়াতেই প্রবীরের ডাক্তারী রোজগারের সবটাই ব্যয় হয়ে যায়।

প্রবীর সেদিন বাড়ী ফিরতেই অবনীনাথ বললেন,—সুশী মেয়েটির কুসঙ্গ থেকে তুমি যদি মুক্ত না হতে পারো, তাহলে······। বাকীটা বলবার আগেই প্রবীর দুঃখে-রাগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাবা সুশীর নাম জানলেন কি কোরে? তবে কি পরমা এই হীন সন্দেহের কথা বলেছে বাবার কাছে? নিশ্চয়ই তাই। পরমার কাছে ছাড়া বাড়ীর আর কারুর কাছে তো সুশীর কথা বলিনি আমি। ছি ছি, পরমা আমাকে এতখানি হীন মনে করে? আমার কথায় তার বিশ্বাস নেই এতটুকু?—অভিমানে প্রবীর সেই দিনই নাম লেখালো সেবা-কার্য্যের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে। চলে গেল বাংলার পল্লী অঞ্চলে দরিদ্রদের সেবা-কার্য্যে। পরমা এর বিন্দুবিসর্গও টের পেল না। শুধু বুঝলে তার প্রতি প্রবীরের এতটুকু মোহ নেই, এতটুকু ভালবাসা নেই। বুকটা তার পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে লাগলো। সেখানেও কিন্তু মন টিঁকলো না প্রবীরের। পরমার পবিত্র সুন্দর মুখটি কেবল তার চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে। ফিরে এল কলকাতায় সুশীর ফ্ল্যাটে। রাত তখন গভীর। সুশী এত রাতে প্রবীরকে দেখে অবাক্। এমন নির্জ্জনে প্রবীরকে একান্ত কাছে পেয়ে সে প্রবীরকে নিবেদন করলো তার অনেক দিনের সঞ্চিত প্রেম। সুশীর লালসায় শিউরে উঠলো প্রবীর। ছিটকে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। সটান চলে গেল তার শৈশবের বন্ধু শিশিরের কাছে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা সে। আসন্ন একটা ধর্ম্মঘট সম্পর্কে প্ল্যান করছিল কয়েক জন কর্ম্মীর সঙ্গে। হঠাৎ প্রবীরকে কড়া নাড়তে দেখে অবাক্ হয়ে গেল। বললে—আয়, আয়, হঠাৎ যে?

শিশিরের কাছ থেকে কাগজ চেয়ে নিয়ে প্রবীর তখনই বম্বেতে ডাঃ ঘোষের পুত্র নির্ম্মলকে একটা চিঠি লিখে সুশীর আচরণ জানিয়ে, অনুরোধ করলে তাকে বম্বেতে নিয়ে যেতে। এমন অবস্থায় সুশীর ভার নিতে সে অক্ষম। কিছু দিনের মধ্যেই নির্ম্মল এসে সুশীকে নিয়ে গেল, এবং প্রবীর নিজের হৃদয়ের দুঃখ ভোলবার জন্যে শিশিরদের শ্রমিক আন্দোলনে ভাসিয়ে দিলে নিজেকে। কয়েক দিন পরেই খবরের কাগজে প্রবীরের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের খবর বের হল। শিউরে উঠলেন পিতা অবনীনাথ, মূর্চ্ছিতা হল পরমা। পরমার মূর্চ্ছা ভাঙলো, কিন্তু অবনীনাথের শিহরণ থামলো না। থামলো যখন, তখন তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের কাজও থেমে গেছে। পিতার পারলৌকিক কাজের জন্যে প্রবীর কয়েক দিনের ছুটি পেয়েছিল। আবার ফিরে যাবার সময় পরমার খবরাখবর নেবার জন্যে পাড়ার বন্ধু জয়ন্তকে অনুরোধ জানিয়ে

গেল। স্বামি-স্ত্রীর মনের মেঘ যখন এমনি ভাবেই কেটে গেল, ঠিক তখনই হল তাদের এক ২ছরের বিচ্ছেদ। বিধাতার এ কি পরিহাস!

জয়ন্ত প্রায়ই আসে। খবরাখবর নেয়, কিন্তু সাংসারিক খবরের চেয়ে পরমার মনের খবরের প্রতিই যেন তার আগ্রহ বেশী। কথায় কথায় বার বার জয়ন্ত এই কথাই পরমাকে মনে করিয়ে দিতে চায় যে, প্রবীরের সঙ্গে সম্বন্ধ হবার পূর্ব্বে তার সঙ্গেই পরমার সম্বন্ধ হয়েছিল।

দিন এগিয়ে যায়। ক্রমে প্রবীরের মুক্তির দিন এগিয়ে আসে। কাল তার মুক্তির দিন। জয়ন্ত বিকেলে এসে নিমন্ত্রণ জানায় পরমাকে সিনেমা যাবার। এর আগেও বহু বার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে জয়ন্ত। প্রতিবারই নানা ছুতায় প্রত্যাখ্যান করেছে পরমা। আজ খুশীর আনন্দে হঠাৎ সে রাজী হয়ে বসলো।

কিন্তু এ কি? জয়ন্তর গাড়ী এ কোন্ দিকে যাচ্ছে? জয়ন্তর চোখে-মুখে ও কিসের পৈশাচিক অভিব্যক্তি? প্রকাণ্ড একটা বাগান-বাড়ীর দরজায় থামলো গাড়ী। পরমা বন্দিনী হল দোতলার একটি ঘরে। ডুকরে কেঁদে উঠলো পরমা। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। একটি বৃদ্ধ চাকর পরমার ঘরে ঢুকলো চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। পরমা কেঁদে পড়লো তার পায়ে ধরে বললে নিজের সব কথা। বললে,—আমায় বাঁচাও তুমি, ভগবান তোমার ভাল কোরবেন।

প্রবীর বড়ো আশা করেছিল, মুক্তির দিন তার জন্যে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে পরমা জেল-ফটকের বাইরে। কিন্তু পরমার দেখা না পেয়ে মনটা তার আবার বিষিয়ে উঠলো। বাড়ী ফিরে ঠাকুর-চাকরের কাছে শুনলে কাল বিকেলে পরমা জয়ন্তর সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে, এখনও ফেরেনি। কাল বিকেলে বেরিয়েছে, আর এখন সকাল সাতটা, এখনো ফিরলো না সে। ঘৃণায় সর্ব্বশরীর বিষিয়ে ওঠে প্রবীরের। অথচ এই পরমার কথা ভেবেই সে একটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে। ছিঃ—

প্রবীর চিঠি লেখে,—'পরমা, তোমাকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। ফিরবো না আর কোন দিন তোমার বিলাসের ব্যাঘাত ঘটাতে।—প্রবীর।'

চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ দেখে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে পরমা এবং তার পেছনেই একটি বৃদ্ধ।

পরমা দৌড়ে এসে প্রবীরের পায়ে লুঠিয়ে পড়ে। কান্নায় ভাসিয়ে দেয় তার পা-দু'টো। 'বৃদ্ধ সবিস্তারে জানায় জয়ন্তর কুকীর্ত্তির কথা। প্রবীর চিঠিটাকে কুচি-কুচি কোরে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। পাশের বাড়ীর রেডিয়োতে শানাই-এর আলাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিশুর বৈশিষ্ট্য

সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেই চিন্তা করেন, ভাবেন কি ভাবে শিশুটিকে একেবারে শৈশব থেকেই ঠিক ভাবে গড়ে তোলা যায়। এ কথা সত্যি, এ বিষয় সকলেরই ভেবে দেখা প্রয়োজন। কেন না, জাতির ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ শিশুর মনের গঠন-প্রণালীর উপরেই নির্ভর করে; শিশু-মনের গঠন-প্রণালীর বিচিত্র ব্যাপারগুলি যত জানা যায় আশ্চর্য্য হতে হয়। সহজেই কিন্তু শিশুকে জানা যায় না। শিশুকে জানতে হলে তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই ভাল ভাবে পরিচিত হতে হয়। সম্ভবতঃ শিশুর বৈশিষ্ট্যই রবীন্দ্রনাথকে তার প্রতি এত আকৃষ্ট করেছিল। শিশু ভোলানাথে তারই কিছু আভাষ পাওয়া যায়। শিশু তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিনিয়ত কত অসংখ্য জিনিষ গ্রহণ করে ও বর্জন করে তার ইয়ত্তা নাই। তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে সে পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সম্পর্ক গড়ে তোলায় সময় শিশু তার বৈশিষ্ট্যের ওপরেই নির্ভর করে। এই সময় কত অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি কল্পনা শিশুর মনকে ভুলিয়ে রাখে আর তারই সঙ্গে লুকিয়ে থাকে—ক্রোধ ঘৃণা ভয় ভালবাসা মনের আবেগে অদ্ভুত আকর্ষণগুলি। প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য আশার ভাঙা-গড়ার খেলা। শিশুর এই মন-রাজ্য এক আজব দেশ-বিশেষ। কল্পনায় শিশু এই আজব দেশ গড়ে তোলে ও সেইখানেই বসবাস করতে চায়। সেখানে সে নিজেই হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা হয়ে বসে থাকে। অদ্ভুত এই আজব দেশের সম্রাট হিসেবেই সে অগ্রসর হতে থাকে। কোন যায়গায় বাধা পেলেই সে ক্ষুব্ধ হয়—সম্রাট হিসেবে সে অনেক কিছু আশা করে। সেখানে বাধা পেলেই সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে পড়ে—বাধা পাবার কোনই কারণ সে খুঁজে পায় না। কারণ, আশা করাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। না পাওয়াটাই যেন অস্বাভাবিক। এই কারণেই অনেক সময় দেখা যায়, শিশু মায়ের কোলে শুয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে হঠাৎ মায়ের কাছে আধ-আধ ভাবে বলে ওঠে—"মা, আমায় একটা চাঁদ দেবে?" মাকে আদেশ করে বা ভুলিয়ে সামান্য চাঁদ নেওয়া তাও মাত্র একটি সে ত কিছুই নয়। শৈশবের প্রতিটি মুহূর্ত্তে মায়ের একাগ্র নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ সর্ত্তহীন অপরিসীম স্নেহের আকাঙ্ক্ষা শিশুর মনে থাকে। কিন্তু মায়ের বিপদ ক্রমেই ঘনিয়ে আসে। শিশু তার ধারণার উপরে নির্ভর করে যখন তার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়-বস্তু লাভ করতে পারে না—সে ক্রোধে ও অভিমানে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে। কান্নায় সে তার ব্যর্থতা প্রকাশ করে। এই ক্রোধ যদি কোন কারণে একটু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় তাহলে দেখা যায়, শিশুর আকস্মিক বিষয়টি কোন রকমে তার কাছে উপস্থিত করা সম্ভব হলেও অনেক সময় জিনিষটি সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তার এই ক্রোধ-প্রকাশের কারণ অতি রহস্যজনক, কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুর ক্রোধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ থেকে তার ভয়ের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। সে মনে করে, এই অস্বাচ্ছন্দ্য থেকেই তার মৃত্যু ঘটতে পারে। ভয় থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যই তাকে একটা বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সে যাকে উপস্থিত পায় তার মধ্যে ভয়কে চালান ক'রে নির্ব্বাসিত করার চেষ্টা হয়। যে ব্যক্তির মধ্যে অথবা যে বিষয়-বস্তুর মধ্যে ভয় নির্ব্বাসিত হয় সে ব্যক্তি বা বিষয়-বস্তু তখন শিশুর কাছে ভীতিজনক হয়ে ওঠে। যদি কোন ব্যক্তি এই রকম ভীতিজনক হ'য়ে ওঠে, তখন তার কাছ থেকে কোন জিনিষ নিতেও শিশু ভীত হয়, কারণ সেই জিনিষটিও তার কাছে ভীতিজনক হয়ে পড়ে।

এই জন্য শিশু যখন স্তন্য পান করতে না পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় ও কান্নাকাটি করে এবং তার পরে তার মা যখন স্তন্য পান করাতে আসেন তখন শিশু অনেক সময় স্তন্য পান করতে চায় না। অনেকে এই সময় শিশুকে আদরের ছলে একটু শাসন করেন। কিন্তু এই সময় শিশু যথেষ্ট আদর না পেলে তা ভয় দূর হয় না, খাদ্য সম্বন্ধেও

তার নানা রকম বিকৃত ধারণা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব—এমন কি শিশুর হজম শক্তির গুরুতর ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এরি সঙ্গে মনে মনে মায়ের প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়ে থাকে। এক দিকে মায়ের প্রতি যদি প্রবল ভালবাসা থাকে ও অপর দিকে যদি প্রবল ক্রোধের সৃষ্টি হয় তাহলে মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এ কথা জানা দরকার শিশু কিন্তু যে কোন লোককে মায়ের স্থানে বসাতে পারে, প্রথমে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়-বস্তুকেও মায়ের স্থানে বসিয়ে নেয়। কেবল যে মায়ের স্থানে বসিয়ে শিশু নিষ্ক্রিয় থাকে তা নয়—কল্পনায় তাকে স্তনযুক্ত করে নেয় অথবা তাকে স্তন বলেই মনে করে। এ ভাবে মনে করার কি কারণ সে কথাই বলছি। শিশু স্তন্য পান ক'রে মনে করে মায়ের শরীরটা স্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পর পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়-বস্তুকে সে স্তন হিসাবেই দেখে এই জন্যই যে কোন বিষয়-বস্তু তার আয়ত্তের মধ্যে এলেই সে সোজা সেটি মুখের মধ্যে এনে ফেলার চেষ্টা করে। যেহেতু মায়ের কাছে ক্ষিদের সময় তৃপ্ত হওয়া যায় ক্ষিদেয় কষ্ট পেলেই শিশু বিশেষ ভাবে তখন যে জিনিষ বা ব্যক্তিকে সামনে পায় তাকে মা হিসেবেই বিবেচনা করে। কেবল ক্ষিদের সময় ছাড়াও যত ভাবে শিশু কষ্ট বা অভাব অনুভব করে শিশুর বিবেচনায় সে সমস্তই সুখাদ্যের সাহায্যে মিটে যেতে পারে। এই কারণে কেবল মায়ের ব্যবহারের মধ্য দিয়েই যে শিশুর মন গড়ে ওঠে তা নয়। পরিবেশের প্রভাবের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী পরিমাণেই থাকে। যে প্রকারেই হোক, ঘৃণা ও ভালবাসা এই দুই বিপরীত মনোভাবের কোন রকমে দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হলেই শিশু এই দ্বন্দ্বকে চেতন মন থেকে অবচেতন মনে নির্ব্বাসন ক'রে দ্বন্দ্ব-কলহের হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। পূর্ণ-বয়সে এক দিন যদি কোন উপায়ে এই নির্ব্বাসিত দ্বন্দ্ব পুনরায় চেতন মনে এসে উপস্থিত হয় তখন নানা রকম মানসিক রোগ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। মায়ের কাছে অর্থাৎ মা অথবা মায়ের স্থানীয় বলে শিশু যাকে মেনে নেয় তার কাছে শিশু যথেষ্ট স্নেহ আকাঙ্ক্ষা করে এ কথা বলেছি। ঐ স্নেহ আশানুযায়ী না পেলে শিশুর মনে কি রকম বিপর্য্যয় ঘটে ও তার পরিণতির বিষয় শুনলেন! এইবার ঐ স্নেহ লাভ করার পর শিশুর মনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া যাক। কি ভাবে সেই পরিবর্ত্তন আসে? পরিবর্ত্তনের বিচিত্র কৌশল একটু খুলে বলি। শিশুর প্রতি যদি স্বাভাবিক ভালবাসা প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ শিশুর ভালবাসার বিষয়-বস্তু তাকে যদি দেওয়া যায় তাহলে যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসার বিষয়-বস্তু দিয়ে থাকে তাকেও শিশু ক্রমে সেই ভালবাসার বিষয়-বস্তুর দোষগুণযুক্ত মনে করে। যদি কোন শিশুকে কোন ব্যক্তি রোজ সন্দেশ খাওয়ায় তাহলে সেই লোকটিকে শিশু সন্দেশের তৈরী বলেই মনে করে। অর্থাৎ সেই লোকটিকে সে জ্যান্ত সন্দেশ হিসেবেই দেখে ও মনে করে, লোকটিকে ভক্ষণ করতে পারলে ঠিক সন্দেশের মতই লাগত। কেবল এই খানেই সন্দেশের গুণ শেষ হয় না—নিজে সন্দেশ খেয়ে নিজেকেও সন্দেশের মত সুস্বাদু মনে করে। শিশু যাকে ভালবেসে উঠতে পারে তাকে শরীর ও মনের বাইরে রাখতে চায় না। শিশুর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এইটের গুরুত্ব খুবই বেশী এ কথা জানা দরকার। সে মনে করে সে যাকে ভালবাসে তাকে আত্মস্থ ক'রে সে তারই মতন হয়ে গেছে। শিশু যখন তার বাবা ও মাকে ভালবাসে তখন সে বাবা ও মায়ের সঙ্গে একীভূত হবার কল্পনা করে নিজেই একাধারে বাবা ও মায়ের স্থান অধিকার করে। বাবা ও মায়ের দোষ-গুণ সব কিছু শিশু নিজস্ব করে নেয়।

শিশুর সঙ্গে ব্যবহারে যাঁরা বাবা ও মায়ের স্থান অধিকার করেন শিশু তাঁদের বাবা ও মা হিসেবেই বিবেচনা করে। বাবা ও মা অথবা তাদের স্থানীয় যাঁরা, তাঁরা যদি রুক্ষ ভাবে ব্যবহার করেন ও চিরাচরিত অভ্যাসগত বিষয়গুলি নিয়ে অত্যন্ত গর্ব্ব করেন, ন্যায়-অন্যায়ের কথা ব'লে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ করেন ও গোঁড়া ধর্ম্মান্ধতার নজির দিয়ে প্রতিটি যুক্তির অবতারণা করেন, তাহলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শিশু বাবা ও মায়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে নিজেকে কল্পনায় ঐ রকম কঠোর বিচারকের সম্মুখীন করে ও তার নির্জ্ঞান মনে চরম অন্যায় বোধের সৃষ্টি হয়। এই রকম গুরুতর অন্যায় বোধের সৃষ্টি হ'লে শিশুর পক্ষে ভাবী কালে উন্নতির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। অতি বড় আদর্শ যা শিশু ভাল ভাবে আয়ত্তে আনতে পারে না, চিন্তায় আনাও সম্ভব নয়, এমন আদর্শ শিশুর সামনে উপস্থিত করলেও অনুরূপ বিপদ থাকে। মা বাবা ভাই বোন যে পরিবেশ সৃষ্টি করেন ও পরবর্ত্তী কালে শিক্ষক ও বাবু-মহলের যে প্রভাব শিশুর মনে বিস্তার করে তারই উপরে অনেকাংশে শিশুর ভাবী জীবনের পূর্ণতা বা অপূর্ণতা নির্ভর করে। শিশুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের সাহায্যে তাকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

মায়ের পূজা

আরতি গোস্বামী

হে মাতঃ! তব পূজন লাগি এনেছি পুষ্প তুলিয়া,
ভুলিব—আমি সকল বেদন, আজিকে যাব ভুলিয়া
বছর পরে এসেছ ঘরে—আজকে কি কেউ হিসাব করে?
চরণ-তটে অঞ্জলি দে, অঞ্চল তোর ভরিয়া,
ভুলিব আমি সকল বেদন আজিকে যাব ভুলিয়া।

হাসিব—যতই মম অন্তরেতে জাগুক হাহাকার,
কান্না-হাসি মিলায়ে আজি করিব একাকার।
চক্ষে যদি অশ্রু ঝরে—তবু হাসব আমি হাসব ওরে—
বলব—"মা গো, দেখছ না কি মুখের হাসি ধার"
(আমি) এমনি কোরেই কান্না-হাসি কোরবো একাকার।

হয়ত ইহা কোরতে বুকে রক্ত আমার ঝরবে—
ফুলের সাজি তাই হয়ত রক্ত-রঙে ভরবে,
শুভ্র ফুলে রক্ত দেখি—মা যদি কন—"ওরে এ কি?"
উত্তরে তার বলব হাসি—"এ কি চিনতে তুমি পারবে?
ধরার এ এক নূতন জবা চিনতে তুমি নারবে।"

ভুলিব—এমনি করেই যাব আমি দুঃখ আমার ভুলিয়া—
সহায়তা কোরবে এতে দোয়েল-শ্যামা-পাপিয়া,
ওদের মধু কুহুস্বরে দুঃখ কি আর থাকতে পারে?
শিউলি ফুলে অঞ্জলি দে মায়ের চরণ ভরিয়া—
তোমার পূজা লাগিয়া মাতা এনেছি জবা তুলিয়া।

ওকগাছের স্বপ্ন

শ্রীসুলতা কর
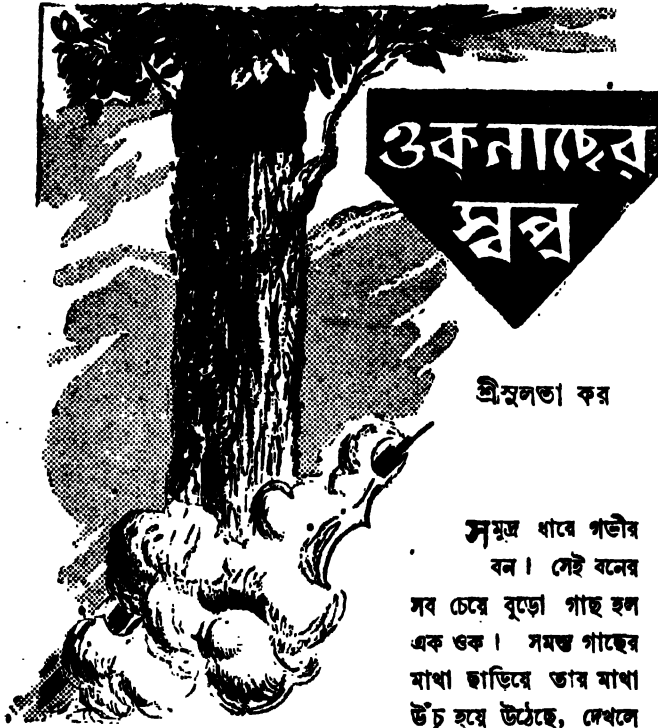
সমুদ্র ধারে গভীর বন। সেই বনের সব চেয়ে বুড়ো গাছ হল এক ওক। সমস্ত গাছের মাথা ছাড়িয়ে তার মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে, দেখলে মনে হয় যেন মেঘেদের ছুঁয়ে আকাশে মিশে যাচ্ছে। এত উঁচু তার মাথা যে সমুদ্রের বহু দূর থেকে তাকে দেখা যেত। ঝড়ের, দুর্য্যোগের রাতে সে ছিল জাহাজদের প্রিয় বন্ধু।

ঝড়ের রাতে জাহাজের নাবিকেরা কত দিন ধরে তাকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছে—"ওই দেখা যাচ্ছে বুড়ো ওক গাছকে, এইবার আমরা ঝড় কাটিয়ে তীরে উঠব।"

কত দিন ধরে কত জনকে সে আশ্রয় আর আনন্দ দিচ্ছে সে খবর সে নিজে রাখত না। তার উঁচু ডালের ভিতরে কাঠঠোকরারা বাসা বেঁধে সুখে ঘর করত, তার সবুজ পাতায় ভরা নীচের ডালে দুলতে দুলতে কোকিলরা গান করত, শীতের আগে দলে-দলে সারসরা এসে তার মাঝের ডালে বাসা বেঁধে কাটিয়ে যেত।

এমনি ভাবে বছরের পর বছর কাটত। এখন তার বয়স ঠিক তিনশো পঁয়ষট্টি বছর হয়েছে। কিন্তু তার পক্ষে এটা এমন কিছু বেশী বয়স নয়। কত গ্রীষ্মের দুপুর, বসন্তের সন্ধ্যা, বর্ষার রাত কেটে যেত, ওক গাছ জেগে জেগে সময় কাটাত। এ সব ঋতুই তার কাছে একটি দিনের সমান। কিন্তু যতই শীত কাল কাছে এগিয়ে আসত ওক গাছেরও চোখে ঘুম জড়িয়ে ধরত। শীতকাল হল তার শান্ত ঘুমের রাত। শীতের কনকনে ঝড় ওকের শুকনো পাতা খসিয়ে দিতে দিতে বলত—"দিন ফুরাল বন্ধু, ঘুমাও ঘুমাও। আমি তোমায় দোলা দেব, ঘুম পাড়াব। আমার তাণ্ডব দোলা লেগে তোমার শাখা মড়মড় করছে বটে, পাতা ঝরে পড়ছে বটে, কিন্তু এই যে ঘুম আমি তোমায় এনে দিচ্ছি, এ তোমার কত উপকার করছে বল দেখি। সারা বছর জেগে কাজ করে যত শ্রান্তি জমেছিল সব কেটে যাচ্ছে। মেঘদের আমি ডেকে এনেছি, তারা তুষার-বৃষ্টি করবে। তোমার সারা গায়ে সাদা তুষারের একখানি চাদর বিছিয়ে দেব। তার তলায় শুয়ে তুমি আরামে ঘুমাবে। শান্ত ঘুম তোমার চোখ জুড়ে আসুক, সুন্দর স্বপ্ন তোমার রাত মধুর করুক।"

ঝড়ের রুদ্র দোলায় দুলতে দুলতে, ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে ওক গাছ অগাধে ঘুমিয়ে পড়ত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ঘুমের ভিতর দিয়ে কেটে যেত। এক বছর খৃষ্টোৎসবের পুণ্য রাতে ওক গাছ ঘুমাতে ঘুমাতে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখল। এত সৌন্দর্য্যভরা, আনন্দময় স্বপ্ন সে তার জীবনের কোন রাতেই দেখেনি। সে যে স্বপ্নটি দেখল সেটি এই রকম—খৃষ্টোৎসবের পবিত্র এক দিন। খৃষ্টোৎসবের দিন অথচ শীত কাল নয়। বরফ পড়ছে না, কোথাও অন্ধকার নাই। আকাশ ভরে সোনালী আলো ঝরে পড়ছে, সূর্য্যের প্রখর দীপ্তিতে চার দিক ঝলমল করছে। প্রত্যেক গির্জ্জা থেকে পূজার ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। চার দিকে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। বড়লোক, গরীব, ছেলে, বুড়ো সবাই হাসছে, আনন্দ ক'রছে।

ওক গাছের সমস্ত জীবন ভরে যে সব সুন্দর সুন্দর ঘটনা ঘটেছে, এইবার সে সব এক এক করে ছবির মত স্বপ্নের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। সে দেখতে লাগল—এক দল বীর যোদ্ধা তার তলা দিয়ে তেজস্বী ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছে। তাদের পাশে ঘোড়ার পিঠে পরমা সুন্দরী রাজকন্যারা বসে রয়েছে। এই সব রাজকন্যাদের যোদ্ধারা শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে। সূর্য্যের প্রখর আলোয় যোদ্ধাদের ঝলমলে পোষাক, হাতের শাণিত তলোয়ার, মাথার সোনার শিরস্ত্রাণ ঝকমক করে উঠছে। রূপসী রাজকন্যাদের অপূর্ব্ব রূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে যোদ্ধার দল কোথায় মিলিয়ে গেল। এবার এল তেজস্বী কালো ঘোড়ার খুরে খুরে আগুনের হল্কা ছুটিয়ে এক দল ভবঘুরে বেদুইন। ওক গাছের তলায় তারা নেমে পড়ল। রাশ রাশ তাঁবু মাটিতে পেতে ফেলল। কুকুর, ছাগল চার দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বোরখা-ঢাকা সুন্দরী বেদুইন মেয়েরা গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমুদে পুরুষেরা ওক গাছের ডালে ডালে শিঙ্গা ঝুলিয়ে রাখল। জন কতক বেদুইন অপূর্ব্ব বন্য সুরে শিঙ্গা বাজাতে লাগল। কি ফূর্ত্তিতে ভরা রাতই না তারা তার তলায় কাটাতে লাগল। বন্য-জীবনের স্বাধীন অনাবিল আনন্দধারা। ওক গাছের ডালে ডালেও সেই আনন্দের ছোঁওয়া লাগতে লাগল। খানিক বাদে এ দৃশ্য মিলিয়ে গেল।

স্বপ্নের ভিতর এই সব সুখের দৃশ্য দেখতে দেখতে ওক গাছের মনে হতে লাগল যেন সে আর বুড়ো নয়, নবযৌবন তার ফিরে এসেছে। তার মনে হতে লাগল, যেন সে স্বর্গে পৌঁছে গেছে। তার মাথা মেঘের উপর উঠে গেছে। অনেক নীচে দিয়ে সাদা মেঘরা ভেসে চলেছে। দেখে মনে হচ্ছে, সাদা সারস পাখীর দল বুঝি উড়ে চলেছে। দেখতে দেখতে ওক গাছের প্রত্যেকটি সবুজ পাতার এক অদ্ভুত দৃষ্টি-ক্ষমতা এসে গেল। যে সব দৃশ্য মানুষ কখনও দেখেনি, ওক গাছের পাতারা সেই সব দৃশ্য দেখতে লাগল।

দেখতে লাগল—হঠাৎ দিনের আলো ম্লান হয়ে গেল। আকাশ তারায় তারায় ভরে উঠল। কি স্নিগ্ধ তাদের জ্যোতি আর কি অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য! তারাদের স্নিগ্ধতার দিকে চেয়ে চেয়ে ওক গাছের পাতাদের মনে হতে লাগল, যেন তারা দেখতে পাচ্ছে

তাদের পরিচিত অতি কোমল, অতি স্নিগ্ধ কতকগুলি চোখের আলো। এ চোখের আলোগুলিকে তারা দেখেছে ছোট ছেলেদের চোখে, যারা কত দিন ওক গাছের তলায় ছুটাছুটি করে খেলা করেছে, আর দেখেছে কবিদের চোখে, যারা তার তলায় বসে উদাস হয়ে কত দুপুর কবিতা পড়ে কাটিয়েছে। স্বর্গের পবিত্র হাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গ মেলে দিয়ে ওক গাছ স্বর্গের আরও কত সুন্দর দৃশ্য দেখতে লাগল। এত আনন্দ এত সুখ সে পেল যে তার মনে হতে লাগল, যেন সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না।

কিন্তু একটু পরে এক ম্লান বিষাদের সুর তার মনের কোণে জেগে উঠল। তার মনে প্রবল এক ইচ্ছা হল, এমন তীব্র ইচ্ছা—কিছুতেই যাকে দমন করা যায় না। সে চাইল—তার এত দিনের বাসভূমির প্রত্যেকটি গাছ বড়-ছোট সবাই; প্রত্যেকটি ফুল, প্রত্যেকটি ঝোপ এমন কি পায়ের তলার ঘাস পর্য্যন্ত স্বর্গের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখুক। সে যে সুখ, যে আনন্দ অনুভব করছে, তার সঙ্গীরা সবাই সেই আনন্দ অনুভব করুক। তা নইলে তার সুখের পূর্ণতা কোথায়? একমনে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল—"ভগবান আমাকে যে সুখ দিলে, সবাইকে সেই সুখ দাও, নইলে আমি কোন আনন্দ পাব না।"

একমনে ওক গাছ চোখ বুজে প্রার্থনা করছে, এমন সময় হঠাৎ ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে গেল, কানের কাছে কোকিল মিষ্টি সুরে গান গেয়ে উঠল। চমকে চেয়ে ওক দেখল, ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। তার সঙ্গে সমস্ত বনভূমি পৃথিবী ছাড়িয়ে, মেঘের রাজ্য পার হয়ে স্বর্গের কোলে এসে পৌঁছেছে। বড়-ছোট সব গাছেরা উপরে উঠেছে, ছোট-ছোট ঝোপেরাও বাদ পড়েনি। রঙ্গীন অসংখ্য ফুলেরা আকাশের কোলে শোভা ছড়িয়ে দুলছে। শুধু গাছেরা কেন—বনভূমির সমস্ত কীট-পতঙ্গও উপরে উঠে এসেছে। সবুজ ফড়িং হাল্কা ডানা নেড়ে আলোয় আলোয় উড়ে বেড়াচ্ছে। রঙ্গীন প্রজাপতিরা স্বর্গের ফুলে ফুলে মধুপান করছে। সকলের আনন্দের গানে স্বর্গ ভরে উঠেছে।

"কিন্তু ঘাসের ছোট নীল ফুলটি কোথায়? নদীর কোলে মাথা নীচু করে যে নিজেকে লুকিয়ে রাখত? আর সেই আগাছার ঝোপ, সবাই যাকে তাচ্ছিল্য করত? তারা কি এখানে আসেনি?"

"এই যে আমরা এখানে, এই যে আমরা।" হাসতে হাসতে তারা ওক গাছের পাশ থেকে বলে উঠল।

"কিন্তু গত বছর যারা ঝরে পড়ে গেছে, সেই সব শুকনো গোলাপের দল? পাইন গাছের পাতারা তারা কি এখানে আসবে না, এত সুন্দর দৃশ্য দেখবে না?"

"এই যে আমরা এসেছি—এই যে আমরা দেখছি।" বলতে বলতে ঝরে-যাওয়া গোলাপেরা তাজা হয়ে উঠল, মরে-যাওয়া পাইন গাছ সবুজ হয়ে উঠল আকাশের কোলে।

ওক গাছ হাসিমুখে বলল—"ওঃ, কি আনন্দ! সবাইকে আমি পাশে পেয়েছি। সবাই আমার সঙ্গে সুখ ভোগ করছে। ছোট, বড় কেউ বাদ যায়নি। এত সুখ ভাবাই যায় না। কি করে এত সুখ সম্ভব হ'ল?"

স্বর্গের কোল থেকে দেবদূতরা উত্তর দিল,—"পৃথিবীতে এত সুখ সম্ভব হয় না। এত সুখ পাওয়া যায় স্বর্গে। সাধু, পুণ্যাত্মারা যারা কেবল নিজের সুখ চায় না, সবায়ের মঙ্গল, সবায়ের সুখ চায় কেবল তারাই স্বর্গে এসে এই সুখ পায়। তুমি সবায়ের মঙ্গল চেয়েছ, তাই তুমি এত সুখ পেলে। সাধু পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে এক রাজ্যে চলে এলে।"

দেবদূতদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওক গাছ অনুভব করল তার প্রত্যেকটি শিকড় যেন মাটির কঠিন বাঁধন থেকে খসে যাচ্ছে। মাটির লৌহ-গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ওক গাছের মন শান্তিতে তৃপ্তিতে ভরে উঠতে লাগল, বলল—"এখন আর কোন শিকলই আমাকে মাটিতে বাঁধতে পারবে না। আলোর জগতে আনন্দের জগতে আমি উড়ে যাব। চলে যাব ভগবানের কাছে। পাশে থাকবে আমার সব প্রিয়জন। ছোট-বড় সবাই, যাদের আমি পৃথিবীতে ভালবেসেছি।"

—খৃষ্টোৎসবের রাতে এই স্বপ্নটি দেখল বুড়ো ওক গাছ। যখন সে স্বপ্ন দেখছে ঠিক সেই সময় জল-স্থল কাঁপিয়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। সমুদ্রের ঢেউয়েরা গর্জ্জন করতে করতে বিরাট আকার ধারণ করে তীরের দিকে ছুটে আসতে লাগল। ক্রমেই ঝড়ের বেগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ ঝড়ের এক অতি তীব্র আঘাতে ওক গাছ কেঁপে উঠল। দেখতে দেখতে তার সব শিকড়গুলি পটপট শব্দে ছিঁড়ে গেল, বিশাল ওক মাটিতে শুয়ে পড়ল। তার তিনশো পঁয়ষট্টি বছরের জীবনের সমাপ্তি ঘটল ঠিক সেই মুহূর্তে যখন সে স্বপ্ন দেখছে যে মাটীর বাঁধন ছিঁড়ে সে স্বর্গে উড়ে চলেছে। দুর্য্যোগ-ভরা রাত কাটল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গর্জ্জন থেমে গেল। খৃষ্টোৎসবের শান্ত প্রভাতে সূর্য্যের প্রসন্ন জ্যোতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেক গীর্জ্জা থেকে উৎসবের আনন্দ-ধ্বনি নিয়ে ঘণ্টা বেজে উঠল। ধনী, গরীব সবারই ঘর থেকে ভগবানের আনন্দ-গান শোনা যেতে লাগল। সমুদ্রের উপর দিয়ে একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ তীরের দিকে এগিয়ে এল। সারা রাত ঝড়ের সঙ্গে সে যুদ্ধ করেছে, তার চিহ্ন তার সর্ব্বাঙ্গে রয়েছে। কিন্তু আজ সকালে সে নতুন পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। নাবিকেরা নতুন পোষাক পরে হাসিমুখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। দূর থেকে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে এক নাবিক বলল—"কই আমাদের জমির নিশানা, সেই প্রিয় ওক গাছটিকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল, প্রিয়বন্ধু কোথায় গেল? কিন্তু ওক গাছকে দেখা গেল না। জাহাজ তীরে ভিড়ল। যাত্রীরা, নাবিকেরা লাফিয়ে নামল, দেখল—তাদের প্রিয়বন্ধু ওক গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

যাত্রীরা সবাই সজল নয়নে ওক গাছকে ঘিরে দাঁড়াল। নাবিকেরা বলল—"কত দিনের প্রিয়বন্ধু তুমি! তুমুল ঝড়ের রাতে কত নাবিক কত যাত্রী তোমায় দেখে ঘরের খবর পেয়েছে, জীবনের খবর পেয়েছে। মৃত্যুকে ভুলেছে। তোমার স্মৃতি আমাদের মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে! এস বন্ধুরা, শুভ খৃষ্টোৎসবের দিনে আমাদের প্রিয়বন্ধু ওক গাছের আত্মার উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।"

তারা সবাই মিলে ওক গাছকে ঘিরে যীশু খৃষ্টের গুণগান করতে লাগল। সে গান দূরে স্বর্গে ওক গাছের কানে পৌঁছল। পৃথিবীর ভালবাসা, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাকে বিহ্বল করে তুলল।

(বিদেশী গল্পের ছায়া)

হাড়-আল্‌সে হেকো

মনোজ সান্যাল

অনেক, অনেক দিন আগে—কত দিন আগে আর কোথায় তা' আমার ঠিক মনে নেই—এক জন লোক বাস করতো। নাম তার হেকো। কিন্তু সবাই তাকে ডাকতো 'হাড়-আল্‌সে হেকো' বলে। কারণ যে কোন কাজকেই সে এড়িয়ে চলতো বাঘের মত ভয় ক'রে। আর সেই আলসেমির জন্যে বেচারীকে কত দিনই না না খেয়ে কাটাতে হোত!

শেষ কালে না খেয়ে-খেয়ে ভারী বিরক্ত ধ'রে গেল তার। ঠিক করলো বুড়ো জারবাটুর কাছে যাবে। জারবাটু খুব পণ্ডিত লোক; যাদু বিদ্যেও জানে। লোকে বলে, সে না কি মানুষের বরাত বদলে দিতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে বহু কষ্টে হেকো গিয়ে হাজির হোল জারবাটুর বাড়ীতে। গিয়ে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে রইলো দোর-গোড়ায়। জারবাটু তো তাকে দেখে অবাক্। 'আরে! হাড়-আল্‌সে হেকো যে! এখনও বেঁচে আছো? ভেবেছিলাম কুঁড়েমির জন্যে এত দিন তুমি কবে টেঁসে গেছ।'

'এখনও কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছি।' জবাব দিলে হেকো।

'তা' আমার কাছে কি মনে ক'রে?

'আপনাকে দিয়ে আমার বরাতটা একবার বদলে নেবো। উপোস আর আমার ভাল লাগছে না।'

মোটা ভুরুর নীচ থেকে জারবাটু একবার তাকালে হেকোর দিকে। তার পর বললে,—'দেখছি তুমি ভুলে গেছ,—লোকে কথায় বলে: ভাঁড়ে যা জমাবে খেটে, তাতে যাবে সুখে কেটে। কিন্তু যদি না খাটো তাহোলে বরাতে উপোস ছাড়া আর কি জুটবে? এই রকমই তো লেখা আছে আমাদের বরাতের শাস্ত্রে!'

'কিন্তু উপোস যে আর আমার সহ্য হয় না! না খেটে রোজ পেট ভ'রে খেতে চাই।'

'বলিহারি তোমার বুদ্ধি! জান না, কষ্ট না ক'রলে কেষ্ট মেলে না? তুমি তো দিব্বি সারা দিন শুয়ে শুয়ে আকাশের কাক গোণ।'

কিন্তু হেকো কিছুতেই শোনে না। সে একেবারে নাছোড়-বান্দা। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুপিতে হাত বুলোয় আর কেবলই কাকুতি-মিনতি করে জারবাটুকে।

শেষে জারবাটু রেগে উঠলো। বললে,—'আচ্ছা বেশ, তাই হবে। আমি তোমায় একটা বর দিচ্ছি,—যদিও তুমি তার যোগ্য নও। যাও, বাড়ী ফিরে যাও। গিয়ে অপেক্ষা কর প্রথম পর্ব-দিনের জন্যে। পরবের ঠিক আগের রাত্তিরে খুব ঝড় হবে। কিন্তু খবরদার, ঘুমিও না যেন! জেগে বসে থাকবে। যেমনি আকাশে বিদ্যুৎ চমকাবে অমনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। দ্বিতীয় বার বিদ্যুৎ চমকালে দ্বিতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তৃতীয় বার চমকালে তোমার তৃতীয় আর শেষ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু হোলে কি হবে, তুমি যা বোকা, নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু চেয়ে বসবে যাতে আমার বরে তোমার কোনই উপকার হবে না।'

বর পেয়ে হেকোর আনন্দ আর ধরে না। জারবাটুকে ধন্যবাদ দিয়ে রওনা হোলো বাড়ীর দিকে।

পরবের আগের রাত্তিরে হেকো তার কুঁড়ে ঘরের চৌকাঠে বসে বসে ঝড়ের অপেক্ষা করতে লাগলো। যত বার হাই ওঠে তত বার সে চোখ ডলে, পাছে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে বলে।

ইতিমধ্যে গাঢ় কালো মেঘ ধীরে ধীরে নেমে এলো পাহাড়ের মাথা থেকে। উত্তুরে হাওয়া উঠলো সনসনিয়ে, আর বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা পড়লো মাটিতে। আর দেরী নেই! যে কোন মুহূর্তেই বাজ ডাকতে পারে।

হেকো অমনি ভাবতে বসলো কি বর সে চাইবে। ভাবতে যাবে ঠিক এমনি সময় পেটটা তার কামড়ে উঠলো। এতই পেট কামড়াতে লাগলো যে বর চাইবার কথা সে ভুলেই গেল।

'বেছে বেছে এই কি পেট কামড়াবার সময়! উচ্ছন্নে যাক পেট!' বললে সে রাগে বিড়বিড়িয়ে। 'এমন পেট না থাকাই ভালো!'

কড়-কড়-কড়াৎ……বাজ কড়কড়িয়ে উঠলো। বিদ্যুৎ চিক-মিকিয়ে গেল। ব্যস, হেকো চেয়ে দেখে তার পেট আর নেই!

কোটের নীচে হাত দিল,—কিন্তু কোথায় পেট! শুধু মেরু-দণ্ডের হাড়খানা পড়ে আছে চামড়ার নীচে। ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো। 'আরে! আরে! এ কি হোল! পেট ছাড়া বাঁচবো কি করে? এর চেয়ে বরং পেটটা বড় হোলেই ভালো হোত।'

যেই এ কথা বলা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চিকমিকিয়ে উঠলো। হেকো ওমনি চেয়ে দেখে তার পেট ফুলছে, ক্রমশঃই বড় হোচ্ছে। আর সে কি পেট! বিরাট এক জয়ঢাক! পেটের ভারে বেচারী আর দাঁড়াতেই পারলে না। হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়ে গোঁঙাতে লাগলো,—'ওরে বাপ রে! এত বড় পেট নিয়ে কি বাঁচা যায়! এর চেয়ে আগের মত পেটই ভালো।'

ঠিক এই সময় তৃতীয় বার আকাশে বিদ্যুৎ চিকমিকিয়ে গেল, বাজ ডেকে উঠলো—হেকো ওমনি আবার যে হেকো ছিল সেই হেকোই হয়ে গেল।

এতে ভারী রেগে গেল হেকো। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে ছুটলো আবার জারবাটুর কাছে।

যেতে যেতে রাস্তায় এক নেকড়ে বাঘের সঙ্গে তার দেখা। নেকড়েটা বুড়ো, রোগা লিকলিকে,—এত রোগা যে বুকের হাড়গুলো একটা একটা করে গোণা যায়। হেকোর পথ আটকে দাঁড়িয়ে নেকড়ে জিজ্ঞাসা করলে—'কি হে হেকো! এত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছ?'

ভয়ে ঠকঠকিয়ে উঠলো হেকো। কাঁপতে কাঁপতে বললে—'দোহাই নেকড়ে ভাই, আমায় যেতে দাও। পণ্ডিত জারবাটুর কাছে যাচ্ছি আমার অদৃষ্টের কথা বলতে।'

'বেশ তবে বন্ধুর মত কাজ কর', বললে নেকড়ে। 'জারবাটুকে আমার কথাটাও এক বার জিজ্ঞাসা করো—আমার কি করা উচিত। কেন আমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছি, আর কেনই বা খেয়ে পেট ভরে না? কিন্তু খবরদার! যদি জিজ্ঞাসা করতে ভোল, তাহোলে কিন্তু তোমার ঘাড় আমি মটকাবো!'

'আচ্ছা ভাই, ভুলবো না', এই বলে হেকো আবার ছুট দিল

ছুটতে ছুটতে পা-দু'টো টনটনিয়ে উঠলো। তাই সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। দাঁড়িয়ে চারি দিকে তাকাতে তাকাতে দেখে, রাস্তার ধারেই একটা লম্বা, ঝাঁকড়া আপেল গাছ—টুকটুকে আপেলে ভরা। দেখে তার ভারী লোভ হোল। গাছতলায় গিয়ে বেশ বড় দেখে একটা আপেল কুড়লো। তার পর এক কামড় খেয়েই চেঁচিয়ে উঠলো,—'আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এ যে একেবারে বিষের চেয়েও তেতো!'

হেকোর কথা শুনে আপেল গাছের পাতা মরমরিয়ে উঠলো দুঃখে। সবুজ পাতার চোখ থেকে ঝরঝরিয়ে জল পড়তে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে ব'ললে আপেল গাছ—'দেখছো তো ভাই, আমায় কি লাঞ্ছনা সইতে হয়? যে আমার আপেল খায় সেই আমায় গালাগাল দেয়। অথচ আমার ভারী সখ, ক্লান্ত পথিকদের আপেল খাইয়ে সেবা করা। ভাই হেকো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমার এ রোগের একটা বিহিত কর।'

'আচ্ছা বেশ, জারবাটুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবো', এই বলে হেকো আবার ছুটতে লাগলো।

ছুটতে ছুটতে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এলো। শেষে দূরে দেখা গেল জারবাটুর বাড়ী। কিন্তু হঠাৎ তার ভারী তেষ্টা পেল। গাছের ফাঁকে একটা নদী দেখে সেই দিকে ছুটে গেল। গিয়ে হেঁট হয়ে নদীর টলটলে জলে মুখ লাগালো। কিন্তু ও মা! হেকো দেখে যে জলের ঠিক নীচেই বিরাট একটা মাছ প্রকাণ্ড হাঁ করে শুয়ে আছে। তার চোখ দু'টো ঠিকরে পড়ছে, নিশ্বাস পড়ছে সাঁই সাঁই করে,—কিন্তু হাঁ আর কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না।

মাছটা হেকোকে দেখে আনন্দে ল্যাজ দিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে বললে,—"ভাই বন্ধু হেকো, আমার একটা উপকার করবে? কুড়ি বছর ধরে আমার এ হাঁ-মুখ আর বন্ধ ক'রতে পারছি না!"

'সবুর কর। জারবাটু হয়তো এর কারণ জানে,—এই বলে হেকো আবার ছুট দিল।

শেষকালে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হোল জারবাটুর বাড়ীতে। জারবাটু তখন তার ঘরের চৌকাঠে বসে ভুরু কুঁচকে বিরাট মোটা একখানা বই পড়ছিল। মুখ তুলে হেকোকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে,—'কি হে, আবার আমার কাছে কেন?'

'বেশ লোক যা হোক!' ব'ললে হেকো রাগে-দুঃখে। 'কেন আমাকে ঠকালেন? আমার তিনটে ইচ্ছে পূর্ণ করবেন বললেন, কিন্তু আসল সময়েই লাগিয়ে দিলেন পেট-কামড়ানি! যদি সত্যি কিছু দিতে চান তবে কেন মিছেমিছি এই গরীব বেচারীর সঙ্গে মজা করছেন?'

'তা হোলে এখনও তুমি না খেটেই পেট ভরে খেতে চাও, কি বল?' জিজ্ঞাসা করলে জারবাটু। 'বেশ, এবার তোমায় আমি বিরাট ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দেবো। কিন্তু জানি, তা' থেকেও তুমি কিছু লাভ করতে পারবে না।'

'আরে না না, দেখবেন এবার আমি আগের চেয়েও চালাক হব।' জবাব দিলে হেকো মাটি ছুঁয়ে পেন্নাম করে।

'এখানে আসবার পথে কি কাউকে তুমি দেখেছিলে?' প্রশ্ন করলে জারবাটু দুষ্টু-দুষ্ট হেসে।

'হ্যাঁ, দেখেছিলাম বৈ কি!' বললে হেকো আনন্দে চটপটিয়ে। 'আসবার পথে এক তরতরিয়াল্ নদীতে প্রকাণ্ড এক মাছকে দেখলাম। মাছ বেচারী কুড়ি বছর ধরে হাঁ করেই আছে, মুখ আর কিছুতেই বন্ধ করতে পারে না। বলুন তো, কিসে তার এই ব্যাধি সারে?'

'একটা খু-ব দামী মুক্তো—সাত সাগরের সেরা মুক্তো—তার জিবের নীচে আটকে আছে। সেটা তুলে ফেললেই সে আবার মুখ বন্ধ করতে পারবে। যাক্, আর কি দেখেছিলে?'

'আর একটা সুন্দর আপেল গাছ দেখেছিলাম। তার আপেল-গুলো টুকটুকে লাল, কিন্তু একেবারে বিষের চেয়েও তেতো। আপেল গাছ আমায় অনেক করে বলে দিয়েছে আপনাকে তার ব্যাধির কারণ জিজ্ঞাসা করতে।'

'আপেল গাছটার শেকড়ের নীচে গুপ্তধন লুকোনো আছে। সেটা খুঁড়ে বার করলেই তার আপেল আবার মধুর চেয়েও মিষ্টি হয়ে উঠবে'—বললে জারবাটু। 'যাও, এবার সরে পড়। আমি বড্ড ক্লান্ত।'

'আসবার সময় এক বুড়ো নেকড়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল', বলতে লাগলো হেকো,—'যতই সে খায় কিছুতেই আর তার পেট ভরে না, আর দিনকে দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। বলুন না কিসে তার এই রোগ সারে?'

হেকোর প্রশ্নে জারবাটু হাসলো,—আগের চেয়ে আরও দুষ্টু দুষ্টু হাসি। তার পর ঝপাং করে বইটা বন্ধ করে বললে,—'যাও, তোমাকে আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। নেকড়েকে গিয়ে বল যে, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বোকা আর কুঁড়ে লোককে খেলেই তার পেট ভরবে' সব রোগ সেরে যাবে।'

জারবাটুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেকো রওনা হোল বাড়ীর দিকে আনন্দে ডগমগিয়ে। তরতরিয়াল্ নদীর কাছে আসতেই মাছ তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—'কি হে, জারবাটু কি বললে?'

'বললে তোমার জিবের নীচে একটা দামী মুক্তো আটকে আছে। সেটা তুলে ফেললেই তোমার রোগ সেরে যাবে।'

'তাহোলে দাও না ভাই রোগটা সারিয়ে'—বললে মাছ মিনতি করে 'আর তার বদলে সেই দামী মুক্তোটা নাও।'

কিন্তু হেকো তাকে ব'ললে চাল মেরে,—'ইস্! কেন আমি তোমার মুখে হাত দিয়ে হাত ময়লা করবো?, জারবাটু আমায় মস্ত ঐশ্বর্য্য দিচ্ছে। তোমার সঙ্গে বকবার আমার সময় নেই!' এই ব'লে সে চ'লে গেল মুখ ঘুরিয়ে।

আপেল গাছের কাছে এলে আপেল গাছ জিজ্ঞাসা করলে, —'কি হে, জারবাটু কি বললে?'

'বললে যে তোমার শেকড়ের নীচে গুপ্তধন আছে। সেটা খুঁড়ে বার করলেই তোমার আপেল আবার মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে।'

'তাহোলে ভাই দাও না আমার রোগটা সারিয়ে'—বললে আপেল গাছ মিনতি করে—'আর তার বদলে গুপ্তধন নাও।'

'ইস্! কেন শুধু শুধু মাটি খুঁড়ে হাতে ফোস্কা পড়াব?' বললে হেকো নাক-মুখ বেঁকিয়ে—'জারবাটু আমায় মস্ত ঐশ্বর্য্য দিচ্ছে।'

আপেল গাছ যেমন ছিল তেমনি তেতো আপেল নিয়েই পড়ে রইলো। হেকো এগিয়ে চললো হনহনিয়ে। যেতে যেতে দেখে

রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুয়ে আছে নেকড়ে বুড়ো। নাকটা থাবার ওপর রেখে পড়ে আছে তারই অপেক্ষায়।

'কি হে হেকো, জারবাটু আমার রোগের কি ওষুধ বললে? বল, নইলে তোমায় এখুনি খেয়ে ফেলবো।'

হেকো আর উপায়ান্তর না দেখে বসে পড়লো নেকড়ের পাশে। বসে নেকড়েকে সব বললে যাওয়ার পথে যা যা সে দেখেছিল আর জারবাটু যা যা তাকে বলেছিল।

'তাহোলে জারবাটু বলেছে যে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বোকা আর কুঁড়ে লোককে খেলেই আমার রোগ সেরে যাবে,—কি বল?'

'হ্যাঁ'—বললে হেকো।

শুনে নেকড়ে হাঁ করে বেশ একখানা বাদশাই হাই তুলে বললে,—'তাহোলে তো বন্ধু, তোমার সময় ফুরিয়ে এসেছে!'

এই না বলেই নেকড়ে লাফিয়ে পড়লো হেকোর ঘাড়ে। তার পর তাকে গিলে ফেললে টুপ করে।

আর এই ভাবেই প্রাণ হারালো হাড়-আল্‌সে হেকো, তার নিজের বোকামির জন্তে।

জর্জিয়ার রূপকথা

জ্যান্তো মা কালি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

(সত্য কাহিনী)

মনে হচ্ছে গত শতাব্দীর শেষের দিকের কথা। সীমান্তের বাসিন্দাদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলছে। আমি তখন বালক। পিতা-মাতার সঙ্গে বাস করি রাওলপিণ্ডি সহরে।

আমাদের বাসার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল পাঠানদের একটি পল্লী। ছাদে উঠলেই তাদের অন্দর-মহলে পর্য্যন্ত নজর চলত। সেখানে লেগে থাকত নিত্য-নূতন হাঙ্গামা। ঝগড়া-মারামারির তো কথাই নেই, খুনোখুনিও হ'ত যখন-তখন।

বাবা বলতেন, "হাতে কাজ না থাকলে বাঙালীরা করে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা, আর পাঠানরা করে মানুষ খুন।"

এটা অত্যুক্তি কি না জানি না, কিন্তু ও-অঞ্চলের মানুষদের প্রকৃতি ছিল সত্য সত্যই অত্যন্ত অশান্ত। এক দিন বাবার সঙ্গে ওখানকার প্রধান বাজারে গিয়েছি। কোথাও কিছু নেই, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত জাগল বিষম গণ্ডগোল! চারি দিকে চ্যাচামেচি, ছুটোছুটি এবং বন্ধ হয়ে যেতে লাগল দোকানের পর দোকান! ব্যাপার কি? না এক দল পাঠান বা আফ্রিদী আচমকা বাজারে এসে লুঠ-পাট সুরু করেছে! তারা নিরস্ত্র ছিল ব'লে কেউ তাদের সন্দেহ করেনি। কিন্তু হঠাৎ তারা আখের দোকানের উপর হানা দিয়ে মোটা মোটা ইক্ষুদণ্ড হস্তগত করে। তার পর সেই মিষ্ট ইক্ষুদণ্ডগুলোই পরিণত হয় মারাত্মক অস্ত্রে! ইক্ষুর দ্বারা কেল্লা ফতে, অবাক্ কারখানা!

কিন্তু রাওলপিণ্ডিতে কেবল মুসলমান নয়, বাস করত অনেক হিন্দুও। তাদেরও দেহ ছিল বেশ লম্বা-চওড়া ও বলিষ্ঠ। জলবায়ুর গুণে একই ভারতের এক এক দেশের লোকের চেহারা ও প্রকৃতি হয়েছে এক এক রকম। ওখানকার হিন্দুদেরও প্রকৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের তুলনায় ছিল বেশ খানিকটা উগ্র।

কিন্তু সংস্কারের দিক্ দিয়ে ভারতের সব হিন্দুরই স্বভাব বোধ হয় এক রকম।

বোধ করি ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর আগে এক দিন শুনলুম, কলকাতার কাঁসারিপাড়ার একখানি দেবী-প্রতিমা হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে! দিকে দিকে মহা হৈ-চৈ প'ড়ে যায়, দলে দলে লোক সাগ্রহে যাত্রা করে প্রতিমা দর্শন করবার জন্তে এবং ফিরে এসে সাক্ষ্য দেয় সত্য সত্যই মাটির প্রতিমার মধ্যে হয়েছে জীবন-সঞ্চার! লোকের ভীড় আরো বেড়ে ওঠে, প্রতিমার সামনে পড়ে রাশি রাশি সিকি, আধুলী, টাকা! দিন কয়েক পরে কিন্তু জীবন্ত প্রতিমার আর দেখা পাওয়া গেল না।

রাওলপিণ্ডিতেও আমি দেখেছিলুম জীবন্ত প্রতিমা নয়, জীবন্ত মা কালিকে। সেই কাঠগোঁয়ার পাঠানদের মুল্লুকে জীবন্ত দেবীর আবির্ভাব!

গুজব উঠল, জ্যান্তো কালি আজ সহরে আসবেন! তখন বয়স ছিল অল্প, গুজবটা শুনে বিস্মিত হলুম বটে, কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারলুম না।

মা-বাবার গুরুদেব পণ্ডিত বিত্তাধরজী তখন আমাদের বাসাতেই থাকেন। তিনি জাতিতে ছিলেন রাঠোর, কিন্তু বাংলা জানতেন। আমরা ভাই-বোনরা তাঁকে 'দাদামশাই' ব'লে ডাকতুম।

আমি আবদার ধ'রে বসলুম, "দাদামশাই, জ্যান্তো কালি দেখব!"

তিনি সায় দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, বেটা!"

যে রাস্তা দিয়ে জ্যান্তো কালির আসবার কথা, পণ্ডিতজীর সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম যথাসময়ে।

রাজপথে বিপুল জনতা। প্রত্যেক লোকেরই মুখে-চোখে প্রদীপ্ত কৌতূহল! ভীড় ঠেলে এগুতে এগুতে দম যেন বেরিয়ে যাবার মত হ'ল।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পরেই জনতার ভিতরে উঠল জয়-জয় রব! জ্যান্তো কালি আসছেন!

একখানা উচ্চাসন বহন ক'রে চলেছে কয়েক জন বলবান লোক এবং উচ্চাসনের উপরে ব'সে আছে একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ে।

মেয়েটির গায়ের রং কালির মতই কালো বটে, কিন্তু কালির মত সে জিভ বার ক'রে নেই ব'লে মনে মনে কিছু হতাশ হলুম। দিকে দিকে প'ড়ে গেল ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করবার ধুম। পণ্ডিতজীর দিকে তাকালুম, তাঁর মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তিনি প্রণাম করলেন না দেখে আমিও করলুম না।

তার পর কয়েক দিন ধ'রে গোটা সহরটা জ্যান্তো কালিকে নিয়ে যেন ক্ষেপে উঠল দস্তুরমত! জ্যান্তো কালি ছাড়া আর কারুর কথাই শোনা যায় না। জ্যান্তো কালির আস্তানায় গিয়ে ধর্ণা দেয় বড় বড় ঘরের পুরুষ আর নারী! টাকা-পয়সা পড়ে ঝমাঝম্!

পণ্ডিতজী বললেন, "চল বেটা, আর একবার কালিকে দেখে আসি।"

মা-ও যেতে চাইলেন।

পণ্ডিতজী বললেন, "না।"

বাবা বললেন, "রাবিস!"

আমারও মনের ভিতরে কালি-ভক্তির সাড়া পেলুম না। পণ্ডিতজীর সঙ্গে চললুম যেন মজার তামাসা দেখতে।

মজাই দেখলুম বটে। মস্ত একখানা দোতলা বাড়ী, উপরে-নীচে গিজ্-গিজ্ করছে লোক। দোতলায় একটা লম্বা-চওড়া দালান পার হয়ে প্রকাণ্ড একখানা ঘর। ভিতরে ব'সে আছে লোকের পর লোক। কেউ মেঝের উপরে দণ্ডবৎ লম্বমান, কেউ করছে উচ্চকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ, এক জায়গায় জ্বলছে হোমাগ্নি।

বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে আছে জ্যান্তো কালির মূর্ত্তি। ভাবহীন মুখ। কালি-প্রতিমার ভঙ্গিতে এক হাত উপর দিকে এবং এক হাত নীচের দিকে। আজও জিভ বার করা নেই দেখে ক্ষুণ্ণ হলুম মনে মনে।

জ্যান্তো কালির বাঁয়ে ও ডাইনে মাটির উপরে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে দু'জন পুরুষ। দেখলেই বোধ হয় যেন তারা কোন যন্ত্রণাভোগ করছে।

শুধালুম, "ওরা কারা ?"

পণ্ডিতজী বললেন, "ওরা নিজেদের জিভ কেটে দেবীকে উপহার দিয়েছে।"

—"কেন দাদামশাই ?"

—"দেবীকে খুশী করবার জন্যে।"

—"কিন্তু দেবী কি খুশী হবেন ?"

—"দেবীই জানেন। কিন্তু ওরা জানে, দেবীর বরে ওরা আবার নতুন জিভ পাবে।"

*   *   *   *

জ্যান্তো মা কালির দৌলতে বাজার গরম হয়ে রইল আরো দিন পনেরো।

তার-পর জীবন্ত দেবী অদৃশ্য হলেন আচম্বিতে।

তিনি কোথা থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং অন্তর্হিতই বা হলেন কোথায়, কেউ সে খবর জানেন না। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদেরও টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। তবে এইটুকু খবর পাওয়া গেল যে, সহরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে তারা আদায় করতে পেরেছিল বেশ কয়েক হাজার টাকা।

আরো জানা গেল, নিজেদের জিহ্বা বলি দিয়ে যে লোক দু'টি অতি-ভক্তির চূড়ান্ত নমুনা দেখিয়েছিল, তাদের আর নতুন জিভ গজিয়ে ওঠেনি। সবাই দেখলে মজা, কিন্তু মজল কেবল তারাই।

এত কাল পরেও সেই দুই নির্ব্বোধ বেচারার কাতর মুখ আমি ভুলতে পারিনি।

তিনটি মজার ঘটনা

শ্রীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সবেমাত্র স্কুল ছুটি হয়েছে। একদল ছেলে ছুটে চলেছে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বেয়ে হৈ-হৈ করতে করতে। খানিকটা এগুতে রাস্তার পাশে একটা ছোট ভীড় দেখে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলের দল। এবং ওর মধ্যেরই একটি কমবয়সী ছেলে একে ঠেলে—তাকে মাড়িয়ে—ওর ঠ্যাংএর তলা দিয়ে একেবারে সুমুখে—ঘটনার কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হোল। ব্যাপার কিছুই না—এক পাদ্রী সাহেব তাঁর গলার রগ ফুলিয়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করছিলেন। তখনকার দিনে যেমন করা হোত রাস্তার মোড়ে-মোড়ে। পাদ্রী তখন বলছিলেন : এই যে তোমাদের ভগবান, কালী বল—কৃষ্ণ বল—ইহাদের যদি আমি গালি দিই ইহারা আমার কী করিতে পারে ? এই বলে তিনি একটা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে উঠলেন এবং তার পর কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললেন : দেখিলে তো আমার কিছুই হইল না। যে স্কুলের ছেলেটি ঠেলে-ঠুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, পাদ্রীর কথা শুনে তার পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলতে লাগল রাগে আর উত্তেজনায়। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সেও বলল : আমি যদি তোমাদের ঠাকুরকে গালি দিই—তোমাদের ঠাকুর গাধা, তোমাদের ঠাকুর পাঁঠা—তবে সেই বা আমার কী করতে পারে ? হকচকিয়ে গেলেন পাদ্রী সাহেব। উপস্থিত সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ঐটুকু বয়সেই যুক্তি দ্বারা নিজের ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের ভেতর। বড় হয়ে যুক্তি-তর্ক দ্বারা বিশ্বের দরবারে তাঁর হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার অমর কাহিনী ত তোমরা সবাই জানো।

*   *   *   *

ছেলেমানুষি ঘোচবার মত বয়স হয়েছে। ছেলেমানুষিটুকু যায়নি তবুও। ঠিক করল ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে হবে। ঠাকুরকে যে বড় বলে, মাটি আর টাকা তাঁর কাছে সমান—টাকা পয়সার প্রতি তাঁর কোনও আসক্তি নেই। দেখা যাক্ পরীক্ষা করে তা কেমন সত্যি। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ঠাকুরের জন্য বিছানা পাতা রয়েছে। ধবধবে সাদা বকের পালকের মত বিছানা। ছেলেটি এসে সবার অলক্ষ্যে তার মধ্যে একটি টাকা গুঁজে রেখে দে ছুট্। খানিক বাদে খেয়ে-দেয়ে এসে সেই বিছানায় বসেই তো ঠাকুর চেঁচাতে সুরু করলেন : জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। যেন তিনি আগুনের ওপর বসেছেন। আশে-পাশে যে সমস্ত ভক্তের দল ছিল তারা সব দৌড়ে এলো ' কী হয়েছে, কী হয়েছে। বিছানার ওপর যখন কিছুই দেখা গেল না তখন সবাই মিলে বিছানা তুলে চাদর-তোষক ঝাড়তে সুরু করল, কিসে জ্বলে যাচ্ছে। এবং ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে পড়ল সেই টাকাটি। টাকাটি তুলে আবার বিছানা করা হোল। ঠাকুর নির্ব্বিবাদে উঠে শুলেন তার ওপর।

খানিক বাদে সেই ছেলেটি গুটি-গুটি এসে এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে একেবারে পা চেপে ধরল ঠাকুরের : ঠাকুর আমিই রেখেছিলাম টাকাটা তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য। কেঁদে ফেললেন বিবেকানন্দ। পরমহংসদেব বললেন না কিছুই। মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন শুধু চোখ বুজে।

*   *   *   *

সবে সন্ন্যাসী হয়েছেন একটি যুবক, গৈরিক বসনে সজ্জিত, চলেছেন কাশীর একটা বনের পাশ দিয়ে। কাশী তখনও এখনকার মত সহর হয়নি। প্রায় জায়গায়ই ছিল বন-জঙ্গল। খানিকটা যেতে এক দল বানর তাঁর ঐ বিচিত্র বেশ-ভূষা দেখে তেড়ে এলো খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে। ভয়ে সন্ন্যাসী দৌড় দিলেন উল্টোমুখো হয়ে। এখন হয়েছে কী, বনের ভেতর থেকে যুবক সন্ন্যাসীর এই দুর্গতি লক্ষ্য করছিলেন আর এক জন প্রবীণ সাধু। তিনি সন্ন্যাসীকে ডেকে বললেন : পালাচ্ছিস্ কেন রে ? রুখে দাঁড়া। যুবক রুখে দাঁড়ালেন। ল্যাজ গুটিয়ে চলে গেল বানরের দল, যে যার গাছে-গাছে।

পরবর্ত্তী জীবনে যত অন্যায় আর পাপ তাঁর সুমুখে তেড়ে এসেছে ঐ বানরের দলের মত সব জায়গায়ই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এ ত তোমাদের অজানা নয়।

গোলকধাঁধা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর.]

শ্রীসুজিতকুমার মহলানবিশ

পরের দিন সকালে জলযোগের পর গোলু যখন তার ঘরে ছোট একটা পকেট-খাতায় কি সব লিখছে, সেই সময় বরেন আর কানাই উপস্থিত হোল। তাদের দেখে গোলু বল্ল, "আয় আয়, তোদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।" বরেন আর কানাই দু'জনেই আরাম করে গোলুর খাটে বসল। বরেন গোলুকে বল্ল, "দেখ, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন আজগুবি বলে ঠেকছে ; তুই একটু ভাল ভাবে আমায় সব বুঝিয়ে বল ত।" কানাই অমনি বলে উঠল, "বরেনের মাথায় না ঢুকিয়ে দিলে সহজে কি বোঝে?" বরেন রেগে বল্ল, "তুই থাম ত ; তোর বুদ্ধির জোরে অঙ্কে ত কেবল গোল্লা পাস।" গোলু তাড়াতাড়ি বল্ল, "অঙ্কের বিদ্যা দু'জনেরই জানা আছে, এখন মন দিয়ে আমার কথা শোন্।" তক্তাপোষের উপর ভাল করে বসে, গোলু সুরু করল, "কাল যখন আমরা হরদেওর দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম, হরদেও অনেকগুলো কেরাসিনের বোতল নিয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটাকে আমি আগে দু'-এক বার বাবার আপিসে দেখেছি। হরদেওর দোকানের ভিতর যেটুকু দেখা যাচ্ছিল, সেখানেও প্রচুর কেরাসিনের বোতল দেখলাম। এখন কথা হচ্ছে এই যে, এত বোতল নিয়ে ও করে কি?" বরেন বল্ল, "এ ত সোজা কথা, ও কেরাসিন তেল বিক্রী করে।" গোলু বল্ল, "তা করা সম্ভব বটে, তবে সাধারণতঃ যারা তেল বিক্রী করে, তারা অত বোতল না রেখে বড় বড় টিনে কেরাসিন তেল রাখে, এবং যারা খুচরা তেল কেনে, তারা নিজেদের বোতল আনে। কিন্তু কাল তোরাও দেখেছিস যে ক্রেতা বলতে একটি লোক ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। যাই হোক, ধরেই নিলাম যে ও কেরাসিন তেল বিক্রী করে। কিন্তু কাল তোরা বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলি যে, আমি একটা কাচের টুকরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।" গোলু উঠে পাশের টেবিল থেকে ভাঙ্গা কাচের টুকরাটা এনে কানাই ও বরেনকে দেখাল। সেটা একটা কাল রংয়ের বোতলের তলার অংশ। বরেন ও কানাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "আরে, এ যে কেরাসিনের ভাঙ্গা বোতল।" গোলু তখন বল্ল, "কেরাসিনের ভাঙ্গা বোতল এই পোড়ো বাড়ীর জমিতে পড়ে থাকা বিচিত্র নয়, তবে আমার মনে হয় যে এর সঙ্গে অন্যান্য অনেক ব্যাপারের যোগ থাকতে পারে। যাই হোক, যত দিন না আমরা বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে পারি, তত দিন কিছুই বোঝা যাবে না।" কানাই জিজ্ঞেস করল, "কবে তাহলে ওই বাড়ীর ভিতরে ঢোকা যায়?" বরেন আস্ফালন করে বলল "আজই চল।" গোলু বলল, "আপাততঃ চল একবার হাটের দিকে। তোদের সঙ্গে পয়সা-টয়সা কিছু আছে?" কানাই তাড়াতাড়ি বলল, "খরচের কথা উঠলেই কিন্তু বরেনের সাহস উড়ে যাবে!" "যা যা, ফাজলামী করিস না" বলে বরেন পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছ'টা পয়সা বার করল। বরেনের দেখাদেখি কানাইও পকেট থেকে দু' আনা বার করল। গোলু তাই দেখে বলল, "ওতেই হবে, কারণ আমার কাছেও কিছু আছে।" তিন জনেই তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গোলু একবার শিষ দিতেই তক্তাপোষের নীচে থেকে কালু লাফিয়ে বেরিয়ে এল। কানাই ত চমকেই গিয়েছিল। কালু কানাই ও বরেনের গা ও জুতা ভাল করে শুঁকে ল্যাজ নেড়ে আনন্দ জ্ঞাপন করল। কানাই বলল, "তোর এই কুকুরটাকে দেখলে ভয় লাগে,—দিন দিন যেন আরও বড় হচ্ছে।" গোলু বলল, "কালুটা আশ্চর্য্য লোক চেনে। লোক যদি ভাল হয়, তাহলে সে বুড়োই হোক আর ছোঁড়াই হোক গায়ে আঁচড়টি দেয় না, অথচ দরকার হলে ঘেউ-ঘেউ করে, ভয় দেখাতে ছাড়ে না।" বরেন জিজ্ঞেস করল, "ও কখনও কাউকে কামড়েছে?" "তা, কামড়েছে বই কি"—বলে হেসে গোলু সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ও তার পিছন পিছন বরেন ও কানাই নেমে গেল। তারা তিন জন বাইরে এসে হাটের পথ ধরল। কিছু দূর যাবার পরই পথে অনেক চেনা লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হোল। হাটে পৌঁছে তারা দেখল যে তখনও লোকের ভীড় মোটেই হয়নি। তিন জনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ গোলু দূরে হরদেওকে দেখতে পেল। হরদেও গোলুকে দেখতে পায়নি। সে কিছু কিনতে এসেছে কি না বোঝা গেল না, তবে তার সঙ্গে একটি লোক ছিল। গোলু হঠাৎ বরেন আর কানাইকে বলল, "তোরা এখানে একটু দাঁড়া, আমি একবার চট করে ঘুরে আসি।" কানাই আর বরেন ততক্ষণ কাল জাম কিনতে ব্যস্ত। তারা গোলুর স্বভাব জানত, কাজেই বলল, "যা, গোয়েন্দাগিরি করে আয়, আমরা এখানে আছি।" গোলু লোকের আড়াল দিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল, যেখান থেকে হরদেওর সঙ্গীটিকে ভাল করে দেখা যায়। হরদেও গোলুর দিকে পিছন ফিরে ছিল, কাজেই সে গোলুকে দেখতে পায়নি। গোলু ভাল করে হরদেওর সঙ্গীটিকে দেখল। লোকটি লম্বা ও বলিষ্ঠ ; গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পরনে দামী ধুতি এবং পায়ে দামী এলবার্ট জুতো। যদিও তার কাপড় খুব পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু তবুও বোঝা যাচ্ছিল যে লোকটি খুব সৌখীন। লোকটি যে বাঙ্গালী নয়, তাও গোলু বুঝতে পারল তার কথাবার্ত্তা শুনে। তার আঙ্গুলে একটা মস্ত হীরে বসান আঙটি ছিল। যাই হোক, গোলু বুঝল যে লোকটি শুধু সৌখীন নয়, সম্ভবতঃ পয়সাওয়ালা লোক। গোলু লোকটিকে ভাল করে দেখে চিনে রাখল। হরদেও ইতিমধ্যে অন্য দিকে চলে যাওয়াতে গোলুও তার বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল। কানাই আর বরেন ততক্ষণে কাল জাম খেয়ে মুখ কাল করে ফেলেছে। গোলুকে দেখে বরেন জিজ্ঞেস করল, "এই যে গোয়েন্দা মশায়, নতুন কিছু রহস্যের সন্ধান পেলেন?" গোলু মনের মত কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় পিছন থেকে, "এই যে, গোলু বাবু" —বলে বিরাট হুঙ্কার শুনে গোলু পিছন ফিরে দেখে গয়ারাম সেখানে এসেছে। টিলাডিতে পুলিশ বলতে কিছুই ছিল না। তবে দরকারী কাজ সব স্থানীয় চৌকিদাররাই করত। গয়ারামকে দেখে গোলু খুশী হয়ে বলল, "দেখ গয়ারাম, এখানে আমরা লাঠি কিনতে এসেছি ; তিনটে ভাল বাঁশের লাঠি দরকার।" গয়ারাম দাঁত বার করে বলল, "ভাল লাঠি এখানে মিলবে কি কোরে গোলু বাবু ; দরকার হোয় ত আমি তৈয়ার করে দিতে পারি, তবে মজুরী মিলনা চাই ত।" গোলু বলল, "তুমি তিনটে ভাল পাকা বাঁশের লাঠি আমাদের তৈরী করে দাও, তোমার মজুরী যা লাগে আমরা দেব।" গয়ারাম খুশী হয়ে বলল, "হাঁ, জরুর বানিয়ে দিব।"

লাঠির ব্যবস্থা হোল, এখন শক্ত দড়ি যোগাড় করে রাখা দরকার মনে করে গোলু, কানাই আর বরেনকে দড়ির সন্ধান করতে বলল। দড়ির দরকার শুনে কানাই বলল, "আমার বাড়ীতে খানিকটা খুব শক্ত আর মোটা দড়ি পড়ে আছে—যেটা আপাততঃ কোন কাজে লাগছে না। কারণ ভুল করে জল তোলবার জন্য দু'বার দড়ি কেনা হয়েছিল।" বরেন বলল, "তাহলে ত ভালই হোল, দড়ি যখন যোগাড় হয়েছে—" বরেনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কানাই বলল, "তোকে ফাঁসি দিলেই হয়, গাছের ত অভাব নেই।" কানাই এই ভাবে বরেনকে চটাতে ভালবাসত। গোলু হো-হো করে হেসে ফেলাতে বরেন ভয়নক চটে গেল। শেষে গোলু অনেক কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করল। বরেনের একটা গুণ ছিল যে সে বেশীক্ষণ রেগে থাকতে পারত না।

হাট থেকে তিন বন্ধুতে যখন গোলুর বাড়ীতে ফিরল, তখন বেলা হয়ে গেছে। কানাই ও বরেনকে ঘরে বসিয়ে গোলু নীচে থেকে তিন গ্লাস ঠাণ্ডা জল ও তিনটে মোয়া নিয়ে এল। তিন বন্ধুতে খেতে খেতে গল্প সুরু হোল। গোলু বলল, "যত দিন যাচ্ছে তত কিন্তু আমার এই ব্যাপারটি জটিল ঠেকছে। যাই হোক, আজ বিকেলে আমরা একবার ডিসপেনসারীতে যাব একটা ওষুধ কিনতে।" বরেন আর কানাই অবাক্ হয়ে গোলুর কথা শুনছিল। গোলু যে পড়ার বই ছাড়া অন্য দরকারী বই পড়ত না, তা নয়। সে হাতের কাছে গল্পের বই ছাড়াও যা ভাল বই পেত, পড়ত। এর মধ্যে সে গোকুল বাবুর কাছ থেকে একটা 'প্রাথমিক চিকিৎসা'র বই পড়ে ফেলেছিল। সে হঠাৎ বরেনকে জিজ্ঞেস করল "আচ্ছা, ওই পোড়ো-বাড়ীতে গিয়ে যদি কাউকে সাপে কামড়ায়, তাহলে তুই কি করবি?" বরেন মাথা চুলকে বলল, "কেন, সাপটাকে মেরে ফেলব।" কানাই হো-হো করে হেসে বলল, "সাপটাকে ত মারবি আর ততক্ষণে যাকে কামড়েছে তার ত দফা নিকেশ হবে?" বরেন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "ও, হ্যাঁ, একটা ওঝা ডাকতে হবে।" গোলু হাসি চেপে বলল, "এ-সব ওঝা-টোঝার কর্ম্ম নয়। মন দিয়ে শোন, কি করা দরকার। সাপ যেখানে কামড়ায় তার একটু উপরে শক্ত করে কয়েকটা বাঁধন দিতে হয়। এই বাঁধন দেওয়ার উদ্দেশ্য হোল, যাতে বিষ রক্তের সঙ্গে না ছড়াতে পারে। তার পর একটা ছুরি দিয়ে ক্ষতের উপরে, পাশে ও নীচে বেশ করে চিরে দিয়ে 'পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে'র দানাগুলি ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হয়।" কানাই জিজ্ঞেস করল, "যে কোন সাপে কামড়ালেই কি তাই করতে হয়, না সাপ-বিশেষে ভিন্ন ব্যবস্থা আছে?" গোলু খুসী হয়ে বলল, "সাপে কামড়ানর জন্য যে ইনজেকৃশন আছে সেগুলো অবশ্য বিশেষ সাপ অনুযায়ী ব্যবহার হয়।" কানাই বলল, "তার মানে, কি জাতীয় সাপে কামড়েছে, জানা দরকার।" গোলু বলল, "হ্যাঁ, কতকটা তাই, কারণ বিষাক্ত সাপকে সাধারণতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটি শ্রেণীকে "কলুব্রাইন" অথবা ফণা-ধরা সাপ বলা হয় এবং অন্যটিকে "ভাইপার" অথবা বোড়া জাতীয় সাপ বলা হয়, যারা ফণা ধরে না। তবে যে শ্রেণীর সাপেই কামড়াক, বাঁধন এবং পারম্যাঙ্গানেট দেওয়া নিশ্চয় দরকার।"

কথায় কথায় বেলা হয়ে গেছে দেখে কানাই ও বরেন বাড়ী ফেরার জন্য উঠে দাঁড়াল। "তোদের একটা জিনিষ দেখাই" বলে গোলু টেবিলের কোণা থেকে সাইকেলের ল্যাম্পটা এনে তাদের দেখাল। কানাই বলল, "খুব ভালই হোল, কারণ অনেকক্ষণ আলো জালিয়ে রাখতে হলে টর্চ্চে সুবিধা হয় না।" গোলু বলল, "সবটা কাল রং দিয়েছি, কারণ অন্ধকারে জ্বালালে, শুধু আলোটুকু ছাড়া বাকী অংশ দেখা যাবে না।"

যাই হোক, কানাই ও বরেন বিদায় নিলে, গোলু স্নান করতে গেল। [ক্রমশঃ।

নদী-পারে

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

ঐ যে দূরে দেখছো নদী—তাহার ওপারে
যাও যদি তো দেখতে পাবে তোমার দু'ধারে
সোনার রোদে হাসছে যেন খামার-ভরা ধান,—
দুলছে যেন তন্দ্রা-ভরে,—গাইছে রোদের গান!

ঐখানেতে ছায়ায় ঢাকা একটি ছোট গ্রাম,—
গরীব চাষার বস্তি ও যে—'সাতপুরিয়া' নাম;
মাটী-মায়ের দুলাল—ওরা চাষার ছেলের দল,—
জানে না কোনো কপটতা, শেখেনি কোনো ছল······

তাদের মিঠে গন্ধে সেথা ভুবনটি ভরপূর,
শুনতে পাবে সকাল-সাঁঝে শালিক-ফিঙের সুর:
আকাশ জুড়ে অনেক দূরে উড়ছে সেথা চিল,
চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে একটি-দু'টি বিল।

তোমার মনের গোপন কোণে যে ব্যথাটি আছে
জুড়িয়ে যাবে—যাও যদি, ভাই, ওই ওদেরই কাছে।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেশের কথা

'পল্লীবাসী'র কথা হইলেও শহরবাসীর কাছেও হয়ত যুক্তিযুক্ত মনে হইবে।—"প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় না দিয়াও এ কথা এখন স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইবে যে, বাঙালীর জীবিকা সংস্থানে বাংলা সরকারের সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব রহিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে তাহারা বাঙালী দেখিলেই খেদাইতে সুরু করিবে, আর আমরা ভোজপুরী পুলিসের তাঁবে বসিয়া উড়িয়ার তৈয়ারী ফুলুরী-বেগুনী খাইয়া ঝিমাইতে থাকিব—এই অসামঞ্জস্যের প্রতিকার করিতে হইবে। দোকানে দোকানে যে গণেশ বসানো থাকে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এ দেশের দোকানদারেরা এক এক উড়িয়া ঠাকুরকে মাসিক ।• হইতে ১৲ পর্য্যন্ত বোকাদণ্ড দিয়া থাকেন। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি দৈব-পৈত্র্য কার্য্যে নিমন্ত্রিতগণের তৃপ্তিসাধনের সমগ্র ভারই এই ঔড্রপুঙ্গবদিগের উপর ন্যস্ত থাকিবেই। মেস, হোটেলের তো কথাই নাই, বহু গৃহস্থ-পরিবারেরও দগ্ধ উদর পরিপূরণের দ্রব্য নির্ম্মাণ, কারখানার যাবতীয় দায়িত্বভার কটক, বালেশ্বর, গঞ্জাম হইতে আমদানীকৃত এই সকল অপূর্ব্ব কারিগরগণের হস্তেই সম্পূর্ণ ন্যস্ত করিয়া আভিজাত্যের ভাণ করিবার একটা মৃত্যুমুখী ফ্যাসান্ এখনও দেশ হইতে আদৌ লোপ পায় নাই। এক ভার গঙ্গাজল ।৶•, কলের জল ।• আনা, এক মণ কয়লা ।৵• আনা—পান-দোক্তার খরচ বাদে এ সমস্তই উৎকল-সৌন্দর্য্যে তৈলহরিদ্রা লেপনার্থ মাসান্তে মণিঅর্ডারযোগে প্রেরিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যাবন্ধু বিশ্বনাথ দাস প্রভৃতি তাই না আজ নিশ্চিন্ত চিত্তে বাঙ্গালী যাহাতে প্রাদেশিকতা-দোষদুষ্ট হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিতেছেন। বিহারবাসীরাও ঠিক এই ভাবেই নানা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বাংলার অর্থ প্রতি মাসে বিহারে মণিঅর্ডার করিতেছে। অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, বহু অফিসের কেরাণী-বাবুকে দারোয়ানের কাছেই হাত পাতিতে হয়। সুদ গ্রহণ ব্যাপারে উহারা কাবুলীওয়ালার মাসতুতো ভাই বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীকে ঠেঙ্গাইয়া ঢিট্ রাখিবার জন্য ইংরাজ বিহারী পুলিশ বাহাল করিয়াছিল। সেই প্রথা কিন্তু এখনও চলিতেছে। হঠাৎ সব বদলানো যায় না, সত্য, কিন্তু এদিকে অতঃপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কথাটা তুলিলাম এই জন্য যে, সম্প্রতি যে ৩০ নং ও ৩১ নং বাঙ্গালী পল্টন লওয়া হইয়াছে, তাহা নামে বাঙ্গালী হইলেও উহাতে শতকরা ৬০ জন গুর্খা লওয়া হইয়াছে।"

* * * *

তাহার পর 'পল্লীবাসী' মন্তব্য করিতেছেন :—"মোট কথা, যে সব ক্ষেত্রে ইংরাজ বাঙ্গালীকে বঞ্চিত রাখিয়াছিল, সেই সব ক্ষেত্রেই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীকে বসাইতে হইবে। বাড়তি লোক দরকার হয় তখন অন্য প্রদেশের লোক লওয়া চলিতে পারে। ড্রাইভারীতে শিখ, কেরাণীগিরিতে মান্দ্রাজী, এই ভাবে নানা দিক্ দিয়া বাঙ্গালীর জীবিকা বন্ধ হইয়া আছে। ব্যবসাক্ষেত্রে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী, বোম্বেওয়ালা। এই সবই বদলাইয়া বাঙ্গালীর স্থান সর্ব্বাগ্রে করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালীরা এ-সব দিকে আন্দোলন না করিয়া শুধু সস্তায় 'শ্লোগান' দিয়া বেড়াইতেছে। জীবিকার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন আগ্রহ দেখি না। আত্মঘাতী আর কাহাকে বলে?" উপরিউক্ত ধরণের কথা আমরাও বহুবার বলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও বলিব। কিন্তু যাহাদের জন্য এত মাথা-ব্যথা, এ-বিষয়ে তাহারা সেই বাঙ্গালী যুবকের দল কি করিতেছে? স্বাধীনতা লাভের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কোন প্রকার প্রাণ-চাঞ্চল্য চোখে পড়ে নাই বলিলেই চলে। এ কথা সত্য যে, এক দল যুবক আছেন, যাঁহারা দেশের জন্য, জাতির জন্য, সর্ব্বপ্রকার কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কত? দেশের নিয়মভঙ্গকারী এবং বাজে-কাজে-উৎসাহী যুবকদের দমন করিয়া তাহাদের শক্তিকে মঙ্গল-পথে প্রবাহিত করিবার জন্য তাঁহারা সংঘবদ্ধ ভাবে আজ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? বাঙ্গলাকে সত্য সত্যই বাঙ্গালীর করিবার জন্য তাঁহারা কতটুকু চেষ্টা করিতেছেন?

* * * *

যুক্তিযুক্ত কথা :—"বঙ্গভঙ্গের পরে ইংরাজ জোর করিয়া বাংলার যে কয়টি জেলাকে বিহারের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, আজ বাঙ্গালী তাহা ফিরাইয়া লইতে চায়। বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা কমাইয়া ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশের বীজ বপন দেখিয়া অনেকে তখনই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ভাঙা বাংলা জোড়া লাগার আনন্দে তখন সকলে ব্যাপারটা তত তলাইয়া দেখেন নাই। ইংরাজের ঐ চক্রান্তের ফলেই যে বাংলা দেশে লীগের "ক্রুট্ মেজরিটি" ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা করিতে পারিয়াছে, আজ তাহার জন্য হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু, ভুল সংশোধন করিতেই হইবে। র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে পশ্চিম-বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার প্রতীকার করিতে হইলে, বিহারভুক্ত বাংলার ঐ সকল স্থান এখনই ফিরাইয়া দিতে হইবে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালী এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন। গণপরিষদের বাঙ্গালী সভ্যগণ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি ও বঙ্গীয় পরিষদের সদস্যগণ সকলেই আজ একসুরে এই দাবী উঠাইয়াছেন। এই দাবী আজ সর্ব্বত্র প্রবল করিয়া তুলিতে পারিলে তাহাকে দাবাইয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ হইবে না।"—সত্য কথা, কিন্তু বাঙ্গলার এই দাবী প্রবল

হইতে প্রবলতর এবং প্রবলতর হইতে প্রবলতম করিবার জন্য কাজে কতটুকু হইতেছে? পশ্চিম-বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় এ বিষয় কি করিতেছেন জানিতে ইচ্ছা হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে বিহারী মন্ত্রিমণ্ডলীকে একখানি আবেদন-পত্র ডাঃ রায় প্রেরণ করেন। কিন্তু জবাবে 'খোট্টাই চড়' খাইবার পর আর কিছু করা তিনি বোধ হয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। সময় কম। ধলভূম মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙ্গালী বিতাড়ন এবং খোট্টাকরণ ক্রিয়াকর্ম্ম প্রবল ভাবে চলিতেছে। এই সময় যদি সমগ্র বাঙ্গলা সমবেত ভাবে শেষ চেষ্টা না করে, তাহা হইতে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর নাম ভারত হইতে অতি অল্পকাল মধ্যে বিলুপ্ত হইবে।

* * * *

'মেদিনীপুর-হিতৈষী' বলিতেছেন: "শিষ্য সংগ্রহ···ঠাকুরের জন্মোৎসব মেদিনীপুরে হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য হার্ডিঞ্জ স্কুল ও মিউনিসিপ্যালিটির বালিকা বিদ্যালয় কয়েক দিন বন্ধ রাখিয়া আগন্তুকদিগের স্থান দেওয়া হইয়াছিল। এখন শুনিতেছি, ঠাকুরের শিষ্য সংগ্রহের জন্য দালাল লাগিয়াছে। আর এক গৌড়ীয় মঠ মেদিনীর বুকে জাঁকিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে। গৌড়ীয় মঠের সেবকদিগের ন্যায় ইঁহাদেরও মোহিনী মন্ত্র আছে তাহা জানিয়া কর্ত্তাগণ সাবধান হউন।" সমস্যাটি প্রায় সমগ্র বাঙ্গলার। বিশেষ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎসবাদির জন্য বিদ্যালয়-ভবনগুলিকে এমন ভাবে কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া 'দান' করা আমরা সমর্থন করি না। নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মকার্য্য এবং উৎসব করার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা যখন অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে বাধা জন্মায় বা জন্মাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহাতে অবশ্যই আপত্তি করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কোন ঠাকুর বা কোন মঠের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিদ্বেষ বা হিংসা-ভাব আমাদের নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও ইহা এখন দেখিতে হইবে, কোন ঠাকুর বা কোন মঠ দেশের সত্যকার কোন হিত করিতেছেন, না, কেবল নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গোষ্ঠীবৃদ্ধি মাত্র করিয়া অর্থসাফল্য বৃদ্ধি করিতেছেন? সরকারী ভাবে দেশের এই সকল ব্যাপারের একটা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন—বিধি-নিষেধও কার্য্যকরী করিবার সময় বোধ হয় হইয়াছে।

* * * *

'দামোদরে' প্রকাশ:—"গত ২৮শে ভাদ্র সোমবার মানকর রাইপুর-নিবাসী শ্রীকালীকুমার রায়ের বৃদ্ধা মাতা (৮০) পরলোক গমন করেন। স্থানীয় প্রতিবাসিগণ বিনা প্রায়শ্চিত্তে শবদাহ করিতে অস্বীকার করে—অন্যথায় ৫০৲ টাকা দিলে তাঁহারা কোনরূপে যাইতে পারেন। কালীকুমার বাবু গত বৈশাখ মাসে খৃষ্টান হইতে শুদ্ধি হইয়া হিন্দুসম্প্রদায়-ভুক্ত হন। ঐ সময় হিন্দু মিলন-মন্দিরের অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞ ও হিন্দু সম্মিলন হয়। ভারত সেবাশ্রমসংঘের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ স্বয়ং শুদ্ধিকার্য্য করেন; ঐ দিনই সভাস্থলে তাঁহার ৩০০০ হাজার লোককে তিনি কন্যাসাহায্যে প্রসাদ বিতরণ করেন। বিপন্ন হইয়া কালীকুমার বাবু হিন্দু মিলন-মন্দিরের শরণাপন্ন হইলে মানকর পল্লী-মঙ্গল সমিতি হিন্দু মিলন-মন্দির অরোরা থিয়েটার পার্টি প্রভৃতির সভ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গিয়া মহা সমারোহে তাঁহার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।" সংবাদ সামান্য হইলেও ইহাতে চিন্তার বহু কথা রহিয়াছে। 'সমাজের' অত্যাচার হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কথা বর্ত্তমানে আমরা শহরে বসিয়া হয়ত চিন্তা করিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থা এখনও 'মধ্য'-যুগের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এদিকে দেশকর্ম্মী এবং কংগ্রেসী সরকারের বহু কাজ করিবার রহিয়াছে। সরকার বাহাদুর হয়ত নানা বৃহত্তর সমস্যা সমাধান করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন, কাজেই এ-বিষয়ে জনগণকেই অবহিত হইতে হইবে। গ্রামগুলিকে আলোকিত করিতে না পারিলে শহরগুলি বাঁচিবে কয় দিন?

* * *

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত 'স্পষ্ট কথা' পাঠে জানা যায়:—"আমরা অতি দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে ডুয়ার্সের পেট্রোল-পাম্প গুলি দুর্নীতির চরম সীমায় উঠিয়াছে। পাম্পে তৈল থাকা সত্ত্বেও কুপন দিয়া তৈল পাওয়া যায় না; অথচ লোক-বিশেষে বিনা কুপনে যথেষ্ট তৈল দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কোন প্রতিবাদ করিলে পাম্পওয়ালারা বলেন, 'আমরা তৈল দিব না—যাহা খুসী করিতে পারেন'। এই সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের করণীয় কিছু আছে কি না তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।" এ বিষয় কলিকাতার অবস্থা কি—তাহা অবশ্য মোটরবিহারী এবং অধিকারিগণ বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা যতটুকু খবর রাখি তাহাতে বলিতে পারি যে প্রাদেশিক সরকারের আস্তানা এই কলিকাতা শহরে বিনা কুপনেও যথেষ্ট পেট্রল লোকে পাইতেছে, অবশ্য মূল্য বেশ কিছু বেশী দিয়া। এই অনাচার কোন কালেও বন্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল পেট্রল নহে, লোহা, লক্কড়, সিমেণ্ট এবং অন্যান্য বহু সামগ্রী সম্বন্ধে একই মন্তব্য করা যায়। অনিয়ম-অনাচার বন্ধ করিতে যে-সকল কর্ম্মচারী সামান্য চেষ্টা করেন, তাঁহারা গোপন-হস্তের নির্দ্দেশে বিভাগান্তরে বদলী হইয়া যান হঠাৎ—এমন খবরও আমাদের জানা আছে। অতএব জলপাইগুড়িবাসীদের বেশী দুঃখ করিবার এমন কোন কারণ ঘটে নাই, এই কথা চিন্তা করিয়া তাঁহারা মনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা বোধ করিতে পারেন।

* * * *

'মফস্বল পত্রিকা' মন্তব্য করিতেছেন:—"নদীয়া জেলার দক্ষিণ সদর মহকুমা হাকিম সম্প্রতি নবদ্বীপ থানার স্বরূপগঞ্জ পানশীলা ইউনিয়নের কংগ্রেস সম্পাদক সতীভূষণের উপর নিরাপত্তা আইনের বিধান জারী করিয়াছেন। কংগ্রেস সম্পাদকের উপর এই নিরাপত্তা অর্ডিনান্স প্রয়োগ হওয়ার ফলে, মফস্বলে গঠনকর্ম্মে রত বহু কংগ্রেস-কর্ম্মীর মনে যে জননিরাপত্তা আইনের ব্যাপক অপপ্রয়োগের সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, এ কথা বলিতে আমরা বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন-সচিব শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার পরিষদ-কক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন, পূর্ব্বে এই আইনের অপপ্রয়োগ হয় নাই এবং আশ্বাস দিয়াছেন যে ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু প্রথম যখন জন-নিরাপত্তা আইন পরিষদে পেশ করা হয়, তদানীন্তন মন্ত্রিসভা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে এই আইন দল-বিশেষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইবে না, কেবল মাত্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইবে। আমাদের

সৌভাগ্য যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত মনোভাব অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে, হায়দরাবাদের ঘটনা তাহার প্রমাণ। অবশ্য এ জন্য জননিরাপত্তা আইনের কোন প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুই-একটি চুনো-পুঁটির পুচ্ছ ধরিয়া টানাটানি করা ছাড়া, গভীর জলে সঞ্চরণশীল কয়টি রাঘব বোয়াল সমাজবিরোধী চোরাকারবারীকে জননিরাপত্তা আইনের জালে আটকাইয়াছেন তাহা জনসাধারণকে জানাইবেন কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি জননিরাপত্তা বিলের উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিতেন, সমাজদ্রোহীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে পশ্চিম-বাংলার লক্ষ লক্ষ জন-সাধারণের দুর্দ্দশা এমন চরমে উঠিত না এবং কম্যুনিষ্টদের পক্ষেও জনসাধারণের অর্থ নৈতিক দুর্দ্দশাকে "মস্কোর ইঙ্গিতে" কাজে লাগাইবার সুযোগ ঘটিত না—পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সাদা কথাটি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?" আশা করি, আমাদের মাননীয় আইন-সচিব উপরিউক্ত মন্তব্যের জবাবে কিছু প্রতিমন্তব্য করিবেন। বর্ত্তমানে আমরাও কোন মন্তব্য করিব না, কারণ, তাহা হয়ত বাঙ্গলার বর্ত্তমান শাসকদের কাছে বিশেষ রুচিকর হইবে না। ব্যক্তিগত ভয়ও আছে।

* * * *

'বীরভূম বার্ত্তা' বলিতেছেন :—"শুনিতে পাই, দেশের লোকের জন্য গভর্ণমেন্ট কাপড়, লোহা, টিন, সিমেন্ট এ সবই প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকেন কিন্তু লোকে তাহা দেখিতেও পায় না। কে বা কাহারা লইয়া উধাও হইয়া যায়! প্রশ্ন জাগে—যাঁহারা এই কালোবাজারের কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহারা কোন্ দলীয়? যাহারা নগ্ন দেহে অথবা জীর্ণ বসনে কল-কারখানায় অথবা ক্ষেতে গিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আসে তাহারা, না যাঁহারা গাড়ীতে চড়িয়া সরকারী দপ্তরখানার আসন অলঙ্কৃত করেন তাঁহাদেরই সগোত্রীয়? এমন অনেক সহৃদয় ব্যক্তি এখনও আছেন যাঁহারা গভর্ণমেন্টকে বিব্রত না করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে গেলে আর এক দল উন্নতশীর্ষ লোকের সহিত মুখোমুখী হইয়া যায় তাহারা ইহা সহ্য করিতে পারে না। আঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিবার জন্য ছুটিয়া আসেন। তখন লড়াই অনিবার্য্য হইয়া ওঠে। ইহাকেই নাম দেওয়া হয় ঘরোয়া যুদ্ধ বা Civil War এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যই হৌক অথবা জগতের কল্যাণের জন্যই হৌক, জনগণের নিজের পায়ে দাঁড়ানটা বন্ধ করিতেই হয়। এবার বিশ্ব জুড়িয়া হৃতসর্ব্বস্বের দল নিজের পায়ে দাঁড়াইবার উদ্যোগ করিতেছে বলিয়াই না কি আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়।" বর্ত্তমান কর্ত্তারা বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এই বার্ত্তা 'ফ্রেণ্ডলি ওয়ার্ণিং,' না 'থেট্'। অবশ্যই স্বীকার করিব 'বীরভূম বার্ত্তা' যাহা বলিতেছেন তাহা যুক্তিযুক্ত এবং আমরাও হাড়ে হাড়ে ইহা অনুভব করিতেছি।

* * * *

'মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকা বলিতেছেন :—"হাওড়া জেলার ঘাটতি অঞ্চলে চাউল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু অভাবগ্রস্ত নরনারী যারা নিছক পেটের দায়ে মেদিনীপুরের বাড়তি অঞ্চল থেকে চাউল ও ধান্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তাদের হাজতে প্রেরণের ব্যবস্থাটা পাকাই হ'য়েছে। গোপীগঞ্জ বাজারে দুর্নীতি দমনের দায়িত্বসহ যে সরকারী কর্ম্মচারীকে নিয়োগ করা হ'য়েছে বৃদ্ধা বিধবা আর অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশুও তাঁর শিকারের বস্তু হ'য়েছে শুনে লজ্জিত হ'তে হয়। রাষ্ট্র-পরিচালকগণ হাওয়ায় উড়ে আর হাওয়া গাড়ীতে চড়ে দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করার লম্বা লম্বা পরিকল্পনা করছেন, কিন্তু গাঁয়ের অন্নবস্ত্রহীন গেঁয়ো মানুষগুলো কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে একটু পায়ে হেঁটে খোঁজ নিলে সন্তোত্তর পুরুষের বরাত জোর মনে করে তারা ধন্য হ'বে।" এ-বিষয় আমরা কোন নূতন মন্তব্য করিব না। সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মাননীয় প্রফুল্ল সেন এবং তাঁহার প্রিয় দুই জন নিকটতম সহকারীর উপরেই এ-কার্য্যের ভার ন্যস্ত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। কিন্তু silence যেখানে golden সেখানে মাননীয় ব্যক্তিরা vocal হইবেন কি? হওয়া উচিত নহে!

* * * *

'মাহিষ্য সমাজ' আরো বলিতেছেন :—"পূর্ব্ব-পাকিস্থান থেকে যে সব বাস্তুত্যাগী পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন সরকার তাঁদের পুনর্ব্বসতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সুবিধার শতকরা ৯০ ভাগ পূর্ব্বে আসা পূর্ব্ববঙ্গীয়রা ভোগ করছেন। সত্যি যাঁরা অভাবগ্রস্ত হ'য়ে বাস্তু হারিয়ে এসেছেন তাঁরা 'কোথায় কি করতে' হ'বে—তোষামোদের তৈল মর্দ্দনে কাকে বা কাহাদিগকে খুসী করতে হ'বে এ সবের 'ঘাঁৎঘুঁৎ' না জানায় বিশেষ কিছুই পাচ্ছেন না।" এ কথা আমরা সমর্থন করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, আজন্ম কলিকাতাবাসী কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের 'বাস্তুত্যাগী—দুর্গত' বলিয়া নাম লিখাইয়া ট্যাক্সি এবং বাসের লাইসেন্স লাভও করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়া শুনিয়া এ-দান করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। তবে অনুসন্ধান করিতে দোষ কি? সরকারী দপ্তরের কর্ম্মচারীরা সকলেই যুধিষ্ঠির নহেন, এ-কথাও মিথ্যা নহে।

-প্রচ্ছদপট-

পত্রিকা প্রকাশে এবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় দরুণ রঙ্গপট ও সাহিত্য-পরিচয় বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা দেওয়ার সুযোগ হইল না। আগামী সংখ্যা হইতে পুনরায় নিয়মিত-প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটের আলোকচিত্র শিল্পী তরুণ চট্টোপাধ্যায়।

এবার পূজার বাজার

সত্যদর্শী

পূজো সর্ব্বত্রই এসেছিল। বারোয়ারী পূজা-মণ্ডপে এসেছিল লাউড-স্পীকারের অষ্টপ্রহর চিৎকারে, স্কুলে-কলেজে এসেছিল কাঁকা বেঞ্চির হাঁফ ছাড়ায়, আফিসে এসেছিল বড় সাহেবের রক্তচক্ষুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, ট্রেণে এসেছিল বাদুড়-ঝোলায়, দোকানে এসেছিল গুদোম সাবাড় কোরে, গেরস্থর ঘরে এসেছিল পকেট সাবাড় কোরে;—চলে যখন গেল, দেখা গেল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাঁশ পোঁতার গর্ত্তগুলো হাঁ কোরে আছে;—সে ঘা আজও শুকোয়নি। গেরস্থদের পকেটের ঘায়েও মলম পড়েনি আজো!

সিনেমা থিয়েটারের পাড়াতেও এসেছিল পূজো। নতুন শাড়ীর খসখসানি আর নতুন জুতোর মচমচানি পূজোর মণ্ডপের চেয়ে ঐ পাড়াতেই যেন বেশি কোরে শোনা গেছিল!

পূজোর নতুন পোষাক পরার প্রথাটা মানুষের বেলায় যেমন, সিনেমা-থিয়েটারের বেলাতেও ঠিক তেমনি। নতুন ছবির পোষাক পরে সেজেছিল শহরের প্রধান প্রধান অনেকগুলি চিত্রগৃহ। কিন্তু নতুন জুতো পরে কেউ যেমন গট্‌গট্‌ কোরে হাঁটে আর কারুকে বা ফোস্কার দায়ে খোঁড়াতে হয় ক্রমাগত, সিনেমার বেলায় তারও ব্যতিক্রম হয়নি।

কোন চিত্রগৃহ যখন নতুন ছবির পোষাক প'রে বুকে চতুর্দ্দশ সপ্তাহের নোটিশ ঝুলিয়ে গট্‌মট্‌ কোরে চলেছে, কেউ বা তখন প্রথম সপ্তাহের নোটিশের আড়ালে খুঁড়িয়েছে ক্রমাগত!

তাই বলছিলাম, পূজো সিনেমার মহল্লাতেও এসেছিল।

রঙ্গমঞ্চের পাড়াটা নেহাৎই দরিদ্রের পাড়া আজকাল। গরীব ঘরের ছেলেদের পুরোনো জুতো তাপ্পি দিয়ে ঘসে ঘসে পালিশ কোরে চলার মতো রঙ্গালয়গুলোও সেই আদ্যিকালের কর্ণার্জ্জুন, কেদার রায়, সুদামা, সীতা, বঙ্গে বর্গী নাটকগুলোকেই তাপ্পি দিয়ে আর বুরুশ ঘষে কাজ চালিয়েছে। ও-মহল্লায় পূজোটা এসেছিল নেহাৎই গরীবিয়ানা চালে।

কলকাতার প্রত্যেকটি রঙ্গালয়ই পুরোনো নাটকগুলির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে অভিনেতৃ-সম্মেলনটা বেশ চটকদার করবার চেষ্টা করেছিলেন। মঞ্চের প্রত্যেকটি নাম-করা অভিনেতা অভিনেত্রীকেই কোন-না-কোন রঙ্গমঞ্চে দেখা গিয়েছিল। সম্পদহীন বনেদী ঘরের কর্ত্তাদের মতো ছেঁড়া কাপড়ে চুমুট করা আর রিপু-করা পুরোনো আদ্দির পাঞ্জাবীর হাতায় 'গিলে' করার প্রচেষ্টা আর কি!

পূজোর ক'দিন সহরের প্রধান সড়কগুলোর ধারে যে সব বাড়ী, তাদের দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টারের ঘাড়াঘাড়ি। নেমন্তন্ন বাড়ীর বারান্দায় নিমন্ত্রিত আত্মীয়াদের ভিজে শাড়ী—সায়া—ব্লাউজের মতোই একটার ওপরে একটা। কোনোটাই রোদ্দুর পায় না ভালো কোরে, কোনোটাই শুকোয় না সবখানি।

এমনি একটি বাড়ীর দেয়ালে সিনেমা-থিয়েটারের পোষ্টারগুলো ঘাড়াঘাড়ি কোরে আর পাশাপাশি হয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত মজাদার কথা শুনিয়েছে।

হেদোর ধারের একটা বাড়ীর দেয়ালে পড়া গেল—'বাংলার মেয়ে চরিত্রহীন!'

চট কোরে চটে উঠবেন না যেন! মিস্ মেয়োর উক্তির এমন নির্লজ্জ সমর্থন করেছে দু'টি পৃথক সিনেমা এবং থিয়েটারের পোষ্টার। পাশাপাশি থেকেই তারা এই বিপত্তি ঘটিয়েছে। একটি হচ্ছে কোনো এক সিনেমায় 'বাংলার মেয়ে' প্রদর্শিত হচ্ছে, তারই খবর; অন্যটিতে কোনো এক রঙ্গালয়ে 'চরিত্রহীন' অভিনীত হচ্ছে, তারই সংবাদ। পাশাপাশি আটকে থেকে এরা কী কাণ্ডই করেছে বলুন দিকি!

কিন্তু এর চেয়েও বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার করেছে আর একটি বাড়ীর দেয়ালের পোষ্টারগুলো। সহরের আর এক প্রান্তের একটি বাড়ীর দেয়ালে দেখা গেল, পোষ্টারগুলো পাশাপাশি থেকে আরো একটি স্ক্যাণ্ডালাস্ খবর শুনিয়েছে উদ্‌গ্রীব পথচারীদের। সে-দেয়ালে লেখা আছে—'তাইতো বিপ্রদাস, কাশীনাথ বিন্দুর ছেলে?' কাশীনাথ নামক ব্যক্তিটি যে বিন্দু নাম্নী কারুর পুত্র, এই অজ্ঞাত গোপন রহস্যটি যে-পোষ্টারগুলো নির্ম্মম ভাবে ফাঁস কোরে দিয়েছে, তার কোনোটি থিয়েটারের, কোনোটি বা সিনেমার। কিন্তু এমন মতলোব কোরে পাশাপাশি থাকতে তাদের কে বলেছিল বলুন তো?

পূজোর বাজারে মই-সিঁড়ি ঘাড়ে কোরে আর আঠার বালতি হাতে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারের কুলীগুলোই আমাদের সঙ্গে পূজোর রসিকতা কোরে গেল না তো!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ—

গত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) প্যারী নগরীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শরৎকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এক মাসেরও অধিক হইয়াছে এই অধিবেশন চলিতেছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যারই কোন সমাধান করা এ-পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন অধিবেশনই বর্ত্তমান অধিবেশনের মত এত ধীর-মন্থর গতিতে চলে নাই। হয়ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কোন আলোচনাই এই অধিবেশনে হওয়া সম্ভব হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য্যসূচীতে স্থান পাইয়াছে। প্যারী অধিবেশনে যে এই প্রশ্ন আলোচিত হইবে সে-সম্বন্ধে ভরসা করার মত কিছুই দেখা যাইতেছে না। সম্ভবতঃ নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে কাশ্মীর সমস্যা লইয়া পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইবে। জাতিপুঞ্জের কাশ্মীর কমিশন জেনেভায় বসিয়া তাঁহাদের রিপোর্টকে শেষ রূপ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত আছেন। যত দূর শোনা যায়, তাঁহাদের রিপোর্ট তৈয়ারীর কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং এই রিপোর্ট সম্বন্ধে যতটুকু জানা যাইতেছে, এই রিপোর্ট ভারতের পক্ষে মোটেই অনুকূল হইবে না। হায়দ্রাবাদ সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে আর উত্থাপিত হইবে না বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই সমস্যা যাহাতে আবার উত্থাপিত ও আলোচিত হয়, পাকিস্থান তাহার জন্য কোন চেষ্টাই বাকী রাখিতেছে না। ভারতের দিক্ হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি সমস্যা বাদে আন্তর্জ্জাতিক দিক্ হইতে গুরুতর সমস্যাগুলিরও সমাধানের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি যে প্যারী অধিবেশনের প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে, বিশ্ববাসী যে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সহিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ও বিতর্ক লক্ষ্য করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ চারি দিকেই যে তৃতীয় মহাসমরের কথা শোনা যাইতেছে, প্যারী অধিবেশন এই যুদ্ধাশঙ্কা দূর করিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করিতে পারিবে কি? আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর গতি ভবিষ্যতে কোন্ পথে প্রবাহিত হইবে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী সম্মেলনে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

বার্লিন-সঙ্কটের দুর্য্যোগের মধ্যে এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত বার্লিন-সঙ্কট সমাধানের প্রয়াস ব্যর্থই হইয়াছে। এই অধিবেশনের অবশিষ্ট কালের মধ্যে বার্লিন সঙ্কটের সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? পরমাণু বোমা সমস্যা, অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করার সমস্যা এ-পর্য্যন্ত অমীমাংসিতই রহিয়াছে। প্যারী অধিবেশনের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব কি? উপনিবেশ-সমস্যার কোন সমাধান সত্যই হইবে কি? প্যালেষ্টাইন সমস্যাকে মুলতুবী রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। ক্ষুদ্র পরিষদের (Little Assembly) অস্তিত্ব বজায় রাখা হইবে কি না, তাহা লইয়াও আলোচনা হইবে। ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হওয়ার পর হইতে রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের অন্যান্য শক্তিবর্গ উহাকে বর্জ্জন করিয়াছে। তার পর আছে ভেটো সমস্যা। এই সকল সমস্যা লইয়া যে সকল আলোচনা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সেগুলির মধ্যে রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের যে বিরোধ পরিস্ফুট দেখা যায়, তাহা এখন পর্য্যন্তও মীমাংসার অযোগ্য বলিয়াই মনে হইতেছে। শুধু কি তাই? এই বিরোধের মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ মার্শাল বলিয়াছেন, "This persistent refusal of a small minority to contribute to the accomplishment of our agreed purposes is a matter of profound concern." অর্থাৎ 'আমাদের সর্ব্বসম্মত উদ্দেশ্য সমূহ কার্য্যকরী করিতে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু দল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অস্বীকৃত হওয়ায় একটি গভীর উদ্বেগের বিষয় হইয়াছে।' তাঁহার এই উক্তি যে রাশিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। মিঃ মার্শাল অবশ্য বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিরোধ চলিতেছে তাহাকে বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাই, কিন্তু মৌলিক নীতিগুলি সম্পর্কে তাঁহারা কোন আপোষ করিবেন না। এই মৌলিক নীতিগুলি কি তাহা যেমন অত্যন্ত অস্পষ্ট, তেমনি এই উক্তির মধ্যে একটা হুমকী যে অনুক্ত রহিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। মিঃ মার্শাল যাহা উহ্য রাখিয়াছেন মিঃ বেভিন তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মিঃ বেভিন বলিয়াছেন, "Russia alone would be responsible if atom warefare burst upon the world." 'পৃথিবীর বুকে পরমাণু-যুদ্ধ যদি বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে একমাত্র রাশিয়াই উহার জন্য দায়ী হইবে।' পরমাণু বোমার ভয় দেখাইয়া রাশিয়াকে কাবু করিবার এই চেষ্টা এ-পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে গত ১লা অক্টোবর রাশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ভিসিনস্কি পরমাণু বোমার রহস্য একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই করায়ত্ত এইরূপ ধারণাকে ভ্রান্ত ধারণা (illusion) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ শুধু পরমাণু বোমার উপরেই নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন বৃটিশের নেতৃত্বেই গঠিত হইয়াছে। বৃটিশের নেতৃত্বে বৃটিশ কমনওয়েলথকে করা হইয়াছে সংহত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্যান-আমেরিকান সংহতি গঠিত হইয়াছে। এই প্যান-আমেরিকান সংহতির সহিত পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংযোগ বিধানের জন্য আটলান্টিক পরিষদ গঠনের আয়োজন চলিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বৃটিশ কমনওয়েলথ, প্যান-আমেরিকান

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর প্রযোজনায় বসুমিত্রের রহস্যচিত্র

কালোছায়া

ভূমিকায়

শিপ্রা দেবী শিশির মিত্র
ধীরাজ ভট্টা গুরুদাস বন্দ্যো
নবদ্বীপ হালদার শ্যাম লাহা
হরিদাস চট্টো নৃপেন্দ্র মিত্র
প্রভৃতি

রচনা ও পরিচালনা
প্রেমেন্দ্র মিত্র

সঙ্গীত : অমিয়কান্তি

বাজী রেখে বন্ধুদের দেখাবার মত ছবি হল 'কালোছায়া' অথচ যাতে রাজী হারবার ভয় নেই। আপনার বন্ধু যত বড় বুদ্ধিমান ধুরন্ধর হোন 'কালোছায়া' চিত্রের কাহিনীর পরিণতি কল্পনা করা তাঁর সাধ্যেরও অতীত, স্বপ্নেরও অতীত। অতীতে এ রকম ছবি বাংলাদেশে তোলা হয়নি, ভারতবর্ষেও নয়। একমাত্র বিদেশে তোলা রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা চিত্রের সঙ্গেই 'কালোছায়া'র কাহিনীর তুলনা চলতে পারে।

পরিবেশক : গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

এসোসিয়েশন মিলিয়া একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, একই মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠী গঠন করা হইতেছে। তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর রহিল কি? ইটালী ও পর্ত্তুগাল পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় নয়। স্পেনকেই যে বাদ দেওয়া হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কুয়োমিণ্টাং চীন যে মার্কিণ নেতৃত্বাধীনেই চলিবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। জাপান ও কোরিয়ার রাজনৈতিক কোন অস্তিত্বই নাই। মালয়, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার কথা কিছু না বলাই ভাল। ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বৃটিশের সহযোগিতা করিয়াই চলিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে; মার্কিন নেতৃত্বে রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপের কয়েকটি দেশ বাদে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র এক-জোট বাঁধিয়াছে। সুতরাং সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আর সার্থকতা কোথায়?

এই জোট-বাঁধা যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং মার্কিণ নেতৃত্বের নির্দ্দেশ ছাড়া এই সকল রাষ্ট্র যে চলিতে অসমর্থ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশন ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মুলতুবী রাখিবার জন্য এবং ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে পুনরায় অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হইবে। ২রা নবেম্বর তারিখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনই যে ইহার কারণ, তাহাও সকলেরই স্বীকৃত। ২রা নবেম্বর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইলেও ১৯৪৯ সালের ২০শে জানুয়ারীর পূর্ব্বে নূতন প্রেসিডেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন না। মার্কিণ রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এই মধ্যবর্ত্তী সময়কে 'Lame Duck' বলিয়া অভিহিত করা হয়। আমাদের এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হইবে তখন নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইয়া যাইবে। মিঃ ডিউইর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। কাজেই মার্কিণ রাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ ডিউই নির্ব্বাচিত হইলে ডাঃ জন ফষ্টার ডুলেস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সচিব হইবেন। ডাঃ ডুলেসের সহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আলোচনা এই জন্যই বিশেষ অর্থপূর্ণ। সাধারণ পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইলেও নিউইয়র্কে রাজনৈতিক কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকিবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক কমিটিকেই পূর্ণ অধিবেশনে রূপান্তরিত করা হইবে। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বিশেষ অধিবেশনের সময়েও তাহাই করা হইয়াছিল।

বার্লিন-সঙ্কট ও নিরাপত্তা পরিষদ—

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথক্ পৃথক্ নোটে বার্লিনসমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করেন। অবশ্য সকলেরই নোটের বস্তু একরূপ। ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) অনুরূপ নোট রুশ গবর্ণমেণ্টকেও প্রদান করা হইয়াছে। ৪ঠা অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদে এ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে রাশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ ভিসিনস্কি বলেন যে, বার্লিন সম্পর্কে আলোচনা করিবার আইনসঙ্গত অধিকার নিরাপত্তা পরিষদের নাই। তিনি আরও বলেন যে, বার্লিন অবরোধ করা হয় নাই (there was 'no blockade')। ৫ই অক্টোবর ৯—২ ভোটে নিরাপত্তা পরিষদে বার্লিন সমস্যা আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে মঃ ভিসিনস্কি এবং ইউক্রেইনের প্রতিনিধি মঃ মমুলস্কি জানান যে, এই আলোচনায় তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু পরের দিন আলোচনার সময় তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হন। অতঃপর নয় দিন ধরিয়া ছয়টি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র একটি আপোষের ফরমূলা বাহির করিতে ব্যর্থ-চেষ্টা করেন। অতঃপর ছয়টি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে তাহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু রাশিয়া ভেটো প্রদান করায় (২৫শে অক্টোবর) সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে।

এই ব্যর্থতার দায়িত্ব অবশ্যই রাশিয়ার ঘাড়েই চাপান হইবে। কিন্তু বার্লিন-সঙ্কটের মূলে যে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি-সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের অস্বীকৃতি, পশ্চিম-জার্ম্মাণী গঠনের আয়োজন এবং পশ্চিম-বার্লিনে পৃথক্ মুদ্রা প্রচলন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, নিরপেক্ষ ছয়রাষ্ট্র সত্যই নিরপেক্ষ কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। জার্ম্মাণীতে মুদ্রা প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ এবং পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের আহ্বান বার্লিন অবরোধ তুলিয়া দেওয়ার সাপেক্ষ করায় রাশিয়া এ প্রস্তাবে রাজী হয় নাই।

পরমাণু বোমা সমস্যা—

পরমাণু বোমা সমস্যার সমাধানেরও কোন পথ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। রাশিয়া একটি আপোষমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। এই প্রস্তাবে একই সঙ্গে পরমাণু বোমাগুলি ধ্বংস করা এবং আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়োগ করার কথা আছে। কিন্তু গত ২০শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। কমিটি অতঃপর পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি আন্তর্জ্জাতিক সন্ধির খসড়া রচনার জন্য এটমিক এনার্জ্জি কমিশনকে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অধিকাংশ পশ্চিমী প্রতিনিধি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-ইউরোপের ছয়টি রাষ্ট্র উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। এই সকল সমর্থক প্রতিনিধি প্রথমে কানাডার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেই বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে এটমিক কমিশনের কাজ স্থগিত রাখার কথা ছিল এবং উহা গৃহীত হইলে সাধারণ পরিষদকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিতে হইত। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের প্রচেষ্টায় আলোচনার দ্বার খোলা রাখিবার জন্য বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা উল্লিখিত প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে। অবশ্য এই প্রস্তাবও কানাডাই উপস্থিত করে। পরবর্ত্তী সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব্বেই এটমিক এনার্জ্জি কমিশনকে তাঁহাদের রিপোর্ট সাধারণ পরিষদে দাখিল করিতে হইবে।

ত্রিশ মাস ধরিয়া আলোচনার পরেও পরমাণু শক্তি সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় নাই। আমেরিকা যদি পরমাণু শক্তির উপর একাধিপত্য বজায় রাখিতে চায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও মীমাংসার কোন আশা দেখা যায় না।

উপনিবেশ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঔপনিবেশিক এবং ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলে রাশিয়া এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল যে, উপনিবেশগুলিতে

রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে উপনিবেশের আটটি মালিক-রাষ্ট্রকে প্রতি বৎসর বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বেলজিয়ম এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করে। রাশিয়ার প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে, কিন্তু ভারত যে প্রস্তাব উত্থাপন করে তাহা গৃহীত হয়। ভারতের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কোন উপনিবেশ যখন আর অ-স্বায়ত্ত-শাসিত থাকিবে না, তখন তাহার মালিককে ঐ উপনিবেশের শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট দাখিল করিতে হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে কোন উপনিবেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে কোনও বার্ষিক বিবরণ ঔপনিবেশিক শক্তিকে দাখিল করিতে হইবে না। বৃটিশ প্রতিনিধি এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট দিতে বিরত ছিলেন এবং বলিয়াছেন যে, বৃটেন এই প্রস্তাব মানিবে না এবং সাধারণ পরিষদে যদি এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলেও এই প্রস্তাবের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে বৃটেন কি দৃষ্টিতে দেখে, ইহারই মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-সমূহের সাম্রাজ্য রক্ষার উপায় তাহাতেও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, জাতিপুঞ্জ সনদের একাদশ অধ্যায়টি পর্য্যালোচনা করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাশিয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতার সময় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্ররা এই অধ্যায়েরই দোহাই দিয়াছিল।

প্যালেষ্টাইন ও জাতিপুঞ্জ—

প্যালেষ্টাইনে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যে যুদ্ধ বিরতি চলিতে পারে না, আরব ও ইহুদীদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ আরম্ভ

হওয়াতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে মনস্থির করিতে পারেন নাই, আলোচনার অবস্থা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। গত ১৫ই অক্টোবর রাজনৈতিক কমিটিতে প্যালেষ্টাইন সমস্যা যখন জরুরী আলোচ্য বিষয় হিসাবে উত্থাপিত হইল, তখন দেখা গেল, কোন সদস্যই কোন কথা বলিতে রাজী নহেন। অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদে ১৯শে অক্টোবর তারিখে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে নেগেভ অঞ্চলে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য আরব ও ইহুদীদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকদিগকে প্যালেষ্টাইনের সর্ব্বত্র নিরাপদে যাতায়াত করিতে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গৃহীত হইয়াছে দ্বিতীয় প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে যে বিশেষ কিছু ফল হইয়াছে তাহা যেমন বুঝা যাইতেছে না, তেমনি প্যালেষ্টাইন সমস্যার আলোচনা মুলতুবী রাখিবার প্রয়াসও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নেগেভ অঞ্চল লইয়াই বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনে প্রধান সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই অঞ্চলটি প্যালেষ্টাইনের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। প্যালেষ্টাইনের ভূ-ভাগের অর্দ্ধেকই নেগেভ অঞ্চল হইলেও উহার অধিকাংশই মরুভূমি। ১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে জাতিপুঞ্জ সম্মেলনে প্যালেষ্টাইন বিভাগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে নেগেভ অঞ্চল ইহুদীদিগকে এবং গ্যালেলী আরবদিগকে দেওয়া হইয়াছে। কাউণ্ট বার্ণাডোটের রচিত পরিকল্পনায় ইহুদীদিগকে গ্যালেলী এবং আরবদিগকে নেগেভ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহুদীরা অবশ্য গ্যালেলী দখল করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু নেগেভ অঞ্চল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব অনুসারে তাহাদের প্রাপ্য। একমাত্র মিশরী সৈন্যবাহিনীই নেগেভ অঞ্চলে আছে। ইজরাইল গবর্ণমেণ্টের সৈন্যবাহিনী তাহাদের পূর্ব্ব অবস্থান স্থানে ফিরিয়া না গেলে, মিশর যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারে না, ইহাই মিশরের যুক্তি। ইজরাইল গবর্ণমেণ্টের কথা এই যে, নেগেভে মিশরের চলাচল এবং ঐ অঞ্চলের ইহুদীদের বাসস্থান সমূহের উপর মিশরীদের আক্রমণ যদি জাতিপুঞ্জ বন্ধ না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয়। নেগেভের যে সকল ইহুদী অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে সেগুলির সহিত সংযোগ বিধান করাই ইজরাইল গবর্ণমেণ্টের সৈন্য প্রেরণের উদ্দেশ্য।

কাউণ্ট বার্ণাডোটের পরিকল্পনায় এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্যালেষ্টাইনের অ-ইহুদী অঞ্চলগুলি ট্র্যান্সজর্ডানের সহিত সংযুক্ত হইবে। কিন্তু নেগেভ অঞ্চল মিশরের সংলগ্ন। নেগেভ অঞ্চল অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায় যে মিশরের নাই তাহা বলা যায় না।

কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন—

সম্প্রতি লণ্ডনে বৃটিশ কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইয়া গেল আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে উহার তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। ১১ই অক্টোবর (১৯৪৮) এই সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং এই সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে ২২শে অক্টোবর। এই সম্মেলনের অধিবেশন প্রকাশ্যে হয় নাই। কাজেই কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্মেলনের আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে যে-টুকু জানিতে দিয়াছেন তাহা ছাড়া এ-সম্পর্কে বিশ্ববাসীর আর কিছুই জানিবার উপায় নাই। সম্মেলনের সর্ব্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পরে চারি পৃষ্ঠাব্যাপী এক ইস্তাহারে সম্মেলনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও আমাদের কাছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তই শুধু নয়, অপূর্ণ বলিয়াও মনে হইতেছে। তাই বলিয়া এই বিবরণ আমাদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রকাশিত ইস্তাহারের আলোকে এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিবার পূর্ব্বে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আয়ার এই সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয় নাই, কিন্তু রোডেশিয়া আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে বলিয়া তাহারও অবশ্য নিমন্ত্রণ হয় নাই। ক্যানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, রোডেশিয়া, ভারত, পাকিস্থান ও সিংহলের প্রধান মন্ত্রী এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইস্তাহারে 'বৃটিশ কমনওয়েলথ' কথাটির পরিবর্ত্তে শুধু 'কমনওয়েলথ' কথাটি ব্যবহৃত হওয়ায় বিলাতের রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক মহল না কি উহাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থব্যঞ্জক বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সম্মেলনের কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত বা স্বীকৃত নীতির ফলে 'বৃটিশ' কথাটি বাদ দেওয়া হয় নাই। উক্ত অধিবেশনে অনুসৃত নীতির নিখুঁৎ প্রতিরূপ হিসাবেই বৃটিশ শব্দটি বর্জ্জন করা হইয়াছে, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এই অনুসৃত নীতি কি, তাহা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখিবার নীতির কথাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার সময় কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট মতৈক্য দেখা গিয়াছে এবং মূলতঃ বিশ্ব-শান্তির উপায় হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সমূহের উপর এবং উহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করিতে তাঁহাদের দৃঢ়তার উপর বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। বিশ্ব-শান্তিরক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থাকা সত্ত্বেও কমনওয়েলথের প্রায়োজনীয়তা কি, আপাতদৃষ্টিতে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। বোধ হয়, সেই জন্যই ইস্তাহারে প্রদত্ত বিবরণে এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, কম্যুনিজমের বিপদ কি ভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব তাহাই ছিল আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়। ইস্তাহারের এই অংশটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই সম্মেলনের দৃষ্টিতে কম্যুনিজম শুধু গুরুতর বিপদই নয়, প্রাচ্যে ইহার বিস্তারের লক্ষণগুলি বিভীষিকারূপে গণ্য হইয়াছে। ইউরোপে কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজীয়াম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ এই ইউনিয়নের সদস্য। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :—There was general agreement that this association of the U, K with her European neighbours (Western Union) was in accordance with the interest of the other members of the Commonwelth, the U N and the promotion of the world peace" অর্থাৎ 'ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের (পশ্চিমী

ইউনিয়ন) সহিত বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সংশ্লিষ্ট হওয়া কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যদের স্বার্থরক্ষা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং বিশ্ব-শান্তি রক্ষার নীতি অনুযায়ীই হইয়াছে বলিয়া সকলে একমত হইয়াছেন। এই একমত হওয়ার তাৎপর্য্য কি? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে রাশিয়া কম্যুনিষ্ট দেশ। বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্যগণ কি মিঃ চার্চ্চিলের মত ইহাই চান যে, রাশিয়ার কম্যুনিষ্টরা কম্যুনিজমের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস বর্জ্জন করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের নির্দ্দেশ মানিয়া চলুক নতুবা পরমাণু বোমা দ্বারা বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ব্যতীত উল্লিখিত একমত হওয়ার আর কি অর্থ হইতে পারে?

পশ্চিমী ইউনিয়নে নেতৃত্ব করিবে বৃটেন। এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বৃটেনের নেতৃত্ব করার অর্থ—পররাষ্ট্র-নীতি, অর্থনীতি এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ বৃটেনের নীতি ও নির্দ্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হইবে। আবার কমনওয়েলথেও যে বৃটেন নেতৃত্ব করিবে, তাহাও অবিসংবাদিতরূপে সত্য। কাজেই পররাষ্ট্র-নীতি, অর্থনীতি ও দেশ-রক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমনওয়েলথের দেশগুলিও পশ্চিমী ইউনিয়নের নীতিই অনুসরণ করিবে। পশ্চিমী ইউনিয়ন এবং বৃটিশ কমন-ওয়েলথের নেতা বৃটেন যে একান্ত ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল, তাহাও কাহারও অজানা নাই। সুতরাং সর্ব্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, পশ্চিমী ইউনিয়ন এবং বৃটিশ কমনওয়েলথও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এবং উহারই নীতি ও নির্দ্দেশ অনুসারে পরিচালিত হইবে। আজ গণতন্ত্র ও কম্যুনিজমের মধ্যে যে সংঘাত শান্তি বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা আসলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। রাশিয়া কম্যুনিষ্ট দেশ না হইয়া ধনতান্ত্রিক দেশ হইলেও এই বিরোধ যে অবশ্যম্ভাবী হইত তাহাতেও সন্দেহ নাই। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বিরোধ পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী ইউনিয়নের সহিত বৃটিশ কমনওয়েলথকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ করা, তাহা বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। ভারতও যে এই ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক চক্রান্তের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িল, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে কি?

গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বিশ্বশান্তি রক্ষা করার সম্মিলিত আদর্শ ই কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের সকল সদস্য গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা, পাকিস্থান এবং সিংহলের সহিত ভারতের যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিশ্বমানবের সম্মুখে এই কমনওয়েলথ যে কোন আশার আলোক প্রজ্বালিত করিতে পারিবে সে-সম্বন্ধে কোন ভরসা আমরা করিতে পারিতেছি না। অথচ শোনা যাইতেছে যে, পণ্ডিত নেহরু না কি ভারতকে কমনওয়েলথের মধ্যে রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতীয় গণ-পরিষদ কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের হুকুম অমান্য করিতে পারিবে না, এই ভরসাতেই যে তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকার পরিণাম সম্বন্ধে যে কেহই অবহিত হইতেছেন না,. ইহা সত্যই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, যদি সত্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে মিঃ চার্চ্চিলই আবার বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হইবেন, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতের স্বাধীনতার প্রতি মিঃ চার্চ্চিলের মনোভাব কাহারও অজানা নাই। সুতরাং তৃতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতকে আবার অধীনতার জালে জড়াইবার চেষ্টা চলিবে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের উপর যে নিপীড়ন চলিয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য দলের সহিত সমমর্য্যাদাসম্পন্ন, এ কথা স্বীকার করা যায় না। পাকিস্থানের সহিত ভারতের সম্পর্কও কম কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করিবে না। মিঃ এটলী পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁয়ের মধ্যে যে গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করাই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈঠকের ফল কি হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু কাশ্মীর বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে। ভারত কি তাহা মানিয়া লইবে? বৃটিশের চাপে না মানিয়া হয়ত উপায় থাকিবে না। পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে, এই স্বীকৃতির পরও বৃটিশের পাকিস্থান-প্রীতি বৃটিশ কমনওয়েলথে ভারতের অবস্থা কি অসহনীয় হইয়াই উঠিবে না? ইঙ্গ-মার্কিণ ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধে ভারত নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া পণ্ডিত নেহরু যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারত কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিলে তাহা আর সম্ভব হইবে না। কমনওয়েলথের প্রত্যেকটি দেশই তাহার নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের সহিত আলোচনা করিবে বলিয়া ইস্তাহারে বলা হইয়াছে। বৃটিশের নেতৃত্বে এবং নির্দ্দেশেই কার্য্যতঃ এই সকল নীতি গৃহীত হইবে বলিয়া উল্লিখিত ঘোষণা আমাদের কাছে অর্থহীন বলিয়াই মনে হইতেছে। এই পথে স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি গঠিত হইবার সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

মিঃ চার্চ্চিলের হুঙ্কার—

গত ১ই অক্টোবর উত্তর-ওয়েলসের ল্যাণ্ডাডনোতে বৃটিশ রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সম্মেলনের উপসংহার উপলক্ষে মিঃ চার্চ্চিল যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা আসলে তৃতীয় মহাযুদ্ধের আবাহন-মন্ত্র ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। তাঁহার এই বক্তৃতা প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী চার্চ্চিলের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯১৯-২০ সালে বলশেভিক বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়া রাশিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার যে-কোন প্রয়াসই যে শুধু তাঁহার সমর্থন লাভ করিয়াছিল তাহা নয়, বৃটিশের অর্থে এইরূপ প্রচেষ্টার জন্য উস্কানী দেওয়ারও তিনি সমর্থক ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের শেষভাগে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী যদি বার্লিনে এবং মার্কিণ সাঁজোয়া বাহিনী যদি প্রাগে প্রবেশ করিত, তাহা হইলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার জন্য মিঃ চার্চ্চিলের খেদোক্তিতে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। তাই সম্মেলনের সদস্যবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্বমূলক মীমাংসা হইতে পারে, এইরূপ মিথ্যা আশা আমি আপনাদের মনে সঞ্চার করিব না।"

রাশিয়ার সহিত সম্ভাব্য যে কোন মীমাংসাই তাঁহার দৃষ্টিতে কৃত্রিম ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি মনে করেন, "মূল বিপদ এবং বিরোধ থাকিয়াই যাইবে।" কাজেই তৃতীয় মহাযুদ্ধ তাহার 'বিবাদময় রূপ লইয়া নিকটবর্ত্তী হইতেছে' (remoreselessly approaching), ইহাই তিনি শুধু দেখিতে পাইতেছেন। পাছে কেহ তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করে, সেই আশঙ্কায় তিনি বলিয়াছেন, "If it were not for the stocks of atomic bombs now in the trusteeship of the U. S. A. there would be no means of stopping the subjugation of Western Europe by communist machination backed by Russian armies and enforced by political police." অর্থাৎ 'যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পরমাণু বোমা মজুত না থাকিত, তাহা হইতে রুশ সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রাজনৈতিক পুলিশের সাহায্যে কম্যুনিষ্ট কৌশলের দ্বারা পশ্চিম-ইউরোপ অধিকৃত হওয়া নিবারণ করিবার কোন উপায় থাকিত না।' শুধু তাই নয়। মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "Nothing stands between Europe to-day and complete subjugation to communist tyranny but the atomic bomb in American possession." অর্থাৎ 'আমেরিকার কাছে পরমাণু-বোমা আছে বলিয়াই কম্যুনিষ্ট স্বৈরাচারিতা ইউরোপ দখল করিতে পারে নাই।'

মিঃ চার্চ্চিলের দৃষ্টিতে বলশেভিক রাশিয়া ইতিমধ্যেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে এবং ইউরোপে তাহার সৈন্য-সংখ্যা অন্য সকল দেশের একত্রিত সৈন্য-সংখ্যা অপেক্ষাও বেশী। কাজেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, মজুত পরমাণু বোমা নষ্ট করিয়া ফেলিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বমানবের স্বাধীনতা ধ্বংসের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি মিঃ চার্চ্চিলের দৃষ্টিতে বিশ্বমানবের স্বাধীনতার অর্থ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। মিঃ চার্চ্চিলের কূটনীতির একটা প্রধান গুণ এই যে, তিনি সত্য কথা সহজ ভাষায় বলিতে ভালবাসেন। রাশিয়া সম্বন্ধে বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যাহা অন্তরের খাঁটি কথা, মিঃ চার্চ্চিল তাহাই সোজা কথায় বলিয়া ফেলিয়াছেন।

চতুর্থ রিপাবলিকের সঙ্কট—

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ কোয়েল গত ৯ই অক্টোবর এক বেতার বক্তৃতায় ফ্রান্সের বর্ত্তমান ধর্ম্মঘট সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহা বিদ্রোহের আকার ধারণ করিতেছে (assuming the shape of an insurrection)। ফ্রান্সের ধর্ম্মঘটের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে হয় না। শুধু শ্রমিক ধর্ম্মঘট দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি না, তাহাতে অবশ্যই সন্দেহ আছে। কিন্তু পরিণামে উহা যে বিদ্রোহের আকার ধারণ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ৩রা অক্টোবর (১৯৪৮) ফ্রান্সের খনি-মজুররা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে এবং ধর্ম্মঘট শুধু খনি-মজুরদের মধ্যেই আবদ্ধ নাই। ফ্রান্সের খনিগুলি নেশনেলাইজড শিল্প। এই নেশনেলাইজড শিল্পকে যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে পরিচালনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহারই প্রতিবাদে এই ধর্ম্মঘট। মাইনস্ ফেডারেশন কর্তৃক এই ধর্ম্মঘট আহূত হইয়াছে। এই ফেডারেশন কম্যুনিষ্ট-পরিচালিত জেনারেল লেবার কনফেডারেশনের সহিত সংযুক্ত। এই ধর্ম্মঘটের জন্য কম্যুনিষ্টদের উপর যতই দোষারোপ করা যাউক না কেন, দুর্ম্মূল্যতার জন্য ফ্রান্সের শ্রমিকরা যে তাহাদের বর্ত্তমান মজুরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে না, সে-কথাও অনস্বীকার্য্য। ফ্রান্সের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলি অর্থাৎ Force Ouvriere এবং ক্রিশ্চিয়ান ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ধর্ম্মঘট প্রশমনের ব্যাপারে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহাদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহারা শ্রমিকদের ক্রয়শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হওয়া নিরোধের উদ্দেশ্যে মূল্যনিয়ন্ত্রণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিতেছেন না।

কম্যুনিষ্টরা ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর হইতেই ফ্রান্সে এই অশান্ত অবস্থা দেখা দিয়াছে। ফ্রান্সের বর্ত্তমান জাতীয় পরিষদ বিভিন্ন দলের মধ্যে কম্যুনিষ্টরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাদিগকে বাদ দিয়া স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন এবং মূল্যস্ফীতি নিরোধের কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ কিছুতেই সম্ভব নয়। সেই জন্য কম্যুনিষ্ট দলকে পুনরায় গবর্ণমেণ্টে গ্রহণের জন্য একটা আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু জেনারেল দ্য গল হুমকী দিয়া বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের গ্রহণ করা হইলে যে-কোন উপায়েই হউক—বে-আইনী উপায় হইলেও তিনি ক্ষমতা দখল করিবেন। তাঁহার এই হুমকীকে শূন্যগর্ভ বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। দ্য গলের পক্ষে আছে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সেনাবিভাগ এবং উত্তর-আফ্রিকা। আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায়ই জানাইয়াছেন যে, সেনা-বিভাগের অধিনায়কবর্গ জেনারেল দ্য গলের ভ্রমণের সময় মোটর, পেট্রল এবং রক্ষী দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ সাহায্য দান বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সামরিক অধিনায়কবর্গ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

উত্তর-আফ্রিকায় দ্য গলের প্রভাবের কথাও মাঝে-মাঝে শোনা যায়। সম্প্রতি আলজিরিয়ায় দ্য গলের নেতৃত্বে পৃথক্ একটি গবর্ণমেণ্ট গঠনের যে ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই ষড়যন্ত্রের সহিত ১৯৩৬ সালের ফ্রাঙ্কোর ষড়যন্ত্রের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কেনারী দ্বীপপুঞ্জ এবং স্পেনিশ মরোক্কো হইতে জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করিয়াছিলেন। দ্য গল ঐরূপ কোন চেষ্টা করিলে উহার পরিণাম কি হইবে, তাহা অনুমানের বিষয় নয়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ফ্রান্সের ঘটনাবলী কোন্ আকার ধারণ করিবে, তাহাও অনুমান করা কঠিন। ফ্রান্স খনিমজুরদের সহিত সৈন্যদের সংঘর্ষের এবং দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধের পরিণাম সমগ্র ইউরোপে যে সুদূরপ্রসারী হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পশ্চিম-ইউরোপের সেনানীমণ্ডলী—

বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ কর্ত্তৃক স্থায়ী সামরিক প্রতিষ্ঠান গঠন পশ্চিম ইউনিয়ন গঠনের অবশ্যম্ভাবী

পরিণতি। পশ্চিম ইউনিয়ন দেশরক্ষা পরিষদের যে সেনানীমণ্ডলী বা কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারী। পশ্চিম-ইউরোপের স্থলবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন জেনারেল দ্য তাসিঞ (ফ্রান্স)। ভাইস এডমিরাল রবার্ট জ্যাজি (ফ্রান্স) নৌবহর প্রতিনিধি হিসাবে পশ্চিম-ইউরোপের ফ্লাগ-অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং এয়ার মার্শাল স্যার জেমস রব (বৃটেন) নিযুক্ত হইয়াছেন পশ্চিম-ইউরোপের প্রধান বিমান সেনাপতি। বেনেলুক্স দেশত্রয়ের সেনা নায়করা সেনানীমণ্ডলীতে অবস্থান করিবেন মাত্র। যিনি সেনানীমণ্ডলীর চেয়ারম্যান তিনি হইবেন পশ্চিম ইউনিয়নের যৌথ দেশরক্ষা ব্যবস্থার সর্ব্বাধিনায়ক। বৃটেন সর্ব্বাধিনায়কত্বের মর্য্যাদা লাভ করার জন্যই বোধ হয় স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ দেওয়া হইয়াছে ফ্রান্সকে। সর্ব্বাধিনায়কত্বের পদ ছাড়া বৃটেনকে দেওয়া হইয়াছে বিমান বাহিনীর সেনাপতির পদ। পশ্চিম-ইউরোপের জন্য এই সম্মিলিত কম্যাণ্ড গঠিত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্ম্মচারীরা না কি আনন্দিত হইয়াছেন। এই যৌথ দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে অর্থ সাহায্য দিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জল্পনা-কল্পনাও চলিতেছে। আমেরিকা যে অর্থ সাহায্য করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত এই রক্ষা-ব্যবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও যোগদান করিবে। কিন্তু কি ভাবে যোগদান করিবে ইহাই প্রশ্ন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাকে পশ্চিম-ইউরোপের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি আটলাণ্টিক রাষ্ট্র-পরিষদ গঠনের আলোচনাও চলিতেছে। এই সমস্তই যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় মহাযুদ্ধ যে রাশিয়ার সহিত সমস্ত পাশ্চমী রাষ্ট্রের যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হইবে না, সে-কথা স্পষ্ট করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

আয়ারের সমস্যা—

আয়ার এক্সটারনেল এফেয়ারস্ এক্ট বাতিল করিবার জন্য যে আয়োজন করিয়াছে তাহা সম্পন্ন হইলে বৃটেনের সহিত তাহার ক্ষীণ সম্পর্কও আর থাকিবে না। অবশ্য এইরূপ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও বৃটেন ও কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের সহিত তাহার সম্পর্ক বজায় রাখিবার কি ব্যবস্থা করা সম্ভব তাহার জন্য উপায় চিন্তা করা হইতেছে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে মিঃ এটলী এবং কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে উঁহাদের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝায়, সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আয়ারের সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন হইবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সহযোগিতার ফরমূলা যে আবিষ্কৃত হইবে তাহাতেও সন্দেহ নেই। আন্তঃ-আমেরিকা ইউনিয়ন এইরূপ সহযোগিতার একটা দৃষ্টান্ত বটে।

বিভক্ত আয়র্লণ্ডকে আবার জোড়া লাগাইবার জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। বিভাগের পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডে ৩২টি কাউণ্টি ছিল। তন্মধ্যে ২৬টি কাউণ্টি লইয়া পৃথক আয়ার রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ছয়টি কাউণ্টি লইয়া উত্তর-আয়র্লণ্ড গঠিত। এই ছয়টি কাউণ্টি লইয়া সমগ্র আলষ্টার নয়। আলষ্টারের কতক অংশ আয়ারের মধ্যেও পড়িয়াছে। বিভক্ত আয়র্লণ্ড আবার যদি জোড়া লাগে, তাহা হইলে ইতিহাসে এক নূতন ঘটনা সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই।

চীনের ভবিষ্যৎ—

চীনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইশেক বলিয়াছেন, 'কম্যুনিজমই চীনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু'। সামরিক পরিস্থিতি চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যেরূপ প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কম্যুনিজমকে যে তিনি চীনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু বলিয়া মনে করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। গত কয়েক মাস ধরিয়াই কম্যুনিষ্ট আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগ হইতেই এই তীব্রতা বৃদ্ধির নূতন স্তর আরম্ভ হয় এবং মাঞ্চুরিয়ার করিডরে মার্কিণ বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। চীনা জাতীয় সরকারের পক্ষে বড় পরাজয় চীনা কম্যুনিষ্ট ফৌজ কর্ত্তৃক ম্যাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চ্যাংচুন অধিকার। চ্যাংচুনের পতন অপেক্ষাও চীনা জাতীয় সরকারের ৬০তম এবং ৭ম সৈন্যবাহিনীর কম্যুনিষ্টদের নিকট আত্মসমর্পণের গুরুত্ব অনেক বেশী। এই দুইটি সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ চীনা জাতীয় সরকারের সৈন্যবিভাগে যে নৈতিক দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করিবে তাহা-ই হইবে বেশী গুরুতর। চ্যাংচুন পতনের কয়েক দিন পূর্ব্বে শাণ্টং প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলস্থ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর চেফু কম্যুনিষ্টরা দখল করিয়াছে। মুকডেনের পতনও আসন্ন।

চীনের গৃহযুদ্ধের অবস্থা যতটুকু বুঝা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় চীনদেশ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আর বড় বেশী বাকী নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির সত্যিকার অভিপ্রায় কিছুই জানা যায় না। এপর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট অভিযানের গতিপ্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, দক্ষিণে ইয়েলো নদী পর্য্যন্ত অধিকার-বিস্তার করাই তাহাদের অভিপ্রায়। তাহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে চীনদেশের উত্তর অঞ্চল কম্যুনিষ্ট চীন এবং দক্ষিণ অঞ্চল কুয়োমিণ্টাং চীন এই দুই সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে চীনদেশ বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ইহার পরেও উভয় চীনের মধ্যে সংঘর্ষ যে বন্ধ হইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? এ দিকে মার্কিণ রাষ্ট্রে এইরূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছে যে, চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় আর কয়েক মাসের বেশী টিকিবে না।

ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা—

ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বর্ত্তমানে কি রূপ? কম্যুনিষ্টদের অভ্যুত্থানের ফলে একই সময়ে বহু স্থানে যে গোলযোগ দেখা দেয়, ব্রহ্ম সরকার তাহা অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট এবং সুসংবদ্ধ সংবাদ পাওয়া না গেলেও গত আগষ্ট মাসে এবং সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থা যেরূপ অতিশয় গুরুতর হইয়াছিল, তাহা কতক পরিমাণে প্রশমিত করিতে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট যে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করার সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। এই সমস্যার সমাধান করাও বড় সহজ হইবে না। গত ৩০শে আগষ্ট (১৯৪৮) থাটোন জেলায় যে কারেণ বিদ্রোহ সুরু হয় তাহাও দমন করা সম্ভব হইয়াছে। গত ১১ই অক্টোবরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু কারেণ নেশন্যাল ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের সহিত নূতন একটি চুক্তি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কারেণ-বিদ্রোহের মূল কারণ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারেণ-বিদ্রোহের মূলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনা আছে, অনেকেই এইরূপ সন্দেহ

করিয়াছেন। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন যে, কর্ণেল জন ক্রোমারটি টুলক কলিকাতা হইতে এই বিদ্রোহ সংগঠন করেন। লণ্ডন হইতে কর্ণেল টুলক গত ১৩ই অক্টোবর যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, কারেণ-বিদ্রোহের সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান গত আঠার মাস যাবৎ কলিকাতায় রহিয়াছে। তবে তিনিই উহার পরিচালক, এ কথা কর্ণেল টুলক অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কারেণরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে কম্যুনিষ্টদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম-বঙ্গের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত কিরণ-শঙ্কর রায় বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন।

ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থা পরিষদে ভূমি জাতীয় করণ বিল পাশ হওয়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্রহ্মদেশের ভূমি যে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে, তাহা ব্রহ্ম শাসনতন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই না কি এই বিলের বিরোধী। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান আপত্তি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও উহা নির্দ্ধারণের প্রণালী লইয়া। চেট্টিয়ারগণ ব্রহ্মদেশের আবাদী জমিতে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা নিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহারা ভারতীয়। ১৯৪১ সালে ব্রহ্মদেশের ধানের জমির শতকরা ২৫ ভাগ ইঁহাদের দখলে ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের অভিযোগ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র—

ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই বুঝা যাইতেছে না। ডাচ লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর জেনারেল ডাঃ ভ্যানমুকের পদত্যাগ আকস্মিক বটে, কিন্তু তাঁহার পদত্যাগে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের কোন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। হল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বীল ডাঃ ভ্যানমুকের স্থলাভিষিক্ত হওয়াতেও আশা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে বাদ দিয়াই ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে অন্তর্ব্বর্ত্তী ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট গঠনের আয়োজন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শুভেচ্ছা কমিটির কোন আপোষ-প্রস্তাবই হল্যাণ্ড গ্রহণ করে নাই। কাজেই শুভেচ্ছা কমিটির মার্কিণ প্রতিনিধি বর্ত্তমানে মীমাংসার চেষ্টা সম্বন্ধেও কিছু ভরসা করা সম্ভব নয়।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ইন্দোনেশিয়ায় প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের এক অভ্যুত্থান হয়। ডাঃ হাতার গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রায় দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান যে সম্পূর্ণরূপে দমিত হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রকাশ, কম্যুনিষ্ট প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মুসো এবং প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আমীর সরীফুদ্দিন জাভার জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ট্যাণ্ডন অপেক্ষা মাত্র ১৫০ ভোট বেশী পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। ডাঃ পট্টভি পাইয়াছেন ১১৯৭ ভোট এবং শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন পাইয়াছেন ১০৪৭ ভোট। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে ডাঃ পট্টভি পাইয়াছেন ৭২ ভোট এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে ১২১ ভোট। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন পশ্চিমবঙ্গ হইতে পাইয়াছেন ১৮১ ভোট এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে ৩২২ ভোট। এই দুইটি প্রদেশই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মত্যাগ করিয়াছে।

এই নির্ব্বাচনের কথা লিখিতে গিয়া ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে-বার নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিপুল ভোটে হারিয়া গিয়াছিলেন। যে সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত—পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের সুপারিশ ও ক্যানভাসিং সত্ত্বেও ডাঃ পট্টভি এত অধিক ভোটে হারিয়াছিলেন যে তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলাই চলে না। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি এখন কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের হাতে। এই অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট পদের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল ব্যক্তিগত নয়, আদর্শগত পার্থক্য লইয়া। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁহারা গোঁড়া দক্ষিণপন্থী, ডাঃ পট্টভি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বৃহৎ নেতৃত্বের নির্দ্দেশ নির্ব্বিচারে পালন করাই তাঁহার আদর্শ। সুতরাং বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডনকে অনেকে হিন্দুভাবাপন্ন মনে করেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা তাঁহার বিরুদ্ধে। তিনি নির্ব্বাচিত হইলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল তাহা মিথ্যা হইলেও শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন যে ঠিক ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া নহেন, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

আগামী জয়পুর কংগ্রেসে প্রায় ৩৩০০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করিবেন। ইঁহারাই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের ভোটদাতা। ভোটের সংখ্যা দেখিয়া বুঝা যায় যে, প্রতিনিধিরা প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত। এই ভোটদানই তাঁহাদের মতবাদের পরিচায়ক।

কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব বলিতে বর্ত্তমানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, [illegible] বল্লভভাই প্যাটেল এবং সম্ভবতঃ ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকেও বুঝায়। তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারেই কংগ্রেসের সকল কার্য্য পরিচালিত হয়। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদের দলের লোক হওয়া একান্ত প্রয়োজন, [illegible] কংগ্রেসী। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মতভেদ হইলে মুস্কিল। এই কারণে আচার্য্য কৃপালনী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহারও এই অবস্থাই হইত। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া নির্ব্বাচিত হওয়াতে অশোভন মতভেদের আর আশঙ্কা রহিল না। কিন্তু কংগ্রেসের প্রায় অর্দ্ধেক প্রতিনিধি বৃহৎ নেতৃত্বের তথা কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের নীতি সমর্থন করেন না, তাহাও এই নির্ব্বাচনে পরিস্ফুট হইল।

মাহে ও ভারত সরকার

ভারতের অন্যতম ফরাসী উপনিবেশ মাহেতে জনসাধারণ ফরাসী সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবার পর শাসন-ভার ভারত সরকারকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে এখনও অগ্রসর হন নাই। নিরপেক্ষতার হেতু বোধ হয় আন্তর্জ্জাতিক নীতি। ইউ, এন, ও, বড় জোর গণভোটের কথা তুলিতে পারেন। কিন্তু যেখানে জনসাধারণ কোন সরকারকে চাহে না, এবং গণ-বিদ্রোহের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়, সেখানে নূতন করিয়া গণভোটের আবশ্যকতা কোথায়? ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা কি মিথ্যা প্রচার করিবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে গিয়া যদি ভারত সরকার ও নেতারা জনসাধারণের ইচ্ছার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করেন, তবে দেশ শাসন করাই তো অসম্ভব হইয়া পড়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ সংগ্রাম করিতেছেন। আজ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ যে সংগ্রাম চালাইতেছেন তাহার মর্য্যাদা না দেওয়ার অর্থ সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন করা।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ

মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ সম্পর্কে ঘোষণার গোড়াতেই সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"প্রথমতঃ, গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, যোগ্যতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরকারী ব্যয় হ্রাস করার সর্ব্ববিধ চেষ্টা করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যমূল্য আর যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, সে জন্য সমবেত ভাবে অবিলম্বে চেষ্টা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব দ্রব্যমূল্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে হ্রাস করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।" তিনটি উদ্দেশ্যই সাধু, কিন্তু কেমন করিয়া এগুলি কার্য্যে পরিণত করা হইবে তাহাই প্রশ্ন। বড় বড় সরকারী নেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইয়া, পুলিশের জন্য খরচের বহর কমাইয়া গভর্ণমেণ্ট যদি ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা পাইতেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন কথা চিন্তা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের লইয়া যে কমিটি গঠিত হইবে, তাঁহারা বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলির মধ্যে কোনটি আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে, তাহাই

বিবেচনা করিবেন। ইহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের জন্ত কোন অর্থ সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ এই দুইটি পরিকল্পনা মুদ্রাস্ফীতি রোধের দোহাই দিয়া শেষ অবধি ধামা-চাপা দেওয়া হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। এক কথায় মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ ও ব্যয়-সঙ্কোচ মানে জনসাধারণের কল্যাণকর ব্যবস্থাগুলিকে বলি দেওয়া। "টপহেভী" সরকারের প্রকৃত অপব্যয় নিবারণ নহে। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাদের নিজেদের হাতে!

সরকারী আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কৃষি আয়কর বসাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উত্তরাধিকার বিলের আলোচনা দ্রুত শেষ করিবার কথা বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত মুনাফাকরের যে অংশ সরকারের নিকট জমা আছে এবং যে অংশ প্রত্যর্পণ করিবার সময় হইয়াছে, তাহা আরও তিন বৎসর প্রত্যর্পণ না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সঙ্গে অল্প সঞ্চয় আন্দোলন জোরদার এবং লোভনীয় করিবার জন্ত পোষ্ট অফিস মারফৎ অধিকতর সুবিধা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সরকার বলিয়াছেন,—"কল-কারখানার ক্ষয়পূরণ ফাণ্ডকে আরও অধিক পরিমাণে আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়কর দিতে হইবে না। কাঁচা মাল ও যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাস করা হইবে। যাঁহারা যন্ত্রপাতি আনিবেন, তাঁহাদের অতিরিক্ত মুনাফা-কর প্রত্যর্পণ করিতে আপত্তি থাকিবে না।" যখন বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্ত সরকারী আয় বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক, ঠিক সেই সময় দেশের ধনিক শ্রেণীকে তোষণ করিবার জন্ত ভারত সরকার এই ভাবে আয়ের পথ রুদ্ধ করিতে বসিয়াছেন।

অল্পবিত্তদের ধনসঞ্চয়ের যে পরিকল্পনা ভারত সরকার করিয়াছেন, তাহাতে সরকারী তহবিল খুব বেশী পূর্ণ হইবে না। সরকারী ঋণ-ভাণ্ডার চিরকাল ধনিক শ্রেণীর প্রদত্ত অর্থেই পূর্ণ হয়, আর ঠিক এই জন্তই ধনীরা গত বার অসহযোগিতা করায় সরকারী ঋণের পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গিয়াছিল। মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্ত সরকার কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির কথাই ভাবিয়াছেন, এবং উৎসাহ দিবার জন্ত আয়কর হ্রাসের ঘুষ দিয়া শিল্পপতিদের তুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কেবল উৎপাদন বৃদ্ধি হইলেই মূল্য কমে না। বস্তুত পক্ষে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির জন্ত দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও পাইকারী ব্যবসায়ী দল যে দায়ী, এ সত্য অত্যন্ত নির্ম্মম ভাবে গত এক বৎসরে প্রমাণিত হইয়া গেলেও ভারত সরকার তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই। ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, কেরোসিন, লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতির উন্নততর বণ্টন ব্যবস্থা করা হইবে এবং চিনির মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। কিন্তু এই তথাকথিত বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বিশেষ লাভ হইবে কি? এই ব্যবস্থার পাশাপাশি চোরাকারবার অবাধেই চলিতে থাকে, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। মূল্যবৃদ্ধির পাপ-চক্রও রোধ হইবে না। আসল কথা, জিনিষপত্রের উৎপাদনের যন্ত্রগুলির উপর যত দিন একচেটিয়া কারবারীদের কর্তৃত্ব থাকিবে, তত দিন উৎপাদনের হিসাব কম দেখাইয়া নিয়ন্ত্রণকে প্রহসনে পরিণত করিতে এবং চোরা-কারবারে অধিক লাভ করিতে তাহারা কসুর করিবে না। দেখা যাইতেছে, মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্ত শিল্পপতিরা যে সুপারিশ করিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহাই গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের স্বার্থ একেবারেই ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছেন।

বাস্তুহারা

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা যে দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছেন তাহা সকলেই জানেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা যে কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িতেছেন তাহাও বলিবার প্রয়োজন নাই। নিজ বাস্তুভিটা কেহ সখ করিয়া ছাড়িয়া আসে না—শত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রাণপণে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। নেহাৎ নিরুপায় হইলেই বাস্তুত্যাগ করে। এই কারণ যে কি তাহার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যখন কেহ এই সত্যকে ধামা-চাপা দিবার চেষ্টা করে তখন সত্যই অসহনীয় লাগে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা মৌলানা আক্রাম খাঁর মতে সেখানকার হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছেন না। ইহা কেবল হিন্দু নেতাদের প্রচার-কার্য্যের নাটকীয় অতিরঞ্জন। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-বালিকাদের জোর করিয়া অন্ত সম্প্রদায়ের যুবকদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, মৌলানা সাহেব তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঢাকা ও অন্যান্ত স্থানে হিন্দুদের গৃহে যে সকল খানাতল্লাস হইয়াছে, মৌলানার দৃষ্টিতে তাহাও নাটকীয় অতিরঞ্জন। মানুষ নিজের মাপকাটি দিয়াই সকলকে বিচার করে। তাহা না হইলে এই সকল ঘটনার পরও তিনি বলিতে পারেন যে, হিন্দুরা তথায় অত্যন্ত সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছে। বাস্তুত্যাগ করার কথা প্রচার-কার্য্যের নাটকীয় অতিরঞ্জন মাত্র। এবার পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের পূজা যেরূপ শান্তিপূর্ণ ভাবে হইয়াছে, বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে কখনও তাহা হয় নাই। অথচ আমরা জানি, শতকরা আশীটা পূজা বন্ধ ছিল এবং পূজার আমোদ-আহ্লাদ, আনন্দ-উৎসব কিছুই হয় নাই। শিয়ালদহ ষ্টেশনে আগত পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীরা যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহা করুণ ও মর্ম্মান্তিক। সরকারী বিবৃতি বরং কমাইয়াই [illegible] হয়। অতিরঞ্জন তাহাতে একেবারেই থাকে না।

এই প্রসঙ্গে মিঃ সামসুদ্দীন আমেদের বিবৃতির কথাও আমরা স্মরণ না করিয়া পারি না। তাঁহার মতে চাউল, কাপড় এবং অন্যান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির জন্ত হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। মুসলিম লীগ, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং বর্ত্তমানে আনছার-বাহিনী পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে যে ভীতি সঞ্চার করিতেছে সে কথা উল্লেখ করা তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মিঃ সামসুদ্দীন আহমদ পূর্ব্বে জাতীয়তাবাদী ছিলেন। সেই জন্তই তিনি এখন নূতন লীগপন্থী হইয়া উগ্র আকার ধারণ করিয়াছেন। তবুও তিনি মৌলানা সাহেবের মত নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণ এবং হিন্দু নেতাদের উপর দায়িত্বহীন উক্তির দোষারোপ করেন নাই। মৌলানা সাহেব লীগ নেতাদের মধ্যে উগ্রতম এবং হিন্দুবিদ্বেষে ভরপুর। বোধ হয়, পূর্ব্বে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দু গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] ছিলেন বলিয়াই এই প্রতিক্রিয়া।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অর্থ ও শিল্পসচিব চৌধুরী হামিদুল হক

বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে এক জনও পশ্চিমবঙ্গে আসেন নাই। তবে জীবিকার সন্ধানে কেহ কেহ আসিয়া থাকিতে পারেন। কলিকাতার পথে-ঘাটে যাহাদের দেখি, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাঁহারা ভীড় করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা কি সকলেই মায়া মাত্র, বাস্তব অস্তিত্ব নাই? যাঁহারা সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে জমায়েৎ হইয়াছেন, তাঁহারা কি পশ্চিমবঙ্গেরই লোক? পূর্ব্ব-পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টের দুর্নাম রটাইবার জন্যই কি এইরূপ করিতেছেন? দুই-তিন বৎসরের শিশু-সন্তান কোলে যে সকল স্ত্রীলোক শিয়ালদহ ষ্টেশনে বসিয়া আছেন, তাঁহারা কি নিজের ও সন্তানদের চাকুরীর সন্ধানে এখানে আসিয়াছেন? এই ধরণের প্রলাপ উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করাও লজ্জার বিষয়। পূর্ব্ব-পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট বাস্তুহারাদের কথা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু আমরা তো পারি না। চোখের সামনে আশ্রয়প্রার্থীদের দুরবস্থা দেখিতেছি। ভারত সরকার কি করিতেছেন তাহাই বিবেচ্য। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস যখন ভারত বিভক্তি মানিয়া লইয়াছে তখন পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের পক্ষে সোজাসুজি পাকিস্থানী বনিয়া গিয়া সেখানকার মুসলমানদের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পাশাপাশি বাস করাই যুক্তিসঙ্গত, পাকিস্থানী কর্ত্তৃপক্ষের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বশতঃ আপাতত যদি হিন্দুদের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা নীরবে সহ্য করিতে হইবে। আজ না হয় কাল সেই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা উদারতায় পরিণত হইতে বাধ্য। মোট কথা, পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিও না। রাজকোষ শূন্য। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি লইয়া আমরা ভয়ানক ব্যস্ত। এই সকল তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আমাদের বিরক্ত ও বিব্রত করিও না।

সরকারের এই বিবৃতিতেই কি সমস্যার সমাধান হইয়া গেল? কোন সাহসে হিন্দুরা সেখানে থাকিবেন? পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু নেতারা যদি প্রথমেই রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া হাজির না হইতেন, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ আপনাদিগকে এত অসহায় বোধ করিতেন না। ভারত সরকার পাকিস্থানী গভর্ণমেণ্টের সহিত জনগণকে ভুলাইবার জন্য একটা আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তি করিলেন বটে, কিন্তু পাকিস্থানী গভর্ণমেণ্ট তাহার এক কানা কড়িও মূল্য দিল না। ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দিল।

তাহা হইলে উপায়? পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে বাস অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের জন্য স্থানাভাব। রাজকোষে অর্থাভাব। এই সমস্যার কি কোন সমাধানই নাই? চুক্তি যুক্তি কিছুতেই সুফল হয় নাই। পাকিস্থানে যদি হিন্দুদের স্থান না হয় তাহা হইলে সর্ব্ব সঙ্কোচ দূর করিয়া পাকিস্থানের কিয়দংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী ভারত গভর্ণমেণ্টকে উত্থাপন করিতে হইবে।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অগ্নিকাণ্ড

কলিকাতার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অকস্মাৎ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের [illegible] ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাময়িক অচল অবস্থার সৃষ্টির উপক্রম হইয়াছে, তাহা নহে, ভবিষ্যতে টেলিফোন সংখ্যা বৃদ্ধির এবং টেলিফোন ব্যবস্থাকে উন্নত করিবার পরিকল্পনাও অনেক অংশে ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৭০০ টেলিফোন কনেকসান ভস্মীভূত হইয়াছে, ৫০ লক্ষ হইতে কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য টেলিফোন বন্ধ হওয়াতে নিদারুণ অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছে। এমন কি, কেন্দ্রীয় পুলিশ-ঘাঁটি লালবাজারও টেলিফোন যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন। ক্ষয়-ক্ষতি ও অসুবিধার পরিমাণ এই সামান্য বিবরণ হইতেই অনুমান করা যায়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ কি, তাহা এখনও জানা যায় নাই। সমস্ত ক্ষতি-পূরণ করিতে না কি দুই তিন বৎসর সময় লাগিবে। যাহাই হোক, এত বড় একটা দুর্ঘটনায় কোন প্রাণহানি ঘটে নাই, ইহাই সুসংবাদ।

পাকিস্থানীদের সীমান্তে হানা

কেবল মাত্র ভারতীয় ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তে গণ্ডগোল করিয়াই যে পাকিস্তান বীরবৃন্দ তুষ্ট নহেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিছু দিন ধরিয়া পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চিম-পাকিস্থান হইতে পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের উপর হানা দিতেছিল। এবার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তাহারা আসামের উপর হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই হানাদারদের কাজ শুধু সীমান্তের অপর পারে নীরিহ অধিবাসীদের উপর গুলীচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা ভারতের অধিবাসীদিগকে পাকিস্থানেও টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এই ভাবে হানাদারী চালাইবার সঙ্গে অনেক পাকিস্থানী লীগভক্ত আসামের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কাশ্মীর সংগ্রামের এক বৎসর

পাকিস্তানের অনুপ্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় আক্রমণকারী বিভিন্ন দল ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর কাশ্মীর ও জম্মু সীমান্ত পার হইয়া একাধিক স্থানে আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য শ্রীনগর অধিকার করিবার জন্য আক্রমণকারী দলের প্রধান বাহিনী ডোমেল-বারামুলা রাস্তা ধরিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। আক্রমণকারীরা শ্রীনগরের পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র মহরা নামক স্থানটি অধিকার করিয়া লইল এবং রাজধানী শ্রীনগরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করিল। এইবার বারামুলা ও শ্রীনগরের পতনের আশঙ্কা দেখা দিল। ২৫শে অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা ভারত সরকারের নিকট সামরিক সাহায্য চাহিয়া এবং ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে চাহিয়া এক জরুরী আবেদন প্রেরণ করিলেন। পরবর্তী দিবস মহারাজা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং ভারত সরকার শ্রীনগরে সৈন্য পাঠাইবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৭শে অক্টোবর লেঃ কর্ণেল ডি আর রায়ের অধীনে তিন কোম্পানী সৈন্যসহ এক দল সৈন্য বিমানযোগে শ্রীনগর গমন করে। শ্রীনগর পৌঁছিয়া কর্ণেল রায় উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন তাহাকে তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ততক্ষণ শত্রু বারামুলা পৌঁছিয়া গিয়াছে। উহা সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইতে পারিলে সমগ্র শ্রীনগর উপত্যকা শত্রুর নিকট উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। শত্রু যদি একবার শ্রীনগর উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারে, তবে সব শেষ হইয়া যাইবে। তিনি স্থ

এক কোম্পানী সৈন্য লইয়া বারামুলায় শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি পশ্চাৎভাগ রক্ষার জন্য এক কোম্পানী এবং বিমান-ঘাঁটি পাহারা দিবার জন্য আর এক কোম্পানী সৈন্য রাখিয়া গেলেন। কর্ণেল রায়ের আক্রমণের ফলে শত্রু ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল—কর্ণেল রায়ের সৈন্যদলেও বহু হতাহত হইল। অবশেষে শত্রু-সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের দরুণ কর্ণেল রায় পর্য্যুদস্ত ও স্বয়ং নিহত হইলেন। আক্রমণকারীরা পুনরায় সুগঠিত হইবার পূর্ব্বেই পর্য্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য বিমানযোগে শ্রীনগর প্রেরিত হইল। প্রথম ভারতীয় সৈন্যদল শ্রীনগর অবতরণ করিবার দ্বাদশ দিন পরে ৭ই নভেম্বর প্রত্যূষে ভারতীয় সৈন্যদল আক্রমণাত্মক অংশ গ্রহণ করিল। শ্রীনগর হইতে মাত্র ৪ মাইল দূরে শত্রু-সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। ১২ ঘণ্টা পর শত্রুদল বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিল। ৮ই নভেম্বর অপরাহ্নে শ্রীনগর উপত্যকার প্রবেশ-পথ বারামুলা পুনর্দখল করিয়া শ্রীনগর নিরাপদ করা হইল। ১৪ই নভেম্বরের মধ্যে শত্রুদলকে তাড়া করিয়া শ্রীনগরের ৬৫ মাইল দূরে উরি পর্য্যন্ত বিতাড়িত করা হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ১২ মাস পরে আজও শত্রু সেখানেই আছে—তাহার অগ্রসরের সকল প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে সুদূর উত্তরাঞ্চলে গিলগিট নামক স্থানে পাকিস্তানী-ভাবাপন্ন আক্রমণকারিগণ সেখানকার শাসন-কর্ত্তাকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা চালু করে। প্রায় ছয় মাস কাল শ্রীনগর হইতে ঐ স্থানে যাতায়াত করা চলিত না। আবহাওয়া ভাল থাকিলে কেবল মাত্র খচ্চরের সাহায্যেই ঐ স্থানে যাতায়াত করা চলিত। ভারতীয় সৈন্যগণ পূর্ব্ব হইতে কাশ্মীর ও জম্মুতে ব্যস্ত ছিল। তাহারা গিলগিট একেবারে ছাড়িয়া আসিবার সিদ্ধান্ত করে। হানাদারগণ উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত বালটিস্তানে সামরিক অভিযান চালাইবার জন্য গিলগিট স্থানটিকে সামরিক কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলে। গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের সৈন্যগণ নৌশেরা হইতে সংগ্রাম চালাইয়া কট ও কামান গোশাগালা নামক শত্রুদের দুইটি সুরক্ষিত ঘাঁটা দখল করে। উহার পাঁচ দিন পরে কাশ্মীরের বৃহত্তম সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শত্রুগণ ৬ হাজার সৈন্য লইয়া নৌশেরার উপর তিন দিক্ দিয়া আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করে। সে সময় পরলোকগত ব্রিগেডিয়ার ওসমান ভারতীয় সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তার পর হানাদারদের দৃষ্টি সুচেতগড়, রণবীর সিংপুরা ও সম্বকঠুয়ার উপর পতিত হয়। তাহারা পাঠানকোট-জম্মু রাস্তায় আমাদের সরবরাহ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী তৎপরতার সহিত আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করায় এই আপদ বিদূরিত হইয়া যায়। ভারতীয় সৈন্যগণ ১৮ই মার্চ্চ তারিখে নৌশেরায় সাফল্য লাভ করিবার পর ঝানগড় পুনরধিকার করে।

গ্রীষ্মকালে বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে উরি এলাকায় যুদ্ধের গতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন উরি-মহুয়া রাস্তার উত্তর ও দক্ষিণের অবরুদ্ধ অঞ্চল হইতে শত্রুদিগকে বিতাড়িত করাই আমাদের সৈন্যদের প্রধান কার্য্য ছিল। সালামবাদ হইতে প্রথমে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়। তার পর ভারতীয় সৈন্য গ্রীষ্মকালীন অভিযান আরম্ভ করে। হাণ্ডওয়ারা হইতে অভিযান আরম্ভ হয়। উহার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এক দল সৈন্য টিথোয়াল অধিকার করে। আর এক দল সৈন্য উরি হইতে ডোমেল রোড ধরিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শত্রুদের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও আমাদের সৈন্য গত ১২ই এপ্রিল তারিখে রাজৌরী অধিকার করে। রাজৌরীর পূর্ব্ব দিকে তিনটি বড় বড় গর্ত্তে তাহারা বহু অমুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদের মৃতদেহ আবিষ্কার করে। যাহারা পঙ্গু অবস্থায় কোন প্রকারে বাঁচিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে হানাদারদের অত্যাচারের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। পুঞ্চ এলাকায় ভারতীয় সৈন্যগণ তাহাদের অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া লইয়া শত্রুদিগকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। পুঞ্চ সহরের খাদ্য-সমস্যা দূর করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্যগণ নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সে সময় ঐ সহরে বহু আশ্রয়প্রার্থী ছিল। কাশ্মীর উপত্যকার চারি দিকে ভারতীয় সৈন্যের লৌহচক্র ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া হানাদারগণ লাডাক নামক বৌদ্ধ প্রদেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। যাইবার পথে তাহারা বহু বৌদ্ধ বিহার অপবিত্র ও লুণ্ঠন করিয়া যায়। তাহারা স্কার্দুতে ১৪ই আগষ্ট তারিখে রাজ্যের সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করে এবং লে অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ভারতীয় বাহিনী তৎক্ষণাৎ রাজ্যের সৈন্য-বাহিনীর সহিত মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত করে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম ভারতীয় সৈন্যদল লে সহরে প্রবেশ করে। জুন মাসে রাজকীয় ভারতীয় বিমান বাহিনী হিমালয় অঞ্চলের ২৩ হাজার ফুট উপর দিয়া উড়িয়া লে সহরে অবতরণ করে।

গত জুলাই মাসের প্রথমে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাশ্মীর কমিশন ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। যাহাতে অবস্থা-সঙ্কট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিশনের সদস্যগণ ভারত ও পাকিস্তানের গভর্ণমেণ্টদিগকে অনুরোধ করেন। পাকিস্তান তাঁহাদের অনুরোধে কর্ণপাত করে নাই। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আবেদনে সাড়া দেন। শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] প্রদেশে প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়। পুঞ্চের চতুর্দ্দিকে বাগ ও মীরপুরে শত্রু আক্রমণের জন্য মরিয়া হইয়া প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে সমুচিত অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য ভারতীয় বাহিনীও প্রস্তুত [illegible]

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র দৈনিক বসুমতীর প্রবেশ নিষিদ্ধ

পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, পূর্ব্ববঙ্গ সরকার গত ২১শে অক্টোবর হইতে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র 'দৈনিক বসুমতী'র প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, জন-নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ সরকার পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা সাপ্তাহিক "নয়া দুনিয়া"র প্রবেশও গত ২১শে অক্টোবর হইতে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... বিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।